"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩৫

১ম সংখ্যা

বিজয়ী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ,
বন্দীরা পেলো ছাড়া।
দিগন্ত হ'তে শুনি' তব সুর
মাটি ভেদ করি' উঠে অঙ্কুর,
কারাগারে দিলো নাড়া।
জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে যে নবীনেরা জানে,
দলে দলে আসে আমের মুকুল
বনে বনে দেয় সাড়া॥

কিশলয়-দল হোলো চঞ্চল,
উতল প্রাণের কল-কোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে

মুক্তির গানে কাঁপে চারিধার,
কাণা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার
আজ গেলো সব টুটে।
মরু-যাত্রার পাথেয়-অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারিভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জন-গীতে
জাগে মৌমাছি-পাড়া॥

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,
কেন সুকুমার বেশ?
মৃত্যুদমন শৌর্য্য আপন
কি মায়ামন্ত্রে করিলে গোপন,
তূণ তব নিঃশেষ।
বর্ম্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয় বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের

জড় দৈত্যের সাথে অনিবার
চির সংগ্রাম ঘোষণা তোমার
লিখিছ ধূলির পটে,
মনোহর রঙে লিপি ভূমিতলে
যুদ্ধের বাণী বিস্তারি' চলে
সিন্ধুর তটে তটে।
হে অজেয়, তব রণভূমি 'পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণ বায়ু মর্ম্মর স্বরে
বাজায় কাড়া নাকাড়া॥

দোলপূর্ণিমা
১৩৩৪

বাসন্তী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

বরযাত্রা

আজি পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে,
সে যে চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন দূর হ'তে দুর্দ্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে॥
কার পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
মৃদু বাতাসে সুগন্ধের বাজায় বাঁশি।
বুঝি ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর, অম্বরে ছড়ায়ে হাসি॥
নব অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিলো সব তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
আজি মধুকর-গুঞ্জিত
কিশলয়-পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া॥
ধরা কিংশুক কুঙ্কুমে বসিল সেজে,
তার কঙ্কণ কিঙ্কিণী উঠিল বেজে।
কত ইঙ্গিতে সঙ্গীতে
নৃত্যের ভঙ্গীতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে॥

(২)

রূপান্তর

চাঁদেরে করিতে বন্দী
মেঘ করে অভিসন্ধি;
চাঁদ বাজাইল মায়া-শঙ্খ।

মন্ত্রে কালী হোলো গত,
জ্যোৎস্নার ফেনার মতো
মেঘ ভেসে চলে অকলঙ্ক ॥

(৩)

ঝরা পাতা

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে ;
অনেক হাসি অনেক আঁখি-জলে
ঘনিয়ে এলো আমার ইতিহাস,
কাঁপায়ে দিয়া আমার হিয়া-তলে
ফাগুন দিলো চরম নিঃশ্বাস।
ঝরা পাতা গো, বাসন্তী রং দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ ?
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে।
আমিও যাবো খেলার হাসি নিয়ে
যাবার বেলা অমনি অনায়াসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী,
আগুন রঙে দিয়ো রঙীন করি,'
সন্ধ্যা-আভা লাগাক্ তারি ছোঁওয়া
প্রাণের মম শেষের সম্বলে।
ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে ॥

(৪)

মুক্তি

বসন্তের আসরে ঝড়
ঐ বুঝি বা আসে।
মুকুল সে তো জানে না ডর,
কচি পাতা সে হাসে।

কেবল জানে জীর্ণ পাতা
　　ঝড়ের পরিচয় ;
ঝড় তো তারি মুক্তি-দাতা,
　　তারি বা কেন ভয় ?

(৫)

পাড়ি

নিবিড় অমা-তিমির হ'তে
বাহির হোলো জোয়ার-স্রোতে
　　শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
সাজাল ডাঙ্গা অমরা-কূলে
　　আলোর মালা চামেলি-বরণী।
তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
　　নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে
পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
　　ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী॥

(৬)

মাধবী

বসন্তের জয়-রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
　　মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলের বন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে,
　　ছাড়িল সকল ভয় লজ্জা।
চির পথিকের লাগি'
নিশি নিশি রহে জাগি' ;
　　দিনে দিনে ভরি' তুলে অর্ঘ্য।

কাননের একভিতে
আপনার প্রাণটিতে
রচি' রাখে মাধুরীর স্বর্গ।
ফাল্গুন পবন-রথে
যখন বনের পথে
জাগালো মর্ম্মর কলছন্দ
মাধবী সকল ঢেলে
আপনারে দিল ফেলে
বাকি না রাখিল রূপগন্ধ॥

(৭)

শাল

ক্লান্ত যখন আম্র-কলির কাল,
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
মঞ্জরী-বনে তখন তুমি হে শাল
বসন্তে করো ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি' দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্ত বেলায় অঞ্চল যবে শূন্য।
বনসভাতলে সবার উপরে তুমি,
সবার পিছনে তোমার দানের পুণ্য॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দোলপূর্ণিমা
১৩৩৪

নারিকেল

সমুদ্রের কূল হ'তে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে
নিঃসঙ্গ প্রবাস তব, নারিকেল,—দিনরাত্রি কাটে
যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় বুঝিতে পারো না তাহা নিজে।
দিগন্তেরে অতিক্রমি' দেখিতে চাহিছ তুমি কি যে
দীর্ঘ করি' দেহ তব, মজ্জায় রয়েছে তার স্মৃতি
গূঢ় হ'য়ে। মাটির গভীরে যে রস খুঁজিছ নিতি

কি স্বাদ পাও না তাহে, অন্নে তার কি অভাব আছে,
তাই যে শিকড় উপবাসী কাঁদে ধরণীর কাছে।
আকাশে রয়েছ চেয়ে রাত্রিদিন কিসের প্রত্যাশে
বাক্যহারা। বারবার শূন্য হ'তে ফিরে ফিরে আসে
তোমারি সন্ধানরূপী সন্ধ্যাবেলাকার শ্রান্ত পাখী
লম্বিত শাখায় তব।
ঐ শুন উঠিয়াছে ডাকি'
বসন্তের প্রথম কোকিল। সে বাণী কি এলো প্রাণে
দক্ষিণ পবন হ'তে, যে বাণী সমুদ্র শুধু জানে;
পৃথিবীর কূলে কূলে যে বাণী গম্ভীর আন্দোলনে
বধির মাটির সুপ্তি কাঁপায়ে তুলিছে প্রতিক্ষণে
অশান্ত-তরঙ্গ-মন্দ্রে, দক্ষিণ সাগর হ'তে একি
তাণ্ডব নৃত্যের স্পর্শ শাখার হিল্লোলে তব দেখি
মুহুর্মুহু চঞ্চলিত?
রুদ্র ডমরুর জাগরণী
পল্লব-মর্ম্মরে তব পেয়েছে কি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি?
কান পেতে ছিলে তুমি,— হে বিরহী, বসন্তে কি আজি
সুদূর বন্ধুর বার্ত্তা অন্তরে উঠিল তব বাজি,—
যে বন্ধুর মহাগানে একদিন সূর্য্যের আলোতে
রোমাঞ্চিয়া বাহিরিলে, প্রাণ-যাত্রা, অন্ধকার হ'তে?
আজি কি পেয়েছ ফিরে প্রাণের পরশ হর্ষ সেই
যুগারম্ভ প্রভাতের আদি উৎসবের?—নিমেষেই
অবসাদ দূরে গেলো, জীবনের বিজয়-পতাকা
আবার চঞ্চল হোলো নীলাম্বরে, খুলে গেলো ঢাকা,
খুঁজে পেলে, যে আশ্বাস অন্তরে কহিছে রাত্রিদিন—
"প্রাণ তীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন॥"

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লর্ড সিংহ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তরের দিক থেকে সব মানুষকে দেখ্‌বার সুযোগ ঘটে ওঠে না। সে-অবস্থায় মানুষটি বড়ো কি ছোট তার বিচার করি মতের মিলের মাপকাঠি দিয়ে। যার সঙ্গে আমাদের মতের অনৈক্য তার সম্বন্ধে আমাদের মন কৃপণ। দলের লোককে পুরস্কার দেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, কেন না সে পুরস্কারের গৌরব অনেকখানি নিজের উপর এসে পৌছয়।

অন্তরের দিক থেকে সব মানুষকে যে আমরা দেখ্‌তে পাইনে তার প্রধান কারণ এ নয় যে, কাউকে কাছে থেকে দেখ্‌বার অবকাশ সাধারণত ঘটে না। অনেক ক্ষেত্রেই অন্তরের মানুষটি দেখ্‌বার মত মানুষ নয়। দলের মধ্যে যে মানুষ কোনো প্রধান স্থান পেয়েছে সমস্ত দলের কাঁধের উপর চ'ড়ে সে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, কিন্তু অন্তরের মানুষ একা, যদি সে আপন মহিমাতেই দেখা দিল তবেই তাকে দেখা যায়। সেই পরিচয়ে কেবল মাত্র দলের লোকের চেয়েও তাকে অনেক বেশি সত্য ব'লে জানি, আত্মীয় ব'লে জানি।

লর্ড সিংহকে দৈবক্রমে কিছুদিন নিয়ত কাছে দেখ্‌তে পেয়েছি। গতবারে য়ুরোপ মহাদেশ ভ্রমণ কর্‌বার সময় তাঁর সঙ্গলাভ কর্‌বার সুযোগ ঘটেছিল। ইংলণ্ড থেকে আমরা একত্র যাত্রা করেছি নরোয়েতে। তিন দিন লেগে-ছিল পাড়ি দিতে—এই তিন দিন ধ'রে উত্তর সমুদ্র ঝড়ে তোলপাড়। ছোট জাহাজের ঝাঁকানি একেবারে অসহ্য, শোওয়া বসা দাঁড়ানো সমস্তই দুঃসাধ্য। ক্যাবিন থেকে এক মুহূর্ত্ত বাইরে বেরোতে আমার সাহস হয়নি। সেই সময়ে প্রতিদিন প্রসন্নমুখে তিনি আমার খবর নিয়েছেন। কাজটা একটুমাত্র সহজ ছিল না—চল্‌তে গিয়ে তিনি সিঁড়ির উপর আছাড় খেয়েছেন, তবু এই কঠিন দুর্য্যোগে বিশেষ কষ্ট ক'রে তিনি যে দেখা দিয়ে যেতেন সে তাঁর অকৃত্রিম স'হৃদয়তার গুণে। সকল অবস্থাতেই তাঁর মধ্যে যে সৌজন্য দেখেছি সে আচারগত নয়, সে হৃদয়গত। এই কারণে এই সৌজন্য তাঁর একটি শক্তির অঙ্গ ছিল। এই শক্তিতে তিনি সহজে সর্ব্বত্র প্রবেশাধিকার পেতেন। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখ্‌তে পেলেম নরোয়েতে যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো সে পরিচয়ে অনায়াসে তিনি তাঁদের হৃদ্যতা লাভ কর্‌লেন,—এই জিনিষটি সম্মানলাভের চেয়েও দুর্লভ। তিনি যে পদবী পেয়েছিলেন য়ুরোপীয় সমাজে সে পদবীর মূল্য যথেষ্ট বেশি। কিন্তু ঐ পদবীর আড়ম্বর কর্‌তে তাঁকে একদিনও দেখিনি। আমরা একত্রে সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্ম্মানি ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এই পদবী-গৌরবের লেশমাত্র চাঞ্চল্য, এই পদবীটাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে সকলের অগ্রসর হয়ে চল্‌বার চেষ্টা আমি কোথাও তাঁর মধ্যে একদিনের জন্যও অনুভব করিনি। যে আভিজাত্যের অভাবনীয় অধিকার তিনি পেয়েছিলেন সেই অধিকার যেন তাঁর নূতন পাওয়া সামগ্রী নয়, সে যেন তাঁর সহজাত। তাতে ক'রে তাঁর স্বাভাবিক নম্রতাকে একটুমাত্র আবৃত করেনি। এর থেকে একটি জিনিষ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেছিলুম, লর্ড সিংহ আপন স্বভাবে অত্যন্ত সত্য ছিলেন। বাইরের কিছুতেই এর থেকে তাঁকে বিচলিত কর্‌তে পারেনি। দশের অনুবৃত্তি করা, ভিড়ের ঠেলায় চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই কারণেই তাঁর মধ্যে সম্মানের চাঞ্চল্য দেখিনি, এই কারণেই লোকমুখের বাহবাতেও তিনি অলুব্ধ ছিলেন।

স্বভাবে তাঁর এই যে প্রতিষ্ঠা এর মধ্যে অন্ধ জেদের রূপ ছিল না, তার কারণ তাঁর বুদ্ধির অসামান্য স্বচ্ছতা। বরাবর নিজের পথ তিনি বিচার ক'রেই স্থির করেছিলেন, ঝোঁকের মাথায় করেননি। যে কয়দিন একত্রে ছিলাম, তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা কর্‌বার অবকাশ ঘটেছিল। এ'সব আলোচনায় যেটা আমি বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করেছি সে হচ্ছে তাঁর চিত্তের শান্ত ভাব। তিনি যা বুঝ্‌তেন বুদ্ধির আলোকে সে তিনি স্পষ্ট ক'রে বুঝতেন, এইজন্যে তার মধ্যে তাঁর এমন শান্তি ছিল। গোঁড়ামির মধ্যে এ শান্তি থাকে না। তাঁর

চিন্তার মধ্যে এই অনুদ্বৃত্ত শান্তি থাকাতেই আলোচনাকালে তাঁর মতকে স্বীকার ক'রে নেওয়া সহজ ছিল। জেদ ও গোঁড়ামির বন্ধুরতা যেখানে নেই সেখানে এক মনের সঙ্গে আর-এক মনের চিন্তা চলাচলের পথ সুগম হয় মতের অমিল থাক্‌লেও।

তাঁর সঙ্গে ভ্রমণকালে বারবার আমার এই কথাটি মনে হয়েছে, যে, তিনি তাঁর নাম সার্থক করেছেন, সত্য এবং প্রসন্নতা এই দুইই তাঁর ছিল স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর বুদ্ধির পরে, তাঁর সত্যের পরে এবং তাঁর সৌহার্দ্দের পরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেত ; এই গুণেই সংসারে তিনি বড়ো হ'তে পেরেছেন, বড়ো হবার জন্যে তাঁকে কোনো কৌশল করতে হয়নি।

লর্ড সিংহের মৃত্যুতে ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে যে বেদনা লেগেছে তার একটা কারণ এই যে, কিছুদিনের নিয়ত সঙ্গলাভের মধ্য দিয়ে আমি তাঁর আত্মীয়তা পেয়েছি। আরো একটি কারণ আছে।

আমাদের গ্রামগুলির জীর্ণতা সংস্কার ক'রে তাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পার্‌লে তবে আমাদের দেশকে বাঁচাতে পারা যাবে, এই কথাটি মনে রেখে দীর্ঘকাল থেকে আমার সাধ্যানুসারে কিছু কিছু কাজ কর্‌বার চেষ্টা করেছি। এই কাজে আমার স্বদেশের লোকের মধ্যে যে দুই এক জনের সহায়তা পেয়েছি তার মধ্যে লর্ড সিংহ ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। তাঁর এই সহায়তা ছিল অপ্রগল্‌ভ, কিন্তু সকল প্রকারেই খুব খাঁটি। এই কাজ সম্বন্ধে যথার্থ তাঁর আস্থা ছিল—সে কেবল দেশের প্রতি তাঁর প্রেমবশতঃ, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই সূত্র অকস্মাৎ ছিন্ন হ'য়ে গেল। ভাগ্যের কার্পণ্যফলে দৈবাৎ আমরা অতি অল্পই পেয়ে থাকি ; এইজন্যে যে বন্ধুকে হারাই তাঁর ক্ষতিপূরণের ভরসা মনে থাকে না। সেই দুঃখের মধ্যে আজ কেবল তাঁর সঙ্গে আমার সৌহৃদ্যের সম্বন্ধ ও আমার সঙ্কল্পে তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতার গৌরব স্বীকার ক'রে এই কয়েকটি ছত্র তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে দিলাম।

৭ই চৈত্র, ১৩৩৪

কয়েকখানি পত্র

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

৭

তোমার চিঠিখানি প'ড়ে আমার মনে বড় বাজ্‌ল। তুমি মনে করেছিলে তোমার আত্মাকে তৃপ্ত কর্‌বার মত কোনো সম্পদ আমার আছে। কিন্তু আমি পথের পথিক, গম্যস্থানের ডাক শুনি ; ঠিকানায় পৌঁছে কাউকে জোর ক'রে ডাক দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। আমার আছে বল্‌বার ক্ষমতা, তাই বিধাতা আমাকে দিয়ে নানা কথাই বলিয়ে নেন—কোনো একটি বাণীতে আমার সকল বাণী সংহত ক'রে সাধনার মন্দিরে আলো জ্বাল্‌বার কাজে আমার তলব পড়েনি। আমি গুরু না, রাষ্ট্রনেতা না,—আমি কবি, সৃষ্টির বিচিত্র খেলায় নানা ছন্দে গড়া খেলনা জোগাব, এই আমার কাজ। তাতে মানুষের যেটুকু আনন্দ সেইটুকুই আমার সার্থকতা। এই আমার স্বধর্ম্ম, আর সেই স্বধর্ম্মরক্ষার দায়িত্ব আমার। আমার কাছ থেকে রাষ্ট্রনৈতিক কূটবুদ্ধি, কর্ম্মনৈতিক নৈপুণ্য যারা আশা করেছে তারা নিজে ভুল করেছে, অথচ আশাভঙ্গের দুঃখের জন্যে আমাকেই দায়ী করেছে। একদিন তুমি যখন আমাকে নানা সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে, তখন আমার মনের ভিতর থেকে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি, কেননা, সেটা আমার কাজ। সেইজন্য এ কাজে ডাক পড়্‌লে আমাকে সাড়া দিতেই হয়। কিন্তু শুধু কথার মধ্যে যেটুকু বুদ্ধি, যেটুকু ভাব থাকে তাতে আমাদের

বুদ্ধি ও হৃদয়ের কিছু তৃপ্তি হ'তে পারে, আত্মার আশ্রয় তাতে সম্পূর্ণ হয় না। সেই আশ্রয় যাঁরা দেন তাঁরা আর-এক শ্রেণীর মানুষ—যে বিধাতা খেলা করেন সেই বিধাতার সাথী তাঁরা নন্, যে বিধাতা বিধান করেন, সেই বিধাতার দৌত্য তাঁদের হাতে।

তোমার যে চিঠিগুলি সেদিন আমি পেয়েছিলুম, তার মধ্যে তোমার একটি সহজ বুদ্ধি ও ভাবের গভীরতা দেখে আমি আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছিলুম। সেই কারণেই আমি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গেই তোমাকে উত্তর লিখেছি। এখনকার চেয়ে তখন আমার হাতে সময় বেশি ছিল, শরীরও সুস্থ ছিল—তোমার কথা বিশেষভাবে মনে রেখে তোমাকে আমার চিন্তার দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করায় আমার আনন্দ ছিল। আমি খুব অল্প লোককেই জানি, যে তোমার মত এমন সংযতভাবে সুস্পষ্টভাবে ও একাগ্রভাবে চিন্তা করতে ও চিন্তা গ্রহণ করতে পারে। আমি জানি, আমার অনেক কথাই তোমার আজন্ম-সংস্কারের প্রতিকূল ছিল। অন্য কেউ হ'লে ক্ষোভে, এমন কি, অবজ্ঞায় সে-সব কথা প্রত্যাখ্যান করত। কিন্তু তুমি ব্যথিত হ'য়েও আমার কথা স্থিরভাবে বোঝ্‌বার সহিষ্ণুতা কখনো হারাওনি। কোনোদিন তোমাকে আমার মতে আন্‌ব, এ কথা কখনই ভাবিনি—সব দিক থেকে সকল কথা ভেবে নেবার পক্ষে তোমার মনে কোনো বাধা না থাকে এইটেই আমার ইচ্ছা ছিল। যাঁরা গুরু, তাঁরা নিজের বিশ্বাসের জোরে নিজের মতে সবাইকে প্রবর্ত্তিত করতে চান —যে কবি, সে কেবল মনের ভাবকে সাজিয়ে দিয়ে চ'লে যায়, গতিয়ে দেবার গরজ তার নেই। পথিক তার উপরে চোখ বুলিয়ে নিজের পথেই চ'লে যায়, যদি একটুখানি খুসি হ'য়ে যায় তাহ'লেই হোলো। তোমার চিঠি প'ড়ে মনে হচ্ছে, তোমাকে কিছু আনন্দ দিয়ে থাক্‌ব—সেটাতে হয়ত ধ'রে রাখ্‌বার মত কিছুই নেই—সে যেন এক পসলা বৃষ্টির মত, পান কর্‌বার পাত্রভরা তৃষ্ণার জলের মত নয়। তোমার প্রয়োজনের স্থায়ী সম্বল যদি তোমাকে দিতে পারতুম তবে আজ তোমার শক্তির অবসানের মুখে তাই তোমার পাথেয় হ'তে পার্‌ত—কিন্তু খেলা নিয়েই যার চিরজীবনের কারবার, তার হাতে কেবল রঙের জিনিষই থাকে, মূল্যের জিনিষ কিছুই থাকে না। তবু আমি জানি, তোমার নিজের ভিতরেই যে শক্তি আছে, অনেক দিন থেকে সেই শক্তিই তোমার পথ ভিতরে ভিতরে কেটে আস্‌চে, সুখে-দুঃখে আশায় নৈরাশ্যে। তোমার সেই শক্তি আজ পরম সার্থক হোক, এই আমার অন্তরের কামনা। ইতি ৪ বৈশাখ, ১৩৩৩

৮

আগামী সোমবার রাত্রে জাহাজে উঠ্‌ব। প্রথমে জাপানে যাব, তার পরে কোথায় সে পরে স্থির হবে। এ দেশ ছেড়ে সহজে দূরে যেতে ইচ্ছা হয় না—ঘুরে বেড়াবার বয়সও নয়। কিন্তু আমি ঘরের মানুষ নই, অতএব আমি স্থির হ'য়ে ঘরে বস্‌ব এ কথা হাজার ইচ্ছা করলেও সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। যেখানে আমার ডাক পড়ে সেখানে আমাকে যেতেই হবে। আমাকে যদি দরকার না থাক্‌ত তাহ'লে কখনই আমার যাওয়া ঘট্‌ত না। আমি যাব না যাব না ক'রেই এতদিন কাটিয়েছি। নানা ছুতোয় এইখানেই রয়ে গেছি, কিন্তু শেষকালে টেনে নিয়ে চল্‌ল। আমি পথিক, এ কথা আমাকে মান্‌তেই হবে।

আজ বুঝেছি পথই আমার স্বদেশ—এই পথই গ্রহ-নক্ষত্রের ভিতর দিয়ে বরাবর চ'লে গিয়েছে; অতএব কোথাও গুছিয়ে বস্‌বার জন্যে আসবাব জড় করা আমার পক্ষে মিথ্যা।

অতএব তোমাদের কাছে আমার আশীর্ব্বাদ রেখে আমি যাত্রা কর্‌চি। ইতি ১৬ বৈশাখ, ১৩২৩

৯

তোমার চিঠিখানি পড়ে খুসি হলুম। আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি তোমার ভাব্‌বার ও ভাব-প্রকাশের শক্তি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। এই কারণেই, যখন আমার সময় ছিল, তোমাকে যত্ন ক'রে অনেক চিঠি লিখেছি—জান্‌তেম তুমি তা বুঝ্‌বে এবং তাতে তোমার নিজের চিন্তার উদ্যম উদ্বুদ্ধ হবে। এখন আমার জীবনের সায়াহ্ন; আমার ভাবনা কল্পনা যা কিছু একদিন বাইরে সঞ্চরণ করতে বেরিয়েছিল তারা সব ভিতরে ফিরে এসেছে —তাই চিঠির গণ্ডুষও ভরতে চায় না।

তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে তুমি নিরুদ্ধ ক'রে কেন রাখ? অন্তত তাকে নিজের কাছে প্রকাশ করতে পারলেও তোমার উপকার হবে। প্রকাশের দ্বারাই নিজের কাছ থেকে নিজে আমরা লাভ করি—আমাদের পক্ষে সেই লাভ সকলের চেয়ে সত্য। গাছ আপনার ফল ফুল পল্লব বিকাশের দ্বারাই আপন সম্পদ পায়—বাইরে থেকে তার ডালে বহুমূল্য জিনিষ ঝুলিয়ে দিলে সে তার পক্ষে ভার হয় মাত্র।

আত্মীয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে আজ কলকাতায় এসেছি। কাল বোলপুরে ফিরে যাব। ইতি ৪ ফাল্গুন ১৩২৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

১০

তোমার চিঠিখানি পেয়ে সুখী হলুম, সেই সঙ্গে মনে উদ্বেগ বোধ করচি। তোমার শরীর নিশ্চয় ক্লান্ত, তাই প্রাণশক্তির ম্লানতায় তোমার মনের মধ্যে অবসাদ আসচে। এই ম্লানতায় মাকড়ষার জালের মতো আমাদের জড়িয়ে ফেলে, বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অনেকখানি বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়—সবটা আলো আমাদের দৃষ্টিতে পৌঁছয় না, সবটা হাওয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে নিঃশ্বসিত হ'তে পারে না। ক্ষীণ জীবনের জীর্ণ শিকড়গুলো অস্তিত্বের সব রস পুরোপুরি শুষে নিতে জোর পায় না। তোমার সঙ্কল্পের আবেগের সঙ্গে তোমার প্রাণশক্তির দৈন্যের অসামঞ্জস্য ঘটেচে, সেই-জন্যে এত বেশি কষ্ট পাচ্চ। তোমার অন্তরে বাহিরে ভালো রকম মিল হতে পারচে না। ন্যূনাধিক পরিমাণে এই অসামঞ্জস্য সকলেরই জীবনে আছে। এই অসামঞ্জস্যের আঘাতের প্রয়োজনও গুরুতর। মাটি উঁচুনীচু, এবং ভিন্নস্থানে তাপমাত্রার ভিন্নতাবশতই পৃথিবীতে জলের ধারা চলে, বাতাস বয়। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অসাম্য আছে ব'লেই আমাদের চিত্তপ্রবাহ আঘাতে অভিঘাতে সর্ব্বদা জাগরিত। অথচ এই অসাম্য অতিশয় অতিরিক্ত হ'লে তাতে আমাদের শক্তিকে নিরস্ত করে, উদ্দীপিত করে না। এ কথা এত ক'রে এইজন্যে বলচি, যে, সম্প্রতি কিছুদিন থেকে অবস্থার দৈন্য, কর্ম্মের বাধা, শরীরের দুর্ব্বলতায় আমার জীবনেও একটা ঔদাস্যের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সেটাকে চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে পারিনে। সেটা মায়াজাল, তার থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখতে চাই। ছায়াকে সত্য ব'লে জানা ভূতের ভয় পাওয়ার মত—যেই বলতে পারব সেটা মিথ্যে, অমনি তার জোর চ'লে যাবে। অবসাদের উপছায়াটাকে বার বার বোলো, মিথ্যা, মিথ্যা—তোমার যে-আত্মা সত্য তাকে নিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব'লে নিশ্চিত জানো, প্রতিদিনের আঘাত-জর্জ্জরতা কেটে যাক্। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩২৪

ওঁ

Uplands, Shillong

১১

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। স—বাবু কবিতাকে যেদিক থেকে যাচাই করতে চা'ন সেদিক দিয়ে সজীব কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় না। বন্ধুকে যদি শরীরতত্ত্ব-রূপে বিচার করি তবে শরীরতত্ত্ব মিলতেও পারে, কিন্তু বন্ধু থাকেন কোথায়? কবিতার পরিচয় তার রসে, সেটাকে পাই সমগ্র স্বাদের দ্বারা, বিষয়-বিশ্লেষণের দ্বারা নয়। প্রথমে তাল, তার পরে গান, তার পরে গতি, কবিতার এপর্য্যায়ের কোনো মানেই নেই। সমস্তটা জড়িয়ে ও একটা অখণ্ড জিনিষ। একটা নদী চলচে তাকে আমরা ভাগ ভাগ ক'রে বলতে পারিনে, আগে তার ঢেউ, তার পরে তার জল, তার পরে তার ধারা—ওর এক সঙ্গেই সব।

১২

আমাদের জীবনের ক্ষেত্র ছোটো, তার উপকরণও সীমাবদ্ধ—সেই কটিকে নিয়ে সেইটুকুর মধ্যে একটি মূর্ত্তি সাজিয়ে তুলতে হবে। সুখদুঃখ জিনিষটা চরম জিনিষ নয়, তারা উপাদানমাত্র, তাদের নিয়ে একটি সুসঙ্গতির মধ্যে গুছিয়ে তুলে জীবনটাকে রূপ দিতে হবে। নিজের জীবন-রচনায় আমরা আর্টিস্‌ট্। যদি তাকে একটি সুষমা দিতে পারি তাহ'লেই যিনি নিত্য আমাদের জীবনে তাঁর প্রকাশ হয়। রেখা রঙ নিয়ে এলোমেলো আঁক

ফাটুলেই ছবি হয় না—তাদের মিলিয়ে নিয়ে যখন রূপ ফুটে ওঠে তখন সেই রূপ জীবন্ততা লাভ করে। ছবি দাঁড়াতে হ'লে এমন কোনো ভাবকে গ্রহণ করতে হয়, যে-ভাবের মধ্যে পূর্ণতার রূপ আছে, সেই মূল ভাবের অনুগত হ'য়ে রেখা ও রঙের বিন্যাস সাধন করা চাই। নিজের জীবনের সম্বন্ধেও তাই, সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত চাওয়া-পাওয়া যদি এলোমেলো ভাবে থাকে তাহ'লে সৃষ্টি হ'ল না—কোনো একটি চিরন্তন ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে তাদের শান্তি সৌন্দর্য্য ও সম্পূর্ণতা দিতে হবে—জীবনের অর্থ হ'ল এই।

ইতি, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

গৌড়ীয় শিল্পের আদিযুগ

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতমাত্র গৌড়ীয় শিল্পরীতি যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। গৌড়রাজ দেশবিদেশ জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন; অন্য দেশের ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া, অথবা দেশে কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা গৌড়রাজ্যের লোকের অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল এবং কেবল তাহার জন্যই যে নবপ্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় শিল্পরীতি একপুরুষের মধ্যে এই অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছিল, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অবশ্য, অর্থ দেশের বা জাতীয় শিল্পের উৎকর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ, কিন্তু কেবল রাষ্ট্রীয় উৎকর্ষে শিল্পের এরূপ অদ্ভুত উন্নতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগ অতিবাহিত হইলে ইটালীতে শিল্প যে নবজীবন (Renaissance) লাভ করিয়াছিল তাহার কারণ ইটালীর জীবনে আবার নূতন করিয়া গ্রীক-উৎকর্ষের ছায়াপাত। গৌড়ীয় শিল্পের এই অতি দ্রুতগতি উন্নতির অপর কারণ ভারতের প্রায় সর্ব্বদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসন। ইটালী যেমন নূতন করিয়া গ্রীক আদর্শ পাইয়াছিল, ইটালীর বর্ব্বর-বলক্রান্ত সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতেরা মধ্যযুগের অবসানে যেমন নূতন করিয়া শিল্প ও সাহিত্যের পুরাতন রত্ন উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছিলেন, গৌড়দেশে সে রকম কিছুই হয় নাই। গৌড় সে সময়ে অপর কোন দেশ হইতে শিল্পের নূতন আদর্শ পায় নাই। [illegible] তখনও বিদ্যমান ছিল; অথচ এই একপুরুষ বা ২৫ বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় ভাস্করের অনুপাত জ্ঞান, সৌন্দর্য্য-বোধ-শক্তি এবং নূতন আদর্শ কোথা হইতে আসিল? অনুমান হয় যে, ধর্ম্মের প্রবল শক্তি রাষ্ট্রীয় উন্নতির সহিত যোগ দিয়া গৌড়দেশে শিল্পের এই অত্যাশ্চর্য্য এবং অভূত-পূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিয়াছিল। এই অনুমানের প্রধান কারণ, গৌড়ীয় শিল্পের কেন্দ্র পরিবর্ত্তন এবং গৌড়রাজ্যের বাহিরে বৌদ্ধতীর্থগুলির দুরবস্থা। পালবংশ বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বী; যখন গোপালদেব রাজা হইলেন, তখন ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে বৌদ্ধ রাজা ছিল না। গৌড়ের বৌদ্ধ রাজা, মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধপণ্ডিত ও ভিক্ষুগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়া উঠিলেন। মগধ বৌদ্ধধর্ম্মের পুণ্য-ক্ষেত্র, মগধের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বৌদ্ধতীর্থ। গৌড়ে বৌদ্ধরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল হইতে মগধ বৌদ্ধধর্ম্ম ও গৌড়ীয় শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল। তিব্বতীয় ইতিহাসকার তারানাথের গ্রন্থের অনুবাদের অনুবাদ পাঠে পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে, বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ গৌড়ীয় শিল্পের সর্ব্বপ্রাচীন কেন্দ্র এবং ধীমান ও বিতপাল নামক দুই ব্যক্তি গৌড়ীয় শিল্পরীতির প্রতিষ্ঠাতা।*

* বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে গৌড়ীয় শিল্পরীতির প্রাচীনতম কেন্দ্র মগধ, এবং তারানাথের [illegible]

বুদ্ধগয়ায় শ্রী ধর্ম্মপাল দেবের ২৬ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর-শিল্প (উপরের ছবি)

বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত মৃত্তিকা-ফলক
(I. M. No. B. G. 140)

হিলসা গ্রামে প্রাপ্ত তারামূর্ত্তি
দেবপালের রাজ্যকালে উৎসর্গীকৃত

কুর্কিহার নামক স্থানে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি
(I. M. No. Kr. 3)

পোতলক উপতারা
(I. M. No. 3820)

গৌড়ীয় শিল্প-রীতির
সর্ব্বপ্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি
(I. M. No. 3376)

নালন্দার নিকটে অ বিষ্কৃত চক্কুম্মান উ
প্রতিষ্ঠিত ষড়ভুজ বো ধিসত্ত্ব
(I. M. No. : 96

কুরকিহ আবিষ্কৃত দ্বিভুজ
শ্বর মূর্ত্তি
No. 3860

নালন্দার নি

No. 3

অজ্ঞাত-পরিচয় মগধের ষড়্‌ভুজ লোকেশ্বর

কলিকাতা চিত্রশালার দ্বিভুজ লোকেশ্বর (I. M. No. 5861)

কলিকাতা চিত্রশালার মঞ্জুশ্রী (I. M. No. 3808)

এ পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গে যত প্রাচীন মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে মাত্র দুই-একটি নবম ও দশম শতকের শিল্প-নিদর্শন হইতে পারে, কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত মূর্ত্তি একাদশ ও দ্বাদশ শতকের। এখন দেখা যাইতেছে যে, নবপ্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় শিল্পায়তনের আচার্য্যেরা খ্রীষ্টাব্দের নবম ও দশম শতকে যে সমস্ত মূর্ত্তি গঠন করাইয়াছিলেন, তাহা অধিকাংশই মগধে আবিষ্কৃত এবং প্রায় সমস্তই বৌদ্ধ নিদর্শন। আমাদের দেশে যে দুই একজন পণ্ডিত তিব্বতীয় ভাষা জানেন, তাঁহারা এখন বলিতেছেন যে, তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে "বারেন্দ্র" কথাটির পরিবর্ত্তে "নালেন্দ্র" লিখিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর অনুবাদক ভুল করিয়া বারেন্দ্র পড়িয়াছিলেন। মূর্ত্তির প্রাপ্তিস্থান দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টাব্দের নবম শতকে গৌড়ে যখন নূতন শিল্পায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন তাহার প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণ মগধে (পাটনা জেলার দক্ষিণাংশে ও গয়া জেলায়) অবস্থিত ছিল। এই যুগের সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ও উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি নালন্দা ও গয়ার চতুস্পার্শ্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অধিকাংশগুলি কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। গৌড়ীয় শিল্পায়তনের প্রথম যুগের মূর্ত্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতনটি নালন্দার নিকটে আবিষ্কৃত একটি ষড়্‌ভুজ লোকেশ্বর মূর্ত্তি; এই মূর্ত্তিটি ধর্ম্মপালের রাজত্বকালের শেষভাগের মূর্ত্তি হইলেও হইতে পারে।(১) বহুকাল পূর্ব্বে গয়ার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কুরকিহার গ্রামে একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা বৌদ্ধ ভিক্ষু পাণ্ডিবিষয় নিবাসী লোকেশ্বরদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।(২) এই বুদ্ধমূর্ত্তিটির সহিত বলাধিকৃত মহুক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অথবা বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত নাগরাজ মুচলিন্দ কর্ত্তৃক রক্ষিত বুদ্ধমূর্ত্তির তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, সপ্তম শতকের শেষভাগে ও অষ্টম শতকের প্রথম ভাগের মূর্ত্তিতে ও নবম শতকের মূর্ত্তিতে প্রভেদ কতদূর। ষড়্‌ভুজলোকেশ্বর মূর্ত্তি ও কুরকিহারের যেন ভিন্ন রাজ্যের অথচ চারিটি আবিষ্কৃত। সহসা গৌড়ীয় ভাস্কর কেমন করিয়া নিজের শিল্পের আদর্শ উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত করিয়াছিল তাহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এই উন্নতি সমস্ত নবম শতাব্দী ব্যাপিয়া গৌড়রাজ্যে যত মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল তাহার সমস্তগুলিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল ভাস্করের গুণ সমান ছিল না, সকল দাতার ব্যয়-শক্তি সমান নহে সুতরাং নবম শতাব্দীর গৌড়রাজ্যে আবিষ্কৃত সমস্ত মূর্ত্তি শিল্পের নিদর্শন হিসাবে সমশ্রেণীর নহে। এই যুগের নালন্দা অঞ্চলে আবিষ্কৃত চক্কুপাণ উজ্জ্বক নামক বৌদ্ধ উপাসকের প্রতিষ্ঠিত ষড়্‌ভুজ লোকেশ্বর মূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত অধিক দীর্ঘ,(১) কিন্তু এইযুগের একই অঞ্চলে আবিষ্কৃত আর একটি দ্বিভুজ লোকেশ্বর মূর্ত্তি অতি সুন্দর। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটিতে দেহের অঙ্গানুপাতে দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্যের আদর্শ অনিন্দনীয়,(২) কুরকিহারে আবিষ্কৃত আর একটি দ্বিভুজ বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি আকারে হ্রস্ব হইলেও ভাস্করের অঙ্গানুপাত জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক; কারণ ইহাতে হস্তের তুলনায় উরুদ্বয় অত্যন্ত স্থূল। ইহার সহিত নালন্দা অঞ্চলে আবিষ্কৃত দ্বিভুজ মঞ্জুশ্রীমূর্ত্তির(৩) তুলনা করিলে উভয় ভাস্করের আদর্শের তারতম্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আচার্য্য গুণমতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে সিততারার মূর্ত্তির চিত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সহিত বিহারে প্রাপ্ত বামুক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পোত্তলক উপতারার মূর্ত্তির(৪) তুলনা করিলে একই যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাস্করের আদর্শের প্রভেদ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও শিল্প-বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেন যে, ভারতবর্ষে মধ্য যুগে সম্পূর্ণরূপে পাথর হইতে কাটিয়া বাহির করা মূর্ত্তি বিরল এবং দুই একটি যাহা পাওয়া যায় তাহা শিল্প-নিদর্শন হিসাবে গণ্য নহে। এই শ্রেণীর পণ্ডিতদিগকে নালন্দা অঞ্চলে আবিষ্কৃত ও পূর্ব্বপ্রকাশিত দ্বিভুজ মৈত্রেয় মূর্ত্তির চিত্র মনোযোগ সহকারে দর্শন করিতে অনুরোধ করি।

১। Bloch—Supplementary Catalogue of the Archaeological Collection in the Indian Museum, Calcutta, 1911, p. 73.

২। Anderson—Catalogue and Handbook of the Archaeological Collections in the Indian Museum, Part II, pp. 73-4, No. Kr. 3.

১। Bloch—Supplementary Catalogue, pp. 57-8.

২। Ibid, p. 58. No. 5861.

৩। Ibid, p. 59, No. 3808.

৪। Ibid, pp. 64-65. No. 3820.

ভিন্ন ভিন্ন ভাস্করের আদর্শের তারতম্য মূর্ত্তি-প্রদাতাগণের আর্থিক অবস্থার প্রভেদ প্রভৃতি নানা কারণ সত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে ও অষ্টম শতকের প্রথম ভাগের মত কোন ভাস্করেরই অনুপাত-জ্ঞানের নিতান্ত অভাব অথবা অতি নিম্নশ্রেণীর আদর্শ ছিল না। বালকবালিকারা যেমন কর্দ্দম দিয়া পুত্তলিকা গঠন করে, নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে গৌড়রাজ্যের ভাস্কর ও শিল্পী ঠিক তাহাই করিত। বলাধিকৃত মল্লুক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির হস্ত ও পদ এতদূর অস্বাভাবিক যে, তাহাকে বালকের গড়া পুতুলের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। কিন্তু গয়ার চতুস্পার্শ্ব ও নালন্দা-অঞ্চলে আবিষ্কৃত নবম শতাব্দীর কোন মূর্ত্তি এতদূর অনুপাতের অভাবে দুষ্ট নহে। দেবপালের নামযুক্ত অথবা নবম শতাব্দীর শিলালেখযুক্ত অনেকগুলি ধাতু ও প্রস্তরমূর্ত্তি নালন্দায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধাতুমূর্ত্তির আলোচনা স্বতন্ত্র করা উচিত। দেবপালের রাজত্বকালে একটিমাত্র প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা নালন্দার নিকটে হিল্‌সাগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা দেবপালদেবের রাজত্বের ৩৫শ অঙ্কে নালন্দা মহাবিহারের একজন স্থবির কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিল্পের নিদর্শন হিসাবে ইহার সহিত আচার্য্য গুণমতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির তুলনাই হইতে পারে না, কিন্তু তথাপি ইহার কোন অঙ্গে অনুপাত-জ্ঞানের নিতান্ত অভাব দেখা যায় না। প্রত্যেক অঙ্গ সুগঠিত। শিল্পী যে দেব মুখে মহাকরুণার ভাব ফুটাইতে পারেন নাই তাহা তাঁহার নিজের দোষ। নবম শতকের লেখযুক্ত যতগুলি মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশগুলি মগধে আবিষ্কৃত। তারানাথের ইতিহাস হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টাব্দের নবম শতকে গৌড়ীয় শিল্পায়তনের প্রধান কেন্দ্র ছিল মগধে। বুদ্ধগয়ায়, গয়ার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কুরকিহারে ও নালন্দায় আবিষ্কৃত নবম শতকের মূর্ত্তি মগধের অন্যস্থানের তুলনায় সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহশালায় যতগুলি লেখযুক্ত প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তাহার কোনটিকে নবম শতকের মূর্ত্তি বলা চলে না। এই সংগ্রহশালার সর্ব্বপ্রাচীন মূর্ত্তিতে কোন লেখ নাই এবং লেখযুক্ত সমস্ত মূর্ত্তিই একাদশ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর মূর্ত্তি। রাজশাহীর সর্ব্বপ্রাচীন মূর্ত্তিটি দিনাজপুর জেলার কাশীপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।(১) ইহা বরাহ অবতারের মূর্ত্তির খণ্ড মাত্র। কিন্তু ভাস্করের আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ। ইহার সহিত কুরকিহারের বুদ্ধ এবং বিহারের বজ্রপাণি ও সিততারার মূর্ত্তি তুলনা করিয়া দেখিলে একই যুগের মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। রাজশাহীর সংগ্রহশালায় আরও দুইটি বরাহ অবতারের মূর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে একটি গোদাগাড়ীর নিকটে দেবপাড়া গ্রামে পদ্মমশহর দীঘিতে আবিষ্কৃত। (২) ইহা সুন্দর মূর্ত্তি, কিন্তু খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতকের শিল্প নিদর্শন বলিয়া ইহার সহিত নবম শতকের কোন মূর্ত্তির তুলনা চলে না। বরাহ মূর্ত্তির প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত। এ পর্য্যন্ত নবম শতকের যত মূর্ত্তির কথা বলা হইল, দিনাজপুর জেলার কাশীপুর গ্রামে অবস্থিত খণ্ডিত বরাহ মূর্ত্তি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্তগুলিই বৌদ্ধ মূর্ত্তি। শিলালেখের প্রমাণ অথবা তুলনালব্ধ শিল্পের বিবর্ত্তনের প্রমাণ অনুসারে কেবল আর একটি হিন্দু মূর্ত্তিকে খৃষ্টাব্দের নবম শতকের মূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। ইহা বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং নালন্দার চতুস্পার্শ্বে কোন স্থানে আবিষ্কৃত (৩)। শিল্পনিদর্শন হিসাবে ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করা উচিত নহে। ইহাতে ভাস্করের অনুপাত-জ্ঞানের অতি সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, আদর্শও নিকৃষ্ট। নবম শতকে গৌড় রাজ্যে হিন্দু মূর্ত্তির অভাব ও বৌদ্ধ মূর্ত্তির আধিক্য দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই যুগে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়া ও হিন্দু-ধর্ম্ম হীন হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সম্রাট্ দেব পাল বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি অন্য দেশের বৌদ্ধদের আদর করিয়া গৌড় রাজ্যে বাস করাইতেন। বর্ত্তমান পেশাবরের নিকট নগরহার নামক একটি প্রাচীন নগর ছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞশান্তির শিষ্য নগরহার নিবাসী বীরদেব তীর্থ-যাত্রায় মগধ দেশের বজ্রাসন বা বুদ্ধ গয়ায় আসিলে সম্রাট্ দেবপাল তাঁহাকে নালন্দা মহা-

১। A Catalogue of the Archaeological relics in the Museum of the Varendra Research Society Rajshahi, 1919, p. 21, No. E (b) 1-48.

২। Ibid, No. E (b) 2-351

৩। Ibid, p. 96, No. 3870.

বিহারের মঠাধ্যক্ষ বা সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন।(১) এই দেবপাল তাঁহার রাজ্যে উনচল্লিশ বর্ষে সুবর্ণদ্বীপ (যবদ্বীপ বা সুমাত্রাদ্বীপ) রাজা বাল পুত্র দেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীনগর বা পাটলিপুত্র ভুক্তির (ডিবিজনের) অন্তর্গত রাজগৃহ বিষয়ের (জিলার) নন্দিবনাক নটিকা, মণিবাটক ও বস্তিগ্রাম, এবং গয়া বিষয়ের পালামক গ্রাম নালন্দার বালপুত্রদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিয়াছিলেন। (২)

দেবপালদেবের রাজ্যকালে শিলালেখযুক্ত মূর্ত্তির বিশেষত্বগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া গৌড়ীয় শিল্পরীতির প্রথম যুগের লেখবিহীন মূর্ত্তিও সহজে চিনিতে পারা যায়। বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধির (Lieutenant Governor) আদেশে আরমেনীয় স্বর্গগত জে, ডি, এম বেগ্‌লার বুদ্ধ গয়া বা মহাবোধি মন্দিরের চারিদিক খনন করাইয়া ১৮৮০ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মন্দির-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই সময়ে তিনি যে সমস্ত প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার কতকগুলি তিনি নিজে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বাসস্থান চাকদহ হইতে এই মূর্ত্তিগুলি কলিকাতার সরকারী সংগ্রহ-শালার বা যাদুঘরের জন্য ক্রয় করা হইয়াছিল। এই-মূর্ত্তিগুলির মধ্যে নাগরাজ মুচলিন্দ রক্ষিত একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিটিতে লেখ না থাকিলেও বুঝিতে পারা যায় যে ইহা নবম শতাব্দীর। নাগরাজ মুচলিন্দ রক্ষিত বুদ্ধদেবের যে মূর্ত্তি বুদ্ধ গয়ার মঠে রক্ষিত আছে তাহার সহিত এই মূর্ত্তির তুলনা করিলে উভয় ভাস্করের সৌন্দর্য্যের আদর্শের তারতম্য বুঝিতে পারা যায়। বেগ্‌লারের সংগ্রহের মূর্ত্তিটি কিন্তু নবম শতকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শনের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে, কিন্তু ইহার মুখের ভাব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাণ প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, অষ্টম শতকে ও নবম শতকে শিল্পের আদর্শের প্রভেদ কত দূর। বেগ্‌লারের সংগ্রহের এই মূর্ত্তিটি নবম শতকের শিল্প-নিদর্শন বলিতেছি কেন তাহা বুঝিতে হইলে ইহার অঙ্গের গঠনের সহিত কুরকিহারের বুদ্ধ-মূর্ত্তির তুলনা করা উচিত। ইহা দশম শতকের শিল্প-নিদর্শন কেন হইবে না তাহা বুঝিতে হইলে উক্ত শতাব্দীতে গৌড়ীয় ভাস্করের আদর্শের যে পরিমাণ অবনতি হইয়াছিল তাহা বিচার করিতে হইবে। গয়া জেলার বিষণপুর তাণ্ডোয়া গ্রামে লেখবিহীন নবম শতকের তিনটি মূর্ত্তি ছিল। এই মূর্ত্তি তিনটি টিকারীর মহারাজের (নয় আনীর) এক জন ইংরেজ ম্যানেজার গয়ায় আনিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহা পাটনার সরকারী যাদুঘরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই মূর্ত্তি তিনটি এক কালে একই মূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অর্চ্চনা পদ্ধতিতে আমাদের হিন্দু পদ্ধতির মত ধ্যান আছে, এই সমস্ত ধ্যানের নাম "সাধনা"। কেবল সাধনা সম্বন্ধে সাধনমালা ও সাধন সমুচ্চয় প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে। এই সকল গ্রন্থে বৌদ্ধ দেবদেবীর বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বজ্রাসনবুদ্ধভট্টারক নামক একপ্রকার বুদ্ধ-মূর্ত্তির পরিচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মূর্ত্তি অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধুনা বুদ্ধগয়ার মন্দির মধ্যে প্রাচীন বজ্রাসন বেদীর উপরে যে মূর্ত্তিটি রক্ষিত আছে তাহা বজ্রাসনবুদ্ধভট্টারক। এই মূর্ত্তির লক্ষণ:—অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দ্বিভুজ বুদ্ধ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে এবং বামহস্ত ক্রোড়ে ন্যস্ত। বুদ্ধের দক্ষিণে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব; দ্বিভুজ, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চামর এবং বামহস্তে নাগকেশরের পল্লব। বামদিকে লোকেশ্বর বোধিসত্ত্ব, দ্বিভুজ, তাঁহার দক্ষিণহস্তে চামর এবং বামহস্তে পদ্ম। (১) বিষণপুর তাঁড়োয়ার মূর্ত্তি তিনটি এই জাতীয়, তিনটি মূর্ত্তিই এক জাতীয় প্রস্তর হইতে খোদিত, সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অরেল ষ্টাইন্ (Sir Aurel Stein) এই মূর্ত্তি তিনটি বিষণপুর গ্রামে যে ভাবে সাজান দেখিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি লইয়া একটি বৃহৎ বজ্রাসনবুদ্ধভট্টারক গঠিত হইয়াছিল (২)। বড় বুদ্ধমূর্ত্তিটির দক্ষিণ পার্শ্বে মৈত্রেয় ও বামপার্শ্বে লোকেশ্বর।

(১) গৌড় লেখমালা পৃঃ ২১—২।

(২) Epigraphia Indica vol. xvii. pp. 31[illegible]

(১) Foucher-Etude sur L'Iconographie Bouddhique de L' Inde, 2nd part, pp. 16-17 fig 1.

(২) Indian Antiquary Vol. XXX, p. 90, Pl. IV-V.

প্রস্তরমূর্ত্তির সঙ্গে গৌড়ীয় শিল্পেতিহাসের প্রথম যুগের আর এক শ্রেণীর মূর্ত্তির কথা বলা উচিত। আমরা যেমন এখন পাথরের মূর্ত্তি ব্যবহার করা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছি ও বড় জোর অষ্টধাতুর রাধাকৃষ্ণ, বংশীধারী, মদন-গোপাল অথবা দশভূজা গড়াইয়া থাকি, খৃষ্টাব্দের নবম শতকে এখনকার তুলনায় অনেক অধিক পাথরের ও ধাতুর মূর্ত্তি তৈয়ারী হইত। কিন্তু আমরা এখন অধিকাংশ দেব-মূর্ত্তি ঠিক পূজার দিনের কিছু পূর্ব্বে কাঁচা মাটি দিয়া গড়াইয়া পূজার পরে বিসর্জ্জন দিয়া থাকি। সেকালের লোকে তাহা করিত না; কিম্বা করিলেও আমাদের সময়ের মত এত অধিক পরিমাণে করিত না। তাহারাও মাটির মূর্ত্তি গড়াইত, কিন্তু সে সমস্ত পোড়ামাটি। পৃথিবীর নানাদেশে গৌড়ীয় শিল্পায়তনের যে সমস্ত নিদর্শন রক্ষিত আছে, তাহার মধ্যে কলিকাতা যাদুঘরের পোড়ামাটির দুইটি মূর্ত্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটিই বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত। প্রথমটি একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি; স্বর্গগত ডাক্তার জন্ এন্ডারসন্ ইহার বিবরণ লিখিতে গিয়া ইহাকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াছেন (১) কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তির মস্তকে জটা থাকে না এবং কচিৎ কখনও অঙ্গে অলঙ্কার দেখা যায়। ইহা লোকেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি; কারণ ইহার বামহস্তে সনালোৎপল ও দক্ষিণহস্ত অভয়মুদ্রায় অবস্থিত। এই পোড়ামাটির মূর্ত্তিটির চালিতে "যে ধর্ম্মাহেতু প্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্রটি খোদিত আছে এবং ইহার অক্ষর হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মূর্ত্তিটি খৃষ্টাব্দের নবমশতকে তৈয়ারী হইয়াছিল। দ্বিতীয় পোড়ামাটির মূর্ত্তিটিও বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত এবং স্বর্গগত জে, ডি, এম্, বেগ্‌লারের পুত্রগণের নিকট হইতে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালা বা যাদুঘরের জন্ত ক্রয় করা হইয়াছে। বুদ্ধগয়ায় এবং অন্যান্ত স্থানে অতীতযুগের সাতজন বুদ্ধ ও ও ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের অনেক মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বুদ্ধগয়ায় খ্রীষ্টাব্দের দশম শতকে একজন চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী আসিয়া সপ্তবুদ্ধ ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই মূর্ত্তির পাদপীঠে চীনদেশের ভাষায় প্রতিষ্ঠাতার নাম ও তারিখ লেখা আছে। ষ্টাইনের মগধ-ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিষণপুরে তাঁড়োয়ার মূর্ত্তির মধ্যে সপ্তবুদ্ধ ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পোড়ামাটির যে মূর্ত্তিটি বেগ্‌লার বুদ্ধগয়া হইতে চাকদহ লইয়া গিয়াছিলেন তাহাও খণ্ডিত। ইহাতে কেবল বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধ গৌতম ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ, বিপশ্বিন্ ও বিশ্বভূর মূর্ত্তি ভাঙিয়া গিয়াছে।

পোড়ামাটির এই দুইটি মূর্ত্তি শিল্পের নিদর্শন হিসাবে অতি উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য এবং ইহার সহিত মৈত্রেয়, বজ্রপাণি ও আচার্য্য গুণমতির সিতভারামূর্ত্তির তুলনা করা যাইতে পারে (১)। ইহাতে গৌতম বুদ্ধ ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি অতি সুন্দর এবং গৌড়ীয় শিল্পরীতির প্রথম যুগের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রস্তর-মূর্ত্তি অপেক্ষা ইহাতে তাৎকালীন গৌড়ীয়ভাস্করের উন্নত আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) J. Anderson—Catalogue and Handbook of the Archaeological Collections in the Indian Museum, Part II, p. 60, B. G. 140

(১) মাঘমাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত চিত্র দেখুন।

'আম্মা'

শ্রী সীতা দেবী

বছর দুই তিন রেঙ্গুনে থাকিয়া বিনোদিনী যেদিন স্বামীর মুখে শুনিলেন যে, এখান হইতে বাস হয়ত বা তাহাদের উঠাইতে হইবে, তখন তাঁর মুখে যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিল, তাহাকে বিয়োগদুঃখ বলিয়া কিছুতেই বর্ণনা ক[রা] যায় না। স্বামী নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদি[ন] থাকলে, একটু কষ্ট হচ্ছে না, দেশটা ছেড়ে যেতে?"

বিনোদিনী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বিন্দুমাত্র না। এখানে এমন কি আছে শুনি যেটা ছাড়্‌তে দুঃখ কর্‌ব? এক যা ভাবনা খোকাকে নিয়ে।"

নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকাকে নিয়ে আবার কি ভাবনা হ'ল? সে ত তোমার সঙ্গেই যাচ্ছে।"

বিনোদিনী বলিলেন, "সে ত যাচ্ছে, কিন্তু তার 'আম্মা' সঙ্গে না থাক্‌লে যে আহার নিদ্রা কিছুই হয় না। দুদিনে আমাকে যমের বাড়ীর দিকে বেশ খানিক এগিয়ে দেবে ছেলে। বড়ও হয়েছে, সহজে ভুল্‌বেও না। অন্য ঝি চাকর রাখলে তাদের কাছে যাবেও না।"

নৃপেশ এবং বিনোদিনীর একমাত্র সন্তান খোকার আর কোনো নবাবী থাক্ বা না থাক্, একটি খাশ পরিচারিকা ছিল। তাহাকে ঘরের সকলে ডাকিত "আয়া' কেবল খোকা কেন জানি না, তাহার নামকরণ করিয়াছিল "আম্মা"। আয়া জাতিতে মাদ্রাজী, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, রং ঘোর কাল এবং মেজাজটা, ভদ্রভাষায় বলিতে গেলে, অতিরিক্ত তেজাল। নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে নাম তাহার নিশ্চয়ই একটা কিছু ছিল, কিন্তু এ বাড়ীর কেহ সে নামের কোনো খোঁজ কখনও পায় নাই। 'আয়া' এবং আম্মা এই ছিল তাহার এখানকার পরিচয়। খোকা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এ বাড়ীতে আসে, এবং কখনও যে সে এখান হইতে যাইবে এমন ভাবনা তাহার বা তাহার মনিবদের, কাহারও মনেই আসে নাই।

কিন্তু বর্ম্মা ছাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনাতেই ষোল আনা গোলমাল বাধিল। আয়া দেশ ছাড়িবে না, এবং খোকা আয়াকে ছাড়িবে না। এ অবস্থায় করা যায় কি?

নৃপেশ বলিলেন, "কি আর করা যাবে? দিন কতক ছেলের চীৎকার শোনবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই থাক। যতই কেন না খোকাকে ভালবাসুক, তাই ব'লে নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে আয়া কখনই যেতে রাজী হবে না।"

বিনোদিনী বলিলেন, "আচ্ছা, ব'লেই দেখি না! বল্‌তে দোষ কি? হাজার হোক, মেয়েমানুষের জাত ত? ভালবাসায় খাতিরে দেশ, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া তাদের অভ্যাসই আছে।"

নৃপেশ বলিলেন, "তোমার খুসি।"

খোকা এবং খোকার আয়া এই সময় বেড়াইয়া ফিরিল। বিনোদিনী অনেক ইতস্ততঃ করিয়া কথাটা পাড়িয়াই ফেলিলেন।

আয়া বেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়া লইল। মনে মনে ব্যাপারটা ভাল করিয়া তৌল দাঁড়িতে ওজন করিয়া লইল বোধ হয়। তাহার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যায়েগা আম্মা।"

বিনোদিনী অবাক হইয়া গেলেন। এত সহজে যে আয়া রাজী হইবে তাহা তিনি মোটেই ভাবেন নাই। বলিলেন, "তুম্‌কো জাস্তি তলব দেগা।"

আয়া বলিলেন, "নেহি মাংতা মা। তলবকো ওয়াস্তে নেহি যাতা হাম্। বিশ রুপিয়াই তুম দেও।" বলিয়া খোকাকে লইয়া সে আর একপালা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, যদিও রোদ তখন বেশ কড়া হইয়া উঠিয়াছিল। বিনোদিনী বারণ করিলেন না। আয়া যাইতে রাজী হওয়ায় তাঁহার মাথা হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। ছেলে যা দুরন্ত, কারো সাধ্যি নাই যে, তাহাকে আঁটিয়া উঠে। দিনের বেলার উৎপাৎ না হয় কোনোক্রমে সহিয়া থাকা গেল, কিন্তু রাত্রেও কাহাকেও নিষ্কৃতি দেওয়া খোকার কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। এক এক রাত্রে সে সমানে আট দশ ঘণ্টা অপ্রতিহত বিক্রমে চীৎকার করিয়া যাইত। বকুনি মার কিছুকেই গ্রাহ্য করিত না। তার আব্দার যে সে কোলে চড়িয়া বেড়াইবে। রাত্রিটা যে ঠিক এমন আব্দার করিবার সময় নয়, এ জ্ঞান তাহার মোটেই ছিল না। বিরক্তিতে দিশাহারা হইয়া নৃপেশ এক রাত্রে ছেলের গালে বেশ বিরাশী শিক্কা ওজনের একটি চড় লাগাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য খোকার চেঁচানি তাহাতে একটুও থামিল না এবং তাহার সঙ্গে বিনোদিনীর বকুনি জুটিয়া ঘুমকে সম্পূর্ণরূপে দেশছাড়া করিয়া দিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া নৃপেশ দেখিলেন যে, বকুনির পালা রাত্রে মোটেই শেষ হয় নাই। সেটা উপক্রমণিকা মাত্র। আয়া সকালে আসিয়া যখন শুনিল যে, খোকাবাবু রাত্রে কাঁদার জন্য মার খাইয়াছে, তখন সে স্থান কাল পাত্র সব ভুলিয়া গিয়া বকুনি জুড়িয়া দিল। এই জিনিষটিতে খোকার

আয়ার জুড়িদার পাওয়া রেঙ্গুন সহরেও সম্ভব ছিল না। কাজেই নৃপেশ চা খাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাহিরে প্রস্থান করিলেন, এবং বিনোদিনী বহুদিনের তুলিয়া রাখা একটা শেলাই পাড়িয়া লইয়া গভীর মনোযোগ সহকারে শেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল চাকর হরনাথ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ছোটলোককে লাই দেওয়া বিষয়ে গুটি-কয়েক মন্তব্য প্রকাশ করিল।

সেদিনও সন্ধ্যা সাতটা বাজিতে-না-বাজিতে বিনোদিনী হরনাথকে খোকার এবং নিজের খাওয়ার জন্ম যথারীতি তাড়া দিতে লাগিলেন। আয়া সাড়ে সাতটায় চলিয়া যায়, তার আগে খাওয়া না সারিলে ছেলের উৎপাতে বিনোদিনীর খাওয়াই হয় না। খোকার মাগুর মাছের ঝোল ভাত আয়াই খাওয়াইয়া দিল, তাহার পর তাহাকে ঘুম পাড়াইতে লইয়া গেল।

ছেলে ঘুম্‌লেই আয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু বিনোদিনী খাইয়া আসিয়া দেখিলেন, সেদিন আয়া যায় নাই। খোকার খাটের পাশে ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া মহা আনন্দে নিদ্রা দিতেছে। তিনি খানিকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর আয়াকে ঠেলা দিয়া উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘর নেহি যায়েগা ?"

আয়া হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, সে রাত্রে থাকিবে, খোকাবাবুকে মার খাইতে দিতে সে পারিবে না। আম্মা বাবু ঘুমান, সে খোকাকে লইয়া বেড়াইবে। আম্মার কাছে চারটা পয়সা থাকিলে যেন তাহাকে দেওয়া হয়, সে রুটী কিনিয়া খাইবে।

রাত্রে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতে পাইবার আশায় বিনোদিনী খুসি হইয়া তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়া ফেলিলেন।

এই ব্যবস্থাটাই কায়েমী হইয়া গেল। নৃপেশ এবং বিনোদিনীর ছুটি মিলিয়া গেল। রাত্রের চৌকীদারীতে ভর্ত্তি হইল আয়া। সারারাত খোকাকে কোলে করিয়া টহল দিয়াও তাহার যে কিছু মাত্র ক্লান্তি হইয়াছে তাহা মনে হইত না। দিনেও সে সমান উদ্যমেই কাজ করিয়া যাইত। মাহিনা বাড়াইবার প্রস্তাব বিনোদিনী একবার করিলেন, কিন্তু আয়া রাজী হইল না। দুনিয়ায় তাহার কেহই নাই, বেশী টাকা লইয়া সে কি করিবে ?

এই ভাবে কিছু দিন চলিয়া গেল, তাহার পর আসিল এই কলিকাতা যাওয়ার প্রস্তাব। ইহাতেও আয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল না দেখিয়া বিনোদিনী অবাক হইয়া গেলেন। নৃপেশ বাড়ী আসিলে বলিলেন, "ওগো, খোকা যে ওকে "আম্মা" ডাকে সেটা কিছু মিছে নয়। আর জন্মে ঐ ওর মা ছিল, তা না হ'লে এতখানি স্বার্থত্যাগ কেউ পরের ছেলের জন্যে করে না।"

নৃপেশ একটা সময়োচিত রসিকতা করিয়া কথার স্রোতটা অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন।

কলিকাতা যাত্রার দিন দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। রাশ রাশ জিনিষ-পত্র গুছাইয়া বাক্সে ভরিয়া, বিছানা বাঁধিয়া, টিফিন বাস্‌কেট সাজাইয়া বিনোদিনী অনেক কষ্টে কাজ শেষ করিলেন। আয়ার জিনিষের মধ্যে ছোট একটা বেতের বাক্স, তাহার জিনিষ গুছাইতে বেশী সময় লাগিল না। ক্রমাগত খোকাকে কোলে লইয়া সে গলির এ মোড় হইতে ও মোড় ঘুরিতে লাগিল। এই মাটির সঙ্গে তাহার আজন্মের পরিচয়। ইহাকে আজ সে ছাড়িয়া চলিল, কোনোকালে ইহার কোলে আবার ফিরিয়া আসিবে কি না ভগবানই জানেন।

ষ্টীমারে উঠিয়া আবার অস্বস্তির সীমা রহিল না। জীবনে সে কখনও জলযাত্রা করে নাই, এই প্রথম। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, আনুষঙ্গিক উপসর্গও দেখা দিল। কিন্তু খোকা ছাড়িবার পাত্র নয়। "আম্ম-আ" করিয়া সে যথারীতি চীৎকার জুড়িয়া দিল। বিনোদিনী তাহাকে কোলে করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, বিস্কুট, কমলালেবু প্রভৃতি ঘুষ দিলেন, কিন্তু খোকার সুর থামিল না। নৃপেশ আসিয়া ছেলের হাত ধরিয়া এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিতেই আয়া উঠিয়া বসিল। বাবুর হাত হইতে খোকাকে টানিয়া লইয়া সে টলিতে টলিতে ডেকে চলিল বেড়াইতে।

এই ভাবে ষ্টীমারের তিনটা দিন কাটিয়া গেল। কলিকাতায় নামিয়া বিনোদিনী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। নৃপেশও আবার পুরাতন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে দেখিবার আশায় খুসিই হইলেন। কেবল মুখ ভার করিয়া রহিল খোকা এবং তাহার আম্মা।

কিন্তু মানুষের সব অবস্থাই সহিয়া যায়। ক্রমে কলিকাতার রাস্তা ঘাট চেনা হইয়া গেল, কোথায় কিসের দোকান, কোথায় জিনিষ সস্তা, কোথায় বেশী দাম সব আয়ার জানা হইয়া গেল। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাবসাবও অল্প অল্প হইল, বাংলা কথাও ভাঙা ভাঙা দু চারটা বাহির হইতে লাগিল। বোঝা গেল এখানে থাকাটা বিধির বিধান বলিয়া সে স্বীকারই করিয়া লইয়াছে, তাহাকে লইয়া আর সংসারে গোলমাল বাধিবে না।

কিন্তু সাজানো সংসার ভাঙিবার কর্ত্তা যিনি, তিনি আড়ালে বসিয়া নিজের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতেছিলেন। হঠাৎ চারদিনের অসুখে স্বামী, শিশু-পুত্র, সাজানো সংসার, সবকিছুর মায়া কাটাইয়া বিনোদিনী বিদায় হইয়া গেলেন। নৃপেশের বুকে এমন একটা ঘা লাগিল যে তিনি জগৎ সংসারে কোনো কিছুর দিকে কয়েক দিন তাকাইতেই পারিলেন না।

তাঁহার ছিল যন্ত্রপাতির কারবার। স্ত্রী মারা যাইবার পর মাস খানেক তিনি সেদিকে বিন্দুমাত্রও মন দিতে পারিলেন না। ফলে যা ঘটিবার তাহা ঘটিল। বিস্তর ঋণের বোঝা তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া কারবারটি ফেল হইয়া গেল।

কিন্তু বুকে শোকের শেল যত কঠিন হইয়াই বাজুক, মানুষকে পেটের অন্নের সন্ধানে বাহির হইতেই হয়। যে একলা তাহার তবু দুদিন বসিয়া কাঁদিবার ছুটি আছে। যার ঘরে শিশু-সন্তান বা আশ্রিত আছে, তাহার সে ছুটিও নাই। পত্নীর জন্য অশ্রুপাত করিবার ছুটি নৃপেশও পাইলেন না। খোকার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে রোজগারের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল। কলিকাতার বাজারে চাকরী যে কেমন সুলভ তাহা চাকরীর উমেদারদের বেশ ভাল করিয়াই জানা আছে। যাহা হউক, নৃপেশকে ক' দিন আগেই আপনার অনুগ্রহের বড় একটা পরিচয় দিয়া নিয়তি দেবী কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার আর ঐ হতভাগ্যের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ ছিল না। সুতরাং খুব ভাল না হইলেও কাজ চালানো গোছের চাকরী একটা নৃপেশের জুটিয়াই গেল। সরব্যবসায়ী এক সাহেবের নিকট সামান্য কমিশনে দালালীর কাজ জুটাইয়া, নৃপেশ, পুরাতন বাড়ী ছাড়িয়া এক এঁদো গলিতে, ছোট এক বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

মুস্কিল হইল ঝি চাকর লইয়া। সামান্য আয়ে দুটিই রাখা চলে না, অথচ এক জনের দ্বারা সব কাজ হওয়াও শক্ত। বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিতেই যখন দু জন না হইলে চলিত না, তখন এখন যে চলিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আয়ের কথাও ভাবিতে হয়।

নৃপেশ ঠিক করিলেন, হরনাথকেই বিদায় দিবেন, তিনজনের রান্না আয়াই কোনো মতে চালাইয়া লইবে। না হয় খাওয়ার কিছু অসুবিধাই হইবে। কিন্তু আয়াকে বিদায় দেওয়াই প্রথমত শক্ত, তাহাকে স্বদেশ আত্মীয়-স্বজন সব কিছু হইতে ছাড়াইয়া আনা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, খোকাকে সামলানো একেবারে অসম্ভব হইবে। তাহার মা তাহাকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়াছে, ইহার পর আম্মাও যদি ছাড়ে, তাহা হইলে খোকাকে বাঁচাইয়া রাখাই হইবে দায়।

অতএব হরনাথই বিদায় হইল। অন্য এক বন্ধুর বাড়ী তাহার কাজ জুটাইয়া দিয়া, নৃপেশ মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

আয়া খোকাকে কোলে করিয়াই রান্না করিতে চলিল। লঙ্কা এবং তেঁতুল প্রচুর পরিমাণে খরচ করিয়া সে যে অপূর্ব্ব সুখাদ্য প্রস্তুত করিল, তাহার একগ্রাস মুখে লইয়াই নৃপেশের দম আটকাইবার জোগাড় হইল। আয়া পাছে বুঝিতে পারিয়া মনে আঘাত পায় এই ভয়ে তিনি কিছু না বলিয়া খাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আয়ার বুদ্ধির অভাব কিছুমাত্র ছিল না, সে বুঝিতেই পারিল, এবং তাহারই চোখে জল আসিল সবার আগে।

পর দিন নৃপেশ গিয়া হরনাথকে ডাকিয়া আনিলেন। আয়া এবার জোর করিয়াই বিদায় হইয়া গেল। বাবুর দুই চাকর রাখিবার মত অবস্থা নয়, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। তাহার দ্বারা যখন সব কাজ চলিল না, তখন তাহার যাওয়াই ভাল। খোকাকে লুকাইয়া সে পলাইয়া গেল। নৃপেশ জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে নিকটেই তাহার মুলুকওয়ালী এক স্ত্রীলোক আছে, সেখানে গিয়া সে প্রথমে উঠিবে, তাহার পর অন্য কাজ দেখিয়া লইবে। নৃপেশ

মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঝাল তরকারী খাইয়াও দিন চলিত, কিন্তু খোকাকে সমস্ত দিন ঘাড় করিয়া তিনি কাজই বা কেমন করিয়া করিবেন, আহার নিদ্রাই বা কেমন করিয়া সম্পন্ন করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

খাওয়াটা সেদিন ভালই হইল, কিন্তু ঘুম আর তাহার পর জমিল না। রাত বারটা অবধি নৃপেশের কাজ সারিতেই গেল। হরনাথ ততক্ষণ চীৎকার-পরায়ণ খোকাকে ঘাড়ে করিয়া বারান্দাময় দৌড়িয়া বেড়াইল। রোজকার অভ্যাস মত সকাল ছ'টার জন্য ঘড়িতে 'এলার্ম' দিয়া নৃপেশ শুইতে গেলেন। চাকর আসিয়া খোকাকে তাঁহার পাশে শোয়াইয়া দিয়া, হাঁফ ছাড়িয়া নিজে খাইতে শুইতে গেল। খোকা অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহার বাবার মনে একটা ক্ষীণ আশার উদয় হইল যে, রাতটা হয়ত বা ভালয় ভালয় কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু খোকাবাবুর এলার্ম বাজিয়া উঠিল সকাল হইবার ঢের আগেই। হরনাথ এবার একেবারেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। তাহাকে বার কয়েক ডাকাডাকি করিয়া নৃপেশ দেখিলেন, তাহার ঘুম আজ আর ভাঙিবে না। বিরক্তচিত্তে নিজেই সারারাত পুত্রকে বহন করিয়া বেড়াইলেন। মৃত পত্নীর মুখ স্মরণ করিয়া ছেলের গায়ে হাত তুলিতেও পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, এই রেটে চলিলে খোকাকে পিতৃহীন হইতেও বেশী দেরী হইবে না। আয়ার উপর বিরক্তিতে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল। এত বেশী আত্মসম্মানের ঘটা না দেখাইলেই কি চলিত না? তিনি ত তাকে যাইতে বলেন নাই?

সেদিন অফিসে গিয়া অনেকের কাছেই নিজের দুঃখের কথা গল্প করিলেন। মনটা পড়িয়া রহিল বাড়ীতে। ছেলেটা না জানি কি করিতেছে। হরনাথের উপর বিশ্বাস এবং ভক্তি তাঁহার অনেকটাই চটিয়া গিয়াছিল। নিজের অসুবিধা করিয়া সে যে খোকার তত্ত্বাবধান ভাল করিয়া করিবে, তাহা ভাবিতে আর তাঁহার ভরসা হইল না।

বন্ধুবান্ধব অনেকে সময়োচিত উপদেশ দিলেন।—"এ রকম গৃহশূন্য হ'য়ে আর কতদিন থাক্‌বে? বেশ বড় সড় দেখে একটি ঘরে আন, ছেলেও দেখ্‌বে, তোমাকেও দেখ্‌বে। ওসব কি চাকর দিয়ে কি আর ছেলে মানুষ হয়?" নৃপেশ ঘৃণায় আর ক্ষোভে তাহাদের দিকে আর ফিরিলেন না।

বাড়ীতে আসিয়া নৃপেশ হরনাথের কাছে খোকার অপকর্ম্মের মস্ত বড় এক তালিকা পাইলেন। এ সমস্যার কি যে সমাধান কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। হরনাথ খাইতে ডাকিলে রাত্রে খাইবেন না, বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। শোবার ঘরে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, খোকা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে খাওয়া শেষ করিতেছে। পেলাস বাটীতে লাথি মারিয়া, চাকরকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া সে যে আসর জমাইয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন।

নিজের কাজ্‌ শেষ করিতে বসিয়া নৃপেশ চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "খোকাকে শীগ্‌গির ক'রে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যা।"

হরনাথের আপত্তি ছিল না। খোকাকে ঘাড়ে করিয়া ছুটাছুটি করিয়া, তাহাকে দোলাইয়া, নাচাইয়া, ভাঙা গলায় গান গাহিয়া, সে কোনোরকমে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিল। নৃপেশ ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন রাত সাড়ে নয়টা। নানাকারণে শরীর মন বড়ই শ্রান্ত ছিল, বারোটা অবধি কাজ করিতে আর ইচ্ছা হইল না। ঘড়িতে এলার্ম না দিয়াই ছেলের পাশে তিনি শুইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন এক আধঘণ্টা যাহা'ই হউক ঘুমাইয়া লওয়া যাক্‌। খোকাবাবু কতক্ষণই বা নিষ্কৃতি দিবেন?

নৃপেশের ঘুম যখন ভাঙিল তখন রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। অবাক্‌ হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন ন'টা বাজিতে পনেরো মিনিট। পাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, খোকার স্থান শূন্য। চীৎকার করিয়া চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা কোথায়?"

হরনাথ হাঁড়ির মত মুখ করিয়া আসিয়াছিল। মনিবের প্রশ্নে মুখের ভাব কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়াই বলিল, "তার আয়ার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।"

নৃপেশের নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল

না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে? সে কখন এল?"

হরনাথ বলিল, "সন্ধ্যে রাত থেকে এসেই ঐ ছোট ঘরটায় বসেছিল। আমি তখন দেখিনি। আপনারা ঘুমিয়ে যাবার পর যেই খোকা উঠে কাঁদতে সুরু করল, তখনই বেরিয়ে এল। সাড়ে পাঁচটা অবধি খোকাকে নিয়ে বেড়িয়েছে, তারপর এই আধঘণ্টা খানিক আগে, ঘুম থেকে উঠে তাকে নিয়ে বেড়াতে গেল।"

নৃপেশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। না খাইলেও তাঁহার তত আপত্তি ছিল না, যত ছিল রাত্রিদিন পুত্রের চেঁচানি শোনায়। তাহা ছাড়া খোকার অযত্ন হইতেছিল অতিরিক্ত রকমের। আয়াকে বিদায় দিয়া খরচ কমানো তাঁহার চলিবে না, তাহা তিনি খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। হয় আয় বাড়াইতে হইবে, নয় খরচ অন্তদিকে কমাইতে হইবে।

হরনাথ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুর মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। নৃপেশ চুপ করিয়াই আছেন দেখিয়া বলিল, "তা হ'লে আমাকেই জবাব দিন, বাবু।"

নৃপেশ বলিলেন, "রান্না করবে কে, তুই গেলে?"

হরনাথ উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আয়াই যাবে?

নৃপেশ বলিলেন, "খোকাকে দেখবে কে?"

হরনাথ বলিল, "দুজনকে রাখবেন না বলেছিলেন যে?"

নৃপেশ বলিলেন, "সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না; তুই যা, নিজের কাজ করগে।" হরনাথ অপ্রসন্নমুখে চলিয়া গেল।

ঠিক সেই সময় আয়া তাহার ক্ষুদ্র মনিবটিকে লইয়া বেড়াইয়া ফিরিল। নৃপেশকে দেখিয়া অতি সংক্ষেপে বলিল, "সেলাম বাবু," বলিয়া খোকাকে লইয়া ভিতরে চলিল। নৃপেশ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন।

আয়া আন্দাজ করিল তলব দেওয়া লইয়া একটা আলোচনা হইবে সম্ভবতঃ। সুতরাং নৃপেশ কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে বলিয়া গেল যে, খোকাবাবুকে ছাড়িয়া সে যাইবে না নিজের দেশ আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া সে আসিয়াছে এই ছেলের জন্য। এখন তাহাকে যাইতে বলিলে চলে কিরূপে? বাবুর টাকা পয়সার টানাটানি সে বুঝিতে পারে, তা না হয় এখন সে তলব নাই লইল? খোকাবাবু বড় হইয়া রোজগার করিতে শিখিলে সে সুদে আসলে সব আদায় করিয়া লইবে। তাহাকে খাইতে দিলে এবং বছরে খান দুই কাপড় দিলেই চলিবে। খোকার মা মারা যাইবার সময় খোকাকে তাহার কাছে দিয়া গিয়াছিলেন, কখনও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাবু তাড়াইয়া দিলেও সে যাইবে না।

ব্যাপারটা তখনকার মত ঐখানেই চুকিয়া গেল। নৃপেশ একরকম নিশ্চিন্ত হইলেন। চাকর এবং আয়ার ঝগড়া ছাড়া আর কোনো গোলমাল সংসারে রহিল না। কিন্তু এ জিনিষটাও যে নিতান্ত তুচ্ছ নয়, তাহা নৃপেশ কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন। হরনাথ পুরানো চাকর, আয়া স্ত্রীলোক, কাহার পক্ষে যে তিনি দাঁড়াইবেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কোনো রকমে ব্যাপারটাকে কেবলি মুলতুবী রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। ফল কিছু ভাল হইল না। চেঁচামেচি করিয়া যেটা একেবারে চুকিয়া যাইত ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সেটা কেবল ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে লাগিল। আয়া এবং চাকর পরস্পরের চিরশত্রু হইয়া দাঁড়াইল। সুবিধা পাইলেই দুজনেই যে খুব বড় রকম শোধ তুলিবে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ রহিল না।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে আর-এক মস্ত বড় উৎপাত আসিয়া জুটিল। গলির মোড়ে এক ঘর সোনার বেণের বাসা। আর কিছু তাহাদের থাক বা নাই থাক, টাকা ছিল এক রাশ। তাহাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের পোষাকে এবং খেলনায়, কথা-বার্ত্তায়, টাকার পরিচয় খুবই পাওয়া যাইত।

একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, তাহাদের বাড়ীর দেড় বছরের এক খোকা, মস্ত বড় এক ট্রাইসিক্লে চড়িয়া গলির এ মোড় হইতে ও মোড় পর্য্যন্ত চষিয়া বেড়াইতেছে। তাহার ছোট ছোট পা দু-খানায় এখনও চাকা চালাইবার

মত দৈর্ঘ্য হয় নাই, কিন্তু বড় মানুষের ছেলে ট্রাইসিক্লে চড়ে এ ধারণাটা কোনো কারণে তাহার পিতা বা মাতার মাথায় ঢুকিয়া থাকিবে। সুতরাং ট্রাইসিক্ল আসিয়াছে এবং ছেলেকে তাহার উপর চড়াইয়া এক উড়ে বেহারা টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে।

যাহাতক দেখা, খোকা আয়ার কোল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড় দিল। আয়া তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিধর যাতা ?"

খোকা হাত পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া যাহা বলিতে লাগিল তাহার মর্ম্ম এই যে, সে আর আয়ার কোলে চড়িবে না, তাহারও একটা তিন-চাকাওয়ালা গাড়ী চাই।

উড়ে চাকরটা নিজের মনিবের আর্থিক স্বচ্ছলতায় এবং আয়ার মনিবের দীনতায় বিশেষ প্রীত হইয়া পানরসরঞ্জিত দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আয়া তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে মানবের পদবী হইতে খারিজ করিয়া চতুষ্পদ অস্পৃশ্য জীবের দলে ভর্ত্তি করিয়া উচ্চকণ্ঠে গালি দিতে দিতে খোকাকে কোলে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। হরনাথ তাহার চীৎকার শুনিয়া রান্নাঘর হইতে উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে।

উত্তরে আয়া উড়িয়া জাতি সম্বন্ধে অনেক এমন কথা বলিয়া গেল, যাহা তাহারা শুনিলে বিন্দুমাত্রও খুসি হইত না। খোকার চীৎকার তখন পর্য্যন্ত সমান ভাবেই চলিতেছিল।

এমন সময় নৃপেশ কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিয়া হরনাথকে ডাক দিলেন, "শীগ্‌গির ক'রে ভাত বাড়', অফিসের বেলা হ'ল।"

খোকা এক ছুটে গিয়া বাপের জামার আস্তিন ধরিয়া টান দিল। নৃপেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি খোকাবাবু ?"

খোকা বলিল, "বাবা, আমায় একটা ট্রাইসিক্ল কিনে দেবে ?"

নৃপেশের স্বভাবে পারিব না বা দিব না বলার ক্ষমতাই ছিল না। কিছু না ভাবিয়াই ছেলের কথার উত্তরে বলিলেন, "দেব এখন, ছাড় অফিস যাই, তা না হ'লে সর্ব্বনাশ হবে।"

খোকার মনে তখন ট্রাইসিক্লের প্রীতি আর সব জিনিষ ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কাজেই "দেব এখন" শুনিয়া সে কিছুমাত্র খুসি হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কখন ? ও বেলা দেবে ?"

নৃপেশ তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বলিলেন, "কাল সকালে দেব। যাও এখন আয়ার কাছে।" সুনির্দিষ্ট সময়ের একটা উল্লেখ করাতে খোকা খুসি হইয়া চলিয়া গেল।

ট্রাইসিক্লের কথা নৃপেশ বেশ নিশ্চিন্ত মনে ভুলিয়া গেলেন; কিন্তু খোকা ভুলিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। সকালে উঠিয়া নৃপেশ দেখিলেন মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। খোকা মুখ ধুইবে না, দুধ খাইবে না, বেড়াইতে যাইবে না। বাবা তাহাকে সকালে ট্রাইসিক্ল দিবেন বলিয়াছেন, সে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

নৃপেশের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। ট্রাইসিক্ল দিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায় ? এই দীনহীন ভাবে সংসার চালাইতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। কেনই বা তিনি মূর্খের মত ছেলেকে ও কথা বলিতে গেলেন ? টাকা ধার পাইলেও না হয় কিনিয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর দল বুদ্ধিমান জীব, টাকা ধার নিতে তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু ধার দেওয়াটাকে তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে এড়াইয়া চলে।

কিন্তু মাতৃহীন একমাত্র সন্তান, তাহাকে না থামাইলেও নয়। একটা ভুলকে আর একটা ভুল করিয়া তিনি চাপা দিলেন। বলিলেন, "এখন যাও বাবা, খেলা করগে, কালকে নিশ্চয় দেব।" খোকার জেদ ভাঙিল। সে দুধ খাইয়া বেড়াইতে গেল।

অফিসের কাজ সারিয়া নৃপেশ সারা বিকাল চেষ্টা করিয়া বেড়াইলেন, যদি কোথায় ধারে বা মাসে মাসে টাকা দেওয়ার কড়ারে ট্রাইসিক্ল পাওয়া যায়। তাঁহাকে ধার দিতে কেহ রাজী নয়। টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিলেন, কোথাও পাওয়া গেল না। সন্ধ্যাবেলায় অবসন্ন দেহমন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। চাকর ডাকাডাকি করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

পরদিন সকালে তাঁহার আর উঠিতে ইচ্ছা করিল না। ছেলের কাছে তিনি মুখ দেখাইবেন কেমন করিয়া? মাথা পর্য্যন্ত কাপড় মুড়ি দিয়া তিনি শুইয়াই রহিলেন। কিন্তু খোকা অত সহজে ভুলিবার পাত্র নয়। সে আসিয়া তাঁহার মুখের কাপড় ধরিয়া টানাটানি সুরু করিল। "বাবা, ও বাবা, শীগ্‌গির ওঠ। আমার গাড়ী নিয়ে আস্‌বে না?"

নৃপেশের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। হায়রে, অক্ষম পিতৃস্নেহ! এতটুকু সাধ্য নাই যে, ছেলের সামান্য একটা আবদার রক্ষা করিতে পারে? খোকাকে কি বলিবেন তিনি?

খোকা টানাটানি করিয়া তাঁহার মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ট্রাইসিক্ল কোথায়? কখন যাবে, সেটা আন্‌তে?"

নৃপেশ মরিয়া হইয়া ছেলেকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "তুমি বড় বাঁদর হয়েছ, সারাক্ষণ কেবল বিরক্ত কর। যাও এখন।"

এতখানি রূঢ় ব্যবহার তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সে কখনও কাহারও কাছে পায় নাই। মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সে কাঁদিয়া বাড়ী ফাটাইয়া ফেলিবার জোগাড় করিল।

আয়া পাশের ঘরে বসিয়া খোকার জামার বোতাম লাগাইতেছিল। কান্না শুনিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। বাবুকে বেশ নরম গরম কিছু শুনাইবে ভাবিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিল, তিনি খাটের উপর বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আছেন। আঙ্গুলের ফাঁকে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

খোকাকে এক টানে মেঝে হইতে কোলে উঠাইয়া আয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। একেবারে দুই আনার লজেন্স কিনিয়া তাহার হাতে দিয়া খানিকক্ষণের মত তাহাকে চুপ করাইল। তাহার পর বলিল, "খোকাবাবু তুম বদমাস্ হুয়, বাবাকো মারা?"

খোকা অবাক হইয়া বলিল, সে মোটেই বাবাকে মারে নাই, বরং বাবাই তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে। আয়া বলিল, বাবার কাছে খোকা যেন আর গাড়ী না চায়, তাহা হইলে খোকাকে সে খুব ভাল জিনিষ দিবে। বাবার কাছে গাড়ী চাহিলে বাবা আবার কাঁদিবে, লক্ষ্মী ছেলেরা বাপকে কাঁদায় না।

এতবড় ত্যাগ স্বীকার করা খোকার পক্ষে বড়ই কঠিন ছিল। কিন্তু বাবাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহারও শিশুমনে বিষম একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল। ভয়ে বিস্ময়ে সে এক রকম আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাজেই বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আয়ার মুখের দিকে চাহিয়া সে স্বীকার করিয়া লইল যে, সে আর বাবার কাছে ট্রাইসিক্ল চাহিবে না।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আয়া দেখিল, বাবু তখনও বাহির হন নাই, চাও খান নাই। সেই একই জায়গায় অভিভূতের মত বসিয়া আছেন। সে আস্তে আস্তে খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। খোকা বাবার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "বাবা, আমার ট্রাইসিক্ল চাই না, তুমি চা খাও।"

নৃপেশ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। খোকা আয়ার দিকে চাহিয়া দেখিল তাহারও চোখে জল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেও কাঁদিয়া ফেলিল। গাড়ীর নামে সবাই মিলিয়া কেন যে কান্নাকাটি সুরু করিয়াছে, বেচারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। আয়া তাহাকে কোলে করিয়া অনেক কষ্টে শান্ত করিল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া, আয়া বাহিরে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিল। হরনাথের সঙ্গে সে পারতপক্ষে কথা বলিত না। আজ তাহাকে ডাকিয়া মিষ্টকথায় বলিল যে, বিশেষ দরকারে সে বাহিরে যাইতেছে। খোকা জাগিলে হরনাথ যেন তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া দেয় এবং একটু দেখে। চারিটার মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিবে।

হরনাথের আয়ার কাজ করিয়া দিবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে রাজী না হইয়া পারিল না।

খোকা যথাকালে জাগিয়া উঠিয়া আয়াকে না দেখিয়া মহা চীৎকার জুড়িয়া দিল। হরনাথ দুধ খাওয়াইতে গেলে তাহাকে লাথি মারিয়া হাত হইতে দুধ ফেলিয়া দিল। সৌভাগ্যক্রমে আয়া আধ ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই আসিয়া

উপস্থিত হইল, তাহা না হইলে খোকার এবং হরনাথের ভাগ্যে কি যে ঘটিত তাহা বলা শক্ত।

আয়াকে দেখিয়া ক্রোধে অভিমানে আটখানা হইয়া খোকা যখন আবার চেঁচানি সুরু করিবার জোগাড় করিতেছে, তখন আয়া তাহাকে টপ্ করিয়া তুলিয়া শোবার ঘরের ভিতর লইয়া গেল। নূতন একটা ট্রাইসিক্লের উপর তাহাকে বসাইয়া এ ধার ও ধার টানিয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। আনন্দ যেন খোকার চোখ মুখ দিয়া উপ্‌ছিয়া পড়িতে লাগিল। হরনাথ ছুটিয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিরক্তিতে গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। হরনাথ বেতন লইয়া কাজ করে, এবং আয়া কাজ করে বিনা মাহিনায়, ইহাতে হরনাথ নিজেকে একটু হীন মনে করিত। তাহার উপর মান্দ্রাজিনী আজ আবার কোথা হইতে এক ট্রাইসিক্ল জোগাড় করিয়া আনিল। ইহাতে বাবুর নজরে সে যে চাকরের চেয়ে আরো ঢের উর্দ্ধে উঠিয়া যাইবে সে-বিষয়ে হরনাথের সন্দেহ মাত্র রহিল না। কিন্তু মাগী এত টাকা পাইল কোথায়? নৃপেশ বাড়ী আসিতেই হরনাথ ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে খবরটা দিল। নৃপেশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া আয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে এত টাকা পাইল কোথায়? আয়া উত্তর দিল খোকার মা মারা যাইবার সময় তাহার কাছে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন খুব বেশী প্রয়োজন হইলে খোকার জন্য উহা খরচ করিতে।

কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া নৃপেশের মনে হইল না। হইতেও পারে। কিন্তু বিনোদিনীর প্রতি একটু অভিমানও তাঁহার মনের কোণে উঁকি মারিতে লাগিল। তিনি কি ছেলের পর? তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন তিনিই দিতেন, তাহার জন্য টাকা রাখিয়া যাওয়ার কিছু দরকার ছিল কি? তাহাও বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া যান নাই, অন্য মানুষের কাছে দিয়া গিয়াছেন। তিনি কি ছেলের টাকা চুরি করিয়া লইতেন?

পরক্ষণেই লজ্জা আসিয়া অভিমানকে চাপা দিয়া দিল। [illegible] তাঁহার কোথায়? ছেলের সব প্রয়োজন পূর্ণ করিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে কই? সামান্য ব্যাপারেও ত নিজের অক্ষমতাই প্রকাশ পাইতেছে। বিনোদিনী তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতেন বলিয়াই হয়ত এ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

খোকার আহারনিদ্রা প্রায় ঘুচিয়া যাইবার যোগাড় হইল, সে ট্রাইসিক্ল হইতে নামিতেই চায় না। হরনাথ ট্রাইসিক্ল টানিয়া বেশী জোরে দৌড়িতে পারে বলিয়া আয়াকে ছাড়িয়া খোকা ক্রমাগত তাহারই খোঁজ করে। সকালে দেখা গেল, আয়া উঠিবার আগেই তাহারা দুজন গাড়ী লইয়া গলিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মোড়ের বাড়ীর উড়ে চাকর পর্য্যন্ত তাহাদের সোল্লাস চীৎকারে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

আয়ার দুই চোখের দৃষ্টি হিংস্র হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়া ডাকিল, "খোকাবাবু আও, দুধ পিয়েগা।"

খোকা সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "নেহি যায়েগা, দুধ নেহি পিয়েগা। হরনাথ-দা, আর একটু জোরে।"

আয়া খপ্ করিয়া খোকাকে গাড়ী হইতে উঠাইয়া লইল। হরনাথকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল যে, সব চাকর মাহিনা লইতে ওস্তাদ, কাজ ফাঁকি দিবার ওস্তাদও তাহারাই। এখনও উনানে আগুন পড়ে নাই, বাবুর অফিসের ভাত কি শূন্য চুলায় সিদ্ধ হইবে? খোকাকে লইয়া খেলিতে তাহাকে ডাকিয়াছে কে? খোকাকে দেখিবার, তাহার কাজ করিবার লোকের অভাব এখনও হয় নাই।

ট্রাইসিক্ল হইতে এমন হঠাৎ তুলিয়া লওয়ায় খোকা প্রাণপণে আপত্তি করিতে লাগিল। সে আয়াকে মারিয়া, কামড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া অস্থির করিয়া তুলিল। আয়া তবু তাহাকে ছাড়িল না। উপরে আনিয়া রুটি, ডিম, দুধ সব খাওয়াইয়া তবে নিষ্কৃতি দিল। ছাড়া পাইবামাত্র খোকা আবার একদৌড়ে গিয়া হাজির হইল রান্নাঘরে। ডাকিয়া বলিল, "এস হরনাথদা, আবার ঘোড়দৌড় করি।"

আয়াকে আড়ালে যতই গাল দিক এবং মনিবের কাছে তাহার নামে যতই নালিশ করুক, সামনাসাম্‌

তাহার সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করিতে হরনাথের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সে বেশ জানিত বাগযুদ্ধে আয়ার সহিত আঁটিয়া উঠিবার তাহার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। পাঁচ মিনিটেই তাহাকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইবে, এবং বাবুর কাছে নালিশ করিয়াও কোনো প্রতিকার হইবে না। সুতরাং খোকার আহ্বান সে অগ্রাহ্য করিয়াই গেল। দুই হাতে উনানের কয়লা ঠাসিতে ঠাসিতে বলিল, "যাও, দাদাবাবু, তোমার আয়ার সঙ্গে। আমি গেলে আমায় এখনি আস্ত গিলে খাবে। কাজ কি আমার পরের কাজে হাত দেবার? আমার নিজের কি কাজের কিছু অভাব?"

খোকা অগত্যা আয়ার কাছেই ফিরিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে কোলে লইয়া আয়ার যেন বুক আর তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না। খোকা আর সে খোকা নাই। যে নিজের মাকেও ছাড়িয়া আয়ার কাছে ঝাঁপাইয়া পড়িত এ যেন সে নয়। হরনাথের মত বিষম লক্ষ্মীছাড়াও ইহাকে ভাঙ্গাইয়া লইতে পারে। খোকাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো; ঘুম পাড়ানো, সবই সে করিয়া গেল, কিন্তু এই সব অভ্যস্ত কর্ম্মের মধ্যেও ঠিক আগেকার সেই সুরটি যেন লাগিল না। কোন রকমে দুপুরটা কাটাইয়া দিয়া, বিকালের দিকে সে খোকাকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার যোগাড় করিতে লাগিল।

কাপড় চোপড় পরিয়া নীচে নামিবামাত্রই খোকা জেদ ধরিল সে ট্রাইসিক্ল চড়িবে। আয়া বিরক্ত হইয়া বলিল দিনরাত কেবল ট্রাইসিক্ল চড়িতে চাহিলে সে গাড়ী লইয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে। খোকা এত দুষ্টামি করিবে জানিলে সে মোটেই তাহার জন্য গাড়ী আনিয়া দিত না।

খোকা হাত পা ছুঁড়িয়া কোনরকমে তাহার কোল হইতে নামিয়া গেল। হামাগুড়ি দিয়া সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে ডাকিল, "হরনাথদা, নীচে এস, আমি তোমার সঙ্গে খেল্‌ব। আয়া দুষ্টু, পাজী, তার কাছে আর যাব না।"

হরনাথ সিঁড়ির দরজার কাছে মাথা বাহির করিয়া বলিল, "না, খোকাবাবু, তোমার আয়ার কাছেই থাক, এই নিয়ে আমি এখন খেয়োখেয়ি করতে পারব না।"

তাহার শ্লেষমিশ্রিত চিবানো কথার সুরে আয়ার আরো হাড়জ্বালা করিতে লাগিল। কিন্তু খোকা পাছে সিঁড়ি দিয়া পড়িয়া যায়, সে ভয়ও ছিল। কাজেই উঠিয়া গিয়া সে আবার খোকাকে নামাইয়া আনিল।

খোকার জেদ, সে গাড়ী চড়িবেই। আয়ার নিজের গালে নিজে চড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল। কেন মরিতে সে ট্রাইসিক্ল আনিতে গিয়াছিল? যার হইতে খোকাটা তাহার পর হইয়া গেল। তখনকার মত অনেক লোভ দেখাইয়া সে খোকাকে ট্রাইসিক্ল ছাড়াইয়া বেড়াইতে লইয়া গেল। তাহারা ট্রামে চড়িয়া চিড়িয়াখানা যাইবে, সেখানে খোকা বাঘ, ভালুক, হাতী কত কি দেখিবে, ইত্যাদি। কিন্তু ঘণ্টাখানেক এধার ওধার ঘুরিয়া, যখন সে ট্রামেও চড়িল না, চিড়িয়াখানাও গেল না, তখন খোকা আয়ার উপর আরও চটিয়া গেল। বাড়ীতে আসিয়া বাপের কাছে নালিশ করিল, হরনাথের কাছে নালিশ করিল, আয়া খাওয়াইতে আসিলে তাহার হাতে বেশ জোরে কামড়াইয়া দিল।

আয়া বিরক্ত হইয়া তাহার পিঠে ছোট একটা চড় মারিয়া বলিল, "বহুৎ পাজী হুয়া রে। একদম খুন নিকাল দিয়া।"

খোকা ভঁ্যা করিয়া উঠিতেই হরনাথ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিল, "মায়ের চেয়ে যে ভালবাসে তার নাম ডান। বাবুর সাম্‌নে ত সোহাগের শেষ নেই, এদিকে পিছন ফির্‌লেই ছেলের পিঠে ঠ্যাঙা পড়ে। কেই বা বল্‌তে যাবে? ওরা হ'ল গিয়ে কত পেয়ারের চাকর।"

আয়া বাংলা ভাল না বুঝিলেও, হরনাথের কথার গতিটা যে কোনদিকে তাহা বুঝিতেই পারিল। অন্য সময় হইলে প্রলয়-কাণ্ড বাধিয়া যাইত, হরনাথকে জ্যান্ত গিলিয়া খাইবার জোগাড়ই সে করিত বোধ হয়। কিন্তু খোকার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার মন বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে চুপ করিয়াই রহিল, কেবল চোখদুইটা তাহার হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত ভীষণ হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া ট্রাইসিক্লটা আর দেখা গেল না। মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। খোকা কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইতে লাগিল। নৃপেশ হরনাথকে রাতদিন সদর দরজা খুলিয়া রাখার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

হরনাথ-বাবুর কথার উত্তরে লম্বা বক্তৃতা করিয়া চলিল, বাড়ীতেই যে চোর থাকিতে পারে, সে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িল না। চুপ করিয়া রহিল কেবল আয়া।

ঘণ্টাখানিক বকাবকির পর বাড়ীটা একটু শান্ত হইল। হরনাথ বাজারে গেল, নৃপেশ কাগজপত্র লইয়া কাজ করিতে বসিলেন। খোকা একটি বাটি দুধের আধটা খাইয়া আধটা ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। আয়ার কোনও কাজে সেদিন মন লাগিতেছিল না, সে বারান্দায় চুপচাপ বসিয়া রহিল।

হঠাৎ হরনাথ ভীষণ উত্তেজিত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া সোজা নৃপেশের কাছে গিয়া বলিল, "বাবু, গাড়ীর ত খোঁজ মিলেছে।"

আয়া নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় খোঁজ মিল্‌ল?"

হরনাথ বলিল, "বড় রাস্তার ঐ কোণটাতে এক মাদ্রাজীর সাইকেল মেরামতের দোকান আছে না? সেখানে ভোরবেলা গিয়ে আয়া গাড়ীখানা রেখে এসেছে। বিক্রী করতেও ব'লে দিয়েছে।"

নৃপেশ আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আয়া এমন কাজ করিবে? সে আধটা পয়সার জিনিষ কোনোদিন সরায় নাই। যতদিন মাহিনা পাইয়াছে, বেশীর ভাগ টাকা খরচ করিয়াছে খোকার পিছনেই। এখন ত মাহিনা লয়ই না, তবু মাতার অধিক যত্নে খোকাকে সে পালন করিতেছে। সে কেন এমন কাজ করিতে গেল? অথচ হরনাথ যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহাও মনে হয় না। আয়ার সাধুতার খ্যাতি যেরূপ, তাহাতে ভাল করিয়া না জানিয়া, তাহার নামে চৌর্য্যের অপবাদ দিবে, এতবড় সাহসী পুরুষ এপর্য্যন্ত নৃপেশ দেখেন নাই। কি যে তাঁহার করা উচিত কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

হরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক জানিস্ না, বাজে কথা বল্‌ছিস?"

হরনাথ বলিল, "এত বড় কথা ঠিক না জেনে বল্‌ব বাবু, এত বড় বুকের পাটা আমার নেই। ওর সঙ্গে আমার [illegible] নেই, [illegible] বাবুর বাড়ীতে কাজ করছি।"

নৃপেশ আয়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরের ভিতর দাঁড়াইল। নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন সে ট্রাইসিক্ল লইয়াছে কি না। আয়া স্বীকার করিল, সে লইয়াছে।

নৃপেশ আরো বিপদে পড়িলেন। ইহাকে লইয়া কি করা যায়? পুলিশে দেওয়ার কথা ত মনেও করা যায় না। সে যত দিন বিনা মাহিনার কাজ করিয়াছে তাতে একটা ছাড়িয়া চারটা ট্রাইসিক্ল কেনা চলে। হয়ত কোনো অভাবে পড়িয়াই করিয়াছে, নৃপেশ ত তাহাকে কিছুই দিতে পারেন নাই। সে যে চুরি করিতে বাধ্য হইয়াছে এ ত তাঁহারই লজ্জা। আয়াকে ছাড়ানোর ইচ্ছাও তাঁহার মোটেই হইল না, খোকার তাহা হইলে হইবে কি? কিন্তু ইহাকে কিছু একেবারে না বলিলে অন্য চাকর বাকরে আস্কারা পাইয়া যাইবে।

আয়াকে কোনোদিন কেহ বকে নাই। সে যে মাহিনা-করা ঝি তাহা সকলেই অনেক কাল ভুলিয়া গিয়াছিল, আত্মীয়ার মতই সে বাড়ীতে ছিল। কি বলিয়া যে তাহাকে বকা যায়, তাহাও নৃপেশ চট করিয়া ভাবিয়া পাইলেন না।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, "এ্যেসা আউর মৎ করো। রুপিয়াকো কাম হোনে সে হমকো বোলো।"

আয়াকে কি বলা হয়, তাহা শুনিবার আশায় হরনাথ এতক্ষণ বাজারের টুকরি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বাবুর বকুনি শুনিয়া তাহারও হাড় জ্বলিয়া গেল। ইহার চেয়ে মাগীকে দশটাকা বক্‌শিশ ধরিয়া দিলেই হইত! বড় চমৎকার কাজ করিয়াছে কিনা? গজ গজ করিতে করিতে সে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

হরনাথ বাহির হইয়া যাইতেই আয়া বলিল, "হম্ কাম্ নেহি করেগা বাবু। হম্ যাতা। গাড়ী ভেজ দেগা।" হতভম্ব নৃপেশকে কথা বলিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া তাহার স্নেহের দুলাল খোকার দিকে একবারও না তাকাইয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বাবুর আদেশে হরনাথ যখন বক্ বক্ করিতে করিতে তাহাকে ফিরাইবার জন্য নামিল, তখন আর গলির মধ্যে তাহাকে দেখা গেল না।

মনিবে ভৃত্যে মিলিয়া কোনোরকমে খোকাকে সামলাইয়া রাখিল। নৃপেশ সেদিনকার মত অফিসে

যাওয়ার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ট্রাইসিক্লটার পুনরাবির্ভাব হওয়ায়, তাঁহার ছুটী মিলিয়া গেল। একটা উনিশ কুড়ি বৎসরের মাদ্রাজী ছোক্রা সেটা ঘাড়ে করিয়া আসিয়া রাখিয়া গেল। তাহার কাছে বিশেষ কিছু খবর মিলিল না। সে কেবল বলিল, এই বাড়ীতে যে আম্ম কাজ করিত, সে গাড়ীটা তাহাদের দোকানে রাখিয়া আসিয়াছিল, আজ আবার এই বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে বলিয়া গিয়াছে। আম্ম কোথায় গিয়াছে সে কিছুই জানে না, তাহার সঙ্গে ইহার বিশেষ আলাপ পরিচয় নাই। যাইতে আসিতে পথে দুচারবার কথা বলিয়াছে মাত্র।

দিন কাটিয়া চলিল একটার পর একটা। খোকাকে লইয়া তাহার বাবার কষ্টের সীমা ছিল না, তবু দিন কাটিয়াই চলিল, আম্মার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। হরনাথ একলা সবদিক সামলাইতে পারে না, কাজেই একটা ঠিকা ঝিও আসিয়া জুটিল। ফলে কাজের সুবিধা হোক্ বা না হোক্, কলহ কিচ্‌কিচিতে বাড়ী মুখর হইয়া উঠিল।

দিন কুড়ি পঁচিশ এমনি করিয়া পার হইয়া গেল। সকাল বেলা, ছেলেকে কোলে বসাইয়া নৃপেশ কাজ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। হরনাথ আসিয়া খবর দিল একজন লোক বাহিরে বাবুকে ডাকিতেছে।

নৃপেশ তাহাকে ভিতরে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। হরনাথের পিছন পিছন একটা চীনা আসিয়া ঢুকিল।

নৃপেশ অত্যন্ত অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই জাতীয় জীবের সঙ্গে তাঁহার কোনই কারবার ছিল না। হঠাৎ কি কারণে এ ব্যক্তি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইল, তিনি কিছু ভাবিয়াই পাইলেন না।

জিজ্ঞাসা করায় সে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বলিল যে, নিকটেই তাহার এক জিনিষ বন্ধক লইয়া টাকা ধার দেওয়ার দোকান আছে। এই বাড়ীর ঠিকানা দিয়া একটি মাদ্রাজী স্ত্রীলোক তাহার কাছে গলার কণ্ঠী বাঁধা দিয়া টাকা লইয়াছিল। কিন্তু চীনাকে হঠাৎ দেশে যাইতে হইতেছে, তাই সে সকলকে খবর দিতেছে। দিন কুড়ির ভিতর টাকা দিলে, জিনিষ ফেরৎ দিয়া সে যাইবে, না হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকে বন্ধকী মাল বিক্রী করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। সুদ সে চায় না, কেবল যে টাকাটা দিয়াছিল, সেটা পাইলেই হইবে।

নৃপেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ তারিখে স্ত্রীলোকটি টাকা ধার লইয়াছে? চীনা যে তারিখ বলিল, তাহাতে সবই তিনি বুঝিলেন। ট্রাইসিক্ল কেনার রহস্য এতদিনে পরিষ্কার হইয়া গেল। খোকার মৃতা জননী নয়, জীবিতা মাতৃস্বরূপিণীই আপনার শেষ সম্বলটুকু দিয়া তাহার আবদার রক্ষা করিয়াছিল। এই সোনার কণ্ঠীটির সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিতে আম্ম সখ করিয়া অনেকদিন উহা তাঁহার শুভ্র কণ্ঠে পরাইয়া দিত। খোকার বউকে জিনিষটি উপহার দিবে বলিয়া নাকি সে ঠিক করিয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি আর এখানে কাজ করে না বলিয়া তিনি চীনাটাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

দিন আবার কাটিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের ভিতরের নিরানন্দ ক্রমে যেন জমাট বাঁধিয়া পাষাণভারের মত হইয়া উঠিল। এ গৃহের স্নেহের নির্ঝর চিরদিনের মত শুখাইয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মীরূপিণী বিনোদিনীকে বিধাতা সরাইয়া লইয়াছিলেন। আর একটি মানুষ, বাহিরটা যাহার কুৎসিৎ ছিল, কিন্তু ভিতরটা প্রেমের জ্যোতিতে উজ্জ্বল, তাহাকে নিয়তি নিজের রহস্যময় অঞ্চলের আড়ালে কোথায় লুকাইয়া ফেলিল, নৃপেশ কোনদিন জানিতে পারিলেন না।

ভারত-শিল্প

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সব-জান্তা যে শিল্প-সমালোচক শিল্প-শাস্ত্র না হ'লেও তার চ'লে গেল, শিল্প-কৌশল না শিখেও সে শিল্পবিশারদ্ হ'য়ে উঠ্‌ল। ভারত-শিল্প বিষয়ে বলা কওয়ার লোক এই ধরণের যথেষ্ট রয়েছে, এদেশে ও বিদেশে এরা নিজের নিজের অভিরুচি অনুসারে আমাদের শিল্পকলায় যা তা পরিচয় দিয়ে চ'লেছে।

আর একদল শিল্পজ্ঞান পাবার জন্ত ব্যাকুল এমন মানুষ ছবি মূর্ত্তি শিল্পশাস্ত্র দেশের ইতিহাস ইত্যাদি চর্চ্চা ক'রে আমাদের শিল্পের সম্পূর্ণ পরিচয় করতে চলেছেন অক্লান্ত উৎসাহ নিয়ে। এই শেষের দলের মানুষ হ'লেন আমাদের পরম স্নেহভাজন অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য। ইনি বহু আয়াস স্বীকার করে' যে বড় বড় দুই খণ্ড* বই প্রকাশ করেছেন তাকে ভারত শিল্প শাস্ত্রের বিরাট সংগ্রহ বলা যেতে পারে। আমাদের শিল্প সম্বন্ধে প্রক্ষিপ্তভাবে এখানে-ওখানে যা ছিল এই দুই খণ্ড পুস্তকে একত্র করে' তিনি আমাদের জন্ত ধরেছেন। চলিত কথায় বলে—'যা নেই মহাভারতে তা নেই ভূভারতে'। বই দু'খানিকে শিল্পশাস্ত্রের মহাভারত বলাও চলে, কেন না আমাদের শিল্পের আদ্যন্ত ওর মধ্যে পাই। জগতের লোকের কাছে ভারত-শিল্পের সঠিক পরিচয় দেবার পক্ষে ঠিক উপযোগী এই দুই খণ্ড পুস্তক এটা জোর করে' বলা চলে। এও ঠিক যে আমাদের শিল্পকলা বিষয়ে অক্লান্ত ভাবে চর্চ্চা ও আয়াস স্বীকার করে' Indian Architecture ও Dictionary of Hindu Architectureর মতো এত বড় ও এমন সুন্দর দুইটি পুস্তক এদেশে ও বিদেশে হয়নি এ পর্য্যন্ত। ইংরাজী ভাষায় লেখার দরুণ জগতের লোকের কাছে আমাদের শিল্পের যথাসম্ভব সঠিক পরিচয় পৌঁছে যাবে।

ভারত-শিল্পের পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করতে হ'লে এদেশের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় থাকা নিতান্ত দরকার। শিল্প-শাস্ত্রের যে-সব সংগ্রহ দেশে বিদেশে নানা পুস্তকাগারে ছড়িয়ে আছে তা প'ড়ে নেওয়া একরকম দুর্ঘট ছিল এ পর্য্যন্ত—যে ভাষায় শাস্ত্রগুলি লেখা সে ভাষার সঙ্গে পরিচয় সবার নেই; তা ছাড়া মূলগ্রন্থ প্রায় সমস্তই দূর দূর দেশে রক্ষিত হয়েছে। এই কারণে ইংরাজীতে একখানি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ শিল্প-শাস্ত্র সংগ্রহ শুধু আমাদের জন্ত নয়, বিদেশের আর্টিষ্টদের জন্তও বিশেষ আবশ্যক হ'য়ে পড়েছিল। সেই দুঃসাধ্য কাজ আমাদের পরম স্নেহভাজন লেখকদ্বারা যে সাধিত হ'ল এতে করে' আমি সত্যই গৌরব বোধ করছি।

বই দুখানি আমার কত যে কাজে আসবে এবং আমার ছাত্রেরা এই বই পড়ে' যে কত লাভবান হ'বে তা কি করে' জানাই। তাই সর্বদিক থেকে লেখককে আমি ধন্তবাদ দিচ্ছি এবং তাঁহার পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করছি।

দেশের স্থাপত্য সম্বন্ধে নানাস্থানের মন্দিরাদির ফটোগ্রাফ দিয়ে আর কয়েকখানি* এমনি সুলিখিত সুন্দর ও সম্পূর্ণ আকারের শিল্প-শাস্ত্র আমরা লেখকের কাছ থেকে প্রত্যাশা করছি। শিল্প-দেবতা এই উদ্যমে তাঁহার সহায় হউন, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

---

* (1) 'A Dictionary of Hindu Architecture' (Price Rs. 20)

(2) 'Indian Architecture according to Manasara Silpasastra' (Price Rs. 10)

by

Prasanna Kumar Acharjya I.E.S., M. A. (Calcutta), Ph. D. (Leiden), D. Lit. (London), University Professor and Head of the Department of Sanskrit, Allahabad. Published for the Government of the United Provinces by Oxford University Press.

* In Press

(1) Manasaram (Sanskrit Text and Critical Notes running to some 600 pages)

(2) Architecture of Manasara (being an English version of the original Sanskrit Text with illustrative plates, running to some 800 pages).

বঙ্কিমচন্দ্র*

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ধূলিধূম-সমাকীর্ণ ক্লিন্ন আজ সাহিত্য-গগন,
এস দীপ্তকরোজ্জ্বল গ্লানিহর্ত্তা মধ্যাহ্ন-তপন ;
কুহেলি-কুজ্ঝটি-জাল রশ্মিদর্পে কর পরিষ্কার,
সুনীল নির্ম্মল রূপে মুক্ত ব্যোম জাগুক আবার।
প্রোজ্জ্বল প্রাসাদে তব, হে সম্রাট, ঘোরে ফেরুপাল ;
তব শুভ্র রাজধানী ঘেরে আজ তৃণের জঞ্জাল।
ন্যায়-দণ্ড হস্তে এস, হে বঙ্কিম, শক্তির আধার,
এস সিংহ, স্তব্ধ কর ফেরুদলে তুলিয়া হুঙ্কার।
হুঙ্কারে গর্জ্জনে তব উন্মথিয়া তোল বঙ্গদেশ,
চঞ্চলিয়া সঞ্জীবিয়া কর তারে দৃপ্ত মুক্তক্লেশ।
তোমার ভেরীর নাদ প্রান্তরে ভবনে বনে পথে
ধ্বনিয়া রণিয়া বঙ্গে জাগাইয়া দিক সুপ্তি হ'তে।
এস বীর সত্যবাক্ ন্যায়াধীশ হে ক্ষুদ্রদলন,
ঘৃণ্য ক্লিন্ন হেয় যাহা ধূলিগর্ভে লভুক মরণ।
চরণে দলিয়া দাও উচ্চশির তৃণগুল্মদল,
তোমার নির্ম্মিত বর্ম্মে করে যাহা কুটিল সমল।
তোমার শীতল-স্নিগ্ধ জলাশয়ে করে যে পঙ্কিল
শৈবালদল, পদ্ম হোক শুভ্র ও সুনীল।

* *

ভুলে গেছি মাতৃমন্ত্র, দীনা বঙ্গজননীর মুখ,
দাহন তোলে না চিত্তে লেলিহান অগ্নি সম দুখ।
মিথ্যা মোহে ভুলে গেছি রিক্তা নগ্না জননীর রূপ,
স্বার্থে লোভে দ্বন্দ্বে দ্বেষে রচিয়াছি মরণের কূপ।
এস ঋষি সত্যদ্রষ্টা দেশ-মুক্তি-যজ্ঞের ঋত্বিক্,
বিভ্রান্তে দেখাও পথ, মাতৃমন্ত্রে কর হে নির্ভীক।
প্রতাপ, মহেন্দ্রে আনো জীবানন্দ, দেবী চৌধুরাণী,
তব দৃপ্ত সুত সুতা হরুক এ নির্জ্জীবের গ্লানি।
বীর্য্যবন্ত কল্পনায় বীর্য্যবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাট
বিমুক্ত করিয়া তুমি দেখাইলে স্বপূর্ণ স্বরাট্ ;
সে পুরুষ মহীয়ান্ নারীচিত্ত বাঙালীর চোখে
আবার উজ্জ্বলি' তোল শক্তি-ন্যায়-মহিমা-আলোকে।
তুমি পূর্ণ শক্তিমান, শক্তিমান মানস সন্তান
গড়িলে যা ঘরে ঘরে আজি তাহা হোক মূর্ত্তিমান্।
বীর্য্য চাই, শক্তি চাই, চাহি বেগ, উন্মত্ত যৌবন,
চাহি দৃপ্ত মেরুদণ্ড, উল্লসিত উদ্দাম জীবন।
ক্ষুদ্র কুব্জ ভীত ত্রস্ত দুর্ব্বল ও অলস বাঙালী
তোমার জীবনমন্ত্রে প্রাণ নৃত্যে উঠুক আস্ফালি'।

* *

এস দ্রষ্টা, এস স্রষ্টা, এস ত্রাতা, মুক্তির সাধক,
তোমারে আহ্বানি' আজ জ্বালি মোরা যজ্ঞের পাবক।
নেতৃহীন শক্তিহীন শান্তিহীন এ বঙ্গের ঘরে
সাহিত্যসম্রাট এস বঙ্গগুরু ন্যায়-দণ্ড করে।

* বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-
৬ শ্রদ্ধাজ্ঞাপক সভায় পঠিত।

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১)

গোলমাল, ভিড়ের অন্ত নাই। গাড়ী ট্রাম মোটর ক্রমাগত চলিয়াছে।

লালদীঘির বড় পোষ্টাপিসের ঘড়িটিতে মিনিট দশেক আগে টং টং করিয়া দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। এমন সময় প্রকাশ বর্ষাতপ-বিবর্ণ জীর্ণ ছাতাটি মুড়িয়া হাঁপাইতে

হাঁপাইতে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একটি সওদাগরি আপিসে ঢুকিল।

মানুষের সুখের জন্য দুনিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা যদি কেহ বলেন, তবে অনেকেই আছেন হয়ত, যাঁহারা একটা পাল্টা জবাব দিবেন। সকাল আটটা হইতে-না হইতে নাকে মুখে চারিটি গুঁজিয়া কলিকাতার জনাকীর্ণ পথ বাহিয়া এমন কত লোকই ত সারি সারি চলিয়াছে, পাকা দুই ক্রোশ দূরে আপিসটিতে ঠিক দশটার সময় পৌঁছিয়া হাজিরা দিবে। সঙ্কীর্ণ ফুটপাথের উপর অসংখ্য লোকের ঠেলাঠেলি পেষা-পেষির মধ্যে কোন মতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে যখন তাহারা আপিসে উপস্থিত হয় তখন তাহাদের শ্রান্ত অবসন্ন দেহ যে-কেহ দেখিবে সে-ই বলিবে, পৃথিবীর তিনভাগ জলের মত তিন ভাগ দুঃখ-কষ্ট লইয়া বিধাতা ইহাদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন।

সম্মুখের টেবিলে কেরাণী বিনয়বাবু নতমুখে লেজার লিখিতেছিলেন, প্রকাশ তাহার পাশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হাজিরা বইখানা কোথা, বিনয়-দা?

বিনয়বাবু মুখ না তুলিয়া বলিলেন—এই মাত্র দপ্তরি বড়-বাবুর কাছে নিয়ে গেল।

প্রকাশ একটি শূন্য চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তারপর চাদরখানি টানিয়া লইয়া ঘর্ম্মাক্ত মুখ বেশ করিয়া মুছিয়া হাতলের উপর সেটি ঝুলাইয়া রাখিল।

বিনয়বাবু বলিলেন—বস্‌লে যে? হাজিরা সেরে এস।

প্রকাশ বলিল—লেট ত হয়েইছি, বিনয়দা। আর একটু দেরিতে বিশেষ কিছু আসবে যাবে না। একটু জিরিয়ে নি। এর পর ত কৈফিয়তের পালা।—বলিয়া সে একটু হাসিল।

বিনয়বাবু বলিলেন—লেট হ'লে যে? স্ত্রীর অসুখ?

—হ্যাঁ দাদা, সেই মামুলি জবাব।—একটু থামিয়া সে বলিল—কতবারই বা এই পুরানো কৈফিয়ৎ কাট্‌ব। লজ্জাও হয় ঘৃণাও হয়।

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন - তোমার স্ত্রী আজ কেমন আছেন?

প্রকাশ বলিল—সেই এক-ই রকম। নড়্‌তে চড়্‌তে উঠ্‌তে বস্‌তে পারে না। যে-ডাক্তার দেখ্‌চে সে যে রোগ ঠিক ধর্‌তে পেরেচে এমন ত মনে হয় না। বোধ করি আন্দাজে ঢিল মার্‌চে। এদিকে আমার ত—

কথাটা সে আর শেষ করিল না—রেজিষ্টার বহি টানিয়া অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উল্টাইতে লাগিল।

বিনয়বাবু সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—তাইত তোমার দেখ্‌চি বড় খারাপ সময় পড়েচে।

প্রকাশ গলিয়া গেল, বলিল—আর বল কেন! এ অবস্থায় কেউ কখ্‌নো পড়েচে, বিনয়-দা? কি যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না। জানইত বাড়ীতে একটি লোক নেই যে শুশ্রূষা করে। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঝিকে দুপুর-বেলা বাড়ী থাক্‌তে রাজি করেচি। তাই কোন মতে চল্‌চে। এদিকে ডাক্তার কবিরাজ, ওষুধ-পত্র—আমি একেবারে হদ্দ হ'য়ে গেলাম, বিনয়-দা।

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—কোথা চল্‌লে?

—বড়বাবুর কাছে হাজ্‌রে দিয়ে আসি।

যে-ঘরে তাহারা বসিয়াছিল সেটি অল্প-পরিসর, লম্বা। দরজার কাছে পিতলের কাউন্টার। পিছনে একটি লম্বা টেবিল। সারি সারি কেরাণীর দল মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কাজ করিতেছিল।

জুতার শব্দে বিরক্ত হইয়া একজন পিছন ফিরিয়া বলিল, প্রকাশবাবু কি আস্তে চল্‌তে জানেন না? দেখ্‌চেন—

অপ্রতিভ হইয়া প্রকাশ বলিল—মাপ করুন, যশোদা-বাবু!

—আরে যান, মশাই! হিসাবটা গুলিয়ে দিয়ে,—বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে বাবুটি আবার হিসাবে মন দিলেন।

পা টিপিয়া প্রকাশ বড়বাবুর ঘরে প্রবেশ করিল। বড়-বাবু স্থূলকায়, মাংসপিণ্ড বিশেষ—দাড়ি গোঁফ কামান, নাকের লোমে নাসারন্ধ্র এক-প্রকার বন্ধ। নমস্কার করিয়া প্রকাশ টেবিলের এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলে তিনি একবার চশমা জোড়ার উপর দিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর বলিলেন,—কি গো বাবু, গ্রাজুয়েট। আসা হ'ল? কাজে বহাল কর্‌বার সময় সাহেবকে বলেছিলাম, সাহেব, মার্চেণ্ট আপিসে ওসব গ্রাজুয়েটের কর্ম্ম নয়।

নম্র স্বরে প্রকাশ কহিল—আজ্ঞে, স্ত্রীর অসুখটা বেড়েছে—তাই আসতে একটু দেরি হ'য়ে গেছে।

—তাই না কি? তাহ'লে এক কাজ কর, প্রকাশবাবু। কোম্পানিকে ঠকান ত উচিত হয় না। গরহাজিরার মাইনেটা না হয় স্ত্রীর কাছ থেকেই চেয়ে নিও, কি বল?

ঘাড় হেঁট করিয়া প্রকাশ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন বাবুদের মহলে একটা বিষম টিট্‌কারির ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। কে কোন্ ফাঁকে কথাটি শুনিয়া আসিয়াছিল, প্রকাশ তাহা জানিতে পারে নাই।

হাসিমুখে যশোদাবাবু বলিলেন—কি ঠিক করলেন, প্রকাশবাবু? মাইনেটা কি তাহ'লে স্ত্রীর কাছ থেকে আদায় করবেন?

কেৎলির ভিতর ফুটন্ত জলের মত, ক্রোধে অপমানে প্রকাশের সর্ব্বাঙ্গ টগবগ করিয়া উঠিল। কোনমতে নিজেকে সংযত করিয়া সে কহিল—কি জানি যশোদাবাবু, নিজের মাইনের কথা এখনো ভেবে দেখিনি। তবে যারা আর-এক বেচারির দুর্দ্দশায় খুসী হ'য়ে উঠেচে তাদের মাইনে বজায় থাক্‌লে আমি খুসী হব, সে-কথা জোর গলায় জানাতে পারি।

যশোদাবাবু বলিলেন,—এ উত্তর বড়বাবুর কাছে দিলে ভাল হ'ত না কি?

—বোধ হয় হ'ত,—বলিয়া প্রকাশ তাহার প্রতি ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া নিজের স্থানটিতে গিয়া বসিল।

বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—বড়বাবু কি বললেন, প্রকাশ?

প্রকাশ তাতিয়া ছিল, কহিল—সবই ত শুনেচ। আবার জিজ্ঞাসা করা কেন?

বিনয়বাবুর মুখের উপর প্রচুর সহানুভূতি ছড়াইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন—ওদের কথায় কান দেও কেন, প্রকাশ? তোমার কি এখনো বুঝ্‌তে বাকি আছে, ওরা সব কি জন্ত এমন ব্যবহার করচে? আপিসে তুমি হচ্চ একমাত্র গ্রাজুয়েট—

প্রকাশের চোখ দুটি আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল। সে বলিল—বুঝি। কিন্তু যাদের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণের সম্পর্ক, তারা এমন ব্যবহার করলে কি কাজ করা যায়, না কাজে মন বসে? সত্যি বলচি, বিনয়দা, আমার আর আধ মিনিটের জন্ত এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না। আমার যদি হাঁড়ি শিকের চড়ান না থাকত, তাহ'লে আজই কাজে ইস্তফা দিতাম ঠিক্!

সেদিন সারাটি সময় প্রকাশ শুধু কাজই করিয়া গেল। কেরাণীরা পাঁচ মিনিট অন্তর উঠিল, বাহিরে গেল, সিগারেট ফুঁকিল, তারপর ফিরিয়া আসিল। প্রকাশ একটিবার মুখও তুলিল না।

সাড়ে তিনটার সময় খাবারওয়ালা টিনের বাক্সটি পাশে নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, কি দেব?

প্রকাশ সংক্ষেপে উত্তর করিল—কিছু না।

—টাট্‌কা খাবার বাবু, আমি বলছি—খেয়ে দেখুন? পরোটা, ক্ষীরমোহন, চমচম—

—না।

আগ্রহ সহকারে খাবারওয়ালা আবার বলিল,—একটা দি—কি বলেন? খেয়ে দাম দেবেন। ভাল না হ'লে একটি পয়সাও নেব না, ব'লে রাখ্‌লুম।

—চাই না, দরকার নেই—যাও!

বিরক্ত হইয়া খাবারওয়ালা বাক্সটি মাথায় তুলিয়া লইল। একটি বাবু—থিয়েটারী ধরণে চুল ছাঁটা, লক্কা পায়রাটির মত ফিটফাট—পিছন দিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল,—ও কি প্রকাশবাবু, এখন থেকেই পয়সা জমাতে সুরু করেচেন বুঝি?

প্রকাশ উত্তর দিল না বটে, কিন্তু রুখিয়া দাঁড়াইলেন বিনয়বাবু। তিনি কহিলেন—এ সব তোমাদের কি হচ্চে, চণ্ডীবাবু? প্রকাশের উপর এরকম জুলুম আমি কিছুতে সহ্য করব না ব'লে দিচ্চি।

চণ্ডীবাবু মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় পূর্ব্ব রাত্রে থিয়েটারে শোনা গানের একটি তান ধরিল,—

—আমি ঢের সয়েচি আর ত সব না।……

—প্রকাশ!

প্রকাশ মুখ তুলিল। এক পেয়ালা চা আর ঠোঙায় কিছু খাবার হাতে লইয়া বিনয়বাবু পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—ও কি, বিনয়-দা ?—না, না আমি কিছু খাব না।

—কেন খাবে না ?

অসংবদ্ধভাবে প্রকাশ হু'টা একটা কি বলিল ভাল বুঝা গেল না। বিনয়বাবু ঘাড় নাড়িলেন,—ও সব শুন্‌ছি না—খাও।

প্রকাশ আর বিরুক্তি করিল না। চায়ের পেয়ালাটি তুলিয়া লইয়া কয়েক মুহূর্ত্তে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

—আচ্ছা, বিনয়দা ?

—কি ভাই—

—এদের ভিতর তুমি এতদিন রইলে কেমন করে' আমি শুধু তাই ভাব্‌চি।

বিনয়বাবু সে-কথার জবাব দিলেন না। বলিলেন,—উঠ্‌বে এখন ? পাঁচটা বাজে।

প্রকাশ কহিল—না দাদা, আমার উঠ্‌তে দেরী হ'বে। ষ্টেটমেণ্ট আজ সেরে ফেল্‌তে না পার্‌লে আবার বকুনি শুন্‌তে হ'বে।

—তোমার একটু সাহায্য কর্‌তে পারি কি ?

দুই হাতে তাহার হাতখানি ঈষৎ চাপিয়া প্রকাশ কহিল—না, দাদা।

বিনয়বাবু ছাতাটি তুলিয়া লইয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, এমন সময় প্রকাশ ডাকিল—বিনয়দা !

বিনয়বাবু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রকাশ কহিল—ডাক্তার ত আর ভিজিট বাকি রাখতে চায় না, বিনয়দা। এখন তাকে গোটা কত টাকা না দিলে নয়। আমার হাতে ত একটি পয়সাও নেই যে দেব।

বিনয়বাবু ইতিমধ্যে বুকপকেট হইতে মনিব্যাগটি টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন। বলিলেন—কত টাকা চাই ?

—গোটা পনের।

বিনয়বাবু কহিলেন—আমার কাছে এখন পাঁচ টাকা মাত্র আছে, এই নাও। বাকি কাল এনে দেব।

আপিসের কাজ সারিয়া প্রকাশ যখন বাহিরে আসিল, তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গেছে। সারাদিনের পরিশ্রমে তাহার মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল। রাস্তার কাঁকরগুলি জ্বলন্ত নিশ্বাসের মত বাতাসময় একটা গরম ভাপ বিকীর্ণ করিতেছিল। দক্ষিণের হাওয়া বন্ধ করিয়া বড় বড় বাড়ী তারা-খচিত নির্মেঘ আকাশকে যেন ঠেকা দিয়া রাখিয়াছে, এবং তেমনি দুই সারি বাড়ীর মধ্য দিয়া একটা আলোকিত পথ সোজা গঙ্গার ধারে গিয়া উঠিয়াছে। মোড়ে ঈষৎ চঞ্চল বায়ু অদূরবর্ত্তী নদীর সন্ধান দিয়া ফিরিতেছিল।

গঙ্গার রাস্তা ধরিয়া প্রকাশ ট্রাণ্ডে আসিয়া পড়িল। নদীর পরপারে আঁধার তখন বেশ ঘোরাল হইয়া আসিয়াছে। কাছেই একটি জেটি। জেটির অনতিদূরে কয়েকটা জাহাজ সেই অপ্রচুর আলোকে অতিকায় দৈত্যের মত বিরাট দেখাইতেছিল। নদীর ধারে একস্থানে জনকতক মজুর পাওনা গণ্ডা লইয়া সর্দ্দারের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছিল। প্রায় সকলেই কৃষ্ণকায়, নগ্নদেহ। পরণের নিতান্ত মলিন কাপড়খানি হাঁটুর উপরটুকু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রতিদিন চলিতে ফিরিতে সচরাচর এমন কত লোকই ত প্রকাশ দেখিয়াছে। কিন্তু আজ এই নগণ্য অতিতুচ্ছ লোক-গুলার পানে চাহিয়া চাহিয়া অনেক কথা সে ভাবিয়া ফেলিল। ইহাদের মা আছে, ভাই আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে—তাহাদের লইয়া আপন-আপন অভাব-অভিযোগ-বেষ্টিত ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের মধ্যে বাস করিয়া ইহারা আছে— কে তাহা গণনা করে ?

ছোট লঞ্চগুলির অবিরাম ছুটাছুটিতে নদীর নীল জল ঘন ঘন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল। পুলের দেদীপ্যমান আলোগুলির নীচে অসংখ্য গাড়ী মোটর চাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সারি দিয়া চলিয়াছে।—যেন একটা প্রকৃত আতস-বাজির খেলা !

চারিদিকে অফুরন্ত সমৃদ্ধি ! বিপুল ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি প্রকাশ দমিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন সব মিথ্যা—বিশ্বের সুখ-সমৃদ্ধি জুয়া জুয়াচুরির মধ্যে নিশ্চিন্তে শিকড় গাড়িয়া আছে।

—সাম্‌নে-ওয়ালা—

প্রকাশ চমকিয়া সরিয়া গেল। সে বিস্মিত হইল, এবং ভিড়ের মধ্যেও তাহার চিন্তা-প্রবাহ একটানা বহিয়া যাইতেছিল। গাড়িটি ল্যাম্প-পোষ্টের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। ভিতরে চশমা চোখে একটি বাবু—বয়স তাহারি মত পঁচিশ-বড় জোর ছাব্বিশ। পাশে, ও কে ? উঁহার স্ত্রী হইবে

হয় ত। বেশ দেখিতে—হাসিতেছে। পিছনে লম্বা ছায়া বিস্তার করিতে করিতে গাড়ীটি তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

অকস্মাৎ তাহার মনের ভিতরটা ব্যর্থতার শূন্য হাহাকারে ছাইয়া গেল। এই উৎসব-যজ্ঞ সে যে নিতান্ত অস্পৃশ্যের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে—যোগ দিবার অধিকার তাহার কৈ? মনে পড়িল, বাড়ীতে পত্নী সুরবালা রোগশয্যায় পড়িয়া আছে। সেইটাই সত্য-আসল—নিজস্ব। এ সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি? চারিদিকের নানা বর্ণের উজ্জ্বল আলোক, বেচাকেনা, কোলাহল ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। সে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল, কোনমতে অপ্রশস্ত গলির ভিতর স্যাঁৎসেতে ঘরখানির সুপরিচিত কোণটিতে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সে অনেকদূর। প্রকাশ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পা আর চলে না। টলিতে টলিতে সে এক হিন্দুস্থানী দরোয়ানের গায়ে ধাক্কা খাইল। লোকটি তাহাকে গালি দিল, মাতাল বলিল। খুব একটা রঙ্গ হইল ভাবিয়া গলির মোড়ে শান্তিপুরে কাপড়-পড়া একটি মেয়েমানুষ হাসিয়া কুটি কুটি হইয়া বলিল, খুব ইয়ার্কি শিখেচিস যা-হোক!

বাড়িতে আসিয়া কড়া নাড়িতে নাড়িতে প্রকাশ ডাকিল—ঝি!

ভিতরে একটা কুকুর অস্বচ্ছ স্বরে ডাকিয়া উঠিল। ঝি দরজা খুলিয়া দিতে ছুটিয়া আসিয়া সে প্রভুর পা বেড়িয়া ধরিয়া দাঁড়াইল। ছোট কাল কুকুর, লোমশ—পিঠে দুইটা সাদা ডোরা।

—জো জো—বারকতক তাহার ঘাড় চাপড়াইয় ঝির দিকে ফিরিয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—কেমন আছে?

ঝি সংক্ষেপে উত্তর দিল—ঘুমুচ্ছে।

মাথা নীচু করিয়া প্রকাশ সেই অস্বচ্ছ দরজার চৌকাঠ অতিক্রম করিয়া আসিল। ভিতরে সুড়ঙ্গের মত সরু পথ, তারপর উঠান। ডান দিকে রান্নাঘর, পাশে একটি খাড়া সিঁড়ি কেরোসিন ল্যাম্পের স্থূল শিখার ধূমে ধূমাকার।

দোতলার বারান্দায় জুতাযোড়া খুলিয়া অতি সন্তর্পণে প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করিল। রাস্তার আলো জানালা দিয়া ঘরের কোণে আসিয়া পড়িতেছিল, এবং সেই স্বল্পালোকে মেজের উপর বিছানায় শায়িত রোগিণীর অবয়বগুলি ছায়ার মত দেখাইতেছিল।

রোগিণী তন্দ্রামগ্ন। তাহার মুখ শীর্ণ পাণ্ডুর। ডাগর চোখ দুটির নীচে কাল রেখা। চুলগুলি নিবিড় মেঘের মত বিস্রস্ত, বালিসের চারিপার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আচ্ছন্নতার অন্তরালে ব্যাধিতের চৈতন্য সাবধানে জাগিয়া থাকে। সুরবালা কুঞ্চিত চোখ দুইটি মেলিয়া কখন চাহিয়াছিল, প্রকাশ জানিতে পারে নাই। পিরাণ ও চাদরখানি যথাস্থানে রাখিয়া ফিরিতে অভিমানক্ষুব্ধ ক্ষীণ স্বরে সুরবালা বলিল—এত দেরি করে' ফিরতে হয় বুঝি। সারাদিন একলাটি আছি।

প্রকাশ শয্যাপ্রান্তে বসিল। কাছে ঔষধের শিশি, জলের গেলাস, পথ্যের বাটি প্রভৃতি বিশৃঙ্খল অবস্থায় বিক্ষিপ্ত। সেগুলি যথাসম্ভব গুছাইতে গুছাইতে সে বলিল—এখন কেমন আছ?

সুরবালা বকিয়া গেল উঃ—সারাটি দিন কি ক'রেই যে কাটচে। ঝি বেটি এক দণ্ড ত যদি একটু স্থির হ'য়ে বসবে, বসে আর ফুড়ুৎ ক'রে উঠে যায়। আর তোমার ত যেন মাথার দিব্যি কিছুতেই সকাল সকাল বাড়ী ফিরবে না।

রাগ বা বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশের মুখে ফুটিল না। সে সুরবালার কৃশ হাতখানি মুঠির মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল—বড় কাজের চাপ প'ড়ে গেছে। যেতে দেরি হয়েছিল, তাইতে চটে গেছে। এর উপর যদি কাজে ত্রুটি হয় তা হ'লে আমায় ওরা রাখবে না।

খানিক চুপ করিয়া প্রকাশ বলিয়া গেল—আমি যে কিছু ওখানে থাকতে চাই তা নয়। যদি জানতে কি রকম অপমান সহ্য ক'রে আমাকে ওখানে থাকতে হচ্চে। কিন্তু তোমার অসুখে যে অনেক খরচ-পত্রের দরকার। এ সময় আর চাকরী খুইয়ে উমেদারী করা চলে না।

সুরবালার চোখে জল দেখা দিল। সে কহিল—ভুগে ভুগে এমনি হয়েচি যে, শুধু নিজের কথাই মনে উঠে। আর তুমি যে এত কয়ছ, পরিশ্রমে চিন্তায় শরীর নষ্ট করছ, সে কথা ভাবি কৈ!

একবাটী সাগু হাতে করিয়া ঝি ঘরে আসিল। বলিল —পথ্যি এনেছি মা।

মুখখানি বিকৃত করিয়া সুরবালা অন্য দিকে ফিরিয়া রহিল।

প্রকাশ কহিল—নাও—ও-টুকু খেয়ে ফেল।

—না—ও আর খেতে পারি না।

—ছি, অমন করে না—লক্ষীটি।—বলিয়া ঝির হাত হইতে পথ্যের বাটি লইয়া সে সুরবালার মুখের কাছে ধরিল।

পথ্য খাওয়া শেষ হইলে ঝি বলিল—এখন যাও বাবু, খেয়ে এসগে। রাত হয়েচে। এর পর আর রামঠাকুরের হোটেলে ভাত পাবে না।

—হাঁ যাই। সুরবালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল, হোটেলে কি যে ছাই-ভস্ম খাওয়াচ্চে। খারাপ খেতে তুমি পার না। তবু দুটি যে রেঁধে দেব সে-শক্তি নেই।

প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। দশটা বাজিয়া গেছে। জঠর-মধ্যে ক্ষুধার অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এতক্ষণ সে টের পায় নাই।

চাদরখানি টানিয়া গায়ে জড়াইয়া নিঃশব্দে সে বাহিরে চলিয়া গেল।

২

ব্রহ্মপুত্রের মূল শাখা যমুনার উপকূলে বারুইখালি গ্রাম খুব বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। নদীর ভাঙনে গ্রামখানির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অতীত গৌরব কৃষক ও রাখালের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। সে গ্রাম নেই—বাজার বন্দর, ধনীর অট্টালিকা, কারিগরের কারখানা সব গিয়াছে। কেবল অদূরে ঐ গ্রামের কিয়দংশে একটা মাটির ঢিপির উপর জেলেদের পর্ণকুটীরগুলি অতি গর্ব্বীর পরিপূর্ণ দর্প উপেক্ষা করিয়াই যেন মাথা খাড়া করিয়া আছে।

এই গ্রামে সুরবালার পিতা উমাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বাস করিতেন। উমাপ্রসন্ন পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও কবিরাজী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সংসারে তাঁহার ছিল দুই পুত্র, ইন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ এবং কন্যা সুরবালা। সর্ব্বকনিষ্ঠ চন্দ্রনাথকে এক বছরেরটি রাখিয়া গৃহিনী পরলোক গমন করিলে গ্রামের হিতৈষী বন্ধুরা পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবার জন্য বারবার তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। তাঁহার জীবন-সূর্য্য তখন অপরাহ্নের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছিল। স্বাস্থ্যও প্রায় নষ্ট হইয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে পুত্র-কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধর্ম্মচিন্তা লইয়া অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইবেন স্থির করিলেন। জ্যেষ্ঠ ইন্দ্রনাথ শিশুকাল হইতেই উচ্ছৃঙ্খল; দিন দিন তাহার অসাধু প্রবৃত্তি বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। শেষে কি একটা অপরাধের দরুণ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রকে ডাকিয়া পিতা যার-পর-নাই ভৎর্সনা করিলেন, পুত্রও সমান কড়া কথা শুনাইয়া দিল। পরদিন অতিপ্রত্যূষে কাক পক্ষীটিরও অগোচরে সামান্য যাহা কিছু টাকা-কড়ি ছিল তাহা লইয়া সে যে কোথায় সরিয়া পড়িল, কেহ তাহার খোঁজ পাইল না।

উমাপ্রসন্ন পুত্রের নাম মুখেও আনিলেন না। ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ আধরতি আফিমের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া বিক্ষিপ্ত চিত্তের সামঞ্জস্য করিয়া লইলেন। চিকিৎসায় তাঁহার আর তেমন সুনাম ছিল না, এবং দুঃখের পরিমাণ উত্তরোত্তর যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল রোগীর সংখ্যা তেমনি কমিয়া আসিতে লাগিল। রোজগার কোনদিন প্রচুর ছিল না; তাহার উপর প্রতিবেশী রসিক ভট্টাচার্য্যের সহিত পৈত্রিক আমল হইতে দু-কাঠা ছ-কাটার বিষয় লইয়া মামলামকর্দ্দমার ফলে যথেষ্ট দেনা হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিতে দেখিতে রেহানি তমসুকখানির তামাদির সময় আসিয়া পড়িল। মহাজন নালিশ করিতে চাহিলে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া নূতন দলিল লিখিয়া দিয়া অতিকষ্টে উমাপ্রসন্ন তাহাকে নিরস্ত করিলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল, কলিকাতায় কোন বারবনিতার গৃহে গহনা-চুরির অপরাধে পুত্র ইন্দ্রনাথের দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারা-দণ্ডের হুকুম হইয়াছে।

উমাপ্রসন্ন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ভাবনা হইল পুত্রের জন্য নয়, কন্যার জন্য। সুরবালা তের বছরে পা দিয়াছে। কিন্তু কে বিবাহ করিবে? একে গরীবের মেয়ে, তাহার উপর ভ্রাতার কলঙ্কে পারিবারিক

মর্য্যাদাটুকুও নষ্ট হইয়া গেছে। সমাজ জাগ্রত—মাথায় থাকুন!—সমাজ সে-কথা শুনিবে কেন? কানা হোক, খোঁড়া হোক, নিদান ঘাটের মড়া হোক—বিবাহ যে একটা দিতেই হ'বে!

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। একদিন রাত্রে প্রতিবেশী রসিক ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী বাহিরে গিয়াছিল, হঠাৎ তাহার চীৎকার শুনিয়া রসিক ছুটিয়া উঠানে বাহির হইয়া দেখিল, অধম অবস্থায় তাহার স্ত্রী তথায় পড়িয়া বিধবা পুত্রবধূটির উদ্দেশে গালিগালাজ করিতেছে। দুই চারিটা প্রশ্ন করিয়াই রসিক ব্যাপার বুঝিয়া লইল এবং পত্নীকে চুপ করিতে উপদেশ দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহার সঙ্গে কি একটা পরামর্শ আঁটিল। তারপর পাড়ার লোকজন আসিয়া পড়িলে তাহাদের কাছে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দিল, তাহা এইরূপ:—দুপুর রাত্রে ভট্টাচার্য্য-পত্নী উঠিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, রাস্তা দিয়া কে একজন লোক যাইতেছে। মেঘলা-রাত, কিন্তু লোকটিকে সে চিনিতে পারিয়াছিল—সে নিবারণ। নিবারণ উমাপ্রসন্ন কবিরাজের বাড়ী গিয়া উঠিল দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইল এবং এত রাত্রে সেখানে কি জন্য যাইতেছে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইল। নিবারণ হাতের ছড়ি গাছটা দিয়া দক্ষিণ ঘরের বেড়ার উপর আঘাত করিতে কবিরাজের অবিবাহিতা কন্যা সুরবালা বাহির হইয়া আসিল। রসিকের স্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি নিবারণ ছুটিয়া আসিয়া তাহার মাথার উপর একটা বেতের বাড়ি বসাইয়া পলাইয়া গেল।

অধিক রাত্রে কখন যে পাশের-বাড়ী সোরগোল উঠিয়াছিল, আফিমখোর বৃদ্ধ তাহা টের পান নাই। পরদিন সকালে দারোগার তলবে রসিকের বাড়ী আসিয়া সকল কথা শুনিয়া তিনি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। রসিকের সহিত তাঁহার চিরকালের শত্রুতা, কিন্তু তাই বলিয়া এতবড় মিথ্যা অপবাদ এক নিরপরাধিনী অনূঢ়া বালিকার উপর চাপাইবে, এমন কথা তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই।

দারোগাবাবু নতমুখে ডায়েরী লিখিতেছিলেন। লেখ শেষ হইলে উমাপ্রসন্নের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি বলিতে চান?

উমাপ্রসন্ন নীরব রহিলেন। চারিদিকে বিস্তর লোক, তাহাদের উৎসুক-নয়নের দৃষ্টি সূচের মত তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

দারোগা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার কি কিছু বল্‌বার নেই, মশায়?

কণ্ঠস্বরে শ্লেষ মিশাইয়া রসিক বলিল—বলবেন আর কি মাথামুণ্ডু দারোগাবাবু। ঘরে অত-বড় মেয়ে—বিয়ে দেবার নামটি পর্য্যন্ত নেই।

বিজ্ঞের ন্যায় ঘাড় নাড়িয়া এক ব্যক্তি বলিল—সে-কথা ঠিক। অত-বড় মেয়ে ঘরে রেখে ভাল করনি, হে কবিরাজ। শেষটা কি না জাত-মান ডোবালে?

উমাপ্রসন্নের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। ক্রোধকম্পিতদেহে সজোরে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে হেঁসেল-ঘরে রসিকের বিধবা পুত্রবধূর উপর চক্ষু পড়িল। বাড়ীতে অতবড় ব্যাপার—হৈ-হৈ পড়িয়া গেছে, তথাপ এই স্ত্রীলোকটি নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে রন্ধনকার্য্যে মন দিয়াছিল।

ইতঃপূর্ব্বে এই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দুই-একটা কাণাঘুষা কথা উমাপ্রসন্নের কানে পৌঁছিয়াছিল। তিনি বলিলেন, —অবিবাহিতা মেয়ের বিয়ে দিলেই লেঠা চুকে গেল, তা যেন হোল। কিন্তু যাদের ঘরে বিধবা বৌ-ঝি আছে, তাদের ব্যবস্থা কি কর্‌বে শুনি?

খোঁচাটা কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দেওয়া হইল, রসিকের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। সে রুখিয়া দাঁড়াইল—কি এতবড় স্পর্দ্ধা! আমার নামে কলঙ্ক! ফের যদি অমন কথা মুখে আন কবিরাজ, তা হ'লে জুতো-পেটা করে ছাড়্‌ব ব'লে দিচ্চি!—আরও কত-কি বলিতে যাইতেছিল সে, কিন্তু দারোগার দরাজ গলার আওয়াজে থামিয়া গেল।

দারোগা বলিলেন—আপনি মিছে চট্‌চেন, ভটচায্যি মশায়। উনি ত অন্যায় কিছু বলেননি। শুধু এই কথা বুঝিয়ে দিতে চান যে, একজন অবিবাহিতা মেয়ের ঘাড়ে সমস্ত অপরাধের ভার চাপিয়ে দেবার অ

বাড়ীর বিধবা বৌ-ঝির চরিত্র সম্বন্ধে এনকোয়ারি করা ন্যায়-সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত। বলিয়া যে প্রিয়দর্শন যুবক এতক্ষণ তাহার পার্শ্বে বসিয়া নানা-মত সাহায্য করিতেছিল, তাহার পানে ফিরিয়া কহিলেন—চল প্রকাশ, একবার ও ঘরে গিয়ে ভট্টাচার্য্যি মশায়ের পুত্র-বধূর ষ্টেটমেণ্ট নয়ে আসি।

ফিরিয়া আসিয়া দারোগাবাবু বিশেষ কিছু তদন্ত করিলেন না। তাঁহার মুখের চেহারা কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সাক্ষীদের দুই-চারিটা প্রশ্ন করিয়া কাগজপত্র তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছিলেন, কি ভাবিয়া প্রকাশের দিকে ফিরিয়া খাটো গলায় বলিলেন—সুরবালার জবানবন্দী নেওয়া দরকার। কি বল ?

প্রকাশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,— হঁঃ চলুন।

প্রকাশ গ্রামের ছেলে, পূর্ব্বে সুরবালাকে সে আরও দেখিয়াছে। এবার মনে হইল, সে যেন একটু অধিক ছিপছিপে, একটু অধিক করশা, একটু অধিক দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। আশঙ্কার ছায়া তাহার সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র মুখখানির উপর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দারোগা ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়া গেলেন। নিষ্পলক নেত্রে প্রকাশ শুধু তাহার পানে চাহিয়া চিত্তের সবটুকু শক্তি জড় করিয়া অন্তরালের গোপন সত্য সন্ধান করিতে লাগিল। তাহার একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে সুরবালার দীর্ঘ ঋজু মূর্ত্তি অক্ষুণ্ণ গৌরবে অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। অবনত মুখ কুণ্ঠায় লজ্জায় আরক্তিম, কণ্ঠস্বরে জড়তা নাই—শুধু বাতাভিহত দীপ-শিখার মত কাঁপিতেছিল।

ফিরিবার পথে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—কি বুঝলেন, দীনদয়াল-বাবু ?

দারোগা-বাবু হাসিয়া বলিলেন—তোমাদের গ্রামের লোকগুলি কি রকম, প্রকাশ ?—ছি ঃ!

কোন্ ভাবে কথাটি গ্রহণ করিবে প্রকাশ তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। সন্দেহাকুল ক্ষীণ স্বরে কহিল—ক ???

দারোগাবাবু কহিলেন—নয়ত কি ? দেখতে পাচ্ছ না ? সব মিথ্যা।

—কি ?

—উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা হচ্চে। একটা কলুষিতা স্ত্রীলোকের কলঙ্ক ঢাক্‌বার জন্ত নির্দ্দোষীকে জড়িয়ে যে-রকম প্রমাণ সৃষ্টি করা হয়েচে তা দেখলে সমস্ত গ্রামখানির উপর ঘৃণা হয়।

প্রকাশ চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—সুরবালা নির্দ্দোষী ?

—সম্পূর্ণ।

প্রকাশের মন আহ্লাদে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সংযত হইবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সে কহিল—আমারও সেই কথা মনে হচ্চিল, দীনদয়ালবাবু। ওর চেহারা দেখলে, কথা শুন্‌লে পাপের ছায়া কারু মনেও আসে না।

দারোগা-বাবু বলিয়া গেলেন—তা বটে। কতকগুলি প্রকৃষ্ট প্রমাণও আমি পেয়েচি। না, না প্রকাশ—ব্যাপারটা দিবালোকের মত স্বচ্ছ, ভুল হ'তেই পারে না। সমস্ত সাজানো, বানোয়াট।

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—এখন কি কর্‌বেন ঠিক করেচেন ?

দীনদয়াল কহিলেন—কি আর করব! আমি ত একটা রিপোর্ট ছেড়েই খালাস। এখন যা কিছু কর্‌বার সবই তোমাদের হাতে।

প্রকাশ বলিল—আমরা কি করব ?

দীনদয়াল তাহার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—কর্‌বার মত অনেক কাজই আছে। দ্যাখ প্রকাশ, তুমি আমার ভাইএর ক্লাস-ফ্রেণ্ড, তোমায় আমি ছোট ভাই এর মত দেখি।—সেইজন্ত বল্‌চি। আজকাল তোমরা সব দেশ দেশ করে' পাগল হ'য়ে উঠেচ। কিন্তু সেই দেশ থেকে দেশের লোকের সমাজটাকে বাদ দিলে দেশ একটা নিরর্থক ফুঁকো আওয়াজে গিয়ে দাঁড়ায়। মনেও ক'র না প্রকাশ, যে, আমার রিপোর্ট দেখেই গ্রামের লোকেরা মেয়েটিকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করে' মুক্তি দেবে। বরঞ্চ শুন্‌বে, আমি ঘুষ খেয়ে ওরকম সাফাই দিয়েচি। মেয়েটির কিন্তু ইহকাল নষ্ট হ'তে চল্‌ল—সে-কথা কেউ ভেবেও দেখবে না। এই না আমাদের দেশ ?—ছিঃ!

দীনদয়াল চলিয়া গেলেন। সূর্য্যদেব তখন মধ্যাহ্ন-শিখর ছাড়িয়া নামিবার জন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। বৃক্ষপরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র বাড়ীটির বিস্তৃত উঠানের প্রান্ত-

আগে ঘরের বারান্দায় প্রকাশের মা সবেমাত্র আহ্নিক সারিয়া তাঁহার থালায় ফুলবিল্বদলগুলি একত্র জড় করিতে-ছিলেন, প্রকাশকে ফিরিতে দেখিয়া বলিলেন—বড় বেলা হ'য়ে গেছে, বাবা। ভট্টাচার্য্য বাড়ী ছিলি বুঝি?

হাঁ মা, দারোগা-বাবু ডেকেছিলেন।

ছোট বোন প্রভা ঘরের ভিতর কি কাজ করিতেছিল—বাহিরে আসিয়া বলিল, কি শুন্‌লে দাদা?

গম্ভীর ভাবে প্রকাশ কহিল—সে খবরে তোর দরকার কি? সেই সকালে বেরিয়েচি, বড় খিদে পেয়েচে। যা—তেল নিয়ে আয়।

তেলের বাটি প্রকাশের হাতে দিয়া প্রভা হাসিয়া বলিল,—গাঁয়ে যে হুলুস্থূল পড়েচে—আমাদের কি কিছু শুনতে বাকি আছে, দাদা?

আহারান্তে প্রকাশ একখানি নভেল লইয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল, কিন্তু পাঠে মন বসিল না। প্রভা পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার পানে ফিরিল।

—আর দুটো পান দেব, দাদা?

—না।

খাবার জল

—না!

প্রভা নীরবে টেবিলের উপর বইগুলি আঁচল দিয়া ঝাড়িতে লাগিল। তারপর কহিল—বিশ্বাস হয় না, দাদা।

—কি?

—সুরবালাকেও বরাবর দেখে আস্‌চি, দাদা। ও মেয়ে কখনো এমন ধারা হ'তে পারে না।

করুণায় তাহার মুখখানি টস্ টস্ করিতেছিল। প্রকাশ চাহিয়া দেখিল, বলিল—তোর বিশ্বাসই সত্য। ওর কোন অপরাধ নেই প্রমাণ হ'য়ে গেছে।

প্রভা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—সত্যি! প্রমাণ হয়ে গেছে?

—হাঁ, প্রমাণ হয়েচে—অন্ততঃ পুলিসের কাছে।

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া সে আবার বলিল—তা যেন হ'ল, সে ত কথা নয়। কিন্তু ওর যতটুকু ক্ষতি হবার তা হ'য়ে গেছে।

—কি ক্ষতি, দাদা?

কে আর এখন ওকে বিয়ে করবে আমি সেই কথা ভাব্‌চি।

প্রভা ক্ষণকাল নীরব রহিল। পর মুহূর্ত্তে একটি মধুর কলহাস্তে টিনের ঘরখানি ঝঙ্কৃত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, এইবার দাদা তোমার ধনুক ভাঙার পালা।

কৃত্রিমরোষে গলা মোটা করিয়া প্রকাশ তাড়া দিয়া উঠিল, যা পালা!

প্রভা ভ্রূক্ষেপ করিল না। পূর্ব্ববৎ হাসিয়া হাসিয়া বলিয়া গেল,—তুমি যেমন বেঁকে বসেচ তাতে যে কোন দিন বিয়ে করবে সে ভরসাই নেই। মা ত ঠাকুর দেবতা মানত করে' বসেচেন।

প্রকাশ হাসিয়া ফেলিল—ফের! এবার বোনাইকে লিখে শ্বশুর-বাড়ী চালান করব ব'লে দিচ্চি।

প্রভার চেয়ে সে মাত্র বছর খানেকের বড়—পার্থক্য এতই অল্প যে, সব সময় বড় ভাইএর মর্য্যাদাটুকু অটুট রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া মাঝে মাঝে তাহার আপ-শোষের জলধি উথলিয়া উঠিত। ভগবান যখন দয়া করিয়া তাহাকে বড় করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন তখন আর-একটু অধিক বড় করিলে এমন বিশেষ লোকসান ছিল না। অবশ্য ছেলেবেলায় এই দুটি ভাইবোন এক জোড়া প্রজাপতির মতন এক সঙ্গে খেলিয়া নাচিয়া বেড়াইত। তাই বলিয়া জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ অধিকার সে ছাড়িবে কেন? কিন্তু বোন্‌টি কেমন অবুঝ—এই নৈসর্গিক বিধানের প্রাচীরটা একটু অতিরিক্ত সম্ভ্রম দিয়া সে যেমন পোক্ত করিয়া তুলে, অমনি তাহার ব্যঙ্গ-কৌতুক সহাস চঞ্চল রবি-কিরণের মত অবিরল ঝরিয়া গাম্ভীর্য্যের কুয়াশা নিমিষে উড়াইয়া দেয়। এ তাহার ভারি অন্যায়—ভারি!

কিন্তু পরদিন প্রকাশ আসিয়া যখন জানাইল যে, প্রকৃতই সে তাহার ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙিয়া সুরবালাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তখন এই রহস্যপ্রিয়া বোনটির মুখের উপর এতটুকু কৌতুকের ছায়া স্পর্শ করিল না। চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল—বল কি!

—হাঁ, প্রভা। বিদ্যারত্ন মশায়কে কথা দিয়ে এলাম।

প্রভার মুখ মলিন হইয়া গেল,—কথা দিয়ে এলে?

প্রকাশ হাসিয়া উঠিল—ওই নাও! এখন থেকেই উল্টে গাইতে সুরু কর্‌লি যে!

—গাঁয়ের লোক কি বল্‌বে, দাদা?

—তা জানি না।

—মা?

—তুই তাঁকে রাজি ক'রিস্‌।

সমস্ত শুনিয়া মাতা ডাকিলেন, প্রকাশ!

—মা!

একথা সত্য?

—হাঁ, মা!

বিধবার একমাত্র ছেলে—মাকে সে বিলক্ষণ চিনিত। সে অসঙ্কোচে বলিয়া গেল—ওদের পানে যদি একবার চেয়ে দেখ্‌তে, মা। এখন যদি মেয়েটিকে পার কর্‌তে না পারে তাহ'লে এ গ্রামে ওদের থাকা সম্ভব হ'বে না। বুড়ো সেই কথা বল্‌ছিল। বাপ-পিতামহের বাড়ী ছেড়ে কোথা যাবে, কি কর্‌বে। বল্‌তে বল্‌তে বুড়ো কেঁদে ফেলেছিল, মা। আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না।—

—কৈ গো, বৌঠাকরুণ কোথা? যষ্টিহাতে এক বৃদ্ধ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাঁড়ুয্যে মশায়, ইহাদের একজন হিতৈষী প্রতিবেশী। সকৌতুক দৃষ্টিতে উভয়কে দেখিয়া লইয়া হাসিমুখে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হচ্চে বাবাজি? মার সঙ্গে ঝগড়া করচ বুঝি?

মাতা বলিলেন—শোন কথা, বাঁড়ুয্যে মশায়। ছেলে বলে কি না সুরবালাকে বিয়ে কর্‌বে।

বাঁড়ুয্যে মশায় উৎফুল্ল হইলেন—তাই না কি? বেশ বাবাজি বেশ! লেখাপড়া শিখচ, এই ত চাই।

মাতা অবাক হইয়া গেলেন—বল কি, বাঁড়ুয্যে মশা[illegible] যাকে নিয়ে এত কেলেঙ্কারি তাকে ও বিয়ে কর্‌বে? তা কি হয়?

গম্ভীর মুখে বাঁড়ুয্যে মশায় কহিলেন—মিছে কথা, বে[illegible] ঠাক্‌রুণ—সব মিথ্যা আমি কি ওদের চিনি না?—[illegible] বাবাজি, এ তোমার মহৎ [illegible]। তুমি বিবাহ কর[illegible] মেয়েটি রক্ষা পেয়ে যাবে। ওরা গরীব বটে, কিন্তু সজ্জন গরীবের দুঃখমোচন, ম্লান মুখে হাসি ফোটান, এর চে[illegible] মহৎ আর কি হ'তে পারে, বৌ-ঠাকরুণ?

—কিন্তু গ্রামের লোকে নিন্দা কর্‌বে যে?

বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—নিন্দা কর্‌বে? করুক তোমাদের কিসের অভাব, বৌ-ঠাকরুণ যে, লোকের মু[illegible] চেয়ে কাজ কর্‌বে? তুমি ত জান, ওর বাবা কখ[illegible] নিন্দার ভয় করতেন না। তিনি বল্‌তেন, ওরা কেব[illegible] নির্জ্জীবের উপর উৎপাত কর্‌তে পারে। স্বয়ং জমিদার[illegible] কখনো তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেননি।

করুণ স্মৃতির ভারে মাতা কিয়ৎকাল স্তব্ধ হই[illegible] রহিলেন। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন-[illegible] তাই হোক্‌, বাবা। এ কাজে আমি তোকে বা[illegible] দেব না।

শুভদিনে শুভক্ষণে অনেক বাধা-বিপত্তি এড়াইয়া প্রকা[illegible] যখন সুরবালাকে বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিল তখন তাহা[illegible] কেবল মনে হইতেছিল, আজিকার একটি দিনের [illegible] একটি দিনের তৃপ্তি তাহার সারা জীবন সার্থক করি[illegible] দিয়াছে।

(ক্রমশ)

লালন শাহ

শ্রী বসন্তকুমার পাল

প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই যে সেই পরমপুরুষ বিরাজমান এবং তিনি যে সর্ব্বঘটে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই জ্যোতির্ম্ময়ের ভাবদ্যুতি যে সমস্ত মানবের মধ্য দিয়াই স্ফুরিত হইতেছে, প্রকৃত প্রেমিক ইহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া নরনারায়ণের ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন। সাঁই-পীরেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। একটি সঙ্গীতে তিনি

য়াছেন—"স্বরংরূপ দর্পণে ধ'রে মানব রূপসৃষ্টি করে।" এই সত্য, এই ভাব ও তাহার অনুভূতি তিনি রের সহিত অনুভব করিতেন। তাহার ফলে মানবের -অবয়ব তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। নি বলিতেন, আপন প্রাণের দুয়ার খুলিয়া দৃষ্টিপাত কর, ান কর, দেখিবে তথায় মন্দাকিনীর পূতধারা প্রবাহিত তেছে। তাহাতে ডুব দাও, ভয় করিও না, "ডাঙ্গা" বে, যদি উপরে বসিয়া থাক ত ভাসিয়া যাইবে। তিনি ই গাহিয়াছেন :—

মধুর দিল্-দরিয়ায় যে-জন ডুবেছে,
সে-না সব খবরের জবর হয়েছে।
পর্ব্বতের চূড়ায় গঙ্গা
জলের ভিতরে ডাঙ্গা
ডুবে দেখ্ না, এবার ডুবে দেখ্ না।
ডুব্‌লে ডাঙ্গা পাই
উঠ্‌লে ভেসে যাই
বিষম তরঙ্গ তুফান রে।
মাক্‌ড়ার অ াশে হস্তী বাঁধা
লোহার তারে চেঁওটী * ছাঁদা
তাহা যায় ছিঁড়ে।
একি অসম্ভব
কুতি কর্ম্ম সব
যে যেমন সে তেমন পেয়েছে রে।
যে স্তনের দুগ্ধ শিশুতে খায়
জোঁকে মুখ লাগলে তথায়,
রক্ত পায় গো সে।
উত্তমে অধম, অধমে উত্তম
লালন বলে যে যেমন
সে তেমন পেয়েছে রে।

কেবল তাহাই নহে, তিনি এই মানবদেহকে গুপ্ত (প্রকাশ্য) মাক্কা ('মক্কাশরীফ') বলিয়া পরিষ্কার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে যে মধুর ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাতে এই দেহকে তিনি আনন্দময়ের লীলা-ময়ের মন্দিররূপে দর্শন করিয়াছেন। পঞ্চভূতে রচিত মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি আপনার মনেই লীলারস উপভোগ করিতেছেন। লীলাময়ের অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ মহাপুরুষেরা দেখিতে পান, এই দেহ নশ্বর হইলেও ইহাই লীলাময়ের আনন্দ-নিকেতন, ইহার অভ্যন্তরে বিনিবেশিত জ্যোতিরাশির কণামাত্রও মুহূর্ত্তের জন্ত নয়নপথে পতিত হইলে মানবহৃদয়ের আঁধার-কালিমা চিরতরে তিরোহিত হইয়া যায়। তখন তাহার দৃষ্টি সেই জ্যোতির উৎসের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অস্থিমাংসময় মানবদেহের মধ্যে—

"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো-
দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুনিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ দীপ্তানলার্কদ্যুতি-
মপ্রমেয়ম্ ॥"

বর্ণিত রূপই দর্শন করিতে থাকে। সাঁইজীরও এই অলৌকিক ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাই তিনি নিম্নের সঙ্গীতে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন :—

আছে আদি মাক্কা এই মানব-দেহে
দেখ্ না রে মন ভেয়ে। (চিন্তা করিয়া)
দেশ দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস্ কেন হাঁপিয়ে।
ক'রে অতি আজব ভাক্কা (আজব—আশ্চর্য্য, ভাক্কা—অবয়ব)
গঠেছে সাঁই মানুষ মাক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে। কুদরতি নূর—ঐশ্বরিক জ্যোতি
ও তার চা'র দ্বারে চার নূরের ইমাম (ইমাম—কর্ত্তা)
মধ্যে সাঁই বসিয়ে।
মানুষ মাক্কা কুদরতি কাজ,
উঠ্‌ছে রে আজগবি আওয়াজ, (আজগবি—অদ্ভুত।)
সাততালা ভেদিয়ে। (আওয়াজ—ধ্বনি)
আছে সিং-দরজায় দ্বারী একজন
নিদ্রাত্যাগী হোয়ে।
দশ দুয়ারী মানুষ মাক্কা
গুরুপদ ডুবে দেখ্ গা
ধাক্কা সামালিয়ে।
সাঁই লালন বলে গুপ্ত মাক্কা
আদি ইমাম সেই মিয়ে। (মিয়ে—প্রভু Lord)

(এই সঙ্গীতটির শব্দবিন্যাস, হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের সন্নিবেশ এবং ছন্দের বিনিবেশ দৃষ্টে সাঁইজীর শব্দ ও ছন্দজ্ঞানের

---

* পিপীলিকা।

পাণ্ডিত্য পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা যায় অথচ তিনি নামেমাত্র লেখাপড়া জানিতেন)।

এই মানুষের মধ্যেই ভগবানের বিকাশ, ইহার মধ্যেই তাঁহার বিলাস এবং এই মানব-জগৎ লইয়াই যে তাঁহার বিশেষ লীলাখেলা এই কথাই তিনি পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এ জগতে কতজন মনের মানুষ সন্ধান করিতে "দেশদেশান্তর ঘুরিয়ে হাঁপিয়ে মরে"; কিন্তু তাহার আশেপাশে, চতুর্দ্দিকে, এবং তাহার আপনার মধ্যেই যে সেই "মানুষ" বিরাজ করিতেছেন, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা তলাইয়া দেখে না! কেবল, "গোলে হরিবোল" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। চিত্ত স্থির করিয়া নরনারায়ণের রূপ ধ্যান কর, নিষ্ফল ছুটাছুটি, বৃথা বাগ্‌জাল সমস্ত পরিত্যাগ কর, আপনার মধ্যেই তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তাই সাঁইজী বলেন,—

ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে,
আছে কোন মানুষের বসত কোন দলে।
অয়নি সহজ সংস্কার
তারে, কি সন্ধানে পাব্‌ব এবার
বড় অগম্য মানুষ নীলে
ও মানুষ নীলে!
সংস্কার সাধন না জানি,
কোথা পাই সহজ কোথা অয়নি,
বেড়াই গোলে হরি বোল ব'লে
হরি বোল ব'লে।
তিন মানুষের কারণ বিচক্ষণ
তারে জান্‌লে হবে এক নিরূপণ
অধীন লালন প'ল গোলমালে
ও মন গোলমালে।

মনুষ্য-জগতের আভ্যন্তরীণ ঈদৃশ লীলাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার "সোণার মানুষের" ভাবে গদ গদ হইয়া তিনি গাহিয়াছেন—

সোণার মানুষ ভাসছে রসে,
যে জানে সে রসপান্তি
সেই দেখ্‌তে পায় অনায়াসে।
তিনশ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি'
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।
মাতা-পিতার নাই ঠিকানা
অচিন দেশে বসত থানা
আজগবি তার আওনা যাওনা
কারণ-বারির যোগ বিশেষে।
অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়
দেখ্‌তে যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে থেকো সদাই
ত্রিবেণীতে থেকো ব'সে।

মনুষ্য সম্বন্ধে যাহার এইরূপ জ্ঞান, যাঁহার দৃষ্টি মানুষের দিকে এইরূপ খুলিয়া গিয়াছিল, যিনি মানবদেহকে গুপ্ত মাক্কা রূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনি আবার আপনাকে দীন, পতিত, অবোধ বালক এবং অপরাধী বলিয়া আকুল ক্রন্দনে 'অপারের কাণ্ডারীকে' ডাকিয়া বলিয়াছেন-

ওহে দীননাথ ক্ষম অপরাধ
কেশে ধ'রে আমার লাগাও কিনারে,
তুমি হেলায় যা কর তাই করিতে পার
তোমা বিনে পাপী তারণ কে করে।
না বুঝে পাপ-সাগরে ডুবে খাপী খাই;
শেষকালে তোমায় দিলেম গো দোহাই,
তুমি আমায় যদি না তরাও গো সাঁই
তোমার, দয়াল নামের দোষ রবে সংসারে।
পতিতকে তরাইতে পতিত-পাবন নাম
তাইতে তোমায় ডাকি ওহে গুণধাম
তুমি আমার বেলায় কেন হ'লে বাম
আমি, আর কতকাল ভাস্‌ব দুখের পাথারে।
শুন্‌তে পাই পরম পিতা গো তুমি
তোমার অতি অবোধ বালক আমি,
যদি ভজন ভুলে কুপথে ভ্রমি
তবে দাওনা কেন সুপথ স্মরণ করি।
অথাই তরঙ্গে আতঙ্কে মরি,
কোথায় হে অপারের কাণ্ডারী,
অধীন লালন বলে তরাও হে তরী,
নামের মহিমা জানাও সংসারে।

সাঁইজী সংসার পাতিয়া গৃহস্থ সাজিয়া সদানন্দ ধামে বাস করিতেন, তিনি যেথায় বাস করিতেন তথাকার পড়শীর জন্ত তিনি অনুক্ষণ চিন্তিত রহিতেন, কারণ পড়শীকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাই কখনো কাঁদিতেন কখনো বা অধৈর্য্য হইয়া বলিতেন, "দেখা দিয়ে ওহে রসুল ছেড়ে যেও না।" আবার কখনো পড়শীর প্রেমে পাগল হইয়া অতৃপ্ত পিপাসায় বলিতেন, "আমি একদিনে না দেখলেম্ তারে।" মনের মত ভালবাসায় পড়শী পাইয়া খেলা করিতেন, আবার পড়শীও তাঁহার সাথে লুকোচুরী খেলিতেন। কখনো তাঁহার ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, আবার কখনো ভাবাধিক্যে হারাইয়া লক্ষ যোজন দূরে সরিয়া পড়িতেন। পড়শী-স্পর্শে যে যম-যাতনা ছুটিয়া যায় তাঁহার এ অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ জন্মিয়াছিল তাই তিনি পড়শীকে লইয়া একত্র বাস করিতেন। কি ভাব! এত আত্মীয়তা, এত ঘনিষ্ঠতা ও এত বেদনা তিনি মনের মানুষের জন্য হৃদয়ে পোষণ করিতেন। তাই গাহিয়াছেন—

আমি একদিনে না দেখ্‌লেম তারে।
বাড়ীর কাছে আরশী নগর পড়্‌শী বসত করে।
গ্রাম বেড়ে তার অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারের।
মনে বাঞ্ছা করি দেখ্‌ব তারি
কেমনে সে গাঁয় যাইরে।
কি কব পড়্‌শীর কথা
ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাইরে,
ও সে ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর
ক্ষণেক ভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁ'ত
ও মোর যম যাতনা সকল যেত দূরে,
সে আর লালন এক খানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন—

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখ্‌তে পায়
অমাবস্যা নাই যে চাঁদে দিনে তার বারাম উদয়,
যেথা রে সে চন্দ্রভুবন,
দিবা রাত্রি নাই আলাপন,
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজলী চঞ্চলা সদাই।
বিন্দুমাঝে সিন্ধু বারি
মাঝখানে তার স্বর্ণ গিরি,
অধর চাঁদের স্বর্ণ পুরী
সেইত তিনি প্রমাণ জাগায়।
দরশনে দুখ হরে
পরশনে পরশ করে
এমন সে চাঁদের মহিমা
লালন ডুবে ডোবে না তায়!

এইরূপ আত্মীয়তা লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি আর সকলকেও এই ভাবের ভাবী হইতে বলিতেন; ভুলে যাও প্রকৃতির বাহ্য অবয়ব, নয়নের কালিমা উন্মোচন কর, রসনার আবিলতা পরিমার্জ্জিত কর, এবং ভাবের ভাবী হইয়া ভক্তি ও বিশ্বাস-যোগে সন্ধান কর, ভস্মের মধ্যে বহ্নি ও গরলের মধ্যে অমিয় পাইবে। বিষয়-রূপ গরলের পার্শ্বেই যে অমৃতের পুণ্যপ্রবাহ ছুটিয়া যাই-তেছে প্রকৃত অমৃতের পিপাসু না হইলে তাহার সন্ধান লইবে কে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত সাধক যখন সংসারে বিষয়ের মধ্যেই বাস করেন তখন তাঁহার মানসিক চিন্তার ধারা বিষয়-সমৃদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্যোতির্ম্ময়েই নিবদ্ধ রহে। নহিলে সংসারী গৃহস্থ কি সাধন-পথের অধিকারী নয়? যদি তাহাই হইত তবে এই সংসার বিজন-মরু-প্রান্তরে পরিণত হইত। সহস্রাংশু দিবাকরের বিমল রশ্মিজাল যেমন প্রত্যেক জলবিন্দুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পায় সেইরূপ আনন্দময়ের হৃদয়-বিকসিত প্রেমসুধার অমল ধারা মাতাপিতা,ভ্রাতাভগ্নি-সন্তান-সন্ততি ও পরিজনবর্গের উপর প্রতিফলিত হইয়া তাহাদিগকেও প্রেমময় করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিশ্ব-ব্যাপী প্রেমের পুণ্য ধারা স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিবার মত পবিত্রতা ও শক্তি প্রাণে পোষণ করা চাই, সেই দেব-ভোগ্য অমৃত আস্বাদন করিবার মত স্বচ্ছ রসনা চাই এবং সেই বিমল জ্যোতির প্রখর রশ্মি উপভোগ করিবার মত উন্মুক্ত এবং তেজোময় দৃষ্টিশক্তি চাই। সংসারের সহস্র কোলাহলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও কেহ আপন অভীষ্ট সাধন করিয়া অন্তিমে সুখ-সুষুপ্তিতে নয়ন মুদ্রিত

করেন, আবার নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াও কেহ বা সুধা-ভ্রমে গরল পান করিয়া নিরন্তর অসহ্য পীড়নে জলিয়া পুড়িয়া অবশেষে দুর্ব্বহ জীবন ভার পরিত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া নিষ্কৃতি পান। সংসারের জটিল কর্ম্মক্ষেত্র মানবের পক্ষে চমৎকার পরীক্ষাগার ; এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই শান্তি। তাই সাঁইজী বলেন—

গোঁসায়ের ভাব যেই ধারা,
আছে সাধু শাস্ত্রে তার প্রমাণ আচার
শুনেরে জীবন অমৃনি হয় সারা।
মরার সঙ্গে মরে ভাবের সাগরে,
ডুব্‌তে পারে তাহে রসিক যারা।
দুধেতে জলেতে মিশাল সর্ব্বদা
মৈথুন দণ্ডে করে আলাদা আলাদা
ভাবের ভাবি হবে সুধা নিধি পাবে
মুখের কথায় নয়রে সেতাব করা।
অগ্নি ঢাকা যৈছে ভস্মের ভিতরে
সুধা আছে তৈছে গরলের ভিতরে
যেমন সুধার লোভে যেয়ে মরে গরল খেয়ে
মৈথুনের সুতায় জানেনা তারা।
যে স্তনের দুগ্ধ খায়রে শিশু ছেলে
জোঁকের মুখে তথায় রক্ত এসে মেলে,
লালন ফকির বলে বিচার করিলে
কুরসে সুরস মিলে এই ধারা।

কর্ম্মিগণের পক্ষে এই সংসার বিস্তীর্ণ বিপণি, সমস্ত শ্রেণীর গ্রাহকের জন্য এখানে বিবিধ বর্ণের পণ্যবীথি থরে থরে সুসজ্জিত রহিয়াছে, যিনি অভিজ্ঞ ও সুচতুর তিনি বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ না হইয়া, সর্ব্বাগ্রে বস্তু-জ্ঞান অবগত হন, তাহার পর আবশ্যক সামগ্রী ক্রয় করেন। আবার যাহারা অজ্ঞ তাহারা নির্ব্বোধ সুসজ্জিত পণ্যের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া অমূল্য ধন ফেলিয়া "পিতল দানা" লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। সৃষ্টির অলঙ্কার মানবের বাস-স্থান এই সংসার বড় রহস্যময় পরীক্ষা-ক্ষেত্র, অতি সাবধানে, সন্তর্পণে ও স্থির বুদ্ধিতে এই পরীক্ষাগার অতিক্রম করিতে হইবে, লালন তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

হীরা লাল মতির দোকানে গেলে না
সবই কিন্‌লিরে তুই পিতল দানা,
চটকে ভুলেরে মন
হারালি তুই অমূল্য ধন
হায়লে বাজী কাঁদলে তখন
আর সারবে না।
শেষের কথা আগে ভাবে,
উচিত বটে তাই জানিবে,
এবার গত কর্ম্মের বিধি কিরে,
মন রসনা।
বেপারে লাভ করি ভাল
সে গুণপণা জানা গেল
অধীন লালন বলে মিছে হ'ল
আনা-যানা। *

* প্রবন্ধটি বহুদিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত, সম্প্রতি মহম্মদ মনসুর উদ্দীন সংগৃহীত লালন সাহের কয়েকটি গান পাইয়াছি। বিগত চৈত্রের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। গানগুলি শীঘ্র ছাপা হইবে। প্রঃ সঃ

ছেলেমেয়েদের বাঁচাও

অধ্যাপক শ্রী মন্মথমোহন বসু, এম-এ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন কয়েকটি লক্ষণ দেখা গেল যাতে বোঝা গেল যে, ইংরেজ জাতি ক্রমশঃ দৈহিক অবনতির পথে নেমে যাচ্ছে। ইংরেজ এমন জাতই নয় যে, এ ব্যাপার দেখে চুপ ক'রে ব'সে থাকবে। ওরা যে নিজের দেশ ও জাতিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। জাতির অঙ্গে এতটুকু ক্ষত—এতটুকু অনিষ্টের আশঙ্কা হ'লেই ওরা আর স্থির থাকতে পারে না, ছুটে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার

করতে চেষ্টা করে। আর স্বজাতির প্রতি তাদের এই দরদ কেবল বক্তৃতা-মঞ্চে ও সংবাদপত্র-স্তম্ভে ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় না, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা হিতকর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সেটা সজীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। উপরি-উক্ত জাতীয় ব্যাধির নিবারণ ও প্রতিকার করবার জন্ত তারা কি করছে ও করেছে তারই একটু পরিচয় আমি এ প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করব। উদ্দেশ্য—আমাদের দেশের লোকেদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করা। কারণ এ ব্যাধিতে আমরা বহুকাল হ'তে ভুগ্‌ছি, ওদের চিকিৎসা প্রণালী ও তার ফল দেখে এর প্রতিকারের প্রকৃষ্ট পন্থা সম্বন্ধে আমাদের কতকটা শিক্ষা লাভ হ'তে পারে, এইটুকু আমার আশা।

ইংরেজ যখন দেখ্‌লে যে, তাদের জাতির দেহে ঘুণ ধর্‌তে আরম্ভ করেছে, তখন তার প্রতিকারের জন্ত তরুণ কবি, দার্শনিক, রাজনৈতিক বক্তা, সম্পাদক, সাধুসন্ন্যাসী, এমন-কি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ম্মান্বিত সর্ব্বগুণসম্পন্ন উকিল ব্যারিষ্টারের কাছে পর্য্যন্ত ছুটে গেল না। তারা গেল চিন্তাশীল ক্রিয়াসিদ্ধ বিশেষজ্ঞদের কাছে। এই বিশেষজ্ঞরা বল্‌লেন,

"জাতির ভিতটা আল্‌গা হ'য়ে পড়াতেই এই দৌর্ব্বল্য দেখা দিয়েছে। ছেলেমেয়েরাই হচ্ছে জাতির সৌধের মালমশলা, তাদের যে-পরিমাণে মজবুদ্‌ ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পারবে সেই পরিমাণে জাতির গাঁথনি শক্ত হবে। তোমরা দেশের সব ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেছ, ভাল কথা। কিন্তু শৈশব অবস্থা থেকেই তাদের দেহের দিকে নজর রাখা দরকার। দুর্ব্বলাঙ্গ, বিকৃতেন্দ্রিয়, ক্ষীণমস্তিষ্ক বালক-বালিকাগণের জন্ত যদি গোড়া থেকে উপযুক্ত চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা না কর তা হ'লে তারা ভবিষ্যতে সমাজের ভারস্বরূপ হ'য়ে আর দৌর্ব্বল্য বাড়াবে বৈ কমাবে না।"

উপদেশ পাওয়ার পর জীর্ণ সংস্কারের কাজ আরম্ভ হ'তে বিলম্ব হ'ল না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দেশের ব্যবস্থা-কর্ত্তারা দস্তুর মত কাজ সুরু ক'রে দিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে কি করা যায় তা তদন্ত করবার জন্ত অভিজ্ঞ সরকারী কর্ম্মচারীদের একটা কমিটি (Inter-Deparmental Committee) বস্‌ল। এই কমিটি অনুসন্ধান ক'রে জান্‌লেন, কোন কোন স্থানে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বেচ্ছায় নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দেহ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এই স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপারটা সব বিদ্যালয়ে অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরিণত করা বিধেয় মনে কর্‌লেন। কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একটি আইন পাশ ক'রে এ ব্যবস্থাটা রীতিমত বিধিবদ্ধ করা হ'ল। এই আইন অনুসারে স্থানীয় শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজ নিজ এলাকাস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রগণের দেহ পরীক্ষা করা এবং অন্ধ ও বধির বালকবালিকাগণের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হ'লেন। এইরূপে জাতি-সংস্কার-কার্য্যের পত্তন হ'ল। তারপর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে একটা আইন পাশ ক'রে ক্ষীণমস্তিষ্ক ও স্নায়বিক-বিকারগ্রস্ত বালকবালিকাগণকেও উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ভারও উপরিউক্ত কর্ত্তৃপক্ষগণকে অর্পণ করা হ'ল। এর চার বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাকর্ত্তারা আরও একপদ অগ্রসর হলেন।* এবারকার ব্যবস্থাটা বেশ ভাল রকমেরই হ'ল। আইন হ'ল, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অতঃপর ছেলেমেয়েদের শুধু দেহ পরীক্ষা করলেই চল্‌বে না; পরীক্ষার পর যদি দেখা যায় যে, কারো চক্ষু-রোগ বা দন্ত-রোগ আছে বা কেউ tonsil, adenoids প্রভৃতি গ্রন্থি-বিবৃদ্ধি রোগে বা ঐ ধরণের অন্ত কোন রোগে ভুগ্‌ছে, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ভর্ত্তি হবার পর এক বৎসরের মধ্যেই এই পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা চাই। তারপর আট বৎসর বয়সে একবার এবং বার বৎসর বয়সে আর-একবার পরীক্ষা করতে হবে। এই আইন অনুসারে উচ্চতর (Secondary) স্কুল-সমূহেও ছাত্রদের শরীর পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'ল। তাদের সম্বন্ধে আদেশ হ'ল যে, ভর্ত্তি হবার সময়েই তাদের দেহ একবার ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে। তার পর মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য-সচিব যেমন নির্দ্দেশ করেন সেইমত আবার তাদের দেহ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হ'বে।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত নিয়মগুলি এখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যথাযথ ভাবে পালিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অনেক স্থানে স্থানীয় শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষগণ শিক্ষা-বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ ক'রে আইনে অনুল্লিখিত আরও কতকগুলি রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। এইসকল রোগের মধ্যে কর্ণরোগ, পঙ্গুতা এবং যে-সকল ব্যাধিতে কৃত্রিম সূর্য্যালোকের দ্বারা উপকার পাওয়া যায় সেইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য এখন প্রায় ১৪০০ আরোগ্যালয় (School clinics) স্থাপিত হয়েছে এবং যদিও সেকেণ্ডারি স্কুলের ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষগণ আইনতঃ বাধ্য নন তথাপি সেরূপ শতাধিক স্কুলকর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় নিজ নিজ ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করেছেন, তবে সে-ব্যবস্থা সাধারণতঃ কেবল অক্ষম দরিদ্র ছাত্রদের জন্য।

এ সব ত গেল সরকারী ব্যবস্থা। কিন্তু দেশের লোক সরকারের উপরেই সব ভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে নেই। তারা সরকারী ব্যবস্থাগুলি সফল ক'রে তোলার জন্য সরকারকে ত যথেষ্ট সাহায্য করেছেই, তা'ছাড়া তাদের সহায়তায় রোগাতুর বান্ধবহীন ছেলেমেয়েদের যত্ন ও সেবার জন্য কেয়ার কমিটি (Care Committee) নামে অনেকগুলি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। এক লণ্ডন সহরেই এখন ৯৩০টি সমিতি আছে এবং সেগুলিতে ৫৭০০ জন শিক্ষিত সেবাকার্য্যে পারদর্শী স্বেচ্ছা-সেবক কাজ করছে। যে সকল রোগকাতর বালকবালিকার সেবা-শুশ্রূষা করবার লোকের অভাব, তাদের বাড়ীতে গিয়ে এইসব মহাপ্রাণ স্বেচ্ছা-সেবক তাদের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ ক'রে তা'দিকে মায়ের মত যত্ন ক'রে, আবশ্যক হ'লে তাদের জুতা কাপড় চিকিৎসার উপকরণাদি যোগায় এবং কারোর জন্য যদি কোন বিশেষ চিকিৎসা বা পথ্যের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তারও বন্দোবস্ত করে। যদি কোন গৃহে কোন বালক বা বালিকাকে তারা ক্রমাগত উপেক্ষিত বা অত্যাচরিত হ'তে দেখে তাহ'লে National Society for the Prevention of Cruelty to Children নামক বালকবালিকাগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার সাহায্যে তারা অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার চেষ্টা করে। এইসকল স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে, শিক্ষা-বোর্ডের প্রধান মেডিকেল আফিসার সার জর্জ নিউম্যান তাঁর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে শতমুখে তাদের গুণগান করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"এইসব স্বেচ্ছা-সেবকের অসীম ধৈর্য্য, অমানুষিক পরিশ্রম ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগের কি ব'লে প্রশংসা করব তা জানি না, কারণ ওদের কাজ সকল প্রশংসার অতীত।"

এইরূপে ইংরেজরা তাদের জাতির ভবিষ্যৎ আশা বালকবালিকাগণের দেহ রক্ষণ ও পালনের ভার গ্রহণ ক'রে তাদের জাতীয় অবনতির স্রোতের গতি রোধ করবার চেষ্টা করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভিতর দিয়ে একাজ করার সুবিধা এই যে, এইসকল বিদ্যালয়ে দেশের সব ছেলেমেয়েকে পাওয়া যায়, কারণ ওদেশে প্রাথমিক শিক্ষাটা এখন সার্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক—পাঁচ বৎসর বয়সের সকল ছেলে-মেয়েকেই প্রাইমারী পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দিতে তাদের অভিভাবকেরা বাধ্য। সুতরাং শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বার ভার গ্রহণ করাতে পাঁচ বৎসর হ'তে চোদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালকবালিকাগণের দেহ রক্ষণ ও পালনের ব্যবস্থা এক রকম হয়েছে। কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের কি হবে? এইটিই হচ্ছে এখন বিষম সমস্যা। শিশু-জীবনের এই প্রথম পাঁচবৎসর তাদের দেহগঠনের ও সংস্কারের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কাল। এসময় দেহটা থাকে অনেকটা নরম মাটির মত, বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এই সময় যত সহজে ঠিক ক'রে দিতে পারা যায়, বড় হ'লে তত সহজে পারা যায় না। তা'ছাড়া, খাওয়া, পরা, চলা, ফেরা, বসা, শোয়া প্রভৃতির দোষে যে-সব অঙ্গবিকৃতি বা ইন্দ্রিয়বৈকল্য ঘটে শিশুকাল হ'তে সাবধান হ'লে আর সে-গুলা ঘট্‌তে পারে না। কিন্তু দেহে দোষ একবার ঢুকে গেলে, পরে তা তাড়ান দুষ্কর হ'য়ে পড়ে।

সৌভাগ্যক্রমে শিশুরক্ষার দিকেও এখন সাধারণের দৃষ্টি পড়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি "শিশুমঙ্গল সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসকল সমিতি সাহিত্য, চিত্র, বক্তৃতা, নাট্যাভিনয়, প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্যে শিশুপালন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়ে শিশুদের জনক-জননী ও অভিভাবকদিগকে এ বিষয়ে সচেতন ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা করছেন। শিক্ষিতা ধাত্রী নার্স প্রভৃতি যাতে সহজে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় তারও চেষ্টা খুব চলছে। কিন্তু সমগ্র জনসাধারণকে বুঝিয়ে কোন কাজ করান সহজ ব্যাপার নয়; বিশেষতঃ যে-সকল কাজে ব্যয় আছে, কষ্ট আছে, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে সে-সকল কাজ যে তারা বল্‌বামাত্র করতে ছুটবে এটা কখন আশা করা যায় না। আর যদিই বা করতে স্বীকার করে, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে হয়ত

হ'তে বিপরীত ক'রে বস্‌বে। সর্ব্বসাধারণকে দিয়ে কাজ করাতে হ'লে আইনের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু আইন পাশ করলেই যে কাজটা হবে তাও মনে করা ভুল। কারণ জনসাধারণের যদি সে কাজ করবার শক্তি না থাকে, তা হ'লে আইন তাদিকে সেটা করতে কি ক'রে বাধ্য করতে পারে? সেইজন্য আইন করবার সঙ্গে তা মানবার উপায় ক'রে দেওয়া চাই। সকলকে পাঠশালায় ছেলে পাঠাতে বাধ্য করতে হ'লে, আগে পল্লীতে পল্লীতে অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করা চাই, নতুবা আইনের ধারা কেতাবের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যাবে, কখনও কাজে লাগবে না। এইজন্যই বালকবালিকাগণের শরীর-রক্ষা সম্বন্ধে যে-সকল আইন পাশ হয়েছে সেগুলি দ্বারা জনসাধারণকে এবিষয়ে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়নি। সে-গুলি কেবল স্কুল-সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণের উপরই প্রযোজ্য এবং তাদের প্রয়োগ-স্থল স্কুলের মধ্যে। সুতরাং পাঁচ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুদিগকে এই আইনের আমলে আনতে হ'লে আগে তাদের জন্য শিশু শিক্ষালয় (Nursery School) গ'ড়ে তুলতে হবে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা আইনেও এই উপদেশ দেওয়া আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত সেখানে ত্রিশটির বেশী 'নার্স স্কুল' স্থাপিত হয় নি। তবে দেশটা জীবন্ত দেশ,—প্রতিষ্ঠিত শিশু-শিক্ষালয়গুলির কার্য্য দেখে যদি সাধারণে তাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে—যদি বুঝতে পারে যে, জাতির উন্নতির জন্য সেগুলি অত্যাবশ্যক—তা হ'লে আমার বিশ্বাস দেশের সর্ব্বত্র যথেষ্ট পরিমাণে এ রকম শিক্ষালয় গ'ড়ে উঠবার জন্য খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হ'বে না। এখন ইংলণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে বালকবালিকারা ভর্ত্তি হ'তে আসে, পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে তাদের মধ্যে শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ জনের দেহে একটা-না-একটা রোগ আছে, আর সেগুলি এমন রোগ যে পূর্ব্বে সাবধান হ'লে সেগুলো হ'তেই পারত না, বা হ'লেও তখন সহজেই সেগুলোকে দূর করা যেত। নার্সারী স্কুল হ'লে যে এ রোগগুলি অনেক পরিমাণে ক'মে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাস্থ্যের সামান্য নিয়মগুলি পালনে অবহেলা, অনুপযোগী খাদ্য আহার, উপযুক্ত ব্যায়াম ও বিশ্রামের অভাব, শরীর অপরিষ্কার রাখা, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস—এইগুলিই বালকবালিকাগণের রোগের প্রধান কারণ। বিদ্যালয়ের চিকিৎসকগণ চেষ্টা করলে এসকল কারণ সহজেই দূর করা যায়। তাঁরা ছেলেদের শরীরের ও সংসারের অবস্থা বুঝে তাদের জন্য পুষ্টিকর আহারাদির নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পারেন। হয়ত অনেকের মনে হ'তে পারে, গরীবের ছেলেরা চিকিৎসকের নির্দ্দেশ মত পুষ্টিকর খাদ্য পাবে কোথা থেকে? তাঁরা মনে রাখবেন যে, উপযুক্ত পুষ্টিকর আহারের অর্থ মূল্যবান আহার নয়—বরং অধিকাংশ সময় মূল্যবান খাদ্যগুলিই দেহের পক্ষে অপকারী হয়। যে-সকল খাদ্যে ভিটামিন প্রভৃতি পুষ্টিকর পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় সেইগুলিই ছেলেদের প্রকৃত উপযোগী আহার। আমরা আজকাল সুলভ আদা ছোলা, গুড় মুড়ির পরিবর্ত্তে ছেলেদিগকে অধিকতর মূল্যবান চা বিস্কুট ও ময়রার দোকানের বিষতুল্য খাবার খেতে দি। কিন্তু এই ব্যবস্থা ক'রে আমরা তাদের শ্মশানের পথটা কতটা প্রশস্ত ক'রে দিয়েছি তা কি আমরা একবারও মনে ভাবি?

স্কুল-গৃহগুলিকেও আরও স্বাস্থ্যকর ক'রে তোলার প্রয়োজন। ইংলণ্ডে সে চেষ্টাও হচ্ছে। এখনও সেখানে অনেক বিদ্যালয় আছে, যার ঘরগুলি অন্ধকার, সেঁৎসেঁতে, বায়ু-চলাচল-হীন। বলা বাহুল্য, এপ্রকার গৃহ শিক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। যাতে এ রকম ঘরে আর স্কুল বসতে না পারে তার জন্য শিক্ষাকর্ত্তৃপক্ষগণ এখন চেষ্টা করছেন। পরিষ্কার খোলা জায়গায় মুক্ত বায়ুর মধ্যে বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বিলাতের বিশেষজ্ঞেরা open-air class আদর্শ পাঠাগার ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন। কিন্তু এ রকম 'মেঠো' পাঠশালার একটা দোষ আছে—রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় ছেলেদের জন্য জায়গার আশ্রয় নিতে হয় আর বৃষ্টিতে জমি ভিজে যাবার পরও সেখানে ব'সে পড়া চলে না, সুতরাং মেঘ ডাকলেই 'অনধ্যায়'। ডারবিসায়ারের কাউন্টি কাউন্সিল কিন্তু সুন্দর উপায়ে এ সমস্যার মীমাংসা করেছেন। তাঁরা এমন ভাবে স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণ করেছেন যে, ইচ্ছা করলেই তার চারদিক খুলে তাকে open-air class-এ পরিণত করা যায়। আশা করি, ক্রমশঃ

ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানেও এই আদর্শে স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও স্কুল-গৃহের একটা আদর্শ ঠিক ক'রে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তা কেবল গৃহের আয়তন সম্বন্ধে। গৃহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কর্তৃপক্ষগণের নির্দ্দেশ মত হ'লেই তাঁরা সন্তুষ্ট, কিন্তু গৃহের মধ্যে কি পরিমাণে আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক বা ছেলেদের পড়বার সময় কোন্ দিক দিয়ে ঘরে আলো আসা উচিত—এ সকল প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরা কর্ত্তব্য মনে করেন নি।

ইংরেজ বালকবালিকাগণের দৈহিক উন্নতির জন্য তাদের দেশের লোকেরা কি করছে এবং আরো কি করতে চেষ্টা করছে তার একটা মোটামুটি বিবরণ উপরে দিলুম। এ বিবরণটা অবশ্য সম্পূর্ণ নয়—অনেক খুঁটিনাটি কথা আমি পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় বাদ দিয়েছি। কিন্তু যেটুকু বলেছি তাতেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন, ওরা ওদের ছেলেমেয়েদের শরীর ভাল করবার জন্য কি রকম উঠে পড়ে লেগে গেছে। ফলও হয়েছে আশ্চর্য্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে একটা স্কুলে (Bermondsey School) একদল ছেলের একটা ফটোগ্রাফ তোলা হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সেই স্কুলে সেই বয়সের ছেলেদের আবার আর একটা ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়। সে দুটো ছবি পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কি চেহারায়, কি ভাব-ভঙ্গীতে, ছেলেদের আশ্চর্য্য উন্নতি হয়েছে। ছবি তোলবার সময় কোন বারেই ভাল ভাল ছেলে দেখে বেছে নেওয়া হয়নি, প্রতিবারেই দলের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, অতি পুষ্ট, সুপুষ্ট, অপুষ্ট সব রকমেরই ছেলে ছিল। সুতরাং ছবির এই সাক্ষ্য আমরা অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারি।

যা হোক, এখন কথা হচ্ছে, আমাদের কর্ত্তব্য কি? ইংলণ্ডের এই চেষ্টা এবং এই সাফল্য কি আমাদের প্রাণে একটু চেতনা, একটু কর্ত্তব্যবুদ্ধিও জাগ্রত করবে না? আমাদের জাতির গাঁথনি যে ইংরেজ জাতির গাঁথনির থেকে ঢের বেশী জরাজীর্ণ হয়েছে তা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। সুতরাং ওদের চেয়ে আমাদের জাতির জীর্ণসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনেক অধিক।

তবে গোড়া থেকেই ব'লে রাখি, একটা খুব উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ ক'রে আমি এ প্রবন্ধ লিখতে বসিনি। আমি আমাদের দৌর্ব্বল্য বিশেষ ভাবেই অবগত আছি, সুতরাং প্রথমেই বড় একটা কিছু করতে পারা যাবে এ ধারণা আমার মোটেই নেই। কিন্তু সমস্ত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কাজটা যে এখনই আরম্ভ ক'রে দেওয়া যেতে পারে তাতে আমার সন্দেহ নেই। উপস্থিত আমাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তাদেরই সাহায্যে আমরা কাজটা সুরু ক'রে দিতে পারি। আমাদের জেলাবোর্ড, লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটিগুলি একাজে আমাদের অনেকটা সহায়তা করতে পারেন। তাঁদের অধীনে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আছে সেগুলির ছাত্রদের শরীর-পরীক্ষার ভার তাঁরা সহজে নিতে পারেন। ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপালিটির হেল্‌থ্‌ অফিসারেরা কয়েকজন সহকারী চিকিৎসকের সাহায্যে এ কাজটা করতে পারেন। রোজ রোজ ত দেহ-পরীক্ষা তাঁদের করতে হবে না আর সব ছেলেকেও এক সময়ে পরীক্ষা করতে হবে না। যে ছেলেকে একবার দেখেছেন, বিশেষ কারণ ব্যতীত তিন চার বৎসরের মধ্যে তাকে আর দেখতে হবে না। পূর্ব্বেই বলেছি, বিলাতে, ভর্ত্তি হবার পর একবার, আট বৎসর বয়সে একবার, আর বার বৎসর বয়সে আর একবার পরীক্ষা করা নিয়ম। আমাদের দেশে তার বেশী পরীক্ষার দরকার নেই—প্রথম প্রথম কিছু কম হ'লেও আপত্তি নেই। এই পরীক্ষার পর পরীক্ষক চিকিৎসকেরা অভিভাবকগণকে ও স্কুলের কর্তৃপক্ষগণকে রোগগ্রস্ত ছেলে-মেয়েদের চিকিৎসাদি সম্বন্ধে যেরূপ বিবেচনা করবেন উপদেশ দিবেন। এর বেশী এখন বোধ হয় আশা করা যাবে না। বেশী আশা করা দূরে থাকুক, এইটুকুই বোধ হয় অর্থাভাবাদি অজুহাত দেখিয়ে অনেক বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি করতে চাইবেন না। অবশ্য সকল বোর্ড বা মিউনিসিপালিটির অবস্থা সচ্ছল নয় তা জানি, কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, রাস্তা-ঘাট তৈয়ারির চেয়ে এ কাজটা কম দরকারী নয়। যদি এর জন্য উপর থেকে কিছু চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আমার বোধ হয় এ ক্ষেত্রে তা করা উচিত। অর্থশালী বড় বড় মিউনিসিপালিটিতে এ ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রবর্ত্তন করার

বরুদ্ধে ত কোন আপত্তিই ওঠা উচিত নয়। আমাদের কলিকাতা মিউনিসিপালিটি এবিষয়ে সহজেই পথ প্রদর্শন করতে পারেন। সেখানে কার্য্যের স্বাধীনতা ও অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, তাতে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে ও পরে আরও অনেক হবে, সুতরাং সেখানকার কর্ত্তারা একটু মনে করলেই কাজটা আজই আরম্ভ হ'য়ে যেতে পারে।

সরকারী শিক্ষা-বিভাগও এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন। যে-সকল বিদ্যালয়ে সরকার সাহায্য করেন সে সকল বিদ্যালয়ে অন্ততঃ নিম্নশ্রেণীস্থ বালকবালিকাগণের দেহ-পরীক্ষার জন্য তাঁরা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বাধ্য করতে পারেন। তা ছাড়া সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের সহযোগে তাঁরা ক্রমশঃ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের একটা দল (school medical service) গ'ড়ে তুলতে পারেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি আদর্শ school clinics ও স্থাপন করতে পারেন। আমার বিশ্বাস, এ কার্য্যে আমরা গবর্মেণ্টের সহানুভূতি পাব। এদেশে 'শিশুমঙ্গল সমিতি'র প্রতিষ্ঠাই তাঁদের এবিষয়ে মনোভাব জ্ঞাপন করছে। এই সমিতির সঙ্গে বহু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীরা সমিতির উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য কিরূপ পরিশ্রম ক'রে থাকেন তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি ব'লেই একথা বলতে আমি সাহস করছি।

কিন্তু শুধু বোর্ড, মিউনিসিপালিটি ও গবর্মেণ্টের উপর নির্ভর ক'রে থাকলেই হবে না। সাধারণের এ বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্য চাই। এমন বহু বেসরকারী বিদ্যালয় আছে যাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা ইচ্ছা করলেই নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের শরীর-পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। ঐসকল স্কুলের কমিটিতে যে-সকল চিকিৎসক আছেন, আশা করা যায়, তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে এবিষয়ে সাহায্য করবেন। তা ছাড়া বালক-বালিকাগণের যত্ন ও সেবা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণে কতকগুলি পল্লী-সমিতি নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এইসকল সমিতি কতকগুলি অভিজ্ঞ স্বাস্থ্য-সেবক ও সেবিকাকে নিজ পল্লীর ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য-পরিদর্শক (Health visitor) রূপে নিযুক্ত করতে পারেন। তারা যতদূর সাধ্য আপন আপন পল্লীর ছেলে-মেয়েদের উপর নজর রাখবে ও তাদের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করবে। সম্প্রতি বিলাতে কেনসিংটনে Father's Council অর্থাৎ 'জনক সমিতি' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য—কি কি উপায়ে বালক-বালিকাগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা যেতে পারে তার আলোচনা ও সে-সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। আশা করি, আমাদের দেশেও এরূপ সমিতি অবিলম্বে স্থাপিত হবে।

আর একটি কথা। আমাদের দেশে অনেকের ধারণা আছে যে, ছেলে-মেয়েদের শরীরের আয়তন, বল ও অবস্থা তাদের জনক জননীর আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা সুখাদ্য ভোজন ও সর্ব্বদা আদর-যত্ন প্রাপ্তির ফলে যেমন বেড়ে উঠতে পারে গরীবের ছেলেমেয়েরা তেমন পারে না। সম্প্রতি অধ্যাপক নোয়েল পেটন ও অধ্যাপক লিওনার্ড ফিণ্ড্লে (Prof. Noel Paton and Prof. Leonard Findlay) এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ব'লে প্রমাণ করেছেন। তাঁরা বিলাতের Medical Research Council-এর তরফ থেকে এবিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে প্রমাণ-প্রয়োগ সহ দেখিয়েছেন যে, সাধারণতঃ ভাল মায়ের ছেলেমেয়েরা অজ্ঞ অপটু মায়ের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী ভারী ও দীর্ঘকায় হয়ে থাকে। আর এই ভাল মা হওয়াটা সংসারের আর্থিক অবস্থার উপর মোটেই নির্ভর করে না। বস্তুতঃ এ বিষয়ে অনেক গরীব মা অনেক ধনী মা-কে শিক্ষা দিতে পারেন। আসল কথা এই, যে-মা ছেলেমেয়েদিগকে প্রকৃত যত্ন করতে জানেন, অর্থাৎ কি খেলে, কেমন ক'রে থাকলে তাদের দেহের যথার্থ পুষ্টি সাধন হয় সেটা জেনে তাদের সেই মত খাবার থাকবার, ব্যবস্থা করেন, তাঁর ছেলেমেয়েরাই মানুষের মত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, ছেলেকে পেট ঠেসে রাণ্ডী মিঠাই খাইয়ে তার মেদ-বৃদ্ধি ও যকৃত-বিকৃতির সহায়তা করাকেই যে-মা মাতৃকর্ত্তব্য পালনের চূড়ান্ত ব'লে মনে করেন, তাঁর ছেলে-মেয়েদের দেহ যে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়বে তার আর

আকাঙ্ক্ষা কি। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ধনী-গৃহে এরূপ মায়ের সংখ্যা খুব বেশী। আর গরীবের ঘরেও যে সুজ্ঞ জননীর সংখ্যা কম, তা নয়। মোট কথা, শিশুরক্ষণ-কার্য্যে আমাদের অগ্রসর হ'তে হ'লে দেশের মেয়েদিগকে মাতৃকর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার চেষ্টা কর্‌তে হবে। প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ে এর ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু মেয়েদের এ গরীব গৃহস্থের দেশে ছেলে-মেয়ে মানুষ কর্‌বার কৌশল (ইংরাজীতে যাকে বলে 'Mother craft') শেখানর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ক'রে শেখাতে হবে প্রকৃত 'গিন্নীপনা' অর্থাৎ কেমন ক'রে আয় বুঝে সংসার চালাতে হয়, কম খরচে বেশী কাজ পাওয়া যায়, হাতের সময়টা কেমন ক'রে ভাগ ক'রে নিয়ে কাজে লাগাতে হয় (যাতে ক'রে রাঁধা আর চুল বাঁধা দুই কাজেরই সময় পাওয়া যায়), ঘরে ছেলেদের রোগ-প্রবেশের পথ কি ক'রে বন্ধ কর্‌তে হয়, ছোটখাট রোগের চিকিৎসা ও রোগ সেবা কেমন ক'রে কর্‌তে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরকম গিন্নীরাই 'ভাল মা' হয় আর তাদের ছেলে-মেয়েরা সংসারের বহু বাধা-বিপত্তি ও দারিদ্র্যের মধ্য থেকেও মাথা খাড়া ক'রে ওঠে। বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে এখন দেখতে পাই কুমারী শিক্ষয়িত্রীদেরই প্রাধান্য, কারণ বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রী রাখ্‌তে কর্ত্তৃপক্ষগণকে একটু নারাজ দেখা যায়। অনেকের মতে (আমিও সে-দলের একজন) এ ব্যবস্থাটা ঠিক নয়। সংসারাভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রী যে-ভাবে গৃহিণীপনা ও মাতার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে পারেন, কুমারী শিক্ষয়িত্রীদের কাছে তা আশা করা যায় না। শুনে শেখা আর ঠেকে শেখার অনেক প্রভেদ। যিনি প্রতিদিন সংসার-সংগ্রামে লিপ্ত, সংসার-ক্ষেত্রের সকল বিপদ-সঙ্কুল স্থানের সঙ্গেই তিনি ক্রমশঃ পরিচিত হন, তাঁর জয় ও পরাজয় উভয় হ'তেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং সে-শিক্ষা তিনি তাঁর শিষ্যদিগকে দিতে পারেন। *

আর একটা কাজ দরকার। শিশুদের জন্য যথো- পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ভিটামিনাদিযুক্ত বিশুদ্ধ আহা- যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে যোগানর ব্যবস্থা করা উচিত। একা- মিউনিসিপালিটি কর্‌তে পারেন, অথবা "সমবায় সমিতি" খুলে এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সম্প্রতি বিলাতে বিশুদ্ধ দুধ সরবরাহ কর্‌বার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য-সচিবের যে আদেশ বা- হয়েছে, সেটা এখানে চালাতে পার্‌লে মন্দ হয় না। এই আদেশ অনুসারে দেশের যত গোয়ালা, দুগ্ধ ব্যবসায়ী ও গোশালা আছে সমস্ত রেজেষ্টারি কর্‌বার ব্যবস্থা করেছে আর প্রত্যেক কাউন্টি ও নগরের কাউন্সিলের উপর সে- গুলি পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বার ভার দেওয়া হয়েছে। যদি কো- গোয়ালা বা দুগ্ধ-ব্যবসায়ী তার গরু বা গোশালা বা পাত্রাদি অপরিষ্কার রাখে তাহ'লে তার খুব বেশী রকমের জরিমানা কর্‌বার ব্যবস্থা হয়েছে। তা'ছাড়া উক্ত কাউন্সিল-সমূহে- উপর আদেশ হয়েছে যে, তাঁরা যেখানে প্রয়োজন বুঝবে- সেখানে (অর্থাৎ দারিদ্র্য ও অক্ষমতা স্থলে) তিন বৎস- বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগকে, শিশু-সেবারতা জননীদিগকে ও পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে (গর্ভের শেষ তিন মাস) পড়তা খরচের চেয়েও কম মূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ করবেন। নিতান্ত আবশ্যক বুঝলে কোন কোন স্থলে তিন বৎসর থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগকেও এভাবে দুধ যোগানর ব্যবস্থা করতে হবে।

* কিন্তু বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রী পাওয়া খুবই শক্ত, সংসার ফে- শিক্ষাকার্য্যে আমাদের দেশের মেয়েরা নাম্‌তে পারেন না এব- সংসার ক'রেও কাজে নাম্‌বার মত অবসর সৃষ্টি কর্‌তে তাঁরা এখনও নানাকারণে অপারগ।—প্রঃ সঃ

আধুনিকতম সাহিত্য

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?"—
স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপরে কবি বৈষ্ণবের গান নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে আমরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছি—আমরা চাহিতেছি পৃথিবী হইতেও বৈষ্ণবের গান নামাইয়া, পৃথিবীর নীচে পাতালে বা রসাতলে কোথাও তাহার জন্য আসর করিয়া দিতে।

দেবতার লীলা অবশ্য বহুপূর্ব্বেই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তার-পরে এতদিন আমরা ধরিয়াছিলাম মানুষের খেলা। এখন মানুষকেও বাতিল করিয়া দিতেছি, মানুষকে ছাড়িয়া বর্ত্তমানে আমরা ব্যস্ত পশুকে লইয়া।

একযুগে দেবতা আর দেবত্বই ছিল সৃষ্টির সকল রহস্য, তাহার মূল সত্তা ও শক্তি। তারপর আর এক যুগে দেবতা অন্তর্ধান করিল, আসিল মানুষ—মানুষ আর মনুষত্বই হইল সৃষ্টির সকল রহস্য, তাহার মূল সত্তা ও শক্তি। এখন আবার তৃতীয় এক যুগ আসিয়াছে দেখি-তেছি, মানুষ ও মনুষত্ব তাহার প্রাধান্য হারাইয়াছে; এখন সৃষ্টির সকল রহস্য তাহার মূল সত্তা ও শক্তি স্থাপিত পশু ও পশুত্বের মধ্যে।

অবশ্য আমরা মানুষেরই জগতের কথা বলিতেছি—মানুষই ছিল দেবতা, মানুষই হইয়াছিল মানুষ, আবার মানুষই এখন হইতে চলিয়াছে পশু। মানুষের অন্তরের চেতনার বিবর্ত্তন তাহার শারীর বিবর্ত্তনের বিপরীত পথে চলিয়াছে দেখিতেছি।

প্রাচীনতর প্রাচীনতম সাহিত্যে—মানুষভাবের দেবভাবের সাহিত্যের মধ্যে পশুর প্রভাব কি ছিল না? ছিল, যথেষ্টই ছিল—নতুবা বৈদিক ঋষির মুখ দিয়া কখন বাহির হইতে পারিত না—
যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা।
উলূখল সুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥ (ঋগ্বেদ ১।২৮।২) কিম্বা কালিদাসের হাত দিয়া "শৃঙ্গারতিলক"ও রচিত হইত না। অতদূরের দেশে কালে কেন, আমাদের ভারতচন্দ্র মানুষের লীলার যে চিত্র দিয়া গিয়াছেন তাহা স্পষ্টতায়, বে-আব্রুতায় অতি আধুনিকেরও সহিত সমানে টক্কর দিয়া চলিতে পারে। চুম্বন আলিঙ্গন কেবল একালের সাহিত্যের কথা নয়, তাহা চিরকালের সাহিত্যের কথা। তবে আধুনিকের দোষ কোথায়? দোষ কি না, আপাতত সে বিচার আমরা করিতে বসি নাই, বলিতেছি আধুনিকের বিশেষত্বের কথা। প্রাচীনের শৃঙ্গার বা আদিরস যতই স্থূল যতই রূঢ় হৌক না কেন—তাহা আধুনিকের Freudian libido বা "কামায়ন" নহে।

আধুনিক কামায়নের বিশেষত্ব কি? আধুনিক কামায়নের পিছনে আছে গোটা একটা দর্শন, সমস্ত মানুষটিকে দেখিবার ও বুঝিবার একটি বিশিষ্ট ধারা, তাহার আকৃতি প্রকৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে, তাহার সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ বিষয়ে একটা সম্পূর্ণ শাস্ত্র বা থিওরি। সেই শাস্ত্রের মূলসূত্র এই—মানুষ প্রথমতঃ ও শেষতঃ হইতেছে পশু। পাশবিক এষণা ও প্রেরণাই তাহার ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত সমস্ত জীবনকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার অন্তরের বাহিরের অভিব্যক্তি আনিয়া দিতেছে। উপরে উপরে অন্তরকমের যাহা কিছু রঙচঙ দেখি না কেন, তাহা শুধু—বিষকুম্ভং পয়োমুখম্, পশুটিকে ঢাকিয়া চাপা দিয়া রাখিবার প্রয়াস। কবিতাই রচনা কর, দেশোদ্ধার করিতেই থাক, আর অধ্যাত্মেরই সাধনা করা মূলতঃ সেই পশুসুলভ যৌনবৃত্তিটাই ধরিয়া তুমি চলিয়াছ, তাহাকেই একটা ভদ্র পোষাক দিতে চেষ্টা করিতেছ। মানুষের সমস্ত সভ্যতাই হইতেছে—কার্লাইল যে অর্থে বলিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক গভীরতর ও গুরুতর অর্থে—"পোষাকী" সভ্যতা। আসল খাঁটি দিগম্বর সত্যের আবরণ আচ্ছাদন অবগুণ্ঠনেরই অন্য নাম সভ্যতা। ধরিয়া একটু টানাটানি করিলেই উহা খসিয়া পড়ে—হাজার সভ্য হৌক একটু আঁচড়েই মানুষের ভিতর হইতে তাহার শাশ্বত পশুটি বাহির হইয়া আসে।

বিজ্ঞান তাহার রূঢ় আলোকশলাকা দিয়া আমাদের জ্ঞানের চক্ষু এইভাবে খুলিয়া দিয়াছে; তাই সত্যকে যথাযথ দেখিতে ও দেখাইতে আমাদের ভয় নাই, কুণ্ঠা নাই—সত্যমেব জয়তে নানৃতং।

প্রাচীনতর যুগ মানুষকে, মানুষের কামবৃত্তিকে এমন করিয়া দেখে নাই। প্রথমতঃ, কাম ছাড়া মানুষের মধ্যে প্রাচীনেরা আরও অন্যান্য বৃত্তি দেখিয়াছিলেন; কামকে তাঁহারাও একটা প্রধান বৃত্তি বলিয়াই অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই হেতু অপরাপর প্রধান বৃত্তিকে অস্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আর কামবৃত্তির মত এই সকল বৃত্তিরও প্রত্যেকেরই আছে যে স্বতন্ত্র সার্থকতা, এ কথাও তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। মানুষের সকল অঙ্গ সোজাসুজি একটিমাত্র অঙ্গে "সরল" করিয়া ধরিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয় কথা এই, যৌন-আবেগকে অতি-প্রধান স্থান দিলেও তাঁহারা ওজিনিষটিকে কেবলি একটা পাশব বৃত্তি হিসাবে দেখিতেন না; উহা ছিল তাঁহাদের কাছে একটা প্রতীক—আনন্দের, ঐক্যের, নিবিড়তার, গভীরতার প্রতীক। বৈষ্ণব কবি যখন বলিতেছেন—

> মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
> বঁধুয়া করল কোলে।
> চরণ উপরে চরণ পসারি
> পরাণ পাইনু বলে॥

তখন শুধু শারীর মিলনটিই একান্ত সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ করি কি? না, শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে গভীরতর মিলন, প্রাণের অন্তরাত্মার মিলন প্রকাশ পাইতেছে, সেইটিই আমরা সকলের উপরে বিশেষ করিয়া অনুভব করি? পক্ষান্তরে শুনুন আধুনিকের কথা—

> তার নিধুবন-উন্মন
> ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন
> বুকে পীন যৌবন
> উঠিছে ফুঁড়ি',
> মুখে কাম-কণ্টক-ব্রণ
> মহুয়া-কুঁড়ি।

এখানে সকল আনন্দ কেবল শরীরের মধ্য হইতেই কবি খুঁড়িয়া বাহির করিতে চাহিতেছেন। শরীর ছাড়া মানুষের আর-যে-কিছু আছে তাহার ইঙ্গিতও পাই না।

আরও কথা আছে। প্রাচীনেরা শৃঙ্গারবৃত্তিকে দেখিতেন একটা সুস্থ সুন্দর প্রফুল্ল প্রেম, এমন-কি শ্রেয়বৃত্তি-রূপে। কিন্তু আধুনিক যুগে জিনিষটিকে যে-ভাবে দেখান হইয়া থাকে, তাহাতে মনে হয় ইহা যেন একটা দারুণ ব্যাধি অথচ তাহা শোধরাইবার সামর্থ্য মানুষের নাই (হয়ত বা সে চেষ্টা করাও মানুষের কর্ত্তব্য নয়)—কারণ, এ ব্যাধি মানবের অস্থিমজ্জাগত, মানুষের স্বভাব ও স্বরূপগত; কিম্বা তাহা যেন একটা বিরাট ক্ষুধা, তবু তাহার পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই; এ যেন একটা কঠিন নিয়তি, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই, অবশ হইয়া মানুষ তাহার কুম্ভীপাকে ঘুরিয়া মরিতেছে—ভ্রাময়ন্ যন্ত্রারূঢানি মায়য়া।

বৃত্তিটির স্বভাব ও স্বরূপ যে রকম একটা কঠোরতার নিরানন্দে গঠিত, তেমনি যে আবহাওয়ায় তাহা খেলিতেছে তাহাও তদনুরূপ বিষাক্ত। দৈন্য, দারিদ্র্য, দ্বেষ, নৃশংসতা, বীভৎসতা—সকল রকম ক্লেদ ও দুঃস্থতাই যেন হইয়াছে মানুষের স্বাভাবিক ভূষণ, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সত্যকার আপনকার বিত্ত, তাহার অঙ্গেরই অঙ্গ।

পশুর কথা বলিতেছিলাম—কিন্তু পশুও নয়, পশুর বিকৃতি এ যেন একটা পিশাচ প্রমথের ডাকিনী যোগিনীর জিন-দানার জগৎ! প্রকৃতির মধ্যে কোথাকার একটি অজানা অচেনা অন্ধকার গহ্বরের মুখ, কোন দিককার আশেপাশের একটা চোরা কুঠরীর দুয়ার—একটা কি নিষিদ্ধ পথ যেন হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহারই মধ্যে আমরা বিষম ঔৎসুক্যে লোভে লালসায় মত্ত হইয়া ধাইয়া চলিয়াছি।

জোলা (Zola) বা মোপাসাঁ (Maupssant) যে-রকম মানুষ দিয়া তাঁহাদের জগৎ গড়িয়াছেন তাহারা পশু অপেক্ষা খুব বেশী উপরের স্তরে নয়; কিন্তু সে পশুতে আছে একটা সরলতা, একটা স্বাস্থ্য, একটা অসংস্কৃত হোক স্থূল হোক তবুও একটা আনন্দ। আর আজ Camille Mauclair বা Rene Maran মানুষ-পশুর যে রূপ দিয়াছেন তাহাতে বে-আব্রুতার পরাকাষ্ঠা নাই বটে, কিন্তু উহাই তাহার বৈশিষ্ট্য নয়। সে বৈশিষ্ট্য বাহিরের স্থূলত্বে নয়, কিন্তু প্রাণেরই একটা বিশেষ ছন্দে। আধুনিকের প্রাণের গতিতে অভাব সরলতার, অভাব স্বাচ্ছন্দ্যের—তাহা কুটিল জটিল, তাহা আত্মপীড়নে জর্জ্জরিত; প্রতি আবেগে সে অতিমাত্র সাহস দেখাইতে চাহে বটে, কিন্তু সে সাহসের অন্য নাম দুঃসাহস; নির্ব্বিবাদে চলা নয়, সে বাধা-বিপত্তিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিতে চায়; সহজ জ্ঞান সহজ আনন্দ নয়, কিন্তু নিষিদ্ধ যাহা কিছু খোলাখুলির এপাশে ওপাশে তেমন জিনিষের উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি।

জাঁ জিরোদু (Jean Giraudoux) বা দ্রিয়ু লা রোশেল (Drieu La Rochelle) বে-আবরু মানুষ পশু বিশেষ কিছু আঁকিয়া দেখান নাই; অথচ তাঁহাদের মধ্যে আধুনিকত্ব স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে। তাঁহাদের জগতে যখন প্রবেশ করি তখন বোধ হয় যেন কি একটা অস্বস্তি, অস্পষ্টতার মধ্যে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে—শরীরের স্থূল রূপ সেখানে বড় কথা নয়, কিন্তু শরীর চেতনার উপাদান, তাহার মূলতত্ত্বই হইতেছে যেন বুভুক্ষা, অস্বাস্থ্য, হতাশ, হাহাকার—জীর্ণ দীর্ণ দুঃস্থ সত্তা সেখানে কি সব লুকান জগতের দুর্ব্বার কামনা লইয়া অপনারা-তাড়িত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সময় সময় মনে হয় এ যেন শ্মশান-কালীর বীভৎস বিকট নৃত্য। চিত্রকলার জগতে আধুনিক শিল্পের এই ভিতরের দিকটা বোধ হয় খুব স্পষ্টই ধরা পড়িয়াছে। Georges Ronault, Modigliani প্রভৃতি ফরাসীর আধুনিকতম কয়েক জনের ছবি দেখিয়া আমার মনে পড়িয়াছে কেবলই ডাকিনী যোগিনীর কথা; এমন কি. নিকলাস রোরিক (Nicholas Roerich) পর্য্যন্ত এমন ধারা জগতেরই অধিবাসী বলিয়া আমি বোধ করি।

কবি দান্তের নরকেরই মত আধুনিক সাহিত্য-জগতেরও দুয়ারে যেন লেখা আছে—"সকল আশা বিসর্জ্জন দাও. কে তোমরা এখানে প্রবেশ করিতেছ"—তবে দান্তে যন্ত্রণার লাঞ্ছনার যতরকম প্রকার-ভেদই আবিষ্কার করিয়া থাকুন না, আধুনিকের চেতনার, অনুভূতির মধ্যে যে সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ সব চলিয়াছে তাহার কোন সন্ধান তাঁহার যুগে তিনি পান নাই। আধুনিকের অন্তরাত্মা মূর্ত্ত ট্রাজেডি; এই ট্রাজেডি বাহিরের রূপের বা ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিতেছে না—তেমনি ট্রাজেডি ত আরোপ মাত্র! ট্রাজেডির বস্তু জমাইয়াই যেন আধুনিকের অন্তরাত্মা গড়া হইয়াছে, সেই অন্তরাত্মার স্বাভাবিক চলনে বলনেই ট্রাজেডি ফাটিয়া পড়িতেছে। আধুনিককে জানিয়া শুনিয়া যেন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় দুঃখ-ক্লেশের হাতে আপনাকে তুলিয়া দিয়াছে। প্রাচীনের অন্ধকার হইতেছে অজ্ঞানের অন্ধকার; আধুনিক চেতনা অন্ধকার—তাহার অপেক্ষা আরও অন্ধকার. কারণ তাহা জ্ঞানের অর্থাৎ অতিজ্ঞানের অন্ধকার—

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

মানুষের—কবির কণ্ঠে আজ যে রসাতলের বাণী মুখরিত, তাহার গোড়া খুঁজিতে সুদূর অতীতেরই মধ্যে যাইতে হয়। কিন্তু উষ্ণ প্রস্রবণের মত এদেশে সে-দেশে একালে সেকালে কখন কদাচিৎ পৃথিবীর আবরণ দীর্ণ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিলেও, জিনিষটা ছিল আকস্মিক আর তাহার ধরণ-ধারণও ছিল অন্য রকমের। কিন্তু বর্ত্তমানে রসাতল যেন একটা বিকট আগ্নেয়গিরির মত ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ধূমে ভস্মে গলিত ধাতুস্রাবে মানুষের সমস্ত চেতনার ক্ষেত্র অভিক্রান্ত করিয়া চলিয়াছে।

ব্যষ্টি হিসাবে নয়, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে একটা অগ্ন্যুৎপাত, সামাজিক একটা ভূকম্প সুরু হয় ফরাসী বিপ্লব দিয়া। 'বুরবন' সিংহাসনের পতনের সাথে সাথে, আভিজাত্য জিনিষটাও ধ্বসিয়া গেল—আর সমাজের তলা হইতে উঠিয়া আসিল দুঃস্থতা কদর্য্যতা, যত ক্লেদ যত ময়লা (Les miserables)। সেই বিপ্লবের নেতা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদেরই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করুন, কেমন ধারা লোক ছিলেন তাঁহারা। Mart, Danton এমন কি Mirabeau পর্য্যন্ত সকলেই সাধারণ অবস্থায় থাকিলে. ব্যক্তিগত মর্য্যাদার দিক দিয়া apaches (ফরাসী গুণ্ডা) হইতে খুব দূরে আসন পাইবার যোগ্য কি না সন্দেহ। কিন্তু তবুও, এই বিপ্লবের যুগে বা তাহার ফলে সমাজের মনোময় ক্ষেত্র আক্রান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে নাই, কাব্যের শিল্পের জগৎ কিছু ধাক্কা খাইলেও তাহার সমুচ্চ সৌন্দর্য্য, আভিজাত্য অনেকখানি অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছিল।

শিল্প-সমাজে পঞ্চম বর্ণ সম্পূর্ণ জাগিয়াছে গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে। সারাজগতে আজ "বোলশেভিক" বা "প্রোলেটেরিয়াট্" সাহিত্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ, রুষ যে আধুনিক এই সৃষ্টিধারার নেতা হইয়া উঠিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। মোটের উপর রুষ-সাহিত্য গোড়া হইতেই ছিল নিপীড়িতের দীনের হতাশের অভিশপ্তের দীর্ঘশ্বাস। সমাজের মধ্যে যে-সব আদর্শ মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারে নাই, যে-সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা কারাগারে দূর বনবাসে রুদ্ধ

আক্রোশ করিয়া মরিয়াছে, যে-সকল প্রেরণা, যে-সকল আবেগ, যে-সকল শক্তির ধারা চাপে পড়িয়া মাটির নীচে চেতনার তলদেশে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদেরই অভিব্যক্তি-প্রয়াস হইতেছে রস-সাহিত্য। তাহারই বীজ সারাজগতে সকল দেশের সাহিত্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। আজকালকার সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যই হইতেছে এই যে, তাহাতে আলো অপেক্ষা উত্তাপ বেশি, উত্তাপ অপেক্ষা দাহ বেশী— আনন্দ অপেক্ষা ব্যথা বেশী, ব্যথা অপেক্ষা জ্বালা বেশি—প্রসারতা অপেক্ষা তীব্রতা বেশি, তীব্রতা অপেক্ষা কুটিলতা বেশি—স্থৈর্য্য অপেক্ষা গতি বেশি, গতি অপেক্ষা ঘূর্ণী বেশি।

বাংলা সাহিত্যের গায়ে এই বিশ্বের হাওয়া লাগিয়াছে। তবে ইউরোপে এই হাওয়া হইতেছে একটা তুফান বা দারুণ ঝাপটা— অনেক কিছুই ইহার ফলে ভাঙ্গিতেছে, চুরিতেছে, ওলট হইতেছে, পালট হইতেছে। আমাদের দেশে ব্যাপার এখনও ততদূর গড়ায় নাই। আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্য্যয়ের ফলে, ইউরোপের চেতনার ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় সে-সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই—এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোসখেয়ালের কথা, জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই দেখি আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে।

তবুও স্বীকার করিব, আজ যাঁহারা বঙ্গবাণীর জন্য নৈবেদ্য আহরণ করিতে গিয়া পাতাল রসাতল ঢুঁড়িতেছেন, সাহিত্যের সাধক যাঁহারা সত্য সত্যই হাতে হাতিয়ারে "লজ্জা ঘৃণা ভয়" এই তিনকে বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছেন, এই যে সব অবধূতমার্গ অঘোরপন্থী তাঁহাদের সবলেই স্রষ্টা হিসাবে যে অক্ষম অপটু তাহা নয়। একাধিকে হয়ত শিল্প-রচনার দিক দিয়াই দেখাইয়াছেন বিশেষ ক্ষমতা ও নৈপুণ্য—বাংলা সাহিত্য, ভাষা ও ভাব উভয় হিসাবে, তাঁহাদের হাতে পাইয়াছে একটা বিশেষ পুষ্টি ও ঋদ্ধি; তবে কথা এই, এই শিল্প হইতেছে মুখ্যতঃ পশু-পিশাচের, প্রেত-প্রমথের জিনদানার * শিল্প; দেবতার শিল্প মানুষের শিল্প যাহা, তাহা অন্য ধরণের বস্তু।

(বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৪)		শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

—

মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র

পূর্ব্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর,—অপর দিকে ভূ-মধ্যসাগর, এই দুইটি সুবিখ্যাত "তোয়নিধির" অন্তর্ব্বেদিরূপে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইউরোপীয় সভ্যসমাজে "প্রাচী" নামে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে।

মানবসভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র কোথায়, তৎসম্বন্ধে মানবসমাজ বহুকাল হইতে তথ্যানুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। নীলনদী-তটের অনন্ত বালুকাস্তর-নিহিত অতি পুরাতন সমাধির মধ্যে ইউরোপীয় বিদ্বৎ-সমাজ ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বকালবর্ত্তী স্মৃতিচিহ্নের আবিষ্কার সাধন করিয়া, তাহাকেই কিছুদিন পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতার উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন। এখন আর সে-সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া মর্য্যাদালাভ করিতে পারিতেছে না। এখন সকলের চক্ষু ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

ভারতবর্ষ একটি অতিবিস্তৃত মহাদেশ, বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন দেশের একত্র সমাবেশে অসীম রহস্যের আধার হইয়া, এতকাল নীরবে কাল-যাপন করিতেছিল। তাহার অতি পুরাতন ভূস্তর-নিহিত পূর্ব্বতন কীর্ত্তিচিহ্ন অনাবিষ্কৃত এবং অনালোচিত থাকিয়া, প্রকৃত তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতে পারিত না।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে, সিন্ধুপ্রবাহের তটভূমির পার্শ্বে,—কয়টি ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন জনপদের পরিত্যক্ত অজ্ঞাত ও অখ্যাত স্থানে কিছু কিছু অনুসন্ধান-চেষ্টা পরিচালিত হইবার পর, অল্পদিন হইল এক বিস্তৃত জনপদের গুপ্তদ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-পুরাতত্ত্ব বিভাগের বহুসংখ্যক সুদক্ষ কর্ম্মচারী তাহার মধ্যে খননকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, বহু পুরাতন অসংখ্য কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত করিয়া, এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছেন।

এই দুইটি তথ্যানুসন্ধান-ক্ষেত্রের নাম এখন জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে। একটির নাম মহেঞ্জোদারো, অপরটির নাম হরপ্পা,—দুইটিই পাঞ্জাব দেশের অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত। স্থলপথে এবং জলপথে এই দুই স্থানের সহিত ভূমধ্যসাগরতীর পর্য্যন্ত সকল দেশেরই নানাবিধ সম্বন্ধ ছিল। সেই সূত্রে ভারতবর্ষ হইতে মানব-সভ্যতার মূলসূত্র পশ্চিমাঞ্চলে সম্প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই প্রদেশটি যখন ভারতবর্ষের অন্তর্গত, তখন ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, এপর্য্যন্ত তাহা যথাযোগ্যরূপে আলোচিত হয় নাই।

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ আকস্মিক সম্বন্ধ হইতে পারে না। এখন যে-সকল লোকব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহার কিছু কিছু নিতান্ত আধুনিক কালে উদ্ভাবিত হইয়া থাকিলেও, অধিকাংশ লোক-ব্যবহার যে স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে কালস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সংশয়প্রকাশের কারণ নাই। তাহার যথাযোগ্য বিশ্লেষণকার্য্য সুসম্পাদিত হইলে, বর্ত্তমানের মধ্যেই চির-পুরাতনের অনেক সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

দিবসের এক ভাগ ইতিহাসের এবং পুরাণের অনুশীলনে যাপন করিবার প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইতিহাস এবং পুরাণ দুইটি পৃথক্ বিষয় বলিয়া পরিচিত ছিল, নচেৎ পৃথক্‌ভাবে দুইটি উল্লিখিত হইত না। উভয়ের মধ্যে একমাত্র সাদৃশ্য এই যে, উভয়ের কথাবস্তু পুরাতন।

ইতিহাসের কথাবস্তু "পূর্ব্ববৃত্ত কথা।" ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষের উপদেশ-সমন্বিত যে পূর্ব্ববৃত্ত কথা, অথবা যে পূর্ব্ববৃত্ত কথাযুক্ত ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষের উপদেশ-সমন্বিত বিষয়, তাহারই নাম "ইতিহাস" বলিয়া সুপরিচিত ছিল। তাহা সত্যঘটনামূলক পুরাকাহিনীর আধার। পুরাণে ঠিক ধরা-বাঁধা সত্যঘটনামূলক কথার উপর ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের উপদেশ নির্ভর করে না।

অনেক স্থানে অনেক অতি পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলেও, তাহার কালনির্ণয়ের যথাযোগ্য নৈপুণ্যের অভাবে, তাহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এতকাল অপেক্ষাকৃত অল্পকালের কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ভারত-পুরাকীর্ত্তি যে সত্য-সত্যই কত পুরাতন, তাহার সন্ধানলাভ করিতে পারেন নাই। এতকালের পর সিন্ধুসৈকতের খননব্যাপারে তাঁহারা নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, ভারত-সভ্যতার অতিপ্রাচীনত্বে আস্থাবান্ হইয়াছেন;

* কথাগুলি সদর্থেই আমি গ্রহণ করিয়াছি, গালাগালি হিসাবে ব্যবহার করা আমার অভিপ্রায় নয়।

এবং কেহ কেহ ভারতভূমিকেই মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিতেও অগ্রসর হইতেছেন। ধীরে, অতিধীরে, এইরূপে সভ্যসমাজে এক নূতন আলোকরেখা বিকীর্ণ হইয়া; ভারতভূমির অতীত গহন মধ্যে সমগ্র সভ্যসমাজকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে। এখন ভারততত্ত্ব কেবল ভারততত্ত্ব বলিয়া সংকীর্ণভাবে বর্ণিত হইতেছে না। এখন তাহা মানবতত্ত্বের সমুচ্চ পদবীতে সগৌরবে সমারূঢ়।

এই চেষ্টা যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত হইলে, কেবল যে ভারতবর্ষের মুখ সমুজ্জ্বল হইবে তাহা নহে, সমগ্র মানব-সভ্যতার মূল যে মানবতা তাহাও সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইবে। কারণ পুরাতন কীর্ত্তি-চিহ্নের মধ্যে যাহা পর্য্যাপ্তরূপে দেদীপ্যমান তাহা পাশবিক আচার ব্যবহারের ধ্যানধারণার এবং শিক্ষাদীক্ষার পরিচয়-বিজ্ঞাপক নহে; তাহা মানবতার শান্তশীতল অভ্রান্ত নিদর্শন।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩৩৪) শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

—

বাংলা ভাষা ও মুসলমান

মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল বলিয়া থাকেন, লেখ্য ভাষা নামে যে ভাষা বাংলা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে, উহাকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণ হইতে দূর করিয়া দিয়া সেইস্থানে কথ্যভাষাকে বসাইয়া দাও, নতুবা বাংলা ভাষার মুক্তিলাভ ঘটিবে না, মুসলমান বাংলা-সাহিত্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে না।

তাঁহাদিগকে আজ আমরা খোলাখুলি ভাবেই জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজী ভাষার সুবিশাল সৌধ কি লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া কথ্য ভাষার উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে, না কথ্য ভাষাকে সুমার্জিত করিয়া লেখ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই লেখ্য ভাষার আশ্রয়েই ইংরাজী সাহিত্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে ?

বর্ণমালার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের সৃষ্টি আরম্ভ হইল, প্রথমতঃ কথ্য ভাষার ভিতর দিয়া। এইরূপে যেমন দিন যাইতে লাগিল, তেমনি অল্প অল্প করিয়া কথ্য ভাষার সংস্কার হইতে লাগিল, শেষে কথ্য ভাষার স্থান সাহিত্যে অতি সামান্যই রহিয়া গেল। মার্জ্জিত ভাষা লেখ্য ভাষা নামে সাহিত্যের বিরাট দেহ অধিকার করিয়া বসিল।

সকলে জানেন, পশ্চিম বঙ্গের নানা জিলার কথ্য ভাষা নানারূপ। আবার পূর্ব্ববঙ্গ বা উত্তর বঙ্গের কথ্য ভাষার সহিত যেমন পরস্পরের মিল নাই, তেমনি উহার কাহারও সহিত পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষারও মিল নাই। কিন্তু এই প্রভেদকে ডুবাইয়া দিয়া বাঙ্গালীর জন্য যে এক সাধারণ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই লেখ্যভাষা নামে পরিচিত হইয়াছে। এই লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া কথ্য ভাষার প্রচলন করিতে গেলে বাংলার অধিবাসীকে বহুধা বিভক্ত করিয়া দিতে হয়। আমাদের প্রতিপক্ষগণ হয়ত বলিবেন, লেখ্য ভাষাকে কথ্য ভাষার অর্থাৎ কলিকাতার কথ্যভাষার ছাঁচে ঢালিয়া চালাইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যখন একথাটা বলেন, তখন তাঁহারা Climatic influence বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা ভুলিয়া যান। কথ্যভাষার ভিতরকার আব হাওয়ার এই প্রাধান্য তাঁহারা রোধ করিবেন কি করিয়া? দুই চারিজন

সক্ষম হইলেই যে, উহা দেশের আপামর সাধারণের গ্রহণীয় হইয়া গেল বা তাহারা উহা গ্রহণ করিল, কোন প্রকারেই একথা বলা যায় না।

মুসলমানী শব্দের প্রচলন-বিরোধী যেমন একদল আছেন, অত্যধিক আরবী, ফারসী শব্দের প্রচলনকামীও আর একদল আছেন। ইঁহারা মনে করেন, হিন্দী ভাষার ভিতরে অত্যধিক আরবী ফারসী শব্দের প্রচলন করিয়া যদি উহাকে উর্দ্দু ভাষায় পরিণত করিয়া খুব ভাল রকমেই কাজ চলিতে পারে, তবে আমরা কেন বাংলা ভাষাকে ঠিক তেমনি ভাবে রূপান্তরিত করিতে পারিব না? করিতে পারিবেন না এই জন্য যে, উহাতে বাংলা ভাষার দ্বিখণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী এবং এইরূপ দ্বিখণ্ডিত করার ফলে দেশের কোন মঙ্গল হইবে না।

আজকাল আমাদের মধ্যে দু-একজন মুসলমান লেখক তাঁহাদের রচনার মধ্যে বহু দুর্ব্বোধ ও কঠিন অনাবশ্যক আরবী, ফারসী শব্দের অবাধ প্রচলনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ফলে এই হয় যে, তাঁহাদের রচনা মাঠে মারা যায়, ততটা কষ্ট স্বীকার করিয়া কেহ উহা পড়িতে চাহেন না।

আরবী-ফারসী অভিধান খুলিয়া কঠিন শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক উহাদিগকে খুব বেশী করিয়া ব্যবহার করিলেই বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সকলের আগে ব্যবহার করিতে হইবে সেই সকল শব্দ, যাহা বাংলার মুসলমান সমাজে নিত্যপ্রচলিত এবং যাহা বুঝিতে বাঙ্গালী হিন্দুর কোনই কষ্ট হয় না। আমাদের আসল কাজ হইল ইস্‌লামী ভাব ও আদর্শ প্রচার —ইস্‌লামের স্বরূপ, সভ্যতা ও কালচার (culture) বাংলার অধিবাসীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা।

বাংলা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত না করিয়া প্রচলিত ভাষার মধ্য দিয়াই মুসলমানদিগকে ইসলামের বাণী ও মহত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। এতদুপলক্ষে অনেক আরবী ফারসী শব্দ ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষার অধিকার-সীমার মধ্যে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারিবে। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, উর্দ্দু ভাষার মত বাংলা ভাষায়ও এত আরবী ফারসী শব্দের আমদানী হইবে যে, তাহা পরিশেষে আরবী ফারসী শব্দেরই আগার হইয়া যাইবে। প্রাচীন বাংলা পুঁথির ভাষা নিজের গণ্ডী ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারে নাই।

বাংলা ভাষা এতদিন হিন্দুর দান গ্রহণ করিয়াছে, এইবার তাহাকে মুসলমানের দানও গ্রহণ করিতে হইবে—অনুগ্রহ করিয়া নহে আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার তরুণ মোস্‌লেম সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা যে আশার আলোক দেখিয়াছি, তাহা অসাধারণ না হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। তাহারা আমাদের সাহিত্যিক সাধনার প্রথম যাত্রীর দল, দুর্য্যোগের মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে চলিতে হইবে, বন্ধুর পথকে সুগম করিয়া দিয়া। ইহাই তাঁহাদের কাজ, পরবর্ত্তীদল সেই পথ বহিয়াই জয়যাত্রা করিবেন।

(মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৩৪) সৈয়দ এমদাদ আলী

—

আয়ুর্ব্বেদের বিরেচন-দ্রব্য

আয়ুর্ব্বেদে ভেষজ-সমূহের ক্রিয়াভেদে তাহাদের কতকগুলিকে সংশোধনীয় আর কতকগুলিকে সংশমনীয় বলা হইয়াছে। যে-সকল

বমন-বিরেচনাদি প্রধান ভেষজে দেহ সম্যক্‌রূপে দোষশূন্য হইয়া পরিশুদ্ধ হয়, তাহা সংশোধনীয়, আর যে-সমুদয় ঔষধ শরীরে সঞ্চিত বাতাদিদোষের প্রভাব হানি করিয়া ব্যাধির উপশমন করে, তাহা সংশমন ঔষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সকল দ্রব্যের শক্তি ও প্রকৃতি কিছু এক প্রকারের হয় না। বিরেচক দ্রব্যগুলিরও সেগুলি প্রশস্ত, সুশ্রুত তাহাদের পরিচয়ে বলিতেছেন, মূল প্রধান বিরেচন দ্রব্যের মধ্যে অরুণ-বর্ণ ত্রিবৃন্মূল প্রশস্ত। সেই প্রকার ত্বক্‌প্রধান দ্রব্যের মধ্যে তিল্বকলোধ্র, ফলে হরীতকী, তৈলে এরণ্ড তৈল, স্বরসে-কারবেল্লপত্র এবং ক্ষীর-নির্য্যাসে সুধাক্ষীর প্রশস্ত। চরক কেবলমাত্র মূলে নয়—যাবতীয় বিরেচক দ্রব্যের মধ্যে ত্রিবৃতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন; তবে অন্যত্র বালকের পক্ষে মৃদুবিরেচন জন্য 'চতুরঙ্গুল' এবং বহু দোষ সংশোধন জন্য তীক্ষ্ণ বিরেচক সুহীক্ষীর সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়াছেন।

অরুণমূলা বা শ্বেত-রক্তাভ ত্রিবৃৎ শ্যামা বা কৃষ্ণ ত্রিবৃৎ হইতে প্রশস্ত। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ইহা শ্যামা অপেক্ষাও নির্দ্দোষ এবং সে জন্যই ইহা শিশু, বৃদ্ধ, সুকুমার ও মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে হিতকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্যামা মূলা তেউড়ী তীক্ষ্ণতার জন্য অনেক সময় হৃদয় এবং কণ্ঠের শোষণ বা আকর্ষণের ভাব আনে। অত্যন্ত ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে বা উদরাদি রোগে বহু দোষ সংশোধন জন্য ইহা উপযোগী হইবে।

তেউড়ী মূল—কষায়-মধুর রস। ইহা রুক্ষ ও বিপাকে কটু, বাতপিত্ত-প্রশমনী ও বায়ু-কোপনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দ্রব্যান্তর সংযোগে ত্রিদোষেই প্রয়োগের উপদেশ পাওয়া যায়।

সুশ্রুতে বায়ুর প্রাবল্যক্ষেত্রে সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ চূর্ণ ও কাঞ্জিকের সহিত, পিত্তশান্তি জন্য ইক্ষুরস বা চিনির সহিত এবং কফজ রোগে গুলঞ্চ, নিমছাল ও ত্রিফলার কাথের সহিত মরিচচূর্ণ মিশ্রিত তেউড়ী-মূল চূর্ণ ব্যবহারের উপদেশ আছে।

(আয়ুর্ব্বিজ্ঞান, চৈত্র ১৩৩৪)　　শ্রী জীবনকালী রায়

অনন্ত যৌবন

দেহস্থিত যন্ত্রখানি চলিতে চলিতে নানা প্রকার বিষ উৎপন্ন হয়। দেহের যথার্থ প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্ধন যোগাইতে পারিলে এই বিষ উৎপাদন বন্ধ করা যাইতে পারে। দেহমধ্যে বিষের ক্রিয়া বন্ধ থাকিলে দেহের ক্ষয় অতি সামান্য মাত্রায় হইয়া থাকে; তাহাতে জরা, বার্দ্ধক্য আসিতে বিলম্ব হয় ও শক্তি অব্যাহত থাকে, ইহাই যৌবনের নামান্তর মাত্র।

দেহের বিষ উৎপন্ন বন্ধ রাখা, তাহা নাশ করা বা নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়ার শক্তিই যৌবন—অভাব, বার্দ্ধক্য। যে যন্ত্রগুলি এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে বিশেষ ভাবে তাহাদের যত্ন লওয়াই যৌবন রক্ষার বিশেষ অঙ্গ। যতক্ষণ উপযুক্ত ইন্ধন পূর্ণমাত্রায় পায় ততক্ষণ অগ্নি তাহার ধূম নাশ করিয়া অঙ্গার না রাখিয়া ভস্মে পরিণত করে এবং সেই অগ্নিরই শক্তি অধিক। দেহ-যন্ত্র চালিত করিতে হইলেও একই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

লিভার (যকৃত) ও কিড্‌নী (বৃক) দেহের বিষ নাশ কার্য্যের প্রধান যন্ত্র। যকৃৎ বিষ নাশ করে ও ক্ষার জাতীয় অপ্রয়োজনীয় বস্তু দূর করে এবং বৃক অপ্রয়োজনীয় অম্ল জাতীয় বস্তু দূর করিয়া এমোনিয়া নামক ক্ষার দিয়া দেহ-মধ্যে উৎপন্ন বিষ নাশ করে। ইহাদের কার্য্য হইতে প্রতিবন্ধক দূর করিতে পারিলে বার্দ্ধক্য ঠেলিয়া রাখা অসম্ভব নহে।

যকৃৎ ও বৃককে যন্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞতা হইতে স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে, যদি এই যন্ত্রগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ইহারা স্বচ্ছন্দে ১৫০ বৎসর চলিতে পারে। কিন্তু মানুষ একটু স্বাদের লোভে নানা প্রকার ক্ষতিকর বস্তু চাপাইয়া দিয়া ইহাদের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায়, এবং মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করে।

প্রকৃতির অনুকূল নিয়ম পালন, প্রকৃতির প্রয়োজনীয় আহার গ্রহণ, প্রকৃতির মধ্যে আপনার দেহখানি ঢালিয়া দেওয়া ইহাতেই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

ক্লান্তির পর বিশ্রাম যৌবন আনয়ন করে, পরিশ্রমের পর দেশ-ভ্রমণ শক্তি দেয়, ক্ষুধার পর আহার যন্ত্রকে কর্ম্মক্ষম করে, রৌদ্র বায়ু শরীর সকল দৃঢ় করে, ইহাই যৌবনের পথ। মনের প্রফুল্লতা ক্ষয় স্থগিত করে, শান্তি জীবন দীর্ঘ করে—যৌবন রক্ষা করিতে হইলে দেহের উপর কোন অত্যাচার করিতে নাই। আহারে, বিহারে, কর্ম্মে চিন্তায় স্মরণ রাখিতে হয়, এই মনুষ্য-দেহই দেড় শত বৎসর কর্ম্মক্ষম থাকে। তাহার পরও যাহাদের যৌবনের প্রয়োজন, তাহারা তাহা পরপারে লাভ করিবে।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, ফাল্গুন ১৩৩৪)

নিখিল-ভারত স্ত্রী-শিক্ষা-সম্মেলন

শ্রী প্রভাত সান্যাল

ভারতীয় নারী জাগরণের ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের নারী আজ ভোট ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য উন্মত্ত, কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে আদর্শ মাতৃত্বে, আদর্শে গৃহিণীরূপে ও আদর্শ শিক্ষয়িত্রী রূপে, ভারতীয় মহিলাগণ নারীপ্রগতির ইতিহাসে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। ভারতের নানা

প্রদেশে তাই নারী-শিক্ষা সম্মেলন, নারী-শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে, ভারতের নারীরা আজ সমাজ হইতে কুপ্রথা ও দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন করিয়া সুশিক্ষা যারা নারী অধিকারবাদকে সুপথে পরিচালনা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

শ্রীমতী বনলতা দাশ
নিখিল-ভারত স্ত্রীশিক্ষা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী

এই উদ্দেশ্য কয়েক মাস ধরিয়া ভারতের নানা প্রদেশে নারী-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। এই প্রাদেশিক সম্মিলনী-সমূহের উদ্দেশ্য ছিল—স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বাল্যবিবাহ নিবারণ, মেয়েদের শারীরিক উন্নতি বিধান বিষয়ে জনমত সুগঠিত করা। প্রাদেশিক সম্মিলনী সমূহের অধিবেশনান্তে গত ফাল্গুন মাসে দিল্লীতে নিখিল-ভারত স্ত্রীশিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। গত বৎসর প্রথম অধিবেশনে বরোদার প্রদেশ হইতে নানা সম্প্রদায়ের প্রায় দুই শত মহিলা-প্রতিনিধি এই সভা সম্মেলনে যোগদান করিয়া নারীদের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব সমূহ আলোচনা করিয়াছিলেন।

সম্মেলনে ভূপালের বেগম সাহেবা, বরোদার রাজকুমারী শকুন্তলা রাজা, মান্দীর রাণী সাহেবা, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু (বোম্বাই), শ্রীমতী নেহারু (এলাহাবাদ), শ্রীমতী সুষমা সেন (পাটনা), শ্রীমতী

সম্মেলনের সভানেত্রী
ভূপালের বেগম

কিবে (ইন্দোর), শ্রীমতী যমুনা দেবী (জয়পুর); শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরানী (বাঙলা), মিসেস্ কাজিনস্ (মাদ্রাজ), মিসেস্ হামিদ আলি (পঞ্জাব) প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সাভানেত্রী শ্রীমতী বনলতা দাশ (ভারত সরকারের আইন সচিব মননীয় মিঃ সতীশরঞ্জন দাশের পত্নী) একটি সুন্দর
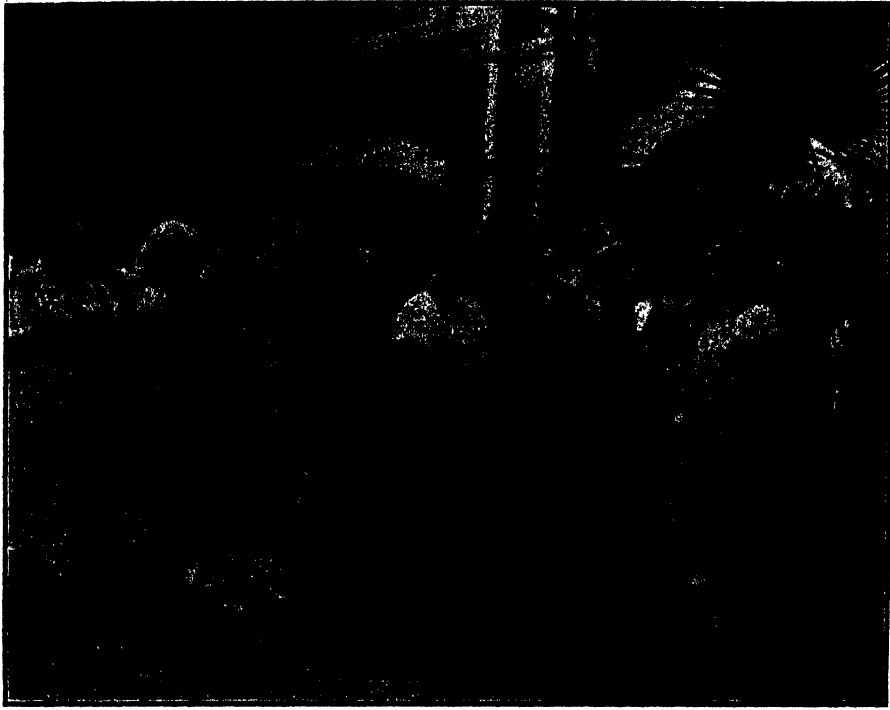
সম্মেলনে সমাগত একদল প্রতিনিধি

"আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের ভিতর অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহার কারণ উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা অভাব এবং পিতামাতার অবহেলা। সুখের বিষয় ক্রমে ক্রমে এই অবহেলার ভাব দূরীভূত হইতেছে এবং পিতামাতা সন্তানের সুখ-সুবিধার বিধানের জন্য চেষ্টিত হইতেছেন। সুতরাং আমাদের দেশের বালিকাদের কিরূপ ধরণের শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবার প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যদি আরও কয়েক বৎসর বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বালিকাদের শিক্ষা পরিচালনা করা হয় অর্থাৎ বালিকাদেরও বালকদের উপযোগী শিক্ষা-বিধি মানিয়া চলা হয় তাহা হইলে বালিকাদের পাঠ্যবিধি আর পরিবর্ত্তন করা সহজ হইবে না।"

সম্মেলনের সম্পাদিকা শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে বলেন—

"এই সম্মিলনী বিভিন্ন প্রদেশের নারীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চেষ্টিতে হইয়াছে। নানাপ্রদেশের নানা ভাষা ভাষী মহিলাগণ এই বিরাট সভায় একত্র হওয়ার ফলে তাঁহাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জন্মিবে, তাঁহাদের কর্ম্মশক্তির বিকাশ হইবে এবং সকল নারীরই যে চরম লক্ষ্য এক এই বোধ শক্তি জন্মাইবে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ভারত-বর্ষের স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা। বিগত বর্ষে সম্মেলনের কর্ম্মীরা এই উদ্দেশ্য সকল করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার ফলে সম্মেলন দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিগত বর্ষে ভারতের নানা প্রদেশে যথা বাঙলা, গুজরাত, হয়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ইন্দোর, আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারিনী সভা গঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলনের অধিবেশনের পূর্ব্বে ভারতের নানা প্রদেশে ৩০টি স্ত্রীশিক্ষা সমিতির বৈঠক হইয়াছে এবং সেইগুলি কর্ত্তৃক প্রায় দুই শত প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন। আশার কথা এই যে মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আজমীর; অন্ধ্র, কানাড়া, তামিল নাড়ু, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থান সমূহ হইতে সম্মেলনের বর্ত্তমান অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছে।

"সম্মিলনী বিগত বৎসর যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তন্মধ্যে মিঃ হরবিলাস সর্দ্দার বালিকা বিবাহ নিষেধক আইন ও ডাঃ গৌরের সহবাস সম্মতি আইনের খসড়ার সমর্থন কল্পে জনমত গঠিত করিবার প্রচেষ্টাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আইন সমর্থন করিয়া সকলে প্রদেশের নারীদিগের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদন পত্র পেশ করা হইবে এবং শুধু গুজরাত হইতেই এই আবেদন পত্রে প্রায় দশ হাজার স্বাক্ষর পাওয়া গিয়াছে।"

ভারতের বড়লাট-পত্নী লেডি আরউইনের উপস্থিতি সভার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙলার প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী সম্মেলনের কার্য্যাবলী আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে "লেডী আরউইন বড়লাট পত্নী হিসাবে সভায় যোগদান করেন নাই—তিনি একজন নারীরূপে এই নারী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।" সম্মেলনের কার্য্য উদ্বোধন করিবার সময় বড়লাট পত্নী বলেন :—

"চরিত্র ও দেহমন উন্নত করাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রত্যেক দেশের নারীরাই দেশের প্রাচীন ধারা বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারা যেন অনন্তকাল ধরিয়া সেই ধারা বজায় রাখেন। বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে সকল দিক দিয়া তাহাদের গুণের ও শক্তির বিকাশ হয় এবং তাহারা উপযুক্ত গৃহিণী হইয়া ও স্বাস্থ্যের নিয়ম কানুন মানিয়া যাহাতে মাতৃত্বের ও পত্নীত্বের দায়িত্ব পূর্ণ কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে এবং সেই সঙ্গে যাহাতে তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও উৎসাহের বিকাশ হয় এই উভয় আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের শিক্ষা সম্পর্কিত আইন-কানুন প্রণয়ন করিতে হইবে।"

পরলোকগতা পার্ব্বতী অম্মল
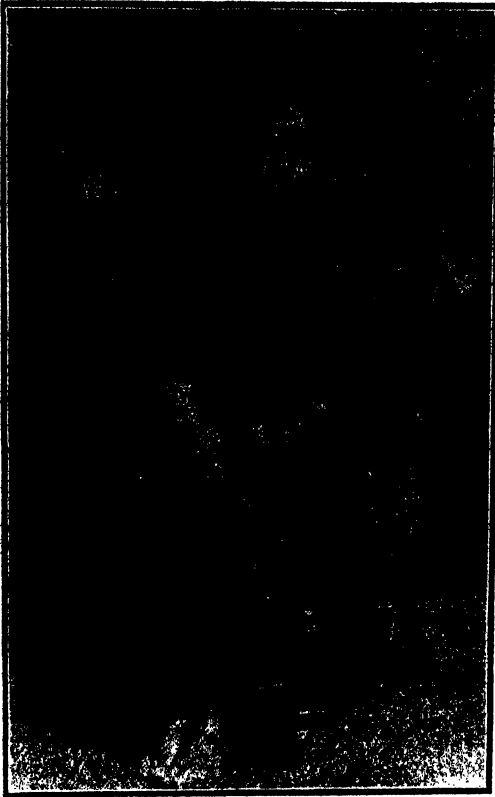
সভায় উপস্থিত প্রতিনিধির মধ্যে কেহ কেহ এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। তাঁহাদের আশঙ্কা এইরূপ ব্যবস্থা হইলে শিক্ষায় নারী পুরুষ অপেক্ষা পিছাইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নহে, তাহা নারীদিগের উন্নতিকামী কয়েকখানি পত্রিকার মতামত পাঠ করিয়া বোঝা যায়। তাঁহারা বলেন ভারতীয় নারী গৃহিণীপনায় চিরকালই দক্ষ; তাঁহাদের শুধু সেই শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না—তাঁহাদের মানসদৃষ্টি যাহাতে শুধু সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ না থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শ্রীমতী সুষমা সেন

ভূপালের বেগম সাহেবা সম্মিলনীর অধিনেত্রী হইয়াছিলেন। নারীশিক্ষার প্রসার ও সামাজিক দুর্নীতি দমনকল্পে তাঁহার রাজ্যে তিনি যে সকল সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি বর্ত্তমানে আলিগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সলর—এ পর্য্যন্ত কোন নারী এইরূপ সম্মানের অধিকারিণী হন নাই। সুতরাং নারী-উন্নতি-সম্পর্কে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন যে, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, পর্দ্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহ ভারতে নারীশিক্ষা-প্রসারের পথে অন্তরায়।

মিসেস্ হামিদ আলী (বামে), শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও মিসেস্ কাজিনস্ (মধ্যভাগে) প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ

নারীদের শরীরচর্চ্চা, বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ডাক্তারী পরীক্ষা করা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সম্মিলনীতে গৃহীত হইয়াছিল এবং ভারতীয় বালিকাদের জন্য বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন, নারীশিক্ষালয়ে কারুশিল্প, গৃহশ্রী-সৌষ্ঠব শিক্ষা ও গৃহস্থালীর কাজ শেখানো এবং স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে স্ত্রী-লোকের উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া "নারীদের দাবী" নামক একখানি নিবেদনপত্র পেশ করা হইয়াছিল। সভায় ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। সম্মিলনীতে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

এই সম্মিলনী স্ত্রী-শিক্ষা ক্ষেত্রে বাল্য-বিবাহের কুফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ এবং অপরিণত বয়স্ক বালক-বালিকার সন্তানের জনক-জননী হওয়াকে ভয়ঙ্কর নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন। সুতরাং সম্মিলনী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও প্রাদেশিক আইন সভাসমূহকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন বরোদা, মহীশূর, রাজকোট, কাশ্মীর, গোন্দাল, ইন্দোর, লিম্‌দি এবং বুঁদী প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলির অনুকরণে আইন করিয়া বালক-বালিকার বিবাহের বয়স বেশী করিয়া দেন। এই সম্মিলনী দাবী করিতেছেন যে আইন করিয়া বালক-বালিকার বিবাহের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৬ বৎসর করা হউক। এই সম্মিলনী রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দার বাল্যবিবাহ নিষেধ সূচক আইন প্রণয়নের সাধু প্রচেষ্টা সমর্থন করেন। কিন্তু সভার মত যে ঐ আইনের খসড়াতে বালক-বালিকার বিবাহের বয়স ১৫ ও ১২ বৎসরের পরিবর্ত্তে সভার গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী করা হউক।

এই সম্মিলনী গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ডাঃ স্যার হরি সিং গৌড়ের সহবাস-সম্মতি আইনের খসড়া সমর্থন করিতেছেন।

সম্মিলনীর উদ্যোক্তাগণ এই দুইটি অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সভায় পাশ করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। আশার কথা তাঁহারা এই সম্পর্কে জনমত গঠন করিতে ও শাসন-কর্ত্তাদের সহানুভূতি লাভের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে সরকারের সহানুভূতি ও দেশের নেতাদের—বিশেষ করিয়া সংরক্ষণশীল নেতাদের—সমর্থন না পাইলে ঐরূপ আইন পাশ হইতে পারে না। তাই সম্মিলনীর অধিবেশন শেষ হইলে মান্দীর রাণী সাহেবার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধি দল সভায় গৃহীত প্রস্তাব দুইটি আলোচনা করিয়া একটি নিবেদনপত্র পাঠ করেন, তাহাতে বলা হয় যে, যে সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন তাহাতে ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রায় ২০০শত প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। যাহাতে ভারতের কোথাও বাল্য-বিবাহরূপ কুপ্রথা আর না থাকিতে পারে তজ্জন্য উক্ত সমিতি প্রবল আন্দোলন চালাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, কারণ, তাঁহারা মনে করেন যে যত দিন পর্য্যন্ত আইন প্রবর্ত্তন করিয়া ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন না হইবে ততদিন দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হইবে না।

উক্ত আবেদন-পত্রের একস্থানে বলা হইয়াছে :—

"আমরা জানি যে আপনার কাজ অনেক বেশী এবং সময় অতি

সঙ্কীর্ণ এবং অন্যান্য অনেক গুরুতর বিষয় লইয়া আপনাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু আমরা আজ যে সমস্যা লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি তাহার গুরুত্বও কোন ক্রমেই কম নহে। কারণ, এই কুপ্রথা নারীদের উন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণকালে—বাল্য-বিবাহের বিষময় কুফল সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা হইয়া থাকিবে এবং কিরূপে ইহা জাতির স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে ও জাতীয় শক্তিকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া দিতেছে তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। যদি আইন করিয়া এই প্রথা রহিত করিয়া না দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারত কখনও জাতিসঙ্ঘে তাহার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে পারিবে না।''

শ্রীমতি সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে আর একদল প্রতিনিধি সম্মেলনের পক্ষ হইতে আইন পরিষদের সদস্যদিগের ও অন্যান্য নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ যে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু, মিঃ জিন্না, ডাঃ আনসারী, মামুদাবাদের মহারাজা, লালা লজপৎ রায় প্রভৃতি অনেকেই ঐ প্রস্তাব দুইটি সমর্থন করিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন।

সম্মিলনীর কার্য্যাবলী সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। কেবল সভা-শেষে একটি দারুণ দুর্ঘটনায় অনেকে ব্যথিত বিখ্যাত মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা পার্ব্বতী অম্মল অসুস্থ শরীর লইয়াও সম্মিলনীতে যোগদান করিতে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি হঠাৎ মারা যান। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন উপযুক্ত মহিলা কর্ম্মী হারাইল। পরলোকগতা অম্মল মহাশয়া দক্ষিণ ভারতের নারী-আন্দোলনের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বাঙ্গালোর জেলা-বোর্ডের সদস্য ও তত্রত্য মহিলা সেবা-সঙ্ঘের সভানেত্রী ছিলেন। ১৯২৭ সালে ভারত সরকার তাঁহাকে কাইজার-ই-হিন্দ্‌ সুবর্ণ পদক প্রদান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন।

সম্মিলনীর কর্ম্মীগণের বিপুল উৎসাহ এবং ইহার উদ্দেশ্য সমূহের প্রতি সর্ব্বত্রই যেরূপ সহানুভূতির লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে এবং উচ্চশিক্ষিত মহিলারা যখন ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে ও ভারতীয় নারী সমাজের অতীতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টিত ও সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁহাদের উদ্যম সার্থক হইবে।

দুঃখের কবি

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

'দুঃখের কবি'—শুনে হাসি পায়—সোণার পাথর-বাটি!
কল্পনা তার এমনি সূক্ষ্ম—মাটিরে বলে যে মাটি!
শুনাইতে চায় কঠিন সত্য—
অতি সে নিঠুর চরম তত্ত্ব,
একটু বেহুঁস হয়েছ যেমনি, অমনি লাগায় চাঁটি!
কাব্যের খাঁটি রস সে বিলায়—মাটিরে বলে যে মাটি!

আর কিছু নয়, শুধু একই কথা—দুঃখই আদি শেষ?
নাই তার মাঝে কোথা একটুকু হাসি-অশ্রুর লেশ?
অন্ধকারের গভীর রোদন
অট্টহাসিতে করিয়া শোধন
শ্মশান-শিবের হ'বে আরাধন—বম্ বম্ ব্যোমকেশ!
ভালো সে পটুয়া—আঁধারের পট একটি রঙেই শেষ!

নূতন তবু কি দুঃখের কথা?—নব সে আবিষ্কার?
কপিল কণাদ বুদ্ধেরও পরে আছে কিছু বলিবার?
নয়নে অশ্রু কার ঝরে নাই?
পায় নি কে দেহে কোনো যাতনাই?
রোগ, শোক, কিবা ক্ষুধার কারণে দেয়নি কে ধিক্কার
আপন জীবনে?—সেই কথাটাই সকল কথার সার?

বড় গলা করে' যুক্তির ছলে আহরি' উপমা শত
কোনো প্রয়োজন আছে কি বুঝাতে—দুঃখ সত্য কত
সূর্য্যের তাপ কত যে প্রখর,
প্রমাণের লাগি' চাই কি নখর?—
মানুষের ত্বক্ এত কি কঠিন?—না করিলে নয় ক্ষত!
বুঝাইলে তবে বুঝিবে সকলে, দুঃখ সত্য কত!

দুঃখের লাগি' হয় যে বিবাগী, সুখ যে মিথ্যা কয়—
সে জন সুখীরে করে পরিহাস—এ যে বড় বিস্ময় !
অশ্রু লুকাতে করে যে হাস্য,
অন্ন-অভাবে চাতুর্ম্মাস্য—
সে যদি দুঃখ না করে স্বীকার—নাহি মানে পরাজয়,
ভণ্ড বলিয়া গালি দিবে তারে ?—এ যে বড় বিস্ময় !

কাঁটার উপরে বক্ষ রাখিয়া গান গাহে যেই পাখী—
কে বলেছে তার হয় নাক' সুখ—সেই আনন্দ ফাঁকি ?
সুখ-সন্ধান জীবনেরই পেশা—
সুখেরই লাগিয়া দুঃখের নেশা !
তা' যদি না হ'ত এক লহমায় চুরমার হ'ত নাকি
সৃষ্টির এই রসের পেয়ালা—ধরা পড়িত না ফাঁকি ?

দুঃখের পরে যেজন বিমুখ, গায় যে সুখের গান—
মিথ্যায় মজি' করিতেছে সেই সত্যের অপমান ?
খোঁড়া ছেলেটারে বক্ষে তুলিয়া
যদি বাই তার খোঁড়া-পা ভুলিয়া,
চুম্বন করি' অধরে তাহার—সুখে গদ্‌গদ প্রাণ—
সত্যের সে কি মহা অনিষ্ট, দুঃখের অপমান ?

হায় গো বন্ধু, সত্যসন্ধ, দুঃখের নেশাখোর !
বুঝিবে কি তুমি—এই জগতের সকলেই সুখ-চোর !
যার গানে আছে যত আনন্দ,
নৃত্যচটুল চপল ছন্দ—
হয় ত সে দুখী সব-চেয়ে, তার দুঃখের নাহি ওর !
ফাঁসির কয়েদী ওজনে বাড়িছে—ধন্য সে সুখ-চোর !

শুধু দুঃখের পসরা বহিয়া পথে যে হাঁকিয়া ফেরে—
বিজ্ঞাপনের ছবিগুলা দেয় দেয়ালে দেয়ালে মেরে,
দুঃখের ভরা ভারী নয় তারি,
হোক্ যত বড় দুখের ব্যাপারী—
ঢাকের বাদ্যে হয় ভূকম্প, বাঁশী যায় বটে হেরে,
তবু সে দুঃখ তারি বড় নয়—পথে যে হাঁকিয়া ফেরে।

দুঃখের বীজ-মন্ত্র যে জপে ছন্দে কি তার কাজ ?
কি নব সত্য-সূক্ত রচিতে ধরে সে কবির সাজ ?
দুঃখের নেই ভাবের অভাব ?—
দুঃখ-বিলাসী কবির স্বভাব
পায় কোথা হ'তে ?—দুই হাতে বাজে কাব্যের পাখোয়াজ !
দুঃখেও যদি রস পাওয়া যায়—কেন দুঃখীর সাজ ?

মিথ্যার মোহে যদি কেহ কভু সত্যই সুখ পায়—
তপ্ত বলিয়া ভাণ করে' কেউ পান্তা জুড়াতে চায়,
ল'য়ে গোপালের পাষাণ-পুতলি
বন্ধ্যার স্নেহ উঠে যে উথলি'—
তার সেই সুখে কার না বক্ষ অশ্রুতে ভেসে যায় ?
কঠোর সত্য স্মরণ করিয়া কে তারে শাসিতে চায় ?

অথই দুঃখ-পাথারে ফুটেছে আনন্দ-শতদল।
অমানিশীথেও পূর্ণিমা-সুখে উথলে সিন্ধুজল !
সুচির বিরহ, মিলন ক্ষণিক—
তাই চেয়ে থাকে আঁখি অনিমিখ,
হৃদয়ের থাক্ ফাগ করে' করি মধু-উৎসব ছল—
হেন সুখ যার সে কেন ফেলিবে দুঃখের আঁখিজল ?

মিথ্যার মূলে দুঃখই আছে—সুখ যে দুখেরই ফুল !
ফুল ছিঁড়ে ফেলে' মূল হেরি তার কেন হেন শোকাকুল ?
জ্বালা আর নেশা—বিষেরই ধর্ম্ম,
দুঃখ-সুখের একই যে মর্ম্ম !
কবি চায় নেশা, জ্ঞানী ভয় পায়—পাছে করে ফেলে ভুল,
বিষের জ্বালায় অকবি অধীর, কবি যে হরষাকুল !

সুখের কাব্য লিখেছে ক'জনা ?—সহজ নয় সে জানি,
চরম দুঃখ পায় যেই তারি কণ্ঠে অমৃত-বাণী !
দুঃখের গাথা বিরাট্-ছন্দ
বোঝে সকলেই—নাহি যে ধন্দ,
গান নয়—সে যে শব্দে অর্থে কাণ নিয়ে টানাটানি !—
দুঃখেরই মাঝে দুঃখ ভুলানো—যে-সে নাহি পারে জানি।

সে যে উন্মাদ—সর্ব্ব অঙ্গে কত না চিতার ছাই !
কণ্ঠে গরল—তবু করোটীর আসবে অরুচি নাই !
তারি ভালে যবে হেরি শশিলেখা,
ঢুলুঢুলু চোখে রাগারুণ-রেখা,
শিয়রে গঙ্গা, অঙ্গারে রচি' শয্যা সে একঠাঁই
হৈমবতীর বিম্ব-অধরে চাহিতে কুণ্ঠা নাই !—

তখনি যে বুঝি সুখ কারে বলে—দুঃখের কিবা নাম !
কোন্ সে আগুনে পুড়িয়াও তবু মনোহর হ'ল কাম !
বাঁশীর রন্ধ্রে ভরে যেই শ্বাস
জানি সে বুকের কোন্ উচ্ছ্বাস,
নিজে নেশা করি' অপরে মাতায়—কতখানি তার দাম
জানি, ভালো জানি—চাহি না বন্ধু শুনিবারে তার নাম

ভোল্টা শতবার্ষিকী

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, এফ্‌-আর-এস্‌

বিগত সেপ্টেম্বর মাসের ১২ই তারিখে উত্তর ইতালীর কোমো নামক এক ক্ষুদ্র সহরে আলেস্যান্দ্রো ভোল্টার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য সমগ্র পৃথিবীর পদার্থ বিজ্ঞান-বিদ্‌ ও তড়িত-বিশারদগণের (Elcetro-techn:cians) যে কংগ্রেস বা সভা বসিয়াছিল তদ্রূপ বৃহৎ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সভা পৃথিবীতে আর হয় নাই। আলেস্যান্দ্রো ভোল্টা ক্ষুদ্র কোমো সহরে জন্মগ্রহণ করেন ও ঠিক একশত বৎসর হইল ওই সহরেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহাধিক কাল ব্যাপিয়া সুন্দরী কোমো নগরী সভাসমিতি, ভোজ, আনন্দ-ভ্রমণ ও অন্যান্য নানাবিধ আমোদ-উৎসবে মত্ত হইয়াছিল। ইতালীয়ান গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে ও ব্যয়ে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পৃথিবীর সর্ব্বদেশের পদার্থবিজ্ঞানবিদ্‌ ও তড়িত-বিশারদ্‌গণ বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। একজন সামান্য শিক্ষক কি গুণের প্রভাবে স্বদেশবাসীর আন্তরিক প্রীতি ও বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিককুলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহাই আমাদের আলোচ্য।

একথা সকলেই মানিয়া লইবেন যে, বিংশ শতাব্দীর মানুষ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শক্তির উপর তাহার অসীম প্রভাব ও অধিকার বিস্তার করিয়া মধ্যযুগের মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। মানুষ বর্ত্তমানে প্রকৃতিকে জয় করিয়া বশীভূত করিয়াছে ও প্রকৃতির বিবিধ শক্তি নিজ ব্যবহারে লাগাইতেছে। পূর্ব্বে উদ্দাম গতিশীল স্রোতস্বিনী অথবা গর্জ্জনমুখর জলপ্রপাত মানুষের মনে একপ্রকার আতঙ্ক-মিশ্রিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া বিপুল ক্ষমতাশালী অদৃশ্যদেবতা রূপে কল্পিত হইয়া তাহার পূজা পাইত, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের মানব এগুলিতে শক্তির উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছে ও জানিয়াছে যে, সে এই শক্তিকে আয়ত্তে আনিয়া ও নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ব্যবহার করিয়া তাহার জীবন-সংগ্রামের অনেক সমস্যারই সমাধান করিতে পারে।

এই প্রকৃতি-বশীকরণের অনেক খানিই তড়িতের সাহায্যে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান যুগ তাড়িত যুগ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, এই তাড়িদ্‌ বিজ্ঞান মাত্র একশত বৎসর হইল গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভোল্টার প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন
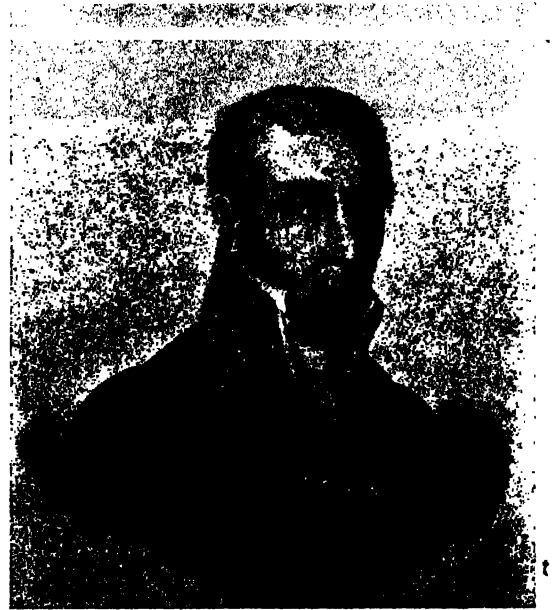
আলেস্যান্দ্রো ভোল্টা

করিয়া জগৎ এমন একজনের পুণ্য স্মৃতির তর্পণ করিতেছে, একশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যিনি সামান্য কতকগুলি ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তড়িত-সম্বন্ধে অনেক মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেন—সেই আবিষ্কারের প্রসাদেই বর্ত্তমানে তড়িৎযুগের প্রবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে।

অবশ্য বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ তড়িতের অস্তিত্ব অবগত ছিল। বজ্রপাত ও আকাশে বিদ্যুৎ-চমক সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই সে দেখিয়া আসিতেছে। খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে এশিয়া মাইনরের অন্তর্বর্ত্তী
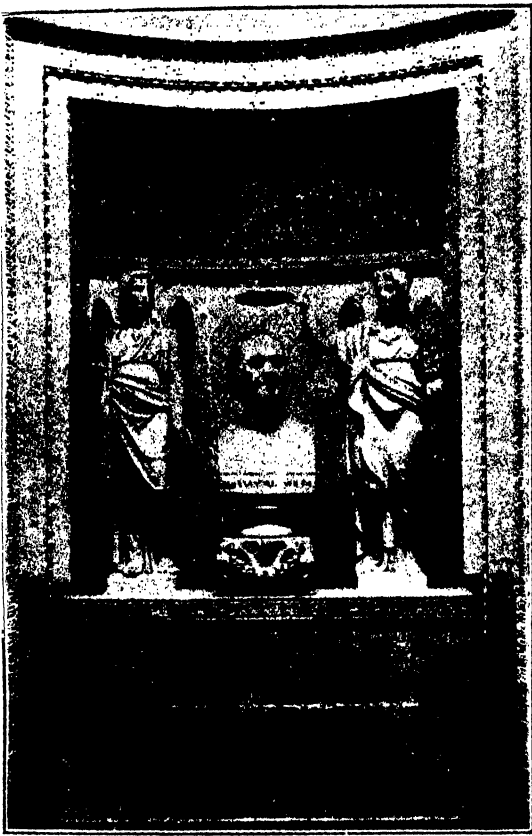
ভোল্টা সমাধি-সৌধের অভ্যন্তর

বেনিতো মুসোলিনী
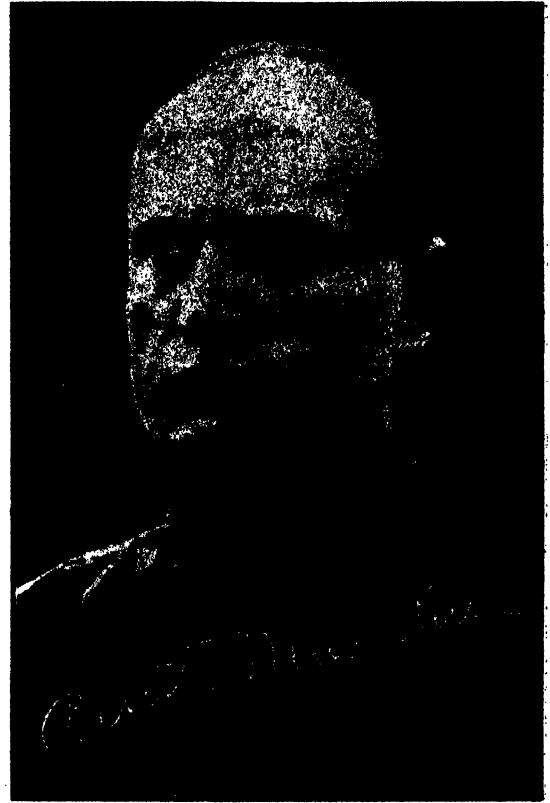
লেটাস নগরের থেল্‌স্ নামক (গ্রীসের বিখ্যাত সাতজন ানীর প্রথম জন) জ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, একখণ্ড তলস্ফটিক (amber) যদি রেশমীবস্ত্র দ্বারা ঘর্ষিত হয় তাহা ইলে উহা ছোট ছোট কাগজের টুক্‌রা আকর্ষণ করিবার ক্তিলাভ করে। তিনি এই শক্তিকে ইলেক্ট্রিকাল (তাড়িৎ) ক্তি আখ্যা দেন—তৈলস্ফটিককে গ্রীক্ ভাষায় ইলেকট্রন লা হয়। সুতরাং থেল্‌স ইলেকট্রনে জাগ্রত শক্তির ইলেক্‌ট্রিকাল শক্তি' নামকরণ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'লিডেন জার' আবিষ্কৃত হয়। [হলাণ্ডর বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ লিডেন সহরের একজন অধ্যাপক হা আবিষ্কার করেন। পাশাপাশি তড়িত-প্রভাবান্বিত য়েকটি ধাতুপাত তড়িৎবিরোধী (Non-conductor) দার্থের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন রাখিলে ধাতুপাতের তড়িৎ নীভূত হয়। 'লিডেন জার' এইরূপ বিদ্যুৎ গাঢ়ীকরণের যন্ত্রবিশেষ। সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় ইহাকে বিদ্যুৎ-ভাণ্ড* আখ্যা দেওয়া হইয়াছে] কিছুকাল পরে দুইটি ভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণ জনিত তড়িৎ-প্রজননের সূত্রগুলি (Laws) সম্পূর্ণ নির্দ্দেশিত হয়। এইরূপ ঘর্ষণের সাহায্যে অবিচ্ছিন্ন তড়িৎ-সৃষ্টি করিবার যন্ত্রাদিও আবিষ্কৃত হয় এবং আমেরিকার সুবিখ্যাত দার্শনিক ও রাষ্ট্রনেতা বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ প্রসিদ্ধ ঘুড়ি-পরীক্ষায় (Kite Experiment) সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ঘর্ষণ-যন্ত্রে উৎপন্ন তড়িতের সহিত আকাশ-তড়িতের কোনো পার্থক্য নাই। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন তড়িতপ্রবাহ সৃষ্টি করিবার কোনো উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। ভোল্টা তাঁহার সুবিখ্যাত ভোল্টেয়িক সেল বা বিদ্যুৎভাণ্ড আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করেন। ভোল্টেয়িক সেল এখন সর্ব্বজন-বিদিত। কোনো কাচের (বা যে কোনো বিদ্যুৎ-বিরোধী

* এই নামকরণ আমার অনুমোদিত নয়— মেঘনাদ সাহা।

কোমোতে অবস্থিত ভোল্টা-স্মৃতিস্তম্ভ

বা non-conductor দ্রব্যে নির্ম্মিত) পাত্র সালফিউরিক এসিডে পূর্ণ করিয়া তাহাতে যদি তাম্র (copper) ও দস্তা (zinc) নির্ম্মিত দুইটি দণ্ড (rod) দুই প্রান্ত দেশে স্থাপন করিয়া এসিডের বাহিরে তারের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে আমরা অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহ পাইতে পারি।

এখন আমরা ভোল্টার বিদ্যুৎভাণ্ডকে অতি সামান্য ও সাধারণ যন্ত্র মাত্র মনে করিতেছি কিন্তু এই সামান্য যন্ত্রই আবিষ্কার করিতে ভোল্টাকে বহুকাল ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। যে ঘটনা পরম্পরার ফলে ভোল্টা এই যন্ত্র আবিষ্কারে সক্ষম হন তাহা পরে বিবৃত হইবে। এই সামান্য যন্ত্রটি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া যে অঘটন ঘটাইয়াছে, বৈজ্ঞানিক জগতে যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এই সহজ ও অল্পমূল্য যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানুষ এমন একটি জিনিষ করায়ত্ত করিল যাহা তাহাকে অবিচ্ছিন্ন তাড়িৎ প্রবাহ লইয়া পরীক্ষা করিবার ও প্রকৃতির গূঢ় সমস্যা সমূহ সমাধানের সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে।

ভোল্টার আবিষ্কারের অল্পদিনের মধ্যেই নিকলসন ও কার্লাইল (Carlisle) জলের মধ্যে তাড়িৎ প্রবাহ সঞ্চার করিয়া দেখাইলেন যে, সুদূর অতীত কাল হইতে যে বস্তুটি পঞ্চভূতের অন্যতম বলিয়া কল্পিত হইয়া আসিয়াছে তাহা দুইটি বিভিন্ন বায়বীয় মূল পদার্থের (gaseous element) সংযোগে গঠিত। এই ভাবে বিদ্যুতের সাহায্যে বহুশতাব্দীব্যাপী সর্ব্বমানবের এক ভ্রান্ত ধারণা,যাহা বিজ্ঞানের উন্নতির পথে প্রকাণ্ড অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অপসারিত হইল।

তাড়িৎবিজ্ঞানের প্রসারের পক্ষে এই ভোল্টেয়িক বিদ্যুৎ-ভাণ্ডের প্রভাব নিতান্ত কম নহে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ওয়ারষ্টেড্ নামক একজন দিনেমার অধ্যাপক প্রদর্শন করেন যে বিদ্যুৎবাহী তারের চারিপাশে সর্ব্বদাই একটি চুম্বক-ক্ষেত্র (magnetic field) সৃষ্টি হয়। এই আবিষ্কারের ফলে সর্ব্ব প্রথম ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, তড়িৎ ও চুম্বক নামক যে দুইটি শক্তি এতাবদ্‌কাল পরস্পর সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-রহিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল আসলে তাহারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। এই জ্ঞান পরে বিজ্ঞানে অশেষ উন্নতি ও প্রসার আনয়ন করিয়াছে।

১৮৩১ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে চুম্বক প্রভাবে তড়িত প্রজননের সূত্রগুলি (Laws of Electro Magnetic Induction) আবিষ্কার করিয়া

ভোণ্টামন্দির, কোমো

খান যে, চুম্বক-ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-চালক (conductor) াবর্ত্তিত করিলে তাড়িত প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। ফ্যারাডের র্ণ্যমান চাক্তিই (Faraday's rotating disc) াধুনিক তড়িত-সঞ্চারী ডাইনামো-সমূহের জনক এবং হাই ক্রমে ক্রমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া াণ্টেয়িক বিদ্যুদ্‌ভাণ্ডের স্থান লইয়াছে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ার্ম্মানীর বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ গটিংগেন সহরে গাউস ও য়েবার নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক প্রথম বৈদ্যুতিক ঙ্কেত (Telegraphic transmission) প্রেরণ করেন বং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এডিসন ও সোয়ান প্রথমে তাড়িত াদীপ (Electr:cal Glow-Lamp) বাজারে বাহির রেন। ইহার পর বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী আবিষ্কৃত হইয়া মশঃ বাষ্পচালিত এঞ্জিন ও ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ীর ন অধিকার করে। জড় প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার ষ্টা ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। জলপ্রপাতের সাহায্য লইয়া নায়াগারা ও মহীশূরের শিবসমুদ্রম্ প্রভৃতি স্থানে বিরাট জলবৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপিত হয় ও ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানেও প্রাকৃতিক জলপ্রবাহকে কাজে খাটানো আরম্ভ হয়। এক কথায় বলা যায়, যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে মানব-সভ্যতা তাড়িত শক্তিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। বড় বড় তাড়িত প্রতিষ্ঠান সর্ব্বত্র স্থাপিত হইতেছে ও এই সকল কারখানায় সহস্র সহস্র লোকের উদারান্নের ব্যবস্থা হইতেছে। এইগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য, জার্ম্মানীর সীমেন্‌স্ কারখানা ও Allgemeine Elekrizitats Gesellschaft (সাধারণ্যে এ-ই-গে নামে পরিচিত), ইংলণ্ডের মেট্রপলিটান ভাইকার্স লিমিটেড ও আমেরিকার জেনারাল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী।

বর্ত্তমান সভ্যতার অনেকখানিই যে তাড়িত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত একথা এখন সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু বিদ্যুতের

প্রভাব সুইডেন প্রভৃতি দেশে কি বিস্ময়কর হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা যাহারা সেই সকল দেশে গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সুইডেনে অতি ক্ষুদ্র গ্রামগুলিও টেলিফোনের সুবিধা পাইয়া থাকে এবং জলতাড়িত শক্তি (Hydro-electric power) এরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, সেখানকার প্রত্যেক অধিবাসী ১১০০ 'অশ্ব-শক্তির' বিদ্যুৎ ব্যবহার করিবার অধিকারী। অতি সাধারণ পল্লী-গ্রামের চাষীর গৃহও বৈদ্যুতিক আলোক ও অন্তবিধ বৈদ্যুতিক যন্ত্র-শোভিত; চাষের কাজ ও অন্যান্য বহুবিধ দৈনন্দিন কাজে ঘোড়া গরু অথবা বাষ্প-শক্তির স্থলে বৈদ্যুতিক শক্তিতে এখানে কাজ হইয়া থাকে।

পিয়েত্রো ডেবাই
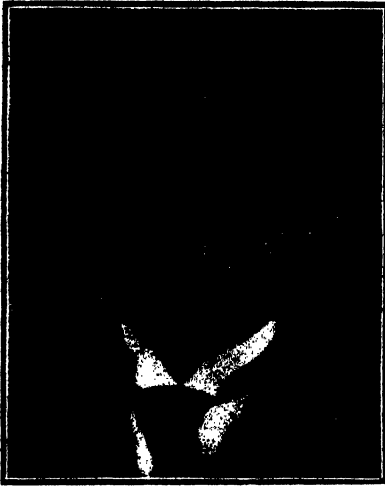
এই গেল তারবাহী তড়িতের কীর্ত্তি। বেতার তড়িতের বিস্ময়কর উন্নতির কাছে এই সকল কীর্ত্তি ম্লান দেখায়। বেতার তাড়িতবার্ত্তা প্রদান উদ্ভাবন করেন একজন ইতালীবাসী, ভোল্টারই স্বদেশীয়—মার্কণি। তিনি ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জন ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তড়িততত্ত্ব ও জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হার্ট্‌জের তাড়িত পরীক্ষা-গুলি অনুসরণ করিয়া ১৮৯৮ সালে ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় শূন্য পথে এক সঙ্কেত পাঠাইতে সক্ষম হন। বর্ত্তমানে বেতার টেলিগ্রাফের এরূপ উন্নতি হইয়াছে যে, পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত দুই ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে নিজেদের মনোভাব পরস্পরের নিকট জ্ঞাপন করিতে পারে। এই অসম্ভব ব্যাপার প্রাচীন মানব ও দেবতার কল্পনার অতীত ছিল।

ভোল্টার আবিষ্কারের ফলে আধুনিক বিজ্ঞান ও সেই সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে আমরা তাহা দেখিলাম। এখন ভোল্টার সেই যুগ-প্রবর্ত্তনকারী আবিষ্কারের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাক্।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর ইটালীর কোমোহ্রদ-তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র কোমোনগরে ভোল্টার জন্ম হয়। কোমো একটি প্রাচীন সুদৃশ্য সহর, রোমান সাম্রাজ্যে ইহার নাম ছিল কোমাম। এই সহরের নিজস্ব এমন একটি সৌন্দর্য্য আছে যাহা পৃথিবীর অপর কুত্রাপিও পরিলক্ষিত হয় না। ইহা সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও ইতালী উভয় দেশেরই সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। এখানে পর্ব্বতবেষ্টিত সুইস হ্রদমালা ও ইতালীর নীলাকাশ উভয়েরই সৌন্দর্য্য মিলিত হইয়া এক অপরূপ নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সহরই অতি প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ প্লিনীদ্বয়ের বাসভূমি ছিল এবং সম্ভবতঃ রোম সাম্রাজ্যে ইঁহাদের সমতুল্য বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোনো লোকই প্রাদুর্ভূত হন নাই।

এই সুন্দর সহরই ভোল্টার জন্মস্থান এবং এখানেই তিনি তড়িত-বিষয়ক প্রাথমিক পরীক্ষা সুরু করেন। এখানেই তিনি ইলেক্ট্রোফোরাস (Electrophorus) যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র-সাহায্যে অতি সহজেই ঘৃষ্ট তড়িত (Frictional Electircity) সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলি দেখান যায় এবং আজিও ঐ যন্ত্রের ব্যবহার আছে। ১৭৭৯ সালে কোমোর সন্নিকটবর্ত্তী পাভিয়া সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকতা করিতে আহ্বান করা হয়। পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ইটালীর নয় পৃথিবীরও একটি প্রাচীনতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই সময়ে ভোল্টা ইয়োরোপের প্রধান প্রধান দেশসমূহে—জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রভূত পর্য্যটন ও উক্ত দেশ-বাসী বৈজ্ঞানিকগণের সহিত পরিচিত হন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অবস্থান কালে তিনি তথাকার রয়্যাল সোসাইটির বহু সভ্যের সহিত ব্যক্তিগত সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হন এবং আঠার বৎসর পরে ভোল্টেয়িক পাইল্‌স্ (piles—তাড়িৎ প্রবাহ উৎপাদনের জন্য সজ্জিত ধাতু-

কোমো সহস্বেদৃরর
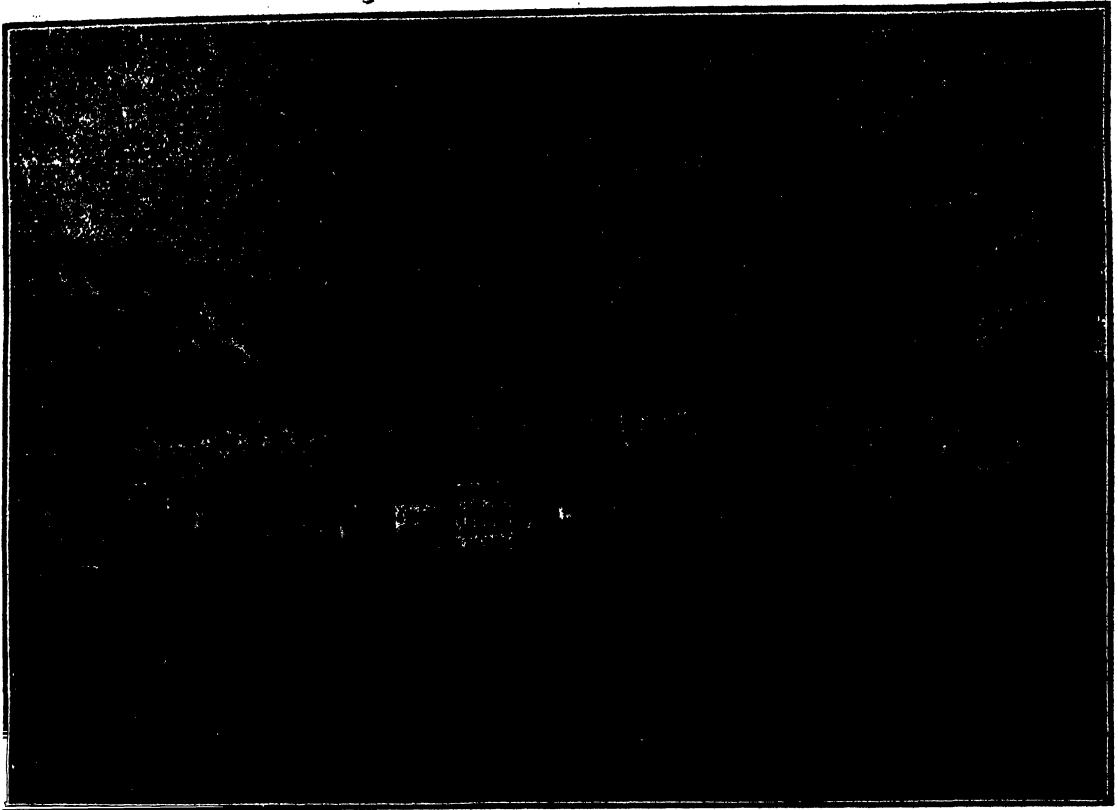
লক শ্রেণী) ও ভোল্টেয়িক সেল (cell—ভাণ্ড)-র আবিষ্কারবার্ত্তা উক্ত সমিতিতে জ্ঞাপন করেন।

যে সকল ঘটনা পরম্পরা অবলম্বন করিয়া তিনি এই াবিষ্কার করিতে সক্ষম হন সেগুলি অতি সাধারণ দৈনন্দিন টনা মাত্র। ১৭৮০ সালে এল গ্যালভানি বোলোনিয়া Bologna) বিশ্ববিদ্যালয়ের দেহতত্ত্বের (Anatomy) ধ্যাপক ছিলেন। গ্যালভানি-জায়া একদা সর্দ্দিতে আক্রান্ত ওয়াতে ডাক্তার তাঁহার জন্য ব্যাঙের পায়ের ঝোল ব্যবস্থা রেন। বাজারে সেদিন ব্যাঙ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় গ্যালভানি হতত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য আনীত কয়েকটা ব্যাঙ্ ক্ষণাগার হইতে আনিতে আদেশ করেন। সহ-রী লোহার সাঁড়াশী দিয়া ব্যাঙের পা ধরিয়া তুলিতে গিয়া ক্ষ্য করেন যে, যখনই কোন বিশেষ বিশেষ শিরার সহিত ড়াশির যোগ ঘটিতেছে তখনই মৃত ব্যাঙের দেহ ঝাঁকানি য়া উঠিতেছে। তিনি অপর এক সহকারীকে ডাকিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখান। দ্বিতীয় সহকারী ইহাও লক্ষ্য করেন যে, শুধু সাঁড়াশি স্পৃষ্ট হইয়াই ব্যাঙের দেহ নড়িয়া উঠে না, এই ঘরে অবস্থিত ঘৃষ্ট তড়িত-যন্ত্রের দুই বিভিন্ন পরিচালক বাহুর (Conductors) মধ্য দিয়া তাড়িত স্ফুলিঙ্গ (Spark) প্রবাহিত হইলেও ঠিক ওইরূপ ঘটিয়া থাকে।

এই সংবাদ গ্যাল্ভানির গোচরীভূত হইলে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য বহুবার নিজে পরীক্ষা করেন ও নিজের মতামত বোলোনিয়ার রয়্যাল একাডেমী অব্ সায়েন্স (বিজ্ঞান পরিষদ)এর বিবরণী পত্রে প্রকাশ করেন। গ্যালভানি দেখান যে, একই ব্যাঙের দেহের ভিতরে দুই বিভিন্ন ধাতুখণ্ড সন্নিবেশিত করিয়া যদি তাহাদের পরস্পর সংযোগে একটি কুণ্ডলী (Circuit) প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে ব্যাঙের দেহে উক্তরূপ গতি সঞ্চারিত হয়।

গ্যালভানি একজন দেহতত্ত্ববিদ্ মাত্র ছিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞান বিশেষ করিয়া তড়িত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোনো জ্ঞান ছিল না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, বিদ্যুতের উৎস ব্যাঙের দেহমধ্যেই নিহিত আছে, ধাতু-খণ্ডদ্বয় পরিবাহকের কার্য্য করে মাত্র। এই তড়িতকে তিনি জৈব তড়িত সংজ্ঞা প্রদান করেন।

পল ধাঁত্রে মারি জানে

গ্যালভানির ব্যাঙ-পরীক্ষা বিষয়ক অনুসন্ধানের ফল ভোল্টার জ্ঞান-গোচর হইলে তিনি রয়্যাল সোসাইটিতে এতদসম্পর্কিত বর্ণনা প্রেরণ করেন ও বলিয়া পাঠান যে, ইহার মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য একটি আবিষ্কার নিহিত আছে। ভোল্টা দেখিলেন যে, এই পরীক্ষা সম্বন্ধে গ্যালভানির সকল মতামতই ভ্রান্ত। তিনি নিজে বহুকাল যাবৎ যন্ত্র-সাহায্যে অবিচ্ছিন্ন তাড়িত প্রবাহ সৃষ্টি করার কথা ভাবিতেছিলেন। গ্যালভানির আবিষ্কারের ফলে ভোল্টা কূল পাইলেন, তিনি বুঝিলেন যে,তড়িতের উৎস ব্যাঙের দেহে নয়,ইহা দুই ভিন্ন ধাতুখণ্ডের (তাম্র ও লৌহ)সংস্পর্শ-জনিত, ব্যাঙের শিরা উপ-শিরাগুলি শীঘ্র উত্তেজিত হয় বলিয়া(Extremely irritable) তাহা কেবল মাত্র তাড়িত নির্দ্দেশকের (Indicator) কাজ করিয়া থাকে। তাঁহার কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি একটি নূতন পরীক্ষা করিলেন। এই পরীক্ষায় ব্যাঙ ব্যবহৃত হইল না (গ্যালভানি ব্যাঙ ছাড়া যে তড়িত উৎপন্ন হইতে পারে ইহা ভাবিতেই পারেন নাই)। তিনি ব্যাঙের দেহের পরিবর্ত্তে একটি ভিজা বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করেন। তিনি ইহাও দেখাইতে সক্ষম হন যে, যখন দস্তা ও তাম্র নির্ম্মিত দুইটি বিভিন্ন পাত্‌কে কোনো এসিড-সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা যুক্ত করিয়া দেওয়া হয় তখন তড়িত উৎপন্ন হয়। তড়িদ্‌মান যন্ত্রে (Electrometer) এই তড়িতের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভোল্টা পূর্ব্ব প্রচলিত তড়িদ্‌মান যন্ত্রের এমন উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন যে, আগে বিদ্যুতের পরিমাণ যতটুকু হইলে মানযন্ত্রে ধরা পড়িত ভোল্টার যন্ত্রে তাহার সহস্রাংশ বিদ্যুৎও ধরা যাইত। এই বিদ্যুৎভাণ্ড আবিষ্কারের ধারা ধরিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে তড়িত-স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির করিতেও সক্ষম হন।

ভোল্টার সময়ে অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সহিত গণিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। বর্ত্তমানে উচ্চ গণিতের সাহায্য ব্যতীত কোনও বিজ্ঞানেই গবেষণা করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বকালে যে সকল বৈজ্ঞানিকেরা গণিত-তত্ত্বের সাহায্যে স্পষ্টভাবে চিন্তা করিতেন ভোল্টা তাঁহাদের অন্যতম। তিনি কখনো আব্‌ছা বা অস্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেরই বিশেষ করিয়া পদার্থ-বিজ্ঞানবিদের এই স্পষ্ট ধারণা-গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। ভোল্টার বহুপরে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্যাপাসিটি, (Capacity) পোটেনসিয়াল (Potential) ও কোয়ান্‌টিটি (quantity) প্রভৃতির যথার্থ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইলেও এইগুলি সম্বন্ধেও তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে তড়িতমান যন্ত্র অল্প তড়িত মাপিবার পক্ষে একেবারেই কার্য্যকরী ছিল না, ঘৃষ্টতড়িৎ-যন্ত্রোদ্ভূত উচ্চ সাংস্থানিক (High Potential) তড়িত মাত্র ইহার সাহায্যে ধরা যাইত। কিন্তু ভোল্টা নূতন উপায় প্রবর্ত্তন করিয়া এই যন্ত্রের অনুভূতি (Sensitiveness) প্রায় সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন এবং ইহার সাহায্যে তাঁহার 'পাইলে' উৎপন্ন নিম্ন সাংস্থানিক (Low Potential) তড়িতের—পরিমাপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৭৯২ সালে ভোল্টা তাঁহার পাইল

Pile) বা তড়িত-স্তূপ আবিষ্কার করেন। ন্তু তাঁহার আবিষ্কারগুলিকে পূর্ণতর করিয়া লিতে (যে ভাবে বর্ত্তমানে সেগুলি প্রচলিত) ারো কয়েক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ভিজা স্ত্র-খণ্ডের পরিবর্ত্তে এসিডের ব্যবহার এই উন্নতির কটি পরিচয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এই আবি- ারের কথা সর্ব্বপ্রথমে পত্রযোগে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির

আর্থার কেন্নেলী

ভাপতি স্যার যোশেফ ব্যাঙ্কের নিকট জানান হয়। ভোল্টা ন্ন ভিন্ন তড়িত-ভাণ্ডের ধারাবাহিক সংযোগ-প্রণালীও Principle of Series Connection) আবিষ্কার রেন। ধারাবাহিক সংযোগ বলিতে পাশাপাশি াণ্ডগুলিকে, রাখিয়া পাশাপাশি ভাণ্ডদ্বয়ের বিপরীত ান্তের (opposite pole) পরস্পর সংযোগ বুঝায়, হাতে তড়িতশক্তির পরিমাণ ভাণ্ড সংখ্যার অনুপাতে বৃদ্ধি াপ্ত হয়। তখন হইতে অদ্যাবধি তড়িতভাণ্ড পদার্থ-জ্ঞানবিদ্ মাত্রেরই অবশ্য ব্যবহার্য্য যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে বং অন্যান্য বহু চমকপ্রদ আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছে।

ভোল্টার এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারের মূল্য দিতে বৈজ্ঞানিক গৎ বিলম্ব করে নাই। উক্ত বৎসরেই তিনি লণ্ডনের য়্যাল সোসাইটির সম্মানিত সভ্য পদে বৃত হন। প্যারিসের ানীন্তন রয়্যাল একাডেমী অব সায়েন্সের সভ্যগণের শেষ করিয়া লাপ্লাস ও লা ভোয়াসিয়ের সহিত তিনি ১৭৮২ সাল হইতেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ১৮০০ সালে ফ্রান্স-সাধারণ-তন্ত্রের সহিত অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের ঘোরতর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল—এই যুদ্ধে উত্তর ইতালী রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সুতরাং ১৮০১ সালের শরৎকালের পূর্ব্বে ভোল্টা তাঁহার আবিষ্কারের কথা জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। একাডেমীতে তাঁহার আবিষ্কার উপস্থাপিত হওয়ার

ম্যাক্স প্লাঙ্ক

পর এই আবিষ্কারের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে লাপ্লাস, চার্ল্স, কুলম, মঁজ ও বিয়ো—বিজ্ঞানের এই কয়জন মহারথীকে লইয়া এক কমিশন বসানো হয়। ভোল্টাকে তাঁহার যন্ত্র প্রদর্শন করিতে আহ্বান করা হয়। ১৮০১ সালের ৭ই নবেম্বর (১৬ই ব্রুমেয়ার) তারিখে তিনি সর্ব্বপ্রথম একাডেমীর ৪২ জন সদস্যের সম্মুখে তাঁহার যন্ত্র প্রদর্শন করেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট দর্শক দলের একজন ছিলেন।

একাডেমীর কার্য্যবিবরণী হইতে নিম্নলিখিত স্থানটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, এইরূপ রাজনৈতিক যুদ্ধবিগ্রহ ও গোলযোগের সময়েও ফরাসী বিদ্বজ্জন ও রাষ্ট্রীয় নেতারা একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যথাযথ সম্মান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বিপ্লবের দশম বৎসরের ১৬ই ক্রমেয়ারের অধিবেশন—

—পাভিয়ার অধ্যাপক সিটিজেন (নগরবাসী) ভোল্টা গ্যাল্‌ভানিজম্‌ তথ্য (তড়িত-প্রবাহ তখন এই নামে পরিচিত ছিল) সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যের প্রথমাংশ বিশেষ করিয়া গ্যালভানিক প্রবাহের (Galvanic Fluid) স্বরূপ বিষয়ক মন্তব্য পাঠ করেন। সিটিজেন বোনাপার্ট (তখনও তিনি সাম্রাজ্যের প্রথম কন্সাল বা সম্রাট হন নাই) প্রস্তাব করেন যে, একাডেমীর তরফ হইতে সিটিজেন ভোল্টাকে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য্যের প্রতি একাডেমীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য একটি সুবর্ণ পদক উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য—কারণ—বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তিনিই প্রথমে একাডেমীর অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন—

জুলিয়েমো মার্কণি

ইহার পর ভোল্টার আবিষ্কার সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গুণগ্রাহী নেপোলিয়ান ভোল্টা সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন ও ভোল্টাকে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মূর্ত্ত প্রতীক্‌ স্বরূপ দেখিতেন। ভোল্টাকে সম্মানিত করিবার সুযোগ ঘটিলেই তিনি তাঁহাকে বিবিধ সম্মানে ভূষিত করিতেন।

এই আবিষ্কারের পর ভোল্টা তড়িত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু গবেষণা করেন নাই। তিনি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ বিশেষ করিয়া আবহ-বিদ্যা (Meteorology) ও বায়ু-বিজ্ঞান (Laws of Gases) সম্বন্ধে অধিকতর উৎসাহী হইয়া পড়েন। ১৮১৯ সালে বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি এবং ১৮২৭ সালের ৫ই মার্চ্চ ৭৫ বৎসর বয়সে কোমোতে দেহত্যাগ করেন।

তাঁহাদের সহরেই সর্ব্বযুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের অন্যতমের জন্ম হইয়াছিল—এই কথা স্মরণ করিয়া কোমোর জনসাধারণ যথেষ্ট গর্ব্বিত। স্থানীয় বাজার-স্থলে ভোল্টার একটি বৃহৎ মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। মুসোলিনী পরিচালিত ইতালিয়ান গবর্ণমেণ্ট ভোল্টার স্মৃতি রক্ষার্থ কোমো সহরের সন্নিকটবর্ত্তী উচ্চতমপর্ব্বত-চূড়ায় একটি বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এখানকার নাট্যশালা, হোটেল, বাজার এমন কি তাড়িখানা পর্য্যন্ত তাঁহার নামের মহিমা বহন করিতেছে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যদি স্বর্গগত বৈজ্ঞানিকের আত্মা এই কংগ্রেস-সপ্তাহে জাগরিত হইত তাহা হইলে তাড়িখানার সহিত যুক্ত হইয়া মহিমান্বিত হইতে তিনি নিশ্চয়ই তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত উত্তম মার্ব্বল প্রস্তর নির্ম্মিত এক স্মৃতি সংগ্রহাগারে (Museum) তাঁহার যন্ত্রগুলি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

এখন কংগ্রেসের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহকাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং ইয়োরোপের সকল প্রদেশ (এমন কি রাশিয়া হইতেও, কেবল বলকান ষ্টেট্‌স হইতে কোন প্রতিনিধি আসে নাই), আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ, কানাডা, ভারতবর্ষ ও জাপান হইতে প্রতিনিধিরা এই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন। কংগ্রেসে উপস্থিত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত চিত্র সম্বলিত হইয়া বিশেষ ভাবে মুদ্রিত ভল্‌টিয়ানা নামক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে কয়েকজনের চিত্র দেওয়া হইল।

কংগ্রেসের মোটামুটি বিবরণ এইরূপ। কোমোর সাধারণ থিয়েটারে কংগ্রেস-উন্মোচনী উৎসব সম্পন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক কিউ মায়োরাণা সমবেত সদস্যদিগকে নিম্নলিখিতভাবে অভ্যর্থিত করেন—

আজ সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ-বৈজ্ঞানিকবৃন্দ বন্ধুভাবে আলাপ-আলোচনার নিমিত্ত এই সহরে সমবেত হইয়াছেন বলিয়া

দস্যদের যশ ও কীর্ত্তির কথা ধরিলে মনে হয় যে, ইতিপূর্ব্বে এরূপ বিরাট সম্মিলনী সম্ভবতঃ আর হয় নাই। সিয়েনা নগরে যে সকল তীর্থ-যাত্রী আসিতেন প্রথমেই সহরের তোরণ-দ্বারে উৎকীর্ণ Sena cor tibi magis Pandit' এই বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করা হইত। এখানে সমবেত সদস্যেরাও যেন আলেস্সান্দ্রো ভোণ্টার জন্মভূমি কোমোর অধিবাসীদের সাদর অভ্যর্থনার মধ্যে কোমোর অন্তরের গভীর গর্ব্বিত আনন্দ-বাণী পাঠ করিতে পারেন, ইহাই আমার কামনা। কোমো সহর আজ ভোণ্টার শত বার্ষিকী উৎসব করিয়া তাঁহার প্রতিভার উত্তরাধিকারীগণকে একত্র মিলনের সুবিধা দান করিয়াছে এবং সাগ্রহে কামনা করিতেছে যে, যেন সমবেত বৈজ্ঞানিকগণের যশোকীর্ত্তি ভোণ্টার সকল আশাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

ইহার পর ইতালীর রাজসভার সদস্য অধ্যাপক গারবাসো ইতালীয়ান ভাষায় ভোণ্টার জীবনী ও কার্য্য বিষয়ে বক্তৃতা দেন। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি স্যার আর্ণেষ্ট রাদারফোর্ড, অধ্যাপক

কুইরিনো মায়োরাণা

জানে, অধ্যাপক এম ফন লাউএ ও অধ্যাপক কেনেলী যথাক্রমে ইংলণ্ড, ফ্রান্স জার্ম্মানী ও আমেরিকার তরফ হইতে বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতা একটি স্মৃতি-পুস্তকে (Memorial Volume) সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের তথ্যাংশ উক্ত বহি হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রত্যহ দুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসিত ও প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইত। সেই সকল প্রবন্ধ বুঝিতে হইলে উচ্চ গণিত ও বিজ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক; "প্রবাসীর" সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সেগুলি দুর্ব্বোধ্য হইবে। এই মাত্র বলা যায় যে, ওই সকল [illegible]

আলোচিত হইয়াছিল। জুরিকের অধ্যাপক ডেবাই, হল্যাণ্ডের খ্যাতনামা অশীতিপর অধ্যাপক লোরেঞ্জ প্রভৃতি কয়েকজন সদস্য নানা ভাষায় দখলের পরিচয় প্রদান করেন। অধ্যাপক ডেবাই জাতিতে ডাচ্ হইলেও প্রয়োজন মত বিশুদ্ধ ইংরেজী, জার্ম্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ডেবাই বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে জার্ম্মাণীর গটিংগেনে অধ্যাপকতা করেন ও পরে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জ্যুরিক সহরে অধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি জার্ম্মাণীর লাইপজিগ্ সহরে ব্যবহারিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইয়াছেন। পাঠকেরা

ম্যাক্স ফন লাউএ

ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইয়োরোপীয় দেশ-সমূহে বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণী ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেওয়া হয়। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সকল স্থানে চাকরীর জন্য দরখাস্ত করার প্রথা নাই—সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী ব্যক্তিকে অধ্যাপকতা গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হয়।

কোপেনহাগেনের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও বর্ত্তমানে আণবিক পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী

নীয়েল্‌স্ বোর এক অপরাহ্নব্যাপী বক্তৃতায় বিশদভাবে নব-প্রচারিত 'ভেলেন মেকানিক' বা তরঙ্গ-বিদ্যা বিষয়ক গূঢ় তথ্য সকল বিবৃত করেন। এই আধুনিক তরঙ্গ-বিদ্যা ফ্রান্সের এল ডি ব্রোইলি ও জ্যুরিকের শ্রডিঙ্গার নামক অধ্যাপকদ্বয় কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হয় ও ইহার অদ্ভুতত্ব এই যে, ইহা জড়বস্তু মাত্রকেই

এণ্ড্রু মিলিকান

তরঙ্গরূপে ও আলোক-তরঙ্গ মাত্রকেই জড়-বস্তুরূপে গণ্য করিয়া থাকে। এই তত্ত্বের সাহায্যে ভবিষ্যতে হয়ত অনেক বড় জিনিষ আবিষ্কৃত হইবে, কিন্তু এখন ইহা অত্যন্ত জটিল বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপক ডব্লিউ আর উড্‌ নামক একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাহবা পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-জগতে নিত্য নূতন রকমের পরীক্ষা করিতে ইনি অদ্বিতীয়। ইনি "উচ্চ গ্রামের শব্দতরঙ্গের (High Pitched Sound waves) সাহায্যে মাছমারার" (নামটা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই) এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন।

কোমো হ্রদের উপরে কোমো হইতে হ্রদের অপর প্রান্তে মেনাজো সহর পর্য্যন্ত একটি ষ্টীমার-ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল। তিনচার জন করিয়া পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্ যখন এক এক কোণ আশ্রয় করিয়া আশেপাশের চমৎকার রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের নিজেদের প্রিয় বিষয়ের আলোচনায় সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন তখন তাহা খুব কৌতুকাবহ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বোর-(Bohr) পন্থী কয়েকজন যুবক-পাণ্ডার দলটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দলে পাউলি ও হাইসেনবার্গ ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বয়সে ত্রিশের কম অথচ ইতিমধ্যে এই দুইজনের গবেষণা বৈজ্ঞানিক জগৎকে আলোড়িত করিয়াছে। হাইসেনবার্গের বয়স মাত্র ২৬ বৎসর অথচ তাঁহাকে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদ দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশের শিক্ষাব্যবসায়িগণ বিশেষ করিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি ইহাতে আকর্ষিত হওয়া উচিত—শিক্ষা-বিভাগে অধ্যাপক নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহারা এই আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন। জার্ম্মানীতে সাধারণতঃ ৩৫।৪০বৎসরের নীচে কাহাকেও উচ্চ অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না। এবং ইহার পূর্ব্বে, ক্রমান্বয়ে লেক্‌চারার, সহকারী অধ্যাপক ইত্যাদি পদেও যথারীতি কাজ করিতে হয়। কিন্তু উচ্চ অধ্যাপক পদ পাইতে

হেণ্ড্রিক লোরেন্স
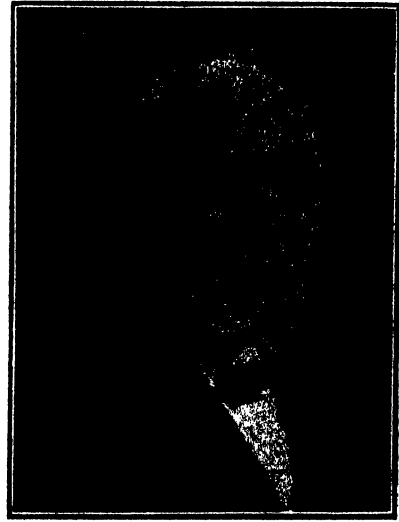
হইলে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিতে হয়, ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বয়সে ছোট ও অল্পদিনের চাকুরী সত্ত্বেও বয়োবৃদ্ধদের টপকাইয়া উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। হাইসেনবার্গ জার্ম্মাণীর একটি প্রাচীনতম ও বহু প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে বৃত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বিগুণ বয়সের লোককেও তিনি অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। জার্ম্মানেরা প্রতিভার কদর জানে, অন্য কিছুতে তাহারা ভোলেই হয় না

ইহার সহিত বাঙলার প্রচলিত প্রথার তুলনা করুন। থানে ভাল চাকরী পাইবার যোগ্যতা নির্দ্দেশ করা হয় য়োবৃদ্ধতা দিয়া। এই কুপ্রথার জন্য পূর্ব্বে বাঙলার শিক্ষা-ভাগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যদি এই ীতি অনুসৃত হইতে থাকে তাহা হইলে বাঙলার শিক্ষা-বিভাগের উপকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবে। দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন বড় একটা হইবে না। এক প্রেসিডেন্সী কলেজের

মেঘনাদ সাহা

র্ত্তমান অবস্থার সহিত তাহার পূর্ব্বতন অবস্থার তুলনা রিলে দেখা যায় যে পূর্ব্বে যে কলেজ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেজরূপে পরিগণিত হইত, বর্ত্তমানে প্রতিভাশালী াক নিযুক্ত না করিয়া একটা বাঁধাধরা রীতি অনুযায়ী াকুরীর বয়স হিসাবে উচ্চ পদে লোকনিযুক্ত করাতে াহা একটি মধ্যমশ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে। লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ক্রমশঃ এই অবস্থা হইয়া াসিতেছে। অকর্ম্মণ্য বা অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ় বড় চেয়ারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছেন লিয়া শিক্ষার অবনতি হইতেছে।

কোমো হইতে ভোল্টার কর্ম্মস্থান পাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয় র্যন্ত প্রায় একশত কুড়ি মাইল মোটর-ভ্রমণের ব্যবস্থা া হইয়াছিল। মিলান সহরের মধ্য দিয়া এই পথ—আমরা মিলান সহরের সুপ্রসিদ্ধ গম্বুজ দেখিলাম। পাভিয়া একটি প্রাচীন নিরিবিলি সহর। বাড়ীগুলি পুরানো ধরণের, মনে হয় যেন কালের বক্ষে পাভিয়া আজিও নিদ্রামগ্ন আছে। এই সহর দেখিলে মধ্য যুগের কথা মনে পড়ে। রাস্তাগুলি সঙ্কীর্ণ এবং বাড়ীগুলিও দেখিতে সুশ্রী নহে। পাভিয়ার পোদেস্তা বা লর্ড মেয়র আমাদিগের মধ্যাহ্ন-ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতদের তরফ হইতে আমেরিকার অধ্যাপক মিলিকান বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে একটি

উইলিয়ম রবার্ট্ উড্

হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান মানুষ প্রাচীন মন্ত্রতন্ত্রের বলে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের নামে প্রকৃতিকে বশ করে নাই, সহজ সরল উপায়ে আপনার বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিয়াছে। এই প্রকৃতি-বিজয়-কার্য্যে পৃথিবীর সকল জাতি ও দেশ সাহায্য করিয়াছে এবং একদেশের বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত বিদ্যা অতি শীঘ্র দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ভোল্টার পরবর্ত্তী তাড়িত বিজ্ঞানের আবিষ্কারে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নামোল্লেখ করেন—যথা, ওয়ারষ্টেড (ডেনমার্ক) আঁপেয়ার (ফ্রান্স), গাউস্ ও ওয়েবার (জার্ম্মানী), ফ্যারাডে (ইংলণ্ড), হেনরী (আমেরিকা), ম্যাক্সওয়েল (ইংলণ্ড) ও হার্টজ্ (জার্ম্মাণী)। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেণার ক্ষেত্রে আমাদের মন যেন সর্ব্বদা বাধা ও সংস্কার-বিমুক্ত থাকে। যুবা-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে আমরা যেন সহজেই

পরস্পর মনোভাব বিনিময় করিতে প্রস্তুত থাকি। শুধু নিজের অসাধারণ ধীশক্তি আঁকড়াইয়া থাকিলে বিজ্ঞানের গবেষণা চলে না। পরের কাছ হইতেও গ্রহণ করিতে হইবে। এই কংগ্রেসেই আমাদিগকে কখনো পক্ককেশ বৃদ্ধ লোরেঞ্জ (বয়স ৭৫) ও প্লাঙ্কের (বয়স ৭০) মত যাঁহারা সমগ্র জীবনের সার্থকতা লইয়া ভবিষ্যতের পানে গর্ব্বিত ও সন্দিগ্ধ মনে চাহিয়া আছেন তাঁহাদের চরণতলে বসিয়া শিক্ষা লইতে হইতেছে; কখনো বা বোর ও ডেবাইয়ের মত মধ্য-বয়সের লোকেরা যাঁহারা জড়বস্তুর আণবিক গঠন

নীয়েল্‌স বোর

বিষয়ে সুন্দর তথ্য আবিষ্কার করিয়া গণিতের জটিল ভাষায় সেগুলিকে বিবৃত করিয়াছেন তাঁহাদের পদতলে বসিতে হইতেছে এবং সমান শ্রদ্ধার সহিত পাউলি ও হাইসানবার্গের মত অজাতশ্মশ্রু যুবকের—যাঁহারা ইতিমধ্যেই আণবিক গঠনের অপূর্ব্ব তথ্য সকল উপহার দিয়াছেন—তাঁহাদের চরণতলে বসিয়াই শিক্ষা লইতে হইবে।

কংগ্রেসের সদস্যেরা প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ভোল্টা যেখানে শিক্ষাদান করিতেন সেই মঞ্চের চারিপাশে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এখানকার প্রত্যেক বক্তৃতামঞ্চে একটি করিয়া তাম্র ক্রুশের উপর উৎকীর্ণ যীশুমূর্ত্তি টাঙ্গানো আছে। এইগুলি প্রাচীনকালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল তখনকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানে হল্যাণ্ডের অধ্যাপক কংগ্রেসের সভ্যগণের মধ্যে প্রবীণতম ও পূজনীয় এইচ এ লোরেঞ্জ প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল বক্তৃতায় ফরাসী ভাষায় কংগ্রেসের সকল অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলির একটি চুম্বক করিয়া দেন। ৭৫ বৎসর বয়সেও এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের ধারণাশক্তি ও ক্ষিপ্রবুদ্ধি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। আমার মনে হয় সমবেত সভ্যদের মধ্যে আর কেহও এই বিস্ময়কর কার্য্য করিতে পারিতেন না। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক দেহত্যাগ করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রমোহন বসু

অধ্যাপক রাদারফোর্ড বিদেশী সদস্যগণের তরফ হইতে রোমো অধিবাসীবৃন্দ ও ইতালীয়ান গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের আতিথেয়তা ও পৃথিবীর ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানবিদ্‌গণকে একত্র সম্মিলিত করা রূপ বিপুল উদ্যমের সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার পর কংগ্রেস সমাপ্ত হয়। তিনি তাঁহার বক্তৃতার শেষে বলেন যে ইতালী যে, মহৎ কার্য্যে অগ্রদূত হইলেন অন্যান্য দেশও ভবিষ্যতে সেই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন তিনি এরূপ আশা পোষণ করেন।

ইতালীবাসীদের আতিথেয়তা কোমোতেই শেষ হয় নাই। আমাদিগকে স্পেশাল ট্রেণে করিয়া রোমে লইয়া

যাওয়া হয় এবং এই প্রসিদ্ধ সহরের (আমাদের সুন্দরী চিরন্তনী নগর-জননী রোমা এই নামে ইতালী-বাসিগণ সগর্ব্বে এই সহরের উল্লেখ করেন) সকল মিউজিয়াম ও শিল্পাগারের সকল সম্পদ আমাদিগের নিকট উদ্‌ঘাটিত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র পথ-প্রদর্শকের (গাইড) ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ইতালীয়ান শিল্পী র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, বার্ণিনি প্রভৃতির ভাস্কর্য্য ও ক্ষুদ্র বর্ণময় প্রস্তর রচিত চিত্র দেখিয়া আমরা চক্ষু সার্থক করিলাম এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্মৃতি সৌধ ভ্যাটিকানের বিরাট ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। রোম সাম্রাজ্যের প্রধান সহর প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ একদিন ধরিয়া দেখিলাম। প্রাচীনকালের সম্রাটবৃন্দের বাসভবন প্যালেটিন পাহাড়ের উপর অবস্থিত প্রাসাদ-সমূহের ধ্বংসাবশেষ; যেখানে গ্ল্যাডিয়েটগণ যুদ্ধ করিত ও রোমনগরের অধিবাসী-দের প্রীত্যর্থে যেখানে সিংহের মুখে অপরাধীদের ফেলিয়া দেওয়া হইত সেই কোলোসিয়াম, যেখানে রোমের বক্তৃতাবীরগণ লোকের মন জয় করিতেন সেই ফোরাম প্রভৃতি দেখিয়া অবাক হইলাম। মধ্যযুগে এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পঞ্চাশ ফুট মাটির নীচে প্রোথিত ছিল। পরে শিক্ষিত পোপেরা কেহ কেহ এই সহর খুঁড়িয়া তুলিবার কার্য্য আরম্ভ করেন। আরো পরে গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু মুসোলিনীর প্রভাবকালে এই কার্য্য বিশেষ যত্ন ও পারদর্শিতার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রবাদী প্রাচীন রোমের এই সকল কীর্ত্তিকে জগৎসমক্ষে স্থাপন করিবার কাজ যেন ইতালীয়ান নেতার জীবনের একটি ব্রত হইয়াছে। আমেরিকান অধ্যাপক মিলিকান আমাকে বলেন যে তিনি সতের বৎসর পূর্ব্বে যখন রোমে আসিয়াছিলেন তখন তাহা আবর্জ্জনা ও নিরানন্দপূর্ণ একটি স্থান ছিল। বর্ত্তমানে সহরের সর্ব্ববিধ উন্নতি, প্রাচীন স্মৃতিগুলি বজায় রাখিতে সর্ব্বসাধারণের চেষ্টা ও দেশবাসীর নৈতিক ও মানসিক প্রসার দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন।

ক্যাপিটোলে রোমের গবর্ণর কর্ত্তৃক আমাদিগকে একটি সরকারী ভোজ দেওয়া হয়। এই ক্যাপিটোল প্রাচীনকালে বলিয়া বর্ণিত হইত, মধ্যযুগে ইহাকে একটি মিউজিয়ামে পরিণত করা হয় এবং বর্ত্তমানে ইহা রোমান মিউনি-সিপালিটির অফিস। বেতারের আবিষ্কর্ত্তা মার্কণি এখানে ভোল্টার কীর্ত্তিকাহিনী ও জড় বিজ্ঞানের উন্নতির কথা বিবৃত করেন। ভায়া আপিয়ার (সাম্রাজ্যবান্ রোম ও প্রাচ্যের সংযোগকারী প্রাচীন রাজপথ, ইহা রোম হইতে ব্রিণ্ডিসি পর্য্যন্ত বিস্তৃত) মধ্যদিয়া আমরা মোটরে সম্রাট কারাকাল্লা নির্ম্মিত স্নানাগার ও ক্যাটাকুম্বস্ দেখিতে যাই। অনেকেই বোধ হয় জানেন্ যে খৃষ্টপ্রচারিত ধর্ম্ম প্রথমে রোমের ক্রীতদাস মহলে বিস্তৃত হয়। তাহাদের উপর সাম্রাজ্যগর্ব্বী রোমানরা নিদারুণ অত্যাচার করিত, এই অত্যাচারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাহারা রোমের প্রান্তস্থিত নরমপাথরের ভিতর সুরঙ্গ-করিয়া তাহাতে উপাসনা ও রাত্রি যাপন করিত। এই সুরঙ্গ রাজিকেই ক্যাটাকুম্ব বলে। রোমের চারিদিকে প্রায় ৬০০ মাইল সুরঙ্গ আছে। ক্যাটাকুম্বসের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে আমরা সঙ্গী পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যদি তিনি এখন আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কি হইবে। পাদ্রী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন যে, "কবরগুলি সব খালি আছে, তোমরা সেখানে অনন্ত কাল নিদ্রা দিতে পারিবে। ক্যাটাকুম্বসে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাচীন খৃষ্টানদের ভগবানে নির্ভরশীলতা, বিশ্বাস ও আন্তরিকতার কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের প্রভুর অনুগামী হইয়া তাহারা কায়িক শক্তির দ্বারা নহে দুঃখ ভোগের দ্বারা বিশ্বকে জয় করিয়াছিল।

প্রাচীন আলবান পর্ব্বতের উপর অবস্থিত সুন্দর সহরতলী ফ্রাসকাটিতে আমাদের একটি সান্ধ্য সম্মিলন হয় এবং রোমের প্রাচীন বন্দর অষ্টিয়াতেও গমন করি। সমুদ্র এখন অষ্টিয়া হইতে চার মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। খননকার্য্যের ফলে ভূতপূর্ব্ব বন্দরটি এখন চারিদিকে স্থলবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত। এখানে আমরা প্রাচীন রোমান সহরের একটি খাঁটি নিদর্শন দেখিলাম—প্রাচীন মন্দির, ফোরাম্, সঙ্কীর্ণ পথ, স্নানাগার ও গৃহ-শ্রেণী তেমনই রহিয়াছে। অষ্টিয়ার বাজার একটি দেখিবার

কালের অনেক নৌবিহার ও ব্যবসায়ী-মণ্ডলীর নাম ও সাঙ্কেতিক চিত্র অঙ্কিত আছে। এখানেও রোমের ন্যায় একটি মিত্রদেবের মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পণ্ডিতেরা এইগুলি দেখিয়া বলিতেছেন যে, প্রাচীন কালে পারসীক জাতির আরাধ্য মিত্রদেবের পূজা খৃষ্ট ধর্মের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

প্রধান মন্ত্রী মুসোলিনী কর্ত্তৃক তাঁহার গৃহে একটি চা-সম্মিলনীই এবারকার সর্ব্বশেষ উৎসব। এই গৃহটি ইতালীর একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। মুসোলিনী নিজে সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও যে কোনো ভারতীয় জিলা-জজের চাইতে কম বেতন গ্রহণ করেন। ডিউক প্রত্যেক সদস্যকে নিজে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দিত করেন। সমবেত সদস্যের মধ্যে নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের স্থান তাঁহার সহিত এক টেবিলে হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা ইচ্ছাকৃত কি আকস্মিক তাহা বলিতে পারি না।

রোম হইতে আমরা সকলে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের নিজের গন্তব্যঅনুযায়ী যাত্রা করি, কিন্তু প্রত্যেকেই ইতালীতে অবস্থানের এই কয়দিনের অতি মধুর স্মৃতি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি। এই অপূর্ব্ব সম্মিলনীর এবং সদস্যগণের প্রতি ইতালীয়ান মাত্র—বিশেষ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের আতিথ্য ও দাক্ষিণ্যের কথা বিস্মৃত হইবার নহে। সর্ব্বশেষে আমরা এই কামনা লইয়া ফিরিয়া আসি যেন ভোল্টার আত্মা সত্যের অনুসন্ধানে প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান। এই সভাতে ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান লেখক ব্যতীত অধ্যাপক ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু সস্ত্রীক ও ছাত্রসভ্য হিসাবে প্যারিসপ্রবাসী শ্রীমান্ অনিল কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন।

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(২৪)

আজ 'মেল ডে' বলিয়া কৃষ্ণা বড় ব্যস্ত ছিল। অবশ্য প্রতি মেলে চিঠি লিখিবার মত অন্তরঙ্গ বন্ধু কেহ তাহার ছিল না। তবু নিজের দেশের, পরিচিত মণ্ডলীর খবরাখবর পাইতে ইচ্ছা করে বলিয়া বন্ধুদের চিঠি-পত্র লেখা সে একেবারে ভুলিয়া দেয় নাই। প্রতি মেলে ঘটিয়া উঠিত না, তাই মাঝে মাঝে স্থিরসংকল্প হইয়া বসিয়া সে একেবারে এক তাড়া চিঠি লিখিয়া ফেলিত। তাহার পর আবার কয়েক সপ্তাহ চুপচাপ থাকিয়া যাইত।

আজ সেইরকম একটা দিন বলিয়া সকাল হইতে সে অনন্যকর্ম্মা হইয়া চিঠি লিখিতে বসিয়া গিয়াছিল। চিঠির কাগজ, খাম, টিকিট, সব এক পাশে, বন্ধুদের চিঠি এবং নিজের লেখা চিঠি আর এক পাশে। দুচারখানা চিঠি সিতার্দ্ধ দায়সারা ভাবে লিখিয়া সে এখন লাবণ্যকে চিঠি লিখিতেছিল। নিজের গভীরতর মনের খবর সে কাহাকেও দিত না, তবু কিছু কিছু কথা এই বন্ধুটির সঙ্গেই বা তাহার হইত কৃষ্ণার এ-কাজটাও লাবণ্যই একরকম জুটাইয়া দিয়াছিল, কাজেই ইহাদের খবরও তাহাকে সে চিঠি লিখিলেই দিত।

তড়িৎ একবার আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেল। খানিক পরে বাহির হইতে শোনা গেল, 'মিস্ রায়, আমি পোষ্ট-অফিসে যাচ্ছি, আপনার কিছু দেবার আছে নাকি?"

কৃষ্ণা মনে মনে হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। বিপিনকে ঠেকাইয়া রাখা সে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মানিয়াই লইয়াছিল। বাধা দিতে গেলে পাছে তাহার মানসিক চাঞ্চল্যকে আরো উদ্বেল করিয়া তোলা হয়, এই ভয়ে সে যথাসম্ভব সবরকম সংঘাত এড়াইয়াই চলিত। লোভী শিশুকে কিছু দিব না বলিলেই তাহার যেন সবটা পাইবার ঝোঁক চড়িয়া যায়। সেইরকম তরুণ মানুষের জীবনেও একটা সময় আসে, যখন অল্প অল্প পাইলে সে হয়ত অনেকদিন ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু একেবারে পাওয়া বন্ধ হইলে তাহার মনের ভিতরে আদিম মানবের হিংস্রতা জাগিয়া ওঠে। গদাঘাতে সব বাধা চূর্ণ করিয়া সে কাম্য জিনিষটিকে গায়ের জোরেই পাইতে চায়।

কৃষ্ণার চিঠি লেখা হয় নাই, এবং বাড়ীতে বিপিন ছাড়াও চিঠি ডাকে দিবার লোক যথেষ্টই ছিল। কিন্তু সে কথা বলিতে গেলে, মাঝে হইতে বিপিন অন্যসব কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া কৃষ্ণার চিঠি লেখা শেষ হইবার আশায় বসিয়া যাইত এবং এমন অনেক কথা হয়ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত, যাহা শুনিতে কৃষ্ণার ভাল লাগিলেও না শুনিলেই সে নিশ্চিন্ত হইত বেশী।

সুতরাং যে ক'-খানা চিঠি তাহার লেখা হইয়াছিল, সেই ক'-খানা লইয়া সে বাহির হইয়া আসিল। বিপিনের হাতে দিয়া বলিল,"এই ক'টা পোষ্ট ক'রে দেবেন।"

বিপিন বলিল, "এবার আপনি এত হাত গুটিয়েছেন যে? অন্যান্য বারে ত দেখি, ডজনখানেক খাম পোষ্টকার্ড যায়!"

কৃষ্ণা বলিল, "সব বারেই সমান হবে নাকি? আপনিও ত মাত্র একখানা চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন দেখছি।"

বিপিনের হাতের খামখানার উপর যে নাম ও ঠিকানা লেখা, সেটা দেখিয়া কৃষ্ণা একটু বিস্মিত হইল। নামটার সহিত এই কিছুদিনের মধ্যে তাহার ছাত্রীগুলির কল্যাণে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছে বটে। কিন্তু তাহাকে বিপিন চিঠি লিখিতেছে কি কারণে তাহা সে মোটেই ভাবিয়া পাইল না।

বিপিন চিঠিগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিয়া আবার চিঠি লিখিতে বসিল।

কিন্তু মনটা তাহার হঠাৎ যেন অন্য কোন পথে যাত্রা করিয়া বসিল, কিছুতেই তাহাকে সে লাবণ্যের চিঠির দিকে ফিরাইতে পারিল না।

আচ্ছা, এই সুবীর ছেলেটি কে? বাংলা দেশে থাকিতে কখনও সে তাহাকে চোখে দেখিল না, নামও শুনিল না। হঠাৎ কোথা হইতে সে এই সাগর-পারের দেশে উড়িয়া আসিল, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কৃষ্ণার মনোজগতে একটা নাড়া দিয়া আবার সাগর পার হইয়া চলিয়া গেল।

প্যাগোডাতে প্রথম সুবীরকে সে দেখে। যুবকটি যে অত্যন্ত মুগ্ধ বিস্ময় সহকারে তাহাকে দেখিতেছিল, তাহার জন্যই প্রথম সে কৃষ্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষ্ণা সুন্দরী, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া মানুষে যে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারে, সেটা তাহার নিজের কিছু অজানা জিনিষ নয়। কিন্তু সুবীরের দৃষ্টিতে অতখানি বিস্ময় থাকিবার কোনো কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না। সে সুন্দর হইলেও সাধারণ মানুষই; তাহাকে দেখিয়া অতখানি অবাক হইবার কি আছে? বিপিনের ক্রোধটা তাহার চক্ষে অত্যন্ত অশোভন ঠেকিয়াছিল, ইহাও হয়ত ঘটনাটা তাহার মনে অমন সুস্পষ্ট হইয়ার থাকার একটা কারণ।

সুবীরের চেহারার মধ্যে রূপ যে খুব বেশী ছিল, তাহা নয়। নাক, মুখ, চোখ, গায়ের রং প্রভৃতির হিসাব করিলে তাহাকে ঠিক সুপুরুষ বলা যায় কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ বাঙালীঘরের মা, মাসী, পিসী, তাহাকে 'সোনার কার্ত্তিক ছেলে' বলিয়া কখনই মানিয়া লইতেন না।

প্রথমতঃ গায়ের রংটা তাহার ফর্সা নয়, শ্যামবর্ণই। শরীরটা লম্বা চওড়া হইলেও, মুখের মধ্যে ড্যাবাড্যাবা চোখ, তিলফুল নাসা, বা আরক্ত অধর কোনোটাই নাই। থাকিবার মধ্যে চোখে এবং মুখে বুদ্ধিমত্তার এবং মার্জ্জিত রুচির পরিচয় গভীর ভাবে আঁকা। মুখের ভাব বয়সের পক্ষে একটু বেশী গম্ভীরই বোধ হয়।

তবু ইহার চেহারাটা কৃষ্ণার মনে বড় বেশী দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। সুবীর যে দিন গলিতে কৃষ্ণাদের বাড়ীর সন্ধানে ফিরিতেছিল, সেদিন সে কৃষ্ণার চক্ষু এড়ায় নাই। ফুল ফেলিতে গিয়া সে সুবীরকে ভাল করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্যটা যে কি তাহাও বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই, কারণ এ সব বিষয়ে যুবতী রমণীর বুদ্ধির আতিশয্য সর্ব্বজনবিদিত। তবে তাহার ফেলা ফুলগুলি যে সুবীর উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে সে ব্যাপারটা সে মোটেই চোখে দেখে নাই, প্রতিভার কাছে শোনা কথা।

এই ছোট ঘটনাটা কি কারণে জানি না, তাহাকে অসঙ্গত রকম চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিভার কথাগুলা যেন ক্রমাগতই তাহার কানে বাজে। বিকালবেলা সে বসিয়া নিজের একটা ব্লাউসে বোতাম লাগাইতেছিল। প্রতিভা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিল। খানিক পরে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কৃষ্ণাদি, সব কাজই আপনি এমন সুন্দর ক'রে করেন যে ব'সে ব'সে দেখতে ইচ্ছা করে। সামান্য

একটা সেলাই করছেন, তাতেও আঙুলগুলো কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। আপনি যার ঘরে যাবেন, সে বোধহয় সব কাজ কর্ম ফেলে ব'সে ব'সে আপনাকে কেবল দেখবে।"

সাধারণতঃ শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীর মধ্যে এ ধরণের কথা-বার্ত্তা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণা এবং তাহার ছাত্রী দুটির বয়স অনেকটা কাছাকাছি ছিল, তাহার উপর অমিয়া এবং প্রতিভা বিবাহিতা, কাজেই পদমর্য্যাদা তাহাদের সাধারণ ছাত্রীদের চেয়ে কিছু বেশী। কাজেই শিক্ষয়িত্রীকে তাহারা ঠিক "গুরুমা" রূপে দেখিত না। খানিকটা বড় বোনের মত ব্যবহারই ইহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণা পাইত। বিশেষ করিয়া প্রতিভা কৃষ্ণার এত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তাহার সব সময় কি বলা উচিত এবং কি উচিত নয় তাহার সীমা ঠিক থাকিত না। কৃষ্ণারও এখানে সঙ্গিনী কেহই ছিল না, কাজেই সে ইহাদের সঙ্গে গল্প করিয়াই সে অভাবটা মিটাইয়া লইত।

প্রতিভার কথায় সে হাসিয়া বলিল, "এরকম নিকর্ম্মা একটি মানুষের সন্ধান ত আজ অবধি পেলাম না। তার কি অন্য কিছু কাজকর্ম্ম থাকবে না? কেবল হাঁ ক'রে আমাকে দেখলেই পেট ভ'রে উঠবে?"

প্রতিভা বলিল, "আপনি খোঁজ না পেলেও অন্যরা কিন্তু পাচ্ছে।"

কৃষ্ণা ভাবিল বুঝি বিপিনের কথাটারই উল্লেখ করা প্রতিভার উদ্দেশ্য। সে তাহাকে থামাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে মুখ একটু গম্ভীর করিয়া বলিল, "অন্যদের কল্পনা শক্তিটা তা হ'লে খুব বেশী বেড়েছে বোঝা যাচ্ছে। ঐ দিকে অত মাথা না খাটিয়ে পড়াশোনার দিকে দিলে ভাল হয় না?"

প্রতিভা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "আপনি যা ভাবছেন, মোটেই আমি তা মনে ক'রে বলিনি। একজন লোকের কথা খুব ভাল ক'রে জানি ব'লেই বলছিলাম।"

কৃষ্ণা অত্যন্ত অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে আবার? আমি এখানে কোনো মানুষকে চিনিই না ত, আমার সম্বন্ধে এ সব খেয়াল কার মাথায় আসবে?"

প্রতিভা বলিল, "নাই বা চিনলেন? আপনাকে চোখে দেখলেই চের। প্যাগোডাতে একটি ছেলে আপনাকে খুব অবাক হ'য়ে দেখছিল মনে পড়ে? সেই যাকে দেখে ঠাকুরপো রেগে অজ্ঞান হ'য়ে উঠল?"

কৃষ্ণা বলিল, "হাঁ মনে আছে।"

প্রতিভা বলিল, "সেই ছেলেটিই। সে নাকি কলকাতার দিকের মস্ত বড় জমিদার। লাখ লাখ টাকা তাদের। আপনি কোথায় থাকেন, কেমন ক'রে জানি না খোঁজ পেয়েছিল। গলির ভিতর ঘুরে ঘুরে সব বাড়ীগুলো দেখছিল। আপনি তখন ফুলদানীর থেকে কতকগুলো বাসি ফুল ফেলবার জন্যে জানলার কাছে এলেন। আমি বড়দির ঘর থেকে দেখছিলাম। ফুল ফেলে দিয়ে আপনি চ'লে গেলেন, তারপর ছেলেটি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, ফুলগুলো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল।"

কৃষ্ণার বুকের ভিতরটা হঠাৎ দোলা দিয়া উঠিল। রোমান্স জিনিষটার সঙ্গে এতদিন কেবল বইয়ের পাতাতেই তাহার পরিচয় ছিল; এখন সেটা একেবারে তাহার জীবনের ভিতর আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু তার নামধাম, টাকাকড়ির খবর সে ত গলিতে দাঁড়িয়ে তোমাকে চেঁচিয়ে ব'লে যায়নি? তুমি অত সব জানলে কোথা থেকে?"

প্রতিভা বলিল, "ঠাকুরপোর সঙ্গে হঠাৎ কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে ছেলেটির দেখা হয়। তিনি আলাপ করিয়ে দেন। ঠাকুরপো বুঝি তাকে রেঙ্গুন দেখিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর ফিরবার সময় ছেলেটি তাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল। তার নাম সুধীর, পদবীটা ভুলে যাচ্ছি। বেশ নামটা না?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ বেশ! আচ্ছা, এখন আমার কাজ আছে একটু।" বলিয়া সে প্রতিভাকে জোর করিয়া বিদায় করিয়া দিল। তাহার খানিকক্ষণ একলা থাকা একান্ত দরকার হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইদিন হইতে এই ক্ষণেকের দেখা মানুষটির কথা থাকিয়া থাকিয়া তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল। সে কোথায় আছে এখন, কৃষ্ণাকে এখনও মনে রাখিয়াছে কিনা? বিপিন পুরুষ না হইয়া নারী হইলে তাহার কাছ হইতেই কৃষ্ণা অনেক খবর পাইতে পারিত। প্রতিভা তাহার ছাত্রী, তাহাকে কিছু এ সব কথা বলা যায় না,

তাহা না হইলে সেও কৃষ্ণার খাতিরে বিপিনের কাছ হইতে খবর আনিয়া দিত।

কৃষ্ণার জীবনে ভালবাসা জিনিষটারই বড় অভাব থাকিয়া গিয়াছিল। পিতা মাতা, ভাইবোন শৈশবে, বাল্যে, মানুষের জন্ম স্নেহের নীড় রচনা করিয়া রাখে। কৃষ্ণার আপনার বলিতে জগতে কেহই ছিল না। যৌবনে নারীর মন প্রণয়ীর প্রেম, শিশুসন্তানের অনির্বচনীয় ভালবাসার জন্ম নিজের অজ্ঞাতসারেই ব্যাকুল হইয়া উঠে। বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ-প্রমোদের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেও তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটিতে চায় না। আর যে নারীর চিত্তকে বাহিরের দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিবার জন্ম ভাগ্য কোন ব্যবস্থাই করে নাই, তাহার হৃদয়ের এই দাবীই ক্রমে তাহার জাগরণ ও নিদ্রার সমস্ত ক্ষণ গুলিকে জুড়িয়া বসে। কৃষ্ণার দশাও হইয়াছিল তাই। ঘরের কোণে বসিয়া ভাগ্যের কৃপণতার জন্ম দুঃখ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। তাহার মনটা ছিল খুব বেশী দৃপ্ত এবং অহঙ্কারী। নিজের কাছেও সে স্বীকার করিতে চাহিত না যে কেবল মাত্র একটি মানুষের অভাবেই তাহার জগৎটা ম্লান আনন্দহীন ঠেকিতেছে। যতক্ষণ নিজেকে নানা কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা সম্ভব তাহা সে রাখিত। দুঃখের বিষয় এই বিদেশে তাহার সাধারণ রকমের ও দু একটা বন্ধু ছিল না। কাজেই অবসর সময়ে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিত। কি করিয়া, কি লইয়া সে সময় কাটাইবে? ঘড়ীর দিকে তাকাইলে তাহার রাগ হইত, ইচ্ছা করিত, কাঁটা ঘুরাইয়া দিন একেবারে শেষ করিয়া দেন।

বিপিনের প্রণয় নিবেদনটা খুব স্পষ্ট না হইলেও, তাহাকে ভুল বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার অন্তরের আসল কথাটি কৃষ্ণা ঠিকই জানিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে ডাকিয়া লইবে কি দ্বারের সম্মুখ হইতে ফিরাইয়া দিবে, তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিত না। বিপিনকে মোটের উপর তাহার মন্দ লাগিত না, কিন্তু তাহার কাছে ভালবাসার বন্ধনে ধরা দিতেও তাহার ইচ্ছা করিত না। একটি মানুষ আর একটি মানুষকে কি দেখিয়া যে ভালবাসে, তাহার চেয়ে হাজার গুণে যোগ্য অন্ত একজনকে কেন যে বাসে না, এ সমস্তার সমাধান আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কোথা হইতে একটা রঙীন আলো আসিয়া পড়িয়া নিতান্ত সাধারণ একটা মানুষকে একেবারে অপরূপ করিয়া তোলে। কৃষ্ণার চোখে সে রঙের নেশা এখনও লাগে নাই, তাই বিপিনের স্বভাবের দোষ ত্রুটি গুলি মোটেই তাহার চোখ এড়াইত না। নিজে যে সে লেখাপড়া বেশী করিয়াছে, জগতের আর্ট, সাহিত্য, শিল্পের খবর বিপিনের চেয়ে বেশী বই কম রাখে না, এ কথাও সে ভুলিয়া থাকিত না। সবার উপরে তাহার আত্মাভিমানে বাধিত। সে যদি বিপিনকে বিবাহ করিতে রাজী হয়, তাহা হইলে বিপিনের পরিবারে মহা হুলস্থূল বাধিয়া যাইবে, কারণ কৃষ্ণা নামে অন্ততঃ এখনও খ্রীষ্টান। কৃষ্ণাকে যে গ্রহণ করিবে, সে যেন সেটা সৌভাগ্য ভাবিয়াই করে, ইহাই তাহার হৃদয় দাবী করিত। দীনা ভিখারিণীর মত কোথাও অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া তাহাকে যাইতে হইবে, তাহাকে দেখিয়া কেহ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, ইহা ভাবিতেই যেন তাহার মস্তিষ্কে আগুন ধরিয়া যাইত।

কিন্তু সুবীরের উপর কোন্ শুভক্ষণে তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল বলা যায় না। তাহার কথা মনে করিলেই, তাহার কৃষ্ণার সন্ধানে গলিতে ঘোরা, কৃষ্ণার পরিত্যক্ত বাসি ফুল কুড়াইয়া লইয়া যাওয়া মনে পড়িলেই, কৃষ্ণার বুকের ভিতর কি যেন একটা মৃদু উত্তাপ ছড়াইয়া পড়িত। কত কল্পনাই যে একটার পর একটা তাহার মনের ভিতর দিয়া ভাসিয়া যাইত, তাহার ঠিকানা নাই।

আজ বিপিনের হাতে সুবীরের ঠিকানা লেখা চিঠি দেখিয়া সে যেন চম্‌কাইয়া গেল। বিপিনের সঙ্গে ইহার এতখানি আলাপ জমিয়া উঠিল কি করিয়া? ইহাদের দেখি চিঠিপত্র লেখাও চলে। চিঠিখানার ভিতর কি আছে কে জানে?

যাহা হউক তখন আর এই সব ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র লেখা শেষ করিয়া, বেয়ারার হাতে সেগুলি পাঠাইয়া দিয়া কৃষ্ণা খানিক নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর নাওয়া-খাওয়া, ছাত্রীদের পড়া দেওয়া, তাহাদের পড়া নেওয়া, সেলাই শেখান, গান শেখান ইত্যাদিতে দিনটা এক রকম কাটিয়া গেল। বিকালবেলা

কৃষ্ণার আবার অবসর। গাড়ী পাইলে সে ছাত্রীদের লইয়া 'রয়াল-লেক্‌স'এ বেড়াইতে যাইত, না হয় ঘরেই বসিয়া থাকিত। আজ গাড়ী পাওয়া যাইবে না সে সকাল হইতেই জানিত। সুতরাং চুল বাঁধা, মুখ ধোওয়া শেষ করিয়া, সে একখানা বই হাতে করিয়া পড়িবার চেষ্টায় বসিয়া গেল।

এমন সময় তড়িৎ হুড়মুড় করিয়া পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। আস্তে বা মৃদুভাবে কিছু করা তড়িতের স্বভাবেই নাই। সে ধপ্‌ করিয়া বই খাতা সব একটা চেয়ারে রাখিয়া বলিল, "জান, ছোট বৌদি, ইস্কুলের মেয়েগুলো কি ভীষণ দুষ্টু? আজ খুব একপালা ঝগড়া হ'য়ে গেছে আমার সঙ্গে।"

প্রতিভা বলিল, "কেন, ঝগড়া হ'তে গেল কেন? তারা ভীষণ দুষ্টুই বা কবে থেকে হ'ল? এই না তোমার ক্লাশের সব মেয়েই খুব ভাল?"

তড়িৎ বলিল, "আগে ত ভালই ভাবতাম। এখন দেখ্‌ছি পেটে পেটে পেজোমীরও অভাব নেই। তলে তলে টীচাররাও যে মেয়েদের সঙ্গে যোগ দেন, এই ত মুস্কিল, তা না হ'লে সবাইকে আজ ঠিক ক'রে দিতাম।"

প্রতিভা বলিল, "আরে ছাই! কি হ'য়েছে তাই বল না। এখন অবধি ত কেবল বাজে কথাই চল্‌ছে।"

তড়িৎ বলিল, "আজ টিফিনের সময় আমাদের ক্লাশের শকুন্তলা এসে আমায় জিগ্‌গেস কর্‌ল কি জান? 'তোর বিপিনদা নাকি খ্রীষ্টান মেয়ে বিয়ে কর্‌ছে?' আমি বল্‌লাম, "তোমাদের কাছেই আগে খবরটা পৌঁছেছে দেখ্‌ছি। আমরা ত কিছু জানি না।"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে সে কি বল্‌লে?"

তড়িৎ বলিল, "আমার হাড়শুদ্ধ জ্বালা করছে, তার কথা মনে করে। বল্‌লে কিনা "এ সব খবর বাড়ীর লোকেই সবার শেষে পায় রে। এ ত আর বাবা মায়ের পাতানো বিয়ে নয়, এ সব হ'ল নিজেরা প্রেম ক'রে বিয়ে করা।" আমি বল্‌লাম, "ছি ছি, এ সব কথা আমার কাছে বোলো না। আমার শুন্‌তেও লজ্জা করে। কৃষ্ণাদি এমন ভাল মেয়ে, তিনি কখনও এমন কাজ কর্‌বেন না।"

প্রতিভা বলিল, "তুমি বেশ যা হোক বাপু। ভাল মেয়েরা বুঝি বিয়ে করে না? না বিয়ের আগে ভালবাসলেই মানুষ খারাপ হ'য়ে যায়?"

তড়িৎ বলিল, "ওসব হিন্দু মেয়ের পক্ষে মহা পাপ।"

প্রতিভা বলিল, "আহা, একেবারে কি হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা এলেন গো! তা হ'লে সাবিত্রী, সতী, দেবযানী, সবাই মহাপাপী। আর আমরা সবাই, যাদের ধ'রে বেঁধে বিয়ে গিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সকলে তাদের চেয়ে অনেক ভাল।"

তড়িৎ রণে ভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেল। কৃষ্ণা যে পাশের ঘরে আছে, তাহা প্রতিভা জানিতই, সে তড়িৎ চলিয়া যাইতেই কৃষ্ণার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "শুন্‌লেন একবার তড়িতের কথা?"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, তড়িতের কথাও শুন্‌লাম, অন্যদের কথাও শুনলাম। এ সমস্ত গাঁজাখুরি কথা রটিয়ে কার কি লাভ হচ্ছে জানি না। আমায় এবার পথ দেখতে হবে দেখছি।"

প্রতিভা বলিল, "কেন কৃষ্ণাদি? রাস্তার কুকুরে ঘেউ-ঘেউ কর্‌লে গেরস্থর কিছু এসে যায় না। যতদিন আমরা কিছু না বল্‌ছি, ততদিন আপনার বিরক্ত হ'বার কোনো কারণ নেই।"

কৃষ্ণা বলিল, "যথেষ্টই কারণ আছে। তবে বিরক্ত আমি অবশ্য তোমাদের উপরে হচ্ছি না, যদিও তোমরাও এই কথা নিয়ে আলোচনা না কর্‌লেই পারতে।"

প্রতিভা একটু অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে স্থির করিল, কৃষ্ণার সঙ্গে আর কোনো দিন গল্প করিতে যাইবে না।

কৃষ্ণা আবার বইয়ে মন দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মনটা তাহার একান্তই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে বেশ তাহার সুনাম ছড়াইতেছে বটে। যেন সে পাকে-চক্রে এই বিবাহটা ঘটাইবার জন্যই চাকরী লইয়া এই সংসারে ঢুকিয়াছে। বিপিন বেচারীর কোনোই অপরাধ নাই, অথচ তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই কথাটা উঠিয়াছে বলিয়া

কৃষ্ণা তাহার উপর শুদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। নিষ্ফল আক্রোশে তাহার নিজেকেই নিজে আঘাত করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। কেন মরিতে সে এখানে আসিতে গেল? না হয় টাকাকড়ির এ সুবিধাটুকুও তাহার নাই-ই হইত? কলিকাতায় টাকা তাহার ছিল না বটে, কিন্তু এ সমস্ত উৎপাতও ছিল না।

যাইবার কোনো জায়গা থাকিলে বোধ হয় কৃষ্ণা তখনই বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু অকরুণ ভাগ্য জগতে তাহার জন্ম এমন কোনো স্থান রাখে নাই, ইচ্ছা করিলেই সেখানে গিয়া জোর করিয়া ঢোকা যায়। কাহারও উপর তাহার দাবী নাই।

একটি মানুষের কথা কেবল তাহার থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতে লাগিল। সে কেন কৃষ্ণার আত্মীয় হইল না? তাহার কাছে ত সে আশ্রয় পাইতে পারিত। সে আশ্রয়ের মধ্যে অপমান কিছুই থাকিত না, আনন্দই থাকিত।

(২৫)

ভবানীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। চিকিৎসা, আদর, যত্ন, কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু কিছুতেই তাহার কোনো উপকার দর্শিতেছিল না। সে নিজেও যেন না-সারার দিকেই মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছিল। কিসের একটা যন্ত্রণা তাহার জীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। কোনো রকমে ইহার শেষ হইলে যেন সে বাঁচে। ভানুমতী বরাবর জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার মনের এই ব্যথার কোন স্পষ্ট সন্ধান পান নাই। বলিবে বলিবে করিয়া সে শেষমুহূর্ত্তে থামিয়া যাইত।

ভবানীকে দাসীরূপে কেহ কখনও দেখে নাই। এখনও বাড়ীর আত্মীয়ার মত ব্যবহারই সে পাইতেছিল। তাহার আলাদা ঘর, ভাল খাট-বিছানা, দেখাশোনা করিবার জন্ম একজন দাসী, কিছুরই অভাব ছিল না। সুবীরদের পারিবারিক চিকিৎসক যিনি, তিনি রোজ আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইতেন, প্রয়োজন হইলে অন্ম বিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিয়া পরামর্শ করিতে পারেন, সে কথাও বারবার বলিতেছিলেন। ভবানী ক্রমাগত আপত্তি করিয়া করিয়া ইহা ঠেকাইয়া রাখিতেছিল। ঔষধ-পথ্য খাওয়া লইয়াও সে গোলমাল করিত। ভানুমতাকে দেখিলেই বলিত, "বাছা, মরতে বসেছি, স্বস্তিতে মরতে দাও। বুড়ো হাড় ক-খানাকে যতই ওষুধে ভেজাও, এ আর তাজা হবে না।"

সুবীর দিনে দুই তিনবার আসিয়া আসিয়া ভবানীকে দেখিয়া যাইত। একেই তাহার মনটা বড়ই উতলা হইয়াছিল, বাড়ীর এই নিরানন্দতার আব্-হাওয়ায় সে যেন আরো মুষড়াইয়া যাইতেছিল। কলেজে যাওয়াও একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "পরের বছর বিলেতে যাওয়া একরকম ঠিকই ক'রে ফেলেছি, শুধু শুধু এখানের কলেজের সিঁড়ি ভেঙে আর কি হবে?"

কলিকাতা ছাড়িয়া আর একবার বাহির হইয়া পড়িবার জন্ম তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল ভবানীর এই অসুখের জন্ম তাহার যাওয়া ঘটিয়া উঠিতেছিল না। কেবল মানসিক অশান্তিই যে তাহাকে তাগিদ দিতেছিল তাহা নয়, মিত্রদের বাড়ী হইতে শীঘ্র বিবাহ করিবার সকাতর অনুরোধও তাহাকে কম অস্থির করে নাই। কোনো রকমে ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইলে সে একটু নিশ্চিন্ত হইত। পিতা মারা গেলে এক বছর অন্ততঃ সন্তানের বিবাহ নিষিদ্ধ, এই জন্ম মেয়ের বাড়ীর লোকেরা একেবারে মরিয়া হইয়া তাহার পিছনে লাগিয়াছিল। পাওনাদারকে এড়াইবার জন্ম মানুষ যেমন পলাইয়া বেড়ায় সুবীরও তেমনি এই প্রজাপতির দূতগুলিকে এড়াইবার জন্ম দিনের বেশীর ভাগ সময় পলাইয়াই বেড়াইত।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া মায়ের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বলিয়া ও ভবানীকে দেখিয়া আসিয়া সে নিজের বসিবার ঘরটিতে দরজা বন্ধ করিয়া বসিত। সামনের জান্‌লা দুইটা খুলিয়া দিত, নীচের বাগানের ফুলের সুগন্ধ যাহাতে অবাধে ভাসিয়া আসিতে পারে। তাহার পর সে এক অদ্ভুত কাজে প্রবৃত্ত হইত। চিঠির কাগজের প্যাড্ লইয়া ক্রমাগত চিঠি লিখিয়া যাইত। সে চিঠি যাহার উদ্দেশ্যে, তাহার কাছে সেগুলি পৌঁছিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাহার নাম ছাড়া সুবীরের আর

জানা ছিল না, চোখের দেখাও সে তাহাকে চার পাঁচ বারের বেশী দেখে নাই। কিন্তু হৃদয়ের ভিতর তাহাকেই নিজের অন্তরতম আত্মীয়রূপে সুবীর বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই তাহার অপরিচিতা প্রেয়সীর কাছে কিছু তাহার গোপন ছিল না, মনের যত আশা আকাঙ্খা, হৃদয়ের যত সফলতার আনন্দ, নিষ্ফলতার বেদনা সব সে ইহারই উদ্দেশে কাগজের শুভ্র বুকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছিল। আশ্চর্য্য যে এই গানদানীতে গা ঢালিয়া দিয়া সত্যই সে কৃষ্ণাকে নিকটে অনুভব করিত, দুজনের মাঝখানের অনন্ত বিস্তৃত সাগরকেও ভুলিয়া যাইত।

মাঝে তাহ্নবতী আসিয়া দরজায় ঠেলা দিয়া আহারের তাগিদ দিতেন। বাহিরে খাইয়া আসিয়াছে বলিয়া কোনো দিন বা তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিত, কোনো দিন বা মনে ব্যথা পাইবেন এই আশঙ্কায় চিঠি-পত্র দেরাজে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিত।

খাইয়া আসিয়া আবার দেরাজের সম্মুখে বসিত। এবার আর চিঠি লেখা নয় কাগজ পেন্সিল ইরেজার প্রভৃতি লইয়া সে ছবি আঁকিতে বসিত। প্রথম প্রথম কোথাও কিছু মিলিত না। তাহার পর সাধনার গুণে তাহার মানসসুন্দরী ক্রমে রূপগ্রহণ করিতে লাগিল। প্রথমে চিবুক, তাহার পর সমুন্নত নাসিকা, তাহার পর ঠোঁট দুটির বঙ্কিম রেখা, সর্ব্বশেষে আশ্চর্য্য চক্ষু দুইটি, কাগজের বুকে ফুটিয়া উঠিল। কৃষ্ণার দৃপ্ত গ্রীবার ভঙ্গিমা চক্ষের জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি ঠিক রেখার বন্ধনে ধরিতে পারিল না বলিয়া সুবীরের দুঃখ থাকিয়া গেল।

সে নিজে কোনো দিন ছবি আঁকা ভাল ভাবে শিক্ষা করে নাই। তবে নিজের খেয়াল খুসি মত, কাগজে আঁচড় টানা তাহার চির দিনের অভ্যাস। এখন এই খেলার সরঞ্জাম লইয়াই সে অসাধ্যসাধনে লাগিয়া গেল। যতটা পাইতে চাহিয়াছিল, ততটা তাহার সাধ্যে কুলাইল না, তবু আশার অতীত ফল সে পাইল। কিন্তু ছবিখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার একটা প্রবল নেশা তাহাকে পাইয়া বসিল।

প্রথমে স্থির করিল নিজেই বাহিরে যাইয়া ছবি আঁকা ভাল করিয়া শিখিয়া লইবে। কিন্তু অত সবুর তাহার সহিল না। তাহার পরিচিত মণ্ডলীর মধ্যে পেশাদার চিত্রকরের অভাব ছিল না। নিজের আঁকা অসমাপ্ত রেখাঙ্কনগুলি লইয়া সে একজনের কাছে একদিন গিয়া উপস্থিত হইল।

বলিল, "এইগুলির থেকে আন্দাজ করে আপনাকে একখানি রঙিন ছবি এঁকে দিতে হবে। আঁক্বার সময় আমি কাছেই থাকব, আপনাকে ব'লে ব'লে খানিকটা আইডিয়া দিতে পারব। আপনাকে খাটতে হবে খুবই, কিন্তু তার fees যত চান তা পাবেন।"

চিত্রকরটির বয়স অল্প, এই ধরণের ব্যাপারে তাহার সহানুভূতি যাইবার সময় আসে নাই। তাহা ছাড়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবারও আশা ছিল, কাজেই সে রাজীই হইয়া গেল।

পরদিন হইতে দুইটি মানুষে মিলিয়া এক অদৃশ্য সুন্দরীর রূপ কাগজে ফুটাইয়া তুলিবার কাজে লাগিয়া গেল। অনেকবার অনেকরকম করিয়া রেখা টানিতে হইল, অনেকস্থানের রং মুছিয়া পুনর্ব্বার রং দিতে হইল, চুলের ঢেউ, গ্রীবার ভঙ্গী, ঠোঁটের হাসি, সব বার বার কাঁকি দিয়া অবশেষে ধরা দিল। একমাসখানেক অশেষ পরিশ্রমের ফলে শেষে একদিন সুবীরের মনোমন্দির ছাড়িয়া তাহার জীবনলক্ষ্মী তাহার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখেই আসিয়া দাঁড়াইল।

সুবীর ছেলেমানুষের মত খুসি হইয়া উঠিল। চিত্রকরকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দিয়া সে ছবিখানি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। খানিক দূর গিয়া তাহার তখনই বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করিল না। সেখানে গিয়া ত তাহার দরজায় খিল দিয়া বসিতে হইবে? না হইলেই হাজার উৎপাত। কিন্তু তাহার মনটা তখনই কোটরে প্রবেশ করিতে চাহিল না। ড্রাইভারকে সে গাড়ী ঘুরাইয়া লইতে বলিল। ভবানীপুরের বদলে শিবপুরে উপস্থিত হইয়া সে গাড়ী বিদায় করিয়া দিল। ড্রাইভারকে বলিয়া দিল সে যেন বাড়ী গিয়া মাকে বলে যে সুবীর একটু বেড়াইয়া দিয়ারে ফিরিয়া যাইবে, তাহার জন্য কেহ যেন [illegible] ভাবনা না করা হয়। ড্রাইভার গাড়ী লইয়া [illegible]

সারা সকাল এবং দুপুরেরও খানিকটা সুবীর শিবপুরের বাগানেই কাটাইয়া দিল। ছুটির দিন না হইলে এখানে মানুষের ভীড় বেশী নয়, নিরালা স্থান খোঁজ করিলেই পাওয়া যায়। নিজের সঙ্গিনীটিকে লইয়া এইরকম অনেক স্থানে বসিয়া সে তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, ষ্টীমার যোগে কলিকাতায় ফিরিয়া, ট্রামে চড়িয়া বাড়ী চলিল।

দিনের প্রথম ভাগটা যেমন সুন্দররূপে কাটিয়াছিল, শেষের দিকটা মোটেই তাহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিল না। বাড়ীতে আসিয়া প্রথমেই মায়ের সঙ্গে খানিকটা বকাবকি করিতে হইল; তাহার পর শুনিল যে, ভবানীর অবস্থা অন্যদিনের চেয়েও আজ খারাপ। তাহাকে গিয়া একবার দেখিয়া আসিল। ভবানী তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়িয়া ছিল, সুবীর আর তাহাকে বিরক্ত না করিয়া পা টিপিয়া চলিয়া আসিল।

নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে স্থির করিল স্নান করিয়া খাইয়া খানিকটা ঘুমাইয়া লইবে। তাহার পর ছবিখানা বাঁধাইবার জন্য লইয়া যাইবে। যদিও দেয়ালে টাঙাইয়া রাখা চলিবে না, তবু এমনি রাখিয়া দিলে রং জ্বলিয়া যাইবার ভয় আছে। এই কাজের ভার আর কাহাকেও সে ভরসা করিয়া দিতে পারিল না, কারণ ধরা পড়ার এবং জিনিষটি পছন্দমত না হওয়ার, দুই সম্ভাবনাই ছিল। ছবিখানি টেবিলের উপর কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়া, সে স্নানাহারে মন দিল।

সকালবেলাটা কাটিয়াছিল তাহার অশরীরী তরুণ দেবতার আরাধনা করিয়া। এখন হাজির হইলেন বৃদ্ধ প্রজাপতি নিজের নৈবেদ্য জোর করিয়া আদায় করিতে। সুবীর খাইতে খাইতেই শুনিতে পাইল তাহার মেজ মাসীমাতা ঠাকুরাণী বক্তৃতা করিতে করিতে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতেছেন। সঙ্গে অপেক্ষাকৃত তরুণ কণ্ঠস্বরও দু একটা শোনা যাইতেছিল। কাজেই সুবীর আন্দাজ করিল, তিনি সদল বলেই আবির্ভূত হইয়াছেন।

খাওয়া শেষ হইবামাত্র তাহার মায়ের ডাক পড়িল। সুবীর বিরক্ত মনটাকে খোঁচা দিয়া আরো বেশী বিরক্ত করিয়া তুলিল। কারণ, যে নারীবাহিনীর সঙ্গে তাহাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে, মনে যথেষ্ট তাপ না থাকিলে সেখানে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। যাইবার আগে কাগজের আবরণ তুলিয়া সে কৃষ্ণার ছবিটিকে একবার দেখিয়া গেল। মনে মনে বলিল, "তোমার আমার মাঝের একটা ব্যবধান অন্ততঃ আজ আমি ভেঙে দিয়ে আস্‌ব।"

তাহার মেজ মাসীমা, কন্যা নাত্‌নী সকলকে লইয়া আসিয়াছিলেন। নাত্‌নীটির সঙ্গে সুবীরের মন্দ বনিবনাও ছিল না, কিন্তু দুর্গার সঙ্গে তাহার আলাপ দুতিন মিনিটের পরেই ঝগড়া অথবা তর্কে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আধুনিক সব কিছু জিনিষ সম্বন্ধে প্রবলভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করা দুর্গার একটা অভ্যাস ছিল। তাহার স্বামী একটি নব্য হিন্দু; তিনি বেদবেদান্ত, সংহিতা, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা সব কিছু মানিয়া চলেন। কাজেই দুর্গা তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হইবার চেষ্টায় নিজে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আত্মীয় বন্ধু সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার স্বামী পছন্দ করেন না বলিয়া সে জুতা পায়ে দিত না, ব্লাউস পেটিকোট পরিত না, মাংস খাইত না। বিবাহের আগে লেখাপড়া যেটুকু শিখিয়াছিল, তাহাও ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা যথাসাধ্য করিত।

সুবীর ঘরে ঢুকিতেই দুর্গা বলিয়া উঠিল, "কি গো সাহেব, কেমন আছ?"

সুবীর বলিল, "দিব্যি আছি। তোমার হিন্দু ধর্ম্মের বিশাল খুঁটিটা কেমন আছেন?"

দুর্গার স্বামীটি বেশ কিছু মোটা। ইহা লইয়া ভাই বোন সকলেই তাহাকে ক্ষেপাইত, এবং সেও যথোচিত ক্ষেপিতে ত্রুটি করিত না। সুবীরের কথায় সে যথেষ্ট ঝাঁজের সহিত বলিয়া উঠিল, "সবাইকে যে তোমার মত ফড়িং বাবাজী হ'তে হবে, তার কিছু মানে নেই।"

তাহার মা বলিলেন, "থাম, থাম, দিন দিন যেন পাগ্‌লামী বাড়ছে। ভাই বোনে যদি ঠাট্টা ক'রে একটা কথা বল্‌লে, অমনি মেয়ের মাথায় ক্ষ্যাপাচণ্ডী চ'ড়ে গেল। দেখ খোকা, তোকে বল্‌লেই ত চ'টে যাবি, অথচ না ব'লেও ত পারি না।"

সুবীর বলিল, "চট্‌বার মত কথা হয় ত নাই বল্‌লে ? আমার ত চ'টে কিছু লাভ হবে না।"

শোভাবতী বলিলেন, "মিত্তিরদের গিন্নি ত আজ কেঁদে কেটে আমার বাড়ী এসে ধ'রে পড়েছেন। তাঁরা স্বামীর অবস্থা খুবই খারাপ, মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে না পার্‌লে ম'রেও ভদ্রলোক শান্তি পাবেন না। জানিস্ ত আমাদের হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা ? বিধবা মানুষের কোন জোরই সেখানে খাটে না। আজ তিনি ঘরের গিন্নি, কাল হয়ত জায়েরা তাঁকে উঠ্‌তে বস্‌তে নাকের জলে চোখের জলে কর্‌বে। তুই শুধু বিয়েটা কর্, তারপর পাঁচ বছর মেয়েকে ঘরে না আন্‌তে চাস তাতেও কেউ কিছু বল্‌বে না।"

সুবীর বলিল, "এক কথা একশ বার ব'লে আমার লাভ নেই, মাসীমা। বিয়ে এখন আমি কিছুতেই করব না। আমার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, তা যদি তাঁরা রাখেন ভাল, না হয় অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিন। পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করার বিরুদ্ধে আমি ঢের বক্তৃতা করেছি, এখন নিজেই সেইটি কর্‌তে রাজী নই। মেয়ের অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাশ কর্‌তে ত দুবছর দেরি আছে, আমিও একবার বিলেত ঘুরে আস্‌তে চাই।"

দুর্গা বলিল, "তবেই তুমি মিত্তিরদের মেয়ে বিয়ে করেছ। একটি মেম্‌সাহেব ক'রে জাহাজ থেকে নাম্‌বে আর কি!"

সুবীর বলিল, "মেমের জন্যে বিলেত যাবার কি দরকার ? এ দেশেই ঢের পাওয়া যায়।"

দুর্গা বলিল, "তা হলে গোড়ায় তাঁদের বল্‌লেই পার্‌তে যে, আমার মেম পছন্দ, আমি বাঙালী মেয়ে বিয়ে কর্‌ব না। শুধু শুধু তাঁদের আশা দিতে গেলে কেন ?"

সুবীর বলিল, "আমি ত তাঁদের সেধে আশা দিতে যাইনি ? তাঁরা যদি গায়ের জোরে আশা আদায় করেন ত আমি কি কর্‌তে পারি ? যেটুকু আশা দিয়েছিলাম তা আমি রাখতে রাজী আছি, যদি তাঁরা আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন। কিন্তু এটা জেনেই যেন দেন যে, যতটুকু মত আমার আগে এ বিয়েতে ছিল, এখন তাও নেই।"

ভানুমতী বলিয়া উঠিলেন, "কেন রে ? আরো মত না থাক্‌বার মত কি হয়েছে ? তারা বিপদে প'ড়ে বেশী ধরাধরি কর্‌ছে, কিন্তু সেটা ত মেয়ের দোষ নয় কিছু। তাকে তার জন্যে অপছন্দ হবার কিছু কারণ নেই।"

সুবীর বলিল, "মা, পছন্দ অপছন্দ ত কারুর হাতে-ধরা জিনিষ নয়। সে মেয়েকে অপছন্দ কর্‌বার কারণ না থাক্‌লেও, অন্য মেয়ে তার চেয়ে আমার পছন্দ বেশী হতে পারে।"

তাহার শ্রোত্রী তিনজন এক সঙ্গেই কথা বলিয়া উঠিলেন। দুর্গা গলাটা সবার উপর তুলিয়া বলিল, "তাই বল, বাপু। তলে তলে কোথায় পছন্দমত মেয়ে ঠিক ক'রে রেখেছ। সে কথা বল্‌লেই হ'ত। এতক্ষণ শাক দিয়ে মাছ চাপা দেবার চেষ্টা কর্‌ছিলে কেন ?"

শোভাবতী বলিলেন, "তাহ'লে সেই কথাই তাদের ব'লে দেওয়া ভাল। অপছন্দ হ'লে বিয়ে ক'রে লাভ কি ? তারপর চিরজীবন ভোগ চল্‌বে।"

ভানুমতী বলিলেন, "হ্যাঁরে, কোথাও যাস্ না। কার মেয়ে তুই দেখলি ? কারো বাড়ীতে ত তুই যাসনা ? শেষে কোন্ ঘরের না কোন্ ঘরের মেয়ে এনে জুটবি ? কাদের মেয়ে ?"

সুবীর বলিল, "জানি না, মা। অদৃষ্টে থাকে ত একেবারে নিয়ে এসে দেখাব।"

শোভাবতী দলবল লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "মিথ্যে ভোগালে, বাছা। আগে এই কথা বল্‌লেই হ'ত। তোমার অন্য মেয়ে পছন্দ জান্‌লে কেউ নিজের মেয়ে জোর ক'রে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইত না। এখন মানুষটাকে গিয়ে আমি বলি কি ? কেঁদেই খুন হবে হয়ত।"

সুবীর বলিল, "ইচ্ছা ক'রে কিছু ভোগাইনি, মাসীমা। আমার গোড়ার থেকেই এ ধরণের বিয়েতে মত ছিল না, তোমরা সকলে জোর ক'রে এর মধ্যে আমায় জড়িয়েছিলে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এই বিয়ে কর্‌লে মেয়ের প্রতিও আমার অন্যায় করা হবে, নিজের প্রতিও অন্যায় করা হবে। সুতরাং এখন থেকে সব কথা পরিষ্কার হ'য়ে যাওয়া ভাল।"

শোভাবতী চলিয়া গেলেন। সুবীরও নিজের ঘরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, তাহার মা বলিলেন, "দাঁড়া, দাঁড়া, অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।"

সুবীর অগত্যা তাহার মায়ের খাটের উপর বসিয়া বলিল, "কি বল্‌বে বল? খুব খানিকটা রাগ কর্‌বে ত?"

ভানুমতী বলিলেন, "না বাছা, রাগের কথা নয়। তুই আমার একমাত্র ছেলে, বিয়ে ক'রে অসুখী হবি এ আমি কখনও চাইব না। মিত্তিরদের মেয়েটি আমার খুব পছন্দ ছিল, ভারি সুন্দর দেখ্‌তে, বড় ঘরেরও, তা তোর যদি পছন্দ অন্য জায়গায়, তাহ'লে আর কি কর্‌ব?"

সুবীর বলিল, "মা, তুমি কখনও অবুঝ হবে না, তা আমি মনে মনে জান্‌তামই। তা না হ'লে কি আর সাহস ক'রে এ বিয়ে আমি ভেঙে দিতে পার্‌তাম? যতই অসুখী নিজে হই, তোমাকে অসুখী করবার সম্ভাবনা আছে জান্‌লে আমি কিছু করতে পারতাম না।"

ভানুমতী বলিলেন, "কিন্তু কার মেয়ে, কি বৃত্তান্ত কিছুই ত বল্‌ছিস্ না। কোথায় দেখ্‌লি তুই তাকে?"

সুবীর বলিল, "কার মেয়ে কিছু জানি না, মা। কিন্তু সে মেয়েকে যে নিজের ঘরে আন্‌তে পার্‌বে, সে কোনোদিন দুঃখ পাবে না, এ কথা জোর ক'রে বল্‌তে পারি।"

ভানুমতী বলিলেন, "তা ত বুঝ্‌লাম। কিন্তু কোথায় তুই তাকে দেখ্‌লি?"

সুবীর বলিল, "রেঙ্গুনের বৌদ্ধমন্দিরে প্রথম দেখেছিলাম।"

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব বুঝি ভাল দেখ্‌তে?"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ মা। এতদিন পর্য্যন্ত তোমার মত সুন্দর কোনো মেয়ে আমি দেখিনি, কিন্তু এ মেয়ে যেন তোমার চেয়েও সুন্দর। একটা জিনিষ আমার ভয়ানক আশ্চর্য্য লাগ্‌ল, যে এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার চেহারার খুব বেশী সাদৃশ্য আছে।"

ভানুমতী বলিলেন, "তাই নাকি রে? কাদের মেয়ে কিছু খোঁজ কর্‌লি না? কত বড় মেয়ে? তার বিয়ে হ'য়ে যায়নি ত?"

সুবীর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "মা, তোমার কাছে কিছু লুকোব না। সব কথাই বল্‌ছি। খোঁজ আমি নিয়েছিলাম। মেয়েটির মা বাবা কেউ বেঁচে নেই, সে ওখানের এক বাঙালী পরিবারে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে। বয়স কত ঠিক জানি না, তেইশ চব্বিশ হতে পারে। বিয়ে এখন পর্য্যন্ত হয়নি। কিন্তু একটা জিনিষ শুন্‌লে হয়ত তুমি একটু দুঃখিত হবে। মেয়েটির মা বাবা তার খুব শিশুকালেই মারা যান। একজন খ্রীষ্টান ধাত্রী তাকে মানুষ করেছিলেন, লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।"

ভানুমতী বলিলেন, "তা এ নিয়ে একটু গোলমাল হ'তে পারে বটে। না জেনে শুনে ঠিক ক'রে ফেল্‌লি? যাক্ যা হবার তা হয়েছে, এখন একটু ভাল ক'রে খোঁজ খবর নিতে হবে।"

(ক্রমশঃ)

মহিলা-সংবাদ

এলাহাবাদের ব্যারিষ্টার মিঃ এল, পি, যুত্‌শীর কন্যা কুমারী জনককুমারী যুত্‌শী পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বর্ত্তমান বৎসর এম্-এ পরীক্ষায় (ইংরেজি সাহিত্যে) প্রথম হইয়া উত্তীর্ণা হইয়াছেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত কোন ছাত্রীই এরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কুমারী যুত্‌শীর মাতা শ্রীমতী লাদোরাণী

ডাক্তার শ্রীমতী সুমিত্রা বাঈ জাহির

শ্রীমতী কল্যাণী আম্মা

যুত্‌শ্রী পঞ্জাবের সমাজ ও শিক্ষাসংস্কার-ক্ষেত্রে সুপরিচিতা কর্ম্মী।

শ্রীমতী কল্যাণী আম্মা মাদ্রাজের সুবিখ্যাত মালয়ালম পত্রিকা 'শারদা'র সম্পাদক। "শারদা" একখানি নারীহিতকামী পত্রিকা। এতদ্ভিন্ন শ্রীমতী কল্যাণী "সদ্‌গুরু" নামক একখানি ধর্ম্মমূলক পত্রিকার ও সম্পাদকদিগের অন্যতম। তাঁহার লিখিত কয়েক-খানি পুস্তক মাদ্রাজ ও কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া কোচিনের রাজা তাঁহাকে 'সাহিত্যসখী' উপাধি ও একটি পদক প্রদান করিয়াছেন। তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ও কোচীন নারীসভার অবৈতনিক সম্পাদক। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা নারী ও নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার দরুণ মালয়ালম সমাজের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে।

শ্রীমতী মাধবী আম্মা সম্প্রতি কোচিন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। ঐ সভায় তিনিই প্রথম ও একমাত্র নারী-সদস্য। শ্রীমতী মাধবীর কবিখ্যাতি ইতি-মধ্যেই মালয়ালমভাষী লোকদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি দরিদ্রদের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

ডাঃ শ্রীমতী সুমিত্রা বাঈ জাহির বরোদা মিউনি-সিপালিটির সর্ব্বপ্রথম মহিলা-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি বরোদা রাজ্যের সিধুপুরে ডাক্তারী করেন।

গরুড়ের সুধা-ভাণ্ড হরণ
শিল্পী শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা
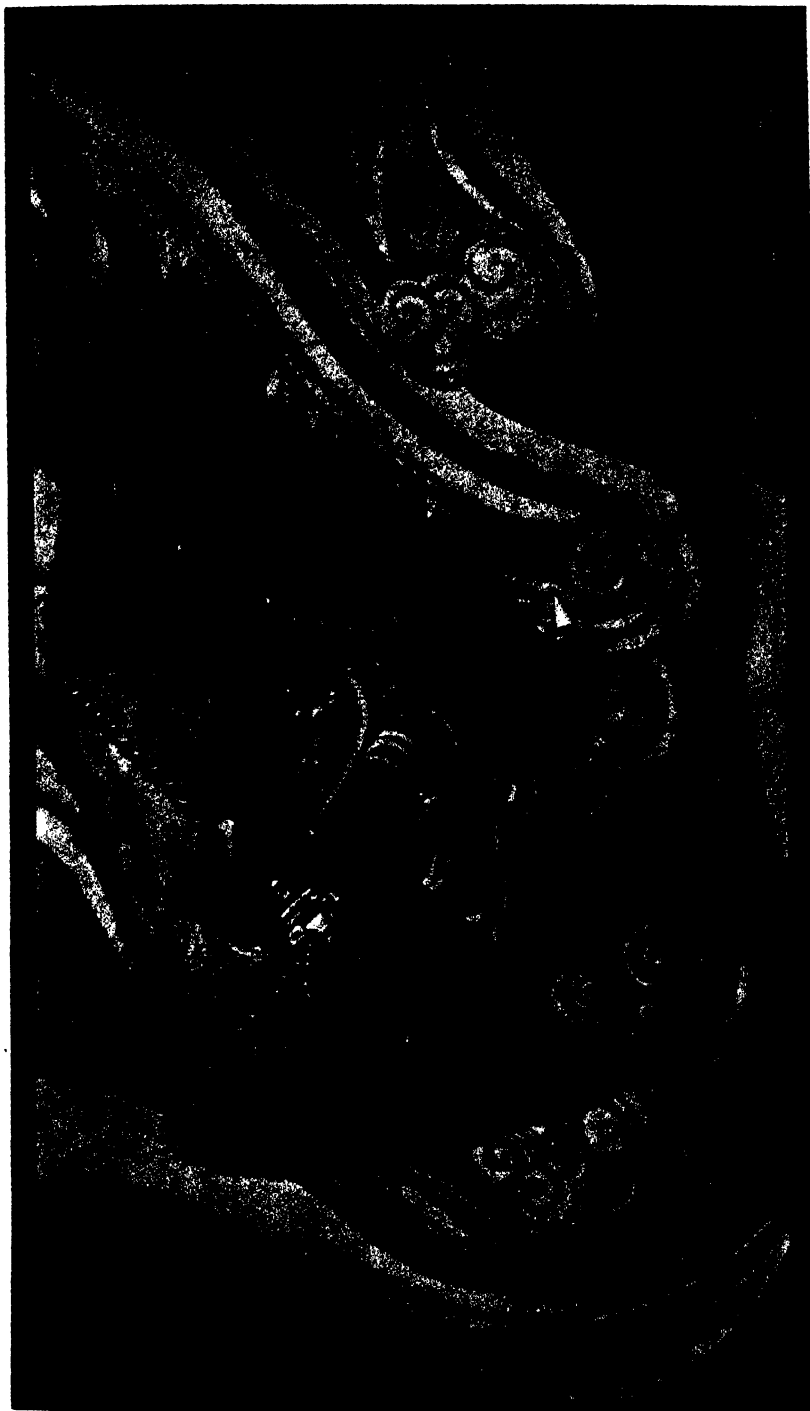
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

কুমারী জনককুমারী মুত্‌শী

শ্রীমতী মাধবী আম্মা

চিরাগত

শ্রী অমিয়া দেবী

তোমারি আনন্দলোকে জেলেছ যে অনির্ব্বাণ আলো
দীপ্তি তারি নয়ন ভুলালো!
দিনে দিনে আঁধারে আলোকে
ঝঞ্ঝাকালো রজনীতে শান্ত জ্যোৎস্নালোকে
নিমেষে নিমেষে
অভিনব বেশে
হে অরূপ, ওগো অপরূপ,
আমার অন্তরলোকে বিশ্বেরে দিয়েছ নব রূপ।
বিচিত্র মধুর তব সৌন্দর্য্য লীলায়
জীবন-বেলায়
পলে পলে দিয়াছ যে আনি'
আনন্দিত উৎসবের বাণী
সাগরের অবিশ্রান্ত সঙ্গীতের সম;
হে অন্তরতম,
জনমে জনমে বারে বারে
ডাক দিয়ে গেছো তুমি অন্তরের দ্বারে,
যুগে যুগে চিরদিন চির রাত্রি ধরি'
সমগ্র জীবনখানি ঘিরে
ফিরে ফিরে
অনাহত সুর তারি ফিরেছে সঞ্চরি'।
তোমারি অভয় বর হে সৌম্যসুন্দর,
পথখানি করিল মুখর;
প্রেম তব ফুল হ'য়ে ফোটে গন্ধভারে
হাসি হ'য়ে জাগে অন্ধকারে,
আঁখির আলোক তব মণির প্রদীপ সম অনির্ব্বাণ জ্বলে
মর্ম্মের অতলে।

চীনের বড় পর্ব্ব—

বড়দিন যেরূপ পাশ্চাত্য জাতিদের শীতের উৎসব, চীনেও সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বড় পর্ব্ব শীতকালে। চীনেদের নববর্ষে পর্ব্বটি তখন সম্পন্ন হয়। পাশ্চাত্য দেশের শীতের উৎসব ইয়ুল টাইড্‌এর (বড়দিন) সঙ্গে
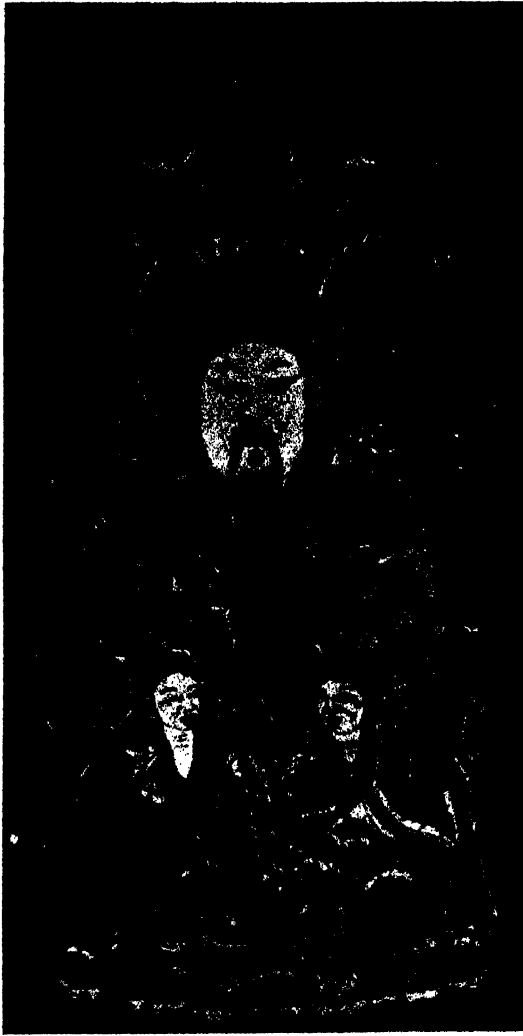
রন্ধনশালার দেবতা সাও চুণ—রন্ধন-গৃহে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। তিনিই নববর্ষে স্বর্গে পরিবারের কাজের হিসাব লইয়া যান। তাই তাঁহার মুখে মধু ও খাদ্য পুরিয়া দেওয়া হয় যেন তিনি ঠিকমত কিছু বলিতে না পারেন।

এই চীনা উৎসবটির আশ্চর্য্য রকম মিল আছে, আর্থার ডি, সি, সোয়ার্বি চায়না জর্ণাল পত্রে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। দুইটিই আদিতে বর্ষের পুনর্জ্জন্মের উৎসব ছিল,—আমোদ, আহ্লাদ, উৎসব, ভোজন ও পরস্পর শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে নিষ্পন্ন হইত। চীনদেশের নববর্ষ-উৎসবের সাও চুণ বা রন্ধনশালার দেবতার মত পশ্চিমের বড়দিনের প্রাচীন সাণ্টা ক্লসও আজ পর্য্যন্ত চিম্‌নির ভিতর দিয়াই প্রথম আবির্ভূত হন।

—

ডাকটিকিটের টুকরা দিয়া ছবির ফ্রেম—

পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার এক ভদ্রলোক হাজার হাজার ডাক-টিকিট টুকরা-টুকরা করিয়া আঁটিয়া এই সুন্দর ছবির ফ্রেমখানা তৈরী
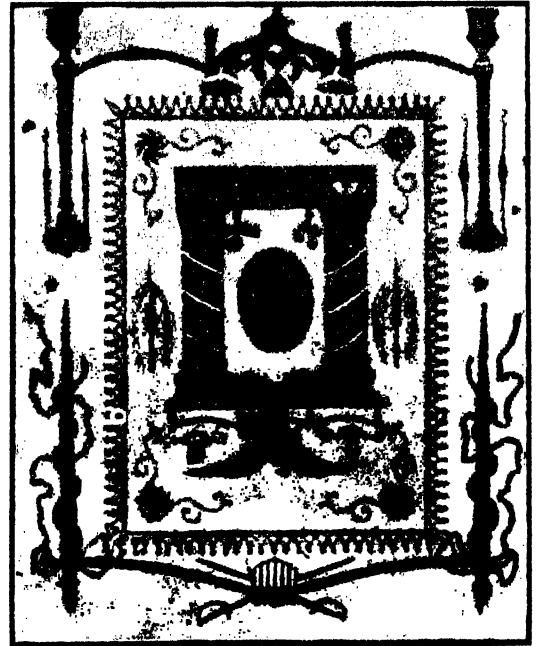
ডাকটিকিটের টুকরায় তৈরী ছবির ফ্রেম্

করিয়াছেন। শুধু অবসর সময়েই এই কাজ তিনি করিতেন,—দুই বৎসরে তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছে। সে-সব টিকিটের রং উজ্জ্বল, তিনি কেবল সেগুলিই বাছিয়া লইয়াছেন।

—

বহুমূল্য সুগন্ধিদ্রব্যের আধার—

এম্বারগ্রিস্ (ambergris) নামে এক প্রকার জিনিস তিমি মাছে
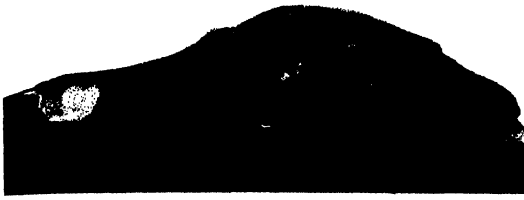
চার হাজার ডলার মূল্যের সুগন্ধি দ্রব্য এই তিমি মাছটি থেকে পাওয়া গিয়াছে

থাকে। ইহার গন্ধ প্রথমটা অত্যন্ত বিশ্রী; কিন্তু রসায়নিকের শোধন-ক্রিয়ার পরে তাহা হইতে সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যই পাওয়া যায়। তাই তিমি মাছকে সুগন্ধির আধার বলা যাইতে পারে। এই তিমিটি কুব্জপৃষ্ঠ (Humpback) জাতীয়—ইহার মধ্যে অন্ততঃ চার হাজার ডলার মূল্যের এম্বারগ্রিস আছে। এই জাতীয় তিমিতেও যে এই দ্রব্য আছে, তাহা এতদিন কেহ জানিত না।

৮০০ বৎসরের পুরাতন গমের আঠা ও কাঠের টুকরায় তৈরী গির্জ্জা—

নরওয়ের অসলো নগরের এই গির্জ্জাটি ৮০০ বৎসর আগে বিনা পেরেকে শুধু গমের আঠা ও কাঠের টুকরায় তৈয়ারী হইয়াছিল। এর পেগোডার মত রূপ সেকালের বাস্তুশিল্পের নিদর্শন।
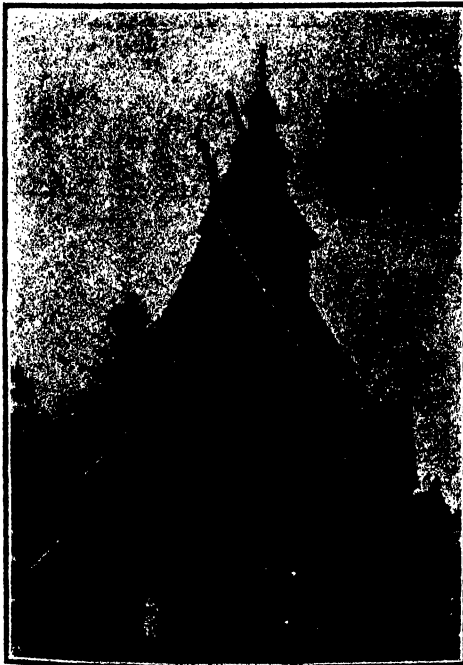
আটশত বৎসর আগেকার আঠা ও কাঠের টুকরায় তৈরী গির্জ্জা

—

তুষার স্ফটিক—

শীতকালের ঝড়ে বাইরে যখন বরফ পড়িতে থাকে তখন কালো বোর্ডের উপর বরফের পাতলা 'পাত' (snowflake) সংগ্রহ করিতে হয়। মনের মত একটা পাত পাইলেই ঘরে লইয়া গিয়া ফটো-মাইক্রোসকোফ-এ (যাহাতে ফটো তুলিবার ও অনুবীক্ষণের কাজ একসঙ্গে চলে) তাহার চিত্র লইতে হয়। ঘরটি বাইরের মতই শীতল হওয়া চাই; আর খুব তাড়াতাড়ি ফটো তুলিতে হয়, না হইলে বরফের পাত গলিয়া যায়। পাতগুলিকে ৬৪ থেকে ৩৬০০ গুণ বড় করিয়া তোলা হইয়াছে। ফলে পাওয়া গিয়াছে এইরূপ অপূর্ব্ব তুষার স্ফটিক।
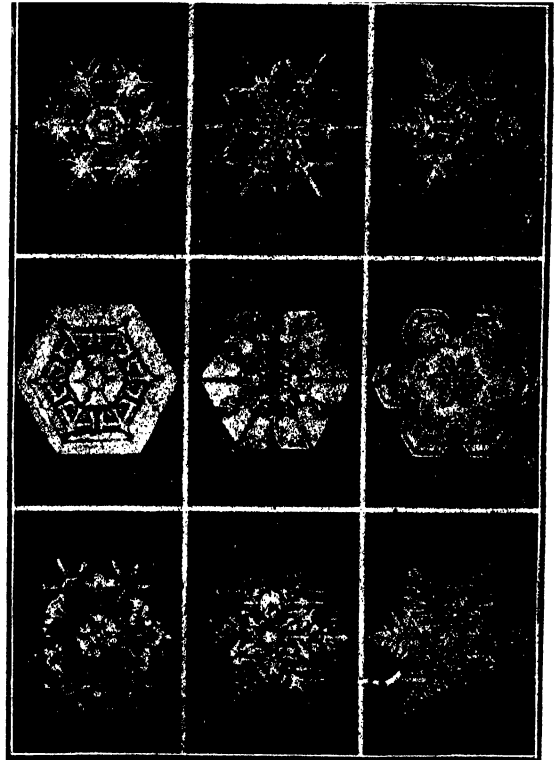
চিত্রের কৃষ্ণ রেখাগুলি তুষার-স্ফটিকে আবদ্ধ বায়ুবুদ্বুদ

কোটিপতি দীর্ঘজীবী জাপানী—

জাপানে আত্ম-প্রযত্নে যাঁহারা উন্নতিলাভ করিয়াছেন কোটিপতি কিহাচিরো ওকুরী তাহার অন্যতম। নিঃস্ব ও নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার সৎকাজের জন্য তাঁহাকে ব্যারণ উপাধি দেওয়া হয়। ৮৮ বৎসর বয়সে তিনি পুত্রের অধিকারে সে
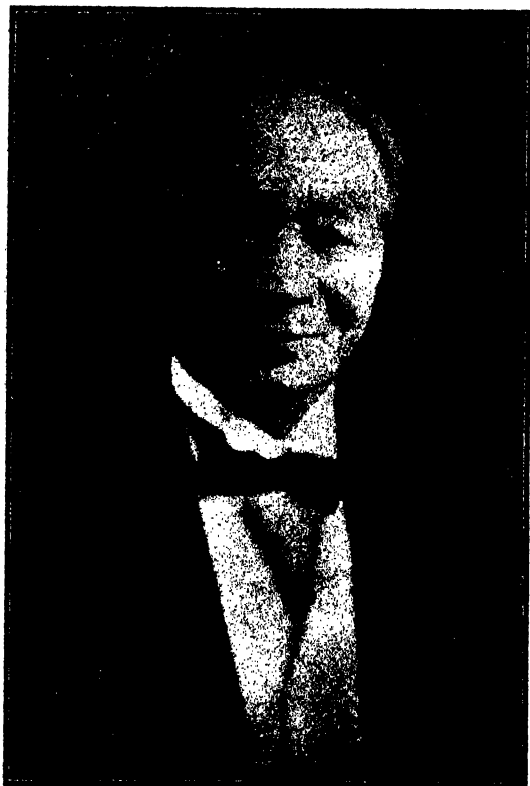
জাপানী কোটিপতি কিহাচিরো ওকুরা (৯১ বৎসর বয়স্ক)

উপাধি অর্পণ করিয়া অবসর লইয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স ৯১; তথাপি তিনি সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ; চোখে চশমার পর্য্যন্ত দরকার নাই। আহারে এখনো তাঁহার রুচি ও শক্তি যথেষ্ট। গান, চারুশিল্প, চিত্রকলা, মূর্ত্তি-সংগ্রহ প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ।

বিজলী-লাঙলে শস্যরক্ষা—

এই বিজলী-লাঙলে জমির সমস্ত অনিষ্টকর কীটাণু ধ্বংস করিবার জন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভল্টের তাড়িৎ শক্তি লাঙলের ফলকের মধ্যে সৃষ্টি করে।

বিজলী লাঙলে শস্যরক্ষা

বেম্বু—

এই চোদ্দমাসের গরিলা-শাবকটি জার্ম্মাণ পূর্ব্ব আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় আসিয়াছে।—সিম্পাঞ্জি মা তাহাকে পালন করিতেছে।

গরিলা-শাবক বেম্বু

আমেরিকায় তাহার খুব খাতির। মানব-শিশুর সঙ্গে এই গরিলা শাবকের আচরণের সাদৃশ্য দেখিয়া বহু পূর্ব্বকার যুগের যে ড্রায়োপিথিকাস্ উভয়েরই পূর্ব্ব পুরুষ ছিল তাহার কথা মনে পড়ে। তাই বেম্বু বাঁচিলে অনেক তথ্য জানা যাইবে; বিবর্ত্তনবাদের দিক হইতে তাহার জীবন খুব মূল্যবান্।

কবির পুরস্কার—

১৯২৭ সনের 'ডায়েল' পারিতোষিক কবি এজরা পাউণ্ডকেই 'সাহিত্য-সেবার' জন্য দেওয়া হইয়াছে। এই পারিতোষিক যাহারা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে টি, এস, ইলিয়ট, ভেন উইক্ ব্রুকস্ উল্লেখযোগ্য। ইলিয়ট্ উচ্চকণ্ঠে পাউণ্ডের কবিতার প্রশংসা করিয়াছেন। কল্পনার সহিত গঠন-কলার (টেক্‌নিক্‌এর)

কবি এজ্‌রা পাউণ্ড

অপূর্ব্ব সমাবেশে তিনি দেন সঙ্গীতের লালিত্য ও বর্ণ, গতি, শক্তি কবিতার মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

প্রাণী-সংরক্ষণের নূতন পদ্ধতি—

এতদিন এলকোহলে ভিজাইয়া প্রাণী-দেহ রাখা হইত। এখন প্রাণী ও উদ্ভিদ সবই পেরাফিনের সাহায্যে সংরক্ষণ করা চলিবে—
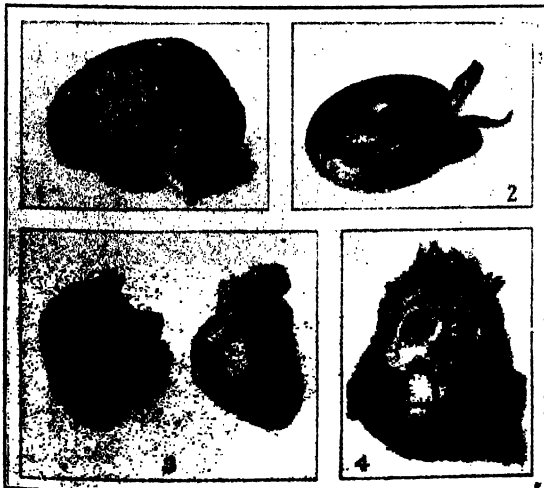
নব্য-পেরাফিন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত
1. মানুষের মস্তিষ্ক, 2. বোয়া, 3. মানুষের হৃৎপিণ্ড, 4. ওরাঙ্গের মাথা

জিনিসগুলি শুষ্ক থাকিবে, তাহাদের বিশেষত্ব হারাইবে না, অথ স্থায়ী হইবে।

পেন্সিল ও প্রদীপ—
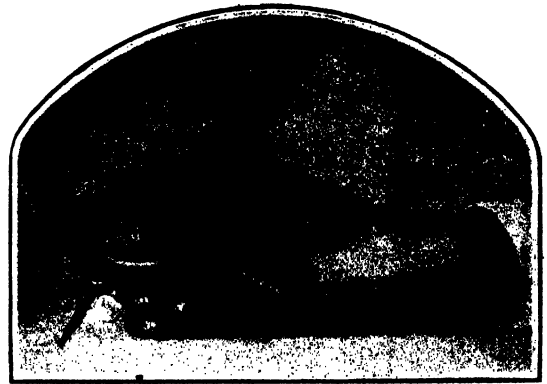
পেন্সিল ও প্রদীপ

সঙ্গের ছোট ব্যাটারি আলো দেয়—রাত্রিতে লেখা সহজ হইয় উঠিবে।

সমুদ্রে চামড়া—

একটি প্রকাণ্ড করাতীমাছ (Sawfish) নামানো হইয়েছে।

একদিনে ধরা পড়িয়াছে—হাঙ্গর ও স-ফিস্

পপুলার মেকানিক পত্রে রাইট সাহেব লিখিয়াছেন যে, হাঙ্গর (shark) ও করাতী মাছ (sawfish) হইতে খুব বেশী চামড়া লাভের সম্ভাবনা আছে। এইসব সামুদ্রিক জীবের চামড়া যেমন মসৃণ, সুন্দর, তেমনি টেকসই। চামড়ার ব্যবসায়ের এক নূতন দিকের গোড়াপত্তন হয়ত এইরূপে বর্ত্তমানে আরম্ভ হইল। হাঙ্গর ও স-ফিস্ শীকারের নূতন নূতন উপায়ও তাই আবিষ্কার হইতেছে। এসব জলজ জীবের চামড়ায় তৈরী জুতা নরম ও প্রায় চিরস্থায়ী হইবে।

আরাতামা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অতি দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বতে মধ্যাহ্ন। দূরে শুভ্র তুষার-শৃঙ্গে সূর্য্যের আলোক জ্বলিতেছে, চূড়ার পর চূড়া, শ্রেণীর পরে শ্রেণী। নীহারে সূর্য্যকিরণ হোমাগ্নি শিখার ন্যায় প্রচণ্ড জ্বালাশালী, শিখরের মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে আলোকের দীপ্তি কিছু ম্লান। পর্ব্বতে শুভ্র মেঘমালা লগ্ন, কুণ্ডলীকৃত হইয়া ইতস্ততঃ অলস গতিতে সঞ্চালিত হইতেছে। একস্থানে পর্ব্বত-শিখরে একটি মৃগ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, হিমানীর উপর তাহার অবয়বের ও শৃঙ্গের ছায়া পড়িয়াছে।

মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা চারিদিকে, নিসর্গ যেন মৌন অবলম্বন করিয়াছে। কেবল নির্ঝরের অবিশ্রান্ত ঝর ঝর শব্দ, দেবদারু বৃক্ষের নির্য্যাসের সুগন্ধ। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, বৃক্ষমূলে পর্ব্বতজাত পুরু পুরু নধর শৈবাল, ঈষৎ পীত হরিদ্বর্ণ পুষ্পরেণুতে তরুতল আচ্ছন্ন। এক জাতীয় বৃক্ষে বৃহদাকার লোহিত বর্ণের ফুল, ফুলে ফুলে বৃক্ষ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

সেস্থানে সে-সময় কেহ উপস্থিত হইলে তাহার মনে হইত সেখানে জনপ্রাণী নাই, কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। পর্ব্বতে বহুসংখ্যক লোক, কিন্তু তাহারা এত প্রচ্ছন্ন ভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, আর কেহ সেখানে আসিলে কিছুই জানিতে পারে না। পর্ব্বতের তলদেশ হইতে অরণ্য পর্য্যন্ত সশস্ত্র প্রহরী; কিন্তু তাহারা এরূপ ভাবে লুক্কায়িত হইয়া আছে যে, নবাগত কোন ব্যক্তি কোন সন্ধান পাইতে পারে না। স্থানে স্থানে প্রস্তরের স্তূপ এরূপ ভাবে সজ্জিত যে, তাহা সহজে অতিক্রম করিতে পারা যায় না। দ্রুত গমনের পক্ষে চারিদিকে নানারূপ বাধা। অত্যন্ত কৌশলের সহিত এই রূপে পর্ব্বতের অনেকটা স্থান অবরুদ্ধ হইয়াছে, কোথাও সহসা শত্রু-প্রবেশের স্থান নাই। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দস্যুদিগের প্রহরীরা সতর্ক হইয়া জাগিয়া আছে।

এক স্থানে ঘন বিন্যস্ত মহীরুহ-শ্রেণীর মধ্যে লতাবেষ্টিত মণ্ডপের ভিতর কয়েক ব্যক্তি বসিয়াছিল। রাজা শিশেরার বৈমাত্র ভ্রাতা আরাদ বলিলেন, প্রথমে আমরা আক্রমণ করিব অথবা এইখানে অবরুদ্ধ হইয়া গর্ত্তে মূষিকের ন্যায় ধৃত অথবা নিহত হইব, সেই কথা মীমাংসা করা উচিত। এ স্থান আর নিভৃত নয়, নিরাপদও নয়। সে রাত্রে আকাশযান আসিয়া সমস্ত জানিয়া গিয়াছে; তাহার পর সৈন্যের অভিযান আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিবে।

আরাদ বলিষ্ঠ, কর্কশ-মূর্ত্তি, মুখে অসংযত চিত্ত ও চরিত্রের চিহ্ন।

আরাদের একজন সঙ্গী কহিল, না, আর আমাদের নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না।

আরাদ কহিলেন, রুদেলা, তোমার কি অভিপ্রায়?

রুদেলা দস্যুদিগের দলপতি। তাহাকে দেখিলে কে বলিত যে, সে দস্যু, অথবা অনায়াসে সকল প্রকার নৃশংসতা আচরণ করে? অত্যন্ত তরুণ বয়স, মধ্যাকৃতি,

মুখের ও অঙ্গের সৌন্দর্য্য প্রায় স্ত্রীলোকের তুল্য, কেশ-বেশের পরিপাট্য বিলাসী নগরবাসীর ন্যায়। হস্তে গজদন্তের ক্ষুদ্র যষ্টি, তাহার দ্বারা মাটিতে আঁচড় কাটিতে-ছিলেন। আরাদের প্রশ্ন শুনিয়া রুদেলা মাথা তুলিয়া চাহিলেন। চক্ষের পাতা ভারি, ভ্রূ-রেখা সরু, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, আয়ত তীক্ষ্ণ চক্ষু, চক্ষের প্রান্তভাগে ঈষৎ আরক্ত আভা। কণ্ঠস্বর মধুর, ধীরে ধীরে কহিলেন, বিমান বিনা শব্দে বিচরণ করা কিছু আশ্চর্য্যের কথা। আমি ত নিশ্চিন্ত নাই। তুমি ত রাজা শিশেরার রাজ্য কামনা কর। আমি দস্যু, দস্যুই থাকিব, যদি রাজা আমাকে ধরিতে পারেন তাহা হইলে দস্যুর ন্যায় নিহত হইব।

আরাদ কহিলেন, তোমাকে ধরিতে পারে এমন রাজা কেহ নাই। আমি যদি রাজ্য পাই ত তোমার প্রসাদে। তুমি দস্যু থাকিবে কেন? এখনি ছোটখাট কয়েক জন রাজা তোমার অধীনে। যুদ্ধে জয়ী হইলে তুমি সম্রাট হইবে।

হস্তধৃত যষ্টি তুলিয়া হাস্যমুখে রুদেলা কহিলেন, রাজা শিশেরা প্রতাপশালী, তাঁহার সৈন্যগণ সুশিক্ষিত, তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ নয়। আবার তিনি যে বিমান আনিয়াছেন তাহাতে আমাদের সৈন্যবল গোপন করা কঠিন। তবে বিবাদের সূত্রপাত তিনিই করিয়াছেন, আমরা আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারি না। আপনাদের কি করিতে হইবে আমি তাহা স্থির করিয়াছি।

আরাদ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিব?

—যে-সকল রাজাদিগকে পরাজয় করিয়াছি তাঁহা-দিগকে স্বপক্ষে করিব। আপনাদিগকে বিমান-রথ সংগ্রহ করিতে হইবে। আবার যদি রাজা শিশেরার বিমান রাত্রে আসে ত ফিরিয়া যাইবে না।

ইফ্রেস!

আরাদের পশ্চাতে গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত একজন বলিষ্ঠ-কায় পুরুষ বসিয়াছিল, কহিল, কি আজ্ঞা?

—তুমি পঞ্চাশ জন জোয়ান লইয়া আমুরা ও গুতার্ণার রাজার সহিত সাক্ষাৎ কর। তাঁহাদের সহিত আমাদের সন্ধি হইয়াছে। তাঁহাদিগকে সসৈন্যে প্রস্তুত হইতে বল। রাজা ইতাস ও তিরাকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমিও শীঘ্র যাইতেছি। শিশেরা যুবরাজ আরাদকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্য হরণ করিয়াছেন। রাত্রিকালে গোপনে আমাকে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাকে পরাজয় করিয়া আরাদের রাজ্য আমরা আরাদকে সমর্পণ করিব। যে-সকল রাজা আপনাদের পক্ষে হইবেন তাঁহাদের রাজ্য-সীমা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, শিশেরার অতুল ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠিত হইলে তাঁহারাও অংশ পাইবেন। যাও!

ইফ্রেস উঠিয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল! অতি অল্প সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ জন সশস্ত্র লোক লইয়া প্রস্থান করিল। দস্যুপতির শিক্ষা ও শাসন এরূপ যে, তাঁহার সকল আজ্ঞা বিনা বাক্যে তৎক্ষণাৎ পালিত হইত!

রুদেলা উঠিয়া আরাদকে কহিলেন, তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। তোমার রাজ্য চাই, এ জন্য তোমার নিজে সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক।

স্বভাবতঃ ও সঙ্গ-ব্যবহার-দোষে আরাদ অলস, কিন্তু দস্যুপতির কথায় ঔদাস্য প্রকাশ করিতে পারিলেন না। কহিলেন, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা, আমাকে যাহা বলিবে তাহাই করিব।

দস্যুপতির অলস শিথিলতা তিরোহিত হইল। চক্ষের দৃষ্টি উজ্জ্বল, চঞ্চল, মুখের ভাব কঠিন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সর্ব্বাঙ্গে স্ফূর্ত্তি, কণ্ঠের স্বর শঙ্খধ্বনির ন্যায় উচ্চ ও দূর-গামী। সংক্ষেপে, স্পষ্টশ্রুত স্বরে আদেশ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শত শত অস্ত্রধারী যোদ্ধা তাঁহার সাক্ষাতে উপনীত হইল। তাহাদের আকৃতি, বেশ, অস্ত্র-শস্ত্রাদি, চলিবার ও দাঁড়াইবার ভঙ্গী শিক্ষিত সৈনিকদিগের ন্যায়, লুব্ধ, অসংযত, বীভৎস-মূর্ত্তি দস্যু-দিগের মত নয়। দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সারির পর সারি দিয়া যন্ত্রচালিত লৌহমূর্ত্তির ন্যায় আসিয়া দাঁড়াইল। রুদেলা ডাকিলেন, জাফেত!

উষ্ণীষধারী সেনাপতি বেশে এক ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

রুদেলার মুখের কঠোরতা অপনীত হইয়া চক্ষের দৃষ্টি কৌতুকোজ্জ্বল হইল। কহিলেন, এত কাল আমরা কর গ্রহণ করিয়াছি, এখন বিতরণ করিব। রাজাদিগকে উপঢৌকন দিবার যোগ্য বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার, এবং তাঁহাদের সেনাপতি ও প্রধান সৈনিকদিগকে বিতরণ করিবার জন্য স্বর্ণ সঙ্গে লইয়া চল।

—কত প্রয়োজন?

—আপাততঃ ছয় জন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। সেইরূপ হিসাব করিয়া লইবে।

দস্যুরা লুণ্ঠন করিয়া যে-সকল সামগ্রী ও অর্থ আনিত তাহা পর্ব্বতের কোন প্রচ্ছন্ন দুর্গম গুহায় রক্ষিত হইত। দস্যুপতি এত অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী সঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, সেরূপ রাজভাণ্ডারেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার আদেশ-মত উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্নপূর্ণ বহুসংখ্যক পেটিকা আনীত হইল। কয়েকটা অশ্বতরের পৃষ্ঠে সেইসকল সামগ্রী রক্ষা করিয়া এক দল সৈন্য লইয়া জাফেত পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন।

পর্ব্বতের নীচে উপত্যকায় সজ্জিত অশ্বশ্রেণী উপস্থিত ছিল। রুদেলার সঙ্গে দুই শত অস্ত্রধারী পুরুষ। অশ্বারো-হণ করিয়া আরাদ তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন।

রুদেলা প্রথমে গুত্তার্ণা ও তাহার পর আমুরার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দস্যুপতিকে তাঁহারা ভয় করিতেন, কিন্তু এ সময়ে তিনি মিত্র ভাবে আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া রুদেলা রাজাদিগকে কহিলেন, তির্ষধা রাজ্য ন্যায়মত ইহাঁর প্রাপ্য, শিশেরা ইহাঁকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আমি ইহাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি। আপনাদের নিকটও সেই প্রার্থনা। সেই কারণে যুবরাজ আরাদ স্বয়ং আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন।

আরাদ কহিলেন, এ সময় উপকৃত হইলে আমি বিস্মৃত হইব না। এখন আপনারা শিশেরাকে কর দেন, আমি আপনাদিগকে করমুক্ত করিয়া দিব। শিশেরার সঞ্চিত বিপুল অর্থ হইতে আপনারা অংশ পাইবেন এবং আপনাদের রাজ্যসীমাও বাড়াইয়া দিব।

আমুরার রাজা কিছু কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, রাজা শিশেরার সহিত আমাদের ত কোন বিবাদ নাই।

রুদেলা কহিল, আমার সঙ্গেও কোন বিবাদ নাই, কিন্তু যুবরাজ আরাদের জন্য এইবার হইবে। বিবাদের সূত্রপাত শিশেরাই করিয়াছেন। আপনারা কিরূপে নির্লিপ্ত থাকিবেন? যাহারা আমাদের স্বপক্ষে নয় তাহারা আমাদের বিপক্ষে, আমরা ইহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারিব না।

রাজা কহিলেন, আপনার বিপক্ষতা আচরণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যেরূপ আদেশ করিবেন তাহাতেই আমি প্রস্তুত।

রুদেলা কহিলেন, আপনার সৈন্যবল যুবরাজ আরাদের সাহায্যার্থ দিতে হইবে। নগরের বাহিরে ও রাজ্য-সীমান্তে এরূপ অবরোধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে যাহাতে শিশেরার সৈন্যগণ সহজে আক্রমণ করিতে না পারে। আমি ও আপনার লোকেরা আপনার পক্ষে।

অগত্যা রাজা সম্মত হইলেন। তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না।

রুদেলা ও আরাদ এইরূপে অপর রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সকল নগরে রুদেলা নিজের কয়েক জন লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা সৈন্য শিক্ষা, প্রাকার ও অবরোধ নির্ম্মাণ, সাহায্য সংগ্রহ প্রভৃতির ভার লইল। প্রত্যেক রাজ্যে রুদেলা আকাশ-যান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আলস্যহীনতা, কার্য্যতৎপরতা ও শিক্ষা-কৌশল দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাজা শিশেরা, মন্ত্রী ও সেনাপতি যখন আরাতামার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন সে সময় আর এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোন কথা কহেন নাই, আরাতামাও তাঁহার কোন পরিচয় পান নাই। তাঁহার নাম নারা, তিনি প্রকাশ্যে কোন রাজকর্ম্ম করিতেন না, কখন্ আসিতেন, কখন্ যাইতেন তাহারও কোন স্থিরতা ছিল না, কিন্তু সকল কার্য্যেই রাজা ও মন্ত্রী তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, তাঁহার দূরদর্শিতায় ও বুদ্ধিমত্তায় তাঁহাদের অটল বিশ্বাস। আরাতামা চলিয়া গেলে শিশেরা নারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্ত্রীলোককে আপনার কিরূপ বিবেচনা হইতেছে?

নারা কহিলেন, অসাধারণ বুদ্ধিমতা, পুরুষের অপেক্ষাও সাহসী, সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপযুক্ত, কিন্তু ইহার জীবনে কিছু রহস্য আছে। এই রমণী কাহারও শত্রু হইলে তাহার রক্ষা নাই, কারণ ইহার প্রকৃতিতে কঠোরতা ও দৃঢ় সঙ্কল্পতা দুই আছে। আবার আত্মত্যাগেরও অদ্ভুত মমতা আছে।

মন্ত্রী কহিলেন, সাহসের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। আরাতামা সে রাত্রে অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি। তাঁহার জীবনে কি রহস্য আছে কে বলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন চিন্তার কারণ নাই।

আরাতামা গৃহে ফিরিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে অন্য কর্ম্মে শীঘ্র লিপ্ত হইতে হইবে। আশঙ্কার কথা তাঁহার মনে হইল না, কিন্তু অতীতের ছায়া তাঁহার স্মৃতিতে পতিত হইল, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সেই অতীতের কোন শত্রু তাঁহার সন্ধান লইয়া এখানে আসিয়াছে। লোবান ও বাষ্টীকে দেখিয়া আরাতামার সংশয় হইয়াছিল যে, লোবান তাঁহার শত্রু এবং তিনি বাষ্টীর সাহায্যে রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। লোবান কে? বৃদ্ধ জিমরাণের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ আরাতামার মানস চক্ষের সমক্ষে সমুদিত হইল। আরাতামা দুশ্চিন্তায় কালক্ষেপ করিলেন না, কার্য্যতৎপরতাই তাঁহার বল। তিনি লোবানকে রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন।

লোবানের মনে কিছু শঙ্কা হইল, কিন্তু নিমন্ত্রণ কিরূপে অস্বীকার করিবেন? যথাসময় লোবান আরাতামার গৃহে উপনীত হইলেন। আরাতামা স্বয়ং দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন, বাষ্টীর সহিত অপরের অসাক্ষাতে কথা কহিবার লোবান কোন সুযোগ পাইলেন না। আরাতামা অত্যন্ত সমাদরের সহিত লোবানকে অভ্যর্থনা করিলেন। লোবান দেখিলেন, আর কাহারও নিমন্ত্রণ হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, গালিম কিংবা ফারেজ কেহ আসেন নাই?

আরাতামা লোবানের প্রতি কোমল-কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া, মৃদুমন্দ হাসিয়া কহিলেন, আর কাহাকেও বলি নাই। আপনি এখানে নূতন আসিয়াছেন, আপনার সহিত নিশ্চিন্তে কথাবার্ত্তা কহিব।

আহারের সময় বাষ্টী দুই একবার সেই গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু আরাতামা তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না। লোবানের শঙ্কা দূর হইয়া আর এক আশায় তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, আরাতামার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কখন সলজ্জ কটাক্ষ, কখন কম্পিত হস্ত, কখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস। এ সকল কিসের লক্ষণ ?

আহারান্তে আরাতামা কহিলেন, আমার একটি ঘরে আর কেহ প্রবেশ করিতে পায় না। চলুন আপনাকে সেই ঘরে লইয়া যাই।

লোবানকে সঙ্গে করিয়া আরাতামা সেই নিভৃত কক্ষের দ্বার মুক্ত করিলেন। বাষ্টী একবার তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। লোবান দেখিলেন, তাহার চক্ষু ভীতি-বিস্ফারিত, মুখ শুষ্ক। লোবান শিহরিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলেন। দ্বারের ভিতর হইতে আরাতামা অতি মধুরস্বরে কহিলেন, ভিতরে আসুন।

লোবান কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রকোষ্ঠের যে অবস্থা ছিল এখনও প্রায় সেইরূপ, কেবল দুই চারিটা যন্ত্র নাই। আরাতামা কহিলেন, এই ঘরে আমি যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করি। অপর কোন ব্যক্তি এইসকল যন্ত্রে হাত দিলে গুরুতর আঘাত লাগিতে পারে, এমন-কি মৃত্যুর আশঙ্কা, সেই কারণে এ ঘর বন্ধ থাকে। নহিলে কাহারও অপহরণ করিবার মত কোন সামগ্রী নাই। আপনাকে একটা কৌশল দেখাইতেছি, আপনি এইখানে উপবেশন করুন।

লোবান নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলেন। আরাতামা তাঁহার সম্মুখে আর-একটা আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পাশে ক্ষুদ্র চক্রাকার একটি যন্ত্র ছিল, আরাতামা স্পর্শ করিতেই তাহা ঘুরিতে লাগিল। আরাতামা কহিলেন, এইদিকে দেখুন।

চক্রে উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হইতেছিল। আবর্ত্তনের বেগ এত অধিক যে, চক্রের আকার নিরূপণ করিতে পারা যায় না, মাত্র প্রদীপ্ত আলোক বিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দেখিতে দেখিতে লোবানের দৃষ্টি স্থির হইল। আরাতামা হস্ত প্রসারিত করিয়া লোবানের মুখের সম্মুখে সঞ্চালিত করিলেন। লোবান নিস্পন্দ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। চক্র স্থির হইল।

আরাতামা কহিলেন, লোবান !

—কি ?

—তুমি জাগ্রত না নিদ্রিত ?

—নিদ্রিত কিন্তু তোমার কথা সম্বন্ধে জাগ্রত।

—তুমি কে ?

—হাতিল।

— জিমরাণের তুমি কে ?

—ভ্রাতুষ্পুত্র।

— মৃত্যুর পূর্ব্বে জিমরাণ তোমাকে কি বলিয়াছিলেন ?

—যাহাতে তোমার অপকার হয় সেই চেষ্টা করিতে।

—কেন ?

—তুমি তাঁহার বিমান ও সঞ্চিত রত্ন অপহরণ করিয়াছিলে।

—আমাকে তুমি হত্যা করিতে এখানে আসিয়াছ ?

—না, আমি তোমার সম্পত্তি ও আকাশ-যান লইতে আসিয়াছি।

—হীরক ও রত্ন কোথায় আছে জান ?

—জানি, তোমার কটিতে জালের থলিতে আছে।

—তুমি এই প্রকোষ্ঠে কাহার সাহায্যে প্রবেশ করিয়াছিলে ?

— বাষ্টীর।

—তাহাকে কি প্রলোভন দেখাইয়াছিলে ?

উত্তর নাই।

আরাতামা তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে লোবানের প্রতি চাহিয়া দুই চারিবার তাহার মুখের ও শরীরের সম্মুখে হস্ত সঞ্চালন করিলেন। লোবানের মুখ যন্ত্রণাক্লিষ্ট হইল। আরাতামা কহিলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুদ্রিত চক্ষু লোবান কহিলেন, তাহাকে বলিয়াছি আমি তাহার প্রণয়প্রার্থী, তোমার সম্পত্তি পাইলে তাহার সহিত বাস করিব।

—সত্য কথা ?

—না।

—সে তোমার প্রতি অনুরক্ত ?

—হাঁ।

—তাহা হইলে তুমি বাষ্টীর সর্ব্বনাশ করিতে চাও ?

—আমার কার্য্যোদ্ধারে সে নিমিত্ত মাত্র।

—তাহার পর তাহাকে ত্যাগ করিবে ?

—সে-কথা এখনও ভাবি নাই।

আরাতামা ধীরে ধীরে লোবানের অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন, স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার মানসিক বল তোমার প্রতি প্রয়োগ করিতেছি। বাষ্টী যেরূপ তোমার প্রতি অনুরক্ত তুমিও সেইরূপ তাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইবে। এখানকার আর সকল কথা বিস্মৃত হও।

আরাতামা সরিয়া গিয়া বীণার ন্যায় একটি বাদ্য-যন্ত্র

বাহির করিলেন। যন্ত্র হাতে করিয়া লোবানকে কহিলেন, এখন জাগ্রত হও।

নয়ন উন্মীলন করিয়া লোবান দেখিলেন, আরাতামা যন্ত্রে মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিতেছেন। লোবান কহিলেন, আমার কি হইয়াছিল?

আরাতামা হাসিয়া কহিলেন, কিছুই হয় নাই। হয় ত আপনি কিছু অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবেন।

সকল কলা-বিদ্যায় আরাতামার বিচিত্র কৌশল। যন্ত্রের আলাপ শুনিয়া, আরাতামার অঙ্গুলি-চালনার ভঙ্গী দেখিয়া লোবান মুগ্ধ হইলেন। অল্পক্ষণ বাজাইয়া আরাতামা কক্ষের বাহিরে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া লোবানের সঙ্গে অপর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। বাষ্টীকে ডাকিয়া কহিলেন, ইঁহার সঙ্গে বাহিরে গিয়া যন্ত্ররথ আনিতে বল।

আরাতামা স্বয়ং গৃহের বাহির হইলেন না। বাষ্টীর মুখ মলিন, শুষ্ক, কোন কথা না কহিয়া লোবানের অগ্রে অগ্রে চলিল। বাহিরে যাইতে একস্থানে কিছু অন্ধকার, সেইখানে লোবান মৃদুস্বরে বাষ্টীকে কি বলিলেন। তাহার পর চলিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিশলাম নগরে ও রাজ্যের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, রাজপুত্র আরাদ দস্যুপতির সহায়তায় অনেক সৈন্য ও নানাবিধ অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছেন, অপর দেশের রাজারা ভয়ে অথবা লুব্ধ হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতেছেন এবং সকলে মিলিয়া রাজা শিশেরার রাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। বিশলাম নগরে আনন্দ-উৎসব বন্ধ হইয়া গেল। রাজা মন্ত্রী সেনাপতি সকলে সর্ব্বদা মন্ত্রণায় ব্যস্ত থাকিতেন, সময়ে সময়ে আরাতামাকেও উপস্থিত থাকিতে হইত। সংবাদ লইয়া সর্ব্বদা দূত ও রাজপুরুষেরা আগমন করিত, চারিদিকে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী প্রেরিত হইত।

গালিম আহূত হইয়া রাজার মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা শিশেরা কহিলেন, এখন রাজ্যরক্ষার জন্য সকলকেই চেষ্টিত হইতে হইবে, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না।

গালিম কহিলেন, আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন পালন করিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু আমার কোন কার্য্যে অভিজ্ঞতা নাই, অতএব কাহারও অধীনে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করি।

মন্ত্রী কহিলেন, তাহাই হইবে। আপনি সৈন্য-বিভাগে যাইতে ইচ্ছা করেন অথবা নগর-রক্ষার কার্য্যে থাকিবেন?

—আমি আপনাদের আজ্ঞাধীন; কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। মন্ত্রণা, নগর ও জনপদ রক্ষা করিবার জন্য প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোক অনেক আছেন, আমরা যুবকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাত করিতে পারি।

সেনাপতি কহিলেন, আপনি নগরের যুবকদিগকে সমবেত করুন, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য আমি একজন সৈন্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিতেছি। আপনি নায়ক হইবেন। অন্য বিষয়ে মন্ত্রীর নিয়োগ মত কার্য্য করিবেন।

গালিম স্বীকৃত হইয়া নগরের পরিচিত অপরিচিত সকল যুবককে সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

বেথর অবসর পাইলেই শেমিদার বাড়ীতে যাইত। মল্লবৃত্তি বেথর একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিল, এখন তাহার সংসারী হইতে কোন বাধা নাই। শেমিদা ও বেথরের বিবাহ স্থির হইয়াছিল, শেমিদার মাসী তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আরাতামার অনুমতির আবশ্যক কিনা বেথর সেই কথা বিবেচনা করিতেছিল। এখন বেথরকে সর্ব্বদা আরাতামার গৃহে উপস্থিত থাকিতে হয়, বিবাহ করিলে বেথর তাহা পারিবে না। তবে যদি আরাতামা তাহাকে নিজের গৃহে সস্ত্রীক বাস করিতে দেন তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। বেথর সেই কথা উত্থাপন করিবে মনে করিতেছিল এমন সময় যুদ্ধের আয়োজনে সমস্ত নগর ব্যস্ত হইয়া উঠিল। গালিম আরাতামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেথরকে নিজের দলভুক্ত করিতে চাহিলেন। আরাতামা তাহাতে সম্মত হইলেন। বেথরের ডাক পড়িল। আরাতামা কহিলেন, বেথর, এখানে শীঘ্রই শত্রুভয় উপস্থিত হইবে, তোমাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

বেথর মস্তক উন্নত করিয়া, বুক ফুলাইয়া কহিল, আমি প্রস্তুত, মল্ল কে?

গালিম হাসিয়া কহিলেন, মল্লযুদ্ধ নয়, অস্ত্রযুদ্ধ। শত্রু অনেক সৈন্য লইয়া এই রাজ্য জয় করিতে চায়, যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে হইবে,যদি শত্রু নগরে প্রবেশ করে তাহা হইলে লুটপাট করিবে, নানাবিধ অত্যাচার করিবে। রাজার আদেশে নগরের সকল যুবকেরা যুদ্ধশিক্ষা করিবে, নগর-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে, প্রয়োজন হয় স্থানান্তরে গিয়া যুদ্ধ করিবে। তোমার মত বলশালী পুরুষ অধ্যক্ষগণের মধ্যে থাকা উচিত।

বেথর কহিল, যেরূপ আজ্ঞা। সম্প্রতি আমাকে কি করিতে হইবে?

—অস্ত্রপ্রয়োগ ও যুদ্ধের কৌশল শিখিতে হইবে। শিক্ষা দিবার জন্য সেনাপতি একজন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।

—আমি যাহা জানি তাহাতে চলিবে না ?

—তুমি মল্ল বীর, মল্লযুদ্ধে অদ্বিতীয়, কিন্তু অস্ত্রযুদ্ধে মল্লবিদ্যা কি কাজে লাগিবে ? তোমাকে যদি কেহ অসি দ্বারা আক্রমণ করে তাহা হইলে রিক্তহস্তে তুমি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে ?

ঈষৎ হাসিয়া বেথর কহিল, অস্ত্র হইতেও আত্মরক্ষা করিতে জানি। আদেশ হয়ত দেখাইতে পারি।

—আজ অপরাহ্নে রাজবাটীর সম্মুখে উদ্যানের মাঠে শিক্ষা হইবে, তুমি সেখানে আসিও।

—যে আজ্ঞা।

বৈকালে মাঠে বিস্তর লোকের সমাগম। কতক শিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছে, কতক দর্শক। গালিমের অনুরোধে ফারেজ আসিয়াছিলেন, কিন্তু যেপক্ষে আরাতামা সেপক্ষে তিনি যোগ দিতে চাহেন না, কারণ তাঁহার আত্মাভিমানে যে আঘাত লাগিয়াছিল, সে ক্ষতচিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। ফারেজের লঘু-প্রকৃতিতে অহমিকার দুর্ব্বলতা ছিল, উদারতার গাম্ভীর্য্য বা দৃঢ়তা ছিল না। তাহার ক্ষমতা থাকিলে ফারেজ আরাতামাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। গালিমকে বলিতেছিলেন আরাতামা স্ত্রীলোক, বিদেশিনী, তাহার প্রতি এত বিশ্বাস কেন, দেশরক্ষার কার্য্যেই বা কেন তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে ? গালিম তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, আরাতামার যেরূপ বুদ্ধি ও সাহস তাহাতে রাজা ও মন্ত্রীর নির্ব্বাচনের দোষ দেওয়া যায় না, বিশেষ আরাতামা রাজপক্ষ না হইলে তাহার বিশ্বাস পাওয়া যায় না।

রাজকন্যা সাফিরা ও আরাতামা একত্রে আসিলেন। রথে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। শিক্ষাচার্য্য কাহারও অসিবিদ্যা, কাহারও ধনুর্ব্বিদ্যা পরীক্ষা করিতেছিলেন, যুবকদিগকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে, সমপদ হইয়া চলিতে, ব্যূহ রচনা করিতে শিখাইতেছিলেন, এমন সময় বেথর আসিল। তাহার হস্তে দীর্ঘ লৌহদণ্ড, অগ্রভাগ বর্ত্তুলাকার, চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা। গালিম শিক্ষাধ্যক্ষকে কহিলেন, বেথর মল্লপ্রধান, ইহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইলে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা হইবে।

অধ্যক্ষ বেথরকে কহিলেন, তুমি অসিবিদ্যা জান ?

বেথর কহিলেন, কিছু জানি কিন্তু যুদ্ধে শত্রু সংহার করা যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে অসির অপেক্ষা আমার এই অস্ত্র অনেক শ্রেষ্ঠ।

অধ্যক্ষ অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন, তোমার হস্তে গদার কি একটা অস্ত্র দেখিতেছি, উহার দ্বারা প্রস্তর ভাঙ্গা যাইতে পারে কিন্তু যুদ্ধে কি কাজে আসিবে ?

—যুদ্ধে অবলীলা ক্রমে শত্রুর মস্তক চূর্ণ করা যায়।

—অসির সাক্ষাতে মুদ্গর কি করিবে ?

—পরীক্ষা করিলেই তাহার মীমাংসা হইবে। অসি চালনায় যিনি সর্ব্বাপেক্ষা কুশলী তাঁহার সহিত পরীক্ষা হউক।

গালিম অধ্যক্ষকে কহিলেন, আপনার তুল্য অসিযোদ্ধা এখানে আর কেহ নাই, আপনি বেথরকে পরীক্ষা করুন।

অধ্যক্ষ পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে সরাইয়া কোষ হইতে অসি মুক্ত করিলেন, বেথরকে কহিলেন, তোমার অস্ত্র আমার তরবারি অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। হউক, তুমি আত্মরক্ষা কর।

বেথর তরবারির সহিত গদা মাপিয়া গদা ছোট করিয়া দুই হাতে ধরিল, অবশিষ্ট অংশ পশ্চাদ্ভাগে রহিল। কহিল, আপনি আমাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করুন।

অধ্যক্ষ যতবার যেরূপ করিয়া আক্রমণ করিলেন বেথরকে কোন মতে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। অবলীলাক্রমে গদা সঞ্চালন করিয়া বেথর তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিল। অবশেষে বেথর অধ্যক্ষের মুষ্টিতে অল্প আঘাত করিতেই তাঁহার হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল। অধ্যক্ষ কিছু লজ্জিত হইয়া বেথরের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তোমার অস্ত্র তরবারি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বেথর কহিল, আর এক প্রকার পরীক্ষা করুন। পাঁচ ছয় জন তরবারি লইয়া একত্রে আমাকে আক্রমণ করুন, আমি এই অস্ত্র লইয়া আত্মরক্ষা করিব।

গদার মুষ্টি ধরিয়া বেথর একটু দূরে দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের আদেশ মত ছয়জন অসিধারী তাহাকে ঘিরিয়া আক্রমণ করিল। বেথর বিচিত্র বেগে চারিদিকে গদা ঘুরাইতে লাগিল, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে চক্রাকারে গদা ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, তরবারি প্রবেশের কোথাও অবকাশ রহিল না। বেথর আক্রমণ করিতেই কাহারও অসি ভাঙ্গিয়া গেল, কাহারও মুষ্টি হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল। দেখিয়া অধ্যক্ষ কহিলেন, তোমাকে শিক্ষা দিবার যোগ্য এখানে কেহ নাই, তোমার অস্ত্রের সঙ্গে অন্য অস্ত্র তুলনা করা যায় না।

কয়েক জন যুবক বেথরকে বলিল, আমাদিগকে এই অস্ত্র চালনা করিতে শিখাও।

বেথর আসিয়া এক যুবকের হস্তে গদা দিল, কহিল, আপনি ঘুরাইয়া দেখুন।

যুবক দুই হস্তে কষ্টে গদা তুলিয়া কহিল, এত ভারী অস্ত্র চালনা করা অসম্ভব।

বেথর কহিল, ইহা আপনার হাতের অস্ত্র, আপনাদের পক্ষে গুরুভার। আপনাদের জন্য ইহার অপেক্ষা লঘু নির্ম্মাণ করাইতে হইবে, কিন্তু উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে সময় লাগিবে।

গালিম সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, কহিলেন, যিনি যে-অস্ত্রের ব্যবহার জানেন তাহাই উত্তমরূপে শিক্ষা করুন, নূতন অস্ত্র-চালনা শিক্ষা করিবার সময় হইবে কি না বলিতে পারা যায় না।

কয়েকজন যুবক কহিল, অপর শিক্ষার সঙ্গে বেথরের নিকট আমরা এই অস্ত্রের কৌশলও শিখিব।

সাফিরা আরাতামাকে কহিলেন, তোমার এই লোক শুধু মল্লপ্রধান নয়, অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যুদ্ধে ইহার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না।

আরাতামা কহিলেন, বেথরের এ বিদ্যার কথা আমি কিছু জানিতাম না। ইহাকে নিযুক্ত করিয়া ভাল করিয়াছি।

যুবকেরা যে যে অস্ত্রে কুশলী সেই বিদ্যা প্রদর্শন করিতে লাগিল। শিক্ষাধ্যক্ষ তাহাদিগকে সারি বাঁধিয়া একত্রে যুদ্ধ করিতে শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। যুবকেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত শিখিতে লাগিল। গালিম নায়ক হইলেন। নগরের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত গভীর পরিখা, অযত্নে কোথাও কোথাও জঙ্গল হইয়াছে সে-সকল পরিষ্কার করিয়া তাহাতে পর্ব্বত-নির্ঝরের জল প্রবাহিত করিয়া পরিখা জলপূর্ণ করা হইল। নগরের দুই দ্বারে দিবারাত্রি প্রহরী নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইল। রাত্রে অকস্মাৎ শত্রুর আশঙ্কা হইলে অতি সত্বর কিরূপে সৈনিকদিগকে সমবেত করিতে হইবে সে শিক্ষা নিয়ত প্রদত্ত হইত। দ্বারের তোরণের উপর সমস্ত রাত্রি প্রহরা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রহরী পরিবর্ত্তিত হইত। প্রহরী তূর্য্যনাদ করিলেই নগর-যুবকেরা তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র হইয়া দ্বারের অভিমুখে প্রধাবিত হইত। নগরে নগরে এইরূপ হইতে লাগিল। গ্রামসমূহ হইতে দলে দলে যুবকেরা সমবেত হইতে আরম্ভ হইল। যুদ্ধের আয়োজনে রাষ্ট্র চঞ্চল হইয়া উঠিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধশিক্ষাক্ষেত্রে লোবানকে কেহ দেখিতে পাইত না। লোবান বিদেশী, অল্পদিন হইল এই নগরে আসিয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। তথাপি শত্রুভয় সকলের সমান, শত্রু আসিলে নগরবাসী ও বিদেশীতে কোন প্রভেদ থাকিবে না, সকলেরই নির্যাতনের তুল্য আশঙ্কা। তাহাতে লোবান যুবা পুরুষ, তাঁহাকে দেখিলে ভীরু কাপুরুষ বিবেচনা হয় না, তিনি এমন সময় নিশ্চিন্ত উদাসীন হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন কেন? গালিমের মনে এই কথা হওয়াতে তিনি লোবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

একটা ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া লোবন চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। গালিম ঘরে প্রবেশ করিলে লোবান উঠিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিলেন। লোবানের মুখে কি একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে গালিম বুঝিতে পারিলেন না। চক্ষু উজ্জ্বল বিস্ফারিত, দৃষ্টি স্থির, সর্ব্বদা যেন অন্যমনস্ক। গালিম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি অসুস্থ?

—না, আমি বেশ আছি।

—আপনাকে আর ত কোথাও দেখিতে পাই না, অশ্বারোহণেও আপনি আর বেড়াইতে যান না।

- কয়েকদিন বড় একটা কোথাও যাই নাই।

— সহরের সংবাদ জানেন?

—কি সংবাদ?

— শত্রুর আশঙ্কা। নগর রক্ষা করিবার জন্য যুবকেরা সকলে যুদ্ধশিক্ষা করিতেছে।

—আমি বিদেশী, নির্লিপ্ত। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আর কোথাও চলিয়া যাইব।

—তাহা হইলে হয়ত শত্রুর হস্তে পড়িতে হইবে। আপনি বিদেশী কিংবা এই নগরবাসী শত্রু ত সে বিচার করিবে না। (ক্রমশঃ)

স্বরাজের আবশ্যকতা ও আমাদের যোগ্যতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে রাজনৈতিক অর্থে 'স্বারাজ্য' শব্দের প্রয়োগ আছে। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়স্বাল তাঁহার "হিন্দু পলিটী" অর্থাৎ হিন্দু শাসন-প্রণালী নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগের ৯১ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে পশ্চিম ভারতে স্বারাজ্য নামক শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। তাহাতে শাসক বা দেশপতিকে

('প্রেসিডেণ্ট্') 'স্বরাট্' বলা হইত। যোগ্যতার বলে স্বরাট্ নিজের পদে নির্ব্বাচিত হইতেন। তিনি প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"এতস্যাং প্রতীচ্যাং দিশি যে কে চ নীচ্যানাং রাজানো যেহপাচ্যানাং স্বারাজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে স্বরাডিত্যেনানভিষিক্তানাচক্ষত......"। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮ম, ১৪।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বাজপেয় অভিষেকের প্রশংসা উপলক্ষে বলা হইয়াছে, যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞ করেন এবং তদ্দ্বারা স্বারাজ্য লাভ করেন ;—"য এবং বিদ্বান্ বাজপেয়েন যজতে। গচ্ছতি স্বারাজ্যম্। অগ্রং সমানানাং পর্য্যেতি। তিষ্ঠন্তেঽস্মৈ জ্যৈষ্ঠ্যায়।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১,৩,২,২।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে "স্বরাজ্য" শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি, প্রাচীন এই স্বারাজ্য ঠিক্ তাহা না হইলেও, গণতান্ত্রিক আত্মশাসনের আদর্শ উভয়েরই ভিত্তিভূত।

"স্বরাজ্যসিদ্ধি" নামক যে সংস্কৃত পুস্তিকা আছে, তাহাতে স্বরাজ্য শব্দটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার অর্থ নিজের উপর নিজের প্রভুত্ব। শুনিয়াছি ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সময়ে তাঁহার গুরু সমর্থ রামদাস স্বামী স্বাধীনতা অর্থে স্বরাজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে ঠিক্ তথ্য অবগত নহি।

আধুনিক সময়ে স্বরাজ শব্দের রাজনৈতিক্ প্রয়োগ প্রথম করেন দাদাভাই নওরোজী। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতিরূপে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বিবৃত করিয়া তিনি বলেন, "এক কথায় ইহাকে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির মত বা ইংলণ্ডের মত স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ বলা যাইতে পারে।" ইংলণ্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ, উপনিবেশগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। এইজন্য দাদাভাই নওরোজী মহাশয়ের উক্তি আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম, যে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতাকেই ভারতের চরম লক্ষ্য মনে করিতেন, কিন্তু তদভাবে আপাততঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও অভিলষণীয় মনে করিয়াছিলেন। অধুনা ক্রমে ক্রমে কানাডা প্রভৃতি উপনিবেশ, [illegible] ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা লাভের উপর, বিদেশে [illegible] দূত নিয়োগ ও প্রেরণ, পররাষ্ট্রের সহিত স্বাধীনভাবে সন্ধিস্থাপন, ব্রিটেন তাহাদের সম্মতি না লইয়া কোনও দেশের সহিত যুদ্ধ করিলে তাহাদের নিরপেক্ষ থাকিবার অধিকার ঘোষণা প্রভৃতি করিয়া পূর্ণ স্বাধীন দেশেরই মত আচরণ করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, ঔপনিবেশিক শাসন-প্রণালী বলিতে আগে যাহা বুঝাইত, এখন তাহা অপেক্ষা ক্রমশঃ উচ্চতর জিনিষ বুঝাইতেছে। এইজন্য বহুকাল হইতে যদিও আমি পূর্ণ স্বাধীনতাকেই কাম্য বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, তথাপি যদি এখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাও এই কারণে গ্রহণযোগ্য মনে করিব, যে, তাহা হইতে পূর্ণ-স্বাধীনতায় পৌঁছিতে পারা যাইবে।

কংগ্রেসের গত অধিবেশনে পূর্ণ-স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাঁহারা কংগ্রেসের সভ্য নহেন, তাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে এখনও "স্বরাজ্য" ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু ইহা লইয়া বাদানুবাদ বা দলাদলির প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি নিজে পূর্ণ-স্বাধীনতাই চাই। কিন্তু যাঁহারা কানাডার মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন চান, তাঁহাদের সহিত তর্ক করা আবশ্যক মনে করি না। এই প্রবন্ধে অতঃপর স্বরাজ শব্দের প্রয়োগ যিনি যে অর্থেই বুঝুন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।

ভারতবর্ষে স্বরাজের প্রয়োজন ইহার নানা অভাব অভিযোগ, দুঃখ ও দুর্দ্দশা হইতে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের সকল প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা বলিব না, কেবল তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

সভ্য লোকদের দ্বারা শাসিত সমুদয় দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ দরিদ্রতম, ইহা ইংরেজদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষে উৎপন্ন ও আহৃত ধনে ইংরেজ ও অন্য কোন কোন জাতি ধনী হইয়াছে ও হইতেছে, অল্পসংখ্যক ভারতীয়ও ধনী হইয়াছে ; কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় যে ঘোর দারিদ্র্যে নিমগ্ন, [illegible] কথা [illegible]

দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। দেড় শত বৎসরের অধিক কাল ইংরেজরা ভারতবর্ষে রাজত্ব ও প্রভুত্ব করিয়াছে, কিন্তু তাহারা এই দারিদ্র্য দূর করিতে পারে নাই বা করে নাই। ইংরেজ রাজত্ব যে ভারতের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা এখানে অনাবশ্যক। আমাদের ধারণা এই যে, দেশে স্বরাজ স্থাপিত হইলে, আমরা ইহার আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে পারিব, ইংরেজ পারে নাই বা করে নাই; তাহাদের শক্তি বা সদিচ্ছার পরীক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া হইয়াছে। যাহারা আমাদের শক্তি বা সদিচ্ছায় সন্দিহান, তাহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, যে, আমাদের সদিচ্ছা ও শক্তির প্রমাণ দিবার সুযোগ আমাদের পাওয়া চাই। স্বরাজ সেই সুযোগ।

সভ্য লোকদের দ্বারা শাসিত সকল দেশের মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা শতকরা অধিকসংখ্যক নিরক্ষর লোক বাস করে। ইংরেজরা ইহার সম্যক্ প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই বা করিতে পারে নাই। আমাদের বিশ্বাস আমরা পারিব। যাহারা আমাদের শক্তি ও সদিচ্ছায় সন্দিহান, তাহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, যে, উহা সপ্রমাণ করিবার সুযোগ আমাদের পাওয়া চাই। স্বরাজ ব্যতিরেকে সেই সুযোগ আমরা পাইতে পারি না। দ্বৈরাজ্যে শিক্ষা একটি হস্তান্তরিত বিষয়। কোন-না-কোন মন্ত্রী ইহার ভারপ্রাপ্ত। কোন প্রদেশেই মন্ত্রীরা তাঁহাদের হস্তে অর্পিত বিষয়গুলির জন্য যথেষ্ট টাকা পান নাই। বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গের অবস্থা এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। অর্থাভাব সত্ত্বেও যেখানে কিছু সচ্ছলতা আছে, সেখানে দেশী মন্ত্রীদের হাতে শিক্ষার ভার আসিবার পূর্ব্বে শিক্ষার বিস্তার যেরূপ হইয়াছিল, তাহার পর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। ইহার একটি প্রমাণ গত পাঁচ বৎসরে পঞ্জাবে শিক্ষার বিস্তার। ১৯২২ সালে তথায় যত ছাত্রছাত্রী পড়িত, ১৯২৭ সালে তাহার উপর শতকরা ৮৮·৭ জন বাড়িয়াছে। ১৯২১-২২ সালে মোট অধিবাসীসংখ্যার শতকরা তিনজন শিক্ষাধীন ছিল। পাঁচ বৎসর পরে তাহা বাড়িয়া ৫.৭২ হইয়াছে। ইংরেজের হাতে যত দিন শিক্ষার ভার ছিল, তত দিন পঞ্জাবে এরূপ দ্রুত শিক্ষার বিস্তার হয় নাই।

সভ্য লোকদের দ্বারা শাসিত দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাধিক্লিষ্ট এবং মহামারী দ্বারা কবলিত। ঐ প্রকার কোন দেশেই ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ক্ষয়কাশ, প্লেগ, প্রভৃতির এত প্রাদুর্ভাব ও প্রকোপ নাই। রস্ সাহেব ম্যালেরিয়ার সহিত মশার সম্পর্ক ভারতবর্ষে আবিষ্কার করিবার পর কত দেশ হইতে ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল বা প্রায় নির্ম্মূল হইল, কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার আবিষ্কার-ক্ষেত্র ভারতবর্ষের অবস্থা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। ম্যালেরিয়া যে একটি দারিদ্র্যজাত রোগ, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট দেহ যে ইহার লীলাভূমি, তাহাও সুজ্ঞাত। ইংরেজ রাজত্বকালে ত্রিশ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ভারতে প্লেগের আবির্ভাব হয়, কিন্তু এখনও প্রতি বৎসর কোন-না-কোন প্রদেশে ইহার আবির্ভাব হইতেছে। পৃথিবীর অন্য কোন অংশে ভারতবর্ষের মত বিস্তৃত ভূখণ্ডে ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল ব্যাপিয়া প্লেগের অস্তিত্বের প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কলিকাতার অন্যতম ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ডাক্তার সিম্‌সন্ ১৯০৫ সালে প্লেগ সম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। * তাহাতে এই রোগের নানা কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন :—

"All that is definitely known is that pandemics and epidemics are generally associated with unusual seasons which bring distress and misery, with war and famine and their attendant ills, with political, social or economic conditions which are the reverse of prosperous, and which produce general depression in the community, and also with a laxity or absence of sanitary administration which prevents or hinders prompt dealing with the earlier causes." Page 142,

মহামারীসকলের সহিত যে-সব অবস্থার সম্পর্ক আছে, উদ্ধৃত বাক্যটিতে ডাক্তার সিম্‌সন্ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—যে-সব অসামান্য রকম ঋতুবিপর্য্যয়ে লোকে বিপন্ন ও ক্লিষ্ট হয়, তৎসমুদয়; যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ও তদানুষঙ্গিক অনিষ্ট-

* *A Treatise on Plague*, by W. G. Simpson. Cambridge.

পাত ; যে-সব রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থায় জনসমাজে ব্যাপক অবসাদ উপস্থিত হয় ও যে-সব অবস্থা সুদশার বিপরীত ; এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার অভাব বা শৈথিল্য।

স্বরাজ ব্যতিরেকে ডাঃ সিম্‌সনের বর্ণিত কারণসমূহের উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস আমরা স্বরাজ লাভ করিয়া দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়া অবসাদ দূর করিতে পারিব, এবং অধিকসংখ্যক চিকিৎসা-শিক্ষালয় খুলিয়া রোগীর চিকিৎসায় দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত করিতে পারিব। আমাদের বিশ্বাস সত্য কিনা প্রমাণ করিবার সুযোগ আমাদের পাওয়া আবশ্যক। স্বরাজ সেই সুযোগ।

কিন্তু আমাদের নানা দুঃখ দুর্দ্দশা অভাব অভিযোগই আমাদের স্বরাজলাভ চেষ্টার একমাত্র কারণ নহে। যদি ইংরেজ-রাজত্ব একেবারে নিখুঁত হইত, যদি দেশে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, সংক্রামক ব্যাধি, মহামারী, প্রভৃতি না থাকিত, কিম্বা যদি ভবিষ্যতে ইংরেজের সুশাসনে অচিরে দেশে ঐরূপ সুদশার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেও আমরা স্বরাজ চাই, নিজের দেশের কাজ নিজেরা চালাইতে চাই।

তাহার কারণ আমরা মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু কিংবা দ্বিপদ বনমানুষ নই। ইম্পীরিয়্যালিষ্ট অর্থাৎ সাম্রাজ্যোপাসকেরা বড় ভদ্রলোক। তাঁহারা মনে মনে আমাদিগকে গবাদি বা মেষাদি পশুর তুল্য মনে করেন কি না জানি না, কিন্তু মুখে আমাদের মানবজাতিত্ব অস্বীকার করিয়া আমাদিগকে কষ্ট দেন না। অতএব, যথোচিত বিনয়পুরঃসর আমরা বলিতে পারি, যে, আমরা মানুষ, পশু নহি। আমরা যদি গোরু হইতাম, তাহা হইলে যদি ইংরেজরা আমাদিগকে স্বাস্থ্যকর খটখটে মশকশূন্য গোয়ালে রাখিয়া ভাল খাইতে দিত, এবং স্নানাদি করাইয়া গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিত, এবং আমরা তাহাদের শক্তিমান্ ও ধনবান্ হইবার কারণ হইতাম, তাহা হইলে আমাদের গোজন্ম সার্থক মনে করা যাইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈশ্বর আমাদিগকে মানবজন্ম দিয়াছেন। সুতরাং আমরা কেবল সুশাসনে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আমরা নিজেরা স্বশাসক ও সুশাসক হইতে চাই, নিজেদের কাজ নিজেরা করিতে চাই। প্রকৃতিস্থ মানুষের ধর্ম্মই এই, যে, সে নিজের কাজ নিজে করিতে চায়, সে আত্মনির্ভরশীল। ইহার প্রমাণ প্রত্যেক সুস্থ শিশুর আচরণে পাওয়া যায়। সে টলিতে টলিতে চলিয়া বারবার পড়িয়া গেলেও সর্ব্বদা কোলে থাকিতে চায় না, নিজের সব কাজ অকাজ ত নিজে করেই, অধিকন্তু গৃহকর্ম্মও করিতে গিয়া পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের কাজ এত বাড়াইয়া দেয়, যে, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তাহার কর্ম্মিষ্ঠতার সাময়িক কিছু হ্রাস কামনা করিতে বাধ্য হন।

কোন মানুষের পক্ষেই সর্ব্বদা অপরের যত্ন পাওয়া, অন্যের নিকট হইতে সর্ব্বদা উপকার লাভ হিতকর ও বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে শুধু যে তাহার নিজের শক্তি-বিকাশের, স্বাবলম্বী হইবার, বাধা জন্মে, তাহা নহে ; ইহা দ্বারা তাহার মনুষ্যত্ব অপমানিত হয়। যে যে-পরিমাণে অক্ষম, সে সেই-পরিমাণে অপরের নিকট হইতে যত্ন ও উপকার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অল্পবয়স্ক ও অতিবৃদ্ধ মানুষদের পক্ষে ইহা আবশ্যক, এবং তাহাতে তাহাদের কোন অপমান নাই। কিন্তু সমর্থ বয়সের সকল নরনারীর পক্ষে অন্যের যত্ন ও উপকার চাওয়া ও পাওয়া অপমানের বিষয়। ইহাতে তাহাদের মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা হয়। অবশ্য, একবিধ সেবার বিনিময়ে অন্যবিধ সেবা লাভে এরূপ অমর্য্যাদা নাই। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, জাতির পক্ষেও তাহা সত্য। ভারতীয় জাতি চিরকাল শিশুর মত বা অথর্ব্ব অতিবৃদ্ধের মত লালিত পালিত হইতে বা সেবা শুশ্রূষাধীন থাকিতে রাজী হইতে পারে না। যদি ইংরেজ-শাসন সুশাসন হয়, তাহা হইলেও ইহা স্বশাসন নহে বলিয়া ইহা আমাদের মনুষ্যত্বের পক্ষে অপমানকর এবং স্বাবলম্বন-বিকাশের পরিপন্থী বলিয়া অনিষ্টকর।

বস্তুতঃ পরশাসন বাহ্য সব বিষয়ে হাজার ভাল বা নিখুঁত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে সুশাসন নামের যোগ্য হইতে পারে না। কারণ, সুশাসন তাহাই, যাহা মানুষকে বাহিরে ও অন্তরে প্রকৃত মানুষ হইতে দেয় ও হইতে সাহায্য করে। মানুষের কেবল শরীরটা সুস্থ সবল হইলেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ঘটে না ; তাহার নিজের সব

কাজ নিজে করিবার শক্তি, প্রবৃত্তি ও সাহস জন্মিলে, সে স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরপ্রিয় ও স্বকর্ম্মসাধক হইলে, তবে তাহাকে অন্তরে ও বাহিরে মানুষ বলিয়া স্বীকার করা যায়। যে শাসন-প্রণালীতে মানুষ এইরূপ হইতে পারে, তাহাই সু-শাসন। স্ব-শাসন, স্ব-রাজ এইরূপ শাসন-প্রণালী। এইজন্ত আমরা স্বরাজ চাই।

স্ব-শাসনের প্রশংসা অনেক পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞ করিয়াছেন। ইংরেজ স্তার হেন্‌রী ক্যাম্বেল-ব্যানারম্যান বলিয়াছেন, "সুশাসনকে কখনও স্ব-শাসনের সমতুল্য ও স্থলাভিষিক্ত মনে করা যাইতে পারে না।" আর্থার জেম্‌স্ ব্যালফুর বলিয়াছেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, (শাসন-প্রণালী নামের যোগ্য) কেবল এক রকম শাসন-প্রণালী আছে, তাহার নাম যাহাই হউক; তাহা সেই প্রণালী যাহাতে শেষ কর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে।"* আমেরিকার বিখ্যাত দেশপতি আব্রাহাম লিঙ্কন্ বলিয়াছেন, "কোন জাতিরই অপর কোন জাতিকে শাসন করিবার উপযুক্ত সাধুতা ও বিজ্ঞতা নাই।"

স্বরাজের আবশ্যকতা দেখাইলাম। এখন, আমরা স্বরাজের যোগ্য কিনা, তাহার আলোচনা করিব।

রাষ্ট্রীয় কাজের দুটা স্থূল বিভাগ আছে; এক যুদ্ধ-বিষয়ক, অপর যুদ্ধ ছাড়া অন্ত সব রকমের। প্রথমে সিবিল বা অসামরিক বিভাগের বিষয় বলি।

অসামরিক ছোট ও বড় যে-কোন রকম কাজে দেশী লোকেরা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহারা আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এক এক রকমের কাজের আলাদা আলাদা উল্লেখ করিয়া ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজ জাতি আমাদের স্বরাজ লাভের বিরোধী। কিন্তু তাহারাও বলে না, যে, আমরা সিবিল বা অসামরিক সব রকম কাজের অনুপযুক্ত। তাহাদের একটা প্রধান আপত্তি এই, যে, আমরা বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা করিতে পারিব না। এই আপত্তিটিরই বিচার এখন করিব।

স্বদেশরক্ষার কাজ নানা উপায়ে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। একটি উপায় নানা জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন ও সদ্ভাব রক্ষা করা। ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ করিলে কেন যে প্রতিবেশী ও দূরবর্ত্তী জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিতে ও সদ্ভাব রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহার কোন কারণ নাই। আমরা কোন দেশকে আক্রমণ করিতে, জয় করিতে, লুণ্ঠন করিতে চাই না; কোন জাতিকে পদানত করিতে ও তাহাদের শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস করিয়া নিজেদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য তাহাদের দেশে বিক্রী করিয়া ধনী হইতে চাই না। সুতরাং আমরা ইচ্ছা করিয়া বা জ্ঞাতসারে কোন জাতির মনে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব জন্মাইব না, ইহা নিশ্চিত। এই কারণে আমাদের পক্ষে অন্ত বিদেশী জাতিদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা সহজ হইবে।

প্রায়ই শুনা যায়, যে দেশ ও জাতির বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি নাই, স্বাধীন বা স্বশাসক হইবার ও থাকিবার তাহার অধিকার নাই। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নহে, আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য মাত্র। আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকা অবশ্য খুবই বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশে—এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপে—বিস্তর দেশ ও জাতি আছে যাহারা প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে কখনই একা একা আত্ম-রক্ষা করিতে পারে না। তাহাদের নাম করিবার প্রয়োজন নাই, পাঠশালার ভূগোলপাঠক ছাত্রেরাও তাহা জানে। কেবল যে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের বাসভূমি এই সব দেশই একা একা আত্মরক্ষায় অসমর্থ তাহা নহে; বিগত মহাযুদ্ধে দেখা গিয়াছে, যে, কোন পক্ষের কোন শক্তিশালী দেশও একা যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিবার আশা করেন নাই। জার্ম্যানী যেমন বন্ধু জুটাইয়াছিলেন, ফ্রান্সও তেমনি বন্ধু জুটাইয়াছিলেন। ফ্রান্স ইংলণ্ড প্রভৃতি যে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছিলেন, তাহাও আমেরিকার সাহায্যে। আমেরিকা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না

* "We are convinced that there is only one form of government, whatever it may be called, namely, where the ultimate control is in the hands of the people." —*A. J. Balfour*.

হইলে এবং প্রভূত অর্থ-সাহায্য না করিলে জার্ম্মানদের জয়ী হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল। অতএব যদি একথা সত্য হয়, যে, ভারতবর্ষ একা বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, তাহা হইলেও তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না, যে, ভারতবর্ষের স্বাধীন হইবার ও থাকিবার অধিকার নাই। কারণ এই যুক্তি অনুসারে—ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি একা একা আত্মরক্ষায় অসমর্থ বলিয়া—ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতিরও স্বাধীনতায় অধিকার নাই। বস্তুতঃ, তর্কশাস্ত্র অনুসারে এই যুক্তির অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বড় বড় কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিজ্ঞ, বণিক্, মহাজন প্রভৃতি কেহই ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী থাকিতে পারেন না; তাঁহাদের সকলকে—অন্ততঃ অধিকাংশকে,প্রসিদ্ধ দস্যু, মুষ্টিযোদ্ধা, পালোয়ান, গুণ্ডা, প্রভৃতির অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। কেননা, প্রথমোক্ত কবি প্রভৃতি শেষোক্ত মুষ্টিযোদ্ধা প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ।

গত মহাযুদ্ধে অন্যান্য স্বাধীন জাতি যেমন মিত্রজাতির সাহায্য পাইয়াছে, ভারতবর্ষও আক্রান্ত হইলে তাঁহার মিত্র জাতির সাহায্যের আশা করিতে পারে। স্বাধীন ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডেরও সাহায্য করা উচিত হইবে—ইংলণ্ড সাহায্য করিবে কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র। বেলজিয়মের দ্বারা ফ্রান্সের দ্বারা, ইংলণ্ড ধনশালী ও শক্তিশালী হয় নাই; অথচ ইংলণ্ড যুদ্ধে তাহাদের সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ ভারতবর্ষের দৌলতে ইংলণ্ড ধনী ও শক্তিশালী। অতএব, প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ড যদি স্বাধীন ভারতের সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাহা ঘৃণ্য নিমকহারামী হইবে।

যাহা হউক, যদি ভারতবর্ষকে যুদ্ধ করিয়াই আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা উচিত তাহার যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে কিনা।

যুদ্ধ করিতে হইলে টাকা খরচ করিতে পারা চাই। জাপান পৃথিবীর সকলের চেয়ে শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে একটি। জাপানের বার্ষিক সামরিক ব্যয় কত? ১৯২৬-২৭ সালে জাপান স্থলসৈন্যদলের জন্য ১৬, ৮৪, ৩৬, ৯৮০ ইয়েন এবং রণতরী বিভাগের জন্য ১২, ৬৬, ৭২, ৬০৫ ইয়েন, মোট ২৯, ৫১, ০৯,৫৮৫ ইয়েন খরচ করিয়াছিল; অর্থাৎ মোটামুটি ত্রিশ কোটি ইয়েন খরচ করিয়াছিল। এক ইয়েন প্রায় দেড়টাকার সমান। তাহা হইলে ১৯২৬-২৭ সালে জাপানের মোট সামরিক ব্যয় ৪৫ কোটি টাকা। ঐ সালে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় হইয়াছিল ৫৯,১১,৭৯,০০০ টাকা। এই ব্যয় শুধু স্থলসৈন্যের জন্য। জাপান যত ব্যয় করিয়া জলে ও স্থলে প্রবলতম জাতিদের সমকক্ষতা করে, ভারতবর্ষ শুধু স্থলসৈন্য বিভাগের জন্যই তাহা অপেক্ষা প্রায় ১৫ কোটি টাকা বেশী খরচ করে। ৬০ কোটি অপেক্ষাও বেশী খরচ ভারতবর্ষ অনেক বৎসর করিয়াছে। গোরা সৈন্য ও গোরা অফিসারদের জন্য খুব বেশী খরচ হয় বলিয়া জাপানের চেয়ে বেশী খরচ করিয়াও ভারতবর্ষের সামরিক শক্তি তাহার চেয়ে কম। মহাযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ায় ভারতীয় সেনাবিভাগের শোচনীয় ও লজ্জাকর বেবন্দোবস্ত ধরা পড়িয়াছিল। এখনও যে বন্দোবস্ত খুব ভাল তাহা নহে। গত ২০শে মার্চ্চের সাপ্তাহিক পাইয়োনীয়ারে লেখা হইয়াছে—

"......as a matter of fact the *Pioneer* believes that not only is the army in India and the Indian army deficient in war stores, but is also compelled to do its training with poor rifles, old machine guns, decrepit Lewis guns, and transport which exists on paper alone."

ভারতবর্ষ টাকা দেয় না, বা দিতে পারে না বলিয়া যে এই দুর্দ্দশা তাহা নহে, প্রভু ইংরেজদের অকর্ম্মণ্যতা, বেবন্দোবস্ত, অত্যধিক বেতন গ্রহণ, অমিতব্যয়িতা ইত্যাদি ইহার কারণ।

সামরিক বিভাগের জন্য জাপানের বাৎসরিক খরচ ছাড়া অবশ্য যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ ইত্যাদির জন্যও আলাদা এককালীন ব্যয় আছে। ভারতবর্ষও তাহা করিতে সমর্থ। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারত ইংলণ্ডকে দেড়শত কোটি টাকা "স্বেচ্ছায়" দান করিয়াছিল। তাহা ছাড়া বহু বহু শত কোটি টাকার যুদ্ধ-সামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়াছিল। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্যও ভারতবর্ষ ঐরূপ—উহা অপেক্ষাও বেশী, খরচ করিতে পারিবে।

ভারতবর্ষের সিপাহীরা যে সাহসে ও রণকৌশলে অন্য কোন দেশের সৈনিকদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, বহুসংখ্যক

ইংরেজ সেনাপতি সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাহার মধ্যে কেবল একজনের কথা উদ্ধৃত করিলেই চলিবে। রুশিয়ার সহিত যখন জাপানের যুদ্ধ হয়, তখন ইংরেজ লেফ্‌টেন্যান্ট-জেনারাল স্যার আয়ান হ্যামিল্টন জাপানী সেনাদলের সহিত ছিলেন। "A Staff Officer's Scrap Book During the Russo-Japanese War" নামক পুস্তকে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"Every thinking soldier who has served on our recent Indian campaigns is aware that for the requirements of such operations a good Sikh, Pathan or Gurkha battalion is more generally serviceable than a British battalion.......For every thing in fact that takes place in those mountains, except a definite attack on a definite position, the best native troops, being more in touch with nature, can give points to the artificially trained townsmen who now form so large a proportion of our men." Vol. I, p. 7.

"All this is supposed to be a secret, a thing to be whispered with bated breath, as if every sepoy did not already know who does the rough and dirty work, and who, in the long run, does the hardest fighting. Nevertheless, these very officers who know will sit and solemnly discuss whether our best native troops would, or would not, be capable of meeting a European enemy! Why—there is material in the north of India and in Nepaul sufficient and fit, under good leadership, to shake the artificial society of Europe to its foundations if once it dares tamper with that militarism which now alone supplies it with any higher ideal than money and the luxury which that money can purchase." Vol. I, p. 8.

এই সৈনিক-লেখকের গুর্খাদের সম্বন্ধেই বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। এই জন্য তিনি জাপানী সৈন্যদের সহিত গুর্খাদের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"The resemblance between Gurkhas and Japanese is more than skin-deep.......These Japanese soldiers were surely Gurkhas, better educated, more civilized; on the other hand, not quite so powerful or hardy." Vol. I, pp. 9-10.

ভারতবর্ষে স্যার আয়ান্ হ্যামিল্টনের সামরিক অভিজ্ঞতা উত্তর-ভারতীয় সৈন্যদের সম্বন্ধেই থাকায় তিনি অন্য সিপাহীদের সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই। তাহাদের মধ্যেও সাহস ও যুদ্ধকৌশল যথেষ্ট আছে। যাহা হউক, ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে শুধু উত্তর-ভারতীয় সৈন্যই যথেষ্ট হইবে।

জেনারাল হ্যামিল্টন লিখিয়াছেন, যে, কোন কোন ব্রিটিশ অফিসার সন্দেহ করেন, যে, ভারতীয় সিপাহীরা ইউরোপীয় শত্রুর সম্মুখীন হইয়া লড়িতে পারিবে কিনা। এই সন্দেহ ভঞ্জন গত মহাযুদ্ধে হইয়া গিয়াছে। মার্নের যুদ্ধে এবং ফ্রান্সে ও ফ্ল্যাণ্ডার্সে আরও অনেক যুদ্ধে সিপাহীরা প্রথিতযশা জার্ম্যান সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছে; পূর্ব্ব-আফ্রিকাতেও তাহারা তাহা করিয়াছে। ভিক্টোরিয়া ক্রস্ লাভ ব্রিটিশ সেনাদলের সর্ব্বোচ্চ সম্মান। ভারতীয় সিপাহীর ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়াছে। আকাশ-যুদ্ধে ইন্দ্রলাল রায় একাধিক জার্ম্যান্ এয়োপ্লেন ভূপাতিত করেন। অতএব সুযোগ পাইলে ভারতীয়েরা ইহাতেও দক্ষতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ। আধুনিক সময়ে জলযুদ্ধে শৌর্য্য দেখাইবার কোন সুযোগ ভারতীয়েরা পায় নাই। কিন্তু অতীত কালে তাহারা জাভা প্রভৃতি সুদূর দ্বীপে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, এবং শিবাজীর রণতরী ও আংগ্রের রণতরী কম শক্তিশালী ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে লস্করেরা যুদ্ধ করিতে না পাইলেও ঝড়-তুফানে ও অন্য বিপৎপাতে জাহাজী গোরাদের সমান সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করে। সুতরাং জলযুদ্ধ করিবার লোকও যথেষ্ট পাওয়া যাইবে।

সেনানায়কের কাজ করিবার মত লোক পাওয়া যাইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হইতে পারে। পুরাকালে ভারতবর্ষ সেনাপতিদের শৌর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। আলেকজাণ্ডার দেশ জয় করিতে করিতে ভারতবর্ষের মত সমৃদ্ধ দেশে পৌঁছিয়া হঠাৎ সাত্ত্বিকভাববুদ্ধি-বশতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, মনে করিবার কারণ নাই। পঞ্জাবে ছোট ছোট রাষ্ট্রের সহিত লড়িয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে, পারস্য আফ্‌গানিস্থান জয় করা যত সোজা হইয়াছিল, ভারতবর্ষ জয় করা তত সোজা হইবে না। ইহা তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের অন্যতম কারণ বলিয়া আমরা অনুমান করি। তাহা সত্য না হইলেও, পরে বাহ্লীয় গ্রীক, শক প্রভৃতি শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে

সৈন্য ও সেনাপতির অভাব ভারতে হয় নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শিখ বহু বহু বিখ্যাত সেনাপতির জন্মস্থান ভারতবর্ষ। এখানে সেনাপতির অভাব হইবে না। সিপাহী যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত কোম্পানীর সেনাদলে দেশী অফিসারদের অধীনে অনেক সময় গোরা সৈন্যেরা যুদ্ধ করিত। স্কীন্ কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন, যে, ২৫ বৎসরে ভারতীয় সৈন্যদলের অর্দ্ধেক অফিসার বা সেনা-নায়ক যেন দেশী হয়, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে, ভারতবর্ষে সামরিক নেতৃত্ব করিবার লোক যথেষ্ট আছে। ৩২ কোটি মানুষের দেশে অর্দ্ধেক অফিসার পাওয়া সম্ভবপর বলিয়া যখন স্বীকৃত হইয়াছে, তখন বাকী অর্দ্ধেকও পাওয়া যাইবে।

একটা আপত্তি উঠিতে পারে, যে, ইংরেজ মনিবদের জন্য যে সিপাহীরা লড়ে, তাহারা স্বরাজের আমলে দেশী মনিবদের জন্য লড়িবে না। এটা বাজে আপত্তি। কারণ, এখন যাহারা টাকার জন্য লড়ে, তখনও তাহারা টাকার জন্য লড়িবে। এখনও দেশী রাজাদের জন্য সিপাহীরা লড়ে। বস্তুতঃ, তখন তাহাদিগকে কোন মনিবের জন্য লড়িতে হইবে না। তখন অন্য সব লোকদের মত, দেশটা সিপাহীদেরও স্ব-দেশ হইবে। তাহারা স্বদেশের জন্য লড়িবে। দেশে যদি গণতান্ত্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে অবস্থা ঠিক্ ঐরূপ হইবে। কিন্তু অন্য রকম স্বরাজ প্রতিষ্ঠা খুব সম্ভবপর না হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। মনে করুন, দেশে মুসলমানপ্রধান স্বরাজ স্থাপিত হইল। তাহা হইলেও যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সেনাপতি ও সিপাহী পাওয়া যাইবে। আকবরের অনেক হিন্দু সেনাপতি ও সিপাহী ছিল, আওরংজেবেরও ছিল; অন্যান্য নবাব বাদশাহদেরও ছিল। যদি দেশে হিন্দুপ্রধান স্বরাজ স্থাপিত হয়, তাহা হইলেও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সেনাপতি ও সিপাহী পাওয়া যাইবে। হিন্দু স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর সৈন্যদলে অনেক মুসলমান সেনাপতি ও সিপাহী ছিল, অন্য অনেক হিন্দু নৃপতিরও ছিল।

যোদ্ধৃ জাতির লোকেরা অযোদ্ধা শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে না, এরূপ আপত্তিরও কোন মূল্য নাই। ইংরেজরা সাধারণতঃ বাঙালীদিগকে ভারতবর্ষের মধ্যে যোদ্ধা জাতিদের সর্ব্বাপেক্ষা অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। কিন্তু রাজপুতানা, বড়োদা, মহীশূর, পঞ্জাব, কাশ্মীর, নেপাল, প্রভৃতি নানা অঞ্চলে উচ্চ, উচ্চতর বা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত কোন বাঙালী যোদ্ধা জাতির লোকদিগকে নিজের আজ্ঞা পালন করাইতে পারেন নাই, এরূপ শুনা যায় নাই। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতেও এরূপ দৃষ্টান্ত নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় যে-সব শিক্ষিত বাঙালী যুবক অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈন্যদলে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের শিক্ষাদাতা পাঠান প্রভৃতি কর্ম্মচারী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত বলিয়া আমরা অবগত আছি। বাঙালীর প্রতি যোদ্ধা জাতিদের আত্যন্তিক অবজ্ঞার কথা যে সত্য নহে, অন্ততঃ তাহাদের অধীনে যোদ্ধা জাতির লোকদের কাজ করিতে অনিচ্ছা যে সত্য নহে, তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই আছে, যে, বাঙালীর বাড়ীতে এবং জমিদারীতে অনেক শিখ গুর্খা প্রভৃতি রক্ষী প্রভৃতিরা কাজ করিয়া থাকে। যাহা হউক, যদি যোদ্ধা-জাতির লোকদের শিক্ষিত বাঙালী প্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে সত্য সত্যই আপত্তি থাকে (যাহা নাই বলিয়া আমরা জানি ও প্রমাণ করিলাম), তাহা হইলেও কাজ চলিবার কোন বাধা হইবে না। কারণ, পাঠান শিখ গুর্খা রাজপুত প্রভৃতি শ্রেণীর অনেক গ্রাজুয়েট পাওয়া যায়; ভবিষ্যতে তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়িবে।

ভারতে স্বরাজ স্থাপনের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই, যে, এদেশে নিরক্ষর লোকদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু যখন লিখনপঠন বিদ্যা উদ্ভাবিত হয় নাই, সেই স্মরণাতীত পুরাকালে সব দেশের সব মানুষই নিরক্ষর ছিল। কিন্তু তখন ত নিরক্ষর মানব জাতিকে শাসন করিবার জন্য অন্য কোন কোন গ্রহ হইতে লিখনপঠনক্ষম শাসক জীব পৃথিবীতে আমদানী করা হইত না; নিরক্ষর মানুষরাই নিজেদের দেশের সব কাজ চালাইত। সভ্য যুগেও আকবর, শিবাজী প্রভৃতি নৃপতি লেখাপড়া জানার জন্য বিখ্যাত ছিলেন না। আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরাও একেবারে অশিক্ষিত ও নির্ব্বোধ নহে; যাত্রা কথকতা ইত্যাদি নানা উপায়ে তাহাদের হৃদয়মনের কতকটা উৎকর্ষ

স্থাপিত হইয়াছে। আমরা লেখাপড়া জানার মূল্য বুঝি এবং তাহার খুব পক্ষপাতী। কিন্তু নিরক্ষর হইলেই মানুষকে বানর করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। স্মরণাতীত কালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই মধ্যে গিলবার্ট ও এলিস্ দ্বীপপুঞ্জের নগণ্য লোকদের মধ্যে হোম্ রূল্ বা স্বরাজ প্রচলিত আছে। আবিসীনিয়া, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা খুব বেশী, কিন্তু তাহারা স্বাধীন।

ভারতবর্ষ যে এখন প্রধানতঃ নিরক্ষরের দেশ, তাহার জন্য দায়ী কে? দায়ী ইংরেজ। সরকারী কাগজ পত্র ও অনেক ইংরেজের বহি হইতে জানা যায়, যে, কোম্পানীর রাজত্বের পূর্ব্বে এবং তাহার প্রথম যুগে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে সাধারণ লেখাপড়ার বিস্তার এখনকার চেয়ে বেশী ছিল, যদিও তখন আধুনিক রকমের উচ্চ শিক্ষা মোটেই প্রচলিত ছিল না। এই বিষয়টির বিস্তারিত বৃত্তান্ত মেজর বামনদাস বসু প্রণীত কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস (*History of Education in India under the Rule of the East India Company*) নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। কোম্পানীর আমলের পূর্ব্বে বঙ্গে ৮০০০০ বিদ্যালয় ছিল—প্রতি চারি শত অধিবাসীর জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। এইগুলি সাধারণতঃ পাঠশালা ছিল। ১৯২৫-২৬ সালে বঙ্গে পাঠশালা ছিল ৩৭১৩৪টি, এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠশালা পর্য্যন্ত মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ৪২৫৯৪টি। বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২। অতএব এখন প্রতি ১১১৭ জন অধিবাসীর জন্য একটি করিয়া শিক্ষালয় আছে; আগে প্রতি ৪০০ জনের জন্য একটি করিয়া বিদ্যালয় ছিল। অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধেও কতকটা এই প্রকার তথ্য পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে আছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, আগেকার চেয়ে এখন এদেশে আধুনিক রকমের উচ্চ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণ লেখা পড়া ও হিসাবের জ্ঞানের বিস্তার কমিয়াছে। শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্ণেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। গোখলে যখন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য আইন করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী প্রতিকূলতায় সে আইন পাস্ হয় নাই। পরেও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এরূপ আইন প্রণয়নে গবর্ণেণ্টের সম্পূর্ণ ও আন্তরিক সহায়তা পাওয়া যায় নাই। যুদ্ধের জন্য, যুদ্ধ বিভাগের জন্য, পুলিস ও শাসন বিভাগের জন্য, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়াইবার জন্য সব সময়েই যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের কথা উঠিলেই অর্থাভাব ঘটে ও জনসাধারণকে নূতন ট্যাক্স দিতে বলা হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় গরীব ভারতবর্ষকে ১৫০ কোটি টাকা "স্বেচ্ছায়" দান করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সরকারী শিক্ষাব্যয় যত আছে, তাহার উপর এই ১৫০ কোটি টাকার সুদটা দিলে সমগ্র দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া চলিত। কিন্তু যুদ্ধের জন্য কোটি কোটি টাকা ধার করা চলে, শিক্ষার জন্য চলে না।

স্বরাজের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিবার বেলা ইংরেজ নিরক্ষর লোকদিগকে অযোগ্য বলেন; তখন লেখাপড়ার জ্ঞান বড় মূল্যবান্ বিবেচিত হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার যে সব গুণ দেখিয়া লোককে দেওয়া হয়, লিখনপঠনক্ষমতা তাহার অন্তর্গত নহে; এমন কি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগকে যে লিখন-পঠনক্ষম হইতেই হইবে, একথাও কোন আইনে স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া লেখা নাই! লেখাপড়া জানার এতই আদর! সেই জন্য ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেবের ভূমিকা সমেত সিবিলিয়ান হ্যামণ্ড সাহেবের লেখা ব্যবস্থাপকনির্ব্বাচন বিষয়ক (*The Indian Candidate and Returning Officer* নামক) পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় অশিক্ষিত চাষার ("uneducated rustic"এর) ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা উল্লিখিত হইয়াছে।

ইংরেজরা নিজের দেশে নিরক্ষরতাকে রাষ্ট্রীয় অধিকার বিস্তারের একটা বাধা বলিয়া কখনও মনে করেন নাই। দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৮৬৭ সালে যখন নূতন আইন করিয়া বিলাতের বিস্তর লোককে পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়, তখন অনেক নিরক্ষর লোক

তাহা পায়। তাহার পর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শেরব্রুক বলেন, আমাদের মনিব (অর্থাৎ নির্ব্বাচক)-দিগকে এখন এ বি সি শিখাইতে হইবে। অর্থাৎ তাহারা আগে স্বরাজ পাইল, তাহার পর তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার কথা উঠিল। এদেশে কিন্তু ইংরেজ বলিতেছেন, তোমরা আগে লেখাপড়া শিখ, তাহার পর স্বরাজের কথা বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, আমরা স্বরাজ পাইলে জাপান, কানাডা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, রুশিয়া প্রভৃতির মত অচিরে দেশে খুব বেশী শিক্ষা বিস্তার করিতে পারিব।

আমরা আগেই বলিয়াছি, যে, এদেশে নিরক্ষর লোক-দিগকেও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায়, যে, ইংরেজদের প্রকৃত মত এই, যে, নিরক্ষর লোকেরাও ইহা যথাযোগ্য ভাবে করিতে পারে। সভ্য জগৎ ও সভ্য রাষ্ট্রের জটিল নানা কাজ চালাইবার জন্য অবশ্য শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। বর্ত্তমানেই সেরূপ যথেষ্টসংখ্যক লোক ভারতবর্ষে আছে, পরে আরও বাড়িবে। দেশভাষার লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা দুকোটির উপর, ইংরেজী লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা ২৫ লক্ষের উপর। ইহাদের দ্বারা দেশের সর্ব্ববিধ কাজ উত্তমরূপে চলিতে পারে। আফ্রিকার ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত নানা বৃহৎ দেশে শিক্ষিত শ্বেতকায়দের সংখ্যা খুব কম, অশিক্ষিত কৃষ্ণকায়দের সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু সেইসব দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত, তথাকার অল্পসংখ্যক শ্বেতকায়েরা দেশের সব কাজ চালাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হন ;— যদিও তাঁহাদের ভাষা, ধর্ম্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার কৃষ্ণ-কায়দের হইতে ভিন্ন। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের ভাষা, ধর্ম্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার ভিন্ন না হইলেও শিক্ষিতেরা দেশের সব কাজ চালাইবার যোগ্য বিবেচিত হন না ; এই দেশ স্বরাজের যোগ্য বিবেচিত হয় না!

আগামী সংখ্যায় আর একটি প্রবন্ধে আমাদের স্বরাজের যোগ্যতা সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করিব।

জীবন-স্মৃতি

রম্যা রলাঁ

অন্তর্লোক-যাত্রা [Voyage Interieure]

পাশাপাশি দুইটি জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি বরাবর। একদিকে আমি একটা মানুষ-জাতি, বংশের উপাদানে গড়া, খণ্ড দেশে খণ্ড কালে রূপায়িত, অন্যদিকে আমি একটা সত্তা, যার নাম নাই, রূপ নাই, দেশ নাই, কাল নাই— যাহা বিরাট প্রাণের অংশ ও স্পন্দন-তরঙ্গ। দুইটি পৃথক অথচ পরিণীত চেতনা। একটি চঞ্চল ও ক্ষণভঙ্গুর, অন্যটি গম্ভীর ও অচঞ্চল। প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া চলিয়াছে। শৈশব-যৌবনের অধিকাংশ, এমন কি, কর্ম্মময় জীবন, ভোগোন্মাদনার জীবনেরও অনেকটা এমনই আচ্ছন্নভাবে কাটিয়া গেল। হঠাৎ মাঝে মাঝে মাটি যেন ফাটিয়া গিয়াছে—কাজের দিনের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া সেই অন্তঃসলিলা চেতনার উৎসধারা দীপ্ত নৃত্যে বাহির হইয়াছে, কিন্তু সে ত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ; পরক্ষণেই তাহা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে,— পৃথিবীর শুষ্ক ওষ্ঠ তাহার সবটুকু নিঃশেষে পান করিয়া লইয়াছে। তবু স্বীকার করিব, সেই উৎস-মুখ আত্মিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ও জীবনে উপর্য্যুপরি নিষ্ঠুর আঘাতের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছে। পাতাল-গঙ্গার ন্যায় আত্মার আভ্যন্তরীণ স্রোত ভীষণ বেগে ধাক্কা দিয়াছে ; প্রচ্ছন্ন সত্তা তার শাশ্বত স্রোতটিকে অবাধে প্রবাহিত করিয়াছে।

রল্ঁা পরিবার

সেই পূত অগ্নি-অভিষেক জীবনে তিনবার হইয়াছে; তিনবার বজ্র-নির্ঘোষ! বিদ্যু-দীপ্তির মত তাহা আসিয়াই মিলাইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার সম্মোহন আজও মিলায় নাই—এ শরীর ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা মিলাইবে না। সুইস সীমান্তে ফরাসী দেশের একটি কোণে—যেখানে ভল্‌টেয়ার থাকিতেন সেই স্থানে— Ferney ভবনের ছাদে প্রথম বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। দ্বিতীয় বার সে স্পিনোজার (Spinoza) অগ্নিমন্ত্র এবং তৃতীয়বার রাত্রির অন্ধকারে পর্ব্বত-সুড়ঙ্গ বাহিয়া যাইতে যাইতে টলষ্টয়ের বজ্রবাণী।
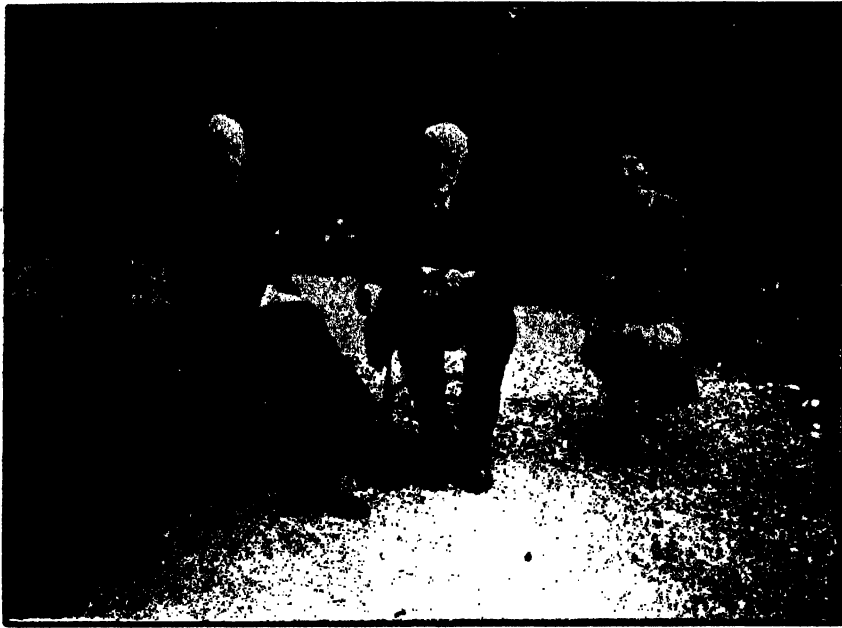
আজ নিখিল প্রাণের সঙ্গে অপরোক্ষ যোগ অনুভব করি। কিন্তু এই অবস্থায় আসিবার পূর্ব্বে ঐ বিরাট প্রাণ-স্রোতের আভাস পাইয়াছি—কখনও নিকটে, কখনও দূরে থাকিয়া ইহার সঙ্গে খেলা করিয়াছি; শুনিয়াছি, সে আমার জীবনধারার সঙ্গে যেন নৃত্য করিতে করিতে কত বন গিরি অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছে,—এবং দূরে, সুদূরে থাকিয়া যখন ইহার কথা প্রায় ভাবি নাই তখন হঠাৎ কোথা হইতে সেই অলথ স্রোতের তাণ্ডব নৃত্য (irruptions mystiques des flots) প্রচণ্ড আঘাতে আমাকে পাড়িয়া ফেলিয়াছে।

প্রথমেই এখানে বলিয়া রাখি আত্মার অন্তস্তল ভেদ করিয়া ঐ উৎক্ষিপ্ত স্রোত জীবনে তিনবার আমাকে আমার লুকান দেবতার স্পর্শ মিলাইয়া দিয়াছে। কি ভীষণ সেই স্পর্শ! জগতের মর্ম্মস্থলে যে অগ্নি ধ্বক্‌ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে, সেই অগ্নির তরল স্রোত যেন আমার শিরায় শিরায় কে ঢালিয়া দিল। সেই দাহনের চিহ্ন আজও এই বার্দ্ধক্য-জীর্ণ আঘাত-জর্জ্জর শরীরে তেমনই প্রকট,—সেই সুদূর অতীতে তরুণ উত্তপ্ত যুবক শরীরে যেমন বসিয়া গিয়াছিল।

মধ্য ফ্রান্সের নিভারনে (Nivernais) প্রদেশে শৈশব কাটাইয়াছি। সৌজন্য ও সঙ্গীতমুখর সেই স্থানটির চিত্র আমার Colas Breugnonতে আঁকিয়াছি; এই গদ্য কাব্যটি হাসির রঙে লেখা; প্রাচীন ফ্রান্সের ওস্তাদ কারিগরদের ছাঁচ Colas, তার গতি-বন্ধুর জীবনের সকল পরীক্ষার মধ্যে তার জাতীয় gallic হাস্য ও অদম্য খোস-মেজাজ বজায় রাখিয়া নিভারনের উৎসবভোজাদি যেন চাখিয়া চাখিয়া আসর জমাইয়া তুলিয়াছে। আজ ভাল করিয়া মনে পড়ে না—আমর সকল প্রয়োজন কেমন করিয়া ঐ ক্ষুদ্র জগৎটি মিটাইয়াছিল। এখন মনে হয়, সেখানকার প্রাকৃতিক শোভাই আমার মন ভরাইয়া দিত, কিন্তু সেখানকার মানুষ আমায় ততটা টানিত না; তাদের হাস্যোজ্জ্বল সরল মুখ, খাটো অথচ চোপা গড়ন, স্নিগ্ধ সুনীল চোখ আমার ভাল লাগে; আমার বাবা একে-বারে এই ছাঁচে গড়া। তবু স্বীকার করিতেই হইবে যে,

সেই প্রাদেশিক কোণটিতে মনের খোরাক মিলিত না—সবটা কেমন যেন ঘুমে আচ্ছন্ন—এখানে বাসা বাঁধিলে বেজার হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের গ্রামখানির (Breves গ্রামে রলা। পরিবার বসতি করিয়াছিলেন) শোভা শৈশবের বন্ধুদের সঙ্গে বসিয়া উপভোগ করিয়া যেন আশ মিটিত না; সেই পাহাড়, নদী, বন, মাঠ, সেই পাটকিলে ও রাঙ্গা মাটি—সবটা জলের মধ্যে যখন প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিতাম মনে হইত এমন সুডোল, সুসঙ্গত তনুভঙ্গিমা কোন পল্লীর দেখি নাই! বারগাণ্ডীর (Burgundy) Auxerre সহরের নিকটে ছিল আমার মামার বাড়ী। এখানে দাদামশায়ের জমিজমা যেটুকু ছিল শৈশবে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতাম। সেই সময়কার সুমধুর স্মৃতি এখনও চক্ষের সম্মুখে যেন ভাসিতেছে—সে-মাধুর্য্য আস্বাদ করিয়া করিয়া আজও যেন আশ মিটে না। গ্রীষ্মকালে দাদামশায়ের বাড়ী যাইতাম; মৌমাছির ঝাঁক, দেবদারু গাছ—রৌদ্রে তার গা বাহিয়া আঠা ঝরিতেছে, নদীর ছপছপ শব্দ, তার সঙ্গে ছন্দ রাখিয়া মাঠে পাটল গরুগুলি কচ কচ করিয়া ঘাস চিবাইতেছে,—প্রত্যেকটি ছবি যেন এখনও দেখিতেছি। আমার জিভে, চোখে, নাকে, কানে, হাতে সেই স্বাদ, সেই রূপ, সেই গন্ধ, সেই লতাপল্লবের কল-সঙ্গীত, সেই মধু, সেই উষ্ণ-রস-স্নিগ্ধ মাটি যেন লাগিয়া আছে, আমার শরীরটাকে যেন চির-আপ্লুত করিয়া আছে। আট বছর বয়সে পিতার হাত ধরিয়া Clamceyর পথ বাহিয়া মধ্য রাত্রে ঠাকু'মার বাড়ী হাজির হইতাম; তিনি অবাক্ হইয়া যাইতেন। ছোট ছোট পা ফেলিয়া গ্রীষ্মের রাতে হাঁটিতাম, স্নিগ্ধ রাত্রি তার অন্ধকারেরপক্ষ-পুটে যেন আমাকে জড়াইয়া ধরিত—আঃ, সেই নক্ষত্রখচিত আকাশের গভীর প্রশান্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাকে ডুবাইয়া রাখিবে।

এখনও স্মৃতির গহ্বরে একটু অন্বেষণ করিলে সেই সব জিনিষ খুঁজিয়া পাই, সেই রাত্রির ঐক্যতানে আঁধার-বীণার মৃদুতম ঝঙ্কার, চাঁদের আলোয় একটা বাদাম-গাছের ভীষণ ছায়া, (আলো না ছায়া—কোন্‌টাতে বেশী অভিভূত হইতাম জানি না), ক্ষেতের ইঁদুরের তীব্র কিচিমিচি, জোনাকির ছোট মশাল।

কিন্তু আজই এই সুরগুলি ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারি, তখন বিশেষ কিছুই বুঝিতাম না। আমি যেন একটা স্পঞ্জ; কখন সব সুর শুষিয়া লইয়াছি,—জানিই না! জলে স্পঞ্জ যেমন তলাইয়া যায়, আমি তেম্‌নি প্রকৃতির মোহিনী মায়ায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম। প্রকৃতি কি? কেমন ভাবে আছে? এসব কিছু জানিতাম না। লুব্ধ অচৈতন্য অন্ধ নিদ্রার ঘোরেই হয়ত আমার সারা জীবন কাটিয়া যাইত, চাষের বলদের মত একই সঙ্কীর্ণ ক্ষেতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতাম—যদি যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে আঘাত আসিয়া আমায় না জাগাইত।
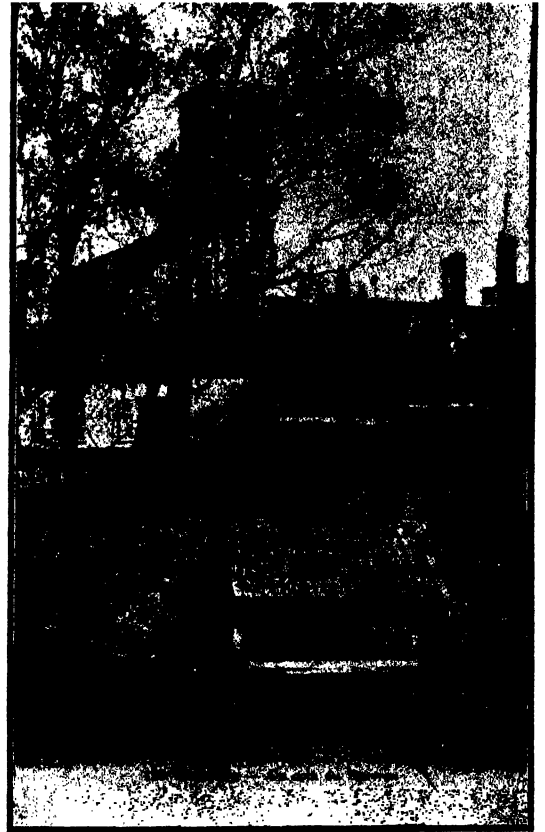
ক্লামসি—রলাঁর জন্মগ্রাম

আমার বয়স তখন ষোল। প্রথম দেশের সীমান্ত ছাড়াইয়া দু এক পা বাহির হইয়াছি। ১৮৮২ সালের গ্রীষ্মকালে আমার গলার অসুখ করে এবং চিকিৎসার জন্য Grenoble-এর কাছে Dauphine নামক একটি স্থানে
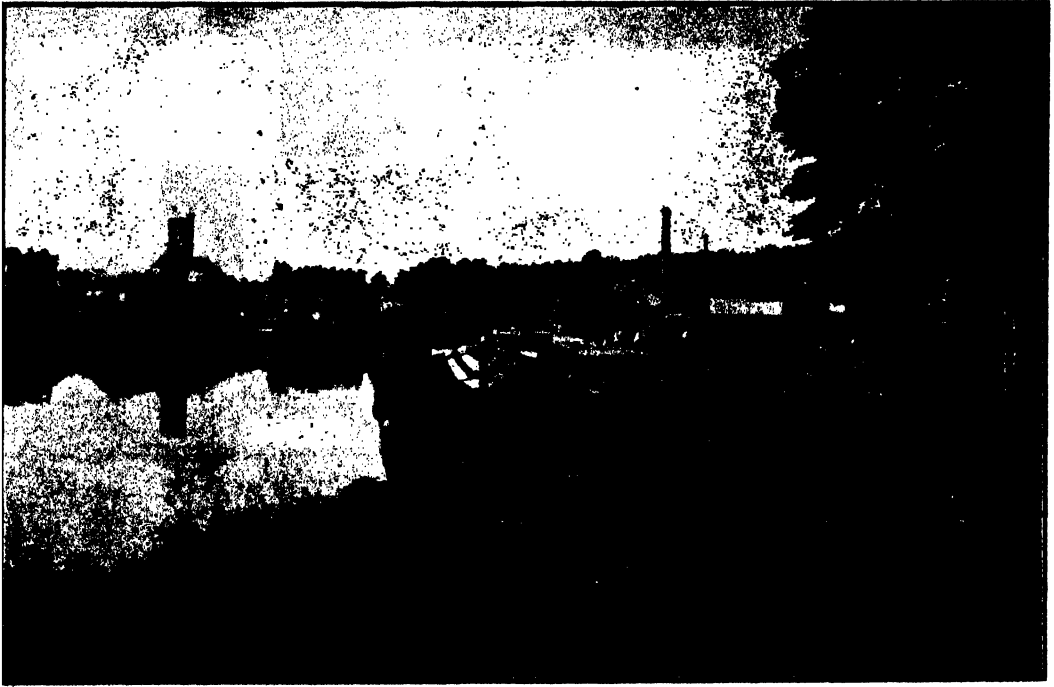
ক্লাবুসি নদীতীর

আমার মা ও বোনের সঙ্গে কিছু দিন থাকি ; গন্ধক-রেণু-মিশ্রিত জলে উপকার হইবে, এই আশা ছিল। আল্‌পস্ পর্ব্বতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভিতরে ভিতরে আমায় নাড়া দিতেছিল, যেন কোথায় উধাও করিতে চায়। বুকের ভিতরে কি একটা জিনিষ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তখনও অনভিজ্ঞতার ফলে বুঝিতে পারি নাই—কোথায় যেন ঝোড়ো মেঘ জমিয়া বজ্র-নির্ঘোষের সূচনা করিতেছিল।

মা ছিলেন আমাদের তিন জনের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আস্বাদনে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী ; সব-চেয়ে তরুণ, তাই ঐ আকর্ষণে তিনি সব-চেয়ে মাতিয়া উঠিতেন। মনে পড়ে বাসন্তী নিশার এতটুকু সৌন্দর্য্যও পাছে হারান তাই তিনি গভীর রাত্রে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাতায়নের ধারে বসিয়া স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতেন, দেখিতেন কত তারা উঠিল, কত তারা খসিয়া পড়িল। শেষে উষার আলোকাঞ্চলে সব চাপা পড়িয়া যাইত। মা'র ঘন-নীল চোখের দীপ্তি অচঞ্চল, তাঁর চোখের পাতা ফোলা…। মা পারীতে ফিরিবার পথে আমাদের একটু খুসী করিতে চাহিলেন—(তিনিও কম খুসী নন !)। আমাদের অবাক্ করিয়া তিনি সেপ্টেম্বর মাসে সুইস দেশে আনিয়া হাজির করিলেন। অবশ্য ফ্রান্স হইতে বেশী দূরে যাইতে আমরা পারি নাই ; কারণ ছুটির দিনগুলি ছিল হিসাব করা, বিশেষ ভাবে টাকাগুলি ! বাবা বহু পরিশ্রম করিয়া সামান্য যাহা উপায় করিতেন তাহাতে সকলে অনেক দিন বাহিরে থাকিতে পারিত না ; বাবার ছুটি থাকিলেও ছুটি ছিল না, তিনি সেই সহরের হাপরে ভাজা ভাজা হইতেন। জেনিভার লেমান হ্রদ ছাড়াইয়া আর বেশী দূর যাওয়া হয় নাই—আমাদের অভিযানের সুদূরতম সীমা ছিল লোজান (Lausanne)…। বন্ধু ! তোমরা হয়ত হাসিতেছ—তোমরা আজকাল মেল ট্রেনে অথবা এরোপ্লেনে চড়িয়া সকাল ও রাত্রের মধ্যে কত দেশ পার হইয়া যাও, ক্ষুধা-উদ্বেগের বালাই নাই ! কিন্তু সেকালে আমাদেরও কিছু সুবিধা ছিল, অতি সামান্য দিয়া আমরা কত বিরাট ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়াছি ! যিশু যে গ্যালিলীর

ধারে অত লোককে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁর আয়োজন ছিল কতটুকু ?

যাহা হউক যে-ধাক্কাটা আমায় নূতন পথে চালাইবে সেটা সুইস দেশে আসে নাই, আসিয়াছিল সীমান্ত-প্রদেশে Ferneyর ছাদে। কেন ঐ জায়গাটাতেই ঘটিল ? ভল্‌তেয়ার (Voltaire)কে অনেকবার প্রশ্ন করিয়াছি, কারণ এখানে তিনি এককালে ছিলেন ; তাঁর একখানি বিয়োগান্ত নাটকের (Zaire) কয়েকটি কবিতা আমায় একটু ছুঁইয়াছিল মাত্র ; বহুকাল ভল্‌তেয়ারকে ভাল করিয়া বুঝি নাই। ত্রিশ বছর পরে গত মহাযুদ্ধের মধ্যে আমার সাহিত্য-স্বর্গে প্রথম সেই উন্মুক্ত রুদ্র হাস্যের অবতারকে আসন দিয়াছি।* বুঝিয়াছি, তাঁর বিদ্রূপ-বাণে তিনি তাঁর যুগের প্রত্যেক অত্যাচার, প্রত্যেক কুসংস্কার, প্রত্যেক গোঁড়ামীকে নির্দ্দয় ভাবে বিদ্ধ বিধ্বস্ত করিয়া আসিয়াছেন। এই মহা-পুরুষের গৃহটি দেখিয়া বাহির হইতেছি—বাগানে কয়েক পা হাঁটিয়া গ্রামের পথে আসিয়াছি—হঠাৎ এক মিনিট—না—কুড়ি সেকেণ্ড...যেন বজ্রপতন...আমি দেখিলাম—অসীমকে দেখিলাম !

কিন্তু কি দেখিলাম ? আশপাশের দৃশ্য তেমনই রহিয়াছে, সেই দূরের পাহাড়, বেশী রকম উঁচু লাগে না, কিছুই অস্বাভাবিক মনে হইল না। বিরাট দিকচক্রবালের উপর উদার আকাশের চন্দ্রাতপ—মাটি যেন হাস্যমুখর, গড়াইয়া মাঠ বাগানের উপর দিয়া নীল হ্রদের তটে আসিয়া থামিয়াছে। এই ছবির পট-ভূমিকায় দেখি স্নিগ্ধ প্রভাতের রং যেন কে ভাল করিয়া ফলাইয়া তুলিয়াছে এবং বিরাট আল্‌প্‌স্‌পর্ব্বত যেন Pan-Athenian প্রস্তর চিত্র, কি তার গতি-বেগ ! অথচ যেন চাপা ঝড়—দূরে, বহু দূরে গর্জ্জাইতেছে—বেটোফেনের Pastoral Symphonyর মধ্যে যেমন শুনিয়াছি। এ যেন ক্লাসিক ছাঁদের ছবি—এর মধ্যে রোমান্টিক আমেজ এতটুকু নাই ; এ রুশোর (Rousseau) যুগের আগেকার সঙ্গীত—সবটা পূর্ণ, শান্ত, সম্বাদী অনুবাদীর আলাপ—শুধু বাঁশী ও তাঁত—ধাতব ধ্বনির কর্কশ মিশ্রণ নাই। সাফা চোখ—স্পষ্ট রেখার টান—প্রজ্ঞার উন্মত্ত আবেশ...

কেন বিশেষ ভাবে এইখানেই তাঁর প্রকাশ হইল ? কেন অন্যত্র হইল না ? জানি না। শুধু এইটুকু জানি, যেন একটা পর্দ্দা ছিঁড়িয়া গেল ; অনাঘ্রাত কলিকার উপর উদ্দাম প্রকৃতি চুম্বন করিয়া যেন তাকে ফুটাইয়া তুলিল—সে যেন নব বিকাশের নব জন্মের সূচনা ; তাই কি এত
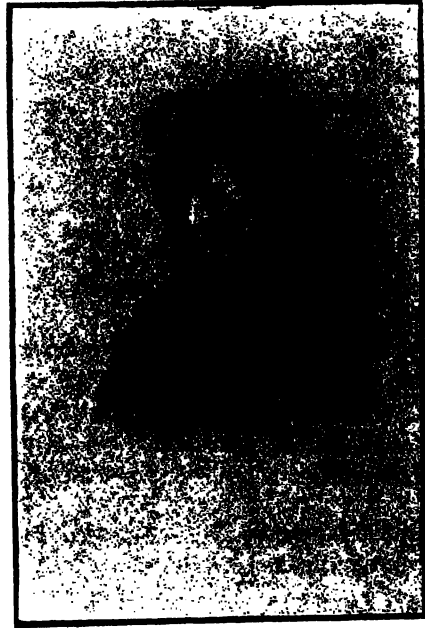
রলাঁর জননী

দিনের আদর, এত কবিত্ব, এত মাধুর্য্য,—প্রেমের মিনতি, তারায় ভরা রাত্রির অসহ বিরহ,—সব,—সবই সার্থক ?—প্রত্যেকটির অর্থ আছে,—সব পরিষ্কার হইয়া গেল। সেই একটি মুহূর্ত্তে প্রকৃতিকে আমি তার মুক্ত অনাবৃত গৌরবে দেখিলাম, তাহাকে চিনিলাম,—না, পুরাতনকে নূতন করিয়া পাইলাম, জীবনের প্রথম দিন হইতেই যে আমাদের সম্বন্ধ...।

হঠাৎ আবার পর্দ্দা পড়িয়া গেল !

আমি পারীতে ফিরিলাম। যদি রূপকপন্থা-বিশ্বাসী হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম চোখের ঠুলীটা যে অদৃশ্য নিয়তি খসাইল, সে ঠিক আমাকে আমার দেশের সীমা পার করিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া, তবেই পর্দ্দা সরাইয়া দিল। আমার ফরাসী দেশভায়েরা আমার বিরুদ্ধে দেশ-

* Liluli নামক ব্যঙ্গ নাট্যখানি দ্রষ্টব্য।

দ্রোহিতার অভিযোগ নানা তানকর্ত্তবে জমাইয়াছেন, সেই সব বন্ধুদের প্রতি একটু শয়তানী হাসি হানিয়া তাঁদের নূতন আক্রোশের মশলা যোগাইয়া এবার বিদায় লই।

[অপ্রকাশিত মূল ফরাসী হইতে অধ্যাপক কালিদাস নাগ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। লেখক মহাশয় ইহা কেবল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। অন্য কোন ভাষায় ইহার অনুবাদ নিষিদ্ধ।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

দেশবিদেশের কথা

বিদেশ

ইতালিতে ফ্যাসিষ্ট নবম বার্ষিকী—

গত মাসে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট নবম বার্ষিকী উৎসবে ঐ দলের নীতি সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে নূতন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর প্রত্যেক যুবকের নিকট নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রচারিত হইয়াছিল :—

(১) ফ্যাসিষ্ট দলের কেহ কখনও চিরশান্তিতে বিশ্বাস করিবে না।

(২) সামান্য ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারিলেও প্রকৃত পক্ষে দেশের হিতসাধন করা হয়।

(৩) ফ্যাসিষ্ট-নেতা সিনর মুসোলিনী যাহা বলেন, যাহা করেন, তাহা সর্ব্বদা, সকল স্থানেই উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত।

ইউরোপে আফগান রাজদম্পতি—

আফগান রাজদম্পতী ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটিই হয় নাই। ইতালী ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে আফগান-রাজদম্পতী যে অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন,—ইংলণ্ডে তাহা অপেক্ষা কিছু কম সম্মান দেখান হয় নাই।

সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ বলের সম্মুখে চিরদিনই নত হয়। রাজা আমানুল্লা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াই আজ বোধ হয় তাঁহার এই মর্য্যাদা। কেবল তাহাই নহে, তিনি আফগান জাতিকে, নূতন আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছেন—ইহাও তাঁহার কম বলের পরিচয় নহে। প্রাচ্যের এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও, কেবল স্বাধীনতার গৌরবে আজ ইউরোপের নিকট তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছেন,তাহাতে প্রাচ্যদেশবাসী গৌরব বোধ করিবে। এ যুগে জগতে সম্মান ও মর্য্যাদা পাইতে হইলে, পরাধীন জাতির স্বাধীনতা অর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই অধিকতর কাম্য নহে।

আফগান রাজ-দম্পতি বিলাতে এত অভ্যর্থনা পাইতেছেন কেন? এই সম্পর্কে একখানি বিলাতী সাংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আসল কথা ধরা পড়িয়াছে। উক্ত পত্রে প্রকাশ—"তিনি এমন একটা রাজ্যের অধিপতি, যাহা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যবর্ত্তী। উপরন্তু তিনি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজা। তারপর আফগান-রাজ্যের সীমা ব্রিটিশ-রাজ্যের সীমার সঙ্গে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যাহাতে সর্ব্বদাই আমাদিগকে সজাগ থাকিতে হয়। আর আজকাল আরব মিশর প্রভৃতি স্থানে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার জন্যও আফগানীস্থানের মন যোগাইতে আমরা বাধ্য।" আফগানরাজ ভারতে আসিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে মিলনের মন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন,ইহাতেও বিলাতী পত্রিকা-খানি সন্তুষ্ট হন নাই। সুতরাং ইংলণ্ড আফগান-রাজকে কেন এত আদর-অভ্যর্থনা করিতেছে, তাহার কারণ বুঝা কঠিন নহে।

প্রবাসী ভারতবাসী—

ভারতের বাহিরে ২০,০২,৯২৮ জন ভারতবাসী পৃথিবী দেশে বাস করিতেছে—

কানাডা	১২০০
অষ্ট্রেলিয়া	২০০০
নিউজিল্যাণ্ড	৬০৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৬১৩৩৯
ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট	১০৪৬২৮
ফরাসী মালয়	৩০৫২১৯
ব্রিটিশ মালয়	৬৮১৯
সিংহল	৭৫০০০০
মরিসাস্	২৮৪৫২৭
কেনিয়া	২২৮২২
ত্রিনিদাদ	১২১৪২০
ব্রিটিশ গায়না	১২৪২৩৮
ফিজি	৬০৬৩৪
জ্যামেকা	১৮৪০১
আমেরিকা	৩১৭৫

—

ভারতবর্ষ

নেপালে বাঙালী—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি-এ সমগ্র নেপালের বিচার ও শাসন বিভাগে একমাত্র বাঙালী। ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা খুব ভাল জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন ও নেপালের "নেওয়ার" রাজবংশ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মোত্তর দেন। হেম-বাবুদের পরিবার আজও তাহা ভোগ করিতেছেন। "নেওয়ার" বংশ গোর্খাদের আগে নেপালে রাজত্ব করিতেন। হেমবাবুর বয়স ২৫।২৬ বৎসর। ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের

নেপাল-প্রবাসী শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গ্রাজুয়েট। বর্ত্তমানে বীরগঞ্জ বিভাগের বড় হাকিমের সহকারীর কাজে নিযুক্ত আছেন।

মাদ্রাজে গণিকাবৃত্তি উচ্ছেদ—

গত মাসে মাদ্রাজে গোখলে হলে স্যার পি, এস্, শিবস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে এক জন-সভায় গণিকাবৃত্তি উচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা বেশান্ত বলিয়াছেন, যে-দেশে এক বিবাহ প্রচলিত সেই দেশেই কুপ্রথা অধিক। অসহায় নিরীহ বালিকাগণ গণিকালয়ে কত অসহনীয় অত্যাচার উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন সহ্য করে তাহার করুণচিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি বলেন, গণিকা সহবাসের তুলনায় বহু বিবাহের অপকার অতি তুচ্ছ। তিনি জোর দিয়া বলেন, অসহায় নিরীহ রমণী ও বালিকাদের রক্ষার জন্যও অন্ততঃ আইন তৈরী হওয়া উচিত। অন্যান্য বক্তাগণ বলেন, আইনের সাহায্য না পাইলে শুধু সাধারণের প্রচেষ্টায় কিছু হইবে না।

এলাহাবাদে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়—

গতমাসে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এলাহাবাদ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলেন, যে, ভারতের নারী শিক্ষিত ও স্বাধীন না হইলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আশা নাই।

মুদ্রাযন্ত্র আইন বাতিল—

মহীশূর রাজ্যকে সাধারণতঃ আদর্শ রাজ্য বলা হইয়া থাকে। গত মাসে উহার ব্যবস্থাপক সভাতে দুইদিন আলোচনার পর গবর্ণমেণ্ট পক্ষের বিরোধীতা সত্ত্বেও মুদ্রাযন্ত্র আইন বাতিল করিবার জন্য জনৈক বে-সরকারী সদস্যের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বাঙলা

সোনার বাঙলা—

বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। লোকের পেটে ভাত নাই, পুকুর-ডোবায় জলবিন্দু মাত্র নাই এহং কলেরা-বসন্ত মহামারীতে দেশে সর্ব্বনাশসাধন হইতেছে। বর্দ্ধমানের "শক্তি" লিখিতেছেন :—

"আমাদের সংবাদদাতাগণ নিত্যই সংবাদ দিতেছেন যে, অন্নকষ্টে অনেক গ্রামের লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। জনমজুর যাহারা খাটিয়া খায়, তাহারা কোনই কাজ পাইতেছে না। নানা স্থানে চুরী ডাকাতি হইতেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখিলাম—

বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাতে যে ভীষণ অন্নকষ্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ দেশবাসীর অবিদিত নাই। এ সম্বন্ধে গ্রামবাসীরা গবর্ণমেণ্ট্, জেলাবোর্ড্ প্রভৃতির নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছে, আমরাও পুনঃ পুনঃ ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। নানা সভাসমিতি জনসাধারণের অসীম দুঃখ-দুর্দ্দশার বর্ণনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু পাষাণে মাথা ঠুকিলে কি ফল পাওয়া যায়? সহৃদয় ও ধনী দেশবাসীরা কি এই বিপদে অগ্রসর হইতে পারেন না?

এদিকে 'খুলনা' পত্রিকায় প্রকাশ—

এই জেলার বহু পল্লী হইতে তৃষ্ণার্ত্তের হাহাকার শুনা যাইতেছে। পুষ্করিণী খাল-বিল শুকাইয়া গিয়াছে। কাদা ছাঁকিয়া সেই জল পল্লীর লোকে পান করিতেছে। কলেরা, উদরাময় সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইতেছে। অবস্থার ভীষণতা চক্ষে না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। গৃহস্থঘরের মহিলাগণ কাঁকে কলসি লইয়া ১ মাইল ২ মাইল হাঁটিয়া জল আনিতেছে। এই দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া লোকে যে কি করিতেছে তাহা নিম্নলিখিত মর্ম্মন্তুদ সংবাদটি পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। যুবক মৃত্যুঞ্জয় শীল নিজের ও পরিবারের পালনের কোন উপায় না দেখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'বাঙলার কথা' লিখিতেছেন;—

যুবক মৃত্যুঞ্জয় শীল আত্মহত্যা করিয়া আপনার বেকার সমস্যার

সমাধান করিয়াছে। বিপুল সংসারের বোঝা তাহার স্কন্ধে চাপিয়াছিল, অথচ পকেটে তাহার পয়সা ছিল না; অদূর ভবিষ্যতে কোন দিক দিয়া অর্থাগমের সম্ভাবনাও ছিল না। চাকরি যখন কোথাও মিলিল না, দারিদ্র্যের নিবিড় মেঘ যখন চৌদিকে ঘনাইয়া আসিল মৃত্যুঞ্জয় কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া তখন নিঃশব্দে মৃত্যুর বুকে ঝাঁপ দিল। বাঙ্গলার কত যুবকই না কত ঘরে মৃত্যুঞ্জয়ের মত অবস্থায় পড়িয়া চারিদিক শূন্য দেখিতেছে; বাজারে পয়সার অভাবে খাবার মিলে না, ঘরে খাইবার লোক বিস্তর; চাকরীর বাজারও শূন্য। হতভাগারা করে কি? আর যে কোনও দেশে এরূপ ব্যাপার ঘটিলে যুবকের দল এ্যাসিডের শিশি ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করিত; কিন্তু আমাদের প্রাণ বড় পোষ-মানা। বাংলা দেশে উপাধিধারী পাঁচ হাজার যুবকের বেকার-সমস্যা দূর করিবার জন্য সরকারের কোনও উৎসাহ নাই। ছেলের দলও অন্ধের মত ডিগ্রীর মোহে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠেলাঠেলি করিতেছে। এমন অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয়ের পথ ছাড়া আর মুক্তি কোথায়?

কলেরা বসন্ত প্রভৃতির কোপে দেশের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা "চারুমিহিরের" নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠেই সম্যক অবগত হওয়া যায়।—

বাঙ্গলায় এবার কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, মহামারী উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও বাঙ্গলার অন্তর্গত ১৪টি জেলার মৃত্যুহার অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। এই জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ১১২ জন লোক মারা গিয়াছে এবং বসন্ত রোগেই ৯২ জনের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। শুধু মেদিনীপুর নয়, বাঁকুড়া, খুলনা, রাজসাহী ও মালদহ প্রভৃতির অবস্থাও শোচনীয়। গত কয়েক মাসের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট, মন্ত্রী-মণ্ডল, জেলা বোর্ড প্রভৃতির নিকট হইতে এই দারুণ দুর্দ্দিনে কোন সাহায্যই পাওয়া যাইবে না। এমত অবস্থায় কি করা যায় আলোচনা-প্রসঙ্গে বাঁকুড়ার যুগদীপ বলিতেছেন, "সরকারের উচিত সত্বর দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা; কিন্তু দেশবাসীর এই ঘোষণার মুখপানে তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না এবং উচিতও নয়। সত্বর সাহায্য সমিতির নিকট যাহার যাহা সাধ্য প্রেরণ করুন। বাংলার বিবিধ প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সত্বর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুনয় করি। ক্ষুধিতের কাতর আহ্বান কি বিফল হইবে? জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠে মাতৃক্রোড়ে কি শিশুসন্তান হারাইবে? ওগো ধনী! তোমার ধনের সার্থকতা কর, ওগো দাতা! তোমার দানের সার্থকতা কর—আর্ত্তসেবায় আপনি ধন্য হও!"

কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ—

আমার গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়ে প্রপীড়িত হইয়াছেন। কন্যার জন্য পাত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাত্র পক্ষের সদাশয়তার অতি অল্প খরচে বিবাহ সম্পন্ন হইবে, এবং সেজন্য তিন শত টাকার প্রয়োজন। সর্ব্বসাধারণের নিকট আমি করজোড়ে নিবেদন করিতেছি, তাহারা মহানুভবতাগুণে অর্থ-সাহায্য করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিপদ হইতে মুক্ত করুন! আমার নিকট সাহায্য প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত
"প্রবাসীর" সহকারী সম্পাদক
৯১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

দিল্লীতে হিন্দু সভা—

দিল্লী হিন্দু সভা ও শুদ্ধি-যজ্ঞের একখানি ছবি আমরা এই মাসে প্রকাশিত করিলাম।

দিল্লী হিন্দুসভার উদ্যোক্তাগণ

বাম দিক হইতে—কুমার বিমলেন্দু রায়, অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য-চৌধুরী, শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল, স্বামী সত্যানন্দ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলন—

বর্ত্তমান মাসে ময়মনসিংহ নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। সম্মিলনীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য একটি সুদক্ষ অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রায় ১০,০০০ হাজার লোকের বসিবার উপযুক্ত একটি বিরাট মণ্ডপ নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতেছে। সুসঙ্গের স্বনামখ্যাত মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন। মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রায় শশধর ঘোষ বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ জমিদারগণ সম্মিলনীকে বিশেষভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

—চারুমিহির

লিলুয়ায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট—

লিলুয়ার উচ্চকর্ম্মচারীদের অসঙ্গত অত্যাচারে, বিনা কারণে শ্রমিক বিতাড়ন প্রভৃতির প্রতিবাদ করে ই, আই, রেলের শ্রমিকগণ

ধর্মঘট করিয়াছে। তাহারা নিজেদের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা করিতেছে। ইতিমধ্যে একদিন এইরূপ নিরস্ত্র শ্রমিক জনতার উপর পুলিশ গুলী বর্ষণ করিয়াছে। ফলে অনেক লোক আহত হইয়াছে। এখনও কোনরূপ আপোষ মীমাংসা হয় নাই।

বাঙলায় বিধবা-বিবাহ—

কুমিল্লা বিধবা-বিবাহ সহায়ক সমিতির চেষ্টায় গত কয়েক বৎসরে মোটে ১৫০টি বিবাহ হইয়াছে। তাহার জাতি অনুসারে হিসাব এইরূপ :—

	১৩৩৪ সনে	১৩৩০ হইতে ১৩৩৩ পর্য্যন্ত	মোট
ব্রাহ্মণ		৬	৬
কায়স্থ	১০	২৩	৩৩
আচার্য্য	২	—	২
গন্ধবণিক	৩	১	৪
কর্ম্মকার	২	—	২
কুম্ভকার	১	১	২
শীল	—	৩	৩
বারুই	২	—	২
মোদক	১	—	১
সূত্রধর	৩	১	৪
নাথ	১০	২৮	৩৮
নাথের ব্রাহ্মণ	২	—	২
ধোপা	—	২	২
কৈবর্ত্ত	৮	৭	১৫
মাহিষ্য	১	—	১
রাজবংশী	—	৮	৮
মালদাস	৩	৭	১০
নমঃশূদ্র	১	১	২
পাটনী	১	১	২
নট	১	১	২
মালী	২	১	৩
পাল	২	—	২
পীর সন্ন্যাসী	৩	—	৩
চুনারী	১	—	১
	৫৯	৯১	১৫০

তাজমহল

শ্রী নির্ম্মলকুমার রায়

স্নানের ঘর হইতে বাহির হইতেই মিসেস্ রায়ের (কথাটি গোপনীয় হইলেও বলা ভাল যে, সুপ্রিয়াকে ও নামে না ডাকিলে তিনি ভয়ানক দুঃখিতা হ'ন) মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। তাঁহার পরণে জরি পাড় ঘোর লাল বর্ণের একখানি সাড়ী, গায়ের ব্লাউজটাও কাপড়ের মত লাল এবং পায়ে অসংখ্য জরির কাজ করা লাল নাগরাই। একটু হাসিয়া বলিলাম—ব্যাপার কি, এই ভোরেই একেবারে যুদ্ধ-ঘোষণা! বন্দীর উপর এই অত্যাচার কেন?

সুপ্রিয়া একটু রাগতস্বরে বলিল—হ্যাঁ, তা' জানা আছে, মাসের মধ্যে তিরিশ দিন তো ভোর ৬টা পর্য্যন্ত লাইনে লাইনে, তার'র জুটেছে এক পোড়া—কপালে ক্লাব—সেখান থেকে ফিরে রাত্রি দশটার সময় শোওয়া আর ঘুমোন। আমি আজ লাইনে যাব, দেখ্‌ব সেখানে তুমি সারা দিন কি কর।

আমি বেশ গম্ভীর ভাবে বলিলাম—তা বেশ কথা। পড়িবার ঘরে যাইয়া নীল কাগজে ছাপান একতাড়া ড্রয়িং লইয়া আসিলাম; তারপর সুপ্রিয়াকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া আরো গম্ভীর ভাবে বলিলাম—'এই No. 30. bridgeএ girder renewal হচ্ছে, gantry প্রায় ready এখন—। আমার মুখের দিকে বিস্ময়ের সহিত তাকাইয়া সে বলিল—তুমি এসব কি মাথামুণ্ড বকছ?

আমি গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলাম—Crabwinchটা ready ক'রে নিয়ে hoist করলেই হবে।

চাহিয়া দেখি—সুপ্রিয়ার মুখ মলিন।

—কোন কথা বল্‌লেই তুমি কেবল ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দাও।

—একি ঠাট্টার কথা হ'ল। লাইনে যাবে, অবশ্য কাজও দেখ্‌বে, তাই একটু বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম এই প্রথম দিন। আর আমিও একটা এ্যাপ্লিকেশন চিফ্ অফিসে পাঠিয়ে দেই, যে এবার হ'তে মিসেস্ রায়ই Subdivisionএর কাজ চালাবেন।

—মিসেস্ রায় যদি লাইনের কাজ চালায় তবে তোমাকে রেখেছে কেন?

—আমার এই হাফ্‌প্যান্টপরা মূর্ত্তির চেয়ে তোমার এই রাঙা মূর্ত্তিতে কাজ চল্‌বে ভাল।

—যাও আমি যদি আর কখনও তোমাকে কিছু বলি—বলিয়া সুপ্রিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যম করিতেই আমি বলিলাম—এখন গিয়ে অনর্থক রোদে কষ্ট পাবে—বরং বিকেলের দিকে বেড়িয়ে আস্‌ব।

—তুমি বুঝি সারাদিন রোদে থেকে খালি সুখ পাও! আমি এখনি যাব—নিশ্চয়ই যা'ব।

ইহার উপর আর তর্ক চলে না। বলিলাম—বেশ চল, তবে বেশী দূরে যাওয়া আর হ'বে না, 'পথি নারী' হ'লে একটা কিছু হ'বেই।

—কিছু হ'বেনা—আমরা বিংশ শতাব্দীর নারী, বলিয়া সুপ্রিয়া একটু হাসিলেন।

যা হোক—ট্রলিতে গিয়া চাপিলাম। শীতকাল খুব ঘন না হইলেও যা কুয়াসা করিয়াছে তাহাতে ৫০।৬০ গজের বেশী দেখা যায় না। অল্প অল্প বাতাস কুয়াসাকে আলোড়ন করিতেছে। ষ্টেশনে কয়েকখানা গরু-বোঝাই গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল! আর দূরে এখানে সেখানে দু একটি মনুষ্যমূর্ত্তি কুয়াসার অস্পষ্ট বহিরাবরণ পরিয়া চলা ফেরা করিতেছে। হেড্ ট্রলিম্যানকে জিজ্ঞাসা করিলাম —লাল ও নীল কাপড়া সব ঠিক আছে কি না। সে বলিল—হাঁ হুজুর।

ট্রলি চলিতেছিল। চোখে মুখে ছোট্ট ছোট্ট জলকণা লাগিতে লাগিল—খুব উঁচু পাড়—দুইদিকে ছোট বড় অসংখ্য বন্য উদ্ভিদ্। তারপর একটি অস্পষ্ট সীমা-রেখা। ট্রলি কখনও জোরে চলে কখনও ধীরে। একটা অবিশ্রান্ত শব্দ সেই পরিবর্ত্তনশীল গতিবেগের সহিত তাল রাখিয়া উঠে এবং নামে, মাঝে মাঝে একখণ্ড রেল হইতে আর একখণ্ডে যাইবার সময় খট্ খট্ করিয়া দুইটি শব্দ হয়।

—আচ্ছা এই কুয়াসাতে যে চলেছ—কিছুতো দেখা যায় না, যদি গাড়ী এসে পড়ে।

আমি হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিলাম—মোটে ৬টা ৩২, ৭টা ১০এর আগে কোন গাড়ী নাই—আর গাড়ী আস্‌লেই বা কি আধ মিনিটের মধ্যে ট্রলি কেটে নিতে পারবে।

পাড় ক্রমশঃই উঁচু হইতেছিল এবং দুদিকের লতাগুল্মের সংখ্যাও ক্রমশই বাড়িতেছিল। লাইনের পাশে-পাশেই অসংখ্য লজ্জাবতী গাছ। ছোট ছোট বেগুনি রঙের ফুল ফুটিয়াছে—তাদের গায়ে কুয়াসার সাদা আবরণ, শীতের বাতাসে কত পাতা সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। কত কথাই মনে হইতে লাগিল। বহু বৎসর আগে যখন এখানেই কাজ আরম্ভ করি—তখন এ লাইন তৈয়ারি হইতেছে, তখনও জীবনের সঙ্গিনী জোটে নাই। দিন রাত্রি কাজের নেশায় ভোর হইয়া খাটিতাম। কলেজের বইপড়া অকর্ম্মণ্য আর খাতা-লেখা জীবন হইতে যখন এই বিশাল কর্ম্মজগতে প্রবেশ করি—দেখিলাম কি অপূর্ব্ব রসময় এই জীবন। প্রত্যেকটি ছোটখাট কাজ একটি রসের মধুচক্র তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলে আর তার অপূর্ব্ব মধুরসে আমাকে জিয়াইয়া রাখে। এ লাইনের প্রত্যেকটি মাইল, প্রত্যেকটি পোল, প্রত্যেকটি ষ্টেশন আমার চেনা—নিতান্ত পরিচিত। যৌবনের প্রারম্ভে একদিন ইহাকে বিন্দু বিন্দু করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি; তখন ইহার মূর্ত্তি ছিল রুক্ষ, অসংবদ্ধ বিবাগী, আর আজ এ সুবিন্যস্ত, পরিপূর্ণ লতা-পল্লবে শ্যামলতাময়ী। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহাকে গড়িয়াছি, সন্ধ্যায় ইহার কথা ভাবিয়াছি, রাত্রিতে একে স্বপ্ন দেখিয়াছি, সৃষ্টির চেয়ে আনন্দের আর কি আছে?

হঠাৎ ট্রলিটা থামিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম কি হয়েছে?—'হুজুর সিগ্‌নাল'।

উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম outer signal down হইয়াছে, জায়গাটা একটু খারাপ। সম্মুখে প্রায়

১০০০ ফুটের পোল—এবং তারপর একটা প্রকাণ্ড sharp curve। কুয়াসা এর মধ্যে আরো ঘন হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে শীতের কাঞ্চন—একটা অস্পষ্ট রেখার মত পড়িয়া রহিয়াছে। জল বেশী বিস্তৃতও নয় গভীরও নয়—তবে বর্ষাকালে এর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর হয়। বহুদূর বিস্তৃত বালুরাশি, তার মধ্য দিয়া এখানে-সেখানে ক্ষীণ জলধারা মন্থর সর্পিল গতিতে চলিয়াছে।—দেখ এখানেই আমরা নেবে থাকি—গাড়ী চ'লে যাক, তারপর যাওয়া যাবে।

আমি বলিলাম—গাড়ীর এখন ঢের দেরী।

—কিন্তু এদিকে যে signal down হ'য়ে গেছে।

—সিগনালের কথা রেখে দাও, ও বেটারা তিন ষ্টেশন আগেই 'ডাউন' ক'রে দেয়।

—আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না—চারিদিকে এই কুয়াসা। কিছু দেখা যায় না, শেষে একটা বিপদ হবে। আর তুমি ট্রলিতে উঠে যে তন্ময় হ'য়ে থাক—কখন কোন্ দিক দিয়ে গাড়ী এসে পড়বে ঠিক নাই।

—গাড়ীগুলি ঠিক যখন যে-দিক দিয়ে ইচ্ছা আসে না—তাদের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট দিক দিয়ে আস্‌তে হয়—আর বিপদ হ'লেই বা কি—কতদিন—

সুপ্রিয়ার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। বলিল—দেখ আমার কাছে কি তুমি যখন তখন ঐ বিপদের কথাগুলি না ব'লেই পার না।

আমি বলিলাম,—এই চালাও। ব্রেকটা একটু মনোযোগের সহিত ধরিয়াই সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। চারিদিকে কুয়াসা, মনটাও কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। ওপারেই ট্রলিটা কাটিলে ভাল হইত, কিন্তু চলিতে চলিতে থামা আমার ভাল লাগে না।

একটা, দুইটা, তিনটা pier ছাড়াইয়া আসিলাম। এতক্ষণ নীচে তাকাইলে শুধু বালি দেখা যাইতেছিল—এখন জলরাশি। জল স্বচ্ছ এবং অগভীর। দূর হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া নদী চলিয়াছে। এদিকে যত চড়া পড়িতেছে ওদিকে ততই ভাঙ্গিতেছে।

হঠাৎ এঞ্জিনের তীব্র চীৎকার শুনিতে পাইলাম। সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখি প্যাসেঞ্জার ট্রেন—ওদিকে প্রথম pier এর উপর উঠিয়াছে। লৌহ-দানবের সে এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত মূর্ত্তি। ঘন ঘন তীব্র চীৎকার করিতেছে আর রাশি রাশি কালো ধোঁয়া কুয়াসাকে ঘোলাটে করিতেছে। এঞ্জিনের প্রচণ্ড কম্পনে ও গর্জ্জনে, ঘূর্ণ্যমান চক্রের ভীষণ তাড়নে মনে হয় এই মুহূর্ত্তে বুঝি রেল, কাঠ লোহা সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছড়াইয়া পড়ে। সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিলাম, কিন্তু তা মুহূর্ত্তের জন্য। ব্রেক চাপিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম—লাল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি 'হেড ট্রলিম্যান' লাল ঝাণ্ডি নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতেছে। ভাগ্যক্রমে একটা pierএর উপরেই ট্রলিটা থামিয়াছিল। বলিলাম—শীগগীর নাব, তাহার নাবিবার শক্তি ছিল না ; একরূপ টানিয়া লইয়া দু'জনেই pierএর উপর নামিলাম। তৎক্ষণাৎ ট্রলি পিছনে চলিয়া গেল এবং একটা প্রচণ্ড ধাক্কার সহিত কড় কড় শব্দে ট্রেনখানি আমাদের ছাড়াইয়া গিয়া থামিয়া পড়িল। উন্মত্ত দানবকে থামাইবার সে প্রচণ্ড চেষ্টা পোলটা স্নায়ুতে অনুভব করিল। থর্ থর্ করিয়া সমস্ত লোহাগুলি কাঁপিয়া উঠিল। এক মিনিটের মধ্যে গাড়ী চলিতে লাগিল—আমার কাছে পোলের উপর গাড়ীর সাক্ষাৎলাভ এই নূতন নয়—কিন্তু আজ যে বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি তাহা ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

সুপ্রিয়া তখনও সামলাইয়া লইতে পারে নাই। তাহার বিবর্ণ মুখ দেখিয়া বুঝিলাম—যে রেলিং ধরিয়া তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলা নিরাপদ নয়। বস, এই বলিয়া দু'জনেই বসিয়া পড়িলাম। এর মধ্যে ট্রলি আসিল, বাললাম—আর একটু পরে।

চাহিয়া দেখিলাম, সুপ্রিয়ার দুই গাল বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে। শীতের বাতাসে ধীরে ধীরে কুয়াসা পাতলা হইতে লাগিল। আমি বলিলাম—একটা গল্প শোন।

—তোমাকে বোধ হয় বলেছি যে, আমার প্রথম কাজ আরম্ভ হয় এই লাইন যখন তৈরি হচ্ছিল তখন। রেলের কাজের মধ্যে সবার চেয়ে মজার হচ্ছে এই পোলের কাজ। একটা পোল তৈরি হচ্ছিল। কাজ দেখতে হ'ত আমাকে রাত্রি দিন। তুমি বোধ হয় জান না যে, এই Pierগুলি কি ক'রে তৈরি হয়। প্রথম নদীর তলাতে একটা লোহার প্রকাণ্ড চাক বসান হয়

তার উপর ইটের গাঁথুনি হয়। চারিদিকে দেয়াল আর মধ্যে থাকে ফাঁকা গর্ত্ত। সে ফাঁকার মধ্যে বড় বড় dredger নেমে যায় আর মাটি কেটে নিয়ে আসে। আস্তে আস্তে চাকটা উপরের গাঁথুনি নিয়ে নিজের ওজনে বস্‌তে থাকে। এমনি করে ৫০।৬০—১০০।১৫০ ফুট এক একটা চাক মাটির নীচে ব'সে যায়। তারপর ভিতরটা কংক্রিট আর বালি দিয়ে ভর্ত্তি ক'রে তার উপর এই pier তৈরি হয়।

চারি দিকে কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া ঝিকিমিকি সোনার আলো পড়িতেছিল। পাড়ের সাদা বালিতে প্রিয়ার লাল সাড়ীর জরি পাড়ে সে আলো প্রতিফলিত হইয়া আরো ঝলমল করিতেছে। উত্তরের বাতাসে তার চোখের জল ধীরে ধীরে শুকাইয়া আসিতেছিল।

—আমাদের একটা পোলের একটা চাক ৭২ ফুট পর্য্যন্ত মাটির নীচে গিয়ে আর কিছুতেই যাচ্ছিল না। অথচ তাকে নিতে হবে ৮০ ফুট। আমি তখন উৎসাহের উন্মাদনায় দিন রাত্রি এখানে থাকতাম। কি চমৎকার সে দৃশ্য! রাত্রিতে চারিদিকে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠত। সে হলদে আলো যখন চারি দিকের এই রশারশি যন্ত্র পুলি কাঠ পাথরের উপর পড়ত তখন আমার মনে হ'ত, এ এক বিভিন্ন জগৎ, যেমন সুন্দর তেমন সুসংবদ্ধ। বাহির হ'তে মনে হয় এ যেন একটা প্রাণহীন বিশৃঙ্খলা, নিতান্ত কুৎসিৎ এবং অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু একটা মানুষের অঙ্গুলির চাপে সমস্ত জগৎটা সজীব হ'য়ে ওঠে, নিশ্চল রশারশি নড়তে আরম্ভ করে, নীরব পুলিগুলি কড়্ কড়্ শব্দ করে, বড় বড় dredger গুলি দাঁত বের ক'রে হুড় হুড় ক'রে নামে, তখন মনে হয় এখানে অপ্রয়োজনীয় কিছু নেই, অবিন্যস্ত কিছু নেই।

চাকের উপর লোহার ওজন চাপান হ'ল বেশ কয়েক টন। তিন দিন তিন রাত্রি কালো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে dredger গুলিও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল, তবু চাক এক ইঞ্চিও গল্‌ল না। আমি এ অবস্থায় এখন যা কর্ত্তব্য তাই ভাবছিলাম।

রাত্রি প্রায় ১২টার সময় কুলি-খালাসিরাও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। আমি সারেংকে হুকুম দিলাম, dredger work বন্ধ কর, কাল ভোরে যা হয় করা যাবে। বোম্বাইয়ের সারেং বল্‌ল, সাহেব, এ রাতটা কাজ চালিয়ে দেখব, যদি কিছু না হয় তবে অন্য চেষ্টা করব। অদ্ভুত অধ্যবসায় এই সারেংদের, এদের আমি নিরাশ হ'তে দেখিনি, ভয় পেতেও দেখিনি। যখন সকলে আশা ছেড়ে দেয় তখনও এরা অদম্য উৎসাহে কাজ চালায় আর শেষে পরিশ্রমের পুরস্কার পায়।

আমি বল্‌লাম, আচ্ছা বেশ। লোকটা কুয়োটার উপর দাঁড়াল এবং এঞ্জিন ড্রাইভারকে হুকুম দিল—চালাও।

কাজ চল্‌তে লাগল। আমি কাছেই দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ৮০ ফুট লম্বা সেই ইটের স্তম্ভটা ভীষণভাবে ন'ড়ে উঠল এবং তার পর মুহূর্ত্তেই প্রকাণ্ড আলোড়নে একেবারে নীচের দিকে ব'সে গেল। সারেং সেই কম্পনের বেগ সাম্‌লাতে না পেরে একটা গর্ত্তের মধ্যে প'ড়ে গেল।

অ্যাঁ, বল কি?—প্রিয়ার মুখে চোখে কাতরতা ফুটিয়া উঠল।

আমি বলিলাম, হয়ত লোকটা বাঁ'চতে পারত কিন্তু তখন একটা dredger প্রচণ্ড বেগে সেই গর্ত্তের মধ্যে হাঁ ক'রে নামছিল। Engine-driverকে থামাবার সঙ্কেত করলাম, কিন্তু সে থামাতে থামাতে সেই হতভাগ্য সারেং আর dredger একসঙ্গে ৮০ ফুট মাটির নীচে ঢুকে গেল। কাজ বন্ধ হ'য়ে গেল—দেখ্‌লাম ৮০'৬ গালাই হয়েছে। লোকজন এসে জুটল—কিন্তু সে রাত্রিতে ৫০।৬০ ফুট কর্দ্দমাক্ত জলের মধ্যে কি করে তার উদ্ধার হবে।

তারপর দিন Executive Engineer আস্‌লেন—এবং সমস্ত দিন অপেক্ষা করতে বল্‌লেন—যদি মৃতদেহটা ভেসে উঠে। অনর্থক dredger work ক'রেও লাভ নাই, হতভাগার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করা ছাড়া আর কিছু হ'বে না। সমস্ত দিনের মধ্যেও তার দেহ উঠল না—তখন সন্ধ্যাবেলা কংক্রিট ঢালা আরম্ভ হ'ল।

প্রিয়া কাতরস্বরে বলিল—বল কি! জ্যান্ত লোকটার উপর তোমরা concrete ঢাল্‌তে দিলে।

তখন কি সে আর জ্যান্ত ছিল—মা ধরিত্রীর অতি নিবিড়তম গহ্বরে সুকোমল বালু-শয্যায় সে যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর কংক্রিটিং হ'য়ে গেল এবং কয়েক দিনের

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী

(জাপানী চিত্র)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মধ্যে তৈরি হ'ল এই কাঞ্চন bridge এর No, 5 pier যার উপর আমরা ব'সে আছি।

সুপ্রিয়া চমকিয়া উঠিয়া বিস্মিত নেত্রে একবার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সেই বিরাট স্তম্ভটাকে দেখিল, সেটা গম্ভীর বিশাল। নীচে জলধারা প্রতিহত হইয়া একটু ফেনাইয়া উঠিয়াছে এবং শব্দ করিতেছে। অস্ফুটস্বরে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—কী ভীষণ! আমি একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—কিন্তু পৃথিবীতে বোধ হয় এমন নগণ্য মানুষের কবরের উপরে এত বড় স্মৃতিস্তম্ভ আর তৈরি হয়নি।

সত্তর বৎসর

শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল

শ্রীহট্ট "জাতীয় বিদ্যালয়"

১

উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ

কটক হইতে কর্ম্ম ছাড়িয়া আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তখন ডিসেম্বর মাস—১৮৭৯। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যাইয়া প্রচার-কার্য্যে সহকারিতা করিতে আহ্বান করিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে বহুদিন হইতেই কেবল পরিচিত ছিলাম না, একটা ঘনিষ্ঠ স্নেহপাশে বাঁধা পড়িয়াছিলাম। তাঁর ভিতরে মানুষকে ভালবাসার আকর্ষণে নিজের করিয়া লইবার একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল। তিনি যে খুব পণ্ডিত ছিলেন, এমন নহে। সংস্কৃত কিছু কিছু অবশ্য জানিতেন, তাঁর উপাধি হইতেই ইহা বোঝা যাইত। বাংলাও বেশ জানিতেন। ইংরাজিতে কোনওই অধিকার লাভ করেন নাই, সামান্য কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিতেন মাত্র, কিন্তু লিখিতে বা বলিতে পারিতেন না। তাঁর বাক্‌প্রতিভাও বেশী ছিল না। কিন্তু ছিল একটা অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি। আর এই আকর্ষণ করিবার শক্তির রহস্য ছিল তাঁর বালস্বভাবসুলভ সরলতা। আমি যখন কটকে ছিলাম তখন প্রচারকর্ম্মোপলক্ষে বিদ্যারত্ন মহাশয় কটকে গিয়াছিলেন, আর আমাদের সঙ্গে কটক একাডেমীর বাড়ীতেই তখন বোধ হয় মাসেককাল ছিলেন। এই সূত্রে পূর্ব্ব-পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় পরিণত হয়। এই বন্ধুতার খাতিরেই তিনি আমাকে বেকার দেখিয়া উত্তরবঙ্গে লইয়া যাইতে চা'ন। আমিও এই আকর্ষণেই ১৮৭৯ ইংরাজীর শেষভাগে তাঁহার সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যাত্রা করি।

আমাদের সহযাত্রী হইলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় এবং তাঁহার ইদানীং-পরিণীতা সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী অন্নদানন্দিনী। বিদ্যারত্ন মহাশয়ই ইঁহাদের বিবাহ দেন। বিবাহের পরে নবদম্পতিকে নিজে সঙ্গে লইয়া আনন্দবাবুর কর্ম্মস্থল শিলিগুড়িতে গমন করেন। আনন্দবাবু কেম্বেল মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলের ডাক্তার হন এবং এখান হইতেই পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

আমি যখন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যাই, তখন ৺চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় জলপাইগুড়িতে মুন্সেফ ছিলেন। সে সময়ে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। উত্তরবঙ্গ রেলে অনেকগুলি ব্রাহ্ম কাজ করিতেন। সৈদপুরে তখন পূর্ব্ববঙ্গ রেলবিভাগের হিসাবপরীক্ষার বা অডিটের অফিস ছিল। পরলোকগত আশুতোষ বসু মহাশয় এখানে একটা বড় চাকুরী করিতেন। তাঁহার সাহায্যে তাঁহার অনেক আত্মীয়স্বজন রেল-আফিসে কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আশুবাবুর গভীর টান ছিল। তাঁহার

দৃষ্টান্তে ও চরিত্রপ্রভাবে তাঁহার দপ্তরের কর্ম্মচারীদের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়েন। এই সময়েই আমার পরলোকগত বন্ধু রাইচরণ মুখোপাধ্যায় এবং ৺ বঙ্কুবিহারী বসু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। তখনও তাঁরা সৈদপুরেই ছিলেন, আমার সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় জলপাইগুড়িতে ছিলেন। এখান হইতে তিনি আদালতের ছুটি হইলেই উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। চণ্ডীবাবু একদিকে শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি, অন্যদিকে অসাধারণ সত্যানুরাগী ও সরল চরিত্রের লোক ছিলেন। এই দুই কারণে তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই শিক্ষিত সমাজের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতেন, সকলেই তাঁর কথা শুনিতে আসিত। এই ভাবে সে সময়ে উত্তর-বঙ্গে একটা বেশ প্রভাবশালী ব্রাহ্মগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠে। রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক পদে বৃত হইয়া, বিশেষ ভাবে আসামে এবং উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। এইরূপে উত্তরবঙ্গে, বিশেষতঃ সৈদপুরে, একটা বেশ বড় ব্রাহ্মকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। আমি যখন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে প্রথমে উত্তরবঙ্গে যাই, তখনই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

কটকের পথে আমার সমুদ্র-দর্শন হইয়াছিল। এবারে জলপাইগুড়িতে যাইয়া আমার প্রথম হিমাচল দর্শন হইল। আমরা যখন জলপাইগুড়ি পৌঁছিলাম, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। চণ্ডীবাবুর বাসায় যাইয়াই উঠি। কিন্তু তিনি তখন বাসায় ছিলেন না। আদালতের তখন ছুটি। এখানে দুই দিন মাত্র ছিলাম। পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া হিমালয়ের যে ছবি দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না। এই ৪৮ বৎসর পরে, আজও যেন সেই ছবি চোখে ও মনে লাগিয়া আছে। উত্তর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, হিমাচলশৃঙ্গ হঠাৎ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও বলিতে পারি না; তিলে তিলে সোণার বরণ হইয়া উঠিতেছে, বলিলেই সেই অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সত্য বর্ণনা হয়। মনে হইল কে যেন সোণার তুলি দিয়া গিরিরাজের টোপর রঙ করিয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে এই সোণা বদলিয়া গেল। ঐ সোণার উপরে কে যেন রূপার তুলি বুলাইয়া তাহাকে রৌপ্যবর্ণ করিয়া দিতেছে। ক্রমে এ'ও মিলাইয়া যাইতে লাগিল, এবং শেষে সূর্য্য যখন চক্রবাল-রেখা ছাড়াইয়া উঠিল, তখন উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে হিমগিরি আপনার নিজের নিত্য-রূপ ধারণ করিয়া অভ্রভেদ করিয়া দাঁড়াইল। হিমাচলশৃঙ্গে যে বাল-অরুণোদয় দেখে নাই, তার পক্ষে এ অপরূপ রূপের কল্পনা করা সম্ভব নয়। আর যে একবার দেখিয়াছে, সে জীবনে এই ছবি কখন ভুলিবেও না।

জলপাইগুড়ি হইতে, আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের কর্ম্মক্ষেত্র শিলিগুড়ি যাই। সেখানে দিন দুই বোধ হয় ছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে ফাঁসীদাওয়া নামে একটা মহকুমা তখন ছিল,—এখনও আছে কিনা জানি না,—সেখানে যাই। এখানে একটি মাত্র নবীন ব্রাহ্ম পরিবার ছিলেন। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম। তাঁর পত্নী হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ বিধবা ছিলেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের গুরুকন্যা ছিলেন এরূপ শুনিয়াছিলাম। হরিদাস বাবু ফাঁসীদাওয়ার মুন্সেফী আদালতে কর্ম্ম করিতেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহারও বিবাহ হয়। আনন্দচন্দ্র রায় ও হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঁহাদের নূতন সংসারে অতিথি হইয়াই, আমি সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মপরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হই। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় কেবল ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। গোস্বামী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী ৺যোগমায়া দেবী আমাকে আপনার ভাই-এর মতন স্নেহ করিতেন। তাঁর পুত্রকন্যারা আমাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিত, নাম ধরিয়া ডাকিত না। সেকালে ব্রাহ্মসমাজের লোকেদের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিত। তাঁরা সকলেই প্রায় নিজেদের ঘরবাড়ী, আত্মীয়স্বজন, সকল ছাড়িয়া সত্যের নামে একমাত্র নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া সংসারে ভাসিয়া পড়িতেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের লোককে প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেন। এবারে উত্তরবঙ্গে যাইয়া, আনন্দবাবুর ও হরিদাস বাবু, এঁদের পরিবারের সঙ্গে একটা স্নেহ ও ভালবাসা

যোগ বাঁধিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল পরেও সে যোগ একেবারে ভুলিতে পারি নাই।

(২)

কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও শ্রীহট্ট-যাত্রা

বোধ হয়, ফাঁসীদাওয়া থাকিতেই কলিকাতায় অবিলম্বে ফিরিয়া যাইবার তাগিদ আসে। আমি কটকের কাজ ছাড়িয়া দিলে, আমার সহকর্ম্মী দুজন, রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং ব্রজেন্দ্রনাথ সেনও আর সেখানে থাকিতে চাহিলেন না। আমার অল্পদিন পরেই তাঁরাও কটক ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সে সময়ে ১৪নং কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রীহট্টের ছাত্রাবাস ছিল। কটকে যাইবার পূর্ব্বে রাজচন্দ্র ও আমি আমরা দু'জনে এই মেসেই ছিলাম। ব্রজেন্দ্রের বাড়ী শ্রীহট্টে নয়, ঢাকা, বিক্রমপুরে। বোধ হয় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে ইঁহার পিতৃপরিবারের আত্মীয়তা ছিল। ব্রজেন্দ্র কটক যাইবার পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে শ্রীহট্টের মেসে বা ছাত্রাবাসে ছিলেন না। কিন্তু এবার কটক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানেই উঠিলেন। আমরা তিনজনেই বেকার। কি করিব ভাবিতেছি। এমন সময় শ্রীহট্ট হইতে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা আমাদিগকে সেখানে যাইয়া একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। আমি উত্তরবঙ্গে যাইবার পূর্ব্বেই উড়োভাবে কথাটা আমাদের কাছে আসিয়াছিল। ফাঁসী-দাওয়াতে খবর গেল, কথাটা প্রায় পাকাপাকি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমাকে অনতিবিলম্বে কলিকাতায় যাইয়া এই প্রস্তাব সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

(৩)

শ্রীহট্ট সম্মিলনী

আমি যে বৎসর কলিকাতায় আসিয়া কলেজে পড়া আরম্ভ করি সেই বৎসর কিম্বা তার অব্যবহিত পূর্ব্ব বৎসর, কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীহট্টের ছাত্রেরা শ্রীহট্ট সম্মিলনী বা সিলেট্ ইউনিয়ান্ নামে একটা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীহট্টে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রচারই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেকালে কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে এরূপ কতকগুলি অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এসকলের মধ্যে, বোধ হয়, বরিশাল-হিতৈষিণী এবং ত্রিপুরা হিতসাধিনী,এই দুইটি সমিতিই সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি দুটির সাহায্যে বরিশাল ও ত্রিপুরা জেলার কলিকাতাপ্রবাসী ছাত্রেরা, নিজেদের জেলায় অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের বিশেষ সাহায্য করিতেছিলেন। ইঁহারা মেয়েদের পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। মেয়েরা বাড়ীতে থাকিয়া, নিজেদের পরিবারের শিক্ষিত লোকদিগের নিকটে, এসকল পাঠ্য অধ্যয়ন করিতেন। বৎসরান্তে সমিতি ইঁহাদের পরীক্ষা লইতেন। যাঁরা একটু উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পড়িতেন, ছাপান প্রশ্নের কাগজ পাঠাইয়া তাঁহাদের লিখিত উত্তর সংগ্রহ করিয়া তার পরীক্ষা করিতেন। অন্যেরা মৌখিক পরীক্ষা দিতেন। প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থিনীদের কোনও নিকট আত্মীয় তাঁদের পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন, মৌখিক পরীক্ষা নিজেরাই করিতেন, এবং ফলাফল সমিতির নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ পরীক্ষা লইয়া, সমিতি পরীক্ষার্থিনীদের পারদর্শিতা অনুসারে, তাঁহাদিগকে পুস্তকাদি পুরস্কার দিতেন, কখনও বা বৃত্তি পর্য্যন্ত দিতেন। আমাদের শ্রীহট্ট সম্মিলনীও এই উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়া এই প্রণালীতেই কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমাবধিই দেশের লোকের সহানুভূতি ও অকৃত্রিম সাহায্য পাইয়া আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি ভাল করিয়া গড়িয়া উঠে। শ্রীহট্টের শিক্ষিত সমাজ ইহাকে অকুণ্ঠিত অর্থসাহায্য করেন। এই সংগৃহীত অর্থ হইতে সম্মিলনীর ছাত্রী-দিগের যথাযোগ্য পুরস্কারাদির ব্যবস্থা করিয়া, যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহার দ্বারা কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীহট্টের ছাত্রদিগকেও সময় সময় সাহায্য করা হইত।

৺জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় এই সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন। জয়গোবিন্দ বাবুর বাড়ী শ্রীহট্টে ছিল। শ্রীহট্টে তিনি রেভারেণ্ড্ প্রাইজ সাহেবের নিকটে ইংরাজি শিক্ষা করেন। বোধ হয়, পরে প্রাইজ সাহেবের নিকটেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া, কলিকাতায়

আসিয়া, অধ্যাপক ডকের কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলেজে জয়গোবিন্দ বাবুর সতীর্থ ছিলেন। জয়গোবিন্দ বাবু এম, এ, পাশ করিয়া শ্রীহট্টের শেকঘাটের পাদ্রিদের স্কুলে কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়া, আইন পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতির সনন্দ লইয়া তিনি শ্রীহট্টে যাইয়া অল্পদিন সেখানকার জজ আদালতে ওকালতি করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। এ ছাড়া জয়গোবিন্দ বাবু কলিকাতার দেশীয় খৃষ্টিয়ান্ সমাজে অল্পদিন মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সহধর্ম্মীদের সমাজপতি হইয়া উঠেন। জয়গোবিন্দ বাবু আমাদের ক্ষুদ্র সম্মিলনীর কর্ণধার হওয়াতে, ইহা একরূপ জন্মাবধিই সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা কটক ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি ও কাজের চেষ্টা করিতেছি, এই কথা শুনিয়া শ্রীহট্টের বন্ধুরা, আমাদিগকে সেখানে যাইয়া একটা নূতন ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীহট্ট-সম্মিলনী এই প্রস্তাবটি নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। সম্পাদক সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পক্ষে শ্রীহট্টের বন্ধুদিগকে লিখিলেন যে, তাঁরা আমাদের তিনজনকে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক মনোনীত করিয়া এই স্কুলের কাজে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে স্কুলের বাড়ীর ও আসবাবের ব্যবস্থা করিবার ভার লইতে হইবে। শ্রীহট্টে একটি মুসলমান ভদ্রলোকের একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল ছিল। ইহার নাম ছিল, মুক্তি-স্কুল। ১৮৭৯ ইংরাজীর শেষভাগে এই স্কুলটি উঠিয়া যায়। ইহার ছাত্রদেরে নূতন স্কুলে সহজেই পাওয়া যাইবে, এই লোভেই আমাদের শ্রীহট্টের বন্ধুরা এই নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইচ্ছুক হয়েন। মুক্তি-স্কুলের বাড়ী ও আসবাবও আমরা পাইতে পারিব, তাঁহারা এ ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আমাদিগকে তখনই শ্রীহট্টে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। ফাঁসীদাওয়াতে আমি এই সংবাদ পাইয়াই, আর কালবিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর তহবিলে তখন কিছু টাকা ছিল। এই টাকা হইতেই আমাদের পাথেয়ের ব্যবস্থা করিয়া সম্মিলনী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং আমাকে শ্রীহট্টে এই স্কুল খুলিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীহট্ট জাতীয় স্কুল বা National Institution

১৮৮০ ইংরাজীর জানুয়ারী মাসেই আমরা শ্রীহট্টে যাইয়া একটা নূতন বে-সরকারী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপন করি। বোধ হয়, প্রথম কয়েকদিন আমাদের এই নূতন স্কুল পুরাতন মুক্তি-স্কুলের বাড়ীতেই বসিয়াছিল। অল্পদিন মধ্যেই সহরের মাঝখানে দুইটি নূতন চালাঘর তুলিয়া সেখানে আমাদের স্কুল উঠিয়া আসে। এই স্কুলের নাম হইয়াছিল Sylhet National Institution অথবা শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়।

আমি জানি না ইহার পূর্ব্বে বাংলা দেশে কোথাও এই নামে কোন বে-সরকারী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কি না, খুব সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য জেলায় এরূপ বে-সরকারী স্কুল খুলিতে আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় অধিকাংশ স্থলেই কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে এ সকল স্কুলের নামকরণ হইয়াছিল। অশ্বিনী বাবু তাঁর পিতা ৺ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের নামে বরিশালে স্কুল খুলিয়াছিলেন। আমাদের শ্রীহট্টের স্কুলের পূর্ব্বে কি পরে ঠিক বলিতে পারি না, কলিকাতায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র একটা স্কুল খুলিয়াছিলেন। ইহার নাম দিয়াছিলেন Albert Institution। ফলতঃ এই স্কুলের বুনিয়াদ পত্তন কেশবচন্দ্রের দ্বারা হয় নাই, হইয়াছিল একজন দরিদ্র কিন্তু উৎসাহী ব্রাহ্মের দ্বারা। ৺হরনাথ বসু মহাশয় কলিকাতা স্কুল নামে ইহার প্রথম পত্তন করেন। পরে এই কলিকাতা স্কুল কেশবচন্দ্রের দখলে আসে, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় ইহার অধ্যক্ষ বা Rector হয়েন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতায় আসিলে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য কেশবচন্দ্র-হাজার পঁচিশেক টাকা তুলেন। সেই টাকা দিয়া এলবার্ট হলের প্রতিষ্ঠা হয়। এলবার্ট হলের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা স্কুল এলবার্ট স্কুল নাম গ্রহণ করে। এখন

যেখানে এলবার্ট ইন্‌স্‌টিটিউট্‌ আছে, সেই বাড়ীটাতেই এক সময়ে কলিকাতা স্কুল ছিল। এইরূপে আমাদের শ্রীহট্টের স্কুল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বাংলা দেশে নানাস্থানে অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি যতদূর খবর রাখি, বোধ হয় এ সকল স্কুলের কোন স্কুলই আপনাকে ন্তাশনাল বা জাতীয় নামে অভিহিত করে নাই।

জাতীয়তার প্রথম উদ্বোধন—৺ নবগোপাল মিত্র

এই কথাটা এমন করিয়া উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে আমরা যে জাতীয় নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলাম, সেই নামের পশ্চাতে আমাদের নিজেদের জীবনের একটা ইতিহাস লুকাইয়াছিল। এই ন্যাশনাল বা জাতীয় কথাটা আমাদের রাষ্ট্র-নীতির গুরু সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে পাই নাই; আনন্দমোহনের নিকট হইতেও পাই নাই; কেশবচন্দ্রের নিকট হইতেও পাই নাই। এ বিষয়ে আমাদের গুরু ছিলেন নবগোপাল মিত্র মহাশয়। আর নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন পুণ্যশ্লোক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়।

আমি যখন শ্রীহট্ট জেলা স্কুলে পড়ি, তখন সেকালের বাংলার ছোট লাট ক্যাম্বেল সাহেব যে শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত করেন, তদনুসারে স্কুলে স্কুলে বিলাতী ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন আসিলাম তখন এখানেও জিম্‌ন্যাষ্টিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। নবগোপাল বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা আমাদের জিম্‌ন্যাষ্টিক শিক্ষক ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অঙ্গনে parallel bar, horizontal bar, trepeze প্রভৃতি বিলাতী ব্যায়ামের উপকরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয়েরও একটা জিম্‌ন্যাষ্টিকের আখড়া ছিল। নবগোপাল বাবুর পৈতৃক ভদ্রাসন ছিল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরে, শঙ্কর ঘোষের লেনের মোড়ে, আর তাঁর এই জিম্‌ন্যাষ্টিকের আড্ডা ছিল ১ নং শঙ্কর ঘোষের লেনের বাড়ীতে। এখানে বিলাতী ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছাড়াও দেশী ব্যায়াম-চর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল। এখানে লাঠিখেলা, তলোয়ার-খেলা এবং ডন-কুস্তি শেখান হইত। সুন্দরীমোহন দাস, রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং আমি, আমাদের শ্রীহট্টের ছাত্রাবাসের এই তিন জন নবগোপাল বাবুর এই ব্যায়াম-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হই। এবং তাঁহারই নিকট হইতে আমরা আমাদের প্রথম স্বাদেশিকতায় বা nationalism-এর দীক্ষা লাভ করি।

সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে patriotism-এ অথবা স্বদেশ-ভক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নবগোপালবাবু nationalism-এ বা স্বাজাত্যাভিমানে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ আমাদিগকে সাধারণভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই স্বাধীনতার প্রেরণাকেই স্বদেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। নবগোপাল বাবুই আমাদিগকে নিজেদের সভ্যতা এবং সাধনার গৌরবে গরীয়ান করিয়া সত্য স্বাজাত্যাভিমানের প্রেরণা দিয়াছিলেন। নবগোপাল বাবুর একখানা ইংরাজী সাপ্তাহিক কাগজ ছিল—National Paper। তাঁহার বন্ধুরা ঠাট্টা করিয়া এইজন্য তাঁহাকে ন্যাশনাল মিত্র বলিয়া ডাকিতেন। এই "ন্যাশনাল পেপার" নূতন ধরণের ইংরাজীতে লেখা হইত। ইংরাজী ব্যাকরণের বিধি-নিষেধের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া নবগোপালবাবু তাঁহার নিবন্ধ সকল রচনা করিতেন না। ইংরাজীর ভুল ধরিলে বলিতেন, "ওত আমার নিজের ভাষা নয়; এই ভাষার ভুল লিখিলে আমার কোন লজ্জার কথা হয় না। এই ম্লেচ্ছ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল।"

নবগোপালবাবু এবং তাঁহার বন্ধু ও গুরুস্থানীয় রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয়—ইঁহারাই বাংলার "স্বদেশী"র প্রথম পুরোহিত। ইঁহারা স্বদেশের পণ্য যাহাতে লোকে একরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি প্রেরণায় ব্যবহার করেন, ইহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্য "হিন্দু মেলা" নামে বোধ হয় ১৮৭২ কি ১৮৭৩ ইংরাজীতে সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী মেলার আয়োজন হইয়াছিল। এই হিন্দু মেলাতেই প্রথমে লুপ্ত-প্রায় তাঁতের কাপড় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। এই মেলাতে অন্যান্য স্বদেশী পণ্যও প্রদর্শিত হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় এই হিন্দু মেলা ক্ষেত্রেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রথমে তাঁহার "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" শীর্ষক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই হিন্দু মেলাতে দেশী ও বিলাতী ব্যায়াম কুশলতা প্রদর্শিত হইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রেরা, বিশেষতঃ

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, এই হিন্দু মেলার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

নবগোপালবাবুর নিকটেই আমরা জাতীয়তা বা ন্যাশন্যালিজিমের প্রথম প্রেরণা পাইয়াছিলাম এবং সেই প্রেরণা লইয়া শ্রীহট্টে যাইয়া এই ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউসন বা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করি। এ কথা বলা বাহুল্য যে, আমাদের এই ন্যাশন্যালিজিমের অতি সামান্য অঙ্কুর মাত্র তখন ফুটিয়াছিল। ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউসন যে কোন বিশিষ্ট জাতীয় আদর্শে পরিচালিত হইয়াছিল এ কথা বলিতে পারি না। আমাদের এই মাত্র তখন সঙ্কল্প ছিল যে, আমরা এই বিদ্যালয় পরিচালনে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন প্রকারের সম্পর্ক রাখিব না। এমন কি গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে আমাদের স্কুল পরিদর্শনের অধিকার ত দূরের কথা, তাহার অবসর পর্য্যন্ত দিব না। তখনও ইহা সম্ভব ছিল। কারণ তখন এই সকল বে-সরকারী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিজেরাই নিজেদের স্কুলের পঠন-প্রণালী এবং পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। কেবল স্কুলের সর্ব্বোচ্চ দুই শ্রেণীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য যে সকল ছাত্রকে প্রস্তুত করিতে হইত, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পড়াইতেই হইত। ইহার আর উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু এ ছাড়া আর সকল শ্রেণীতে আমরা আমাদের আদর্শ এবং রুচি অনুযায়ী পাঠ্য-পুস্তকাদি নির্ব্বাচন করিতে পারিতাম।

জানুয়ারী মাসের প্রথমে আমাদের এই নূতন স্কুল খোলা হয়, আর তিন মাসের মধ্যেই আমাদের ছাত্র-সংখ্যা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্কুলের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৮০ ইংরাজী ৩১শে মার্চ্চ গভর্ণমেণ্ট স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা চারি শত ছিল। আর আমাদের ছাত্রসংখ্যা সাড়ে তিন শত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার একটা কারণ ছিল, আমাদের স্বল্পতর বেতনের হার। কিন্তু ইহার প্রধান কারণ ছিল যাঁরা এই স্কুলে পড়াইবার ভার গ্রহণ করেন তাঁদের চরিত্রের প্রভাব। আমরা বেতনভূক্ ছিলাম না বলিলেই চলে। রাজচন্দ্র চৌধুরী এবং আমি আমরা কোন বেতনের দাবী রাখিতাম না। অপরাপর শিক্ষকদিগকে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট মাহিয়ানা দিয়া স্কুলের ছাত্র বেতনের যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত আমরা তাহা হইতেই যৎসামান্য টাকা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় খরচের জন্য লইতাম। অনেক সময় এমন হইত যে, আমরা এই টাকা দিয়া দুবেলা খাইতে পাইতাম না। তবে বাজারে হালুইকারের দোকানে ধার মিলিত। সেখান হইতে লুচী ও জিলাপী আনাইয়া রাত্রে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিতাম। রাজচন্দ্রের পিতা তখন সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া সামান্য পেন্‌সন্ পাইতেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রায় সকল ভদ্রলোকেরই স্বল্পবিস্তর জমী-জেরাত ছিল। এই হিসাবে রাজচন্দ্রের পিতা একজন সম্পন্ন গৃহস্থই ছিলেন। স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে পুত্রের উপার্জ্জনের উপরে নির্ভর করিতে হইত না। কিন্তু ব্রজেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা তখন জীবিত ছিলেন কি না, মনে নাই। তবে ব্রজেন্দ্রকে-বাড়ীর খরচের জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা জোগাইতে হইত। সুতরাং তিনি সামান্য বেতন গ্রহণ করিতেন। তবে শ্রীহট্টে থাকার খরচটা আমাদের এক সঙ্গেই কষ্টেসৃষ্টে চালাইয়া লওয়া হইত।

সাহিত্যরূপ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ এই সভা আহ্বান করা হয়েচে এই ইচ্ছা ক'রে যে, নবীন প্রবীণ সকলে মিলে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করব ; কোনো চরম সিদ্ধান্ত পাকা ক'রে দেওয়া যাবে তা মনে ক'রে নয়। অনেক সময়ে আমরা ঝগড়া করি পরস্পরের কথা স্পষ্ট বুঝি না ব'লে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের মনে ব্যক্তিগত বিরুদ্ধতা আমরা অনেক সময়ে কল্পনা ক'রে

নিই, তাতে ক'রে মতান্তরের সঙ্গে মনান্তর মিশে যায়, তখন কোনো প্রকার আপোষ হওয়া অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। মোকাবিলায় যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হব তখন আশা করি একথা বুঝতে কারো বিলম্ব হ'বে না যে, যে-জিনিষটা নিয়ে তর্ক করচি সেটা আমাদের দুই পক্ষেরই দরদের জিনিষ, সেটা বাঙলা সাহিত্য। এই মূল জায়গায় আমাদের মিল আছে, এখন অমিলটা কোথায় সেটা শান্তভাবে স্থির ক'রে দেখা দরকার।

আমার বয়স একদা অল্প ছিল, তখন সেকালের অল্প বয়সীদের সঙ্গে একাসনে ব'সে আলাপ করা সহজ ছিল। দীর্ঘকাল সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তার কারণ এ নয় যে, আমার পক্ষে কোনো বাধা আছে। এখনকার কালে যাঁরা চিন্তা কর্‌চেন, রচনা করচেন, বাঙলা সাহিত্যে নেতৃত্ব নেবার যাঁরা উপযুক্ত হয়েচেন বা হবেন তাঁরা কি মনের ভাব নিয়ে আসরে নেবেচেন সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সহজভাবে আলাপ-আলোচনা কর্‌বার পক্ষে তাঁদের মনের মধ্যে হয়তো কোনো অন্তরায় আছে। এ নিয়ে অনেকে আমাকেই অপরাধী করেন। তাঁরা বলেন আমি না জেনে অনেক সময় অনেক কথা ব'লে থাকি। এটা অসম্ভব নয়। আজকের দিনে বাঙলা ভাষায় প্রতিদিন যে সব লেখা প্রকাশিত হচ্চে তা সমস্ত পড়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। সে শক্তিও নেই, অবকাশেরও অভাব আছে। সেই কারণেই আজকের মতো এই রকম উপলক্ষ্যে নূতন লেখকদের কাছ থেকে রচনানীতি ও রীতি সম্বন্ধে তাঁদের অন্তরের কথা কিছু শুনে নেব এই ইচ্ছা করি।

আলোচনাটাকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রসঙ্গটার একটা গোড়াপত্তন ক'রে দেওয়া ভালো।

এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকের চেয়ে আমার বয়স বেশি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য যে-যুগে আরম্ভ হয়েছিল সে আমার জন্মের অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বকালে। সেই জন্যে এই সাহিত্য-সূত্রপাতের চিত্রটি আমার কাছে সুস্পষ্ট।

আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্য সুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে। তিনিই প্রথমে ভাঙনের, এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে নয়। পূর্ব্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহূর্ত্তেই নূতন পন্থা নিয়েছিলেন। এ যেন এক ভূমিকম্পে একটা ডাঙা উঠে পড়্‌ল জলের ভিতর থেকে।

আমরা দেখ্‌লুম কি? কোনো একটা নূতন বিষয়? তা নয়, একটা নূতন রূপ। সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন ক'রে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাক্‌তে পারে, কিন্তু সেও গৌণ, সেই ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন ক'রে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোনো অপূর্ব্বতা না থাক্‌তে পারে—সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েচে এমন বিষয় হ'লেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে-একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্ব্বতা। পান-পাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে, পণ্যের দিক থেকে বিচার কর্‌লে তার দামের ইতরবিশেষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার কর্‌বার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি। রস-সাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়। বলা বাহুল্য মধুসূদন দত্তের প্রতিভা আত্ম-প্রকাশের জন্যে সাহিত্যে একটি রূপের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চেষ্টা করেছিল। যাতে সেই লক্ষ্যের দিকে আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি ক'রে তুল্‌লেন। রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য্য দেবেন ব'লে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ো কর্‌লেন। তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে-রূপের সম্পদ পেলো সেইটেতেই সে ধন্য হোলো। মিল্‌টন্‌ ইংরেজি ভাষায় লাটিন ধাতু-মূলক শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহার করার দ্বারায় তার ধ্বনিরূপের যে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়েছিলেন মাইকেলেরও তদনুরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিলো। যদি বিষয়ের গাম্ভীর্য্যই যথেষ্ট হ'ত তাহ'লে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এ কথা সত্য, বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার

দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা র'য়ে গেল। অর্থাৎ মাইকেল বাঙলা ভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন যে-পথে কেবলমাত্র তাঁরি একটিমাত্র মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাঙলা ভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি যে-ফল ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তাঁর লেখা সন্ততিহীন হোল, উপযুক্ত বংশাবলী সৃষ্টি করল না। তাঁর পরে হেম বাঁড়ুয্যে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখ্‌লেন; এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাঁদের কাব্যের রূপ হোলো স্বতন্ত্র। তাঁদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্ত্তিমান হয়েচে কি না, এবং তাঁদের এই রূপের ছাঁদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কি না সে তর্ক এখানে করতে চাইনে—কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা বিচারেই তাঁদেরও কাব্যের বিচার চল্‌বে; তাঁরা চিন্তা-ক্ষেত্রে অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন্ কোঠা খুলে দিয়েছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার্য্য নয়। বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।

মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চির প্রতিষ্ঠা দেননি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বল্‌লেন, প্রতিভা আপন সৃষ্ট নব নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত ক'রে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি সেই একই কথা। তিনি গল্প-সাহিত্যের এক নতুনরূপ নিয়ে দেখা দিলেন। বিজয়বসন্ত বা গোলেবকাওলির যে চেহারা ছিল সে চেহারা আর রইল না। তাঁর পূর্ব্বেকার গল্প-সাহিত্যের ছিল মুখোষ-পরা রূপ, তিনি সেই মুখোষ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের একটি সজীব মুখশ্রীর অবতারণা করলেন। হোমার, বর্জ্জিল, মিল্‌টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাধনার পথে উৎসাহ পেয়েছিলেন, বঙ্কিম-চন্দ্রও কথাসাহিত্যের রূপের আদর্শ পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু এঁরা অনুকরণ করেছিলেন বললে জিনিষটাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে বলা হয়। সাহিত্যের কোনো একটি প্রাণবান রূপে মুগ্ধ হ'য়ে সেই রূপটিকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন,—সেই রূপটিকে নিজের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনায় তাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তার আনন্দ পেয়েছিলেন, সেই আনন্দে তাঁরা বন্ধন ছিন্ন করেছেন, বাধা অতিক্রম করেছেন। একদিক থেকে এটা অনুকরণ, আরেকদিক থেকে এটা আত্মীকরণ। অনুকরণ করবার অধিকার আছে কার? যার আছে সৃষ্টি করবার শক্তি। আদান-প্রদানের বাণিজ্য চিরদিনই আর্টের জগতে চলেচে। মূলধন নিজের না হ'তে পারে,—ব্যাঙ্কের থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা না হয় সুরু হোলো, তা নিয়ে যতক্ষণ কেউ মুনফা দেখাতে পারে ততক্ষণ সে মূলধন তার আপনারি। যদি ফেল্ করে তবেই প্রকাশ পায় ধনটা তার নিজের নয়। আমরা জানি, এসিয়াতে এমন এক যুগ ছিল যখন পারস্যে চীনে গ্রীসে রোমে ভারতে আর্টের আদর্শ চালাচালি হয়েছিল। এই ঋণ প্রতিঋণের আবর্ত্তন আলোড়নে সমস্ত এসিয়া জুড়ে নবনবোন্মেষশালী একটি আর্টের যুগ এসেছিল—তাতে আর্টিষ্টের মন জাগরূক হয়েছিল, অভিভূত হয়নি। অর্থাৎ সেদিন চীন পারস্য ভারত কে কার কাছ থেকে কি পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করেছে সে কথাটা চাপা পড়েচে, তাদের প্রত্যেকের স্বকীয় মুনফার হিসাবটাই আজো বড়ো হ'য়ে রয়েচে। অবশ্য, ঋণ-করা ধনে ব্যবসা করবার প্রতিভা সকলের নেই। যার আছে সে ঋণ করলে একটুও দোষের হয় না। সেকালের পাশ্চাত্য সাহিত্যিক স্কট্ বা বুলোয়ার লিটনের কাছ থেকে বঙ্কিম যদি ধার করে থাকেন সেটাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছু নেই। আশ্চর্য্য এই যে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন। অর্থাৎ তাঁর হাতে সেটা মরা বীজের মতো শুকনো হ'য়ে ব্যর্থ হোলো না। কথা-সাহিত্যের নতুনরূপ প্রবর্ত্তন করলেন; তাকে ব্যবহার ক'রে বাংলা দেশের পাঠকদের পরমানন্দ দিলেন; তারা বললে না যে, এটা বিদেশী, এই রূপকে তারা স্বীকার ক'রে নিলে। তার কারণ বঙ্কিম এমন একটি সাহিত্যরূপে আনন্দ পেয়েছিলেন, এবং সেই রূপকে আপন ভাষায় গ্রহণ করলেন যার মধ্যে সর্ব্বজনীন আনন্দের সত্য ছিল। বাংলা ভাষায় কথা-সাহিত্যের এই রূপের প্রবর্ত্তনে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী। রূপের এই প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে তারি পূজা চালালেন তিনি বাংলাসাহিত্যে।

তার কারণ তিনি এই রূপের রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ নয় যে গল্পের কোনো একটি থিওরি প্রচার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। "বিষবৃক্ষ" নামের দ্বারাই মনে হ'তে পারে যে, ঐ গল্প লেখার আনুষঙ্গিকভাবে একটা সামাজিক মৎলব তাঁর মাথায় এসেছিল। কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীকে নিয়ে যে একটা উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা গৃহধর্ম্মের পক্ষে ভালো নয় এই অতি জীর্ণ কথাটাকে প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য রচনাকালে সত্যই যে তাঁর মনে ছিল এ আমি বিশ্বাস করিনে—ওটা হঠাৎ পুনশ্চ নিবেদন, বস্তুত তিনি রূপমুগ্ধ, রূপদ্রষ্টা, রূপস্রষ্টারূপেই বিষবৃক্ষ লিখেছিলেন।

নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব সাহিত্যে তিনি কোন্ নবরূপের অবতারণা করেছেন।

ইংরেজি সাহিত্যের থেকে দেখা যাক্। এক দিন সাহিত্যের আসরে পোপ ছিলেন নেতা। তাঁর ছিল ঝক্‌ঝকে পালিশ করা লেখা ; কাটা কোটা, ছাঁটা ছোঁটা, জোড়া-দেওয়া দ্বিপদীর গাঁথনী। তাতে ছিল নিপুণ ভাষা ও তীক্ষ্ণ ভাবের উজ্জ্বলতা, রসধারার প্রবাহ ছিল না। শক্তি ছিল তাতে, তখনকার লোকে তাতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিল।

এমন সময়ে এলেন বার্ণস্। তখনকার শানবাঁধানো সহিত্যের রাস্তা, যেখানে তক্‌মা-পরা কায়দাকানুনের চলাচল, তার উপর দিয়ে হঠাৎ তিনি প্রাণের বসন্ত-উৎসবের যাত্রীদের চালিয়ে নিলেন। এমন একটি সাহিত্যের রূপ আন্‌লেন যেটা আগেকার সঙ্গে মিল্‌ল না। তারপর থেকে ওয়ার্ডস্বার্থ, কোলরিজ, শেলি, কীটস্ আপন আপন কাব্যের স্বকীয় রূপ সৃষ্টি ক'রে চল্‌লেন। সেই রূপের মধ্যে ভাবের বিশিষ্টতাও আছে, কিন্তু ভাবগুলি রূপবান হয়েছে ব'লেই তার গৌরব। কাব্যের বিষয়, ভাষা, ও রূপ সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্বার্থের বাঁধা মত ছিল,—কিন্তু সেই বাঁধা মতের মানুষটি কবি নন, যেখানে সেই সমস্ত মতকে বেমালুম পেরিয়ে গেছেন সেইখানেই তিনি কবি। মানবজীবনের সহজ সুখ দুঃখে প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য্যে আনন্দই সাধারণত ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যের অবলম্বন বলা যেতে পারে। কিন্তু টম্‌সন্ একেনসাইড প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনার মধ্যেও এই বিষয়টি পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়ের গৌরব তো কাব্যের গৌরব নয়—বিষয়টি রূপে মূর্ত্তিমান যদি হ'য়ে থাকে তাহ'লেই কাব্যের অমর লোকে সে থেকে গেল। শরৎকালকে সম্বোধন ক'রে কীটস্ যে কবিতা লিখেছেন তার বিষয়-বিশ্লেষণ করে কীইবা পাওয়া যায় ; তার সমস্তটাতেই রূপের জাদু।

য়ুরোপীয় সাহিত্য আমার যে বিশেষ জানা আছে এমন অহঙ্কার আমি করিনে। শুন্‌তে পাই দান্তে, গ্যেটে ভিক্টর হ্যুগো আপন আপন রূপের জগৎ সৃষ্টি ক'রে গেছেন। সেই রূপের লীলায় ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের আনন্দ। সাহিত্যে এই নব নব রূপস্রষ্টার সংখ্যা বেশি নয়।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বল্‌তে চাই। সম্প্রতি সাহিত্যের যুগ যুগান্তর কথাটার উপর অত্যন্ত বেশি ঝোঁক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে "যুগ" ব'লে এক-একটা মৌচাক তৈরি হয়, সেই সময়ের বিশেষ চিহ্ন-ওয়ালা কতকগুলি মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে,—বোঝাই সারা হ'লে তারা চাক ছেড়ে কোথায় পালায় ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার পরে আবার নতুন মৌমাছির দল এসে নতুন যুগের মৌচাক বানাতে লেগে যায়।

সাহিত্যের যুগ বল্‌তে কি বোঝায় সেটা বোঝাপড়া কর্‌বার সময় হয়েচে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখ্‌লেই কি নবযুগ আসে? এই রকমের কোনো-একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় একথা মান্‌তে পার্‌ব না। সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিষ আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাস-পরা সাহিত্য দেখ্‌লেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো-একটা চাপরাসের জোরে যে-সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায় জান্‌ব তার গোড়ায় একটা দুর্ব্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে ব'লেই চাপরাসের দেমাক বেশি হয়। য়ুরোপের কোনো কোনো লেখক শ্রমজীবীদের দুঃখের কথা লিখেচে, কিন্তু সেটা যে-ব্যক্তি লিখেচে সেই

লিখেছে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীলদর্পণ নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টিকর্তা। ওর মধ্যে যুগের তক্‌মাটাই সাহিত্যের লক্ষণ বানিয়ে বসে নি। আজকের দিনের বারো আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখ্‌তে বসে তাহ'লেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হ'বে না—কেন না তার পনেরো আনাই হবে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন, তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে ব'লেই করেন,সেটা সৃষ্টি কর্‌বার তাগিদ—সেটা ভিন্ন লোকের ভিন্ন রকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়্‌ল তো ভালোই। কিন্তু সেই এসে-পড়াটা যেন যুগধর্ম্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। কোনো-একটা উল্টরকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বল্‌বার চেষ্টা হয় যে, যে-হেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে কখনো হয় নি সেইজন্তেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হোলো সেও অসঙ্গত। পাগ্‌লামীর মতো অপূর্ব্ব আর কিছুই নেই—কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যালিটি ব'লে গ্রহণ করতে পারিনে। সেটা নূতন, কিন্তু কখনোই চিরন্তন নয়—যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিষ বলা যায় না।

কোনো ব্যক্তিবিশেষ নিজের সাহিত্যিক পালাটা সাঙ্গ ক'রে চ'লে যেতে পারেন, কিন্তু তিনি যে একটা-কোনো যুগকে চুকিয়ে দিয়ে যান—কিম্বা আর-একজন যখন তাঁর নিজের ব্যক্তিগত প্রতিভাকে প্রকাশ করেন তিনি আর-একটা যুগকে এনে হাজির ক'রে দেন এটা অদ্ভুত কথা। একজন সাহিত্যিক আর একজন সাহিত্যিককে লুপ্ত ক'রে দিয়ে যান না, তাঁরা একটা পাতার পরে আর একটা পাতা যুক্ত ক'রে দেন। প্রাচীনকালে যখন কাগজ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না তখন একজনের লেখা চেঁচে মেজে তারই উপরে আর একজন লিখত—তাতে পূর্ব্ব লেখকের চেয়ে দ্বিতীয় লেখকের অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণ হ'ত না,—এইমাত্র প্রমাণ হ'ত যে, দ্বিতীয় লেখকটি পরবর্ত্তী। একযুগ আর-এক যুগকে লুপ্ত না ক'রে আপনার স্থান পায় না এইটেই যদি সত্য হয় তবে তাতে কেবল কালেরই পূর্ব্বাপরতা প্রমাণ হয়, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়—হয় তো দেখা যাবে ভাবী কাল উপরিবর্ত্তী লেখাটাকে মুছে ফেলে তলবর্ত্তীটাকেই উদ্ধার করবার চেষ্টা করবে। নূতন কাল উপস্থিত মতো খুবই প্রবল,—তার তুচ্ছতাও স্পর্দ্ধিত, সে কিছুতেই মনে করতে পারে না যে, তার মেয়াদ বেশিক্ষণের হয়তো নয়। কোনো-এক ভবিষ্যতে সে যে তার অতীতের চেয়েও জীর্ণতর প্রমাণিত হ'তে পারে একথা বিশ্বাস করা তার পক্ষে কঠিন। এইজন্তেই অতি অনায়াসেই সে দম্ভ করে, যে, সেই চরম, সত্যের পূর্ব্বতন ধারাকে সে অগ্রাহ্য ক'রে দিয়েছে। একথা মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের সম্পদ চিরযুগের ভাণ্ডারের সামগ্রী—কোনো বিশেষ যুগের ছাড়পত্র দেখিয়ে সে আপনার স্থান পায় না।

যদি নিজের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি আশা করি আপনারা মাপ করবেন। আমার বাল্যকালে আমি দুই একজন কবিকে জানতুম। তাঁদের মতো লিখতে পারব এই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। লেখবার চেষ্টাও করেছি, মনে কখনো কখনো নিশ্চয়ই অহঙ্কারও হয়েচে—কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা অতৃপ্তিও ছিল। সাহিত্যের যে রূপটা অন্যের, আমার আত্মপ্রকাশকে কোনো মতে সেই মাপের সঙ্গে মিলিয়ে তোলবার চেষ্টা করে কখনই যথার্থ আনন্দ হ'তে পারে না। যা হোক্, বাল্যকালে যখন নিজের অন্তরে কোনো আদর্শ উপলব্ধ করতে পারিনি তখন বাইরের আদর্শের অনুবর্ত্তন ক'রে যতটুকু ফল লাভ করা যেত সেইটেকেই সার্থকতা ব'লে মনে করতুম্।

এক সময়ে যখন আপন মনে একলা ছিলুম, একখানা শ্লেট হাতে মনের আবেগে দৈবাৎ একটা কবিতা লিখতেই অপূর্ব্ব একটা গৌরব বোধ হ'ল যেন আপন প্রদীপের শিখা হঠাৎ জ্ব'লে উঠল। যে লেখাটা হোলো সেইটের মধ্যেই কোনো উৎকর্ষ অনুভব ক'রে যে আনন্দ তা নয়। আমার অন্তরের শক্তি সেই প্রথম আপন রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্ত্তেই এতদিনের বাইরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলুম। তখনকার দিনের প্রবীণ সাহিত্যিকরা আমার সেই কাব্যরূপটিকে সমাদর করেন নি, পরিহাসও করেছিলেন। তাতে আমি ক্ষুব্ধ হইনি, কেন না আমার আদর্শের সমর্থন আমার

নিজেরই মধ্যে, বাইরেকার মাপকাঠির সাক্ষ্যকে স্বীকার করবার কোনো দরকারই ছিল না। সেদিন যে কাব্য-রূপের দর্শন পেলুম সে নিঃসন্দেহই কোনো একটা বিষয় অবলম্বন ক'রে এসেছিল, কিন্তু আনন্দ সেই বিষয়টিকে নিয়ে নয়; সেই বিষয়ের মধ্যে কোনো অসামান্যতা ছিল ব'লেই তৃপ্তি বোধ করেচি তাও নয়। আত্মশক্তিকে অনুভব করে-ছিলুম কোনো একটি প্রকাশরূপের স্বকীয় বিশিষ্টতায়। সে লেখাটি মোটের উপর নিতান্তই কাঁচা—আজকের দিনে তা নিয়ে গৌরব করতে পারিনে। সেদিন আমার যে-বয়স ছিল আজ সে বয়সের যে-কোনো বালক-কবি তার চেয়ে অনেক ভালো লিখ্‌তে পারেন। তখনকার কালের ইংরেজি বা রাণীয় বিশেষ একটা পদ্ধতির সঙ্গে আমার সেই লেখাটা থাপ খেয়ে গেল এমন কথা বল্‌তে পারি নে। আজ পর্য্যন্ত জানিনে কোনো-একটা যুগযুগান্তরের কোঠায় তাকে ফেলা যায় কিনা। আমার নিজেরই রচনার স্বকীয় যুগের আরম্ভ-সঙ্কেত ব'লে তাকে গণ্য করা যেতে পারে।

এই রূপসৃষ্টির আবির্ভাব একই কবির জীবনে বারবার ঘটে থাকে। রচনার আনন্দের প্রকাশই হচ্ছে নব নব রূপে। সেই নবরূপ-আবির্ভাবের দিনে প্রত্যেক বারেই অন্তরের প্রাঙ্গণে শাঁখ বেজে ওঠে একথা সকল কবিই জানে। আমার জীবনে, মানসী, সোনার তরী, ক্ষণিকা পলাতকা আপন বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়েই উৎসব করেচে। সেই রূপের আনন্দেই রচনার বিষয়গুলি হয়েচে সার্থক। বিষয়গুলি অনিবার্য্য কারণে আপনিই কালোচিত হ'য়ে ওঠে। মানবজীবনের মোটা মোটা কথাগুলো আন্তরিক ভাবে সকল সময়েই সমান থাকে বটে, কিন্তু তার বাইরের আকৃতি-প্রকৃতির বদল হয়। মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র কালে-কালে বিস্তৃত হ'তে থাকে। আগে হয়ত কেবল ঋষি মুনি রাজা প্রভৃতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ কবিদের কাছে স্পষ্ট ছিল এখন তার পরিধি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছে। অতএব বিষয়ের বৈচিত্র্য কালে কালে ঘট্‌তে বাধ্য। কিন্তু যখন সাহিত্যে আমরা তার বিচার করি, তখন কোন্ কথাটা বলা হয়েচে তার উপরে ঝোঁক থাকে না, কেমন ক'রে বলা হয়েচে সেইটের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি দিই। ডারুয়িনের অভিব্যক্তিবাদের মূল কথাটা হয়তো মানব সাহিত্যে কখনো না কখনো বলা হয়েছে, জগদীশচন্দ্র বৃক্ষের মধ্যে প্রাণের যে স্বরূপটি দেখাচ্চেন হয়তো মোটামুটি ভাবে কোনো-একটা সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে তার আভাষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু তাকে সায়ান্স বলে না—সায়ান্সের একটা ঠাট আছে, যতক্ষণ সেই ঠাটের মধ্যে কোনো-একটা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা না যায় ততক্ষণ তার বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছুই নেই। তেমনি বিষয়টি যত বড়োই হিতকর বা অপূর্ব্ব হোক্ না কেন যতক্ষণ সে কোনো একটা সাহিত্য-রূপের মধ্যে চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র বিষয়ের দামে তাকে সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না। রচনার বিষয়টি কালোচিত যুগোচিত এইটেতেই যাঁর একমাত্র গৌরব তিনি উঁচুদরের মানুষ হ'তে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন্, সাহিত্যিক নন্।

আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে স্তব্ধ নয়। তার চল্‌তিধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাটে যা-নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায় কালই তা আবর্জ্জনা-কুণ্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব'লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কাল্‌চারের লক্ষণ বলে মানি। চল্‌তি স্রোতে যা-কিছু সব-শেষে আসে তারই যে সব-চেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ বাতিল হ'য়ে যায় এবং ভাবীকালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুবরূপ পায় এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম্ম আছে, এইজন্যে মাঝে মাঝে সে-সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূর্চ্ছা আক্ষেপ দেখা দেয়—তার মধ্যে যদি প্রাণের জোর থাকে তবে এ সমস্তই সে আবার কাটিয়ে যায়। কিন্তু দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার ক'রে নিই। মনে করি তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী যেহেতু এটা আধুনিক। সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনি প্রকাশ পায় যখনি দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশি প্রবল হ'য়ে উঠেচে। আজকালকার দিনে য়ুরোপে নানা কারণে তার ধর্ম্ম সমাজ লোকব্যবহার স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত

বেশি নাড়া খাওয়াতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা না হ'লে তার বাঁচাও নেই। এই একান্ত উৎকণ্ঠার দিনে এই সমস্যার দল বাছ-বিচার করতে পারচে না। যুদ্ধের সময় সৈনিকেরা যেমন প্রয়োজনের দায়ে গৃহস্থের ঘর ও ভাণ্ডার দখল ক'রে বসে তেমনি প্রব্লেমের রেজিমেণ্ট তাদের নিজের বারিক ছাপিয়েও সাহিত্যের সর্ব্বত্রই ঢুকে পড়চে। লোকে আপত্তি করচে না, কেননা সমস্যা সমাধানের দায় তাদের অত্যন্ত বেশি। এই উৎপাতে সাহিত্যের বাসা যদি প্রব্লেমের বারিক হ'য়ে ওঠে তবে এ প্রশ্ন মারা যায় যে, স্থাপত্য কলার আদর্শে এই ঘরের রূপটি কি। প্রয়োজনের গরজ যেখানে অত্যন্ত বেশি সেখানে রূপ জিনিষটা অবান্তর। য়ুরোপে সাহিত্যের সব ঘরই প্রব্লেমের ভাণ্ডারঘর হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করচে তাই প্রতিদিনই দেখচি সাহিত্যে রূপের মূল্যটা গৌণ হ'য়ে আসচে। কিন্তু এটা একটা ক্ষণকালীন অবস্থা—আশা করা যেতে পারে যে, বিষয়ের দল বর্ত্তমানের গরজের দাবী ক্রমে ত্যাগ করবে এবং সাহিত্যে রূপের স্বরাজ আবার ফিরে আসবে। মার্শাল্ ল যেখানে কোনো কারণে চিরকালের হ'য়ে ওঠে সেখান থেকে গৃহস্থকে দেশান্তরে যাবার ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। বিষয়-প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তা হ'লে বলতেই হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।

সভায় আমার বক্তব্য শেষ হ'লে পর অধ্যাপক অপূর্ব্ব-কুমার চন্দ বললেন—"কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্টতা ভাবের প্রগাঢ়তায় (intensity)। কবি টম্সন্ ঋতুবর্ণনাচ্ছলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, এইখানে ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গে তাঁর কাব্য বিষয়ের মিল আছে, কিন্তু পরস্পরের প্রভেদের কারণ হচ্ছে এই যে, টম্সনের কবিতায় কাব্যের বিষয়টির গভীরতা নেই, বেগ নেই, ওয়ার্ডস্বার্থের সেটি আছে।"

আমি বললুম, "তুমি যাকে প্রগাঢ়তা বলচ সেটা বস্তুত রূপসৃষ্টিরই অঙ্গ। সুন্দর দেহের রূপের কথা যখন বলি তখন বুঝতে হবে সেইরূপের মধ্যে অনেকগুলি গুণের মিলন আছে। দেহটি শিথিল নয়, বেশ আঁটসাট, তা প্রাণের তেজে ও বেগে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্য-সম্পদে তা সারবান ইত্যাদি। অর্থাৎ এই রকমের যতগুলি গুণ তার বেশি, তার রূপের মূল্যও তত বেশি। এই সব গুণগুলি একটি রূপের মধ্যে মূর্ত্তিমান হ'য়ে যখন অবিচ্ছিন্ন ঐক্য পায় তখন তাতে আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি। নাইটিঙ্গেল পাখীকে উদ্দেশ ক'রে কীট্স্ একটি কবিতা লিখেছেন। তার মাঝখানটায় মানব জীবনের দুঃখতাপ ও নশ্বরতা নিয়ে বিশেষ একটি বেদনা প্রকাশ করা হয়েচে। কিন্তু সেই বেদনার তীব্রতাই কবিতার চরম কথা নয়; মানবজীবন যে দুঃখময় এই কথাটার সাক্ষ্য নেবার জন্যে কবির দ্বারে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই—তা ছাড়া কথাটা একটা সর্ব্বাঙ্গীন ও গভীর নয়—কিন্তু এই নৈরাশ্য বেদনাকে উপলক্ষ্যমাত্র ক'রে ঐ কবিতাটি যে একটি বিশেষ রূপ ধ'রে সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠেচে সেইটেই হচ্চে ওর কাব্যহিসাবে সার্থকতা। কবি পৃথিবী সম্বন্ধে বলচেন,

"Here, where men sit and hear each other groan;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs
Where youth grows pale, and spectre-thin and dies;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs,
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond tomorrow'

এ'কে ইন্‌টেন্সিটি বলা চলে না, এ রুগ্ন চিত্তের অত্যুক্তি এতে অস্বাস্থ্যের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে—তৎসত্ত্বে গোটের উপর সমস্তটা নিয়ে এই কবিতাটি রূপবান কবিতা যে ভাবটিকে নিয়ে কবি কাব্য সৃষ্টি করলেন সে কবিতাকে আকার দেবার একটা উপাদান।

দেবালয় থেকে বাহির হ'য়ে গোধূলীর অন্ধকারে ভিতর দিয়ে সুন্দরী চ'লে গেল এই একটি তথ্যকে ক ছন্দে বাঁধলেন—

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনী মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরি-রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

তিন লাইনে আমরা একটি সম্পূর্ণ রূপ দেখলুম সামান্য একটি ঘটনা কাব্যে অসামান্য হ'য়ে র'য়ে গে

আর একজন কবি-দারিদ্র্য দুঃখবর্ণন করছেন। বিষয় হিসাবে স্বভাবতই মনের উপর তার প্রভাব আছে। দরিদ্র ঘরের মেয়ে, অন্নের অভাবে আমানি খেয়ে তাকে পেট ভরাতে হয়—তাও-যে পাত্রে ক'রে খাবে এমন সম্বল নেই—মেজেতে গর্ত্ত ক'রে আমানি ঢেলে খায়—দরিদ্র-নারায়ণকে আর্ত্তস্বরে দোহাই পাড়্বার মতো ব্যাপার। কবি লিখ্লেন,—

দুঃখ করো অবধান,
দুঃখ করো অবধান,
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখো বিদ্যমান।

কথাটা রিপোর্ট করা হ'ল মাত্র, তা রূপ ধর্ল না। কিন্তু সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় করা দ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না;—ভাব ভাষা ভঙ্গী সমস্তটা জড়িয়ে একটি মূর্ত্তি সৃষ্টি হোলো কি না এইটেই লক্ষ্য কর্বার যোগ্য। "তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে"—দারিদ্র্যদুঃখের বিষয়-হিসাবে এর শোচনীয়তা অতি নিবিড়, কিন্তু তবু কাব্য-হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের অসামান্য পাণ্ডিত্য; সেইটি অপর্য্যাপ্তভাবে প্রমাণ কর্বার জন্যে বঙ্কিম তার মুখে ষড়্দর্শনের আস্ত আস্ত তর্ক বসিয়ে দিতে পার্তেন। কিন্তু পাঠক বল্ত, আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাইনে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট ক'রে দেখ্তে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায় ভঙ্গীতে আভাষে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্ব্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানেই বঙ্কিম হ'লেন কারিগর, সেইখানে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের বিষয়গত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল আপন সৃষ্টির কাজ করে। আনন্দমঠে সত্যানন্দ ভবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের নবযুগ অবতারণ করেছেন কি না তা নিয়ে সাহিত্যের তরফে আমরা প্রশ্ন কর্ব না, আমাদের প্রশ্ন এই যে, তাঁদের নিয়ে সাহিত্যে নিঃসংশয় সুপ্রত্যক্ষ কোনো একটি চারিত্র রূপ জাগ্রত করা হ'ল কি না। পূর্ব্বযুগের সাহিত্যেই হোক্, নবযুগের সাহিত্যেই হোক, চিরকালের প্রশ্নটি হচ্চে এই যে, "হে গুণী, কোন্ অপূর্ব্ব রূপটি তুমি সকল কালের জন্যে সৃষ্টি কর্লে।"

(বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-আলোচনা সভার প্রথম অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বিবরণ)

শঠে শাঠ্যং

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য

এক—হাতে খড়ি

(১)

নির্জ্জন বাড়ির কোণের এক ঘরে ব'সে বিমল ভবিষ্যতের কথা ভাব্ছিল।

চাকর রামলাল এসে বল্লে, "খোকাবাবু, তোমাকে একজন বাবু ডাক্ছেন।" কে আবার তার খোঁজ কর্তে এল একথা ভাব্তে ভাব্তে বিমল বল্লে—"বেশতো, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।"

"তিনি মোটর থেকে নাম্বেন না। আমি তো বল্লাম, 'আপনি উপরে আসুন', তাতে তিনি বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন, আমি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে যেতে পার্ব না, তোমার বাবুকে বলো, নীচে এসে দেখা ক'রে যেতে।"

রূঢ় বা অভদ্র ব্যবহার বিমলের প্রায় গা-সওয়া হ'য়ে এসেছিল, তবুও এটা অযাচিত ব'লে সে একটু আশ্চর্য্য হ'ল। রামলাল ব্যাপারটা বুঝে একটু ইতঃস্তত ক'রে বল্লে—"এই বাবুই বোধ হয় এ বাড়ী খরিদ করেছে।"

বিমল কোন কথা না ব'লে উঠে, নীচে নেমে গেল। বাড়ীর সাম্নে একখানা গতায়ুপ্রায় ফোর্ড গাড়ি, পেছনের সীটে একজন দালাল গোছের প্রৌঢ় লোক ব'সে, সাম্নে ড্রাইভার ও আর একজন দারোয়ান গোছের লোক।

প্রৌঢ় লোকটি বিমলকে দেখ্বামাত্র নমস্কার ইত্যাদির অবসর না দিয়ে জোরে ব'লে উঠ্লেন, "এই যে বিমলবাবু, তারপর, আপনার মতলবখানা কি বলুন তো?"

প্রশ্নের ভাবগতিকে চম্কে উঠে বিমল বল্লে, "আজ্ঞে, কি—কিসের কথা বল্ছেন?"

বিমলের উত্তরে বাবুটি যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে চীৎকার ক'রে বল্‌লেন, "কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, না? বলি, আমি কি এবাড়ীটা ধর্ম্মশালা করার জন্যে কিনেছি, না কি মনে করেছেন? নড়্‌বার নামগন্ধও নেই, এর মানেটা কি?"

লোক জড়ো হ'তে লাগ্‌ল। বিমল মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "দেখুন, চেষ্টার ত ত্রুটী কর্‌ছি না। একটা আয়ের উপায় না হ'লে কোথায় যাই বলুন, কে আমায় আশ্রয় দেবে! আপনি যে অনুগ্রহ ক'রে আমায় এখানে থাক্‌তে দিয়েছেন, তার জন্যে আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।"

একথা বল্‌তে বিমলের প্রায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। কিন্তু বাবুটি তাতে কিছুমাত্র নরম না হ'য়ে বল্‌লেন, "কৃতজ্ঞ হয়েছ ত আমি বত্তে গেলাম। আরে বাবু, তোর আপন বাপ, সে গেল তোকে রাস্তায় বসিয়ে, আর তুই চাপ্‌তে চাস্ অন্য লোকের কাঁধে! ওসব অনুগ্রহ-ফনুগ্রহ জীবনকেষ্ট পাল বোঝে না। এত বড় শরীরটা তো রয়েছে মুটেগিরী কর্‌লেও তোমার মাসে পঁচিশটা টাকা আসে। আচ্ছা, এর বিহিত আমি কর্‌ছি। এই, গাড়ি ষ্টার্ট দেও।"

"ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, দেখ, ভাল চাও ত"

বিমল রাস্তার লোকের সামনে এইরকম অপমানিত হ'য়ে বজ্রাহতের মত খানিক দাঁড়িয়ে তারপর মাথা হেঁট ক'রে ধীরে ধীরে বাড়ীতে ঢুকে উপরে চল্‌ল।

ঘরে ঢুকে শূন্য মনে সে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় সিঁড়িতে পাল মহাশয়ের চটির চটাপট শব্দ ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। তিনি ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "দেখ, ভাল চাও ত আজই মানে মানে স'রে পড়, এই আমার শেষ কথা।" ব'লেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিমল অবসন্ন দেহ মন নিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। অল্পক্ষণ পরে তার মন একটু স্থির হ'তেই নানা কথা তার মনে আস্‌তে লাগ্‌ল। স্নেহময় পিতা, যিনি অল্পবয়সে মা-হারা ছেলের একাধারে মা-বাপ দুই ছিলেন; আনন্দময় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আলয় এই তার পৈতৃক বসতবাড়ী, যা ক'মাস আগেও আত্মীয় বন্ধু চাকর বাকরে পরিপূর্ণ ছিল—দুর্দ্দিনের সঙ্গে সঙ্গে সে-সবাই তাকে ছেড়ে চ'লে গেছে, আছে শুধু এক প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত পুরানো চাকর রামলাল; প্রেসিডেন্সী কলেজ, খেলার ক্লাব, জিম্‌নাষ্টিকের আড্ডা, কি সুখের মধ্যেই সে-সব দিন গিয়েছে! কে জান্‌ত তখন যে, তার বাবা ক্রূরমতি বন্ধুদের কথা সরল মনে বিশ্বাস ক'রে সর্ব্বস্ব হারিয়ে ব'সে আছেন। তারপর পিতার হঠাৎ ব্যারাম ও অল্প ক'দিনের মধ্যেই মৃত্যু আর তার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত মোকর্দ্দমা নালিশ ক্রোক, সুসময়ের আত্মীয়বন্ধুদিগের অন্তর্দ্ধান এবং চারিদিকে উত্তমর্ণরূপ ফেরুপালের চীৎকার।

সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান অবস্থার কথা তার মনে এল। উপার্জ্জনের চেষ্টায় কত লোকের কাছে সে গিয়েছে কত অফিসে উমেদারী করেছে, কিন্তু সে হৃতসর্ব্বস্ব মুরুব্বীহীন অসহায় যুবক, শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয়নি, সুতরাং প্রত্যেক বারেই তাকে নিরাশ হ'য়ে ফির্‌তে হয়েছে এবং বিদ্রূপ অপমানও ফাউ হিসাবে অনেক জুটেছে। তার উপর আজকার এই ব্যাপার।

রামলাল এসে বল্‌লে—"খাবার ঠিক হয়েছে, স্নান করতে ওঠো।"

বিমল কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে প'ড়ে রইল।

"খোকাবাবু, বেলা হয়েছে, স্নান ক'রে খেয়ে নাও।"

বিমল কোনও উত্তর দেয় না দেখে রামলাল কাছে এগিয়ে এল।

কাছে এসে বিমলের মুখের ভাব দেখে সেও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগ্‌ল,

"মন খারাপ ক'রে কি হবে, খোকাবাবু! নেে

খেয়ে নাও, তারপর যা দরকার তার বন্দোবস্ত আমি কর্‌বো।"

রামলালের মুখে ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কথা শুনে বিমল মুখ তুলে তার দিকে তাকালে। রামলাল গরীব হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ; তার কতটা কি ক্ষমতা, তা জানা সত্বেও একথায় বিমল যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল।

"কি ব্যবস্থা কর্‌বে, রামলাল ?"

"আর কিছু না হয় ত চলো আমরা এ জুয়াচোরের দেশ ছেড়ে চ'লে যাই।"

"কোথায় যাব, যাবার জায়গা যে নেই।"

"কেন, গয়া জিলায় আমার দেশে; সেখানে তোমাদের দৌলতে আমার যা আছে তাতে ক'রে নিশ্চিন্তি হ'য়ে কিছুদিন থাকা যাবে, তারপর ধীরে সুস্থে যা হয় একটা কিছু কাজ তুমি ঠিক ক'রে নিয়ো।"

রামলালের কথায় বিমলের চক্ষে জল এল। একটু ভেবে সে বল্‌লে, "রামলাল, সেটা কি ঠিক হ'বে ? তুমি বুড়ো মানুষ, সারাজীবন খেটে যা জমিয়েছ তা আমার জন্যে খরচ হ'য়ে গেলে তোমার শেষ বয়সে হ'বে কি ? তার চেয়ে তুমি বরং দেশে চ'লে যাও, আমি দেখি কপালে কি আছে !"

"ওসব হবে না, বাবু ! আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পার্‌ব না। আমার আর আছেই বা কে ? আজ চল্লিশ বছর তোমাদের এখানে আছি, যে-কটা দিন বাকী আছে তা তোমার সঙ্গেই কাটিয়ে যাব। তুমি আমার কথা শোন, আমরা চ'লে যাই। এদেশে ধরম নেই, দেবতা নেই। নইলে অমন লোক তোমার বাবা, তার এমন সর্ব্বনাশটা হয়। ও হোঃ হোঃ ! কী পাজী দাগাবাজ এখানের লোক ! রাজেন্দ্রলাল বোস, জনম ভোর ধরম করম দয়া দান কর্‌লো, কারো অনিষ্ট, কারো উপর অত্যাচার করেনি; আর যত বেটা জুয়াচোর মিলে তার কি দশাই না কর্‌লে। এদের ছুরী মেরে খুন কর্‌লেও পুণ্যি হয়। ছেড়ে চল এদেশ, খোকাবাবু।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বিমল বল্‌লে—"আচ্ছা, তাই হবে। তবে কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে যাব।"

"আচ্ছা তাহ'লে আমি দুচার দিনের জন্যে বন্দোবস্ত করি।"

সেই দিনই খাওয়ার পর রামলালকে সঙ্গে নিয়ে বিমল এক হোটেলে গিয়ে উঠল। ভবিষ্যতের কিছুটা ঠিক হওয়ায় তার মনের ভার অনেকটা কমে গিয়েছিল। আবার তার আশা হচ্ছিল যে, হয় তো বা তার দুঃখের অবসান আরম্ভ হ'ল। কিন্তু উপার্জ্জনের কি করা যায় এ প্রশ্নের কোনও উত্তর সে খুঁজে পাচ্ছিল না।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সে ঠিক কর্‌লে যে, সে একবার এটর্নী মিটার সাহেবের কাছে যাবে, তিনি যদি কিছু ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন। মিটার সাহেবকে সে ছেলেবেলা থেকেই পিতৃ বন্ধু ব'লে জানে, এবং তিনি যে তার বাপের কাছে বহুবার অনুগৃহীত একথাও সে জান্‌ত। সুতরাং যদিও লোকে বলে যে, তিনিই তার বাপের সর্ব্বনাশের মূল এবং এপর্য্যন্ত মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আর কোন সাহায্যও তিনি করেননি, তবুও সে ঠিক কর্‌লে যে, সন্ধ্যার পর একবার তাঁর বাড়ী যাবে।

হরিদাস মিত্র, অধুনা মিষ্টার এইচ ডি মিটার, এককালে যাই থাকুন এখন একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। বালিগঞ্জে বাড়ী করার পর তিনি পুরো-দস্তুর সাহেব, গরীব বাঙ্গালী আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে কোন সম্পর্কও রাখেন না।

সন্ধ্যার পর বিমল তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল। মিত্র মহাশয়ের—থুড়ি, মিটার সাহেবের—নূতন "বোই" বেয়ারা বিমলের ভদ্র পোষাক-পরিচ্ছদ ও চেহারা দেখে সাহেবের কোনও "দোস্তের" বাড়ীর ছেলে ভেবে তাকে ড্রইং রুমে বসিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে কি একটা আন্‌তে চ'লে গেল।

ড্রইং-রুমের পাশেই মিটার সাহেবের ষ্টডি ঘর। মাঝের দরজা খোলা কিন্তু একটা দামী পরদা টাঙ্গানো। পর্দার ও দিকে থেকে দুজন লোকের গলা শোনা যাচ্ছে, একজন মিটার সাহেব, অন্য জনের গলা অপরিচিত।

বিমল শুন্‌ল, মিটার সাহেব বল্‌ছেন—"দেখ হরেন, আমি ও সব শুন্‌তে চাই না, যদি ভাল চাও তো আমার কথামত বখরা দাও, নইলে আমি সব ভণ্ডুল ক'রে দেবো।"

অপরিচিত লোকটি উত্তর দিলে, "আমি কি দেবো না বল্‌ছি ? তবে যা ন্যায্য তাই বলুন, আমি রাজী আছি।"

"কি অন্যেয্যটা বলেছি ? আমিই খুঁজে পেতে শীকার জোটালাম, আমারই পরামর্শে ও লোকটা তোমার কাছ থেকে হুণ্ডি হ্যাণ্ডনোটে গলাকাটা সুদে টাকা নিলে, তবে না তোমার দুলাখ টাকা সুদে আসলে এক বছরেই ছ'লাখ হ'য়ে দাঁড়ালো।"

"আজ্ঞে, তা ধার নিলেই ওরকম দাঁড়ায়; ওর টাকার দরকার তবে না ও নিয়েছে।"

"বটে ! সত্যি নাকি ? কেন, ওর যা property তা ও মর্টগেজ কর্‌লে ওকি সাত আট পার্সেণ্টে টাকা পেতো না ? আমিই না ওকে লোকলজ্জা জানাজানির ভয় দেখিয়ে, ওরকম সাংঘাতিক সুদে Short term loans নিইয়ে দি। টাকার দরকারের কথা বল্‌ছো, তাও তো আমারই ব্যবস্থা, আমার কথা মতই তো ও কাপ্তেনি আর তার পর Speculation আরম্ভ কর্‌লে। তাও সে কত ব্যাপার কর্‌তে হয়েছে, গোড়ায় ত ও কথায় কথায়

ভড়্কাতো। এখানে কিছু পাইয়ে দিয়ে ওখানে কিছু করিয়ে দিয়ে তবে না ওর ভয় ভাঙ্লো।"

"সে-সব জানি। কিন্তু ওকে যারা লুট কর্‌লে তাদের কাছ থেকেও তো আপনি মন্দ কিছু পান্‌নি।"

"আমি কি পেয়েছি না পেয়েছি, তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? তোমায় শাঁসালো খাতক এনে দিয়েছি, যাতে তোমার ডিক্রী নির্ব্বিবাদে হ'য়ে যায় তার বন্দোবস্তও আমি কর্‌বো। কিন্তু যদি যা বল্‌ছি তা না করো তো আমি ফ্যাসাদ বাধাব ব'লে রাখ্‌ছি।"

"আরে না, না, না। কি বিপদ! কেন মিছে চট্‌ছেন, আমি ত আপনার সঙ্গে রফা কর্‌তেই এসেছি। ডিক্রীটা হ'য়ে যাক, তার পর ওর দলিল-পত্তর এনে অল্প দিনের মেয়াদে একটা Sale purchase document বা মর্টগেজ ক'রে দিন যাতে নীলাম-ফিলামের বখেড়া না হ'য়ে সহজেই ওর সম্পত্তিটা হাতে আসে—"

"সে-সব ভার আমার। কিন্তু আমার এক কথা, রফা-টফা নয়। হাস্‌নাবাদের দিকের চর জমী গুলো আর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাড়ীখানা।"

"তবে আর আমার রইলো কি?"

"রইলো কি? ওর ভবানীপুরের বসত বাড়ী, বৌবাজারের দোকান-বাড়ীগুলো, শাল্‌কেতে গঙ্গার ধারে জমিটা, তারপর আবাদ জমিগুলো—না, তোমার সঙ্গে বন্‌বে না দেখছি।"

"আহা, চটেন কেন? তবে প্রাপ্য গণ্ডা কে হাসিমুখে ছাড়্‌তে পারে বলুন?"

"তুমি কি প্রাপ্য গণ্ডা কিছু ছাড়্‌ছো নাকি? যা আমি নেব তা ছাড়াও যা রইল তার দামও এই আজ-কালকার বাজারে সাত আট লাখ টাকা।"

"আচ্ছা, তবে আপনি যা বলেন তাই হ'বে। কিন্তু দেখ্‌বেন সব ফস্‌কায় না যেন। ও লুকিয়ে কিছু ব্যবস্থা না করে।"

"লুকিয়ে ব্যবস্থা? কি Collusive mortgageএর কথা ভাব্‌ছো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এই আপনিই যা দুচারবার দেখিয়েছেন, তারপর ত আর নিশ্চিন্তমনে টাকাকড়ি দিতে পারা যায় না।"

মিটার সাহেব এ কথায় যেন খুব আমোদ পেয়ে হো হো ক'রে হেসে বল্লেন—"আরে দুরঃ। তুমিও যেমন, সঞ্জীব ঘোষের অতবুদ্ধি থাক্‌লে সে এ খপ্পরে পড়ে? তোমার নোটীশ পেয়েই সে ভয়ে আধমরা হ'য়ে গেছে। এই দেখো তিন চার দিনের মধ্যেই ওর যত দলিল-দস্তাবেজ এখানে এসে, তোমার আমার যা দরকার সব ঠিক হ'য়ে যাবে। এর আগেই সব হ'তে হ'য়ে যেতো শুধু ওর বৌটা ভারী ত্যাঁদড়। সে যত দলিল-পত্র নিজের কাছে রেখেছে। এবার তোমার নোটীশের ঠেলায় সেও ঘেব্‌ড়ে গিয়ে রাজী হয়েছে।"

"ভাল কথা, তবে এবার আপনার আমার মধ্যে বন্দোবস্তটা হোক। কি রকম কি কর্‌তে হ'বে বলুন।"

বিমল এসব শয়তানী পরামর্শের এতটা শুনেছে এমন সময় বেয়ারা এক ট্রেতে ক'রে এক বোতল হুইস্কি, চার পাঁচটা পেট মোটা সোডার বোতল ইত্যাদি নিয়ে পর্দ্দা কাঁধদিয়ে ঠেলে ভিতরে ঢুক্‌লো। ভিতরে ঢুকে সে মিটার সাহেবকে বল্‌লে, "হুজুর, এক বাবু আপসে মিল্‌নেকে লিয়ে গোল কামরা-মে বইঠে হুঁয়।"

মিটার সাহেব শশব্যস্ত হ'য়ে "বাবু—কোন্ বাবু" ব'লে প্রায় লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বিমলকে দেখে তিনি একটু স্থির হয়ে বল্‌লেন, "ওঃ, বিমল।"

এই ব'লেই তিনি তীব্র দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "তুমি কতক্ষণ ব'সে আছ?"

হঠাৎ এই প্রশ্ন করায় বিমলের মুখ দিয়ে স্বাভাবিক ভদ্র উত্তর—"আজ্ঞে, এই আস্‌ছি" এ কথা সহজ ভাবে বেরোল।

মিটার সাহেব এ উত্তরে মনে মনে খুসী হলেন, কিন্তু বিমল তাঁর সৎকাজের মধ্যে এ রকম বাধা দেওয়ায়, উপরন্তু তাঁর মনে মিথ্যা আতঙ্ক আনায় তাঁর ভয়টা বিরক্তিতে পরিণত হোলো। তিনি বেশ রুক্ষ ভাবেই বল্‌লেন,—"কি-ব্যাপার কি? এ রকম অসময়ে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছো কেন?"

তখন রাত্রি বড় জোর আটটা। বিমলের মনে পড়ল যে, তাদের অবস্থা ভাল থাক্‌তে এই মিটার সাহেবই কত বার রাত্রি দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত গল্প ক'রে পরে তাকেই বলেছেন "বিমল বাবা, অনেক রাত্তির হয়ে গেল আজ এখানেই খেয়ে যাই, রামলালকে ব'লে দাও ব্যবস্থা কর্‌তে", এবং কতবার ওকে সেধে এনে রাত্রে খাইয়েছেন। কিন্তু কি করে? এখন যে দায় তার, কাজেই যতদুর সম্ভব ধীর ভাবে সে বল্‌লে—"বড় বিপদে পড়েছি, তাই আপনাকে বিরক্ত—"

কথা শেষ হবার আগেই মিটার সাহেব জোরে ব'লে উঠলেন, "বিপদে পড়েছ ত আমি কি কর্‌বো? টাকা ত আর গাছে ফলে না যে, যখন যে চায় তাকে বিলিয়ে দেবো।"

"আজ্ঞে না, আমি তো টাকার কথা বল্‌ছি না।"

"তবে কি চাই? শীগ্‌গির ক'রে বলো।"

'যদি কোথাও চিঠি-টিঠি দেন, যাতে একটা চাকরী পাই।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখ্‌বো এখন। একদিন আফিসে দেখা কোরো। এরকম বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে এসো না।" ব'লে মিটার সাহেব ফিরে ষ্টাডি ঘরে যাবার উপক্রম কর্‌লেন।

নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে এ অভদ্র উত্তর সহ্য ক'রে বিমল বল্‌লে,—"কবে যাবো ?"

এ কথার উত্তরে মিটার সাহেব ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে চেঁচিয়ে বল্‌লেন,—"ওঃ, ভারি আমার মক্কেল রে, তাই appointment চাইছেন! মাঝে মাঝে খবর নেবে, যেদিন ফুরসৎ হ'বে দেখা কর্‌বো। এখন যাও, আমার সময় নষ্ট কোরো না।"

বিমল ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় শুন্‌লে মিটার সাহেব বেয়ারাকে বল্‌ছেন, "দেখো বোই, হামারা হুকুম নহী লেকে কিসিকো ভিতর আনে মৎ দেও"।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা। গড়ের মাঠে ঘাসের উপর ব'সে বিমল কি কর্‌বে তাই ভাবছিল। যেখানে যায় সেখানেই ব্যর্থ চেষ্টা! শেষ ভরসা ছিল যার কাছে সেতো অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে। অপমানের পর অপমান, মানুষের কত আর সহ্য হয়! কি কৃতঘ্ন এই মিটার সাহেব। যে বন্ধু তাকে সময়ে অসময়ে সাহায্য ক'রে এসেছে, তার সর্ব্বনাশ ক'রে শেষে তার অসহায় ছেলেকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে। রামলালের কথা মনে এল বিমলের—"এদের ছুরী মেরে খুন কর্‌লেও পুণ্যি হয়"—

বাপের সর্ব্বনাশ ও নিজের অপমানের কথা মনে ক'রে বিমল রাগে দুঃখে জল্‌তে লাগ্‌লো। মনের জ্বালায় অধীর হ'য়ে সে উঠে সোজা হ'য়ে চীৎকার ক'রে বল্‌লে,—"বাবা, তোমার নাম ক'রে শপথ ক'রে বল্‌ছি, যদি বেঁচে থাকি এ সবের প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ক্ষান্ত হ'ব না।"

এরকম পাগলের মত চীৎকার ক'রে শপথ করায় তার দেহ-মনের জ্বালা যেন হঠাৎ নিবে গেল। তারপর সে ধীরে ধীরে চল্‌তে চল্‌তে ভাবতে লাগ্‌ল যে, প্রতিশোধের কি উপায়। জীবিকা উপার্জ্জনের কথা সে ভুলেই গেল।

(২)

প্রতিশোধের কথা ভাবা সহজ, কিন্তু কাজে পরিণত করা বিশেষ শক্ত; বিশেষে শত্রু যেখানে প্রবল পরাক্রান্ত শঠ। শঠে শাঠ্যম্‌ সমাচরেৎ। বিমলের মনে একটা মতলব এলো, মন কিন্তু সহজে তাতে রাজী হোলো না, কেননা সেটা বে-আইনী অতএব অসৎ। "প্রতিশোধ"ই আমার ধর্ম্ম, আইন ও ধর্ম্ম এক নয়, এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়ে বিমল ভাবতে লাগ্‌লো যে কার সাহায্যে সে কার্য্য-সিদ্ধি কর্‌তে পারে।

অনেক ভাব্‌বার পর তাদের ক্রিকেট ক্লাবের সার্ব্বজনীন "দাদা" অক্ষয় মুখুয্যের কথা মনে পড়্‌লো। অক্ষয়-বাবুর ছোট ভাই অমর বিমলের বাল্যবন্ধু অক্ষয়বাবুর "দাদা" খেতাব সার্থক ছিল। ছোট ভাইয়ের বন্ধুদের তিনি সত্য সত্যই নিজের ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন, এবং তারাও এই স্নেহশীল, স্পষ্ট-বক্তা, কিন্তু প্রচণ্ড-ক্রোধ-পরায়ণ লোকটিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্‌তো।

বিমল অক্ষয়বাবুর পরামর্শ নেওয়া ঠিক সাব্যস্ত ক'রে তাঁর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হোলো। যখন সে সেখানে পৌঁছালো তখন রাত্রি দশটা বেজে গিয়েছে এবং অক্ষয়-বাবুর বৈঠকখানায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা উঠবার উপক্রম কর্‌ছেন।

বিমলকে দেখে অক্ষয়বাবু—"এই যে বিমল, এস ভাই, বোসো, বোসো" ব'লে সম্ভাষণ কর্‌লেন, তারপর অন্য বন্ধু-বান্ধব সবাই একে একে বিদায় নিলে পরে তার কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লেন—"অনেক দিন পরে দেখা হোলো ভাই, কেমন আছ বলো।"

বিমল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে,—"আছি এই এক রকম। জানেনই তো সব।"

অক্ষয়বাবু একটু চুপ ক'রে থেকে পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন,"হ্যাঁ ভাই, জানিতো সবই। আরও দুঃখ যে,জেনেও কিছু কর্‌বার উপায় খুঁজে পাইনি। আমার সংসারের ব্যাপার তো জানই তার উপর অমরের বিলেত যাওয়ায়"—

"সে-সব আমায় বল্‌তে হবে না, অক্ষয়দা।"

"হ্যাঁ, বুঝেছো তো ভাই। তবে একথা ভুলোনা যে যতদিন তোমার অক্ষয়দা দু পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ততদিন এবাড়ীতে অমরের যে-স্থান তোমারও তাই।"

খানিক থেমে অক্ষয়বাবু ফের বল্‌লেন,—"যাক সে-সব কথা, এখন কি কর্‌বে মনস্থ করেছ ?"

বিমল বল্‌লে, "অনেক জায়গায় তো চেষ্টা দেখলাম, কোথাও কিছু হলোনা, লাভের মধ্যে খোঁচা খাওয়া আর কয়েক জায়গায় রীতিমত অপমান হওয়া।"

"অপমান! কে তোমায় অপমান কর্‌লে ?"

ঈষৎ ম্লান হাসি হেসে বিমল বল্‌লে—

"যে কেউ সুবিধে পেয়েছে। এই আজই তো সন্ধ্যের সময় মিত্তির সাহেবের বাড়ী গেছলুম, যদি সে কারুর কাছে চিঠি পত্র দেয়। সে-সব তো হ'লই না, উল্টে কুকুরের মত তাড়া খেয়ে চ'লে আস্‌তে হোলো।"

"কী ? হরিদাস মিত্তির তোমায় অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে ? উঃ! কী পাজী বজ্জাৎ লোক! তোমার বাবা তাকে রাস্তা থেকে তুলে হাতীর ওপর বসিয়েছিলেন, তার জন্যে কি না করেছিলেন, আর তার ছেলেকে"—

বল্‌তে বল্‌তে ভয়ানক গরম হ'য়ে তিনি বল্‌লেন—"তোমারই বা কি রকম আক্কেল! ও হারামজাদার বিশ্বাসঘাতকতাতেই তো তোমাদের এই সর্ব্বনাশ। তুমি আর লোক খুঁজে পেলে না তাই গেলে ওর কাছে। তোমাকেই বা কি বলি। রাজেন্‌-বাবু, তোমার বাবা,—আমাদের গুরুজন ব্যক্তি কাজেই কিছু বলা যায় না, কিন্তু কি বিশ্বাসে যে তিনি দুধ-কলা দিয়ে এমন কালসাপ পুষেছিলেন জানি-না।"

"বুঝ্‌ছি সে সব অক্ষয়দা। নিতান্ত অসহায় হ'য়ে রয়েছি নইলে এর শোধ একচোট—"

"আরে, আমরাই কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি না, তুমি তো ছেলে-মানুষ। কি বল্‌বো, লোকটাকে ধর্‌বার ছোঁবার উপায় নেই—যাক্‌ খোদা দিন দেয় তো এই অক্ষয় মুখুয্যেই তাকে একবার দেখে নেবে"—

"আপনাকেও কি ঘায়েল করেছে নাকি?"

"আমার আর আছে কি যে ঘায়েল হ'ব! তবে এই সেদিন একটা মোকদ্দমায় অনেক লড়ে ডিক্রী পেয়ে execute কর্‌তে গিয়ে ওর কারসাজীর দরুণ আমায় মহা বেকুব বন্‌তে হয়েছে। থাক্‌ আর সেকথা ভেবে লাভ কি—"

বিমল জান্‌তো অক্ষয়বাবুর আত্মাভিমানে আঘাত লাগা মানে কি; সুতরাং সুযোগ বুঝে সে ব'লে উঠ্‌লো—

"লাভ যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না" অক্ষয়-বাবু একথায় বিস্মিত হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"কি রকম?"

"বল্‌ছি। আচ্ছা, Collusive mortgage কাকে বলে বুঝিয়ে দিন্‌তো।"

"কেন হে, সে খবরে তোমার কি দরকার?"

"দরকার হ'বে কি না জানি না। আজ যখন মিত্তির সাহেবের ওখানে যাই তখন বেয়ারাটা আমায় যেখানে বসিয়েছিল সেখান থেকে পাশের ঘরের কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছিলো। আমি অবিশ্যি ইচ্ছে ক'রে আড়ি পাতিনি"—

অক্ষয়বাবু উৎসুক হ'য়ে বল্‌লেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বুঝেছি, তারপর?"

"যা শুনলাম তাতে বুঝলাম যে, ওরা খুব বড় একটা শীকার পাকে ফেলেছে। বধ করারও বন্দোবস্ত প্রায় সব ঠিক, তবে ভয় এই যে, চটপট্‌ সব হয়ে না গেলে শেষে Collusive mortgage হ'য়ে ফস্কে যেতে পারে। তাই ভাব্‌ছিলুম যদি"—বিমলের মুখে এসব কথা শুনে অক্ষয়বাবু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর প্রচণ্ড একচোটে হেসে নিয়ে টেবিলে এক কিল মেরে বল্‌লেন—

টেবিলে এক কিল মেরে বল্‌লেন

"ব্রাদার! একেই ব'লে Poetic justice, মানে যদি শেষ পর্য্যন্ত এটা ঠিক উৎরে যায়।"

এই ব'লে তিনি অল্পক্ষণ ভেবে ফের বল্‌তে লাগ্‌লেন—"দেখ ভাই' এ জিনিষটা বড় খারাপ, তবে, I am a believer in Mosaic Law, 'An eye for an eye, a tooth for a tooth'—in certain cases, that is, কাজেই তুমি যদি প্রতিশোধ চাও তো আমি যতটা সম্ভব বন্দোবস্ত ক'রে দেবো, তবে আমি কিছু নেব না।"

"আমারো প্রতিশোধ নিয়েই কথা, অক্ষয়দা। আমি শপথ করেছি যে যারা আমার এ অবস্থা করেছে তাদের উপর vengeance না নিয়ে আমি ক্ষান্ত হ'ব না।"

বিমলের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে অক্ষয়বাবু বল্‌লেন,—"বেশ! তবে শঠে শাঠ্যম্‌ই করা যাক্‌। এখন কাজের কথাই হোক। তুমি যা বল্‌ছো তাতে সময় নষ্ট করা চল্‌বে না। যে লোকটা ফাঁদে পড়েছে তাকে চেনো?"

"না চিনি না। তবে তার নাম সঞ্জীব ঘোষ আর তার বসতবাড়ী ভবানীপুরে।"

"সঞ্জীব ঘোষ, ভবানীপুর? দেখি telephone directoryটা। এই যে, Ghosh Sanjib Shandra, 55 Iswar Gupta Road। যাক্‌ এখন কি কি শুনেছো সব বলতো।"

অদ্যোপান্ত শুনে তিনি বল্‌লেন,—"সঞ্জীব ঘোষের স্ত্রী যদি দলিলপত্র হাত ছাড়া না ক'রে থাকে তাহ'লে এটার

ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দেখি একবার আশুকে ফোন ক'রে, ওর এক Jew মক্কেল আছে,তার ব্যবসাই এই।" এই ব'লে তিনি টেলিফোন তুলে বল্লেন,"নর্থ টু, ও, ফোর,ও। হ্যালো কে? ও আশু? ওরে তোর সে Jew মক্কেল এখানে আছে? আছে! কেন জানতে চাস্? কাল সকালে আসিস, মানে আমার সকালে বুঝেছিস্ তো? হঁ্যা, এই সাড়ে আটটা আন্দাজ।" ব'লে তিনি ফোন ছেড়ে দিয়ে আবার ডাইরেক্টরী খুঁজ্তে লাগ্লেন। নম্বর দেখে আবার টেলিফোন তুলে তিনি ডাক্লেন—

"কালিঘাট, থ্রী, টু, সিক্স। হ্যালো সঞ্জীববাবুর বাড়ী? কোন্ হ্যায় দারোয়ান? দারোয়ানজী, বাবু কাঁহা, ভিতর্মে? বোলায় দেও। হাঁ, বহুত জরুরী কাম হ্যায়।"

একটুপরে আবার কথাবার্ত্তা চল্লো—'হ্যালো, আপনি কে? সঞ্জীববাবু? নমস্কার। আপনার নামে বিস্তর টাকার নালিশ হয়েছে, না? হঁ্যা দরকার আছে কিছু, আমি একটা খবর পেয়েছি যাতে আপনার বিশেষ উপকার হ'তে পারে। নাম-ধাম পরে জান্‌বেন, এটুকু জেনে রাখুন যে, আমি একজন হাইকোর্টের উকীল। আপনি যদি একটা ট্যাক্সি ক'রে, কাউকে না জানিয়ে আমার এখানে একবার আস্তে পারেন ত ভাল হয়। কি ক'রে আস্‌বেন, আচ্ছা, দেখুন, আপনি ট্যাক্সী ক'রে হ্যারিসন রোডের মোড়ে কেষ্টদাস পালের ষ্টাচুর কাছে নাববেন। সেখানে একটি ফর্সা লম্বা মত বাঙ্গালী ছেলে দেখ্‌বেন, তার নাম বিমল। সে আপনাকে নিয়ে আস্‌বে। আস্ছেন তো? আচ্ছা।"

এই বলেই তিনি বিমলের দিকে ফিরে বল্লেন "ব্রাদার! the plot thickens, তুমি যাও তা'হলে ওকে নিয়ে এসো।"

বিমল তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হোলো।

আধঘণ্টা পরে কেষ্টদাস পালের মূর্ত্তির কাছে একটা ট্যাক্সী দাঁড়ালো। ট্যাক্সীতে এক ভদ্রলোক ব'সে; গোল-গাল শ্যামবর্ণ চেহারা, বয়স বছর ত্রিশ আন্দাজ, গায়ে দামী শাল, মাথার চুল কাপ্তেনি "ফ্যাসনে" ছাঁটা। ভদ্রলোক বিমলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন "আপনার নাম কি বিমলবাবু?"

"আজ্ঞে হঁ্যা" ব'লেই বিমল ট্যাক্সীতে উঠে ড্রাইভারকে আমহার্ষ্ট-ষ্ট্রীটে যেতে বল্লো। গাড়ী চল্‌বার পর ভদ্রলোক নাম-ধাম সংক্রান্ত দু একটা সাধারণ কথা ব'লে চুপ ক'রে রইলেন। বিমল বুঝলে যে, ভদ্রলোক বেশ ভীত অবস্থায় আছেন।

অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে নেমে তাঁর সাইনবোর্ডে নাম, পদবী, পেশা দেখে ভদ্রলোকের আড়ষ্ট ভাব অনেকটা ঘুচলো।

ভিতরে যেতেই অক্ষয়বাবু তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে বসালেন। একথা ও কথার পর সঞ্জীববাবু বল্লেন—"আমার সঙ্গে আপনাদের কি দরকার সেকথা বলুন।" অক্ষয়বাবু বল্লেন, "হঁ্যা, কাজের কথাই হোক। আচ্ছা এই যে নালিশ হয়েছে এর ব্যবস্থা কি করেছেন?"

এ প্রশ্নে যেন বিরক্ত হ'য়ে সঞ্জীববাবু বল্লেন, "আপ-নারা কি কর্তে পারেন তাই বলুন। আমার সঙ্গে আমার এটর্নী, কাউন্সেলের কি পরামর্শ হয়েছে তা আপনাকে জানাবার কি প্রয়োজন? বিশেষে আপনার সঙ্গে পরিচয়"—

'ঠিক বলেছেন, আমি অন্য পক্ষের লোকও হ'তে পারি!"

"আচ্ছা তবে আমিই বলি আপনার ব্যবস্থা কি হ'য়েছে। আপনার নামে নালিশ হয়েছে, সুদে আসলে প্রায় ছলাখ টাকার জন্যে। আপনার এটর্নী, মিষ্টার এইচ, ডি, মিটার বলেন যে, ডিক্রী হওয়া অব্যর্থ। কেমন ঠিক?"

"ঠিক। তবে আপনি উকীল, আপনার পক্ষে এসব জানা আশ্চর্য্য নয়।"

"তা বল্‌তে পারেন। যাহোক, মিত্তির সাহেবের মতে আপনার বিষয়-সম্পত্তি নীলামে উঠলে সর্ব্বস্ব গিয়েও ধার শোধ হ'বে না। সেইজন্যে সে আপনাকে উপদেশ দিয়েছে যে, সমস্ত সম্পত্তি এখন ঐ মহাজনের কাছেই বাঁধা দিতে, পরে অন্য জায়গায় জোগাড় ক'রে সুবিধা মত সুদে Mortgage কর্‌লেই হ'বে, কেমন?"

সঞ্জীব-বাবু এবার একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকালেন। অক্ষয়-বাবু বল্‌তে লাগলেন—"এই পরামর্শে আপনি অনেক আগেই রাজি হ'য়েছিলেন, খালি আপনার স্ত্রী দলিল-পত্র ছাড়ার কথায় মহা গণ্ডগোল করাতে আপনি থেমে যান। এবার এই নালীশের ব্যাপারে আপনার স্ত্রীও ভয় পেয়ে রাজী হয়েছেন। কেমন?"

"কি আশ্চর্য্য! মিটার সাহেব কি এ সব ব'লে বেড়াচ্ছে নাকি? সে আমি ছাড়াতো এসব কেউ জানে না।"

অক্ষয়-বাবু বল্লেন, "একটু ভুল করছেন আপনি। আপনারা বাদে জানে শুধু অপর পক্ষ।"

"বলেন কি মশায়! আপনি কি হরেন রায়ের উকীল?"

"আজ্ঞে না। তাকে আমি চক্ষেও দেখিনি!"

"তবে এ সব জান্‌লেন কি ক'রে?"

"বলছি সে-সব। আগে এই ছেলেটির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম বিমলকুমার বসু, এর বাপ রাজেন্দ্রলাল বসু আপনার মিটার সাহেবের একজন বড় মক্কেল ও হিতকারী বন্ধু ছিলেন।"

"হাঁ, তাঁর কথা শুনেছি। মিটার সাহেব তাঁর কথায় অনেক দুঃখু ক'রে বলেন যে অনেক ক'রেও, তিনি তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। মিটার সাহেবের এই সম্পর্কে কিছু ক্ষতিও হয়েছিল ব'লে বলেন।"

"তা সে বলবে বই কি। আপনার সর্ব্বনাশ করার পরেও আপনার সম্পর্কে ঠিক ঐ রকম ব'লে বেড়াবে।"

সর্ব্বনাশের কথায় আঁৎকে উঠে সঞ্জীব-বাবু বল্লেন—"আমার সর্ব্বনাশ! ওরকম অলক্ষুণে কথা বল্‌বেন না, মশাই।"

"না বল্‌লে যদি তা আট্‌কায় তো তথাস্তু। তবে মিত্তিরের চাল কি ওতে আট্‌কাবে?"

"মিটার সাহেব আমার বন্ধু লোক, কেন তার নামে মিছে অপবাদ দিচ্ছেন?"

"অপবাদ মিথ্যে কি সত্যি তার বিচার আপনার ওপর। ওহে বিমল, এঁকে আজকার ব্যাপার সব খুলে বল তো!"

বিমল সবিশেষে সমস্ত ব'লে গেলো। শুনতে শুনতে সঞ্জীববাবুর মুখ-চোখ ভয়ে শুকিয়ে আড়ষ্টপ্রায় হবার উপক্রম। সব শুনে অক্ষয়বাবুর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে, ঢোক গিলে অতি কষ্টে তিনি বল্‌লেন—"কিছু বুঝতে পারছি না, মশায়। ও বন্ধু হ'য়ে কি এতটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে?"

"বিশ্বাস না হয় এর বাবার বেলায় ওকি করেছে খোঁজ নিন। আরও চান তো দু চারেট অন্য caseও আপনাকে দিচ্ছি। আমরা যা বল্‌ছি তা যদি সত্যি না হয় তো আপনিই বলুন এসব confidential খবর আমরা কোত্থেকে পেলুম।"

"তাও তো ঠিক। ওঃ ওর মনে এতও ছিলো। ওর সঙ্গে আমার যে শুধু মক্কেল এটর্নী সম্পর্ক তা নয়; আপনাকে বলতে কি, আমি আমোদ-প্রমোদ, কাজে-কর্ম্মে সবেতে ওকে নিজের লোকেরই মত দেখেছি।"

"তা আমি বেশ বুঝেছি। ওই রকমেই ত ও লোককে হাতে ক'রে তারপর সময় বুঝে নিজ মূর্ত্তি ধরে।"

"তা হ'লে কি হ'বে। অক্ষয়বাবু দোহাই ধর্ম্ম, আমায় বাঁচান। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পথে দাঁড়াতে হ'লে আমি মরে যাব। আমার সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে থুয়ে ঐ ধার শোধের একটা ব্যবস্থা করুন।'

"তা করা এখন কঠিন। আজ বাদে কাল ডিক্রী, এ শিরে সংক্রান্তি অবস্থায় কি ওসব হয়?"

"তবে কি উপায়?"

"আপনি একটু স্থির হ'য়ে বসুন। ভয় পেয়ে লাফা-লাফি করলে কিছু সুবিধা হ'বে না; এখন আমার কথা-গুলো মন দিয়ে শুনুন। আপনি যে-রকম পাকে পড়েছেন তাতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। এখন একমাত্র উপায় স্ত্রী-পুত্রের জন্যে কিছু সংস্থানের ব্যবস্থা ক'রে, তার পর যা হয় তা মরদবাচ্চার মত বুক পেতে দেখে নেওয়া।"

এই রকমে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সঞ্জীববাবু একটু ধাতস্থ হ'য়ে, অক্ষয়বাবুর পরামর্শ নিতে রাজী হ'লেন। অক্ষয়বাবু তাঁকে পরদিন সকালে দলিল-পত্র সব নিয়ে আসতে ব'লে বিদায় দিলেন। বিমলও সেই সঙ্গে বিদায় নিলে।

পরদিন আশুবাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবা মাত্রই তিনি মহা উৎসাহে তাঁর মক্কেল কোহেন সাহেবকে টেলিফোন ক'রে ডেকে আনালেন। সেই সময় ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সঞ্জীববাবুও দলিল পত্র নিয়ে হাজীর হলেন। বিমল তো ভোর হ'তে না হ'তে এসেছিলো। অক্ষয়বাবু তাকে বল্লেন—"বিমল, তুমি সব বুঝে নেও। এর পর এসব তোমার হোটেলে ব'সে হ'বে। দরকার হ'লে আমিও যাব, কিন্তু এখন থেকে তুমিই সঞ্জীব-বাবুর তরফে তদারক করবে।"

বিমল সমস্ত বুঝে শুনে লিখে নিলো। সেইদিনই কোর্ট search ক'রে সমস্ত বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলো। রাত্রে বিমলের হোটেল বসে পুরনো ষ্টাম্প কাগজে মর্টগেজের দলীল ইত্যাদি তৈরী হলো। যুদ্ধের আয়োজন সমাপ্ত হ'য়ে গেলো।

* * * *

মাসখানেক হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যে সঞ্জীব ঘোষের নামে ডিক্রী, কোহেনের তরফ থেকে পাল্টা নোটীশ, মিটার সাহেবের বিষম তর্জ্জন-গর্জ্জন, সঞ্জীবের পাওনাদার হরেন রায়ের তরফ থেকে ওজর' আপত্তি অনেক কিছুই হ'য়ে গেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলোনা, কোহেনের দাবী আদালতে টিঁকে গেলো। কেবল সঞ্জীব ঘোষ নবমীর পাঠার মত কাঁপতে কাঁপতে প্রায় অর্দ্ধেক হ'য়ে গেলেন।

এদিকে রামলাল বিমলকে তার দেশে যেতে ব'লে। হোটেলের খরচ পত্রে বেচারার হাতের টাকা হু হু ক'রে বেরিয়ে যাওয়ায় সে অস্থির হ'য়ে পড়েছিলো। বিমল তার হাতের আংটি, গায়ের শাল এসব বিক্রী করতে চাইলেও সে রাজী হয় না।

প্রতিশোধ দিয়ে তো দিন চলে না, আয়েরও কোনও উপায় দেখা যায় না, কাজেই বিমল কিছু দিনের মত দেশে যাওয়াই ঠিক করলে। যাবার আগের দিন মিটার সাহেবের মনের অবস্থাটা জানতে অত্যন্ত কৌতুহল হওয়ায় বিকেলের দিকে সে তাঁর অফিসে গেলো। সেখানে নিজের নাম একটু কাগজে লিখে পাঠাতেই চাপরাশী এসে বল্লে যে, সাহেব দেখা করবেন।

বিমল ঘরে ঢুকে দেখলে, মিটার সাহেবের পাশে একজন লোক জড়সড় হ'য়ে ব'সে আছে আর মিটার সাহেব রাগে মুখ লাল ক'রে তাকে বকছেন ও শাসাচ্ছেন। মিটার সাহেব বিমলকে দেখে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে হঠাৎ তার দিকে ফিরে বল্লেন—"কি, সঞ্জীব ঘোষ তোমায় পাঠিয়েছে নাকি?" বিমল প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো, সে বল্লে—"আজ্ঞে না। আপনি কি তাঁকে আমার কথা কিছু বলেছিলেন?"

"কিছু জানো না, না? ন্যাকা সাজতে এসেছো! জানো আমি কি করতে পারি?"

বিমল এবারে রাগ দেখিয়ে বল্লে—"আপনি কি পারেন জানি না, তবে একবার তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবার অকারণ বকছেন। স্পষ্ট বলুন, আপনি আমার জন্যে কিছু করবেন না। তা হ'লে আমি আর এসে আপনাকে বিরক্ত করবো না।"

বিমল ঘরে ঢুকে দেখলে, মিটার সাহেবের পাশে একজন লোক জড়সড় হ'য়ে ব'সে আছে

মিটার সাহেব এর উত্তরে একবার "হুঁঃ" ক'রে খানিক কটমট ক'রে তাকিয়ে, রুক্ষভাবে বিমলকে বললেন—"দিন পনেরো পরে এসো, আজ আমার সময় নেই।"

বিমল নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এলো। যেতে যেতে শুনলে, মিটার সাহেব বলছেন, "দেখলে তো! আমি জানি এ ওর কাজ নয়, তুমিই মদ খেয়ে কোথায় বেফাঁস"—বিমল সেখান থেকে অক্ষয়-বাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁকে এ খবর দিয়ে পরে তার কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাবার কথা জানালো। অক্ষয়বাবু তাকে তাঁর বাড়ীতে থাকতে বললেন। বিমল তাতে রাজী না হয়ে বিদায় নেবার সময় তাঁকে বল্লে—"অক্ষয়দা আমি এখন বাইরেই যাই। যদি কাজ-কর্ম্মের খোঁজ-খবর পাই ত ফের আসবো। আপনি বরং সেদিকে একটু নজর রাখবেন।"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর পরদিনের যাত্রার জন্যে জিনিষপত্র গোছান হচ্ছে এমন সময় হোটেলের চাকর এসে খবর দিলো যে, একটি বুড়ো বাবু ও একজন স্ত্রীলোক বিমলের সঙ্গে দেখা করতে চা'ন।

বিমল একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে তাঁদের আনতে বল্লো। পরমুহূর্ত্তেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তাঁর পেছনে একটি স্ত্রীলোক, ঘরে এসে ঢুকলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "বাবা, তোমার নাম বিমলকুমার বসু?" বিমল—"আজ্ঞে হ্যাঁ" ব'লে বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইলো। ভদ্রলোক বললেন, "তুমি আমায় চিনবে না, বাবা। তবে আমার জামাই সঞ্জীব ঘোষকে তুমি চেন। এটি আমার মেয়ে সঞ্জীবের স্ত্রী। বাবা আমরা তোমার কাছে বিশেষ ঋণী। তুমি না হ'লে আমার এ মেয়ের যে কি অবস্থা হোতো বলা যায় না, আমি গরীব লোক কি আর করতাম।"

বিমল সঞ্জীব বাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলে যে, সঞ্জীবের বাপ সুন্দরী দেখে গরীব ঘরের মেয়ে এনেছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার বললেন—"বাবা, কিছু মনে কোরো না, আমার মেয়ে তার স্বামীর কাছ থেকে তোমার নিজের বিষয় শুনে সামান্য কিছু তোমাকে নিজহাতে দেবার জন্যে এনেছে। ও বড় খুসী হবে যদি তুমি এটা নাও।" এই ব'লে তিনি একটা লম্বা বন্ধ-করা খাম এগিয়ে ধরলেন।

বিমল একটু পেছিয়ে গিয়ে ব'লে উঠলো—"না, না, সে কি হয়! আপনাদের যদি সামান্য কিছু উপকার করতে পেরে থাকি ত তাতেই আমি সন্তুষ্ট।"

একথায় স্ত্রীলোকটি বললেন—"আপনি যা করেছেন তা শোধ কোন দিনই হবে না। এই সামান্য যা এনেছি, তাও যদি না নেন ত আমি বড়ই দুঃখিত হবো। যদি নিতান্তই না নিতে পারেন তো ওটা রাস্তায় ফেলে দেবেন। চল বাবা আমরা যাই।" ব'লে খামটা

একটা চেয়ারের উপর রেখে তিনি প্রস্থান-উদ্যত হ'লেন।

ভদ্রলোকও "তবে আসি বাবা" ব'লে বিদায় নিলেন। রামলাল এই কথা-বার্ত্তার মধ্যে বেরিয়ে গিয়েছিলো। সে ফিরে এসে জানতে চাইলে যে, ব্যাপার কি। বিমল সংক্ষেপে তাকে সব বলাতে সে বল্‌লো, "বেশ তো দেখনা, যদি টাকাকড়ি দিয়ে থাকে ত বিদেশে যেতে কাজে লাগ্‌বে।"

বিমল খাম খুলে দেখ্‌লে যে, পঁচিশখানা একশ' টাকার নোট তার ভেতর রয়েছে।

বিদেশ-যাত্রা স্থগিত হ'য়ে গেল।

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীতনায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতে হিন্দোল রাগের ভার্য্যা জয়ন্তী পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে এক্ষণে এই সংখ্যাতে "দেবগিরী" রাগিণীর রূপবর্ণন ইত্যাদি প্রকটিত হইল।

দেবগিরীর ধ্যান

কাদম্বিনী শ্যামতনুঃ সুবৃত্তা।
তুঙ্গস্তনী সুন্দর হারবল্লী।
চিত্রাম্বরা মত্তচকোরনেত্রা।
সদালসা দেবগিরী প্রদিষ্টা॥ সঙ্গীতদর্পণ।

দেবগিরীর ঠাট

শুদ্ধ সপ্তস্বরা-যুক্তা দেবগিরী চ রাগিণী
গান্ধার স্বরবাদিনাং সংবাদী ধৈবত স্বরঃ।
অবশিষ্টৌ অনুবাদী গ্রহন্যাসঃ ষড়্‌জভিঃ
দিবসে দ্বিতীয় যামে গীয়তে কথিতা বুধৈ॥ সঙ্গীতদর্পণ।

অর্থ—দেবগিরী রাগিণীতে সাতটি শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়, গান্ধার বাদী এবং ধৈবত সংবাদী বাকী স্বর সকল অনুবাদী, 'স' স্বর গ্রহ ও ন্যাস এবং দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গান করিবার বিধি।

আলাপ

অস্থায়ী—

সা গা-। রা সা-। ন্‌ধ্‌। ন্‌। ধা ন্‌-। সা-। । সা গা রগা মপা গা-।-।
তে •• না •• তো• • ম্ না• •• • তে • রে• •• না••

গা পা ধা ধনা ধপা পধা পমা মপা মগা-। রগা রগা মগা
তো • ম্ না• •• তে• •• রি• রে•• না• •• ••

মা গা রা গা রা-। সা-। সা সা সা সন্‌। সন্‌। রা । সা-। ।I
তে না • তো •ম্ না• তে রে না তে• না• • • তো ম্

অন্তরা—

পা -া　ধনা　ধা　র্সা -া　র্রা　র্সা -া　র্সা　র্গা　র্রা　র্সা　না　ধা　না　র্সা -া
তে ০　রি ০　০　রে ০　না　তোম্　তে　০　না　০　রি　০　০　০ ০

র্সা　না　ধা　ধনা　ধা　পা -া　পধা　র্রা　র্সা -া　নধা　ধনা　ধপা
রে　০　০　না ০　০　০ ০　তো ০　ম্　না ০　নে ০　গে ০　০ ০

পধা　পমা　পা　মা　গা -া　গরা　গা　মা　পা　মা　গরা　গা -া
তে ০　০ ০　০　রি　০ ০　রে ০　০　না　০　তো　০ ০　০ ০

রা　সা -া　সা　সা　সা　সন্া　সনা　রা -া　সা -া II
ম্　না ০　"তে　রে　না　তে ০　স ০　০ ০　তোম্"

সঞ্চারী—

পা　পা　পমা　পা　মা　গা -া　গা　রা　গা -া　রা　সা -া
তা　না　নে ০　তে　না　০ ০　তে　০　রি ০　রে　না ০

সন্া　সা　ন্া　ধ্া -া　ধ্ন্া　ধা -া　প্া -া　প্ধ্া　রা　সা -া
নে ০　তে　তে　০ ০　রি ০　০ ০　০ ০　রে　০　না ০

সা　গা　রা　গমা　পা　গা -া　গা　রা -া　সা -া I
তে　রে　না　০ ০　০　রি ০　রে　০ ০　না ০

আভোগ—

পা　র্সা -া　র্সা -া　র্সা　র্সনা　র্সা　র্রা　র্সা -া -া　সা　না　ধা -া
তো　০ ম্　না ০　তে　রে ০　০　নে　রি ০ ০　রে　না　০ ০

না　ধা -া　পা -া　ধমা　পা　মা　গা -া　গমা　পা　মা　গা　রা
তে　০ ০　না ০　নে ০　০　না　০ ০　তো ০　ম্　না　০　০

গা　রা -া　সা -া　সা　সা　সা　সন্া　সন্া　রা -া　সা -া II
তে　০ ০　না ০　"তে　রে　না　তে ০　না ০　০ ০　তোম্"

পুস্তক-পরিচয়

প্রাচ্যদর্শন, প্রথম ভাগ—যাদবেশ্বর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ কর্ত্তৃক লিখিত। প্রাপ্তিস্থল—রংপুর চতুষ্পাঠী। পৃঃ ১০২। দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রণ-সাহায্য এক টাকা।

এই পুস্তিকাতে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ন্যায়-দর্শনেরও ন্যায় বৈশেষিক তত্ত্বের আলোচনাই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত (পৃঃ ৬৬)। প্রথম শিক্ষার্থিগণ ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

পঞ্চপ্রদীপ—শ্রী লাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী সাহিত্যবিশারদ প্রণীত। পৃঃ ৬৩। মূল্য ।৵০

পাঁচটি প্রবন্ধ—নবযুগ, ত্যাগ-ভোগ, ত্যাগের পথে, ত্যাগাতঙ্ক, আদর্শ। কোন কোন প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতের নিধি—প্রকাশক শ্রী লাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী,

সাহিত্যবিশারদ। প্রাপ্তিস্থল—শ্রী গোপালচন্দ্র দেব, পোঃ ভাঙ্গা-বাজার, গ্রাম উত্তর ভাগ, শ্রীহট্ট। পৃঃ ।০+৬৪ ; মূল্য ।৵১০

চারিটি প্রবন্ধ—গৃহী সন্ন্যাসী, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শিব-সতী। লেখকের নাম অজ্ঞাত।

মুক্তির পথ—শ্রী অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত। পৃঃ ৪০ ; মূল্য ।০

James Allen একজন খ্যাত-নামা লেখক। তাঁহার গ্রন্থসমূহ অনেকের ধর্ম্মসাধনে সহায় হইয়াছে। এই পুস্তিকা ইঁহারই The Divine Companion নামক গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ। পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ—শ্রী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী ক্ষেত্রপাল ঘোষ, ২৮।৩ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৬+১০৬০ ; মূল্য ৫৲

গ্রন্থে আছে (১) উপক্রমণিকা (৩০ পৃঃ), (২) শঙ্কর-চরিত্র (৩৭১ পৃঃ), (৩) রামানুজ-চরিত্র (১৯৫ পৃঃ), (৪) সামান্য ভাবে তুলনা, (৫) সামান্য ভাবে মত তুলনা, (৬) বিশেষ ভাবে তুলনা (৩৯৫ পৃঃ), (৬) উপসংহার, (৭) নির্ঘণ্ট (৬৪ পৃঃ)।

এপ্রকার পুস্তক বাংলা ভাষায় আর লিখিত হয় নাই। একাধারে শঙ্কর-চরিত্র এবং রামানুজ-চরিত্র, কেবল তাহাই নহে ; উভয়ের মতের ও চরিত্রের তুলনা।

গ্রন্থকার আটটি বিষয় বিশেষ ভাবে তুলনা করিয়াছেন। এ আটটি বিষয় এই—(১) ২৮টি সাধারণ বিষয় দ্বারা তুলনা, (২) ৩৭টি গুণাবলী দ্বারা তুলনা, (৩) ২২টি দোষাবলী দ্বারা তুলনা, (৪) কোষ্ঠী বিচার দ্বারা তুলনা, (৫) আদর্শ দার্শনিকের ধর্ম্মদ্বারা তুলনা, (৬) আচার্য্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা, (৭) নিজ নিজ আদর্শে ধর্ম্মদ্বারা তুলনা এবং (৮) আচার্য্যদ্বয়ের মতের বীজ নির্ণয়।

গ্রন্থকার উদার ও নিরপেক্ষ ভাবে উভয়ের জীবন ও মত বর্ণনা ও তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থে গবেষণা আছে, পাণ্ডিত্য আছে, সর্ব্বোপরি আছে গ্রন্থকারের সাম্যভাব ও অপক্ষপাত। সাম্প্রদায়িকতার অতীত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। শঙ্কর ও রামানুজের বিষয় লিখিতে গিয়া অনেকেই চিত্তের স্থৈর্য্য হারাইয়া থাকেন ; কেহ রামানুজকে অযথা হীন করেন, কেহ বা হীন করেন শঙ্করকে। কিন্তু আমাদিগের গ্রন্থকার এই সমুদায় সাম্প্রদায়িক ভাব অতিক্রম করিয়াছেন। ইহা এই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব।

এই গ্রন্থের জন্য গ্রন্থকারকে নিশ্চয়ই অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। গ্রন্থকার আমাদিগকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করিলেন। গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি, পাঠকগণও হইবেন। আশা করি, এই গ্রন্থ জন-সমাজে আদরণীয় হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

বাঙ্গালা-প্রবেশ ব্যাকরণ ও রচনা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। ময়মনসিংহ হইতে শ্রীমোহিতমোহন ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। একাদশ সংস্করণ ; ১৪৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵১০ (বাংলা ও আসামের শিক্ষা-বিভাগ কর্ত্তৃক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত।)

বইখানি সুরচিত ; বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসারে তাহার ব্যাকরণের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং বাংলা ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাকরণ ছাড়া বাক্য-রচনার স্থূল নিয়ম ও সাধারণ অশুদ্ধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুস্তিকাখানি অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদিগের যে উপযোগী হইয়াছে তাহা ইহার একাদশ সংস্করণ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

ব্যাকরণ-পাঠ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। শ্রীমোহিত-মোহন ধর কর্ত্তৃক ময়মনসিংহ, নূতন বাজার হইতে প্রকাশিত। তৃতীয় সংস্করণ ; ৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৵১০ (উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত)।

এখানি অতি অল্পবয়স্ক শিশুদিগের পাঠ্য। ব্যাকরণের স্থূল নিয়ম উদাহরণ অনুশীলনী ইত্যাদির সমাবেশ খুব সহজ ভাষায় হৃদয়গ্রাহী করিয়া করা হইয়াছে।

আলোচনা ও কল্পনা—শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, ভাষা-তত্ত্বরত্ন, এম্-এ, প্রণীত। ৬২ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি পাব্লিশিং ও ট্রেডিং কোম্পানী লিমিঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯২ পৃষ্ঠা ; মূল্য আট আনা।

নিবন্ধ-পুস্তক। ইহাতে ছয়টি নিবন্ধ আছে—(১) অভ্যাস ও মনঃসংযোগ (২) Satire বা উপহাসাত্মক রচনা, (৩) অদ্ভুত মমতা, (৪) অলৌকিক বাৎসল্য, (৫) প্রিয়দর্শিক, (৬) নিখিল-বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মিলনের শান্তিপুরস্থ (সপ্তম) অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। নিবন্ধগুলি ওজস্বী ভাষায় লিখিত, চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। Satire প্রবন্ধে দেশী-বিদেশী উপহাসাত্মক রচনার ইতিহাস ও নমুনা পরম উপভোগ্য। অদ্ভুত মমতা একটি বানরের তাহার পালক বেদে-দম্পতির প্রতি ; বেদেনীর মুখে এমন অনেক কথা ব্যক্ত হইয়াছে যাহা গভীর জ্ঞান ও আত্মোপলব্ধির পরিচায়ক। অলৌকিক বাৎসল্য সিপাহী যুদ্ধের সময়কার একটি ঘটনার কাহিনী ; এক হিন্দুস্থানী আয়া নিজের প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া প্রভুপুত্রের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রিয়দর্শিকা সংস্কৃত নাটকের আখ্যায়িকা, গল্পের আকারে বর্ণিত। অভিভাষণে শান্তিপুর, শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

চীন-উদ্ধার কাব্য—শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার প্রণীত এবং তৎ-কর্ত্তৃক পোঃ রাথেডাং, আকিয়াব, বাম্মা হইতে প্রকাশিত। নূতন সংস্করণ, ১৭৯ পৃষ্ঠা ; মূল্য ১৲।

চীন জাতির মাতৃ-দাসত্ব মোচনের প্রচেষ্টাকে অষ্টাদশ সর্গে মহাকাব্যের আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দে রচিত ; মিত্রাক্ষর ছন্দে পর্য্যায়-সম মিল দেওয়াতে পয়ারের একঘেয়ে ভাব দূর হইয়াছে। ইহা পদ্যে চীনা স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার ইতিবৃত্ত মাত্র, কাব্য হয় নাই।

দেবী-মাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও বজ্বজ্ 'চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন' হইতে প্রকাশিত। ৬০ পৃষ্ঠা ; মূল্য ।০ আনা।

এই পুস্তিকায় লেখক চণ্ডীগ্রন্থের শ্লোকের পর শ্লোক অনুবাদ না করিয়া চণ্ডী সম্বন্ধে জানিবার কথাগুলি বিভিন্ন বিষয়ে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকটি বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে অনুক্রমণিকা-অংশে ভক্ত হিন্দুগণ দেবী-মাহাত্ম্য কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন তাহা আলোচনা করিয়া, কি সূত্রে দেবী-মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ হইয়াছিল তাহা বলিয়াছেন, এবং তৎপরে যথাক্রমে দেবীর আবির্ভাব বিবরণ, দেবীর স্বরূপ, এবং কার্য্যের কথা আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় চণ্ডীর গল্পাংশ সমস্তই সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিশেষে দেবী-মাহাত্ম্যের অন্তর্গত সুললিত স্তবগুলি, তৎকালীন ঘটনা ও প্রার্থনা (বর্ণনামূলক কয়েকটি শ্লোক বাদে) প্রায় সমস্তই উদ্ধৃত হইয়াছে ও অনুবাদ করা হইয়াছে। দেবী-মাহাত্ম্যের বীজস্বরূপ বৈদিক দেবীসূক্তও অনুবাদসহ প্রদত্ত হইয়াছে। চণ্ডীগ্রন্থের দেবী-মাহাত্ম্য অতি উচ্চ ভাবব্যঞ্জক, ইহা সচেতন মনে পাঠ করিলে সকল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিই আধ্যাত্মিক উপকার উপলব্ধি করিবেন। চণ্ডী-মাহাত্ম্য বুঝিবার পক্ষে এই পুস্তিকাখানি বিশেষ সাহায্য করিবে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

চুম্বক ও চুম্বকশক্তি—শ্রী ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী-কার্য্যালয়। মূল্য ১৲

বঙ্গভাষায় লিখিত চুম্বকতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

আজকাল আমাদের বিদ্যালয়সমূহে বঙ্গভাষায় যে-সকল বিষয়ের পঠন-পাঠন চলিবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার মধ্যে বিজ্ঞান একটি। বলা বাহুল্য যে, বঙ্গভাষার সাহায্যে নানা বিষয়ে বাঙ্গালায় শিক্ষালাভ যেরূপ সহজ ও সুখসাধ্য, ইংরাজী বা অপর কোন ভাষার সাহায্যে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। তবে যে-কোন বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবিধার জন্য তত্তদ্বিষয়ে উপযুক্ত পুস্তক প্রণয়ন হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলা ভাষায় অন্যান্য নানা বিষয়ে বহুপুস্তক প্রকাশিত হইলেও বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকের যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয় এবং তদভাব-নিবন্ধন বিজ্ঞান চর্চ্চা দেশের মধ্যে সবিশেষ প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। সুখবোধ্য পরিভাষার অভাব বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-তত্ত্বের প্রচারের একটি প্রধান অন্তরায়। যে সকল বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে, ভাষা ও পরিভাষার দোষে তাহাদের অধিকাংশই সাধারণ পাঠকের পক্ষে একেবারে দুর্ব্বোধ্য। অনেক সময়ে ইংরাজী বিজ্ঞানবিদ্ পাঠকগণও সহজে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। এই কারণে অনেকে বাংলা অপেক্ষা ইংরাজীতে বিজ্ঞান-পাঠ ছাত্রদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করেন। সুশিক্ষার অন্তরায় স্বরূপ এইরূপ মনোভাব জাতির হৃদয়ে বহুদিন বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত নহে। যে-কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রাথমিক পুস্তকগুলি সরলভাষায় সহজবোধ্য ভাবে লিখিত হইলে বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণের অনুরাগ ও আকর্ষণ পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং একবার এবিষয়ে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল জন্মিলে ইহার চর্চ্চা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিবে। ভূপেন্দ্রবাবু এই পুস্তক লিখিয়া এই প্রসারের পথ কিয়ৎপরিমাণে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। চুম্বক-তত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি জটিল বিষয় হইলেও ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং বুঝাইবার গুণে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বিষয় সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। আই-এস-সি পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ চুম্বক সম্বন্ধীয় তথ্য-সমূহ এই পুস্তক পাঠ করিয়া সহজে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবেন। বক্তব্য বিষয় বহুসংখ্যক সাদাসিধা বি-এও পরীক্ষা দ্বারা সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং গ্রন্থকারের এই চেষ্টা বিফল হয় নাই। আশা করি গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম তাঁহার শেষ উদ্যম হইবে না; তিনি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুস্তক লিখিলে দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার উন্নতি হইবে।

লৌহ ধাতুর অক্সাইড (Fe 3·4) নামক যৌগিকের সাঙ্কেতিক চিহ্ন (Chemical formula) গ্রন্থকার বাংলায় ল৩ অ৪ আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন (২ পৃষ্ঠা)। আমি এইরূপ পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহাতে কোন লাভ নাই, বরং যথেষ্ট ক্ষতি আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা হইলেও রাসায়নিক সাঙ্কেতিক চিহ্ন (Symbols and formulae) সর্ব্বত্র একই আকারে ব্যবহৃত হয়, এইজন্য ইহার পরিবর্ত্তন একেবারেই বাঞ্ছনীয় নহে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাহা প্রচলিত, বাংলা ভাষায় তাহা প্রচলিত রাখিলে অধ্যয়নার্থীর পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইবে এবং ভাষার প্রতিও অগৌরব করা হইবে না।

গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধান ভাল এবং চিত্রগুলি নিজস্ব, কোন পুস্তক হইতে ধার-করা নহে।

বিজ্ঞানের ছাত্রগণ এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবে।

শ্রী চুনীলাল বসু

খেজুরী-বন্দর—শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত। ক্ষেমানন্দ-কুটীর, ভাঙ্গনমারি, জনকা পোষ্ট, মেদিনীপুর, ১৩৩৪।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ড ("হিজলীর মস্‌নদ্-ই আলা") লিখিয়া গ্রন্থকার যশস্বী হইয়াছেন। মেদিনীপুর ইতিহাস, ভূগোল ও নৃতত্ত্ব হিসাবে বৈচিত্র্যময়; সুতরাং ইহার কথা বাঙালীর কাছে ভাল লাগিবে। গ্রন্থকার অশেষ পরিশ্রম করিয়া খেজুরী-বন্দর সম্বন্ধে যা-কিছু ঐতিহাসিক তথ্য ও দলিল আছে তাহা একত্র করিয়াছেন। এই পুস্তক "রোগ-শয্যাতেই লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।" এইজন্যও সকলে তাঁহাকে উৎসাহ দান করিবেন আশা করা যায়। গ্রন্থে কয়েকখানা ছবি থাকাতে ইহার আদর বাড়িবে। পরিশিষ্টে খেজুরী-থানার নানা জ্ঞাতব্য বিষয় ও তথ্য (statistics) দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ দ্বারা স্থানীয় ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হইলে সমস্ত বাঙলা দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনার সুযোগ ঘটিবে।

শ্রীরমেশ বসু

(১) অচল পথের যাত্রী। (২) দুই রাত্রি—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্‌স্, ৯০।২এ, হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে দুই টাকা ও এক টাকা।

প্রেমাঙ্কুরবাবু বাংলার কথা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার বিশেষত্ব—প্লটের সারল্য, বর্ণনার সরস ভঙ্গী ও প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পের স্বাভাবিক পরিণতি। আলোচ্য গল্প-পুস্তক দুইখানিতে সেইসমস্ত বিশেষত্ব বজায় আছে। আমরা পুস্তক দুইখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। গল্প দুইটি সজীব ও গতানুগতিকতা-বর্জ্জিত। ভাষা সরল ও সুন্দর।

গুপ্ত

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৩) মালয়-দেশে—সিঙ্গাপুরের চীনাদের মধ্যে

২৩শে জুলাই শনিবার। আজকের দিনটাকে চীনা জগতের সঙ্গে আমাদের বেশ অন্তরঙ্গ পরিচয়ের দিন ব'ল্‌তে পারা যায়। চীনে বাজার দোকানপাট, চীনে মন্দির দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা প্রায় এগারোটা বেজে গেল। এই দিন সিগ্‌লাপে গিয়ে আহারাদি আমাদের হ'ল না, সারাদিন শহরেই ঘুরতে হ'ল। আরিয়াম্ আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন Feng Chih Chen ফ্যঙ্‌ চ্যঃ চেন্ নামে একটি চীনা যুবকের সঙ্গে। কথা হ'ল যে ফ্যঙ্-এর সঙ্গে সিঙ্গাপুরের শিক্ষিত চীনা মহলে একটু ঘুরে লোকেদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ ক'রবো, কবির বিষয়ে আর বিশ্বভারতী সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত চীনা জান্‌তে চান, তাঁদের সঙ্গে কথা কইবো। ফ্যঙ আমাদের পাণ্ডা হবেন, আর দরকার হ'লে দোভাষীও হবেন। আরিয়াম্ নিজের বা'র হ'লেন সিঙ্গাপুরের কার্য্যাবলীর বন্দোবস্তের জন্যে,আর বিশ্বভারতীর জন্য চাঁদা তুলতে আরম্ভ ক'রেছিলেন যাঁরা তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্যে।

ফ্যঙ্‌ আর আমরা সারাদিনটা সিঙ্গাপুরে চীনাদের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে কাটালুম। এই যুবকটির একটু পরিচয় দিই। ইনি ফেডারেটেড-মালাই-স্টেট্‌সের Selangor সেলাঙোর রাজ্যের Kajang কাজাং নগরে একটি চীনা বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন। যখন বন্ধুবর আরিয়াম্ মালয়-দেশে এসে কবির ভ্রমণের ব্যবস্থা ক'রছিলেন, তখন ফ্যঙ-এর সঙ্গে আরিয়াম্-এর পরিচয় হয়। অল্পভাষী অধ্যয়নশীল উচ্চমনোভাবযুক্ত এই চীন যুবকটি কবির গ্রন্থের একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। কবির ইংরেজী বইয়ের মধ্যে অনেকগুলিই চীনা ভাষায় অনূদিত হ'য়ে গিয়েছে। ইনি চীনা-অনুবাদ থেকে আর মূল ইংরিজী থেকে কবির বাণীর মহত্ত্ব আর উদারতা বিশেষরূপে উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। কবির আগমনের সংবাদ শুনে ইনি খুব উৎফুল্ল হন, আর যাতে এঁর স্বজাতীয় চীনারা কবির মর্য্যাদা উপযুক্ত রূপে বুঝে' তাঁর যথোচিত সম্মান করে, আর কবির দ্বারা স্থাপিত আর তাঁর অনুপ্রাণিত বিশ্বভারতীর জন্য যাতে তারা তাদের উপযুক্ত অর্থ সাহায্য ক'রতে পারে, সেইজন্য নিজে থেকেই ইনি চেষ্টা ক'রতে আরম্ভ করেন। আরিয়াম্-এর সঙ্গে এঁর বেশ হৃদ্যতা হ'য়ে যায়। ইনি মালাই দেশের চীনা সংবাদ পত্রে আর পত্রিকায় কবির বিষয়ে আর ভারতের সভ্যতা আর চীন আর ভারতের প্রাচীন যোগের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। সিঙ্গাপুরে এঁর বড়ো ভাই একটি চীনেদের ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, আর তা ছাড়া কতকগুলি চীনে সংবাদ পত্রের সঙ্গে ইনি সম্পৃক্ত। কবি সিঙ্গাপুরে এসেছেন, তাই কাজাং থেকে ছুটী নিয়ে ফ্যঙ সিঙ্গাপুরে চ'লে আসেন—কবি সন্দর্শন ক'রতে, আর কবির মালাই-দেশে আগমন যাতে সাফল্য-মণ্ডিত হয়, সেজন্য সাহায্য ক'রতে।

১৯২১ সালের লোক গণনা অনুসারে সমগ্র মালাই দেশের অধিবাসীদের সংখ্যা হ'চ্ছে সাড়ে-তেত্রিশ লাখের কাছাকাছি। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে-ষোলো লাখ মালাই জাতীয়, প্রায় পোনে-বারো লাখ চীনা, পৌনে-পাঁচ লাখের কাছাকাছি ভারতীয়, আর বাকী সব অন্য জাতের। আগেই ব'লেছি, চীনেরাই এদেশের সব চেয়ে সমৃদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ আর শক্তিশালী জাতি। পাঁচ শ' বছর আগে থেকে চীনেদের এদেশে যাওয়া আসা। প্রথম প্রথম যে সব চীনা মালাই-দেশে আস্‌তে থাকে, তারা বেশীর ভাগ চীনের Hokkien হোকিয়েন (বা Fu Chien ফু চিয়েন) প্রদেশের লোক ছিল, Amoy আময় শহর থেকে মালাই-দেশে আসে। মালাই-দেশে এসে বসবাস ক'রতে আরম্ভ করায়, দু-তিন পুরুষের মধ্যে তারা চীন-দেশের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলে, অনেকে চীনে ভাষা একেবারে ভুলে যায়, মালাইদের মধ্যে থেকে মালাই-ভাষা গ্রহণ করে; আর মালাইদের ঘরে আবাহ-বিবাহ কিছু কিছু ক'রতে থাকে। মালাইরা এক সময়ে হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ) ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, আর অনেক অংশে তাদের পূর্ব্বেকার জাতীয় ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারেও চ'লত। আরবেরা আর বোম্বাই গুজরাট অঞ্চলের মুসলমানেরা আর তামিল মুসলমানেরা খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ আর চতুর্দ্দশ শতক থেকে মালাইদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ক'রতে থাকে। চীনেরা মালাই দেশে যখন আস্‌তে শুরু করে, তখন মালাইরা অনেক অংশে মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে। মুসলমান মালাই, আর বৌদ্ধ আর কনফুশীয় চীনাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান অনেকটা কমই হ'ত। মোটের উপর, আগত

চীনারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ বা চীনে আর আচারে অনুষ্ঠানে (যথা শূকরমাংস ভক্ষণে) চীনে থেকেও, ভাষায় মালাই হ'য়ে গিয়ে আর কতকগুলি রীতিতে মালাইদের অনুকরণ ক'রে (যেমন ঝাল-লঙ্কা দেওয়া মালাই ধরণে তৈরী তরকারী খেতে অভ্যস্ত হ'য়ে, চীনে মেয়েদের পা-জামার বদলে মালাই মেয়েদের ধরণে "সারং" বা লুঙ্গী প'রতে আরম্ভ করায়, আর মালাইদের অনুকরণে পান খেতে আরম্ভ ক'রে), একটী নোতুন আধা-চীনে আধা-মালাই জা'তে পরিণত হ'তে থাকে। এইরূপ Straits-born Chineseদের ওদেশের ভাষায় Baba "বাবা" বলে; আর এদের পুরুষদের সম্বোধন ক'রতে হ'লে "বাবা" শব্দের প্রয়োগ হয়, মেয়েদের সম্বোধন করতে হ'লে Nonya "নোঞা"। পিতৃভূমি চীন-দেশের সঙ্গে যোগ একেবারে না থাকলে "বাবা"-চীনারা ক্রমে ধীরে ধীরে মালাই-জা'তেরই একটা শাখা হ'য়ে যেত। কিন্তু দুটো জিনিসে মালাইদের থেকে এদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এক, চীনা ব'লে মালাইদের অপেক্ষা একটু বেশী শ্রেষ্ঠতা বা অভিজাত্য বোধ; আর দুই, চীনের সঙ্গে যোগ-সূত্র ছিন্ন না হওয়া। বছর বছর হাজার হাজার চীনা চীন-দেশ থেকে মালাই-দেশে যাওয়া আসা করে, অনেকে আবার স্থায়ী বাশিন্দেও হ'য়ে যায়। এদের সংস্পর্শে আসার দরুন "বাবা"-চীনেদের চীনত্ব একটু বেশ সাত্মাভিমান, একটু সজাগ হ'য়ে ছিল বরাবরই; পয়সা-কড়ি জমালে অনেকের মনে আগ্রহ হ'ত যাতে চীনা বৈশিষ্ট্য আবার পূরোপূরি ফিরিয়ে পায়। চীনদেশে বিপ্লব আর তার সঙ্গে সঙ্গে চীনের নূতন জাগরণের ফলে "বাবা"-চীনারা এখন আরও বেশী ক'রে সচেতন হ য়ে উঠেছে। এদের মধ্যে যারা ছেলে-ছোকরা, তারা এখন ভাষায় সংস্কৃতিতে পোষাকে পরিচ্ছদে জাতীয়-তার বোধে আবার পূরা চীনা হবার চেষ্টা ক'রছে। বুড়ো ঠাকুরমা ঠাকুরদাদা, বা বাবা মা—আধা-চীনে আধা-মালাই; রঙীন মালাই সারং পরা, পায়ে মালাই ধরণের মল পরা, গায়ে আধা-চীনে আধা-মালাই হাঁটু-অবধি-লম্বা পাতলা সাদা কাপড়ের কোর্ত্তা, মাথায় বড়ো বড়ো সোনার কাঁটা, এই হ'চ্ছে সেকেলে "বাবা"-চীনে মেয়েদের পোষাক; এরা খুব লঙ্কা-বাটা দেওয়া বা না'রকেল-দুধ দেওয়া সুঁটকী-মাছের তরকারী দিয়ে মালাইদের মতন ভাত খায়, চীনে ধরণের পেঁয়াজ-কলি আর বাঁশের-কোঁড়ের chop-suey বা তরকারী এদের মুখে আর রোচে না; এরা মালাই ছাড়া অন্য ভাষা জানে না, চীনে ভাষার দু-চার কথা জান্‌লেও কেউ তা লিখ্‌তে প'ড়তে পারে না; এদের মধ্যে মালাই ভাষার একটু পরিবর্ত্তিত রূপ যা দাঁড়িয়ে গিয়েছে, তাকে "বাবা"-মালাই বলে,—কবিত্ব-শক্তি থাকলে, এই মালাই ভাষায় pantum "পান্তুম" বা শ্লোক রচনা ক'রে, সাময়িক ঘটনা মালাই-কবিতায় বর্ণনা ক'রে আনন্দ লাভ ক'রে থাকে; লেখাপড়ার কাজ কিছু ক'রতে হ'লে রোমান-অক্ষরে একটু-আধটু মালাই লিখেই কাজ চালিয়ে নেয়; চীন থেকে নবাগত চীনেদের সঙ্গে মালাই-ভাষায়ই কথা কয়; ঘরে কিন্তু নিজেদের বংশ-নাম গোত্র-নাম পূর্ব্বপুরুষদের নাম চীনা অক্ষরে কাঠের ফলকে লিখে রাখে, চীনা মন্দিরেও যায়, পয়সা হ'লে নোতুন মন্দিরও করে, তার জন্য চীন-দেশ থেকে কারিগর পুরোহিত প্রভৃতিও আনে;—এই সব নিয়ে হ'চ্ছে সেকেলে ধরণের "বাবা"-চীনাদের জগৎ। কিন্তু এদেরই নাতি-নাতনী বা ছেলে-মেয়েরা এখন অন্য ধরণে মানুষ হ'চ্ছে; মেয়েরা মালাইদের পরিপাটী চোখ-জুড়ানো সারং ছেড়ে দিয়ে, চীনে মেয়েদের বিশ্রী কালো রঙের ছাতার কাপড়ের পা-জামা ধ'রেছে, কিম্বা হাল-ফ্যাশানের চীনে মেয়েদের অনুকরণে skirt বা ঘাগরা প'রছে; সারা মালাই-দেশে চীনে-ভাষা শেখবার জন্যে যে সব নোতুন ইস্কুল খোলা হ'চ্ছে, তাতে এই সব ছেলে-মেয়ে প'ড়তে যাচ্ছে, চীন-দেশে প্রবর্ত্তিত আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে চীনা-ভাষা শিখছে, নিজেদের চীনা সভ্যতাকে বেশে আচারে ব্যবহারে, উল্লাসের সঙ্গে প্রকাশ ক'রে নোতুন ক'রে গ্রহণ ক'রছে। এরূপ "মালয়ীকৃত" বা "অর্দ্ধমালয়ীকৃত" চীনা পরিবারের প্রাচীন আর নবীনদের মধ্যে কোনও আদর্শ-গত মত-বৈষম্য ঘটবার সুযোগ পায় নি; প্রাচীনেরা তাদের সামাজিক জীবনে চীনা সংস্কৃতির পুনঃ-প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা মেনে নেওয়ার ফলে, নবীনেরা প্রাচীনদের আচরিত আধা-মালাই জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে অভিযান করার আবশ্যকতা মনে করে নি—পাশা-পাশি এই "বাবা"-চীনা রীতি-নীতি আর নবজাগরিত নবীন চীনা রীতি-নীতি একই বাড়ীতে চ'লছে দেখা যায়। এইরূপ বহু চীনা পরিবারের যুবক আর বৃদ্ধদের সঙ্গে মালাই-দেশে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ হ'য়েছিল। বুড়ী ঠাকুরমা মালাই সারং পরে ভূঁয়ে ব'সে মালাই ধরণে হামান-দিস্তায় পান ছেঁচ্‌তে ছেঁচ্‌তে কোনও কারণে চ'টে উঠে মালাই ভাষায় নাত্‌নীকে ব'কছে; নাত্‌নী চীনে-ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, পরণে চীনে মেয়েদের পা-জামা, মাথায় লাল রেশমের গোছা বাঁধা লম্বা বেণী ঝুলছে, মুখে চীনে প্রসাধন দ্রব্যের গুঁড়ো দিয়ে ঠোঁট চীনে কায়দায় লাল রঙে রঙিয়ে, মালাই-ভাষায় ঠাকুরমার কথার জবাব দিচ্ছে, আর সাদা রেশমের চীনে ব্লাউজ, কালো রেশমের চীনে ঘাগরা পরা এক সহপাঠিনী খেলুড়ীর সঙ্গে তাদের ইস্কুলে-শেখা পেকিঙের উচ্চারণে চীনেতে কথা কইছে—এ দৃশ্য আমি দেখেছি। সিংগাপ-এ আমাদের বাসা-বাড়ীর (শ্রীযুক্ত নামাজীর বাঙলার) পাশে, এইরূপ একটী

"বাবা"-চীনা পরিবারের আর একটী বাঙলা ছিল। কবি ময়দানের মধ্যেকার তাঁর ছোটো ঘরটীতে একদিন ব'সে আছেন, কাছে আমরা আছি, নামাজীদের কেউ আছেন, আর ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ আছেন, সকলে মিলে আলাপ জমানো গিয়েছে, এমন সময় পাশের ঐ বাঙলা-বাড়ী থেকে তামিল মালী এসে নিবেদন ক'রলে,ভারতবর্ষ থেকে ধর্ম্মগুরু এসে এই বাড়ীতে অবস্থান ক'রছেন, পাশের চীনা বাড়ীর মেয়েরা এসে তাঁকে প্রণাম ক'রতে চায়। তাদেরকে দর্শন দিতে কবির আপত্তি না থাকায়, ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ তাদের আস্‌তে ব'ল্‌লেন। দুই বাড়ীর হাতার মধ্যে ব্যবধান ছিল একটা ছোট্ট পাঁচীলের। কবি-সম্বর্দ্ধনার কারণে আগত জনসাধারণের জন্যে জায়গা সঙ্কুলান ক'রতে ও-বাড়ীরও ময়দান নেওয়া হয় ব'লে, লোকের যাতায়াতের জন্য তাও আবার খানিকটা ভেঙে দেওয়া হ'য়েছিল। ও-বাড়ীর মেয়েরা সেই ভাঙা পাঁচীল দিয়ে সহজেই কবিকে দেখ্‌তে এলেন। তিন পুরুষের মেয়ে আর ছেলে—বাড়ীর গিন্নীমা, তাঁর দুই মেয়ে কিংবা পুত্রবধূ, আর তাঁর একটি নাতী। মেয়েদের সকলেরই পরণে সারং, গায়ে লম্বা কোর্ত্তা-জামা। বুড়ী গিন্নীটি প্রাচীনা, পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলি কালো ক'রে ফেলেছেন। তাঁর পরণের সারং কালো, খর্ব্বাকার শুকনা চেহারা। মেয়ে বা পুত্রবধূ দুজনেই আধা-বয়সী মেয়ে, মালাই-দেশের ধনী ঘরের চীনে মেয়েদের মতনই স্থূলাকার, রঙীন সারং প'রে, হাতে আঙুলে কাণে চুলে প্রচুর ভারী ভারী সোনার গয়না, হাতে চীনে পাখা। ছেলেটি বছর তেরো চোদ্দোর, বেশ smart বা চড়্‌কো, খাকী রঙের ইস্কুলের উর্দ্দী হাফ-প্যাণ্ট পরা, মাথায় কালো রঙের কপাল-ছাওয়া টুপী। বুড়ী গিন্নী এসে কবিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হেঁট হ'য়ে দুই হাত জোড় ক'রে প্রণাম ক'রলেন। অন্য মেয়ে দুটিও প্রণাম ক'রলেন, ছেলেটি একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ার দিতে এঁরা ব'সলেন। ডাক্তার জ্ঞানপ্রকাশম্ মালাই-ভাষার সাহায্যে দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগ্‌লেন। বৃদ্ধা শুনেছেন যে কবি ভারতবর্ষ থেকে, বুদ্ধ-ভগবানের দেশ থেকে এসেছেন, আর তিনি একজন শ্রেষ্ঠ লোকমান্য ধর্ম্মগুরু; বৃদ্ধা নিজে বুদ্ধদেবের উপাসিকা, তাই তিনি কবিকে দর্শন ক'র্‌তে এসেছেন। কথা-প্রসঙ্গে জানা গেল, বৃদ্ধার ধর্ম্মগুরু এক প্রাচীন আর অতি ধার্ম্মিক চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষু কিছু কাল হ'ল দেহত্যাগ ক'রেছেন। গুরুর মৃত্যুতে বৃদ্ধাকে দু-বৎসর ধ'রে অশৌচ পালন ক'রতে হবে, দু-বছর ধ'রে অশৌচ-জ্ঞাপক এক রকম কালো রেশমের কাপড় প'রে থাক্‌তে হবে। এটা আমার কাছে একটু আশ্চর্য্যের জিনিস ব'লে বোধ হ'ল, কারণ আমি বইয়ে প'ড়েছিলুম যে চীনেদের অশৌচের রঙ হ'চ্ছে সাদা, আমাদেরই মতন। ছেলেটী ইংরিজী শিখ্‌ছে, তার কাছে শুন্‌লুম যে সে ইস্কুলে চীনে আর ইংরিজী দুইই প'ড়ছে। তবে সে মালাইটাই ভালো জানে। ছেলে বেলা থেকে শিখছে ব'লে চীনে-ভাষা তার কাছে সক্ত লাগে না। কিয়ৎকাল এইরূপ শিষ্টাচার ক'রে "নোঞা"-ত্রয় চ'লে গেলেন।

এই-রকম আধা-মালাই চীনাদের এখন আবার পূরা চীনা ক'রে নেবার যে একটা সজ্ঞান চেষ্টা চ'লেছে, তাতে মালাই দেশের সব জায়গার "বাবা"-চীনারা সমান উৎসাহ দেখাচ্ছে না। শুন্‌লুম, উত্তর-মালয়-দেশে, পিনাং-অঞ্চলে ততটা উৎসাহ নেই। সে যা হোক, সাধারণতঃ পয়সা-ওয়ালা "বাবা"-চীনারা এই কাজে খুব মেতে গিয়েছে; তাদের ছেলেরা যাতে চীনা নামের যোগ্য হয় তার চেষ্টায় সর্ব্বত্র অনেক টাকা খরচ ক'রে বিস্তর Anglo-Chinese School, Confucian School খাড়া ক'রছে। এইরূপ ইস্কুল আমরা অনেকগুলি দেখেছি। এত সুন্দর সুন্দর বড়ো বড়ো সমৃদ্ধ ইস্কুল আমাদের দেশে খুব কম। চীনা সংস্কৃতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার এই যে চেষ্টা চ'লছে, তাকে সাহায্য করবার জন্য চীন-দেশেও খুব উৎসাহ আরম্ভ হ'য়েছে। বহু শিক্ষিত চীনা যুবক এখন চীন থেকে মালাই দেশে এসে এই কাজে লেগে গিয়েছে, মালাই দেশের "বাবা"-চীনাদের শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের হ'য়ে কাগজ চালাচ্ছে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রছে, তাদের চীনা মাতৃভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগসূত্রে বদ্ধ ক'রছে। আমাদের ফাঙ এইরূপ একটী চীনা যুবক, আর এর বড়ো ভাই-ও আর একজন।

প্রথমটা যখন দু' চার কথায় আলাপ ক'রে ফাঙ-এর কাছ থেকে অবস্থাটা মোটামুটি বুঝে নিই, তখন মালাই-দেশের উপনিবিষ্ট চীনা যারা আধা-মালাই ব'নে গিয়েছে তাদের ধ'রে-বেঁধে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে আবার পুরো চীনা করবার এই চেষ্টাটি আমার তেমন ভালো লাগে নি। কারণ, মনে হ'য়েছিল যে, যারা আচারে-ব্যবহারে ভাবে-ভঙ্গিতে মালাই হ'য়েই যাচ্ছে, তাদের আবার টেনে-হিঁচড়ে চীনা তৈরী করবার চেষ্টায় ফল কি হবে? আর এইরূপ চেষ্টার পিছনে চীনা জাতির মালয়-দেশটীকে গ্রাস ক'রে ফেলবার একটা অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষাও থাক্‌তে পারে। Sympathy for the under dog: মালাই জা'ত প্রযোগিতায় চীনেদের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারছে না, পারবে না—চীনারা যদি মালাই-দেশে খাঁটী চীনা অর্থাৎ চীন-সভ্যতার গর্ব্বে দৃপ্ত চীনা হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে "বাবা"-চীনাদের মধ্যে মালাইদের সঙ্গে একটা আপোস, একটা মেলামেশা, রীতিনীতির আদান-প্রদানের একটা

যে ভাব আছে, যার দ্বারা মালাইরা একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকৃতে পারছে, সেটা চ'লে যাবে, এক-রকম nationalism এসে আর একটা দুর্বল জা'তকে নিষ্পেষিত ক'রে ফেল্‌বে, আর তার ফলে ক্রমে দেশ থেকে মালাই নাম মুছে যাবে। চীনারা নিজেদের দেশে সংখ্যায় চল্লিশ কোটির উপর, সব-চেয়ে বৃহৎ জা'ত এরা; তার মধ্যে লাখ দশেক চীনা না হয় মালাই দেশে এসে ভাষায় আর মনোভাবে মালাই-ই ব'নে গেল—এতে সমগ্র চীনাজাতির বিশেষ ক্ষতি নেই, বরং মালাইদেরই লাভ; উদ্যমশীল চীনাদের যদি "কবলীকৃত" ক'রতে পারে, তা'হলে মালাই-জা'তটা ত'রে যাবে।

কবির সঙ্গে আমি এই সম্বন্ধে আলাপ ক'রেছিলুম। চীনাদের নোতুন ক'রে খাঁটি চীনা করণের চেষ্টায় আজকাল চীনারা নিজেদের মধ্যে যে শিক্ষা-রীতি প্রচলন ক'রছে, তার যুক্তিযুক্ততা আর সার্থকতা কতদূর, সে-বিষয়ে কবির কাছে আমার সন্দেহ নিবেদন করি। কবি ব'ললেন যে, যে-সব চীনা, মালাইদের প্রতিবেশ-প্রভাবে প'ড়ে নিজেদের প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হ'য়ে গিয়েছে তারা যে সংস্কৃতিতে অংশ গ্রহণ ক'রতে যাচ্ছে বা ক'রছে, সেই মালাই-সংস্কৃতি চীনা-সংস্কৃতির চেয়ে বড়ো জিনিস, অন্ততঃপক্ষে তার সমকক্ষ কিছু কি না। যদি বড়ো বা সমান-সমান না হয়, তা হ'লে অপরিপুষ্ট অপরিণত মালাইদের জাতীয় জীবনে এই চীনাদের এনে কোনও সুফল হবে না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, চীনের বিদ্যাবুদ্ধি শিল্পকলা ভাবসম্পৎ সমস্তই মালাইদের চেয়ে বৃহত্তর আর গভীরতর ব্যাপার, জগৎকে চীনাদের দান মালাইদের দানের চেয়ে ঢের বেশী। তারপর ব্যক্তিগত আর সমাজগত উদ্যমশীলতা-গুণেও চীনারা মালাইদের চেয়ে ঢের উন্নত। মালাইদের কোনো সদ্‌গুণ যে নেই তা নয়। এরা সুখের চেয়ে সোয়াস্তি বা শান্তিকে বেশী পছন্দ করে, অল্পে সন্তুষ্ট হ'য়ে আরামে আর শান্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়, কিন্তু তার ফলে সব বিষয়েই তারা লা-পরওয়া হ'য়ে চলে। খালি লা-পরওয়া দিল-দরিয়া নয়, নিরুৎসাহও বটে। মনোরাজ্যে মালাই হ'চ্ছে সদানন্দ শিশুর শামিল, আর চীনারা হ'চ্ছে বিচারশীল প্রৌঢ়। কাজে কাজেই সব দিকে দেখলে, Straits চীনাদের আবার চীনা আদর্শে, ভাষায় ভাবে চীনা সংস্কৃতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা খুবই উচিত, এদের জাতীয় চরিত্রের জড়ই যখন চীনা, ব্যক্তিগত আর সমাজগত অনুভূতি যা মালাই ভাষার বাহ্য আবরণের তলে-তলে অন্তঃসলিলা নদীর জলের মতন বইছে সেই অনুভূতি যখন হ'চ্ছে মূলে চীনের মনোরাজ্যের আর রীতিনীতির উপরই স্থাপিত।

কবির এই যুক্তি অকাট্য যুক্তি। তারপর যখন আমি মালাই দেশেই বহুদিন ধরে সপরিবারে বাস ক'রছেন এমন দু'একটি বাঙালী পরিবারের ছেলে-মেয়েদের দেখলুম, যারা চীনা, মালাই আর তামিলদের মধ্যে মানুষ হ'য়ে আর ইস্কুলে খালি ইংরিজি প'ড়ে বাঙলা আর ব'লতে পারে না, মালাই আর ইংরিজিই যেন তাদের ভাষা হ'য়ে যাচ্ছে; যখন আমি এইরূপ ভারতীয় ভাষা আর সভ্যতার প্রতিষ্ঠা থেকে নিপতিত আরও অন্য দু'চারজন তামিল যুবকদের দেখি, তখন এদের মধ্যে বাঙলা আর তামিল পড়াবার আবশ্যকতা আমি উপলব্ধি করি। ভারতীয় সংস্কারের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন ক'রে মালাই ব'নে গেলে এইসব ছেলে—বাঙালী গুজরাটী আর তামিল হিন্দু, শিখ, আর গুজরাটী আর তামিল মুসলমান—তাদের একটা বড়ো মানসিক আর নৈতিক উত্তরাধিকার, তাদের ভারতীয়ত্বের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে গেলে তারা যে জীবনে একটা মস্ত অপূর্ণতাকে স্বীকার ক'রবে, এ কথা দৃঢ় ভাবে আমার মনে অঙ্কিত হ'য়ে যায়। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের পর, আর উপনিবিষ্ট ভারতীয়দেরও দু'চার ঘরের ছেলেদের অবস্থা দেখে, Straits চীনাদের খাঁটী চীনা ক'রে নেবার চেষ্টাকে আমি আর সন্দেহের সঙ্গে দেখতে পারিনি—এই চেষ্টার সঙ্গে তখন থেকে একটা সহানুভূতির ভাবই আমি অনুভব ক'রতে থাকি।
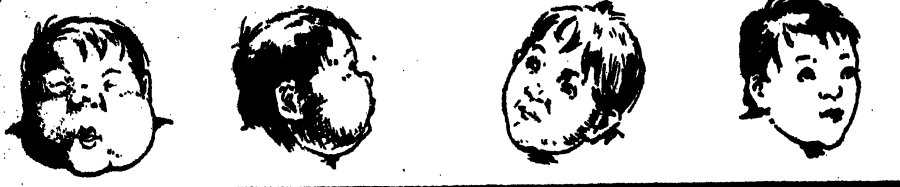
কুমার বাহাদুরের রোগমুক্তি

লেখক—শ্রীসুখময় মিত্র ● চিত্রশিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

(১)

কলিকাতা হইতে গিরিডি যাইতেছিলাম। গাড়ীটা যথাসম্ভব ধীরে ধীরে গড়াইয়া গড়াইয়া মধুপুর জংশনে গিয়া পৌছিল। শুনিলাম, দুই ঘণ্টা পরে গিরিডির গাড়ী ছাড়িবে। বুঝিলাম যে, এই ধ্যানের দেশে রেলগাড়ীগুলাও অল্পবিস্তর আত্ম-নিগ্রহ সংযম-শিক্ষা প্রভৃতি না করিয়া নড়াচড়া করে না। কি আর করিব, প্ল্যাটফর্ম্মের এদিক হইতে ওদিক অবধি পাইচারি সুরু করিলাম। রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপরে বিশ্বের সকল কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়—এ যেন বিশ্বেরই এক সুলভ ও ক্ষুদ্র সংস্করণ। মানব-জীবনের প্রায় সকল অবস্থার চিত্রই রেলের প্ল্যাটফর্ম্মে দেখা যায়। জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ সাক্ষাৎ ভাবে প্ল্যাটফর্ম্মে না ঘটিলেও এখানে সদ্যজাত শিশু, মুমূর্ষু বৃদ্ধ ও বরবধূর ছড়াছড়ি; ক্ষণে ক্ষণে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত প্ল্যাটফর্ম্মে না হইলেও, ক্ষণে ক্ষণে নিত্য নূতন রেলগাড়ীর আগমন ও বিদায়ের মধ্যে সূর্য্যোদয়-সঞ্জাত জাগরণের তীব্র কোলাহল ও সূর্য্যাস্ত-প্রসূত নিস্তব্ধ নিদ্রার ভাব এখানেও বেশ ফুটিয়া উঠে। কুলি ও যাত্রীগণ পশুপক্ষী অপেক্ষা কম কোলাহল করিতে পারে না—অল্প সময়ের মধ্যে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া যাইতেও ইহারা কম পারগ নহে। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে যেমন নানা-প্রকার অকারণ চাঞ্চল্য ও অসহ্য জড়তা আমাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তার বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান করিয়া তুলে, রেল প্ল্যাটফর্ম্মের আশে-পাশের নানান্ ব্যাপার দেখিয়াও আমরা সেইরূপ রেল কর্ত্তৃপক্ষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে হতাশ হইয়া উঠি। এক পাশে দেখিলাম, সারি সারি পুরাতন চটাওঠা মালগাড়ী নিস্পন্দ নিঃসাড়; সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত রেল লাইন, অথচ নড়িবার কোনো চেষ্টা নাই, যেন অশীতিপর বৃদ্ধের দল,—স্বর্গের পথ উন্মুক্ত অথচ মরিবার নামটি নাই। কোথাও কয়েকখানা ইঞ্জিন, কাজ নাই কর্ম্ম নাই, ধোঁয়া ছাড়িতেছে, যেন বেকার যুবক, কখন্ বাহির হইতে কোন্ ড্রাইভার আসিয়া কল-কব্জায় মোচড় দিয়া কাজে লাগাইয়া দিবে সেই আশায় বসিয়া আছে। প্ল্যাটফর্ম্মের ঠিক মাঝখানে বসিয়া একজন বীভৎস-আকৃতি পুরুষ আরসিতে মুখ দেখিয়া সস্মিত বদনে টেরি ঠিক করিতেছে, বিশ্বাস তিনি ব্যতীত কার্ত্তিক ঠাকুরের অপর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। সত্যই এই প্ল্যাটফর্ম্ম, যেন রেল মরু-পথের ওয়েসিস, একটি ছোট-খাট বিশ্ব, যেন ইহার মধ্যেই বিশ্বের সকল রস কবিরাজী বড়ির ন্যায় জমাট বাঁধিয়া অল্পায়তন রূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ একদিকে নজর পড়িল। বেজায় ভীড়, সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া পরস্পরকে কনুইয়ের গুঁতা দিতেছে। ভাবিলাম, হয়ত কোন সাপুড়িয়া কিম্বা যাদুকর রেল প্ল্যাটফর্ম্মে বসিয়া বসিয়াই অবসর-সময়ে স্বভাব-সুলভ বুদ্ধিমত্তার

উবু হইয়া বসিয়া একটা হাঁড়ি হইতে কৈ মৎস্য বাহির করিয়া…

তাড়নায় টিকিটের দাম উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে। ধীর পদক্ষেপে সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার ফর্দা কাপড় দেখিয়া দুই-এক ব্যক্তি একটু জায়গা করিয়া দিল। যাহা দেখিলাম তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একজন মেদিনীপুরী কিম্বা উড়িয়া ভৃত্য উবু হইয়া বসিয়া একটা হাঁড়ি হইতে কৈ মৎস্য বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের ধূলির উপর আছড়াইয়া মারিতেছে এবং একটা আঁশবটিতে সেগুলির "কোটা" সমাধান করিয়া এক পার্শ্বে রাখিতেছে। অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছি এমন সময় পশ্চাৎ দিক হইতে কে সুস্পষ্ট বামাকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আ মরণ! মিন্সেরা ভীড় করেছে দেখ! যেন বাই-নাচ হচ্ছে আর কি।"

সসম্ভ্রমে তফাতে সরিয়া যাইতেই বাম হস্তে কটাহ ও খুন্তি, দক্ষিণ হস্তে পুঁটুলি এবং হস্ত ও দেহের মধ্যে একটি 'প্রাইমাস ষ্টোভ' ধারণ করিয়া একটি নাতি-বৃদ্ধা স্থূলকায়া রমণী মৎস্য-"কোটা"-রত ভৃত্যের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, প্ল্যাটফর্ম্মের এই অঞ্চল অতঃপর কিয়ৎকাল "হেঁসেলে" পরিবর্ত্তিত হইবে এবং এইরূপ পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে বাহিরের লোকের না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সে-স্থান ত্যাগ করিয়া অদূরে গমন করিয়া কয়েকটি কমলা-লেবু ক্রয় করিয়া সেগুলির সদ্গতি করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে ছ্যাক-ছোঁক ইত্যাদি শব্দ অযাচিত ভাবে কর্ণে প্রবেশ করিয়া কৈ মাছের ঝোল রন্ধন হইতেছে এইরূপ একটা সন্দেহ মনে জাগাইতে লাগিল। আরও কিছুকাল পরে সেই স্থান হইতে ভীড় সরিয়া গেল; বুঝিলাম ঝোল প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং যে সৌভাগ্যবান পুরুষের জন্য রেল-জংশনের প্ল্যাটফর্ম্মের বক্ষে হাঁড়িতে রক্ষিত কৈ-মৎস্য সদ্য নিহত ও ঝোল রন্ধন হয় তিনি সম্ভবত এক্ষণে অবিচলিত চিত্তে সেই ঝোল দিয়া ভাত মাখিতেছেন। কি উদ্দেশ্যে যে তিনি ঝোল দিয়া ভাত মাখিতেছেন তাহা বাহুল্য ভয়ে আর বলিলাম না।

হতাশ হইয়া ভাবিতেছি যে এই পৃথিবীতে কিরূপ জটিল রকম ভেদাভেদের সৃষ্টি হইয়াছে—কেহ খাইতে পায় না, কেহবা রেলে যাইতে যাইতেও কৈ-মৎস্য ভোজন করে, কেহ বস্ত্রের অভাবে শীতে মরে, কেহ বা বস্ত্র-বাহুল্যে গরমে মরে ইত্যাদি—এমন সময় সেই পূর্ব্বশ্রুত বামা-কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হইল, "মেধো, যা না, খোকা-বাবুকে ইঞ্জিন দেখিয়ে আন্; যা যা, শীগগির যা, তা নইলে আবার কান্নাকাটি সুরু করবে।

ভাবিলাম, মহাপুরুষ এইবার নিদ্রা যাইবেন তাই ক্রন্দনপরায়ণ বংশধরকে ইঞ্জিনের ছুতা করিয়া গাড়ী হইতে বিদায় করিতেছেন। পরমুহূর্ত্তে মেধো নামধেয় ভৃত্য "খোকা" নামধেয় ব্যক্তিকে কোলে করিয়া গাড়ী হইতে বহু কষ্টে অবতীর্ণ হইল। যদি হৃদ্‌যন্ত্রের কোন ব্যাধি থাকিত তাহা হইলে আমি অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া

'মেধো' নামধেয় ভৃত্য 'খোকা' নামধেয় ব্যক্তিকে কোলে করিয়া গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইল

প্ল্যাটফর্ম্মে আন্দোলনের সৃষ্টি করিতাম, সন্দেহ নাই। শুধু বাল্যকাল হইতে ব্যায়ামের সাহায্যে উক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের চারি দিকে প্রায় দুই মণ পরিমাণ মাংসপেশী ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া "খোকা"কে দেখিয়াও সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু, হে ভগবান, সে কি দৃশ্য! অনুমান হইল, খোকার বয়স চৌদ্দ কিম্বা পনের হইবে, দৈর্ঘ্য চারফুট চার ইঞ্চি, ওজন সওয়া দুই মণ, ছাতি চুয়াল্লিশ ইঞ্চি, কোমর ঐ, স্থানাভাবে অপরাপর মাপ দিলাম না। বর্ণে খোকা বর্ষার মেঘের ন্যায়, পটল-চেরা চোখ দুইটি ঈষৎ টেরা, পরণে জরীর টুপি, লাল কোর্ত্তা ও ঢিলা পায়জামা, গলায় কম্ফর্টার ও পায়ে উলের মোজা। খোকাকে দেখিয়া সামলাইয়া উঠিতেছি এমন সময় মেধো ঠিক আমার পাশে আসিয়া হোঁচট খাইল। মুহূর্ত্তের জন্য ভাবিলাম সরিয়া যাই, দেখি খোকা পড়িলে প্ল্যাটফর্ম্মে কি-প্রকার দাগ

পড়ে ; কিন্তু সে-লোভ সম্বরণ করিয়া মেধো ও খোকাকে বাক্কা মারিয়া সিধা করিয়া দিলাম। মেধো স্মিতহাস্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "এনা হচ্ছেন,—এর ছোট-তরফের কুমার। গিরিডিতে হাওয়া বদ্‌লাতে যাচ্ছেন।"

আমি মেধোর সহিত আলাপের সুযোগ না ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও, আর রাজাবাবু বুঝি গাড়ীতে ?" মেধো বলিল, "আজ্ঞে না, রাজাবাবু সঙ্গে নেই, এনাকে আমি, বামুন-ঠাকরুণ আর সরকারবাবু, আমরাই নিয়ে যাচ্ছি। রাজাবাবু লাটের দরবার হ'য়ে গেলে পর আস্‌বেন। গিরিডিতে বাড়ী আছে, লোকজন আছে, একজন ডাক্তার-বাবু রোজ আস্‌বেন, রোগা শরীর কি না ; অরুচির ব্যারাম, কিছু মুখে রোচে না, টাট্‌কা কৈ-মাছের ঝোল আর পুরান চালের ভাত না হ'লে খাওয়া হয় না, দু'পা হেঁটে বেড়াতে পারেন না, কোলে কোলে রাখতে হয়......"

আমি বলিলাম, "ও ! বেশ বেশ, সাবধানে রেখ, দেখো যেন খাওয়া-দাওয়া ঠিক মত হয়। গিরিডির হাওয়া বড় শুক্‌, জোয়ান লোকেই রোগা হ'য়ে যায়।"

মেধো পুনর্ব্বার দন্তবিকাশ করিয়া বলিল, "সে আর বল্‌তে হবে না ; বামুন ঠাকরুণ বড় কড়া লোক, তেনার চোখে ধূলো দিতে পারে এমন লোক জন্মায়নি......"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ তাত বটেই, তবে কি না, এই সাবধানের মার নেই, বুঝ্‌লে না ?"

মেধো বলিল, "এজ্ঞে, তা আর বুঝি না ?"

(২)

গিরিডি পৌঁছিবার পর বহুদিন—এর ছোটতরফের কুমারকে দেখি নাই। নূতন জায়গায় আসিয়া ও চতুর্দ্দিকের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে নিকটে, হয়ত অতি নিকটেই, প্রাকৃতিক বীভৎসতার সেই চরম নিদর্শনটি কৈশোরে পদার্পণ করিয়াও শিশুর ন্যায় ব্যবহার ও জীবনযাপন করিয়া নিজ পারিপার্শ্বিককে কদর্য্য করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু, একদিন তাহাকে দেখিলাম। মেধো, বামুন ঠাকরুণ ও সরকারবাবু পরিবৃত হইয়া "খোকা" হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে। একটা ঠেলা-গাড়ীতে দুইজন ভৃত্য তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। খোকার আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আবৃত। হাতে একটা বড় লজঞ্চুষের বোতল। বামুন-ঠাকরুণ চলিতে চলিতেও সদা সতর্ক। যেন খোকার অঙ্গের কোন অংশ অনাবৃত না থাকিয়া যায়। মেধো আমায় দেখিয়া একটা সেলাম করিয়া বলিল, "সেলাম বাবু, আপনার বাড়ী কি এই কাছেই নাকি ?" আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "না, খুব কাছে না, আর-একটু দূরে।" মেধো আমায় জানাইল, "......... কাল আসবেন, খোকার শরীর তেমন ভাল যাচ্ছে না, রাজা-বাবু এসে বড়ই রাগ কর্‌বেন, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, এদেশের জল-হাওয়া ভাল নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি নীরব হইয়া সব শুনিয়া বলিলাম, "হঁ, তা ঠিক, তবে খোকাকে একটু হাঁটালে চলালে হয়ত শরীরটা আরও ভাল হ'তে পারে।"

বামুন-ঠাকরুণ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তিনি আমার কথা শুনিয়া ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "ওমা তা কি আবার হ'তে পারে ? ডাক্তারের মানা আছে যে ! এত বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে চলি তাতেই এই, হাঁটা চলা কর্‌লে কি আর বাঁচ্‌বে ?"

আমি রণে ভঙ্গ দিয়া, "আর এক জায়গায় কাজ আছে" বলিয়া দ্রুতপদে সে-স্থান ত্যাগ করিলাম। চক্ষের সম্মুখে অতবড় একটা হত্যাকাণ্ড দাঁড়াইয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তারপর যে কয়দিন গিরিডিতে ছিলাম, দূর হইতে কখন কখন কুমার বাহাদুরের সেই শিশু-হিমাচল সদৃশ আকৃতি দেখিয়াছিলাম। সাহস করিয়া কখন কাছে যাই নাই ; কারণ সেই ঐরাবতের ন্যায় চর্ব্বির বস্তাকে কেহ সাদরে খোকা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে অথবা লজঞ্চুস খাওয়াইতেছে দেখিলে আমার পক্ষে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইত। মেধো, বামুন-ঠাকরুণ প্রভৃতিকে উল্টাইয়া ফেলিয়া খোকাকে খানিকটা দৌড় করাইয়া স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্বের পথে টানিয়া আনিবার একটা দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন হয়ত বা আমাকে হাজতের পথের পথিক করিয়া তুলিত—কে বলিবে ?

(৩)

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ওয়াল্‌ফোর্ডের বাস, টালার জলের ট্যাঙ্ক, গ্যাস রিজর্‌ভয়ের, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন বৃহদায়তন বস্তুনিচয় সতত দেখিয়া—এর ছোটতরফের কুমার বাহাদুরের কথা অনেকটা ভুলিয়াছিলাম। তা ছাড়া চাকুরীর অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ও 'ওয়াণ্টেড কলম' হাত্‌ড়াইয়া অবসর-সময়ের অভাব এত অধিক ছিল যে, স্মৃতির ভাণ্ডার ঘাঁটিয়া মানসিক সুখ সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও মাঝে মাঝে একটা অতিশয় দুঃস্বপ্নের মতই কুমার বাহাদুরের সেই সদা-কম্পমান মেদভারের চিত্র ক্ষণিকের জন্য স্মৃতির আকাশ অন্ধকার করিয়া কাল-বৈশাখীর মেঘের মত অন্তর্হিত হইত। এমন সময় একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল—

WANTED. Highly Educated young man of good character and physique to serve as resident tutor to young boy of noble

জাভায় রামায়ণ

সীতা-হরণ

স্বণ-মৃগ
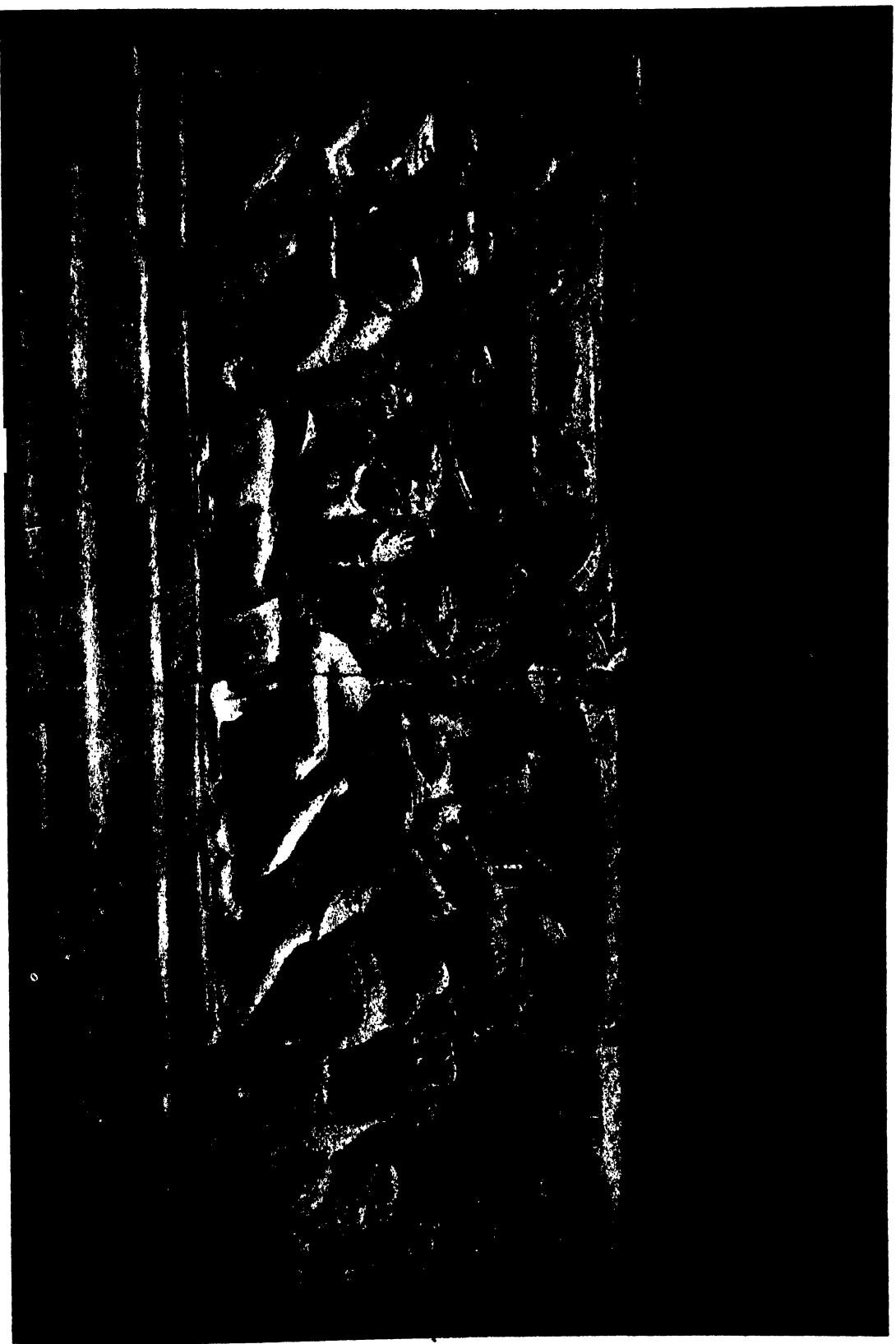
family. Knowledge of the Principles of health and hygiene essential. Pay and prospects according to qualification. Apply Box No. ইত্যাদি ইত্যাদি

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইলে যেমন একটা আশার নিশ্বাস ফেলে আমিও সেইরূপ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া একখানা দরখাস্ত পাঠাইয়া দিলাম। দিন তিন পরে উত্তর আসিল, আমায় হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ীতে গিয়া কোন এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। আমি সেখানে গিয়া বেয়ারার সাহায্যে খবর পাঠাইতেই আমার ডাক পড়িল। উপরে গিয়া একটা কামরায় আমায় ঢুকিতে বলা হইল। ঘরে ঢুকিয়াই ত আমার চক্ষু স্থির! দেখিলাম—এর ছোটতরফের কুমার বাহাদুরদের সরকারবাবু একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া যত্নের সহিত একটি থেলো হুঁকায় ধূম পান করিতেছেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, "আরে, আরে, এ যে আপনি! আসতে আজ্ঞা হোক্। তা হ'লে আপনিই—বাবু? কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই আপনাদের উমেদার। এ ছাত্রটি কে, যার জন্যে লোক চাইছেন?" সরকার-বাবু বলিলেন, "ছাত্রটিকে ত আপনি ভাল ক'রেই চেনেন। আমাদের কুমার বাহাদুর, বুঝলেন না, সেই যে যিনি শরীর খারাপ ব'লে গিরিডি গিয়েছিলেন? রাজা বাহাদুর আর রাণীমা সামনের মাসে কাশী যাচ্ছেন কি না, খুড়ো রাণীমাকে দেখতে। তাই,একজন পাকা পোক্ত লোকের হাতে কুমারকে রেখে যেতে চান। লেখাপড়াও হবে, শরীরের দিকেও নজর রাখ্‌বে এমন একজন কাজের লোক চাই। তা আপনি হ'লে বেশ হবে, চেনা-শোনা লোক…"

আমি সরকার-বাবুর কথার স্রোতে বাধা দিয়া বলিলাম, "তা রাজা-রাণী কাশী যাচ্ছেন, তা হ'লেও আপনাদের বামুন-ঠাকরুণ ও মেধো ত আছে, তারা ত খোকাকে খুবই আদরে রাখে।"

সরকার-বাবু বল্লেন, "আজ্ঞে, তা ঠিক, কিন্তু বামুন-ঠাকরুণ রাণীমার সঙ্গে কাশী যাচ্ছেন; আর মেধোকে কোন বিশ্বাস নেই, কাজেই লোক রাখতে হচ্ছে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। লোকজনের অভাব নেই, বড় বাগান, ফল-মূল অনেক, টাট্‌কা খাবেন…।"

আমি আর কথা না বাড়াইয়া বলিলাম, "আহা, সে-কথা কি আমি জানি না, তবে কি না, রাজা-রাজড়ার ব্যাপার আবার কোথায় কার মন জুগিয়ে চল্‌তে হবে, কি কর্‌তে হবে এই কথাই ভাবছিলাম।"

আসলে ভাবিতেছিলাম যে সম্মুখে যে-সমস্যা তাহাকে সুবর্ণ সুযোগ বলিব, না, জীবনের মহা সন্ধিক্ষণ বলিব, কুমার বাহাদুর ওরফে খোকাকে হাতে পাইলে, হয় তাহার জীবনের একটা মহা উপকার হইবে, নয়, আমার নিজের জীবন বিপন্ন হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে খাড্ডার সৈনিককে বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া উন্মুক্ত ক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইতে বলিলে যেমন ক্ষণিকের জন্য তাহার মানস-পটে মহা গৌরব অথবা অপযশ-পূর্ণ মৃত্যুর একটি পরিবর্তনশীল চলচ্চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যায়; এই মহাক্ষণে আমার প্রাণেও সেইরূপ একটা এস্‌পার-ওস্‌পার ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। হয়, খোকাকে মেদ-সমাধি হইতে রক্ষা করিয়া নিজের নিকট অনন্ত যশের ভাগী হইব, নয় খোকার চর্বির চাপে নিজেও পিষ্ট হইয়া অমানুষ হইয়া যাইব। আর ভাবিলাম না। সরকার-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কি বলেন?"

আমি সজোরে দম লইয়া বলিলাম, "আমি আপনাদেরই, আদেশ করুন, কবে কোথায়, কি কর্‌তে হবে?"

(৪)

প্রাতরাশ :—
দুধ /১॥০, কলা ৪টি, সন্দেশ ৮টি, লুচি ১২ খানা, আলুর দম, পোয়াটাক আঙুর, বেদানা, বাদাম প্রভৃতি যথেচ্ছ

মধ্যাহ্নে :—
সুক্তনী, ডাল, ভাজা, দাদখানি চালের ভাত, এক ছটাক ঘী, কৈ অথবা মাগুরের ঝোল, দৈ-বড়া, ডালনা, ধোকা, অম্বল, পায়েস, সর-ভাজা, রসগোল্লা, এক গেলাস দুধ

অপরাহ্নে :—
পরটা ৬ খানা, খোয়া ক্ষীর আধপোয়া, মালপোয়া চার খানি, দুধ, বাদামের ঠাণ্ডাই এক গেলাস (প্রমাণ সাইজ)

নৈশভোজন :—
লুচি ১৬ খানী, পটলের দোলমা, ছোলার ডাল, মাছের মালাই-কারী, মাটনের কোর্ম্মা, চাটনী, রাবড়ী, সন্দেশ, কমলা-লেবুর রস (এক গেলাস)

প্রথম দিন রাজবাড়ীতে পৌছিয়াই খোকা কুমারের সে-দিনকার খাবারের ব্যবস্থা দেখিয়া আমারত চক্ষুস্থির! ছেলেটা যে কেন দিনে দেড় সের হারে ওজনে বাড়ে তাহা আর আমার নিকট গোপন রহিল না। পুরাকালীন রাজনীতির ইতিহাস পাঠ করিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, রাজপুত্রদিগকে হত্যা করিবার যে-সকল প্রথা আছে তাহার মধ্যে বিষদান, ছুরিকাঘাত, গলা টিপিয়া মারা প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আজ বুঝিলাম, সুস্বাদু চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় সরবরাহের সাহায্যেও রাজপুত্রদিগকে অতি উত্তম ও নিষ্পাপ উপায়ে হত্যা করা যায়। আমার হাতে যে অভিজাত-বংশীয় বালকের শিক্ষার ভার পড়িল, তাহাকে স্নেহময় পিতামাতা দাসদাসীগণ তিল তিল করিয়া চর্ব্বিতে চুবাইয়া মারিবার যে-ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিলাম, তাদৃশ নির্ম্মম ব্যাপার প্রাচীন

কালের ষড়যন্ত্রের ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। স্নেহ যে কত নিষ্ঠুর, তাহা বুঝিলাম। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, রাজারাণী বাড়ীর বাহির হইবামাত্র এই ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করিয়া তবে ছাড়িব।

ছুই তিন দিন চোখের সম্মুখে কুমারের আহার ও নিদ্রার বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া কোন প্রকারে কালাতিপাত করিলাম। তার পর বহু হট্টগোল অশ্রুবর্ষণ সহযোগে রাজা ও রাণী-মা পূর্ণ তিন মাসের জন্য কাশীযাত্রা করিলেন। কুমার বাহাদুর মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দাপাদাপি করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সকলে বলিল, "আহা, বাছা রে, এতটুকু ছেলে, মাকে ছেড়ে, বামুন-ঠাকরুণকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকবে?" আমি স্থির করিলাম, ভাল করিয়াই থাকে যাহাতে তাহার ব্যবস্থা করিব।

(৫)

রাত্রি প্রভাত হইল। কুমার বাহাদুর নিদ্রাভঙ্গের পর ঠোঁট চাটিতে চাটিতে খাটের বেড়া ধরিয়া বহুকষ্টে উঠিয়া বসিলেন। আধ-আধ ভাবে হাঁকিলেন, "মদো, খাবাল আন্।"

মেধোকে আমি ছুটি দিয়াছিলাম। বিজয় বলিয়া অপর এক ভৃত্য একটি রেকাবিতে করিয়া দুইখানি হাত-গড়া রুটি, গুড় ও এক গেলাস ঘোল আনিয়া শয্যাপার্শ্বস্থ ছোট টেবিলটার উপরে রাখিল। সদ্যজাগ্রত ক্ষুধাতুর অজগরকে প্রাতরাশের জন্য একটি চড়ুই পাখী দিলে সে যেমন যথার্থই আশ্চর্য্য হইয়া যায়, কুমার এই রুটি দুখানা দেখিয়া তেমনই নির্ব্বাক মোহাবিষ্ট হইয়া তাকাইয়া রহিল। আমি বলিলাম, "খাও।"

যেন ঘুম হইতে সদ্য জাগিল এই ভাবে কুমার বলিল, "খাব, তি খাব?"

আমি বলিলাম, "ঐ রুটি দুখানা খাও।"

কুমার এইবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর ঘরের চতুর্দ্দিকে মাথার বালিস, পাশ-বালিস, কোল-বালিস, গাল-বালিস প্রভৃতি বিভিন্ন বালিস ছুঁড়িতে লাগিল। আমরা বহুকষ্টে সেই ঝড়ের মুখে আত্মরক্ষা করিলাম।

বহুক্ষণ বিকট চীৎকার করিয়া কুমার রুটি দুইখানি খাইয়া পুনর্ব্বার মেধোকে ডাকিতে লাগিল, তাহাকে কোলে করিয়া বাগানে লইয়া যাইবার জন্য। আমি বলিলাম, "তুমি নিজে নিজে হেঁটে যাও।"

ফলে এই হইল যে, খোকা সে-দিন সারা সকাল বাগানে বাহিরই হইল না। আমিও সকাল-বেলা বাহির হইয়া খোকার চিকিৎসার অপরাপর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া আসিলাম। দ্বিপ্রহরে খোকার খাবার বাহির বাড়ীতে দিবার ব্যবস্থা করায় খোকা হাঁটিয়া বাহিরে যাইতে বাধ্য হইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রায় ৫০।৬০ গজ গিয়া যখন সে দেখিল যে, ভোজের ব্যবস্থার মধ্যে খান চার গড়া রুটি ও দুই টুকরো মাগুর মৎস্যের ঝোল, তখন তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না। নিষ্ফল আক্রোশে কুমার নিজের আধ-আধ বুলি ভুলিয়া বেশ বয়স্ক ভাষায় সকলের পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিল। আমরা তাহার উত্তরে কিছু না বলিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার পদব্রজে নিজের কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করাইলাম।

এইরূপ খাদ্যের উপর দিন দুই তিন কুমারকে রাখিয়া আমি দেখিলাম যে, শুধু এই উপায়ে তাহার মেদ-ভার কমাইবার চেষ্টা ঝিনুকের সাহায্যে পুকুর সেচিবার চেষ্টার সমতুল্য। তাই আরও প্রচণ্ডতর উপায়ের উদ্ভাবনা করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলাম।

খাজাঞ্চিখানার এক দরোয়ানের প্রিয় একটা ছাগল ছিল, তাহার কথাই আমার সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়িল। আমি দরোয়ানকে কিছু বকশিস্ কবুল করিয়া ছাগলটাকে বাগানের এক কোণে আনিয়া রাখিলাম।

তৃতীয় দিবসে খোকাকে প্রাতরাশের পরে চাকর দিয়া বলাইলাম যে, বাগানে অনেক ফলের গাছ আছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া চেষ্টা করিলে হয়ত দুই একটা খাবার উপযুক্ত ফল হাতে পড়িতেও পারে। খোকার অনন্ত উদর-গহ্বরের যে নেকার নব-দশমাংশ সদাসর্ব্বদা হাহাকার করিতেছিল তাহার তাড়নায় খোকা বড়দিনের বাজারের সুপুষ্ট হংসশাবকের ন্যায় ধীর পদক্ষেপে বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। আমিও একটি গাছের আড়ালে ছাগলটার দড়ি ধরিয়া উন্নত পেরিস্কোপ ড্রেডনট-ধ্বংসী সাবমেরীনের মত গা ঢাকা দিয়া দণ্ডায়মান ছিলাম। খোকা এদিক ওদিক তাকাইয়া ঘুরিতেছে এমন সময় আমি ছাগলটার বাঁধন খুলিয়া দিলাম। তৎপরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, খোকা পালাও, পালাও, ছাগলে ঢু মারবে, শীগগির পালাও।" খোকাও ভয়ে কোন দিকে না তাকাইয়া ধীরে ধীরে ছুটিয়া বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। ছাগলটাও ঐরকম একটি জীবকে হঠাৎ ছুটিতে দেখিয়া আবার আশানুরূপ ভাবে তাহাকে তাড়া করিল। খোকা একবার ঘাড় ফিরাইয়া সেই দৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ তাহার প্রকৃতিদত্ত চির-অব্যবহৃত ক্ষমতা যেন ফিরিয়া পাইল। তারপর যে-দৃশ্য দেখিলাম তাহা যুদ্ধে হস্তীর ব্যবহার উঠিয়া যাইবার পরে আর কেহ দেখে নাই। খোকা তাহার বিপুল দেহ লইয়া বেগে ছুটিয়া বাগানে জল দিবার একটা চৌবাচ্চা ছিল তাহার ভিতর গিয়া লাফাইয়া পড়িল।

আমরা উত্তেজিত ছাগলটাকে বহু কষ্টে শান্ত করিয়া খোকাকে জল হইতে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেলাম। এই অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ খোকাকে সেই দিন মধ্যাহ্নে দুইখানি রুটি অধিক দেওয়া হইল। খোকাও তাহাতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিল।

........হঠাৎ তাহার প্রকৃতিদত্ত চির-অব্যবহৃত ক্ষমতা যেন ফিরিয়া পাইল।

অতঃপর খোকাকে একদিন বলা হইল যে, তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন দেওয়া হইবে, তবে মিষ্টান্নগুলি পুঁটুলি করিয়া একটি বৃক্ষের ডালে ঝুলান থাকিবে। তাহাকে একটি মই দেওয়া হইবে, তাহা বাহিয়া উঠিয়া মিষ্টান্নগুলি পাড়িয়া খাইতে হইবে। কুমার সস্মিত বদনে এই প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেল। বাগানের যে গাছটির উচ্চ এক ডালে এক পুঁটুলি বাতাসা ও একটি সন্দেশ ঝুলান ছিল তাহার গায়ে একটা মই লাগান হইল। কুমার বেশ সহজেই মই বাহিয়া পুঁটুলি অবধি উঠিয়া গেল। এবং আর সময়ের অপব্যবহার না করিয়া পুঁটুলিটি খুলিতে লাগিয়া গেল। যতক্ষণ বৃক্ষের ডালে আকাশ আড়াল করিয়া বসিয়া কুমার সোৎসাহে মিষ্টান্ন ধ্বংস করিতেছিল আমরা তদবসারে মইখানা সরাইয়া লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলাম।

সে খাওয়া শেষ করিয়া নামিবার সময় মই নাই দেখিয়া আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া গেল। বার কয়েক জড়িত কণ্ঠে ডাকাডাকি করিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে নিজেই বৃক্ষ হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায় ১৫।২০ মিনিট ধস্তাধস্তি করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া গায়ের পায়ের ছাল তুলিয়া অবশেষে কুমার ধরাতলে অবতীর্ণ হইল।

রাজারাণীরা কাশী যাইবার পর প্রায় ১০।১২ দিন কাটিয়া গিয়াছে। কুমার জবরদস্তি-মিতাহারের ফলে এবং মধ্যে মধ্যে ছাগল-তাড়িত এবং অপরাপর উপায়ে লাঞ্ছিত হইয়া ওজনে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। তাহার সেই ফুটবলকান্তি দেহ ও মুখের মধ্যে যেন ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছিল। ফলে অবশ্য চেহারাটা আরও সুদৃশ্য ও মনুষ্যোচিতই হইয়াছিল। আমি এই অশাতীত সুফল লাভে উৎসাহিত হইয়া নিত্য-নূতন উপায়ে কুমারকে দেহ-সঞ্চালনে বাধ্য করিতে লাগিলাম। একদিন তাহাকে বন-ভোজনে লইয়া গিয়া গাড়ী হারাইয়া মাইল দুই হাঁটিয়া ফিরিয়া আসিলাম। অপর একদিন তাহাকে একটা একরোখা ঘোড়ার উপর তুলিয়া দিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে ঘোড়া তাহার রাস টানাটানি অগ্রাহ্য করিয়া ৫।৬ মাইল ঘুরিয়া আসিল। তারপর শরীর একটু হাল্কা হইয়া আসার সঙ্গে-সঙ্গেই কুমারের বালকসুলভ খেলাধূলার প্রতি আপনা হইতেই মন যাইতে লাগিল। আমিও তাহাকে লেখাপড়ার ভিতর দিয়া ক্রমাগত খেলাধূলা ও অন্যান্য পুরুষোচিত কার্য্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ফলে কুমার ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল ও দেহের সাহত তাহার মনেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে সময় কাটিতে লাগিল; রাজা রাণীদের আসিবার সময়ও নিকট হইতে লাগিল।

উপসংহার

রাজারাণী ফিরিয়া আসিয়াছেন। হৈ রৈ সোরগোল পড়িয়া গেছে। গাড়ী হইতে বড় বড় বাক্স নামিতে লাগিল; স্কন্ধ হইতে ভারি ভারি পুঁটুলি পড়িতে লাগিল; যে যত কম কাজ করিতেছিল সে তত জোরে চীৎকার করিতে লাগিল। রাজারাণী বলিলেন, "খোকা কোথায়?"

বামুন-ঠাকুরাণী নাকে কাঁদিয়া বলিল, "ওমা আমার খোকাকে নিয়ে এস না, একবার দুচোখ ভ'রে দেখি।"

আমি ভাবিলাম, "চোখ ভরিবার মত মাল-মসলা আর খোকাতে নাই।"

রাজারাণী ক্রমশঃ যে-ঘরে কুমার পিতামাতার সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য বসিয়াছিল সেই ঘরে পৌছাইলেন। হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর কিছুক্ষণ খালি কান্না আর চীৎকার। আমি দূর হইতে আমার উদ্দেশ্যে বর্ষিত বহুবিধ গালি। শুনিতে লাগিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কণ্ঠ বামুন-ঠাকরুণের। যেন আমি তারই পুত্র-হন্তা।

বহুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর একজন চাকর আসিয়া

বলিল, "রাজা বাহাদুরের হুকুম, আপনি এখনি আপনার জিনিষ-পত্র নিয়ে চ'লে যান।"

আমি "আচ্ছা" বলিয়া নিজের জিনিষপত্র একত্র করিতে লাগিলাম।

যাইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় বাহিরে খুব একটা হৈ চৈ শুনিলাম। দেখিলাম, কুমার বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে এবং বলিতেছে, "মাষ্টার মশায় গেলে আমিও তাঁর সঙ্গে যাব। তোমরা সব স'রে যাও, ছেড়ে দাও আমাকে…"

তারপর, তারপর আর কি! রাজার প্রস্তাব রাজপুত্রের আদেশে (অর্থাৎ রাণীর আদেশে) অগ্রাহ্য হইল। আমি রহিয়া গেলাম—আর রহিয়া গেল কুমারের দেহশ্রী।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ
ন মেধসা ন বহুভোজনেন ॥

আলোচনা

চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

চৈত্রের 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রের ভিতরে চরকা-প্রসঙ্গে তিনি যে সমস্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করি। পত্রগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বের লেখা। কিন্তু তাহা হইলেও এ পত্র প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়ায় মনে হয়, চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতের এখনও কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং এ মত লোকের কাছে প্রচার করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই। সুতরাং আলোচনা অনাবশ্যক নহে।

প্রকাশিত পত্রগুলির পঞ্চম পত্রখানিতে কবিবর একস্থানে লিখিয়াছেন, "চরকা চালিয়ে খদর প'রে এ আগুন নিব্‌বে—এটা এত বড় একটা ছেলে-ভোলানো কথা যে, এ কথায় দেশশুদ্ধ লোক ভুলেছে দেখে হতবুদ্ধি ও হতাশ হ'তে হয়। সন্ন্যাসী বল্‌চে—তামাকে সোনা কর্‌বার একটা সহজ প্রক্রিয়া আমি জানি; আমি বল্‌চি—সোনা যথা-নিয়মে উপার্জ্জন করতে হ'বে, অন্য কোনো প্রক্রিয়া নেই; তখন যদি তুমি আমার ওপর রাগ করো তবে এই প্রমাণ হয় যে, উপার্জ্জন কর্‌বার মতো উদ্যম তোমার নেই, অথচ সোনা পবার লোভ তোমার পুরামাত্রায়—এমন মানুষকে বিধাতা পুরস্কার দেন না।"

তামাকে সোনা করার প্রলোভন যে দেখায়—আমরা সকলেই জানি, সে বুজরুক সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করিয়াছেন—চরকা চালাইয়া যিনি স্বরাজ পাওয়ার কথা বলেন তাঁহার—অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর। মহাত্মার নামটির উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু উপমাটি এমনি ভাবেই টানা হইয়াছে যে, তাহার ভিতর দিয়া ইঙ্গিতটি একান্ত ভাবেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চতুর্থ পত্রখানিতে লিখিয়াছেন, "দেশের যে-অবস্থা ঘটুলে স্বাধীনতার মূল-পত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয়, সে-অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। সে-অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন এবং বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই।"

যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জেলে যান, যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার কামনা করিয়াই চরকা কাটেন—ফাঁকা কথায় তাঁহাদের দুঃখ-ভোগটাকে উপেক্ষা করিবার কি যো আছে? রবীন্দ্রনাথ যে-তপস্যার কথা বলিতেছেন—সে-তপস্যা তো ইঁহারাই করিতেছেন। বর্ত্তমান জগতের কোন্ কর্ম্মীর সাধনা মহাত্মার সাধনা অপেক্ষা বেশী? এ যুগের আর কে দেশের শুভ ও ধ্রুবকে লাভ করিবার জন্য দিন-রাত্রি তাঁহার মতো তপস্যা করিতেছে? দুনিয়ায় যে দেশ-প্রেম দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে একথা হয়তো রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করিবেন না। সুতরাং বর্ত্তমান জগতে যাঁহাদের দেশপ্রেমের মহত্তর আদর্শ দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহার কাছে মেকি সন্ন্যাসী রূপে প্রতিভাত হইয়াছেন—তাঁহাদেরই দুই এক জনের নাম উল্লেখ করিবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। তাহাতে দেশের উপকার তো হইবেই, তাঁহার অভিযোগের অর্থটাও সুস্পষ্ট হইবে।

রবীন্দ্রনাথ হয়তো চরকাপন্থীদের খবর রাখেন না। রাখিলে তিনিও জানিতে পারিতেন, দেশের স্বাধীনতার সাধনাই তাঁহাদেরও সাধনা,—সেজন্য তাঁহারা বিশ্রাম ভুলিয়াছেন, নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা ভুলিয়াছেন, গণের দুঃখ মোচন ও জাগরণের জন্য চেষ্টা তাঁহাদের জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। চরকার সাধনা কেবল কাপড় বোনার সাধনা নয়, সে-সাধনার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া আছে জাতির একতার সাধনা, দেশের কাজের জন্য কর্ম্মী সৃষ্টির সাধনা। তাঁহারা সেই অবস্থা ঘটাইতেই চেষ্টা করিতেছেন "যে-অবস্থা ঘটুলে স্বাধীনতার মূল পত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয়।"

কাজের বাস্তব পদ্ধতির কোনো ইঙ্গিত যদি রবীন্দ্রনাথের থাকে, তবে সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিবেশন করিলেই তাঁহার সমালোচনা সার্থক হইত।

শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

সম্পাদকীয় মন্তব্য। যদি ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, যে, রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীরই চরকা-বিষয়ক মতের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না, যে, তিনি মহাত্মাজীকে মেকি সন্ন্যাসী মনে করেন। একজন মানুষের সকল মতের সহিত মিল না থাকিলেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা যায়। মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ কেহই কাহারও সকল মতে সায় দেন না; অথচ আমরা জানি তাঁহারা পরস্পরকে খুব শ্রদ্ধা করেন। আমাদের নিজের মত এই, যে, মহাত্মা গান্ধী যদি কেবল চরকার শক্তির কথাই বলিতেন, যদি তাঁহার ঐ কথার পশ্চাতে তাঁহার সমগ্র মহৎ জীবন ও সাধনা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার চরকা-বিষয়ক মত এত লোকে অনুসরণ করিত না। চরকাবিষয়ক মতের প্রচারক বলিয়াই তিনি বড় নহেন; তিনি মহৎ লোক বলিয়াই তাঁহার চরকাবিষয়ক মত এত লোক গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিয়াও শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করে।

নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনা করা যায়, ইহা বিশ্বাস কাহারও থাকিলেই তিনি "বুজরুক সন্ন্যাসী" বা "মেকী সন্ন্যাসী" হন না। কাহারও কাহারও ঐরূপ অকপট বিশ্বাস থাকিতে পারে। যেমন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা বিজ্ঞানাচার্য্য অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছিল। তিনি বুজরুক বা মেকি সন্ন্যাসী ছিলেন না। কাহারও ভ্রম আছে বলিলেই তাহাকে প্রতারক বলা হয় না।

প্রবাসীর সম্পাদক

—

"গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস"

অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাঘ সংখ্যার প্রবাসীতে 'গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস' শীর্ষক এক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি উপাদেয় এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তবে শিক্ষার্থী হিসাবে সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য কতক কতক বিষয় আমার জানিবার ও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছি।

এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "গৌড়ী-রীতির" একটি নিদর্শনরূপে এক "অর্দ্ধনারীশ্বর" নামক প্রস্তর-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষের চিত্র মুদ্রিত করিয়া লিখিয়াছেন, "উত্তরবঙ্গে রাজসাহী জেলায় গোদাগাড়ী গ্রামের নিকটে প্রদ্যুম্নেশ্বর বা পদুমসহর নামক বিখ্যাত দীর্ঘিকায় আবিষ্কৃত এবং অধুনা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় রক্ষিত "অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি"।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গোদাগাড়ী দেখিয়াছেন, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালা এবং পদুমসহর নামক দীর্ঘিকাও দেখিয়াছেন। তাহার তীরে বরেন্দ্র অনুসন্ধানকারীদিগের যে-আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে তাঁহার চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ দীর্ঘিকা গোদাগাড়ী গ্রামের নিকট নহে এবং উহার গর্ভ হইতেও "অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি" আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐ দীর্ঘিকার পূর্ব্ব তটে সেন রাজ-বংশের প্রথম রাজা বিজয়সেন দেব প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক মহাদেবের এক অত্যুচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করাইবার এবং তাহার পুরোভাগে দীর্ঘিকাটি খনন করাইবার কথা তাম্রলিপিতে খোদিত রহিয়াছে। এই দীর্ঘিকার একাংশের পঙ্কোদ্ধার সাধিত করিতে গিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সদস্যগণ এক শিল্পসৌন্দর্য্যমণ্ডিত "গঙ্গামূর্ত্তির" ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার চিত্র এখন দেশবিদেশে সুপরিচিত হইয়াছে।

"অর্দ্ধনারীশ্বর" মূর্ত্তিটি ঢাকা জেলায় অবস্থিত একটি স্থান হইতে আনীত, ইহা রাজসাহী অঞ্চলের কোন স্থান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ 'গৌড়শিল্প' বলিলে তাহা বাঙ্গালীর শিল্প বলিয়া বুঝা যাইত; "গৌড়ীয় শিল্প" বলিলে তাহা বাঙ্গলার বাহিরে অবস্থিত গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্য যে-কোন প্রদেশের শিল্প বলিয়াও বুঝা যাইতে পারে। তিনি যাহা গৌড়ীয় শিল্পের নিদর্শন বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই বাঙ্গলার মাটির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। অতএব প্রবন্ধটি "গৌড়শিল্প" নামে অভিহিত করিলে যথাযোগ্য হইত বলিয়া মনে হয়।

শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার

"গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে সরকার মহাশয় যে-পত্র লিখিয়াছেন তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তিনি যে-ভুল বাহির করিয়াছেন তাহা ইচ্ছাকৃত নহে। আমি বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে আমার এক বন্ধু ও একজন শিল্পীকে ব্লক প্রস্তুত করিবার জন্য অনেকগুলি ফটোগ্রাফ দিয়া গিয়াছিলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, পদুমসহরে আবিষ্কৃত গঙ্গামূর্ত্তির চিত্রই প্রকাশিত হইতেছে। গঙ্গামূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গে আবিষ্কৃত অর্দ্ধনারীশ্বর ও গঙ্গা উভয় মূর্ত্তির চিত্রই শিল্পীকে দেওয়া হইয়াছিল। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির ছবি প্রকাশিত হওয়ায় প্রবন্ধের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। কারণ, বাংলা দেশের দ্বাদশ শতাব্দীর তথা-কথিত "সুষমার" বিকাশ প্রদর্শনই আমার উদ্দেশ্য এবং তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। নবম শতাব্দীর তুলনায় দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়ীয় শিল্পীর কতদূর অধঃপতন হইয়াছিল প্রথম প্রবন্ধে কেবল তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের পত্রের অন্য কোনও বিষয়ের উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না।

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের মন্তব্য। প্রতিবাদ-লেখক তাঁহার বক্তব্য একখানা ইংরেজী দৈনিকে ছাপাইয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রের নিয়ম অনুসারে আমরা তাঁহার চিঠি না ছাপিলেও পারিতাম; কিন্তু রাখালবাবুর বক্তব্য ছাপা উচিত বলিয়া আমরা ছাপিলাম। প্রতিবাদকারীর চিঠিতে রাখালবাবুর প্রতিব্যঞ্জক যে-সব অনাবশ্যক কথা ছিল, তাহা বাদ দিয়াছি।

প্রবাসীর সম্পাদক
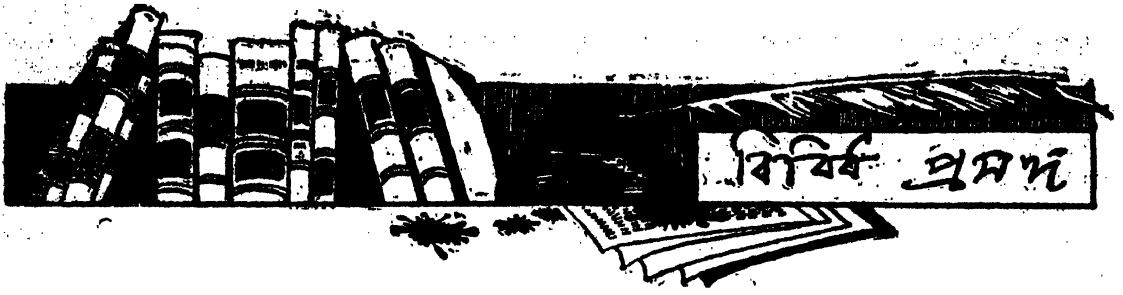
অভিনয় ও নৃত্য

১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে, গুজরাতী যাঁহাদের মাতৃভাষা, কলিকাতায় এরূপ লোকের সংখ্যা ৬:৮৫ ; এখন হয় ত সাত হাজার হইয়াছে। গুজরাতী বালক ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য ইঁহারা কলিকাতায় একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বিদ্যালয়-গুলির পুরস্কার বিতরণ সভায় আমাকে সভাপতির কাজ করিতে হয়। গুজরাতীরা সভার জন্য ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের কোরিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া লইয়াছিলেন। যাঁহাদের পুত্রকন্যারা এইসব বিদ্যালয়ে পড়ে, তাঁহারা সপরিবারে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ঐ রঙ্গালয়ে সকলের স্থান হয় নাই, অনেককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও পারসী ছিলেন ; মহিলাদের মধ্যে মুসলমান কেহ ছিলেন কি না বুঝিতে পারি নাই।

সভায় রিপোর্ট পাঠ ও পুরস্কার বিতরণ ছাড়া, বালকদের দ্বারা ইংরেজী ও গুজরাতীতে অভিনয়, বালিকাদের দ্বারা গুজরাতীতে অভিনয়, এবং বালিকাদের নৃত্য হইয়াছিল। গুজরাটে যাহাকে গরবা বলে, এই নৃত্য তাহাই। হিন্দু ভদ্র গৃহস্থের বালিকা ও মহিলাদের নৃত্য গুজরাটের প্রাচীন রীতি। প্রকাশ্য স্থানে এই নৃত্য তাঁহারা এখনও করিয়া থাকেন। অনেক বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতী'তে গুজরাটে গরবার বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি দুই বার বোম্বাই ও একবার সুরাট গিয়াছিলাম। কিন্তু এই নৃত্য দেখি নাই। গুজরাতী বালিকাদের এই নৃত্য এই প্রথম কলিকাতায় দেখি। তাহার আগে এইরূপ নৃত্য শান্তিনিকেতনে দেখিয়াছিলাম। তথাকার একজন পারসী অধ্যাপকের পত্নী কতকগুলি বালিকাকে উহা শিখাইয়াছেন। অন্যবিধ নৃত্যও সেখানকার কতকগুলি বালিকা জানে। তাহাও আমি দেখিয়াছি।

দি ন্যাশন্যাল ক্রিশ্চিয়ান্ কৌন্সিল রিভিউ নামে ভারতীয় খৃষ্টীয়ানদিগের একটি ইংরেজী মাসিক পত্র আছে। তাহার এপ্রিল সংখ্যায়, গত ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে স্ত্রীশিক্ষার সংস্কার-সাধনার্থ ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদের যে কনফারেন্স হইয়াছিল, সেই বিষয়ে মিস্ এলিয়ট একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি বোম্বাইয়ের একটি খৃষ্টীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তিনি লিখিয়াছেন, যে, কন্ফারেন্সে বালিকাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল ও প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাহার পর বলিতেছেন,

"যে-দেশে মৃত্যুর হার এত বেশী এবং শরীর সাধারণতঃ এত দুর্ব্বল, তথায় কন্ফারেন্সে জরুরী বলিয়া সমর্থিত শিক্ষাসংস্কারগুলি খুবই দরকারী সন্দেহ নাই। ইস্কুলের ছেলেদের ও মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দৈহিক শিক্ষার বন্দোবস্তের দাবী করিয়া ভারতীয় মহিলারা ঠিকই করিয়াছেন। সকল সমাজেরই রক্ষণশীল শ্রেণীর লোকেরা বালিকাদের অবাধ খেলা ও ব্যায়াম ভীতির চক্ষে দেখেন। ইংলণ্ডে যখন বালিকারা হকি খেলিতে আরম্ভ করে, তখন এইরূপ আতঙ্ক দেখা দেয়। ভারতবর্ষে নৃত্যের সঙ্গে এত অশুচি ও অমঙ্গলকর জিনিষের স্মৃতি জড়িত, যে, ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা ইহা দীর্ঘকাল পরিহার করিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু এখন বোধ হয় একটা পরিবর্ত্তনের সময় আসিতেছে। ভারতীয় বালিকারা আনন্দোপভোগের সর্ব্বাপেক্ষা তালানুগত ও সুশোভন একটি উপায় হইতে বরাবর বঞ্চিত থাকিলে দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে। বালিকা-বিদ্যালয়ে নৃত্যের প্রবর্ত্তনের পক্ষ সমর্থন করিতে মহীশূরের কুমারী ল্যাজ্যারসের সাহসের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে মাধুর্য্য ও রসিকতার সহিত ইহা করিয়াছিলেন। তাহার জন্য আমাদের সকলের তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলী বহুশতাব্দী ধরিয়া সুখবিমুখ হইয়া কঠোর সাধনার আদর্শ সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেণ্ট ফ্রান্সিসের সহিত আবার তাহা সঙ্গীতমুখর হইয়া উঠে। যদি ভারতবর্ষের খৃষ্টীয়ানেরা তাঁহাদের দেশের জন্য অতীত সব কলঙ্ক হইতে মুক্ত নৃত্যকলার পুনরুদ্ধার কার্য্যে অগ্রণী হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহা সুখের বিষয় হইবে।"

কুমারী এলিয়ট যে মনে করিয়াছেন, যে, ভদ্রশ্রেণীর বালিকা ও মহিলাদের মধ্যে নৃত্য ভারতবর্ষের কোথাও প্রচলিত নাই, তাহা ভুল। গুজরাটে বরাবর প্রচলিত আছে ; অন্যত্রও প্রচলিত থাকিতে পারে—তাহা আমরা অবগত নহি। উহার পুনঃপ্রবর্ত্তনও যে বাংলা দেশে আগেই হইয়া গিয়াছে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বঙ্গে উহার পুনঃপ্রবর্ত্তন উপলক্ষ্যে খবরের কাগজে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে। আমাদের মতে সব রকমের নৃত্য অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় নহে। কোন কোন রকমের নৃত্য কেবল যে নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর নহে, তাহা নয়, বরং তাহা সুশোভন ও হিতকর। শান্তি-

নিকেতনে ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে যে নৃত্য ও নৃত্য-সম্বলিত গীত ও অভিনয় দেখিয়াছি, তাহা আমার চক্ষে সুন্দর ও নির্দ্দোষ লাগিয়াছে। কলিকাতার আর যে-যেখানে বালিকাদের নৃত্য হইয়াছে, তাহা আমি দেখি নাই; সুতরাং সে-বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারি না।

অভিনয় ও নৃত্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ফল। কাহারও শিক্ষা ব্যতিরেকেও শিশুরা নাচে, তালে তালে হাত পা ছুঁড়ে, সুন্দর অঙ্গভঙ্গী করে। এই রূপে তাহারা তাহাদের হর্ষ ও আনন্দ জ্ঞাপন করে। অভিনয়ও তাহারা স্বভাবতঃ করে। তাহারা যাহা নয়, তাহা হইবার ভাণ করে, এবং সেইরূপ কাজ করে ও কথা বলে। অভিনয় ও নৃত্য স্বাভাবিক বলিয়া উহাকে মূলতঃ দুর্নীতিবিজড়িত মনে করা যাইতে পারে না। অন্য অনেক জিনিষের মত অভিনয় ও নৃত্যের ভাল মন্দ দুই রকম আছে, এবং প্রকার-ভেদে উহার সুফল কুফল দুই-ই আছে। যাঁহারা ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, যে, ধর্ম্ম মানব-সমাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত, অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা ও পুরোহিতের জীবনের সহিত ঘোরতর দুর্নীতির যোগ সকল দেশেই দেখা গিয়াছে; কিন্তু তাহার জন্য চিন্তাশীল লোকেরা ধর্ম্মকে নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয় মনে করেন না।

এমন কথা উঠিতে পারে, যে, শিশুরা যাহা করে, তাহা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও,তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক লোকদের পক্ষে করণীয় না হইতে পারে। আমরাও বলিতেছি না, শিশুরা যাহা কিছু করে, অন্যদেরও তাহাই করা উচিত। শিশুরা স্বভাবতঃ অভিনয় করে বলিয়া উহার সঙ্গে দুর্নীতির নিত্য-সম্পর্ক নাই, ইহাই আমাদের বক্তব্য। বেঞ্জামিন্ কিডের লেখা শক্তি-বিজ্ঞান ("Science of Power") নামক পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন, যে, সভ্যতর জাতিদের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়মন বাস্তবিক সুমার্জ্জিত, তাঁহারা বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমেই দেখিতে শিশুদের মত হন; নৃতত্ত্ববিদেরাও এইরূপ বলেন। সুতরাং শিশুরা করে বলিয়াই কোন জিনিষ তাচ্ছিল্যের যোগ্য নয়। বরং যে-সব জাতির লোক অল্প বয়সেই অতিপ্রবীণ ও অতিবিজ্ঞ সাজিয়া সব রকম খেলাধুলা ত্যাগ করে, সেইসব জাতিকে জরাগ্রস্ত এবং দৈহিক ও মানসিক কর্ম্মিষ্ঠতায় নিকৃষ্টস্থানীয় মনে করা যাইতে পারে।

অভিনয় অন্য অনেক প্রাচীন দেশের মত ভারতবর্ষেও পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। উৎকৃষ্ট নাটক ও উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দ্বারা অন্য দেশের মত ভারতবর্ষের লোকদেরও খুব উপকার হইয়াছে। যাত্রা একরকম অভিনয়। অন্তবিধ অভিনয়ও আছে। কথকতাও এক-প্রকার অভিনয়; তাহাতে কথক একাই নানাজনের স্থলাভিষিক্ত হইয়া অভিনয় করেন। এইরূপ নানাবিধ অভিনয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের নিরক্ষর লোকেরাও কাব্যের, সঙ্গীতের, ধর্ম্মের, ধর্ম্মনীতির,দর্শনের, এবং পুরাণাদি লিখিত ইতিহাসের আস্বাদ পাইয়া অন্য অনেক দেশের শিক্ষিত লোকদের কতকটা সমান সুবিধা পাইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারত যে ভারতবর্ষের সমাজকে ও মানুষকে গড়িয়াছে, তাহা অনেকটা অভিনয়ের সাহায্যে। নাটক অনেক দেশের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ জিনিষ। তাহার দ্বারা মানবসমাজ উন্নত ও উপকৃত হইয়াছে। সুতরাং নাটক ও অভিনয়কে বাদ দেওয়া চলে না। অবশ্য মন্দ নাটক অনেক আছে, এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে দুশ্চরিত্র লোক অনেক দেখা গিয়াছে। সেইজন্য খৃষ্টীয় জগতে ও অন্যত্র নাটক ও নাট্যাভিনয়কে বর্জ্জনীয় করিবার নানাবিধ বিপুল চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের আনন্দ দিবার ও হিত সাধিবার শক্তি থাকায়, এবং সেই আনন্দ ও হিত মানব-প্রকৃতি অজ্ঞাতসারে চাহিয়াছে বলিয়া নাটক ও নাট্যাভিনয় বাঁচিয়া আছে। সমাজের অন্য অনেক শ্রেণীর লোক নিজেরা যাহা বটে ও যাহা করে, তাহার দ্বারা পরিচিত হয়, সুখ্যাত বা অখ্যাত হয়; অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা যাহা নয় তাহা সাজিয়া পরিচিত হয়। মহারাণাপ্রতাপ ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিজ নিজ বীরত্বের জন্য সম্মানিত; কিন্তু যাহারা প্রতাপ ও লক্ষ্মীবাঈ সাজে, তাহাদের নিজের কোন বীরত্ব না থাকিতে পারে। বোধ হয়, অপরের গুণের আলোকে প্রভামণ্ডিত বলিয়া সচ্চরিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অন্য কৃতী লোকদের মত সম্মান পায় নাই। তা ছাড়া, তাহাদের পদস্খলনের অধিক সম্ভাবনা ঘটে। তাহা সত্ত্বেও, তাহাদের বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার বলিয়া, "ধর্ম্ম ও নীতির বিশ্বকোষ" * নামক বৃহৎ প্রামাণিক গ্রন্থের চতুর্থ ভল্যুমে "নাটক" প্রবন্ধের লেখক বলিতেছেন :—

"Yet it must not be forgotten that this darker side is, in reality, nothing but an unhappy incident; only the faul's are generally known, and the brighter and nobler side of the actor's life is too little recognized. Accurate statistics of tho moral and intellectual standard of the acting profession would, doubtless, compare favorably with similar standards of many other professions."

ইহা পাশ্চাত্য দেশের কথা। আমাদের দেশের অভিনেতা

* *Encyclopaedia of Religion and Ethics*: Edited by James Hastings, M. A., D. D. Volume 4, pages 870-871.

ও অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ লোক মত প্রকাশ করিয়াছেন কি না, জানি না। আমি আমাদের দেশের পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীদের কোন অভিনয় দেখি নাই ও তাহাদের সহিত পরিচিত নহি বলিয়া কোন মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এবিষয়ে কেবল একটা অবান্তর কথা বলিব। চারিত্রিক কারণে আমাদের দেশের পেশাদার অভিনেত্রীদের ভদ্রসমাজে স্থান নাই, কিন্তু নিকৃষ্টচরিত্র পেশাদার অভিনেতাদের স্থান আছে। আমার বক্তব্য এ নয়, যে, ঐসব অভিনেত্রীরও ভদ্র সমাজে স্থান হউক। ঐসকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চারিত্রিক অধোগতি যাহাতে না হয়, তাহারা যাহাতে সচ্চরিত্র হইতে ও থাকিতে পারে, তাহার জন্য অবিরাম চেষ্টা হওয়া উচিত। সচ্চরিত্র রঙ্গালয়াধ্যক্ষ ও অভিনেতাদেরই এই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। যে-সকল সচ্চরিত্র লোক রঙ্গালয়ে গিয়া আনন্দ ও উপকার পান, তাঁহাদেরও এবিষয়ে মন দেওয়া আবশ্যক। যেবিদ্যার দ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে সমাজের আনন্দ ও কল্যাণ হইয়াছে, তাহার অনুশীলকগণ চারিত্রিক কারণে ঘৃণিত হইয়া থাকেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, দুশ্চরিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দের সংসর্গে অনেক সচ্চরিত্র লোকের পতন হয়।

নাট্যাভিনয় যখন মূলতঃ দুর্নীতির জনক নহে, তখন সচ্চরিত্র পুরুষ ও নারীর তাহা করা অনুচিত মনে হয় না। কিন্তু এরূপ নাটক অভিনয় করা উচিত নয়, যাহা কুরুচিপূর্ণ ও দুর্নীতির পরিপোষক। ইহাও সহজবোধ্য, যে, সচ্চরিত্র পুরুষ ও নারীদের দুশ্চরিত্র কোন পেশাদার অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সাহায্যে বা সহযোগে নাট্যাভিনয় করা বাঞ্ছনীয় নহে।

ভদ্রসমাজের লোকদের, বিশেষতঃ মহিলাদের, নাট্যাভিনয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা কি উচিত? অর্থোপার্জন নিজের জন্য করা যাইতে পারে, কোন সদনুষ্ঠান বা হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্যও করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত যাঁহাদের নাটক-সমূহের ও অভিনয়ের সুরুচি কুরুচি সুনীতি দুর্নীতির সূক্ষ্ম বোধ আছে, তাঁহাদের পরিচালনায় কোন ভাল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা তুলিবার নিমিত্ত অভিনয়ে আপত্তি দেখি না; কিন্তু যাহার তাহার অধ্যক্ষতায় ইহা হওয়া উচিত নয়। তাহাতে নাটকের নির্ব্বাচন এবং অভিনয় উভয়ই কুফলপ্রদ হইতে পারে। কিসে টাকা বেশী হইবে বা অধিকসংখ্যক লোকের বাহবা পাওয়া যাইবে, এই দিকেই যাহাদের বেশী ঝোঁক, তাহারা এরূপ কাজে হাত দিলে সমাজের অহিত হইবার সম্ভাবনা। কেবল টাকার দিকে ঝোঁকের জন্য নিকৃষ্ট রকম নাটকের নিকৃষ্ট রকম অভিনয় হইতে সমাজকে ও নাট্যবিদ্যাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে সচ্ছল অবস্থার নাট্যোৎসাহী লোকদের দ্বারা এরূপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহার আয় কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ টিকিট বিক্রীর উপর নির্ভর করে না।

অনেক বিষয়েই সংস্কার ও বিনাশ দুই পথ আছে। সংসারে থাকিলে অনেক পাপ হইবার সম্ভাবনা ঘটে। সন্ন্যাসের ব্যবহার ইহা একটা কারণ। ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইবার ব্যবস্থা আর এক পথ। কোনটি ভাল, বা কোনটি সহজ পথ, তাহার বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধেও দু রকম ব্যবস্থা হইতে পারে। বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা উভয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী; তাঁহারা উভয়ের বিনাশ বা চিরপাতিত্য চাহিয়াছেন কিন্তু সফল-প্রযত্ন হন নাই। অন্য অনেকে আছেন, যাঁহারা দ্বিবিধ ছুটির সুনীতিসঙ্গত ব্যবহার, সংস্কার ও রক্ষা চান। শেষোক্ত দলের মত যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, যদিও তাঁহাদের মত অনুসারে কাজ হওয়া বড় কঠিন।

নৃত্য সম্বন্ধে আগে কিছু বলিয়াছি। বলিয়াছি, উহা স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা হইলেও প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা যে নানাবিধ নৃত্য করে, তাহাতে ভাল মন্দ দুই-ই আছে। নৃত্য মাত্রেই যে দুর্নীতির পরিপোষক বিবেচিত হয় না, তাহার একটি প্রমাণ এই, যে, চৈতন্যদেবের অনুসরণে বৈষ্ণব সমাজের ও ব্রাহ্ম সমাজের পুরুষেরা যে নগর-কীর্ত্তনাদির সময় নৃত্য করেন, সামাজিক পবিত্রতা রক্ষণে বিশেষ যত্নশীল ব্যক্তিরাও তাহাকে দুর্নীতির পরিপোষক মনে করেন না। তাহার একটি কারণ অবশ্য এই, যে, পুরুষেরাই ঐরূপ নৃত্য করেন। কিন্তু তাহা হইলেও উহা হইতে বুঝা যায়, যে, নৃত্যমাত্রেই খারাপ নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে নৃত্যের যোগ পুরাকালে নানা দেশে ছিল, এখনও অনেক দেশে আছে। নটরাজ মহেশ্বরের এক নাম, এবং জন্মমৃত্যু সৃষ্টিপ্রলয়াদি বিশ্বব্যাপার তাঁহার নৃত্য বলিয়া কথিত হয়।

যাহা পুরুষেরা করিলে দোষ হয় না, স্ত্রীলোকে তাহা করিলে দোষ হয়। পুরুষদের কিসে অসুবিধা বা অনিষ্ট হইতে পারে বা না পারে, তদনুসারে নানা সামাজিক বিধিব্যবস্থা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর বাহির হইলে বা তাহাদের মুখটি পর্য্যন্ত দেখা গেলে দুর্নীতি বাড়িতে পারে মনে করিয়া অবরোধপ্রথার ব্যবস্থা হইয়াছে। নারীরা সমাজের কর্ত্রী হইলে পুরুষদের অবরোধ ও অবগুণ্ঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; কারণ সামাজিক অপবিত্রতার জন্য পুরুষরা (কম করিয়া বলিলেও) নারীদের সমান দোষী। কিছু দেখিলে বা শুনিলে কুভাব পুরুষদের মনে আসিতে পারে, নারীদের মনেও আসিতে পারে। নারী

রাস্তাঘাটে বাহির হইলে যদি পুরুষদের মানসিক এবং অন্য ক্ষতি হয়, তাহা হইলে পুরুষরা দৃষ্টিগোচর হইলে নারীদেরও সেইরূপ অনিষ্ট হইতে পারে। নারীদের নৃত্য দেখিলে যেমন পুরুষদের অনিষ্ট হইতে পারে, পুরুষদের নৃত্য ও নানারকম কুস্তি ও মল্লযুদ্ধ দেখিলে নারীদেরও তেমনি অমঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং নরনারী উভয়েরই দুটা চোখ কানা করিয়া দেওয়া তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত সুব্যবস্থা বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের এরূপ পরম ও চরম ভক্ত কেহ নাই।

কিছু কাল আগে পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ভদ্র মহিলাদের ও বালিকাদের পক্ষে গীতবাদ্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তাহা প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজেও চলিতেছে। তাহা সত্ত্বেও এখনও বিস্তর লোক আছে, যাহারা নারীকণ্ঠে ভক্তিভাবপূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গীত বা দেশপ্রীতিপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া সঙ্গীতের ভাবে নিমগ্ন ও আপ্লুত হইতে চায় না, হয় না, অন্য নিকৃষ্ট ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া সঙ্গীতের স্থানে যায়। তাহা তাহাদের আচরণ, মুখের ভাব ও হাস্য হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু এইরূপ অপকৃষ্ট লোক পৃথিবীতে আছে বলিয়া ধর্ম্মমন্দিরে ও সার্ব্বজনিক সভায় নারীদের উৎকৃষ্ট গান গাওয়া অবাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইবে না।

গানের মত নৃত্যের দ্বারাও মানুষের ধর্ম্মভাব, ভক্তিভাব, নির্ম্মল আনন্দ, শোক প্রভৃতি ব্যক্ত হইতে পারে। বালিকা ও মহিলারা তাহা করিলে দোষের বিষয় মনে করি না। শান্তিনিকেতনে যখন "নটীর পূজা"র নৃত্যসহকৃত অভিনয় দেখিয়াছিলাম, তখন হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্রেক হইয়াছিল।

গানের মত গানের কথাগুলির মধ্যে যে ভাব চিন্তা আদর্শ নিহিত আছে, তা ছাড়া সুরেরও একটি স্বতন্ত্র রূপ, মাধুর্য্য আছে। নৃত্যেও যদি মানুষের গতির, অঙ্গসঞ্চালনের সেইরূপ একটি ছন্দোময় তালসঙ্গত রূপ অভিব্যক্ত হয়, তাহাও নির্ম্মল আনন্দের কারণ হইতে পারে। এরূপ নৃত্য যাহা দেখিয়াছি, তাহার উল্লেখ আগে করিয়াছি। অধোগতি হইবার ভয়ে সৌন্দর্য্য মাত্রকেই আমাদের অনেক সময় ভয় হয়। কিন্তু বিধাতা যখন সুন্দর অনেক ফুলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন ফুলও রচনা করিয়াছেন যাহা হইতে ফলের উৎপত্তি হয় না, সব ফুলকে ফুলকপি করেন নাই, তখন সৌন্দর্য্যকে কেবলমাত্র পতনসম্ভাবনার একটি কারণ রূপে দেখা ঠিক্ নয়। তাহা মানুষকে শ্রেয়ের দিকেও লইয়া যায়।

স্বভাবতঃ নারীদের চলিবার, কাজ করিবার, কথা বলিবার ভঙ্গী পুরুষ ও নারীদের লক্ষীভূত হয়। অনেক বালিকার ও মহিলার এই সব বাহ্য আচরণ সুশোভন এবং গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদাপূর্ণ। তাহা স্বভাবতই লোকের ভাল লাগে। কিন্তু কোন মানুষের মনে বিষ থাকায় যদি এই ভাল-লাগাটা তাহার অমঙ্গলের কারণ হয়, তাহা হইলে বিধাতার কৃপায় যে বালিকা বা মহিলার বাহ্য আচরণ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, তিনি কি এই অমঙ্গলের জন্য দায়ী বিবেচিত হইবেন ?

অনেক নৃত্যে এরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা কুভাবের প্ররোচক। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য যদি বালিকাদিগকে নৃত্য শিখাইতেই হয়, তাহা হইলে যার তার হাতে তাহার ভার দেওয়া কখনই উচিত নয়। অর্থলাভ যাহার উদ্দেশ্য, এরূপ নৃত্য প্রদর্শনে আরও বেশী সাবধানতা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

নৃত্য নানা রকমের। ছোট ছোট মেয়েরা নানা রকম কাজের অনুকরণ করিয়া যে গান (action song) করে, তাহা এক-রকম নৃত্য বটে। তাহা ব্যায়ামেরও কাজ করে। সক্রেটিস্ কেবল ব্যায়ামের জন্য নৃত্য করিতেন। কৃষি-নৃত্য, জাদু-নৃত্য, রণ-তাণ্ডব, মূক অভিনয়ের নৃত্য, সামাজিক আমোদ ও কালক্ষেপের নৃত্য, পূর্ব্বরাগ-সংপৃক্ত নৃত্য—নর্ত্তন এইরূপ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলির স্থান অসভ্য সমাজে আছে। পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে যত রকম নাচের চলন আছে, তাহার সবগুলি আমাদের দেশে না-চালানই ভাল।

নৃত্যের কি কি অভিপ্রায় ও ফল পরিহার করিতে হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা "ধর্ম্ম ও নীতির বিশ্বকোষ" ("Encyclopaedia of Religion and Ethics") হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। লাগ্রেঞ্জের Physiology of Bodily Exercise নামক গ্রন্থে আছে :—

> 'Muscular movement, of which the dance is the most complex expression, is undoubtedly a method of auto-intoxication of the very greatest potency.' 'A girl who has waltzed for a quarter of an hour is in the same condition as if she has drunk champagne ?'

এই 'আত্ম-মাদনা' কেবল বালিকাদেরই হয় না ; কীর্ত্তনকালে নাচিতে নাচিতে যাঁহাদের ভাব ও দশা হয়, তাঁহাদেরও ইহা হয়। তাহার প্রমাণ উক্ত বিশ্বকোষের নিম্নলিখিত বাক্যে আছে।—

> The powerful neuro-muscular and emotional influence, leading to auto-intoxication, is the key both to the popularity of dancing in itself and to its employment for special purposes, such as the production of cerebral excitement, vertigo, and various epileptoid results, in the case of medicine-men, shamans, dervishes, prophets, oracle-givers, visionaries, and sectaries even in modern culture.

নৃত্যে আর-একটি বর্জ্জনীয় জিনিষের ইঙ্গিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের শেষ কয়েকটি কথায় আছে।

Primarily were physical play, it has developed in many spheres, gymnastic and artistic, as a pastime, and as a sexual stimulus ;......

প্রমাণ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

Just as the male bird of several species parades and dances before the female, with the object of producing tumescence in himself and in her, so to the savage dancing is the chief means of courting a woman, and for the same reason. In both bird and man the 'intention' is unconscious ; it is prompted and engineered by instinct. The 'showing off' of modern youth is equally instinctive.

বালিকা ও মহিলাদের অভিনয় ও নৃত্য সম্বন্ধে যে-আন্দোলন হইতেছে, তাহা আমাদের দেশের অন্য অনেক আন্দোলনের মত একতরফা হইতেছে ;—মহিলারা সম্প্রতি এবিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। "বঙ্গনারী" ছদ্মনামধারিণী হিন্দুমহিলা তাঁহার "আগমনী" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"আমাদের মেয়েদের আর-একটি অভাব, তাঁহারা দেহের সকল অঙ্গ অবলীলাক্রমে ও শোভন ভাবে সঞ্চালন করার কৌশল কিছুই শিখেন না। ইহাতেও তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের অনেক হানি হইয়া থাকে। উহা ঠিক মত আয়ত্ত করিতে হইলে উপযুক্ত ব্যায়ামের সহিত কয়েকটি নৃত্যকলাও শেখা উচিত। ইহাতে অনেকেই হয়ত বিরক্ত হইয়া উঠিবেন, অথবা হাসি রাখিতে পারিবেন না, জানি। তথাপি মেয়েদের ব্যায়াম ও সহবৎ শিখার জন্য নৃত্যকলার উপযোগিতা স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য দেশে ইহার প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হয়, আমাদের অবশ্য তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কয়েকটি দেশী বিলাতী নৃত্যকলা ও শোভন ভাবে দেহ সঞ্চালন করিবার কৌশল মেয়েদের শেখান দরকার।...কেবল মাংসপেশীর পুষ্টির উপর এখন সকল বিশেষজ্ঞরাই বিশ্বাস হারাইতেছেন ; সুতরাং মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ডাম্বেল ইত্যাদি অপেক্ষা যাহাতে মনের স্ফূর্ত্তির সহিত সকল অঙ্গের চালনা হয়, তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। মুক্ত বাতাসে খেলা ও নৃত্যকলার চর্চ্চা ইহার সবিশেষ উপযোগী বলিয়াই বোধ হয়।"

বাংলাদেশে আগে ভদ্রমহিলারা নৃত্য শিখিতেন ও করিতেন কি না, সে-বিষয়ে কোন সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক গবেষণা করি নাই। সতী বেহুলা স্বর্গে নৃত্য দ্বারা দেবতুষ্টি-বিধান করিয়া স্বামীর জীবন বর পাইয়াছিলেন বলিয়া মনসামঙ্গলে যে বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয়, নৃত্য পূর্ব্বে অন্তঃপুরিকারা শিখিতেন ও করিতেন।

সমাজে দুর্নীতি প্রবেশ করিলে তাহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য এবং দুর্নীতির প্রবেশ নিবারণের জন্য সাহিত্য ললিত-কলা প্রভৃতিকে নির্ব্বাসিত করিয়াও সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার ইচ্ছা কখন কখন হইতে পারে। কিন্তু সে উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বীরত্বের পূর্ণ বিকাশের নিমিত্ত স্পার্টা কঠোর সাধনা করিয়াছিল, কিন্তু বীর উৎপাদনেও এথেন্স্ অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, এথেন্স শুধু উৎকৃষ্ট কাব্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই ; ধর্ম্মনীতি ও দর্শন ক্ষেত্রেও তাহার সন্তানেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এবং সমগ্র মানব-সমাজ তাহার জন্য তাহার নিকট ঋণী। স্পার্টার এরূপ কিছু দেখাইবার নাই।

কোন দেশে, জাতিতে, সমাজে, মানব-প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও পুষ্টির ব্যবস্থা ভিন্ন তাহাতে বহু শ্রেষ্ঠ মানবের উদ্ভব হয় না।

—

মিস্টার ষ্টেপ্‌ল্টনের পদোন্নতি

মিস্টার ষ্টেপ্‌ল্টনের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ায় আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বরং তাঁহার পদোন্নতি না হইলে বিস্ময়ের কারণ ঘটিত। ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের একটি অলিখিত নিয়ম এই, যে, দেশী লোকেরা ও দেশী খবরের কাগজ যে ইংরেজ কর্ম্মচারীর বেশী সমালোচনা করিবে, তাহাকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে হইবে। কেন এই নিয়ম অনুসৃত হয় বলা কঠিন। অনেকে বলেন, দেশী লোকমতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য ইহা করা হয়। দেশী লোকমতের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবার জন্য যদি একটা নিয়ম করিতে হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কিন্তু সরকার বাহাদুরকে প্রকারান্তরে উহার গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই জন্য নিয়মটির এই কারণ নির্দেশ সত্য কিনা, সন্দেহ হয়। আর এক ব্যাখ্যা হইতে পারে। ভারতের কোন কোন নেতা ও সম্পাদক বলিয়া থাকেন, বিলাতের টাইম্‌স্ কাগজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে আইন, কাজ, ব্যবস্থা, প্রচেষ্টার প্রশংসা করে, তাহা নিশ্চয়ই অনিষ্টকর ; কিন্তু ঐ কাগজ যাহার নিন্দা করে, তাহা নিশ্চয়ই হিতকর। কি হিতকর কি অহিতকর বুঝিবার এটা খুব সোজা সঙ্কেত বটে, কিন্তু সব সময় নির্ভরযোগ্য না হইতেও পারে। যাহা হউক, ভারতবর্ষে গবর্ন্মেণ্ট্ হয়ত এইরূপ একটা সঙ্কেত অনুসারে কাজ করেন, যে, দেশী খবরের কাগজগুলা যাহাকে মন্দ বলে, সে নিশ্চয়ই খুব লায়েক লোক।

মিস্টার ষ্টেপল্টন যে মিস্টার ওটেনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, তাহাতে বেশ একটু যথাযোগ্যতা আছে। কথিত আছে, মিঃ ওটেনকে তাঁহার প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন কোন ছাত্র প্রহার করিয়াছিল। সেই কারণেই তিনি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হইয়াছিলেন বলিলে কাকতালীয় ন্যায়ের অনুসরণ করা হয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে, মিঃ ষ্টেপল্টনও প্রেসিডেন্সী কলেজের কোন কোন ছাত্রের হাতে মার খাইয়াছিলেন, তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ

আছে; এবং তিনিও ডিরেক্টর হইলেন। আকস্মিক মিল, দু বার কেন, দশ বার ঘটিতে পারে। কিন্তু বার বার এরূপ ঘটিলে গুরুহিতৈষী ছাত্রেরা মনে করিতে পারে, যে, তাহাদের গুরুর পদোন্নতিসাধনের একটা অব্যর্থ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এরূপ আবিষ্কারে বিশ্বাস ছাত্র ও গুরু কাহারও পক্ষে ভাল নয়। অন্য কারণে না হউক, অন্ততঃ এই কারণে মিঃ ষ্টেপল্টনের ডিরেক্টর পদে নিয়োগ সমর্থনযোগ্য নহে।

এই নিয়োগের জন্য অনেকে শিক্ষা-মন্ত্রীর কৈফিয়ৎ তলব করিতেছেন। ডিরেক্টরের মত বড় চাকর্যে নিয়োগে তাঁহার সত্য সত্যই হাত থাকিলে তিনি কেন এমন নিয়োগ করিলেন তাহা কৌতূহলের বিষয় বটে। কিন্তু যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলেও মনে রাখিতে হইবে, তাঁহার নিজের চাকরীর পূর্ণ কালের জন্য স্থায়িত্ব ব্যবস্থাপক সভার ইংরেজ সভ্যদের ও দেশী মনোনীত ও সরকারী সভ্যদের ভোটের উপর নির্ভর করে। সুতরাং তাঁহাকে এইসব লোকের অর্থাৎ কার্য্যতঃ গবর্ন্মেণ্টের মন জোগাইয়া চলিতে হয়

—

বিপক্ষের প্রতি অভদ্র ব্যবহার

পুরাকালে ভারতবর্ষে কি ছিল না ছিল, তাহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ব্যবহারের কোন কার্য্য-কারণ যোগ নাই। এখন যে আমরা রাজনৈতিক দলা-দলি করি, তাহা বিলাত হইতে আমদানী। ইংরেজ সরকার যে-রকম শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন দল থাকা অনিবার্য্য হইতে পারে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে, পাশ্চাত্য রাজনীতির যত কিছু জঞ্জাল ও মন্দ জিনিষ, তাহাও কি আমদানী করিতেই হইবে? বঙ্গের মন্ত্রীদের উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত না হওয়ায়, কোন কোন সভ্যকে টাউন হলের বাহিরে গালাগালি, অপমান ও প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছে। গালাগালিটা স্থলবিশেষে বংশ ও জাতি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং এরূপ গালাগালি দিয়াছেন সেই দলের লোক যাহারা অস্পৃশ্যতা ও "নিম্ন" শ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা দূরীকরণ প্রয়াসী মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক "বিবেক রক্ষক"। এই অভদ্র আচ-রণের বর্ণনা উল্লাস ও বিশেষ তৃপ্তির সহিত কোন কোন খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। ইহা আত্যন্তিক অধোগতির পরিচায়ক।

স্বরাজ্য দলের অন্যতম নেতা বাবু সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত না হওয়ার পরও এইরূপ অভদ্র আচরণ দৃষ্ট হইয়াছিল।

যাঁহাদিগকে গালাগালি দেওয়া বা প্রহার করা হয়, অপমান বস্তুতঃ তাঁহাদের হয় না; যাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহারা নিজেদের ও মানব-প্রকৃতির অপমান করেন।

অনেক খবরের কাগজে এইরূপ লেখা হইয়াছে, যে, কতকগুলি যুবক কোন কোন রাজনৈতিক নেতার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাদের বিরোধী দলের লোকদের অপমান করিয়াছেন। যুবকেরা এইরূপ কাজ করিতে সম্মত হইয়া থাকিলে নিজেদের মনুষ্যত্বের অপমান করিয়াছেন। কাপুরুষেরা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গুণ্ডা লাগায়। সত্য সত্যই কি অনেক ভদ্রসন্তান গুণ্ডার স্তরে নামিয়াছেন?

—

কলিকাতার নূতন মেয়র নির্ব্বাচন

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত উপর্য্যুপরি তিনবার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার আগে স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের কার্য্যকালে সহরে পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত জল সরবরাহের কোন উন্নতি হয় নাই, অন্ততঃ এই সমালোচনা আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে করিতে পারি। ইহার জন্য যতীন্দ্র-বাবু স্বয়ং কতটুকু দায়ী জানি না; ব্যক্তিগত ব্যবহারে তিনি মেয়রের পদের নিরপেক্ষতা, মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই প্রশংসা তাঁহার বিপক্ষেরাও করিয়াছেন।

স্বরাজ্যদলের আমলে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার, অবৈতনিক চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ, চিকিৎসা-বিদ্যা শিখান, খাঁটি দুধ জোগাইবার বন্দোবস্ত, এবং প্রসূতিদের সাহায্য ইত্যাদি বিষয়ে কাজ হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বসু যে-ভাবে নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাহার উপর তাঁহার নিন্দা-প্রশংসা নির্ভর করিবে। এখন তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না।

—

একজন খেতাবী মহারাজার মত

সম্প্রতি মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এক বক্তৃতায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, সমগ্র ভারতের জন্য যেমন সাধারণ ব্যবস্থাপক সভা আছে এবং ভিন্ন

কৌন্সিল অব্ ষ্টেট্ আছে, তেমনই প্রত্যেক প্রদেশেও ব্যবস্থাপক সভা ছাড়া "অভিজাত" বা "সম্ভ্রান্ত"দের আর একটা সভা থাকা চাই। মহারাজা ঠাকুরের মত লোকদের রাজনৈতিক চিন্তক বলিয়া কোন খ্যাতি নাই। সুতরাং অন্য কারণ না থাকিলে তাঁহার উক্তির উল্লেখ মাত্রও না করিলে চলিত। কিন্তু তাঁহাদের মুখ দিয়া যে-কথা বাহির হয় বা বাহির করা হয়, তাহা দেশের স্বাভাবিক নেতাদের মত, এই ওজুহাতে গবর্মেণ্ট দেশের পক্ষে অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর কোন কোন ব্যবস্থা করিবার সুযোগ পান। এইজন্য এবিষয়ে দু'একটা কথা বলা দরকার।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় যে-সব প্রস্তাব ধার্য্য হয়, কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের দ্বারা তাহা উল্টাইয়া দিবার সুবিধা গবর্মেণ্টের আছে। প্রত্যেক প্রদেশেও ঐরূপ দুটা প্রতিনিধিসভা থাকিলে গবর্মেণ্ট নির্ভয়ে 'প্রভিন্স্যাল অটনমি' বা প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব দিতে পারিবেন। নীচের সভায় যাহা হইবে, তাহা সরকারের মনঃপূত না হইলে উপরের সভার জো-হুকুম সভ্যদের দ্বারা তাহা নাকচ করাইয়া লইতে পারিবেন।

ইংরেজের লেখা বহিতে এবং ইংরেজদের কাগজে প্রাদেশিক প্রতিনিধি-সভার এইরূপ দুটা চেম্বার বা হৌসের প্রস্তাব ও তাহার সমর্থন দেখিয়াছি।

এই উপায়ে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব স্থাপিত হইলে তাহাতে দেশের লোকদের আত্মকর্তৃত্ব বাড়িবে না, প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের ক্ষমতা বাড়িবে। ইহাতে ইংরেজ শাসকদের আর-একটা সুবিধা হইবে। সমুদয় প্রদেশেরই কতকগুলা রাষ্ট্রীয় বিষয়ের ভার ভারত গবর্মেণ্টের হাতে থাকিলে, সেইগুলার সম্বন্ধে একযোগে ভারতব্যাপী আন্দোলন হয়, এবং তাহাতে জাতীয় একতা, সংহতি ও শক্তি বাড়ে। কিন্তু যে-পরিমাণে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট স্বস্ব-প্রধান হইবে, সেই পরিমাণে সমগ্র ভারতের অবধানযোগ্য বিষয়ের সংখ্যা কমিবে, এবং সমগ্র-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার জোরও কমিবে। তাহাতে জাতীয় একতা, সংহতি ও শক্তির হ্রাস হইবে। এই কারণে গত শতাব্দীতেই অনেক ইংরেজ প্রাদেশিক আত্মক-র্তৃত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার প্রমাণ মেজর বামনদাস বসু প্রণীত "কন্সলিডেশ্যন্ অব্ দি ক্রিশ্চিয়ান্ পাওয়ার ইন্ ইণ্ডিয়া" পুস্তকে আছে। প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। উহা ইংরেজরা আমাদিগকে দিতে চাহিলে, ঐ নামে কি জিনিব দিতে চায়, তাহা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। তাহারা কি প্রদেশের অধিবাসীদিগকে আত্মকর্তৃত্ব দিতে চায়, না প্রাদেশিক গবর্মেণ্টকে দিতে চায়? আমাদের অনুমান, যে বর ইংরেজরা দিবে, তাহার লেফাফার উপরে লেখা থাকিবে "প্রদেশের লোকদের আত্মকর্তৃত্ব", কিন্তু ভিতরে থাকিবে "প্রদেশের ইংরেজ প্রভুদের আত্মকর্তৃত্ব"। প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব যে-রকমেরই হউক, তাহার যে আশঙ্কার দিকের আভাস আমরা দিলাম, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

—

হিন্দুত্বের ব্যাপক অর্থ

আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখিলাম, জব্বলপুরে নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত নরসিংহ চিন্তামন কেলকর বলিয়াছেন :—

হিন্দু সভার নিকট শুদ্ধি অপেক্ষা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। শুদ্ধির একটা সীমা আছে, কিন্তু সংগঠনের সীমা নাই। ঐক্য ও শক্তি অর্জ্জনের জন্য সংহত হওয়ার নামই সংগঠন। এই সংগঠন-কার্য্য যদি সফল করিতে হয়, তবে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মিলন ঘটাইতে হইবে। সনাতনী, আর্য্য-সমাজী, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ভারতীয় ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া হিন্দু মহাসভা ভাল করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐসকল ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন কিছুই নহে। কোনটি বা বেদ, কোনটি বা পুরাণ, আবার কোনটি বা উপনিষদ্ হইতে উদ্ভূত। হিন্দুসমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ বিরোধের অবসান করিতে হইবে। অব্রাহ্মণদিগকে দেবমন্দিরে প্রবেশ এবং কূপাদি ব্যবহার করিতে দিতে হইবে। তাহাদিগকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিলে হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

হিন্দু মহাসভা "হিন্দু" কথাটির ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সংস্কার প্রয়াসী অন্যান্য সমাজের লোকেরা ও বৌদ্ধেরা কি মনে করেন, তাহা তাঁহাদেরই বলা ভাল; ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, অনেক ব্রাহ্ম আমার মত আপনাদিগকে হিন্দু-ব্রাহ্ম মনে করেন, অনেকে তাহা করেন না। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজের সংস্কারক শাখা মনে করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে সিটি কলেজের রামমোহন রায় ছাত্র-নিবাসে সরস্বতী পূজার প্রশ্ন লইয়া বঙ্গের সমুদয় হিন্দু-সমাজকে ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার নেতৃত্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা বা হিন্দুমিশন করিতেছেন না। ইহা হইতে অনুমান হয়, যে-সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে হিন্দু মহাসভা "হিন্দু" বলিয়া স্বীকার করিয়া বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, এখানকার হিন্দু সভা ও হিন্দু মিশন তাহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে চান। সম্ভবতঃ তাঁহারা জানেন, আধুনিক যুগে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়ই হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে কয়েকটি উপনিষদের ইংরেজী

অনুবাদ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ সভ্য জগতের গোচর করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা ইহাও জানেন, যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই প্রথমে উপনিষদ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বিলাতের টাইম্‌স্ কাগজে বাহির হয়। তাহাতে অনেক খৃষ্টীয় মিশনরী ও অন্য অনেক ইংরেজ খৃষ্টিয়ান্ একজন হিন্দুর এই 'আস্পর্দ্ধা'য় আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন।

সিটি কলেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাঁহারা নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহারা কেহ বা রাজনৈতিক কর্ম্মী, কেহ বা অন্য কলেজের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক কর্ম্মী। তাঁহাদের সকলের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকৃত রাজনৈতিক মত কি বলিতে পারি না। তাঁহারা হিন্দুমুসলমানের মিলন-প্রয়াসী বলিয়া পরিচিত হইলেও ব্রাহ্মদের প্রতি কেন বিদ্বেষপরায়ণ, তাহাও ঠিক জানি না। কিন্তু এপর্য্যন্ত যত প্রকারের রাজনৈতিক মত বঙ্গে দেখা দিয়াছে, তাহা কাহারও কাহারও মতে ভালই হউক বা মন্দই হউক, সকলগুলির সহিতই ব্রাহ্মসমাজের কোন-না-কোন লোকের যোগ দৃষ্ট হইবে। এইজন্য, যাঁহারা প্রধানতঃ রাজনৈতিক কর্ম্মী, তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রীতিমান্ হওয়াই উচিত। দু' একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আধুনিক সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ছিলেন রামমোহন রায়। প্রয়োজন হইলে তিনি যে ইংরেজের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতে দৃষ্ট হয়। গত শতাব্দীতে যে স্বদেশীমেলা হয়, তাহা আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ঠাকুর পরিবারের ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির সহায়তায় ও উৎসাহে হইয়াছিল। সাবেক কংগ্রেসে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, স্বদেশী আন্দোলনে, বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলনে বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম যোগ দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নাম উল্লেখই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। যাঁহারা বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত হইবার অহঙ্কার করেন, তাঁহাদের মনে থাকিতে পারে, যে, বাংলা দেশে প্রথমেই যাঁহারা এইরূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্র, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শচীন্দ্র-প্রসাদ বসু ছিলেন। বিনাবিচারে এইরূপ নির্ব্বাসনের প্রতিবাদ করিবার জন্য ফিডারেশুন হলের মাঠে প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য যখন কোন রাজনৈতিক বীরকে পাওয়া যায় নাই, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শিব-নাথ শাস্ত্রী সভাপতি হইয়া এরূপ কাজের দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যোগ থাকায় যাঁহারা অধ্যাপকতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও ললিতমোহন দাস ছিলেন। দু তিন বৎসর পূর্ব্বে বিনাবিচারে নির্ব্বাসিতদের মধ্যেও ব্রাহ্ম ছিলেন। কলিকাতায় একজন যুগলক্ষ্মী সম্প্রতি ছাত্র-দিগকে খুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতির দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং তিনি সিটি কলেজের ছাত্রদের অন্যতম পরিচালক সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহকর্ম্মিণী। তাহাতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, যে, তাঁহাদের মতে এই দৃষ্টান্তের মূল্য আছে। সেইজন্য ইহাও সুভাষ-বাবু প্রভৃতির স্মর্ত্তব্য, যে, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, উল্লাসকর দত্ত ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ব্রাহ্মসমাজের যুবক ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনেও অনেক ব্রাহ্ম যোগ দিয়াছিলেন। সুভাষবাবুর নিজের দল, কংগ্রেস বা স্বরাজ্য দলেও ব্রাহ্ম আছেন; যথা—ললিত-মোহন দাস, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ললিতমোহন সেন প্রভৃতি। খদ্দরপ্রচারের বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আছেন। প্রধানতঃ সংবাদপত্রের কাজ যাহারা করে, এমন লোকও ব্রাহ্মদের মধ্যে আছে।

১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে, অপোগণ্ড শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত বঙ্গে সমুদয় ব্রাহ্মের সংখ্যা ৩২৮৪ মাত্র। এরূপ ক্ষুদ্র মনুষ্যসমষ্টির প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করা ও তাহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা সুভাষ-বাবু প্রমুখ দূরদর্শী ও বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞদের বিবেচনায় "লাভজনক" মনে না হইবারই কথা। কিন্তু ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন মানবসমষ্টিই মনুষ্যবিশেষের কৃপায় টিকিয়া থাকে না বা পিষ্ট ও লুপ্ত হয় না। ভগবৎ-কৃপা এবং তাঁহার প্রদর্শিত সত্য, ন্যায় ও মৈত্রীর পথে নম্রতার সহিত দৃঢ় পদে চলাই তাঁহাদের অবলম্বনীয় এক-মাত্র উপায়।

—

সিটি কলেজের সংবাদ

সিটি কলেজ সম্বন্ধে এখনও অনেক অতিরঞ্জিত ও অপ্রকৃত সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইতেছে। সব ভ্রম নির্দ্দেশ করা মাসিক কাগজের পক্ষে দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলিলেও চলে। কিন্তু একটা মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করিতে হইতেছে। মুখে মুখে ও ছাপার অক্ষরে এইরূপ কথা প্রচারিত হইয়াছে, যে, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় লাঠি দিয়া কলেজের দ্বারবানদের পূজিত শিব-প্রতীক ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। অন্য একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে, যাহা হইতে এইরূপ ধারণা হইতে পারে, যে, বিস্তর ছাত্র সিটি কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে তাহা ঠিক নয়। বেশী ছাত্র উহা ত্যাগ করে নাই।

যাঁহারা সিটি কলেজের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা যাহাতে উদ্বিগ্ন না হন, সেইজন্য ইহা লিখিতেছি। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ৩০শে এপ্রিলের পর জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন মোট কত ছাত্র ছাড়িয়া গিয়াছে বলিতে পারিবেন। ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গেলেও যাহাতে কলেজ চলিতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষ বরাবরই তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন।

সিটি কলেজের হিতৈষী কেবল ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ নহেন; সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই আছেন। নতুবা পুরাতন ও নূতন কলেজগৃহ নির্ম্মিত হইতে পারিত না এবং এত ছাত্রও পাওয়া যাইত না। ১৯২১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে,

"......though the number of professed Brahmos is small and has increased but little in the last 20 years, thousands of the intellectual Hindus of Bengal have been so profoundly influenced by the monotheistic ideas which belong to the doctrines of the Brahmo Samaj as really to be Brahmos at heart, though they have not actually joined the Samaj."

ইঁহাদের সহযোগিতা ও উৎসাহ বরাবর পাওয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।

আমরা গত মাসে সিটি কলেজের সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমি চৈত্রের বিবিধ প্রসঙ্গ লেখা শেষ করিয়া ১২ই মার্চ্চ লাহোর যাত্রা করি। ১৩ই মার্চ্চে অমৃতবাজার পত্রিকায় সিটি কলেজ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা-কথার প্রতিবাদ বাহির হয়। বলা বাহুল্য, এই প্রতিবাদ বাহির হইবার পূর্ব্বেই আমার বিবিধ প্রসঙ্গ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। আমি ২৫শে মার্চ্চ লাহোর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ঐ প্রতিবাদ দেখিয়াছি। তজ্জন্য গত চৈত্র সংখ্যার ৮৮৩ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় স্তম্ভ ১৪ পংক্তি হইতে গিরিশবাবুর নাম বাদ দিতেছি। তাঁহার কলেজের কোন কোন অধ্যাপক সিটি-কলেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিয়া আসিতেছেন বলিয়া কাগজে দেখিতে পাই। ইহা সত্য হইলে গিরিশবাবু বিহিত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

এই উপলক্ষ্যে আরও একটি কথা বলার জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। যাঁহারা দেবী সরস্বতীর প্রতিমা পূজা করিতে চান, তাঁহারা তাহা অবশ্যই করিতে অধিকারী; কিন্তু বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজার অঙ্গ অঙ্গ বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যালাভের জন্য চেষ্টা যেন ছাড়িয়া না দেন ও কম আবশ্যক মনে না করেন।

—

বাল্যবিবাহ-নিবারক আইন

বাল্য-বিবাহের বাল্য-মাতৃত্ব ও অন্যান্য কুফল যদি সামাজিক আন্দোলন দ্বারা নিবারিত হইত, তাহা হইলে বাল্য বিবাহ নিবারক আইনের আমরা সমর্থন করিতাম না। কিন্তু তাহা না হওয়ায় আমরা, "হিন্দু শ্রেষ্ঠতা" নামক ইংরেজী গ্রন্থের লেখক আজমীরবাসী রাও সাহেব হরবিলাস সর্দ্দা কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বাল্য বিবাহ নিবারক আইনের সমর্থন করিতেছি। তিনি উহা কেবল হিন্দু-সমাজের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সিলেক্ট কমিটি উহা সকল ধর্ম্মের লোকদের প্রতি প্রযোজ্য করিয়াছেন, এবং বিবাহের ন্যূনতম বৈধ বয়স বাড়াইয়া পাত্রীর পক্ষে ১৪ ও পাত্রের পক্ষে ১৮ করিয়াছেন।

এই আইন সম্পর্কে বাংলা দেশের স্থায়ী দেশী অধিবাসী সকল সমাজের ও শ্রেণীর লোকদের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। যাঁহারা এরূপ আইনের বিরোধী, তাঁহার অবশ্য ইহার বিরোধিতা করিবার অধিকার ত্যাগ করিবেন না; এরূপ আইনের প্রতিবাদ তাঁহারা করিবেন। তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদিগেরও মত যদি সর্ব্বসাধারণের গোচর হয়, তাহা হইলে ভাল হয়। কারণ সাক্ষাৎভাবে নারীরাই বাল্য-বিবাহের কুফল ভোগ করেন, এবং সেইজন্য এ পর্য্যন্ত নানাধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নারীদের যে-সব সভাসমিতি এবিষয়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকল স্থলেই বাল্য-বিবাহনিবারক আইন চাহিয়াছেন। যাহা হউক, আইন পাস হইলে বিরোধীদিগকেও উহা মানিয়া চলিতে হইবে। সেইজন্য বিরোধী ও সমর্থক সকল লোককে একটি কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বাল্যবিবাহ-নিবারক আইন পাস হইলে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক অনেক কন্যাকে পল্লীগ্রামের পথে ঘাটে মাঠে দেখা যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে যে-সব দুর্বৃত্ত নারীদের উপর অত্যাচার করে, তাহারা হঠাৎ অন্তর্হিত হইবে না; তাহারা ইহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে। এইজন্য ইহাদের রক্ষার সকল রকম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রাচীনপন্থী লোকদের মধ্যেও ১৪ ও তদধিক বয়সের অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকে এবং বাহিরে চলা-ফিরা করে। এরূপ কোন কোন প্রদেশ হিন্দুপ্রধান, কোনটি বা মুসলমানপ্রধান। বঙ্গের বাহিরে কিন্তু সর্ব্বত্রই অপেক্ষাকৃত নারী সুরক্ষিতা। অবশ্য, বাংলা দেশ ছাড়া কোথাও নারী-নির্য্যাতন হয় না বলিতেছি না; কম হয় বলিতেছি। অন্যত্র যাহা সম্ভব, বঙ্গেও তাহা সম্ভব। নারীদিগকে বাল্যে বিবাহ দিয়া অবরুদ্ধ অবস্থায়

"পর্দ্দা গ্যাসের"* দ্বারা অন্যায় করা নারীরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। তাহাদিগকে কোন প্রকারে পঙ্গু না করিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করিবার মত ধর্ম্মবুদ্ধি, বৈষয়িক বুদ্ধি ও সাহস আমাদের থাকা চাই। বঙ্গের যুবক-শক্তিকে নানা নেতা নানাদিকে আহ্বান করিতেছেন। আমরা নেতা নহি; সেইজন্য আমাদের আহ্বান করিবার অধিকার নাই। কিন্তু সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। যুবা প্রৌঢ় সকলেরই পৌরুষ জাগিয়া উঠুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিরক্ষর ও লিখনপঠনক্ষম সব লোকের মধ্যে এই শিক্ষা প্রচারিত হউক, যে, নারীর সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা বীরত্বের ও ধর্ম্মের একটি প্রধান উপাদান।

বালিকা ও অন্য সব নারীকে যথাসাধ্য আত্মরক্ষায় চেষ্টিত, সাহসী ও সমর্থ করিতে হইবে। অবরোধমুক্ত না হইলে নারীদের আত্মরক্ষায় সামর্থ্য জন্মিবে না। ইহার জন্য মনের বল ও দৃঢ়তা এবং দেহের বল ও দৃঢ়তা চাই। উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা বালিকা-নারীদিগকে এই দ্বিবিধ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ করিতে হইবে। যেখানে যেখানে বালিকাবিদ্যালয় আছে, তথাকার শিক্ষাপ্রণালীতে যাহা যোগ বা সংস্কার করিতে হইবে, কর্তৃপক্ষ তাহা করুন। যেখানে নাই, সেখানে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার জন্য বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হউক।

—

"আনন্দমোহন-ভবন"

কলিকাতার ব্রাহ্মবালিকাশিক্ষালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী হিন্দুসমাজের। যাহাদের পিতামাতা মফঃস্বলে থাকেন, তাহাদের জন্য ছাত্রীনিবাস আছে। ইহাতে যথেষ্ট স্থান ও অন্যান্য সুবিধা ছিল না। এইজন্য সম্প্রতি "আনন্দমোহন-ভবন" নাম দিয়া একটি নূতন ছাত্রীনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সেদিন গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে ৯০টি ছাত্রীর স্থান হইবে। কিন্তু শ্রীযুক্তা অবলা বসু মহাশয়া বলিতেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই ১০০টি বালিকার আবেদন পাইয়াছেন। নূতন ছাত্রীনিবাসটিতে রন্ধন, স্নান, চিকিৎসা প্রভৃতির বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট। শিক্ষালয়ের মন্ত্র সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে—"শ্রদ্ধয়া তপসা সেবয়া।" এখানকার ছাত্রীরা লাঠিখেলা, তালানুগত ব্যায়াম প্রভৃতি শিখিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রক্ষা করিতে পারে।

—

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সভা

বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার অধিবেশনে, আজকাল খবরের কাগজে যে-সব বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, প্রধানতঃ তাহার আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা দোষের বিষয় নহে। কিন্তু বঙ্গের বিশেষ বিশেষ দুঃখ কি, বাংলা দেশ কেন গবর্ন্মেণ্ট দ্বারা এবং "নিখিলভারতীয়" নেতাদের দ্বারা এক-ঘরে ও কোণঠাসা হইতেছে, প্রধানতঃ তাহার আলোচনাই বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সভায় হওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদলের লোকেরা কৌন্সিলে গিয়া গবর্ন্মেণ্টের কাজ-অকাজের বিধিব্যবস্থার আলোচনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা রাষ্ট্রীয় সভাতেও বঙ্গের প্রতি সরকারপক্ষের অন্যায়াচরণের আলোচনা ও প্রতিবাদ করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইত না। বঙ্গের লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের প্রায় আড়াই গুণ, অথচ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের ও বোম্বাইয়ের দেশী প্রতিনিধির সংখ্যা সমান সমান! বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট ১৯ নিযুত লোকের জন্য প্রায় ষোল কোটি টাকা খরচ করিতে পান, বঙ্গের প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট বাংলার ৪৭ নিযুত লোকের জন্য রাজস্ব খরচ করিতে পান ১১ কোটিরও কম! অথচ বঙ্গে বোম্বাই অপেক্ষা রাজস্ব আদায় কম হয় না। বাংলা গবর্ন্মেণ্টের হাতে টাকা না থাকিলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য—কোন দিকেই উন্নতি হইতে পারে না। শুধু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টেরই আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি আছে, এমন নয়। মিসেস বেশাণ্ট ও অন্যান্য দেশনায়করা যে-সব স্বরাজ্য-বিল প্রস্তুত করিতেছেন, তাহাতেও বাংলাদেশকে অধিবাসীর সংখ্যা, লিখনপঠন-ক্ষমের সংখ্যা বা আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ অনুসারে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি দেওয়া হয় নাই। ভারত গবর্ন্মেণ্ট যে বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে নিতান্ত কম টাকা দেন, পাটের ট্যাক্সটা পর্য্যন্ত দেন না, ইহাও আমরা বার বার লিখিয়াছি। কিন্তু বঙ্গের প্রতি এইরূপ নানা অবিচারের বিরুদ্ধে বঙ্গের বাহিরের কোন সংবাদপত্র বা নেতা একটি কথাও বলিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। শুধু যে ভারত-গবর্ন্মেণ্টের নিযুক্ত কমিটিতেই অনেক সময় বাংলা দেশের কোন প্রতিনিধি থাকে না, তাহা নহে, "নিখিল-ভারত" নেতাদের নিযুক্ত কমিটিতেও থাকে না। স্বরাজ্য-আইনের খসড়া তৈরী করিবার জন্য ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে সকল-দলের কনফারেন্সের যে কমিটি বসিয়াছিল, তাহাতে বঙ্গের একজনও প্রতিনিধি ছিল না; কিন্তু দিল্লীর ছিল ২ জন, মান্দ্রাজের ৪, আগ্রা-অযোধ্যার ৫, বোম্বাইয়ের ৫, পঞ্জাবের ৩, রাজপুতানার ১, ইত্যাদি। ভারতবর্ষের সকল

* এই কথাটি "মোতীচুর"-রচয়িত্রী মিসেস্ সখাওৎ হোসেন ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রদেশের মধ্যে যেমন বঙ্গের লোকসংখ্যা বেশী, তেমনি মুসলমানদের সংখ্যাও বঙ্গে সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু কমিটির পাঁচজন মুসলমান সভ্যের মধ্যে এক জনও বাঙালী নহেন। বঙ্গের স্বরাজ্য দলের লোকেরা মনে করেন, তাঁহারা বড় প্রভাবশালী, কিন্তু বঙ্গের বাহিরের তাঁহাদের দলের নেতারাও তাঁহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। বঙ্গের মডারেটদিগকেও অন্যান্য, প্রদেশের মডারেটরা পুছে না। বঙ্গের বাণিজ্যে পণ্যশিল্পে অবাঙ্গালীর প্রাধান্য, বিদ্যামন্দিরে অবাঙ্গালীর প্রাধান্য, স্বাস্থ্যরক্ষাও কৃষির যথেষ্ট ব্যবস্থা নাই, জলকষ্ট অন্নকষ্টে দেশ ম্রিয়মাণ। কিন্তু তথাপি বঙ্গের স্বরাজ্যদল বাহিরের নেতাদের তাচ্ছিল্য নীরবে সহ্য করিতেছেন। তাঁহারা গবর্ন্মেণ্টকে ভোটে হারাইয়া এতদিন কোন প্রকারে মুখরক্ষা করিতেছিলেন ; এখন সে উপায়ও নাই।

—

বাঁকুড়ায় অন্নকষ্ট

অন্য কোন কোন জেলার মত এবার আবার বাঁকুড়াতেও অন্নকষ্ট হইয়াছে। আগের বারে বে-সরকারী সাহায্যকারী নানাসমিতি নানা কাগজে আবেদন ছাপাইয়া এবং বাঁকুড়া সম্মিলনী প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউতে দুর্ভিক্ষশীর্ণ লোকদের ছবি ছাপাইয়া অনেক টাকা তুলিয়া লোকদের সাহায্য করিয়াছিলেন। এবার জেলানায়কেরা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগ দিয়া এক কমিটি করিয়াছেন। উভয় পক্ষ যদি আলাদা আলাদা চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হয় ত ফল ভাল হইত। কমিটির আবেদন প্রধান প্রধান সব কাগজে বহুপূর্ব্বেই ছাপা হওয়া উচিত ছিল ; সম্প্রতি দু একটি-কাগজে ছাপা হইতেছে। খাতড়ায় বাঁকুড়া জেলার সম্প্রতি এক কন্‌ফারেন্স্ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে বাঁকুড়ার নিরন্ন লোকদের কোন সুবিধা হইতেছে কিনা, জানি না। দয়ালু লোকেরা বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়কে টাকাকড়ি পাঠাইলে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে। হাজার হাজার লোক উপবাসে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

—

রাজবন্দী

রাজবন্দীদের দুঃখের কথা কাগজে পড়িয়া দুঃখ ও লজ্জা পাই ; রাগও হয় না যে, এমন নয়। কিন্তু তাঁহাদের উপর নির্ম্মম নিষ্ঠুর অন্যায় আচরণের কোন প্রতিকার করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া কিছু লিখিতে ইচ্ছা করে না। জগৎকে ও গবর্ন্মেণ্টকে জানাইবার কাজ দৈনিক কাগজগুলির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে।

—

রামনবমী

গত ১৭ই চৈত্র রামনবমী হইয়া গিয়াছে। ইহা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা সর্ব্বজাতি-সম্মিলনের দিন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। রামচন্দ্র ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন কিনা, তাহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ক্রিস্‌মাস্ ডেতে যিশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহা নিশ্চিত হইলেও, ঐদিনের উৎসব চলিয়া আসিতেছে। সেইরূপ রামচন্দ্র যে "অনার্য্যজাতীয়" গুহকচণ্ডালকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, "অনার্য্যজাতীয়" সুগ্রীব জাম্বুবান্ হনুমান প্রভৃতির সহিত মৈত্রীস্থাপন পূর্ব্বক সপ্রেম ও সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা অন্ততঃ রামনবমীর দিনে স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসী সকল লোকের সহিত সদ্ভাব রক্ষার সংকল্প করিলে আমাদের সকলেরই কল্যাণ হইবে।

—

বামুনগাছীতে গুলি

রেলওয়ে ধর্ম্মঘটকারীদের প্রতি বামুনগাছীতে গুলি নিক্ষেপের যথেষ্ট কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। এদেশে মানুষের জীবনের মূল্য কম এবং সরকারী লোকেরা জনতার উপর গুলি চালাইলে জবাবদিহি প্রায় হন না, ইহা ইংলণ্ড অপেক্ষা এদেশে অধিকতর গুলি-নিক্ষেপ-প্রবণতার একটা কারণ বটে।

—

নিখিল-ভারত স্ত্রীশিক্ষা সম্মেলন

দিল্লীর নিখিল-ভারত স্ত্রীশিক্ষাসম্মেলনের কার্য্যবিবরণী ও প্রস্তাবসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে ভারতীয় নারীর উন্নতি-কামীগণ প্রীত হইবেন। যেরূপ দক্ষতা ও শৃঙ্খলার সহিত সম্মেলনের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাঠ করা যায়, তাহাতে মনে আশার সঞ্চার হয়। আমরা ভরসা করি সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ ও প্রতিনিধিবর্গ গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বিপুল উৎসাহের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন এবং তাঁহারা আমলাতন্ত্র ও দেশের নেতাদের নিকট যে আবেদন-নিবেদন পেশ করিয়াছেন, তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন।

সম্মেলন সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও আনন্দদায়ক ঘটনা এই, যে, সভাক্ষেত্রে ভারতীয় দেশীয় রাজন্যবর্গের আত্মীয়াগণ ও উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীদের পত্নীরা "চরমপন্থী" রাজনৈতিক মহিলাদের সহিত এক-যোগে জাতি-ধর্ম্ম সামাজিক-পদমর্য্যাদা-নির্ব্বিশেষে ভারতীয় নারীদের হিতসাধন-চেষ্টায় সমবেত হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, এইসকল অনুষ্ঠান যত শীঘ্র ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের পত্নীদের "প্রভাব"—তাহার মূল্য যাহাই হউক না কেন—হইতে মুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ন্যায় একজন সুপরিচিতা অসহযোগপন্থী ও স্বরাজ্যদলনেত্রী কিরূপে বড়লাট-পত্নী কর্ত্তৃক উদ্বোধিত সভায় যোগদান করিলেন, ইহা সম্ভবত অনেকের চক্ষে অসমঞ্জস ঠেকিবে। খাঁটি সামাজিক ব্যাপারে অসহযোগীগণ হয়ত আমলাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বড় বড় কর্ম্মচারীদের পত্নীদের সহিত যোগ দিতে পারেন। কিন্তু এদেশে শিক্ষা-সম্মেলনকে খাঁটি সামাজিক বা অ-রাজনৈতিক অনুষ্ঠান বলা যায় না; কারণ যদি ভারতের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয়-শিক্ষা পদবাচ্য হইত এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কশূন্য হইত, তাহা হইলে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় ও অসহযোগ যুগে বাংলাদেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পৃথক্ জাতীয় শিক্ষায়তন স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইত না। এই প্রসঙ্গে আর-একটি সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহাও অসম্ভব নহে, যে, অনেক স্থলে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারীরা চরমপন্থী ভারতীয় নেতাগণকে নিজেদের প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতিতে "সহযোগিতা" করাইতে অসমর্থ হইলে তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণ সামাজিক মেলামেশার সুযোগে যাহাতে সেইসকল নেতৃপত্নী বা অন্যান্য বিখ্যাত মহিলা নেত্রীকে দলে টানিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তৎপর হন। "কান টানিলে মাথা আসে" এরূপ একটি প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে ঐ প্রবাদ প্রযুজ্য কিনা ভাবিবার বিষয়।

কার্য্যবিবরণীর এক স্থলে দেখিলাম—

In proposing a vote of thanks to Lady Irwin, Mrs. Naidu gratefully acknowledged the illuminating words of Her Excellency which, she said, should be the keynote of their aims and ideals. Amidst loud applause, Mrs. Naidu declared that the East and the West had met to-day in the kinship of women—that indivisible sisterhood. India was the home of Lakshmi, Saraswati and Parvati (cheers) and did not consist of Hindu ideals only but ideals of all nationalities who had come into contact with this land.

"তাৎপর্য্য। লেডী আরউইন্‌কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া শ্রীমতী নাইডু তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলীর সারবত্তা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন এবং বলেন যে, লেডী আরউইনের উপদেশ তাঁহাদের (ভারতীয় নারীদের) আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার চরম লক্ষ্য স্বরূপ গণ্য হইবে। বিপুল করতাল-ধ্বনির দ্বারা সমর্থিত হইয়া তিনি বলেন, যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারী আজ ভারতীয় অখণ্ড নারী-সমাজের আত্মীয়তা বন্ধনে মিলিত হইল। লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং পার্ব্বতীর অধিষ্ঠান ভারতবর্ষেই (করতাল-ধ্বনি) এবং এই মহাদেশ কেবল মাত্র হিন্দু আদর্শেই অনুপ্রাণিত নয়—যে কোন জাতি ইহার সংস্পর্শে আসিয়াছে ভারতের উচ্চ আদর্শে তাহার ছাপ রহিয়া গিয়াছে। বক্তা জোরের সহিত বলেন, যে, ভারতবর্ষ সঙ্কীর্ণ আদর্শে অনুপ্রাণিত, এ ধারণা অলীক।"

লেডী আরউইন সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে রাজী হইয়া সৌজন্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নিজে গায়ে পড়িয়া সভায় যোগদান করেন নাই। কাজেই সে-সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু আমরা তাঁহার অভিভাষণের কোন কোন অংশের সহিত একমত হইতে পারি নাই। সম্মেলনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নারী কিরূপে আত্মীয়তা-সূত্রে মিলিত হইল, তাহাও খুঁজিয়া পাই না। যদি ভারতপ্রবাসী বেসরকারী ইংরেজদের আত্মীয়ারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিতেন এবং এমন একজন ইংরেজ মহিলার দ্বারা ইহার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইত যিনি জ্ঞানে, শিক্ষানুরাগে ও মানবহিতৈষণায় ভারতে সুপরিচিতা,—বিশেষ করিয়া স্বামীর উচ্চপদের দোহাই দিয়া নহে—তাহা হইলে আমরা ঐরূপ উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

লেডী আরউইন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন :—

The obstacles in the way of women's education in this country are enormous—difficulties of language, poverty, ignorance, apathy, hostile public opinion, social customs and even politics. But women, the world over, are famed for their patience, their dogged courage in the face of daily adversities. If we keep a stout heart and are determined to go forward steadily, I am convinced

that we shall, in due time, overcome all our present troubles, and win through them to our goal. In one respect India is favoured. Other countries have been pioneers, and have made mistakes by which India, if she is wise, may profit. They have been slow to recognise the necessity for differentiating between education of boys and girls. It is, of course, true that they both have to live in the same world and that they both have to share it between them; but their functions in it are largely different. In many countries to-day, we see girls' education developing on lines which are a slavish imitation of boys' education. It is surely inappropriate that a curriculum for girls should be decided by the necessity of studying for a certain examination so that it must perforce exclude many if not most of the subjects we would most wish girls to learn. We must, therefore, as I see it, do all in our power to set a different standard, and to create a desire in the public which will allow girls or at any rate a greater number of girls to develop on other lines. What I feel we should aim to give them is a practical knowledge of domestic subjects and the laws of health, which will enable them to fulfil one side of their duties as wives and mothers, reinforced by a study of those subjects which will help most to widen their interests and outlook.

তাৎপর্য্য—এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পথে ভাষাগত অসুবিধা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, উদাসীনতা, বিরুদ্ধবাদী জনমত, সামাজিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক কারণ-সম্ভূত নানা প্রকারের অন্তরায় রহিয়াছে। কিন্তু জগতের সর্ব্বত্রই নারীরা সহিষ্ণু বলিয়া খ্যাত এবং দৈনন্দিন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইবার অপরিসীম সাহসের জন্য প্রশংসিত। যদি আমাদের মনের বল থাকে এবং যদি আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হই, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, উপযুক্ত সময় আসিলে আমরা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাফল্যলাভ করিব। অন্যান্য দেশ এ-বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে। তাহাদের ত্রুটী-বিচ্যুতি হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয় নারীগণ সাবধান হইতে পারেন। ঐ দেশসমূহ, বিলম্বে হইলেও, বালক ও বালিকাদের শিক্ষা-প্রণালী স্বতন্ত্র হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা অবশ্য সত্য যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই একই সমাজে বাস করে, কিন্তু সমাজে তাহাদের উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন। অনেক দেশেই আমরা দেখিতে পাই, যে, বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বালকদের অনুকরণে গঠিত হইতেছে। বালিকাদের যে-সকল বিষয়ে শিক্ষা বিধান করা অবশ্যকর্ত্তব্য সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বালকদের মত পরীক্ষার মাপ-কাঠিতে শিক্ষাপ্রণালী গঠন করা অত্যন্ত অসঙ্গত।......সুতরাং আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এই যে, আমাদিগকে বালিকাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে যাহা দেখিয়া জনসাধারণ সেই প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয় এবং ফলে বালিকারা—অন্ততঃ অধিকসংখ্যক বালিকা—পাস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের নিজেদের গুণপনার পরিচয় দিতে পারে। আমাদের মতে তাহাদের জন্য এরূপ শিক্ষাপ্রণালী গঠন করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের হাতে-কলমে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও শরীর-পালন সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় ও তাহারা ভালভাবে পত্নীত্বের ও মাতৃত্বের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ পুঁথিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে তাহাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ে ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়।

ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের পথে যে-সকল বাধা-বিঘ্নের কথা বক্তা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি প্রকৃত এবং অন্যগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত অথবা অত্যুক্তিদোষ-দুষ্ট। প্রথমেই বক্তা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্বের দরুন স্ত্রী-শিক্ষা আশানুরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। সত্যই ভারতে নানা ভাষা-ভাষী লোকের বাস; কিন্তু আদমসুমারী রিপোর্টে ঐ সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করা হইয়াছে এবং ভারতীয় ভাষাগত হিসাব নিকাশ তালিকাতেও (Linguistic Survey) প্রত্যেকটি উপভাষাকে এক একটি পৃথক্ ভাষা বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে ভারতবর্ষের ভাষা নির্ণয় সম্পর্কে অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি—যেগুলিকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—এবং কত লোক সেইসকল ভাষাতে কথা বলে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

হিন্দী	৯৮,১১৫,০০০
বাংলা	৪৯,২৯৪,০০০
তেলুগু	২৩,৬০১,০০০
পঞ্জাবী	২১,৮৮৬,০০০
মরাঠী	১৮,৭৯৮,০০০
তামিল	১৮,৭৮০,০০০
রাজস্থানী	১২,৬৮১,০০০
কন্নাড	১০,৩৭৪,০০০
ওড়িয়া	১০,১৪৩,০০০
গুজরাতী	৯,৫৫২,০০০
ব্রহ্মী	৮,৪২৩,০০০
মালয়ালাম	৭,৪৯৮,০০০
সিন্ধী	৩,৩৭২,০০০
আসামী	১,৭২৭,০০০
পস্তু	১,৪৯৬,০০০
কাশ্মীরী	১,২৬৯,০০০
	মোট—২৯,৭০,০৯,০০০

এই তালিকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারত-সাম্রাজ্যের ৩১,৫১,৫৬,৩৯৬ অধিবাসীর মধ্যে ২৯,৭০,০৯,০০০ (অর্থাৎ অধিকসংখ্যক লোকই) মাত্র ১৬টি ভাষায় কথা বলে ও সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং উহার প্রত্যেকটি ভাষাতেই দশ লক্ষাধিক লোক কথাবার্ত্তাদি করে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার, যে, ভারতের বিভিন্নভাষাভাষী লোক সাধারণত এক-একটি নির্দ্দিষ্ট প্রদেশেই বসবাস করে। কাজেই তাহাদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করা সুকঠিন নহে। পৃথিবীর সম্পূর্ণ স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন দেশ-সমূহের অনেক স্থলে ভারতের এক একটি প্রদেশের তুলনায় লোকসংখ্যা কম। অথচ সে-সকল দেশে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক-সংখ্যক সরকারী বালিকা বিদ্যালয় বর্ত্তমান এবং সে-সকল দেশে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অনেক বেশী। এইরূপ কতগুলি দেশের নাম ও তাহাদের অধিবাসীর সংখ্যা দিতেছি :—

দেশ	লোকসংখ্যা
আফ গানিস্তান	৬,৩৮০,০০০
প্যালেষ্টাইন	১,০০০,০০০
পারস্য	১০,০০০,০০০
শ্যাম	৯,৫১৩,০০০
এশিয়াটিক তুরস্ক	১২,০০০,০০০
ঈজিপ্ট	১৪,০০০,০০০
কানাডা	৯,০০০,০০০
মেক্সিকো	১৬,০০০,০০০
কোষ্টারিকা	৫৩২,০০০
গোয়াটিমালা	১,৬০০,০০০
হন্দুরাস	৬৭৪,০০০
নিকারাগুয়া	৬৪০,০০০
পানামা	৪৪২,০০০
সালভাডর	১,৬৩৪,০০০
কিউবা	৩,৫০০,০০০
ডোমিনিকান্ রিপাবলিক্	৯০০,০০০
হাইতি	২,৩০০,০০০
আরজেন্টিনা	১০,০০০,০০০
বলিভিয়া	২,৮০০,০০০
চিলি	৪,০০০,০০০

দেশ	লোক-সংখ্যা
কলম্বিয়া	৬,০ ,০০০
ইকোয়েডার	২,৬ ,০০০
প্যারাগুয়ে	৭০০,০০০
পেরু	৫,৫০০,০০০
উরুগুয়ে	১,৭২০,০০০
ভেনজুয়েলা	৩.০২৭,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৬,০০০,০০০
নিউজিল্যাণ্ড	১,৪৬১,০০০
আল্‌বানিয়া	১,০০০,০০০
অষ্ট্রীয়া	৬,৬০০,০০০
বেল্‌জিয়াম	৭,৬০০,০০০
বুল্‌গেরিয়া	৫,৫০০,০০০
চেকোস্লোভাকিয়া	১৪,৩০০,০০০
ডেন্‌মার্ক	৩,৪৩৫,০০০
ইস্‌থোনিয়া	১,১১৬,০০০
ফিন্‌ল্যান্ড	৩,৫০০,০০০
গ্রীস্	৭,০০০,০০০
হাঙ্গেরি	৮,০০০,০০০
লাটভিয়া	২,০০০,০০০
লিথুয়ানিয়া	২,০০০ ০০০,
নরওয়ে	২,৭৮৯,০০০
সুইডেন	৬,০৭৪,০০০
সুইজারল্যাণ্ড	৪,০০০,০০০
ইয়োরোপীয় তুরস্ক	২,০০০,০০০

যদি এইসকল দেশে বালিকা ও বয়স্কা নারীদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতে পারে, তবে ভারত সরকারের পক্ষে ঐরূপ ব্যবস্থা করা—বিশেষ করিয়া যে-সকল প্রদেশে ১৬টি সমৃদ্ধ ভাষার যে-কোন একটির বহুল প্রচলন আছে—কোন মতেই কঠিন নহে।

দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা প্রযুক্ত ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে না বলিয়া যে-অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সে-অপরাধে আমাদের দেশবাসীদিগকে যতটুকু অপরাধী করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যে অন্ততঃ ততটুকু দোষী, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী লোকের সংখ্যা যদিও আমাদের দেশে এখনও বিরল নহে—কিন্তু তাহাদের সংখ্যা

that we shall, in due time, overcome all our present troubles, and win through them to our goal. In one respect India is favoured. Other countries have been pioneers, and have made mistakes by which India, if she is wise, may profit. They have been slow to recognise the necessity for differentiating between education of boys and girls. It is, of course, true that they both have to live in the same world and that they both have to share it between them; but their functions in it are largely different. In many countries to-day, we see girls' education developing on lines which are a slavish imitation of boys' education. It is surely inappropriate that a curriculum for girls should be decided by the necessity of studying for a certain examination so that it must perforce exclude many if not most of the subjects we would most wish girls to learn. We must, therefore, as I see it, do all in our power to set a different standard, and to create a desire in the public which will allow girls or at any rate a greater number of girls to develop on other lines. What I feel we should aim to give them is a practical knowledge of domestic subjects and the laws of health, which will enable them to fulfil one side of their duties as wives and mothers, reinforced by a study of those subjects which will help most to widen their interests and outlook.

তাৎপর্য্য—এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পথে ভাষাগত অসুবিধা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, উদাসীনতা, বিরুদ্ধবাদী জনমত, সামাজিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক কারণ-সম্ভূত নানা প্রকারের অন্তরায় রহিয়াছে। কিন্তু জগতের সর্ব্বত্রই নারীরা সহিষ্ণু বলিয়া খ্যাত এবং দৈনন্দিন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইবার অপরিসীম সাহসের জন্য প্রশংসিত। যদি আমাদের মনের বল থাকে এবং যদি আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হই, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, উপযুক্ত সময় আসিলে আমরা সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাফল্যলাভ করিব। অন্যান্য দেশ এ-বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছে। তাহাদের ক্রটী-বিচ্যুতি হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয় নারীগণ সাবধান হইতে পারেন। ঐ দেশসমূহ, বিলম্বে হইলেও, বালক ও বালিকাদের শিক্ষা-প্রণালী স্বতন্ত্র হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা অবশ্য সত্য যে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই একই সমাজে বাস করে, কিন্তু সমাজে তাহাদের উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন। অনেক দেশেই আমরা দেখিতে পাই, যে, বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বালকদের অনুকরণে গঠিত হইতেছে। বালিকাদের যে-সকল বিষয়ে শিক্ষা বিধান করা অবশ্যকর্ত্তব্য সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বালকদের মত পরীক্ষার মাপ-কাঠিতে শিক্ষাপ্রণালী গঠন করা অত্যন্ত অসঙ্গত।......সুতরাং আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এই যে, আমাদিগকে বালিকাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন ভাবে গঠিত করিতে হইবে যাহা দেখিয়া জনসাধারণ সেই প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয় এবং ফলে বালিকারা—অন্ততঃ অধিকসংখ্যক বালিকা—পাস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের নিজেদের গুণপনার পরিচয় দিতে পারে। আমাদের মতে তাহাদের জন্য এরূপ শিক্ষাপ্রণালী গঠন করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের হাতে-কলমে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও শরীর-পালন সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় ও তাহারা ভালভাবে পত্নীত্বের ও মাতৃত্বের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ পুঁথিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে তাহাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ে ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়।

ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের পথে যে-সকল বাধা-বিঘ্নের কথা বক্তা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি প্রকৃত এবং অন্যগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত অথবা অত্যুক্তিদোষ-দুষ্ট। প্রথমেই বক্তা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্বের দরুন স্ত্রী-শিক্ষা আশানুরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। সত্যই ভারতে নানা ভাষা-ভাষী লোকের বাস; কিন্তু আদমসুমারী রিপোর্টে ঐ সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করা হইয়াছে এবং ভারতীয় ভাষাগত হিসাব নিকাশ তালিকাতেও (Linguistic Survey) প্রত্যেকটি উপভাষাকে এক একটি পৃথক্ ভাষা বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে ভারতবর্ষের ভাষা নির্ণয় সম্পর্কে অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি—যেগুলিকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—এবং কত লোক সেইসকল ভাষাতে কথা বলে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

হিন্দী	৯৮,১১৫,০০০
বাংলা	৪৯,২৯৪,০০০
তেলুগু	২৩,৬০১,০০০
পঞ্জাবী	২১,৮৮৬,০০০
মরাঠী	১৮,৭৯৮,০০০
তামিল	১৮,৭৮০,০০০
রাজস্থানী	১২,৬৮১,০০০
কন্নাড	১০,৩৭৪,০০০
ওড়িয়া	১০,১৪৩,০০০
গুজরাতী	৯,৫৫২,০০০
ব্রহ্মী	৮,৪২৩,০০০
মালয়ালাম	৭,৪৯৮,০০০
সিন্ধী	৩,৩৭২,০০০
আসামী	১,৭২৭,০০০
পস্তু	১,৪৯৬,০০০
কাশ্মীরী	১,২৬৯,০০০
	মোট—২৯,৭০,০৯,০০০

এই তালিকা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারত-সাম্রাজ্যের ৩১,৫১,৫৬,৩৯৬ অধিবাসীর মধ্যে ২৯,৭০,০৯,০০০ (অর্থাৎ অধিকসংখ্যক লোকই) মাত্র ১৬টি ভাষায় কথা বলে ও সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং উহার প্রত্যেকটি ভাষাতেই দশ লক্ষাধিক লোক কথাবার্ত্তাদি করে। এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলা দরকার যে, ভারতের বিভিন্নভাষাভাষী লোক সাধারণত এক-একটি নির্দ্দিষ্ট প্রদেশেই বসবাস করে। কাজেই তাহাদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করা সুকঠিন নহে। পৃথিবীর সম্পূর্ণ স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন দেশ-সমূহের অনেক স্থলে ভারতের এক-একটি প্রদেশের তুলনায় লোকসংখ্যা কম। অথচ সে-সকল দেশে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক-সংখ্যক সরকারী বালিকা বিদ্যালয় বর্ত্তমান এবং সে-সকল দেশে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অনেক বেশী। এইরূপ কতগুলি দেশের নাম ও তাহাদের অধিবাসীর সংখ্যা দিতেছি :—

দেশ	লোকসংখ্যা
আফগানিস্তান	৬,৩৮০,০০০
প্যালেষ্টাইন	১,০০০,০০০
পারস্য	১০,০০০,০০০
শ্যাম	৯,৫১৩,০০০
এশিয়াটিক তুরস্ক	১২,০০০,০০০
ঈজিপ্ট	১৪,০০০,০০০
কানাডা	৯,০০০,০০০
মেক্সিকো	১৬,০০০,০০০
কোষ্টারিকা	৫৩২,০০০
গোয়াটিমালা	১,৬০০,০০০
হন্দুরাস	৬৭৪,০০০
নিকারাগুয়া	৬৪০,০০০
পানামা	৪৪২,০০০
সালভাডর	১,৬৩৪,০০০
কিউবা	৩,৫০০,০০০
ডোমিনিকান্ রিপাবলিক্	৯০০,০০০
হাইতি	২,৩০০,০০০
আরজেন্‌টিনা	১০,০০০,০০০
বলিভিয়া	২,৮০০,০০০
চিলি	৪,০০০,০০০
কলম্বিয়া	৬,০০০,০০০
ইকোয়েডার	২,৬০০,০০০
প্যারাগুয়ে	৭০০,০০০
পেরু	৫,৫০০,০০০
উরুগুয়ে	১,৭২০,০০০
ভেনেজুয়েলা	৩,০২৭,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৬,০০০,০০০
নিউজিল্যাণ্ড	১,৪৬১,০০০
আল্‌বানিয়া	১,০০০,০০০
অষ্ট্রীয়া	৬,৬০০,০০০
বেল্‌জিয়াম	৭,৬০০,০০০
বুল্‌গেরিয়া	৫,৫০০,০০০
চেকোস্লোভাকিয়া	১৪,৩০০,০০০
ডেন্‌মার্ক	৩,৪৩৫,০০০
ইস্‌থোনিয়া	১,১১৬,০০০
ফিন্‌ল্যান্ড	৩,৫ ০০০
গ্রীস্	৭,০০০,০০
হাঙ্গেরি	৮,০০ ০০০
লাটভিয়া	২,০০০,০০০
লিথুয়ানিয়া	২,০০০ ০০০,
নরওয়ে	২,৭৮৯,০০০
সুইডেন	৬,০৭৪,০০০
সুইজারল্যাণ্ড	৪,০০০,০০০
ইয়োরোপীয় তুরস্ক	২,০০০,০০০

যদি এইসকল দেশে বালিকা ও বয়স্কা নারীদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতে পারে, তবে ভারত সরকারের পক্ষে ঐরূপ ব্যবস্থা করা—বিশেষ করিয়া যে-সকল প্রদেশে ১৬টি সমৃদ্ধ ভাষার যে-কোন একটির বহুল প্রচলন আছে—কোন মতেই কঠিন নহে।

দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা প্রযুক্ত ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে না বলিয়া যে-অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সে-অপরাধে আমাদের দেশবাসীদিগকে যতটুকু অপরাধী করা হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট্ যে অন্ততঃ ততটুকু দোষী, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী লোকের সংখ্যা যদিও আমাদের দেশে এখনও বিরল নহে—কিন্তু তাহাদের সংখ্যা

দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, ভারতীয় নারীদের শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যথোচিত বিধি-ব্যবস্থা না-করা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের কর্ণধারগণ—এবং দেখাদেখি তাঁহাদের পত্নীরাও—ঐ অভিযোগটি বাড়াইয়া বলিয়া সময়ে অসময়ে নিজেদের কর্ত্তব্যবিমুখতার সাফাই গাহিতে সুরু করেন। ভারতের কতকগুলি সামাজিক কুসংস্কার স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পথে অন্তরায় সন্দেহ নাই—কিন্তু সে-সকল সামাজিক বিধিনিষেধ ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতেছে এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল সমাজসংস্কারকদলের চেষ্টা ও প্রচার-কার্য্যের ফলে সেইসকল বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হইতেছে।

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পথ বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে, আমরা বড়লাট পত্নীর এই অভিযোগের কারণ খুঁজিয়া পাই না। ভারতের কোন প্রদেশের কোন রাজনৈতিক দল কি কোন ব্যবস্থাপক সভাতে কখনও সরকার কর্ত্তৃক স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত টাকা বরাদ্দ করিবার বিপক্ষে ভোট দিয়াছেন ? আমরা এবম্বিধ সংবাদ অবগত নহি। যদি লেডী আরউইন ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন—খুব সম্ভব তাহা তিনি করেন নাই—যে, রাজনৈতিক কারণে ভারত সরকার যথোপযোগী স্ত্রীশিক্ষা (এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের শিক্ষা) প্রসারের পক্ষপাতী নহেন, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিব, যে, সরকার ঐ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে।

বালকবালিকাদের পাঠ্য বিষয় পৃথক্ করিবার সম্বন্ধে যে-অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাও কিয়ৎপরিমাণে যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়। আমরা অবশ্য স্বীকার করি, যে, স্ত্রীলোকদের ও বালিকাদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত যাহাতে তাহারা নিজ নিজ গৃহ সকল দিক্ দিয়া শ্রীমণ্ডিত করিতে পারে। বালিকাদের সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়ে নারীত্বের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিক্ষা বিধান করাও আবশ্যক। কিন্তু সেই কারণে আমরা তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা পুরুষদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিবার পক্ষপাতী নহি। বালক-বালিকা উভয়েই মানুষ, উভয়েই একই সমাজে বাস করে এবং সেই সমাজ-দেহের উন্নতির নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই জ্ঞান-বুদ্ধির যথোপযুক্ত বিকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই উভয়ের শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্য বিষয় অনেকাংশে একরূপ হওয়া দরকার। পুরুষদের সহিত সংস্পর্শে আসিতে হইলে, তাহাদের আদর্শের ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইলে ও সংসারক্ষেত্রে তাহাদের সহচরী হইতে হইলে নারীদের শিক্ষা-ব্যবস্থা যথাসম্ভব পুরুষদের অনুরূপ হওয়াই বিধেয়। এবং স্ত্রীলোকদিগকে যে জ্ঞানে বুদ্ধিতে পুরুষ অপেক্ষা হেয় বলিয়া অযথা কলঙ্ক আরোপ করা হয়, তাহার অপনোদনের নিমিত্তও যাহাতে তাহারা পুরুষের শ্রদ্ধা-সম্মানের অধিকারিণী হইতে পারে সেজন্য তাহাদের উদার শিক্ষা-পদ্ধতির বিধান কর্ত্তব্য।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেসে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত P.—42. 28.

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
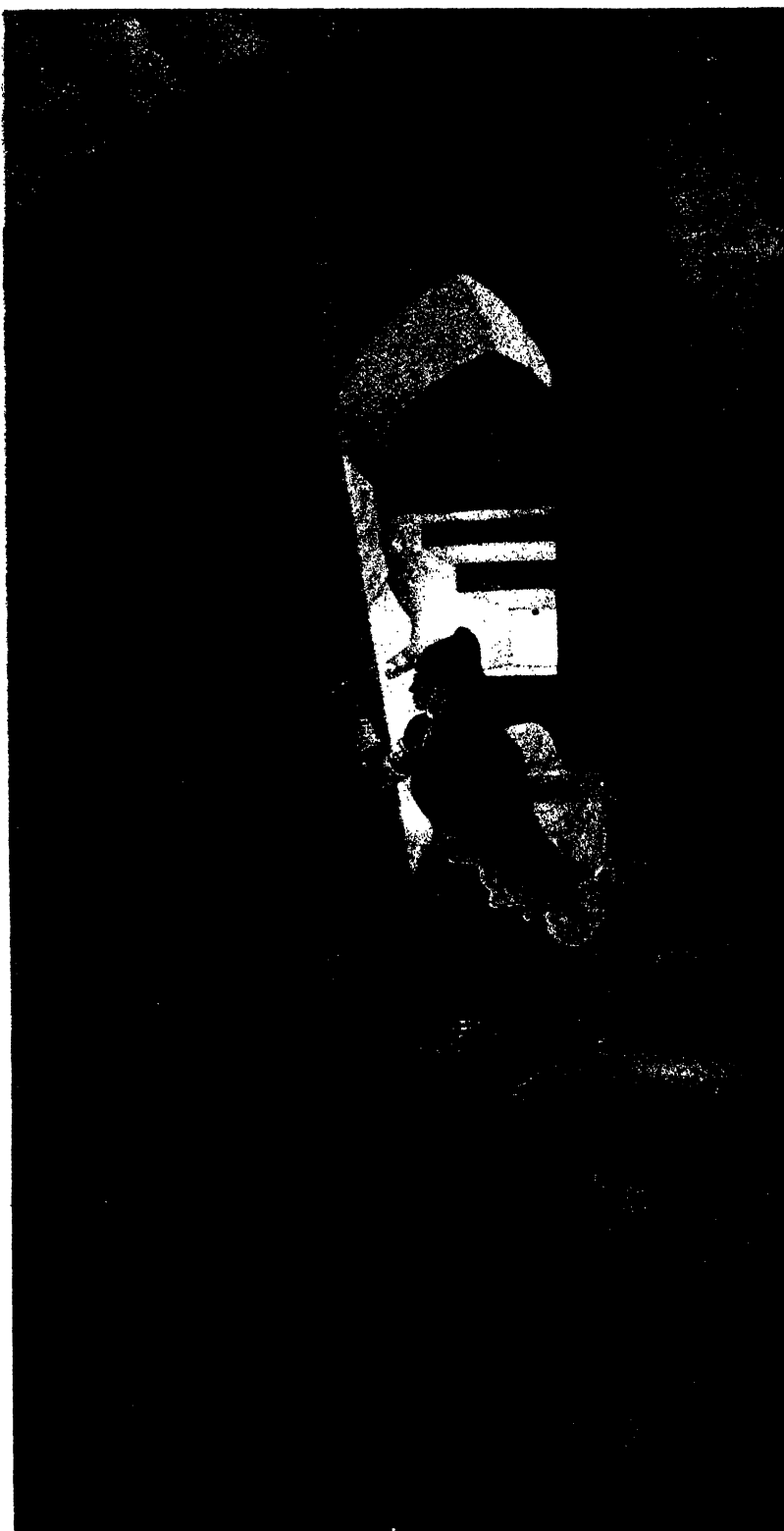
২৮শ ভাগ, ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ | ২য় সংখ্যা

বর্ষশেষ

১৩৩৪

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজধানীর জনসংঘের কোলাহল থেকে যখন এখানকার শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে আজ এসে পৌঁছলেম, তখন আকাশ দিনাবসানের আলোকে অবগুণ্ঠিত, মেঘাবরণ ছায়ানিক্ষেপ ক'রে অরণ্যানীর শ্যামলতাকে কোমলতর করেচে। বর্ষশেষের যে-রূপটিকে আজ এখানে দেখলুম, রাজধানীতে থাকলে সেটি এমন প্রত্যক্ষ ক'রে দেখতে পেতুম না। সেখানে একটি ঘূর্ণিপাকের আচ্ছাদন চারিদিকে; বিশ্বসৃষ্টিতে আরম্ভ ও অবসানের অবিচ্ছিন্ন সমগ্র রূপটিকে ঐ আচ্ছাদনে লুপ্ত ক'রে রেখেচে। মানব-জীবনের সঙ্গীতে ক্ষণে ক্ষণে সমে ফিরে আস্‌বার অপেক্ষা আছে। কিন্তু জনতার কোলাহলে মনে হয়, তানের পর তান চল্‌চে, কোথাও সম আসে না। অন্তের সত্যরূপ সেখানে আচ্ছন্ন। অন্ত আসে বিচ্ছেদের রূপ ধ'রে, সে যেন সত্যের প্রতিবাদ, যেন অকল্যাণ,—তাকে সহজে স্বীকার ও ব্যবহার করবার শক্তি আমাদের নেই—তার জন্যে মন কখনোই প্রস্তুত থাকে না ব'লে সে হঠাৎ চমক লাগিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দেয়। চারিদিকের ভিড়ের ঠেলায় মানুষ চলেচে; সে-চলায় ছন্দ নেই। বিরামহীন প্রয়াস; সেই প্রয়াসের সঙ্গে শান্তির মিলন হোলো না। নগরীতে যখন সন্ধ্যা আসে তখন সে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, দিনের কোলাহল অনধিকার প্রবেশ ক'রে তার কণ্ঠরোধ ক'রে দেয়। দিনের উদ্যম সন্ধ্যার বিশ্রামের মধ্যে উগ্র উত্তেজনার সন্ধান করে।

ক্লান্ত শরীর-মন নিয়ে মনে করেছিলেম আজ বর্ষশেষের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাব না। এমন সময় বনপ্রান্তের উপর ঘনমেঘের স্নিগ্ধচ্ছায়ার স্পর্শ নাম্‌ল, প্রান্তরের উপরকার সুবিশাল শান্তি শূন্যতার রূপে নয়, সুন্দরের রূপে দেখা দিল, বিশ্বকর্মার অনন্ত ধ্যানস্রোতের অন্তরে চিরসঞ্চিত যে পূর্ণতা, সন্ধ্যার কালো কানায় ভরা সেই পূর্ণতার সঙ্কেত দেখতে পেলুম। তাকে অনুভব করলুম

বাইরে যাকে অবসান ব'লে জানি, এইখানে তার মধ্যে নব-প্রাণের বীজের অন্তঃস্থবাস।

জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অবসানের মধ্যেই তার সমগ্র ছন্দের পূর্ণতাটিকে দেখতে পাই। যতি না থাকলে ছন্দের চেহারা লুপ্ত হ'য়ে যায়। আমাদের জীবনে যতি-নিয়মিত ছন্দের প্রবাহই জীবনকে নির্মল করে,—গতি ও যতির মধ্যে দিয়েই সেই প্রবাহ। মানুষের ইতিহাসের অনেক বড়ো বড়ো সভ্যতা কিছুকালের সমারোহে পরেই অন্তর্ধান করেছে, তার কারণটা এই যে, তার ছন্দের যতিকে সে হারিয়েছিল, তার উদ্যমকে কেবলি সে ছড়িয়েচে, কুড়োয়নি। ক্লান্তির মধ্যে যে পূর্ণতা তাকে সে স্বীকার করেনি। তার তাল কেটে গেছে। তার সম এলো অস্থানে, সেটা বিরাম নয়, সে বিনাশ।

আমার সৌভাগ্য যে, আজ এখানে এসেচি। যে নগরী থেকে এলেম সেখানে সন্ধ্যার মূর্ত্তি উন্মত্তা, কল্যাণী নয়; সেখানে মৃত্যুর মুখচ্ছবি আপন গাম্ভীর্য্য হারিয়েচে। লোকালয়ে মৃত্যুকে অস্বীকার করবার একান্ত চেষ্টা, এই-জন্যেই মৃত্যুর সত্যকে সেখানে দেখতে পাইনে। মৃত্যুর সূচনাতেই চিরাভ্যস্ত অবরোধ থেকে বেরিয়ে এসে প্রবাহিত জলধারার কাছে বাস করবার যে-প্রথা আমাদের দেশে আছে সেটি আমার কাছে বড়ো সুন্দর লাগে। যে-মৃত্যু আপন বিরাট রথে বিশ্বকে বহন ক'রে নিয়ে যায় আরম্ভ থেকে অবসানে, অবসান থেকে নবজন্মে, সেই পরম গম্ভীর মৃত্যুকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে নেবার জায়গা হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে, গৃহপ্রাচীরের মধ্যে নয়।

আজ অবসান আমাদেরকে মুক্তির রূপ দেখাক, যে মুক্তির মধ্যে পূর্ণতা। শান্ত হ'য়ে বলি, হে অন্ত, তুমি ওঁ, তোমার মধ্যে অনন্ত। আজ বর্ষশেষের দিনে তোমার মধ্যে অশ্রুর আভাস লাগল, বিরহ বিচ্ছেদ নৈরাশ্য ক্লান্তির অবসাদ আজ গোধূলির অন্ধকারে জড়িয়েচে—তবু সমস্তকে অঙ্গীকৃত ক'রে, উত্তীর্ণ ক'রে অন্তরে বাহিরে তোমার ধ্বনি শুনতে পাচ্চি, ওঁ। হৃদয়ের বেদনা ওকে সৌন্দর্য্যই দিয়েছে,—অশ্রু-বাষ্পে এ ম্লান হয়নি, সুকোমল হয়েচে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তারালোকিত বিপুল আকাশে মৃত্যু আপন শান্ত সুন্দর মূর্ত্তিকে প্রকাশ করে, দিনের সমস্ত ভার নাবিয়ে দিয়ে তার আলিঙ্গনে আমরা নিজেকে নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দিই। বর্ষশেষের দিনে আজ তারই বিরাট রূপকে ক্লান্তিহীন, জীর্ণতাহীন অন্ধকারের মহাসনে আসীন দেখি এবং তাকে নমস্কার করি॥

শান্তিনিকেতন, ৩০ চৈত্র ১৩৩৪

নববর্ষ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

আজ নববর্ষের প্রথম দিনে যখন নিজেকে একটি প্রশ্ন করি, তুমি কি করতে এসেছ অসীম দেশ ও অসীম কালের এক প্রান্তে? তার উত্তরে মন বলে, আর কিছু নয়, জীবনে এই কথাটি প্রকাশ করতে এসেচি, যে, দেখা হয়েচে। এই উত্তরটি আমার সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে নিহিত, সমস্ত বাধার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে শুভ মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত চৈতন্যের দীপ্তিতে এই উত্তরটি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেচে যে, সকল দেখার অন্তরে সত্যকে দেখতে পেলুম। তীর্থে যায় মানুষ তীর্থের অন্তরতম অধিদেবতাকে দেখতে,—বলে, দর্শন মিলেছে। কোনো কিছু সংবাদ নিতে নয়, তত্ত্ব নির্ণয় করতে নয়, পরিপূর্ণ আনন্দে শুধু এই কথাটি বলতে,—প্রভাতের সূর্য্য-কিরণে সন্ধ্যারতির দীপালোকে দর্শন পাওয়া গেলো।

কাড়াকাড়ি হানাহানি, কুৎসা এবং কুৎসিত, চার

দিকেই আছে। অস্তিত্বের পরিচয় সেইখানে এসেই ঠেকে গেল না, তাকে উত্তীর্ণ হ'য়েও মন সত্যের আনন্দরূপকে দেখতে পেয়েছে এই কথাটি বল্‌বার জন্তেই কবির কাব্য,—সেইজন্তেই তো এত যত্নে কাব্যের রূপগ্রহণ, সেইজন্তেই আনন্দের সাধনায় তার ছন্দোময়ী হ্লাদিনী মূর্ত্তি। অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে জীবনে মরীচিকার পিছনে ছুটতে হয়নি তা নয়, কিন্তু মরীচিকাও তো চোখ ভোলাতে পারত না যদি সে কোনো-একটি সত্যের ছায়া না হোত—সেই সত্যটি আছে ব'লেই তারি আভাস নিয়ে মরীচিকাও আছে। মরীচিকাতেও কবি সেই সত্যকে স্বীকার করতে যদি পারলো তবেই তার বাণী হোলো সত্য—সে বল্‌লে, ক্ষণিক মরীচিকা যে-সত্যের স্বপ্ন-দূতী সে সত্যটি চিরকালের, সেই সত্যটি মরুভূমির পরপারের—সেই সত্যটিকে "বেদাহং" আমি জেনেছি, এই কথাটি বলাই আমার কাব্য।

"আলোয় বাতাসে মাটিতে জলে যে অলক্ষ্য অপরিসীম প্রাণের স্পন্দন, তারি স্পর্শ পেলাম," গাছ এই কথা বল্‌চে তার শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, নানা ঋতুতে নানা বর্ণে নানা ভাষায়। আলোর মধ্যে মিথ্যে, বাতাসের মধ্যে ছলনা, মাটি জলের মধ্যে চির প্রচ্ছন্ন দীনতা, একথা বর্ষে বর্ষে অজস্র ক'রে বল্‌বার জন্তে সুন্দর হ'য়ে তার ফুল ফুট্‌ত না, মধুর হ'য়ে তার ফল ফল্‌ত না। গাছ যেখানেই বিশ্বের মর্ম্মগত প্রাণশক্তির সঙ্গে যোগে বাধা পেল সেখানেই তার প্রকাশ হোলো ম্লান, সেখানেই তার পাতা পড়লো ঝ'রে, তার শাখা গেলো শুকিয়ে। তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা শ্যামল হ'য়ে, সুন্দর হ'য়ে আলোর দিকে নিজেকে প্রসারিত ক'রে বল্‌চে, "হে আলো, তোমার স্পর্শ দাও আমাকে।" আলোককে আমি বিশ্বাস করি, এই কথাটি বলাই তার সমস্ত অস্তিত্ব। সে বলে, "যে প্রাণ দেশে কালে আনন্দিত, তাকেই আমি আমার মধ্যে বিচিত্ররূপে মূর্ত্তিমান করব।"

কবিও এই কথা বল্‌তেই এসেচে,—"আনন্দের যে অমৃতরূপ তাই দেখলুম দুই চক্ষু দিয়ে, রক্তের মধ্যে তার কাঁপন লাগল। এই দেখাটি আমার ছন্দে সুরে অক্ষয় রূপ নেবার জন্তে এত ক'রে ব্যাকুল।" চৈতন্ত যখন বাধাগ্রস্ত হয়, বাষ্পে ধূলায় তার চারদিকের হাওয়া যখন ঘন হ'য়ে ওঠে, তখনি অন্ধ মন সন্দেহে চায় সমস্ত ফাঁকি; সে বলে, আমি ঠকেছি। কিন্তু ঠকা'র কথাটা তো গানে গাবার নয়, কোনো-একটি সুনিশ্চিতের আশ্বাস এলেই তো গানের সুরে ঢেউ তুলে দেয়। তার প্রতি বিশ্বাসেই নবীনতা,—অবিশ্বাসেই জরার আক্রমণ, তাতে রস শুকিয়ে ফেলে। সেই রস গেলেই বিশ্বলোকে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় না। শুক্‌নো ডাল বলে, "কিছুই পাচ্ছিনে, কিছুই নেই।" সেই তো বলে, "বসন্ত মিথ্যেবাদী।"

আমাদের জীবনে জরার প্রবেশ কোন্‌খান দিয়ে? "আমি" ব'লে যে একটা পদার্থ গাঁথা হ'য়ে উঠচে জন্ম হ'তে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নানান্ জোড়াতাড়ায়, নানান্ দাবী-দাওয়ায়, নানান্ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সেইখানে। এইটেই পলে পলে জীর্ণ হয়, আঘাতে আঘাতে ক্ষুণ্ন হয়, অন্তরের ও বাইরের দাগে দাগী হ'তে থাকে। প্রতিদিনের সংসার-যাত্রায় এরই টুক্‌রো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝরে ঝরে আবর্জ্জনা জমে ওঠে। যে-চৈতন্তের সঙ্গে বিশ্বের যোগ সত্য হবে তাকে নানা ক্ষণিক খণ্ডতায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

এইজন্তেই জীবনে সকল সত্য-মিলনের গোড়াতেই আছে সেই "আমি"কে ভুলে যাওয়া। সুন্দরকে দেখে বলি, তোমাকেই পেলেম, "আমি"কে ভুললেম। সত্যকে আত্মীয় ব'লে উপলব্ধি করতে পারলে বলি, তোমার জন্তে আমি যেন মরতে পারি। এই আমিকে অতিক্রম করার দ্বারাই সত্য-উপলব্ধির সত্যতা প্রমাণিত হয়। সেই আমির আবরণমুক্ত উপলব্ধিতেই বিশ্বের গানের সঙ্গে কবির গান সুরে তালে এক হ'য়ে ওঠে। শুধু সঙ্গীতকেই এখানে গান বল্‌চিনে,—সেই কর্ম্মও গান যে-কর্ম্মে আত্ম-প্রকাশ; জীবনকে সকল দিকে পূর্ণ ক'রে যাপন করা, সেও গান; আপন সংসারের অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে সমগ্রতার সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে তোলা সেও গানের মতোই রূপ-সৃষ্টি। উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বিক্ষেপকে দমন ক'রে যখন জীবনের লীলাকে ঐক্যের সুষমা দিতে পারি তখন "আমি"-অত্যাচারমুক্ত সেই সৃষ্টির মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির মূলগত কল্যাণকে সৌন্দর্য্যকে স্পর্শ করি। তখন জানতে পারি, সে কি নিবিড় সত্য। তার জন্তে আপনার সব-কিছু নিঃশেষ ক'রে দেওয়া সহজ হয়। এরজন্তে বই পড়ি, উপদেশ

শুনি, কথা কই,—কিছুই হয় না। বিশ্বের সৃষ্টিতে সত্যকে দেখতে হবে, এবং নিজের সৃষ্টিতে সত্যকে দেখাতে হবে এইটেতেই হোলো সার্থকতা।

সত্য বিশ্বের অন্তরে আছে, তাকে নিজের সত্যের দ্বারাই পাওয়া যায় এইটে ঠিক মতো ক'রে বলাতেই কল্যাণ। বিজ্ঞানের পথ দিয়ে য়ুরোপ প্রতিদিন এই কথা বলেচে, তার ফল পেতেও দেরি হয়নি,—সে-ফল একেবারে অজস্র, সে আর ফুরোয় না। বিজ্ঞান তো ফাঁকি দিল না, সে তো মরীচিকা নয়। বিশ্বশক্তির সঙ্গে মানুষের চিত্তশক্তির যোগ হবা মাত্রই দেখা গেল, দৈন্যই মিথ্যা, রোগ-তাপই মিথ্যা। ব্যর্থতার মূল বিশ্বের মধ্যে নেই সেটা আছে, "আমি" ব'লে পদার্থের অশক্তির মধ্যে, আত্ম-অবিশ্বাসের মধ্যে। যারা বিজ্ঞান-তাপস তারা সব দিক দিয়ে এই "আমি"-রচিত মায়াজাল কাটিয়ে তবেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করেচেন। এজায়গায় য়ুরোপের সাধনা বিশ্বের মধ্যে সাড়া পেল, এমন কিছুকে লাভ করল, যেটা হাঁ,—তাই য়ুরোপ বল্‌তে পারলে, বেদাহং, আমি জেনেছি। বল্‌তে পারলে "তোমরাও শোনো আমার কাছ থেকে।" এই যে য়ুরোপ এমন কিছুকে পেয়েছে যেটা তাকে ছলনা করলে না, এইটে থেকেই তো বিশ্বের প্রকৃতি জানা যায়,—বোঝা যে, সে মায়া নয়। আমাদের তরফে যখনি ভুল করি তখনি মায়ার সৃষ্টি। বহু দিন নিজের কল্পিত আল্‌কিমি মানুষকে ভুলিয়েছে, কেমিষ্ট্রি ভুল ভাঙচে আমি-মায়াবীর জাল কাটিয়ে। বিশ্বের আধ্যাত্মিক সত্য আনন্দময় সত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা,—তাকে তলিয়ে না দেখলে মিথ্যে দেখা হয়। মানুষের ধর্ম্মের ইতিহাসে এই মিথ্যে দেখার প্রমাণ হাজার হাজার। সেই খানে মানুষ নিজেকে অনেক ঠকান্ ঠকিয়েছে,—তাই ধর্ম্মের নামে মানুষ যত বৃথা দুঃখ দিয়েছে ও বৃথা দুঃখ পেয়েচে এমন আর-কিছুতেই নয়। মানুষের বিকৃত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বহু শত বৎসর ধ'রে যেমন বহুবিস্তৃত বঞ্চনার জাল বুনে এসেচে, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্যজ্ঞানের বিকৃত সাধনাও তেমনি ক'রেই কল্পনার কুহেলিকায় তার চিত্তাকাশে অন্ধতা ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই মায়াবী কে? মানুষের আমি। সেই তো নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা রাগ দ্বেষ অভিরুচির অন্ধ পথে পদে পদে সত্যের পরিবর্ত্তে উপচ্ছায়াকে দেখেচে, কিন্তু তাই নিয়ে কি বল্‌তে পারি যে, উপচ্ছায়াই আছে, সত্য নেই, বল্‌তে কি পারি অস্তিত্বের মূলে ফাঁকি, ও অন্তে ফাঁকি। যদি তাই হোত, ফাঁকিই যদি আসল কথা হোত তাহ'লে ফাঁককে ঘৃণা করবার শক্তিও থাকৃত না, প্রবৃত্তিও থাকৃত না; তাহ'লে ফাঁকির কাছে হার মেনে মানুষ নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকৃত, তা হ'লে সত্যের দোহাই দিয়ে, অর্থাৎ যা নেই তারি দোহাই দিয়ে, ফাঁকিকে নিন্দে করবার ব্যর্থ ধৃষ্টতা তার চেয়ে আর কিছুই হ'তে পারৃত না।

আজ নববর্ষের দিনে আমি নিজেকে দিয়ে একাগ্র মনে বলাতে চাই যে, বিশ্বের অন্তরে সত্য আছেন এই আমি বিশ্বাস করি; আপনার আবরণ ছিন্ন ক'রে সেই সত্যের সঙ্গে একান্ত যোগে যে আমাদের সার্থকতা তা'তে আমার কোন সন্দেহ নেই। এই পুরাতন কথা আজ যেন আমি নূতন ক'রে আবিষ্কার করি যে, বিশ্বের সকল দেখার গভীর অন্তরে সত্যকে জানিনি বটে, কিন্তু দেখেচি এই কথাটি নানা ছন্দে রূপ দিয়ে ব'লে যাওয়াই কবির কাজ।

২

আজ আমার জীবনের লীলাক্ষেত্রের প্রান্ত সীমায় এসেচি। এ জীবনে কি হ'তে পারে-না-পারে অনেকটা পরিমাণে সেটা নিশ্চিত ক'রে জানা গেল। বয়স যখন অল্প ছিল আমার আয়ুর অনেকটা অংশই ছিল ভাবী কালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। তখন আশা করবার শক্তির সীমা ছিল না। তখন আপন সার্থকতার যে মূর্ত্তি কল্পনা করতুম তাতে কোনো ত্রুটির আশঙ্কা করিনি। কালে কালে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, কিছুই অসম্ভব নেই, এই আশা তখন অক্ষুণ্ণ ছিল।

আশা করবার এই শক্তিই প্রথম বয়সের সব-চেয়ে বড়ো শক্তি। এই আশাতে কেবল যে পাথেয়রূপে আমাদের পথ চলাতে উৎসাহ রক্ষা করে তা নয়, এর মধ্যে সৃষ্টি-শক্তি আছে, অনুকূল অবস্থাকে এ গ'ড়ে তোলে।

যা অভাবনীয় তাও সম্ভবপর এ কথা জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারায় যারা এ কথা সত্য হ'য়ে ওঠে।

আজ আমার জীবনে বিশেষ নূতন কিছু আশা কর্‌বার স্থান সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেচে। পথ-চলার সত্য সম্বন্ধে আজ আমার বেশি কিছু বল্‌বার নেই—আজ আমার বল্‌বার কথা লাভ করার সত্য সম্বন্ধে।

ফল-লাভের একটা বহিরঙ্গ আছে তাকে বলি সিদ্ধি, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে সাক্‌সেস। সেটাকে সহজে দেখা যায়, পরিমাপ করা যায়, সেটাকে দিয়ে দশ জনের কাছে নিজের গৌরব প্রমাণ করা সহজ। তার প্রতি মানুষের লোভ প্রবল। তার কোনো বৈকল্য ঘটলে মানুষ সেটা ঢাকতে চেষ্টা করে, অত্যুক্তির দ্বারা তার ছিদ্রতায় তালি দিতে চায়। আপন আপন সিদ্ধি প্রমাণ কর্‌বার প্রতিযোগিতায় নিজ কৃত অধ্যবসায়ে, ধর্ম্মে পলিটিক্‌সে মিথ্যাবাদ ও কলহের অন্ত থাকে না।

নবীন বয়সে যখন আশা কর্‌বার দিন সম্মুখে থাকে তখন সিদ্ধির ঝুলি ভর্ত্তি করার চেয়ে চলার উৎসাহই প্রবল থাকে। তারপরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িকতায় ধরে। সেই বিষয়বুদ্ধিই লুব্ধ মনে সিদ্ধির হিসাব কর্‌তে বসে। অল্প বয়সে বিপুল আশা আমাদের মনকে টানে লক্ষ্মীর কমলাসনের দিকে,—বয়স হ'লে আমাদের পথ বেঁকে যায় কুবেরের ভাণ্ডারের দিকে, নগদ লাভের মহলে।

যে-সব প্রত্যক্ষ ফল-লাভ নিয়ে সিদ্ধি সেটা যে ভালো নয় এমন কথা বলিনে। তাকেও চাই, তাকে নইলে চল্‌বে না, কিন্তু তার যতটা মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি দিতে গিয়ে তার পিছনে নিজের সমস্ত সম্বল উজাড় ক'রে দিলেই বিপদ। আমরা যা চাই, বাইরে থেকে হাতে হাতে তার সমস্ত পূর্ণ হ'তে পারে না, এ অত্যন্ত নিশ্চিত। তাই ব'লে বল্‌তে পারব না ভাগ্য আমাদের বঞ্চিত কর্‌লে। বাহিরের সিদ্ধিই যদি সার্থকতার একমাত্র পরিমাপ হোত তাহ'লে সংসারের মতো এত বড়ো ফাঁকি আর কি হ'তে পার্‌ত? জীবনে অনেক ইচ্ছা অকৃতার্থ, অনেক চেষ্টাই অসমাপ্ত। তবু এ কথা ভুললে চল্‌বে না যে, আমাদের অধিকাংশ সত্য-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের অকৃত্রিম প্রয়াস, আসক্তির ভিতর দিয়েই আন্তরিক সার্থকতায় পৌঁছয়, জীবনের ইতিহাসের মজ্জায় গিয়ে তারা সঞ্চিত হয়। মানুষ বল্‌লে, মানুষের পক্ষে যা অমঙ্গল তাকে চরম ব'লে মান্‌ব না। বিদ্রোহে প্রস্তুত হোলো। ফল চোখে দেখতে পেলে না। কোন্ শয়তান এই নিষ্ফলতাকে বিদ্রূপ করবে? এই বীর্য্যের ধ্রুব সার্থকতা আসন রয়ে গেছে ইতিহাস-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য বিভাগে। যে অবিশ্বাসী অমঙ্গলের প্রতিবাদ কর্‌তে দাঁড়ালো না, বল্‌লে, যা অসাধ্য তাকে সম্ভব কর্‌বার চেষ্টা করা শক্তির অপব্যয়, সংসারে সে পরাভব সৃষ্টি কর্‌লে। সে পরাভব আত্মার। যে-মুহূর্ত্তে জোরের সঙ্গে সত্য ক'রে বলেছি মানুষের অপূর্ণতাকে কিছুতেই স্বীকার করব না, তার জন্যে দিয়ে ফেল্‌ব প্রাণ, তখনি জয়ী হয়েচে সেই দিয়ে-ফেলা প্রাণ। মানুষের মধ্যে যাঁরা মহৎ তাঁরা যা প্রত্যাশা করেন চারিদিকে সেই প্রত্যাশার কঠিন প্রতিবাদ সইতে পারেন। তাঁরা ফল পাননি তবু কাজ করেচেন, এইজন্যেই তাঁরা আমাদের নমস্কার পাবেন। তাঁরা এ সংসারের দিনমজুর নন্। তাঁরা ব'লে গিয়েচেন বাইরে ফলের জন্যে লুব্ধ হোয়ো না, কর্ম্মের ফল অসিদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে অন্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা এই কথাটি সমস্ত শক্তি দিয়ে বল্‌তে এসেছি, অসত্যকে অকল্যাণকে মান্‌ব না, মান্‌ব না। দুর্জ্জয় বাধার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এই কথাটি অক্লান্ত উৎসাহে বলার দ্বারা আমাদের আত্মা জয়ী হয়। সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতার অক্ষয় ভাণ্ডারে অসংখ্য নিষ্ঠাবান বীরের এই বাণী সঞ্চিত, তাতেই তাদেরকে অলক্ষ্যে অমর শক্তি জুগিয়ে দিচ্চে।

সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী-পূজা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কিত সিটিকলেজের অধীনে একটি ছাত্রাবাস আছে, ঠিক সেই জায়গাটাতেই মূর্ত্তিপূজা করাই চাই ব'লে সেখানকার একদল ছাত্র রুখে দাঁড়িয়েচে। এ কাজ ঠিক এইখানটাতে ব'সে না করলেই যে হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষা হয় না তা সত্য নয়, অথচ ধর্ম্মের নামে বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মনে এতে ক'রে অনাবশ্যক আঘাত দেওয়াতে অধর্ম্মই ঘটে, এমন কথা বলা চলে। একথা বল্লেও অন্যায় হয় না, যে, অপর পক্ষকে অপদস্থ করবার উদ্দেশে কৌশলে দেবতাকে ব্যবহার করলে তাতে দেবতার পূজা হয় না, অসম্মানই হয়। বস্তুত, এ যেন, যার উপরে রাগ আছে তাকে বেদনা দেবার জন্যে, নিজের দেবতাকে লাঠির মতো ক'রে তোলা। এতে দেবী সরস্বতী প্রসন্ন হ'তে পারেন এমন কথা যারা মনেও করতে পারে সরস্বতীর 'পরে তাদের শ্রদ্ধা নেই। যাইহোক, এ স্থলে কোনো তৃতীয়পক্ষ কর্ত্তব্যের অনুরোধে যুক্তির দোহাই দিতে যদি সাহস করে তবে সেও যে এই উত্তেজিত ছাত্রদলের কটু ব্যবহারের লক্ষ্যবর্ত্তী হবে তাতে সন্দেহ নেই। বিরোধের যে-ক্ষেত্রে যুক্তিবিচার অপেক্ষা রূঢ় আচরণই প্রবল, সেখানে মাথা পাত্‌তে কারো সহজে ইচ্ছা হয় না। কেননা, এই অস্ত্র সকলের হাতে নেই।

কিন্তু এমন নয় যে, ব্যাপারটা কলেজ-বিশেষের অধ্যক্ষদের সঙ্গে ছাত্রদের একটা সামান্য ব্যবহারঘটিত দ্বন্দ্ব মাত্র। এই ঘটনাটির মূলগত যে নীতি, তার গুরুত্ব কোনো একটি সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ নয়। এমন স্থলে নিজের সম্বন্ধে অপ্রিয়তা ও অশান্তির আশঙ্কা ক'রে চুপ ক'রে থাকা অকর্ত্তব্য হবে।

যে-ধর্ম্মভেদ নিয়ে য়ুরোপে একদিন সাংঘাতিক বিবাদ ঘটেছিল সেই ধর্ম্মভেদটি আজও সেখানে আছে, কিন্তু তার বিবাদ গেছে ঘুচে। গেছে ব'লেই সেখানকার জনসাধারণের পক্ষে সামাজিক সুব্যবস্থা ও রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে। পরস্পর ভেদ থাকা সত্ত্বেও যে শুভবুদ্ধির প্রভাবে পরস্পর বিবাদ থাকে না সেইটিই স্বরাজ-সাধনার বুদ্ধি। পরস্পরের বিহিত সীমাকে স্বীকার ক'রে আত্মসংযমের চর্চ্চার দ্বারাই স্বরাজ সত্য হ'য়ে ওঠে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্মভেদ অন্য সকল দেশবাসীর চেয়ে অনেক বেশি। সেই ভেদকে আশ্রয় ক'রে পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণুতা আমাদের রাষ্ট্রীয় সদ্গতি লাভের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। এইজন্যে আমাদের দেশেই অত্যন্ত সাবধানে এমন শুভ বুদ্ধির নিয়ত চর্চ্চা করা দরকার, যাতে ক'রে ধর্ম্মকেই অনৈক্য সংঘটনের প্রবলতম উপায় ক'রে না তোলা হয়।

ঐ কথাটা আমরা খুবই জানি, সর্ব্বদা ব'লেও থাকি, এবং রাষ্ট্র-সভায় এ নিয়ে আমরা আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ করি, বিশেষ ভাবে যেখানে হননক্ষম কোনো এক পক্ষ দারুণ বলশালী। অথচ এই নীতিকে ব্যবহারে প্রকাশ করবার উপলক্ষ্য ঘটবামাত্র যখন অন্যথা দেখ্‌তে পাই তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি কোন্ বাধা আমাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠভাবে নিহিত যা'তে ক'রে আমাদের জনসাধারণ সর্ব্বজনীন লোকহিতের জন্যে কোনো মতেই ব্যূহবদ্ধ হ'তে পারচে না।

অনেক মানুষ যেখানে একত্র বাস করে সেখানে সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি ও রাষ্ট্রিক মুক্তি লাভই হচ্চে সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা। এই সার্থকতা লাভ ও রক্ষার জন্যে সকল বড়ো জাতিই তপস্যা করে। মানুষের এমন অনেক অপগুণ আছে যেগুলি শনির মতো, কলির মতো এই তপস্যাকে নষ্ট করবার জন্যে কেবলি ছিদ্র সন্ধান করতে থাকে। তার মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো অপগুণ হচ্চে নিজের মত ও নিজের রুচির অসংযত সংঘাতের দ্বারা অন্যের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ ক'রে আত্মশ্লাঘা সম্ভোগের

উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা, বিশেষত সেই দুষ্প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মনামে ঘোষণা ক'রে ধর্ম্মের অবমাননা। যে বিশেষ ক্ষেত্রে বৈষ্ণবের অধিকার, সেখানে দেবীপূজাকালে বলপূর্ব্বক পশু বলি দিলেই শাক্তের ধর্ম্ম রক্ষা হয় এমন নীতিকে যদি কোনো শাক্ত গ্রহণ করে তবে ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গ রক্ষার চেষ্টায় তার আন্তর সত্যকে আঘাত করা হয়, আর সেই আঘাতে সমাজস্থিতির কঠিন পীড়া ঘটে। এমনতরো উপলক্ষ্যে গায়ের জোরে এবং মানুষকে অপমান করবার অকুণ্ঠিত প্রবৃত্তির জোরে আক্রমণকারী দলের জিৎ হ'তে পারে, কিন্তু এই জিৎ কি সত্যকার জিৎ? এই নিয়ে খোল বাজিয়ে সঙ্কীর্ত্তনের ব্যঙ্গ ক'রে আস্ফালন করলে তাতে কি ভদ্র সমাজের গৌরবরক্ষা হয়? বিনা নিন্দায় যে-দেশে এমনতরো গর্হিত অত্যাচার সহজে সম্ভবপর হয় সেদেশের পক্ষে কি আশঙ্কার কারণ নেই?

পরস্পরের ধর্ম্মের ক্ষেত্রকে উপদ্রবের দ্বারা বিঘ্নযুক্ত করা হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ, একথা আমরা চিরদিন গৌরব ক'রে ব'লে আসচি। এই জন্যেই সম্প্রদায়বহুল ভারতবর্ষে হিন্দুরা পরধর্ম্মকে নির্ব্বিকার চিত্তে স্থান দিয়েছে, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে নিজে গায়ের জোরে অনধিকার-প্রবেশ করেনি। হিন্দু বলে, পূজক-ভেদে পূজা-বিধি স্বতন্ত্র; হিন্দু বলে, প্রত্যেক ভক্তের বিশেষ পূজাক্ষেত্রে তার বিশেষ পূজার নিয়ম; সেই নিয়ম পালনেই ভক্ত ও ভগবানের পরিতৃপ্তি। হিন্দু বলে, সেই পূজাক্ষেত্রে যদি অন্য সম্প্রদায়ের কেউ ছলে-বলে-কৌশলে পূজাবিধির ব্যভিচার ঘটায় তবে তার দ্বারা, যিনি সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভগবান, তাঁরই অসম্মান ঘটে। এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে বলতেই হবে যে, কেবল মাত্র পূজানুষ্ঠানের দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষা হয় না, সেই সঙ্গে সেই অনুষ্ঠান অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি পীড়ন না ক'রে সাত্ত্বিক ভাবে স্বক্ষেত্রেই হওয়া চাই; তার অন্যথা যে করে সে "স্বাধিকার-প্রমত্ত" হ'য়ে আপন দেবপূজা দ্বারাতেই আপন দেবতার কাছ থেকে নির্ব্বাসিত হয়।

এই তো ধর্ম্মের নিয়ম, এ হোলো সকলের উপরে। তারো নীচে আসা যাক্। সেখানে ভদ্রসমাজের পক্ষে ভদ্রতার নিয়ম ব'লে একটি মূল্যবান জিনিষ আছে। কোনো বিশেষ ধর্ম্মসমাজ যে-বিদ্যালয়ের পরিচালনা করেন সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গায়ে প'ড়ে সেই সমাজের লোকদের ধর্ম্মবিধিকে আঘাত করবে না, এটা আর কিছু না হোক, ভদ্রপ্রথা। তাও মানবার ধৈর্য্য যদি কারো না থাকে, তবে লোকালয়ের বাহ্য-শাসন আপনিই এসে পড়ে। লোকালয় তার বিচিত্র অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি রক্ষা ক'রে নিজের ব্যবস্থা পালনের উদ্দেশে কতকগুলি শাসনবিধি প্রবর্ত্তন করেচে, যার ভয়ে পরস্পরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করবার স্বাধীনতা কেউ নিজের হাতে জোর ক'রে নিতে পারে না। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব হিন্দু ছাত্র আছে তারা যদি আপন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অভিমানে বলে বা ছলে, গভীর রাত্রে বা মধ্যদিনে, সেই বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোনো বিভাগে কালীপূজা করে তবে সেটা যে কেবল মাত্র ধর্ম্মনীতি ও ভদ্ররীতি-বিরুদ্ধ হবে তা নয়,—সেটা হবে অবৈধ, অর্থাৎ কোনো সভ্য লোকালয় আত্মরক্ষার খাতিরেই তাকে সহ্য করতে পারবে না। এমনতরো জবরদস্তি যিনি করতে যাবেন, ভদ্রাচারের ব্যত্যয়ে কেবল যে অন্তরের দিক থেকে তাঁর লজ্জার কারণ ঘটবে তা নয়, লোকালয়-বিধিলঙ্ঘন জন্য বাইরের দিক থেকেও তাঁর শাস্তির কারণ ঘটতে বাধ্য।

তাহ'লেই কথা উঠবে, রামমোহন হস্টেলে সরস্বতী পূজা অবৈধ কি না। এই হস্টেল প্রথম থেকে যাঁদের পরিচালনার অধিকারবর্ত্তী, তাঁরা বলচেন সেটা অবৈধ। বলা বাহুল্য, যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্চে তাঁদের ধারণা ভুল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁদের বিধানই অগ্রগণ্য। ছাত্রেরা যদি সে-বিধান অস্বীকার করে তবে বৈধ প্রণালীতেই করতে হবে। অর্থাৎ এর শেষ মীমাংসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অথবা আদালতে, কখনোই ছাত্রদের গায়ের জোরে নয়। আমার কলকাতার বাড়িতে যদি গণনা ক'রে দেখি তবে সম্ভবত দেখা যাবে নানা কর্ম্ম উপলক্ষ্যে যারা সেখানে আছে, তারা আমার আত্মীয়বর্গের চেয়ে সংখ্যায় বেশি—এবং মুসলমান বাদ দিলে তাদের অন্য সকলেই নিজের সমাজে প্রতিমা পূজা করে। যদি হঠাৎ তাদের মনে বিশ্বাস জাগে যে, আমাদের দালানে দেবীপূজা করবার বৈধ অধিকার তাদের আছে এবং দেশের-

অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা ধার্ম্মিক বা ব্যক্তিগত যে-কোনো কারণেই হোক তাদের সেই বিশ্বাসে প্রশ্রয় দেন তবে গায়ের জোর থাক্‌লে আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে অপমানিত ক'রে এর মীমাংসা তারা নিজের হাতেই নিতে পারে, কিন্তু সেটাকে কি সভ্যসমাজের প্রথা বলা চল্‌বে? কিম্বা তাতে কি ভাবী স্বরাজের উৎকৃষ্ট নমুনা পাওয়া যেতে পারে? রুচি প্রত্যেকের নিজের, চরিত্র নিজের, ভদ্রতাবোধ নিজের, ধর্ম্ম নিজের, বুদ্ধি নিজের, স্বভাবে যদি না বাধে তবে এদের সম্বন্ধে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক যা খুসি করা চলে। কিন্তু আইন তো প্রত্যেকের নিজের গড়া হ'লে চলে না; গোবরের জলে, জুতার মালায় বা লগুড়াঘাতে তাকে নিজের ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে প্রমাণিত কর্‌বার ব্যবস্থা কোনো ভদ্রসমাজে নেই।

অবশ্য, এমন অবস্থা কল্পনা করা যেতে পারে যখন অসুবিধা বা বিপদ স্বীকার ক'রেও আইন লঙ্ঘন করাই কর্ত্তব্য। যদি বলি বর্ত্তমান ব্যাপারে সে-কথা খাটে, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ব্রাহ্মসামাজিক বিদ্যালয়ের হস্টেলেও ছাত্রদেরকে মূর্ত্তিপূজায় বাধা দেওয়া বৈধ হ'লেও সেটা উচিত হয় না। না হয় তাই মেনে নিলাম, কিন্তু এই ঔচিত্য কেবল সিটি কলেজের সীমানার মধ্যেই একান্ত অবরুদ্ধ কর্‌লে তো চল্‌বে না। তাহ'লে ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হিন্দু বিদ্যালয়ের হস্টেলে বা প্রাঙ্গণে মুসলমান ছাত্রদেরকেও কোরবানী কর্‌বার উদ্যোগে বাধা দেওয়া অনুচিত হবে। হিন্দুর আশ্রমে কোরবানীতে পাছে হিন্দুর ধর্ম্মরীতিতে ও তার হৃদয়ে অযথা আঘাত দেওয়া হয় এইজন্যেই নিষেধের বিধি। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রে জোর ক'রে মূর্ত্তিপূজাতেও ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করে, একথা সবাই জানে। তবু জেদের তর্কটা এই হ'তে পারে যে, আঘাত লাগা উচিত ছিল না। জেদের তর্ক মুসলমানও তুল্‌তে পারে, বল্‌তে পারে যে, কোরবানীতে হিন্দুদের ক্ষুব্ধ হ'বার সঙ্গত কারণ নেই। কেন না ধর্ম্মকর্ম্মে যে-মহিষকে হিন্দু উৎসাহের সঙ্গে বলি দেয় সে মহিষ গোরুর মতোই দুধ দেয়, চাষবাসে সাহায্য করে, ভার ব'য়ে নিয়ে যায়, এবং জীবহিংসার বাহ্য পরিমাণ অনুসারে মহিষ-হিংসা গো-হিংসার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। বিরুদ্ধ পক্ষ বৈদিকযুগের নজিরের দ্বারা তর্কটার সমর্থন করাও সঙ্গত মনে কর্‌তে পারে। কিন্তু জেদের তর্কে হার জিৎ যাই হোক্ তাতে ব্যবহারক্ষেত্রে আঘাত বেদনার লাঘব হয় না।

শুনেছি এমন কথা কেউ কেউ বলেচেন যে, সরস্বতী-পূজার প্রসঙ্গে কোরবানীর তুলনা তোলা উচিত নয়। মনে রাখা উচিত, এ তুলনা আমি তুলিনে। যে মুসলমান আপন শাস্ত্রমতে গোমেধকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে পালনীয় মনে করে সেই মুসলমান প্রতিমাপূজাকে ঈশ্বরের অবমাননা ও গর্হিততম অধর্ম্ম ব'লেই জানে। গো-হত্যাকারীকে হিন্দুরা যত বড়ো শাস্তি দিতে বা নিষেধ করতে প্রস্তুত, মূর্ত্তি-পূজককেও নিষ্ঠাবান মুসলমান তত বড়ো শাস্তি দিতে বা নিষেধ কর্‌তে ইচ্ছা করে। এমন কথা কোনো মুসলমানের মুখে শোনা গেছে যে, হিন্দুরা গোরুকে হিংসা করা পাপ বলে, কিন্তু যে-মূর্ত্তিপূজার দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরের হিংসা করা হয় তার পাপের সঙ্গে আর কিছুর তুলনাই চলে না। মূর্ত্তিপূজা করা ও তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধ সম্বন্ধে মুসলমানের মনে যে প্রবল ঘৃণা ও বাধা দেবার প্রথা আছে তাদের ইতিহাসে তার প্রমাণ রক্তের অক্ষরে লিখিত। অতএব এই প্রসঙ্গে হিন্দুর সরস্বতী পূজার পাশাপাশি মুসলমানের কোরবানীর উল্লেখ করা অসঙ্গত নয়।

যাহোক্ যাঁরা আজ বল্‌চেন, অন্য সম্প্রদায়ের অধিকার-স্থলে স্বসম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিধি জোর ক'রে খাটিয়ে পরের দুঃখ ও ক্ষতি ঘটিয়েও ধর্ম্মরক্ষা করা শ্রেয়, তাঁদের উচিত হবে সর্ব্বাগ্রে মুসলমান ও খৃষ্টানদের অধিকার-সীমার মধ্যে প্রতিমা নিয়ে এই ধর্ম্মসাধন করা। কারণ সাহসিকতা দেখাবার এত বড়ো সুযোগ ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে কোথাও নেই। উত্তরে অপর পক্ষ এমন কথা বল্‌তে পারেন যে, যেখানে শক্তি নেই সেখানে কর্ত্তব্যও নেই, কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের প্রতি অনায়াসে জোর খাটানো চলে অতএব সেখানে ধর্ম্মের নামে জোর খাটাবই।

আমাদের দেশে বরযাত্রীরা প্রায়ই নিরুপায় কন্যাকর্ত্তার অতিথিরূপে তাকে অন্যায় উৎপীড়ন ক'রে থাকে। তাতে প্রমাণ হয়, যেখানে নিরাপদে জোর খাটাতে পারি সেখানে উপদ্রবের দ্বারা অন্যকে অপদস্থ ক'রে নিজের প্রভুত্ব প্রমাণ

করাতে আমাদের আনন্দ। এই মনোবৃত্তিকে গৃহস্থের ঘরে, বা শিক্ষার ক্ষেত্রে, বা রাষ্ট্রিক দলাদলিতে যদি আমরা সর্ব্বদা প্রবল হ'তে দেখি, যদি দেখি, পরের মতকে গায়ের জোরে চাপা দিতে, পরের বৈধস্বাতন্ত্র্যকে অবৈধ উপদ্রবের দ্বারা বিপর্য্যস্ত করতে আমাদের সঙ্কোচ নেই, তবে সেটা কি গভীর উদ্বেগের বিষয় নয়? প্রতিমাপূজার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও যে-সিটিকলেজকে দেশের সকল সম্প্রদায় অনায়াসে এতকাল স্বীকার ও ব্যবহার ক'রে এসেছে আজ তাকে নানা উৎপাতে ধ্বংস ক'রে দেওয়া দুঃসাধ্য না হ'তে পারে, কিন্তু এই আঘাতে আমাদের দেশের এক সম্প্রদায়ের মনে যে কাঁটা-গাছ রোপণ ক'রে দেওয়া হবে, সেটা নিয়ে আমাদের এই শতধাবিচ্ছিন্ন দুর্ভাগা দেশে আস্ফালন করাতে কি পৌরুষ আছে, না, তাতে ধর্ম্মবুদ্ধি বা কর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়? সবশেষে এঁদের কাছে আমার এই বক্তব্য, নীতিকথা যখন-যেমন সুবিধা তখন তেমন ক'রে বলা চলে না। পরের প্রতি আমার ব্যবহারে ও আমার প্রতি পরের ব্যবহারে কর্ত্তব্য-নীতির পার্থক্য করা অসঙ্গত ভারত রাজ্যশাসন যাঁদের হাতে তাঁরা খৃষ্টান,—জোর আমাদের সকল পক্ষের চেয়েই তাঁদের বেশি। সেই সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি খৃষ্টানের অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও খৃষ্টান কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের গৃহে, দেবালয়ে, বিদ্যায়তনে জোর ক'রে খৃষ্টান উপাসনাবিধির প্রবর্ত্তন করেননি। যদি করতেন তাহ'লে বিলাতী ভাটপাড়ার অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টান পণ্ডিত ধর্ম্মপ্রাণ শাসনকর্ত্তাদেরকে শাস্ত্র আউড়িয়ে আশীর্ব্বাদ করতেন, তাতে সন্দেহ নেই। তবু সেই পবিত্র আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'য়েও তাঁরা ভারতবর্ষের অখৃষ্টান সম্প্রদায়ের পূজাধিকার-ক্ষেত্রে নিজের পূজাকে বলবান করতে চাননি। যাঁরা গোবরজল, পাঁক ও পানের পিকবর্ষণ, জুতোর মালা ও লগুড়াঘাতের সাহায্যে তাঁদের পবিত্রধর্ম্মকে জয়যুক্ত করবার পৌরুষ প্রকাশে উদ্যত ও এই রোমাঞ্চকর অধ্যবসায়ে দেশাত্মবোধী ধার্ম্মিকদের কাছ থেকে উৎসাহ পাচ্চেন, অন্তত বাধা বা লেশমাত্র তিরস্কার পাচ্ছেন না, একান্তমনে আশা করি, তাঁদেরই শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ গুরুদের কাছ থেকে আমাদের ম্লেচ্ছ কর্ত্তারা যেন ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ না করেন।

আরাতামা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

লোবান কহিলেন,—আমার পক্ষে এই যুদ্ধে যোগ দিবারও ত কোন কারণ নাই। আমার পক্ষে শত্রুমিত্র দুই-ই সমান, যুদ্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন করা উচিত নয়।

গালিম কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আশঙ্কা আসন্ন সেইজন্য আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। যাঁহারা নির্লিপ্ত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে নগর এই সময় ত্যাগ করাই শ্রেয়।

লোবান কিছু চিন্তিত হইয়া কহিলেন,—যুদ্ধ কি খুব শীঘ্র আরম্ভ হইবে?

– তাহাই ত মনে হয়।

—আরাতামা কি করিবেন? পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী-লোকের আশঙ্কা অধিক।

—আরাতামা বিদেশিনী, স্ত্রীলোক, কিন্তু তিনি আপনার মত নির্লিপ্ত না থাকিয়া রাজা শিশেরার পক্ষে যোগ দিয়াছেন। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি সকলেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন।

লোবান কহিলেন,—আমি বিবেচনা করিয়া আপনাকে পরে জানাইব।

হাকিম চলিয়া গেলেন।

লোবানের কি হইয়াছিল তিনি নিজে কিছু বুঝিতে পারিতেন না। ইতিপূর্ব্বে আরাতামার প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ ছিল না। মৃত্যুশয্যায় বৃদ্ধ জিমরাণ তাঁহাকে যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন লোবান তাহাই প্রতিপালন করিবার জন্য এই নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি কৃতকার্য্য হইলে আরাতামা সম্পত্তিশূন্য হইবেন, কিন্তু তাহার পর কি করিতে হইবে লোবান সে-কথা ভাবেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে জিমরাণ লোবানকে (হাতিলকে) শপথ করাইয়াছিলেন, 'তুমি আরাতামাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবে, যাহাতে তাহার সর্ব্বনাশ হয় প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিবে।' সর্ব্বস্বান্ত হইলেই ত সর্ব্বনাশ হইল, আর সর্ব্বনাশ কি রকম? আর কেমন করিয়া ইহ জীবনে আরাতামাকে নরক-ভোগ করাইতে হইবে? এখন কিন্তু লোবানের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাঁহার মনে ক্রোধ সঞ্চিত হইতেছিল। কেন? আরাতামা তাহার কি অপকার করিয়াছেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর লোবান খুঁজিয়া পাইতেন না। এ কি প্রতিহিংসা? তাহা হইলে আরাতামা ত লোবানের কোন অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু জিমরাণকে বঞ্চনা ব্যতীত আরাতামা ত আর কোন নূতন অপরাধ করেন নাই। বরং লোবানের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তবে কেন এমন হইল? কেন ক্রোধে লোবানের এরূপ অন্তর্দাহ হইতেছিল? শুধু ক্রোধ নয়, ক্রোধের সঙ্গে ভয়। আরাতামা রমণী, যুবতী, সুন্দরী, তাঁহাকে ভয় কেন? তাহারও কোন কারণ লোবান নির্ণয় করিতে পারিতেন না। যাহার উপর ক্রোধ তাহাকেই ভয়। কখন মনে হইত আরাতামাকে অপর লোকের অসাক্ষাতে দেখিতে পাইলে দুর্ব্বাক্য বলিবেন, কিন্তু তাহাতে ফল কি? যদি আরাতামা জানিতে পারেন যে, লোবান তাঁহার শত্রু অথবা তাঁহার বিদ্বেষী তাহা হইলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। এদিকে ভয়ে তাঁহার কিছু করিতে সাহস হইত না।

চিত্তের আর এক প্রকার বিকার লোবানকে আকুল করিতেছিল। বাঈীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ যথার্থ কি না লোবান তাহা বুঝিতে পারিতেন না, তাহার সহায়তায় নিজের কার্য্যসিদ্ধি করিবেন ইহাই তাঁহার অভিসন্ধি। বাঈীর মোহ তাঁহার সিদ্ধির অনুকূল। এখন আর সে অবস্থা নাই। পূর্ব্বে বাঈীকে দেখিলে তাঁহার কোনরূপ চিত্তবিকার হইত না, এখন মুহূর্ত্তকাল তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। পূর্ব্বে হৃদয়ে কোন-প্রকার চঞ্চলতা ছিল না, এখন হৃদয়ের অস্থিরতা কোন মতে নিবারিত হইত না। ঘূর্ণী বায়ুতে তৃণ যেমন বেগে ঘূর্ণিত হয় লোবানের চিত্ত সেইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ কি লালসা না কোনরূপ উন্মাদনা? যদি বাঈী সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা হইত, যদি লোবানের প্রতি তাহার বিরাগ থাকিত তাহা হইলেও বা এরূপ উন্মত্ততার কোন কারণ থাকিত, কিন্তু বাঈী সামান্য পরিচারিকা মাত্র, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশীভূত, তাহার জন্য এরূপ ব্যাকুলতা কেন? আয়াস আকাঙ্ক্ষার অনুসারী, যাহা যত দুষ্প্রাপ্য তাহারই আকাঙ্ক্ষা তদনুরূপ বলবতী, যাহা সহজ-লব্ধ তাহার জন্য আয়াসের কি প্রয়োজন, যাহা নিজের অধীন তাহার জন্য উদ্বেগ কেন? লোবানের বুদ্ধিতে ও হৃদয়ের উত্তেজনায় নিরন্তর বিরোধ চলিতেছিল। ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি দুর্ব্বল ও হৃদয়ের আবেগ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

বাঈী এই মাত্র বুঝিল যে, তাহার প্রতি লোবানের অনুরাগ বাড়িতেছে, সে যেমন সর্ব্বদা লোবানকে কামনা করে লোবানের মনোভাবও সেইরূপ হইতেছে। সে-জানিত আরাতামার গুপ্ত ধন কোন মতে অপহরণ করিতে পারিলেই লোবান নিশ্চিন্ত হইবেন, তাহার পর বাঈীকে লইয়া আর কোথাও চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সে কথা ত পূর্ব্বের মত সদা সর্ব্বদা লোবান আর বলিতেন না, কখন কখন লুক্কায়িত রত্নসমূহের কথা পাড়িয়া বাঈীকে বলিতেন,—তুমি খুঁজিয়া বাহির কর, তাহার পর এখানে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন নাই।

বাঈী বলিত,—তোমাকে আমি ত বলিয়াছি যে, আরাতামা হীরা জহরাত কোথায় রাখেন তাহা কেহ

জানে না। তুমি নিজে খুঁজিয়া দেখিয়াছ। আমি আর কি করিব ?

সময় সময় লোবান আরাতামার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন, কহিতেন,—উঁহার সম্পত্তি না পাই আর কোন অনিষ্ট করিব, উঁহার সর্ব্বনাশ করিব।

বাষ্টী বলিত,—আরাতামা কাহাকেও ভয় করেন না, তাঁহার লোকবলেরও অভাব নাই। আর তুমি স্ত্রীলোকের প্রতি প্রকাশ্যে কোন অত্যাচারও করিতে পার না। আমাকে আর যাহা বলিবে করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আরাতামার কোনরূপ লাঞ্ছনা অপমান করিলে আমি তাহাতে থাকিব না। আমি কৃতজ্ঞ নই, কৃতঘ্ন, কিন্তু কৃতঘ্নতারও সীমা আছে।

লোবান সময়ে অসময়ে যখন-তখন বাষ্টীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেন। সন্ধ্যার পর প্রায় আরাতামার বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কোন মতে যদি বাষ্টীর দেখা পান। তাঁহার কথা এড়াইতে না পারিয়া সন্ধ্যার পর দুই চারি দিন বাষ্টী গোপনে সেই বাগানে তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিল। কিন্তু যেমন যেমন লোবানের আগ্রহ বাড়িতেছিল বাষ্টীর সেইরূপ আশঙ্কা বাড়িতে লাগিল। এইরূপ সঙ্কেত-স্থানে সর্ব্বদা যাতায়াত কতদিন গোপন থাকিবে ? আরাতামা জানিতে পারিলে কি করিবেন কল্পনা করিতেও বাষ্টীর ভয় হইত। আরাতামা অপহৃত রত্ন কোথায় গোপন করিয়া রাখেন এ পর্য্যন্ত লোবান তাহার কোন সন্ধান পান নাই। এমন করিয়াই বা কত দিন যাইবে ? এক বাষ্টী লোবানের সহিত আর কোথাও চলিয়া যায় তবেই সে নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু লোবানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, তিনি আরাতামাকে সর্ব্বস্বান্ত না করিয়া অন্যত্র যাইবেন না। সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবার সূচনা পর্য্যন্ত হয় নাই। একবার বাষ্টীর সহায়তায় আরাতামার গৃহে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিয়া লোবান কিছুই পান নাই। কখনও যে পাইবেন সে আশাও ছিল না। আরাতামার বিমান গুলিতাই বা কেমন করিয়া অপহৃত হইবে ? বিমান-চালক নাদিবকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া কে বশীভূত করিবে ? লোবান বাষ্টীকে যে এক থলি মুদ্রা দিয়াছিলেন তাহা অমনি রাখা ছিল, ব্যবহার করিতে বাষ্টীর সাহসে কুলায় নাই। বাষ্টীর অপর লোকের সঙ্গে বাষ্টী তেমন মিশিত না, আর সকলে তাহাকে গর্ব্বিত মনে করিত। আরাতামার বিরুদ্ধে কোন কথা ভরসা করিয়া সে আর কাহারও সাক্ষাতে পাড়িত না। কাহার মনে কি আছে কে জানে ? এদিকে রাজার গৃহে দিন দিন আরাতামার সম্মান বাড়িতেছিল। রাজগৃহ হইতে তাঁহার কাছে লোক আসিত, তিনিও সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। এমন অবস্থায় বাষ্টীর কে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে ? এই সকল কথা বাষ্টী এক দিন স্পষ্ট করিয়া লোবানকে কহিল।

—তুমি ত এ পর্য্যন্ত আরাতামার কিছুই করিতে পারিলে না, আর আমি গোপনে তোমার সঙ্গে এ রকম কত দিন দেখা করিব ? জানিতে পারিলে আরাতামা কি বলিবেন ?

—না হয় তোমাকে বিদায় করিয়া দিবেন, আর কি করিবেন ?

—তাহা জানি না, কিন্তু অপমানিত হইয়া বিদায় হইবার পূর্ব্বে আমার নিজের পথ দেখা উচিত। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে এমন কত দিন থাকিব ?

—আর বেশী দিন নয়, আমি শীঘ্রই একটা কোন উপায় করিব। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অনেক সুযোগ হইতে পারে।

—সুযোগ কি দুর্য্যোগ কে জানে ? রাজদরবারে আরাতামার যেরূপ সম্মান তাহাতে তাঁহার বাড়ীতে পাহারা থাকিতে পারে।

—তাহার পূর্ব্বেই একটা কিছু করিতে হইবে। আমি আর-একবার আরাতামার গৃহে সন্ধান করিতে চাই।

বাষ্টী কোনরূপ সহায়তা করিতে অস্বীকৃতা হইল, কহিল, আমাকে দিয়া আর কিছু হইবে না। একবার যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বারে আমরা দুই জনে ধরা পড়িব।

সেদিন লোবান আর কিছু বলিলেন না।

আরাতামা যেন কিছুই জানেন না। বাষ্টীকে তিনি কখন কিছু বলিতেন না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। তাঁহাকে সদা সর্ব্বদা রাজবাড়ীতে যাইতে হইত, কখন যাইতেন তাহার কিছু স্থিরতা ছিল না। কোনও কোনও দিন সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেন

বাদী বাড়ীতে নাই, তাহার পর সে যখন চুপি চুপি ফিরিয়া আসিত তখন আরাতামা তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না। ইহাতে প্রথম প্রথম বাদীর মনে একটা অজানিত আশঙ্কা হইত, ক্রমে শঙ্কা দূর হইয়া তাহার মনে ভরসা, নিশ্চিন্তা হইল। তাহার ধারণা হইল যে, আরাতামার মনে কোন সংশয় বা সন্দেহ নাই, তিনি অপর কর্ম্মে এত ব্যস্ত যে, বাড়ীতে কে কি করিতেছে না করিতেছে, কে থাকে না থাকে সে-বিষয় তিনি উদাসীন। বাদীর মনে যে কোন খটকা রহিল না এমন নয়, কারণ সে বুঝিত যে, এমন করিয়া অধিক দিন কাটিতে পারে না, সে যত শীঘ্র আর কোথাও চলিয়া যায় ততই মঙ্গল। লোবান তাহার কথায় সম্মত হইতেন না, নিজের উদ্দেশ্যসাধন না করিয়া তিনি আর কোথাও যাইতে স্বীকৃত হইতেন না। আরাতামা কোন্ বলে লোবানের চিত্ত বশীভূত করিয়াছিলেন লোবানের তাহা কিছু মাত্র স্মরণ ছিল না। বাদীর প্রতি লোবানের অল্প অনুরাগ কেন যে বাড়িতেছিল লোবান চেষ্টা করিলেও কিছু বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু সে-বিষয়ে কোন কথাই তাঁহার মনে হইত না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

রুদেলা অক্লিষ্ট-কর্ম্মা। কোন সঙ্কল্প স্থির করিলে তিনি আলস্য জানিতেন না। তাঁহার দস্যুবৃত্তি একেবারে রহিত হইল। দস্যুরা শিক্ষিত সৈন্য হইল, সৈন্য সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তির্বথা রাজ্যের সীমায় ছোট ছোট রাজারা কতক ভয়ে, কতক লোভে, রুদেলার পক্ষে হইলেন। আরাদ একা কিছুই করিতে পারিতেন না, এমন-কি, হয়ত কোন রাজা তাঁহাকে আশ্রয় পর্য্যন্ত দিতেন না। শুধু যে আরাদের জন্য রুদেলা শিশেরার ন্যায় পরাক্রমশালী নরপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন তাহা নহে। আরাদ দস্যুপতির আশ্রিত মাত্র; রুদেলা তাঁহাকে মনে মনে সম্মানযোগ্য বিবেচনা করিতেন না। আরাদ নিমিত্তমাত্র, যাহারা শুনিল তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন তাহারা সকলেই বুঝিল দস্যুপতি তাঁহার প্রধান সহায়। রুদেলার মনে একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা ছায়ার মত আসিত-যাইত, কিন্তু নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি নিজেই স্থির করিতে পারেন নাই। যদি তিনি জয়ী হন, তাহা হইলে আরাদ রাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন; আর তিনি কি করিবেন? আবার কি দস্যুর মত পরস্ব লুণ্ঠন করিবেন? তাহা হইলে এই সকল রাজাদিগের সহিত সন্ধি করিতেছিলেন কেন? আরাদের আশা পূর্ণ হইলে কৃতজ্ঞতার স্বরূপ তিনি কি করিবেন, রুদেলা সে-কথা কখন ভাবিতেন না। আরাদ ত তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীমাত্র, যেমন ইচ্ছা সেইরূপ নাচাইবেন। কেন তিনি আরাদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন?

পর্ব্বত হইতে সমতলে প্রবাহিত হইলে নদীতে যেমন অপর জলস্রোত আসিয়া মেশে, সেইরূপ রুদেলার সৈন্য-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। রাজা শিশেরার রাজ্যের ভিতর যাইতে হইলে বিশলাম প্রথমে পড়ে, সেখান হইতে রাজ-ধানী আরও কয়েক দিনের পথ। আরাতামা একবার গিয়া দস্যুদিগের পর্ব্বতবাস দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর রুদেলা ও আরাদের সংবাদ দূতমুখে আসিতে লাগিল, কারণ তাঁহারা সৈন্যবল লইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। শিশেরার অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণ একে একে শত্রুপক্ষে মিলিত হইতে লাগিলেন। রাজা শিশেরার সেনাপতি ও মন্ত্রিগণ পরামর্শ দিলেন রাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই শত্রুকে আক্রমণ করা উচিত। কতক সৈন্য রাজ্যের সীমায় ছিল। সেই স্থানে আরও সেনাপ্রেরণ করা স্থির হইল। রাজা স্বয়ং যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন। রাজকন্যা বিশলামে থাকিবেন। নাগরিক সৈন্যগণ গালিমের অধীনে, সেই সঙ্গে কতক সৈন্যও থাকিবে। আরাতামা তাঁহার বিমান লইয়া রাজ্যসীমায় গমন করিবেন। সেই সঙ্গে আরও আকাশযান যাইবে, অল্পসংখ্যক বিশলামে ও কয়েকটি রাজধানীতে থাকিবে।

সৈন্যসংগ্রহ ও যুদ্ধের আয়োজন ছাড়া রুদেলা রাজা শিশেরার রাজ্যে গৃহবিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেছিলেন। নানা-রূপ প্রলোভন দেখাইয়া যদি কতক লোককে রাজার বিপক্ষ করিতে পারা যায়, এবং তাহারা রাজ্যে বাস করিয়াই অনিষ্ট চেষ্টা করে তাহা হইলে দেশের শান্তিভঙ্গের বিশেষ

সুবিধা হইবে ও গৃহশত্রু ও বাহিরের শত্রু একত্রে দমন করা কঠিন হইবে। কাহাকে দিয়া এ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে? আরাদ কিংবা তাঁহার পক্ষীয় কেহ যাইলে অবিলম্বে ধরা পড়িবে। আর কাহাকে পাঠান যাইতে পারে? রুদেলার অধীনে দস্যুনায়কগণের মধ্যে কয়েকজন যথেষ্ট সাহসী, দস্যুপতির এক কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত; কিন্তু এরূপ কাজে সাহস ছাড়া আরও অনেক প্রকার ক্ষমতার আবশ্যক। সে-সকল ক্ষমতা কাহার আছে?

সৈন্যসংখ্যা যেমন বাড়িতে লাগিল, সেইমত রুদেলা স্বতন্ত্র দলে বিভাগ করিতে লাগিলেন। আবশ্যকমত সকল সৈন্য একত্র থাকিত আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইত। দস্যুদের মধ্যে প্রধান কয়েকজন বিশ্বস্ত ও ক্ষমতাশালী। দস্যুসেনার ভার তাহাদের প্রতি ন্যস্ত হইল। যে-সকল নূতন সৈন্য দলভুক্ত হইতে লাগিল তাহাদের তত্ত্বাবধান রুদেলা নিজে করিতেন। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া, শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের শিবির দখল করা, রাত্রে অতর্কিত অবস্থায় শত্রুকর্ত্তৃক আক্রমণ, আত্মরক্ষার শিক্ষা, এইসকল ভার রুদেলার। এ পর্য্যন্ত প্রকৃত যুদ্ধ কোথাও হয় নাই। রাজা শিশেরার রাজ্যসীমায় সৈন্য-সংগ্রহ হইতেছিল, কিন্তু দস্যুসৈন্যকে আক্রমণ করিতে এ পর্য্যন্ত তাহারা অগ্রসর হয় নাই। রুদেলার সৈন্যগণও এখন পর্য্যন্ত রাজা শিশেরার রাজ্যে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু উভয় পক্ষে অবিশ্রান্ত যুদ্ধের আয়োজন হইতেছিল। আরাদ স্বয়ং নিশ্চেষ্ট, কেবল রুদেলার উত্তেজনায় সৈন্যশিবিরে মধ্যে মধ্যে আগমন করিতেন। সকল সময়েই রুদেলা আরাদকে অগ্রবর্ত্তী করিতেন, কারণ সর্ব্বসাধারণের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আরাদ অন্যায় পূর্ব্বক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং নিজের রাজ্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

পর্ব্বতের প্রচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে রুদেলার সৈন্যশিবির পর্য্যন্ত পথ অবারিত ছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইলে সৈন্যগণ অনায়াসে পর্ব্বতের নিভৃত স্থানে পলায়ন করিতে পারিত, কিন্তু শত্রুসৈন্য অনুসরণ করিলে সহজে পর্ব্বতে উপস্থিত হইতে পারিত না, তাহাদের পথে নানা বিঘ্ন-বাধা অত্যন্ত-কৌশলের সহিত প্রস্তুত হইয়াছিল।

ওদিকে রাজা শিশেরার মন্ত্রণাগৃহে পরামর্শ হইতেছিল শত্রুকে প্রথমে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য অথবা তাহাদের আক্রমণের প্রতীক্ষা করা উচিত। মন্ত্রী ও সেনাপতির মতে, যখন কয়েকজন করদ রাজা শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সে অবস্থায় তাঁহারা বৈরিতা আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই, অতএব অপর পক্ষ হইতে যুদ্ধের সূচনা হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। এমন সময় যত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা যাইবে শত্রুর সাহস ও স্পর্দ্ধা ততই বাড়িবে। অতএব ঘোষণাপত্র-দ্বারা অথবা দূতমুখে এই সকল রাজা-দিগকে জানান আবশ্যক যে, যদি তাঁহারা অবিলম্বে শত্রুপক্ষ ত্যাগ না করেন, অথবা আরাদ এবং দস্যুসেনাকে আপ-নাদের রাজ্যে স্থান দেন, তাহা হইলে তাঁহারা রাজ্যচ্যুত হইবেন এবং রাজা শিশেরা তাঁহাদের রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

এই পরামর্শ প্রায় স্থির হইয়াছে, এমন সময় ওবেদার অতিথি-নিবাসে অশ্বারোহণে একজন রত্নবণিক আগমন করিল। ওবেদা দেখিয়া মনে করিলেন, এই অল্পবয়স্ক কিশোরমূর্ত্তি এমন সূক্ষ্ম ব্যবসার কি বুঝিবে। কিন্তু যুবাকে দেখিয়া তাঁহার একটু মায়া হইল, একটু স্নেহ, একটু দরদ, একটু টান। দেখিলে মনে হয়, সৌখীন বিলাসী নব্য যুবা, কিন্তু তেমন বুদ্ধিও নাই, বিশেষ কোন রকম অভিজ্ঞতাও নাই। ওবেদা ঘোড়া তেমন চিনিতেন না, কিন্তু তবু তাঁহার মনে হইল, উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব, তেমন ঘোড়া সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আস্তা-বলে ঘোড়া কোথায় বাঁধা হইল, রত্নবণিক নিজে গিয়া দেখিয়া আসিল।

বণিকের নাম উজাল। আহারাদির পর ওবেদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি এত অল্প বয়সে বাণিজ্য করিতে কোথায় শিখিলে?

উজাল কহিল,—আমরা পুরুষানুক্রমে রত্নের ব্যবসা করি। আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন সেইজন্য আমি বাণিজ্যে বাহির হইয়াছি।

—এখন কি বাণিজ্যের সময়? চারিদিকে যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, দেশ-সুদ্ধ লোক সেই ভাবনা লইয়া ব্যস্ত।

—কোথায় যুদ্ধ, কাহাতে কাহাতে যুদ্ধ?

—তুমি কিছুই শুন নাই?

—আমরা অনেক দূর দেশে থাকি, কোথায় কি হইতেছে কেমন করিয়া জানিব?

—এই দেশের রাজার সহিত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার যুদ্ধ হইবে। রাজ্যের জন্য যুদ্ধ। রাজার ভাই নির্ব্বাসিত, তাঁহাকে অত্যন্ত পরাক্রমশালী একজন দস্যুপতি সাহায্য করিতেছে।

—দস্যুপতি কে?

শুনিতে পাওয়া যায়, সে অত্যন্ত নৃশংসপ্রকৃতি, দুর্দ্দান্ত, কত লুট ও হত্যা করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। দেখিতেও না কি যমদূতের মত, যে দেখে তাহার হৃৎকম্প হয়।

উজাল ভয়ের ভঙ্গী করিয়া কহিল—ভাগ্যে আমি তাহার হাতে পড়ি নাই।

—তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিত? তোমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া তোমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিত।

উজাল অন্য কথা পাড়িল। নগরে কে কে ধনবান, রাজদরবারে কাহার কেমন সম্মান এইরূপ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। ওবেদা অকপটে তাহাকে সকল কথা বলিলেন।

প্রথমে উজাল ফারেজের গৃহে গেল। হাতে একটি ছোট বাক্স। তাহার বেশের পরিপাট্য দেখিয়া ফারেজ মনে করিলেন কোন বিদেশী ধনী দেশ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। অন্য কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার হাতে কি?

—আমি রত্নবণিক, ইহাতে নানাবিধ জহরাত আছে।

অমনি ফারেজের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বণিকে অনেক প্রভেদ। রুক্ষ স্বরে কহিলেন,—আমি কিছু খরিদ করিব না।

উজাল কহিল,—আমি আপনার কাছে কিছু বিক্রয় করিতে আসি নাই। কাহারও আবশ্যক হইলে অর্থ ধার দিয়া থাকি।

ফারেজের অর্থাভাব ক্রমেই বাড়িতেছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে ধার করিতে হইত; তাহাও এখন কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। বাড়ীতে আসিয়া নিজে উপযাচক হইয়া কে এমন ধার দিতে চায়? ফারেজ কহিলেন,—সুদ আপনি বিবেচনা করিয়া দিবেন, আগামী বৎসর যখন আমি আবার এদিকে আসিব সেই সময় দিলেই হইবে। আপনার কত আবশ্যক?

ফারেজের আবশ্যক অনেক, কিন্তু একেবারে অনেক সুদ বেশী না লইলে আমি কিছু ধার লইতে পারি।

চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না। কহিলেন,—দুই শত স্বর্ণমুদ্রা হইলেই চলিবে।

উজাল বাক্স খুলিয়া একটি থলি হইতে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিল। ফারেজ কহিলেন, আমাকে কি বন্ধক রাখিতে হইবে?

—কিছু না। হাতচিঠা দিলেই হইবে।

ফারেজ হাত-চিঠা লিখিয়া দিলেন। তাহার পর অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। উজাল যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করাতে ফারেজ প্রথমে অত্যন্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন, কহিলেন,—আমি কোন পক্ষই অবলম্বন করিব না। রাজা শিশেরা স্ত্রীলোকের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতেই বুঝিতে হইবে তাঁহার সৈন্যবল কিরূপ?

—স্ত্রীলোকের সাহায্য? কি রকম?

—একজন বিদেশিনী এখানে আসিয়াছেন, শুনিতে পাই না কি রাজা ও মন্ত্রী তাঁহার সহিত যুদ্ধের পরামর্শ করেন।

ফারেজের কথার স্বরে বিরক্তি ও ঘৃণা। উজাল ওবেদার নিকট আরাতামার কথা কতক কতক শুনিয়াছিল, কিন্তু ফারেজের বিরক্তির যথার্থ কারণ সে জানিত না। উজাল কহিল,—রাজা যদি স্ত্রীলোকের ভরসা করেন তাহা হইলে তিনি শত্রুকে কেমন করিয়া পরাভব করিবেন?

—আমিও ত তাহাই ভাবি।

—তবে আপনি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন? এমন সময় নিরপেক্ষ থাকা কি সৎপরামর্শ?

—কি করিব? রাজ্য যাহার হয় হইবে আমার তাহাতে কি?

—যদি এ রাজা পরাভূত হন আর নূতন রাজা হন

তাহা হইলে কে স্বপক্ষে কে বিপক্ষে জানিয়া তিনি সেই মত পুরস্কার ও শাস্তি দিবেন।

যাহারা নির্লিপ্ত থাকিবে তাহারা কোন পক্ষেই অপরাধী হইতে পারে না।

—সে-কথা গ্রাম্য ও সাধারণ লোকের পক্ষে খাটে, কিন্তু আপনার মত বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তি একথা কেমন করিয়া বলিবেন?

—আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেন?

—আমি ব্যবসাদার লোক রাজতন্ত্রের কি জানি? তবে যে-রকম বুঝিতেছি তাহাতে রাজা শিশেরা বোধ হয় পরাজিত হইবেন। যদি আপনি গোপনে অন্য পক্ষ অবলম্বন করেন অথচ প্রকাশ্যে কিছু না করেন তাহা হইলেও আপনার লাভ হইতে পারে।

—আর যদি রাজা শিশেরা জয় লাভ করেন করেন?

—তাহা হইলে তিনি কিছুই জানিতে পারিবেন না। আপনিই ত বলিতেছেন কোন বিদেশিনী অপরিচিতা স্ত্রীলোক রাজা শিশেরার প্রধান মন্ত্রদাত্রী। তাহাতে কি শুভফল হইবে?

—যদি এই রাণীকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে আমি অপর পক্ষে যোগ দিতে স্বীকৃত আছি। আমাকে কি করিতে হইবে? আপনি কি অপর পক্ষের কোন সংবাদ রাখেন? তাঁহাদের সহিত আপনার কোন সংস্রব আছে?

—আমি ব্যবসা উপলক্ষে সর্ব্বত্র যাতায়াত করি, কিন্তু রাজধর্ম্ম অথবা যুদ্ধের আমি কি জানি? রাজপুত্র আরাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আপনার কথা বলিব। কিন্তু আমার পরামর্শ যদি গ্রহণ করেন তাহা হইলে এরূপ উদাসীন হইয়া থাকিবেন না।

আমাকে কি করিতে বলেন?

—প্রকাশ্যে আপনি রাজা শিশেরার পক্ষ অবলম্বন করুন। নগর-রক্ষার জন্য যে নাগরিক সৈন্য শিক্ষিত হইতেছে তাহাদের দলে যোগ দিন। তাহা হইলে আপনি অনেক সংবাদ রাখিতে পারিবেন। প্রয়োজন মত সেই সকল কথা আপনি অপর পক্ষকে বলিতে পারিবেন।

—আপনার কথা স্বীকার করিলাম।

—উত্তম। আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। রত্ন বণিক উজাল চলিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ফারেজের গৃহ হইতে উজাল লোবানের গৃহে উপস্থিত হইল। লোবান জহরাত দেখিতে চাহিলেন। উজাল বাক্স খুলিয়া কয়েক খণ্ড হীরক, গোটা কতক বড় বড় চুনি ও কয়েক ছড়া মুক্তার মালা দেখাইল। লোবান দেখিলেন মহামূল্য রত্ন, সাধারণ রত্ন-বণিকদিগের নিকট এমন জহরাত দেখিতে পাওয়া যায় না। লোবান কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—এ সব অত্যন্ত মূল্যবান রত্ন, এই সকল লইয়া দেশ বিদেশে যাইতে আপনার আশঙ্কা বোধ হয় না?

উজাল হাসিয়া কহিল,—আমি যথাসাধ্য সাবধান থাকি। আত্মরক্ষাও করিতে যে না পারি এমন নয়।

তাহার শরীর দেখিয়া লোবান মনে করিলেন, এই দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের নিকট কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি শুধু জহরাত বিক্রয় করেন না খরিদও করেন?

—কেনা-বেচাই আমাদের ব্যবসা। আপনার বিক্রয় করিবার কিছু আছে?

—না, তবে আরাতামা নামে এক জন ধনবতী বিদেশিনী এখানে বাস করেন, শুনিতে পাই তাঁহার অনেক হীরা মুক্তা আছে, মাঝে মাঝে বিক্রয় করেন।

—তাঁহার কাছে যাইব। এই যে যুদ্ধের জনরব শুনিতে পাইতেছি এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

—লোকে যাহা বলে তাহাই শুনি, আর বিশেষ কিছু জানি না।

—এমন সময় কিছু না জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কি বুদ্ধির কাজ?

—আমি বিদেশী, কোন পক্ষেই আমার কোন স্বার্থ নাই। এখানে যদি শান্তিভঙ্গ হয় তাহা হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইব।

—যুদ্ধ আরম্ভ হইলে হয়ত আপনার পক্ষে নগর

পরিত্যাগ করা অসম্ভব হইবে। নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে উভয় পক্ষ হইতেই আশঙ্কা।

—আমার এখানে একটা সামান্য কাজ আছে, শেষ হইলেই এখান হইতে চলিয়া যাইব।

লোবান আর কিছু বলিতে চাহেন না দেখিয়া উজাল আরাতামার বাড়ী গেল। তাহাকে দেখিয়া আরাতামা কিছু বিস্মিত হইলেন। বণিকের পরিপাটী বেশভূষা, তাহার কথাবার্তার ধরণ বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্থায়, আর সে অত্যন্ত সুপুরুষ। সে যথার্থ বণিক কিংবা ছদ্ম বেশে আসিয়াছে তাহাতেও আরাতামার সংশয় হইল। আরাতামা তাহাকে কয়েকবার কটাক্ষে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপর রমণী হইলে হয়ত বিরক্ত হইত, কিন্তু আরাতামা তাহার নিবিড় মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া বরং কিছু আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার রূপের মোহে এই ব্যবসায়বৃত্তিজীবী আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিল।

আরাতামা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার নিবাস কোথায়?

উজাল একটা দূর দেশের নাম করিল।

আরাতামা কহিলেন,—এত দূরে ব্যবসার জন্য আসিয়াছ?

—আমাদের এই পৈত্রিক ব্যবসা। মূল্যবান জহরাত নিজের দেশে সমস্ত বিক্রয় হয় না বলিয়া অনেক দূর দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

—তোমার বয়স ত বেশী নয়, পথে কত রকম ভয়, বহুমূল্য রত্নসমূহ লইয়া দেশভ্রমণ করিতে তোমার আশঙ্কা হয় না?

—যাহার যে ব্যবসা সে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবে?

আরাতামা জহরাত দেখিতে চাহিলেন। উজাল বাক্স খুলিয়া তাঁহাকে সমস্ত দেখাইল। তিনি কয়েকটা অলঙ্কার, কয়েক খণ্ড হীরক হাতে করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—আমি অনেক রত্নবণিকের সামগ্রী দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার জহরাতের তুলনায় সে-সব কিছুই নয়। রাজাদের ঘরেও এমন জিনিস দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমার পিতা বোধ হয় খুব ধনী?

—আমরা পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসা করিয়া আসিতেছি, গ্রাহকদের অনুগ্রহে আমাদের অন্নবস্ত্রের কোন দুঃখ নাই।

—ইহা ত বিষয়ের কথা। আমিও সময়ে সময়ে কিছু হীরামুক্তা বিক্রয় করিয়া থাকি। তুমি দেখিতে চাও?

—যদি দেখান ত অনুগৃহীত হই।

আরাতামা উঠিয়া গেলেন। সেই অবসরে বাঁদী একবার গৃহে প্রবেশ করিল। উজাল কহিল,—তুমি কে? তোমাকে যেন কোথাও দেখিয়াছি।

—আমি এই বাড়ীতে কর্ম্ম করি। হয়ত পথে আমাকে দেখিয়া থাকিবেন।

বাঁদী চলিয়া গেল। তখন উজালের স্মরণ হইল যে, সে যখন লোবানের বাটীতে প্রবেশ করিতেছিল সেই সময় এই স্ত্রীলোক বাটী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

আরাতামা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে তিন চার খানা বড় বড় হীরা। উজালকে বলিলেন,—এই কয়টা আমি বিক্রয় করিতে চাই।

উজাল সেগুলি হাতে লইয়া অনেক ক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। তাহার পর বস্ত্রের মধ্য হইতে একটি ছোট যন্ত্র বাহির করিয়া চক্ষে দিয়া হীরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিল। কহিল,

—আপনি কত চান?

—তুমি কত দিবে?

—এই চারি খণ্ড হীরার ন্যায্য মূল্য দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা।

—আমি এত মনে করি নাই। তুমি এই মূল্যে গ্রহণ করিবে?

আমি লইতে প্রস্তুত। আপনি আমার কোন সামগ্রী পছন্দ করিলেন না?

বড় বড় মুক্তার কাণের দুইটি দুল তুলিয়া আরাতামা কহিলেন,—আমি এ জোড়া লইতে পারি। কত দাম?

—দামের জন্য কিছু আসিয়া যায় না। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় দিবেন। হীরার মূল্য এই এক হাজার মুদ্রা

রাখুন, বাকি কাল আনিয়া দিব। হীরাও এখন আপনার কাছে থাকুক।

—কানের অলঙ্কারের মূল্য না জানিয়া আমি কেমন করিয়া রাখিব ?

—সে-কথা কাল নিষ্পত্তি হইবে। আমি আপনার কাছে আর এক কারণে আসিয়াছি। আমাদের একটা আকাশ-যান আছে, আর-একটা কিনিবার কথা হইতেছে। শুনিয়াছি আপনার বিচিত্র বিমান আছে। সেটা একবার দেখিতে পাই কি ?

—আমার বিমান বিক্রয়ের জন্য নহে।

—তাহা জানি। একবার শুধু দেখিবার অনুমতি চাহিতেছি।

আরাতামা তীক্ষ্ণ কটাক্ষে বার কয়েক উজ্জালের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। এই রত্ন-বণিক যে ধনী তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার আকাশ-যান আছে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন না। তাঁহার বিমানের কথা সকলেই জানিত ; অতএব বণিকের পক্ষে সে-কথা শোনা বিচিত্র নয়। কহিলেন, কাল যখন আসিবে সেই সময় দেখিও।

পর দিবস উজ্জাল অশ্বারোহণে আসিল। বেথর ও নাদির ফটকের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। উজ্জাল ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটা বৃক্ষে অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়া ভিতরে গেল। বেথর ও নাদির অশ্বের নিকট গেল। বিমানচালক হইবার পূর্ব্বে নাদির অশ্বচালক ছিল, সে অশ্ব চিনিত। উজ্জালের অশ্ব দেখিয়া বলিল,—ইহা উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব, এখানে কাহারও কাছে এমন অশ্ব দেখি নাই।

বেথর বলিল,—একজন বণিকের কাছে এমন অশ্ব কেমন করিয়া আসিল ?

—রত্নবণিকেরা ধনবান হয় আর এ ব্যক্তি কত দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছে, কোথাও এই মহা মূল্যবান অশ্ব পাইয়া থাকিবে।

উজ্জাল আরাতামার নিকটে গিয়া বাকি এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা বাহির করিয়া দিল। হীরা কয়েকখানা আরাতামার হাতে ছিল। বণিককে বলিলেন,—কানের অলঙ্কারের যাহা মূল্য হয় ইহা হইতে তুলিয়া লও।

রত্ন-বণিক মুদ্রায় হাত দিল না, কহিল, ফুল জোড়া একবার পরিয়া দেখিলে হইত না ?

আরাতামা হাসিয়া কানে ফুল পরিলেন। সম্মুখে এক-খানা বড় আরসী ছিল ; তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার দেখিলেন। উজ্জাল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অনুমতি হইলে আমি খুলিয়া দিই।

আরাতামা কহিলেন,—কেন, আমি নিজে খুলিতেছি।

—খুলিবার একটা কৌশল আছে, আপনাকে দেখাইতে চাই।

—তবে দাও।

ফুল খুলিতে কিছু বিলম্ব হইল। খুলিয়া উজ্জাল আরাতামার হাতে দিল। তিনি দেখিয়া বলিলেন,—একি ! আমি ত এ ফুল পরি নাই।

উজ্জাল কহিল, ইহাতে কৌশল আছে। এই দেখুন।

ফুল টিপিয়া উজ্জাল দেখাইয়া দিল এক দিকে মুক্তা আর-এক দিকে চুনি। একটা টিপিলে আর-একটা দেখা যায় না।

আরাতামা কহিলেন,—কত মূল্য ?

—পঞ্চাশ মুদ্রা।

সহস্র মুদ্রা হইতে আরাতামা পঞ্চাশ মুদ্রা গণিয়া দিলেন। অবশিষ্ট মুদ্রা তুলিয়া রাখিয়া রত্ন-বণিককে কহিলেন,—আমার বিমান-যন্ত্র দেখিবে চল।

উজ্জালকে সঙ্গে করিয়া যেখানে তালিতা রাখা ছিল আরাতামা সেই স্থানে গমন করিলেন। নাদিব ও বেথর সেই সঙ্গে আসিল। আরাতামা নাদিবকে কহিলেন,—এই রত্ন-বণিককে বিমান দেখাও।

আরাতামা দাঁড়াইয়া রহিলেন। উজ্জাল নাদিবের সঙ্গে সমস্ত দেখিল। সে যেরূপ সূক্ষ্মভাবে সমস্ত দেখিতে লাগিল তাহাতে নাদিবের মনে হইল, এ ব্যক্তি বিমানের যন্ত্র-কৌশল জানে। জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার বিমান আছে ?

—আছে

—তুমি চালাইতে জান ?

—অল্প-স্বল্প জানি। তোমাদের এ যন্ত্রে বিশেষ কোন নূতন কৌশল আছে কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না

—আমিও তাহা জানি না।

—কে জানে?

যাঁহার যন্ত্র তিনি।

বিমান দেখা হইলে নাদিব কহিল,—ইঁহার যে অশ্ব আছে এমন এখানে কাহারও নাই।

আরাতামা কহিলেন,—কোথায়? আমি ত দেখি নাই।

উজ্জাল কহিল,—আসুন, আপনাকে দেখাইতেছি।

ঘোড়া যেখানে বাঁধা ছিল সকলে সেইখানে গেলেন। ঘোড়া দেখিতে খুব বড় নয়, কুমেদ, ক্ষুর সাদা, উত্তম লক্ষণ। আরাতামা নিজেও ঘোড়া কিছু কিছু চিনিতেন, বুঝিলেন এরকম ঘোড়া সহজে পাওয়া যায় না। উজ্জালকে কহিলেন,—ঘোড়া চড়িয়া একবার আমাকে দেখাইবে?

উজ্জাল হাসিয়া কহিল,—আমি জহরাত বিক্রয় করি, ঘোড়া ত বেচি না, কিন্তু আপনি যখন দেখিতে চাহিতেছেন সে-আদেশ লঙ্ঘন করিব না।

রত্ন-বণিক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কহিল,—আপনি অশ্বের বেগ দেখিতে চাহেন?

আরাতামা কহিলেন,—যাহা তোমার অভিরুচি হয় দেখাও।

উজ্জাল দুই চারি বার অশ্বকে সংযত বেগে চালনা করিল। অশ্বপৃষ্ঠে বসিবার ও চালনার ভঙ্গীতেই তাহাকে দক্ষ অশ্বারোহী বিবেচনা হয়। পরে অনেক দূরে অশ্বকে লইয়া গিয়া বেগে ফিরিয়া আসিল। আরাতামার সম্মুখ দিয়া অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে চলিয়া গেল। এমন বেগবান অশ্ব আরাতামা কখন দেখেন নাই।

কটি হইতে উজ্জাল অসি বাহির করিল। নাদিবকে কহিল,—একটা লেবু আনিতে পার?

নাদিব গিয়া একটা লেবু লইয়া আসিল। উজ্জাল কহিল,—তুমি হস্ত প্রসারিত করিয়া এই লেবু হাতে রাখ, অশ্ব দৌড়িবার সময় আমি লেবু কাটিয়া ফেলিব, তোমার হাতে কোন আঘাত লাগিবে না।

নাদিব কহিল,—যদি আমার হাত কাটিয়া যায়?

অল্প হাসিয়া উজ্জাল কহিল, তোমার সে আশঙ্কা হইতে পারে কেন না আমি বণিক, অসিবিদ্যার কি জানি? তুমি লেবু পথের পাশে মাটিতে রাখিয়া দাও।

নাদিব সেইরূপ করিল। উজ্জাল অশ্ব ফিরাইয়া লইয়া কিছু দূর গিয়া বেগে ফিরিয়া আসিল। মুক্ত অসি একবার মাথার উপর ঘুরাইয়া অশ্ব পৃষ্ঠে নমিত হইয়া লেবু দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল।

একখানা রুমাল বাহির করিয়া উজ্জাল বেথরের হাতে দিল। কহিল,—তুমি বলবান, এই রুমালের অগ্রভাগ দৃঢ় করিয়া ধর। আমি অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে এই রুমাল লইব। যদি ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলেও তুমি ছাড়িয়া দিও না।

রুমালের এক অংশ দৃঢ়রূপে ধরিয়া বেথর হাত বাড়াইয়া দিল, রুমালের অবশিষ্ট অংশ তাহার হস্তের নীচে ঝুলিতে লাগিল। উজ্জাল কিছু দূর গিয়া অশ্ব ফিরাইয়া বেথরের অভিমুখে ধাবিত হইল। অত্যন্ত বেগে নয়, ঘোড়া যেরূপ দুল্‌কি চলে সেইরূপ গতি। বেথরের পাশে আসিয়া রুমাল না ধরিয়া তাহার মুষ্টি ধারণ করিল। উজ্জাল কি করিল বেথর কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার অঙ্গুষ্ঠে এরূপ যন্ত্রণা হইল যে, তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল, তখন উজ্জাল তাহার হস্ত হইতে রুমাল টানিয়া লইল। আরাতামার নিকটে গিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া অল্প হাসিয়া কহিল,—আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে। তাহার পর বায়ুবেগে অদৃশ্য হইল।

বেথরের কি হইয়াছিল শুনিয়া আরাতামা স্থির করিলেন, রত্নবণিকের সহিত কোন রহস্য জড়িত আছে। অশ্বারোহণে তাহার পারদর্শিতা, তাহার হস্তের বল, ও কৌশল সামান্য বণিকের পক্ষে অসম্ভব। এই ব্যক্তি কে, কি উদ্দেশ্যে নগরে আসিয়াছে?

চারিদিকে রত্ন-বণিকের অন্বেষণ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

(ক্রমশঃ)

বাংলার আধুনিক চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত বাংলার আধুনিক চিত্রকলার ধারা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পারিপার্শ্বিক বিষয়-সমূহ চিত্রে কম স্থান পাইয়াছে। অনুসন্ধিৎসা বা studyর একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পারিপার্শ্বিক বিষয় হইতে নিজেকে বঞ্চনা করিয়া কল্পিত বিষয় লইয়া অঙ্কন করিয়াছি বলিয়া ইহা ঘটিয়াছে। এজন্য শিল্পীদের কারো কারো ভিতরে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বতন পথে আর চলিতে চান না, নূতন পথ বাহির করিতে চেষ্টিত, কিন্তু সেই পথ আমাদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় নাই।

অবনীন্দ্রনাথ আমাদের গোড়া প্রথম শক্ত করিয়া বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহার আগেকার মত 'ভারতীয় শিল্প'হইতে জানিতে পারি। তখন জাতীয়তা বা re-action-এর যুগ। ইউরোপীয় অনুকরণ হইতে নিজের দেশের দিকে মুখ ফেরান তখন প্রয়োজন। কাজেই তখন একটা খুব রক্ষণশীলতার চেষ্টা ও ভারতীয়তাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস দেখা যায়। আর্টের ভিতর যে সার্ব্বজনীন ভাব আছে, যাহা চৈনিক, জাপানী, ভারতীয়, পারস্য বা ইউরোপীয় যে-কোনো শিল্পরীতির ভিতর পাওয়া যাইতে পারে, সেকথা তখন আমাদের মনে পড়ে নাই। শুক্রাচার্য্য উপদেশ দিয়াছেন, ধ্যানযোগে প্রতিমা গড়িতে হইবে এবং দেবতার মূর্ত্তি গড়িতে হইবে। শুক্রাচার্য্যের সময় কি ছিল জানি না, কিন্তু অষ্টম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে-সকল হিন্দু-ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দেখি, তাহাতে দেবদেবীর মূর্ত্তিই দেখি, মানুষের মূর্ত্তি দেখি না।

এখন করিতে হইবে তার উল্টা। দেবতা আঁকিলে তাহাকে আঁকিতে হইবে মানুষ করিয়া। এখন মানুষ বড়। র‍্যাফেল যেমন মেডোনা ও যীশুকে সাধারণ মানুষ করিয়া আঁকিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে শিল্পীর নিকট দেবতা ও মানুষে প্রভেদ নাই, ব্রাহ্মণ ও মুচিতে তফাৎ নাই। আমরা বলিয়া থাকি, ভারতীয় চিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের ছবি; সেটা অতীতে

শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহাই একমাত্র আদর্শ হইবে না। শিল্পী যদি ডাকাতের ছবিতে ডাকাতের ভাব ভাল ফুটাইতে পারে, তবে তাহা সাধুর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ ছবি হইতে নিকৃষ্ট হইবে কেন? শিল্পীর কাছে হীরা-জিরার প্রভেদ নাই।

জাপানের মনীষী ওকাকুরার একটা উক্তি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন, আর্টের ভিতর ত্রিগুণ বর্ত্তমান —tradition, nature এবং originality অর্থাৎ দেশের জাতীয় রীতি, প্রকৃতি এবং মৌলিকতা। কেবল জাতীয় রীতির অনুবর্ত্তন করিলেই চলিবে না। আশে পাশে প্রকৃতিকে এবং পারিপার্শ্বিক জীবনের ঘটনা-সমূহকে অনুশীলন করিতে হইবে। শিল্পী তার মৌলিকতা দ্বারা

ভিখারীর রাজা
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের পুস্তকের জন্য অঙ্কিত

স্থির করিবে কতটুকু গ্রহণ করিবে কতটুকু বা বর্জ্জন করিবে। পরে নিজের কল্পনার রং মিশাইয়া নিজের সৃষ্টিকে প্রকাশ করিবে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে এক সময় অবস্থা ছিল 'কানু ছাড়া গীত নাই'। আমাদের চিত্রের অবস্থাটাও কতকটা সেরূপ হইয়া পড়িয়াছে। চিত্রের কতকগুলি ধরা-বাঁধা বিষয় এবং অঙ্কন-রীতির একটা বিশেষ ধরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানের এই গতানুগতিক অবস্থার উপর সন্তুষ্ট নহেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতী পরিদর্শন করিতে তিনি যখন প্রথম যান, তখন তাঁহার অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, প্রাচ্য চিত্রকলা-প্রদর্শনী পাঁচ বছরের জন্য বন্ধ থাকা উচিত। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, শিল্পীরা নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না, কিছু দিন প্রদর্শনী বন্ধ থাকিলে হয়ত গতানুগতিক পথ ভুলিয়া যাইবে এবং নূতন পথ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

আমাদের এখন ঝোঁক হওয়া উচিত, আর-একটু জীবন ও প্রকৃতির দিকে। আমাদের শিল্পে এ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল ভাবাত্মক আর্টের যুগ, যেটা হইল ইউরোপীয় অনুকরণশীল আর্টের বিরুদ্ধে re-action বা অভিযান। re-action হইতে যার উৎপত্তি তার ভিতরে ঠিক রূপটি পাই না। আর্টে re-actionএর ভাব মন্দীভূত হইয়া আসিলে তার স্বকীয়রূপ প্রকাশ পায়।

বর্ত্তমানে জীবন ও প্রকৃতিকে আর্টে ফুটাইবার চেষ্টা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের কাজে লক্ষ্য করি—ইহা প্রকৃতির হুবহু নকল নহে, প্রকৃতির সহজ, অনাড়ম্বর ভাবটি প্রকাশ করাই আসল কথা। আমরা প্রকৃতির উপর একটি কষ্টকল্পিত ভাব চাপাইয়া দিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের ভাবটি নষ্ট করিয়া ফেলি। বিষয়টা বোধ হয় পরিষ্কার হইল না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—যেমন রাজপুত চিত্র—ইহাতে realism কিছু নাই, কিন্তু প্রকৃতির প্রকৃতরূপটি আছে। প্রকৃতিকে শিল্পীরা অন্তর দিয়া সহজভাবে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। Perspective না থাকিলেও এবং ছবি flat হইলেও আমরা তাহাতে প্রকৃতির স্বাচ্ছন্দ্য পাইয়া থাকি।

শিষ্যদের নিকট আচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয়কে এই স্বভাবানুবর্ত্তিতার ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছি। রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ বালুকা, ঘাসের লেশমাত্র নেই; তার ভিতরে তালের একটুকরা ছোট্ট পাতা মাথা তুলিয়াছে। বসু মহাশয় বলিতেছেন, "দেখ, একটুকরা সবুজের ফুলকি

নৃত্য

শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

[শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের 'পাথুরে বাঁদর রামদাস' হইতে গৃহীত]

রাজা বাসুকী

শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

[শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের 'পাথুরে বাঁদর রামদাস' হইতে গৃহীত]

মরকত মণির মত জ্বলছে, এই ছোট্ট জিনিষটুকুকে যদি আঁকতে পার এরি দাম লাখো টাকা হ'বে।"

বসু মহাশয়ের আধুনিক চিত্র বর্ষার পোয়ে নাচ* স্বভাবানুবর্ত্তিতার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ। ইহার ভিতর কোনোরকম গতানুগতিকতা নাই। ঈষৎ আন্দোলিত ফুলতনুতে অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গিমা। ইহার ভিতর কোনো রকম অজন্তা, রাজপুত বা মোগল চিত্রের প্রভাব লেশ মাত্র নাই।

সাঁওতাল-জননীর † চিত্রে তিনি নূতনভাব ফুটাইয়াছেন। জননী অবাক হইয়া সদ্যজাত শিশুকে দেখিতেছে। জননীর মুখে কেবল জননীর ভাব নয়, শিল্পীর মতই যেন তার নূতন সৃষ্টিকে দেখিতেছে। সাঁওতাল-জননী অজন্তার কোনো ব্যক্তি নন, কৃষ্ণের মাতা যশোদা নন, চর্ম্ম-চক্ষে সর্ব্বসাধারণের গৃহে এমন দেখিতে পাই, অথচ ইহার ভিতরেই জননীর শাশ্বতরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শান্তিনিকেতন-কলাভবনের শিক্ষাকেন্দ্র উন্মুক্ত প্রান্তরে স্থাপিত বলিয়া সেখানকার শিল্পীদের উপর নিসর্গের প্রভাব বেশী পড়িয়াছে। পল্লীগ্রামের জীবনযাত্রার ছবি তাহাদের অনেক চিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজীতে যাকে বলে Local colour, তাহা অনেক চিত্রে পাই।

এই নূতন ধারা প্রকাশ পাইয়াছে বিশেষ করিয়া কলাভবনের শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাজে। কলাভবনের শিল্পীদের ভিতর তিনিই গুরুর কৌশল ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম দলের শিষ্যদের ভিতর অনেকেই দেশে বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; নূতন দলের ভিতরেও অনেকে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে।

প্রবাসীর পাঠকদের নিকট এই নূতন দলের একজন শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কাজের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। আমাদের শিল্পীদের কাজে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব বড় বেশী করিয়া অনুভূত হয়। রমেন্দ্রনাথের কাজ সম্বন্ধে বলিতে পারি, তাঁর একটা distinct character বা ব্যক্তিত্ব আছে।

আর এক কারণে এই শিল্পীর পরিচয় দিতে পারি। তিনি বাংলার বাহিরে একটি শিক্ষা-কেন্দ্রের ভারতীয় চিত্রকলার অধ্যাপকতা করিতেছেন। প্রবাসী পত্রিকা বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। কাজেই আশা করি, এই শিল্পীর পরিচয় এখানে অনর্থক হইবে না। রমেন্দ্রবাবু এখন অন্ধ্র প্রদেশে মছলিপট্টমে জাতীয় কলাশালার ভারতীয় চিত্রকলার পরিচালক। পূর্ব্বে এই কাজে শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। তিনি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া বরোদার কলাভবনে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করিলে, রমেনবাবু সেকাজে নিযুক্ত হন।

ভিখারী রাজ-জামাতা
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের পুস্তকের জন্য অঙ্কিত

রমেনবাবুর শিক্ষা প্রথম কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট

* মূল চিত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধিকারে।
† মূল চিত্র শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর অধিকারে (পুরুলিয়া)।

স্কুলে আরম্ভ হয়। দুই বছরে তিনি সেখানকার পাঁচ বছরের পাঠ্য সমাপ্ত করেন, পরে কলাভবনে যোগ দেন।

কলাভবনের তদানীন্তন পরিচালক, বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় উভয়েই কলাভবনে শিক্ষা দিতেন। অধ্যাপকেরা ছাত্রদের সঙ্গেই শিক্ষা করেন বলিয়া চিত্রের সকল নিয়ম-

পারুল
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের পুস্তকের জন্য অঙ্কিত

প্রণালী জানার সুবিধা হয়। শান্তিনিকেতনে নানা উৎসবে, নাট্যাভিনয়ে সাজ-সজ্জা করিতে হয় বলিয়া রুচিও মার্জ্জিত হয়। আর্টিষ্টরা প্রতি বৎসর দল বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হয়। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় সঙ্গে থাকেন এবং সামনে যাহা কিছু ভাল টুকিয়া রাখিতে উৎসাহ দেন। এই রকমে প্রকৃতিকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়।

রমেনবাবুর কাজের ভিতর ভ্রমণের প্রভাব খুব বেশী করিয়া দেখা যায়। তাঁহার অধিকাংশ genre painting তাঁহার ভ্রমণ এবং স্কেচ করার অভ্যাস হইতে প্রভাবিত হইয়াছে। ৬ বৎসর কাল কলাভবনে থাকার কালে পুরী, কোনারক, বিহার অঞ্চল—গয়া, পাটনা, রাজগৃহ, নালন্দা প্রভৃতি এবং বদরিকাশ্রম (হিমালয়), আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী, মথুরা, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসেন। তিনি একা উত্তর ভারতে দিল্লী, জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর, আজমীর, জব্বলপুর, কাশী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ, আউরঙ্গাবাদ, অজন্তা ও ইলোরার গুহাবলী ইনি দেখিয়াছেন; মান্দ্রাজ, মাদুরা ভ্রমণ করিয়াছেন। সিংহলও বাদ পড়ে নাই। সিংহলে প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তি সকল রহিয়াছে অনুরাধাপুর, সিগি-রিয়া গোলানারুয়াতে, কাণ্ডিতে, ফ্রেস্কোচিত্র, ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন রহিয়াছে।

তিনি নিজের ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

"একা একা ঘুরিয়া ধর্ম্মশালায় থাকিয়া সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিয়া এসমস্ত ভ্রমণে যথেষ্ট study হইয়াছে। স্কেচবুকে অনেক কিছু টুকিয়া রাখিয়াছি। পর্ব্বত, ঝরণা, হ্রদ, সমতল ভূমি, সমুদ্র, নদী ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়াছি। এখন কেবল তাহারা আমার নিকট কল্পনার বস্তু নয়।"

যে-কোনো দেশের শিল্পীদের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে ভ্রমণ করিয়াছে।

মছলিপট্টমে অধ্যাপনা সম্বন্ধে রমেনবাবু লিখিয়াছেন,

"ছেলেদের মধ্যে আর্ট-এর সহজ এবং চিরন্তন রূপটি যাহাতে ধরা দেয় সেদিকে আমি লক্ষ্য রাখিতেছি। তাহাদের চারিদিকে যাহা-কিছু ঘটিতেছে, তাহারা যাহার ভিতর মানুষ, তাহাই যেন তাহাদের কাজের ভিতর প্রকাশ পায়। নূতন কিছু দেখিলেই তাহা টুকিয়া রাখিতে বলি। এমন ভাবে তাহারা আজকাল বেশ নিজেই দেখিতে শিখিতেছে।"

রমেনবাবুর শিক্ষার প্রণালী ইহা হইতে বুঝা যাইবে। রমেনবাবুর শিক্ষাধীনে চমৎকার একটি 'শিক্ষাকেন্দ্র

ড়িয়া উঠিতেছে। ইহা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, ছাত্রদের কাজে আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। ২০।২৫টি ছাত্র অনন্যমনা হইয়া কাজ করিতেছে। ইহারা নিশ্চয় রমেনবাবুর গৌরবের বিষয়। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় আমাকে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন, "রমেন আমার মুখ রক্ষা করেছে, অবনীবাবু যখন আশ্রমে এসেছিলেন

ধান-ভানা

তখন আমায় বলেছিলেন, আমার গুরুদক্ষিণা চাই। বুঝি বা আমার গুরুদক্ষিণা শোধ হ'ল, তবে তার প্রতিপত্তি হ'লেই সাধারণে মান্‌বে।"

রমেনবাবুর কাজ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিতে হয়। তিনি শুধু শিল্পী নন; কারিগরও (Crafts-man) বটেন। তাঁর ছবিতে craftsman'এর কারিগরি পাই, এবং craftsman-এর যে কাজ তাতে আর্টের ব্যাপকতা পাই। শিল্পীর যেমন সুন্দরীর মুখ আঁকিতে দরদের প্রয়োজন তেম্‌নি কারিগরের সুন্দরীর গহনা প্রস্তুত করিতেও দরদের প্রয়োজন। কারিগর যখন আর্টিষ্ট তখনই তাহার কাজ ভাল হয়, নহিলে তাহা মামুলী ধরণের হইয়া পড়ে। আর্টিষ্টের কাজেও যখন কারিগরি থাকে তখন তাহা নয়নগ্রাহী হয়।

আমাদের আর্টিষ্টরা যদি crafts এর প্রতি যত্ন লইতে শিখেন, তবে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের আর্টের দুর্গতি হইতে উদ্ধার পাইবার পথ সুগম হইবে।

আমাদের আর্টিষ্টদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ই প্রথম কারিগরির প্রতি যত্ন দেখান। তিনি কারিগরির কোনো বিশেষ কাজ দেক্ষ না হইলেও নানা রকম কাজে নিজের হাতে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজের হাতে চিত্রিত একটি ছোট কৌটা লইয়া আমাকে একদিন বলিতেছিলেন, "এই ছোট্ট জিনিষটি একটা ছবির চাইতে কম কেন হ'বে? যত্ন চাই দরদ চাই, যে কোন কাজই হোক্ না, তাতে যদি যত্ন ও দরদ থাকে, তা সুন্দর হ'বেই, এর ভিতরেই সব পাবে। এই যে ছোট্ট কৌটা এরি দাম অনেক।"

বসু মহাশয়ের এই গুণটি তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে যদি কেহ পাইয়া থাকেন তবে রমেনবাবু বিশেষ ভাবে পাইয়াছেন।

রমেনবাবু লিথোগ্রাফ ও উডকাটে সিদ্ধহস্ত শিল্পী। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় বিলাত হইতে লিথোগ্রাফ শিক্ষা করিয়া আসিলে, রমেন্দ্রবাবু তাঁহার নিকট শিক্ষা পান। পরিশেষে শিল্পী মাদাম্ আঁদ্রে কার্পেলের নিকট উডকাট চর্চ্চা সুরু করেন, পরে নিজে নিজেই এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করেন। তিনি রঙীন ছবিও ছাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এখনও এ-সব কাজের আদর করিতে শিখি নাই। এসব কাজে যারা ওস্তাদ তাদের ছাপা ছবি ইউরোপে তৈল-চিত্রের সমান মূল্য দিয়া থাকে। ইউরোপে এচিং বা তামার পাতে ছাপা ছবির মূল্য অনেক। শিল্পীসমালোচকগণ এসব সংগ্রহ করিয়া থাকেন। শিল্পী শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে A. R. C. A. ইংলণ্ডে এচিংয়ের জন্য সম্মান লাভ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে রমেন্দ্র-বাবুর উডকাট্ সম্বন্ধে বলিতে পারি। তিনি যদি উৎসাহ পান, আমাদের দেশ হইতে দে মহাশয়ের ন্যায় তিনিও একাজে যশোলাভ করিতে পারেন। তাঁহার প্রস্তুত কয়েকটি লিথোগ্রাফ ও উডকাটের নমুনা দেওয়া গেল। যিনি সমঝ্‌দার তিনিই ইহার মূল্য বুঝিবেন। 'শিবের বিবাহ' শীর্ষক কয়েকটি চিত্রে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উডকাটের খোঁজ কেহই রাখেন না।

আমরা অনেক সময় দেশের যুবকদের সামর্থ্যের অভাবের। উল্লেখ করি, কিন্তু যখন কারো সামর্থ্য দেখা যায়, তাহাকে

বনের ছায়ায়

সাহায্য করিতে অগ্রসর হই না। রমেন্দ্রবাবু উডকাটের জন্য কারো কাছে বিশেষভাবে শিক্ষা পান নাই, নিজের চেষ্টাতেই শিখিয়াছেন। তিনি যদি জাপানে গিয়া ভাল ভাবে শিক্ষা করিতে পারেন, তবে আমাদের দেশে একটি নূতন শিল্প সৃষ্টি করিতে অগ্রণী হইতে পারেন। আমাদের ভিতর শক্তির অঙ্কুর রহিয়াছে, কিন্তু জলসেচন করে কে?

রমেনবাবুর চিত্র সম্বন্ধে অনেক কাগজে, ইংলিশ টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতিতে সমালোচনা বাহির হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহোদয় ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। বিলাতের ও প্যারিসের কোনো কোনো নামজাদা Engraver তাঁহার উডকাটের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে।

মহীশূরের আর্ট গেলারীতে তাঁহার দুই খানা ছবি রহিয়াছে। আমেরিকাতেও তাঁহার ছবি বিক্রয় হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ডেও একখানা ছবি গিয়াছে।

ভারতবর্ষের নানা কাগজে রমেন্দ্রবাবুর ছবি ছাপা হইয়াছে। ইটালীতে এক কাগজে রবীন্দ্রনাথের এক বক্তৃতা বাহির হইয়াছিল, তাহার উপরে রমেন্দ্র-বাবুর 'শালবীথি' নামে একটা Sketch খুব বড় করিয়া ছাপাইয়াছিল।

জাপানে রবীন্দ্রনাথের গোরার যে অনুবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে রমেন্দ্রবাবুর এক ছবি বাহির হইয়াছে।

রমা রলাঁর ষাট বৎসর বয়ক্রম উপলক্ষে জার্ম্মানীতে এক পুস্তক বাহির হয় তাহাতে জগতের সকল মনীষীরা তাঁহাদের লেখা উপহার দিয়াছিলেন, ইউরোপীয় আর্টিষ্টদের কয়েকটি স্কেচ্ ছিল, আর ভারতবর্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এবং রমেন্দ্রবাবুর চিত্র ছিল। রমেন্দ্রবাবুর বিষয় ছিল 'বাংলার গ্রাম্য জীবন'—কালীর কাজ। ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

রমেন্দ্র-বাবুর প্রতিভা বহুমুখী—পুস্তক-চিত্রাঙ্কণে তিনি একটা নূতন ভঙ্গী দিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীযুক্ত তপনমোহন চাটার্জ্জি বিলাতে বালকদের জন্ত একটি গল্পের পুস্তক ছাপাইতেছেন, ইহা রমেন্দ্রবাবুর চিত্রিত। Laurene Benion প্রভৃতি মনীষীরা এই চিত্রাঙ্কণ দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কয়েকটি পুস্তক-চিত্রাঙ্কণ এই সঙ্গে দেওয়া গেল। ইহার অনেকগুলি শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের 'পাথুরে বাঁদর রামদাস' পুস্তকে বাহির হইবে। আজকাল কলিকাতায় অনেকে পুস্তক-চিত্রাঙ্কণ করিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা কেবল পুস্তক-চিত্রাঙ্কণই আছে এবং Commercial artএর কোঠায় পড়ে। রমেন্দ্রবাবুর চিত্র কেবল পুস্তক-চিত্রাঙ্কণ নয়, ইহা অনেক উন্নতশ্রেণীর এবং আর্টের কোঠায় পড়ে।

তাঁহার শাদা কালো সুষমা, রেখার সাবলীল গতি এবং ছন্দ, অর্ণামেণ্টাল কম্পোজিসন এবং সর্ব্বোপরি সরলতা ও সংযম অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করে। তিনি বুদ্ধের জীবন হইতে এক সেট চিত্র আঁকিয়াছেন। এগুলি এলবাম আকারে প্রকাশিত হইলে অতিশয় সুন্দর জিনিষ হইবে।

তাঁহার বড় বড় রঙীন ছবিতেও এসব গুণাবলী রহিয়াছে। তাঁহার কাজের ভিতর simplicity এবং sincerity বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। আর বিষয়-নির্ব্বাচনেও খুব মৌলিকতা। পৌরাণিক চিত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেও তিনি প্রধানত গ্রাম্য জীবনের ছবিতে বেশী আনন্দ পাইয়া থাকেন। একটি একটি ছবি যেন এক একটি idyll।

পৌরাণিক চিত্রের ভিতর বেশী বিখ্যাত 'মহাদেবের 'বিবাহ'। রাজা রামস্বামী মুদেলিয়ার ইহা ক্রয় করিয়াছেন। এই চিত্র পরে আবার কুচবিহারের মহারাণীর জন্ত করিতে হইয়াছিল।

মহাদেব বৃষবাহনে আকাশপথে চলিয়াছেন, শিঙ্গা বাজাইতেছেন। শরতের পুঞ্জীভূত মেঘ। রমণীগণ পুষ্পসম্ভার এবং পুষ্পমাল্য বহন করিয়া চলিয়াছে। অগ্রে অগ্রে এক ভৃত্য শঙ্খ বাজাইয়া পথে শিবের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিতেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রাসাদের চূড়া দেখা যাইতেছে; এই সকল বোধ হয় যক্ষ, গন্ধর্ব্বদের ভবন হইবে।

এই চিত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন,
ও গো মরণ, হে মোর মরণ;
তাঁর কতমতো ছিলো আয়োজন,
ছিলো কত শত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি' রহি' গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি' জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তার ববম্ ববম্ বাজে গাল,
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তার বিষাণে ফুকারি' উঠে তান,
ও গো মরণ, হে মোর মরণ॥

এই চিত্র যতই ভাল হোক না কেন শিল্পীর গ্রাম্য-জীবনের চিত্রের ভিতর যে-মাধুর্য্য, যে-মোহ দেখি এই চিত্রে তাহা পাই না, ইহাতে বিশেষ ভাবে দেখি শিল্পীর কৌশল।

সরাইখানা—বদরিনারায়ণের পথে কাঠের বাড়ী। যাত্রীরা সব ভিতরে জটলা করিয়া বসিয়া আছে। ছোট কুঠরী, সরু বারান্দা, হাল্কা বাড়ী, কাদার প্রলেপ। ভিতরটা মনে হইতেছে ইংরেজিতে যাকে বলে cosy। শিল্পীর যেন কাদার রংয়ের ওপর একটু দরদ আছে। বহু যত্ন করিয়া কাঠের বেড়ার উপর গোবর মাটির প্রলেপ। (মূল চিত্রটি Scotlandএ আছে। অধ্যাপক গেডিসের পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।)

পুষ্পপ্রদীপ—গোলাপ গাছ, তার পুষ্পপ্রদীপ জ্বালাইয়া আকাশে আরতি দিতেছে। পিছনে কতকগুলি কুটীর গোরুর গাড়ী চলিয়াছে গ্রামের পথ দিয়া। চাকার পিছনে ধূলা উড়িতেছে; উঁচু নীচ পথ, মাটির ঢিবি।

ঝুলন—এক ফোঁটা একটুখানি মেয়ে। প্রকাণ্ড বড় বট গাছের ডালে দোলনা বাঁধা মেয়েটি দুলিতেছে। গাছের সরু সরু ডালগুলি নীচের দিকে ঝুলিয়া আছে। গাছের বল্কলের বক্র রেখায় রেখায় কম্পনের অঙ্কন। পত্রপুঞ্জের নীচে বিরল ঘাস, বালুকার উপর কম্পনের শিহরণ। (মূল চিত্র শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের অধিকারে)।

* মহাদেবের বিবাহ ও পুষ্পপ্রদীপ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইংরেজি পঠন-সাহিত্যের নূতন ধারা*

অধ্যাপক শ্রী গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসমর সমগ্র বিশ্বে এক নূতন যুগের উষার আলোক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কর্ম্মতৎপরতার সকল বিভাগেই আমাদের আত্মা সচেতন ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য-স্রষ্টাদের ও শিক্ষা-সংস্কারকদিগের চিন্তার ধারা নূতন পথ আশ্রয় করিয়াছে এবং ইঁহাদের কর্ম্মচেষ্টার ফলে ইংরেজি পঠন-সাহিত্য নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে।

ব্যয়-সঙ্কোচ এবং আরোহীবর্গের সুখ-সুবিধার প্রাচুর্য্যই "মোটরকার" ইত্যাদি শিল্প-যানের গঠন-প্রণালীর পরম ও চরম উদ্দেশ্য। শিল্পকলায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমাত্র ব্যবহারিক উপযোগিতাকে আদর্শ করিয়াই শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়াছেন। তজ্জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন, অকুণ্ঠিত চিত্তে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন এবং কায়িক শ্রমে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিতেছেন না। যাহা শিল্প-বিভাগে সত্য, তাহা সাহিত্য-বিভাগেও সত্য। শ্রম-শিল্প বিভাগে ব্যবহারিক উপযোগিতা ও লৌকিক আবশ্যকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেরূপ উন্নতি ও সংস্কার সাধন সার্থক ও অব্যর্থ করিয়া তোলা হয়, সাহিত্য-বিভাগেও ঠিক তাই। এই ভাবের অনুশাসনে ইংরেজি পঠন-সাহিত্য কিরূপে গঠিত হইয়া উঠিতেছে দেখা যাউক। লৌকিক বা ব্যবহারিক উপযোগিতাই সাহিত্যের গঠন-প্রণালীর ভিত্তি-ভূমি। প্রাথমিক পঠন-পুস্তকের সহিত শিশুর যখন প্রথম পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহার বর্ণ পরিচয় হয় নাই। এই ব্যাপার শিশুর পক্ষে যেমন দুরূহ তেমনই নীরস। সুতরাং এই কষ্টসাধ্য ব্যাপার শিশুর পক্ষে শুধু প্রীতিকর করিলেই যে শিক্ষকের কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইল তাহা নহে। বর্ণপরিচয় ব্যাপারটি এরূপ ভাবে ব্যবস্থিত করিতে হইবে যেন শিশু প্রয়াস প্রয়োগ করিবার ফলে আত্ম-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। তাহা হইলেই অনুষ্ঠিত কার্য্যে শিশুর ব্যগ্রতা আত্ম-প্রকাশ করিতে থাকিবে।

শব্দ-পরিচয়ের পূর্ব্বে ২৬টি বর্ণের সহিত পরিচিত হওয়াই চিরাচরিত বিধি। এই প্রণালী যেমন অপ্রীতিকর তেমনই উৎসাহের অন্তরায়। প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়াও উক্ত প্রণালী সমর্থনযোগ্য নহে। সকল বর্ণের উপ-যোগিতা সমান নহে। T এবং E বর্ণের আবশ্যকতা যত Z বর্ণের আবশ্যকতা তদনুপাতে উল্লেখযোগ্যই নহে। যে-কোনও পঠন-পুস্তক লইয়া পড়িতে থাকুন, অনেকগুলি পংক্তি পড়িলেও Z বর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। পক্ষান্তরে এক পংক্তি পড়িতে গেলে T ও E বর্ণের সহিত বহু বার সাক্ষাৎ হইবে। সুতরাং যে-সকল অক্ষরের প্রয়োজনীয়তা বা ব্যবহার যত বেশী সেই-সকল অক্ষরের পরিচয় ব্যবস্থা তত সত্বর করা আবশ্যক। আর যে যে বর্ণের সহিত যখনই পরিচয় ঘটিবে সেই সেই বর্ণের সাহায্যে গঠিত এবং ব্যবহারিক ভাবে উপযোগী শব্দের সহিতও তখনই পরিচয় স্থাপন করিতে হইবে। ফলে প্রথম শিক্ষার্থী শিশু বলিতে গেলে প্রথম পাঠ হইতেই ব্যবহারিক ভাবে উপযোগী শব্দ ও বাক্যের সহিত পরিচিত হইতে সমর্থ হইবে। বর্ণের পক্ষে যে উক্তি সত্য শব্দের পক্ষেও সেই উক্তি ঠিক সেই পরিমাণে সত্য।

সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, শব্দের উপযোগিতা এবং আবশ্যকতার তারতম্য আছে। কোন কোন শব্দের ব্যবহারের যেমন বাহুল্য তেমনই উহাদের উপযোগিতারও আধিক্য। The, he, it, is প্রভৃতি শব্দের বাহুল্য ও উপযোগিতা অবিসংবাদিত। ইংরেজি পড়িতে বা বলিতে গেলে প্রতি কথায়ই উল্লিখিত শব্দগুলির প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ এবং ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ ও ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত তাঁহারাও অনেকে হয়ত onyx, rebus, haberdasher, gwyniad,

* সাহিত্য পরিষদের কুমিল্লা শাখার বিশেষ অধিবেশনে পঠিত

primum, mobile প্রভৃতি শব্দের সহিত অপরিচিত থাকিতে পারেন। শিশুর শব্দ-সম্পদ স্বভাবতই নিতান্ত সীমাবদ্ধ। এই কারণে শিশুর পক্ষে যে-সকল শব্দের সহিত পরিচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত সেইসকল শব্দের নির্ব্বাচন-কালে ইহাদের প্রয়োগ-বাহুল্যের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। যদি এই উক্তি স্বীকার্য্য হয় তাহা হইলে প্রাথমিক পঠন-পুস্তকের রচনা-ব্যাপারে শব্দ নির্ব্বাচন-কালে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণীয়। যে সকল শব্দের ব্যবহারের প্রাচুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সর্ব্বপ্রথম সেইসকল শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, তৎপরে যে-সকল শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য তদপেক্ষা কম সেই-সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপে প্রাচুর্য্য ও উপযোগিতার ক্রমানুসারে শব্দ-নির্ব্বাচন-কার্য্য পরিচালিত হইতে থাকিবে। ফলে পঠন-সাহিত্যর বিভিন্ন স্তরে পাঠার্থী তদধিগত শব্দ-সম্পদের পরিমাণানুসারে উক্ত স্তরের পক্ষে সম্ভবপর উচ্চতম কথন ও পঠন শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে যে-সকল পঠন-পুস্তক প্রচলিত আছে সেইসকল পুস্তকের গঠন-প্রণালী উল্লিখিত বিজ্ঞান-সম্মত তথ্যের অনুকূল নহে। যে কোনও সাহিত্য-পুস্তক লইয়া পরীক্ষা করুন। পাঠার্থী যখন কোনও নূতন পাঠ অধিগত করিতে সচেষ্ট হয় তখন অপরিচিত শব্দের সহিত পরিচয় স্থাপন তাহার প্রথম কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ শব্দ তাহার অপরিচিত? যদি প্রতি স্তরের শব্দ-সম্পদের পূর্ণ তালিকা নির্দ্দিষ্ট না থাকে তাহা হইলে অপরিচিত শব্দ বাছিয়া লওয়ার উপায় নাই। প্রথম স্তরে শিশু যদি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট শব্দ আয়ত্ত করিয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় স্তরে তাহার অপরিচিত শব্দ বাছিয়া লওয়া কষ্ট-সাধ্য নহে। সেইরূপ দ্বিতীয় স্তরের নির্দ্দিষ্ট শব্দ-সম্পদের সহিত পরিচিত থাকিলে তৃতীয় স্তরে নূতন ও অপরিচিত শব্দ সহজে বাছিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু যদি পঠন-সাহিত্য উল্লিখিত তত্ত্ব অগ্রাহ্য করিয়া রচিত হয় তাহা হইলে শিক্ষক অযথা সময় নষ্ট করিতে বাধ্য হন। শুধু তাঁহার সময়ই যে নষ্ট হয় তাহা নহে, শিক্ষার্থীর সময়ও নষ্ট হইয়া থাকে। মনে করুন, শিক্ষক যে-শব্দ পাঠার্থীর অপরিচিত বলিয়া অনুমান করিয়া শিক্ষা দিতে অগ্রসর হন সেই শব্দ পাঠার্থীর পরিচিত হইতে পারে—কতিপয় পাঠার্থী উক্ত শব্দের সহিত পরিচিত থাকিতে পারে, আবার কতিপয় পাঠার্থীর নিকট উক্ত শব্দ অপরিচিতও থাকিতে পারে। সুতরাং পঠন-সাহিত্যের গঠন-ব্যাপারে উক্ত তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রতিপাঠে যে শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হইল সেই শব্দটি ভিন্ন ভাবে মুদ্রিত করিয়া তৎ-প্রতি পাঠার্থীদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত অভিপ্রেত। শুধু ইহা করিলেই যথেষ্ট হইল না। প্রতি পাঠের শীর্ষদেশে উক্ত পাঠে সন্নিবিষ্ট নূতন শব্দ-সমূহের তালিকা সংযোজিত করিতে হইবে। উল্লিখিত তালিকায় প্রত্যেক শব্দের বাংলা অর্থও লিখিত থাকিবে। যদি কোনও শব্দ বিভিন্ন অর্থে পরবর্ত্তী পাঠে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই পাঠের শীর্ষদেশে প্রবর্ত্তিত শব্দতালিকায় পরিবর্ত্তিত অর্থ সহ উক্ত শব্দের উল্লেখ করিতে হইবে।

যে-সকল শব্দের উচ্চারণে বিশেষত্ব আছে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যও কোন সরল কৌশল ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। নব প্রণালীতে রচিত প্রত্যেক পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে উক্ত পুস্তক এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকসমূহে যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেইসকল শব্দের তালিকা সংযোজিত থাকিবে এবং কোন্ কোন্ শব্দ কোন্ পুস্তকে এবং কোন্ পাঠে সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে তাহারও আভাস থাকিবে।

উচ্চারণ সম্বন্ধেও দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, ওয়েলস্ প্রভৃতি দেশের ভাষা ইংরেজি হইলেও সেই সকল দেশের লোকের উচ্চারণ খাঁটি ইংরেজের উচ্চারণ প্রণালী হইতে অনেক বিভিন্ন। বরং বাঙ্গালীর উচ্চারণ আদর্শ উচ্চারণের অনেকটা নিকটবর্ত্তী। তথাপি খাঁটি ইংরেজ উল্লিখিত দেশের অধিবাসীদিগের কথা বাঙ্গালীর কথা অপেক্ষা সহজে বুঝিতে পারে। তাহার প্রথম কারণ কথনভঙ্গী (বা intonation); দ্বিতীয় কারণ শব্দসঙ্গীত (বা rhythm)। বাঙ্গালীকে ইংরেজের মত ইংরেজি বলিতে হইবে একথা আমি বলিতেছি না; ইহা অসম্ভব না হইলেও স্বাভাবিক নহে। তবে যাহাদিগকে ইংরেজকে

ইংরেজ কিম্বা ইংরেজি ভাষা ভাষীর নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে হইবে তাহাদিগকে এরূপ ভাবে উচ্চারণ ব্যাপারে অভিজ্ঞ হইতে হইবে যেন তাহাদিগের উচ্চারণ বিনা আয়াসে শ্রোতার বোধগম্য হয়, এবং অপর বক্তার কথাও তাহাদিগের বুঝিবার পক্ষে অসম্ভব হইয়া না দাঁড়ায়। সুতরাং বিশুদ্ধ উচ্চারণ, কথন-প্রণালী এবং শব্দসঙ্গীত (rhythm) এই ত্রিবিধ বিষয় প্রথম হইতে অগ্রাহ্য করিলে পঠন-সাহিত্যে কৃতিত্বলাভ সম্ভব হইবে না।

সকলেই জানেন ইংরেজি বর্ণের ধ্বনি, ও শব্দগঠনে সেই বর্ণের ব্যবহার, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভূত অসামঞ্জস্য রহিয়াছে। Cat শব্দ উক্ত অসামঞ্জস্যের এক দৃষ্টান্ত। ইহা ছাড়া ধ্বনি-বিজ্ঞানেও (phonetics) ইংরেজি শব্দের উচ্চারণে অসামঞ্জস্যের অভাব নাই। Put, cut, ought rough, drought প্রভৃতি শব্দ উক্ত অসামঞ্জস্যের উদাহরণ। ইহার মধ্যে আবার অনুচ্চারিত বর্ণও ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যথা, caught প্রথম হইতে পাঠার্থী যাহাতে অল্প আয়াসে উচ্চারণ শিখিতে পারে তজ্জন্য যে-স্থলে শব্দ বিশেষের উচ্চারণ জটিল সে-স্থলে বর্ণবিশেষের নীচে সংখ্যা ব্যবহার করিয়া উচ্চারণ-শিক্ষার সাহায্য করা সম্ভব। উল্লিখিত বিষয়ের পরীক্ষা পরিচালনার ফলে এগারটি সরল চিহ্ন ব্যবহার দ্বারা উচ্চারণ শিক্ষা অনেকটা সহজ করিয়া তোলা হইয়াছে। নয় দশ বৎসরের শিশু শিক্ষার ফলে উক্ত সংখ্যা ও চিহ্ন ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় (১)।

নূতন শব্দের ব্যবহার বিধির আভাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এইসকল নূতন শব্দ কোনও বর্ণনা বা গল্পের প্রথম ভাগেই যদি পুঞ্জবদ্ধ ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে পাঠার্থীকে বাধ্য হইয়া একসঙ্গে কতকগুলি শব্দের অর্থ শিখিতে হইবে। ইহাতে পঠন-ক্রিয়া অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইবে, একটা মানসিক বিরক্তি (বা boredom) দেখা দিবে। সুতরাং শব্দবিন্যাস এরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যেন পরিচিত ৪৫-৫০টি চলিত শব্দের মধ্যে একটি নূতন শব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে তিনটির বেশী নূতন শব্দের ব্যবহার করিলে পঠন-ব্যাপার অনেকটা ব্যাহত হইয়া থাকে। আবার নূতন শব্দের শিক্ষা-প্রণালীর প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। অসংশ্লিষ্ট ভাবে নূতন শব্দ শিক্ষা করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের যোগে ব্যবহার মূলে নূতন শব্দ শিক্ষা করিতে হয়। আবার একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহার করিলে উক্ত শব্দের প্রয়োগ-বিধি শিশুর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। সুতরাং যখন কোনও শব্দ সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় তখন ভাষার সৌন্দর্য্য ও রচনার লালিত্য নষ্ট না করিয়া উক্ত শব্দ এক এক অনুচ্ছেদে যথাসম্ভব কয়েকবার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা উচিত।(২) তিনবার ব্যবহার

---

(২) Awoke (নূতন শব্দ) :—The king's son kissed her, she *awoke.* Then all the house awoke, the man awoke at the door. The woman awoke and put on her shoe. The boy awoke and read his story. The king awoke at his table. The queen rubbed her eyes and said, "What were you saying ? I fell asleep."

Before (নূতন শব্দ) :—The ship came to an unknown country where they had never been before. Then the king told his servants to bring food. They brought food and set it on the table before... the men. As soon as they set the food on the table hundreds of mice came out of holes in the wall. The men had never seen so many mice before. The mice jumped on the table and ate up the food before the men could take it. The mice ate up the food before their eyes.

---

(১) 1. i as in Queen (1)
2. e Red (2)
3. æ Cat (3)
4. a Father (4)
5. ɔ Not, Saw (5, 5)
6. o(ʊ) Lo(w) (6)
7. u Good (7)
8. ʌ Up (8)
9. ə Bird (9)

Similarly diphthongs
21. ei Rein, Rain (21, 21)
41. ai Fine (41)
78. wʌ One (78)

Si lent
Caught-Caut
Consonants :
S S City (S)
$ S(sh) Sure ($)
Z 3 Measure (Z)
J d3 Giant
F f Enough (F)
V Voiced e.oz., House (Houzes) (V)
— Long, e.g., Hope (—, V)
‿ Short. e.g., Hop.

করিতে পারিলেই ভাল হয়। পরে প্রয়োজনানুসারে বর্ণনা বা গল্পের অবশিষ্টাংশে উক্তশব্দের যথাসম্ভব পুনরুক্তি করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে।

প্রাথমিক পঠন-সাহিত্যে ছবি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছবিতে উপকার হয় সত্য, কিন্তু অনেক সময় অপকারও বড় কম হয় না। যদি প্রদীপনার্থ একাধিক ছবি কোনও গল্পে সন্নিবিষ্ট হয় তাহা হইলে পাঠার্থী মনোযোগ সহকারে গল্প না পড়িয়াই গল্পের মর্ম্ম অনুমান করিয়া লইতে পারে। সুতরাং পাঠার্থী প্রকৃত পক্ষে গল্প পাঠ করিয়া মর্ম্ম গ্রহণ করিল কি না শিক্ষক তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে পারেন না। কিন্তু কোনও একটা নূতন শব্দ যে ভাব প্রকাশ করে অনেক সময় সেই ভাব পাঠার্থীর হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য ছবির ব্যবহার বিশেষ কার্য্যকর হইয়া থাকে। এইরূপ ছবি ছোট হইলেই ভাল হয়, কিন্তু স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ক্ষুদ্র ছবি উদ্দেশ্যে সাধনের প্রতিকূল, আবার স্পষ্ট বৃহৎ ছবি ব্যয়-সাপেক্ষ। এই গেল শব্দ ও বাক্য পাঠনার উপযোগী পঠন-পুস্তকের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা। তারপর পঠন সাহিত্যের উপাদানের কথা আলোচ্য।

সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান স্মরণীয় বিষয় এই যে, প্রাথমিক পঠন-পুস্তকে দেশীয় আবেষ্টন সম্পর্কিত শব্দের ব্যবহার যত কম হয় ততই ভাল। গরুর গাড়ী, কাঁটাল প্রভৃতি স্থানীয়বর্ণাত্মক শব্দ (with local colour) পরে ইংরেজী সাহিত্য পাঠনাকালে ততটা কাজে আসিবে না। বরং কথন ও রচনা বিষয়ক পুস্তক রচনা কালে স্থানীয় বর্ণাত্মক শব্দের প্রয়োগ অধিকতর উপকারে আসিবে। আবার প্রাথমিক পঠন-পুস্তকের উপযোগী উপাদান নির্ব্বাচন লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। একটু অনুধাবন করিলেই প্রতীতি হইবে যে, বিশেষ বিদ্যা বিষয়ক (technical) জ্ঞান অপেক্ষা আখ্যান বিষয়ক (fiicton) জ্ঞানই প্রাথমিক বিদ্যার্থীর পক্ষে সমধিক উপযোগী ও আবশ্যক। ক্রমে শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সাধারণ তথ্যমূলক informative matter) জ্ঞান লাভের চেষ্টা যুক্তি-সঙ্গত। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উপযোগিতার প্রাচুর্য্য হিসাবে ৩০০০ শব্দের সহিত পরিচিত হইলেই বিদ্যার্থী উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত আখ্যানমূলক যে-কোন বর্ণনা প্রীতি সহকারে ও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। উল্লিখিত শব্দ-সম্পদের অধিকারী হইলে, পরে বিদ্যার্থীকে বিশেষ বিদ্যাবিষয়ক বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তদুপযোগী আরও ৩০০০ বিশেষ শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে হইবে।(৩) এল, সি, প্রেসি উক্ত বিষয়ের গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু আখ্যানমূলক পঠন-সাহিত্য ও বিশেষ বিদ্যা বিষয়ক পঠন-সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত সাহিত্য-পুস্তকগুলি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, পরবর্ত্তী স্তরের সাহিত্য-পুস্তক পাঠ করিতে গেলে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সাহিত্য পুস্তকের শব্দ-সম্পদ। পাঠার্থী আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, সুতরাং ক্রম ভঙ্গ করিয়া আখ্যান-মূলক সাহিত্য-পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে বিশেষ বিদ্যা বিষয়ক পঠন সাহিত্য পুস্তক উক্ত প্রকারে গঠিত হওয়া অনাবশ্যক। এই-সকল পুস্তকের শব্দ-সম্পদ বিভিন্ন। যদি আখ্যানমূলক পঠন-সাহিত্যই প্রথম পাঠার্থীর পক্ষে উপযোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা হইলে কোন্ জাতীয় ও কিরূপ গল্প পঠন-সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত? যে বয়সের পাঠার্থী যেরূপ গল্প শুনিতে ভালবাসে সেই বয়সের পাঠার্থীর জন্য সেইরূপ গল্পই নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় বর্ণাত্মক শব্দের উপযোগিতা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় যে-সকল শব্দের উপযোগিতার প্রাচুর্য্য ও প্রয়োগের অত্যধিক বাহুল্য আছে সেই-সকল শব্দ লইয়াই আখ্যান রচনা করা অভিপ্রেত। আখ্যান-মূলক উপাদান ও দেশজাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শিশু-হৃদয়ে সমান ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। উপকথা ও রূপকথা সকল জাতির শিশু সম্প্রদায়েরই সাধারণ সম্পত্তি।

প্রাথমিক পঠন সাহিত্যের উপযোগী উল্লিখিত উপাখ্যানমালা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

---

(৩) L. C. Pressey; The Technical Vocabulary of the Public School subjects, Educational Research Bulletin of Ohio State University. III, 182, April 30, 1924.

লণ্ডন নগরের তিনটি বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রগণের অভিমত সংগ্রহ করিয়া সেই অভিমতের ফলানুসারে কতিপয় গল্প নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত তিনটি বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু যে-সকল গল্প ইংরেজ-শিশুর বিশেষ প্রীতিপ্রদ সেই সকল গল্পই যে বাঙ্গালী শিশুরও বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নহে। সুতরাং উল্লিখিত যে-সকল গল্প অধিক সংখ্যক ইংরেজ-শিশুর প্রীতিপ্রদ বলিয়া স্থির হইয়াছে সেই-সকল গল্পের মধ্যে আবার যে-সকল গল্প বহুল পরিমাণে ভাষান্তরিত হইয়াছে বিদেশী বিদ্যার্থীর পক্ষে সেই-সকল গল্পই উপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া নবপর্য্যায়ের ক্রম-সংশ্লিষ্ট দশখানি পঠন-সাহিত্যের পুস্তক রচিত হইয়াছে (৬)। উল্লিখিত পুস্তকাবলীতে ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা প্রায় ৩৫০০। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ১৬ বৎসর বয়সের বাঙ্গালী বিদ্যার্থীর শব্দ-সম্পদের (মেট্রিকুলেশন শ্রেণী) পরিমাণ ৫০০০, এই সকল শব্দের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় শব্দের হার বড় কম নহে। বাস্তবিক ব্যবহারের বাহুল্য হিসাবে নির্ব্বাচিত ৫০০০ শব্দের সাহায্যে প্রাথমিক বিদ্যার্থীর পঠনোপযোগী আখ্যানমূলক যে-কোন বর্ণনা অনায়াসে লিপিবদ্ধ হইতে পারে।

শুধু গল্প নির্ব্বাচন করিয়া লইলেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয় না। গল্পগুলির অনুচ্ছেদে পরিমাণ স্থির করিয়া তদনুসারে ইহাদের বিন্যাস করাও আবশ্যক। প্রথম স্তরের পঠন-সাহিত্যে অনুচ্ছেদগুলি এরূপে বিন্যস্ত করিতে হইবে যেন প্রতি ১০০০ শব্দে ২০টি প্রশ্ন অথবা প্রতি ৫০টি শব্দে একটি করিয়া প্রশ্ন করা যাইতে পারে। বিদ্যার্থী যতই পঠন-নৈপুণ্য আয়ত্ত করিবে প্রশ্ন হিসাবে উচ্চতর স্তরের গল্প-সমূহের অনুচ্ছেদে শব্দের গভীরতা বা সংখ্যাও তত বাড়িতে থাকিবে, যথা, ১০০ শব্দে একটি করিয়া প্রশ্ন, ২০০ শব্দে একটি করিয়া প্রশ্ন, ৪০০ শব্দে একটি করিয়া প্রশ্ন, ৮০০ শব্দে একটি করিয়া প্রশ্ন।

(৬) New Method Readers : New series. Longmans Green & Co.
Book 1 A (Primer) 222 words ; Reader 1 B—236 words ; Readers II, III 300 words each. Readers IV, V 350 words each. Readers VI, VII 400 words each. Readers VIII, IX 450 words each. Total about 3,500 words.

নিম্ন শ্রেণীতে যে-সকল ইংরেজি কবিতা সচরাচর সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে সেই-সকল কবিতা প্রায়ই উৎকৃষ্ট নহে। ইহার কারণ এই যে, যে-সকল কবিতা নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সেই-সকল কবিতা অত্যন্ত আধুনিক এবং ইহাদের রচয়িতা এখনও জীবিত আছেন। যে-সকল গ্রন্থকার শুধু অর্থলোভে পুস্তক-প্রকাশকদিগের জন্য পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া থাকেন তাঁহারা জীবিত কবিদিগের অনুমতি লাভের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন। শিক্ষা-ক্ষেত্রে এরূপ ব্যয়কুণ্ঠতা সঙ্কীর্ণ নীতির পরিচায়ক। ইহাতে পরিণামে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইয়া থাকে।

বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে পঠন-সাহিত্য রচনা করিতে গেলে আর-একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। সকল স্কুল এবং সকল শ্রেণীর ছাত্রগণ সমান ভাবে নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করিতে পারে না। কোন স্কুলের ছাত্র এক বৎসরে নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের পঠন পরিসমাপ্ত করিতে পারে, আবার কোন স্কুলের ছাত্র পারে না। আবার কোন কোন স্কুল বা শ্রেণীর ছাত্রগণ যে-পুস্তক এক বৎসরে পরিসমাপ্ত করিতে পারে অন্য স্কুল বা শ্রেণীর ছাত্রগণ তদপেক্ষা কম সময়ে সেই পুস্তক পরিসমাপ্ত করিতে সমর্থ হয়।

ব্যক্তিগত শক্তি কদাপি সকলের সমান নহে। যে পুস্তক যে স্তরের পঠনের পক্ষে উপযোগী সেই পুস্তক সেই স্তরের ছাত্রগণের সম্পূর্ণরূপে পাঠ করা উচিত, কোন অংশই বাদ দেওয়া উচিত নহে। যদি কোনও অংশ বাদ দেওয়া চলিত তাহা হইলে সেই অংশ উক্ত পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইত না। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরের বা শ্রেণীর উপযোগী পুস্তক পড়িয়া শেষ না করিলে পরবর্ত্তী স্তরের বা শ্রেণীর উপযোগী পুস্তক পাঠ করিয়া অভীষ্ট সাধন করিতে পারা যায় না। কোন্ স্তর বা শ্রেণীর পুস্তকে কয়টি শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকিবে গবেষণা দ্বারা বাঙ্গালী বিদ্যার্থীর পক্ষে উল্লিখিত শব্দ-সম্পদের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হইয়াছে। একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে-সকল পুস্তক কোনও নির্দ্দিষ্ট স্তরের উপযোগী করিয়া রচিত সেই-সকল পুস্তকে আবার বিদ্যালয়-বর্ষের কোন্ কোন্ সময়ের মধ্যে কতটা অতীত হওয়া সম্ভব তাহারও বিভাগ থাকে। তাহা হইতে

ব্যক্তিগত শক্তির পার্থক্য অনুসারে বিদ্যার্থিগণের উন্নতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যে-শ্রেণীর ছাত্রগণ অপেক্ষাকৃত কম মনীষা-সম্পন্ন তাহারা হয়ত এক বৎসরে কোনও স্তর বা শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট পুস্তকখানি শেষ করিতে পারে, কিন্তু যে-শ্রেণীর ছাত্রগণ অপেক্ষাকৃত অধিক মনীষা-সম্পন্ন (better than average) তাহারা নির্দ্দিষ্ট পুস্তক অপেক্ষাকৃত কম সময়েই শেষ করিতে পারে। তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্তরের অতিরিক্ত পাঠ্য পুস্তক রচিত হওয়া উচিত ; তাহা না হইলে তাহাদের সময় নষ্ট হইবে। একই পুস্তকের অধীত অংশ পুনরালোচনা করিয়া নিষ্ফলপ্রয়াস প্রয়োগ করিলে বিদ্যার্থীর পক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া উঠিবে। উল্লিখিত অতিরিক্ত পঠন-পুস্তকাবলী কিরূপে গঠিত হওয়া উচিত তাহাই নিম্নে বর্ণিত হইল।

নির্দ্দিষ্ট স্তরের পাঠ্য পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নূতন শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকে। নির্দ্দিষ্ট স্তরের উপযোগী অতিরিক্ত পুস্তকে একটিও নূতন শব্দ থাকিবে না। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবিষ্ট শব্দ লইয়াই অতিরিক্ত পুস্তক রচিত হইবে, ইহাতে নূতন শব্দের প্রয়োগ কিংবা পুরাতন শব্দের নূতন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাহা হইলেই বিদ্যার্থী পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানবলে আত্ম-চেষ্টায় অতিরিক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিবে (৫)। উল্লিখিত অতিরিক্ত পঠন-পুস্তক তিনটি কারণে মূল্যবান। প্রথমতঃ, পুরাতন বিষয়ের পুনারালোচনা না করিয়া বিদ্যার্থী নূতন বিষয়ের সাহায্যে পুরাতনের পুনরালোচনা করিতে পারে। উক্ত প্রয়াস বিশেষ ভাবে কার্য্যকর হইয়া থাকে। পরিচিত শব্দের ব্যবহারের সহিত বিদ্যার্থী নূতন ভাবে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, অতিরিক্ত পুস্তকের সাহায্যে বিদ্যার্থী স্বয়ং আত্ম-শক্তির ও উন্নতির পরিমাপ করিতে সমর্থ হয়, এবং পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানবলে কি পরিমাণ আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব তাহারও একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে। বস্তুতঃ উল্লিখিত প্রণালীতে বিদ্যার্জ্জন করিয়া পাঠার্থী দুই কি প্রায় দুই বৎসর পরে অর্থাৎ বর্ণমালা শিক্ষার পর দুই বৎসরের মধ্যে তদীয় পরিচিত শব্দ-সম্পদের সাহায্যে রচিত রবিন্‌সন্ ক্রুশো নামক নূতন পুস্তক অভিধানের সাহায্য ব্যতীত পাঠ করিয়া মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছে। তৃতীয়তঃ, উল্লিখিত অতিরিক্ত পুস্তক পাঠ করিলে পঠন ও কথন-শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইবে, বিদ্যার্থী পঠন ও কথন ব্যাপারে অবাধে ও স্বচ্ছন্দে আত্ম-শক্তি প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে। পঠন ও কথন-শক্তির অবাধ ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কথন ও পঠন কালে কথক ও পাঠক মাতৃভাষার মানসিক প্রতিচ্ছবির সাহায্য ব্যতীতই বিজাতীয় ভাষার শব্দ ও তৎপ্রকাশক ভাবের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাই কথন ও পঠন-শক্তির উৎকর্ষ সাধনের গূঢ় তত্ত্ব।

ব্যক্তিগত শক্তির ন্যূনাধিক্য হিসাবেও উল্লিখিত অতিরিক্ত পুস্তক সবিশেষ মূল্যবান। কোনও নির্দ্দিষ্ট স্তরের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট বৎসর অতীত হওয়ার পূর্ব্বে পরিসমাপ্ত হইলে যে-সময় অবশিষ্ট থাকে সেই সময়ে উল্লিখিত পাঠ্য পুস্তকের অনুরূপ অতিরিক্ত পঠন-পুস্তক পুনরালোচনা রূপে অধ্যয়ন করাই অভিপ্রেত। যদি শ্রেণীগত পঠন-ব্যাপারে অতিরিক্ত সময় অবশিষ্ট না থাকে তাহা হইলে যাহারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর মনীষা-সম্পন্ন তাহারা উল্লিখিত কোনও নির্দ্দিষ্ট স্তরের উপযোগী অতিরিক্ত পুস্তক অবসর-সময়ে আপন আপন গৃহে অধ্যয়ন করিয়া উপকৃত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উল্লিখিত অতিরিক্ত পুস্তকাবলী পুরস্কার দানের পক্ষেও অত্যন্ত উপযোগী। সচরাচর যে-সকল পুস্তক পুরস্কারের জন্য নির্ব্বাচিত হয় সেইসকল পুস্তক যাহারা পুরস্কার লাভ করে তাহাদের অনেকেই আত্ম-চেষ্টায় পাঠ করিয়া

---

(৫) Reader IA এবং IB শেষ করিলে অতিরিক্ত পঠন পুস্তক (Reader I) বিনা আয়াসেই বালক বালিকাগণ অধিগত করিতে পারিবে। IA এবং IB পুস্তকে যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে অতিরিক্ত প্রথম পুস্তকে মাত্র সেই সকল শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইরূপ IA, IB ও Reader II শেষ করিলে অতিরিক্ত দ্বিতীয় পুস্তক পাঠ করিতে কোনও কষ্ট হইবে না, কারণ অতিরিক্ত দ্বিতীয় পুস্তকে IA, IB ও Reader II এই তিন পুস্তকে যে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে অতিরিক্ত দ্বিতীয় পুস্তকে মাত্র সেই সকল শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অতিরিক্ত পুস্তক সম্বন্ধেও এইরূপ।

মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ পুস্তক পুরস্কারের পক্ষে তত উপযোগী নহে। পক্ষান্তরে পূর্ব্বোল্লিখিত অতিরিক্ত পঠন-পুস্তক পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইলে যাহারা উক্ত পুরস্কার লাভ করিবে তাহারা পুরস্কার-লব্ধ পুস্তক অবাধে ও স্বচ্ছন্দে পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে, কারণ উল্লিখিত পুস্তক উপকথাপূর্ণ সুতরাং বিদ্যার্থীর প্রীতিপ্রদ।

উল্লিখিত বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর পঠন-পুস্তকাবলী ঢাকা ট্রেনিং কলেজে পরিচালিত পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যালয় পাঠ্য পঠন সাহিত্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রণালীতে রচিত পুস্তক এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত পুস্তকাবলী মনীষা ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। পৃথিবীর সকল দেশেও ইহাদের বিজ্ঞান-সম্মত ও শিক্ষা-বিজ্ঞানানুমোদিত আবিষ্কৃত সত্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুদূর আফ্রিকা, বেলজিয়ম এবং ওয়েল্‌স্ হইতে নবাবিষ্কৃত পঠন-সাহিত্যের গঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে। চীনদেশের শিক্ষা-সংস্কারক ব্যক্তিবর্গও নব-প্রচারিত সাহিত্য-গঠন-নীতির প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। উল্লিখিত পুস্তকাবলী পঠন-সাহিত্যের গঠন-ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত নব-বিধানের অগ্রদূত। যাহাতে উল্লিখিত পুস্তকাবলী নির্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে তজ্জন্য গবেষণা-কার্য্যে শিক্ষাবিভাগ অর্থব্যয় করিতে দ্বিধা করে নাই এবং গবেষণা-কার্য্যের পরিচালকবর্গও শ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। একটি গল্প পঠন-সাহিত্যে স্থান লাভ করিবার পূর্ব্বে আঠার প্রকার ক্রিয়ার যোগে সংশোধিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা-কার্য্যের আয়াস ও শ্রম-ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীর স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল। উল্লিখিত নববিধান প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে শিক্ষা-কার্য্যের সমগ্র আয়াস ও শ্রমক্লান্তি শিক্ষার্থী হইতে গ্রন্থকারের উপর স্থানান্তরিত হইয়াছে। ফলে শিক্ষার্থী অল্প আয়াসে, অল্প সময়ে ও প্রীতিসহকারে নির্দ্দিষ্ট স্তরের পঠন-সাহিত্য আয়ত্ত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রণালীতে বিদ্যার্থিগণ ছয় কি সাত বৎসরে ৩৫০০ শব্দের সহিত পরিচিত হয়। উল্লিখিত নব প্রণালীর সাহিত্য-পুস্তক অনুসরণ করিলে পাঁচ বৎসরে উক্ত শব্দ-সম্পদ আয়ত্ত করা সহজসাধ্য। ইহাতে এই দাঁড়াইল যে, নবপ্রণালীর দশখানি পুস্তক পাঁচ বৎসরে অর্থাৎ প্রতি বৎসরে দুইখানি পুস্তক পরিসমাপ্ত করা সম্ভব। আর যদি শ্রেণীর ছাত্রগণ মনস্বিতায় অপেক্ষাকৃত উন্নত থাকে এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক যদি শিক্ষাকৌশলে সুদক্ষ হন তাহা হইলে উল্লিখিত দশখানি পুস্তক তিন বৎসরেই পরিসমাপ্ত হইতে পারে, অর্থাৎ তিন বৎসরে মনস্বী বিদ্যার্থী ৩৫০০ শব্দের সহিত পরিচিত হইতে সমর্থ হয়।

যে-সকল পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে পঠন-সাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে সেই-সকল পরীক্ষা ও গবেষণার বিশেষ বিবরণ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের অবগতির জন্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে (৬)।

---

(৬) (1) Bureau of Education, India: Occasional Reports No. 13. Bilingualism. M. P. West I. E. S. with Introduction by Sir Michael E. Sadler of University College, Oxford.

(2) Dacca University Bulletin No. 13.—The Construction of Reading Material for teaching a Foreign Language M. P. West I. E. S. Introduction by Sir P. J. Hartog.

(3) Learning to read a Foreigu Language—(An Experimental Study). M. P. West. I. E. S. Longmans Green & Co., London.

মরু-মায়া *

শ্রী সীতা দেবী

পশুশালা হইতে বাহির হইবামাত্র মহিলাটি বলিলেন, "কি ভীষণ দৃশ্য !"

তিনি এতক্ষণ ধরিয়া খাঁচার ভিতর পশুপালক এবং তাহার পালিত হায়েনাটার খেলা দেখিতেছিলেন।

"মানুষে কি ক'রে এই ভয়ানক জানোয়ারগুলোকে এমন ক'রে পোষ মানায় ? তাদের ভালবাসার উপর এতটা নির্ভর করে কি ক'রে ?"

আমি বলিলাম, "আপনার কাছে যেটা খুব জটিল সমস্যা মনে হচ্ছে, সেটা প্রকৃতির একটা নিয়ম বই আর কিছু নয়।"

তিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তাই নাকি ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি মনে করেন যে, এই পশুগুলির মধ্যে ভালবাস্‌বার ক্ষমতা নেই ? সভ্য মানুষের মধ্যে যতরকম দোষগুণ আছে সবই এদের শেখান যায়।"

ভদ্রমহিলা আমার দিকে অত্যন্ত অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আমি প্রথম যখন এই পশুরক্ষকটিকে হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে খেলা কর্‌তে দেখি, তখন আপনারই মতন অবাক হ'য়েছিলাম। আমার পাশে একজন বৃদ্ধ সৈনিক দাঁড়িয়েছিল, তার একখানা পা অস্ত্র করে কেটে ফেলা হয়েছে। তার চেহারাটা আমার খুব চোখে লেগেছিল। তার গর্ব্বোন্নত ললাটে যেন অদৃশ্য জয়তিলক আঁকা, দেখ্‌লেই বোঝা যায়, মহাবীর নেপোলিয়নের যুদ্ধে সে দিন কাটিয়েছে। তার সরল ভাব আর খোস্‌মেজাজ দেখে আমার বড় ভাল লাগ্‌ছিল। এরা সেই সৈন্যদলের একজন যাদের কোনো ব্যাপারই আশ্চর্য্য কর্‌তে পারে না, যারা মৃত্যুর মুখে তুড়ি মেরে হাসে, যারা শয়তানের সঙ্গেও বসে' খোস্‌মেজাজে গল্প কর্‌তে প্রস্তুত। পশুরক্ষকটার দিকে অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে ঠোঁট উল্‌টে স্নেষের হাসি হেসে বেরিয়ে আস্‌ছিল। আমি পশুরক্ষকের সাহসে অবাক হ'য়ে চীৎকার ক'রে ওঠায় সে বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে, হেসে বল্‌লে, "এ সব আমি খুব বুঝি হে'।"

আমি বলিলাম, "তাই নাকি ? আপনি যদি রহস্যটা বুঝিয়ে দেন ত অত্যন্ত বাধিত হই।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের আলাপ জমে উঠ্‌ল এবং দুজনে একসঙ্গে একটা হোটেলে গিয়ে ঢুক্‌লাম। এক বোতল শ্যাম্পেন টেনেই তার দিল্ খুলে গেল। সে নিজের জীবনের কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। আমি বুঝ্‌লাম "এ সব আমি খুব বুঝি হে", বলে যে সে গর্ব্ব কর্‌ছিল, কর্‌বার অধিকার তার আছে।

ভদ্রমহিলা বাড়ী ফিরিয়া এমন মধুরভাবে আমার কাছে আবদার করিতে লাগিলেন যে, আমি তাঁহাকে সেই বৃদ্ধ সৈনিকের কাহিনী লিখিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

পরদিন এই গল্পটি গিয়া তাঁহার কাছে পৌঁছিল—

মিশরে ফরাসী সেনাপতি দেশাইয়ের অধীনে যে অভিযান যায়, তাহার মধ্যে একটি ফরাসী সৈনিক শত্রুদলভুক্ত আরবদের হস্তে পতিত হয়। ইহারা নীল-নদের প্রপাত হইয়া তাহাকে এক মরুভূমিতে লইয়া গিয়া উপস্থিত করে। ফরাসী সৈন্যদল যাহাতে তাহাদের কোনো সন্ধান না পায়, এ জন্য তাহারা অবিশ্রাম চলিয়া বহুদূর অতিক্রম করিয়া যায়। রাত্রে একস্থানে বিশ্রাম করিবার জন্য তাহারা আড্ডা গাড়িল। তাহারা রাত্রি কাটাইবার জন্য যে-স্থানটি বাছিয়া লইল, তাহা একটি কূপের পাশে। ঐ কূপটির চারিপাশ খর্জ্জুরবৃক্ষে পরিবেষ্টিত! ঐ স্থানে আরবগণ কিছুকাল পূর্ব্বে কিছু খাদ্যদ্রব্য পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। অতএব এই স্থানই তাহারা পছন্দ করিল।

* Balzac হইতে।

তাহাদের বন্দী যে পলাইবার চেষ্টা করিতে পারে, সে কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সুতরাং তাহারা কেবল ফরাসী সৈনিকটির হাত বাঁধিয়া দিয়া, আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা দিল। ফরাসী বীরটি যখন দেখিল যে, তাহার শত্রুদল একেবারে নিদ্রায় অচেতন, তখন সে দাঁত দিয়া একটি খড়্গ উঠাইয়া লইল এবং উহা দুই জানুর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া নিজের হাতের বাঁধন কাটিয়া ফেলিল। নিজেকে মুক্ত করিয়া সে একটা বন্দুক এবং একটা ছোরা যোগাড় করিয়া লইল। ঘোড়ার জন্ম কিছু যব এবং নিজের জন্ম শুখনো খেজুর বন্দুকের কার্তুজ ও বারুদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেও ভুলিল না। তাহার পর একটা ঘোড়ায় চড়িয়া সে মরুভূমির উপর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। ফরাসী-বাহিনী যে-দিকে আছে বলিয়া তাহার মনে হইল, সেইদিকেই সে চলিল। তাহাদের ছাউনিতে শীঘ্র শীঘ্র পৌঁছিবার জন্ম সে এমন প্রাণপণে ঘোড়াটাকে দৌড় করাইল যে, কিছুদূর গিয়া হতভাগ্য পশুটি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া মরুভূমির কোলে বিশ্রামলাভ করিল। ফরাসী সৈন্যটি ঐ দিশাহীন মরুতে একলা দাঁড়াইয়া রহিল।

পলাতক বন্দীর সাহস অসীম! সে অনেকক্ষণ এধার ওধার ঘোরাঘুরি করিয়া অবশেষে থামিতে বাধ্য হইল। রাত্রি আসিয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বদেশের রজনীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তাহার চক্ষুকে মোহিত করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও সে আর অগ্রসর হইবার শক্তি নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। সৌভাগ্যক্রমে সে একটা বালিয়াড়ীর পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই বালিয়াড়ীর উপর কয়েকটা খেজুরের গাছ দেখা গেল। দূর হইতে ঐ গাছের পাতা দেখিয়া সৈনিকটির মনে একটি আশ্রয়লাভের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। উপরে উঠিয়া প্রকাণ্ড একটা পাথরের উপর শুইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। সে এত শ্রান্ত হইয়াছিল যে ঘুমের মধ্যে নিজেকে কোনোরূপে রক্ষা করিবার কোনো ব্যবস্থাই করিল না। নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে, ইহা সে স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া আসিয়া এখন তাহার আরব-দস্যুর দল ছাড়িয়া আসার জন্ত দুঃখ হইতে লাগিল। তাহাদের যাযাবর-জীবন-যাপনও এখন তাহার কাছে মধুময় বোধ হইতে লাগিল।

সূর্য্যের উত্তাপে প্রস্তরখণ্ড অত্যন্ত তপ্ত হইয়া ওঠায় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে অসাবধানতাবশতঃ এমন দিকে শুইয়াছিল যে-দিকে গাছের ছায়া পড়ে না। গাছগুলির দিকে চাহিয়া তাহার মন বিভীষিকায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। নিজের চারিধারে তাকাইয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই, কেবল অনন্তবিস্তৃত বালুকাসাগর। নিরাশা যেন তাহার হৃৎপিণ্ডকে মুঠি করিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল। যতদূর পর্য্যন্ত চক্ষু যায়, বালুকারাশি সূর্য্যের কিরণসম্পাতে শাণিত খড়্গের মত ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সে সত্যই বুঝিতে পারিতেছিল না যে, সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া আছে না মরুভূমির দিকে! চারিদিকের দৃশ্যের উপর একটা অগ্নিময় কুয়াসার আবরণ দুলিতেছিল। আকাশও একটা তীব্র জ্যোতিতে প্লাবিত হইয়াছিল, জলস্থল সকলই আগুনের রঙে রঞ্জিত। চতুর্দ্দিকের নীরবতা কি ভীষণ মহীয়ান্! অসীম, দিশাহীন, জ্বালাময় শূন্যতা তাহার অস্তিত্বকে পীড়িত করিতে লাগিল। আকাশে মেঘের লেশ নাই, বায়ুর শব্দমাত্র নাই, বালুকারাশি নিস্তরঙ্গ।

ফরাসী সৈন্যটি একটা গাছকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। ইহার স্বল্পপরিসর ছায়ায় বসিয়া সে রোদন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে বিস্তৃত দৃশ্যরাজি তাহার কাছে মহাভয়ের আকর হইয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছিল, কিন্তু মরুভূমিতে এ রোদনের কোনো প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল না। প্রতিধ্বনি ছিল কেবল তাহার অন্তরেই।

সৈনিকটির বয়স মাত্র একুশ বৎসর। কিছুক্ষণ পরে সে বন্দুকে গুলি ভরিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তখনই ব্যবহার না করিয়া সে বন্দুকটা তখনকার মত নিজের সম্মুখে পাথরের উপর রাখিয়া দিল। বিড় বিড় করিয়া বলিল, "ওর জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।"

সে একবার করিয়া তাকাইতে লাগিল উপরের নীল আকাশের দিকে, আর একবার করিয়া বালুকা-সাগরের নিরানন্দ দৃশ্যের দিকে। সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল নিজের

মাতৃভূমি ফ্রান্সের। সে কল্পনাতেই প্যারিসের রাস্তা-ঘাটের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিল। যে-সকল সহরের ভিতর দিয়া সে আসিয়াছে, তাহার সঙ্গীদের মুখ, নিজের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা, সব স্মরণ করিতেই তাহার চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মরু মরীচিকার মধ্যে সে নিজের দেশের উপলখণ্ড কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইল। কিন্তু মরীচিকার মধ্যে বিভীষিকার অন্ত নাই, তাই সে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বালিয়াড়ীর অপর পার্শ্ব দিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। নীচে নামিয়া সে ছোট একটা গুহার মত দেখিতে পাইল, উহা বেলে পাথরের বুক খোদাই করিয়া প্রকৃতি দেবীই প্রস্তত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া সৈনিক খুসিই হইল; গুহার ভিতর একখণ্ড ছিন্ন মাদুর দেখিতে পাইয়া বুঝিল, এই স্থানে মানুষ বাস করিয়া গিয়াছে। আরো কিছু দূর গিয়া সে দেখিতে পাইল ফলভারে অবনত সার সার খেজুরের গাছ। ইহা দেখিয়া মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারণের বৃত্তি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে আশা করিতে লাগিল এখানে থাকিতে থাকিতে কোনো ভ্রাম্যমান আরবের দৃষ্টিপথে পড়িয়া যাইতে পারে, নয়ত কামানের শব্দও তাহার কানে আসিয়া পৌছিতে পারে কারণ এসময় নেপোলিয়ন সারা মিশর দেশ জুড়িয়া বিজয়-অভিযান করিতেছিলেন।

এই চিন্তায় তাহার মন খানিকটা শক্তি লাভ করিল। তখন সে গাছ হইতে কয়েক গোছা খেজুর পাড়িয়া খাইতে বসিল। খেজুরগুলি এত সুস্বাদু ও মিষ্ট যে, সৈনিকটি বুঝিতে পারিল এগুলি শুধু প্রকৃতি দেবীর কীর্ত্তি নয়, মানুষের হাতও ইহাতে আছে।

নিরাশার গভীরতম গহ্বর হইতে উঠিয়া সে হঠাৎ আনন্দের আতিশয্যে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। সে আবার ক্ষুদ্র পাহাড়টির উপরে উঠিয়া, একটা খেজুর-গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল।

কোনো বন্য পশু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে, হঠাৎ এ কথা তাহার মনে পড়িল। পাথরের স্তূপের ভিতর দিয়া একটি ছোট নির্ঝরিণী বহিয়া চলিয়াছিল, এখানে জলের সন্ধানে যে কোনো পশু আসিয়া জুটিতে পারে। সে স্থির করিল, রাত্রে শুইবার আগে গুহার মুখে একটা আড়াল দিয়া শুইবে। কিন্তু প্রাণপণে প্রাণপণ পরিশ্রম করা সত্বেও সে গাছটা সেদিন টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে পারিল না। কেবল সেটা কাটিয়া পাড়িতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল; এই বিশাল মহীরুহটি পড়িবার সময় দিগদিগন্ত কম্পিত করিয়া একটা শব্দ শোনা গেল, যেন নির্জ্জন মরুর আর্ত্তনাদ। সৈনিকের দেহ শিহরিয়া উঠিল, যেন কোন দৈববাণী ভাবী মহা দুর্ভাগ্যের সূচনা করিয়া গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ দুঃখ না করিয়া সে তাড়াতাড়ি গাছটির ডালপালা সব কাটিয়া লইয়া ছিন্ন মাদুরখানার ত্রুটী সংশোধন করিতে বসিল। অবশেষে রৌদ্রের তাপে এবং পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া সে গুহার মধ্যে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রির মধ্যভাগে একটা অদ্ভুত শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সে একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল, উহা একেবারে বন্য ও ভীষণ, মানুষের নিঃশ্বাসের সহিত তাহার কোনোই সাদৃশ্য নাই। এই গভীর অন্ধকারে, হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া, এই ব্যাপারে তাহার রক্ত যেন ভয়ে হিম হইয়া গেল! ভাল করিয়া চোখ চাহিয়া সে দেখিল আঁধারের মধ্যে দুই টুকরা পীতাভ আলো ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে। ভয়ে তাহার মাথার চুল শুদ্ধ খাড়া হইয়া উঠিল। প্রথমে মনে করিল সে চোখে ভুল দেখিতেছে, কিন্তু অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া ওঠামাত্রই সে দেখিতে পাইল, তাহার নিকট হইতে দুই তিন পা মাত্র দূরে, প্রকাণ্ড একটা পশু শুইয়া।

উহা সিংহ না ব্যাঘ্র না কুম্ভীর? ফরাসী সৈনিকটির প্রাণীবিদ্যায় জ্ঞান তত ছিল না। কাজেই সে এই ভীষণ আগন্তুকটির জাতি নির্ণয় করিতে সহজে পারিল না; কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ তাহার ভয়টা হইল আরো বেশী। কল্পনাতে বিভীষিকা আরো বাড়িয়া গেল। সে ভয়ে নড়িতে শুদ্ধ পরিতেছিল না, কেবল শুইয়া শুইয়া ঐ ভয়াবহ নিঃশ্বাসের শব্দে কোনো তারতম্য হয় কি না তাহাই শুনিতেছিল। শেয়ালের গায়ের গন্ধের মত কিন্তু তাহা অপেক্ষা বহু গুণে তীব্র একটা গন্ধে গুহার ভিতর ভরিয়া উঠিয়াছিল। উহা নাকে যাইবামাত্র আতঙ্কে তাহার জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইল। তাহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে,

কোন শ্রেণীর জীবের রাজপ্রাসাদে সে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ক্রমে অস্তগামী চন্দ্রের কিরণ গুহার ভিতর আসিয়া পড়িল। ঐ আলোয় গুহার ভিতরটা উজ্জল হইয়া ওঠায় চিতা বাঘের চিত্রিত দেহও বেশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

মিশর দেশের পশুরাজটি কুকুরের মত কুণ্ডলি পাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উহার চোখ দুইটা একবার খুলিয়া আবার বুজিয়া গেল। সে শুইয়াছিল ফরাসী সৈন্যটির দিকে মুখ করিয়া।

চিতাবাঘের বন্দী হইয়া সৈনিকটির মস্তিষ্কে হাজার রকম চিন্তার আলোড়ন চলিতে লাগিল। প্রথমে সে স্থির করিল বাঘটাকে গুলি করিয়া মারিবে, কিন্তু পশুটি তাহার এত নিকটে শুইয়াছিল যে বন্দুক ধরিবার মত জায়গাও তাহাদের মধ্যে ছিল না। বন্দুকের নল চিতার দেহ পার হইয়া যাইত। তাহা ছাড়া বন্দুক ঠিক করিতে গিয়া সে যদি উহাকে জাগাইয়া ফেলে? এই ভয়ে সে নড়িতে শুদ্ধ পারিতেছিল না। মরুভূমির নীরবতায় তাহার নিজের হৃৎস্পন্দনও অত্যন্ত প্রবল শুনাইতেছিল। সে নিজেকে অভিশাপ দিতেছিল, যদি এই শব্দেই তাহার শত্রুর ঘুম ভাঙিয়া যায়? সে যতক্ষণ ঘুমাইবে, তাহার মধ্যে তাহাকে নিজের মুক্তির উপায় ভাবিয়া স্থির করিতে হইবে। দুই দুই বার সে খড়্গের উপর হাত দিল, কিন্তু চিতার গলদেশ এমন ঘন লোমরাজিতে আচ্ছন্ন যে, তাহার ভিতর দিয়া খড়্গ চালানো দুঃসাধ্য বুঝিয়া সে চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। কারণ উহাকে আক্রমণ করিয়া যদি বধ না করিতে পারে তাহা হইলে নিজের প্রাণ বাঁচাইবার তাহার আর কোনো উপায় থাকিবে না। ঐ ভয়ানক পশুর সহিত সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা করাই উচিত মনে করিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাকে বধ করার ইচ্ছা সে ত্যাগ করিল। সে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল কতক্ষণে দিনের আলো দেখা দেয়।

খুব বেশী দেরি হইল না। তখন সে চিতা বাঘটিকে ভাল করিয়া দেখিল। উহার মুখ তখনও রক্তসিক্ত। সে ভাবিল, "একটু আগেই পেট ভ'রে খেয়েছে দেখছি, জেগে উঠেই খাবার চেষ্টা করবে না।"

ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল, উহা ব্যাঘ্র নয় ব্যাঘ্রী। তাহার বুক এবং জানুর লোমরাজি ধবধবে শাদা। থাবার চারিপাশ ঘুরিয়া মখমলের মত কোমল কালো কালো ফুটকি, দেখিলে মনে হয় সুন্দরী কঙ্কণ পরিয়া আছে। তাহার পেশীবহুল পুচ্ছটিও শাদা, তবে তাহার অগ্রভাগটি ঘোরানো কালো ডোরায় শোভিত। তাহার পিঠের চর্ম্ম পুরানো সোনার মত পীতবর্ণ, অতি কোমল ও মসৃন, তাহার উপর কালো গোলাপের ছাপ। এই ছাপ দেখিয়াই ইহাদের জাতি নির্ণয় হয়। বিড়ালশাবক যেমন সুবঙ্কিম ভঙ্গীতে চেয়ারের গদির উপর ঘুমায়, এই ভয়াবহ অতিথিটিও তেমনি ভঙ্গীতে নিশ্চিন্ত মনে নাসিকাধ্বনি করিয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার রক্তরঞ্জিত বিপুল নখর-শোভিত থাবাগুলি সম্মুখে প্রসারিত করিয়া, তাহার উপর মাথা রাখিয়া সে শুইয়াছিল, মুখের দুইপাশ দিয়া রূপার তারের মত শাদা এবং সোজা গোঁফ দেখা যাইতেছিল।

ফরাসী সৈনিক এই জানোয়ারটিকেই যদি খাঁচায় বদ্ধ অবস্থায় দেখিত, তাহা হইলে ইহার গঠনের সৌষ্ঠব ও ইহার গাত্রচর্ম্মের নানা বর্ণরঞ্জিত রাজোচিত শোভার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। এখন কিন্তু ইহার ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যে তাহার চোখের দৃষ্টি ভয়ে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতে লাগিল। এই ঘুমন্ত ব্যাঘ্রীর উপস্থিতি তাহাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল, সর্পের দৃষ্টি যেমন করিয়া পক্ষীকে মুগ্ধ করে তেমনই।

এই বিপদের সম্মুখে তাহার সাহস ক্রমেই ম্লান হইয়া আসিতেছিল; যদিও কামানের মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে সে কোনদিন দ্বিধা করে নাই। কিন্তু একটা কথা চিন্তা করিয়া সে নিজকে একটু শান্ত করিল, কপালে কালঘাম ঝরাও তাহার বন্ধ হইল। একেবারে নিরুপায় হইলে মানুষ অনেক সময় নিয়তিকে উপেক্ষা করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। সৈনিকটি ধরিয়া লইল ব্যাপারটা হইবে বিয়োগান্তই, কিন্তু এ নাটকে শেষ পর্য্যন্ত নিজের অংশ তাহার বীরের মত অভিনয় করিতে হইবে। মরণের সম্ভাবনা ত মানুষের প্রতিদিনই রহিয়াছে।

নিজেকে যুক্তি করিয়া বুঝাইল, "দুদিন আগেই ত আরবদের হাতে আমার প্রাণ যেতে পারত।"

সে নিজেকে মৃতের সামিল বলিয়াই ধরিয়া লইল। মনে সাহস সঞ্চয় করিয়া সে ব্যাঘ্রীর জাগিবার অপেক্ষায় রহিল। কিছু কৌতুহলও তাহার মনে উঁকি মারিতেছিল।

সকালে সূর্য্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রী চোখ মেলিয়া চাহিল। তারপর পদ চতুষ্টয় টান করিয়া ছড়াইয়া দিয়া আলস্য ভাঙিতে লাগিল। তারপর হাই তুলিল মস্ত বড় হাঁ করিয়া। তাহার ভীতিজনক দাঁতের সার এবং খাঁজ-কাটা করাতের মত জিহ্বাটি বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল। তাহার গড়াগড়ি দিবার মনোরম ভঙ্গী দেখিয়া ফরাসীটি মনে মনে বলিল, "মহিলাটি বেশ সৌখীন।" তাহার মুখে এবং থাবায় যে রক্ত লাগিয়াছিল, তাহা সে চাটিয়া চাটিয়া সাফ করিতে লাগিল, মাথাটা মাটিতে ঘষিতে লাগিল বেশ মনোহর ভাবেই।"

মনে জোর করিয়া সাহস আনার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা স্ফুর্ত্তির ভাবও তাহার আসিয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, "হ্যাঁ, সাজপোষাক আগে ক'রে নাও, তারপর তোমাকে সুপ্রভাত জানান যাবে।" সে আরবদের কাছ হইতে যে ছোরাটা চুরি করিয়া আনিয়াছিল, সেটা মুঠি করিয়া ধরিল।

এই সময় ব্যাঘ্রী ফরাসী বীরের দিকে চাহিয়া দেখিল। সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অগ্রসর হইবার কোনো চেষ্টা করিল না। তাহার দৃষ্টির অসহনীয় উগ্রতায় ফরাসী বীরের দেহ শিহরিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রী আস্তে আস্তে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সৈনিক তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, যেন তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিতে চায়। ব্যাঘ্রী নিকটে আসিলে সে সাহস সঞ্চয় করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের উপর দিয়া পুচ্ছ পর্য্যন্ত ক্রমাগত নখ দিয়া চুলকাইয়া দিতে লাগিল। ব্যাঘ্রী আরামে পুচ্ছ তুলিয়া বিড়ালীর মত ঘড়ঘড় শব্দ করিতে লাগিল, তাহার দৃষ্টিও কোমল হইয়া আসিল। কিন্তু এই ঘড়ঘড় শব্দটাই তাহার বিপুল বক্ষ ভেদ করিয়া উঠাতে, প্রায় বিশাল অর্গ্যান যন্ত্রের ধ্বনির মত বোধ হইতে লাগিল। ফরাসী সৈনিক এইভাবে নিজের আদর সফল হইতে দেখিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে সুন্দরীর মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল; দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রী একেবারে শান্ত হইয়া গেল।

সৈনিক যখন দেখিল তাহার সঙ্গিনীর হিংস্র ভাব একেবারে জুড়াইয়া গিয়াছে, তখন সে গুহা ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্যাঘ্রী প্রথমে কোনই আপত্তি প্রকাশ করিল না, কিন্তু সৈনিক বালুকাস্তূপের উপরে উঠিবামাত্র, সে লঘুগতিতে লম্ফ দিয়া তাহার নিকটে আসিয়া জুটিল। বিড়ালীর ন্যায় পিঠ বঙ্কিম করিয়া সে যুবকের পায়ে নিজের দেহ ঘষিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর সঙ্গীর দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া সে তীব্র হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

"সুন্দরীর আব্দার কম নয়", বলিয়া যুবক আবার তাহার মাথা চুলকাইয়া দিতে এবং গায়ে হাত বুলাইতে সুরু করিল। সফলতায় তাহার সাহস বাড়িয়া গেল, তখন নিজের ছোরাটা লইয়া সে ব্যাঘ্রীর মাথায় সুড়সুড়ি দিতে লাগিল, আঘাত করিবার মত নরম স্থান আছে কিনা তাহাও দেখিয়া লইল। কিন্তু তাহার মাথার খুলি এত শক্ত বলিয়া বোধ হইল, যে অকৃতকার্য্য হইবার ভয়ে সে কিছুই করিল না।

মরুসাম্রাজ্ঞী যে ভৃত্যের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন নানা ভাবেই। তিনি মাথা তুলিয়া, গ্রীবা প্রসারিত করিয়া দিলেন, এবং একেবারে নীরব নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। ফরাসী সৈনিক ভাবিল এখন গলার কাছে ছোরার এক ঘা বেশ জোরে দিলেই এই ভয়ঙ্করী রাজনন্দিনীকে হত্যা করা যায়। ছোরা তুলিয়া মারিতে যাইবে, এমন সময় ব্যাঘ্রী মনোহর ভঙ্গীতে তাহার পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল, এবং তাহার দিকে এমন একভাবে তাকাইয়া রহিল, যাহার মধ্যে স্বভাবোচিত হিংস্রতা কিছু থাকিলেও, ভালবাসার চিহ্ন খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখা গেল।

সৈনিক হতাশভাবে বসিয়া একটা গাছে ঠেস দিয়া কয়েকটা খেজুর খাইতে লাগিল। এক একবার করিয়া

সে মুক্তির আশায় মরুভূমির দিকে তাকায়, আবার একবার করিয়া তাহার সঙ্গিনীর দিকে তাকায়, তাহার করুণার ধারা হঠাৎ শুষ্ক হয় কি না দেখিবার জন্ত। যতবার সে খেজুরের আঁঠি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলে, ততবার ব্যাঘ্রী সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে সেই দিকে চায়। যুবককেও সে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল। পরীক্ষার ফল ভালই বোধ হইল, কারণ খাওয়া শেষ করিয়া যুবক উঠিতেই তাহার সঙ্গিনী নিজের জিহ্বা দিয়া চাটিয়া চাটিয়া তাহার জুতাজোড়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিল।

ফরাসী ভাবিল, "এখন ত খুব খাতির, ক্ষিদে পেলে পরে কি হ'বে জানি না।"

কথাটা মনে হইবামাত্র তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবু সে বসিয়া বসিয়া ব্যাঘ্রীর গঠনসৌষ্ঠব দেখিতে লাগিল। ঐ জাতীয় পশুর মধ্যে এটি যে খুবই সুন্দরী সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। সে প্রায় তিন ফিট উচ্চ, এবং পুচ্ছ বাদ দিয়াও চার ফিট লম্বা। পুচ্ছটিও কম পুষ্ট নয়, এবং লম্বায় প্রায় তিন ফিট। মাথাটা প্রায় সিংহীর সমান আকারের, মুখের ভাবে একটা আশ্চর্য্য সৌকুমার্য্য ধরা পড়ে। ব্যাঘ্রীর কঠিন হিংস্রতা তাহাতে আছে বটে, কিন্তু চতুরা রমণীর মুখের ভাবের সঙ্গেও সাদৃশ্য কম নয়। এই নির্জ্জনমরুবাসিনী রাণীর মুখ একটা কঠোর আনন্দে উদ্ভাসিত, সে রক্তপান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইয়াছে এখন আমোদ করিতে চায়।

সৈনিক একটু এধার ওধার চলাফেরা করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রী আপত্তি করিল না, যদিও তাহার প্রতিপদক্ষেপের প্রতি সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া রহিল। ঝরণার ধারে গিয়াই সৈনিক নিজের ঘোড়ার মৃতদেহ দেখিতে পাইল, ব্যাঘ্রী ইহাকে এতদূর টানিয়া আনিয়াছে। ঘোড়ার দেহের দুই তৃতীয়াংশই তাহার উদরসাৎ হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হইল। ঘুমন্ত অবস্থায় তাহাকে ব্যাঘ্রী কেন যে আক্রমণ করে নাই, এবং কোন কর্ম্মে যে সে ব্যস্ত ছিল, তাহা যুবক ভাল করিয়াই বুঝিল।

প্রথমে একটুখানি শুভলক্ষণ দেখিয়া তাহার ভবিষ্যতের জন্তও আশা হইল। ব্যাঘ্রীকে লইয়া ঘরসংসার করিবার অদ্ভুত বাসনা তাহাকে পাইয়া বসিল। অবশ্য সারাক্ষণ মহারাণীর তাঁবেদারী তাহাকে করিতে হইবে, যাহাতে তিনি কোনোমতে অসন্তুষ্ট না হন, তাহাও দেখিতে হইবে। সে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাঘ্রীর পার্শ্বে বসিল, এবং দেখিয়া খুসি হইল যে, সে আনন্দসূচক পুচ্ছ আন্দোলন করিতেছে। ফরাসীর মন হইতে ভয় দূর হইয়া গেল, সে উহার সহিত খেলিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া তাহার পিঠ চুলকাইয়া তাহাকে খুসি করিয়া দিল। তাহার থাবায় হাত বুলাইতে যাওয়ায় সে তাড়াতাড়ি নখরগুলি ভিতরে টানিয়া লইল, যাহাতে যুবকের হাতে আঁচড় না লাগে। ফরাসীর হাতে তখনও সেই ছোরা, ব্যাঘ্রীর দেহে সেটি আমূল বসাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা তখনও তাহার মন হইতে যায় নাই। কিন্তু পাছে মরিবার সময় শেষ আলিঙ্গনে ব্যাঘ্রী তাহাকেও সাথী করিয়া লয়, সে ভয়ও ছিল। তাছাড়া মনে মনে একটু অনুশোচনার ভাবও তাহার যে না হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এই পশুটি তাহার ত কোনই অপকার করে নাই? বরং তাহার মনে হইতেছিল, এই জনশূন্য মরুতে সে একটি সঙ্গী খুঁজিয়া পাইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া তাহার একটি রমণীর কথা বারবার মনে পড়িতেছিল। ঐ রমণীটিকে সে একসময় খুবই ভালবাসিত। তামাসা করিয়া যুবক তাহার নাম দিয়াছিল "কেতকী"; কারণ সুন্দরীর রূপ ছিল বটে, কিন্তু খোঁচা ছিল বেশী। তাহার সঙ্গে যতদিন সৈনিকের সম্বন্ধ ছিল, তাহাকে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে হইত, কখন না জানি সুন্দরী তাহার বুকে ছোরা বসাইয়া দেয়। সেই বিগতদিনের স্মৃতি মনে আসায়, এই সুন্দরী পশুরাজনন্দিনীর নামও সে 'কেতকী' রাখা স্থির করিল। ইহার সম্বন্ধে ভয়ের ভাব তাহার ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল।

সন্ধ্যা হইতে হইতে অবস্থাটা তাহার এতখানি সহিয়া গেল যে ইহার মধ্যে ভাল লাগিবার মত জিনিষও সে দেখিতে পাইল। "কেতকী" বলিয়া ডাকিলে ব্যাঘ্রী ক্রমে চোখের দৃষ্টিতে সাড়া দিতে সুরু করিল।

সূর্য্যাস্তের সময় কেতকী কয়েকবার হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

খোশমেজাজী ফরাসী যুবক মনে মনে বলিল,—

"শ্রীমতীর শিক্ষা-দীক্ষা বেশ ভালই দেখছি, সন্ধ্যাবন্দনা করতেও জানে।"

অন্ধকার হইয়া আসিল। সৈনিক স্থির করিল ব্যাঘ্রী ঘুমাইয়া পড়িলেই, সে নিজের পায়ের দৌড়াইবার শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে পারিলেই ভাল।

সে ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল। সময় উপস্থিত হইবামাত্র সে প্রাণপণ শক্তিতে নীল নদের দিকে দৌড় দিল। কিন্তু মাইল খানেক যাইবামাত্র সে বুঝিতে পারিল, ব্যাঘ্রী তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে, তাহার তীব্র হুঙ্কার ও সলম্ফ গতির শব্দ নীরবতার মধ্যে বড় ভীষণ হইয়া যুবকের কর্ণে পৌঁছিল।

সে মনে মনে মনে বলিল, "ইনি আমায় বড় ভালবেসে ফেলেছেন, দেখ্‌ছি। হয়ত এখন পর্য্যন্ত আর কারো সঙ্গে সুন্দরীর পরিচয় হয়নি। যাক্, তাঁর প্রথম প্রেমাস্পদ হওয়ার মধ্যে খানিকটা গৌরব আছে।"

হঠাৎ সে এক চোরাবালির গর্ত্তে পড়িয়া গেল। এইগুলি মরুভূমির প্রধান বিপদ, ইহার মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। সে বুঝিতে পারিল যে, ক্রমেই সে ডুবিয়া যাইতেছে, ভয়ে পাগল হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

ব্যাঘ্রী নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে যুবকের গলার কলার কামড়াইয়া ধরিয়া, ভীমবেগে পশ্চাৎ দিকে এক লম্ফ দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে চোরাবালির গহ্বর হইতে সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া পড়িল।

যুবক মহোৎসাহে তাহাকে আদর করিতে করিতে বলিল, "কেতকী আমরা আজ থেকে চিরদিনের বন্ধু হ'লাম। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কোরোনা।" দুই জনে আবার ফিরিয়া চলিল।

এখন হইতে মরুভূমির নির্জ্জনতা ঘুচিয়া গেল। এখানে এমন একজন সঙ্গী পাওয়া গেল, যাহার সহিত কথা বলা যায় যাহাকে আদর করা যায়। ইহার হিংস্রতা কেমন করিয়া যে লুপ্ত হইয়া গেল, যুবক ভাবিয়াও পাইল না।

রাত্রে তাহার জাগিয়া থাকিবারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই সে কখন ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙিবার পর সে আর কেতকীকে নিকটে দেখিতে পাইল না। বালিয়াড়ীর উপর উঠিয়া দেখিল অনেক দূরে কেতকী লাফ দিতে দিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

ব্যাঘ্রী নিকটে আসিয়া পড়িলে, যুবক দেখিল তাহার মুখ রক্তরঞ্জিত। সৈনিক তাহাকে আদর করায় সে আরাম পাইয়া ঘড় ঘড় শব্দ করিতে লাগিল। দুই চোখে অনুরাগ ভরিয়া সে ফরাসী যুবকের দিকে তাকাইয়া রহিল।

যুবক তাহাকে আদর করিয়া বলিতে লাগিল, 'সুন্দরি, তুমি খুব ভদ্রঘরের মেয়ে না? কিন্তু আদর ত খুব পছন্দ কর দেখি। তোমার লজ্জা করেনা? কি খেয়ে এলে, আরব নাকি?. তা খেতে পার তারাও তোমার মত জানোয়ার বই আর কিছু না। কিন্তু ফরাসী ধ'রে খেয়ো না যেন, কখনও। তা যদি খাও, তোমাকে আর ভালবাস্‌ব না।"

বিড়াল-ছানা যেমন করিয়া প্রভুর সঙ্গে খেলা করে, সে তেমনি যুবকের সঙ্গে খেলিতে লাগিল। যুবক অন্যমনস্ক হইলে সে ভাবে ভঙ্গীতে খোসামোদ করিয়া আদর ভিক্ষা করিতে লাগিল।

এই ভাবে দিন কাটিয়া চলিল। ফরাসী যুবকের চক্ষে ক্রমে মরুভূমির অতুল সৌন্দর্য্য ধরা পড়িতে লাগিল। আকাশে সে অনাহত রাগিণী শুনিতে আরম্ভ করিল। আত্ম-চিন্তার আনন্দও সে জানিতে পারিল এই নির্জ্জন মরুর কল্যাণে। ব্যাঘ্রীর প্রতি তাহার ভালবাসা দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল। মানুষ ভালবাসিতে না পারিলে বাঁচে না। সে বুঝিতে পারিত না যে, নিজের ইচ্ছা-শক্তির প্রবলতায় সে ব্যাঘ্রীর স্বভাবই পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে না, অন্যত্র খাদ্য-দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পায় বলিয়াই সে তাহাকে আক্রমণ করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। শেষে ব্যাঘ্রী যুবকের এমন অনুগত হইয়া পড়িল, যে, তাহার সম্বন্ধে সৈনিকের মনে ভীতির লেশমাত্রও রহিল না।

দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় সে ঘুমাইয়াই কাটাইয়া দিত। কিন্তু মুক্তির উপায় যাহাতে তাহার চক্ষু এড়াইয়া না যায় সে বিষয়ে সে মনকে সর্ব্বদা সতর্ক

রাখিত। নিজের পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা সে একটা পতাকা প্রস্তুত করিয়া উহা একটা খেজুর-গাছের আগায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল।

যখন পরিত্রাণের আশা একেবারেই নাই বলিয়া মনে হইত, তখন সে সঙ্গিনীকে লইয়া আদর করিতে বসিত। সে তাহার গলার স্বরের সামান্য তারতম্যও এখন বুঝিতে পারিত, তাহার বিভিন্ন দৃষ্টির অর্থ করিতে পারিত। কেতকীকে পুচ্ছ ধরিয়া টানিলেও সে এখন আপত্তি করিত না। তাহার শুভ্র বক্ষ এবং সৌষ্ঠবময় দেহ দেখিয়া সৈনিকের মনে বড়ই আনন্দ হইত। সে লম্ফঝম্ফ দিয়া ক্রীড়া করিলে তাহার ক্ষিপ্রতা, তাহার মনোহারিতা দেখিয়া সে নিত্যই চমৎকৃত হইত। যতই কেন না ক্রীড়ায় মত্ত থাক, 'কেতকী' বলিয়া ডাকিলে ব্যাঘ্রী তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হইয়া আহ্বানকারীকে দেখিত।

একদিন দারুণ রৌদ্রে প্রকাণ্ড এক পক্ষী দেখা দিল। সৈনিক ব্যাঘ্রীকে ফেলিয়া এই নূতন অতিথিকে দেখিতে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া মরুভূমির সুন্দরী গর্জন করিয়া উঠিল।

সৈনিক ফিরিয়া দেখিল কেতকীর চক্ষু আবার তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সে অবাক হইয়া বলিল, "হিংসেও আছে দেখ্‌ছি। নিশ্চয় কোনো মেয়ে মানুষের আত্মা এর শরীরে এসে ঢুকেছে।"

পাখাটা উড়িতে উড়িতে শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। যুবক ফিরিয়া আসিয়া ব্যাঘ্রীর সৌন্দর্য্যের তারিফ করিতে বসিল। সত্যই সে তরুণী রমণীর মত সুন্দরী ছিল। তাহার সোনালী রংএর লোমরাজি ফিকা হইতে হইতে বক্ষের কাছে একেবারে শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। সূর্য্যের আলোকে তাহার গাত্রচর্ম্ম অপূর্ব্ব বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিত। ব্যাঘ্রী এবং সৈনিক পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকিত, যেন দুজনে দুজনের মনের কথা জানে। মাথায় হাত বুলাইলে এই মরুবাসিনী সুন্দরীর দেহ আনন্দে কম্পিত হইয়া উঠিত। চক্ষু বিদ্যুতের মত ঝিলিক্ হানিয়া উঠিয়া ক্রমে আরামের আতিশয্যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত।

সৈনিক যুবক ব্যাঘ্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। সে মরুভূমির বালুকার মতই স্বর্ণকান্তি, এবং তাহারই মত জ্বালাময়ী এবং নিঃসঙ্গ। মনে মনে বলিল, "ইহার আত্মা আছে নিশ্চয়।"—

এতদূর পর্য্যন্ত পাড়ার ভদ্র মহিলা আমায় বলিলেন, "পশুদের সম্বন্ধে আপনার ওকালতী পড়্‌লাম। কিন্তু এই দুটি প্রণয়ীর শেষ পরিণাম কি হ'ল?"

"পরিণাম সচরাচর যা হয়। সকল ভালবাসাই শেষ হয় একটা কিছু বুঝ্‌বার ভুলের জন্যে। পরস্পরকে বিশ্বাসঘাতক ব'লে সন্দেহ হয়, কিন্তু আত্মসম্মানের আতিশয্যে কেউ বোঝাপড়া করার চেষ্টা করে না! ফলে একেবারে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায়।"

মহিলা বলিলেন, "ঠিক কথা। কখনও কখনও একটা কথা একটা দৃষ্টিতেই সব শেষ হ'য়ে যায়। কিন্তু গল্পের শেষটা বলুন।"

আমি বলিলাম, "বলা কিছু শক্ত, কিন্তু আপনি বুঝ্‌বেন হয়ত।" বুড়ো সৈনিক মদের বোতল শেষ করে বল্‌লে, জানিনা কি ক'রে আমি কেতকীকে ব্যথা দিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ সে ফিরে আমার জানুতে দাঁত বসিয়ে দিল। খুব হিংস্রভাবে যে এটা কর্‌ল তা নয়, কিন্তু আমি ভয় পেয়ে ভাব্‌লাম সে আমায় মেরে ফেল্‌তে চায়। হাতের ছোরাটা ধাঁ ক'রে তার গলায় বসিয়ে দিলাম। সে তীব্র চীৎকার ক'রে গড়িয়ে পড়্‌ল। শব্দটা আমার বুকের রক্ত যেন হিম ক'রে দিল। তারপর সে আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌ল, তার দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্রও ক্রোধ ছিল না। জগতে আমার যা কিছু ছিল, সব আমি তখন তার প্রাণ ফিরে পাবার জন্যে দিতে পার্‌তাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন একটি মানবীকেই হত্যা কর্‌লাম। কিছু পরেই একদল ফরাসী সৈন্য আমার পতাকা দেখ্‌তে পেয়ে আমার কাছে এসে উপস্থিত হল। এসে দেখ্‌ল চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে।

তারপর কত জায়গায় গিয়েছি, কত যুদ্ধে লড়াই ক'রে ফিরেছি, কিন্তু মরুভূমির মত সুন্দর আর কোথাও কিছু দেখিনি। কি অপূর্ব্ব মহীয়ান্ সৌন্দর্য্য!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেখানে আপনি কি অনুভব কর্‌তেন?"

বৃদ্ধ বলিল, "পরিষ্কার ক'রে বল্‌তে পারব না। খেজুর-গাছের ছায়া আর কেতকীর জন্যে এখনও ক্ষোভ হয়। মরুভূমিতে সব আছে, অথচ কিছু নেই।"

"তার মানে কি?"

বৃদ্ধ বলিল, "কিরকম জান? শুধু ভগবান আছেন, মানুষ নেই, এ যে-রকম।"

জার্ম্মেণীর তরুণ আন্দোলন

শ্রী দুর্গাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী

জার্ম্মেণীর তরুণ ভ্রাম্যমাণদের একদল কিছু দিন হইল ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। জার্ম্মেণীর আধুনিক সভ্যতার উপর প্রভাবশালী এই আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু বলাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই তরুণ ভ্রাম্যমাণ আন্দোলনের লক্ষ্য—পুরাতনের প্রভাব হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া নবজীবন ও নবশক্তি লাভের জন্য মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া। এই আন্দোলনটাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইহার জন্মকালীন জার্ম্মেণীর সামাজিক অবস্থাটাও একটু জানা দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানুষের সহিত মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ ক্রমশঃ অসরল ও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে এবং তীব্র শ্রেণীগত পার্থক্যের দ্বারা চালিত হইয়া ধনে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। সকলেই যে এইরূপ পৃথক্ ভাবে জীবন কাটাইত তাহা নহে। কিন্তু পুরুষানুক্রমে এইরূপ আবহাওয়ার ভিতর মানুষ হইয়া ইহার প্রভাব কাটাইয়া উঠা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন ছিল, সন্দেহ নাই। উচ্চশিক্ষার নামে সমাজের মধ্যে অনেক ক্লেদ জমিয়া উঠিতেছিল। গীর্জ্জায় যাওয়াটা শিক্ষার চিহ্ন বলিয়া অনেকেই গীর্জ্জায় যাইত, যদিও ধর্ম্মানুশাসনের উপর প্রায়ই তাহাদের কোন বিশ্বাস ছিল না।

এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর থাকিয়া শিশুদের সুকুমার চিত্তবৃত্তিগুলির সুন্দর ও স্বাভাবিক বিকাশ হইতে পারিতেছিল না। শিশুর মন স্বভাবত জিজ্ঞাসু। চারিদিকে যে-সকল ব্যাপার সে দেখে তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি প্রশ্ন তাহার মনে উদিত হয় এবং সেই প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য তাহার মন লালায়িত হইয়া উঠে। কিন্তু তখনকার প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতর এইসকল
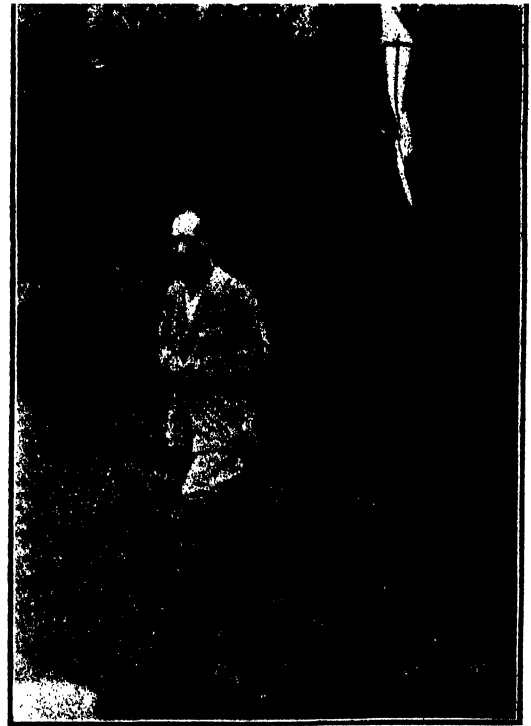
কার্ল ফিশার

প্রশ্নের উত্তর পাইবার উপায় ছিল না। বাড়ীতে এইসকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া অসম্ভব ছিল; বিদ্যালয়ে পড়াইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন, তিনি পড়াইয়াই যাইতেন;

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন ভাববিনিময় হইতে পারিত না।

এই সময় প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য একটা আন্দোলনের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বার্লিনের কাছেই কয়েকজন শিক্ষক থাকিতেন; তাঁহারা সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যে-ভাবে ছাত্রদের গঠন করিতে-ছিলেন তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছিলেন। এই সহানুভূতিশীল ক্ষুদ্র দলটির একজনের নাম ছিল হার্‌মান হফ্‌মান। তিনি নিজের ছাত্রদের শর্টহ্যাণ্ডে পাঠ দিতেন

ওয়ান্ডারভূগেল দলের একজন সভ্য

ও তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাদের লইয়া পাহাড়ে ও বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে তিনি কয়েক জন ছাত্রকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হন ও চারি সপ্তাহ বোহেমিয়ার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ান। এইসময় তাঁহার সঙ্গে কার্ল ফিশার নামে একজন ছাত্র ছিলেন; ইনিই পরে এই তরুণ ভ্রাম্যমাণ-সঙ্ঘের সংস্থাপক হন। এইসকল ভ্রমণ হইতেই, অবসর-সময়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া আনন্দ অর্জ্জন করার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হয়। তাঁহার সহপাঠীদের নিকট সহানুভূতি পাইয়া তাহা-দের লইয়া তিনি সপ্তাহের অবসর-সময়ে প্রমোদ-ভ্রমণ আরম্ভ করেন। তাহাদের এইসকল প্রমোদ-ভ্রমণের কার্য্যবিবরণী ছিল—বিকালে কোন-একটা ধ্বংসাবশেষে যাইয়া আগুনের কুণ্ড জ্বালাইয়া তাহার পাশে মাটিতে শোওয়া ও নক্ষত্রখচিত আকাশের পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়া; ঠাণ্ডায় ও পোকার কামড়ে ঘুম ভাঙ্গিলে কবিতা আবৃত্তি বা নিজ নিজ সুখদুঃখের কাহিনী বলিয়া বাকী রাতটুকু কাটাইয়া দেওয়া; ভোরে ভরত-পাখীর গানের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বাড়ী হইতে আনা তৈরী কাফি,

স্নানের পর তাঁবুতে বিশ্রাম

রুটি ও মাখমের সঙ্গে প্রাতরাশ শেষ করা; ঝরণার জলে স্নান, সম্ভব হইলে সাঁতার, তারপর মধ্যাহ্ন-আহার প্রস্তুত করা; আহারশেষে গৃহাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ ও প্রমোদ-ভ্রমণ শেষ।

অপটু হস্তের রন্ধনে খাদ্য প্রায়ই অখাদ্য হইয়া দাঁড়াইত, কিন্তু গৃহ ও বিদ্যালয়ের শাসন হইতে দূরে মুক্ত নীল-আকা-শের তলে স্বাধীন তাহাদের মনে এইসব অভাব-অভিযোগের কথা মোটেই উদিত হইত না। যদিও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় তাহারা বাড়ী পৌঁছিত, এবং পরদিন সকালে বিদ্যালয়ে ঝিমাইত তবুও নূতন জিনিষ দেখা ও জানার খুশীতে তাহাদের বুক ভরিয়া থাকিত।

কার্ল ফিশার ও তাঁহার সাথীদের এ'রূপ ভবঘুরের মত যেখানে সেখানে ভ্রমণ সে-সময়কার প্রাণহীন নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়। বাস্তবিক এই সময়টার সামাজিক অবস্থার সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের সামাজিক অবস্থার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল এবং দুয়েরই ফল হয় ঠিক একই রকম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে যে

ওয়ানডারভগেল দলের বন্ধন

প্রতিক্রিয়া সুরু হয়, তাহা সমসাময়িক সাহিত্যের ভিতর দিয়া, Storm and Stress আন্দোলনরূপে প্রকাশ পায়। ঠিক এইভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের কুশাসনের ফলে জার্ম্মেণীর বর্ত্তমান যুবক-আন্দোলন আরম্ভ হয়। সাহিত্যেও ইহার পূর্ব্বাভাস যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল

কার্ল ফিশারের দল ক্রমশ উন্নতিলাভ করিতে থাকে। অবশেষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর কার্ল ফিশার যথোচিত অনুষ্ঠান সহকারে তাঁহার Wandervogel সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। জার্ম্মেণীর ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী এক-প্রকার পাখীর নামানুসারে এই সঙ্ঘের নামকরণ হয়। এই সঙ্ঘের প্রতি অনেক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরও সহানুভূতি ছিল; তাঁহারা টাকা দিয়া ও অন্যান্য নানাপ্রকারে সহায়তা করিতেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, Wandervogel সঙ্ঘ শুধু একটা ভ্রমণ-আয়োজন, কিন্তু ইহার নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা একটা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যপিপাসু ভ্রাম্যমাণ-যুবক-সঙ্ঘ। ইহার নেতাদের উপাধি Oberbacchantan, তাহার নীচেই Burchen বা যুবক-ভ্রাম্যমাণ। নবব্রতীদের বলা হয় Fuechse। নিয়মবন্ধন বলিয়া কোন জিনিষ তাহাদের ভিতর ছিল না; কারণ, সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। ইহাদের ভিতর অনেকেই আচার-ব্যবহারে, এমন-কি কথাবার্ত্তায় পর্য্যন্ত মধ্যযুগের ভবঘুরে পণ্ডিতদের অনুকরণ করিতেন। কোন প্রকার সৌন্দর্য্যানুষ্ঠানের তাঁহারা ধার ধারিতেন না। কারণ তাঁহাদের চরম কামনা ছিল প্রকৃতির ক্রোড়ে স্বাধীনতালাভ ও কৃত্রিম সামাজিক অনুশাসন হইতে মুক্ত হওয়া।

তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই সেতারের মত একরকম বাজনা থাকিত এবং সেই বাজনার সঙ্গে তাঁহারা যখন-তখন যা-তা গান করিতেন। বাস্তবিক তাঁহাদের গানের

ওয়ানডারভগেল দলের একটি প্রিয় আড্ডাস্থল

কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। কখন বা আরম্ভ করিতেন গ্রাম্য-গীতিকা, কখন বা দেশের অতীত-গৌরবের গাথা,
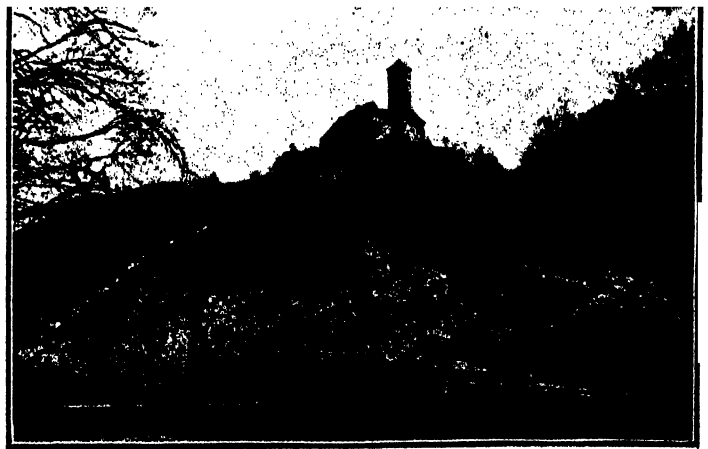
কখন বা প্রেমের গান, কখন বা এমন গান আরম্ভ করিতেন যাহার কোন অর্থই হইত না। কখন বা জার্ম্মেণীর কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা গাহিতে আরম্ভ করিতেন—"হে শস্যশ্যামলা জন্মভূমি, কী সুন্দর তোমার রূপ!"

একজন প্রবীণ ওয়ান্‌ডারভগেল তাঁহার অভিজ্ঞতার গল্প বলিতেছেন।

এই তরুণ-ভ্রাম্যমাণ-দলের কার্য্যনীতি ছিল—ভ্রমণে বাহির হইলে দেশের যতদূর সম্ভব দেখা ও যত কম পারা যায় ট্রেনে চড়া। কোন বড় নগর হইতে বাহির হইতে হইলে তাঁহারা প্রথম খানিকটা পথ ট্রেনে যাইয়া তারপর পায়ে হাঁটিতে আরম্ভ করেন; কারণ, নগরের মধ্যে অথবা কাছে সময় নষ্ট করা তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়। পর্য্যটনে বাহির হইবার দিন অতি প্রত্যূষে তাঁহারা রীত-অনুযায়ী পোষাকে একে একে ষ্টেশনে সমবেত হন। তারপর চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীতে চড়িয়া ট্রেনে যাইবার রাস্তাটুকু অতিবাহিত করেন। ট্রেন হইতে নামিয়া একবার সারা দিবসের কার্য্যবিবরণী আলোচনা করিয়া ভ্রমণের জায়গাটার মানচিত্র দেখেন; তারপর সকলে একসঙ্গে গান করিতে করিতে হাঁটিতে আরম্ভ করেন। তিন চারি ঘণ্টা ভ্রমণের পর তাঁহারা বিশ্রামের জন্য কোন-একটা পাহাড় বা নদীর ধারে থামেন। তখন কেহ বা পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমান, কেহ কেহ বা কৃত্রিম যুদ্ধ করেন, কেহ কেহ বা গল্পগুজব করেন। শ্রান্তি দূর হইলে তাঁহারা আবার মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে থাকেন, যতক্ষণ না কোন একটা ছোট নদী বা জলাশয় পাওয়া যায়। সেখানে সকলে মিলিয়া স্নান করিয়া একটা পরিষ্কার জায়গা বাছিয়া রান্নার জন্য আগুন জ্বালান। তখন কেহ-বা রান্নার জিনিষপত্র ঠিক করিতে থাকেন, কেহ বা জল আনেন, কেহ বা জ্বালানি কাঠ আনেন। সমস্ত ঠিক হইলে খিচুড়ীর মত একরকম খাদ্য প্রস্তুত করা হয়—তাহাও প্রায়ই অর্দ্ধসিদ্ধ থাকে, কারণ রান্নার জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট করার মত ধৈর্য্য তাঁহাদের নাই। খাওয়া শেষ করিয়া থালা-বাটি ধুইয়া তাঁহারা আবার মহা স্ফূর্ত্তিতে হাঁটিতে আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ তাঁহারা দিনে প্রায় ২৫ মাইল পর্য্যটন করেন। রাত্রিতে খোলা যায়গায় অথবা কোন কৃষকের শুক্‌না ঘাসের গাদায় পড়িয়াই তাঁহারা ঘুমান। আজকাল

ওয়ান্‌ডারভগেল দলের নৃত্য

Wandervogel-দের রাত্রিতে বিনা খরচে থাকিবার জন্য জার্ম্মেণীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাসা তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে রাত্রে থাকিবার

ওয়ান্‌ডার্‌ভগেল নৃত্যের আরেকটি ছবি

জার্ম্মেণী ও সুইট্‌সারল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও স্থানে স্থানে তাহার শাখা স্থাপিত হয়। দলে দলে লোক ইহার সভ্য হইতে থাকে এবং ইহার জন্য স্বতন্ত্র একটা সাময়িক পত্রিকা বাহির করা হয়। কিন্তু নূতন সভ্যদের মধ্যে অনেকেরই কার্ল ফিশার ও তাঁহার সঙ্গীদের মত পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইবার উৎসাহের অভাব ছিল। তাঁহারা ভ্রমণটা ট্রেনের উচ্চশ্রেণীর যাত্রী হইয়াই সারিতেন এবং থাকিতেনও বড় বড় হোটেলে। কার্ল ফিশার ও তাঁহার দল এইসব কারণে এই আরামপ্রিয় ও সৌখীন লোকদের দল ত্যাগ করেন। সেই হইতে তাঁহার দলের নাম হয় পুরাতন Wandervogel সঙ্ঘ। এই দল আজ পর্য্যন্ত ইহার

জায়গা পাওয়া যায় না, খোলা জায়গাতেই ঘুমাইতে হয়, সেখানে তাঁহারা আগুনের কুণ্ড জ্বালাইয়া তাহার চারিদিকে বসিয়া পুরাতন ও ভূতের গল্প আরম্ভ করেন। কখন বা তাঁহাদের বাজনার সঙ্গে একজন একজন করিয়া বা সকলে একত্রে গান জুড়িয়া দেন এবং আস্তে আস্তে একে একে সকলে ঘুমাইয়া পড়েন। এইভাবে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পাহাড়ে-পর্ব্বতে, বনে-জঙ্গলে ও জলাশয়ে-জলাশয়ে ছুটাছুটি করিয়া যখন তাঁহারা বাড়ী ফেরেন, তখন তাঁহাদের বুনো অসভ্যদের মতই দেখায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের চোখ যৌবনের জ্যোতিতে ও প্রকৃতিকে ভালবাসার আলোয় দীপ্তিময় হইয়া উঠে। ইঁহারা কোন সহরে বেড়াইতে যান না, এটা একটা ভুল ধারণা। Hildesheim, Weimer, Munich প্রভৃতি ঐতিহাসিক সহরের রাস্তায় Wandervogel-দের সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়।

আহারের পর বাসন ধোয়া হইতেছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে Wandervogel আন্দোলন

আড়ম্বরহীন সরলতা অটুট রাখিয়াছে। মূল দলের ভিতর হইতে কতকগুলি প্রশাখা বাহির হয়; বড় বড় অফিসার ও সৈন্য এইগুলির সভ্য বলিয়া এইগুলিতে রাজনীতির গন্ধ বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। পুরাতন Wandervogel দলের

সকলকে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়—চরিত্র সৎ রাখিব, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখিব এবং মদ্যপান বা ধূমপান করিব না। তাঁহাদের দলে কোন নারী সভ্য লওয়া হয় না, কিন্তু নারীরা যাহাতে নিজেরা দল গঠন করিয়া ভ্রমণ করিতে পারেন সেইজন্য যথেষ্ট সহায়তা-উৎসাহ তাঁহারা দিয়া থাকেন। অবশ্য কোন কোন শাখায় নারী সভ্য লওয়া হয়; পুরুষ সভ্যদের মতই তাঁহাদের সাজ, শুধু লম্বাবেণী পিঠের উপর ঝুলান থাকে।

যাত্রাপথে একদল ওয়ান্ডারভোগেল

ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে
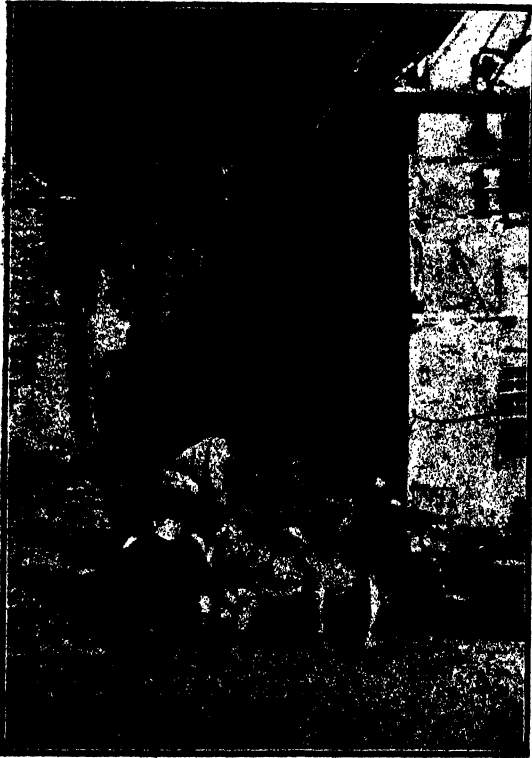
ওয়ান্ডারভোগেল দলের সভ্যগণ বীণা বাজাইতেছেন।

ওয়ান্ডারভোগেল দলের নারী সভ্যগণ রন্ধন করিতেছেন।

Wandervogel আন্দোলনটাই জার্ম্মেনীর সব-চেয়ে পুরাতন যুবক আন্দোলন। অন্যান্য যুবক আন্দোলনগুলির ইহা হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, Wandervogel আন্দোলনটাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের কৃত্রিম সমাজ-শাসন ও

ওয়ান্ডার্ভগেল দলের একটি আস্তানা

দিনের পরিশ্রমের পর শুইবার উদ্যোগ
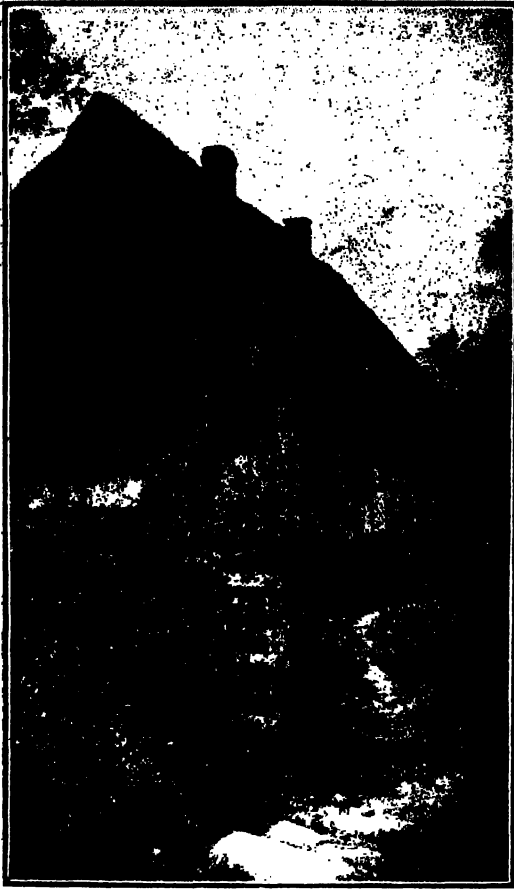
তীব্র শ্রেণীগত পার্থক্যের সব-চেয়ে খাঁটী ও প্রবল প্রতিবাদ। আধুনিক জার্ম্মান সমাজের উপর ইহা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একথা বলিলে অন্যায় হয় না যে, এই Wandervogel আন্দোলন জার্ম্মেণীর যুবকদিগের মধ্যে এক নবশক্তি সঞ্চার করিয়াছে।

নব জার্ম্মেণীর কাব্য, সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ এই Wandervogel আন্দোলনের নিকট বিশেষ পরিমাণে ঋণী। সমসাময়িক অন্যান্য যুবক আন্দোলনের সহযোগে Wandervogel সম্প্র মধ্যযুগের গূঢ়ার্থাত্মক নাটকগুলি ও Hans Sachsএর Carnival Playগুলি অভিনবরূপে সাধারণের সম্মুখে অভিনীত করেন। তাঁহাদের অভিনয়ের অসামান্য সাফল্যে এবং এইরূপ নাটকের অভিনয়ের জন্য সাধারণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে জার্ম্মেণীর থিয়েটার-ওয়ালারা তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চগুলি নূতন করিয়া সজ্জিত করিয়া এইসব নাটকের অভিনয় সুরু করেন। এইভাবে জার্ম্মেণীর রঙ্গমঞ্চে পুরাতন ধর্ম্মমূলক নাটকগুলির পুনরভ্যুদয় হয়।
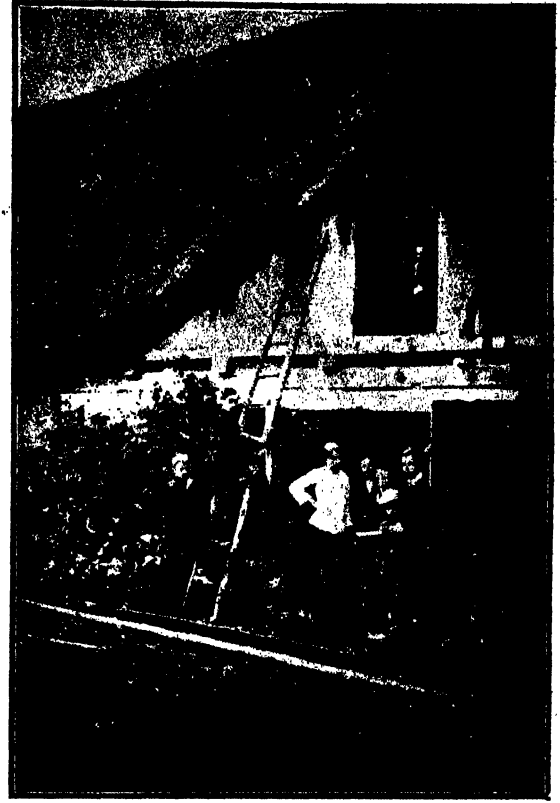
আজকাল অনেকগুলি Wandervogel সাময়িক পত্রিকা বাহির হওয়াতে সাহিত্যও ইঁহাদের কাছে কতক পরিমাণে ঋণী হইয়া পড়িয়াছে। Wandervogel-দের মধ্য হইতে অনেক কবির অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান Hermann Loens, Waldemar Bosuels, Stefen George, Frank Wergel প্রভৃতি কয়েকজন।

যে-সব গ্রাম্যগাথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, সে-গুলিকে ইঁহারা গাহিয়া গাহিয়া এতটা জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন যে, সেগুলি এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জার্ম্মান সাহিত্যের পাঠ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

Wandervogel সঙ্ঘ যে বর্ত্তমান জার্ম্মেণীর সমাজ ও সাহিত্যের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ আড়ম্বরহীনতা ও প্রকৃতির উপর তাঁহাদের সুগভীর ভালবাসা। একজন জার্ম্মান লেখক বলিয়াছেন, প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের এই সম্বন্ধটা যেন একটা অশ্রুত-মধুর সুর; তাহা সমস্ত শরীর-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া যৌবনালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।

সেল্‌মা লাগেরলফ্‌

শ্রী বটকৃষ্ণ ঘোষ

সুইডেনে সেল্‌মা লাগেরলফের জন্ম। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ৬০ লক্ষ লোকের বাস। যেখানে লক্ষাধিক লোকের বাস এমন বড় সহর এখানে মাত্র তিনটি—ষ্টক্‌হোলম্‌, গোয়েটেবর্গ এবং মাল্‌ম্যো। দেশের অর্দ্ধাংশ বনাকীর্ণ এবং বড় বড় সহরগুলিও চারিদিক্‌ হইতে হ্রদ ও পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। এক কথায় বলা যায়, মানুষ এখানে বাস্তবিক প্রকৃতির কোলেই মানুষ হইতেছে। সুদূর উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় সুইডেন সকল বিষয়েই নিজের পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছে, সকল বিষয়েই নিজের বিশেষত্ব পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করিয়াছে, বাহিরের জগতের সাধারণ দ্বন্দ্বকোলাহল হইতে সুইডেন বহুলপরিমাণে নিষ্কৃতি পাইয়া আসিয়াছে। সেইজন্যই সুইডেন আজ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ, শতাধিক বৎসর এখানে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। ধনী-দরিদ্রের বিবাদ এখানে যে একেবারেই নাই তাহা বলা যায় না, তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম।

ইহাই সেল্‌মা লাগেরলফের জন্মভূমি। সুইস্‌-সমাজ হয়তো খুব শীঘ্রই তাহার প্রতিভাসম্পন্ন সন্তানগুলিকে চিনিতে পারে না; কিন্তু বৈদেশিকগণ একবার তাহা দেখাইয়া দিলে, সুইডেন তাহাদের আদর করিতে খুবই তৎপরতা দেখায়। ডেন্মার্কে চিরকুমারী সেল্‌মা লাগেরলফের সুখ্যাতি হওয়ামাত্রই সমস্ত সুইডেন নানা সম্মানে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়াছিল।

* Walter A. Berendsohn কর্ত্তৃক জার্ম্মান ভাষায় লিখিত সেল্‌মা লাগেরলফের জীবনী হইতে

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২০ নভেম্বর ভের্ম্‌লাণ্ডের (Varmland) অন্তর্গত 'মার্‌বাকা' (Marbacka) নামক ভবনে

সেল্‌মা লাগেরলফ্‌

সেল্‌মা লাগেরলফের জন্ম হয়। তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্মদিবসে লেখিকা বলিয়াছেন, তাঁহার জন্মের অব্যবহিতপরেই নাকি খড়ি পাতিয়া তাঁহার ভবিষ্যদ্‌জীবনের গতিনির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছিল। সাড়ে তিন বৎসর বয়সে শিশু সেল্‌মার পক্ষাঘাত হয়, তাহার ফলে তাঁহার নড়াচড়া বা হাঁটাহাঁটি করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাঁহার পিতামাতা এক বৎসর ধরিয়া নানা চিকিৎসাতেও কোন ফল না পাইয়া অবশেষে তাঁহাকে লইয়া ষ্ট্রোমষ্টাটে (Stromstad) গমন করেন। সেখানে সমুদ্র-স্নানের ফলে শিশু সেল্‌মা আবার চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পায়ের দুর্ব্বলতা কিয়ৎপরিমাণে রহিয়াই গেল, সেজন্য শিশুসুলভ অনেক খেলা-ধূলা হইতেই সেল্‌মাকে বিরত থাকিতে হইত। তখন হইতেই কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করা সেল্‌মার অভ্যাস হইয়াছে।

সেল্‌মার দুইটি বড় ভাই ছিল; তাহাদের সঙ্গে কিন্তু সেল্‌মার কখনও হৃদ্যতা ছিল বলিয়া জানা যায় না। বরং তাঁহার অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট বোন্‌টির সঙ্গেই সেল্‌মার বেশী ভাব ছিল। সেল্‌মার পিতার চরিত্র ছিল চমৎকার। তাঁহার সারাটি জীবন শুধু ব্যর্থতার ইতিহাস, কিন্তু তথাপি জীবনে কখনও আনন্দের অভাব তাঁহার ছিল না, বরং আনন্দের প্রাচুর্য্যই চোখে পড়িত বেশী। তাঁহার অবস্থা কোনকালেই খুব ভাল ছিল না, কিন্তু অভ্যাগতের নিকট 'মারবাকা'র দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। সেল্‌মা লাগেরলফের সকল লেখার মধ্যেই একটা সুগভীর গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাঁহার এই সদানন্দ পিতার কথা আসিলে তাঁহার ভাষা আপনা হইতেই আনন্দ-উচ্ছল হইয়া পড়ে। কি যে নিবিড় সম্বন্ধ পিতা ও পুত্রীর মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সেল্‌মার "বার্চশ্রেণীর মধ্যে" (In der Birkenallee, 1884) নামক কবিতা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পিতা তখনই ভগ্নস্বাস্থ্য, মেয়ের উপর ভর করিয়া ধীর পদক্ষেপে বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই বৃদ্ধের শ্রাদ্ধের কথায় আসিয়া পড়িতেছে। বৃদ্ধ তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে নিজে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছেন। অশ্রুপাত ও শোক-চিহ্নের কিছুই বৃদ্ধ হইতে দিবেন না। শ্রাদ্ধে যেন পূর্ণ আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে - কন্যাকে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর দুই জনে হাসিলেন; পিতার সেই প্রাণ খোলা হাসি, যৌবনের আনন্দ তাহাতে প্রতিধ্বনিত হইল পিতার আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে শঙ্কিত কন্যা হাসির মধ্যেই অশ্রু মোচন করিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইল তাহার তিন বৎসর পরে ঘরবাড়ীও বিক্রয় করিতে হইল।

"খৃষ্ট-কথা" (Christuslegenden, 1904) নামক পুস্তকে সেল্‌মা লাগেরলফ তাঁহার শৈশবকাল সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতামহীর মৃত্যুতে সেল্‌মা প্রথম দুঃখ পান। পিতামহী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাঁহার ঘরের কোণে 'সোফা'র উপর বসিয়া ছোট ছেলে মেয়েদের গল্পের পর গল্প বলিয়া যাইতেন; তাহাদের দিনগুলি স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইত। তারপর একদিন যখন সেই 'সোফা' চিরদিনের মত শূন্য হইল, শিশু সেল্‌মা ভাবিয়া পাইল না দিন কিরূপে কাটিবে। শিশুর মন শীঘ্রই অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। খেলাধূলার অপর সমস্ত ছেলেমেয়ের মত সেল্‌মারও দিন কাটিতে লাগিল; কিন্তু সেল্‌মা যে পিতামহীকে ভুলে নাই তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল ৪০ বৎসর পরে যখন সেল্‌মা লাগেরলফ্ তাঁহার পিতামহীর কথিত খৃষ্টের জন্মকাহিনী গল্পাকারে প্রকাশিত করেন। পিতামহীর কাছে শোনা এই সব রূপ কথা চিরদিনের জন্য সেল্‌মার মনে একটা ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। ইহাই তাঁহার সকল কাব্য ও উপন্যাসের উৎস। পিতামহীর মৃত্যুর পরেও সেল্‌মা তাঁহার পিসিমার নিকট হইতে ভের্ম্‌লাণ্ডের (Varmland) সম্ভ্রান্ত বংশগুলির সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিয়াছিলেন এবং "গ্যোস্টা বের্লিং" নামক পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে এই সকল গল্প তাঁহার শিশুহৃদয়ে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী জীবনে যখনই তিনি তাঁহার জন্মস্থান 'মারবাকা'য় আসিয়াছেন তখনই এই সব বহু পুরাতন গল্প মনে পড়িয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে এবং এই স্থান হইতে তিনি নূতন রচনাশক্তি সঞ্চয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

সেল্‌মা ও তাঁহার ভগ্নী কোন দিন কোন স্কুলে যান নাই; বাড়ীতেই তাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। দিনের বেলায় সকলকেই অনেক সময় কাজে ব্যস্ত থাকিতে হইত; সন্ধ্যার পর গল্পস্বল্প, গানবাজনা বা পড়াশুনায় সকলে আনন্দ উপভোগ করিতেন। Mayne Reid-এর Oceola নামক উপন্যাস কোন ক্রমে একবার বাড়ীতে আসিয়া পড়ে। ইতিপূর্ব্বে সেল্‌মা কোন উপন্যাস পড়েন নাই। 'Oceola' পাঠ করিয়া তিনি একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যান। ইহার পর হইতে সেল্‌মা ক্রমাগতই উপন্যাস পাঠ করিতে আরম্ভ করেন; রুগ্ন শিশুটিকে কেহই তাহাতে বাধা দিত না।

নয় বৎসর বয়সের সময় পায়ের খঞ্জতা সারাইবার জন্য সেল্‌মাকে ষ্টক্‌হোল্‌ম্ যাইতে হয় এবং তাহাতে তাঁহার পা সারিয়াও গিয়াছিল। রাজধানীতে অবস্থানকালে সেল্‌মা ওয়াল্‌টার স্কটের গ্রন্থাবলী পাঠ করেন এবং জীবনে এই খানেই প্রথম নাটকাভিনয় দেখিয়া তাঁহার কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করিবার সময় সেল্‌মা লাগেরলফ্ বলেন, পড়িতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার লিখিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। Oceola পাঠ করার পর তাঁহার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল যে, জীবনে একদিন এইরূপ একটি সুন্দর উপন্যাস রচনা করিবেন। (পরিণত বয়সে সেল্‌মা Oceola একটি অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন।) ষ্টক্‌হোল্‌মে অবস্থানকালে তাঁহার ধারণা জন্মায় শুধু উপন্যাস লিখিলেই চলিবে না, জীবনে তাঁহাকে নাটকও লিখিতে হইবে। 'মারবাকায়' ফিরিলে তাঁহার নেতৃত্বে সেখানে 'আমার বনের গোলাপ' (Meine Rose in Walde) নামক একটি প্রসিদ্ধ নাটক অভিনীত হয়।

তারপর যৌবনের প্রথম উন্মেষের সময়, দেহ ও মনের সৌন্দর্য্য যখন একই সঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতে চায়, সেল্‌মা তাঁহার প্রথম কবিতা লিখিয়াছিলেন। প্রেমের স্পর্শেই যে এই কবিতা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার আপন প্রতিভাই ইহার জন্মদান করিয়াছিল। এই নূতন শক্তির পরিচয়ে সেল্‌মার কত আনন্দ :—

"মনে কর জন্মান্ধ তুমি, হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছ, মনে কর ভিখারীর অবস্থা হইতে হঠাৎ তুমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছ, মনে কর নিরানন্দ বন্ধুহীন জীবনে অকস্মাৎ প্রীতি ও সম্মানলাভ করিয়াছ; অপ্রত্যাশিত যত-কিছু সৌভাগ্যের কথাই মনে কর না কেন, কিছুই আমি সেই সময়ে যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহার সমান হইতে পারে না।" ইহার পর হইতে সেল্‌মা অবিশ্রাম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল কবিতা বাস্তবিকই খুব উচ্চশ্রেণীর নয় এবং ইহার অধিকাংশই এখন নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহার দুইটি লাইন স্মরণ করিয়া সেল্‌মা লাগেরলফ এখনও আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।—

নেবু গাছ তলে গাঢ় ও গভীর রাজিছে অন্ধকার!
বায়ুগতি যেন স্তব্ধ অসাড়, বুকে চাপে তার ভার!*

শুধু কবিতাই নয়, এই সময়ে তিনি বহুসংখ্যক নাটক, গল্প ও উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। সেইগুলির মূল্য খুব বেশী না হইলেও এইগুলি লিখিতে লিখিতেই ভাষার উপর সেল্‌মার অদ্ভুত অধিকার জন্মিয়াছিল। স্থানীয় বিবাহাদি উৎসবেও সেল্‌মা এই সময়ে কবিতাদি পাঠ করিতেন। তখনও সেল্‌মা লাগেরলফ্ দৈনন্দিন জীবনের অনুভূতি হইতে রচনার সামগ্রী আহরণ করিতে শিখেন নাই; Walter Scottএর নাইট, ১০০১ রজনীর সুলতান এবং Snorri Sturlusonএর রূপকথার রাজন্যবৃন্দকে অবলম্বন করিয়াই তখন তাঁহার লেখা হইত।

এইরূপে বহুসংখ্যক উপন্যাস, নাটক এবং কবিতা লিখিয়া সেল্‌মা সেগুলি বাহিরের জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিবার সুযোগের অপেক্ষায় তাঁহার পিতৃগৃহ 'মারবাকা'য় অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় একটি সুযোগ বাস্তবিকই মিলিয়া গেল। একটি বিবাহ-বাসরে সেল্‌মার পঠিত কবিতা Eva Fryxell-এর মনোযোগ আকর্ষণ করিল এবং সেল্‌মার কতকগুলি কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি সেল্‌মার নিকট হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কতকগুলি কবিতা চাহিয়া লইলেন। কিন্তু বহুদিন অপেক্ষার পর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই সেল্‌মার

* We dunkel ist es doch unter der Linde
Wie angstlich still wehen die winde.

সমস্ত কবিতা ফেরত আসিল, একটিও কোন পত্রিকায় ছাপা হইল না। সেল্‌মা মর্ম্মাহত হইলেন। Eva Fryxell কিন্তু বুঝিয়াছিলেন সেল্‌মার কিসের অভাব। সারা জীবন ভের্মল্যাণ্ডের এককোণে আবদ্ধ থাকায় জগৎ সম্বন্ধে সেল্‌মা তখনও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন ; মূলতঃ ইহাই ছিল তাঁহার নিষ্ফলতার কারণ। সেল্‌মাও এ কথা বুঝিয়া সেই বৎসরই ঘরের কোণ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত নিজেকে প্রস্তুত করিবার জন্য Sjoberg এর বালিকা বিদ্যালয়ে এক বৎসরকাল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া এই এক বৎসরকাল তিনি সর্ব্বপ্রকার কবিতা লেখা হইতে বিরত রহিলেন। তাহার পর যখন সংবাদ আসিল, তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তখন দীর্ঘ উৎকণ্ঠার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সেল্‌মা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। এখন হইতে তিনি নিজেই জীবনের গতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন। তারপর তিন বৎসর ধরিয়া ষ্টকহোলমের শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ে কঠোর অধ্যয়ন। এই সময়ে তাঁহার মধ্যে অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ দৃঢ়ীভূত হইল এবং এই সময়েই তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ত্তব্যপথ চিনিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদিন সাহিত্যের ক্লাশের পর নানা গ্রন্থকর্ত্তার কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সেল্‌মার মনে প্রতিভাত হইল, তাঁহার শৈশবে শোনা সেই সব গল্পের মধ্যেই ত রচনার এমন প্রচুর সামগ্রী নিহিত রহিয়াছে যাহা প্রসিদ্ধ লেখকদের রচনা-সামগ্রী অপেক্ষা কোন অংশেই কম মূল্যবান নহে। এই মুহূর্ত্তেই সেল্‌মা লাগেরলফের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Gosta Berling এর বীজ অঙ্কুরিত হইল, যদিও শাখাপ্রশাখায় তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে আরও দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

সেল্‌মা লাগেরলফ্‌ জীবনে যে কাজেই হাত দিয়াছেন সেই কাজই তিনি দৃঢ়তার সহিত সম্পূর্ণ করিয়াছেন। শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয়ে তিনি তাই একজন সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যোৎসাহী ছাত্রীরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। অহঙ্কারের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না ; সকলের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ তিনি আপন রচনাগুলি সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতেন। কখনও মনে করিতেন না ইহাতে তাঁহার রচনার অপমান হইতেছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সেল্‌মা লাণ্ড্‌স্ক্রোনায় শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে পড়াশুনায় তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত, এখন অধ্যাপনা-কার্য্যেই তাঁহাকে সকল সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইল। অনেকে মনে করেন, সেল্‌মার রচনা যেরূপ অবাস্তব কল্পনায় পরিপূর্ণ, তাঁহার অধ্যাপনা-পদ্ধতিও সেইরূপ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ছাত্রগণকে তিনি কোনরূপ কঠোর শাসনে রাখিতেন না বলিয়াই হয়তো কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তাঁহার অধ্যাপনাপদ্ধতির বিশেষত্ব এই ছিল যে, ছাত্রদিগকে তিনি বাস্তব জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা শিখাইবার চেষ্টা করিতেন। Darwinism, Socialism এবং Utilitarianism প্রভৃতি দুর্বোধ্য বিষয়ও তিনি শিশুদের বুঝাইতে ছাড়িতেন না। সেল্‌মা যে একজন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার এই অধ্যাপনা কেবল মাত্র কয়েকটি শিশুর মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই ; ক্রমে সমস্ত জাতি, পরে সমগ্র জগৎ তাঁহার শিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষয়িত্রীর পদে সেল্‌মা লাগেরলফ যতই কেন না দক্ষতা দেখান, মনের আশা কিন্তু তাঁহার তাহাতে পূর্ণ হয় নাই। সকল সময়েই তিনি ইহাই ইচ্ছা করিতেন যেন কেহ আসিয়া তাঁহাকে ঘরের কোণ হইতে টানিয়া বাহির করে। ঘটিলও তাই। বিখ্যাত মহিলানেত্রী সোফি আডলারস্পারে তাঁহার কবিতাগুলি দেখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব জন্মিল। সোফি আডলারস্পারের চেষ্টায় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে Dagny নামক পত্রিকায় সেল্‌মার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি প্রকাশিত হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। বাস্তবিক সেল্‌মা লাগেরলফের মনের সেই গতিশীলতা ও আনন্দোচ্ছ্বাস নাই যাহাতে মানুষ নিজেকে হারাইয়া ফেলে ; তিনি স্থির, অচঞ্চল, আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত। Gosta Berling-এ (গোস্টা বের্লিং) তাঁহার এই স্বচ্ছতার উপযুক্ত

ক্ষেত্র মিলিল। বহু দিন হইতেই তাঁহার শৈশবে শোনা এই গল্পটিকে তিনি উপন্যাসাকারে সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন, কিন্তু কবিতার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহবশতঃ এত দিন এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দেই সেল্‌মা বুঝিয়াছিলেন তাঁহার জন্মস্থানে প্রচলিত গল্পগুলির মধ্যে অনেক রচনা-সামগ্রী নিহিত আছে; কিন্তু তখনও সেগুলি অসম্বদ্ধ ও অস্পষ্ট। এখন তিনি এই গুলিকে সাহিত্যোচিত আকার প্রদানে যত্নবতী হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার আত্মনির্ভরতা অতি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

গদ্য সাহিত্যে ইংরাজ লেখক কার্লাইল তাঁহার উপর সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করেন। কার্লাইলের উদ্দীপনাময় ভাষা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং সেল্‌মা লাগেরলফ্‌ তাঁহার রচনা প্রণালীকেই নিজের আদর্শ করিয়া লইয়াছিলেন। কার্লাইলের গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেল্‌মার অন্তরে একটি সুপ্ত শক্তি যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তিনি স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিলেন তিনিও ঐরূপ গদ্য রচনা করিতে পারেন।

ভের্মলাণ্ডের গল্পগুলিকে গদ্যে রচনা করিয়া তিনি সেগুলি Dagny নামক পত্রিকায় ছাপাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইলেন। এজন্য দায়ী তখনকার দিনে প্রচলিত naturalistic style। সেল্‌মা তখনও প্রচলিত সাহিত্যপ্রগতির বিপরীত মুখে অগ্রসর হইবার সাহস করিতে পারিতেছিলেন না। এই প্রত্যাখ্যানেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ পান এবং আর যে কখনও তাঁহার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে সে আশাও প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'মারবাকা' বিক্রয়ের সময় সেল্‌মা জন্মভূমির নিকট বিদায় লইতে একবার 'মারবাকায়' আসিলেন। এইখানে জন্মভূমির ক্রোড়ে তিনি অন্তরে বল ও সাহস খুঁজিয়া পাইলেন যাহার সাহায্যে তিনি সেই পুরাতন রোমাণ্টিক উপাখ্যানাবলীকে উপযুক্ত আকার দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি মনে করিয়াছিলেন ইহাতে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার জীবন, একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ তাঁহার রোমাণ্টিক লেখা কেহই পড়িবে না, আর পড়িলেও কেবল মাত্র বিদ্রূপ করিবার জন্যই পড়িবে। কিন্তু উপায়ও ত নাই। জন্মভূমির দেওয়া জিনিষ কৃতজ্ঞচিত্তে উপযুক্ত আকারে রক্ষা করিতেই হইবে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 'Idun' পত্রিকায় একটি উপন্যাসের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া সেল্‌মা অবশেষে একটু গোছান দেখিয়া তাঁহার উপন্যাসের পাঁচটি অধ্যায় প্রতিযোগিতার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। কিয়দ্দিবস পরে জানিতে পারা গেল তিনিই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহাই সেল্‌মার জীবনে প্রথম কৃতকার্য্যতা। পরীক্ষকবর্গ তাঁহার রচনাচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন শীঘ্রই এই লেখিকা বিশ্ববিশ্রুত হইয়া পড়িবেন। 'Idun' পত্রিকা তাঁহার সমস্ত উপন্যাসটি প্রকাশিত করিতে সম্মত হইল এবং ব্যারনেস্‌ আডলার্স্পারের সাহায্যে বিদ্যালয় হইতে এক বৎসরের ছুটি লইয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সেল্‌মা তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'গ্যোস্টা বের্লিং' সম্পূর্ণ করিলেন। প্রথমে সেল্‌মা লাগেরলফের এই উপন্যাস সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'Gosta Berling' ডেনিশ ভাষায় অনূদিত হইলে ডেন্মার্কের শ্রেষ্ঠ সমালোচক ব্রাণ্ডেস্ (Brandes) যখন জলন্ত ভাষায় ইহার প্রশংসা করিলেন, তখন হইতেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সেল্‌মা লাগেরলফের স্থান চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 'গ্যোস্টা বের্লিং'এর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। এই সময়ে সেল্‌মার জীবনে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। নিরাশ অন্তঃকরণে সেল্‌মা যখন পুনরায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত সেই সময় হঠাৎ এক দিন তিনি রাজার নিকট হইতে দেশ ভ্রমণের জন্য অনেক অর্থ পাইলেন।

পূর্ণ দশটি বৎসর শিক্ষকতার জন্য সেল্‌মা লাণ্ডস্‌-ক্রোনায় আবদ্ধ ছিলেন। এত দিন তিনি বাহিরের জগতের কিছুই দেখেন নাই। রাজানুগ্রহে সে আকাঙ্ক্ষা এতদিনে পূর্ণ হইল। ১৮৯৫,৬ খৃষ্টাব্দে সেল্‌মা লাগেরলফ্‌ ইতালী সুইট্‌সারলাণ্ড, জার্ম্মানী ও বেলজিয়াম ভ্রমণ করিলেন। ১৮৯৯।১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভ্রমণার্থ বাহির হইলেন; এই সময়ে তিনি ইজিপ্ট, প্যালেস্টাইন, তুরস্ক ও গ্রীসদেশে

পরিভ্রমণ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শুনিতে পান যে, Dalarne হইতে এক দল কৃষক পুণ্যলাভের জন্ম প্যালেস্টাইনে গিয়া বসতি করিতেছে। তাহাদেরই ভাগ্য সম্বন্ধে কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার ভ্রমণার্থ নির্গত হইয়াছিলেন। ১৯০৩এ সেল্‌মা লাগেরলফ্‌ পুনরায় ইতালী গমন করেন এবং পর বৎসর উত্তর সুইডেন এবং তৎপর বৎসর ডেন্মার্ক ও ইংলণ্ড পরিদর্শন করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ফিন্‌ল্যাণ্ড ও রুশিয়া দেশে ভ্রমণার্থ বাহির হন।

রাজসাহায্য পাইবার পর সেল্‌মা লাগেরলফ্‌ স্বদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে Uppsalaর ভেমলাণ্ড জনসম্প্রদায় তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইল। ইতিপূর্ব্বে কোন মহিলার ভাগ্যে এই সম্মান-লাভ ঘটে নাই। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জেরুসালেম (Jerusalem) নামক গ্রন্থ বাহির হইলে সুইডিশ একাডেমি তাঁহাকে স্বর্ণ-পদক দান করে এবং এই সময়েই তিনি গোটেনবুর্গে কলা ও বিজ্ঞান সমিতির সভ্য মনোনীত হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে তাঁহাকে বহু সমারোহের সহিত লরেল-মুকুট প্রদান করা হয়। ১৯০৮-এ সেল্‌মা লাগেরলফের পঞ্চাশৎ জন্মতিথিতে তাঁহার গৌরবে গর্ব্বিত সমগ্র সুইড্‌ জাতি আনন্দ-উৎসব করিয়াছিল। তখনই সেল্‌মা লাগেরলফ্‌কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। পরবৎসর সে প্রশ্নের সমাধান হইল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "সুমহৎ আদর্শবাদ ও উচ্চ কল্পনা শক্তি এবং তাঁহার রচনার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্যের"* জন্ম তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার গ্রহণ কালে সেল্‌মা লাগেরলফ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। আত্মম্ভরিতার কণামাত্রও তাহাতে ছিল না; বিস্মিত ও চমৎকৃত চিত্তে সকলে কেবল শুনিল দুঃখিনী কন্যা সজলনয়নে স্বর্গগত পিতার নিকট এই আনন্দ-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ভের্মলাণ্ডের সেই সামান্য গৃহস্থ-কন্যা সেল্‌মা লাগেরলফ্‌ আজ জগতে সুপরিচিত। আরও কত সম্মান তিনি লাভ করিয়াছিলেন, কতবার তাঁহার জন্মভূমি সুইডেন এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে তাহার উল্লেখ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেবল ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহিলাদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়াই এই গরীয়সী মহিলার জীবন-বৃত্তান্ত শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন, "জগতে পুরুষ গড়িয়াছে রাষ্ট্র, নারী গড়িয়াছে গৃহ। রাষ্ট্রকে আজ গৃহের আকারে গড়িতে হইবে, এজন্য পুরুষ ও নারীর সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের একান্ত প্রয়োজন। এমন দেশ কোথায় যেখানে দেশের কোন সন্তান বিপথগামী হয় না, কাহারও জীবনের আশা-ভরসা যৌবনেই বিলুপ্ত হয় না? কোথায় এমন দেশ, যেখানে বৃদ্ধের যথেষ্ট সম্মান আছে? কোথায় এমন দেশ, যেখানে হিংসার জন্য শাস্তি দেয় না, দেয় শুধু শিক্ষা দিবার জন্য?" এই বক্তৃতার কোথাও এতটুকু ঔদ্ধত্য নাই, আছে শুধু মাতার মঙ্গলকামনা।

এত ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের মধ্যেও সেল্‌মা লাগেরলফ্‌ তাঁহার সেই জন্মস্থান 'মারবাকা'র কথা বিস্মৃত হন নাই। দুঃখের দিনে যে-জন্মস্থানের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, এখন পুনরায় তিনি তাহা ফিরাইয়া আনিয়াছেন এবং বাল্যের মধুর স্মৃতিবিজড়িত 'মারবাকা'তেই এখন তিনি অবস্থান করিতেছেন।

---

* "Pour le noble idealisme, la richesse d'imagination, la generosite et la beaute de la forme qui caracterisent son oeuvre."

সাহিত্য-সমালোচনা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার দুটি কথা বল্‌বার আছে। এক, আমরা গেল বারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট্ বেরিয়েছে।* সে-রিপোর্ট্ যথাযথ হয়নি। অনেক দিন এ সম্বন্ধে দুঃখ বোধ করেছি, কখনও কোন রিপোর্ট্ ঠিক মত পাইনি। সেদিন নানা আলোচনার ভিতর সব কথা ঠিক ধরা পড়েছে কি না জানি নে। আর-একটা বিপদ আছে, কোনো কিছু সম্বন্ধে যখন যে কেউ রিপোর্ট্ নিতে ইচ্ছা করেন, তাঁর নিজের মতামত খানিকটা সেটাকে বিচলিত ক'রে থাকে। এটুকু জানিয়ে রাখ্‌ছি যে,যদি এ সম্বন্ধে রিপোর্ট্ বেরোয়,আমাকে দেখিয়ে নিলে ভাল হয়। তারও প্রয়োজন নেই, একটু সংযত ভাবে চিত্তকে স্থির রেখে যদি লেখেন। এর দরকার আছে, কেন না এ-সম্বন্ধে এখনও উত্তেজনা আছে—সে জন্য অল্পমাত্র যদি বিকৃতি ঘটে তাহ'লে অন্যায় হবে।

দ্বিতীয় কথা, আমি সতর্ক করতে চাই, ব্যক্তিগতভাবে এই তর্কে আমার কোন স্থান নাই। এমন কথা নয় যে, আমি এক পক্ষে আছি আর আধুনিক সাহিত্য আর এক পক্ষে আছে। এ রকম ভাবে তর্ক উঠ্‌লে আমি কুণ্ঠিত হব। বর্ত্তমান কালে আমার লেখা মুখরোচক হোক বা না হোক আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি নে। লোকমতের কি মূল্য আজকের দিনে আমার বুঝ্‌বার মত বয়স হয়েছে। অল্প বয়স যখন ছিল তখন অবশ্য বুঝিনি, তখন লোকমতকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দিতাম। অন্যের মত-অনুযায়ী লিখ্‌তে পার্‌লে, অন্যকে অনুকরণ করতে পার্‌লে, সত্য কাজ কিছু করা গেল কল্পনা করেছি—সে যে কত বড় অসত্য বারবার —হাজার বার তা প্রমাণ হ'য়ে গেছে আমার এই জীবনে। আমি তার উপর বিশেষ কোন আস্থা রাখি না। আমাকে কেউ পছন্দ করুন বা না করুন, এখন আমার চেয়ে ভাল লিখ্‌তে পারুন বা না পারুন সে-আলোচনা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ব'লে মনে করি।

আমি সেদিন যে আলোচনা উত্থাপিত করেছিলাম সে-প্রসঙ্গে আমার মত আমি ব্যক্ত করেছি। সাহিত্যের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে, নীতি সম্বন্ধে যা বক্তব্য সে আমার লেখায় বারবার বলেছি। গত বারে সে কথা কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এখনকার যাঁরা তরুণ সাহিত্যিক তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম, কিম্বা তাঁদের মতের প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি জানি আমি কোন ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য ক'রে লিখিনি। কতকগুলি লেখা আমার চোখে পড়েছিল যেগুলিকে সাহিত্য-ধর্ম্ম বিগর্হিত মনে হয়েছিল। তাতে সমাজধর্ম্মের যদি কোন ক্ষতি ক'রে থাকে—সমাজ-রক্ষার ব্রত যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা সে বিষয়ে চিন্তা করবেন; আমি সেদিক থেকে কখনও আলোচনা করিনি। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, মানুষ যে-সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় ব'লে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায়, চিরকালের চিত্রে চিত্রিত করে। আমাদের সব সাহিত্যের গোড়াতেই যে-মহাকাব্য, স্পষ্টই দেখি তার লক্ষ্য মানুষের দৈন্য-প্রচার, মানুষের লজ্জা ঘোষণা করা নয়, তার মাহাত্ম্য স্বীকার করা।

সংসার-ধর্ম্মে মানব চরিত্রে সত্যের সেই সব প্রকাশকে তাঁরা চিরকালের মূল্য দিয়েছেন, যাকে তাঁরা সর্ব্বকাল ও সর্ব্বজনের কাছে ব্যক্ত করবার ও রক্ষা করবার যোগ্য মনে করেছেন। যার মধ্যে তাঁরা সৌন্দর্য্য দেখেছেন, মহিমা দেখেছেন তাই তাঁদের রচনার আনন্দকে জাগিয়েছে। বাল্মীকি যেদিন ছন্দ পেলেন সেদিন অনুভব করলেন, এ-ছন্দ কোনো মহৎ চরিত্র, কোনো পরম অনুভূতি প্রকাশ করবার জন্যে, এমন-কিছু যাতে মানব-জীবনের পূর্ণতা, যাতে তার গৌরব। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি তখনকার লোক মনুষ্যত্বের কোন্ রূপকে শ্রেষ্ঠ ব'লে জান্‌তেন। কলাবান্ বাক্য যে-বিষয়কে প্রকাশ করে

---

* 'বাংলার কথা,' ৩ই চৈত্র সোমবার।

তাকে আপন অলঙ্কারের দ্বারা স্থায়ী মূল্য দেয়। সেকালের কবি খুব প্রকাণ্ড পটের উপর খুব বড় ছবি এঁকেচেন এবং তাতে মানুষকে বড় ক'রে দেখে মানুষ আনন্দ পেয়েচে। আমাদের মনের ভিতর যে-সব বেদনা, যে সব আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং আমরা যাকে অন্তরে অন্তরে খুব আদর করি সেই আদরের যোগ্য ভাষা পাই না ব'লে বাইরে প্রকাশ করতে পারি না, পূজা করতে পারি না, অর্ঘ্য দিতে পারি না। আমাদের সে-সম্পদ নেই, আমরা মন্দির রচনা করতে জানি না, যাঁরা রচনা করেন ও যাঁরা দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন আমরা তাঁদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ ক'রে আমাদের পূজা সেখানে দিই। বড় বড় জাতি সাহিত্যে বড় বড় পূজার জন্যে আমাদের অবকাশ রচনা ক'রে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ সেখানে তাঁদের অর্ঘ্য নিয়ে যাবার সুযোগ লাভ ক'রে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছে। সমাজের প্রভাত-কালে প্রকাণ্ড একটা বীরত্ব দৃপ্ত প্রাণ সম্পদপূর্ণ মনুষ্যত্বের আনন্দময় চিত্র মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে কবিরা রচনা করতে বেরিয়েছেন। অনেক সময় সমাজের পাথেয় নিঃশেষিত হ'য়ে যায় এবং বাইরের নানাপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমে ক্রমে পতন ঘটে। এই জন্য যেটা মানুষের সভ্যতার অতি-পরিণতি তাতে বিকৃতি আসে এরূপ পরিচয় আমরা প্রাচীন গ্রীস, রোম ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসে বারংবার পেয়েছি। অবসাদের সময়ে কলুষটাই প্রবল হ'য়ে ওঠে। আমাদের দেহ-প্রকৃতিতে অনেক রোগের বীজ আছে। শরীরের সবল অবস্থায় সেগুলি পরাহত হ'য়েই থাকে। এমন নয় যে তারা নেই। তাদের পরাভূত ক'রে আরোগ্য-শক্তি অব্যাহত থাকে। যে মুহূর্ত্তে শরীর ক্লান্ত হয়, জীর্ণ হয়, দুর্ব্বল হয় তখনই সেগুলি প্রবল হ'য়ে দেখা দেয়। ইতিহাসেও বারংবার এটা দেখেছি। যখন কোন-একটা প্রবৃত্তি বা মনের ভাব প্রবল হয় তখন তার প্রবলতাকে চিরন্তন সত্য ব'লে বিশ্বাস না ক'রে থাকতে পারি না তাকে, একান্তভাবে অনুভব করি ব'লেই। সেই অনুভূতির জোরে প্রবৃত্তিকে নিয়ে আমরা বড়াই করতে সুরু করি। এইজন্য এক একটা সময় আসে যখন এক-একটা জাতির মধ্যে মানুষের ভিতরকার বিকৃতিগুলিই উগ্র হ'য়ে দেখা দেয়। ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর যখন অত্যন্ত একটা কলুষ এসেছিল সে উদ্ধত হ'য়েই নির্লজ্জ হ'য়েই আপনাকে প্রকাশ করেছিল। তারপর আবার সেটা কেটে গেছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় ইংরেজ কবিদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহের কথা বলেছেন, প্রচলিত সমাজনীতি, প্রচলিত ধর্ম্ম-নীতিকে গুরুতর আঘাত করেছেন। মানুষের মনকে কর্ম্মকে মোহমুক্ত ক'রে পূর্ণতা দান করবার জন্যে তাঁদের কাব্যে, সাহিত্যে খুব একটা আগ্রহ দেখা গেছে। তখনকার সমাজে তাঁদের কাব্য নিন্দিত হয়েচে, কিন্তু কালের হাতে তার সমাদর বেড়ে গেল। এদিকে বিশেষ কোনো যুগে যে সব লালসার কাব্যকীর্ত্তন প্রকাশিত হয়েছিল তারা সেকালের বিদগ্ধদের কাছে সম্মান পেয়েছে, মনে হয়ত হয়েছিল এইটেই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। তবু পরে প্রকাশ পেয়েচে এ জিনিষটা সেই যুগের ক্ষণকালীন উপসর্গ।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও এই বিকৃতি অনেক দেখা গিয়েছে। যখন সংস্কৃত সাহিত্যে সাধনার দৈন্য এসেছিল তখন কাব্যে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বর্ত্তমান কালের আরম্ভে কবির লড়াই, পাঁচালী, তর্জ্জা প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে বিকার দেখা দিয়েছিল, সেগুলিতে বীর্য্যবান জাতির প্রবল উন্নতির বা মহৎ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় নেই। তার ভিতর অত্যন্ত পঙ্কিলতা আছে। সমাজের পথ-যাত্রার পাথেয় হচ্চে উৎকর্ষের জন্যে আকাঙ্ক্ষা। জীবনের মধ্যে ব্যবহারে তার প্রকাশ খণ্ডিত হ'য়ে যায় ব'লেই মনে তার জন্যে যে-আকাঙ্ক্ষা আছে তাকে রত্নের মতো সাহিত্যের বহুমূল্য কৌটোর মধ্যে রেখে দিই—তাকে সংসার-যাত্রায় ব্যক্ত সত্যের চেয়ে সম্পূর্ণতর ক'রে উপলব্ধি করি। এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ মহৎ থাকে এবং এই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ যতক্ষণ লোকের কাছে মূল্য পায় ততক্ষণ সে জাতির মধ্যে যতই দোষ থাক্, তার বিনাশ নেই। য়ুরোপীয় জাতির ভিতর যে অস্বাস্থ্য রয়েছে তার প্রতিকারও তাদের মধ্যে আছে। যেখানে স্বাস্থ্যের প্রবলতা সেখানে রোগও আপাতত প্রবল হ'য়ে দেখা দেয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ বাঁচে। দুর্ব্বল শরীরে তার প্রকাশ হ'লে সে মরে।

আমরা এখন একটা নবযুগের আরম্ভকালে আছি।

এখন নূতন কালের উপযোগী বল সংগ্রহ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে প্রতিকূলতার সঙ্গে। আমাদের সমস্ত চিত্তকে ও শক্তিকে জাগরূক ক'রে আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তা হ'লেই আমরা বাঁচবো। নইলে পদে পদে আমাদের পরাভব। আমাদের মজ্জার ভিতর জীর্ণতা, এইজন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে আমাদের যেটা তপস্যার দান সেটাকে যেন আমরা নষ্ট না করি, তপোভঙ্গ যেন আমাদের না হয়। মানবজীবনকে বড় ক'রে দেখার শক্তি সব চাইতে বড় শক্তি। সেই শক্তিকে আমরা যেন রক্ষা করি। সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতার দ্বারা সে-শক্তিকে আমরা খর্ব্ব করব না। এ জন্যে আমাদের অনেক লড়াই করতে হবে। সে-লড়াই করতে না পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। যুদ্ধের পথেই আমরা বীর্য্য পাব। যে-আত্মসংযমের দ্বারা মানুষ বড় শক্তি পেয়েছে, তাকে অবিশ্বাস ক'রে যদি বলি সেটা পুরাণো ফ্যাশন, এখন তার সময় গেছে, তা'হলেআমাদের মৃত্যু। যে ফল এখনও পাকবার সময় হয়নি তার ভিতর পোকা ঢুকেছে, এই আক্ষেপ মনের ভিতর যখন জাগে, তখন সেটাকে কেউ যেন ব্যক্তিগত কলহের কথা ব'লে না মনে করেন।

যে সমস্ত লেখা সমাজের কাছে তিরস্কৃত হ'তে পারতো যখন দেখি তাও সম্ভব হয়েছে তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে বাতাসে কিছু ঘোরতর বিষ সঞ্চার হয়েছে। এই মনের আক্ষেপ নিয়ে হয় তো কিছু বলে থাকব। বেদনা কিছু ছিল দেশের দিকে, কালের দিকে, সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে। যদি কেউ মনে করেন এই বেদনা প্রকাশের অধিকার আমাদের নাই; অসংযত ভাবে তাঁরা যা বলেন সেটা এখনকার Democratic সাহিত্যে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে হবে, তা হ'লে বলতে হবে তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। যদি কেউ বলেন, আমরা সে দলের নই আমি খুসী হব। মানুষের জন্ত, দেশের জন্ত, সমাজের জন্ত যাঁরা কাজ করেন, ত্যাগের ভিতর দিয়ে, সংযমের ভিতর দিয়েই করেন। কেউ যেন কখনও না বলেন উন্মত্ততার দ্বারা পৃথিবীর উপকার করবো।

যাকে শ্রদ্ধা বলে তা সৃষ্টি করে, অশ্রদ্ধা নষ্ট করে। যদি বলি,আমি বড়কে শ্রদ্ধা করি না, তা হ'লে শুধু যে বড়কে আঘাত করি তা নয়, সৃষ্টির শক্তিকে একেবারে নষ্ট করি; সেটা আমাদের পতনের কারণ হয়। যারা বিজয়ী হয়েছে তারা শ্রদ্ধার উপর দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে জয় করেছে। বড় বড় যুদ্ধে যে সকল সেনাপতিরা জিতেছেন তাঁরা হারতে হারতেও বলেছেন আমরা জিতেছি, কখনও হারকে স্বীকার করতে চাননি। সেটা উপস্থিত তথ্যের বিরোধী হ'তে পারে। হয় ত হেরেছিলেন। কিন্তু যে হেতু তাঁরা নিজেকে শ্রদ্ধা করেছেন তার দ্বারা হারের ভিতর দিয়ে জয়কে সৃষ্টি করেছেন। শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত জাতির জয়-সম্পদকে সৃষ্টি করা যায়। যখন দেখি জাতির মনে অশ্রদ্ধা আসন পেতে মহৎকে অট্টহাসির দ্বারা বিদ্রূপ করতে থাকে, তখন সব চাইতে বেশী আশঙ্কা হয়, তখন হতাশ হ'য়ে বলতে হয় পরাভবের সময় এল। আমাদের সিদ্ধি সে ত দূরে রয়েছে, কিন্তু তার অগ্রগামী দূত যে শ্রদ্ধা সেও যদি না থাকে তা হ'লে তার চেয়ে এমনতর সর্ব্বনাশ আর কিছু হ'তে পারে না।

আমার নিজের লেখাতে যেটা বিকৃত সেটার নজির দেখাতে পারেন, অসম্ভব কিছু নয়। দীর্ঘকালের লেখার ভিতরে কখনও কলুষ লাগেনি এ কথা বলতে পারবো না। যদি বলি, যা কিছু লিখেছি সমস্ত শ্রদ্ধেয়, সমস্ত ভালো, অত বড় দাম্ভিকতা আর কিছু হ'তে পারে না। অনেক রকমের অনেক লেখার মধ্য থেকে খুঁটে খুঁটে যেগুলি নিজের পক্ষ সমর্থন করে সেগুলিই যদি গ্রহণ করি তবে তার দ্বারা শেষ কথা বা সম্পূর্ণ কথা বলা হবে না।

আজকের সভায় ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়, ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে যাঁরা সাহিত্যের সত্যকে মনের ভিতর দেখতে পেয়েছেন তাঁরা আপনাদের মনের কথা বলবেন এই বিশ্বাসেই এই সভা আহ্বান করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম সাহিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত যাঁদের আছে তাঁরা সেটা সুস্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করবেন। কোন্ নীতির ভিত্তির উপর সাহিত্য রচিত হ'য়ে থাকে, কোন্ সাহিত্য মানুষের কাছে চিরকালের গৌরব পাওয়ার যোগ্য সেই সম্বন্ধে কারো কিছু বিশেষভাবে বলবার থাকে

সেইটাই বল্‌বেন, এই সংকল্প ক'রেই আমি আপনাদের ডেকেছি। আমি কখনও মনে করিনি আমার পক্ষের কথা ব'লে সকলের কথাকে চাপা দেব। আমার নিবেদন এই যে, আপনারা আমার উপর রাগ না ক'রে আপনাদের মত সভায় ব্যক্ত করুন। আমার যেটা মত সেটা আমারই মত। যদি বলেন এ মত সেকেলে, পুরোণো, তা হলে সেটাকে অনিবার্য্য ব'লে মেনে নিতে রাজি আছি। যে মত নিয়ে কাজ করেছি, লিখেছি সেটা সত্য জেনেই করেছি, তাকে যদি মূঢ়তা বলে বিচার করেন, করুন। আমার সাফাই জবাব থাকে দিতে চেষ্টা কর্‌বো। আমরা এত দিন যা ভেবে এসেচি সেটা চিরকালের সাহিত্যে স্থান না পাবার যোগ্য হ'তেও পারে। এতকাল যা হয়েছে এখন থেকে ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত তার সম্পূর্ণ উল্টা রকমের ব্যাপার হবে এ রকমই যদি আপনাদের মত হয়, বলুন। সেদিন আপনাদের কেউ কেউ বল্‌লেন আমার সঙ্গে তাঁদের মতের পার্থক্য নেই সেটাও স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায়—সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার কর্‌বেন।

রবীন্দ্রনাথ—সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন একসময় আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠ ছিল, অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থার যখন পরিবর্ত্তন হয়, সে-পরিবর্ত্তন যে কারণেই হোক, (ধর্ম্ম-নৈতিক কারণেই যে সব সময় হয় তা নয়, অধিকাংশস্থলে অর্থনৈতিক কারণেও হয়।) তখন একটি কথা ভাববার আছে। তৎকালীন যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবল ছিল, যার প্রয়োজন ছিল, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্ত কতক-গুলো বিধিনিষেধ পাকা ক'রে দেওয়া হয়। সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে প্রয়োজন চ'লে যায় অথচ নিয়ম শিথিল হ'তে চায় না। সমাজ অন্ধভাবেই আপন নিয়ম আঁকড়ে থাকে। সে বলে, যে কারণেই হোক, একটাও নিয়ম আলগা হ'লেই সব নিয়মের জোর চ'লে যায়। সকল মানুষই সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধি খাটাবার অধিকার দাবী কর্‌লে সমাজ টিক্‌তে পারে না। সমাজের পক্ষে এই কথা। সাহিত্য সমাজের এই সতর্কতাকে সম্মান করে না। সর্ব্বকালের নীতির দিকে তাকিয়ে সাহিত্য অনেক সময় তাকে বিদ্রূপ করে, তার বিরুদ্ধবাক্য ব'লে। অবশ্য সমাজের এমনও অনেক বিধি আছে যার আয়ু অল্প নয়। রীতির চেয়ে নীতির উপরে যার ভিত্তি। যেমন আমাদের হিন্দুসমাজে গো হত্যা পাপ ব'লে গণ্য অথচ সেই উপলক্ষ্যে মানুষ-হত্যা ততদূর পাপ ব'লে মনে করি না। মুসলমানের অন্ন খেয়েছে বলে শাস্তি দিই, মুসলমানের সর্ব্বনাশ করেছে ব'লে শাস্তি দিই নে। সমাজ-ব্যবস্থার জন্য বাঁধাবাঁধি যে নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু যে সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্ম্মগত সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না ইত্যাদি, সেগুলির ব্যতিক্রম কোনোকালে হ'তে পারে ব'লে মনে করি না।

প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়—কিন্তু তরুণরা এই যে লিখেছেন, ভগবান প্রেম আর ভূত মানি না, সাহিত্যে তার স্থান আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ—এ কথা পূর্ব্বে বলেছি। মানুষ যেখানে জয়ী হয়েছে সেখানে সে যা পেয়েছে, তার বেশী দিয়েছে। ঐশ্বর্য্য বলতে এই বোঝায়, সে তার মূলধনের বাড়া। সেই ঐশ্বর্য্যই প্রকাশ পায় সাহিত্যে। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে ঐশ্বর্য্যই হচ্ছে প্রেম, কামনা নয়। কামনার উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না। উদ্বৃত্তটাই নানা বর্ণে রূপে প্রেমে প্রকাশ পায়। লোভ ক্রোধের প্রবলতার মধ্যেও প্রকাশের শক্তি আছে। যুদ্ধের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, নিষ্ঠুরতার মধ্যে আপনাকে সে প্রকাশ কর্‌তে পারে। বর্ব্বরতার মধ্যেও সাহিত্যের প্রকাশযোগ্য কিছু আছে, সেটা কলুষ নয়, সেটা তেজ—শক্তি। অনেক সময় অতিসভ্য জাতির প্রাণশক্তিতে শৈথিল্য যখন আসে তখন বাহির হ'তে বর্ব্বরতার ক্রোধ ও হিংসা কাজে লাগে। অতিসভ্য জাতির চিত্ত যখন ম্লান হ'য়ে আসে, চিরকালের জিনিষ সে যখন কিছু দিতে পারে না তখন তার দুর্গতি। গ্রীস যখন উন্নতির মধ্যগগনে ছিল, তখন সে চিত্তেরই ঐশ্বর্য্য দিয়েছে, কামনা বা লালসার আভাস সেই সঙ্গে থাক্‌লেও সেটা নগণ্য। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যেমন

পঙ্কিলতা প্রকাশ পায় এও সেইরূপ। স্রোত ক্ষীণ হ'য়ে পাঁক বড়ো হ'লেই বিপদ।

(একজন প্রশ্ন করিলেন)—আপনি সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শের কথা বল্‌লেন। সমালোচনারও এ রকম কোন আদর্শ আছে কি না। সাহিত্য-সমালোচনায় লগুড় ও ব্যক্তিগত গালাগালিই যদি একমাত্র জিনিষ হয় তা হ'লে সেটা সাহিত্যের পক্ষে হিতজনক কি না।

রবীন্দ্রনাথ—এটা সাহিত্যিক-নীতি বিগর্হিত। যে-সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবল মাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিষ আছে যা বস্তুতঃ নিষ্ঠুরতা—এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিক ভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ রচনাকে তার সমগ্রতার দিক্ থেকে দেখ্‌তে হবে। অনেক সময়ে, টুক্‌রো কর্‌তে গেলেই এক জিনিষ আর হ'য়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে-ছবি আছে পট্‌টাকে ছিঁড়ে তার বিচার করা চলে না—অন্তত সেটা আর্টের বিচার নয়।

সুবিচার কর্‌তে হ'লে যে-শান্তি মানুষের থাকা উচিত সেটা রক্ষা ক'রে আমরা যদি আমাদের মত প্রকাশ করি তা হ'লে সে মতের প্রভাব অনেক বেশী হয়। বিচার-শক্তির প্রেস্‌টিজ শাসন-শক্তির প্রেস্‌টিজের চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের গভর্ণমেণ্টের কোনো কোনো ব্যবহারে প্রকাশ পায় যে,তার মতে শাসনের প্রবলতা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে মারের মাত্রাটা ন্যায়ের মাত্রার চেয়ে বাড়ানো ভালো। আমরা বলি সুবিচার কর্‌বারই ইচ্ছাটা দণ্ডবিধান কর্‌বার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল থাকা উচিত।

সজনীকান্ত দাস—এখানে যে আলোচনা হচ্ছে সেটা সম্ভবতঃ 'শনিবারের চিঠি' নিয়েই।

রবীন্দ্রনাথ—হাঁ, শনিবারের চিঠি নিয়েই কথা হচ্ছে।

(ইহার পর 'শনিবারের চিঠির' আদর্শ, 'শনিবারের চিঠির' 'মণিমুক্তার' আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যিক ও সামাজিক doctrine, তাঁহারা যাহা সৃষ্টি করিতেছেন তাহা আদপে সাহিত্য কি না ইত্যাদি বিষয়ে নানা ভাবের আলোচনা হয়। এই আলোচনায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অপূর্ব্ব-কুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা পর পর লিখিত হইল।)

('মণিমুক্তা' সম্বন্ধে) যা মনকে বিকৃত করে সেগুলিকে সংগ্রহ ক'রে সকলের কাছে প্রকাশ করলে উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়।

(আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন) যে জিনিষ বরাবর সাহিত্যে বর্জ্জিত হ'য়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় ক'রে দেখান এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্দ্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলচেন এসব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বল্‌বো, প্রতিক্রিয়া কখনই প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হ'তে পারে না। যেমনতর কোন সময় বাতাস গরম হ'য়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আস্‌তে পারে অথচ কেউ বল্‌তে পারেন না,এর পর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।

ঈশ্বরকে মানিনে, ভালবাসা মানিনে, সুতরাং আমরা সাহিত্যে বিশেষ কৌলীন্য লাভ করেচি এমন কথা মনে করার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হ'তে পারে না। ঈশ্বরকে মানি না বা বিশ্বাস করি না সেটাতে সাহিত্যিকতা কোথায়? ভালবাসা মানছি না, অতএব যারা ভালবাসা মানে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছি, সাহিত্য-প্রসঙ্গে একথা ব'লে লাভ কি?

(শনিবারের চিঠির সমালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন)—'শনিবারের চিঠি' যদি সাহিত্যের সীমার মধ্যে থেকে বিশুদ্ধভাবে সম্পূর্ণভাবে সমালোচনার পথে অগ্রসর হন, তা হ'লে বেশী ফললাভ করবেন এই আমার বিশ্বাস। যদি একান্ত ভাবে দোষ-নির্ণয় করবার দিকে সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করি তা হ'লে সেটা মাথায় চেপে যায়, তাতে শক্তির অপচয় ঘটে। শনিবারের চিঠিতে এমন সব লোকের সম্বন্ধে আলোচনা দেখেছি যাঁরা সাহিত্যিক নন এবং জনগণের মধ্যেও যাঁদের বিশেষ প্রাধান্য নেই। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে অতি

কট ক'রে যে-সব ছবি আঁকা হয় তাতে না সাহিত্যের না াজের কোনো উপকার ঘটে। এর ফল হয় এই যে, খানে সাধারণের হিতের প্রতি লক্ষ্য ক'রে লেখকেরা ঠিন কথা বলেন তার দাম কমে যায়। মনে হয় কঠিন থা বলাতেই লেখকের বিশেষ আনন্দ, তাঁর লক্ষ্য যেই াক আর যাই হোক।

কর্ত্তব্য-পালনের যে অবশ্যম্ভাবী কঠোরতা আছে জেরও সম্বন্ধে সেটাকে অত্যন্ত দৃঢ় রাখা চাই। শনি- ারের চিঠির লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা- নপুণ্যেরও আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের ায়িত্ব অত্যন্ত বেশি; তাঁদের খড়্গের প্রখরতা প্রমাণ রবার উপলক্ষ্যে অনাবশ্যক হিংস্রতা লেশমাত্র প্রকাশ না পলে তবেই তাঁদের শৌর্য্যের প্রমাণ হবে। সাহিত্য- ংস্কার কার্য্যে তাঁদের কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র আছে—কিন্তু কর্ত্তব্যটি প্রিয় ব'লেই এই ক্ষেত্রের সীমা তাঁদেরকে একান্ত ভাবে ক্ষা করতে হবে। অস্ত্র-চিকিৎসায় অস্ত্র-চালনার সতর্কতা ত্যন্ত বেশি দরকার, কেন না, আরোগ্য-বিধানই এর লক্ষ্য, ারা এর লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের চিকিৎসাই শনিবারের ঠির লক্ষ্য, এই কারণেই এই লক্ষ্যের একটু মাত্র বাইরে েলেও তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে। চিকিৎসকের পক্ষে ্রচালনার কৌশলই একমাত্র জিনিষ নয়, প্রতিপত্তিও মহা- ্য। সেই প্রতিপত্তি রক্ষা ক'রে শনিবারের চিঠি যদি র্ত্তব্যের খাতিরে নিষ্ঠুরও হন তাঁকে কেউ নিন্দা করতে রবে না। যাঁদের শক্তি আছে তাঁদের কাছেই আমরা স্থানে ক্ষান্তি দাবী করি। কর্ত্তব্য যেখানে বড়ো খানেই তার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ শুচি রক্ষার প্রয়োজন।

(আধুনিক সাহিত্যের doctrine সম্বন্ধে পুনরায় বলেন)

বলমাত্র না মানার দ্বারা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। ভগবান প্রেম আর ভূত কেন তোমরা আরও নক কিছু না মানতে পারো। যেমন, হোমিওপ্যাথি কিৎসা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যদি সে কথাও লিখতে তা ল বুঝতেম সেটাতে সাহিত্য-বহির্বর্ত্তী বিশেষ কোনো দ্দশ্য আছে। সাহিত্য-আলোচনায় যদি বল, অনেকে ভীমনাগের সন্দেশ ভাল, আমি বলি ভালো নয়, তার সাহিত্যিক সাহসিকতা বা অপূর্ব্বতার প্রমাণ হয় না।

(সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন)—

অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম ক'রে কেউ লিখতে পারে না। তোমরা বলতে পার দরিদ্রের মনোবৃত্তি আমি বুঝি না, একথা মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই। তোমরা যদি বল তোমাদের সাহিত্যের বিশেষত্ব দারিদ্র্যের অনুভূতি, আমি বলবো সেটা গৌণ। তোমরা যদি সর্ব্বদা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দরিদ্র-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, কর তাতে ক'রে এমন একটা বায়ু বৃদ্ধি হবে যাতে সাধারণ পাঠকেরা দরিদ্র-নারায়ণ বললেই চোখের জলে ভেসে যাবে। তোমরা কথায় কথায় আধুনিক মাসিক পত্রে বল আমরা আধুনিক কালের লোক অতএব গরীবের জন্যে কাঁদবো। এ রকম ভঙ্গিমা-বিস্তারের প্রশ্রয় সাহিত্যে অপকার করে। আমরা অর্থশাস্ত্র শেখবার জন্য গল্প পড়ি না। গল্পের জন্য গল্প পড়ি। 'গরীবিয়ানা' 'দরিদ্রিয়ানা'কে সাহিত্যের অলঙ্কার ক'রে তুলো না। ভঙ্গী-মাত্রেরই অসুবিধা এই যে অতি সহজেই তার অনুকরণ করা যায়—অল্পবুদ্ধি লেখকের সেটা আশ্রয়স্থল হ'য়ে ওঠে। যখন তোমাদের লেখা পড়বো তখন এই ব'লে পড়বো না যে এইবার গরীবের কথা পড়া যাক্। গোড়ার থেকে ছাপ মেরে চিহ্নিত ক'রে তোমরা নিজেদের দাম কমিয়ে দাও। দল বেঁধে সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না। প্রত্যেকের নিজের ভিতর অভিমান থাকা উচিত যে, আমি যা লিখছি 'গরীবিয়ানা' বা যুগ-প্রচার করবার জন্য নয়, এক মাত্র আমি যেটা বলতে পারি সেটাই আমি লিখছি। এ কথা বললেই লেখক যথার্থ সাহিত্যিকের আসন পায়। উপসংহারে এ কথাও আমি ব'লে রাখতে চাই, তোমাদের অনেক লেখকের মধ্যে আমি প্রতিভার লক্ষণ দেখেছি। আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্ত্তনের লোভে প'ড়ে তাঁদের লেখার সর্ব্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উল্কি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হ'ল, ব'লে না মনে করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক্।*

* বিগত ৭ই চৈত্র মঙ্গলবার, বিশ্বভারতী সম্মিলনের সাহিত্য-সমালোচনা অধিবেশনের রবীন্দ্রনাথ লিখিত বিবরণ।

প্রাচীন বাংলার স্ত্রী-আচরণ

সেকালের সকল কাজের সঙ্গেই ধর্মকর্ম্মের সংস্রব ছিল। সাহিত্যে, সমাজ-নীতিতে, পারিবারিক আচরণে—সর্ব্বত্রই ধর্ম্মকে ভিত্তি রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

একথা সত্য যে, আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি কালে বিকৃত হইয়া অনেক অর্থহীন সংস্কারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ঐগুলির উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, উহাতে ক্ষতি উপলব্ধি না করা পর্য্যন্ত উহা বর্জ্জন করা উচিত মনে হয় না। যাহা হউক হাজার বৎসর আগেকার দিন হইতে দুইশত বৎসর আগেকার দিনপর্য্যন্ত মধ্যকার প্রাচীন বাংলার স্ত্রী-আচরণ সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু এখানে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

সেকালে বৈশাখ, কার্ত্তিক, মাঘ মাস পুণ্য মাস বলিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে প্রশস্ত ছিল। পুরনারীগণ পুণ্যমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া তুলসী-মূলে জল দিতেন, পরে শাস্ত্রজ্ঞ ভক্ত কথকের নিকট ভক্তিকথা শ্রবণ করিতেন। অশ্বথ, বট, বিল্ব, নিম্ব প্রভৃতি কোন কোন বৃক্ষও দেবাশ্রিত বলিয়া পূজিত হইত। অশ্বথকে বর ও বটকে কন্তা কল্পনা করিয়া ঐ দুই বৃক্ষ একস্থানে রোপণ করিয়া খুব ঘটা করিয়া বিবাহ দেওয়া হইত।

ভিক্ষুক বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে চাউল, কড়ি, হরিদ্রা, লবণ কলাদি ভিক্ষা দেওয়া হইত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা হিন্দু বা বৌদ্ধ বিধবাকে তাঁহাদের সঙ্ঘে লইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। কখন কখন ধনশালী বিধবা সঙ্ঘে গিয়া সঙ্ঘকে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি দান করিয়া নিজে সঙ্ঘের সেবিকা হইয়া থাকিতেন।

বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গুবাক (সুপারী) দিয়া নিমন্ত্রণ করার রীতি ছিল। কালে ঐ সুপারীর সহিত কিঞ্চিৎ সন্দেশ দেওয়ার নিয়ম হইয়াছিল।

সন্তান জন্মিবার পাঁচ দিনে পাঁচটি, ছয় দিনে ষষ্ঠী, সাত দিনে সাতিনা (সপ্ত ঋষির অর্চ্চনা), আট দিনে আট-কলাই, দশ দিনে দশা, একুশ দিনে একুশে ষষ্ঠী ও ত্রিশ দিনে ত্রিশা উৎসব সম্পন্ন হইত। ষষ্ঠী পূজা এখনও প্রচলিত দেখা যায়।

অতি প্রাচীন যুগের কথা বাদ দিয়া প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার একটি বিবাহের বর্ণনা কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে উল্লেখ করা গেল। ইছানী নগরে লক্ষপতি সদাগর ধনপতি সদাগরের সহিত স্বীয় কন্তা খুল্লনার বিবাহ দিতেছেন—

> ধনপতি ধরিলাত অষ্টজনে তোলে।
> খুল্লনা বাহির কৈলা করি চতুর্দ্দোলে॥
> সপ্ত বার সুবদনী করিল ভ্রমণ।
> যুগপাণি প্রণামিল প্রভুর চরণ॥
> চন্দ্রমুখী দরশন সদাগরে কৈল।
> গলার পুষ্পের হার বদল করিল॥
> ধান্যদূর্ব্বা অঙ্গে দিয়া রহিল তরুণী।
> তদন্তরে কৈল সাধু ফুলের সাজনি॥
> দোঁহাকারে তোলাইয়া যত বন্ধুগণে।
> সভামধ্যে বসাইল রত্ন-সিংহাসনে॥
> দোঁহাকার কর দ্বিজ করি একত্তর॥
> সূত্রাবলী দিয়া তাহা বাঁধে দ্বিজবর॥
> সম্প্রদান বাক্য দ্বিজ উচ্চারে বদনে।
> দানের সজ্জা আনি দিল সভা বিদ্যমানে॥
> রমণী সহিত তথা বণিক-তনয়।
> হুতাশন প্রণামিল সানন্দ হৃদয়॥
> পাকের মন্দিরে গিয়া করিলা ভোজন।
> দম্পতি গৃহেতে দুহ গেল ততক্ষণ॥

ধনিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করিতেন। নিমন্ত্রণ-সভায় ধণিগণ তাঁহাদের মূল্যবান স্বর্ণপাত্রাদি সঙ্গে লইতেন। ঐ সকল মূল্যবান বাসনাদি দেখাইয়া অধিকতর মর্য্যাদার অধিকারী হইতেন।

নিম্নলিখিত মিষ্ট দ্রব্য তখনকার দিনে ব্যবহৃত হইত:—

মনোহরা, রসকরা, নিখুতি, মণ্ডা, সরভাজা, ইন্দ্রমিঠা, সীতামিশ্রি আলকা, এলাইচ দানা, ফুলচিনি, সন্দেশ প্রভৃতি। দুগ্ধ আল দিয়া খাওয়ার রীতি ছিল। চিড়া খই মুড়ী প্রভৃতি বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।

পান্তা ভাতের প্রচলন এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল। আমানি জল বা কাঁজী অনেক ঘরেই সঞ্চিত থাকিত। গরীবেরা কাঁজী খাইত, অনেক ঔষধেও কাঁজী ব্যবহৃত হইত। দরিদ্রেরা খুদের জাও, কলমী শাক, পুঁই শাক বেশী খাইত। লবণ দেশেই প্রস্তুত হইত। আমরা মাধবাচার্য্যের অষ্টমঙ্গলা হইতে খুল্লনার রন্ধন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

> "দুবলা করিয়া দেহি যত আয়োজন।
> হরষিতে খুল্লনারে করয়ে রন্ধন॥
> হৃদয়ে ভাবিয়া রামা অপর্ণা-চরণ।
> অমৃত সমান হোক আমার রন্ধন॥
> পাবক জ্বালায়ে রামা মনের হরিষে।
> শাক রন্ধন করি ওলাল বিশেষে॥
> শুক্ত বরি রামা রান্ধে ঘৃতেতে আগল।
> জাতি কলা দিয়া রান্ধে ঝুনা নারিকেল॥
> জলপাই অম্বল রান্ধে মহা হৃষ্ট হয়্যা।
> সম্ভরি ওলাল তাতে শস্ত পোড়া দিয়া॥
> নিরামিষ্য ব্যঞ্জন রান্ধি থুইল এক ভিত।
> আমিষ রান্ধিতে পরে খুল্লনা দিল চিত॥
> মনের হরিষে রান্ধে রুহিতের মাচ।
> চুরিতা মিশালে রান্ধে উরিকা আনাজ॥
> বড় বড় কৈ মৎস্য রান্ধিল হরিষে।
> অপূর্ব্ব খরল মাচ রান্ধে অবশেষে॥
> ঝাল ব্যঞ্জন রান্ধে হিঙ্গু দিয়া তায়।
> মৎস্যাদির মুড় দিয়া সবারি ওলায়॥"

পূজারিণী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

কদলীর মূল রান্ধে [illegible] করি ।
তিল পিঠা পিপাসে রাখয়ে নির্মরি ॥
ক্ষীরপুলি রান্ধে বাখ্য মুরিস্ত হয়ে ।
ডুবাইয়া থুয়ে তাহে খণ্ড-মধ্যে পাত্রে ॥
সমুদ্রের ফেনা পিঠা অপূর্ব্ব গণি ।
দধি মধু চন্দ্রপুলি রান্ধে সুবদনী ॥
অপূর্ব্ব পিষ্টক রান্ধে নাম সৈলাম ।
পুলাপাবি পিঠা রান্ধয়ে অনুপম ॥
কলাবড়া পিঠা রান্ধে মনের হরিষে ।
সুগন্ধি তণ্ডুল অন্ন রান্ধে অবশেষে ॥
রন্ধন করিয়া বৈসে খুল্লনা যুবতী ।
দুবলার তরে রামা কহে শীঘ্রগতি ॥
অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন হইল আমার ।
থালা পীড়ি দেয় সাধু ভোজন করিবার ॥
স্বর্ণ থালা আনিয়া যোগায় দুবা চেরী ।
দ্বিজ মাধবে গায় বন্দি মহেশ্বরী ॥

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ীতে যে রন্ধনের বর্ণন করিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণ করিবার বিষয়। এ রন্ধনে তিনি শড়শড়ি, ঘণ্ট, ভাজা, নানা-প্রকার ডাইল, শুক্তনি, ডালনা, তিল পিটালী, মৎস্যের নানা-প্রকার ব্যঞ্জন, মৎস্যের ডিম, মুড়া, তৈল দিয়া নানা-প্রকার রন্ধন, চড়চড়ী, বড়া, মাংসের কাল, ঝোল, কালিয়া, দোলমা, রসা, সেকটী, শিকভাজা, কাবাব, অম্বল, আচার নানা প্রকার পীঠা, পুলী, পুরী, মুগ সামুলী, কলাবড়া, পাঁপর, লুচি, পরমান্ন, খেচরান্ন, বিষ্ণুভোগ প্রভৃতি উপাদেয় রন্ধনের বর্ণন করিয়াছেন।

এইবার বেশভূষার বিষয় একটু বলিব।

বারোহাত দীর্ঘ শাড়ী, কোঁচট করিয়া ধনীগৃহে ব্যবহৃত হইত। বহরে বর্ত্তমানের ৪৪ ইঞ্চি অপেক্ষা কম ছিল। শাড়ীর নাম ছিল—মেঘডম্বুর, পাড়িদার ভূনীপোতা, পাটের (পটবস্ত্রের) শাড়ী প্রভৃতি। বুকে কাঁচলী আঁটা হইত। কাঁচলীর ব্যবহার অতি উত্তম ছিল, এখনও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কাঁচলীর ব্যবহার আছে।

পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মত দীর্ঘ কেশ রাখিত। ইহা বৌদ্ধ রীতি হইতে গৃহীত বলিয়াই মনে হয়। পুরুষের মধ্যে অনেকে বাবরী করিয়া চুল কাটিত। উহা মল্লদিগের লক্ষণ বলিয়া সূচিত হইত। পুরুষেরা তিন খণ্ড কাপড় পরিত। "একখানা কাছিয়া পিন্দে, আর একখানা মাথায় বান্ধে আর একখানা দিল সর্ব্ব গায়ে।"

আমলকী বাটা দিয়া মুখ পরিষ্কার করা হইত। স্নানের পরে মাথায় তৈল ব্যবহার করিয়া চুল আঁচড়াইয়া পরিপাটি করা হইত। লোটন খোঁপা, গুয়াঠুটি খোঁপা, ঝিরিঝি খোঁপা প্রভৃতি অনেক প্রকার খোঁপা বাঁধা হইত। বাঁশের তৈরী কাকই বা চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়ান হইত। কাংস্যদর্পণে মুখ দেখিত। সধবারা সিঁদুর তিলক এবং বিধবারা তিলক ব্যবহার করিত। মুসলমান স্ত্রীলোকেরা সিঁদুরের পরিবর্ত্তে কাগ বা কাউন পরিত। গ্রীষ্মকালে সুগন্ধি শীতল চন্দন কপালে ও গায়ে ব্যবহৃত হইত। গায়ে হলুদ ও পিটালী মাখিয়া গাত্র পরিষ্কার করা হইত। সুগন্ধ তৈলের ব্যবহার কিছু কিছু ছিল।

অলঙ্কার বহু প্রকার ছিল। কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

কণ্ঠে সাতনরী, কণ্ঠমাল, মুক্তাবেড়ী হার, ধবক শিকলিহার, পঞ্চেশ্বরী হার, কণ্ঠভাবিজ, হাঁসুলি, ময়ূরালী ব্রাত্নক, কর্ণে-কুণ্ডল, কর্ণফুল, মাকড়ি (সোণার্থ্যা) কানকাটি, মাদুলী, নাকে—বেসর, নথ, নকজবেসর, বাহুতে—কেয়ূর, কঙ্কণ, মাদুলী, বালা, তাড়, মুরারী, শঙ্খ, খাড়ু, তাড়ব, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী; কটিদেশে কিঙ্কিণী, পদে নূপুর, বাঁকমল, মল, পদাঙ্গুলিতে পাশুলি প্রভৃতি।

বিধবাদের মধ্যে কেহ কেহ সোনার চুড়ী ব্যবহার করিতেন। ধনীগৃহে সোনা ব্যবহৃত হইত। সাধারণ গৃহে রূপা রূপাদস্তা ও [illegible] বহুল ব্যবহার ছিল।

বেত বাঁশ বা কাঠের পেটরীতে মূল্যবান বস্ত্র, [illegible] রাখা হইত। পোকায় কাটিতে না পারে [illegible] তোলা কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে কালজিরা ছড়াইয়া দেওয়া হইত।

শ্রীমতী সুশীলা নন্দী

(মাতৃমন্দির, বৈশাখ ১৩৩৫)

—

মেয়েদের কাজ

শিল্প বিষয়ে যথার্থ শিক্ষা বা পাঁচ রকম দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ তাহাও যেমন মেয়েদের ভাগ্যে ঘটে না, মনও কি তেমনি একটু খুলিতে পায় যে ভাল রুচি জন্মিবে? শিল্প বা কোন কলাও যদি সেরকম ভাবে কিছু শিখিতে না পারে, ভাল করিয়া ফুলের বাগান করিতে নিযুক্ত হইলেও তাহাও যে অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর কাজ হয়। ঘর সাজান, সভাসমিতি সাজান, ফুল সাজানি ইত্যাদি মেয়েরা ভাল করিয়া শিখিলে তাহাতে কতটা আবশ্যক বুদ্ধি, সৌন্দর্য্যের চর্চা সহজে হইতে পারে। এমন করিয়া অশিক্ষার জগতের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মেয়েরা পরস্পরে মিলিবার সুবিধা না পাইয়া ঘরের কোণে আলাদা আলাদা রহিয়া গেলে আর কি হইবে।

ফুলের প্রতি, বাগানের প্রতি মেয়েদের সজাগ অনুরাগ জাগাইতে পারিলে তাঁহারা অন্ত অনেক জিনিষের অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, আনন্দজনক এবং আবশ্যকীয় কাজ পাইবেন, ইহার সহিত নানারকম স্বাস্থ্যকর খেলারও প্রচলন হওয়া আবশ্যক। গান, বাজনা, চিত্রকলাদি শিক্ষার সুযোগ, উহা শুনিবার দেখিবার সুযোগও আরও অনেক বেশী হওয়া চাই-ই, তা ছাড়া ফোটোগ্রাফিতেও আমাদের মেয়েরা যান নাই বলিলেই হয়। ফোটোগ্রাফি মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত হওয়া দরকার।

মেয়েদের কাজের কথা হইলেই যত একঘেয়ে বসা-কাজই তাঁহাদের উপর দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহারা ত এমনিই দিনরাত ঐরকম কাজেই বদ্ধ থাকেন, উহার উপরও আবার শুধু চরকা ও সূচীশিল্প মাত্রই তাঁহাদের ঘাড়ে না চাপাইয়া যে সব কাজে মুক্ত-বাতাসে অঙ্গসঞ্চালন আবশ্যক তাহাই বরং তাঁহাদের করিতে দেওয়া ভালো।

যিনি যে খাবার রান্না ভাল জানেন, শুধু তাঁহার আত্মীয়েরা ছাড়া আর কেহই যেন তাহার আস্বাদ পাইবে না। তিনিই বা আপনার দক্ষতা ও পরিশ্রমের মূল্য পাইবেন না কেন? তাহাতে তাঁহার পরিজনেরাও কি বেশী লাভবান হইবেন না? যিনি ভাল সন্দেশ, রসগোল্লা তৈরী করিতে জানেন, তাঁহার উপর ভার চাপাইয়া দিয়া হইতে ঘরের অন্ত সমস্ত খুঁটি-নাটি চাপাইয়া দিলে তিনি সেই সন্দেশ, রসগোল্লা আরও ভাল করিয়া করিতে শিখিবেনই, বা কিরূপে? তাহাপেক্ষা তাঁহাকে তাহাই ভাল করিয়া ব্যবসায়ের মত করিয়া করিতে দিলে বাড়ীর লোকে তাঁহার সন্দেশ ও অর্থ এবং

সঙ্গেই পাইতে পারেন, অথচ তাঁহার দক্ষতার ফল সর্ব্বসাধারণে পাইবে।

মেয়েরা এই রকম কত ভাবেই জনসেবা ও অর্থার্জ্জন এক সঙ্গেই করিতে পারেন। আর তাহার দ্বারা সমস্ত মেয়েদেরই এখনকার আনাড়ি ও অসহায় ভাবে সন্তান ও ঘরকন্না লইয়া হাবুডুবু খাওয়াও দূর হইতে পারে।

বঙ্গনারী

(বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৩৫)

—

বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ

আজ, কি অর্থে, কি শিক্ষায়, কি জ্ঞানে, কি গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে সব জায়গাতেই মুসলমানের ঠাঁই করতে হচ্ছে ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আস্ফালন ক'রে বেড়ানই হয়েছে আমাদের সকল দৈন্য লুকিয়ে রাখ্‌বার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই দৈন্যের জন্য সে তার অতীতের নির্বুদ্ধিতাকে দায়ী না ক'রে দায়ী করছে অগ্রগামী দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হিন্দু সমাজকে, আর আঁকড়ে ধরছে বটবৃক্ষের আশ্রিত কাকের মত ব্রিটিশের হাত, এই ভয়ে পাছে হিন্দুরা ঘাড় ধ'রে তাকে খোর্ম্মা খেজুরের দেশে তাড়িয়ে দেয়। এতে ক'রে সে নিজেই যেন স্বীকার করছে, সে পরগাছা, এদেশে তার কোন শিকড় নেই।

বাঙ্গালী মুসলমান নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত মূর্খ ও নিতান্ত কৃপার পাত্র। ইংরাজী-শিক্ষিত ও আরবী-শিক্ষিত উভয় শ্রেণীর এ বিষয়ে এক মত। এই দারিদ্র্য-মোচনের উপায় কি সে-বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে ব'লে বোধ হচ্ছে না। উপায়ের মধ্যে দেখ্‌ছি সমাজের অভিভাবকগণ বল্‌ছেন লেখাপড়া শিখ— আর চাকরীতে ঢুক। হিন্দু চাকরী ক'রে আজ এত ধনবান্‌ হয়েছে। মুসলমানকে উঠতে হ'লে ঐ চাকরীর পথই অবলম্বন করতে হবে। কি মারাত্মক দুর্ব্বলতা আমাদের চেপে রেখেছে! কিন্তু আমাদের হাত হতে ক্রমশঃ সম্পদ-বৃদ্ধির উপায়গুলি স'রে যাচ্ছে কেন? তা কি কেউ একবারে অনুসন্ধান করেন? আমাদের জমিগুলি হিন্দুমহাজনের বাক্‌স-বন্দী আর আমরা জমির উপর মজুর খেটে পেটের সংস্থান করছি। আর শত শত মুসলমান নিরুপায় হ'য়ে ভিক্ষার ঝুলি সম্বল ক'রে শহরের অলি-গলি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ' গেয়ে গেয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের দৈন্য ঘোষণা ক'রে ফিরছে এবং ইসলামের প্রতি অন্যের অনুরাগ কমিয়ে দিচ্ছে। অথচ আমরা হিন্দুকে মুসলমান করবার জন্য কি ব্যগ্র! তাকে কলমা পড়িয়েই নিশ্চিন্ত। আমাদের সৃষ্টির ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। পরের উপর নির্ভর ক'রেই নিশ্চিন্ত হতে চাই। কোন গতিকে চাকুরী একটা জুটলেই 'বাস্‌' 'তোফা' 'কিয়াবাত' ব'লেই সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের জয়স্তুতিতেই দিন গুজরান ক'রে বেশ ইৎমিনানে দিন কাটাতে পারলে বেঁচে যাই। অত ঝঞ্ঝাটে কাজ কি? আমরা মুসলমান —চাই শান্তি—ইসলাম অর্থে শান্তি; এই চাকুরীজীবী মুসলমানদের সঙ্গে পল্লীর মাটি খুঁড়ে জীবন বাঁচায় যারা তাদের কোন যোগ আছে ব'লে মনে হয় না। কারণ তাঁরা এদের জীবনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না। এরা মহাজন, মোল্লা, বিদেশী বণিক ও নানা-প্রকার শোষণের ফলে জীবন্মৃত হ'য়ে পড়ছে, কিন্তু আমরা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের কোন প্রতিকার করতে চেষ্টা করছি না। আমরা কেবলই সরকারের কাছে চাকুরি চাচ্ছি। এদের জীবনের দুঃখ দৈন্য দূর করতে হ'লে সরকারকে দু কথা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তা আমরা পারি না—ভয়, পাছে আমাদের চাকুরীর অনুগ্রহটুকু কমে যায়। মোল্লাজীকেও শোষণকারী শ্রেণীভুক্ত করেছি ব'লে হয়ত অনেকে বিরক্ত হবেন; কিন্তু উপায় কি? মহাজন তবু তার দেহকে বাঁচায়, কিন্তু মোল্লাজী তার মনটিকে গলা টিপে মেরে ফেলেন। অলৌকিক ভৌতিক রূপকথা উপকথার ভিতর দিয়ে ধর্ম্মব্যাখ্যা ক'রে ক'রে তিনি সাধারণ পল্লীর মুসলমানকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ক'রে ফেলেছেন। তাই আমি মোল্লাজীর নজরানা ও মহাজনের সুদ একই প্রকার শোষণের ফল বলতে চাই।

মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আজ বাঙ্গালী মুসলমানকে এমনি ক'রে আচ্ছন্ন করা হয়েছে যে, তার সমস্ত শক্তির স্রোত রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। এই নসিহতের ফলে সাধারণ মুসলমান কিরূপ পাপাসক্ত, নিশ্চেষ্ট, নিশ্চিন্ত, আত্মবিস্মৃত ও অপরিণামদর্শী হয়েছে তা আপনারা একটু দৃষ্টি ফিরালেই বুঝ্‌তে পারবেন। বাংলাদেশের সর্ব্বত্র এই নসিহৎ মুসলমানকে তন্দ্রাহত ক'রে রেখেছে। এর জন্য মোল্লাজীর যে পাপ হ'য়েছে সেই পাপের ফলে আজ মুসলমান সমাজ সমস্ত কর্ম্মশক্তি ও সৃষ্টির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। হে বাঙ্গালী মুসলমান, খোদার এই দুনিয়া এখনও নবীন, অতি নবীন, অনন্তকাল এর বয়স। তোমরা আর ঘুমিয়ে থেক না, তোমরা দোন জাহানের অভিভাবক মোল্লাজীর দোয়া তাবিজের উপর ভরসা ক'রে থেক না। তোমার ঘাড়ের উপর যে মাথা চোক, কান, মুখ আর হাত পা খোদা দিয়েছেন সেগুলি একবার ঝাড়া দিয়ে খাড়া কর। অসীম তোমার শক্তি, তুমি এমন ক'রে ঝিমিয়ে আর ঘুমিয়ে কতকাল থাকবে? তুমি সিংহ, এমন ক'রে নিজেকে ভুলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরছ কেন? তোমারই পূর্ব্বপুরুষ একদিন মসলিন তৈরী ক'রে রুশিয়া ও রোমের বাজারে সর্ব্বোচ্চ মূল্য আদায় ক'রে আনতে। বাংলার চিনি, লবণ, তুলা, নীল, কারা তৈরী করত? বাংলার পণ্যের জাহাজের মালিক ছিল কারা? সে জাহাজ তৈরী করত কারা? বাংলার পল্লীর আনন্দে রস ঢালত কারা? বাংলার গ্রামে গ্রামে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা ক'রে শিক্ষার কেন্দ্র গড়েছিল কারা? প্রাচীন অট্টালিকার কারুকার্য্যের মিস্ত্রী ছিল কারা? তাদেরই পূর্ব্বপুরুষ আজ গাড়োয়ান, কোচম্যান, খানসামা, বাবুর্চ্চি ও বয়। কেমন ক'রে তারা আজ এমন সৃষ্টিছাড়া হয়েছে, কেমন ক'রে তাদের হাতের শক্তি এমন ক'রে বিলুপ্ত হয়েছে, কেমন ক'রে তাদের গৃহ এমন আনন্দহীন হয়েছে তাই ভাব্‌বার বিষয়। তার জন্য দায়ী সমান ভাবে মোল্লা, মহাজন ও ম্যানচেষ্টার। বেশী ক'রে মোল্লা, যিনি অভিভাবক সেজে মুসলমানকে বেশী ক'রে মুসলমান করবার জন্য দৌরাত্ম্য করেছেন ঐ সকল ধর্ম্মের মন্ত্র শুনিয়ে শুনিয়ে। পদে পদে গোনাহ্‌র ভয় দেখিয়ে শৈশব হ'তেই মোল্লাজী আমাদের সকল স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের পথে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা ও বিপুল ভয়ের সৃষ্টি করেছেন। ক্রমে সমাজ আজ এমনি একটা ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়েছে যে, কোন কিছু নূতনের ইঙ্গিতেই তার হৃৎপিণ্ড থর থর করতে থাকে। নব অভিজ্ঞতায় বিপদ্‌ সে বরণ না করতে কিছুতেই রাজী হতে চাচ্ছে না, অথচ সে বিপদকে বরণ করলে কোন সৃষ্টিই সম্ভবপর হবে না। 'আধুনিক বাঙ্গালী মুসলমানের ধর্ম্ম-প্রীতি আছে'—এ একটি মস্ত বড় মিথ্যা কথা। একথা শুনে অনেকেই হয়ত চটে উঠ্‌বেন; কিন্তু এ একটি নিছক সত্য কথা। এর দৃষ্টান্ত দিতে গেলে আরো বেশী অপ্রীতিকর কথার

উল্লেখ করতে হবে। আজ আমাদের ধর্মপ্রীতি শুধু মুখে, কিন্তু অন্তরে নয়, জীবনে ত নয়ই।

(জাগরণ, বৈশাখ ১৩৩৫) আবুল হুসেন

—

তিব্বতে মৃতের সৎকার

নাড়ীর স্পন্দনে বিরতি অথবা নিশ্বাস বন্ধ হওয়াকেই তিব্বতীয়েরা মৃত্যুর নিশ্চিত বা পূর্ণ লক্ষণ বলিয়া মনে করে না। তাহাদের বিশ্বাস, ইহার পরেও অন্ততঃ তিন দিন পর্য্যন্ত আত্মা দেহের মধ্যেই অবস্থিতি করে। সমস্ত তিব্বতে এবং মঙ্গোলিয়াতেও সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই মৃত্যুর পরে দেহ অন্ততঃ তিন দিন পর্য্যন্ত ঘরেই রক্ষা করা হয়।

ব্যক্তিবিশেষে চারি প্রকার দেহ-সৎকারের প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, যথা (১) দেহ সমাহিত করা (ক্ষিতি), (২) জলে বিসর্জ্জন দেওয়া (অপ্), (৩) অগ্নিতে সংস্কৃত করা (তেজ), এবং (৪) শকুনী পাখীর নিকট ভোগ দেওয়া (মরুৎ, ব্যোম)। এই শেষোক্ত প্রথাই সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচলিত।

চতুর্থ দিবস প্রাতে যিনি সর্ব্ব প্রথম শবদেহ স্পর্শ করিবেন, তাঁহার এবং মৃতব্যক্তির কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখা হয়। তার পরে একজন লামা কতকগুলি ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; তাহার উদ্দেশ্য যাহাতে মৃতব্যক্তির মাথার খুলির কোনও বিশেষ একটা ছিদ্রপথে তাহার আত্মা (প্রাণবায়ু ?) বহির্গত হইতে পারে। এই অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে আত্মা অন্য কোনও পথেও বাহির হইয়া যাইতে পারে—তাহাতে আত্মার অধোগতি অনিবার্য্য। এই অনুষ্ঠানের জন্য সেই লামাকে শবদেহ লইয়া একটা ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একাকী থাকিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ঘোষণা না করেন যে, কোন্ পথে মৃতব্যক্তির আত্মা বাহির হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ সেই ঘরে প্রবেশ করিতে পায় না। এই কার্য্যের জন্য মৃতব্যক্তির অবস্থা অনুসারে সেই লামাকে একটা গাভী, চমরী গাই (yak), ভেড়া, ছাগল, অথবা অর্থ দান করিতে হয়।

শব বহন করিবার পূর্ব্বে একজন জ্যোতিষী আসিয়া উপস্থিত সকলের জন্মতারিখ ইত্যাদি তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। যদি দেখা যায় যে,মৃতব্যক্তির সহিত কাহারও জন্মের রাশিচক্র ঠিক মিলিয়া যাইতেছে, তবে সেই ব্যক্তিকে শবের অনুগমন করিতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহাতে আশঙ্কা আছে যে, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা তাহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিতে পারে। এই কার্য্যের জন্য জ্যোতিষীকেও অর্থ-প্রদান অথবা অন্য প্রকারে দক্ষিণা দেওয়া হয়। শবের মাথার নিকটে পাঁচটি মাখনের (এ দেশে ঘৃতের প্রচলন নাই) বাতি জ্বালান হয় এবং দেহটাকে ঘিরিয়া একটা পর্দ্দা খাটাইয়া তাহার ভিতরে নিত্যকার খাদ্য, পানীয় এবং একটা বাতি দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে অতি প্রত্যূষে শবাধারে দেহটিকে নিকটবর্ত্তী সৎকার-ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। শবাধার বহন করিবার পূর্ব্বে আত্মীয়-স্বজনেরা উহার নিকট প্রণতি করে। শবের অনুগমন-কারী দুই জনে একথালা যবের ছাতু, কিছু মদ এবং চা লইয়া যায়। পারিবারিক পুরোহিত—একজন লামা—শবাধারের উপরে একখানা চাদর বিছাইয়া আর একখানা চাদর ঐ চাদরের সঙ্গে বাঁধিয়া সেই চাদরের এক কোণ ধরিয়া ধীরে ধীরে শবের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে থাকেন। চলিতে চলিতে তিনি মন্ত্র আওড়াইতে থাকেন এবং ডান হাতে এক প্রকার ডমরু আর বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজাইতে থাকেন।

প্রত্যেক সৎকারভূমিতে একখানা করিয়া বড় প্রস্তর পাতিত থাকে। শবাধার হইতে শবদেহ নামাইয়া উহার কাপড়-চোপড় ছাড়াইয়া ঐ প্রস্তরশয্যার উপরে মুখ নীচের দিকে করিয়া, শোয়ান হয়। পুরোহিত আসিয়া শবের উপরে রেখাকারে কতকগুলি দাগ চিহ্নিত করেন এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে টুকরা টুকরা করিয়া শবদেহটা কাটিয়া ফেলেন। এইসব করিতে করিতেই শকুনীর দল আসিয়া পড়ে।

শকুনীদের ভোজের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইলে ভুক্তাবশিষ্ট শরীরের অস্থিগুলি পাথরে গুঁড়া করিয়া, মস্তিষ্ক পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া শকুনীদের ভোজে দেওয়া হয়। কাওয়াগুচি বলেন, ইহার সঙ্গে কিছু ছাতুও মিশাইয়া দেওয়া হয়। ভোজের পালা সমাধা হইলে একটা নূতন মৃৎপাত্রে ঘুঁটের আগুনে কিছু মাখন এবং যবের ছাতু ধুনারূপে জ্বালান হয়। মৃতব্যক্তির আত্মা যেদিকে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে বিশ্বাস, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে ধুনাসহ ঐ মৃতপাত্র সেই দিকেই উৎসৃষ্ট হয়।

মৃত্যুর পরে সপ্তম দিবসে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে খাবার, চা, সোনা, রূপা অথবা টাকা পয়সা বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠান প্রতি সপ্তম দিবসে পুনরনুষ্ঠিত হয়। মৃত ব্যক্তির শেষ নিশ্বাস-গ্রহণের পর হইতে এ পর্য্যন্ত প্রতিদিনই তাহার উদ্দেশে থালায় করিয়া খাদ্য পানীয় দেওয়া হয় এবং মাখন ও ছাতু Juniper কাষ্ঠ সংযোগে ধুনা রূপে জ্বালান হয়। উনপঞ্চাশৎ দিবসে সমস্ত লামাদিগকে এক বিরাট ভোজ দেওয়া হয় এবং মৃত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ টাকা পয়সা ইত্যাদি জলে ধৌত করিয়া এবং জাফরানের জলে শোধিত করিয়া কোন লামাকে দেওয়া হয়। অন্তঃসত্ত্বা, বন্ধ্যা এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত—মৃত্যুর পরে ইহাদের শবদেহ বিশেষ ভাবে অশুচি বলিয়া গণ্য করা হয় এবং সেই জন্য দেশের সীমানার বাহিরে ফেলিয়া আসিতে হয়।

Palti হ্রদের তীরে যাহাদের নিবাস, তাহারা অবস্থা বা শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলের মৃত দেহই হ্রদের জলে বিসর্জ্জন দেয়।

মৃতদেহ অগ্নিসংস্কৃত করাটা ইহারাও খুব উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়াই মনে করে, কিন্তু এদেশে জ্বালানি কাঠের অভাবে সেটা কার্য্যে পরিণত করা সহজ নয়। বিশিষ্ট লামাদের মৃতদেহ কোন কোন সময় অগ্নিসংস্কৃত করা হয়; সৎকারের পরে অস্থি এবং ভস্মাবশেষ কোন চৈত্যে রক্ষিত হয়।

শ্রীসত্যভূষণ সেন

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৫)

—

গ্রামের সমস্যা

গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য গ্রামে সুশিক্ষিত, উদার এবং কর্ম্মঠ লোকের নিয়ত বাসের প্রয়োজন।

গ্রামে সুশিক্ষিত লোক নিয়ত বাস করিতে হইলে, গ্রাম হইতেই তাঁহাদের অন্ন-সংস্থান হওয়া দরকার। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম সমস্যা। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, গ্রামের ধ্বংসের কারণ কেবলমাত্র গ্রাম্য জমিদারের বর্ত্তমান বিকৃতি রুচি নহে। গ্রামের মধ্যবিত্ত লোকের উদরান্নের সংস্থানের জন্য সহরে বাস প্রবলতর কারণ।

যেমন ইহা আশা করা যাইতে পারে না যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক লোক চরকা কাটিবে, তেমন ইহাও আশা করা অসঙ্গত যে, রাজ্য

দেশের গ্রামের প্রত্যেক লোকই চাষ করিবে কিংবা গৌণভাবে চাষের দ্বারাই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। ধরুন, গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে অন্যান্য অনেক জিনিষের সঙ্গে ইহাও একান্ত দরকার যে, গ্রামে একজন চিকিৎসক থাকেন। এখন চিকিৎসকের হয়ত সেই গ্রামে কোন জমি নাই। তাঁহার অন্নসংস্থান কি করিয়া হইবে?

একটিমাত্র গ্রামের অধিবাসিগণ যদি একজন পারদর্শী (qualified) চিকিৎসকের ভরণ-পোষণ উপযোগী অর্থ মাসে মাসে যোগাইতে না পারেন, তবে কয়েকটি গ্রাম মিলিয়া একটি Federation সৃষ্টি করা দরকার। সেই গ্রামসমষ্টির অধীন বেতনভুক্ চিকিৎসক থাকা দরকার। গ্রামের উন্নতির জন্য ইহাও একান্ত দরকার যে, গ্রামে একটি বিদ্যালয় থাকিবে। এখন ধরুন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়ের, যে গ্রামে তিনি শিক্ষকতা করিতেছেন, সে গ্রামে কোন জমি নাই। সুতরাং জমি চাষ করিয়া নিজের উদরান্নের সংস্থান করিয়া বেতনহীন শিক্ষকতা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং যে গ্রামে তিনি শিক্ষকতা করিতেছেন, সেই গ্রাম হইতেই তাঁহার অন্ন-সংস্থানের একান্ত প্রয়োজন। আবার ধরুন, কোন গ্রামে হয় ত পিতল, কাঁসার বাসন তৈয়ারী হয়, কোন গ্রামে হয় ত রেশমের কাপড়, চাদর ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। এখন এ যুগে এ আশা করা যাইতে পারে না যে, একটি গ্রামে যাহা কিছু এই প্রকারের জিনিষ তৈয়ারি হইবে তাহা সমস্তই সেই বিশেষ গ্রামের অধিবাসীরাই কিনিয়া লইবে। সুতরাং এইসব গ্রাম্য কারুশিল্পীর উদরান্ন সংস্থানের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক বাজার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তা ছাড়া এই সব জিনিষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কারুশিল্পীর হাতে ত পৌঁছায় না, পৌঁছায় middle man-এর হাতে আর পৌঁছায় মহাজনের হাতে। এদের উভয়ের হাত থেকে গ্রাম্য শিল্পীকে উদ্ধার করিতে হইলে, সমবায় শক্তির শরণাপন্ন হইতে হইবে।

কোন কোন গ্রামে হয়ত সুশিক্ষিত এবং কর্ম্মঠ লোক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু "উদার" অর্থাৎ যাহাদের দল পাকানো অভ্যাস নাই এমন লোক গ্রামে নিতান্ত বিরল। "সব ক্ষমতা আমার হাতেই আসুক" ইহাই গ্রাম্য নেতার একমাত্র কাম্য। এই দল পাকানো অভ্যাস সমূলে বিনষ্ট করিতে না পারিলে, বাঙ্গলার ক্ষয়িষ্ণু গ্রামের পুনরুদ্ধার একবারে অসম্ভব।

আমাদের দেশে সত্য কথা বলিতে কি গ্রামের ডাক কানের ভিতরে পশিয়াছে কিন্তু মরমে পশে না। তাই শুনিতে পাই রাজনৈতিক বক্তৃতা, গ্রামের ডাকের কথা। কিন্তু অনেকের দৈনন্দিন জীবন-প্রণালী এবং কথিত বাক্য, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাই না।

গ্রামে বাস করিয়া যাহাতে সুশিক্ষিত লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেই উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইয়াই সহরে আসিতে হইবে। চাই, উন্নততর প্রণালীর চাষ, চাই নব নব কুটীর-শিল্পের প্রতিষ্ঠা, লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার, চাই সমবায়-সমিতি, চাই শিক্ষা-মন্দির, চাই চিকিৎসালয়, চাই মাতৃমন্দির (Maternity Home)। আর একটি কথা সর্ব্বোপরি স্মরণ রাখা আবশ্যক। যিনি বাঙ্গলার মরণোন্মুখ গ্রামের উন্নতিকামী, তিনি যেন কোন প্রকারের শ্রমকেই ঘৃণার চক্ষে না দেখেন, এমন-কি patronage-এর চক্ষেও যেন না দেখেন।

(গ্রামের ডাক, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৩৪)

শ্রীঅতুলচন্দ্র সান্যাল

—

স্বাস্থ্য-রক্ষা

এমন কতকগুলি আহার্য্য দ্রব্য আছে যাহা অন্য কয়েকটি দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে মানব-স্বাস্থ্যের বিপর্য্যয় সাধন করে।

কোন্ কোন্ জিনিষের সহিত কোন্ কোন্ জিনিষের সংযোগ বিরুদ্ধ তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম :—

(১) লবণের সহিত দুগ্ধ।

(২) মৎস্য বা মাংসের সহিত দুগ্ধ।

(৩) দুগ্ধের সহিত লাউ, কুমড়া প্রভৃতি লতাফল, অম্লরস, দধি, তৈল, চাউলের পিঠা, গুড়পাক, মদ্য, জাম, মূলা ও রসুন।

(৪) কলার সহিত তাল, দধি ও ঘোল।

(৫) কাঁসার পাত্রে ঘৃত ১০ দিন রাখিবার পর খাইতে নাই।

(৬) মধু উষ্ণ করিয়া পান করিবে না।

(৭) মধু ও জল বা মধু ও ঘৃত সমপরিমাণে আহার করিবে না।

নিম্নে কয়েকটি খাদ্য-দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছি যাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইলে সহজে জীর্ণ হয়। সুতরাং যদি কোন খাদ্য বিশেষ কারণ বশতঃ অধিক আহার করা হয়, তবে অপরটি দ্বারা পরিপাক শক্তির সাহায্য হইবে।

(১) চিঁড়া বা মুড়ির সহিত ঝুনা নারিকেল।

(২) মিষ্ট আমের সহিত গরম দুগ্ধ।

(৩) কাঁঠালের সহিত কলা।

(৪) কলার সহিত লবণ জল।

(৫) পিষ্টকের সহিত শীতল জল।

(৬) চাউলের সহিত উষ্ণ দুগ্ধ।

(৭) দুগ্ধের সহিত জল।

(৮) পলান্নের সহিত ঘোল।

(৯) সন্দেশের সহিত শীতল জল।

(১০) মাষকলাইয়ের সহিত চিনি।

(১১) পায়সের সহিত মুগের যুষ।

(১২) দধির সহিত লবণ।

(১৩) খিচুড়ির সহিত সৈন্ধব লবণ।

(১৪) লুচির সহিত চিনি।

(১৫) মৎস্য, মাংসের সহিত আমানী।

(১৬) সরিষার তৈলের সহিত গুল।

(১৭) ঘৃতের সহিত কাগজী লেবু।

কয়েকটি গাছের নাম নিম্নে প্রকাশ করিলাম; এগুলি বাসস্থানের সন্নিকটে থাকিলে অধিবাসীবৃন্দের স্বাস্থ্যহানি সম্ভব। কারণ, এইগুলির পাতা হইতে যে-বাষ্পের উদ্ভব হয় তাহা বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে :—

(১) তেঁতুল, (২) কুল, (৩) বাঁশ, (৪) গাব ও (৫) তাল।

যে-সকল বৃক্ষপত্র হইতে রোগ-জীবাণু-নাশক বাষ্প উদ্গত হইয়া বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ করে তাহার নাম প্রকাশ করিলাম। অপর কয়েকটি পুষ্প বৃক্ষ বা লতা আছে যাহার পুষ্প বিকসিত হইলে সুগন্ধে মানব-মন মোহিত ও আনন্দে উৎফুল্ল করে, তাহারাও স্বাস্থ্যের পরম বন্ধু, কারণ মানসিক আনন্দ স্বাস্থ্যের নিয়ামক।

(১) নিম, (২) তুলসি, (৩) শেফালি, (৪) ইউক্যালিপটাস, (৫) সূর্য্যমুখী, (৬) বেলফুল, গোলাপ ফুল, মালতীফুল, হেনা, যূথী ও মুচুকুন্দ ফুল।

(স্বাস্থ্য, বৈশাখ ১৩৩৫) শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার

সন্ধাভাষা

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

প্রায় দশ বৎসর হইবে কোনো-কোনো বঙ্গীয় লেখক বাঙ্‌লা ও ইংরাজী রচনায় স ন্ধ্যা ভা ষা এই একটি শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে ইহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বসম্পাদিত বৌ দ্ধ গা ন ও দো হা য়[১] ভূমিকায় লিখিয়া চালাইয়া দেন। এই পুস্তকে চারিখানি গ্রন্থ একত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে; ১। চ র্য্যা চ র্য্য বি নি শ্চ য়, ২। সরোজবজ্রের দো হা কো ষ; ৩। কৃষ্ণা-চার্য্য বা কাহ্নপাদের দো হা কো ষ; ও ৪। ডা-কা র্ণ ব। প্রথম তিনখানি গ্রন্থের সংস্কৃতে লিখিত এক-একখানি টীকা আছে।

চ র্য্যা চ র্য্য বি নি শ্চ য় ও সরোজবজ্রের দো হা কো ষে র টীকায় নিম্নলিখিত শব্দ কয়টি পাওয়া যায়*:—

১। স ন্ধ্যা, পৃপৃ. ৬, ১১, ২৯, ৩২, ;

২। স ন্ধ্যা ভা ষা, পৃপৃ. ৫, ১৩, ১৬, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৬, ৩০, ৫১, ৮৩, ৯৩[২],

৩। স ন্ধ্যা ব চ ন, পৃ ৩৭; ও

৪। স ন্ধ্যা স ঙ্কে ত, পৃ. ৬।

এগুলি পর্য্যায় শব্দ, অর্থাৎ একই অর্থে প্রযুক্ত।

ইহাদের অর্থসম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকায় (পৃ. ৮) লিখিয়াছেন:—"সহজিয়া ধর্ম্মের যত বই আছে, সকলেরই মূল কথা ঐ এক, কিন্তু ইহাতে একটি মুস্কিল আছে, সেটি এই যে, সহজিয়া ধর্ম্মের সকল বইই সন্ধ্যাভাষায় লেখা। সন্ধ্যাভাষার মানে, আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্ম্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নহে।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মত কত দূর গ্রহণ করা যাইতে পারে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া বলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় স ন্ধ্যা ভা ষা র যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সমীচীন নহে। স ন্ধ্যা ভা ষা র অর্থ স ন্ধ্যা নামে প্রসিদ্ধ দেশের ভাষা। প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত ও আসল বঙ্গদেশ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম স ন্ধ্যা দেশ, এই স ন্ধ্যা দেশের ভাষা স ন্ধ্যা ভা ষা।[৩]

ইহা কল্পনামাত্র, ইহার সমর্থক কোনো প্রমাণ নাই।

নিম্নে স দ্ধ র্ম্ম পু ণ্ড রী ক (Bib. Budh., 1912) হইতে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইতেছে; দেখিতে হইবে ইহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলির কোনো সম্বন্ধ আছে কি না:—

১। স ন্ধা ভা ষি ত, পৃপৃ. ১২৫, ১২৯, ২৩৩;

১। ব ঙ্গী য় সা হি ত্য প রি ষ দ্‌—গ্র ন্থা ব লী, সংখ্যা ৫৫, কলিকাতা, ১৩২৩ সাল।

২। একবার পাঠ আছে ভা সা।

* বাঙ্‌লায় উপযুক্ত অক্ষর না থাকায় সংস্কৃত ও তিব্বতী প্রভৃতি অংশে কতকগুলি ধ্বনি যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ সহজেই উহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

(৩) "Pandit Haraprasad Shastri came to the conclusion that the language used by the Siddhacaryas was called *Sandhya* because it was a kind of twilight language which sought to give mere glimpse of the high truths of Buddhism, not in their pure original form, but in such modified shape as could be understood by the common people, leaving deliberately vague which was not deemed safe or useful for them to worry about. With this conclusion I cannot agree.

The tract to S-E of Bhagalpur comprising the western portion of Birbhum and Santhal Perganas, is the border land between the old Aryavarta (the Indian domicile of the Aryan) and Bengal proper, and was called *Sandhya* country. Any one who is familiar with the several dialects all closely resembling one another, spoken in that region, cannot have any doubt as to their near relationship to the language used by the Siddhacaryas." *Visvabharati Quarterly*, 1924, p. 265.

২। স ন্ধা ভা ষ্য, পৃপৃ. ২৯, ৩৪, ৬০, ৭০, ২১৩ ; ও
৩। স ন্ধা ব চ ন, পৃ. ৫৯।

এই তিনটি শব্দও একার্থক। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ঐ অর্থটি কি।

বোধ হয় সর্ব্ব প্রথমে বুর্নুফ (Burnouf) সাহেব ঐ গ্রন্থের নিজকৃত ফরাসী অনুবাদে (*Le Lotus de la Bonne Loi*, Paris, 1852, p. 342) নিম্নলিখিত বাক্যে প্রযুক্ত ঐ শব্দটির (পৃ. ২৯) অর্থ বিচার করেন :—

"দুর্বিজ্ঞেয়ং সারিপুত্র স ন্ধা ভা ষ্যং তথাগতানাম্।"

'হে সারিপুত্র, তথাগতগণের স ন্ধা ভা ষ্য দুর্বোধ।' বুর্নুফ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আলোচ্য শব্দটির অর্থ 'প্রহেলিকাময় বাক্যালাপ' ("le langage énigmatique.")। তিনি বলেন, তাঁহার এই অর্থটি তিব্বতী অনুবাদ হইতে পাওয়া যায় ("লদেম পোর দগোঙস তে বশদ প নি")। তাঁহার মতে এই তিব্বতী কথাটির অর্থ হইতেছে, 'প্রহেলিকারূপে প্রকাশিত চিন্তার ব্যাখ্যা' "l'explication de la pensée expirmée enigmatiquement")। ইহা আমরা পরে সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিব।

কার্ন (Kern) সাহেব উক্ত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে (*Sacred Books of the East*, Vol. XXI), ঐ শব্দটিকে সর্ব্বত্র 'রহস্য' ('mystery') অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য p. 59, note 3). মোক্ষমূলর সাহেব (Max Muller) চীনা অনুবাদের সাহায্যে অর্থ করিয়াছেন 'প্রচ্ছন্ন উক্তি'[৪] ("hidden saying").। দ্রষ্টব্য *Sacred Books of the East*, Vol. XLIX, p. 118 ; ব জ্র চ্ছে দি কা, পৃ. ২৩, টিপ্পনী ৫।

আমরা আরো একটু আলোচনা করিয়া দেখি।

স ন্ধা ভা ষ্য, স ন্ধা ভা ষি ত ইত্যাদির পূর্ব্ব পদ স ন্ধা যে স ন্ধা য় (সম্+ধা+য) হইতে হইয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। স দ্ধ র্ম পু ণ্ড রী ক সংস্করণ করিতে কার্ন যে-সকল পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুই খানিতে (K ও W) এক স্থানে (পৃ ৭০) স ন্ধা স্থানে স ন্ধা য় পাঠ পাওয়া যায়। যদিও ছন্দোনুরোধে[৫] পরবর্ত্তী পাঠটিকে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তথাপি আমরা ইহা একেবারে অবজ্ঞা করিতে পারি না, কেননা, ইহা স্পষ্টই সূচনা করিয়া দিতেছে যে, ঐ পুঁথি দুইখানির লেখক বা লেখকেরা আলোচ্য শব্দটিকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে স ন্ধা পদটি যে, স ন্ধা য় ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ হইতে পারে না পরবর্ত্তী আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তাহাই হইলেও এই প্রশ্নটি সহজেই উঠে যে, স ন্ধা য় শব্দের যকারের লোপ কি রূপে হইবে? নিম্নলিখিত শব্দ কয়টি লক্ষ্য করিলে ইহার উত্তর সহজেই পাওয়া যায় :—

পালি অ ঞ্‌ ঞা < অ ঞ্‌ ঞা য় (সংস্কৃত আ জ্ঞা য়), ধ ম্ম প দ, ৫৬ ; পালি অ ভি- ঞ্‌ ঞা < অ ভি ঞ্‌ ঞা য় (সংস্কৃত অ ভি জ্ঞা য়), সু ম ঙ্গ ল বি লা সি নী, পৃপৃ. ১৭৩, ৩১৩ ; পালি উ পা দা < উ পা দা য়, ধ ম্ম স ঙ্গ ণি, §§ ৮৭৭, ৯৬০। দ্রষ্টব্য—Geiger : *Pali Literature und Sprache*, 1916, §27, 2.

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, স দ্ধ র্ম পু ণ্ড- রী কে র ভাষা সর্ব্বত্র খাঁটি সংস্কৃত নহে, বহু স্থলেই বৌদ্ধ সংস্কৃত।

স ন্ধা য় শব্দের অর্থ নানারূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে, যেমন অ ভি স ন্ধা য় 'অভিসন্ধি করিয়া' ; অ ভি প্রে ত্য 'অভিপ্রায় করিয়া' ; উ দ্দি শ্য 'উদ্দেশ্য করিয়া,' ইত্যাদি। ইহার সমর্থনের জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি সংস্কৃত ও পালি বাক্য উদ্ধৃত করিতে পারা যায় :—

১) "পুনরপি মহামতিরাহ। যদিদমুক্তং ভগবতা যাং চ রাত্রিং তথাগতোঽভিসম্বুদ্ধো যাং চ রাত্রিং পরিনির্বাস্যতি অত্রান্তরে একমপ্যক্ষরং তথা গতেন নোদাহৃতং ন প্রত্যাহরিষ্যতি।[৬] অবচনং বুদ্ধবচনমিতি। তৎ কিমিদং[৭] স ন্ধা য়ো ক্তং তথাগতে নার্হতা সম্যক্-

৪। "স ন্ধা ভা ষ্যো ণ ভাষন্তো বুদ্ধবোধিরনুত্তমাম্।"
৫। ন প্রত্যুদাহরিষ্যতি?
৬। ব জ্র চ্ছে দি কা র ৬৪ পৃষ্ঠায় মোক্ষমূলর ই যং পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু J পুঁথির অনুসরণে তাহার স্থানে ই দং পাঠ করা উচিত।

সম্বুদ্ধোবচনং বুদ্ধবচনমিতি। ভগবানাহ। ধর্মদ্বয়ং মহামতে স ন্ধা য় ময়েদম্ উ ক্ত ম্। কতমদ্ধর্মদ্বয়ম্। যদুত প্রত্যাত্মধর্মতাং চ স ন্ধা য় পৌরাণস্থিতিধর্মতাং চ। ইদং মহামতে ধর্মদ্বয়ং স ন্ধা য় ময়েদম্ উ ক্ত ম্।"—ল ঙ্কা ব তা র (ed. B. Nanjio, Kyoto, 1923), পৃ. ১৪৩।

'মহামতি পুনর্বার বলিলেন "ভগবান্ যে বলিলেন, যে রাত্রিতে তথাগত অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, আর যে রাত্রিতে তিনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ইহার মধ্যে তিনি একটি অক্ষরও বলেন নাই এবং বলিবেনও না। না-বলাই বুদ্ধের বলা। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অর্হৎ তথাগত কি উ দ্দে শ্যে ব লি য়া ছে ন যে, না-বলাই বুদ্ধের বলা?" ভগবান্ বলিলেন "হে মহামতি, আমি দুইটি ধর্ম্মের উ দ্দে শ্যে ইহা ব লি য়া ছি। কোন্ দুইটি ধর্ম্মের? 'প্রত্যাত্মধর্ম্মতা' ও 'পৌরাণ-স্থিতিধর্ম্মতা'র উ দ্দে শ্যে। হে মহামতি, আমি এই দুইটি ধর্ম্মের উ দ্দে শ্যে ইহা ব লি য়া ছি।"

২) "চতুর্বিধাং সমতাং স ন্ধা য় মহামতে তথাগতো বাচং নি শ্চা র য ন্তি।" কতমাং চতুর্বিধাং সমতাং স ন্ধা য়।" ইমাং মহামতে চতুর্বিধাং সমতাং স ন্ধা য় তথাগতা বাচং নি শ্চা র য ন্তি।" ঐ, পৃ. ১৪১।

'হে মহামতি, তথাগতগণ চতুর্বিধ সমতা অ ভি প্রা য় করিয়া কথা বলিয়া থাকেন।" কোন্ চতুর্বিধ সমতা অ ভি প্রা য় করিয়া?" এই চতুর্বিধ সমতা অ ভি-প্রা য় করিয়া হে মহামতি, তথাগতগণ কথা বলিয়া থাকেন।'

৩) "অনুৎপত্তিং স ন্ধা য় মহামতে সর্বধর্মা নিঃস্বভাবাঃ।" ঐ, পৃ. ৭১।

'উৎপত্তি নাই ইহাই অ ভি প্রা য় করিয়া সমস্ত ধর্ম্ম স্বভাবহীন (উ ক্ত হইয়াছে)।'

৪) "বাঃ স ন্ধা যা হমেবং ব দা মি।"

দ শ ভূ ম ক শা স্ত্র (ed Radhar), পৃ. ৫।

'যে (বোধিসত্ত্বভূমি-) সমূহকে উ দ্দে শ্য করিয়া আমি এইরূপ ব লি তে ছি।'

৫) "ইদং মু তে মাগন্দিয় এতং স ন্ধা য় ভা সি তং ভূনহু সমণো গোতম। ম জ্ঝি ম নি কা য়, ১.৫০৩।

'হে মাগন্দিয় এই অ ভি প্রা য় করিয়া তোমাকে ইহা বলা হইয়াছে যে, শ্রমণ গোতম ভূতঘাতী।'

৬) "যং স ন্ধা য় বু ত্তং।"

জা ত ক, ১, ২০৩,

'যাহা উ দ্দে শ্য করিয়া উ ক্ত হইয়াছে।'

৭) "ইদং কির বোধিসত্তো অত্তনো অব্ভন্তরে ঞাণাবুধং স ন্ধা য় ক থে সি।"

ঐ, পৃঃ ২৭৪।

'নিজের অভ্যন্তরে (অবস্থিত) জ্ঞান-অস্ত্রকে উ দ্দে শ্য করিয়া তথাগত ইহা ক হি য়া ছি লে ন।'[৭]

পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, অর্থসম্বন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের স ন্ধা য় আর বেদপন্থীদের অ ভি স ন্ধা য় এই দুই শব্দের মধ্যে বস্তুত কোনো ভেদ নাই। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বাক্য ইহা সমর্থন করিবে:—

১) "অ ভি স ন্ধা য় তু ফলম্।"

শ্রী ম দ্ভ গ ব দ্গী তা, ১৭.১২।

'ফল উ দ্দে শ্য ক রি য়া।'[৮]

৭। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। সু ম ঙ্গ ল বি লা সি নী, পৃ. ১৬৩:—

(ক) "র জো ধা তু য়ো তি রজোওকিণ্ণট্ঠানানি হত্থপীঠপাদপীঠাদীনি স ন্ধা য় ব দ ন্তি।"

(খ) "স ত্ত স এ ক্রি গ ন্তা তি ওট্ঠগোণ-গজভজজপসুমিগমহিসে স ন্ধা য় ব দ ন্তি।"

(গ) "অ স এ ক্রি গ ন্তা তি সালিযব গোধুম-মুগ্গকঙ্গুব রকর্কুদ্রসকে স ন্ধা য় ব দ ন্তি।"

(ঘ) "নি গগ ন্থি গ ন্তা তি বেলুনলাদয়ো স ন্ধা য় ব দ ন্তি।" দ্রষ্টব্য পৃপৃ. ১৬১, ১৬৫।

ক থা ব থু প ক র ণ অ ট্ঠ ক থা, পৃ. ৩:—"অঞ্ঞং স ন্ধা য় ভ ণি তং।"

৮। শঙ্করাচার্য্য, নীলকণ্ঠ, ধনপতি, শ্রীধর, অভিনবগুপ্ত, ও মধুসূদন অ ভি স ন্ধা য় শব্দের অর্থ করিয়াছেন উ দ্দি শ্য।

২) "অ ভি স ন্ধা য় যো হিংসাম্।"

শ্রী ম দ্ভা গ ব ত, ৩. ২৯. ৪।[১]

'যে ব্যক্তি হিংসা উদ্দেশ্য করিয়া।'

৩) "বিষয়ান ভি স ন্ধা য়।" ঐ, ৩. ২৯. ৯।

'বিষয়সমূহ উ দ্দে শ্য করিয়া।'

স ন্ধা য় শব্দের পূর্ব্বোক্ত অর্থ তিব্বতী অনুবাদেরও দ্বারা সমর্থিত হয়। চন্দ্রকীর্ত্তি স্বকীয় ম ধ্য ম ক বৃ ত্তি তে (পৃ. ৫০৫) নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি ল ঙ্কা ব তা র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"স্বভাবানুৎপত্তিং স ন্ধা য় মহামতে সর্ব্বধর্ম্মাঃ শূন্যা ইতি দে শি তাঃ।"

'হে মহামতি, স্বভাবত উৎপত্তি নাই ইহাই অ ভি প্রা য় করিয়া উ প দে শ করা হইয়াছে যে, সমস্ত ধর্ম্ম শূন্য।'

এখানে স ন্ধা য় শব্দের তিব্বতী অনুবাদ হইতেছে দ গো ঙ স ন স। ইহার অর্থ (অভিপ্রেত্য, অভিসন্ধায়, উদ্দিশ্য—) উ দ্দে শ্য ক রি য়া। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি, স দ্ধ র্ম পু ণ্ড রী কে র (পৃ. ২৯) ফরাসী-অনুবাদে বুর্নুফ সাহেব স ন্ধা ভা ষ্য শব্দের অর্থনির্ণয়ের জন্য ইহার তিব্বতী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—ল দে ম পো র দ গো ঙ স তে বশদ প নি। এখানে ল দে ম পো র দ গো ঙ স সংস্কৃত অ ভি স ন্ধি ছাড়া আর কিছুই নহে, যদিও ল দে ম পো আর দ গো ঙ স অথবা দ গো ঙ স প শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, গ ঝু প'ল ল দে ম পো র দ গো ঙ স প—অ ব তা র ণা ভি স ন্ধি; ম ছ ন ঞি দ ল ল দে ম পো র দ গো ঙ স প—ল ক্ষ ণা- ভিসন্ধি; ইত্যাদি। ল দে ম পো র দ গো- ঙ স শব্দের পর তে পদ থাকায় এখানে স ন্ধা য় (—অ ভি স ন্ধা য়) ভিন্ন অন্য কোনো অর্থ হইতে পারে না। শেষের ব শ দ প বলিতে ভা ষ্য, ভা ষি ত, ভা ষ ণ, ব চ ন, ইত্যাদি বুঝায়।

স দ্ধ র্ম পু ণ্ড রী কে র অন্যান্য স্থানেও স ন্ধা ভা ষ্য প্রভৃতি শব্দের তিব্বতী অনুবাদ এইরূপই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে যে কয়েকটি সংস্কৃত ও পালি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যাইবে যে, স ন্ধা য় শব্দটি কথনার্থক ক্রিয়ার (ক থ, ব, দ্, দি শ্, ইত্যাদি ধাতু) সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে। কোনো-কোনো স্থানে ক্রিয়াপদটি উহ্যও থাকে। আমরা ইহাও দেখিতে পাইয়াছি যে, বহু স্থানে স ন্ধা য় শব্দটি নিষ্ঠাপ্রত্যয়ান্ত (ত-প্রত্যয়ান্ত) পদের সহিত প্রযুক্ত গিয়াছে; যথা, স ন্ধা য় দে শি- তং; স ন্ধা য় ভা ষি তং; স ন্ধা য় উ ক্তং (বু ক্তং); ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এতাদৃশ স্থলে এই দুই-দুইটি পদের সমাস হয় নাই। কিন্তু কাল- ক্রমে সমাস হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমশ এতাদৃশ স্থলে নিষ্ঠা প্রত্যয়ান্ত পদের অর্থেরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; অর্থাৎ ভা ষি ত শব্দের অর্থ 'বলা হইয়াছে' ইহা না হইয়া 'বলা' এই অর্থ হইল; অর্থাৎ এই জাতীয় পদ ক্রমশ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যেরও অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। সংস্কৃতে এরূপ অনেক হইয়া থাকে। তাই ভা ষি ত যখন বস্তুত ভা ষ- ণ অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল, তখন তাহার অনুরূপ ক্রিয়াবাচক অন্যান্য বিশেষ্য পদও (যেমন, ভা ষ্য, ব- চ ন প্রভৃতি) চলিতে লাগিল। এই রূপেই স ন্ধা ভা ষি ত প্রভৃতি পদগুলি চলিত ভাষায় দেখিতে পাওয়া গেল।

ঠিক এই অর্থেই আমরা আ ভি প্রা য়ি ক ব চ ন (অথবা ব চ স্) শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিং শ তি কা রি কা[১০] হইতে এই কারিকাটি (৮) উদ্ধৃত করিতে পারা যায় :—

"রূপাদ্যায়তনাস্তিত্বং তদ্‌ বিনেয়জনং প্রতি।
অভিপ্রায়বশাদুক্তমুপপাদুকসত্ত্ববৎ॥"

১। শ্রীধরস্বামী এখানে অ ভি স ন্ধা য় শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন স ঙ্ক ল্প্য 'সঙ্কল্প করিয়া।'

১০। *Vijnaptimatrasiddhi* ed. Levi, Paris, p.5.

এখানে ইহার বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে "অ ভি প্রা য় ব শা চ চিত্তসন্তত্যনুচ্ছেদমারত্যাম্ অ ভি প্রে ত্য[১১] আ ভি প্রা য়ি কং তদ্ চ ন ম্।[১২] অ ভি প্রা য় ব শে অর্থাৎ যাহাতে ভবিষ্যতে চিত্ত-সন্ততির উচ্ছেদ না হয়, এই অ ভি প্রা য়ে তাহা আ ভি প্রা য়ি ক উ ক্তি।"

এই প্রসঙ্গে ত ত্ত্ব সং গ্র হ (গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরীজ, ১৯২৬, পৃ. ৮৬৮, শ্লোক ৩৩৩১) হইতে নিম্নোদ্ধৃত পঙক্তিটি উল্লেখ করিতে পারা যায়:—

"আ ভি প্রা য়ি ক মেতেবং স্যাদ্বাদাদি মতং যদি।[১৪]

'যদি মনে করা যায় যে, ইঁহাদের স্যাদ্বাদ-প্রভৃতি আ ভি প্রা য়ি ক (কোনো বিশেষ অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে)।

অতএব স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, স ন্ধ ভা ষি ত (অথবা-ভা ষ্য) আর আ ভি প্রা য়ি ক ব চ ন বস্তুত একই।

চীনা অনুবাদ হইতেও এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায়।[১৫] চীনা ভাষায় স দ্ধ র্ম্ম পু ণ্ড রী কে র কয়েক খানি অনুবাদ আছে। প্রথম খানির অনুবাদক ফা-হু বা ধর্ম্মরক্ষ (২৭৮ খ্রীঃ), দ্বিতীয় খানির কুমারজীব (৪০৬ খ্রীঃ), তৃতীয় খানির জ্ঞানগুপ্ত ও ধর্ম্মগুপ্ত (৬০১ খ্রীঃ)। ইহা ছাড়া আরো দুই খানি অনুবাদ আছে, কিন্তু ইহাতে আমাদের আলোচ্য স ন্ধা ভা ষ্য -যুক্ত বাক্য কয়টি নাই।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই কয়েকখানি অনুবাদের কেবল দুইটি স্থানে (স দ্ধ র্ম্ম পু° পৃপৃ° ৩৬, ২৩৩ = কুমারজীবের অনুবাদ, টোকিও সংস্করণ, ১১. ১ক. ১৫-১৬, ১১. ৩০ খ. ২-৩) আলোচ্য শব্দটির (স ন্ধা ভা ষ্য, স ন্ধা ভা ষি ত) অনুবাদ করা হইয়াছে। প্রথম স্থলে চীনা শব্দটি হইতেছে ও য়া ই (wei), আর দ্বিতীয় স্থলে হইতেছে য়ু (yu)। অন্য স্থলে ইহা একবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে, অথবা সু ই-ই (sui i) এই দুই শব্দের দ্বারা তাহার অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। ও য়া ই শব্দের অর্থ 'সূক্ষ্ম,' 'অস্পষ্ট', 'গূঢ়'। য়ু শব্দও সেই অর্থে প্রযুক্ত হয়। ইহা আলোচনা করিয়া আমার মনে হয় যে, নী তা র্থ বলিতে আমরা যাহা বুঝি আলোচ্য চীনা শব্দ দুইটির অর্থ তাহার ঠিক বিপরীত। আমরা একটু পরেই দেখিতে পাইব যে অ ভি ধ র্ম্ম কো শ-ব্যা খ্যা য়, নী তা র্থ শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে বি ভ ক্তা র্থ অর্থাৎ যাহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অপর কথায়, আমরা বলিতে পারি যে, ঐ দুইটি চীনা শব্দ আর সংস্কৃত অ বি ভ ক্তা র্থ (যাহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই) একই, অর্থাৎ 'সূক্ষ্ম,' 'প্রচ্ছন্ন' (বি ভা জ্যা র্থ 'যাহাব অর্থ স্পষ্ট করিতে হইবে'—নে য়া র্থ)।

Couvreur সু ই-ই এই শব্দ দুইটির অর্থ করিয়াছেন 'যাহা উপযুক্ত ("d'apres ce qui convient")।' তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে স ন্ধা ভা ষ্য শব্দটির যে আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়া আসিয়াছি, তাহা অনুসরণ করিলে, মনে হয়, ঐ শব্দ দুইটিকে 'আভিপ্রায়িক' অর্থে গ্রহণ করিলে কোনো বাধা হয় না। সু ই শব্দের অর্থ 'অনুসরণ করা' (অ নু + গ ম্)। স স্কৃতে বহু স্থানে অ নু এই উপসর্গের দ্বারা ইহার অর্থ প্রকাশ করা যায় (যেমন, সু ই ত্ সো=অ নু বি ধা ন; সু ই সাং গ=অ নু জা ত)। ই শব্দের অর্থ 'উপযুক্ত'। 'উচিত' অর্থেও ইহা প্রয়োগ করা হয়। অতএব বলা যাইতে পারে চীনা সু ই-ই = সংস্কৃত অ নু স র ণী য় (=অ ভি প্রে য়, অ ভি প্রা য়া নু গ ত)= আ ভি প্র য়ি ক।

১১। ইহার তিব্বতী অনুবাদ—দ গোঙ্স প'ই দবঙ গিস।

১২। তিব্বতী—বকা' দে নি দগোঙ্স প চন নো।

১৪। ইহার তিব্বতী অনুবাদটি এই (বিশ্বভারতী-পুস্তকশালার স্তু র, নারথাঙ সংস্করণ, মদো, 'এ পত্র ১৩৫ ক):—
গল তে দে দগ গ্যুর স্মু সোগস।
ছিগ নি দগোস প'ই দোন য়িন ন।
এই অনুসারে আ ভি প্রা য়ি ক শব্দের স্থানে প্র য়ো না র্থ ক পাঠ পাওয়া যায়। কিন্তু স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে, তিব্বতী অনুবাদের দ্বিতীয় চরণে দ গো স স্থানে পাঠ করিতে হবে দ গো ঙ স, তাহা হইলে দ গো ঙ স প'ই দোন ইহার অর্থ হয় অ ভি প্রা য়া র্থ ক—আ ভি প্রা য়ি ক।

১৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয় এ সম্বন্ধে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, এ জন্য আমি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। এখানে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার উত্তরদাতা তিনিই।

যাহার যেরূপ যোগ্যতা বা অধিকার বুদ্ধগণ তদনুসারেই তাহাকে সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, ইহা একটি তাঁহাদের উপদেশ-দানের সৌন্দর্য্য ('দেশনাবিলাস'); এইরূপেই সত্যোপলব্ধির উপায়- প্রদর্শনে তাঁহাদের নৈপুণ্য ('উপায়কৌশল্য') প্রকাশ পায়। এই জন্য এই সকল উপদেশও ('দেশনা') ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া থাকে।[১৬] এই সমস্ত উপদেশ প্রধানত দুই প্রকার। এক প্রকারের উদ্দেশ্য বস্তুতত্ত্ব দেখাইয়া দেওয়া ('তত্ত্বার্থা'); অপর প্রকারের উদ্দেশ্য কোন এক বিশেষ অভিপ্রায়ে কিছু উপদেশ করা, অর্থাৎ অক্ষরের দ্বারা যাহা বুঝা যায় ('যথারুতার্থ'—যথাশ্রুতার্থ) তাহা হইতে অপর কিছু বুঝাইবার জন্য যাহা করা হয় ('আভিপ্রায়িকী')। প্রথম প্রকারের প্রয়োজন কাহাকেও নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাওয়া ('মার্গাবতার'), দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজন নির্ব্বাণরূপ ফলে লইয়া যাওয়া ('ফলাবতার')। এই দুই প্রকার উপদেশ বা দেশনা (বা সূত্র) যথাক্রমে নীতার্থ ও নেয়ার্থ নামে কথিত হইয়া থাকে। নীতার্থ শব্দের অর্থ যাহার অর্থ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নেয়ার্থ শব্দের অর্থ যাহার অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে—স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হয় নাই। অপর কথায়, প্রথমটির দ্বারা আমাদিগকে অক্ষরার্থ বা যথাশ্রুতার্থ বুঝিতে হইবে, আর দ্বিতীয়টির দ্বারা বুঝিতে হইবে অভিপ্রেত অর্থ বা ভাবার্থ।[১৭]

পূর্ব্বে যেরূপ আলোচিত হইল তাহাতে বুঝা যাইবে যে, সন্ধাভাষ্য (অথবা ইহার সন্ধাভাষিত প্রভৃতি পর্য্যায় শব্দগুলি), আভিপ্রায়িক বচন ও নেয়ার্থ বচন (অথবা সূত্র বা দেশনা) এই তিনেরই একই অর্থ।

এখন শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধগান ও দোহায় প্রযুক্ত সন্ধ্যাভাষা প্রভৃতির মূল কি দেখা যাউক।

বুর্নুফ সাহেব আলোচ্য শব্দটীর অর্থবিচার করিবার সময় বলিয়াছেন (*Lotus*, p. 343) যে, তিনি সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের যে সমস্ত পুঁথি পাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে সন্ধাভাষ্য স্থলে সন্ধ্যাভাষ্য পাঠও ছিল। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, কার্ন ও নাঞ্জিও সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের যে সংস্করণ (Bilo. Budh.) করিয়াছেন তাহাতে অন্যূন আটখানি পুঁথির পাঠ মিলান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের একখানিতেও সন্ধ্যা পাঠ পাওয়া যায় নাই। আমার মনে হয়, বৌদ্ধগান ও দোহার বর্ত্তমান সংস্করণখানিকে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যদিও শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত উপকরণগুলি পর্য্যাপ্ত বলিয়া গণ্য করা চলে না, তথাপি যাহা তাঁহার হাতে ছিল তাহাও তিনি যথাযথভাবে কাজে লাগাইতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহার প্রদত্ত পাঠকে সর্ব্বত্র খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি হয়। তিনি বলিয়াছেন,[১৮] চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের সংস্করণে তিনি যে তালপাতার পুঁথিখানির পাঠ লইয়াছিলেন, তাহার একখানি প্রতিলিপি (সংখ্যা ৮০৬৩) এসিয়াটিক

১৬। দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোক উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ কিল॥
সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ধৃত বোধিচিত্তবিবরণ, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৯০৬, পৃঃ ১১।
দুর্বোধ্যং চাপি তজ্‌জ্ঞানং সহসা শ্রুত্ব বালিশাঃ।
কাঙ্ক্ষাং কুর্যুঃ সুদুর্মেধাস্ততো ভ্রষ্টা ভবেযু তে॥
যথা বিষযু ভাষামি যস্ত যাদৃশকং বলম্‌।
অন্তমন্তেহি অর্থেমি দৃষ্টিং কুর্বামি উজ্জ্বকাম্‌॥
সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, পৃ. ১২৫।

১৭। দ্রষ্টব্য নেত্তিপকরণ (PTS), পৃ. ২১৮ :—নীতত্থং তি যথারুতবসেন ঞাতব্বত্থং। নেয্যত্থং তি নিহারেত্বা গহেতব্বত্থং। অঙ্গুত্তরনিকায়ের অর্থকথা মনোরথপূরণীতে (শ্যাম সংস্করণ), ১. ১০. উক্ত হইয়াছে :—ক্যা অত্থো নেতব্বো তং নেয্যত্থং সুত্তন্তং। নীতত্থো কথিতত্থো। পুস্যাঁ সাহেব (Poussin) সম্পাদিত মধ্যমকবৃত্তির টিপ্পনীতে (পৃঃ ৫৯৭) অভিধর্ম্মকোশব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—নীতার্থ—বিভক্তার্থ (অভিধর্ম্মকোশব্যাখ্যা ২৩০ ব), 'de sense clair' tandi que নেয়ার্থস্য সূত্রস্য নানামুখপ্রকৃতার্থবিভাগোঽনিশ্চিতঃ সন্দেহকরো ভবতি।"

১৮। *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal, Vol 1, Buddhist Manuscripts, 1917, p. 144.*

সোসাইটির পুস্তকালয়ে আছে। দেখিতে পাওয়া যায় এই প্রতিলিপিখানিতে বহু পাঠভেদ আছে। মূল তাল-পত্র পুঁথিখানির সহিত মিলাইয়া না দেখিলে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না যে, ঐ পাঠভেদগুলি মূল পুঁথিতে আছে অথবা প্রতিলিপিখানির লেখকই ভুল করিয়া ঐরূপ করিয়াছেন। যাহাই হউক, মুদ্রিত পুস্তকের স ন্ধ্যা পাঠ সম্বন্ধে দেখা যায় যে, অন্তত একটি স্থলে প্রতিলিপি খানিতে ভিন্ন পাঠ আছে; মুদ্রিত পুস্তকের (পৃ. ২৯,পং.১৩) পাঠ স ন্ধ্যা য়া, কিন্তু প্রতিলিপিখানিতে (পৃ. ৩৮) আছে সং ধ য়া।[১৯]

বলিয়াছি সরোজবজ্রের দো হা কো যে র অদ্বয়বজ্র-কৃত টীকাতেও স ন্ধ্যা ভা যা পাওয়া যায়। এই পুঁথিখানির লেখক স্বয়ং বলিতেছেন যে, তিনি যে পুঁথিখানি হইতে প্রতিলিপি করিয়াছেন তাহা লেখার দোষে নিতান্ত অশুদ্ধ ছিল, তথাপি গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি তাহা লিখিয়াছেন।[২০] এই পুস্তকের অন্য পুঁথি আমাদের নিকটে নাই। এ অবস্থায় কেবল এক তিব্বতী-অনুবাদের সহিত ইহার পাঠ মিলাইয়া দেখিতে পারা যায়। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত দো হা কো যে (পৃ.৮৩) আছে:—

স ন্ধ্যা ভা যা ম্ অ জা না ন ন্ত্য [?] চ।

ইহার তিব্বতী অনুবাদ[২১] এই:—

দ গো ঙ স প স গ সু ঙ স প'ই ঙো বো মি শেস প'ই ফ্যির।

সংস্কৃতে ইহার আক্ষরিক অনুবাদ:—স ন্ধা ভা যা-ভা বা জা না ৎ, অর্থাৎ 'আভিপ্রায়িক বাক্যের ভাব না জানায়।'

উক্ত পুস্তকের অন্যত্র (পৃ: ৯৩) আছে:—

স ন্ধ্যা ভা যা মজানন্তিঃ।

ইহার তিব্বতী এই (পত্র ১৯৪ ক):—

দ গো ঙ স তে ব স্তন প'ই স্ক দ ম শেস পস।

সংস্কৃতে ইহার আক্ষরিক অনুবাদ:—

স ন্ধা য় উ প দি ষ্টাং ভা যা ম্ (=স ন্ধা ভা যা ম্) অজানন্তিঃ।

এইরূপে দেখা যায় এই সমস্ত স্থলে স ন্ধ্যা র (অর্থাৎ সন্ধ্যাকালের) কোনো সম্বন্ধ নাই। এখন ইহা বুঝা শক্ত নহে যে, কিরূপে মূল স ন্ধা স্থানে স ন্ধ্যা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা খুবই সম্ভব যে, সাধারণ লেখকেরা স ন্ধা শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারায়, এবং স ন্ধ্যা শব্দের সহিত বিশেষ পরিচিত আকার শেষোক্ত শব্দটিকেই লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

১৯। শব্দটি লিখিত হইয়াছে কতকটা এইরূপ—সংধয়া। এখানে ধকারের পূর্ব্বে দেবনাগরের তকারের মত যে অক্ষরটি দেখা যাইতেছে তাহা তৎপূর্ব্ববর্তী বিন্দুর সহিত অনুস্বারের চিহ্ন বলিয়া মনে হয়।

২০। অস্তব্যস্তপদো তাতি গ্রন্থোঽয়ং লেখদোষতঃ।
তথাপি লিখ্যতেঽস্মাভিগ্রর্ন্থসংগ্রহকাঙ্ক্ষয়া ॥

২১। ত গ্যু র, গু্'দ গ্রেল, মি (নারথাঙ সংস্করণ), পত্র ১৮৪ ক (ইহা আমাদের বি শ্ব ভা র তী পু স্ত কা ল যে র পুঁথি)। Cordier, II. p. 214 (42), 199a—231a 5.

পুস্তক-পরিচয়

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ—অধ্যাপক ৺ অভয়কুমার মজুমদার লিখিত ইংরাজী হইতে শ্রী যতীন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক অনূদিত, পৃঃ ৯১; মূল্য ৷৵০

গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চাহেন যে, সাংখ্য দর্শন সেশ্বর। এজন্য তিনি সাংখ্য সূত্রাদি গ্রন্থের অনেক অংশ এবং টীকাকারদের মতামত আলোচনা করিয়াছেন। এই সমুদায় হইতে তিনি পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন যে, সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে সাংখ্যমত ও বেদান্তমত জড়িত হইয়াছে। এ সমুদায় হইতে তিনি দেখাইতে চাহেন যে, সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বহু গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবং অন্য কেহ যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, ইহাও মনে করি না।

দর্শন-জগতে সাংখ্য দর্শনের একটি বিশেষ স্থান আছে। যে-সমুদায় ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাংখ্যকার সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়াছেন, তাহা এই :—

(১) একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায় না।

বিশুদ্ধ অমিশ্র, অদ্বৈতবাদ ইহা ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম।

(২) প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটার সাহায্যে সৃষ্ট্যাদি ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই দর্শনে মোট তত্ত্বের সংখ্যা ২৫টি। প্রকৃতি ও প্রকৃতি-মূলক তত্ত্ব ২৪টি এবং পুরুষ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব। পুরুষ বহু। সাংখ্য-কারিকাদি গ্রন্থে এই মতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শন বলিয়া জগতে যাহা পরিচিত, তাহা এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব-মূলক দর্শন। ইহাতে ঈশ্বর নামক স্বতন্ত্র তত্ত্বের স্থান নাই। চতুশ্চক্র যানে যেমন পঞ্চম চক্র, প্রচলিত সাংখ্য দর্শনেও তেমনি ঈশ্বর। যদি এই দর্শনে একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে বহু পুরুষের মধ্যে অন্যতম পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু এ প্রকার কল্পনায় ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ভারতবর্ষে বেদান্তের অসাধারণ প্রভাব। ইহার প্রভাবে নানা মুনি সাংখ্য মতকে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। কেহ সাংখ্যের বহু পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন (মহাভারত ১২।৩০২।৩৮ ইত্যাদি কলিকাতা সং ?) কেহ বা প্রকৃতিকেই ঈশ্বর সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন (অব্যক্তং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তথা সত্ত্বং তথেশ্বরঃ অর্থাৎ অব্যক্তকে ক্ষেত্র সত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি, এবং ঈশ্বর বলা হয় (মহা ১২।৩০৬।৪১) ; কেহ কেহ বা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত এক সত্তার কল্পনা করিয়া লইয়াছেন (ঐ, ১২।৩০৫।১) ইত্যাদি।

সাংখ্য দর্শনের ইতিহাসে আমরা প্রধানতঃ তিনটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথম স্তরে সম্ভবতঃ কেবল চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। এ তত্ত্ব-সমূহ পুরুষ-বিবর্জ্জিত। মহাভারতের বহুস্থলে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় (শান্তি, ৩০১—৩১৮ অধ্যায়)। চরক সংহিতাতেও ইহার বর্ণনা আছে (শারীর-স্থানে, প্রথম অধ্যায়)।

দ্বিতীয় স্তরে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। কেবল প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট্যাদি ব্যাখ্যাত হয় না, এইজন্য এই স্তরে 'পুরুষ' নামক তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাই সাংখ্য কারিকাদি গ্রন্থের মত এবং ইহাই খাঁটী কাপিল দর্শন বা সাংখ্য দর্শন নামে পরিচিত। তৃতীয় স্তরে বৈদান্তিক সাংখ্য। এই স্তরে বহু পুরুষের স্থলে এক ঈশ্বর বা পরমাত্মা, কিংবা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতীত এক সত্তা বা তত্ত্ব, বা অতত্ত্ব।

আমাদের গ্রন্থকার সাংখ্যমতের এই ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন বা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বত্রই দেখিতে চান ঈশ্বর-বাদ। কিন্তু প্রথম স্তরে ঈশ্বর পাওয়া যায় না এবং ঈশ্বরের স্থানও নাই। দ্বিতীয় স্তরেও ঈশ্বরের স্থান নাই। ঈশ্বরের একটি স্থান কল্পনা করিলেও তিনি বহু পুরুষের মধ্যে অন্যতম পুরুষ হইয়া পড়েন। তৃতীয় স্তরের মত প্রকৃত পক্ষে একটা বৈদান্তিক মত।

* মহাভারতের একস্থলে এই অংশ আছে :—

পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং
পঠ্যতে ন নরাধিপ।

মহাঃ ১২।৩০৭

গ্রন্থকারের অনুবাদ—

"সাংখ্যে পঞ্চবিংশ তত্ত্বের অতিরিক্ত কোনও তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই"। পৃ ৮১। মহাভারতকার ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু এই মতকে প্রকৃত সাংখ্যমত বলিয়া গ্রহণ করিলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এইজন্য এই অংশ লইয়া তাঁহাকে মহা বিপদে পড়িতে হইয়াছে। এরূপ স্থলে লোকে সচরাচর যাহা করিয়া থাকে, গ্রন্থকারও তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য এই :—"প্রথমতঃ উপরিউক্ত শ্লোকটির পাঠ ভিন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ইহা প্রক্ষিপ্ত (interpolation) হইতে পারে" ইত্যাদি। পৃঃ ৮২।

এপ্রকার কল্পনা-জল্পনার কোন আবশ্যক ছিল না। সাংখ্যমতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সমুদায় গোলমাল মিটিয়া যাইত—গ্রন্থকারকে আর কষ্ট করিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব মূলক সাংখ্যকে ষড়বিংশতি তত্ত্বমূলক [বৈদান্তিক] সাংখ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে হইত না।

দর্শনজগতে আস্তিক নাস্তিক—সমুদায় দর্শনেরই স্থান আছে। খাঁটী সাংখ্য দর্শনের বিশেষত্ব এই যে, ইহা ঈশ্বরের অবতারণা না করিয়াও সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার ব্যাখ্যা করিয়াছে। যদি সাংখ্য দর্শনের কোন পুস্তকে এমন কোন কথা থাকে যাহা দ্বারা পরোক্ষ ভাবেও অনুমিত হইতে পারে যে, সাংখ্য দর্শন সেশ্বর তাহা হইলে আমরা ইহা বলিব না যে, সাংখ্য-দর্শন সেশ্বরই ; আমরা ইহাই বলিব যে, গ্রন্থলেখকের ঐ ভাবাই প্রমাদ-সম্ভূত। সৌভাগ্যবশতঃ সাংখ্যদর্শনের প্রমাণিক গ্রন্থসমূহ এবিষয়ে অতি সাবধান। আর যদি কোন ব্যাখ্যাকর্ত্তা সাংখ্যকে সেশ্বর বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি সাংখ্য দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভুলিয়া গিয়াছেন।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

ওলাউঠা রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অভয়কুমার সরকার এম্-বি, ডি-পি-এইচ প্রণীত। মূল্য ১৲

এই পুস্তকে ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির ইতিহাস, উহার সংক্রামকতা, পরিব্যাপ্তি ও তৎপ্রতিকার, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রোগের লক্ষণ, ডাক্তারি মতে চিকিৎসা, ডাক্তার রজার্সের প্রবর্ত্তিত লাবণিক দ্রাবণ প্রয়োগ ও তাহার সঠিক ব্যবস্থা, রোগ-নিবারণ-কল্পে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ, সরকারী স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী এবং তত্তদ্দেশবাসীর কর্ত্তব্য, পানীয় জল বিশোধন প্রক্রিয়া, প্রতিষেধবিধি নিয়মাবলীর পালন ইত্যাদি বহুবিধ অত্যাবশ্যক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক নিজে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারী, সুতরাং এই বিষয় আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার তাঁহার বিশেষ অধিকার আছে। মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড্ এবং ভিলেজ্ ইউনিয়নের সভ্যগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানিতে পারিবেন। এখন অনেকেই জানেন যে, শিরামধ্যে লাবণিক দ্রাবণ প্রয়োগ দ্বারা কলেরা রোগে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অনেক রোগীকে এই উপায়ে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসারে এবং অতি সাবধানতার সহিত প্রযুক্ত না হইলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই চিকিৎসা-প্রক্রিয়া যেরূপ সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। চিকিৎসকগণ পুস্তকের এই অংশ পাঠ করিয়া সবিশেষ উপকৃত হইবেন। সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য রোগ-বিস্তার-নিবারণকল্পে সহজসাধ্য নানা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

উহাদিগের সম্যক্ পালনে রোগের পরিব্যাপ্তি যে বহুল পরিমাণে নিবারিত হইবে, সে-বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিকাংশ স্থলে দূষিত পানীয় জল ও মক্ষিকাদ্বারাই ওলাউঠা রোগ মহামারীরূপে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই পুস্তকে জল বিশোধন এবং মক্ষিকার উপদ্রব নিবারণ সম্বন্ধে সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বসন্ত রোগের টীকার ন্যায় ওলাউঠা রোগের টীকা লইয়া এই রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। এসম্বন্ধে গ্রন্থকার অন্যান্য দেশে টীকা লইবার সুফল পর্য্যালোচনা করিয়া, ওলাউঠা রোগ আবির্ভাব হইবামাত্র তৎস্থানবাসী সমস্ত লোককে টীকা লইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিলে বহুলোকের জীবন রক্ষা হইবে।

বইখানি বড় অক্ষরে ছাপা হইয়া পড়িবার সুবিধা হইয়াছে। পুস্তকের ভাষার একটু সংস্কারের প্রয়োজন; স্থানে স্থানে ভাষা বড় বেশী ইংরাজী-ঘেঁসা হইয়াছে।

আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীচুনীলাল বসু

ছান্দোগ্যোপনিষৎ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন, বি-টী কর্ত্তৃক পদপাঠ অবিকল অনুবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্য ঘটিত বহুল মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাত; দশোপনিষদের টীকাকার ও অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক খণ্ডশীর্ষ-বিষয়ানুক্রমণিকা ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের দার্শনিকভিত্তি এবং সাধন প্রণালী বিষয়ক ভূমিকাসহ সম্পাদিত। প্রথম ভাগ ৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত ২৬৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০ টাকা; দ্বিতীয় ভাগ ৫ম অধ্যায় হইতে ৮ম অধ্যায় পর্য্যন্ত ২৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০ টাকা—মোট ৩৲ টাকা।

বৈদিক ধর্ম্মের দার্শনিক অংশের ভিত্তি বেদান্ত বা উপনিষৎ। এই বেদান্ত বা উপনিষৎ বেদের সংহিতা বা ব্রাহ্মণ ভাগের শেষ ভাগ। ইহাতে উপাসনা ও জ্ঞানের কথা আছে; সংহিতা ও ব্রাহ্মণের প্রথম ভাগে যাগযজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মের কথা আছে।

এই বেদ বা বেদান্তই আমাদের প্রসিদ্ধ ষড়দর্শনের মূল ভিত্তি বা অবলম্বন। তন্মধ্যে এই বেদান্তকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া আপাত-বিরুদ্ধ বেদান্ত-বাক্যের মীমাংসার ছলে যে দর্শনশাস্ত্র হইয়াছে তাহার নাম বেদান্ত দর্শন। আর বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য বেদের প্রথমাংশকে মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া যাগযজ্ঞাদি বিষয়ক বেদবাক্য মীমাংসার ছলে যে দর্শনশাস্ত্র রচনা হইয়াছে তাহার নাম পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন। এই উভয় দর্শনই মুখ্যভাবে বেদকেই অবলম্বন করে। অপর চারিখানি দর্শন বেদান্তমূলক হইলেও মুখ্যভাবে বেদান্তকে অবলম্বন করে না। তাহাতে যুক্তি ও যোগশক্তিসম্ভূত অনুভবরূপ প্রমাণের প্রাধান্য অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। মীমাংসা দর্শনদ্বয়ে শ্রুতি মুখ্য প্রমাণ এবং অনুভব ও যুক্তি প্রভৃতি তাহার অনুকূল বা গৌণ প্রমাণ। বেদান্ত দর্শনের ইহাই বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব অন্য দর্শনে নাই। আর এই বেদান্ত দর্শনে যে-সকল বেদান্ত বা উপনিষৎসমূহকে অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রথম স্থান ছান্দোগ্যের এবং দ্বিতীয় স্থান বৃহদারণ্যকের—ইহা বেদান্ত শাস্ত্রানুশীলন-পরায়ণ ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবেই জানেন। আর আজ বড়ই আনন্দের বিষয় যে, সেই ছান্দোগ্যোপনিষৎখানি বিচক্ষণ দার্শনিক পণ্ডিতদ্বয়ের দ্বারা অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ভাষ্যাদি মণ্ডিত করিয়া উপনিষৎ প্রচার এদেশে প্রথম, বোধ হয় মহাত্মা ৺রামমোহন রায় করেন। তৎপরে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র পাল করেন। তৎপরে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অল্প মূল্যে অন্বয়মুখে অবিকল আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দিয়া উপনিষৎ প্রচারের চেষ্টায় অগ্রণী, যতদূর মনে হয়, এই গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, ইহার পরে স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্যামলাল গোস্বামী এবং পরিশেষে স্বর্গীয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডূক্য তৈত্তিরীয় ঐতরেয় শ্বেতাশ্বতর ও কৌষিতকী উপনিষৎ বহুদিন হইতে অন্বয়-মুখে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছেন, কেবল ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষৎখানি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহোদয়ের ঔদার্য্যে ও যত্নে তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

বেদান্তরত্ন মহাশয়ের এই অনুবাদ মধ্যে দেখা যায়, উপনিষদের মূলের অন্বয় ও সেই অন্বয় মধ্যে দুরূহ শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ এবং স্থলে স্থলে পাণিনির সূত্রসহ তাহাদের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি অতি সাবধানে প্রদত্ত হইয়াছে। এই অন্বয়ের নিম্নে অঙ্কসহযোগে একটি সরল অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ছান্দোগ্যোপনিষদের সাধারণতঃ কঠিন বা অনভ্যস্ত ভাষাটি একেবারে বাল-বোধোপযোগী সরল হইয়াছে। এই সারল্য দেখিলে বাস্তবিকই আনন্দ হয়।

অনুবাদের পর বেদান্তরত্ন মহাশয় প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে একটা করিয়া মন্তব্য দিয়াছেন। এই মন্তব্য মধ্যে বেদান্তরত্ন মহাশয়ের নিজত্ব এবং অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা এবং বহুদর্শিতা পরিস্ফুট। ইহাতে ব্যাকরণ-সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য, আধুনিক ও প্রাচীন অপর ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাখ্যার সহিত তুলনা, শঙ্করকৃত ব্যাখ্যার সহিত যেখানে তাঁহার নিজের কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ, পাঠভেদ, প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় কথা আছে। ইহার অধিকাংশস্থল পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

আধুনিকভাবে যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট এই মন্তব্য যে, যথার্থই অমূল্য রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভাষ্যাদিবিহীন মূল ও তাহার অনুবাদ সহিত ছান্দোগ্যোপনিষৎ এ পর্য্যন্ত যত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা নিশ্চিত। আমরা বেদান্তরত্ন মহাশয়ের বৃহদারণ্যকোপনিষদের বঙ্গানুবাদের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

এইবার তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কৃতিত্বের বিষয় আলোচ্য। তত্ত্বভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদনে বাস্তবিকই অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদকে পৃথক্ করিয়া তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষানুরূপ ও যথাযোগ্য ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া সমগ্র গ্রন্থখানিকে সুখপাঠ্য এবং করামলকবৎ আয়ত্ত করিবার পক্ষে আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন। গ্রন্থখানির পরিচ্ছেদসমূহের শিরোনামাগুলি সহজেই দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এবং পাঠ মাত্রই গ্রন্থের বিষয় আয়ত্ত হইয়া যায়। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ অক্ষরে নানাভাবে সাজাইয়া, প্রতি বাক্যের অঙ্কাদি বিন্যাস করিয়া, মূলের পরিমাণ অনুসারে টীকা ও অনুবাদ প্রতিপত্রে প্রদান করিয়া পুস্তকখানিকে তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের দুইভাগেরই প্রারম্ভে বিস্তৃত দুইটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই ভূমিকা তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক ধুরন্ধর মহামতি হেগেলের মতাবলম্বী হইয়া লিখিয়াছেন। হেগেলীয় ভেদাভেদবাদ এজন্য তিনি এই ভূমিকামধ্যে যথারীতি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (১) শ্রদ্ধা ও বিচার, (২) চিন্তার তিন স্তর, (৩) তিন প্রকার ন্যায়, (৪) আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের আশ্রয়—আত্মা সকল বস্তুর আশ্রয়, (৫) সাংখ্য ও বৈজ্ঞানিক দ্বৈতবাদ খণ্ডন, (৬) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ খণ্ডন, (৭) জীবব্রহ্মের সম্বন্ধ, (৮) সৃষ্টিতত্ত্ব, (৯) ব্রহ্মবাদের দুই ধারা,—এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় ১। উপনিষদের নীতি, ২। জ্ঞানসাধন, ৩। প্রেমসাধন, এই তিনটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত দুইটি ভাগেই যে দুইটি মুখবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহাতে তত্ত্বভূষণ মহাশয় বেদান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন।

ভূমিকামধ্যে তিনি যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিচারপটুতা এবং চিন্তাশীলতার অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যদর্শন-শাস্ত্রানুরাগীর পক্ষে এই ভূমিকা যে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা পাঠ করিয়া তাঁহারা উপনিষৎপাঠে অভিলাষী হইবেন এবং যথেষ্ট আনন্দও অনুভব করিবেন। ভারতীয় দর্শনে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে যাঁহারা পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও ভারতীয় ভেদাভেদ-বাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে এই পাশ্চাত্য ভেদাভেদ বাদের কিরূপ পার্থক্য তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার দিনে এইসকল পাশ্চাত্য মতবাদের জ্ঞান লাভ করা প্রাচীন পণ্ডিত সমাজেরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক ভারতীয় দ্বৈত অদ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এতদিন বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল; এইবার পাশ্চাত্য হেগেলীয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদেও ইহার ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তত্ত্বভূষণ মহাশয় ও বেদান্তরত্ন মহাশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আমাদের বেদবিদ্যার বিস্তার করুন।

শ্রী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভ্রমণ-কাহিনী—শ্রীশচীভূষণ মিত্র। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১৯ খুরুট রোড, হাবড়া হইতে প্রকাশিত। দেড় টাকা।

পদ্যে ভ্রমণ-কাহিনী। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর, জব্বলপুর, পুনা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বিবরণ। বিবরণ বহু ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। বহু ঐতিহাসিক তথ্য আছে বলিয়াই পুস্তকখানি গদ্যে লিখিলে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইত। গ্রন্থকার বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু গিরীশবাবুর অনুকরণে যে ছন্দ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ অনুকরণ হইয়াছে।

ষোড়শী (অনূদিত কবিতা)—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, এম-এ। প্রাপ্তিস্থান নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। তিন আনা।

কয়েকটি বিদেশী কবিতার পদ্যানুবাদ। অনুবাদে কৃতিত্বের পরিচয় নাই। দু'একটি অনুবাদ চলনসই; বাকীগুলি অপটুতার পরিচায়ক।

সেপাই ঘোড়া—শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলিতে নূতনত্ব না থাকিলেও গল্পগুলি মন্দ নয়। আমাদের বাঁচোয়া এই যে, লেখক 'কল্লোল' বা 'কালি-কলমের' প্রবর্ত্তিত অশ্লীল, অস্বাভাবিক ও স্বাকামিপূর্ণ ভঙ্গী অবলম্বন করেন নাই। এই নবীন গল্পলেখক কালে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন।

গুপ্ত

বিনোদিনী—শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশক শ্রীব্রজজনবল্লভ বসু, বোলপুর (বীরভূম)। মূল্য ১৲ এক টাকা।

নয়টি গল্পের সমষ্টি। বিভিন্ন মাসিক পত্রে গল্পগুলি সম্ভবত প্রকাশিত হইয়াছিল; তাই পাঠক-সমাজের লেখকের সঙ্গে অল্পাধিক পরিচয় থাকিতেও পারে, অন্তত থাকা উচিত। লেখকের গল্প বলিবার একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সেটি মোটের উপর তৃপ্তিদায়ক। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্য দিয়াই, মানব-জীবনকে দেখিবার একটি নূতন ভঙ্গী উঁকি দিতেছে, এবং শঙ্কার কথা এই যে, আজকালকার গল্পসাহিত্যে অনেকেই এই দৃষ্টিটিকে একটা সস্তা ও সহজ pose হিসাবে জাহির করিয়া বাহাবা পাইতে চান। তাহাদের সংযম, শক্তি ও স্বকীয়তার অভাব স্পষ্ট। লেখকের এই সব আছে—এবং তাহার সুসঙ্গতিও যে তিনি রাখিতে পারেন, তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান গ্রন্থের 'ভরাসুখে'। অপর গল্প কয়টিতে কৃতিত্বের অভাব নাই, সম্পূর্ণতার অভাব কতকটা আছে।

লেখক জানাইয়াছেন, 'গল্প কেন লিখিলাম।' লিখিয়া নিঃসন্দেহ ভালো করিয়াছেন, কিন্তু 'প্রিয়ম্বদার ঠোঁটের কোণে হাসির উদয়-শিখরে অতিশয় তীক্ষ্ণ হাসির একটি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াই তাহার মনের যে লঘু ভাবটা এক নিমেষে কাটিয়া গেল', একথা পড়িতেই সে লঘু ভাবটা আমাদের পাইয়া বসিল। ভাষা-রীতির যে-সব চাতুর্য্য আজকালকার অপরিণত-শক্তি লেখকদের একমাত্র সম্বল, লেখক মহাশয় তাহার মোহ কাটাইয়া উঠুন, আমরা এই প্রার্থনা করি। কারণ, তিনি ত শক্তিহীন নহেন।

গ্রন্থের নাম ও আকার সুন্দর হইয়াছে বলিতে পারি না। আবরণ-পত্রের পরিকল্পনা 'এইবার লোকে ঠিক বলে' গল্পটি হইতে গৃহীত—লোকে ঠিকই বলে—শিল্পীকে। ছাপা সুন্দর।

সইদ খাঁ—লেখক শ্রী রসিকচন্দ্র বসু, বিদ্যাবিনোদ। প্রকাশক শ্রী অখিলচন্দ্র বসু, ১৫ বাঙ্গলা বাজার রোড, ঢাকা। প্রাপ্তিস্থান—মডেল লাইব্রেরী, বাঙ্গলাবাজার ঢাকা। মূল্য ।০।

লেখক বাঙালাসাহিত্যে তাঁহার 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি উপন্যাসের জন্য যথেষ্ট পরিচিত। লেখকের 'নিবেদন' এই—"হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে পরস্পরের প্রতি যাহাতে আরও অধিক উদার, শ্রদ্ধাবান্ ও স্নেহশীল হইয়া উঠেন, সেই উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী সইদ খাঁ পাঠান চরিত-কথা অবলম্বন করিয়া সইদ খাঁ প্রণীত হইল। সইদ খাঁ ইতিহাস নহে, উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনায় লেখকের যে-খ্যাতি আছে, তাহা আরও বর্দ্ধিত হইল।

রক্তকরবীর মর্ম্মকথা—লেখক শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস, এলাহাবাদ। মূল্য ॥০ আনা।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকখানার টীকা ও আলোচনা। লেখক নাটকের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং আপনার মর্ম্মে উহার রস গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহারা নাটকখানি বুঝিতে বেগ পান, তাঁহারা এই পুস্তিকার সহায়তা লইলে উপকৃত হইবেন। লেখকের ভাষার কবিত্ব ও ভাবাবেগ যথেষ্ট। ভাষা আর একটু সরল হইলেও ক্ষতি হইত না। লাল কালিতে মুদ্রিত।

ভারদ্বাজ

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস—শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম-এ। ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দেড় টাকা; সদস্য পক্ষে এক টাকা; শাখাপরিষদের সদস্য পক্ষে পাঁচ সিকা।

ফরাসী ঐতিহাসিক গিজো ইউরোপীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ। আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহারই ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। গিজোর মতে "সভ্যতার দুই অঙ্গ (১) মানুষের অন্তরাত্মার বিকাশ—যাহার ফলে ধর্ম্ম, শিল্পসাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞানাদির উদ্ভব; (২) মানুষের সামাজিক জীবনের পুষ্টি ও পরিণতি—যাহার পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির মধ্যে। তিনি কিন্তু এই শেষোক্ত অঙ্গেরই ইতিহাস রচনা করিয়াছেন. ইউরোপীয় সভ্যতার ব্যাপক পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন নাই। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের দিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়াছেন..."

এই অনুবাদ গ্রন্থখানি যখন ক্রমশঃ "নব্যভারত" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে তখন আমরা মাসের পর মাস আগ্রহসহকারে ইহা পাঠ করিয়াছি। ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও রচনা-নৈপুণ্যে পুস্তকখানিকে আদৌ অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। অনুবাদ হইলেও ইহা আমাদের ইতিহাস-গ্রন্থমালায় স্থান পাইবার যোগ্য। সুধী সমাজ পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ইতিহাস—শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দেবী। প্রকাশক বিজয়কৃষ্ণ ব্রাদার্স, ৫ মাণিকতলা স্প্রার, কলিকাতা।

পুস্তকখানিতে বৈদিক গোত্র প্রবর্ত্তক প্রকরণ ছাড়া আঙ্গিরস, ভৃগু, কাশ্যপ, আত্রেয় ও বশিষ্ঠ বংশাবলীর পরিচয়; বঙ্গে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন ও তাঁহাদের সমাজ গঠন; এবং বঙ্গদেশের নানা স্থানে অবস্থিত বৈদিক বংশাবলীর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা গ্রন্থকর্ত্রীর অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। পুস্তকখানি আমাদের সামাজিক ইতিহাস গঠনে সহায়তা করিবে।

গুপ্ত

শিক্ষা ও সভ্যতা—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক, ক্যাল্‌কাটা পাব্লিশার্স, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১৪৭ পৃষ্ঠা দাম দেড় টাকা।

পুস্তক-সমালোচনা করিতে বসিয়া গোড়াতেই চোখে পড়িল পুস্তকের বহিরাবরণ—ছাপাই, বাঁধাই ও কাগজ। এত সুন্দর ছাপা বাঁধা ও কাগজ, কম বাংলা পুস্তকেই দেখিয়াছি।

এই পুস্তকে, শিক্ষার লক্ষ্য, অন্নচিন্তা, রোম, আর্য্যামি, বৈশ্য, সবুজের হিন্দুয়ানী, ধর্ম্মশাস্ত্র, চাষী, ভারতবর্ষ, ভুতাম-খামেন, গণেশ এই ১১খানি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজের বহু চিন্তা, গবেষণা ও অধ্যয়নের ফল এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুলিখিত এবং গ্রন্থকারের খ্যাতি প্রত্যেকটিতেই বজায় আছে।

শিক্ষা ও সভ্যতা কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত গ্রন্থকার নানা সভ্যতার দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে মানবীয় সভ্যতা শিক্ষাসাপেক্ষ। বড় জাতি বা বড় বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে সমাজোচিত বুদ্ধি ও চরিত্র লাভ করা যায় বটে কিন্তু শিক্ষা না থাকিলে সভ্যতা অর্জ্জন করা যায় না। সমস্ত বইখানিতে এই মতই নানাভাবে নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। শিক্ষার লক্ষ্য, রোম, বৈশ্য, চাষী ও ভারতবর্ষ প্রবন্ধ সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই বইখানিকে এই বৎসরে বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য দান বলিতে পারা যায়।

—স

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(২৬)

সকালে চা খাইয়া, একবার চন্দ্রদের বাড়ীর দিকে যাইবে মনে করিয়া সুবীর চুল আঁচ্ড়াইতেছিল, তাহার মা এমন সময় আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ছেলের প্রসাধনে বাধা দিয়া বলিলেন, "এত চুল আঁচ্ড়াবার ঘটা যে সকাল বেলাই? কোথায় যাচ্ছিস্? কলেজে নাকি?"

সুবীর বলিল, "না, সকাল আটটায় কলেজ পাব কোথায়? একটু চন্দ্রদের বাড়ী যাচ্ছিলাম।"

ভানুমতী বলিলেন, "পড়া-শুনো সব উঠিয়েই দিলি, যে রে? তোকে অবিশ্যি চাকরী ক'রে খেতে হবে না, তবু চুপ ক'রে ব'সে থাকাটা কি ভাল?"

সুবীর বলিল, "সামনের বছর, বিলাতে গিয়ে খুব ভাল

ক'রে পড়ব, শুধু শুধু এখানকার কলেজে গিয়ে আর কি হবে?"

ভানুমতী বলিলেন, "হ্যাঁ, বিলেত যাবে বই কি? তারপর মা বুড়ী এখানে ম'রে থাকুক, ছেলের হাতের আগুনটুকুও তার অদৃষ্টে জুটবে না। সে না হয় নাই মান্‌লি; কিন্তু কোথায় চব্বিশ বছরের বউ ঠিক ক'রে এসেছিস্, সে কি তোর আশায় ব'সে মাথার চুল পাকাবে? কাকে না কাকে বিয়ে ক'রে ব'সে থাক্‌বে।"

সুবীর বলিল, "তাকে কি আর রেখে যাব? বিয়ে ক'রে নিয়েই যাব। সেও পড়্‌বে। তুমিও যদি আস্‌তে রাজী হতে তা হ'লে আর কোনো কথাই থাকত না। সবাই মিলে কয়েক বছর কাটিয়ে তারপর দেশে ফেরা যেত।"

ভানুমতী বলিলেন, "যা নয় তাই। বিলেত যাবার ঠিক লোকই বেছেছিস্। তা তুই বিয়ে ক'রে যেতে চাস্ যাস্। এই বিয়েতেই যখন বাধা দিচ্ছি না, তখন আর কিছুতেই দেব না। আমার অদৃষ্টে থাকে আবার তোর মুখ দেখতে পাব।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে যখন জাহাজে উঠব, তখনকার কথা। এখন থেকেই মন খারাপ ক'রে লাভ কি? যাওয়া যে হয়েই উঠবে, তাই বা কে বল্‌তে পারে? কিন্তু তুমি এমন সময় আমার ঘরে এসে পড়লে কি মনে ক'রে?"

ভানুমতী বলিলেন, "ঐ দেখ, কাজের কথাটাই ভুলে যাচ্ছি। জানিস রে, মিত্তিররা সেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে মেজদির ছেলের সঙ্গে?"

সুবীর বলিল, "সুশীলের সঙ্গে? কোনও চাকরী না জুটিয়েই ছেলে আগে বৌ জোটাতে চল্‌ল?"

ভানুমতী বলিলেন, "কেন রে? তোদের মত জমীদারীই নেই না হয়, তা ব'লে মেজদি কি আর একটা বৌকে খাওয়াতে পার্‌বে না? অমন সুন্দর মেয়ে, হাতে পেলে কি আর কেউ ছেড়ে দেয়? তোর মতন ত সবাই নয়?"

সুবীর বলিল, "যাক্, ভালই হ'ল। মেয়েটিকে বৌ কর্‌বার ভয়ানক সখ ছিল তোমাদের, শেষ অবধি বৌই হ'ল। দুঃখের বিষয় আমি আর তার মুখ দেখ্‌তে পাব না, একেবারে ভাসুর হ'য়ে বস্‌লাম।

ভানুমতী বলিলেন, "যা যা, কাজ্‌লামী কর্‌তে হবে না। পায়ে ধর্‌তে শুধু বাকি রেখেছিল তারা, তখন জেদ ক'রে ফিরিয়ে দিল, এখন আবার ঢং হচ্ছে। কত রূপসী বউ তোমার আসে দেখা যাবে। তবে এইটুকু বল্‌তে পারি বাঙালীর ঘরে এত সুন্দরী মেয়ে লাখে একটার বেশী মেলে না।"

সুবীরের একবার ইচ্ছা হইল, কৃষ্ণার ছবিখানা বাহির করিয়া ভানুমতীকে দেখায়, কিন্তু লজ্জা আসিয়া বাধা দিল। চুল আঁচড়ান শেষ করিয়া সে বলিল, "আহা, এমন একটা নবম আশ্চর্য্য কিছু নয়। তুমিই ওর বয়সে ওর চেয়ে দেখতে ভাল ছিলে।"

ভানুমতী হাসিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, "তুই ত মায়ের মতন সুন্দরী কোথাও দেখিস্ না।"

সুবীর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ভবানীদিদি কেমন আছে?"

ভানুমতী বলিলেন, "সেই একই রকম। ডাক্তাররা যে কি কর্‌ছে তারাই জানে। আমি ত কিছু ভাল দেখছি না।"

ভানুমতী চলিয়া যাইবার পর সুবীর বাহির হইয়া পড়িল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল, দিন কতকের জন্য আবার কোথাও পলাইতে হইবে। সুশীলের বিবাহে যোগ দিতে যাওয়া তাহার দ্বারা ঘটিয়া উঠিবে না। কন্যা-পক্ষ ত তাহাকে দেখিলে ইট ছুঁড়িয়া না মারে ত ঢের, বরপক্ষেও মাসীমা তাহার উপর মর্ম্মান্তিক খুসি হইয়া নাই। তাহার উপর শ্রীমতী দুর্গার ক্ষুরধার রসনা আছে। একমাত্র দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে তাহাকে, সুশীল। কিন্তু একে সে সুবীরের বয়সে ছোট, তাহার উপর এই বিবাহে সে বর, কাজেই আশীর্ব্বাদটা তাহাকে মনে মনেই করিতে হইবে। সকল দিক ভাবিয়া বিবাহের সময়ে না থাকাই সুবীর স্থির করিয়া ফেলিল।

চন্দ্রের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল, সে একটা বেতের ঝাঁপি লইয়া বাজার করিতে চলিয়াছে। ইন্দ্র একটা ঝাড়ন এবং ঝাঁটা লইয়া ঘর দোর পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

সুবীর চৌকাঠ পার হইয়াই বলিল, "এ কি হে? এমন ভীষণ স্বাবলম্বন কেন?"

চন্দ্র বলিল, "ঝি পালিয়েছে!" ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "ছোট বৌএর জ্বর হয়েছে।"

সুবীর বলিল, "যাক, তাহ'লে আর তোমাদের অবকাশ নেই এখন। আমি একটু পরামর্শ করবার লোক খুঁজছিলাম।"

চন্দ্র বলিল, "বোস বোস, চা খাও। বড় বউ এখনও খাড়া আছেন, কাজেই বাজারটা ক'রে দিয়েই আমি খালাস। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি। ইন্দ্র, চা করতে ব'লে আয়।"

ইন্দ্র ঝাড়ন ও ঝাঁটা রাখিয়া ভিতরে চলিল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দু মিনিটেই এসে পড়বে। দেখুন সুবীরবাবু, আপনি আজকাল যে-সব বিষয়ে ইন্টারেষ্ট নেন, আমার দাদাটি মোটেই সে-সব ব্যাপার য়্যাপ্রুভ করেন না। কাজেই পরামর্শ করতে চান ত আমার সঙ্গেই করুন। আমার যদিও বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে, তবু রোম্যান্স সম্বন্ধে সহানুভূতি যায়নি।"

সুবীর বলিল, "খুব রোম্যান্টিক ব্যাপার কিছু নয়, কলকাতা ছেড়ে মাসখানেকের মত বেরিয়ে পড়তে চাই। কোথায় যাব সেটা ঠিক করা দরকার এবং সঙ্গে একজন সঙ্গী দরকার।"

ইন্দ্র বলিল, "প্রথমটার উত্তর রেঙ্গুন। দ্বিতীয়টা একটু ভেবে দেখতে হবে।"

সুবীর বলিল, "রেঙ্গুন ত ডিসেম্বর মাসে যাচ্ছিই। নভেম্বরটা অন্য কোথাও কাটাতে চাই।"

ইতিমধ্যে চা আসিয়া পৌঁছিল। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সুবীর বলিল, "আর কিছু না জোটে ত দেশে জমিদারী তদারক করতে যাওয়া যাবে। অনেক কাল যাইনি। তুমি চল না হে?"

ইন্দ্র জিভ কাটিয়া বলিল, "আরে মশাই, বলেন কি? তা হ'লে এবাড়ীতে আর ঠাঁই হবে না। দেখছেন, না কেমন নিষ্ঠাসহকারে ঘর ঝাঁট দিচ্ছি? এতেই বোঝা উচিত ছিল আপনার। স্ত্রীর জ্বর, মাত্র দেড় বছর হোলো বিয়ে হয়েছে, এখন কি ফেলে যাওয়া যায়? বছর চার যাক্, তখন ও সবের লাইসেন্স পাব।"

বাজারের ঝাঁপি হাতে চন্দ্র এই সময় ফিরিয়া আসিল। ডাক দিয়া বলিল, "খুকি, বাজার ভিতরে নিয়ে যা।"

বছর দশের একটি মেয়ে আসিয়া ঝাঁপিটা উঠাইয়া লইয়া গেল। চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে?"

ইন্দ্র বলিল, "এই অসুখ-বিসুখ।"

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে, এমন একটা জায়গার নাম করতে পার, যেখানে নভেম্বর মাসটা বেশ ভাল কাটে?"

চন্দ্র বলিল, "বাংলাদেশে, না তার বাইরে?"

সুবীর বলিল, "বাইরে না হ'লেই ভাল।"

চন্দ্র বলিল, "তা হ'লে বলতে পারি না; কলকাতা ছাড়া বাংলা দেশের আর কোনো জায়গা বাসযোগ্য আছে কি না আমার জানা নেই। অনেক কাল ওসব খোঁজ নিইনি।"

সুবীর বলিল, "শেষ অবধি জমিদারী দেখতেই যেতে হবে দেখছি। চন্দ্র আমার সঙ্গে যাবে?"

চন্দ্র বলিল, "আমার ত সামনের বছর বিলাত যাবার প্রস্পেক্ট নেই? এম্-এর লেক্‌চারের জন্যে চিন্তা নেই, কিন্তু ল লেক্‌চারগুলোয় অত ফাঁকি দিলে চল্‌বে না।"

সুবীর বলিল, "তবে থাক, কারো ল' লেক্‌চার, কারো কার্টেন লেক্‌চার, ছুটি পাবার জো নেই। বেশ, আমি একলাই যাব।"

ইন্দ্র বলিল, "যাবার দিন যদি কিছু পিছিয়ে দেন, তা হ'লে আমি যেতে পারি। ধরুন আর এক সপ্তাহ পরে।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা দেখি। একটি বিশেষ পারিবারিক উৎসব এড়াবার জন্যে প্রধানত আমার যাওয়া। সেটা কোন্ তারিখে হচ্ছে জান্‌তে পারলে, যাওয়ার দিন ঠিক করতে পারি। আজ সন্ধ্যার সময় ঠিক খবর দিতে পারব।"

বাড়ী পৌঁছিয়া সুবীর ভানুমতীর ঘরে গিয়া উপস্থিত

হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সুশীলের বিয়েটা হচ্ছে কবে ?"

মা বলিলেন, "বেশী দেরি আর কই ? তারা ত তাড়াহুড়ো ক'রে সেরে ফেল্‌তে পারলে বাঁচে। আর দিন দশ আছে বোধ হয়। মেজদি ত পরশু থেকেই ওদের ওখানে গিয়ে থাক্‌তে বলছে। তা ভবানীর এরকম অসুখ, ফেলে যাব কি করে ? বিয়ের দিন, বৌ-ভাতের দিন, গিয়ে গিয়ে ফিরে আস্‌তে হবে আর কি ?"

সুবীর বলিল, "মা, তুমি হয়ত শুনলে খুব চটে যাবে, কিন্তু আমি এ বিয়েতে থাক্‌তে পার্‌ব না। দিন চার পাঁচ পরে আমি দেশে যাবার জোগাড় করছি। অনেক কাল ওদিকে যাইনি, একটু দেখা-শোনা দরকার।"

ভানুমতী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "কেন রে ? দেশে যাবার এখনই এমন কি তাড়া পড়ল ? দেওয়ানজী এতকাল সব দেখে শুনে চালাচ্ছেন ; তুই আর দশ দিন দেরি ক'রে গেলে কি সব অচল হয়ে যেত ? মেজদি কি রকম দুঃখ করবে শুনলে।"

সুবীর বলিল, "কিছু ভাবনা নেই মা, আমার কথা মনে করবারই তাঁর অবসর থাকবে না। এ বিয়েটা নিয়ে এত কথা হয়ে গেছে, যে, ওর মধ্যে থাকতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না আমার। বউকে আর সুশীলকে খুব দামী কিছু উপহার দিয়ে দিও, তা হ'লেই সকলে খুসি হয়ে যাবে। তোমার কাছে টাকা না থাকে ত বল, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাব।"

ভানুমতী বলিলেন, "টাকার দরকার নেই, বাছা। আমার কাছে যা আছে, তাই কি ক'রে খরচ করব ভেবে পাই না। বেশী দিতে গেলে আবার অন্য বউরা রাগ করবে না ? সকলকে যা দিয়েছি এদেরও তাই দেব।"

সুবীর সন্ধ্যাবেলা গিয়া ইন্দ্রকে বলিয়া আসিল, যাওয়ার দিন সে এক সপ্তাহ পিছাইয়াই দিল। ইন্দ্র যেন যাইবার অনুমতি জোগাড় করিয়া রাখে।

ভানুমতী মুখ ভার করিয়াই রহিলেন। এই বিবাহে উপস্থিত থাকিতে তাহার কোথায় যে বাধিতেছে, তাহা সুবীর মাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিল না। হিন্দুসমাজে একশ'টা সম্বন্ধ হইয়া ভাঙিয়া যায়, ইহার মধ্যে লজ্জার আর আছে কি ? মেয়েও নয়, ছেলে। কোনকালে বিবাহের কথা হইয়াছিল বলিয়া, চিরদিন তাহাদের সম্মুখে মাথায় ঘোমটা দিয়া বেড়াইতে হইবে নাকি ?

সুবীরের যাইবার দিন আসিয়া পড়িল। ভানুমতী বলিলেন, "সাবধানে থেকো বাছা, যা দেশ, ওখানে কিছুর ঠিকানা নেই। দেওয়ানজীর পরামর্শ না নিয়ে কোথাও যেও না। সর্ব্বদা লোকজন সঙ্গে রেখো। আর যাই কর, আমার মাথার দিব্যি রইল তোমার কাকার বাড়ী যেয়ো না বা তাদের বাড়ীর জলগণ্ডুষ মুখে দিও না। ওর মত কুচক্রী মানুষ দুনিয়ায় দুটি নেই। যতটা পার এড়িয়ে চোলো। শীকার-টিকার করতে যেয়ো না যেন।"

সুবীর তাঁহার সব ক'টা নিষেধই মানিয়া চলিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল। ভানুমতীর দিন যেন আর কাটিতে চাহিতেছিল না। ভবানীর জন্য নিতান্ত তিনি আটকা পড়িয়া ছিলেন, তাহা না হইলে তিনিও বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও কয়েকদিনের জন্য চলিয়া যাইতেন। অন্ততঃ শোভাবতীর বাড়ী গিয়া কয়েকটা দিন কাটাইয়া আসিতে পারিলেও তাঁহার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হইত। কিন্তু ভবানীই হইয়াছিল তাঁহার সব কিছুর অন্তরায়।

একজন ঝি আসিয়া বলিল, "মা, দিদি একবার আপনাকে ডেকে দিতে বললে।"

ভানুমতী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুবীরের চিন্তা তখনকার মত মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, তিনি ভবানীকে দেখিতে চলিলেন। সুবীর অবশ্য অনেকবারই তাঁহার কোল ছাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেক দূর দেশেও গিয়াছে। কিন্তু দেশে পাঠাইয়া তাঁহার বেশী মন খারাপ লাগিতেছিল এই জন্য যে সেখানে তাঁহাদের চির শত্রু উদয় এখনও বাসা বাঁধিয়া আছে। সুবিধা পাইলে সে কি আর কিছু অনিষ্ট চেষ্টা না করিবে ? ইহার আগে সুবীর যখনই দেশে গিয়াছে, ভানুমতী এবং ভবানী তাহার সঙ্গে গিয়াছেন, কাজেই উদয় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভবানীকে অন্ততঃ অতীত কালের পরিচয়ে তার যথেষ্টই ভয় ছিল। এবার ছেলেমানুষ সুবীর একলাই যাইতেছে, তাই এত দুশ্চিন্তা।

দেওয়ানজীকে ছেলের উপর ভাল করিয়া চোখ রাখিতে

বলিয়া একখানা চিঠি লিখিতে হইবে ইহা স্থির করিয়া ভানুমতী গিয়া ভবানীর ঘরে ঢুকিলেন।

ভবানীকে দেখিয়া আর সেই পুরাকালের ভবানী বলিয়া চিনিবার জো নাই। সে রং নাই, সেই দীর্ঘায়ত দেহ নাই, চোখে মুখে সেই দুঃসহ তেজ নাই। তাহার কঙ্কালমাত্র পড়িয়া আছে। ভানুমতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভানু, খোকা নাকি আজ দেশে গেল?"

ভানুমতী বলিলেন, 'হ্যাঁ, কিছুতেই রাজী হ'ল না থাকতে। ছেলে সব দিক দিক দিয়ে অদ্ভুত। এত ক'রে বললাম সুশীলের বিয়েটা হ'য়ে যাক, তার পর যাস্, তা কিছুতে যদি শুনলে। ঐ মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল, তাই নাকি তার মহা লজ্জা। যাক্, এখন ভালয় ভালয় ফিরে এলে বাঁচি, যে শত্রু সেখানে। তার হাতের মুঠিতে না গেলেই হয়। তুইও সঙ্গে নেই যে ঠেকাবি। একমাত্র তোকেই ও হতভাগা যা একটু ভয় করে।"

ভবানী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাছা, চির-শত্রুই ও বটে। তোমাদের চেয়ে আমার বড় শত্রু। আজ যে মর্‌তে বসেছি, তবু ওর কথা মনে হ'লে রক্ত গরম হয়ে ওঠে।"

ভানুমতী বলিলেন, "থাক্ গে, ওর কথা আর এখন ভাবিস্ না। রোগ-শয্যায় দুটো ভাল কথা ভাব, মনে শান্তি পাবি।"

ভবানী অনেক কষ্টে একটুখানি হাসিয়া বলিল, "শান্তি? আমার অদৃষ্টে তা কি আর আছে? ইহকাল শেষ হ'য়ে এল, পরকালেও আমার শান্তি আছে কি না জানি না।"

ভানুমতী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে? কি এমন তুই ক'রেছিস? নিজের ছেলেপিলের বাড়া ক'রে পরের ছেলেপিলে মানুষ করলি, মেয়ে মানুষ হ'য়েও পুরুষের বাড়া ক'রে আমাদের ঘর-সংসার আগ্‌লে রাখলি, তোর শান্তি না থাকবে কেন? কোন কাজ ত তুই বাকি রেখে যাচ্ছিস্ না। ভগবান না করুন, যদিই এখন তুই স্বর্গে যাস, আমি ব'লে দিচ্ছি তুই শান্তিতে থাকবি, সুখে থাকবি।"

ভবানী কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিল, "সবই অদৃষ্ট, মা। করতে সত্যিই কিছু বাকি রাখিনি, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তোমাদের জন্যে করেছি। তোমাদের মা কচিকাচা সব আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল, তার কাছে গিয়ে মাথা সোজা ক'রে দাঁড়াতে পারব যে, তার কাজে আমি ফাঁকি দিই নি। কিন্তু মহাপাপ করতেও আমার আটকায় নি, মা। তার প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে যদি যাই, স্বর্গেও আমার শান্তি থাকবে না। এখানেও যেমন তুষানলে জ্বল্‌ছি, ওখানেও তাই জ্বলব।"

ভানুমতীর বিস্ময় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "জন্মাবধি তোকে চোখের উপর দেখছি। কবে কি পাপ তুই করলি? অসুখে ভুগে ভুগে তোর মাথাই খারাপ হ'য়ে গেল নাকি?"

ভবানী বলিল, "মাথাটাই এক এখনও ঠিক আছে, তাই এত কথা বল্‌ছি। নইলে ত সব ভুলে যেতাম।"

ভানুমতী বলিলেন, "আচ্ছা, যদি কিছু ক'রেই থাকিস্, তাতেই বা কি? সেরে সুরে ওঠ, তখন তার যা বিহিত তা করা যাবে।"

ভবানী বলিল, "সারবার আশা থাকলে কি আর এ কথা মুখে আনতে আমার সাহস হ'ত? যাই হই, মেয়ে মানুষ, ভয়টা আমাদের থাকেই। জানি যে আর বড় জোর পনেরো কুড়িটা দিন আমার বাকি, তাই যা করবার এখনই করতে চাই। কিন্তু আজ থাক্ বাছা, আজ সব কথা খুলে বলতে মনটা যেন পিছিয়ে যাচ্ছে। কাল বলব।"

ভানুমতী বলিলেন, "আচ্ছা, তোর যখন খুসি; কাল সুশীলের আইবড় ভাত, আমি সকালের দিকে বাড়ী থাকব না। তোর কোনও অসুবিধে হবে না, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে যাব।"

পরদিন সকালেই স্নানাদি সারিয়া ভানুমতী শোভাবতীর বাড়ী চলিয়া গেলেন। যদিও শুভ-কর্ম্মে তাঁহার কোনই স্থান নাই, তবু তিনি বাড়ীতে অন্ততঃ উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার মেজদি অত্যন্তই দুঃখিত হইবেন, ইহা জানিয়া ভানুমতী সর্ব্বদাই সে বাড়ীর বিবাহাদিতে যোগ দিতে যাইতেন। একেবারে সামনে না গিয়া কোন একটা কোণের ঘরে গিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিতেন। গল্প-গুজব

আমোদ-প্রমোদে সব কিছুতেই যোগ দেওয়া চলিত, অথচ কাহারও কোনো অমঙ্গলও হইত না।

এবারেও তিনি গিয়া দুর্গার ঘরে ঢুকিয়া বসিলেন। দুর্গার মেয়ের একটু জ্বরের মত হইয়াছিল; সকলে এত আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে, অথচ তাহাকে মেয়ে আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিতে হইতেছে, ইহাতে দুর্গার বিরক্তির সীমা ছিল না। ছোট মাসীমা আসাতে সে হাতে স্বর্গ পাইল। তাঁহাকে মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ভানুমতী বসিয়া নাতনীর সঙ্গে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বরকে স্নান করান, খাওয়ানো, কনের বাড়ী তত্ত্ব পাঠানো সব একে একে হইয়া গেল। তখন দুর্গা আসিয়া তাঁহাকে ছুটি দিল। এ বাড়ীতেও শোভাবতীর এক বিধবা ননদ ছিলেন, ভানুমতী তাঁহার ঘরে খাওয়া দাওয়া করিতে গেলেন।

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একজন ঝি একখানা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে চিঠি দিল, রে?"

ঝি বলিল, "জানি না মা, আপনার গাড়ী এসেছে, ড্রাইভার এই চিঠিখানা দিল।"

ভানুমতী নিষেধ সত্ত্বেও খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। হাত ধুইয়া চিঠি খুলিয়া দেখিলেন বাড়ীর সরকারের লেখা। ভবানীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, ডাক্তার আসিয়াছেন, তিনি ভানুমতীকে অবিলম্বে আসিতে বলিলেন।

ভানুমতীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। শোভাবতী হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চিঠি এল রে? খাওয়া ফেলে চল্‌লি কেন?"

ভানুমতী চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভবানীকে আর বুঝি রাখতে পারলাম না, মেজদি। এতকাল মায়ের মত ক'রে আগ্‌লে রেখেছিল, সে গেলে সংসারে একেবারে একলা পড়ব।"

শোভাবতী বলিলেন, "কি কর্‌বি বল? জগতের নিয়মই এই। মা বল, বাপ বল, চিরকাল কেই বা থাকে? তা কাঁদ্‌ছিস কেন? আগে গিয়ে দেখ কেমন আছে। ও সব পুরনো রুগী, মরতে মরতে দশ বার সাম্‌লায়।"

ভানুমতী আর দেরী না করিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল।

ডাক্তারে তাঁহাকে সিঁড়ি ওঠা নামা পারতপক্ষে না করিতেই বলিয়াছিল। যদিই করিতে হয়, তাহা হইলেও খুব ধীরে ধীরে। সে-সব ভুলিয়া এক নিঃশ্বাসে এক রকম দৌড়িয়াই তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। ভবানীর ঘরের সাম্‌নে আসিতেই মাধী ঝি কাঁদিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভানুমতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, মাধী? এখনও আছে ত?"

মাধী বলিল, "আছে, মা। কিন্তু আজকের রাত কাটে কি না সন্দেহ। যাও মা, তোমার আশায় পথ চেয়ে আছে।"

ভানুমতীর পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি জোর করিয়া মন শক্ত করিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। তাঁহাদের পারিবারিক চিকিৎসক বিছানার পাশে চেয়ার লইয়া বসিয়াছিলেন। ভানুমতীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি নীচে গিয়ে বস্‌ছি, ও আপনাকে কি যেন বল্‌তে চায়। বেশী উত্তেজিত হ'তে দেবেন না। রাত্রে এখানেই একটা বিছানা ক'রে দিতে বল্‌বেন আমার জন্তে। দরকার হ'লেই আমায় ডাক্‌বেন," বলিয়া তিনি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

ভবানীর বিছানায় আসিয়া বসিয়া ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কিছু ব'লে যেতে চাস্?"

ভবানী ইসারায় তাহাকে বালিশে ঠেশ দিয়া উঁচু করিয়া বসাইয়া দিতে বলিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "এখনও বল্‌তে মনটা ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে মা, কিন্তু আর সময় নেই। মায়ের মত যত্নে তোকে মানুষ করেছি এই মনে ক'রে আমায় ক্ষমা করিস্। তখন বুদ্ধির দোষে মনে করেছিলাম তোর ভালই কর্‌ছি। ভগবানের কাছে কি জবাবদিহি কর্‌ব জানি না।" এতটুকু বলিয়া সে আবার দম লইবার জন্ত থামিল।

ভানুমতীর বুকের ভিতর কেমন যেন করিতে লাগিল। কোন্ মহা রহস্যের সম্মুখে ভাগ্য তাঁহাকে আনিয়া দাঁড় করাইল? এই পরপারের যাত্রী কি তাঁহাকে বলিয়া যাইতে চায়? শুনিবার পর পৃথিবীর চেহারা এমনিই কি থাকিবে? কি মহাপাপ সে করিয়াছে? ভানুমতীর জীবনও তাহার সহিত এমন ভাবে জড়িত হইয়া গেল কি করিয়া?

ভবানী আবার বলিতে লাগিল, "উদয় হতভাগা যদি অত ক'রে আমায় না জ্বালাত তা'হলে এমন কাজ হয়ত কর্‌তাম না। কিন্তু মাথায় আমার খুন চড়িয়েছিল সে। তাকে জব্দ কর্‌বার জন্যে না কর্‌তে পার্‌তাম এমন কাজই ছিল না। ধাত্রীটাও হ'ল আমার সহায়। অদৃষ্টে ছিল এই লিখন তা না হ'লে সময়মত এসে জুটবে কেন?"

ভয়ে ভানুমতীর হৃৎস্পন্দনও যে থামিয়া গেল। ভবানী কি বলিতে চায়? ধাত্রীও সহায় হইল তাহার কিসে? অস্ফুটস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে কি বল্‌তে চাস তুই? কি সর্ব্বনাশ বাধিয়ে রেখেছিস্?"

ভবানী অনেক কষ্টে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল, "সর্ব্বনাশই বটে, মা। টাকার দাম তখন অনেক বেশী ভাব্‌তাম। এখন দেখ্‌ছি আট লাখ টাকার লোভে যা করেছি, মাথার ঠিক থাক্‌লে লক্ষ কোটী টাকার জন্যেও কেউ তা করে না। তোমার মেয়েসন্তান হ'লে পাছে উদয় টাকাটা হাত করে, এই ভয়ে আমার রাতে ঘুম হ'ত না। কিন্তু বিধাতা তাই কি ঘটালেন। ধাত্রী যেই বল্‌লে, "হয়ে গেছে," ঝুঁকে প'ড়ে দেখলাম গোলাপ ফুলের মত সুন্দরী মেয়ে—"

বাধা দিয়া ভানুমতী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি রে? মেয়ে হয়েছিল?"

ভবানী বলিল, "হ্যাঁ মেয়েই। আমার মাথার তখন ঠিক ছিল না। উদয়কে ফাঁকি দেবার জন্যে তখন মানুষ খুন কর্‌তেও আট্‌কাত না। ধাত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মেয়েকে সরিয়ে ফেলা গেল, তার জায়গায় একটি ছেলে জোগাড় ক'রে নিয়ে এল সে! তার মা দুদিন আগে ওর বাড়ীতেই প্রসব হ'য়ে মারা গিয়েছিল। দুনিয়ায় কেউ ছিল না তার। মেয়েটিকে নিয়ে ধাত্রী চ'লে গেল।"

ভানুমতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বুক-ফাটা কান্নার সুরে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুই তবে আমার ছেলে নস্?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হতচেতন দেহ ঘরের মেঝেতে গড়াইয়া পড়িল।

পতনের শব্দে তিন চার জন দাসী ছুটিয়া আসিল। তাহাদের চীৎকারে ডাক্তারবাবু যখন উপরে ছুটিয়া আসিলেন, তখন তিনি কাহার দিকে প্রথম দৃষ্টি দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ভানুমতীর অবস্থাও ভবানী অপেক্ষা বিশেষ ভাল বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

সুবীরকে ফিরিয়া আসিবার জন্য তখনই টেলিগ্রাম করা হইল। পাড়াগাঁয়ের টেলিগ্রাফ অফিসে অবশ্য কতক্ষণে যে তাহার নিকট সংবাদ পৌঁছিবে, কিছুই ঠিক নাই। শোভাবতীর বাড়ী তখন সকলে বিবাহের উৎসবে ব্যস্ত, তবু খবর পাইয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিলেন।

ভানুমতী নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া ছিলেন। অত্যন্ত দুর্ব্বল, হৃৎস্পন্দন কখন্ থামিয়া যায়, তাহার ঠিক নাই। কয়েক ঘণ্টায় তাঁহার যেন কুড়ি বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক গৌরবর্ণ এখন মোমের মত সাদা দেখাইতেছিল।

ডাক্তার তাঁহাকে কথাবার্ত্তা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। শোভাবতী বোনের হাত ধরিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন। বলিলেন, "কি অলক্ষুনে মেয়ে ঘরে আন্‌ছি জানি না, বিয়ের নামে তার বাপ মর্‌তে বস্‌ল, আবার এ ধারে দেখ আমার বোনও বুঝি ফাঁকি দিয়ে যায়। সুবীর ভালই করেছিল এ মেয়েকে ঘরে না এনে।"

তাঁহার একমাত্র শ্রোত্রী মাধী ঝি বিজ্ঞ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সত্যি মাসীমা, দাদাবাবুর আমাদের যা বুদ্ধি! কে বল্‌বে যে অতটুকু ছেলে।"

শোভাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কখন আস্‌বে রে?"

ঝি বলিল, "তার গেছে, এই এসে পড়্‌ল ব'লে।"

শোভাবতী উঠিয়া পড়িলেন, "যাই বাছা, কোন অযত্ন যেন না হয়। এমন সময়ে অসুখে পড়্‌ল, দু ঘণ্টার বেশী

চারঘণ্টা যে ব'সে থাক্‌ব তার জো নেই। আবার আস্‌ব কাল সকালে। ভবানী কোন্ ঘরে? তাকেও একটু দেখে যাই।"

কাত্তী ঝি তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। ভবানীর আর কথা বলিবার শক্তি ছিল না। সে শুধু চাহিয়া দেখিয়া চোখ বুঝিল। পাছে কান্নাকাটির শব্দে ভানুমতীর অসুখ বাড়ে, সেইজন্য সকলে চুপ করিয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভবানী তাহার এতদিনের পরিচিত ঘর ছাড়িয়া চিরদিনের মত বিদায় হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ

সম্পাদকের চিঠি

সুরমা উপত্যকার সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ্যে তাহার সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য আমাকে গত ফাল্গুন মাসে শিলচর যাইতে হইয়াছিল। ফাল্গুনের ১২ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত সেখানে নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রথমে ১২ই সুরমা উপত্যকা সমবায়-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। কুমিল্লার লোকহিতকর্ম্মী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্তের ইহার সভাপতির কাজ করিবার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তিনি আসিতে না পারায়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র দে কর্ত্তৃক তাঁহার সুলিখিত সম্ভাষণ পঠিত হইবার পর সুরমা উপত্যকার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার মুদ্রিত সুচিন্তিত ইংরেজী অভিভাষণ পড়িয়া তাহার পর বাংলায় অনুধাবনযোগ্য কিছু বলেন। যৌথ ঋণদান ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ বেসরকারী হওয়া উচিত, তাঁহার এই মত যুক্তিসঙ্গত মনে করি। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন সরকারের তত্ত্বাবধানাধীন সমবায়-ঋণদান-সমিতি-গুলির সাহায্য লওয়া উচিত। মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার নিমিত্ত যাহা কিছু দরকার, সকল ব্যবস্থার উপরই গবর্মেণ্টের, বিশেষতঃ বিদেশী গবর্মেণ্টের, কর্ত্তৃত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। সাধারণ মহাজনদের দোষগুণ দুই-ই আছে। দেশী লোকদের দ্বারা সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক সর্ব্বত্র যথেষ্টসংখ্যক থাকিলে মহাজনদের দোষের নিরাকরণ হইতে পারে।

১২ই ফাল্গুন সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শিলচরের প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ তাঁহার ভাবপূর্ণ সম্ভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর রায় বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব করিতে উঠিয়া রসিকতাপূর্ণ একটি ছোট বক্তৃতা করেন। এইসকল বক্তৃতায় সচরাচর প্রস্তাবিত ব্যক্তির যেরূপ প্রশংসা থাকে, অধিকারী মহাশয় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও কৃপণতা করেন নাই। অধিকন্তু তিনি, "কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥" এই শ্লোকটির সাময়িক প্রয়োগচ্ছলে তাহার প্রথম তিনটি শব্দেরও সঙ্গতি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন!! সেইজন্য অস্মাদৃশ বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিদিগের পৌত্রীকল্পা ও দৌহিত্রীকল্পা সভাস্থলে সমাসীনা মহিলাবর্গকে কিছু পরিহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্থানীয় সাহিত্য সম্মিলনের রীতি অনুসারে আমাকে আগেই অভিভাষণ লিখিয়া পাঠাইতে হইয়াছিল। তাহা শিলচরেই মুদ্রিত হয়। আমি তাহা পাঠ করি। যাহা মুদ্রিত হইয়াছিল, অবসর অভাবে তাহাও তাড়াতাড়ি লিখিয়াছিলাম, এবং তাহাতে আমার সব বক্তব্য খুলিয়া বলা হয় নাই। এইজন্য আমি এক-একটি অংশ পড়িবার পর মৌখিক কিছু বলিয়াছিলাম। তাহার সমষ্টি বোধ করি মুদ্রিত বক্তৃতাটি অপেক্ষা ছোট হইবে না। মৌখিক কথিত অংশগুলি যথাযথ অনুলিখিত না হওয়ায় সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ পরে তাহা আমাকে লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। দুঃখের বিষয়, আমি কি বলিয়াছিলাম ঠিক্

মনে না থাকায় এবং অবসরের অভাবেও তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা লিখিত ও মুদ্রিত হইবার যোগ্য কি না, তাহার বিচারক অন্যে। সে-বিষয়ে কিছু বলিতেছি না। সাধারণ ভাবে এই কথা বলা দরকার, যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলে বক্তৃতার অনুলিখনে দক্ষ ব্যক্তির অভাব আছে। বাংলা অনুলিখনে ও ইংরেজী অনুলিখনে অভ্যস্ত ব্যক্তি ছোট বড় সকল সহরে থাকিলে ভাল হয়। বর্ত্তমান সময়ে অল্পসংখ্যক লোক এইরূপ কাজ করিয়া কিছু উপার্জ্জনও করিয়া থাকেন। আরও অনেকের আংশিক জীবিকা নির্ব্বাহ এই কাজের দ্বারা ভবিষ্যতে হইতে পারিবে।

সম্মিলন অনেক বিষয়ে ভাল সঙ্কল্প (resolution) করিয়াছেন। তাহা স্থানীয় খবরের কাগজে বাহির হইয়া থাকিবে। তদনুসারে কাজ হইলে দেশের উপকার হইবে। "কমলা" নামক মাসিক কাগজ যদি আবার বাহির করা হয়, তাহা হইলে সুরমা উপত্যকার বিদ্যালয়-পরিদর্শক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক এক শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। তদ্ভিন্ন তিনি সুরমা উপত্যকার অমুদ্রিত ভাল বাউলের গান ও অন্য ভাল গানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহের জন্য একটি সুবর্ণপদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন।

প্রীত, আশান্বিত ও উৎসাহিত হইবার মত অনেক বিষয় এই সম্মিলনে লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

কর্তৃপক্ষ অধিকাংশের মতে যাহা স্থির করেন, কাহারও তাহাতে মত না থাকিলে নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত ও জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গবর্ন্মেণ্ট কোন একটি বাংলা বহি বাজেয়াপ্ত করায়, তাহার প্রতিবাদসূচক একটি প্রস্তাব বিষয়নির্ব্বাচন কমিটিতে আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়। তাহা গৃহীত না হওয়ায় ঐ প্রতিবাদের সমর্থকেরা তাহা সম্মিলনের সাধারণ প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনার জন্য উপস্থিত করিবার নিমিত্ত সভাপতির নিকট এক অনুরোধপত্র প্রেরণ করেন। এই প্রণালী সম্পূর্ণ বৈধ, এবং স্বমত-প্রতিষ্ঠায় এই উৎসাহ প্রশংসনীয়। আমি সভাপতি রূপে যে যে কারণ দেখাইয়া প্রস্তাবটি আলোচিত হইতে দি নাই, প্রবাসীতে তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

অধিবেশনের কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহের সুবন্দোবস্ত কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন। সম্মিলনে ধর্ম্মজাতিবৃত্তিনির্বিশেষে বাংলাসাহিত্যানুরাগী লোকেরা যোগ দিয়াছিলেন। কয়েক জন মুসলমান ভদ্রলোক কেবল যে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাহা নহে, সভার কাজেও যোগ দিয়াছিলেন। একজন মুসলমান যুবক "যবন" শব্দের অবজ্ঞাসূচক বা বিদ্বেষব্যঞ্জক প্রয়োগের বিরুদ্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমিও সে-বিষয়ে কিছু বলি। এই শব্দটি যে প্রথমে গ্রীকজাতির অংশ আইয়োনিয়ান্‌দিগকে এবং পরে গ্রীকবংশীয় অন্য লোকদিগকে বুঝাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপরে ইহা যে-কারণে যাহাদের প্রতিই প্রযুক্ত হউক না, এবং ইহার কল্পিত ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না, এখন অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিবার জন্য ইহা কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রথম প্রথম ইহার যে ঐতিহাসিক অর্থ ছিল, একান্ত প্রয়োজন হইলে কেবল সেই অর্থে ইহার ব্যবহার সমর্থন করা যায়। সভাস্থলে মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন নামক একজন ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হই। তিনি সাহিত্যোৎসাহী ও সাহিত্যসেবী। তিনি "শান্তি কন্যার বারমাসী," "কাঞ্চনসুন্দরীর বারমাসী," "খঞ্জনসুন্দরীর বারমাসী," "দিলখোস কন্যার বারমাসী" প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং অন্য ছোট ছোট পুস্তকও লিখিয়াছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সকলধর্ম্মাবলম্বী বাঙালীরই নিজের জিনিষ। কিন্তু আজকাল হিন্দু মুসলমান ইহার চর্চ্চাও আলাদা আলাদা করিতেছেন। সেইজন্য শিলচরে সকলের একত্র সাহিত্যসেবার প্রয়াস দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম।

সামাজিক জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইতেছে। কিন্তু রাজনৈতিক জাতিভেদ বাড়িয়াছে মনে হয়। অনেক রাজনৈতিক কর্ম্মী মনে করেন, সরকারী কর্ম্মচারীরা দেশহিতৈষী বা দেশসেবক হইতে পারেন না। তাঁহারা পেন্স্যন্ লইবার পরও আন্তরিক হিতৈষণার সহিত দেশের কাজ করিতে পারেন না, অনেকে এমনও ভাবেন। এই-

জন্য রাজনৈতিক কর্ম্মীদের ও উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যেন জাতিভেদের মত একটা ব্যবধান-রেখা টানা হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকদের মধ্যেও এমন একটা মনোমালিন্য অনেক সময় দেখা যায়, যে, তাঁহারা একত্র অরাজনৈতিক কাজ করিতে পারেন না—মনে হয় যেন তাঁহারা পরস্পরকে অনাচরণীয় মনে করেন। এইসব কারণে শিলচরে সাহিত্যক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী ও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকদিগকে একত্র কাজ করিতে দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। কোন কার্য্যক্ষেত্রেই উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে "অপাংক্তেয়" মনে করা উচিত নয়। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারীর স্থান অবজ্ঞেয় নহে। স্বদেশভক্তিব্যঞ্জক অনেক গদ্য ও পদ্য রচনাও তাঁহাদের কলম হইতে বাহির হইয়াছে। এখনও অনেক সরকারী কর্ম্মচারী বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। সেইজন্য, পুস্তকবিশেষ বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আলোচনা সাহিত্যসম্মিলনে না-হওয়ায়, সুরমা উপত্যকার একখানি কাগজকে ঐ সম্মিলনকে "কেরানীসম্মিলনে" পরিণত করিবার বিদ্রূপাত্মক উপদেশ পড়িয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম। যে রাজনৈতিক দলের লোক আপনাদিগকে গণতান্ত্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র বলিয়া ঘোষণা করেন, যাঁহারা তথাকথিত "অস্পৃশ্য" মেথরদিগের প্রতিও প্রকাশ্য সভায় ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সামাজিক মর্য্যাদায় ও শিক্ষায় তাঁহাদের সমান কেরানীবৃন্দের প্রতি তাঁহাদের একটি মুখপত্রের এই অবজ্ঞাপ্রকাশ পীড়াদায়ক।

সাহিত্যসম্মিলনে অনেক ভদ্রপরিবারের মহিলা ও বালিকারা উপস্থিত ছিলেন। তাহার মধ্যে অল্পবয়স্কা জনৈক মহিলা একটি সংকল্পের সমর্থন করিয়া ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা করেন। ইনি আমার সিটি-কলেজের প্রাক্তন এক ছাত্রের কন্যা। ছাত্রটি অবশ্য এখন উচ্চপদস্থ ও প্রৌঢ়। ইনি ছাড়া শিলচরে আমার আরও ৬।৭ জন প্রাক্তন ছাত্রকে দেখিলাম। তাঁহারা সমবেত ভাবে আমার প্রতি প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের ইহা তৃপ্তি ও আহ্লাদের বিষয়, যে, আমাদের দেশে এখনও প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরাও নিজে অধিকতর কৃতী ও বিদ্বান্ হইলেও ভূতপূর্ব্ব শিক্ষককে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বহু কুলক্ষণ সত্ত্বেও এই আশা পোষণ করিতেছি, যে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির এই সদ্‌গুণ লুপ্ত হইবে না।

স্থানীয় ইণ্ডিয়া ক্লাবের উদ্যোগে কৃষিশিল্পগোপ্রদর্শনী হইয়াছিল। এই ক্লাবের নিজের গৃহ আছে। তাহাতে লাইব্রেরী ও পাঠাগার আছে। শিলচরের মত ক্ষুদ্র সহরের পক্ষে ইহা প্রশংসনীয়। উন্নত আধুনিক প্রণালীতে কৃষিজাত নানাবিধ দ্রব্যের কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাহার অনেক নমুনা প্রদর্শনীতে দেখিলাম। অনেক উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য এবং নানাবিধ তাঁতের কাজও এখানে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় মিশনারিদের বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া শিলচরের শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস প্রমুখ স্থানীয় ভদ্রলোকদের চেষ্টায় পরিচালিত অন্য যে বালিকা বিদ্যালয়টি আছে, তাহার পুরস্কার বিতরণ সভায় আমাকে সভাপতির কাজ করিতে হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে এই বিদ্যালয় আগে একদিন দেখিয়া আসিয়াছিলাম। পুরস্কার বিতরণ সভায় বালিকাদের আবৃত্তি, গান ও অভিনয় বেশ হইয়াছিল। পুরস্কার বিতরণ শেষ হইবার পূর্ব্বে ঝড়বৃষ্টির জন্য সভামণ্ডপে সমবেত সকলকে নিকটস্থ ছাত্রনিবাসে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সেই ছাত্রনিবাসে মহিলাদিগের সভায় আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। ঝড়বৃষ্টি থামিলে ভদ্রমহিলারা অনেকে হাঁটিয়াই নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শুনিলাম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিলচরে ইহা অভাবনীয় ছিল।

সভামণ্ডপে এক দিন দুজন পেশাদার পালোয়ানের কুস্তি হয়। তাহাদিগকে ২৫০৲ টাকা দিতে হইয়াছিল। আমার বিবেচনায় ইহার পরিবর্ত্তে ছেলেদের ব্যায়াম লাঠিখেলা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইলে ভাল হইত।

স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে কয়েকটি আদিমজাতীয় বালককে বাংলা শিখান হইতেছে দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম।

শিলচর সহরটি ছোট, কিন্তু বিদ্যালয়, ছাপাখানা ইত্যাদি

কয়েকটি আছে। ইহার দৃশ্য সুন্দর। জলের কল আছে। শীঘ্র তাড়িত আলোক হইবে শুনিলাম।

আলিপুরের জীবনিবাসে যেমন "হুকু হুকু" বানর আছে, শিলচরে সেইরূপ একটিমাত্র বানর স্থানটিকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। অথচ সে তথাকার শ্রেষ্ঠ জীব নহে। এই তথ্যটি হইতে ধ্বনিসার মনুষ্যদের কিছু শিখিবার আছে।

শিলচরে থাকিবার সময় শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা হইতে আহ্বান পাই। সেইজন্য সেই দুটি স্থানেও গিয়াছিলাম, এবং তাহাদের সম্বন্ধেও অল্প কিছু লিখিব। সামান্য কিছু কাজ করিবার নিমিত্ত যে দু এক দিন থাকা দরকার, তাহার বেশী কোথাও থাকিতে পারি নাই। সেইজন্য বেশী কিছু দেখিতে শুনিতে পারি নাই। সাধারণ ভাবে বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্তের এই স্থানগুলি সম্বন্ধে আমার ধারণা এই হইয়াছে, যে, তথাকার লোকেরা অনেকটা উৎসাহী ও উদ্যোগী। অবশ্য, আমার এই বক্তব্যের বিশেষ কোন মূল্য না থাকিতে পারে। কারণ, দুখের বিষয়, আমি ঐ তিন স্থানের ও জেলার কতকগুলি শিক্ষিত লোকের সঙ্গেই কিছু মিশিয়াছি, এবং তাঁহারাও অধিকাংশ স্থলে হিন্দু। জেলা তিনটির অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। কোথাও হিন্দুমুসলমান সাধারণ লোকদের সহিত মিশিবার সুযোগ হয় নাই, তাহার জন্য যে অবসরের দরকার, তাহাও ছিল না।

শিলচর হইতে রেলে শ্রীহট্ট যাওয়া যায়; কিন্তু আমি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার মোটর গাড়ীতে গিয়াছিলাম। পথের দৃশ্য বিচিত্র ও রমণীয়। রাস্তার এক অংশের কিছু দূরে শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃভূমি। পথে বোধ করি গোটা পাঁচ নদী নৌকায় গাড়ী সমেত পার হইলাম। তা ছাড়া, বাঁশের কতগুলা সাঁকোর উপর দিয়া যে মোটর গাড়ী পার হইল, তাহা গুনিয়া রাখি নাই। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ সেতুর উপর দিয়া কেহ সহজে গরুর গাড়ীর ত চালাইবে না। পূর্ব্ব রাত্রে এবং দিনের বেলাতেও বৃষ্টি হওয়ায় আমরা কয়েক ঘণ্টা বিলম্বে শ্রীহট্ট পৌঁছিয়াছিলাম। শ্রীহট্টের একটি অসুবিধা দেখিলাম, রেলওয়ে ষ্টেশন ও সহরের মধ্যে একটি প্রশস্ত নদী বিদ্যমান, কিন্তু সেতু এখনও হয় নাই।

সর্ব্বত্রই আহূত অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের আয়োজন হয়। শ্রীহট্টেও হইয়াছিল। যে-সভায় তাহা হইয়াছিল, তাহাতে বাংলাদেশের পক্ষে কতকটা নূতন এই দেখিলাম, যে,সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন একজন শ্রদ্ধেয়া মহিলা। তিনি শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী, পঞ্জাবের স্বনামধন্য স্বর্গীয় পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। শ্রীহট্টের সন্তান তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার সহিত আমি পূর্ব্বেই পরিচিত ছিলাম। হেমন্তকুমারী দেবী পশ্চিমে মানুষ হইয়াছিলেন বলিয়া, বাংলায় বক্তৃতা করা ছাড়া, হিন্দীতেও বেশ বক্তৃতা করিতে এবং হিন্দী বেশ লিখিতে পারেন। বৃন্দাবন হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভানেত্রীর পদে বৃতা হইয়াছিলেন। হিন্দী গ্রন্থকার বলিয়া তাঁহার নাম আছে। পঞ্জাবে স্ত্রী-শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব আছে। বর্ত্তমানে তিনি পাটিয়ালা রাজ্যে উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা। তাঁহার পুত্রকন্যারা সকলেই শিক্ষিত। চারি পুত্র বিদ্যাবলে সরকারী উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত। এক কন্যা দিল্লীর নারীদের সরকারী মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসা-শিক্ষা বিলাতে সমাপ্ত হয়। এই সভায় আমাকে কিছু বলিতে হইয়াছিল। শ্রীহট্টে আমি জাতিগঠন ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করি। স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, ব্রহ্মমন্দিরে সে-বিষয়ে কিছু বলি। স্থানীয় মুরারীচাঁদ কলেজটি বেশ সুন্দর জায়গায় স্থিত, কিন্তু সহর হইতে অনেক দূরে। এই কলেজে কয়েকটি হিন্দু ছাত্রী ছাত্রদের সঙ্গেই পড়ে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল একজন ওয়েল্‌শ ম্যান, তা ছাড়া আর সবাই বাঙালী। তাঁহার আগে গণিতজ্ঞ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। লাইব্রেরীতে তাঁহার ছবি রহিয়াছে দেখিলাম। বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল সৌজন্যপূর্ব্বক আমাকে সব ঘরবাড়ী ল্যাবরেটরী ইত্যাদি দেখাইলেন। একটি পুরাতন অট্টালিকায় ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতামহ থাকিতেন। কলেজে ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতে হইল। অতঃ-

পর ছাত্রাবাসে আর এক সভা, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও জলযোগ হইল।

শ্রীহট্টের বালিকা-বিদ্যালয়ে বালিকাদের নানারকম গান শুনিয়া ও খেলা দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। গার্লগাইডের ("গৃহদীপের") কাজও তাহারা বেশ শিখিতেছে। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ছাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া কয়েক মিনিট বক্তৃতা করিলাম। জলযোগের পর শিক্ষয়িত্রীদিগকেও সামান্য কিছু বলিলাম। বিদ্যালয়ে যাহা কিছু দেখিবার, প্রধান শিক্ষয়িত্রী তাহা আমাকে দেখাইয়াছিলেন। নদীর পরপারে সরকারী টেক্‌নিক্যাল স্কুল বা শিল্পবিদ্যালয় অবস্থিত। তাহার অস্থায়ী অধ্যক্ষের অনুরোধে বালিকা-বিদ্যালয় দেখার পর উহা দেখিতে গেলাম। এখানে প্রধানতঃ কাঠের কাজ ও লোহার কাজ শিখান হয়। কাজ বেশ হয়। মোটরগাড়ী মেরামতের জন্য ছোট-খাট যে-সব অংশের দরকার হয়, এখন তাহা আর আমদানী করিতে হয় না, এই বিদ্যালয়েই তৈরী হয়। এখানে দমকল প্রভৃতি যে-সব জিনিষ তৈয়ী হইতেছে, তাহাতে বুঝিলাম, যথেষ্ট টাকা যন্ত্র ও শিক্ষা পাইলে আমাদের ছেলেরা বড় বড় সব কলও নির্ম্মাণ করিতে পারে। পরিদর্শনের পর এখানেও বক্তৃতা করিতে হইল—নিস্তার নাই। তাহার পর ছিল শ্রীহট্টের টাউন হলে স্বরাজের আবশ্যকতা ও তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা। বক্তৃতার সময় ছিল বিকালে পাঁচটা কিম্বা সাড়ে পাঁচটা, কিন্তু টেক্‌নিক্যাল স্কুল হইতে নদীপার হইয়া ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় বক্তৃতা আরম্ভ হইল প্রায় সন্ধ্যার আগে। এই বক্তৃতা করিবার একটু ইতিহাস আছে। শিলচরে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একদিন বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি স্বরাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। ঐ সভায় সভাপতিরূপে আমাকেও কিছু বলিতে হয়। তখন আমার মনে হয়, যে, ঐ বিষয়ে অন্যত্রও কিছু বলা উচিত। তদনুসারে শ্রীহট্টে দীর্ঘ বক্তৃতা করি। পরে ইংরেজীতে লাহোর ও এলাহাবাদে ঐ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছি। শ্রীহট্টে এই বক্তৃতা ছাড়া তথাকার সাংবাদিকদিগের সহিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা ও জলযোগ হয়। শাহ জালালের দরগা এবং আরো দু-একটি দ্রষ্টব্য জিনিষমাত্র দেখিয়াছিলাম। মোট দুদিন ছিলাম। কত আর দেখিব শুনিব?

শ্রীহট্টেও আমার ভূতপূর্ব্ব কয়েকজন ছাত্রকে দেখিয়া প্রীত হইলাম।

এখানে বলিয়া রাখি, যেখানে যেখানে গিয়াছি, সর্ব্বত্র সাতিশয় সদয় ব্যবহার পাইয়াছি, যাতায়াতের বন্দোবস্ত যথাসম্ভব উত্তম হইয়াছে, যাঁহাদের বাড়ীতে ছিলাম, তাঁহারা সাতিশয় যত্ন করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট হইতে রাত্রে রওনা হইয়া পরদিন কুমিল্লা পৌঁছি। এখানে সেই জায়গাটি দেখিয়া আসিয়াছি যথায় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুনারীর মানইজ্জত রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হন।

কুমিল্লার অভয় আশ্রম বঙ্গের সর্ব্বত্র পরিচিত। চরকায় কাটা সুতা হইতে খদ্দর প্রস্তুত করা ইঁহাদের একমাত্র কাজ নহে। জাতীয়তাপ্রচার, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একতা ও সদ্ভাববর্দ্ধন, 'অস্পৃশ্যতা' জন্মগত জাতিভেদ ও অন্যান্য সামাজিক কুরীতি দূরীকরণ, এবং রোগীর চিকিৎসার কাজ এই আশ্রমের দ্বারা হইয়া থাকে। এই আশ্রমের নানা বিভাগ দর্শনযোগ্য। ইহার বস্ত্ররঞ্জনবিভাগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের দ্বারা দেশী রঞ্জনকার্য্যের উন্নতির আশা করা যায়। আশ্রমে হিন্দুসমাজের নানা জাতির কর্ম্মী আছেন; কিন্তু রন্ধন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ রাখা হয় না, অন্য জাতির লোক রাখা হয়। আশ্রমের কর্ম্মীরা আমাকে কিছু বলিতে বলায় একটি ছোট বক্তৃতা করিয়াছিলাম।

কুমিল্লার আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য—হাউস্ অব্ লেবারার্স অর্থাৎ শ্রমিকদের পণ্যশিল্পাগার। ইহার বৃত্তান্ত প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র ছাপা হইয়াছে। কষ্টসহিষ্ণুতা, দৈহিক শ্রম ও কারিগরী বুদ্ধি যে-সব কাজে দরকার, শিক্ষিত শ্রেণীর লোকরা সাধারণতঃ তাহা না করায় তাঁহাদের ক্ষতি ও অনিষ্ট হইয়াছে এবং দেশের পণ্যশিল্পের অবনতিবশতঃ দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে। এইজন্য এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আমি আশান্বিত হইয়াছি। বাঙালীর ছেলে বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বুদ্ধি ও দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ কাজ
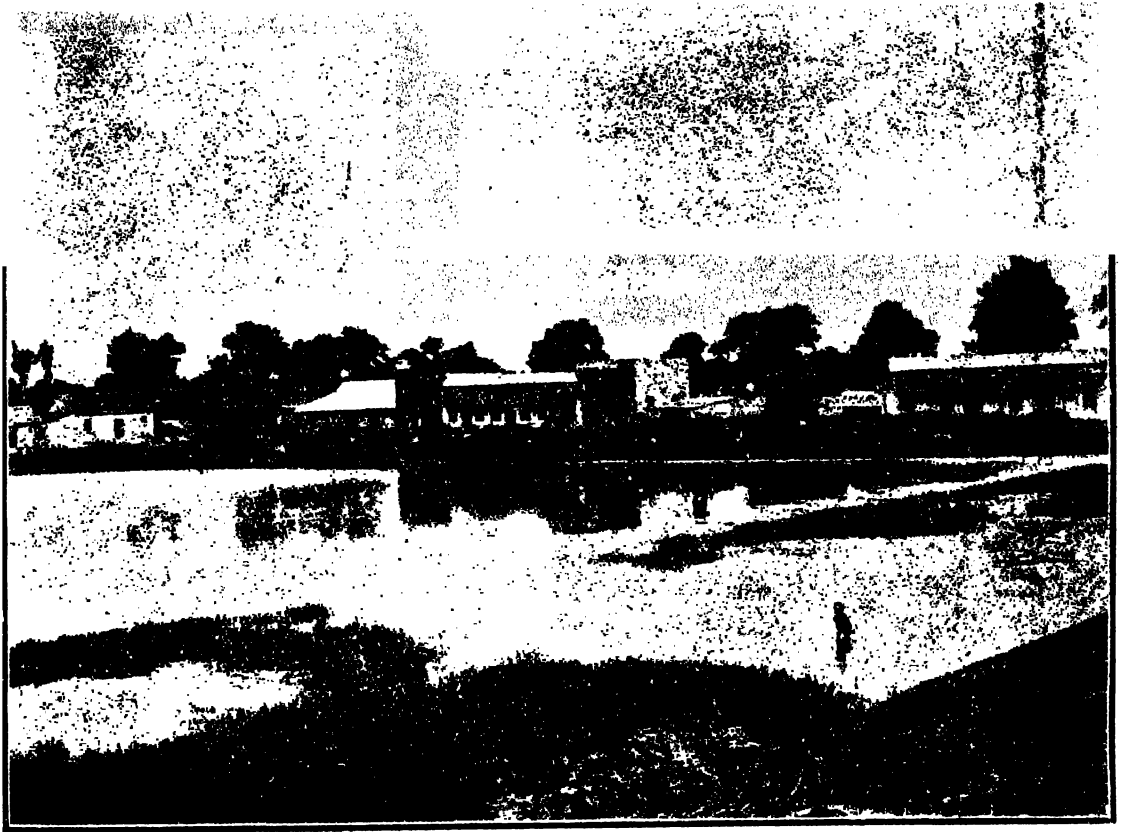
কুমিল্লা অভয়-আশ্রমের সাধারণ দৃশ্য

করিলে তাঁহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা জন্মে এবং তাঁহাদের ও দেশের ধন বাড়ে। কৃষিকার্য্যেও এইরূপ বালক ও যুবকেরা প্রবেশ করিলে ভাল হয়। বুদ্ধি-চালনা-বিবর্জ্জিত শুধু দৈহিক শ্রমের কাজ করা গর্হিত বা অসম্মানজনক না হইলেও তাহাতে কোন গৌরব নাই। কিন্তু যেরূপ কাজে বুদ্ধি খেলে, হাত পা-ও চলে, তাহা সম্মানকর।

শুনিলাম, কুমিল্লার ব্যবসা-বাণিজ্য ও তেজারতী মাড়োয়ারী ও কাবুলী-ওয়ালাদের দ্বারা কবলিত হয় নাই। মাড়োয়ারী ও কাবুলী-ওয়ালাদের কোন অনিষ্টচিন্তা আমরা করিতেছি
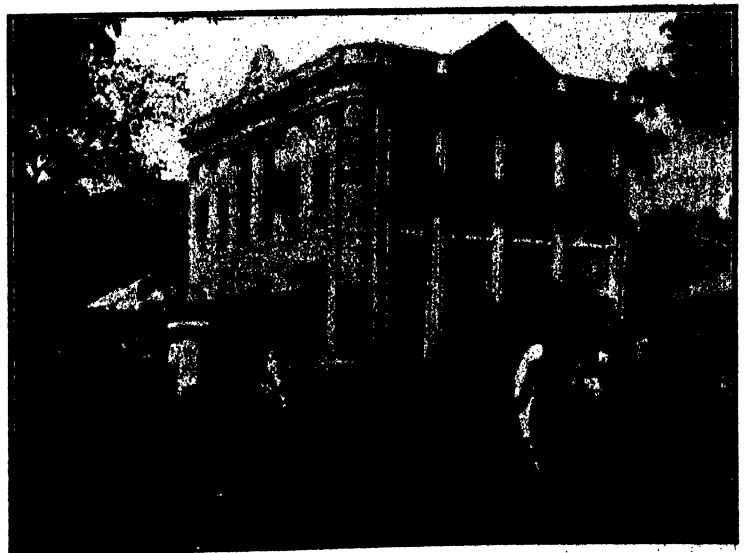
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মহেশ-প্রাঙ্গণ, কুমিল্লা
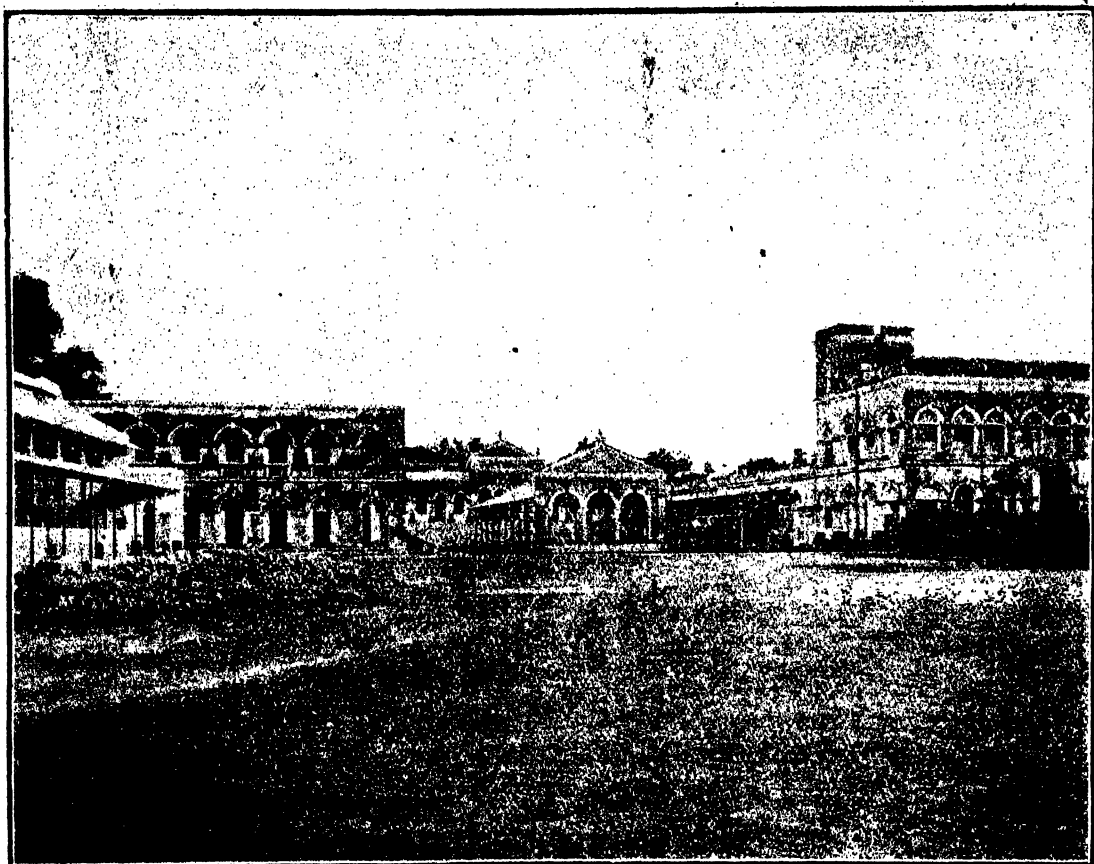
না—যাহাদের যে-বিষয়ে যোগ্যতা আছে সে-বিষয়ে তাহাদের উন্নতি হইবেই। কিন্তু বাঙালীরা নিজের বাসভূমিতে সকল কার্য্যক্ষেত্রে উদ্বাস্ত হইবে, ইহাও স্বাভাবিক বা বাঞ্ছনীয় নহে। কুমিল্লায় দুটি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, তিনটি নাগরিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং দশটি যৌথব্যাঙ্ক আছে। ইহার মধ্যে কুমিল্লা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের তেজারতিতে খাটাইবার মূলধন আছে দশলক্ষ টাকা এবং কার্য্যালয় নিজের বাড়ীতে স্থিত। যৌথ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশ্যন লিমিটেড এবং কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড আধুনিক প্রণালীতে ব্যাঙ্কের কাজ করিয়া থাকে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কাজ তাহার নিজের দুতলা পাকা বাড়ীতে হয় এবং তাহার তেজারতিতে খাটাইবার মূলধন সাড়ে দশ লক্ষ টাকা। শুনিলাম, শীঘ্রই কলিকাতায় ইহার একটি শাখা খোলা হইবে।

কুমিল্লার প্রধান ব্যবসাদার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিজের শ্রম, সততা ও ব্যবসায়বুদ্ধি দ্বারা অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে ধনশালী হইয়াছেন এবং অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ইহার বৃহৎ ব্যায়ামশালা নির্ম্মিত হইতে ও সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে দেখিয়া আসিয়াছি। নিকটেই তাঁহার নিজের ভদ্রাসন। তাহার পাশে স্থিত "মহেশ-প্রাঙ্গণে" বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। রাজনৈতিক বক্তৃতা হইতে কোন বাধা নাই। ইহার চারি পাশ খোলা, উপরে লোহার করোগেটেড চাদরের ছাদ, মেজে পাকা। ইহাতে ও চারিপাশের জায়গায়

চারি পাঁচ হাজার শ্রোতার স্থান হইয়া থাকে। মহেশ-বাবুর প্রতিষ্ঠিত "রামমালা ছাত্রাবাসে" একশত ছাত্র তাঁহার ব্যয়ে প্রতিপালিত হয়। ১৯২৭ সালে কেবল এই ছাত্রাবাসের জন্য তিনি ১১৯৬৮ টাকা তিন পয়সা খরচ করিয়াছেন, রিপোর্টে দেখিলাম।

যাহাতে আমি কুমিল্লার ভদ্রলোকদের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে পারি, তাহার জন্য শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের হলে তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন। সেখানে অনেকে আমাকে নানা প্রশ্ন করেন। জিজ্ঞাসার প্রধান বিষয় ছিল লীগ অব নেশুন্সের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম্ম এবং আমার ইউরোপদর্শনবিষয়ক অন্যান্য কথা। প্রশ্নোত্তরে অন্তত ঘণ্টা দুই সময় লাগিয়া থাকিবে।

স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয় দেখিবার পর আমাকে শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে হয়। এখানে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়ান হয়। প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমাকে বিদ্যালয় দেখাইয়াছিলেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহেই সহরের সমবেত ভদ্র মহিলাদের নিমিত্ত বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

হাউস্ অব লেবারার্স দেখিবার পর উহার শিক্ষিত শ্রমিকদের পক্ষ হইতেও বক্তৃতার দাবী হয়—যদিও তাঁহারা কাজের লোক, আমাদের মত বাগ্-যুদ্ধ ও লিপিযুদ্ধ করেন না। অগত্যা সেখানেও আমাকে কিছু বলিতে হইল। অভয়াশ্রমেও যে আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মহেশ-প্রাঙ্গণে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল, স্বরাজের আবশ্যকতা ও আমাদের যোগ্যতা।

পূর্ব্ববঙ্গের অন্য সব সাধারণ সভার মত ইহাতেও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। প্রাঙ্গণ ও তাহার পার্শ্বস্থ স্থান শ্রোতায় পূর্ণ হইয়াছিল। সেইজন্য, সকলে বক্তৃতা শুনিতে পাইয়াছিলেন কি না, সন্দেহের বিষয়। আমার গলা উঁচু নয় বলিয়া অনেক সময় মনে হইয়াছে, বক্তৃতার জন্য মেগাফোনের মত কিছু ব্যবহার করা যায় কি না।

কুমিল্লার কলেজও দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন কলেজ বন্ধ ছিল। কেবল ঘর বাড়ী, সরঞ্জাম, পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখিলাম। শুনিলাম কলেজ বর্ত্তমান সংকীর্ণ স্থান হইতে বিস্তীর্ণতর একটি জায়গায় উঠিয়া যাইবে।

এযাত্রা পূর্ব্ববঙ্গের তিনটি মাত্র সহর দেখা হইল। কিশোরগঞ্জ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল, যাইতে পারি নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ভ্রমণ আরম্ভ করিলে সমুদয় বাংলাদেশ দেখিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইতে পারিতাম। এখন তাহা দুর্ঘট।

মহিলা-সংবাদ

গত বৎসর (ভাদ্র, ১৩৩৪) আমরা এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের ছাত্রী কুমারী শীলা রায়ের কৃতিত্বের সংবাদ দিয়াছিলাম। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস্‌সি শেষ পরীক্ষায় (রসায়ন-বিজ্ঞান) প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই পরীক্ষায় তিনি Influence of Light on Colloids শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞ পরীক্ষক-মণ্ডলী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রবন্ধটি খুব ভাল হইয়াছে। কুমারী শীলা রায় এক্ষণে ডি-এসসি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। কুমারী রায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও অধিকসংখ্যক ভারতীয় ছাত্রী যদি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন তবে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

সিন্ধু-দেশের মহিলাদের উদ্যোগে সম্প্রতি বিখ্যাত নারীকর্ম্মী শ্রীমতী রূপচাঁদ বিলারামের সভানেত্রীত্বে করাচীতে একটি নারী-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল।

করাচী কারুশিল্প প্রদর্শনী

শ্রীমতী অম্মুকুটি অম্মল
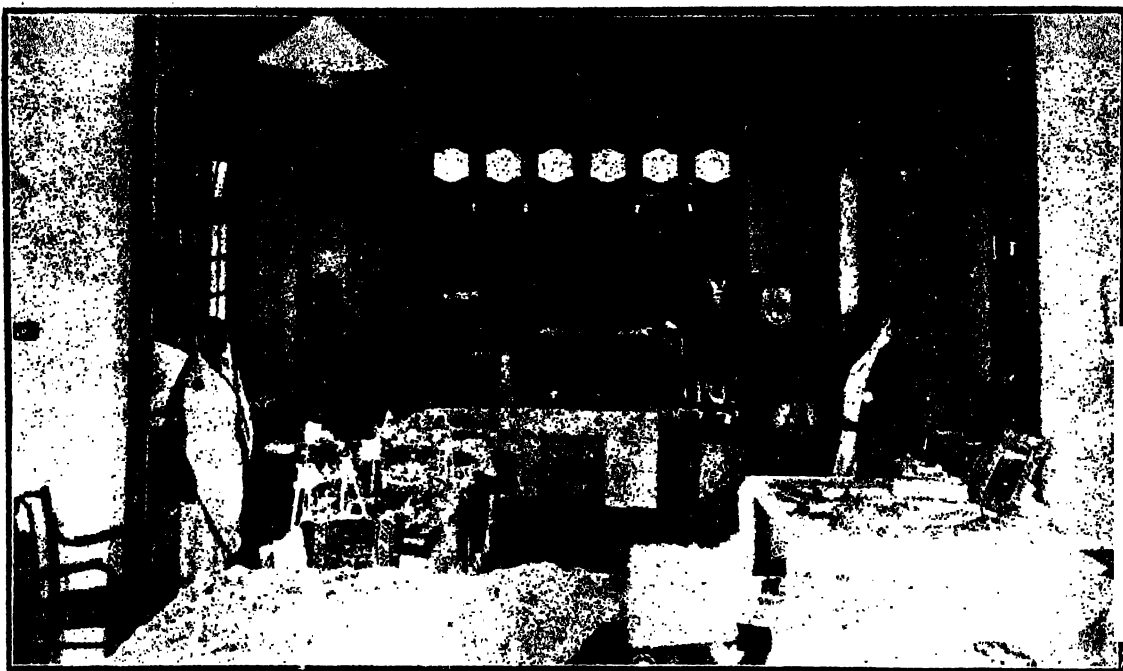
শ্রীমতী ইরাবতী মেহেতা

করাচী নারী-সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ
বাম হইতে—শ্রীমতী চন্দুর সিং, শ্রীমতী দৌলতরাম, শ্রীমতী হরি মেহেতা, শ্রীমতী রূপচাঁদ বিলারাম
কুমারী খুমচাঁদ, শ্রীমতী ধর্ম্মদাস

শ্রীমতী পাল

শ্রীমতী তেমিনা ধনজী মুন্সী

শ্রীমতী বিলারাম কিছুদিন পূর্ব্বে করাচীতে নিজ ব্যয়ে হরি মেহেতা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির
একটি মহিলা-ক্লাব গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। শ্রীমতী সভানেত্রী ছিলেন। এই সময়ে করাচী ভারতীয়

শ্রীমতী লক্ষ্মী বাঈ

বালিকাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একটি কারুশিল্প প্রদর্শনী খোলেন।

সমাজ হিতসাধনের জন্য ভারতসরকার কাশীর শ্রীমতী ইরাবতী মেহেতাকে কাইজার-ঈ-হিন্দ পদকে ভূষিত করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ভারতীয় মহিলাগণ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন :—কুমারী তেমিনা ধন্‌জী মুন্সী (বুলসর ম্যুনিসিপালিটি), শ্রীমতী লক্ষ্মী বাঈ (দক্ষিণ কানাড়া শিক্ষা পরিষৎ), শ্রীমতী পাল (পালমাকোট্টা ম্যুনিসিপ্যালিটি) ও শ্রীমতী অম্মুকুট্টি অম্মল বি, এ, এল, টি (কাঞ্জিভরম ম্যুনিসিপ্যালিটি)।

জীবন-স্মৃতি

অন্তর্লোক যাত্রা—স্পিনোজা (Spinoza)

রম্যা রলাঁ

দ্বিতীয় বার বজ্রনির্ঘোষ—সে দুই বৎসর পরে। ১৮৮২-১৮৮৪ দু'টা বছর কী বিষম পরীক্ষার মধ্যেই কাটিয়াছে! প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইয়াছে বুঝি সব শেষ হয়, অথচ বাহিরের দিক হইতে যারা শুধু জীবনের মোটা বুনোনটার উপর চোখ বুলাইয়া যাইতেছে, তারা কিছুই বুঝিতেছে না। তাহারা দেখিতেছে আমি সেই চিরপরিচিত ঘরোয়া জীবন ও অপরিণত কৈশোরের পাঠাভ্যাসাদির মধ্যেই বেশ দিন কাটাইতেছি। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে যে মর্ম্মান্তিক নৈরাশ্য, যে অতলস্পর্শ নিরয়, যে ভীষণ দৈত্যদানার তাণ্ডব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা কাহারও চোখে পড়িতেছে না। জীবনের মধ্যে এই বয়সটাতেই একবার শূন্যতার মধ্যে যেন তলাইয়া গিয়াছিলাম। "হায় রে সৌখীন যৌবন!" তিক্ত বিদ্রূপের সুরে এই কথাটি কবি স্পিট্‌লার (Carl Spitteler) একদিন আমায় বলিয়াছিলেন ; তিনি তাঁর যৌবন স্বপ্নের যুগটা স্মরণ করিয়া ঐ কথা বলেন—কিন্তু সে বহুকাল পরে—সে কথা পরে হইবে। (রলাঁর "কার্ল স্পিটলার" দ্রষ্টব্য—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) জীবনতরী বান্‌চাল হইয়া তলাইয়া যায় যায়—হঠাৎ অবসাদ-সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত ঘুলাইয়া ঝড়-তুফান ভাঙ্গিয়া পড়ে—আমাকে চুরমার করিয়া অসীম অন্ধকারের মধ্যে বুঝি সমাধিস্থ করে—আবার ঘূর্ণাবর্ত্তের টানে আমার সেই ভাঙ্গাচোরা 'আমি'টাকে উপরে টানিয়া ফেলে—সে যেন সেকস্‌পীয়রের 'ঝঞ্ঝানাট্য' Tempest! এই বয়সটায় সেকস্‌পীয়র এবং বিশেষ ভাবে তাঁর হ্যামলেট আমার কত বড় বন্ধু ও সহায় ছিল তাহা এক কথায় বলিতে পারি না, (মডার্ণ রিভিউ ডিসেম্বর, ১৯২৬ দ্রষ্টব্য) সুযোগ হয়ত সে-কথা পরে বলিব। এখন শুধু বলিয়া রাখি

যে হ্যাম্‌লেটের প্রতি পংক্তি প্রত্যেক কথাটির সঙ্গে আমার জীবনের গভীর প্রশ্নোত্তরগুলি জুড়িয়া তখন যেন একটি "মহাভাষ্য" রচনা করিতেছিলাম।

কিন্তু ভিতরের মানুষটির চেহারা অদ্ভুত রকম বদলাইয়া গেল; কী প্রচণ্ড কী তেজোময় এই রূপান্তর! আমার গলার স্বর, আমার চিন্তা, আমার শরীর, আমার আত্মাও যেন নূতন হইয়া দেখা দিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে ফেয়ারনেজ (Ferney) ছাদে যেদিন প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম জীবন্ত সাক্ষাৎ মেলে সেদিন তত্ত্বচিন্তা বা ভাব-রূপ আমার বুদ্ধির অগোচর ছিল। প্যারিসে স্যাঁ লুই (St. Louis) বিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগে পাঠ লইবার সময় কলের মত সব কথা শুনিয়া যাইতাম কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের এক বর্ণও বুঝিতাম না। সে কথাগুলার না আছে রূপ না আছে রঙ না আছে গন্ধ; হাত দিয়া তাদের স্পর্শ করিতে পারি না, মুখ দিয়া তাদের আস্বাদ করিতে পারি না; আমার ইন্দ্রিয়-গ্রামের কোন আদরে কোন আঘাতেই তারা সাড়া দেয় না—সেই তত্ত্ববিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের কথার কল (mots machines) কত বড় বড় মাথা এতকাল ধরিয়া যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে—সেই বিরাট যন্ত্রগুলার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আমার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিত; অন্ধের মত শুধু অনুভব করিতাম আমার সম্মুখে একটা বন্ধ দরজা! অথচ এক বৎসরের মধ্যে লুই-ল্য-গ্রাঁ (Louis le Grand) বিদ্যালয়ে যাইয়া আমি দর্শন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলাম এবং ডবল প্রমোশন পাইয়া প্যারিসের সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয় Ecole Normale Superieure যোগ দিবার উদ্যোগ করিলাম। আমার সুযোগ্য শিক্ষক মহাশয় আমার প্রবন্ধটি ক্লাসে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতে গেলেন; অথচ তার মধ্যে শয়তানী করিয়া আমি বিখ্যাত দার্শনিক মালব্রাঁশ্‌কে (Malebranche) বিদ্রূপ করিয়াছি! এই সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শনিকটি জন্তুদের আত্মা আছে ইহা মানিতেন না; আমি তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর কুকুরটিকে লেলাইয়া দিয়া কুকুরের মুখে যে কথাবার্ত্তা নাট্যাকারে বসাই তাহা শুনিয়া সকলে হাসিয়া অস্থির! এমনি করিয়া পরিহাসের ধাক্কায় দেখিলাম একদিন হঠাৎ তত্ত্ববিদ্যার দরজা খুলিয়া গেল; আমি অরূপের রাজ্যে

স্পিনোজা

(an royaume du Sans forme) দস্যিছেলের মত হুড় মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম; অবশ্য মানব-রূপের ঝাঁঝ তখনও সেই অরূপ কল্পনার মধ্যে যথেষ্ট ছিল, তবু অরূপের সন্ধান ত পাইলাম সেই যথেষ্ট। সে সন্ধান এমনই সহজে এমনই দুঃসাহসের ভরে কত ছোট বড় দার্শনিক পাইয়া আসিয়াছে।

প্যারিসের শিক্ষায়তনে তখন দর্শনের চাষ বলিতে বুঝা যাইত মাটি খোঁড়া আর উল্টান; ক্ষেত্রটি ছিল সঙ্কীর্ণ; দেকাত (Descartes) চোস্ত করিয়া উঁচু বেড়া দিয়া যে বাগানখানি তৈয়ারি করিয়া গিয়াছিলেন সেটি যেন চিন্তা-রাজ্যের ভেয়ারসাই (Versailles) তার মধ্যেই সকলের চিন্তা ঘুরিয়া বেড়াইত। প্যারিসের এই বিরাট রাজোদ্যানটির মধ্যে মানুষের ধীশক্তি ও সুসঙ্গতির যেমন অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখি দেকাতের দর্শনের মধ্যে ঠিক তেমনই পাই। দেকাত যে খোরাক জোগাইতে পারেন তাহা পুরামাত্রায় আমায় ঠাসিয়া খাওয়ান হইতেছিল। কিন্তু দেকাতের সেই জমকাল বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়া কখন আমার মন তার প্রকৃতিগত টানে বাহির হইয়া পড়িল, দেখিল সম্মুখে উদার দিকচক্রবালের অসীম বিস্তৃতি!

কুকুর যেমন তার সহজ বোধের চালনায় তার শিকার খুঁজিতে ছোটে আমিও তেমনি ছুটিলাম—পথ নির্দ্দেশ করিল শুধু ঋষি স্পিনোজার দুএকটি বাণীস্ফুলিঙ্গ।

মনে পড়ে ওদেওঁ (Odeon) থিয়েটারের তলাকার বইএর দোকান হইতে স্পিনোজার একখানি ফরাসী সংস্করণ কিনি (এটি আজ কাল দুষ্প্রাপ্য)। এই বইখানি সে-সময়ে যেন আমার কাছে শাশ্বত জীবনের সোপান, অমৃতত্বের রসায়ন হইয়া উঠিয়াছিল। আজ হয়ত তার কঠিন যুক্তিবাদের বেড়া ডিঙ্গাইয়া আসিয়াছি, হয়ত তার ভিতরকার কোন কোন যুক্তির অপূর্ণতা আজ আমার চোখে পড়ে, তবু স্বীকার করিব যে বিশ্বাসী খৃষ্টানের কাছে বাইবেল যেমন, স্পিনোজার গ্রন্থও আমার কাছে তেমনই পবিত্র। ইহা আজও যখন স্পর্শ করি ভক্তিমিশ্র অনুরাগে আমার মন ভরিয়া উঠে। যৌবনের প্রারম্ভে প্রবৃত্তির ঘূর্ণীবায়ু যখন আমায় আছাড়-পিছাড় খাওয়াইতেছে তখন আম্‌স্‌টেয়ার দাম নিবাসী মনীষী স্পিনোজার গভীর ভাবনীড়ে অনন্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম একথা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিন বেলা চারটা বাজিয়াছে, শীতকালে বেলা পড়িয়া আসে আকাশ ঘোলাটে—যেন ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে—দিনটা অবসাদভারে আচ্ছন্ন। জানালার কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়া টেবিলটার সাম্‌নে বসিয়া আছি। বাইরে Michelet সড়কের দিকে চাহিয়া দেখি জনপ্রাণী নাই শুধু উত্তুরে হাওয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ছুটিতেছে। বাহিরের দিকে চাহিয়া আছি কিন্তু কিছুই দেখিতেছি না। বদ্ধ ঘরের মধ্যে আমি যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছি। কচ্ছপের মত গুড়ি মারিয়া ঠাণ্ডা হইতে আত্মরক্ষা করিতেছি; ছাত্রাবাসের ছোট্ট, শস্তা ঘরগুলি গরম করিবার কোন ব্যবস্থা নাই, হাত পা কালিয়া যাইতেছে, ওভার-কোট মুড়ি দিয়া কোন রকমে গা-টা গরম করিতেছি। মনটাও পড়ার দুশ্চিন্তায় যেন ম্রিয়মাণ; ঠাণ্ডায় অসাড় আঙুলগুলা দিয়া বই ঘাঁটিতেছি। মরণোন্মুখ দিনের আলো যেন আমার চারিদিকে বিষাদের এক প্রভামণ্ডল বিস্তার করিয়াছে। নির্ম্মম প্রকৃতি, নির্দ্দয় পাষাণ-পুরী ও আমার দুশ্চিন্তার জাঁতাকলে ফেলিয়া কে যেন আমায় পিষিয়া মারিতেছে। আমি যেন চিরবন্দী, কারাগারে আবদ্ধ, পায়ে আমার দুশ্চিন্তার বেড়ী। জীবন-সংগ্রাম-পরীক্ষায় পাশ ফেলের আতঙ্ক, এই সব মিলিয়া আমাদের ছাত্র জীবনকে যেন বিষাক্ত করিয়া তোলে। একাধিকবার নিষ্ফল হইয়া ছাত্র সমস্ত স্বাস্থ্য ও শক্তি নিঃশেষ করিয়া যুদ্ধে নামে, বিতৃষ্ণায় মন বিষাইয়া ওঠে, তবু কোন ক্রমে জয়ী হইতে হইবে। সে যে একটা নৈতিক দায়িত্ব; শুধু নিজে বাঁচা নয়, প্রিয়তম আত্মীয়দের জীবন রক্ষা যে তার উপর নির্ভর করিতেছে; তারা যে আমারই উপর একান্ত নির্ভর করিয়া সর্ব্ব ত্যাগ করিয়াছে —তার প্রতিদান ত দিতে হইবে! হায় দুর্ভাগা দুর্ব্বল! যে দায়িত্বের বোঝা তুই স্বেচ্ছায় ঘাড়ে করিস নাই, যে ভার বহন করিবার শক্তি তোর নাই, কেন তাহা তোর উপর আসিল?

কিন্তু এক দিকে এই দায়িত্ব যেমন পিষিয়া মারে অন্যদিকে ইহা আবার বর্ম্মের কাজ করে; ভারে কাঁধটা যেমন ছিঁড়িয়া পড়ে তেম্‌নি ইহা শক্ত হইয়া ওঠে। এই বিষম ভার না থাকিলে আমি স্বপ্নের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতাম; বদ্ধ চাকের মধ্যে মৌমাছির মত স্বপ্ন অবিরত গুঞ্জন করিতেছে। কিন্তু ঢাক্‌না চাপা পড়ায় সেই ক্ষীণ তীব্র শক্তিটুকু কেন্দ্রীভূত হইয়া বেদনার মধ্যেই একটি আলোক-রেখার দিকে ছুটিতে থাকে। অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাতাস আসিয়া যেমন প্রাণ বাঁচায় তেম্‌নি সেই ক্ষীণ রশ্মিটুকু আত্মাকে জীবন্ত করিয়া রাখে।

সে রশ্মি আমারও কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল। তার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই আমি সে আলোকটি ধরিয়াছিলাম; আমার হাতে যে বইখানি ছিল তার কালো কালো লাইনগুলো যেন কারাগারের গরাদে তবু তার ভিতরেই জ্যোতির রেখা ফুটিয়া উঠিল, আজও যেন তাহা চোখের সাম্‌নে দেখিতেছি। আমার মন্ত্র-মুগ্ধ চোখ একটা অস্বাভাবিক আবেগে পলকহীন—হঠাৎ কালো গরাদে-গুলো যেন কোথায় মিলাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী-বস্তু (স্পিনোজার "Substance" তাঁর Ethics দ্রষ্টব্য) সূর্য্যের মত আমার কাছে প্রকট হইল; কি একটা ধাতব পদার্থ যেন গলিয়া জল জল করিয়া উঠিল—আমার চোখ

ভরিয়া আমার সত্তার ভিতর পর্য্যন্ত পোড়াইয়া যেন ইহা প্রবেশ করিল—আমার প্রাণ আবার উৎসের মত যেন নাচিয়া বাহির হইল।

স্পিনোজার "Ethics" গ্রন্থের চকমকীতে ঘা লাগিয়া দু'একটি স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া পড়িল—প্রথম পৃষ্ঠার চারটি সংজ্ঞা [Definitions ৩, ৪, ৫, ৬ ও ১৫, ১৬ প্রতিজ্ঞা (Proposition); প্রথম অধিকরণ এবং প্রতিজ্ঞা দ্বিতীয় অধিকরণ দ্রষ্টব্য]—সেই এক পৃষ্ঠাই যথেষ্ট!

রহস্যের জালে আমি নিজেকে জড়াই নাই অপরকেও জড়াইতে চাই না। স্পিনোজার বাণীর আসল অর্থটি আমি ধরিয়াছিলাম অথবা তার মধ্যে কোন একটা যাদু আবিষ্কার করিয়াছিলাম বলিয়া স্পর্দ্ধা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। স্পিনোজার গ্রন্থে আমার **অজানা আমিকেই** খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম, স্পিনোজাকে নয়। তাঁর "Ethics" গ্রন্থের প্রথম পাতায় উদ্ধৃত বাণীতে, বিচিত্র হরফে ছাপা তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে আমি পড়িতেছিলাম আমার নিজের কথা—স্পিনোজার বিশেষ অর্থ লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর আমার ছিল না। শিশুর মত তাঁর আড়ষ্ট জিহ্বায় যেন বর্ণ যোজনা করিয়া আমার অপরিণত চিন্তা ও ভাবগুলিকে প্রথম উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। এমনি করিয়া নিজেকে আবিষ্কার করিতে, অথবা নিজেকে গড়িয়া তুলিতেই মানুষ পরের লেখা বই পড়ে। আমরা বই পড়ি না, বইএর ভিতর দিয়া নিজেকেই পড়ি। এখানে যারা যত বৈরাগ্যের বড়াই করে তারা ততই মোহান্ধ। বড় বই কাকে বলি? যে বই তার কালো কাগজের অক্ষরগুলা মগজে ছাপা দেয় টেলিগ্রাফের সঙ্কেত-চিহ্নের মত? না, যার ধাক্কায় অপরের প্রাণ জাগিয়া উঠে এবং বিচিত্র উপাদানের সংযোগে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া যার প্রাণ-শিখা আত্মায় আত্মায় দীপালি উৎসব করিয়া ক্রমশ এক বিরাট অগ্নিস্কন্ধের মত বনে বনান্তরে ছড়াইয়া পড়ে, তেমন বইকেই আমি বড় বই বলি।

সুতরাং স্পিনোজার যে আসল ভাবটি দার্শনিক চিন্তাকে এক নূতন মুক্তির পথে চালাইয়াছে তার কথা আমি বলিব না। আমি বলিব আমার কথা, শৈশব হইতে যে বস্তুর সন্ধানে হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছি তাহার খোঁজ কেমন করিয়া

কিশোর বয়সে র'লা

স্পিনোজার মধ্যে পাইলাম সেই কথাই বলিব। স্পিনোজা যুক্তিবাদীদের অগ্রণী, যুক্তিকে জ্যামিতির মত সুস্পষ্ট রেখা-পাতে পরিস্ফুট করিতে তাঁর দোসর নাই; তাঁর যুক্তি-বিন্যাসের মধ্যে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের নৃত্য দেখিয়া নিবিড় সৌন্দর্য্য-বোধের আনন্দ লাভ করিতাম কিন্তু যে স্পিনোজা আমার হৃদয় হরণ করিয়াছিলেন তিনি সত্য-দ্রষ্টা ঋষি। তাঁর সেই উদার মহান্‌ রূপ আজও আশ্চর্য্য হইয়া দেখি—পেশাদারি দার্শনিকগণের গুরুভার বুক্‌নীর জালে তাহা এমনই চাপা পড়িয়াছে যে প্রায় দেখাই যায় না! কেন তারা আমার মতন দেখিবা মাত্র এই আসল স্পিনোজার সত্যোন্মাদনায় ভরা দৃষ্টি ও বাণী ধরিতে পারে না? "আমাদের যত কিছু ভাবনা ও ধারণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ সত্য বাস্তব পদার্থ হইতেই জন্মায়—ইহা ছাড়া অন্য গতি নাই। কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা বাহিয়া একটি বাস্তব সত্তা হইতে আর একটি বাস্তব সত্তায় উপনীত হওয়া; অবাস্তব আপাত-সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বের রাজ্য বাহিয়া নয়—বাস্তবকে

ছাঁটিয়া একটা সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া নয়, অথবা গোটা মানুষকে মনগড়া একটা তত্ত্বে পরিণত করিয়াও নয়, কারণ, ঐ দুটা পদ্ধতিই সত্যোপলব্ধির পথে বিষম বাধা দেয়"—Treatise or understandingএ স্পিনোজার এই কথাগুলি আমাদের স্তম্ভিত করিয়া দেয়—এই অতি-বাস্তব-যুগের মানুষদের কাছেও বাস্তব তত্ত্বের এই ব্যাখ্যান প্রভূত বিস্ময়ের সঞ্চার করে। কিন্তু স্পিনোজা এই খানেই না থামিয়া ঋষিদের প্রশান্ত সত্য-নির্ভরের সঙ্গে বলিতেছেন,—

"কিন্তু একথা কেহ যেন না ভোলেন যে সত্য-বস্তু, সত্তা অথবা কারণ-পরম্পরা বলিতে আমি এই পরিবর্ত্তনশীল ও সীমাবদ্ধ জিনিষগুলিকে বুঝিতেছি ; মোটেই নয়। আমি বলিতেছি **অপরিবর্ত্তনীয় চিরন্তন বস্তু-প্রবাহের** কথা। (Series des choses fixes et eternelles, Ethics II. 6. দ্রষ্টব্য) Per realitatem et perfectionem idem intelligo অর্থাৎ বাস্তব (Reality) এবং পূর্ণসিদ্ধি (Perfection) আমার কাছে একই বস্তু"।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্পিনোজার কাছে অপরিবর্ত্তনীয় চিরন্তনবস্তুই সত্য বস্তু এবং তাহা বৈশিষ্ট্যগুণ-সম্পন্ন কাল্পনিক নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব নয়। স্পিনোজার কাছে বস্তু-মাত্রেই সার বস্তু-জীবন্ত বস্তু, সকলই প্রাণধর্ম্মী অগণ্য সসীম জগৎ ও অসংখ্য অসীম গুণসমষ্টি (Attributes) ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সত্তার মূল উপাদান (Substance) সেই এক অখণ্ড অসীম সত্তা **সেই এক যিনি বহু হইয়াছেন এবং যাহার বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না** ("L' Etre unique infini L'Etre quiest tout l'Etre et hors duquel il n'y a rien")

এ কী অগ্নিময় সোমরস! আমার কারাগারের প্রাচীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই ত প্রশ্নের জবাব পাইলাম। আমার বেদনা আমার নৈরাশ্যের মধ্যে এই প্রশ্নই ত অস্পষ্ট ভাবে জাগিয়া ছিল, প্রবৃত্তির তাড়নায় ঝড়ের মত ছুটিয়াছি, কতবার ডানা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছি, তবু থামি নাই, একগুঁয়ের মত খুঁজিয়াছি, কোথায় প্রশ্নের সমাধান? রক্তাক্ত ক্ষত রক্তঅশ্রু লইয়াও ছুটিয়াছি, ঐ প্রশ্নের ঈপ্সিত উত্তর চাহিয়াছি—এই ত আজ আশৈশবের সমস্যা মিটিয়া গেল—কি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মীমাংসা! একদিকে আমার অন্তরাত্মার অসীম গৌরব অন্যদিকে আমার খণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণতা ও দীনতা। এই বিষম নিষ্ঠুর দ্বৈত-সংঘর্ষে (antinomie accablante) যেন শ্বাসরোধ হইতেছিল, আজ বাঁচিয়া গেলাম! **স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই অভিন্ন সত্তা** (Nature naturante Ethics I, 29) যাহা কিছু আছে তাহা ভূমাতেই আছে (Tout ce qui est, est en Dieu, Ethics I, 15) সুতরাং আমিও ভূমাতেই আছি! এমনি করিয়া শীতের রাত্রে আমার সেই বরফের মত ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে কাঁপিতে কাঁপিতে বস্তুর করাল গহ্বর পার হইয়া সত্তার অমিত কিরণে নবজন্ম লাভ করিলাম ; এই নব সূর্য্যালোকে অভিনব দিকচক্রবাল দেখিতে দেখিতে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কত ঊর্দ্ধে উড়িয়া এই স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছি, তবু এই অপূর্ব্ব অনুভূতি যেন স্বপ্নকেও ছাড়াইয়া যায়। শুধু আমার দেহ নয়, আত্মা নয়, আমার সমগ্র জগৎ যেন এক সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে স্নান করিতেছে। সেই অসীম ব্যাপ্তি ও অসীম চিন্তার সাগরকে কেউ অতিক্রম করিতে পারে না। আবার সেই তলহীন সমুদ্রের বুকেই যেন অন্য অনেক অজানা সমুদ্রের অন্তহীন কল্লোলসঙ্গীত শুনিতেছি—এই ত নামরূপের সাগর! ইহার বর্ণনা অসম্ভব, ইহার ধারণা চিন্তার অতীত, অথচ এ সমস্তই সত্তার অসীম সাগরে সহজে ভাসিতেছে ; স্পিনোজার সহজ প্রজ্ঞা ইউরোপীয় চিন্তার রুদ্ধ আকাশ যেন উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের তিনি একজন পুরোধা, এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাস হইতে তিনি দুই শতাব্দী আগাইয়া আছেন। আমাদের অতি আধুনিক এই জগতকে স্পিনোজা বলিবেন, "মানুষী মূর্ত্তিতে ভর করিয়া বেশী দূর ভাসিতে পারিবে না, কূলে লাগাত দূরের কথা"। কিন্তু সেই সঙ্গেই অটল সত্যের অমোঘ সাক্ষ্যও তিনি আমাদের দিতেছেন—সত্য আমাদের বিশেষ চেতনার জগতে একটি খণ্ড তথ্য মাত্র নয়, সত্য আমাদের বুকের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়া আমাদের সঙ্গে চিরদিন এক হইয়া আছে।

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমার এই সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের খাঁচায় যে সত্তার শ্বাসরোধ হইতেছিল তাহা যেন এক বিরাট জগতের

উত্তরাধিকার পাইয়া অসীম ধনে ধনী হইয়া উঠিল। অথচ এই বিপুল আত্মপ্রসারের চাপ আমার হৃদয়ের উপর এতটুকুও পড়িল না। ডানা মেলিয়া সেই উদার আকাশে উড়িতে লাগিলাম এবং সেই সর্ব্বতোমুখ একের দিকে চাহিয়া অপলক নেত্রে তাঁকে দেখিতে লাগিলাম—আমার প্রতি শ্বাসে তাঁর শ্বাস, তিনি আর আমি একা Facies totius universi—নিখিল বিশ্বের মুখ এইত দেখিতেছি! ঐ ভূমা হইতে নিঃসৃত এক স্বাধীন বিধান যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তার দক্ষিণ হস্তে আমায় নির্ভর দিল, আর আমি পড়িয়া যাইব না, আমি যে তার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছি, আমার পতনে যে তারই পতন। "যদি একটি কণাও ধ্বংস হয় তাহা হইলে তাঁর অসীম ব্যাপ্তি অলীক স্বপ্নের মত মিলাইয়া যাইবে"—কত বড় সাহসের কথা! আমি যদি পড়ি ত তাঁরই বুকের উপর পড়িব। আর কোন উদ্বেগ নাই, শান্ত হইলাম, সঙ্গীতের শেষে সমের পূর্ণতায় আসিয়া আমার যেন আনন্দ আর ধরে-না।

"কোন এক শাশ্বত বিধানে জানি না, যখন একবার আমার আমিত্বের চেতনা, বস্তু-চেতনা, ভূমার চেতনা লাভ করিয়াছি তখন আর আমি মরিতে পারি না। আত্মার অচঞ্চল শান্তি এখন হইতে আমার চিরকালের সম্পত্তি।"

স্পিনোজার এই শেষ কথাগুলি শুধু পড়িলে চলিবে না, শুধু বুদ্ধির সাহায্যে ইহার মর্ম্ম-কথা মিলিবে না, হৃদয়ের উত্তপ্ত আবেগ ও ইন্দ্রিয়-গ্রামের আকুল আলাপ ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে, সেই ভাবোন্মাদনার প্রত্যেক স্নায়ু-নর্ত্তনটি অনুভব করিতে হইবে। এই ভাবোন্মাদকে (Beatitude) আমাদের কৃষ্ণ Christ বলিয়াছেন **প্রেম**—মানুষের ভোগস্পৃহা যতটা মাধুর্য্য কল্পনা করিতে পারে তাহা অপেক্ষাও এই প্রেম মধুর।

"অনন্ত জীবন? সেও শুধু প্রাণধারণের অসীম আনন্দ।" ইহা সে যুগের কটমট লাটিন ভাষায় স্পিনোজা তাঁর বন্ধু Meyerকে লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজও আমার চোখ, আমার হাত, আমার জিভ আমার প্রত্যেক স্পর্শেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া যেন ঐ সরস কথাগুলি চাখিয়া আস্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

জরথুস্ত্রের শান্ত হাস্য! ইহার পরিচয় লাভ করিবার জন্য আমায় নীটশের (Nietzsche) পথ চাহিয়া থাকিতে হয় নাই। আজও সেই হাস্যের প্রতিধ্বনি শুনিতেছি, তার মধ্যে কি অপূর্ব্ব সঙ্গতি, কি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য—এ যেন শিলারের (Schiller) "আনন্দ-বন্দনা" বেটোফেনের অমর সঙ্গীতে মুখরিত।

"আনন্দ! সে যে এক অদ্ভুত আবেগ—ইহা শরীরের শক্তি বর্দ্ধন করে—আনন্দ সর্ব্বদা কল্যাণকর, ইহা অসংযমে লইয়া যায় না; হাঁসি'ও তেমনি বিশুদ্ধ তেমনই মঙ্গলকর। আনন্দ যতই বাড়ে আমাদের পূর্ণতাও ততই বাড়ে।"

"খাদ্য, সুগন্ধ, রঙ, সুন্দর পোষাক, সঙ্গীত, নৃত্য, খেলা,—যাহা কিছু অপরের অনিষ্ট না করিয়া আমাদের আনন্দ দেয় সমস্তই উপভোগ কর।"

"জীবনের যত কিছু দান সব উপভোগ কর, পরকে আপন কর—মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করাইয়া দাও, কারণ যাহা কিছু মিলনে সাহায্যে করে তাহাই কল্যাণকর। আপন সুখ অপরের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ কর, **পূর্ণ জ্ঞানে নিখিল বিশ্বের সঙ্গে এক হইয়া যাও।**

স্পিনোজার এই বাণীর সহিত Beethovenএর Ninth Symphonyর সুরের অদ্ভুত মিল—

"হে অগণ্য প্রাণিসংঘ! আমাকে আলিঙ্গন দাও"
Embrassons-nous, millions d' Etres!

[অপ্রকাশিত মূল ফরাসী হইতে অধ্যাপক কালিদাস নাগ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। লেখক মহাশয় ইহা কেবল বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। অন্য কোন ভাষায় ইহার অনুবাদ নিষিদ্ধ—প্রঃ সঃ]

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩। সিঙ্গাপুরে চীনাদের মধ্যে

ক্যঙ্-এর বাড়ী দক্ষিণ চীনের হোক্কিয়েন Hokkien বা ফু-চিয়েন Fu-Chien প্রদেশে। কার্য্য উপলক্ষে এঁর পিতা উত্তর চীনে ছিলেন, তাই ক্যঙ্-ভ্রাতৃগণের শিক্ষা উত্তর চীনে হয়। চীন দেশের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে একটি অখণ্ড চীনা ভাষার প্রচলন এখন আর নেই। প্রাচীন কালে যে চীনা ভাষা ছিল, সে ভাষা শতকের পর শতক ধ'রে ব'দলে ব'দলে চীন দেশের নানা অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধ'রে ব'সেছে। প্রাচীন লিপি ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু লিপির অক্ষরগুলির উচ্চারণ প্রদেশ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। যেমন চীনা চিত্রলিপিতে উল্টা V এর আকারে একটি অক্ষর—Λ—এর মানে হ'চ্ছে 'মানুষ'; এখনকার মতনই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন চীনায় এই অক্ষরের অর্থ ছিল 'মানুষ', আর তখন শব্দটির উচ্চারণ ছিল * n'z'ian; কিন্তু এখন উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গিয়েছে উত্তর চীনে (পেকিঙ-এ) zhan, দক্ষিণ চীনে (কাণ্টন্-এ) nin, অন্যত্র ren, বা jin. 'বুদ্ধ' শব্দটি ভারত থেকে চীন দেশে যখন প্রথম নীত হয়—খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে—তখন তার চীনা অনুকরণ হয়েছিল *Bhyuwad বা *Bhyuwat (একাক্ষর Buddh শব্দের আধারের উপর); পরে নানা বিকারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমাদের 'বুদ্ধ', প্রাচীন চীনার *Bhyuwat শব্দ পেকিঙ-এর উচ্চারণে এখন দাঁড়িয়েছে Fu 'ফু'-তে, আর কাণ্টনে Fat 'ফাৎ'-তে; কিন্তু বুদ্ধ-বাচক অক্ষরটী এখন অবিকৃত আছে, আর সর্ব্বত্র 'বুদ্ধ' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা উচ্চারণে Fu 'ফু'-ই হোক, আর Fat 'ফাৎ'-ই হোক। তদ্রূপ সংস্কৃত নাম 'কাশ্যপ' খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীনে নীত হয়, Ka-shyap(a) দুইটি অক্ষরের দ্বারা এই নামটিকে জানাবার চেষ্টা হয়; প্রাচীন ভারতের প্রাদেশিক উচ্চারণ ধ'রে তখনকার চীনে ভাষায় এর উচ্চারণ দাঁড়ায় *Ka-zbyap; এখন ঐ দুটি অক্ষরই আছে, কিন্তু উত্তর চীনে তাদের ধ্বনি দাঁড়িয়েছে Chia-yeh 'চিয়া-ইয়েঃ,' আর দক্ষিণ চীনে Ka-yep 'কা-ইয়েপ্'। একই চীনা নাম উত্তরের উচ্চারণে Hsuan Chwang বা Yuan-Chuang, আর দক্ষিণের উচ্চারণে Hiuen Tsang. দক্ষিণ চীনের একটি প্রদেশ, প্রাদেশিক উচ্চারণে Hok-Kien, পেকিঙ-এর উচ্চারণে Fu-Chien. চীন দেশের একজন বড় ডাক্তার, শাংহাইয়ে ডাক্তারী করেন, প্লেগের চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা ক'রে ইনি সমগ্র ইউরোপেও খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছেন; এঁর নাম হ'চ্ছে Dr. Wu Lien-teh of Shanghai, formerly Dr. Ngoe Lim Tock of Singapore; ইনি দক্ষিণ চীনের লোক; যে-তিনটি চীনা অক্ষরে এঁর নাম লেখা হয়, কাণ্টনের উচ্চারণে সে-তিনটি পড়া হয় Ngoe Lim Tock 'ঙো-লিম্-টক্'—সিঙ্গাপুরে যখন ইনি ডাক্তারী ক'রতেন, তখন সিঙ্গাপুরের সব চীনারা দক্ষিণী ব'লে, সাধারণতঃ কাণ্টনের উচ্চারণ রোমান অক্ষরে লেখা চ'ল্‌ত; কিন্তু শাংহাইয়ে বাস আরম্ভ করায় সেখানকার কায়দা মোতাবেক Wu Lien-teh'বূ লিএন্-তেঃ' উচ্চারণ ক'রতে হয় ব'লে, ডাক্তারের নামের রোমান অক্ষরে এই নোতুন বানান ক'রতে হ'য়েছে; আর স্থল বিশেষে এঁর পূর্ব্ব-পরিচয় জানাবার জন্য এইরূপ formerly লিখে দিতে হয়।

এই উচ্চারণ-পার্থক্য, যেটি ভাষার সাধারণ গতি প্রসূত, সেটি এখন চীনদেশে ভাষাগত অনৈক্য এনে দিয়েছে। উচ্চারণগত পার্থক্য তো আছেই; তার উপরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে আবার ভাষার ব্যাকরণের রীতি ব'দলে, তার শব্দ-বিন্যাসের পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন এনে নোতুন নোতুন চীনা উপভাষার উদ্ভব ক'রে ফেলেছে।

চলতি কথাবার্ত্তার ভাষায় এখন এই অনৈক্যকে দূর না ক'রলে সমগ্র চীনের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য আর তাকে অবলম্বন ক'রে রাষ্ট্রগত ঐক্য হওয়া দুর্ঘট। চীনা লিপি অবশ্য আছে ; এই লিপি মুখ্যতঃ ভাবদ্যোতক, ধ্বনিদ্যোতক নয়। অক্ষরটী চোখে দেখলে পরে তবে সমস্ত অঞ্চলের চীনারা তার অর্থ বোধ ক'রতে পা'রবে, কিন্তু তার এক জায়গার উচ্চারণ ধ'রে তাকে প'ড়লে আর পাঁচ জায়গার লোকেরা বুঝ্তে পা'রবে না। ইংরিজি k,g,t,d, a,e,i,o, বা ভারতীয় 'ক,গ,ত,দ, আ,এ,ই,ও', প্রভৃতির মতন ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালা চীন দেশে চালাতে গেলেই, Λ = 'মানুষ' সর্ব্বত্রই, তা উচ্চারণে যাই হোক্ না কেন,—এই যে বড়ো একটা ঐক্য আছে সেটা তখনি ভেঙে যাবে ; প্রাদেশিক ভাষাগুলি ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালায় বানান ক'রে শব্দগুলিকে নিজের নিজের উচ্চারণ অনুযায়ী ক'রে লিখতে সুরু ক'রলেই আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র পরস্পরের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষাতে নিজের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে ফেলবে।

এই ভাষা-সঙ্কট চীনের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পক্ষে সব-চেয়ে বড়ো সমস্যা। আধুনিক চীন এখন এই ভাবে এর সমাধানের চেষ্টা ক'রছে ;—রাজধানী (বা রাষ্ট্রকেন্দ্র) পেকিঙ (পে-চিঙ) এর উচ্চারণকে এখন প্রামাণিক ব'লে মেনে নিয়ে, সমগ্র চীনেদেশের ইস্কুল চীনা-ভাষা পড়াবার জন্য এই উচ্চারণই শেখানো হ'চ্ছে ; যাতে ছেলেরা বড়ো হ'য়ে পেকিঙের ভাষাকেই চীনাভাষার রাষ্ট্রিক স্বরূপ ব'লে মেনে নেয়। চীনদেশের প্রায় বারো আনা অংশে মোটামুটি এই উত্তর চীনা ভাষা বা তার নিকট সম্পৃক্ত ভাষাই চলে, আর অন্য প্রাদেশিক ভাষা বলিয়ে' লোক বাকী চার আনা নিয়ে। এর ফলে, ছেলেরা ঘরে হয়ত 'মানুষ' ব'লতে nin শব্দ ব্যবহার ক'রবে, কিন্তু ইস্কুলে শিখবে zhan ; আর পেকিঙের ভাষার অনুমোদিত বাক্যবিন্যাস আর শব্দ-গঠন-প্রণালী শিখবে। অর্থাৎ ছোটো বেলা থেকেই এরা ঘরোয়া ভাষা বা মাতৃভাষাকে ছেড়ে আর একটি ভাষা, উত্তর চীনের ভাষাকে শিখ্তে থাকবে। এ কতকটা যেন বাঙালীর ছেলে পাঁচ বছর বয়স থেকে বাঙলা শব্দ না শিখিয়ে একেবারে হিন্দী বা মারহাট্টি ধরানোর চেষ্টার মতন। গত্যন্তর না থাকায় সাধারণতঃ চীনারা এই সমাধানকেই মেনে নিয়েছে। স্বাভাবিক সমাধান অবশ্য এটাই হ'ত, যে, ভাষার বিকাশকে স্বীকার ক'রে নিয়ে, পনেরো শ' বছর আগেকার পুরাণো চীনাভাষার পরিবর্ত্তনে উদ্ভূত কতকগুলি আধুনিক চীনা ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া। কিন্তু তা হ'লে রাষ্ট্রীয় একতায় ঘা লাগে, সেটা কেউ চায় না। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনকে এখানে রাষ্ট্রীয় আর সামাজিক ব্যবস্থার সামনে গৌণ স্থান স্বীকার ক'রতে হ'চ্ছে ; কিন্তু প্রকৃতি এতো সহজে পরাজয় মানবে না।

ফ্যঙ্ শিক্ষক হ'য়ে এসেছেন মালাই দেশে। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা চীনাদের এই বিশেষ ভাষা-সঙ্কটের পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। তিনি ঘরে Hokkienএর প্রাদেশিক ভাষা বলেন, কিন্তু আধুনিক চীনার কাম্য পেকিঙের ভাষা দখল ক'রেছেন। Hokkienএর উচ্চারণ ধ'রে এর বংশ-নাম (চীনে নামে বংশ-নাম বা পদবী আগে বসে) লেখা উচিত Hong 'হঙ,' কিন্তু পেকিঙের উচ্চারণের রেওয়াজ মেনে নিয়ে এঁরা রোমান অক্ষরে লিখতে আরম্ভ ক'রেছেন Feng ফ্যঙ। এই দুরকমের চীনাভাষা ছাড়া অন্য রকমেরও চীনা প্রাদেশিক ভাষা তিনি জানেন। মালাই অঞ্চলের চীনারা দক্ষিণ চীনের এই কয়টা প্রাদেশিক ভাষা ব'লে থাকে—কাণ্টনী ভাষা বলে তিন লাখ বত্রিশ হাজার, হোক্কিয়েন তিন লাখ আশী হাজার, Kheh খেঃ বলে দু'-লাখ আঠারো হাজার, Tie-chiu তিয়ে-চিউ এক লাখ ত্রিশহাজার,আর Hailam হাই-লাম অর্থাৎ দক্ষিণ চীনের Hai-nan হাইনান দ্বীপের ভাষা বলে আটষট্টি হাজার। ফ্যঙ কাণ্টনীও জানেন, বেশ ব'লতে পারেন। সিঙ্গাপুরে থাকতে থাকতেই ঠিক হ'ল যে আমরা ফ্যঙকে চীনা সহকর্ম্মী, দোভাষী আর সেক্রেটারী হিসাবে আমাদের দলে নিয়ে মালাই দেশের যেখানে যেখানে আমাদের যেতে হবে সেখানে সেখানে যাবো। এইরূপ ভাষাবিৎ উৎসাহশীল চীনা যুবক ফ্যঙ্-এর সাহায্য পাওয়ায় আমাদের বিশ্বভারতীর দলের পক্ষে নানা বিষয়ে চীনাদের সঙ্গে মেলামেশা আর হৃদ্যতা করা সহজ হ'য়েছিল। চীনাদের মধ্যে থেকে কবির সম্বর্দ্ধনা সর্ব্বত্রই হ'ত, নানা চীনা প্রতিষ্ঠানে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রত। বহু

স্থলে যাঁরা আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রছেন তাঁরা ইংরিজি ভালো জানেন না, বা একটুও জানেন না। ফ্যঙ তাঁদের বক্তব্য বা অভিভাষণ শুনে—তা হোকিয়েনেই হোক্ বা কাণ্টনী চীনায়ই হোক্—মুখে মুখে ইংরিজিতে তরজমা ক'রে দিতেন। আবার কবি যখন ইংরিজিতে বক্তৃতা দিতেন, ফ্যঙ'ও অবস্থা বুঝে' যথোচিত প্রাদেশিক চীনা ভাষায় (ইস্কুল-টিস্কুল হ'লে সাধারণতঃ উত্তর চীনা সাধু ভাষায়) ভাষান্তর ক'রে দিতেন। আর বহু স্থলে চীনারা যখন কবির কাছে আস্‌ত, তখন ফ্যঙকেই দোভাষীর কাজ ক'রতে হ'ত। এ ছাড়া, ফ্যঙ চীনা খবরের কাগজেও কবির বক্তৃতা সম্বন্ধে, বিশ্বভারতী সম্বন্ধে প্রবন্ধ বা সংবাদ লিখতেন। কবির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকায়, আর কবির লেখা পড়ার দরুন কবির চিন্তার ধারার সঙ্গে পরিচয় থাকায়, ফ্যঙ আমাদের একজন খুব চমৎকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহকর্মী হ'য়েছিলেন।

ফ্যঙ ইংরিজিতে যাকে বলে খুব serious-minded অর্থাৎ চিন্তাশীল আর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। চীনের সমস্যা, এশিয়ার সমস্যা, বিশ্বের তাবৎ জাতির পলিটিক্স, চীনা সাহিত্য, চীনা সংস্কৃতি, বিশ্বভারতীর আদর্শ বিশ্বসমন্বয়বাদ,—এই সব বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হ'ত। ফ্যঙ গম্ভীর মনোযোগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনতেন। কিন্তু বহুকাল ধ'রে হাসি-ঠাট্টা-মস্করায় এঁকে বেশী যোগ দিতে দেখিনি। সভার মধ্যে কবির ইংরিজি বক্তৃতা যখন চীনাতে অনুবাদ ক'র্‌তেন, তখন ফ্যঙ-এর মুখে কোন ভাব-বৈচিত্র্য নেই, গম্ভীর মুখ ক'রে চোখ বুজে কর্কশ দক্ষিণা চীনা ভাষায় কথাগুলি সুর ক'রে উচ্চারণ ক'রে ক'রে ফ্যঙ তারস্বরে ব'লে যেতেন। অন্য সময়েও সেইরূপ তাঁর ভাব-বৈচিত্র্যহীন বদনমণ্ডলে কোন হর্ষবিষাদের, কৌতুক বা অস্বস্তির রেখা ফুটে' উঠত না। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য একদিনও আমাদের একটি কথা বলেননি, অথচ বেশ নির্ব্বাক্‌ভাবে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চ'ল্‌তেন। আর যে-কাজের ভার নিতেন, বা স্বতঃই যে-কাজের কথা ব'ল্‌তেন, তা সমাধা ক'র্‌তেন। এইরকম ভাবে চলায়, ফ্যঙের চরিত্রের একটা দিক্—তার lighter side বা ফুর্ত্তিপূর্ণ হাল্‌কা দিক্‌টা—অনেকদিন ধরা পড়েনি। আমাদের হাসি-ঠাট্টায় (বন্ধুবর আরিয়াম্ থাকায় তাঁর বোঝবার জন্য ইংরিজিতেই আমরা কথা কইতুম) সে বড়ো একটা যোগ দিত না, কোনও হাসির কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌লে সে অবশ্য হেসে উঠত—তা যেন কেবল ভদ্রতার খাতিরে ব'লে আমাদের মনে হ'ত। হঠাৎ একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফলে ফ্যঙ-ও যে প্রাণ খুলে হাস্‌তে পারে তার পরিচয় পাওয়া গেল, আর সেই থেকে ফ্যঙ একেবারে অন্য মানুষ, যেন আমাদের মধ্যে যে একটা বাধো-বাধো ভাব ছিল সেটা সেই থেকে অন্তর্হিত হ'ল। আমরা মালাই দেশের উত্তরে একটা ছোটো শহরে সন্ধ্যের দিকে উপস্থিত হই। সমস্ত বিকালটা ট্রেণে লম্বা পাড়ী দিয়ে এসেছি, সকলের খুব খিধে পেয়েছে। আমাদের বাসাবাড়ী—চমৎকার বাড়ী একটি আমাদের থাকবার জন্য ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল—সেখানে অভ্যর্থনাকারী ভারতীয়, চীনা আর মালাইরা আমাদের নিয়ে গেলেন। ফ্যঙ-ও আমাদের সঙ্গে উঠলেন; ফ্যঙকে নিয়ে আমরা ছয়জন, আর স্থানীয় জনদুই ভদ্রলোকও রইলেন। সন্ধ্যের পর যখন আহারের পালা এল, তখন শুনলুম, স্থানীয় একজন ভারতীয় ভদ্রলোক আমাদের খাবার পাঠাবার ভার নিয়েছেন। রাত্তিরও হ'য়ে যাচ্ছে,—বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে যাঁরা রইলেন সেই স্থানীয় ভদ্রলোকেরা টেলিফোঁ ক'রে তাড়া দিয়ে খাবার আনালেন। খাবার এল—ভাত, দালের সুপ, পুরী, ভাজী, পায়স—পূরা নিরামিষ খাদ্য। এতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের কোনও অসুবিধার কথা নয়। কিন্তু প্রথম তো চীনারা ভীষণ মাংসাশী জা'ত। তারপর তরকারীগুলিতে ছিল বেশ লঙ্কার ঝাল, "বাবা"-চীনারা তা বরদাস্ত ক'র্‌তে পারলেও ফ্যঙ-এর মতন আহেলি-চীনের চীনার পক্ষে একেবারে অচল—চীনারা তরকারীতে লঙ্কা খায় না। আর সব তরকারীতে বেশ ঘীয়ের গন্ধ ভুরভুর্ ক'র্‌ছিল—এদিকে চীনা মালাই প্রভৃতি জা'ত দুধ-ঘী মোটেই সহ্য ক'র্‌তে পারে না। টেবিলের চার ধারে ব'সে, আমরা দু' তিনবার ক'রে চেয়ে খেলেও ফ্যঙ বেচারীর মুখ দেখে আমাদের সকলেরই দুঃখ হ'ল—একখানি মূর্ত্তিমান্ ট্রাজেডী। সে রাত্রের আহারটা পুরোপুরি সাত্ত্বিক না হ'য়ে একটু রাজসিক হ'লে পথশ্রান্ত আর ক্ষুধার্ত্ত

আমরাও যে অখুশী হ'তুম তা নয়। এখন সঙ্গে ছিল দু টিন ক্রীম-বিস্কুট, বা বিকালে চায়ের সঙ্গে খাবার জন্য বিলিতি মেঠাই-বিস্কুট। প্রস্তাব করা গেল যে, ডা'ল-ভাত-ভাজীর পর্ব্ব শেষ ক'রে নতুন পদ হিসাবে বিস্কুট কিছু খাওয়া যাক্। এতে ফ্যঙ হঠাৎ খুশী হ'য়ে পুলকের চোটে হেসেই আকুল। তার পর থেকে, সঙ্গে বিস্কুটের টিন রাখার মতন বিমৃষ্যকারিতা আর ভবিষ্যদর্শন আর কিছুই নেই, এই কথা ব'ল্‌লেই ফ্যঙ অসীম কৌতুক অনুভব করে। এর পরের দিন থেকে আমাদের গম্ভীর-প্রকৃতি ফ্যঙ, সর্ব্বদা দুর্ব্বোধ্য মুখ-ভাব নিয়ে চোখে একটি দূর-জগতের প্রতি লক্ষ্য নিয়ে যে থাক্‌ত, সে যেন একেবারে ব'দ্‌লে গেল। সে আর সে মানুষ নয়—তার মনের পরদা খুলে' গেল, হাসি-ঠাট্টা, তার চার-পাশের জগতের প্রতি কৌতুকময় নেত্রপাত, সরস কথাবার্ত্তা—এ সব যেন নোতুন ক'রে এল। একজন আনকোরা ক্ষুধার্ত্ত চীনার পক্ষে ভারতীয় ভাত-ডাল-পুরীর ঘৃত-সুরভি shock বা সংঘাত,—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-বাঁচানো শেষরক্ষাকারী বিস্কুটের টিন্ দুটির প্রতিক্রিয়া, এই দুয়েতে যেন তার প্রকৃতিকে ব'দ্‌লে দিলে। ফ্যঙ-এর এই পরিবর্ত্তন দেখে আমরা বিস্মিত আর পুলকিত হ'য়ে গেলুম। কবি পরে ব'ল্‌লেন, এটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যে কোনো ছেলে হয়তো ছোটো বেলায় খুবই নির্ব্বোধ থাকে, কোনো বুদ্ধি বা জলুশের পরিচয় সে দেয় না, কিন্তু একটু ডাগর বয়সে হঠাৎ একটা কোনো বিশেষ ঘটনায় বা কথায় কখনো কখনো তার মনে প্রবল আঘাত লাগে, আর তার ফলে তার স্বভাব, তার চিন্তার ধারা একেবারে ব'দ্‌লে যায়, সে খুব বুদ্ধিমান ছেলেতে পরিণত হ'য়ে যায়। ফ্যঙ-এরও যেন তাই হ'ল।

এ হেন ফ্যঙ, অপ্রকটিত-রসস্রোতাগুণ ফ্যঙ, তৎকাল-গম্ভীর প্রকৃতির ফ্যঙ, সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু আর আমি দুপুরে সিঙ্গাপুরে ঘুরতে বা'র হলুম। চীনা সুধীজনমণ্ডলীর দু-চারজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। Sin Kuo Min 'সিন্-কুও মিন্' ব'লে সিঙ্গাপুরে নামী একখানা চীনা দৈনিক কাগজ আছে, এই কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব ফ্যঙ ক'র্‌লেন। ইতিমধ্যে বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছে, খাওয়া-দাওয়া হয়নি, ইংরিজি কথার অনুবাদ ক'রে ব'ল্‌লে 'আভ্যন্তর মানব' আর সাদা বাঙলা কথায় 'মহাপ্রাণী'কে আর কষ্ট দেওয়া চলে না, তার তৃপ্ত্যর্থে একটা ভোজনালয়ের সন্ধান ক'রতে হ'ল। লণ্ডনে চীনা হোটেলে চীনা খাদ্যের স্বাদের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টেছিল, কিন্তু এ দেশে চীনা-হোটেলে ঢুকতে প্রবৃত্তি হ'ল না; বিশেষতঃ যে-হোটেলগুলি বিশুদ্ধ চীনে-কায়দার হোটেল, তাদের সৌরভ দূর থেকে আকৃষ্ট করার উলটোটাই করে। ফ্যঙ আমাদের নিয়ে গেলেন ইংরিজি কায়দার একটি ভোজনালয়ে, তার মালিক আর চাকর-বাকর কিন্তু চীনা। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা, মস্ত মস্ত ঘর, সব চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে। ভারতবর্ষে বিলিতি খানায় যেমন বহুস্থলে rice and curryকে একটি পদ হিসাবে ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে, ওদেশেও তেমনি। ভাতের সঙ্গে মালাই ধরণে রান্না কারি ওদেশের রেওয়াজ। এই কারির সঙ্গে side dish বা টাক্‌না বা চাট্‌নী হিসাবে ৫।৭ রকম অম্ল আচার, শুঁটকী মাছ প্রভৃতি দেয়। চুনো মাছের মতন ছোটো ছোটো একরকম মাছ একটা ভীষণ টক্ গোলা বা জলীয় পদার্থে কাঁচা অবস্থায় রেখে দেওয়া, এই কাঁচা মাছের টাক্‌নাও একটি উপাদান। জাপানে শুনেছি, এই রকম কাঁচা মাছ খাওয়ার রীতি আছে। মালাই দেশেও দেখছি তাই।

আহার চুকিয়ে রিক্‌শ ক'রে নানা রাস্তা আর কুচো গলি ঘুরে শেষটা আমরা 'সিন্-কুও-মিন্' আপিসে উঠলুম। রিক্‌শ ভাড়া করবার সময় ফ্যঙ ব'ল্‌লেন যে, তিনি পারতপক্ষে রিক্‌শ চড়েন না, একটা মানুষে পেটের দায়ে হাঁ ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁকে গাড়ীতে ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তিনি আরাম ক'রে পিছনে ব'সে আছেন, এটা তাঁর কাছে ভারী নিষ্ঠুর, এমন কি বর্ব্বর ব'লে মনে হয়। কিন্তু কি করা যায়,—আমাদের নানা কাজ, যেতে হবে তাড়াতাড়ি; আর সর্ব্বত্র যেমন এখানেও তেমনি, লোকেদের অভাব বেশী, জীবন-সংগ্রাম ভীষণ; একখানা রিক্‌শ ডাকলে সাতজন রিক্‌শওয়ালা ছুটে' আসে—১৬।১৭ বছর বয়সের ছেলে থেকে অথর্ব্ব আকারের বুড়োও আছে;

যারা সওয়ারী পেলে না তাদের মুখ দেখলে কষ্ট হয়

'সিন্-জুঙ-মিন্' আপিসে পঁহুছলুম। ক'লকাতার কোলুটোলা ষ্ট্রীট মুরগীহাটার মতন একটা দোকানপাট-গদী-আপিস-হৌসের পাড়ায়। নীচের তালায় দু-ধারে দোকান, আর মাঝে খবরের কাগজের আপিসে ঢোক্‌বার দরজা। এক এঁদো স্যাঁৎসেঁতে ঢাকা আঙিনা মতন পেরিয়ে বাঁয়ে কাঠের টানা সিঁড়ি বেয়ে Editor's sanctum বা সম্পাদক মহাশয়ের 'বিমানমন্দির' বা 'গর্ভগৃহে' গিয়ে উঠলুম। একদিকে উঁকি মেরে দেখলুম—ছাপাখানা। কম্পোজিটররা সব হরফ নিয়ে 'ম্যাটার' সাজাচ্ছে। ইংরেজিতে ছোট হরফ আর বড় হরফ জড়িয়ে ২৬ আর ২৬, একুনে ৫২, আর সংখ্যা-বাচক অক্ষর ইংরিজি, সংযুক্ত বর্ণ œ ff প্রভৃতি জড়িয়ে অনধিক কুড়ি—এই গোটা সত্তর হরফের ঘর হ'লেই চ'লে যায়; সাম্‌নে উপরে-নীচে upper case আর lower case দু থাক বা দু বাক্স হরফ নিয়ে ইংরিজি বা রোমান অক্ষরের বই কম্পোজিটররা ব'সে ব'সেই কম্পোজ ক'র্‌তে পারে। বাঙলার পঞ্চাশ বর্ণ, তার পর ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হ'লে স্বরবর্ণের যে রূপ বদ্‌লায় তা আছে, আর তা ছাড়া ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে, আর তার সঙ্গে স্বর যুক্ত হ'লে যে অগুণতি সংযুক্ত বর্ণ আছে,—সবে মিলে প্রায় ৫০০টা অক্ষর। এদের পাঁচ শ' ঘর—সাম্‌নে ডা'নে বাঁয়ে কতকগুলি case বা বাক্স নিয়ে বাঙলা কম্পোজ ক'রতে হয়। চীনে ভাষ বাঙলাকেও হার মানিয়েছে। এদের ধ্বনিদ্যোতক বর্ণমালা নেই, আছে এক-একটি চৌকো ঘরের মধ্যে বসানো যায় এমন বহু অক্ষর, অল্প বা বহু রেখার সমাবেশে যা সৃষ্ট; আর প্রত্যেক অক্ষরটি একটা বস্তু বা ভাবের দ্যোতক। চীনা ভাষায় যত শব্দ, যেন ততই অক্ষর। প্রামাণিক চীনা অভিধানে সাতচল্লিশ হাজার অক্ষর আছে শোনা যায়। এর সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। "অবিমৃষ্যকারিতা" বা "কিংকর্তব্যবিমূঢ়" লিখতে গেলে, চীনে ভাষায় অত বানানের বালাই নিয়ে বিব্রত হ'তে হয় না—স্বরে অ+ব-এ-হ্রস্ব-ই বি+ম-এ ঋ-কলা মৃ+মূর্দ্ধণ্য-ষ এ-য-ফলা ষ্য+ক-এ আকার কা+র-এ হ্রস্ব-ই রি+ত-এ আকার তা—প্রভৃতির মতন এত গোলমাল নেই। চীনা লেখক বা কম্পোজিটার এই দুই শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশক দুটি অক্ষর খুঁজে বের ক'রে নিয়েই ধাঁ ক'রে বসিয়ে দিলেন, ল্যাঠা চুকে' গেল। কয় আঁচড়ে এই ভাব প্রকাশক চীনে অক্ষরটি লেখা হয় সেইটি জান্‌লে, অভিধান থেকে বা চীনা অক্ষরমালার কেস্ বা বাক্স থেকে কোনো অক্ষরকে খুঁজে' বা'র করা কঠিন হয় না। চীনার ৪৭০০০ অক্ষর সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। খুব পণ্ডিত লোকে ১০।১৫ হাজার অক্ষর জান্‌তে পারেন; সাধারণ শিক্ষিত লোকে ২।৩ হাজারেই কাজ চালিয়ে নেন। আবার খবরের কাগজের জন্য ৬।৭ হাজার অক্ষর হ'লেই যথেষ্ট। চীনা ছাপাখানার অক্ষরগুলি কয় আঁচড়ে তৈরী সেই হিসাব ধ'রে খুপরীতে সাজানো থাকে, কম্পোজিটর ঘুরে' ঘুরে' দরকার মতন অক্ষর বা'র ক'রে নেয়। চীনে কম্পোজিটারের কাজ ব'সে ব'সে হয় না। ঘরের এ-কোণে হরফের ঘর থেকে সাত আঁচড়ে কাটা একটি হরফ নিয়ে বসিয়ে, আবার ঘরের ও-কোণে ছুটতে হ'ল, সতেরো আঁচড়ের একটি অক্ষর তার পরে বসাবার জন্য। এই রকম দৌড়াদৌড়ি ক'রে, আঁচড় গুণে, চোখের মাথা খেয়ে চীনা কম্পোজিটররা কম্পোজ ক'রে যাচ্ছে দেখা গেল। কম্পোজিটরদের প্রায় সকলকেই দেখলুম কোল-কুঁজো-মারা চেহারা, আর চোখে কচ্ছপের খোলার ফ্রেমের চশমা।

এডিটরের ঘর ব'লে আলাদা কুঠরী নেই। সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা বারান্দা, তার পরে একটা বড়ো ঘর সেটা যে খবরের কাগজের আপিস, তা রাশীকৃত পুরাতন সংখ্যার কাগজ, প্রুফ, 'কপি,' বড়ো বড়ো ডাইরেক্টরী জাতীয় বই—এই সব ইতস্ততঃ জঞ্জালের মত ছড়িয়ে থাকায়, আর ছাপার কালির গন্ধে বুঝতে দেরী হয় না মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ঘরের পাশে বারান্দার মেঝের একটু অংশ চৌকো ক'রে কাটা তার ভিতর দড়ি-টানা কলে ঝোড়ায় ক'রে নীচে ছাপাখানা থেকে প্রুফ আস্‌ছে, ঝোড়া উঠতে উঠতে নীচে লোকেরা ঘণ্টা বাজিয়ে দিচ্ছে, এডিটরের

আপিসের লোকেরা খোড়া খালি ক'রে প্রুফ নিচ্ছে, আবার নোতুন 'কপি' বা সংশোধিত প্রুফ দিচ্ছে। বেশ একটা চটপটে ক্ষিপ্র কার্য্যকারিতার ভাব। ঘরে কতকগুলি টেবিলের উপর কাগজপত্র রেখে পাঁচ ছ' জন লোকে কাজ ক'রছে। সম্পাদক মহাশয় তখন ছিলেন না। একটি খর্ব্বাকৃতি চশমা-চোখে চীনে মেয়ে ছিলেন, কালো রেশমের ঘাগরা পরা (বিশ্রী পাজামার বদলে ঘাগরা পরা হ'চ্ছে চীনা মেয়েদের আধুনিকত্বের নিদর্শন), তিনি সহকারী সম্পাদকদের অন্যতম। ফ্যঙ আমাদের সেখানে এনে হাজির ক'রে একে একে সকলকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চেয়ারের অভাবে আমরা কেউ কেউ টেবিলের উপরে ব'সলুম। এঁদের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ হ'ল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এদের গভীর শ্রদ্ধা, তাঁর উদ্দেশ্যের সঙ্গে পূর্ণ সহানুভূতি। রবীন্দ্রনাথের সিঙ্গাপুর আগমন উপলক্ষ্যে এঁরা এঁদের কাগজের এক বিশেষ সংখ্যা বা'র ক'রছেন, তাই দেখালেন। তাতে রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে কতকগুলি বিশেষ প্রবন্ধ বা'র ক'রেছে, পৃথিবীর ভাবরাজ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান নিয়ে আলোচনা হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের চীন ভ্রমণ, নিজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল চীনের শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের সাদর আমন্ত্রণ আর সম্বর্দ্ধনা, ভারতবর্ষে চীনা ভাষার আর চীনা সংস্কৃতির অনুশীলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা, এই-সব বিষয়েও লেখা হ'য়েছে; আর চীন-দেশে রবীন্দ্রনাথের চতুঃষষ্টিতম জন্ম-দিন উপলক্ষ্যে তাঁর চীনা বন্ধুরা তাঁর যে চীনা নামকরণ ক'রেন—Chu Chen-tan "চু-চেন্-তান্" চু-চেন্-তান্ 'অর্থাৎ The Thunder and Sun-light of India; এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের চীনা নাম হ'য়েছে—'চেন' অর্থাৎ বজ্রদেব বা ইন্দ্র, 'তান' অর্থাৎ প্রভাত বা রবি, 'চেন্-তান' শব্দে তাঁর নাম রবীন্দ্রের অনুবাদ ক'রে; আর ভারতের প্রাচীন চীনা নাম Thien-chu 'থিয়েন্-চু' বা স্বর্গ-রাজ্য, এই 'থিয়েন্-চু' সংক্ষেপে 'চু' রূপে লিখে, 'ভারত' অর্থে ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপে রবীন্দ্রনাথের পদবী হিসাবে ধ'রে;—এইরূপে সেই নাম দিয়ে তাঁকে স্বাগত ক'রেছে। ভারতে চীনা ভাষার পঠন-পাঠনের আবশ্যকতার বিষয়ে, আর বিশ্বভারতীতে চীনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভো-চিঙ্‌-সিম্ আর ফরাসী অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি, এঁদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ ক'রে আমি চীনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। এঁরা কেউ ইংরিজি বোঝেন না। ফ্যঙ আমাদের দোভাষীর কাজ ক'রলেন। সুরেনবাবু আমাদের সকলের ফোটোগ্রাফ নিলেন। এইরূপে ঘণ্টাখানেক এই খবরের কাগজের আপিসে কাটিয়ে আমরা বিদায় নিলুম।

তারপর ফ্যঙ আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর ভাইয়ের ইস্কুলে। পথে আর একটি চীনা ভদ্রলোকের বাড়ীতে গেলুম—এরা মালাই দেশীয় "বাবা"-চীনে, পাজামার বদলে সারং পরা মেয়েদের দেখে বোঝা গেল। আমাদের সিগ-লাপের বাঙলার পথে ফ্যঙ-এর দাদার ইস্কুল। ফ্যঙ-এর পুরা নাম Fang Chih Chen, তাঁর দাদার নাম Feng Shu Pang। ইস্কুলটি তার স্থাপয়িতা Choon Guan চুন-গুআন ব'লে একজন ধনী চীনার নামে। ছেলে আর মেয়েরা একত্র পড়ে। আমাদের মধ্য ইংরাজি ইস্কুলের মতন Anglo-Vernacular ইস্কুল। ইস্কুলে যখন পৌঁছই, তখন ছুটী হ'য়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা ঘরে যাচ্ছে। ফ্যঙ-এর দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল। অতি প্রিয়দর্শন মধুরালাপী যুবক, ফ্যঙ এর চেয়ে ঢের ভালো ইংরেজি ব'লতে পারেন। মাষ্টারদের বস্‌বার ঘরে আমাদের বসালেন। আধুনিক রীতির সব চীনা পাঠ্য পুস্তক র'য়েছে, ফ্যঙ সেগুলি দেখালেন। ছেলেদের আর মেয়েদের অক্ষর খাতা, তাদের আঁকা ছবি, তাদের হাতের চীনা আর ইংরিজি লেখা, এসব দেখালেন। সব বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর ছেলেদের হাতের কাজে তাদের বেশ শৃঙ্খলাযুক্ত ব'লে বোধ হ'ল। দেয়ালে ছেলেদের আঁকা ছবি দু-একখানা ফ্রেমে বাঁধা রয়েছে। এক জন চীনা চিত্রকরের হাতের আঁকা ফুলের ছবি, রঙীন, তার সঙ্গে চীনা কবিতা, এ-ও দু-একখানা বাঁধিয়ে রাখা হ'য়েছে। আর আছে সনাতন চীনা পদ্ধতিতে প্রাচীন চীনা মনীষীদের বচন, সুন্দর চীনা হরফে লেখা, লম্বা লম্বা রেশমের বা কাগজের ফালিতে কালো বা সোনালি কালিতে, সেগুলি বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো আছে। কন্‌ফুশিউস্, আব্রাহাম লিঙ্কন্, মাক্সিম গোর্কি,

যীশু—এঁদের বচনযুক্ত কাগজও দেয়ালে টাঙানো আছে। ইস্কুলের কতকগুলি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আর শিষ্টাচার হ'ল, বরফ-লেমনেড পান হ'ল।

ফ্যঙ-এর দাদা খুব জবর চীনা ন্যাশনালিস্ট্, কিন্তু ধর্ম্মে তিনি খ্রীষ্টান। স্বয়ং খ্রীষ্টান হ'য়েছেন। চীনদেশে ধর্ম্ম নিয়ে ঝগড়া নেই। একই পরিবারে নানা ধর্ম্মের লোক থাক্‌তে পারে। ফ্যঙ-এর বউদিদিও বোধ হয় স্বামীর মতোই খ্রীষ্টান। পরে এঁর দাদা আর বউদিদি উভয়কেই এক চীনা থিয়েটারে আমরা দেখি—বউদিদির সাম্‌নে কপালের উপর জুলপীর মতন কাটা এক গোছা চুল ঝুল্‌ছে, পরনে চীনা ঘাগরা—সম্ভ্রান্তঘরের চীনা মেয়ের মতই পোষাক আর সৌষ্ঠব। এঁরা দূরে ব'সেছিলেন, আর নাটক শেষ হবার আগেই আমরা চ'লে এলুম, তাই এঁদের সঙ্গে তখন কথা-বার্ত্তা হয়নি। ফ্যঙ-এর মা হ'চ্ছেন ধর্ম্মমতে বৌদ্ধ—বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে পূজা পাঠ করেন, মাছ মাংস খান না। ফ্যঙের বাবা ছিলেন কন্‌ফুশীয় মতাবলম্বী। ফ্যঙ নিজে কতকটা অজ্ঞেয়বাদী। চুন্‌-গুআন্ ইস্কুলে ফ্যঙ-এর দাদা তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট ঘরে তাঁর লেখা-পড়া করবার টেবিলের উপরে একটী ছবি, একজন ইংরেজ চিত্রকরের আঁকা ছবির হাফটোন প্রতিলিপি—গেথ্‌শেমানি বাগানে যীশু ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা ক'র্‌ছেন। ফ্যঙএর দাদার খ্রীষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাসের এইটাই একমাত্র বাহ্য নিদর্শন যা আমাদের গোচরে এসেছিল। আমাদের সঙ্গে ৩।৪ দিন ধ'রে সিঙ্গাপুরে বা'র কতক এঁর কথবার্ত্তা হ'য়েছিল, কিন্তু তিনি চীনা, এবং চীনা সভ্যতার উত্তরাধিকার তাঁরই—এরূপ কথা ছাড়া, তিনি যে খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান না হ'লে চীনের উন্নতি হ'বে না—এ রকম মন্তব্য কখনও তাঁর মুখে শুনিনি।

ফ্যঙ-এর এক ভাগ্‌নে প্রাচীন চীনা পদ্ধতিতে ভালো ছবি আঁক্‌তে পারে। ছোকরা তার বড়ো মামার কাছে আছে। ইংরিজি জানে না। কবিকে উপহার দেবার জন্য এরা তার আঁকা দুখানা ছবি বেছে নিলে। দু-তিনটি রঙ, আর কালো চীনে কালি দিয়ে আঁকা কতকগুলি ফুল, আর উপরে একটি চীনা কবিতা। "চীনের বন্ধু চু-চেন্‌-তান্‌কে চিত্রকর-কর্ত্তৃক সশ্রদ্ধ সমর্পণ" এইরূপ একটি সমর্পণ-বচন ছবির গায়ে চিত্রকর লিখে দিলেন।

মুখ খুলে সমস্ত স্পষ্ট ক'রে না ব'ললেও বুঝলুম যে এই সব চীনদেশ থেকে আগত চীনা intellectual বা শিক্ষিত লোক যারা মালাইদেশের চীনাদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা ক'রছেন, ইংরেজ সরকার তাঁদেরকে প্রীতির চোখে দেখে না। দেখতে পারেও না। শিক্ষকতার কাজে আর সংবাদপত্রের সম্পাদকতার কাজে এদের নানা ব্যাঘাত ঘটে। ফ্যঙ এর দাদা আগে এক খবরের কাগজের সম্পাদকতা ক'রতেন। হঠাৎ এক দিন সিঙ্গাপুরের পুলিশের কর্ত্তার এক হুকুম এল, কাগজ তাঁকে ছাড়তে হবে। নইলে কাগজ বন্ধ ক'রে দেবার ভয় আছে। চীন দেশের ঘটনাবলী, ইউরোপীয় বিশেষ ক'রে ইংরেজ আর জাপানীদের চীন সম্বন্ধীয় রাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা এই-সব কাগজে অনেক সময়েই নাকি বা'র হয়। চীনা লোক কুলিগিরি আর অন্য কাজ ক'রতে হাজারে হাজারে মালাই দেশে আসে। ইংরেজ সরকার মনে ক'রলেই যে-কোনো চীনাকে মালাই দেশ থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দিতে পারে। এই সব কারণে এদের নানা অসুবিধায় চ'লতে হয়। কিন্তু স্থানীয় "বাবা"-চীনাদের, আর অন্য পয়সাওয়ালা চীনাদের কাছ থেকে এঁরা পুরা সহানুভূতি পান। তাই সরকারের তোয়াক্কা না রেখে এঁদের দ্বারায় মালাই দেশের চীনাদের উদ্বোধন আর তাদের মধ্যে সংগঠন আর সঙ্ঘবন্ধন কার্য্য বেশ জোরের সঙ্গেই চ'ল্‌ছে।

এই রকমে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে বেলা প্রায় চারটে বেজে গেল। পাঁচটায় সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের তরফ থেকে সিগ্‌লাপের বাড়ীতে কবিকে সংবর্দ্ধনা করবার কথা ছিল, সিঙ্গাপুরের বিস্তর ভারতীয় আস্‌বেন এতে, তাই আমাদের এখন বাসায় ফিরতে হ'ল। চীনা ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের আর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে কবি বিশেষ ক'রে একটি বক্তৃতা দেবার কথা হ'চ্ছিল, ফ্যঙ-ভ্রাতৃদ্বয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা ক'রছিলেন, আগামী কাল অর্থাৎ ২৪শে তারিখে সিঙ্গাপুরের চীনরাষ্ট্রের কনসাল্ বা প্রতিনিধির সভাপতিত্বে এই বক্তৃতা-সভা হবার কথা হ'চ্ছিল, সে-বিষয়ে পাকাপাকি কথা বলবার জন্য ফ্যঙ-

ভ্রাতৃদ্বয় সিগ্‌লাপে আমাদের সঙ্গে এলেন, আর এঁদের ভাগ্‌নেও তার আঁকা ছবি স্বয়ং কবিকে অর্পণ করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে এল।

এইরূপে সিঙ্গাপুরে চীনাদের মধ্যে ঘুরে' আলাপ ক'রে একটা দিনে চীনা জগতের নানা দিগ্‌দর্শন আমাদের ঘ'ট্‌ল, চীন-দেশে না গিয়েও চীনের অনেক খবর অনেক মানসিক গতির ঢেউ আমাদের কাছে এসে পঁউছুলো।

পরিচয়

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

সন্ধ্যাবেলা কাল
আঁধার তখন আপন মনে পাত্‌তেছিল জাল,
আমাদের ওই শুক্‌নো মাঠের পাছে
একটা বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছে
হোলিখেলা রঙিন ফুলে ফুলে—
ডালগুলি তার দখিন-হাওয়ায় উঠতেছিল দুলে।
সেইখানেতে খেল্‌তেছিল একটি ছোট মেয়ে,
ব'সে ছিলেম তারি দিকে চেয়ে।
খুসীর ঘোরে উজল তাহার আঁখি
অস্তরবির আলোয়-আলোয় কাঁপছে থাকি' থাকি'।
চরণ দুটি দুরন্ত-চঞ্চল,
বাতাস লেগে উড়তেছিল রঙ-করা অঞ্চল।
অন্ধকারে আলোক-রেখা আপনি হ'ল লয়,
আমার তখন তাহার সনে ঘট্‌ল পরিচয়।
কইনু তারে ডেকে—
কোথায় থাক? এই মাঠেতে আস্‌ছ কবে থেকে?
ছোট্ট মেয়ে ছোট্ট কথা, অনেক-কিছু কইল চুপে-চুপে
সরল মনের সরল ছবি ফুটল রূপে-রূপে।
আবার কখন অরূপ-পারাবারে
মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে॥

ছোট্ট মেয়ে ক্ষণেক আমার বুকের কাছে থামি'
যাবার বেলা ব'লে গেল "আস্‌ব আবার আমি।"

হঠাৎ হলো মনে
এম্‌নি করে' এম্‌নি সঙ্গোপনে,
আমাদের এই জীবনখানি ভরে'
কতপ্রাণের পরশ-চিহ্ন পড়ে,
কত রকম হয় যে দেখা-শোনা
যায় না তা ত' গোনা,
কারু স্মৃতি লুকিয়ে থাকে মনের কূলে-কূলে
কারু কথা যাই যে আবার ভুলে।

এমন মধুময়
এই-যে পরিচয়—
একি শুধু আধেক চিনে ক্রমে ক্রমে ভোলা?
প্রীতির দোলে একটুখানি দোলা—
ইহার মাঝে স্থায়ী কিছুই রয় না কি গো বাকী?
এমন কিছু সত্য থাকে নাকি
যেটি মোদের প্রাণের মাঝে নিত্য হ'য়ে রয়—
নূতন মাঝে পুরাতনেই বারে বারে ঘটায় পরিচয়?

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩

সেবার মফস্বলের পড়া সাঙ্গ করিয়া প্রকাশ কলিকাতায় আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল। গোলদীঘির কাছে একটি গলির ভিতর ক্ষুদ্র দোতালা মেস। তাহারি উপরকার একটি ঘরে দূর-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়ের অনুগ্রহে একটি স্থান সে অধিকার করিয়া বসিল।

ইতিপূর্ব্বে আর সে কলিকাতায় আসে নাই। ইহার বিরাট্ আকার, অফুরন্ত সৌধশ্রেণী, কঙ্করাস্তীর্ণ বিস্তৃত সড়ক-গুলির উপর অন্তহীন জনতা, গাড়ী ট্রাম মোটর—সব মিলিয়া এই পল্লী-ছেলেটির অন্তরে বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম হইতে একটা অজানা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। সঙ্কীর্ণ জানালাটির ধারে বসিয়া সে দেখিত, নানা দেশের লোক, নানা জাতি, নানা পরিচ্ছদ—পরস্পর সম্বন্ধ নাই, সামঞ্জস্য নাই—অনন্ত উদ্দেশ্য ধরিয়া এই অনন্ত জনস্রোত ক্রমাগত বহিয়া চলিয়াছে। সেগুলিতে ফেরি-ওয়ালার হাঁক, আবর্জ্জনা-গাড়ীগুলির ঝন্‌ঝনি। চারিদিকে অবিরাম কোলাহল যেন ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া পিঙ্গল-বর্ণ ধোঁয়াটে আকাশের মাঝখানে ছড়াইয়া পড়িত। দেখিতে দেখিতে তাহার অন্তরে কোন্ এক বৃক্ষবেষ্টিত ছায়া-বহুল পল্লীর করুণ আহ্বান জাগিয়া উঠিত, এবং অনির্দ্দেশ্য ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া তাহার মন খাঁচার পাখীর মতনই সেই দিকে উড়িয়া যাইতে চাহিত।

মেসে একজন লোক ছিলেন, দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ, শুভ্র-দন্ত, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি—তিনি শ্যামবাবু, দোতালায় একলা একটি ঘর লইয়া থাকিতেন। ঘরটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিছু কিছু আস্‌বাব-পত্রে সাজান। তিনি যে কি কাজ করিতেন সঠিক খবর কেহই জানিত না। তবে মেসে অনেকে বলাবলি করিত, তিনি ভুষি মালের, না পাটের, না কিসের দালালি করেন—সম্প্রতি না কি একটা বিজনেস্ খুলিবার যোগাড় করিতেছেন। এসম্বন্ধে কাহারো অসঙ্গত কৌতূহল উদ্রিক্ত হইলে তিনি চোখ নাচাইয়া রহস্য গভীরতর করিয়া কহিতেন—আরব্য-রজনীর সেই গল্পটা জান ত হে? রাজা সোলেমানের আদেশে এক দৈত্যকে কলসীর ভিতর বন্ধ করে' সমুদ্রে ফেলে' দেওয়া হয়েছিল। তারপর হাজার বছর পরে একজন জেলে জাল ফেলে' সেই কলসী টেনে' তুলেছিল। সে দৈত্য এখন কোথায়? যদি না জান তা হ'লে বলি, আমার এই মগজটির মধ্যে এখন সে বন্ধ হ'য়ে আছে!—বলিয়া টেরিকাটা মাথার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বুঝাইয়া দিতেন যে, একদিন-না-একদিন কোন ধীবর আসিয়া ছিপি খুলিয়া দিবেই, তিনি সেই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন!

ইজি চেয়ারে শুইয়া তিনি বর্ম্মা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতেন, এবং মাঝে মাঝে প্রকাশকে ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া কহিতেন, তুমি বেশ ভাল ছেলেটির মত মেসের এক ধারে প'ড়ে থাক—সাতে নেই পাঁচে নেই। ঠাকুর অনুগ্রহ ক'রে চাট্টি খেতে দিলে খাও, ঠাকুর দয়া ক'রে যে কাজ করে দিলে তাই যথেষ্ট। হুবহু গোপাল, বেণীর ধার দিয়েও যাও না। কিন্তু আমি জানি, সেই দুরন্ত বেণীই একদিন মস্ত বড় হ'য়ে উঠেছিল—আর ভাল-ছেলে গোপাল গণ্ডা গণ্ডা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে, শুঁট্‌কি মাছটির মত চুপ্‌সে শুকিয়ে কোন-এক জংলা দফ্‌তরে বাতি দিত আর বিদ্যাসাগরের মুখ উজ্জ্বল করত।

প্রকাশ নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। একদিন শ্যামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার বাবা আছেন প্রকাশ?

—আজ্ঞে না।

—কদ্দিন মারা গেছেন?

—বছর সাতেক আগে।

—সংসারে কে কে আছেন?

—আমার মা—স্ত্রী—

স্ত্রী!—শ্যামবাবু গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে প্রকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

—বিলক্ষণ! এরই ভিতর সে কাজটা সেরে রেখেছ দেখ্‌ছি!

লজ্জিত হইয়া প্রকাশ বলিল,—আজ্ঞে, তা নয়। এখন বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছাও ছিল না। তবে অবস্থা এম্‌নি হ'য়ে দাঁড়ালো—

—ঠিক বিবাহের অনুকূল। কেমন? হাঃ হাঃ! এ সম্বন্ধে বাঙালীর ছেলের প্রতিকূল অবস্থা কখনো দেখ্‌লাম না।

শ্যামবাবুর ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য প্রকাশ তাহার বিবাহের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। শ্যামবাবু মনযোগের সহিত শুনিলেন, তারপর বলিলেন,—যা বল্‌লে সবই সেন্‌টিমেন্ট্‌। সেন্‌টিমেন্ট্‌ নিয়ে জগৎ চলে না, প্রকাশ। জগৎ একটা বিরাট্‌ কাড়াকাড়ির ব্যাপার, কঠিন বাস্তব নিয়ে লড়াই। এখানে যিনি একটু দুর্ব্বলতা দেখালেন, তিনিই মর্‌লেন।

ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রকাশ কহিল,—দরকার কি আপনার ওসব কাড়াকাড়ির ভিতর গিয়ে। জোত-জমা যা-কিছু আছে আমাদের তাতে একরকম চ'লে যাবে। বিশেষ অভাবই হ'বে না।

শ্যামবাবু হাসিয়া উঠিলেন—সে-দিন আর নেই, প্রকাশ। কূপমণ্ডুক হ'য়ে এমন অল্পে সন্তুষ্ট থাক্‌লে আর চল্‌বে না। দেখছ না? বিশ্ব জুড়ে এক নূতন ভাব জেগে উঠেছে। মানুষ বুঝতে শিখেছে, সে শুধু মানুষ নয়—সে সোনার খনি! তাই সে আজ সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে স্বর্ণ উদ্ধার কর্‌তে উঠে-প'ড়ে লেগেচে।

বিস্ময়ে চক্ষু মেলিয়া প্রকাশ তাহার পানে চাহিয়া রহিল। লোকটি কি তবে বস্তুতান্ত্রিক?

শ্যামবাবু কহিলেন,—এ বিবর্ত্তন—মানুষের ক্রম-বিকাশ। অসন্তোষ জীবন, সন্তোষ সমাধি। জেনে রেখ, অসন্তোষের ভিতর দিয়ে মানুষ এতখানি বড় হ'য়ে উঠেছে। একে বাঁচিয়ে রাখাই মানুষের কর্ত্তব্য।

সে-দিন ছোট ঘরখানির ভিতর ফিরিয়া কেবল এই কথাগুলি প্রকাশের মনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আগাগোড়া যে-ভাবে সে তাহার জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার সহিত কথাগুলির এতটুকু মিল সে খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তবু এই নির্ম্মম নীতির ভিতর একটা সত্যের সুর কাঁসির মত বাজিয়া উঠিয়া তাহার শিক্ষা সংস্কার ধারণা সব যেন ওলটপালট করিয়া দিল। চারি-দিকে সহরের কোলাহল, উন্মত্ততা, পেষাপেষি—এসব এখন এক নূতন অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার কাছে দেখা দিল। সত্যই ত, জগৎ একটা কাড়াকাড়ির ব্যাপার! জীবন পণ করিয়া দুর্ব্বল-সবলের হার-জিত খেলা চলিতেছে। জীবন ছোট, হার-জিতের বাজিটাই আসল হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ তাহার মন একটা নিরাশ্বাসের ব্যথায় কাতর হইয়া উঠিল। সে আজ এক দুঃসহ বোঝার ভারে হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। না, না! এসব শ্যামবাবুর খেয়াল। শ্যামবাবুর উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল। লোকটা ঘোর আত্মপর—না হয় বুজরুক—না হয় পাগল! একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া সে সুরবালাকে তৎক্ষণাৎ পত্র লিখিতে বসিল—কলিকাতা তাহার ভাল লাগিতেছে না, দিনরাত তাহার কথা সে ভাবে, এবং তাহাকে সে বড় ভাল বাসিয়াছে, বারবার লিখিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিল।

দুধের জলীয় অংশ ছাড়িয়া ছানার কণাগুলি যেমন একত্র জমাট বাঁধিয়া উঠে, তেম্‌নি কোন সুক্ষ্মের বিধি অনুসারে কলেজের বিবাহিত ছাত্রদলের মধ্যে প্রকাশ কিরূপে মিশিয়া গিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে হয়ত কোন জবাব দিতে পারিত না। ঘণ্টার শেষে ছেলেরা পানের দোকানের সাম্‌নে ভীড় করিত, পান কিনিত—কেহ বা সিগারেট টানিত। দাম্পত্য-প্রণয় লইয়া, অভিমান লইয়া, মিছা ঝগড়া লইয়া ইহাদের সরস উক্তিগুলি মুখে মুখে কৌতুকের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিত। চিন্তা নাই, উদ্বেগ নাই—স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, খোলা বই-এর মত প্রাঞ্জল, দিনের পর দিন সেই একই কাহিনী, তবু তাহাদের জীবনের পাপড়িগুলি নিত্য নূতন বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণের ছটায় রঙিন হইয়া উঠিত।

ক্লাসের যে ছেলেটির সঙ্গে প্রকাশ খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছিল, সে সুনীত। ছেলেটি ঢেঙা, চোখে পুরু চশমা,

বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই—এই সাজগোজ-পরা হংসদের মধ্যে অনেকটা বকের মতন। ক্লাশের কোণের বেঞ্চটিতে ইহারা একত্র বসিত—বৈকালে ছুটির পর একসঙ্গে বেড়াইত। সুনীত দেখিতে শুক্‌না কাঠ, কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর মলয়ার হাওয়া বেশ জোরে বহিত—প্রমাণ, গ্রীষ্মে শীতে ঝড়ে বাদলে সপ্তাহ-অন্তে শনিবার দিন সন্ধ্যাকালে আহিরিটোলার একটি ক্ষুদ্র ভবনে তরুণী ভার্য্যার কাছে একটিবার হাজিরা দিতে আসা কদাচিৎ কামাই যাইত, অন্ততঃ সজ্ঞানে বহাল তবিয়তে ত নয়ই।

ইহাদের মধ্যে থাকিয়া ইহাদের স্ফূর্ত্তির তহবিলে নিজের ষোল আনা ভাগ জমা দিয়াও মাঝে মাঝে প্রকাশের মন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িত, সুনীত তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। একদিন বলিল, তুমি কি ভাব বল দেখি ?

প্রকাশ হাসিল,—কৈ কিছু না।

দুজন তখন গোলদীঘির চারিধারে ঘুরিতেছিল। রাঙা রাস্তা দিয়া অসংখ্য লোক বেড়াইতেছিল—কেহ দল বাঁধিয়া, কেহ একা। কাহারো গতি ক্ষিপ্র, কাহারো লঘু। সন্ধ্যা হব-হব। গ্যাস জ্বালা হইয়াছে—কিন্তু দীঘির জলে আলোগুলি তখনো ঝিকিমিকি দিয়া উঠে নাই।

চলিতে চলিতে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—এগ্‌জামিনের পড়া কেমন তৈরি কর্‌লে, সুনীত ?

—ঘোড়ার ডিম !—শ্বশুর-বাড়ী এত কাছে থাক্‌লে কি আর পড়াশুনা হয়, ভাই ?

গম্ভীর মুখে প্রকাশ বলিল,—না ভাই। এখন আর সময় নষ্ট করো না। ও সবে চিরদিন চল্‌বে না।

দীঘির ধারে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া খৃষ্টান পাদ্রীদের অনুকরণে এক ব্যক্তি বক্তৃতা জুড়িয়া দিয়াছিল। ভূতের মতন চেহারা, শীর্ণ-কায়, পোষাক মলিন। শ্রোতা প্রায় সবই কলেজের ছাত্র, ইহাকে ঘেরিয়া রঙ্গ-রহস্য করিতেছিল।

সুনীত বলিল, চল দেখে আসি, কি হচ্ছে।

লোকটি চেঁচাইয়া বলিতেছিল, আপনারা হাস্‌ছেন, হাসুন। হাসি আপনাদের কর্ম্ম, আমার কর্ম্ম বক্তৃতা দেওয়া—

ভীড়ের ভিতর কে একজন বলিল, কর্ম্মভোগ বলুন।

সকলে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

বক্তা বলিতে লাগিল,—হে মানব, আজ তুমি অতৃপ্ত বাসনা হৃদয়ে বহিয়া নৈরাশ্যের বেদনায় দীর্ণ, সর্ব্বভুক্ ক্ষুধার অগ্নি অন্তর মধ্যে জ্বালিয়া দিয়াছে। কর্ণধারহীন তরীর মত দুঃখসাগরে বিপর্য্যস্ত হইবার জন্যই কি তবে এত সব আয়োজন ? এমন কি কোন শিক্ষা নাই যাহা তোমাকে নৈরাশ্য অসন্তোষ হইতে রক্ষা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে ?........

একে একে ছাত্রের দল সরিয়া পড়িয়া ক্রমশঃ ভীড় পাতলা হইয়া আসিতেছিল। প্রকাশের আস্তিন ধরিয়া টানিয়া সুনীত বলিল, চল প্রকাশ।

প্রকাশ নড়িল না। সে এই দেখিতে-আধ-পাগলা লোকটির পানে চাহিয়া চাহিয়া অসম্বদ্ধ ভাবে কি-যে ভাবিয়া লইতেছিল, তাহা সে-ই জানে।

চলিতে চলিতে সুনীত বলিল—আরে ভাই, মুখে ওকথা সবাই বল্‌তে পারে—অসন্তোষ নৈরাশ্য পরিহার কর। কিন্তু তা কি কখনো হয় ? নন্‌সেন্স !

প্রকাশ কিছু বলিল না।

মেসের কাছে আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—পাশ করে বেরিয়ে এসে কি কর্‌বে মনে করেছ, সুনীত ?

—কি জানি, সে-কথা ভেবে দেখিনি।

দরজায় পা দিয়া প্রকাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—আজ রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী যাচ্চি।

বিস্মিত হইয়া সুনীত কহিল,—আজই ? কৈ, এতক্ষণ বলনি।

—এখনি ঠিক কর্‌লাম,—বলিয়া সে একটু হাসিল।

সুনীত অবাক্ হইয়া ক'য়েক মুহূর্ত্ত তার পানে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, ফির্‌চ কবে ?

—ফির্‌বো না।

—সে কি! এগ্‌জামিন ?

—এগ্‌জামিন আর দেওয়া হ'ল না।

(৪)

রেল ষ্টীমার পরিশেষে নৌকায় চড়িয়া চব্বিশ ঘণ্টা পথশ্রমের পর ক্লান্তদেহে প্রকাশ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল।
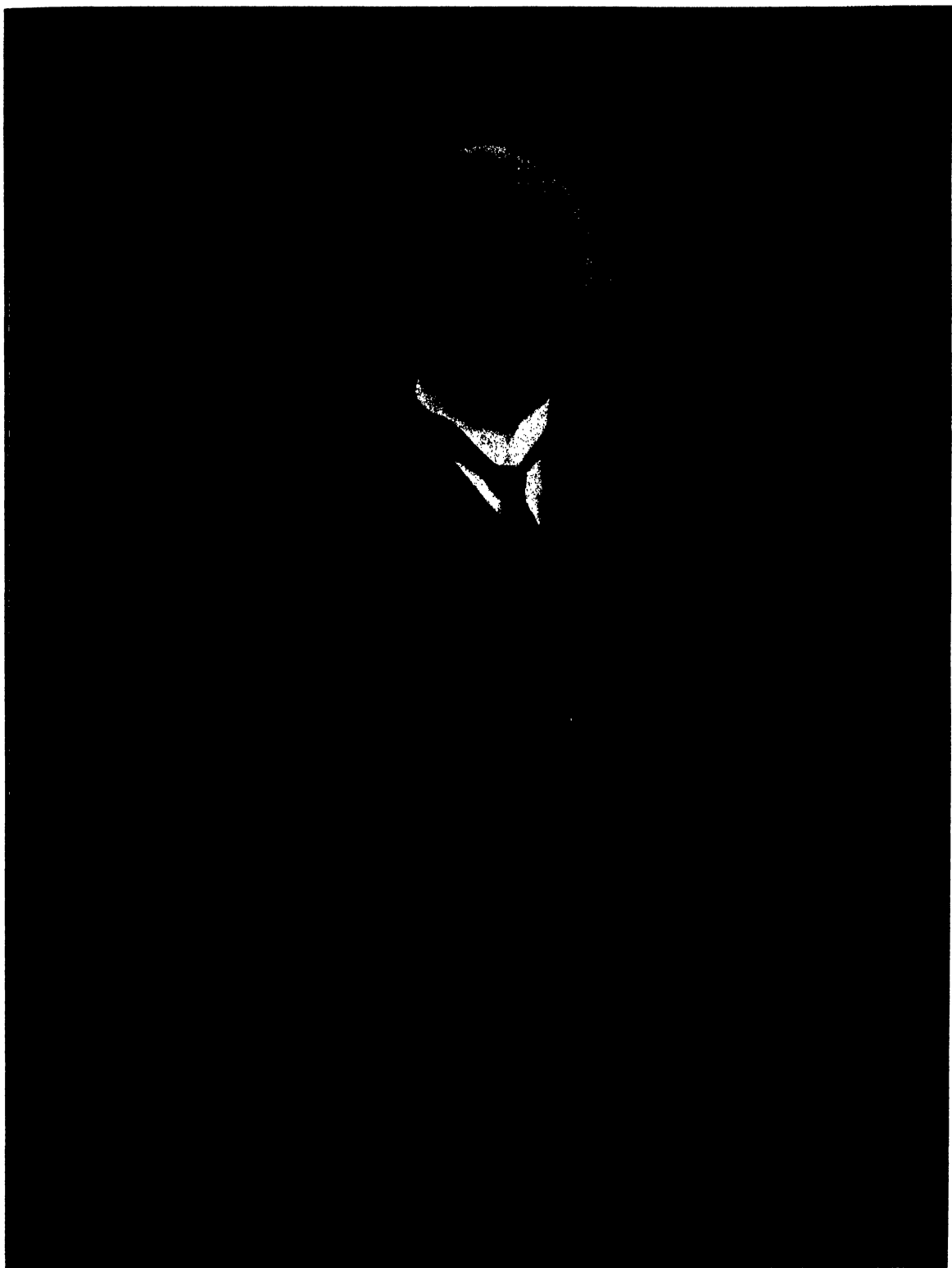
ভারতবন্ধু ভক্তিভাজন জে, টি, সাণ্ডার্ল্যাণ্ড, এম-এ, ডি-ডি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। গ্রামখানি সুপ্ত—নিঝুম। গাছের তলায়-তলায়, ঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে রাশি রাশি অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। শুধু নক্ষত্রলোক হইতে একটু অস্পষ্ট আলোক নদীর কালো জলে নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

তীরে উঠিয়া অন্ধকারে প্রকাশ কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। বলিল—এ কোথা এসে উঠ্‌লি রে?

মাঝিটি বিদেশী—এ পথে অল্পই আসিয়াছে। চারিদিক চাহিতে চাহিতে সে বলিল—আগ্যা কর্ত্তা ওইটা না বারুইখালির তেঁতুলগাছ?

প্রকাশ চিনিল—তাহাদের গ্রামই বটে। ওই ত চৌধুরীদের পুকুরপাড়। একবার মনে হইল, পূর্ব্বে এই তেঁতুলগাছটি সে নদীতীর হইতে আরও অনেক দূরে দেখিয়াছে। কিন্তু সে তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছিবার জন্য ব্যস্ত—ইহার দূরত্ব লইয়া হিসাব করিল না। আজ সারাপথ একটিমাত্র চিন্তা তাহার মস্তিষ্ক জুড়িয়া বসিয়াছিল। গ্রামে ফিরিয়া সে কি করিবে? তাহার অন্তর বলিতেছিল, দেশে যাও—সেখানে অনেক কাজ করিবার আছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সকলেই যদি সহরে আসিয়া বাস করে, তবে গ্রাম বাঁচিবে কাহাকে লইয়া? সে দেখিল, গত দুই বৎসর তাহার মনের ভিতর একটা তুমুল সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। আকাঙ্ক্ষার তীব্র কষাঘাতে ক্রমশঃ তাহাকে কোন্ অন্ধকার পথে অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। আজ তাহার মন অতৃপ্ত বাসনার বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। গোলদীঘির সেই বক্তার কথাগুলি কেবলি তাহার মনে পড়িতেছিল। সত্যই সে সর্ব্বভুক্ ক্ষুধার অগ্নি নিজের ভিতর প্রজ্বলিত করিয়াছে। এ আগুনে সে যে নিজেই দগ্ধ হইয়া যাইবে। ছাই লেখা পড়া—এই আগুন জ্বালিবার জন্যই না এত সব আয়োজন? সে স্থির করিল, আর যাহা হোক্—কলিকাতায় সে আর ফিরিবে না। কেন ফিরিবে? তাহার অভাব কিসের?

সে যত গ্রামের কাছাকাছি আসিয়া পড়িতেছিল, ততই তাহার মনের ভিতর সুরবালার মুখখানির স্নিগ্ধজ্যোতিঃ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহের পর দীর্ঘ দুই বৎসর কাটিয়া গেছে। এই দুই বছরের মধ্যে ছুটিবারমাত্র সে বাড়ী আসিয়াছিল। মেয়েটিকে ততখানি চিনিবার এবং নিজেকে ততখানি চিনাইবার ফুরসৎ তাহার ঘটে নাই। দুঃখ হইল—অনির্দ্দেশ্য লক্ষ্য ধরিয়া মিছা পড়াশুনার ধাঁধায় এতকাল ঘুরিয়া কেন সে তাহাদের সম্বন্ধ আরও নিবিড়, আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিল না? এই যে লোকসান, এই যে অপচয়—এ তাহার পূরণ করিতেই হইবে। যে-তীব্র আলোক তাহার চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছিল, সেই আলোর মোহ কাটাইয়া আবার তাহাকে ভালবাসার অর্দ্ধপথে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সুরবালাকে সে ভালবাসিবে এবং তাহাকে লইয়া জীবনের দিনগুলি সেই স্নেহভরা, স্মৃতিঘেরা গ্রামখানির ভিতর বসন্ত-নিঃশ্বাসের মত অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারিবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি?

তোরঙ্গ ও বিছানা মাঝির মাথায় চাপাইয়া লণ্ঠনটি তুলিয়া লইয়া প্রকাশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। সরু পথ—দুই ধারে জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু'-একখানা বাড়ী, তারপর ছোট একটি ক্ষেত। সেখানে গেলে বাড়ীর পুকুরধার দেখা যাইবে। হাতের আলো দুলিয়া দুলিয়া সম্মুখের খানিক আলোকিত করিতেছিল, তারপর গাঢ় অন্ধকার—সূচিভেদ্য। এই রাত্রে খবর নাই, বার্ত্তা নাই, হঠাৎ তাহাকে বাড়ী আসিতে দেখিয়া তাহার মাতা কত খুসী হইবে, সুরবালার দেহখানি জুড়িয়া কেমন স্বচ্ছন্দ পুলকের ঢেউ বহিয়া যাইবে—কল্পনায় এই মধুর চিত্র আঁকিতে আঁকিতে সে রাস্তার মোড়ে আসিয়া পড়িল। ওই যে মাঠ—ওই পুকুর। ওকি! পুকুর-পাড়ে গাছের আড়ালে ও আগুন কিসের? আগুনের শিখাগুলি লক্‌লক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মনে পড়িল, শীতকালে সময় সময় ডুলি-বেহারারা ঐ জায়গাটিতে একখানি নীচু চালা তুলিয়া থাকিত। কিছু নয়—গরীবের উপর দেবতার জুলুম, উহাদের চালাঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। রাশিরাশি আগুনের ফুল্‌কি দখিনা বাতাসের সঙ্গে বিপরীত দিকে উড়িতেছিল। একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে সহসা তাহার অন্তরে ভীষণ সংশয় দোল দিয়া উঠিল। সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

মাঝির পানে চাহিয়া সে ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ও কিসের আগুন বল্‌তে পারিস্?

মাঝি বলিল—আগ্যা কর্তা—মনে হয়, ও চিতা।

—চিতা! প্রকাশের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ও যে তাহার বাড়ী! আজ তাহার একি সর্ব্বনাশ হইল! ত্রস্ত কম্পিতপদে সে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

বাতি হাতে এক ব্যক্তি সেইদিকে আসিতেছিল। লণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—কে, প্রকাশ?

—হাঁ।

সে বলিল—তা হ'লে তার পেয়েছিলে?

প্রকাশ হাঁফাইতেছিল। কোনমতে বলিল,—না, বীরুদা। কিসের তার?

বীরু অগ্রসর হইয়া তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত ব্যথাভরা স্বরে সে কহিল—বড় দারুণ খবর, প্রকাশ। অধীর হ'লে চল্‌বে না। তোমার মা আর নেই—ওই দ্যাখ।

দূরে চিতার আগুন তখন নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল। চারিদিকে মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়াগুলি প্রেতের মত ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।

প্রকাশের চোখে জল দেখা দিল। তাহার গতি শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। বীরু বলিয়া গেল গ্রামে খুব কলেরা লাগিয়াছে। এমন দিন নাই, দুই-একজন না মরিতেছে। প্রকাশের মা কাল সন্ধ্যাকালে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তখনি প্রকাশকে টেলিগ্রাম করা হয়। চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। সকলি ভবিতব্য!

প্রকাশ চিতার পাশে বসিয়া পড়িল। সারাদিন অনাহারে কাটিয়াছে, সে শ্রান্ত হইয়াছিল। তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সমস্ত ব্যাপার তাহার কাছে একটা বিকট দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। চিতা ক্রমে নিব-নিব হইয়া আসিল। কয়েক খণ্ড কাঠ শেষবার জ্বলিয়া উঠিয়া জানাইয়া দিল, সব ফুরাইয়া গিয়াছে।

সে মাতৃহীন—সংসারে নিতান্ত একা। কে ভাবিয়াছিল এমন আকস্মিক দৈবদুর্ব্বিপাক তাহার সুখের ছবিখানি নিমেষমধ্যে চূর্ণ করিয়া দিবে? হায়রে, সে যে বড় আশা করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর আসিয়া দেখিল, মেঝের উপর পড়িয়া সুরবালা অঝোরে কাঁদিতেছে।

পরদিন সকালবেলা যষ্টি হাতে বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে মশায় আসিয়া দেখা দিলেন। প্রকাশ ইঁহাকে মুরুব্বির মত দেখিত। ক্ষীণ বাহু দিয়া তিনি প্রকাশকে বক্ষমধ্যে টানিয়া লইলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল।

তিনি বলিলেন—এইত সংসার, বাবা। একদিকে মৃত্যুর হাহাকার উঠ্‌ছে, তবু এরি ভিতর খেলার পুতুলগুলি সাজাতে হ'বে, গুছোতে হ'বে। এই বুকভরা কান্নার মধ্যেও শৃঙ্খলা বজায় রাখ্‌তে হ'বে।

কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন,—ভগবান্ বুঝি এবার আমাদের একটু শোকদুঃখেরও ফুরসত দিলেন না। যারা গেছে তাদের চেয়েও যারা আছে তাদের ভাবনা এখন বেশি ভাব্‌তে হ'বে। গ্রামের অবস্থা যে-রকম নদীভাঙ্গা সুরু হয়েছে, তাতে আস্‌ছে বর্ষাবধি এখানে আমরা টিঁকে থাক্‌তে পার্‌বো এমন সম্ভাবনা নেই। বেলগ্রাম গেছে।

প্রকাশ চমকিয়া উঠিল,—বেলগ্রাম গেছে! বলেন কি!

—হাঁ বাবা।

—আমাদের জমীগুলি যে সেখানে!

—তোমাদের জমী গেছে, বাবা।

—সব?

—হাঁ।

প্রকাশ হতভম্বের মত স্তব্ধ হইয়া রহিল। কাল রাত্রে বাড়ী আসিবার পথে চৌধুরীদের তেঁতুলগাছটি তাহার মনে পড়িতেছিল। খানিক পরে সে বলিল,—আমায় ত কেউ লিখে জানাননি?

বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—তোমার মার বারণ ছিল।

প্রকাশ বুঝিল, নির্ভাবনায় যাহাতে তাহার পড়াশুনা চলে সেজন্য মাতা ইহা গোপন করিয়াছিলেন

বৃদ্ধ কহিলেন,—ধার-কর্জ্জ ক'রে—যেমন ক'রে হোক্ তোমার খরচ চালাবেন ঠিক করেছিলেন।

অদূরে একটা গাছে অপর্য্যাপ্ত রক্তজবা ফুটিয়াছিল। এই গাছ হইতে মাতা প্রতিদিন পূজার ফুল চয়ন করিতেন। প্রকাশের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। তাহার মনে হইল, মাতার স্নেহ-পারিজাত যেন গাছটিকে আলো করিয়া ফুটিয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

স্বরাজের যোগ্যতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গত মাসে স্বরাজের আবশ্যকতা ও আমাদের যোগ্যতা-শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সামরিক সামর্থ্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হয় নাই। একটা প্রবন্ধে কোন বিষয়েরই সম্যক্ আলোচনা হইতে পারে না। কিন্তু যে-উপবিষয়টির উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাতে যে দুটা কথা বলা হয় নাই, তাহা এখানে বলিতেছি। ভারতবর্ষে যে এখনও উপযুক্ত সেনানায়ক পাওয়া যাইতে পারে, তাহার দুটি প্রমাণ গত মহাযুদ্ধে পাওয়া গিয়াছে। অনেক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অনেক ইংরেজ সেনানায়কের মৃত্যু হয়; তাঁহাদের জায়গায় ভারতীয় রিসালদার, সুবেদার প্রভৃতি সিপাহী-নেতারা উত্তমরূপে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। দেশী রাজ্য হইতে যে-সব সিপাহীর দল যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের নেতারা বরাবরই ভারতীয় ছিলেন, এবং নেতৃত্বের কাজ উত্তমরূপে করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক বিরোধ

আমরা যে স্বরাজের অযোগ্য তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা হয়, যে, ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে, বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমানে, বিবাদ ও রক্তারক্তি হয়, ইংরেজ রাজত্ব ও ইংরেজ প্রভুত্ব না থাকিলে দেশে রক্তের স্রোত বহিবে এবং বাহির হইতে বিদেশী কোন শক্তিমান্ জাতি আসিয়া আবার ভারতবর্ষ দখল করিয়া প্রভুত্ব করিবে। ভবিষ্যতে কি অবস্থার কি হইতে পারে বা না পারে, বলা কঠিন। কিন্তু এখানে বিচার্য্য এই, যে, ইংরেজরা সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ও রক্তারক্তি বন্ধ করিতে, অন্ততঃ পক্ষে কমাইতে পারিয়াছেন কি না। এ বিষয়ে সত্য নির্দ্ধারণের জন্য কোন যুক্তি প্রয়োগের আবশ্যক নাই। সবাই দেখিতেছেন, ইংরেজ রাজত্বে সাম্প্রদায়িক রেষারেষি ও রক্তারক্তি লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং ইংরেজ রাজত্বে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছে, বলা যায় না। রেষারেষি ও রক্তারক্তি কমিয়াছে কি না তাহাও প্রমাণ করা অনাবশ্যক। যাঁহাদের দশ পনের বৎসর আগেকার অবস্থা মনে আছে তাঁহারা জানেন, তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা যত হইত, আধুনিক সময়ে তাহা অপেক্ষা বেশী হয় এবং তাহাতে আগেকার চেয়ে বেশী লোক যোগ দেয়, বেশী মানুষ হতাহত হয়, এবং বেশী রক্তপাত হয়। সুতরাং ইংরেজ রাজত্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কমিতেছে, ইহাও বলা চলে না; বরং বাড়িতেছেই বলা চলে। কেন বাড়িতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে অনাবশ্যক। বিস্তর লোক এরূপ সন্দেহ, এমন কি বিশ্বাস করেন, যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগাইয়া রাখা ও বাড়ান গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রায়; কেন না, তদ্রূপ বিরোধের দ্বারা ইংরেজরাজত্বের অস্তিত্বের প্রয়োজন প্রমাণিত হয়। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, বিরোধ বাধাইবার জন্য সরকারের বেতনভোগী লোকও আছে। কিন্তু সাক্ষী মানিলে খুব সম্ভব তাঁহারা নিজেদের বিশ্বাসের প্রমাণ সম্বন্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিবেন না। সুতরাং এসব সন্দেহ ও বিশ্বাস যখন আদালতে প্রমাণ করা যাইবে না, তখন

আমরা ইহার উপর জোর দি না। আমরা বলি, ইংরেজ-রাজত্বে সাম্প্রদায়িক রক্তারক্তি লুপ্ত হয় নাই, কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে, কেবল ইহার দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইতেছে, যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি বন্ধ করিবার বা কমাইবার কাজ ইংরেজদের দ্বারা হইতেছে না; সুতরাং সেই তথাকথিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাদের এদেশে প্রভুত্ব করিবার প্রয়োজন নাই। আগে যে অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। একটি মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিব।

১৮৩৯ সালে ঢাকা সম্বন্ধে ডাক্তার টেলারের একখানি বহি (Topography of Dacca) প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে—

"Religious quarrels between the Hindus and the Mahomedans are of rare occurrence. These two classes live in perfect peace and concord, and a majority of the individuals belonging to them have even overcome their prejudices so far as to smoke from the same *hookah*."—*The Topography of Dacca*, chapter ix, page 257.

১৮২৬ সালে প্রকাশিত ওয়াণ্টার হ্যামিণ্টন লিখিত ও ঈষ্ট্-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগকে উৎসর্গীকৃত "ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ারেও" ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ও আফগানিস্থানে হিন্দুমুসলমানে এইরূপ সদ্ভাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝা যায়, যে, ইংরেজ যখন ভারতের নানা অংশের রাজা হয়, তখন হিন্দু মুসলমানে যতটা সদ্ভাব ছিল, তাহা কোম্পানীর আমলের প্রথম যুগেও বিদ্যমান ছিল। এখন ইংরেজ-রাজত্বেই তাহা কমিয়া যাইতেছে।

স্তার মাইকেল ওডোয়াইয়ার ও অন্যান্য ভারতফেরত ইংরেজরা বলে, বর্ত্তমান সংস্কৃত ভারতশাসনপ্রণালীর (The "Reforms"এর) দরুন সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের সেরূপ বলিবার উদ্দেশ্য, বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীতে ভারতীয়দের সামান্য যতটুকু ক্ষমতা আছে তাহা লুপ্ত করিয়া ইংরেজ আমলাতন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপন। আমরা সে-উদ্দেশ্যের আলোচনা এখানে করিব না। আমরা বলি, প্রচলিত শাসন-প্রণালী ত আমরা প্রবর্ত্তিত করি নাই, উহা আমরা চাইও নাই। উহার জন্য সম্পূর্ণ ইংরেজরা দায়ী, এবং উহাতে যদি কোন কুফল ফলিয়া থাকে তাহার জন্যও তাহারা দায়ী। তাহারা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছে। কিরূপ শাসন-প্রণালীর ফল কিরূপ হইতে পারে, তাহা না ভাবিয়া অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িবার অভ্যাস তাহাদের নাই। সুতরাং এরূপ অনুমান করিলে ইংরেজদের প্রতি অবিচার করা হইবে না, যে, তাহারা সংস্কৃত শাসনপ্রণালীতে বিরোধ বৃদ্ধির সম্ভাবনা জানিয়াও তাহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কিন্তু যদি এরূপ সম্ভাবনার কথা তাহাদের মনে না আসিয়া থাকে, তাহা তাহাদের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিনাশ বা হ্রাস করিবার ইচ্ছার ও ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। অন্ততঃ তাহাদের এই অদূরদর্শিতার ফলের জন্য তাহারাই দায়ী, আমরা নহি।

আমাদের ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে, যে, বিরোধ ও রক্তারক্তির জন্য হিন্দুরও দোষ নাই, মুসলমানেরও দোষ নাই, সব দোষ ইংরেজের। আমরা জানি, উভয় ধর্ম্মের লোকদেরও দোষ আছে। কিন্তু এখানে তাহা আলোচ্য নহে। এখানে আমাদের বক্তব্য এই, যে, ইংরেজ আমাদের বিরোধ নষ্ট বা হ্রাস করিতে পারে নাই, করে নাই, করিবার মত কার্য্যগত কোন চেষ্টা ও ব্যবস্থা করে নাই; কেবল রক্তারক্তির পর শান্তিরক্ষক হইয়াছে, কতকগুলা লোককে শাস্তি দিয়াছে, এবং তাহাদের বড় কর্ত্তারা লম্বাচৌড়া ধর্ম্ম-কথা শুনাইয়াছে।

কোন দেশে প্রভুত্বসম্পন্ন তৃতীয় পক্ষ থাকিলে বিবদমান কোন দুই পক্ষের স্বয়ং আপোসে মিটমাট করিবার প্রবৃত্তি বাড়ে না, বরং কমে। মানুষ ঘোড়া দেখিলে খোঁড়া হয়, এই প্রবাদ-বাক্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত। "পথে দেখ্‌লাম কামার, ত, কাল পাজিয়ে দে আমার", ইহাও আর একটি প্রবাদ-বাক্য। তৃতীয় পক্ষ বিদ্যমান থাকিতে বিবদমান দুই পক্ষের আলোচনা দ্বারা বা চূড়ান্ত রকম মারামারি দ্বারা বিবাদের নিষ্পত্তি করিবার প্রয়োজন ভাল করিয়া অনুভূত হয় না, সেই প্রকারে নিষ্পত্তির ইচ্ছাও হয় না; তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা গ্রহণ তার চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয়। ইহাতে

তৃতীয় পক্ষের প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বাড়ে বলিয়া সে বিবদমান দুই পক্ষের উক্ত মনোভাব ও প্রবৃত্তিতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিয়া থাকে। এই কারণে আমরা মনে করি, প্রভুত্বশক্তিসম্পন্ন তৃতীয় পক্ষ থাকিতে হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া তাহাদের নিজেদের দ্বারা মিটিবে না। তাহার মানে এই, যে, স্বরাজ ভিন্ন সাম্প্রদায়িক রক্তারক্তি লুপ্ত হইবে না।

আপত্তিকারী এখানে বলিতে পারেন, ইংরেজ রাজত্বে রেষারেষি, রক্তারক্তি নষ্ট হয় নাই, কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে, ইহা না হয় মানিয়া লইলাম, কিন্তু স্বরাজে যে তাহা থামিবে বা কমিবে, তাহার প্রমাণ কি? ভবিষ্যতে কি হইবে, না হইবে, তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা ও তাহার প্রমাণ দেওয়া যায় না; বিরোধ যে থামিবে বা কমিবে, এইরূপ প্রবল অনুমানের ভিত্তি কি, তাহাই নির্দ্দেশ করা যায়।

ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে স্বরাজ নানা রকমের হইতে পারে। এক রকম হইতে পারে, গণতান্ত্রিক স্বরাজ। তাহাতে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে ব্যবস্থাপক সভাদিতে যোগ্যতম লোকেরাই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, মন্ত্রী হইবেন, উচ্চপদে নিম্নপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থা ধর্ম্মমূলক রেষারেষি কমিবার অনুকূল হইবে। আমাদের ধারণা, এইরূপ স্বরাজই প্রার্থনীয় এবং এইরূপই হইবে। আর এক রকম স্বরাজ হইতে পারে, ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যগুলির মত। ঐগুলির কোনটিতে রাজা হিন্দু, কোনটিতে মুসলমান, কোনটিতে শিখ। তাহাদের শাসন-প্রণালী ভাল কি মন্দ, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে যত ধর্ম্মমূলক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, এইসব রাজ্যসমূহে তত হয় না; আগে মোটেই হইত না, কিন্তু সে-কথা বার বার বলায় এখন অল্পস্বল্প হইতেছে। যাহা হউক, উভয় প্রকার স্বরাজেই দাঙ্গাহাঙ্গামা কম হইবে, আমাদের অনুমান এইরূপ।

পৃথিবীতে এমন কোন সভ্যতম দেশও নাই যাহার ইতিহাসে কখনও ধর্ম্মমূলক ঝগড়া, দাঙ্গাহাঙ্গামা, নরহত্যার বৃত্তান্ত দেখা যায় না। এরকম দোষ সব দেশেই ছিল; ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যাহা আছে, তার চেয়ে বেশী কোন কোন দেশে ছিল। এখনও অনেক সভ্য দেশে আছে। সন তারিখ সমেত তাহার উদাহরণ আমি মডার্ণ রিভিউ নামক কাগজে ও পরে আমার 'টুআর্ডস্ হোমরূল' বহিতে দিয়াছি। যেখানে যেখানে এই অবস্থা বিলুপ্ত হইয়াছে, স্বাধীনতার মধ্যেই হইয়াছে, বিদেশী কোন প্রভু আসিয়া কোথাও তাহার উচ্ছেদ সাধন করে নাই। ঐ অবস্থা লোপ পাইয়াছে নানা কারণে— জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রকৃত পার্থিব আর্থিক ও পারমার্থিক উন্নতির বোধ বৃদ্ধি পাওয়ায়। আমাদের দেশেও শান্তিস্থাপন করিতে হইবে আমাদিগকেই। তৃতীয় পক্ষ তাহা করিবে না, করিতে পারিবে না।

ইংরেজ বলে, আগে তোমরা ভাল ছেলে হও, তবে স্বরাজ পাইবে। আমরা বলি স্বরাজ ব্যতিরেকে আমাদের ভাল ছেলে হইবার সম্ভাবনা কম, প্রভুরূপে তোমাদের বিদ্যমানতা আমাদের ভাল ছেলে হওয়ার পক্ষে একটা বিষম বাধা। ইহার একটা প্রমাণ তোমাদের সাম্রাজ্য হইতেই দিতেছি। স্বরাজ পাইবার পূর্ব্বে কানাডায়, ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে এত রেষারেষি ছিল ও মারামারি হইত, যে, মুখদেখাদেখি ছিল না বলিলেই হয়। স্বরাজ স্থাপিত হইবার পর সে অবস্থা তিরোহিত হয়।

অবনত শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব

ইংরেজরা বলে, যে, ভারতবর্ষে তাহাদের শাসন না থাকিলে অবনত ও "অস্পৃশ্য" শ্রেণীদের বড় অসুবিধা হইবে; তাহাদের উন্নতি হইবে না, তাহাদের উপর উচ্চ-শ্রেণীর লোকদের অত্যাচার বাড়িবে।

ইংরেজরা বিদেশী, ভারতবর্ষের কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক-দের সঙ্গে তাহাদের সাম্যের ভিত্তিতে পুরামাত্রায় সামাজিক মেশামেশি ও আদানপ্রদান নাই—হিন্দুদের সঙ্গে ত নাই-ই। অতএব, হিন্দুসমাজে এখনও যা সামাজিক উৎপীড়ন হয়, তাহার জন্য ইংরেজকে একটুও দায়ী না-ই করিলাম— সূক্ষ্ম বিচার এখন না-ই করিলাম। কিন্তু হিন্দুদের সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ না করিয়াও ইংরেজ-শাসকেরা

অবনত শ্রেণীর লোকদের জন্ত যাহা করিতে পারিত, তাহা কি তাহারা করিয়াছে ? করে নাই। প্রমাণ দিতেছি।

অবনত শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত ইংরেজরা করিয়া তাহাদের অধিকাংশ লোককে লিখনপঠনক্ষম করিতে পারিত, এবং এইপ্রকারে তাহাদের সবরকম উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। তাহারা শিক্ষাবিস্তারে "উচ্চ" জাতির লোকদের কাছাকাছিও এখনও যায় নাই। ইংরেজদের দেড়শতাধিক বৎসরের অবনতশ্রেণী-হিতৈষণার ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ! অথচ আমেরিকার অসভ্য নিগ্রো দাসেরা ও তাহাদের সন্তানসন্ততিরা দাসত্বমোচনের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষের "উচ্চতম" জাতিদের চেয়েও শতকরা অনেক অধিক সংখ্যায় লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে। আমেরিকার অধীনে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা পঁচিশ বৎসরে শিক্ষার বিস্তারে ভারতীয় "উচ্চতম" জাতিসমূহকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে।

অস্থি ও বিষ্ঠামূত্রাদি "উচ্চশ্রেণীর" লোকদের অস্পৃশ্য জিনিষ জমীর উৎকৃষ্ট সার রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ কালে চাষের যোগ্য পতিত সরকারী জমী বিস্তর ছিল, এখনও অনেক আছে। প্রজা বসাইবার সময় পতিতজাতিপাবন ইংরেজ বিশেষ করিয়া "অস্পৃশ্য" জাতির লোকদিগকে এই-সব জমী দিয়া হাড় ও বিষ্ঠামূত্রের ব্যবহার শিখাইয়া তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট ভদ্র সম্পন্ন কৃষকে পরিণত করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা করেন নাই। মেথর মেথরই রহিয়া গিয়াছে। বিদেশে হাড়ের চালান বাড়িয়া চলিতেছে।

কতকগুলি শিল্পের কাজ অবনত জাতির লোকেরা বরাবর করিয়া আসিতেছে। যেমন চামড়ার কাজ মুচি চামারে করে, বাঁশ ও বেতের কাজ হাড়ি ও ডোমরা করে। অন্তে কোথাও করে না বলিতেছি না। কিন্তু যাহাদের যাহা কৌলিক ব্যবসা তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি। ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজা হইবার পর কত শত কোটি টাকার কষ না করা বা সামান্ত কষ করা চামড়া বিলাতে ও অন্ত বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, এবং চামড়ার তৈরীজিনিষ আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। বেত ও বাঁশের জিনিষও বিস্তর আমদানী হয়। আমরা "ভদ্রলোকরা" যদি এসব কাজ নাই করি, তাহা হইলে পতিতপাবন ইংরেজ অবনত শ্রেণীর লোকদিগকে উন্নত আধুনিক প্রণালীতে এইসব কাজ শিখাইয়া চামড়ার ও চামড়ার জিনিষের এবং তাহাদের অন্তবিধ কৌলিক শিল্পোৎপন্ন জিনিষের বড় বড় কারখানার মালিক কেন না করিয়া তুলিলেন ?

আর বেশী দৃষ্টান্ত দিব না, আর বেশী প্রশ্ন করিব না। মোটের উপর জিজ্ঞাসা করি, পতিতপাবনতা ও পতিত-রক্ষকতার বৃহৎ দাবীর ইংরেজ কি বিশেষ ও জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিতে পারেন ? সে রকম বিশেষ প্রমাণ আমরা অবগত নহি। "পিস্তিরক্ষা" নীতি অনুসারে কোথাও সামান্ত কিছু হইয়া থাকিলে তাহা এত বড় দাবীর ভিত্তি হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের লোকদের দ্বারা অবনত শ্রেণীসমূহের উন্নতির সাহায্যে কি হইতে পারে, না পারে, পরে বলিতেছি। একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি। এইসব লোকের সংখ্যা খুব বাড়াইয়া ছয় কোটি বলা হয়, কিন্তু অল্পদিন আগে ব্যবস্থাপকসভায় সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, যে, তাহাদের সংখ্যা তিন কোটির কম। তাহাও অত্যুক্তি হইতে পারে।

ঠিক্ আমাদের দেশের মত জাতিভেদ ইউরোপে না থাকিলেও, সেই মহাদেশের ইংলণ্ড ও অন্ত অনেক দেশে অবনত শ্রেণীর লোক ছিল, এখনও আছে। বিদেশী কোন প্রভুজাতি আসিয়া তাহাদের উন্নতি সাধন করে নাই, তাহাদের স্বদেশবাসীদেরই ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া তাহাদের উন্নতির সহায় হইয়াছে। জাপানে আমাদের দেশের মতই জাতিভেদ ছিল, "অস্পৃশ্য" জাতি ছিল। স্বাধীন জাপান স্বয়ং তাহা উঠাইয়া দিয়াছে, বিদেশী প্রভু আসিয়া জাপানী অস্পৃশ্য "এতা" নামক জাতিকে স্পৃশ্য ও আচরণীয় করে নাই। আমাদের দেশে স্বরাজের আমলে আমরাও যে এরূপ কিছু করিব না, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

সভ্যতর ও অসভ্যতর জাতিদের সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ ঘটিলে শক্তিশালী সভ্যতর জাতি দুই পথ অবলম্বন করিতে পারে। তাহারা দুর্ব্বল পক্ষের ধ্বংসসাধন করিতে

পারে, কিম্বা তাহাদিগকে নিজেদের জাতির অন্তর্ভূত করিয়া ফেলিতে পারে। ইউরোপীয়েরা যাইবার পূর্ব্বে আমেরিকা অগণিত আদিম জাতির বাসভূমি ছিল। ইউরোপীয়েরা যাইবার পর এরূপভাবে তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়াছে, যে, এখন বিশাল উত্তর আমেরিকায় তাহাদের সংখ্যা জোর তিন লক্ষ হইবে। পৃথিবীর অন্য কোন কোন দেশেও ইউরোপীয়েরা তথাকার আদিম জাতিদিগকে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত বিনষ্ট বা প্রায় বিনষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে সভ্যতার নানাস্তরে অবস্থিত নানা জাতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ হইয়া আসিয়াছে। কোথাও তাহাদের মধ্যে কেহ কাহাকেও বিনষ্ট করে নাই, বলিলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হইবে। কিন্তু মোটের উপর ইহা সত্য, যে, ভারতবর্ষে সভ্যতর জাতিরা তাহাদের চেয়ে কম সভ্য জাতিদিগকে সাধারণতঃ হয় নিজেদের সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দিয়াছে কিম্বা উচ্চস্তরের অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছে। হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে উচ্চতম জাতি ধরা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে যেমন গৌরবর্ণ "আর্য্য" চেহারার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দেখা যায়, তেমনি আবার অন্যত্র শ্যামবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ "অনার্য্য" চেহারার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দেখা যায়; কোথাও বা উভয় প্রকারের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দেখা যায়। ইহা হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, যে, হিন্দুসমাজে নানাজাতির সংমিশ্রণ স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখন যে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীস্থ বলিয়া দাবী করিতেছে ও তাহাদের দাবী ক্রমশঃ গ্রাহ্যও হইতেছে, এখন যে অনেক আদিমজাতিকে ক্ষত্রিয় করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হইতেছে, ইহার প্রণালী যাহাই হউক, ইহা ভারতবর্ষে নূতন নহে। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি লোকশিক্ষকের প্রভাবে আগে যেমন অনেক অবনত শ্রেণীর লোক হিন্দুসমাজে সম্মানের স্থান পাইয়াছে, ভবিষ্যতেও তদ্রূপ পাইবে—ইংরেজ-প্রভুত্ব না থাকিলেও পাইবে।

আধুনিক কালে ভারতীয় ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যেই রাখিয়া "অস্পৃশ্য" ও "অনাচরণীয়"কে সামাজিক মর্য্যাদা দানের কাজ প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ আরম্ভ করেন; পরে এই কাজ আর্য্যসমাজ এবং প্রাচীনপন্থী হিন্দুরাও করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজ আমলাতন্ত্র এ কাজ করেন নাই, করিতে পারেন না। জীবিত নেতাদের মধ্যে অবনত শ্রেণীর লোকদের মনুষ্যোচিত অধিকারের দাবী মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা প্রবলতম ভাবে ঘোষিত ও সমর্থিত হওয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক হিন্দুর প্রাণ স্পর্শ, হৃদয় আন্দোলিত ও ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত করিয়াছে। ইংরেজপ্রভুত্ব লোপ পাইলেও এই জাগরণ থাকিবে।

মোটের উপর ইহা সত্য কথা, যে, ভারতীয় লোকেরা অবনত শ্রেণীর লোকদের সামাজিক উন্নতির জন্য ইংরেজ শাসকদের চেয়ে বেশী চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। এই কাজে তাহারা ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে সময়, শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিতেছে।

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্ব্বজনীন ও অবশ্য-কর্ত্তব্য করিবার নিমিত্ত আইন প্রণয়নের চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজ শাসকেরা করেন নাই, গোপালকৃষ্ণ গোখলে করেন; কিন্তু ইংরেজ শাসকদের বিরোধিতায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহার পর এইরূপ যত চেষ্টা হইয়াছে, অধিকাংশস্থলে তাহা হিন্দুরা করিয়াছে। যতবার তাহা বিফল হইয়াছে, গবর্ন্মেণ্টের এবং তাহার আশ্রিত লোকদের বিরোধিতায় হইয়াছে। বেসরকারী হিন্দুরা যতবার এই চেষ্টা করিয়াছে, কোনবারই আইনের খসড়ায় এরূপ বলে নাই যে, অস্পৃশ্য ও অবনত শ্রেণীর লোকেরা সে আইনের সুযোগ পাইবে না। বস্তুতঃ শিক্ষালাভ আইনতঃ দেশের সকল বালক-বালিকার অবশ্যকর্ত্তব্য হইলে উচ্চতম হইতে নিম্নতম সকল জাতিরই সুবিধা হইত। কিন্তু রাজনৈতিককারণে গবর্ন্মেণ্ট বরাবর এরূপ আইনে বাধা দিয়া আসিতেছেন, অথচ আপনাদিগকে দেশের লোকদের চেয়ে বেশী পরিমাণে অবনত শ্রেণীর বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এই সেদিন বিশেষ করিয়া অবনত শ্রেণীর লোকদের উন্নতি ও সুবিধার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট তাহা গ্রহণ করেন নাই। অবনত শ্রেণীসমূহের সুবিধার

জন্ত উত্থাপিত কোন কোন প্রস্তাব আগেও সরকার পক্ষের বিরোধিতায় গৃহীত ও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ; সুতরাং তথাকার নিম্নশ্রেণীর লোকদের অবস্থা ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর লোকদের অবস্থার চেয়ে ভাল। কিন্তু ইংলণ্ডেও অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শাসক ইংরেজরা কয়লার খনির মজুর ও তদ্বিধ অন্য মজুরদের ন্যায্য অধিকার পাইবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে। যাহারা নিজের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের ন্যায্য অধিকার পাইবার বিরোধী, তাহারাই এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের বন্ধু সাজিয়াছে!

এদেশে ইংরেজপ্রভুত্ব থাকিতে ব্রাহ্মণকে যেমন মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে, মেথরকেও তেমনি মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে; কেহই উন্নতশির পুরা মানুষ হইতে পারিবে না। ইংরেজ সকলের মাথায় থাকিবে আর সকলে তাহার নীচে। অন্য দিকে ভারতীয়দের পক্ষ হইতে প্রস্তুত স্বরাজ আইনের খস্‌ড়া দেখুন; তাহাতে কোথাও গাত্রবর্ণ জাতি ধর্ম্ম বা শ্রেণী অনুসারে অধিকারের পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট নাই। সকলের সকল রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক অধিকার সমান করা হইয়াছে। অধিকন্তু কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং সম্পাদক জবাহরলাল নেহরু সম্মতি দিয়াছেন যে,

"All castes are hereby declared and guaranteed to be on a footing of perfect equality, no superiority or inferiority of any caste and no hierarchy of castes shall be recognised or given effect to by the State for any purpose."

"The State shall not treat or allow to be treated any community in India as an untouchable community but shall recognise it as having the same status as other communities."

ভারতবর্ষে ইংরেজরা বলিতে পারে, যে, হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থা অবনতশ্রেণীসকলের উন্নতির অন্তরায়, ধর্ম্মবিষয়ে গবর্ণ্মেণ্ট নিরপেক্ষ বলিয়া কিছু করিতে পারে না;—যদিও এরূপ ছলের বিশেষ কোন মূল্য নাই। কিন্তু যেসব দেশে এরূপ কোন অন্তরায় নাই, সেখানে ইংরেজ কেন অশ্বেতকায়দিগকে উন্নত হইতে দিতেছে না, বরং তাহাদের উন্নতিতে বাধা দিতেছে? দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফ্রিকার ইংরেজ অধিকৃত অন্যান্য দেশে অনেক বিষয়ে কৃষ্ণকায়রা আইনের চক্ষে ও নাগরিক অধিকার বিষয়ে ভারতীয় অবনতশ্রেণীর লোকদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কিন্তু তাহাতে ত তথাকার ইংরেজরা স্বরাজের অযোগ্য বিবেচিত হয় নাই? আমেরিকায় নিগ্রোদের সামাজিক অধিকার ও মর্য্যাদা আমাদের অবনতশ্রেণীর লোকদের চেয়ে ঢের কম। শ্বেত জনতা বিনা বিচারে তাহাদের ফাঁসী দিলে বা তাহাদিগকে জীয়ন্তে পুড়াইয়া মারিলে অনেক সময়ই এই শ্বেতপশুদের কোন শাস্তি হয় না। অথচ আমেরিকার শ্বেতকায়েরা স্বাধীনতার অযোগ্য বিবেচিত হয় না! এ বিষয়ে অনেক বহি ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। এখানে আমরা, গত বৎসরের এপ্রিল মাসের ক্রাইসিস্ নামক আমেরিকান কাগজ হইতে এ দেশের খৃষ্টিয়ান কাগজ 'দি উইকে' তাহার ইউরোপীয় সম্পাদক যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ক্রাইসিসের প্রবন্ধটি মিস্ ডবলিউ এম্ ওভিংটন নাম্নী আমেরিকান মহিলার লিখিত। তিনি বলেন—

Only a white person who has been accustomed to move freely among Negroes can appreciate the segregation of the South. It stares you in the face. Continually you see the signs "White" "Colored." I even saw in an Arkansas courthouse, "WHITE WATER" "COLORED WATER", with a fine disdain of punctuation. When you enter the railroad station, you see the colored shunted off to an inferior waiting room. You buy your ticket at one window, they at another. You ride in separate coaches. When you leave your train, you must watch that you do not walk toward the colored section, though you are not likely to make a mistake, since to you, while you pay no more, is always given the best accommodation. In the street car, yours are the front seats. At every turn you are shown that a colored man belongs to the "untouchables." The Southerner's idea of segregation is to deny the educated Negro the right to remain anywhere where he, the Southerner, has decided to put his foot. He is denied all those beautiful things that accompany city life—art, music, the drama. He may not hear an opera or see a good play, or enter a public library.

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অবনতশ্রেণীর লোকেরা কি সকল বিষয়ে এইরূপ মন্দ ব্যবহার পায়?

"দি উঈকে"র সম্পাদক ডাক্তার জাকারিয়াস্ ঐ বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"This beats even India—does it not? But such is the force of propaganda that India is deemed incapable of democratic institutions, whilst America is accepted as their great exponent!"

অবনত শ্রেণীর লোকদের প্রতি আমাদের ব্যবহার যেরূপ হওয়া উচিত, আমরা সবাই সেইরূপ ব্যবহার করি, বলিতেছি না। কিন্তু ইহাই বলিতেছি, যে, অনেক ভারতীয় শিক্ষিত লোক শাসক ইংরেজদের চেয়ে তাহাদের কম হিতৈষী নহে, তাহাদের জন্য কম চেষ্টা করে না, এবং স্বরাজে তাহাদের অবস্থা ইংরেজরাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না, উৎকৃষ্ট হইবে।

স্বরাজের যোগ্যতা বিষয়ে অন্যান্য প্রধান প্রধান বক্তব্যও এই প্রবন্ধে শেষ করিতে পারিলাম না। পরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য*

Santinekatan
9. 4. 28

সবিনয় নিবেদন

অসুস্থতাবশত আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। কোনোমতে কয়েক লাইন যে লিখিতে পারিতাম না তাহা নহে, কিন্তু সে-ভাবে আপনার চিঠির উত্তর দিতে ইচ্ছা করে না।

আপনার দ্বিতীয় পত্র কবিকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম, তিনি নিজেই একটি উত্তর লিখিয়া দিবেন আশা দিয়াছিলেন কিন্তু সহসা তাঁহার ইউরোপযাত্রার দিনস্থির হওয়ায় তাঁহার বলিবার কথা আমাকে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে মানবমনের সমগ্রতা এবং বিচিত্র সম্ভবপরতাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার নিকট কেবলমাত্র চরকাচালনার দাবী করিলে তাহার শক্তিকে মূলে আঘাত করা হয়, এবং জনমনের ভিতরে এইরূপ inferioty complexএর সৃষ্টি করিলে তাহা অপেক্ষা জাতীয় দুর্গতি আর কী হইতে পারে। বুদ্ধ কিম্বা খৃষ্ট, সর্ব্বদেশের সকল মহাপুরুষই মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ, দুরূহতম পূর্ণতার আদর্শের দাবী জানাইয়া তাহাদের টানিয়া তুলিয়াছেন, তাহাদের চেতনার ক্ষেত্রকে সুবিস্তৃত করিয়াই, তাহাদের সম্মুখ পথে পরিণতির পর্য্যায়ে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। ছোটো ছেলের নিকট বেশীর দাবী করিয়াই, তাহার বিচিত্র শক্তির উপর দাবী জানাইয়াই আমরা তাহার শিক্ষাকে সফল করিয়া তুলি, সে মানুষ হইয়া উঠে, দাবীকে খাটো করিয়া, সহজ করিয়া, মনুষ্যত্বের আদর্শকে খর্ব্ব পঙ্গু করিয়া কাহারো কখনো মঙ্গল হয় না।

এই কথাই কবি আপনাকে জানাইতে বলিলেন—এই কটি কথার ইঙ্গিত হইতেই আপনি তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

নিবেদক—শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সরসী-বাবুকে অমিয় যে চিঠি লিখেছেন সেটি দেখলুম। সেই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা বলেচি সেগুলিকে বাদ দিলে চল্‌বে না।

চরকাকাটা একটা বাহ্যক্রিয়া—এটাকে একটা লৌকিক আচার ক'রে তোলা যেতে পারে। কিন্তু আচার প্রায়ই প্রবল হ'য়ে বিচারকে উপেক্ষা করে। কোনো একটা অভ্যস্ত দৈহিক কর্ম্মকে যখনি উচ্চ সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখনি সে আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ্য আচারকে বড়ো জায়গা দেয় আমাদের সমাজে তার অনেক প্রমাণ আছে। আরো

* শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকারের পত্রের উত্তরে।

একটা নতুন আচার যোগ ক'রে আমাদের মনোবৃত্তির জড়তা তাতে বাড়ানো হ'বে ব'লে আশঙ্কা করি।

একা একা ব'সে যাঁরা চরকা কাটেন তাঁরা মনে মনে ভাব্‌তে পারেন যে চরকা কেটে সুতো উৎপাদন ক'রে তাঁরা দেশের ধন বৃদ্ধি করছেন। কিন্তু একথা মনে রাখ্‌তে বেশি লোকে বেশি দিন পারবে না—ক্রমেই এটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হ'য়ে বুদ্ধিকে ম্লান ক'রেই দেবে।

বস্তুত চরকা কাটো একথায় মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই এই জন্যে একথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে তখনি শক্তি দিয়েচে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্য্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সঙ্কীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান ক'রে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোচনা

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত

গত বৈশাখ মাসের প্রবাসীর ১৬০ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে আপনি লিখেছেন—"স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সংস্কারক শাখা মনে করিতেন।"

এ বিষয়ে আপনি যদি শাস্ত্রীমহাশয়ের লিখিত মত তাঁহার কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করেন, তাহা হইলে বাধিত হইব। আমার ধারণা যে, তিনি এরূপ মত প্রকাশ করেননি, হয়ত বুঝ্‌তে ভুল হ'তে পারে।

"জিজ্ঞাসু"

সম্পাদকের মন্তব্য। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐরূপ মত বোম্বাইয়ের "ঈষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" নামক মাসিক পত্রে লিখিত তাঁহার এক প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছিল। তাহা এখন আমার নিকট নাই। ঐরূপ মত তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রকাশিত হইয়াছে। যথা, তিনি উহার ২৭৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :—

"The last and most characteristic defect, as noted by outside observers, is the greater appreciation that the members of this Samaj have shown for western ideals and methods than those which are their own as Hindus." *History of the Brahmo Samaj*, Vol. ii, p. 275.

এই বাক্যটির শেষ চারিটি শব্দে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে হিন্দু বলিয়াছেন।

২৭৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন :—

"I hope their disposition to study their ancient scriptures and to walk in the path of Hindu commission will be further developed as time rolls on, and the Brahmo Samaj will come to be regarded as the truest and greatest exponent of higher Hinduism. With that hope and that prayer I close this part of the history of that section of the Brahmo Samaj with which I am personally concerned."—*Ibid* p. 279,

এই বাক্যদুটিও আমাদের মতের সমর্থক।

প্রবাসীর সম্পাদক।

—

"সমগ্র ভারতীয় প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী"

বিগত পৌষ মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গোক্ত উপরিলিখিত শীর্ষক মন্তব্যে বাঙ্গালীর অধঃপতনের আপনি যে মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার মূল কারণ

অনুসন্ধান করা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কি পরিতাপের বিষয়! যে বাঙ্গালা, পরাধীন ভারতে, রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা এবং ধর্ম্মসম্পর্কিত ব্যাপারে, নূতন ভাব এবং সাধনার ধারা প্রবাহিত করিয়া এই আত্মবিস্মৃত বিজিত জাতির মুক্তির পথের সন্ধান দিয়াছিল, আজ তাহারা জাতীয় উন্নতির সকল প্রচেষ্টা হইতেই বহু দূরে সরিয়া পড়িতেছে। লিখিতে বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিতেছি—এই মাত্র সেদিন দিল্লীতে সর্ব্বদল-সম্মিলনী কর্ত্তৃক ভারতীয় স্বরাজের মুসাবিদা প্রস্তুত করিবার জন্য যে একটি সাব্‌কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কোন বাঙ্গালীর নিয়োগ হয় নাই। যে বাঙ্গালী ভারতে জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্বোধন করিয়া বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কাল বিভিন্ন পথে তাহার উদ্‌যাপনে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট ছিল, আজ নিজের, তথা জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে তাহার কোন স্থানই নাই। আমার মনে হয়, গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ অনুসৃত নির্য্যাতন নীতিই বাঙ্গালীর এই আকস্মিক অবসাদ ও অধঃপতনের একটি বিশেষ কারণ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অসহযোগ আন্দোলন কাল পর্য্যন্ত সরকারের অবৈধ পীড়ন-নীতির ফলে দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ কৃতী বঙ্গীয় যুবকগণ নির্ব্বিচারে কারারুদ্ধ হইয়া অসীম নির্য্যাতনের মধ্যে একে একে মৃত্যুর কোলে চলিয়া পড়িতেছেন। বিজাতীয় শাসক-সম্প্রদায় বুঝিতে পারিয়াছিল, বাঙ্গালীর এই নবজাগরণ ভারতকে যে পথে পরিচালিত করিতেছে তাহার প্রবাহ রোধ করিতে না পারিলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসননীতি ভারতে অচিরেই অচল হইয়া উঠিবে। সেই মনোবৃত্তি হইতেই সরকারের এই দুর্দ্দমনীয় পীড়ন-নীতির উদ্ভব এবং অনেকটা এই নীতি অনুসরণের ফলেই বাঙ্গালা আজ উপযুক্ত ত্যাগী নেতা এবং কর্ম্মীর অভাবে জাতীয় জাগরণে প্রয়োজনীয় স্থান গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

করিমগঞ্জ ১২।৩।২৮ ইং

শ্রীইন্দ্রকুমার দত্ত।

—

শ্রীহট্ট গ্রীবাপীঠ

১৩৩৪ চৈত্র মাসের "প্রবাসীর" ৮৫৯ পৃষ্ঠায় "আলোচনা" প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের "সত্তর বৎসর" প্রবন্ধের স্থান বিশেষে ভ্রম দর্শাইতে গিয়া, শ্রীযুক্ত তরণীকুমার ভট্টাচার্য্য নিজেও এক ভুল করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন "শ্রীহট্টে গ্রীবাপীঠ। গোটাটিকর পরগনার পৌনপুর গ্রামে, সহর হইতে অগ্নিকোণে এই পীঠ অবস্থিত। এখানে দেবী মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সম্বরানন্দ নামে অভিহিত।" এই সম্বরানন্দ নাম ভুল তাহার প্রমাণ :—

(১) গ্রীবা পপতে শ্রীহট্টে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িকা।
দেবীতত্র মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বানন্দশ্চ ভৈরবঃ॥　　পীঠমালাতন্ত্র

(২) রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলে আছে :—
শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব, বৈভব যাহা সেবি॥

এই সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের প্রথম খণ্ডের ১১০ হইতে ১১৬ পৃষ্ঠায় বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

উক্ত সত্তর বৎসর প্রবন্ধে আরও একটা ভুল অথবা মুদ্রাকর প্রমাদ দৃষ্ট হয়। নানা প্রকার সব্‌জী একসঙ্গে ডালের বড়া দিয়া রন্ধন করিলে যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহা শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে লাকড়া নামে অভিহিত হওয়ার কথা উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে "লাবড়া" হইবে।

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী

—

"অভিনয় ও নৃত্য"

বৈশাখের প্রবাসীর বিবিধ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় "অভিনয় ও নৃত্য" সম্বন্ধে লিখিবার সময় লিখিয়াছেন যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অধ্যক্ষতায় কোন সদনুষ্ঠান বা হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য মহিলাদের নাট্যাভিনয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে। "কিসে টাকা বেশী হইবে বা অধিক সংখ্যক লোকের বাহবা পাওয়া যাইবে এইদিকেই যাহাদের বেশী ঝোঁক তাহারা এরূপ কাজে হাত দিলে সমাজের অহিত হইবার সম্ভাবনা।"

কিন্তু এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে, গত দু'এক বৎসর যাবৎ যাঁহারা এই সকল প্রকাশ্য অভিনয় ও নৃত্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা কি ইচ্ছা করিয়াই ঐসকলের মধ্যে মহিলাদের নৃত্যাদি সংযুক্ত করেন নাই ?—উদ্দেশ্য এই যে, উহাদ্বারা টাকা বেশী উঠিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, 'নটীর পূজার' অভিনয়ের সময় সকল দৈনিক কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল—"Special Dance of Srimati Gouri Devi," etc. পেশাদার Company যখন বিজ্ঞাপন দেয়—Special attraction ! Continental Dances by Miss 'X' তখন আমরা জোর গলায় তাহার নিন্দা করি ও অনেককে তথায় যাইতে বারণ করি। ঠিক্ সেইজন্যই আমাদের এইসকল নৃত্যাদিরও নিন্দা করা উচিত।

মহিলাদের নৃত্যাদি না থাকিলে অতি অল্পসংখ্যক লোকই যাইত। এইরূপ প্রকাশ্য নৃত্যাদি হওয়াতে অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোকও সেখানে গিয়াছে। সুতরাং ঐ সকল সম্মিলন নির্দ্দোষ ও পবিত্র হয় নাই। আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র—এদেশে টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া আনন্দ লাভ করিবার মত অর্থ অতি অল্প লোকেরই আছে। ইহা সত্ত্বেও যখন ঐ সকল স্থানে ভিড় হয় তখন লোকে মনে করিতে পারে, যে, ঐসকল অভিনয়ের উদ্যোক্তাগণ আমাদের দেশের জনসাধারণের নৈতিক অবনতির জন্য অন্যায় সুবিধা লইতেছেন। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয় পুরুষদিগের কুস্তি প্রভৃতির কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু সেরূপস্থলে অতি অল্প স্ত্রীলোকই গিয়া থাকেন উপরন্তু সেখানে পিতামাতার রক্ত জল করা অর্থের অপব্যবহার ত' দেখা যায়ই না।

ভদ্রমহিলারা ব্যায়ামের জন্য ; নিজেদের চিত্ত বিনোদনের জন্য অথবা একটি ললিতকলার চর্চ্চা হিসাবে নিজ নিজ গৃহে নৃত্য করুন তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে নৃত্য করার মতন আবহাওয়া আমাদের দেশে এখনও হয় নাই।

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, শান্তিনিকেতনে যখন "নটীর পূজা"র নৃত্যসহকৃত অভিনয় দেখিয়াছিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদ্রেক হইয়াছিল।

কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যেসকল ব্যক্তি ঐ সকল নৃত্যাদি দেখিতে যায় তাহাদের অধিকাংশই ছাত্র এবং কেহ কেহ দুষ্ট প্রকৃতির লোকও। উঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। উঁহাদের মনে কচিৎ কখনও ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়। সুতরাং ঐ সকল নৃত্যাদির দ্বারা আমাদের কোনরূপ নৈতিক লাভ নাই—বরং ক্ষতিই আছে।

তাই বলিতেছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আলোকিত না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত ভদ্রমহিলাদের নৃত্যাদির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন সদুদ্দেশ্যে হইলেও স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের প্রকৃত শিক্ষার জন্য সকল রকম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

যখন জনসাধারণ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে ও ভদ্রমহিলাদের নৃত্য দেখিবার জন্য অযথা ভিড় করিবে না, তখন আর ভদ্রমহিলাদের প্রকাশ্য নৃত্যে কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সমাজের মঙ্গলের জন্য উহা বন্ধ রাখিতে হইবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার গুপ্ত

সম্পাদকের মন্তব্য।

আমি যাহা লিখি নাই, সেরূপ কোন কোন কথার উল্লেখ ও আলোচনা বাদ দিয়াছি।

"কিসে টাকা বেশী উঠিবে বা অধিকসংখ্যক লোকের বাহবা পাওয়া যাইবে, এই দিকেই যাহাদের বেশী ঝোঁক, তাহারা এরূপ কাজে হাত দিলে সমাজের অহিত হইবার সম্ভাবনা।" যাহারা কুরুচিপূর্ণ নৃত্য বা অভিনয় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে সঙ্কোচ বোধ না করিতে পারে, তাহাদের উদ্দেশে আমি ঐ কথা লিখিয়াছিলাম। "নটীর পূজা"র অভিনয় ও নৃত্য সে-জাতীয় নহে। উহার বিজ্ঞাপন আমি দেখি নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপনে সুরুচিসম্মত নৃত্যে নিপুণা কোন মহিলার উল্লেখ কুরুচিপূর্ণ নৃত্যে দক্ষা পেশাদার নর্ত্তকীর উল্লেখের সমশ্রেণীস্থ মনে করি না। পেশাদার নর্ত্তকীদের সব নৃত্যও কুরুচিপূর্ণ নহে। তাহাদের সেরূপ সুনৃত্য দেখিলে সচ্চরিত্র লোকদের অনিষ্ট না হইতে পারে।

নৃত্যের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, যে, মহিলাদের গান শুনিবার জন্য ও তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্যও অনেক "দুষ্টপ্রকৃতির লোকও" খুব সুস্থানসকলেও গিয়া থাকে; কিন্তু তাহার জন্য প্রকাশ্য স্থানে মহিলাদের ধর্ম্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, গান প্রভৃতি বন্ধ করা যাইতে পারে না।

আমি যেসব অভিনয় ও নৃত্য দেখি নাই, সেই সকলের বিষয় কিছু লিখি নাই, লিখিতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় যে-সব অভিনয় ও নৃত্য হইয়াছে, তাহাতে "আমাদের দেশের জনসাধারণের নৈতিক অবনতির জন্য অন্যায় অসুবিধা" লওয়া হয় নাই, ইহা আমার বিশ্বাস ও মত। অধিকন্তু আমি মনে করি তিনি নৃত্যকে পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজের উপকার করিতেছেন, এবং নির্ম্মল আনন্দের ব্যবস্থা করিতেছেন।

স্থলবিশেষে আমি পুরুষদের কুস্তি প্রভৃতিতে বিস্তর মহিলা দেখিয়াছি। "পিতামাতার রক্ত জল করা অর্থের অপব্যবহার" করিবার জন্য থিয়েটারে বায়োস্কোপে এবং ফুটবল ম্যাচে যত ভিড় হয়, রবীন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় যে-সব অভিনয় ও নৃত্য হইয়াছিল, তাহাতে তত ভিড় হয় নাই। "অযথা ভিড়" হয় নাই।

ব্যায়াম, চিত্তবিনোদন ও ললিতকলার চর্চ্চার জন্য ভদ্রমহিলাদের নিজ নিজ গৃহে নৃত্য করায় যে লেখকমহাশয়ের আপত্তি নাই, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু নৃত্য যে নির্দ্দোষ হইতে পারে, প্রকাশ্যস্থানে ভদ্রমহিলাদের সুনৃত্য না দেখিলে আমাদের দেশে অনেকের সেরূপ ধারণা জন্মিবে না। অন্য রকমের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ব্রাহ্ম-সমাজের মহিলারা প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্মসঙ্গীত ও অন্যান্য ভাল গান গাওয়ায় অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে ভাল গান গাহিবার রীতি প্রচলিত হইবার পক্ষে সাহায্য হইয়াছে। জলে না নামিলে যেমন সাঁতার দেওয়ার অভ্যাস জন্মে না, তেমনি "প্রকাশ্যে নৃত্য করা" ব্যতিরেকে "প্রকাশ্যে নৃত্য করার মতন আব্‌হাওয়া আমাদের দেশে" হইবে না।

ছাত্র ও অন্যান্য দর্শকদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক কত ও দুষ্টপ্রকৃতির লোক কত, তাহা আমি বলিতে অসমর্থ। জনসাধারণের প্রকৃত শিক্ষা আমিও চাই। ভাল নাটক ও যাত্রার অভিনয় এবং ভাল নৃত্য লোকশিক্ষার একটি উপায় বলিয়া আমি মনে করি।

যাহা নির্দ্দোষ চিত্তবিনোদনের উপায়, সেইরূপ সুনৃত্য যদি ভদ্রপরিবারের বালিকারা ও মহিলারা নিজের আত্মীয়স্বজনের নিকট করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা সামাজিক চিত্তবিনোদনের জন্য সামাজিক ভাবে না করিবার যথেষ্ট কারণ দেখিতেছি না। বরং এরূপ সামাজিক আনন্দ বিধানের ব্যবস্থা করিলে একত্র আনন্দ উপভোগ দ্বারা সামাজিক ঘনিষ্ঠতা ও সংহতি বৃদ্ধি হয় বলিয়া তাহা করাই উচিত।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসীর সম্পাদক

কাগজের দেবমূর্ত্তির ব্যবসা—

চীনদেশে এইসব বিচিত্র রঙের কাগজের দেবমূর্ত্তি বিক্রয় হয়। এইসবে লালরঙের প্রাধান্য বেশী।

(ক) এক জোড়া 'দ্বারীদেবতা'। বাড়ীর দুয়ারে ইহাদের আঁটিয়া দেওয়া হয়, অমঙ্গল ঢুকিতে পারে না।

(ক) এক জোড়া 'দ্বারীদেবতা'। বাড়ীর দুয়ারে ইহাদের আঁটিয়া দেওয়া হয়, অমঙ্গল ঢুকিতে পারে না।

(খ) দ্বিতীয় চিত্রে আর এক জোড়া এরূপ দেবতা।

(ক) প্রথম চিত্র দুটিতে এক জোড়া 'দ্বারীদেবতা'—বাড়ীর ...রে ইহাদের আঁটিয়া দেওয়া হয়। অমঙ্গলের বিরুদ্ধে ইহারা ...হারা দেয়।

—

ফরাসীজাতি ইংরেজী পোষাক চায় না?—

মরক্কোর সুলতানের সঙ্গে ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি তাঁহার য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে চলিয়াছেন। এই চিত্র দেখিয়া ফরাসীর একজন ফ্যাসান দক্ষ পরিচ্ছদকলা নায়ক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।—"ফরাসী

(খ) আর এক জোড়া দ্বারীদেবতা।

সেখ-এর পোষাক কি সাহেবী পোষাকের অপেক্ষা সুন্দরতর ?

জাপানে আলু পরীক্ষা চলিতেছে।

জাত কেন ইংরেজের এসব বিশ্রী পরিচ্ছদের নকল করে ? সুলতানের এই ঢোলা সুন্দর ও গরিমাময় পোষাকের পাশে ফরাসীর ট্রাউজার-পরা সভাপতি কি বিশ্রীই না দেখাইতেছেন।"

—

ভাত খাওয়ার পরিণাম—

মৎসুমুরা নামক জাপানী বৈজ্ঞানিক মনে করেন, ভাত খাওয়াই নাকি এশিয়ার জাতিদের অধঃপতনের কারণ। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের মত সুসভ্য ও মহীয়ান্ জাতির অধোগতির মূলও নাকি অনেকাংশে ভাত খাওয়াই। যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন্ আহার্য্য বস্তুতে না পাওয়াতেই 'ভেতো' হিন্দুর মস্তিষ্ক বাড়িতে পারে না;—ইহা তাঁহার অভিমত। জাপানীরা পরীক্ষা করিতেছে যে ভাতের বদলে গোল আলু চালানো সম্ভব কি না—চিত্রে তাহাই দেখানো হইতেছে।
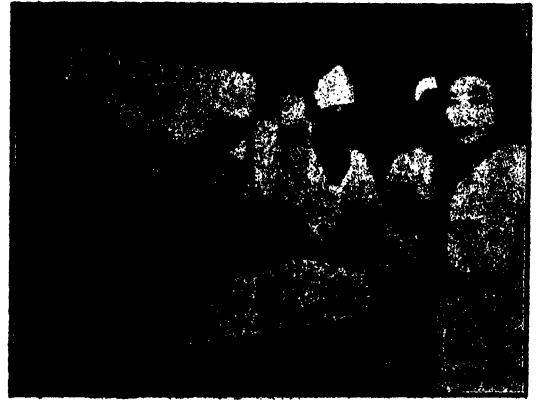
—

জার্ম্মানীর খেলাধুলায় শৃঙ্খলা—

সন্ধিপত্রের চুক্তি অনুসারে জার্ম্মানীতে বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তি ও সমর-শিক্ষা নিষিদ্ধ হওয়ায় জার্ম্মানী এই কঠিন বাধ্যতামূলক খেলাধুলার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। কোনো কোনো ইংরেজ লেখকের মতে গত যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে খেলোয়াড়ের উপযুক্ত গুণগ্রাম দেখিয়া জার্ম্মানরা মুগ্ধ হয়; তাই খেলাধুলার প্রতি তাহারা এখন জোর দিয়াছে। তবে, জার্ম্মান্-নেতাদের কাছে এ খেলা 'খেলা' নয়; ইহা আরো এক বৃহত্তর ও সুকঠিন জীবনের আয়োজন মাত্র।

জার্ম্মান্ হাইস্কুলের মেয়েদের খেলা

বৃক্ষের বৃদ্ধি—

এক-একটি পূর্ব্বেকার চক্র (ring) বা পর্দ্দার (layer) উপর বৃক্ষ কি করিয়া নূতন নূতন চক্র বা পর্দ্দা বৃদ্ধি করিয়া চলে, অধ্যাপক এমানুয়েল ক্রিটুজ তাহা আমেরিকান্ লুম্বারম্যান্ পত্রে বিবৃত করিয়াছেন। প্রথম চিত্রটিতে দেখানো যাইতেছে যে, একশত বৎসরে এই রেড্‌উড্ গাছটি মাত্র তিন ইঞ্চি রেডিয়াস্ পরিমাণ বাড়িয়াছিল। তখন পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গাছগুলি কাটিয়া দেওয়ায় বেশী পুষ্টিলাভ করিয়া সেই গাছটিই চল্লিশ বৎসরে সাত ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়া গেছে। দ্বিতীয় চিত্রটিতে আহত হইলে গাছ তাহার আঘাত কি করিয়া শুকাইয়া ফেলে ও নূতন চক্রের দ্বারা আঘাত স্থান ঢাকিয়া লয়, তাহা দেখা যাইতেছে।

বৃক্ষের বৃদ্ধি

বৃক্ষের ঘা-চিকিৎসা

রয়াল একাডেমি অব আর্টসের একমাত্র মহিলা-সদস্য—

মিসেস লরা নাইট রয়াল একাডেমির সদস্যপদে নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। ডার্বিশায়ারের মিঃ চার্লস জন্‌সন্ তাঁহার পিতা। তিনি তাঁহার সহাধ্যায়ী পোর্ট্রেট্-পেইণ্টর মিঃ হেরল্‌ড নাইট্‌কে ১৯০৩ খৃঃতে বিবাহ করেন। মিঃ হেরল্ড নাইট্-ও সেদিন রয়াল একাডেমির সদস্যপদে বৃত হইয়াছেন। মিসেস নাইট বলিতেছেন, সেদিনে মহিলা-ছাত্রীদের নগ্ন-মূর্ত্তি দেখিয়া আঁকিতে দেওয়া হইত না। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে নর-নারীদের দেহের যতটুকু উন্মুক্ত

(খ) লরা নাইটএর নিগ্রোচিত্রাবলী

দেখানো হইত,আমরা সেইটুকুই দেখিতে পাইতাম। বৎসরের পর বৎসর আমি থিয়েটারে গিয়া নৃত্য-কুশলা অভিনেত্রীদের দেখিয়া আঁকিয়াছি। একাডেমিতে এবৎসর তিনি যে চিত্র দিয়াছিলেন তাহার নাম— 'নৃত্যাভিনয়ের প্রসাধন।' এ বৎসর আমেরিকা গিয়া তিনি নিগ্রোদের যে-সব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এখানে 'লিটারারি ডাইজেষ্ট' পত্র হইতে তাহাই পুনর্মুদ্রিত হইল। মিঃ এ, জে, মুনিংস, আর-এ, বলেন, 'মিসেস নাইট্‌কে আমি এদেশের মুক্ত-বায়ুর ও সূর্য্যালোকের শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য মনে করি।'

মিসেস লরা নাইট

চিত্র পরিচয় —

প্রথম পংক্তিঃ (ক) নিগ্রোজননী (খ) মাতা-পুত্র (গ) নিগ্রোতন্বী।

দ্বিতীয় পংক্তিঃ (ক) সাগর বালা (খ) সার্কাসের ক্রীড়াঙ্গিনী (গ) বার্দ্ধক্যের রেখা চিহ্নিতা।

তৃতীয় পংক্তিঃ (ক) নিদ্রা (খ) জাগরণ।

—

শিশু ও মুষিক—

স্যার উইলিয়াম রীচির বোধ হয় এইখানাই শ্রেষ্ঠ চিত্র। 'লিটারারি ডাইজেষ্টের' মতে শিশু ও নারী যাঁহাদের চিত্র-বিষয় অষ্টাদশ শতাব্দের সেইসব শিল্পীদের মধ্যে তাঁহার আসন প্রথম পংক্তিতে।

—

বীরশিশু—

এই শিশুর চিত্রটি 'ইণ্ডিয়ান্ ডেলিমেল্' পত্র হইতে গৃহীত। শিশুটির নাম কে, কে, শাহ্। তাহার বয়স সাড়ে তিন বৎসর, বাড়ী পাটন (বোম্বাই প্রদেশ) ১৩৫ পাউণ্ডের ভার (tension) সহন-ক্ষম শিকল এই শিশুটি ছিঁড়িতে পারে।

শিশু ও মুষিক

ভারতবর্ষের বীরশিশু

হাউস্ অব্ লেবারার্স লিমিটেড্, কুমিল্লা

(কুমিল্লাস্থিত "শ্রমিকদের কারখানা")

দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, পাঁচজন লোককে ডাকিয়া দেখাইতে পারে, আজ পর্য্যন্তও 'হাউস অব লেবারার্স' এমন কিছু দর্শনীয় ব্যাপারের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই। এবং হয় নাই বলিয়াই দীর্ঘ ছয় বৎসর পূর্ব্বে একটা অখ্যাত দিবসে যাহার জন্ম হইয়াছিল আজ পর্য্যন্তও সে লোক-লোচনের অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে। 'লেবারার্স'দের' ঐতিহাসিক দৈন্যের বা প্রাচুর্য্যের অভাবের কারণ যাহাই হউক, আজও এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের নিকট অপরিচিতই রহিয়াছে। অথচ মনে হয়, যে-আদর্শের শক্ত বনিয়াদের উপর এই 'হাউস্‌টি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, দেশব্যাপী এই বিরাট বেকার সমস্যার নিতান্ত নিরাশার দিনে, মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের দারুণ অন্নাভাবের হাহাকারের মুখে এই প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত একশ্রেণীর লোকের ব্যর্থ হতাশ প্রাণে ক্ষীণ হইলেও নব আশার নূতন আলোক প্রদান করিবে। কেননা, এই ক্ষুদ্র ইতিহাসের মধ্যে মিলিবে একনিষ্ঠ সাধনার সার্থকতা; দেখা যাইবে কি করিয়া গুটিকতক ছন্নছাড়া নিঃসম্বল যুবক হেয় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়াও একমাত্র আত্মবিশ্বাস ও বিপুল কর্ম্মপ্রেরণার বশে একটা যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের শক্ত বনিয়াদ খাড়া করিয়া তুলিয়াছে।

হাউস অব লেবারার্স লিমিটেডের বর্ত্তমান মূলধন সওয়া লক্ষ টাকারও উপরে, কিন্তু ইহার ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল মাত্র ২১০৲ টাকা লইয়া। সে ১৯২২ অব্দের কথা। দেশ-জোড়া তখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ঢেউ; গোটা সমাজ দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা লইয়া একটা আশু মুক্তির আশায় জাগিয়া উঠিয়াছে। এমনি বিরাট আন্দোলনের মধ্যে অকস্মাৎ একদিন ২রা ফেব্রুয়ারী আড়ম্বরহীন নীরবতার ভিতর দিয়া এই হাউসের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রবর্ত্তক ছিল ইহার গুটিকত উৎসাহশীল যুবক - কয়েকজন নির্য্যাতিত ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী ও কয়েকজন অসহযোগী। সকলেই নিরুদ্দেশের যাত্রী—প্রাণভরা শুধু একটা সৃষ্টির আকুল প্রেরণা—অন্তর-ভরা আত্মত্যাগের একটা নিঠুর দ্যোতনা। নিগৃহীত, অবজ্ঞাত, সত্যকার রাজবন্দী বা অসহযোগীদের গোপন ব্যথার সঙ্গে যাঁহাদের এতটুকুও পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন, সেই হতভাগ্যদের অভাব কত বড়। কাজেই, যে ২১০৲ টাকা মাত্র মূলধন লইয়া কয়েকটি দুঃসাহসী যুবক ঐ প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহাও নিতান্ত পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়াই সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। (অবশ্য সে-ঋণ বহু পূর্ব্বেই শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।) পরের দুয়ারে হাত পাতিয়া বেড়াইলে আরও কিছু টাকা সংগ্রহ হইত সত্য, কিন্তু ঐ চেষ্টা আত্মাবমাননারই নামান্তর হইবে জানিয়া ঐ সামান্য কয়েকটি টাকা লইয়াই তাহারা কুমিল্লা সহরের এক নিভৃত সহরতলীতে একটা ছোট্ট টিনের চালায় ক্ষুদ্র একটি কারখানা স্থাপন করে।

সৃষ্টির সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কারখানার ইতিহাস সত্যই চমকপ্রদ ঘটনা-বিপর্য্যয়ে পরিপূর্ণ। ইহার কাহিনী যেমন দীর্ঘ তেমনি দুঃখের। বিস্তারিত বলিতে গেলে প্রবন্ধ একখানা পুঁথিতে পরিণত হইবার সমূহ আশঙ্কা আছে জানিয়া, এই স্থলেই অতি সংক্ষেপে দুই চারটি কথা বলিয়াই সমস্ত ব্যাপার সাঙ্গ করিবার ইচ্ছা।

বলিয়াছি, একটা কারখানার প্রতিষ্ঠার কথা। কিন্তু কারখানাটা যে কি, তাহা খুলিয়া বলিলে অতি গম্ভীর লোকের পক্ষেও হাস্য সম্বরণ করা সাধন সাপেক্ষ হইবে। কারখানার তখনকার বড় বড় যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল, গোটা দুই নেহাই, কয়েকটা হাতুড়ী, ছেনী, সাঁড়াশী, একটা সান ও লোহা ছেঁদা করিবার একটি ছোট্ট যন্ত্র। সঙ্গে ছিল একটা কোদাল ও খান দুই চার কাঠ-মিস্ত্রীর অস্ত্র। যেভাবে বা যে কারণেই হউক একটা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু একমাত্র প্রবর্ত্তকদের মানসিক অবস্থা ছাড়া ব্যবসার কোন অবস্থা বা ব্যবস্থাই বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। মূলধন সামান্য; যন্ত্র-পাতির অভাব; অবস্থান ব্যবসার প্রতিকূল—সবই হতাশার কথা। কিন্তু সকলের চাইতে আশার কথা এই যে, যাহারা কারখানার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারা নিজেরাই জানিত না, ঐ কারখানায় তাহারা প্রস্তুত করিবে কি! যে ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাহারা পা বাড়াইয়াছিল, সেইদিকে তাহাদের কাহারও কোন প্রকার অভিজ্ঞতা থাকা দূরে থাক—ভালো আইডিয়াও ছিল না। কলকব্জার সঙ্গেও কাহারও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। আয়োজন সামান্য ছিল সত্য, কিন্তু প্রয়োজন তাহাদের ছিল অতি বড়; তাহাদের বুকভরা ছিল আশা—প্রাণভরা ছিল ব্যাকুল কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়াইলেও প্রথম হইতেই তাহাদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সদিচ্ছার উদ্যম কখনই ব্যর্থ হইবে না—তাহাদের অকপট চেষ্টা পরিণামে
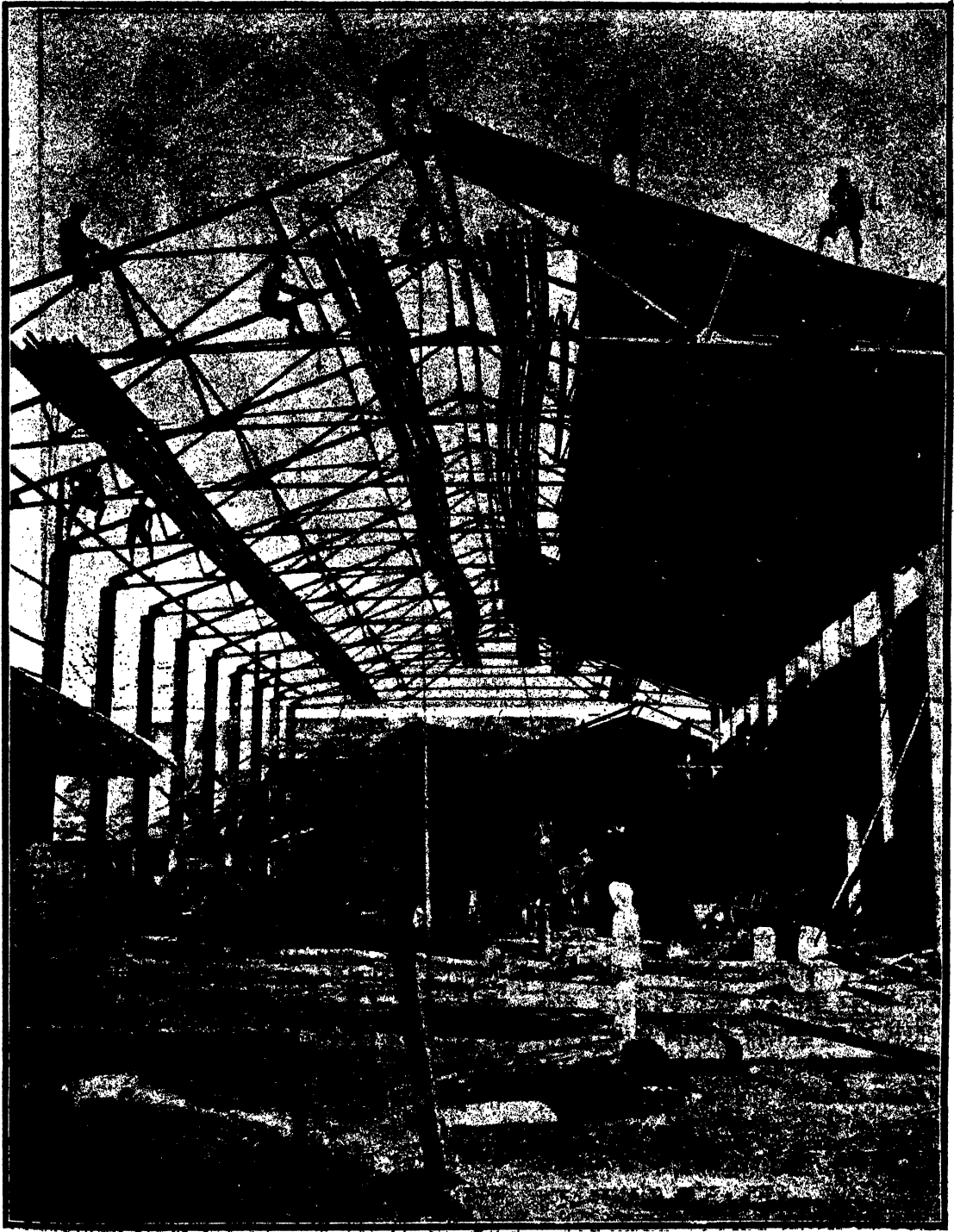
হাউস অব্ লেবারার্স কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বারনাপুর চা কারখানা

জয়যুক্ত হইবেই হইবে। অপরদিকে, প্রবীণের দল একদল মতিচ্ছন্ন যুবককে এমনি বেপরোয়া ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে

দেখিয়া তাহাদের ধ্রুব ব্যর্থতার কথা দিনক্ষণ গুণিয়া বলিয়া দিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবরাও দুই চারিটি ব্যর্থ
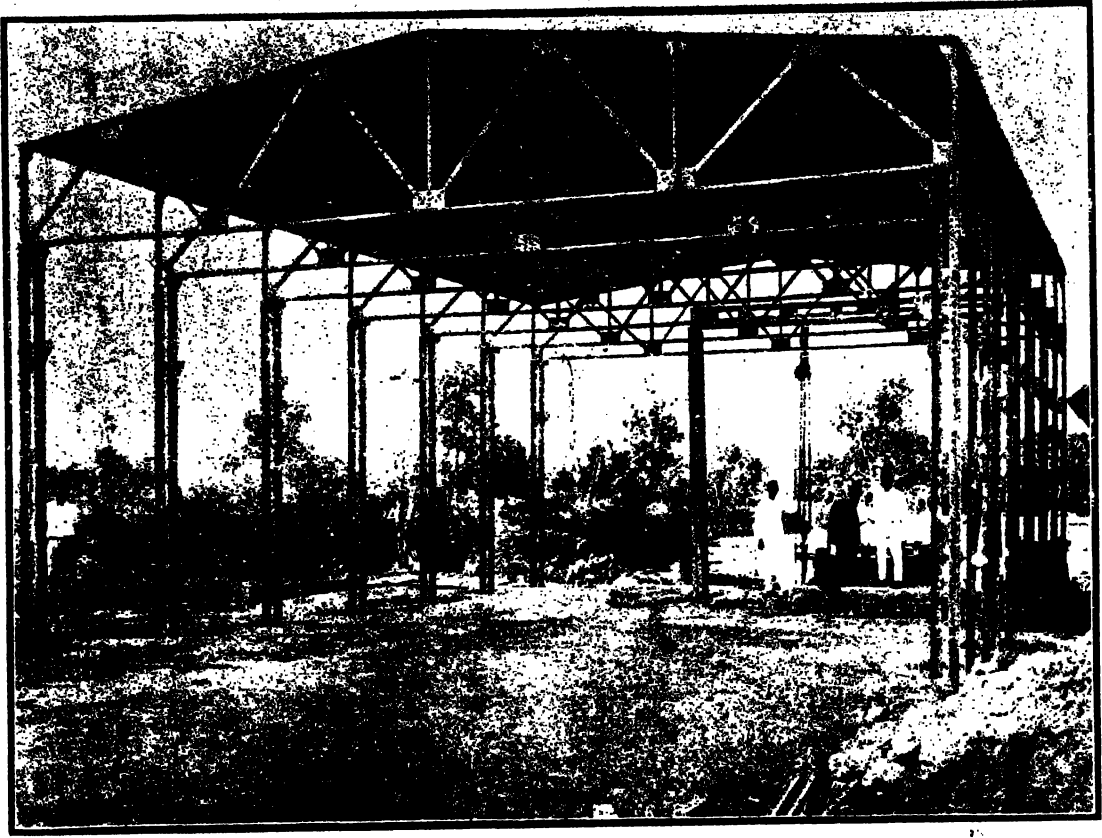
হাউস অব্ লেবারাসে'র কর্ম্মীগণ একটি কলে কাজ করিতেছেন।

উপদেশ দিয়া পরিশেষে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ করিল—করিবার কারণও হয়ত ছিল—কেননা ভদ্রলোকের ছেলে যেখানে লেখা-পড়ার সনাতন মর্য্যাদাকে বিদ্রূপ করিয়া মূর্খের মতো লোহা পিটিতে ও মাটি কাটিতে আরম্ভ করে, অথচ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা বলিলে কিছুই বলিতে পারে না, সেইখানে ভালোবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করাও কখনই শিক্ষিত জনোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে পারে না। সে যাহাই হউক, প্রবীণের সাবধান বাণী ও বন্ধু-বান্ধবদের উপদেশে কর্ণপাত না করার ফলে তাহাদিগকে ঘোর দুর্দ্দিনের অনেক দুঃখ-আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে, অনেক প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে সত্য; কিন্তু আশার কথা, গর্ব্বের কথা, দীর্ঘ অমানিশার অবসানে প্রভাত-সূর্য্যের হেমাভ কিরণে, আজ তাহাদের মুখে দীপ্তির আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়, উপযুক্ত মূলধন অভাবেই না কি দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার হইতেছে না। কিন্তু এই 'হাউসের' দৃষ্টান্তে বেশ বুঝা যায় - একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেননা, ব্যবসার মূলধন কেবল টাকা পয়সা নয়—কর্ম্মনিষ্ঠা—কর্ম্ম-শক্তিই ব্যবসার প্রকৃত মূলধন। আশানুরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতেছে না বলিয়া এই যে অবসাদ-আক্ষেপ ইহার কারণ এই নয় যে, দেশে টাকা পয়সা নাই, ইহার মুখ্য কারণ, মাত্র টাকা পয়সা সংগ্রহ করিবার মতো শক্তি বা সাধনার অভাব। কর্ম্মী যে, কর্ম্ম করিবার শক্তি-সাধনা যাহার আছে—কর্ম্মের সহজাত অনিবার্য্য পুরস্কার ব্যর্থতা ও বাধা বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া অম্লান চিত্তে খাটিয়া যাইতে প্রস্তুত যে, সার্থকতার পথে কোন বিপদ-বাধাই তাহার নিকট অলঙ্ঘ্যনীয় নয়। কাজ করিয়া গেলে পয়সা আপনিই আসে—কাজই টাকাকে সঙ্গী করিয়া লয়। আর তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত ঐ হাউস অব লেবারাস'—মূলধন ছাড়াও মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে যাহার সম্পত্তি লক্ষ টাকারও অনেক বেশীতে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অবশ্য টাকার অভাবে হাউসের প্রতিষ্ঠাতাগণকে প্রথমে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। ফলে

হাউস অব্ লেবারার্সের্ কর্ম্মিগণ—মধ্যস্থলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হাউসের উন্নতিও আশানুরূপ দ্রুত হইতে পারে নাই। এমন অনেক দিন গিয়াছে যখন হাতে টাকা নাই—অর্ডার নাই—কাঁচা মাল নাই, অন্যদিকে ঘরে চাল-ডালও নাই। কিন্তু স্পষ্টই দেখা গিয়াছে, সদিচ্ছা, সততা ও সরল ব্যাকুলতা এতটুকুও ব্যর্থ হয় নাই। কর্ম্ম আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইয়াছে—নিজের প্রয়োজনীয় যাহা—জোর করিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়াছে। এবং এই ভাবেই, চতুর্দ্দিকের যুগপৎ উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় এক বৎসর এক দিকে কঠোর পরিশ্রম ও অন্য দিকে ঘোর আর্থিক অনটন সহ্য করিবার পর অকস্মাৎ এক অভাবনীয় স্থান হইতে অযাচিত সাহায্য উপস্থিত হইল। কুমিল্লার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী—এম্ ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, দানবীর শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড় অসময়ে হাউস্‌কে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। অতি প্রথম হইতেই তিনি এই কারখানার কার্য্য বিশেষ অনুসন্ধিৎসার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এবং যে-মুহূর্ত্তে কর্ম্মীদের সততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন হিসাবী লোকের বাধায় কর্ণপাত না করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই তিনি অযাচিত ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি হাউসকে বাইশ হাজার টাকা (২২০০০৲) দিয়াছিলেন। ঐ টাকার জন্য তিনি কোনও সুদ, সর্ত্ত, তমসুক, জামিনদার বা অন্য কোন কিছু চাহেন নাই—উদার সরল বিশ্বাসে দিয়াছিলেন। কেবল সর্ত্তের মধ্যে এই ছিল যে, ব্যবসার অবস্থা ভালো হইলে ঐ টাকা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই-প্রকার অযাচিত সাহায্য এই দেশে অত্যন্ত বিরল—এইজন্য হাউস অব লেবারার্স তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সুখের কথা এই যে, হাউস অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীযুক্ত মহেশবাবুর সম্যক্ টাকা কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিয়া দিয়াছে—এমন-কি মহেশবাবু কোন প্রকার দাবী না করিলেও হাউস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই টাকার সম্যক্ সুদ পর্য্যন্ত চক্রবৃদ্ধি-হারে শোধ করিয়া দিয়াছে।

১৯২৭ অব্দের উদ্ধৃত পত্রে দেখা যায়, ঐ বৎসর কারখানায় মোট ১,০৩,০০০৲ টাকার মাল তৈরী হইয়াছে। তন্মধ্যে লাভ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ১১০০০৲ টাকা। লাভের সম্যক্ টাকাই আবার রিজার্ভ ফণ্ডে ভুক্ত হইয়াছে। কারণ, এই কারখানার লাভের টাকা কখনই বণ্টন হয় না, বোধ হয় হইবেও না। কারখানার উন্নতির জন্যই ঐ টাকা ব্যয় হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হাউসের সম্পত্তির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৯৭০০০৲ টাকার উপর (অবশ্য ইতিমধ্যেই তাহা প্রায় দেড় লক্ষ টাকায় যাইয়া দাঁড়াইয়াছে)।
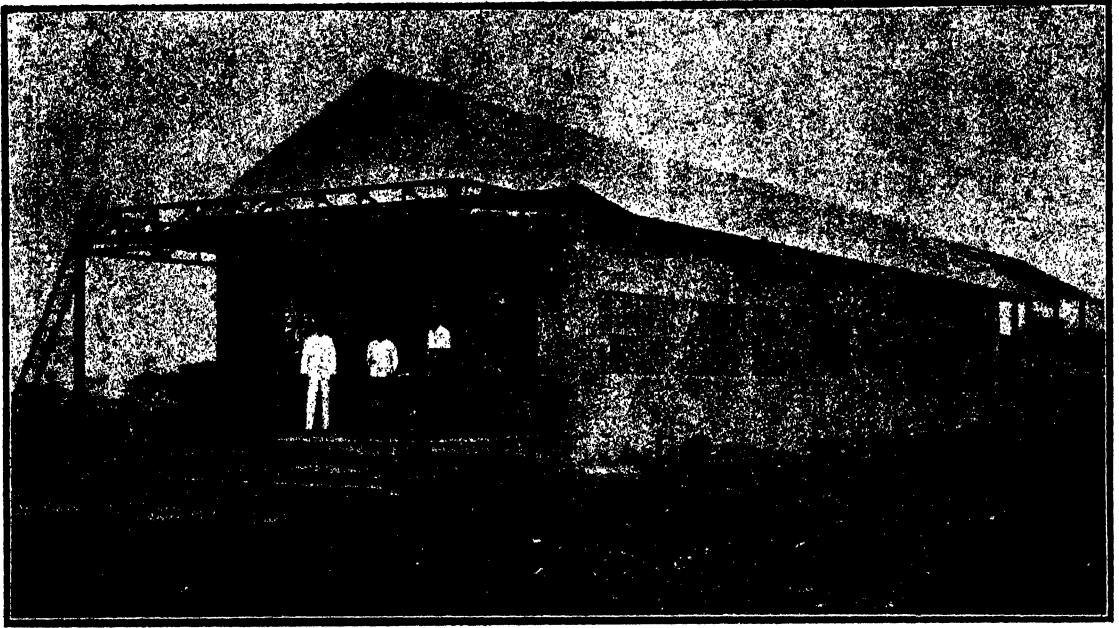
হাউস অব্ লেবারার্সের আপিসগৃহের সম্মুখে পরিচালকবর্গ

ব্যাঙ্কের দেনা প্রায় ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা। কারখানায় গড়ে ৭৫ জন লোক কাজ করে এবং দিন মজুরের সংখ্যা ধরিলে প্রায় ৯৫ জন লোক প্রত্যহ খাটে। লেবারার্সদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জনই কারখানা সংশ্লিষ্ট হোটেলে বাস করে। তাহাদের খাওয়া-পরা হাউসের তত্ত্বাবধানেই নিষ্পন্ন হয়। কর্ম্মীরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত ভদ্র লোকের সন্তান—কিন্তু খাটে প্রকৃত মজুরের মত। বৎসরে গড়ে ১২ জন লোক এইখানে শিক্ষিত হয়। নিজের প্রয়োজন ছাড়া হাউস অন্য লোককে কোনও প্রকার শিক্ষা দেয় না। একজন কর্ম্মী তিন মাস কাজ করিলেই তাহার ভরণ-পোষণের উপযোগী মাহিনা অর্জ্জন করিতে পারে। এইখানে বেতনের হার সম্বন্ধে কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম নাই—নিষ্ঠাবান কর্ম্মী গড়ে দিনে অনায়াসে ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। আশা করা যায় যে, হাউসের অবস্থার আরও উন্নতি হইলে ঐ প্রকার কর্ম্মীরা দৈনিক ৩৲।৪৲ টাকা রোজগার করিতে পারিবে। কেননা, পরিশ্রম ও যোগ্যতার উপরই বেতনের তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়।

কারখানায় বর্ত্তমানে মাত্র দুইটা জিনিষ প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ লোহার ঘর ও পুল; দ্বিতীয়তঃ, চা-বাগানের চাকু। লোহার ঘর প্রায় সবই চা-বাগনের জন্য—চা-বাগানের বাংলা, কল-কারখানার ঘর ইত্যাদি। টাকার সচ্ছলতা হইলে হাউস হয়ত শীঘ্রই লোকের বাসোপযোগী ঘর প্রস্তুত করিবে। চা-বাগানের চাকুও একপ্রকার মন্দ তৈরী হয় না। বৎসরে গড়ে ৩০০ শত ডজনের উপর ছুরী প্রস্তুত হয়। এইজন্য ইস্পাত আসে সেফিল্ডের Firth & Co.র বাড়ী হইতে, কাঠ আসে আমেরিকা ও সুইডেন হইতে এবং পালিস করিবার মাল-মসলা আসে মাঞ্চেষ্টারের বিখ্যাত পালিসকার Canning & Co.র বাড়ী হইতে। বাজারের চাকু হইতে তাহাদের চাকু তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। অনেক সাহেব-বাগানেও তারা ছুরী সরবরাহ করিয়া থাকে। এই বৎসর ছুরী সম্বন্ধে যে-রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহা খুবই সন্তোষজনক। কেহ কেহ Yeatsএর চাকু হইতেও তাহাদের চাকুর প্রশংসা করিয়াছে বেশী। এতদ্ভিন্ন তাহারা অনেক চা-বাগানে নূতন ইঞ্জিন ও কলকব্জা বসায় এবং পুরানো যন্ত্রপাতি মেরামত করিয়া থাকে। সুর্ম্মাভেলীর অনেক বাগানেই তাহারা কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়াছে। তন্মধ্যে Cachar Native Joint Stock Co. Ltd.; Bharat Society Ltd.; The All-India Tea & Trading Co., Ltd. প্রভৃতির নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত Jardine Skinner & Co.; Begg Dun-lop & Co. এবং Duncan Brothers প্রভৃতি অনেক ইংরেজের বাগানে কাজ করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ৩টি অর্ডার পাইয়াছে।

আশা করা যায়, এই কার্য্যেও তাহাদের সুনাম অব্যাহত থাকিবে।

হাউস অব লেবরার্স প্রথমতঃ লিমিটেড কোম্পানী ছিল না। মাত্র ১৯২৬ অব্দে ইহা রেজিষ্টার্ড হইয়াছে। তাহা হইলেও ইহা Private Limited Company। বৎসরাধিক হইল তাহারা Peerless Tea Co., নামে একটি চা-কোম্পানীও খুলিয়াছে। হাউসের কারখানা কুমিল্লা রেলওয়ে ষ্টেশনের সংলগ্ন ভূমিতে অবস্থিত। গত ৩।৪ মাসের ভিতর হাউসের কর্ম্মক্ষেত্র আরও অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইতি-মধ্যেই কারখানাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তজ্জন্য ৭২ অশ্বশক্তির একটি নূতন Polar Diesal Engine ও 50 K. V. A. Generator আনিয়া বসানো হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহাদের হাতে ৪ লক্ষ টাকার অধিক কাজ আছে এবং আশা করা যায় যে, এই বৎসর তাহারা ৭।৮ লক্ষ টাকার মাল প্রস্তুত করিবে।

House of Labourers Ltd. এর বিশেষত্ব যে বিশেষ কিছু আছে তাহা নয়। তবে তাহাদের দুইটা নিয়ম ও আদর্শের কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, লাভ বণ্টন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জনসমাজের সেবা। তাহারা আজকাল লাভ মন্দ করে না, কিন্তু লাভের টাকা কখনই বণ্টন হয়-না। সমস্ত নিয়োজিত হয় ব্যবসার উন্নতির জন্য। তাহারা মনে করে, ব্যবসার লাভের টাকার উপর ব্যবসার পরিচালকগণেরই একমাত্র অধিকার নয়—জনসাধারণ অর্থাৎ ক্রেতাদেরও তাহার উপর যথেষ্ট অধিকার আছে—কেননা, ব্যবসার উন্নতি নির্ভর করে তৈরী মালের বিক্রীর উপর। কাজেই, ক্রেতা যারা, তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য হইতে না দিলেই লাভের টাকাকে ব্যবসায়ে খাটাইয়া অল্প মূল্যে ভালো জিনিষ সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। আধুনিক কার্য্য পরিমাণের বিশালতার (Big Business-এর) আইডিয়াও তাই—Mr. Ford, বর্ত্তমান জগতে একজন কৃতী ব্যবসায়ী; তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত To-day and To morrow পুঁথির এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—

The true course of business is to follow the fortune and pursue the service of those who had faith in it from the beginning—the Public. If there is any saving in manufacturing cost, let it go to the Public. If there is any increase in profits; let it be shared with the public in lowered prices. If there is any improvement in the commodity, let it be made without any question, for whatever the capital cost, it was first the public that supplied the capital. That is the true course for good business to steer and it is good business. For, tnere is no better partnership a business can enter than a partnership of service with the people.

দ্বিতীয়তঃ—জনসমাজের সেবা। এই তাহাদের লক্ষ্য। এই জন্যই মন্ত্র তাহাদের কর্ম্ম। কর্ম্মই তাহাদের একমাত্র সাধনা, কর্ম্মই তাহাদের ধ্যান ধারণা। তাহাদের নিকট সব কর্ম্মই আবার সমান আদরণীয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ১০ সের ওজনের হাতুড়ীর ঘা মারা—দ্বিপ্রহর রৌদ্রে নির্ব্বিকার চিত্তে বোঝার পর বোঝা মাটি কাটিয়া যাওয়া—অসহ্য রৌদ্রে তপ্ত টিনের ঘর ছানি দেওয়া অথবা টেবিলের এককোণে বসিয়া প্রত্যহ ৬০।৭০ খানা চিঠি লিখিয়া যাওয়া—সবই তাদের নিকট সমান। কোন কর্ম্মই উপেক্ষণীয় নয়—কোন কর্ম্মই হেয়, নিন্দনীয়, লজ্জাকর নয়। এই তাহাদের বড় সম্পত্তি, এই তাহাদের বড় মূলধন এবং এই ভাবে কর্ম্ম করিয়া তাহারা এ কথা সত্যই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, ভদ্রলোকের সন্তান কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ বলিয়া যে একটা বিদ্রূপউক্তি আছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; সুযোগ এবং শিক্ষা পাইলে তাহারা যে-কোন কার্য্য করিতে পারে।

হাউস্ অব্ লেবারার্স লিমিটেড্ একটা যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। সে ব্যঙ্গ কতদূর যুক্তিসহ, বলা দুষ্কর। কিন্তু ঐ লইয়া তর্ক করিয়াও বোধ হয় লাভ নাই। তবে এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বর্ত্তমানে চলিয়াছে একটা যন্ত্রের যুগ—যান্ত্রিক কলকব্জার সুবিধা লইয়া যাহারা সগৌরবে জীবনের জয়গান গাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহার সহিত তাল ঠুকিয়া চলিতে না পারিলে দুর্ব্বল ভীরুর জীবন ধারণ অসম্ভব। সে যাহাই হউক, ভবিষ্যৎ কি হইবে, কোন্ আদর্শ টিঁকিয়া যাইবে কেহই বলিতে পারে না—যাহা হইবার তাহা হইবেই হইবে। Mr. Fordএর কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়—

No man can say anything of the future; we need not bother about it. The future has always cared for itself inspite of our well-meant efforts to hamper it. If today we do the task we can best do, then we are doing all that we can do.

হাউস অব লেবারার্স বলে তাহাই এবং করিতেছেও তাহাই।

সিটি-কলেজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিঠি

মডার্ন রিভিয়ুতে সিটিকলেজ-ঘটিত ব্যাপার সম্বন্ধে আমার যে-মন্তব্য বেরিয়েছে তার উত্তরে একটা অদ্ভুত তর্ক শুনতে পাচ্ছি। কেউ কেউ বল্‌চেন, ছাত্রেরা বেতন দিয়ে হোস্টেলে বাস করে, তাদের সঙ্গে এমন কারো অধিকারের তুলনা হয় না যাঁরা বিনাব্যয়ে কারো বাড়ীতে থাকেন। এ সম্বন্ধে আমার বল্‌বার কথা এই যে—

(১) সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেচেন তাঁদের প্রধান বর্গেরই মধ্যে কেউ কেউ হস্‌টেলবাসের অথবা অধ্যয়নের জন্যে কিছুই দেননি। এমন কি, কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ অনেকে তাঁদের আনুকূল্যই করেচেন।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এরকম আনুকূল্যের দ্বারা ছাত্রদেরকে অসম্মানিত করা হয়, এটা কর্ত্তৃপক্ষদেরই অপরাধ। এইরূপ অসম্মানিত চিত্তের বিরুদ্ধতা অপরিমিত উত্তেজনার আকারেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। কলেজের বদান্য কর্ত্তৃপক্ষের এইটেই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। এটা তাঁদের কর্ম্মফল।

(২) বেতন দিয়ে হস্‌টেলে বাসের অধিকার স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ। বেতন দিয়ে ক্লাসে পড়ার মতোই তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ। কোনো ছেলে ক্লাসে গিয়ে নৃত্যগীত করলে অধ্যাপক তাকে বিদায় ক'রে দিতে পারেন সে ছেলে বেতন দেওয়া সত্ত্বেও। ভাড়া দিয়ে যারা কোনো বাড়ীতে থাকে তারা মদ খেয়ে মাৎলামি করলেও বাড়ীওয়ালা তাকে জবাব দিতে পারে না; কারণ ভাড়াটে বাড়ী কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু বেতন দিয়েচে ব'লেই হস্‌টেলের নিয়ম লঙ্ঘন করার অধিকার কারো নেই। হস্‌টেলবাস অনেকটা রেলগাড়ীর যাত্রী হওয়ার মত ভাড়া দিলেও এবং সকল যাত্রী একমত হ'লেও গাড়ী নিজের নিয়ম অনুসারেই চলে, যাত্রীদের খেয়ালমত চলে না।

(৩) গৃহস্থের বাড়ীতে অনেক লোক বাস করেন, যাঁরা সেখানে বাস কর্‌বার অধিকার পান কর্ম্মদানের পরিবর্ত্তে বস্তুত তাঁরা অমনি থাকতে পান না, কাজের বদলে তাঁদের থাক্‌বার দাবী আছে। যদি বাড়ীতে থাকতে না পেতেন তবে বেতনে সেই অভাব পূরিয়ে দিতে হ'ত। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বেতনের এক অংশ দিয়েই গৃহস্থের বাড়ীতে থাকতে পান। কিন্তু তাই ব'লে তাঁরা সেই গৃহস্থের দালানে নিজের সাম্প্রদায়িক পূজা করতে না পেলে হিন্দুধর্ম্মই বিপন্ন হয়, এমন অদ্ভুত কথা কেউ বলতে পারে না। হিন্দু ধর্ম্মের যদি এই প্রকৃতিই সত্য হয় তবে এ দেশে যারা অহিন্দু বাস করে, তাদের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ আছে বলতে হবে।

এমন কথাও কেউ কেউ বলেচেন, এই ব্যাপারে ধর্ম্ম-বিরোধটা গৌণ। তাঁরা বলেন, সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা কতকগুলি গলদ ক'রে বসেচেন ব'লেই এই কাণ্ডটা ঘটেচে। প্রথমত, আমি জানিনে তাঁদের ব্যবহারে ত্রুটি কি ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত, যদি কিছু ঘ'টে থাকে সেটা স্বতন্ত্র নালিশের অন্তর্গত। তার বোঝাপড়ার মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারি এমন ইচ্ছা এবং অবকাশ আমার নেই। যারা সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে ত্রুটি দেখ্‌চেন, তাঁরা ছাত্রদের কোনো ব্যবহারে কোনো ত্রুটি দেখ্‌চেন না। ছাত্রেরা হেরম্ববাবুর মতো মান্যলোকের গায়ে পানের পিক, গোবরের জল সিঞ্চন ক'রে উল্লাস প্রকাশ করেচে; যে-ছেলেরা সিটি কলেজে পড়তে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবমাননা ও দৈহিক দণ্ডবিধানের ভয় দেখিয়ে পরের ন্যায্য অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক নিরস্ত কর্‌বার চেষ্টা করচে, অথচ এইসমস্ত রূঢ় আচরণ ও উপদ্রব সম্বন্ধে ছাত্রহিতৈষীরা কোনো কথা বলেন না। আমিও বলতে চাইনে। আমার আলোচনার প্রধান বিষয়টিই হচ্ছে পূজার অধিকারের সীমা নিয়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে এর চেয়ে গুরুতর বিষয় আর কিছুই নেই। অথচ যাঁরা ভারতে রাষ্ট্রিক ঐক্য ও মুক্তিসাধনকে তাঁদের সমস্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেচেন তাঁরাও যখন প্রকাশ্যে এই ধর্ম্মবিরোধকে পক্ষপাত দ্বারা উৎসাহই দিচ্ছেন, তাঁরাও যখন ছাত্রদের এই স্বরাজনীতিগর্হিত আচরণে লেশমাত্র আপত্তি প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত তখন স্পষ্টই দেখ্‌চি, আমাদের দেশের পলিটিক্‌স্ সাধনার পদ্ধতি নিজের ভীরুতায়, দুর্ব্বলতায় নিজেকে ব্যর্থ কর্‌বার পথেই দাঁড়িয়েছে। পরের সমালোচনা করার চেয়ে নিজের লোকদেরকে কঠোর অনুশাসনে ন্যায়ের পথে নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার কাজটাই স্বরাজ্যসাধনের গুরুতর কর্ত্তব্য,—এর অপ্রিয়তা স্বীকার করা জেলখানায় যাওয়ার চেয়ে অনেক বড়ো। যে-কোনো কারণেই হোক, তাতে যখন শৈথিল্য দেখি তখন কপালে করাঘাত ক'রে বলতেই হয়, বাইরের শত্রুর চেয়ে বড়ো শত্রুকে অন্তরে দেখ্‌লুম—রাষ্ট্রসাধনায় জয়লাভ করার পক্ষে এইটে সব-চেয়ে দুর্লক্ষণ।

২৩ বৈশাখ, ১৩৩৫ — শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদেশ

চীন—

নব-জাগ্রত চীনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আবার নূতন উদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। এই জাতীয় দল গত বৎসর যখন দক্ষিণ চীনে দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিরাট্ অভিযান করিয়াছিল ও সাংহাই অধিকার করিয়াছিল তখন ব্রিটিশ সৈন্য নানারূপে তাহাদিগের গতি প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেনাপতি চ্যাং-কাই-সেকের নেতৃত্বে জাতীয় দল উত্তর চীনে দেশদ্রোহী চাং-সো-লিনের সেনাদলকে পরাজিত করিয়া সিয়াংফু অধিকার করিয়াছে। সিয়াংফু জাপানীদের একটি আড্ডা—সুতরাং ইহাতে তাহাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা হঠাৎ বিনা কারণে জাতীয় দলের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া চীনা বসতির উপর অত্যাচার করিয়া ও সংটাঙের কমিশনারকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়া নিজেদের বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছে। চীন অভিমুখে জাপানের সৈন্য সামন্ত ও রণতরী প্রেরিত হইয়াছে এবং যাহাতে জাতীয় দল উত্তর চীনে আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে সেজন্য সাম্রাজ্যবাদী জাপান চেষ্টিত হইয়াছে। জাপানের সহিত চীনের এই সংঘর্ষে আমেরিকা মধ্যস্থ হইবে বলিয়াও একটা গুজব রটিয়াছে। স্বাধীনতাকামী জাতীয় দল এ-সমস্ত বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য করিবেন না বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেছে। কারণ গত বৎসর সাংহাই অধিকারের সময় ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তিসমূহের সমস্ত অন্যায় আব্দার তাঁহারা ব্যর্থ করিয়াছিলেন; তাই মনে হয় ব্রিটিশের পদাঙ্ক-অনুসরণকারী জাপানের দুরভিসন্ধিও তাঁহারা বিফল করিবেন। জাপানের এই হঠাৎ আক্রমণের ফলে চীনের আভ্যন্তরিক গোলযোগ বোধ হয় কিছুকালের জন্য থামিয়া যাইবে। কারণ বিদেশী শত্রুর অন্যায় অভিযান প্রতিরোধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চীনের সকল দলই মিলিত হইবে।

মিশর—

মিশরকে ইংরেজ এক সময় দায়ে পড়িয়া "স্বাধীনতা" দান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরই পারস্য, ইরাক ও ভারতের তোরণদ্বার সুয়েজ খাল সম্পূর্ণ স্বাধিকারে আনিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ মিশরে নিজেদের সৈন্য আমদানি করিল। অজুহাত হইল, মিশরে ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রভৃতির স্বার্থ সংরক্ষণ। মিশর তার প্রতিবাদ করিয়া জানাইল যে, সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রেই বিদেশীগণ বসবাস করিয়া থাকে; তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন দেশেই বিদেশীয় সৈন্য রাখার প্রয়োজন হয় না। উপরন্ত মিশরে যে-সকল বিদেশী বসবাস করিতেছে, তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবে বলিয়া মিশরের কর্ত্তৃপক্ষ ভরসা দিল। কিন্তু ইংরেজ মিশরের এই ন্যায্য কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হইল এবং ১৯২২ সালে সে মিশরকে যে অধিকার দিয়াছে- তদতিরিক্ত কোন দাবীই কখনই সে মানিয়া লইবে না বলিয়া উত্তর দিল।

সম্প্রতি মিশরবাসীরা Assemblies আইনের (সভাসমিতি সম্পর্কিত আইন) প্রবর্ত্তন সাধন করিতে চাহিয়াছে। মিশরের পক্ষে এই Assemblies আইন প্রবর্ত্তিত করা প্রয়োজনীয়। কারণ, মিশরে জাতীয়ভাবের উদ্বোধন-কল্পে যেসব উৎসব ও সভাসমিতি হইয়া থাকে, শান্তিভঙ্গের অজুহাতে ইংরেজ পুলিশ তাহা অযথা বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে অকারণে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। মিশরের জাতীয়-দল তাই এই আইনটি এমনভাবে পরিবর্ত্তন করিতে চাহে যে, পুলিশ কোন সভাসমিতি শোভাযাত্রা বন্ধ করিতে পারিবে না, অথবা কোন সভা ভাঙিয়া দিতে পারিবে না। যদি কোন সভায় কখনো শান্তিভঙ্গ হয় তাহা হইলে পুনরায় শান্তি স্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশ সভার কার্য্য বন্ধ করিতে পারিবে না।

ইংরেজ ইহাতে বাদ সাধিল এবং ভয় দেখাইল যে, ২রা মে তারিখের সন্ধ্যার পূর্ব্বে মিশর যদি ঐ আইন প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব বর্জ্জন না করে, তাহা হইলে ইংরেজ তাহার ইচ্ছামত কাজ করিবে। এই চরমপত্রের সঙ্গে সঙ্গে রণতরীও প্রেরিত হইল।

ইংরেজ বলে যে, মিশরীরা যখনই কোন রকম সভাসমিতি শোভাযাত্রা করে তখনই তাহারা অ-মিশরী, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয়-দের উপরেই উপদ্রব করে। সুতরাং সেই উপদ্রব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই ইংরেজকে ঐ আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইতেছে। ইংরেজের পক্ষ হইতে পররাষ্ট্র-সচিব স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশাকে এই মর্ম্মে একখানি চরম-পত্র প্রেরণ করেন :—

(১) প্রস্তাবিত খস্ড়াটি যাহাতে আইন সভায় উত্থাপিত না হয় অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) এই আইনটি লইয়া যে আলোচনা হইবে না সে-সম্বন্ধে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

এই চরমপত্র পাইয়া মিশরের কর্ত্তৃপক্ষ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা জাতীয়দলের লোকদের শান্তভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। জাতীয়দল বলেন যে, ইংরেজ যখন ভয় দেখাইয়া মিশরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে তখন তাহাই হউক। কিন্তু মন্ত্রীসভা স্থির করে যে, আগামী নভেম্বর মাসে মিশরের পার্লামেণ্ট এ-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে তদনুসারে কাজ করা হইবে, আপাততঃ নূতন Assemblies আইন প্রবর্ত্তন করা স্থগিত রাখা হইবে। মিশরের সিনেট অনেক তর্ক-বিতর্কের পর মন্ত্রী-সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইংরেজের চরম-পত্রের প্রত্যুত্তরে মিশর জানাইয়াছে যে—মিশরের আইন সভার নিজের দেশের আইন প্রণয়নে বাধা দিবার

অধিকার ইংরাজের আছে বলিয়া স্বীকার না করিয়াও কেবলমাত্র ইংরেজের সঙ্গে আপাততঃ মিত্রতা বজায় রাখিবার নিমিত্তই মিশর এই আইন প্রণয়ন স্থগিত রাখিল—"to demonostrate the goodwill and desire of Egypt to maintain friendly relations with Great Britain, though the Egyptian Government is unable to admit the right of Britain to interfere with independent legislations in the Egyptian Parliament."

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মিশর হয়ত নিরুপায় হইয়া তাহার অধিকার ছাড়িয়া দিল। কিন্তু মিশরের জাতীয়দল—যাহারা একদিন পরলোকগত জগলুল-পাশার নেতৃত্বে "হয় স্বাধীনতার গৌরব-মুকুট কিম্বা স্বদেশের মুক্তি কামনায় আত্মবিসর্জ্জনের মহিমায় মৃত্যু'' বরণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল তাহারা—যে ইংলণ্ডের নিকট চিরতরে আত্মসমর্পণ করিবে এমন মনে হয় না।

বৈজ্ঞানিকের আত্মদান—

জগতের সর্ব্বপ্রধান মারাত্মক রোগ ক্যান্সার বা কর্কটিকা। এক্সরের সাহায্যে এই রোগের কি প্রকারে চিকিৎসা হইতে পারে, তজ্জন্য ডাক্তার চিশলম উইলিয়ম আত্মজীবন দান করিয়াছেন। এক্সরের দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা বিশেষ মারাত্মক ইহা জানিয়াও তিনি জগতের হিতের জন্য এই পরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য নানারূপ রোগে আক্রান্ত হইবার ফলে চল্লিশবার তাঁহার শরীরে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্তের দুইটি অঙ্গুলী ছেদন করিতে হইয়াছিল তথাপি তিনি গবেষণা-কার্য্য হইতে বিরত হন নাই। এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি যে-সকল উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে চিকিৎসা-জগতের বিশেষ উপকার হইবে। ত্রিশ বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। বিশ্বের হিতের জন্য যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া এই প্রকারে আত্মবলি দিতে পারেন, তাঁহারা সাধারণ মানব নহেন। ইঁহারা দেশ কাল পাত্র ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেরই পূজনীয়। ইঁহাদের নাম জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ভারতবর্ষ

বারদোলী সত্যাগ্রহ—

ভারতের একপ্রান্তে অবস্থিত গুজরাটের অন্তর্গত বারদোলী তালুকের জনকয়েক কৃষক কেবলমাত্র সাত্ত্বিক শক্তি ও দৃঢ়সঙ্কল্পের বলে যে মহান্ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনা করিয়াছে, সমগ্র ভারতের দৃষ্টি তাহার দিকে পুঞ্জিত হইয়াছে। এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের নেতা মহাত্মা গান্ধীরই প্রিয় শিষ্য শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে এই বারদোলী তালুকেই মহাত্মাজী তাঁহার সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম আরম্ভ করেন, কিন্তু চৌরীচৌরার শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাহার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আজ মহাত্মাজীর একান্ত বিশ্বস্ত শিষ্য, তাঁহারই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মহাত্মাজীরও পূর্ণ সহানুভূতি ইহার পশ্চাতে আছে।

এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম বোম্বাই গবর্ণমেণ্টেরও অবিচারের বিরুদ্ধে। নূতন সেটেল্‌মেণ্ট্‌ বন্দোবস্তে পুরাতন ভূমিরাজস্বের হার গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ শতকরা ২২্‌ টাকা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বারদোলী তালুকের রায়তেরা বলে যে, নিতান্ত খামখেয়ালীভাবে ও অন্যায়রূপে ঐ হার বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। সেটেল্‌মেণ্ট্‌ কর্ম্মচারী জমির মূল্যও নিজের ইচ্ছামত ধার্য্য করিয়াছেন। প্রজারা পুনঃপুনঃ সুবিচারের জন্য উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট আবেদন করিয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এদিকে কয়েক বৎসর হইতে দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির ফলে বারদোলী তালুকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, প্রজারা চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে ;—ইহার উপর যদি নূতন বর্দ্ধিত হারে খাজনা লওয়া হয়, তাহা হইলে বারদোলী তালুকের প্রজাদের ধ্বংস অনিবার্য্য।

প্রজারা সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একটি সম্মিলন আহ্বান করে এবং তাহাতে শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেলকে বোম্বাই গভর্ণ্‌মেণ্টের নিকট প্রজাদের প্রতিনিধিরূপে আবেদন করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। শ্রীযুত প্যাটেল তদনুসারে প্রজাদের সমস্ত দুঃখদুর্দ্দশা বিবৃত করিয়া বোম্বাইয়ের গবর্ণরের নিকট আবেদন করেন —আবেদনপত্রে তিনি অনুরোধ করেন যে, গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ এখন বর্দ্ধিত হারে খাজনা আদায় কার্য্য স্থগিত রাখুন এবং সমস্ত বিষয় তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করুন। বোম্বাই গবর্ণ্‌মেণ্ট শ্রীযুত প্যাটেলের আবেদনের উত্তরে তাঁহাকে জানাইলেন যে সেটেল্‌মেণ্ট্‌ অফিসার যাহা করিয়াছেন, তাহা ঠিকই করিয়াছেন প্রজারা বর্দ্ধিতহারে খাজনার বিরুদ্ধে যে আপত্তি তুলিয়াছে তাহা কোন মূল্য নাই।—গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের প্রার্থনা মত তদন্তের জন্য কোন কমিটি নিয়োগ করিবেন না। এবং প্রজাদের কোন আপত্তি না শুনিয়া খাজনা বর্দ্ধিত হারেই যথারীতি আদায় করা হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই জিদ ও জনমতকে পদদলিত করিবার প্রবৃত্তি, বারদোলি সমস্ত প্রজামণ্ডলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল,—তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, কিছুতেই তাহারা বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিবে না এবং তাহার জন্য, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার্থ তাহারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত। এইরূপে বারদোলি তালুকে সত্যাগ্রহ ঘোষিত হইল।

গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ কিন্তু এই প্রজা-বিক্ষোভের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না, তাঁহারা প্রজাদের স্থাবর সম্পত্তির উপর ক্রোকী পরোয়ানা জারি করিতেছেন, জমি বাজেয়াপ্ত করিবার নোটিশ দিতেছেন, স্বয়ং বিভাগীয় কমিশনার এবং কালেক্টর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রজাদের সম্পত্তি ক্রোক, নীলাম ইত্যাদি করিয়া খাজনা আদায় করিবার চেষ্টা আয়োজন করিতেছেন। প্রজারা সকলেই সঙ্ঘবদ্ধ, ক্রোক নীলাম প্রভৃতির প্রতি তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই,—নীলামী স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি কিনিবার লোকও কেহ নাই। সরকারী কর্ম্মচারীরা সেজন্য নানাস্থানে ক্রেতা সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন,—এমন-কি নিকটবর্ত্তী বরোদা রাজ্য পর্য্যন্ত তাঁহারা ধাওয়া করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।

বারদোলীর অশিক্ষিত, দরিদ্র কৃষকেরা আজ সত্যের জন্য, অধিকার রক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহিতে প্রস্তুত, কেবল পুরুষ নহে, নারীরা পর্য্যন্ত এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন সভাসমিতি করিয়া সত্যাগ্রহের বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

ব্রহ্মদেশে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ—

ব্রহ্মদেশে দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদের জন্য মিঃ বার্ণাডের নেতৃত্বে যে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সম্প্রতি মিট্‌কিনায় ফিরিয়া আসিয়াছে। অভিযান সর্ব্বত্রই বন্ধুভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং কোথায়ও বাধা পায় নাই। অভিযানের সফলতাও কম হয় নাই—এই বৎসরে মোট ১০২৮ জন দাস মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি এক দরবার হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সাগাং বিভাগের কমিশনার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কাচিন পাহাড়ের দাসগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে। মালিকদের অধীনে যে-সমস্ত দাস আছে তাহাদের নাম রেজিষ্টারী করিতে বলা হইয়াছিল এবং মালিকরা দাসদের জন্য ক্ষতিপুরণও পাইয়াছে। কিন্তু যাহারা যথা সময়ে নাম লিখায় নাই তাহারা ক্ষতিপুরণও পাইবে না। আর দাসদের আটকাইয়াও রাখিতে পারিবে না। কৃতদাসদের মালিকরা কোন কৃতদাসকে আটকাইয়া রাখিলে বা দাসত্ব-প্রথায় সমর্থনের চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

—

বাঙলা

অন্ন—

বাঙলার চতুর্দ্দিক হইতে যেরূপ সংবাদ আসিতেছে তাহা বড় ভয়ানক। অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল নষ্ট হইয়াছে—নিত্য ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। প্রত্যেক মাসে অক্ষমদের আর্ত্তনাদ ছাপিতে আমাদের ক্লেশ হয়, লজ্জা করে ও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। আগে দেশের অবস্থা যেরূপ হইলে দুর্ভিক্ষ বলিয়া হাহাকার পড়িয়া যাইত এখন সেই অবস্থা স্থায়ী হইয়াছে।

বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সম্প্রতি খুলনা হইতে অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের যে ভীষণ সংবাদ আসিয়াছে, তাহা সত্যই হৃদয়-বিদারক। আশাশুনী সেবাশ্রম হইতে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে জানাইয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলে লোকে দিনের পর দিন অনাহারে কাটাইতেছে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে একমুষ্টি ক্ষুধার অন্ন তাহারা দিতে পারিতেছে না। লোকে যে মজুরের কাজ করিয়া খাইবে, তাহার উপায়ও নাই। দুই জন লোক অনাহারে থাকিয়া পরিবারবর্গের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মনের ক্ষোভে আত্মহত্যা করিয়াছে। একজন তালা থানার অন্তর্গত মেসের ডাঙ্গি গ্রামের রাইচরণ মণ্ডল। তাহার পরিবারে সাতটি লোক। সে যখন হাট হইতে রিক্তহস্তে ফিরিল, তখন তাহার ছেলে-মেয়েরা কাঁদিতে লাগিল। এই দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া রাইচরণ রাত্রে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। গোয়ালডাঙ্গা গ্রামের আর একটি লোক বৃদ্ধা মাতার জন্য অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারায় বৃদ্ধা তাহাকে তিরস্কার করে। ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া হতভাগ্য পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছে।

বালুরঘাট অঞ্চলে (দিনাজপুর) কয়েক মাস হইল দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট্ প্রতিকারের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানে লোকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে—বিশেষভাবে বাঁকুড়া, বীরভুম, বর্দ্ধমান জেলায় অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষও দেখা গিয়াছে। বাঁকুড়া হইতে প্রত্যহই আমরা দুর্ভিক্ষের শোচনীয় সংবাদ পাইতেছি,—বীরভুমের বোলপুর অঞ্চলে অবস্থাও অতি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে।

দেশের শাসন-কর্ত্তারা দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ে বসিয়া আছেন। মনে হয় যেন তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। যেখানে লোকে ক্ষুধার তাড়নায়, স্ত্রীপুত্রের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া এইরূপে আত্মহত্যা করে, সে দেশের কি ভীষণ দুর্দ্দশা! উহাও যদি দুর্ভিক্ষ না হয়, তবে আর কি হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট দুর্ভিক্ষ গ্রাহ্য হইবে?

তাই সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন—

আমাদের বোলপুরের সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ যে, বিশ্বভারতীর কর্ম্মিগণ পল্লীবাসীদের প্রাণরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা আর কতদূর করিবেন? যদি গবর্ণমেণ্ট্ এবং দেশের সহৃদয় ধনীব্যক্তিরা দুর্ভিক্ষনিবারণে অগ্রসর না হন, তবে বাঁকুড়া-বীরভুমের লোকেরা অনাহারে পিপীলিকার মত মরিবে, এই আশঙ্কাই মনে উদিত হইতেছে।

অর্দ্ধেক বাঙ্গালা আজ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত। অথচ গবর্ণমেণ্ট উদাসীন নিশ্চেষ্ট। বাঙ্গালার সহৃদয় ধনী ও সেবাব্রতী সঙ্ঘ সমিতি প্রভৃতি মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হউন। তাঁহারা লোকরক্ষায় অগ্রসর না হইলে, অন্য কোন উপায় নাই।

জল—

একে ত দারুণ অন্নাভাব তাহার উপর বাঙ্গলার চারিদিক হইতে আমরা যেসব সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে পল্লীগ্রামে যে ভীষণ জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এখনই যদি এরূপ জলকষ্ট হইয়া থাকে, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারাই জানেন যে, জলাভাবের ফলে অনেক গ্রামের লোকই গ্রীষ্মের সময় "কাদাগোলা" খাইয়া জীবন ধারণ করে, দরিদ্র গৃহস্থ কুলবধূগণকে ৩৪ মাইল হাঁটিয়াও দূর গ্রাম হইতে জল আনিতে হয়। ইহার প্রতিকার কি?

সহযোগী হিন্দুরঞ্জিকা লিখিতেছেন—

যদি গবর্ণমেণ্ট, জেলাবোর্ড প্রভৃতি মিলিয়া টিউবওয়েল বসাইয়া, এবং পুরাতন কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতির সংস্কার করিয়া জলাভাব দূর করিতে চেষ্টা না করেন, তবে অবস্থা অতি ভীষণ হইবে। প্রতি বৎসরই এ সময়ে বাঙ্গলার পল্লী হইতে জলাভাবের চীৎকার উঠিয়া থাকে, গবর্ণমেণ্ট বধির হইয়া থাকেন, জেলাবোর্ডগুলি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। চিরকালই কি এইরূপ চলিবে, বাঙ্গলার পল্লীবাসী জনসাধারণ কি মানুষ নহে? তাহাদের প্রদত্ত অর্থে নানারূপ বাজে কাজ হয়, আর তাহারা জলাভাবে মরিবে ইহা একেবারে অসহ্য।

স্বাস্থ্য—

দেশের অন্ন ও জলাভাবের অপরিহার্য্য পরিণাম কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি তো আছেই। ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার গ্রামে ঐ সব রোগে বহু লোকের মৃত্যু হইতেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের সাপ্তাহিক তালিকাই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালী জাতি যে ধ্বংসোন্মুখ, তাহার জীবনশক্তি যে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, শিশুমৃত্যু, প্রসূতিমৃত্যু, অকালমৃত্যু প্রভৃতি যে

বাঙালীদের মধ্যে প্রবল হইয়াছে এই নিষ্ঠুর সত্য সরকার কর্ত্তৃক প্রতি বৎসরেই উদ্ঘাটিত হয়। সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ বেন্টলী বাঙ্গালী জাতির ১৯২৬ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণী বাহির করিয়াছেন। গত দশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী জাতি যেভাবে মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, ১৯২৬ সালেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের কথা দূরে থাকুক, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনাতেও বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি অতি ক্ষীণ। ভারতের দশটি প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গালীর জন্মের হার সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম—হাজারকরা ২৭·৪, আর তাহার মৃত্যুর হার হাজারকরা ২৪·৭। সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ বাংলার জন্মের হার ও মৃত্যুর হারের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। ভারতের কোন কোন প্রদেশে এমন মৃত্যুর হার চোখে পড়িতেছে। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলাদেশে গত দশ বৎসরের তুলনায় মোট ২৬টি জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত ১৮টি জেলাতেই জন্মের হার হ্রাস হইয়াছে :—

(১) মুর্শিদাবাদ, (২) নদীয়া, (৩) দিনাজপুর, (৪) মালদহ, (৫) রাজসাহী, (৬) জলপাইগুড়ী, (৭) চট্টগ্রাম, (৮) রংপুর, (৯) বাখরগঞ্জ, (১০) ফরিদপুর, (১১) ঢাকা, (১২) খুলনা, (১৩) পাবনা, (১৪) ময়মনসিংহ, (১৫) হুগলী, (১৬) যশোহর, (১৭) বগুড়া, (১৮) ত্রিপুরা।

বাঙ্গলার রাজধানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর কলিকাতা সহরের অবস্থা এক হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। এখানকার জন্মের হার মফঃস্বল সহর অপেক্ষা শতকরা ৮·৬ কম এবং পল্লী অপেক্ষা শতকরা ৩৯·৯ কম। অপর পক্ষে কলিকাতার মৃত্যুর হার মফঃস্বল সহর অপেক্ষা শতকরা ৩৬·৬ বেশী এবং পল্লী হইতে শতকরা ৪০·৫ বেশী। তবু অনেকের ধারণা যে, কলিকাতার স্বাস্থ্য বাঙ্গলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ভাল!

আলোচ্যবর্ষে বাঙ্গলাদেশে ১২ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৮০টি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আর ২ লক্ষ ৫১ হাজার ১৮৪টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। বাঙ্গালার সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার শতকরা প্রায় ২১ ভাগই শিশুমৃত্যু। ইহাদের মধ্যে :—

(১) জন্ম হইতে এক মাসের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ৫২;

(২) এক মাস হইতে ছয় মাস বয়সের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২১;

(৩) ৬ মাস হইতে এক বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২৪।

আলোচ্য বর্ষে সমগ্র বাঙ্গলা দেশে মৃত-প্রসূত শিশুর সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। —আনন্দবাজার পত্রিকা

শিক্ষা—

কলিকাতা ভবানীপুরের জমীদার পরলোকগত রাধিকামোহন রায়ের পত্নী শ্রীযুক্ত শৈলসুতা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের উন্নতি কল্পে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

সভাসমিতি—

গত মাসে বাঙলা দেশে দুইটি উল্লেখযোগ্য সভা হইয়াছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন। বসিরহাটে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। মৈমনসিংহে প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতি হইয়াছিলেন ও সুসঙ্গের মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় যুবক সম্মেলন, ফরিদপুর জেলা সম্মেলন, বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মেলন প্রভৃতি কয়েকটি সভা হইয়াছিল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভায় গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব—

১। পূর্ণস্বাধীনতা—এই সভা ঘোষণা করিতেছে যে, পূর্ণস্বাধীনতা লাভই ভারতের লক্ষ্য।

২। যেহেতু ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন তজ্জন্য এই সম্মিলনী সর্ব্বতোভাবে কমিশন বর্জ্জন করা সমর্থন করিতেছে।

৩। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন :—কমিশন গঠন করিয়া বৃটিশ সরকার ভারতের যে অপমান করিয়াছে ও বিনা বিচারে বাঙ্গলার কর্ম্মীদিগকে যে আটক রাখিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ-কল্পে এবং ভারতের জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এই সম্মিলনী দেশবাসীকে বৃটিশপণ্য বর্জ্জন বিশেষতঃ বৃটিশবস্ত্র বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে।

৪। বাংলাদেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস কমিটী পুনর্গঠন ও নূতন কমিটী স্থাপন করিবার জন্য দেশবাসিগণকে এই সম্মিলনী সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে।

৫। যেহেতু দেশের কার্য্যের জন্য একদল কর্ম্মী আবশ্যক। এই নিমিত্ত এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছে যে, একটি স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হউক।

৬। বাঙ্গলার পাট—যেহেতু পাট বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কৃষিসম্পদ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রধানতঃ বাঙ্গলা দেশেই উহা জন্মিয়া থাকে। যেহেতু গত দুই বৎসর কৃষককুল অজ্ঞতাপ্রযুক্ত চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া ক্রেতাগণের অনুগ্রহদত্ত নাম মাত্র মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। যেহেতু পৃথিবীর বর্ত্তমান বাণিজ্য পাট নির্ম্মিত চট ও বস্তার সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। যেহেতু বাঙ্গলায় পাটের বপন ও বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে বাঙ্গলার সম্পদ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে এবং তদ্দ্বারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতি লাভবান্ হইবে. যেহেতু বর্ত্তমানে পাট প্রচুর পরিমাণে মজুত রহিয়াছে, এই নিমিত্ত এই সম্মিলনী বাঙ্গলার কৃষক সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতেছে, এইবার যেন পাটের আবাদ গত বৎসরের অর্দ্ধেক করা হয়।

৭। যেহেতু দিল্লীতে সর্ব্বদল সম্মিলনের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং মানভূমের অধিকাংশ অধিবাসীই বাঙ্গালা ভাষাভাষী বলিয়া মানভূম জেলা সম্মিলনী অধিবেশনে মানভূম জেলাকে বাঙ্গলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তজ্জন্য এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছে। যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটী মানভূম জেলাকে বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বিহিত ব্যবস্থা করুন এবং সেইরূপ সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা, সিলেট, কাছাড়, সুরমাভেলি জেলাসমূহ এবং পূর্ণিয়া; ভাগলপুর প্রভৃতি অন্যান্য বাংলা ভাষাভাষী জেলাকেও বাঙ্গলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার বিহিত চেষ্টা করা হউক।

৮। যামুনগাছিতে জিলুয়ার নিরস্ত্র নিরীহ ধর্ম্মঘটকারী শ্রমজীবীদের প্রতি যেরূপ নৃশংসভাবে গুলীবর্ষণ করা হইয়াছে, এই সম্মিলনী তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। সেখানে নিহত ও আহত নিরস্ত্র ব্যক্তিবর্গের জন্য এই সম্মিলনী গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ও তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত গভীর সমবেদনা করিতেছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনীতে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব—

১। কুমিল্লার গত দাঙ্গার সময় ক্ষিপ্ত মুসলমান জনতার আক্রমণ হইতে নিজ পল্লীবাসী নরনারীর মর্য্যাদা রক্ষার্থে বীর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ভীকচিত্তে দুর্ব্বৃত্তগণের সহিত সংগ্রাম করতঃ বীরোচিত গতি প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু জাতির মুখোজ্জল করিয়াছেন। এই সম্মিলনী তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং হিন্দু যুবককে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলিতেছেন।

২। এই সম্মিলনী মনে করেন যে, শারীরিক শক্তিচর্চ্চা প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের ও সমাজ-রক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। গ্রামে গ্রামে ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করতঃ যাহাতে প্রত্যেক হিন্দু যুবক কুস্তী লাঠি-খেলা প্রভৃতিতে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য হিন্দু সভাকে অবিলম্বে সমুচিত ব্যবস্থা করিতে এই সম্মিলনী অনুরোধ করিতেছেন।

৩। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনে সর্ব্বথা অসমর্থ হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রসঙ্গত কিনা এই বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রব্যবস্থাপকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও বঙ্গীয় হিন্দুসভা বিবেচনা করেন যে, এইরূপ বিধবা বিবাহ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের পক্ষে আবশ্যক বোধে যাঁহারা ইহার প্রচলনার্থে উদ্যোগ করিতেছেন এবং তদনুসারে বঙ্গের নানা শ্রেণীর হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান করাইতেছেন, তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালীতে বাধা প্রদান বা উপহাস করা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের হিতকর নহে এবং যুগধর্ম্মের অনুযায়ী বলিয়া নব্যতন্ত্রী হিন্দু সমাজের মধ্যে পরিগৃহীত হইলে ইহা হিন্দু সংগঠন কার্য্যের পক্ষে অনুকূলই হইবে।

৪। যেহেতু পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিলে হিন্দু জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব, তজ্জন্য এই সম্মিলনী বিশ্বাস করেন, হিন্দু জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী ও উন্নত করিয়া তুলিতে, ভারতকে স্বরাজের পক্ষে অগ্রসর করিতে এবং অহিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হিন্দু সংগঠনই প্রধানতম পন্থা। অতএব সম্মিলনী সমগ্র হিন্দু সমাজকে, প্রতি গ্রামে বা গ্রামপুঞ্জে এবং সহরে হিন্দু সভা স্থাপন পূর্ব্বক হিন্দু সংগঠন কার্য্য সাফল্য-মণ্ডিত করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

৫। অতি প্রাচীন কাল হইতে সর্ব্বজাতির লোককেই হিন্দু ধর্ম্মের ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিয়া হিন্দুসমাজ শক্তি সঞ্চয় করিয়া আসিতেছিল। এই প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনী হিন্দু জাতির পুনরুত্থানের জন্য হিন্দু ধর্ম্মের অবাধ প্রচারের আবশ্যকতার প্রতি বাঙ্গালার হিন্দুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। হিন্দু আদর্শ হইতে চ্যুত হিন্দু সন্তানগণকে তথা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান অহিন্দুগণকে শিক্ষা ও দীক্ষা দান করা হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র অঙ্কে আশ্রয় দান করা হিন্দুজাতির পক্ষে শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য বলিয়া এই সম্মিলনী নিজ দৃঢ় বিশ্বাসজ্ঞাপন করিতেছেন এবং যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত তাহাদের সহিত এই সম্মিলনী সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

৬। যে-সকল প্রাচীন ভারতীয় জাতি যথা সাওতাল, মুণ্ডা, কোল, খাসিয়া, নাগা, কুকী, মিকির, ডাহ, বারাই, হাজং, হদি প্রভৃতি বর্ত্তমান হিন্দুজনোচিত দীক্ষা সংস্কৃত হইয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন, এই সম্মিলনী তাহাদিগকে অগ্নিকুল ও নাগাদি বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং তাহাদিগকে উক্ত ক্ষত্রিয়োচিত সামাজিক সম্মান প্রদর্শনের জন্য বাঙ্গালায় হিন্দু জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন।

৭। এই প্রাদেশিক সম্মিলনী সমুদয় হিন্দু সমাজকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাহারা সমাজের মধ্য হইতে জাতিগত অস্পৃশ্যতা অবিলম্বে দূর করিয়া সমাজের সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে প্রীতি, মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত করতঃ সংগঠন-কার্য্যের সহায়তা করুন।

৮। এই সম্মিলনী নির্দ্ধারণ করিতেছে যে, বিভিন্ন জেলায় দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক যেরূপ ভয়াবহ নারী-নিগ্রহ চলিতেছে তাহা নিবারণ করা এবং নিগ্রহকারী গুণ্ডাগণকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন হিন্দুর ও হিন্দুসভার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

(ক) কোন হিন্দুনারী বলপূর্ব্বক বা ছলপূর্ব্বক অপহৃতা বা নির্য্যাতিতা হইলে, এই সম্মিলনীর মতে তাহাকে শাস্ত্রানুমোদিত প্রায়শ্চিত্তান্তর সমাজে পুনর্গ্রহণ ও পূর্ব্বাধিকার প্রদান করা উচিত।

(খ) নারীদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থা করার জন্য লাঠিখেলা, অস্ত্র-পরিচালন ও অন্যান্য কৌশল শিক্ষা দেওয়া উচিত। সম্মিলনী হিন্দু অভিভাবকগণকে অনুরোধ করেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের কন্যা ও বধূগণকে উক্ত প্রকার শিক্ষা প্রদান করেন।

(গ) এই সম্মিলনী অনুরোধ করেন, ধর্ষিতা, গৃহচ্যুতা ও নিরাশ্রয়া নারীগণকে রক্ষার নিমিত্ত বঙ্গদেশে উপযুক্ত সংখ্যক অবলা আশ্রম স্থাপন করা হউক।

(ঘ) এই সম্মিলনী কলিকাতা নারীরক্ষা সমিতির মহান ও একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যের আন্তরিক অনুমোদন ও সমর্থন করিতেছেন এবং বঙ্গের সমগ্র হিন্দুসমাজকে এই সমিতিকে অর্থ সাহায্য ও অন্য সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলনী সকল জেলা নগরে ও গ্রামে ইহার শাখা স্থাপন একান্ত আবশ্যক মনে করেন।

৯। এই সম্মিলনী বরপণ ও কন্যাপণ উভয় প্রকার পণপ্রথাই হিন্দু সমাজের উন্নতির পরিপন্থী ও অত্যন্ত অনিষ্টকারী বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে হিন্দু-জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন।

পরলোকগত কবি শ্রীমতী বীণাপাণি রায়—

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ এন্, সি, রায়ের পত্নী কবি বীণাপাণি রায় গত ৬ই মে, ভবানীপুরে তাঁহার স্বীয় আবাস বাটীতে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি অধিক দিন কাব্য-সাহিত্যের সাধনা করিতে সুযোগ পান নাই। কিন্তু স্বীয় শক্তিবলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই নবীন সাহিত্যিক-সমাজে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি "জীবনী" নামে একখানি সুপাঠ্য উপন্যাসও লিখিয়া গিয়াছেন।

পরলোকগত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—

হুগলীর প্রবীণতম উকীল মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সি আই-ই মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মহেন্দ্র-বাবু স্বদেশী যুগে সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী প্রচারে যথেষ্ট কাজ করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া হুগলী জেলার অবিসম্বাদি নেতা এবং সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন।

অকাল-বৈশাখী

(জীর্ণ তরুর গান)

শ্রীজীবনময় রায়

বহু যুগ পরে বসন্ত মম অঙ্গনে
এসেছিল তার বৈজয়ন্তী উড়ায়ে ;
ভরি' নিয়া ডালি যূথী-চম্পক-রঙ্গনে,
নিখিলের যত হাসি-কুহুম কুড়ায়ে।
নব কিশলয় শিহরি' উঠিল বিস্ময়ে
শুষ্ক এ শাখে মধু-উৎসব প্রভাতে ;
চির পুরাতন ধূলি-ধূসরিত বিশ্ব এ
জাগে অভিনব নব নবীনের শোভাতে।
একাকী বসিয়া এ মম অন্ধ অন্তরে,
সব বাতায়ন নীরবে বন্ধ রাখিয়া,
আপনার মাঝে গভীর হৃদয়-কন্দরে,
চাহিয়াছিলাম রাখিতে নিজেরে ঢাকিয়া।
ফুলের গন্ধ মন্দ-অনিল-স্যন্দনে
পশিত না সেথা গোপন-পন্থ-চারিণী ;
আনন্দধারা গতি-বিদ্যুৎ-স্পন্দনে
ঝরিত না সেথা অকারণ-সুখসারিণী
তুমি কোথা ছিলে কনক-কোরকবন্ধনে,
নিরাকুল চিতে কিসের লভিলে সাড়া,
বিকশিলে যবে বন-যৌবন-বন্দনে'-
রুদ্ধ আমার দুয়ারে যে দিলে নাড়া।
স্তব্ধ বিজন সমাহিত ধ্যান-মন্দিরে
জাগিল চেতনা—খুলিনু দুয়ার হরষে ;
দিলে নবপ্রাণ অন্ধ কারার বন্দীরে,
তোমার হৃদয়-সুধা-সুন্দর-পরশে।
মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে দু'বাহু বিস্তারি',
লয়ে মনোহর নবীন কুসুম-মালিকা ;
বিস্ময়ে আমি চাহিনু নয়ন বিস্ফারি'—
হেরি' অপরূপ বিকচোন্মুখ বালিকা।

সহসা আমার চিত্তে উঠিল সঞ্চরি'—
লক্ষ যুগের নব বসন্ত-রাগিণী ;
গুঞ্জনগীতে চঞ্চল হ'ল চঞ্চরী
মধু-মঞ্জুল—মধুপের অনুরাগিণী।
আপনা পাসরি' তব বাহু-অভিনন্দনে
ধরা দিনু মম সকল দৈন্য ভুলিয়া ;
ভীরু এ বক্ষ ঘন দুরু দুরু স্পন্দনে,
আকুল আবেগে উঠিল দুলিয়া দুলিয়া।
শুষ্ক আমার হৃদয়ে উঠিল মুঞ্জরি'
শ্যাম সমারোহ, নবকিশলয়-পুলকে ;
মধুর মন্ত্র কি করুণ রাগে গুঞ্জরি'—
ভরিয়া তুলিল নিখিল ভূলোক-দ্যুলোকে।
সুখের আবেগে ছিলাম যখন মূর্চ্ছিত,
প্রাণে ছিল শুধু নব মিলনের জড়িমা,
তুমি অগোচরে দলিয়া এ প্রাণ উচ্ছ্রিত,
গেলে চলি' লয়ে নিখিল-মাধবী-গরিমা।
জ্বালাময়ী কথা লাগিল সহসা অন্তরে,
অকাল-নিদাঘ-পরশে উঠিনু জাগিয়া ;
বিস্ময়ে চাহি' দেখিনু যেন কি মন্তরে,
শুকায়েছে সব আগুনের ছোঁয়া লাগিয়া।
কোথায় সে বন-পুষ্প-শোভন-বাঞ্ছিত ;
কোথা সে তটিনী স্রোত-অমৃতক্ষরণী ;
কোথা সে-মলয়-সৌরভে পুলকাঞ্চিত ;
কোথায় সে গীত-মধু-বিহ্বলা ধরণী।
কোন্ নব লোকে, কোন সে নূতন যৌবনে,
ওগো বাসন্তী, লভিলে কী অভিনব দান !
কে তোমারে বরি' কী নবীন উপঢৌকনে
দিল সে তোমারে দেব-বাঞ্ছিত অবদান !
হেথায় তোমার আপন রচিত নন্দনে,
অকাল রুদ্র বৈশাখী ঘন শ্বসিছে।
এ কুটীরে মম—সজ্জিত ফুল-চন্দনে,
মহামরণের অকূল আঁধার পশিছে।
আজি শুধু বসি' গণিছে দিবস বঞ্চিত,
আবার সে কবে কোথা সে মিলিবে দরশন
ক্ষুব্ধ দুরাশা হৃদয়ে করিয়া সঞ্চিত
ব'সে আছি চাহি' মধু-বাসন্তীপরায়ণ।

"গ্রাম্য" শব্দ-সংগ্রহ

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ ব্যতীত বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ অপরিহার্য্য। কিন্তু ইহা দুই-এক জনের চেষ্টাসাধ্য নহে। এইরূপ শব্দ-সংগ্রহের পথপ্রদর্শক "Bihar Peasant Life" গ্রন্থ প্রণেতা স্বনামখ্যাত স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন সাহেব এই সঙ্কলন-কার্য্যে বিহারের প্রত্যেক জেলা হইতেই সাহায্য পাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় সাহিত্যানুরাগী অনুসন্ধিৎসু, এবং অভিজ্ঞ অধিবাসীর নিকট এসম্বন্ধে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি, সংযুক্ত সূচীর অন্তর্গত ও অন্যান্য যে যে বিষয়ে যিনি জ্ঞাত আছেন বা জ্ঞাত হইবেন, তাহা এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলে আমরা বাধিত হইব।—প্রবাসীর সম্পাদক।

১। চাষের যন্ত্রপাতি এবং প্রত্যেক যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম ও তাহার ব্যবহার কি? কৃষি-সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভাষা যেমন মই দেওয়া, বিদে কাটা, নিড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি; জমি, সার, বীজ, মলিয়ান ইত্যাদি সম্বন্ধে।

২। গোচারণ, গোপালন, গোয়াল সম্বন্ধীয় নামের ভাষা।

৩। গরু, মোষ, ঘোড়া, গাধা, ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু সম্বন্ধীয় (ও ভারবাহী ও মনুষ্য, শকটবাহী)।

৪। শকট, জলযান ও যাবতীয় যান, যেখানে যাহা প্রচলন আছে তাহার নাম, বিবিধ অংশের নাম ও কার্য্য, অবস্থা বিশেষে তাহাদের স্থিতি গতি ইত্যাদির অভিব্যক্তি।

৫। গ্রামের শ্রমশিল্পের বিবিধ বিভাগের সন্ধান—কামার-শাল, তাঁত-ঘর, কুমার শাল, ছুতারের কারখানা এবং গ্রামে প্রচলিত যাবতীয় শিল্পের তথ্য সংগ্রহ, বিশেষ বিশেষ কার্য্যের নাম, ভাষা, যন্ত্রপাতি।

৬। চিনির, চটের, তুলার কল, ভাঁটি বা শেলাইয়ের কারখানা, বস্ত্ররঞ্জন ও রজকের ব্যবসায়, দপ্তরীর ব্যবহারের যন্ত্রপাতি ও বই বাঁধন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা।

৭। দোকান সম্বন্ধীয় (মুদিখানা, ময়রার দোকান, কাপড়, মনিহারী, ইত্যাদি যত রকমের দোকান আছে প্রত্যেকের) বিষয়, দোকানের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, পণ্য-সংগ্রহ, সরবরাহ, খরিদ বিক্রী ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ব্যবহারিক ভাষা।
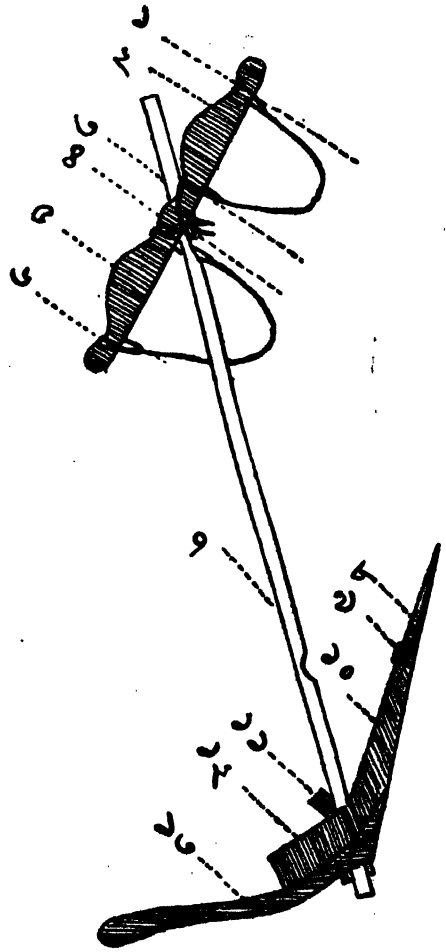
৮। মাছ, মাছের নাম, মাছ ধরা, জাল, ছিপ, বঁড়শি প্রভৃতি যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নাম, ব্যবহার, ইত্যাদি সম্বন্ধীয় উক্তি

৯। গৃহস্থের ব্যবহারের যাবতীয় গৃহ-সামগ্রী, পোষাক, আসবাব-পত্র ইত্যাদি নাম ও কার্য্য।

১০। ভদ্রাসনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম—শয়নাগার, পাঠাগার, রন্ধনশালা, আঁতুড়-ঘর, বৈঠকখানা বা চণ্ডীমণ্ডপ, পূজার ঘর, ঢেঁকিশাল, আঁস্তাকুড় ইত্যাদি।

১১। পূজা-পার্ব্বণ, হোম যাগ, ব্রত-নিয়ম, ইত্যাদি।

১২। সাজ-সজ্জা—অলঙ্কার প্রসাধন ইত্যাদি।

১৩। মণি রত্ন, ধাতু অলঙ্কার ইত্যাদির ও গড়ানের নাম।

১৪। কূপ, আঘাত, জলাভূমি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নাম ও উক্তি।

১৫। জঙ্গল, জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি সম্বন্ধে।

১৬। নীল, তামাক, তাড়ি, গুড়, পান, চা প্রভৃতি চাষ ও ব্যবসায় আদির নাম ও উক্তি।

১৭। জমী, জমিদারী, মহাজনী ইত্যাদি।

১৮। হাট বাজার, ব্যবসায় বাণিজ্য, ওজন সংখ্যা ইত্যাদি।

১৯। জন্ম-বিবাহ, মৃত্যু-বিষয়ক ও অনুষ্ঠানের সংস্কার নাম ও ভাষা।

২০। বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত করণের নাম ও উক্তি।

২১। আমোদ-প্রমোদ বিষয়ক।

২২। হাস্য-পরিহাস সম্বন্ধীয় ভাষা।

২৩। গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, ফল ইত্যাদির নাম এই তালিকার অতিরিক্ত বিষয়ও ইচ্ছামত যোগ করা যাইতে পারে।

কোন্ যন্ত্র বা জিনিষের কোন্ অংশের কি নাম, তাহা বুঝাইবার জন্ম এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত লাঙ্গলের ছবির ন্যায় ছবি আঁকিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশে নম্বর দিয়া তাহার নাম লিখিয়া পাঠাইলে সুবিধা হইবে।

শঠে শাঠ্যং

শ্রী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য

দুই—সুহৃদ্-ভেদ

[বিমলের বাবা নানা জুয়াচোরের পাল্লায় পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দুঃখে ভাবনায় ও শোকে মারা যান। বিমল ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ম প্রতিজ্ঞা করে যে, সে এইসব জুয়াচোরদের সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িবে।]

মাসকয়েক কেটে গেছে। বিমল দিনের পর দিন শত্রু-পক্ষের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়। এ কাজের দরুন্ অনেক জায়গায়, অনেক লোকের সঙ্গে তাকে আলাপ করতে হয়েছে। সে দেখলে যে, তার শত্রুদেরও শত্রু অনেক আছে; কিন্তু তাদের প্রায় সবাই অক্ষম। যে ক'জনের অল্পবিস্তর ক্ষমতা আছে তাদের অধিকাংশই ভয়ে অস্থির। এদিকে তার নিজের ইচ্ছা থাকলেও অর্থবল, জনবল কিছুই নেই, সুতরাং 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই আশায় সে দিন কাটাতে লাগল।

এইসব নূতন লোকের মধ্যে মনোমোহন দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিমলের আলাপ হয়। মনোমোহনবাবু পৈতৃক, নগদে ও জমীজমায় বেশ কিছু পেয়েছিলেন; কিন্তু, প্রথমে শেয়ার মার্কেট, তারপর পাটের বাজারে রাতারাতি বড়লোক হবার চেষ্টায় তার দুই-তৃতীয়াংশ বিসর্জন দেন। শোনা যায়, ব্যাপার বেগতিক বুঝে তাঁর গৃহিণী নিজের হাতে রাশ টেনে নিয়ে বাকী অংশ কোন রকমে বজায় রেখেছেন। মনোমোহনবাবু এখনও আপীসে আপীসে হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ান ও শীঘ্রই মস্ত কিছু একটা ফাঁদবেন এ রকম কথা বলেন এবং কোন কোন মহাজনের সঙ্গে তিনি কি কাজ করেছিলেন, কি কাজে কত লাভ (কল্পিত) বা কত লোকসান (সত্য ?) হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। লোকে দুই কারণে তাঁর এসব চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক্রিয়া সহ্য করত। প্রথম কারণ, লোকটি অত্যন্ত নিরীহ আর দ্বিতীয় এই যে, তিনি একটি বেসরকারী গেজেট বিশেষ। সহরে কে কোথায় কি করছে, বাজারে কি রকম কি চলেছে, এ সমস্ত খবর তাঁর যেন মুখস্থ থাকত। বিমল প্রথমে উদ্গ্রীব হ'য়ে, এবং পরে স্বাভাবিক ভদ্রতার খাতিরে এবং হাতে কোন কাজ না থাকায় তাঁর সব কথা শুনে যেত। তিনি এরকম শ্রোতা পেয়ে মহা খুশী হতেন। ক্রমে এই সূত্রে দুজনের মধ্যে, বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ বন্ধুত্ব হোলো, এবং বিমল কিছুদিন মনোমোহনবাবুর বাড়ী যাতায়াত করায় এই বন্ধুত্ব আত্মীয়তায় পরিণত হোলো। মনোমোহন-

বাবুর স্ত্রী বিমলকে কিছুদিন জান্‌বার পর এবং তার মিকে সব কথা শোন্‌বার পর, তাকে দেবর ব'লেই গ্রহণ করেছিলেন।

গোড়ায় গোড়ায় তিনি প্রায়ই বিমলকে বল্‌তেন, "ভাই, একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখ, তোমার বয়সে অমন চুপ ক'রে ব'সে থাকাটা ভাল দেখায় না।" বারকয়েক এ কথা শোনার পর একদিন বিমল তাঁকে নিজের প্রতিজ্ঞা ও সে সংক্রান্ত সব কথা বলে। সব শুনে তিনি প্রথমে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাকে প্রতিজ্ঞায় অটল দেখে শেষে জয়াশীর্ব্বাদ ক'রে শেষ করেন।

একদিন বিমলকে নিয়ে খেতে ব'সে মনোমোহনবাবু বল্‌লেন,—"বিমল, তোমাদের বাড়ীটা ছ'শো টাকায় ভাড়া হয়েছে। এক বাঙ্গাল জমীদার, ছেলের চিকিৎসার জন্যে নিয়েছে।" হঠাৎ এ কথা শুনে বিমলের মন পূর্ব্বস্মৃতিতে যেন কেঁপে উঠ্‌ল। মনোমোহনবাবুর স্ত্রী তার মুখের ভাবে মনের অবস্থা বুঝে নিজের স্বামীর উপর মহা বিরক্ত হ'য়ে ইসারায় তাঁকে থামাবার চেষ্টা কর্‌লেন। মনোমোহনবাবু ভ্রূকুঞ্চন এবং ঠোঁট চাপার অর্থ না বুঝ্‌তে পেরে বল্‌লেন,—"অ্যাঁ। কি কিছু বল্‌ছ না কি?"

"বল্‌ছি যে, খুকির বালার কিছু খোঁজ করেছিলে?"

"হ্যাঁ, সে ৬৷৷৹ টাকার কম বানিতে হবে না। ও সস্তায়-মস্তায় কিছু কেনা, সেকি আমাদের কপালে আছে? এই দেখ না, জীবনকেষ্ট পাল বিমলদের বাড়ীটা কিন্‌লে পঁয়তাল্লিশ হাজার দিয়ে, আর তার ভাড়া পাচ্ছে ছশো টাকা। ষোল পার্সেণ্ট রিটার্ণ"—

মনোমোহনবাবুর স্ত্রী এবার আর রাগ সাম্‌লাতে না পেরে ব'লে উঠ্‌লেন, "আচ্ছা, তোমার কাণ্ডজ্ঞান কি কোন দিন হবে না? বিমলকে এ সব কথা শুনিয়ে কি কেতার্থ করছ?" মনোমোহন ব্যাপার বুঝে অপ্রতিভ ভাবে বিমলের দিকে তাকালেন। বিমল একটু হেসে বল্‌লে— "তাতে কি হয়েছে, বৌদি? এ সব ত আমার অজানা কিছু নয়। তবে দুঃখু এই, যে, এ সব লোক জাল-জুয়াচুরি ক'রে সাজা পাওয়ার বদলে কেমন সুখে সর্ব্বস্ব ভোগ দখল করে।" মনোমোহনবাবু সোৎসাহে ব'লে উঠ্‌লেন— "ঠিক্ বলেছ, ভাই! সাধে বলি ভগবান ঘুমিয়ে আছেন। ওই জীবনকেষ্টই আর এক দাঁও মারবার চেষ্টায় আছে।"

"কি? সে আবার কার গলায় ছুরী বসাল?"

"কেন, তারক চৌধুরীর ছেলে নরেশের? তোমাদের মিত্তির আর জীবনকেষ্ট দুজনে মিলে তাকে 'পঞ্চমকারে' সিদ্ধ ক'রে তার ইহকাল পরকাল ঝরঝরে ক'রে ছাড়্‌ছে।"

"হাঁ, তা শুনেছি। কিন্তু দাঁওটা কি?"

"আরে, তাও জান না? নরেশের আয় তো বেশীর ভাগ জুট আর চায়ের ডিভিডেণ্ট থেকে। বাবু কাপ্তেনি ক'রে খুব টাকা উড়িয়েছেন, কাজেই প্রায় টাকার টানাটানি পড়্‌ত। জীবনকেষ্ট হ্যাণ্ডনোটে বেশ heavy discount-এ যখন যা দরকার তাই দিয়েছে। তারপর হঠাৎ একদিন সে সবের জন্য নালিশের ভয় দেখিয়ে ভাল ভাল শেয়ার কতক Security হিসেবে নিয়েছে, বাকীগুলো হাতাতেও বেশী দিন নেই।"

মনোমোহনবাবুর স্ত্রী বল্‌লেন—"আচ্ছা, এদের শাস্তি কি কেউ দেয় না? লোকটার স্বভাব-চরিত্রও না খুব খারাপ?"

"যতদূর হ'তে পারে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীটাকে ত এক রকম মেরেই ফেল্লে, এখন দ্বিতীয় পক্ষটির ওপর অত্যাচার চলেছে। সেও কোন দিন গলায় দড়ি দেবে। তার মেয়েটা অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে; তাকে পর্য্যন্ত মদ খেয়ে মেরে ধ'রে শেষ করছে।"

"কী? নিজের মেয়েকে পর্য্যন্ত মারধোর করে? তার মা-টা এসব সহ্য করে? আমি হ'লে অমন স্বামীর—"

"হা! পেয়েছিলে আমাকে তাই এত বাক্যি বেরোচ্ছে। পড়তে ওম্‌নি একটির হাতে—"

"রেখে দাও! দেখে নিতাম তাকে। তুমি ত বল্‌বেই! ওই জীবনকেষ্টই না সেবার পাটের কাজে তোমায় ঠকিয়ে হাজার পনেরো আদায় ক'রে নিল?"

"হাঁ তা—সেটা ঠিক ঠকিয়ে নয়, আমি Bear—"

"যাও, যাও। সব জানি আমি। কিল খেয়ে কিল চুরী যদি না কর্‌লে ত তুমি তুমি কেন। আমি তাকে একবার পেলে দেখে নি। ওর স্ত্রীটা নিশ্চয় একটা হ্যাকা।"

"তা সে হিন্দু ঘরের স্ত্রী, কি আর করবে? রোজ গঙ্গাস্নান ক'রে পুজো মানত ক'রে স্বামীর মতি-গতি বদ্‌লোবার চেষ্টা করে।"

"মরুক গে তারা। ওরে মাংসের কারীটা আন্। বিমল, পাতে যে সব প'ড়েই রইল? মাছটা কি নরম ঠেকছে?"

'না বৌদি, বেশ মাছ। এতক্ষণ গল্প শুনছিলাম কি না।"

তারপর খাওয়া-দাওয়া চল্‌ল। সবশেষ হ'য়ে যাবার কিছু পরে বিমল মনোমোহনবাবুকে বল্‌লে—"মনোমোহন দা', এই নরেশ তো সেই ফুটবল খেলোয়াড় নরেশ, যে রাজাবাগানের হ'য়ে হাফ ব্যাক্ খেল্‌তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই। কেন কি হয়েছে?"

"কিছু না, ভাব্‌ছি অমন একটা খেলোয়াড় নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে?"

"ও, এই জন্যে! হ্যাঁ তাও তো বটে, তুমিও যে একজন বড় প্লেয়ার। কি, এবার কি মনে হয়, তোমাদের

ক্লাবের অবস্থা কেমন?" কিছুক্ষণ ফুটবল, শীল্ড লীগ ইত্যাদির কথা হ'বার পর বিমল বিদায় নিল।

দিন কুড়ি পঁচিশ পরে, একদিন বিকালে বিমল মনোমোহনবাবুর বাড়ী উপস্থিত হলো। মনোমোহন বাবুর ছেলে ও মেয়ে "বিমল কাকা" "বিমল কাকা" ব'লে ছুটে এসে তার দুই হাত ধ'রে তাকে বাড়ীর ভিতর টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেলো। মনোমোহনবাবুর তখনও ফের্‌বার সময় হয়নি।

মনোমোহনবাবুর স্ত্রী হাসিমুখে বল্‌লেন, "কি বিমল, এমন সময় খেলাধুলো ফেলে কি মনে ক'রে?"

বিমল বল্‌লে—"বৌদি, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।"

"ঠিক লোক ঠাউরেছো, ভাই। যাহোক আগে তোমার চায়ের জোগাড় দেখি তারপর পরামর্শ হবে খন।"

চায়ের পাট সাঙ্গ হ'বার পর মনোমোহনবাবুর স্ত্রী বিমলকে জিগ্‌গেস্ করলেন, "কি, তোমার পরামর্শ কিসের?"

বিমল খানিক চুপ ক'রে বল্‌লে, "সে কথা বল্‌ছি পরে। গোড়ায় আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আচ্ছা, সেদিন যে বল্‌ছিলেন জীবনকেষ্ট পালকে পেলে আপনি একবার দেখে নেন্, এটা কথার কথা হিসেবে বলেছিলেন, না এর মধ্যে কিছু সত্যি আছে?"

"ও বাবা! এ বুঝি তোমার সেই প্রতিজ্ঞার ব্যাপার? না বাবু, আমি বাঙ্গালী ঘরের বৌ, ওসব আমি কিছু কর্‌তে পার্‌ব না। পরের অনিষ্ট করতে গিয়ে শেষে নিজের একটা কিছু হ'লে কোথায় যাব?"

বিমল একটু হেসে বল্‌লে, "বুঝেছি! আপনার যত তেজ মনোমোহনদার সাম্‌নে।"

"ইস্! তাই নাকি?" ব'লে তিনি একটু থেমে গেলেন। তারপর বল্‌তে লাগ্‌লেন—"তোমারও বুদ্ধির বলিহারি! তুমি কি চাও আমি তোমার সঙ্গে লাঠি ঘাড়ে ক'রে জীবনকেষ্টকে ঠেঙ্গাতে যাব?"

বিমল হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল, "তা আপনি সেদিন যেরকম রাগ দেখিয়েছিলেন তাতে ওরকম মনে করা আশ্চর্য্য কি?" ব'লে সে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—"আচ্ছা, এমন যদি হয় যে, আপনার অনিষ্টের কোনও সম্ভাবনা না থাকে—কোনও অঘটন ঘটবার মত কাজ না কর্‌তে হয়, তাহ'লে আপনি এগোতে পারেন কি?"

"আমায় কি কর্‌তে হবে বলতো? তারপর আমি ওসব বুঝ্‌ব।"

বিমল স্থির হ'য়ে খানিক ভেবে বল্‌লে—"আপনাকে কিছু দিন রোজ ভোরে গঙ্গাস্নান কর্‌তে যেতে হবে। কোন্ ঘাটে যেতে হবে তা আমি পরে ব'লে দেব। আর স্নানের ঘাটে একটি স্ত্রীলোককে আমি দেখিয়ে দেবো। তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ভাল রকম ক'রে নিতে হবে।"

"সেটি কে?"

"সেটি জীবনকেষ্ট পালের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার।"

"তারপর?"

"তারপর আলাপ-পরিচয় ভাল ক'রে জম্‌লে তার সুখ-দুঃখের কথা টেনে আন্‌তে হবে। সে কাজ হ'লে ধীরে সুস্থে তার মনে একথা ঢুকিয়ে দিতে হবে যে, তার এত দুঃখ, মেয়ে বিধবা হয়েছে, সংসার ছারেখারে যাচ্ছে—এ সব তার স্বামী অপরের সর্ব্বনাশ ক'রে পাপ করছে ব'লে। সেই সঙ্গে তার স্বামীর অত্যাচারের ব্যাপারটা খুব ফেনিয়ে ব'লে ওকে অধীর করতে হবে।"

"কি বাপু, শেষ পর্য্যন্ত ওকে দিয়েই ওর স্বামীকে খুন করাতে চাও নাকি?"

"আরে নাঃ! ওরকম কিছুই নয়, যা করা দরকার তা পরে বল্‌ব আর তাতে যদি কোনও ভয়ের কারণ দেখেন ত করবেন না।"

মনোমোহনবাবুর স্ত্রী কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌লেন, "এ পর্য্যন্ত যা বল্‌তে তাতে তো কিছুই সেরকম ভয়ানক দেখ্‌ছি না, পরে কি হয় জানি না। দেখো ভাই, শেষ পর্য্যন্ত একটা বিপদে না পড়ি।"

"কোন ভয় নেই, বৌদি। তবে মনোমোহনদাকে এসব কথা বলা নয়। নইলে—"

"জানি। তাঁর পেটে কোন কথা থাকে না।"

'হ্যাঁ। আচ্ছা তবে এই কথাই রইলো। কাল্‌কে থেকেই তবে ধর্ম্মকর্ম্ম গঙ্গাস্নান আরম্ভ করুন। আমি খুব ভোরেই আস্‌ব।" এই ব'লে বিমল বিদায় নিলো।

—

মাস দেড়েক পরে একদিন সকালে উকীল অক্ষয়বাবু বৈঠকখানায় ব'সে চা খাচ্ছেন এমন সময় বিমল গিয়ে উপস্থিত হোলো। তাকে দেখে অক্ষয়বাবু সাদরে বল্‌লেন, "এই যে ব্রাদার! ওরে, আর এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়! তারপর, এত সকালে কি মনে ক'রে?" দু চার জন অন্য লোক রয়েছে দেখে বিমল বল্‌লে, "চা খেয়ে নিন্, পরে একটা কথা আছে। তবে কোন তাড়া নেই।"

চা খাবার পর অক্ষয়বাবু বিমলকে বস্‌বার ঘরে ডেকে নিয়ে জিগ্‌গেস করলেন—"কিহে, ব্যাপার কি?"

"আপনার চেনা কোন লোক আছে যে জুট, চা, বা অন্য ভাল শেয়ার সস্তায় কিন্‌তে চায়? খদ্দের কিন্তু দু'ষে লোক হওয়া চাই।"

"কেন, ছঁেদ খদ্দেরের দরকার কিসের জন্তে? লুট-তরাজের মাল না কি? বেচ্‌ছে কে?"

"বেচ্‌ছে যার সম্পত্তি সে নিজে, তবে এ জিনিষগুলি জীবনকেষ্ট আর মিত্তির মহাশয়ের খপ্পর থেকে উদ্ধার করা—"

"By fair means or foul?"

"দুই। তবে দাঁড়িয়ে লড়তে পারলে কিছু ওরা কর্‌তে পারবে না। আমার মক্কেলের দিক ঠিক আছে।"

"ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, একেবারে ঠিক। যদি সন্দেহ থাকে ত আপনার সেই আশুবাবুকে ব'লে দিন না। তাঁর ত এসবে আপত্তি নেই।"

"আ···চ্ছা।···না, তোমার বার বার একই লোকের কাছে যাওয়া ভাল নয়, কি জানি কার মনে কি আছে। দেখি আর কে একাজে সাহায্য করতে পারে।" এই ব'লে তিনি চুপ ক'রে ভাবতে লাগ্‌লেন। একটু পরে তিনি বল্‌লেন—"দেখ, এই এগারটা সাড়ে এগারটা। আন্দাজ তুমি একবার এটর্নী শ্যামাচরণ খাস্তগীরের অফিসে এসো। তোমার কাছে এই transactionএর details পুরো আছে?"

"এই নিন্" ব'লে বিমল একখানা কাগজ অক্ষয়বাবুর হাতে দিল। অক্ষয়বাবু সেটা আদ্যোপান্ত প'ড়ে বিমলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে বল্‌লেন, "বিমল, আগুন নিয়ে খেলা করছো, ভাই! তুমি ছেলে-মানুষ, আমার ভয় হয় পুড়ে না যাও।"

"পুড়ি পুড়্‌ব। ওদের দু-চারটাকে আগে পোড়াতে পারি, ত তাতে আমার কোনও দুঃখ নেই। এখন আসি তবে, অক্ষয়দা।"

"এস, ভাই।"

সেদিন এটর্নী খাস্তগীরের অফিসে বিমল লম্বা দেড় ঘণ্টা ধ'রে জেরার উত্তর দিয়ে এটর্নীকে সন্তুষ্ট করলে। ঠিক হোলো যে, তার পরদিন এটর্নী তাঁর চেনা এক খদ্দের আন্‌বেন আর বিমল শেয়ারগুলির মালিক নরেশ চৌধুরী' তাকে সনাক্ত করার লোক, শেয়ারগুলি যে নরেশের নিজস্ব সম্পত্তি সে সম্বন্ধে প্রমাণ ইত্যাদি আন্‌বে।

দু-তিন দিনের মধ্যে শেয়ারগুলি বিক্রীর বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। এক মাম্‌লা-বাজ জমীদার সব ব্যাপার জেনে শুনে দু-লাখ টাকায় শেয়ার লাখ তিনেকে কিন্‌তে রাজী হ'ল। নরেশ চৌধুরী নিয়ম মত রসীদ-পত্র ক'রে সেই জমীদারের নামে শেয়ার transfer করবার দরখাস্ত ইত্যাদি ক'রে খাস্তগিরের নামে আমমোক্তার-নামা রেজেষ্ট্রী ক'রে কলকাতা ছেড়ে চম্পট দিল।

নরেশ যাবার কয়েক দিন পরেই সব কাগজে নোটিশ বেরল যে, এইচ ডি মিটার কোম্পানি তাঁদের মক্কেল জীবনকৃষ্ণ পালের তরফ থেকে সর্ব্ব-সাধারণকে জানাচ্ছেন যে, নরেশচন্দ্র চৌধুরী, ৺তারক চৌধুরীর এক মাত্র সন্তান, উক্ত পাল মহাশয়ের কাছে অমুক, অমুক, অমুক কোম্পানীর কতকগুলি শেয়ার বিক্রী করেছিল। সেগুলি চুরি গিয়েছে
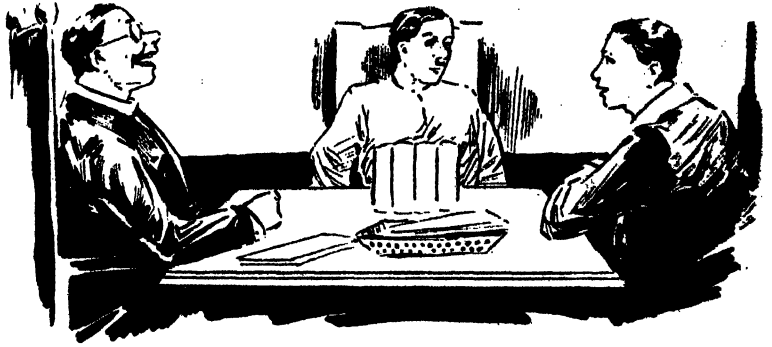
বিমলের দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন।

সুতরাং যদি কেউ তা কেনেন তাহ'লে চোরাই মাল কেনার দায়ে পড়িবেন ইত্যাদি।

এই নোটিসের জবাবে খাস্তগীর কোম্পানি পাল্টা নালিশ করলেন যে, তাঁদের মক্কেল শ্রীনরেশচন্দ্র চৌধুরী উক্ত জীবনকৃষ্ণ পালের কাছে কোনও শেয়ার বিক্রী করেন নাই, তিনি উক্ত পালের কাছে হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করেছিলেন, এবং শেয়ার বিক্রী ক'রে সেটাকা শোধ দিয়ে হ্যাণ্ডনোট ফেরত নিয়েছেন ইত্যাদি।

রীতিমত মামলা বেধে গেল। কিন্তু জীবনকৃষ্ণের দিকে কেবল মুখের সাক্ষী আর নরেশের দুচারখানা চিঠি, এবং নরেশের তরফে তার ফিরৃতি রসিদ করা হ্যাণ্ডনোট এবং তার আগের তারিখ দেওয়া সেই জমীদারের দরুন্ শেয়ার বিক্রীর রসিদ ইত্যাদি। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত নরেশেরই জিত হ'ল। সব গোলমাল মিট্‌বার পর নরেশের শেয়ার বিক্রী হ'য়ে গেল। বিক্রীর দরুন্ চুক্তিমত বিমলের পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা ছিল। অক্ষয়বাবু সেই টাকার চেক নিয়ে আসলে পরে বিমল তাঁকে বল্‌ল যে, তার মধ্যে দশহাজার মনোমোহন-বাবুর স্ত্রীর প্রাপ্য। সুতরাং একদিন বিকালে সেই চেক ভাঙ্গিয়ে টাকা আনা হোলো এবং অক্ষয়বাবু মনোমোহনবাবুকে তার থেকে দশহাজার টাকা নিতে বল্‌লেন মনোমোহনবাবু তো অবাক! কিসের টাকা, কি বাবদ তাঁকে দেওয়া হচ্ছে এসব তিনি খোঁজ করতে অক্ষয়বাবু

বল্লেন—"হ্যাঁ, আমারও অনেক কিছু এর মধ্যে জানবার আছে। অতবড় সেয়ানা জোচ্চোর ছুটোর হাত থেকে এসব তুমি ছিনিয়ে আনলেই বা কি ক'রে, আর তারা কিছু ক'রে উঠতেও পারলো না বা কেন ?" বিমল একটু ভেবে বল্লে—"আমার সে-সব বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু যদি মনোমোহনদা কোথাও গল্পের মধ্যে ব'লে ফেলেন তবে—"

মনোমোহনবাবু ব'লে উঠলেন, "তুমি কি মনে করো আমাকে ? এরকম ব্যাপার নিয়ে আমি গল্প ক'রে বেড়াবো ?"

অক্ষয়বাবু বল্লেন—"হ্যাঁ, পাগল হয়েছ তুমি ? মনোমোহন-বাবুর স্ত্রী এর মধ্যে আছেন, উনি কখনো একথা

শেষে যখন সে তাঁর হাত চেপে ধ'রে কাঁদতে লাগ্‌ল।

-ব'লে বেড়াতে পারেন ? তার পর ওই ছুই ব্যাটা খাওয়াখায়ি ক'রে পরস্পরকে যা বিপদে ফেলেছে—"

মনোমোহনবাবু উৎসুক হ'য়ে বল্লেন, "সে আবার কি হয়েছে ?"

"আরে মিত্তিরের এক মক্কেলকে জীবনকেষ্ট কি সব প্রমাণ জুটিয়ে দিয়েছে সে তাই নিয়ে মিত্তিরের নামে misfeasance, ইত্যাদির নালিশ করেছে, মিত্তিরও পাল্টা জবাবে জীবনকেষ্টকে আর এক মক্কেলের মারফৎ জাল, purgery ইত্যাদির দায়ে ফেলেছে।"

বিমল বল্লে, "যাক্! তবে আমি যা ভেবেছিলাম তাই হলো।"

অক্ষয়বাবু বল্লেন—"কেন ? কি ভেবেছিলে ? আঃ, সব খুলেই বল না ছাই !"

"বলছি তবে, শুনুন। মনোমোহনদার কাছে একদিন কথায় কথায় শুনলাম যে ওরা নরেশ চৌধুরীকে ঘায়েল করার চেষ্টায় আছে। সেই থেকে আমি নরেশের পেছনে ঘুরতে লাগলাম, তার সঙ্গে খেলার সূত্রে আগের থেকেই চেনাশুনো ছিল। কিছুদিন যাবার পর সে একদিন টাকাকড়ির কথায় আমাকে বলে, যে, যারা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে তারা ওকেও বধ করেছে। আমি তাতে খুব দরদ জানিয়ে, ভাল উকীলের পরামর্শ জোগাড় ক'রে দেব ইত্যাদি বলায় ক্রমে ক্রমে সব কথা বেরিয়ে পড়্‌ল মিত্তিরের সঙ্গে এক নাচের আসরে ওর সঙ্গে আলাপ হয় তারপর মিত্তির ধীরে ধীরে ওর যত বদখেয়ালে সাহায্য করে, ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোক জুটিয়ে, আরো নানা রকমে ওবে মুঠোর মধ্যে আনে। গোড়ায় যখন টাকার দরকার পড়তো মিত্তির নিজেই দিত। পরে জীবনকেষ্টর কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোটের ব্যবস্থা হ'লো। মারাত্মক discount বিষম সুদ, চক্রবৃদ্ধি এই সবে সে দেনা চট্‌চট্‌ ক'রে বেড়ে যেতে লাগ্‌ল। তারপর জীবনকেষ্ট নালিশের ভয় দেখাতে মিত্তিরের পরামর্শে সে তার কতকগুলি শেয়ার জীবনকেষ্টর কাছে বাঁধা রাখে। তারপরে আবার ধার নেওয়া আরম্ভ হয়, মদের ঝোঁকে কখন সে কত নিয়েছে তার হিসেবও ছিল না। এই রকমে বছর দেড়েক যাবার পর হঠাৎ একদিন এক ফিরিঙ্গীর দরুন্ divorce ও damageএর এবং তার পরেই অন্য একটা বিশ্রী স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারের নালিশের চিঠি এসে উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনকেষ্ট তাকে একটা statement দেয়। statement দেখে নরেশের ত চক্ষুস্থির। সে বলে যে, টাকা সে লাখ, সওয়া লাখ, বড় জোর দেড় লাখ নিয়েছিল, কিন্তু জীবনকেষ্টর হিসাবে তা সাড়ে তিন লাখের ওপর ব'লে দেখান ছিল। হ্যাণ্ডনোট ও সুদের হিসাব ঠিকই ছিল। নরেশের মাথায় ত আকাশ ভেঙে পড়ল। কি আর করে তখন। কোন রকমে পরিত্রাণ পাবার জন্যে, প্রায় বাজার দরে দুলাখ টাকা দামের শেয়ার জীবনকেষ্টকে তার প্রাপ্য টাকা বাবদ এবং আরো নগদ চল্লিশ হাজার নিয়ে, বিক্রীর রসিদ লিখে দিয়ে দিলে। ওই নগদ টাকা থেকে পঁচিশ হাজার দিয়ে নালিশ মিটমাট করে, জীবনকেষ্টর কাছ থেকে জাল ও আসল হ্যাণ্ডনোটগুলি এবং নগদ পনর হাজার টাকা নিয়ে সে ফিরে এলো।" একটু থেমে বিমল ফের বলতে লাগ্‌ল—"আমার সঙ্গে যখন তার কথা হয় তার কদিন আগে এ সব হ'য়ে গেছে।"

মনোমোহনবাবু চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্লেন, "উঃ, কী ভয়ানক! বেটারা সব করতে পারে! কী চক্রান্ত!"

অক্ষয়বাবু মৃদু হেসে বল্লেন, "যাই বল, বেটাদের বুদ্ধি আছে। মেয়ে মানুষের ব্যাপারটা কি cleverly staged আর timed! তার পর কি হ'ল, ব্রাদার ?"

বিমল বলতে লাগ্‌ল, "এর অনেক দিন আগেই গজা-

স্নানের ঘাটে জীবনকেষ্টর স্ত্রীর সঙ্গে বৌদির খুব আলাপ-সালাপ হ'য়ে গেছে। মনোমোহনদা জানেন না যে, তাঁর স্ত্রীর হঠাৎ এমন ধর্ম্মে মতি কেন হয়েছিল।"

অক্ষয়বাবু বল্‌লেন, "কি রকম? কি রকম?"

বিমল বল্‌লে, "আমি দেখলাম জীবনকেষ্ট ত কাউকে বিশ্বাস করে না, আর ভয়ানক সাবধান, কেবল তার স্ত্রী যা কিছু কর্‌তে পাবে। তার পর মনোমোহনদার কাছে শুন্‌লাম যে, সে তার স্ত্রী আর বিধবা মেয়েব উপর ভয়ানক অত্যাচার করে। কাজেই বল্‌লাম যে, তার স্ত্রীকে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার হ'তে পারে। এখন তাকে হাত করা যায় কি ক'রে? সে প্রায় দিনই গঙ্গাস্নানে যায় জেনে অনেক খোঁজ ক'রে দেখলাম সে যায় বাবুঘাটে।"

অক্ষয়বাবু বল্‌লেন, "তারপর মনোমোহনকে না জানিয়ে তার স্ত্রীকে পাঠালে ধর্ম্মের ভাণ ক'রে জীবনকেষ্টর স্ত্রীকে হাত কর্‌তে?"

"হ্যাঁ।"

অক্ষয়বাবুত বিষম হাস্‌তে লাগ্‌লেন। মনোমোহনবাবু হাস্‌বেন না রাগবেন ঠিক না কর্‌তে পেরে বিমলের দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন। বিমল আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—

"জীবনকেষ্টর স্ত্রী ক্রমে তার সাংসারিক দুঃখকষ্টের কথা বৌদির কাছে বল্‌তে লাগ্‌ল। বৌদিও খুব সহানুভূতি জানাতে লাগ্‌লেন। কিছুদিন পরে আমার পরামর্শ মত বৌদি ওসব কথা শুন্‌লেই বল্‌তেন যে তার সংসারে যা কিছু দুঃখ কষ্ট, অঘটন সব তার স্বামীর পাপের দরুণ, মায় তার মেয়ের বৈধব্য। এখন এই মেয়েটা তার একমাত্র সন্তান কাজেই তার ওপর ওর বড়ই টান। সুতরাং মেয়ের ওপর অত্যাচারের কথা বলতে বেচারী কেঁদে কেটে অস্থির হ'ত। বৌদি সে সব শুনে বলতেন যে তিনি হ'লে এর বিহিত কর্‌তেন। কি বিহিত কর্‌তেন জিগ্‌গেস কর্‌লে তিনি বল্‌তেন যে তা ওর কর্ম্ম নয়। এ রকমে অনেক দিন যাবার পর আমি নরেশের সমস্ত খবর পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বৌদির মারফৎ এ খবরও পেলাম যে, জীবনকেষ্ট বোধ হয় শেয়ারগুলি পাওয়ায় খুব স্ফূর্ত্তি কর্‌ছে, তার ফলে রোজই মাতাল অবস্থায় মেয়েটাকে ভীষণ মারধোর কর্‌ছে, স্ত্রীকে ঠেঙ্গাতেও কসুর কর্‌ছে না। আমি ঠিক সময় এগিয়ে এসে বৌদিকে পরামর্শ দিলাম। পরদিন জীবনকেষ্টর স্ত্রী যেমন তাঁর কাছে কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে অম্নি বৌদি বল্‌লেন, 'যাও আমাকে ওসব ব'লে জ্বালিয়ো না। তুমি ত এর বিহিত কর্‌বে না আর তোমার মেয়েও একদিন মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরবে।' জীবনকেষ্টর স্ত্রী এর কি বিহিত করা যায় জিগ্‌গেস করাতে তিনি আর কিছু বলেন না। শেষে যখন সে তাঁর হাত চেপে ধ'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো তখন তিনি বল্‌লেন যে, বিপদে না পড়্‌লে লোকের শুভমতি হয় না। অতএব ও যদি তার স্বামীর বিপদ ঘটাতে পারে ত সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কি কর্‌তে হবে জান্‌তে চাওয়ায় বৌদি বললেন যে, সে কাজ ও কর্‌তে পার্‌বে না। জীবনকেষ্টর স্ত্রী তাতে গঙ্গাজলে শপথ ক'রে বল্‌ল যে, সে তার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে স্বামীকে খুন করা বাদে সব কর্‌তে পারে। বৌদি তখন তাকে পরামর্শ দিল যে, যখন তার স্বামী শেষ রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ী ফিরে বেহুঁস হ'য়ে ঘুমোবে তখন তার লোহার সিন্দুক খুলে টাকা পয়সা নোট বাদে যা কাগজ-পত্র পাবে সে-সব—মায় লোহার সিন্দুকের চাবিটা—একটা গামছায় জড়িয়ে বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে।

জীবনকেষ্ট ত মার খেয়ে ফ্লাট

"পরদিন ঠিক তাই হ'ল। বৌদি তখন স্নান কর্‌ছেন এমন সময় সে জলে নেমে এসে দেখালো যে একটা গামছায় বাঁধা পুলিন্দা সে কাপড়ের ভিতরে ক'রে এনেছে। গাড়িতে কোনও কাগজ পত্র প'ড়ে আছে কিনা জিগ্‌গেস্ করায় সে সেই পুলিন্দা বৌদির হাতে চুপি চুপি দিয়ে গাড়ি দেখ্‌তে গেল। আমি বৌদির কাছে খোঁজ নিয়ে ঠিক তার গামছার মত আর একটা গামছায় পুরোনো কাগজের এক পুলিন্দা বেঁধে বৌদিকে দিয়েছিলাম। বৌদি সেটিকে আচ্ছা ক'রে জলে চুবিয়ে জীবনকেষ্টর স্ত্রী ফিরে এলে তার হাতে দিলেন। সে জলের ওজনের দরুণ তাতে আর নিজেরটাতে কোনও তফাৎ না বুঝে গলা-জলে গিয়ে ডুবে তাই বিসর্জ্জন দিল। বৌদি আমায় আসল পুলিন্দাটা দিতে আমি খুলে

দেখ্‌লাম নরেশের শেয়ারগুলি, তার হাতে লেখা রসীদ এবং তা ছাড়া অন্য অনেক শেয়ার দলীল ইত্যাদি রয়েছে।"

অক্ষয়বাবু বল্‌লেন, "সেগুলো কি কর্‌লে?"

"দলীলগুলো পরশুদিন রেজেষ্ট্রি ক'রে মর্গ্যান কোম্পানিতে পাঠিয়ে দিয়েছি, খামে জীবনকেষ্টর নামধাম দিয়েছি। শেয়ারগুলো তার কদিন আগেই মিত্তিরের পেটোয়া শেয়ার ব্রোকার ছাপনলাল কোম্পানিতে বিক্রী করার এক জাল অর্ডার দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার মধ্যে নরেশেরও দু-চারখানা শেয়ার ছিল। সে খবর মিত্তির পেয়েছে ব'লে আঁচ করছি।"

মনোমোহনবাবু বল্‌লেন, "ঠিকই ধরেছ, দালাল হরেন ঘোষ গত শনিবার বাগান করেছিল। জীবনকেষ্ট সেখানে গিয়ে মনের দুঃখ মদের গেলাসে ডুবোচ্ছে এমন সময় মিত্তির ঝড়ের মত সেখানে ঢুকে জীবনকেষ্টকে "চোর বজ্জাৎ, লুকিয়ে শেয়ার বিক্রী ক'রে আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আছো" এই সব বল, জীবনকেষ্টও উঠে দাঁড়িয়ে তাকে পাল্টে গাল দিতে-দিতেই হাতাহাতি হয়। জীবনকেষ্ট ত মার খেয়ে ফ্লাট, তখন সবাই মিলে ছাড়িয়ে দেয়। তাতেই বোধ হয় এই সব পরস্পরের সর্ব্বনাশের চেষ্টার সূত্রপাত হয়েছে।"

অক্ষয়বাবু বল্‌লেন "যাক্‌, ব্রাদার! তোমার ত প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে, হাতে কিছু টাকাও পেয়েছ। এবার অন্য কাজে মন দাও।"

বিমল বল্‌ল, "প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে কি অক্ষয়দা! এই ত সবে কলির সন্ধ্যে!"

বাউল গান*

মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীন, বি-এ

[ফরিদপুর জিলার লক্ষ্মীকোল গ্রামের ফটিক সাঁইএর নিকট হ'তে সংগৃহীত।]

সে বড় আজব কুদরতি।
আঠার মোকামের মাঝে
ওরে জ্বল্‌ছে একটা রূপের বাতি ॥
কে বোঝে কুদরতি খেলা
জলের মধ্যে অগ্নি জ্বালা,
জানতে হয় সেই নিরালা
ওরে নিরক্ষিরে আছেন জ্যোতি ॥
চুনি, মনি, লাল ও জওহরে
সেই বাতি রেখেছে ঘিরে,
তিন সময় তিন যোগ সে ধরে,
যে জানে সে মহারতি ॥
থাকতে বাতি উজ্জ্বল ময়,
দেখনা যার বাসনা হৃদয়,
লালন বলে কখন কোন সময়
ওগো অন্ধকার হয় বসতি ॥

শুদ্ধ প্রেম-রাগে থাক্‌রে অবোধ মন।
নিভাইয়া মদন জ্বালা
ওহি পথে কর মন খেলা,
উভয় নিহার উর্দ্ধ তালা
প্রেমেরই লক্ষণ ॥
একটা সাপের দুইটি ফণী,
দুই মুখে কামরালেন তিনি,
প্রেম বাণে বিক্রমে
তার সনে দাও রণ ॥
মহারস যার হৃদ্‌ কমলে
প্রেম আশ্রম নাওরে খুলে,
আত্মা সামাল সেই রণ কালে,
কয় ফকির লালন ॥

যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়।
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায় ॥
রস রতি অনুসারে,
নিগূর ভেদ জানতে পারে,
রতিতে মতি ঝরে,
মূল খণ্ড হয় ॥
নিলেয় নিরাঞ্জন আমার,
আধ নিলে কর্‌লেন প্রচার,
জানলেন আপনার জন্মের বিচার,
সব জানা যায় ॥
আপনার জন্মলতা
জানগে তার মূলটা কোথা,
লালন কয় হবে শেষে
সাঁই পরিচয় ॥

মরশেদ বিনে কি ধন আর আছেরে এ জগতে।
মরশেদের চরণ সুধা,
পান করলে হরে ক্ষুধা,
করনা আর দেলে দিধা,
যেহি মরশেদ সেহি খোদা,
বোঝ "অলিয়ম মরশেদা"
আয়েত লিখে কোরানেতে ॥
আপনে খোদা আপনে নবি,
সেই আদম ছবি;
অনন্তরূপ করে ধারণ
কে বোঝে তার নিরাকারণ
নিরকোর হাকিম নিরাঞ্জন
মরশেদ রূপ ঐ ভজন পথে ॥
"কুল্যো সাইয়েন মহিত আরস,"
"আলা কুল্যো সাইয়েন কাদ্দির,"
কেন লালন ফাঁকে ফের,
ফকিরি নাম বারাও মিছে ॥

---

* মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সংগৃহীত বাউল গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিত মন্তব্য গত চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে।
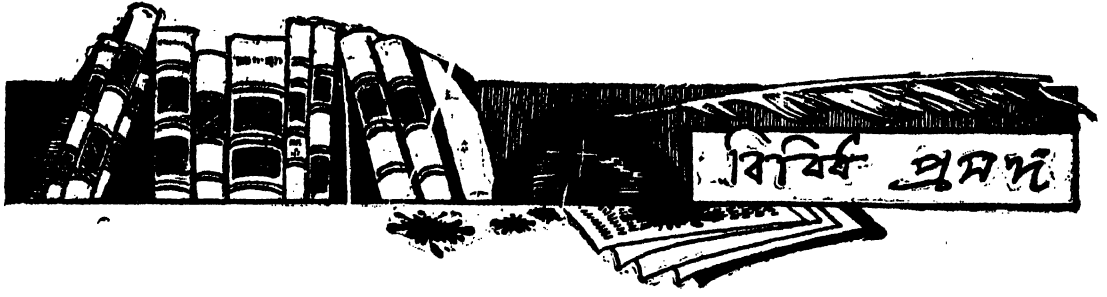
বুদ্ধ উৎসব

বৈশাখের শেষ সপ্তাহে বিবিধ প্রসঙ্গ লিখিতে বসিয়াছি। ভারতীয়দের পক্ষে, মানবজাতির পক্ষে, যে সুমহান্ ঘটনাগুলি এই বৈশাখে ঘটিয়াছিল, তাহা শাক্যসিংহের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ, মহাপরিনির্ব্বাণানন্তর দেহত্যাগ। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি নিজের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া অপর সকলকে সেই সাধনা ও সিদ্ধির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকের এই স্বরাজ্যলাভ সত্য জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যলাভের প্রকৃত ভিত্তি। বর্ত্তমান সময়ে যখন ভারতবর্ষে স্বরাজ্যলাভের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশিত হইতেছে, তখন স্বাধীনতার, মুক্তির, এই পরমগুরু সকলের স্মরণীয় ও পূজনীয়।

তিনি মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও উপদেষ্টা। তাঁহার মৈত্রী শুধু সকল মানুষকে নয়, সকল জীবকে আলিঙ্গন করিয়াছে। মানবেতর প্রাণীসকলেরও প্রতি এমন আত্মীয়তার ভাব তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কোন শিক্ষক দেখাইতে পারেন নাই।

জাভার বোরোবুদুরের মন্দির দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে আছে—

"অন্য মন্দিরে দেখেছি সব দেবদেবীর মূর্ত্তি, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীও খোদাই হয়েচে। এই মন্দিরে দেখ্‌তে পাই সর্ব্বজনকে—রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে ভিখারী পর্য্যন্ত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে। জাতক কাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে যুগ যুগ ধ'রে বুদ্ধ সর্ব্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ প্রকাশিত। প্রাণী-জগতে নিত্যকাল ভালো-মন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেচে, সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধ'রেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্যরূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজকে ফুটিয়ে তুলচে। তার চরম বিকাশ হচ্চে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ! জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প ক'রে নানা দিক্ থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করচে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয়, কেন না আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্ম্মের যে অভিব্যক্তি, তার প্রণালী পরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের পরে আঘাত লাগ্‌চে। সেই আঘাত যে-পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে ছেলেবেলায় দেখেছিলুম দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ীর গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্চে; দেখে আমার বড় বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হ'তে পারেন একথা বল্‌তে জাতক কথা লেখকের একটুও বাধ্‌ত না। কেন না, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতক কথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হ'য়ে উঠ্‌ল। সেই জন্যেই এতবড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্ম্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্ম্মেরই প্রকাশ-চেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।"—বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৪।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের সাতষট্টি বৎসর অতিক্রম করিয়া আটষট্টি বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী সম্মিলনী তাঁহার জোড়াসাঁকো-স্থিত ভবনে তাঁর জন্মোৎসবের আয়োজন করেন। কবির ইউরোপ যাত্রার প্রাক্‌কালে তাঁহাতে ভক্তি ও প্রীতিমান্ সকলকে তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার কথা শুনিবার ও তাঁহাকে প্রণাম করিবার সুযোগ দিয়া সম্মিলনী তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছিল, যদিচ শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে ও কবির জীবনের নানা স্মৃতির সহিত জড়িত নানা পদার্থের মধ্যে তাঁহার জন্মোৎসবের যে-বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয়, কলিকাতায় তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। বহুসংখ্যক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে বিদেশীও কয়েক জন ছিলেন। উৎসব প্রাচীন

ভারতীয় রীতিতে শঙ্খধ্বনি বেদগান স্বস্তিবাচন অর্ঘ্যাভিহরণ তুলাদান প্রশস্তিপাঠ ও শান্তিপাঠ সহকারে নিষ্পন্ন হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী পৌরোহিত্য করেন। অনেকগুলি গান গীত হইয়াছিল। তুলাদান কবির উপযুক্ত ভাবে হইয়াছিল। তুলাদণ্ডে তাঁহার নিজের পরিমাণ স্বলিখিত পুস্তক তৌল করিয়া যোগ্য পাত্রে তাহার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কবি স্বয়ং কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন এবং মৌখিক কিছু বলেন।

আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি, এবং তাঁহার সমুদয় শুভ চেষ্টা ফলবতী হউক, এই প্রার্থনা করিতেছি।

—

অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু

প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল জন্মভূমি হইতে প্রবাসে কাটাইয়া অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্র বসু অল্প দিনের জন্য দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। প্রকাশ যে, ভারতে তিনি মাত্র ছয় মাস বাস করিবেন এবং এই সময়ে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবেন না, এই মর্ম্মে তাঁহাকে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য বৃটিশ তরফ হইতে করা হইয়াছে। এইরূপ অন্যায় ও সভ্যতাবিরুদ্ধ কার্য্যের বিশেষ প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে বসু মহাশয়কে দেশে আসিতেই দেওয়া হয় নাই। এবার যদি বা সে অনুমতি দেওয়া হইল, তাহাও অবমাননার ভাবে। এ অপমান অবশ্য বসু মহাশয়ের গায়ে লাগিবে না। অপমানকারীর উপরেই ইহার কলঙ্ক সম্পূর্ণ পড়িবে।
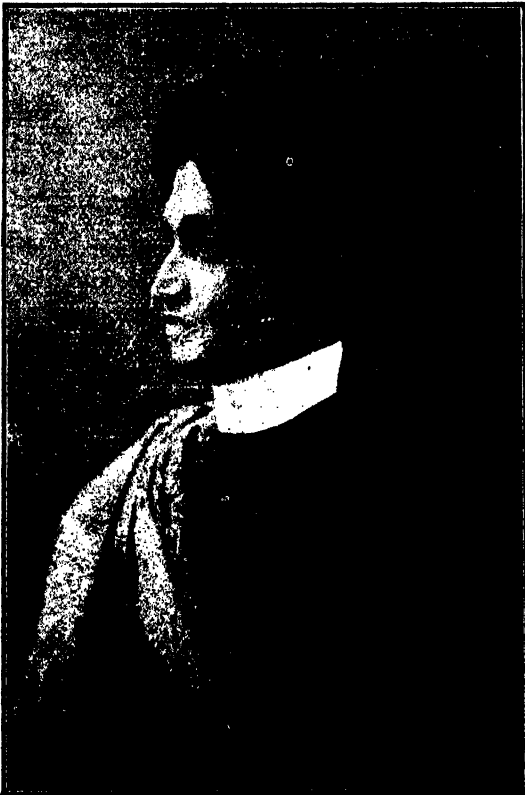
অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু

—

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ

বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগকে সাহায্য দিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও বেসরকারী লোকদের একটি কমিটি সর্ব্বাগ্রে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই কমিটিকে যাঁহারা টাকা-কড়ি দিতে চান, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, বাঁকুড়া, ঠিকানায় তাহা পাঠাইবেন। রামকৃষ্ণ মিশনও কাজ করিতেছেন; ঠিকানা,, বাগবাজার, কলিকাতা।

বাঁকুড়া জেলার ধুলুই (সোনামুখী) গ্রামের দুর্ভিক্ষগ্রস্ত নর-নারী
(বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্ত্তৃক গৃহীত ছবি)

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ আর একটি সাহায্য-কমিটির পক্ষ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন; তাঁহার ঠিকানা ১নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা। বাঁকুড়া-সম্মিলনীও একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রাহা (পোষ্টমাষ্টার জেনার‍্যাল) ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনার‍্যাল) এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই কমিটিকে যাঁহারা টাকাকড়ি দিতে চান, তাঁহারা সভাপতির নামে ২১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় তাহা পাঠাইবেন। যাঁহারা তথায় মনি অর্ডারে টাকা পাঠাইবেন তাঁহাদিগকে আলাদা রসীদ দিবার দরকার নাই; হাতে পাঠাইলে মুদ্রিত রসীদ দেওয়া হইবে।
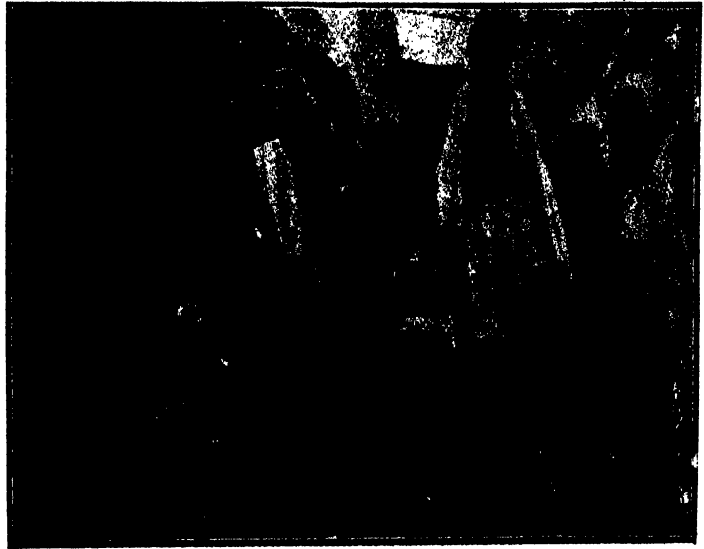
বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামের একদল দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নর-নারী
(বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্ত্তৃক গৃহীত ছবি)

বাঁকুড়া জেলার পথন্না-পলাশডাঙ্গা গ্রামের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নর-নারী
(বাঁকুড়া সম্মিলনী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ছবি)

কমিটিগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাজ করিতেছেন। সর্ব্বত্রই টাকার প্রয়োজন। বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত ভিক্ষাপত্রের কিয়দংশ অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার পর লেখা হইয়াছে—

"The smallness of the harvest affects not only the rayats and petty landholders but also the labouring class. Many of the rayats have to resort to manual labour, and thus the number of men wanting work is greatly increased, but the amount of labour available is less than usual. These two classes are therefore faced with the certainty of great distress, which will become more and more acute until the next harvest is gathered in."

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেছেন, যে, অজন্মাতে শ্রমিক শ্রেণী, রায়ৎ ও সামান্য আয়ের ভূস্বামীদের অন্নকষ্ট হইয়াছে; রায়ৎদের অনেকেও মজুরের কাজ খুঁজিতে বাধ্য হইতেছে, কিন্তু অত লোকের পক্ষে যথেষ্ট কাজ নাই; কয়েক মাস পরে বর্ত্তমান বৎসরের ফসল সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্নকষ্ট বাড়িয়াই চলিবে। তিনি সম্প্রতি প্রকাশিত

বর্ণনাপত্রে জানাইয়াছেন, যে, অন্নকষ্টে আরও বাড়িয়াছে।

এবৎসর যে জেলার সর্ব্বত্র যথেষ্ট ফসল নিশ্চয়ই হইবে তাহা বলা যায় না।

—

বীরভূমে দুর্ভিক্ষ

বীরভূম জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে মানুষের যত রকম কষ্ট ও দুর্গতি হয়, তাহা হইতেছে। কয়েকটি কেন্দ্র হইতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। তাহার মধ্যে বোলপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কমিটি সাহায্য করিতেছেন। টাকাকড়ি, চাউল ও কাপড় পাঠাইবার ঠিকানা—অধ্যাপক জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ এই কমিটির হাতে এক হাজার টাকা দিয়াছেন।

বীরভূমে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোক

—

আচার্য্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের জন্মদিন

আমেরিকার ধর্ম্মাচার্য্য জে, টি, সাণ্ডার্ল্যাণ্ড মহাশয় দুই বার ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া নিজের চোখে দেশটি দেখিয়া, নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিয়া, ইহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ভারতবর্ষের অনেকগুলি কাগজ নিয়মিতরূপে পাঠ করেন। ভারতবর্ষের হিতার্থ আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের নানা কাজের সহিত তাঁহার যোগ আছে। তিনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বহি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহা কয়েক মাসের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। তাহার অল্প কয়েকটি অধ্যায় মডার্ণ রিভিউ কাগজে ছাপ হইয়াছে। পরে সমগ্র পুস্তকটির বাংলা অনুবাদও হয় ত ছাপা হইবে। ইনি ধর্ম্মবিশ্বাসে ইউনিটেরিয়ান্ অর্থাৎ একেশ্বরবাদী। ইনি ভারতবর্ষের জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, তাহা ছাড়া স্বদেশের জন্যও পরিশ্রম করেন। যাঁহারা তাঁহার বয়সের বিষয় অবগত নহেন, তাঁহারা শুধু এই পরিশ্রম হইতে তাঁহাকে যুবা পুরুষ মনে করিতে পারেন। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার বয়স ৮৭ (সাতাশি) বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। গত এপ্রেল মাসে আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ একটি ভোজ দিবার কথা ছিল। তাহা এতদিনে হইয়া গিয়া থাকিবে। আমরাও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

—

লীগে ভারতের প্রধান প্রতিনিধি

জেনিভায় লীগ অব্ নেশ্যন্সের প্রতি বৎসর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে উহার সভ্য প্রায় ষাটটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন। ভারতবর্ষও উহার সভ্য বলিয়া তাহারও প্রতিনিধি সেখানে প্রেরিত হয়। অন্য যত দেশ উহার সভ্য, তাহাদের অধিকাংশ সম্পূর্ণ স্বাধীন; কানাডা প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত যে-যে দেশ উহার সভ্য তাহারা কার্য্যতঃ স্বাধীন। এইজন্য এই সকল দেশের অধিবাসীদের

ইচ্ছা এক রকম, গবন্মেণ্টের ইচ্ছা অন্য রকম, অবস্থা এরূপ নহে। সেই কারণে এইসব দেশের প্রতিনিধি মনোনয়ন গবন্মেণ্টের দ্বারা হইলেও তাহা তাহাদের অধিবাসীদিগের দ্বারা নির্ব্বাচনেরই সমান। ভারতবর্ষ নামে আত্মশাসক নহে, কাজেও আত্মশাসক নহে। সুতরাং ভারত গবন্মেণ্টের দ্বারা প্রতিনিধি মনোনয়ন ভারতীয় লোকদের দ্বারা নির্ব্বাচনের সমান নহে।

ভারতবর্ষ লীগের সভ্য বলিয়া আমাদিগকে বার্ষিক সাত আট লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হয়। তা ছাড়া প্রতিনিধিদের খরচ দিতে হয়। অথচ এইসব ব্যয়ের বিনিময়ে সুবি া যাহা হয়, তাহার সবটাই প্রায় ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের, আমাদের নহে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধিরা লীগে প্রতিনিধি মনোনয়ন সম্বন্ধে দু রকম ব্যবস্থা চাহিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভা কতকগুলি ভারতীয়ের নাম বাছিয়া দিবেন, গবন্মেণ্ট তাঁহাদের মধ্য হইতে যাঁহাকে যাঁহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিবেন, ইহা হইল একটি অভিলাষ। তাহা পূর্ণ হয় নাই। দ্বিতীয় অভিলাষ, লীগে প্রেরিত প্রতিনিধিদের সর্দ্দার হইবেন একজন ভারতীয়। ইহাও পূর্ণ হয় নাই। গবন্মেণ্ট বলেন, যিনি সর্দ্দার হইবেন, তাঁহার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জাগতিক বা পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই; এইজন্য তাঁহারা সর্দ্দার মনোনয়নে ভারতীয়কেই নিযুক্ত করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম দ্বারা তাঁহাদের স্বাধীনতার হ্রাস ইচ্ছা করেন না। ওয়ার্লড্ পলিটিক্স বা বিশ্বরাজনীতি ভারতীয় কোন লোকই জানেন না বা বুঝেন না, এমন নয়। এ পর্য্যন্ত যে-কয়জন ইংরেজ ভারত-প্রতিনিধিদের সর্দ্দারী করিয়াছেন, তাঁহাদের চেয়ে অধিক রাজনৈতিক জ্ঞানবিশিষ্ট লোক ভারতীয়দের মধ্যে আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও মনোনয়ন না করার কারণ তাঁহাদের অযোগ্যতা নহে। প্রকৃত কথা এই, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ ও ভারতের স্বার্থে অনেক বিষয়ে বিরোধ আছে; ভারতের ক্ষতি বা অনিষ্ট না করিয়া, অন্ততঃ ভারতের মঙ্গলের দিকে না চাহিয়া কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা না করিলে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ রক্ষিত হয় না। এইজন্য ভারতবর্ষকে তাহার নিজের সাধারণ প্রতিনিধিগণ ও সর্দ্দার প্রতিনিধি মনোনীত করিতে দেওয়া হয় না; কেন না, যাঁহারা সত্য সত্যই ভারতের প্রতিনিধি তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ভারতের মঙ্গল-চেষ্টা করিবেন, কেবল মাত্র বা প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিবেন না।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া অনেক দিন হইতে ভারতীয়দিগের ধারণা হইয়াছে, যে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষের ব্যয়ে নিজের একটি ভোট বাড়াইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে; অধিকন্তু প্রত্যেক বৎসর একজন ইংরেজকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সর্দ্দার নির্ব্বাচন করিয়া জগতের নিকট ঘোষণা করিতেছে, যে, ভারতবর্ষ পরাধীন, ভারতবর্ষে প্রতিনিধিদের সর্দ্দারী করিবার যোগ্য লোক নাই। এই প্রকারে ভারতবর্ষ অর্থের বিনিময়ে অপমান, অবজ্ঞা, ক্ষতি ও অনিষ্ট ক্রয় করিতেছে।

—

ভারতবর্ষে আর ছুর্ভিক্ষ হয় না!!

ভারত গবন্মেণ্টের একজন মোটা মাহিনার কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাকে বলা হয় ডিরেক্টর অব পব্লিক ইনফর্মেশুন, অর্থাৎ সার্ব্বজনিক বিষয়ে যিনি সরকারী খবরাখবর জোগাইয়া থাকেন। তিনি প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বহি বাহির করেন। এখন মিঃ কোটম্যান নামক এক ব্যক্তি এই কাজ করেন। তিনি সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯২৬-২৭ সালের বহিতে লিখিতেছেন:—

"Fortunately, one of the grimmest of the spectres, which formerly dogged the Indian agriculturist's footsteps, has now been laid. Famine is no longer the dread menace it used to be—... Even the well-marked areas of constant drought are now secure against famine by reason of the extension of well and canal irrigation and facilities for the use of river-bed moisture."—*India in 1926-27*, page 114

লেখক বলিতেছেন, দুর্ভিক্ষের ভূতকে মন্ত্রমুগ্ধ করা হইয়া গিয়াছে, সে আর কৃষিজীবীদিগকে বিপন্ন করিতে পারে না! অথচ আমরা ত দেখিতেছি, প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষের কোথাও-না-কোথাও দুর্ভিক্ষ হইতেছে। অন্নাভাবে স্ত্রী ও

সন্তান বিক্রয়, সন্তান পরিত্যাগ বা কূপে নিক্ষেপ, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ, এ সব এখনও ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের কোথাও কোথাও ঘটে। সম্প্রতি দিনাজপুর জেলায় ইহা ঘটিয়াছে।

লেখক আরও বলিতেছেন, যে, যে-সব জায়গা অনাবৃষ্টির মুলুক বলিয়া জ্ঞাত, সেখানেও কূপাদি হইতে জলসেচনের বন্দোবস্ত থাকায় আর দুর্ভিক্ষ হয় না। বাঁকুড়া এমন একটি জেলা যেখানে যথা সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ হয়, কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর হইয়া আসিতেছে। এ বৎসরও হইয়াছে। তথাকার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যার্থ ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত একটি ভিক্ষাপত্রে লিখিত হইয়াছে :—

"The rainfall last year was deficient, especially at the times when it was most needed for the planting and subsequent growth of the paddy crop, which forms the mainstay of life to a great majority of the population of this District. Investigation has shown that over large areas either no paddy could be planted at all or the crop planted was only a miserable fraction of the normal yield."

কৃত্রিম উপায়ে জল সেচনের যদি যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলে কি এরূপ অজন্মা হইতে পারিত ?

—

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

এবার বঙ্গের নানা জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দিনাজপুর, যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার কোন-না-কোন স্থানে বা সর্ব্বত্র লোকের অন্নাভাব ঘটিয়াছে। এই সব জেলার মাটি এক রকমের নয়। সম্বৎসর যে-সব নদীতে জল থাকে, এরূপ নদী দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানগুলির কোথাও আছে, কোথাও নাই। এইজন্য দুর্ভিক্ষের কারণ সব জায়গায় এক নয়। কারণ যাহাই হউক, যাহাতে অন্নাভাবে কোথাও কাহারও প্রাণ না যায় সেরূপ চেষ্টা সর্ব্বত্র হওয়া চাই। অন্নাভাবে অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া যদি উদরের পীড়ায় মানুষ মারা যায়, তাহা সরকারী অভিধান অনুসারে অন্নাভাবে মৃত্যু না হইলেও বস্তুতঃ বটে। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানগুলিতে সচরাচর অন্নদান, পানীয় জলদান, বস্ত্রদান ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হয় অনেক স্থানেই দরিদ্র পরিবারের, কোথাও কোথাও মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা কাপড়ের অভাবে সাহায্য লাভের চেষ্টায় বাড়ীর বাহিরে আসিতে পারেন না।

—

সকল দলের খসড়া স্বরাজ-আইন

ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দল মিলিয়া, ভারতীয় স্বরাজ কিরূপ হইবে, তাহার একটি খসড়া আইন তৈরী করিতেছেন। তাহার জন্য সকল দলের কন্‌ফারেন্স একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে যাহা করিয়াছেন, তাহার একটি রিপোর্ট বাহির করিয়া ১লা মের মধ্যে তৎসম্বন্ধে যাঁহার যাহা বক্তব্য সম্পাদককে জানাইতে লিখিয়াছিলেন। তদনুসারে আমরা মে মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে কিছু লিখিয়া তাহা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। এমাসে প্রবাসীতে রিপোর্টটির আলোচনা না করিবার কারণ দুটি—প্রথমতঃ ১লা মে তারিখ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ কমিটিতে বাংলা দেশের প্রতিনিধি একজনও নাই, সুতরাং বাংলায় কিছু লেখা পণ্ডশ্রম। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বাঙ্গালীর কন্যা, কমিটিতে আছেন; কিন্তু তিনি বঙ্গের প্রতিনিধি নহেন, হইতে পারেন না, এবং বাংলা পড়িতে পারেন না।

বাংলা দেশকে যথাসম্ভব বাদ দিয়া কাজ করা "নিখিল-ভারতীয়" নানা ব্যাপারের কর্তৃপক্ষের একটা ফ্যাশন দাঁড়াইয়া যাইতেছে। সুতরাং আলোচ্য কমিটি হইতে বাংলাদেশ বাদ পড়া গুরুতর ব্যাপার না-ও হইতে পারে। কিন্তু উহা হইতে বাংলা ছাড়া আরও অনেক অঞ্চল বাদ পড়িয়াছে। সেইজন্য বিষয়টির একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

স্বরাজে ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষের সহিত দেশী রাজ্যগুলির কিরূপ সম্বন্ধ হইবে, তাহারা কিরূপে একত্র সম্বদ্ধ হইবে, তাহা কমিটির একটি আলোচ্য বিষয়। তাঁহারা আলোচনা করিয়া একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেনও। অথচ দেখা যাইতেছে, যে, কমিটির বাইশ জন সভ্যের মধ্যে একজনও কোন দেশী রাজ্যের প্রতিনিধি নহেন।

সমগ্র ভারতবর্ষ ১৮,০৫,৩৩২ বর্গ মাইল পরিমিত। তন্মধ্যে ১০,৯৪,৩০০ বর্গমাইল ইংরেজ-অধিকৃত ; ৭,১১,০৩২ বর্গমাইল দেশী রাজ্য। সমগ্রভারতের লোকসংখ্যা ৩১,৮১,২৮,৭২১। তাহার মধ্যে ২৪,৬৯,৬০,২০০ ইংরেজ রাজ্যে বাস করে, ৬,৯১,৬৮,৫২১ দেশী রাজ্যের প্রজা। অতএব দেশী রাজ্যগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় নগণ্য নহে। কিন্তু যাঁহারা সমগ্রভারতের জন্ত বিধির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছেন, দেশী রাজ্যগুলিরও আংশিক রূপে ভাগ্য-বিধাতা হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে দেশী রাজ্যের প্রতিনিধি একজনও নাই। তাহার পর ইংরেজ-অধিকৃত কোন্ প্রদেশের প্রতিনিধি কয় জন দেখা যাক্। দুজন দিল্লীর, পাঁচজন-আগ্রা অযোধ্যার, চারিজন মান্দ্রাজের, ছয় জন বোম্বাইয়ের, চারিজন পঞ্জাবের, এবং একজন আজমীরের। আসাম, উৎকল, বালুচিস্থান, বাংলা, ব্রহ্মদেশ, বিহার, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, কূর্গ, ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোন প্রতিনিধি কমিটিতে নাই। এই প্রতিনিধিহীন প্রদেশগুলির মোট লোকসংখ্যা ১১,৮২,২১,-৬৪০। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে ২৪,৬৯,-৬০,২০০ লোক বাস করে। তাহারও প্রায় অর্দ্ধেক লোকের কোন প্রতিনিধি কমিটিতে নাই। দেশী রাজ্যগুলির ত নাই ই। কমিটি গণতান্ত্রিক স্বরাজবিধির মুসাবিদা করিবেন, কিন্তু উহা গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত নহে।

এরূপ কথা উঠিতে পারে, যে, কমিটিতে যে বাইশ জন সভ্য আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট কাজের এমন যোগ্য, যে, তাঁহাদের সমকক্ষ লোক উক্ত ১১ ৮২ ২১,৬৪০ জন মানুষের মধ্যে নাই, দেশী রাজ্যে ত নাই-ই। আছে বলা যেমন কঠিন, নাই বলাও তেমনি কঠিন। আমরা নীচে সভ্যদের নাম দিতেছি। পাঠকেরা স্থির করিবেন, ইঁহাদের একজনেরও সমকক্ষ বা অধিক যোগ্য লোক প্রতিনিধিহীন প্রদেশগুলির স্বরাজ্যদল, পারস্পরিক সহযোগীর দল, উদারনৈতিক দল ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের মধ্যে আছেন কি না। ডাক্তার আন্সারী, মদনমোহন মালবীয়, এস্ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রী বিজয়রাঘবাচারিয়ার, ডাক্তার এনী বেশাণ্ট, এম্ এ জিন্না, লাজপৎ রায়, এম্ আর জয়াকর, মোতিলাল নেহরু, এন সী কেলকার, মোহম্মদ আলী, তেজ বাহাদুর সপ্রু, সরোজিনী নাইডু, এম্ এম্ জোষী, রাজা গজনফর আলী, হৃদয় নাথ কুঞ্জরু, মিঃ পথিক, দেওয়ান চমন লাল, জবাহরলাল নেহরু, শুয়েব কুরেশী, সর্দার শার্দুল সিং কবীশ্বর, শিব রাও।

প্রতিনিধিহীন প্রদেশগুলি হইতে মনোনীত হইয়াও কেহই কমিটিতে কাজ করিতে চান নাই বা পারেন নাই, ইহাও একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু আমরা এরূপ কোন সংবাদ জানি না।

বাংলা দেশের কোন রাজনৈতিক দলকেই বাংলার বাহিরের সেই সেই দলের লোকেরা কেন সমগ্রভারতীয় ব্যাপারে আমল দিতে চায় না, তাহার কারণ বঙ্গের সেই সব দলের লোকেরা ভাবিলে হয়ত স্থির করিতে পারিবেন। যোগ্যতার অভাব, নিজের দলেরই মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, সকল দেশের ও কালের রাজনীতির মূল বিষয়গুলির অধ্যয়ন ও অনুশীলনের অভাব, বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে গভীর চিন্তা ও অধ্যয়নাদির অভাব, ইত্যাদি নানা কারণ থাকিতে পারে। বাঙালীর ও বাংলা দেশের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব এবং বাঙালীর প্রতি অবজ্ঞা বা অবজ্ঞার ভাণও বঙ্গের বাহিরে থাকিতে পারে, এবং তাহার জন্যও বাঙালী বাদ পড়িতে পারে।

কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে কমিটির জন্য আমরা প্রবাসীতে কিছু লিখিব না। কিন্তু বাঙালীদের জন্ত একটি কথা লিখিতেছি। রাষ্ট্রীয় কোন্ কোন্ বিষয় ভারতগবর্মেণ্টের এবং কোন্ কোন্ বিষয় প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হইবে, কমিটি তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কিন্তু সমগ্র ভারতে যত রকমের যত রাজস্ব আদায় হয়, তাহার ভাগ ভারত গবর্মেণ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের মধ্যে কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু ন্যায্য ভাবে রাজার ভাগও চাই ; নতুবা যে-যে বিষয়ের প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের উপর পড়িবে, তাহার কাজ যথোচিত হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিক্ষা যদি প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে যে প্রদেশের

লোকসংখ্যা যত বেশী, শিক্ষার জন্ত তাহার তত বেশী টাকা চাই। বর্ত্তমানে রাজস্বের ভাগ যে প্রণালীতে হয়, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশে ১৯ নিযুত লোকের জন্ত প্রায় যোল কোটি টাকা পায়, বাংলা ৪৭ নিযুত লোকের জন্ত প্রায় এগার কোটি টাকা পায়! এই কারণে বাংলা দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য—কোন বিভাগের জন্তই অন্ত অনেক প্রদেশের সমান টাকা খরচ করিতে পাওয়া যায় না, যদিও সকলের চেয়ে বেশী পাওয়া উচিত, কারণ বঙ্গের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী।

বঙ্গের বাহিরের লোকদের বঙ্গের প্রতি এক প্রকার প্রেম আছে, তাহা খেজুর গাছের প্রতি সিউলির অনুরাগের মত। অর্থাৎ অবাঙালী যে-যত পারে, বঙ্গভূমির রস শোষণ করিতে চায় ও করে। ইহার জন্ত আমরা অবাঙালীদিগকে দোষ দি না। তোমরা যদি নিজের মাতৃভূমির ঐশ্বর্য্য আহরণ করিতে না পার, অন্তে ত করিবেই। আমরা তাহাদিগকে দোষ দি না। বরং বাঙালীদিগকে বলি, অন্তেরা দূর হইতে বঙ্গে আসিয়া কেমন করিয়া বিত্তশালী হয়, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে চেষ্টা কর, তাহা অধ্যয়ন কর, পরিশ্রমী হও, উদ্যোগী হও, সাহসী হও। আমরা বঙ্গের বাহিরের লোকদের যেরূপ বঙ্গপ্রীতির কথা বলিলাম, তাহা ছাড়া অন্ত কোন রকম প্রীতির আশা যেন না করি। বঙ্গের প্রতি অবিচার দূর করিবার জন্ত, বঙ্গের ন্যায্য পাওনা বঙ্গকে দেওয়াইবার জন্ত চেষ্টা বঙ্গের বাহিরের লোকেরা করিবে, অন্ততঃ সে বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিবে, এ দুরাশা আমরা যেন না করি। বাংলার দুঃখ-মোচন আমাদিগকেই করিতে হইবে। অপরে যদি আমাদের চেষ্টার সহায় হন, সেটা তাঁহাদের সদাশয়তা।

—

বাঙালী কে?

ঐতিহ্য আছে, যে, বঙ্গের অনেক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা কালক্রমে বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ঐতিহাসিক সত্য, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়াও অন্ত একটি প্রমাণ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, যে, যাঁহারা বংশতঃ বাঙালী ছিলেন না, এমন অনেক লোক এখন পূর্ণ মাত্রায় বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশে এখন অনেক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাদের আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ঘর বাড়ী নাই, কোথায় ছিল তাহা যাঁহারা জানেন না, যাঁহারা হিন্দী বলিতে পড়িতে পারেন না, বাংলা যাঁহাদের মাতৃভাষা। এইরূপ লোকেদের মধ্যে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নাম সব বাঙালী জানেন। অপ্রসিদ্ধ এইরূপ বিস্তর লোক আছেন।

বঙ্গের বাহির হইতে আগত যে-সব ভারতীয় লোক এখন সপরিবারে বঙ্গে বাস ও বিষয়কর্ম্ম করেন, হয় ত দু-তিন পুরুষ বাস করিতেছেন, "দেশে" কখনও কচিৎ যান, বাংলা জানেন, বলিতে পারেন, তাঁহারা নিজেরা বা বাঙালীরা যাহাই মনে করুন, তাঁহারাও বাঙালী। এইরূপ মাড়োয়ারী আছেন। তাঁহারা কেহ কেহ বাংলা দেশের জন্ত সময় শক্তি ও অর্থ ব্যয়ও করেন।

—

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় গ্রীষ্মের ছুটির পর আষাঢ়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে খুলিবে। উপযুক্ত ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে দশ, সাত ও পাঁচ টাকার কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। প্রার্থীরা সার্টিফিকেট সহ কলিকাতায় ১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে কর্ম্মসচিবের নিকট দরখাস্ত করিবেন।

ছাত্রছাত্রীদের খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ উকীল সে বিষয়ে একটি বিজ্ঞানসম্মত তালিকা দিয়াছেন। তদনুসারে, যে-সব ছাত্রছাত্রী আমিষ দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত বা যাহাদের তাহাতে আপত্তি নাই, তাহাদের জন্ত আমিষ খাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—

ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনী

হিন্দু মহাসভা "হিন্দু" শব্দটির যে ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে ভারতবর্ষে উদ্ভূত যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী

লোক নিজেকে হিন্দু মনে করিতে পারেন, এবং হিন্দু মহাসভার ও প্রাদেশিক যে-কোন হিন্দু সভার সভ্য ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। অন্ত ভারতীয় ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় ব্রাহ্মেরাও হিন্দু সভার সভ্য হইতে পারেন। অনেক ব্রাহ্ম বরাবর আপনাদিগকে হিন্দু মনে করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু কথাটির প্রচলিত অর্থ অনুসারে যাঁহারা হিন্দু, তাঁহারা মূর্ত্তির পূজা বা মূর্ত্তির সাহায্যে পূজা করেন বটে; কিন্তু হিন্দুবংশোদ্ভূত যে-সব লোক তাহা করেন না, উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারাও হিন্দুনামে অভিহিত হইতে পারেন। বস্তুতঃ, ঐতিহাসিক সত্যের দিক্ দিয়া বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, যে, হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে মূর্ত্তির সাহায্যে পূজা অপেক্ষাকৃত আধুনিক রীতি, মোটামুটি একহাজার বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। তাহার পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত অন্যবিধ রীতিই প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, ইহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য নহে।

ময়মনসিংহের হিন্দু সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে পত্র দ্বারা এবং পরে মৌখিক নিমন্ত্রণ ও অনুরোধ আমি পাই। বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটির সভ্যও মনোনীত হইয়াছিলাম। তথাপি নানা কারণে সম্মিলনীতে যোগ দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, যদি কোন ব্যক্তি মহাসভার সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুপদবাচ্য হয় এবং নিজের ধর্ম্মমত বিশ্বাস ও আচার বিন্দুমাত্রও গোপন বা পরিবর্ত্তন না-করা সত্ত্বেও অন্যতম সেবক বলিয়া কাজ করিতে আহূত হয়, তাহা হইলেও সে যদি সম্মিলনীতে যোগ দিতে না চায়, তাহাও ত এক প্রকার পার্থক্যাভিমান বিবেচিত হইতে পারে। এইজন্য সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য ময়মনসিংহ যাত্রা করিলাম। আরও একদিন আগে গেলে ঠিক্ হইত। বিলম্বে পৌঁছায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ও সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ শুনিতে পাই নাই। বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটিতেও গোড়া হইতে যোগ দিতে পারি নাই। যখন উপস্থিত হইলাম, তখনও বরাবর শ্রোতা থাকিবারই ইচ্ছা ছিল। তাহাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন বিষয়ের আলোচনায় যেরূপ তর্কবিতর্ক হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু কিছু বলা উচিত মনে হওয়ায়, সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে কিছু বলিয়াছিলাম। সে-সব কথা বিস্তারিত লিখিবার প্রয়োজন নাই। হিন্দু মহাসভা প্রধানতঃ রাজনৈতিক সভা নহে, কিন্তু যদি অন্য কোন সভাসমিতির কোন প্রস্তাব, সংকল্প বা কার্য্য দ্বারা হিন্দুসমাজের ক্ষতি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তখন রাজনৈতিক বিষয়েও তাহার মত প্রকাশ করা উচিত। আমার এই ধারণা অনুসারে কোন কোন তর্কবিতর্কে যোগ দিয়াছিলাম। সমগ্রভারতীয় সর্ব্বসাম্প্রদায়িক কোন রাজনৈতিক সভা সমিতি এ পর্য্যন্ত সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে চান নাই। সুতরাং কোন প্রাদেশিক হিন্দু সভার পক্ষে সাইমন কমিশন বর্জ্জন করিবার সংকল্প করা অনাবশ্যক বোধে আমি ঐরূপ প্রস্তাব সম্মিলনীতে পেশ্ ও আলোচনা করিবার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলাম। এই কমিশন বর্জ্জন করা যে সকল ভারতীয়ের কর্ত্তব্য, এই মত আমি আমার ইংরেজী বাংলা উভয় কাগজে বরাবর ব্যক্ত করিয়া আসিতেছি এবং তাহা অপরিবর্ত্তিত আছে।

সম্মিলনীর কাজ বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রতিনিধি ও শ্রোতার সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল। বহুসংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। চিক বা অন্য কোন রকম পর্দার আড়ালে তাঁহারা বসেন নাই। অল্পবয়স্ক লোকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে বলপ্রয়োগ হইয়াছিল, তাহা বেশী দূর গড়ায় নাই। সভাপতি মহাশয় নিজের পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গাম্ভীর্য্য ধীরতা ও নিরপেক্ষতার সহিত সভার কাজ চালাইয়াছিলেন।

আমি বিদ্যালয়সমূহে প্রবেশিকার মান পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। উত্তর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের একতার একটি কারণ ও নিদর্শন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তির উপর বর্ত্তমান সভ্যতা দাঁড়াইয়া আছে। গাছকে জমী হইতে আমূল উৎপাটিত করিলে যেমন গাছ বাঁচে না, বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতাকেও তেমনি প্রাচীন সভ্যতার সহিত সম্পর্কশূন্য করিলে উহা জীবনশূন্য হইবে, অন্ততঃ আবহমানকালের ভারতীয় সভ্যতা

বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে না। প্রাচীনের সহিত নবীন সভ্যতার যোগ রক্ষার উপায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান ব্যতীত অবলম্বিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধারণ ইতিহাস, ধর্মের সভ্যতার সাহিত্যের শিল্পের ইতিহাস, ভাল করিয়া জানিতে হইলে সংস্কৃত জানা চাই। ভারতীয় দর্শন সংস্কৃত না জানিলে ভাল করিয়া জানা যায় না। বাংলা ভাষার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বাংলার সুলেখক হইতে হইলে কিছু সংস্কৃত জানা চাই। যাঁহারা বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় এমন কিছু কিছু লিখিতে চান, যাহাতে নূতন শব্দ রচনার প্রয়োজন, তাঁহাদের সংস্কৃত না জানিলে মুস্কিলে পড়িতে হয়। এইরূপ নানা কারণে আমি শুধু হিন্দুদের নয়, অন্য সব ভারতীয়েরও সংস্কৃত শিক্ষার সমর্থক। হিন্দু ছাত্রদিগকে উহা শিখিতে বাধ্য করিলে তাহারা ধর্ম্মমূলক কোন আপত্তি তুলিবে না, অন্যেরা অমূলক হইলেও তাহা তুলিতে পারে। এইজন্য ব্যাপক অর্থে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের উহা অবশ্য শিক্ষিতব্য করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শিখাইবার প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। উহা শিখিতে এখন যত কষ্ট হয় ও সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা সহজে ও কম সময়ে নিশ্চয়ই উহা শিখা যায়।

—

মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহের অভিভাষণ

ময়মনসিংহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মিলনীর অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন সুসঙ্গের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের মহারাজা শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা। তাঁহার অভিভাষণে ময়মনসিংহ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা ছিল এবং ময়মনসিংহের (ও বাংলার অন্য অনেক জেলার) কতকগুলি সামাজিক সমস্যার উল্লেখ ছিল। তিনি তাঁহার জেলা যাঁহাদের মাতৃভূমি বলিয়া সগৌরবে উল্লেখ করেন, তাঁহারা "সাধক পূর্ণানন্দ অথবা কৃষ্ণানন্দ", "সর্ব্বজনাদৃত আনন্দমোহন", এবং "বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত।" এই আনন্দমোহনের কীর্ত্তি সিটি কলেজ ধ্বংস করা অনেকের মতে হিন্দুত্বের অন্যতম প্রমাণ।

মহারাজের মতে "বর্জ্জন ও গ্রহণ, সঙ্কোচ ও প্রসারণ প্রয়োজনানুরোধে সনাতনী সমাজেও স্মরণাতীতকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।" তাঁহার জেলার মালি, ধোপা, গোপ, কুমার, মুচি, নমদাস, পাটনী, তেলি ও তিয়র জাতির লোকসংখ্যা কমিয়াছে বলিয়া তাঁহার অভিভাষণে দেখিতে পাই। অন্য কোন কোন জেলাতেও কোন কোন জাতির লোক এইরূপ কমিতেছে। ইহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকার উপায় অবলম্বন হিন্দুসভার কর্ত্তব্য।

"ময়মনসিংহের পল্লীগীতিকা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে, ময়মনসিংহের হিন্দু ও মুসলমান এই দেশের সন্তানবোধে পরস্পর সুখে শান্তিতে বাস করিত, আমোদ আহ্লাদ ও শান্তিতে ধর্ম্মময় জীবন যাপন করিত।"

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "এই অসদ্ভাবের বীজ ধ্বংস করিতেই হইবে।" ময়মনসিংহের প্রাচীন মুসলমান জমীদারগণ যে হিন্দুর ধর্ম্মভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাহার তিনি উল্লেখ করেন।

"আমাদের বিশ্বাস, ধর্ম্মগত আন্দোলন রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া না লইলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের হলাহলে দেশ জর্জ্জরিত হইয়া উৎসন্ন যাইত না।"

অভিভাষণের শেষে তিনি যে-সব সমস্যার উল্লেখ করেন তন্মধ্যে একটি—

সমাজে ধর্ষিতা নারীর যাহাতে স্থান হয় এবং পশুপ্রকৃতি দুর্বৃত্তগণের অবৈধ বল-প্রয়োগে লাঞ্ছিতা নারীর স্বামী ও পিতৃকুলে স্থানলাভ হওয়ার উপায় কি? [এই ক্ষেত্রে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ময়মনসিংহ ভূস্বামীসভার প্রচেষ্টায় একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে এবং এই কার্য্যের জন্য সেরপুরের দানবীর শ্রীযুক্ত গোপালদাস, গৌরীপুরের ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর ও মুক্তাগাছার অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির দান উল্লেখযোগ্য।]

এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যাবশ্যক। ইহার কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

—

পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের অভিভাষণ

ময়মনসিংহ হিন্দু-সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের অভিভাষণ উৎকৃষ্ট ও সময়োচিত হইয়াছিল। হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে তিনি নিরাশ নহেন, পরন্তু আশান্বিত। তাহার কারণও তিনি পরোক্ষভাবে জানাইয়াছেন। তিনি ইতিহাস হইতে ও পুরাণ হইতে দেখাইয়াছেন, যে, শক, যবন, পারদ, পহ্লব, খশ, হূণ প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক জাতি হিন্দুজাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। "হিন্দু একবার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে সে আর হিন্দু হইতে পারে না,... এই ধারণা যে হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।"

বর্ণ-বহির্ভূত ম্লেচ্ছ প্রভৃতি মনুষ্যমাত্রকে হিন্দু মহাজাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যে আমাদের মধ্যে নূতন নহে, ভারতে যবন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বকাল হইতেই যে হিন্দু নিঃসঙ্কোচে এইভাবে বিরাট হিন্দুজাতি গঠনে ব্যাপৃত ছিল, তাহার রাশি রাশি প্রমাণ আমরা পুরাণ শাস্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই।

শ্রীজীব গোস্বামী কৃত ষট্‌সন্দর্ভে ধৃত তত্ত্বসাগর গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

আমরা মনে যাহা ভাবি মুখে তাহা বলিতে সাহস করি না, মুখে যাহা বলি অন্তরে তাহা বিশ্বাস করি না, ইহারই নাম হইল আত্মবঞ্চনা। আত্মবঞ্চিত জাতি কখনও এজগতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

সেইজন্য আমার মনে হয় আমাদিগের মধ্যে তথাকথিত নীচজাতির শুদ্ধি অপেক্ষা উচ্চজাতি শুদ্ধি সর্ব্বপ্রথমেই আবশ্যক। তাই আমি বলি হিন্দুসভার ভারতব্যাপী শুদ্ধি আন্দোলন অগ্রে নীচজাতির জন্য না হইয়া উচ্চ উচ্চতর জাতির জন্য যাহাতে হয় সর্ব্বাগ্রে তাহারই জন্য চেষ্টা করা উচিত।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হিন্দুসমাজের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য আমাদিগের ধর্ম্মের যাহা বাহ্য আকার অন্যূন অতীত সহস্র বর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্রানুসারে তাহার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। এরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বে আমরা যে করিয়াছি, তাহার প্রভূত প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রেই পাওয়া যায়।

স্বজাতি রক্ষার জন্য, স্বজাতির মঙ্গলের জন্য আবশ্যক হইলে মহর্ষিগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক।

তাই পুরাণ কর্ত্তা ঋষিই আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন— "সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ।"

মনুষ্য সমাজ ঢালাই করা লোহার ফ্রেম নহে যে তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। মানুষ যেমন জীবিত, তাহার সমাজও সেইরূপ জীবিত, জীবনের স্থিতি উন্নতি ও প্রসার যেমন পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থার উপর ঐকান্তিক ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে, মনুষ্যসমাজের পক্ষেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। কালের পরিবর্ত্তন বশতঃ সুতরাং সকল সমাজকেই অতীত আকার পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহা না করিয়া কোনও মনুষ্যসমাজই এ সংসারে জীবিত থাকিতে পারে না। এই অবিসম্বাদিত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া আমরা যদি হিন্দুধর্ম্মের সেই বৈদিক যুগের বা স্মার্ত্ত যুগের আকারকে ধরিয়া রাখিতে চাই তাহা হইলে আমরা যে কিছুতেই মৃত্যুগ্রাস হইতে পারিব না ইহা যিনি এখনও দেখিতে পান নাই বা দেখিয়াও দেখিতে চাহেন না তাঁহার নিকট হইতে নব-জাগরণের আহ্বানে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ নব্যশিক্ষিত হিন্দুসমাজ কোনও উপকার পাইতে পারে একথায় এখন আর কেহই বিশ্বাস স্থাপন করে না, করিতে পারেও না।

কালপ্রভাবানুসারে ধর্ম্ম ও সমাজের রূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনের যুগে ধর্ম্মের বিধান অতিক্রম করিলে যে পাপ হয় না সুতরাং কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তেরও আবশ্যকতা একেবারেই নাই ইহা পরাশর সংহিতার ভাষ্য রচয়িতা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যুগানুসারে ধর্ম্মের বাহ্য আকার বদলাইতে হয়, আচারের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ইহা হিন্দুর পক্ষে নূতন কথা নহে। যুগযুগান্তর হইতেই এরূপ পরিবর্ত্তন হিন্দুসমাজে কতবার হইয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং আমাদিগকে আমাদিগের জাতির ও ধর্ম্মের স্থিতি, উন্নতি ও প্রসারের জন্য সময়োপযোগী আচার গ্রহণ ও পূর্ব্বকৃত আচারের পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহা স্থির।

হিন্দু বলিলে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী। বেদমার্গানুসারী আস্তিক-শিরোমণি ব্যক্তির ন্যায় বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম ও প্রার্থনা সমাজী প্রভৃতি সকলেই এই হিন্দু সভার বর্ণিত হিন্দু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই এতগুলি জাতের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করিবার গুরুতর ভার হিন্দু সভা যখন গ্রহণ করিয়াছে তখন হিন্দুসভার অন্তর্গত প্রত্যেক সমাজের উন্নতির জন্য অপক্ষপাতে হিন্দু মহাসভার চেষ্টা করিতেই হইবে ইহা স্থির।

ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন সমাজের হিন্দুমাত্রেরই মধ্যে যাহাতে একটা সহিষ্ণুতা ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি আদর ও গৌরববুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় তাহারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়।

হিন্দুসমাজের প্রকৃত বলই হইল এইসকল তথাকথিত অধঃপাতিত জাতিসমূহ।

তর্কভূষণ মহাশয় সাধারণভাবে হিন্দুদের গন্তব্য পথ ঠিকই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার ফল ভালই হইবে। হিন্দু ধর্ম্মের আকারের ও আচারের কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহার কতক আভাস হিন্দু সভার প্রস্তাব ও সংকল্পগুলি হইতে পাওয়া যায়। তর্কভূষণ মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান্ প্রাচীন পণ্ডিতবর্গ তাঁহাদের অনুমোদিত পরিবর্ত্তনগুলি একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিলে ও তদনুসারে আচরণের দৃষ্টান্ত দেখাইলে আরও অধিক সুফল হইবে।

—

সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতার ফল

দিল্লীতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ছয়জন যুবক পারদর্শিতা অনুসারে কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে একজনও বাঙালী নহে। ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের

পঞ্চমাংশ বাঙালী। অতএব অন্ততঃ একজন বাঙালীর এই ছয়জনের মধ্যে স্থান অধিকার করিতে পারা উচিত ছিল। যদি দেখিতাম ও জানিতাম, বাঙালীর ছেলেরা সরকারী চাকরী চায় না, অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতাম, সিভিল সার্ভিসে স্থান না-পাওয়ার কারণ তাহাদের ওরকম কাজ না-চাওয়া। কিন্তু যখন অল্প বেতনের সরকারী শিক্ষকতা ও লিপিকরতার জন্যও শত শত দরখাস্ত পড়ে, তখন বুঝিতে হইবে, বাঙালী যুবকরা সিভিলিয়ানও হইতে চা", কিন্তু তাহাদের শিক্ষা ভাল হইতেছে না বলিয়া প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়।

বঙ্গের স্বাস্থ্য

বঙ্গের সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের ১৯২৬ সালের রিপোর্ট সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্মমৃত্যুর হারের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বঙ্গে ঐ সালে জন্মের হার সব প্রদেশের চেয়ে কম (হাজার করা ২৭'৪) এবং মৃত্যুর হার (হাজার করা ২৪'৭) কেবল আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশের চেয়ে কম, অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বেশী। ফলে ঐ সালে বঙ্গে স্বাভাবিক লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার সব প্রদেশের চেয়ে কম দাঁড়াইয়াছে। তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

প্রদেশ	হাজার করা স্বাভাবিক বৃদ্ধিহার
মধ্যপ্রদেশসমূহ	১১'৭
বিহার উৎকল	১১'৬
মান্দ্রাজ	১০'৫
আগ্রা অযোধ্যা	৯'১
বোম্বাই	৮'৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৮'৫
আসাম	৭'৮
ব্রহ্মদেশ	৬'৭
পঞ্জাব	৫'১
বাংলা	২'৭

বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার স্বাভাবিক বৃদ্ধির ও হ্রাসের হারও রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে। ১৮টি জেলায় মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার বেশী, ৯টিতে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী। প্রথমে হাজারকরা বৃদ্ধির হার দিতেছি।

জেলা	হার	জেলা	হার
বাঁকুড়া	১৪'২	ময়মনসিংহ	৫'১
বীরভূম	১২'৬	মুর্শিদাবাদ	৪'০
নোয়াখালি	১১'৫	দার্জিলিং	৩'৬
ত্রিপুরা	৬'৪	ফরিদপুর	২'৬
চট্টগ্রাম	৬'৩	খুলনা	২'৫
ঢাকা	৬'১	জলপাইগুড়ি	২'৫
বর্দ্ধমান	৫'৭	বগুড়া	২'১
মেদিনীপুর	৫'৬	মালদহ	০'৯
বাখরগঞ্জ	৫'৬	হুগলী	০'৫

হাজার করা হ্রাসের হার

জেলা	হার	জেলা	হার
কলিকাতা	১৭'৮	হাবড়া	২'৫
যশোর	৫'০	দিনাজপুর	১'৬
রাজশাহী	৩'৪	পাবনা	০'৭
রংপুর	১'১	চব্বিশ-প্ররগণা	০'৩
নদীয়া	৩'৩		

সিটি কলেজ সম্বন্ধে দুএকটি-কথা

সিটি স্কুল ও কলেজটির জন্য কোন কোন হিন্দু ভদ্রলোক চাঁদা দিয়াছিলেন বলিয়া এখন এইরূপ কথা কেহ কেহ বলিতেছেন, যে, ব্রাহ্মেরা অন্যায়রূপে উহা আত্মসাৎ করিয়াছেন। চাঁদার একটি তালিকাও কাগজে বাহির হইয়াছে। উহা নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নহে। মোট এককালীন দান ৮৮৬৪৬ টাকার মধ্যে অর্দ্ধেকের অনেক অধিক টাকা ব্রাহ্মদের দান। সিটি স্কুল ও কলেজের জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান ও ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা চাঁদা দিয়াছিলেন, ইহা সত্য কথা। কিন্তু চাঁদাদাতাদের কাহারও ইহা অজ্ঞাত ছিল না, যে, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু ও প্রধান

কর্ম্মীরা ব্রাহ্ম এবং তাহা তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের অবিরোধী ভাবে চালিত হইবে। কেহ নিজের মত ও উদ্দেশ্য গোপন না করিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলে, তাহার নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থা করিবার অধিকার লুপ্ত হয় না। আলিগড় কলেজ সকল সম্প্রদায়ের নিকট চাঁদা লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উদ্যোক্তা মুসলমান ছিলেন ; কলেজটিও মুসলমান কলেজ আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরেও অনেক হিন্দু চাঁদা দিয়াছিলেন এবং অনেক হিন্দু তথায় উপাসনায় যোগ দেন। কিন্তু তথাপি উহাতে ব্রাহ্মদের মতের বিপরীত কোন কাজ হওয়া অবৈধ। যাহা হউক, এখন সিটি স্কুল ও কলেজের কথাই বলি। উহা প্রথমে স্কুল ছিল, পরে কলেজের শ্রেণী খোলা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ১৯১২ সালে প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (History of the Brahmo Samaj, Vol. ii, p. 133) লিখিত আছে :—

Another important step taken by some prominent members of the Samaj at the beginning of this year was the opening of a high class English institution called the City School. It was started with two objects, namely, first, to spread among the younger generation of that time the religious and moral influence of the Brahmo Samaj, and second, to get together and always to have by our side a number of earnest workers in the persons of the Brahmo teachers who would find employment there."

সিটি কলেজের ব্রাহ্ম পরিচালকদিগের ধর্ম্মবিষয়ক ও নৈতিক প্রভাবের ফল কিরূপ অনুভূত হইয়াছিল, তাহা স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯১২ সালে উহার পারিতোষিক বিতরণ সভায় উল্লেখ করেন ; যথা—

"But if the personal self-secrifice of the promoters of this institution has been one of the factors that have led to its success, its religious tone and character have exercised an even more potent influence on its growth and development."

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই স্কুল ও কলেজ একটি বোর্ড অব ট্রষ্টির হাতে দেন। তাঁহারা উহার ভার ব্রাহ্ম এডুকেশ্যন সোসাইটীর হস্তে অর্পণ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা এই সোসাইটীর সভ্য হইবার অধিকারী। এই সোসাইটী ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে। কলেজটি কোন নীতি-বিরুদ্ধ বা বে-আইনী ভাবে এই সোসাইটীর হাতে আসে নাই। সোসাইটীর যাহা উদ্দেশ্যাদি রেজিষ্টরী করিবার সময় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বদলাইবার ক্ষমতা সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা কোন অধ্যাপক বা কলেজ কৌন্সিলের নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিয়ম বদলাইবার জন্য বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার কোন সার্থকতা দেখা যাইতেছে না। তাঁহারা যদি কেহ অন্যায় কাজ করিতেন, তাঁহাদের জায়গায় অন্য যোগ্য লোক নিযুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য তাঁহারা বদলাইতে পারেন না।

রামমোহন রায় হষ্টেলটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দিয়াছেন। উহার নিয়মাবলীও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন অনুসারেই বলবৎ আছে। হষ্টেল সরকারী টাকায় নির্ম্মিত বলিয়াই সেখানে সরস্বতী পূজার অধিকার জন্মে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হষ্টেলের নিয়ম করিবার অধিকার কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে দিয়াছেন। হষ্টেলটিতে সব সম্প্রদায়ের ছাত্রদের অধিকার আছে। সরকারী টাকা সব সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে দেওয়া, কেবল হিন্দুদের দেওয়া নহে।

১৯২৮ সালের ৮ই মার্চ্চ কলিকাতার নয়টি কলেজের প্রিন্সিপ্যালদের যে কন্‌ফারেন্স প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু ও প্রিন্সিপ্যল জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আহ্বান করেন, তাহাতে উপস্থিত কেবল একজন ছাড়া অন্য সকলের সম্মতিক্রমে নিম্ন-লিখিত প্রস্তাবটি ধার্য্য হয় :—

"While we recognise that College authorities should grant free liberty of conscience to students in matters pertaining to their own faith, we are of opinion that the Governing Bodies of Colleges

have also rights of conscience, and so on general principles we should be opposed to any pressure being brought to bear on the authorities of a Brahmo, Christian, Hindu or Mohammedan college to permit or recognise religious observances contrary to their faith in any hostel under their control, irrespective of any pecuniary assistance received from public funds."

সিটি কলেজ কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইলে কেবল নগদ এককালীন দানগুলি ধরিলেই চলিবে না। পূর্ব্বে অনেক বৎসর ধরিয়া ইহার শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা (তখন প্রায় সকলেই ব্রাহ্ম) কখন বা বিনাবেতনে কখন বা সামান্য বেতনে কাজ করিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্ম সতীশরঞ্জন দাশ ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মাসে মাসে বেশী পরিমাণ চাঁদা দিয়াছিলেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা অল্প বেতন লইতেন বলিয়াই এককালীন দানও ছাত্রদত্ত বেতনের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে কলেজের জমি ক্রয় ও গৃহনির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছিল; শুধু দান হইতে তাহা হইত না। উক্ত উদ্বৃত্ত টাকা বস্তুতঃ শিক্ষক ও অধ্যাপকের দান। এ সব কথা বলিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিটিকলেজ সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজের উপর অনেক আর্থিক নীচ অভিসন্ধি ও ব্যবহার আরোপিত হওয়ায় লিখিতে হইল।

—

প্রবাসী

প্রবাসীর নিয়মিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১৬৮ পৃষ্ঠা করিয়া লেখা দেওয়া হইল।

বিদায় ভেরী

শ্রী সুধীরচন্দ্র কর

যেতে যখন হবেই তখন
আর কেনরে করিস্ দেরী?
বের হ'য়ে পড়, দিনের বেলা
ঐ বেজেছে বিদায়-ভেরী॥
ফিরে ফিরে ঘরের পানে
চাস্ কেন আর আকুল প্রাণে?
কেউ যদি রে পিছে টানে
আয় ছিঁড়ে আয় মায়ার বেড়ী॥
হ'য়ে কি আজ সঙ্গীহারা,
ব্যথায় ঝরে নয়নধারা?
এদিক-ওদিক ভাবনা ছাড়া
একদিকে পথ চল না হেরি॥
দে ছেড়ে সব লাভের দাবী,
সময় হ'লে সবই পাবি,
ভাব্‌লে শুধু কাল হারাবি
রাতের আঁধার আস্‌বে ঘেরি'॥

(১)
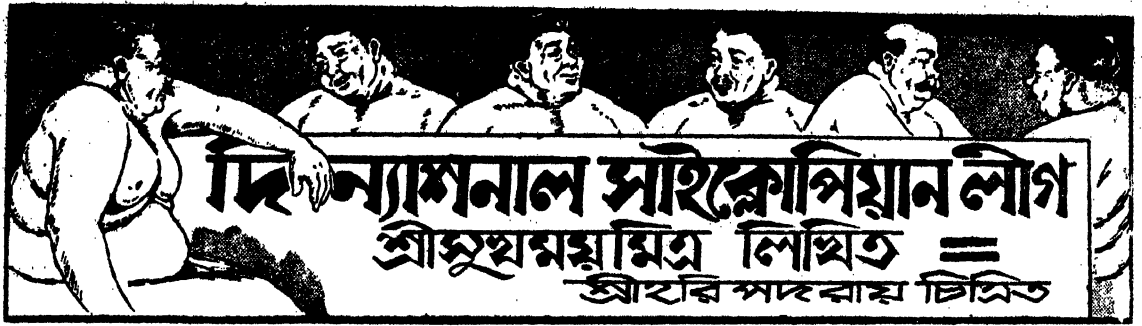
অচ্যুতবাবু আফিসের ফিরতি-মুখে ট্রেন-টাইম হয় নাই বলিয়া একটু গা ঢিলা দিয়া চলিতেছিলেন। তিনি সকল ব্যক্তিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন এবং সকল ব্যক্তিও তাঁহাকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কারণ, অচ্যুতবাবুর দেহটি প্রমাণ সাইজের কিছু উপরে। দেহের গঠনের মধ্যে সচরাচর যে পরিমাপ-গত বৈষম্য দেখা যায়, অচ্যুতবাবুর কলেবরে সে সকলের প্রায় কোনই লক্ষণ ছিল না। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের, ঘাড়ের ও গর্দ্দানের, বুক ও পেটের মধ্যে সে সকল পার্থক্য অহরহ পথে ঘাটে লক্ষিত হয়, অচ্যুতবাবুর নিটোল শরীরে সে সকলের একান্তই অভাব। সার্দ্ধ চারি মণ অচ্যুতবাবু বহুবিজ্ঞাপিত আধুনিক নার্শারীজাত কোন অতি-অলাবুর ন্যায়ই পথ বাহিয়া চলিতেছিলেন, বোঁটা ছেঁড়া ফলেরও যে প্রাণ থাকে তাহারই একটা জীবন্ত প্রমাণের মত।

টাউন-হলের কাছাকাছি আসিয়া অচ্যুতবাবু অনুভব করিলেন ভীড়টা যেন একটু অধিক। কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ঘাড় নাড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া যথাসম্ভব ইতস্ততঃ তাকাইয়া দেখিলেন, বহুলোক টাউনহলের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। বুঝিলেন মিটিং। ট্রেণের তখনও প্রায় দেড়ঘণ্টা বিলম্ব, তাই অচ্যুতবাবু স্থির করিলেন, কিয়ৎকাল জাতীয়জীবন-প্রবাহে অবগাহন করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিয়া লইবেন। আধুনিক জীবনে মিটিং করা তীর্থ করার শামিল, ভোটযুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধের সমান। পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রাণ লোকে কীর্ত্তন করিয়া 'দশা' পাইতেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা অর্থহীন বক্তৃতা করিয়া জ্ঞান হারাইয়া সেই আদর্শ বজায় রাখেন। পূর্ব্বকালের টিকি ও বর্ত্তমানের গান্ধীক্যাপ, পূর্ব্বের উপবীত ও বর্ত্তমানের খদ্দর, পূর্ব্বের কাশীবাস ও এখনকার জেলে বাস ইত্যাদি অপরাপর সাদৃশ্যও অনেক আছে। তাই অচ্যুতবাবু ভাবিলেন, আফিসের দাসত্বপাপ টাউনহলের অদম্য স্বাধীনতার স্রোতে কথঞ্চিৎ ক্ষালন করিয়া লইবেন। কিন্তু হায়, এ প্রতিযোগিতার যুগে পুণ্য করিতে হইলেও না যুঝিলে চলে না। টাউনহলে যত লোক ধরে তাহা অপেক্ষা অধিক লোক তথায় প্রবেশ করিতে চাহিলে কাহাকেও না কাহাকেও যে বাহিরে থাকিতেই হইবে এ কথা কে না বুঝে! তাই ভীড়ের সহিত স্থূলদেহে কিয়ৎকাল ধস্তাধস্তি করিয়া অচ্যুতবাবু দেখিলেন যে, স্রোতের বিপরীতগামী সন্তরণকারীর ন্যায় তিনিও পশ্চাদ্ভাগে বহুদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। উচ্চ আদর্শে বিফল, ব্যর্থচিত্ত অচ্যুতবাবু অগত্যা ট্রাম ধরিয়া হাওড়ার পথে চলিলেন। ট্রেণের তখনও বিলম্ব ছিল তাই তিনি ইণ্টারের টিকিট লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে ঢুকিলেন। যথালাভ; ওয়েটিংরুমে ক্রুসিস্টেম এখন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ঠকাইয়া ছারপোকার কামড় খাইতেও সুখ হয়।

একখানা "মহাশক্তি" পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাইতে বুলাইতে অচ্যুতবাবু ঢুলিতে লাগিলেন। ঘুমন্ত চোখের সম্মুখে স্বপ্নছবি; কখন দেখিলেন যেন একটা চরখা ছোট হইতে ক্রমে বাড়িতেছে। বাড়িতে বাড়িতে সূর্য্যের পথ অবরুদ্ধ করিয়া প্রলয়ের চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। সে ঘূর্ণীর পাকে পড়িয়া সৃষ্টি পেঁজা তূলার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেন কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি তাহা হইতে অনায়াসে সূতা কাটিয়া চলিতেছে। বিরাম নাই, তূলার শেষ নাই, সূতারও শেষ নাই। আবার নূতন ছাব, কে যেন বলি-

তেছে—"দেশের সকল ছারপোকা 'অরগ্যানাইজ' করিয়া ইংরাজদিগের পিছনে লেলাইয়া দিলে অচিরাৎ স্বরাজ লাভ হইবে।" আর একজন বলিতেছে, "না না, অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠতর পথ।" আবার পটপরিবর্ত্তন—অনন্ত শূন্যের বক্ষ চিরিয়া কালির বন্যা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল ও শূন্যে লিখিত হইল, "শুধু ভুল বকিয়া যাও, ভুল লিখিয়া যাও; ইংরেজী ভুল, বাংলা ভুল, হিন্দী ভুল; সকল ভাষা ভুলের ভেজালে এমন হইয়া উঠিবে যে, ইংরেজ পিতৃনাম বিস্মৃত হইয়া মস্তকে ভিজা তোয়ালে জড়াইয়া এ দেশ ত্যাগ করিবে। শরীরে কাবু করিতে না পারিলেও ইংরেজকে মস্তিষ্কে কাবু করিতে আমাদের বেশীক্ষণ লাগিবে না।" অচ্যুতবাবু শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মনপ্রাণ যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। পৃথিবীতে কখন কখন আপনা হইতে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া যায় যাহার ফল বহুদূর পর্য্যন্ত পৌঁছায় অথচ তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে কোন বিধিব্যবস্থা দেখা যায় না। এই সকল মহা মহা আকস্মিক ঘটনার কারণ গ্রহবৈগুণ্য ব্যতীত আর কিছু বলিতে আমরা পারি না। অচ্যুতবাবু দেখিলেন তাঁহার তন্দ্রাকালে আরও পাঁচ জন লোক ওয়েটিংরুমে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আয়তনে অচ্যুতবাবুর সমতুল্য, উনিশ-বিশ হইতে পারেন কিন্তু কেহই তাচ্ছিল্যের পাত্র নহেন।

আকৃতিগত বা চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকিলে মানুষ স্বভাবতঃই মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং অতি শীঘ্রই অচ্যুতবাবুর সহিত আনন্দ বাবু, গোবর্দ্ধন বাবু, সহায়রাম বাবু, চিন্তামণি বাবু ও ঘটু বাবুর বেশ আলাপ জমিয়া উঠিল। সকলেই ডেলি প্যাসেঞ্জার, সকলেই কেরাণী এবং প্রত্যেকেই সকল বিষয়ে অসন্তুষ্ট। কিছু কাল নানান বিষয়ে আলাপ হইবার পর ঘটুবাবু বলিলেন, "আর মশাই, যেখানেই যাই, যত ব্যাটা পিট্‌কে চীৎকার ক'রে ওঠে 'ঐরে, ঐ মোটাটা আস্‌ছে, এবারে চারজনের জায়গা জুড়ে বস্‌বে।' বলি, মোটা হয়েছি তা নিজের খেয়েই হয়েছি, তোমরাও গাঁটে কড়ি থাক্‌লে আর হজম করবার ক্ষমতা থাক্‌লে তুমিও মোটা হ'তে।"

প্রথম মিলন

সহায়বাবু বলিলেন, "যা বলেছেন মশায়। এর একটা বিহিত করা দরকার। এখন দিনকাল এমন যে লোকে বোঝে না রোগা মোটার তফাৎ কি। সমস্ত জাতটা যে রোগা হ'তে হ'তে নিরাকার হ'য়ে যাবার পথে চলেছে তা কি কেউ বোঝে? ৩৫১৩ সন নাগাদ বাবাজিদের সব মাকড়সায় গিলে খাবে, দেখবেন এখন। মোটা সোটা লোকেরা হচ্ছে প্রাচীনপন্থী। জীবনী-শক্তি আছে মশায়, তাই ত যা খাই গায়ে লাগে? তা নইলে ঐ ফুটো কাঁশার মত, এক ফোঁটা জল ধরে না অথচ খ্যান-খ্যানানির চোটে দুনিয়া মাৎ, ওতে কি হবে?"

আনন্দবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে, গলকম্বল সদৃশ চার থাক চিবুক তৎপ্রায়িত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এজিটেশন করা দরকার মশায়, এজিটেশন আর প্রপ্যাগাণ্ডা দরকার, তা নইলে কিছু হবে না। এ যেন রাঘব বোয়ালের বুকে

কুচো চিংড়ি লাথি মারে। হায়রে হায়; আমরা যে ওদের পিষে মেরে ফেলতে পারি।"

অচ্যুতবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। তিনি গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "তা আসুন না একটা পার্টি গড়া যাক। একথা ঠিক জানবেন, আমাদের যা পার্সোনালিটি আছে তাতে আমরা অবশ্য দেশব্যাপী একটা আন্দোলন করতে পারব। একটা নতুন ভোটনীতি খাড়া করা যেতে পারে। 'ভোট একর্ডিং টু ওয়েট' অর্থাৎ কিনা যে মানুষের ওজন যত তাই দেখে তার ভোট তত কম বেশী হবে। এক মণ ওজণ এক ভোট, দু মন দু ভোট, তিন মন তিন ভোট এই রকম, বুঝ্‌লেন না?"

অতিকায় সংঘের সহর প্রদক্ষিণ

চিন্তামণি বাবু, স্বল্পভাষী লোক, বেশী কথা বলিলে হাঁফ ধরে। তিনি বলিলেন, "হু...হু...হু... শুভস্য শীঘ্রম... হু হু হু।"

আনন্দবাবু বলিলেন, "ঠিক বলেছেন, বাঙালীর ব্রেণ, একটা ড্রাফট কন্সটিটিউশন খাড়া ক'রে ফেলে এক দিন প্রভিন্সিয়াল মিটিং ক'রে সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলা যাক আর কি? দেরী ক'রে লাভ কি।

কথায় বলে যে জিনিস যত অল্পক্ষণ জ্বলন্ত থাকে তাহাতে আগুন ধরে তত শীঘ্র, আর তাহার প্রথম হল্‌কা তত প্রবল হয়। যেমন খড়ের গাদার আগুন আর কয়লার গাদার আগুন। একটা দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে আর চট্ করিয়া নিভিয়া যায় আর অপরটি ধরিতে সময় লাগিলেও জ্বলে বহুক্ষণ ধরিয়া। আমাদিগের ষড় বিপুলের উৎসাহও ঠিক বাঙলার রেওয়াজ মত হঠাৎ এবং প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল। মেন লাইন, নিউ কর্ড ও বি এন আরের বিভিন্ন ট্রেণ ধরিয়া উপরোক্ত ছয় মহাপুরুষ গৃহগামী হইবার পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গেল যে, অবিলম্বে দি ন্যাশন্যাল সাইক্লোপিয়ান লীগ নাম দিয়া এই বিরাট সংঘের পত্তন করা হইবে।

(২)

অচ্যুতবাবু, ঘটুবাবু প্রভৃতির ইচ্ছা ছিল যে শেষ অবধি তাঁহাদের লীগের ব্রাঞ্চ ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন; কিন্তু বর্ত্তমানে শুধু বাংলা দেশেই তাঁহারা কার্য্য চালাইবেন স্থির করিলেন। কারণ বাংলা দেশে বৃহদায়তন জমিদার, উকিল, আফিসের বড় বাবু, দালাল, উত্তমর্ণ প্রভৃতির অভাব নাই, এবং সিদ্ধিদাতা গণেশের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ উক্ত আকৃতির লোকেরা সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র না হইলেও আকর্ষণের বস্তু অবশ্যই বটে। অচ্যুত বাবুরা একজন শেয়ারের দালালের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার টেলিফোনটা ব্যবহার করিবার অনুমতি লইলেন। তাহার বাড়ীর দরজায় একটা সাইন বোর্ডও লাগাইলেন। তাহারই বৈঠকখানায় তাঁহাদের ছয় জনের একটা বিরাট সভা হইল। সভায় স্থির হইল যে যেহেতু শারীরিক মানসিক, সামাজিক আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে বাংলা দেশের অতিকায় ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তি-গত ও সমষ্টিগত উন্নতি অপরাপর মণ্ডলীর ও সম্প্রদায় সমুদয়ের উন্নতির সহিত একাভিমুখী নহে, সেইজন্য উক্ত অতিকায় ব্যক্তিগণ সভাস্থ হইয়া স্থির করিতেছেন যে, প্রথমত, সরকার বাহাদুরকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে

যে ন্যাশনাল সাইক্লোপিয়ান লীগ একটি বিশেষ সম্প্রদায়; দ্বিতীয়ত, সরকার বাহাদুরকে উক্ত সম্প্রদায়ের সভ্যবর্গের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ ও ভোট দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে (ওজন অনুপাতে ভোটের সংখ্যা কম বেশী হইবে এই আদর্শের পত্তন ঐ সভা আকাঙ্ক্ষা করেন); তৃতীয়ত, অতিকায় ব্যক্তিদিগের জন্য সরকার বাহাদুরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যথা—(১) রেল গাড়ীতে তাহাদিগের জন্য বিশেষ কামরা নির্দ্ধারণ করা। সেই সকল কামরাতে "টু সিট সিক্স্টিন" না লিখিয়া "টু সিট ফোর" (অথবা ঐ অনুপাতে) লিখিতে হইবে। সেই সকল কামরার দরজা দ্বিগুণ চওড়া করিতে হইবে। (২) সকল সরকারী আফিসে অতিকায়দিগের জন্য লিফটের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) ট্রামে ও বাসে অতিকায়দিগের জন্য অতিরিক্ত চওড়া সিট দিতে হইবে... ইত্যাদি ইত্যাদি

"মহাশক্তি" আফিসে একজন ইতিহাসে এম, এ, পাশ ছোক্‌রা পোলিটিক্যাল নোটস্ লিখিত। তাহাকে কিছু সাকার ও নিরাকার আপ্যায়ন করিতেই সে এই বিরাট সভার একটা বিরাটতর রিপোর্ট বিরাটতম হেডিং টাইপ দিয়া ছাপাইয়া দিল। "মহাশক্তি" এই সভার অধিবেশনের রিপোর্ট ছাপাইয়া নিম্নলিখিতরূপ মত প্রকাশ করিল—

"পথের কাঁকর মাথা তুলিয়া গৌরীশঙ্করের মস্তকে পদাঘাত করিবে সে দিন আর নাই। হিমাচল আজ জাগ্রত, বিপুল, বিরাট, ভয়ঙ্কর, দুর্দ্ধর্ষ নির্ঘোষে আজ আপনার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করিতেছে। হায় নিয়েনডারথাল মানব। ক্রোম্যাগ্নেনের প্রাণশক্তি আজ মূর্ত্ত অতিকায়রূপে তোমাকে মেজরিটি মাষ্ট বি গ্রাণ্টেড লীলার অবসানের গহ্বরে প্যালিওলিথিক প্রবলতার সহিত নিক্ষেপ করিবে। সাইক্লপ মাথা তুলিয়াছে, পর্ব্বত শিখর টুটিয়া আজ তাহার হাতের অস্ত্র। ঘূর্ণীর পাক শাশ্বত অকর্ম্মণ্যতার সসংখ্য নিষ্ক্রিয়তার ফলহীন কুঞ্জে লাগিয়াছে। মহাদেব তাণ্ডবে নৃত্যপরায়ণ। ঝড়ের উদ্দামতা আর ছিন্ন পত্রের অনন্ত নিরুদ্দেশ যাত্রা এর শেষ কোথায়?"

"মহাশক্তি"র ইংরেজী সংস্করণ—"হাউট্‌হাব" পত্রিকায় উক্ত ঐতিহাসিক যুবক প্যারাগ্রাফ লিখিল।

"The pebbles cramming the breast of the path lifts no more its head kicking the head of the mount Everest. Where is that day? The Mount Himalayas have arisen, awaken and is resounding its relentless voice in the loud tone of eternal annihilation. Alas, thou Neanderthal man. The Cromagnon man rushes out with the life power personified and is casting you in the depths of the end of majority must be granted with true palaeolithic potency. The cyclop has lifted its head, the mountain head is brokenly its weapon. The cyclone has touched the bower of beginningless inefficiency and callow fruitlessness. The God Mahadev is dancing *Tandav*. The madness of the storm and the objectless motion of decapitated tree leaves. Where is its end?

সর্ব্বত্র, মেসে, মাঠে, আফিসে বাজারে সাড়া পড়িয়া গেল যে বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা নবশক্তি উদ্ভূত হইয়াছে। তারপর অচ্যুত বাবুরা এক হাজার ভলান্টিয়ার ও সাড়ে সাত লক্ষ টাকার জন্য একটা প্রাণস্পর্শী আবেদন করিলেন। এক হাজার ভলান্টিয়ার গিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবে যে দেশ স্বাধীন করিতে হইলে আরও অধিক ঘী খাওয়া প্রয়োজন; কারণ সমগ্র জাতি যদি ওজনে দ্বিগুন হইতে পারে তাহা হইলে তাহার শক্তিও দ্বিগুন হইবে। আনন্দবাবু একটা বক্তৃতায় বলিলেন, " 'এ নেশন মার্চ্চেস অন ইট্‌স্ ষ্টমাক' সুতরাং 'ষ্টমাক' বাড়াও নতুবা মুক্তি নাই।" ঘটুবাবু বলিলেন, "আমরা যেন বিদেশী বণিকদিগের সম্মুখে সত্যই পর্ব্বতের ন্যায় বিরাট অটল ভাবে দাঁড়াইতে পারি।" সহায় বাবু বলিলেন "ইংরেজগণ আমাদিগের দেশে আছে খাবার লুঠ করিবার জন্য। আমরা যদি পূর্ব্বাহ্ণেই সকল খাবার গলাধঃকরণ করি তাহা হইলে লুঠের মাল মশলার অভাবে ইংরেজ আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে।" চিন্তামণি বাবুও কাশিতে কাশিতে উঠিয়া এক সভাতে বলিলেন "হু...হু...হু...সকলে সমান মোটা হ'লে...হু...হু...আর ভেদাভেদ থাক্‌বে না...হু...হু...সব ভাই এক ঠাঁই...হু দূরে কেউ যাবে না।"

একদিন সকলে পতাকা প্রভৃতি লইয়া একটা লরী করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন।—আরিশের

অতি-মানবিনীদিগের সভা অধিকার

হরতালের পর বহুকাল এত ভীড় কলিকাতার রাজপথে হয় নাই। যেখানেই তাঁদের লরী উপস্থিত হইল সেখানেই যেন সহর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে বলে, "ঐ, ঐ। বটু বাবু সহায় বাবুকে বলিলেন, "শুনছেন কি রকম, 'জয় জয়' ব'লে চীৎকার কর্‌ছে সকলে!"

(৩)

বিরাট আমার, বিপুল আমার, আমার মাংস আমার মেদ,
দূর ক'রে দাও ভারত হইতে রোগা মোটা সরু স্থূলের ভেদ।
এ দীন দিবসে ফুকারি ডুকারি, 'কোথা গেল হায় চতুর্ব্বেদ'!
মহাভারতের অর্জ্জুন আর করেনাক আজ লক্ষ্যভেদ।
আঠার পুরাণ খাড়া কর ফের প্রাণপণে ফেলে মাথার স্বেদ,
বিরাট বিরাট লেখগো কেতাব দূর ক'রে শত চুটকী-ক্লেদ।
বিরাট আমার, বিপুল আমার, আমার মাংস আমার মেদ,
স্বাধীনতা পাবে হলে অতিকায় পরাধীনতায় পূর্ণচ্ছেদ॥

গোবর্দ্ধন বাবু সাইক্লোপিয়ান পার্টির গাইয়ে লোক। তিনি যখন তাঁর ৬২ ইঞ্চি ছাতি খানা ফুলাইয়া সপ্তমের কোঠায় লইয়া গিয়া উপরের গানটি গাহিতেন, তখন সভায় সকলের অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হইত। তার পর একে একে জাতীয় অতিকায়-সংঘের সভ্যবৃন্দ নিজ নিজ বক্তব্য অতিকায়োচিত ভাষায় বলিতেন। একটা সভার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল। ইহা হইতে সাধারণতঃ অতিকায়-সংঘের মিটিং কি ভাবে হইত তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাঠকের হইবে।

[স্থান :—অ্যালবার্ট হল। কাল—অপরাহ্ণ। পাত্র—অধিকাংশই শ্রোতা। কয়েকজন মাত্র বক্তা, ডেইজের উপর আসীন, তাঁহাদের সকলেরই আকার অতিকায়। হলের নানাদিকে স্থূলকায় যুবক ও ভলান্টিয়ারবৃন্দ বিদ্যমান, তাহাদের কোমরের ক্রশ বেল্ট মেদের খাঁজে অদৃশ্যপ্রায়। দেয়ালে বিভিন্ন প্রকার পোষ্টার ঝুলান রহিয়াছে, তাহাতে স্থূল ও কৃশের পার্থক্য নানা প্রকারে দেখান হইতেছে। কোনো পোষ্টারে একটি অতিক্ষুদ্র মানবের পার্শ্বে একটি অতিকায়ের চিত্র; সঙ্গে লেখা, "কাহার ন্যায় হইতে চাও?" অপর চিত্রে একজন লোক নানান উপকরণ লইয়া বসিয়া ভোজনে ব্যস্ত; তাহার নিম্নে লিখিত "স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রকৃত পন্থা।" তৃতীয় এক পোষ্টারে দেখান হইতেছে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কত লোক স্থূলকায় ছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের সাহায্যে স্থূলত্বের মূল্য বুঝাইবার জন্য

অপর দুইটি পোটারে কটোৎকচের কুম্ভকর্ণ খণ্ডনের ও কুম্ভকর্ণের মহাযুদ্ধের চিত্র দেখান হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। পাতলা রেশম অথবা কার্পাস বস্ত্রের স্থূলত্ব অতিকায় সংঘের আদর্শ বিরুদ্ধ বলিয়া মোটা কিংখাব ও মখমলের দ্বারা তৈয়ারী বহু রং বেরঙের পতাকা চারিদিকে ঝুলান হইয়াছে। সভা গমগম করিতেছে। সঙ্গীত সবে শেষ হইয়াছে]

সভাপতি [নূতন সভ্য ঝুনঝুনিয়া পাটকলের বেনিয়ান ; নূতন ওজন-কেন্দ্রিক ভোটনীতি প্রবর্ত্তিত হইলে সাত ভোটের অধিকারী হইবার আশা রাখেন] বলিলেন,

"সমবেত ভদ্র মহোদয়গণ; আজ আমরা যে মহান ব্রত উদ্‌যাপন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাহার উপর আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, জন্ম মৃত্যু বিবাহ, মরণ বাঁচন, অগ্র পশ্চাৎ, দারা পুত্র পরিবার সকল কিছুই নির্ভর করিতেছে। এর জন্য আমাদের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান, আমলক হরতাল অট্টালিকা স্বার্থ পরার্থ পরমার্থ, ধনাঢ্য আঢ্য সকল কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে। এরই অনুপ্রাণনায় উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে ঈশানে নৈঋতে বায়ুতে অগ্নিতে উর্দ্ধে অধঃ ধাইয়া চলিতে হইবে। রৌরব কুম্ভীপাক পুন্নাম, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য উনপঞ্চাশ প্রাবল্যকে ভয় না করিয়া আগুয়ান হইলে তবেই লভ্য পাইব আমরা। চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়, দধি দুগ্ধ ঘৃত, ক্ষীরসর নবনী, রূপ রস গন্ধ স্পর্শের পথেই আমাদের মুক্তি।" (ঘন ঘন করতালি) আজানুলম্বিত বাহু মহামেদ লম্বোদর আমরা, আমরাই ভারতের আশার স্থল। (সঘন করতালি ও সভাপতির আসন গ্রহণ)"

চিন্তামণি বাবু।—"হু...হু...হু... মুক্তি...হু...হু ...।"

একজন কৃশকায় ব্যক্তি স্নায়ুচাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কি বলিতে যাওয়ায় তাহার স্কন্ধে তৎক্ষণাৎ দশ জোড়া মহাভুজ ন্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল। অচ্যুত বাবু যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মিটিংএ উদ্দাম ব্যবহার অতিশয় অযথা। এই যে কৃশকায় ছোকরাটি অতিকায়-সংঘ সম্বন্ধে নিজ কল্পনা প্রসূত বিদ্বেষ বশতঃ বিসদৃশ আচরণে মিটিংএর পবিত্র আবহাওয়া কলুষিত করিল, ইহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি কিন্তু ইহার যেন প্রাণে অনুতাপ জাগ্রত হয়।" (ঘন করতালি)

দুন্দুভি ঘটক নামক নবলব্ধ পার্টি হুইপ মহাশয় মত্ত মাতঙ্গ গতিতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া ইহার উহার কাণে ফিস ফাস করিয়া নানা কথা বলিয়া সংঘের সলিডারিটি রক্ষা করিতেছিলেন। আরও চার পাঁচজন বক্তৃতা দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল এবং মিটিং এর রিপোর্ট ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিবার জন্য সংঘের বড় বড় নেতাগণ চিন্তামণি বাবুর বাড়ীতে ডিনারে জড় হইবার জন্য রওয়ানা হইলেন।

(৪)

বাংলায় যেন একটা নূতন যুগ আরম্ভ হইল। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে জাতীয় অতিকায় সংঘের আদর্শ ও জীবনযাত্রা প্রণালী ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দেশ-ব্যাপী একটা বিরাট "অ্যান্টি"-কৃশতার বান ডাকিয়া গেল। রোগা ছিপছিপে লোকে আর চাকুরী পায় না, সমাজে আদর পায় না এমন কি বিনা পণে বিবাহ করিতে পর্য্যন্ত বাধ্য হয়। কৃশকায় লোকেরা সর্ব্বত্র অপদস্থ হইতে লাগিল। বহু লোকে উপরের জামার অন্তরালে মোটা তুলার জামা পরিয়া নকল স্থূলতার অত্যাচারে গরমে ঘামিয়া পচিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে লাগিল। কাউনসিলে প্রসিদ্ধ বক্তা অতিরঞ্জন তালুকদার কৃশতা নিবন্ধন সভাপতিত্বের যুদ্ধে সাড়ে ছয়মণি কাউনসিলার অলিকান মিঞার কাছে পরাস্ত হইলেন। অলিকান সহি করিবার ক্ষমতার অভাবে টিপ সহি মারিয়া নিজের উচ্চ পদের কার্য্য চালাইতে লাগিল।

ইহা ব্যতীত সাহিত্যে, শিল্পে, শিক্ষায় সর্ব্বক্ষেত্রে এই অতিকায় নীতির ঢেউ পৌঁছাইল। সরকার বাহাদুর যদিও ঠিক প্রকাশ্যে 'ভোট একর্ডিং টু ওয়েট' পন্থা মানিয়া লইলেন না তবুও সকলেই বলাবলি আরম্ভ করিল যে অনতিবিলম্বেই দেশের কৃশ মেজরিটী বহু ভোটধারী অতিকায় মাইনরিটির দ্বারাই শাসিত হইবে। সাহিত্যে কৃশতাবাদ, টিউবার-কিলোম্নিলবাদ, চন্দ্রালোকপানবাদ প্রভৃতি উঠিয়া যাইবার

শেষ বিদায়ের বেলা

জোগাড় হইল। তরুণ প্রেমিক প্রণয়িনীকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল—

মত্ত হস্তিবৎ প্রিয়ে, তোমার বিহনে
নিরাশা-রুহের মূলে খুঁড়ে মরি মাথা ;
হৃদয়-কটাহে ফুটমান ইক্ষুরস সম
উন্মাদিনী প্রেমজ্বালা গাঁজিয়া উঠিছে
সদা। ইত্যাদি—

ইংরেজী শিক্ষিত নায়িকা নায়ককে আর "ওগো হৃদয়-কুঞ্জের বুলবুল" কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু বলিয়া সম্বোধন করিতে রাজী হইলেন না। কেহ কেহ "হে প্রেমসমুদ্রের ক্যাচালট হোয়েল" কিম্বা, "ওগো আমার প্রাগৈতিহাসিক মর্ম্মবনানীর ম্যাস্টোডন" লিখিয়া প্রাণের আবেগ চরিতার্থ করিলেন। শিল্পে স্থূলের আদর বাড়িতে লাগিল। জমিদার পুত্রগণ গ্রে হাউণ্ড পোষা ছাড়িয়া হৃষ্ট মেষ শিকলে টানিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। স্কুলে "ক্যাটেষ্ট বয়" প্রাইজের উদ্ভাবনা হইল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও স্থূলতম ছাত্রের জন্য বিশেষ জলপানির চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এহেন সময়ে, যখন বাংলার আকাশে অতিকায় সূর্য্য প্রখরতম তেজের সহিত দেদীপ্যমান, তখন আর একটা বিপদ ঘনীভূত হইয়া ঘন কৃষ্ণ মেঘের মত সেই আকাশে দেখা দিল। কাউনসিল ইলেকশনে জয়ী হইয়া যখন অতিকারগণ সমগ্র বাংলার একছত্র অধিপতি তখন এক অজানিত অকল্পিত কোণ হইতে এই ভীষণ বিপদটা গহ্বর হইতে সদ্যজাগ্রত অজগরের ন্যায় বাহির হইয়া আসিল।

কিছুকাল হইতেই বাংলার নারী-জাগরণ চলিতে ছিল। "নারীকে ভোট দেও" "নারীকে পুলিস কোর্সে গ্রহণ কর" প্রভৃতি নানা প্রকার কথা শুনা যাইতেছিল। কিন্তু আসল বিপদটা জাতীয় অতিকায়-সংঘের অ্যানুয়াল কনফারেন্সে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। সে সভার সভাপতি গণপতি বাবু অ্যাড্রেস পাঠ করিয়া ঘন ঘন করতালির মধ্যে সবে আসন গ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময়, সভাস্থলের প্রবেশ পথে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। অচ্যুত বাবু আনন্দ বাবু প্রভৃতি সেইদিকে তাকাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দেখিলেন ভলান্টিয়ার দলের নেতা চার ভোটের অধিকারী শর্ব্বরীবদন ঘোষ একটি মহিষমর্দ্দিনী মহিলার কবলে পড়িয়া পাচিকার হস্তে কৈ মৎস্যের ন্যায় ছটফট করিতেছে। অপরাপর ভলান্টিয়ারগণ ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া আছে। মহিষমর্দ্দিনীর পশ্চাতে আরও বহু সংখ্যক ও তদনুরূপ অন্যান্য মহিলা উপস্থিত। কেহই প্রায় সওয়া পাঁচমণের কম নহেন।

শর্ব্বরী-নিগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়া মহিলার দল গজেন্দ্রগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন। কেহ কোন কথা বলিল না। শত ঐরাবত যূথের ন্যায় এই মহিলাদঙ্গল গিয়া ডেইজে উঠিল। যাহাদের সেখানে স্থান হইল না তাহারা ডেইজ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—

যূথনেত্রী গম্ভীর নির্ঘোষে সশব্দে টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন,"

"সমবেত অতিকায় ও স্বল্পকায় নরনারীগণ

আমাদের জীবনের এক মহা সঙ্কিক্ষণ উপস্থিত। পুরুষ এতকাল বুদ্ধির দোহাই দিয়া নারীকে ও তৎসঙ্গে জগতকে উৎপীড়ন করিয়া ঘুরিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। বুদ্ধিতে যখন নারী তাহাকে পরাস্ত করিল, তখন সে অতিকায়ত্বের দোহাই পাড়িয়া নিজের গতপ্রায় প্রাধান্য ফিরিয়া পাইবার জন্য সচেষ্ট হইল। কিন্তু পাপ যাহা তাহা কি করিয়া জয়ী হইবে? তাই আজ আমরা বাংলার অতি-মানবিনী সভা, বলপূর্ব্বক এই সভাস্থল অধিকার করিলাম। আমরা কেহই পাঁচ অপেক্ষা কম ভোটের অধিকারী নই। আমি নিজে বর্ত্তমানে আট ভোট দাবী করিতে পারি। আমাদের দলের "শত ত্রিশজন সভ্যের সমবেত ওজন ৮০৩২½ মন; গড়পড়তা সভ্য পিছু ওজন ৫মন ১০ সের। এ অবস্থায় এই সকল চুনোপুঁটি নরকীটগণ কি করিয়া আশা করে যে আমরা তাহাদিগকে মানিয়া চলিব? এই ইহাদিগের সভাপতি। এই ত ইহাকে আমি ধাক্কা দিয়া ডেইজ হইতে নীচে ফেলিয়া দিলাম। এ আত্মরক্ষা করুক দেখি!" (চতুর্দ্দিকে ভয় ও বিস্ময়মিশ্রিত ধ্বনি)।

যথা কর্ম্ম তথা কাজ। মহিষাসুরমর্দ্দিনীর দুর্দ্দান্ত আক্রমণে গণপতি বাবু ধোপানী-নিক্ষিপ্ত বিরাট একটা ময়লা কাপড়ের বস্তার ন্যায় নীচে গিয়া গড়াইয়া পড়িলেন। সভাস্থল ছাড়িয়া অন্যান্য অতিকায়গণ যথাসম্ভব দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিলেন। শীঘ্রই সভায় অতিমানবিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

পরদিন "মহাশক্তি" কাগজে লিখিত হইল—

"তুফান আর ঝড়, ঝড় আর তুফান। প্রবল শক্তিতে মাতঙ্গিনী যখন অরণ্য-গামিনী হয় তখন কে তাহাকে থামাইবে। হরিণ শিশু? না কখনও না। তাই বাংলার আজ বান ডাকিয়াছে। কে যেন সমগ্র রাষ্ট্রটাকে ধরিয়া নাড়া দিতেছে। মা, মহাশক্তি জাগিলে কি? মা!"

"হাউইটজারে" লেখা হইল:—

Typhoon and cyclone, cyclone and tornado. When in indomitable force the elephantress ravishes the forest land, who stop her undaunted onrush? 'The deer child? No, never. Therefore Bengal is now over inundated with brimful flood waters. Some one has been shaking the kingdom, the state relentlessly. The callow degenerates depart to cram their object lesson in peace. Mother of great strength have you awaken? Mother!

(৫)

ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়া অচ্যুত বাবু তাঁর চিন্তাকণ্টক-জর্জ্জরিত কৃশ দেহভার চেয়ারের উপর ন্যস্ত করিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা, দেশে মা বোন প্রভৃতিকে দেখিয়া কিছু দিনের জন্য সিঙ্গাপুরে গিয়া বাস করিবেন, নূতন একটা কাজ লইয়া। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ জাগিয়া চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন আনন্দবাবু, গোবর্দ্ধন বাবু, ঘটুবাবু, চিন্তামণিবাবু ও সহায়রামবাবুও তাঁহারই ন্যায় কৃশকায় হইয়া আসে পাশে বিভিন্ন গন্তব্য স্থানের লেবেলমারা লগেজ লইয়া বসিয়া আছেন। ছয়খানি ভগ্ন হৃদয়ের যেন একগাছি মালা। শুষ্ক, ম্লান, শীর্ণ। কেহ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সবাই সকলের সব দুঃখ নীরবেই বুঝিয়া নীরবেই সহানুভূতির কারুণ্যে করুণ নয়নে শূন্য মার্গে তাকাইয়া রহিলেন।

প্রবাসী প্রেসের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা

প্রবাসী প্রেসের সহিত যাঁহাদের কারবার আছে, তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, যে, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সরকারের সহিত এখন ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
প্রবাসী প্রেসের স্বত্বাধিকারী।
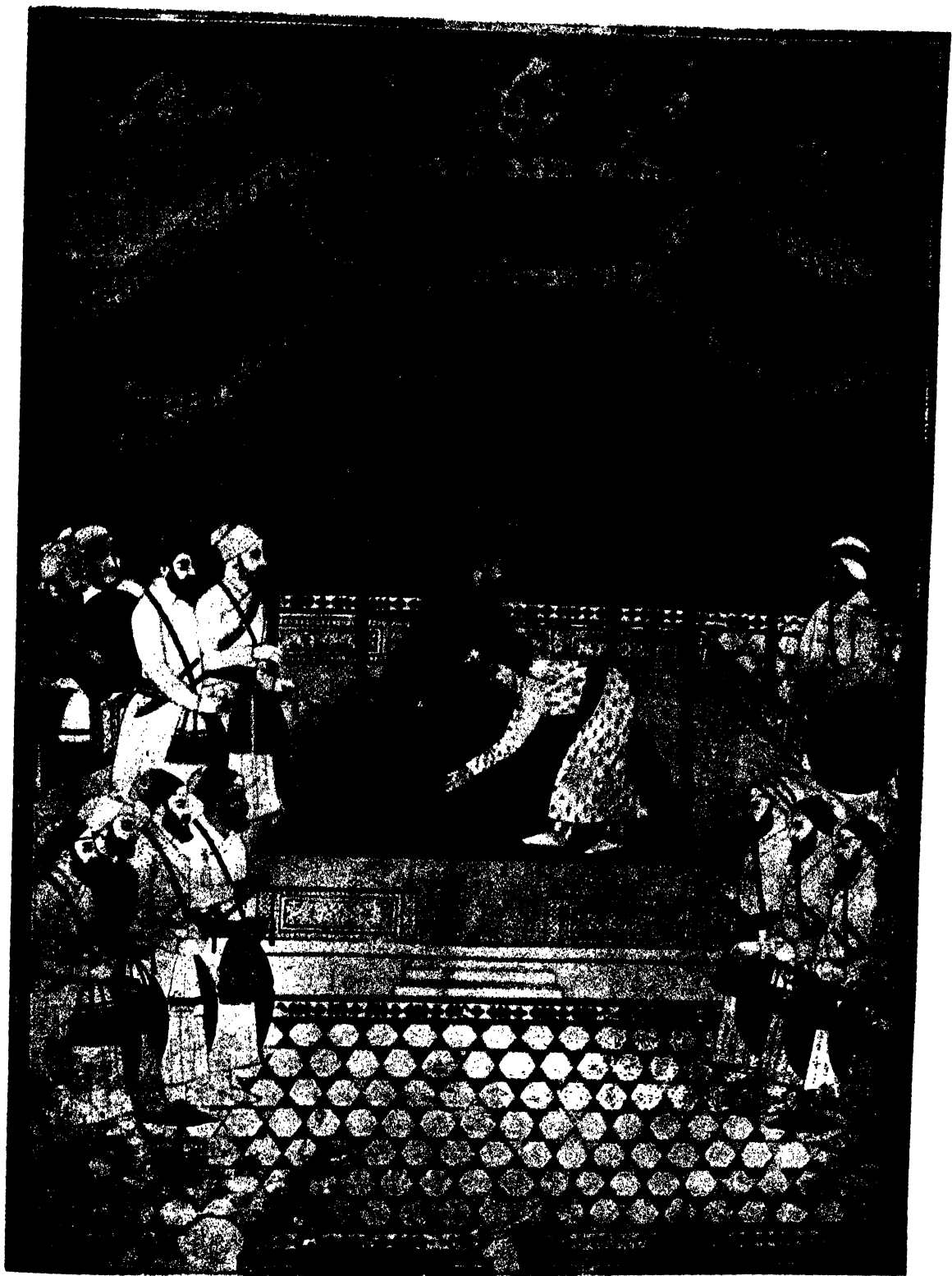
দরবারে ক্ষমা-প্রার্থনা
একখানি প্রাচীন মোগল চিত্র হইতে

"সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩৫

৩য় সংখ্যা

সংস্কার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রগুপ্ত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর খাতায় জমা করেন যা থাকে পাপীর নিজের অগোচরে। তেম্‌নি এমন পাপও ঘটে, যাকে আমিই চিনি পাপ ব'লে, আর কেউ না। যেটার কথা লিখ্‌তে ব'সেছি সেটা সেই জাতের। চিত্রগুপ্তের কাছে জবাবদিহী কর্‌বার পূর্ব্বে আগে-ভাগে কবুল ক'র্‌লে অপরাধের মাত্রাটা হাল্‌কা হবে।

ব্যাপারটা ঘ'টেছিলো কাল শনিবার দিনে। সেদিন আমাদের পাড়ায় জৈনদের মহলে কী একটা পরব ছিল। আমার স্ত্রী কলিকাকে নিয়ে মোটরে ক'রে বেরিয়েছিলুম—চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধু নয়নমোহনের বাড়িতে।

স্ত্রীর কলিকা নামটি শ্বশুর-দত্ত, আমি ওর জন্য দায়ী নই। নামের উপযুক্ত তাঁর স্বভাব নয়, মতামত খুবই পরিস্ফুট। বড়বাজারে বিলিতী কাপড়ের বিপক্ষে যখন পিকেট্‌ ক'র্‌তে বেরিয়েছিলেন, তখন দলের লোক ভক্তি ক'রে তাঁর নাম দিয়েছিল ধ্রুবব্রতা। আমার নাম গিরীন্দ্র। দলের লোক আমাকে আমার পত্নীর পতি ব'লেই জানে, স্বনামের সার্থকতার প্রতি লক্ষ্য করে না। বিধাতার কৃপায় পৈতৃক উপার্জ্জনের গুণে আমারও কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে। তার প্রতি দলের লোকের দৃষ্টি পড়ে চাঁদা আদায়ের সময়।

স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের অমিল থাক্‌লেই মিল ভালো হয়, শুক্‌নো মাটির সঙ্গে জলধারার মতো। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত ঢিলে, কিছুই বেশি ক'রে চেপে ধরিনে। আমার স্ত্রীর প্রকৃতি অত্যন্ত আঁট্‌, যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। আমাদের এই বৈষম্যের গুণেই সংসারে শান্তিরক্ষা হয়।

কেবল একটা জায়গায় আমাদের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ঘটেছে, তার আর মিটমাট হতে পার্‌লো না। কলিকার বিশ্বাস, আমি স্বদেশকে ভালোবাসিনে। নিজের বিশ্বাসের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল—তাই আমার আন্তরিক দেশ-ভালোবাসার যতোই প্রমাণ দিয়েছি, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণের সঙ্গে মেলে না ব'লে কিছুতেই তাকে দেশ-ভালবাসা ব'লে স্বীকার করাতে পারিনে।

ছেলেবেলা থেকে আমি গ্রন্থবিলাসী, নোতুন বইয়ের খবর পেলেই কিনে আনি; আমার শত্রুরাও কবুল কর্‌বে যে সে বই প'ড়েও থাকি, বন্ধুরা খুবই জানেন যে প'ড়ে

তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ক'রতেও ছাড়িনে।—সেই আলোচনার চোটে বন্ধুরা পাশ কাটিয়ে চলাতে অবশেষে একটি মাত্র মানুষে এসে ঠেকেছে, বনবিহারী, যাকে নিয়ে রবিবারে আমি আসর জমাই। আমি তার নাম দিয়েছি, কোণ-বিহারী। ছাদে ব'সে তার সঙ্গে আলাপ ক'রতে ক'রতে এক একদিন রাত্তির দুটো হ'য়ে যায়। আমরা যখন এই নেশায় ভোর তখন আমাদের পক্ষে সুদিন ছিল না। তখনকার পুলিশ কারো বাড়ীতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেতো। তখনকার দেশভক্ত যদি দেখ্‌তো কারো ঘরে বিলিতী বইয়ের পাতা কাটা, তবে তাকে জান্‌তো দেশ-বিদ্রোহী। আমাকে ওরা শ্যামবর্ণের প্রলেপ দেওয়া শ্বেত-দ্বৈপায়ন ব'লেই গণ্য করতো। সরস্বতীর বর্ণ সাদা ব'লেই সে-দিন দেশ-ভক্তদের কাছ থেকে তাঁর পূজা মেলা শক্ত হয়েছিল। যে-সরোবরে তাঁর শ্বেতপদ্ম ফোটে, সেই সরোবরের জলে দেশের কপাল-পোড়ানো আগুন নেবে না, বরঞ্চ বাড়ে, এম্‌নি একটা রব উঠেছিলো।

সহধর্ম্মিণীর সদ্‌দৃষ্টান্ত ও নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও আমি খদ্দর পরিনে; তার কারণ এ নয় যে, খদ্দরে কোনো দোষ আছে বা গুণ নেই বা বেশভূষায় আমি সৌখীন। একেবারে উল্‌টো, স্বাদেশিক চালচলনের বিরুদ্ধ অনেক অপরাধ আমার আছে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা তার অন্তর্গত নয়। ময়লা মোটা রকমের সাজ, আলুথালু রকমে ব্যবহার করাটাই আমার অভ্যাস। কলিকার ভাবান্তর ঘট্‌বার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে চীনেবাজারের আগা-চওড়া জুতো পরতুম, সে জুতোয় প্রতিদিন কালিমা-লেপন করিয়ে নিতে ভুলতুম, মোজা পরতে আপদ বোধ হতো, শার্ট না প'রে পাঞ্জাবী পরতে আরাম পেতুম, আর সেই পাঞ্জাবীতে দুটো একটা বোতামের অভাব ঘটলেও খেয়াল করতুম না; ইত্যাদি কারণে কলিকার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হবার আশঙ্কা ঘটেছিল। সে বল্‌তো, "দেখো, তোমার সঙ্গে কোথাও বেরতে আমার লজ্জা করে।" আমি ব'লতুম, "আমার অনুগত হবার দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়েই তুমি বেরিয়ো।"

আজ যুগের পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয়নি। আজও কলিকা বলে, "তোমার সঙ্গে বেরতে আমার লজ্জা করে।" তখন কলিকা যে দলে ছিল তাদের উর্দ্দি আমি ব্যবহার করিনি, আজ যে-দলে ভিড়েছে তাদের উর্দ্দিও গ্রহণ করতে পারলুম না। আমাকে নিয়ে আমার স্ত্রীর লজ্জা সমানই র'য়ে গেলো। এটা আমারই স্বভাবের দোষ। যে-কোনো দলেরই হোক্ ভেক্ ধারণ করতে আমার সঙ্কোচ লাগে। কিছুতেই এটা কাটাতে পারলুম না। অপর পক্ষে মতান্তর জিনিষটা কলিকা খতম ক'রে মেনে নিতে পারে না। ঝরণার ধারা যেমন মোটা পাথরটাকে বারে বারে ঘুরে ফিরে তর্জ্জন ক'রে বৃথা ঠেলা দিতেই থাকে, তেমনি ভিন্ন রুচিকে চলতে ফিরতে দিনে রাত্রে ঠেলা না দিয়ে কলিকা থাকতে পারে না, পৃথক্ মত নামক পদার্থের সংস্পর্শমাত্র ওর স্নায়ুতে যেন দুর্নিবারভাবে সুড়সুড়ি লাগায়, ওকে একেবারে ছটফটিয়ে তোলে।

কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবার পূর্ব্বেই আমার নিষ্‌-খদ্দর বেশ নিয়ে একসহস্র-একতম বার কলিকা যে-আলোচনা উত্থাপিত করেছিলো, তাতে তার কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্যমাত্র ছিল না। বুদ্ধির অভিমান থাকাতে বিনা-তর্কে তার ভৎর্সনা শিরোধার্য্য ক'রে নিতে পারিনি। স্বভাবের প্রবর্ত্তনায় মানুষকে এত ব্যর্থ চেষ্টাতেও উৎসাহিত করে। তাই আমিও একসহস্র-একতম বার কলিকাকে খোঁটা দিয়ে বললুম, "মেয়েরা বিধাতার সৃষ্ট চোখটার উপর কালাপেড়ে মোটা ঘোম্‌টা টেনে বাহ্য আচারের সঙ্গে আঁচলের গাঁঠ বেঁধে চলে। মননের চেয়ে মাননেই তাদের আরাম। জীবনের সকল ব্যবহারকেই রুচি ও বুদ্ধির স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সংস্কারের জেনানায় পর্দ্দানশীন করতে পারলে তারা বাঁচে। আমাদের এই আচারজীর্ণ দেশে খদ্দর-পরাটা সেই-রকম মালা-তিলকধারী ধার্ম্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হ'তে চলেছে ব'লেই মেয়েদের ওতে এতো আনন্দ।"

কলিকা রেগে অস্থির হ'য়ে উঠলো। তার আওয়াজ শুনে পাশের ঘর থেকে দাসীটা মনে করলে, ভার্য্যাকে পুরো ওজনের গয়না দিতে ভর্ত্তা বুঝি ফাঁকি দিয়েছে। কলিকা বললে, "দেখো, খদ্দর-পরার শুচিতা যে-দিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা প'ড়ে

যাবে সে-দিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সঙ্গে এক হ'য়ে যায় তখনি সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দৃঢ়বদ্ধ হয় তখনি সেটা হয় সংস্কার, তখন চোখ বুজে কাজ ক'রে যায়, চোখ খুলে দ্বিধা করে না।"

এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আপ্ত বাক্য, তার থেকে কোটেশন-মার্কা ক্ষয়ে গিয়েছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বচিন্তিত ব'লেই জানে।

"বোবার শত্রু নেই" যে-পুরুষ বলেছিলো সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত। কোন জবাব দিলুম না দেখে কলিকা দ্বিগুণ ঝেঁকে উঠে বল্‌লে, "বর্ণভেদ তুমি মুখে অগ্রাহ্য করো অথচ কাজে তার প্রতিকারের জন্য কিছুই করো না। আমরা খদ্দর প'রে প'রে সেই ভেদটার উপর শাদা রং বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণ-ভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।" বল্‌তে যাচ্ছিলুম, "বর্ণভেদকে মুখেই অগ্রাহ্য করেছিলুম বটে যখন থেকে মুসলমানের রান্না মুর্গির ঝোল গ্রাহ্য করেছিলুম। সেটা কিন্তু মুখস্থ বাক্য নয়, মুখস্থ কার্য্য—তার গতিটা অন্তরের দিকে। কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষম্য ঢাকা দেওয়াটা বাহ্যিক, ওতে ঢাকা দেওয়াই হয় মুছে দেওয়া হয় না।" তর্কটা প্রকাশ ক'রে বল্‌বার যোগ্য সাহস কিন্তু হলো না। আমি ভীরু পুরুষ মানুষ মাত্র, চুপ ক'রে রইলুম। জানি আপোষে আমরা দুজনে যে-সব তর্ক সুরু করি কলিকা সেগুলিকে নিয়ে ধোবার বাড়ীর কাপড়ের মতো আছড়িয়ে ক'চলিয়ে আনে তার বাহিরের বন্ধুমহল থেকে। দর্শনের প্রোফেসর নয়নমোহনের কাছ থেকে প্রতিবাদ সংগ্রহ ক'রে তার দীপ্ত চক্ষু নীরব ভাষায় আমাকে বল্‌তে থাকে, "কেমন! জব্দ!"

নয়নের ওখানে নিমন্ত্রণে যাবার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না। নিশ্চয় জানি, হিন্দু-কালচারে সংস্কার ও স্বাধীন বুদ্ধি, আচার ও বিচারের আপেক্ষিক স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকতায় আমাদের দেশকে অন্য সকল দেশের চেয়ে উৎকর্ষ কেন দিয়েছে এই নিয়ে চায়ের টেবিলে তপ্ত চায়ের ধোঁয়ার মতোই সূক্ষ্ম আলোচনায় বাতাস আর্দ্র ও আচ্ছন্ন হবার আশু সম্ভাবনা আছে। এদিকে সোনালি পত্রলেখায় মণ্ডিত অখণ্ডিতপত্রবতী নবীন বহিগুলি সদ্য দোকান থেকে এসে আমার তাকিয়ার পাশে প্রতীক্ষা ক'রছে, শুভদৃষ্টিমাত্র হ'য়েছে, কিন্তু এখনো তাদের ব্রাউন মোড়কের অবগুণ্ঠন মোচন হয়নি, তাদের সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বরাগ প্রতি মুহূর্ত্তে অন্তরে অন্তরে প্রবল হ'য়ে উঠছে। তবু বেরতে হ'লো, কারণ ধ্রুবব্রতার ইচ্ছাবেগ প্রতিহত হ'লে সেটা তার বাক্যে ও অবাক্যে এমন সকল ঘূর্ণিরূপ ধারণ করে যেটা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

বাড়ি থেকে অল্পই একটু বেরিয়েছি। যেখানে রাস্তার ধারে কলতলা পেরিয়ে খোলার চালের ধারে স্থূলোদর হিন্দুস্থানী ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা নানা প্রকার অপথ্য সৃষ্টি হ'চ্ছে, তার সাম্‌নে এসে দেখি বিষম একটা হল্লা। আমাদের প্রতিবেশী মাড়োয়ারিরা নানা বহুমূল্য পূজোপচার নিয়ে যাত্রা ক'রে সবে মাত্র বেরিয়েছে। এমন সময় এই জায়গাটাতে এসে ঠেকে গেলো। শুন্‌তে পেলেম মার্-মার্ ধ্বনি। মনে ভাবলুম কোনো গাঁট-কাটাকে শাসন চ'লছে।

মোটরের শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে উত্তেজিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখি, আমাদের পাড়ার বুড়ো সরকারী মেথরটাকে বেদম মার্‌ছে। একটু আগেই রাস্তার কলতলায় স্নান সেরে সাফ কাপড় প'রে ডান হাতে এক বাল্‌তি জল ও বগলে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিলো। গায়ে চেক-কাটা মেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে; বাঁ হাত ধ'রে সঙ্গে চ'লেছিলো আট নয় বছরের এক নাতি। দুজনকেই দেখ্‌তে সুশ্রী, সুঠাম দেহ। সেই ভিড়ে কারো সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে তাদের ঠেকাঠেকি হ'য়ে থাক্‌বে। তার থেকে এই নিরন্তর মারের সৃষ্টি। নাতিটা কাঁদ্‌ছে আর সকলকে অনুনয় ক'র্‌ছে, দাদাকে মেরো না। বুড়োটা হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌ছে, "দেখতে পাইনি, বুঝ্‌তে পারিনি, কসুর মাফ করো।" অহিংসাব্রত পুণ্যার্থীদের রাগ চ'ড়ে উঠ্‌ছে। বুড়োর ভীত চোখ দিয়ে জল প'ড়ছে, দাড়ি দিয়ে রক্ত।

আমার আর সহ্য হয় না। ওদের সঙ্গে কলহ ক'র্‌তে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্থির ক'র্‌লুম, মেথরকে

আমার নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাবো আমি ধার্ম্মিকদের দলে নই।

চঞ্চলতা দেখে কলিকা আমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। জোর ক'রে আমার হাত চেপে ধ'রে ব'ললে, "ক'রছো কী, ও যে মেথর!"

আমি ব'ললুম, "হোক্ না মেথর, তাই ব'লে ওকে অন্যায় মারবে?"

কলিকা ব'ললে, "ওরি তো দোষ, রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন? পাশ কাটিয়ে গেলে কি ওর মানহানি হ'তো?"

আমি ব'ললুম, "সে আমি বুঝিনে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবোই।"

কলিকা ব'ললে, "তা হ'লে এখনি এখানে রাস্তায় নেবে যাবো। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারবো না—হাড়িডোম হ'লেও বুঝতুম, কিন্তু মেথর!"

আমি ব'ললুম, "দেখছো না, স্নান ক'রে ধোপ দেওয়া কাপড় প'রেছে। এদের অনেকের চেয়ে ও পরিষ্কার।"

"তা হোকনা, ও যে মেথর!" শোফারকে ব'ললে, "গঙ্গাদান, হাঁকিয়ে চ'লে যাও।"

আমারি হার হ'লো। আমি কাপুরুষ। নয়নমোহন সমাজতত্ত্বঘটিত গভীর যুক্তি বের ক'রেছিল,—সে আমার কানে পৌছলো না, তার জবাবও দিই নি। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫। মাদ্রাজ।

রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ

অধ্যাপক শ্রী অনিলকুমার বসু, এম্-এ

[বোম্বাই সহরে নিখিল-ভারত-বিজ্ঞান-সম্মিলনীতে (All-India Science Congress) ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার "A Peculiarity in the Imagery of Dr. Rabindranath Tagore's Poems" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধটিতে সরসীবাবু রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যরাজি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করিয়া যে একটি বিশেষ পরিকল্পনা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিকন্তু, অধুনা সুপরিচিত বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া এই পরিকল্পনার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কোনও কবির কাব্যকে এরূপভাবে বুঝিবার চেষ্টা য়ুরোপে পরিচিত হইলেও আমাদের এ দেশে নূতন; এবং এই নূতন ধারায় সমালোচনার প্রথম পথপ্রদর্শক হইলেন ডাক্তার সরসীলাল সরকার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে এই নূতন দিক্ দিয়া বুঝিবার চেষ্টা আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান হিসাবে এই প্রবন্ধ মূল্যবান মনে করায় এই প্রবন্ধটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার লোভ আমি সম্বরণ করিতে পারি নাই। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কবির কি মত তাহা জানিবার জন্য একদিন সরসীবাবু আমাকে লইয়া কবির নিকট উপস্থিত হইলেন। সেইখানে কবির সহিত আমাদের যে-সব আলাপ-আলোচনা হইল, তাহা এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে কবি নানা মূল্যবান্ জ্ঞাতব্য কথা বলিলেন; এবং সেই উক্তিগুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, কবি এইরূপ বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানমূলক আলোচনাকে কি ভাবে গ্রহণ করেন।]

কবি—এই যে ডাক্তারবাবু, আমাকে নিয়েই টানাটানি আরম্ভ করেছো!

সরসীবাবু—গতবারে যে টানাটানি করেছি শুধু তাই নয়; এবারেও Science Congress-এ যে প্রবন্ধ পড়বো, তাতেও আপনাকে নিয়ে টানাটানি। সে-বিবরটি এই, যে, আপনি দিলীপবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এক

জায়গায় বলেছেন, যে, মানুষের প্রেমের মধ্যে দুটা জিনিষ আছে—তার একটি কামমূলক (Sexual) যার দ্বারা আমরা পশুদের সহিত সমান স্তরে এবং আর একটিকে aesthetic element বলা যেতে পারে। আমি এ বৎসরের প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক উপাদান সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি, যে, এই Love emotion যদি ঠিক ভাবে পরিমার্জ্জিত হয়ে পরিণতি লাভ করে, তা হ'লে ওর মধ্যে যেটি কামমূলক, সেটি ক্রমশঃ কমে নষ্ট হয়ে যায় এবং যেটি aesthetic সেটি ক্রমশঃ বিকাশলাভ করে এবং শেষে artistic প্রভৃতি চারুকলায় পরিণতি লাভ করে।

কবি—তোমরা আমায় Psycho-analysisএর মধ্যে টেনে এনে মহা মুস্কিলেই ফেলেছো, আমি তো ওর কিছু বুঝতে পারিনে। তা ছাড়া তোমরা তোমাদের নিজেদের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বুঝি কিছু দেখ্‌তে শেখনি? যা ফ্রয়েড্‌ বল্‌ছে, তাই একেবারে শিরোধার্য্য ক'রে চলেছো? আমরা যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তি হারিয়ে বসেছি, সে-কথা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই।

সরসীবাবু—আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে এ অপবাদটা আছে এ কথা আমিও স্বীকার করি; এবং ইহা যে অনেকটা দাস-মনোবৃত্তি (Slave mentality)-ঘটিত, তাহাও অনুমান করা যেতে পারে।

কবি—দেখ, এই জগৎ এবং জীবের মধ্যে কতশত বৈচিত্র্য আছে। এইসব বৈচিত্র্যকে প্রত্যেক মানুষ তাদের নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের মতন ক'রে দৃষ্টি করে এবং নিজের জীবনের মধ্যে assimilate ক'রে নেয়। সব মানুষের অনুভূতি সমান নয়। কারও মধ্যে কোনও শক্তি বিশেষভাবে আছে, সে তার নিজের জগৎকে যেরূপ ভাবে গ'ড়ে তোলে, অন্যলোকে হয়তো তা পারে না। সুতরাং এ স্থলে এক ব্যক্তি তার নিজের মনের মধ্যে যেরূপ জগৎ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে, সে-স্থলে অন্য এক ব্যক্তি [যেমন কোনও *Psycho-analyst*] তার ভিন্ন মন দিয়ে কেমন ক'রে সেই প্রথম ব্যক্তির সমস্ত অনুভূতি বুঝতে পারবে?

সরসীবাবু—আমাদের Psycho-analysis বিজ্ঞানানুযায়ী; প্রধানতঃ Sexual-feelingsএর বিশ্লেষণ ধ'রেই মানুষকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়।

কবি—Freudএর Schoolএর সঙ্গে এইখানেই আমার প্রধান ঝগড়া। আমি বলি, sex-instinct একেবারে গোড়ার কথা নয়। আরও গোড়ার কথা হচ্ছে Self-assertion, এই শেষোক্ত instinct Sex-instinct অপেক্ষা বেশী পুরাতন এবং ওতপ্রোতভাবে আমাদের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে রেখেছে। মানুষ জন্মাবার সঙ্গে-সঙ্গেই অহংজ্ঞান (Ego Consciousness) নিয়ে জন্মেছে। প্রতি পদে এই Ego নিজেকে assert করতে চাইছে, হয়তো প্রতিপদে বিফলও হচ্ছে। একটি ছোট শিশু—সেও চায় recognition পেতে—আর সব ভাইএদের মধ্য হ'তে মা তাকেই বিশেষ ক'রে স্নেহ করুক, সেটা না হ'লেই তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তার পর সে যখন Schoolএ যায়, সেখানেও সে চায় মাষ্টারের কাছে, সমপাঠীদের কাছে recognition পেতে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিষটা আরও বেশী ক'রে দেখতে পাওয়া যায়। প্রণয়প্রার্থীরা (Lovers) যেখানে অকৃতকার্য্য হয় সেখানেও তার দুঃখ তার আত্ম-সম্মানে আঘাত লেগেছে ব'লে,—কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি ব'লে নয়। এমন কি, আমি বলি self-preservation এবং self-propagation এই দুটা self-assertion এরই অন্যতম বিকাশ। Ego মরতে চায় না, নিজেকে জীবিত দেখতে চায়—তার সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়ে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি এই sex instinct এরও গোড়ার কথা Ego assertion। এমন কি স্বর্গ-সৃষ্টির পরিকল্পনার মূলেও এই রহস্য রয়েছে। মানুষ যখন দেখে যে, এ জীবনে তার অনেক জিনিষ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, তখন সে মনে মনে সৃষ্টি করলে আর এক কল্পনাজগতের কথা যেখানে সে তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাকে সফলতায় পূর্ণ দেখতে পেলে। এই হ'ল স্বর্গ। অমরত্ববাদের (Theory of Immrotality) মধ্যেও এই কথা রয়েছে। নিজেকে একেবারে মুছে ফেলতে মানুষ কিছুতেই চায় না, তাই সে বলে আমি মরব না, অমর হয়ে রইবো,—এ জগতে নয়, অন্য জগতে।

তার পর সরসীবাবুর প্রবন্ধের মূল বক্তব্যগুলির কথা

স্মরণ ক'রে আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টিগুলিকে—যেমন Shelley, Keats, Brownings এদের lyrics, ballads প্রভৃতিকে sex-instinctএর চরম আদর্শ পরিণতি হিসাবে ধরা যেতে পারে কি না?

কবি—কতকগুলিকে যে বলা যায় তা আমি অস্বীকার করি না। তবে জগতের সব বড় বড় কাব্যসৃষ্টিগুলি তো আর কেবল ballads এবং love lyrics নয়, সুতরাং কেমন ক'রে বলব যে, তাদের মূলও সুতরাং sexinstinct? যেমন ধর Miltonএর Paradise Lost। একে যে sex-instinctএর পরিণত বিকাশ ব'লে গণ্য করা যায় এরূপ মনে হয় না।

আমি—Freud এর মতানুযায়ী sexual feelingsএর বিশ্লেষণ নিয়ে প্রত্যেক মানুষকে বুঝবার চেষ্টার সপক্ষে আমি একটি কথা বল্‌তে চাই। Consistency অথবা coherence সত্য নিরূপক হিসাবে ধরা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাই Freud স্বপ্ন প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে এমন একটি systematic এবং coherent Theory আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির একটি চমৎকার consistent ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, Freud এর Theoryর নীচে অনেকখানি সত্য রয়েছে?

কবি—সাধারণ বিজ্ঞানে যে-সকল বিষয় গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হয়, তার উপাদানগুলিতে একটা কিছু definiteness থাকে যা পরিমাণ করা যায়, বা নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তোমাদের psycho-analysisএর প্রধান উপাদান স্বপ্ন। এই উপাদানগুলিকে কি সাধারণ বিজ্ঞানের উপাদানগুলোর মত নির্দ্দিষ্টভাবে পরিমাণ করা যেতে পারে? To-day and To-morrow seriesএ যে-সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতে Freudএর Theoryকে এই হিসাবেই বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়েছে। স্বপ্নের কোনও self-recording machine নাই যাহা দ্বারা সেগুলো সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হতে পারে। এই ধর ভোরের বেলা যে-স্বপ্ন দেখেছি, যত বেলা হবে সেটা ততই ভুলতে থাক্‌বো। তার পর যদি স্বপ্নের কোনও Theory আমার মনের মধ্যে থাকে তা হ'লে স্বপ্নটি এমনি ভাবে বদ্‌লে যাবে, যেন সেই Theoryটা suit করে। অধিকন্তু যে psycho-analystএর নিকট সে স্বপ্নটা বল্‌বো তিনি তাকে অনেক ভেঙে চুরে নেবেন নিজের Theory suit করবার জন্য।

সরসীবাবু—আর একটা জিনিষ আছে যাকে symbolism বলে। উপনিষদের শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ মন্ত্র আপনার লেখার মধ্যে যেন symbolism হয়েছে এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন? * Symbolism অর্থে যেমন মনে করুন যুদ্ধক্ষেত্রের flag (নিশান)। নিশান একটা কাষ্ঠফলকে জড়ানো বস্ত্রখণ্ড মাত্র। কিন্তু যে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে তারা তো একে সে ভাবে নেয় না। তারা মনে করে এটাই তাদের দেশের সম্মান ও স্বাধীনতার প্রতীক। সেইজন্য মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও তারা পতাকা ধ'রে রাখতে ভীত হয় না। মহাত্মা গান্ধীর চরকা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যেতে পারে। চরকার যে কোনও Economic value নেই এ কথা আপনি সবুজ পত্রে লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী দেশের সম্মুখে এই চরকা তাঁর Economic সমস্যা সমাধান হিসাবে উপস্থাপিত করেননি; বিদেশী বর্জ্জন ক'রে দেশী দ্রব্য ব্যবহার করবো, দেশের দরিদ্র শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবো, এই সকলের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাল, গান ও গতি, যাহা 'মানসী' তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের বক্তব্য, সেগুলি কি শান্তম, শিবম্, অদ্বৈতম্ মন্ত্রের প্রতীক (symbol) স্বরূপ আপনার মনের মধ্যে নাই?

কবি—তোমার ব্যাখ্যা যে সম্ভব হতে পারে তা আমি অস্বীকার করি না। উপনিষদের এই মন্ত্র আমারও জীবনের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র নিয়ে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় বহুবার অনেক কথাই লিখেছি। সুতরাং ইহার আভাস যে আমার কবিতাগুলির মধ্যেও থাকবে তা কিছুই বিচিত্র নয়। তবে আমি যে সর্ব্বদাই ঐ মন্ত্র স্মরণ ক'রে লিখে

* মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকার ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়—রবীন্দ্র-কাব্যে পরিকল্পনায় একটি বিশেষত্ব শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গেছি, একথা মনে করলে ভুল করা হ'বে। Symbols এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রত্যেক মানুষই তার জীবনে একটা কিছু লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য ঠিক ক'রে রাখে, যাকে সে উপলব্ধি করবে। যাহাতে আমরা এই লক্ষ্য ভুলে না যাই, তাকেই সহজভাবে মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা রয়েছে এই symbol সৃষ্টির মধ্যে। জাপানে কচি গাছের ডালকে স্বর্গের symbol স্বরূপ ব্যবহৃত হ'তে দেখেছি। কিন্তু জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্যেই যদি আমরা এই symbol দেখবার চেষ্টা করি, তাহ'লে ভুল হ'বে। symbolকে কেন্দ্র ক'রে মানুষের জীবনের পরিধি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে; এবং সেগুলির মধ্যে symbolকে হয়তো ঠিক ভাবে নাও দেখ্‌তে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা ব'লে সেগুলিকে অবান্তর ব'লে উড়িয়ে দেব না, কারণ তাহ'লে জীবনের অসীম বৈচিত্র্যকে ভুলে যাওয়া হ'বে।

সরসীবাবু—Mysticism জিনিষটা কি আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন।

কবি—দেখ, mystic যে শুধু আমি তা নয়; অল্পবিস্তর সব কবিই mystic। এই mysticism বুঝাতে আমি geniusএর কথা বলব। Geniusএর মধ্যে দুটো element থাকে; তার একটি universal, অপরটি unique এবং individual। মনে কর, আমি একটি কবিতা লিখলাম; সেই কবিতা প'ড়ে একজন পাঠক অনুভব করলে যে, আমি কবিতার মধ্যে যে-কথা বলেছি তা স যদিও প্রথমে স্পষ্ট ক'রে অনুভব করেনি, তবুও যেন এটি তার ভিতরের কথা। এর অর্থ কি? আমি বলি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একটা universal জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে; কিন্তু কোনও একটি বিশেষ মানুষের মধ্য দিয়ে এই জ্ঞান বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়; এটাই হ'ল mysticism—geniusএর uniqueness and individuality এই খানেই। ইহা কিরূপ? যেমন এই মাটির নীচে দিয়ে একটি universal জলের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে; কিন্তু সেটি যখন একটি বিশেষ ছিদ্র দিয়ে নির্গত হয় তাহার নাম দিই আমরা ফোয়ারা। Geniusএর মধ্যে এই individual elementটি যখন খুব বেশী থাকে তাকে আমরা চল্‌তি কথায় পাগ্‌লামি বলি। এই mysticism যোগসাধনা অথবা গভীর concentrationএর দ্বারাও লাভ করা যেতে পারে।

সরসীবাবু—এই mystic সাধকদের মধ্যে একরূপ জ্যোতির্দর্শনের কথা অনেক স্থলেই দেখা যায়। আপনার কবিতার মধ্যেও এই জ্যোতির্দর্শনের কথার উল্লেখ আছে। এই জ্যোতির্দর্শন ব্যাপারটি কিরূপ?

কবি—এই জ্যোতির্দর্শনের physiological এবং psychological ভাবে কি অর্থ তাহা আমি বল্‌তে পারি না; তবে ব্যাপারটি আমার যেরূপ বোধ হয়েছে তোমায় বল্‌ছি। আমাদের মনের আকাশ নিয়তই নানারূপ আবর্জ্জনায় অন্ধকারময় এবং ঘোলাটে হ'য়ে আছে; কিন্তু যদি আমরা মনকে কোনওরূপে শান্ত ও সংযত করতে পারি, তা হ'লে সেই সমস্ত আবর্জ্জনা অপসারিত হয়ে যায় এবং মনের স্বাভাবিক নির্ম্মলতা ও স্বচ্ছতা ফিরিয়ে পাই। মনের সেই স্বচ্ছতাই আমরা জ্যোতিরূপে অনুভব করি; এবং সেই সঙ্গে আমরা বিমল আনন্দও অনুভব করি; এবং যতক্ষণ এই আনন্দ অনুভব করি, ততক্ষণ যেন আমরা মুক্ত।

মানবসৃষ্টি ও বর্ণাশ্রম

(বৌদ্ধ অগগ্ন সুত্তান্ত হইতে সঙ্কলিত)

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কোন সময় বুদ্ধদেব কিছুকাল শ্রাবস্তী নগরের নিকটে একটি উদ্যানবাটিকায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ নামক দুইজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষু হইবার মানসে সেই স্থানে বাস করিতেন। অপরাহ্নকালে সূর্য্যাস্তের সময় ধ্যান সমাপন করিয়া তথাগত বাটীর সম্মুখে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছিলেন।

বশিষ্ঠ ভরদ্বাজকে কহিলেন, "আইস, আমরা প্রভুর সমীপে গমন করি, ভাগ্যক্রমে হয়ত তাঁহার মুখে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শুনিতে পাইব।"

তাঁহারা দুই জনে বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাদ-চারণ করিতে লাগিলেন।

বুদ্ধদেব বশিষ্ঠকে কহিলেন, "তোমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, গৃহত্যাগ করিয়া গৃহশূন্য জীবন অবলম্বন করিয়াছ। এ কারণে ব্রাহ্মণেরা তোমাদিগের নিন্দা ও তোমাদিগকে কটুক্তি করে না?"

"হাঁ প্রভু, ব্রাহ্মণেরা আমাদের নিন্দা করে ও কটুকথা বলে ও অনেক গালি দেয়।"

"কি বলিয়া তোমাদের নিন্দা করে?"

"তাহারা বলে, সমাজে কেবল তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাতি, অপর সকল জাতি হীন। কেবল তাহারা গৌরবর্ণ, অপর সকলে কৃষ্ণবর্ণ। কেবল তাহাদের বংশ বিশুদ্ধ, অপর জাতির নয়। শুধু তাহারাই ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মার ঔরসজাত, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ব্রহ্মার বংশধর। আমাদিগকে বলে,' তোমরা এমন কুল ত্যাগ করিয়া নীচ-শ্রেণীতে মিশিয়াছ—মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসী, নীচজাতীয় ধনী, কৃষ্ণবর্ণ জাতি, ব্রহ্মার পদজাত ঘৃণিত শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এমন কর্ম্ম তোমাদের পক্ষে উত্তম হয় নাই, নিজের উচ্চবংশ ত্যাগ করিয়া কেশশ্মশ্রু-বর্জ্জিত ভিক্ষুসমূহ, কৃষ্ণকায়, আমাদের পদানত দাসগণতুল্য নীচ দলে প্রবেশ করিয়াছ। এইরূপ আমাদের অনেক নিন্দা করে।"

বুদ্ধদেব কহিলেন, "বশিষ্ঠ, ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন কথা নিশ্চিত বিস্মৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণীদিগের সন্তানাদি হইয়া থাকে, তাহারা সন্তান প্রসব করে ও লালনপালন করে। এইসকল গর্ভজাত ব্রাহ্মণেরাই আবার বলে তাহারা যথার্থই ব্রহ্মার সন্তান, তাঁহার মুখ হইতে সমুৎপন্ন, তাঁহা-রই সৃষ্ট, তাঁহারই বংশধর। এমন কথায় ব্রহ্মার স্বভাবকে বিদ্রূপ করা হয়। ইহা মিথ্যা কথা এবং ইহাতে পাপ হয়।

"বশিষ্ঠ, সমাজে চারি শ্রেণী আছে। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র। হয়ত কোন ক্ষত্রিয় হত্যা করে, কিম্বা চুরি করে, অসচ্চরিত্র, মিথ্যা কথা কহে, পরনিন্দা করে, কটুকথা বলে, লোভী, দুষ্টপ্রকৃতি অথবা ভ্রান্ত মতাবলম্বী। আর্য্যের অনুপযুক্ত সকল প্রকার দোষ তাহাতে আছে। আবার কোনও ব্রাহ্মণ, বৈশ্য অথবা শূদ্রেও এইসকল দোষ লক্ষিত হইতে পারে। অপর পক্ষে, এমন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের এসকল দোষ নাই।

ভাল মন্দ উভয় গুণ সকল জাতিতেই আছে, অতএব ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না। এই চারি জাতির মধ্যে যে-কেহ ভিক্ষু শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে অথবা অর্হৎ পদবী লাভ করিয়াছে, যে-কেহ পাপ বিনাশ করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছে, কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে, ভার নামাইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে, পুনর্জন্মের শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়াছে এবং জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ।

"এই সাম্য ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা করিতে হয়? ইহার দৃষ্টান্ত দেখ। কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ অবগত আছেন যে,

তাঁহার রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী শাক্যবংশ হইতে শ্রমণ গৌতম (বুদ্ধদেব) সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শাক্যগণ রাজা প্রসেনজিতের করপ্রদ। তাঁহাকে দেখিলে তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করেন, সকল প্রকার সম্মান প্রদর্শন করেন। শাক্যগণ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান করেন রাজা প্রসেনজিৎ তথাগতকে তদ্রূপ সম্মান করেন। তিনি নিজের মনে বলেন, 'শ্রমণ গৌতমের কি সদ্বংশে জন্ম নয় তাহা হইলে আমিও সদ্বংশ-জাত নহি। তিনি (গৌতম) বলবান আমি দুর্ব্বল। তিনি প্রিয়দর্শন, আমি কুৎসিত। তাঁহার বহু প্রতিষ্ঠা, আমার যৎসামান্ত।' রাজা যথার্থ সাম্যতত্ত্ব বুঝিতে পারেন বলিয়াই তথাগতকে এরূপ সম্মান করেন, তাঁহাকে দেখিলে আসন ত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

"বশিষ্ঠ, তোমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে, ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, গৃহ হইতে গৃহশূন্ত আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছ। যদি কেহ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা কে?' উত্তরে তোমরা কহিবে, 'আমরা শ্রমণ, আমরা শাক্য সন্তানকে অনুসরণ করি।' দেখ, বশিষ্ঠ, তথাগতের প্রতি যাহার বিশ্বাস স্থির, দৃঢ়, বদ্ধমূল হইয়াছে, যে বিশ্বাস-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার অথবা ব্রহ্মা অথবা জগতে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, সেই যথার্থ বলিতে পারে যে সে মহতের সন্তান, মহতের মুখোৎপন্ন। যে ধর্ম্ম অবলম্বন করে সেই শ্রেষ্ঠ।

"বশিষ্ঠ, বহু কাল অতীত হইলে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন এই জগৎ লুপ্ত হয়। তখন জীবগণের জ্যোতির্লোকে পুনর্জন্ম হয়। তাহারা মানস-গঠিত, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দ আহার করে, শূন্তে ভ্রমণ করে, আলোকে বাস করে। এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে আবার এই জগতের বিকাশ হয়। জ্যোতির্লোক হইতে দেহ ত্যাগ করিয়া জীবসমূহ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় কিন্তু তাহাদের প্রকৃতিতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, জ্যোতির্লোকে যেরূপ ছিল ইহ-জগতেও সেইরূপ থাকে। সে-সময় জগৎ জলপূর্ণ, অন্ধকার, এমন অন্ধকার যে অন্ধ করিয়া দেয়। চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ ছিল না, তারকা বা নক্ষত্রপুঞ্জ ছিল না, দিবা-রাত্রের বিভাগ, মাস পক্ষ, বৎসর ঋতু, পুরুষ রমণী কিছুই ছিল না। জীব কেবলমাত্র জীব ছিল। ক্রমে সেই সর্ব্বব্যাপী জলরাশির উপর সুগন্ধ সুস্বাদু মৃত্তিকা দেখা দিল। চাউল সিদ্ধ করিলে যেমন জলে ফেন উঠে সেইরূপ ধরণী উঠিল। মৃত্তিকার বর্ণ উত্তম ঘৃত অথবা নবনীতের ন্তায়। স্বাদ মধুমক্ষিকাকৃত সঞ্চিত মধুর ন্তায় মিষ্ট।

"কোন লুব্ধ জীবন সেই মৃত্তিকা দেখিয়া কহিল, 'ইহা কি?' এবং অঙ্গুলিতে তুলিয়া মুখে দিল। সেই স্বাদ অনুভব করিয়া তাহার লোভ বাড়িল ও তাহার দেখা-দেখি আর সকলেও মৃত্তিকার আস্বাদ গ্রহণ করিল। তাহার পর যদৃচ্ছাক্রমে সকলে পর্য্যাপ্ত ভোজন করিতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের অঙ্গের জ্যোতি ম্লান হইয়া লুপ্ত হইল। তখন চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ হইল ; ক্রমে নক্ষত্র ও তারকাপুঞ্জ আবির্ভূত হইল। দিন রাত্রি, পক্ষ মাস, ঋতু বৎসরের পর্য্যায় আরম্ভ হইল।

"এই রূপে দীর্ঘ কাল পর্য্যবসিত হইল। সেই সুস্বাদু মৃত্তিকা আহার করিতে করিতে জীবের সূক্ষ্ম মানস দেহ তিরোহিত হইল, শরীর স্থূল ও কঠিন হইল, এবং বর্ণে, আকারে ও রূপে তারতম্য দেখা দিল। কতকগুলি জীব দেখিতে সুন্দর, কতক কুৎসিত। যাহারা সুন্দর তাহারা অপরকে ঘৃণা করিতে লাগিল। সৌন্দর্য্য-অভিমানে কতক জীব গর্ব্বিত হওয়াতে সেই সুস্বাদু মৃত্তিকা অন্তর্হিত হইল। তখন সকল জীব শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল, 'হায়, সে স্বাদ কি হইল, সে মিষ্টতা কোথায় গেল!' লোকে যখন কোনও স্বাদু সামগ্রীর আস্বাদ পাইয়া বলে, 'আহা, কি আস্বাদ, কেমন মিষ্টতা!' তখন তাহারা অজ্ঞাতে সেই পূর্ব্ব স্মৃতির অনুসরণ করে।

"বশিষ্ঠ, সুভক্ষ্য মৃত্তিকা অপসৃত হইলে পর সাধারণ ভূমিতে ছত্রকের ন্তায় গুল্ম উৎপন্ন হইল। তাহাও সুস্বাদ ও সুমিষ্ট। সেই ছত্রক আহার করিয়া জীবের দেহ আরও পরিবর্ত্তিত হইল, সুন্দরে ও কুৎসিতে আরও প্রভেদ হইল, সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব আরও বাড়িল। তাহার ফলে ছত্রক অদৃশ্য হইল এবং তাহার পরিবর্ত্তে কোমল, আহারের উত্তম উপযোগী লতাসমূহ সমুৎপন্ন হইল। কিন্তু জীবের প্রকৃতির বিকার বাড়িতে লাগিল, তাহাতে লতাও নিঃশেষ হইয়া গেল। জীবগণ পূর্ব্বের ন্তায় অনুতাপ করিতে

লাগিল, 'আমাদের এমন লতা ছিল, কোথায় গেল! হায়, হায়, আমরা কি হারাইলাম!' এখনও যে লোকে হারান সামগ্রীর জন্য শোক করে তাহাও পূর্ব্বস্মৃতি।

"তাহার পর মাঠে চাউল জন্মিল। ধান নয়, কেন না চাউলে খোসা ছিল না, গুঁড়া ছিল না, পরিষ্কার, সুগন্ধ চাউল। আহারের জন্য প্রাতে চাউল তুলিলে সন্ধ্যার সময় আবার আপনা আপনি চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকিত। চাউল আহার করিতে করিতে জীব স্ত্রী পুরুষ স্বভাব সম্পন্ন হইল। পুরুষ রমণীর প্রতি ও রমণী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ইহাতে অপর জীবেরা বিস্মিত ও কুপিত হইয়া কহিতে লাগিল, 'এ কিরূপ আচরণ! এ কিরূপ ব্যবহার।' এই বলিয়া তাহারা ধূলি, বালি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এখন পর্য্যন্ত কোন কোন দেশে বিবাহের পর বরবধূর প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করে। ইহাও পূর্ব্বস্মৃতি ও প্রাচীন প্রথা।

"এই সময় বাসের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ হইল। যতকাল মানবদেহ সূক্ষ্ম ছিল, স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদ ছিল না, ততকাল বাসস্থানের প্রয়োজন হয় নাই। এখন গৃহস্থ আশ্রম আরম্ভ হইল। ইহাদের মধ্যে কোন অলস মানব ভাবিল, 'আহারের জন্য দুইবেলা চাউল সংগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন? একেবারে ত দুইবেলার উপযোগী তুলিয়া আনিলে হয়!' সে তাহাই করিল, তাহার পর যখন অপর লোকে তাহাকে ডাকিতে আসিল, কহিল, 'চল, আমরা চাউল সংগ্রহ করিতে যাই'; তখন সে বলিল, 'আমি দুই বেলার মত তুলিয়া রাখিয়াছি, আমি যাইব না।' অপর সকলে মনে মনে বলিল, 'বটে, এ ব্যক্তি বড় সেয়ানা!' তাহারা গিয়া দুই দিনের উপযোগী চাউল সংগ্রহ করিল। এইরূপে আহার্য্য-সংগ্রহ-প্রথা আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে চাউলের আকার পরিবর্ত্তিত হইল, ধান জন্মিতে লাগিল ও চাষের আবশ্যক হইল। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মানবেরা শোক করিতে লাগিল।

"অতঃপর চাষ করিবার জন্য সকলে জমী পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ভাগ করিয়া লইল। চাষের সময় হয়ত কোন লোভী ব্যক্তি অপরের ভূমিখণ্ড অপহরণ করিল। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া অপর লোকে কহিল, 'দেখ, তুমি বড় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ, ভবিষ্যতে এরূপ আর করিও না।' সে বলিল, 'না, এমন কর্ম্ম আর করিব না।' কিন্তু সুযোগ পাইয়া দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সেইরূপ করিল। প্রথমে অপরাধ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিল। ক্রুদ্ধ হইয়া লোকে তাহাকে প্রহার করিল। এইরূপে চুরি, মিথ্যা কথা, ক্রোধ ও শাস্তি জগতে আরম্ভ হইল। তখন সকলে একত্র হইয়া পরামর্শ করিল। কহিতে লাগিল, 'আমাদের দোষেই এরূপ হইতেছে। আইস, আমরা এক ব্যক্তির হস্তে অপরাধ বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করি, সে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিবে, প্রয়োজন হইলে নির্ব্বাসন দণ্ড দিবে। ইহার পরিবর্ত্তে সে-ব্যক্তিকে আমরা আমাদের চাউল হইতে কিছু কিছু অংশ দিব।'

"সকলে মিলিয়া তাহাদের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা রূপবান্, গুণশালী ও ক্ষমতাপন্ন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'শুন, যাহার প্রতি ক্রোধ করা আবশ্যক তুমি করিবে, শাস্তি দিতে হয় তুমি দিবে, নির্ব্বাসন করিতে হয় তুমি করিবে। এই কর্ম্মের পরিবর্ত্তে আমরা তোমাকে তণ্ডুলের অংশ দিব।' সে ব্যক্তি এই প্রস্তাবে সম্মত হইল।

"বশিষ্ঠ, যাহাকে লোকে একমত হইয়া এইরূপে নির্ব্বাচিত করে তাহাকেই মহাসম্মত বলে (সূর্য্যবংশীয় প্রথম ক্ষত্রিয় রাজার নাম মহাসম্মত)। ক্ষত্রিয় অর্থে চাষভূমির-(ক্ষেত্র) প্রভু। প্রথমে মহাসম্মত, তাহার পর ক্ষত্রিয়, এইরূপে ভিন্ন ব্যক্তিসূচক শব্দের আরম্ভ হইল। রাজা শব্দের অর্থ কি? যিনি সাম্যধর্ম্ম পালন করিয়া অপর সকলকে মুগ্ধ করেন। ক্ষত্রিয়শ্রেণী এইরূপে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে জীবদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। আবার কতক লোকের মনে হইল, 'চুরি, মিথ্যাকথা, নিন্দা বড় গর্হিত আচরণ, আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিব।' এই শ্রেণীর লোকেরাই ব্রাহ্মণ হইল। তাহারা নির্জ্জন উপবনে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইল। কোথায় গেল গৃহস্থালীর অগ্নি, ধান ভানিবার উদূখল! রাজধানী হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনিয়া কুটীরে বসিয়া ধ্যান করে। দেখিয়া লোকেরা বলিল, 'ইহারা অগ্নি জ্বালে না, চাউল প্রস্তুত করে না, স্থানান্তর হইতে অন্ন সংগ্রহ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করে।' এইরূপে ধ্যান

ও ধ্যানী শব্দ প্রচলিত হইল। আবার ইহাদের মধ্যে কতক লোক এরূপ নির্জ্জনে বাস করিতে না পারিয়া গ্রাম ও নগরপ্রান্তে বাস করিয়া গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইল। ইহারাই অধ্যাপক নামে পরিচিত হইল। আদি-কালে ব্রাহ্মণে ও অপর শ্রেণীতে কোন প্রভেদ ছিল না।

বিবাহাদি করিয়া যাহারা গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করিল তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বিবিধ ব্যবসা উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিল। ইহারাই বৈশ্যনামে অভিহিত হইল। আবার যাহারা জীবন ধারণের জন্য মৃগয়া অথবা কোন কোন সামান্য উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিল, তাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে আদিমকালে কোনরূপ বর্ণ বা জাতিবিভাগ ছিল না, যাহারা যেরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল সেই অনুসারে তাহাদের জাতি নির্দ্দেশ হইল। শূদ্রদিগের বৃত্তি হীন বলিয়াই তাহাদিগকে লুব্ধ ক্ষুদ্র শূদ্র বলে।

"কালক্রমে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণী হইতে কিছুসংখ্যক লোক সংসার ত্যাগ করিয়া গৃহশূন্য হইল। এই চারি বিভাগ হইতেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হইয়াছে, সুতরাং পুরাকালে জাব একজাতীয় ছিল। আবার চারি জাতি হইতে যাহারা বাচিক, মানসিক অথবা প্রকাশ্যভাবে দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইল, তাহারা পতিত হইয়া জন্মান্তরে নরকে গমন করিল। অপর পক্ষে যাহারা সৎপথে রহিল, বাক্যে মনে ও ক্রিয়ায় শুদ্ধ আচরণ করিল, তাহারা মৃত্যুর পর দিব্যলোকে জন্মগ্রহণ করিল। যাহারা সৎ ও অসৎ, উভয়বিধ কর্ম্ম করিল, তাহারা পরজন্মে সুখ ও দুঃখ দুই-ই ভোগ করিল। এই চারি জাতির মধ্যে যে-কেহ কর্ম্মে, বাক্যে এবং মনে আত্মসংযম করিবে, জ্ঞানের সকল পক্ষ অবলম্বন করিবে সে ইহজীবনেই সকল প্রকার ক্লেশ হইতে পরিনির্বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

"হে বশিষ্ঠ! এই চারি শ্রেণী হইতে যে-কোন ব্যক্তি ভিক্ষু হইয়া ক্রমে অর্হৎ অবস্থায় সমুন্নত হয়, সর্ব্বপ্রকার মোহ বিনাশ করে, যে-কর্ত্তব্য সমুচিত পালন করে, যে-ভার নামাইয়াছে, যে-নিজের মুক্তি লাভ করিয়াছে, যে-পুনর্জন্মের শৃঙ্খল ছেদন করিয়াছে, যে-পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইয়াছে, মানবকুলে সেই শ্রেষ্ঠ।"

গীতার আত্ম-তত্ত্ব

শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ

বেদান্ত শাস্ত্রের তিনটি স্তর—

(১) প্রাচীন উপনিষৎ

(২) ব্রহ্মসূত্র, এবং

(৩) ভগবদ্‌গীতা।

এই সমুদায়ের মধ্যে উপনিষৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক; কিন্তু গীতাই অধিক প্রচলিত এবং অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। প্রকৃতপক্ষে গীতাও সহজবোধ্য নহে। 'আত্মা কি', 'ব্রহ্ম কি', 'জগৎ কি'—এই সমুদায় বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। গীতার প্রকৃত মত কি, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে এবং ইহা নির্ণয় করিবার জন্য লোকের তত আগ্রহও নাই। গীতার কি-প্রকার ব্যাখ্যা করিলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতকে সমর্থন করা যায়, সেই বিষয়েই অধিকাংশ লোকের আগ্রহ। কিন্তু আমরা কোন সাম্প্রদায়িক মতকে সমর্থন করিবার জন্য চেষ্টা করিব না। গীতাকার কি উদ্দেশ্যে গীতা রচনা করিয়াছেন এবং তিনি নিজে কি মত পোষণ করিতেন, তাহাই আমরা ব্যাখ্যা করিব। আমাদের আলোচ্য বিষয় গীতার 'আত্ম-তত্ত্ব'।

লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য

যে-ঘটনা অবলম্বন করিয়া গীতাকার গীতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক কি ন.,আমরা সে-বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। ইহা ঐতিহাসিক না হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাটি এই :—

যুদ্ধ করিবার জন্য পাণ্ডবগণ ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। যুদ্ধারম্ভের আর বিলম্ব নাই। এমন সময়ে অর্জ্জুন বলিলেন—আমি যুদ্ধ করিব না ; জ্ঞাতিক্ষয় কুলক্ষয় ও ধর্ম্মক্ষয় করিয়া আমি জয় চাহি না, রাজ্য চাহি না।

গীতাকার উপলক্ষ্য করিয়াছেন এই ঘটনা, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা।

(১)

আত্মার স্ব-রূপ

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, 'আমি যুদ্ধ করিব না'। এই বলিয়া তিনি শশর-ধনু ত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, আত্মার মৃত্যু নাই, দেহের বিনাশে আত্মার কোন ক্ষতি হয় না। কৃষ্ণের ভাবা এই :—

'আমি কখন ছিলাম না এমনও নহে,তুমি কখন ছিলে না এমনও নহে, আর এই রাজগণও ছিলেন না এমনও নহে এবং ইহার পরে আমরা কখন থাকিব না এমনও নহে। ২।১২।

'দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা, তেমনি আত্মার পক্ষেও দেহান্তর ধারণ' ।২।১৩

ইহার দুইশ্লোক পরে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

'অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই এবং সৎ বস্তু অস্তিত্ববিহীন নহে'। ২।১৬

ইহার পরের ৯টি শ্লোক এই :—

"যিনি এই সমুদায় ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিও। কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ করিতে পারে না। ২।১৭

শরীরী নিত্য অবিনাশী, অপ্রমেয়, তাঁহার এই সমুদায় দেহ নশ্বর। ২।১৮

যে ইঁহাকে হন্তা বলিয়া মনে করে এবং যে ইঁহাকে হত বলিয়া মনে করে, তাঁহারা উভয়ই প্রকৃত তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ। ইনি হত্যাও করেন না এবং হতও হয়েন না। ২।১৯

ইনি কখন জন্মেনও না মরেনও না ; কিংবা ইনি উৎপন্ন হইয়া আবার অস্তিত্ব-বিহীন হইবেন, তাহাও নহে। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীর হত হইলেও ইনি হত হয়েন না। ২।২০

যিনি ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া জানেন, হে পার্থ, তিনি কিরূপে কাহাকে হনন করাইবেন বা হনন করিবেন ? ২।২১

নর যেমন জীর্ণবস্ত্রসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতনবস্ত্র সমূহ পরিধান করে তেমনি দেহী (অর্থাৎ দেহধারী আত্মা) জীর্ণ শরীরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নব দেহ ধারণ করেন। ২।২২

শস্ত্র ইঁহাকে ছেদন করিতে পারে না, পাচক ইঁহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইঁহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ২।২৩

ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু (=স্থির-স্বভাব) অচল এবং সনাতন।২।২৪

ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকারী—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া তোমার অনুশোচনা করা উচিত নহে।২।২৫

হে ভারত! নিত্য, অবধ্য দেহী (অর্থাৎ দেহ-ধারী আত্মা) সকলের দেহে বর্ত্তমান। সুতরাং ভূত-সমূহের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে।" ।২।৩০

নরহত্যার ভয়ে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, 'আমি যুদ্ধ করিব না'। এই বিষয়ে অর্জ্জুনের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্যই কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশ। উপদেশের ভাবার্থ এই যুদ্ধে দেহের বিনাশ হইতে পারে, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না। আবার এই দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও শোক করিবার কিছু নাই। এদেহের অবসানে আত্মা আর-একটি দেহ ধারণ

করিবে। সুতরাং যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার কোন কারণ নাই।

সুতরাং এস্থলে যে-আত্মার কথা বলা হইল তাহা জীবেরই আত্মা।

এখন পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক এই আত্মার প্রকৃতি কি।

১। অনাদি, অনন্ত

মানবের জন্ম আছে, মৃত্যুও আছে। কিন্তু আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই (২০)। সাধারণ লোকে মনে করিতে পারে যে, এমন এক সময় ছিল যখন আত্মা ছিল না; নির্দ্দিষ্ট এক সময়ে ইহার উৎপত্তি হয়, তাহার পরে কিছু দিন জীবন ধারণ করে, তাহার পরে আবার বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গীতাকার বলিতেছেন, এ মতও সত্য নহে (২০)। বর্ত্তমান কালে যাহারা জীবিত, তাহারা অতীতকালে ছিল না বা ভবিষ্যৎ কালে থাকিবে না, এ মতও সত্য নহে (১২)। দেহ ধারণ করিবার পূর্ব্বেও আত্মা ছিল, দেহত্যাগের পরেও আত্মা থাকিবে (১৩, ২২)।

সুতরাং এই এই আত্মা অনাদি ও অনন্ত।

২। অজ, অবিনাশী

অনেক স্থলে বলা হইয়াছে, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। ইহার অর্থ আত্মা অজ ও অবিনাশী। আবার অনেক স্থলে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, 'আত্মা অজ (২।২০,২১) এবং অনাশী (২।১৮) ও অবিনাশী (২।১৭,২১)।

৩। নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ

এই আত্মা নিত্য (২।২০,২১,২৪), শাশ্বত (২।২০) পুরাণ (২।২০), এবং সনাতন (২।২৪)।

অপর এক অধ্যায়ে পরমাত্মার জীবভূত অংশকে সনাতন বলা হইয়াছে (১৫।৭)।

এদেশের একটি প্রাচীন মত এই যে 'সৎ' বস্তুর বিনাশ নাই এবং 'অসৎ' বস্তুর অস্তিত্ব নাই, গীতাকারও এই মতই প্রচার করিয়াছেন (২।১৬)।

প্রথমে দেখা যাউক 'সৎ' এবং 'অসৎ' এই দুইটি শব্দের মৌলিক অর্থ কি। উভয় শব্দই 'অস্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। অস্ ধাতুর অর্থ 'থাকা'। যাহা আছে তাহাই 'সৎ', যাহা নাই তাহাই 'অসৎ'। সদ্বস্তু বলিলেই বুঝিতে হইবে 'অস্তিত্ববান্ বস্তু'; আর 'অসৎ বস্তু*' বলিলেই বুঝিতে হইবে "অস্তিত্ববিহীন বস্তু*"। যেমন 'ধনী' বলিলেই বুঝিতে হইবে, 'ইহার ধন আছে'; 'নির্ধন বলিলে বুঝিতে হইবে 'ইহার ধন নাই'।

'অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই' কিংবা 'সৎ বস্তুর অস্তিত্ব আছে'—এ সমুদায় উক্তি পুনরুক্তি-দোষদুষ্ট। 'অসৎ বস্তু'র অর্থই 'অস্তিত্ববিহীন বস্তু'। সুতরাং 'অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই'—এই উক্তির অর্থ অস্তিত্ববিহীন বস্তুর অস্তিত্ব নাই'। 'সৎ বস্তু'র 'অর্থই অস্তিত্ববান্ বস্তু'। সুতরাং 'সৎ বস্তুর অস্তিত্ব আছে' এই বাক্যের অর্থ 'অস্তিত্ববান বস্তুর অস্তিত্ব আছে'। 'নির্ধন ব্যক্তির ধন নাই' বা 'ধনী ব্যক্তির ধন আছে' এপ্রকার বলাও যাহা, 'অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই' এবং 'সৎ বস্তুর অস্তিত্ব আছে' এপ্রকার বলাও তাহাই।

তবে কেন যে পুনরুক্তি করা হইল, তাহার যথেষ্ট কারণও আছে। লোকে সহজে সব কথা বুঝে না, তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্যই প্রত্যেক বাক্যে একই কথা দুইবার বলা হইয়াছে।

গীতাকার 'সৎ' ও 'অসৎ' বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে আরও কিছু গভীর তত্ত্ব আছে। তাঁহার মতে যাহা 'সৎ' তাহা নিত্যই 'সৎ', আর যাহা অসৎ তাহা নিত্যই 'অসৎ'। কেহ কেহ মনে করেন, "এই জগৎ এখন 'সৎ', কালে ইহা 'অসৎ' হইবে"। কিন্তু গীতাকার এপ্রকার মত গ্রহণ করেন নাই। এই জগৎ যদি কখনও অসৎ হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে ইহা এখনও অসৎ। সৎ কখন অসৎ হয় না এবং অসৎও কখন সৎ হয় না। ইহা বুঝাইবার জন্যই গীতাকার বলিয়াছেন—

* যাহার বিষয়ে কিছু বলা হয়, তাহাকেই এস্থলে 'বস্তু' বলা হইয়াছে। লোকে যাহাকে 'অবস্তু' বলে, তাহারও সংজ্ঞা এস্থলে 'বস্তু'।

"না সতো বিদ্যতে ভাবো,
না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

২।১৬

অর্থাৎ অসতের ভাব (= সত্তা) নাই এবং সতের অভাব (অসত্তা) নাই।

সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মা নিত্য শাশ্বত, পুরাণ এবং অজ ও অবিনাশী।

৪। অব্যয়, অবিকারী

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে আত্মাকে সৎ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ ও অবিনাশী বলিলেই স্বীকার করিতে হয় যে, এই আত্মা অব্যয় ও অবিকারী।

কোন একটি অবস্থার পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলেই সেই অবস্থার বিনাশ স্বীকার করা হয়।

মনে কর একটা বস্তু শুভ্র এবং এই শুভ্র বস্তুটি পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্যামরূপ ধারণ করিল। পূর্ব্বে শুভ্রতা ছিল, এখন সে শুভ্রতা নাই। শুভ্রতা স্থায়ী হয় নাই, ইহা বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমে শুভ্রতার বিনাশ, তাহার পরে শ্যামরূপের আবির্ভাব। এইরূপ যে-স্থলে পরিবর্ত্তন, সেই স্থলেই বিনাশ। কোন অবস্থার বিনাশ স্বীকার না করিলে, পরিবর্ত্তন আসিতে পারে না। অধ্যাত্ম জগতেও এই-প্রকার। যদি আত্মার বিকার বা পরিবর্ত্তন স্বীকার করা হয় তাহা হইলে স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, আত্মার পূর্ব্বরূপ বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আত্মার স্বরূপ অবিনাশী; সুতরাং আত্ম-স্বরূপের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। আত্মার স্বরূপ নিত্য ও শাশ্বত—ইহা হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন নাই, ইহা অব্যয় ও অবিকারী। বহুস্থলে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, আত্মা অব্যয় (২।১৭, ২১), অবিকারী (২।২৫) এবং স্থাণু (= স্থির) ও অচল (২।২৪)।

অন্য অধ্যায়েও 'শরীরস্থ' আত্মাকেই 'অব্যয়' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১৩।৩১ কিংবা ৩২ ; ১৪।৫)।

৫। সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী

গীতাতে আত্মাকে 'সর্ব্বগত' বলা হইয়াছে (২।২৪)। যিনি জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, যিনি সমুদায় বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট, তিনিই সর্ব্বগত। এই অর্থেই গীতাকার দেহী আত্মাকে সর্ব্বগত বলিয়াছেন।

এই ভাব অন্য ভাষাতেও ব্যক্ত হইয়াছে। একস্থলে এইরূপ আছে:—

"যাহা কর্ত্তৃক এই সমুদায় ব্যাপ্ত (যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্) তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিও" ।২।১৭। আমরা লৌকিক ভাষায় জীবাত্মা বলিয়া থাকি, এ স্থলে সেই জীবাত্মাকেই সর্ব্বব্যাপী বলা হইল।

৬। অব্যক্ত, অচিন্ত্য

গীতার মতে আত্মা অব্যক্ত (২।২৫)। সাংখ্য দর্শনে এবং গীতারও কোন কোন স্থলে 'অব্যক্ত' অর্থ প্রকৃতি। কিন্তু গীতার এই অংশে (২।২৫) ইহার অর্থ 'অপ্রকট' বা অপ্রকাশ। যাহা ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট প্রকাশিত হয় না, যাহাকে বুদ্ধিমন প্রভৃতির বিষয়ীভূত করা যায় না তাহাই অব্যক্ত। এই অর্থেই গীতাতে আত্মাকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে।

যাহা অব্যক্ত, তাহা কখন চিন্তার বিষয় হইতে পারে না। এইজন্য আত্মাকে অচিন্ত্যও বলা হইয়াছে (২।২৫)।

৭। অপ্রমেয়

একস্থলে বলা হইয়াছে এই আত্মা অপ্রমেয় (২।১৮)। যাহাকে পরিমাপ করা যায় না, তাহাই অপ্রমেয় বা অপরি-মেয়। এই মর্ম্মেই জীবাত্মাও অপ্রমেয়।

একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অপ্রমেয়। গীতাতে জীবাত্মাকেও কেন এই সমুদায় বিশেষণ দেওয়া হইল, তাহা দ্বিতীয় প্রবন্ধে আলো-চিত হইবে। আপাততঃ এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, গীতাকার জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এতদুভয়ের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন নাই, প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবাত্মার কথাও ভাবেন নাই পরমাত্মার কথাও ভাবেন নাই। তিনি

ভাবিয়াছিলেন আত্মার বিষয়ে এবং বলিয়াছিলেনও আত্মার বিষয়ে। তাঁহার মতে আত্মা একই, এ আত্মার আর শ্রেণীবিভাগ নাই। আমরাই তাঁহার উপদেশ বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছি যে, এই স্থলে আত্মা অর্থ 'জীবাত্মা' আর ঐ স্থলে আত্মা অর্থ পরমাত্মা। কিন্তু গীতাকারের নিকটে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই। পরমাত্মার যে বিশেষণ গীতাকারের নিকটে জীবাত্মারও সেই বিশেষণ, কারণ উভয়ই এক আত্মা।

৮। অকর্ত্তা

আমরা প্রধানতঃ দ্বিতীয় অধ্যায় অবলম্বন করিয়াই আত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু গীতার অন্যান্য অংশেও আত্মার প্রকৃতি বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এ সমুদয় স্থলের একটি বিশেষ কথা এই যে, আত্মা অকর্ত্তা।

যাঁহারা বলেন আত্মা অব্যয় ও অবিকারী, তাঁহাদিগকে বলিতেই হইবে যে, আত্মা কখন কর্ত্তা হইতে পারেন না। কর্ম্মের সহিত কর্ত্তার কি সম্বন্ধ তাহা বিশ্লেষণ করিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। কোন কর্ত্তা ও তাহার একটি কর্ম্মের বিষয় কল্পনা করা যাউক। এই কর্ত্তার প্রধানতঃ পাঁচটি অবস্থা। প্রথমতঃ যখন কর্ম্ম করিবার সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ যখন কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। তৃতীয়তঃ যখন কর্ম্ম করা হইতেছে। চতুর্থতঃ যখন কর্ম্ম শেষ হইল। পঞ্চমতঃ যখন কর্ম্ম অতীত হইয়া স্মৃতির ব্যাপারে পরিণত হইল বা বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইল। এই পাঁচটি অবস্থা সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত নহে ; এক অবস্থার সহিত অন্য অবস্থার কিছু না কিছু সম্পর্ক রহিয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্যই আমরা এই পাঁচটি অবস্থাকে পৃথক্ পৃথক্ কল্পনা করিলাম। আবার এই পাঁচটি অবস্থা কখনই সম্পূর্ণরূপে এক নহে। নিত্যই যদি প্রথম অবস্থা থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি প্রথম অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, যদি কর্ম্মসংক্রান্ত জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার উদয় হয়, তবেই কর্ম্মের আরম্ভ সম্ভব হয় এবং তবেই মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যখন কর্ত্তা কর্ম্ম আরম্ভ করে, তখন সেই কর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার প্রাণে নূতন জ্ঞান ও নূতন ভাবের উদ্রেক হয় এবং নূতন ভাবে ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকে। এই সময়ে তাহার যে-প্রকার অবস্থা, কর্ম্ম শেষ হইবার পর তাহার সে-অবস্থা থাকে না। কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কর্ত্তা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করে, নূতন ভাবদ্বারা আপন্ন হয়, তাহার ইচ্ছাও নূতন ভাবে চালিত হয়। এই চতুর্থ অবস্থা তৃতীয় অবস্থা হইতে ভিন্ন। কর্ম্মের অব্যবহিত পরে যে অবস্থা, চিরদিন সে অবস্থা থাকে না। কর্ম্ম যখন প্রাচীন কালের ঘটনা হইয়া পড়ে, যখন সে-কর্ম্মের কথা স্মৃতিতেও থাকে না, তখন সেই কর্ত্তার নূতন এক অবস্থা উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে কর্ত্তার মনের অবস্থা সব সময়ে এক প্রকার থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। যখন কর্ম্মের কোন সম্ভাবনা থাকে না, তখন কর্ত্তা আর কর্ত্তা নহে, সে তখন অকর্ত্তা। যদি তাহার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে সে চিরকাল অকর্ত্তাই থাকিয়া যাইবে। কর্ম্ম করিতে হইলে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেই হইবে। আবার যিনি নিত্য কর্ম্মশীল, তাঁহার অবস্থাও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কর্ম্ম যেমন পৃথক্ পৃথক্, কর্ম্ম-সংক্রান্ত জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাও তেমনি পৃথক্ পৃথক্।

কর্ম্মতত্ত্ব আরও গভীর। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম কর্ত্তারই বাহ্য প্রকাশ। কর্ত্তার অন্তর্গত ভাবই কর্ম্মরূপে বাহ্য জগতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই বাহ্যাবস্থা যেমন পৃথক্ পৃথক্ ও পরিবর্ত্তনশীল কর্ত্তার অন্তর্গত অবস্থাও তেমনি পৃথক্ এবং পরিবর্ত্তনশীল। আভ্যন্তরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে বাহ্যাবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যেখানে কর্ম্ম, সেইখানেই কর্ত্তার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ; কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেই, কর্ত্তার বিকার ও পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হয়।

গীতার মতে আত্মা অব্যয় ও অবিকারী। কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেই বিকার স্বীকার করিতে হয় ; এইজন্য গীতাকার আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করেন নাই।

এবিষয়ে গীতাতে সাংখ্য-মত গৃহীত হইয়াছে। আত্মা কোন কার্য্য করে না, কার্য্য করে প্রকৃতি। এবিষয়ে প্রমাণ এই :—

(ক)

গীতার এক স্থলে (৩।২৭) আছে—

"সমুদয় কর্ম্মই সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে। অহঙ্কার বশতঃ বিমূঢ় হইয়া লোকে মনে করে 'আমি কর্ত্তা।'

(খ)

ইহার পরের শ্লোকে আছে, "হে মহাবাহো! গুণ কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা মনে করেন, গুণই গুণের অনুবর্ত্তন করিতেছে। ইহা জানিয়া তাঁহারা আসক্ত হয়েন না" ।৩।২৮।

'গুণ কর্ম্ম বিভাগ' শব্দকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় ব্যাখ্যারই মৌলিক ভাব এই যে, গুণ এবং কর্ম্ম হইতে আত্মা পৃথক্।

'গুণসমূহ গুণসমূহের অনুবর্ত্তন করে'—ইহার অর্থ 'ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়।'

(গ)

অপর এক স্থলে আছে—"যিনি দেখেন যে প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে কার্য্য করে এবং আত্মা অকর্ত্তা—তিনিই (প্রকৃত ভাবে) দেখেন ।১৩।২৯ কিংবা ৩০।

(ঘ)

অন্যত্র আছে (৫।৮,৯) "যুক্ত ও তত্ত্ববিৎ এইরূপ ধারণা করেন যে, ইন্দ্রিয়গণই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং মনে করেন যে, আমি কিছুই করি না।"

(ঙ)

"ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফল-সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই। স্বভাবই প্রবর্ত্তিত হয়" (৫।১৪)।

(চ)

ইহার পরের শ্লোকে (৫।১৫) আছে—

"বিভু কাহার পাপও গ্রহণ করেন না, সুকৃতও গ্রহণ করেন না।"

কর্ম্ম করিলেই ফলভাগী হইতে হয়। আত্মা কর্ম্ম করেন না ; সুতরাং তাহার পাপও নাই, পুণ্যও নাই।

(ছ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় :—

"হে কৌন্তেয়! অনাদিত্ব প্রযুক্ত, নির্গুণত্ব প্রযুক্ত এই অব্যয় পরমাত্মা শরীরস্থ হইয়াও (কিছুই) করেন না এবং লিপ্ত হয়েন না (৩১ বা ৩২ শ্লোক)।

গীতার মতে যিনি জীবাত্মা তিনিই পরমাত্মা। এইজন্য এস্থলে শরীরস্থ আত্মাকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। শরীরস্থ এই আত্মা অকর্ত্তা, ইনি কিছু করেন না এবং কিছুতেই লিপ্ত হন না।

(জ)

ইহার পরের শ্লোক এই—"যেমন সর্ব্বগত আকাশ সূক্ষ্মতা বশতঃ (কিছুতেই) লিপ্ত হয় না, তেমনি সর্ব্বত্র দেহে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মা কিছুতে লিপ্ত হন না (১৩।৩২ বা ৩৩)।

এ স্থলেও বলা হইল আত্মা কোন-প্রকার দৈহিক ব্যাপারে লিপ্ত হন না।

(ঝ)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এইরূপ আছে ;—

যখন দ্রষ্টা গুণসকল হইতে পৃথক্ কর্ত্তা দেখেন না এবং গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে দেখেন, তিনি আমার ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন (১৪।১৯)।

এ স্থলে বলা হইল, আত্মা কর্ত্তা নহে ; গুণসমূহই কর্ত্তা এবং আত্মা গুণসমূহ হইতে 'পর'।

৯। এক, অদ্বিতীয়

"আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়"—এই প্রকার ভাষা গীতাকার কোন স্থলেই ব্যবহার করেন নাই। উপনিষদের যুগে এই মত প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। যখন কোন সত্য নূতন প্রচারিত হয়, তখন নানা ভাবে ইহার উল্লেখ ও ব্যাখা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যখন ইহা সাধারণ সত্যরূপে গৃহীত হয়, তখন আর এপ্রকার ব্যাখ্যাদির কোন প্রয়োজন থাকে না। আত্মা যে এক ও অদ্বিতীয় এই মত গীতাকারের যুগে একটি মৌলিক সত্যরূপে গৃহীত

হইয়াছিল। এইজন্য গীতাকার এবিষয়ে বিশেষ ভাবে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

(ক)

গীতাতে 'আত্মা' শব্দ নানা বিভক্তিতে ৫৯ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। লোকে যাহাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলে, সেই অর্থেই অধিকাংশ স্থলে উক্ত শব্দের প্রয়োগ। সর্ব্বত্রই 'আত্মা' শব্দ এক বচনান্ত, কোন স্থলেই দ্বিবচন বা বহু বচনের প্রয়োগ নাই। ইহা হইতে স্বভাবতই মনে আসিতে, পারে যে, আত্মা একই।

(খ)

এক স্থলে এই প্রকার আছে—নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় শরীরীর এই দেহ সমূহ নশ্বর (অন্তবন্তঃ ইমে দেহাঃ নিত্যস্য শরীরিণঃ অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য) ২।১৮।

শরীরিণঃ (=শরীরী আত্মার) ষষ্ঠীর এক বচন ; নিত্যস্য, অনাশিনঃ এবং অপ্রমেয়স্য—এই তিনটি 'শরীরিণঃ' এর বিশেষণ ; এ তিনটাও, এক বচনান্ত। কিন্তু 'দেহাঃ' (দেহ সমূহ) বহুবচন।

দেখা যাইতেছে যে এই পৃথিবীতে দেহ বহু ; কিন্তু এই দেহ-সমূহের আত্মা এক।

(গ)

আর এক স্থলে আছে—"দেহী জীর্ণ শরীরসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহসমূহকে ধারণ করে।" ২।২২

'দেহী' (=দেহবিশিষ্ট আত্মা) একবচন ; কিন্তু 'জীর্ণ শরীর সমূহ" (জীর্ণানি শরীরাণি) বহুবচন। এ স্থলেও বলা হইতেছে আত্মা এক কিন্তু ইহার দেহ বহু।

(ঘ)

ঐ অধ্যায়ের অপর এক স্থলে (২।৩০) আছে :—

"সকলের দেহে (অবস্থিত) এই দেহী (অর্থাৎ আত্মা) নিত্য অবধ্য।"

'দেহী' (অর্থাৎ আত্মা) এক বচন ; এক দেহীই সমুদায় দেহে বর্ত্তমান। এস্থলেও বলা হইতেছে যে, আত্মা এক।

(ঙ)

ভগবান্ এক স্থলে বলিতেছেন—"হে ভারত ! সমুদায় ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াও জানিবে।" ১৩,২ কিংবা ৩।

ক্ষেত্রজ্ঞ এক ; কিন্তু ক্ষেত্র (অর্থাৎ দেহ) বহু। আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, দেহস্থ জীবাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। এস্থলে ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব প্রদর্শিত হইল। একই পরমাত্মা যখন সকল ক্ষেত্রে, তখন প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মা এক।

(চ)

একস্থলে উপমা দ্বারাও ঐ কথাই বলা হইয়াছে :

"হে ভারত ! যেমন এক রবি এই সমুদয় লোককে প্রকাশিত করে, তেমনি ক্ষেত্রী সমুদয় ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে" (১৩।৩৩ কিংবা ৩৪)।

লোক বহু, তেমনি ক্ষেত্রও (অর্থাৎ দেহও) বহু। রবি এক, ক্ষেত্রজ্ঞও (অর্থাৎ আত্মাও) এক। বহু লোকে যেমন এক রবি, তেমনি বহু দেহে একই আত্মা।

(ছ)

আত্মাকে 'সর্ব্বগত' বলা হইয়াছে (২।২৪)। যাহা সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট, তাহা এক ভিন্ন বহু হইতে পারে না।

(জ)

আমরা যাহাকে জীবাত্মা বলি, সেই জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া একস্থলে এইরূপ বলা হইয়াছে :—

"যাহা দ্বারা এই সমুদয় ব্যাপ্ত (যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্) ২।১৭

যাহা সর্ব্ব ব্যাপী তাহা বহু হইতে পারে না, তাহা একই।

(ঝ)

একস্থলে আছে :—

যাঁহার চিত্ত যোগে সমাহিত এবং যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতস্বরূপে এবং ভূত-সমূহকে আত্মাতে দর্শন করেন।" ৬।২৯

এস্থলে 'আত্মা' একবচনান্ত কিন্তু 'ভূত-সমূহ' বহু-বচনান্ত। ইহাতে আত্মার অদ্বিতীয়ত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এস্থলে 'আত্মা' অর্থ পরমাত্মা'- আমাদিগের বক্তব্য এই যে গীতাকার জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন নাই। তিনি জানেন কেবল 'আত্মা' এবং উদ্ধৃত শ্লোকে এই আত্মার কথাই বলা হইয়াছে।

উপসংহার

আলোচনার সিদ্ধান্ত এই :—আত্মা অনাদি ও অনন্ত; অজ ও অবিনাশী; নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ; অব্যয় ও অবিকারী; সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী; অকর্ত্তা, এক ও অদ্বিতীয় আত্মা বলিলে অনেকে বুঝেন—মন, চিত্ত, বুদ্ধি, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি। কেহ বা মনে করেন অহঙ্কারই বুঝি আত্মা। 'অহঙ্কার' একটি দার্শনিক শব্দ, ইহার অর্থ— 'অহং ভাব, "আমি' এই বুদ্ধি। গীতাকারের মতে এ সমুদয়ের কোনটিই আত্মা নহে এবং এ সমুদয়ের সমষ্টিও আত্মা নহে (১৩শ অধ্যায়ের ৫,৬ কিংবা ৬,৭ শ্লোক, দ্রষ্টব্য)।

এ সমুদয়ই অনাত্ম বস্তু। আত্মা এ সকলের অতীত। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অপ্রমেয়। ইহাই গীতার উপদেশ।

গীতার অপরাপর তত্ত্ব পরে আলোচিত হইবে।

জা'ত-রক্ষা

শ্রী প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়

১

পাণিহাটী গ্রামটা নিতান্ত ছোট নহে। গাঁয়ে গরীব চাষার সংখ্যাই বেশী। গ্রামে জমীদার, তালুকদারের উৎপাত-উপদ্রব নাই বটে, তবুও ঘরকয়েক খুদে ভদ্র-লোকের প্রবল দাপটে বাকী লোকগুলি কেঁচো হইয়া থাকে, এমনিই অবস্থা।

গ্রামের ভিতর থাকিবার মধ্যে জীর্ণশীর্ণ একটি পাঠ-শালা। তারও ঘর-দুয়ারের কোন বালাই নাই, কোনও মতে এর তার বাইরের ঘরে মাথা গুঁজিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। আর তাহার বিদ্যার্থিগণ বোধোদয় অনুত্তীর্ণ অত্যন্ত বিচক্ষণ পণ্ডিত গোবিন্দ পাঠকের কঠোর শিক্ষকতায় অতিমাত্রায় বিব্রত হইতেছে।

গ্রামের ভিতর তারিণী ঘোষালের অবস্থাই ভাল। তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপেই আজকাল পাঠশালা বসে। পাঠশালার ভদ্রসন্তানই বেশী; তবে কিছুদিন হইতে গুটিকয়েক গরীব নমঃশূদ্র ছাত্রও বসিবার স্থান পাইয়াছে। অবশ্য, চাষাদের এত-বড় অসঙ্গত আবদারে ভদ্রলোক হাসে, প্রথমে তারিণীও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া শেষে রাজী হইয়াছিলেন। তবে চাষার ছেলেরা কিছু-আর চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর বসিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না, সুতরাং গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপ ও বর্ষার দিনে বৃষ্টির জল-ঝাপ্‌টা সহ্য করিয়াও তাহারা ঐ দাওয়ায় বসিয়াই কৃতার্থ হইতেছিল।

একে ত চাষার ছেলের লেখাপড়া শেখাই ভয়ঙ্কর বেয়াদবি, তার উপর বসিবার স্থান আবার চণ্ডীমণ্ডপ, সুতরাং এই কুৎসিৎ দৃশ্য ঘোষাল মহাশয়ের সহ্য হইলেও তাঁহার জননীর চক্ষুশূল হইয়াছিল।

ফলে দাঁড়াইয়াছিল এই যে, দাওয়ায় বসিয়া দেওয়ালে কেহ পিঠ দিলেই তিনি রৈ রৈ করিয়া লাফাইয়া উঠিতেন অথবা দাওয়ার কেহ ভিতরের কাহাকেও স্পর্শ করিলেও লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া আসিতেন। কিন্তু পাওনা-গণ্ডার মাত্রাটা ছিল এই গরীবদের কাছেই বেশী—তাই গোবিন্দ কোন মতে তাল সাম্‌লাইয়া আসিতেছিলেন।

অবশেষে একদিন ছুপুরবেলায় এক তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় সবেমাত্র দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা সমাপনান্তে একটু তাম্রকূট ইচ্ছা করিবেন বলিয়া সর্দ্দার-পড়ো ভূলোকে হুকুম করিতে যাইয়া অকস্মাৎ সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। যে-দৃশ্যটি তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে এতবড় নেশার কথাটাও চাপা পড়িয়া গেল। দেখিলেন, ঘোষাল-জননী দীনতারিণী রৈ রৈ শব্দে সমস্ত পাড়া মাথায় করিয়া স্কুল-প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সঙ্গে ও-পাড়ার দীনু মণ্ডলের ১৩।১৪ বছরের ছেলে আগে আগে আসিতেছে আর পিছনে তাঁহার নিজেরই নাতি শিবনাথ মুখকে অসম্ভব রকম লাল করিয়া দুম্‌দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধার হাতে একখানি কঞ্চি, তিনি তাহাই বারবার অগ্রবর্ত্তী নমঃশূদ্র-তনয়ের উপর আস্ফালন করিতে করিতে স্কুলের বদনে প্রজ্বলিত তৃণগুচ্ছ গুঁজিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইতে শাসাইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া হাঁক দিলেন,—"বলি ও গোবিন্দ! গোবিন্দ,একবার শোন্ দেখি কাণ্ডটা!" হাঁকডাকে গোবিন্দ বাহির হইয়া আসিলেন, কিন্তু বৃদ্ধার মূর্ত্তি দেখিয়াই তাঁহার হইয়া গেল, কাণ্ড শুনিবার দুঃসাহস আর তাঁহার রহিল না।

দীনতারিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "বলি তোর আক্কেলটা কি রকম তাই শুনি? এই ইস্কুল কর্‌বার নাম ক'রে তুই যে বামুনপাড়ায় চাঁড়াল-মুচি এনে ঢোকালি—তোকে বিশ দিন না বলেছি, গোবিন্দ এমন কাজটি করিস্‌নে করিস্‌নে। হাজার হোক বামুনের ছেলে তুই, পয়সার লোভে চাঁড়াল চাষাকে বিদ্যে বেচে মহাপাতক করিস্‌নে গোবিন্দ! ছোট লোককে ছোট লোকের মত থাকতে দে! এখন জাতজন্ম থাকে কি ক'রে তাই শুনি।" অকস্মাৎ ঘোষাল-জননীর ছোটলোকের উপর এই প্রবল করুণায় গোবিন্দ বিশেষ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং মাসীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মুখখানা হাসিবার মত ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "ব্যাপারটা কি বল দেখি, মাসি! দিচ্ছি আমি ঠিক ক'রে।" কিন্তু এই হাসিতে বিশেষ কোন ফল হইল না বরঞ্চ মাসী একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "ঠিক আবার তুই কি কর্‌বি তাই শুনি, ছিষ্টি যদি আমার নষ্ট হ'য়েই গেল তবে ঠিক কর্‌বি কি আমার মাথামুণ্ডু? এই যে দীনে চাঁড়ালের ব্যাটা এক লাফে দাওয়ায় গিয়ে উঠ্‌ল, এই যে"—বলিতে বলিতে বোধ করি ছিষ্টি নষ্ট হইবার প্রবল শোকে আর তিনি শেষ করিতে পারিলেন না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পিছন হইতে নাতিটি বলিয়া উঠিল, "বেশ যা হোক, দাওয়ায় আবার চরণা কখন উঠ্‌ল।" ঠাকুরমা কান্না ভুলিয়া একেবারে মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিলেন, "মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার! আবার মুখ নেড়ে বলা হচ্ছে দাওয়ায় ও আবার কখন উঠ্‌ল? আমি ওখানে দাঁড়িয়ে দেখিনি? তুই উপরে দাঁড়িয়ে জল ঢেলে দিচ্ছিলি আর ঐ চাঁড়াল-ছোঁড়া চালের তলায় দাঁড়িয়ে তাই দু-হাতে শোঁ শোঁ শুষে নিচ্ছিল। বামুনের ঘরের ১২।১৩ বছরের বুড়ো ধাড়ী—এটা তুমি জান না যে, চাঁড়াল চাষায় চালের তলায় মাথা নিয়েছে কি তখনই তার ঘরে ঢোকা হ'ল। ওর মুখের জল ওখানে পড়েনি? সবটা চাঁড়ালের তা হ'লে এঁটো হ'ল না?" নাতিটি পিছনে দাঁড়াইয়া গম্‌গম্ করিতে করিতে কহিল, "ঘরে যাওয়া হয় না আর কিছু! শুধু শুধু মার খাওয়াবে তাই।" দীনুমাসীর নাতিটিই যে মাসীর অকস্মাৎ জাত-জন্ম লুপ্ত করিবার প্রধান আসামী তাহা বুঝিতে আর পণ্ডিত মহাশয়ের বাকী রহিল না। কিন্তু তিনি এই পাঠশালায় পণ্ডিতী করিয়া চুল পাকাইয়াছেন, সুতরাং কাহারও পিঠে বেত ভাঙিতে পারিলে যে রুষ্ট মাসী তুষ্ট হইয়া ঘরে ফিরিতে পারেন, এ বিবেচনাশক্তি গোবিন্দের ভাল রকমই ছিল। তিনি চাঁড়াল-ছোঁড়ার উপরই অত্যন্ত চটিয়া যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ষোল আনা ছাপাইয়া আঠার আনার মত হাঁক দিলেন। "আয় হারামজাদা এদিকে, কেন তুই গিয়েছিলি ভদ্রলোকের বাড়ী তাই শুনি? গহ্বর ঠাণ্ডা কর্‌বার আর যায়গা পেলি না? মর্‌তে গেলি শেষে বামুন-বাড়ী?" মাসী এতক্ষণে কিঞ্চিৎ খুসী হইয়া কহিলেন, "তাই একবার বল্ গোবিন্দ, মর্‌তে আর জায়গা পেলে না, ও গেল কি না আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে! ও মা, মা মা! কত বড় আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে এই ছোটলোকের—আমি কেবল তাই ভাবছি।" বলিয়া গালে মুখে হাত দিয়া বোধ করি এই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। মাসীকে খুসী দেখিয়া গোবিন্দের রোষ যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। হাতের বেতখানা বার বার আস্ফালন করিতে করিতে একটা গোবিন্দ রাগে দশটা হইয়া ফুলিতে লাগিলেন।

এবার দীন-মাসীর নাতিটি ওখান হইতে উত্তর করিল, "ভাল! ওর দোষ কি? আমি ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম তাই!" গোবিন্দ পাঠশালার পণ্ডিত, ছাত্রগণ ভয়ে মিছা কথা বলিবে, ইহাই তিনি চিরকাল প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। তাঁহারই একজন ছাত্র যে, এমন করিয়া বুক ফুলাইয়া অকপটে সত্য কথা বলিয়া ফেলিবে এ গোবিন্দের অসহ্য। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার স্থান, কাল, পাত্র কিছুই মনে রহিল না। দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি।" কিন্তু দেখাইতে চাহিলেই দেখানটা সহজ হইল না। দীনতারিণী ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "এ তোর কেমন বিচার রে.

গোবিন্দ তাই শুনি। ওর কি ভাল-মন্দ কিছু বোধ আছে, যা শুকে মন্তর দিয়েছে ও হাবা-খ্যাবালা বোকার মত তাই করেছে; আর তুই আসিস্ আমার ছেলের গায়ে হাত তুল্‌তে, এত বড় সাহস তোর! ওমা! কলিকালের বিচেরই এই।" ধমক খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ পণ্ডিত নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইলেন, এবং পরক্ষণেই হাঃ হাঃ করিয়া খানিকটা হাসিয়া মাসীকে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া কহিলেন, "তুমি কি খেপেছ মাসী,আমি যাব কি না আমার শিবনাথের গায়ে বেত মার্‌তে? যাকে মারব এই দেখনা তুমি দাঁড়িয়ে! ঐ বজ্জাতের চামড়া যদি না তুলি ত আমার নাম গোবিন্দই নয়।"

দীন-মাসী অত্যন্ত খুসী হইয়া কহিলেন, "ওকি কম বজ্জাৎ, রে গোবিন্দ! দেখেছিস্ না যেন একেবারে ভিজে বেড়াল, কিছুই জানে না! ওকি সহজে জবাব কর্‌বে? এই এমনি ক'রে পেট ফুটো করে দিলে তবে বাক্যি বেরুবে।" বলিয়া হাতের কঞ্চিখানা দিয়া খোঁচা মারিতে গিয়া অত্যন্ত অকস্মাৎ কঞ্চিখানা ছাড়িয়া ফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে তিন চারি পা পিছাইয়া আসিলেন, রক্তবর্ণ মুখখানা মুহূর্ত্তেই তাঁর কালি-বর্ণ হইয়া গেল। কাঁদ কাঁদ গলায় কহিলেন, "সর্ব্বনাশ কর্‌লাম যে, গোবিন্দ! অবেলায় চাঁড়াল ছুঁয়ে দিলাম যে, এখন এই রোগা দেহ নিয়ে যে আমায় ডুব দিয়ে মর্‌তে হ'বে তার কি?" বলিয়া মাসী আর একবার কাঁদিবার উপক্রম করিলেন। একঘর ছেলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাসীর নাতিটি ত আনন্দে আটখানা হইয়া ফাটিয়া যাইবার মত অবস্থা। মাসী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "নে গোবিন্দ, আর দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে, দে ওটাকে শাসন ক'রে বাপু, আমার আবার ডুবটা দিতে যেতে হবে।" অকস্মাৎ আর-এক ভীষণ কাণ্ড হইয়া গেল। মাসী ঠিক ভূতে-পাওয়া মানুষের মত গোঙাইয়া হাত পা ছুঁড়িয়া লাফাইতে লাগিলেন। গোবিন্দ মাসীর কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরক্ষণেই মাসী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "মেরে ফেলেছে গোবিন্দ, ডাকাত খুন করেছে আমায়।" ডাকাত কিন্তু এতক্ষণ ধরা পড়িবার বাহিরে গিয়াছিল। দূর হইতে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঁচু করিয়া কহিল "কি কর্‌বি আমার কলাটা! মিথ্যা ক'রে মার খাওয়ালে কেমন লাগে তাই দ্যাখ ডাইনি বুড়ি কোথাকার।" গোবিন্দ পণ্ডিত তাঁহার ফৌজদিগকে ঢালা হুকুম দিলেন,"নিয়ে আয় শিবের কাণ ধ'রে, কিন্তু কাণ ধরা ত দূরের কথা, তাহার ধারে যায় কার সাধ্য। আসামী একখানা থানইট হাতে করিয়া প্রতিপক্ষকে আহ্বান করিল, "আয় দেখি এদিকে।" দীনতারিণী মিনতি করিয়া কহিলেন, "আমার মাথা খাস ওদের ফিরতে বল্, গোবিন্দ! ও ডাকাত কাকে খুন ক'রে ফেল্‌বে। তুই দেখে নিস আমি আজ ও দস্যিকে জ্যান্ত পুঁতবো। দ্যাখ দেখি আমার অবস্থা" বলিয়া গোবিন্দকে তাঁহার পিঠের অবস্থাটা দেখাইলেন। বাস্তবিক মাসীর নিজের সেই পরিত্যক্ত কঞ্চিখানা নিজের পিঠের উপর কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। তিনি পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নাতির কি হাড়ির হাল করিবেন, না করিবেন, তাহাই বার বার উচ্চারণ করিতে করিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার নাতিটিও সঙ্গে সঙ্গে উধাও হইয়া গেল।

২

পরদিন শিবুকে মার-ধর করা হইল। ঠাকুরমা নিজের পিঠের অবস্থাও দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। ফলে শিবুর পিঠে তাহার বাপ পায়ের এক পাটি খড়ম ভাঙ্গিয়া খালি পায়ে চলিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু শিবুর যে বিশেষ কিছু হইল তাহা বোঝা গেল না। শিবু আবার যে সেই, ধুলা-ঝাড়ার মত এত বড় দারুণ প্রহারটাকে মুহূর্ত্তে ঝাড়িয়া ফেলিল। বৃদ্ধা ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে বসিয়া কি যেন করিতেছিলেন, শিবু হেলিয়া দুলিয়া কাসিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া হাজির হইল এবং তাঁহার মুখের উপর দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচাইয়া কহিল, "কি কর্‌তে পার্‌লি আমার। শিবুর কলাও এতে হয় না; এ আর কেউ নয় বাবা, এশিবু শর্ম্মা কাউকে ভয় করে না, বুঝ্‌লি? মানুষকে তেষ্টার জল দেব না, ওম্‌নি বল্‌লেই হ'ল, আজ থেকে কি করব জানিস্? যাকে পাব, ডেকে এনে জল খাওয়াব। শর্ম্মারামের যে কথা সেই কাজ, হ্যা।" শর্ম্মারাম যখন এত বড় একটা শপথ করিয়া বসিল তখন দায়ে পড়িয়া ঠাকুরমাকেই নরম হইতে হইল। অনেক রকমে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া পরে মিনতি করিয়া কহিলেন "শিবু! লক্ষ্মী মাণিক আমার! তুইত, আমার বোকা ছেলে নয় সবইত বুঝিস বাবা, বামুন কায়েতকে না হয় এনে জল দিস, কিন্তু চাঁড়াল আর আনিস নে বাবা, লোকে কথায় বলে চণ্ডাল, ওদের কি বিচের-আচারের জ্ঞানগম্য আছে? ওরা কি আর আমাদের মত মানুষ রে, ওরা সব চণ্ডাল, ছোট লোক।"

বাবা কিন্তু বুঝিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না, বরঞ্চ মুখ ভেঙচাইয়া একটা উল্টা প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল. "কেন ওরা মানুষ নয় শুনি? ছুঁলে কি গা প'চে যায় না কি?" বলিয়া তাল ঠুকিয়া বৃদ্ধার সম্মুখে আসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সনাতন হিন্দু সমাজে এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সোজা, কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং বৃদ্ধাকে চিন্তা করিতে হইল না, কহিলেন, "ছুঁতে নেই, নেই তার আবার কি! বামুনের ছেলের চাঁড়াল চাষার ছোঁয়া-ছিত খেলেই জাত থাকে না, ম'রে যায় তা জানিস্।"

নাতিটি কিন্তু এতবড় অকাট্য প্রমাণেও হাসির লহর তুলিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "দূর! জাত কি মানুষ যে ম'রে যাবে? তোর যদি কিছু বুদ্ধি থাকে।"

ঠাকুরমা এবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তাই ব'লে ফের যদি তুই ঐ দীনের ব্যাটাকে আমার বাড়ীতে ঢোকাবি।"—তাঁহাকে আর শেষ করিতেও হইল না, শিবু দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, "পোড়ারমুখি রাক্কুসী, তাই বল্ না কেন, যে তুই ওদের দেখ্‌তে পারিস না। জাত যায়, মানুষ নয়, ছুঁতে নেই, এসব বল্‌তে আসিস্ কেন?" বৃদ্ধা তর্জ্জনী তুলিয়া শাসাইয়া কহিলেন, "নিয়ে আসিস্ ঐ চাঁড়াল চাষা আমার বাড়ীতে।" প্রত্যুত্তরে শিবু নানা রকম মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, "রাক্কুসী, ক্ষিদে তেষ্টা তোরও যেমন চাঁড়াল-চাষারও ঠিক তেম্‌নি। তবে বামুন-কায়েত ব'লে মরিস্ কেন?" শ্রীমান্ শিবচন্দ্র এক লাফে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। ঠাকুরমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"শিবে হারামজাদা, বাঁদর, তুই আমার ভাঁড়ার ঘরে যাচ্ছিস্ কেন রে?"

এতবড় হুঙ্কারে পাথর শিবও বিচলিত হইতেন, কিন্তু মানুষ শিবনাথ ভ্রূক্ষেপও করিল না। পরক্ষণেই একটা নূতন কলসী হাতে করিয়া মৃদুমন্দগতিতে বাহির হইয়া আসিল। সেইটা উঁচু করিয়া কহিল, "এই দ্যাথ পোড়া-মুখী, কেন?" বৃদ্ধা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া চেঁচাইতে লাগি-লেন, "শিবে দস্যি কোথাকার, ভাল চাস্ ত রেখে যা আমার কলসী। ও-কলসী ভাঙলে তোর কি হাল হয় দেখিস্, তোর মাকে দিয়ে যদি আমি তোর পিটের চাম্‌ড়া না তুলি তবে"—বলিয়াই একটা ভীষণ রকম শপথ করিয়া বসিলেন। মাকে শিবু ভয় করিত, কিন্তু নত হইবার সময় এ নয়। ওখান হইতে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, "আমি জল রাখব শুনলে সে কিছু বল্‌বে না, সে তোর মত হিংসুটে নয় তা জানিস্।" এম্‌নি সময় শিবুর বিমাতা রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এই বিমাতাকেই শিবু মা বলিয়া জানিত। শিবু যখন ছয় মাসের শিশু তখন তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তার পর মাসতিনেকও গেল না, শিবুর পিতা তারিণী ঘোষাল পাত্রীটি বড়সড় আছে দেখিয়া আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, অবিলম্বে এই বধূটিকে বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন। সেই হইতে এই মা-মরা ছেলেটিকে রাজলক্ষ্মীই মানুষ করিতেছেন। বাড়ীর আর কাহারও সে বড় একটা ধার ধারিত না। তাহার আদর, আবদার, উৎপাত, উপদ্রব সমস্তই চলিত এই মায়ের সঙ্গে। আবার মাকে ভয়ও করিত তেম্‌নি।

বৃদ্ধা রাগের জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন, বধূকে পাইয়া ঝাল ঝাড়িবার উপায় হইল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "বলি বৌমা, তোমার ছেলেকে তুমি শাসন করবে, না এম্‌নি ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে, তা শুনি?"

রাজলক্ষ্মীর মনটা আজ তত ভাল ছিল না। সকালবেলায় ছেলের উপর প্রহারে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কক্ষের জলপূর্ণ কলসীটা দাওয়ায় রাখিয়া ভিজা গামছাখানা নিংড়াইতে নিংড়াইতে কহিলেন, "আমি আর কি করব মা। শাসন ত দেখছি দিনরাতই চল্‌ছে, তখন ত আমায় কেউ জিজ্ঞাসা কর না?" শাশুড়ী জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তবে আমিও বলি, বাছা। তোমার আস্কারা পেয়েইনা ও এমন হয়েছে, নইলে আরও ত পাঁচটা বামুনবাড়ী আছে, তাদেরও ছেলেপুলে রয়েছে। কৈ বলুক দেখি, কে বল্‌তে পারে, কোন্ বাড়ীতে এমন যবন নিয়ে ছোঁয়া-খেলা হয়।" রাজলক্ষ্মীর একটা দোষ ছিল এই যে, তাঁহার ছেলেকে কেহ কিছু বলিলেই আর তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তার উপর বৃদ্ধার এই খোঁচাটাও তাঁহাকে বেশ ভাল রকম বিঁধিল, তাই একটু তিনি রুক্ষ স্বরেই কহিলেন, "কি করব মা! এ বাড়ীর ছেলে হ'য়ে, ওর যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, ঠিক তেমনটি ও হয় নি। তাই ব'লে, আর যেই ওকে মন্দ বলুক, আমি মা হ'য়ে এতবড় কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারব না। আর ওর দেহে দয়া মায়া ব'লে যে বস্তু আছে তাই বা নষ্ট কর্'ব কোন্ প্রাণে! সে তোমরা যাই বল না কেন?" শাশুড়ী যদিও বা এতক্ষণ মাথা ঠিক রাখিয়াছিলেন এবার আর-কিছু ঠিক রহিল না। মুখের বিষ সহস্র ধারায় ছড়াইয়া কহিলেন, "তবে যদি বল্‌লে বাছা! তা হ'লে আমিও বলি—পেটে ধর নাই ব'লে যে ওকে মাথায় পা দিয়ে গোল্লায় দিতে হ'বে, এমনও ত কখনও শুনি নি। লোকে কথায় বলেছে চাঁড়াল না চণ্ডাল! যাদের ছায়া দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্তি করতে হয়, সেই যবনের সঙ্গেই হয়েছে ওর ওঠা বসা। দিন নেই রাত্তির নেই সর্ব্বক্ষণ দেখ গিয়ে লেপটে প'ড়ে আছে। এ ত তোমারই কারসাজি বাছা, এমনি ক'রেই ত বাপের বিষনজর এর ভিতর ক'রে দিয়েছ" বলিয়া অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর অদ্ভুত উপায়ে মিনতিপূর্ণ করিয়া যোড় হস্তে কহিলেন, "এখন না হয় প্রসন্ন হও বাছা! আমি ওর হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি যে-কয়দিন এই বুড়ীটা বেঁচে আছে সে কয়টা দিন না হয় বাছাকে রেহাই দাও তার পর ত বুঝতে পারছ ওর কপালে অশেষ লাঞ্ছনা আছে নইলে এমন সব মতি-গতি ওর হ'বে কেন?" এতবড় নির্লজ্জ মিথ্যা অভিযোগ না হইলে রাজলক্ষ্মী তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিতেন। কিন্তু এই আগাগোড়া রচিত অসত্যের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই তাঁহার মুখে যোগাইল না। শুধু কেবল

কহিলেন, "আমার সন্তান ও নয় এত বড় কথা মুখ দিয়ে বের করতে পারলে, মা!"

মা নাতির কাছে অপমানিত হইয়া চক্র ধরিয়া গর্জ্জাইতেছিলেন। এতক্ষণ বিষটুকু তাঁহারই এক পরমাত্মীয়ের উপর ঢালিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, এবং অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত বিষের ক্রিয়া এই বধূটির মুখের উপর নিরীক্ষণ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ শিবুর আগমনে তাঁহার আর যাওয়া হইল না। ওখানেই বেড়ার আড়ালে আড়ি পাতিয়া প্রত্যেক কথাটি গিলিয়া গিলিয়া শুনিতে লাগিলেন।

বাহিরে দাঁড়াইয়া মায়ের দুর্গতি সমস্তই শিবু দেখিয়াছিল, শুনিতে আর কিছু বাকি রাখে নাই। দুই একবার ইচ্ছাও হইয়াছিল বুড়িকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া চড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহার জানা ছিল ইহাতে তাহার মায়ের দুর্গতি বাড়িবে বই এক বিন্দু কমিবে না। তাই বাহিরে দাঁড়াইয়া সে নীরবে সহ্য করিতেছিল।

বৃদ্ধা যে ওখানে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। ঠাকুরমা প্রস্থান করিয়াছেন ইহাই কল্পনা করিয়া ধীরে ধীরে মায়ের কোলের কাছে আসিয়া কহিল, "ঐ রাক্ষুসীর কথায় বুঝি আবার কেউ কাঁদে? তুই কিছু মনে করিস্ নে, ও আবাগি ঐ রকমই। ও আমাকে বলে কি জানিস—তুই আমার মা নস, সৎমা, শুনেছিস রাক্ষসীর কথা! ওর কথা আমি বুঝি শুনব?"

সঙ্গে সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বুকখানাকে ছ্যাঁক করিয়া শব্দ বাহির হইল, "উঃ বাবা গো!" ঠিক এমনি সময়েই এক কাণ্ড হইয়া গেল। খিড়কির সেই খোলা দরজা দিয়া দিনুর ছেলেটা মুখ বাড়াইয়া কেবল উচ্চারণ করিয়াছিল, "মাসি ঠাকরুণ।" ব্যস ঐ পর্য্যন্তই; বৃদ্ধা আর লুকাইতে পারিলেন না, এক চীৎকার দিয়া কক্ষচ্যুত উল্কাবৎ আসিয়া ছিটকাইয়া পড়িলেন। মানুষের স্বর যে অতখানি ভীষণ এবং এতবড় তীব্র হইতে পারে, তাহা না শুনিলে ঠিক বুঝা যায় না। সম্মুখে বাজ পড়িলে যেমন মানুষের অবস্থা হয় সেই এক চীৎকারে এই তিনটি প্রাণীর অবস্থা ঠিক সেই রকম হইল। বৃদ্ধা চটাং করিয়া একটানে বেড়ার একখানা ব্যাঁকারী ভাঙিয়া তীরবেগে তাড়া করিয়া আসিলেন। "তবে রে হারামজাদা চাঁড়াল, দাঁড়া! আজ তোর কপালে আমি আগুন জাল্‌বো তবে আমার নাম দীন বাম্‌নী।" নিদারুণ চীৎকারে ছেলেটা প্রথমটা যেন ভয়ে বিহ্বল হইয়া গেল, কিন্তু সে পলকের জন্য। পরক্ষণেই রাস্তার কুকুর যেমন গৃহস্থের নিকট নিদারুণ প্রহার খাইয়া কেঁউ-কেঁউ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করে এই বালকও তেম্‌নি করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

৩

এতক্ষণে রাজলক্ষ্মীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, এবং ছেলেটি যে কেন আসিয়াছিল সে কথাও মুহূর্ত্তে মনে পড়িয়া গেল। আজ ভোরে খিড়কির ঘাটে দিনুর স্ত্রী আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া কাঁদিয়া পড়ে, অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দেওয়ার পর জানিতে পারেন, অভাবের তাড়নায় এই হতভাগাদের কাল কিছুই জোটে নাই। অন্নাভাবে মানুষ উপবাসী রহিয়াছে এত বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখের সংবাদে আর যেই চুপ করিয়া থাকিতে পারুক, গৃহস্থঘরের মেয়েরা পারে না। রাজলক্ষ্মী আকুল হইয়া কহিয়াছিলেন, "যা যা বাছা, আর একমুহূর্ত্ত দাঁড়াসনে, আমার মাথা খাস, তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দে, আমি সব ঠিক ক'রে রাখ্‌ছি।"

সেই অনাহার-ক্লিষ্ট বালক যখন কুকুরের মত তাড়া খাইয়া বাহির হইয়া গেল তখন ক্রোধে, ক্ষোভে ও আত্মগ্লানিতে রাজলক্ষ্মীর বুকের ভিতর পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতে লাগিল।

দীনতারিণী বকিতে বকিতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহা যে শিবুর কাণ্ড, সে-কথা তাঁহার জানাই ছিল। গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "শিবে, হারামজাদা, বেহায়া কোথাকার, আবার তুই গিয়েছিলি ঐ ছোঁড়াকে ডাকতে।" এবার রাজলক্ষ্মী জবাব করিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরে কোন উত্তাপ বা উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। সহজভাবে কহিলেন, "শিবু ত ডাকে নি, মা! আমিই আসতে বলেছিলাম।" এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বৃদ্ধা প্রথমটা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। পরক্ষণেই রাজলক্ষ্মীর কথাটা পুনরাবৃত্তি করিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিলেন, "আমিই আসতে বলেছিলাম, আমায় একেবারে স্বর্গে তুললে আর কি?" মুহূর্ত্তখানেক বধূর মুখের উপর অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "তুমি বৌ ঝি মানুষ তোমার এত তেজ ভাল নয় বাছা।" রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ভাল কি মন্দ তা জানি না, মা। একটা মানুষ বাড়ীর উপর এসে দাঁড়ালে তখনই স্বর্গে উঠে যেতে হয় কি পরে নরকে গিয়ে প'চে মরতে হয় তাও তখন ভাবিনি। শুধু তখন এইটুকু বুঝেছিলাম যে, ঐ হতভাগাদের সমস্ত দিন উপবাসে কেটেছে।"

বধূর মুখের উপর শাশুড়ি একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই হাসি যাহার কাণে গিয়াছে সেই জানে এই বিদ্রূপের জ্বালা কতখানি। এই হাসির সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিশিয়া যে-বিষ ছড়াইতে লাগিল তাহার জ্বালা সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা এক বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের বধূরই সম্ভব, রক্তমাংসের দেহ লইয়া আর কেহ সহ্য করিতে পারে না। দীনতারিণী হাতদুটা বধূর মুখের কাছে

নাচাইয়া কহিলেন, "এত দান-ধ্যান করতে শিখ্‌লে কোথা থেকে বৌমা, সেত আমি ভেবেই পাচ্ছি না। তোমাকে যখন তোমার বাবা দান করেছিল সে কথা ত ভুলে যাইনি, তোমার বাপ ত একটা হর্ত্তুকী দিয়ে তোমায় উচ্ছুগ্‌গ্য করেছিল। দানের ঘটা কি কেবল এই গরীবের উপর দিয়েই চল্‌বে। তবু যদি দু খানা সানা দানা প'রে আস্‌তে বাছা," বলিয়া তিনি আর একদফা হাসিতে সুরু করিলেন। এতবড় কদর্য্য উপহাসের জ্বালা, ঐ অতটুকু ছেলে শিবু, সেও বরদাস্ত করিতে পারিল না। বৃদ্ধা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন অকস্মাৎ শিবু একেবারে "চোপরাও বল্‌ছি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে বালক হইলেও মায়ের অপমানের তীব্রতা যে কতখানি তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিল। সে একেবারে পাগলের মত হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই রান্নাঘরের বেড়া হইতে একখানা বাকারি ভাঙ্গিয়া বৃদ্ধাকে তাড়া করিয়া যাইতেই, রাজলক্ষ্মী নিজে সামলাইয়া এবং ধমক দিয়া উঠিলেন, "শিবে, দস্যি কোথাকার, তোর এতখানি দুঃসাহস হয়েছে?" দীনতারিণী ওখান হইতে কহিলেন, "হ'বে না কেন বাছা! যেমন শিক্ষে-দীক্ষে তেমনই ত হ'বে।" রাজলক্ষ্মী একথায় কানও দিলেন না। দ্রুতপদে শিবুর সম্মুখীন হইয়া, তাহার হাতের বাখারীখানা ছিনাইয়া লইয়া সপ্ সপ্ করিয়া ঘা কতক বসাইয়া দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "থাক্ কাণ ধ'রে দাঁড়িয়ে হতভাগা পাজী কোথাকার।"

অকস্মাৎ ঠাকুরমার স্নেহ মমতা যেন উছলিয়া উঠিল। তিনি বধূকে সম্বোধন করিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, "আমার ছেলের গায়ে তুমি হাত তুলতে কে? তোমার আস্পর্দ্ধা ত বড় কম নয়!" বলিয়াই নাতীর হাত ধরিয়া এক টান দিয়া কহিলেন, "চ'লে আয় তুই ওর সমুখ থেকে।"

শিবু কিন্তু এতখানি সহানুভূতির পরও এক পা নড়িল না। বৃদ্ধাকে এক ঝাপটায় সরাইয়া দিয়া মায়ের আদেশ পালন করিতে ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরমা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোর কপালে আছে অশেষ লাঞ্ছনা। নইলে তোরই বা মা ম'রে যাবে কেন? আর তুই—" শিবু কটমট করিয়া বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাইল, সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা বাছা, তুমি ওর কাছে ব'সেই ঝাঁটালাথি খাও, আমি যদি কথাটি বলি ত আমার অতিবড় দিব্যি রইল, হ্যাঁ।"

ছেলেকে আঘাত করিয়া রাজলক্ষ্মী যেন পুড়িয়া যাইতেছিলেন। বৃদ্ধা চলিয়া যাইতেই তাহার মাথাটাকে বুকে টানিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "বড্ড লেগেছে না রে শিবু! শিবু তড়াং করিয়া উঠিয়া কহিল, "না—কিছু লাগেনি ত, মা।" রাজলক্ষ্মী তাহার মাথাটাকে বুকে চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে চোখ মুছিয়া কহিলেন, "আচ্ছা শিবু, তোর এই সৎমা যদি ম'রে যায়, তুই কি করিস্? খুব কাঁদিস্ বুঝি নারে?" শিবু কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল, "অমনি ভাবে যদি তুই বক্‌বি আমি যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাব, তখন দিনরাত্তির কেঁদেও কূল পাবিনে, সে-কথা যেন মনে থাকে।"

মা একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, "মুখে বল্‌লেই কি আর মরতে পারা যায় রে, সে পুণ্য—" ছেলে মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, "ফের ঐ কথা রাক্ষুসী," বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রু টল টল করিতে লাগিল। মা স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা আর কখনও বলব না, তোর এ মা তোকে রেখে কোথাও যেতে পার্‌বে না; বুঝলি, বাবা।" রাজলক্ষ্মী ছেলেকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। শিবু মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, "ওসব শুন্‌লে আমার কত কষ্ট হয় জানিস্, তবু তুই বল্‌বি।" মা ছেলের মাথাটাকে তেমনি বুকে রাখিয়া উদাসভাবে চাহিয়া রহিলেন। এই স্নেহের স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন জুড়াইয়া দিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, এই চরম সুখ, এর চেয়ে বড় কামনার বস্তু নারীর আর কিছুই নাই। শুধু এইটুকুর লোভে সে সমস্ত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, হাসিমুখে সহ্য করিতে পারে। ছেলে মায়ের বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া কহিল, "মা ওদের কি হ'বে?" মা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "কাদের কি হবে রে?" শিবু হাসিয়া বলিল, "তোর যদি কিছু মনে থাকে? সত্যি মা ওরা যে তাহ'লে আজও না খেয়ে থাক্‌বে।" রাজলক্ষ্মীর বুকের ভিতর যেন লোহার হাতুড়ির ঘা পড়িল। ছেলের প্রশ্নের কোন জবাবও দিলেন না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মাগো! আর যে পারিনে।" ছেলে বোধ করি মায়ের নিরুপায় অবস্থা কতকটা অনুমান করিয়া লইল, তাই ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, "যাব, মা দিয়ে আস্‌ব আমি?" রাজলক্ষ্মী এ প্রশ্নেরও কোন জবাব করিলেন না, বোধ করি কানেও গেল না। নিরুপায়ের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যেন কত কি ভাবিয়া যাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শিবু যে ভাঁড়ার ঘরে গিয়াছে, চাল ডাল বাহির করিয়াছে, তাহাও তাঁহার চোখে পড়ে নাই। শিবু যখন ফিরিয়া আসিয়া "মা" বলিয়া দাঁড়াইল তখনই তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়িল শিবুর কাপড়ে বাঁধা পুটলিটির উপর। চক্ষের পলকে তাঁহার দেহমন প্রবল বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। শাশুড়ির তীব্র শ্লেষ বিদ্রূপ এখনও তাঁহার কানে বাজিতেছিল, তাই মুহূর্ত্তে তাঁহার করুণ নারী-হৃদয় কঠিন পাথরে রূপান্তরিত হইয়া গেল। তিনি কঠিন কণ্ঠে কহিলেন "শিবে ছুঁস্‌নে ওসব, এক্ষুনি দূর ক'রে ফেলে দে বল্‌ছি। জানিস্ এসকলে আমাদের

কোন অধিকার নেই' বলিয়াই তিনি ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সে বেচারা অতশত বুঝিতে পারে নাই। মাকে মৌন দেখিয়া তাঁহার সম্মতি আছে ইহাই স্থির করিয়াছিল। এখন এই অদ্ভুত কথায় সে প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, পরে জড়াইয়া জড়াইয়া কোনমতে কহিল, "তুমি যে বল্লে।" রাজলক্ষ্মী আগুন হইয়া উঠিলেন, "কি! ফের মিছে কথা। ওখানে দিয়ে আয় ফেলে ঐ ওখানে।" মায়ের এমন মূর্ত্তি ত শিবু কখনও দেখে নাই, এমন কণ্ঠস্বরও শুনে নাই, সে বেচারা স্তব্ধ-বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এখুনি ফেলে দিয়ে আয় বল্‌ছি, আর যদি না শুনিস্ ত জেনে রাখিস্ আমি তোর মা নয়, সৎ মা।" মায়ের এতবড় কঠিন তিরস্কার সে কখনও শুনে নাই। সে আর সহিতে পারিল না, সমস্ত চা'ল ডাল দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

দীননতারিণী বোধ করি পণ্ডিতের কাছেই নালিশ করিতে গিয়াছিলেন। গোবিন্দ যে আজ শিবুর কি দশা করিবেন তাহাই শুনাইতে শুনাইতে অন্দরে আসিয়া হাজির হইলেন।

শিবু যে ওখানে নাই, বৃদ্ধা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ব'লে এসেছি আজ গোবিন্দকে। জলরাখা তোমার ভাল ক'রেই দেবে এখন।" সঙ্গে সঙ্গে রাজলক্ষ্মী কঠোরস্বরে উত্তর করিলেন, "তা হ'লে এ কথাও পণ্ডিতকে জানিয়ে দেবেন, আমার ছেলের গায়ে হাত তুল্‌লে আর কোথাও ইস্কুল কর্‌তে হ'বে, এ বাড়ীতে নয়।" বধূর এমন অবিচলিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধা অবাক্ হইয়া গেলেন, তিনি বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "কি বল্‌লে?"

রাজলক্ষ্মী উত্তর করিলেন, "ঐতো বল্‌লুম মা, আমার ছেলের উপর কেউ অত্যাচার কর্‌লে আমি তা সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। সে কথা আজ ভাল ক'রে জানিয়ে দিচ্ছি"—বলিয়াই জলপূর্ণ কলসীটি কক্ষে লইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

৪

কতবড় উৎকট লাঞ্ছনার তীব্র কশাঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া রাজলক্ষ্মী পুত্রকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, সে কেবল এক অন্তর্য্যামীই জানেন। শিবু ছেলেমানুষ, তাহার অর্থ কি বুঝিবে? তাই একদিকে যেমন মায়ের উপর অভিমানে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল তেমনি চরণাকে শাস্তি দিবার জন্ত মাথায় তাহার খুন চাপিয়া বসিল। সে প্রথমে নাকমলা কাণমলা খাইয়া পরে কঠিন দিব্য করিয়া বসিল,

প্রতিজ্ঞামত পরদিনই ইস্কুলে সে ভদ্রলোক সাজিয়া বসিল। চরণকে ডাকিয়া কঠিন কণ্ঠে কহিল, "এই শুয়ার শোন্, তুই আমার সঙ্গে মিশতে আসিস্ কেন তাই শুনি? তুই হ'লি ছোটলোক, চাঁড়াল, তোদের সঙ্গে ছোঁয়া হ'লে আমাদের জাত যায় জানিস্, তোর জন্যে আমি মার খেতে পার্‌ব না।"

এই কথা কয়টি সে বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ করার মত করিয়াছিল, তাহাই এখন এক নিশ্বাসে উগরাইয়া [illegible] লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। আর সে সেখানে [illegible] পারিল না, তাড়াতাড়ি নিজের আসন-টাকে তুলিয়া লইয়া ভীষণ অপরাধীর মত ও-কোণে গিয়া নির্জ্জীবের মত বসিয়া রহিল। ক্রোধের বশে যে জিনিস উচ্চারণ করা অত্যন্ত সহজ হইয়াছিল এখন সেই কয়টি কথাই তীরের ফলার মত অহরহ তাহার নিজেরই বুকে বিঁধিতে লাগিল। তবুও তিন-চার দিন কোন মতে সহ্য করিয়া কাটাইল, তারপর আর পারিল না। রবিবারে বেলা আড়াইটা তিনটার সময় সে চরণদের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। আজ চরণকে ডাকিতেও লজ্জায় যেন তাহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল। অথচ সেই চরণকে খুসী করার জন্য কতরকম উপায়ই-না তাহার মাথায় খেলাইতেছিল। চরণের বাবা দীনুকে সে খুড়া বলিয়া ডাকিত—তাহাকেই ডাকিতে ডাকিতে সোরগোল করিয়া উঠানের উপর আসিয়া হাজির হইল।

চরণের মা শশব্যস্তে বাহির হইয়া একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসিতে দিয়া কহিল, "বাবাঠাকুর, তোমার কি শীত-গ্রীষ্মিও বোধ নাই, এই দুপুর রদ্দুরে তুমি বার হ'লে কি ক'রে? মাঠে যে পা দেওয়াও যায় না।"

বাবাঠাকুরের কিন্তু রোদ-বৃষ্টি ভাবিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। পিঁড়ির উপর বসিয়া কহিল, "দম আটকে ত মর্‌তে পারি না। হারামজাদা চরণার কাণ্ড শুনেছ—ও আমার সঙ্গে আজ পাঁচদিন কথা বন্ধ করেছে, আমি তার মাথা ভেঙ্গে তবে ছাড়ব, তা তোমাকে আজ ব'লে যাচ্ছি।" এই পাগলা খ্যাপাটে গোছের ছেলেটিকে খুড়ী ভাল করিয়াই চিনিত এবং সে-যে তাহার চরণকে কতখানি ভালবাসে তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। শিবু পুনশ্চ কহিল, "তুমি দেখে নিয়ো খুড়ি, আমার যা ইচ্ছে হচ্ছে—" এই শূন্য আস্ফালনের ভিতর দিয়া যে মাধুর্য্যটুকু ঝরিয়া পড়িল তাহাই উপভোগ করিয়া খুড়ীর সমস্ত চিত্ত আনন্দে থম্ থম্ করিতে লাগিল। কিন্তু ইচ্ছাটা আর প্রকাশ করা হইল না, ঐ পর্য্যন্তই রহিল। দরজার চৌকাঠের উপর ঠিক সম্মুখেই অকস্মাৎ চরণ আসিয়া দাঁড়াইল। চক্ষের পলকে তাহার দীপ্ত মুখের লম্বা লম্বা কথা দাঁতের ভিতর আটকাইয়া গেল। ঢোক গিলিয়া

কাশিতে কাশিতে কহিল, "তুইকোথায় ছিলি রে, চরণা! এক গেলাস জল খাওয়া দেখি, দুপুর রদ্দুরে বেরিয়ে গলা যেন কাট হ'য়ে গিয়েছে রে।"

কথাটা সত্য। এই কড়া রৌদ্র মাথায় করিয়া আসিবার সময় রাস্তাতেই সে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব করিবার কথা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও সে ভাবে নাই। চরণকে কিছু একটা বলিতে হইবে ইহাই ছিল তার ইচ্ছা। অকস্মাৎ যে-জিনিষটার অভাবে তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া যাইতেছিল তাহাই এখন তাহার মুখ দিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু একজনের শুষ্ক কণ্ঠ শীতল করিবার অদ্ভুত ও অসঙ্গত প্রস্তাব কানে যাইতেই আর দুইটি জীব সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত সম্বল করায়ত্ত থাকিয়াও, আজ তাহাদের উপায়হীন অক্ষমতার জন্য এই দুর্ভাগ্য মাতা-পুত্র যেন পুড়িয়া মরিতে লাগিল। শিবু পল্লীগ্রামের ছেলে, অবস্থাটা বুঝিয়া ফেলিতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। বোধ করি সে একটু অপ্রস্তুত হইয়াও পড়িল। কিন্তু কথাটা ফিরাইবার আর তাহার উপায় ছিল না, এটুকু সে বেশ বুঝিয়াছিল, এখন আর চাপা দিবার উপায় নাই, দিলেই ইহাদের অপমানের মাত্রা আরো বাড়িবে বই কমিবে না। তাই সে জোর দিয়া কহিল, "নে আর দাঁড়াইয়ে থাকিসনে, চরণা। আমি তেষ্টায় ম'রে যাচ্ছি, আনবি ত আন, নইলে আমি নিজে নিয়ে খেতে জানি," বলিয়াই সে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহার উঠিয়া দাঁড়াইবার হেতুটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। কারণ এ-বাড়ীতে আজ সে প্রথম আসিয়াছে তাহা নহে। এ-স্থানটি শিবুর একটি আড্ডা বলিলেও চলে, এবং তাহার উৎপাত উপদ্রব ইহারা হাসিমুখে সহ্য করিয়া থাকে। বস্তুতঃ দিনুর স্ত্রী এই মা-মরা ছেলেটিকে নিজেরটির চেয়ে কম স্নেহ করিত না। সেই পরম স্নেহের পাত্রটি যখন তৃষ্ণার জল চাইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তখন এই নিরুপায়া নারীর সমস্ত অন্তর ঐ জলের কলসীটির ধারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল। কিন্তু তাহার পদদ্বয় কোন মতেই সে ঈপ্সিত স্থানে যাইতে পারিল না। দেখিল ঋষি-প্রবর্ত্তিত সনাতন সমাজ প্রকাণ্ড দানবের মত চুলের মুঠা ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টিতে না আছে করুণা, না আছে একফোঁটা স্নেহ—এমন কি, সমবেদনার এতটুকু আভাস পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু এ ভাবে চিন্তা করিবারও অধিক সময় মিলিল না। ওখানে শিবু একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। কহিল "ধাৎ, এরা কেবল হাঁ ক'রেই দাঁড়িয়ে থাক্‌তে জানে, যা! আমি নিজেই নিচ্ছি। খোষামদ আমার ভাল লাগে না," বলিয়াই অসীম বিরক্তির সঙ্গে দুই চারি পা অগ্রসর হইতেই দীনুর স্ত্রী আসিয়া সম্মুখে আড় হইয়া দাঁড়াইল। বাধা দিয়া কহিল, "বাবাঠাকুর! অমন কাজটি করো না, এ পোড়া জাত কি সেই তপিস্যে করেছিল যে, বামুনের হাতে দেবে জল! হায় রে পোড়া কপাল!" বলিয়া শিরে করাঘাত করিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমরা কি আবার মানষ্যি না কি! আমরাও শিয়াল কুকুরের সামিল, উপরওয়ালার বিচের যে বাবা," বলিতে বলিতে তাহার মুখ অসম্ভব রকমের পাণ্ডুর হইল, কথা ফুটিল না। শুধু কেবল অক্ষমের যা চির সম্বল, সেই চোখের জল ধারাব মত নামিতে লাগিল।

শিবু এতবড় করুণ মূর্ত্তিকেও আঘাত করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিল না। কহিল, "নাও, তোমাদের ও ঘ্যানঘ্যানানি আমার ভাল লাগে না; তোমার উপর-ওয়ালার ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, কে কোথায় কাকে জল দিচ্ছে তাকে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া ক'রে যাওয়া হয়েছে তাঁর কাজ। ওসব কি জান, ও একেবারে মিছে কথা। সত্যি কথা হচ্ছে, তোমরা শুধু বাবাদের ভয় কর, তা নইলে এইত আমি জল খাচ্ছি, দেখি একবার কোন্ ত্রিশূলওয়ালা খোঁচা দিতে আসেন" বলিয়াই সে দ্রুতবেগে ও-কোণের কলসীটার ধারে গিয়া চট্ করিয়া একঘটি জল গড়াইয়া লইল। মুহূর্ত্তে এই নারীর কঠিন সংস্কারের বাঁধ প্রবল বন্যার আঘাতে বালির স্তূপের মত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধসিয়া একাকার হইয়া গেল। দ্রুতপদে শিবুর কাছে আসিয়া পরম স্নেহের স্বরে সে কহিল, "বাবা ঠাকুর! শুধু জল ত আমি ম'রে গেলেও তোমাকে খেতে দেব না। একটুখানি ঐ পিঁড়ির উপর গিয়ে ব'স, আমিই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি" বলিয়াই যেমন ভাবে আসিয়াছিল ঠিক তেমনি ভাবে ছুটিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

৫

পল্লীগ্রামে কিছুই চাপা থাকিবার যো নাই। গোপাল মুখুজ্যের চাকর সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিল। দীনুর বাড়ীর পাশেই ইহাদের ঘর। তাহার স্ত্রী না কি আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিয়াছিল। শিবুর পিতা তারিণী অতিশয় কড়া হিন্দু। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মটাকে বাঁচাইয়া রাখিবার তাঁহার অশেষবিধ যত্নের ও চেষ্টার অবধি ছিল না। ছোটলোকের ছোঁয়াছিৎ ত দূরের কথা, চালের তলায় মাথা দিলেও গাড়ুর জলটি মরিয়া ভূত হইয়া যাইত। ঘটনাটা তারিণী-বাবুরও কাণে গেল। শুনিয়া তিনি বারংবার শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে কহিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ! চণ্ডালের জলগ্রহণ! এ যে মহাপাতক! এখন উপায়!"

তবে উপায় স্থির করিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না। কারণ, পাতকের ভয় যা সে ঐ প্রমাণ হইলেই,—না! মাটী হইল—অস্বীকার করিবার উপায় না থাকিলে। এমন কি, আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রুগুম্ফধারী নবাব-বংশোদ্ভব শুদ্ধ শান্ত পাচক সাহেবের হাতে রান্না করা গোস্ত, পোলাও চালান যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। অন্ততঃ এতটা সঙ্কীর্ণ এই সনাতন হিন্দু সমাজ নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া ছোটলোকের বাড়ীতে! তাহারা যে স্বজাতি! হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়! এর চেয়ে বড় অপরাধ আর আছে না কি! সুতরাং ঘোষাল মহাশয় অবিলম্বে আটঘাট বাঁধিয়া ফেলিবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে চলিলেন। প্রথম ধাক্কা চলিল তাঁহার একমাত্র পুত্র শিবুর পিঠের উপর দিয়া। সে যে কি ভীষণ অত্যাচার, সে কথা উল্লেখ না করাই ভাল। দীনুকে পূর্ব্বেই খবর দেওয়া হইয়াছিল। সে আসিয়া হাজির হইল। ডাকিবার হেতু সে পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল। রসিক স্মৃতিরত্ন এ বাড়ীর কুল-পুরোহিত। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। উপযুক্ত যজমানকে খুসী করা তাঁহার প্রয়োজন। সুতরাং সেখান হইতে খর বাক্যই বাহির হইবে। তিনি কহিলেন—"এ সব কি শুনছিরে, দীনে! এ সব মিথ্যে রটনা ক'রে বেড়ান ত ভাল নয়! দেবতা ব্রাহ্মণ নিয়ে তামাসা! বেটা চণ্ডাল কোথাকার! নির্ব্বংশ হ'বার ভয় নেই তোর!" বলিয়াই তিনি তাঁহার আরক্ত চক্ষু দুইটা দীনুর মুখের দিকে কটমট করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন।

নমঃশূদ্র জা'ত অতিশয় ধর্ম্মভীরু। ব্রাহ্মণের উপর ইহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার অন্ত নাই। এমন-কি, ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া উচ্চারিত বাক্য দেবাদেশ বলিয়া মনে করে। তাই স্মৃতিরত্ন যখন অভিসম্পাত করিবার ভয় দেখাইলেন, তখন দীনুর ভিতরটা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। কি যে সে মিথ্যা করিয়া রটাইয়াছে তাহাও বুঝিল। কহিল,—"এত বড় কথা কি ছোটলোকে মুখ দিয়ে খসাতে পারে! মুখ যে প'চে যাবে কর্ত্তা।"

স্মৃতিরত্ন পুলকিত হইয়া কহিলেন,—"তবে তাই বল!—এ সর্ব্বৈব মিথ্যা! জলও খায় নাই, তোর বাড়ী শিবনাথ যায়ও নাই।"

দীনু দুই হাত দুই কানে চাপা দিয়া কহিল, "রাম, রাম! এই এতখানি বয়েস হ'ল কর্ত্তা মিথ্যুক কেউ ক'বার পারে না। আজ এত বড় মিথ্যে আমি কব ক্যাম্‌নে? ওপর-ওয়ালার ত চোখ আছে!"

স্মৃতি-রত্ন দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, "হারামজাদা মিথ্যুক! এখানে এসেছ ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সাজ্‌তে? আমি জানি না? শুনিনি আমরা সব কথা? এ-বাড়ীর বুড়োঠাকরুণ তোর ব্যাটাকে পণ্ডিত দিয়ে বেত খাইয়েছিল, সেই রাগে তুই এই সব রটিয়ে বেড়াচ্ছিস্! আমরা কি ঘাস খাই? বুঝি না—এ সব বজ্জাতি!" বলিয়া পাশের বৃদ্ধটিকে একটু ধাক্কা দিয়া কহিলেন, "ও মধু খুড়ো! ছোট লোকের কত বড় বাড়-বাড়ন্ত হ'য়েছে দেখ্‌ছ?"

খুড়া কহিলেন, "আমরা ত এতকাল দেখে এলাম, এখন তোমরা পাঁচজনে তাই দেখ। জুতোর তলায় রাখ্‌তে পার, থাকবে। একটু ছাড়া পেয়েছে কি মাথায় চ'ড়ে ব'সে আছে! এমন নেমকহারাম জাত ওরা!"

ছোটলোক হইলেও আত্মসম্মান-বোধ এখনও এ জাতের যায় নাই। সে সহ্য করিতে পারিল না। একটু রুক্ষ স্বরেই কহিল,—"কর্ত্তা! আপনারা ভদ্দরলোক, দিনকে একেবারে রাত্তির কর্ত্তে পারো। আপনাদের সঙ্গে তকরার ক'রে ফল নেই। খোকাবাবু এখনও ছাওয়াল মানুষ।

বুদ্ধিশুদ্ধি এখনও পাকেনি। তেনারে ডাক দেখি? তিনি সত্যি ঘটনাই কবে।"

তারিণী-বাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া কহিলেন,—"আর তোমার, 'তিনি যদি বলেন তোর বাড়ী পর্য্যন্ত দেখে নি? তখন—"

একে বুড়ো মানুষ, তারপর এমন করিয়া বিদ্রূপ। বৃদ্ধ সহিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গে কহিল,—"তা হ'লে এই সদরে দাঁড়িয়ে শুনে দশ হাত নাকখৎ আর নিজ হাতে ২৫ জুতো খেয়ে ঘরে যাবো, এ তোমায় ক'লাম, বড় কর্ত্তা!"

পিতার আদেশে পরক্ষণেই শিবু আসিয়া যাহা সাক্ষ্য দিল, সেকথা না বলাই ভাল। শুনিয়া বৃদ্ধ দীনু মণ্ডল আর কথাটি পর্য্যন্ত কহিল না। নিঃশব্দে নাকখৎ দিল। পরে শুণিয়া শুণিয়া ২৫ জুতা নিজের মুখে মারিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ঘোষাল মহাশয়ের বৃদ্ধা জননী দীনতারিণী ভিতরটায় বসিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন। সমস্ত আলোচনাই তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। মিথ্যুকটা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও মালা-জপ শেষ হইল। পুত্রবধূ কি একটা দরকারে এ ঘরে আসিয়াছিল। শাশুড়ী তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "শুনলে ত, বউমা। বজ্জাৎ বেটার কথার শ্রী। হ্যাঁ, শিবু আমার গোঁয়ার দুষ্ট। সে-কথা আমি একশ' বার স্বীকার করব। তাই ব'লে বামুনের ঘরের ছেলে, সে যাবে এই অনাচার কর্ত্তে।"

বউমা রান্নাঘরে যাইতেছিলেন। ফিরিয়া কহিলেন, "দুষ্টুমী, গোঁয়ারতুমির কথা বলছ মা, সে একদিন না হয় শুধ্‌রে যেত; কিন্তু, এ যা ওকে শেখান হচ্চে তাতে আর দুঃখ থাক্‌বে না। ঐ ওখানে ব'সে যাঁরা বিচার করছেন, ঠিক ওঁদের মতই একজন হবে।"

শাশুড়ি কথাটার নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদ ত করি মা, যেন বাপ-খুড়োর নাম বজায় রাখতে ও পারে। নইলে বামুনের ছেলে মুখ্যুই হোক্ আর যাই হোক্ তাতে কেউ দোষ দেবে না। লোকে দেখবে গলার সুতো আর বিচার-আচারের জ্ঞান-গম্যি!"

দশম শতকে গৌড়ীয় শিল্প

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদীর্ঘ চত্বারিংশৎ বর্ষ গৌড়ীয় সাম্রাজ্য শাসন করিয়া দেবপালদেব স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই, তবে তাঁহার রাজ্যের অষ্টত্রিংশৎ বর্ষে তিনি যবদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেবের অনুরোধে নালন্দায় যবদ্বীপরাজ নির্ম্মিত মন্দিরবাসী বিগ্রহের সেবার জন্য শ্রীনগর বা পাটলিপুত্র ভুক্তিতে রাজগৃহ ও গয়া বিষয়ের অন্তঃপাতী যে গ্রাম পঞ্চক দান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তিনি অন্ততঃ চত্বারিংশৎ বর্ষকাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধবয়সে দেবপালকে গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশীয় প্রথম ভোজদেবের হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। খৃষ্টাব্দের নবম শতকের দ্বিতীয় পাদে গৌড়রাজকে কান্তকুব্জের অধিকার হারাইয়া মগধে ফিরিতে হইয়াছিল। দেবপালের পুত্র রাজ্যপাল বোধ হয় পিতার জীবদ্দশায় মরিয়া গিয়াছিলেন; কারণ দেবপালের মৃত্যুর পরে ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠভ্রাতা বাক্‌পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র প্রথম শূরপাল বা বিগ্রহপাল গৌড়সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে পাল বংশের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম শূরপাল বা বিগ্রহপালের রাজ্যকালের তৃতীয় বর্ষে উদ্দণ্ডপুর বা বর্ত্তমান পাটনা জিলার মহকুমা বা সব্-ডিবিসন বিহারে দুইটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উনিশ বৎসর পূর্ব্বে পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই দুইটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার-কালে একটু সামান্য ভুল করিয়াছিলেন। তিনি উদ্দণ্ডপুর না পড়িয়া "উদ্দণ্ডচুর" পড়িয়াছিলেন। তদনুসারে কোন কোন মহাত্মা এখনও এই শিলালিপিদ্বয়ে উদ্দণ্ডপুর নামক স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাঁহারা দশম শতকের অক্ষর পড়িতে পারেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কলিকাতার সরকারী যাদুঘরে গিয়া প্রথম মূর্ত্তির (৩৭৬৩ সংখ্যক মূর্ত্তির) তৃতীয় পঙক্তিতে এবং দ্বিতীয় মূর্ত্তির (৩৭৬৪ সংখ্যক মূর্ত্তির) ঐ পঙক্তিতে শব্দটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পারেন। শিল্প হিসাবে এই দুইটি মূর্ত্তি বিশেষ নিকৃষ্ট নহে ; কিন্তু এই দুইটি ও উহাদের একই সময়ের মূর্ত্তি মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, গৌড়ীয় শিল্পীর আদর্শের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতার সরকারী যাদুঘরে চারি হাত যুক্ত লোকনাথ বা লোকেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি (৬৪৭৩ সংখ্যক মূর্ত্তি) ঠিক এই সময়ের ; ইহাতে সর্ব্বপ্রথমে শিল্পীর আদর্শের আপেক্ষিক অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়।

গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশীয় প্রথম ভোজদেব কেবল পাল বংশকে বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশ হইতে দূর করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বার বার পাল রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ করিয়া শূরপাল ও তাঁহার পুত্র নারায়ণপালকে ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন। নারায়ণপালের রাজ্য কালের সপ্তম বর্ষে গয়া তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মুদগগিরি বা মুঙ্গের তাঁহার অধিকারে ছিল। ইহার পরে কোনও সময়ে প্রথম ভোজদেব মুদগগিরি বা মুঙ্গেরের যুদ্ধে পালরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভোজদেবের সামন্ত যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত মাণ্ডোর বা মাণ্ডব্যপুরের দশম শতাব্দীর সামন্তরাজ প্রতীহার বংশীয় কক্ক গৌড়রাজকে মুদগগিরির যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। ভোজদেবের অপর সামন্ত হৈহয়বংশীয় প্রথম গুণাম্ভোধিদেবও গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার পরে মগধের পশ্চিম অংশ, তিরহুত, মিথিলা, হাজারীবাগ ও উত্তরবঙ্গ গুর্জ্জর-প্রতীহার-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। গয়া জিলার গয়া নগরের নিকট রামগয়ায় ও দক্ষিণ দিকে ডোভির নিকট গুণেরিয়া গ্রামে, হাজারীবাগ জিলায় ইটখোরী গ্রামে, পাটনা জিলায় নালন্দার নিকটে ও রাজশাহী জিলায় পাহাড়পুর গ্রামে প্রথম ভোজদেবের পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপালদেবের শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেকালে লোকে মূর্ত্তি বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজার নাম, রাজ্যাঙ্ক বা রাজার রাজ্যকালের বৎসর এবং নিজেদের নাম পাথরে লিখাইয়া রাখিত। আমাদের দেশে বিক্রম বা শক সম্বৎসর বা অব্দের ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না। রাজার নাম ও রাজ্যাঙ্কই পাওয়া যায়। মহেন্দ্রপালের এইসমস্ত শিলালেখ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার রাজ্যের চতুর্থ হইতে নবম বর্ষ পর্য্যন্ত পাটনা, গয়া, হাজারীবাগ ও রাজশাহী জিলা এবং সম্ভবতঃ সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, পূর্ণিয়া, মালদহ ও দিনাজপুর জিলা তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই মহেন্দ্রপালদেবের রাজ্য-কালের তিনখানি মূর্ত্তি মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথম শূরপাল বা বিগ্রহপাল দেবের রাজ্যকালে গৌড়ীয় শিল্পের আদর্শ প্রথম যে-ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে দেখা গিয়াছে তাহা ক্ষণিক নহে, দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। যে তিনখানি মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হইল তাহার মধ্যে একখানি নালন্দার, দ্বিতীয়খানি গয়ার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত গুণেরিয়া গ্রামের ও তৃতীয়খানি হাজারীবাগ জেলার ইটখোরী গ্রামের। নালন্দার মূর্ত্তিখানির সহিত প্রথম শূরপাল বা বিগ্রহপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি দুইটি মিলাইয়া দেখা উচিত। তিনটি মূর্ত্তি একই স্থানে আবিষ্কৃত, শিলালেখ অনুসারে তিনটিই একই যুগের মূর্ত্তি, তিনটিই বুদ্ধ-মূর্ত্তি। এখনকার শিল্পীরা দেখিলে মনে করিবেন যে, তিনটি মূর্ত্তি একই ছাঁচে ঢালা। এখন যেমন বাঙ্গালার কুম্ভকারেরা দেব-মূর্ত্তির মুখের ছাঁচ গড়িয়া রাখে সুতরাং কার্ত্তিক ও সরস্বতীর মুখ একই ছাঁচ হইতে ঢালা হয়, এ তিনটি মূর্ত্তিও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু এই তিনটি পাথরের মূর্ত্তি ; সুতরাং ছাঁচে ঢালা সম্ভব নহে। ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, গৌড়ীয় শিল্পের প্রত্যেক কেন্দ্রে দেব-প্রতিমা গঠনের সময়ে শিল্পী আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিত
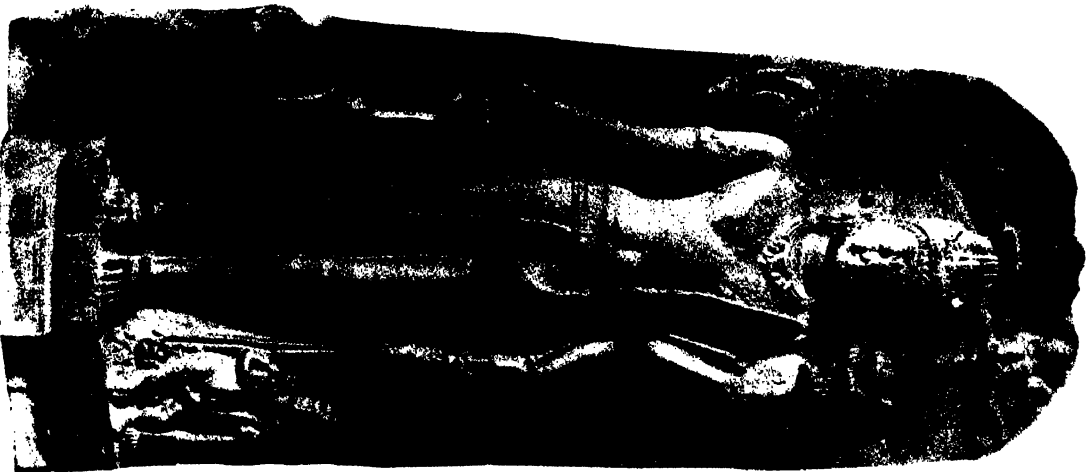
বিহারে আবিষ্কৃত চতুর্ভুজ লোকনাথ (I. M. No. 3962)

অজ্ঞাতস্থানে আবিষ্কৃত বুদ্ধ মূর্ত্তি (I. M. No. N. S. 2072)
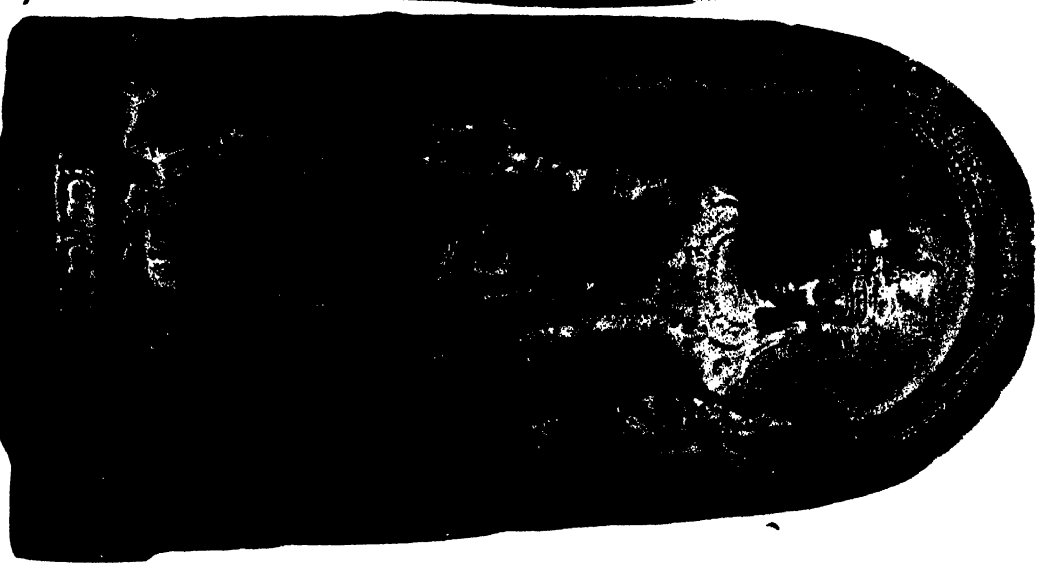
কুরকিহারে আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্ব (I. M. No. Kr. 7)

বুদ্ধ
দত (I I. No. B.

(I. M.), 4
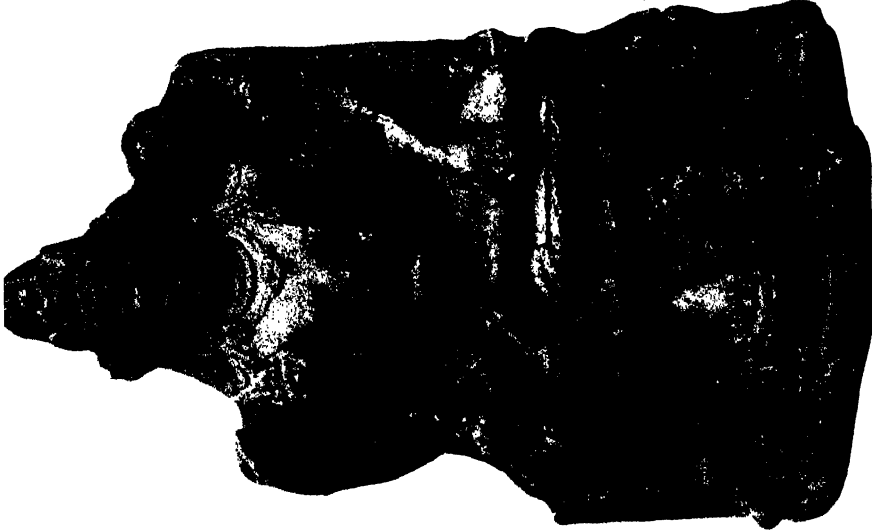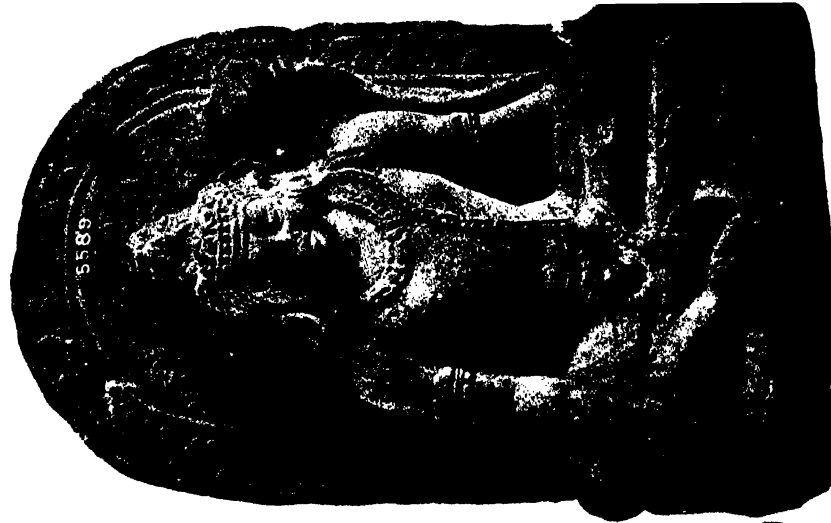
.. M. o. 558

বিহারে আবিষ্কৃত ১ম শূরপালের
৩য় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্ত্তি

নালন্দায় আবিষ্কৃত ২য় গোপালের
রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত বাগীশ্বরী মূর্ত্তি
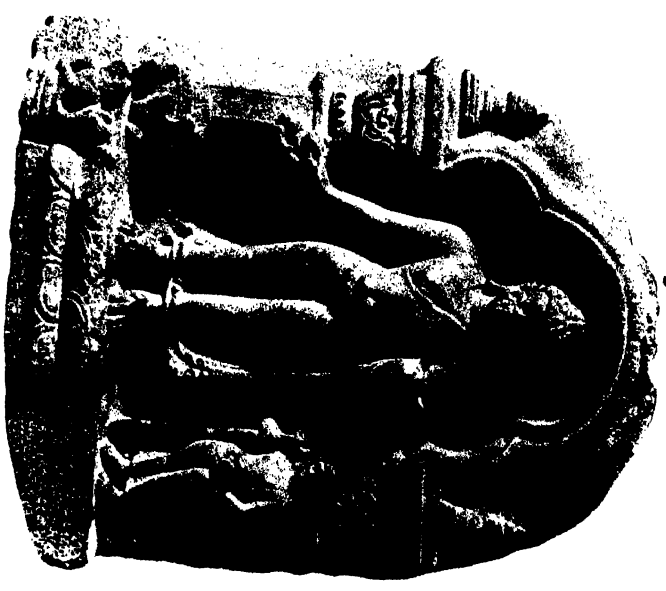
আবিষ্কৃত ১ম শূরপালের
জ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্ত্তি

হাজারীবাগ জেলার ইটখোরী গ্রামে আবিষ্কৃ
মহেন্দ্রপালের ৮ম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত তারা মূ

ালন্দায় আবিষ্কৃত মহেন্দ্রপালের
র্থ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্তি
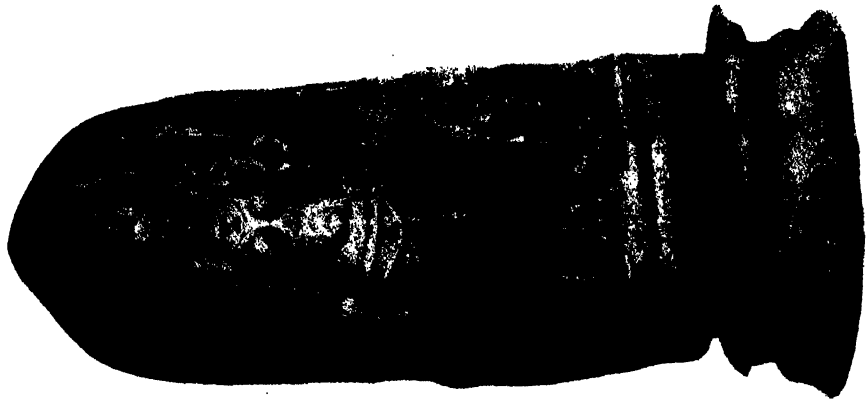
া গ্রামে আবিষ্কৃত
প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্তি

পূর্ব্বের দুইটি প্রবন্ধে যে-আদর্শের কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহা শিল্পীর মানসিক আদর্শ। শিল্পীর মনে কাম্যমূর্ত্তির যে সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয় গড়িবার সময়ে তাহা শিল্পী সম্পূর্ণরূপে কখনই ফুটাইয়া উঠিতে পারে না, তাহার মনের সৌন্দর্য্যের সহিত গঠিত মূর্ত্তির অবয়বের যেটুকু প্রভেদ থাকে প্রকৃত শিল্পী বার বার চেষ্টা করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে ফুটাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু শিল্পীর যখন অন্নাভাব হয় কিংবা অত্যাচার, অনাচার, রাজদ্রোহ প্রভৃতি নানা কারণে যখন দেশ চঞ্চল হইয়া উঠে তখন বহুচেষ্টা সত্ত্বেও শিল্পী শিল্পের উন্নতি করিতে পারে না এবং রাষ্ট্রীয় অশান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে শিল্পীর অধিকৃত আদর্শের সৌন্দর্য্যও ক্রমশঃ ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে।

অনাচারী রাজার বা বিদেশীয় শক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত রাজ্যেও শিল্পী উদরান্নের জন্ত মূর্ত্তি গড়ে, কিন্তু তখন আর সে মূর্ত্তি শ্রীসম্পন্ন থাকে না, শ্রেষ্ঠ শিল্পী পূর্ব্বে যে আদর্শ মূর্ত্তিতে আনিতে পারিয়াছিল তাহারই যথাসম্ভব অনুকরণ করিয়া ছাড়িয়া দেয়; নিকৃষ্ট শিল্পীরা কেবল একটা আদর্শেরই বার বার অনুকরণ করিয়া থাকে। ফলে একদেশের একস্থানের একই যুগের মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যে, সে-গুলি একই ছাঁচে ঢালা। উদ্দণ্ডপুর বা বিহারে আবিষ্কৃত প্রথম শূরপাল বা বিগ্রহপাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে সিন্ধু দেশীয় ভিক্ষু পূর্ণদাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম মূর্ত্তি (কলিকাতা চিত্রশালার সংখ্যা ৩৭৬৩) বুদ্ধের জীবনের একটি প্রধান ঘটনার চিত্র। গৌতম বুদ্ধের প্রাচীন জীবনী লেখকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, গৌতম সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে তাঁহার মাতার নিকট নিজধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনটি সোপান-শ্রেণী ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। প্রথমটি সুবর্ণের, মধ্যেরটি স্ফটিকের এবং শেষেরটি রজতের। গৌতম স্ফটিকের সোপান দিয়া, চামর হস্তে ব্রহ্মা সুবর্ণের সোপান দিয়া ও ছত্র লইয়া, ইন্দ্র রজতের সোপান দিয়া মর্ত্ত্যে সংকাশ্য নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন। পূর্ণদাসের প্রথম মূর্ত্তি এই ঘটনার চিত্র।

পূর্ণদাসের দ্বিতীয় মূর্ত্তি বুদ্ধের জীবনের আর-একটি ঘটনার চিত্র। কথিত আছে যে, বুদ্ধের ধর্ম্মজীবনের প্রধান শত্রু দেবদত্ত বহুবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একবার রাজগৃহ নগরের এক সঙ্কীর্ণ পথে দেবদত্ত একটি উন্মত্ত হস্তী ছাড়িয়া দিয়া দূরে অপেক্ষা করিতে ছিল। হস্তীটির নাম নালাগিরি এবং উহা পূর্ব্বে দুই চারিটি নরহত্যা করিয়াছিল। নালাগিরি প্রথমে বুদ্ধকে দেখিয়া শুণ্ড উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু বুদ্ধের নিকটে আসিবামাত্র তেজে অভিভূত হইয়া জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। পূর্ণদাসের দ্বিতীয় মূর্ত্তি এই ঘটনার চিত্র (কলিকাতার চিত্রশালার ৩৭৬৪ সংখ্যক মূর্ত্তি)। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে পরমশ্রদ্ধাস্পদ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কলিকাতা চিত্রশালার জন্ত এই ঘটনার চিত্রযুক্ত আর-একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি বিহার অথবা নালন্দায় পাইয়াছেন। ইহা মহেন্দ্রপালদেবের চতুর্থ বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (কলিকাতার চিত্রশালার এন্, এস্, ৪২৫০ সংখ্যক মূর্ত্তি)। পূর্ণদাসের দুইটি মূর্ত্তি সম্ভবতঃ একই শিল্পী কর্ত্তৃক গঠিত, কিন্তু ইহাদিগের সহিত মহেন্দ্রপালের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিটির তুলনা করিলে মনে হয় যেন উহাও একই শিল্পী কর্ত্তৃক গঠিত, অথচ তৃতীয়মূর্ত্তিটি অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পরে গঠিত হইয়াছিল। এই তিনটি মূর্ত্তির সাদৃশ্যের কারণ পালরাজ্যের অবস্থার অবনতি এবং তাহার সহিত গৌড়ীয় রাষ্ট্রের প্রজার অবস্থান্তর ও বিজিত মগধ দেশে বার বার রাজপরিবর্ত্তন। এই তিনটি মূর্ত্তিতে গৌড়ীয় শিল্পের অবনতির নিম্নলিখিত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়:—

(১) বুদ্ধ-মূর্ত্তির অবয়বে পরিমাণের অভাব, হস্তের তুলনায় পদদ্বয়ের হ্রস্বতা,

(২) দেহের উপরিভাগের তুলনায় নিম্নভাগের খর্ব্বতা,

(৩) সর্ব্বাঙ্গে লালিত্যের অভাব।

বহুকাল পূর্ব্বে গয়া জেলার দক্ষিণাংশে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্করোডের নিকটে গুণেরিয়া গ্রামে এই মহেন্দ্রপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্কে আর-একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা এখনও সেই স্থানেই আছে। এই মূর্ত্তিটি গৌতমের সম্যক্সম্বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের চিত্র। ইহাতেও শিল্পীর

দশম শতকের তৃতীয় অথবা চতুর্থ। পাদের মূর্ত্তির পাদপীঠের শিলালেখ অনুসারে ইহা প্রজ্ঞপ্রভের মূর্ত্তি। এক শীর্ষ দ্বিভুজ মূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে ধৃত সনালোৎপলের উপরে পুস্তক দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা মহাযান সম্প্রদায়ের বিদ্যাধিপতি মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষের প্রকারভেদ। মূর্ত্তিটির মুখ ও হস্তদ্বয় আঘাতে ভগ্ন, তথাপি ইহার সর্ব্বাবয়ব অতি সুন্দর। ইহা কলিকাতা চিত্রশালার বি, জি ৭৪ সংখ্যক মূর্ত্তি। তৃতীয় মূর্ত্তিটি কোনও অজ্ঞাত বোধিসত্বের মূর্ত্তি, ইহা উপবিষ্ট একশীর্ষ ও দ্বিভুজ। মূর্ত্তির পৃষ্ঠের শিলা ফলকে "যে ধর্ম্ম হেতু প্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধ মন্ত্রটি খোদিত না থাকিলে বুঝিতে পারা যাইত না যে, ইহা বৌদ্ধ-মূর্ত্তি। অক্ষরতত্ত্বের বিচারে ইহা দশম শতকের দ্বিতীয়, অথবা তৃতীয় পাদের মূর্ত্তি। বোধিসত্বের কুঞ্চিত কেশের উপরে মুকুট আছে, কিন্তু কোনও ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি নাই। দক্ষিণ হস্তে ধৃত সনালোৎপলের উপরে একটি রত্ন এবং বাম হস্ত বরদ মুদ্রায় অবস্থিত (কলিকাতা চিত্রশালার ৫৫৮৯ সংখ্যক মূর্ত্তি)।

দেবমূর্ত্তির মুখশ্রী, শিল্পীর পরিমাণ-জ্ঞান ও সর্ব্বাবয়বের লালিত্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দশম শতকের তৃতীয় পাদে কোনও অজ্ঞাত কারণে অবনতির পরে আবার গৌড়ীয় শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। এ উন্নতির কারণ কি তাহা বুঝিবার শক্তি এখনও আমাদের হয় নাই। গৌড়-রাজ্যের অবস্থা তখনও অত্যন্ত হীন। দেবপালের রাজ্যের শেষভাগে ধর্ম্মপালের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, নারায়ণপালের রাজ্যকালে মগধ, তীরভুক্তি, মিথিলা ও বরেন্দ্রভূমি প্রতীহারসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ধীরে ধীরে নারায়ণপালের বংশধরগণ মগধ জয় করিয়াছিলেন। রাজ্যপালের রাজ্যকালে উদ্দণ্ডপুর বা পাটনা জিলার বিহার নগর তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। দ্বিতীয় গোপালের রাজ্যকালে নালন্দা ও বুদ্ধগয়া তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। নারায়ণপালের মৃত্যুর পরে তিন পুরুষ পালবংশের রাজারা কেবল মগধের কতক অংশ ও রাঢ় দেশের রাজা ছিলেন বলিয়াই বোধহয়। এই সময়ে শিল্পের অবনতি হইয়া আবার কেমন করিয়া উন্নতি আরম্ভ হইল তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। পালবংশগৌরবের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মহীপাল দশম শতকের তৃতীয় পাদের কোনও সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পালবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই গৌড়রাষ্ট্রে শিল্পোন্নতির দ্বিতীয় যুগ আরব্ধ হইয়াছিল।

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(২৭)

সুবীরের আগমন-সংবাদ সে দেওয়ানজীকে দেয় নাই। কারণ হাতী, গাড়ী বরকন্দাজ লইয়া ভীষণ একটা হৈ চৈ করিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না। আজন্ম অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পালিত হইয়াও তাহার ভিতর কোথায় একটা সর্ব্বত্যাগী বৈরাগীর ভাব ছিল। বেশী জাঁকজমক, অর্থের ছড়াছড়ি দেখিলে, মনটা তাহার সঙ্কুচিত না হইয়া পারিত না। অথচ এসব সহ্য না করিয়াও তাহার উপায় ছিল না। ভানুমতীর একমাত্র সন্তান সে, কাজেই সব সাধ তাঁহার সুবীরকেই মিটাইতে হইত। এত বড় জমিদার সে, টাকা রাখিবার যাহার স্থান নাই, সে যদি এমন করিয়া সন্ন্যাসীর মত বেড়ায় তাহা হইলে এ সব ধন-সম্পদে আগুন লাগাইয়া দিলেই হয় ? কাহার জন্য এ সব ? বংশে ত আর কুল-কুঁড়া একটাও কেহ নাই ? অগত্যা মা

সঙ্গে থাকিলে মনে মনে হাজার বিরক্ত হইলেও জমিদার-গিরি না ফলাইয়া সুবীরের উপায় ছিল না।

এবার কিন্তু সে যে-কোনো সাধারণ যাত্রীর মতই আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রেণ হইতে সে এবং ইন্দ্র নামিয়া দেখিল সুবীরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোন ব্যক্তিই উপস্থিত নাই। দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সুবীরের ভয় ছিল, পাছে মা তাহাকে না জানাইয়াই দেওয়ানজীকে কোনো খবর দিয়া থাকেন।

কিন্তু প্ল্যাটফর্ম্মে নামিবামাত্র একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র ষ্টেশন, এখানের ষ্টেশন-মাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কুলিটি পর্য্যন্ত জমিদার-বাবুকে উত্তমরূপে চিনিত। হঠাৎ এ ভাবে তিনি উপস্থিত হওয়ায় সকলে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। গাড়ী নাই, ঘোড়া নাই, হাতী নাই, রাজাবাবু কি হাঁটিয়াই বাড়ী যাইতে চান না কি?

সুবীর সঙ্গে জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই আনে নাই। তাহার নিজের একটা স্যুটকেস্ এবং ইন্দ্রের একটা ব্যাগ ভিন্ন আর কিছুই তাহাদের সঙ্গে ছিল না। এই দুইটা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একটা কুলি ডাকিবামাত্র সকলে যেন নিজেদের লুপ্ত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল। ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কুলিটাকে এক ধাক্কা দিয়া সরাইয়া বলিলেন, "দূর ব্যাটা ভূত, এ মোট ঘাড়ে কর্‌বার যোগ্যতা তোর এ জন্মে হবে না।" সুবীরকে আভূমি প্রণত হইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বাবু এই রোদে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরের ভিতর এসে বসুন। দেওয়ানজীর এত দেরী হচ্ছে যে? একটা লোক পাঠিয়ে দেব তাঁর কাছে?"

সুবীর বলিল, "তাঁকে খবর দেওয়া হয় নি। যাক্ একটা লোকই পাঠিয়ে দিন। রোদটাও বেশ জোর হ'য়ে উঠেছে।"

সুবীর এবং ইন্দ্র ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরের ভিতর গিয়া বসিল। একটা কুলি তাহাদের আগমনবার্ত্তা লইয়া জমিদার বাড়ীর দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া চলিল।

ইন্দ্র বলিল, "এই দেখুন, আমি আগেই বলেছিলাম না? 'Some have greatness thrust upon them'. আপনি যতই কেন না ফাঁকি দেবার চেষ্টা করুন, আপনার জমিদারী আপনাকে তাড়া ক'রেই বেড়াবে।"

সুবীর বলিল, "যাক্ ক'দিনই বা থাক্‌ব? একেবারে হাড় জ্বালাতন হ'য়ে উঠ্‌বার সময়ই হবে না।"

ইন্দ্র বলিল, "দেখুন বিধাতার কি অবিচার। আপনার সমস্ত প্রাণটা হাহাকার করছে পুঁইশাক চচ্চড়ি খেয়ে হাঁটুর উপর কাপড় প'রে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে বেড়াতে, অথচ আপনিই কি না জন্মালেন মস্ত বড় এক জমিদার হ'য়ে। কুলীন-কুলোদ্ভব কুলী না হ'লে, আপনার ছেঁড়া জুতো পর্য্যন্ত ছুঁতে পায় না। আর আমার দশাটা দেখুন। আবু হাসানের মত এক রাত্রির জন্যে যদি আমাকে কেউ রাজা ক'রে দেয়, তা হ'লে চুটিয়ে ফুর্ত্তি উড়িয়ে নিই। গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, আসাসোটা, বরকন্দাজ, রাজপ্রাসাদ, রাজনন্দিনী, কোনো কিছুতেই আমার অরুচি নেই। অথচ আমার অদৃষ্টে কলকাতার এঁদোগলির বাড়ী, ছ্যাকড়া থার্ডক্লাশ গাড়ী, হাবী ঝি এবং কুচো চিংড়ী ছাড়া কিছুই জোটে না। এটা অন্যায় নয়? ভাগ্য অদল-বদল ক'রে নেওয়া যায় না?"

সুবীর বলিল, "একটি জিনিষ বাদ দিয়ে গেলে যে? তাঁকে এক রাণীর রাজা হবার লোভেও ছাড়্‌তে রাজী হবে কি না সন্দেহ।"

ইন্দ্রের তরুণী পত্নীটির সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। সে একটু গর্ব্বিত হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঐখানে বিধাতা একটু ঠিকে ভুল ক'রে ফেলেছিলেন। ওকে আমাদের বাড়ীতে মোটেই মানায় না। হাবী ঝি আর গয়লানীর মধ্যে তাকে দেখায় যেন চেড়ীপরিবৃতা সীতা।"

সুবীর বলিল, "ভালই ত। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা যত কালো হবে, তার গায়ে আলোও তত বেশী ফুটবে।"

এমন সময় মস্ত-বড় এক ফিটন হাঁকাইয়া বৃদ্ধ দেওয়ানজী মহা ব্যস্তভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুবীর উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাওয়ায় তাহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "একি কাণ্ড! একটা খবর দিতে নেই?"

সুবীর বলিল, "ভারি ত ব্যাপার, তার আর খবর

দেব কি? কলকাতায় ভাল লাগছিল না ব'লে কয়েক দিন এখানে কাটিয়ে যেতে এলাম। একলা মন টিক্‌বে না ব'লে ইন্দ্রকে পাকড়ে এনেছি।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "বাবা, নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কথাটা বল্‌লে। তোমার এ-সব কিছু ভাল লাগ্‌তে না পারে, কিন্তু এ সব দরকার যে? প্রজারা সব মূর্খ মানুষ, তারা কি এ সব সিম্পিলিসিটির মানে বোঝে? তাদের কাছে নিজের মান বজায় রাখ্‌তে হ'লে এ সব হাঙ্গাম না ক'রে উপায় নেই।"

সুবীরের তখন ঠিক তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে আর কথা না বাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল। জমিদারের প্রাসাদ ষ্টেশন হইতে মাইল-খানেক দূরে। তাহাদের পৌছিতে বেশী দেরী হইল না।

সুবীরের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে চাকর-বাকর সব সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ঘরগুলি বেশীর ভাগই বন্ধ পড়িয়াছিল, কেবল দু-চারটায় চাকররা নিজেদের আড্‌ডা স্থাপন করিয়া মহাসুখে বাস করিতেছিল। গাড়ী লইতে লোক আসিবামাত্র তাহারা হুড়াহুড়ি করিয়া নিজেদের পোট্‌লা-বিছানা প্রভৃতি সরাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুবীর যখন আসিয়া পৌছিল, তখনও চারিদিকে ভৃত্য-রাজকতন্ত্রের চিহ্ন সুস্পষ্ট, সে সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়াই বৈঠকখানায় গিয়া বসিল। ইন্দ্র বলিল, "সুবীরবাবু, কিছু যদি মনে না করেন, বেজায় তেষ্টা পেয়েছে।"

সুবীর দেওয়ানজীর দিকে ফিরিবামাত্র তিনি বলিলেন, "এই-যে সব এসে পড়্‌ল ব'লে। যদি একটু খবর দিয়ে আস্‌তে, কোনো অসুবিধাই হ'ত না। এই সবেমাত্র দু-দিন আগে বামুন ঠাকুরুণটি তীর্থ কর্‌বার ছুটি নিয়ে গেলেন। আমি জানি যে এখন তোমাদের আস্‌বার কোনোই সম্ভাবনা নেই, তাই দিলাম ছেড়ে। সঙ্গে তোমাদের তারা পিসী ঠাকুরুণও গিয়েছেন। কাজেই ক'টা দিন কষ্ট ক'রে আমার বাড়ীর ডাল-ভাতই খেতে হবে। একটু জলখাবার, চা করতে ব'লেই এসেছি, এতক্ষণে হ'য়ে গেছে।"

সুবীর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তাইত খবর না দিয়ে আপনাকেই বিপদে ফেল্‌লাম দেখ্‌ছি।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "এটা আমার বিপদ হ'ল না কি? অবশ্য যদি তোমরা খেতে না পার, তা হলে বিপদই হবে।"

ইতিমধ্যে একরাশ লুচি, তরকারি, ভাজা, নানা-প্রকারের পিঠা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহন করিয়া চার পাঁচ জন চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। দেওয়ানজী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এই দেখ্, ব্যাটারা 'চা'টাই ভুলে এসেছিস? আরে সেটাই যে আগে দরকার!"

সুবীর বলিল, "ব্যস্ত হবেন না, চা এক বেলা না খেলে কোনো অসুবিধাই হ'বে না।"

বৃদ্ধ দেওয়ানজী সে কথায় কান না দিয়া চাকরদের বকিতে বকিতে নিজেই বাহির হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র বলিলন "নিন্ সুবীরবাবু, আরম্ভ ক'রে দিন। ভদ্রতা ক'রে জল চাইছিলাম বটে, কিন্তু আশা ছিল মনে মনে, তার চেয়ে সারবান পদার্থ কিছু জুটবে।"

খাইতে খাইতেই চা আসিয়া পড়িল। দেওয়ানজী নিজে সাম্‌নে বসিয়া তাহাদের সব জিনিষই কিছু কিছু খাওয়াইয়া তবে ছাড়িলেন। সুবীর আপত্তি করায় বলিলেন, "রান্না হ'তে কত দেরি হ'বে তার ঠিকানা কি? কিছু না খেয়ে রাখ্‌লে পিত্তি প'ড়ে যাবে যে।"

জলযোগান্তে সুবীর বলিল, "একবার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, তারপর ইন্দ্রকে নিয়ে ঘুর্‌তে বেরনো যাবে।" দেওয়ানজীর স্ত্রীকে সুবীর জ্যাঠাইমা বলিয়া ডাকিত।

দেওয়ানজী বলিলেন, "তোমার কাকার ওখানেও একবার যেও। তিনি খুব ভুগ্‌ছেন শুনলাম, না গেলে ভাল দেখাবে না।"

সুবীর বলিল, "হ্যাঁ, যাব একবার বিকেলে।" এমন সময় একটি চাকর আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও?"

চাকরটি জিজ্ঞাসা করিল, "শোবার জন্যে কোন্ কোন্ ঘর ঠিক করব?"

সুবীর বলিল, "গোটাদশ ঘরের কিছু প্রয়োজন নেই. একটা ঘর হ'লেই হবে। দুটো বিছানা বেশ ক'রে ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে পেতে রেখ।"

দে॰ ানজীর ব'াড়ী যাইবার জন্য উঠায় তিনিও তাহার সঙ্গেই চাললেন। ইন্দ্র বলিল, "সুবীরবাবু, আসবার পথে চমৎকার একটা দীঘি দেখ্‌লাম। আপনি যতক্ষণ দেখা সাক্ষাৎ কর্‌বেন, আমি ততক্ষণে স্নানটা সেরে রাখি। কলকাতায় থেকে থেকে মনের সুখে সাঁতার দেওয়ার কি যে আনন্দ তা একরকম ভুলেই গিয়েছি।"

সুবীরের কোনও আপত্তি ছিল না। ইন্দ্র কাপড় তোয়ালে প্রভৃতি বাহির করিবামাত্র, সেগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য একজন চাকর আসিয়া জুটিল। দেওয়ানজী একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া ইন্দ্র নীচু গলায় বলিল, "সুবীরবাবু, আমার প্রার্থনাটা পূর্ণ হ'তে চল্‌ল দেখ্‌ছি। কাপড় বইবার জন্যে চাকর ত স্বপ্নের অতীত ব্যাপার আমার।"

ইন্দ্রকে রওনা করিয়া দিয়া, সুবীর দেওয়ানজীর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তাঁহার বাড়ী অতি নিকটেই, কাজেই সুবীর গাড়ী চড়িতে কিছুতেই রাজী হইল না।

দেওয়ানজীর বাড়ীতে দেখা করিবার লোক খুব যে বেশী ছিল, তাহা নয়। তাঁহার বড় ছেলে থাকিত কলিকাতায়, বড় মেয়ে থাকিত শ্বশুরবাড়ী। বিধবা একটি কন্যা, একটি শিশু পুত্র লইয়া বাপের কাছে থাকিত। আর ছোট ছেলেও এখানে থাকিয়া বাপকে সাহায্য করিত।

জ্যাঠাই মাকে প্রণাম করা এবং বাড়ীর সব লোকের খবর দেওয়া শীঘ্রই চুকিয়া গেল। বিধবা হইবার পর প্রমীলা বড় একটা কাহারও সামনে বাহির হইত না। তবু সুবীরকে তাহারা জন্মাবধি দেখিতেছে, নিজের ভাইয়ের মতই সে সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছে, কাজেই সে বাড়ী আসায় দেখা না করিয়া পারিল না। তাহার নিরাভরণ থানপরা চেহারা দেখিয়া সুবীর কি যে বলিবে কিছু ভাবিয়া পাইল না। কোনোরকমে কুশল-প্রশ্নটা মুখ দিয়া তাহার বাহির হইল বটে, সেটাও কেমন যেন ঠাট্টার মত শুনাইল। প্রমীলার ছেলেকে আগে সে দেখে নাই, তাহার হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজিয়া দিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল ইন্দ্র তখনও আসে নাই। তাহার ক্ষণিক অনুপস্থিতির অবসরে চাকররা ঘর-দোর ঝাড়-পোঁছ করিয়া অনেকটাই ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিয়াছিল। শুইবার ঘরে গিয়া পালঙ্কের বিছানার উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া, সুবীর ইংরাজী মাসিক পত্র পড়ায় মন দিল।

হঠাৎ বাহিরে কিসের একটু শব্দ শোনা গেল। সুবীর চাহিয়া দেখিল, একজন চাকর দাঁড়াইয়া। সুবীর তাহার দিকে তাকাইতেই সে নমস্কার করিয়া জানাইল, "ছোট বাবু এসেছেন। বৈঠক খানায় ব'সে আছেন।"

ছোট বাবু অর্থাৎ উদয়। সুবীর আসিবামাত্রই তাঁহার স্নেহের নদীতে এমন জোয়ার উপস্থিত হইতে দেখিয়া, না হাসিয়া পারিল না। বিকালে পাঁচ মিনিটের জন্যে সে তাঁহাদের বাড়ী যাইবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ভাইপোর প্রতি টানে কাকা তাহার পূর্ব্বেই আসিয়া হাজির হইলেন।

যাহা হোক, আসিয়াছেন যখন তখন দেখা করিতেই হইবে। ইংরাজী মাসিক রাখিয়া চটি পায়ে দিয়া, সুবীর বৈঠকখানার দিকে চলিল।

উদয় বড় একটা কৌচে হেলান দিয়া বসিয়া ছিল। তাহার মাথার চুল এখন অর্দ্ধেক পাকা, টাকও একটা মাঝারী গোছের দেখা দিয়াছে। চোখে মুখে বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের দাগ সুস্পষ্ট। রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া চেহারা এখন অনেকটাই রোগা হইয়া গিয়াছে।

সুবীর উদয়কে প্রণাম করিতে সর্ব্বদাই মনে মনে আপত্তি অনুভব করিত। কিন্তু নিতান্ত কাকা, না করিয়াও উপায় নাই। যাহা হউক, প্রণামটা অর্দ্ধেক হইতে-না-হইতেই, উদয় তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া ফেলিল। যেন মহা ব্যস্ত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে বাবাজী, কোনো খোঁজ না দিয়েই এসে পড় লে যে? সব খবর ভাল ত? তোমার মা ঠাকরুণ ভাল আছেন ত?"

সুবীর, বলিল, "এলাম এমনি একটু বেড়াতে। কাজ বিশেষ কিছু নেই। হ্যাঁ, মা ভালই আছেন। তবে ভবানী দিদিকে নিয়ে বড় ব্যস্ত।"

উদয় অত্যন্ত নিরাহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও তাই

না কি ? খুব অসুখ বুঝি তার ? কই এখানে তা ত কিছু শুনিনি ?"

সুবীর বলিল, "এখানে আর তার খবর কে দিতে যাবে ? খুবই অসুখ, এবার আর টিক্‌বে না মনে হচ্ছে !"

উদয় মুখটা একটু বিষণ্ণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, "সে গেলে তোমাদের একটু মুস্কিলে ফেলে যাবে। এখানে থাক্‌তে ত দেখ্‌তাম, বৌঠাকরুণ কিছুই দেখ্‌তেন না, ওই সব চালাত।"

সুবীর বলিল. "হ্যাঁ, ওখানেও তাই চল্‌ত। আমায় মানুষ করার কাজটাও সে যতটা করেছে, মা ততটা করেননি।"

উদয় বলিল, "যাক্‌, কথায় কথায় আসল কথাটা ভুলেই যাচ্ছিলাম। তোমাদের ওখানে ত রান্না-বান্না কর্‌বার লোক নেই কেউ, সব তীর্থি কর্‌তে গেছে। তা যা হয় দুটো ডাল ভাত, আমার এখানেই খেও।"

সুবীরের মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল। সে বলিল, "দেওয়ানজী বাড়ীতে সব রান্না-বান্না করাচ্ছেন, সেখানেই খাব বলেছি।"

উদয় বলিল, "তা আজ না হয় কালই হ'বে। আমি এখানে থাক্‌তে, পরের বাড়ী খেয়েই বিদায় হবে, সেটা কি ভাল দেখায় ? তোমার কাকীমা বড় দুঃখ কর্‌বেন তা হ'লে।"

কাকীমাটিকে সুবীর দুই এক বারের বেশী চোখেও দেখে নাই। কাজেই তিনি যে সুবীরের পরের বাড়ী খাওয়ার দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া পড়িবেন তাহা মনে করিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সে-কথা বলিয়া উদয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। সুবীর ভাবিতে লাগিল, মিথ্যা কথা একটা বলিতেই হইবে, সেটা মায়ের কাছে না বলিয়া কাকার কাছে বলাই ভাল।

যাই হোক্‌, দেওয়ানজী তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। বাহির হইতেই খুড়া-ভাইপোর কথোপকথনের কিছু অংশ তিনি শুনিয়া থাকিবেন বোধ হয়। ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, "তোমার শিকারে যাবার ব্যবস্থা সব ক'রে এলাম। কাল সকাল বেলাই বেরিয়ে পড়্‌তে পার্‌বে।"

সুবীরের শিকারে যাওয়া যে একেবারে নিষেধ তাহা দেওয়ানজী ভাল করিয়াই জানিতেন। কিন্তু উদয়ের বাড়ী খাওয়া যে আরো বেশী করিয়া নিষেধ, তাহাও তিনি জানিতেন। সুতরাং তাড়াতাড়িতে উদয়কে নিরস্ত করিবার আর কোনো উপায় ভাবিয়া না পাইয়া সুবীরকে শিকারেই চালান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সুবীর ব্যাপারটা আন্দাজে বুঝিয়া বুদ্ধিমানের মত চুপ করিয়া রহিল। উদয় বলিল, "তা হ'লে কি আর হ'বে ? তোমার সুবিধা হ'বে না, তোমার কাকীমাকে বল্‌ব এখন। কিন্তু তুমিও শেষে এই খেয়ালে মজ্‌লে, বাবাজী ? তোমাদের কম সর্ব্বনাশ ত এতে হয়নি।"

সুবীর বলিল, "সবরকম খেয়ালই কারো-না-কারো পক্ষে মারাত্মক হয়েছে। ছাড়্‌তে হ'লে তাহ'লে সব কিছুই ছেড়ে দিতে হয়। আচ্ছা, বিকেলে যাব এখন কাকীমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে।"

উদয় উঠিয়া পড়িয়া বলিল "হ্যাঁ, একবার যেও। আমার শরীরটা আজকাল মোটেই ভাল যাচ্ছে না। সন্ধ্যার পরেই শুয়ে পড়ি একটু বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে যেও।"

উদয় বাহির হইয়া যাইতেই দেওয়ানজী বলিলেন, "যাক্‌, চট্‌ ক'রে কথাটা মাথায় এল, তাই। তা না হ'লে যা নাছোড়বান্দা মানুষ, তোমাকে বাগিয়ে না নিয়ে ছাড়্‌ত না।"

সুবীর বলিল, "নিতান্ত মায়ের কাছে কথা দিয়ে এসেছি, তা না হ'লে আমি যেতামই। কবে কি শত্রুতা করেছিলেন ব'লে এখন অবধি অতটা শত্রুতার ভাব বজায় রাখা আমার ভাল লাগে না। বিশেষ ক'রে এখন শত্রুতা ক'রে লাভই বা কি ? তাঁর ছেলেপিলেও নেই কিছু, চেহারা দেখে মনে হয় না যে, নিজেও আর বেশী দিন টিক্‌বেন।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "অতটা নিরীহ হ'য়ে গেছেন মনে কোরো না। যে ক'টা দিন বেঁচে আছেন, সেই ক'টা দিনই ফুর্ত্তি কর্‌তে পার্‌লে কি ছেড়ে দেবেন ? তোমার অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌লে এখনও তার ভাল বই মন্দ নয়।

এইজন্যেই না তোমার মা-ঠাকরুণ তোমার বিয়ে দিয়ে দিতে এত ব্যস্ত।"

কথাটা কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িল। সুবীর তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া বসিল। বলিল, "ইন্দ্রটা ভারি দেরি কর্ছে, উৎসাহের চোটে বেশী জল ঘেঁটে জরজাড়ি না ক'রে বসে। তাহ'লে তার মা আর আমায় আস্ত রাখবেন না।"

দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোক্‌রাটি সাঁতার ভালরকম জানে ত? আমাদের দীঘিটি লম্বা-চওড়ায় কম নয় বড়। মানুষ বিপদে পড়তে পারে।"

সুবীর হাসিয়া বলিল, "সে ভয় নেই কিছু। ওর সমান সাঁতার দিতে পাড়াগাঁয়ের ছেলেরাও পারে কি না সন্দেহ। কলকাতায় কত Swimming competetionএ ও Gold medal পেয়েছে তার ঠিকানা নেই।"

ইন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া পৌছিল। সুবীরকে জিজ্ঞাসা করিল, "অনেকক্ষণ ব'সে আছেন বুঝি?"

সুবীর বলিল, "বেশীক্ষণ না। চল, তোমায় একবার আমার রাজত্বটা ঘুরিয়ে আনি। খানিকক্ষণ আগেই যা পেট ঠেসে খেয়েছি ভাত খাবার জায়গা নেই। গাড়ীটা তৈরীই আছে বোধ হয়।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "হ্যাঁ ঠিকই আছে, যাও। কিন্তু আমি ভাবছি, কালকে তোমায় কোথাও-না-কোথাও একটু বেরিয়ে পড়তে হবে, তোমার কাকার সাম্‌নে কথাটা ব'লে ফেলেছি যখন। শিকারে যাওনি দেখলে মহাকাণ্ড বাধাবে আর কি?"

সুধীর বলিল, "যাবার জায়গার অভাব কি? নৌকায় ক'রে নদীতে বেশ একচোট ঘুরে আস্‌ব। বড় বজরাটা ঠিক কর্তে ব'লে দেবেন।" সুবীর আর ইন্দ্র বেড়াইতে চলিয়া গেল। পরদিন দেখা গেল, দিনটা একটু মেঘ্‌লা। নৌকা করিয়া যাওয়া ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইবে না ভাবিয়া সুবীর আর ইন্দ্র গাড়ী করিয়াই বাহির হইয়া গেল। তাহাদের প্ল্যান ছিল মাইল দশ দূরে আর এক গ্রামে জমিদারের এক কাছারী বাড়ী ছিল, সেইখানেই গিয়া উঠিবে। সেখানে খাওয়া দাওয়া, ঘোরা ফেরা, গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বেলাটা কাটাইয়া বিকালে যদি মেঘ কাটিয়া যায় ত নৌকা করিয়াই ফিরিয়া আসিবে। না হয় আবার গাড়ীরই শরণ লইতে হইবে।

যাইতে যাইতে ইন্দ্র বলিল, "আপনার হয়ত মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না, কারণ এসবে আপনারা অভ্যস্ত। আমার কিন্তু সহরের বাইরে এলেই খুব ভাল লাগে। একমনে এত ভাবছেন কি? উত্তরটা জানিই অবশ্য।"

সুবীর বলিল, "মোটেই জান না। আমি ভাবছিলাম আমার মাস্‌তুতো ভাই সুশীলের কথা। আজ তার আইবুড়োভাতের ধূম লেগে গেছে এতক্ষণ। ছোঁড়া মনে মনে আনন্দে ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে, তাই ভাবছিলাম। আমাকে তার কত যে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, তা আর বল্‌বার নয়।"

ইন্দ্র বলিল, "কেবল তার উপকারের জন্যেই যদি অতটা কর্‌তেন, তাহ'লে ধন্যবাদ দেবার কথা ছিল অবশ্য।"

বেলা দশটা আন্দাজ তাহারা গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌছিল। এখানেও সেই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের কোলাহল। যাহা হউক, সে সব চুকাইয়া দুই বন্ধুতে আহারাদি সারিয়া, কোথায় কোথায় যাওয়া যাইবে এবং কি কি করিতে হইবে, তাহার প্ল্যান করিতে বসিল।

ইন্দ্র বলিল, "এখন ত সংসারী হ'বার দিকে আপনার ঝোঁক গিয়েছে, তাহ'লে পাকাপাকি রকমই হোন্। এতদিন বোধ হয় আপনার জমিদারী কত বড়, তার আয়ই বা কতখানি, কিছুই জান্‌তেন না?"

সুবীর বলিল, "এক রকম তাই বটে। ঘরে মা আর ভবানীদিদি, বাইরে দেওয়ানজী মিলে আমার সব অভাব এমন ক'রে মিটিয়ে রেখেছিলেন যে, কিছু খোঁজ নেবার দরকারই হয়নি, কিন্তু এবার নানা কারণেই মনে হচ্ছে যে নিজের ভার নিজে নিতে হবে।"

হঠাৎ ভেজান দরজায় ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল সুবীর বলিল, "কে? ভিতরে এস।"

তাহাদের একজন কর্ম্মচারী প্রবেশ করিয়া একখানা টেলিগ্রাম তাহার হাতে দিয়া বলিল, "দেওয়ানজী লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

টেলিগ্রামের হল্‌দে খামটা চোখে পড়িবামাত্র সুবীরের মনের ভিতরটা আশঙ্কায় কালো হইয়া উঠিল। মনকে

প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতে করিতে সে খামটা খুলিয়া কাগজখানা টানিয়া বাহির করিল।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুবীরবাবু, কি খবর ?"

সুবীর বলিল, "এই দেখ পড়ে। নিজের ভার নিজে নেবার ব্যবস্থাটা খুব ভাল ক'রেই হচ্ছে।"

ইন্দ্র টেলিগ্রাম পড়িয়া দেখিল। ভবানী মারা গিয়াছে, ভানুমতীর অবস্থাও ভাল নয়।

সুবীর উঠিয়া পড়িল। বলিল, "চল, এবারকার মত বেড়ান এই পর্য্যন্ত। দেরি করলে বিকালের ট্রেণটা ধরতে পারব না।"

কাহারও কাছে বিদায় লইবার অপেক্ষা না করিয়া সুবীর আর ইন্দ্র বাহির হইয়া পড়িল। জমিদারবাড়ীতে পৌছিয়া দেখিল ট্রেণ ছাড়িতে আর আধঘণ্টাও নাই। নিজেদের স্যুটকেশ ও ব্যাগ লইয়া কেবলমাত্র দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাহারা ট্রেণ ধরিতে চলিল।

হাবড়া ষ্টেশনে নামিয়া ইন্দ্র বলিল, "বিকেলেই দাদাকে নিয়ে আমি আস্‌ব। দরকার থাকে ত বলুন, বাড়ী না গিয়ে আপনার সঙ্গেই যাই।"

সুবীর বলিল, "না না, এত কিছু দরকার নেই। বাড়ী যাও, বিকেলে এলেই হবে। তোমাকে শুধু শুধু যাওয়া-আসার কষ্টটা দিলাম, বেড়ান ত কিছুই হল না।"

ইন্দ্র বলিল, "আমার সঙ্গে ভদ্রতা সুরু করলেন শেষকালে ? ঐ যে আপনার ড্রাইভার আপনাকে খুঁজছে।"

ড্রাইভার কাছে আসিয়া সেলাম করিতেই সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "মা কেমন আছেন ?"

ড্রাইভার বলিল, "আগের চেয়ে কিছু ভাল আছেন।"

বাড়ী পৌছিয়া সুবীর এক ছুটে মায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল। সামনাসামনিই ভবানীর ঘরের দরজাটা তালা দিয়া বন্ধ। দৃশ্যটা যেন কাঁটার মত তাহার চোখে বিঁধিয়া গেল। জোর করিয়া সে দিক্ হইতে সে চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

ভানুমতীর অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল, জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল, এইটুকুমাত্র তফাৎ। ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই সুবীরের প্রথম চোখে পড়িল একটি নর্স। ভবানী বাঁচিয়া থাকিতে রোগ যতই কঠিন হউক, কখনও বাড়ীতে কাহারও জন্য নর্স ডাকিতে হয় নাই। সে নিজে অধিকাংশ নর্স অপেক্ষা রোগীর সেবাশুশ্রূষা ভালই করিতে পারিত। সে বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, তার বিদায় হওয়ার অর্থ যে কতখানি তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

সুবীরের অপেক্ষায় ডাক্তার ঘরের ভিতর বসিয়াই ছিলেন। তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিলেন, "একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে, এখন ডাক্‌বেন না। চলুন, আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলি।"

সুবীর খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভানুমতীর দিকে তাকাইয়া রহিল। যেন শ্বেতপ্রস্তরে গড়া রমণীমূর্ত্তি। কোথাও রক্তের লেশ নাই, কোথাও প্রাণের স্পন্দন নাই। তিন দিন আগে সুবীর তাঁহাকে দেখিয়া গিয়াছে, ইহারই ভিতর এমন শীর্ণ, এমন প্রাণহীন মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ?

বাহিরে আসিয়া সে ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে আপনি কি তখন থেকেই আছেন ? মাসীমার বাড়ীর কেউ বুঝি আস্‌তে পারেন নি ?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, কেউ আস্‌তে পারেন নি। কাল তাঁদের বাড়া বিয়ে গেছে, আজ বৌ আসবে, কি করেই বা আস্‌বেন ? আমি আর সরকার মশাই বাড়ী আগ্‌লে আছি।"

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "ভবানী-দিদি গেল কখন ? খুব কি কষ্ট পেয়েছিল ?"

ডাক্তার বলিলেন, "পরশু রাত্রে আটটার সময়। না, শেষের দিকে বিশেষ কিছুই কষ্ট পায় নি। আপনার মাকে এখনও আমরা জানাইনি।"

সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ের অসুখ কি আগেই হয়েছিল ? আমি ত ভাবতে ভাবতে আস্‌ছি যে, ঐ খবর শুনেই বোধ হয় এমন হয়েছে। হঠাৎ তা হ'লে এমন হ'ল কেন ?"

ডাক্তার বলিলেন, "সেটা ত এখন অবধি ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না। ভবানী-দিদির অবস্থা খুব খারাপ দেখে সরকার মশাই তাঁকে আপনার মাসীমার বাড়ী থেকে ডেকে আন্‌তে পাঠিয়েছিলেন। এসে তিনি ঘরে ঢুক্‌লেন

তখন আর কেউ ঘরের ভিতর ছিল না। মিনিট দশ পরে হঠাৎ তাঁর চীৎকার শুনে ঝিরা ছুটে এসে দেখল তিনি মেঝের উপর অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছেন। আমি এসে ভবানী-দিদিরও আর জ্ঞান দেখিনি। আপনার মাকে তাড়াতাড়ি ও ঘর থেকে সরিয়ে আনা হ'ল। জ্ঞান হ'তে খুব বেশী দেরি হয়নি। তবে হার্ট বড় দুর্ব্বল ব'লে ওঁকে আমি কিছু জানাইনি, কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বল্‌তে দিইনি। আপনাকে ক্রমাগত খুঁজছেন। খুব বড় একটা Shock পেয়েছেন বোঝাই যাচ্ছে। আপনি জান্‌তেই পার্‌বেন, কিন্তু নিজে থেকে যদি না বলেন, এখন কোনো কথা জিগগেষ কর্‌বেন না। কোনো রকম Excitement যেন একেবারে না হয়।"

সুবীর বলিল, "কিন্তু কি এমন ঘট্‌তে পারে আমি ত আকাশ পাতাল খুঁজে কিছু পাচ্ছি না। ভবানী-দিদি কিছু আজকের মানুষ নয়, চিরকালই এবাড়ীতে ছিল। তার এমন কি লুকানো কথা থাক্‌তে পারে? আমার মনে হচ্ছে সে-সব কিছু নয়, ভবানী-দিদি চোখের সামনে চ'লে যাচ্ছে দেখেই হয়ত অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "তা হ'তেও পারে, কিন্তু আমার ঠিক তা মনে হচ্ছে না। Sudden shockএর ফলেই এরকম হয়েছে বলে মনে হয়। যাই হোক্ দুচার ঘণ্টার মধ্যে জানাই যাবে। আপনি স্নান-টান করুন গিয়ে। খুব বেশী ব্যস্ত হ'বার কারণ নেই। অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল বটে; কিন্তু এখন ভালর দিকেই যাচ্ছে। কাল না হয় আর কাউকে ডাকা যাবে আপনি যদি বলেন।"

সুবীর বলিল, "আপনি যদি দরকার মনে না করেন তা হ'লে আমি কাউকে ডাক্‌তে চাই না। মা এত অল্পে ভয় পান যে, নতুন ডাক্তার দেখলেই তাঁর মনে হবে যে, ভয়ানক একটা কিছু হয়েছে। আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি স্নানটা সেরে আস্‌ছি।"

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন, "যদি কিছু মনে না করেন তা হ'লে বাড়ীর থেকে একটু হ'য়ে আসি। তিন চার-দিন আর ওমুখো হইনি। আজ আপনি এসেছেন এখন নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারব। এ ক'দিন একেবারে কেউ ছিল না। ভুবনবাবু রোজ এসে খবর নিয়েছেন, কিন্তু থাকতে পারেননি।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা যান, বেশী দরকার হ'লে গাড়ী পাঠিয়ে দেব।"

ডাক্তারবাবু সিঁড়ি নামিতে নামিতে বলিলেন, "হঠাৎ কোনো change এখন হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তা হ'লে কি আর আমি যাবার নাম করি?"

ডাক্তার চলিয়া যাইতেই সুবীর নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। মায়ের হঠাৎ এমন অসুখে তাহার মনটা বড় মুষড়াইয়া গিয়াছিল। দুঃখের সঙ্গে বিস্ময়ও বেশ খানিকটা মিশ্রিত ছিল। কেন এমন হইল? ভবানী-দিদি নিজে ত গেলই, সেই যথেষ্ট দুঃখের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে ভানুমতীকে ও এমন সঙ্গে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিল কেন?

জামা জুতা ছাড়িয়া, প্রথমেই কাপড়ের আল্‌মারী খুলিয়া সে কৃষ্ণার ছবিখানির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। ইহার মুখের হাসি তাহার বিষণ্ণ মনে যেন একটা সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়া গেল। সুবীর ভাবিল ছবি না হইয়া মানুষটিই যদি এত কাছে থাকিত? তাহা হইলে জগতে কোনো কিছুই কি তাহাকে দুঃখ দিতে পারিত? কোনো দুঃখের ভয়ই কি তাহাকে পরাজিত করিতে পারিত?

স্নান করিয়া, খাওয়া দাওয়া সারিয়া সে আবার মায়ের ঘরের দিকে চলিল। নূতন নর্স টি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কি উঠেছেন?"

নর্স বলিল, "হ্যাঁ, এই এখুনি উঠলেন।" সুবীর ঘরে ঢুকিয়া মায়ের পাশে গিয়া বসিল। ভানুমতী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সুবীর তাড়াতাড়ি তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কেন মা অত অস্থির হচ্ছ? আমি ত এসেই পড়েছি।"

সুবীরের কথায় ভানুমতীর কান্না না থামিয়া বরং আরো বাড়িয়াই চলিল। সুবীর বলিল, "মা, তুমি যদি আমাকে দেখে অমন কর, তাহ'লে আমি আর তোমার ঘরে আস্‌বই না। দুঃখ কর্‌বার কিছু যদি কারণ ঘটেও থাকে, তাহ'লেও অসুখের মধ্যে চুপ ক'রে থাকা উচিত। অসুখ বাড়িয়ে ত লাভ নেই কিছু?"

ভানুমতী অনেক চেষ্টা করিয়া নিজেকে একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইলেন। সুবীরের হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "বাবা, আমার দুঃখ যে কতবড়, সহ্যের সীমায় কতখানি উপরে, তা তুই কি জান্‌বি। তবু তোর কথায় চুপ কর্‌ছি। দেখ্‌ বল্‌তে পারিস ভবানী এখনও আছে কি না? ওদের জিগ্‌গেষ কর্‌লে ওরা বলে, "আছে, ভাল আছে।" কিন্তু ওদের মুখ দেখেই বুঝি যে, মিথ্যে কথা বল্‌ছে। সে নেই রে, না? আমার মনই বল্‌ছে সে নেই।"

সুবীর বলিল, "মা, তুমি ত ছেলেমানুষ নও, তোমাকে মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে লাভ কি? ভবানী দিদি নেই, পরশু রাত্রেই মারা গিয়েছে। তার মারা যাওয়ার জন্যে ত প্রস্তুতই ছিলে, এতে বেশী অস্থির হোয়ো না।"

ভানুমতী বলিলেন, "যাবে তা ত জান্‌তামই। তবে আর ক'টা দিন যদি বিধাতা তাকে রাখ্‌তেন। এ ত নিজে গেল না, আমাকে শুদ্ধ নিয়ে গেল। হতভাগীর লোক-লজ্জাই বড় হ'ল, দয়া মায়ার চেয়ে। যাক্‌, ওপারে গিয়ে যেন শান্তি পায়, এখানে বড় জ্বালা পেয়ে গিয়েছে। তার কাছে আমি যেতে পার্‌লে, আমার হাড় ক'খানা জুড়োত: কতকাল এই জ্বালা বুকে নিয়ে বেঁচে থাক্‌ব, ভগবানই জানেন।"

সুবীর অবাক হইয়া তাহার মায়ের কথা শুনিতেছিল। এই তিন দিনের ভিতর কি এমন ঘটিয়া বসিল, যাহাতে তাহার মায়ের মুখে এমন কথা শোনা যায়? ভবানীর মৃত্যুতে তাঁহার শোক পাইবার কথা বটে, কিন্তু সেও কি এতখানি হওয়া সঙ্গত? সুবীরকে শুদ্ধ ছাড়িয়া মা ভবানীর কাছে চলিয়া যাইতে চান? তা ছাড়া লোক-লজ্জা, দয়া, মায়া, এসবের কথা কোথা হইতে আসিল? ভবানী দু দিন পরে মরিলেই বা ভানুমতীর কি এমন উপকার হইত?

ভানুমতীকে বলিল, "মা একটু স্থির হও, ভবানী-দিদি তোমার খুব আপনার ছিল বটে, কিন্তু মা-বাপও মানুষের চ'লে যায়, জগতের নিয়মই এই। দুঃখ পেলেও, এ দুঃখ স'য়ে যেতেই হয়। কিন্তু তার জন্যে নিজের ছেলে শুদ্ধ তুমি ফেলে চ'লে যেতে চাও, এটা কি উচিত?"

ভানুমতী সবলে সুবীরের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওরে সে যে তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে রে! আমার বুক একেবারে খালি ক'রে দিয়ে গেছে!"

সুবীর বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মায়ের কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে? তিনি বলিতেছেন কি? কিন্তু এতক্ষণ ত মোটেই সেরূপ কিছু মনে হয় নাই? ডাক্তারবাবু ত তাঁহাকে আগাগোড়া দেখিতেছেন, তিনিও এমন কিছু যে ঘটিয়াছে বা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা সুবীরকে বলেন নাই।

ভানুমতীর কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুবীর বলিল, "মা, কি পাগলের মত কথা বল্‌ছ? আমাকে কেউ কি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে? এক ভগবান নিতে পারেন, কিন্তু তার সম্ভাবনা এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

ভানুমতী খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "না বাবা, পাগল আমি হইনি, পাগল হ'লে বেঁচে যেতাম। তোকে সব আমি বল্‌ছি, তার পর তুই-ই বল্‌ কি আমার করা উচিত। নিজের ভাবনা শুদ্ধ নিজে কখনও ভাবিনি, আজ এত বড় বোঝা আমার উপর সে দিয়ে গেল।"

সুবীর বলিল, "সেই ভাল মা, আমার উপরেই ভার দাও তুমি। যথাসাধ্য অন্যায় না হয়, তা আমি দেখব।"

ভানুমতী বলিলেন, "জানি বাবা, তোকে দিয়ে অন্যায় কখনও হ'বে না। অন্য ছেলেদের মতন হ'লে, তোকে বল্‌তেই আমার সাহস হ'ত না। এতবড় আঘাত তোকে দেবেন ব'লেই ভগবান গোড়ার থেকে তোকে সন্ন্যাসী ক'রেই গড়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখিস্‌ বাবা, লোকের চোখে আমিও দোষী হ'ব, কিন্তু ভগবান জানেন আমার কোনও দোষ নেই। ধন-সম্পত্তির লোভ আমারও না ছিল তা বলি না, কিন্তু যা পেয়েছি, তার দু-গুণ পেলেও এ কাজ আমি কর্‌তাম না।"

সুবীর নীরবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল সম্মুখেই যে একটা নিদারুণ রহস্যের যবনিকা উঠিবার উপক্রম করিতেছে, তাহা সে বুঝিতেই পারিতেছিল।

মনে মনে নিজকে কেবল দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ভানুমতী বলিলেন,"আট লাখ টাকা রেখে যান, আমার জ্যেঠশ্বশুর। তাঁর উইলে ছিল, বংশে ছেলে যার হবে, সেই ও টাকা পাবে। ঐ টাকার জন্যে তোর কাকা কম করেনি, আমাদের খুন কর্‌তেও তার আট্‌কাত না। তখন তার বয়স ছিল অল্প, ছেলে হ'বার আশাও ছিল। যাহোক্, উনি মারা গেলেন, তখন তার প্রাণটা জুড়ল। কিন্তু তখন আমার ছেলে পেটে, সেও এক জ্বালা হ'ল। ভবানী বাঘিনীর মত দরজা আগ্‌লে থাক্‌ত, পাছে কোথা দিয়ে আমার কিছু অনিষ্ট হয়। তার যত রাগ ছিল উদয়ের ওপর, এতটা আর কারো ছিল না।"

ভানুমতী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। সুবীর নীরবেই তাঁহার হাত ধরিয়া বসিয়া রহিল।

ভানুমতী আবার বলিতে লাগিলেন, "ছেলে হবার জন্যে আমি কল্‌কাতায় আসি। আমার বাবা তখন বেঁচে ছিলেন, ভবানীপুরে বাসা করেছিলেন। তাঁর কাছেই ছিলাম। তখনও নিজের দেওয়া ডাক্তার ধাত্রী এনে কিছু একটা গোলমাল কর্‌বার ঢের চেষ্টা উদয় করেছিল। কিন্তু ভবানীকে হার মানাতে পারে নি। উদয়কে জব্দ কর্‌বার তার এক রোখ চ'ড়ে গিয়েছিল। কাছেই এক ধাত্রী ছিলেন, মিসেস্ মিত্র ব'লে, তাঁকে সে ঠিক কর্‌ল, কাউকে আর ঘরে ঢুক্‌তেই দিল না। মেজদি এসেছিল, যেমন অদৃষ্ট, তার স্বামীর অসুখ ব'লে সেও ঠিক সেদিন চ'লে গেল। ভবানী আর ধাত্রী রইল কেবল।

"আমি ত অজ্ঞান হয়েছিলাম, যখন জ্ঞান হ'ল তোকে কোলে দিয়ে ভবানী বল্‌লে, "এই নাও ছেলে।" বাবা তার হাত থেকেই তোকে বুকে নিয়েছিলাম, বুকের রক্ত দিয়ে পালন করেছি, ভগবানের চোখে তুই আমারই ছেলে চিরদিন থাক্‌বি। কিন্তু মানুষ এ সম্বন্ধ স্বীকার করবে না।"

সুবীর বাধা দিয়া বলিল, "মা, এক রকম সবই বুঝলাম। কেবল জান্‌তে চাই, কোথা থেকে তারা আমায় অমন সময়মত নিয়ে এল। আর তোমার সন্তান যেটি হয়েছিল, তার কি হ'ল?"

ভানুমতী বলিলেন, "মেয়ে হয়েছিল। টাকাটা উদয়ের হাতে চ'লে যাবে, এই ভয়ে ভবানী তাকে তখনি ধাত্রীর কাছে দিয়ে দেয়। ধাত্রীর ঘরে দু-তিন দিন আগে একটি গরীব মেয়েমানুষ প্রসব হ'তে এসে মারা যায়, ছেলেটি মিসেস্ মিত্রের কাছেই ছিল। আর কিছু ভবানী ব'লে যেতে পারে নি।"

সুবীরের চোখের সম্মুখে বিশ্বের মূর্ত্তি যেন অন্য রকম হইয়া গেল। এই কয় মিনিট আগে সে ধনীর বংশের একমাত্র দুলাল, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিল। এখন সে নামধাম পরিচয়হীন পথের ভিখারী। তাহার জগতে কেহ আপনার বলিতে নাই, তাহার নাম বংশ-পরিচয় পর্য্যন্ত নাই।

ভানুমতীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আচ্ছা মা, আমার যা শুন্‌বার ছিল শুন্‌লাম। যতটুকু প্রতিকার এখন করা যায়, তা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। তুমি দুঃখ কোরো না, সেরে উঠতে চেষ্টা কর। তোমার সাহায্যও আমার দরকার হবে।"

ভানুমতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "চ'লে যাস্‌নে, বাবা। তুই বল্ এখনও আমাকে মা-ই বল্‌বি। আমার উপর কোনো রাগ রাখিস্‌নে।"

সুবীর আবার বসিল, ভানুমতীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "মা, তুমিই আমার মা, চির দিন তাইই থাক্‌বে। কিন্তু তোমার ছেলে হ'লেও, এ বংশের ছেলে আমি নই। এদের ধনসম্পত্তি ভোগ কর্‌বার কোনো অধিকার আমার নেই। তাঁদের নাম ব'য়ে বেড়াবার কোনো অধিকার আমার নেই। এ সব আমায় ঝেড়ে ফেল্‌তে হবে। স্নেহের উপর আইনের দাবী নেই মা, সেইটুকু কেবল আমার থাক্‌বে। আর যার উপর অন্যায় হয়েছে সবচেয়ে বেশী, সেই মেয়েকে খুঁজে বার কর্‌তে হবে। তার প্রাপ্য তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। টাকাও যেটা কাকার প্রাপ্য তা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তুমি মন শক্ত ক'রে সেরে ওঠ মা, এত কাজ প'ড়ে রয়েছে। আমার ঘরে ব'সে থাক্‌লে চল্‌বে না, কত দেশে, কত জায়গায় ঘুর্‌তে হবে।"

ভানুমতী বলিলেন,"বাবা,অমন ক'রে বলিস্‌নে। তোকে আমি অমন ক'রে ভাসিয়ে দিতে পার্‌ব না। এদের কিছু তুই

নাই দিদি, আমার নিজেরও টাকা আছে, সম্পত্তি আছে, চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার গহনা আছে। সব আমি তোকে লিখে দেব। তোর টাকার জন্যে কোন কষ্ট হবে না।"

সুবীর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আচ্ছা মা, সে পরের কথা পরে হবে। গহনাগাঁটি নিয়ে আমি কি কর্‌ব? সে সব তোমার মেয়ের জন্যে রাখ।"

ভানুমতী বলিলেন, "সে কি আর বেঁচে আছে? মিসেস্ মিত্রও ত আমরা ওখানে থাক্‌তে থাক্‌তে কলকাতা ছেড়ে চ'লে যান, কার কাছে কোথায় খবর পাবে?"

সুবীর বলিল, "হারানো খবর বার করবারও উপায় আছে মা, সেই সব দিকেই মন দিতে হবে। তুমি উঠলেই কাজ আরম্ভ কর্‌ব। আচ্ছা তুমি একটু ঘুমোও, আমি ঘণ্টাখানেক পরে আবার আস্‌ব।"

সুবীরের মাথাটা তখন বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছিল, একলা হইবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কোনরকমে নিজের ঘরে আসিয়া সে বসিয়া পড়িল

[ক্রমশঃ]

সোনার খনি

(শঠে শাঠ্যং—তিন)

শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য

"মনোমোহন দা"!

"কি বিমল যে খবর কি?"

"কাল বেনারস যাচ্ছি তাই বল্‌তে এলাম।"

"বেনারস! হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন?"

"কল্‌কাতা আর ভাল লাগ্‌ছে না। কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, তাই ভাবলাম একবার ঘুরে আসি।"

"তা বেশ; দিনকয়েক ঘুরে এসো, সেখানে ক'দিন থাক্‌ছো?"

"এই দিন দশ বারো।"

মনোমোহন বাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুক্‌লেন। মনোমোহন বাবু তাঁকে বিমলের কাশীযাত্রার কথা বল্‌তে তিনি তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লেন,—"কার পিছু নিচ্ছো? বেনারস যাচ্ছে কে, ঠিক ক'রে বল তো?"

"কেন বৌদি, আমার কি কোথাও বেড়াতে যেতে নেই?"

"না তা কে বল্‌ছে? তবে তোমায় তো চিন্‌তে আমার বাকী নেই, ভাই, কাজেই তুমি কোথাও কিছু নেই অতদূর যাচ্ছো এই-যে কেমনতর ঠেক্‌ছে।"

বিমল এ কথার কোনো উত্তর না দেওয়ায় তিনি বল্‌লেন—

"বুঝেছি। যাক্, আমি তোমার কোন কথা জান্‌তে চাই না; তবে সেখান থেকে চিঠিপত্র দিয়ো, নইলে আমরা বড় ভাবনায় থাক্‌বো। যাই, ওদের ইস্কুলের বেলা হ'ল। তুমি আজ রাত্রে এখানে খাবে।"

বিমল ঘাড় নেড়ে সায় দিতে তিনি চ'লে গেলেন। তিনি যাবামাত্রই মনোমোহন বাবু উদ্বিগ্নভাবে বল্‌লেন,

"কিহে, সত্যিই তাই নাকি?" ব'লে বিমলকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে তিনি বল্‌তে লাগলেন—

"দেখ বাপু, ও-সব হবে-টবে না। এখানে তুমি যা কর তা কর; আমি, অক্ষয়, আমরা পাঁচজন আছি! বিদেশে বিভূঁয়ে ও-সব চল্‌বে না আমি ব'লে দিচ্ছি।"

বিমল এবার হেসে বল্‌লে—

"আপনি যে দেখ্‌ছি ধরেই নিলেন যে আমি কিছু একটা ভয়ানক ফন্দী এঁটে চলেছি।"

"সে ধারণাটা কি একেবারে ভুল? সত্যি ক'রে বল তো?"

"একেবারে ভুল নয়, তবে যতটা ভাবছেন তাও নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের না জানিয়ে আমি কোনো কাজে হাত দেবো না, তা হ'লেই হবে তো?"

"হবে আর কি? না হ'লেও হ'তে হবে। তোমার ঘাড়ে যখন ভূত চেপেছে—"

"আচ্ছা, ভূত এম্‌নিতে না ছাড়ে তো ওঝার ব্যবস্থা কর্‌বেন এখন। চলি তবে, গোটাকয়েক জিনিষ কিন্‌তে হবে।"

আগ্রা-দিল্লী এক্সপ্রেস—ওরফে "তুফান্ গাড়ী" ঝড়ের মত চলেছে। রেলের লাইনের দুপাশে সবুজ ধানের ক্ষেত, মাঝে মাঝে এক একটা আমগাছ যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে, দূরে এক একটা গ্রাম ছুটতে ছুটতে চক্ষের সাম্‌নে এসে তেমনিই ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, শরৎকালের দুপুরের রোদে চারিদিক্ উজ্জ্বল।

বিমল একটি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর নীচের বার্থে বিছানা পেতে বসেছিল। তার সহযাত্রীদল দুজন হিন্দুস্থানী পুরুষ—ব্যবসাদার গোছের চেহারা—এবং তাদের সঙ্গে একটি আপাদমস্তক গহনা কাপড়ে মোড়া সজীব পুঁটলী বিশেষ। পুরুষ দুটির একজন প্রৌঢ়, অন্যজন মধ্যবয়স্ক। পুঁটলীটির বয়স বলা মুস্কিল, তবে মাঝে মাঝে ঘোমটার ফাঁক থেকে কৌতুহলভরা দুটো চোখ এবং মুখের যতটা দেখা যাচ্ছিল তাতে মনে হয় বয়স খুব বেশী নয়।

বিমল ইংরাজী নভেল পড়তে পড়তে দেখছিল যে হিন্দুস্থানী দুজন বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে এক একবার তাকাচ্ছে। তবে সে বিরক্তির সঙ্গে—বোধ হয় তার চেহারা, দামী পোষাক-পরিচ্ছদ এসবের দরুণ—খানিকটা সম্ভ্রম মেশান আছে।

ট্রেন হু হু ক'রে একটা ষ্টেশন ছাড়িয়ে গেল। বিমল বইখানা নামিয়ে রেখে মুখ তুলে সহযাত্রীদের দিকে তাকাল।

মধ্যবয়স্ক হিন্দুস্থানীটি জিজ্ঞেস কর্‌লে, "বাবু আপনি কতো দূর যাবেন?"

"বেনারস। আপনার কোথায় যাবেন?" হিন্দু স্থানীটি তার সঙ্গীর দিকে হতাশ ভাবে তাকিয়ে বল্‌লে,

"আমরাও বেনারস যাচ্ছি। আপনি বেড়াতে যাচ্ছেন?"

"না।"

"তবে কোনো কাজে যাচ্ছেন? আপনার কারবার আছে সেখানে?"

"না, ঠিক যে কাজে যাচ্ছি তাও নয়।"

এবারে অন্যজনও বিমলের দিকে ফিরে তাকাল। প্রথম লোকটি বল্‌লে—

"কাজেও না, বেড়াতেও না? তোবে আপ্‌নার বাড়ী সেখানেই হোবে"। ব'লে সে খুব কৌতুহলের সঙ্গে বিমলের দিকে তাকিয়ে রইল। বিমল একটু হেসে বল্‌লে—

"আমি যাচ্ছি পুজো দিতে আর কুষ্ঠি দেখাতে।"

"ও! কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে, না সাদি-বিয়ার ব্যাপার?"

"সে সব নয়—তবে একটা নতুন কাজে হাত দিচ্ছি, তাতে লাভ-লোকসান দুই খুব বেশী হ'তে পারে, সেইজন্যে এ সব কর্‌ছি।"

"হো, আচ্ছা! হাঁ, এটা ঠিক কাজ কর্‌ছেন। দেওতার দোয়া আর নসীবে বদা না থাক্‌লে কারবারে কিছু হোয় না। আপনার কিসের কারবার, বাবু?"

"কারবার কর্‌তে যাচ্ছি, এখনও আরম্ভ করিনি।"

"কারবার সুরু করেন নি? চাল-ডালের কারবার হোবে?"

"না। খনির কাজ।"

"খনি? কোয়লার খোনি? লিমটিড্ কম্পনি কর্‌বেন?"

"না কয়লাও নয়, লিমিটেড কোম্পানিও নয়।"

"আমি যাচ্ছি পুজো দিতে আর কুষ্ঠি দেখাতে"

"তবে কিসের?"

বিমল হেসে বল্লে—

"সে সব জেনে আপনার লাভ? কারবার আরম্ভ না হ'তেই তার বিষয় এতো কথা বলা কি ভাল?"

"বল্লে আপনার লোকসান যদি হোয় ত বোল্বেন না। তবে আমি কারবারি লোক তাই কারবারের কথা শুনতে ইচ্ছা হোয়; আমার নাম আপনি শুনে হোবেন, আমার নাম ছগ্‌গনলাল হচ্ছে।"

"না, আমি শুনিনি।"

দ্বিতীয় জন মহা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লে—

'কি ছগগনলালের নাম আপনি জানেন না? ছগ্‌গন লাল রামপ্রতাপ শেয়র্ মার্কিটের রাজা, ফটকা বজারের গুরু, তার নাম শোনেননি আপনি!"

দুজনে অবাক্ হ'য়ে বিমলের দিকে তাকিয়ে রইলো। পুঁটলীরও মুখের আড়ালটা একটু বেশী স'রে যাওয়ায় দেখা গেল যে ভিতরের প্রাণীটিও আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকিয়ে আছে।

বিমল বল্লে—

"মাফ করবেন, আমি নতুন লোক, তাই অত নাম-ধাম জানি না। যা হোক্ আমার কারবারের কথা বল্‌তে আপত্তি বিশেষ নেই. তবে কাজ না হ'তেই ঢাক পিটোতে আমি চাই না। আমার কাজ হ'ল গিয়ে একটা সোনার খনির দরুন।"

প্রৌঢ় হিন্দুস্থানীটি ব'লে উঠল—

"সোনা—সোনেকা খনি!"

অন্যজন অবজ্ঞাভরে হেসে বল্লে—

"কিসিনে ঠগ্ লিয়া হোগা। কেত্তো টাকা দিয়ে আপনি কিনেছেন?"

"কিন্‌ব কেন? সোণার খনি কেউ বেচে? আমি রাজার কাছ থেকে ইজারা নিয়েছি। পরীক্ষা করা হ'য়ে গেলে সেলামী দিয়ে ত্রিশ বছরের renewable lease নেব।"

"পরীক্ষা কে করবে? আপনি কি এঞ্জিনীয়র?"

"না। আমি শুধু মোটামুটি দেখতে জানি। কাশী যে কারণে যাচ্ছি তাতে যদি ঠিকমত ফল পাই তাহ'লে বোম্বাই থেকে সাহেব এঞ্জিনীয়ার এনে তাকে দিয়ে পরীক্ষা করাব।"

প্রথম হিন্দুস্থানীটি "হুঁ" ব'লে নীরবে কি যেন ভাবতে লাগ্‌ল। খানিক পরে সে জিগ্‌গেস করলে—

"এ দেশে কি সোনার খনি হোয় বাবু?"

"কেন হবে না? এইতো মহীশূরে প্রকাণ্ড খনি সব আছে, প্রতি বছরে তিন-চার-ক্রোড় টাকার সোণা সেখানে বেরোয়।"

"তিন-চার ক্রোড়? একটা সোণার খনি চালাতে কোতো টাকা লাগে বাবু?"

"এই পঞ্চাশ ষাট লাখ আন্দাজ।"

"ওতো টাকা আপনার আছে? না? তোবে কি করবেন, কোলকাত্তায় লিম্‌টেড কম্পনির শেয়র বেচা আজকাল মুস্কিল আছে।"

"সে কথা আমিও জানি। তবে কল্‌কাতার বাজারের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, হবেও না।"

"কি মৎলব কোরেছেন তা হ'লে?"

"আমি প্রথমে সাহেব এঞ্জিনীয়র দিয়ে খুব ভাল ক'রে পরীক্ষা করাব। তাতে দশ-বিশ হাজার যা লাগে। রিপোর্ট ভাল হ'লে তাই নিয়ে বিলেত যাব, সেখানে ভাল দর পাই বেচে দেব নইলে কোম্পানি করব।"

"যদি রিপোর্ট খারাব হোয়?"

"তবে অনেক টাকা লোকসান যাবে। সেইজন্যেই তো কুষ্ঠিফল জান্‌তে চাচ্ছি।"

"ঠিক্। কাকে দিয়ে গণাবেন?"

"দু তিন জনকে দিয়ে; কোনো এক জনের গণনার উপর বিশ্বাস করা ঠিক নয়।"

"ঠিক কথা। আচ্ছা যদি খুব ভাল লোকের দরকার হয় তো আমার কাছে আস্‌বেন। আমি থাকি কামেচ্ছায়, আমার নাম করলে যে-কেউ বাড়ী দেখিয়ে দেবে।"

ট্রেণ আসানসোলে থাম্‌ল। বিমল চা আনিয়ে খেতে আরম্ভ করল।

পাঁচ ছ দিন পরে বিমল ছগ্‌গনলালের সঙ্গে দেখা করল। তাকে খুব খাতির-যত্ন ক'রে ব'সিয়ে ছগ্‌গনলাল জিজ্ঞেস্ করলে—

"তারপর বাবুজী, যে কাজে এসেছেন সে সব ঠিক-ঠাক্ হ'য়ে গেছে তো?"

"হ্যাঁ। দু-জায়গায় ভালই বলেছে। কিন্তু তারা দু জনেই আমাদের চেনে। তাই ভাবলাম, আপনার কে লোক আছে, সে তো আমায় চিন্‌বে না, তার কাছে একবার দেখাই।"

"ভাল কথা। কিন্তু সে বিচারের জন্যে চব্বিশ টাকা আর পূজার জন্যে সওয়া-পাঁচ-টাকা লিবে।"

"এ আর এমন বেশী কি? চলুন আজই যাই।"

"আচ্ছা, চলুন। আমি কাপড়-চোপড় প'রে আসি।" গাড়ী এলো। ছগ্‌গনলাল পোষাক বদ্‌লে এসে বিমলকে সঙ্গে ক'রে কেদারঘাটের কাছে এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণের বাড়ী গেল। ব্রাহ্মণ বিমলের কাছ থেকে তার কোষ্ঠীর সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখে নিয়ে তিন দিন পরে আস্‌তে বল্‌লেন।

নিরূপিত সময়ে আবার দুজনে সেখানে উপস্থিত হোলো। ব্রাহ্মণের সঙ্গে' দেখা হ'বামাত্রই ছগ্‌গনলাল জিগ্‌গেস করলে—

"মহারাজ! বিচারমে ক্যা আয়া?"

পণ্ডিতজী বল্‌লেন,

"অরে বড়া ভাগ্যবান পুরুষ ল্যায়া তুম্‌নে। স্বর্ণলাভ, ভার্য্যালাভ, রাজসম্মান সবহি কুছ হোয়েগা।" ব'লে তিনি বিমলের দিকে ফিরে বল্‌লেন—

"বেটা, দেওতা তুম পর প্রসন্ন হ্‌য়। সিদ্ধিদাতা গণেশ কা পূজা করো, ব্রাহ্মণ কো স্বর্ণদান করো, মনস্কামনা পূর্ণ হো জায়গা।" এই ব'লে তিনি গণনাফল লেখা কাগজ বিমলের হাতে দিলেন। বিমল পকেট থেকে একটি গিনি, একটি একশ টাকার নোট এবং খুচরা এক টাকা বার ক'রে তাই রেখে, ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে, আশীর্ব্বাদ এবং নিজের কল্যাণের জন্য পূজা হোম ইত্যাদির ব্যবস্থা চাইলো।

ব্রাহ্মণ তাতে সম্মতি দিয়ে দু হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে সে তাঁকে ফের প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এলো। ছগ্‌গন লাল এতক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে নির্ব্বাক অবস্থায় এসব দেখছিল। বিমল বেরিয়ে আস্‌তে সেও "পায় লাগি পণ্ডিতজী" ব'লে বেরিয়ে এসে বিমলের সঙ্গে গাড়ীতে উঠ্‌লো।

গাড়ী কতক দূর যাবার পর ছগ্‌গনলাল বিমলকে বল্‌লে—

"এখোন আপনার প্লান কি আছে বাবু?"

"প্লান আর কি, আমার সব ঠিকঠাক করা আছে, বিলেত পর্য্যন্ত চিঠি লেখালেখি হ'য়ে গেছে। এবার গিয়ে খনি পরীক্ষা করিয়ে তার ফল দেখে ইজারা পাট্টা নিয়ে বিলেত যাব।"

"আমি এ সব খবর কোথায় পাব?"

"আপনি খবর নিয়ে কি করবেন? কলকাতার লোকের এ কাজ করার মত হিম্মৎ নেই।"

"আরে বাবু, পূরা কাজের হিম্মৎ না থাক্ কিছু কাজের মত তো আছে! আপনি সব কিছু ইণ্ডিয়ার ধন অংরেজদের লুটিয়ে যদি দেন তো স্বরাজের কি হোবে?"

"আমি অত স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। যা দেখি তাতে মনে হয় স্বরাজ মানে একদল লোক পরের দৌলতে

"বেটা, দেওতা তুম পর প্রসন্ন হ্‌য়"

নিজেদের বড় করছে। আর ধরুন যদি তা নাও হয় তা হ'লে কলকাতার বাজারে শেয়ার বিক্রী ক'রে কি স্বরাজ হবে?"

"কিছুটা দেশের টাকা দেশের লোকে পাবে।"

"হ্যাঃ। আর আমি আমার টাকার জন্যে একবার বিলেত একবার কল্‌কাতা করি! ওসব ঝঞ্ঝাটে আমি নেই।"

"আপনার কোনও গোলমাল হোবে না। আচ্ছা, আপনি কাজ তো করুন তারপর আমায় খবরটা দেবেন। আমি তো আপনার কচ্ছু ছিনিয়ে লিবো না, আপনি রাজী হ'লে তবে বন্দোবস্ত হোবে। আরো দেখুন কোথা কোথা থেকে আপনাতে আমাতে আলাপ হোলো, আমি আপনাকে পণ্ডিতজীর কাছে লিয়ে গেলাম, এতে কি মনে হয় না যে এর মধ্যে দৈব কিছু আছে?"

বিমল ক্ষণেক ভেবে বল্‌লে—"তা অবিশ্যি আপনি বল্‌তে পারেন। আচ্ছা, এই নিন আমার উকীল অক্ষয়বাবুর ঠিকানা, সেখানে খোঁজ করলে আমার খবরাখবর আপনি সব কিছু পাবেন। আমি তাঁকে ব'লে রাখব।"

কল্‌কাতায় ফিরে এসে বিমল এক দিন অক্ষয় বাবু ও মনোমোহন বাবুকে নিজের হোটেলে ডেকে এনে তার বেনারস-যাত্রার বৃত্তান্ত সবিশেষে বল্‌লো। অক্ষয় বাবু সব শুনে বল্‌লেন—

"তারপর? এসবের মধ্যে আসল মৎলবটা কি?"

"মৎলব শত্রু-নিধন।"

"বুঝলাম। কিন্তু সেটা ত স্রেফ ধাপ্পাবাজীতে হবে না, কিছু একটা স্থাবর জিনিষ তো চাই! তোমার কুষ্ঠী তো লিমিটেড কোম্পানির কারবারের asset হিসাবে চল্‌বে না; আর তার গণনাফলের দরুণ কোনও সাহেব এঞ্জিনীয়ার সার্টিফিকেটও দেবে না। যে সোনার খনির উপকথায় মেড়োটাকে ভুলিয়েছো সে তো এখনো রয়েছে আকাশে!"

"আকাশে নয় অক্ষয়দা, সিংহভূম জেলায়।"

"মানে? তুমি কি বল্‌তে চাও যে সত্যি সত্যিই তোমার একটা সোনার খনি আছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; মায় ম্যাপ, লাইসেন্স এগ্রীমেণ্ট সব।"

মনোমোহন বাবু ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন,

"অ্যাঁ, তাই নাকি? তবে তো এক্ষুনি এর একটা ব্যবস্থা করতে হয়! ওসব ছগ্‌গনলাল টাল নয়, আমার সঙ্গে ম্যাক্‌টাভিশ কোম্পানির বড় সাহেবের আলাপ আছে, কালই তোমায় সঙ্গে ক'রে—"

অক্ষয় বাবু হাত তুলে বল্‌লেন,

"হো, হো, তিষ্ঠ। আগে দেখ মাইনিং এঞ্জিনীয়ার কি বলে।"

"আরে, রাখো তোমার মাইনিং এঞ্জিনীয়ার। অমন কুষ্ঠী যার—"

বিমল মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে,

"হ্যাঁ, খাসা কুষ্ঠীখান না? কুড়িটে টাকা দেওয়া সার্থক।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ কুষ্ঠীটা আমারই! তবে গ্রহ-নক্ষত্র যাঁরা একটু আধটু ন'ড়ে চ'ড়ে গিয়েছিলেন তাঁদের ঠিক জায়গায় বসাতে কুড়ি টাকা খরচ হ'য়ে গেছে।"

একথার ফলে মনোমোহন বাবুর হতভম্বভাব দেখে অক্ষয় বাবু বিষম হাস্‌তে লাগলেন। মনোমোহন বাবু রেগে বল্‌লেন—

"দেখ আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু এসব জিনিষ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না।"

"আরে আরে চটো কেন? বিমল তো তোমাকে ঠকাবার জন্যে এসব করেনি? হ্যাঁ হ্যাঁ বিমল, এখন তোমার প্ল্যানটা কি শুনি।"

"আমি এখন চল্‌লাম বাঙ্গালোরে। সেখান থেকে মনের মত একটি সাহেব ধ'রে আন্‌তে হবে। ইতিমধ্যে ছগ্‌গনলালের দল যদি আপনাদের কাছে কোন খোঁজ খবর নিতে আসে তো স্পষ্ট কিছু না ব'লে, তাদের বুঝতে দেবেন যে মস্ত একটা এলাহী কাণ্ড চলেছে।"

"বেশ তাই ঠিক রইল। The mysterious gold mine, কেমন?"

হ্যাঁ। তবে mystery টা একটু সরেস গোছের করবেন।"

মাস তিন চার বনে জঙ্গলে কাটিয়ে বিমল কলকাতায় ফিরেছে। এঞ্জিনীয়ার ফ্লেচার সাহেব ক'মাস ধ'রে পরীক্ষা করবার পর টন খানেক নমুনা নিজ হাতে তুলে এনেছেন। তার কতক অংশ সরকারী পরীক্ষাগারে দেওয়া হয়েছে বাকী অংশ গ্রাণ্ড হোটেলে সাহেবের বস্বার ঘরে রয়েছে।

বিমল ফ্লেচার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছে এখবর অক্ষয়বাবু মারফৎ পাওয়া পর্য্যন্ত, ছগ্‌গনলাল সদলে খুব ঘোরাঘুরি করছে। মনোমোহন বাবু তো ঐ দরুন ক্লাইব ষ্ট্রীট আমড়াতলা অঞ্চলে বেশ খাতির জমিয়ে নিয়েছেন! অক্ষয় বাবুর বাড়ীতেও এরা যাতায়াত করে। তবে তিনি উকিল লোক কাজেই ধরা-ছোঁওয়া দেন না।

শেষ পরীক্ষার ফল জান্‌তে দিন দশ বারো লাগবে শুনে বিমল "বিলেত যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে" একবার দেশে গেল। অন্ততঃ পক্ষে ছগ্‌গনলালের দল তাই শুন্‌লো। আসলে সে দিন কয়েকের জন্যে গিরিডি যাত্রা করল। সে যাবার পরেই, মনোমোহন বাবুকে বিস্তর সাধ্য-সাধনা, খাতির যত্ন ক'রে ছগ্‌গনলাল ফ্লেচারের সঙ্গে আলাপ করলে।

ফ্লেচার সাহেব ত প্রথম কিছুতেই কিছু বলে না। অনেক ভেট্, ডালী, বিনা পয়সায় ভাল মোটরের বন্দোবস্ত; এসব করার পর, সে বললে যে, বিমল সত্যি সত্যিই একটা আশ্চর্য্য ভাল সোনার খনি পেয়েছে। তবে কত ভাল তা সরকারী পরীক্ষাগারের খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত বলা যায় না।

ছগ্‌গনলাল তো উদ্‌গ্রীব হ'য়ে সেই খবরের প্রতীক্ষায় রইলো। শেষে একদিন সাহেব বল্‌লে, "চগন্‌লাল, পরশু খবর মিলেগা, হম আজ বিমলবাবুকো টার (তার) ভেজেগা আনেকা ওয়াষ্টে।"

ছগ্‌গনলাল সাহেবের কাছে এগিয়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লে,

"হুজুর, অভি তার মৎ ভেজিয়ে। খবর আনেসে ভেজিয়েগা।"

সাহেব মৃদু মৃদু হেসে বল্‌লে,

"কেঁও, টুমারা ক্যা মট্‌লব হুয়? বিমলবাবুকো ঠগানা মাংটা হুয়?"

"নহী হুজুর, সিফ ইয়ে বাৎ হুয় কি হমলোককো থোড়া আগে খবর মিল্‌নেসে আপকা ফায়দা হোগা হমারা ভি ফায়দা হোগা, মগর বিমলবাবুকা কোই লোকসান নহী হোগা।"

"হমারা ক্যা ফায়ডা হোগা?"

"একশও রুপেয়া।"

"গ-অ-ন্! টুম্ হাম্‌কে ক্যা সমঝটা?"

"অচ্ছা দোশো।"—সাহেব ফিরে চ'লে যায় দেখে ছগ্‌গনলাল ফের বল্‌লে, "আচ্ছা পাঁনশো লিজিয়ো।"

"কম্ অন্। অভি নিকালো রুপেয়া।"

ছগ্‌গনলাল পাঁচটি একশো টাকার নোট দিতে সাহেব একখানা লেখা টেলিগ্রাফ ফর্ম ছিঁড়ে ফেলে তাদের বিদায় করল।

পরীক্ষার ফল এলো। সাহেব খাম ছিঁড়ে সেটি পড়্‌তে লাগ্‌লেন। ছগ্‌গনলালের দল অনেক আগের থেকেই এসে তীর্থের কাকের মত বসেছিল।

সাহেব মুখ তুল্‌তেই ছগ্‌গনলাল উঠে দাঁড়িয়ে জিগ্‌গেস করল—

"হুজুর, ক্যা খবর হুয়?"

"ক্যা খবর? Auriferous gravel, containing Seventeen pennyweights! বিমলবাবু পাঁচ ছ বরস মে ক্রোড় রুপেয়া পাবেগা।"

"ক্রোড় রু-পে-য়া! হুজুর, হমলোগ কো ভি কুছ মিলনা চাহিয়ে!"

"মিল্‌না চাহিয়ে? বিমলবাবুকা সাঠ join কড়ো।"

"উয়ো তো রাজী নহী হোতে। অব হুজুর সরকার কুছ মেহেরবাণী—

"Aw rubbish! হম্ ক্যা কড়েগা?"

ছগ্‌গনলাল খানিক হাত কচ্‌লিয়ে, এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্‌লে,

"রিপোর্ট ঠো থোড়া খরাব হোতা, তো শায়েদ বিমল বাবু বেচনেকো তৈয়ার হোতে।"

সাহেব সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প হাস্‌তে লাগ্‌ল। ছগ্‌গনলাল একটু সাহস পেয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, "আপ মেহেরবাণী করকে জরা কোশিস্ কিজিয়ে, তো আপকা বহুত ফায়দা—"

ছগ্‌গনলাল সদলবলে তাকে ঘেরাও কর্‌লে

ছগ্‌গনলালের দল পরস্পরের মুখ চাওয়াচাই করতে লাগ্‌ল। বিমল ক্ষণেক পরে তার কাজ আছে ব'লে উঠে গেল। সে যাবামাত্রই ছগ্‌গনলাল অক্ষয়বাবুকে বল্‌ল, "অক্ষয়বাবু, দেখুন, ইনি তো বুঝছেন না। ফজুল বিলাইত ধৌড় ক'রে কি লাভ আছ? আমার কাছে ভাল খদ্দের আছে, এখন নগদ লিয়ে বেচে দিলে এঁর ভালো হোতো।" এইরকম অনেক বক্তৃতা চল্‌বার পর অক্ষয়-বাবু বল্‌লেন, "বেশ্‌ তো আপনারা মনোমোহনবাবুর মারফৎ offer দিন না।" ছগ্‌গনলাল তাতে রাজী হ'য়ে চ'লে গেল।

দিন পাঁচ ছয় ধ'রে অনেক মারপ্যাঁচের পর তিন লাখ নগদ ও তিন লাখের শেয়ারে রফা হোলো। ছগ্‌গন-লালের দল লিমিটেড কোম্পানীর আয়োজনে উঠে প'ড়ে লেগে গেল।

ছমাস কেটে গেছে। "দি য়ুরেকা গোল্ডমাইন্‌স্‌" সতেজে বেড়ে চলেছে। বাজারে তার একশো টাকার শেয়ার একশো ত্রিশে উঠেছিলো। সম্প্রতি হঠাৎ যেন তার একটু মন্দা পড়েছে। মনোমোহন ও অক্ষয় দুজনেই বেশ কিছু শেয়ার কেনা-বেচা করেছেন। তবে হঠাৎ দাম পড়তে আরম্ভ হওয়ায় দুজনেই সব বেচে—মনোমোহন-বাবু স্ত্রীর নির্ব্বন্ধে অনিচ্ছাসত্ত্বে, অক্ষয়বাবু সতর্কতার জন্যে —হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন। বিমল কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছে, তাকে ফির্‌তে লিখে দুজনেই তার প্রতীক্ষা কর্‌ছেন।

বিমল যেদিন ফিরে এলো সেইদিনই রাত্রে মনোমোহন-বাবুর বাড়ীতে তিনজন একত্র হ'লেন। খাওয়া দাওয়ার পর বৈঠকখানায় ব'সে অক্ষয়বাবু বিমলকে জিগ্‌গেস কর্‌লেন—

"ব্রাদার, শেয়ার যে এরি মধ্যে পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। কি-রকম বুঝ্‌ছো, ওতে আর হাত দেওয়া চলে?"

সাহেব বাধা দিয়ে বল্‌লে—

"হম্‌ একলাখ মাংটা।"

ছগ্‌গনলাল এবার হাত জোড় ক'রে বল্‌লে,

"হুজুর হম গরীব আদমী, লাখরূপেয়া কাঁহাসে লায়েঙ্গে?"

অনেক দরদস্তুরের পর ঠিক হোলো যে,ফ্লেচার দশহাজার নগদ এবং খনির এক আনা স্বত্ব পাবে।

পরদিন বিমল এসে সাহেবের কাছ থেকে রিপোর্টটা নিল।

সেই রাত্রেই ছগ্‌গনলালের দল অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। বিমল তখন অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ছে। ছগ্‌গনলাল এসেই জিগ্‌গেস কর্‌ল,

"বিমলবাবু, রিপোর্ট কেমন দেখলেন?"

"মন্দ নয়, কাজ চল্‌বে। তবে যতটা ভাল ভেবেছিলাম তা নয়।"

"তাহ'লে এখোন কি করা ঠিক হোলো?"

"ঠিক আর কি! বাকী পাথর যা আছে সেগুলো আর রিপোর্টটা নিয়ে বিলেত রওনা হ'ব।"

"ও রিপোর্টে কি কাজ হোবে?"

"কাজ একদম পুরো হিসাবে না হ'তে পারে, কিন্তু বিলাতী কোম্পানীর লোক এখানে তদন্ত করতে আস্‌বে নিশ্চয়। যেখানে প্রথম পরীক্ষায় এতটা পাওয়া গেছে সেখানে এর চেয়ে ভাল থাকা সম্ভব।"

"মোটেই না। যা ছিলো সব ঝেড়ে দিয়েছেন তো?"

"হ্যাঁ, সেদিকে সব ঠিকই আছে, মনোমোহন ধ'রে থাকতে চেয়েছিলো। তবে তার গিন্নী রুদ্রমূর্ত্তি ধরায় ভয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

মনোমোহন-বাবু অপ্রতিভ ভাবে বল্লেন—

"আঃ কি বাজে বকছো! আচ্ছা, বিমল, এরকম ভাবে শেয়ারগুলো নাম্‌লো কেন হে? কেউতো কিছু বল্‌তে পারছে না।"

"আমি পারি।"

"হ্যাঁ? কি, কি ব্যাপার বলতো?"

"আমার যত শেয়ার ছিলো সব বোম্বাই, দিল্লী, ঐসব বাজারে গত মাসের মধ্যে বেচেছি। সে খবর এতদিনে এখানে পৌছেছে, তাতেই এই ব্যাপার।"

"সব বেচে দিলে? কেন হে, কোম্পানীর এঞ্জিনীয়র-রাও তো খনিটা ভালোই বলেছে।"

"এতদিন বলেছে, এরপর আর বল্‌বে না।"

অক্ষয়বাবু চম্‌কে উঠে বল্লেন,

"কি রকম? তাদেরও কি হাত করেছো?"

"পাগল হয়েছেন? তাদের ও কি হাত কর্‌তে গিয়ে নিজের গলায় নিজেই ফাঁসী পরাব?"

"তবে কি? খুলেই বলনা ছাই, এসমস্ত জিনিষটাই যেন কেমন একটা হেঁয়ালী হ'য়ে আছে।"

বিমল বল্লে,

"আচ্ছা তবে শুনুন। প্রথমে তো অনেকদিন ঘুরে, ছগ্‌গনলাল বেনারস যাচ্ছে শুনে তার পিছু নিলাম। সেখানের প্রহসন শেষ ক'রে আমি বাঙ্গালোরে একজন ভালো, পাস-করা অথচ জুয়াচুরিতে ভড়কায় না এরকম এঞ্জিনীয়ারের খোঁজে গেলাম। সেখানে ফ্লেচার জুটে গেলো। ওলোকটা বেশ বিচক্ষণ লোক। তবে রেস খেলে সর্ব্বস্ব খুইয়ে শেষে কোম্পানীর টাকায় সামান্য গরমিল করায় ওর চাকরী যায়। ওকে এনে ভালো ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে পরে ওতে আমাতে খনিটা প্রথমে চুপি-চুপি ঠিকমত পরীক্ষা করি। তারপর ফ্লেচার পরম যত্নে খনিটি salt করলো।"

"Salt করার অর্থ?"

"Salt করা অর্থ কৃত্রিম উপায়ে খনির মধ্যে বাইরের থেকে সোনা বা সোনার আকর এনে, সেইটে পরিপাটি ক'রে ছড়িয়ে এবং পুঁতে দেওয়া।"

"তার পর?"

"তার পর সেই salt করা মালের খানিকটা এনে সরকারী পরীক্ষাগারে দেওয়া হোলো। সঙ্গে সঙ্গে ছগ্‌গনলালের দল টোপ ঠোক্‌রাতে আরম্ভ করলে। আমি আঁচ করেছিলাম যে, ওরা ফ্লেচারকে ঘুসঘাস দিয়ে আমায় ঠকাবার যোগাড় দেখবে। ঠিক তাই হোলো। ফ্লেচার আমার শিক্ষামত গোড়ায় আপত্তি করার ভাণ ক'রে পরে চড়া দর হেঁকে ওদের গেঁথে ফেল্লে। পরে যা-যা হোলো তাতো আপনারা সবই জানেন।"

মনোমোহন-বাবু ও অক্ষয়বাবু বল্লেন—

"আচ্ছা, ওরা যদি তোমাকে cheatingএর charge ফেলে?"

"কি ক'রে ফেল্‌বে? ফ্লেচার ওদের কাছে ঘুস খেয়ে যে 'মন্দ' রিপোর্ট দিয়েছিলো আমি তো তারই basisএ বিক্রী করেছি। সে রিপোর্ট যদিও খাঁটি জিনিষের ওপর অল্প কিছু রং ফলান, কিন্তু তাতে cheatingএর charge দাঁড়াবে না।"

"তবে সে ব্যাটারা নিজেদের গলায় নিজেরাই দড়ি দিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

অক্ষয়বাবু হেসে বল্লেন—

"সাবাস ভাই! বেড়ে একহাত দেখিয়েছো। এখন কি কর্‌বে ঠিক করেছো?"

"কাল কলম্বো যাচ্ছি, সেখান থেকে সোজা বিলেত রওয়ানা দেব। ফ্লেচার তো আগেই পালিয়েছে।"

"সে ভেগেছে নাকি? তাকে কতো দিতে হলো?"

"আমি দিয়েছি দেড় লাখ, তারপর সে মেড়োদের কাছে নগদে সেয়ারে যা পেয়েছিলো তাতে আরো হাজার চল্লিশেক হয়েছে।"

অক্ষয়বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লেন,

"আজকার মত সভাভঙ্গ করা হোক। তুমি তাহ'লে এখানের লঙ্কাকাণ্ড শেষ ক'রে লঙ্কায় চলেছো?"

"হ্যাঁ। কলকাতা শীগ্রিই আমার পক্ষে বেজায় অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে উঠবে।"

পরদিন বিকালে মনোমোহন ক্লাইভ ষ্ট্রীট টহল দিয়ে ফির্‌ছেন এমন সময় ছগ্‌গনলাল সদল বলে তাঁকে ঘেরাও কর্‌লে। ছগ্‌গনলাল মহা উত্তেজিত ভাবে তাঁকে জিগ্‌গেস কর্‌লে,

"বিমল-বাবু তার সোব শেয়র্ বেচে দিলো কেনো? সিধা সাফ কথা বলো, এর মধ্যে কি জুয়াচুরী আছে?"

"আমি কি জানি, আমায় ধরেছো কেন?"

চারিদিকে মহা কোলাহল, "তুম্ আলবৎ জান্‌তা" "সব শালা চোর" "পুলুস্ মে দেও" এই সব আরম্ভ হ'ল দেখে মনোমোহন-বাবু ভড়কে বল্‌লেন, "বিমল আজ মাদ্রাজ মেলে চ'লে যাচ্ছে, তাকে ধ'রে জিগেস্ করনা বাবা, আমায় কেন?"

"মাদ্রাজ মেইল! চলো সব কোই, শালেকো পকড় লে আবে।" দল বল তৎক্ষণাৎ মোটর ট্যাক্সী চ'ড়ে ষ্টেশনে ছুট্‌ল।

মাদ্রাজ মেল সবে ছেড়েছে এমন সময় ঐ দল উর্দ্ধ শ্বাসে প্লাটফরমে ঢুকে লোকজন ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের দিকে ছুট্‌ল। দেখা গেল বিমল একটি ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখবামাত্র ছগ্‌গনলাল "পাকড়ো পাকড়ো" ব'লে দিগবিদিক না দেখে ছুটে এক সার্জ্জেণ্টের ঘাড়ে পড়্‌ল। সার্জ্জেণ্টটা ধাক্কা সামলিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে ছগ্‌গনলালকে উত্তম মধ্যম দিতে সুরু কর্‌ল। ষ্টেশনের অন্য লোকজনও যোগদান কর্‌ল।

বিষম হুড়াহুড়ি আরম্ভ হ'ল। ইংরাজি, বাংলা, হিন্দী ও ঝাড়সাই ভাষার অশ্লীল শব্দে প্লাটফর্ম মুখরিত।

বিমল এসব দেখে হাস্‌ছিল। মান্দ্রাজ মেল তাকে বহন ক'রে ধীর হতে ক্রমে দ্রুত গতিতে চ'লে গেল।

পাঞ্জাবের মৃণ্ময়-শিল্প

শ্রী প্রাণনাথ পণ্ডিত, এম-এসসি

পাঞ্জাবে এই শিল্পের প্রথম সূচনা কবে হইয়াছিল, তাহার ঠিকুজি ঠিক করা সুকঠিন। কারণ, মানব-সভ্যতা-সহজাত সুকুমার বিদ্যার বিকাশ-পর্য্যায়ের ধাপে ধাপে ইহা ধীরে ধীরে আকার ধারণ করিয়াছে। তক্ষশিলা এবং অন্যান্য প্রাচীন জনপদ-সমূহ খনন-কালে এই মৃণ্ময় শিল্পসম্ভূত বিবিধ পাত্র ও চিকণের কাজ করা টালি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণিত করিতেছে, যে, বিস্মৃত যুগের হিন্দু-নরপতিগণ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—ইহার প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

এই শিল্পে ইষ্টক নির্ম্মাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান অধিকার করে; কারণ, ইহা ব্যতীত কোন উৎকৃষ্ট স্থাপত্য সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না—যদি না প্রস্তরের

এই প্রদেশে এই চিকণের কাজ করা নক্সাদার টালির ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল—দ্বাদশ শতাব্দীর পাঠান শাসক-দিগের সময় তাঁহাদের সমাধিসমূহ এবং মস্‌জিদের গুম্বজগুলি এক-প্রকার নীল বর্ণের চিকণের কাজ দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইত। লাহোরের "নীলা গুম্বজের" নাম-করণ হইয়াছে—ঐ নীল বর্ণের চিকণের কাজের জন্যই। ঐরূপ চিকণের কাজ আমরা অন্যান্য মিনার প্রভৃতিতেও দেখিতে পাই। প্রায় তিনটি শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমরা এই শিল্পের ক্রম-বিকাশ অনুসরণ করিতে পারি। এই বিকাশের চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল শাহান শাহ সাজাহানের সময়—তখন অসংখ্য অপূর্ব্ব সৌধে ও অপরূপ মস্‌জিদে সমস্ত প্রদেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই-সকল অট্টালিকার দেওয়াল ও গুম্বজ চমৎকার

চিকণের কাজে এবং নক্সাদার প্রতিসন্ধিচিত্রিত (mosaic) টালিতে সমৃদ্ধ ছিল—যে-সকল টালিকে ভাষান্তরে "চিনি-কারি" টালি বলা হয়।

আমরা এই শিল্প সম্বন্ধে কিছু মাত্র অত্যুক্তি করিতেছি না। যাঁহারা মৃত্তিকা মাত্র দিয়া এইরূপ সুন্দর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরিকল্পনার এবং পার-দর্শিতার প্রমাণ এখনো তাঁহাদের স্থাপত্যের মধ্যে জড়াইয়া ও ছড়াইয়া আছে। ভারতীয় স্থাপত্য-কলার এই-সব নিদর্শন সত্যই আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করে।

ডাক্তার বার্ডউড বলেন—"ভারতের সমতল ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সহসা কোন প্রাচীন মসজিদের সম্মুখে উপনীত হওয়া যায়, তখন তাহার শিল্পকলা ও সৌন্দর্য্য আমাদিগকে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। নীল, হরিৎ, পীত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ-সমাবেশে মসজিদগুলি বিচিত্র-সুন্দর। সূর্য্যোদয়-কালে দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে

একটি দিল্লীর জার

ইহাদিগের উচ্চ গুম্বজ ও উজ্জ্বল মিনার—যাহা সুন্দর এক-প্রকার নভোনীল বর্ণের অনুলেপে অনুরঞ্জিত—নিখাদ স্বর্ণ নির্ম্মিত বলিয়াই বোধ হয় এবং তাহার সম্মোহন-দ্যুতিতে স্বভাবতই চিত্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে।"

মুলতানের চিকণের কাজ করা টালিশিল্পের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে জানা যায়—পারস্যের "কাসান" সহরে ঐ শিল্প সমসাময়িক যুগে আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু মুলতান এবং পাঞ্জাবের স্থানীয় কিম্বদন্তী ইহার মৌলিকত্ব চীনের প্রতি আরোপ করে—যেহেতু ইহার

একজন পাঞ্জাবী কুম্ভকার মাটির পাত্র প্রস্তুত করিতেছে।

এক নাম "চিনিকারি"। পক্ষান্তরে "কাসিগারি" বলিয়াও ইহার অপর নাম আছে। বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়—সম্ভবত এই শিল্পের প্রবর্ত্তনা পারস্য হইতেই আসিয়াছে।

শিল্পের প্রকার

(ক) কাঁচা মাটির সাধারণ কাজ ও ইটের কাজ। এই কাজের কারখানা প্রত্যেক সহরে এবং পল্লীতেই আছে। এই কাজ যাহারা করে তাহাদিগকে কামিন বা কুমার বলে। পল্লীর পতিত জমি হইতে কুমাররা এই কাজের জন্য মাটি সংগ্রহ করে। ভালো কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে ভালো মাটি সংগৃহীত হয়। যদি উপযুক্ত মাটি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মাটির সঙ্গে বালি, ক্ষার, সোরা প্রভৃতি মিশাইয়া মাটিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হয়। কোন কোন স্থানে স্বভাবতই ভালো মাটি মিলে—তাহার সঙ্গে অন্য কিছু মিশাইতে হয় না। শিয়ালকোট জেলার 'পশরূরে' প্রস্তুত হাঁড়ির সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। কেহ হাঁড়ি ক্রয় করিতে আসিলে বিক্রেতা হাঁড়িটি ছাদ হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া হাঁড়ির পরীক্ষা দিত। হাঁড়ি অক্ষত থাকিলে দর করিয়া ক্রেতা উহা লইত। কথাটির মধ্যে হয়ত অত্যুক্তি আছে; কিন্তু

হাঁড়িগুলি যে পাথরের মত মজবুৎ করিয়া তৈয়ারি করা হইত, তাহাতে কোন ভুল নাই।
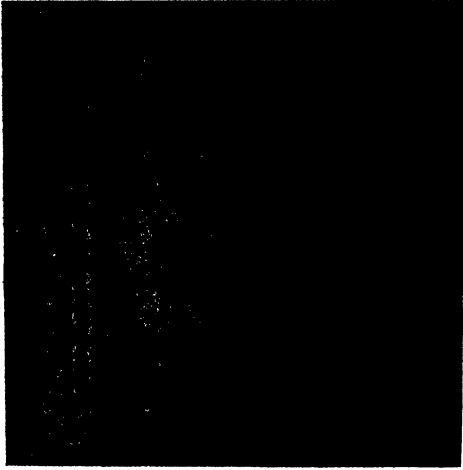
মুলতানে নির্ম্মিত একটি সুদৃশ্য ইঁট

খাদ্যাদি রাখিবার প্রয়োজনে আরও অনেক প্রকার মাটির মাল্‌সা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। তারপর মাটির হুঁকা-কল্কেও আছে। জল ও অন্যান্য পানীয় রাখিবার জন্য বিবিধ প্রকারের সোরাই তৈয়ারি হয়—শিল্পকলার দিক হইতে সেগুলি দর্শনীয়ও বটে।

কুমারের চক্র বা চাক হইতে এইগুলি বিশেষ বিশেষ কৌশলের সহিত তৈয়ারি হয়। দুই রকমের চাক আছে; রাম চাক—যাহা হাত দিয়া ঘুরান হয়; চাক লড়্‌কি—পাদান সংযুক্ত চাক।

ইষ্টক নির্ম্মাণ এই শিল্পের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় শাখা। ইহা ছাঁচ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়।

(খ) ভাওয়ালপুর এবং জহরের একপ্রকার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর (চিকণের কাজ নয়) কাজ। জিনিষগুলি বেশ হাল্কা—সেইজন্য সেগুলিকে 'কাগ্‌জি' নামে অভিহিত করা হয়।

(গ) চিকণের কাজ করা মাটির জিনিষ। ইহা দুই উদ্দেশ্যে দুই ভাবে প্রস্তুত হয়—খাদ্যাদি রাখিবার জন্য সাধারণ ভাবে এবং গৃহ-সজ্জার জন্য চিত্রবিচিত্র নক্সা কাটিয়া। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ—"মার্ত্তাবন" বা জালা। চিকণের কাজ করা জিনিষগুলিকে স্থানীয় ভাষায় "রঘুরনি বর্ত্তন" বলা হয়। নীলাভ সবুজ এবং স্বচ্ছ সোরা বা ক্ষার জাতীয় দ্রব্যের লেপ দিয়া এই চিকণের কাজ করা হয়। ইহা দেখিতে বেশ পছন্দসই এবং ইহার মধ্য হইতে চমৎকার একরূপ জর্‌দা আভার আভাস পাওয়া যায়। এই কাজে মধ্যে মধ্যে লাল রঙও ব্যবহৃত হয়।

মুলতানের চিকণের কাজেও বিশেষত্ব আছে। এই কাজকে 'কাসি'র কাজ বলা হয়। যদিও কারিগররা প্রাচীন কালের তুলনায় অনেক অংশেই হীন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এখনো ইহারা চমৎকার জিনিষ তৈয়ারি করে।

(ঘ) মাটির খেলনা, পুতুল প্রভৃতি। এইসব প্রস্তুত করিবার কাজে ইহারা আগ্রা বা লক্ষ্ণৌয়ের সমান না হইলেও একেবারে আনাড়িও নয়। প্রায় প্রতি মেলাতেই একশত টাকার উপরও ইহার কাট্‌তি হয়। দুঃখের বিষয়, বিদেশী সস্তা মালের প্রতিযোগিতায় এই ব্যবসা অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।
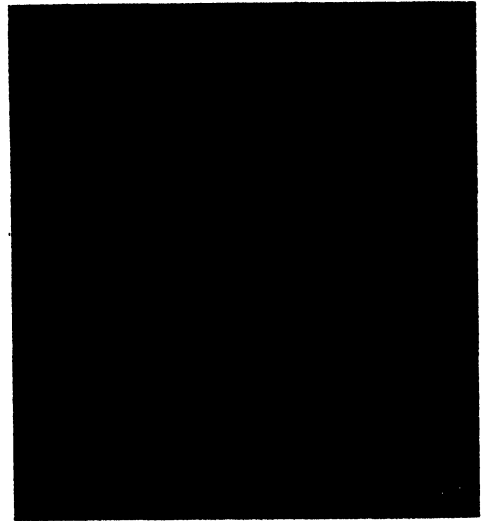
লাহোরের দুর্গের একটি চিত্রিত টালি

খেলনা ও পুতুল দুই রকমে তৈয়ারি হয়—হাতে ছাঁচে। ছাঁচেই ভালো হয়। গড়িবার পর খড়িয়া খড়িমাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। তার পর রঞ্জনের রঙ গুলিয়া সেই রঙে উহা চিত্রিত হয়। অনেক পাত্‌লা দস্তা বা রূপার পাতেও মোড়া হয়।

এক প্রকার লাল চিকণের কাজের চলনও বাজারে আছে—কিন্তু দাম অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে না।

বিদেশীয় দ্রব্যজাতের অনুকরণে জিনিষ-প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা এখানে কিছুদিন হইতে অনুভূত হইতেছে। সেজন্য অনেক প্রকার চেষ্টাও আরম্ভ হইয়াছে এবং সামান্য রূপ সাফল্যও যে ঘটে নাই তাহাও নহে। উৎকৃষ্টতর জিনিষের চাহিদা এখানে খুব বেশী। লাহোর এবং দিল্লীর য়্যাসিডের কারখানা হইতে প্রতি বৎসর ২০০০ সংখ্যক জার বা জালা ক্রীত হয়। কালির দোয়াত এবং ব্যাটারির "diaphragms"এর চাহিদাও কম নয়। মেঝে শান করিবার জন্য টালির চাহিদা ত আছেই।
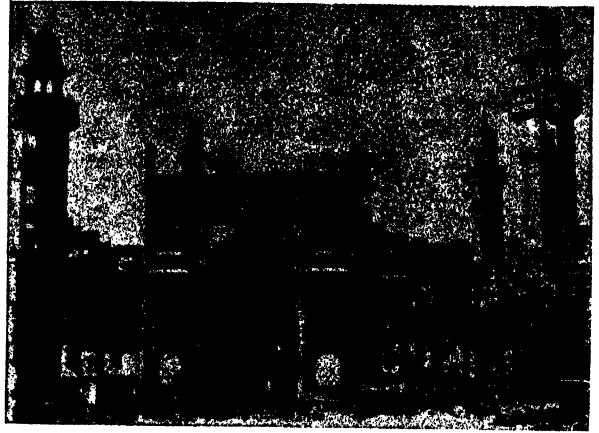
এই প্রদেশের মধ্যে দিল্লী সহরে একটি মাত্র কারখানায় এইসব কাজ উত্তমরূপে চলিতেছে। লাহোরেও একটি কারখানা আছে। পোর্সলেনের কাজ এখানে বেশ ভালোরূপেই সামান্য কিছু দিন চলিয়াছিল —এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মেলায় মাটির পুতুল

এইসব কারখানার কাজের জন্য নিম্নলিখিত কাঁচা মালের দরকার।

(১) সাধারণ মাটি বা "কালী মাটি"—পাঞ্জাবের পলি-পড়া সমতল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই মাটি দিয়া সাধারণ হাঁড়ি মাল্‌সার এবং ইটের কাজ হয়।

(২) দেরাজাৎ হইতে আম্‌দানি অন্য এক প্রকার মাটি

সাজাহানের রাজত্বকালে নির্ম্মিত সুদৃশ্য টালি দ্বারা নির্ম্মিত উজীর খাঁর দর্‌গা

—যাহা আগুনে পোড়াইবার সময় একরকম হলুদরঙের জৌলুস্ বাহির হয়।

(৩) খড়িমাটির মতন এক রকম ভালো মাটি—জম্মুরাজ্যের রায়সি নামক স্থানে এবং দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। কাংড়া ও ডালহৌসির নিকট দুই এক জায়গাতেও ঐ শ্রেণীর মাটি আছে। এই মাটি উপযুক্ত উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া উচ্চশ্রেণীর কাজে ব্যবহৃত হয়। "কুঠালি" বা সোনা গলাইবার মুচিও ইহাতে প্রস্তুত হয়।

(৪) বালি এবং সোরা—মাটির কাজের দুইটি প্রধান উপাদান। এই প্রদেশে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। "গড়ু" বা "বান্নি"ও (oxide of iron) দুষ্প্রাপ্য নয়। ইহা গরম করিয়া মাটির পাত্র প্রভৃতি লালরঙে রঙান হয়।

(৫) কাচ ও সোহাগা—চিকণের কাজের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। বালি ও অন্যান্য উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে মিশাইয়া হাপরে গরম করিয়া এই কাচ নির্ম্মিত হয়। সোহাগা অন্যত্র হইতে আম্‌দানি করিতে হয়।

(৬) ধাতব ক্ষার—(manganese dioxide এবং cobalt oxide) রঙের জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে ঐ প্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত এবং প্রাচীন কারিগরদের বিশেষ পরিচিত ছিল; আজকাল বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

গৃহ-শিল্পের দিক হইতে এই মৃণ্ময়-শিল্প বিশেষ মূল্যবান। এক পাঞ্জাবেই এই কাজ করিয়া ২৪০,০০০ জন লোক জীবিকা-সংস্থান করে। দুঃখের বিষয়, ইহারা পূর্ব্বের মত আর ভালো জিনিষ তৈয়ারি করিতে পারে না।

১৯২০ সালের এপ্রিল-মে-জুন- তিন মাসে ব্রিটিশ ভারতে ৯৭৪,০০০ টাকার জিনিষের কাটতি হইয়াছিল। ইহাতেই চাহিদার অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

এইসব কাজের উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা উচিত। যদিও পোর্সলেনের কাজের তেমন সুবিধা হইবে না, কিন্তু স্থানীয় আবশ্যকীয় জিনিষ আরো অনেক আছে।

"Forman Christian College,"এর শিল্প-বিভাগ বিদেশীয় প্রণালীতে এই কাজের উন্নতির জন্য একজন বিশেষজ্ঞ রাখিয়া গবেষণা করিতেছেন। আমরা আশা করি, এই কার্য্য সফলতার পথেই অগ্রসর হইবে। যদি হয়,—এই প্রদেশের বহুকাল-অনুভূত একটি বিশেষ অভাব মিটে।

আফগান-আমীরের য়ুরোপ ভ্রমণ

শ্রী প্রভাত সান্যাল

বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা জাতির, নানা ধর্ম্মের ও বিভিন্ন প্রকার সভ্যতার মিলন-সঙ্ঘাত আফগানিস্থানে ঘটিয়াছে। আলেকজান্দার আফগানিস্থান অতিক্রম করিয়া ভারতের প্রাকৃতিক তোরণদ্বার দিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। চেঙ্গিজ খাঁ ও অন্যান্য অনেক ভাগ্যান্বেষী অভিযানকারী আফগানিস্থানের পথেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বৈদিক-যুগে ভারতীয় আর্য্যগণের একটি শাখা আফগানিস্থানে বসবাস করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।* ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী ছিলেন বর্ত্তমান কান্দাহার-দেশের রাজকন্যা। ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার যুগেও আফগানিস্থানে উহার প্রসার হইয়াছিল এবং বৌদ্ধযুগে ঐ দেশের অনেক অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সেখানে মঠ, স্তূপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

আফগানিস্থানের প্রাচীনকালের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইতে পারে। অশোক আফগানিস্থানের মধ্য দিয়াই সিরিয়া, ইজিপ্ট, মেসিডোনিয়া, এপিরাস প্রভৃতি রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। আফগানিস্থানের ভিতর দিয়াই প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম, ভাস্কর্য্য ও সঙ্গীতকলা মধ্য-এশিয়া হইতে জাপান পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবাসী যখন যেখানে গিয়াছে হিন্দু ও বৌদ্ধ-সভ্যতার শ্রেষ্ঠদানসমূহকে সে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলে নাই। তাই আফগানিস্থানের নানাপ্রান্তে, উত্তর ও মধ্যএশিয়ার মরুভূমিতে, চীনে, জাপানে, প্রশান্তমহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে, চম্পা, কম্বোজ ও শ্যামদেশে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অপূর্ব্ব সম্পদ-সমূহের নিদর্শন এখনও দেখা যায়।

ফা-হিয়ান, হু-এনত্সাং প্রভৃতি বৌদ্ধশ্রমণ আফগানিস্থানের পথেই ভারত-প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আফগানিস্থানের বৌদ্ধস্তূপ, গুহা, মূর্ত্তি ও

* Dr. U. N. Ghosal: Afghanistan, Greater India Society's Bulletin No. V.

মঠগুলির উল্লেখ আছে ; সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে আফগানিস্থানে ঐ দুই ধর্ম্ম যে বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল
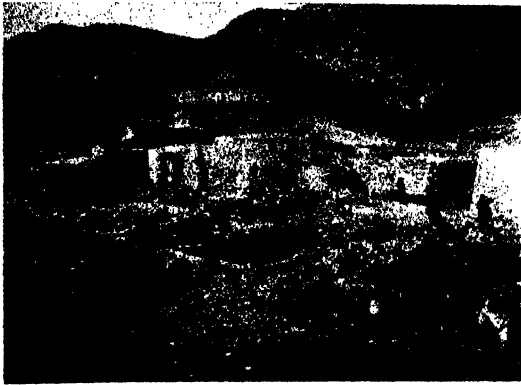
বিমারান স্তূপ, জেলালাবাদ

তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। পরে ঐ দেশে ইস্লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইলেও তাহার উপরেও বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত।*

"Islam in Afghanistan...was a superstructure on the existing Buddhist *cum* Hindu construction. The miracles of the older faiths continued: they were ascribed to Muslim spiritual power ; the hair of Buddha and the miracles of the stupas were reproduced in the mysterious movements of the tombs (Turbat) of the 'minor prophets' of Islam."

কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকগণের নেতৃত্বে যে অনুসন্ধান হইয়াছিল তাহার ফলে আফগানিস্থানে অনেকগুলি বৌদ্ধস্তূপাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। কাবুল-নদীর নিকট জেলালাবাদ, হিদ্দা ও বৌদ্ধ কাবুলের গান্ধার শিল্পরীতির অনুযায়ী মূর্ত্তি ও স্তূপ সমূহ।

২। মধ্য-এশিয়ার শিল্পপদ্ধতির অনুকরণে নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও সৌধ—যেগুলি বামিয়ান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ঐ দেশে জৈন ও ঋষি যরথুশথ্রের ধর্ম্মেরও প্রচার হইয়াছিল। আবার এই আফগানিস্থানের পথেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রচারক টমাস্ এবং ইসলামধর্ম্ম-প্রচারকগণ ভারতে আসেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় ধর্ম্মমত আফগানিস্থানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত আফগানিস্থান ভারত-সাম্রাজ্যেরই প্রত্যন্ত প্রদেশ ছিল। আফগানিস্থানের সহিত ভারতের রক্তসম্বন্ধ অতি প্রাচীন। এইসমস্ত কারণে আফগানিস্থানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে ভারতবাসীদের আনন্দপ্রকাশ করা স্বাভাবিক। সেইজন্যই আফগান-রাজদম্পতীর পশ্চিম-ভ্রমণ সম্পর্কে ভারতবাসীরা এত উৎসাহ দেখাইতেছে ; সেইজন্যই আফগান-রাজদম্পতীর ভারত-ভ্রমণকালে ভারতের জনসাধারণ তাঁহাদিগকে বিরাট অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

আফগান-রাজদম্পতীর ইয়োরোপ ভ্রমণ ও তাহার রাজনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে দুই একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিব। বিগত একশত বৎসরে আফগানিস্থানের রাজ-

হিড্ডা তিন নং গুহাস্থিত মূর্ত্তি
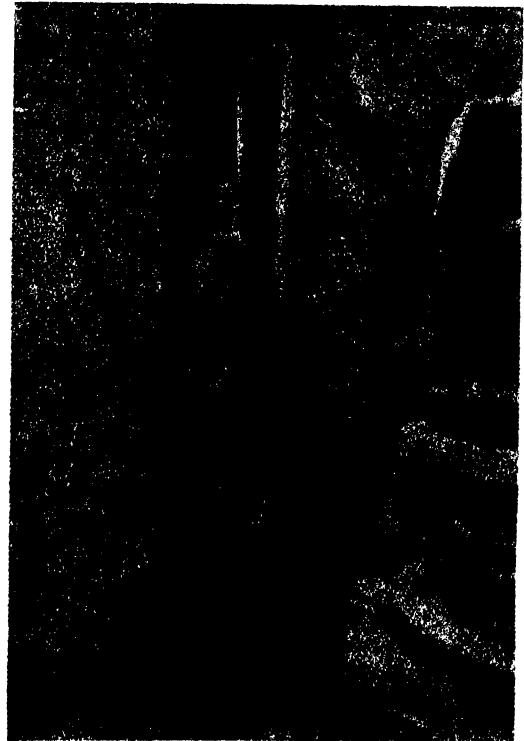
নৈতিক ইতিহাসে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইংলণ্ড এই সকল সমরাঙ্গণে প্রধান নায়করূপে দেখা দিয়া ভারতবর্ষকে বাহিরের আক্রমণ ও হুজুগ হইতে নিরাপদ

* Ranjit Pandit, Bar-at-Law: Buddhist Remains of Afghanistan. M. R. February, 1927.
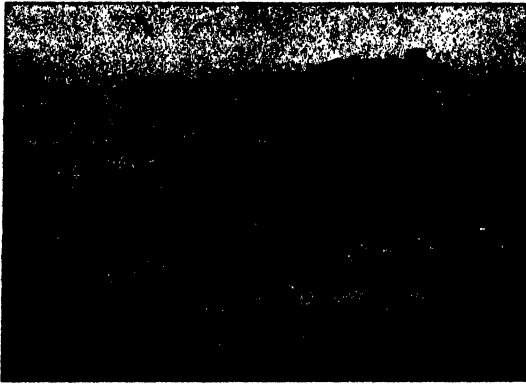
কাবুলের নিকটে একটি বৌদ্ধ বিহারের স্তূপ

রাখিতে হইলে উত্তর-পশ্চিম সামান্ত সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সকল পথই আফগানিস্থানের অতি নিকটে অবস্থিত; কাজেই সেখানে যদি বৈদেশিক শক্তি প্রসার-প্রতিপত্তি করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতের মালিক ইংলণ্ডের অসুবিধা। তাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ঘাটি আগলাইবার অছিলায় ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ও ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে দুইবার ইংলণ্ড আফগান আমীরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন ও দেশটিকে একরূপ নিজেদের করতলগত করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সরকারের সহিত একটি নূতন চুক্তি করিয়া ইংলণ্ড আফগানিস্থানকে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাবের (Sphere of Influence) মধ্যে আনেন। আফগানিস্থানের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তখন যাহা সম্ভব হইয়াছিল, এখন আর তাহা সম্ভব নহে। আফগানিস্থানের বর্ত্তমান আমীর আমান-উল্লা আফগানিস্থানকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করিয়াছেন। আজ আফগানিস্থানের পশ্চাতে সুশিক্ষিত সৈন্য, আধুনিক সমরোপযোগী সাজসজ্জা সমস্তই আছে—তাই বলদর্পী ইংলণ্ড আজ শক্তিশালী আমীরকে বিপুল অভ্যর্থনা করিতেছে। যাহাদের হঠাৎ অভিযানের ফলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব আমীর সের আলী পলায়ন করেন ও পরে ক্ষোভে ও অপমানে আত্মহত্যা করেন, যে-আফগানিস্থানের সহিত সেদিন (১৯১৯ খৃঃ) পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের যুদ্ধ হইয়াছে তাহারই রাজ-দম্পতীকে সম্মানিত করিবার জন্য ইংলণ্ডের রাজা ও রাজমহিষী বিপুল আয়োজনে ব্যস্ত, ইংলণ্ড আজ আফগানিস্থানের সহিত মিতালি পাতাইবার জন্য আগ্রহান্বিত।

আফগানিস্থানের এই সকল উন্নতির মূল কারণ আমীর আমানউল্লার সুশাসন। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তখন আফগানিস্থানে ঘরে ঘরে গোলমাল, দেশের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ ও অরাজকতা। তিনি ঐ সকল অন্তর্মুখী বিদ্রোহকে বহির্মুখ করিয়া দেশে স্বাধীনতা স্থাপন করিলেন ও দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। আমানউল্লার পিতা-পিতামহ সকলেই ইংরেজের তাঁবেদারিতে থাকিতেন, তাঁহারা ভারত-সরকারের সহিত মিতালি করিয়া তাঁহাদের আব্দার রক্ষা করিয়া কোনরূপে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেন। আমানউল্লা গদী পাইয়াই নিয়ম বদ্‌লাইয়া দিলেন। আমীরের একজন পাশ্চাত্য-ভ্রমণ-সহচর বার্লিনের *Deutsche Allgemeine Zeitung* নামক সংবাদপত্রে লিখিতেছেন:

হিড্ডা ১নং গুহার স্তূপ

Amanullah has broken with the tradition of his forefathers. They never left their native soil on long journeys abroad, but confined themselves to brief visits to India, where they conferred with the Viceroy—for Afghanistan's foreign relations were confined to that one contact. From this yoke Amanullah has freed his country...Afghanistan became an independent State with whom England concluded a treaty of complete equality in 1921. At the same time Amanullah began his great reforms.

আমানউল্লা তাঁহার এই মাত্র ৯ বৎসর রাজত্বে আফগানিস্থানের কিরূপ উন্নতি করিয়াছেন তাহার পরিচয় বিগত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীর পাঠকবর্গ অবগত আছেন।*

আফগান-রাজদম্পতী পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বিগত ডিসেম্বর (পৌষ) মাসে কাবুল পরিত্যাগ করেন। এই ভ্রমণকালে যাহাতে তিনি ইংরেজের নির্দ্দেশ অনুসারে চলেন এজন্য ইংরেজরা বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়াছে। কিন্তু আমীর কাহাকেও তাঁহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই। তাঁহাদের ভারত-ভ্রমণের সময় যাহাতে ভারতবাসিগণ তাঁহার সান্নিধ্যে না আসিতে পারে ভারত-সরকার সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কোনরূপ অভ্যর্থনা প্রভৃতি দেওয়া নিষিদ্ধ! কিন্তু তিনি উক্ত নির্দ্দেশ মতে চলেন নাই। বোম্বাইএ নানা সভা-সমিতির নিকট হইতে অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-সহচর লিখিতেছেন—

...The Viceroy had forbidden any public address in the city. Nevertheless, the king acted as if he were in Kabul and made speeches, acknowledged welcome addresses...although the English obviously did not approve of these secnes.

বামিয়ানের পর্ব্বতশিখরস্থিত বুদ্ধ মূর্ত্তি

কাবুলের নিকটস্থ একটি বৌদ্ধ চক্র

ভারত হইতে ইয়োরোপের পথে তিনি মিশরে গমন করেন। সেখানে রাজা ফুয়াদ স্বয়ং তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। মিশরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই বারই প্রথম একজন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন মুসলমান নৃপতিকে অভ্যর্থনা করা হইল। আফগান-রাজদম্পতীর থাকিবার জন্য গীজএ প্রাচ্য ঐশ্বর্য্য-ভূষিত নূতন শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল। মিশরে তাঁহার বেশভূষা লইয়া একটু আমোদ হইয়াছিল। নববর্ষের দিন তিনি ফেজের পরিবর্ত্তে বিলাতী রেসের ঘোড়ার মালিকদের বেশ ও ধূসর রঙের লম্বা টুপী পরিধান করেন। ইহাতে মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনের (এল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপকমণ্ডলী একটু অসন্তুষ্ট হন। তাহার কারণ তাঁহাদের মতে একমাত্র মিশরের ইংরেজ রাজদূতই ঐরূপ টুপী ব্যবহার করিবার অধিকারী। এই সংবাদ পাইয়া আমীর জানান যে আফগানিস্থানের অধিবাসীরা সাধারণতঃ ঐ প্রকার টুপী ব্যবহার করে এবং ইয়োরোপের লোকেরা আফগানিস্থানের দেখাদেখি ঐরূপ টুপী ধরিয়াছে। ইহাতে অধ্যাপকমণ্ডলী খুসী হন। মিশর-ভ্রমণকালেও ইংরেজ সরকার আমীরকে লইয়া কম বিব্রত হন নাই। আমীর আমানউল্লা মিশরের আইন পরিষদে মিশরের রাজা ও তাঁহার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে নানা
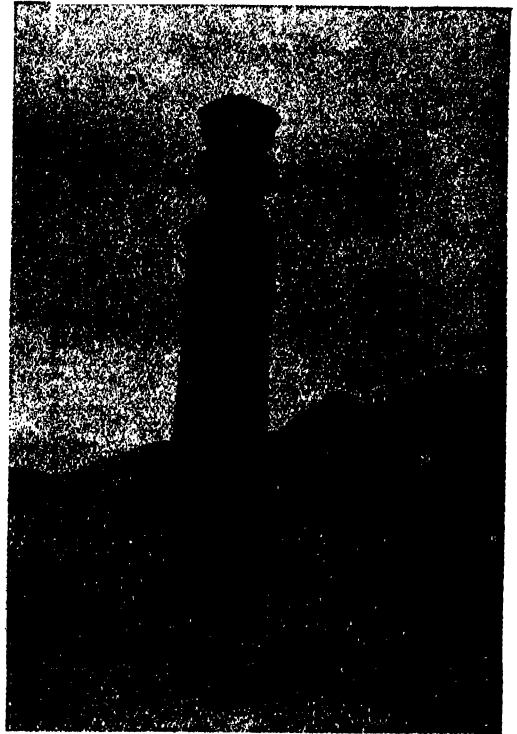
* আফগানরাজের দেশভ্রমণ—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রকার সহানুভূতি-সূচক বাণী বলেন। মিশরের জনসাধারণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া উল্লসিত হইয়া তাঁহাকে গণতন্ত্রবাদী রাজা বলিয়া অভ্যর্থনা করেন।

টাম্নাকালান হইতে আবিষ্কৃত কতকগুলি ভগ্ন মূর্ত্তি
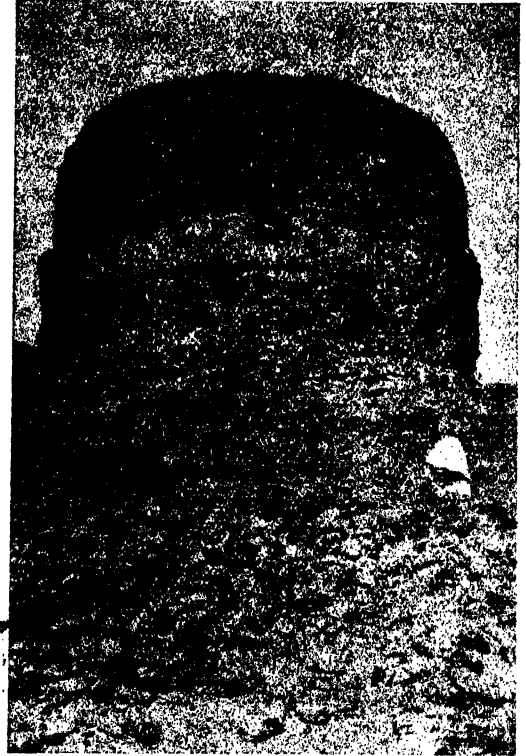
মিশর হইতে তিনি ইতালী যাত্রা করেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে নেপল্‌সএ অবতরণ করেন—ইয়োরোপের মাটিতে ইহাই তাঁহার প্রথম পদার্পণ। এখানে ইয়োরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আফগান রাজদূতগণ আমীরকে অভ্যর্থনা করেন। রোমে সিনর মুসোলিনী ও ইতালীর রাজপরিবার তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তিনি ইতালীয় ভাষাতে এই সকল অভিনন্দন-পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করেন। তৎপরে তাঁহার পোপের সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

ইতালী হইতে তাঁহারা ফরাসী দেশে গমন করেন। ফরাসী দেশ আমীরের বিশেষ প্রিয়। তিনি বেশ ভালরূপে ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন। তাঁহার রাজ্যে পূর্ত্ত-বিভাগে অনেক ফরাসী দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্য আত্মীয়বর্গ ফরাসী দেশে অধ্যয়ন করিতেছেন। পারীতে ফরাসীগণতন্ত্রের সভাপতি ম্‌ঁসিয় ডুমার্জ্জ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। পারীতে তাঁহাকে বিরাট্‌রূপে অভ্যর্থনা করা হয়। রাষ্ট্রবীর নেপোলিয়ন একদিন যে-শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন আমীরকে তাহাতে শুইতে দেওয়া হইয়াছিল। সম্রাজ্ঞী এন্‌টোয়ানেট একদিন যে-প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন আফগান রাজমহিষী সুরিয়াকে তাহা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। ফরাসী দেশে নেপোলিয়ানের সমাধি, ভার্সাই গ্যালারী প্রভৃতি নানা দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি জার্ম্মেনী যাত্রা করেন। এখানেও রাষ্ট্রনেতা হিণ্ডেনবার্গ ও জার্ম্মান দেশের জনসাধারণ তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা করেন। জার্ম্মেনী হইতে তাঁহারা ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

খায়েস্তা স্তূপ, জেলালাবাদ

ইংলণ্ডে আফগান রাজদম্পতীকে সর্ব্বাপেক্ষা বিপুল অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের যুবরাজ ডোভারে তাঁহাদের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া

ষ্টেশনে ইংলণ্ডের রাজা, রাণী ও মন্ত্রীমণ্ডল উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার পর তাঁহাদিগকে বাকিংহাম প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়। ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ অকস্‌ফোড বিশ্ববিদ্যালয় আমীরকে ডি, সি, এল উপাধিভূষিত করেন। মোট কথা, তাঁহারা যে কয় সপ্তাহ ইংলণ্ডে ছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, গৌরব, বলবীর্য্যের নিদর্শন—ইংলণ্ডের সৈন্য, রণতরী, বিমান-বহর, আইন-সভা, কল-কারখানা, বন্দর পোত, রেলওয়ে, শিক্ষা-কেন্দ্র, বিজ্ঞানাগার, শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্র, ব্যাঙ্কবিপণি সমস্তই তাঁহাদিগকে দেখান

বামিয়ানের অপর একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি

হইয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে আমীর রুশিয়া গিয়াছিলেন। রুশিয়ার সোভিয়েট সরকার এই সম্মাননীয় অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমীরের রুশিয়া যাত্রার পূর্ব্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বর্ত্তমান রুশিয়া-সম্বন্ধে অনেক অলীক সংবাদ রটনা করিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট সরকার ইংলণ্ডের মত নিজেদের সৈন্যসামন্ত, রণতরী প্রভৃতি না দেখাইয়া আমীরকে রুশিয়ার সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের নিদর্শন দেখাইয়াছেন। আফগানরাজ পরলোকগত রাষ্ট্রবীর লেনিনের সমাধির উপর আফগান
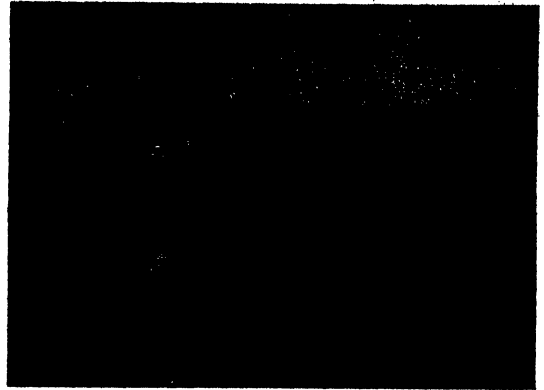
টাপ্পাকালানের বৌদ্ধ বিহার

পতাকা সহ পুষ্পমাল্য উপহার দিয়া লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আফগানরাজ সোভিয়েট রুশিয়ার শাসন-প্রণালী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং

হিড্ডার নিকটস্থ একটি স্তূপের নীচের অংশ

তাঁহার মনে কমিউনিষ্ট-বিরোধ ধারণাই দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে। একখানি বিলাতের সংবাদপত্রে লেখা হইয়াছিল :—

আমানুল্লাকে প্রভাবান্বিত করিবার জন্য সোভিয়েট সরকার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের সে-চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ইহাতে বড় বড় কমিউনিষ্ট নেতারা নিরুৎসাহ হইয়াছেন। রুশিয়া সম্পর্কে আফগানরাজের যে-সমস্ত ধারণা ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরেজ-বিরোধী সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া ইংলণ্ডের কার্য্যের সমালোচনা করার জন্য আফগানরাজকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই।

বামিয়ানে স্থাপিত একটি বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি
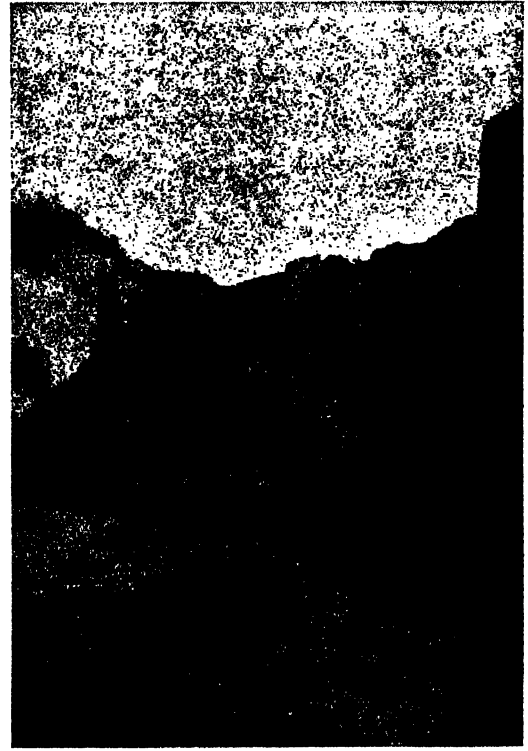
বামিয়ানে সমাসীন বুদ্ধ মূর্ত্তির নিকটস্থ দেওয়াল-চিত্র

কিন্তু বিশ্বদূত রয়টার অন্যরূপ বলিতেছেন। রয়টারের প্রতিনিধির নিকট আফগানিস্থানের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব বলেন যে,

> সোভিয়েট শাসনাধীনে রুশিয়ার অবস্থা দেখিয়া আমীর অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই মনোভাবের ফলে আফগানিস্থান ও রুশিয়ার মধ্যে একটা পাকাপাকি বাণিজ্য সন্ধি স্থাপন অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া আসিবে।

রুশিয়া হইতে তিনি তুরস্ক ও পারস্য দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

এই প্রসঙ্গে আফগান রাজ-মহিষী সুরিয়া (Surayya) সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। তিনি আফগানিস্থানের পররাষ্ট্রসচিব মহম্মদ তারজির কন্যা। রাজ্ঞী সুরিয়া বাল্যকালে সীরিয়ায় প্রতিপালিতা হন এবং পিতামাতার তত্ত্বাবধানে সুশিক্ষা লাভ করেন। তিনি পাশ্চাত্য বেশ পরিধান করেন এবং বোর্‌খার পরিবর্ত্তে একটি ওড়না ব্যবহার করেন। তিনি ইউরোপে ওড়না ব্যবহার করেন নাই। আমীর-মহিষী তাঁহার মাতার সহযোগিতায় আফগানিস্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি কাবুলে যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বর্ত্তমানে ৮০০ ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। সংরক্ষণশীল আফগান নেতাগণ এরূপ স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছেন, কিন্তু আমীর সে-সমস্ত প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নাই। রাজ্ঞী সুরিয়া ইয়োরোপের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মতই অতিথি অভ্যাগতকে অভ্যর্থনাদি করিতে পারেন।

আফগান-নৃপতির এই বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। আমীর স্বয়ং নেপল্‌সে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন,

> He wants to see with his own eyes the best of European civilisation and society, in order to transplant it to Afghanistan. His journey is more than a goodwill visit to various capitals.
>
> For it involves Afghanistan as well as the countries visited in important political, economic and cultural questions.

তাৎপর্য্য—তিনি স্বচক্ষে ইয়োরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন দেখিতে চান যাহাতে আফগানিস্থানেও ঐগুলির বিকাশ সম্ভবপর হয়। তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য শুধু বন্ধুভাবে বেড়ান নহে, পাশ্চাত্য দেশসমূহের কৃষ্টি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সহিত আফগানিস্থানেরও যে সম্বন্ধ আছে সে বিষয়েও তিনি উদাসীন নহেন।

আফগান-আমীরের পক্ষে ইয়োরোপ ও এসিয়ার নানা শক্তিপুঞ্জের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, তিনি জানেন যে, যদি রুশ ও ইংরেজ একজোটে আফগানিস্থানকে করতলগত করিবার প্রয়াসী হয় তাহা হইলে উক্ত শক্তি দুইটির পক্ষে আফগানিস্থানের স্বাধীনতা লোপ করা বিশেষ কঠিন নহে। কাজেই তাঁহাকে ইয়োরোপ ও এশিয়ার শক্তিগুলির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে হইবে। পারস্য, তুরস্ক, ভারতবর্ষ, চীন, জাপানের সহিত আমীর সৌহার্দ্দ্য ঘটাইতেছেন বলিয়া অনেকে ঐ প্রকার সন্দেহ করিতেছেন। আবার অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, আমীর এসিয়ার জাতিসমূহের একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। নিখিল-

বৌদ্ধ কাবুলের নিকটস্থ একটি স্তূপ

এশিয়া সম্মিলন (Pan-Asian Conference) নামক একটি সমিতি এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্মিলনীর আগামী অধিবেশন কাবুলে হইবে বলিয়া স্থির হওয়ায় অনেকে ঐরূপ সন্দেহ করিতেছেন। ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যে আমীর মিতালি করিতেছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইতালীতে অভিনন্দন-পত্রের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন যে, "ইয়োরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইতালীই সর্ব্বপ্রথম আফগানিস্থানের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে।" ফরাসী রাষ্ট্রের সহিতও আমীর সখ্যতা-বন্ধন ক্রমে ক্রমে সুদৃঢ় করিতেছেন এবং জার্ম্মেনীর সহিতও তিনি বন্ধুত্ব

আমীর আমান উল্লা

আমীরের খাস মুন্সী এন্ হুমায়ুন মুহম্মদ তার্জ্জি পররাষ্ট্র সচিব

করিয়াছেন, যাহার ফলে আফগানিস্থানের খনিসমূহে অনেক জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ার নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমীরের এই সমস্ত মতিগতি ইংরেজের ভাল না লাগিবারই কথা। ইংরেজ চায় আফগানিস্থানে একমাত্র তাহাদেরই একাধিপত্য থাকিবে। সেখানকার খনিজ সম্পদ তাহারাই আহরণ করিবে। এই প্রতিযোগীতা-ক্ষেত্রে—জার্ম্মান, ইতালিয়ান, ফরাসী বা আমেরিকান যে-কোন দেশেরই হউক—অন্যে মূলধন অথবা লোক-লস্কর লইয়া অবতীর্ণ হইবে ইংলণ্ড ইহা সহ্য করিতে পারিতেছে না। আমীরের ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় তিনি যাহাতে ইংলেণ্ডের শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন সেজন্য চেষ্টার ত্রুটী করা হয় নাই। অকস্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় লর্ড বার্কেনহেড ইঙ্গিত করিলেন—

আফগানিস্থানের আমীর আমান উল্লা ও সম্রাজ্ঞী সুরিয়া

"আজ যখন আফগানরাজ আমাদের দেশে আসিয়াছেন, তখন তিনি দেখুন প্রতীচ্যও মানব-সভ্যতার জন্য কতটুকু করিয়াছে। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে সে কি দান করিয়াছে এবং এই পরস্পর আদানপ্রদানের উপর ইংলণ্ড ও আফগানিস্থানের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক।"

এই বক্তৃতার পরে ইংলণ্ডের একখানি সমাজতন্ত্রবাদী দৈনিক লিখিতেছেন, আফগানরাজ ও রাণীকে এমন অনেক জিনিষ দেখানো হইয়াছে, যাহা দেখিয়াই তাঁহাদের মনে হইতে পারে যে, ঐ সব জিনিষ দ্বারা আফগানিস্থানের প্রভূত উন্নতি হইবে। ঐ সমস্ত জিনিষ লইতে হইলে যে-অর্থের প্রয়োজন লণ্ডনের অনেক মহাজন নাকি খুব অল্পসুদে তাহা আফগানরাজকে দিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু বিদেশী—বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের—ঋণ গ্রহণ দ্বারা দেশকে উন্নত করার পরিণাম কি তাহা আমীর ও তাঁহার পরামর্শ-দাতাগণ ভালই জানেন। মরিস প্যারনোট নামক একজন ফরাসী গ্রন্থকার সম্প্রতি আফগানিস্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়া পারীর L' Europe Nouvelle সংবাদপত্রে একজন আফগান মন্ত্রীর সহিত কথোপকথনের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার নিকট মন্ত্রী বলিয়াছেন :—

"We have not escaped from the tutelege of our neighbors" one of his (Amir's) ministers said to me, "only to fall into other chains. We have seen too clearly what has happened to certain oriental states to wish to modernise ourselves too quickly In a short time they have had roads, railways factories and electric power. But at what price Afghanistan has no foreign debt, and she does not want one. Our program is, no loans no concessions."

তাৎপর্য্য—আমাদের প্রতিবেশীদের অভিভাবকত্ব হইতে এখনও আমরা পরিত্রাণ পাই নাই সুতরাং আর সহজে ফাঁদে পা দিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। কয়েকটি প্রাচ্য রাষ্ট্রের তাড়াতাড়ি পাশ্চাত্য ধরণে গড়িয়া উঠিবার প্রয়াসের পরিণাম কি হইয়াছে তাহা হইতে আমাদের শিক্ষা হইয়াছে। তাহারা অন্যের সাহায্যে রাস্তা, রেল, বৈদ্যুতিক কলকারখানা স্থাপন করিল। কিন্তু তাহার পরিণাম বিষময় হইল! আফগানিস্থানের বিদেশী ঋণ নাই—আমরা বিদেশী ঋণ চাইও না।

আমাদের নীতি, ঋণও চাই না, এবং (বিদেশীকে) সুবিধা দিতেও চাই না।

কিন্তু আফগান অর্থসচিবের এইরূপ উক্তির পরেই সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আফগানরাজ জার্ম্মান সরকারের নিকট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনিবার জন্য প্রায় ৯০ কোটি টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন এবং রুশিয়ার সহিত আফগানিস্থানের একটি বাণিজ্য-সন্ধির ব্যবস্থা হইতেছে। আফগানিস্থানের সমৃদ্ধিশালী তেলের খনিগুলি হইতে যদি আমেরিকা লাভবান হয়, আফগান সরকারকে টাকা ধার দিয়া যদি জার্ম্মেনী লাভবান হয় এবং কাবুল মুলুকে ব্যবসা করিয়া রুশিয়া ধনশালী হয় তাহা হইলে আর ইংলণ্ডের আফ্‌শোষের সীমা থাকিবে না।

বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক মহলে নানা কারণে আফগানিস্থানের উপর সকলের লক্ষ্য পড়িয়াছে। নবজাগ্রত আফগানিস্থান এখন একটি প্রবল শক্তিরূপে দেখা দিয়াছে। তাই আজ ইতালি, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইংলণ্ড সকল পাশ্চাত্য রাষ্ট্রই আফগানিস্থানের সহিত সখ্যতা স্থাপনে আগ্রহ দেখাইতেছে। সেই কারণেই আজ চীন, জাপান, তুরস্ক এমন কি পরাধীন ভারতবর্ষও আফগানিস্থানের গৌরবে উল্লসিত হইতেছে। আফগানিস্থান স্বাধীন, উন্নত ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইলে প্রাচ্যে নূতন যুগের সূচনা হইবে। অধ্যাপক মলডেন (Prof. Molden) বার বৎসর পূর্ব্বে Preussische Jahrbucher নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "The road from Constantinople to Peking passes through Kabul"। কর্ম্মবীর আমীর আমানউল্লা এই ভবিষ্যৎ-বাণী সার্থক করিবেন।
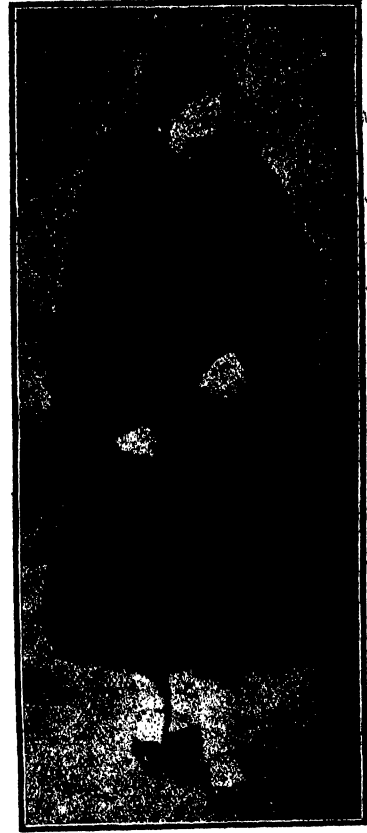
আফ্‌গান-সম্রাজ্ঞী সুরিয়া

আরাতামা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শেমিদার মাসী শেমিদাকে বলিল, আমার বয়স হইয়াছে, শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে, তোর বিবাহ হইয়া গেলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি।

শেমিদা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—এ কথা আপনাকে কেন বলিতেছ? আমাকে কি করিতে বল?

—তোকে এখন বলিতেছি, ইহার পর বেথরকেও বলিব।

বেথর আসিলে বৃদ্ধা তাহাকে বলিল,—দেখ, আমি

কবে আছি কবে নাই তাহার ঠিক নাই, আমি থাকিতে থাকিতে মেয়েটার যদি বিবাহ হয় তাহা হইলে আমার একটা ভাবনা দূর হয়।

বেথর বলিল,—আমি ত এখনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু যুদ্ধ বাধিতে আর বিলম্ব নাই। যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না, যুদ্ধের পর বিবাহ হইলেই ভাল হয়।

—যুদ্ধের জন্য কি ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধ থাকিবে? তুমি এখনি বিবাহে মত কর, বিবাহের পর যাহা হইবার হইবে।

—আমি যাঁহার চাকরী করি তাঁহাকে এখনও বিবাহের কথা বলি নাই।

—বলিতে চাও তাঁহাকে বল, কিন্তু তোমার বিবাহে তাঁহার কি আপত্তি হইতে পারে?

—তাঁহাকে জানান আবশ্যক, কেন না বাড়ী রক্ষার ভার আমার উপর, সর্ব্বদাই আমাকে সেখানে থাকিতে হয়।

—তবে তাঁহাকে বল।

বেথর গিয়া আরাতামাকে বলিল। আরাতামা কহিলেন,—শেমিদার সহিত তোমার বিবাহ? তাহাকে আমি উত্তমরূপে জানি, তাহার সহিত বিবাহ হইলে তুমি সুখী হইবে, কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না?

—আমারও সেই মত, কিন্তু শেমিদার বৃদ্ধা মাসী পীড়াপীড়ি করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি জীবিত থাকিতে বিবাহ হইয়া যায়।

—তাহাই হউক। আমি শেমিদা ও তাহার মাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। আরাতামা শেমিদার ও তাহার মাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শেমিদার জন্য বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিলেন।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল, কিন্তু বর কন্যা শয়ন-গৃহে যাইবার পূর্ব্বে চারিদিকে নগরে অত্যন্ত কোলাহল উঠিল। কি হইয়াছে? শত্রুর আকাশ-যান নগর আক্রমণ করিয়াছে। আকাশে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল যন্ত্রের শব্দ শোনা যাইতেছে। নগরের লোক দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়িল। রাজপ্রাসাদের সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজা শিশেরা স্বয়ং বাহির হইলেন, নাগরিক সৈন্য সমবেত করিবার জন্য ভেরী বাজিতে লাগিল।

আকাশ-যানের শব্দ শুনিতে পাইয়া আরাতামা পদব্রজে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। পথে রাজা ও সেনাপতির সহিত দেখা হইল। সেনাপতি আরাতামাকে কহিলেন,—আমাদের বিমান এখনি আকাশে উঠিবে। আপনি কি করিবেন?

—আমার বিমান-চালক বেথরের বিবাহে গিয়াছে, তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি। সে আসিলে আমিও আকাশে উঠিব। আপনাদের যত বিমান আছে আমার অধীনে থাকিতে আদেশ করুন। আমার পূর্ব্বে যেন কোন বিমান আকাশে না উঠে।

সেনাপতি সেইরূপ আদেশ করিয়া বিমান-বিভাগের অধ্যক্ষকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আরাতামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই আক্রমণ হইতে আপনি কি আশঙ্কা করেন?

—ইহারা নগরে আগুন লাগাইবার চেষ্টা করিবে। আপনাদের সৈন্য ও নাগরিক সৈন্যদিগকে আগুন নিভাইতে নিযুক্ত করুন। ভিন্ন ভিন্ন দল সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকুক। পাহাড়ের জলের নহর খুলিয়া দিতে আদেশ করুন, যাহাতে সহরের সর্ব্বত্র জল পাওয়া যায়। দেখুন শত্রুর বিমানসমূহে আলোক নাই, আলোক দেখিতে পাইলে আমরা আক্রমণ করিব, এই ভয়ে নিভাইয়া দিয়াছে।

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আপনি যুদ্ধবিদ্যা কোথায় শিখিলেন?

সেনাপতি কহিলেন, স্ত্রীলোক হইলে কি হয় আপনি যথার্থ সেনাপতি হইবার উপযুক্ত।

এমন সময় আকাশ হইতে স্থানে স্থানে প্রজ্জলিত অগ্নি-গোলক পতিত হইতে আরম্ভ হইল। সৈন্যেরা পূর্ব্বেই আদিষ্ট হইয়াছিল অতএব তাহারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে ধাবিত হইল।

বিমান-বিভাগের অধ্যক্ষ আসিলেন, নাদিব আসিল, তাহার সঙ্গে বেথরও আসিল। অধ্যক্ষকে আরাতামা

কহিলেন, শত্রুরা বিমানের আলোক নিভাইয়া দিয়াছে, আপনি সকল যন্ত্রে আলোক জ্বালিয়া রাখিতে আদেশ করিবেন। হয় ত শত্রু আপনাদিগকে আক্রমণ করিবে, কিন্তু সেজন্য আপনারা কোন চিন্তা করিবেন না। শত্রুকে পরাভব করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার ভার আমার। আমার বিমানে আলোক জ্বলিবে না, কোন শব্দও হইবে না। আমি যাহাতে শত্রুমিত্র উভয়ে প্রভেদ বুঝিতে পারি সে বিষয়ে আপনারা সতর্ক থাকিবেন। শত্রু আলোক জ্বালাইলে আপনারা আলোক নিভাইবেন, তাহারা নিভাইলে আপনারা জ্বালাইবেন।

অধ্যক্ষ চলিয়া গেলেন। আরাতামা স্মিতমুখে বেথরকে কহিলেন,—তোমার বিবাহরাত্রিও নিরাপদে কাটিল না। তুমি এখন কি করিবে?

—যেমন আদেশ করিবেন। যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি আপনার নিকট থাকিব।

—আমি শত্রুপক্ষের বিমান বিনাশ করিতে যাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?

—এখনি।

সেনাপতি কহিলেন,—আমিও যাইব।

আরাতামা কহিলেন,—আপনি যাইবেন না, এখানে আপনার উপস্থিত থাকা আবশ্যক। ইচ্ছা হয় আর কাহাকেও আমার সঙ্গে দিন।

সেনাপতি আর একজন প্রধান সেনানায়ককে ডাকিয়া দিলেন। আরাতামা কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তলিতায় আরোহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সৈন্যাধ্যক্ষ বেথর ও নাদিব গেল।

আকাশে উঠিবার সময় যন্ত্রের শব্দ হইল, তাহার পর আর কোন শব্দ নাই। আরাতামা স্বয়ং যন্ত্র চালনা করিতেছিলেন। তলিতায় একটিও আলোক জ্বালাইলেন না। অন্ধকার আকাশে, বৃহৎ অন্ধকার ছায়ার মতন নক্ষত্রখচিত নৈশ গগনে তলিতা বিচরণ করিতে লাগিল। শত্রুপক্ষের বিমানে আলোক ছিল না, রাজা শিশেরার বিমানসমূহে আলোক জ্বলিতেছিল। সকল যন্ত্রেই শব্দ হইতেছিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া ও বিমানের আলোক দেখিয়া শত্রুর আকাশযানসমূহ রাজপক্ষের বিমানশ্রেণীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল। তলিতা যে নিঃ[শব্দে] কৃতান্তের ন্যায় তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল তাহারা ত[াহা] জানিত না। অকস্মাৎ একটা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা তলি[তা] হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রচণ্ড বেগে শত্রুদের একটা বিমান আঘাত করিল, বিমান অমনি জ্বলিয়া উঠিয়া নগরের বাহি[রে] গিয়া ক্ষেত্রে পতিত হইল। এইরূপে শত্রুদের আর এ[ক] বিমান দগ্ধ হইয়া গেল। তখন আরাতামা সকল বিমা[নের] উপরে উঠিয়া তলিতার সমুদায় আলোক জ্বালিয়া দিলে[ন]। সূর্য্য-তুল্য তীব্র জ্বালাশালী একটা আলোক চারিদি[কে] ঘুরিতে লাগিল। তখন শত্রুপক্ষের অবশিষ্ট বিমান স[কল] নগর হইতে পলায়ন করিল।

দিক্-নিরূপণ করিবার জন্য তাহাদের আলোক জ্বা[লিতে] হইল। কিছুদূর পর্য্যন্ত রাজপক্ষের বিমানসমূহ তাহা[দের] অনুগামী হইল, তলিতা জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় তাহাদিগ[কে] তাড়না করিল। আর-একটা আকাশযান পুড়িয়া গে[ল], অবশিষ্ট কয়েকটা পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল।

পর দিবস সংবাদ আসিল—শত্রুদের বিমান রাজ্যসী[মায়] কয়েকটা গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে, আরাদ সসৈন্যে রা[জ্যের] প্রান্তভাগ আক্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সৈন্য অধিক থাকাতে রাজা শিশেরার সৈন্য একটা দুর্গে আ[শ্রয়] গ্রহণ করিয়াছে। রাজধানীতে এ পর্য্যন্ত আশঙ্কার কো[ন] কারণ হয় নাই। রাজা শিশেরা বিশলামে আছেন জানি[তে] পারিয়াই শত্রুদের বিমান নগর আক্রমণ করিয়াছিল।

সেনাপতি সেই দিনই রাজ্যসীমায় যাত্রা করিলে[ন]। বিশলাম ও রাজ্যসীমার মধ্যে স্থানে স্থানে যে-স[কল] সৈন্য ছিল তাহারা রাজ্যপ্রান্তে প্রেরিত হইল। রা[জা] স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে মনস্থ করিলেন। রাজ[্ঞী] সাফিরা কোথায় থাকিবেন তাহার বিচার হইল। বিশ[লাম] যখন আকাশমার্গ হইতে একবার আক্রান্ত হইয়া[ছে] তখন দ্বিতীয় বার শত্রু আসিতে কতক্ষণ? রাজধানী[র] বৃহৎ ও উচ্চ রাজপ্রাসাদ অনেক দূর হইতে দেখি[তে] পাওয়া যায়, শত্রুর একটা আকশযান আসিলে[ই] আশঙ্কা। সাফিরা কিছুতেই বিশলাম ছাড়িয়া যাই[তে] চাহেন না, বলিলেন, এখানে প্রজার যেমন আশঙ্কা আমা[রও] সেইরূপ আশঙ্কা, আমি আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন ক[রিব]

কেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির হইল বিশলাম হইতে কিছু দূরে বস্তের মধ্যে একটি ছোট বাড়ীতে রাজকন্যা কিছু দিন থাকিবেন। মৃগয়া উপলক্ষে রাজা সময়ে সময়ে সেখানে থাকিবেন। সেখানে শত্রুর বিমান বা সৈন্য হইতে কোনরূপ আশঙ্কা নাই। রাজকন্যার রক্ষার জন্য অল্প সংখ্যক সৈন্য রহিল।

আরাতামা রাজা ও সেনাপতিকে কহিলেন, যেখানে শত্রুর আশঙ্কা অধিক, যেখানে যুদ্ধের সম্ভাবনা সেইখানে তলিতার ও আমার স্থান। এখানে দুই চারিটী বিমান রাখিলেই হইবে, আর সকল বিমান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হউক।

সেনাপতি কহিলেন,—বিমান-বিভাগের অধ্যক্ষতা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে।

রাজা কহিলেন, সে কথা ত স্থিরই আছে।

আরাতামা কহিলেন,—আপনার আদেশ আমি ত পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি। বিমানসমূহ কোথায় থাকিবে সেনাপতি নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

সেনাপতি কহিলেন, যে-দুর্গে আমাদের সৈন্যগণ রহিয়াছে আপনি আপাততঃ সেইখানে বিমান রাখুন সেখানে স্থান যথেষ্ট আছে, আপনার উপযুক্ত বাসস্থানও আছে।

গৃহে ফিরিয়া আরাতামা সেই দিনই যাত্রার আয়োজন করিলেন। বেথর তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। আরাতামা বাষ্টীকে সঙ্গে লইলেন না। গৃহরক্ষার ভার উরীনের উপর রহিল, সেনাপতিও কয়েক জন সৈনিককে আরাতামার বাটীর প্রহরায় নিযুক্ত করিলেন।

আরাতামার সঙ্গে গেল নাদিব, বেথর ও সেনাপতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এক ব্যক্তি। তাহার হস্তে সেনাপতি দুর্গের অধ্যক্ষের নামে পত্র দিলেন।

একোবিংশ পরিচ্ছেদ

দস্যুপতি রুদেলা ওরফে রত্নবণিক উজাল বিশলাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজা শিশেরার রাজ্য আক্রমণ করিতে বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার আদেশেই আকাশযানশ্রেণী বিশলাম আক্রমণ করে, তিনি স্বয়ং দস্যু ও অপর সৈন্য লইয়া রাজা শিশেরার রাজ্যসীমায় প্রবেশ করেন। প্রথম যুদ্ধে রাজার পক্ষের সৈন্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে তাহারা হটিয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। আরাদের ইচ্ছা দুর্গ বেষ্টন করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত সৈন্যগণকে পরাজয় করিয়া দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু রুদেলা সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দুর্গ হস্তগত করিতে পারিলে বিশেষ কোন লাভ নাই, কারণ দুর্গে অবরুদ্ধ সৈন্য অল্প, দুর্গ অধিকার করিতে বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন এবং তাহাতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবে। তাহাতে রাজ্যজয়ের সম্ভাবনা হইবে না; কেন না, যতই কাল কাটিবে ততই রাজা শিশেরার সৈন্যবল বাড়িবার সম্ভাবনা এবং অন্য রাজারাও তাঁহার সহায়তা করিতে পারেন। কাল তাঁহার অনুকূল ও আরাদের প্রতিকূল। যদি অল্প সময়ের মধ্যে রুদেলা এবং আরাদ রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিতে পারেন তাহা হইলে রাজ্যের সর্ব্বত্র একটা আন্দোলন উপস্থিত হইতে পারে। প্রজাদের মনে রাজা শিশেরার বলের সম্বন্ধে সংশয় জন্মিতে পারে, অপর রাজারাও কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন সে-বিষয় ইতস্ততঃ করিতে পারেন। দুর্গের সম্মুখে কিছু সৈন্য রাখিয়া রুদেলা সসৈন্যে রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি যে প্রথমে কয়েকটা গ্রামে গ্রামবাসীদিগকে কঠিন শাসন করিয়াছিলেন ও দুইচারিটা গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য রাজ্যের প্রান্তবাসীরা ভয় পাইয়া তাঁহার বশীভূত হইবে ও তাঁহার পথে কোনরূপ বাধা দিবার চেষ্টা করিবে না। সে উদ্দেশ্য সফল হইতেই তিনি প্রজাদিগের প্রতি উৎপীড়ন একেবারে নিবারণ করিলেন। কোন সৈনিক লুটপাট অথবা প্রজার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে তাহার অত্যন্ত কঠোর শাস্তি হইত। ক্রমে প্রজাদের আশঙ্কা ও প্রাণভয় তিরোহিত হইল। রাজপক্ষের সৈন্য উপস্থিত নাই অতএব প্রজাদের প্রতি অত্যাচার হইলে রক্ষার কোন উপায় নাই। প্রজাদের মনের ভাব যাহাই হউক, তাহারা কোন আপত্তি না করিয়া শত্রুপক্ষকে রসদ যোগাইত এবং তাহাদের আদেশ পালন করিত।

আকাশে বিমানের শব্দ শুনিয়া রুদেলা স্থির করিলেন রাজার পক্ষের বিমান আসিতেছে। তিনি দুইজন বিমান-চালককে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, এইসকল বিমান কোথায় যাইতেছে দেখ, কিন্তু কোন মতে যুদ্ধ করিবে না। তোমাদিগকে তাড়না করিলে তোমরা পলায়ন করিবে।

চিল যেমন অলক্ষ্যভাবে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া মাঝে মাঝে আকাশে ভাসিয়া বেড়ায় সেই-রকম বিমানের দল উড়িয়া গেল। তখনি রুদেলার দুইটি বিমান আকাশে উঠিয়া দূর হইতে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইল রাজা শিশেরার বিমানের দল অবরুদ্ধ দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত রুদেলা আকাশ-পথ হইতে দুর্গ আক্রমণ করেন নাই। বিমানে অগ্নি জ্বালা ব্যতীত আর কোনরূপ আক্রমণের অস্ত্র ছিল না, কিন্তু দুর্গে কেবল পাষাণ, কোথায় আগুন লাগিবে?

সেইদিন হইতে আরাতামা প্রত্যহ বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশ হইতে শত্রুসেনা লক্ষ্য করিতেন। যেমন অপর বিমানে শব্দ হয় তলিতায়ও সেইরূপ শব্দ হইত, সুতরাং শত্রুসৈন্যেরা কোনরূপ প্রভেদ বুঝিতে পারিত না। দুই একবার শত্রুপক্ষের কয়েকটা বিমান তলিতাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। একবার আরাতামা একটা বিমান জ্বালাইয়া দিলেন। আবার তলিতার বেগ এত অধিক যে, কোন বিমান তাহার নিকটে আসিতে পারিত না। শত্রুরা তলিতাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল। কখন কখন আরাতামা এত নীচে নামিয়া আসিতেন যে, শত্রুপক্ষের লোকের মুখ দেখা যাইত, অথচ নীচে হইতে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইত না। একদিন আরাতামা সেই রত্নবণিককে দেখিতে পাইলেন। সেই ব্যক্তি, সেই অশ্ব। সৈন্যের অগ্রে নেতার ন্যায় ইতস্ততঃ অশ্ব চালনা করিতেছে। বিমানে দুর্গের একজন লোক ছিল, আরাতামা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ব্যক্তি কে?

সে কহিল, আমি ঠিক বলিতে পারি না, শত্রু-সৈন্যের কোন নায়ক হইবে।

—তাহা ত দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু ইহাকে কি কেহ চেনে না?

—অধ্যক্ষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিবেন।

অধ্যক্ষও ঠিক বলিতে পারিলেন না। আরাতামা ভাবিলেন যে-ব্যক্তি রত্নবণিকের বেশে বিশলাম নগরে গিয়াছিল সে যেই হউক অত্যন্ত চতুর ও সাহসী। নগরের সন্ধান লইতে গিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল! নগরে কি কোনরূপ গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছে? তাহার কথা আরাতামা ইহার পূর্ব্বেও মাঝে মাঝে ভাবিতেন, কিন্তু শত্রু-সেনার মধ্যে তাহাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত সদাসর্ব্বদা তাহার বিষয় চিন্তা করিতেন। তাহার মূর্ত্তি, তাহার কথা কহিবার ভঙ্গী মনে পড়িত। তাহার বয়স অল্প, নবীন যুবা পুরুষ, কিন্তু সে যে অসাধারণ ক্ষমতাবান এই ধারণা আরাতামার মনে দৃঢ় হইল। সেই সঙ্গে এক-প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব চঞ্চলতা, হৃদয়ের অজানিত শিথিলতা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিতেন না, তাঁহার মনের যে কোনরূপ বিকার হইয়াছে তাহাও অনুভব করিতেন না। তাঁহার মনে পড়িত ছদ্মবেশী রত্নবণিক তাঁহাকে বলিয়াছিল আবার দেখা হইবে। কোথায় কি অবস্থায় আবার সাক্ষাৎ হইবে আরাতামা তাহাই জল্পনা করিতেন। আবার কি রত্নবণিকের বেশে না প্রকাশ্য শত্রুভাবে?

আরাতামা মনে মনে-জানিতেন তিনি অশ্বারোহী-শত্রু সৈন্য-নায়ককে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। এ কথা সত্য, কিন্তু চক্ষে দেখিলেই সব যে জানিতে পারা যায় এমন নয়। আর সকলের বুদ্ধি ও অনুমান-শক্তিও সমান নয়। রুদেলা আরাতামাকে দেখিতে পান নাই বটে, কিন্তু আরাতামার বিমান দেখিয়াছিলেন এবং আরাতামা যে বিমানে আছেন সে সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছিলেন।

তাহার পর দিবস আরাতামা তলিতায় আরোহণ পূর্ব্বক আকাশে ভ্রমণ করিয়া কোথাও শত্রুর চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। কোথাও শিবির নাই, সৈন্য নাই, অশ্ব নাই, আকাশযান নাই। আরাতামা বিমানে করিয়া অনেক দূর ঘুরিয়া চারিদিক দেখিলেন। কিছু দূরে পর্ব্বতের নীচে ও পর্ব্বতে আরোহণ করিতে নিবিড় বন

তাহার ভিতর কি শত্রুসৈন্য লুক্কায়িত আছে? যেখানে ভূমিতে নামিবার তেমন ভাল স্থান নাই, সেখানে অবতরণ করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। শত্রুসৈন্য কোথায় অন্তর্হিত হইল? দুর্গে ফিরিয়া আরাতামা দুর্গরক্ষক সৈন্যাধ্যক্ষকে শত্রুর প্রস্থান-সংবাদ জানাইলেন। তিনি কহিলেন, শত্রু যে পলায়ন করিয়াছে এরূপ আমার মনে হয় না। এখানে তাহাদের অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল, বোধ হয় তাহারা অপর সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া আর কোথাও গিয়াছে। সেনাপতির আদেশ না পাইলে আমরা এ দুর্গ পরিত্যাগ করিতে পারি না। শত্রু যে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে সে-সংবাদ সেনাপতিকে দিতে হইবে।

আরাতামা কহিলেন, আমি তাঁহাকে সংবাদ দিব। সসৈন্যে তাঁহার এই দিকে আসিবার কথা।

রাত্রিশেষে অন্ধকার থাকিতে আরাতামা বিমানে বিশলাম নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে বেথর ও দুর্গের একজন সেনানায়ক। আকাশে অধিক উচ্চে না উঠিয়া আরাতামা নীচে ভূতলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেন। তলিতায় শব্দ নাই, আলোকও জ্বালা হয় নাই। সূর্য্যোদয় হইবার কিছু পরে আরাতামা দেখিলেন সারি বাঁধিয়া রাজ-সৈন্য চলিয়াছে, সৈন্যের মধ্যস্থলে অশ্বারোহণে সেনাপতি। আরাতামা পতাকা সঞ্চালন করিয়া তলিতার যন্ত্রশব্দ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি আকাশে নিরীক্ষণ করিয়া সৈন্যসমূহকে দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। আরাতামা মাঠে একটা ভাল স্থান দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

আরাতামার মুখে শত্রুসৈন্যের প্রস্থান-সংবাদ শুনিয়া সেনাপতি কহিলেন, আমরাও কোন সংবাদ পাই নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে শত্রু পলায়ন করিবে ইহা অসম্ভব। রাজার ভ্রাতা আরাদের বুদ্ধিতে যে কিছু হইতেছে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কেন না, কোন কালেই তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দস্যুপতি রুদেলা তাঁহার প্রধান সহায় এবং তাহাকে বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান মনে হয়। তাহার সমস্ত সৈন্য একত্র আছে অথবা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখে গিয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। শত্রু কোথায় আছে জানিতে না পারিলে নানারূপ আশঙ্কা। আমরা সাবধান না থাকিলে রাত্রিকালে হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিতে পারে।

আরাতামা বলিলেন, সেজন্য ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শত্রু কোথায় আছে জানিতে পারিলেও কি রাত্রে আশঙ্কা নাই?

—শত্রু দূরে থাকিলে আশঙ্কা অল্প, নিকটে আসিলে উভয় পক্ষে সমান আশঙ্কা, কিন্তু শত্রু কোথায় আছে কিছুই না জানিতে পারিলে সর্ব্বদাই আমাদের আশঙ্কা-কারণ, তাহারা আমাদের সংবাদ জানে, আমরা তাহাদের সংবাদ জানি না। শত্রু সম্মুখে কি পশ্চাতে অথবা পাশে আমরা কিছুই জানি না।

—যে পর্য্যন্ত শত্রু প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবে ততদিন তাহাদের সংবাদ পাওয়া কঠিন, কিন্তু কোন স্থানে আক্রমণ করিলে অথবা কোন দিকে যাত্রা করিলে সংবাদ পাওয়া যাইবে। সে ভার আমার। যে পর্য্যন্ত শত্রু কোথায় আছে জানিতে না পারা যায় ততদিন আমি আপনার সঙ্গে থাকি, তলিতায় কোন শব্দ হয় না, দিনে কি রাত্রে শত্রু আসিলে আমি সংবাদ দিতে পারিব।

—আপনাকে দিবারাত্র প্রহরার কাজে নিযুক্ত করিতে পারি না।

—সকল সময় বিমানে আমার থাকিবার প্রয়োজন নাই। দিনের বেলা সর্ব্বদা কোন আবশ্যক হইবে না, রাত্রে দুই চারিবার দেখিলেই হইবে, কখন আমার বিমান-চালক যাইবে, কখন আমি যাইব।

শত্রু-সৈন্য কোথায় আছে জানিতে না পারিয়া সেনাপতিকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইল। শত্রু সম্মুখে আছে জানিলে কিছু সৈন্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়া চলে, শত্রু পিছনে থাকিলে সমস্ত সৈন্য সেই দিকে ফিরিয়া শত্রুর আগমন অপেক্ষা করে। এ যে কিছুই জানা নাই, শত্রু সম্মুখে কি পশ্চাতে, দক্ষিণে কি বামে, কিছু মাত্র জানিতে পারা যায় না, তাহা হইলে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, আকস্মিক আক্রমণ কিরূপে নিবারণ করা যাইবে? সেনাপতিকে অত্যন্ত সন্তর্পণের সহিত সৈন্যরক্ষা করিতে হইল। শত্রু কোথায় আছে জানিতে না পারিলে কোন দিকে সৈন্যবল লইয়া যাইতে হইবে তাহা স্থির করিতে পারা
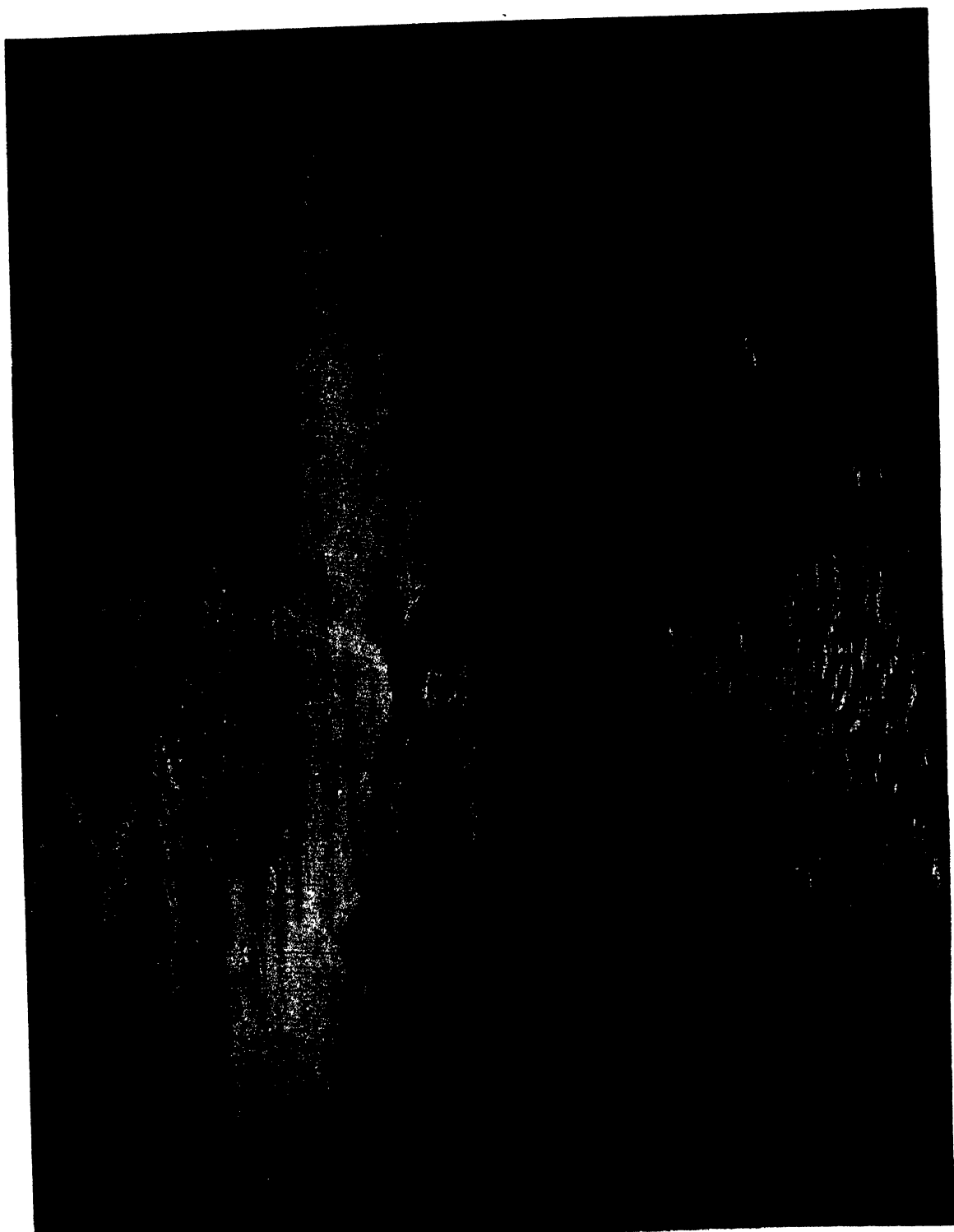
যায় না, আবার শত্রু সহসা কোথা হইতে উপস্থিত হইবে কেহ বলিতে পারে না। অনির্দ্দিষ্ট ভাবে সৈন্যের অভিযান ইতস্ততঃ চালনা করা যায় না, শত্রুর অবস্থিতির স্থান নিরূপণ না করিয়া শিবিরও স্থাপন করা যায় না। সেনাপতির চিন্তার সমূহ কারণ উপস্থিত হইল। অগত্যা সম্মুখে সঙ্কীর্ণ নদী দেখিয়া ও চারিদিকে মুক্ত সমভূমি লক্ষ্য করিয়া সেনাপতি শিবির রচনা করিলেন। শিবির হইতে দূরে চারি পাশে অল্পসংখ্যক সৈন্য রক্ষিত হইল, নদীর পারেও কিছু সৈন্য রহিল। কোন দিক দিয়া শত্রু আসিে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং সৈন্য-শিবিরে সংবাদ আসিে রাত্রে শিবিরে আলোক বা অগ্নি জ্বালা নিষিদ্ধ। সৈে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আহারাদি করিয়া, অস্ত্র শস্ত্র পাশে রাখি শয়ন করিত, প্রহরীরা পালা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগি থাকিত। তলিতা সমস্ত রাত্রি নিঃশব্দে আকাশে বিচ করিত, কখন আরাতামা চালনা করিতেন, কখন নাি চালাইত। (ক্রমশঃ

পান্থশালা

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায়

ধরণীর এই পান্থশালে
যুগে যুগে কালে কালে
অরুণ উদয় হ'তে সন্ধ্যা-ছায়া-লেখা—
গ্রীষ্ম হতে বর্ষা, ক্রমে বসন্তের টানি' ঋতু-রেখা,—
অনন্ত বিচিত্র পথ ধরে'
অনাদির যাত্রী সব এসে ভিড় করে।
সুদূরের পথ-পার থেকে,
নিয়ে আসে চোখে তার লেখে
অপরিচয়ের বাণীখানি।
সবে ভাবে,—'নাহি এরে জানি
এ মুখ চিনি না কোন কালে।'

পান্থ-রূপে এই যাত্রী-শালে,—
ক্ষণিক বিশ্রাম শেষে অশেষ যাত্রার মোহে মেতে,
নবীন পথিক যবে সুদীর্ঘ পথের খোঁজ পেতে,
যাত্রা-পথে সুগোপন কি ইঙ্গিত লভি,'—
বিদায় লইতে যায়; সবি
মনে মনে চমকিয়া উঠে;—
ইহারে বিদায় দিতে প্রাণে প্রাণে ব্যথা কেন ফুটে?
কেন আঁখি ভ'রে আসে জলে?
হৃদয় করিল জয় কবে কোন্ ছলে
পরিচয়হীন পান্থ; যেন মনে হয়
অনাদির কোন্ প্রান্তে ছিল পরিচয়
এর সনে;—ছিল জানাজানি
তদবধি এরি মূর্ত্তিখানি
কল্প-লোক-রহস্যের সনে
ছায়া হ'য়ে মিশে ছিল মনে!'
ইহারে বিদায় দিতে রক্তে রক্তে উঠে আলোড়ন
নাড়ীতে নাড়ীতে বাজে যাতনা-কম্পন।
যেন এরি লাগি,
এই পান্থশালা প্রতি পল জাগি' জাগি,'
ছিল অপেক্ষিয়া;
ইহারে পাইয়া
ধন্য মেনেছিল যেন।
কে বলিবে কেন—
সবে ভাবে,—'এর কানে কানে অতি ধীরে
আপন গোপন কথা বলা হয়নি রে!'
নিজে সে জানে না কোন্ গোপন সে কথা—
তবু মনে জেগে রয় ব্যথা! ....

নবীন অজানা যাত্রী পান্থশালা হ'তে,
বাহিরায় নিজ যাত্রা-পথে।
সবে ভাবে,—'কাল যাহা ছিল আজ নাই—
বুকে ব্যথা বেজে রয় তাই।'
যত ভাবে চোখে তত জল ভ'রে আনে;—
চেয়ে থাকে দীর্ঘ পথ-পানে!
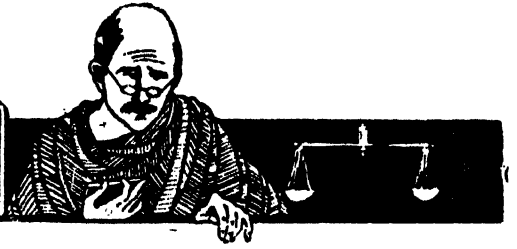
বৈদিক যুগের নারী

বৈদিক যুগে আর্য্যনারীর সামাজিক অবস্থা ও পদমর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে।

অতি প্রাচীনকালের বেদের ভাষার মধ্যে যাহা প্রাচীনতম বলিয়া অনুমিত হয়, সেই ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল "নারী"; এই নারী শব্দ "নর" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নয়। যাঁহারা বৈদিক ভাষার পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা হয়ত একথা শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। নর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যে নারী হয় নাই তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, নর শব্দটি সুপ্রাচীন বেদ-সংহিতায় প্রচলিত নাই; ঐ শব্দটি তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শতপথ-ব্রাহ্মণে ও অন্যান্য বেদ-পরবর্ত্তী বৈদিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদাদির অতি প্রাচীন ভাষায় বিবাহিতা অবিবাহিতা অভেদে কেবল জাতিমাত্র বুঝাইবার জন্য যেমন নারী নাম ছিল, তেমনি জাতি বুঝাইবার জন্য স্ত্রী শব্দেরও প্রচলন ছিল।

নারী ছিলেন পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী; তিনি ভোগবিলাসের রমণী বা কামিনী ছিলেন না। রমণী কামিনী প্রভৃতি অতি ঘৃণিত শব্দ বৈদিক যুগে সৃষ্টই হয় নাই।

বৈদিক যুগে পত্নীর অর্থই ছিল যজ্ঞাদিতে অধিকারপ্রাপ্তা জায়া। কেবল যে এই অধিকারেরই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, তাহাই নয়; নারী যে ঋষি হইতেন, মন্ত্ররচয়িত্রী হইতেন ও নিজে স্বতন্ত্রভাবে দেবতাকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন, ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন বৈদিক যুগে আর্য্যনারীর পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও দোষের বলিয়া বিবেচিত হইত না।

বৈদিক যুগে যে বাল্যবিবাহ ছিল না ও আর্য্যনারীরা যে ইচ্ছামত অধিক বয়সে বিবাহ করিতে পারিতেন আর ইচ্ছা করিলে চিরকাল কুমারী থাকিতে পারিতেন, ঋগ্বেদে ও অথর্ব্ববেদে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

খাঁটী বৈদিক ভাষায় "বর" অর্থই হইল wooer; বয়স্কা পত্নী সংগ্রহ করিতে হইলেই যে পুরুষকে বর হইতে হয় তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

বৈদিক যুগে বিধবার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই বিবাহ দেবর অথবা পতির নিকট-সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে হইত বলিয়া ধরিতে পারা যায়।

বেদে ও বৈদিক সাহিত্যে ঋষিদের পারিবারিক জীবনের যতটুকু আভাষ পাওয়া যায়, তাহাতে একপত্নী-গ্রহণই সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল ও আদর্শ ছিল বলিয়া মনে হয়। নাম করিয়া ধরিতে গেলে যেমন যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি পত্নীর কথা পাওয়া যায়, সকল স্থলেই সেরূপ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও কোন কোন স্থলে ঋষিদের যে বহু পত্নী থাকিত, তাহা পত্নীপর্য্যায়ের বিশেষ বিশেষ নাম হইতে অনুমিত হয়। রাজার যে-পত্নী প্রথম পুত্রবতী হইতেন, সেই পত্নীর নাম হইত মহিষী; দ্বিতীয়া পত্নীর নাম হইত পরিবৃক্তী; তৃতীয়ার নাম হইত বাবাতা; চতুর্থীর নাম ছিল পালাগলী। ইহা হইতে চারিটি পর্য্যন্ত বিবাহ বেশ বুঝিতে পারা গেল।

স্ত্রী ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ, আর স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতাবিধান, ইহাই ছিল প্রাচীন কালের আদর্শ।

কুমারী অবস্থায় নারী নিজে যাহা উপার্জ্জন করিতেন ও বিবাহের পর তিনি যে-সকল উপহার পাইতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজের সম্পত্তি হইত ও তিনি সেই সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে হস্তান্তরিত করিতে পারিতেন। নারীরা যখন মন্ত্ররচনা করিতে পারিতেন, তখন তাঁহাদের সুশিক্ষার অভাব ছিল, একথা বলা চলে না। নারীরা সকলেই যে নৃত্য ও গীত শিক্ষা করিতেন, ইহা ঋক্ ও অথর্ব্ববেদের অনেক সূক্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। নারীরা যেমন পেশস্ নামক কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র পরিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন, দেবদুহিতা উষা তেমনিভাবে নৃত্য করেন বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে।

বৈদিক যুগে পুত্র-কন্যাদের নিকট মাতার সম্মান বড় অধিক ছিল। মাতাকে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের অধীনে থাকিতে হইত, পরবর্ত্তী যুগের শাস্ত্রকারদের এই নির্দ্দেশ খাঁটি বৈদিক যুগে পাওয়া যায় না। তবে কোন পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ না থাকিলে ভগিনীকে ভ্রাতার রক্ষণাধীনে থাকিতে হইত; ভ্রাতা না থাকিলে "ভ্রাতৃব্যেরা"ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতেন।

সত্য যুগের কথা হইলেও বৈদিক যুগে পতিতা ছিল। পতিতারা বিশ্ বা আর্য্যশ্রেণীর লোকসাধারণের ভোগ্য ছিল বলিয়া তাহাদের নাম হইয়াছিল "বিশ্যা"। শব্দটির ব্যুৎপত্তির কথা বিস্মৃত হওয়াতে সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক শব্দের ই-কার স্থলে এ-কার হইয়া গিয়াছিল।

(বঙ্গলক্ষ্মী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার

—

কবি ইক্‌বাল্

কবি কিশোর ইকবাল্ শৈশবকালে শিয়ালকোটের বিদ্যালয়ে বহুমনীষামণ্ডিত, প্রাচ্যগুণে গরীয়ান, প্রখ্যাতনামা শামসুল ওলামা সৈয়দ মীর হোসেন সাহেবের নিকট আরবী ও পার্শী ভাষা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

সেকালে দেশ-বিদেশের কবিগণের সম্মিলনীতে পরস্পর কাব্য-প্রতিযোগিতার প্রথা ছিল। ইক্‌বালের জন্মভূমি শিয়ালকোট প্রদেশ তাহার একটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এই কাব্য-প্রতিযোগিতা-

ক্ষেত্র উদীয়মান কবিকে প্রতিভা-বিকাশের মহা সুযোগ দিয়াছিল। তাঁহার বাল্যকালে দাক্ষিণাত্যের নিজাম সাহের ওস্তাদ দিল্লীবাসী মির্জ্জা দাগ দাগের কবিত্ব-শক্তিই সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল। দূর-দূরান্তের অপরিচিত কবিগণও পত্র-সাহায্যে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। আর, কবি দাগ সাহেবও তাঁহাদের কবিতাগুলি শুদ্ধ করিয়া দিতেন। তরুণ কবি ইক্‌বাল যখন সেই শ্রেষ্ঠ কবির শিষ্যত্ব গ্রহণেচ্ছু হইয়া একটি কবিতা পাঠাইলেন, তখন তিনি তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ইহা এমনই ওস্তাদ-শিল্পীর সুনিপুণ তুলিতে আঁকা যে, ইহাতে পরিবর্ত্তনের কিছুই নাই।" তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই প্রতিভা-দীপ্ত কবিকে নিজ শ্রেষ্ঠতম শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন।

এই গুণগ্রাহী ওস্তাদ ও কৃতী শিষ্যের মধ্যে এমনই এক নিবিড় সৌহার্দ্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহারই প্রবল আকর্ষণ কবি ইক্‌বালকে সুদূর ইউরোপ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় শিক্ষা সমাপ্ত করতঃ ইক্‌বাল ইংলণ্ডে গমন করেন; তথাকার কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের এক অম্লান স্মৃতি রাখিয়া তিনি জার্ম্মানী গমন করিয়াছিলেন। ইউরোপে অবস্থান-কালে, বহু পার্শী গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাহাদের ভাবরাশি ছানিয়া প্রতিভাদীপ্ত কবি 'ফিলসফীর' যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার ভাব-মাহাত্ম্য ও রচনা-নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া জার্ম্মান্‌বাসী ইক্‌বালকে গৌরবজনক 'ডাক্তার' উপাধিতে বিভূষিত করেন। ইহার পর ইক্‌বালের কাব্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'সার' উপাধিতে আপ্যায়িত করেন।

১৯০১ সনে সহাধ্যায়ীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, লাহোরের এক জন-সভায় ইক্‌বাল সর্ব্বপ্রথম নিজ বিরচিত একটি ছোট কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রতিভা-বিকাশের প্রথম সূচনা। ইক্‌বালের সবুজ প্রাণ নিংড়ানো এই ছোট কবিতাটিই সকলের চিত্ত-হরণ করিয়াছিল। তাহার পর কিছুদিন ধরিয়া ইক্‌বাল্‌-প্রতিভা লাহোর কলেজের চতুর্সীমানায় আবদ্ধ ছিল; কিন্তু যেইদিন ইক্‌বাল অন্য এক মহতী সভায় 'কুহে হিমালা' (হিমালয় পর্ব্বত) কবিতা আবৃত্তি করিলেন সেইদিন হইতেই তাঁহার যশঃপ্রতিভা লাহোর কলেজের সীমা-রেখা ডিঙ্গাইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল। ১৯০১ সনের এপ্রিল মাসে, উর্দ্দু মাসিক পত্র 'মখ্‌জন্‌' প্রকাশিত হইলে, সর্ব্ব সাধারণের ও সম্পাদকের ঐকান্তিক অনুরোধে ইক্‌বাল ইহাতে কবিতা লেখার ভার লইলেন।

কবি ইক্‌বাল এক সন্ধ্যায় জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বন্ধুগণ পারসী কবিতা আবৃত্তির নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন; কিন্তু পারসী কবিতা লেখায় অনভ্যস্ত থাকা নিবন্ধন তিনি তাহাতে অনেকখানি অকৃতকার্য্য হইয়া বিশেষভাবে মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। অতঃপর বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কবি নিজ গৃহে আসিয়া পারস্য-কাব্য-সাধনায় বাকী রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। এই এক রাত্রির সাধনায় ইক্‌বাল পারস্য কবিরূপেও বিশ্বময় খ্যাতি লাভ করিলেন। প্রসিদ্ধ 'আস্‌রারে খোদী' তাহারই অমৃতফল।

পারসী ভাষায় এই পর্য্যন্ত তাঁহার তিনখানি কিতাব্‌ বাহির হইয়াছে। তাঁহার পারসী কিতাব 'পয়ামে মশ্‌রেক' ইউরোপের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি গেটের 'সালামে মগরেবের' উত্তরে লিখিত। ইহার ভাষা সরল ও সুন্দর।

প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আবদুল কাদের সাহেব, কবি ইক্‌বালের স[illegible] উর্দ্দু কবিতারাজির সমষ্টি স্বরূপ 'বাঙ্গেদারা' বা গীর্জ্জা-ধ্বনিনাম দী[illegible] একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য-প্রতি[illegible] ক্রম-বিকাশ হিসাবে, কিতাবখানিও তিন ভাগে বিভক্ত। কিতাবখা[illegible] এই শ্রেণী-বিভাগের হিসাবে ইক্‌বাল্‌-প্রতিভার ও ক্রমবিকাশের [illegible] ইহাতে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার গজল ও কবিতা উ[illegible] সাহিত্য-ভাণ্ডারে শাশ্বত সম্পত্তি।

(জাগরণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)

—

বাংলার কুটির-শিল্প

বাংলার কুটিরশিল্প ও অন্যান্য ছোট ছোট শিল্পানুষ্ঠান[illegible] এখনও কিছু কিছু পরিমাণে টিঁকিয়া আছে; ইহাদের উন্নতি সাধ[illegible] ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে প্রচুর সুফলের সম্ভাবনা আছে।

বাংলা দেশে শতকরা ৯৩.৫ জন লোক কৃষিজীবী। ইহ[illegible] সকলেই পল্লীগ্রামে বাস করে। প্রত্যেক বৎসরই কয়েক মা[illegible] জন্য চাষের কাজ বন্ধ থাকে। সেই সময়টা আলস্যে না কাটাই[illegible] তাহারা যদি কুটির-শিল্পের দিকে মন দেয় তবে তাহাদের অর্থ-সমস্য[illegible] কিছুটা সমাধান হয়। এইসমস্ত দুঃস্থ পরিবারের মেয়েরা ব[illegible] বসিয়া অনেক সময় আলস্যে কাটাইয়া দেয়। কুটির-শিল্পের প্রচ[illegible] থাকিলে এইসমস্ত মেয়েরা গল্প করিয়া সময় না কাটাইয়া সংসারে[illegible] আয় কিয়ৎপরিমাণে বাড়াইতে পারিত।

পাশ্চাত্য জাতিদের ভিতর কলকারখানার প্রভূত উন্নতি হও[illegible] সত্ত্বেও কুটির-শিল্পের আদর সেখানে কমে নাই। ইংলণ্ডের ছো[illegible] ছোট শিল্পানুষ্ঠানগুলিতে প্রায় ২৭৫০০০ জন লোক কাজ করে[illegible] ফরাসীদেশে বড় কলকারখানা ও ছোট শিল্পানুষ্ঠানগুলি মজুরে[illegible] সংখ্যায় সমান। জার্ম্মানীতে ১৪৩০০,০০০ জন নিযুক্ত মজুরে[illegible] মধ্যে তাহাদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক লোক ছোট শিল্পানুষ্ঠা[illegible] গুলিতে কাজ করে। ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও অষ্ট্রিয়া[illegible] শিল্পব্যবসায়ের দিক দিয়া কুটির-শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিক[illegible] করিয়াছে। ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে শিল্পব্যবসায়ে[illegible] অবস্থা যৎপরোনাস্তি শোচনীয়, সুতরাং যাহাতে প্রাচীন কুটিরশি[illegible] পুর্ণ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হও[illegible] উচিত।

১৯২১ সনের সেন্সস্‌ রিপোর্ট হইতে বাংলার প্রধান প্রধা[illegible] কুটিরশিল্পগুলির বর্ণনা তুলিয়া দিতেছি:—

	শিল্প	নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সংখ[illegible]
১।	হাতে সুতা কাটা ও বয়ন	৫,২০,৯০৯
২।	আহার্য্য শিল্প	৩,৪৩,৫২১
৩।	কাষ্ঠ-শিল্প	৪,২১,৬০৪
৪।	কুমোরের কাজ	২,৮০,১৪৬
৫।	পোষাকের কাজ	৩,৬৩,০৯৭
৬।	ধাতু-শিল্প	২,০০,০০০
৭।	চামড়ার কাজ	৪,০,০০০
৮।	ঝিনুকের কাজ	১০,০০০

এই সমস্ত কুটির-শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের পরিশ্রম হ্রাসের নিমি[illegible] বাংলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগ হইতে কয়েকটি কল তৈয়ারী করিয়[illegible] দেওয়া হইয়াছে। এই কলগুলি তৈরী হওয়ায় কুটিরশিল্পের বি[illegible]

পরিমাণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা মিত্র মহাশয়ের লিখিত বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। হস্ত বয়ন শিল্প :—বর্ত্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২,১৩,৮৮৬টি হাতে চালানো তাঁতের কাজ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে 'ফ্লাই-সাটল্' (fly-shuttle) তাঁতের সংখ্যা ৫৩,১৮৬। ইহারাই প্রায় ৬ কোটী টাকার মাল উৎপাদন করিয়া থাকে। পুরানো ধরণের তাঁতগুলি হইতে ইহারা প্রায় দ্বিগুণ মাল উৎপন্ন করিতে পারে। সুতরাং এই 'ফ্লাইসাটল্' তাঁতগুলির প্রচলন করিতে পারিলে বৎসরে কয়েক কোটী টাকা বাঁচিয়া যায়। হাতে চালানো তাঁতের বহুল প্রচলনে দেশীয় মিস্ত্রীদের অন্ন-সংস্থানের একটা পথও হয় বটে।

২। পিত্তল ও কাংস্য-শিল্প :—এই শিল্পে প্রতি বৎসর কয়েক কোটী টাকার জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। কিছুদিন হইল এনামেল ও এ্যালুমিনিয়ামের জিনিষের সস্তাদরে প্রচুর আমদানীতে ইহাদের ব্যবসায়ের কিছু মন্দা পড়িয়াছে। শিল্পবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদের জন্যও কতকগুলি কল তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। এই কলের সাহায্যে পরিশ্রমেরও অনেকটা লাঘব হয়, আবার অল্প খরচে এক সঙ্গে অনেক মালও উৎপাদন করা যায়।

এই সকল ছোট ছোট কল নির্ম্মাণ করার ফলে, কামারের কাজ, ঝিনুকের কাজ, ছাতা তৈয়ারী ও ধানের খোসা ছাড়ানো ইত্যাদি কাজে অনেক উন্নতি হইয়াছে।

শিল্প-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ মনে করেন যে, পাটের আঁশ হইতে সুতা তৈয়ার করা, বয়ন এবং রেশম শিল্প প্রভৃতি কুটির-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইলে ইহাদের কাজ খুবই ভালো চলিবে।

সুতরাং এই দিক দিয়া আমাদের দেশের যুবকদের অনেক কিছুই করিবার আছে। সমস্ত দেশের ভিতরে কুটির-শিল্পের সংগঠন ও তাহাদের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে।

(ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)

—

কৃষি-সন্ধান

সব্জী সার

নিতান্ত নিঃসার ও দুর্ব্বল ভূমিতে ভুরা, ধঞ্চে, অরহর প্রভৃতি জন্মাইতে পারিলে উহা শীঘ্রই উর্ব্বরা হইয়া উঠে। ভুরা জন্মাইয়া শীঘ্র বাহির হইলেই সমস্ত ক্ষেত্র হাল দ্বারা কর্ষণ করতঃ মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া দিলে দুই মাসের মধ্যে পচিয়া পরবর্ত্তী শস্যের উপযোগী হইয়া উঠে। ধঞ্চেও উক্তরূপে মৃত্তিকার সহিত পচাইতে হয়। ভুরা ও ধঞ্চে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিলে ২।৩ মাসের মধ্যে কাটিয়া মৃত্তিকাতে মিশাইবার উপযোগী হয়।

চর জমীতে ধঞ্চের উপকার

দামোদর, পদ্মা প্রভৃতি বৃহৎ নদ নদীর বালুকাময় চরে পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া শর, বন-ঝাউ প্রভৃতি গাছ জন্মিয়া কিছু সারবান পদার্থ বালুকার সহিত জমিয়া গেলে, চরগুলি আশু ধান্য, জই, যব, সর্ষপ, নীল ইত্যাদি ফসল জন্মাইবার উপযুক্ত হয়। এইরূপ পাঁচ সাত বৎসর অপেক্ষা না করিয়া চরে ধঞ্চের বীজ ছিটাইয়া দিয়া, একই বৎসরের মধ্যে বালুকার সহিত সারবান জৈবিক পদার্থ জমাইয়া লইয়া দ্বিতীয় বৎসর হইতে চরে চাষ চলিতে পারে।

বীজরক্ষা ও তাহার উন্নতি

কাহারও বীজ রাখিতে হইলে গাছটি যাহাতে সতেজ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও কীট-ভক্ষিত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এ নিমিত্ত ক্ষেত্রস্থ উৎকৃষ্ট গাছগুলি নির্ব্বাচন করিতে বা অপর কোন পরিষ্কৃত সারময় ভূমিতে সেই গাছগুলি জন্মাইতে হইবে।

অস্মদ্দেশে বীজার্থ প্রথম ফল গণপতির উদ্দেশ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ইহা সুন্দর প্রথা। যে-গাছের বীজ রাখিতে হইবে তাহাতে অধিক ফল ধরিতে দেওয়া উচিৎ নহে এবং যে ফলগুলি অত্যন্ত বৃহৎ, সুপুষ্ট ভারবিশিষ্ট ও সুপক্ব হইয়াছে তাহাই বীজের জন্য রাখিতে হইবে। উত্তরোত্তর বহুকাল ধরিয়া এই প্রণালী অনুসারে বীজ রক্ষা করিলে বীজের আর অবনতি ঘটে না। ইংরেজীতে ইহাকে পেডিগ্রি (Pedegree System) প্রথা কহে। যদি কোন গাছে বিশিষ্ট ফল, পত্র বা পুষ্প জন্মে বা মূল উদ্ভিদের মধ্যে যাহার মূল বৃহত্তম বা মিষ্টি বা বিশিষ্ট আকারবান হইবে তাহারই বীজ রাখিলে তদুৎপন্ন গাছ হইতে সেই সেই বিশিষ্ট আকার বা গুণবান জাতির উৎপত্তি সম্ভাবনা। উপর্য্যুপরি ১৫২০ বৎসরকাল এইরূপে উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন ও তত্তৎ বীজোৎপন্ন গাছ হইতে চারা জন্মাইতে পারিলে তত্তৎ বিশেষ গুণ তত্তৎ জাতিতে স্থায়ীভাব ধারণ করে। মানব-ব্যবহার্য্য অধুনা এক এক উদ্ভিদের যে বহুপ্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া উন্নত ও বিশিষ্ট প্রণালীমতে কর্ষিত হইয়া তত্তৎ বিশেষ গুণ স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার যে কত কত নূতন জাতি উৎপন্ন হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

কলমের সার

বৃক্ষাদির গুল কলমের নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায়ে সার প্রস্তুত হইতে পারে। এঁটেল মৃত্তিকা ১৬, পচা গোময় ৮, ক্ষুদ্র মৎস্য ৪, বালুকা ৪, সূক্ষ্মকুট্টিত নারিকেল ছোবড়া ২ ভাগ, সমস্ত একত্রে মৃৎপাত্রে দুইমাস কাল সামান্য জল সহযোগে পচাইয়া লইলে কলম বাঁধিবার উপযুক্ত উত্তম সার প্রস্তুত হয়; ইহাকে মধ্যে মধ্যে আলোড়ন ও ব্যবহার কালে গাঢ় পঙ্কের মত করিতে হইবে।

আকন্দের সুতা প্রস্তুত

আকন্দের সুতা বাহির করিতে হইলে. যে-সকল শাখা বেশ সরল দীর্ঘ, অপরিপক্ব ও সবুজ বর্ণ, তাহাই অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া এক দিবস কাল বাহিরে শুকাইতে হইবে। পরে শাখাগুলি অল্প অল্প থেঁতো করিয়া কাষ্ঠ ও উপরকার ত্বকভাগের মধ্যস্থ সুতা ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা চাঁচিয়া বাহির করতঃ শুকাইয়া লইলেই বিক্রয়োপযোগী সুতা প্রস্তুত হইল। এই উপায়ে যে সূত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইহাতে বিলম্ব ও ব্যয়বাহুল্য ঘটে। শাখা হইতে ছালগুলি ছাড়াইয়া জলে পচাইয়াও সুতা বাহির হইতে পারে। এ উপায়ে প্রস্তুত সূত্র একটু মলিনবর্ণ হয়, সূক্ষ্ম বয়ন-কার্য্যের উপযোগী হয় না; কিন্তু তদ্দ্বারা রশারশি প্রস্তুতের কার্য্য সুন্দর নিষ্পন্ন হইতে পারিবে।

(কৃষক, বৈশাখ ১৩৩৫)

—

আর্ট ও মনোবিকলন

এ সময়ে মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে আর্টের জন্মকথা লিখিলে তাহা খুব মুখরোচক হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবু সময় আসিয়াছে যখন আর্টের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লেখক ও সমালোচকগণের গোচর

করা দরকার। মনোবিদ্ জিজ্ঞাসা করিবেন, আর্ট কেন হয়? কি করিয়া হয়? পুরাতন মনোবিজ্ঞান বলিবে, মানুষের মনে কান্তি-রস (aesthetic sentiment) রহিয়াছে, এবং সেই কান্তি-রসই আর্টের মূল। কান্তি-রসই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ইচ্ছাকে উদ্যত করে। কিন্তু ইহার দ্বারা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সকল ব্যাপার ব্যাখ্যা করা চলে না। মনে করুন, কোন শিল্পী একখানা ছবি আঁকিলেন,—যথা, লিওনার্দো দা'ভিঞ্চির 'মোনা লিসা'। এই ছবিখানিতে শিল্পী হাসির এক বিশেষ রূপকে মূর্ত্ত করিয়াছেন। কেন তিনি 'মোনা লিসার' সেই হাসি না ফুটাইয়া মুখখানিকে গম্ভীর করিয়া আঁকিলেন না? পুরাতন মনোবিজ্ঞান এ-সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে না, বড় জোর বলে তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শিল্পীর তখনকার মনোভাবই শিল্পীকে এই বিশিষ্ট রূপ মূর্ত্ত করিতে বাধ্য করিয়াছে। তখন আবার প্রশ্ন উঠে, শিল্পীর তখনকার সে মনোভাবই বা কোথা হইতে আসিল? এ কথার জবাব পুরাতন মনোবিজ্ঞান দিতে পারে না, কারণ পুরাতন মনোবিজ্ঞানের শুধু সংবিদ্ লইয়াই কারবার। মনের যে অংশ আমাদের জ্ঞানগোচর তাহাই সংবিদ্; কিন্তু এই সংবিদ্ই মনের সমস্তটা নয়। মনের বেশীর ভাগ অংশই আমাদের অগোচর এবং সেই অংশই প্রবলতর। এই অজ্ঞাত অংশ লইয়াই মনোবিকলনের (Psycho-analysis) কারবার।

মনোবিকলন বলে, অসংখ্য, অতৃপ্ত কামনা মনের অজ্ঞান-প্রদেশে পরিতৃপ্তির জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু, সংসারে তাহাদের পরিতৃপ্তির কোনো পন্থাই নাই। সমাজ, সভ্যতা সে-সব কামনাকে দুর্নীতি-মূলক বলিয়া পরিহার করিয়াছে। সে-সব কামনা লোকসমাজে প্রকাশ করিতেও লজ্জা, এমন-কি নিজের মনে উঠিলেও গ্লানি। এই জন্য মানুষের চৈতন্য সেইসকল কামনাকে শিশুকাল হইতেই ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়াকে অবদমন (repression) বলা হয়। মানুষ কামনাগুলিকে ভুলিয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু ভুলিলেই যে তাহারা লুপ্ত হয়, তাহা নহে। তাহারা অজ্ঞানে থাকিয়া মানবের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত উপহৃতি (emotion), সমস্ত ক্রিয়াকে নিয়মিত করে। তাহারা সর্ব্বদা পরিতৃপ্তি চায়, কিন্তু চৈতন্যের সজাগ প্রহরী (censor) তাহাদিগকে চৈতন্যের ক্ষেত্রে আসিতে দেয় না। তখন তাহারা পাহারাওয়ালাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। এই ফাঁকিতেই স্বপ্নের সৃষ্টি, মনোবিকারের জন্ম, এবং আর্টেরও উদ্ভব।

স্বপ্ন, মনোবিকার ও আর্টের জন্ম একই মনোবৃত্তি হইতে। স্বপ্নের সঙ্গে রূপকথা ও পুরাণের বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। প্রভেদ এই মাত্র যে, স্বপ্ন ব্যক্তিগত, আর রূপকথা ও পুরাণ জাতিগত। একটা জাতির স্বপ্নকেই আমরা রূপকথা অথবা পুরাণ বলিতে পারি। একটা জাতির নিরুদ্ধ অজ্ঞাত কামনার ছদ্মবেশে পরিতৃপ্তিকেই আমরা রূপকথা অথবা পুরাণ বলি।

স্বপ্ন, মনোবিকার, ও আর্ট এই তিনই ব্যক্তিগত। কবি কাব্য অথবা নাটক লিখিলেন—নিজের দিবা-স্বপ্নকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিলেন। সুতরাং কাব্য ও নাটককে কবির স্বপ্ন বলা যাইতে পারে। স্বপ্ন যেমন অজ্ঞাতসারে রূপ গ্রহণ করে, কাব্য ও নাটকও সেইরূপ অজ্ঞাতসারে রূপ গ্রহণ করে। তবে এ দুইয়ের প্রভেদ কোথায়? স্বপ্নের রূপের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু কাব্যের রূপের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। মনোবিকারেও স্বপ্নের মতো কোনো সামঞ্জস্য নাই। বাহিরের লোকের কাছে সে একটা নিছক আবোল-তাবোল মাত্র। এই সু-ষমাই আর্টকে সুন্দর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রূপের সু-ষমাই (proportion) সৌন্দর্য্যের গোড়ার কথা। যাঁহারা 'art for art's sake'-এর পক্ষপাতী তাঁহারা রূপের সুষমাকে মোটেই অস্বীকার করিতে পারেন না। রূপ লইয়াই বিশুদ্ধ আর্টের কারবার সন্দেহ নাই, কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে, দর্শনে যেমন বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ কেবল একমাত্র বাদ নয়, কাব্য-জিজ্ঞাসায়ও 'art for art's sake' একমাত্র সূত্র নয়। তথাপি, সামঞ্জস্য, সঙ্গতিই সৌন্দর্য্যের গোড়ার কথা। এই সামঞ্জস্য অথবা সঙ্গতি না থাকিলে কোনো চিন্তা আর্টের কোঠায় পড়ে না।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, সুবিন্যস্ত, সুসমঞ্জস কল্পনা হইলেই কি আর্ট হয়? মনে করুন, একজন ঈডিপাস্-এষণার একটা নগ্নচিত্র আঁকিলেন; প্রতিরূপ ও ভাষার মধ্যে সঙ্গতি থাকিলে তাহা আর্ট হইবে না। যাঁহারা এরূপ বিশেষত্বযুক্ত দু'চারটি বাঙলা গল্প বা উপন্যাস পড়িয়াছেন তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। আর্টের লক্ষণই এই যে, যে-কামনা হইতে সে উদ্ভূত সে-কামনা যথাসম্ভব গুপ্ত থাকিবে। বলা বাহুল্য, এ কামনা অ-জ্ঞানে অবস্থিত। আমাদের অজ্ঞাত কামনার ছদ্মবেশী পরিতৃপ্তিতেই আমরা হর্ষ (pleasure) লাভ করি, এবং তাহাই সুন্দর। মনের প্রতিবন্ধের (resistance) জন্য কামনার নগ্ন পরিতৃপ্তিতে আমরা দুঃখ (pain) পাই, এবং তাহা কুৎসিৎ। আসল কথা, সংবিদের প্রহরীকে ফাঁকি না দিলে আর্ট আর্টই হইতে পারে না,—তখন তা গ্লানিকর ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।

কামনার রূপান্তরে (transformation) যেরূপে আর্টের উদ্ভব হয়, তাহার সহিত বৈষ্ণবদর্শনকথিত রতির মহাভাবে পরিণতির তুলনা চলে। যখন কোনো নগ্ন প্রতিরূপ আমাদের কামভাব জাগাইয়া তুলে, তখন আর আর্টের কথা উঠিতে পারে না,—সেখানে কান্তিরসের পরিতৃপ্তি হয় না, কামেরই পরিতৃপ্তি হয়। এজন্য অশ্লীল সাহিত্য আর্টের কোঠায় থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই যতক্ষণ পর্য্যন্ত কামভাবের উদ্রেকই তার মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়।

আজকাল বাংলা মাসিক সাহিত্যে সাইকো-এ্যানালিসিসের নামে যা চলিতেছে তা দেখিলে মনে হয়, অশিক্ষিতপটুত্ব আর যেখানে চলুক, বিজ্ঞানে চলে না।

আজকালকার নবীন সাহিত্যিকের দল ফুল-ফলের সঙ্গে সাপের কোনো প্রভেদ নাই বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা পড়িলে মনে হয়, মানুষ সজ্ঞানে কামোপহত হইয়াই ঘুরিয়া মরিতেছে। মনোবিকলনের মতে মানুষের বহু চিন্তা, বহু ইচ্ছা অ-জ্ঞানের যৌন এষণা দ্বারা নিয়মিত হয়, সন্দেহ নাই। এবং ইহা মানসিক নিয়তিরই (psychical determinism) অন্তর্গত। অ-জ্ঞানে যৌন ইচ্ছাদ্বারা নিয়মিত হইলেই যে সকল চিন্তা, সকল ক্রিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রেও যৌনতার দিকেই ধাবিত হইবে তা নয়। সুতরাং পৌরুষ কামোন্মাদের (satyriasis) ও নারীর-কামোন্মাদের (nymphomania) চিত্র আঁকিয়া যদি কেহ বলেন, ফ্রয়েডের মতে এই-ই আসল মানুষের চিত্র তবে সেই সত্যান্বেষী মনোবিদের অপমানই করা হইবে।

আধুনিক সাহিত্যে অজাচার (incest) খুব প্রবল ভাবে চলিতেছে। মনোবিকলনের মতে অজাচারের মূলে থাকে ঈডিপাস এষণা। ইহা হইতেই অজাচারের উৎপত্তি ও পরিণতি দেখানো হয় সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টা হইয়া থাকে, তবে বৈজ্ঞানিক সত্যের খাতিরে ঈডিপাস-এষণার আনুষঙ্গিক মনোবৃত্তিও দেখানো উচিত।

যদি দেখা যায় গল্পের কোনো নায়ক বৌদিদি কিংবা দিদির সঙ্গে প্রেম করিতেছেন, অথচ তাহার 'শত্রু পিতার' (hostile father) প্রতিরূপের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ নাই, তবে অনায়াসে বলা চলে যে, লেখকের অজাচার প্রচারই উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের জ্ঞানলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই, অথবা ঘটিলেও সেজ্ঞান প্রচারে তিনি বিমুখ।

আসল কথা, অজ্ঞাত মনের যে-চিরন্তন দ্বন্দ্ব রূপান্তরিত হইয়া কাব্যে দেখা দেয়, আধুনিক সাহিত্যে সে-দ্বন্দ্বের কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় না। এ যেন আগাগোড়াই স্থাকামি, আগাগোড়াই ভাণ। অপর পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যে-কোনো গ্রন্থ লইলেই অজ্ঞাত মনের চিরন্তন দ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

(শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)

—

মহেশ-মঙ্গলে দিবোদাসের উপাখ্যান

মহেশমঙ্গল বহু উপাখ্যানে রচিত। ইহার মধ্যে দিবোদাসের উপাখ্যানটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয়। এই উপাখ্যানে কাশীর ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। উপাখ্যানটি এই :—

শিব, কাশীর রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে দেবতারা কাশীতে বাস করিতেন। অনাবৃষ্টি হইয়া প্রজাক্ষয় হইতে থাকিলে ব্রহ্মা, রিপুঞ্জয় নামক একজন রাজর্ষিকে দিবোদাস নাম দিয়া কাশীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিব, কাশী ছাড়িয়া মন্দার পর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। দিবোদাস, ব্রহ্মার সহিত এই নিয়ম করিয়া রাজপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, দেবতার কাশীতে থাকিতে পারিবেন না। কাজেই দেবতারা বাধ্য হইয়া কাশী ছাড়িয়া স্বর্গে গমন করেন। দিবোদাসের সুশাসনে অনাবৃষ্টি নিবারিত হইলে লোকে সুখে কাশীতে বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু কাশী ছাড়িয়া শিবের স্বস্তি রহিল না, যে কোনরূপে হউক দিবোদাসকে ছলনা করিয়া কাশী গ্রহণ করিতে তিনি সচেষ্ট হইলেন। নিজে প্রচ্ছন্নভাবে কাশীতে থাকিয়া নানা পাপ জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন, তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন ছলনার জন্য "যোগীনী"দিগকে পাঠান হইল, কিন্তু তাহারা বহু চেষ্টাতেও কাশীবাসীদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তাহার পরে ক্রমে সূর্য্য, ব্রহ্মা ও প্রমথগণ গেলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। তাহার পরে শিব, গণেশকে পাঠাইলেন। গণেশ, গণকের বেশে কাশীবাসীদিগের ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিতে লাগিলেন। তাঁহার গণনা ঠিক ঠিক ফলিতেও লাগিল। কাশীবাসীর বিস্ময় জন্মিল। ক্রমে গণকের অদ্ভুত বিদ্যার কথা রাজবাড়ীতে প্রচারিত হইল। দিবোদাস, মহিষীর কথায় গণককে ডাকিয়া আনিয়া—

"অন্তে মোর কি হইবে কহ তাহা শুনি।"

জিজ্ঞাসা করিলেন। গণেশ বলিলেন—"রাজা, অন্তকালে তোমার সদ্গতি হইবে। আজি হইতে অষ্টাদশ দিবসে এক ব্রাহ্মণ তোমার নিকট আসিবেন তিনি যাহা বলেন, তাহাই করিও।" পুরুষকারের মূর্ত্তি দিবোদাস, গণকের ছলনায় বিশ্বাস করিলেন।

এদিকে গণেশের বিলম্ব দেখিয়া শিব কাশী উদ্ধারের জন্য বিষ্ণুকে পাঠাইলেন। বিষ্ণু কাশীতে যাইয়া ধর্ম্মক্ষেত্র নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। এই পুরীতে বিষ্ণু, পুণ্যকীর্ত্তি নামে বৌদ্ধাচার্য্য হইয়া বিনয়কীর্ত্তি নামধারী গরুড়কে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। তাহার

'বেদপথ ছাড়ি সবে বৌদ্ধমত সাধে।"

বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া কাশীর প্রজারা "পাপময়" হইল। দিবোদাস, এই পাপের নিবারণ করিতে পারিলেন না। কাশীতে দুর্ভিক্ষ হইল—

"ধরণী হরিল শস্য, প্রজা পাপময়।"

দিবোদাসের সুশাসিত রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এমন সময়ে গণকের কথিত অষ্টাদশ দিবসে বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি ধরিয়া দিবোদাসের নিকটে গেলেন এবং দিবোদাসের হিতার্থেই শিবকে কাশীরাজ্য সম্প্রদানের উপদেশ দিলেন। বিনা আপত্তিতে দিবোদাস সে উপদেশ মানিয়া লইলেন। বৌদ্ধ বিষ্ণু ও তান্ত্রিক শিব মিলিত হইয়া বৈদিক দিবোদাসের রাজ্য হরণ করিলেন। আবার শিব কাশীর রাজা হইলেন।

এই উপাখ্যান কবিকল্পিত নহে। এরূপ ঘটনা কাশীতে হইয়াছিল বলিয়াই বুঝা যায়। প্রথমে কাশীতে শৈবমত প্রচলিত ছিল এবং রাজা ছিলেন শিব। দিবোদাস, রাজা হইয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার করেন। তাহার পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারে বৈদিক ধর্ম্ম লুপ্ত হয়; দিবোদাস রাজ্য ত্যাগ করেন। আবার শিব রাজা হন এবং শৈবমত প্রবল হইয়া উঠে। এখনও কাশীতে শৈব ধর্ম্মেরই প্রাধান্য। যে বৌদ্ধাচার্য্য কাশীতে বৌদ্ধমত প্রচার করেন, মহেশ মঙ্গলে তাঁহার নাম পুণ্যকীর্ত্তি। এই নামে সত্য সত্যই কোন বৌদ্ধাচার্য্য কাশীতে ছিলেন কি না, অনুসন্ধেয় বটে।

দিবোদাস, শিবকে কাশী ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলে বিষ্ণু সে সংবাদ মন্দার পর্ব্বতে পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া চৈত্র মাসের মদন ত্রয়োদশীর দিন শিব কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই দিনই তাঁহার অভিষেক হইল না। আট মাস পরে কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে শিব, কাশীর ঈশ্বরপদে অভিষিক্ত হইলেন।

(সৌরভ, মাঘ, ১৩৩৪) শ্রীরসিকচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

—

নাট্যোৎপত্তি

নাটক ও অভিনয় মানব-সভ্যতার পরিণত অবস্থার ফল। ইহার সাহায্যে সভ্যতার একটা পরিমাপ করাও যাইতে পারে। ভারতীয় সভ্যতা বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় আদর্শবাদ। একথা ঠিক যে, জগৎকে দিবার পক্ষে ইহাই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কিন্তু ইহাই ভারতের একমাত্র সম্পদ নহে। ভারতীয় সভ্যতা বুঝিতে হইলে ভারতের সমগ্র জীবনটি বোঝা দরকার, এবং ইহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইবে প্রাচীন ভারতের আমোদ-প্রমোদ ও জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের উপায়গুলি। সর্ব্বযুগে ও সকল দেশে নৃত্য, গীত, ভাস্কর্য্য, পূর্ত্ত ইত্যাদি সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার অবনতির সময় নানা বিকৃতির ভিতর দিয়া আপনা হইতেই লয় পাইয়াছে। মানুষের সৌন্দর্য্যপিপাসা অসীম ও চিরন্তন। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, আদিম মানব শারীরিক ক্ষুধা মিটিবার পরই যাহা চাহিয়াছিল তাহা ঘরবাড়ী ইত্যাদি কিছুই নহে—তাহারা চাহিয়াছিল শরীর ও মনের শোভা বর্দ্ধন করিতে। সেইজন্য একদিকে দেখিতে পাই আদিম মানব অতি প্রাচীন কাল হইতেই অলঙ্কার পরিধান করিতে ... [illegible] ছাদের উপর ও পাহাড়ের গহ্বরে ছবি আঁকিতে

ছবি আঁকার সময়েই বোধ হয় তাহারা অপর এক উপায়ে চিত্ত-বিনোদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল—সেটি নৃত্য। প্রয়েস্ (Preuss) প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ মনে করেন, সেই আদিম যুগের অসভ্য মানবের নিকট নৃত্যসুলভ দ্রুত অঙ্গপরিচালনা বোধ হয় খুব ভাল লাগিত, কিন্তু গীতের আবির্ভাব হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় ফিডিয়াস্ (Phidias) ও প্রাক্সিটিলিস্ (Praxitiles) প্রমুখ গ্রীসের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ যখন পার্থেনন্ (Parthenon) প্রভৃতি অপরূপ সৌন্দর্য্যময় সৌধনির্ম্মাণদ্বারা গ্রীসকে সৌন্দর্য্যভূষিত করিতেছিলেন, তখনও গ্রীসের সঙ্গীত অতি অনুন্নত অবস্থায় ছিল। এইরূপে নৃত্যের পর গীতের আবির্ভাব এবং উভয়ের সংমিশ্রণের ফলে ক্রমশঃ নাটকের সৃষ্টি হইল। সকলদেশ সম্বন্ধে একথা সত্য না হইতেও পারে; কারণ, নানা দেশে নানা উপায়ে নাট্যের উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইহা মূলতঃ সত্য। 'নাট্য' এই কথাটি লইয়া আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। 'নট' (অভিনেতা) হইতেই 'নাট্য' শব্দের উৎপত্তি এবং 'নট' শব্দের আদিম অর্থ ছিল 'নর্ত্তক'। সুতরাং ভারতে নৃত্য হইতেই ক্রমশঃ নাট্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। এখন এই 'নাট্য' শব্দের মধ্যে আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, "নট" হইতে নাট্যের উৎপত্তি; কিন্তু 'নট' সংস্কৃত শব্দ নহে, ইহা প্রাকৃত শব্দ, ইতর সাধারণ যে ভাষায় কথা বলিত ইহা সেই ভাষার শব্দ, পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের কথিত ভাষায় এ শব্দের স্থান নাই। অথচ নাট্য কথা সম্বন্ধে যত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় সবই ঋষি বা পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্বপ্রণীত গ্রন্থে কেন এই প্রাকৃত কথাটিকে স্থান দিলেন? একমাত্র উত্তর যাহা দিতে পারা যায় তাহা সহজ ও স্বাভাবিক। আমাদের মানিয়া লইতে হইবে যে, এই 'নট' সম্প্রদায় এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যও এই ইতর-সাধারণের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের কলা ও নাট্যপরিভাষা পর্য্যন্ত সমাজে এরূপ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণগণ সেগুলির পরিবর্ত্তে ব্যাকরণ-শুদ্ধ সংস্কৃত নাম চালাইতে সমর্থ হন নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে, ইতরজনসাধারণের মধ্যেই ভারতের আদিম নাট্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং প্রথমে এই নাট্য ছিল নৃত্যপ্রধান। এক কথায় বলিতে হয় Popular pantomime হইতেই ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি। কেহ কেহ মনে করেন গ্রীকগণের অনুকরণেই আমাদের দেশে নাট্যের উদ্ভব হইয়াছে, অথবা গ্রীক্ নাট্য দ্বারা ভারতীয় নাট্য অনেকাংশে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এ প্রশ্নের এখনও সুমীমাংসা হয় নাই। অনেকেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই এই কথা লইয়া এখানে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

এখন দেখা যাক্ ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে নাট্য কত প্রাচীন যুগে উদ্ভূত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ভারতীয় নাট্য ছিল নৃত্যগীত-প্রধান। ঋগ্বেদেই নৃত্য ও নর্ত্তকীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সামগানও অতি প্রাচীন কালেই প্রস্তুত ছিল; এখন সেগুলি সংযোজিত করিয়া প্রকৃত নাট্যের আরম্ভ হইয়াছিল কবে? ঋগ্বেদের যুগেই ইহার আরম্ভের আভাস মেলে। ঋগ্বেদের সংবাদ-সূক্তগুলিই ভারতের আদিম নাট্যের প্রথম নিদর্শন, এ কথা অধ্যাপক Sylvain Levi ও Schroeder দুই জনেই স্বীকার করিয়াছেন। এই সংবাদসূক্তগুলিতে দেখা যায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পরস্পর কথোপকথন করিতেছে এবং যদিও ঋগ্বেদের সকল অংশই কোন না কোন রূপে পরবর্ত্তী যুগের যজ্ঞসংস্কারাদিতে প্রয়োগ করা হইয়াছিল তথাপি এই সংবাদসূক্তগুলির এরূপ কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। স্বতঃই মনে হয়, এই সংবাদসূক্তগুলি কেবল মাত্র দেবপূজার্থে ব্যবহৃ হইত না, হয় তো তাহাতে অন্য কোন কার্য্য হইত। শ্রোয়ডা (Schroeder) মনে করেন, এই সংবাদসূক্তগুলি অভিনয়ার্থে ব্যবহৃ হইত এবং তাঁহার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নাও হইতে পারে Schroeder তাঁহার Mysterium und Mimus in Rigved নামক গ্রন্থে সংবাদসূক্তগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন Schroederএর পূর্ব্বে Sylvain Levi তাঁহার Theatre Indie নামক গ্রন্থে এই মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। অব আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে এই সময়ে নাট্যের বীজমাত্র অঙ্কুরি হইয়াছিল, এবং ঐ সকল সূক্ত যে তখনই ভরতোক্ত প্রণালী অভিনীত হইত না একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই গেল বৈদি যুগের কথা। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ যুগেও এই নাট্য অতি পরিস্ফ আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ যুগের যজ্ঞসংস্কারাদির ম নাট্যাভিনয়সুলভ অনেক জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ সোমলতা ক্রয়ের অনুষ্ঠানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথ সোমবিক্রয়ী শূদ্র ও সোম-ক্রেতা ব্রাহ্মণের মধ্যে মূল্য লইয়া অত বচসা হয় এবং অবশেষে ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক সোমল কাড়িয়া লইয়া লগুড়সংযোগে সোমবিক্রয়ীদের বিপুল সংবর্দ্ধ করেন। পরে কিন্তু আবার তাঁহারাই বিক্রয়ীদিগের সহিত মিটম করিয়া লইয়া তাহাদের যথাযোগ্য মূল্য প্রদান করেন। ইহ হইল সোমযাগের মধ্যে "সোমক্রয় পর্ব্ব।" "মহাব্রতে" নাট্যচিহ্ন আরও সুস্পষ্ট। গৌরবর্ণ একজন বৈশ্য ও কৃষ্ণ একজন শূদ্র গোল এক টুকরা চামড়ার জন্য পরস্পরের স যুদ্ধ করিতে থাকে এবং তাহাতে বৈশ্যই জয়ী হয়। পরে এক বেশ্যা ও একজন ব্রহ্মচারী পরস্পরকে গালি দিতে দিতে যজ্ঞস্থ উপস্থিত হয়। এইসকল অদ্ভুত ও অশোভন অনুষ্ঠানগুলি ব্রাহ্মণদিগের অনুমোদিত বলা চলে না। আমাদের মানিয়া লই হইবে যে, এইগুলি ইতর সাধারণের নাট্যপ্রধান আনন্দ-উৎস ভগ্নাংশ; ইহাকে ধর্ম্মের আবরণে আবৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের শাস্ত্রে স্থান দিয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞের অধিকার লইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রি মধ্যে বিবাদ এবং ক্রমশঃ মিটমাটের ভিতর দিয়া "মহাভি উৎসবের" সূচনা দেখিতে পাই। এই উৎসবের মধ্যেও অভিন ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট এবং যজ্ঞ ও রাজনীতি সম্পর্কীয় এরূপ বহু প্র অনুষ্ঠানের মধ্যে শুধু উচ্চ শ্রেণীর নয়—জনসাধারণের যে এ বড় স্থান ছিল তাহা Eggeling প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছে

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে দেখিতে পাই পাণিনি "নটসূ উল্লেখ করিতেছেন; কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, সে-সময় না শুধু যে, প্রচলিত ছিল তাহাই নহে, নাট্য সম্বন্ধে সূত্রাকারে গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। পাণিনিদ্বারা উল্লিখিত এইসকল নট আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার স্থলে আমরা পাই পর যুগের নাট্যশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির সহিত এইদিকে নাট্য শাস্ত্রের এ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লোকবদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ব্বে প্র যেরূপ ধর্ম্মসূত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, নাট্যক্ষেত্রেও সেইরূপ রচিত নাট্যশাস্ত্রের পূর্ব্বে নাট্যসূত্র বা নটসূত্র সকল হইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রটিই রক্ষা পাইয়াছে, আর সমস্তগুলিই কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

নাট্যোৎপত্তিসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতের পর এইবার যাক্ আমাদের নাট্যগুরু ভরতমুনি এসম্বন্ধে কি বলেন। তা নাট্যশাস্ত্র বহুদিন যাবৎ সুধী-সমাজে পরিজ্ঞাত থাকিলেও এ

এ গ্রন্থটির কোন সম্পূর্ণ সংস্করণ ছাপা হয় নাই। এতদিনে রামকৃষ্ণ কবি সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন; তিনি চারিখণ্ডে ভারতীয়নাট্য-শাস্ত্রের এক সংস্করণ গাইকোয়াড় প্রাচ্য গ্রন্থমালায় বাহির করিতেছেন। ইহার মধ্যে প্রথম খণ্ডটি এখন বাহির হইয়াছে। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, রামকৃষ্ণ কবি ইহার সহিত কলা-কোবিদ অভিনবগুপ্তের টীকাটিও প্রকাশিত করিতেছেন। ইহা হইতে নাট্য সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়টির নাম নাট্যোৎপত্তি। ভরত মুনি ইহাতে নাট্যোৎপত্তি যেরূপে বিবৃত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত না হইলেও বড়ই হৃদয়গ্রাহী,—এবং প্রণিধান পূর্ব্বক ইহা পাঠ করিলে ভারতীয় নাট্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইবে।

বৈবস্বত মনুর ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে, কৃতযুগসুলভ সততা ও ধর্ম্মবুদ্ধির পরিবর্ত্তে জগৎ ক্রমশঃ কলুষদুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। লোকের চিত্তে 'গ্রাম্যধর্ম্ম' প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ লোক কাম ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতে লাগিল। অভিনবগুপ্ত 'গ্রাম্যধর্ম্মের' অর্থ করিয়াছেন অশ্রুতশাস্ত্রার্থজনাকীর্ণ-দেশোচিতো ধর্ম্ম—অর্থাৎ অত্যন্ত জনবহুল দেশে লোকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে বিমুখ হইয়া যেরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে তাহারই নাম গ্রাম্যধর্ম্ম। কাজেই দেখা যাইতেছে পূর্ব্বের নিষ্পাপ যুগে লোকে যখন পরস্পরের উপর নির্ভর না করিয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া কেবল ধর্ম্মাচরণেই জীবন যাপন করিত তখন নাট্যের প্রয়োজন হয় নাই এবং হইলেও নাট্যসৃষ্টির আবশ্যক ছিল না। কিন্তু পরে যখন লোকে বাস্তবিক সমাজে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল তখনই নাট্যের প্রয়োজন প্রথম অনুভূত হইল। এখন শুধু এই গ্রাম্যধর্ম্ম নয় কাম ও লোভের সহিত ঈর্ষা ও ক্রোধের আবির্ভাব হওয়াতে লোকে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সমাজে "সুখ" ও "দুঃখ" আসিয়া দেখা দিল এবং সমগ্র জম্বুদ্বীপ একে একে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, মহোরগ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইল। এইভাবে ভরতমুনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, পূর্ব্বে কৃত যুগে নরসমাজে যখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বিরাজ করিতেছিল তখন সুখদুঃখের অনুভূতি ছিল না, সুতরাং দুঃখসুখের দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃত নাট্য গড়িয়া উঠাও তখন সম্ভব ছিল না। যে সমাজে কেবলমাত্র ধার্ম্মিক লোকের বাস সে সমাজ আদর্শে যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা দ্বন্দ্বশূন্য ও প্রাণহীন, তাহাতে আর যাহাই হউক নাট্য বা নাটকের উদ্ভব হইতে পারে না। বিচিত্র সংঘর্ষের ফলে মানব-সমাজে যখন একটা প্রবল জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায় তখনই নাটকের সৃষ্টি হয়। ভরতমুনি দেব-দানবের নাম করিয়া ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যখন নানাভাবে অনুপ্রাণিত নানাজাতির বিচিত্র সংস্কৃতির (culture) সংঘর্ষ বাধিল তখনই নাটকের সৃষ্টি সম্ভব হইল। এইরূপে দেবদানবের আবির্ভাব হইলে দেবগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন তাঁহারা এমন একটি ক্রীড়নীয়ক পাইতে ইচ্ছা করেন যাহা একসঙ্গে দেখাও যাইবে এবং শোনাও যাইবে। ইন্দ্র আরও বলিলেন, "বেদাদিতে শূদ্রের অধিকার নাই। আপনি অপর এক সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ নির্ম্মাণ করুন"। এইখানে দুইটি বিষয়, লক্ষ্য করিবার আছে। নাট্যশাস্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; ইহাতেই বুঝা যাইবে নাট্যশাস্ত্র রচনাকালে নাট্যকে লোকে কিরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিত। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের এই অযাচিত অনুগ্রহ। দৈবাৎ বেদমন্ত্র শুনিয়া ফেলার অপরাধে যে দয়ালু ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের কর্ণে তপ্ত শিষা ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা এক সময় করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পক্ষ হইতে শূদ্রের প্রতি এই দরদ দেখিলে স্বভাবতই মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়। আসল কথা এই যে, শূদ্রগণনা এই নাট্যবেদ গড়িয়া তুলিয়াছিল, অথর্ব্ববেদ ধর্ম্মসূত্রগুলি এবং অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে সুতরাং শূদ্রদের আর ইহা হইতে বাদ দিবার উপায় ছিল না। ভরত মুনির এই কথা উপরিউক্ত মতেরই পরিপোষক।

ইন্দ্রের এই সকল কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "তাহাই হউক"। অতঃপর তিনি দেবরাজকে বিদায় দিয়া ধ্যানযোগে চতুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া অন্য এক পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন 'আমি ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের কারণ, নানা সদুপদেশপূর্ণ, ভবিষ্যৎ জগতের সর্ব্ব কর্ম্মানুদর্শক, সর্ব্বশাস্ত্রার্থসম্পন্ন, সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তক নাট্যশাস্ত্ররূপ ইতিহাসসম্পদযুক্ত পঞ্চমবেদ প্রস্তুত করিব'। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভগবান সর্ব্ববেদ স্মরণ করিয়া চতুর্বেদাঙ্গসম্ভব এই নাট্যবেদ প্রস্তুত করিলেন। তিনি নাট্যের পাঠ্যসামগ্রী ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করিলেন, গেয়াংশ সামবেদ হইতে লইলেন, এবং অভিনয় সকল যজুর্ব্বেদ হইতে ও রসসকল অথর্ব্ববেদ হইতে আহরণ করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, যজ্ঞানুষ্ঠানাদির মধ্যে কত অভিনয়-সামগ্রী লুকায়িত আছে এবং ভরত যখন যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয়াংশ আহরণের কথা বলিতেছেন তখন মনে হয় একথা তাঁহারও অবিদিত ছিল না। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা বেদের বেদোপ-বেদের সাহায্যে এইরূপে নাট্যবেদ প্রণয়ন করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, "আমি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছি; তুমি দেবতাদিগের মধ্যে ইহার প্রয়োগ কর। যাঁহারা কর্ম্মকুশল, উচ্চশিক্ষিত, বাগ্মী ও জিতশ্রম তাহাদের মধ্যেই তুমি এই নাট্যবেদের প্রচার করিবে"। এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্মা নাট্যবেদকে ইতিহাস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইতিহাস বলিতে বুঝায়, পুরাণাদি প্রাচীন আখ্যানাবলী। এইগুলিকে অবলম্বন করিয়া সাধারণতঃ নাটক রচনা হইত বলিয়াই বোধ হয় নাট্যশাস্ত্রকে এখানে ইতিহাস বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যের বিষয় অভিনেতার এই উচ্চশিক্ষার কথা। যদিও সূত্রযুগে নাট্যকলা প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর উপজীব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের আধুনিক সংস্করণের কালে, অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের প্রায় সমসাময়িক যুগে ভারতবর্ষে যে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন কাহারও অভিনেতা হইবার সম্ভাবনা ছিল না তাহা বেশ বুঝা যায়। অভিনেতার শিক্ষাসম্পদের গৌরব দেখিয়া ইন্দ্র গলবস্ত্র হইয়া ব্রহ্মার নিকট করযোড়ে নিবেদন করিলেন—"প্রভু, দেবগণ এই নাট্যশাস্ত্র গ্রহণ, ধারণ, সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম ও প্রয়োগ করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত এবং তাহারা নাট্যকর্ম্মের অযোগ্য। বেদের গূঢ় অর্থগ্রাহী সংশিতব্রত ঋষিগণই কেবল এই নাট্যবেদ গ্রহণ, ধারণ ও প্রয়োগ করিতে সমর্থ"। ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ভরতমুনিকে বলিলেন- "শতপুত্রের সহিত তোমাকেই এই নাট্যবেদের প্রযোক্তা হইতে হইবে।" পিতামোহের এই আদেশ পাওয়া ভরত প্রয়োগচাতুর্য্য সহিত এই নাট্যশাস্ত্র তাঁহার শতপুত্রকে শিখাইতে লাগিলেন। এইখানে ভরত তাঁহার পুত্রদের নামও করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও পূর্ব্বে কেবল শতপুত্রের কথা বলা হইয়াছে, গ্রন্থমধ্যে কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরও চারিজনের নাম বেশী পাওয়া যায়। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে নাট্যশাস্ত্র আমরা যে অবস্থায় পাইতেছি তাহার কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। যাহাই হউক, এই নামগুলি লইয়া ভাবিবার অনেক কথা আছে। প্রথমেই কোহলের

নাম দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় ভরত এইখানে নিজপুত্রদের নামচ্ছলে নানা নাট্যশাস্ত্রকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

কতকগুলি বাস্তবিকই নাট্যশাস্ত্রকারগণের নাম হইতে পারে, আর কতকগুলি কেবল মাত্র ভৌগোলিক নাম, কতকগুলি শ্লেষাত্মক এবং কতকগুলি ভাব ও রসের নাম মাত্র।

এই সকল নাম পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভরত এই স্থলে নানা নাট্যশাস্ত্রকারের নামোল্লেখ করিতেছেন, কারণ ভরতের পুত্রের নাম কখনই তাণ্ডায়নি বা সৈন্ধবায়ন হইতে পারে না। অবশ্য বাদরায়ণ প্রভৃতিকেও ইহার মধ্যে টানিয়া আনিবার কারণ অনুমান করা দুষ্কর; তবে বলা যাইতে পারে দার্শনিক বাদরায়ণ ভিন্ন অপর এক বাদরায়ণ হয় তো নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন।

যাহাই হউক ভরত তাঁহার এই শত পুত্রকে নাট্যশাস্ত্র শিখাইয়া যোগ্যতা অনুসারে তাহাদিগকে নানা দিকে নিয়োজিত করিলেন এবং তাহা ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী এই তিন বৃত্তি শিখাইলেন। ভারতী বাগ্‌বৃত্তি। পুরুষের সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা-চাতুর্য্যের নাম ভারতীবৃত্তি। পুরুষের গুণসমষ্টির নাম সাত্বতী বৃত্তি। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, "মনোব্যাপাররূপা সাত্ত্বিকী সাত্বতী"। সাত্বতী-বৃত্তি বলিতে প্রধানতঃ বীর্য্য, পৌরুষ প্রভৃতি পুরুষের গুণসমষ্টিকে বুঝায়। 'আরভটী' কথাটি লইয়া অভিনবগুপ্ত একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, "ইয়র্ত্তী ত্যারভটাঃ সোৎসাহা অনলসাস্তেষামিয়মারভটীকায়বৃত্তিঃ" অর্থাৎ যাহারা গমন করে তাহারাই আরভট। উৎসাহশীল, অনলস এই আরভটদিগের গুণসমষ্টির নাম আরভটীবৃত্তি ইহা কায়বৃত্তি মাত্র। বস্তুতঃ নাট্যমধ্যে লম্ফঝম্ফ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি বীর রসের নামই আরভটী। অভিধানে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় "আরভ্যতে অনয়া ইতি আরভটী।" এই তিনটি বৃত্তির নাম বড়ই অদ্ভুত, বাক্যের সহিত অর্থের কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল টানিয়া বুনিয়া অর্থ করা হইয়াছে। মনে হয় তিনটিই প্রথমে ভৌগোলিক নাম ছিল। ভরত সাত্বৎ ও আরভট (অরট্ট?) তিনটি জাতি; তাহাদেরই মধ্যে প্রচলিত নাট্যপদ্ধতির সমন্বয়ে এই নাট্যশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেই সম্পূর্ণ হয় নাই। ভরত তাঁহার শতপুত্রকে এই তিন বৃত্তি শিখাইলে বৃহস্পতি আসিয়া বলিলেন, ইহার উপর কৈশিকীবৃত্তিও শেখা দরকার এবং কে এই কৈশিকীবৃত্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ তাহাও বৃহস্পতি ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কৈশিকীবৃত্তি সম্বন্ধে ভরত বলিয়াছেন, "কৈশিকী শ্লক্ষ্ণনৈপথ্যা শৃঙ্গাররসসম্ভবা" এবং অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, "যৎকিঞ্চিল্লালিত্যং তৎ সর্ব্বং কৈশিকীবিজৃম্ভিতং" অর্থাৎ নাট্যমধ্যে লালিত্যসম্পন্ন যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই কৈশিকীবৃত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। কৈশিকীবৃত্তিও শিক্ষা করিতে হইবে এই কথা শুনিয়া ভরত বলিলেন, "ভগবন্, কৈশিকীবৃত্তি প্রয়োগ করিতে পারে এমন লোক আমায় প্রদান করুন। নটরাজের নৃত্যকালে নৃত্য-অঙ্গহারসম্পন্ন, রস ভাব ও ক্রিয়াত্মক এই কৈশিকী বৃত্তি দেখিয়াছি; পুরুষ তাহা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ।" তখন ব্রহ্মা মানসিক বলের সাহায্যে অপ্সরগণের সৃষ্টি করিলেন। এইখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে নাট্যকলা কেবল মাত্র পুরুষদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; পরে নারীগণও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ভরতকর্ত্তৃক প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তির মধ্যে নারীর স্থান নাই, বৃহস্পতি নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ কৈশিকীবৃত্তির মধ্যেই কেবল নারীর স্থান আছে। ইহার মধ্যে আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—পরবর্ত্তী যুগে কৈশিকী-বৃত্তিকে তৃতীয় এবং আরভটী বৃত্তিকে চতুর্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু নাট্যবেদ সম্বন্ধে আদি গ্রন্থ এই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে আরভটী বৃত্তিকে তৃতীয় বৃত্তিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং স্পষ্টই বলা হইয়াছে অপর তিনটি বৃত্তির প্রয়োগশিক্ষার পর বৃহস্পতির উপদেশে এই কৈশিকীবৃত্তি শিক্ষা করা হইয়াছিল।

এইরূপে চতুর্বৃত্তি শিক্ষা করা হইলে স্বাতি শিষ্যগণের সহিত বাদ্যযন্ত্রের ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং নারদাদি গন্ধর্ব্বগণ গানে নিয়োজিত হইলেন। রামকৃষ্ণ কবি মনে করেন, স্বাতি একজন ঋষি; অবশ্য এস্থলে স্বাতি নক্ষত্রও বুঝাইতে পারে। অতঃপর স্বাতিও নারদ কর্ত্তৃক সমলঙ্কৃত বেদবেদাঙ্গ; কারণ এই নাট্যবেদ শতপুত্রের সহিত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভরতমুনি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাট্যশিক্ষা আমাদের সমাপ্ত হইয়াছে, এখন আমরা কি করিব?" একথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমাদের এই নাট্যশাস্ত্র প্রয়োগের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। ইন্দ্রের ধ্বজোৎসব হইতেছে; ইহাতেই তোমরা নাট্যকলা দেখাইয়া দেবতা-দিগকে পরিতুষ্ট কর।" অতঃপর সেই মহেন্দ্রবিজয়োৎসবে বহু অভ্যাগত দেবগণের সমক্ষে মঙ্গলাচরণ দ্বারা বিঘ্নাদি অপসারিত করিয়া ভরতমুনি প্রথমে আশীর্ব্বচনমণ্ডিত, অষ্টাঙ্গপদ-সংযুত, বেদ-নির্ম্মিত বিচিত্র নান্দী উচ্চারণ করিলেন এবং তৎপরে সুরগণ দৈত্য-দিগকে কিরূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন অভিনয় দ্বারা তাহাই দেখাইতে লাগিলেন। সেই অভিনয়ে পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ভরতের পুত্রদিগকে নানা দ্রব্য প্রদান করিলেন; ইন্দ্র তাঁহার শুভধ্বজা দিলেন, ব্রহ্মা দিলেন বিদূষকের কুটিলক দণ্ড, বরুণ দিলেন ভৃঙ্গার, সূর্য্য দিলেন ছত্র, শিব দিলেন সিদ্ধি, বায়ু ব্যজন, বিষ্ণু দিলেন সিংহাসন, কুবের দিলেন মুকুট এবং সেই সভাস্থ আর আর যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে নানা গুণ প্রদান করিলেন এবং দেবতাগণ প্রহৃষ্ট হইয়া রূপ, রস, ভাব ও ক্রিয়া প্রদান করিলেন। এইখানে আর একটি কথা আছে; শ্রাব্যত্বং প্রেক্ষণীয়স্য দদৌ দেবী সরস্বতী। রামকৃষ্ণ কবি মনে করেন এই চরণদ্বয় প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত হউক আর নাই হউক ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রথমে নাট্যে শ্রাব্যবস্তু কিছু ছিল না, ছিল শুধু দৃশ্য বস্তু, অর্থাৎ নাট্য প্রথমে নৃত্যপ্রধান ছিল। সরস্বতী দেবী শ্রাব্যবস্তুর যোজনা করেন। অন্য উপায়ে এই কথাই পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে।

(সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)

শ্রীকালিদাস নাগ
শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৫

নদী ভাঙা—নদীর ভাঙন—সকলের মুখে এক কথা, নদী ভাঙিতেছে। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেছে। সম্মুখে বর্ষার বিশাল নদী—ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসের মত জিহ্বা মেলিয়া ছুটিয়াছে, গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া তীরে জলের ভীষণ প্লাবন। বৃহৎ মাটির চাপ সশব্দে ধসিয়া পড়িতেছে, তারপর ঘূর্ণীর পাক আর বুদ্বুদ। ভিটা গাছ মাঠ—গিয়াছে, যাইতেছে।

তীরে দাঁড়াইয়া প্রকাশ নদীর এই নিষ্ঠুর খেলা দেখিতেছিল। ঘোলা জলের পরপারে নদীর চড়ায় পাট গাছের সবুজ শোভা—এপারে প্রলয়ের রুদ্র মূর্ত্তি। নিকটে একটি গৃহস্থ বাড়ী—বাগান উঠান ভাঙ্গিয়া টিনের ঘরখানি ধর ধর হইয়াছে। কয়েকজন লোক চালে উঠিয়া টিনগুলি খুলিয়া আনিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। চারিদিকে ছেলে বুড়া আর মেয়ের দল ভিড় করিয়া আছে। প্রতি-মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাহারা চালের উপরকার লোকদের নামিয়া আসিবার জন্য বারবার ডাকিতেছিল।

—কে রে, আফি?

—ছ্যালাম কর্ত্তা, এক ব্যক্তি প্রকাশের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নগ্ন দেহ—ধূলা কাদা মাখান। বোধ করি কাছাকাছি কোন ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে উঠিয়া আসিয়াছে।

—তোদের হাল কি রে?

ভাঙা বাড়ী আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া লোকটি বলিল,—দ্যাখ্‌ছেনইত কর্ত্তা। যেমন ভাঙন লেগেচে, মেয়াদ বেশী দিন নেই। পাত্তারী গুটোতে হ'ল।

—কি ঠিক করলি? কোথায় যাবি?

আফি জবাব দিল—চাষা-ভুষা মানুষ কর্ত্তা। কি আর ঠিক করব? নসিবে যা লেখা আছে তাই হ'বে।

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া প্রকাশ কহিল,—নসিবের উপর বরাত দিয়ে হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাক্‌লে কি চলে, আফি?

গম্ভীরভাবে আফি বলিল,—আল্লা কুকুরটিরও খোরাক যোগান, পাখীটিরও আস্তানার ব্যবস্থা করেন। তিনি কি আমাদেরই কিছু কর্‌বেন না, এ-ও কি হয় কর্ত্তা?

ঈশ্বরের উপর লোকটির কি অগাধ বিশ্বাস! প্রকাশ বিস্মিত হইল। ইহার মত সেও যদি সকল ভাবনা-চিন্তা বিশ্বাসের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারিত! সে ভাবিয়া দেখিল, তাহার বিশ্বাস নাই—অথচ অবিশ্বাসই কি সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে? একবার মনে হইল, সংসার যায়—যাক্ না! তাহাতে কাহার কি? দুনিয়ার মালিক যিনি তাঁহার দরদ কি কাহারো অপেক্ষা কম? কিন্তু যখন যুক্তি-তর্ক ঝুড়ি ঝুড়ি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বোঝা আনিয়া হাজির করিল, তখন সে আর এই নিরক্ষর মুসলমানের সহজ বিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারিল না।

বেলা তখন শেষ হইয়া আসিতেছিল। পাতলা মেঘের জাল ছিঁড়িয়া সন্ধ্যার কতটুকু সোনালী আভা বিস্তৃত জলরাশির উপর একখণ্ড রক্তাম্বর বিছাইয়া দিয়াছিল এবং সেই আলোই তীরে পতনোন্মুখ কয়েকটা গাছের উপর পড়িয়া নির্দ্দয় অস্বাভাবিক অথচ মনোরম একটু হাসি যেন জন্মের শোধ হাসিয়া লইতেছিল। গৃহস্থের চালের টিনগুলি নামান হইয়া গিয়াছে। টিন লইয়া জিনিষপত্র সরাইয়া তাহারা বাড়ী ছাড়িয়া চলিল। সেই ভাঙা বাড়ীর উপর দিয়া মাঝিরা সারি সারি কাঁধের উপর গুণের দড়ি ফেলিয়া ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া হেলিয়া হেলিয়া চলিয়া গেল। পিছনে লম্বা ধাঁচের একখানি নৌকা কল কল করিয়া জল কাটিতে কাটিতে অগ্রসর হইতে-ছিল।

সন্ধ্যা ঘন হইয়া ক্রমে রাত্রির কৃষ্ণসাগরে ডুবিয়া গেল। নীচে আড়কাঠির বাতি, আকাশে তারাগুলি একে একে

জ্বলিয়া উঠিল। প্রকাশ তখন পায়ে-হাঁটা সরু পথ দিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সুরবালা ঘরে শুইয়াছিল। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর হইতে সে সর্ব্বক্ষণই বিমর্ষ। পাড়ার মেয়েরা কাছে বসিয়া নানা কথা কহিয়া তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিত।

কয়েক মুহূর্ত্ত প্রকাশ তাহার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। তারপর ঈষৎ ঝুঁকিয়া বাহুটিতে মৃদু ঝাঁকি দিয়া ডাকিল, ও গো, ঘুমিয়েচ?

সুরবালা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। সে জাগিয়াছিল।

প্রকাশ তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। আলগোছে তাহার হাতখানি মুষ্টি মধ্যে টানিয়া লইয়া সে কহিল,—আর ত এখানে থাকা চলে না, সুর। আমি কাল কলকাতা যাব মনে করেছি।

—কালই?

—হাঁ, সুর। আর দেরি করা উচিত নয়। এগজামিন দিয়ে শিগ্‌গির যেমন হোক একটা চাকরির জোগাড় কর্‌তে হ'বে।

ঘরে একটা পিতলের পিলসুজের উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাহার ক্ষীণ রশ্মি সুরবালার ভিজা চোখ দুটির উপর পড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশ বলিল,—মনে করেছিলাম চিরদিন এখানেই থাক্‌ব। কিন্তু তা আর হ'ল না।

ঠিক সেই সময় পোষা-কুকুর জো একটা বিড়ালের পিছনে ছুটিয়া ঘরের ভিতর আসিল। বিড়াল বারান্দায় একটা দুধের বাটিতে মুখ দিয়াছিল। তাড়া খাইয়া তাড়াতাড়ি সে যেমন ঘরে ঢুকিল অমনি কুকুর চীৎকার করিয়া লাফাইয়া পড়িল।

সুরবালা বলিতেছিল, আবার কবে আস্‌বে?

প্রকাশ কহিল, তা ঠিক বল্‌তে পারি না। একটা চাকরি ঠিক ক'রে তোমায় নিয়ে যাব। আঃ—জো জো!

আর জো! এসময় প্রভুর আদেশ মানিতে সে কোন মতে রাজি নয়। বিড়ালকে কোণ-ঠাসা করিয়া সে তাহার উপর লাফ দিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, অমনি বিড়াল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, রোঁয়া ফুলাইয়া, গোঁফ বিস্তার করিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কুকুরটাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

ফের!—প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরবালা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, না না, তুমি যেও না।

কেন?

ভয়ে সুরবালার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল।

প্রকাশ হাসিল,—ছি, ভয় কিসের?

সুরবালা হাত ছাড়িয়া দিল।

৬

পরীক্ষায় পাশ হইয়া অনেক চেষ্টার পর প্রকাশ সওদাগরি অপিসে একটি কেরাণীগিরি জোগাড় করিল। তারপর একদিন দেশ হইতে সুরবালাকে কলিকাতায় আনিয়া ভাবিল, যাক্‌ বাঁচা গেছে—আর চিন্তা নাই।

গলির ভিতর ছোট স্যাঁৎসেতে বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকিতে প্রথম প্রথম সুরবালা কষ্ট বোধ করিত। সারাদিন একলা বসিয়া কাটাইতে হইত—কথা বলিবে, এমন সঙ্গী কেহ ছিল না। ভোরে স্নান করিয়া সে রাঁধিতে বসিত, রন্ধন শেষ হইলে কাছে বসিয়া প্রকাশকে খাওয়াইত। প্রকাশ আপিস চলিয়া গেলে বাকি গৃহকর্ম্মগুলি সারিয়া সেই যে উপরে উঠিয়া আসিত, তারপর সারা দুপুর সে ছট্‌ফট্‌ করিত—দিন যেন কাটিতেই চাহিত না। কিন্তু সন্ধ্যাকালে ক্লান্ত হইয়া প্রকাশ যখন বাড়ী ফিরিত, অমনি সকল কাজ ফেলিয়া সে স্বামীর কাছে ছুটিয়া আসিত এবং পাখা দিয়া বাতাস করিয়া নানাকথা কহিয়া তাহার ক্লান্তি দূর করিবার চেষ্টা করিত। নিজের নিঃসঙ্গ পিঞ্জরাবদ্ধ জীবনের কথা তখন তাহার মনেও উঠিত না।

প্রতিদিন আহারান্তে তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া প্রকাশ ছাতা হাতে বাহির হইয়া পড়িত। রাস্তায় তখন লোকের ভিড়, গাড়ীর ভিড়—পথ চলা দুঃসাধ্য। সেই ভিড়ের ভিতর আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রকাশ অগ্রসর হইত। দুইধারে দোকানের সম্মুখে নানা রঙের সাইনবোর্ড—সেগুলি সে পড়িতে পড়িতে চলিত, চলিতে চলিতে পড়িত।

দুইবেলা এই দীর্ঘপথ চলিবার সময় অতীতের কথা কখন তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত, সে তাহা জানিতে পারিত না। তাহার মনে পড়িত, একদিন সে এই কলিকাতা ছাড়িয়া পল্লীর নিবিড় শান্তির আশ্রয় লইয়াছিল। তখন কে জানিত তাহাকে আবার এখানে

ফিরিয়া আসিতে হইবে ? তাহার বাড়ী ছিল, ঘর ছিল— হোক ছোট বাড়ী, ছোট ঘর, তবু তাহারই। পুকুরের মাছ, বাগানের আম কাঁটাল লিচু—সব, সবই যে তাহার। সেই মালিক, কাহারো সাধ্য নাই যে, তাহার অধিকার অস্বীকার করে। আর আজ তাহার আপন বলিতে কিছু নাই। বাড়ী-ঘর, জমি-জমা, পিতৃপুরুষের যাহা কিছু নিদর্শন, সব গিয়াছে। আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে আজ এক মমতাহীন সহানুভূতি-শূন্য বিশাল সমুদ্রেএকাকী ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহার এই বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে অতীতের সম্ভাবনাগুলি তুলনা করিয়া সে দেখিত, সেদিন সে কি সুমধুর স্বাধীন উদার জীবন বাছিয়া লইয়াছিল। যেন বিশ্বশুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল,—বাঁচ, বাঁচিবার জন্যই ত জীবন! তুমি বাঁচ, আমি বাঁচি, জগৎ বাঁচুক!

হইতে পারিত—কিন্তু হইল না! জীবনের কত মর্ম্মান্তিক বিয়োগ-গাথার বীজ নিহিত রহিয়াছে এই কয়টি কথার ভিতর! অকস্মাৎ প্রকাশের অন্তর তিক্ত বিষে ভরিয়া উঠিত এবং সেই বিষে তাহার চরিত্রে যাহা-কিছু ভাল উদার মহৎ, সব যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত।

কলেজের বন্ধুদের কথা প্রায় তাহার মনে উঠিত। কোথায় তাহারা—কি করিতেছে? সকলেই কি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত? কদাচিৎ কখনো সংবাদপত্রে সে যদি দেখিতে পাইত তাহাদের মধ্যে কেহ সৌভাগ্য-শিখরে যশের মুকুট মাথায় পরিতে উঠিয়াছে, অমনি কে যেন তাহার অন্তরে অতৃপ্ত বুভুক্ষা জ্বালিয়া দিত। পৃথিবী কি যথেষ্ট বিস্তীর্ণ নহে? তবে কোন্ অপরাধে তাহাকে ঐ সংকীর্ণ স্থানটুকু অধিকার করিয়া আজীবন তুষ্ট থাকিতে হইবে? এ বিধান কাহার?

একদিন হঠাৎ রাস্তায় সুনীতের সহিত তাহার দেখা হইল। সে এখন একজন ডেপুটি। চেহারা তেমনি কৃশ, তেমনি ঢেঙা। সে অনর্গল বকিয়া গেল। এ যেন সেই আগেকার সুনীত, এতটুকু বদলায় নাই। তেমনি চঞ্চল হাস্যমুখর। প্রকাশ অন্যমনা হইয়া পড়িতেছিল। একটা গ্যাসের থামে ঠেস দিয়া সে কেবল ট্রাম মোটর দেখিয়া যাইতে লাগিল।

পরিশেষে সুনীত বলিল, বা রে—এত দিন পরে দেখা, আর তুমি কি না এখান থেকে বিদায় করবে ভেবেচ। চল তোমার বাড়ী গিয়ে দুদণ্ড ব'সে গল্প করি।

অপ্রতিভ হইয়া প্রকাশ বলিল—হাঁ ভাই চল।

অপরিচ্ছন্ন এঁদো গলির ভিতর তাহারা আসিল।

—এই আমার বাড়ী সুনীত, বলিয়া সে বাঁদিকের ছোট বাড়ীটি আঙ্গুল দিয়া দেখাইল।

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া সে মহা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল সে চেঁচাইয়া কহিল—সুর—আরে সুনীত এসেচে। আমার পুরান বন্ধু, ক্লাস-ফ্রেণ্ড। যে সে লোক নয় বুঝেচ? একজন হাকিম। চোপ জো চোপ! কিছু খাবার তৈয়ার কর, সুর, শিগ্‌গির। চল সুনীত, উপরে যাই।—আবার!

কুকুরটা দুই পায়ে ভর দিয়া ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে বিষম লাফালাফি সুরু করিয়াছিল।

উভয়ে উপরে উঠিয়া আসিল। একখানি মাদুর বিছাইয়া অপর্য্যাপ্ত উৎসাহের সহিত প্রকাশ বলিয়া গেল, এই একটি ঘর—তা বৈঠকখানাই বল, আর শোবার ঘরই বল। চেয়ার টেবিল, কৌচ সোফা সবই হচ্চে এই মাদুরটি ভাই। কিছু দুঃখ নাই বেশ আছি। তোমাদের ও সব খাওয়ান বসান সমাদ যত্ন আদব-কায়দার কোন ধার ধারি না। বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

সুনীত বলিল, এই ত বেশ। তারপর পিরানের বোতামগুলি খুলিয়া একখানি হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিল,—দ্যাখ ভাই, মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জান? সভ্যতার নামে আমরা কতগুলি প্রয়োজন সৃষ্টি করেচি যার কোন দরকার ছিল না—যা বাদ দিলে আমাদের সুখের মাত্রা বাড়ে বৈ হ্রাস হয় না।

প্রকাশ কিছু বলিল না। অকস্মাৎ তাহার মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্যের ভারে গুমট বাঁধিয়া উঠিয়াছিল।

সুনীত বলিতে লাগিল,—এই ধর না আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের কথা। তাঁদের প্রয়োজন ছিল অতি অল্প, বছরে দু জোড়া কাপড় আর দু খান চাদর, বস্। তাই ব'লে তাঁরা সুখী ছিলেন না বলা চলে না। কেন না, তাঁরা

দীর্ঘজীবী ছিলেন, আর আমরা দিন দিন ক্ষীণজীবী হ'য়ে পড়্‌ছি। আর এখনো দেখ চাষা মজুরদের। এখনো তা'রা আমাদের সভ্যতার ঘূর্ণীর ভিতর এসে পড়েনি—তাই এত অল্প তাদের অভাব।

চেঁচাইয়া বাধা দিয়া প্রকাশ কহিল,—দোহাই তোমার সুনীত, আমাদের কথা হচ্ছিল আমাদের কথাই বল। ও বেচারিদের আর এর ভিতর টেনে এন না। কি ওদের সুখ-দুঃখের জ্ঞান তুমি বল দেখি? আমরা কি ওদের মানুষ বলে মনে করি, না কোন দিনও করেচি? ওদের জন্ম হ'য়েছিল শুধু আমাদের সুখ-সুবিধার জন্তে!

বলিতে বলিতে গভীর উত্তেজনায় প্রকাশের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে আবার বলিতে লাগিল,—তুমি হয়ত বল্‌বে সমাজ সংঠনের আদিম যুগ হ'তে এমনি কর্ম্ম-বিভাগ চ'লে আস্‌চে। তা মানি, হয় ত সমাজ-রক্ষার জন্য কর্ম্ম বিভাগ প্রয়োজন। কিন্তু তাই ব'লে মানুষে মানুষে এমন আকাশ-পাতাল প্রভেদ কখনো নীতি-সম্মত হ'তে পারে না। সুখ-সম্ভোগের উপর আরামে গড়াগড়ি দিয়ে অনেকে বল্‌তে পারেন বটে ওদের অভাব অল্প। কিন্তু তাঁরা কেবল মনকে চোখ ঠেরে রেখেচেন।

তাহার চোখ দিয়া একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি ঠিক্‌রিয়া বাহির হইতেছিল। বিস্ময়ে চোখ মেলিয়া নির্ণিমেষ দৃষ্টি তাহার পানে নিবদ্ধ করিয়া সুনীত কি যে ঠাহর করিয়া লইল তাহা সেই জানে। তার পর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তুমি দেখচি একজন আস্ত বিপ্লববাদী হ'য়ে উঠেচ।

দরজার পাশে ঘোম্‌টা টানিয়া থালা হাতে সুরবালা আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এতক্ষণে তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতে প্রকাশ হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, দেখেচ সুনীত, সুরর কাণ্ড। ঐখানে দেয়ালের আড়ালে সাত-হাত ঘোমটা টেনে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে। লজ্জা কিসের, সুর? ও-যে সুনীত। এস এস, খাবার এইখানে দিয়ে যাও।

জড়সড় হইয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সুরবালা খাদ্য-দ্রব্যগুলি সুনীতের সাম্‌নে আনিয়া রাখিল। খাবার সামান্ত—খানকতক পরোটা আর কিছু তরকারী।

খাইতে খাইতে সুনীত বলিল, বৌদি'ত চমৎকার রাঁধে।

প্রকাশ হাসিল—হাঁ, একেবারে দ্রৌপদী। তবে শাক দিয়েই দুর্ব্বাসার পারণ রক্ষা কর্‌তে হয়, এই যা।

সুনীত মৌন রহিল। চোখা তীরের মত প্রকাশের কথাগুলি তাহার মনের ভিতর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া মস্তিষ্ক জুড়িয়া একটা ধ্বনি রণিয়া তুলিতে লাগিল। সেই ধূসর দেয়ালগুলির ছোঁয়াচে তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি দমিয়া গিয়াছিল। মনে হইল, এই স্থান ছাড়িয়া বড় রাস্তার স্বচ্ছন্দ আলো-বাতাসের মধ্যে নামিয়া চলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা মনে উঠিতে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মাত্র দুই বছর তাহাদের দেখা হয় নাই—মাত্র দুইটা বছর! কিন্তু কালচক্রের এই দুইমটাত্র বিবর্ত্তন বন্ধু-দ্বয়ের মধ্যে যে সাগর খুঁড়িয়া দিয়াছে, সারা জীবনেও বুঝি তাহা আর ভরিয়া উঠিবার নহে।

সুনীত উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—আজ আসি, প্রকাশ।

উভয়ে নীরবে রাস্তায় নামিয়া আসিল। সুনীত ফিরিয়া কহিল—একটা কথা বল্‌ব, কিছু মনে কর না, প্রকাশ।

—কি?

—জুয়ো খেল্‌তে ব'সে কেউ হারে, কেউ জেতে। কিন্তু সকলেই খেলাটাকে খেলার মত দেখে থাকে।

প্রকাশ মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিল। তার পর একটু হাসিয়া সে বলিল,—তা-হ'লে জুয়ারী যখন দেউলে হ'য়ে আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াবে—খালাস দিও। ব'লো, দোষ খেলার, তার নয়।

সুনীত বিদায় হইল। ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ মাদু-রের উপর সটান শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

কি কাজে সুরবালা উপরে আসিয়াছিল। ঘোর সন্ধ্যা, তখনো প্রকাশ শুইয়া আছে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, ওকি, এখনো শুয়ে আছ? উঠ্‌বে না?

প্রকাশ জবাব দিল, না।

সুরবালা ঝুঁকিয়া আলগোছে হাতখানি তাহার গায়ের উপর রাখিয়া কহিল,—অসুখ করে-নি-ত?

হঠাৎ সরীসৃপ-জাতীয় জীব গায়ে পড়িলে লোক যেমন

করিয়া উঠে, প্রকাশ ঠিক তেমনি চমকিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ চোখ মেলিয়া বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি সুরবালার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল,—না গো, না—কিছু হয়-নি। তুমি কাজে যাও।

সুরবালার চোখ দুটি ছল-ছল করিয়া উঠিল।

বাদ্‌লা হাওয়ার মতন মাঝে মাঝে কি-যে অস্বস্তি স্বামীর অন্তরে-বাহিরে এলোমেলো বহিয়া যাইত, সে তাহা ভাবিয়া পাইত না; কিন্তু ইহার প্রতি ঝাপ্‌টায় তাহার সদ্যঃ-মুঞ্জরিত মুকুলগুলি নিঃশব্দে ছিন্ন হইতেছিল। এ কথা যেন তাহার অন্তর্য্যামী জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার কোনো দাবি নাই, অধিকার নাই, শুষ্ক পত্রের মত সে উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে বিবাহ করিয়া প্রকাশ, যে কত মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিল, সুরবালা তাহা অনুভব করিত না এমন নহে। বরঞ্চ সেই কৃতজ্ঞতার সুরই মনের ভিতর নিয়ত বাজিয়া এখন তাহার জীবন অসহ্য করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রকাশ তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে কলঙ্কের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য—সে শুধু অনুকম্পা ভিন্ন আর কিছু নয়। প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া স্কন্ধে তাহাকে কেহ আহ্বান করিয়া আনে নাই। সে কি স্বামীর তবে একটা বোঝার মত ঝুলিয়া আছে? ছি ছি কি লজ্জার কথা!

দিন কাটিতে লাগিল। তাহার স্ফূর্ত্তিহীন অনভ্যস্ত জীবনের অসুবিধাগুলি একে একে সহিয়া উঠিতেছিল। ক্ষুদ্রসংসারটিকে গুছাইয়া সাজাইয়া নিত্যকার কাজগুলি সে করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য দিন দিন নষ্ট হইতেছিল, সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। তাহার শরীর শীর্ণ, রক্তশূন্য হইয়া উঠিল, গাল দুটি বসিয়া গিয়াছিল।

প্রকাশ লক্ষ্য করিল। কহিল,—বড় কাহিল হ'য়ে পড়েছ, সুর। সুরবালা বলিল, না—ও কিছু নয়।

প্রকাশ সে কথা শুনিল না। বলিল,—তুমি বড় খাট্‌চ, এত খাট্‌লে হয়ত অসুখ ক'রে বস্‌বে।

সেই দিন প্রকাশ একটি ঝি সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিল।

সুরবালা স্থির করিয়াছিল, তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা স্বামাকে কোনমতে সে জানাইবে না। কিন্তু একদিন তাহাকে শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। সে-দিন সে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দুই হাতে মাথা চাপিয়া, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, আমি—মরি, আমি মরি—হে ঠাকুর, তাই কর।

প্রকাশ ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইল, ব্যবস্থামত ঔষধ দিল, পথ্য সেবন করাইল। তার পর একদিন কহিল, অনেক দিন হ'য়ে গেছে—শ্বশুর মহাশয়কে খবরও দিলাম না। একখানা চিঠি লিখে দেব কি?

সুরবালা বলিল,—না গো না। আমার জন্য কাউকে ব্যস্ত ক'র না। আমার কোন কষ্ট নেই। আমি বেশ আছি।

৭

একটি গলির ভিতর রামঠাকুরের হোটেল; রামঠাকুর দেখিতে বেঁটে, ভুঁড়ি প্রকাণ্ড। কাঁচাপাকা গোঁফগুলি ঝাঁটার কাটির মত খোঁচা খোঁচা। মাথার স্থূল শিখা যত পাপের গলায় দড়ি দিবার জন্য যেন কাঁধ অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দাড়িগুলি শক্ত, শনের মত—দীর্ঘ, পনর দিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধিলাভ করিয়া শেষে একদিন দেশোয়ালী নাপিতের ক্ষুরে সমূলে বিনষ্ট হইলে বাহিরের ঘরে একটা চৌকির উপর গণেশ ঠাকুরটির মত পেট হইয়া বসিয়া হুঁকা-হাতে সে খানকত চিত্রগুপ্তের খাতা নাড়াচাড়া করিত।

খাদ্যদ্রব্য লইয়া কেহ নালিশ করিলে রামঠাকুর তৎক্ষণাৎ হুঁকা নামাইয়া ডাকিত,—বিরাজ!

বিরাজ হোটেলের ঝি। বয়স বাইশ-তেইশ। দেখিতে শ্যামবর্ণ, দিব্য গোলগাল হাসিখুসি মুখ। চোখ দুটি ভাসা-ভাসা।

বিরাজ আসিলে হুঙ্কার দিয়া রামঠাকুর জিজ্ঞাসা করিত,—মাছ না-কি পচা?

ঝঙ্কার দিয়া বিরাজ উত্তর দিত—কোন্ মিন্‌সে বলে?

রামঠাকুর বলিত,—জিজ্ঞাসা কর না সরকার মশায়কে।

গালে হাত দিয়া বিরাজ বলিত, ও মা, বল কি গো,

সরকার মশায়! অমন তরতাজা মাছ। বলে, এতক্ষণ যে সাঁতার খেলে বেড়াচ্ছিল।

এমন সন্তরণশীল মাছ সম্বন্ধে আর প্রশ্ন মাত্র না করিয়া হাসিতে হাসিতে নালিশকারী চলিয়া গেলে, রাম-ঠাকুর বলিত—হা রে বিরাজ, ঝোলে দু কোয়া পিঁয়াজ ছাড়ে নি বুঝি?

বিরাজ কহিত, ছাড়বে না কেন? যত রদ্দি জিনিস বাজারে বিক্রি হয় না, সব তোমার হোটেলে। অত সস্তা খুঁজলে চলে না, সত্যি।

অমনে রাম-ঠাকুর ধমকাইত,—আরে থাম্ মাগী। সস্তা না হ'লে চৌদ্দটি মাত্র পয়সা দিয়ে জাহাজ বোঝাই চল্‌বে কেমন ক'রে? নে এক ছিলিম তামাক সাজ।

বেলা সবে আটটা। ইহারই মধ্যে হোটেলে লোকের ভিড় জমিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কনট্রাকটার সরক মুহুরি, দলে দলে আসিয়া জুটিল। তারপর চারি দিকে হট্টগোল-বিশৃঙ্খলা। যে যেখানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইতেছিল—সর্ষের তেল···সর্ষের তেল···অ বিরাজ সর্ষের তেল দেনা··· ঠাকুর, ভাত কামিনী, জল দে। পিচল উঠান লোকে ভরিয়া উঠিল। সকলেরই কাঁধে গামছা—কলের নীচে না হয় চৌবাচ্চার জলে কোন মতে একটিবার গা ভিজাইয়া একে একে বাহির হইয়া আসিতেছিল।

হেঁসেলে খাবার ঘরে, স্নানের জায়গায় সর্ব্বত্র বিরাজ চকির মত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।

—বলেচি বাবু এই আন্‌চে একটু সবুর কর, কামিনী আন্‌তে গেছে বাবু ঝোল নামলো বলে,···ওমা, তোমায় এখনো ভাত দেয় নি বুঝি···রোস, বলে আসি···অ ঠাকুর··· পাট কলের বাচনদার রাসু ঘোষ, বলিল, মাইরি বল্‌চি বিরাজ তুই একটু কাছে এসে বস। তোর কথাগুলি দিয়েই না হয় দু গেরাস ভাত মেখে খাই।

তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া বিরাজ হাসিয়া জবাব দিল, তা বাবু ওতে তোমার পেট ভর্‌বে না।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রত্যুত্তরে রাসু কি একটা রসিকতা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু বিরাজ দাঁড়াইল না। তাহার মরিবার ফুরসৎ ছিল না। ফিরিতেই বারান্দার এক পার্শ্বে প্রকাশ দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, অমন চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হয়, বাবু? পোড়া কপাল! দেখচ না? হোটেলের কাণ্ড! এস আমার সঙ্গে। তোমার একখানা জায়গা ক'রে দি।

যে ঘরে লোকের ভিড় কম সেই ঘরে এক প্রান্তে একটি ঠাঁই করিয়া সে প্রকাশকে বসাইয়া দিল। ঠাকুর ভাত আনিয়া সাম্‌নে রাখিলে সে বলিল, ধীরে সুস্থে খাও, বাবু। রৈলই বা আপিস—অ ঠাকুর, আরো দুটিখানি ভাজা এনে দাও। তুমি ব'সে খাও বাবু, আমি ততক্ষণ একবার চট ক'রে দেখে শুনে আসি।

বিরাজ পোঁ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রাসু ঘোষ আঁচাইয়া কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছিতেছিল। বিরাজকে দেখিয়া কহিল, হাঁ রে বিরাজ, তুই কি আমাদের হোটেল ছাড়া না ক'রে ছাড়্‌বি না? খেয়ে উঠে পানটুকু পর্য্যন্ত পাব না? হা পিত্যেস ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে না কি?

মুখ ভারি করিয়া বিরাজ বলিল, পানটিও কি আমায় এনে দিতে হবে? জানই ত ওই ঘরে পান সাজা রয়েচে। দুটো পান তুলে নিলেই ত পার।

রাসু চটিয়া বলিল, সবই যদি নিজেদের ক'রে নিতে হবে তা হ'লে তুই আছিস্ কেন রে মাগী?

বিরাজ ফোঁস করিয়া উঠিল,—দেখ রাসু-বাবু, গাল মন্দ কর না বল্‌চি। ভাল হবে না।

রাসু জল হইয়া গেল। সে তাহার দুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, দোহাই বিরাজ, রাগ করিস্ নি।

তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া, একটু দুষ্ট হাস হাসিয়া বিরাজ বিদ্যুৎ চমকের মত চলিয়া গেল। উঠানে কামিনীকে দুটা হুকুম দিয়া, রান্নাঘরে ঠাকুরকে কি করিতে বলিয়া প্রকাশের কাছে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

—বেশ যা হোক! এরি মধ্যে খাওয়া সেরে ফেল্লে?

জলের গেলাস তুলিয়া লইয়া প্রকাশ কহিল, তাড়াতাড়ি করিনি, বিরাজ।

বিরাজ কহিল,—কি দিয়েচে না দিয়েচে দেখলাম না! পেট ভরল ত বাবু?

—হ্যাঁ।

—তা হোক। টক নেমেচে। একটু বস বাবু—আন্‌তে ব'লে দিয়েচি, বলিয়া বিরাজ সেইখানে বসিয়া পড়িল।

—বৌ কেমন আছে, বাবু? ডাক্তার এসেছিল?

—না, কাল আস্‌বে।

বিরাজ বলিতে লাগিল, আমার ছোট বোন্‌টির অমনি এক শক্ত ব্যারাম হয়েছিল। আমরা তখন কাশীতে থাকি। ডাক্তার কবিরাজ ত এক রকম জবাবই দিয়েছিল। মণিকর্ণিকার ঘাটে এক সন্ন্যাসী ঠাকুর থাক্‌ত—কারু সঙ্গে কথা কইত না। মা তার কাছে গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়ল। অনেক হাতে-পায়ে ধর্‌বার পর একদিন আমাদের বাড়ী এসে কমণ্ডলু থেকে গড়িয়ে একটু জল বোনকে খেতে দিলে। কি বলব আশ্চর্য্য কাণ্ড! সেই দিন থেকে বোন আরাম হতে লাগ্‌ল।

রাম-ঠাকুরের গলার আওয়াজ শোনা গেল—বিরাজ তামাক দে।

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্বালাতন! দুই দণ্ডও কি কোথাও বসিয়া থাকিবার জো আছে?

—এই নাও বাবু, হাতে ক'রে রাখ। এর পর তোমার হয় ত মনেই থাক্‌বে না, বলিয়া আলগোছে দুইটা পান প্রকাশের হাতে দিয়া বিরাজ চলিয়া গেল।

প্রকাশ বাহিরে চলিয়া আসিতেছিল এমন সময় রাম-ঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া বলিল—বাবুর দেখ্‌চি কিছু বাকী পড়েচে। এখন কয়েকটা টাকা দিলে হত না?

প্রকাশ কহিল,—এখন ত আমার হাতে কিছু নাই রাম-ঠাকুর। আর কয়েক দিন সবুর কর।

কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিয়া রাম-ঠাকুর বলিতে লাগিল, কি জানেন বাবু, আমার হচ্চে মাছের তেলে মাছ ভাজা। আপনাদের টাকা নিয়ে আপনাদের খাওয়াব। যোল টাকা আপনার কাছে প'ড়ে থাকাও যা, আর আমার ঐ সিন্ধুকে থাকাও তা।

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম-ঠাকুর বলিল,—খরচ-পত্র ত কম নয়, বাবু। আপনারা না দিলে আমার সাধ্য কি এত সব খরচ চালাই। এই ধরুন, বাড়ী ভাড়া পঞ্চাশটি ক'রে টাকা—মাসের পহেলা তারিখে গণে দিতে। তারপর বিরাজের মাহিনা সাত টাকা—

বিরাজ বলিয়া উঠিল, ওমা সাত টাকা আবার কবে দিলে?

রাম-ঠাকুর ধমক দিল,—তুই চুপ কর। তারপর কহিল, আমার ত বাবু জমিদারি তালুকদারি নেই যে, তাই থেকে হোটেল চালাব। আপনাদের দয়ার উপর নির্ভর। কিন্তু এও বলিব বাবু, রাম-ঠাকুর ভাল মানুষ—খদ্দের টাকা দিতে সবুর করে, রাম-ঠাকুর খাওয়াতে সবুর করে না। কিন্তু আর কোন হোটেল হলে অন্য রকম ব্যবস্থা হত।

অপমানে প্রকাশ মরিয়া গেল।

—দু-দিন অপেক্ষা কর ঠাকুর। তারপর যেমন ক'রে হোক তোমার টাকা মিটিয়ে দেব, বলিয়া আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ

সম্পাদকের চিঠি

কয়েক দিন হইল, আমার বয়স আরও এক বৎসর বাড়িয়াছে এবং আমি মৃত্যুর দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়াছি। আমার জীবনের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন জীবনের অতীত কালের নানা ঘটনা ও অবস্থার কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ শিলচরে সুরমা সাহিত্য-সম্মিলনীতে যে রাজনৈতিক প্রস্তাবটি আলোচিত হইতে দি নাই, তাহার বিষয় মনে পড়িল। মনে হইল, সাহিত্যবিষয়ক সভাতে রাজনৈতিক কোন প্রস্তাবের আলোচনা সাধারণতঃ অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক বটে, কিন্তু রাজনীতি যদি সাহিত্যকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সাহিত্যের অবশ্যই থাকা উচিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের
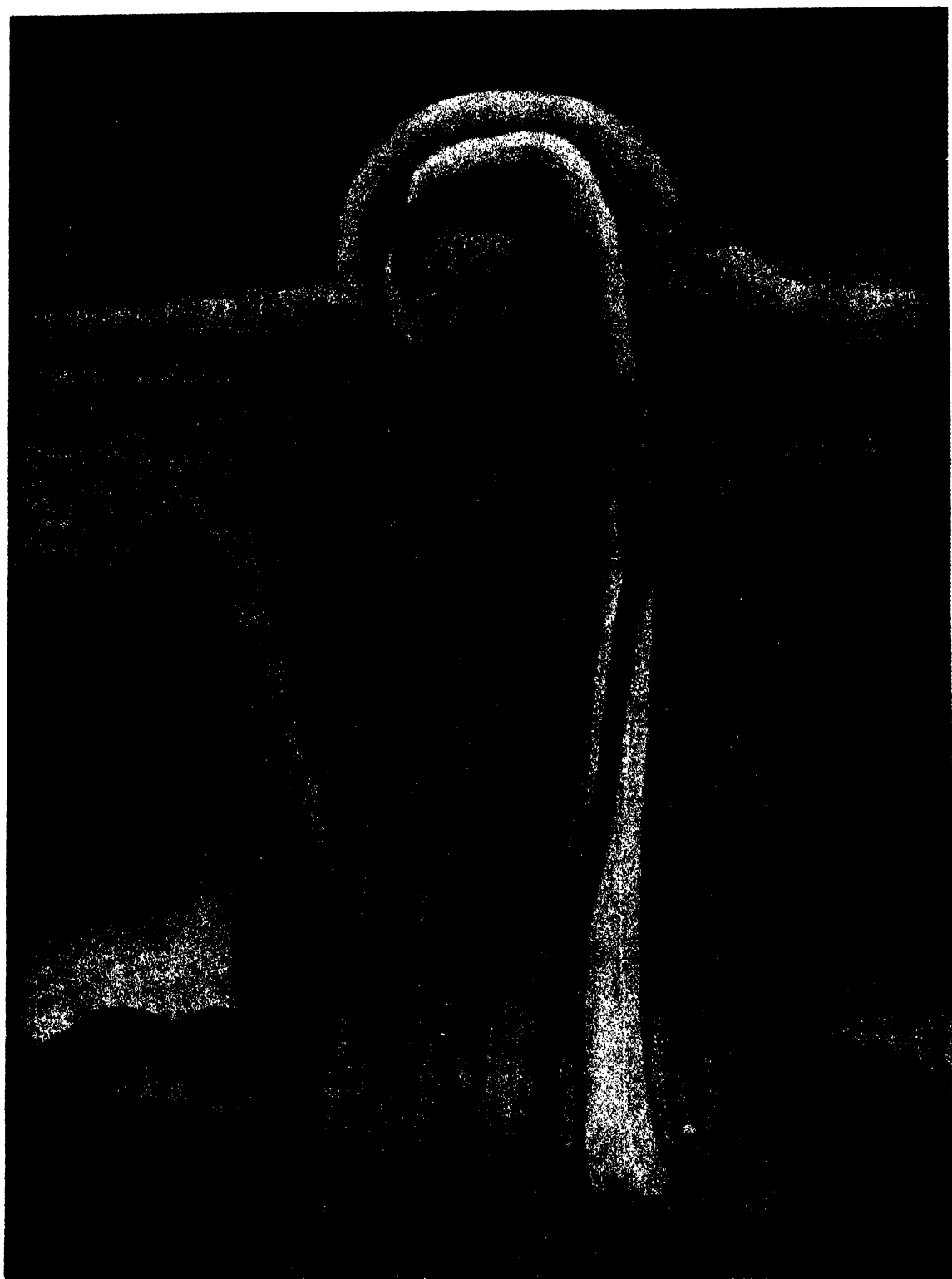
যীশু খৃষ্ট

শিল্পী শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

দাবী' রাজনৈতিক বহি বটে কি না, জানি না, তাহার আলোচনারও প্রয়োজন নাই ; কিন্তু গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক উহা রাজনৈতিক কারণেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এবং বিনা প্রকাশ্য বিচারে উহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। সাহিত্যের উপর গবর্মেণ্টের এই অবিচারিত আক্রমণের প্রতিবাদ সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে হওয়া সঙ্গত। আমি যখন সুরমা সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রতিবাদটি আলোচিত হইতে দি নাই, তখন এই যুক্তি আমার মনে উদিত হয় নাই ; সাহিত্যসভায় রাজনৈতিক প্রস্তাবের আলোচনা হওয়া অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক, এই সাধারণ নীতি অনুসারেই আমি প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়াছিলাম। এখন যে যুক্তির উল্লেখ করিলাম, তখন তাহা মনে আসিলে এই মীমাংসা করিতাম, যে, প্রতিবাদটির আলোচনা সম্মিলনীর সভায় হইতে পারিবে, আলোচনা বা ভোটপ্রদানের সময় সরকারী কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে সভা হইতে অনুপস্থিত থাকিতে বা ভোট না দিতে পারেন। এখন আমি যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে আমার ভ্রম হইয়াছিল মনে হইতেছে। তাহার প্রতিকার করিবার সাধ্য এখন আমার নাই কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে আমার বর্ত্তমান মত প্রকাশ করিলাম।

ঠিক সংবাদ যথাসময়ে না পাওয়ায় আমার অন্য একটি বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছে, তাহা শিলচরে বুঝিতে পারি। গত বৎসর প্রবাসীর এক সংখ্যায় শ্রীহট্টের শশীমোহন দে নামক এক যুবককে নারীর সম্মানরক্ষক বীর বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলাম। শিলচরে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারি। উহা অপ্রকাশিত। ঐ প্রশংসা প্রত্যাহার করিতেছি।

শ্রীহট্ট দর্শন সম্বন্ধে গত মাসের চিঠিতে একটা কথা বলা হয় নাই। তাহাতে অনেকে কৌতুক বোধ করিতে পারেন, এইজন্য বলিতেছি। যখন মুরারিচাঁদ কলেজ দেখিতে যাই, তখন সিঁড়ি বাহিয়া টিলার উপর উঠিয়া ওয়েল্‌শ্‌ প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের খাস্‌ কামরার দিকে অগ্রসর হইবার আগে সঙ্গের ছাত্রটি তাঁহাকে খবর দেওয়ায় তিনি সৌজন্যের সহিত বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাকে দেখিয়াই হাসিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, "আমার ধারণা ছিল আপনি ইয়ং ম্যান্ (যুবা পুরুষ)।" আমিও ইংরেজীতে বলিলাম, "তা যে নই, তা ত দেখিতেই পাইতেছেন।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কেবল মডার্ণ রিভিউ পড়িয়া আপনার সম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা হইয়াছে, অন্য কোন রকমে ত আপনাকে জানিতাম না।" মডার্ণ রিভিউ পড়িয়া কেন তাঁহার আমাকে ছোক্‌রা মানুষ মনে হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

কুমিল্লা দর্শনের বৃত্তান্ত হইতেও একটি কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। সেখানকার টাউন হলে ভদ্রমহোদয়েরা স্থানীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমার প্রতি প্রীতি জ্ঞাপন করেন। আমিও উত্তরে কিছু বলি। পরিষদ অনেক পুরাতন পুঁথি ও গান প্রভৃতি সংগ্রহ এবং কিছু মুদ্রিত করিয়াছেন। টাউনহলটি স্বাধীন ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। তথায় তাঁহার নিজের আঁকা নিজের একটি উৎকৃষ্ট তৈলচিত্র আছে। চিত্রবিদ্যায় তাঁহার নৈপুণ্য ছিল এবং বিদ্যোৎসাহীও তিনি ছিলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার ইহা একটি বিশেষত্ব, যে, তথাকার রাজকীয় সমুদয় কাজকর্ম্মের ভাষা বাংলা। বাংলার এই আদর অন্য কোথাও নাই। থাকিবেই বা কেমন করিয়া? বঙ্গে মোটে দুটি দেশী রাজ্য আছে ; তাহার মধ্যে কুচবেহারের রাজপরিবার অতিরিক্ত রকম বিদেশীভাবাপন্ন।

পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি জায়গা দেখিয়া আসিবার পর আমাকে লাহোর যাইতে হইয়াছিল। তথাকার ব্রাহ্ম-সমাজের দুই জন পরলোকগত ভক্ত ও কর্ম্মী ভাই লালা কাশীরাম ও বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্থানীয় ব্রাহ্মেরা বাহিরের কোন লোকের দ্বারা বৎসরে অন্যূন দুটি বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বক্তৃতাগুলি উক্ত দুই মহাশয়ের নামে অভিহিত হয়। এ বৎসর বক্তৃতা করিবার ভার আমার উপর পড়ে। মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমি লাহোর গিয়া ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। লিখিত দুটি বক্তৃতা পাঠ করি। একটির বিষয় ছিল, আধুনিক ভারতবর্ষে ধর্ম্মসংস্কারের অগ্রণী (রামমোহন রায়) ; অন্যটির, আধুনিক ভারতবর্ষের

প্রথম জাতিগঠনকারী (রামমোহন রায়)। তা ছাড়া, মৌখিক আর একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম ব্রাহ্মসমাজ ও জাতিগঠন বিষয়ে। রাজনৈতিক বক্তৃতা ভারতভৃত্য সমিতির লাহোর শাখার উদ্যোগে করিয়াছিলাম। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে সভাপতি ও লাহোরের নেতৃস্থানীয় অন্য কোন কোন পঞ্জাবী ভদ্রলোক উহা আমাকে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। সময়ের অভাবে তাহা এখনও করিতে পারি নাই। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মমন্দিরে রবিবারে ভাই সীতারাম উপাসনা করিবার পর ইংরেজীতে ধর্ম্মবিষয়ক একটি ব্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল।

আগন্তুক কেহ কোথাও গেলে, সকলের সহিত না হউক, অন্তত পূর্ব্বপরিচিত সকলের সহিত বাড়ী গিয়া দেখা করা তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু যে কাজে কোথাও যাওয়া হয়, তাহা করিয়া যথেষ্ট সময় না থাকিলে এবং পরিচিতের সংখ্যা অধিক হইলে আগন্তুকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে এই কর্ত্তব্য পালন হইয়া উঠে না। অপরিচিত সকলের সহিত সাক্ষাৎ করা সাধ্যাতীত। এইজন্য সভা আহ্বান করিয়া আগন্তুকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের রীতি আছে। আমার অন্য বক্তৃতাগুলিতে লাহোরের সর্ব্বসাধারণের সহিত সামান্য পরিচয়ের সুযোগ ছিল। তদ্ভিন্ন সনাতন ধর্ম্ম কলেজ গৃহে বিশেষ করিয়া বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের একটি সভা হয়। তাহাতে সঙ্গীত ও বক্তৃতা হয়। লাহোরের শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকা ট্রিবিউনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি কিছু বলিবার পর আমি কিছু বলি। উভয়েই বাংলায়।

আঠার বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার লাহোর গিয়াছিলাম, একটি রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে। তখন লাহোরের দ্রষ্টব্য প্রধান প্রধান প্রাচীন ও আধুনিক উদ্যান, দুর্গ, মসজিদ, সমাধিমন্দির প্রভৃতি দেখিয়াছিলাম। এবার দর্শনের কাজটা প্রায় কিছুই হয় নাই। তথাপি কিছু দেখিয়াছিলাম। দয়ানন্দ এংলো-বেদিক কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পণ্ডিত দেওয়ান চাঁদ শর্ম্মার আহ্বানে তাঁহাদের কলেজ দেখিতে যাই। কলেজটি সুবৃহৎ; আর্য্য সমাজের এক শাখার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত। তাহার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বিষয়ে গবেষণার আয়োজন উৎকৃষ্ট। লাইব্রেরীতে বিস্তর প্রাচীন পুঁথি ও আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, এবং অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজ উৎসাহের সহিত চলিতেছে। এই কলেজের বৃহৎ স্কুলটিও দেখিলাম। কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সমক্ষে বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল। একজন অধ্যাপক আমাকে পরিচিত করিয়া দিবার নিমিত্ত কিছু বলিয়াছিলেন। এই কলেজে তখন ছেলেদের পরীক্ষা চলিতেছিল। তাহা উপলক্ষ্য করিয়া পরীক্ষার অব্যবহতা প্রসঙ্গে বলি, যে, এখনও কখন কখন স্বপ্ন দেখি, যে, কাল পরীক্ষা হইবে অথচ গণিতের কিছুই শেখা হয় নাই; ভয়ে ঘুম ভাঙিয়া যায়, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি। কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত স্বপ্নে আমার এই গণিতাতঙ্কের গল্প শুনিয়া শ্রোতারা হাসিয়াছিলেন। অধ্যাপক শর্ম্মা একদিন অপরাহ্নে তাঁহার বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কয়েক জন সাংবাদিক ও অধ্যাপকের সহিত তথায় পরিচয় হয়।

লাহোরে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের অল্পাধিক সজীব ভাব দেখিলাম। ভারতীয়দের মধ্যে আর্য্য সমাজের লোকদের আয়োজন ও উদ্যোগিতাই বেশী মনে হইল। কিন্তু মুসলমান, সনাতনধর্ম্মী, দেবসমাজী, ব্রাহ্ম—সকলেরই নিজের নিজের কলেজ ও ছাত্রাবাস আছে। তা ছাড়া ফর্ম্যান ক্রিশ্চান কলেজ ও গবর্ন্মেণ্ট কলেজ আছে। ব্রাহ্ম সমাজের কলেজ সর্দ্দার দয়াল সিংহের দানে স্থাপিত ও চালিত হয়। বেশ বড় কলেজ। উহার নিজের কলেজ-গৃহ ও স্কুল-গৃহ আছে। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ উহা দেখিতে আহ্বান করায় দেখিতে গিয়াছিলাম। লাইব্রেরী ও বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীগুলি উৎকৃষ্ট। প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুত হেমরাজ সৌজন্যের সহিত আমাকে দর্শনীয় সব-কিছু দেখাইলেন। তিনি অল্পভাষী মানুষ। পঞ্জাবী ও বাঙ্গালীদের মুখে শুনিলাম, লাহোরে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ গণিতাধ্যাপক। কলেজের অন্যতম ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত সুন্দরদাস সূরী আমাকে ছাত্রাবাসগুলি দেখাইলেন। সেগুলি বৃহৎ ব্যাপার। প্রত্যেক ছাত্রের এক একটি আলাদা কামরা। তা ছাড়া খেলিবার খুব প্রশস্ত কয়েকটি জায়গা আছে। এই

কলেজে একটি নূতন জিনিষ দেখিলাম। একটি খোলা জায়গায় অভিনয় বা বক্তৃতার জন্য একটি পাকা মঞ্চ আছে। তাহার সম্মুখে গ্যালারীর মত পাকা বাঁধান ক্রমোচ্চ বসিবার জায়গা। এখানে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। ছাদ নাই। রৌদ্রের সময় সামিয়ানা টাঙান হয়, অন্য সময় আকাশই চন্দ্রাতপ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই কলেজে মিস্টার রিচার্ডস্ নামক একজন য়ুনিটেরিয়ান্ বা একেশ্বরবাদী বিদ্বান অধ্যাপক ছিলেন। এখন তিনি পরলোকে। তাঁহার স্ত্রী বিদুষী শ্রীমতী নোরা রিচার্ডস্ ভারতবর্ষকে মাতৃভূমিস্থানীয় করিয়া পঞ্জাবে বাস করেন। এই দম্পতি, বিশেষতঃ শ্রীমতী নোরা, উৎকৃষ্ট নাটক অভিনয়কে ছাত্রদের শিক্ষা, আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের অন্যতম উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া অভিনয়োৎসাহী ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে পূর্ব্বোক্ত মুক্ত বাচনালয়টি নির্ম্মিত হয়। এখানে দয়াল সিং কলেজের ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া আমাকে কিছু বলিতে হইয়াছিল। আর একবার এইখানে কয়েক মিনিটের জন্য আসিয়াছিলাম। উপলক্ষ্য—আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ তদ্বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক। সভাপতি ও বিচারক ছিলেন ভূতপূর্ব্ব কমিশনার রাজা নরিন্দ্রনাথ। বিরুদ্ধবাদী প্রথম ছাত্রটির বক্তৃতার পরই আমি সভাপতির অনুমতি লইয়া চলিয়া আসি। ছেলেটির উচ্চারণ ভাল নয়; কিন্তু জনতা-উন্মাদক রকমের উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাগ্মিতা কিছু আছে। দয়াল সিং কলেজের একেশ্বরবাদী ছাত্রদের ক্লাবেও আমাকে কিছু বলিতে হইয়াছিল। এই কলেজে আরও একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম কি না মনে পড়িতেছে না।

দয়াল সিং কলেজ দেখাইবার সময় একজন পঞ্জাবী ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পঞ্জাবী ছাত্রেরা বাঙালী ছাত্রদের চেয়ে সুস্থ ও বলিষ্ঠ নহে কি?' এরূপ প্রশ্নের হঠাৎ উত্তর দেওয়া কঠিন। "বোধ হয় তাহাই হইবে," কিম্বা "হইতে পারে", এইরূপ কিছু উত্তর দিয়া আমি বলিলাম, "বাঙালী ছেলেরাও ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে।" বস্তুতঃ, পঞ্জাবী ছাত্রদিগের অধিকতর সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা আমার চোখে সুস্পষ্ট ঠ্যাকে নাই। যে-জাতির দুর্ব্বল বলিয়া অখ্যাতি আছে, সেই জাতীয় একজন আগন্তুককে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা শিষ্টাচার-সম্মত কি না, আমার সন্দেহ হইয়াছিল। পরে এই বিষয়ে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হওয়ায় তিনি বলিলেন, "আপনি কেন বলিলেন না, আপনারা সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইলেও আমাদেরই মত পরাধীন?"

শীর্ণ একজন মানুষ যদি খোলা গায়ে কিম্বা একটা গেঞ্জি বা সরু পাঞ্জাবী পরিয়া খালি মাথায় থাকে, তাহাকে যতটা দুর্ব্বল মনে হইবে, সেই মানুষই যদি কামিজ কোট প্যাণ্টালুন পরে ও মাথায় পাগড়ী বাঁধে, তাহাকে ততটা দুর্ব্বল দেখায় না; অন্যে তাহাকে অধিক সম্ভ্রম করে। নিজেকে পরিচ্ছদপরিহিত অবস্থায় পাগ্‌ড়ী মাথায় দেখিতে অভ্যস্ত হইলে নিজের দৈহিক বলের প্রতি অশ্রদ্ধাও কমিয়া আসিতে পারে। ইহা এক প্রকার পরোক্ষ অটো-সাজেশ্চ্যান্, অর্থাৎ নিজের স্বাস্থ্য বলিষ্ঠতা ও সাহস সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস উৎপাদনের উপায়। বাঙালীদের এতটা অর্দ্ধনগ্নতা ভাল কি না, বিবেচ্য। হাজার হাজার পঞ্জাবী ছাত্র ও বাঙালী ছাত্রের স্বাস্থ্য ও বলের পরীক্ষা একই মান অনুসারে হইলে তবে একটা আপেক্ষিক বিচার হইতে পারে। কিন্তু এই আপেক্ষিক বিচারে পঞ্জাবী বা বাঙালী কাহারও জয়পরাজয়ে সন্তোষের কোন কারণ নাই। লাহোরের দয়ানন্দ এ্যংলো বেদিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বক্‌শীরাম মহাশয় আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলেন, আজকালকার ছেলেরা স্বাস্থ্য ও বলে তাহাদের পূর্ব্বগদের চেয়ে নিকৃষ্ট। সমগ্র ভারতীয়জাতিব্যাপী এই দৈহিক অবনতির প্রতিকার হইলে তবে তাহা সন্তোষের বিষয় হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আঠার বৎসর পূর্ব্বে এক রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় সাফাই সাক্ষী হইয়া লাহোর যাই। কোনও বিশিষ্ট পঞ্জাবী ভদ্রলোক, "আপনি আগে আর কখনও লাহোর আসিয়াছিলেন কি" জিজ্ঞাসা করায় ঐ কথা বলি, এবং বলি, যে, অভিযুক্ত লালা লালচাঁদ ফলক গরীব বলিয়া তাঁহার পক্ষে কোন উকীল মোক্তার ছিল না। তাহাতে তিনি বলেন, যে, এখনও রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় অভিযুক্তেরা টাকা দিলেও পঞ্জাবে সহজে

উকীল ব্যারিষ্টার পায় না। ইহা সত্য হইলে, পঞ্জাবের এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের এরূপ মানসিক দৌর্ব্বল্য দুঃখের বিষয়।

কারণ যাহাই হউক, নগদ টাকা বেশী বেশী দান করার যত দৃষ্টান্ত পঞ্জাবে দেখা যায়, বাংলায় তাহা দেখা যায় না। বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার ও ধনীদের মধ্যে ২।৪ জন যেরূপ দান করিয়াছেন, পঞ্জাবে অবিখ্যাত এবং বিশেষ ধনী নহেন, এরূপ অনেক লোক সেরূপ ও তার চেয়ে বেশী দান করিয়াছেন। তথাকার সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন ফর্ম্যান্ কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বলিলেন, "এখানকার এক এক কলেজের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত সৎকাজের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ৪।৫।৭।৮ শত টাকা অনায়াসে তুলিয়া ফেলে।" লালা সুন্দরদাস সূরী বলিলেন, "এখানে সৎকাজের জন্য টাকা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই পাওয়া যায়"।

দানবীর স্বর্গীয় লালা স্যার্ গঙ্গারামের কয়েকটি কীর্ত্তি দেখিলাম। সমুদয় প্রতিষ্ঠানেরই বাড়ীঘর জমী নিজের। একটি বিধবাদের আশ্রম। সুন্দর দুতলা বাড়ী, সংলগ্ন বাগান আছে। এখানে আশীটি হিন্দু বিধবা বাস করে এবং সাধারণ লেখাপড়া ও কোন কোন পণ্যশিল্প শিখে। ইহার সহিত বিধবাদের বিবাহ দিবার চেষ্টার কোন সম্বন্ধ নাই। সমস্ত আশ্রমটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। যে কামরাগুলিতে বিধবারা থাকে, সেগুলিতে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা আছে। লালা গঙ্গারামের ইচ্ছা অনুসারে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহার মনের ভাব এই ছিল, যে, বিধবারা যেন মনে না করে, যে, তাহারা কাহারও তাচ্ছিল্যমিশ্রিত অনুগ্রহে গ্রাসাচ্ছাদন পাইতেছে। তাঁহার নিজের কন্যাদের সমান আরামে তাহাদিগকে রাখিবার ইচ্ছা প্রযুক্ত এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। বিধবাশ্রমটির কোথাও তাঁহার নাম নাই। তাঁহার বন্ধুরা বলিয়াছিলেন, আপনার না হউক অন্তত আপনার জননীর নামে এই আশ্রমটির নাম রাখুন। তিনি তাহাতেও সম্মত হন নাই। কেবল ইংরেজীতে মর্ম্মরফলকে লেখা আছে, "Given by one who felt for the widow", "বিধবার জনৈক ব্যথার ব্যথীর প্রদত্ত।" আশীটি বিধবা ছাত্রীর প্রত্যেকে বার টাকা করিয়া সরকারী বৃত্তি পায়। দেউলিয়া বাংলা গবর্মেণ্টের এরূপ সদিচ্ছার কোন প্রমাণ নাই; সদিচ্ছা থাকিলেও মেস্টন্ য়্যাওয়ার্ড নামক বঙ্গলুণ্ঠন-ব্যবস্থা সেরূপ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিবে না। লালা গঙ্গারামের প্রতিষ্ঠিত আর-একটি প্রতিষ্ঠানে কুমারী, সধবা, বিধবা সব রকমের নানা বয়সের অনেক মেয়ে নানাবিধ পণ্যশিল্প শিখে। তাহা খুব একটা সংকীর্ণ অপরিষ্কার গলিতে স্থিত; কিন্তু বাড়ীটি ভিতরে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উভয় স্থানেই প্রধান শিক্ষয়িত্রীরা মেয়েদের হাতের নানারকম সুন্দর কাজ দেখাইলেন। আর-একটি প্রতিষ্ঠানের নাম অপহজ আশ্রম। ইহা পুরাতন রাবী নদীর পরপারে সহরের বাহিরে প্রশস্ত বাগানের মধ্যে স্থিত। এখানে অধিক বয়স বা রোগে অসমর্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আলাদা আলাদা বিভাগে বাস করে, স্বাভাবিক কারণে অসমর্থ শিশুদেরও রাখা হয়। ঘরবাড়ী সব পাকা, আলোবাতাসের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত হইয়া আছে, বৈদ্যুতিক শক্তি যোগাইবার কারখানার সহিত যোগ হইলেই আলো হইবে ও পাখা চলিবে। সাদাসিধা অথচ বেশ পুষ্টিকর খাদ্য এই অপহজ আশ্রমের লোকদিগকে দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ তাহা আমাকে দেখাইলেন। অধ্যক্ষের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী ইহার হাতার মধ্যেই আছে। শ্রীযুক্ত লাজপৎ রায় সহনী স্যার গঙ্গারামের প্রতিষ্ঠানগুলি আমাকে দেখাইলেন। বাড়ীতে যেমন, তেমনি লাহোরেও প্রায় দুপর একটার সময় খাইতাম। স্নান-আহারের পূর্ব্বে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান দেখিতে যাই; এইজন্য সব জায়গাতেই তাড়াতাড়ি করিতেছিলাম। ভারতীয় আতিথেয়তার প্রমাণ তিন জায়গাতেই পাইলাম। আমার স্নানাহার হয় নাই, সহনী মহাশয়ের মুখে শুনিয়া প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষয়িত্রীদ্বয় এবং অপহজ আশ্রমের অধ্যক্ষ, প্রত্যেকেই আমাকে স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিলেন।

পঞ্জাবে পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বাংলার চেয়ে দ্রুততরবেগে হইতেছে।

লাহোরে যাহা দেখিলাম এবং পঞ্জাবের অন্য সব জায়গার বিষয় যেরূপ পড়ি, তাহাতে পঞ্জাবকে বাংলাদেশের

চেয়ে কম দারিদ্র্যগ্রস্ত মনে হইল। চালচলন ও পরিচ্ছদে পঞ্জাবের পুরুষেরা বাঙালীর চেয়ে অনেক বেশী পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইয়াছে। বিস্তর অশিক্ষিত লোকে পর্য্যন্ত গলা-বুক-খোলা কোট পরে এবং অনেকে কলার-নেকটাই ব্যবহার করে; ইংরেজী-জানা লোকদের ত কথাই নাই। হ্যাটও অনেকে পরে, তবে পাগড়ীর চলন এখনও বেশী আছে। পঞ্জাবী ফ্যাশনেব্‌ল্‌ মেয়েদের মধ্যে বব্‌ড্‌ হেয়ার অর্থাৎ ঘাড়ের কাছে ছাঁটা চুলের চলন যতটা হইয়াছে, ফ্যাশনেব্‌ল বাঙালী মেয়েদের মধ্যে ততটা হয় নাই—ততটা কেন, প্রাপ্তবয়স্কা বাঙালী মেয়ের একজন ছাড়া আর কাহারও এরূপ চুল আমার চোখে পড়ে নাই।

পঞ্জাবীরা বাঙালীর চেয়ে বেশী কেজো ও কম ভাব-প্রবণ, তাহা পঞ্জাবের সামান্য অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝা যায়।

পঞ্জাবে কোন কোন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে মেয়েদের যে পা-জামা পরার রীতি আছে, তাহা আমাদের. কদাকার মনে হয়।

বাংলা অপেক্ষা পঞ্জাব অনেক পরে ইংরেজদের দখলে আসে। সেইজন্য শাসনের কল চালাইবার নিমিত্ত প্রথম প্রথম বিস্তর বাঙালী পঞ্জাবে চাকরী পাইয়াছিল, ওকালতী প্রভৃতিও অনেকে করিত। এখন সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। আমি সকলকে চিনি না, কিন্তু রাজকার্য্যে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ বাঙালী বোধ হয় এখন সামান্যই আছে। অধ্যাপকের কাজে বাঙালীর সর্ব্বত্র খ্যাতি আছে। লাহোরে এখন বাঙালী অধ্যাপকের সংখ্যাও কম। ফর্ম্ম্যান্‌ কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি। দয়ালসিং কলেজে আমি দেখিয়াছিলাম, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল, অধ্যাপক কিশোরীমোহন মৈত্র, অধ্যাপক শ্রীমান্‌ অমলকুমার সিদ্ধান্ত ও অধ্যাপক তাপসকুমার দত্তকে। অধ্যাপক মৈত্রের বিশেষত্ব এই, যে, তিনি ফারসী ও আরবীর অধ্যাপক। দয়ানন্দ কলেজে বোধ হয় কেবল একজন বাঙালী অধ্যাপক আছেন—নাম ক্ষেত্র-মোহন (?) ঘোষ। লাহোরে গল্প শুনিয়াছিলাম, শিক্ষা বিভাগের একজন বাঙালী-বিদ্বেষী ইংরেজ ডিরেক্টর উক্ত কলেজ দেখিতে আসিয়া ঘোষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি এখানে কেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "আপনার আগমন যে উদ্দেশ্যে"—অর্থাৎ টাকা রোজগারের জন্য। তাহাতে ইংরেজ বাহাদুর আর মুখ খুলেন নাই। দয়ানন্দ কলেজের বর্ত্তমান অনেক অধ্যাপক ঘোষ মহাশয়ের নিকট গণিত শিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক উপেন্দ্র-নাথ বলের বাড়ীতে একদিন জলযোগের নিমন্ত্রণ ছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, অধ্যাপক শর্ম্মার বাড়ীতে এবং সেখানে বক্তৃতা করিতে হয় নাই। মেয়োস্কুল অব্‌ আর্টসে চিত্র-শিল্পী শ্রীমান্‌ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অধ্যাপক আছেন। যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতি হইলে বলিতে হয়, ইঁহার এই শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যালের পদ পাইবার যোগ্যতা আছে। শ্রীমান্‌ প্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী সরকারী রেলওয়ের ডেপুটি চীফ অডিটারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ট্রিবিউনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের নাম আগেই করিয়াছি। মান্দ্রাজে সমগ্র ভারতের দেশী সম্পা-দকদের যে কন্‌ফারেন্স হইবার কথা ছিল, কালীনাথ-বাবু প্রথমে তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইহা হইতেই তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সাক্ষাৎভাবে পঞ্জাবের এবং পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের জনমতগঠনে টিবিউনের প্রভাব অনুভূত হয়। লাহোরের হিন্দু হেরাল্ড নামক অন্য একটি ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদক বাঙালী—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন (?) চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার সম্পাদকতায় এই কাগজের কাটতি বাড়িতেছে শুনিলাম।

বাঙালীর যাহাতে লজ্জা ও অপমান বোধ হওয়া উচিত, এরূপ একটি দুঃসংবাদ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের নিকট শুনিলাম। লাহোরে ও পঞ্জাবের অন্যত্র বিধবা বিবাহের ওজুহাতে একদল দুষ্ট লোক বাঙালী স্ত্রীলোককে পণ্য দ্রব্যের মত কেনা বেচা করিতেছে। দাস গুপ্ত মহাশয়ের নিকট ইহার প্রমাণ আছে।

লাহোরে সর্ব্বসাধারণের জন্য যে গ্রন্থালয় নির্ম্মিত হইতেছে তাহা অতি উৎকৃষ্ট। অট্টালিকাটির সংলগ্ন বাগান থাকিবে। পুরুষদের, মহিলাদের ও ছেলে-মেয়েদের আলাদা আলাদা বৃহৎ পড়িবার হল নির্ম্মিত হইতেছে। কলিকাতায় এরূপ কিছুই নাই।

লালা লাজপৎ রায়ের প্রতিষ্ঠিত জনভৃত্য সমিতি (Servant of the People Society) একটি লোকহিত সাধক প্রতিষ্ঠান। নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও সময় অভাবে উহা দেখিতে যাইতে পারি নাই। বঙ্গে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

লাহোরে থাকিতে অমৃতসর ও রাওয়ালপিণ্ডি যাইবার এবং জালন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয় দেখিবার আহ্বান আসে, কিন্তু সময় অভাবে যাইতে পারি নাই।

ফিরিবার মুখে এলাহাবাদে নামিয়া এক রাজনৈতিক বক্তৃতা করি। তাহাতে একটি ছাত্র সভাপতি হইয়াছিলেন। এলাহাবাদে আমি তের বৎসর ছিলাম বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

লাহোর হইতে ফিরিয়া মৈমনসিংহ গিয়াছিলাম, তাহা গত মাসের কাগজে লিখিয়াছি। সেখানে যাইবার সময় জাহাজে একটি খুব সম্ভাব্যতাপূর্ণ লক্ষণ দেখিলাম—হিন্দুসভার অনেক সভ্য "অস্পৃশ্য"কে স্পৃশ্য ত করিয়াছেন, "অভক্ষ্য"কেও ভক্ষ্য করিয়াছেন! মৈমনসিংহ হিন্দু-সম্মিলনীর সম্পর্কে কিছু কাজ করা ছাড়া, এক দিন বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের অধিবেশনে সভাপতির কাজ করিয়াছিলাম। তদুপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা "সৌরভ" পত্রিকায় বাহির হইবে। তাহার পর, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ফরাসীর অধিকৃত চন্দননগর যাই, তথাকার পালপাড়া স্পোর্টিং ইউনিয়নের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে। ইঁহারা কেবল খেলার প্রতিযোগিতা করান না, পাঠাগার আছে, আবৃত্তির প্রতিযোগিতাও হয়। চন্দননগর আগে বহুজনাকীর্ণ ছিল, অনেক জায়গা এখন জঙ্গলময়। দেখিলে কষ্ট হয়। আগে অনেক পণ্যশিল্পের জন্য ইহা বিখ্যাত ছিল। এখনও কাঠের আস্‌বাব খুব তৈরী হয়। সহরটির গঙ্গাতট অতি সুন্দর। ইউনিয়নের অন্যান্য প্রতিযোগিতা আগে হইয়া গিয়াছিল। আমি যাইবার পর হাডুডুডুর প্রতিযোগিতা হইল, কিন্তু উভয় পক্ষ সমান হওয়ায় হার-জিতের কোন মীমাংসা হইল না। হাডুডুডুর আর সব ভাল। যদি ইহার কোন নিয়ম ও আয়োজন বদলাইয়া বা ইহাকে বাড়াইয়া কতকটা ফুটবলের মত, খেলোয়াড় ও দর্শকদের পক্ষে অধিকতর আগ্রহোৎপাদক করা যায়, তাহা হইলে বিনা ব্যয়ে এই খেলা ব্যয়সাধ্য বিলাতী অনেক খেলার স্থান অধিকার করিতে পারে। ইউনিয়নের পারিতোষিক বিতরণের পর আমাকে কিছু বলিতে হয়। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের সুবন্দোবস্তে তাহা অনুলিখিত হওয়ায় তাঁহার অনুরোধক্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে তাহা অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী মালতীলতা সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি পরীক্ষার আটটি প্রশ্নপত্রের প্রত্যেকটিতেই প্রথম হন। বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েটেও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

শ্রীমতী বীণা ঘোষ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম্‌-এ পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বি-এ পরীক্ষাতেও অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে অনার্সে লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

আসামে শ্রীমতী কমলালয়া কাকতি ও শ্রীমতী কনকলতা চলিহা কিছুদিন যাবৎ "ঘর-জেউতী" নামক একখানি অসমিয়া মাসিকপত্র সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইহাই আসাম প্রদেশে মহিলাপরিচালিত সর্ব্বপ্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র অসমিয়া পত্রিকা। শ্রীমতী কমলালয়া উক্তপত্রিকার সম্পাদনকার্য্য ছাড়া নানাপ্রকার নারী-

শ্রীমতী বীণা ঘোষ

অধ্যাপক কার্ভে, ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা

শ্রী মতী মালতীলতা সেন

শ্রীমতী কমলালয়া কাকতি

শ্রীমতী কনকলতা চলিহা

হিতমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং তিনি শিবসাগর মহিলা সমিতির সম্পাদক। শিবসাগরে পতি-প্রাণা বীররাণী জয়মতীর স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতি বৎসর যে জয়মতী উৎসব হয়, তিনি তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী। শ্রীমতী কনকলতা আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ব্যারিষ্টার মিঃ টি, পি, চলিহা মহাশয়ের পত্নী।

অধ্যাপক কার্ভে ও হিন্দু বিধবাশ্রমের জীবন-সদস্যবর্গ

শ্রীমতী নাথিবাঈ মহিলাকলেজের ছাত্রীদের বোর্ডিং
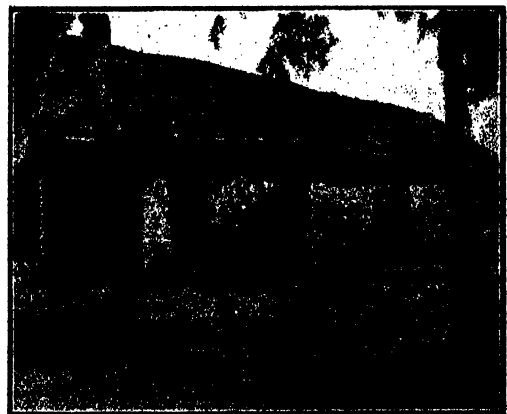
পুণা বিধবাশ্রমের সর্ব্বপ্রথম গৃহ

গতমাসে পুণায় ও বোম্বাই প্রদেশের অন্যান্য স্থানে অধ্যাপক ডি, কে, কার্ভের ৭১তম জন্মতিথি দিবসে সভা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। পুণা মিউনিসিপ্যালিটি এই উপলক্ষে অধ্যাপক কার্ভেকে একখানি মানপত্র প্রদান করিয়া ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারকল্পে তিনি যে অশেষ

শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর থ্যাকার্সে মহিলাকলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রীগণ

শ্রীমতী নাথিবাঈ মহিলাকলেজ

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ডাঃ ভিঠল রাঘোবা লাণ্ডে ভবন

পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার উল্লেখ করেন। বার বৎসর পূর্ব্বে পুণার সন্নিকটে একটি জীর্ণ কুটীরে তিনি হিন্দু বিধবাশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠানটি প্রসারলাভ করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর থ্যাকার্সে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত। স্যার দামোদর থ্যাকার্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ডাঃ ভিটল রাঘোবা লাণ্ডে ও অন্যান্য দাতা উহার উন্নতিকল্পে যথাশক্তি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চাঁদার টাকা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে বার্ষিক ৭০ হাজার টাকা সুদ আদায় হয়।
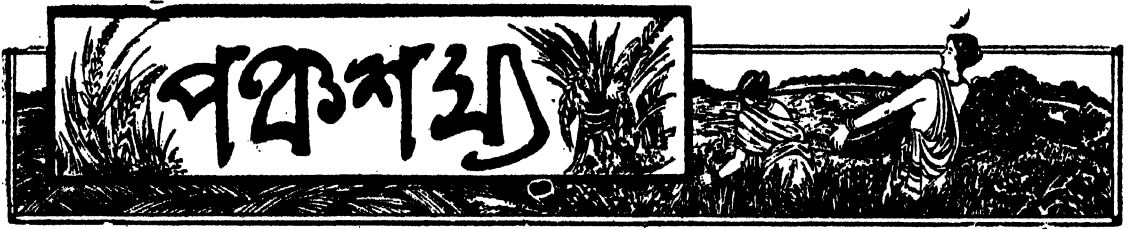
কাগজের চীনা দেবতা—

গতবার দুইটি চীন দেশের কাগজের তৈরী দেবতার চিত্র

ধনাধিপতি

শয়তান-বিতাড়ক

প্রকাশিত হইয়াছিল—বাকী দুইটি এবার প্রকাশ করা গেল।

চিত্রপরিচয়

(খ) চীনের ধনাধিপতি দেবতা।

(গ) সয়তান-বিতাড়ক দেবত।

রৌদ্রকে কাজে খাটানো—

যদি কলকব্জা চালনায় ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে রৌদ্রকে কাজে খাটানো সম্ভব হয়, তবে সভ্যতার ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে।
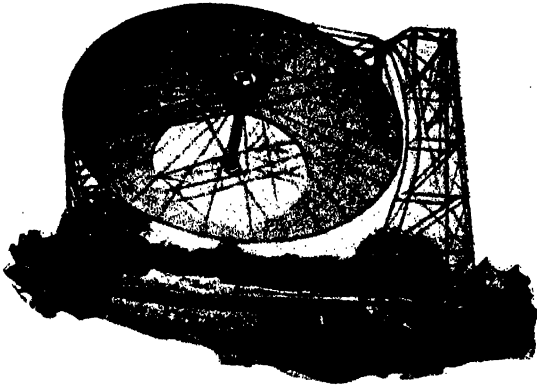
প্যাসিডেনার কৃষিকার্য্যের সহায়ার্থ আরসীর তৈয়ারী সেচ-যন্ত্র
ক্যালিফোর্ণিয়ায় ঘরের কাজে জল উত্তপ্ত করিবার
জন্য রৌদ্র-উনুন স্থাপিত হইতেছে।
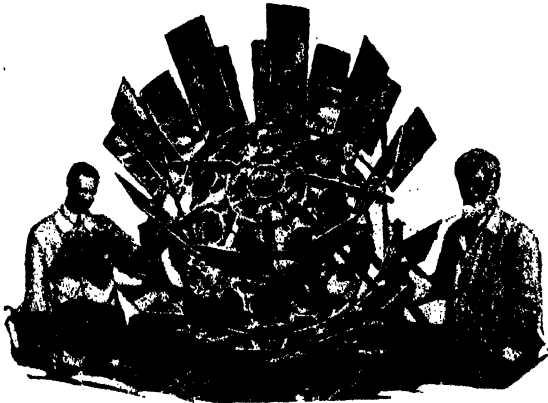
মোরুর আবিষ্কৃত রৌদ্র-উনুন

তুনিসিয়া ও উত্তর অফ্রিকার ফরাসী অধিকারে পানীয় জলের বড় অভাব, অনেক খানেই রৌদ্র-সাহায্যে চোয়ানো যন্ত্র দিয়া জল সরবরাহ করা হয়। রৌদ্রের উনুনে মিশর, আফ্রিকার কারু ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে রুটি সেকা চলে ও অন্যান্য খাদ্য তৈরী হয়। বোম্বাই-এর এডাম্‌স নামে একটি সাহেব ১৮৭০ খৃঃ তে এরূপ উনুন প্রথম উদ্ভাবন করেন। ক্যালিফোর্ণিয়ায় সূর্য্যের আলোর অভাব নাই। সেখানকার বাড়ীর উপরে যে জলের ট্যাঙ্ক থাকে তার জল রৌদ্রের সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া গৃহস্থদের ঘরের সকল কাজে লাগানোর ব্যবস্থা আছে।

সুমান-বোয়েস(Shumun-Boys) যন্ত্র এতটা কার্য্যকরী হইয়াছে যে, নীলনদের তীরভূমিতে এরূপ কয়েকটি যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এবং ফরাসী সরকার তুসিনিয়ায় কৃষিকর্ম্মের সহায়তার জন্য এ জাতীয় সেচ-যন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মোরুর (Moreau) রৌদ্র-উনুনে অনেকখ ও খণ্ড আরসীর সাহায্যে বিকীরিত রৌদ্রকে কেন্দ্রস্থ করিয়া উত্তাপ সংগ্রহের সুন্দর উপায় আবিষ্কার হইয়াছিল।

—

কৈশরের প্রতিদ্বন্দ্বী—

ম্যাক্সিম্যালিয়ান্ হার্ডেন কৈশরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি সম্পাদকতা করিতেন; এবং তিনি গোঁড়া শান্তিবাদী, আন্তর্জ্জাতিক প্রীতির প্রবক্তা, এবং নিজেকে সাম্যবাদী বলিয়া স্বীকার না করিলেও সাম্যবাদের সমর্থক ছিলেন। কোনো রাজনৈতিক দলেই তিনি

কৈশরের প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক্সিম্যালিয়ান্ হার্ডেন্

যোগ দেন নাই,—তবে, জার্ম্মানীর স্তোশালিষ্টদের কার্য্যাক্ষমতা লইয়া তিনি উপহাস করিলেও তাহাদেরই কতকটা পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা যুদ্ধশেষে জার্ম্মানীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মতবাদ হার্ডেনের লেখাই গঠন করিয়াছিল।

—

পৃথিবীর বিখ্যাত পুস্তকাগার—

প্যারিসের 'ন্যাশানাল লাইব্রেরী' পুস্তকাগারের পুস্তকসংখ্যা ৩৭০০০০০। ন্যাশানাল লাইব্রেরীর ন্যায় অধিকসংখ্যক পুস্তক পৃথিবীর অন্য কোন পুস্তকাগারে নাই। ইহার পর বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর স্থান, এই লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ২৩০০০০০। আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরের কংগ্রেস লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সমান। নীচে পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাক পুস্তকাগারের পুস্তক সংখ্যা দেখানো হইল।

লেনিন গ্রাড্ সাধারণ লাইব্রেরী	২০৪৪০০০,
প্রাসিয়ান ষ্টেট্ লাইব্রেরী	১৭৭০০০০,
মিউনিক সাধারণ লাইব্রেরী	১৪০০০০০,

ষ্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী	১২০০০০০
ম্যাড্রিড ন্যাশানাল লাইব্রেরী	১১২৫০০০,
ভায়েনাষ্টেট লাইব্রেরী	১০০০০০০,
ভায়েনা ইউনিভার্সিটি"	১০০০০০০.

য়ুরোপের বড় লাইব্রেরীগুলির সংখ্যা ৬০৯টি, সমস্ত লাইব্রেরীগুলির মোট পুস্তকসংখ্যা ১১ কোটি ৯০ লক্ষ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩১৪টি বড় পুস্তকাগার আছে, সমস্তগুলির মোট পুস্তকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০লক্ষ। ইহাব্যতীত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ২২টি, এশিয়ায় ২৩টি, অষ্ট্রেলিয়ায় ৭টি ও আফ্রিকায় ৩টি বড় লাইব্রেরী আছে।

য়ুরোপের মধ্যে একমাত্র জার্ম্মাণীতে ১৬০টি বড় লাইব্রেরী আছে। ঐ লাইব্রেরীগুলির মোট পুস্তকসংখ্যা ১১১টি, তাহাদের মোট পুস্তকসংখ্যা দুইকোটি। ইংলণ্ডে ১০১টা বড় লাইব্রেরী আছে, তাহাদের পুস্তকসংখ্যা এক কোটি ৭০লক্ষ। ইটালীর ৮৫টি বড় লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা এক-কোটি ৩০লক্ষ।

য়ুরোপের সমস্ত লাইব্রেরী গুলির মধ্যে প্যারিসের ন্যাশানাল লাইব্রেরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে উহা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পরে ভায়েনার লাইব্রেরী ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত য়ুরোপের অনেক পুরাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীর কথা শুনিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে কোন কোনটি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর মধ্যে স্পেনেরস্যালমানকা, লাইব্রেরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে উহা স্থাপিত হইয়াছিল। ষ্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী অপেক্ষা বড়। রোমের প্রাচীন ভ্যাটিকান লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা মাত্র ৫ লক্ষ, কিন্তু প্রাচীনত্বের দিক হইতে এই লাইব্রেরীর স্থান সকলের উচ্চে।

আমেরিকার ধর্ম্মবিষয়ক চিত্র—

আমেরিকার চিত্রকলা উৎকট হৃদয়াবেগ ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রে শান্ত ও সুসমাহিত ভাব ও আবেগকে অবলম্বন করিতেছে।

মোরার মাতৃমূর্ত্তি

গতানুগতিক ভাবের বদলে চিত্রকরের নিজস্বতাই বেশী আদরণীয় হইতেছে। ম্যাডোনার মধ্য দিয়া খৃষ্টজগৎ চিরন্তন পত্রে মাতৃমূর্ত্তিই অঙ্কিত করিয়াছে। আমেরিকার শিল্পকলায় যীশুমাতা বেশী করিয়া মানবী (human) হইয়া উঠিয়াছেন। মোরার এই চিত্রে আমেরিকার সেইরূপ মাতৃমূর্ত্তির শ্রেষ্ঠ আদর্শই ফুটিয়াছে।

ভারত-ইংলণ্ড যাত্রী-বাহী উড়োজাহাজ—

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যে সব উড়োজাহাজ—যাত্রী লইয়া গতায়াত করিবে, তাহাদের বিবরণ 'পোপুলার মিকানিক্' প্রকাশিত হইয়াছে। ওসব জাহাজে খানসামারা খানা তৈরী করিবে ও পিছনে হেলান-দেওয়ার কাঠটি যাত্রীদের খানার টেবিল

উড়োজাহাজের অভ্যন্তর

রবারের ফাঁপা-আসন জলে পড়িলে লাইফ্ বেল্টের কাজ দিবে

হইবে। এ জাহাজে ১৫ জন যাত্রী ও আরও তিনজন চালক প্রভৃতি থাকিবে। এইসব উড়ো জাহাজ ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে উড়িবে।

ইহার যে দিকটা দেখা যায় তাহা ধাতব ও সে দিকটা নানারূপ চিত্রে একাধিকবার মণ্ডিত করা চলে।

অভিনব টালি—

এই টালি আগুনে পুড়িবে না, কোনোরূপ শব্দও ইহা হইতে উত্থিত হইবে না। ওইস্‌কন্‌সিন্ কোম্পানি ইহার উদ্ভাবক। এ নূতন উপকরণের নাম দেওয়া হইয়াছে—সানাকাউষ্টিক টালি।
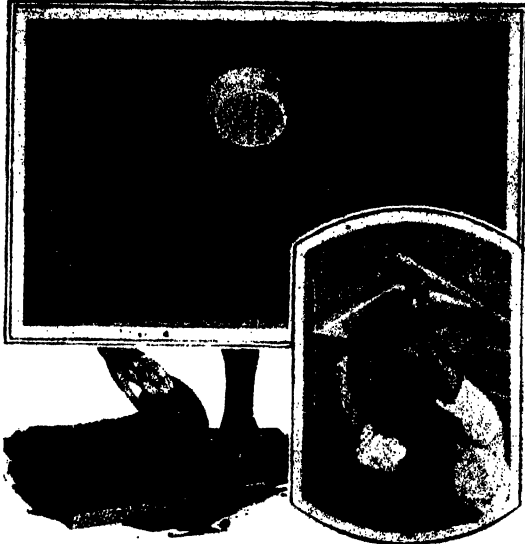
চিত্রশোভিত টালির ছাদ—জিনিষটির নির্ম্মাণরূপ দেখানো হইতেছে

মায়া-প্রাসাদ—

প্যারিসের গ্রাফিন্ যাদুঘরে এই মায়া-প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—যেন আরব্য উপন্যাসের মায়ালোক সত্য হইয়াছে। দর্শক কখনো কোনো হিন্দুমন্দিরের অভ্যন্তর, কখনো বা কোনো আরব্য রাজপ্রাসাদ, আবার কখনো বা বিশাল বনানীর অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া
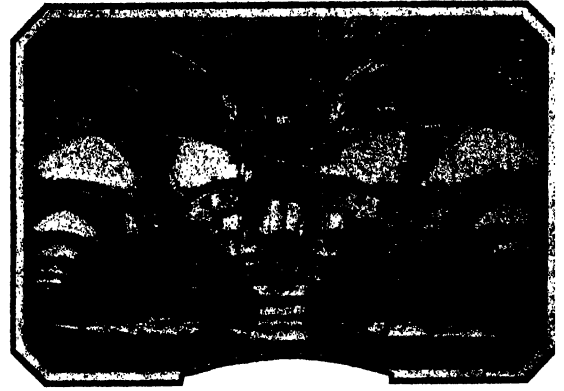
মায়া-প্রাসাদ

ফেলিবেন। বিজলি আলোর সাহায্যে ৪৫ রকম বিভিন্নরূপ ও তাহার অদল বদলে আরো অনেক রূপ এইরূপে দেখানো হয়। বিভিন্ন রঙের আড়াই হাজার বাতির সাহায্যে এই মায়া-প্রাসাদের এত বৈচিত্র্য দেখানো সম্ভব হইয়াছে।

অন্তর্লোক-যাত্রা

রম্যাঁ রলাঁ

মেঘের একটা পাশ বিদীর্ণ করিয়া একটিবার সূর্য্যরশ্মি দেখা দিলে চারিদিক আলোকস্নাত হইয়া থাকে না। রশ্মিরেখা যে ছিদ্র বাহিয়া পড়িয়াছিল তাহা বন্ধ হয়, ছিন্নমেঘ আবার জোড়া লাগে, দিগ্বিদিক আলো-আঁধারের মায়াজালে জড়াইয়া পড়ে। তবু একবার ত আলো দেখা গেল—এই-খানেই আত্মার বিরাট্ বিজয়গর্ব্ব! সে-স্মৃতি জীবনে ভুলিবার নয়। তার চারিদিকে যে দেয়াল এতদিন চাপিয়া ছিল তার ভিতর দিয়া আত্মা যেন একটা ওলনদড়ি চালাইয়াছে—সেই কারাপ্রাচীরের স্থূলতা মাপিয়া লইয়াছে। সে বুঝিয়াছে যে সেই দেয়ালের অপর দিকে আলোর রাজ্য তার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দু-একটা ঘুন-ধরা গরাদ যখন সে ভাঙ্গিতে পারিয়াছে, তখন দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁজিতে হইবে—হাতড়াইয়া বার করিতে হইবে আরও কোথায় কোথায় বেড়া জখম হইয়াছে—এমনি ভাবে একদিন

সব বাধা চূর্ণ করিয়া বন্দী আত্মা পূর্ণমুক্তি লাভ করিবেই।

কিন্তু মুক্তির সন্ধান জানা এবং সেটা লাভ করার মধ্যে অনেক ব্যবধান। আমার সেই 'তরুণ আমি'র শক্তিগুলি তখনও কেন্দ্রীভূত হয় নাই। তার অনেকটা অস্থির ও ভঙ্গুর। দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার ভিতর দিয়া কেমন করিয়া নিজেকে একাগ্র করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করা হয় নাই—যোগ যে উদার শিল্পেরই প্রকারভেদ। অথচ সেই অপরিণত 'আমি' যে একটা কাদার তাল—তখনও শক্ত হয় নাই, তাই প্রতিদিনের পুঞ্জীভূত যত অসংলগ্ন ভাবনা ও কামনার সঙ্গে লড়াই করিতে সে হটিয়া গিয়া কোন এক গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে! সেখান হইতে বাহিরে আসিতে কে তাহাকে সাহায্য করিবে? সেত ঐ ক্ষীণ আলোক-রেখাটুকু—কিন্তু কে বলিবে, যদি সেটাও চকিতে মিলাইয়া যায়?

পথে চলিতে চলিতে এমনি কত মানুষ ঐ দীপশিখাটি হারাইয়া বসে। যত পরীক্ষাই আসুক কিছুতে শ্রান্ত না হইয়া, কিছুতে ধাক্কা না খাইয়া, না ভাঙ্গিয়া একাগ্রচিত্তে ঐ দীপশলাকাটি দৃঢ়হস্তে ধরিয়া অগ্রসর হওয়া কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? বারো হইতে চব্বিশ পর্য্যন্ত এই-যে বছর-গুলা ইহার মধ্যে কৈশোরের শেষ ও যৌবনের পরিণতি—মানুষের আত্মা এখনই প্রথম সজ্ঞানে শরীরী হইয়া কত বিচিত্র ভাব ও ইন্দ্রিয়চেতনার প্রবল অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও যৌনপ্রবৃত্তির সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া যেন সব গিলিতে চায়! কি প্রচণ্ড আত্মপ্রসারণ! সেই ভীষণ নিরয়ের মধ্যে পড়িয়াও কাহারা ভাসিয়া থাকিতে পারে? যারা ঐ অন্ধ অভিজ্ঞতা-স্তূপের মধ্য দিয়া আত্মার তড়িৎপ্রবাহ বহা-ইয়া সমস্তটাকে আপন সত্তার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে প্রবৃত্তির অস্বচ্ছ কুজ্ঝটিকার মধ্যে সূর্য্যের কিরণ-কণিকা প্রবেশ করাইয়া এমন মিলাইয়া দেয় যে, প্রত্যেক অনুভূতি-বিম্বটির মধ্যে কিরণলেখা প্রতিবিম্বিত হয় সুপ্ত প্রান্তরের প্রত্যেক শিশিরকণা যেমন করিয়া নবদিনমণিকে প্রতি-বিম্বিত করে! কিন্তু হঠাৎ একদিনে যৌবনের এই উদার-সুন্দর পরিণতি হয় কি?

ECOLE NORMALE-এর জীবন

প্রকাণ্ড একটা জেদ লইয়া নিজেকে গড়িবার কাজে লাগিয়া গেলাম। তখন একল্ নরমাল (Ecole Normale) ইস্কুলে পড়ি। প্যারিসের উল্ম্ (Ulm) সড়কের উপর অবস্থিত এই ইস্কুলটি ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে (Faculty)
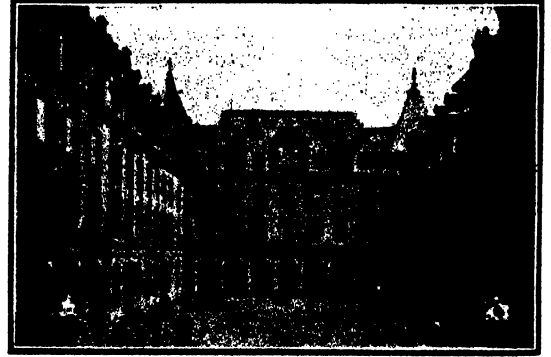
প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়

একোল নর্ম্মাল ল্যাবরেটরীতে লুই পাস্তুর

যাঁরা অধ্যাপনা করিবেন সেই সব অধ্যাপকদের ইহা একটি লেবরেটরি বিশেষ। কিন্তু তা ছাড়া বহু সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লেখক ও রাজনীতিজ্ঞও এই প্রতিষ্ঠানে লালিত হইয়া পরে দেশের কাজে নামিয়া দেশকে বিশ্বের দরবারে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। পাস্তুর (Pasteur) এর মত বৈজ্ঞানিক, মিশলের (Michelet) মত ঐতিহাসিক এখানে কাজ করিয়াছেন, অধ্যাপনা করিয়াছেন। বিখ্যাত সোসিয়ালিষ্ট নেতা জাঁ জরেস্ (Jaures) আমার চেয়ে একটু আগে পড়িতেন। এরিও (Herriot)—যিনি ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন—আমার একটু নীচের ক্লাশে পড়িতেন। আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন কবি সরেস্ (Saures), চীনভাষাবিৎ শাভান (Chavannes) ও ভারত তত্ত্বজ্ঞ
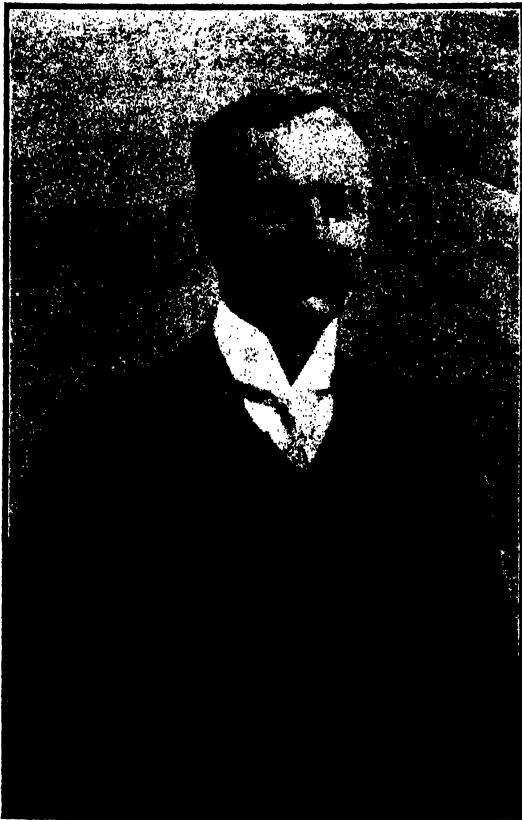
মসিয় শাভান

ফুশে (Foucher)। এই মণ্ডলীতে যোগ দিয়াই বুঝিলাম যে, দেকার্তের চেলা, হলাণ্ডবাসী স্পিনোজা যে মানসিক খোরাকে পুষ্ট হইয়াছিলেন তার তুলনায় আমার খোরাক বেশ একটু আলাদা রকমের। নিভয়ারনের (Nivernais) মেঁয়ো মাটিতে মানুষ হইয়াছি, ঝোপঝাড়ের মধু খাইয়া—সেক্সপীয়র এই মধুকে 'গলা সোনা' বলিয়া আদর করিয়াছেন—আর আজ প্যারিসের শিক্ষাগারে কত নূতন খাদ্য প্রলুব্ধ করিতেছে। টলষ্টয়ের মোটা গমের রুটি ও উগ্র মধু—ভাগ্নার (Wagner) Vikingদের ঝাঁঝাল পানীয়—এই সবের সঙ্গে স্পিনোজার জ্বলন্ত প্রেরণা কেমন করিয়া মিলাইব? নবশিক্ষাকেন্দ্রে আসিয়া আমার দশাটা প্রায় আমার সেই চতুর্থ শতকের পূর্ব্বপুরুষ গাললো-রোমীয় বর্ব্বরগণের মতই হইয়াছিল। তাঁরা এক নবধর্ম্মমণ্ডলীতে, আর আমি এক নব শিক্ষাচক্রে 'উড়ে এসে জুড়ে' বসিয়াছিলাম। এ ক্ষেত্রে হাবুডুবু খাওয়া অনিবার্য্য, তবু তাঁরা যেমন জুডিয়ার ভাষায় লিখিত নব সুসমাচার (New Testament) লাটিন হরফ হইতে বহুকষ্টে আয়ত্ত করিতে লাগিয়াছিলেন, আমিও তেমনি একমনে লাগিয়া গেলাম। শুধু প্রভেদ এই, আমার শিক্ষাচক্রে সূত্রধার-সন্তান খৃষ্টের প্রবেশাধিকার ছিল কি না সন্দেহ! যাহোক, একদিকে স্পিনোজার ভগবদ্বাদ, অন্যদিকে নবশিক্ষার বাদানুবাদ—এই দোটানায় পড়িয়া যখন হাবুডুবু খাইতেছি তখন আমার তরুণ চিত্তের দ্বৈধীভাব দেখিয়া আমস্টারডামের কাঁচ-কাটা মিস্ত্রী মহাত্মা স্পিনোজা হয়ত হাসিতেছিলেন। আমার একনিষ্ঠ প্রেমের সাময়িক অভাবের দরুণ তিনি আশা করি আমায় ত্যজ্য-শিষ্য করেন নাই।

Ecole Normale-এ থাকিবার সময় (১৮৮৬-১৮৮৮) দুই বছর প্রায় প্রতিদিনই ডায়েরীর পাতায় অনেক কথা লিখিয়াছি। স্পিনোজার বাণীকে অদলবদল করিয়া আমার জীবনের মূলতত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করিতে সে কি অবিশ্রাম চেষ্টা! শেষে ১১ই এপ্রেল ১৮৮৭ সালে জয়ী হইলাম। ১১ই এপ্রেল আমার জীবনে কত বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে! পরিশেষে স্পিনোজার ভগবানকে আমার রুচি, আমার প্রয়োজন অনুসারে নিজের করিয়া মিলাইয়া লইলাম। স্পিনোজার ইন্দ্রিয়-চেতনামূলক অধ্যাত্মবাদ আমার ভিতর দিয়া যেভাবে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল তাহা আমি একটি ক্ষুদ্র অপ্রকাশিত (মূল ফরাসী

অপ্রকাশিত, কিন্তু ইহার বঙ্গানুবাদ করিবার অধিকার রলাঁ মহোদয় আমায় দিয়াছিলেন—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২, "আত্মদর্শন" দ্রষ্টব্য -কঃ নঃ।) রচনায় ধরিয়াছি। অনাগত জীবনে যে সব সংশয় সন্দেহ ঘনাইয়া আসিবে তাহার বিরুদ্ধে তরুণ ঔদ্ধত্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াই যেন এই রচনার নাম দিয়াছিলাম "Credo Quia Verum"। আমার জীবনের মূলবিশ্বাস (Credo) এই খানে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা একটি মৃত বন্ধুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলাম—তেজের সঙ্গে যেন বলিতে চাহিয়াছিলাম—সে বাঁচিয়া আছে, মৃত্যুকে মানি না! যতই অপরিণত হোক ঐ রচনা, ইহা লিখিয়া যেন আমার ভিতরের সংগ্রাম থামিল—যত এলোমেলো অস্পষ্ট ধারণাও যেন সুস্পষ্ট হইল—এক অপূর্ব্ব শান্তিতে আমার জীবন যেন ভরিয়া উঠিল। তখনকার ডায়েরীর এক জায়গায় লিখিয়াছি :—

"বহুকাল পরে এই প্রথম বুকটা যেন তাজা হইয়া উঠিয়াছে··আমার ভিতরে শান্তির মলয়ানিল প্রবেশ করিয়াছে···"

এই আনন্দের উচ্ছ্বাস আমার এই সময়কার ডায়েরীর প্রতি ছত্রে ও ১৮৮৭ সালের বসন্ত কালে বন্ধু Sauresকে লেখা পত্রে দেখা যায়। এই তরুণ আত্মজিজ্ঞাসা যে ক্ষীণ ও ক্ষণভঙ্গুর তাহা আমি ঢাকা দিতে চাই না, কিন্তু ইহাও সত্য যে সে আত্ম-জিজ্ঞাসা একান্তভাবে আমারই—ধার করা বস্তু নয়। আমার তখনকার ধারণা ভাবনার সঙ্গে পূর্ণভাবে ছন্দ রাখিয়া তাহা প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং স্পিনোজার ভাষায় তাহা সার্থক ("adequate") এবং তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হইবে না বহুদিন। এখানে যেন একটা বড় জিনিষের ভিত্তি পত্তন হইল; ভিতরের নানা কলহ সংশয় কাটাইয়া এই দৃঢ় আশা-বেদিকার উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন-সৃষ্টিধর্ম্মী শিল্পীর সত্য জীবন (ma vraie vie creatrice), তার প্রেম ভালবাসা, তার রচনা গড়িয়া তুলিলাম।

আমার Credoতে যে সর্ব্বশক্তিমান সত্তাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি তিনি আমাতে এবং যাহা কিছু আছে সকলের মধ্যেই প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁরই জ্যোতির অপরোক্ষ স্পর্শ পাইলাম—ইহার প্রমাণ অন্যত্র পাওয়া যাইবে। *

কিছু দিন পরে ১৮৮৭ সালের মে মাসে প্যারিস হইতে আমি প্রথম টলষ্টয়কে চিঠি লিখি। তার পর সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের ক্লামসীর (Clamecey) সেই পুরান বাড়ী হইতে আর একবার লিখি। ফ্রান্সের একটি প্রাচীন কেল্টিক্ প্রদেশের (Morvan) ধারে এই ক্লামসী গ্রামে জন্মিয়াছি, শৈশবটা কাটাইয়াছি, ক্রমশঃ জানিয়াছি এখান হইতে কুড়ি কিলোমিটার দূরে গথিক শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন Vezelaiর গির্জ্জা; এখানেই সেণ্ট্ বার্নার্ড (St Bernard) দ্বাদশ শতকে ফ্রান্সের রাজা ও জার্ম্মান সম্রাটের সমবেত বাহিনীর সম্মুখে দ্বিতীয় ক্রুশেদ প্রচার করেন। গেলিক ও রোমান সভ্যতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ এখানে হইয়াছে, অথচ তার পূর্ব্বে সংঘর্ষও কম হয় নাই। সীজারকে এখানে বাধা পাইতে হইয়াছিল—Vercingitorix প্রভৃতি বীরগণ দেশের জন্য এখানে প্রাণ দিয়াছেন। এদেশের সন্তান Vauban রাজাদিত্য চতুর্দ্দশ লুই (Louis xiv) এর মুখের উপর শুনাইয়াছিল প্রজাসাধারণের দুঃখের কথা। এই প্রদেশ ফরাশী বিপ্লবের যুগে আরও একজন মানুষকে জন্ম দিয়াছে যাকে নেপোলিয়ন (Napoleon) এর পূর্ব্বাবতার বলা যাইতে পারে :—St Just সেকালের Convention এর অন্যতম নেতা ছিলেন। আবার এই প্রদেশ হইতেই দুটি হাস্যাবতারেরও জন্ম :—Mon Oncle Benjamin ১ ও Colas Breugnon. ২।

---

* শিল্পীর জীবন যে আদি-কবি আদি-শিল্পীর জীবনেরই স্ফুলিঙ্গ এ বিশ্বাস এই তরুণ বয়স হইতেই রলাঁর মধ্যে জাগে, ইহা তাঁর নিজ মুখে শুনিয়াছি। এইখানে রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ সমধর্ম্মী—মস্ত বড় জায়গায় দুজনের গভীর মিল দেখিতে পাই। তাই বোধ হয় এই নিরীশ্বরতার যুগে এই দুই মহাশিল্পী বিশ্বদেবের বন্দনা অমর ভাষায় একান্ত ভাবে করিয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের শিল্প শুধু খেলা নয়। ইহা অর্চ্চনা, সৃজন বেদের উদাত্ত সামগান। কঃ নঃ

১। Claude Tillierএর সুপ্রসিদ্ধ রচনা।

২। রম্যা রলাঁর অন্যতম হাস্যরসাত্মক রোমান্স। মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯১৩ সালে লিখিত। ইহার মধ্যে শিল্পী করুণ হাস্যের স্নিগ্ধ বর্ণোচ্ছ্বাসে তাঁর পরিবার ও জন্মভূমির অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিয়াছেন। জাঁ ক্রিস্তফ শেষ হইবার এক বৎসরের মধ্যে ইহা বাহির হইয়াছিল বলিয়া ইহা তখন কতকটা যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন শিল্পীমহলে ইহার প্রভূত সমাদর হইতেছে।

ফ্লাণ্ডার্স ও হলাণ্ড ভ্রমণ শেষ করিয়া কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম করিবার জন্য এই প্রাচীন স্মৃতিমণ্ডিত দেশে আমাদের প্রাচীন বাড়ী খানিতে আসিলাম। এবং ১৮৮৭ সেপ্টেম্বরে টলষ্টয়কে দ্বিতীয় পত্র লিখিলাম। তার জবাব পাইলাম প্যারিসে ফিরিয়া ২১শে অক্টোবর ১৮৮৭। মিশলে (Michelet) সড়কের সেই আমার ছোট্ট ঘরের মধ্যে চিঠিখানি পড়িলাম। একাধিক রচনায় আমি এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়া আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছি। উদারহৃদয় বৃদ্ধ টলষ্টয়ের সেই দয়া, সেই সস্নেহ উপদেশ দান, সেই প্রীতিচিহ্ন, "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করা—সব আমার প্রাণে গাঁথা আছে।*

টলষ্টয়

কিন্তু এই খানে বলিয়া রাখিতে চাই যে, আমার উপর টলষ্টয়ের প্রভাব কতটা এবং কি রকমের সে বিষয়ে যথেষ্ট ভুল ধারণা থাকিয়া গিয়াছে। আমার নৈতিক জীবনের উপর এই প্রভাব যথেষ্ট ছিল, আমার শিল্পী জীবনের আদর্শ নির্দ্ধারণে ইহার প্রবলতম শক্তি অনুভব করিয়াছি, কিন্তু আমার জ্ঞানের প্রসারে ইহা এতটুকুও সাহায্য করে নাই। টলষ্টয়ের "সমর ও শান্তি" (War and Peace) তে শিল্পের কি অপূর্ব্ব গরিমা! অথচ ফরাসী জাতির মনটাকে এই রচনা যেন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া বিপথে চালাইতে চায়—কেমন যেন তার সুরে অমিল ঠেকে তাই ফরাসীরা প্রায় কেউই ঐ বইখানির উপযুক্ত সমাদর করিতে পারে নাই। শিল্পী এক অপূর্ব্ব প্রতিভায় নিখিল বিশ্বকে যেন শ্যেন-দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। অধ্যাত্মশক্তিতে পূর্ণ রুষ জাতি যেন সহস্র ধারায় কোন এক মহান সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়াছে! সবার পিছনে অলক্ষ্যে যেন চিরন্তনী শক্তিরই নর্ত্তন। টলষ্টয়ের এই অপূর্ব্ব রচনা আমার গূঢ়তম সৃষ্টি প্রেরণা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করিত এবং এক অভিনব মহাকাব্যের (nouvelle Epopee) প্রথম আদর্শ (তাহা যতই অসম্পূর্ণ হোক) আমার সম্মুখে ধরিত। আমি অবশ্য ইহাকে নকল করিতে চেষ্টা করি নাই, কারণ অনুভব করিতাম আমাদের শক্তি ও গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন-জাতীয়। তবু স্বীকার করিব যে ঐ বইটিই আমার আপন ছাঁদের মহাকাব্য (Gesta) জাঁ ক্রিশতফকে ও পরবর্ত্তী রচনাকে বোধ হয় ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়াছিল। এই বইগুলির বাহিরের দিকটায় নভেল বা জীবনীর ছাপ থাকিলেও বস্তুতঃ যে ইহা মহাকাব্য-পর্য্যায়ের রচনা এটি ইউরোপীয় সমালোচকরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

অন্য দিকে দেখি যে টলষ্টয়ের জীবনের যে উদারতা আমার প্রাণে ছাপ দিয়া গিয়াছিল তার এতটুকুও নষ্ট হয় নাই। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত একটি কথা ভুলি নাই যে শিল্প-সৃষ্টির একটা দায়িত্ব আছে, সেটি মানবের প্রতি নিশ্চিত দায়িত্ব। এই জায়গায় যদি কখনও অজ্ঞানে আমার

* টলষ্টয় এই চিঠিখানি ফরাসী ভাষায় নিজহস্তে লেখেন। তরুণ ফরাসী যুবকের প্রাণে যে গভীর প্রশ্ন জাগিয়াছে তাহার উত্তর ত তার মাতৃভাষায় দিতে হইবে! বিশ্ববিখ্যাত লেখক কত পরিশ্রম করিয়া সেই চিঠি লিখিয়াছেন! মধ্যে মধ্যে বানান ভুলও আছে। রলাঁ এই চিঠি খানি অমূল্য সম্পদ হিসাবে সর্ব্বদা তাঁর কাছে রাখেন; তাঁর ঘরে ইহা দেখিবার ও স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ইহার ইংরাজী ও বাঙলা অনুবাদ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি—Modern Review, January 1927 ও প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৪ দ্রষ্টব্য। কঃ নঃ

খলন ঘটিয়া থাকে তখনি তাহা বুঝিয়াছি এবং নিজেকে শাস্তি দিয়াছি।

কিন্তু টলষ্টয়ের চিন্তার ধারা আমাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে আমার চিন্তা জাগিয়াছিল, আমার নিজের শক্তি ও প্রেরণা অনুসারে আমি আম'র Credo নূতন ভাষায় নূতন রঙে ফুটাইয়া তুলিতেছিলাম। আমার বলা উচিত যে পরে যখনই টলষ্টয়ের চিন্তার সঙ্গে বোঝা পড়া করিতে গিয়াছি—তখনই নিরাশ হইয়াছি; তাঁর চিন্তা কেমন যেন সূক্ষ্মতাবর্জ্জিত আটপৌরে রকমের - সে যেন যত পুরাণো রঙউঠা মোটা কাপড়ের বাজার—তার মধ্যে কে যেন মোটা হাতে অতি সযত্নে কাটা টুক্‌রা থান জোড়া দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে। নিজেকে নিজে শিক্ষা (auto-education) দিতে গিয়া টলষ্টয় এই চিন্তার বাজার গড়িয়া তুলিয়াছেন। হয়ত এই কড়া সমালোচনা করিয়া আমি টলষ্টয়ের প্রতি অবিচার করিয়াছি, কিন্তু ইহা আমার গভীর নির্ব্বেদেরই ফল। আমার যুগের যে মানুষকে সব চেয়ে ভালবাসিতাম তাঁর মধ্যে ধীশক্তি ও সৃজনী শক্তির এমন বিসদৃশ লড়াই দেখিয়া যে গভীর আঘাত পাইয়াছিলাম তার দরুণই বোধ হয় একটু অতিরিক্ত কঠিন হইয়া টলষ্টয়ের বিচার করিয়াছি। মনে পড়ে এক সময় নব পরিণীতের মধুচন্দ্র উপভোগের মত আমি "সমর ও শান্তির" নায়িকা Natachaর মধুর আলিঙ্গনে বিভোর হইয়া থাকিতাম এবং প্রিন্স আঁদ্রেকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া গর্জ্জাইতাম। তবু সে অবস্থায়ও টলষ্টয়ের আল্‌গা মোটা চিন্তার বোঝার পাশে ইংনেের ধীশক্তি যে কত উঁচুদরের তাহা বুঝিতাম ও প্রকাশ্যে যেন একটু আক্রোশের সঙ্গে ঘোষণা করিতাম। এবং বহুদিন পরে মহাযুদ্ধের শেষে যখন Valentine Bulgakoff * আমাকে তাঁর 'টলষ্টয়ের নীতিবাদ' (Ethique Tolstoyenne) গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করেন তখন আমার মন টলষ্টয়ের চিন্তা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে সেই মতবাদের খাঁটি ও অনুমোদিত সংকলনটির প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তিই আমার জাগিয়াছিল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে টলষ্টয় আলোক-পন্থী না হইয়া অন্ধকার-পন্থী (obscurantist)। এই খানে তাঁর সঙ্গে আমার বিবাদ এবং এই জন্যই তাঁর প্রতি মধ্যে মধ্যে আমার মন বিরাগে ভরিয়া উঠিত, এই কথাটি তাঁদের স্মরণ রাখিতে বলি যাঁরা আমার সঙ্গে টলষ্টয়ের সম্বন্ধ লইয়া আলোচনা করেন। এ বিষয়ে কতকটা ভুল ধারণা আমার পাঠকদের মনে জন্মাইয় দেওয়ার জন্য আমি নিজেও অনেকটা দায়ী, কারণ পিতৃতুল্য প্রিয় মনীষী টলষ্টয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে জীবনীখানি লিখিয়া আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলাম তাহা হইতে স্বভাবত সমস্ত বিরাগ ব্যবধানের কথা বাদ দিয়াছিলাম। সেই জীবনীর * মধ্যে আছে শুধু প্রেমের ও কৃতজ্ঞতার প্রণতি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটো মানুষ (সহজ করিবার জন্য মাত্র দুটো বলিতেছি!) আছে—একটা সহজ প্রেরণার (instinct) আর একটা বিচার বুদ্ধির (raison) মানুষ। একটির কাজ মগ্নচৈতন্যলোকে, আর এক জনের কাজ এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে প্রত্যেক পদক্ষেপে মাপ্‌জোপ্, তর্ক-বিতর্ক, ভাঙ্গা গড়া! দুজনের মধ্যে চিরদিনের কোঁদল এবং দুজনের ক্ষেত্র যত বেশী দামী, তাহা লইয়া মামলা মকদ্দমা ততই বেশী; বিশেষতঃ টলষ্টয়ের মত মানুষ যখন মোটা জোরাল হাত ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি লইয়া এই ক্ষেতে চাষ করিতে আসেন তখন সংগ্রাম আরও উৎকট ভাবে দেখা দেয়। তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক প্রেরণা ও প্রবৃত্তি সব দিক দিয়া তাঁর বুদ্ধি ও ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই করিয়াই আছে! কখনও এই সংগ্রাম সজ্ঞানে কখনও অজ্ঞানে অথচ ইহা অশ্রান্তভাবে চলিয়াছে—এমন কি তাঁর শেষ কথাবার্ত্তার মধ্যেও ইহা মোটা অক্ষরে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

টলষ্টয়ের শেষ কয়েক মাসের চিন্তা, ভাব ও কথা বার্ত্তা দুইখানি বইয়ের মধ্যে দেখিতে পাই। (১) টলষ্টয়ের নীতিবাদ (২) টলষ্টয়ের শেষ বছরের ডায়েরী। দুইখানিই তাঁর সেক্রেটারী Bulgakoff কর্ত্তৃক অনুলিখিত। প্রথমটিতে দেখি, টলষ্টয় যেন ক্রমওয়েল (Cromwell)

---

* ইনি টলষ্টয়ের শেষ সেক্রেটারী এবং তাঁর কাছে থাকিয়া তাঁর মত অনুসারে ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে টলষ্টয়ের মতামতের ডালি সাজাইয়াছেন।

* Vie de Tolstoy—Paris 1911.

-বাহিনীর সব চেয়ে গোঁড়া ও অসহিষ্ণু Puritanকেও হার মানাইয়াছেন। কিন্তু তাঁকেই দ্বিতীয় পুস্তকে দেখি,—মুক্ত উদার শিল্পীর প্রাণ, আর্টের উপভোগে আত্মহারা এবং সব বাধা ও সঙ্কোচ দূর করিয়া তাঁর অনুরাগবিধুর হৃদয়কে যেন উন্মুক্ত করিয়া কথা বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এই শিল্পীমনীষী টলষ্টয় অধিকাংশ স্থলেই আর এক টলষ্টয়ের দ্বারা পরাস্ত হইয়া হটিয়া গিয়াছেন, যার মধ্যে দেখি অতি সাদামাটা অর্দ্ধশিক্ষিত একগুঁয়ে মামুলী যুক্তিবাদী। অথচ এই অমর শিল্পীর যে অপূর্ব্ব প্রতিকৃতি গোর্কি (Maxim Gorky) আঁকিয়াছেন তাহা আমাদের হৃদয় হরণ করে। Yasnaia Polianaর পল্লীতে এক প্রকাণ্ড গাছের তলায় বৃদ্ধ টলষ্টয় প্রাচীন জার্ম্মানদেব Odinএর মত বসিয়া আছেন—সে যেন এক বিরাট বনস্পতি! তার কাণ্ড হইতে অসংখ্য ছোট ছোট ঝুরি নামিয়াছে—যেন কতশত অদ্ভুত সর্প মাটিতে মুখ ঢুকাইয়া ধরণীর সুদূর সুগোপন প্রাণ-উৎস হইতে টানিয়া পান করিতেছে! এই ত আমার টলষ্টয়! এই মানুষকেই ত ভালবাসিয়াছি। গেঁয়ো ইস্কুল মাষ্টারের মত যে টলষ্টয় তার অনুগত ভক্তদের "নীতিপাঠ" পড়াইয়াছেন তাঁকে আমি চিনি না। ঐ যে মাটির তলায় অসংখ্য অলক্ষ্য শিকড়, যাহা আঁকিয়া-বাঁকিয়া ব্যক্তিত্বের পাতলা খোলস ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, ও স্থায়ী বস্তুর মর্ম্মস্থলটি আঁকড়িয়া ধরিয়াছে—সেই শিকড়ের মধ্য দিয়া আমাদের পরিচয় যে বহুদিন হইয়াছে, তাঁর রচনা পড়িবার বহুপূর্ব্বেই যে এই পরিচয়। টলষ্টয়ের বইয়ের এক অক্ষর পড়িবার আগে আমার জীবনের শিকড় যে তাঁর সঙ্গে জড়াইয়াছিল। বলিতে বলিতে মনে পড়িয়া গেল আমার জীবনে তৃতীয় বিরাট আবির্ভাবের (Revelation) কথা।

ঠিক কোন্ বছরে সেটি ঘটিয়াছিল মনে নাই। Ecole Normale ইস্কুলে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই মনে হয়। উত্তর ফ্রান্সের রেলপথে অল্প কিছু দূর যাইতেছিলাম। মনে আছে দিনের বেলায় একটি টানেলের ভিতর ঢুকিয়া গাড়ীটা হঠাৎ থামিয়া গেল এবং আলোবাতি সঙ্গে সঙ্গে নিভিল! মিনিটের পর মিনিট কাটিতেছে, গাড়ী আর চলে না—মধ্যে মধ্যে এলারম্ সিগ্‌নাল সিটি দিতেছে—আমার সহযাত্রীর দল ক্রমশঃ দুশ্চিন্তার বেশ অস্থির হইতে লাগিল। সম্প্রতি যে একটা দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে সেই কথাই সকলের মনকে অধিকার করিয়াছে। আমি কিন্তু কেমন যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম......যেন টানেলটার বাহিরে আসিয়াছি এবং সাম্নে খোলা মাঠ সোনার রোদে যেন ভরিয়া আছে—সবুজ ঘাসের ঢেউ, তার ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে লার্ক পাখী উড়িয়া যায়—মনে মনে বলিতেছি—

"এই ত আমার জন্যেই এই চারিদিক হাসিতেছে, এই ত আলোক-স্নাত উদার আকাশে আসিয়াছি। এই গাড়ীটার সঙ্গে যদি কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাই তাহাতে কি আসে যায়? চূর্ণ, ধ্বংস হইবে কে? আমি? কখনই না! আমাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না, আমি বায়ু হইতেও সূক্ষ্মতর, অসংখ্য আমার রূপ, আমি হাতের এতটুকু ফাঁকের ভিতর দিয়া গড়াইয়া বাহির হইতে পারি; ঐ তক্তা পাথর লোহার পাত, মানুষের হাড় মাস সব যদি পিষিয়া যায় তবু আমায় কেউ স্পর্শ করিতে পারিবে না, আমি মুক্ত হইয়া বাহির হইব, আমি এখানে ভিতরে, আমি বাহিরে, আমি সর্ব্বত্র, আমি সর্ব্বময়।"

এই ঘটনার প্রায় এক বছর পরে টলষ্টয়ের, "সমর ও শান্তি" বইখানি গ্রাস করিতে করিতে প্রথম Peter Besukhow কে আবিষ্কার করিলাম—সর্ব্ব শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। সে মানুষটি ফরাসীদের হাতে বন্দী, তাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, Moscowহইতে নেপোলিয়নের সৈন্য ফরাসীরা নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেছে, Besukhow একটা গাড়ীর পিছনে বসিয়া আছে, Kolongaর রাস্তায় সন্ধ্যার ঘোর লাগিয়াছে, মানুষটি মাথা নীচু করিয়া দুই পায়ের উপর রাখিয়া চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছে—এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল কেউ তার খোঁজও লয় না—

'হঠাৎ লোকটি হাসিতে যেন ফাটিয়া পড়ে! একেবারে শিশুর হাসি—পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত লুটাপুটি খাইয়া হাসি! সেই আকস্মিক হাসির ধাক্কায় সকলে অবাক হইয়া তাকাইল। 'হা! হা! আমায় ধরেছে, আমায় বেঁধেছে, কে এই আমি? অমর এই আমার আত্মা—কে একে

বাঁধবে? হা হা হা।' হাসিতে হাসিতে তার চোখ দিয়া জল বাহির হইতেছিল। এক জন সৈনিক উঠিয়া দেখিতে আসিল সেই বিরাট বপুটি হঠাৎ হাসিতে কেন দুলিয়া উঠিয়াছে। Peter এর হাসি থামিয়া গেল, সেও উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল। পূর্ণচাঁদ আকাশের মাঝখানে উঠিয়াছে, মাঠ বন যেন আপনা হইতে সুন্দর ভাবে সকলকে সৌন্দর্য্যের জালে বেড়িয়াছে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত সেই মাঠ ও বনের উর্দ্ধে চাহিতে চাহিতে অসীম আকাশের অনন্ত বিস্তারের মধ্যে যেন হারাইয়া যায়। Peter সেই রাত্রির আকাশে যেন ঝাঁপ দিয়াছে, 'ঐ সবই ত আমি, আমার মধ্যেই ত সবাই রহিয়াছে, আমি ত এই সবার অঙ্গ। এই আমাকে ধরিবে? গারদে বন্দী করিবে? হাসিয়া সে তার সঙ্গীদের পাশে শুইল।"

এম্‌নি হাসি হাসিয়া আমিও জীবন-স্রোত বাহিয়া যাত্রা করিলাম। সেই টানেলের ঘটনার পর দিন হইতে কত বার অমন কত অন্ধকার ভয়াবহ সুরঙ্গ সামনে পড়িয়াছে, রাত্রি যেন আর শেষ হয় না, ভেড়ার পালের মত কত সহযাত্রী ভয়ার্ত্ত মানুষের সঙ্গে দিন কাটাইয়াছি। তাদের ঘর্ম্ম ও ক্লেদ, তাদের শরীরের অশ্রান্ত কম্পন আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিয়াছি; তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়াছি—পরস্পর বিরোধী সে কত আশা আকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণা বিতৃষ্ণা ভয় ক্রোধ বেদনা! কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও অনুভব করি আমি ঐ আলোক-প্লাবিত আকাশ ও অরণ্যানী—থাকিয়া থাকিয়া পাখী আকাশের দিকে শান্তির রাজ্যে উঠিতেছে"

[অপ্রকাশিত মূল ফরাসী হইতে অধ্যাপক কালিদাস নাগ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। লেখক মহাশয় ইহা কেবল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। অন্য কোন ভাষায় ইহার অনুবাদ নিষিদ্ধ—প্রঃ সঃ]

বাণিজ্য-সহায় চিত্রশিল্প

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

ভারতীয় চিত্রকলার এই নবজাগরণের যুগে প্রতীচ্য শিল্প-তরুর একটি কলমের চারা কিছুকাল হইল প্রাচ্যের উর্ব্বর-ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে। উদ্যানপাল কলিকাতা শিল্পবিদ্যা-পীঠের অধ্যক্ষ পার্সী ব্রাউন সাহেব; এই বিলাতী চারা গাছটির নাম কমার্শ্যাল আর্ট অর্থাৎ বিজ্ঞাপনী চিত্রশিল্প। এই শিল্পের সহিত প্রাচ্যের পরিচয় অতি অল্প দিনের। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বাণিজ্যজগতে ইহা এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, ইহাকে বাদ দিয়া কোন ব্যবসায়ই চলিতেছে না। তাহার কারণ, ইহা বাণিজ্যের প্রসারবর্দ্ধক এবং বিজ্ঞাপিত পণ্যের প্রতি অবিস্মরণীয়ভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষক। এই শিল্প কতদূর অর্থকরী, বাণিজ্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, তাহা প্রাচ্যের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রতীচ্যের সংশ্রবে আসিয়া অবগত ও তদীয় পন্থানুসরণরত হইলেও সাধারণের নিকট তাহার বিশেষত্ব ও প্রয়োজন-স্বতন্ত্রতা একপ্রকার অজ্ঞাতই আছে। যদিও বহু পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপনের প্রতীকস্বরূপ চিত্রের ব্যবহার জর্ম্মণী, ইতালী ও আমেরিকায় সম্প্রসারিত হইয়াছিল, তথাপি দৈনিক ও সাময়িক পত্রাদিতে বিজ্ঞাপন দিবার প্রথা ও প্রাচীরচিত্রাঙ্কণরীতি পঁচিশ ত্রিশ বৎসর মাত্র হইল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং আরও অল্পদিন হইল বৈশ্য-পশ্চিমে ইহা বাণিজ্যের অদ্বিতীয় সহায়স্বরূপ অতিপ্রয়োজনীয় শিল্পকলা বলিয়া ইহার সন্ধান মিলিয়াছে। তথায় প্রত্যেক বড় বড় শ্রমশিল্প বাণিজ্যাগারে বিজ্ঞাপনী ও পরিকল্পনা-বিভাগসমূহ অপরিহার্য্য হইয়া বাণিজ্যের সহিত কারুকলা ও চারুকলার অপূর্ব্ব অবিচ্ছেদ্য মিলনসাধন করিয়াছে। ইহা তথায় একটি উচ্চশ্রেণীর অর্থকরী পেশা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং রাজপথ-পার্শ্বের সৌধপ্রাচীরাদি প্রকাশ্যস্থলে লাগাইবার মত বিজ্ঞাপনী-চিত্রের পরিকল্পনা, পণ্যতালিকা, সচিত্রকরণ, সমাচারপত্রাদির জন্য বিজ্ঞাপনী চিত্রাঙ্কণ ও গ্রন্থ সচিত্রণ প্রভৃতি তাহার অন্তর্ভুক্ত

অনুশীলনীয় বিষয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সকল দেশের সকল ভাষার সংবাদ ও সাময়িকপত্র, কলকারখানা, বাণিজ্যকুঠির সালঙ্কৃত সচিত্র পণ্যপঞ্জী, বড়বড় অট্টালিকার প্রাচীরগাত্র, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দারুপট্টবেষ্টনী (hoardings) প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। একদিকে প্রয়োজনীয় পণ্য কোথায় কি ভাবে সুলভ হইবে তাহার সংবাদ যেমন বিজ্ঞাপনের কার্য্য, অন্যদিকে তেম্‌নি কোন্ পণ্য কোন্ প্রয়োজনে আসিয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ কত সহজ ও আরামদায়ক করিবে তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখানো বিজ্ঞাপনের অন্যতম কার্য্য; অর্থাৎ বিজ্ঞাপন চাহিদার যোগান দেওয়ার সন্ধান যেমন বলিয়া দিবে, বাজারে নূতন নূতন চাহিদারও তেম্‌নি সৃষ্টি করিবে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল আক্ষরিক। এখন বিজ্ঞাপনীচিত্রের প্রাধান্য তাহার ক্ষেত্র সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য, আক্ষরিক বিজ্ঞাপনের শক্তি অস্বীকার করিবার যো নাই। অনেকেই জানেন, কত নিষ্ফল "পেটেণ্ট' ঔষধ, কত বাজে গ্রন্থ, কত রাবিশ মাল, কেবল বিজ্ঞাপনের লেখার জোরেই বিকায়। বিজ্ঞাপনের ভাষা যে নিতান্ত মূল্যহীন বস্তুকেও অমূল্য করিয়া তোলে, এবং তাহার কাট্‌তি বাড়ায়, ঐ ভাষার যে সম্মোহনকারী ও গ্রাহকসংগ্রাহী শক্তি আছে তাহা ব্যবসায়ীদের ভালরকমই জানা আছে। সোজা কথায় পণ্যের পরিচয় ও তাহার কার্য্যকারিতার উল্লেখে বড় ফল হয় না। তাই বিজ্ঞাপনের ভাষা গড়িতে হয়; বিজ্ঞাপন তাই বাছা-বাছা কথায় লিখিত হয়। আর বিশেষ বিশেষ ছাঁদে, বিচিত্র বর্ণের অক্ষরে সাজাইয়া উদ্ভটমূর্ত্তিতে বাহির করিতে হয়; যাহাতে তাহা রাশিরাশি বিজ্ঞাপনের মধ্যে নজরে পড়ে। যে যে গুণের জন্য দ্রব্যবিশেষ অবিলম্বে সংগ্রহ করিতে লোকের আগ্রহ জন্মে, সেই সেই গুণ কৌশলে বিজ্ঞাপনের ভাষাগত করিতে সমর্থ, এমন দক্ষ বিজ্ঞাপন-লেখকের কদর বাজারে যথেষ্ট আছে ও থাকিবে। কিন্তু এমন অনেক পণ্য আছে, যাহা সকল দেশের লোকেরই নিত্য-ব্যবহার্য্য এবং যাহার প্রচার কোন-একটি বা কয়েকটি ভাষার ভিতর দিয়া করিলেও সকলের পাঠ্য ও বোধগম্য হয় না। ব্যবসাদারদের তাহাতে বিলক্ষণ অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই বাণিজ্যপ্রধান য়ুরোপে চিত্রে বিজ্ঞাপন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এখন ভাষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অথবা তাহার নামমাত্র সাহায্য

বিদেশী বিজ্ঞাপনী চিত্র

লইয়া চিত্র কেন যে বিজ্ঞাপনের আসর জুড়িয়া বসিতেছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। চিত্রের ভাষা বিশ্বমানবের সার্ব্বভৌমিক সহজবোধ্য ভাষা কৌতূহলোদ্দীপক এবং উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে আশু ফলদায়ক।

মানুষের মন কল্পনার মূর্ত্তিকে অধিক দিন দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু দৃঢ়তর ও সজীবভাবে ধরিয়া রাখে সেই সকল রূপ (form) যাহার প্রতি তাহার অন্তর ও বাহিরের দৃষ্টি নিত্যই ধাবিত হয়।

রাশি রাশি ছড়াছন্দ, কথার চটক নিদর্শন পত্রাদি ম্লান করিয়া চিত্র তাই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রদূতের ন্যায় বিজ্ঞাপনের পতাকা হাতে করিয়া সর্ব্বদেশের নরনারীকে নিত্য আহ্বান করিতে থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বণিক সম্প্রদায় এই বিজ্ঞাপনীটিকে সাহায্য লইবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেন। তাঁহাদের বাণিজ্য প্রতিযোগিতার ফলে চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা প্রাচীর চিত্রশিল্পী বা বিজ্ঞাপনী চিত্রশিল্পী (commer-

cial artist) নামে অভিহিত হইয়াছেন। কমার্শ্যাল আর্টের শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে প্রাচীর চিত্র (poster art)
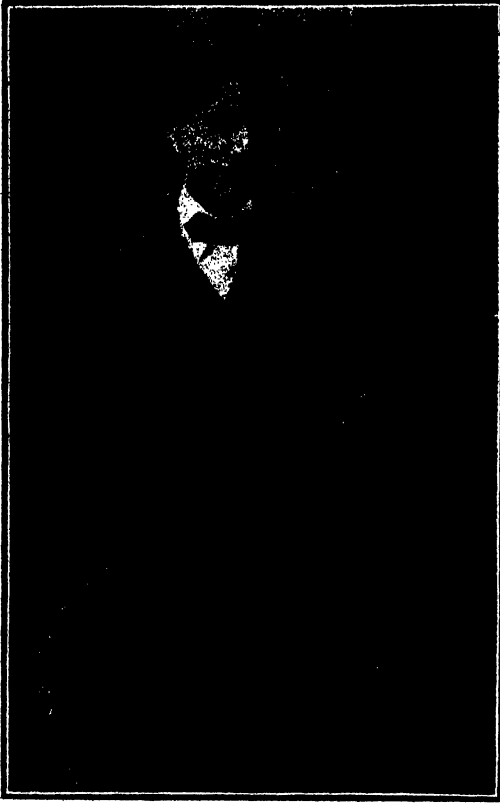
শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মুখোপাধ্যায়

শিল্পে, প্রতীচ্যজগৎ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তথায় পোষ্টার ছবিগুলি এত বড় বড় করিয়া অঙ্কিত হয়, এবং এত উচ্চস্থান হইতে প্রদর্শিত হয় যে, তাহা বহুদূর হইতে বহুলোকের দৃষ্টি যুগপৎ আকর্ষণ করিতে পারে। সেই সেই বিরাট চিত্রগুলি মুখনেত্র ভঙ্গীতে, বর্ণের গাঢ়তা বা তীব্রতায়, স্থূল সবল রেখার টানে শরীর-সংস্থানে এবং কৌতূহলোদ্দীপক কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রদর্শনে এক অপূর্ব্ব বস্তু ও অপরিহার্য্য দর্শন হয়। ইহা বর্ত্তমান জগতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তথা সুকুমার শিল্পে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

যতদিন শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ এক্ষেত্রে অবতরণ করেন নাই ততদিন ইহা তেমন অর্থকরীও হয় নাই। কলা হিসাবেও ইহা নিতান্ত হীন ও উদ্দেশ্য-সাধনের অনুপযোগী ছিল। তাহার মূল্যও বড় কেহ দিত না। কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকার উচ্চশ্রেণীর রূপদক্ষগণ এদিকে আত্মনিয়োগ করায় ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মন চিত্রশিল্পী হার্‌কোমার (Her Komer) এবং ইংরেজ কলাশিল্পী সার্ টি মিলেজ (Sir T. Millais) প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে প্রাচীর-চিত্র (poster) বিজ্ঞাপনীচিত্র শিল্পের (Commercial art) চরম বিকাশ বলিয়া বিবেচিত হয়। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বেগারষ্টাফ ভ্রাতৃযুগল (Beggarstaff Brothers) ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম ইহার প্রবর্ত্তন করেন। তখন হইতে 'পোষ্টার' চিত্র রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপন রূপেই ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং বৃহদক্ষরে বা দীপ্তবর্ণে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন প্রাচীর-গাত্রে লাগাইবার (bill posting) প্রথা প্রচলিত হয়। অন্যদিকে ড্যুলাক (Mr. Dulac) র‍্যাকহ্যাম (Mr. Rackham) হার্ট্রিক্ (Mr. Hartrick) সুলিভান্ (Mr. Sullivan), অষ্টেন (Mr. Austen) এবং ব্র্যাঙ্গুইন্ (Mr. Brangwyn) প্রমুখ বহু রূপদক্ষ সর্ব্বোত্তম কাব্যগ্রন্থগুলি সচিত্র করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের নিপুণ তুলিকার প্রভাবে অচিরেই মণ্ডন বা প্রাচীন শিল্প (Decoration), গ্রন্থ সচিত্রকরণ (Illustration) এবং প্রাচীর চিত্রাঙ্কণ (poster painting) বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীর গাত্রাঙ্কিত চিত্রে (Mural painting) স্বনামখ্যাত ফ্রাঙ্ক্ ব্র্যাঙ্গুইন্ য়ুরোপের নানাস্থানে কর্ম্মকেন্দ্র করিয়া তাঁহার চিত্রণ শৈলীর প্রচার করেন। তাঁহার ন্যায় প্রখ্যাত ইংরেজ চিত্রশিল্পী শ (Mr. Byam Shaw), টেলার (Mr. Fred Taylor) এবং হার্ডী (Mr. Dredley Hardy) প্রমুখ অনেকেই পোষ্টার চিত্রকলার সৌন্দর্য্য ও চাতুর্য্যের সন্ধান পাইয়া তাহার অনুরাগী হইয়া পড়েন। এমন-কি, বর্ত্তমান ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রথম চিত্রকলাদক্ষ সার উইলিয়ম অর্পেন্ পর্য্যন্ত প্রাচীরচিত্র আঁকিয়া থাকেন। আবার দেখা যায় প্রাচীর-চিত্রেই লব্ধখ্যাতি কলাবিদ্‌গণ আধুনিক শ্রেষ্ঠ তৈল চিত্রকারদের অন্যতম। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ পোষ্টার শিল্পী কক্স (Mr. E. A. Cox) এবং হ্যাস্‌স্যাল

(Mr. Hassal) প্রভৃতির প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট তৈল চিত্রকার (Oil painters)। সুতরাং প্রাচীর চিত্রশিল্প যে শ্রেষ্ঠ কলাবিদের প্রতিভা ক্ষুন্নকারী অথবা তাঁহার মর্য্যাদার হ্রাসকারী একথা বলিবার যো নাই। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে যে, খুব ভাল বা বড় আর্টিষ্ট না হইলে পোষ্টার চিত্রকে আর্টের দিক্ দিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন না। বিজ্ঞাপনটি এমন চমকপ্রদ করিয়া তুলিতে হয়, যাহাতে দর্শক তাহা দু দণ্ড দাঁড়াইয়া দেখে। বলা বাহুল্য, এইরূপ সৃষ্টি যে-সে শিল্পীর কর্ম্ম নহে। আজ-কাল বাণিজ্য-জগতের উগ্র প্রতিযোগিতা-হেতু এবং ধনোৎপাদনের অত্যাগ্রহে কলার দিক্ দিয়া যত না হউক, দৃষ্টি আকর্ষক নিত্য নূতনের সন্ধানে শিল্পকলার শৈলী ও যান্ত্রিক কৌশল (technique) লঙ্ঘন করিয়াও সৃষ্টিছাড়া রূপ রচনা ও কিম্ভূতকিমাকার অঙ্গপ্রচেষ্টাত্মক চিত্রের প্রতি লোকের ঝোঁক অধুনা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রের বিজ্ঞাপনী চিত্রের ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজ রহস্যোদ্ভেদক ব্যঙ্গচিত্রেরও (caricature) কদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পশ্চিমের এই আব হাওয়া প্রাচ্যেও যে সৃষ্ট হইতে বসিয়াছে। বিজ্ঞাপনের যুগ যে ভারতেও জারী হইয়া গিয়াছে, আজকাল আর তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। কলিকাতার ন্যায় বড় বড় শহরের রাজপথ দিয়া যাঁহারা দুই পার্শ্বে দেখিতে দেখিতে আসা যাওয়া করেন, ধর্ম্মতলা, চৌরঙ্গী, বড়বাজার প্রভৃতির ন্যায় বাণিজ্য-প্রধান স্থানের বড় বড় চৌমাথায় দাঁড়াইয়া যাঁহারা একবার চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া দেখেন, বায়স্কোপ, সার্কাস, থিয়েটর প্রভৃতির সম্মুখে বড় বড় তক্তায় (board) বা দেয়ালের গায়ে আঁটা মস্ত মস্ত ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, অথবা স্থানে স্থানে উচ্চ উচ্চ সৌধ-প্রাচীরের উচ্চতম স্থানে নানা পণ্য দ্রব্যের শত শত চিত্র নিত্য দেখিয়া থাকেন। পিঠে বিজ্ঞাপনের তক্তা আটা ও তদনুরূপ ছাতা টুপী মাথায় প্রচার-মুখর সজীব বিজ্ঞাপনী চিত্র সহরের রাজপথে, অলিতে-গলিতে রঙ্গভঙ্গে যাইতে দেখেন তাঁহারাই জানেন ব্যবসায়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সম্বন্ধ কি এবং বাণিজ্য-জগতে তাহার স্থান কোথায়। এখন বিজ্ঞা-পন ব্যতীত ব্যবসায়ে উন্নতি করা একপ্রকার অসম্ভব। ইহা কৃষি শিল্প বাণিজ্যের সহিত যেমন অবিচ্ছেদ্য হইয়া গিয়াছে, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তেমনি অপরিহার্য্য হইয়া

বিজ্ঞাপনী চিত্র—তেলের

উঠিয়াছে। বিগত মহাসমরের সময় হইতে ইহার প্রভাব সমগ্র জগতে অনুভূত হইতেছে এবং ভারতেও ইহার প্লাবন আসিয়াছে।

মিষ্টার পার্সী ব্রাউন এই যুগলক্ষণ ধরিয়া এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞাপনী চিত্রশিল্পের কি পরিমাণ চাহিদা হইবে, তথা দক্ষ শিল্পীর অভাব কত তীব্র ভাবে দেখা দিবে এবং ব্যবসায়-জগৎ তাহাতে কতটা অসুবিধা বোধ করিবে তাহা উপলব্ধি করিয়াই কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টে "কমার্শ্যাল আর্ট" বিভাগ খুলিয়া এই নূতন অর্থকরী শিক্ষার প্রবর্ত্তন

করিয়াছেন। এখানে চার বৎসর শিক্ষার ফলে প্রত্যেক ছাত্রই স্বীয় অন্ন-সমস্যার সমাধান কিছু-না-কিছু করিতে পারিবে। এই শ্রেণীতে এক বৎসরের মধ্যে যে ত্রিশ জনের উপর ছাত্র হইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকজন গ্রাজুএটেরও নাম পাওয়া যায়।

এই নূতন বিভাগের অনুষ্ঠান-পত্রে দৃষ্ট হয় যে, শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এখান হইতে বাহির হইবার পরও ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং কর্ম্মপ্রাপ্তি বিষয়েও এই গুরুকুলের সহিত শিষ্যবর্গের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না।

এই বিশেষ শিল্পবিভাগের প্রবর্ত্তক ব্রাউন সাহেব পূর্ব্ব হইতেই ইহার প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিতেছিলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই যেন তাঁহার সহকারী এবং এই নব বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মুখোপাধ্যায় ইংলণ্ডে বাণিজ্য-সহায় চিত্রশিল্পে (commercial art) বিশেষজ্ঞ হইতেছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও দেশে ফিরিলেন,ব্রাউন সাহেবের কল্পনাও মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

চারুকলা সমিতির (Society of Fine Arts) যে প্রদর্শনী হয়, তাহাতে এই বিভাগের এক বৎসরের কার্য্য-ফল প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শিত চিত্রগুলি লর্ড লিটনের দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকর্ষণ করে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে না করিলেও এখন ইহার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন।

কুশলকুমার-বাবুর পিতা স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সহোদর ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার বিগত জর্ম্মন যুদ্ধে বিলক্ষণ সাহসের পরিচয় দিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কুশল-বাবু ডিগ্রী শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বেই কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে প্রবেশ করেন এবং সেখান হইতে অল্প দিন পরেই বিলাত যান। লিভারপুলের নাগরিক শিল্প বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া চিত্রশিল্প ও কলা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও শৈলী যাহা আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রায় সাত বৎসর বিলাত প্রবাসের পর কুশল-বাবু ১৯২০ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং Alliance Advertising Companyতে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ঠিক এই সময় ব্রাউন সাহেব তাঁহার স্কুলে কল্পিত "কমার্শ্যাল আর্ট" বিভাগ খুলিতে উদ্যত হইয়া গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীর অপেক্ষায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ছয়মাসের জন্য নিযুক্ত করেন; ব্যয়-সঙ্কোচ নীতির ফলে সরকারী মঞ্জুরী না পাওয়ায় তখন আর কিছু হয় না।

তিনি ওরিএণ্টাল সোসাইটি অব আর্টস্‌এ অল্পদিন শিক্ষকতা করিয়া সাড়ে চার বৎসর "ষ্টেটস্‌ম্যান" অফিসে ষ্টাফ্ আর্টিষ্ট্ (Staff Artist)-এর কাজ করেন, ১৯২৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলা গবর্ণমেণ্ট মিষ্টার পার্সী ব্রাউনের আশা ফলবতী করিয়া কলিকাতা আর্টস্কুলে নূতন বিভাগটি খুলিবার মঞ্জুরী দিলে তিনি তাহার গঠন ও অধ্যাপনার ভার কুশলবাবুর হস্তে অর্পণ করেন।

কুশলবাবুর একবৎসরের চেষ্টা যেরূপ ফলবতী হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই অর্থকরী শিল্প জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত অনেক যুবকের আকর্ষণের বস্তু হইবে এবং এই অন্ন-সমস্যার দিনে ইহা বাঙ্গালীকে উপার্জ্জনের নূতন পথে পরিচালিত করিবে।

খদ্দরের কথা

শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভাইস্‌চান্সেলর, বিহার বিদ্যাপীঠ

খদ্দর সম্বন্ধে অনেকের নানারকম ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। "কলের কাপড়ের মতন খদ্দরের প্রচার হইতে পারে কি? উহাতে দেশের কোন লাভ আছে কি? অতিরিক্ত দাম দিয়া মোটা কাপড় কিনিতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচয় কি? যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় খদ্দরের জন্য করিব, তাহা যদি কাপড়ের কলে লাগাই, তাহা হইলে দেশের পক্ষে অধিক লাভ হয় না কি?" ইত্যাদি কতই না প্রশ্ন খদ্দর কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। বিশেষতঃ অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা কেবল এই কথাই বলিতেছেন যে, "সেই পুরাতন মান্ধাতার আমলের চরকা-যন্ত্রে হাতে-কাটা সূতায়, হাতে-চালিত ঠক্‌ঠকি তাঁতে বুনা খদ্দর বাষ্প বা বিদ্যুৎ চালিত প্রকাণ্ড 'মিল' যন্ত্রে প্রস্তুত সুদৃশ্য ও সস্তা কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় পারিয়া উঠিবে কি?"

এই প্রবন্ধে আমি এমন কতকগুলি কথার অবতারণা করিব, যা দিয়া পাঠক উপরোক্ত কথাগুলির সারবত্তা বিচার করিয়া নিজ অভিমত গঠন করিতে পারিবেন।

আজকাল সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৬০ কোটি টাকার কাপড় বিদেশ হইতে আসে এবং প্রায় ঐ পরিমাণ (অর্থাৎ প্রায় ৬০ কোটি টাকার) কাপড় ভারতের কাপড়ের মিলগুলিতে প্রস্তুত হয়। কোন বৎসর বা দুই-চারি কোটি টাকার কাপড় বিদেশ হইতে বেশী আসে, কখনো বা দেশী মিলেই কিছু বেশী তৈয়ার হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য প্রতি বৎসর এই ৬০ কোটি ৬০ কোটি লইয়া মোট ১২০ কোটি টাকার কাপড়ও পর্য্যাপ্ত নয়, ইহা ছাড়া, দেশের ভিতর যে-সকল হাতের ঠক্‌ঠকি তাঁত তাহাতেও প্রায় ৬০ কোটি টাকার মতন কাপড় বুনা হয়, এবং দেশের মধ্যেই সেগুলি বিক্রয় হইয়া যায়। দেশের বস্ত্রশিল্পের এই দুর্দ্দশার দিনেও হাতে-চালিত তাঁতগুলিতে দেশীয় মিলগুলির সমান কাপড় বুনা হইতেছে। ইহাতে সত্যই প্রমাণ হয় যে, হাতে চালানো তাঁতগুলি বাষ্প ও বিজলি-চালিত দেশস্থ মিলগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া আছে। ইংরাজ সরকারের পরিদর্শকেরাও ইহা স্বীকার করিতেছেন যে, বুনিবার কাজে মিলের সহিত তাঁত বেশ প্রতিযোগী হইতে পারে। ১৯২৪-২৫ সালের বিহার উড়িষ্যা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে ("Bihar & Orissa in 1924-25" পৃ ৫৯-৬০) লিখা আছে:—

"খুব কম লোকেই এ কথা জানে যে, এই বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের লোকে যতটা কাপড় খরিদ করে, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের ও অধিক, এই প্রদেশের গ্রামগুলিতে তাঁতে বুনা হইয়া থাকে। খাস্ বিহারে একটু কম হয় বটে, কিন্তু ছোটনাগপুরে অর্দ্ধেক কাপড় তাঁতেই বুনা হয়। আবার উড়িষ্যা অঞ্চলেও দুই-তৃতীয়াংশ-হইতে তিন-চতুর্থাংশ (অথাৎ বারো আনা) পর্য্যন্ত তাঁতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে এই প্রদেশে [বিহার ও উড়িষ্যায়] হাতে চালানো তাঁতে প্রতি বৎসর পাঁচ কোটি টাকার কাপড় প্রস্তুত হয় এবং ঐ টাকায় কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ লোকের ভরণ পোষণ হইয়া থাকে।"

সরকারী গণনায় বিহার উড়িষ্যায় দেড় লক্ষের উপর (মোট ১৬৪,৫৯২) তাঁত চলিতেছে। যদি এই তাঁতগুলি নিয়মিতরূপে দিবসের অধিক সময় পর্য্যন্ত চলিতে থাকে তবে যে $\frac{2}{3}$ অংশ দেশী ও বিলাতি মিলের কাপড় ক্রয় করা হয় তাহারও অধিকাংশ ঐ সকল তাঁতেই উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা ছাড়া যে-সকল জোলা তাঁতীরা মাল না চলায় পৈতৃক ব্যবসায় একেবারে তুলিয়া দিয়া অন্য কাজকর্ম্ম ধরিয়াছে, তাহারা যদি একবার বুঝিতে পারে যে, তাদের তৈয়ারী কাপড় পুনরায় বিকিয়া যাইবে তাহা হইলে সে সব জোলা তাঁতী পূর্ব্ব পেশা পুনরবলম্বন করিবে, এবং সহজেই সমগ্র প্রদেশটির আবশ্যকীয় কাপড় তাহারা বুনিতে পারিবে। সমস্ত ভারতেই এইরূপ হইতে পারে, তাঁতের প্রতিযোগিতা এত বেশী যে, বিশেষ কোন

প্রযত্ন বা অর্থব্যয় না করিলেও সমগ্র দেশের চাহিদা উহাতে মিটিয়া যাইতে পারে।

এখন কথা হইতেছে, সূতা কোথা হইতে আসিবে? এবিষয়ে মাঝে দেশ খুবই পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল সত্য। আর ঐ কাজে মজুরী এত কম মিলে যে, যে-সকল স্ত্রী বা পুরুষ অন্য কাজকর্ম্মের দ্বারা কিছু বেশী উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে সেই কাজ ত্যাগ করিয়া চরকায় সূতা কাটিতে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। তবে দেশের ভিতর এমন লোকের অভাব নাই যাহারা অন্য কোন কাজই করিতে পারে না, বা করে না, যে-সকল স্ত্রীলোক বিশেষ আর কিছু করে না তাহারা যদি এই অল্পায়াসসাধ্য চরকা ধরিয়া সূতা কাটিতে থাকে তাহা হইলেই সমগ্র দেশের জন্য যথেষ্ট সূতা উৎপন্ন হইতে পারে। সোজা কথায় এই বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। যদি একটি স্ত্রীলোক ঘণ্টায় ৩০০ গজ সূতা কাটিতে পারে এবং রোজ ৬ ঘণ্টা করিয়া ঐ কাজে লাগিয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যহ ১৮০০ গজ সূতা হইয়া যায়। ধরিয়া লউন উহা সাধারণ ১০ নম্বরের সূতা হইয়াছে; তাহা হইলে ওজনে ঐ ১৮০০ গজ সূতা ৯ তোলা পর্য্যন্ত হইবে।* বৎসরের ৩৬৫ দিন অবশ্য একটানা কাজ হয়ত হইবে না। যদি ৩০০ টি দিনও সে ঐ হারে সূতা কাটিয়া যায়, তাহা হইলে বৎসরের ভিতর ৮০ তোলা ওজনের ৩৩৮ সের সূতা প্রস্তুত হইয়া যায়, প্রতি সেরে ৫ গজ করিয়া ধরিলেও উহাতে ১৬৫ গজ কাপড় বুনা যাইতে পারে। আজকাল দেশের লোকের কাপড় লাগে মাথা পিছু গড়পড়তা প্রায় ১০ গজ করিয়া, তাহা হইলে কমপক্ষে ১৬ জন লোকের কাপড় বুনিবার মতন সূতা একটি স্ত্রীলোক তাহার চরকায় কাটিয়া দিল।† আমার এই হিসাবে অত্যুক্তি নাই, কারণ চরকা কাটায় হাত অভ্যস্ত হইয়া গেলে একটি স্ত্রীলোক ঘণ্টায় ৭০০ গজেরও উপর সূতা কাটিতে পারে, আমি ত কেবল ৩০০ গজ ধরিয়াই হিসাব করিলাম, এবং বৎসরে ৬০ দিনের ছুটী ধরিয়া লইলাম। যে কোটি কোটি স্ত্রী পুরুষ আমাদের দেশে দিনে দুইটি বারের আহার পায় না, তাদের দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, এই চরকার আয়ই ত সামান্য নয়। তারপর দেখুন, দেশের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই ত কৃষিজীবী বা একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যে আমাদের দেশে বৎসরে ৮০।৯০ দিনের অতিরিক্ত খাটিতে হয় না। স্ত্রীলোকের কাজ ত আরো কম। কৃষক তাহার ক্ষেত্র ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে না। কার্য্যের দিনে বরাবরই তাহাকে কিছু-না-কিছু কাজ রোজই করিতে হয়। এইজন্য গৃহে বসিয়া কৃষক ও কৃষক-পত্নী যথেষ্ট সময় পায়। এ কথা বলা হইতেছে না যে, অধিক লাভের কাজ ত্যাগ করিয়া অল্প লাভের চরকা-কাটায় দিন অতিবাহিত করুক। অন্য কোন লাভের কর্ম্ম যখন হাতে না থাকে, তখন আলস্যে দিন না কাটাইয়া চরকা ধর। ভারতের অসংখ্য নরনারীকে এই কথা কয়টি অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। বহু-কালের আলস্য জড়তা ত্যাগ করিয়া তাহারা একবার রুচি পরিবর্ত্তন করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, কিছু না করার চেয়ে চরকায় সূতা কাটাই শ্রেয়ঃ।

মিল এবং চরকার তুলনায় একথা অবশ্য ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, একটি কাপড়ের মিল স্থাপন করিতে কত অর্থ ব্যয়িত হয় এবং সেই অর্থের কত বড় অংশ প্রারম্ভেই বিদেশে যায়, ও মিল-মালিককে বছর বছর কত টাকা খরচ করিয়া মিল চালানো সম্পর্কে বিদেশের দ্রব্যাদি কিনিয়া লইতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে,

---

* মহাত্মাজী ১৪ অক্টোবর ১৯২৩ তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় যে পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন তদনুসারে হিসাব করিলে ১০ নম্বরের ১৮০০ গজ সূতায় ৮⅓ তোলা ওজন হয়।

$$\frac{১৮০০ \times ১০}{ক \times ২১৬} = ১০\text{; অর্থাৎ } \frac{২৫}{৩ক} = ১\text{; অর্থাৎ } ৩ক = ২৫ \text{ তোলা'}$$

এই হিসাবেও দেখা যায় যে উন্নত বৎসরে ৪৪ ইঞ্চি বহরের কাপড় ১৫০ গজের কম হইবে না। অর্থাৎ ক = ৮⅓ তোলা। তাহাতেও ১৫ জন লোকের এক বছরের কাপড় হইয়া যাইবে।

—অনুবাদক

† তুলা কোথা হইতে আসিবে, সে-বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রবাবু কথা উত্থাপন করেন নাই। কেবল কৃষক বলিয়া নহে, সাধারণ যে-কোনো গৃহস্থ নিজেদের পরিবারের দরকারী তুলা অনায়াসে আপন আপন ক্ষেতে উৎপন্ন করিয়া লইতে পারে। যতদিন না এরূপ অবস্থা হইয়া উঠে, ততদিন তুলা কিনিতে হইবে। বিহারে অনেক স্থানে শাদা তুলা এবং স্বাভাবিক গৈরিক বর্ণের কোকটি তুলা জন্মে।

—অনুবাদক

একটি কাপড়ের কল স্থাপন করিতে ও চালাইতে যত অর্থ ব্যয় হয়, তাহার শতকরা ৫০।৬০১ কল ইত্যাদির জন্য বিদেশে যায়। তারপর প্রতি মাসে বা বৎসরে কল চালাইবার খরচের একাংশ বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। একটি ছোট-খাটো রকমের মিল স্থাপনায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাহার ১০ লাখ বিদেশে যায় কলের মূল্য বাবদ। কল চলিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্বদাই উহার একটা-না-একটা অংশ নষ্ট হইতে থাকে। তাহা মেরামতের জন্য বরাবর কিছু-না-কিছু বিদেশে পাঠাইতে হয়। অপরাপর বিষয়েও বিদেশে অনেক টাকা সর্ব্বদাই চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু চরকা ও তাঁতের কাজের একটি পয়সাও দেশের বাহিরে যাইতে পারে না। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাঁত ও চরকাদ্বারা দেশের আবশ্যক বস্ত্রাদি উৎপন্ন করিয়া লইতে হইলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মিলের মূল্য বাবদ যে কোটি কোটি টাকা দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই মূলধনকে রক্ষা করাই ত দেশের পক্ষে এক মস্ত উপকার।

আবার একটি বিষয় বিচার করিয়া দেখা যাউক। বিহার গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের উদ্ধৃতাংশে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ প্রদেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক শুধু তাঁতের কাজেই জীবিকার্জ্জন করে। ইহা ত কেবল একটি মাত্র বিহার ওড়িষ্যা প্রদেশের কথা যেখানে এক লক্ষ চৌষটি হাজার তাঁত চলে এবং তাহার দ্বারা পাঁচ কোটি টাকার কাপড় তৈয়ার হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে যখন ৫০।৬০ কোটি টাকার কাপড় তাঁতেই হয়, তখন ঐ হিসাবে দেখা যাইবে যে, তাঁতের দ্বারাই ভারতে অন্যূন ৫০ লক্ষ লোক দিন গুজরান করে। ইহাতে চরকা যে কত জন লোকে চালান তার কোন হিসাব নাই। মিলের দ্বারা কতগুলি লোকের জীবিকা চলে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে মানিয়া লইতে হইবে, যে, লক্ষ লক্ষ লোকের রোজগার বন্ধ হইয়া তাহা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে চলিয়া গিয়াছে। আজকাল ভারতবর্ষে যে-সকল মিলে সূতা ও কাপড় তৈয়ার হয়, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯২৩—২৪ সনে ঐ সকল কারখানায় তিনলক্ষ চৌদ্দ হাজার মজুর কাজ পাইয়াছে। অর্থাৎ, মিলের চরকায় একটি লোকের মারফৎ যতটা সূতা বাহির হইতে পারে, ততখানি সূতা দুইশত লোকে মিলিয়া হাতের চরকায় কাটে। কারণ মিলের লোকটির ত আর নিজ হাতে সূতা কাটিতে হয় না? সে শুধু মিলের চরকাগুলি পরিদর্শন করে, তাদের যোগান দেয় মাত্র। তাহা হইলেই দেখুন একটি লোক মিলের মজুর হইয়া কিছু উপার্জ্জন করিল বটে, কিন্তু তারই জন্য ১৯৯টি গরীবের অবসর সময়ের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়া গেল; আবার দেখুন, ২০০ কাটনী হাতের চরকায় যতটা উপার্জ্জন করিতে পারিত, তাহার বদলে যে মিলে একটি মজুর কাজ করিতেছে সে কি ঐ ২০০ লোকের সব উপার্জ্জন পায়? একটি অংশমাত্র সেই দিন-মজুরীর প্রাপ্য—অধিকাংশই যায় মিল-মালিকের ঘরে। তাকে আবার তাহার অনেকাংশ পাঠাইতে হয় বিদেশে কলকব্জার জন্য। অতএব আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে মিল স্থাপন করিয়া দেশের আবশ্যকীয় কাপড় উৎপাদন করা যে কত কষ্টসাধ্য, আর যদি-বা সম্ভবই হয়, তবে সেটা দেশের পক্ষে প্রকৃত হিতকর কি না, ইহা প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ দেখুন, আমাদের নিকট অত মূলধন কোথায়? গত ষাট-বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতে করিতে আজ পর্য্যন্ত সবেমাত্র ২৫৬টি মিল স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা মূলধন লাগিয়াছে। এখন যদি আমরা নিজেদের দেশের দরকারের জন্য সব কাপড় দেশী মিলেই তৈয়ার করাইতে চাই, তবে, কমপক্ষে আরো ৫শত মিল গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাতে মূলধন চাই একশত কোটী। যদি মানিয়াই লই যে, ভারত এত মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহা হইলেও দ্বিতীয় অসুবিধা দাঁড়ায় এই যে, অত মিলের কলকব্জা কতকালে যে বিদেশ হইতে আনিয়া পৌছিবে তা কে জানে? তাদের কারখানাগুলির শক্তির ত একটা সীমা আছে? আমরা যতটা কল চাইব পাইব হয়ত তার চেয়ে কম। সুতরাং টাকার জোগাড় হইলেও এতগুলি মিল একসঙ্গে তৈয়ার হওয়া মুস্কিল এবং তাতে কত বৎসর লাগিয়া যাইবে। মিলগুলির অবস্থা আজকাল যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে এই প্রযত্নে সফলতার আশা করা যায় না। যে-সব মিল স্থাপিত হইয়াছে তাহারই কতকগুলি ত বন্ধ হয়-হয়। কতক ত

বন্ধ হইয়াই গিয়াছে। এখন গভর্ণমেণ্টের কাছে এই এক সমস্যা যে, বিদেশী মিলের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয়গুলিকে কি করিয়া বাঁচানো যায়। এইরূপ অবস্থায় আমাদের সমস্ত মূলধন যোগাড় করিয়া তা দিয়া এতগুলি মিল বসাইবার আশা বৃথা।

সকল বিঘ্ন ও আপত্তি কাটিয়া গিয়া যদিই অতগুলি মিলস্থাপন সম্ভবপর হয়, তবে, আরো একটি প্রশ্ন আছে। এক নয়, দুই নয়—দেশের পঞ্চাশ কোটী টাকা একই সময়ে বিদেশে পাঠাইয়া দিতে হইবে। পরে প্রতি বছর আবার কোটি কোটি টাকা পাঠাইতে হইবে সেই কল চালাইবার জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের যে কোটি কোটি স্ত্রী-পুরুষ একপ্রকার বেকার বসিয়া আছে তারা বেকারই রহিয়া গেল—তাদের ভিতরকার ক'-জন গিয়া ঐ সকল নূতন মিলে মজুরী পাইবে? অপর দিকে, চরকা চালাইতে গিয়া আমাদিগকে একটি পয়সাও বিদেশে পাঠাইতে হয় না, মূলধনের যোগাড় করিতে হয় না, দেশ ইচ্ছা করে ত এক মাসের ভিতর সমস্ত ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্তসংখ্যক চরকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া কোটি কোটি বেকার লোকের অন্নসংস্থান করিতে পারে। আজ পর্য্যন্ত কেহ ত অন্য এমন কোনো উপায় বলিয়া দিতে পারেন নাই, যা দিয়া এই ভীষণ বেকার সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে? যদিই-বা উপরোক্ত হিসাব অনুসারে পাঁচশত নূতন কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়া যায়, তাহা হইতে ত মাত্র ৭ লক্ষ মজুর ঐ সব মিলে কাজ পাইতে পারিবে, কিন্তু এখানে যে কোটি কোটি লোকের জন্য ব্যবস্থা চাই। কেবলমাত্র চরকাই এই কোটি কোটি নরনারীর মুখে অন্ন দিতে পারে বলিয়াই চরকার প্রতি জোর দেওয়া হইতেছে।

এ হেন চরকার উপযোগিতা সম্বন্ধে যদি কাহারো কিছু সন্দেহ থাকে মনে করেন [অর্থাৎ রোজ ৫।৬ ঘণ্টা খাটিয়া মাসে ৪৲ টাকায়] এত কম মজুরীতে কেহ সূতা কাটিবে কি না, তবে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখুন যে, ঐ সামান্য আয়ের জন্য হাজার হাজার স্ত্রীলোক প্রস্তুত আছে কি না। আমার মনে হয়, যেখানে দারিদ্র্য অধিক সেখানে চরকার চলন হইলেই গরীবের অন্নবস্ত্রের সোজাপথ খুলিয়া যায়। আজ কেবলমাত্র বিহার চরকাসঙ্ঘ হইতেই ৬০০০ হাজার স্ত্রীলোক চরকা কাটিয়া ১০২৲ টাকা অবধি উপার্জ্জন করিতেছে, (সঙ্ঘের বাহিরে খাদি মহাজনদিগের নিকট হইতেও এই প্রদেশেই কর্ম্মীরা আরো কত পাইতেছে) যে দেশের লোকের আয় মাথাপিছু মাসিক দুই টাকা আড়াই টাকা মাত্র সেখানে উহার উপরে আর একটি টাকাও যদি বাড়াইয়া দিতে পারা যায়, তবে মন্দ কি? চরকা দ্বারা কেহ কেহ ত ৫৲ টাকা অবধি উপার্জ্জন করিতেছে। বেকারের চেয়ে ঐ আয় কি সামান্য হইল?

সকল দেশেই মানুষে আপন আপন শিশুশিল্প রক্ষা করার জন্য অনেক চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত কাপড়ের মিল চালাইবার জন্য ভারতীয় কাপড়ের উপর শতকরা ৭০।৮০ অবধি কর বসাইয়াছিল। অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পীকে দাবাইয়া রাখিয়া, নিজেদের বস্ত্রশিল্প বজায় রাখিয়াছিল। আজ আমরা পরাধীন বলিয়া বিদেশী কাপড়ের আমদানী বন্ধ করিতে অথবা তাহার উপর যথেষ্ট শুল্ক বসাইতে পারিতেছি না, কিন্তু যদি এই মৃতকল্প বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার করিয়া দরিদ্র দেশবাসীর সেবায় লাগাইতে হয় তবে প্রথম প্রথম আমাদিগকে কিছু অধিক দাম দিতে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আজ যদি ভারত স্বাধীন থাকিত, তাহা হইলে ত বিদেশী বস্ত্রের উপর যথাযোগ্য শুল্ক বসিত এবং বিদেশী কাপড় কিনিতে গেলেই ঐ শুল্ক দেশস্থ খরিদ্দারগণকে দিতে হইত—যেমন বিদেশের আমদানী লোহার উপর আমাদিগকে কর দিতে হইতেছে। কিন্তু সে অধিকার যতক্ষণ না আমাদের হস্তগত হয় ততক্ষণ ত আমাদের নিজেদের দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধার বলে এই কাজ উদ্ধার করিতে হইবে। ইহার জন্য যিনি গজ প্রতি দুই চার পয়সা বেশী খরচ করিতে নারাজ হইতেছেন, এক্ষণে তাঁহাকে দূরদর্শী হইয়া এই শিশুরূপী চরকার প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। একটি শিশুকে লালন পালন করিতে হইলে বহু পরিশ্রম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। শিশুর জন্য লোকে এতখানি করে কেবল এই আশা করিয়া নয় কি, যে, ওই শিশুই বড় হইয়া আবার কত উপকারে আসিবে। ঠিক এইরূপ বস্তুতন্ত্রতার দিক দিয়া দেখিলেও এই পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত শিশু 'চরকা'টি প্রতিপাল্য। ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদিগকে

অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। তবেই এককালে এই শিশু আমাদের দেশের দরিদ্রতা দূর করিতে পারিবে। যিনি খদ্দর ক্রয় করিবেন, তিনি ত কেবল গাত্রাবরণ বা বস্ত্রাভরণের জন্যই খদ্দর লইতেছেন না, পরন্তু দেশের ভয়ঙ্কর দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এবং কোটী কোটী নরনারীর লজ্জা নিবারণের উপায় করিতেছেন ,খদ্দর কেবল ক্রেতার লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নহে, পরন্তু সমগ্র দেশের লজ্জা নিরাকরণের প্রতীক স্বরূপ। যদি একটি টাকার খদ্দরও কেহ ক্রয় করেন তাহা হইলেও তিনি বুঝিবেন যে, তাঁহারই দেশের দরিদ্র এক অজানা অচেনা ভগিনীর জন্য অন্ততঃ ৪।৫ দিনের অন্ন সংস্থান তিনি করিয়া দিলেন, এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন যে, দেশবাসী মিলিয়া চরকা ধর,—স্বরাজস্যূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। প্রকৃত পক্ষে চরকা যজ্ঞই বটে।

এই প্রবন্ধ লেখার পর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ অখিল-ভারত চরকা সঙ্ঘের বিহার প্রান্তীয় শাখার যে বার্ষিক বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহা মহাত্মা গান্ধী ১৯২৭।২০শে জানুয়ারির ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৩০শে সেপ্টে-ম্বর ১৯২৬ হইতে পিছনের দিকে ১২ মাসের বিবরণ উহাতে বিশেষ ভাবে রহিয়াছে। তাহার সারাংশ দেওয়া গেল।

চরকা-সঙ্ঘের অধীনে খাদি বোর্ড এই প্রদেশ ('বিহার') খদ্দরের কাজ হাতে লইয়া অবধি যত টাকার খাদি উৎপন্ন ও বিক্রয় হইয়াছে তাহার ষাণ্মাসিক হিসাব-গুলি সংক্ষেপে এইরূপঃ—

ষাণ্মাসিক	উৎপন্ন	বিক্রয়
১৯২৪ এপ্রেল-সেপ্টেম্বর	২১,৫৮৮৲	১৭,৪৭৯৲
১৯২৪ অক্টোবর ১৯২৫ মার্চ	৩৫,২৭৩৲	২৭,৭৮৪৲
১৯২৫ এপ্রেল-সেপ্টেম্বর	৪৭,০৩১৲	৩৩,৩৩৫৲
১৯২৫ অক্টোবর ১৯২৬ মার্চ	৫১,০৮০৲	৫১,৮৬৫৲
১৯২৬ মার্চ-সেপ্টেম্বর	৯৬,৭২৩৲	৫৯,৬৭৮৲

কংগ্রেস অথবা খাদি বোর্ডের বাহিরে 'গান্ধী কুটির' প্রভৃতি ব্যবসায়ীর উৎপন্ন বা বিক্রয়ের পরিমাণ উপরোক্ত হিসাবে দেওয়া হয় নাই। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত এক গান্ধী কুটীরের ব্যবসাই বোর্ডের চেয়েও অধিক বিস্তৃত ছিল।

বিহার প্রদেশে খাদি বোর্ডের অধীন আটটি বিশেষ কেন্দ্রে খদ্দর উৎপাদন করিয়া ১১টি দোকান বা ডিপো রাখিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। দুইজন অবৈতনিক কর্ম্মকর্ত্তা সহ মোট ৩৫ জন কর্ম্মী সারা দিন পরিশ্রম করিয়া এই বৃহৎ ব্যাপার চালাইতেছেন। কর্ম্মিদিগের মাসিক বৃত্তি গড়ে ২৫৲ টাকা।

যে ১২ মাসের বিবরণ উল্লেখ করা গেল তাহাতে দেখা যায় ২৬৯৮ জন কাটুনী (সুতা কাটুনী মেয়ে লোক) ২৯,৫১৯৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। ৪৮৯ জন জোলা তাঁতী মজুরী পাইয়াছে ৩৬, ৮৬২৲ ; ৬জন দর্জ্জী দুই মাসে উপার্জ্জন করিয়াছে ২৩০৲ ; ৮ জন রঙ্‌রাজ ৬ মাসে মায় রঙের খরচ, মজুরি পাইয়াছে ২,২৭৩৲ ; ৪০ জন ধোপা ৬মাসে ১৯৫১৲ উপার্জ্জন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, কাটুনী ও জোলা তাঁতী দিবসের সকল সময়ই ঐ কাজে লাগায় নাই। অনেকে ত অবসর মত এবং অনিয়মিত ভাবে কাজ করিয়াছে।

কেবল যে, উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়াছে, তা নয় ; পরন্তু জিনিষের উৎকর্ষও যথেষ্ট হইয়াছে। আবার খাদির দামও পূর্ব্বাপেক্ষা সস্তা হইয়াছে। ১৯২৩ সালে গজ প্রতি খাদির গড়পরতা দাম ছিল ১৻৫ পাই (অর্থাৎ প্রায় ১৶৷ আনা (১৯২৬ সনে উহা ৶৵ আনায় নামিয়াছে। [সাধা-রণ ৩৬ ইঞ্চি বহরের থান ত এখন ।৵ আনা ।৶ আনা] কাটনীরা যখন নিকৃষ্ট বে-মজমুত সুতা কাটিত, তখন বুনাই (৪৪ ইঞ্চি বহরের) গজ প্রতি দিতে হইত ৶৩ ; কিন্তু এখন সুতা ভাল হওয়ায় ৵৩ (নয় পয়সা) দাঁড়াইয়াছে। আবার আর একটি বড় কথা এই যে, এখন আর জোলা তাঁতীরা হাতে কাটা সুতায় কাপড় বুনিতে আপত্তি করিতেছে না। কারণ, মিলের মতন শক্ত সুতাই তারা এখন পাইতেছে, বিহারে জোলারা কেহ কেহ ৭২ ইঞ্চি বহরের থানও বুনিতে পারিতেছে, নানা রকমের টুইল কোট বা কামিজের কাপড়ের হরেক রকমের পরিকল্পনা ফরমাস্ করিলেই বুনিয়া দেয়। বিহার বিদ্যাপীঠের একটি স্নাতক (গ্রাজুয়েট) রঙরাজের কাজ ও ছাপার কাজ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন।

দুঃখের বিষয়, যত খাদি উৎপন্ন হইতেছে, বিহারে তত বিক্রয় হইতেছে না, কাজেই অনেক মাল জমিয়া যাইতেছে। কিছু কিছু ভিন্ন প্রদেশে যায় বটে,

সব মাল বিক্রয় হইয়া গেলে আশা করা যায়, খদ্দরের দাম শতকরা আরো ১০৲ কমাইতে পারা যাইবে।

বিবরণীর উপসংহারে লেখা আছে :—খদ্দর উৎপাদনের পক্ষে বিহার প্রদেশ অতি উৎকৃষ্ট স্থান। অধিবাসীরা প্রায় সকলেই চাষ-বাস করে। ছোটনাগপুরের কয়লার খনি ও জেমশেদপুরের লৌহ কারখানা বাদ দিলে, কৃষির অতিরিক্ত কোনো মজুরী এবং অর্থকরী কাজ দেশবাসীর নাই বলিলেই চলে। বয়ন-শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এখনো সবগুলি তাঁত আছে তাহাতে কাজ হইলে সমগ্র বিহার প্রদেশের বস্ত্র উৎপাদন হইতে পারে। তুলা যতটা জন্মে তাহা উৎকৃষ্ট না হইলেও তাহাতে কাজ বেশ চলে। আজকাল অনেক স্থানে তুলার চাষ হইতেছে। ব্যবস্থা ঠিক ঠিক চালাইতে পারিলে ক্রমশঃ কর্ম্মকুশলতা বাড়িয়া গেলে খাদি উৎপাদন বেশ ভাল ভাবেই চলিতে পারে।

খাদি বোর্ড এবং অপরাপর খদ্দর ব্যবসায়ীরা আজ পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের সামান্য অংশেই কাজ সুরু করিয়াছে। তাহাতেই এতদূর সুফল দেখা যাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিলে বিহারবাসী চাষীর মাথা-পিছু আবাদী জমী মাত্র, ⅘ একর তাহারাও অধিকাংশ (প্রায় ⅘ ভাগ) ভূমি আবার, নদী প্রভৃতি স্বাভাবিক জলস্রোত হইতে দূরে ; জল-সেচনের জন্য খাল নালাও নাই ; সেইজন্য সময় মত এক বৎসর বৃষ্টি না হইলেই অনুপায়, ঐ সামান্য জমী হইতেই ত কৃষককে খাদ্য ও অপরাপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি (যথা তুলা) উৎপন্ন করিয়া লইতে হইবে। এমত অবস্থায় অবসর-সময়ের জন্য কিছু শিল্পাদি কর্ম্মের ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত দরকার। আর কিছু না হউক অবসর মত চরকা ত সকলেই কাটিতে পারে! অর্থনীতিবিৎ বলিবেন, চরকায় এত কম আয় হয় যে, উহাতে শ্রম করা পণ্ড শ্রম। কিন্তু লোকের দৈনিক হারাহারি আয় কতটা, সেই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, জন-পিছু রোজ দুইটি মাত্র পয়সা অতিরিক্ত আয় হইলেও তাহা যে কতদূর কাজে আসে, তা কর্ম্ম ক্ষেত্রে যাঁহারা নামিয়াছেন, তাঁহারা অহরহ দেখিতে পাইতেছেন। আবার দেখুন বৎসরে এক শত দিনের অধিক ও আর চাষের কাজে লাগে না? অবশ্য চাষের কাজই এমনি, যে, থোকে থোকে এক এক সময়ে কিছু কিছু করিয়া কাজ করিয়া সারাটি বৎসর জমীর কাছাকাছি থাকিতে হয়। অধিক দিন দূরে থাকা পোষায় না। এমন অবস্থায় কিছু দিন পরে পরে কৃষকের সময় ত যথেষ্ট মিলে? অভিজ্ঞতা দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, চরকা ব্যতীত এমন সার্ব্বজনিক অনায়াস লভ্য হাতিয়ার আর একটি নাই। অবসর-সময়ে যাহারা অপর বিধ হস্তশিল্পাদি করিতে পারিবে তাহারা তাহা দিয়া দু-পয়সা উপার্জ্জন করুক না? কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য চরকাই এমনি একটি হাতিয়ার যে, ইহার তুল্য আর একটি নাই।

[শ্রীমতী গুহজায়া কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত]

আলোচনা

[প্রত্যেক প্রতিবাদে চারিশতের অধিক শব্দ না-থাকা প্রবাসীর নিয়ম]

"ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘট"

আপনার গত চৈত্রের প্রবাসীতে কলিকাতার ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনি সম্পাদকীয় স্তম্ভে উক্ত ধর্ম্মঘট ও উহার পরিচালকদিগের সম্বন্ধে যে বিদ্রূপ, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও অমূলক সন্দেহাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আজ কয়েকটি প্রতিবাদাত্মক কথা লিখিতেছি।

গত চৈত্রের প্রবাসীতে আপনি ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘট, ধর্ম্মঘটী, ও উহার পরিচালকদিগকে অযথা ও অন্যায় আক্রমণ করিয়া যে-প্রকার রোষ ও দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে আক্রোশ ও বিদ্বেষের ভাবই মূর্ত্ত হইয়াছে। ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘট, ধর্ম্মঘটী এবং উহার পরিচালক, উহার কোনটির সঙ্গে আপনার কোন আক্রোশ থাকিতে পারে কি না, তাহা আমাদের চিন্তা ও বুদ্ধির অতীত। আপনার উক্ত সমালোচনা পাঠ করিয়া আমরা নিঃসঙ্কোচ হৃদয়ে আজ বলিব, যে, নিরপেক্ষ সমালোচক হিসাবে আপনার লোক-সমাজে

সমাদৃত গুণ যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে। আপনার আলোচনার কতকগুলি রূঢ়, আপত্তিকর, অসমীচীন, অসার ও অযৌক্তিক কথার সমাবেশদ্বারা আপনি জনসাধারণকে আপনার ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। আপনি একজন নিপুণ সাহিত্যিক ও প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী। আপনার সাহিত্যতূণ হইতে যে-সমস্ত বাক্যবাণ আপনি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলি জ্যা-বিমুক্ত হইয়া অলক্ষ্যে কোন্ লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা একমাত্র কুশল শরসন্ধানকারী ব্যতীত অপরের বুঝিবার মত তত ক্ষমতা নাই। আপনার আলোচনার শেষভাগে ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘটের সঙ্গে এক রাজনৈতিক দলাদলির সন্দেহ যোগ করিয়া আলোচনার উপসংহার করিয়াছেন। উপসংহারের ভিতর আপনার যে বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আলোচনার প্রারম্ভেও তাহা অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও অপ্রকট থাকিতে পারে নাই। আপনি অত্যন্ত চতুরতার সহিত "ঝাড়ুদার নহেন এরূপ কয়েকজন লোক"...ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ করিয়া উপসংহার পর্য্যন্ত দলাদলির গোলমালে টানিয়া ধর্ম্মঘট পরিচালকদিগকে নাস্তানাবুদ করিতে এতটুকু চেষ্টার ত্রুটী রাখেন নাই। এই ব্যর্থ চেষ্টায় আপনি ক্রোধান্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট-পরিচালকদিগকে বহুবার অন্যায় ও ধৈর্য্যহীন আক্রমণ করিয়াছেন এবং জনসাধারণকে আপনার মতানুবর্ত্তী করিয়া তুলিতে অনেক অসার ও অযৌক্তিক অর্থনীতি ও সমাজনীতির অবতারণা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, ধর্ম্মঘট অপরের প্ররোচনায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, জনসাধারণকে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মঘটীদের দাবী অসঙ্গত হইয়াছে এই বিশ্বাস সাধারণের মনে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মঘট-পরিচালকেরা "লোক নাচাইয়া বেড়ায়", "নিজেদের আদর্শ বা স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে", "সুবিবেচক লোক নহেন," "ঝাড়ুদার-হিতৈষী অবিবেচক ব্যক্তি" ইত্যাদি নানা লোকহৃদয়ের প্রত্যয়হানিকর, শ্রদ্ধাপহারক ও গ্লানিজনক কথার সন্নিবেশ দ্বারা লোক-হৃদয় বিষাক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, উপরি উক্ত উপায়ে সুচতুর রাজনীতিবিদের ন্যায় অত্যন্ত নিপুণতার সহিত জনসাধারণের হৃদয়কে দুর্ব্বল করিয়া ও তাহার সুযোগ গ্রহণে অযৌক্তিক অর্থনীতির ও সমাজনীতির ফাঁকা আওয়াজে সকলকে স্তম্ভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রমজীবিগণ "পরোক্ষভাবে সমাজের সহিত কড়ারে আবদ্ধ থাকে" এবং এইরূপ "ধর্ম্মঘট মহা অধর্ম্ম" ইত্যাদি আপনার সমাজনীতির প্রতিপাদ্য। এই চতুর্থ যুক্তি দর্শাইতে যাইয়া আপনি এত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন; যে, ধর্ম্মঘট-পরিচালকদিগকে "সমাজ ততটা সহজে ক্ষমা করিবে না" বলিয়াও ক্ষান্ত না হইতে পারিয়া একেবারে "অনেকগুলি নির্দ্দোষ লোকের প্রাণহানির পাপ তাহাদের উপর পড়িবে" বলিয়া এক প্রকাণ্ড অভিশাপ দিতেও ছাড়েন নাই। আপনি লিখিবার সময় ক্রোধান্ধ হইয়া নিশ্চয়ই ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। আপনার পঞ্চম যুক্তি উপসংহারে আপনার সন্দেহ প্রকাশ। আপনার সমগ্র আলোচনা মোকর্দ্দমার বর্ণনা-পত্রের মত অভিযোগপরিপূর্ণ। আপনার সমগ্র অভিযোগগুলিকে আমি উল্লিখিত পাঁচটি বিভাগে ফেলিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর করিলাম। কারণ আপনাদের নির্দ্দিষ্ট চারিশত কথায় আমার সকল কথা প্রকাশ করিতে হইবে।

প্রথমটি একেবারে যুক্তিহীন। সমাজের এক শ্রেণীর লোকের অপর শ্রেণীর লোককে সাহায্য করা দূষণীয় নহে।

দ্বিতীয়টির প্রমাণাভাব। উহা জেদ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে। কলিকাতার চেয়ে আয় কম অনেক মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতার চেয়ে অধিক বেতন দেন। তৃতীয়টি অবিবেচনাপূর্ণ, আক্রোশাত্মক ও বিদ্বেষাত্মক। চতুর্থটি ধনিকসুলভ ও সুবিধাবাদী শ্রেণীগত মনোবৃত্তির পরিচয়, সুতরাং স্বার্থসাপেক্ষ, অসার ও অযৌক্তিক। পঞ্চমটি অর্থহীন সন্দেহসৃষ্টিকারক উপসংহার এবং অভিযুক্তদের উপর আরোপিত দোষে দুষ্ট। আর-একটি কথা বলিবার এই যে, "লোক নাচাইবার প্রবৃত্তি" আমাদের নাই। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা তরুণের দলে, বৃদ্ধের আসরে, ধনীদের মজলিস ও শ্রমিক বৈঠকে এবং সম্প্রদায়ের সভায় হাজির থাকেন। একমাত্র তাঁহারাই একাজের উপযুক্ত। আমরা নহি। আমরা একমাত্র শ্রমিকশক্তিতে বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর অপরাপর স্থানের ন্যায় ভারতেও শ্রমিক উত্থান হইবে। তাহাতে ধনিক-শ্রমিকে বিবাদও হইবে। কারণ ধনিক-শ্রমিক-বিবাদ শ্রেণী-স্বার্থবৈষম্যেরই তিক্ত ফল। উহাতে কোন স্থান বিশেষের "ট্রেডমার্ক থাকে না।

শ্রী ধরণীকান্ত গোস্বামী

লেখক প্রথমে এক অতি দীর্ঘ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন। অতি দীর্ঘ বলিয়া ফেরত দেওয়ায় এবার যেটি পাঠাইয়াছেন, তাহাতেও চারিশতের অনেক বেশী কথা আছে। তথাপি তিনি ঝাড়ুদারদের নেতা বলিয়া ইহা ছাপিলাম। ইহাতে তাঁহার মত ও ক্রোধ প্রকাশ ছাড়া আমাদের কোন যুক্তির খণ্ডন আছে কি না, তাহা পাঠকেরা স্থির করিবেন। আমাদের প্রতি আক্রোশ আদির আরোপ সম্পূর্ণ তাঁহার কল্পনা-প্রসূত।—প্রবাসীর সম্পাদক।

—

"অভিনয় ও নৃত্য"

গত বৈশাখ সংখ্যার "প্রবাসী"তে "অভিনয় ও নৃত্য" সম্বন্ধে প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্য বিষয়ে সমালোচকের অভিমত এইরূপ ;—

১। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে ভদ্রমহিলাদের নৃত্য ও অভিনয়ের বিরুদ্ধেই আন্দোলন হইতেছে, "উহার পুনঃ প্রবর্ত্তন উপলক্ষ্যে নহে।"

২। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—নৃত্য মাত্রই দুর্নীতির পরিপোষক নহে—এই বলিয়া বৈষ্ণব সমাজের ও ব্রাহ্মসমাজের নগর-কীর্ত্তনের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নগর-কীর্ত্তনের সময় নৃত্য ও "সাগর নৃত্য" সমজাতীয় হইতে পারে না।

৩। থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের চারিত্রিক অবনতি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সম্পাদক মহাশয় সাবধান হইতে বলিয়াছেন, কিন্তু যে-কারণে তথায় তাহাদের অবনতি হয়, সেই কারণে এখানেও ঐরূপ হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণের একসঙ্গে অভিনয় নৃত্যাদি হেতু অনিবার্য্য অবাধ মেলামেশা হইতে পরস্পরের চারিত্রিক অবনতি হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে ; কারণ, "কাজল কা দারমে যেতনা সেয়ানা হোই বুঁদ লাগই পর লাগই—"

৪। এইরূপ অবনতি যে ইতিপূর্ব্বেই হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন, "প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে * * * অভিনয় করিতে যাইয়া পুরুষ ও স্ত্রীলোকের (ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা) অবাধ মেলামেশার ফলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা তৎকালীন লোক অবগত আছেন।" * * *

৫। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "মহিলাদের নাট্যাভিনয় অর্থোপার্জ্জনের জন্ম করা যাইতে পারে।" সোনার বাংলার আর্থিক অবস্থা কি এখন এতই শোচনীয় যে, বাংলার কুললক্ষ্মীদের শেষে সাধারণ নটীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে? তারপর, কোন রাজরাজড়ার নাচের আমন্ত্রণে যাইয়া তাঁহাদের কাহারও অবস্থা যে মমতাজ বেগমের মত না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? হইবার আশঙ্কাই বেশী। কিন্তু তাহা কি মর্য্যাদাকর ও শোভনীয় হইবে? ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে নৈতিক বিপজ্জনক পথে চলিতে বলা কি সমীচীন?

৬। "বঙ্গনারী"র লেখা হইতে যে-অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মহিলাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য চর্চ্চার দিক হইতে নৃত্যকলা শিখিবার বিষয়ে বলা হইয়াছে; উহা হইতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মহিলাদের নৃত্যাভিনয় সম্বন্ধে কোন অনুমোদন-বাক্য সম্পাদক মহাশয় পান নাই। অধিকন্তু বৈশাখের "উদ্বোধনে" শ্রীমতী সুষমা দেবী এইরূপ নৃত্যাভিনয়ের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়াছেন।

৭। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, প্রাচীন ভারতেও নাটকাভিনয় প্রচলিত ছিল, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু পুরাকালের সমাজতত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায়, ভদ্রমহিলারা তাহা করিতেন না, এখনকার মত তখনও এক শ্রেণীর পেশাদার নটী উহা করিত। তাহাদিগকে "কুশীলব" বলিত, যথা—

"কুশীলব—আগন্তবো অন্যস্মাদাগতা নট নর্ত্তকাঃ (বাৎস্যায়ন) তাহাদিগকে "নট-নটী"ও বলা হইত; যথা;—নটঃ—জায়াজীবঃ (অমরঃ)

রঙ্গজীবঃ (হেমচন্দ্র) নটী—রঙ্গযোষিৎ (বাৎস্যায়ন)

নটঃ—শৌচিক্যাং (কর্ত্তব্যস্ত চ কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব শৌচিক, শৌণ্ডিকাজ্জাতো নটো বরুড় এব চ (পরাশর)। সুতরাং দেখা গেল, প্রাচীনকালের নটীরা ভদ্রমহিলা ছিলেন না, নিম্নশ্রেণীর রমণী।

৮। সম্পাদক মহাশয় গুজরাটের "গরবা" নাচের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় না। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন ও বিশিষ্ট বন্ধুগণের সম্মুখে মহিলারা ঐরূপ নৃত্য করিয়া থাকেন। উহা তদ্দেশে পূজার অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং "গরবা" নৃত্যের সহিত সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে "জলসা" নৃত্যের তুলনা করা যায় না। প্রভেদ অনেক।

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

১। সমালোচক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অধিকতর সত্য; কিন্তু আমাদের কথাও মূলতঃ সত্য এই কারণে, যে, ভদ্রমহিলাদের নৃত্য ও অভিনয় পুনঃপ্রবর্ত্তিত না হইলে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে তাহা অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। ভদ্রমহিলাদের অভিনয় ও নৃত্য প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে না হইলেও বর্ত্তমান আন্দোলনকারীরা তাহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করিতেন বলিয়া আমার বিশ্বাস; কিন্তু আন্দোলন হয় ত এত প্রবল হইত না।

২। আমি "সাগরনৃত্য" দেখি নাই, এবং তাহার সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলি নাই।

৩। পুরুষ ও নারীর একত্র অভিনয় ও নৃত্যের আলোচনা আমি করি নাই। পুরুষনারীর একত্র নৃত্যের সমর্থন আমি করি না। ভদ্রসমাজের পুরুষনারীর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী সম্মিলিত অভিনয় বঙ্গীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অবাঞ্ছনীয়; আপত্তির কারণ ভবিষ্যতে দূরীভূত হইবে কি না, অনুমান করিতে পারিতেছি না। কিন্তু সমাজের এমন নৈতিক অবস্থা অচিন্তনীয় বা অসম্ভব নহে, যখন সাবধান হইয়া এরূপ সম্মিলিত অভিনয় করিলে অবনতি নিবার্য্য হইবে।

৪। 'সঞ্জীবনী" যাহা জানেন, আমি তাহা জানি না।

৫। আমি ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না, সমালোচক কোথা হইতে "মহিলাদের * * * নাট্যাভিনয় অর্থোপার্জ্জনের জন্য করা যাইতে পারে," কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কয়েকটি বাক্যের আদি অন্ত ও মধ্য হইতে নিজের প্রয়োজন মত কোন কোন কথা বাদ দিলে যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রমাণ করা যায়। আমি বৈশাখের প্রবাসীতে যে মত প্রকাশ করিয়াছি এবং যাহা এখনও আমার মত, তাহা নীচে ঐ প্রবাসীর ১৫৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত যাঁহাদের নাটক-সমূহের ও অভিনয়ের সুরুচি-কুরুচি, সুনীতি-দুর্নীতির সূক্ষ্ম বোধ আছে, তাঁহাদের পরিচালনায় কোন ভাল প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা তুলিবার নিমিত্ত অভিনয়ে আপত্তি দেখি না; কিন্তু যাহার তাহার অধ্যক্ষতায় ইহা হওয়া উচিত নয়।"

৬। ঠিক্ কথা। কিন্তু আমার নিবন্ধিকায়, নৃত্য মাত্রেই খারাপ কি না, তাহাও একটি বিবেচ্য বিষয় ছিল, এবং সেই বিষয়টিরই আলোচনা উপলক্ষ্যে "বঙ্গনারী"র কথা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

৭। প্রাচীন ভারতে ভদ্রমহিলারা অভিনয় করিতেন কি না, সে-বিষয়ে আমার কোন বিশেষ জ্ঞান নাই। এক সময়ে কোন রীতি চলিত না থাকিলেও তাহা অন্য সময়ে চলিত হইতে পারে, এবং তাহা অবিমিশ্র কুফলোৎপাদক না হইতে পারে। আধুনিক সময়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রমহিলারা সঙ্গীত শিখিতেন না এবং প্রকাশ্যে গান করিতেন না; এখন অনেকে তাহা করেন। তাহাতে কু-ফল হয় না।

৮। গুজরাটে গরবার উল্লেখ ভদ্রশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে নৃত্যের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমার আলোচনা সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত না হইলেও, তাহাতে একাধিক বিবেচ্য বিষয় ছিল। একটির প্রমাণ অন্য কিছুর প্রমাণ বলিয়া ভুল করা উচিত নয়। যদিও কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে ছাত্রীরা পারিতোষিক বিতরণ সভায় গরবা নৃত্য করিয়াছিল বলিয়াছি, তথাপি ইহা আমি বলি নাই, যে, গুজরাটী মহিলারা প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে বা জলসায় উহা করেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

—

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত

জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'র ২৮৬ পৃষ্ঠায় আপনি আমার প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমার মতে সন্তোষজনক নয়। আপনি শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাস হইতে যে দুটি কোটেশন দিয়াছেন, তাহা "ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের সংস্কারক শাখা" এই মত মোটেই সমর্থন করে না। আপনার প্রথম কোটেশন অসম্পূর্ণ। নিম্নলিখিত

কথাগুলি উদ্ধৃত করিলে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত পরিষ্কার বোঝা যাইত।

It is thus that the Brahmo Samaj has come to be regarded by the outside public, by Hindus specially, as Christianity in another guise. There lies the root, perhaps, of the present aversion of our countrymen against the Brahmo Samaj. And with the spread of the Hindu revival movement that aversion is daily strengthening. Much of that *prejudice* is certainly *due to an imperfect realization of the Mission of the Brahmo Samaj* on the part of outsiders and *also* to *prejudice* and *ignorance*. Men do not see that the Mission of the Brahmo Samaj *is to combine the east and the west.* *

Thus its ideals are both *eastern and western* i. e., in a *new faith that will combine both of them in due measure.* The East cannot be forgotten nor can the West be neglected. Besides, the Brahmo Samaj stands on *the Universality of the spiritual endowment of man. To shut the eye to something really great and good because it comes from abroad would be un-Brahmic.*" Pages 275-277:—History of the Brahmo Samaj, vol. II. (ইটালিকগুলি লেখকের।)

ইহার পর আর একথা বলা সঙ্গত নয়, যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজের "সংস্কারক শাখা"। দ্বিতীয় কোটেশ্যনে শাস্ত্রী মহাশয় Higher Hinduism এর কথা বলিয়াছেন। Higher Hinduism ব্রাহ্মসমাজের মতে ও সম্ভবতঃ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে কেবল শুদ্ধ আধ্যাত্মিক একেশ্বরবাদ বোঝায়; ইহার মধ্যে মূর্ত্তিপূজার স্থান নাই, যাগযজ্ঞ নাই, অভ্রান্তগুরুবাদ, অবতারবাদ, শাস্ত্রবাদ নাই, জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা নাই, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য, ইত্যাদি নাই। এই Higher Hinduism ব্রাহ্মসমাজের একটা ideal বা কল্পনা মাত্র; হিন্দুসমাজে এই Higher Hinduism এর বাস্তব অস্তিত্ব নাই; ঐতিহাসিক যুগে কখনও ছিল না,—এবং তার পূর্ব্বেও ছিল কি না, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। যখন হিন্দুসমাজে Higher Hinduism বলিয়া একটা জিনিষই নাই, এবং হিন্দুসমাজ ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন কিনা সন্দেহের বিষয়; এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজকে "হিন্দু সমাজের সংস্কারক শাখা কি করিয়া বলা যায়"? Higher Hinduism এর ন্যায় ব্রাহ্মসমাজে Higher Christianityর একটা ideal রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আসিয়াছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার Unitarian সম্প্রদায়ের মধ্যে এই Higher Christianity জীবন্তভাবে বর্ত্তমান, এবং এজন্যই Unitarianদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের এত আত্মীয়তা ও আদান-প্রদান। হিন্দুসমাজের সঙ্গে সেরূপ হয় না। কেন হয় না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। "মোরা হিন্দু" "মোরা হিন্দু" বলিয়া যে ব্রাহ্মরা সময়ে অসময়ে চীৎকার করেন, তার যে কি কুফল তাহা City-Collegeএর গোলমালে হয়ত কেহ কেহ বুঝিতে পারিতেছেন। আপনারা বলিতেছেন, "আমরা হিন্দু"। কলিকাতার হিন্দুসমাজ বলিতেছে, তাহা হইলে আপনাদের কলেজ হোষ্টেলের সীমার মধ্যে কোন হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে আপনাদের কোন আপত্তি হওয়া উচিত নয়।" এই পর্য্যন্ত লেখার পর ২০এ মের *Indian Messenger*এ দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু, ব্রাহ্মেরা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, এই কারণে College hostelএ তাদের মূর্ত্তিপূজার অধিকার আছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

"জিজ্ঞাসু"

আমি প্রবাসীতে যাহা লিখি, তাহা আমার নিজের মত। তাহার জন্য ব্রাহ্ম সমাজের কোন শাখার লোক দায়ী নহেন; কারণ, আমি কোনও ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নহি। এইজন্য ব্রাহ্মদের "মোরা হিন্দু" বলিয়া চীৎকার করা সম্বন্ধে লেখক যে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই। আলোচ্য প্রশ্ন হইতে সরিয়া গিয়া অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা অনুচিত। লেখকের প্রত্যেক কথার উত্তর দিতে পারি, কিন্তু প্রবাসী সেরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তরের জন্য অভিপ্রেত নহে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে আমি দেখাইয়াছি, যে, শাস্ত্রী মহাশয় নিজেকে এবং সধর্ম্মী ব্রাহ্মদিগকে "as Hindus" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ Higher Hinduismএর প্রকৃততম ও মহত্তম ব্যাখ্যাতা হইবেন, এই আশা ও প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার Mission of the Brahmo Samaj নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণেও এইরূপ বাক্য আছে। যথা, ৬ পৃষ্ঠায়—

"To us, Hindus of the East, brought up under the influence of the Upanishads and of the Gita such a conception is childish." ২৫ পৃষ্ঠায়, "We mild, contemplative and meditative Hindus of India.... will perhaps still continue to be contemplative and see the Supreme as the Soul of our souls."

শাস্ত্রী মহাশয়ের এইসব উক্তির অর্থ আমি এইরূপ বুঝি, যে, তিনি ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু মনে করিতেন। ব্রাহ্মদের সমষ্টির নাম ব্রাহ্মসমাজ। ব্যক্তিগত ভাবে যদি ব্রাহ্মেরা হিন্দু হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমষ্টিও হিন্দুদের বৃহত্তর সমষ্টি হিন্দুসমাজের অংশ। হিন্দু-সমাজের এই অংশ সংস্কারপ্রয়াসী। এই কারণে আমি এই অংশকে হিন্দুসমাজের সংস্কারক শাখা মনে করি। আমি জানি, শাস্ত্রী মহাশয়ও তাহাই মনে করিতেন। অবশ্য "জিজ্ঞাসুর" ইহা হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিশ্রণ চাহিতেন, সত্য কথা। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভূত প্রাচীনপন্থী অনেক হিন্দুও তাহাই করিয়াও হিন্দুনামধেয়ই থাকিতেছেন। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন অনেক হিন্দু তাহার প্রমাণ। শিক্ষিত অনেক হিন্দুর লেখা বহি তাহার প্রমাণ। রামকৃষ্ণ মিশনের মিশন নাম এবং সেবাশ্রমাদি নানা জনহিতকর কাজ পাশ্চাত্য প্রভাবের পরিচায়ক। অথচ এই মিশন ও তৎসংসৃষ্ট ভক্তমণ্ডলী হিন্দুই আছেন। অতীতকালে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম নিওপ্ল্যাটোমিজ্‌মের দ্বারা রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও খৃষ্টীয় নামেই পরিচিত। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র হিন্দু ও বৌদ্ধ চিন্তা, সাধনপ্রণালী ও মতের প্রভাবে খৃষ্টীয় সমাজের অলক্ষিত পরিবর্ত্তন ঘটা সত্ত্বেও তাহা খৃষ্টীয় আছে। বিলাতী বিস্কুট খাইলেই যেমন আমাদের ভারতীয়ত্ব ঘুচিয়া গিয়া ইংরেজত্ব লাভ হয় না, তেমনি বিদেশের উৎকৃষ্ট বা ভিন্ন ধর্ম্মের কোন মত, অনুষ্ঠান, সাধন, আদর্শ লইলেই আমরা অহিন্দু হইয়া যাইতে পারি না। হিন্দুরা আবহমান কাল অন্য অনেক জাতিকে যেমন

ভাব ও চিন্তা দিয়াছে, তেমনি লইয়াছে। সব সভ্য জাতি এই-রূপ করিয়াছে। তথাপি তাহারা নিজনামেই পরিচিত।

মূর্ত্তিপূজা হিন্দুত্বের প্রাচীন রীতি নহে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অভ্রান্তগুরুবাদ, অবতার বাদ, বাল্যবিবাহও প্রাচীন নহে। চিরবৈধব্য রীতি অধিকাংশ হিন্দুর মধ্যে কখন প্রচলিত ছিল না, এখনও নাই। উহার অশাস্ত্রীয়ত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমাণ করেন। Higher Hinduism এখনও আছে, আগেও ছিল। কেবল একটি প্রমাণ দিতেছি। রামমোহন রায় তাঁহার "A Defence of Hindoo Theism" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন :—

"I have urged in every work that I have hitherto published, that the doctrines of the unity of God are real Hindooism, *as that religion was practised by our ancestors*, and as it is well-known even at the present age to many learned Brahmans."

লেখকের মতে হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের আত্মীয়তা ও আদানপ্রদান তেমন হয় না, যেমন পাশ্চাত্য ইউনিটেরিয়ানদের সহিত হয়। আমি জানি, হিন্দুসমাজের সহিতও আদানপ্রদান হয়। ব্রাহ্মেরা আকাশ হইতে পড়েন নাই, ভুঁইফোঁড়ও নহেন। তাঁহারা হিন্দুবংশজাত, এবং তাঁহাদের অধিকাংশ—অন্ততঃ অনেক, মত, বিশ্বাস, আচার, চিন্তা, ভাব, আদর্শ ভারতবর্ষজাত, যদিও পাশ্চাত্যের ছাপ ও প্রভাব তাহার কোন কোনটার উপর পড়িয়াছে।

সুভাষ-বাবুর দাবী অযৌক্তিক। কারণ, হিন্দুত্ব ও মূর্ত্তিপূজা অভিন্ন নহে। হিন্দুসমাজেও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করেন না। এই বিষয়ের আলোচনা প্রবাসীতে আমাদের নিয়ম অনুসারে এখানেই সমাপ্ত করিলাম।—প্রবাসীর সম্পাদক।

পাঞ্চজন্য

শ্রী যতীন্দ্রমোহন বাগচী

দুখে গাঁথা এই জীবনের মালা, তবু এরে ভালো লাগে—
কালো আকাশের বুকের আঁধার রঞ্জিত উষারাগে!

গন্ধ বিলায়ে ঝরে' পড়ে ফুল সন্ধ্যার কিনারায়,
নিশি না পোহাতে মরে' যায় হাওয়া দখিনের জানালায়;
বৌ-কথা-কও সুরের আবেশে বধূ ধীরে মেলে আঁখি—
বাতায়নপাশে ঘোম্‌টা খুলিতে দেখে উড়ে'গেছে পাখী;
জননীর কোলে শিশু হাসে শুনে' ঘুমপাড়ানিয়া গান,
সকালে সে ঘুম ভাঙেনাক, শুধু কেঁদে জাগে মা'র প্রাণ—
—এইত জীবন, তবু এরে হায়, ভালো লাগে ভালো লাগে,
কোন্ সে কামনা রাঙা হ'য়ে ফুটে বক্ষের গুল্-বাগে!

সুখ সুখ করি—সুখ সে কোথায়? পেতে ত রয়েছি হাত!
মনের আঙুলে খিল ধরে' আসে, নেমে আসে হিম-রাত;
আপনার মাঝে খুঁজিয়াছি সুখ ভোগের ছদ্মবেশে,—
আলেয়ার আলো নয়ন ভুলালো বুঝিয়াছি অবশেষে;
জোড় করে' করে' জড়ো করি যত জীবনের জঞ্জাল,
চোখ চেয়ে দেখি, জমে' উঠিয়াছে নিজ বন্ধন-জাল!
তারি ফাঁকে ফাঁকে সরে' গেছে সুখ শান্তিরে লয়ে সাথে,
খালি বুক শুধু খালি পড়ে' আছে, জল ভরে আঁখিপাতে;
আপনারে লয়ে ব্যস্ত যখন, লাগায়ে সুখের ধোঁকা
মৃত্যুর জাল বুনিয়া চলেছে চিত্তের গুটি-পোকা!

বর্ষার জল নামিয়া গিয়াছে, জাগিয়া উঠেছে চর,
কাঁচা রোদখানি বালুকার বুকে চিক্কণ ভাস্বর;
নূতন-গজানো বাব্‌লার বনে বাসা বাঁধিতেছে পাখী,
চখাচখীদের চরণচিহ্ন তলে কেবা দিল আঁকি'!
বুনো ঝাওয়েদের বুকের ঝুরিতে ঝুরে' মরে খোলা হাওয়া-
কি ধন খুঁজিতে ঘুরে মরে যেন দিবসে 'নিশিতে পাওয়া'!
দূরে দূরে মাঠ ভরিয়া উঠেছে শ্যামল শস্যভারে,
কৃষাণের বধূ থালা ল'য়ে হাতে হেসে উঠে হেরি' কারে!
কোন্ অজানার অচেনা চরণে জানাতে মিনতি তার
জেলের যুবতী জালের সঙ্গে বুনিতেছে গীতিহার!

আজ এ প্রভাতে জাগিয়াছে প্রাণ, জীবন আমার ধন্য—
বুঝিয়াছি আজ জীবনের কাজ নহে সে নিজের জন্য!
কালো আকাশের বুকের আঁধার দিবালোকে লভে দীপ্তি,
যদি সে বক্ষে ভরি' উঠে প্রেম—সবার সেবার তৃপ্তি;
ঘর করি' পর পর করি' ঘর হারায়ে আপন লক্ষ্য
আকাশ পেয়েছে উদার চক্ষু সাগর অপার বক্ষ;
তারি পানে চেয়ে আজি এ পরাণ লভিল কি আজি মুক্তি,
মুক্তার মালা ঠেকিল কি হাতে ঘাটে-ঘাটে ঘাঁটি' শুক্তি!
পাঁচজনে ডেকে পঞ্চমে আজি কাঁদে এ পাঞ্চজন্য—
সব যে আমার, আমি যে সবা'র—ধন্য জীবন ধন্য!

মেঘ-দূত

শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা লিখিত ও শ্রী যতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত

পূর্ব্ব-মেঘ

তীব্র কান্তা-বিরহ-বেদনা ! দীর্ঘ বরষ প্রভুর শাপ,
ভ্রষ্ট-মহিমা— হবে যে ভুগিতে স্বকর্ম্মে অবহেলার পাপ ;
ছায়া-তরু-ঘন, পুণ্যসলিল—সেবিত-জনক-তনয়া-স্নান,
সেই রামগিরি আশ্রমে এক যক্ষ করিলা অধিষ্ঠান।

প্রকোষ্ঠ তার রিক্ত, খসিয়া কনক-বলয় গিয়াছে নামি।
সেই অদ্রিতে কতিপয় মাস অতিবাহি' প্রিয়াবিরহী কামী
দেখে—আষাঢ়ের প্রথম দিবসে সানুদেশে মেঘসন্নিবেশ,
বপ্রক্রীড়ানিরত বিশাল পরিণতাঙ্গ গজের বেশ।

মেঘ—সে বাসনা-বিধায়ক, রহি কোনমতে তার পুরঃস্থিত,
বাষ্পরুদ্ধ অন্তরে রাজরাজ-অনুচর বিচিন্তিত।
সুখী যে তাহারো চিত্তবৃত্তি মেঘদর্শনে বিকল হবে,
কণ্ঠাশ্লেষপ্রার্থীর মন—প্রিয়া দূরে—করে কেমন তবে !

প্রত্যাসন্ন শ্রাবণ, চাহি সে দয়িতা জীবন-আলম্বন
জীমূতের দ্বারা প্রেরিতে আপন কুশল-বার্ত্তা করিলা মন।
অভিনব তাই কুটজ কুসুমে সজ্জিত করি অর্ঘ্যভার,
প্রীতিসুমধুর বচন বিরচি' প্রীতিতে শুধায় স্বাগত তার।

কোথা ধূমজ্যোতিসলিলমরুতে সঞ্জাত মেঘ, আর কোথায়
সংবাদ—শুধু ইন্দ্রিয়বান্ প্রাণীর সমীপে যা পাওয়া যায় !
আগ্রহবশে ইহা না গণিয়া, যাচে তার কাছে যক্ষ দীন,
কামার্ত্ত যেই স্বভাবত সেই চেতনাচেতনে জ্ঞানবিহীন।

তুমি পুষ্কর-আবর্ত্তকের ভুবনবিদিত বংশে জাত,
তুমি ইন্দ্রের প্রধান পুরুষ, কামরূপ তুমি জানি হে তাত।
বঁধু দূরে—তাই বিধিবশে তব প্রার্থী ; শ্রেয় যে গুণীর ঠাঁই
ব্যর্থ যাজ্ঞা, অধমের কাছে লব্ধকাম না হইতে চাই।

সন্তপ্তের শরণ পয়োদ, ধনপতি-ক্রোধে শপ্ত প্রিয়া-
বিযুক্ত আমি, সন্দেশ মোর যাও হে তাহার সমীপে নিয়া!
যক্ষপতির অলকা নামে সে বসতিতে যেতে হবে তোমার
উদ্যানঘেরা, হরশিরশশী-করবিধৌত হর্ম্ম্য যার।

আরূঢ় হইলে আকাশে তুমি হে, আশাপ্রত্যয়ে আশ্বসিত
হেরিবে তোমারে পথিকবনিতা করিয়া অলক উন্নমিত।
আমার মতন পরাধীন যারা, তারা ছাড়া আর কোথা কে আছে,
বিরহবিধুরা জায়ারে যে করে উপেক্ষা, তুমি যখন কাছে ?

মন্দ মন্দ বহি অনুকূল পবন তোমারে যথাবিধান
করিবে চালনা, চাতক গরবী বামে নিনাদিবে মধুর তান,
গর্ভাধানের উৎসবে মাতি আকাশবিহারে বদ্ধ-মালা
মিলি একত্রে সেবিবে নয়ন-সুভগ তোমারে বলাকাবালা।

পতিব্রতা সে—দিবস-গণনা-তৎপরা, তব ভ্রাতৃজায়া,
অবিহতগতি গিয়া, অবশ্য দেখিবে সে শুধু ধরিয়া কায়া
আছে কোন মতে ; প্রণয়ি-রমণী-হৃদয়কুসুম বিরহ-পাকে
সদ্যঃপাতি, তা আশাবন্ধই বৃন্তের মত ধরিয়া রাখে।

মার্গ তোমার প্রয়াণানুরূপ কহিতেছি এবে—শুনিয়া যেয়ো,
শুনিয়ো জলদ, তারপর সেই সন্দেশ মোর শ্রোত্রপেয় ;
খিন্ন হইলে শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া চলিও ধীর,
করিও স্রোতের পরিলঘু পয় উপযোগ যবে ক্ষীণ শরীর।

'অদ্রিশৃঙ্গ উড়ালো না কি গো পবনে ?'—হেরিবে সে উদ্যোগে
ঊর্দ্ধমুখী যে সিদ্ধাঙ্গনা মুগ্ধা তাহারা চকিতচোখে।
বেতসস্নিগ্ধ এই স্থান হ'তে উত্তর-নভে উঠো তখন,
দিঙ্‌নাগেদের পরিহরি পথে স্থূল শুণ্ডের আস্ফালন।

'তব আয়ত্ত কৃষিফল' ভাবি প্রীতিস্নিগ্ধলোচনে তারা
দেখিবে তোমারে জনপদবধূ—ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ যারা।
হলকর্ষণে সদ্য সুরভি মালভূমি পরে আরোহি,' আর
পশ্চাতে কিছু আসি, লঘুগতি উত্তরে তুমি যেয়ো আবার।

পরিণতফল-দ্যুতিঝলমল কানন-আম্রে শৈলভূমি
সমাচ্ছন্ন, শিখরে তাহার স্নিগ্ধবেণীর বর্ণে তুমি
কোরো আরোহণ ; পরিধি-বিথার পাণ্ডু, মধ্যে কাজলপ্রভা,
অমরমিথুনদর্শনীয় সে ধোরো ধরণীর স্তনের শোভা।

বিহরে কুঞ্জে বনচরবধূ, সেথা মুহূর্ত্ত রহিয়া গিয়া,
বর্ষণলঘু দ্রুততর গতি পরের পথটি উত্তরিয়া,
উপলবিষম বিন্ধ্যের মূলে পাবে বিশীর্ণা রেবার দেখা,
গজের অঙ্গে রচনাভঙ্গীবিরচিত যেন বিভূতি-রেখা।

অর্দ্ধোদ্গতকেশর নিরখি হরিত কপিশ নীপ সকলি,
ভক্ষণ করি জলভূমে স্ফুট-প্রথমমুকুল ভূ-কদলী,
অধিক সুরভি উর্ব্বীগন্ধ আঘ্রাণ করি অরণ্যেই,
কুরঙ্গকুল সূচনা করিবে হে মেঘ, তোমার মার্গ সেই।

পাণ্ডুচ্ছায়া কাননের বেড়া বিকচকেতকীমুকুলে হবে,
নীড়-আরম্ভে গৃহবিহঙ্গ-সমাকুল গ্রামচৈত্য রবে,
পরিণতফলশ্যাম সে জম্বুবনান্ত, আর হংসগণ
হবে দশার্ণে স্থায়ী কিছুদিন, ওগো আসন্ন তুমি যখন।

দিগ্ দিগন্তে রাজধানী তার প্রথিত বন্ধু বিদিশা নামে,
প্রেমিকত্বের ফল অবিকল সদ্যই পাবে গিয়া সে ধামে,
বেত্রবতীর তীরে আসি তার মন ও মন্ত্রে হরিয়া নিও,
সভ্রূভঙ্গ অধরে মধুর উর্ম্মিচপল সলিল পিও।

উত্তরদিক প্রয়াণে এ পথ বক্র যদিও, রহিয়া তবু
উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে প্রণয়বিমুখ হোয়ো না কভু।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরণে সে আঁখি চকিত, বৃথাই জন্ম তব
সেথা সেই পুর-অঙ্গনাদের লোলঅপাঙ্গ যদি না লভ।

বীচিবিক্ষোভে মুখর বিহগপংক্তি নদীর কাঞ্চীহার,
মদস্খলিত মনোহরগতি, আবর্ত্ত-নাভি দৃষ্ট যার,
অন্তরঙ্গরূপে ভোগ কোরো নির্ব্বিন্ধ্যার রসানুরাগে,
বিভ্রম—সে তো নারীর প্রথম প্রণয়বচন প্রিয়ের আগে।

পাবে অবন্তী—গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়নকথা গল্প করে,
যাবে সে বিশালা অপূর্ব্বশ্রী পূর্ব্বকথিত পুরীতে পরে,
উজ্জয়িনী সে—স্বর্গভোগীরা ভূপতিত ক্ষীণপুণ্যফলে
স্বর্গের একখণ্ড উজল আনিল কি বাকি সুকৃতিবলে?

পটুমদকল সারসকূজনে ওঠে একটানা দীর্ঘতান,
সেথা প্রভাতের বিকচকমলপরিমলভারে সুরভিপ্রাণ
শিপ্রার বায় সুখস্পর্শ—যেন প্রিয়তম মিনতিভরে
প্রিয়ার সকল সম্ভোগখেদ চাটুবচনেই হরণ করে।

বাতায়নপথনির্গত কেশসংস্কারের ধূপ ও-দেহ
উপচিবে, দেবে নৃত্যোপহার পালিত শিখীর বন্ধুস্নেহ,
ললিতবনিত পাদরাগ আঁকা কুসুমসুরভি হর্ম্ম্যে এসে
উজ্জয়িনীর ঋদ্ধি হেরিয়া পথশ্রান্তি দূরিও শেষে।

রত্নদীপ্তিখচিত-দণ্ড চামর ঢুলায়ে ক্লান্ত কর
লীলাভঙ্গিম, পাদবিন্যাসে কণিতরশনা, নৃত্যপর
বারাঙ্গনারা পেয়ে বর্ষার অগ্রবিন্দু মধুরজ্বালা
নখক্ষত সম, হানিবে দীর্ঘ কটাক্ষ—যেন ভ্রমরমালা।

রাত্রে নগরে রমণীরা চলে কান্তভবনে প্রেমাভিসারে,
রুদ্ধ-আলোক রাজপথ বাহি' সূচিভেদ্য সে অন্ধকারে,
দেখায়ো কনকনিকষস্নিগ্ধ বিজলীঝলকে পথের ভূমি,
ভীরু তারা, দেখো বৃষ্টি-এবং-মন্দ্র মুখর হোয়ো না তুমি!

গম্ভীরানামা তটিনীসলিল চিত্তের মত সুনির্ম্মল,
তোমার স্বভাবসুন্দর ছায়া-আত্মা তাহার লভিবে তল,
চটুলশফরীলীলা-রূপ তার কুমুদধবল চোখের চাওয়া,
কোরো না, কোরো না, কোরো না বিফল বিস্মৃতির বশে যেন সে পাওয়া!

তব বর্ষণ-সমুচ্ছ্বসিত বসুধাগন্ধে মধুরঘ্রাণ
সুভগশুণ্ডকুহরশব্দে করীরা করিবে সমীর-পান,
স্পর্শ তাহার লাগিয়া পাকিবে বন্য ডুমুর, মন্দস্রোতে
বহিবে শান্ত শীতল বাতাস দেবগিরিগামী তোমার পথে।

হে মেঘ, কনকপদ্মপ্রসবি মানস-সরের সলিল হরি,'
জলদানকালে ঐরাবতের মুখপটে প্রীতি প্রকট করি,
কল্পতরুর কিশলয়দল অংশুক সম কাঁপায়ে বাতে,
যথেষ্ট ভোগ কোরো নাগাধীশে সাবলীল নানা প্রচেষ্টাতে।

স্রস্তগঙ্গাদুকূলা বিরাজে প্রণয়ী কৈলাসেরি সে কোলে,
দেখিবামাত্র চিনিবে না তারে হে কামচারিন্, অলকা ব'লে?
কামিনী-অলকে মুক্তামালার মতন সে যেন বর্ষাকালে
উচ্চসৌধশিখরা অলকা বহে জলঝর জলদজালে। *

লেখক কৃত 'মেঘদূতে'র অপ্রকাশিত কাব্যানুবাদের নির্ব্বাচিত অংশ।
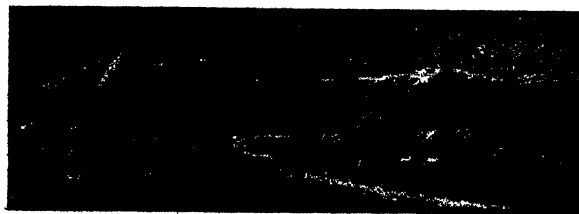
স্বরাজের যোগ্যতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(২)

ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপিত হইবার বিরুদ্ধে আর একটা আপত্তি এই, যে, ইংরেজদের প্রভুত্ব লুপ্ত হইলে এখানে সমাজসংস্কার বন্ধ হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কা অমূলক। যখন ইংরেজ জাতি বলিয়া একটা মিশ্র জাতির উদ্ভব হয় নাই, যখন ইংরেজদের পূর্ব্ব পুরুষরা সভ্য হয় নাই, তখন বৌদ্ধ যুগে, দু হাজারের অধিক বৎসর আগেও, ভারতবর্ষে সমাজসংস্কার হইয়াছিল, জাতিভেদের প্রকোপ কমিয়াছিল, নিম্নশ্রেণীর নরনারী উন্নত উপদেষ্টার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, অনেক বিধবার বিবাহ হইত, এবং অন্য এমন কোন কোন প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, যাহাকে আমরা এখন সমাজসংস্কার বলিয়া থাকি। পরবর্ত্তী সময়েও নানক চৈতন্য প্রভৃতির উপদেশে ও প্রভাবে এবং মহারাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের সময় সমাজ কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃত হইয়াছিল। তা ছাড়া, আবহমান কাল অনেক "অহিন্দু" জাতি হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইংরেজ-রাজত্ব বা ইংরেজ-প্রভুত্ব ব্যতিরেকে সমাজসংস্কার হয় নাই, বা হইতে পারে না, ইহা মিথ্যা কথা।

ইংরেজ-রাজত্বে সমাজসংস্কার নানা দিকে হইতেছে, সত্য কথা। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রভাবে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য অনেক দেশেও সমাজসংস্কার হইয়াছে ও হইতেছে। চিরস্বাধীন জাপানে আধুনিক সময়ে জাতিভেদ উঠিয়া গিয়াছে; "অস্পৃশ্য" এতা নামক জাতি স্পৃশ্য ও আচরণীয় হইয়াছে, যে বৈশ্যবৃত্তি অবজ্ঞাত ছিল, তাহা উচ্চ সামুরাই বা বা যোদ্ধা জাতির লোকেরাও অবলম্বন করিতেছে। স্বাধীন তুরস্কে অবরোধপ্রথা ও বহুবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার হইতেছে। স্বাধীন আফগানিস্থানেও নানাদিকে সমাজসংস্কার হইতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন না হইলে সমাজসংস্কার হইত না, বা ইংরেজ-প্রভুত্বের অবসানে সমাজসংস্কারেরও অবসান হইবে, ইহা অমূলক কথা।

সতীদাহ-নিবারণ ইংরেজ-রাজত্বে হইয়াছে সত্য। কিন্তু এই প্রথার বিরুদ্ধে আকবর বাদশাহও হুকুম জারী করিয়াছিলেন। তাহাতে বুঝা যায়, যে, ইংরেজ নয় এমন লোকের দ্বারাও ইহার নিবারণ অসম্ভব হইত না। তদ্ভিন্ন, সতীদাহ-নিবারণে রামমোহন রায় গবর্ণ্মেণ্টের সহায় না হইলে এই সংস্কার সুসাধ্য হইত না। সুতরাং ইহাতে দেশী লোকের কৃতিত্বও রহিয়াছে, এবং তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, রাজশক্তি রামমোহনের মত ভারতীয় লোকের হাতে থাকিলে ইংরেজের বিনা সাহায্যেও এই সংস্কার সাধিত হইত। ইংরেজ-রাজত্বে সাধিত প্রত্যেক সংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর ইহা বলিলেই চলিবে, যে, সংস্কার-কার্য্যে দেশের লোকে ইংরেজের সহায় বরাবর ছিল, এখনও আছে।

আর একটা কথা এই যে, যে-যে দিকে সমাজসংস্কার দ্বারা ভারতীয় লোকেরা একটা বলিষ্ঠ, মনস্বী ও তেজীয়ান জাতি হইতে পারে, ব্রিটিশ সরকার বরাবর তাহার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। যেমন ধরুন, বাল্যবিবাহ-নিবারণ। অনেক দেশী রাজ্যে অনেক বৎসর হইল বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আইন হইয়া গিয়াছে। যেগুলিতে হয় নাই, তাহাতেও ক্রমে ক্রমে হইতেছে। কিন্তু ইংরেজ প্রভুরা নিজে ত এরূপ আইন করেনই নাই, অধিকন্তু দেশী সংস্কারকদের এরূপ আইন প্রণয়নের চেষ্টায় বাধা দিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এই একটা কারণ দেখান, যে, তাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তাহা হইলে সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, চড়কে বাণফোঁড়া—এসব কি প্রকারে আইন দ্বারা বন্ধ করা হইল? এগুলা যখন বন্ধ করা হইয়াছিল, তখন বহুসংখ্যক জনপ্রতিনিধিপূর্ণ ব্যবস্থাপক সভা ছিল না, নিজের দায়িত্বে গবর্ণ্মেণ্ট আইন করিয়াছিলেন। আর, আজকাল এরূপ ব্যবস্থাপক সভা থাকা সত্ত্বেও এবং তাহার বেসরকারী সভ্যেরা সমাজসংস্কার উদ্দেশ্যে কোন আইন

করিতে চাহিলেও সরকার বাধা দেন। যখন আজমীরের হিন্দু প্রতিনিধি হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব ("Hindu Superiority") বিষয়ক পুস্তকের লেখক হরবিলাস সরদা মহাশয় বাল্য-বিবাহনিষেধক আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার অনুমতি চান, তখন স্যার আলেকজাণ্ডার মাডিম্যান এইসব বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত সরকারী সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, কোন বিল পেশ হইবার সময়ই তাহাতে বাধা দিবার রীতি নাই, এইজন্য আমি মিঃ সরদার বিল পেশ করায় আপত্তি করিব না; কিন্তু পরে এই বিল সম্বন্ধে প্রস্তাবক যাহা কিছু করিতে বা করাইতে চাহিবেন, তাহার প্রত্যেক ধাপে আমি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব। তাঁহার এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি মডার্ণ রিভিউয়ে আমার এই যুক্তি সমর্থন করিয়াছিলাম, যে, গবর্ণমেণ্ট এমন কোন সমাজসংস্কার চান না, যাহাতে ভারতীয় জাতি বলিষ্ঠ, মনস্বী ও তেজীয়ান হইতে পারে। হরবিলাস সরদা মহাশয় মডার্ণ রিভিউ হইতে আমার মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা করেন এবং সরকারি সদস্যদিগকে এরূপ ব্যবহার করিতে বলেন যাহাতে তাঁহাদের উপর মডার্ণ রিভিউয়ের লিখিত দুরভিসন্ধির মত কোন দুরভিসন্ধি কেহ আরোপ করিতে না পারে। তখন মাডিম্যান সাহেব অন্য চাকরীতে বাহাল হইয়াছেন এবং ক্রেরার সাহেব তাঁহার স্থানাধিষ্ঠিত। তিনি হরবিলাস সরদার বক্তৃতার এই অংশের কোন উত্তর দিতে পারেন নাই।

অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ, ইহা অতি সত্য কথা, যে, স্বরাজ সমাজসংস্কারের পরিপন্থী ত হইবেই না, বরং স্বরাজ স্থাপিত না হইলে সমাজসংস্কার আর বেশী অগ্রসর হইতে পারিবে না। সি, এফ, এণ্ড্রুস্ সাহেব, এবং ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল্ রিফরমারের সম্পাদক বিখ্যাত সমাজসংস্কারক শ্রীযুক্ত কে নটরাজন্ ঠিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতীয় স্বরাজের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, ভারতবর্ষ চিরকালই একনায়কত্বে ও স্বেচ্ছাচারী রাজার শাসনে অভ্যস্ত, এদেশে কখনও প্রজার অধিকার, প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী বা গণতন্ত্র বলিয়া কিছু ছিল না, এবং গণতন্ত্র এদেশের পক্ষে বিদেশী জিনিষ। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, যে, গণতন্ত্র এদেশের পক্ষে বিদেশী, অতএব বিদেশী বলিয়াই উহা এদেশের পক্ষে উপযোগী নহে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যে-সব বিদেশী ইংরেজ এদেশে ঘড়বাড়ী করে না, কেবল কয়েক বৎসরের জন্য প্রভুত্ব করিতে ও টাকা রোজগার করিতে এদেশে আসে এবং অধিকাংশ ইংরেজ ভারতসচিবের ও পার্লেমেণ্টের সভ্যের মত যে-সব ইংরেজ একদিনের জন্যও ভারতবর্ষে পদার্পণ করে না, সেই সব লোকদের শাসন কি ভারতবর্ষের স্বদেশী জিনিষ? তাহাও ত বিদেশী? এ রকম শাসনপ্রণালী কি ভারতবর্ষে কখন ছিল? ইহাও ত তাহা হইলে ভারতবর্ষের অনুপযোগী ও অহিতকর। ইহাকে কেন স্থায়ী করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে? আর যদি প্রজার অধিকার জিনিষটাই ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশী, অনুপযোগী ও অহিতকর হয়, তাহা হইলে তাহা ক্রমে ক্রমে দিবার অঙ্গীকার করিয়া সামান্য পরিমাণে দেওয়া হইতেছে কেন?

বিদেশী জিনিষ মাত্রেই যে অনুপযোগী ও অহিতকর, তাহা স্বীকার্য্য নহে। বিদেশের নানা ঔষধ এদেশে নানা রোগের চিকিৎসায় সুফল দেয়, আবার এদেশের নানা ঔষধ বিদেশে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এদেশের শ্রেষ্ঠ ভাব, চিন্তা ও আদর্শ বিদেশে গৃহীত হইয়াছে এবং বিদেশের শ্রেষ্ঠ ভাব চিন্তা ও আদর্শ এদেশে গৃহীত হইয়াছে। একদেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণপ্রণালী, এবং পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অন্য নানা দেশে অবলম্বিত হইতেছে। শাসনপ্রণালীটাই এমন কি অদ্ভুত চীজ, যে, তাহা এক দেশে উদ্ভূত হইলে অন্য দেশে অবলম্বিত হইতে পারিবে না? বস্তুতঃ যদি স্বীকার করিয়া লওয়াও যায়, যে, প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রাচ্যদেশে কখন ছিল না, উহা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য জিনিষ, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে, যে, উহা কম বেশী সাফল্যের সহিত জাপান, রুশীয় সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার নানা দেশ, পারস্য, আফগানিস্থান, তুরস্ক প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কি সৃষ্টিছাড়া একটা দেশ, যে, এখানেই বিদেশে উদ্ভূত শাসনপ্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে।

কিন্তু প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী যে ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ বিদেশী জিনিষ, এই কথাটাই মিথ্যা। একুশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৭ সালের জুন মাসের মডার্ণ রিভিউতে আমি ভিন্‌সেণ্ট্‌ স্মিথের ইতিহাস হইতে কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম, যে, দুই হাজার বৎসরের অধিক পূর্ব্বে পঞ্জাব, রাজপুতানা ও মালব দেশে ছোট ছোট সাধারণতন্ত্র ছিল। অন্যান্য লেখকদের মতও উদ্ধার করিয়াছিলাম। বিশেষ করিয়া ভিন্সেণ্ট্‌ স্মিথের নাম করিলাম এই জন্য, যে, তিনি নিতান্ত বাধ্য না হইলে ভারতবর্ষের কোন প্রশংসা করেন না। আঠার বৎসর পূর্ব্বে দেশী ও বিদেশী নানা ঐতিহাসিকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি ঐ ইংরেজী মাসিকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহে উপনীত হই, যাহার ভ্রম কেহ দেখাইতে পারেন নাই :—

ভারতবর্ষে অনেকগুলি সাধারণতন্ত্র ছিল। তদপেক্ষা পূর্ব্বে না হইলেও খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর ও বুদ্ধদেবের জীবিত কালে সেগুলি বিদ্যমান ছিল। পরে অন্ততঃ খৃষ্টোত্তর চতুর্থ শতাব্দীতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অনেক গুলি সাধারণতন্ত্র ছিল। পশ্চিমে পঞ্জাব হইতে পূর্ব্বে বিহার এবং উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশসমূহের দক্ষিণ সীমা—এই চতুঃসীমার মধ্যে সাধারণতন্ত্রগুলি অবস্থিত ছিল। অতএব সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী এই এক হাজার বৎসর ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বা নবীন কোন দেশে ইহা অপেক্ষা দীর্ঘ কাল ধরিয়া সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্বের বিষয় আমরা অবগত নহি। প্রাচীন ইতালীতে রোমের সাধারণতন্ত্র পাঁচ শত বৎসর টিকিয়া ছিল। প্রাচীন গ্রীসে এথেন্সের সাধারণতন্ত্রের আয়ু তিন শত বৎসরের কিছু অধিককাল-ব্যাপী ছিল। ভারতবর্ষের যে বিস্তৃত ভূখণ্ডে কোথাও না কোথাও সাধারণতন্ত্র ছিল, তাহা ছোট ছোট অনেক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাভূমি ইতালী ও গ্রীস অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ ছিল। গ্রীস ও ইতালীর কয়েকটি সাধারণতন্ত্রের নানা মহৎ কীর্ত্তির ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সম্পূর্ণ উদ্ধার কখনও হইবে কিনা জানি না। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সাধারণতন্ত্র যে এক জন মহাবীর ও এক জন শাক্যসিংহকে জন্ম দিয়াছিল, ইহা অকিঞ্চিৎকর কীর্ত্তি নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিয়াছিলাম, তখন প্রধানতঃ বিদেশীদের ইতিহাস আমার অবলম্বন ছিল। তাহার পর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল প্রমুখ অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এবিষয়ে স্বাধীন গবেষণা করিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন।

ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপনের বিরুদ্ধে আর এক আপত্তি ইংরেজরা তাহাদের ভাষায়, "Rome was not built in a day", "রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই", এই প্রবাদ-বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার তাৎপর্য্য এই, যে, ইংরেজরা কত শত বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া ও শিক্ষা করিয়া জনপ্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী অনুসারে রাষ্ট্রীয় কার্য্য চালাইতে অভ্যস্ত ও দক্ষ হইয়াছে ; ভারতীয়েরা অল্প কয়েক বৎসরে তাহাতে অভ্যস্ত ও দক্ষ কেমন করিয়া হইবে ? আপত্তিটা আপাতত প্রবল ও অখণ্ডনীয় মনে হইলেও অসার। কোন একটা জিনিষ ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে বহু শত বা সহস্র বৎসর লাগিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সেই অবস্থায় তাহা উপনীত হইবার পর তাহা শিখিতে তত দীর্ঘ কাল লাগে না। একটা দৃষ্টান্ত লউন। আজকাল যে ষ্টীম এঞ্জিনে কত রকম কাজ হইতেছে, তাহার আদিম নমুনা উদ্ভাবন করেন আলেকজান্দ্রিয়ানিবাসী হেরো নামক এক জন গ্রীক ১৩০ খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দে, অর্থাৎ ২০৫৮ বৎসর পূর্ব্বে। এখন যে-কোন দেশের ছেলে কোন এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বা কার-খানায় ষ্টীম এঞ্জিন তৈরী করিতে শিখিতে গেলে, শিক্ষক কি বলেন, যে, তোমাকে ২০৫৮ বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া হেরোর কল হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত যত বাষ্পীয় কল উদ্ভাবিত হইয়াছে, সকলের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া উন্নততম আধুনিকতম বাষ্পীয় কল নির্ম্মাণ করিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে ? তাহা কেহ বলে না। এইরূপ আধুনিকতম জাহাজ, বন্দুক, তাঁত, আকাশ-যান, প্রভৃতি সমুদয় বস্তুই আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে বহুসহস্র বৎসর লাগিয়া থাকিলেও

তাহার কোন একটিই নির্ম্মাণ করিতে শিখিতে পাঁচ সাত বৎসরের বেশী সময় লাগে না। আকাশযান নির্ম্মাণ ও চালনা শিখিবার জন্য ত্রেতাযুগের পুষ্পক রথের যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ক্রমাগত দেহত্যাগ ও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া তবে আকাশযান-নির্ম্মাতা ও আকাশনাবিক হইতে হয় না; তাহার পক্ষে দু চার বৎসর সময়ই যথেষ্ট।

বস্তুতঃ কোন জিনিষের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতিতে যত সময় লাগে, তাহা শিখিতে কখনই তাহা লাগে না। জন-প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী শিখিতে জাপানের কত যুগ লাগিয়াছে? তুরস্কের কত যুগ লাগিয়াছে? গত মহা-যুদ্ধের ফলে চেকোস্লোভাকিয়া, জুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি যে সব দেশ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহারা ত এক বৎসরেরও শিক্ষানবীশী করে নাই। বিলাতী পার্লেমেণ্টের বয়স অনেক শত বৎসর বলিয়া কোনও ব্রিটিশ শিশু একেবারে গ্লাডষ্টোনের মত রাজনীতিজ্ঞ হইয়া জন্মে না, তাহাকেও রাজনীতি শিখিতে হয়। জাপানী শিশুকে, তুর্ক শিশুকে, এবং অন্যান্য সাধারণতন্ত্রের শিশুকেও শিখিতে হয়; কেহই জন্মসিদ্ধ রাজনৈতিক শুকদেব নহে। রাজনীতিবিদ্ হওয়াটা ভারী একটা আশ্চর্য্য জিনিষ নয়। বড় কবি বা অন্য রকমের বড় সাহিত্যিক হইবার জন্য যেরূপ অসাধারণ স্বাভাবিক শক্তির দরকার হয়, রাজনৈতিক কর্ম্মী হইবার জন্য তাহা আবশ্যক হয় না। ঐতিহাসিক লেকী তাঁহার "গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা" ("Democracy and Liberty") নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন:—

"Statesmanship is not like poetry, or some of the other forms of higher literature, which can only be brought to perfection by men endowed with extraordinary natural gifts. The art of management, whether applied to public business or to assemblies, lies strictly within the limits of education, and what is required is much less transcendental abilities than early practice, tact, courage, good temper, courtesy, and industry.

"In the immense majority of cases the function of statesmen is not creative, and its excellence lies much more in execution than in conception. In politics possible combinations are usually few, and the course that should be pursued is sufficiently obvious. It is the management of details, the necessity of surmounting difficulties, that chiefly taxes the abilities of statesmen, and those things can to a very large degree be acquired by practice."

ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বের ত কথাই নাই, ইংরেজ-রাজত্বকালেও ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক রাজনীতিবিশারদ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজাধিকৃত ভারতে দেশী লোকের নয়নৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ নাই; এই জন্য ভারতীয় রাজনীতিবিশারদেরা নানা দেশী রাজ্যেই আপনাদের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপিত হইলে সর্ব্বত্রই শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা অনেকে রাজনীতিদক্ষ হইয়া উঠিবে।

ভারতবর্ষে নানাজাতি (races, tribes, etc.) ও নানাভাষাভাষী লোকের বাস বলিয়া এখানে স্বরাজ স্থাপিত হইতে পারে না, এইরূপ একটা আপত্তিও উত্থাপিত হইয়া থাকে। এই আপত্তির মর্ম্মগত তাৎপর্য্য এই, যে, ভারতবর্ষের নামটা ছাড়া অন্য কোন ঐক্য নাই, ছিল না, কেবল ইংরেজ সমস্ত জায়গাটা ও লোকগুলার প্রভু, ইহাই একমাত্র ঐক্য। কিন্তু যিনি ভারতবর্ষের জাতীয়তার সপক্ষে কিছু না বলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, সেই ভিন্সেণ্ট স্মিথও তাঁহার Early History of Indiaতে লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

"India, encircled as she is by seas and mountains, is indisputably a geographical unit, and, as such, is rightly designated by one name. Her type of civilisation, too, has many features which differentiate it from that of all other regions of the world, while they are common to the whole country, or rather sub-continent, in a degree sufficient to justify its treatment as a unity in the history of the social, religious and intellectual development of mankind."

ভারতবর্ষের মত বা ভারতবর্ষের চেয়ে অধিকসংখ্যক জাতি ও ভাষা যে-সব রাষ্ট্রে আছে, তাহারা যে স্বশাসক ও স্বাধীন এবং তথায় যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রমাণ দিতেছি।

১৯০১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ভারতবর্ষে ১৪৭ টা ভাষা ছিল, ১৯১১ সালের সেন্সসে তাহা বাড়িয়া ২২০টা হয়। এক একটা প্রধান ভাষার উপভাষাগুলিকে স্বতন্ত্র

ভাষা বলিয়া ধরিয়া এবং অল্পসংখ্যক আদিম অসভ্যজাতি যে সব ভাষা বলে তাহা গণনা করিয়া এইরূপ সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক যে মাত্র ১৫।১৬টি ভাষায় কথা বলে তাহা পরে দেখাইতেছি, এবং তাহার মধ্যেও অনেকে পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা মোটামুটি বত্রিশ কোটি, রুশীয় সাধারণতন্ত্রের লোকসংখ্যা ১৪ কোটি। একশতেরও অধিক সম্পূর্ণ আলাদা জাতি (nationalities) রুশীয় সাধারণতন্ত্রে বাস করে*। তাহাদের ভাষার সংখ্যাও ঐরূপ অধিক। নানাবিধ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে প্রচলিত। ১৪ কোটি লোকের ভাষা যদি একশতের উপর হয়, তাহা হইলে বত্রিশ কোটি লোকের ভাষা ১৪৭ বা ২২০ হওয়াটা বিচিত্র নয়। রুশিয়ায় একশতের উপর ন্যাশন্যালিটি বাস করে। ভারতে ভিন্ন ভিন্ন এত ন্যাশনালিটি বাস করে না, তার চেয়ে খুব কম। বস্তুতঃ ভারতের একটা জাতি বা ধর্ম্মসম্প্রদায়কেও একটা আলাদা ন্যাশন্যালিটি বলা যায় কি না সন্দেহ। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের লোকসংখ্যা এগার কোটির কিছু অধিক। তাহাদের মধ্যে মধ্য-আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সমুদয় প্রধান প্রধান ভাষাভাষী লোক আছে, এবং তদ্ব্যতীত আমেরিকার আদিমনিবাসী লাল-ইণ্ডিয়ানদের দুইশতের অধিক ভাষা চলিত আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কানাডা দেশের লোকসংখ্যা অষ্টআশী লক্ষ—এক কোটিও নহে। তাহারা ৫৩টা ন্যাশন্যালিটির লোক, ১৭৮টা ভাষা তাহাদের মধ্যে চলিত, এবং ৭৯ রকম ধর্ম্মমতের লোক তাহাদের মধ্যে আছে!

ভারতসাম্রাজ্যের ৩১,৮৯,৪২,৪৮০ জন লোকের মধ্যে ২৯,৭০,০৯,০০০ জন লোক নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাষায় কথা বলে ;—

ভাষার নাম	ভাষাভাষীর সংখ্যা
হিন্দী	৯,৮১,১৫,০০০
বাংলা	৪,৯২,৯৪,০০০
তেলুগু	২,৩৬,০[illegible],০০০
পঞ্জাবী	২,১৮,৮৬,০[illegible]
মরাঠী	১,৮৭,৯৮,০০০
তামিল	১,৮৭,৮০,০০০
রাজস্থানী	১,২৬,৮১,০০০
কর্ণাটক	১,০৩,৭৪,০০০
ওড়িয়া	১,০১,৪৩,০০০
গুজরাতী	৯৫,৫২,০০০
বর্ম্মী	৮৪,[illegible]৩,০০০
মলয়ালম	৭৪,৯৮,০০০
সিন্ধী	৩৩,৭২,০০০
অসমিয়া	১৭,২৭,০০০
পশ্‌টো	১৪,৯৬,০০০
কাশ্মীরী	১২,৬৯,০০০

নানা ভাষা, ধর্ম্ম ও ন্যাশন্যালিটির একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও যে অনেক দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিলাম। তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপন অসাধ্য ও অসম্ভব নহে।

ভারতবর্ষে নানা ভাষা প্রচলিত বলিয়া ভারতে স্বরাজ স্থাপন যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বাংলা, আগ্রা-অযোধ্যা, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, অন্ধ্র, প্রভৃতি যে সকল ভূখণ্ডে একটি ভাষা প্রধানতঃ চলিত, সেই ভূখণ্ডগুলিতে কেন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হউক না? তাহাতে কি আপত্তি? ক্ষুদ্র ইংলণ্ড একদা সাতটা রাজার রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সাতের রাজত্বকে হেপটার্কী বলা হইত। পরে সমস্ত ইংলণ্ড এক হইয়াছে। ভারতবর্ষে এক এক ভাষার লোকেরা স্বরাজ পাইলে তাহারা সকলের সমষ্টি একটা বৃহৎ স্বরাজ স্থাপন করিতে পারে। হয়ত সেই কারণেই ইংরেজ ভাষানুযায়ী প্রদেশগুলিকে স্বরাজ দিতে চায় না। অবশ্য, আমরাও যে তাহাই চাই, তাহা নহে; আমরা সমগ্র ভারতে স্বরাজ চাই। কেবল তর্কের অনুরোধে প্রাদেশিক স্বরাজের কথা বলিলাম।

স্বরাজস্থাপনের বিরুদ্ধে সকল আপত্তির আলোচনা করিলাম না, প্রধান কয়েকটির মাত্র করিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা

* "The population of the Union of Socialist Soviet Republics is composed of more than one hundred different nationalities". *Soviet Union Year-Book* for 1927, p. 12.

বড় আপত্তি এই, যে, স্বরাজ চালাইবার মত দৃঢ়, বলিষ্ঠ, ন্যায়ানুসারী, পরার্থপর, নির্লোভ, সত্যব্রত, এবং সৎ চরিত্রের লোক আমাদের মধ্যে যথেষ্ট নাই। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, যে, যথেষ্ট আছে কি না, বাস্তবিক কার্য্যভার হাতে না আসিলে বলা যায় না। আরও এক কথা এই, যে, কাজ না করিতে পাইলে, স্বরাজের ভার না পাইলে, চরিত্রের ঐ সকল প্রয়োজনীয় গুণ বিকশিত হইতে পারে না। আমাদের চরিত্রে যে-সব সত্য, অতিরঞ্জিত বা কল্পিত দোষ আরোপিত হয়, শক্তিশালী স্বাধীন দেশসকলের প্রধান প্রধান বিস্তর লোকের মধ্যে তদপেক্ষা গুরুতর দোষ লক্ষিত হয়। তাহার প্রমাণ সেই সব দেশের ইতিহাসে এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রে দৃষ্ট হয়। অতএব আমাদের ঐ রকম দোষও থাকিলেও সেই সব দেশের মত স্বরাজ আমাদের দেশেও চলিতে পারে না, এমন নয়।

এইরূপ তর্ক করার অনিষ্টকারিতা ও বিপদ অবগত আছি। এইরূপ তর্ক হইতে মনে হইতে পারে, যে, ঐ দোষগুলা যেন দোষই নয়, এবং অন্য সব দেশে যেরূপ স্বরাজ আছে, তাহাই যেন আদর্শস্থানীয় ও উৎকৃষ্টতম স্বরাজ। বস্তুতঃ উভয় ধারণাই ভ্রান্ত। দোষ যাহাদেরই থাক্, তাহা দোষ, এবং বর্জ্জনীয়; এবং কোনও দেশেরই রাজনৈতিক অবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী এখনও নিখুঁত ও আদর্শস্থানীয় হয় নাই। চরিত্রবান্ লোক ব্যতিরেকে তাহা নিখুঁত ও আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না।

আর একটা কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যেরূপ দোষ ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাহা চলনসই রকমে চালান যায়, সেরূপ দোষদুর্ব্বলতা থাকিলে পরাধীন জাতি স্বরাজ লাভ করিতে পারে না। উপমা দ্বারা আমাদের বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করি। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রুগ্ন মানুষেও সমতল রাস্তা দিয়া হাঁটিতে পারে; কিন্তু ক্রমোচ্চ রাস্তায় চলিতে হইলে তার চেয়ে বেশী জোর দরকার, পাহাড়ে উঠিতে হইলে আরও বেশী শক্তি চাই। ইংরেজের প্রভুত্ব, ইংরেজের অধিকৃত সব ক্ষমতা, আমাদিগকে স্বরাজ দিতে ইংরেজের অনিচ্ছা পর্ব্বতের মত একটা বাধা। তাহা লঙ্ঘন করিয়া বা ভাঙিয়া ফেলিয়া স্বরাজ লাভ করিতে হইলে, পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ চালাইবার জন্য যত শক্তি আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তির দরকার। ইহার সোজা মানে এই, যে, স্বাধীন দেশের লোকদের যতটা চরিত্রবল আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক চারিত্রিক শক্তি আমাদের না থাকিলে আমরা স্বরাজের বাধাবিঘ্ন সকল অতিক্রম বা বিনষ্ট করিতে পারিব না। সাধারণ সমতল রাস্তায় একটা এঞ্জিনেই রেলের ট্রেন টানিতে পারে। কিন্তু ক্রমোচ্চ খুব খাড়া পার্ব্বত্য পথে দুটা এঞ্জিনের দরকার হয়। নদীগর্ভে যদি কোন বাঁধ বাঁধা না থাকে তাহা হইলে সামান্য জলও ঝির্ ঝির্ করিয়া স্রোতের আকারে চলিতে থাকে। তেমনি যাহাদের স্বাধীনতা আছে, তাহাদের চরিত্রিক বল কমিয়া গেলেও রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহের ধারা চলনসই রকমে কিছুকাল রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যদি নদীগর্ভে বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়া হয়, সেই বাঁধ টপকাইয়া বা ভাঙিয়া স্রোতের আকারে প্রবাহিত হইবার জন্য গভীর জলরাশির প্রয়োজন। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবননদীর গর্ভে বিদেশীরা বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাকে লঙ্ঘন বা বিনষ্ট করিতে হইলে চারিত্রিক শক্তি সঞ্চিত পুঞ্জীভূত ও গভীর হওয়া চাই। এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি ইহাই বলিতে চাই, যে শক্তিশালী স্বাধীন দেশের লোকদের চরিত্র যেরূপ, আমাদের চরিত্র তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলে আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না।

দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক যে অর্থে স্বরাজ্য শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতে আছে, সেই অর্থে ব্যক্তিগত স্বরাজ্য জাতীয় স্বরাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি। আত্মজয়ী লোকদের সমষ্টি জাতিই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যের উপযুক্ত। যে জাতির প্রধান লোকেরাও ইন্দ্রিয়ের ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির দাস, তাহাদের দেশে স্বাধীনতা পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাহারা কিছু কাল স্বাধীন থাকিতেও পারে; যেমন একটা গাড়ীকে ধাক্কা দিয়া চালাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার ধাক্কা না দিলেও, এমন কি থামাইবার চেষ্টা করিলেও, তাহা প্রথম ধাক্কার গতিবেগ (momentum) বশতঃ কতক দূর চলিতে থাকে। কিন্তু পরাধীন কোন জাতির প্রধান লোকেরাও চরিত্রহীন হইলে, অন্ততঃ তাহাদের শাসক প্রভুদের সমান বা তদ-

পেক্ষা চরিত্রহীন হইলে, তাহারা স্বদেশে প্রকৃত স্বরাজ স্থাপন করিতে পারিবে না।

স্বরাজ স্থাপিত হইলে আমাদের সব দুঃখ দুর্দ্দশা তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া যাইবে, আমরা তখন আর কোন ভ্রম বা দোষ করিব না, এরূপ দুরাশা করিতেছি না। প্রবলতম ও স্বাধীনতম জাতিদের শাসক ও মন্ত্রীরাও দোষ ও ভ্রম করিতেছে, এবং তাহার জন্য তাহারা অপসারিত হইয়া তাহাদের জায়গায় অন্য লোকেরা মনোনীত হইতেছে। ঠেকিয়া ও ঠকিয়া সবাই শিখে; সেইরূপে শিখিবার অধিকার আমাদেরও আছে।

স্বরাজ অর্জ্জন দ্বারাই স্বরাজের যোগ্যতা নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হয়, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

লালা লাজপৎ রায়ের "ইয়াং ইণ্ডিয়া" নামক যে উৎকৃষ্ট পুস্তক ১৯১৬ সালে আমেরিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পর তাহার প্রচার ভারত গবর্ন্মেণ্ট নিষেধ করেন (গত বৎসর এই নিষেধ প্রত্যাহৃত হইয়াছে), তাহার দীর্ঘ ভূমিকার শেষে তিনি ১৯১৬ সালের ১লা মার্চ্চ আমেরিকায় লিখিয়াছিলেন :—

"Nor do I propose to discuss the fitness of Indians for immediate self-government, as that would largely add to the bulk of the book; but for a brief and able discussion of the matter I may refer the reader to an article by the Editor in the *Modern Review* of Calcutta for February, 1916."

বার বৎসর পূর্ব্বে আমি মডার্ণরিভিউয়ের ঐ সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার শেষ কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"We are not perfectly fit for self-rule;—no nation is. We are not entirely unfit for self-rule;—no nation is. Fitness grows by practice and exercise. We want to grow more and more fit in that way, which is the only way."

"আমরা স্বশাসনের সম্পূর্ণ যোগ্য নহি;—কোন জাতিই নহে। আমরা স্বশাসনের একেবারে অযোগ্যও নহি;—কোন জাতিই নহে। অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আমরা ঐ উপায়েই অধিক হইতে অধিকতর যোগ্য হইতে চাই;—উহাই একমাত্র উপায়।"

চন্দননগরে দুইচারি কথা *

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ এবং আমার অল্পবয়স্ক বন্ধুগণ, আজ আমায় যে সভার সভাপতি পদে বরণ করা হ'য়েছে,সে সভায় সভাপতি হ'বার মত উপযুক্ত লোক আমাদের দেশে পাওয়া বড় কঠিন। খেলাতে মজবুত, লেখাপড়ায় পণ্ডিত এবং আবৃত্তিও করতে পারে, এই সমস্ত গুণ একটা লোকের মধ্যে পাওয়া কঠিন। আমাদের জাতির একটা দোষ আছে; আমরা অল্প বয়সেই বেশী বিজ্ঞ হ'য়ে পড়ি, অল্প বয়সেই খেলাধূলোকে ছেলেমানুষি মনে করতে শিখি। ইউরোপে কলেজের ছেলেদের মধ্যে ত খেলা খুব চলিত আছেই, প্রৌঢ় অধ্যাপক এবং অন্য অনেক প্রৌঢ় এমন কি বৃদ্ধ লোকেও পুরুষোচিত খেলা করে; যারা খেলাধূলো করে তারা সেখানে খুব সম্মান পায়। ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ কালে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলার আদর ছিল না, এখন অনেকটা হয়েছে। লেখাপড়া করে এবং খেলাধূলাও করে, এমন লোক এখন অনেক পাওয়া না গেলেও সুখের বিষয় যে, সে রকম লোকেরও ২।১টি দৃষ্টান্ত আছে। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বৃদ্ধ সারদারঞ্জন রায় মৃত্যুর খুব কম দিন আগে পর্য্যন্তও ক্রিকেট খেলেছেন, এবং ম্যাচে জিতে এসেছেন। অথচ তিনি বিদ্বান ছিলেন। এই রকম লোকই আজকের সভার সভাপতি হ'বার উপযুক্ত।

পূর্ব্বেই বলেছি, আমরা অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হ'য়ে পড়ি। ঐ অল্প বয়সে বিজ্ঞ হ'য়ে পড়া শুধু পরিহাসের কথা নয়। প্রকৃত বিজ্ঞতা বাড়ে, অথচ মনটা থাকে ছেলেদেরই মত, এই রকম হওয়াই ভাল। তাতে একটা চিরতরুণ জা'ত গড়ে ওঠে; আর সেই তরুণ জাতের কাছ থেকেই ভাল কাজ পাওয়া যায়। এটা খুব সুলক্ষণ, যে, ছেলেরা আজকাল খেলাটাকেও একটা কাজ মনে করে। খেলা স্বাভাবিক। খেলার উপকারিতা আছে। খেলায় স্বাস্থ্য ভাল থাকে; মনের ফুর্ত্তি কখনও চলে যায় না। খেলার দরকার শুধু একজনের জন্য নয়, দশজনের জন্য, সমগ্র জাতির জন্য। মানুষ সামাজিক জীব। তাহারা একত্র বাস করে, একত্র খেলাধূলার আনন্দ উপভোগ করে। এতে সামাজিক ঘনিষ্ঠতা ও সংহতি বাড়ে। ঘরের ভিতরে ও ঘরের বাহিরে দুরকম খেলারই উপকারিতা আছে। একত্র খেলায়

* গত ৬ই মে চন্দননগরে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের ভবনে পালপাড়া স্পোর্টিং ইউনিয়নের বাৎসরিক উৎসবে কথিত।

পরস্পরের সাহায্য করতে হয়, তাতে পরস্পরের মধ্যে একটা ঐক্য আসে।

বিদেশীর অধীনতা ও বিদেশী লোকের প্রভাবে আমাদের মধ্যে অনেক বিদেশী খেলার আমদানী হ'য়েছে। বিদেশী জিনিষ মাত্রই খারাপ নয়। ভগবানের নিয়মই হচ্ছে, সমস্ত জাতির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকা, আদান প্রদান হওয়া, বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে, চিন্তার মধ্য দিয়ে,আরো কত রকমে। কিন্তু তাই বলে' দেশের কোন ভাল জিনিষ ত্যাগ করা উচিত নয়। আজ যে খেলাটা হ'ল এবং যে খেলাটিকে আপনারা ভেল্-দিগ্-দিগ্ বা কপাটী বলছেন, অন্যত্র তা হাডু-গুডু বা হাডুডুডু নামে পরিচিত। অনেক নিয়মের মধ্যে ফেলে এই খেলাটিকে আপনারা এক নূতন আকারে গড়ে তুলেছেন, কিন্তু এটি খুব পুরান খেলা। এতে খরচ কিছুই নেই। বিদেশী খেলা যতগুলি আমাদের মধ্যে এসেছে, সেগুলিতে অল্পাধিক খরচ আছে। এই খরচ যারা করতে পারে তারা ঐ সব খেলা খেলুক। কিন্তু এই নি-খরচার খেলাটিও দরকার। খেলার গুণ শরীর চালনা বা ব্যায়াম এতেও হয়। এই খেলার মধ্যে এক এক জনের খেলার দক্ষতা দেখাবার দরকার হয় বটে, কিন্তু দলকে জিতিয়ে দেবার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রধান। এই যে নিজের বাহাদুরীকে পিছনে রেখে আপন দলকে জেতাবার চেষ্টা, এইখানেই হল জাতের ভিত্তি। দলকে জেতাবার চেষ্টা যদি ছেলেরা ছেলেবেলা থেকে করে আসে, তবে বড় হ'লে তারা খুব বড় কাজ করতে পারে। কথিত আছে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ওয়াটারলুর যুদ্ধ জিতেছিলেন ইটনে খেল্‌বার মাঠে; অর্থাৎ এই খেল্‌বার মাঠে তাঁর যে শিক্ষা হয়েছিল, সেই শিক্ষা তাঁর সেনাপতিত্বের ভিত্তি। এই জন্যে এই সমস্ত খেলা শুধু ছেলেদের জন্য নয়, সমাজের পক্ষেও, জাতির পক্ষেও ভাল।

ছেলেদের মত, মেয়েদেরও খেলার দরকার। অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু মধ্যে সেটা বন্ধ হ'য়ে যায়। এখন আবার মেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে মানুষের মত বদলে যাচ্ছে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা খুবই ভাল। কিন্তু অধিক মানসিক পরিশ্রম করলে ছেলেদের যেমন শরীর খারাপ হয়, তেমনি মেয়েদেরও শরীর ভাল থাকে না। বঙ্গের প্রথা অনুসারে মেয়েরা মাদ্রাজ মহারাষ্ট্রের মত বাড়ীর বাহির হয় না। এই জন্যে বাংলা দেশে মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খেলার বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে খেলারও দরকার। মেয়েদের খেলা মেয়েদের মতনই হ'বে। আমাদের দেশে যদি সে রকম কোন খেলা না থাকে, তবে অন্য জায়গা থেকে খেলা ধার করাও দরকার। বড়োদা রাজ্যে মেয়েদের লেখাপড়ায় খুব উৎসাহ দেখা যায়। সেখানে মেয়েদের জন্যে অনেক রকম খেলার প্রবর্ত্তন হ'য়েছে। সেগুলো বাংলা দেশেও চল্‌তে পারে, আর সেগুলো ভারতবর্ষেরই। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীহট্টে ছাত্রীদের মধ্যে অনেক খেলা দেখেছি।

আপনাদের কার্য্যবিবরণীর মধ্যে দেখলাম, আপনাদের একটি পাঠাগার ছিল, সেটি উঠে গেছে, তার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন। পাঠাগার পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রশংসনীয়। এই সব পাঠাগার পড়ার অভ্যাসকে জাগিয়ে রাখে; আর এই পড়ার অভ্যাস খুব দরকারী। পড়বার ইচ্ছা যাঁদের আছে, তাঁদের সকলেরই সব রকম বই কিনে পড়বার ক্ষমতা নাই, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের এই রকম পাঠাগারে খুব কম পয়সায় বা বিনা পয়সাতেই পড়বার সুবিধা হয়। এটা কম সুবিধা নয়। হরিহর বাবুর কাছ থেকে শুনলাম, গত বৎসর আপনাদের চন্দননগরে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। তাঁর মত মহৎ লোক এলে সকলেরই ইচ্ছা হয় তাঁর কাছে দুদণ্ড বসি, তাঁর কথা শুনি। কিন্তু আপনারা যদি সকলেই কিছুক্ষণের জন্য তাঁর কাছে গিয়ে বসেন আর তাঁর কথা শুনতে চান, তবে সেই মহৎ লোকটি মহা বিপদে পড়েন। অথচ মহৎ লোকের কথা শুনবার ইচ্ছা আমরা দমন করতে পারি না। কিন্তু পড়ার অভ্যাস থাকলে কাহাকেও কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মত কবিও কথাবার্ত্তায় সব সময় বহিতে লেখা উচ্চ কথা বলেন না। অনেক মামুলী কথা বলে থাকেন। কিন্তু প্রধানতঃ বহিতে কেবল মানুষের মনের ভাণ্ডারে সঞ্চয়ের যোগ্য কথাই লিখে থাকেন। আট আনা কি এক টাকা খরচ করেই আমরা অনেক সেই রকম কথা শুনতে পারি। তাতে বড় লেখকদেরও অসুবিধা ভোগ করতে হয় না; আমাদেরও সুবিধা হয়। আমার নিজের সুবিধা অনুযায়ী আমি ব্যাস, বাল্মীকি কালিদাসের সঙ্গে দেখা করতে পারি, তাঁদের কথা শুনতে পারি। নিজেদের কাজের সময় আমরা তাঁদের নমস্কার করে' বলতে পারি, এখন আমরা আসি, সময় পেলে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করব, আপনাদের কথা শুনব। পাঠাগারের ও পড়্‌বার অভ্যাসের মূল্য এর থেকে বুঝা যায়।

আপনাদের একটা চেষ্টা আমার ভাল লেগেছে; সেটা সংস্কৃত, ইংরাজী, ফরাসী ও বাঙ্গালায় আবৃত্তি। নানা ভাষার চর্চ্চা করা এবং তাতে আবৃত্তি করা খুব প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত আমরা পড়ি বটে, কিন্তু সংস্কৃতে কথা কহিতে পারি না। আবৃত্তিতে সে দোষ কতক দূর হ'বার সম্ভাবনা আছে। মৈমনসিংহে এক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য না করার বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়। আমি সেখানে বলেছিলাম, সংস্কৃত আমাদের সকলেরই পড়া উচিত, তাহার স্বেচ্ছানুযায়ী পাঠ ভাল নয়। সংস্কৃত ভাষার মধ্যে আমাদের দেশের এক গভীর ঐক্য নিহিত আছে। আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত। তীর্থ করতে গেলে আমরা উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশটাকে এক দেখি; পূজার মন্ত্র সব সংস্কৃতে। গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরীর জল সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশটাকে এক মন্ত্রে বেঁধেছে। সংস্কৃত ভারতের ঐক্যের এক মূল ভিত্তি।

সংস্কৃত খুব সামান্যই জানি; তবে আমার লেখার মধ্যে সময় সময় দুটো একটা সংস্কৃত বাক্য ব্যবহার করি। তাই দেখে আমার ইংরেজী মাসিকের তাঞ্জোরের এক গ্রাহক আমাকে সংস্কৃতে খুব পণ্ডিত বলে মনে করেছিলেন। এটা অনেক বৎসর আগেকার কথা। সেখানকার টোলের দু জন যুবক ছাত্র যখন পরামর্শাদির জন্য কাশী যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁদের কলিকাতায় আমার কাছেই যেতে বলে, দিয়েছিলেন। তাঁরা ইংরেজী হিন্দী বাংলা কিছুই বল্‌তে পারেন না; সংস্কৃতে কথা বল্‌তে পারেন কিন্তু আমি সংস্কৃতে কথা বল্‌তে পারিনা আর তাঁদের ভাষা তামিল আমি একেবারেই জানি না। যাই হোক, সংস্কৃতেই তাঁরা তাঁদের কি প্রয়োজন তা জানালেন, আমিও কিছু কিছু বুঝ্‌লাম এবং ভাঙা সংস্কৃতে আমার বক্তব্য বুঝাবার চেষ্টা করলাম। তারপর আমার তখনকার সহকারী অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকলাম। তিনি বি,এ অবধি সংস্কৃত পড়েছিলেন, আমার চেয়ে বেশী সংস্কৃত জানেন। কিন্তু দেখ্‌লাম চারু-বাবু সংস্কৃতে কথা বল্‌তে আমার চেয়ে খুব বেশী

দক্ষ নন। সংস্কৃত বল্‌বার অভ্যাস থাকলে এই রকম সময়ে অনেক কাজে লাগে। আবৃত্তি এই বল্‌বার অভ্যাসকে জাগিয়ে রাখে।

তারপর ইংরেজী আবৃত্তির কথা। আজকালে সকলেই বলছে, এটা গণতন্ত্রের যুগ; সকলের মত নিয়ে শাসন কার্য্য চলবে। ইংরেজের কানে আমাদের মত পৌঁছতে গেলে এবং ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মধ্যে চিন্তার বিনিময়ের জন্তে আমাদের ইংরেজীতে বক্তৃতা করা দরকার, ইংরেজীতে বিতর্কের দরকার, আবৃত্তিরও দরকার। আর বাংলায় বক্তৃতা করা যে বিশেষ দরকার তা বলাই বাহুল্য। দেশের কটা লোকেই বা ইংরেজী জানে? সকল বাঙালীকে আমাদের বক্তব্য জানাবার একমাত্র উপায় বাংলা। ছাত্রদের মধ্যে ভাল আবৃত্তি করতে পারে এমন দৃষ্টান্ত কম। বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার।

তারপর ফরাসী ভাষার কথা। ইউরোপে ফরাসী জানার সুবিধা অশেষ। রেলে, ষ্টীমারে, সব জায়গাতেই ফরাসীর জ্ঞান কাজে লাগে। আমি ফরাসী জানি না। তার জন্তে ইউরোপে গিয়ে আমি অনেক অসুবিধা ভুগেছি। সেখানে আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়েছিল। ডাক্তার আমাকে জ্বর ছাড়লেই দেশে ফিরে যেতে বল্লেন। তখন দেশ বিদেশে জাহাজ যাবার মরসুম। আমি মার্সেঈ থেকে খবর নিয়ে জানলাম, জাপানী, বিলাতী, ইতালীয় কিংবা অন্ত কোন জাহাজে একটুও জায়গা নেই। তারপর শুনলাম যে এক ফরাসী জাহাজে আমার জায়গা হ'তে পারে। যাই হোক সেই জাহাজেই আসতে ইচ্ছা ক'রে আমি জাহাজের অধ্যক্ষকে অনুরোধ করলাম যেন আমাকে কোন বাঙালী কিংবা ইংরেজী-জানা ভারতবর্ষীয়ের সঙ্গে এক কামরায় জায়গা দেওয়া হয়। কিন্তু জাহাজে বাঙ্গালী কেউ ছিল না। তবে দুইজন ভারতীয় ছাত্র ছিলেন; একজন মাদ্রাজী আর একজন পার্শী। কিন্তু তাঁহারা ও আমি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর যাত্রী বলে' জাহাজের ফরাসী অধ্যক্ষ তাঁহাদের আমার সহিত দেখা করতে দেন নাই। আমাকে এক ফরাসী সৈনিক কর্ম্মচারীর সঙ্গে এক কামরায় আসতে হয়েছিল। তিনি ইংরেজী জানেন না; ইংরেজীর মধ্যে জানেন কেবল finish কথাটি। আকারে ইঙ্গিতেই আমাদের কাজ চলত। আমার কাছে দুটা ঘড়ি ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুটিই বিগড়ে যায়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর খাবার ঘণ্টা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পড়ায় খাওয়া দাওয়া যে কখন করব, ইসারায় ফরাসী ভদ্রলোকের কাছে থেকে তার সময় জেনে নিতে হ'ত। খাওয়ার পর একটু বিশ্রামের অভ্যাস আছে। সেই ফরাসী সৈনিক মুখে হাত দিয়ে বলতেন, "finish?"—অর্থাৎ খাওয়া হ'য়েছে? যদি ইঙ্গিতে বলতাম হয়েছে, তবে তিনি শোবার ইঙ্গিত করতেন অর্থাৎ এইবার ঘুম। জাহাজে আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু জাহাজের ছোকরা ফরাসী ডাক্তার ইংরেজী জানতেন না বলে' আমি তাঁর পরামর্শ নিতে পারিনি, এমন কি আমার জানা একটা ওষুধ কিনবার চেষ্টাও করতে পারিনি। কথাবার্ত্তা ত প্রায় কারুর সঙ্গেই হ'ত না। নির্জ্জন কারাবাসের মত দিন কাটত। যদি আমি ফরাসী ভাষা জানতাম, তা হ'লে আমায় এই সব অসুবিধা ভোগ করতে হোত না। শুধু তাই নয়। ফরাসীরা একটা প্রধান জাতি। চিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে সুকুমার শিল্পে, তাঁদের কীর্ত্তি অশেষ। তাদের সমৃদ্ধ সাহিত্যের সহিত পরিচিত থাকা গর্ব্ব করবার মত জিনিষ। একজন সাহিত্যিক বলেছেন—আমি যতগুলি ভাষা জানি, ততগুলি আমার মনের জানালা। সেই সব জানালা খুলে রাখলে তার ভিতর দিয়ে নূতন আলো বাতাস ঢোকে।

দেশবিদেশের কথা

বিদেশ

জাপানে সাম্যবাদী দলন—

জাপান রাজ সরকার সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে তাহার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। স্বাধীনতাকামী চীনের জাতীয় দলের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়া এবং জাপানের (সাম্যবাদী) কমিউনিষ্ট্-দিগকে দলন করিয়া সে আজ স্বেচ্ছাচারিতার চরম দেখাইতেছে। ১৯২২ সাল হইতেই জাপানে কমিউনিষ্ট দলন সুরু হয়। সে বৎসর অনেকগুলি কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার হন ও আন্দোলন কিছুকালের জন্ত দমিয়া যায়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আবার জাপানে কমিউনিষ্ট দলের প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহারা কৃষক-সঙ্ঘ, যুবক সঙ্ঘ প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া নিজেদের মতবাদ প্রচার করিতে সুরু করেন। তাঁহাদের দলের লক্ষ্য (১) সোভিয়েট সমাজ-তন্ত্রের মতবাদ সমর্থন করা (২) জাপানের অধীনস্থ রাজ্যসমূহকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা প্রভৃতি। (Vendication of Soviet Russia, Perfect independence of all Japanese dependencie etc.) তাঁহাদের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া জাপান সরকার সম্প্রতি ৩০০ কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে মহিলা, অধ্যাপক ও ছাত্র নানা শ্রেণীর লোকও আছেন।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী একটি ঘোষণাপত্রে জাপানের সকল শ্রেণীর লোককে এই দলের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আহ্বান করিয়াছেন—

All people must unite in efforts to stamp out such dangerous ideas as are calculated to endanger the foundations of the state.

এই ঘটনা লইয়া জাপানে ও অন্যান্য স্থলে নানা প্রকার আন্দোলন হইতেছে। জাপানের বিখ্যাত সংবাদপত্র উইক্‌লি ক্রনিকেল সরকারের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে গ্রেপ্তারের ফলে সাম্যবাদীদের আন্দোলন আরও প্রচার লাভ করিবে।

"If their (the Communists) desire is to be stifled then Japan must give up all idea of posing as an intellectual nation...the arrests will excite the

curiosity of all the younger men and greatly stimulate their interest in the radical reform movement that is going on all over the world. যদি সাম্যবাদীদের মতবাদকে এইরূপ অন্যায় ভাবে পদদলিত করা হয় তবে জাপানের আর বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া বড়াই করিবার পথ থাকিবে না। তাহাদিগের গ্রেপ্তারের ফলে জাপানের যুবক সম্প্রদায় তাহাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইবে এবং জগৎ ব্যাপী এই বিরাট্ আন্দোলন জাপানে আরও প্রসার লাভ করিবে। জাপানের রাজসরকারের বাঁধন যতই শক্ত হইবে সমাজতন্ত্রবাদীদের সাফল্যও তত বেশী হইবে।

চীন—

চীনের জাতীয়দলের সহিত জাপানের একটি রফা নিষ্পত্তি হইয়াছে। চীনের জাতীয়দল রাজধানী পিকিং প্রবেশ করিয়াছেন ও তথাকার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। জেনারেল চ্যাংসো-লিনের উত্তর বাহিনী সোনাদল পিকিং হইতে সরিয়া পড়িতেছে। তাহাদের অধিনায়ক সেনাপতি চ্যাংসো-লিনের এই মনোভাবের কারণ বোধ হয় যে, জাতীয় দলের সঙ্গে বিবাদ করিয়া দেশের অশান্তি বৃদ্ধি এবং বিদেশী শক্তিকে চীনের উপর আধিপত্য করিতে সুযোগ দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। আমরা গতমাসে এরূপ আভাস দিয়াছিলাম।

সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ চ্যাং-সোলিন পিকিন হইতে দলবল সহ মাঞ্চুরিয়ার দিকে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে মুকদেন সহরের নিকট তাঁহার ট্রেনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে তিনি এবং তাঁহার সঙ্গীদের অনেকে হতাহত হইয়াছেন। জাপানী সংবাদপত্র "জিজিসিম্পো" গুজব রটাইয়াছিলেন যে, এই আঘাতের ফলে চ্যাং-সোলিনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু সে সংবাদ মিথ্যা। তবে চ্যাং-সোলীনের পরাজয়ের ফলে চীনের আভ্যন্তরীন রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিবে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

রয়টারের ৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, জাতীয় দলের সেনাপতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা পিকিং সহরের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১১ সালে চীনের জাতীয়দলের পরলোকগত নেতা সান ইয়াৎ সেন ক্যান্টন বন্দরে যে স্বাধীনতার ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন সেনাপতি ফেং হু সীয়াং ও সেনাপতি চ্যাংকাই শেকের সাধনায় তাহা এতদিনে চীনের পরাধীনতা ও দাসত্বরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিল। ১৯১১ সালে প্যারিস প্রবাসী ভারতীয়গণ সান ইয়াৎ সেনের বিদ্রোহ ঘোষণা করায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তখন সেই রাষ্ট্রবীর উত্তর দিয়াছিলেন "চীনে স্বাধীনতার যে আলোক-মালা প্রজ্জলিত হইল, তাহার রশ্মিরাজি সুদূর ভারতের উপর পতিত হউক"। চীনের জাতীয়দলের সম্পূর্ণ সাফল্য গৌরবে আজ সকল স্বাধীনতাকামী জাতি উল্লসিত।

বাংলা

বিধবা বিবাহ—

ডোড়াইল থানার অধীন সেকান্দরনগর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য কয়েকজনের উদ্যোগে গতমাসে উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীমান মথুরচন্দ্র মল্লবর্ম্মণের সহিত ৺কটু মল্লবর্ম্মণের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী চিত্রময়ী মল্লবর্ম্মণের শুভ-বিবাহ হইয়াছে।

—চারুমিহির

—রাজবাড়ী আর্য্যমঙ্গল সমিতির চেষ্টায় রতনদিয়া নিবাসী মৃত জানকীনাথ মানীর পুত্র শ্রীহৃদয়নাথ মানীর বিবাহ পাংশা অন্তর্গত বড়ুরিয়া নিবসী মৃত অনাথবন্ধু মানীর বিধবা কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণবালা দাসীর সহিত উক্ত বড়ুরিয়া গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। তত্রস্থ জমিদার, বহুদিন হইতে এই বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

পাবনা সাঁথিয়া থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর নিবাসী মৃত বিদেশী প্রামাণিকের ১৬ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা শ্রীমতি মানদাসুন্দরী দাসীর বিবাহ তাঁতিবন্দ নিবাসী শ্রীদুর্গানাথ প্রামাণিকের সহিত হইয়াছে। পাত্র ও পাত্রীপক্ষের সমাজস্থ ব্যক্তিগণ উক্ত বিবাহে যোগদান করিয়াছিল। জাতি নমঃশূদ্র, মেয়ে ৮ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল।

—স্বরাজ

ময়ূরভঞ্জের নূতন মহারাজা—

মহারাজা লেফ্‌টান্যাণ্ট পূর্ণচন্দ্রভঞ্জ দেওএর পরলোক গমনের পর মহারাজা প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও ময়ূরভঞ্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি পরলোকগত মহারাজার ন্যায় জনপ্রিয় ও বিদ্যোৎসাহী শাসনকর্ত্তারূপে খ্যাতিলাভ করিবেন।

মহারাজা প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও

বঙ্গ ও আসাম অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধায়িনী সমিতি—

বঙ্গ ও আসাম অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি বিধায়িনী সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক রায় সাহেব রাজমোহন দাস সম্প্রতি দৃষ্টিহীনতা ও বার্দ্ধক্য বশতঃ উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সমিতি

বঙ্গদেশ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণী উন্নতিকামী কর্ম্মী রায় সাহেব রাজমোহন দাস

স্থাপিত হইবার সময় হইতেই তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যখন সমিতি স্থাপন হয় তখন উহার অন্তর্ভুক্ত সামান্য কয়টি বিদ্যালয় ও অল্প সংখ্যক ছাত্র ছিল। কিন্তু দাস মহাশয় অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে সমিতির অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০০ শতের উপর ও ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার ছিল। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

পরলোকগত মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় —

বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নদীয়ার বিখ্যাত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর ও এই অল্প বয়সেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নানা জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু শোচনীয়

বাংলায় সমবায় সমিতি—

১৯২৬-২৭ সালের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ঐ বৎসর বঙ্গদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৫৪৩৯ ও তাহাদের সদস্য সংখ্যা ৫৪৭৩২৫ ছিল

বাঙ্গালায় সমবায় আন্দোলনের ক্রমিক উন্নতি সন্তোষজনক হইলেও কৃষি ব্যাপারে ঋণদানের ব্যবস্থা সেরূপ নহে। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান বাৎসরিক ফসলগুলির মূল্য প্রায় ২০০ কোটী টাকা, কিন্তু এই সম্পর্কে ৫ কোটী ১৫ লক্ষ ঋণ প্রদানের জন্য নিযুক্ত আছে। এই টাকা শুধু কৃষি ব্যাপার নয় সকল প্রকার সমবায় সমিতিতে খাটিতেছে।

পাটের ব্যবসায়ে সমবায় বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা মন্দ নহে। সাধারণ ঋণদান সমিতির কাজ বেশ সন্তোষজনক। পাট বিক্রয় সমিতির কার্য্য উল্লেখযোগ্য।

কৃষি পণ্য বিক্রয় সমিতির সংখ্যা ৭৮। সমবায় দুগ্ধ সরবরাহ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সমিতির নাম ও উল্লেখযোগ্য। দুগ্ধ সমিতির সংখ্যা ৯৭ তন্মধ্যে ৮২টি কলিকাতায়।

কলিকাতার দুগ্ধ ইউনিয়নে ২২১৬৮৲ টাকা লাভ হইয়াছে।

সমবায় কৃষি সমিতির সংখ্যা ৩০। ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সংখ্যা ৪৫০।

মালদহে একটি রেশম য়ুনিয়ন রেজেষ্ট্রারী করা হইয়াছে। ইহার সহিত ৪৫ সমিতি সংযুক্ত।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১০৩।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সমিতির অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। এবার ৫ কেটী টাকা নিযুক্ত ছিল। ইহার সদস্য সংখ্যা ৯৮৭৫। এই সমিতি সরকার হইতে ১০ হাজার টাকা পায়।—ত্রিস্রোতা

অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্র বসু—

অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী কুমিল্লায় গিয়া তাঁহাদের পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের

অধ্যাপক ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই বিপুল অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। বসু মহাশয় আগামী জুলাই মাসের প্রথমেই আমেরিকা যাত্রা করিবেন।

লোকহিতব্রত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

বৈদ্যবাটী চাঁপদানীর ত্যাগী, কর্ম্মী ও দানশীল জমীদার নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সেই তিনি তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসায় (বিদেশের জাহাজে মাল বোঝাই ও মাল খালাস) গ্রহণ করিয়া অধ্যবসায়গুণে ঐ কার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। বৈদ্যবাটীতে যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল তাহাতে তিনি পূর্ব্বে মাসিক ২৫৲ টাকা দিতেন; পরে উপযুক্ত গৃহের অভাবে তাহা উঠিয়া যাইবার মত হইলে তিনি পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণ করান

পরলোকগত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এবং সেই স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র বেশী নম্বর পাইত তাহাকে ১০৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি কয়েক বৎসর তিনি প্রদান করেন। তাঁহার প্রচুর অর্থব্যয়ে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি বৈদ্যবাটী কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি গঠন করিয়া দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ করেন। বৈদ্যবাটী ও চাঁপদানীতে তিনি নিজ ব্যয়ে দুইটি রাস্তা নির্ম্মাণ করান। বহুবৎসর ধরিয়া তিনি ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীকুমুদবান্ধব মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের গৃহে কয়েকটি করিয়া দরিদ্র ছাত্রকে প্রতি বৎসর ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজায় তিনি কাঙালীগণকে দশ হাজার বস্ত্র বিতরণ করিতেন ও নিজে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে অন্ন ও পয়সা প্রদান করিতেন। উত্তরবঙ্গের বন্যার সময় তিনি ২১০০ বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করেন। রায়পুরে (মধ্য প্রদেশে) তিনিই বাঙালী প্রবর্ত্তিত একটি প্রথম Electric Current Supply Co. গঠন করিয়াছেন। বৈদ্যবাটী অঞ্চলের তিনি প্রাণস্বরূপ ও পিতৃস্বরূপ ছিলেন। ধনী হইয়াও তিনি নিরহঙ্কার, সরল, সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

ঢাকা দীপালি সঙ্ঘ—

ঢাকার দীপালি সঙ্ঘের বাৎসরিক বিবরণীতে অনেক আশার কথা আছে। এই সমিতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই সমিতি মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত।

মেয়েদের জন্য ৫টি অবৈতনিক বিদ্যালয় দীপালি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শিল্প শিক্ষাও দেওয়া হয়। এ ছাড়া দীপালি সমিতির উদ্যোগে মহিলাদের মধ্যে ব্যায়াম-চর্চ্চা ও (লাঠি খেলা প্রভৃতি) হইতেছে। এই সমিতি নানাবিধ শিক্ষার ভিতর দিয়া মেয়েদের দেশ সেবার বিপুল কর্ত্তব্যভারগ্রহণের যোগ্য করিয়া তোলা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ—

বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে আটটি দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলার বিবরণ তাঁহাদের ইস্তাহারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরও কোন কোন জেলায়—বিশেষভাবে খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ খুলনার কথা বলা যাইতে পারে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় স্বচক্ষে খুলনার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল-সমূহ পরিদর্শন করিয়া খুলনার হতভাগ্য নরনারীদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। দক্ষিণ-খুলনায় প্রায় তিনশত বর্গমাইল স্থান ইতিমধ্যেই ভীষণ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইয়াছে। লবণাক্ত নদীর উভয় তীরে শস্যহীন ধানের ক্ষেতগুলি ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। বাঙলার অপরাপর জেলা যথা বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর রাজসাহী প্রভৃতি জেলার অবস্থারও বিশেষে কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাঙলার লাট সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সরকার হইতে আশানুরূপ সাহায্য করিবার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

লজ্জার বিষয় যে আমাদের দেশে মহাজনেরা এই দারুণ দুর্দ্দিনে কৃষককুলের সর্ব্বনাশ করিতেছে। সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ—

আমরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল হইতে সংবাদ পাইতেছি, ধনী ও মহাজনেরা অনাহারক্লিষ্ট গৃহস্থদিগকে বিনা সুদে বা অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহারা এই সুযোগে দ্বিগুণ চতুর্গুণ সুদ এবং জমি বন্ধক প্রভৃতি লইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশের পথ আরও প্রশস্ত করিতেছে। ইহার ফলে দুর্ভিক্ষের পরে কত কৃষক যে ভূমিহীন নিঃস্ব ভিখারীতে পরিণত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একেই বলে কারো সর্ব্বনাশ কারো পৌষমাস! ইহা রোধ করিবার একমাত্র উপায় সরকারী তহবিল হইতে কৃষকদিগকে উপযুক্ত তাকাভী ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা বা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী হইতে তাহাদিগকে ঋণ দেওয়া। কিন্তু অনেক স্থলেই গবর্ণমেণ্ট যে তাকাভী ঋণের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অপ্রচুর—কতকটা লোক দেখানো মত! স্থানীয় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং জন-সেবকদের দৃষ্টি আমরা এইদিকে আকৃষ্ট করিতেছি।

—

ভারতবর্ষ

বারদোলী সত্যাগ্রহ—

বারদোলীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন-দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ হইতেছে। বারদোলী তালুকের কৃষকেরা এপর্য্যন্ত যেরূপ অহিংসভাবে সরকারী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে, তাহা সমগ্র ভারতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই নিরস্ত্র, অহিংস সত্যাগ্রহী কৃষকদের দমন করিবার

চন্দননগরের পালপাড়া স্পোর্টিং ইউনিয়নের বাৎসরিক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য উদ্যোক্তৃগণ

বারদোলী সত্যাগ্রহ-সম্পর্কিত একটি সভায়
শ্রীযুক্ত প্যাটেল বক্তৃতা দিতেছেন

গুজরাতে একটি রায়ত সভায় শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম বক্তৃতা দিতেছেন। এখানকার রায়তরা বারদোলী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন

শ্রীযুক্ত রবিশঙ্কর
বারদোলী সত্যাগ্রহ সংগ্রামের প্রারম্ভে ইনি ছ'মাসের সশ্রম কারদণ্ডে দণ্ডিত হন

জন্য সশস্ত্র পুলিশ ও পাঠানদিগকে আমদানী করিয়াছেন। আর এই পাঠানেরা সত্যাগ্রহীদের মাল ক্রোক ও নিলাম ইত্যাদি কার্য্যে যেরূপ অত্যাচার, জোর জবরদস্তী করিতেছে, তাহা নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সিন্ধু প্রদেশের জননায়ক শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম স্থরাট প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে অত্যাচারী পাঠানদের কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, এই সব পাঠানেরা অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির। ভারতের সহরগুলিতে ইহাদের মত দুর্ব্বৃত্ত অপরাধী বড় একটা দেখা যায় না। অথচ এই সব লোককেই বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বাছিয়া বাছিয়া নিরীহ গুজরাটি কৃষকদের সায়েস্তা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ইস্তাহারে বলিতেছেন—পাঠানদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। সরকারী কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে চালিত মুষ্টিমেয় জনকয়েক পাঠান যে ৯০ হাজার কৃষকদের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে, একথা গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাসই করিতে পারেন না।

গবর্ণমেণ্ট যে কেবল বারদোলী তালুকে পাঠানদেরই আমদানী করিয়াছেন, তাহা নহে, বোম্বাই কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুত নরিম্যান, দেশাই প্রভৃতি তাঁহাদের পদত্যাগ পত্রে বলিয়াছেন যে, পুরাতন হিন্দু কর্ম্মচারীদিগকে ঐ স্থান হইতে সরাইয়া তাহাদের স্থানে নূতন

একদল মুসলমান কর্ম্মচারী আমদানী করা হইয়াছে। বারদৌলী হিন্দুপ্রধান স্থান—সত্যাগ্রহীরা অধিকাংশই হিন্দু; মুসলমান সত্যাগ্রহীও অনেকে আছে এবং এ পর্য্যন্ত হিন্দুদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবেই তাহারা সত্যাগ্রহ করিতেছে।

সরকারী বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, সত্যাগ্রহীরা ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিল যে, সরকার প্রজাদের স্থাবর অস্থাবর কোন সম্পত্তি নীলাম করিতে সাহস পাইবেন না, পাইলেও তাহার ক্রেতা জুটিবে না। কিন্তু এখন সত্যাগ্রহীদের ভীতি-প্রদর্শন মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কতিপয় সত্যাগ্রহভঙ্গকারী ও বিশ্বাস ঘাতক লোভের বশে নামমাত্র মূল্যে সত্যাগ্রহীদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কিনিতেছে। কিন্তু তাহার ফলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়ের কোন সুবিধা হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, শতকরা ২০ টাকা খাজনা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র অন্যায় করেন নাই; প্রজারা বলিতেছে, তাহারা ঐরূপ বর্দ্ধিত কর দিতে অশক্ত। তাহারা সমস্ত অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি বসাইতে অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই অতি সঙ্গত প্রস্তাবেও সম্মত নহেন। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই কাউন্সিলের সাতজন গুজরাটী সদস্যও গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রহণ না করাতে তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নরীম্যান, দেশাই প্রভৃতি আরও কয়েকজন সদস্য গবর্ণমেণ্টের পীড়ন-নীতির প্রতিবাদ করিয়া পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলের অনেক প্যাটেল ও তালাটি (গ্রাম্য পঞ্চায়েত) পদত্যাগ করিয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বোম্বাইএর জনৈক পার্শী লক্ষপতির কন্যা শ্রীমতী মিঠুবেন পেটিট ও শ্রীযুক্ত গোপালদাস দেশাইএর পত্নী শ্রীমতী ভক্তিবাঈ ইঁহারা বারদৌলী সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিয়াছেন

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি মাননীয় মিঃ ভি, জে, প্যাটেল প্রতিমাসে সত্যাগ্রহ ফণ্ডে এক হাজার টাকা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীও এই আন্দোলনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষকে বারদৌলীর সত্যাগ্রহীদের পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে, অর্থ ও উৎসাহবাণীর দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। তাহারা যে-মহান আদর্শকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতেছে ভারতের জাতীয় জীবনের তাহা একটি অমূল্য সামগ্রী।

ভারতীয় হকী দল—

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জগদ্বিখ্যাত। পৃথিবীব্যাপী তাহার যশ ও প্রতিষ্ঠা। পূর্ব্বে ভারতীয়গণ এ প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কেহ দৌড় ইত্যাদিতে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য যোগ দিয়াছিলেন। এ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে একদল হকী খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে ভারতের গৌরব করিবার যথেষ্ট আছে। অলিম্পিক চরমখেলায় ইঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন শুধু তাহা নহে, এই প্রতিযোগিতায় ইঁহারা একটি গোলও না হারিয়া পাঁচটি দলকে মোট ২৯টি গোল দেন।

গভীর গবেষণালব্ধ ত্রেতাযুগের গল্প

(১)

কলিকাতার হেদুয়া সরোবরের উত্তর প্রান্তে একটি রাণীগঞ্জ টালি আচ্ছাদিত চাগা আছে। সেই চাগার অভ্যন্তরস্থ বেঞ্চিগুলি অধিকার করিয়া সকাল-সন্ধ্যা উত্তর-কলিকাতার যাবতীয় পরলোকের পথের পথিকগণ গল্প গুজব করিয়া ডাক আসিবার পূর্ব্বের সময়টুকু আনন্দে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সেদিন বৈকালেও এখানে চিরানুসৃত প্রথা মত আড্ডা বসিয়াছিল। "হট ডিস্‌কাশ্যন্"—বিষয় "সিডিশন।

প্রমথবাবু বলিলেন, "দেখ গভর্মেন্টের যদি বুদ্ধি থাক্‌ত তা হ'লে তারা সিডিশন থামাবার জন্য আরও গোটা কয়েক কাউনসিল, এসেম্ব্লি ইত্যাদি বাড়িয়ে দিত আর তাতে ঢোক্‌বার "ইলেক্‌শনের" নিয়ম-কানুন এমন ক'রে দিত যে কোন ভদ্রলোক আর তাতে ঢুক্‌তে পার্‌ত না। তা হ'লে দেখতে যে, জাল জুচ্চুরী ক'রে যারা তাতে ঢুক্‌ত তারা এমন লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিত আর এত খাটো খাটো কাজ কর্‌ত যে দেশে সত্যি সত্যি রিভোল্যিউশন কর্‌বার মত লোক যদি কেউ থাক্‌ত ত তারা উপযুক্ত রকম বক্তৃতা দেওবার ক্ষমতার অভাবে শীঘ্রই পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে মুদির দোকান খুলে দেশের দেশাত্মবোধের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে লেগে যেত। সিডিশনের আসল দাওয়াই হচ্ছে উপযুক্ত ছাঁদের পলিটিক্‌স্; কি বলেন, মধুবাবু?" মধুবাবু কারুর মতে মত দেন না; দিলে, ভাঙ্গের নেশা খরচা সত্ত্বেও অকালে ছুটিয়া যায়। তিনি বলিলেন, "আরে মশায়, সেও কি কথা! কাউন্সিল যত বাড়বে সিডিশনও তত বেড়ে চল্‌বে। সিডিশন ক'রে জেলে না গেলে লোকে কাউন্সিলে ঢুক্‌বে কিসের জোরে? অবিশ্যি বল্‌তে পারেন, যে, এতে বড় রকম সিডিশন, যেমন খুন-খারাপী, তা কম্‌বে, কিন্তু ছোটখাট সিডিশন, যেমন কাগজে 'ইস্‌কো শীর লেও, উস্‌কো গর্দ্দান লেও' ব'লে আস্ফালন করা, কি চৌরঙ্গীর মোড়ে ফিরিঙ্গী সার্জ্জেণ্ট-কে লেঙ্গি মেরে ফেলে দেওয়া, এসব এতে বাড়বে। আজকালকার দিনে ঐ রকম কিছু না কর্‌লে কেউ দেশের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারে না। ধরুন না কেন, আমাদের হাতু, তার আর কি ক্ষমতা ছিল? ওবছরের ৫ই তারিখের হরতালের দিন সে গণেশ ময়রার দোকানের পিছনের দরজার ফাঁক দিয়ে জিবে গজা কিনে খাচ্ছিল। এমন সময় 'রৈ রৈ' ক'রে সেই পথ দিয়েই ভিড় আর তার পিছনে পুলিশ ছুট্‌ল। হাতু ভয় পেয়ে এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা ক'রে 'অন সাসপিশন' গ্রেপ্তার হ'য়ে গেল। আর কি রক্ষা আছে! নগদ ৪৲ জরিমানা। এদিকে, হাতুর মামাবাড়া বর্দ্ধমানে। সেখানে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল হাতু শুধু হাতে ৭।৮ জন সার্জ্জেণ্টকে জখম ক'রে জেলে গিয়েছে। হাতু মাস দুই পরে বর্দ্ধমান যেতেই তাকে সকলে কাগজের স্বরাজ ফ্ল্যাগ, মালা ইত্যাদি উড়িয়ে গলায় দিয়ে ষ্টেশনে 'রিসিভ' কর্‌লে। তার পর দিন "বার অ্যাসোসিয়েশন" তাকে কাউন্সিলে ব্যাক কর্‌বে ব'লে জানালে। হাতু ত হতভম্ব! কিন্তু তা হ'লে কি হবে—সেই দেখ হাতু আজ 'এমেল্‌সি' হ'য়ে শাঁই শাঁই ক'রে বক্তৃতা ছোটাচ্ছে। প্রমথবাবুর ওসব ধারণা ভুল। সিডিশন বন্ধ কর্‌বার মাত্র এক উপায় আছে। "মাস এডুকেশন" কম্পালসারি ক'রে সেই সঙ্গে প্রাইমারী স্কুল থেকে আফিং খাওয়া কম্পালসারি ক'রে

দেওয়া ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাশে এক পয়সা প্রমাণ দিয়ে সুরু ক'রে দিলে ক্রমে ডোজ বাড়তে বাড়তে বি, এ, পাশ দেবার সময় নাগাদ সব এক এক জন চিনে ম্যাণ্ডারীনের বাপ হ'য়ে দাঁড়াবে। তারপর দেখব কে সিডিশন করে!"

ডিপার্টমেন্টে কি ইংলিশ লেডি ছিল কম। মিস মেয়ার, মিসেস রাইট, মিস কুহুম আরও কত—আমার প্রতি সকলেরই বেশ টান ছিল—ভাইয়ের মত দেখ্‌ত—; কিন্তু আমার তাদের সঙ্গে সুরেন বাঁড়ুয্যের স্পীচটীচ নিয়ে কি তর্কটাই না হ'ত! সে শুন্‌লে কুসুমের ভার ইংলিশ লেডি ফ্রেণ্ড থিওরী মাথায় উঠে যেত। ছ্যা, ছ্যা, ও কি কোন কাজের কথা!"

'রৈ রৈ' ক'রে সেই পথ দিয়েই ভিড় আর তার পিছনে পুলিশ ছুট্‌ল!

কুসুমবাবু দমিবার পাত্র নহেন; তিনি রায় বাহাদুর কে খোঁচা দিয়া কি বলিতে যাইবেন, এমন সময় নিরাড়ম্বর মুখুজ্জ্যে মহাশয় ঈষৎ কাশিতে কাশিতে চালাতে প্রবেশ করিলেন। নিরাড়ম্বর বাবুর বয়স আশীর অধিক, কিন্তু এখনও চুলে যথাযথ রকম পাক ধরে নাই। বয়স কালে তিনি কলিকাতার ব্যবসাদার মহলে বেশ নাম করিয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ তাঁহার কারবার চালাইয়া কলিকাতায় বাড়ীর পর বাড়ী তুলিতেছেন। সকলেই তাঁহাকে বয়স, অর্থ, বুদ্ধি সকল দিক দিয়া শ্রদ্ধা করিয়া চলিত ও তাঁহার কথা মত ও তাঁহারই অনুকরণে নিজ নিজ শিরঃসঞ্চালন করিত। তিনি চালায় ঢুকিবার পূর্ব্বেই ভিতরের উত্তেজনার আভাস পাইয়াছিলেন, তাই ভিতরে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে প্রমথ, কিহে গজেন, কি ব্যাপার? সকলে মিলে চেঁচিয়ে যে ওদিকে জলের মাছ গুলোর শুদ্ধ 'নারভাস ব্রেক-ডাউন' করিয়ে তুলছ। কি হয়েছে কি?"

মধুবাবু বলিলেন, "এই কথা হচ্ছিল কি, যে, দেশে সিডিশন হচ্ছে কেন আর হচ্ছে যদি ত থামান যায় কি করে। তা কুসুমবাবু বলেন, যে, বিলেত থেকে কিছু লেডি ফ্রেণ্ড আমদানী ক'রে দিলেই সরকার বাহাদুরের সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। দেশের সব রিভোলিউশন নাকি তাহ'লে অবিলম্বে কটাক্ষের ধাক্কায় মোক্ষলাভ কর্‌বে। এতে গজেনবাবু আপত্তি করেছেন। তিনি বলেন যে দেশে তাঁর মত বহুৎ বহুৎ কটাক্ষ-প্রুফ লোক আছে সুতরাং…"

গজেনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "অন এ পয়েণ্ট অফ অর্ডার; আই ষ্ট্রংলি অবজেক্ট; দিস ইজ…"

নিরাড়ম্বর বাবু বামহস্তখানি একটু তুলিয়া বলিলেন, "আরে মশায়, থামুন থামুন, বুঝেছি। সকলেই আপনারা ভুল করেছেন। কাজেই রাগ কর্‌বার কিছু নেই। সিডিশন

কুসুমকুমার অল্পবয়স্ক অর্থাৎ পঞ্চাশের কমের দিকে। তিনি যুদ্ধের সময় ফরাসী উপনিবেশসমূহের শাসন-বিধি, সেই সকল স্থানে কার্য্য-সূত্রে অবস্থান কালে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আরে মশায়, আফিং খাওয়ালে যদি সিডিশন থাম্‌ত, তাহ'লে চীনে আর আজ রাষ্ট্রবিপ্লব হ'ত না। ওসব কোন কাজের কথা নয়। আমাদের দেশে সিডিশন হয় তার কারণ আমাদের দেশে ছোকরাদের ইংরেজরা ইংলিশ এডুকেশন দেয়, কিন্তু, ইংলিশ উইমেনদের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেয় না। ফরাসীরা দেখুন, কেমন আনামে রাজত্ব করছে। প্রত্যেক ছোক্‌রা আনামাইট মাত্রেরই একটি বা তার চেয়ে বেশী ফ্রেঞ্চ লেডি ফ্রেণ্ড আছে। বাস্‌ আর কি তারা ফ্রেঞ্চদের দেশ থেকে তাড়াতে চায়, না বোমা মেরে ওড়াতে চায়? ইংরেজ গভর্ণ্মেণ্ট স্রেফ ঐ "প্রিনসিপ্‌ল্‌" অনুসারে কাজ করুক; ইংলিশ এডুকেশনের সঙ্গে ইংলিশ লেডি ফ্রেণ্ডের ব্যবস্থা করুক; দেখবেন সিডিশন কোথায় থাকে!"

কুসুমবাবুর কথাগুলি সকলেরই পছন্দ হইলেও, নৈতিক কারণে কেহই তাঁর কথার সমর্থন করিলেন না; বরং বহুবার বিপত্নীক রায় বাহাদুর গজেনবাবু বলিলেন; "আরে ছ্যা, ছ্যা, ছেলে-ছোকরার কথা! কুসুম, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। ছ্যা, ছ্যা, লেডি ফ্রেণ্ড, ছ্যা ছ্যা, আমাদের কি আর কারও লেডি ফ্রেণ্ড ছিল না, না ছিল ব'লেই আমরা স্বাধীনতা চাই নি। এই ধর না, আমাদের

সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বার আগে দেখা দরকার সিডিশন দেশে সত্যি সত্যি আছে কি না। আমার ত মনে হয় সিডিশন এদেশে নেইই, সুতরাং তা কি ক'রে দূর করা যায় তার আলোচনা এক দিক দিয়ে নিস্প্রয়োজন। তবে বল্‌তে পারেন এত 'কেস্' হয় কেন আজকাল। সিডিশন থাকা আর সিডিশন 'কেস্' থাকা এক কথা নয়। কেস্ যে আছে তার কারণ কি জানেন? গ্রেটেষ্ট গুড অফ দি গ্রেটেষ্ট নাম্বার, জনহিতকর ব্যাপার আর কি বুঝলেন না? এই যেমন দেশে স্বদেশভক্ত ছেলের চেয়ে পুলিশের সংখ্যা বেশী হ'য়ে গেছে এবং সিডিশন না হ'লে পুলিশের লোকগুলির অন্ন মারা যায়। একে সংখ্যায় বেশী তায় পুলিশের বাবুদের সকলেই প্রায় ছা পোষা মানুষ এবং বৎসরান্তে, ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে সিডিশন না হ'লেই "টোটালে" দেশের লোকের কষ্ট বেশী হবে। তাই জাতীয় মঙ্গলের দিক দিয়েই এর একটা দাম আছে বলা যায়। কি বল, প্রমথ?"

প্রমথ—"আজ্ঞে, যা বলেছেন। ওর উপর কি আর কথা চলে?"

নিরাড়ম্বর বাবু বলিয়া চলিলেন, "আর যদি এই সিডিশন বন্ধ করতে চাও তা হ'লে এক কাজ কর। এই যত পুলিশের বাবুরা আছেন, তাঁদের সকলের চাকরীর নিয়ম ক'রে দাও যে দেশে যত সিডিশন কম হবে তাঁদের তত বেতন বাড়বে এবং সিডিশন হ'লেই জরিমানা হবে। আরও নিয়ম ক'রে দাও যে যাঁর যাঁর এলাকায় যত সিডিশন কম হবে তিনি তাঁর আফিসে তত বেশীসংখ্যক নিজের ভাগ্নে, সম্বন্ধী প্রভৃতিকে চাকরী দিতে পারবেন; এই সব নিয়ম কর, দেখ দুদিনে দেশে শান্তির বান ডেকে যাবে, ছেলেরা বোমা ছেড়ে ঢিল শুদ্ধ আর ছুঁড়বে না।'

সকলে নিরাড়ম্বর বাবুর কথা শুনে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌ল, কারণ সারবান কথার আদর কে না করে? নিরাড়ম্বর বাবুও কিয়ৎকাল নিজের যশের স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া সেই সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "সিডিশনের কথা বলতে মনে প'ড়ে গেল, এ সিডিশন ব্যাপারটা শুধু এই কলিযুগের ব্যাপার নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এর প্রভাব সকল দেশে দেখা গিয়েছে। স্বয়ং যে ভগবান রামচন্দ্র, তাঁর রাজত্বেও সিডিশন দেখা দিয়েছিল। সে কথা রামায়ণে লেখে না, কিন্তু ঋষি মহলে এখনও অনেক কথা শুনতে পাওয়া যায় যা কেতাবে নেই। এই ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম বদরিকাশ্রমের শ্রীশ্রীউড্ডীয়ানন্দ মহাপ্রভুর কাছে। আরও অনেক কথা তিনি আমায় শুনিয়েছিলেন কিন্তু এইটাই শোন আপাততঃ—

(২)

অযোধ্যায় তখন আইনতঃ রাম-রাজত্ব; কিন্তু রামচন্দ্র অযোধ্যায় নাই। তিনি কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে। ভরত তাঁহার চন্দনের খড়ম জোড়াকে সিংহাসনে বসাইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতেছেন। ভরত সকল পরোয়ানাতে খড়মের ছাপ লাগাইয়া তবে তাহা জাহির করিতেন। সকল পেয়াদা আদালতে আদালতে খড়ম মার্কা তকমা পরিয়া ঘুরিত ফিরিত। রাষ্ট্রশক্তির নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ঐ খড়ম জোড়াটা। এমন কি টোল পাঠশালার বকাটে ছেলেরা ভরতের রাজনীতির নাম দিয়াছিল খড়মতন্ত্র। ভরতের সময়কার সকল টাইটল্ ও খেতাবও খড়ম-সম্পর্কিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যেমন, রাষ্ট্রের বিশেষ কোন উপকার করিলে মানুষ কার্য্যের গুণানুসারে রৌপ্য বা স্বর্ণ নির্ম্মিত খড়মাকৃতি পদক পুরস্কার পাইত। তদ্‌ব্যতীত খড়ম-নায়ক, খড়ম-তিলক, খড়ম-মহানায়ক, খড়ম-অধিনেতা প্রভৃতি খেতাব পাইবার জন্যও সকল রাজকীয় কর্ম্মচারী যথাসাধ্য চেষ্টা ও রেষারেষি করিতেন।

ভরত তাঁহার চন্দনের খড়ম জোড়াকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন

কাহাকেও সম্মান দেখাইতে হইলে খড়ম-সম্বল, খড়ম-সেবক বলিয়া সম্বোধন করা রীতি ছিল।

ভরতের রাজ্যে শাসন ছিল সবিশেষ কড়া রকমের; কারণ, ভরতের একমাত্র আদর্শ ছিল রাজ্যটাকে রামের অবর্ত্তমানে ঠিক মত খাড়া রাখা। সেই জন্য তাঁহার রাজত্বে কেহ কোন প্রকার রাজ-অসম্মান-সূচক কার্য্য করিলে তাহার তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করা হইত। খড়ম যে পায়ে পরিবার জিনিস, মস্তকে ধারণ করিবার নহে, এ কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। খড়ম কথাটি উচ্চারণ করিতে হইলে নিয়ম ছিল যে তৎপূর্ব্বে "শ্রীশ্রী" অথবা "জয়" কথাটি যোগ করিতে হইবে। খড়মের চিত্র লাল, সোনালী অথবা রূপালী রংয়ে ছাড়া অপর রং-এ আঁকিলে তাহাও দণ্ডনীয় ছিল।

ভরত যাহা কিছু যথেচ্ছাচার করিতেন, সকল কিছুই খড়মের আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে করিতেন। এবং খড়ম কোনওরূপ অন্যায় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, এই অখণ্ডনীয় যুক্তির উপর যেক্ষেত্রে ভরতশাসিত অযোধ্যার সকল বিচার ও সকল শাসন চলিত, সেক্ষেত্রে ভরতও বস্তুতঃ সকল অন্যায়ের উপরে ছিলেন। অর্থাৎ ভরত কোন অন্যায় করিলেও তাহা ন্যায়, ভরতের খেয়াল অযোধ্যাবাসীর জনমত, ভরতের নায়েবগণ অযোধ্যার জনসংঘের প্রতিনিধি এবং ভরতের অর্থশালায় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে অযোধ্যার সাধারণের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, ইত্যাদি বহুল প্রকার অসম্ভব সত্যের উপর অযোধ্যার রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যহ প্রত্যুষে অযোধ্যার মন্দিরে মন্দিরে রাষ্ট্রীয় অর্থে পুষ্ট পুজারীগণ খড়ম-রাজত্বের গুণ কীর্ত্তন করিত এবং তাহারা যাহা বলিত তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তাহাদের তৎক্ষণাৎ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। ভরতের প্রধান পূজারী এই সকল অবিচারের সাফাই গাহিয়া বলিতেন, যে, অবিচার সুবিচার অন্যায় ন্যায় প্রভৃতির কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই, এ-সকলের একমাত্র স্থিতি মানুষের অন্তরে। কোন মানব যদি উৎপীড়িত হইয়াও খুসী থাকে, তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে তাহার উপর কোন অন্যায় করা হয় নাই। কেহ যদি প্রভূত সুবিচার লাভ করিয়াও উৎপীড়িত বোধ করে তাহা হইলে ধরিতে হইবে তাহার উপর অবিচার হইয়াছে। সুতরাং কোন রাজ্যে ন্যায় ও বিচার পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার উপায় সেই রাজ্যের সকল অসন্তুষ্ট প্রজাকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া অথবা বন্দী করিয়া রাখা। কারণ এই উপায় অবলম্বন করিলে সে রাজ্যে আর কোন অসন্তুষ্ট প্রজাকেই দেখা যাইবে না—অর্থাৎ রাজ্যে ন্যায় ও সুবিচার ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না।

ভরতকে অপরাপর পূজারী প্রভুগণও বুঝাইয়াছিলেন যে যেমন বাগান সুন্দর রাখিতে হইলে আগাছাগুলিকে মধ্যে মধ্যে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয় তেমনি রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও ন্যায়ের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে মধ্যে মধ্যে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আগাছার সমতুল্য অসন্তোষের অবতার অবাধ্য প্রজাদিগকেও বাছাই করিয়া রাষ্ট্রীয় জীবন-ক্ষেত্রের বাহিরে স্থাপন করিতে হয়। ভরতও বুঝিয়াছিলেন যে এই যুক্তি অকাট্য এবং তিনি সেই কারণে পুজারীদিগকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়া রাজ্যে পূর্ণভাবে শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাম-রাজত্ব, খড়মতন্ত্র অথবা ভরতের রাজ্যে এইরূপে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। সমগ্র রাষ্ট্রে শুধু উঠিতে বসিতে সকলে 'জয় খড়মের জয়' ছাড়া অপর কোন কথা বলিতে না। অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সে সময়ে অযোধ্যায় আসিলে দেখিয়া অবাক হইয়া যাইত যে এত সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলার সহিত এতবড় একটা রাজ্য কিরূপ অবাধে শাসিত হইতেছে। তাহারা দেখিত, শিরস্ত্রাণের উপর খড়ম বাঁধিয়া দলে দলে শান্ত্রিগণ শান্তিরক্ষা করিয়া পথে পথে বিচরণ করিতেছে। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার শীর্ষে খড়মচিহ্নিত পতাকামালা পত পত করিয়া উড়িতেছে। পথের পার্শ্বে ও রাজধানীর উদ্যানে উদ্যানে প্রসিদ্ধ খড়ম-অধিনায়কদিগের মর্ম্মর-মূর্ত্তি। পাঠশালার বালকগণ প্রত্যহ উচ্চৈঃস্বরে খড়মের গুণগান করিয়া তবে পাঠে রত হয়। পথে ঘাটে বাগানে গৃহে সর্ব্বত্র শুধু খড়মের গুণগান। রাজ্যে শান্তি ও সন্তোষের অপ্রতিহত প্রভাব।

(৩)

রামরাজত্ব যখন এইরূপ অসাধারণ গৌরব ও সৌষ্ঠব-মণ্ডিত ভাবে চলিতেছে, এমন সময় একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় একটা দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া রাজ্যের কর্ণধারদিগের মনে সবিশেষ চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। সে দিন রবিবার। সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের চিরানুসৃত প্রথামত সে দিন বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সভার কার্য্য হইতেছিল। পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ধূপধুনা, শঙ্খধ্বনি, স্তুতিগান, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির সাহায্যে সভাস্থ সকলে প্রায় আত্মহারা হইয়া খড়মমাহাত্ম্য উপভোগ করিতে-ছিলেন।

হঠাৎ সভা একেবারে নিস্তেজ হইয়া গেল। সকলে দেখিল, আঠার জন দীর্ঘকায় দাসের স্কন্ধে একটা বিরাট সিংহাসন ধীরে ধীরে সভায় প্রবেশ করিতেছে। অমনি চারিদিক হইতে "জয় খড়মের জয়" ধ্বনিতে সভা মুখরিত

হইয়া উঠিল। সিংহাসনটি ক্রমে সভার একপ্রান্তে, যেখানে ভরত কুশাসনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, সেখানে আনিয়া রাখা হইল। ভরত সসম্ভ্রমে উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অমনি সভাজনের সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জয় শ্রীশ্রীখড়মের জয়"। তার-পর রাজপুরোহিত মহাশয় উঠিয়া সিংহাসনের নিকটে গিয়া খড়মের উপর বহুমূল্য কিংখাবের আবরণখানি উত্তোলন করিলেন। করিয়াই তিনি একটা বিরাট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "কি হইল কি হইল" শব্দে সভা পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভরত তাড়াতাড়ি সিংহাসনের নিকটে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনিও "হা হতোস্মি" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া কয়েকজন নিকটবর্ত্তী সভাসদ উঠিয়া সিংহাসনের নিকটে ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখি-লেন স্বর্ণসিংহাসনের বক্ষে যে স্থলে রামের খড়ম-জোড়াটি সতত রক্ষিত হয়, সে স্থলে রহিয়াছে মাত্র এক পাটি খড়ম!

অতি তীব্রবেগে এই দুঃসংবাদ সভায় ছড়াইয়া পড়িল। সকলে কপালে করাঘাত করিতে থাকে আর শুধু "হায় হায়" বলিয়া আর্ত্তনাদ করে। কিয়ৎকাল এইরূপে কাটিবার পর ভরতের জ্ঞান হইল। তিনি উঠিয়াই বলি-লেন, "খড়মের অপমান রাজদ্রোহ। খড়মের এক পাটি অপহরণ, রাজশক্তিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা। এ ভীষণ রাজ-দ্রোহের প্রতিকার চাই, উচ্ছেদ চাই, ইহাকে সমূলে উৎ-পাটিত করা চাই।"

সভাস্থ সকলে বলিল, "সাধু সাধু, উৎপাটিত করা চাই-ই।"

ভরত প্রথমতঃ আদেশ করিলেন যে, খড়মের সেবায় যত লোক নিযুক্ত আছে সকলকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে। সকলে উপস্থিত হইল এবং ভরতের প্রধান শান্তিসচিব (পুলিশ কমিশনার) তাহাদিগকে বিশেষ জেরা করিলেন। জেরায় দেখা গেল যে, যদিও কেহ খড়ম অপহৃত হইতে দেখে নাই তবুও শুধু খড়ম অপহৃত হয় নাই, এরূপ প্রমাণ আছে। খড়মের প্রসাদ যে প্রত্যহ ভোগের পর লইয়া যাইত, সেই ভৃত্য বলিল যে, সেইদিন প্রাতে ভোগের বাসনপত্র পরিষ্কার করিতে গিয়া সে দেখিল যে, একটি স্বর্ণময় থালিকা কম রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত ভোগের ফলমূল পায়সান্ন প্রভৃতিও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। পাছে তাহাকেই চোর বলিয়া সন্দেহ করা হয়, সেই ভয়ে সে এই সকল কথা পূর্ব্বে বলে নাই। ভরত এ সকল কথা হইতে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সেইজন্য আদেশ দিলেন, "রাজদ্রোহের মূল গভীর এবং একটা যে বিরাট ষড়যন্ত্র এই রাজদ্রোহের মূলে আছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই ষড়যন্ত্র ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা অতঃপর হইবে। আপাততঃ খড়মের রাজশক্তি যে এখনও অপ্রতিহত আছে তাহার প্রমাণস্বরূপ থালিকা-অপহরণ-আবিষ্কারক ভৃত্যের প্রাণদণ্ড এবং সিংহাসনবাহক অষ্টাদশ শূদ্রের পৃষ্ঠে একশত কষাঘাত করিতে হইবে।" সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইহাকেই বলে রাজ-শক্তি! যে রাজশক্তি কখন জাগ্রত হইয়া তীব্রবেগে প্রজার পৃষ্ঠে পতিত হয় না, সে আবার কি প্রকার রাজ-শক্তি? রাজা অর্থে ইহা অবশ্য বুঝায় যে, রাজা প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া চলিবেন কিন্তু তাহার অপেক্ষাও রাজার অধিক কর্ত্তব্য, মধ্যে মধ্যে প্রজার রক্তে রাজ্যকে রঞ্জিত করা। রাজার কার্য্যে প্রজার জীবনের পূর্ণতা লক্ষিত হইবে। তাহার মধ্যে সৃজন-পালন-সংহার এই তিনটিই পূর্ণরূপে থাকা চাই।

সকলে বুঝিল, খড়মের এক পাটি অপহৃত হইলেও রাজার রাজশক্তি পূর্ব্বের ন্যায়ই খরধার আছে।

(৪)

অতঃপর অযোধ্যায় অরাজকতার প্রতিকারস্বরূপ যে "রাজকতার" সূত্রপাত হইল, তাহা অরাজকতার অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ও নির্ম্মম। ভরত রাজ্যের সকল শান্তিরক্ষক রাজকর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলেন যে, রাজ্যে বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং সকল কর্ম্ম-চারীর কর্ত্তব্য, যে স্থলেই অল্প রাজদ্রোহিতা দেখিতে পাইবেন সেই স্থলে তৎক্ষণাৎ কঠিন হস্তে তাহার নিপাত করা। কারণ, পাপকে বাড়িতে দিতে নাই। সর্পশিশুর ন্যায় পাপকেও বাড়িবার পূর্ব্বেই বিনাশ করা প্রয়োজন। এই উপদেশের ফলে রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজকর্ম্মচারীগণ সজাগ হইয়া উঠিলেন এবং সর্পের অভাবে সর্পশিশু বধ করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

অযোধ্যার পূর্ব্বসীমানায় একটি পুষ্করিণীতে দশবার জন বালক উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতেছিল। একজন ষড়-যন্ত্রান্বেষী কর্ম্মচারী তাহাদিগকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পাকড়াও করিয়া আদালতে উপস্থিত করিলেন। সেখানে বিনা কষ্টে প্রমাণ হইয়া গেল যে ঐ বালক-সংঘ একত্র হইয়া এক যোগে, এক প্রকার পরিচ্ছদে, কোন এক অজানা কার্য্যে লিপ্ত ছিল। ফলে তাহাদিগের উপর দশ ঘা করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ হইয়া গেল।

অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদের এক পাচিকার সহিত এক ব্যক্তির প্রণয় ছিল। সে রাজ-প্রাসাদের উদ্যানে সন্দেহ-জনক ভাবে ঘোরা-ফেরা করিতেছিল বলিয়া ধৃত হইল। তাহার নিকট একখানা লিপি পাওয়া গেল তাহা নিম্নরূপ—

"প্রাণ-প্রতিমাসু,

তোমা অদর্শনে প্রাণ ব্যাকুল। তুমি কি আমার প্রতি-

বিরূপা ? আমার বক্ষে কি আর সেইরূপ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে না ? আগামী কল্য অমাবস্যা ; আমি উদ্যান-বাটিকার দক্ষিণপ্রান্তে উপস্থিত থাকিব। তোমার দর্শন চাইই চাই। না আসিলে মৃতদেহ দেখিবে।"

লিপিখানি পাঠ করিয়া রাজসভার এক নৈয়ায়িক কর্ম্মচারী বলিলেন, যে, উহা "গূঢ়লেখ" বা সাঙ্কেতিক ভাবে লিখিত। উহার উদ্দেশ্য রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরবাসী কোনও এক সহযড়যন্ত্রকারীকে অমাবস্যা রাত্রিতে খড়মের অপর পাটিটিও অপহরণ করিয়া লেখকের হস্তে তাহা অর্পণ করান। কারণ "প্রাণপ্রতিমা" বলিতে খড়ম ব্যতীত আর কি বুঝাইতে পারে ? তৎপরে "তোমা দর্শনে প্রাণ ব্যাকুল" ইহার অর্থ এক পাটি খড়ম অপর পাটিকে না দেখিয়া অর্থাৎ নিকটে না পাওয়াতে ষড়যন্ত্রকারীগণ বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। "আমার বক্ষে" ইত্যাদির তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বে যে রূপ খড়মের পাটিটিকে প্রাসাদের অলিন্দ হইতে নিক্ষেপ করিয়া ষড়যন্ত্রকারীকে দেওয়া হইয়াছিল এই বারও সেই রূপ করিতে লইবে। ষড়যন্ত্রকারী অমাবস্যা নিশিতে উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকে অপর পাটি খড়ম না দিলে বাহিরের ষড়যন্ত্রকারীগণ প্রাসাদ-অধিবাসী ষড়যন্ত্রকারীকে অবশ্য হত্যা করিবে।

এই ব্যাখ্যার পরে যে বেচারা পাচিকা-প্রণয়ীর প্রতি শূলে চড়িবার আদেশ হইল, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে ?

এই রূপ বহুশত অভিযোগে অযোধ্যারাজ্যের সকল বিচারালয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কোথাও তিন চার জন যুবক গোপনে নৌকা আরোহণে সরযূবক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছিল ; কোথাও কেহ শুধু একাকী গৃহের ছাদে বসিয়া কি যেন কি কুচিন্তা করিতেছিল ; এইরূপ অভিযোগের ফলে অযোধ্যার বহুশত যুবক অযথা কারারুদ্ধ হইল। অবশ্য সমগ্র রাষ্ট্রের উপকারের জন্য সামান্য কয়েকজন লোক কষ্টভোগ করিলে ইহার মধ্যে অন্যায় কিছুই ছিল না।

বিচারালয়ে বিচারালয়ে যখন বিচার চলিতে লাগিল, সেই সময় অযোধ্যার গৃহে গৃহে রাজকর্ম্মচারীগণ প্রবেশ করিয়া হৃত খড়ম পাটিটির জন্য খানাতল্লাসি করিতে লাগিল। কেহ যে কিছু লুকাইয়া রাখিবে এমন উপায় রহিল না। লোকের সিন্দুক, তোরঙ্গ, পুঁটুলি, হাঁড়ি, লেপ, তোষক, এমন কি ঘরের মেঝে পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া খানাতল্লাস হইতে লাগিল। কিন্তু পাওয়া গেল কিছুই না। রাজ-প্রাসাদে নানা স্থলের খানাতল্লাস লব্ধ বহু ছোট বড় নূতন পুরাতন খড়ম আসিয়া গাদাও হইতে লাগিল। কিন্তু রামচন্দ্রের সেই শ্রীশ্রীখড়মের পাটিটি যেমন নিরুদ্দেশ তেমনি নিরুদ্দেশই রহিয়া গেল।

(৫)

রাজ প্রাসাদের এক বৃহৎ উঠানে সারি সারি গণৎকারগণ খড়ি পাতিয়া বসিয়া হারান খড়মের ঠিকানা অন্বেষণে লাগিয়া গেল। কেহ বলিল যে, তাহা একদল দস্যুর আস্তানায় বিন্ধ্যাচলের এক গুহা মধ্যে রহিয়াছে। অপর কেহ বলিল, উহা লইয়া একজন ডাইনী রামচন্দ্রের প্রাণনাশের জন্য তুকতাক করিতেছে। এক এক জন এক এক কথা বলে এবং সেই অনুসারে রাজ্য ওলট-পালট হয়। কখন বিন্ধ্যাচলের গুহায়-গুহায় রাজার সেনাগণ ঘুরিয়া মরে, কখন বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের গৃহে গিয়া শান্ত্রীগণ অত্যাচার করে। কিন্তু কোনই ফল হয় না। ভুল পথে চালাইবার জন্য এক জনের পর একজন গণৎকারকে উল্টো গাধায় চড়াইয়া রাজ্যের বার করিয়া দেওয়া হয়।

ভরত ষড়যন্ত্রের ভয়ে কাতর। রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হয় না। অন্ধকারে তিনি ছুরিকা দেখেন, খাদ্যে বিষ দেখেন এবং সর্ব্বত্র গুপ্ত ঘাতকের ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠেন। তাঁহার জন্য প্রাসাদের সর্ব্বত্র সারা রাত্রি প্রদীপ জ্বলে। ভোজনকালে বিড়ালশাবকগণ রাজ-ভোগের ভাগ পাইয়া পাইয়া স্থূল বর্ত্তুলাকার হইয়া উঠে এবং রাজ-প্রাসাদের প্রহরীর নিত্য সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

এমন সময় একদিন রাজার প্রধান পুরোহিত অতি প্রাতে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সরযূ নদীতে অবগাহন করিতে গেলেন। সরযূ নদীর স্নানের ঘাটের উপর একটি বৃক্ষের ছায়ায় এক বৃদ্ধা বসিয়া বসিয়া পুষ্প, মাল্য, তৈল প্রভৃতি বিক্রয় করে এবং স্নানান্তে ফোঁটা কাটিবার জন্য স্নানার্থীদিগকে চন্দন সরবরাহ করে। পুরোহিত মহাশয় অত্যল্পকাল জলে অবস্থান করিয়া উঠিয়া আসিয়া শিখার জন্য একটি পুষ্প ও তিলকের জন্য কিছু চন্দন আহরণার্থে বৃদ্ধার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। সে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একটি ফুল দিল ; কিন্তু চন্দন দিতে গিয়া দেখিল চন্দনের পাত্র শূন্য। ইহা দেখিয়া সে ঠাকুরকে বলিল, "প্রভু, আপনি দয়া করিয়া অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য চন্দন বাঁটিয়া দিতেছি।" রাজ-পুরোহিত দাঁড়াইয়া আছেন। বৃদ্ধা চন্দন বাঁটিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ পুরোহিত ঠাকুর বিকটস্বরে, "অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া তীব্রগতিতে বৃদ্ধার সম্মুখ ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন। চারিদিকে ভিড় জমিয়া গেল। বৃদ্ধাও কিছু বুঝিতে না পারিয়া "হায় কি হইল" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

পুরোহিত ঠাকুর কিন্তু অনতিবিলম্বে কয়েকজন প্রহরী লইয়া সেই স্থলে ফিরিয়া আসিলেন এবং খুব জোর গলায় বলিলেন, "ঐ বৃদ্ধাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর ; এবং উহার পুঁটুলি খুলিয়া কি আছে দেখ।"

প্রহরীগণ বৃদ্ধার পুঁটুলি খুলিতেই তাহার ভিতর হইতে হারান সোণার থালাখানি ও খড়মের পাটিটি বাহির হইয়া পড়িল। সকলে স্তম্ভিত। বৃদ্ধাকে তৎক্ষণাৎ শিকলে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে রাজার সভায় লইয়া যাওয়া হইল।

বৃদ্ধাকে তৎক্ষণাৎ শিকলে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে রাজার সভায় লইয়া যাওয়া হইল

বিগত মাসের প্রথম ভট্টারকবারের প্রান্তে আমি যখন আমার ব্যবসাস্থলে বসিয়া আছি, এমন সময় আমার মাথার উপরে বৃক্ষশাখায় আওয়াজ শুনিয়া চাহিয়া দেখি একটা বানর আমার উদ্দেশ্যে বিকট মুখভঙ্গী করিতেছে। তাহার হস্তে কি একটা চকমক করিতেছিল। আমি তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেই সে সশব্দে আমার পদপ্রান্তে তাহার হস্তস্থিত বস্তু নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। আমি দেখিলাম একখানা উৎকৃষ্ট পিত্তল থালিকা, কিছু অখাদ্য ভোজ্য বস্তু ও একপাটি চন্দন কাষ্ঠের খড়ম। আমার নিকটে তৎকালে চন্দন কাষ্ঠ অল্প থাকাতে আমি থালিকা ও পাদুকা সযত্নে তুলিয়া রাখিলাম ও ভোজ্যগুলি দূরে নিক্ষেপ করিলাম। সেই দিন হইতে আমি খড়মের পাটিটি ঘষিয়া সকলকে চন্দন প্রলেপ সরবরাহ করিতেছি। প্রভু, ভগবান আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে পিত্তল থালিকা ও চন্দন-কাষ্ঠখণ্ড দান করিয়াছেন, ইহাতে আমার অপরাধ কোথায়?” সকলে এই কাহিনী শুনিয়া ত অবাক! ভরতের মানস-চক্ষের সম্মুখ দিয়া মাসাধিক কালের অকারণ বিভীষিকার দৃশ্যগুলি যেন পুনর্ব্বার অভিনীত হইয়া গেল। তিনি জড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধাকে খড়মের ভোগের প্রতি “অখাদ্য” কথাটি প্রয়োগ করার অপরাধে পাঁচ ঘা বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দিয়া সভাভঙ্গ করিয়া অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। এত ভীতি, এত হট্টগোল, সব কিনা একটা বানরের জন্য! ছি, ছি, তিনি কি করিয়া সভাস্থলে মুখ দেখাইবেন! সেই দিন রাত্রেই একটা বিশেষ আদেশ-পত্র সকল সভাসদের নিকট চলিয়া গেল; যেন তাঁহারা কেহ খড়মসংক্রান্ত আসল খবর প্রকাশ না করেন। এবং তৎপরে দেশের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র করা হইল যে, ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে, খড়মের পাটিটি বহু কষ্টে ষড়যন্ত্রকারীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, কিন্তু ভরত-রাজের অতিশয় দয়ার শরীর, তিনি তাই ষড়যন্ত্রকারী বন্দিদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে, শুধু একটা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে যে তাহারা ভবিষ্যতে আর কখন কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিবে না। খড়মের যে দিকটা প্রলেপের উদ্দেশ্যে ঘর্ষিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল,

ভরত খড়ম ও থালিকা বৃদ্ধার নিকট পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া তাহাকে তাহার সহষড়যন্ত্রকারীদিগের নাম বলাইবার জন্য নির্য্যাতন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা সহস্র নির্য্যাতন সত্ত্বেও কিছু বলিল না। ভরত তখন গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, “রে নারী, তুই কি জানিস্ না যে তোর এ অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড? তবে তুই কেন বৃথা নিজের পাপ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছিস্?”

বৃদ্ধা বলিল, “প্রভু, আমি কি করিয়াছি জানিলে বলিতে পারি সে বিষয়ে আমি কি জানি।”

ভরত উত্তেজিতকণ্ঠে পার্শ্বস্থ সমরসচিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি, ইহাকে ইহার অপরাধের কথা বলা হয় নাই?”

সমরসচিব ভীতকণ্ঠে বলিলেন, “প্রভু, কি অপরাধ তা ত সকলেই জানে; বলিব আর কি?”

বৃদ্ধা কাতর হইয়া বলিয়া উঠিল, “প্রভু, সকলেই জানে আমি ব্যতীত।”

ভরতের আদেশে তখন বৃদ্ধাকে বলা হইল, যে, সে অপর বহু ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রামচন্দ্রের খড়মের একপাটি অপহরণ করিয়াছে ও রাজ্যে বিদ্রোহের চেষ্টা করিতেছে, এই অপরাধে সে ধৃত হইয়াছে।

বৃদ্ধা সকল কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “প্রভু,

সেই দিকে সুদক্ষ কারিগর দিয়া একটা চন্দন কাঠের ডালি লাগাইয়া লওয়া হইল এবং রাজ-প্রাসাদের বাতায়ন-গুলিতে বানরের প্রবেশ নিবারণার্থ গরাদে বাসন হইল।"

(৫)

নিরাড়ম্বর বাবু গল্প শেষ করিয়া ঘাড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! রাত প্রায় ন'টা বাজে। আজ আর নয়; চলি।"

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৩) মালাইদেশ—সিঙ্গাপুরে চীনা বৌদ্ধ বিহার

২৪শে জুলাই, রবিবার। আজকের কাজ ছিল তিনটী—বেলা দুটোর সময়ে Palace Gay Theatre নামে এক সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে চীনা শিক্ষক আর ছাত্রদের কাছে কবির বক্তৃতা, আর বিকাল বেলায় সাড়ে চারটে থেকে ছটায় সিগ্‌লাপে শ্রীযুক্ত নামাজী মহাশয় একটি সান্ধ্যসম্মিলনের ব্যবস্থা করেন, যাতে কবিকে সংবর্দ্ধনা করবার জন্য সিঙ্গাপুরে সব জাতের লোক মিলিয়ে যে একটী International Fellowship বা আন্তর্জাতিক সম্মিলন গ'ড়ে তোলা হ'য়েছিল তার সভ্যদের তিনি কবির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্য আহ্বান করেন। তারপর সন্ধ্যার পরে সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের এক mass meeting বা জনসাধারণের সভা।

সিঙ্গাপুরের চীনা শিক্ষকেরাই আগ্রহ ক'রে Palace Gay Theatre এর সভার ব্যবস্থা করেন। বেশ বড়ো থিয়েটার ঘর, লোকে ঠাসা—চীনা ছাত্র, চীনা ছাত্রী, চীনা মেয়ে আর পুরুষ মাষ্টার। সিঙ্গাপুরের শিক্ষিত ভদ্র চীনার মেলা ব'ললেই হয়। কবির সঙ্গে উপরে মঞ্চের উপর আমাদের বসিয়ে' দেওয়া হ'ল—নীচে খালি কালো-চুল মাথা, আর সাদা পোষাক, সাদা জীনের পাজামা আর গলা-আঁটা কোট-পরা ভদ্রলোক,—আর মেয়েদের কালো বা রঙিন ঘাগরা; যুবক আর ছোক্‌রাদের উদ্‌গ্রীব উৎসাহশীল বুদ্ধিশ্রীতে মণ্ডিত চাওনী, আর তাদের সোনার-ঝলক-দেখানো হাসি (প্রায় চৌদ্দ আনা লোকের ২।৫টা ক'রে দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো), আর কচিৎ গম্ভীর মূর্ত্তি কচ্ছপের-খোলার-চশমা পরা সেকেলে চীনা পোষাক গায়ে দুই এক জন প্রাচীন চীনা—শ্মশ্রুমান ঋষিকল্প চেহারা, যেন এক একটী লাউ-ৎসে বা খুং-ফু-ৎসে ব'সে আছেন। মেয়েদের বসবার ব্যবস্থা সামনের দুটো তিনটে পংক্তিতে হ'য়েছিল। হলের মধ্যে সমস্ত লোকের জায়গা হয় নি, তাই বাইরেকার বারান্দায়ও খুব ভীড় জ'মেছিল। চীনদেশের কন্‌সাল্‌ ছিলেন সভাপতি। বক্তৃতা ছিল দুটোর দিকে বিকালে। আমরা পৌঁছুলুম, কবির আগমনে তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য চীনাছাত্রদের ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজনা বেজে উঠ্‌ল। বয়-স্কাউট বা ব্রতীবালকদের রেওয়াজ চীনা স্কুলের ছেলেদের মধ্যে খুবই আছে। আবার বড়ো বড়ো চীনা ইস্কুলে ছেলেদের দ্বারায় চালিত school band আছে। এ সব ব্যাপার বিশেষ পয়সা-সাপেক্ষ, কিন্তু চীনারা তাদের ইস্কুলগুলিকে কেতা-দুরস্ত ক'রে রাখবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ক'রছে। প্রায় সকল ইস্কুলেই ছেলেদের খাকী কাপড়ের উর্দী প'রে আসা নিয়ম। ক'লকাতায় চীনেরা এক ইস্কুল ক'রেছে, সেখানেও সেই ব্যবস্থা দেখেছি। এই উর্দী পরিয়ে' ব্যাণ্ড বাজিয়ে' ব্রতী বালকের দল তৈরী ক'রে, ছেলেদের মধ্যে অল্প বয়স থেকেই যে একটা সমবেত জীবনের ধারা এনে দেওয়া হয়, সেটার প্রভাব আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রকে বিশেষভাবে উন্নত ক'রে দেয়, আর পাঁচজনের সঙ্গে সমাজের কল্যাণের জন্য নিজের অসুবিধাকে উপেক্ষা ক'রে কাজ ক'রে যাবার একটা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে' তোলে। চীনারা এইটা বেশ বুঝেছে। বাজনা থাম্‌ল। আমাদের ফ্যঙের দাদা (চুন-গুআন ইস্কুলের হেড-মাষ্টার শ্রীযুক্ত ফ্যঙ শু-পাং মহাশয়) দাঁড়িয়ে পেকিঙের চীনায় উচ্চৈঃস্বরে জানিয়ে দিলেন, কন্‌সাল মহাশয় বক্তৃতা ক'রবেন। মঞ্চের উপর একখানা বোর্ডে খড়ি দিয়ে ঐ দিনকার কার্য্যবিবরণী লেখা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি বক্তার নাম ইত্যাদি শ্রোতাদের জানিয়ে দেওয়ার এই রকম রেওয়াজ দেখছি এদের মধ্যে আছে।

কন্‌সাল্‌ মহাশয় উঠ্‌লেন—খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিটী, অভিজাত বংশীয় লোকের মতো চমৎকার ধরণ-ধারণ। তিনি ইংরিজী জানেন না, চীনা ভাষায় (পেকিঙের চীনায়) তিনি কবিকে স্বাগত ক'রলেন। তাঁর খাস-মুন্সী তার পর উঠে ইংরিজীতে তরজমা ক'রে দিলেন। কবি তখন উঠ্‌লেন–চীনারা খুব জয়ধ্বনি আর করতালির সঙ্গে তাঁর সমাদর ক'রলে। প্রথম তিনি ইংরিজীতে লেখা শিক্ষকদের কাছে তাঁর একটী ছোটো message বা উপদেশবাণী পড়লেন। তারপর তিনি তাঁর বক্তৃতা দিলেন। তাঁর এই বক্তৃতাটীতে একটী কথা চমৎকার করে তিনি ব'লেছিলেন। নদীর বা ঝরণার জলের মতো তাঁর উক্তির ধারা সহজে অচিন্তিতভাবে ব'য়ে চ'লে যায়,—দুঃখের বিষয়, সব সময়ে সুযোগ্য রিপোর্টারের শ্রুতিলিখনের দ্বারা তাকে চিরকালের জন্য বেঁধে রাখা যায় না। তিনি যে কথাটী ব'লেছিলেন সেটীর আশয় হ'চ্ছে এই যে, মানুষ যে দেশে জন্মায় সে তার জন্মসূত্রেই সেই দেশের সমস্ত অতীতের, তার সমস্ত ইতিহাসের সহজ অধিকারী হ'য়ে থাকে। ক'লকাতার একটী কোণে জন্ম নিয়ে কবি তেম্‌নি ভারতের সমস্ত কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী হ'য়েছেন। তেম্‌নি তাঁর চীনা বন্ধুগণও চীনা সভ্যতার জগতের শ্রেষ্ঠ অধিকার পেয়েছেন। ভারতের এই যে প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতি, তার মধ্যে তার এক কোণে চীনের সঙ্গে একটু যোগ আছে। চীনে মানবিকতার যে বিকাশ হ'য়েছিল, ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে তার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আর ধর্ম্মপ্রচারকদের হাত দিয়ে নিজের আধ্যাত্মিক জগতের নিজের দর্শন আর চিন্তার নিজের বিজ্ঞানের আর কলার অবিনশ্বর সমৃদ্ধির ভাগ চীনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তার সেই মানবিকতারই সংবর্দ্ধনা ক'রেছিল। কবির ভারতীয় পূর্ব্বজগণ চীনে যে এই আধ্যাত্মিক অভিযান ক'রেছিলেন, বহু দূরের অনাগত কালের কবি-ও তখন তাঁদের মধ্যে দিয়ে এই অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। গতবার যখন কবি চীনে যান, তখন এই বোধটী তাঁর কাছে যেন একটী উপলব্ধ সত্য হ'য়ে উঠেছিল। চীন আর ভারতের প্রাচীন বন্ধুত্ব, ভারতের আধ্যাত্মিক আর মানস জগতে চীনের প্রবেশ, আর চীনের কাছে উপায়নস্বরূপে ভারত যে তার পণ্ডিত আর সত্যদ্রষ্টা সন্তানদের পাঠিয়েছিল—এই সবের দ্বারায় আধুনিক চীনের কাছে বন্ধুত্বের দাবী করা কবির পক্ষে এক অতি সহজ দাবী হ'য়েছিল। আর চীনের লোকেরা তাঁকে যে রকম আদর আর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছিল, আর চীনাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর এমনিই অকৃত্রিম আত্মীয় হ'য়ে উঠেছিলেন যে তাতে তাঁর মনে হ'য়েছিল যে তাঁর এই দাবী চীনে পরিপূর্ণ ভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে। চীনে তাঁর চৌষট্টি বছরের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর চীনা বন্ধুরা তাঁর এক চীনা নামকরণ করেন, আর চীনা শিশুকে তার জন্মতিথির দিনে যেমন নোতুন পোষাক পরানো হয় তেমনি ক'রে তাঁকেও নীল আর হ'লদে রেশমের এক চীনা পোষাক তাঁরা উপহার দেন। এতে ক'রে বাস্তবিকই কবি যেন এক নবীন জীবন—তাঁর চীনা জীবন পেয়েছেন ব'লে তিনি মনে করেন। চীনাদের সঙ্গে সখ্যের আর ভ্রাতৃত্বের আসনে ব'স্‌তে তাঁর কোনও দ্বিধা বা সঙ্কোচ নেই। তিনি মনে মনে ভাবেন, যে সমস্ত মহাপুরুষ চীন আর ভারতের সংস্কৃতিকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন, তিনি তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চ'লেছেন, এশিয়াখণ্ডের এই দুই বিশাল জাতির একতা-বিধান-রূপ বিরাট ব্যাপারের গুরুত্ব তাদের মতনই তিনি উপলব্ধি ক'রেছেন।—এই রকমে একটি অতি সুন্দর বক্তৃতায়, আন্তর্জাতিক সংযোগেও যে দুটী জাতির মধ্যে কতখানি দরদ কতখানি সহানুভূতি থাক্‌তে পারে তার এক মরমী বিচার ক'রে, চীন আর ভারতের মধ্যে পুনরায় যাতে ভাবের আদান প্রদান আরম্ভ হয় সে বিষয়ে তাঁর আন্তরিক কামনা জানিয়ে তিনি উপসংহার করেন। শ্রীযুত ফ্যঙ কবির বক্তৃতার মূল কথাটী চীনা-ভাষায় ব'লে দেবার চেষ্টা করেন, আমার কিন্তু মনে হয় যে এই ব্যাপারটী তাঁর কাছে ততো সহজ-সাধ্য হয় নি। বক্তৃতার পালা চুকলে, একটী ছোটো ইস্কুলের-মেয়ে এসে ইংরিজীতে ছোট্টো একটি বক্তৃতা আউড়ে কবিকে সিঙ্গাপুরের চীনা মেয়েদের তরফ থেকে তাদের হাতের দুটী সূচের কাজ উপহার দিলে। তারপর ধন্যবাদের পালা, আবার ব্যাণ্ডে চীনা রাষ্ট্রগীত বাজানো, আর সভাভঙ্গ। সভা শেষের পরে কবি, কন্‌সাল্‌ মহাশয় আর চীনা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী জনকতককে নিয়ে ছবি তোলা হ'ল।

চীনা সিনেমা থিয়েটার—ইউরোপীয় থিয়েটারের ঢঙে তৈরী। যতক্ষণ ফোটোগ্রাফের তোড়জোড় চ'লছিল, থিয়েটারের হাতার মধ্যে খোলা জায়গায় চেয়ার টেবিল পাতা জলযোগের স্থানে ব'সে থিয়েটারের ভিতরের রেস্তোরাঁয় বরফ লেমনেড খাওয়া গেল। রেস্তোরাঁয় নানা মণিহারী জিনিসও আছে,—আর আছে চীনা ফিল্‌মের দৃশ্যের পোষ্টকার্ড সাইজের ফোটো। খাস চীন থেকে এই সব ফোটোর আমদানী। সিনেমার ব্যবসায় চীনে চ'ল্‌ছে খুব, বিস্তর চীনা ছবিও তৈরী হ'য়েছে। সিঙ্গাপুর অঞ্চলে এই সব চীনা ছায়াচিত্র খুবই আসে। কতকগুলি ঐতিহাসিক আর সামাজিক ফিল্ম্‌, শুন্‌লুম অতি চমৎকার হ'য়েছে। ক'লকাতায় একবার এই রকম একটী চীনা সামাজিক ফিল্ম আসে, সেটী দেখে আসা গিয়েছিল। এই সাধারণ একটী চীনা ছবি, ভারতে তোলা যে কোনো

ফিল্মের চেয়ে ঢের ভালো তোলা হ'য়েছে। এ বিষয়ে চীনারা দ্রুত উন্নতি ক'রছে, সন্দেহ নেই।

বিকালে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র সংবর্দ্ধনা সমিতির সভ্যেরা কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসেন—চীনা, মালাই, নানা প্রকারের ভারতীয়, ইউরোপীয়, সব সমাজের লোক ছিলেন। সন্ধ্যার পরে স্থানীয় ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ গৃহে জনসাধারণের একটী সভা হ'য়েছিল। তামিল, গুরুমুখী আর বাঙ্‌লা ভাষায় এই সভার বিজ্ঞাপনী বিতরিত হয়। শহরতলী অংশে একটা বড়ো রাস্তার ধারে স্থানীয় এসোসিয়েশনের পাকা বাড়ী, আর করোগেটের দেওয়াল ঘেরা খানিকটা খোলা জমী, সেখানেই সভা ঠিক হ'য়েছে। ভুঁয়ের উপর শতরঞ্চিতে ব'সে দু-তিন হাজার লোক, বেশীর ভাগ তামিল আর পাঞ্জাবী। আশে পাশে চীনেরা সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে উঁকিঝুঁকি মারছিল। কবি দেহে বড়ই দুর্ব্বল বোধ ক'রছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত লোকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁকে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হ'য়েছিল। এর আগেই তাঁর বক্তব্য হিসাবে ছোটো একটী লেখা আমি হিন্দী ক'রে নিয়েছিলুম, কারণ ইংরিজি জানে না এমন লোকেদের সামনে তাঁকে ব'লতে হবে; আর এই লেখাটার ইংরিজিটা ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনে আগে থাকতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে একটী তামিল ভদ্রলোক এটীকে তামিলে অনুবাদ করে রাখেন। কবি উপস্থিত হ'লে 'বন্দে মাতরম্, হিন্দুস্থান কী জয়, ভারতমাতা কী জয়, শ্রীরবীন্দ্রনাথজী কী জয়' ধ্বনির সঙ্গে তাঁকে মঞ্চে বসানো হ'ল; আসোসিয়েশনের সাহিত্যবিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আবিদ আলী কবিকে স্বাগত ক'রে হিন্দীতে বেশ সুন্দর ভাবে ব'ললেন। তার পর কবি আমাকে তাঁর হ'য়ে তাঁর বক্তব্যটী যেটী হিন্দীতে লেখা ছিল সেটী প'ড়তে ব'ললেন। আমার পরে শ্রীযুক্ত কুপ্পুস্বামী আয়্যর ব'লে তামিল ভদ্রলোকটী তার তামিল অনুবাদ প'ড়লেন। কবিকে তার পরে আরও একটু ব'লতে হ'ল। এই জনসভায় যারা উপস্থিত ছিল তারা বেশীর ভাগ অতি সাধারণ লোক—ছোটো-খাটো দোকানদার, ব্যবসায়ী, মোটর-গাড়ীর শোফার, দরওয়ান প্রভৃতি—শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবী মুসলমান, তামিল হিন্দু আর মুসলমান, গুজরাটী ভাটিয়া আর খোজা, আর দু-দশজন ভোজপুরে'। কিন্তু এই দূরদেশে স্বদেশ থেকে আগত একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দর্শন করবার জন্য, বুঝুক বা না বুঝুক তাঁর মুখের দুটো কথা শোনবার জন্য এরা যেরূপ আগ্রহান্বিত হ'য়ে এসেছে, যেরূপ শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছে, সে আগ্রহ আর সে শ্রদ্ধা একটা খুবই উচ্চ ভাবের জিনিস।

২৫ শে জুলাই, সোমবার।—

আজকের কাজ ছিল এইগুলি: সকালে দশটার পর ফ্যঙ-এর সঙ্গে চীনা বৌদ্ধ বিহার দেখা; বেলা আড়াইটের মালয় দেশের কলোনিয়ার সেক্রেটারী The Hon. E. C. H. Woolfe এর সভাপতিত্বে ভিক্টোরিয়া থিয়েটার গৃহে সিঙ্গাপুরের ছাত্র আর শিক্ষকদের কাছে কবির বক্তৃতা; সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত Cashin কাশিন বলে স্থানীয় একজন ইউরেশীয় ভদ্রলোকের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ; আর রাত্রে চীনাদের নিমন্ত্রণে চীনা থিয়েটার দর্শন।

ফ্যঙকে কথা প্রসঙ্গে বলি—শহরের ভিতরে চীনে মন্দির তো দেখলুম; বৌদ্ধ বিহার-টিহার এখানে নেই, যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে দু দণ্ড আলাপ ক'রতে পারি? ফ্যঙ্ ব'ললেন, সিঙ্গাপুরে একটী বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার আছে, আপনাদের নিয়ে যাই, আজ সকালেই। এই বিহারটী মালয় দেশ সব চেয়ে বড়ো নয়, কিন্তু এথেকে চীনা বিহারের সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রতে পারবেন। সব-চেয়ে বড়ো চীনা বৌদ্ধ বিহার হ'চ্ছে পিনাঙ্-এ, পিনাঙ্-এ গেলে পরে সেটাও আপনাদের দেখতে হবে।

সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু, ফ্যঙ, ফ্যঙ্-এর ভাগনে, আর আমি, এই পাঁচজনে মোটরে ক'রে বেরুলুম। শহরের বাইরে বসতি যেখানে খুব ঘন নয় এই রকম দুই একটা সড়ক দিয়ে মন্দিরে এলুম। মন্দিরের কাছে একটা চীনা বস্তীর মধ্য দিয়ে পথ, রাস্তার দু ধারে সারী সারী খোলার বাড়ী; বাড়ীগুলির সামনেটা জমীর উপরে আর পিছনটা মালাই বাড়ীর মতন খোঁটার উপরে প্রতিষ্ঠিত, খোঁটাগুলিকে রাস্তার দু-ধারে চওড়া পগার বা খাল গিয়েছে তার মধ্যে গাড়া হ'য়েছে। রাস্তা নয়, যেন দু-ধারের নীচু জমির মধ্য দিয়ে চওড়া আ'ল। রাস্তার পাশে বাড়ী করার জন্য শুখনা জমীর অভাব হওয়ায় তাতে চীনাদের উপায়োদ্ভাবিকা শক্তি হার মানেনি। মন্দিরটা একটী উঁচু টিলায়। মোটর দাঁড়ালো; বাঁয়ে কতকগুলি আটচালা, তাতে দোকান পাট বসবার জন্য তক্তপোষ আর কাঠের পাটাতন পাতা র'য়েছে। জানলুম এখানে উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা-টেলা বসে। ডান দিকে কতকগুলো দোকান, এখানে চীনা পূজার উপকরণ আর চীনা সুখাদ্য মেঠাই-মণ্ডা পাওয়া যায়, পয়সার ভাঙানী পাওয়া যায়। কতকগুলি অঙ্গহীন অথর্ব্ব বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা ভিক্ষা ক'রছে, শততালীযুক্ত নীল কাপড়ের জামা আর পা-জামা পরা - নোংরার চূড়ান্ত। এদের দু চার পয়সা দিয়ে, ঢালু জমী বেয়ে, মন্দিরের সামনে এ'সে দাঁড়ালুম। বেশী ভীড় নেই। চীনা বাস্তু-গঠন-প্রণালীতে, সবুজ টালিতে ছাওয়া লাল-ইট-বা'র-করা বাড়ী; পাঁশুটে রঙের গ্রানাইট পাথরের থাম যুক্ত একটু porch ব, বারান্দা-মতন সামনে, তার দেয়ালটা ঐ পাথরেই ঢাকা; দু-ধারে পাথরের উপর চীনা দেবদেবীর লীলার দুটী bas-relief বা উঁচু করে কেটে তোলা ছবি আছে, আর ছাতের নীচে দিয়েও ঐ রকম পাথরে-কাটা

ছবি। এইখান দিয়েই মন্দিরের ভিতর ঢুকতে হয়। বারান্দা দিয়ে ঢুকেই একটা বড়ো ঘর, তাতে মাঝখানে খুব উঁচু বেদীর উপরে বিরাট এক Pu-tai পূ-তাই বা মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্ত্তি—বিপুল ভুঁড়িওয়ালা, খালী গা, হাতে জপের মালা, এক গাল হাসি একজন ভিক্ষু ব'সে আছেন। ডান ধারে বাঁ ধারে, দেওয়ালের দিকে পিছন ক'রে চার জন (দুজন ডাইনে দুজন বাঁয়ে) রাক্ষসাকার অস্ত্রশস্ত্রধারী পুরুষের মূর্ত্তি; এঁরা চার জন দিক্‌পাল, মন্দিরের দ্বারপাল হিসাবে এঁদের অবস্থান। মূর্ত্তি গুলি মাটির, তার উপর রঙ-চঙ করা। এই দেউড়ি ঘর পেরিয়েই একটা উঠান। পাথরে বাঁধানো মস্ত উঠান, উঠানে প'ড়েই সাম্‌নে আসল মন্দির লক্ষ্য হয়; আর বাঁ ধারে লম্বা ঘর একখানা, আর ডান ধারে কোণে প্যাগোডার আকারে তেতালা ছোটো একটী ইমারত—এটী হ'চ্ছে ঘণ্টাঘর; ঘণ্টাঘরের লাগোয়া ডান দিকে আর একটি লম্বা ঘর। পাথরে বাঁধানো উঠোনটীর মধ্যে বড়ো বড়ো চীনা মাটির টবে বিস্তর পাতা-বাহারের গাছ আছে। উঠান পেরিয়ে ও ধারে বিহারের ঠাকুর ঘর। দরজার দুধারে পাথরের সিংহমূর্ত্তি, আর দুটো পাথরের ছাত ওয়ালা ঢাকা খুপরী বা গুমটী ঘরের মতন আছে—জাপানী মন্দিরের পাথরের দীপাধারগুলি কতকটা এই ধরণের হ'য়ে থাকে। ঠাকুর ঘরের দুই পাশ দিয়ে পিছনে আর একটা আঙিনায় যাবার পথ। ঠাকুর ঘরে ঢোকা গেল।

চোখ ঝ'লসে দেয় এই রকম তার ভিতরের সাজ। বড়ো বড়ো অতিকায় বুদ্ধমূর্ত্তি, কতকগুলি শ্যামদেশথেকে আনা হ'য়েছে, শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি, সোনার হলকরা ধাতুমূর্ত্তি; চীনা ধরণের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি; একটী চমৎকার Kuan-yin কুআন্‌-য়িন্ দেবীর মূর্ত্তি। লাল, হলদে, আর অন্য রঙের সাটিনে, সোনার কাজে, ছাত থেকে ঝোলানো চীনা হরফ লেখা রঙীন সাটিনের লম্বা লম্বা ফালিতে, ব্রঞ্জের আর চীনা মাটির বড়ো বড়ো কলসে, সমস্তটায় একটা ঐশ্বর্য্যের আর জাঁকজমকের ছবি সৃষ্টি ক'রেছে। আমাদের বুক সমান উঁচু বেদির উপরে এই সব ছোটো বড়ো মূর্ত্তি। চীনাদের কারুকার্য্যময় হাতের নানা ছোটো-খাটো জিনিস। বেদির সাম্‌নে ধূপ জ্ব'লছে,—দুপুরের আলো তো বাইরে থেকে এসে ঘরটাকে ভরিয়ে দিয়েছে, উজ্জ্বল জিনিসে প্রতিফলিত হ'য়ে সে আলো আরও বেশী তেজোময় ব'লে মনে হ'চ্ছিল; ধূপের ধোঁয়ার একটা ঘোর এনে জায়গায় জায়গায় সেই চক্ষুপীড়াদায়ক আলোকে যেন একটী ধূম্রবর্ণের কাপড়ে ঢেকে কোমল ক'রে দিয়েছে। একটি চীনা পুরুষ বেদীর সাম্‌নে নতজানু হ'য়ে ব'সে ঘাড় হেঁট ক'রে চোখ বুজে বিড়-বিড় ক'রে প্রার্থনা ক'রছে, কি মন্ত্র-টন্ত্র প'ড়ছে। ঠাকুর ঘরের কোণে ছোটো একটী পূজার উপকরণের দোকান; সেখানে একজন বৃদ্ধ চীনা ভিক্ষু তার সাজিয়ে-রাখা পটকা, মন্ত্রলেখা কাগজ, ধর্ম্মপুস্তক, ধূপ ধূনা প্রভৃতির মাঝে একটী চেয়ারে বসে বাঁ হাতে পাখার বাতাস খাচ্ছে, আর টেবিলের উপর খাতা রেখে ডান হাতে তুলি দিয়ে তাতে কি লিখছে। বেশ একটা নিস্তব্ধ শান্তি ভাব, যেন কোনও মহারাজার সজ্জিত সভায় সকলে রাজার প্রতীক্ষায় র'য়েছে। বাজে লোকের যাওয়া-আসা হুটোপাটি এখানে নেই। আর সমস্ত ঘরটাকে যেন উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে ভগবান বুদ্ধের করুণাপূর্ণ স্মিত দৃষ্টি, অতগুলি বড়ো বড়ো বুদ্ধ মূর্ত্তির চোখ থেকে যেন করুণা ঝ'রে প'ড়ছে।

ফ্‌ঙ্‌ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ খোঁজ খবর রাখেন না, আমাদের সব ভালো ক'রে দেখাবার জন্য বিহারের একজন চাকরকে ডাক্‌লেন। বুড়ো ভিক্ষু যেটি ঠাকুর ঘরে ব'সেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ক'রে দিলেন—আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেকার লোক এই শুনেই ভিক্ষুটী খুব বিনয়ের সঙ্গে আমাদের অভিবাদন ক'রলেন, ব'সতে ব'ললেন। বিহারের প্রধান যিনি, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। বিহারের সংক্রান্ত আরও জন কতক ব্যক্তি এসে প'ড়ল। সুরেনবাবুর কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে, মাঝে মাঝে তিনি ছবি নিচ্ছেন, আর পকেট থেকে আঁকবার খাতা বা'র ক'রে সুরেন বাবু ধীরেন বাবু দু জনের পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করাও চ'লছে। বিহারের একজন চাকর এল, আমাদের সমস্ত ঘুরিয়ে নিয়ে দেখাবার জন্য। অনেক খানি জায়গা জুড়ে বিহার আর মন্দির। প্রথম আঙিনা, তারপর বড়ো ঠাকুর ঘর বা মন্দির, মন্দিরের পিছনে আর এক সান বাঁধানো ধারে ধারে নীচু রোয়াক ওয়ালা আর একটী আঙিনা এই আঙিনাতে পা দিয়েই বাঁ দিকে কতকগুলি দোতালা ঘর, সামনে একটা মস্ত দোতালা ঘর, আর ডান দিকে আরও কতকগুলো ঘর। বাঁ দিকের দু একটি ঘরে দেবতাদের মূর্ত্তি আছে সেগুলি ছোটো ছোটো ঠাকুর ঘর। আর আছে একটী মস্ত হল-ঘর। সেটি হ'চ্ছে ভিক্ষুদের ধ্যান আর জপের ঘর। এই ঘরটিতে দেয়ালের ধারে ধারে পাশাপাশি কতকগুলি সুন্দর কাজ করা কালো আবলুস কাঠের বড়ো বড়ো জল-চৌকীর মতন আসন আছে, প্রত্যেকটিতে এক জন ক'রে লোক বেশ আরামে 'খাটনমালা' হ'য়ে ব'সতে পারে। প্রত্যেক চৌকীর পাশে একটি ধ'রে ছোটো টেবিল। এই ঘরে ভিক্ষুরা যে যার নির্দ্দিষ্ট চৌকীতে পদ্মাসনে ব'সে প্রত্যেক দিন যত ঘণ্টা পারেন তত ঘণ্টা ধ'রে ধ্যান করেন, আর 'নান্‌-মো-ও-মি তো-ফো' 'নমো অমিতাভবুদ্ধায়'—এই মন্ত্র জপ করেন। এই ধ্যান-চর্য্যা চীনের বৌদ্ধ বিহারের—বিশেষতঃ Ch'an 'ছান' অর্থাৎ ধ্যান মার্গী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বিহারের একটি প্রধান চর্য্যা। এই ধ্যান মার্গ, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ায়

দক্ষিণ ভারত থেকে বোধিধর্ম্ম নামে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনে গিয়ে প্রচার করেন। বোধিধর্ম্ম এখন ও চীনে Ta-mo 'তা-মো' আর জাপানে Daruma 'দারুমা' নামে পূজিত হ'য়ে আস্‌ছেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত ধ্যানবাদ চীনে Ch'an আর জাপানে Zen নামে পরিচিত; সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দ, প্রাকৃতে 'ঝাণ', এখন চীনে 'ছান', আর জাপানে 'জেন্' রূপে উচ্চারিত হয়। ধ্যানের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের গভীর দার্শনিক তথ্য গুলি এঁরা উপলব্ধি করবার প্রয়াস করেন। পাশের ছোটো টেবিলে এঁদের ধর্ম্ম গ্রন্থ—চীনা অনুবাদে—অবশ্য পঠনীয় বৌদ্ধ সূত্র রাখেন, কেউ বা মূর্ত্তি রাখেন, জপমালা রাখেন। রুমাল, চায়ের বাটীও রাখেন। ধ্যান মন্দিরের উপরের তালায় ভিক্ষুদের সারি সারি বাসের কুঠরী; সে জায়গাটা আমাদের দেখা হয় নি। ধ্যান মন্দিরের পাশে (আঙিনার বাঁ ধারে, কোণে) একটি দরজা দিয়ে বিহারের আর একটি অংশে যাবার পথ; সেখানে ঢুকেই একটি বড়ো ঘর; তার আর্দ্ধেকটা খোলা আর্দ্ধেকটা ছাত-ঢাকা, খোলা অংশে একটি কৃত্রিম প্রস্রবন আর একটি ছোটো কৃত্রিম পাহাড়; আর ঢাকা অংশটি চীনা টেবিলে, বইয়ের আলমারীতে ছবিতে মূর্ত্তিতে একটি চীনা বৈঠকখানার মতন ক'রে সাজানো। এই জায়গাটী হ'চ্ছে বিহারের অধ্যক্ষের খাস কামরা, এখানে তিনি সমাগত লোক জনের সঙ্গে আলাপ করেন; এর পাশেই একটী ঘর, সেটি তাঁর শয়ন-গৃহ আর পাঠ-গৃহ। এর পরে বড়ো ঠাকুর ঘরের ঠিক পিছনকার ঘর গুলিতে গেলুম; এখানে নীচের তালায় কতকগুলি ঘরে নানা দেবতার মূর্ত্তি—কাঠে খোদা, আর মাটির—ছোটো, বড়ো; বৌদ্ধ মূর্ত্তি—নানা বোদ্ধিসত্ত্ব, 'পূ-তাই' বা মৈত্রেয়, 'কুআন্-য়িন' বা অবলোকিতেশ্বর, ব্রহ্মা ইন্দ্র, নানা দিকপাল; আর প্রাচীন চীনেরও দেবতা, চীনাদের দেবলোকে যাদের পাশাপাশিই ভারত থেকে আগত বৌদ্ধ দেবতাদের স্থান হ'য়েছে। এর পরে, কাঠের সিঁড়ি ব'য়ে দোতালায় উঠলুম—এখানে বিহারের পুস্তকালয়। মাঝারী আকারের একটি ঘর, দু দিকে তার বারান্দা—একটা বারান্দা ভিতরের আঙিনার দিকে আর একটি বাইরের দিকে, সেখানে দাঁড়লে গাছ-পালায় ঢাকা উঁচু পাহাড়ের মতন একটু জায়গা দেখতে পাওয়া যায়। ঘরে এক পাশে কোন্ বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি—মঞ্জুশ্রী বোধ হয় হবেন—তাঁর সাম্‌নে ধূপ জ্বালানো র'য়েছে। কাজ-করা আবলুস কাঠের আলমারী, আলমারীতে সব চীনে বই। একজন ভিক্ষু সেখানে ব'সে বই প'ড়ছিলেন, মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তির সাম্‌নে। ফ্যঙ আর সঙ্গের বিহারের ভৃত্যটি আমাদের পরিচয় দিতে তিনি কেবল নত মস্তকে মনোহর ভঙ্গীতে আমাদের অভিবাদন ক'রলেন। দু' চার খান চেয়ার আর ছোটো টেবিল আছে, বেশ শান্তিতে পড়া শুনা করার জায়গা। লাইব্রেরী থেকে নেমে নীচে এলুম। আঙিনার ডান ধারের ঘরে এই বার যাবো। মাঝে একটা ঘর নোতুন ক'রে মেরামত করা হ'চ্ছে, সেই ঘরেও মূর্ত্তি থাক্‌তো।

আঙিনার ডান ধারের ঘরটীতে হ'চ্ছে বিহারের খাবারের জায়গা। ভোজনশালায় ঢোকবার পথে, বড়ো ঠাকুর ঘরের কাছে, আঙিনার ধারের রোয়াকের উপর, মানুষ-সমান উঁচু কাঠের তেকাঠা থেকে ঝুল্‌ছে একটা মস্ত কাঠের মাছ, তার পাশে একটী ছোটো কাঠের হাতুড়ী। এটী বিহারের ভিক্ষুদের জন্য ঘণ্টার কাজ করে; হাতুড়ী দিয়ে কাঠের মাছে ঘা মার্‌লে টং-টং ক'রে কতকটা ধাতব আওয়াজ বার হয়। এই আওয়াজ শুনে ভিক্ষুরা শয্যা ত্যাগ করেন, মন্দিরে অর্চ্চনা করবার জন্য উপাসনার জন্য সমবেত হন, ধ্যানের ঘরে যান, আহারের জন্য উপস্থিত হন।

আমরা সমস্ত জিনিস তন্ন তন্ন ক'রে খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখছিলুম। এদিকে ঘণ্টা দেড় কি দুই কেটে গেল, বেলা বারোটা। একজন ভিক্ষু ব'ললেন, আমরা ওখানে খেলে তাঁরা ভারী খুশী হবেন। সকালে সিগ্‌লাপে প্রাতরাশ ক'রে বেরিয়েছি, নামাজীদের অতিথিপরায়ণতার গুণে তার পরিপাটি ব্যবস্থাই ছিল, খিদে তেমন পায়নি, তবুও চীনা বৌদ্ধ বিহারে 'সেবা' কেমন হয় দেখবার জন্য রাজী হলুম। বিশেষ যখন দেখলুম যে ফ্যঙ আর তার ভাগনের-ও ইচ্ছে যে আমরা বিহারের এই অঙ্গটার-ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে যাই। ভোজনশালায় প্রবেশ করা গেল। বাইরে খর উজ্জল আলো, ভিতরটার বেশ কম আলো, আর খুব ঠাণ্ডা। চেয়ারে টেবিলে আর এক পাশে রেলিং দেওয়া জায়গায় মস্ত মস্ত টেবিলে বড়ো বড়ো গামলায় আর অন্য পাত্রে ভাত তরকারী সমস্ত সজ্জিত থাকায়, ভোজনশালায় ভিতরটায় যেন একটা বাজারে হোটেল বা রেস্তোর্‌াঁর ভাব। কিন্তু সমস্তটা পরিপাটি পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন। হাত-মুখ ধুয়ে এসে আমরা পাঁচ জনে একটি টেবিলের চার ধারে ব'সলুম। অন্য টেবিলে লোক নেই, খালি একটি টেবিলের ধারে দু জন বর্ষিয়সী চীনা মহিলা ব'সেছেন—সেই সনাতন চীনা পোষাকে—ছাতার কাপড়ের মতন দেখতে কালো রেশমের চীনা কোর্ত্তা চাপকানের মতন এক ধারে বোতাম দিয়ে আঁটা, আর আঁট পাজামা। ফ্যঙ ব'ললেন যে বৌদ্ধ বিহারে মাছ মাংস ডিম চর্ব্বি এ সব একেবারে নিষিদ্ধ, ভিক্ষুরা সকলেই নিরামিষাশী, মন্দিরের চাকর বাকরেরাও তাই। বহু ধর্ম্ম-প্রাণ বৌদ্ধ চীনা মেয়ে আর পুরুষ আছেন, যাঁরা মাছ মাংস খাওয়া পাপ মনে করেন। চীনা গৃহস্থের বাড়ীতে বা বাজারের চীনা হোটেলে মাছ মাংসের পাট থাকবেই,

জয়পুরের আহীরিণী

চিত্রকর শ্রী রামগোপাল বিজয়বর্গীয় কর্ত্তৃক অঙ্কিত, (শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে)

সর্ব্বত্রই চীনারা খুব মাংস খায়—তাই নিরামিষ খাবার জন্য অনেকে বিহারের ভোজনশালায় এসে আহার ক'রে যান। শুঁটকী মাছ,শূকরেরমাংস আর চর্ব্বি, আর বহুদিনের রক্ষিত ডিম—এ-সব না হ'লে চীনাদের ভালো করে খাওয়া হয় না ; এহেন রাজসিক আর তামসিক আহারে প্রবৃত্তি যাদের মজ্জাগত, তাদের অনেককে যে সাত্ত্বিক নিরামিষ আহারে অতি সহজেই আকৃষ্ট ক'রে তুলেছে,—ভগবান বুদ্ধের প্রভাবের, তাঁর অহিংসার আর জীবদয়ার, মৈত্রী আর করুণার বাণীর পক্ষে এটা কম জয়ের কথা নয়।

খেতে বসা গেল। চীনাদের সঙ্গে একত্রে আহার আমাদের পক্ষে এই প্রথম না হ'লেও, চীনাদের সঙ্গে চীনা রুচির খাদ্য চীনা প্রথায় খাওয়া এই আমাদের প্রথম। একজন পরিবেশক আমাদের তিনটে চারটে বড়ো বড়ো বাটি ক'রে তরকারী দিয়ে গেল। আর দিলে ছোটো ছোটো পাঁচটী পিরিচে কিছু চীনাবাদাম ভাজা, খোশা শুদ্ধ, মিয়োনো ; আর কিছু খরমুজের বীচি নুন-জল মাখিয়ে ভাজা। আর এলো কয় বাটি ভাত, পানের জন্য লেমনেড। কাঁটা চামচের বদলে এল, দুটো ক'রে উল-বোনার কাঁঠির মতন লম্বা কাঠি, chop stick বলে যাকে। তাতে আমাদের অসুবিধা হবে বুঝে, শেষটা আমাদের জন্য একটা ক'রে কাঁটা আর চামচ যোগাড় ক'রে নিয়ে এল। চীনা খাদ্যের তারের সঙ্গে আমার পরিচয় লণ্ডনে আর পারিসেই বহুবার হ'য়ে গিয়েছে। তবে এখানে সমস্ত আহার্য্য নিরামিষ, সুতরাং নির্ভয়ে খাওয়া চলে। আহারকালে চীনা ভদ্র সমাজের রীতির সম্বন্ধে, বন্ধুবর কালিদাস নাগ প্রমুখের কাছে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছু কিছু শোনা গিয়েছিল, পরে দূর থেকে চীনাদের আহার দেখে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাও কিছু করা গিয়েছিল। Forewarned is forearmed. চীনা খাওয়ায়, ভাতের বাটী যার যার নিজের নিজের থাকে ; বাঁ হাতে ভাতের বাটী মুখের কাছে এনে, এমন কি মুখে লাগিয়ে ধ'রে থাকে, আর ডান হাতে ক'রে কাঠি দুটী নিয়ে ভাত ঠেলে ঠেলে মুখের ভিতর পুরে দেয়। তারপর, সামনে বড়ো বড়ো বাটীতে তরকারী থাকে, (এই বাটীগুলো হচ্ছে যৌথ সম্পত্তি), তা থেকে নিজের নিজের কাঠি দুটী দিয়ে এই বাটী থেকে তরকারী তুলে নিয়ে সকলে খায়। বন্ধুদের এই রীতির কথা ব'লে দিলুম ; সুতরাং প্রথমেই আমরা তিন জনে খাবার যোগ্য তরকারী নিজের নিজের আলাদা আলাদা পাত্রে একটু একটু তুলে নিলুম। এতে চীনা বন্ধুরা একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। তারপর খাওয়ার পালা। ডাল বা ছোলা ভিজিয়ে রেখে দিলে তার লম্বা লম্বা কোঁড় বা'র হয়, তার তরকারী ; পানীকলের দু তিন রকম তরকারী ; আলু আর পেঁয়াজের কলির তরকারী ; বাঁশের কোঁড়ের তরকারী ; আর উদ্ভিজ্জ তেলে ভাজা দু'একটা সব্‌জী। ধীরেন বাবু আর সুরেন বাবুর এসব জিনিস বরদাস্ত হ'ল না, কারণ এদের স্বাদ একেবারে আলাদা ; ঘী নেই মশলা নেই, লঙ্কা-হ'লুদ নেই, soya bean ব'লে এক রকম কড়াইয়ের তেলে সঁাতলানো তরকারী। আমার কাছে এর স্বাদ অপরিচিত না থাকায় চীনা বন্ধুদের সঙ্গে আমি বেশ পাল্লা দিয়ে চ'ললুম। কিন্তু ধীরেনবাবু আর সুরেনবাবুর অবস্থা হ'ল, ঈসপের গল্পে বর্ণিত বকের নিমন্ত্রণে শেয়ালের মতন বা শেয়ালের নিমন্ত্রণে বকের মতন। দু একটা চীনাবাদাম খোসা ছাড়িয়ে বা দু একটা খরমুজের বীচি নিয়ে দাঁতে ক'রে কাটতে লাগলেন। চীনেরা খরমুজের বীচি ভাজা আমাদের দেশের চা'লকড়াই ভাজার মতন খায়। এইরূপে আহার শেষ হ'ল, আমরা টেবিল ছেড়ে উঠলুম, তারপর খাবারের দাম দেবার জন্য পকেটে হাত দিচ্ছি, এমন সময়ে আমাদের পরিবেশক ফ্যঙ-কে কি ব'ললে, তাতে ফ্যঙ আমাদের ব'ললেন, পাশে রান্না-বাড়ীর আঙিনায় মুখ ধোবার জল আছে, খাওয়া-দাওয়ার পর মুখ ধোওয়া দস্তুর। কথাটী বেশ লাগ্‌ল। ভারতের আর আরব পারশ্য তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান দেশগুলির বাইরে আহারের পরে মুখ ধোয়ার রেওয়াজ যেন কম। অন্ততঃ যেখানে যেখানে হালের "ইউরামেরিকার" দস্তুর গৃহীত হচ্ছে। আমাদের কাছে—হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে ভারতীয়দের কাছে—এটা একটা ম্লেচ্ছাচার। চীনে ভদ্রঘরে কি দস্তুর জানি না ; ইউরোপের ভদ্রঘরে বা হোটেলে খাওয়ার পর আঁচাতে যাওয়াটা বিরল। তবে সিঙ্গাপুরে চীনেদের মধ্যে সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানোর বাহুল্য দেখে মনে হয়, এখন এদের মধ্যেও ইউরোপের মতনই এই ম্লেচ্ছাচারই বিদ্যমান। বৌদ্ধ বিহারের এই স্বাস্থ্যকর সদাচার পালনের ব্যবস্থা দেখে মনটা বড়ই পুলকিত হ'ল। বোধ হয় এটা প্রাচীন ভারতীয় ভিক্ষুদেরই প্রবর্ত্তিত একটা "বিনয়" ব্যবস্থা ; আর এর থেকে এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না, যে ভারতের বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপ্রচারকেরা ভারতের বাইরে গিয়ে এইরূপ খুঁটিনাটি বিষয়েও নানা সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, যে সব সদাচার এখনও বহির্ভারতের নানা দেশে অন্ততঃ সম্প্রদায়বিশেষে বিদ্যমান আছে। ভোজনশালার পাশে আর একটি ছোটো আঙিনা, তার চার পাশে ঘর—সেই আঙিনায় একটা মস্ত জালার মতন মুখ খোলা পাত্রে হাতমুখ ধোবার জল র'য়েছে। ঠিক যেন কোনো সাবেক চালের, জলের কলের-প্রবেশ যেখানে হয়নি এমন জায়গায়, ভারতীয় বাড়ীর উঠোন। আমাদের খাওয়ার দাম দিতে গেলুম, এরা নিতে চাইলে না, একরকম জোর ক'রেই উপযুক্ত অর্থ হাতে গুঁজে দিলুম।

তারপরে আমরা বড়ো ঠাকুর ঘরে ফিরে এলুম—এসে দেখি যে বিহারের অধ্যক্ষ তখন ফিরেছেন। ফ্যঙ তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আধাবয়সী লোকটী, মুণ্ডিত মস্তক, দিব্য কমনীয় কান্তি, মুখে বেশ একটি শান্তোজ্জ্বল হাসি। পরণে হ'লদে রেশমের পোষাক, প্রাচীন চীনের পোষাক যা জাপান গ্রহণ ক'রেছে আর যার মর্য্যাদা চীনদেশে এখন খালি বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই আর তাও-পন্থী পুরোহিতেরাই বজায় রেখেছেন। এক হাতে একটী পাখা, আর হাতে সবুজ কাঁচের একটী জপমালা। ফ্যঙ এঁর কাছে আমাদের পরিচয় দিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের কথাও ব'ললেন। চীনে কাগজে রবীন্দ্রনাথের কথা ইনি শুনেছেন—তাই খুব খুশী হলেন। রবীন্দ্রনাথ চীনের সঙ্গে ভারতের নোতুন যোগস্থাপন করবার চেষ্টা ক'রছেন, চীনা পড়াবার ব্যবস্থা ক'রেছেন তাঁর ইস্কুলে, আর চীনেও সংস্কৃত, পালি প্রভৃতির আলোচনার ব্যবস্থা যাতে হয়, সে বিষয়েও তিনি সচেষ্ট,—এ সব কথা ফ্যঙের মুখে শুনে ভারী আনন্দিত হ'লেন। আমাদের তাঁর ঘরে ফোয়ারার ধারের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন, সেখানে বসালেন। নির্ব্বন্ধ ক'রে চা খাওয়ালেন। ফ্যঙ দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগলেন। বিহারের অধ্যক্ষকে প্রায়ই কোনও কথা বলবার সময় 'ও-মি-তো' বা 'ও-মি-তো-ফো' কথাটি ব'লতে শুনলুম —উত্তর চীনা উচ্চারণে অমিতাভ বুদ্ধের নাম, আমাদের দেশের প্রাচীন লোকেরা যেমন 'হরি' 'রাধেগোবিন্দ' 'দুর্গা' প্রভৃতি দেবতার নাম উচ্চারণ করেন, এ-ও তেমনি ক'রে কথার মধ্যে দেবতার নাম নেওয়া। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা.বৌদ্ধ ভিক্ষু আর সন্ন্যাসীদের কর্ত্তব্য আর দায়িত্ব, ভারতেরও দায়িত্ব, এই সব নিয়ে কথা হ'ল। ইনি ব'ললেন যে চীনে সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের এক রকম পুনরুদ্ধার আরম্ভ হ'য়েছে। কনফুশীয় পন্থী পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম্ম প'ড়ত না, এখন গভীরতর আধ্যাত্মিক জগতের খবরের জন্য সকলেরই একটা ঝোঁক এসেছে। শিক্ষিতমণ্ডলীর অনেকে এখন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা ক'রছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও উদাসীন নন। বিহারগুলিতে নূতন জীবন সঞ্চার হ'চ্ছে। অনেক স্থলে ভিক্ষুরাও সাধারণ্যে এসে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ ক'রেছেন। এইরকম খানিক আলাপ হ'ল। ইনি এঁর পরিচয়ের কার্ড আমায় দিলেন, আর রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের জন্য একখানি চীনাধরণে আঁকা ফ্রেমে বাঁধা বুদ্ধের ছবি দিলেন। তার পিছনে উপহারসূচক বচন চীনে ভাষায় লিখে দিলেন। আর দিলেন একটী প্রাচীন সাদা চীনামাটির পু-তাই মূর্ত্তি, চমৎকার জিনিষ এটি, মূর্ত্তিটির গায়ে সূক্ষ্ম কাট-ধরার মতন দাগ ছিল, এইরকম দাগে চীনামাটির বাসন বা মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য বাড়াবার একটি উপায়, ইচ্ছা ক'রেই এইরূপ crackled China তৈরী করা হয়। আমার কাছে একখানা নোতুন মুর্শিদাবাদী রঙীন ছাপানো রেশমী রুমাল ছিল, সবুজ জমীতে লাল পদ্মের নক্সা, একেবারে ভারতীয় জিনিস—সেই সামান্য জিনিসটি তাঁকে আমি উপহার দিলুম। তিনি বেশ আদর ক'রেই সেটি নিলেন। তারপর সঙ্গে ক'রে আমাদের নিয়ে এলেন বড়ো ঠাকুর ঘরে, সেখানে আমাদের আরও কতকগুলি চীনা ছবি উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন। এই চমৎকার লোকটির সঙ্গে আলাপ করবার কালে ফা-হিয়ান, হিউয়েন-ৎসাঙ, ই-ৎসিঙ প্রমুখ এঁর দেশের ভক্ত বৌদ্ধ আচার্য্যদের কথা ক্রমাগত আমার মনে হ'চ্ছিল।

বিহারের মধ্যেকার ঘণ্টাঘরটি চীনা প্যাগোডার এক সুন্দর নিদর্শন। ছোটো তেতালা ঘরটি, উপরের তলায় ব্রঞ্জের একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা, মোটা কাঠ মেরে বাজাতে হয়—খুব গম্ভীর আওয়াজ বেরোয় যার রেশ অনেকক্ষণ ধ'রে থাকে।

বিহারের বাইরে আশপাশের জায়গাগুলি দেখে আসা গেল। বিহারের পাঁচীলের বাইরে, একটু নির্জ্জন স্থানে বিহারের চিতাগৃহ দেখতে গেলুম। চীনদেশের প্রাচীন রীতি, শবদেহকে মাটিতে সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু ভিক্ষুদের দেহ দাহ করা হয়। তাই প্রায় সব বড়ো বড়ো বিহারের সংলগ্ন একটি ক'রে ছোটো ঘর থাকে, যেখানে দাহকার্য্য হয়, একে বাঙলায় 'চিতাগৃহ'ই বলা গেল। আবার বিহারে ফিরে এলুম। মন্দিরগৃহে দেয়ালে সব চীনা বচন লেখা র'য়েছে। এগুলি বৌদ্ধশাস্ত্রের চীনা তরজমা থেকে। ফ্যঙ ব'ললেন যে, আমরা সংস্কৃতে কোনো মন্ত্র বা বচন বেশ বড়ো ক'রে যদি লিখে দিই, তা হ'লে এঁরা নিশ্চয়ই খুব আনন্দের সঙ্গে রেখে দেবেন। আমি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর কাছে শুনেছিলুম, চীনারা খোশ-নবিসী অর্থাৎ ভালো ছাঁদের হাতের লেখাকে একটা উচ্চ কোঠার শিল্প ব'লে মনে করে ব'লে, বহুস্থলে তারা নন্দবাবুর হাতের লেখা বাঙলা অক্ষর রাখতে চাইত। ফ্যঙ এর কথাটা আমাদের ভালোই লাগলো। মস্ত মস্ত কয়েক তা চীনা কাগজ এনে হাজির ক'রলে, আর মোটা চীনা তুলি, আর জল দিয়ে ঘ'ষে অনেকটা চীনা কালি তৈরী করা হ'ল; সুরেন বাবু তুলি ধ'রে মোটা হরফে বেশ সাপটা টান দিয়ে বাঙলা হাতে "শ্রীঃ" আর "নমো ভগবতে বুদ্ধায়" এই রকম কতকগুলি বচন লিখে দিলেন, একটু আধটু ফুলপাতা দিয়ে লেখাটা পুরিয়ে দিলেন।

এইরূপে বৌদ্ধ বিহার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাড়ি-মুখো ফিরলুম। কোথায় চীনারা, আর কোথায় বাঙালী হিন্দু আমরা; কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রসাদে, প্রাচীন ভারতের

মোক্ষপথের পথিক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের প্রসাদে, এদের সঙ্গে এই যে আমাদের একটা আত্মিক যোগ, একটা হৃদ্যতা, একটা আধ্যাত্মিক স্বাজাত্য-বোধ অনুভব ক'রলুম যা আমাদের কাছে কত সহজ, অন্তরঙ্গ আর স্বতঃসিদ্ধ জিনিস ব'লে মনে হ'ল,—সে জিনিসটা কত বড়ো,—স্বার্থপ্রণোদিত জগতে যেখানে মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে, সেখানে এই সমান-ধর্ম্ম ভাব, এই একই ভাব-জগতের পূজা কত আবশ্যকীয় জিনিস! একদিনের দেখা ব'লে চীনা বৌদ্ধ বিহারের স্মৃতি সমস্তটা প্রথমদিনের দেখার মতো আর স্পষ্ট থাকছে না—কিন্তু এই বিহারের কথা মনে হ'লে তার সঙ্গে সঙ্গে এই ক'টা জিনিস আপনাআপনিই মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে—তার প্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে আঙিনা, আর আঙিনার গাছপালা,—তার একটা আঙিনার কোণের ছোট্টো কাঠের তৈরী ঘণ্টাঘরটী, তার হ'লদে পোষাক পরা মুণ্ডিতশীর্ষ ভিক্ষুদের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌজন্য, আর তার মন্দিরের ভিতরের উজ্জ্বল বর্ণের সমাবেশ আর বিশাল-কায় আর ভীষণ-দর্শন নানা দেবমূর্ত্তিকে অতিক্রম ক'রে বুদ্ধদেবের অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্র, মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠা আশ্চর্য্য প্রশান্তি মণ্ডিত হাসি।

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

১

কাচের উপর লিখন-প্রণালী

সাধারণ স্বচ্ছ কাচের উপর কি জিনিষ দিয়া লিখিলে উহা স্থায়ী হইতে পারে অথচ উহার দ্বারা কাচের স্বচ্ছতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে না? লণ্ঠন, টেবিল্‌ল্যাম্প প্রভৃতির চিমনির উপর ঐরূপ জিনিষের লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারেও সার্শীর জন্য কাচ বিক্রয় হয়, তাহার এক পৃষ্ঠে ঐরূপ এক-প্রকারের বস্তু লাগান থাকে। জলের সহিত, কোনও কর্কশ দ্রব্য বা অঙ্গুলির নখের দ্বারা অনেকক্ষণ ঘর্ষণ করিলে উহা উঠিয়া যাইতে দেখা যায়। ঐ দ্রব্য-বিশিষ্ট কাচের ভিতর দিয়া দৃষ্টি একেবারেই যায় না, কিন্তু সূর্য্যের, বৈদ্যুতিক বা উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বেশ প্রবেশ করে এবং ঐ আলোকে বিনা ক্লেশে পড়াও যায়। ঐ দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী ও উহার দ্বারা কাচের উপর লিখন-প্রণালী কি?

শ্রীবৈঃ

২

মুসলমান লেখক

মহাভারত, রামায়ণ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রাজা রামমোহনের চরিত-কথা কোন মুসলমান সাহিত্যিক কর্ত্তৃক আরবী পারসী অথবা উর্দ্দু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে কি? হইলে কোন্ সময়ে কোন্ লেখক তাহা অনুবাদ করিয়াছেন ও লিখিয়াছেন? পুস্তকাবলী এখন কোথাও পাওয়া যায় কি?

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক

৩

পিঁপড়া তাড়াইবার উপায়

অনেক স্থলেই পিঁপড়ার বড়ই উপদ্রব। প্রত্যহ ঘরের সমস্ত জিনিষ ফিনাইল দ্বারা ধৌত করা সত্ত্বেও কোনও সুফল হয় না। পিঁপড়া তাড়াইবার উপায় কি?

শ্রীকালিদাস নন্দী

৪

বাংলা টাইপ্‌ রাইটার

কলিকাতা ও মফঃস্বলে কোথাও বাংলা টাইপ রাইটিং (Bengali Type-writing) শিক্ষার জন্য কোন স্কুল আছে কি না?

৫

বেতার টেলীগ্রাফ শিক্ষা

বিনাতারে টেলীগ্রাফ ও টেলীফোনী (Wireless Telegraphy and Telephony) শিখিবার জন্য ভারতের কোন স্থানে সুবিধা আছে কি না? এবং এইসব শিক্ষায় কি ব্যয় পড়া সম্ভব?

শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত

জাগ্‌গান

পাবনা জিলায় পৌষ মাসে রাখাল বালকগণ রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া এক-প্রকার গান করে ও ভিক্ষা লয়। এই গানকে জাগ্‌গান বলা হয়। তাহারা ও অন্যান্য গ্রামবাসিগণ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা পৌষ মাসের শেষ দিনে মাঠের মধ্যে (নিরামিশ) পাক করিয়া খায় ও ইহাকে পুষুরিয়া বলে। বাঙ্গালা দেশের অন্য কোন জেলায় কি এই প্রকার গান ও উৎসব আছে? এই উৎসবের ইতিহাস কি? জাগ্‌ শব্দটা কি জাগরণ বা জাগরণীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ?

৭

বিয়াল্লিশ বাজনা

আমরা কবিকঙ্কণ "চণ্ডীমঙ্গলে" পাই,

"দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা।"

বিয়াল্লিশ বাজনা কি কি? ইহার বিবরণ কোথায় পাওয়া যাইবে? দামামা দগড় (ঢোল) প্রভৃতি কি বাঙ্গালা শব্দ?

৮

তানসেন

তানসেনের সম্পূর্ণ নাম কি? তাঁহার জীবনী কোন্ কোন্ পুস্তকে পাওয়া যাইবে?

মুহম্মদ মন্‌সুর উদ্দীন

৯

মহাভারতীয় যুগে বার

মহাভারতে কুত্রাপি সোম, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি কোন বারেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলে মহাভারতের সময়ে কি বার দ্বারা দিন-গণনার নিয়ম প্রচলিত হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে তবে কোন্ সময় হইতে উহা আরম্ভ হইয়াছে?

শ্রীকান্ত দাস

—

মীমাংসা

গত বৎসরের

৪৯

ইস্পাতে মরিচা

আমরা যাহাকে মরিচা বলি রসায়ন-শাস্ত্রে তাহাকে Hydrated Oxide of Iron বলা হয়। ইস্পাত যখন আর্দ্র বায়ুতে ফেলিয়া রাখা হয় তখন উহা বাতাস হইতে Oxygen গ্রহণ করিয়া মরিচায় পরিণত হয়। ইস্পাত যদি আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে আসিতে পারে তবে উহাতে মরিচা ধরিবেই। কাজেই "এমন কোন উপায়, যাহা অবলম্বন করিলে চিরদিনের তরে মরিচা ধরা দূর করা যায়," আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে মোম, ভেসেলিন, তৈল প্রভৃতি ইস্পাতের গায়ে মাখাইয়া কোন পাত্রে ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে সাময়িক ভাবে মরিচা ধরা বন্ধ করা যাইতে পারে। কোন-প্রকার ধাতুর (যেমন তাম্রের, নিকেলের, টিনের, অথবা দস্তার) coating ইস্পাতের উপর দিয়া রাখিলে বেশ ভাল হয়। ইহার উপর ইস্পাতের যন্ত্র moist air হইতে যত দূর রাখা যায় ততই মঙ্গল। ইস্পাতের গায় কিঞ্চিৎ গ্র্যাফাইট্ মাখাইয়া রাখিলেও খুব সহজভাবে মরিচা ধরা বন্ধ করা যাইতে পারে।

হরিদাস সাহা

যে-কোন ইস্পাতে মরিচা পড়িলে তাহাতে সামান্য পরিমাণে oxalic acid (অক্‌স্যালিক এসিড্) লাগাইলে তৎক্ষণাৎ মরিচা দূর হইয়া যায়। ইহা আমি নিজে পরীক্ষা (experiment) করিয়া দেখিয়াছি। উক্ত এসিড মাঝে মাঝে লাগাইলে আর মরিচা পড়ে না।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(৫০)

লবণ

সাধারণ লবণে Sodium Chloride Calcium ও Magnasium chloride নামক দুইটি পদার্থ কিয়ৎপরিমাণে থাকে। এই দুইটি পদার্থ আর্দ্র বায়ু হইতে জলগ্রহণ করিয়া লবণ সিক্ত করে। লবণ যদি বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসিতে না পারে অথবা লবণে উক্ত দুইটি পদার্থ না থাকে তবে জল হইবে না।

যদি এমন কোন পাত্রে লবণ রাখা যায় যাহা জল হওয়া মাত্রই চুষিয়া নিতে পারে তবে মন্দ হয় না। কোন প্রকার ধাতু (যেমন স্বর্ণ, তাম্র ইত্যাদি) গলাইবার পর পরিত্যক্ত পাত্র লবণ রাখিবার বড়ই উপযোগী। কারণ উহা ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে লবণ বহুকাল অবিকৃত থাকে। এই পাত্র দেশী ও বিলাতী দুই প্রকারই আছে। দেশী পাত্রগুলি সাধারণতঃ মাটি, তুষ, পাট প্রভৃতির সংমিশ্রণে তৈয়ার করা হয়। ধাতু গলাইবার কারখানায় অনেক সময় এই সমস্ত পরিত্যক্ত পাত্র খুব কম মূল্যে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ লবণ মাটীর নীচে মাটীর পাত্রে এমন ভাবে রাখা হয় যেন বাতাস উহার ভিতর বেশী আনাগোনা করিতে না পারে। তাহাতেও লবণ বেশ ভালই থাকে।

হরিদাস সাহা

স্বাধীন মানুষ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক, আর্য্য সাহিত্যভবন, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। দাম পাঁচসিকা।

স্বাধীনতার ডাক যাঁহাদের মন ও প্রাণকে চিরদিনের মত ঘর ছাড়া করিয়াছে, লেখক তাঁহাদেরই একজন। 'বিজলী' ও 'আত্মশক্তিতে' যখন চারদিককার লক্ষ্যহারা ক্ষিপ্ততাকে তিনি আত্ম-সমাহিত পূর্ণ স্বাধীনতার ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখনকার সাময়িক রুচিতে তাহা ঠিক উপাদেয় ঠেকে নাই;—তাঁহার অন্তরের সত্য ও নিজ জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতাকে অবশ্য বাঙলা দেশ অবজ্ঞাও করিতে পারে নাই। মত্ততার পরিণাম অবশ্যম্ভাবী অবসাদে—দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ তাহাই প্রকট, আর দেশের রাষ্ট্রবীরদের দাপটে অবসন্ন দেশকে তেমনি কোন কড়া নেশায় 'মাতাইবার' চেষ্টাই আজও স্পষ্ট। লেখক এই পাঁচ ছয় বৎসরের স্রোতে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন জানি না; কিন্তু, তাঁহার ১৩২৮ ও ১৩২৯এর কথা এই পাঁচ ছয় বৎসর পরেও দেশকে শুনাইবার দরকার আছে,—ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। দেশ ইহা মর্ম্ম দিয়া গ্রহণ করুক, ইহাই আমাদের কামনা। কিন্তু, এই সংযত সাহস, স্বাধীন চিন্তা, দৃঢ়চিত্ততা, তীব্র বিদ্রূপ ও সমাহিত শক্তির পরিচয় কি আমরা আজ আর লেখকের নিকট আশা করিতে পারি না?

ছাপা ও বাঁধাইর জন্য প্রকাশকগণ যথেষ্ট সাধুবাদ পাইতে পারেন।

—ভারদ্বাজ

মুক্তি-পথ—শ্রীমৃগেন্দ্রলাল মিত্র। প্রকাশক এম্ ঘোষ, ৩৬ রোল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। দুই টাকা।

উপন্যাসের ছলে দেশহিতমূলক আলোচনা। লেখক মহাশয় ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহাই তাঁহার পুস্তকের কেন্দ্রগত কথা। তিনি বলিয়াছেন—"...পল্লী-সংগঠনের যে ক্ষীণ চেষ্টা অধুনা দৃষ্ট হইতেছে, সেই চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইলে...দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন আমরা যতই করি না কেন যতদিন না আমরা এই বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিয়া, সমাজের কুনীতি ও কুরীতি দূর করিয়া, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত অকাল আন্দোলনে রাজনৈতিক গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন করা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। ...দেশোদ্ধারের বীজ ঐ পল্লীসংস্কারের মাটিতেই মহাক্রমে পরিণত হইবে। সেই কারণেই evolution আমাদের পক্ষে প্রশস্ত পথ, revolution নয়।"

গ্রন্থকারের উক্ত জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। আমাদের মতে তিনি দেশমুক্তির গোড়ার কথা ধরিতে পারিয়াছেন। তাঁহার এই মতামতের পোষকের সংখ্যা দেশে যত বাড়িবে ততই দেশের উন্নতি নিকটবর্ত্তী হইবে। যাহা হউক, এইসব মতামতের ব্যাখ্যান স্বরূপ তিনি এই উপন্যাস লিখিয়াছেন। উপন্যাস হিসাবে পুস্তকটি সফল হয় নাই। তবে, দেশহিতনির্দ্দেশ হিসাবে পুস্তকটি মূল্যবান হইয়াছে।

রামধনু—শ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। এক টাকা।

কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ঠিক গতানুগতিক কবি নন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে। তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব—বিবিধ ছন্দে তিনি নিপুণ। নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দকে তিনি অনায়াসে সুকৌশলে বাংলা কবিতায় গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহার এই নিপুণতা পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সংস্কৃত লঘু ও গুরু ছন্দকে লঘু ও গুরু বিষয়-ভেদে প্রয়োগ করিয়া যতীন্দ্রনাথ যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইয়াছেন।

আলোচ্য কবিতাপুস্তকখানি পাঠ করিলে আর একটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে। সেটি কবির অত্যন্ত সরল। অত্যন্ত ঋজু অভিব্যক্তি। অনেকগুলি কবিতায় এমন অনেক খুটি-নাটি ও ঘরোয়া ঘটনার বিবৃতি আছে যাহা একটু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বা একটু শোভামণ্ডিত করিয়া পরোক্ষ ভাবে বলিলেও চলিত, কিন্তু তাহা না করিয়া কবি অত্যন্ত খোলা প্রাণে অতিশয় অকপট ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার এই অভিব্যক্তির ঋজুতা স্থানে স্থানে অত্যন্ত প্রকট হইলেও তাহা অতিশয় নির্ম্মল ও আনন্দদায়ক।

যতীন্দ্রপ্রসাদ পল্লীপ্রাণ কবি। বাংলার গাছপালা, নদী, আকাশ, পশুপক্ষী প্রভৃতি তাঁহার বহু কবিতায় প্রচুর স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে পাঠকের মন স্নিগ্ধ ও পল্লীপ্রিয় করিয়া তুলে।

মোটের উপর, কবিতাপুস্তকটি পড়িয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। তবে কবির একটি ত্রুটির ইঙ্গিত করিতেছি। এই কাব্যের ২।৪টি কবিতা অত্যন্ত দীর্ঘতা লাভ করিয়াছে, এবং সে-দীর্ঘতা পাঠকের পক্ষে ক্লেশকর বলিয়া মনে হয়।

সাহিত্যিক-সমাজে পুস্তকখানি আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।
পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধান আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার—শ্রী শরৎকুমার রায়। চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দেড় টাকা।

এই জীবনচরিতখানি অল্পকালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ লাভ করিল। তাহাতেই ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর, সুরচিত, সুবিন্যস্ত ও সুচিত্রিত পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম তাহারই পুনরাবৃত্তি স্বরূপ সংক্ষেপে এই বলিতে চাই যে, আমরা এই সারবান পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহাতে সূচনা, দুইটি নূতন অধ্যায় ও ৯ খানা নূতন ছবি সন্নিবেশিত হইয়া ইহার গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। প্রায় চারিশত পৃষ্ঠার এই বৃহৎ পুস্তকের দেড় টাকা মূল্য অতিশয় সুলভ বলিতে হইবে।

গ্রন্থকার মহাশয়ের বৌদ্ধ ভারত, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, শিখগুরু ও শিখ জাতি প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে প্রচুর আদর লাভ করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিও সে-বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইবে না।
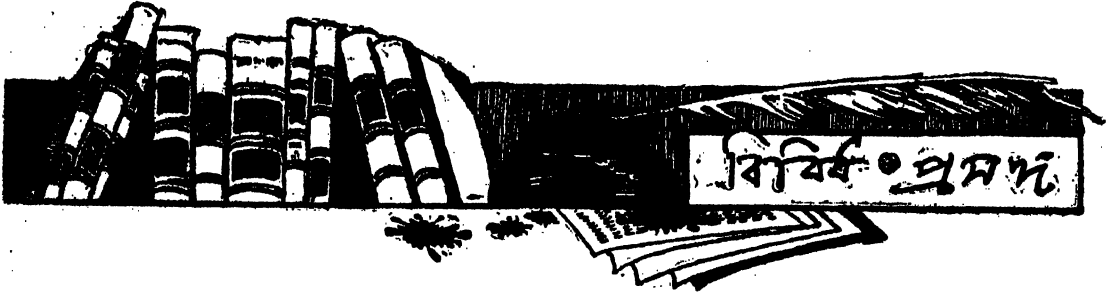
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাগমন

ইহা সাতিশয় দুঃখের বিষয়, যে, রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতা বশতঃ কোলোম্বো পর্য্যন্ত গিয়া ইউরোপ অভিমুখে আর যাইতে পারিলেন না। তাঁহার হিবার্ট লেকচ্যর্স দেওয়া আপাততঃ স্থগিত রহিল।

তাঁহার চিঠি হইতে জানিলাম, যে, যদি তাঁহাকে ফিরিবার পথে কোথাও বিশ্রাম করিতে না হয়, তাহা হইলে তিনি আগামী ২রা আষাঢ় কলিকাতা পৌঁছিবেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘ বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইয়া উঠুন, অগণিত হৃদয় হইতে এই প্রার্থনা স্বতঃ উত্থিত হইবে।

তাঁহার চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন, স্থির হইয়া থাকা ভিন্ন তাঁহার অসুস্থতার অন্য ঔষধ নাই। এ অবস্থায় তাঁহার পরিচিত ও অপরিচিত সকলে তাঁহাকে দীর্ঘকাল বাক্য ও কর্ম্ম হইতে, এবং তাঁহার উপর ছোট বড় সব রকম দাবী হইতে নিষ্কৃতি দিলে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে, এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি ও মানবের কল্যাণ হইবে।

—

স্বরাজ ও বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ

খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘ্যতা, খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা, অন্নকষ্ট, ইত্যাদি অনেক নাম দ্বারা দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব ঢাকা দিবার চেষ্টা অনেক সময়ে করা হয়। তাহার দ্বারা কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রতিকার হয় না। দুর্ভিক্ষের সময় খবরের কাগজে কাহারও কাহারও অনশনে মৃত্যুর সংবাদ বাহির হইলে সরকারী কর্ম্মচারীরা কখন কখন সেই সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য এইরূপ কিছু বলিয়া থাকেন, যে, লোকটি উদরাময়ে বা রক্তামাশয়ে মারা গিয়াছে, অনশনে নহে। কিন্তু তাহার পেটের পীড়ার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যে, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে মানুষটি ঘাসপাতা প্রভৃতি অখাদ্য খাইয়া রোগগ্রস্ত হইয়া মারা পড়িয়াছে। অনশন তাহার মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ না হইলেও পরোক্ষ কারণ নিশ্চয়ই বটে, এবং সে যে মরিয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং 'খাদ্যাভাব ও মৃত্যু' এই উভয়ের মধ্যে উদরাময়ের মধ্যবর্ত্তিতা হইতে কোন সান্ত্বনা লাভ করা যায় না। দুর্ভিক্ষকে অন্নকষ্ট বা খাদ্যদ্রব্যের মহার্ঘ্যতা বলিলেও নিরন্ন লোকদের উদরপূর্ত্তি হয় না। এইজন্য শাব্দিক সংগ্রামে সময়ের অপব্যয় না করিয়া, কেমন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত লোকদের দুঃখ নিবারিত হইতে পারে, সেই দিকে মনোযোগ দেওয়া অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজ।

ক্ষুধার্ত্ত লোকদের দুঃখ নিবারণ দুই রকমের হইতে পারে; সাময়িক ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। দুর্ভিক্ষ হইলে চাঁদা তুলিয়া অভাবগ্রস্ত লোকদের অভাব দূর করিলে আপাততঃ তাহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি ও মৃত্যু নিবারিত হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব ও তজ্জনিত দুঃখ নিবারিত হয় না। দেশে অধিকতর শস্য উৎপাদন ও রক্ষা, দেশে অধিকতর অন্যবিধ ধন উৎপাদন ও রক্ষা এবং সেই শস্য ও অন্যবিধ ধনের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়-সঙ্গত বণ্টন দুর্ভিক্ষ নিবারণের স্থায়ী উপায়। বেকার-সমস্যার সমাধানেও তজ্জন্য মনোনিবেশ করিতে হইবে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান কোন দেশেই এখনও সম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন হয় নাই। কিন্তু আমাদের দেশ ও পাশ্চাত্য বহুসংখ্যক দেশের মধ্যে একটা প্রভেদ শিক্ষিত লোকেরা জ্ঞাত আছেন। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরই কোথাও-না-কোথাও দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু ইংলণ্ড, বেলজিয়াম হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি নানা দেশে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দুর্ভিক্ষ হয় নাই। ইংলণ্ডে কখন কখন, দু দশ বৎসর

ধরিয়া কয়েক লক্ষ লোক বেকার আছে, এরূপ অবস্থা ঘটে; তাহাদের মধ্যেও আবার একই লোক বরাবর বেকার থাকে না। কিন্তু সুপুষ্ট রাষ্ট্রীয় কোষ হইতে তাহাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা সহজেই হয়। আমাদের দেশের মত দুর্ভিক্ষ তথায় হয় না, তজ্জন্য অনশনে মৃত্যুও হয় না। তাহার কারণ, ইউরোপের নানা দেশে এত ধন উৎপন্ন হয়, যে, কোথাও শস্তের অভাব ঘটিলেও অন্য দেশ বা স্থান হইতে খাদ্য আমদানী করিবার মত যথেষ্ট অর্থ থাকে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান কালে যথেষ্ট ধন উৎপন্ন হয় ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার একটা খুব বেশী ভাগ নানা আকারে বিদেশীদের হস্তগত হওয়ায় দেশের অন্নাভাব ও অর্থাভাব দূরীভূত হইতে পারে না।

বাংলা দেশের আট নয়টি জেলা হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু কোথাও চাউল অপ্রাপ্য নহে, টাকা দিলেই কিনিতে পাওয়া যায়; লোকদের হাতে টাকা না থাকায় তাহারা কিনিতে পারিতেছে না। সুজন্মা হইলে চাষীরা নিজেদের জন্য যথেষ্ট শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। কম শস্য জন্মিলে তাহাদিগকে টাকা দিয়া খাদ্য কিনিতে হয়। টাকা না থাকিলে তাহাদের অন্নাভাব ঘটে। এইজন্য, তাহাদের চাষ ছাড়া রোজগারের ও সঞ্চয়ের অন্য কিছু উপায় থাকা আবশ্যক। যাহারা চাষী নয়, তাহাদেরও রোজগারের এমন উপায় থাকা আবশ্যক যাহাতে তাহারা দুর্দ্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে।

রোজগারের নানা উপায়ের মানে দেশে নানা রকমের ব্যবসা, নানা রকমের পণ্যশিল্প, এবং অন্য নানাবিধ কাজের অস্তিত্ব। তাহার মানে এই, যে, দেশটি কৃষিপ্রধান থাকিলে চলিবে না। অনেকে বলেন, ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান (agricultural) দেশ ছিল, পণ্যশিল্পবহুল (manufacturing) ছিল না। ইহা ভুল। কৃষি অবশ্য পুরাকাল হইতেই ভারতবর্ষের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু সভ্য মানুষের অন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহাও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া দেশের অভাব মোচন করিত, এবং উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিদেশে চালান হইত। এইজন্য অনেক বিদেশী লোকের একটা অভিযোগ ছিল, যে, ভারতবর্ষ নিজের পণ্যের বিনিময়ে কেবল সোনা গ্রাস করে, কোথাও পণ্যের বিনিময়ে সোনা রপ্তানী করে না। থর্ণটনের "প্রাচীন ভারতের বৃত্তান্তে" ("Description of Ancient India" তে) লিখিত আছে—

"Ere the pyramids looked down upon the valley of the Nile, when Greece and Italy, those cradles of European civilization, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of wealth and grandeur. A busy population had covered the land with the marks of industry; rich crops of the most coveted productions of nature annually rewarded the toil of the husbandman. Skilled artisans converted the rude products of the soil into fabrics of unrivalled delicacy and beauty. Architects and sculptors joined in constructing works, the solidity of which has not, in some instances, been overcome by the evolution of thousands of years.……The ancient state of India must have been one of extraordinary magnificence."

রবার্টসন তাঁহার Historical Disquisition Concerning India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"In all ages, gold and silver, particularly the latter, have been the commodities exported with the greatest profit to India. In no part of the earth do the natives depend so little upon foreign countries either for the necessaries or the luxuries of life. The blessings of a favorable climate and a fertile soil, augmented by their own ingenuity, afford them whatever they desire. In consequence of this, trade with them has always been carried on in one uniform manner, and the precious metals have been given in exchange for their peculiar productions, whether of nature or art."

"In all ages, the trade with India has been the same; gold and silver have uniformly been carried thither in order to purchase the same commodities with which it now (1817) supplies all nations; and from the age of Pliny to the present times, it has been always execrated as a gulf which swallows up the wealth of every other country, that flows incessantly towards it, and from which it never returns."

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষই আমাদের আলোচ্য। সেইজন্য বাংলা যে আগে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশ ছিল, তাহার কিছু প্রমাণ দিতেছি। ১৮০১ সালের এশিয়াটিক য়্যানুয়্যাল রেজিষ্টার নামক বার্ষিক পুস্তকে লিখিত আছে—

"...In Bengal, however, from being in every part intersected by navigable rivers, inland trade was transported by water carriage with much more expedition and at a much less expense than by the caravans; and this great advantage, together with the extraordinary fecundity of the soil produced by those rivers, and the superior industry of the inhabitants, rendered this province in all ages by far the most prosperous and wealthy in the whole country."

যখন ক্লাইব ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদ প্রবেশ করেন, তখন তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"This city is as extensive, populous and rich as the city of London, with this difference, that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last city."

ভারতীয় বাণিজ্য ও পণ্যশিল্প-সমূহের ধ্বংস সম্বন্ধে মেজর বামন দাস বসুর যে ইংরেজী পুস্তক আছে, তাহা হইতে ইংরেজীতে ইংরেজ লেখকদের যে-সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পরোক্ষভাবে বা অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালীদের আত্মতৃপ্তি ও আলস্য বাড়াইবার অভিপ্রায়ে করিলাম না। কোন মানুষের পূর্ব্বপুরুষদের অবস্থা যদি ভাল ছিল এবং তাহার নিজের অবস্থা ভাল না হয়, তাহা হইলে সে নিজের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা না করিয়া যদি কেবল বংশের বড়াই করে, তাহা হইলে সে সম্মানভাজন হয় না। বিদ্বান্ পূর্ব্বপুরুষের মূর্খ সন্তানের মুখে পূর্ব্বপুরুষের পাণ্ডিত্যের প্রশংসাও অশোভন। এবম্বিধ কারণে আমরা বড়াই করিবার জন্য দেশের পূর্ব্ব গৌরব কীর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক। এখানে দেশের প্রাচীন সমৃদ্ধির উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য ইহাই দেখান, যে, এই দেশেই যখন আমাদের জাতির লোকদের দ্বারাই আগে যথেষ্ট ধন উৎপাদিত ও সঞ্চিত হইত, তখন বর্ত্তমান কালেও তাহা সম্ভবপর।

ক্লাইব মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া সহরটিকে তখনকার লণ্ডনের সমান বিস্তৃত, বহুজনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ দেখিয়াছিলেন; প্রভেদ কেবল এই দেখিয়াছিলেন, যে, মুর্শিদাবাদে এমন সব ধনী লোক ছিলেন যাঁহাদের ধনের পরিমাণ লণ্ডনের ধনীদের ধনের পরিমাণ অপেক্ষা অগণিত গুণ বেশী। সেই মুর্শিদাবাদের নামধারী জেলায় আজ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, উদরপূর্ত্তির পক্ষে যথেষ্ট অন্ন ক্রয় করিবার অর্থ বহু লোকের নাই।

বঙ্গের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির যে-সব কারণ ১৮০১ সালের এশিয়াটিক অ্যান্নুয়্যাল রেজিষ্টারে লিখিত হইয়াছে, তাহা মনে রাখিলে আমাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের কারণও বুঝা যাইবে। ঐ বার্ষিক পুস্তকটি ইংরেজদের দ্বারা লিখিত ও প্রকাশিত হইত। তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গের অযথা প্রশংসা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এইজন্য উহাতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্গের পূর্ব্বসমৃদ্ধির সকল কারণ উহাতে লিখিত হয় নাই। কেবল বলা হইয়াছে, যে, বঙ্গের জমী অসাধারণ রকম উর্ব্বরা এবং এই উর্ব্বরতা নদীজাত। উর্ব্বরতা বঙ্গের ধনশালিতার একটি কারণ। আর একটি কথা বলা হইয়াছে, যে, বাংলা দেশে বিস্তর নদী আছে এবং এই সকল নদীতে নৌকা চলে; স্থলপথে বাণিজ্যদ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া অপেক্ষা জলপথে তাহা শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে করা চলিত। ইহাও বঙ্গের ধনশালিতার একটি কারণ ছিল। আর একটি কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, বঙ্গের অধিবাসীরা পরিশ্রমে শ্রেষ্ঠ। এই সকল কারণে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা সকলের চেয়ে শ্রীসম্পত্তি-শালী ছিল।

বঙ্গের জমী এখনও উর্ব্বরা আছে, কিন্তু আগেকার মত উর্ব্বরা আছে কি না, সন্দেহ। যে-সব জমীর উপর নদীর ঘোলা জলের পলি পড়ায় তাহা উর্ব্বর হইত, এখন তাহার মধ্যে অনেক জমী আর সেরূপ উর্ব্বরা হয় না; কারণ অনেক নদী ভরাট হইয়া গিয়াছে, অনেকগুলিতে আর স্রোত বহে না। অন্য অনেক জমীতে বিনা সারে বা বিনা যথেষ্ট সারে পুনঃ পুনঃ চাষ হওয়ায় তাহার উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া গিয়াছে। নদী খনন করিয়া আবার তাহাকে স্রোতস্বতী করা রাজশক্তির কার্য্য। সরকারী কাজে জন-সাধারণের মত প্রবলতম না হইলে বঙ্গের ভরাট নদী খনন হইবে না, অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে। গত শতাব্দী হইতে ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইয়া এবিষয়ে আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু কাজ হয় নাই। অতএব বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া অর্থাৎ স্বরাজ স্থাপিত হওয়া দরকার। কিন্তু স্বরাজ স্থাপনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না; বর্ত্তমান গবর্মেণ্টকেও তাহার কর্ত্তব্য করাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে হইবে। যে-সব জমীর উৎপাদিকা শক্তি পুনঃ পুনঃ চাষের জন্য কমিয়া গিয়াছে, তাহাতে যথেষ্ট সার দেওয়াইতে হইলে যে কৃষক জমীর চাষ করে তাহাতে তাহার স্বত্ব কিরূপ হওয়া উচিত, জমীতে যথেষ্ট সার দিবার জন্য তাহার কিরূপ সাহায্য পাওয়া আবশ্যক,

যে জমীর যেরূপ সার দরকার সে-বিষয়ে কৃষকের যথেষ্ট জ্ঞান জন্মাইবার জন্য তাহার কিরূপ শিক্ষা আবশ্যক, কৃষককে এবিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য কৃষিবিভাগের বন্দোবস্ত কিরূপ হওয়া দরকার—এইসকল প্রশ্নের সুমীমাংসা গবর্মেণ্ট প্রজাতন্ত্র না হইলে আশা করা যায় না। অতএব, এই কারণেও স্বরাজ স্থাপন আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু স্বরাজ স্থাপন চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান গবর্মেণ্টকেও তাহার কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

অনেক নদী ভরাট হইয়া যাওয়ায়, তাহাতে স্রোত না থাকায়, এবং অনেক স্থানে কচুরী পানার প্রাদুর্ভাবে জল-পথে বাণিজ্যের এবং মানুষের যাতায়াতের পূর্ব্ব সুবিধা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতিকারের ব্যাপক চেষ্টা রাজশক্তির দ্বারাই হইতে পারে। যে-সব বড় নদীতে জলযান এখনও চলে, তাহাতে বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীর কার্য্যতঃ একচেটিয়া অধিকার জন্মিয়াছে। দেশী কোন কোম্পানী জাহাজ চালাইবার চেষ্টা করিলে বিদেশী জাহাজের মালিকেরা ভাড়া কমাইয়া দেশী কোম্পানীর চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। যদি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর বিল আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার হইবে। বলা বাহুল্য, স্বরাজ স্থাপিত হইলে বিদেশী বণিকদের এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিকার অবিলম্বে হইয়া যাইত।

বিলাতী লৌহইস্পাত ব্যবসায়ীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সব রকম বিলাতী ব্যবসাদারদের পণ্যদ্রব্য দেশের সর্ব্বত্র বিক্রীর সুবিধার জন্য, এবং সর্ব্বত্র শীঘ্র ও সহজে সৈন্য পাঠাইয়া দেশকে ঠাণ্ডা ও অধীন রাখিবার জন্য ইংরেজ গবর্মেণ্ট রেলওয়ে নির্ম্মাণে খুব বেশী মন দিয়াছেন, দেশের জলপথগুলি রক্ষায় মন দেন নাই। স্বাভাবিক কারণ ব্যতীত, রেলওয়ের উপদ্রবেও জলপথের ক্ষতি হইয়াছে। দেশে স্বরাজ থাকিলেও রেলওয়ে হইত বটে, কিন্তু জলপথের অনিষ্ট হইতে দেওয়া হইত না। সভ্য ও স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশসকলে রেলওয়ে নির্ম্মিত হইতেছে, আগে হইতে বিদ্যমান জলপথগুলি রক্ষিত হইতেছে, নূতন জলপথ খনিত হইতেছে, এবং অধুনা মানুষের ও পণ্যদ্রব্যের চলাচলের জন্য আকাশযানের ব্যবহারও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে রেলওয়েগুলিই সরকারের পোষ্যপুত্র; জলপথ যাহা আছে, তাহাও বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীর হস্তগত; আকাশযান যদি পরে চলে, তাহাও এরূপ আইন অনুসারে চলিবে যাহাতে ইংরেজদেরই বেশী সুবিধা হয়। দেশে স্বরাজ স্থাপিত হইলে এরূপ হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতেও যতটা অনিষ্ট নিবারিত ও ইষ্ট সাধিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; স্বরাজের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে চ'লবে না।

এশিয়াটিক য়্যানুয়্যাল রেজিষ্টারে উল্লিখিত বঙ্গের তৎকালীন ধনশালিতার শেষ কারণ বাঙালীদের সমধিক শ্রমশীলতা। ইহা পড়িয়া এখন হয় ত অনেকে বিস্মিত হইবেন, এবং কথাটির সত্যতায় সন্দিহান হইবেন। কিন্তু সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য দেখা যাইতেছে, যে, রেলওয়ে ষ্টেশনে ও জাহাজের ঘাটে, কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে এবং সমুদয় পাটের কল ও অন্যান্য কল-কারখানায় সমুদায় বা অধিকাংশ কুলি মজুর কারিগর অ-বাঙালী। সমুদয় বড় সহরে পাচকাদি গৃহভৃত্য প্রায় সব অ-বাঙালী হইতে বসিয়াছে। চাষের কাজের জন্য পর্য্যন্ত বিস্তর জায়গায় চাষীরা অ-বাঙালী মজুর লাগাইয়া কাজ করিতেছে। ছুতারের কাজ অনেক জায়গায় চীনাদের হাতে যাইতেছে। রাজমিস্ত্রীর কাজ কলিকাতায় বহুপরিমাণে অ-বাঙালীর হাতে গিয়াছে। কলিকাতায় মোটরচালক ও মোটর মিস্ত্রীদের মধ্যে পঞ্জাবীদের সংখ্যা খুব বেশী। এই সব দেখিয়া বাঙালী যে কোন-কালে শ্রমে পটু ও শ্রমে অভ্যস্ত ছিল, এমন-কি এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙালী শ্রমশীল ছিল, ইহা সত্য। তাহা যদি হয়, তবে অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

একটি কারণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গের সকল জেলাতেই অনেক বৎসর হইতে খুব ম্যালেরিয়া হইতেছে। কয়েকটি জেলার ত লোকে কয়েক পুরুষ ধরিয়া ঐ রোগে জর্জ্জরিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া লোকদের শ্রমশক্তির ও আয়ুর হ্রাসের একটি কারণ। যাহারা পরিশ্রম করিতে

পারে না তাহাদের উপার্জ্জন কম হয়, সুতরাং তাহাদের যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য জুটে না। ইহাতে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া শ্রমশক্তি আরও কমে। যাহারা বাঙালীদের মত এত দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত হয় নাই, রেলের সুবিধা বশতঃ তাহারা দলে দলে বঙ্গে আসিয়া শ্রমের ক্ষেত্রে বাঙালীদের চেয়ে নিজেদের অধিক কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করায় বাঙালী নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়া আরও অবসাদগ্রস্ত, শ্রমে অসমর্থ, ও শ্রমবিমুখ হইয়া থাকিবে। আমি আরও একটি কারণ অনুমান করি। বঙ্গে পূর্ব্বেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু শাস্ত্রীয় আচার এখনকার চেয়ে অধিক পালিত হইত বলিয়া বাল্যমাতৃত্ব কম ছিল, সুতরাং অধিকতর সুস্থ, বলিষ্ঠ ও জীবনীশক্তি-সম্পন্ন শিশু ভূমিষ্ঠ হইত। সেকালে বাল্যে বিবাহিতা অনেক বাঙালী মহিলার আঠার, উনিশ বা একুশ বৎসর বয়সে প্রথম সন্তান হওয়ার কথা আমি নিজে জানি।

বাংলা দেশকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করিতে হইলে রাজশক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। রেল বিস্তারের আনুষঙ্গিক যে যে কারণে ম্যালেরিয়া বাড়িয়াছে, তাহার প্রতিকার রাজশক্তিরই সাধ্য এবং রাজশক্তির কর্ত্তব্য। নদী ভরাট হইয়া যাওয়ায় এবং বর্ষায় পূর্ব্বে যে সব নদীর দু ধারের জায়গা প্লাবিত হইত, এখন অনেক স্থলে তাহা না হওয়াতেও ম্যালেরিয়া বাড়িয়াছে। কচুরীপানার প্রাদুর্ভাবে চাষ কমিয়া যাওয়াও ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির একটি কারণ। এইসব দিকে প্রতিকারের চেষ্টা স্বরাজ স্থাপিত হইলে অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতেও যাহা হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

বঙ্গে রোজগারের নানা পথ খুলিয়া দিবার নিমিত্ত মাথা ঘামাইতে হইবে। পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মূলধন জোগাইবার নিমিত্ত বাঙালীদের নিজের ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হইবে। কেন না ইহা নিশ্চিত, যে, বঙ্গের বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদেশীরা যেমন এবিষয়ে বাঙালীদের সাহায্য করিবে না, তেমনই ঐ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিপ্রদেশী মাড়োয়ারী, গুজরাতী, কচ্ছী, দিল্লীওয়ালা, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী প্রভৃতিরাও বাঙালীর সাহায্য করিবে না। দুর্ব্বিলকে অনুগ্রহের দান সকলেই করিতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে এখন নীচে আছে, তাহাকে সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ হইবার সুযোগ দিতে কেহ সম্মত হইবে, এরূপ দুরাশা পোষণ করা উচিত নহে। ইহা বঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অ-বাঙালীদের একচেটিয়া দোষ নহে, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারে ইহার ব্যতিক্রম হওয়া অসম্ভব নয়; হইলে আনন্দিত হইব।

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সংঘ

বঙ্গে বাঙালীদের ব্যাঙ্ক ও লোন-অফিসগুলিকে সংঘবদ্ধ করিবার এবং কলিকাতায় বাঙালীদের একটি ফেডারাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার যে-চেষ্টা হইতেছে, তাহা সময়োচিত। আশঙ্কাপরায়ণ অনেকে মনে করিবেন, সময়োচিত নহে; কারণ এই ত সেদিন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক উঠিয়া গেল, এবং বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের দুর্দ্দশার জন্য তাহা নূতন ম্যানেজারদের হাতে গেল। ইংরেজ প্রভৃতি বড় বড় বণিক জাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় আর্থিক দুর্ঘটনা ও লজ্জাকর প্রতারণা ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষেই ত তাহাদের কয়েকটা ব্যাঙ্ক প্রবঞ্চকদের অপকর্ম্মে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা সে কারণে ব্যাঙ্কিঙের ক্ষেত্রে নূতন- উদ্যম ছাড়িয়া দেয় নাই। বাংলাদেশে কার্য্যদক্ষ, অভিজ্ঞ ও সৎ লোকের একান্ত অভাব ঘটে নাই। তাঁহাদের চেষ্টায় বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সংঘ ও ফেডারাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হইতে পারে। এই চেষ্টার বিস্তারিত বৃত্তান্ত কলিকাতার ১৫নং হেয়ার ষ্ট্রীট ভবনে সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সিংহ পিএইচ ডি মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

সিটি কলেজের জন্য চাঁদা কাহারা দিয়াছেন

সিটি কলেজ সম্পর্কে অনেক অমূলক কথা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তাহার কোন্‌টার জন্য কে দায়ী,

তাহা অধিকাংশ স্থলে স্থির করা যায় না। অনেক ক্ষুদ্র পত্রী মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে, যাহাতে লেখকের নাম নাই, এমন কি প্রেস-আইন অনুসারে মুদ্রিতব্য প্রেস প্রিণ্টার্ ও প্রকাশকের নামও নাই। সিটি কলেজের বিরুদ্ধে যাঁহারা সংগ্রাম ও আন্দোলন চালাইতেছেন,তাঁহারা একাধিক নেতার দ্বারা ধর্ম্মবীর বলিয়া প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হইয়াছেন। এই বীরেরা আত্মগোপন না করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে তর্কবিতর্কে সুবিধা হয়। যে-সব কথার অসত্যতা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি খবরের কাগজে এবং এইসব ক্ষুদ্র পাত্রীতে স্বচ্ছন্দে করা হইতেছে। এইরূপ একটি অসত্য কথার প্রতিবাদ পূর্ব্বে করিয়াছিলাম। তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় বিস্তৃততর ভাবে আবার ভ্রম প্রদর্শন করিতেছি। বার বার বলা হইতেছে, যে, সিটি কলেজের জন্য মোট আন্দাজ ২৭০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মরা দিয়াছেন ৫০০০, এবং বাকী ২২০০০ অন্যেরা দিয়াছেন। তাহা সত্য হইলেও, ইহার স্থাপন এবং পরিচালনে উদ্যোগী ব্রাহ্মদের তত্ত্বাবধানে ইহা থাকা বৈধই হইত। কিন্তু চাঁদা সম্বন্ধে ঐ উক্তিগুলি সত্য নহে। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতার সিটি কলেজের উদ্দেশ্য, কার্য্য ও অভাব (City College, Calcutta, its aims, its work and needs") নামক একটি পুস্তিকা মুদ্রিত হয়। ইহাতে সেই সময় পর্য্যন্ত প্রদত্ত চাঁদার তালিকা আছে। তাহার মোট পরিমাণ ৮৮১৬৮ টাকা। তাহার পর স্বর্গীয় পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস পাঁচ শত টাকা দেন। মোট ৮৮৬৪৬ টাকা। ইহার মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ এবং মফঃস্বলস্থ কোন-না-কোন ব্রাহ্মসমাজের নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যত চাঁদা দিয়াছিলেন, তাহা লিখিতেছি।

চাঁদাদাতার নাম	চাঁদার পরিমাণ
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০০০
উপেন্দ্রকিশোর রায়	১০০০
বিপিনবিহারী রায়	১০০০
ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব	১০০০
শেঠ দামোদরদাস গোবর্দ্ধনদাস	১০০০
স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৩০০০
রাধাকৃষ্ণ মাইতি	১০০০
রাজা মহিমারঞ্জন রায়	৩০০০
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	৭০০
সতীশরঞ্জন দাস	৯৫০
সুধাংশুমোহন বসু ও ভ্রাতৃগণ	৪০০০
হেমেন্দ্রমোহন বসু	২৪০০
রাজা সূর্য্যপ্রকাশ রাও	৩০,০০০
স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত	১০০০
নবদ্বীপচন্দ্র দাস	৫০০
	৫৩৫৫০

ইহা ব্যতীত ৫০০৲ টাকার কম কতকগুলি দানের সমষ্টি ৫৪৯৫৲ টাকা আছে। তাহা সমস্তই ব্রাহ্মদের দান; কিন্তু পুস্তিকায় নাম দেওয়া নাই বলিয়া তাহা উপরের তালিকায় ধরিলাম না। এতদ্ব্যতীত সিটি কলেজ ও স্কুলের কর্ম্মচারীদের দান ৯২৮ টাকা আছে। তাহারও কিছু টাকা ব্রাহ্মরা দিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয়ান, মুসলমান, শিখ ও হিন্দুদের দানের তালিকা নীচে দিলাম।

চাঁদাদাতার নাম	দানের পরিমাণ
লর্ড রিপন	১০০০
মুর্শিদাবাদের নবাব	৫০০
নবাব আশানুল্লা বাহাদুর	৫০০
মহারাণী স্বর্ণময়ী	১৫০০
কুমার মন্মথনাথ মিত্র	৫০০
ডুমরাওনের মহারাজা	১০০০
শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরানী	২০০০
রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১০০০
কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	৫০০০
ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা	৫০০
ত্রিপুরার মহারাজা	৪৫০০
শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরানী	১০০০
পাটিয়ালার মহারাজা	১০০০

চাঁদাদাতার নাম	দানের পরিমাণ
রাজা হরনাথ রায়	৪০০
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর	১০০০
রাজা শ্রীনাথ রায় ও ভ্রাতৃগণ	৫০০
গিধৌড়ের মহারাজা	৫০০
নীলগিরির রাজা	৪০০
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫০০
কুমার গোপাললাল রায়	১৭৫০
মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	২০০০
জানকীনাথ রায়	১০০০
ভূপেন্দ্রনাথ বসু	৩২৩
	২৮৬৭৩

চাঁদাদাতাদের এই শ্রেণীবিভাগ সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই, আমি যাহা জানি তদনুসারে করিয়াছি। কাকিনার স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায়ের পরিবারস্থ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী কি না, জানি না, কিন্তু তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী ও ব্রহ্মোপাসক ছিলেন এবং নিজের ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দান ব্রাহ্মদের দানের মধ্যে ধরিয়াছি। ত্রিপুরার যে মহারাজা ৪৫০০ টাকা দিয়াছিলেন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দান ব্রাহ্মদের দানের মধ্যে ধরি নাই।

—

সিটি স্কুল ও কলেজের ভিত্তি

অপ্রকৃত কথার পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ করা ক্লান্তিকর; কিন্তু প্রতিবাদ ও প্রমাণ সত্ত্বেও অপ্রকৃত কথার পুনরুক্তি হইলে এবং তাহা খবরের কাগজে ছাপা হইলে সত্যের পুনঃপ্রকাশ বাধ্য হইয়া করিতে হয়। ৯ই জ্যৈষ্ঠ বুধবারের "সিটি কলেজের ছাত্রদের" একটি সভার বৃত্তান্ত ১১ই জ্যৈষ্ঠের 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ছাপা হয়। তাহা অবশ্য সম্পাদকীয় নহে। তাহাতে "ছাত্রদের"পক্ষ হইতে বলা হইতেছে :—

"(১) কলেজের লক্ষ্য সম্বন্ধে আপীলে বলা হইয়াছে :—ছেলেদের দেহমনপ্রাণের গঠনের সহিত শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য একেশ্বরবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

এই কথা কয়েকটাই মারাত্মক কথা, আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই কথা কয়টা সম্পূর্ণ আমদানী করা কথা। মিঃ এ এম বসু প্রথমে যখন এই কলেজের জন্য আবেদন করেন, ঐ আবেদনে ঐ কথা কয়টা ছিল না। এতদ্ব্যতীত ১৮৮১ সনে এফিলিয়েসনের জন্য সিটি কলেজ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কলেজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নোট পাঠান, তখনও ঐ নোটে উক্ত কথা কয়টা ছিল না। উক্ত আবেদনে ও নোটে শুধু এই কথা কয়টি ছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি:—"সাধারণতঃ যে ভাবে শিক্ষা বিস্তার করা হয়, তদপেক্ষা উদার ভাবে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য—অর্থাৎ শুধু বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন ও যথোচিত নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর লক্ষ্য না রাখিয়া ছাত্রদের চরিত্রের ও মানসিক অপরাপর বিষয়ের উন্নতি সাধন করিবার জন্য"। একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা বিস্তারের কোন উল্লেখই নাই।

কতকগুলি যুবক বলিতেছেন, আনন্দমোহন বসু মহাশয় যখন প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রথম আবেদন করেন, তখন ঐ আবেদনে ঐ কথা কয়টি ছিল না। তাঁহাদের মতে য়্যাফিলিয়েশ্যনের নোটেও ঐ কথাগুলি ছিল না। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা যাহা শুনিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু "আমরা শুনিয়াছি" একটা প্রমাণ নহে। সিটি স্কুলের জন্য আবেদন বাহির হয় ১৮৭৮ সালে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে; য়্যাফিলিয়েশ্যনের দরখাস্ত হয় ১৮৮১ সালে, সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে। তখন এই যুবকদের জন্ম হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা ১৮৭৮ সালের আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের মূল আবেদন একখানি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার বা রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত য়্যাফিলিয়েশ্যনের নোটটির একটি সত্য নকল আমাদের নিকট উপস্থিত করিলে তখন আমরা আমাদের বক্তব্য বলিতে পারি। "আমরা শুনিয়াছি"র উপর বিন্দুমাত্রও আস্থা-স্থাপন করা যায় না। যাহা পঞ্চাশ ও সাতচল্লিশ বৎসর আগেকার কথা, তাহা এই যুবকেরা কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন, বলুন। তাঁহাদের সংবাদদাতা যদি ১৮৭৮ ও ১৮৮১ সালে সাবালক ছিলেন, তাহা হইলে এখন তাঁহার বয়স সত্তরের কাছাকাছি বা অধিক হইবে। তীক্ষ্মস্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, সত্যবাদী এবং অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেকার একটি বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য আবেদন পর্য্যন্ত যিনি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, এমন অন্ততঃ একজন বৃদ্ধের

নাম এই যুবকেরা করুন। তাহা হইলে তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া ও তাঁহাকে জেরা করা চলিবে। তিনি পরলোকে গিয়া থাকিলে, ঐ যুবকদের "আমরা শুনিয়াছি"র মূল্য সুগন্ধি তৈলের বিজ্ঞাপনে ও কোন-কোন-প্রকার বহির বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর প্রকাশিত সার্টিফিকেটের মূল্য অপেক্ষাও অনেক কম হইবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সিটি কলেজ হলে যে বক্তৃতা করেন, তাহার উত্তরে একটি ছাত্র বলেন, "সিটি কলেজ ব্রাহ্মকলেজ নয়। ঐ ভাবের উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিতও হয় নাই। উহা সর্ব্বসাধারণের কলেজ।" (আনন্দবাজার পত্রিকা)।

সিটি স্কুল ও কলেজ প্রথম হইতে কাহাদের দ্বারা কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত বর্ণনাপত্রের নিম্নমুদ্রিত অংশ হইতে বুঝা যাইবে।

The late Mr. A. M. Bose founded the City School in 1879 and in 1881 the school was raised to the status of a college. A manifesto was issued at the time of the foundation of the school in the names of Mr. A. M. Bose, Pandit Sivanath Sastri and Mr. Surendranath Banerjee. Pandit Sivanath Sastri, the first Secretary of the school, in his history of the Brahmo Samaj, Vol. II. page 133, (published in 1912), gives the following account of the foundation of the City School :—

Another important step taken by some prominent members of the Samaj at the beginning of this year (1879) was the opening of a high class English Institution called the City School. It was started with two objects, namely, first, to spread among the younger generation of that time the religious and moral influence of the Brahmo Samaj and second, to get together and always to have by our side a number of earnest workers in the persons of the Brahmo teachers who would find employment there. The school was opened after special divine service in the beginning of January, 1879. Its prospectus had been issued in the names of Mr. Anandamohan Bose, who supplied the initial expenses, of Mr. Surendranath Banerjea, who, though not a member of the Samaj, yet kindly undertook to be one of the first teachers, and of the present writer (Pandit Sivanath Sastri) who was the Secretary and the organiser."

Mr. (afterwards, Sir) Surendranath Banerjea in his autobiography "A Nation in Making," page 35, writes :—

"The City College was founded in 1879. The schism in the Brahmo Samaj had important results. It led to the establishment of the Sadharan Brahmo Samaj, the City College and other kindred institutions. The leading spirits in that dissentient movement were Anandamohan Bose, Sivanath Sastri, Durgamohan Das and other Brahmo leaders. I was invited to join the tutorial staff of the City School (for it had not then become a college). I gladly accepted the offer, as it added to my income and extended the sphere of my contact with the student community."

Miss Collet, in her Year Book for 1881, the year in which the school was raised to the status of a college, writes :—

"But these brief notes of educational attempts made by the Sadharan Brahmo Samaj Brahmos of Calcutta should be supplemented by some account of their work in a field beyond their own community. I mentioned in my last Year Book (page 24) the marked success of the City School, opened in January, 1879 for the higher education of boys. Of the eight gentlemen who composed the School Committee, seven are leading members of the Sadharan Brahmo Samaj (the eighth being an active-minded B. A. who does not belong to the Brahmo community); the President is Mr. Anandamohan Bose, M. A. and the secretary, Babu Umes Chandra Datta, B. A."

This shows clearly that the institution was all along managed and owned by members of the Sadharan Brahmo Samaj.

The college was formally made over to the Sadharan Brahmo Samaj in June, 1904.

A special meeting of the S. B. Samaj was held on the 17th June, 1924. Mr. A. M. Bose was in the chair and the following resolution moved by Mr. S. R. Das was accepted :—

"That the Sadharan Brahmo Samaj do take over the City College and that the Executive Committee of the S. B. Samaj be authorised to make all necessary arrangements for taking over and managing the Institution."

যে-কয়েকটি-যুবক এই আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহারা সিটি কলেজের জন্য সংগৃহীত দানের মোট পরিমাণ, হিন্দুদের দানের মোট পরিমাণ, ব্রাহ্মদের দানের মোট পরিমাণ, যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনটিই যে সত্য নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

—

কলেজের ছাত্রাবাস সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব

সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এবং কতকগুলি ছাত্র ও তাঁহাদের নেতাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণপ্রমুখ ভদ্রলোকেরা যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা স্থগিত আছে। তাঁহাদের কমিটির শেষ অধিবেশনের ঠিক রিপোর্ট কোন কাগজে পাই নাই। স্বরাজ্যদলের মুখপত্র ফরোয়ার্ডের রিপোর্ট অনু-

সারে সুভাষ বাবু প্রস্তাব করেন, যে, সব কলেজের হষ্টেলের ভার সাক্ষাৎভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করুন। এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মত না হওয়ায় গৃহীত হয় নাই। ইহাতে সরস্বতী পূজার কোন উল্লেখ নাই। অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে সুভাষবাবু কেবল রামমোহন রায় হষ্টেলটিরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ ভার লওয়ার প্রস্তাব করেন, ইহাতেও সরস্বতী পূজার কোন উল্লেখ নাই। এই প্রস্তাব দ্বারা সিটি কলেজের ব্রাহ্ম কর্ত্তৃপক্ষকে লাঞ্ছিত করা হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ইহার প্রতিবাদ করেন। আপোষ-কমিটির পক্ষ হইতে উভয় প্রস্তাবের কোনটি সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ইহাতে রাজী না হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। কারণ, প্রস্তাবটি যাহাই হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন্ পরিবর্ত্তন না করিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না; এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেন রেগুলেশ্যন বদলাইয়া এমন কাজের ভার লইবে, যাহা করিবার মত আয়োজন তাহার নাই, তাহাও বুঝি না। যদি সব কলেজ-হষ্টেলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিতে বলা হয়, তাহা হইলে গবর্ণ্মেণ্ট কলেজ ও মিশনরী কলেজগুলি কি তাহাতে রাজী হইবে?

—

কান্‌ট্রি লীগ

সম্প্রতি কান্‌ট্রি-লীগ্ নামক একটি লীগ স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উদ্যোগ আয়োজন অনেক আগে হইতেই চলিতেছিল। অনেক জমিদার এবং অন্য হোমরা-চোমরা ইহার সভ্য হইয়াছেন। এইরূপ একটি লীগের উপর আমাদের কোন আস্থা নাই। ইহার একটি কাজ হইবে, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সমর্থন। সকল সভ্য এবিষয়ে একমত নহেন, তাহাও লেখা হইয়াছে। এবিষয়ে যাহার সকল সভ্য একমত, এমন পুরাতন সভাসমিতি ভারতবর্ষে থাকিতে এই কাজটি করিবার জন্য একটা নূতন সমিতির আবশ্যক ছিল না।

কান্ট্রী-লীগের আর-একটি সমর্থনীয় জিনিষ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ছুটি কামরার প্রস্তাব। কয়েক মাস পূর্ব্বে মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর তাঁহার এক বক্তৃতায় এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতের জন্য "অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত"দের একটা ব্যবস্থাপক সভা আছে। তার নাম কৌন্সিল অব ষ্টেট। ভারতীয় লেজিস্‌লেটিব য়্যাসেম্ব্লীতে গবর্ণ্মেণ্টের ইচ্ছার বিরোধী যাহা কিছু করা হয়, কৌন্সিল্ অব ষ্টেটের ধামাধরা লোকদের দ্বারা তাহা উলটাইয়া দিবার কাজটা সরকার করাইয়া থাকেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাতেও অনেকবার গবর্ণ্মেণ্টের পরাজয় ঘটে। তাহাকে জয়ে পরিণত করিতে হইলে কৌন্সিল্ অব ষ্টেটের মত এক-একটি প্রাদেশিক সভার প্রয়োজন আছে। কান্‌ট্রি লীগ সরকারী অভিপ্রায়টা সিদ্ধ করিবার এই উপায় প্রস্তাব করিতেছেন। এরূপ লীগের প্রতি দেশহিতৈষী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

দেশী লোক ও ইংরেজেরা একযোগে ভারতবর্ষের হিত করিবেন, ইহা যদি কান্‌ট্রি-লীগের একটা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সেই হিতটা যে কি, তাহা আগে হইতে বুঝা ভাল। দু-একজন স্বদেশবাসী বা ভারতপ্রবাসী ইংরেজের কথা বলিতেছি না, কিন্তু সাধারণতঃ স্বদেশবাসী ও ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের ভারতহিতৈষিতার মানে এই, যে, তাঁহারা অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব করিবেন, এবং ভারতকামধেনুর দুধ সর ক্ষীর ননীটুকু ভোগ করিবেন। তাঁহাদের নিজের দেশে তাঁহাদের যেরূপ অধিকার ক্ষমতা সুবিধা সুযোগ আছে, আমাদের দেশেও আমরা সেইসব অধিকারাদি চাই। ইংরেজের প্রভুত্ব, মুরুব্বিয়ানা ও শোষকত্ব থাকিতে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

জমিদারদের নিজের কথা বলিবার আলাদা সভা আছে, মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাদা লীগ আছে। সুতরাং তাঁহাদের জন্যও একটা আলাদা লীগের দরকার ছিল না। সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্যও কতকগুলি লোক ও বঙ্গের ভারতসভা আছে, এবং নানা ছত্রাকধর্ম্মী সমিতির উদ্ভব হইতেছে ও হইবে। হয়ত বা এইটিই কান্‌ট্রি লীগের আসল

উদ্দেশ্য। তাহা হইলে এই ব্যাঙের ছাতার উদ্ভব বর্ষাকালে হওয়া সময়োচিতই হইয়াছে।

কান্ট্রি লীগের সভ্যেরা নাকি বলিতেছেন, তাঁহারা ষ্টেক্-হোল্‌ডার বা মালদার আদমী। তাঁদের সম্পত্তি আছে, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা চিন্তাশক্তির একটা প্রমাণ নহে। যে-সব পাখীর ল্যাজ লম্বা, তারা বেশী উড়িতে পারে না। মালদার আদমীরাও চিন্তা ও আদর্শের মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে অসমর্থ। পরিবর্ত্তন ভিন্ন উন্নতি হয় না। যাদের সম্পত্তি বেশী, তারা পরিবর্ত্তনকে ভয় করে। ষ্টেকের একটা মানে গোঁজ। যাঁরা সম্পত্তির ও খেতাবের গোঁজে বাঁধা, তাঁদের স্বাধীনতা কোথায় যে সাহসের সহিত দেশহিত করিবেন?

—

আগ্রা-অযোধ্যার হিন্দু মন্ত্রিদ্বয়

আগ্রা-অযোধ্যার হিন্দু মন্ত্রী রায় রাজেশ্বর বলী এবং কোঁয়ার রাজেন্দ্র সিং সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবেন না বলিয়া মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন, বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বাধীনচিন্ততা প্রশংসনীয়। দ্বৈরাজ্যের দ্বারা নাকি দায়িত্বপূর্ণ শাসন-প্রণালীর সূত্রপাত করা হইয়াছে? কিন্তু মন্ত্রীদের দায়িত্বটা কাহার নিকট? জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট, না লাটসাহেব ও তাঁহার পারিষদদের নিকট? আগ্রা-অযোধ্যার দুই মন্ত্রী মনে করেন, যে, তাঁহারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী। সুতরাং আগ্রা-অযোধ্যার ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য সাইমন কমিশনের উপর অনাস্থা প্রকাশ করায় তাঁহারা মনে করেন, যে, তাঁহারা উহার সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন না। অবশ্য তাঁহাদের নিজেরও ঐ কমিশনের উপর আস্থা নাই।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও সাইমন কমিশন

কয়েক মাস পূর্ব্বে তারিখ ফেলিয়াও বাংলা গবন্মেণ্ট বেগতিক বুঝিয়া সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব স্থগিত রাখিয়াছিলেন। এখন আবার তাহা ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে, শুনা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কয়েকটি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় এরূপ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। বাঙালী সভ্যেরা কি করেন দেখা যাক্।

—

পঞ্জাব ও সাইমন কমিশন

পঞ্জাবে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে লোকমত খুব প্রবল। তথাপি তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় তাহার সহিত সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত এহেন কমিটির সভ্যেরাও বাঁকিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, সকল বিষয়ে সাইমন কমিশনের বিলাতী সভ্যদের সমান ক্ষমতা ও সুযোগ তাঁহাদের থাকা চাই। পঞ্জাবে যত সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া হইবে, সকলেরই সাক্ষ্য তাঁহাদের সমক্ষে লইতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে জেরা করিবার অধিকার দিতে হইবে, এবং সাইমন কমিশনের সভ্যেরা যেমন গোপনীয় কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন, পঞ্জাবী কমিটির সভ্যদিগকেও তাহা তলব করিবার ক্ষমতা দিতে হইবে। এইরূপ তাঁহারা বলিতেছেন। পঞ্জাবী ভায়াদের এ চা'লটার তারিফ করা যায় না কি?

—

ভারতে সিবিল সার্বিস প্রতিযোগিতা

কয়েক বৎসর হইতে বিলাতের ন্যায় ভারতবর্ষেও সিবিল সার্বিস্ প্রতিযোগিতা গৃহীত হইতেছে। কিন্তু ইহাকে ঠিক প্রতিযোগিতা বলা চলে না। পরীক্ষায় যে-সব যুবক উচ্চতম কয়েকটি স্থান অধিকার করে, তাহাদিগকে কয়েকটি চাকরী দেওয়া হয়। অন্য কতকগুলি চাকরী প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য্য কিন্তু পাসের নম্বর পাওয়া সংখ্যান্যূন সম্প্রদায়ের যুবকদিগকে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার ফল অনুসারে যদি ছয় জনকে কাজ দেওয়া হয়, তাহা হইলে, ধরুন, ষষ্ঠস্থানীয় যুবক হাজারে ৬০০ নম্বর পাইয়াছে। তাহার পর তিন চারি জন হিন্দু যুবক যদি ৫৮০, ৫৫০, ৫২৫, ৫১৬ পায়, তাহারা চাকরী পাইবে না; কিন্তু কোন মুসলমান বা ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ যুবক যদি ৩৯৯ পান, তিনি চাকরী পাইবেন। এই নীতির সরকারী নাম "redressing communal inequalities," "সাম্প্রদায়িক অসাম্যের প্রতীকারসাধন।" যাহারা কিন্তু মুসলমানদের চেয়েও লেখাপড়ায় অনগ্রসর ও সংখ্যায় কম, সেই আদিমজাতীয় কোলভীল সাঁওতাল বাউরীরা এই নীতির ফলভোগ করে না। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রে এবং তাহার পূর্ব্বে ও পরে বহুবার বলা হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যের সকল-ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের প্রতি সমান ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু এস্থলে ত হিন্দু যুবককে তাহার ধর্ম্মের জন্য অসুবিধায় ফেলা হইতেছে, এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে সুবিধা দেওয়া

হইতেছে। অন্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা চাকরী পাইবার দুটা সুযোগ পাইতেছে। যদি প্রতিযোগিতায় তাহারা উচ্চস্থান অধিকার করে, তাহা হইলে ত তাহারা চাকরী পাইয়াই গেল, কিন্তু যদি নিম্নস্থানীয় হয়, তাহা হইলেও কর্ত্তৃপক্ষের নেক নজরে তাহারা কেহ কেহ কাজ পাইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত না হওয়ায়, ষ্টেটস্‌ম্যান পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ শ্লেষ করিয়াছেন। যথা—

"......there are several backward communities to be thought of. So competition has had to be tempered by kindliness to the weaker vessel...By this interpretation of the principle of competition, a number of the less qualified candidates get two chances—they may pass in, or if they fail they may be nominated to redress a want of balance. The next stage may be to select individuals and earmark them for selection if they fail."

আমরা একাধিক বার বলিয়াছি, যে, যদি মুসলমানেরা হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারেন, তাহা ভালই; কিন্তু যাঁহারা পারিবেন না, তাঁহাদের জন্ত শুধু মুসলমানদের মধ্যেই আরও একটি প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা হউক। তাহাতে পারদর্শিতা অনুসারে মুসলমান যুবকেরা চাকরী পাইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে তোষামোদকারী মুসলমান "নেতারা" সম্প্রদায়ের হিতের ব্যপদেশে গরীব বুদ্ধিমান যোগ্যতর যুবকদের দাবী চাপা দিয়া নিজেদের আত্মীয়স্বজনের চাকরী জুটাইতে পারিবেন না।

—

চীন স্বাজাতিকদের জয়

চীনে যাঁহারা সান্‌য়াৎ সেনের সহকর্ম্মী ও অনুচর,-ছিলেন, তাঁহারা দক্ষিণ চীনের দল, স্বাজাতিক দল, ক্যাণ্টনের দল, ইত্যাদি নামে পরিচিত। সান্‌-য়াৎসেনই বিপ্লব ঘটাইয়া চীনে মাঞ্চু সম্রাটদের রাজত্বের উচ্ছেদসাধন করেন, এবং তাহার ফলে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার দলের লোকেরা জয়ী হইয়া চীনের রাজধানী পেকিং প্রবেশ করিয়াছে। এখন যদি চীনে অন্তর্যুদ্ধের অবসান হয়, শান্তি স্থাপিত হয়, এবং সমগ্র চীনজাতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দেশের উন্নতিতে মন দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে চীনের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার ও সমুদয় পৃথিবীর হিত সাধিত হইবে।

—

রাজমোহন দাস মহাশয়ের অবসর গ্রহণ

ছয় মাস হইল বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাস মহাশয় বার্দ্ধক্য ও দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ তাঁহার প্রিয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি বার বৎসর পূর্ব্বে যখন এই কাজটির ভার লন, তখন ৮টি জেলায় সমিতির ৪২টি বালকবিদ্যালয়ে ৮৬৬টি ছেলে পড়িত এবং ৮টি বালিকাবিদ্যালয়ে ১৯৬টি বালিকা পড়িত। সমিতির হাতে মজুত টাকা ছিল ৬৫টি এবং দেনা ছিল ৬৮২ টাকা ও শিক্ষকদের তিন বৎসরের বেতন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সকল দিকেই সমিতির কাজের বিস্তৃতি ও উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ১৯২৬-২৭ সালের শেষে ২২টি জেলায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০৭ এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬৬৭০ পর্য্যন্ত পৌঁছে। তাঁহার কার্য্যকালে সরকারী ও বেসরকারী মঞ্জুরী টাকা ও চাঁদা হইতে ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ১,২৩,৭৩২৸৴৪॥ খরচ হইয়া ৭,৩৫৩৸৴৯॥ উদ্বৃত্ত থাকে।

সমিতির কাজ ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে, খরচও বাড়িতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণ ইহার সহায় হইলে দেশে অনেক পরিমাণে শিক্ষার বিস্তার হইবে। বঙ্গে ও আসামে শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত এই সমিতির চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ব্যাপক ও সফল বেসরকারী চেষ্টা।

রাজমোহন-বাবু কেবল যে শিক্ষাদান দ্বারাই অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের উপকার করিয়াছেন, তাহা নহে, সামাজিক উৎপীড়ন হইতেও তাহাদিগকে প্রয়োজন ও সাধ্য অনুসারে রক্ষা করিয়াছেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত নীচে দিতেছি।

—

সামাজিক অত্যাচার দমন

১৯১৮-১৯ সালে ঢাকা জেলার নয়ানগরের বাবু দ্বারকানাথ রায় নামক একজন সঙ্গতিপন্ন নমঃশূদ্র চাষী গৃহস্থ, মুসলমান জমীদারদিগকে সেলামী না দিয়া, ত্রিংশ দিনের পরিবর্ত্তে একাদশ দিবসে একটি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জমিদারেরা বহুসংখ্যক লাঠিয়াল দ্বারা দ্বারকানাথবাবু ও অন্ত অনেককে আক্রমণ করে, শ্রাদ্ধ পণ্ড ও অপবিত্র করে, এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া জমিদারী কাছারীতে লইয়া গিয়া বেশী পরিমাণ জরিমানা দিবার অঙ্গীকার লইয়া ছাড়িয়া দেয়। পুলিশে ঘটনার সংবাদ দেওয়ায় আহত ব্যক্তিরা ঢাকায় হাঁসপাতালে প্রেরিত হয়। তথা হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। পুলিস জমিদারদিগকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল লাঠিয়ালদিগকেই বিচারের জন্ত চালান দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু রাজমোহন দাস মহাশয় নিজে তদন্ত করিয়া উচ্চ পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে বুঝাইতে সমর্থ হন, যে, জমীদারদিগকেও চালান দেওয়া উচিত। তদনুসারে তাহাদিগকেও চালান দেওয়া হয়। তিনি এইরূপ

বেআইনী কাজ ও অত্যাচার দমন করিবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী হইতে ১৫০০ এবং নমঃশূদ্রদের নিকট হইতে ৬০০০ টাকা মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত তুলেন। অধিকাংশ আসামীর শাস্তি হয়। দ্বিতীয় একদল আসামী ফেরার হইয়াছিল। তাহাদের বিচারের সময় উপস্থিত হইলে সরকার পক্ষ হইতে এই ওজুহাতে তাহাদের নামে মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হয়, যে, প্রথম দলের শাস্তিতেই ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। হাইকোর্টে এই প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে আপীল করায় হাইকোর্ট এই বলিয়া প্রত্যাহারের হুকুম নাকচ করেন, যে, ফেরার হওয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে এবং প্রথম দলের শাস্তি, দ্বিতীয় দলের কোন অপরাধ হইয়া থাকিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ফলে অন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা দ্বিতীয় দলের বিচার হইয়া শাস্তি হয়। অত্যাচারী ধনশালী ও প্রভাবশালী লোকদের শাস্তি হওয়া কত কঠিন, তাহা যাঁহারা জানেন তাঁহারা রাজমোহন-বাবুর চেষ্টার মূল্য বুঝিবেন। এই মোকদ্দমার ফলে অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের অনেক সাহায্য হইয়াছে, এবং সমিতির প্রতি তাহাদের অনুরাগ বাড়িয়াছে। তাহাদের উপর অত্যাচারও কমিয়াছে।

এই ঘটনাটিতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, নমঃশূদ্রেরা দ্বিজের মত একাদশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে মুসলমানদের কোন সামাজিক বিধি লঙ্ঘিত হয় না। অথচ সামাজিক কুসংস্কারের বিষ অনেক মুসলমানকেও এতটা অভিভূত করিয়াছে এবং বে-আইনী লাভের লোভ এবং ধন ও আভিজাত্যের ঔদ্ধত্য এরূপ, যে, মুসলমান জমিদারদের দ্বারা এরূপ একটি অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল।

—

জেনীভার লীগে "ভারত-প্রতিনিধি"

বরাবর যেরূপ হইয়া আসিতেছে, এবৎসরও তাহাই হইয়াছে। জেনীভায় লীগ অব্ নেশ্যন্সের অর্থাৎ মহাজাতিসংঘের অধিবেশনে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকে। ইঁহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলা হয়, কিন্তু বস্তুতঃ ইঁহারা ভারতের বিদেশী শাসক-সমষ্টির প্রতিনিধি। স্বাধীন দেশের লোকেরা ও তাহাদের উচ্চতম রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীরা যে অর্থে যতটা এক, ভারতের লোকেরা ও ভারতের উচ্চতম সরকারী কর্ম্মচারীরা সে অর্থে ও ততটা এক হওয়া দূরে থাক্, তাহাদের স্বার্থ মোটেই এক নহে। সুতরাং স্বাধীন দেশের গবর্ন্মেণ্টের দ্বারা মনোনীত প্রতিনিধিরা সেইসব দেশের প্রতিনিধি বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ভারত সরকারের মনোনীত লোকেরা ভারতের প্রতিনিধি বিবেচিত হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের পরাধীনতা বৃহত্তম অপমান। তাহা হইতে নানা ক্ষুদ্র অপমানের উৎপত্তি হয়। জেনীভায় যাঁহারা ভারতের প্রতিনিধি হইয়া যান, এ পর্য্যন্ত বরাবর একজন ইংরেজকে তাঁহাদের সরদার করিয়া পাঠান হয়। এবার গত বারের মত লর্ড লিটনকে সরদার করা হইয়াছে। তাঁহা অপেক্ষা যোগ্য ভারতীয় লোক আছেন। অথচ তাঁহারা দেশী বলিয়া মনোনীত হন না, লর্ড লিটন ইংরেজ বলিয়া মনোনীত হন। ইহা ভারতের এক লাঞ্ছনা। ইহাতে অন্য সব দেশের নিকট ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হইতেছে। প্রতিনিধিদিগের প্রধানের কাজ করিবার দায়িত্ব ভারতীয়ের থাকিলে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা হইত, তাহা হইতে ভারতীয়েরা বঞ্চিত হইতেছে।

—

শান্তিভবন-বিদ্যালয়

কলিকাতায় বাগবাজারের নবীন সরকারের গলির ২০ নং গৃহে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমের কয়েক-জন প্রাক্তন ছাত্র-অধ্যাপক মিলিয়া প্রায় দুই বৎসর হইল এই শান্তিভবন বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ইঁহারা শান্তি-নিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপক দুই-ই ছিলেন বলিয়া তথাকার আদর্শ ও শিক্ষা-প্রণালীর সহিত বিশেষ পরিচিত। এইজন্য যাঁহাদের বালকদিগকে শান্তিনিকেতনে পাঠাইবার সুবিধা নাই, তাঁহারা শান্তিভবন বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে শিক্ষার জন্য পাঠাইলে সুফল পাইবেন। এখন এই বিদ্যালয়ে ছয়জন শিক্ষক ও ৫০টি ছাত্র আছেন। শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং তথায় বহুদিন শিক্ষকতা কার্য্যেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ছাত্রগণ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকে। ইহার ছাত্রাবাসও শীঘ্র খুলিবার ইচ্ছা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তা ছাড়া বয়-স্কাউটের কাজ, ব্যায়াম ও সঙ্গীত শিখান হয়। ছাত্রদের মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ ও বনভোজন হয়। তাহাদের নিজেদের সাহিত্যসভা, পত্রিকা, বিচারসভা প্রভৃতি আছে।

—

জয়পুর কলা-বিদ্যালয়

গত বৎসরের প্রবাসীতে জয়পুর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তথাকার মহারাজার কলাবিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ইহার প্রিন্সিপ্যাল।

তিনি কলিকাতায় শিল্প শিখিবার পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। ভাস্কর্য্যে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য আছে। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে জয়পুর কলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন শিষ্য, কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিবার পর অন্যত্রও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা ভিন্ন আরও অনেক ভারতীয় উপযুক্ত শিক্ষাদাতা আছেন। এই বিদ্যালয়ে চারুশিল্প ও কারুশিল্প উভয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়। জয়পুরের মাটী, পাথর, কাঠ ও ধাতুর নানাবিধ সুন্দর জিনিষ ভারতবর্ষে ও ইউরোপ আমেরিকায় সাদরে ক্রীত হয়। এই বিদ্যালয়টির মত একটি প্রতিষ্ঠান যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ইহা গৌরব ও সন্তোষের বিষয়। সম্প্রতি ইহার কতকগুলি শিল্পদ্রব্য বাঙ্গালোরের কলামন্দিরের প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইয়াছিল। সবগুলিই প্রশংসিত হইয়াছে, এবং চীনা-মাটির পাত্র এবং মুক্তাদির দ্বারা ধাতুদ্রব্য খচিত করিবার কাজের জন্য বিদ্যালয় স্বর্ণপদক পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দের কার্য্য প্রশংসার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালোর প্রদর্শনীর সম্পাদক প্রিন্সিপ্যাল রায়চৌধুরীকে লিখিয়াছেন—

"Your exhibits have opened the eyes of many regarding the artistic works produced in our country and tempted me also to send one of my students to your care for a few months to get training in porcelain and inlay work, if you can kindly permit."

—

শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য

বঙ্গে ও ভারতের অন্য অনেক প্রদেশে শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া এবং অন্য নানা প্রকারে নিজেদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতেছে। তাহাদের অসন্তোষ দূর করিবার একমাত্র বৈধ উপায় গুলিনিক্ষেপও অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু এই অমোঘ ঔষধেও রোগের শান্তি হইতেছে না। ধনিক ও ধনিকদের বন্ধু গবর্ণ্মেণ্ট ইতিহাস ভুলিয়া যাইতেছেন। কোন দেশের লোক যতই কেন দুর্ব্বল, অজ্ঞ, ছত্রভঙ্গ হউক না, তাহাদের বল, জ্ঞান ও দলবদ্ধতা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের ন্যায্য দাবীর জয় হইবেই হইবে। অতএব, বিদ্বেষ ও তিক্ততা উৎপাদন না করিয়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে রক্তপাতের আয়োজন না করিয়া, ন্যায়সঙ্গত ভাবে শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর করা উচিত। যাহাদের শ্রমে ধনিকরা ঐশ্বর্য্যশালী হইতেছেন ও বিলাস সম্ভোগ করিতেছেন, তাহারা পশুর অধম জীবন যাপন করিবে, পশুর মত কেবল গ্রাসাচ্ছাদন পাইবে, ইহা ন্যায্য নহে। স্বাস্থ্যকর গৃহ, শিক্ষা ও আনন্দ লাভের অবসর, যথেষ্ট খাদ্য ও বস্ত্র, রোগে চিকিৎসার সুবিধা, সন্তানগণকে পালন করিয়া শিক্ষাদানের সুযোগ, প্রভৃতি সুবিধা অন্য মানুষদের মত শ্রমিকদেরও প্রাপ্য। এই প্রাপ্য তাহাদিগকে দিবার জন্য সকল দেশের ধনিক ও গবর্ণ্মেণ্ট সমূহের তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক দেশেই তাঁহারা যেন, "আমাদের দিনটা ত কোন প্রকারে কাটিয়া যাইবে, তাহার পর আসুক না প্রলয়", এই নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অনেক দেশে যে প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও ঘোর দারিদ্র্য পাশাপাশি রহিয়াছে, তাহাতে ধনিক ও শ্রমিকের সহযোগিতায় উৎপাদিত ধনের বণ্টন প্রথা ন্যায়ানুসারী নহে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। সকল ধনিক যে ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞাতসারে শ্রমিকদিগকে বঞ্চিত করেন, তাহা নহে; অনেকেই প্রচলিত প্রথার দাস, গতানুগতিকের অনুসরণ করেন। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ সত্য, যে, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, অপরকে বঞ্চিত না করিয়া কেহ প্রভূত ধনশালী হইতে পারে না। এই হেতু কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি ধনী হইয়া উঠিলে তাহা তাঁহার অনুতাপের কারণ হওয়া উচিত।

—

শ্রমিকদের জন্য রুশিয়ার সাহায্য

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের শ্রমিকেরা প্রায় সবাই নিরক্ষর ও অজ্ঞ। তাহাদের স্বয়ং দলবদ্ধ হইয়া সুশৃঙ্খল ভাবে শ্রমিকসংঘের কাজ চালাইবার ক্ষমতা নাই। এই জন্য তাহাদের অশ্রমিক শিক্ষিত নেতার প্রয়োজন আছে। এই নেতাদের দায়িত্ব খুব গুরুতর। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, বিশেষ ভাবে প্রস্তুত না হইয়া, ধর্ম্মঘটের সময় গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত না করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মঘটে প্রবৃত্ত করা অনুচিত। শ্রমিকদের নিজের প্রদত্ত চাঁদা হইতে সৃষ্ট একটি ধর্ম্মঘট ফণ্ড সর্ব্বদা থাকা উচিত। তাহারা অনেকে যে মজুরী পায়, তাহা হইতে চাঁদা দেওয়া দুঃসাধ্য জানি; কিন্তু ধনিকদের নির্ম্মম নিষ্পেষণ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ধর্ম্মঘট ঘোষণা করাইয়া তাহাদিগকে ভিক্ষুকে পরিণত করাও উচিত নহে।

একটা কথা উঠিয়াছে, যে, ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের জন্য রুশিয়ার টাকা লওয়া উচিত কি না। আমাদের বিবেচনায় কি রুশীয়, কি ব্রিটিশ, কি অন্য বৈদেশিক শ্রমিকসংঘ, কাহারও নিকট ভিক্ষা করা জাতীয় আত্মসম্মানের হানিকর। আপনা হইতে টাকা আসিলে লওয়া যাইতে পারে। উহা

যা প্রকাশ্য আশা বা সর্ত্ত ব্যতিরেকে কোন বৈদেশিক শ্রমিকসংঘই ভারতীয় শ্রমিকদের সাহায্য করে না। বিদেশী শ্রমিকরা নিজের দেশের বা মহাদেশের ধনিকদের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য ভারতীয় শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘটে প্রবৃত্ত ও জয়ী করিতে চায়, শ্রমিক অশ্রমিক সমগ্র ভারতীয় লোকদিগকে তাহারা কেহ স্বাধীন জাতিতে পরিণত দেখিতে চায় না। রুশীয় অর্থ রক্তমাখা বলিয়া তাহা লওয়া উচিত নয়, বলা হইয়াছে। কিন্তু বিদেশীর রক্তপাত না করিয়া পাশ্চাত্য কোন জাতি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুতরাং রক্তমাখা টাকা না লইতে হইলে বিলাত হইতে আগত টাকাও না-লওয়া উচিত।

রুশীয়দের অর্থসাহায্যদান সম্বন্ধে একটা কথা সকলে জানেন না বলিয়া নীচে তাহা মুদ্রিত করিতেছি। অন্য দেশে সাহায্য প্রেরণ সম্বন্ধে লেনিনের কতকগুলি নীতি ও উদ্দেশ্য ছিল। তাহার কতকগুলি মার্চ মাসের চাইনীজ ষ্টুডেণ্টস্ মান্থলীতে (*The Chinese Students' Monthly*তে) প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার দুটি তুলিয়া দিতেছি।

"It is necessary to combat the Pan-Islam and Pan-Asiatic and similar tendencies which strive to combine the struggle against European and American imperialism with the growing power of Turkish and Japanese imperialism, of the nobility, large land-lords, the priesthood, etc.

"It is the duty of the Communist International to support the revolutionary movements in colonies and backward countries only for the purpose of enabling the elements of future proletarian parties, Communistic not only in name, in all backward countries, to be grouped and trained to recognize their special tasks of fighting the bourgeois democratic movement in each country. The Communist International must enter into temporary agreements and even alliances with the bourgeois democracy in colonies and backward countries, but must not merge with it, but preserve the absolute independence of the proletarian movement, even in its most rudimentary form."

—

বকরীদের রক্তপাত

এবারেও বকরীদে মানুষের রক্তপাত হইয়াছে। তবে বেশী জায়গায় হয় নাই। তাহাতে হিন্দু মুসলমান ও পুলিসের ঈশ্বর প্রীত হইয়াছেন কি না, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন। যাঁহাদের ঈশ্বর পশুবলি চান ও তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তিনি মনুষ্যবলিতে অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি? কারণ মানুষ তাঁহার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব। যাঁহারা গোরক্তপাত নিবারণের জন্য নিজেদের ও অন্য মানুষদের প্রাণকে তুচ্ছ করেন, তাঁহাদের মতে নিশ্চয়ই "মানুষ গোরুর চেয়ে নিকৃষ্ট জীব", ইহাই ঈশ্বরের উপদেশ। অতএব গোরুর প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া মানুষের প্রাণহানিতে তাঁহাদেরও ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা বিবেচ্য। পুলিসের ঈশ্বর গোরু ও মানুষ উভয়েরই রক্তপাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা জানি না।

—

বারদোলীর রায়ৎগণ

বারদোলীর রায়ৎগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে, তাহারা বর্দ্ধিত-হারে সরকারী খাজনা দিবে না। তাহারা আবাল-বৃদ্ধ বনিতা দীর্ঘকাল ধরিয়া অসাধারণ সাহস, ধৈর্য্য ও অহিংসতা সহকারে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ও সরকারী পাঠান ভৃত্যদের অত্যাচার সহ্য করিয়া আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছে। তাহাদের সাহায্যার্থ অনেকে টাকা দিতেছেন; অনেকে রায়ৎদের সাহায্য করিতে গিয়া জেলে গিয়াছেন। বারদোলী তালুকের অনেক সরকারী কর্ম্মচারীই সরকারী নীতির প্রতিবাদস্বরূপ চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার দশজন সভ্যও প্রতিবাদস্বরূপ ইস্তফা দিয়া আবার নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন। বারদোলী ভারত-ব্যাপী অহিংস প্রতিরোধ প্রচেষ্টার পথপ্রদর্শক।

—

ডাকের চিঠি খোলা

শ্রীমতী এনি বেশাণ্ট অভিযোগ করিয়াছিলেন ও প্রমাণ করিয়াছেন, যে, গবর্ন্মেণ্ট তাঁহার কোন কোন চিঠি খুলিয়া পড়িয়া বিলম্বে বিলি করেন, কখন বা বিলি না করিয়া নষ্ট করেন। শ্রীমতী খ্যাতিপ্রতিপত্তিশালিনী, সুতরাং তাঁহার এই অভিযোগ বিস্তর কাগজে আলোচিত হইতেছে। তাহার ফলে চিঠি-খোলা রীতিটা পরিত্যক্ত হইবে না—খুব বেশী যদি কিছু হয় ত কেবল তাঁহার চিঠি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বিত হইবে। কেন না, গবর্ন্মেণ্টের কাছে সুবিবেচনা ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পাই-বার এক উপায় তাহাকে খুব বেশীরকম হায়রান ও অপদস্থ করিবার ক্ষমতা; তাহা শ্রীমতীর আছে।

আমাদের তাহা না থাকায়, যদিও দীর্ঘকাল হইতে আমরা কাহারও কাহারও বিদেশী চিঠি ও লেখা বিলম্বে পাই, তথাপি অভিযোগ করি না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতবন্ধু সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব আমাদিগকে ৩রা এপ্রিল তারিখে চিঠি লেখেন, যে, তিনি ঐ তারিখে আমাদিগকে রেজিষ্টরী করিয়া একখানি পুস্তকের সমগ্র হস্তলিপি পাঠাইয়াছেন। তাঁহার চিঠি আমরা ২৯শে এপ্রিল পাই। কিন্তু বইখানি পাই ১৪ই মে তারিখে, অর্থাৎ পনর দিন পরে। উহা দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, যে, উহার মোড়কের সীল ভাঙ্গিয়া উহা খুলিয়া দেখা হইয়াছে, এবং পুনর্ব্বার বাঁধিয়া সীলের সব জায়গায় গালা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতার বিদেশী ডাকে যাহা আসে, তাহার এই একটি বিশেষত্ব আছে, যে, তাহাতে দেশী চিঠির মত কলিকাতা ডাকঘরের কোন ছাপ দেওয়া হয় না! সুতরাং চিঠিটি কলিকাতার ডাকঘর কবে বিলি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। চিঠি যে পায়, তাহার কথা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য না হইতে পারে।

—

পুলিশের উত্তেজক চর

পুলিশের বেতনভোগী গুপ্তচরেরা যে অনেক যুবককে "রাজনৈতিক" ডাকাতি ও রাষ্ট্রবিপ্লব-সংঘটন-উদ্দেশ্যে কৃত অন্যান্য অপরাধে প্রবৃত্ত করে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস চলিত আছে। এরূপ গুপ্তচর-নিয়োগ-প্রথা অন্য অনেক দেশেও আছে। সম্প্রতি লাহোরের ট্রিবিউনের উদ্যম ও সাহসে কে, সি, বাঁড়ুজ্যে নামক এক উত্তেজক গুপ্তচরের কাজ প্রকাশিত হইয়াছে। ট্রিবিউন তাহার কয়েকটা চিঠির নকল পর্য্যন্ত যোগাড় করিয়া তাহার ফোটোগ্রাফে ছাপিয়াছেন। এই লোকটা আগ্রা-অযোধ্যা হইতে লাহোর যায় কাহাকেও "রাজনৈতিক" অপরাধ করাইবার নিমিত্ত। তাহার কাছে বন্দুক ও কার্ত্তুজ থাকায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার পরিচয় না জানায় তাহাকে জেলে পাঠান। পরে পঞ্জাব গবর্ন্মেণ্টের হুকুমে সে পুলিশের গোয়েন্দা বলিয়া খালাস পায়। জেলে জেল-কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে পুলিশ তাহাকে টাকা ও চিঠি পাঠাইত। তাহা বেআইনী কাজ।

লোকটার প্রকৃত পরিচয় যে জানা গিয়াছে, তাহা ভালই। আমাদের লজ্জার বিষয় এই, যে, লোকটা ভারতীয় ও বাঙালী।

—

নারীর উপর অত্যাচার

বঙ্গে নারীর উপর অত্যাচার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই করে। অত্যাচারীর সংখ্যা কাহাদের মধ্যে বেশী, তাহার আলোচনা করিয়া কোন সুখসান্ত্বনা প্রাপ্তব্য নহে। কিন্তু আমাদের বরাবর মনে হইয়াছে, যে, ভদ্র, শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র মুসলমানেরা একটি বিষয়ের প্রতি মন দিলে ভাল হয়। অনেক নারীহরণের মোকদ্দমার সাক্ষ্যে দেখা গিয়াছে, যে, অপহৃতা নারীকে মুসলমান পুরুষ ও অন্তঃপুরিকাদের পর্য্যন্ত সাহায্যে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখা হইতেছে; লঘুগুরুসম্পর্কবিশিষ্ট লোকেরা এই দুষ্কার্য্য একযোগে করিতেছে। ইহা সামাজিক অবনতির পরিচায়ক। এইরূপ ঘটনায় স্বভাবতই ভদ্র মুসলমানেরা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক। সম্প্রতি দেখিলাম, "খাদেম" এইরূপ একটি মোকদ্দমার সাক্ষ্য পড়িয়া চিন্তিত ও দুঃখিত হইয়াছেন। ইহা সুলক্ষণ।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও খদ্দর

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী প্রথমে অনেক হাজার টাকার খদ্দর সরবরাহ করিতে বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন এক ব্যবসাদারকে যিনি উহা প্রস্তুত করেন না। সুতরাং তিনি খাঁটি খদ্দর সংগ্রহ করিতে ভুল করিতেও পারিতেন। তদ্ভিন্ন, যাঁহারা খাঁটি খদ্দর প্রস্তুত করেন, ওরূপ একজন ব্যবসাদারের তাঁহাদের চেয়ে কম পাইকারী দরে খদ্দর দিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে না। এই উভয় কারণে এবং বাংলার মিউনিসিপালিটির বাঙালী প্রতিষ্ঠানকেই উৎসাহিত করা উচিত বলিয়া কলিকাতা মিউনিসিপালিটি যে এখন খাদিপ্রতিষ্ঠান, অভয়াশ্রম, খাদিমণ্ডল ও বিদ্যাশ্রম হইতে খদ্দর কিনিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। পণ্যদ্রব্য ও মানুষ বহিবার জন্য মোটরগাড়ী প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও যেমন গোরুর গাড়ীর এখনও প্রয়োজন রহিয়াছে, তদ্রূপ বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত কলে সুতা কাটা ও কাপড় বোনা হইলেও হাতের চরকা ও হাতের তাঁতের প্রয়োজন আছে। —

শ্রীমতী এনি বেশান্ত ও সিটি কলেজ

শ্রীমতী এনি বেশান্তের হিন্দুধর্ম্মে খুব আস্থা আছে। তাঁহার সম্পাদিত ১১ই জুনের নিউ ইণ্ডিয়ার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হইয়াছে—

THE SARASWATI PUJA EPISODE.

—It is unfortunate that a well-known private institution like the City College of Calcutta should fall a prey to religious intolerance and irresponsible agitation. The Saraswati Puja episode and its further developments reflect little credit on those concerned. To judge from the statements in the press, the cry of "religion in danger" seems unjustifiable. The management, which is Indian, seems to have provided ample facilities for those who wish to perform image-worship, the crux of the whole squabble. The name of Raja Ram Mohan Roy has a claim to universal reverence. Even those to whom image-worship appeals more than the Brahmo doctrine might have extended a graceful courtesy to his memory and not insisted on the use, for their celebration, of the particular hostel raised to commemorate his services to liberal Hinduism. The agitation carried on by some of the students and their sympathisers against a section of their own community might well have been reserved for a much worthier cause.

ভ্রম-সংশোধন

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫—পৃঃ ২৪০, প্রথম স্তম্ভ, ১১ পংক্তি—'বহু পুরুষকে' এই স্থলে হইবে "বহু পুরুষের স্থলে এক পুরুষকে"।

পৃঃ ২৮৬ দ্বিতীয় কলম নিম্ন হইতে ১৩শ লাইন Commission স্থলে Communion হইবে।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেসে শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাউল
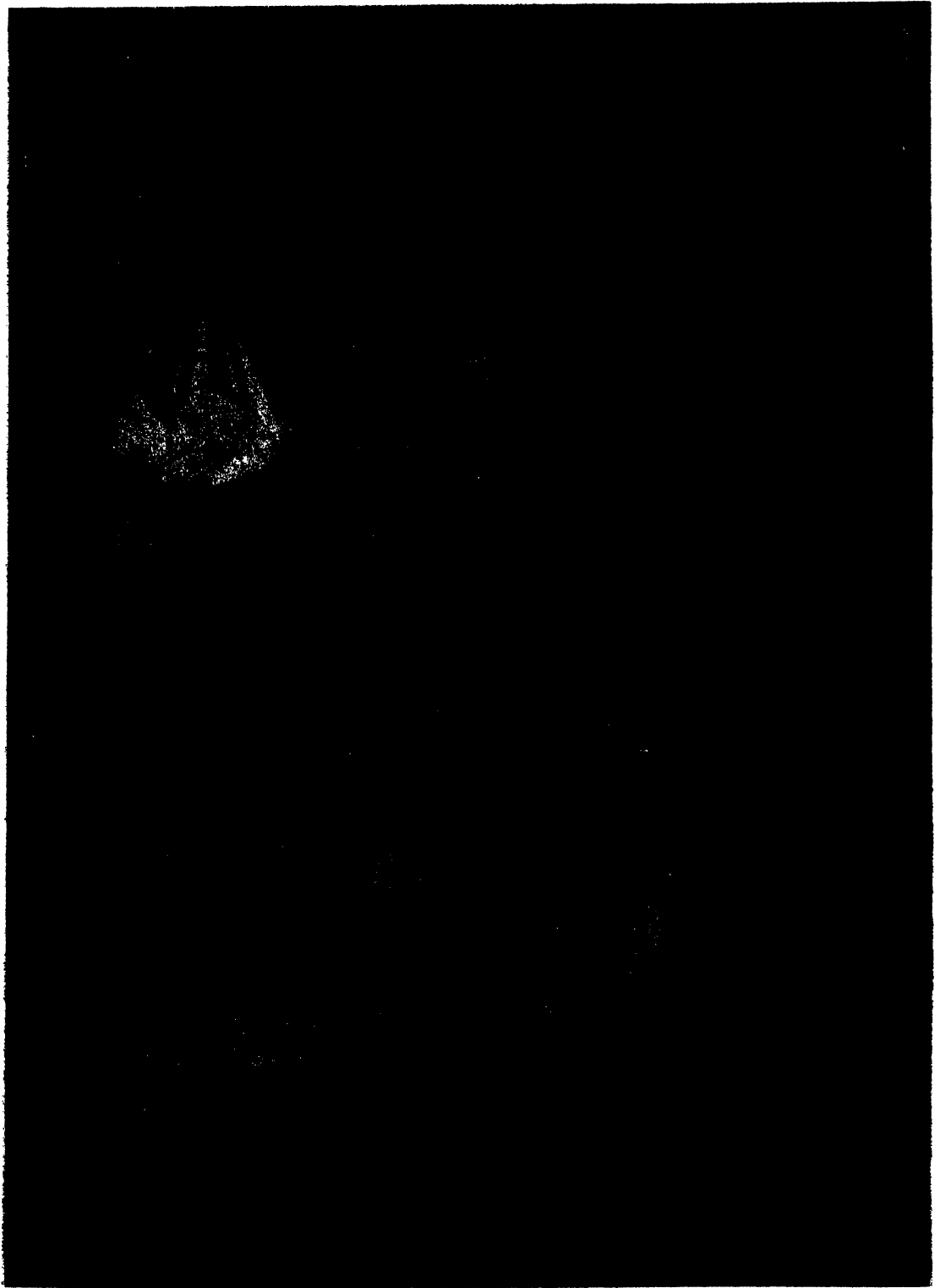
শিল্পী শ্রী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৩৫

৪র্থ সংখ্যা

অরবিন্দ ঘোষ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখ্‌বো। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'লো। তাঁকে দেখে যা আমার মনে জেগেছে সেই কথা লিখ্‌তে ইচ্ছা করি।

খৃষ্টান শাস্ত্রে বলে বাণীই আদ্যা শক্তি। সেই শক্তিই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। নব যুগ নব সৃষ্টি, সে কখনো পঞ্জিকার তারিখের ফর্দ্দ থেকে নেমে আসে না। যে-যুগের বাণী চিন্তায় কর্ম্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির নূতন পথে বাহির করে তাকেই বলি নব যুগ।

আমাদের শাস্ত্রে মন্ত্রের আদিতে ওঁ, অন্তেও ওঁ। এই শব্দটিকেই পূর্ণের বাণী বলি। এই বাণী সত্যের অয়মহং ভো,—কালের শঙ্খকুহরে অসীমের নিশ্বাস।

ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের বান ডেকে যে-যুগ অতল ভাব-সমুদ্র থেকে কলশব্দে ভেসে এলো তাকে বলি য়ুরোপের এক নব যুগ। তার কারণ এ নয়, সে দিন ফ্রান্সে যারা পীড়িত তারা পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধালে। তার কারণ সেই যুগের আদিতে ছিল বাণী। সে-বাণী কেবল মাত্র ফ্রান্সের আশু রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের খাঁচায় বাঁধা খবরের কাগজের মোড়কে ঢাকা ইস্কুল বইয়ের বুলি আওড়ানো টিয়ে পাখী নয়। সে ছিল মুক্তপক্ষ আকাশ-বিহারী বাণী; সকল মানুষকেই পূর্ণতর মনুষ্যত্বের দিকে সে পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছিল।

একদা ইটালির উদ্বোধনের দূত ছিলেন মাট্‌সীনি, গারিবাল্‌ডি। তাঁরা যে-মন্ত্রে ইটালিকে উদ্ধার ক'র্‌লেন সে ইটালির তৎকালীন শত্রু বিনাশের দ্রুত ফলদায়ক মারণ উচাটন পিশাচ মন্ত্র নয়, সমস্ত মানুষের নাগপাশ মোচনের সে গরুড় মন্ত্র, নারায়ণের আশীর্ব্বাদ নিয়ে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ। এইজন্যে তাকেই বলি বাণী। আঙুলের আগায় যে স্পর্শবোধ তার দ্বারা অন্ধকারে মানুষ ঘরের প্রয়োজন চালিয়ে নিতে পারে। সেই স্পর্শবোধ তারই নিজের। কিন্তু সূর্য্যের আলোতে নিখিলের যে স্পর্শবোধ

আকাশে আকাশে বিস্তৃত; তা প্রত্যেক প্রয়োজনের উপযোগী অথচ প্রত্যেক প্রয়োজনের অতীত। সেই আলোককেই বলি বাণীর রূপক।

সায়ান্স এক দিন য়ুরোপে যুগান্তর এনেছিল। কেন? বস্তুজগতে শক্তির সন্ধান জানিয়েছিল ব'লে না। জগৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্ধতা ঘুচিয়েছিল ব'লে। বস্তু-সত্যের বিশ্বরূপ স্বীকার ক'র্‌তে সেদিন মানুষ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েছে। আজ সায়ান্স সেই যুগ পার ক'রে দিয়ে আর এক নবতর যুগের সম্মুখে মানুষকে দাঁড় করালে। বস্তুরাজ্যের চরম সীমানায় মূল তত্ত্বের দ্বারে তার রথ এলো। সেখানে সৃষ্টির আদি বাণী। প্রাচীন ভারতে মানুষের মন কর্ম্মকাণ্ড থেকে যেই এলো জ্ঞানকাণ্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এলো সৃষ্টির যুগ। মানুষের আচারকে লঙ্ঘন ক'রে আত্মাকে ডাক প'ড়লো। সেই আত্মা যন্ত্রচালিত কর্ম্মের বাহন নয়, আপন মহিমাতে সে সৃষ্টি করে। সেই যুগে মানুষের জাগ্রত চিত্ত ব'লে উঠেছিল, চিরন্তনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হ'লো বেঁচে যাওয়া; তার উল্‌টাই মহতী বিনষ্টি। সেই যুগের বাণী ছিল, "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

আর এক দিন ভারতে উদ্বোধনের বাণী এলো। সমস্ত মানুষকে ডাক প'ড়্‌লো,—বিশেষ সঙ্কীর্ণ পরামর্শ নিয়ে নয়, যে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে যায় তারি বাণী নিয়ে। সেই বাণী মানুষের চিত্তকে তার সমগ্র উদ্বোধিত শক্তির যোগে বিপুল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত ক'র্‌লে।

বাণী তাকেই বলি যা মানুষের অন্তরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে অভিব্যক্তির দিকে আহ্বান ক'রে আনে, যা উপস্থিত প্রত্যক্ষের চেয়ে অনাগত পূর্ণতাকে বাস্তবতর সত্য ব'লে সপ্রমাণ করে। প্রকৃতি পশুকে নিছক দিন-মজুরী ক'র্‌তেই প্রত্যহ নিযুক্ত ক'রে রেখেছে। সৃষ্টির বাণী সেই সঙ্কীর্ণ জীবিকার জগৎ থেকে মানুষকে এমন জীবনযাত্রায় উদ্ধার ক'রে দিলে যার লক্ষ্য উপস্থিত কালকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের কানে এলো—টিকে থাক্‌তে হবে, একথা তোমার নয়; তোমাকে বেঁচে থাক্‌তে হবে, সেজন্যে ম'র্‌তে যদি হয় সেও ভালো। প্রাণ যাপনের বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে যে-আলো জ্বলে সে রাত্রির আলো, পশুদের তাতে কাজ চলে। কিন্তু মানুষ নিশাচর জীব নয়।

সমুদ্রমন্থনের দুঃসাধ্য কাজে বাণী মানুষকে ডাক দেয় তলার রত্নকে তীরে আনার কাজে। এতে ক'রে বাইরে সে যে সিদ্ধি পায় তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি তার অন্তরে। এ যে দেবতার কাজে সহযোগিতা। এতেই আপন প্রচ্ছন্ন দৈব শক্তির পরে মানুষের শ্রদ্ধা ঘটে। এই শ্রদ্ধাই নূতন যুগকে মর্ত্ত্য সীমা থেকে অমর্ত্ত্যের দিকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যায়। এই শ্রদ্ধাকে নিঃসংশয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাঁর মধ্যে, যাঁর আত্মা স্বচ্ছ জীবনের আকাশে মুক্ত মহিমায় প্রকাশিত। কেবল মাত্র বুদ্ধি নয়, ইচ্ছাশক্তি নয়, উদ্যম নয়, যাঁকে দেখ্‌লে বোঝা যায় বাণী তাঁর মধ্যে মূর্ত্তিমতী।

আজ এইরূপ মানুষকে যে একান্ত ইচ্ছা করি তার কারণ, চার দিকেই আজ মানুষের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাস প্রবল। এই আত্ম-অবিশ্বাসই আত্মঘাত। তাই রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধিই আজ আর সকল সাধনাকেই পিছনে ঠেলে ফেলেছে। মানুষ বস্তুর মূল্যে সত্যকে বিচার ক'র্‌ছে। এম্‌নি ক'রে সত্য যখন হয় উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হয় আর কিছু, তখন বিষয়ের লোভ উগ্র হ'য়ে ওঠে, সে লোভের আর তর্‌ সয় না। বিষয়সিদ্ধির অধ্যবসায়ে বিষয়বুদ্ধি আপন সাধনার পথকে যতই সংক্ষিপ্ত ক'র্‌তে পারে ততই তার জিৎ। কারণ, তার পাওয়াটা হ'লো সাধনাপথের শেষ প্রান্তে। সত্যের সাধনায় সর্ব্বক্ষণেই পাওয়া। সে যেন গানের মতো, গাওয়ার অন্তে সে গান নয়, গাওয়ার সমস্তটার মধ্যেই। সে যেন ফলের সৌন্দর্য্য, গোড়া থেকেই ফুলের সৌন্দর্য্যে যার ভূমিকা। কিন্তু লোভের প্রবলতায় সত্য যখন বিষয়ের বাহন হ'য়ে উঠ্‌লো, মহেন্দ্রকে তখন উচ্চৈঃশ্রবার সহিসগিরিতে ভর্ত্তি করা হ'লো, তখন সাধনাটাকে ফাঁকি দিয়ে, সিদ্ধিকে সিঁধ কেটে নিতে ইচ্ছে করে, তাতে সত্য বিমুখ হয়, সিদ্ধি হয় বিকৃত।

সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন ব্যাপ্ত ক'রে রামচন্দ্রের একটি সাধনা সম্পূর্ণ হ'য়েছিল। যতই দুঃখ পেয়েছেন ততই গাঢ়তর ক'রে উপলব্ধি ক'রেছেন সীতার প্রেম। তাঁর সেই উপলব্ধি নিবিড় ভাবে সার্থক হয়েছিল যেদিন প্রাণপণ

যুদ্ধে সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আন্‌লেন।

কিন্তু রাবণের চেয়ে শত্রু দেখা দিল তাঁর নিজেরই মধ্যে। রাজ্যে ফিরে এসে রামচন্দ্র সীতার মহিমাকে রাষ্ট্রনীতির আশু প্রয়োজনে খর্ব্ব ক'র্‌তে চাইলেন,—তাঁকে ব'ল্‌লেন, সর্ব্বজন-সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষায় অনতিকালেই তোমার সত্যের পরিচয় দাও। কিন্তু একমুহূর্ত্তে জাদুর কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, তার অপমান ঘটে। দশজন সত্যকে যদি না স্বীকার করে, তবে সেটা দশজনেরই দুর্ভাগ্য, সত্যকে যে সেই দশজনের ক্ষুদ্র মনের বিকৃতি অনুসারে আপনার অসম্মান করতে হবে এ যেন না ঘটে। সীতা বল্‌লেন, আমি মুহূর্ত্তকালের দাবী মেটাবার অসম্মান মান্‌ব না, চিরকালের মতো বিদায় নেবো। রামচন্দ্র এক নিমিষে সিদ্ধি চেয়েছেন, একমুহূর্ত্তে সীতাকে হারিয়েছেন। ইতিহাসের যে উত্তরকাণ্ডে আমরা এসেছি এই কাণ্ডে আমরা তাড়াতাড়ি দশের মন-ভোলানো সিদ্ধির লোভে সত্যকে হারাবার পালা আরম্ভ ক'রেছি।

বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেনের দুর্লভ বাক্যরত্নের ঝুলি থেকে একদিন এক পুরাতন বাউলের গান পেয়েছিলুম। তার প্রথম পদটি মনে পড়ে :—

"নিঠুর গরজী, তুই কি মানস মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে?" যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনসাপেক্ষ, দশের সাম্‌নে অগ্নিপরীক্ষায় তার পরিণত সত্যকে আশুকালের গরজে সপ্রমাণ ক'র্‌তে চাইলে আয়োজনের ধূমধাম ও উত্তেজনাটা থেকে যায়, কিন্তু তার পিছনে মানসটাই অন্তর্দ্ধান করে।

এই লোভের চাঞ্চল্যে সর্ব্বত্রই যখন সত্যের পীড়ন চ'লেছে তখন এর বিরুদ্ধে তর্ক-যুক্তিকে খাড়া ক'রে ফল নেই; মানুষকে চাই; যে মানুষ বাণীর দূত, সত্য সাধনায় সুদীর্ঘ কালেও যাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, সাধনপথের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সত্যেরই অমৃত পাথেয় যাঁকে আনন্দিত রাখে। আমরা এমন মানুষকে চাই যিনি সর্ব্বাঙ্গীন মানুষের সমগ্রতাকে শ্রদ্ধা করেন। একথা গোড়াতেই মেনে নিতে হবে, যে, বিধাতার কৃপাবশতই সর্ব্বাঙ্গীন মানুষটি সহজ নয়, মানুষ জটিল। তার ব্যক্তি-রূপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহু বিচিত্র। কোনো বিশেষ অপ্রশস্ত আদর্শের মাপে ছেঁটে একঝোঁকা ভাবে তাকে অনেক দূর বাড়িয়ে তোলা চলে। মানুষের মনটাকে যদি চাপা দিই তবে চোখ বুজে গুরুবাক্য মেনে চলার ইচ্ছা তার সহজ হ'তে পারে। বুঝিয়ে বলার পরিশ্রম ও বিলম্বটাকে খাটো ক'রে দিতে পারলে মনের শক্তি বাড়ানোর চেয়ে মনের বোঝা বাড়ানো, বিদ্যালাভের পরিবর্ত্তে ডিগ্রি-লাভ সহজ হয়। জীবনযাত্রাকে উপকরণশূন্য করতে পারলে তার বহনভার ক'মে আসে। তবুও সহজের প্রলোভনে সবচেয়ে বড় কথাটা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে আমরা মানুষ, আমরা সহজ নই।

তিব্বতে মন্ত্রজপের ঘূর্ণিচাকা আছে। এর মধ্যে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় ব'লেই আমাদের মনে অবজ্ঞা আসে। সত্যকার মন্ত্রজপ একটুও সহজ নয়। সেটা শুদ্ধমাত্র আচার নয়, তার সঙ্গে আছে চিত্ত, আছে ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা। হিতৈষী এসে বল্‌লেন, সাধারণ মানুষের চিত্ত অলস, ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল, অতএব মন্ত্রজপকে সহজ কর্‌বার খাতিরে ঐ শক্ত অংশগুলো বাদ দেওয়া যাক্—কিছু না ভেবে না বুঝে শব্দ আওড়ে গেলেই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট। সজীব ছাপাখানার মতো প্রত্যহ কাগজে হাজারবার নাম লিখ্‌লেই উদ্ধার। কিন্তু সহজ কর্‌বার মধ্যেই যদি বিশেষ গুণ থাকে তবে আরো সহজইবা না করব কেন? চিত্তের চেয়ে মুখ চলে বেগে, মুখের চেয়ে চাকা, অতএব চলুক চাকা, মরুক চিত্ত।

কিন্তু মানুষের পন্থা সম্বন্ধে যে-গুরু বলেন, "দুর্গং-পথস্তৎ," তাঁকে নমস্কার করি। চরিতার্থতার পথে মানুষের সকল শক্তিকেই আমরা দাবী কর্‌বো। বহুলতা পদার্থটিই মন্দ, এই মতের খাতিরে বলা চলে যে, ভেলা জিনিষটাই ভালো, নৌকাটা বর্জ্জনীয়। এক সময়ে অত্যন্ত সাদাসিধে ভেলায় অত্যন্ত সাদাসিধে কাজ চ'ল্‌তো। কিন্তু মানুষ পার্‌লে না থাক্‌তে, কেন না সে সাদাসিধে নয়। কোনমতে স্রোতের উপর বরাৎ দিয়ে নিজের কাজ সংক্ষেপ ক'র্‌তে তার লজ্জা। বুদ্ধি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো, নৌকোয় হাল লাগালো, দাঁড় বানালে, পাল দিলে তুলে, বাঁশের লগি আন্‌লে বেছে, গুণ টান্‌বার উপায় ক'র্‌লে, নৌকোর উপর তার কর্তৃত্ব নানাগুণে নানাদিকে বেড়ে

গেলো, নৌকোর কাজও পূর্ব্বের চেয়ে হ'লো অনেক বেশি ও অনেক বিচিত্র। অর্থাৎ মানুষের তৈরী নৌকো মানব-প্রকৃতির জটিলতার পরিচয়ে কেবলি এগিয়ে চ'ল্‌লো। আজ যদি বলি নৌকো ফেলে দিয়ে ভেলায় ফিরে গেলে অনেক দায় বাঁচে, তবে তার উত্তরে ব'ল্‌তে হবে মনুষ্যত্বের দায় মানুষকে বহন করাই চাই। মানুষের বহুধা শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিতার্থকে কেবলি উদ্‌ঘাটিত করতে হবে—মানুষ কোথাও থাম্‌তে পাবে না। মানুষের পক্ষে "নাল্পেসুখমস্তি।" অধিককে বাদ দিয়ে সহজ করা মানুষের নয়, সমস্তকে নিয়ে সামঞ্জস্য করাই তার। কলকারখানার যুগে ব্যবসা থেকে সৌন্দর্য্য-বোধকে বাদ দিয়ে জিনিষটাকে সেই পরিমাণে সহজ ক'রেছে, তাতেই মুনফার বুভুক্ষা কুশ্রীতায় দানবীয় হ'য়ে উঠ্‌লো। এদিকে মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল ঘানি ঢেঁকি থেকে বিজ্ঞানকে চেঁচে মুছে ফেলায় ওগুলো সহজ হ'য়েছে, সেই পরিমাণে এদের আশ্রিত জীবিকা অপটুতায় স্থাবর হ'য়ে রইলো, বাড়েও না এগিয়ে চলেও না, নড়্‌বড়্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কোন মতে টিকে থাকে। তার পরে মার খেয়ে মরে শক্ত হাতের থেকে। প্রকৃতি পশুকেই সহজ ক'রেছে, তারই জন্য স্বল্পতা; মানুষকে ক'রেছে জটিল, তার জন্যে পূর্ণতা। সাঁতারকে সহজ করতে হয় বিচিত্র হাত-পা-নাড়ার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে; হাঁটুজলে কাদা আঁকড়ে অল্প পরিমাণে হাত-পা ছুঁড়ে নয়। ধনের আড়ম্বর থেকে শুরু আমাদের বাঁচান, দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্য্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরব-বোধকে জাগ্রত ক'রে।

এই সমস্ত কথা ভাবছি এমন সময় আমাদের ফরাসী জাহাজ এলো পণ্ডিচেরী বন্দরে। ভাঙা শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট ক'রেই নাম্‌তে হ'লো—তা হোক্, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম,—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন ব'ল্‌লে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বাল্‌বেন। কথা বেশি বল্‌বার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হ'লো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণা-শক্তি পুঞ্জিত। কোনো খর-দস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্য যুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে ব'লে এলুম,—আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আস্‌বেন এই অপেক্ষায় থাক্‌বো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজ্‌বে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হ'য়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হ'য়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়,—আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

শান্তিলি জাহাজ
২৯ মে ১৯২৮

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি

[শ্রী জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

(১)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। কিছুদিন হইতে বাংলা দেশের যুবকদের ভাব-গতিক দেখিয়া বড়ই হতাশ হইতেছিলাম। স্বদেশ-ভক্তির নাম লইয়া বিচার-বুদ্ধির অন্ধতা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন-কি আমার এই বিদ্যালয়ে অল্পবয়সের যে-সব ছাত্র আসে তারাও এমন একটা বিরুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া আসে যে হার মানিতে হয়। যে-মূঢ়তা স্বাভাবিক তার প্রতিকার আছে। কিন্তু যে-মূঢ়তা কৃত্রিম,—যাহা জোর করিয়া কোমর বাঁধিয়া সর্ব্বত্র তাল ঠুকিয়া বেড়ায়, তার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। আমি একরকম হাল ছাড়িবার চেষ্টাতেই ছিলাম, এমন সময় এই বক্তৃতার ["কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"] তাগিদ আসিল। আর যাই হোক একটা দেখিলাম, রাক্ষসটাকে যত প্রকাণ্ড প্রবল বলিয়া মনে হইত উহার জোর ততটা নয়। উহার আয়তন বড়, কিন্তু ভিতরটা ভুয়ো। একটু ধাক্কা মারিলেই দেখি টলমল করিয়া উঠে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না কাৎ হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে ধাক্কা মারিবার সঙ্কল্প রহিল। দূর হইতে আপনাদের উৎসাহবাণী কাজে লাগিবে। ইতি ৬ই ভাদ্র, ১৩২৪

ভবদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সাদরনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার চিঠিখানি পড়িয়া বড় আনন্দিত হইলাম। আমি আমাদের দেশের মানসিক কারাবাসকে রাষ্ট্রীয় অধীনতার চেয়ে বড় দুর্গতির লক্ষণ বলিয়া মনে করি এবং সে-কথা নানা উপলক্ষ্যে বারবার বলিয়া থাকি। এমনি করিয়া বাংলা দেশের লোককে আমার প্রতিকূল করিয়া তুলিয়াছি। এইজন্য আপনাদের কাছ হইতে আমার মত ও চেষ্টা সম্বন্ধে যখন সম্মতি পাই তখন বড় আরাম বোধ করি। আমাদের সমাজে অনেক দিন হইতে উজান স্রোত ঠেলিয়া চলিয়াছি। আজকাল কখনো কখনো ছুটির জন্য মন ব্যাকুল হয়; কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি শেষ পর্য্যন্ত ছুটি মঞ্জুর হইবে না, কারণ কাজের অন্ত নাই। অনেক দিন লিখিবার সময় পাই নাই বটে, কিন্তু অন্য আকারে কাজ করিতে হইতেছে। আমার কাজের ধারা একই, তাহার লক্ষ্যও এক—কাজেই দেশের লোকের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমাকে একলাই চলিতে হইবে। আমার দ্বারা দেশের স্তব, দেশের লোকের জয়-গান হইবে না, অতএব দিন গতে আমার মজুরী মিলিবে না। কিন্তু নিজের জয়-পরাজয়ের বিচার না করিয়া সত্যের সুনিশ্চিত সফলতার প্রতি আস্থা রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত যেন স্থির থাকিতে পারি এই আমার কামনা।। ইতি ৬ই ভাদ্র, ১৩২৯

ভবদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতার অক্ষর ও ব্রহ্ম

মহেশচন্দ্র ঘোষ

উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রে পরমাত্মাকেই অক্ষর এবং ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। গীতাতে এবিষয়ে দুইটি বিরোধী মত দৃষ্ট হয়। গীতাকার উপনিষদাদির মতও গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন স্থলে অক্ষর ও ব্রহ্মকে নিম্নতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। আলোচনা করিয়া দেখা যাউক গীতাকারের প্রকৃত মত কি

অক্ষর তত্ত্ব

অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিম্নে সমগ্র অংশই বিশ্লেষিত হইল।

(ক)

তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে 'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্' অর্থাৎ অক্ষরই পরম ব্রহ্ম। ৮।৩

'ক্ষর' শব্দের অর্থ বিনাশশীল বা পরিবর্ত্তনশীল যাহা 'ক্ষর' নহে তাহাই অক্ষর; সুতরাং 'অক্ষর' অর্থ অব্যয়, অবিনাশী।

(খ)

একাদশ শ্লোক 'অক্ষর' বিষয়ক। এই শ্লোকটি বুঝিতে হইলে ইহার পূর্ব্বে তিনটি শ্লোকের বিষয়ও জানা আবশ্যক। শ্লোক তিনটি এই :—

"অভ্যাসরূপ যোগে যুক্ত হইয়া অনন্যগামী চিত্ত দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে দিব্য পরম পুরুষকে (পরমং পুরুষং দিব্যম্) লাভ করা যায়। ৮।৮

অন্ধকারের পরপারে (অবস্থিত) আদিত্য বর্ণ, অচিন্ত্য রূপ, সকলের বিধাতা, অণু হইতে অণুতর জগতের প্রশাসিতা, সেই পুরাতন কবিকে যে ব্যক্তি স্মরণ করেন, তিনি প্রয়াণকালে অবিচলিত চিত্তে ভক্তি দ্বারা এবং যোগবলে ভ্রূযুগল মধ্যে প্রাণকে সম্যক্ রূপে আবিষ্ট করিয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন (পরম্ পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্)"। ৮.৯, ১০

এই তিনটি শ্লোকে পরম্ পুরুষের কথা বলা হইল। বলা বাহুল্য যে 'পরম পুরুষ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কেহ নাই।

(গ)

ইহার পরেই 'অক্ষর' বিষয়ক শ্লোক। অনুবাদ এই—

"বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে "অক্ষর' (অক্ষরম্) বলেন, বীতরাগ যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করে, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় (ব্রহ্মচারিগণ) ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, আমি তোমাকে সেই পদ বিষয়ে উপদেশ দিতেছি"। ৮।১১

অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, একাদশ শ্লোকেও নিশ্চয়ই তাঁহার কথাই বলা হইল। পূর্ব্বে তিনটি শ্লোকে যাঁহাকে 'পরম পুরুষ' বলা হইয়াছে, এ শ্লোকে তাঁহাকেই বলা হইল "অক্ষর"।

বেদবিদ্‌গণ কাহাকে 'অক্ষর' বলেন? বীতরাগ যতিগণ তাহাতে প্রবেশ করেন? ব্রহ্মচারিগণ কাহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন? তিনি কে? না, পরম পুরুষ, যাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই সেই পরমপুরুষই অক্ষর।

(ঘ)

এই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার একটি উপায় যোগ ধারণা। দ্বাদশ শ্লোকে এই যোগ ধারণার কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরের শ্লোক এই :—

"ব্রহ্মবাচক 'ওম্' এই অক্ষরটি উচ্চারণ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে-ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সে পরমা গতি লাভ করে"। ৮.১৩

এ স্থলে বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরমাত্ম রূপে পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হইল যে, মৃত্যুর সময় যে 'ওম্' উচ্চারণ করিয়া পরমাত্মাকে স্মরণ করে, তাহার পরমাগতি লাভ হয়।

একাদশ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, আমি 'অক্ষর' প্রাপ্তির উপায় বলিব। ইহার পরের দুই শ্লোকে পরমাত্মাকে লাভ করিবার উপায় বলা হইল। সুতরাং বুঝিতে হইবে পরমাত্মাই 'অক্ষর'।

ইহার পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোক এই :—

যে অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে নিত্য স্মরণ করে, সেই নিত্য যুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। ৮।১৪

মহাত্মগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করে; তাহারা আর দুঃখপূর্ণ অশাশ্বত জন্ম লাভ করে না। ৮।১৫

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকই পুনরাবর্ত্তন করে। হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৮।১৬

একাদশ শ্লোকে যাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'অক্ষর' এই তিনটি শ্লোকে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার কথা বলা হইল। যাঁহাকে লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না (৮।১৪,১৫), তিনিই পরমাত্মা, পরম পুরুষ, তিনিই অক্ষর।

(৬)

১৭,১৮ ও ১৯ সংখ্যক শ্লোকে ব্রহ্মার দিন রাত্রি এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে। প্রলয়-কালে সমুদায়ই অব্যক্তে লীন হয়। এই 'অব্যক্ত' 'প্রকৃতি'ই একটি নাম। ইহার পরের শ্লোক এই :—

"সেই অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ যে অন্য একটি অব্যক্ত সনাতন ভাব (আছে) তাহা সমুদায় ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না"। ৮।২০

ইহার পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে :—

"(এই) অব্যক্তই অক্ষর" এইরূপ উক্ত হয়। তাহাকে পরমা গতি বলা হয়। যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। ৮।২১

অক্ষর প্রাপ্তি হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। সুতরাং অক্ষরই পরমাত্মা।

একাদশ শ্লোকে যে অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকেও সেই অক্ষরের কথাই বলা হইল। এই অক্ষরই 'পরমাগতি'। সুতরাং অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই।

এই প্রসঙ্গেই পরের শ্লোকে পরম পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। শ্লোকটি এই :—

"হে পার্থ! ভূত-সমূহ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, এবং যাহার দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত, সেই পরম পুরুষ (পুরুষঃ পরঃ) অনন্য ভক্তি দ্বারাই লভ্য"। ৮।২২

এ স্থলেও 'অক্ষর' কে লক্ষ্য করিয়াই "পরম পুরুষ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে এই স্থলেই অক্ষর তত্ত্ব শেষ হইয়াছে। আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

১। অক্ষরকে লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

২। অক্ষরই পরমাগতি।

৩। অক্ষরই পরব্রহ্ম এবং পরম পুরুষ।

(২)

একাদশ অধ্যায়ে 'অক্ষর' বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোকটিতে অর্জ্জুন কৃষ্ণরূপী ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন :—

"তুমিই বেদিতব্য পরম অক্ষর (ত্বম্ অক্ষরম্ পরমম্ বেদিতব্যম্); তুমি অব্যয় ও শাশ্বত; এবং ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; তুমি সনাতন পুরুষ – ইহাই আমার মত। ১১।১৮

এস্থলে বলা হইল যিনি পরমাত্মা, তিনিই অক্ষর।

এই অধ্যায়েরই অপর এক স্থলে এইরূপ আছে :—

"হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি সৎ (=ব্যক্ত) এবং অসৎ (=অব্যক্ত) এবং এ সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ যে 'অক্ষর' তাহাও তুমি"। ১১।৩৭

অক্ষর 'সৎ' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, 'অসৎ' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই অক্ষরই পরমাত্মা।

(৩)

দ্বাদশ অধ্যায়ে অক্ষরের উপাসনা বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

সততযুক্ত ভক্তগণ তোমার উপাসনা করে, আর এক শ্রেণীর সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে—এই দুই শ্রেণীর উপাসকদিগের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর উপাসক শ্রেষ্ঠ যোগী? ১২।১

ইহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন :—

'আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া, নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত যাহারা আমাকে উপাসনা করে, তাহারা যুক্ততম—আমি ইহাই মনে করি। ১২।২

কিন্তু যাহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া এবং সর্ব্বভূতে রত থাকিয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব অক্ষরকে উপাসনা করে তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ১২।৩,৪

সেই অব্যক্তাসক্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়; কারণ দেহিগণ দুঃখেই অব্যক্তাগতি প্রাপ্ত হয় ১২।৫

এস্থলে বলা হইয়াছে যে, অক্ষরই অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল এবং ধ্রুব। এসমুদায় পরমাত্মা বা পরব্রহ্মেরই বিশেষণ। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, অক্ষরই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম।

উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকে জ্ঞানপথের সহিত ভক্তিপথের তুলনা করা হইয়াছে। জ্ঞানপথে দুঃখ অনেক, কিন্তু ভক্তি-

পথ সহজ। ভক্তি-পথাবলম্বিগণের লক্ষ্য সগুণ ব্রহ্ম এবং জ্ঞান-পথাবলম্বিগণের লক্ষ্য অক্ষর ব্রহ্ম। ভক্তিপথ সহজ হইতে পারে, কিন্তু এই স্থলে এমন কোন কথা নাই যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, নির্গুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ। বরং এস্থলে উভয়ের একত্বই স্থাপন করা হইয়াছে। কৃষ্ণরূপী ভগবান্ বলিলেন—"যে অক্ষরকে উপাসনা করে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" অক্ষরকে উপাসনা করিলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, অক্ষর ও ভগবান্ একই। আর গীতার একটি বিশেষ মত এই যে, যে যাঁহার উপাসনা করে সে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। একস্থলে ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন—"দেবযাজিগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়" ৭।২৩। অন্যত্র বলিয়াছেন—"দেবব্রতগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, পিতৃব্রতগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়, ভূতপূজকগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়, এবং আমার পূজকগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়" ৯।২৫। সুতরাং যখন বলা হইল অক্ষরের উপাসকগণ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় (১২।৩,৪), তখন বুঝিতে হইবে অক্ষর এবং ভগবান্ একই।

অক্ষর বিষয়ক বিভিন্ন স্থল আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, যিনি অক্ষর তিনিই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম।

অক্ষরের নিম্নস্থান

কিন্তু পঞ্চদশ অধ্যায়ের তিনটি শ্লোকে অক্ষরকে নিম্নতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। শ্লোক তিনটি এই :—

সংসারে ক্ষর এবং অক্ষর এই দুইটি পুরুষ। সর্ব্বভূতকে ক্ষর এবং কূটস্থকে অক্ষর বলা হয়। ১৫।১৬

অন্য একজন উত্তম পুরুষ আছেন—যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, যিনি অব্যয় ও ঈশ্বর ; এবং যিনি অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া লোকত্রয়কে ধারণ করেন। ১৫।১৭

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম—এইজন্য লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত হই।১৫।১৮

এই অংশ অবৈদান্তিক ; অথচ ইহা গীতার অঙ্গীভূত। ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ ইহার বৈদান্তিক ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ইহাকে আরও দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এই তিনটি শ্লোকের অর্থ বিষয়ে আমাদিগের মন্তব্য এই :—

(১) যাহা বিনাশশীল, বা পরিবর্ত্তনশীল, তাহাই 'ক্ষর'। জড় প্রকৃতিকে ক্ষর বলা যাইতে পারে এবং এখানে জড় প্রকৃতিকেই ক্ষর বলা হইয়াছে। বেদান্তে, সাংখ্যে এবং গীতার অপরাপর স্থলে পুরুষ অক্ষর (অর্থাৎ অবিনাশী, অবিকারী)। অথচ এই স্থলে 'ক্ষর'-কেও পুরুষ বলা হইয়াছে।

(২) কূটস্থকে অক্ষর বলা হইয়াছে। 'কূট' শব্দের বহু অর্থ।

(ক) কূট=পর্ব্বত, পর্ব্বতশৃঙ্গ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান, স্তূপ।

সুতরাং কূটস্থ শব্দের অর্থ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় অচল, স্তূপের ন্যায় স্থির।

গীতার আরও দুইটা স্থলে 'কূটস্থ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। একস্থলে (৬।৮) যুক্তযোগীকে জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা, বিজিতেন্দ্রিয়, সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন, ও কূটস্থ বলা হইয়াছে।

আর একস্থলে (১২।৩) অক্ষরকে অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, অচল ধ্রুব এবং কূটস্থ বলা হইয়াছে। উভয় স্থলেই কূটস্থ অর্থ "অচল"।

পালিগ্রন্থে অচল, নির্ব্বিকার ও স্থির বস্তুকে কূটস্থ (কূটট্‌ঠ) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (দীঘ ১।১৪, ১।৫৬ ; মজ্‌ঝিম ১।৫১৭ ; সংযুত্ত ৩।২১১ ইংলণ্ডের সংস্করণ)। টীকাকার ও অনুবাদকগণের অর্থ 'পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় অচল'।

(খ) শঙ্করাচার্য্য বলেন কূট, মায়া, বঞ্চনা, জিহ্মতা, কুটিলতা সমপর্য্যায়ের কথা। সুতরাং যিনি মায়াতে অবস্থিত, মায়া যাঁহার উপাধি, বা যিনি মায়ার ঈশ্বর, তিনিই কূটস্থ।

গীতার অপরাপর অংশে অক্ষর ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমপুরুষ ইত্যাদি একার্থ সূচক ; ইহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা হয় নাই। কূটস্থ শব্দের প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হয় কূটস্থ অক্ষরই পরমাত্মা বা পরমপুরুষ। তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অন্য

এক পুরুষোত্তমের কল্পনা করা অনর্থক হইয়া পড়ে। গীতাতে কিন্তু 'পুরুষোত্তম' নামক তৃতীয় পুরুষের কল্পনা করা হইয়াছে (১৫।১৮)। প্রকৃত পক্ষে কূটস্থ অক্ষরই পুরুষোত্তম। গীতাতে যে অক্ষরকে হীন করিয়া নূতন পুরুষোত্তমবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ইহার বিশেষ কারণ আছে।

কূটস্থ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে সমগ্র অংশের একটা সঙ্গত অর্থ করা সম্ভব। কূটস্থ যদি মায়া যুক্ত ঈশ্বর হন, তাহা হইলে পুরুষোত্তম হইবেন মায়ার অতীত তুরীয় ব্রহ্ম। কিন্তু এই প্রকার অর্থ অপ্রচলিত।

(৩) অষ্টাদশ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "আমি বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত হই"। কথাটা ঠিক নহে। কোন বেদের কোন শাখাতেই কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণরূপী ভগবান্‌কে বা পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা হয় নাই। প্রধান এবং প্রাচীন উপনিষৎ বার খানা; এই সমুদায় উপনিষদের কোন স্থলেই বলা হয় নাই যে, পরমাত্মা বা আর কেহ পুরুষোত্তম। 'পুরুষোত্তম' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থলে (৮।১২।৩) "উত্তমঃ পুরুষঃ" এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এ উত্তম পুরুষ পরমাত্মা নহেন। শরীরী আত্মা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরম জ্যোতিঃ সম্পন্ন হইলে তাহাকে উত্তম পুরুষ বলা হয়—ইহাই ঐ স্থলে (৮।১২।৩) উক্ত হইয়াছে।

প্রকৃত কথা এই—'পুরুষোত্তম' শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ নাম। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে নামটি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পুরুষোত্তম বলিলেই ইঁহারা বুঝেন শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ বা বাসুদেব ইত্যাদি। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ আছে। বৈষ্ণব পুরাণ এবং সাম্প্রদায়িক উপনিষদেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

গীতার 'পুরুষোত্তম'বাদ একটি বৈষ্ণব মত; ইহা বৈদান্তিক মত নহে।

অন্যত্র 'ক্ষরাক্ষর' বাদ

মহাভারতের কয়েকটি শ্লোকে ক্ষরাক্ষর তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। শ্লোক কয়েকটি এই :—

অক্ষরঞ্চ ক্ষরঞ্চৈব দ্বৈধীভাবোঽয়মাত্মনঃ।
ক্ষরঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু দিবি * হ্যমৃতমক্ষরম্‌॥
(২৩৮।৩১, কলিকাতা সং)

অর্থাৎ আত্মার দুই ভাব—ক্ষর এবং অক্ষর। ভূতসমূহে 'ক্ষর' এবং দিব্যলোকে 'অক্ষর'।

নবদ্বারং পুরং গত্বাহংসোহি নিয়তো বশী।
ঈশঃ সর্ব্বস্য ভূতস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।
২৩৮।৩২

(যিনি) স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, অচঞ্চল ও বশী, (তিনি) নবদ্বারযুক্ত পুরে (অর্থাৎ মানবদেহে) প্রবেশ করিয়া হংস (নামে খ্যাত হন)।

পরের শ্লোক উদ্ধৃত হইল না; অজ পরমেশ্বরকে কেন 'হংস' বলা হয় তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরের শ্লোক এই :—

হংসোক্তং চাক্ষরঞ্চৈব কূটস্থং যত্তদক্ষরম্‌।
তদ্বিদ্বানক্ষরং প্রাপ্য জহাতি প্রাণ জন্মনী
২৩৮।৩৪

"যিনি হংস নামক অক্ষর, তিনিই কূটস্থ অক্ষর; জ্ঞানবান এই অক্ষরকে লাভ করিয়া প্রাণ ও জন্মের অতীত হয়।"

এই স্থলে কূটস্থ, অক্ষর, এবং পরমাত্মা একই। ইহা উপনিষদেরই অদ্বৈতবাদ। এই মতই পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। গীতাতে প্রথম শ্লোকটি পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। আর ক্ষরাক্ষরবাদের যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা গুরুতর। শান্তিপর্ব্বের ক্ষরাক্ষরতত্ত্ব অদ্বৈতবাদ; গীতাতে ইহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে ত্রিত্ববাদ। এই অংশের ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম তিনটি পৃথক সত্তা।

আমাদিগের মনে হয় মৌলিক গীতাতে এই অংশ ছিল না। প্রাচীনকালেই কোন বৈষ্ণব সম্পাদক ঐ গ্রন্থকে নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূলভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে অনেক স্থলে নূতন নূতন শ্লোক গ্রথিত করিতে হইয়াছিল। 'ক্ষরাক্ষর' সংক্রান্ত শ্লোক-সমূহও এই শ্রেণীর। প্রক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্য—

* কলিকাতা সংস্করণের পাঠ 'দিব্যম্‌'। আমরা 'কুম্ভকোণম্‌' সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করিলাম।

বৈষ্ণবমত প্রচার। কেবল ক্ষরই যে পুরুষোত্তমের নিম্নে তাহা নহে, কূটস্থ অক্ষরও পুরুষোত্তম অপেক্ষা হীনতর; অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পুরুষোত্তম উপনিষদ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে গীতার মৌলিক মতের কোন ব্যত্যয় ঘটে না। এ অংশ পরিবর্জ্জন করিলে গীতা অঙ্গহীন হয় না, গীতার অন্য কোন মত এই অংশের উপর নির্ভর করে না, গীতার অন্য কোন অংশে ইহার অনুরূপ মত পাওয়া যায় না বরং বিরোধী মতই পাওয়া যায় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহের সহিত এই অংশের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই; সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, এই অংশ প্রক্ষিপ্ত।

ব্রহ্মতত্ত্ব

আত্মতত্ত্ব ও অক্ষরতত্ত্ব আলোচনা করিবার পর আর ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক হয় না, কারণ আত্মা, অক্ষর এবং ব্রহ্ম একই। কিন্তু গীতাতে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে মতভেদ আছে—সেইজন্য পৃথক্ ভাবেই এ তত্ত্বের বিচার করা যাইতেছে।

ব্রহ্মবিষয়ে প্রধান অংশ এই :—

"যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি—যাহা জানিলে অমৃত (অর্থাৎ মোক্ষ) লাভ হয়। তিনি আদিবিহীন, পরব্রহ্ম; তিনি সৎ (অর্থাৎ দেশে কালে ব্যক্ত বস্তু) নহেন এবং অসৎও (অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীনও) নহেন। ১৩।১৩

তিনি সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্রচক্ষু, শির ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র কর্ণবিশিষ্ট, তিনি লোকমধ্যে সমুদায়কে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। ১৩।১৪

তিনি সকল ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের আভাসযুক্ত, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত, অসক্ত অথচ সর্ব্বভৃৎ, নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা। ১৩।১৫

তিনি ভূতগণের বাহির এবং অন্তর, অচর এবং চর, সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন অবিজ্ঞেয়, দূরস্থ এবং নিকটস্থ। ১৩।১৬।

তিনি ভূত-সমূহের মধ্যে অবিভক্ত অথচ বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত; সেই জ্ঞেয় (বস্তু) ভূতগণের পালক, গ্রাসকারী এবং উৎপত্তিশীল (বা উৎপাদনশীল)। ১৩।১৭

চতুর্দ্দশ শ্লোকটি (১৩।১৪) শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ হইতে গৃহীত (৩।১৬)। ঐ স্থলে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ মন্ত্রটি রচিত হইয়াছে। মন্ত্রটি এতই প্রিয় হইয়াছে যে, মহাভারতের বহু স্থলে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে (শান্তি ২৩৮৷২৯; ৩১২।১৪; অনু ১৪।৪১৮—৪১৯; অশ্ব ১৯,৪৯; ৪০।৪ ইত্যাদি)।

১৩।১৫ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ হইতে গৃহীত (৩।১৭)।

উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকই অতি উপাদেয়; এই স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম পরম সত্তা; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ হইতে পারে না।

ব্রহ্মই লক্ষ্য

বহু স্থলে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কয়েকটি স্থল এই—

(ক)

যোগযুক্ত মুনি অবিলম্বে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় (ব্রহ্ম ন চিরেন অধিগচ্ছতি)। ৫।৬

(খ)

মৃত্যুর পরে কেহ দক্ষিণায়ণ পথে কেহ বা উত্তরায়ণ পথে গমন করে। 'উত্তরায়ণ'ই শ্রেষ্ঠ পথ। যাঁহারা এই পথে গমন করেন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই বিষয়ে গীতাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"সেই মার্গে অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথে গমন করিলে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্ম লাভ করে"। ৮,২৪

(গ)

এক স্থলে বলা হইয়াছে যে সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় (ব্রহ্ম আপ্নোতি)। ১৮৷৫০

(ঘ)

আর-এক স্থলে এইরূপ আছে—যখন সাধক ভূতগণের পৃথক্ ভাবকে একস্থ (অর্থাৎ একেতে স্থিত) বলিয়া অবলোকন করে এবং তাঁহা হইতেই ভূতগণের বিস্তার (অর্থাৎ উৎপত্তি) অবলোকন করে। তখন সে ব্রহ্ম হয় (ব্রহ্ম সম্পদ্যতে)। ১৩,৩১

'ব্রহ্ম সম্পদ্যতে' বাক্য অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে;

ইহার অর্থ 'ব্রহ্ম হয়' 'ব্রহ্ম লাভ করে' ইত্যাদি মহাভারতের বহু স্থলে এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে (শান্তি ২১।৫ ; ২৬।:৪, ১৫ ; ৬৬।৩৮ ; ২৩৮।২১ ; ২৬১.১৫,১৬ ; ৩২৮ ৩৩ ইত্যাদি)। ব্রহ্মই পরম বস্তু ; এইজন্য ব্রহ্মত্ব লাভকে লক্ষ্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৬)

গীতাতে 'ব্রহ্মভূত' শব্দ তিনবার (৫।২৪ ; ৬।২৭ ; ১৮। ৫৪), ব্রহ্মভূয় দুই বার (১৪.২৬ ; ১৮।৫৩), ব্রহ্ম নির্ব্বাণ চারিবার ২.৭২ ; (৫.২৪,২৫,২৬) এবং 'ব্রাহ্মী স্থিতি' একবার (২ ৭২) ব্যবহৃত হইয়াছে। এ সমুদায়ের অর্থ ব্রহ্মত্বলাভ, ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্তি, ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ, ব্রহ্মে অবস্থিতি ইত্যাদি। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিই সমুদায় সাধনার লক্ষ্য ; এবং ইহাতেই সমুদায় সাধনার পরিসমাপ্তি। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অবস্থা নাই ; সুতরাং ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর বস্তু নাই। ব্রহ্ম পরম বস্তু ; এইজন্যই ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য এত সাধনা।

ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ

সর্ব্বত্রই ব্রহ্মকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু একটি স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্থলটা এই :—

"আমি অমৃত অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (ব্রহ্মণ হি প্রতিষ্ঠা)এবং শাশ্বত ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা"। ১৪ ২৭

কেহ কেহ ইহার প্রথম অংশের এইরূপ অর্থ করেন—

"আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অব্যয় অমৃতেরও (অর্থাৎ মোক্ষেরও) প্রতিষ্ঠা"।

এই অংশের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ ; সুতরাং এস্থলে বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ ব্রহ্মেরও আশ্রয়-ভূমি।

আমাদিগের ধারণা, এই শ্লোক কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ-প্রকার বলিবার কারণ এই :—

(১) গীতার অন্য কোন স্থলেই ব্রহ্মকে কৃষ্ণ অপেক্ষা হীন করা হয় নাই। অনেক স্থলে কৃষ্ণও আপনাকে ব্রহ্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। একস্থলে কৃষ্ণকে 'পরব্রহ্ম' ও বলা হইয়াছে (১০।১২)। কিন্তু কোন স্থলেই বলা হয় নাই যে, কৃষ্ণ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গীতাতে 'ব্রহ্ম' শব্দ বিভিন্ন বিভক্তিতে ২৮ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩টা স্থলে 'ব্রহ্মা' অর্থে, দুইটা স্থলে 'বেদ' অর্থে, একটি স্থলে 'ওম্' অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। একটি স্থলে 'বেদ' বা 'ব্রহ্ম'—ইহার যে-কোন অর্থই হইতে পারে। অবশিষ্ট ২১টি স্থলের ব্রহ্ম বেদান্তের ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মা। এই সমুদায় স্থল পড়িলে এপ্রকার সন্দেহই আসিতে পারে না যে-ব্রহ্ম কৃষ্ণ অপেক্ষা হীন।

(২) যে শ্লোক লইয়া বিচার চলিতেছে তাহার পূর্ব্বের শ্লোক এই :—

"যে-ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগদ্বারা আমাকে সেবা করে, সে-ব্যক্তি গুণসমূহ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবের যোগ্য হয় (ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)"। ১৪ ২৬

এস্থলে বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। বলা হইতেছে যে, কৃষ্ণকে ভক্তি করিলে ভক্ত ব্রহ্মত্ব লাভ করে। সাধারণ ভাবে বিচার করিলে প্রমাণিত হয় যে, এস্থলে কৃষ্ণ ও ব্রহ্মের একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে (অক্ষর তত্ত্বের 'ত' অংশ এবং উক্তস্থলে উদ্ধৃত ৭।২৩ ও ৯.২৫ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু সূক্ষ্মতর ভাবে বিচার করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কৃষ্ণভাব অপেক্ষা ব্রহ্মভাব শ্রেষ্ঠ। উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 'ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি'ই (ব্রহ্মভূয়) লক্ষ্য ; ইহার উপায় কৃষ্ণভক্তি। যাহা লক্ষ্য তাহাই শ্রেষ্ঠতর ; লক্ষ্য অপেক্ষা পথ শ্রেষ্ঠ হয় না।

কৃষ্ণকে ভক্তি করিলে ব্রহ্মকে লাভ করা যায় এ-প্রকার বলিলে ব্রহ্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। কেহ এ-প্রকার বলে না যে "পরব্রহ্মের উপাসনা কর, তাহা হইলে তুমি অপর ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে।" বরং ইহাই বলা যাইতে পারে যে, "অপর ব্রহ্মের উপাসনা কর, তাহা-হইলেও তুমি পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিবে।" ক্ষুদ্র উপায়ে মহৎ বস্তু লাভের উপদেশ দেওয়া যায় ; কেহ মহৎ উপায়ে ক্ষুদ্রবস্তু লাভের উপদেশ দেয় না।

এই শ্লোকে যে ব্রহ্মভাবকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেওয়া হইয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বৈষ্ণব সাধকগণের মনঃপূত হয় নাই। ব্রহ্মকে হীন করিয়া

কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ করা আবশ্যক হইয়াছিল। এইজন্য কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ইত্যাদি অংশ সংযোজন করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, এই শ্লোকে 'ব্রহ্ম' অর্থ 'অপর ব্রহ্ম'। এ অর্থ যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথম কারণ এই যে, কৃষ্ণ 'অপর ব্রহ্ম' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এপ্রকার বলিবার কোন সার্থকতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যদি 'অব্যয়' ও 'অমৃত'-কে ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে এই 'অব্যয় অমৃত ব্রহ্ম' পরব্রহ্মই। তৃতীয়তঃ, পূর্ব্ব শ্লোকের (১৪।২৬) 'ব্রহ্মভূয়' শব্দের সহিত এই ব্রহ্ম শব্দের (১৪।২৭) যোগ রহিয়াছে। ঐ শ্লোকে (১৪।২৬) বলা হইয়াছে যে, ভক্তিমান্ ব্যক্তি ব্রহ্মের ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহার পর এই শ্লোকে (১৪।২৭) বলা হইল কৃষ্ণ ঐ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এস্থলে 'ব্রহ্মভূয়' শব্দের অর্থ অবশ্যই অপর-ব্রহ্ম প্রাপ্তি নহে—এপ্রাপ্তি পরব্রহ্ম প্রাপ্তি। পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া যখন 'ব্রহ্মভূয়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে শেষ শ্লোকের 'ব্রহ্ম' ও পরব্রহ্মই। কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা পরব্রহ্ম প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ হইবে, বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ এ-ভাব পছন্দ করেন নাই। এ-ভাবকে ব্যাহত করিবার জন্যই ঐ শ্লোকের (১৪।২৭) রচনা।

বর্ত্তমান যুগেও একশ্রেণীর বৈষ্ণব-পণ্ডিত আছেন যাঁহারা মনে করেন পরব্রহ্ম অপেক্ষা কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণ, গোবিন্দ বা বাসুদেবই পরম সত্তা এবং ইনিই পুরুষোত্তম। তাঁহারা বলেন, উপনিষদের ব্রহ্ম তাঁহারই 'তনুভা' অর্থাৎ অঙ্গকান্তি। প্রাচীনকালেও এই শ্রেণীর লোকের অভাব ছিল না। গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকই (১৪। ২৭) তাহার প্রমাণ।

উপসংহার

অক্ষর এবং ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।

১। অক্ষর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরম পুরুষ ইত্যাদি সমপর্য্যায়ের কথা। একই সত্তার এই সমুদায় নাম।

২। 'ক্ষরাক্ষর' বিষয়ক শ্লোক-সমূহ (১৫।১৬-১৮) এবং ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বিষয়ক শ্লোকটি (১৪.২৭) প্রক্ষিপ্ত। এই দুইটি অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে—গীতাতে আত্ম-বিরোধ আছে।

বীরভূমের কৃষি-কথা

শ্রী গৌরীহর মিত্র

বীরভূমের অবস্থান

বীরভূম জেলার আকৃতি ঠিক ইংলণ্ড দেশের অনুরূপ। এই জেলা অন্যান্য জেলা অপেক্ষা আয়তনে তাদৃশ বৃহৎ নহে। ইহার আয়তন ১৭৫২ বর্গমাইল (১১২১৯২০ একর, ৬৪০ একর =১ বর্গমাইল)। এই জেলা সমুদ্রতীর হইতে সোজাসুজি ভাবে প্রায় দেড়শত মাইল দূরে বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে অবস্থিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লুপ-লাইন ইহার উপর দিয়া ঠিক মাঝামাঝি ভাবে দক্ষিণ হইতে পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। আর একটি লাইন এই জেলার সাইথিয়া (লুপলাইনে অবস্থিত) ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অণ্ডাল জংসনে মেল লাইনে গিয়া মিশিয়াছে। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ, উত্তর-পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা এবং দক্ষিণে বর্দ্ধমান এই ক্ষুদ্র জেলাটিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানের ভৌগোলিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার মৃত্তিকা অনুর্ব্বর নহে। এখানকার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। জেলায় গড়ে বাৎসরিক ৫৬ ইঞ্চি বারিপাত হয়। ইহার উত্তর-পশ্চিম অংশে কয়েকটি ছোট বড় পাহাড় আছে। পূর্ব্ব দক্ষিণভাগ অপেক্ষাকৃত ঢালু বলিয়া এই অংশের জমি সরস ও উর্ব্বর। দক্ষিণে অজয় নদী এই জেলাকে বর্দ্ধমান

হইতে বিভাগ করিয়াছে। এই নদী ব্যতীত এখানে ময়ূরাক্ষী, কানা, বক্রেশ্বর, চন্দ্রভাগা, সাল, হিঙ্গলো, দ্বারকা, কোবাই পুষ্করিণী, বাঁশলই, পগাসী প্রভৃতি বহু ছোট বড় নদী আছে। তন্মধ্যে অজয় এবং ময়ূরাক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা বড় নদী। পূর্ব্ববঙ্গের নদীর তুলনায় এই জেলাস্থ নদীগুলি কিছুই নহে। ইহাদের কোনটিতেই বারমাস প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যায় না। তবে বর্ষাকালে নদীগুলি স্ফীত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি-সমূহকে পলির প্রলেপদ্বারা উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিয়া তোলে।

লোকসংখ্যা ও কৃষিজীবী

এই জেলার প্রধান নগর সিউড়ী। জেলায় ৮,৪৭,৫৭০ জন লোকের বাস। এখানকার শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী। যাহারা শুধু স্বকীয় পরিশ্রম দ্বারা কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের সংখ্যা (পুরুষ ৮৪৬৩৯ এবং স্ত্রী ১৩৫১৭) মোট ৯৮১৫৩ জন।

কৃষিশিল্পের আবশ্যকত

আজকাল দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে শিক্ষিত-বর্গকেও দেশের সমস্ত শিল্পের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হইবে —"লেখাপড়া শেখ্ নয়ত চাষ করে' খেতে হ'বে" এই নীতিবাক্য লঙ্ঘন পূর্ব্বক কৃষিব্যবসায়ের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক দেশের ধনবৃদ্ধি করিয়া জাতীয় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। দেশের কৃষকেরা সমৃদ্ধিশালী না হইলে দেশ কখন বড় হইতে পারে না। শিল্প-বাণিজ্য দেশের উন্নতির সহায়ক মাত্র। শিল্প-বাণিজ্য না থাকিলেও দেশ বাঁচিতে পারে; কিন্তু খাদ্য শস্য না থাকিলে দেশ কিরূপে বাঁচিবে? আমেরিকার কোন প্রধান জননায়ক একদা বলিয়াছিলেন "শিল্প বল, বিজ্ঞান বল, সভ্যতা বল সকলের আগে মানব জাতির জীবনদাতা শিল্প বাণিজ্যের জনক যে কৃষি, তাহারই স্থান। যে বিজ্ঞানে যুদ্ধ-প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলে তাহার স্থান নহে; কিম্বা যে শিল্প-বাণিজ্য শুধু ধন আহরণ করে তাহারও স্থান নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দেশ তাহার কৃষিউৎপন্ন সমৃদ্ধির উপর স্থায়িত্বের ভিত্তি রচনা না করে ততক্ষণ তাহার ঐ বিষয়ে গর্ব্ব করিবারও অধিকার নাই।" কৃষক সম্প্রদায় সমৃদ্ধিশালী হইলে দেশে কলকারখানা ও ব্যবসায় বাড়িয়া যায়। দেশের চারিদিকে তখন উন্নতির স্রোত বহিতে থাকে।
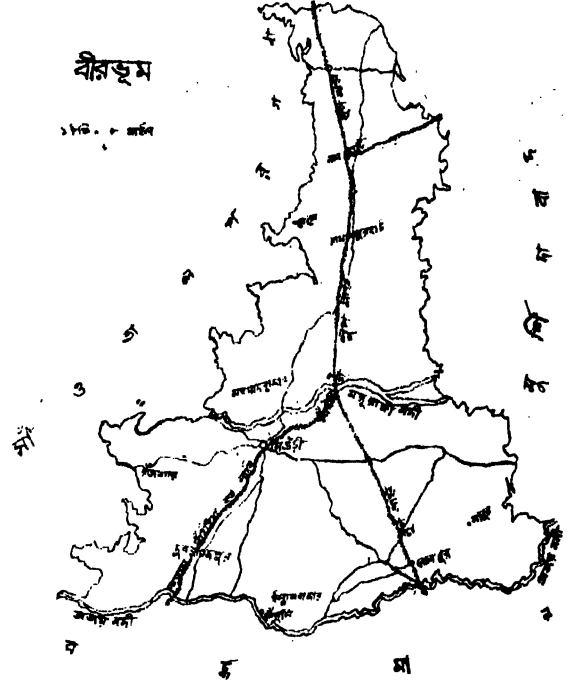
কৃষিকর্ম্মের দিকে কোন লক্ষ্য করিব না; অথচ খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না। ইহার প্রতিকার থাকিতে, এমন সুজলা সুফলা দেশ থাকিতে কেন আমরা খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার বিষয়ে চীৎকার করিব? শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে সোনার বাঙলায় সোনা ফলিবে সন্দেহ নাই।

আবাদী ভূমি

এই জেলার ৮,০৭,০০০ একর (১ একর প্রায় ৩ বিঘা) ভূমি আবাদ হইয়া থাকে। বাকী ভূমি বসতি, ডাঙ্গা, পতিত ও বন। আবাদী ভূমি একপ্রকারের নয়; ইহার আবার পার্থক্যভেদ আছে। এই ভূমির কতকটা এঁটেল এবং দো। এক একরূপ জমিতে এক একরূপ ফসল উৎপন্ন হয়। ঐ আবাদী ভূমির মধ্যে ৬,৫০,০০০ একর জমিতে খুব ভালরূপে ফসল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ জেলার ৫৮ ভাগ অংশ হইতে সুন্দর ও প্রচুর পরিমাণে ফসল পাওয়া যায়।

উৎপন্ন দ্রব্য

এই জেলার প্রধান শস্য ধান। ইহা বৎসরে দুইবার পাওয়া যায়। একবার শরৎকালে আউস ধান, আর একবার শীতকালে আমন ধান।

আখ মাড়াই হইতেছে।

প্রথমোক্ত চাষ ১,৪৫,০০০ একর ভূমিতে আবাদ করা হয়। এই সময়ে বাদরাস, লাল অতিস, মহিপাল, শয়নকল্মা, কলম কাঠি, দাদসাল ইত্যাদি নানাজাতীয় ধান পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় চাষ ৬,০৪,০০০ একর ভূমিতে আবাদী হয়। এই সময়ের চাষ হইতে জটাকল্মা, কালিকল্মা, বালাম, হলুদ সাল, নারীকল্মা, বাঁকিকল্মা, পাথর সাল, সিন্দুরমুখী, চড়ুই-মুখী ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভালরূপ সার ও লাঙল দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া ধান রোপণ করিলে এবং সময় মত জলসেচন ও নিড়ান দিলে ১/ একবিঘা জমি হইতে মোটা ও সরুধান যথাক্রমে ১২/ বার মণ ও দশ মণ পাওয়া যায়।

(৩) ২৬০০০ একর ভূমিতে শাকসবজী, ঢেঁড়ো, ডিঙ্গলে (মিঠাকুমড়া), চালকুমড়া, লাউ, শশা, দেশী ও বিলাতি বেগুণ, সাকরকন্দ ও গোল আলু, ঝিঙ্গে, করলা (উচ্ছে), সিম, মুলা, সালগম, ওলকপি, কপি, ফুট, লঙ্কা, আদা, পেঁয়াজ, রসুন, ওল, হলুদ ;

(৪) ১০,০০০ একর ভূমিতে কুঁড়ী বাম্বা, কাজলে, টানা, রাণিবয়ালে নলখাগড়া প্রভৃতি নানা জাতীয় আখ ;

(৫) ৯০০০ একর ভূমিতে ছোলা (বুট), মসুর, খেসারী, অরহর, কুড়ি, কালকলাই (বিরি) ;

(৬) ৫০০০ একর ভূমিতে গম, যব, তামাক ;

(৭) ৪০০০ একর ভূমিতে তিসি, সরিষা ;

(৮) ৪০০০ একর ভূমিতে জনার (ভুট্টা) শন প্রভৃতি মোট ৮,০২০০০ একর ভূমি আবাদ করিয়া উক্ত প্রকার শস্যের চাষ করা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ভূমিতে পান, কলা, পাতিলেবু প্রভৃতির চাষ করা হইয়া থাকে।

বলদ ও মহিষের সুবন্দোবস্ত

চাষ করিয়া লাভবান হইতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ভাল বলদ ও মহিষ এবং উর্ব্বরা জমির দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৎপরে পরবর্ত্তী অবস্থাগুলির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এখানকার বলদ ও মহিষের সংখ্যা ২,৬২,৯০৫। তবে সবগুলি চাষ করিবার উপযোগী নহে। বলবান বলদ ও মহিষ যাহাতে তৈয়ারি করা যায় তাহা করিতে হইবে—তাহাদের আহার যত্নের প্রতি সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে অবহেলা করা অন্যায় ; বরং খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য তাহাদিগকে আরও বলিষ্ঠ ও হৃষ্ট-পুষ্ট করিয়া তোলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

সার

ভালরূপ ফসল পাইতে হইলে প্রথম হইতেই ভাল সারের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। দেহের পুষ্টিলাভের জন্য যেমন সারবান দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তেমনি শস্যের পুষ্টি সাধনের জন্য ভাল সারের প্রয়োজন। আমাদের এখান-কার চাষে অধিকাংশস্থলেই গোবর ব্যবহার করা হয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যেখানে গবাদি পশুর বিষ্ঠা ও মূত্র পাওয়া না যায় সেই সেই স্থলে নাইট্রেট অব সোডা, নাই-ট্রেট অব্ পটাশ, অক্সাইড অব আয়রণ, কার্ব্বনেট অব লাইম প্রভৃতি কৃত্রিম সার কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই সারের যত্ন করিতে হয়। যেখানে সেখানে গোবর ফেলিয়া রাখিলে তাহা ভাল সার বলিয়া গণ্য হয় না। সার অযত্নে পচিয়া থাকিলে উহা রৌদ্র ও বাতাস পাইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং উহার উৎপাদিকা

শক্তি একেবারেই কমিয়া যায়। এইজন্য অদূরে একটি ডোবা কাটিয়া তাহার উপর ছাউনি করিয়া দিয়া উহার মধ্যে গোবর ফেলিলে তাহাই উত্তম সার বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপ জাত সার এখানে টাকার দুই গাড়ী হিসাবে বিক্রয় হইয়া থাকে। সময় সময় পুকুর হইতে পাঁক মাটি তুলিয়া মাঠে দিলে উহা কতকটা সারের ন্যায় কার্য্যকরী হয়, তবে এই মাটির উর্ব্বরাশক্তি সারের ন্যায় দীর্ঘ দিন স্থায়ী নহে। ভেড়ার নাদি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সার। জমিতে একবার ভেড়ার নাদি দিতে পারিলে দুই তিন বৎসর সার দেওয়া হইতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়; কিন্তু আমাদের এখানে ভেড়ার নাদি পাওয়া একপ্রকার দুষ্কর।

যন্ত্রপাতি ও জলের কল

চাষের জন্য আজকাল নানারূপ বিলাতি যন্ত্রপাতির আমদানী হইয়াছে; কিন্তু আমাদের মোটামুটি ভাবের চাষের পক্ষে ঐ সকল যন্ত্রপাতির কোনই আবশ্যক করে না। আমাদের দেশে পুরুষ-পরম্পর-প্রচলিত দেশী হাল ও কোদালি কৃষি কর্ম্মের প্রধান যন্ত্র এবং এই যন্ত্রই এদেশের মাটি কর্ষণের বিশেষ উপযোগী। মাঠে জলের টান পড়িলে দেশের প্রস্তুত নৌকাকৃতি দুনী ব্যবহার করা হয়। মাঠে অল্প জলের প্রয়োজন হইলে বংশ-নির্ম্মিত সিনি দিয়া জলসেচন করা হইয়া থাকে। তবে আজকাল যে সমস্ত জলের কলের আমদানী হইয়াছে, তাহা এ চাষের বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হইতেছে। নিকটবর্ত্তী পুকুর, নদী বা কূপে কল বসাইয়া ঠিক করিয়া দিলে কয়েকঘণ্টা মধ্যে সমস্ত মাটি জলে ছাপাইয়া উঠে। ইহাতে সামান্য পেট্রোল ইত্যাদি খরচ হয় মাত্র। তবে কল কিনিবার সময় অবশ্য খরচ কিছু বেশী পড়ে। কৃষকগণ যদি সমবেত হইয়া এই কল ক্রয় করেন তবে তাঁহাদের গায়ে আঁচ লাগে না; অথচ পালাক্রমে সকলেই কল ব্যবহার করিয়া অর্থনষ্ট শস্যনষ্ট ইত্যাদির ভাবনা হইতে আশু উদ্ধার পান। আজকাল কেহ কেহ আবার নলকূপ ব্যবহার করিতেছেন; কিন্তু, এই নলকূপ অপেক্ষা উক্ত প্রকারের কল ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

এখন আমরা যতদূর সম্ভব মোটামুটি ভাবের এক একটি চাষের কথা বলিব।

দুনী দ্বারা জল-সেবন

এখানে কুঁড়ি, টানা, রাণিবয়ালে, বাস্তা, কাজলী, নল খাগড়া প্রভৃতি ৫।৬ রকম আখের চাষ করা হয় এবং দো জমিতেই ইহার ফলন বেশী হয়। যে জমিতে আখের চাষ হয় তাহাতে ধান উৎপন্ন করা চলে না; কারণ উহার চাষ আরম্ভ করিয়া শেষ হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। যে-জমিতে আখ বসান হয় তাহাতে অন্ততঃ তিন চার বার জল দেওয়া উচিত এবং ঘাস, কাঁটা ইত্যাদি যাবতীয় অনিষ্টকর গাছ তুলিয়া ফেলিয়া সার ও খইল দিতে হয়। ১/০ বিঘা জমিতে অন্ততঃ তিন চারি গাড়ী ভাল সার ও ১/০ মণ হিঃ রেড়ীর খইল দেওয়া দরকার। আমাদের এখানে মাঘ মাসের শেষ কিম্বা ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আখের ডগা (চারা) বসান হয় এবং ইহার পরবৎসর ঐ সময়ের মাসখানেক আগে কাটিয়া লইয়া পেষণ-যন্ত্র দ্বারা রস বাহির পূর্ব্বক গুড় তৈয়ারী করা হয়। সময় সময় গাছগুলির যত্ন লইতে হয়। গোড়া খুলিয়া দিয়া দরকার হইলে জল দিতে হয়। মাঝে গাছগুলি বড় হইলে দুই তিনটি ঝাড়ের সহিত এক সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে হয়। এইরূপ সংলগ্নভাবে থাকিলে ঝড়-বাতাসে গাছগুলি পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। আখের ডগাগুলি (আগের ভাগ) কাটিয়া পুকুরের পাঁকে কিম্বা সার ডোবায় পুঁতিয়া রাখিতে হয়। দিন বিশ এইভাবে থাকিলে তাহাই চারা হয় এবং চারাগুলি উঠাইয়া লইয়া ভেলিতে বসাইতে হয়। এই ডগা অর্থাৎ চারা গাছ ৮।১০ টাকা হাজার হিসাবে বিক্রয় হয়।

আখ

ইক্ষুদণ্ড কাটিয়া লইলেও ইহার গোড়া হইতে পুনরায় গাছ বাহির হয় এবং এই ইক্ষুদণ্ড হইতেও পূর্ব্বের মত ফল পাওয়া যায়। যত্ন করিলে এই গোড়া হইতে তিনবার পর্য্যন্ত ভাল রকম ফল লাভ করা যায়। ভাল ফলন হইলে একবিঘা জমি হইতে ৪০/ চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত গুড় পাওয়া যায়।

টানা আখগুলি আকারে খুবই লম্বা হয়। খয়রা রঙের কাজলী আখ হইতে আশানুরূপ ফললাভ করা যায় না। বাস্তা, নলখাগড়া এবং কুড়ী এই তিন প্রকার আখ হইতেই প্রচুর পরিমাণে গুড় পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের চাষই এখানে বেশী।

গোল আলু

গোল আলুর চাষেও সার এবং রেড়ীর খইল দুইই আবশ্যক।

"সর্ষের খোলে জোর কম বাড়ায় শুধু পোকা,
রেড়ীর খোল দিবে তুমি হয়ো নাকো বোকা।"

পাছে উর্ব্বরা-শক্তির হ্রাস হয়, এইজন্য ইহার জমিতেও ধান্য রোপণ করা হয় না। সাধারণতঃ এখানে, কার্ত্তিক মাসেই আলু বসান হইয়া থাকে। যত্ন করিয়া চাষ করিলে ১/০ বিঘা জমিতে ৪০/ চল্লিশ মণ হইতে ৬০ ষাট মণ পর্য্যন্ত আলু পাওয়া যায়। ভালরূপ ফলন হইলে এক একটি ঝাড়ে ১২টি হইতে ২০টি পর্য্যন্ত আলু ধরে এবং এই একটি আলুর ওজন প্রায় /১/০ আধ পোয়া হইতে /।০ এক পোয়া পর্য্যন্ত হয়।

কলাই প্রভৃতি

ছোলা, মসুর, খেসারি, বিরি, (কাল কলাই), গম, যব, সরিষা, জোয়ান, মৌরী ইত্যাদি রবি ফসল ধান কাটিবার পরই লাগান হয়। অরহর কলাই ও হলুদের জন্য পৃথক জমি তৈয়ারি করিতে হয় না। ইহাদের গাছগুলি আখ-বাড়ীর ধারে ধারে আলের উপর লাগান হয়। অরহর গাছ-গুলি উপরন্তু আখবাড়ীর বেড়ার কাজও করিয়া থাকে।

শাক-সব্জী

ঝিঙ্গে, করলা, সিম, বেগুণ, মুলা, পেঁয়াজ, কপি, শশা, খেঁড়ো, ডিঙ্গলে, (মিঠা কুমড়া) পুঁই, কচু, বিভিন্ন জাতীয় শাক ইত্যাদি নানা প্রকার শাক-সব্জীর চাষ ফাল্গুন মাসের শেষ হইতেই আরম্ভ করা হয়। এইসমস্ত চাষের মধ্যে এদেশে খেঁড়ো ও কচু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পাণ

এখানকার পাণের চাষের আধিক্য দেখা যায়। এ জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই পাণের বরজ আছে। এখানকার পাণ রাণিগঞ্জ দেওঘর ইত্যাদি স্থানে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। বর্ষার কিছু আগেই পাণের চারা বসান হয়। এঁটেল মাটি পাণ চাষের উপযুক্ত। পূর্ব্বে রোপিত চারা-গুলি বর্ষার জল পাইয়া বহু পত্রবিশিষ্ট হয়, এই সময়ের পাণ দরে কিছু সস্তা হয়। মাঘ ফাল্গুনে রোপিত চারাগুলি উপযুক্ত জল পাইলেই মাস চার পরেই পাতা তুলিবার যোগ্য হইয়া উঠে। পাণ গাছে বেশী রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না বলিয়া শর দিয়া সকল দিক আচ্ছাদন বা ছাউনী করিয়া দিতে হয়। তবে যাহাতে সামান্য সামান্য আলোক বাতাস প্রবেশ করে তাহার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। পাণে জল দিবার জন্য বরজের চারি পাশেই পুকুর কাটা হয়। পাণের চারাগুলি সারি বাঁধিয়া বসাইতে হয়। বরজের ভিতর ছায়া শীতল—উহা দেখিতে অতীব মনোরম—কোথাও একটি ঘাস কিম্বা পাতা পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। গাছগুলি খুব লম্বা হইলে উহা কাটিয়া পুনরায় বসান হয়। লতা পুরাতন হইয়া গেলে উহা কাটিয়া দিয়া নূতন কচি লতা বসান হয়। এখানে দেশী, ছাঁচি ও মিঠা এই তিন প্রকার পাণেরই চাষ করা হয়। ছাঁচি পানের আকৃতি ছোট এবং দেখিতে একটু কৃষ্ণাভ। এক-একটি লতায় বিশ পঁচিশটি করিয়া পাণ হয়। সময় সময় পোকা-মাকড়ে বড়ই উপদ্রব করে। এইজন্য ঘুঁটের ধূম দিলে ঐ সমস্ত পোকা-মাকড়ের হাত হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা যায়। পাণে ভাল মিহি সার এবং বালি ছাড়া অধিক পরিমাণে সরিষার খইল দিতে হয়। রেড়ির খইল ইহার চাষের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। এখানে ভাল পাণ পয়সায় ৮টি হইতে ১২টি পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বরজের ভিতর সামান্য সামান্য পটলের চাষ করা হয়। এখানে পটল অতি কম পরিমাণেই উৎপন্ন হয়। সময় সময় বরজের বেড়ার ভিতরধারে লাউ, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, সিম, পুঁই ইত্যাদি শাক-সবজীর গাছও লাগান হইয়া থাকে। শরের বেড়াগুলি দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত টেঁক

শই হয়। তাহার পর বৃষ্টির জলে পচিয়া যায়। এই-জন্য বারুইদিগকে দুই তিন বৎসর অন্তর নূতন করিয়া ছাউনী তৈয়ার করিতে হয়।

তামাক

সাধারণতঃ ভাদ্র আশ্বিন মাস হইতেই তামাকের চাষ আরম্ভ করা হয়। প্রথমতঃ একস্থানে শাকের পেটিলির মত থানা করিয়া তাহাতে বীজ ফেলিয়া চারা প্রস্তুত হইলে উহা উঠাইয়া মাঠে এক দেড় হাত অন্তর বসাইতে হয়। ছোট চারাগুলি ভাদ্র আশ্বিনের রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না বলিয়া রোপণ করিয়াই উহাদিগকে কিছু দিন রৌদ্রের সময় ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তামাকের জমিতে খুব ভালরূপে পাট করিতে হয়। অন্ততঃপক্ষে ৬।৭ বার লাঙল দেওয়া উচিত। পচা সার ছাড়া উনানের ছাইও ইহার সারের অতি উত্তম কাজ করে। ভাল পাট থাকিলে একই জমিতে ক্রমান্বয়ে দুই তিন বৎসর তামাক জন্মে। তামাকের চারা একটু বড় হইলেই উহার গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া আবশ্যকমত জল দিতে হয়। মাসের ভিতর অন্ততঃপক্ষে তিন চার বার জল দেওয়া উচিত। গাছগুলি দেড়-দুই হাত হইলেই উহার আগা-ভাগ কাটিয়া দিতে হয়; কারণ গাছ বড় হইলে তাহাতে ভাল এবং বড় পাতা জন্মিতে পায় না। ছোট ছোট পাতার দর এবং গুণও কম। এইজন্য প্রত্যেক গাছে যাহাতে দশ বারটি পাতা জন্মে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বীজের গাছ কাটিবার দরকার নাই। আগায় বীজ জন্মিয়া পরিপক্ক হইলেই উহা কাটিয়া লইয়া যত্ন করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। এখানে সাধারণতঃ শিবের জটা, মতিহারি, বিলাতি প্রভৃতি তামাকের চাষ করা হয়। মাটির ভালরূপ যত্ন করিলে এক এক বিঘায় অন্ততঃ দশ বার মণ তামাক উৎপন্ন হয়। সময়মত তামাক গাছ কাটিয়া ছায়ায় রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। বেশী রৌদ্র পাইলেই তামাকের তেজ ও গুণ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এইজন্য পাতাগুলিকে ছায়ায় শুকাইয়া চাপা দিয়া রাখিতে হয়। পরে ২০।২৫টি পাতা একত্র করিয়া খড়-নির্ম্মিত ভুরুয়াতে বাঁধিয়া রাখা হয়। আবার কোন কোন স্থানের লোকেরা গাছ শুদ্ধ তামাক আঁটি বাঁধিয়া ঘরের মাচার মধ্যে ঝুলাইয়া রাখে। তামাক ভাল করিয়া যত্নপূর্ব্বক না রাখিলে ইহার তেজ কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। তামাক সচরাচর ৫৲ টাকা মণ হইতে আরম্ভ করিয়া ২০৲ বিশ টাকা মণ দরেও বিক্রয় হয়। এখানকার প্রায় অধিকাংশ তামাকই বর্দ্ধমান, রাণিগঞ্জ, দুবরাজপুর, সাইথিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানি হইয়া থাকে।

কদলী

এখানকার স্থানে স্থানে কদলীর চাষ হয়। ইহার তিন চারি শত গাছ লাগাইয়া হেপাজৎ করিলে একটি গৃহস্থ অনায়াসে পোষা যাইতে পারে।

> "আট হাত অন্তর এক হাত খাই,
> কলা রুইও চাষা ভাই।
> তিন শত ষাট ঝাড় কলা রুই এ,
> থাক্‌গে চাসা ঘরে শুই এ।
> লাগিয়ে কলা কাটিস নে পাত,
> কলায় যোগাবে কাপড় আর ভাত।"

খনার এই উক্তি যথার্থই সত্য। ভেলি কাটিয়া সারি সারি ভাবে কলার চারা রোপণ করিতে হয়। এ দেশে সাধারণতঃ কাবুলি, চাঁপা, মর্ত্তমান, চিনিচম্পা প্রভৃতিরই চাষ করা হয়। কলার কাঁচা পাতা কাটিলে রস নির্গত হইয়া গাছকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। গাছ রোপণ করিয়া বৃষ্টির অভাব হইলে তিন চারি দিন অন্তর জল দিতে হয়। গাছগুলি সামান্য বড় হইলেই গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিলে গাছগুলি খুব জোয়াল হয়। গাছে জোর ধরিলে উহা আট দশ হাত লম্বা হয় এবং গোড়া হইতে পাঁচ ছয়টি তেউড় বাহির হয়। গাছে কাঁদি ধরিলেই আড়াআড়ি ভাবে দুইটি বাঁশ বাঁধিয়া ঠেকা দিলে কাঁদির ভারে বা বাতাসে উহা পড়িয়া যাইতে পারে না। ভালরূপ সেবা-যত্ন করিলে ৯।১০ নয় দশ মাস হইতে ১২ মাসের ভিতরই ইহার ফলন হইতে দেখা যায়। এবং এক একটি কাঁদিতে প্রায় আড়াই শত কলা ধরিয়া থাকে। ইহার ন্যায় এত অল্প বয়সে আর কোন ফল-গাছ ফল ধারণ করে না। ইহার ফলনের সময় অসময় নাই। ইহা বার মাসই ফলিয়া থাকে। সময় মত মোচা কাটিয়া লইলে কলা বেশ পুষ্ট হয়; নচেৎ ইহার আকৃতি ছোট হইয়া পড়ে। মোচা কাটিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে

গোবর কিম্বা মাটির দ্বারা ক্ষতস্থান ঢাকিয়া শেওলার সহিত বাঁধিয়া দিলে বেশী রস নির্গত হইতে পায় না। কাঁদি বাহির হইবার পর ইহারা তিন মাস হইতে ছয় মাসের মধ্যেই পরিপক্ক হয়।

পোকা, মশা, ইঁদুর, বানর, বাদুড় প্রভৃতি শত্রু হইতে কদলী রক্ষা না করিলে চাষ করা বৃথাই হয়। খড়, ঘুঁটে, গন্ধক ইত্যাদির ধূম দিলে মশা, মাছি, পোকা ইত্যাদি মরিয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য শত্রুদিগকে বন্দুকের ভয় না দেখাইলে উপায় নাই। কলাবাগানের চারিদিকে ভাল করিয়া বেড়া দিয়া গবাদি পশু এবং মনুষ্যশত্রু হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করা হয়।

কাঁদিতে কলা পাকিলেই সঙ্গে সঙ্গে না খাইয়া দু এক দিন রাখিয়া মজাইয়া খাইলে ইহার আস্বাদ সুস্বাদু হয়।

এক এক বিঘায় অন্ততঃপক্ষে ১০০ শত হইতে ১২৫টি কলার চারা রোপণ করা হয়। চারিশত কলার চারা লাগাইয়া চাষ করিলে শুধু কলা বিক্রয় করিয়া খরচ-খরচা বাদে খুব কম পক্ষে দৈনিক দুই টাকা হিসাবে লাভ পাওয়া যায়।

পাণের চাষে বরজের জন্য যেমন অপেক্ষাকৃত উচ্চ-ভূমির প্রয়োজন, কলার চাষেও তদ্রূপ উচ্চভূমিই উপযোগী। যাহাতে গাছে বাতাস পায় এবং গোড়ায় জল জমিতে না পায় এইরূপ স্থানেই ইহার চাষ করিতে হয়। এক-একটি স্থান অন্ততঃপক্ষে দুই তিন বৎসর ভালরূপ ফল দান করিয়া থাকে। পরে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যায়। এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই অন্য একটি স্থানে কলার চারা উঠাইয়া লইয়া যাইতে হয় এবং এই স্থানের ফল ধরিতে ধরিতে পূর্ব্বস্থান পরিষ্কার করিয়া নূতন ভাবে সার ও পাঁক মাটি দিয়া আবার চারা বসাইবার জন্য ভূমি তৈয়ারী করিতে হয়। তিনটি ভূমি লইয়া এইভাবে ইহার চাষ আরম্ভ করাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে সমানভাবে বারমাসই একরূপ ফল পাওয়া যায়।

পাতিলেবু

অন্যান্য চাষের তুলনায় এখানে পাতিলেবুর চাষ মন্দ হয় না। গুণে এবং গন্ধে কাগজী বা পাতিলেবু সকল জাতীয় লেবুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার গাছ ৪০।৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। সকল জাতীয় লেবুর মধ্যে এই জাতীয় লেবুর গাছ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় এবং আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। বীজের গাছ অপেক্ষা কলমী গাছে শীঘ্রই ফল ধরে। পাতিলেবুর চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। আমাদের দেশে লেবুর চাষের ন্যায় অন্য কোন চাষে অত্যধিক লাভ হয় না। ৫০।৬০টি পাতিলেবুর কলম লাগাইলে দুই তিন বৎসর পর হইতেই বার মাসই ফল ধরিতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে মাটি খুঁড়িয়া সার-জল এবং ডাল কাটিয়া দিলে ইহা প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কালপর্য্যন্ত ভালরূপ ফলদান করিয়া থাকে। আজকাল লেবুর দর আক্রা, সুতরাং ইহাতে কিরূপ লাভ হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এখন মোটামুটিভাবে আমাদের চাষের কথাগুলি বলা হইল। আমাদের দেশের এখন যেরূপ চাষের অবস্থা তাহাতে ইহার আরও উন্নতি সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজকাল চাষ করিবার ভালরূপ চাষা পাওয়া যায় না—ভাল ভাল বলদ, মহিষ এবং সারের একান্ত অভাব। উপযুক্তরূপে জমিতে সার এবং চাষও পড়ে না—ভালরূপ জলনিকাশের বন্দোবস্ত নাই, চাষবাস শিক্ষা করিবার নিমিত্ত এ দেশে স্কুল-কলেজও নাই। তবে কলিকাতার সা ওয়ালেস কোম্পানী বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক জনৈক বাঙালীর তত্ত্বাবধানে কলিকাতার উপকণ্ঠ টালিগঞ্জে একটি অবৈতনিক কৃষি-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত স্কুল কর্ত্তৃপক্ষগণ গ্রহণ করেন। আবেদন করিতে হইলে ফার্টিলাইজার কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, Post Box No. 70, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয়। সম্প্রতি বীরভূমের সদর সিউড়ী ষ্টেশনের দক্ষিণে উন্মুক্ত ডাঙ্গায় গভর্ণমেন্টের একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষকগণের অনেক সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ত্রিশবৎসর যাবৎ সিউড়ীতে গবাদি কৃষি-শিল্প বিষয়ক প্রদর্শনী বসিয়া কৃষক ও অন্যান্য লোক সকলকে পুরস্কার সহ উৎসাহিত করা হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আমাদের অভাব মোচন হইলে এখানে আরও ফসল উৎপন্ন হইবে—দুর্ভিক্ষ ঘুচিবে এবং দুটি অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না।

ময়মনসিংহের পল্লী-কবি কঙ্ক

শ্রী চন্দ্রকুমার দে

ময়মনসিংহের প্রাচীন পল্লীকবিগণের মধ্যে কবি কঙ্ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এক হিসাবে তাঁহাকে ময়মনসিংহের রায় গুণাকর বলা যাইতে পারে। কেন না তিনিই ময়মনসিংহের আদি বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা। ময়মনসিংহের আরো কয়েকজন কবি বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকা অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে বলাইচাঁদ ধুপীর বিদ্যা-সুন্দরের গান ও রামসদয় বা সদয়ঠাকুরের বিদ্যাসুন্দর উল্লেখ-যোগ্য হইলেও কি প্রাচীনতায়, কি কবিত্ব হিসাবে ইঁহাদের মধ্যে কঙ্কের স্থানই সর্ব্বোপরি।

কবির জন্ম ও শৈশব

ঠিক্ কত খৃষ্টাব্দে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়া কবি ময়মনসিংহকে ধন্য করিয়াছিলেন তাহা বলা অসম্ভব। কারণ, ময়মনসিংহের সাহিত্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। এই গীতিকাব্যবহুল্য দেশ মুগ্ধ হইয়া গায়কের মুখে শুধু কাব্য-গাথা শুনিয়া গিয়াছে। কবিকে চিনিবার মত আগ্রহ তাহাদের মোটেই ছিল না। বরং সমজদার-গণ কবি অপেক্ষা গায়কের সম্মানই দিয়াছেন বেশী। আমরা কবির নিজকৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ ও প্রচলিত লীলার বারমাসী হইতে তাঁহার জীবনের যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিব।

বোধ হয় বিদ্যাসুন্দরই কঙ্কের প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রাচীন অন্যান্য কবিগণের ন্যায় কঙ্ক একটি ধারাবাহিক বন্দনা-গীতি গাহিয়াছেন। সেই সুদীর্ঘ বন্দনা-গীতিতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই। তাহা হইতে মাত্র কবির জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

জন্মভিটে

"নদী মধ্যে বন্দি গাই রাজরাজেশ্বরী,
তিয়াস লাগিলে যার পান করি বারি।
তাহার পারেতে বৈসা সুন্দর গেরাম,
জন্মভূমি বন্দি গাই নাম বিপ্রগ্রাম।"

দেখা যায় কবি রাজরাজেশ্বরী নদী-তীরে বিপ্রগ্রাম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

কবির পিতামাতা

"পিতা বন্দো গুণরাজ মাতা বসুমতী
যাহার ঘরেত জন্ম লইলাম অন্নমতি।"

কিন্তু অদৃষ্ট এই চিরদুঃখী কবিকে শৈশবেই পিতামাতার স্নেহশীতল কোল হইতে বঞ্চিত করিয়া চণ্ডালের অন্নদাস করিয়া গিয়াছিল।

কঙ্কের চণ্ডাল পিতামাতা

"শিশুকালে মাও মৈল বাপ গেলা ছাড়ি,
পালিলা চণ্ডাল পিতা মোরে যত্ন করি।
জ্ঞানমানে খাই অন্ন চণ্ডালের ঘরে,
চণ্ডালিনী মাতা মোরে পালিলা সাদরে।"

গ্রন্থের আর একস্থানে আছে—

"জনম অবধি নাহি হেরি বাপ মায়,
শিশু থুইয়া মোরে তারা সর্ব্বপুরী যায়।
মুরারী চণ্ডাল পিতা পালে অন্ন দিয়া,
পালিলা কৌশল্যা-মাতা শুক্ত দুগ্ধ দিয়া॥"

কৃতজ্ঞ কঙ্ক তাঁর চণ্ডাল পিতামাতার উদ্দেশে শেষ বন্দনা-গীতি গাহিয়াছেন—

"মুরারী চণ্ডাল পিতা ভক্তির ভাজন,
বার বার বন্দি গাই তাঁহার চরণ।"

কবির জন্মভিটা সম্বন্ধে মন্তব্য

বন্দনা-গীতিতে যে বিপ্রগ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা কেন্দুয়া থানার সন্নিকটে অবস্থিত। বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের অন্যতম সংগ্রাহক শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ৺ রমানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রামকেই কবির জন্মভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। একদিন এই বিপ্রগ্রামের পাদমূল ধৌত করিয়া বিপুল জলরাশি সমন্বিতা রাজরাজেশ্বরী নদী বহিয়া যাইত। কবি তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

বাঁশ ঝাড় দুই ধারে পাখীরা গাহানা করে,
মধ্যে নদী বহে খরস্রোতে,
তৃণ কুটা নাহি তায় ঢেউ খেলে সর্ব্বদায়
পাহাড় ভাসিয়া যায় স্রোতে।

গ্রীষ্ম বর্ষা নাহি তায়, সদাই পূর্ণিতকায়
ডালিমের রস যেন পানি।
পাড়ে অধিবাসী যারা, সানন্দ অন্তরে তারা,
সুখে কাটে দিবস যামিনী।

যে-স্রোতে পাহাড় ভাসিয়া যাইত, কালবৈগুণ্যে সেই ক্ষীরধারা স্রোতস্বিনী মধুময় জীবন-স্মৃতির ন্যায় চিহ্ন মাত্রে পর্য্যবসিত। নদী নাই—চিহ্ন আছে। নদীর সে তরঙ্গ সে কুল-কুল ধ্বনি নাই; আজ তাহা বিশুষ্ক গোচারণ-ভূমিতে পরিণত। অধুনা বিকৃতরুচি পল্লীবাসীর হাতে পড়িয়া রাজরাজেশ্বরীও বিকৃত নাম ধারণ করিয়াছে। তাহার বর্ত্তমান নাম রাজী নদী বা রাজী গাং।

কবির কুলশীল

পিতা গুণরাজ মাতা বসুমতী। কিন্তু ইহাতে কবি কোন্ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টত জানা যায় না। কিন্তু গ্রন্থের একস্থানে আছে—

"দ্বিজ কবি কঙ্ক ভনে বসুমতী সুতে।

তিনি যে পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উল্লিখিত শ্লোক দৃষ্টে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অদৃষ্ট-দোষে কবি অতি শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হন।

চণ্ডাল আলয়ে

"স্নানমানে খাই অন্ন চণ্ডালের ঘরে" এই শ্লোকটিতে দেখা যায় পিতৃমাতৃহীন কবি আশৈশব চণ্ডালের অন্নেই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন। মুরারী চণ্ডাল হইলেও সদাশতায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। কবি চণ্ডাল-পিতার গুণরাশি গ্রন্থের স্থানে স্থানে শতমুখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৌশল্যাও দয়াময়ী স্নেহময়ী জননী। পিতৃ-মাতৃহীন কঙ্ক চণ্ডাল-পিতার আশ্রয়ে সুখেই কালাতিপাত করিতেছিলেন।

কিন্তু ভাগ্যহীন কঙ্কের সে সুখও চিরস্থায়ী হয় নাই। কিছুদিন পরেই কঙ্কের চণ্ডাল পিতাও ইহসংসার হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন। কৌশল্যাকেও অধিক দিন স্বামী-বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। হতভাগ্য কঙ্ক দ্বিতীয় বার পিতৃ-মাতৃ-হীন হইলেন।

গর্গের আলয়

যৎকালে এই পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ কঙ্ক তাঁহার চণ্ডাল-পিতার শ্মশানে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন তখন মহাপুরুষ গর্গ শিষ্যালয় হইতে নিজগৃহে ফিরিতেছিলেন। স্নেহপরবশ হইয়া তিনি চণ্ডাল বালককে হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন। কঙ্ক তখন হইতে গর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার ধেনু চরাইতেন।

"গর্গ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় সে মনু,
যাহার আশ্রমে আমি চরাইতাম ধেনু।"

ক্রমে কঙ্ক যখন তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও স্মরণ-শক্তির প্রভাবে সংস্কৃত-শাস্ত্রের সুদীর্ঘ শ্লোকগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন, তখন গর্গের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

"দশনা বৎসরের কালে গুরু হাতে দিলা খড়ি
গুরুর কৃপায় আমি লিখাপড়া করি।"

কিন্তু এই সময় আবার এক দুর্ঘটনা ঘটিল। দুরন্ত বসন্ত রোগ গর্গ পণ্ডিতের গৃহ লক্ষ্মীশূন্য করিয়া দিল। হতভাগ্য কঙ্ক তৃতীয় বার মাতৃহীন হইলেন।

এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যে পড়িয়াও কঙ্কের আর এক সঙ্গিনী জুটিল, সে গর্গের অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যা লীলা। উভয়ে মাতৃহীন, উভয়ে উভয়ের দুঃখ বুঝিল। এই মহা-বিপদ-ঝটিকায় ভাই-বোনের মত তাহাদের স্নেহ-বন্ধন দৃঢ় করিয়া তুলিল। কঙ্ক এই বাল্য-সঙ্গিনীর বন্দনা-গীতি গাহিয়াছেন।

"কণ্বের আশ্রমে যেমন দেবী শকুন্তলা
গর্গের কুমারী কন্যা নাম তার লীলা।
বিরিঞ্চি তনয়া সেই সাহা স্বরূপিনী,
স্নেহের ভগিনী মোর ভক্তির জননী।

লীলার বারমাসী

অতঃপর লীলার বারমাসী নামক প্রচলিত গীতি-কথা হইতে আমরা কঙ্কের জীবন-কথা আলোচনা করিব। এই বারমাসীর ভনিতায় চার জন পল্লী-কবির নাম পাওয়া যায়:—দামোদর দাস, রঘু সুত, শ্রীনাথ বাড়িয়া, নয়নচাঁদ ঘোষ। এই বারমাসীতে শিবু গাইন নামক অপর এক ব্যক্তিরও ভনিতা দৃষ্ট হয়।

"শিবু গাইন নাম মোর আওজিয়া বাড়ী,
সভার চরণে আমি পরিচয় করি।"

কিন্তু আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, শিবু লীলার বারমাসীর কবি নহেন। তিনি একজন সুকণ্ঠ গায়ক। বারমাসীর কবি-চতুষ্টয়ের কোনো পরিচয় আমরা পালা-

গানে খুঁজিয়া পাইতেছি না। এক মাত্র নামেই তাহাদিগকে অমরত্ব দান করিয়াছে। কবি-চতুষ্টয়ের হাতে পড়িয়া লীলার বারমাসীর ঐতিহাসিক অংশটুকু কতখানি অবিকৃত রহিয়াছে, এক্ষণে আমরা তাহার কথা কিছুই বলিব না। সংক্ষেপতঃ উপাখ্যান-ভাগের আলোচনা করিব।

বারমাসীতে লীলা ও কঙ্কের আখ্যান

এই আখ্যান-ভাগে শৈশবের খেলা-ধূলা সম্বন্ধে কবিগণ স্বল্প কথায় দু-একটি মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার ভাব মাধুর্য্য দেখাইবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না।

শৈশব

লীলা কঙ্কের বাল্য-সঙ্গিনী। কঙ্ক গরু চরাইয়া আসিত—লীলা শীতল জল মিষ্ট অভ্যর্থনা লইয়া তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত। সরল-স্বভাব বালিকা তালের পাখা দ্বারা কঙ্ককে বাতাস করিত। রোদের বেলায় কঙ্ককে ধেনু চরাইতে মানা করিত। আশ্রম-ধেনু সুরভীর জন্য ভাতের ফেন লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার কোমর ধরিয়া গিয়াছে বলিয়া কঙ্ককে বাহিরে রাগ দেখাইয়া তিরস্কার করিত—তার পরক্ষণেই আবার সেই মুগ্ধা বালিকা কঙ্কের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত।

কঙ্ক ধেনু চরাইতে যাইত, লীলা একাকিনী কুটীর-প্রান্তে বসিয়া আপন সুখ-দুঃখের স্মৃতিটি ভুলিয়া কেবলি সেই অনাথ বালকের কথা ভাবিত। এসংসারে ত কঙ্কের আপন বলিবার কেহ নাই। যখনই লীলা কঙ্কের অতীত জীবনের কথা ভাবিত, তখনই তার নিজের অজ্ঞাতসারে দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত। কুটীর-প্রান্তে সেই বালিকা বাষ্প-গদগদকণ্ঠে গাহিত।

"নাহি মাতা নাহি রে পিতা, নাহি বন্ধু ভাই।
এমতি অভাগা করি সৃজিলা গোসাঞ্‌।
কেমন সে বিধাতারে জানি পাষাণে বান্ধা হিয়া।
স্রুতের বা শৈবাল করি দিল ভাসাইয়া।"

প্রাণের সমস্ত স্নেহটুকু এইরূপে কঙ্কের উপর ঢালিয়া সেই সমদুঃখভাগিনী বালিকা নিজের মাতৃশোকটি পর্য্যন্ত ভুলিতে চেষ্টা পাইত। লীলা বুঝিত এ সংসারে কঙ্কের আপনার বলিবার আর কেউ নাই—কঙ্ক ভাবিত এসংসারে সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী আর-একজন আছে—সে, লীলা।

যৌবনে

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। লীলা বাল্য কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিতেছিল। আর কঙ্ক? কঙ্কও এখন আর বালক নহে। সে তাহার গুরুর নিকট হইতে যথাবিধি শাস্ত্র অলঙ্কার শিক্ষা করিয়াছে।

"পুরাণ সংহিতা আদি হরেক প্রকার,
শিখিয়াছে যথাবিধি শাস্ত্র অলঙ্কার।"

পীরের আগমন ও কঙ্কের দীক্ষাগ্রহণ

অতঃপর কঙ্কের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ। এই অধ্যায়ে মুসলমান পীরের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট গোপনে দীক্ষা গ্রহণ। যবন-পীরের সঙ্গে মিলন, কঙ্কের সাধারণ জীবন-ধারা গঙ্গাসঙ্গম তুল্য। কেন না এই পীরই কঙ্ককে সত্য পীরের পাঁচালী বা বিদ্যাসুন্দর লিখিতে প্রবুদ্ধ করেন।

বিদ্যাসুন্দর রচিত হইলে কঙ্কের যশ বেলফুলের সুমিষ্ট গন্ধের ন্যায় চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই তাহার সমান প্রতিপত্তি। কারণ, এই সত্য-পীর উভয় সমাজেরই দেবতা।

এই সময় পণ্ডিতগণ কঙ্ককে সমাজে তুলিয়া লইবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং স্বপক্ষে বিশেষ করিয়া দলবল জুটাইয়া তুলিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ দল আপত্তি তুলিল, কঙ্ক চণ্ডাল বালক, সে আশৈশব চণ্ডালের অন্নে প্রতিপালিত। কিন্তু গর্গের অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভার কাছে পরাজিত হইয়া, তাহারা রটাইয়া দিল যে, কঙ্ক শুধু চণ্ডাল নয় সে মুসলমান পীরের নিকট দীক্ষিত—সুতরাং মুসলমান।

এই আপত্তি যখন গর্গের অনন্যসাধারণ বিচার-শক্তির প্রভাবে ভাসিয়া গেল তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রতিপক্ষ দল ঘোষণা করিল গর্গের কুমারী কন্যা লীলা কঙ্কের প্রতি আসক্ত, শুধু তাই নয় কঙ্ক গান গাহিয়া, বাঁশী বাজাইয়া সেই অনাঘ্রাতযৌবনা কুলপুষ্পরূপিনী গর্গ-দুহিতার ধর্ম্মনাশ করিয়াছে।

গর্গের অপ্রকৃতিস্থতা

বাহিরের এই জনরব কঙ্ক অথবা লীলা কেহই তখন

পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। কিন্তু গর্গ এই প্রপঞ্চে প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিলেন না। তিনি লীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "লীলা! কাল রাত্রে আমি বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি, তুমি শীঘ্র জল লইয়া আইস, আমি নিজ হস্তে মন্দির ধৌত করিব। আমার অমন দেবের মন্দির অপবিত্র হইয়া গিয়াছে।" লীলা নীরবে কলসী লইয়া নদীর ঘাটে চলিল। গর্গ আবার ডাকিলেন—"দাঁড়াও লীলা!" লীলা আবার দাঁড়াইল। গর্গ আবার ডাকিয়া বলিলেন—

"শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
আমিই আনিব জল দেবের কারণ।
কলসী রাখিয়া তুমি যাও নিজ ঘরে।
দেবের নৈবেদ্য মোর খাইল কুকুরে॥"

পবিত্র যজ্ঞবেদী আজ চণ্ডালের করস্পর্শে কলঙ্কিত। আমি এ সংসারে আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। লীলা তুমি ঘরে যাও,আমিই জল আনিতে যাইতেছি। লীলা তখনও কিছু বুঝিতে পারে নাই।

"দৈবেতে ঘটাইল কিবা অঘট ঘটন।
আজি কেন পিতা গর্গ হইলা এমন।"

গর্গ নদীর ঘাটে গেলেন। নিজ হস্তে কলসী ভরিয়া জল আনিলেন। নিজ হস্তে দেবের মন্দির পবিত্র করিলেন। তারপর লালার চয়িত পুষ্পসকল বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া সিংহাসন, শালগ্রাম সব ধৌত করিয়া পূজায় বসিলেন।

আজিকার পূজায় ফুল নাই—নৈবেদ্য নাই—বুঝি ভক্তিও নাই—আজিকার পূজা শেষ পূজা। এ পূজায় আবাহন নাই, কেবল বিসর্জ্জন। প্রতিহিংসা তার ধূপ-ধূনা—হৃদিরক্ত তার স্রকচন্দন, অশ্রুধারা তার ফুল। আর সেই অবিশ্বাসিনী হতভাগিনী কন্যার ও অকৃতজ্ঞ নরাধম কঙ্কের নিধন তার মূল মন্ত্র।

পূজা শেষ হইল। গর্গ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। কঙ্ককে হত্যা করিতেই হইবে তারপর লীলা। ভাবিয়া-চিন্তিয়া গর্গ কঙ্কের আহার্য্য অন্নে বিষ মিশাইয়া দিলেন যাহা কঙ্কের আগমন প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া লীলা যত্নপূর্ব্বক গৃহের এক কোণে আর-আর দিনের মত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

এই নিদারুণ ব্যাপার ভাগ্যক্রমে লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল। অন্য দিনের মত কঙ্ক যথাসময়ে আশ্রমে ফিরিল।

একহস্তে অন্ন-ব্যঞ্জন অপর হস্তে অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে লালা আসিয়া কঙ্কের সম্মুখে দাঁড়াইল। কঙ্ক অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"লীলা তুমি কাঁদিতেছ। আজ গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার কালে পথে অমঙ্গল দেখিয়াছি—গাছের ডালে বসিয়া কাক সকল খা খা শব্দে যেন উজাড় করিয়া তুলিতেছে, উৎকর্ণ চঞ্চলচিত্ত ধেনুসকল শষ্পভূমি শুধুই পদদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে তৃণ জল গ্রহণ করে নাই! পিতা বিরস বদনে নিতান্ত অনুতপ্তের মত কেন আজ পাশ কাটিয়া সরিয়া গেলেন?"

লীলা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। নীরব নির্ঝরিণীর মত তার দুই চোখ ভাসিয়া জলধারা বহিতে-ছিল। কঙ্ক আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"আর বার বলে কঙ্ক দেবী তোমাকে সুধাই
কোনোদিন তোমাকে কান্দিতে দেখি নাই।"

লীলা তখন সকল কথা কঙ্ককে ভাঙ্গিয়া বলিল। কঙ্ক লীলাকে প্রবোধ দিল, "লীলা ভয় পাইও না, পাপীগণের পাপচক্রান্তে যদিও সেই মহাপুরুষ ক্ষণকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু এ চাঞ্চল্য তাঁর অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। তিনি পরম জ্ঞানী ধর্ম্মশীল। রাহুমুক্ত শশীর মত নিজ জ্ঞানবলেই তিনি শীঘ্র মুক্তি লাভ করিবেন। আমি ইতিমধ্যে কিছুকালের জন্য স্থানান্তরে গমন করিব। তুমি যত্নপূর্ব্বক তাঁর সেবা করিও। তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হইলে আবার আসিব।"

"ঘরে আছে পোষা পাখী হীরামন শারী,
তাহারে ডাকিও লীলা কঙ্ক নাম ধরি।
রৈল রৈলরে লীলা তোমার তোতা শারী,
ক্ষীর সর দিয়া তারে পালিও যত্ন করি।"

এইরূপে কঙ্ক কিছুকালের জন্য কিম্বা নিয়তির কূট চক্রান্তে ইহজীবনের জন্য শেষ বিদায় মাগিয়া লইতেছিল। কিন্তু যাইবার সময় একদিন যিনি শ্মশান-বন্ধুরূপে তাহাকে কোলে স্থান দিয়াছিলেন তাঁহার সেই আশ্রয়-কল্পতরুর চরণ দর্শন করিয়া যাওয়া সঙ্গত কি না একর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, এপ্রশ্নের মীমাংসা—তাহার পক্ষে তত সহজসাধ্য হইল না।

কঙ্ক যখন এইরূপে স্থানান্তরে যাওয়ার চিন্তা লইয়া

বিব্রত হইয়া পড়িল, তখন ভয়ত্রস্তা লীলা দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"কঙ্ক! শীঘ্র আইস, আমাদের আশ্রম-ধেনু কেন আজ মাটিতে পড়িয়া ছটফট্ করিতেছে।" উভয়ে যখন দৌড়িয়া গেল তখন সুরভী স্থির দৃষ্টে তার প্রতিপালকের মুখ পানে চাহিয়া অন্তিম-বিদায় প্রার্থনা করিতেছে। কঙ্ক বলিল, "লীলা! সেই বিষমিশ্রিত অন্ন কোথায় রাখিয়াছিলে?" লীলা মুখে কিছুই বলিতে পারিল না, অঙ্গুলী-সঙ্কেতে মাত্র স্থানটি দেখাইয়া দিল। "সর্ব্বনাশ করেছ দেবী, এবিষ খাইয়া আমরা মরিতাম সেও যে ছিল ভাল। মহাপুরুষের আশ্রমে গোহত্যা হইল।"

কঙ্কের নিরুদ্দেশ

সেই রজনীতেই কঙ্ক কোথায় জানি নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

"প্রভাতে উঠিয়া লীলা কঙ্কের উদ্দেশে,
আলুই মাথার কেশ পাগলিনী বেশে—
পরথমে পশিল লীলা কঙ্কের শয়ন-ঘরে—
শূন্য শেয পড়ে আছে কঙ্ক নাই ঘরে।
মালতী বকুলে লীলা জিজ্ঞাসে বারতা,
তোমরা নি দেইখাছ আমার কঙ্ক গেল কোথা!
পোষনিয়া পাখিগণে লীলা কান্দিয়া সুধায়,
তোমরা নি জানগো বন্ধু গিয়াছে কোথায়?"

বহু অনুসন্ধান করিয়া কঙ্ককে আর পাওয়া গেল না।

গর্গের ধন্না দেওয়া ও দৈববাণী

কঙ্ক ত মরিবেই—এই কাল বিষ হইতে সে কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। কিন্তু এক্ষণে লীলাকে হত্যা করা ত সহজ নহে। মৃত্যুকালে গায়ত্রীদেবী এই মাতৃহারা শিশুটিকে তার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। গর্গ কতবার ভাবিয়াছেন আর কেন? যাই, তীর্থাশ্রমে চলিয়া যাই, কিসের সংসার—কিসের বাসনা! আবার ভাবিয়াছেন, কোথায় যাইব। আমার সংসার-নন্দনের এই স্নেহ-পারিজাতটি কাহার গলায় গাঁথিয়া যাইব! যাইব সেদিন—যেদিন এই প্রাণসমা দুহিতাকে সুপাত্রে অর্পণ করতঃ সংসারের সমস্ত ঋণ হইতে মুক্তি পাইয়া মহাযাত্রা করিব, বানপ্রস্থের সেই ত সময়! কবে আসিবে সেদিন। কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁর সেই স্নেহ-কোমল-মনোবৃত্তিগুলি যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলেন, না যেরূপেই হউক তাকে প্রাণে মারিতেই হইবে।

"মনেতে করিনু স্থির ভাবিয়া চিন্তিয়া,
মারিব পাপিষ্ঠা কন্যা জলে ডুবাইয়া।"

কিন্তু পরদিন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া গো-হত্যার কারণ জানিতে পারিয়া গর্গ সবিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং নিজেকেই গো-হত্যার পাতকী মনে করিয়া পাপ ক্ষালন মানসে দেবতার দুয়ারে ধন্না দিলেন।

"এহিমতে বহুক্ষণ　　কান্দিয়া পাগল মন,
গর্গ পরে হইলা সুস্থির।
ঘাটেতে সিনান করি,　　বাড়ীতে আসিয়া ফিরি,
প্রবেশিলা মন্দির ভিতর,
কপাটেতে খিল দিয়া,　　পূজায় বসিল গিয়া—
দর দর চক্ষে বহে জল,
বলি আজ আত্মদানে,　　দামোদর দাস ভনে
অশ্রু ধার পূজা উপচার।

দেবতার আদেশ পাইবার জন্য গর্গ ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হইলেন।

আজ ভ্রান্ত জ্ঞানে গর্গ তাঁর মানস দেবতার নিকট তিরস্কৃত। এতকাল ধরিয়াও তিনি ক্রোধ হিংসাকে জয় করিতে পারেন নাই। অতি সামান্য কারণে তাঁর এ-চিত্ত চাঞ্চল্য। বহুদিনের সাধন-ফলে প্রায়সিদ্ধব্রত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি গো-হত্যার পাতকী। এদের পূজার আর কি তাঁহার অধিকার আছে।

গর্গ স্থির চিত্তে দেবতার আদেশ শুনিলেন। শুনিয়া আবার পূজায় বসিলেন। এবারকার পূজা তাঁর মুক্তির কামনা—গোহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে অব্যাহতি লাভ। দরবিগলিতধারে অশ্রু গণ্ডস্থল ভাসাইয়া যাইতেছিল। অনিদ্রায় অনাহারে চতুর্থ দিনও কাটিয়া গেল।

দেবতার দয়া হইল। গর্গ দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। সরলপবিত্র হৃদয়া লীলার চয়িত পুষ্প না হইলে দেবতা তুষ্ট হইবেন না, তাহারই অসাধারণ সরলতা-ডোরে দেবতা তাঁর ঘরে বাঁধা—এইজ্ঞানে লীলার চয়িত যে বাসী ফুল সকল বাহিরে পড়িয়াছিল গর্গ তাহাই অঞ্জলি ভরিয়া দেবতার চরণে উৎসর্গ করিলেন। সেই সঙ্গে উৎসর্গ করিলেন, জীবন, যৌবন, সংসার, বাসনা, মন, প্রাণ, বিষয়, বৈরাগ্য, হিংসাদ্বেষ, সুখ,

দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, পাপ, তাপ, চিন্তা, অচিন্তা, যা-কিছু সমস্ত। আজ হইতে গর্গ—মুক্ত পুরুষ।

কঙ্কের অন্বেষণ

কঙ্ককে নিষ্পাপ জানিয়া গর্গ তখন বিচিত্র ও মাধব নামক দুই অনুগত শিষ্যকে তাহার অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। বিচিত্র ও মাধব চলিয়া গেল।

বারমাসী

তারপর বারমাসী আরম্ভ। কঙ্কের নিরুদ্দেশের পর বিরহিনী লীলার কি ভাবে জীবন কাটিতেছিল, কবি বারমাসীতে বর্ণনা করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ষড় ঋতুর ছয়টি মূর্ত্তি জীবন্ত ভাবে আমাদের চক্ষের সম্মুখে আঁকিয়া ধরিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ বারমাসী তুলিয়া দেখাইবার স্থানাভাবে আবশ্যকও নাই। যিনি ইহার ভাবমাধুর্য্য গ্রহণে ইচ্ছুক তিনি মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সবশেষ

এইরূপে পূর্ণ একবৎসর যায়, কঙ্কের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। ব্যর্থ মনোরথে বিচিত্র ও মাধব দুইবার ফিরিয়া আসিল। নিরাশায় বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল। লীলা তখন—

"হেমন্ত চলিয়া যায় শীত আইসে ঘুরে—
আইঞ্চল পাতিয়া লীলা শুয়ে ভুয়ের পরে।
* * * * * * *
এইত না ছিল লীলার সোনার যৌবন,
হেমন্ত নিদারে যেমন পুড়ে পদ্মবন।
গঙ্গার তরঙ্গ লীলার দীঘল কেশপাশ।
সে কেশ শুকাইয়া হইল চাকুলীর আঁশ।"

একদিন কঙ্ক দৈবাৎ গৃহে ফিরিল বটে—তখন গর্গ প্রাণাধিকা দুহিতাকে চিতাশায়ী করিয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড হাতে চিতা প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। অতঃপর সশিষ্য গর্গের অগস্ত্যযাত্রা—

"সঙ্গে লয়ে অনুগত শিষ্য পঞ্চজন,
সংসার তেয়াগি গেলা জন্মের মতন॥

বিভিন্ন শাখা

লীলার বারমাসী, কবি-চতুষ্টয়ের হাতে পড়িয়া, বিভিন্ন শাখায় রূপান্তরিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কবিগণের এই স্বাধীন বিহারে লীলার জীবনধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছে। লীলার উল্লিখিত স্বাভাবিক মরণ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন দামোদর দাস। কিন্তু অন্য জন, অনেক দূর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বকবির পথ অনুসরণ করিয়া ভিন্ন পথে চলিয়া গিয়াছেন। এই শাখায় লীলার মৃত্যু অস্বাভাবিক, কিন্তু তাহা আরও করুণ মর্ম্মস্পর্শী। দেখিতে পাই বিরহিণী লীলা প্রিয়তমের নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া "ঘামনা লতা"র সাহায্যে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

"ডালেতে আছিল বান্ধা ঘামুনার লতা।
দাঁড়াইয়া দেখিছে লীলা মুখে নাই কথা।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল,
শুকনা ঘামুনা লতা গলায় বাঁধিল।"

লীলার এই অস্বাভাবিক মরণ-চিত্র যিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনিও কবি। কবিত্ব-সম্পদ তাঁহারও যথেষ্ট ছিল। নীরব নৈশ প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া মিশাইয়া এই অস্তমিতা মূক-বিরহিণীর চিত্রটি অতি সাবধানেই অঙ্কিত করিয়াছেন। সুপ্ত জগৎ—নদী ঢেউশূন্য—মাঝি মাল্লাগণ এই মাত্র বাউল গান ছাড়িয়া নিদ্রার ক্রোড়ে মাথা পাতিয়াছে। গাছের পাতা একটিও কাঁপে না। লীলা তখন ধীরে ধীরে নদীর পাড়ে আসিয়া পড়িল। তার চক্ষু দুটি শুষ্ক দুঃখের জলন্ত অগ্নিশিখা,নীরব সহিষ্ণুতার প্রগাঢ় ধূম্রপুঞ্জে আচ্ছাদিত রহিয়াছে।

"চন্দ্র তারা গণে কন্যা কাইন্দা সাক্ষী করে—
মুখে শব্দ নাহি কন্যার চক্ষে নাহি জল,
দেবতার কিরপা মাগে কন্যা পাতিয়া আইঞ্চল।

তারপর সবশেষ

তৃতীয় কোনো মিলন-প্রিয় কবি। এই ব্যক্তি বহুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। শেষে বোধ হয় লীলার শোচনীয় অকালমৃত্যু তাঁহার প্রাণে বরদাস্ত হইল না। তিনি গর্গের জ্ঞান-মন্ত্র-বলে তাহাকে পুনর্জ্জীবিতা করিয়া বেশ করিয়া কঙ্কের সঙ্গে ঘর-সংসার পাতাইয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তির ভাষা আধুনিক ও বিশেষত্ববর্জ্জিত। গীতির শেষাংশে এতদঞ্চলের একজন ধনবান্ ব্যক্তির প্রশংসা-গীতি জুড়িয়া দিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। হয় ত সময়ে উক্ত ব্যক্তি দ্বারা কবি উপকৃত হইয়া থাকিবেন।

বারমাসীতে বিরুদ্ধভাব

কবি-চতুষ্টয়ের হাতে পড়িয়া লীলার বারমাসী যে শুধু বিভিন্ন শাখায় রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু তাহাতে কবিগণের স্ব স্ব কল্পিত বিরুদ্ধ ভাব স্থান পাইয়াছে। এই বিরুদ্ধ ভাব দ্বারা কবির জীবন-অখ্যায়িকার প্রকৃত ইতিহাসের মর্য্যাদা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। লীলার বারমাসীর একমাত্র অবলম্বন লীলা। এই লীলা আবার কঙ্কর জীবনকথার সারা অংশ জুড়িয়া আছে। এক্ষণে দেখা যাউক লীলার জীবন প্রকৃত না, কবি-কল্পিত।

কবির নিজকৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি তাহাকে স্নেহের ভগিনী, ভক্তির জননী বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। কবির জীবন যদি সত্য হয় তবে লীলার বাস্তব জীবন আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু কবি-চতুষ্টয় লীলাকে কঙ্কের মানস প্রতিমারূপে চিত্রিত করিয়া নিজেরাই একটু গোলে পড়িয়াছেন। লীলার বারমাসীর কবি একস্থানে গাহিয়াছেন।

"আইস আইস বন্ধুরে বইস মোর কাছে,
দেখিব তোমার মুখে কত মধু আছে।
তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হইম লতা—
বেইড়া রাখম যোগল চরণ ছাইড়া যাইবা কোথা।
তোমারে শুইতে দিবরে বন্ধু অঞ্চল বিছান,
মুখেত তুলিয়া তোমায় দিব সাঁচীপান।"

এগুলি প্রেমের চিরপ্রচলিত বাঁধা গৎ। কবিগণ এগুলি বারমাসীতে স্থান দিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু কঙ্কের বন্দনা-গীতির "স্নেহের ভগিনী, ভক্তির জননী" সঙ্গে একথাগুলি কিছুতে একাসনে স্থান পাইতে পারে না।

লীলার বিলাপ নাচারীর আর-একস্থানে তাঁহারাই গাহিয়াছেন।

"সোদর সাক্ষাৎ বেশী তা হ'তে অধিক বাসি
হেন ভাই জলেতে ডুবিল,
কি মোর কর্ম্মের লিখা আর না হইব দেখা
বিধি মোরে নিদারুণ হইল।"

এই স্থানে ভাইয়ের প্রতি ভগিনীর উচ্ছ্বসিত স্নেহ-ধারাই ব্যক্ত হইতেছে। এই কথাগুলির সঙ্গে নিম্নলিখিত স্থানগুলি পাঠক একটু মন দিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ভাবধারা উন্মাদের মত কখন্ কোন্ স্রোতে বহিয়া গিয়াছে—

"না যাইও না যাইও বন্ধু আরে বন্ধু চরাইতে ধেনু,
আতপে শুকাইয়া গেছে তোমার সোনার তনু।
আইস আইস বন্ধুরে—খাওরে বাটার পান,
তালের পাঙ্খায় বাতাস করি জুড়াক রে পরাণ।
আহারে পরাণ বন্ধু তুমি ছিলে কৈ,
তোমার লাগ্যা ছিকায় তোলা গামছাবান্ধা দৈ।
গামছা বান্ধা দৈরে বন্ধু শালীধানের চিড়া,
তোমারে খাওয়াইব বন্ধু সামনে থাইক্যা খাড়া।"

আরেক স্থানে লীলা আপন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে গাহিতেছে।

"অকূলে ডুবিল নাও শিশুকালে মৈল মাও
কত দুঃখে পাল্যাতুলে বাপে—
হেন বাপ বৈরি হৈল কারে দোষ দিব বল,
কপাল পুড়িল ব্রহ্মশাপে।
মনে চিন্তে নাহি জানি, লোকে বলে কলঙ্কিনী
এত ছিল কর্ম্মে নাহি জানি,
দিবস আন্ধাইর ঘোর চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী মোর
আর কারে বা সাক্ষী করি আমি।"

সরল-হৃদয়া পুণ্যশীলা লীলা নিজের মনের ভিতর খুঁজিয়া পাপের লেশ মাত্র পাইতেছে না। নিদারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়া চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিতেছে, যে পাপী যে আপন পাপের কথা সম্পূর্ণ জানে, মনে মনে সে কখনো ধর্ম্ম সাক্ষী করে না। যদি বা করে তাহা প্রকাশ্য মানব-সমাজে নিজকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য।

অনুতপ্ত গর্গের মুখ দিয়াও কবি বলাইয়াছেন—

"না জানিয়া না শুনিয়া করিলাম কর্ম্ম,
আজি হতে আমারে ছলিল শাস্ত্র ধর্ম্ম।"

অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। এইরূপ অনবধান কবি ও গায়কের হাতে পড়িয়া এই সুন্দর বারমাসীটির ঐতিহাসিক অবস্থা এতাদৃশ দুর্দ্দশার চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইতিহাসে কবির প্রভাব

ঐতিহাসিক মর্য্যাদা যতই কেন ক্ষুণ্ণ হউক না লীলা-কঙ্কের এই প্রণয়-কাহিনী প্রেমিক কবিগণের হাতে পড়িয়া ভাব-মাধুর্য্যে যে-অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইতিহাসের উপর কবির একটা প্রভাব চিরকাল আছে—থাকিবে। ইহাই কবির দুর্জ্জয় শক্তি। রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের—বিদ্যাপতির সঙ্গে

লছমী দেবীর প্রণয়-কুসুম যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু বিদ্যমান, তাহা বলা অসম্ভব। অনেক স্থলে কাব্য-কথাকেই আমরা ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হই। রামী বলিয়া প্রকৃত কেহ ছিল কি না এরূপ সন্দেহ মনে মনে পোষণ করিয়াও আমরা বিপদগ্রস্ত হইতে চাহি না। বিশেষ রামী না থাকিলে আমাদের ভাব ভাষা শুধু যে নীরস হয় তাহা নহে, নির্জীবও হইয়া পড়ে, কারণ চণ্ডীদাস দেহ, রজকিনী প্রাণ। চণ্ডীদাস কবি, রজকিনী তার ভাব ভাষা। রামী রজকিনী না থাকিলে চণ্ডীদাসের অস্তিত্বই থাকে না; কারণ, রামীর প্রেমই চণ্ডীদাসকে তাঁহার জগৎ-বশীকরণ মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছে। চণ্ডীদাসের বর্ণনায় রামীর নাম পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, পদাবলী সাহিত্যে সে একজন বিশিষ্ট কবি। চন্দন-তরুর সংস্পর্শে আসিয়া সেও চন্দনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে রামীর বাস্তব জীবনের মূল্য কত—এই সকল ভনিতা তার নিজকৃত কি না, ভাবিবার বিষয়। যে-শ্রদ্ধেয় সমালোচক রাধাকে বাদ দিয়া কৃষ্ণ-চরিত্র উদ্ধারে প্রয়াস পাইয়াছেন তিনি এবিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন—সেই রাধা-লতার বেষ্টনী হইতে কৃষ্ণকল্পদ্রুমটি কতটুকু উদ্ধার পাইয়াছে তাহা বলিতে পারিব না। তবে রাধাকে বাদ দিলে ভারতীয় সাহিত্যের যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

লীলার বারমাসীতে বৈষ্ণব কবির প্রভাব

লীলার বারমাসী হইতে কবিদের কল্পিত প্রণয়-কাহিনী বাদ দিলে বাস্তবিক তাহা শুষ্ক কাষ্ঠবৎ নীরস হইয়া পড়ে। ভাবমাধুর্য্য বিন্দু মাত্র থাকে না। বারমাসীর মাঝে মাঝে বৈষ্ণব কবির হস্ত-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। "আহারে কঙ্কের বাঁশী" এই পদগুলিতে "আহারে শ্যামের বাঁশী" সেই চিরপ্রচলিত সাধা সুর আসিয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব কবিই কঙ্কের হাতে এইরূপে বাঁশী তুলিয়া দিয়াছেন। দেখিতেছি কঙ্ক তখন হইতে বৃন্দাবনের বংশীবদন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধার মত মুগ্ধা লীলা, কত ভাবে কত রকমে তার বঁধুয়ার মন সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছে। লীলার বিরহ-শয্যা বিরহিনী রাধার দশম দশায় পরিণত হইয়াছে। কাব্যাংশে এইসকল স্থান অতি সুন্দর। পাঠক মূল কাহিনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। বৈষ্ণব কবির হাতে পড়িয়া লীলার বারমাসীতে অপ্রত্যাশিত ভাবে গৌরাঙ্গ-কাহিনীও স্থান পাইয়াছে।

লীলার বারমাসীতে গৌরাঙ্গ-কাহিনী

বোধ হয় সুদূর নবদ্বীপ হইতে তখন সেই প্রেম-তরঙ্গ ময়মনসিংহের উপকূলে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল। তদানীন্তন পল্লীকবিগণ জগৎ-ভাসানো প্রেমতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়াছেন এবং ভক্তের মনোরঞ্জনার্থ বাধ্য হইয়া তাঁহারা লীলার বারমাসীতে এইসকল প্রেমগাথা জুড়িয়া দিয়াছেন।

তথাপি গঙ্গা-যমুনার মিলনের মত এই জোড়া স্থানটি অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়; ইহা যে রিপুকার্য্য তাহা কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয় না।

কিন্তু যে-কৌশলে তাঁহারা গৌরাঙ্গ-গাথা লীলার বারমাসীতে স্থান দিয়াছেন সে কৌশলটি অতি সুন্দর। আশ্রমে গোহত্যা হইলে কঙ্ক স্বপ্নে দেখিল, সে আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে—এসময়ে এক কাঞ্চন-কায় পুরুষ আসিয়া কঙ্ককে আগুন হইতে উদ্ধার করিলেন।

> "রক্তগৌর তনু তার কাঞ্চনের কায়া—
> আগুন হইতে কঙ্কে দিল বাঁচাইয়া।
> স্বপনে আদেশ তার পাইয়া কঙ্কধর
> প্রভাতে গৌরাঙ্গ বলি ত্যজিলেক ঘর।"

কঙ্কের অন্বেষণে ব্যর্থমনোরথ বিচিত্র ও মাধব যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন গর্গ তাঁহাদিগকে আবার তাহার অন্বেষণে পাঠাইলেন এবং কোথায়, কি ভাবে তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে বলিয়া দিলেন; সেই নির্দ্দেশ-বাণীতে মহাপ্রভুর প্রেম-কাহিনী অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা তাহার ভাবার্থটুকুমাত্র সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। "বিচিত্র, মাধব, তোমরা যাও, পথে দেখিবে যে দেশের যে-গিরি নদীর উপর দিয়া শিষ্যগণ সহ মহাপ্রভু চলিয়া গিয়াছেন মহাপুরুষের চরণ-স্পর্শে সেদেশের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। কত অহল্যা পাষাণী মানুষ হইয়াছে, কত কাষ্ঠের তরী সোনা হইয়া গিয়াছে। দেখিবে প্রভুর শিষ্যগণের পদ-রেণুতে সেদেশের আকাশ ধূলি-সমাচ্ছন্ন। আজও পথে পথে তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন লক্ষিত হইবে। তিনি যে-দেশ ছাড়িয়া

চলিয়া গিয়াছেন সে-দেশের বনের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত তাঁহার অন্বেষণে আকুল চিত্তে ছুটাছুটি করিতেছে। সে দেশের গাছের পাখীরা হরিনাম শিখিয়াছে—সে দেশের নদী আজও হরিনামের ধ্বনি শুনিলে উজান বয়—সে-দেশের শুষ্ক মালঞ্চলতা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে সে-দেশের ধূলিকণা তীর্থ-রেণুতে পরিণত হইয়াছে—শ্রীঅঙ্গের সুরভিশীতল স্পর্শে সে-দেশের বাতাস আজও সুরভিত। সে-দেশের কুলবধূরা পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলিয়া আকুল চিত্তে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসে। তোমরা সেই সেই দেশে তাহার অন্বেষণ কর, কারণ 'সহজে গৌরাঙ্গ ভক্ত হয় সেইজন'।

এই সকল গীতি-কথা হইতে আর কিছু পাই না পাই শ্রীগৌরাঙ্গ-ভাবে ভাবিত তৎকালীন দেশের অবস্থা উত্তম-রূপে জানিতে পারা যায়। দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় লীলার বারমাসীতে এই গৌরাঙ্গ-গাথার স্থান একেবারে অস্বাভাবিক হয় নাই।

লীলার বারমাসীর কবিত্ব ও উপমা

অশিক্ষিত হইলেও লীলার বারমাসীর কবিগণ স্বভাব-কবি। বোধ হয় বঙ্গপ্রকৃতিই তাঁহাদিগকে এই দুর্লভ কবি-প্রতিভা দান করিয়াছিল। তাঁহাদের ভাষা নির্ঝরিণীর মত মুক্ত-প্রাণ, কোথাও বাধা-বিঘ্ন মানে নাই। ভাবি-বার জন্য দু-দণ্ড দাঁড়ায় নাই। উপমাগুলি তেমনি মধুর অথচ চাহিয়া খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। যাহা তাঁহাদের মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে পড়িয়াছে তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন—

* * * * * * * *
"ভাদ্র মাসের চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা
* * * * * * * *
সিন্দুর মাখিয়া কন্যার দিয়াছে অধরে—
কাল কাজল রাঙ্গা তার দুই পাশে
বর্ষাকাল্যা তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে।
সুন্দর বদন লীলার কোটা পদ্ম ফুল
হাটিয়া যাইতে লীলার মাটিতে পড়ে চুল।
তার মধ্যে দন্ত লীলার নাহি যায় দেখা
দুর্লভ মুকুতা যেন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা।"

ভাদ্র মাসের চান্নির মতনই উপমাগুলি মুক্তপ্রাণ। পাঠক মূল গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে-পারিবেন।

একস্থানে লীলা কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিতেছে। এই বিবর্ত্তনের সংবাদ কেউ লীলাকে দেয় নাই—সে নিজেও জানিতে পারে নাই। একদিন জানিল, যে-দিন জল ভরিতে গিয়া—

চাহিল নদীর জলে আঁখি ফিরাইয়া,
হেরি সে সুন্দর রূপ চমকে সুন্দরী,
শীঘ্রগতি ঘরে ফিরে লইয়া গাগরী॥

এইরূপে সামান্য দু-একটি রেখাপাতে কবি সুন্দররূপে স্থানবিশেষের চিত্রসকল অঙ্কিত করিয়াছেন।

আর এক স্থানে আছে—

পিক ডাকে ডালে বসি হাতের মালা ভূমে খসি
পড়ে কন্যা চমকিয়া যায়
আঁচল তুলিয়া শিরে লীলাবতী পশে ঘরে
আউল কেশ চরণে লুটায়।
মলয়ের সমীরণে শিহরে সোনার তনু
ভাবে কন্যা কি হবে উপায়।
বসন টানিয়া হায়। ঢাকিছে কাঞ্চন কায়
ঢাকিলেও ঢাকা নাহি যায়।

সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত করিয়াও লীলার মনের সন্দেহ ঘুচি-তেছে না।

কঙ্ক ধেনু চরাইতে বাথানে যাইত, সেই অন্যমনস্কা সুন্দরী তখন—

"ভূতলে অঞ্চল পাতি শুযে কন্যা লীলাবতী
একেলা শুইয়া নিদ্রা যায়।
ঘুমে নাহি ঢুলু আঁখি উঠে বইসে বিধুমুখী
পালটিয়া পন্থ পানে চায়॥

আবার যখন—

ফুকারে বন্ধের বাঁশী শিউরিয়া উঠে বসি,
জল ভরন্তে যায় লীলা।
মনে ভাবে সুন্দরী কি জানি কেমন করি,
আজিবা হইল এত বেলা!"

নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলি লীলা আর তেমন করিয়া সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বেলা চলিয়া যায়—কেমন করিয়া বা চলিয়া যায়—লীলা এক্ষণে তাহা বুঝিতেই পারে না। সে আজকাল নিজের এই ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য নিজেই লজ্জিত। সে প্রত্যহ আপনাকে প্রশ্ন করে—"কি জানি কেমন করি আজি হইল এত বেলা"। এই অনাহুত চিন্তা কোথা হইতে আসিল, চিন্তাই বা কিসের, লীলা তাহা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বুঝিতে পারিত না যে, বর্ষার মেঘ যৌবনের চিন্তা—বিধাতার

স্বাভাবিক নিয়মের বশে আসিয়া উদয় হয়, ইহাদিগকে ডাকিয়া সাধিয়া আনিতে হয় না।

সময়োচিত এই সকল বিবর্ত্তন যেমন ভাবিবার বিষয়, তেমনি লক্ষ্য করিবার বিষয়ও বটে। কিন্তু ভাসা ভাসা নজরে তাহা হয় না। এগুলি লক্ষ্য করিতে হইলে তেমন অন্তর্ভেদী সূক্ষ্ম দৃষ্টি চাই।

যৌবন-বর্ণনার এই সূক্ষ্মদর্শী কবি নয়ান দাস গাহিয়াছেন—

"সোনার যৌবন কাল কহে নয়ান দাসে
সাধিলে থাকে না যৌবন যত্নে নাহি আসে।"

বারমাসী

কঙ্ক ও লীলার কাহিনীকে বারমাসী বলা হয় কেন? তাহার কারণ নায়িকা কর্ত্তৃক তাহার বার মাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনাই হইল বারমাসী। যেমন সীতার বারমাসী। অশোক বনবাস-কালে সীতা আপন দুর্ভাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া যে-দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই সীতার বারমাসী নামে অভিহিত। সেইরূপ রাধিকার বারমাসা, ফুল্লরার বারমাসী। কিন্তু পালাগীতিগুলির মধ্যে এরূপ বার মাসের বর্ণনা যাহাতে আছে, তাহা সমগ্রভাগেই বারমাসী নামে অভিহিত হইয়াছে। লীলা ও কঙ্কের কাহিনী পল্লীসমাজে লীলার বারমাসী নামেই পরিচিত। যে উৎকৃষ্ট গীতিকার নামে এই কাহিনীর নামকরণ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা এক্ষণে কিঞ্চিৎ বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। চাঁদের আলো, ফুলের সৌরভ, নদীর তরঙ্গ এসকল যেমন উপভোগের সামগ্রী, মূল কাহিনীর ভিতর এও তেমনি উপভোগ্য। শিশির-ধোয়া ফুলের মত ইহার প্রত্যেকটি দল নায়িকার করুণ প্রেমাশ্রুতে আর্দ্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা যেমন সুন্দর তেমনি সুমিষ্ট। আমরা সামান্য দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"দারুণ ফাল্গুন মাস গাছে নানান ফুল,
মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী বকুল।
কইও কইও বন্ধুর আগে শুন অলিকুল,
মালতীর গাছে তার ফুটিয়াছে ফুল।
দারুণ চৈত্রের হাওয়া দূর হইতে আসে,
আমার বন্ধু এমন কালে রইয়াছে বৈদেশে।
গাছে গাছে সোনার পাতা ফুটে সোনার ফুল
কুঞ্জেতে গুঞ্জরি উঠে ভ্রমরার রোল।
বিনা সুতে হার গাঁথিলাম মালতী বকুলে,
প্রাণের বন্ধু দেশে নাইরে দিব কার গলে।"

এই বারমাসী দীর্ঘ বিধায়, আমরা সব স্থান তুলিয়া দেখাইতে পারিলাম না, আবশ্যকও নাই। মূল গ্রন্থই কৌতূহলী পাঠকের চিত্ত বিনোদন করিবে। তথাপি বারমাসীর আরও দুইটি ছত্র তুলিয়া দেখাইবার লোভ আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"হাতে ত সোনার ঝারি বর্ষা নেইমে আসে।
*   *   *
শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পশরা।"

এই পদগুলি পাঠ করিবার সময় পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন ইহা কেবলই সেই পল্লার অশিক্ষিত অবজ্ঞাত কাষ্ঠ কবির রচনা কি না।

বৈধ-অবৈধ বিচার

ইতিহাসের উৎকর্ষ সত্যনির্ণয়ে। কাব্যের উৎকর্ষ কবিত্বে, কেন না, কাব্য ইতিহাস নহে। কঙ্ক ও লীলার জীবন ঐতিহাসিক—কিন্তু কঙ্ক-লীলার কাহিনী ঐতিহাসিক নহে, ইহা একটি কল্পিত পল্লীগীতিকা মাত্র। বিশেষ এই অশিক্ষিত অর্দ্ধ শিক্ষিত পল্লীকবির কাছে আমরা বৈধ-অবৈধ বিচারের আশা তেমন করিতে পারি না। দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথক পৃথক সমালোচনায় শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকেও একটু নীচে নামিয়া বসিতে হয়। আমরা দেখিব ভাল মন্দ ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক—বৈধ-অবৈধ এসবের মিলিত স্পর্শে এই যে পল্লা-শাখাটি রামধনুর মত বিচিত্র বর্ণে নয়নানন্দদায়িনী শোভায় পল্লীর আকাশ জুড়িয়া বসিয়াছে তাহা কত সুন্দর! রামধনুর মতনই তাহা উজ্জ্বল, তেমনি বিচিত্র। উপকরণও তেমনি সামান্য। মাত্র কয়েক ফোঁটা চোখের জল আর সংসারিক হাসিকান্নার দুএকটি আলোক-রেখা!

কিন্তু আরও একটি কথা। এইসকল গীতিকার ভাব-মাধুর্য্য বই পড়িয়া ততটুকু উপভোগ করা যায় না যতটুকু গান শুনিয়া হয়। ভাটিয়াল রাগিনীতে এইসকল পল্লীগাথা শুনিলে বাস্তবিক যেন পাষাণ গলিয়া ধারা বয়। কতদিনের কত শীর্ণ স্মৃতি একটি একটি করিয়া মনের ভিতর জাগাইয়া তোলে। আজও সে-গান শুনিতে শুনিতে পল্লীর ভাটিয়াল নদী উজান বয়। ধন্য তাহারা, প্রাণের সমস্তটুকু আদর-সোহাগ দিয়া, শিক্ষিত সমাজের অনাদর অবজ্ঞা সহ্য করিয়া তাহাদের এই প্রাণের জিনিষগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

আরাতামা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিশলাম নগরে শত্রুর আক্রমণের আশু আশঙ্কা না থাকিলেও যাঁহারা নগররক্ষার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। রাজা শিশেরা সেনাপতির সঙ্গে নগর ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে আরও কিছু সৈন্য লইয়া তিনি সেনাপতির অনুগামী হইলেন। তাঁহার আদেশমত রাজকন্যা সাফিরা গোপনে নগর পরিত্যাগ করিয়া বনে মৃগয়াভবনে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রক্ষকস্বরূপ পঁচিশ জন সৈনিক সঙ্গে গেল। রাজকন্যা যে নগরে নাই, এ কথা কিছুদিন প্রকাশ পাইল না। নগরবাসীরা জানিল, রাজকন্যাকে নগরে রাখিয়া রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন।

নগর-রক্ষার ভার প্রধানতঃ নাগরিক-সৈন্যের উপর, অপর সৈন্যসংখ্যা অল্প। গালিমের আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সৈন্যদিগকে শিক্ষা দেওয়া, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক রাখা, নগরের সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করা, গালিমের দৈনন্দিন কর্ম্ম। তাহা ছাড়া রাত্রিকালে প্রহরে প্রহরে তিনি নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার উৎসাহে ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ে সমস্ত নগর উৎসাহিত হইয়া উঠিল, এমন কি, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অস্ত্রনির্ম্মাণ, আহার্য্য সংগ্রহ প্রভৃতি করিতে লাগিল। যদি শত্রু রাজসৈন্যকে বঞ্চিত করিয়া নগর বেষ্টন করে, তাহা হইলে কিছুদিন নগরের বাহির হইতে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যাইবে না, এই সকল বিবেচনা করিয়া গালিম প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিলেন। শত্রু পাহাড়ের জলপ্রণালী বন্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহার প্রতিকারস্বরূপ গালিম নগরের যাবতীয় তড়াগ ও কূপ জলপূর্ণ করিলেন। যে কয়টি বিমান ছিল, সেগুলি দিবাভাগে ও রাত্রে নগরের চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিত। অতি অল্পসংখ্যক অপর সৈন্য ছিল, তাহারা গালিমের অনুগত, বিনাবাক্যে তাঁহার সকল আদেশ পালন করিত।

নগরে যে কোন শত্রু আছে অথবা শত্রুপক্ষীয় কেহ আছে গালিম সে সংশয় করিতেন না। ছদ্মবেশী রত্নবণিকের পরামর্শমত ফারেজ নাগরিক সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছিলেন ও সকল কর্ম্মে উৎসাহী ছিলেন। গালিম তাহাকে একদল সৈন্যের ভার দিয়াছিলেন। ফারেজ যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল, কিন্তু শত্রুর সহায়তা তাঁহাকে কেমন করিয়া করিতে হইবে ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। হয় সেই রত্নবণিক কিংবা আর কাহাকেও দেখিতে না পাইলে তিনি কি সন্ধান দিবেন? ফারেজ যে ঠিক রাজদ্রোহী তাহা নয়; কেন না, রাজা শিশেরার বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অভিযোগ ছিল না। তাঁহার রাগ আরাতামার উপর। আরাতামার প্রতি রাজার বিশেষ অনুগ্রহ আর আরাতামা যথেষ্ট ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শত্রুর জয় হইলে আরাতামার শাস্তি হইবে, ফারেজের সেই আশা এবং সেইজন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত। তিনি একটা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

লোবান নাগরিক-সেনার দলে যোগ দেন নাই। গালিম তাঁহাকে একবার বলাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন আমি বিদেশী, কোন পক্ষে যোগ দিতে চাহি না।

গালিম বলিলেন,—বিদেশী বলিলে ত শত্রুর কাছে রক্ষা পাইবেন না।

—শত্রু আসিবার পূর্ব্বেই আমি নগর ছাড়িয়া যাইব।

গালিম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, নগর হইতে বাহিরে গিয়া আপনি যে শত্রুর সঙ্গে যোগ দিবেন না তাহা কেমন করিয়া জানিব?

লোবান রাগিয়া বলিলেন, আমি এখানকার রাজার প্রজা নই, আমার উপর আপনাদের কি ক্ষমতা?

—নগরে যত লোক আছে সকলের উপর আমাদের সমান ক্ষমতা, আপনি বিদেশী বলিয়া এড়াইতে পারিবেন না। এখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা শুধু দুই পক্ষ জানি, শত্রুপক্ষ আর মিত্রপক্ষ, তৃতীয় কোন পক্ষ মানি না।

গালিম চলিয়া গেলেন। দুই দণ্ড পরে একজন সৈনিক আসিয়া লোবানকে পরুষভাবে বলিল,—নগর-সেনাপতির আদেশ, আপনি এ নগর ত্যাগ করিবেন না, তাহা হইলে বন্দী হইবেন।

লোবান মনে মনে অত্যন্ত রাগ করিলেন, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

আরাতামা চলিয়া যাওয়াতে লোবান ও বাষ্টীর দেখা-সাক্ষাতে কোনরূপ বাধা বা সঙ্কোচ রহিল না। উরীম বড়-একটা বাড়ী থাকিত না, নগর-রক্ষার জন্য কোথায় কি আয়োজন হইতেছে দেখিয়া বেড়াইত। বাষ্টী কোথায় যায়-আসে প্রহরীরা কখন জিজ্ঞাসা করিত না। আরাতামা নাই জানিয়া লোবান মনে করিতেছিলেন, একদিন আরাতামার বাড়ী উত্তমরূপ খুঁজিয়া দেখিবেন যদি লুক্কায়িত রত্নসমূহের কোন সন্ধান পাওয়া যায়। আরাতামা স্ত্রীলোক হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন, সেখানে হীরামুক্তা কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন? তিনি নিশ্চিত বাড়ীতেই কোথাও গোপন করিয়া রাখিয়া থাকিবেন, উত্তমরূপে অন্বেষণ করিলে পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া বাষ্টীও সম্মত হইয়াছিল। আরাতামার অনুপস্থিতিতে তাহারও সাহস বাড়িয়াছিল। লোবানকে বলিল,—তোমার যখন ইচ্ছা হয় আসিও। প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, তুমি আরাতামার বন্ধু, আমাদের সকলের পরিচিত, তোমাকে কেহ নিষেধ করিতে পারে না।

লোবান একদিন আরাতামার বাড়ী যাইবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময় সৈনিক আসিয়া তাঁহাকে গালিমের আদেশ শুনাইয়া গেল। বাষ্টী আসিলে লোবান তাহাকে বলিলেন—নগর হইতে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ হইয়াছে।

—কেন?

—গালিম বলিয়া পাঠাইয়াছেন নগরের বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিলে তিনি আমাকে বন্দী করিবেন।

সকল কথা শুনিয়া বাষ্টী কহিল, তুমি সৈনিক হও না কেন?

—গালিমের ভয়ে? এখন স্বীকার করিলে গালিম মনে করিবে তাহার ভয়ে সৈনিক হইতে চাহিতেছি।

—করে করুক। কত সুবিধা বিবেচনা করিয়া দেখ। সৈনিক হইলেই তুমি একটা পদ পাইবে, আরাতামার বাড়ী যখন ইচ্ছা যাইতে পারিবে, কেহ কোন কথা বলিবে না। তাহার পর যখন ইচ্ছা আমরা নগর পরিত্যাগ করিতে পারি, কেহ কোন সন্দেহ করিবে না।

—তাহার পর আমাকে ধরিবার জন্য সৈন্য ছুটিবে।

তখন দেখা যাইবে। শত্রুর দলে মিশিতে কতক্ষণ?

ভাবিয়া-চিন্তিয়া লোবান নাগরিক সৈন্যদলে ভুক্ত হইলেন। গালিম সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বের আদেশ প্রত্যাহার করিলেন, অপর সৈনিকদিগের মত লোবান যেখানে ইচ্ছা যাইতেন, পিছনে প্রহরী থাকিত না। ফারেজ দেখিলেন, এতদিন পরে লোবান সৈনিক হইয়াছেন। তিনি সময় বুঝিয়া একদিন সন্ধ্যার পর লোবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

দুই চারিটা অন্য কথার পর ফারেজ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি এতদিন নগররক্ষার জন্য নাগরিক সৈন্যদলে প্রবেশ করেন নাই কেন?

—আমি বিদেশী, কোন পক্ষেই আমার অস্ত্রধারণ করা উচিত নয় বলিয়া যোগ দেই নাই।

—তবে এখন কেন সৈনিক হইয়াছেন?

—সে অনেক কথা। আপনাকে বলিয়া কি হইবে?

—আপনি মনে করিতেছেন গালিম আমার বন্ধু, আমার কাছে কোন কথা প্রকাশ করিলে তাঁহার কানে উঠিবে।

—সেও একটা কারণ বটে।

—গালিমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব মৌখিক, আমি যে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সৈনিকের দলে প্রবেশ করিয়াছি এরূপ বিবেচনা করিবেন না।

লোবান চুপ করিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

ফারেজ লোবানের আরও কাছে আসিয়া বসিলেন। কণ্ঠের স্বর নামাইয়া কহিলেন—আমাদের কথা আর কেহ শুনিতে পাইবে না ত? আর কেহ ত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে না?

আসিবার মধ্যে এক বান্দী, কিন্তু তাহাকে বারণ করা যায় না।

লোবান বলিলেন, এখানে কেহ নাই। যদি কেহ আসে ত বিশ্বস্ত লোক, আপনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন নির্ভয়ে বলুন।

—রত্ন-বণিক উজ্জালের সহিত আপনার দেখা হইয়াছিল?

—হইয়াছিল।

—কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল?

—সামান্য, স্পষ্ট কোন কথা হয় নাই।

—সে শত্রুপক্ষের লোক এমন কোন আভাস পাইয়াছিলেন?

—আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা হইয়াছিল। গালিমের আমি কি রকম বন্ধু এখন বুঝিতে পারিতেছেন?

দুই জনে অনেকক্ষণ পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। উভয়ে উভয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, কথার আবশ্যক হইল না।

কিছুক্ষণ পরে ফারেজ কহিলেন,—আরাতামার সম্বন্ধে আপনার কি মত?

—এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

—গালিমের বিষয়ে আপনার যেমন ভুল ধারণা ছিল আরাতামার সম্বন্ধেও সেইরূপ থাকিতে পারে। সেইজন্য আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে, আরাতামা আমাকে অপমান করিয়াছেন এবং সে-অপমান আমি কখন ভুলিব না।

—কিরূপ অপমান?

—সে কথা আপনাকে নাই বা বলিলাম।

—আরাতামা আমারও বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন। যেমন করিয়া পারি তাহার প্রতিশোধ লইব।

—তাহা হইলে দেখিতেছি সকল বিষয়ে আপনার ও আমার এক মত। অতএব সকল কাজ আমাদের পরামর্শ করিয়া করা উচিত।

—আমি তাহাতে রাজি আছি।

—সুযোগ বুঝিয়া আমাদিগকে শত্রুর সঙ্গে যোগ দিতে হইবে, নহিলে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না।

—আমারও সেই মত।

—আমার বিশ্বাস রত্ন-বণিক উজাল ছদ্মবেশে এখানে আসিয়াছিল, আর সে সামান্য চর নয়। তাহার সঙ্গে অথবা তাহার কোন লোকের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হইবে। যে পর্য্যন্ত আমাদিগকে এখানকার সমস্ত সন্ধান রাখিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজন মত শত্রুপক্ষের সহায়তা করিতে পারি।

—আমাদের নিজের যাহাতে কোন বিপদ না হয় সে-বিষয়েও সাবধান থাকিতে হইবে। গালিম যদি ঘুণাক্ষরে কিছু জানিতে পারেন অথবা কোনরূপ সন্দেহ করেন তাহা হইলে আমাদের নিস্তার নাই। শত্রুর যে জয় হইবে এমন কথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যদি তাহাদের পরাজয় হয় তাহা হইলে কি করিবেন আপনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

—শত্রু একবার এখানে আসিলে রাজা শিশেয়ার জয়ের কোন আশা নাই।

কিন্তু আপনি যখন এ কথার উল্লেখ করিতেছেন তখন এ বিষয় অবশ্য ভাবিয়াছেন।

যদি আরাদের পরাজয় হয় তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?

—আমাদের এ দেশ ছাড়িতে হইবে। আবশ্যক মত পলায়নের পথ মুক্ত রাখিতে হইবে।

—সে ব্যবস্থা আমি করিব। কতক লোক আমাদের পক্ষে আছে, আমি দল-পুষ্টির চেষ্টায় আছি।

—অধিক লোক জানিলে কথা প্রকাশ হইবার আশঙ্কা আছে।

—যাহারা আমাদের সঙ্গে জড়িত সকলেরই তুল্য অবস্থা। তাহা ছাড়া, কেহ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারিবে না।

এইরূপে ফারেজ ও লোবান মিলিত হইয়া পাকচক্র করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

শত্রুসৈন্য অন্তর্হিত হয় নাই, ভূগর্ভেও প্রবেশ করে নাই, রুদেলা সহজ কৌশল অবলম্বন করিয়া কয়েক দিবস সৈন্যবল গোপন করিয়াছিলেন। আশেপাশে কয়েকটা পুরাতন গ্রাম ছিল; সেই সকল গ্রামের লোকেরা গিয়া অন্যত্র বাস করিত এই কারণে অনেক বাড়ী খালি পড়িয়াছিল। সৈন্য সকল সেই সমস্ত গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল, অশ্বসমূহ উদ্যানে ও বনে বৃক্ষতলে বাঁধা রহিল, আকাশযান পর্ব্বতের উপত্যকায় চলিয়া গেল। রুদেলার উদ্দেশ্য রাজা শিশেরার সেনাপতি শত্রুসৈন্য কোথায় আছে নির্ণয় করিতে না পারেন ও তাঁহার নিজের সৈন্যবল কোন্ দিকে লইয়া যাইবেন স্থির করিতে না পারেন। দস্যুপতির সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

রুদেলা আরও এক কৌশল করিলেন। সন্ধ্যা হইলেই অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে একে একে বাহির হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইতে বলিতেন। অধিক সংখ্যক নয় দুই এক শত অশ্বারোহী। সমস্ত রাত্রি অশ্ব চালনা করিয়া রাত্রি-শেষে ঘোর কোলাহল করিয়া কোন গ্রাম আক্রমণ করিতেন, ভীত নিদ্রোত্থিত গ্রামবাসীরা মনে করিত সমস্ত শত্রুসৈন্য আসিতেছে। রুদেলা কয়েক জন অশ্বারোহী সঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামবাসীদিগকে অভয় দিতেন। গ্রামের বৃদ্ধদিগকে ডাকিয়া আরাদের নূতন রাজ্য স্থাপনা প্রচার করিতেন, আর বুঝাইতেন সমস্ত সৈন্য কিছু দূরে আছে, গ্রাম লুট করিতে চায়, তিনি তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিয়াছেন। আজ পূর্ব্বদিকে কাল পশ্চিমে, এক রাত্রে উত্তরে ও অপর রাত্রে দক্ষিণে। সেনাপতির কাছে যে-সকল সংবাদ আসিতে লাগিল তাহাতে তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। দুই গ্রামে হয়ত পঞ্চাশ ক্রোশ তফাৎ অথচ পর পর দুই রাত্রে দুই গ্রামে আক্রমণ হইল। এক দিনে বৃহৎ সৈন্য বল পঞ্চাশ ক্রোশ কেমন করিয়া গেল? সৈন্যই বা কোথায়? রুদেলা গ্রাম হইতে বাহিরে আসিয়াই অশ্বদল ভাঙ্গিয়া দিতেন, প্রত্যেক অশ্বারোহী স্বতন্ত্র পথ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া যাইত, আকাশযান হইতে আরাতামা অথবা আর কেহ কোথাও বহু সংখ্যক সৈন্য অথবা অশ্বারোহী দেখিতে পাইতেন না। শত্রু কোথায় জানিতে পারিলেই সেনাপতি আক্রমণ করিতেন, কিন্তু কোথায় শত্রু শিবির, কোথায় সৈন্যদল?

সেনাপতি অপর অধ্যক্ষদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন আরাতামাও ছিলেন। সেনাপতি কহিলেন—শত্রুর সৈন্য-অভিযান যে চকিতের মত চারিদিকে চলিতেছে, অষ্ট প্রহরের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ দূরের দূরের গ্রাম আক্রমণ করিতেছে এ কোন কাজের কথাই নয়, অথচ যে-রকম বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ আসিতেছে তাহা অবিশ্বাস করাও যায় না। তবে ইহার অর্থ কি?

একজন নায়ক কহিলেন,—সমস্ত সৈন্যের কথা কল্পনা। যে গ্রামে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে কেহই বলে না বহুসংখ্যক পদাতিক বা অপর সৈন্য দেখিয়াছে। কেহ বলে শোনা কথা, কেহ বলে মনে হইতেছিল যেন গ্রামের বাহিরে অনেক দূরে সৈন্য দাঁড়াইয়াছিল।

আর-একজন বলিলেন,—প্রকৃত কথা এই মাত্র যে ভীষণ কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইলে গ্রামের লোকের কল্পনা ভয়ে উত্তেজিত হয়। গ্রামে কেবল দশবার জন অশ্বারোহী প্রবেশ করে আর তাহাদের পশ্চাতে আরও কয়েকজন অশ্বারোহণে দাঁড়াইয়া থাকে। ব্যাপার অসম্ভব নয়, ইন্দ্রজালও নয়, দুই চারি দল উত্তম অশ্বারোহীর কৌশল মাত্র। তাহাদের উদ্দেশ্য চারিদিকে ভীতি উৎপাদন করা; সে-উদ্দেশ্য সুসাধিত হইয়াছে।

—অশ্বারোহীদের নেতা কে?

—তাহা কেহ বলিতে পারে না। অতি সুন্দর তরুণ পুরুষ, উত্তম বেশভূষা, কথাবার্ত্তাও মনোহর। অনেকে মনে করিয়াছে আরাদ—কিন্তু রাজপুত্র আরাদ দেখিতে সুপুরুষ নন, তাঁহার বয়সও অতি অল্প নয়।

আরাতামা চক্ষু নত করিয়া স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক কথা তাঁহার কর্ণে আঘাত করিতেছিল, হৃদয়ের চঞ্চলতায় বক্ষ স্ফীত হইতেছিল। সেই অশ্বারোহী রত্নবণিককে তাঁহার স্মরণ হইতেছিল, কিন্তু মুখে কোন কথা বলিলেন না।

সেনাপতি আরাতামাকে বলিলেন,—আপনি কোন মত প্রকাশ করিতেছেন না?

আরাতামা কহিলেন,—আমি বিমান চালাইতেছি জানি,

সৈন্য-চালনার কৌশল কি বুঝি? ইঁহাদের কথা আমার সঙ্গত বোধ হইতেছে। শত্রুর এরূপ কৌশলে লোকের ভয় হইতে পারে, কিন্তু আর কোন ফল হইবে না। যুদ্ধ না হইলে কিছু মীমাংসা হইবে না, শত্রুসৈন্যও অধিক দিন প্রচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব।

পর দিবস রাজা শিশেরা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও পথে আসিতে এই সকল কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই সেনাপতিকে কহিলেন, শত্রু আমাদের গ্রামসমূহ অধিকার করিতেছে আপনি যুদ্ধ না করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন কেন?

সেনাপতি কহিলেন,—শত্রু কোন গ্রাম অধিকার করে নাই, কেবল শাসাইয়াছে। শত্রুসৈন্য লুকাইয়া আছে, তাহাদের সংবাদ পাইলেই আমরা যুদ্ধে অগ্রসর হইব।

—রাজ্যসীমায় অস্তপালের সংবাদ কি?

আরাতামা কহিলেন,—আমি দেখিয়া আসিয়াছি তিনি দুর্গরক্ষা করিতেছেন। কাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

পর দিবস আরাতামা ও একজন সেনানায়ক তলিতায় আরোহণ করিয়া রাজ্যসীমান্তের দুর্গে উপনীত হইলেন। দুর্গরক্ষক অস্তপাল কহিলেন, দুর্গের সর্ব্বোচ্চ স্থানে সর্ব্বদা প্রহরী থাকে। মাঝে মাঝে শত্রুর অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পদাতিক সৈন্য কোথায় আছে তিনি জানেন না। এ পর্য্যন্ত দুর্গ আক্রমণের কোন উপক্রম হয় নাই।

সেনানায়ক কহিলেন,—রাজা শিশেরা ও সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যদি শত্রু সবলে এই দুর্গ আক্রমণ করে এবং আমাদের অপর সৈন্য আসিতে বিলম্ব হয় তাহা হইলে কয় দিন আপনি দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন?

—শত্রু যে এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে আক্রমণ করে নাই তাহাতেই অনুমান হইতেছে যে, এ দুর্গ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের বিশেষ ব্যগ্রতা নাই। বহুসংখ্যক সৈন্য এই দুর্গের আক্রমণের জন্য এখানে রাখিলে কি লাভ? দুর্গ তেমন বড় নয়, আমাদের সংখ্যাও অল্প। এ দুর্গ অধিকার করিলেও প্রকৃত জয়-পরাজয় কিছুই স্থির হইবে না, রাজ্যের অপর অংশ যাহার এই দুর্গও কালে তাহার হইবে। বহুপূর্ব্বে কেবল দস্যুভয় নিবারণ করিবার জন্য এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। যদি শত্রু আমাদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে পনর দিন আমরা দুর্গ রক্ষা করিতে পারি।

ওদিকে শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল,—আমরা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি না লুকাইয়া থাকিতে আসিয়াছি? এরকম করিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কারণ কি? যে-সকল অশ্বারোহী রুদেলার সঙ্গে যাইত তাহারাও অপ্রসন্ন হইল। না আছে লড়াই, না আছে লুটপাট, দিবারাত্রি অশ্বারোহণে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া কি ফল? আরাদও সেই পক্ষে যোগ দিলেন। রুদেলাকে কহিলেন,—তোমার কি উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এমন করিয়া সৈন্য লুকাইয়া রাখিয়াছ কেন? যতই দিন যাইবে শিশেরার সৈন্য প্রবল হইবে আর তাহাদের সংখ্যা বাড়িবে। এ পর্য্যন্ত একটা রীতিমত যুদ্ধ হয় নাই। সৈন্যেরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দুই চারিটা গ্রামে গিয়া আস্ফালন করিলে কি হইবে?

রুদেলা আরাদের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া অল্প হাসিলেন। কহিলেন,—যুদ্ধ তোমার জন্য, তুমি রাজ্যের প্রত্যাশা কর। সৈন্যের ভারও তুমি গ্রহণ কর না কেন?

আরাদ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—আমি কোন অভিযোগ করিতেছি না। তুমি আমার পক্ষে না হইলে আমি কিছুই করিতে পারিতাম না। তুমি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এরূপ করিতেছ তাহাও বুঝিতে পারি, কিন্তু কিছু না জানিলে সৈন্য অবাধ্য হইতে পারে, আমাদের মন চঞ্চল হয়।

—তুমি ভাবিয়া দেখ ইতিমধ্যেই আমাদের কিছু লাভ হইয়াছে কি না। দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে প্রজাদের আতঙ্ক হইয়াছে, আমরা যেখানে যাইব তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাদের পক্ষে হইবে। রাজসেনাপতি সসৈন্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আছেন, কোথায় সৈন্য লইয়া যাইবেন নির্ণয় করিতে পারিতেছে না। আমাদের পক্ষের লোক বিশলাম নগরে গোপনে আয়োজন করিতেছে, ইচ্ছা করিলেই নগর আমাদের হস্তগত হইবে। এইবার আমরা সসৈন্যে বাহির

হইব। কোথায় যাইব স্থির করিয়াছি, তোমাকে পরে বলিব।

আরাদ ভরসা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রুদেলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বৈকালে রুদেলার আদেশ মত সমস্ত সৈন্য একটা প্রকাণ্ড মাঠে সমবেত হইল। পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে বিমানসমূহ আসিয়া মাঠে নামিল। রুদেলা অশ্বারোহণে সৈন্যের সম্মুখে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে আরাদ ও কয়েকজন সেনাপতি। সজ্জিত সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রুদেলা উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—আমার আদেশে কয়েক দিন তোমাদের প্রচ্ছন্নভাবে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে না কি তোমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছ? এখন কেহ সে কথা বলিতে প্রস্তুত আছ?

প্রথমে কেহ কোন উত্তর দিল না। পরে সৈন্যশ্রেণীর ভিতর হইতে একজন বলিল,—আমি বলিতে প্রস্তুত আছি।

রুদেলার কণ্ঠ প্রথমে ভেরীর ন্যায় শ্রুত হইয়াছিল। এবার স্নিগ্ধ ধীর কণ্ঠে কহিলেন,—বাহির হইয়া আমার সম্মুখে আইস!

সৈন্যশ্রেণীর ভিতর হইতে একজন বাহির হইয়া আসিল। বিশাল বলবান মূর্ত্তি, নির্ভয়ে রুদেলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এ ব্যক্তি রুদেলার দস্যুদলের মধ্যে নয়। দস্যুরা মুষ্টিমেয়, তাহাদের লইয়া কি বিপুল সৈন্যবল হয়? সকল সৈন্যই প্রায় বাহিরের লোক।

রুদেলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি সৈনিক হইয়া কোন্ সাহসে সেনাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ কর?

—স্পষ্ট কথা বলিয়াছি তাহাতে ভয় কি?

রুদেলা যে কখন্ কোষ হইতে অসি টানিয়া সৈনিককে আঘাত করিলেন তাহা কেহ দেখিতেই পাইল না। পলকের মধ্যে সে ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

সৈন্যমণ্ডলী শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু কেহ কোন কথা কহিল না।

রুদেলা পূর্ব্ববৎ অবিচলিতস্বরে কহিলেন, আর কাহারও কোন অভিযোগ আছে?

সকলে স্তব্ধ, কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রুদেলা কহিলেন,—দুই দণ্ড পরে সৈন্য যাত্রা করিবে।

(ক্রমশঃ)

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

শ্রী যুগলকিশোর সরকার

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নৃত্যদোদুল ছন্দের ভিতর সর্ব্বত্র একটা আবেগ-চঞ্চল উচ্ছ্বাস, একটা উদ্দাম গতি-বেগ ও ক্রিয়াশীলতা পরিলক্ষিত হয়। এই চলমান, ক্রিয়াশীল অবস্থার পশ্চাতে একটা নিষ্ক্রিয়, মোহাবিষ্ট সুপ্ত অবস্থার বেদনার আভাসও পাওয়া যায় এবং প্রকাশ-লিপ্সার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনিও শ্রুতিগোচর হয়। এই রূপকের অন্তরালে কবি গাহিয়াছেন একটা বিরাট জাগরণীর গান। আঁধার এখানে আলোকের জন্য প্রার্থনা করিতেছে, অস্ফুট স্ফুটতর হইতে চাহিতেছে, নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াশীল হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, মোহাবিষ্ট চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হইতে চাহিতেছে। জাগরণের উল্লাসে কবি অধীর, আবেগে কবি চঞ্চল, আনন্দে প্রাণবান্। আবার এই উল্লাস, এই আবেগ, এই চাঞ্চল্য, এই প্রাণশীলতা এত উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে যে, ঈপ্সিত লাভের পথে যে-কোন বাধাবিপত্তিই তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর। ভূধরের কুক্ষির অন্ধকার কারাগৃহে আবদ্ধ ছিল নির্ঝর। রবির কর প্রতিদিনই ভূধরগাত্রে প্রতিফলিত হইত, পাখীও গান করিত। আজিও পাখী গাহিয়া উঠিয়াছে, রবির করও ভূধরগাত্রে পড়িয়াছে। চিরাচরিত রীতির কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাই। তবে আজ কেন নির্ঝর হঠাৎ এমন জাগরণের দোলায় দুলিয়া উঠিল? এমন অকারণ পুলকে তাহার সমস্ত সত্তা শিহরিয়া উঠিল? তবে কি রবির কর ও পাখীর গান এত দিন নির্ঝরের মর্ম্ম স্পর্শ করে নাই? ঠিক তাই। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে, নিত্যকর্ম্মের মধ্যে প্রায়শঃই নিত্যবস্তুর, সত্য বস্তুর, সাক্ষাৎ পাইয়া থাকি। কিন্তু মোহাবিষ্ট আমরা সত্যকে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি না, গ্রহণ করিতে পারি না। হঠাৎ একদিন আমরা সেই সত্যকে ধরিয়া ফেলি। আলোচ্য ক্ষেত্রে জড়প্রকৃতি কবির বর্ণনীয় বস্তু হইলেও ইহার পশ্চাতে মানবমনের অভিব্যক্তিই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। নবোদ্ভিন্না কিশোরী চল-চঞ্চল গতিতে খেলিতেছে, হাসিতেছে। ব্রীড়া নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই;

নিজের ললিতমধুর হাস্তে নিজেই মুখর, নিজের মনের মাধুরীতে মধুর, আনন্দে উৎসবময়ী হঠাৎ এমন সময়ে যৌবনের মঞ্জু আগমনী বাজিয়া উঠিল। জীবনের ঐ পুণ্যময় গোধূলি-লগ্নে কিশোরী তাহার অলক্তকরঞ্জিত চরণ দুখানি মধুরোজ্জ্বল অজানা কোন এক দেশে ফেলিলেন। সরলা, লীলা-চঞ্চলা কিশোরী হঠাৎ ব্রীড়াময়ী, লজ্জাশীলা হইয়া উঠিল, চল-চঞ্চল গতি-ভঙ্গি সংযত হইল, নূপুরে তাল-ভঙ্গ দৃষ্ট হইল। কিশোরের মধু-যৌবনের ফেনোচ্ছল উগ্রদ্রাক্ষারসে পরিণত হইল, মঞ্জু-আগমনী রুদ্রদীপকে আত্মগোপন করিল। এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা সাধিত হইল একমুহূর্ত্তে—যাহাকে সচরাচর আমরা অনন্তমুহূর্ত্ত আখ্যা দিয়া থাকি। যে-আবেষ্টনের মধ্যে কিশোরী পরিবর্দ্ধিতা হইয়া আসিতেছিল তাহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না তথাপি যে আকাশ-বাতাসের সাথে তাহার চিরদিনের পরিচয় সেই চির-পুরাতন আকাশ আজ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল, বাতাসে যেন কাহার 'রঙিন উত্তরীয়' দুলিতে দেখিল। যেন কোন অদৃশ্য যাদুকর তাহার 'রূপের বাটী রঙের তুলি, রসের পেয়ালা' নিঃশেষে উজাড় করিয়া বিশ্বকে তাহার নিকট নূতন রূপে রূপায়িত, নূতন রাগে অনুরঞ্জিত করিয়া দিল। মনে আজ তার নূতন রঙ, প্রাণে আজ তার নূতন গান, দেহ আজ তার জীবন-চঞ্চল।

আলোচ্যক্ষেত্রে রবির কর ও পাখীর গানের অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না, নির্ঝরের মগ্ন-চৈতন্যেও তাহার স্বপ্নাবস্থার পরিসমাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। আকাশ আলোক-বীজের ভিতর ভাবী লতিকাকে যে-ভাবে আহ্বান করিয়া থাকে, 'দখিন পবন' দ্বারে কাণ পাতিয়া যেমন করিয়া কুঁড়ির গর্ভশয্যায় বদ্ধগন্ধের কামনা জানিয়া থাকে, রবির কর ও পাখীর গান ঠিক তেমনি করিয়াই নির্ঝরের কামনা জানিয়াছিল এবং তাহার স্বপ্নভঙ্গের চেষ্টাও করিয়াছিল। তবুও এতদিন নির্ঝরের ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। হইবে কেন? এতদিন যে তাহার ছুটির ঘণ্টা বাজে নাই। আজ বাজিয়াছে। তাই আজ সে দূর মহাসিন্ধুর মেঘমন্দ্রস্বর শুনিতে পাইয়াছে। আজ তাহার নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় অবস্থার সমাধি;—তাই আজ সে গতিশীল,ক্রিয়াশীল,জীবন-চঞ্চল। জগৎ দেখিবার জন্য 'অগাধ বাসনা,' 'অসীম আশা' আজ তাহার সমস্ত সত্তা ছাইয়া ফেলিয়াছে। আজ 'পাষাণ-টুটে ব্যাকুলবেগে ধেয়ে' সে 'সুরের সুরধনী' বহাইয়া ছাড়িবে। যে-কোন বাধাবিপত্তিই আজ তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর, যে-কোন কাজই আজ তাহার কাছে সুসাধ্য। সে আজ পাষাণকারা চূর্ণ করিবে, করুণাধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়া পাগলিনীর মত ছুটিয়া বেড়াইবে। কিছু বাকি রাখিবে না—যতটুকু প্রাণ আছে সমস্তটুকু উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া সে আজ উদ্দাম-প্রমত্ত-অন্ধ-গতিতে বাঞ্ছিতের উদ্দেশে চলিয়াছে।

"এত কথা আছে,　　এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে,　　এত সাধ আছে,
প্রাণ হ'য়ে আছে ভোর।"

এমন সুবিপুল আবেগ, এমন দুনিয়া-ভোলা নেশা, এমন নিখিল-প্লাবী উচ্ছ্বাস, এমন সুগভীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা কোন ভাষার কোন কবি ছন্দে শৃঙ্খলিত করেন নাই। শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই 'রহস্তময়ী দেবীশক্তিসম্পন্ন'; আবার প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীয় প্রতিভায় সচেতন। বিশেষে কবি যখন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলেন তখন তিনি কিশোর বয়স্ক। যৌবন সবেমাত্র তাহার রক্তকেতু কবির হৃদয়-প্রাকারে নিখাত করিয়াছে। নব উন্মেষের রাগে পার্থিব সমস্ত বস্তুই তখন তাঁহার কাছে রঙিন। কবি নিজেও 'জীবনস্মৃতিতে' বলিয়াছেন যে, যখন তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখিয়াছিলেন তখন জগতের সমস্ত জিনিষকেই তিনি অপরূপ শ্রীসম্পন্ন দেখিয়াছিলেন এবং প্রাণ দিয়াই ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। রুদ্র দীপক তখন তাঁহার বুকে বাজিয়া উঠিয়াছিল। কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আপনাকে জগতে শতধা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা তখন তাঁহার সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া দেদীপ্যমান। সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ, সমাজের অনুশাসন, রাষ্ট্রের ভ্রূকুটি—কিছুতেই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। কাজেই তাঁহার মনের ছবি যে তাঁহার রচিত কবিতায় দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

তবে কেবলমাত্র যৌবনের উগ্রসুরার উন্মত্ততাতেই যে তিনি এই জাগরণ-গীতি, এই জয়ধ্বনি গাহিয়াছেন এরূপ নহে। উদ্দামতা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের বহু কবিতাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) "ইহার চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুয়ীন…"
(খ) "ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ…ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা বাছা…"
(গ) "ওরে সাবধানী পথিক বারেক পথ ভুলে মর ঘুরে…"
(ঘ) "ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে'…"

অবশ্য তাঁহার ভিতরে—অপরাপর সকল মহামানবের মতই চাঁদ ধরিবার প্রবৃত্তি বরাবরই বর্ত্তমান ছিল। যে কল্পনা-রঙিন চোখে নেপোলিয়ঁ দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস্‌কে সমতল ক্ষেত্রের মত দেখিয়াছিলেন, নাবিক কলম্বস দুস্তর আটলাণ্টিককে গোষ্পদ কল্পনা-করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা কল্পনা-রঙিন চোখে তিনি বিশ্বের দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। চিরাচরিত রীতির প্রথা-ভিত্তি নিজের গতি-প্রাবল্যে ভেদ করিতে না পারিলে, সংস্কারমুক্ত হইতে না পারিলে, নিরর্থ আচার অনুশাসন নিয়ম কানুনের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে না পারিলে,এক কথায় প্রাণশক্তির প্রকাশের অন্তরায় এমন সব কিছু বিনষ্ট করিতে না পারিলে ঈপ্সিত লাভ হয় না। তবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' ভিতরে কেবল যে ঝটিকার উদ্দামতাই দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, মেদুর বাতাসের চিরপরিচিত স্পর্শও অনুভূত হয়, শ্রাবণরাত্রির বজ্রধ্বনির সহিত কাশকেতকী হাসিয়া উঠে, বৈশাখের প্রদীপ্ত ভ্রূকুটির পার্শ্বে বর্ষার মৌন, গম্ভীর, প্রশান্ত, শ্যামল শ্রী দেখিতে পাই, শীতের রিক্ততা বসন্তের মদির হাসিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। যাহা হউক, কিশোরের কল্পনা-রঙিন চোখে স্বীয় প্রতিভার আলোকময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া কবি দম্ভভরে যে-উক্তি করিয়াছিলেন, যে-স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন আজ তাহা লৌকিক সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

"অমৃতস্য পুত্রোঽহং"—আপনার সম্বন্ধে এই সুমহান্ ধারণা কৈশোরেই তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল;—আজ সেই অঙ্কুর মহাদ্রুমে পরিণত হইয়াছে। যে-আলোক-বর্ত্তিকার রশ্মিসম্পাত তাঁহার কিশোর মনকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল আজ তাহা শত ইন্দ্রধনুর বর্ণবিলাসে পূর্ণ প্রভায় দীপ্ত হইয়া তাঁহার জন্য একটা আলোকপন্থা রচনা করিয়াছে। যে ভাব-শিশু, যে-সব অপরিপুষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রেরণা তাঁহার তরুণ বুকে অন্তঃশীলা ফল্গুর মত বহিয়াছিল আজ তাহা পূর্ণতালাভ করিয়া কূলপ্লাবী চাঞ্চল্যে তাঁহার মন-প্রাণ উৎসময় করিয়া দিয়াছে। কিশোর কবি তখনই বুঝিয়াছিলেন জীবনের বিকাশ বন্ধনের ভিতর হয় না, হয় মুক্তিতে; সুপ্তির ভিতর হয় না, হয় জাগরণে; মোহ-অজ্ঞতার অন্ধকারে হয় না, হয় জ্ঞানের অরুণালোকে।

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(২৮)

কৃষ্ণার আজ হঠাৎ ছুটি মিলিয়া গিয়াছিল। কর্ত্তা অনেকদিন পরে বাড়ী আসিয়াছেন, তাই মহা ধুমাধাম সুরু হইয়াছে, আজ আর পড়াশুনা করিবার অবসর কাহারও নাই। সবচেয়ে খুসি হইয়াছেন অবশ্য গৃহিণী, কিন্তু তিনি এতবড় সংসারের কর্ত্রী, এতগুলি ছেলে-মেয়ের মা, আজ বাদে কাল ঠাকুরমা হইবেন, তিনি ত আর বহুদিন পরে স্বামী আসিয়াছেন বলিয়া ছ্যাবলার মত আনন্দে নাচিতে পারেন না? কাজেই তিনি যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়াই আছেন। তবে মনটা যে যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া আছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। চাকর-বাকর তাড়া খাইতেছে অন্যদিনের চেয়ে বেশী, বউ-ঝির সব কাজেই গণ্ডা-গণ্ডা খুঁৎ বাহির হইতেছে। বউরা বিরক্ত হইলেও হাসিমুখ করিয়া আছে, কারণ এতদিন পরে শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছেন, এখন তোলো হাঁড়ির মত মুখ করিয়া থাকিলে ভাল দেখায় না। তড়িতের সে বালাই নাই, যতটা না বিরক্ত সে হইয়াছে, তাহারও চারগুণ বিরক্তি মুখে ফুটাইয়া সে বাড়ীময় ঘুরিতেছে। বিছানায় কাদা-মাখা পায়ে উঠিয়াছিল বলিয়া খুকী-মায়ের হাতের এক চড় খাইয়া বারণ্ডার পা ছড়াইয়া বসিয়া তারস্বরে কান্না জুড়িয়াছে। বিপিন ও নবীন কিছুক্ষণ বাড়ীতে ছিল, কিন্তু জ্যাঠামশায়ের সামনে বেশীক্ষণ থাকা নানা কারণেই সুবিধার নয় বুঝিয়া তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে।

কৃষ্ণার ছাত্রীরা আজ পলাতকা। শ্বশুর-মহাশয় বউমাদের হাতের রান্না খাইতে চাহিয়াছেন, কাজেই তাহারা বইখাতা ফেলিয়া ভাঁড়ার-ঘরে এবং রান্না-ঘরে গিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ভাল মাছ তরকারী আনিবার জন্য দুইটা চাকরকে বড়বাজারে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহারা আসিলেই কাজ আরম্ভ হয়। প্রতিভা বসিয়া পোলাওএর চাল বাছিতেছে, অমিয়া তরকারী কুটিতেছে। তাহাদের শাশুড়ী বড় একখানা পিঁড়া টানিয়া বসিয়া অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যাইতেছেন। বউদের বয়সে একহাতে কত কাজ করিয়াছেন এবং কিরূপ নিখুঁৎ ভাবে, তাহাই ছিল তাঁহার বক্তৃতার বিষয়। তবুত বউদের উপর মা-ষষ্ঠীর কোনো কৃপা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহার তখন একটি ছেলে হইয়াছে, আর-একটিও আগতপ্রায়। তড়িৎকে তাহার মা মাঝে মাঝে বক্তৃতায় ভঙ্গ দিয়া উচু গলায় ডাকিতেছেন। আসিয়া ত পান ক'টা ভাল করিয়া সাজিয়া রাখিতে পারে? এতবড় ধিঙ্গী মেয়ে একটা কাজ কি তাহাকে দিয়া হইবার যো আছে? লেখাপড়া শিখিতেছে না মাথামুণ্ড শিখিতেছে! এ মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গিয়া যে কি গতি হইবে তাহার ঠিকানা নাই। তড়িতের কানে সব কথাই যাইতেছে, কিন্তু মায়ের উপর ক্রোধে তখন সে ফুলিতেছে, পান সাজা তাহাকে দিয়া হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা সেদিন নাই।

কৃষ্ণা ঘরে বসিয়া একখানা ইংরাজী উপন্যাস পড়িবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। বইখানি Michael Arlen প্রণীত The Green Hat; খানিকটা পড়িয়া সে বইখানা ছুড়িয়া টেব্‌লের উপর ফেলিয়া দিল। নিজের মনেই বলিল, "কেন যে এ সব বইয়েব এত নাম তা যদি ছাই কিছু বুঝি। আমিও এমন বই লিখ্‌তে পারি।"

তাহার লিখিবার টেব্‌লটির উপর অনেকগুলি ইংরাজী বাংলা মাসিক পত্র এবং উপন্যাস সাজান রহিয়াছে। রেঙ্গুনে আসিয়া তাহার আর যে জিনিষেরই অভাব ঘটুক বইয়ের অভাব হয় নাই। বিপিন ছিল তাহার সহায়। অল্প কয়েকদিনের ভিতরই এই যুবকটি বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কৃষ্ণাকে এই দিক দিয়া হয়ত খানিকটা কৃতজ্ঞ করা যাইতেও পারে। কৃষ্ণাকে কিছু উপহার দিবার মত সাহসও তাহার ছিল না, এবং তাহা দেওয়া চলে কি না সে-বিষয়েও তাহার সন্দেহ ছিল। কাজেই সে বইগুলি কিনিয়া আনিয়া, কৃষ্ণাকে

পড়িতে দিয়া আসিত। নিজে সে কোন বইয়ের এক আধ পাতা উল্টাইত, কোনটা একেবারে ছুঁইতও না। মাসিক পত্রগুলি মাঝে মাঝে পড়িত। কৃষ্ণাকে বই ধার দিয়া, তাহা ফিরাইয়া লইবার তাহার কোনই উৎসাহ দেখা যাইত না; হাজার বার বলিলেও যেখানকার বই সেইখানেই থাকিয়া যাইত। টেব্‌লের উপরের বই যখন সিলিংএ ঠেকিবার উপক্রম করিত, তখন কৃষ্ণা বাধ্য হইয়া হয় তড়িৎ নয়ত কোনো চাকরকে ডাকিয়া যাহার সম্পত্তি তাহার ঘরে চালান করিয়া দিত। তড়িৎও দুই চারবার গিয়া আর যাইতে চাহিত না। তাহাকে বইয়ের গাদা হাতে ঘরে ঢুকিতে দেখিলেই বিপিন তাড়া দিয়া উঠিত, "আমার ঘরটা কি গুদাম পেয়েছিস্? দেখ্‌ত তাকিয়ে, এখানে অত বই রাখ্‌বার জায়গা আছে!"

তড়িৎ বলিত, "আমি কি জানি? তুমি কৃষ্ণাদিকে জিগ্‌গেস ক'রো গিয়ে! তোমার ঘরে জায়গা না থাকে, তুমি বই না কিন্‌লেই পার?"

বিপিন বলিল, "আহা, কিনেছি ত চোরের দায়ে ধরা পড়েছি! আমার মাথার উপরেই ওগুলো থাকতে হবে, এমন কোনো আইন হয়েছে না কি? তোমার কৃষ্ণাদির অতবড় ঘরে এগুলোর আর জায়গা হ'ল না?"

তাহার পর হইতে, লইয়া যাইবার লোকের অভাবে অনেক বই কৃষ্ণার ঘরেই থাকিয়া যাইত। জিনিষের অযত্ন করা বা ঘর অগোছাল করিয়া রাখা, কৃষ্ণার স্বভাব ছিল না, কাজেই বইগুলি খুব যত্নেই থাকিত। বিপিন একদিন তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে বলিল, 'মিস্ রায়, যে, জিনিষ যেখানে ভাল থাকে তাকে সেই খানেই থাক্‌তে দেওয়া উচিত নয় কি? এই বইগুলোর চেহারা দেখুন, আর আমার ঘরে যেগুলো আছে, সেগুলোর চেহারা দেখুন। সেগুলোকে সের দরে বিক্রী করলেও কেউ নেবে কি না সন্দেহ। সুতরাং আপনি যখন বই ভালবাসেন তখন তাদের এ রকম অযত্ন হ'তে দেওয়া উচিত নয়।"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "আমার কাছে যত্নে থাকে বটে, কিন্তু বইয়ের দোকানে তার চেয়েও যত্নে থাকে। আপনি যখন অর্দ্ধেকের বেশী না পড়েই ফেলে রাখেন তখন অত বই কিনিবারই বা কি দরকার?"

বিপিন বলিল, "কি জানেন আমার একটা স্বভাব, ভাল বই দেখ্‌লে না কিনে আমি থাক্‌তেই পারি না। তারপর সুবিধামত পড়ি। অনেক বই কিন্‌বার দুবছর তিন বছর পরেও পড়েছি।"

বিপিনের সৌভাগ্যক্রমে তড়িৎ সেখানে উপস্থিত ছিল না, তাহা হইলে সে তখনি বলিয়া বসিত যে, কৃষ্ণা এ বাড়ীতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বিপিনকে বিলাতী মাসিক পত্র ভিন্ন আর-কোনো প্রকারের বই কেহ কোনো দিনও কিনিতে দেখে নাই। কৃষ্ণাও যে তাহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইল তাহা নহে তবে এ বিষয়ে আর কথা বলিবার ইচ্ছা না থাকায় সে তখনকার মত চুপ করিয়াই গেল। নূতন বই এবং মাসিক পত্র ইহার পর অবাধে তাহার ঘরে জমিতে লাগিল।

আজও কৃষ্ণা সেগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল, কোনোখানা পড়িতে ইচ্ছা হয় কিনা। বাড়ীর আনন্দস্রোতে তাহার যোগ দিবার কোনই উপায় ছিল না, কারণ গৃহ-স্বামীকে সে একেবারেই চিনে না। সুতরাং একলা ঘরে বসিয়া থাকা ভিন্ন তাহার উপায় ছিল না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে পরিচয় তাহার করিতেই হইবে, কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত সেদিকে খেয়াল করে নাই।

মাসিকপত্রগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ একটা পোষ্টকার্ড ঠক্ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। কৃষ্ণা সেটা উঠাইয়া লইতে যাওয়ায় লেখকের নামটা তাহার চোখে পড়িল। তাহার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর রক্তের গতি হয় ত বা একটু দ্রুততর বহিয়া চলিল। এ নামটি তাহার অতি পরিচিত অথচ মানুষটিকে সে চেনে না।

সামান্য দুতিন লাইন লেখা অতি সাধারণ কুশল প্রশ্ন ও দু-একটা অন্য কথা। অথচ কৃষ্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল কার্ডখানি সে লুকাইয়া রাখে। এই অমূল্য সম্পদ হাতছাড়া করিতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। বিপিনের কাছে এ চিঠির কোনই মূল্য নাই। এখানা হারাইলে তাহার কিছুই আসিয়া যাইবে না। অথচ ইহা তাহারই; কৃষ্ণার ইহা অপহরণ করা সামাজিক রাষ্ট্রীয় নীতিসঙ্গত

মোটেই হইবে না। সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া পোষ্টকার্ডখানা আবার যথাস্থানে ঢুকাইয়া রাখিয়া দিল।

কয়েকমাস আগে যদি কেহ কৃষ্ণাকে বলিত যে, কোনো যুবককে না চিনিয়া না জানিয়া তাহার সহিত একটা কথা শুদ্ধ না বলিয়া কোনো যুবতী তাহার প্রতি অনুরক্তা হইতে পারে, তাহা হইলে সে কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিত। নভেল, নাটক এবং উপকথায় এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটা সম্ভব নয় বলিয়াই সে মনে করিত। কিন্তু এখন তাহার মত পরিবর্ত্তন করার সময় আসিয়াছিল।

সুবীরকে সে ভালবাসে বলিলে হয়ত একটু বাড়াইয়া বলা হইত। কিন্তু সুবীর সম্বন্ধে তাহার যে একেবারেই কোনো মানসিক চাঞ্চল্য ছিল না তাহাও বলা যায় না। জগতের আর-সব মানুষ হইতে এই মানুষটিকে সে বেশ কিছু পৃথক চক্ষে দেখিত। সুবীরের ভালবাসার যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছিল তাহাতেই পৃথিবীর মূর্ত্তি তাহার কাছে রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল। তরুণী নারীর মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা সর্ব্বদাই প্রায় লাগিয়া থাকে। এই অচির ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের সাথীরূপে কৃষ্ণা যাহাকে মানসচক্ষে দেখিত, সে আর কেহ নয়, সে সুবীর। কেন যে ইহাকে সে হঠাৎ এত আপনার, এত প্রিয় বলিয়া অনুভব করিল তাহার কোন সদুত্তর ছিল না। একমাত্র প্রেমের বিশ্ব-বিজয়ী দেবতা ইহার উত্তর দিতে পারিতেন।

বিপিনের অনুরাগ দিন দিন যে প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছিল তাহা কৃষ্ণার কাছে অগোচর ছিল না। তাহাকে বাধা দেওয়া উচিত, না এ সম্বন্ধে একেবারে নির্লিপ্ত থাকা উচিত কৃষ্ণা ভাবিয়া পাইত না। উৎসাহ অবশ্য সে কিছুই দিত না, কিন্তু মানুষের মনের এ অবস্থায় সাধারণ ভদ্র ব্যবহারকেও উৎসাহ বলিয়া ভ্রম করা কিছু বিচিত্র নয়। বিপিন হয় ত এই ভুল করিতেছে বলিয়াই কৃষ্ণার সন্দেহ হইত। আজকাল তাহার প্রসন্নতার, হাসি-ঠাট্টা আমোদের আর অন্ত নাই। এমন কি জ্যাঠাইমার সমালোচনা করা, তড়িতের পিছনে লাগা পর্য্যন্ত সে ছাড়িয়া দিয়াছে। কৃষ্ণার ভয় হইত এই ব্যাপারটা শেষে এমন স্থানে না গড়ায় যেখানে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা ভিন্ন আর উপায় থাকিবে না। সোজাসুজি একটা এতবড় আঘাত দিতে তাহার মন কুণ্ঠিত হইত, অথচ না দিয়াই বা চলিবে কি প্রকারে? বিপিনকে বিবাহ করিতে কোনো কালেই যে সে পারিবে না এ বিষয়ে তাহার নিজের কোনোই সন্দেহ ছিল না।

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া তড়িৎ ডাকিল, "কৃষ্ণাদি।"

কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া বলিল, "কি তড়িৎ?"

তড়িৎ বলিল, "বাবা একবার আপনাকে ডাক্‌ছেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা চল।"

তড়িতের সঙ্গে সঙ্গে সে গৃহিণীর শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। কর্ত্তা একখানা ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশয়ান ভাবে বিশ্রাম করিতেছিলেন, কৃষ্ণাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলেন।

কৃষ্ণা দেখিল ভদ্রলোক হাতে বহরে গৃহিণীর স্বামী হইবার উপযুক্ত বটে। তবে গৃহিণী গৌরবর্ণা, ইনি বেশ-কিছু শ্যামবর্ণ। মুখের ভাবটা তিনি সম্প্রতি খুব অমায়িক করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা হইলেও স্বভাবতঃ যে তিনি বিশেষ ধীরপ্রকৃতির নয়, তাহার যথেষ্ট পরিচয় তাঁহার মুখে ছিল।

কৃষ্ণা তাঁহাকে নত হইয়া নমস্কার করিল। প্রণাম করিবে মনে করিয়াই আসিয়াছিল, কিন্তু ইঁহাকে দেখিয়া শেষ অবধি তাহার আর প্রণাম করিবার ইচ্ছা রহিল না।

গৃহকর্ত্তা বোধ হয় কি ভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করিবেন তাহা আগে হইতে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ত?"

কৃষ্ণা বলিল, "না, অসুবিধা হবে কিসের জন্যে?"

ভদ্রলোক অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "তড়িতের মায়ের কাছে শুন্‌লাম বউমারা লেখা-পড়ায় অনেক উন্নতি করেছেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "হাঁ কিছু কিছু শিখ্‌ছে।" তাহার এই লোকটির সাম্‌নে বসিয়া থাকিতে অত্যন্তই অস্বস্তিবোধ হইতেছিল। তাঁহার দৃষ্টিটা যেন কেমন। এ বাড়ীর সকলকে সে আত্মীয়ের মত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল,

কিন্তু এ ব্যক্তিটি মোটেই যেন সে রাজ্যের নয়। ইহাকে কোন মানুষ প্রথমে সন্দেহের চোখে না দেখিয়াই পারিবে না। আর কতক্ষণ যে তাহাকে এখানে বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহার ঠিকানা নাই।

এমন সময় গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "ও গো তোমার পাত্রমিত্র সব হাজির হয়েছে এসে। এখন নাওয়া-খাওয়া সব ঘুরে যাবে বোধ হয়।"

কর্ত্তা উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন "না, না, ওরা এখনই চ'লে যাবে, একটু দেখা করতে এসেছে বইত নয়? তোমার রান্না হ'তেও ঢের দেরি।" এই বলিয়া তিনি চটি পায়ে দিয়া বাহিরের ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

কৃষ্ণা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিজের ঘরে আসিয়া ভাবিল, ভাগ্যে বাড়ীর কর্ত্তাটি দূরে-দূরেই থাকেন, তাহা না হইলে এ বাড়ীতে কৃষ্ণাকে একমাসও কাটাইতে হইত না। সে একটা সেলাই টানিয়া লইয়া বসিয়া গেল।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিতে দেরি হইল ঢের। কৃষ্ণার দেরিতে খাওয়া অভ্যাস নাই, অথচ বাবু এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবের খাওয়া না হইলে, মেয়েরা খাইবে না। কাজেই প্রতিভা দয়া করিয়া আগেভাগে থালা সাজাইয়া খাবার আনিয়া তাহার ঘরে হাজির করিল; বলিল, "কৃষ্ণাদি, আপনি খেয়ে নিন্, নইলে আবার মাথা ধর্‌বে। আমাদের এখনও ঘণ্টা চার দেরি আছে। শ্বশুরমশায় ত এখনও স্নান কর্‌তেই ওঠেননি।"

কৃষ্ণা খাইতে বসিয়া বলিল, "খুব ভাল রান্না হয়েছে। কে কে রেঁধেছে?"

প্রতিভা বলিল, "পোলাও আর মাংস আমি রেঁধেছি, আর চাট্‌নীটা। বাকি সব দিদি করেছে।"

কৃষ্ণা বলিল, "সবই বেশ ভাল হয়েছে। আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি।"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "আপনি ত দিলেন, কিন্তু কর্ত্তা মহাশয়ের সার্টিফিকেট না পেলে আজ মায়ের বকুনি খেতে খেতে আমাদের প্রাণ যাবে।"

এমন সময় ডাক পড়ায় প্রতিভা চলিয়া গেল। কৃষ্ণাও খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। পাশের বাড়ী একঘর বাঙালী বাস করিত। তাহাদের একটি বউ মাঝে মাঝে জান্‌লা খুলিয়া কৃষ্ণার সহিত আলাপ করিত। কৃষ্ণাকে প্রায়ই সে যাইতে বলিত, এতদিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণা তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারে নাই। আজ ঘরে আর কিছুতেই তাহার মন টিকিতেছিল না, কাজও কিছু ছিল না। সে জুতা পায়ে দিয়া, কাপড়-চোপড় একটু ঠিক করিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু এখানেও তাহার বিশেষ সুবিধা হইল না। কৃষ্ণা এক রাজ্যের মানুষ, ইহারা আর-এক রাজ্যের। দুই-চারিটা বিষয়ে মাত্র এমন স্থলে গল্প করা চলে, এবং তাহা শেষ হইতেও বেশী সময় লাগে না। কাজেই ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই কৃষ্ণা উঠিবার জোগাড় করিতে লাগিল।

খুকী আসিয়া তাহার বিদায় গ্রহণটা সোজা করিয়া দিল। বলিল, "কৃষ্ণাদি, মা আপনাকে একটু ডাক্‌ছেন।"

কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িল। যদিও এত ব্যস্ততার মধ্যে গৃহিণী কেন যে তাহাকে ডাকিতেছেন, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল গৃহিণী তখন স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছেন। কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমাদের সকলের ত রাত্রে ওঁর এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন হয়েছে। তুমি কি যাবে, না বাড়ীতেই খাবে? ঠাকুরকে তাহ'লে বলে দিই।"

কৃষ্ণা বলিল, "এ বেলা যা খাওয়া হয়েছে, ওবেলা কিছু না খেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনি ত তা হ'তে দেবেন না। ঠাকুরকে ব'লে দেবেন দুটো ভাতে ভাত সেদ্ধ ক'রে দিতে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, ভাতে ভাত খেতে যাবে কিসের দুঃখে? কত মাছ-তরকারী বলে জমা হয়ে রয়েছে, এ বেলা সব খরচ হয়নি। আমি ঠাকুরকে সব ব'লে যাব এখন, তোমার কিছু কষ্ট হবে না।"

কৃষ্ণা যেন মাছ-তরকারি না খাইতে পাইবার আশঙ্কায় মরিতে বসিয়াছিল, আর কি? কিন্তু গৃহিণীর কাছে ভাল করিয়া খাইতে না পাওয়া একটা মহা দুঃখের বিষয়। কাজেই কৃষ্ণা আর কিছু না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। তাহার ডাইরি লেখার অভ্যাস ছিল।

আজ অনেকদিন পরে খাতাখানা দেরাজ হইতে বাহির করিয়া, সে লিখিতে বসিল।

পাশের ঘরে আসিয়া প্রতিভা, তড়িৎ, মহা কোলাহল সহকারে সাজ করিতেছিল। রেঙ্গুনের বাড়ীতে দুইটা ঘরের মধ্যে কখনও পুরা দেওয়াল থাকে না, সব কাঠের বা ইঁটের আধা পার্টিসন, কোনো কথাই পাশের ঘর হইতে কাহারও শুনিতে বাকি থাকে না। কাজেই নিজের সম্বন্ধে অনেকপ্রকার কথাই মাঝে মাঝে কৃষ্ণার কানে আসিতে লাগিল। গৃহিণী মাঝে আসিয়া একবার বলিলেন, "দেখ গো বউমারা, আজ যার যত গহনা আছে সব প'রে যাবে। ওসব মেমসায়েবী পোষাক তোমাদের থিয়েটার বায়োস্কোপের জন্যে রাখ, আমাদের বাঙালীর মধ্যে ওসব ভাল দেখায় না। এ রকম ক'রে গেলে, ওরা মনে কর্‌বে শ্বশুর-শাশুড়ী এদের কিছু দেয়নি বুঝি।"

খানিক পরে শাশুড়ীর আদেশ মত সাজসজ্জা সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণার ঘরের সম্মুখ দিয়া সকলে চলিয়া গেল। কৃষ্ণা লেখায় ব্যস্ত দেখিয়া আর কেহ তাহার কাজে ব্যাঘাত করিল না।

আধঘণ্টা খানিক পরে দরজার সাম্‌নে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, বিপিন দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে নেমন্তন্ন খেতে গেলেন না বড়!"

বিপিন বলিল, "খাওয়া ত রাত্রে, এত আগে গিয়ে কি কর্‌ব? জ্যাঠামশায় তাস্ খেল্‌বেন, জ্যাঠাইমা নিজের বড়মানুষীর পরিচয় দেবেন, বৌদিরা গহনা দেখ্‌বেন এবং দেখাবেন। আমার ত কিছুই কর্‌বার নেই, কাজেই গেলাম না। তাছাড়া বাড়ীতে একটু দরকারও ছিল।"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দরকারটা আপনার সঙ্গে।" কৃষ্ণা কিছুই বলে না দেখিয়া বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "খুব কি ব্যস্ত আছেন? আপনার মিনিট দশ বারোর বেশী লাগ্‌বে না।"

কৃষ্ণার বুকের ভিতর তখন ঢিপ্ ঢিপ করিতেছিল। অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন না শুনিয়াই বা উপায় কি? যাক্ একেবারে চুকাইয়া ফেলা যাক, মনে করিয়া কৃষ্ণা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। দরজার বাহিরে আসিয়া বলিল, "না, এমন কিছু কাজ নয়, আজ না হয় কাল লিখ্‌লেও ক্ষতি নেই।"

সিঁড়ির মুখে যে জায়গাটাতে কৃষ্ণারা চা খাইত বিপিন সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া একখানা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "বসুন"।

কৃষ্ণা বসিয়া বলিল, "আপনি ত দাঁড়িয়েই রইলেন।"

বিপিন একটা চেয়ারের পিঠে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বস্‌লে যেটুকু সাহস কোনো রকমে জোগাড় করেছি, তাও জল হ'য়ে যাবে। দাঁড়িয়েই থাকি। কি ক'রে যে কথা আরম্ভ কর্‌ব, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

উপায় থাকিলে কৃষ্ণা তাহার কথার অপেক্ষা না করিয়া, তখনি পলায়ন করিত। কি কথা যে বিপিন বলিতে চায়, তাহা জানিতে তাহার বাকি ছিল না। এ ধরণের কথা যে তাহাকে শুনিতে হইবে, তাহার জবাবও দিতে হইবে, তাহা কৃষ্ণা কিছুদিন হইতে নিশ্চয় করিয়া জানিত। তবু ব্যাপারটা একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়ায় তাহার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। মাথা নীচু করিয়া সে চুপচাপ বসিয়াই রহিল।

বিপিন বলিল, "কি বল্‌তে চাই, হয়ত আপনি জানেনই। তবু আমার পরিষ্কার ক'রে বলা উচিত। জ্যাঠামশায় এবার ফিরে যাবার সময় সঙ্গে ক'রে আমাদের এক ভাইকে নিয়ে যেতে চান। যদি আমাকে নিয়ে যান, তাহ'লে অনেক দিনের মত আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। কাজেই যে কথাটা আরো-কিছুদিন পরে বল্‌লে হয়ত ভাল হ'ত, আজই আমায় তা বল্‌তে হচ্ছে। আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন, আপনাকে আমি কি চোখে দেখি। আমার আপনাকে স্ত্রীরূপে পাবার কোন যোগ্যতাই নেই, তা আমি খুব ভাল ক'রেই জানি। তবু ভালবাসাই একমাত্র যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার করে না, সেই আশায় আপনার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এ কথা বল্‌তে পারছি। আমার কি কোনো আশা আছে?"

বিপিনকে এ ধরণের কোনো আশা দেওয়া কৃষ্ণার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাহার হৃদয়ের সিংহাসন যদি আর

একটি মানুষ প্রায়-দখল করিয়া নাও রাখিত, তাহা হইলেও বিপিনকে সে-স্থলে কৃষ্ণা অভিষিক্ত করিতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু ইহাকে ব্যথা দিতে তাহার সমস্ত মন পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। তবু না বলিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহার পর তাহারও এখানকার বাস উঠিল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল।

বিপিনের দিকে চাহিতে সে পারিল না। মাথা তেমনি নীচু করিয়াই বলিল, "আপনাকে চিরকাল বন্ধু ব'লেই জান্‌ব, তার বেশী কিছু দেবার ক্ষমতা আমার নেই।"

বিপিনের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কয়েক মিনিট সে চুপ করিয়াই রহিল, কেবল বেতের চেয়ারখানা তাহার বলিষ্ঠ মুষ্টির পীড়নে মড়মড় করিয়া উঠিল। তাহার পর হঠাৎ সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলিয়া আসিল। বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কেন যে এই অশ্রুপাত, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না। আর একজনকে ব্যথা দেওয়ার ব্যথাও ত কম নয়। তাহার উপর নিজের নিঃসঙ্গ স্নেহপ্রেমহীন জীবনের দুঃখও আজ যেন পথ পাইয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে সে এইরকম ভাবে পড়িয়া ছিল, তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ বাহিরের দরজায় করাঘাতের শব্দে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। দরজা খুলিয়া দেখিল, কেহ নাই, কেবল একটা চিঠি পড়িয়া আছে। সিঁড়িতে তখনও পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে।

চিঠিটা খুলিয়া পড়িল। কোনো সম্বোধন নাই, কেবল কয়েক লাইন লেখা। "আমার মনে হ'য়েছিল, আমার আশা আছে, তাই অতটা সাহস ক'রেছিলাম। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, ক্ষমা কর্‌বেন। আমি আর দু-তিন দিন মাত্র এখানে আছি; সুতরাং আপনার বেশী অসুবিধা কিছু হবে না। এ কথা আর-কেউ না জান্‌লে ভাল। দুঃখ সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু দুঃখের অপমান সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। বিপিন।"

কৃষ্ণার চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল।

(২৯)

ভানুমতী আস্তে আস্তে সারিয়া উঠিতেছিলেন। তবে ডাক্তার তাঁহাকে এখনও হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইবার অনুমতি দেন নাই। ঘরের ভিতরেই সোফা বা ইজি চেয়ারে মাঝে মাঝে তিনি উঠিয়া বসিতেন, কথাবার্ত্তা বেশী কিছু বলা বারণ ছিল এবং কথা বলিবার লোকও বিশেষ কেহ ছিল না। সুবীর অবশ্য প্রায় সমস্তদিনই মায়ের কাছে কাটাইত, কিন্তু সেও কথাবার্ত্তা বেশী বলিত না। বলিতে গেলেই কোন্ কথা উঠিয়া পড়িবে, তাহা তাহার জানা ছিল, এবং ইহাতে ভানুমতীর খানিকটা উত্তেজনা হওয়া অনিবার্য্য। তাঁহার শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া ওঠা এখন একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে এই অপরিসীম জটিলতার অবসান ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

সুবীরের দিনগুলি কাটিতেছিল অদ্ভুতভাবে। তাহার সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন স্বপ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সে সুবীর, অথচ সে সুবীর নয়। সে যাহা-কিছুর সঙ্গে নিজের জীবনকে এতদিন একত্রে গাঁথিয়া চলিয়াছে, সে সকলই হঠাৎ তাহার জীবন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। জন্মের সম্পর্কে যাহাদের সে আত্মীয় বলিয়া জানিত এখন তাহারা তাহার কেহ নয়, নিজেকে যে ভবিষ্যতের ভিতর চিরদিন সে কল্পনা করিয়াছে, সেটা হঠাৎ আকাশ-কুসুমের মত শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

মহা ধনবান ভূস্বামী হইতে একেবারে নাম-বংশ-পরিচয়-হীন দরিদ্রের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মনেও অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। তাহার কোনো অপরাধ ইহার ভিতর নাই, কিন্তু দৈবের চক্রান্তে সে এমন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা অনেকের কাছেই হাস্যকর মনে হইবে। ইন্দ্র কয়েক দিন পূর্ব্বে একরাত্রির জন্য আবু-হাসানের মত সম্রাট্ হইতে চাহিয়াছিল, তখন সে জানিত না যে, তাহার নিজের অবস্থাই আবু-হাসানের মত। এক রজনীর পরিবর্ত্তে ভাগ্য তাহাকে বেশী কিছুদিন রাজত্ব করিতে দিয়া হঠাৎ চরম রিক্ততার মধ্যে ফেলিয়া নিজের নিষ্ঠুর পরিহাসবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে। যাহা-কিছু পরিচিত, সমস্তকে জীবন হইতে একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলে হয়ত তাহার মনে একটু শান্তি আসিত। কিন্তু

যে-বংশের উপর আইনতঃ তাহার আর কোনো দাবী নাই, সেইখান হইতে অদ্ভুত এক স্নেহের বন্ধন তাহাকে নাগ-পাশের মত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহার জন্মদাত্রী জননী কে ছিলেন সে জানে না, সন্তানকে এই পৃথিবীর নির্ম্মম কবলে ফেলিয়া তিনি বহুদিনই জগৎ-সংসার হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মা তাহার ছিল না বা নাই, একথা সে মুখেও আনিতে বা মনে ভাবিতে পারিত না। আজ তাহার সমস্তই গিয়াছে, পৃথিবীর চক্ষে সে ভিখারী, কিন্তু স্নেহের সম্পদে সে সম্রাট্ হইতেও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া রহিয়াছে।

ভানুমতী ভবানীর কথা কিছুমাত্র অবিশ্বাস করেন নাই। তিনি জানিতেন সুবীর তাঁহার সন্তান নয় হয়ত বা পৃথিবীর কোথায় কোন্ কোণে তিনি যে হতভাগিনী কন্যাকে জন্মদান করিয়াছেন, সে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তাহার প্রতি স্নেহের পরিবর্ত্তে, বিদ্বেষই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত। যাহাকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছেন, সেই প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে পথের ভিখারী করিয়া এ কোন্ রাক্ষসী তাহার স্থানে আসিয়া বসিতে চায়? দৈব যদি তাহাকে ফিরাইয়া আনে, তাহাকে কি তিনি সন্তান বলিয়া বুকে টানিয়া লইতে পারিবেন? হয়ত পারিবেন না।

সুবীরের বিপদ হইয়াছিল ভানুমতীকে লইয়া। সে যদি একেবারে ইঁহাদের সহিত সব সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ভানুমতী যে বাঁচিবেন না তাহা সে নিশ্চিত করিয়াই জানিত। কিন্তু এতকাল যেখানে সে রাজত্ব করিয়াছে, সেখানে অন্য লোক আসিয়া বসিবে, এদৃশ্য দূরে দাঁড়াইয়া দেখাও যে কত কঠিন হইবে, তাহা সে বুঝিত। কি যে করিবে, কিছু ভাবিয়া পাইত না। এমন মানুষ কেহ ছিল না যে তাহাকে একটু পরামর্শ দেয়, কারণ কাহারও কাছে এ কথা এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই। যেমন ভাবে সব চলিত, তেমনিই চলিতেছিল। বাড়ীর লোক, বাহিরের লোক সকলে ভাবিত সম্প্রতি বাড়ীতে একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার উপর ভানুমতীও এমন পীড়িতা, সেইজন্য বুঝি সুবীর এত বিষণ্ণ এত অন্যমনা। ভানুমতীও মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সন্দেহ করিবার কোনো উপলক্ষ্যই ছিল না।

আজও সকালে সুবীর নিজের ঘরে একলা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ভানুমতী এখনও ওঠেন নাই। তিনি উঠিয়া মুখ ধুইয়া, ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ করার পর সুবীর তাঁহার ঘরে যাইত। তাহার সাম্‌নে অনেক চিঠিপত্র, কাগজ ইত্যাদি জমা করা। যেগুলি তাহার ব্যক্তিগত চিঠি সেইগুলি কেবল খোলা এবং পড়া হইয়াছে, জমিদারী-সংক্রান্ত চিঠিপত্র কাগজ ইত্যাদি সে আর স্পর্শও করে নাই, সেগুলা যেমন আসিয়াছে, তেম্‌নি পড়িয়া আছে। এ সবের ব্যবস্থা করিবার তাহার আর অধিকার নাই।

সিঁড়ি দিয়া হঠাৎ অনেক মানুষ ওঠার শব্দ শোনা গেল। সুবীর ভাবিয়াই পাইল না কোথা হইতে কে এত সকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মিনিট দুইয়ের মধ্যেই কণ্ঠস্বর, অলঙ্কারের সিঞ্জন, শাড়ীর খস্‌খস্ শিশুর কান্না, সব মিলাইয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে, শোভাবতী সপরিবারে আসিতেছেন। সুবীর দরজার কাছে আসিয়া একবার সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল। শোভাবতী, তাঁহার কন্যা, নাত্‌নী ও নব বধূসহ বহু কষ্টে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতেছেন। রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিয়া সুবীর মনে মনে বলিল, "ভগবান তোমায় বাঁচিয়েছেন, তোমার মস্ত ফাঁড়া কেটে গেছে। রাজার রাণী হ'তে যাচ্ছ মনে ক'রে এতক্ষণে পথের কাঙালিনী হ'য়ে বেরিয়ে পড়্‌তে হ'ত।"

দুর্গা তাহাকে দেখিতে পাইয়া নীচ হইতে বলিল, "উঁকি মেরে দেখা হচ্ছে কি শুনি? তুমি এখন ভাসুর তা যেন মনে থাকে।"

সুবীর হাসিয়া সরিয়া গেল। শোভাবতী মেয়েকে বকিয়া উঠিলেন, "দেখেছে ত কি হয়েছে? নূতন বউ সবাই দেখ্‌তে পারে। খোকা, আমরা ভানুর ঘরে বস্‌ছি গিয়ে, তুইও আয়। তোদের বউ দেখাতেই নিয়ে এসেছি। যেমন আমার কপাল, না রইলি বউ ভাতে, না রইলি বিয়েতে।"

সুবীর ঘরের ভিতর হইতে বলিল, "যাচ্ছি মাসীমা, আপনারা যান্।"

ভানুমতীকে নার্স তখন মুখ ধোয়াইয়া, সোফার উপর

উঠাইয়া বসাইয়া বিছানাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছিল। শোভাবতীকে দেখিয়া ভানুমতীর মুখে একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল। বলিলেন, "এস দিদি, এস। নূতন বৌকে নিয়ে এসেছ বুঝি? কই ঘোমটা খোল দেখি কেমন সুন্দর বৌ।"

বোনকে সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিয়া শোভাবতী খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "যাক্ বাঁচলাম, বাবা। তোর অসুখের জন্মে আমার আর মনে শান্তি ছিল না। সারাক্ষণ বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ কর্‌ত কখন কি হয়। এই যে দুর্গা, বৌকে নিয়ে আয় এদিকে, ঘোমটাটা অতখানি টেনে দিয়েছিস্ কেন? উঠিয়ে দে, তোর মাসীমা ভাল ক'রে দেখুক।"

দুর্গা বলিল, "ওমা, নতুন বৌ ঘোমটা দেবে না ত কি? সব সাহেব-মেমের পাল্লায় প'ড়ে মাও দেখ্‌ছি মেম হ'য়ে উঠ্‌ছ। এই নিয়ে বলে আমার শ্বশুরবাড়ী কত খোঁট হয়।"

শোভাবতী একেবারে ফোঁস্ করিয়া উঠিলেন, "আরে বাবা, খোঁট হয়! কি সব সাত কুলীনের এক কুলীন কুটুম করেছি গো, তাঁরা আবার খোঁট করেন আমায় নিয়ে! কেন না, কিসের খোঁট? আমি কি গরু খাই, না বল্ নাচি যে, আমায় নিয়ে খোঁট করে? মা, মা, মা। কত দেখ্‌ব কালেকালে। করুক্, করুক্,একশ'বার করুক্। কারো খাইও না, কারো পরিও না। মেয়ের বিয়ে দিয়েছি ত দশ হাজার টাকা খরচ ক'রে। এ কথা কোন ব্যাটা-বেটী বল্‌তে পারুবে না যে, খয়রাৎ ক'রে মেয়ে নিয়েছে।"

মায়ের প্রচণ্ড গর্জ্জনে ভড়্‌কাইয়া গিয়া দুর্গা একেবারে চুপ করিয়া গেল। ভানুমতী বলিলেন, "যাক্‌গে দিদি, যাক্‌গে, ছেলেমানুষ একটা কথা ব'লে ফেলেছে, তাই নিয়ে অত রাগ করে না। থাম্, থাম্, এখনি ঘোমটা খুলিস্ না। লক্ষ্মীকে খালি হাতে দেখব না। ও বাছা, সুরবালা, যাও ত কোনো দাসী কি চাকরকে দিয়ে আমার ছেলের কাছ থেকে আমার আলমারীর চাবীটা নিয়ে এস।"

নার্স বাহির হইয়া গেল ও মিনিট কয়েক পরে চাবী লইয়া ফিরিয়া আসিল। ভানুমতী তাহাকে আলমারী খুলিতে বলিলেন। তারপর বলিলেন, "ঐ যে কোণার দিকে ঐ চন্দন-কাঠের বাক্সটা রয়েছে, ঐটা বার করে আন ত।"

নার্স বাক্স আনিয়া তাঁহার পাশে রাখিল। সেটি খুলিয়া তিনি একছড়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া লইলেন। দুর্গাকে বলিলেন, "এইবার নিয়ে আয় বউ, দুর্গা, দেখি।"

দুর্গা নূতন বধূকে সাম্‌নে আনিয়া ঘোম্‌টা খুলিয়া দিল। বউ নত হইয়া প্রণাম করিতেই, ভানুমতী তাহার গলায় মুক্তার মালাটি পরাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দিদিকে বলিলেন, "সত্যি দিদি, ঠিক যেন লক্ষ্মী! দেখো এখন এ বউয়ের ভাগ্যে সুশীলের কত বাড়বাড়ন্ত হয়।"

শোভাবতী বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদই কর। কিন্তু নিজের এত দামী গহনাটা দিয়ে দিলি যে? না হয় পরে একটা কিছু গড়িয়ে দিতিস্, এত তাড়া ত কিছু ছিল না। এ সব তোর বৌ এসে পর্‌লেই ঠিক হ'ত।"

ভানুমতীর মুখ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। কোনোরকমে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "বৌয়ের গহনার অভাব কি দিদি? সবই ত তার জন্মে রইল। এটা দিলাম, ইচ্ছে হ'ল তাই। গড়িয়েই দেব ভেবেছিলাম,কিন্তু তারপর যা সব আরম্ভ হ'ল, আর কোনো কথা মনে ছিল না।"

এমন সময় সুবীর আসিয়া প্রবেশ করিল। নূতন বৌ ঘোমটা আবার লম্বা করিয়া টানিয়া দিল। শোভাবতী বলিলেন, "আয় খোকা, সুশীলের বউ দেখাতে নিয়ে এলাম। তোর ত দেখা মানুষই, তবু আর একবার দেখ্।"

সুবীরকেও বৌ টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। তবে সে ভাসুর হয় বলিয়া পা ছুঁইল না। দুর্গা সুবীরকে হাসিতে দেখিয়া, কি একটা বলিবার উপক্রম করিয়া থামিয়া গেল। মায়ের বকুনীটা তখনও তাহার কাণে বাজিতেছিল।

ভানুমতী বলিলেন, "খোকা, আমি ত উঠ্‌তে পারি না। নীচে দাসীদের বলে দে, সব জোগাড় জাগাড়

ক'রে আনুক। নুতন বউ এসেছে, মিষ্টিমুখ করাতে হবে ত ?"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা, আমি সব বলে দিচ্ছি, তুমি ব্যস্ত হোয়ো না।"

সে বাহির হইতে-না-হইতেই শোভাবতী বলিলেন, "ভবানী যে গিয়েছে, তা যেন প্রতি পদে টের পাওয়া যাচ্ছে। সে থাক্‌তে কোনোদিন কি করতে হবে-না-হবে, তা তোকে মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে হয়নি।"

ভানুমতী চুপ করিয়াই রহিলেন। কথাগুলো সুবীরেরও কানে গিয়াছেন। সে ভাবিল কবে যে এই সব লুকোচুরীর অবসান হইবে। নকল রাজা হইবার দুঃখ বোধ হয় ভিখারী হওয়ার চেয়ে বেশী।

ঘণ্টাখানিক পরে শোভাবতী সকলকে লইয়া চলিয়া গেলেন। সুবীর তখন ভানুমতীর ঘরে গিয়া বলিল, "মা, আজ ত মনে হচ্ছে তুমি অনেকটা ভাল আছে। আমাদের কাজ এখন আরম্ভ কর্‌তে হবে ; দেরি ক'রে লাভ কি ?"

ভানুমতীর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কর্‌তে চাস্ বাবা ? তোকে ছেড়ে আমি একদিনও বাঁচ্‌ব না তা ব'লে দিচ্ছি। এ সব ধন-দৌলতে আমার কাজ নেই আমি তোকে নিয়ে কাশী চ'লে যাব। আমার নিজের যা আছে তাতেই আমাদের মায়ের ছেলের বেশ চ'লে যাবে।"

সুবীর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "মা, কি পাগলের মত কথা বলছ ? যার বিরুদ্ধে সকলে মিলে অবিচার অন্যায় করেছে, তাকেই তুমি শেষ অবধি দোষী করতে চাও ? সে মেয়ে যদি বেঁচে থাকে, তাহ'লে, টাকাকড়ি, জমিদারী ফিরিয়ে দিলেই কি তার সব ক্ষতিপূরণ হবে ? তোমার মত মায়ের সন্তান হ'য়েও যে তোমাকে জান্‌ল না, তোমার স্নেহ এক কণা পেল না, এ ক্ষতি কি কোনো আর্থিক ক্ষতির চেয়ে কম ? তাকে শেষ অবধি তুমি বঞ্চিতই রাখতে চাও ?"

ভানুমতীর দুই চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণ তিনি কথাই বলিতে পারিলেন না। তাহার পর বলিলেন, "বাবা, তোকে আমি সব শাস্তি নিতে দেব না। আমার যতদূর সাধ্য আছে আট্‌কাব। তুই কোনো দোষে দোষী নস্, তোর উপরেই সব চাপ পড়বে ? এই কি উচিত ?"

সুবীর বলিল, "মা, উচিত, অনুচিত জানি না। দোষী আসলে যারা, তারা কেউ বেঁচে নেই, সুতরাং শাস্তি তারা নিতে আস্‌বে না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাদের অপরাধের ফলে সুবিধাটা আমারই হয়েছিল, আমিই এতদিন যাতে আমার অধিকার নেই তা ভোগ করেছি। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত খানিকটা আমায় কর্‌তেই হবে। দুটি মানুষকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্যের থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, একটি তোমার মেয়ে, আর-একটি তোমার দেবর। দুজনকে তাদের প্রাপ্য ফিরিয়েই দিতে হবে, তাতে অন্যদের যা অসুবিধা হয় হবে, উপায় নেই।"

ভানুমতী বলিল, "সে মেয়ের খোঁজ পাবি কি ক'রে ? তাদের খবর ত কেউই জানে না।"

সুবীর বলিল, "খোঁজ ক'রে' বার কর্‌তে হবে। সেই জন্যেই ত আর দেরী কর্‌তে চাইছি না। তুমি অনুমতি দিলে এখনই কাজ সুরু কর্‌তে পারি।"

ভানুমতী বলিলেন, "যা তোর খুশী কর্ বাবা। বেশী লোক-জানাজানি এখনই করিস্‌নে। এ নিয়ে বেশী সোরগোল হ'লে আমার জ্বালা আরো বাড়বে।"

সুবীর বলিল, "সোরগোল যাতে একেবারে না হয়, তারই ব্যবস্থা কর্‌ব। আচ্ছা, আমি তাহ'লে একবার বেরচ্ছি।"

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবি ?"

সুবীর বলিল, "দুজন লোকের কাছে। তার একজন উকীল নিত্যরঞ্জনবাবু, তাঁকে ত তুমি জানই, আর-একজন আমার চেনা এক ছোকরা, C. I. D.তে কাজ করে।"

ভানুমতী নীরবই রহিলেন। সুবীর বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা তিন-চার পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সঙ্গে আর-একজন যুবক। ভানুমতীর ঘরের সম্মুখেই ভবানীর ঘর ভবানী মারা যাইবার পর হইতে ইহা তালাবন্ধ অবস্থাতেই পড়িয়া আছে, কেহ আর ইহা খোলে নাই।

চাবি আনাইয়া সুবীর দরজাটা খুলিয়া দিল। দুজনে

ভিতরে প্রবেশ করিলে পর সুবীর বলিল, "এই ঘরেই সে বরাবর ছিল, আমার যতদূর মনে পড়ে। তার জিনিষপত্র যা-কিছু সব এখানেই আছে, কেউ নাড়ে-চাড়েনি।"

ঘরে জিনিষ বড় বেশী ছিল না। একখানা তক্তপোষ, একটা বড় ষ্টীলট্রাঙ্ক, একটা কাঠের বাক্স। একটা ছোট চেয়ার এবং টেবলও শেষাশেষি ডাক্তারের আদেশে এ ঘরে আনীত হইয়াছিল। এক কোণে একটা পুরাতন ভাঙা আলমারী, দেওয়ালের গায়ে ভানুমতার একখানি এবং সুবীরের একখানি ফটোগ্রাফ। ইহাই ঘরের আস্‌বাব।

যুবক বলিল, "বাক্স দুটো আর আলমারীটা একটু দেখ্‌তে হবে।"

আলমারীটা প্রথম খোলা হইল। তাহার ভিতর ভবানীর লেপ-কম্বল এবং বাড়ীর যত পুরান ছেঁড়া কাপড়, বিছানার চাদর প্রভৃতি গাদা করা। দু-তিনখানা কাঁথাও অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় এক কোনে গোঁজা রহিয়াছে।

যুবক বলিল, "বাক্সটা খুলুন। এর ভিতর ত দরকারী কিছু নেই দেখ্‌ছি।"

কাঠের বাক্সের ভিতর পানের সরঞ্জাম, মাথার তেল, চিরুণী, দুই চারিটা পেটেন্ট ওষুধ। বাকি রহিল শুধু ষ্টীল-ট্রাঙ্কটা। সেটাও খোলা হইল।

উপরে অনেকগুলি থানধুতি, সেমিজ এবং লংক্লথের হাত-কাটা জামা পরিপাটি করিয়া সাজান। দুখানা গরদের থান, দুখানা মট্‌কার থান এবং দুখানা কাশ্মীর তসরের চাদরও রহিয়াছে। সেগুলি উঠাইয়া ফেলার পর অনেকগুলি চিঠি ফিতা দিয়া বাঁধা, দুতিনখানা মোটা মোটা মলাট দেওয়া খাতাও ছোট একটা আবলুস্ কাঠের বাক্স দেখা গেল।

যুবক বলিল, "এইবার কাজের জিনিষ পাওয়া যাবে। ছোট কালো বাক্সটা খুলুন ত?"

সুবীর খুলিয়া দেখিল, একগাছি সরু সোনার হার, একজোড়া বালা, আর কালো সুতায় বাঁধা মাদুলি। আর কিছু নাই।

আব্‌লুস্ কাঠের বাক্সটি যেখানে ছিল, সেখানেই রাখিয়া দেওয়া হইল। খাতাগুলি এবং চিঠির তাড়াটা লইয়া যুবক বলিল, "আমি এগুলো নিয়ে চল্লুম। কাল বিকেলে এসে আপনাকে report দেব। এ বাড়ীতে খুব পুরানো ঝি চাকর কেউ আছে কি?"

সুবীর বলিল, "না, তেমন পুরানো কেউ নেই। সব চেয়ে পুরানো যারা, তারাও আট দশ বছর আগে এসেছে।"

যুবক চলিয়া গেল। সুবীরের মনটা যেন আজ অন্য দিনের চেয়েও ভারাক্রান্ত বোধ হইতেছিল। বাড়ী-ঘর সব যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিতেছিল। সে মোটরটা আনাইয়া চড়িয়া বসিল, ড্রাইভারকে বলিল, "পেট্রল আছে কি না দেখে নাও, একবার ব্যারাকপুর ঘুরে আসা যাক্।"

(ক্রমশঃ)

বাংলার গরু

শ্রী অরবিন্দ সিংহ

হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মুখে গো-রক্ষণ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু দেশে আজ দুধের দুর্ভিক্ষ, আর কৃষক ভাল বলদের অভাবে সারা বৎসরের মধ্যে ৭.৮ বিঘা জমিও চাষোপযোগী করিয়া কর্ষণ করিতে পারে না। হিন্দু গরুর পূজা করিয়া থাকেন ফুল দিয়া, মন্ত্র পড়িয়া; গরুর বিবাহ দেন গায়ে রঙের দাগ আঁকিয়া। কত হিন্দু গৃহস্থের ঘরে দশ বারটি মা ভগবতী আছেন, কিন্তু গৃহে একমুটো ঘাস অথবা এক

আঁটি বিচালির সংস্থান নাই, খইল, ভূষি, কুঁড়া প্রভৃতি ত দূরের কথা। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে গ্রামের সমস্ত মাঠ জ্বলিয়া গিয়াছে, আর গৃহস্থের গরু সেই মাঠেই সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সন্ধ্যার সময় শূন্য পেটে ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহস্থ সেই গরুর নিকট হইতে যতটুকু পারিলেন দুধ টানিয়া লইয়া বাছুরকে শূন্য বাঁট টানিতে দিলেন. এই-রূপে হিন্দু আজ তাঁহার গোরক্ষণ ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ঘরে গরু, বাছুর, বলদ খাদ্যের অভাবে, যত্নের অভাবে তিলে তিলে মরিতেছে, কিন্তু তাহাতে হিন্দু গৃহস্থের গোহত্যার পাপ হয় না এবং কোনও হিন্দু তাহার প্রতিবেশী হিন্দুর মাথা কাটায় না।

এই গোজাতির অধঃপতন বাংলা দেশে যত অধিক হইয়াছে এত আর ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে হয় নাই। তাই বাংলার গোজাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের গরুর এ হীন অবস্থা কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা ভাবিবার বিষয়। আমরা চক্ষে দেখি নাই, তবে বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাই এই দেশে পয়সা সের দুধ ছিল। সেই পয়সা সের দুধ আজ প্রায় টাকা সের দুধে দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের যে-সমস্ত প্রদেশ বিশিষ্ট গোবংশের জন্য বিখ্যাত দেখা যায় সেই সমস্ত প্রদেশের কোন-না-কোন এক জাতি গোপালন-কেই তাহাদের জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যাহাতে অন্য কোনও গো-বংশের রক্ত এই গো-বংশের রক্তের সহিত মিলিত না হয়, সেদিকেও তাহাদের দৃষ্টি সজাগ আছে। পঞ্জাব প্রদেশের 'সাঁহিওয়াল' অথবা 'মণ্টগোমেরী' গোবংশ, সিন্ধু প্রদেশের 'সিন্ধী' গো-বংশ, মাদ্রাজ প্রদেশের 'নেলোর', উত্তর-পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের 'হিসাব' জাতি এইরূপেই নিজেদের বিশিষ্টতা (Breed characteristics) রক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র গো-বংশের সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলাদেশের কিন্তু কোনও জাতি গোপালনকে তাঁহাদের পেশা করিয়া লয়েন নাই। বাংলার গোয়ালারা গোদুগ্ধ বিক্রয়ের দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়াছিল, বাংলার গোজাতির বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া গোপন করা তাহাদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত ছিল। দেখা যায় ভারত-বর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই সেই প্রদেশীয় বিশিষ্ট গোবংশের বাস আছে। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে 'হিসার', পঞ্জাবে 'মণ্টগোমেরী, যুক্তপ্রদেশে 'ত্রিহুত', সিন্ধুপ্রদেশে 'সিন্ধী', মাদ্রাজে নেলোর,' মহীশূরে অমৃত মহাল; কিন্তু সমস্ত বাংলা প্রদেশে কোনও বিশিষ্ট গোবংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলার গরু অন্যান্য প্রদেশীয় গরুর অবাধ সংমিশ্রণের ফলে নিজেদের বিশিষ্টতা হারাইয়া বসিয়াছে। পঞ্জাব, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশের গরুর সহিত ইয়োরোপের 'আয়ারশায়ার,' 'হোলষ্টিন', 'জার্সি' প্রভৃতি গোবংশের তুলনা বরং সম্ভবপর, কিন্তু বাংলার গো-বংশের সহিত তাহাদের তুলনা পর্য্যন্ত করিতে যাওয়া বাতুলতা। বাংলার গরু ৩০।৩২ ইঞ্চির বেশী উঁচু হয় না; অনেকে এক পোয়ার বেশী দিনে দুধ দেয় না এবং এই গরুর সন্তান যে বলদ সে দিনে আধবিঘার বেশী জমি চষিতে পারে না। 'হিসার' অথবা 'অমৃতমহাল' জাতীয় বলদ, তাহাদের দেশের অধিবাসীদের মতই, মাথা তুলিয়া, বুক ফুলাইয়া, পৃষ্ঠে পাহাড়ের মত বোঝা লইয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে, আর বাংলার বলদ বাংলার অধিবাসীদের মতই নুব্জ দেহ, কুব্জ পৃষ্ঠ।

ভাল বলদের অভাবে দেশে কৃষিকার্য্যের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে এবং গো দুগ্ধের অভাবে বাংলার জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে। বলদের সহিত কৃষির সম্বন্ধ অতি নিকট। আবার ভাল বলদের সৃষ্টি ভাল গরু হইতে হয়। তাই যদি দেশে কৃষির উন্নতি করিতে হয় তবে তাহার আগে ভাল গরুর সৃষ্টি করিতে হইবে। একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, দেশে গরুর সংখ্যা জনপ্রতি খুব কম। অন্যান্য কয়েক দেশের তুলনায় হয়ত তাহা ঠিক, তাই বলিয়া কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া বাংলায় গরুর সংখ্যা বাড়াইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যা বাড়াইতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল ভাল গরুর। যাহা আছে তাহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে, যাহাতে করিয়া তাহাদের সন্তানরা মায়ের দুগ্ধদান করিবার ক্ষমতা অথবা পিতার হলকর্ষণ করিবার ক্ষমতাকে ছাড়াইয়া যায়। যেখানে পাঁচটা গরুতে একসের

পরিমাণ দুধ দিতেছিল তথায় যেন একটা গরুতে ঐ পরিমাণ দুধ দিতে পারে।

বাংলার গৃহস্থ, হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে গোপালন করিয়া থাকেন ; কিন্তু গো-পালন করিতে হইলে যতটুকু করা প্রয়োজন, তাহা কেহই করেন না। প্রাতঃকালে দুগ্ধ দোহনের পর গৃহস্থের গরু গ্রামের অন্যান্য গরুর সহিত মিলিত হইয়া গোষ্ঠে চলিয়া গেল এবং দিনান্তে আবার গৃহস্থের ঘরে ফিরিয়া আসিল। সন্ধ্যায় যতটুকু পারিলেন গৃহস্বামী আবার দুগ্ধ দোহন করিয়া লইলেন এবং তাঁহার সংসারের দুধের অভাব মিটাইলেন। গৃহস্থের সহিত গরুর সম্পর্ক এতখানি। গরুরও যে ভাল খাইবার ও ভাল থাকিবার একটা দাবি আছে অধিকাংশ গৃহস্থের তাহা ভাবিবার অথবা দেখিবার সময় নাই। কোন কোন গৃহস্থ গরুর ভাল খাইবার ও থাকিবার দিকে দৃষ্টি রাখেন বটে, কিন্তু গো-জনন বিষয়ে বাংলার সমস্ত গৃহস্থই উদাসীন। গো-জননের প্রতি এই উদাসীনতা বাংলার গো-বংশের যে কি ভীষণ ক্ষতি করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দুঃখের বিষয়; এখনও বাংলা এদিকে মন দিবার অবকাশ পান নাই। এই গো-জননের (selection and breeding) উপর নির্ভর করিয়া ইয়োরোপের 'হোলষ্টিনফ্রিজেন', 'আয়ারশায়ার', 'জার্সী' প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গো-বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, একটি ভাল 'হোলষ্টিনফ্রিজেন' ষাঁড়ের দাম পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ হাজার টাকা হইতে পারে এবং এই জাতীয় কোন কোন গরু দিনে এক মণেরও উপর দুধ দেয়। ইয়োরোপেরও চিরদিন কিছু এমনি ছিল না। কত দিনের সাধনার ফলে আজ তাহারা এই অদ্ভুত গো-বংশের সৃষ্টি করিয়াছে। সন্তান-জন্মের কত দিন পরে গরু স্বাভাবিক নিয়মে ষাঁড়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে, কোন গৃহস্থ তাহা জানেন না। সমস্ত গ্রামের গরু লইয়া যে রাখাল গোষ্ঠে যায়, এ দায়িত্ব তাহারই উপর চাপাইয়া দিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া থাকেন।

এই পালের কত অপদার্থ ষাঁড় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যথাসময়ে স্বাভাবিক আকর্ষণে এইরূপ কোনও এক অপদার্থ ষাঁড়ের সহিত মিলনের ফলে আরও এক অপদার্থ গো-বৎসের সৃষ্টি হইল। বাংলার গো-বংশের বৃদ্ধি এইরূপেই হইয়া আসিতেছে। কতদিনের উদাসীনতার ফলে তাহারা অধঃপতনের এই শেষ সীমায় পঁহুছিয়াছে তা কে বলিবে ?

গো-জননের ইতিহাস ত এইরূপ ; গো-বৎসের প্রতি ব্যবহারটাও একবার ভাবিবার বিষয়। স্বভাবের নিয়মই এই যে, বলিষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট পিতামাতার সন্তান শীঘ্রই শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়া সন্তানধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। বাংলার গো-বৎসের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। সে তাহার কৃশ পিতামাতার সমস্ত অভিশাপ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিল, উপরন্তু গৃহস্থের কল্যাণে তাহার মাতার যে সামান্য দুগ্ধ হয় তাহাতেও সে বঞ্চিত হইল। ফল হইল এই, যেখানে ইয়োরোপের গোবৎস দুই অথবা আড়াই বৎসরের মধ্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আড়াই অথবা তিনবৎরের মধ্যে সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা লাভ করে, বাংলার গোবৎসের সেখানে চারি বৎসর লাগে। শুধু এই নয়, তাহার জীবনী-শক্তিও কম হইয়া যায় এবং অন্য দেশের গরু তাহার জীবিতকালে যে সংখ্যক গোবৎসের জন্ম দিয়া যায়। বাংলার গরু তাহা অপেক্ষা অনেক কম গো-বৎসের জন্ম দেয়। ইহাও একজাতীয় ক্ষতি।

Nestles Condensed Milk Supply Co. সমগ্র ভারতে বৎসরে দুইলক্ষ টাকা কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। বৎসরে অন্ততঃ কত লক্ষ টাকার দুগ্ধ বিক্রয় হইলে পর যে এত টাকা কেবল বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ করা যায় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই দুগ্ধের অধিকাংশই এই বাংলা দেশেই বিক্রয় হয়, তাহার কারণ বাংলার দুগ্ধাভাব অন্যান্য সব প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। বাংলার প্রতি পল্লীতে প্রায় ২০০।৫০০ শত গরু দেখিতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে ৪০।৫০টার বৎস মরিয়া গিয়াছে, কতকগুলি হয়ত ২।৪ মাস দুধ দিয়াই বন্ধ করিয়াছে, যাহারা এখনও দিতেছে তাহারা গড়পড়তা একপোয়া কি আধসের দুধ দেয়। তাই দুধের অভাব হওয়া স্বাভাবিক এবং নেস্‌ল্‌স্ কোম্পানিরও বৎসরে দুই লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত ব্যয় করা সার্থক হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলায় যে পশু-গণনা হয় তাহাতে দেখা যায় যে, সমগ্র বাংলায় গাভীর সংখ্যা একাত্তর লক্ষ দশ হাজার ছয়শত চৌত্রিশ এবং ঐ বৎসর সমগ্র বাংলার জন-সংখ্যা ছিল তিন কোটী পঁয়ষট্টি লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয় শত পঁচিশ অর্থাৎ প্রতি পাঁচ জন বঙ্গবাসীর জন্ত একটা করিয়া গাভী ছিল। প্রত্যহ যদি জন প্রতি আধ সের করিয়া দুধের খরচ ধরা হয় এবং যদি প্রতি গাভী প্রতিদিন তিন সের করিয়া দুধ দেয় আর যদি তাহাদের দুগ্ধদান-সময় (Lactation period) নয় মাস করিয়া ধরা হয় তাহা হইলে বাংলা প্রদেশে দুধের দুর্ভিক্ষ হওয়া উচিত নয়। এই গরু ব্যতীত এই দেশে প্রায় দুইলক্ষ পাঁচ হাজার উনষাট মহিষ ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে বাংলায় দুধের দুর্ভিক্ষ গরু অথবা মহিষের সংখ্যা-ন্যূনতার জন্ত নয়, ইহার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে।

রঙ্গপুরে বাংলা সরকারের যে ডেয়ারি ফার্ম্ম আছে, তথায় এই বাংলা দেশেরই গরুর উন্নতি করিয়া এমন অবস্থায় আনয়ন করা হইয়াছে যে, সেখানকার গরু প্রত্যহ গড়পড়তা (average milk yield) চারি সের করিয়া দুধ দেয়। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে, চেষ্টা করিলে এবং মনোযোগ দিলে এই দেশেরই গরু প্রত্যহ চারি সের করিয়া দুধ দিতে পারে। আর সমগ্র বাংলায় আজ এই যে দুগ্ধাভাব তাহার কারণ বাংলার গরু প্রত্যহ গড়পড়তা এক পোয়ার বেশী দুধ দেয় না এবং তাহা তিন কোটী পঁয়ষট্টি লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয় শত পঁচিশ জন বঙ্গবাসীর প্রয়োজনানুযায়ী নয়। অতএব দেখা যাইতেছে, গরুর সংখ্যা না বাড়াইয়াও এই গরুদেরই সংস্কার করিয়া বাংলার দুগ্ধ-সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। শুধু তাহাই নয়, কতকগুলি অপদার্থ গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাতে দেশে আর্থিক ক্ষতি হইবে। একেই ত দেশে গোচারণ ভূমির জন্ত হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর যখন এই প্রকার শুক্‌নো গরুতে দেশ ভরিয়া যাইবে তখন যদি তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে বঙ্গবাসীদের নিজেদের চাষের জমি গরুকে ছাড়িয়া দিয়া অনশনে দিন কাটাইতে হইবে। Bengal Councilএর Legislative Assemblyতে গোরক্ষণ সভাতে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কত স্থানে গো-জাতির উন্নতি নিমিত্ত গোচারণ-ভূমির ব্যবস্থা করিবার জন্ত কত প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। যদিও এইরূপ প্রস্তাবের ফল কোথাও এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই তথাপি এইরূপ ব্যবস্থা অর্থনীতির দিক দিয়া কতদূর সমীচীন তাহা ভাবিবার বিষয়।

গো-জাতির উন্নতি করিতে হইলে দুইটি জিনিসের দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। ১। গোচারণের সংস্থান। ২। নির্ব্বাচনপূর্ব্বক গো-জনন। প্রথমটার কথা ভাবিতে গেলে স্বতঃই গোচারণ-ভূমির কথা মনে পড়ে। ভূমি আকাশের মত অনন্ত অসীম নয়, তাহা সীমাবদ্ধ, অথচ দেশে লোকসংখ্যা এবং গো-বংশের বৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে। এই যে সমগ্র বাংলাদেশের গোচারণ-ভূমি আজ ধান অথবা অন্য শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে, ইহা কেহ গো জাতির উপর শত্রুতা করিয়া করিতেছে না। পৈতৃক দশ বিঘা জমী দুই ভাই ভাগে পাইল, আজ তাহাদের সংসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরই সীমানাভুক্ত যে দুই এক বিঘা পতিত জমী ছিল তাহাও কাটাইয়া ছাঁটাইয়া চাষোপযোগী করিয়া তুলিতে হইতেছে। অর্থনীতিই (Economic tendency) তাহাকে ইহা করিতে বাধ্য করিতেছে। এখনও দেশে কিছু কিছু পতিত ডাঙ্গা এবং বন-জঙ্গল আছে। উপস্থিত হয়ত আইন প্রণয়ন করিয়া কয়েক বৎসরের মত এই গোচারণ-ভূমির সমস্যার একটা সমাধান হইতে পারে, কিন্তু আবার কয়েক বৎসর পরে, লোক-সংখ্যা এবং গোবংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক এই সমস্যাই আবার দেখা দিবে। এইত গেল প্রথম কথা। তারপর এই বাংলা দেশে গরুর সংখ্যা একাত্তর লক্ষ দশ হাজার ছয় শত চৌত্রিশ এবং মহিষের সংখ্যা দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার উনষাট, অর্থাৎ সর্ব্বসমেত তিয়াত্তর লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয় শত তিরানব্বই। যদি ইহাদের প্রত্যেকের জন্ত অভাব পক্ষে এক একর অর্থাৎ তিন বিঘা করিয়া জমি গোচারণ-ভূমি রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দুই কোটী একুশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার উনআশি বিঘা জমি গোচারণের জন্ত প্রয়োজন হইবে। সমগ্র বাংলাদেশে মাত্র চার কোটী একানব্বই

লক্ষ তেইশ হাজার তিন শত আটানব্বই বিঘা ভূমি আছে। অতএব দেখা যাইতেছে বাংলাদেশকে মা ভগবতীদের হাতে সঁপিয়া দিয়া বাঙ্গালীকে অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইত গেল দ্বিতীয় কথা।

ঐ বৎসরই বাংলা দেশে যে পশু-গণনা হয় তাহার ফল বাংলা সরকার A Survey and Census of the Cattle of Bengal নামক একটি পুস্তকে আরও অন্যান্য সংবাদ সহ প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকেরই এক স্থানে দেখিলাম যে, প্রতি এক একর গোচর ভূমির জন্য—প্রেসিডেন্সি বিভাগে—নদীয়া জেলায় ১৩ হইতে আরম্ভ করিয়া চব্বিশ পরগণা জেলায় ৩০টি পর্য্যন্ত; বর্দ্ধমান বিভাগে বাঁকুড়া জেলায় ০.৪ হইতে আরম্ভ করিয়া হাবড়া জেলায় ৪৫টি পর্য্যন্ত; রাজসাহী বিভাগে—দার্জ্জিলিং জেলায় ০·৩ হইতে আরম্ভ করিয়া বগুড়া জেলায় ৪০টি পর্য্যন্ত; ঢাকা বিভাগে—বাখরগঞ্জ জেলায় ৬ হইতে আরম্ভ করিয়া ফরিদপুর জেলায় ৬৯টি পর্য্যন্ত; এবং চট্টগ্রাম বিভাগে—পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ৭ হইতে আরম্ভ করিয়া নোয়াখালি জেলায় ৫৫টি পর্য্যন্ত গরু আছে। এই হিসাবে দেখিতে গেলে বাঁকুড়া, বীরভূম এবং দার্জ্জিলিং জেলায় যথেষ্ট গো-চর ভূমি আছে এবং বাংলার গো-জাতির এ হীনাবস্থা যদি গো-চর অভাব বশতঃই হইয়া থাকে, তবে বাঁকুড়া, বীরভূম এবং দার্জ্জিলিং জেলার গরু অন্যান্য জেলার গরু অপেক্ষা ভাল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে সকলের অবস্থাই সমান, বরং বাঁকুড়া বীরভূমের গরু কতকাংশে নিকৃষ্ট। বোম্বাইয়ের 'নাসিক' জেলায় গো-চর ভূমি আদৌ নাই বলিলেও চলে অথচ সেখানকার গরু কত সুন্দর, বিহারের চম্পারণে গোচর-ভূমির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও সেখানকার গরু নাসিকের গরু অপেক্ষা অনেকাংশে হীন। ইহাতে এই বুঝিতে পারা যায় যে, গোচর-ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেই যে গো-খাদ্যের ব্যবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে গো-জাতির উন্নতি হইবে না। এ সমস্যাকে অন্য উপায়ে সমাধান করিতে হইবে। জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা, লুসার্ণ, বরসীম, গিনিঘাস প্রভৃতির চাষ করিতে হইবে। মাটীর ভিতর গর্ত্ত (Silo) করিয়া এই-সমস্ত ঘাসকে রক্ষা করিতে হইবে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করা যাইবে।

মোট কথা, এই সমস্ত অবনতির মূলে জাতীয় দারিদ্র্য ও উদাসীনতা বর্ত্তমান। সমস্ত বাংলার অন্নসমস্যা আজ প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক, অন্নাভাবে চাকুরী লাভের লাঞ্ছনায় উদ্বন্ধনে, বিষ-প্রয়োগে, বন্দুকের গুলিতে ইত্যাদি কত উপায়ে কত অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছে। বাংলার শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় যদি চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া কৃষি ও গো পালনের দিকে মন দেন, তবে সকল দিক্ দিয়া জাতির লাভ,—বাংলার গো-বংশের উন্নতি হইবে, দেশে শিশুমৃত্যুর হার কমিবে, কৃষির অবস্থা রূপান্তরিত হইয়া যাইবে, দেশে অর্থাগম হইবে, অন্নসমস্যারও কথঞ্চিৎ সমাধান হইবে।

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৮

আপিসে নিবিষ্টমনে প্রকাশ খাতা লিখিতেছিল, এমন সময় বিনয়-বাবু আসিয়া কহিলেন,—কেসিয়ার-বাবু তোমায় একবার ডাকছেন, প্রকাশ।

—আমায়? কেন?

—তোমার হিসাব মিল্‌ছে না বল্‌লেন।

—যাই বিনয় দা', বলিয়া প্রকাশ লিখিতে লিখিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই লম্বা ঘরে এক প্রান্ত হইতে

অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত টেবিলের পাশে বসিয়া কেরাণীরা যে যাহার কাজ করিতেছিল। উপরে ঘুরে ঘুরে কয়েকখানা বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে।

দোতলার সিঁড়ির ধারে কেসিয়ার-বাবুর ঘর। আলোকের অপ্রাচুর্য্য হেতু এই ঘরে দিনেও বাতি জ্বলিত। ভিতরে একটি প্রকাণ্ড টেবিল, দুই ধারে দেরাজ। টেবিলের উপর রাশি রাশি খাতা-পত্র।

কেসিয়ার-বাবু প্রকাশের অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি, কৃশ। মুখ শুষ্ক—নাসিকাটি শরীরের অন্যান্য অবয়বগুলিকে বঞ্চনা করিয়া বিপুল পরিপুষ্টতা লাভ করিয়াছে। সর্দ্দি-কাশির ভয়ে এত গরমেও তিনি গলায় একটি কম্ফার্টার জড়াইয়া থাকিতেন।

প্রকাশকে আসিতে দেখিয়া তিনি কহিলেন,—এস, প্রকাশ! হিসাব মিল্‌ছে না, তাই তোমায় ডেকেছি।

প্রকাশ টেবিলের পাশে দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, আমার হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখত, যদি ভুল ধর্‌তে পার।

একটি চেয়ারে বসিয়া প্রকাশ হিসাবের কাগজ মিলাইতে লাগিল। কেসিয়ার-বাবু চুরুট ধরাইলেন।

তকমা-আঁটা পাগড়িপরা একজন চাপরাসি আসিয়া জানাইল—বড় সাহেব কেসিয়ার-বাবুকে তলব দিয়াছেন।

—সাহেব? স্প্রীংএর পুতুলের মত তড়াক্ করিয়া কেসিয়ার-বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেবের নামেই কোন কোন ব্যক্তি স্নায়বিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই রোগের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি অচিরাৎ তাঁহার মধ্যে দেখা দিল। তিনি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

একলা ঘরে বসিয়া প্রকাশ অল্প সময়েই ভুল ধরিয়া ফেলিল। ভুল কেসিয়ার-বাবুর। একটি অঙ্ক খাতায় উঠাইতে তিনি ভুল করিয়াছেন। প্রকাশ সেখানে পেন্সিল দিয়া দাগ দিল। কেসিয়ার-বাবু আসিলে তাঁহাকে হিসাব দেখাইয়া ফিরিয়া যাইবে মনে করিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বসিয়া বসিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। হাই ছাড়িয়া সে উপর দিকে চাহিল, তারপর দরজার পানে ফিরিল। পরমুহূর্ত্তে পিছনে চাহিতে—কি সর্ব্বনাশ! তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সে দেখিল দেয়ালে বসান লোহার সিন্দুকের ছিদ্র দিয়া এক গোছা চাবি ঝুলিতেছে!

প্রকাশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। লোকটা কি অসতর্ক! এমন ধারা চাবি ফেলিয়া কেহ উঠিয়া যায়? প্রকাশ আবার ফিরিয়া দেখিল। সিন্দুক খোলা, ডালা ভেজান—ভিতরে নোটের তাড়া। সে মুখ ফিরাইয়া রহিল। আপন অভাবের কথা তাহার মনে জাগিতেছিল। এত অভাব তাহার, তথাপি ঐ পুঞ্জীভূত ধনরাশির একটি কপর্দ্দকও সে স্পর্শ করিতে পারিবে না। সে ডাক্তার-খানার দেনা শোধ করিতে পারে নাই, হোটেলে তাহাকে অপমান সহিতে হইয়াছে। তাহাতে কাহার কি? রুগ্না স্ত্রী পথ্যাভাবে মরিলেও কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না, কেন এমন হইল। জঙ্গলা স্থানে ভিজা বাতাসে জ্বলন্ত বাতির চারিদিকে অসংখ্য পতঙ্গ যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসে, কোথা হইতে আসে কেহ জানে না—তেমনি তাহার মনে অশেষ কল্পনা আসিয়া দেখা দিল। সে যদি সিন্দুকের কাছে গিয়া ডালা খুলিয়া ফেলে, তারপর এক তাড়া নোট—ও কি! এ সব কি সে জাগিয়া স্বপন দেখিতেছে? অকস্মাৎ প্রকাশ জোরে হাসিয়া উঠিল। কি অদ্ভুত খেয়াল! এমন অসম্ভব কল্পনাও সে করিতে পারে? সত্যই সে আজ নিজের কাছে নিজে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে।

—কি হে, হিসাব মিল্‌ল,—চুরুট টানিতে টানিতে কেসিয়ার-বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রকাশ হাসিতেছিল। কেসিয়ার-বাবু তাহার হাসির অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। কহিলেন,—পাগল হ'লে না কি হে?

প্রকাশ আঙুল দিয়া সিন্দুক দেখাইয়া দিল।

মুহূর্ত্তকাল কেসিয়ার বাবু বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন। তাহার চোয়াল ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তারপর স্প্রিংএর ন্যায় লাফাইয়া গিয়া সিন্দুকের ডালা টানিয়া খুলিলেন।

কেসিয়ার-বাবু নোটের তাড়াগুলি গুণিতেছিলেন, সে-দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ কিছুকাল নীরবে বসিয়া রহিল। অনর্থক এই লোকটির অন্তরে আঘাত দিবার দুষ্ট মতলব অকস্মাৎ তাহার মাথায় গিজ্ গিজ্ করিয়া উঠিল।

সে কহিল,—বুঝি মশায়, সব্বই বুঝি। টাকা-কড়ি নিজে সরিয়ে চুরির দায় আর-একজনার উপর চাপাবার মতলব করেছেন। সেইজন্যই বুঝি নিজের হিসাব গরমিল করে' আমায় ডেকে আনা হয়েছিল। আর সাহেব ডাকার অছিলায় সিন্দুক খোলা রেখে আমায় একলা ঘরে ফেলে' সরে' পড়্লেন।

পরীক্ষা-শেষে সিন্দুক বন্ধ করিয়া কেসিয়ার-বাবু চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। তারপর প্রকাশের পানে একটি ভৎর্সনা-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—আমি বড় দুঃখিত হয়েছি, প্রকাশ। তুমি যে আমাকে এমনি জঘন্য সন্দেহ কর্তে পার, তা জান্তাম না।

প্রকাশের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। সে কহিল,—আমি কাউকে বিশ্বাস করি ভেবেছেন?

কেসিয়ার-বাবু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কহিলেন,—কাউকে বিশ্বাস কর না! সে কি!

—হাঁ। সত্যি কথা। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

—কেন কর না?

—আপনার কাছে আমি তার কোন কৈফিয়ৎ দিতে চাই না।

কেসিয়ার-বাবু মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিলেন। তারপর কহিলেন,—আমি তোমায় বুঝ্তে পার্ছি না, প্রকাশ। এ কৈফিয়তের কথা নয়। তোমার অল্প বয়স। এ বয়সে লোকের উপর এমন ধারা বিশ্বাস হারানো ভাল কথা নয়।

—থাক্ মশায়। আমি এবিষয়ে কারুর উপদেশ চাই না, বলিয়া প্রকাশ বিস্ময়াবিষ্ট কেসিয়ার-বাবুর দিকে হিসাবের কাগজপত্র ছুঁড়িয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ছুটির পর আপিসের এই ব্যাপারটি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে প্রকাশ পথ চলিতে লাগিল। সে আজ কেসিয়ার-বাবুর সঙ্গে ইচ্ছা করিয়া ঝগড়া করিয়াছে। কেন? অসাবধানতা বশতঃ তিনি সিন্দুকটি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইয়াছে? তিনি যদি প্রকাশের হাতে চাবির গোছা সঁপিয়া দিয়া এই বলিয়া চলিয়া যাইতেন যে,—সব রহিল, তুমি দেখিও ত ভাই—তাহা হইলে সে কি তাঁহার সহিত ঝগড়া করিতে পারিত? সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, দোকানে মিষ্টান্ন-ভরা কাঁচের বাক্সের চারিদিকে যেমন মৌমাছি ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার মনও তেমনি ঐ সিন্দুকটির চতুষ্পার্শে ঘুরিতেছিল, এবং যে-প্রবৃত্তি তাহার অন্তরে জাগিয়াছিল—সেই প্রবৃত্তি ও আসল অপরাধের মধ্যে তাহার শিক্ষা ও সংস্কার অচিরাৎ একটি নীতির প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এ সব কথা ভাবিতে গিয়া বিষয়টির আর-একটা দিক্ মনে উঠিতে, নিজকে সে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে কোন মতেই পারিল না। কিসের নীতি? নীতির জন্য মানুষ, না মানুষের জন্য নীতি? সে যদি মানুষের এই জীর্ণ সংস্কার ছাপাইয়া বাধাবন্ধহীন মুক্তির সুরে আপন জীবন বীণা বাঁধিতে পারিত!

একপক্ষকাল কাটিয়া গেল। দিনগুলি একই রকম সহিষ্ণুতার বোঝা বহিয়া একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল। সুরবালা শয্যায় তেমনি পড়িয়া—রোগের কিছু মাত্র উপশম হয় নাই।

প্রতিদিন প্রকাশ মনে করিত, আজ সে সুরবালার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখিতেছে। কিন্তু দিবা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই তাহার ভুল ভাঙিয়া যাইত। তথাপিও সে নিরাশ হইল না। আরোগ্য হইতে কিছু দিন সময় লাগিবে বৈ কি! সেজন্য উদ্বিগ্ন হইলে চলিবে কেন?

একদিন সকালে যথাসময় প্রকাশ ঔষধ ঢালিতেছিল,—সুরবালা কহিল,—আমি আর ওষুধ খেতে পারি না।

মৃদু ভৎর্সনা করিয়া প্রকাশ কহিল,—ছি, এরকম ছেলে মানুষি কর্তে আছে?

—খেয়ে কি হ'বে? আমার ওতে কোনো ফল হচ্ছে না।

—ফল কি একদিনে হ'বে, সুর? ওষুধ খাও, আমি বল্‌ছি, তুমি সেরে উঠবে।

তারপর তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য সে কহিল,—শ্বশুর-মশায়ের চিঠি পেয়েছি, সুর। তিনি লিখেছেন, চন্দ্রনাথকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

ঔষধ সেবন করিয়া সুরবালা শুইয়াছিল, কহিল—মিছামিছি তার পড়ার ক্ষতি হ'বে। তুমি বরঞ্চ তাকে আস্‌তে বারণ করে' লিখে দাও।

প্রকাশ কহিল—তাও কি হয়? তার ত দিদিকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। তা ছাড়া সে দুপুরবেলা কাছে থাক্‌লে তোমার তত কষ্ট হ'বে না।

সুরবালা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

আজ ডাক্তার আসিবার কথা। সারাদিন প্রকাশ তাহার আসার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সে স্থির করিয়াছিল, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিবে যাহাতে সুরবালা শীঘ্র আরাম হইয়া উঠে। কিন্তু বিকাল বেলাও যখন ডাক্তার আসিয়া দেখা দিলেন না,তখন জামাটি পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে সে তাহার বাড়ী-অভিমুখে চলিল।

গৌর-বাবু ডাক্তারের বাড়ী নিকটেই, গলির ভিতর। রাস্তার উপর ছোট একটি ঘর। বাহিরে প্রাচীর-গাত্রে একখানি ঝক্‌ঝকে তাম্রফলক নাম ও আয়ুর্ব্বিদ্যা ঘোষণা করিতেছে।

দরজার সম্মুখে পাপোশে পা মুছিয়া প্রকাশ ঘরের মধ্যে উঠিয়া আসিল। ভিতরে এক পাশে টেবিল—পশ্চাতে চেয়ারে বসিয়া ডাক্তার গৌর-বাবু একজন রোগী পরীক্ষা করিতেছিলেন।

নমস্কার করিয়া প্রকাশ বেঞ্চের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ডাক্তারবাবু মুখ তুলিয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি খবর?

প্রকাশ কহিল,—আজ্ঞে, আপনার আজ আস্‌বার কথা ছিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—হাঁ যাবার কথা ছিল বটে। কিন্তু পরে ভেবে দেখ্‌লাম ঘন ঘন যাবার কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্যবস্থাই এখন কিছুদিন চল্‌বে। আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি এর কাজটা সেরে নি,—বলিয়া তিনি রোগীর পরীক্ষায় মনোযোগ দিলেন।

—অ্যাঁ পেট গরম হয়? তা একটু হবেই। রাত্রে? অ্যাঁ—রাত্রে ভাল ঘুম হয় না? না হবারই কথা। স্মৃতি-শক্তির হ্রাস? অ্যাঁ—কাজে মন বসে না? এরূপ অবস্থায় সম্প্রতি কাজ না করাই বিধেয়।

পরীক্ষা শেষ করিয়া ডাক্তার-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—যা বলি করবেন ত?

রোগী কহিল,—নিশ্চয়ই। আপনি যে-রকম বল্‌বেন।

ডাক্তারবাবু কহিলেন,—সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ ঘটেছে কি না। তা এক কাজ করুন, ডাগর-ডোগর দেখে একটি পাত্রীর সন্ধান করে' যত শীঘ্র পারেন বিবাহ করে' ফেলুন। বলিয়া একবার তাহার দিকে, একবার প্রকাশের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

লোকটি মূঢ়ের মত হাসিয়া কহিল,—আজ্ঞে বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘুরে—

ডাক্তার-বাবু কহিলেন,—ও সব কিছু নয়। কতক মানসিক, কতক স্নায়বিক। তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন,—ব্যবস্থাটা পছন্দ হ'ল না বুঝি? বসুন তবে, ওষুধ লিখে দিচ্ছি।

প্রকাশ অবাক হইয়া এই লোকটির পানে চাহিয়া ছিল। সে যুবক ঈষৎ স্থূল নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ। চেহারা দেখিয়া মনে হয় না যে, ইহার কোনরূপ ব্যাধি থাকিতে পারে; অথচ স্বচ্ছন্দে কতকগুলি উপসর্গ কল্পনা করিয়া তাহার প্রতিকারকল্পে ব্যবস্থার সন্ধানে আসিয়াছে। এ-যে বড় অদ্ভুত প্রতারণা!

সে চলিয়া গেলে ডাক্তার ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া আলস্য ঝাড়িয়া কহিলেন,—জানেন প্রকাশ-বাবু, এদের মত রোগীই হচ্ছে বার-আনা। তাই চিকিৎসা-শাস্ত্রটা এখনো কোন মতে বেঁচে আছে—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

প্রকাশ কহিল,—ওর ত ব্যবস্থার কোন দরকার ছিল না। তবু দিলেন যে? ওতে কি কোন ফল হ'বে মনে করেন?

—হ'বে বৈকি, খুব হ'বে। ওতেই সে আরাম হ'য়ে যাবে। হাইড্রোপ্যাথি জানেন ত? ওষুধ ব'লে জল

খেয়েই কত লোক আরাম হ'য়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ স্থলে রোগী আপনা থেকে ভাল হ'য়ে ওঠে। ওষুধপত্র উপলক্ষ। ঝড়ে কাক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে, এ হচ্ছে তাই।

একজন ডাক্তারের মুখে ভেষজ সম্বন্ধে এমন তাচ্ছিল্যের কথা শুনিয়া প্রকাশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে কহিল,—কি বলেন ডাক্তারবাবু, ওষুধের কোন ফল নেই? বিষ খেলে মানুষ যখন মরতে পারে তখন ওষুধ খেলে সে ভাল হ'বে না কেন?

একটু চিন্তা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন,—সে কথা ঠিক। ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে কথা হচ্ছে না। কিন্তু কি জানেন প্রকাশ-বাবু, আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র এখনো এতদূর অসম্পূর্ণ যে, ওষুধ দিয়ে উপকার করার চেয়ে অনেক সময় অপকারটাই আমরা বেশী করে' থাকি। আমাদের চিকিৎসাবিদ্যা এখনো experiment মাত্র। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, experiment গুলি তাদের শরীরের উপর দিয়ে চলেছে, যারা দুমুঠো অন্নের জোগাড় ক'রে আমাদের পরিবার প্রতিপালন করছে।

প্রকাশ নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তারবাবু বলিতে লাগিলেন,—আমরা হাতুড়েদের ঘৃণা করি, কিন্তু সেই হাতুড়েদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোন্‌খানে জিজ্ঞাসা করলে অনেক বড় ডাক্তারও বোধ করি তেমন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবেন না। প্রক্রিয়া দুজনেরই সমান—লাগে তুক্ না লাগে তাক্!

প্রকাশের মনে সুরবালার অবস্থার কথা জাগিয়া উঠিতেছিল। এতকাল সে কি তবে একটি ভ্রান্তির ডোরে বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছে? অকস্মাৎ সে অনুভব করিল, কে যেন তাহার অন্তরের আশার দীপটি নিভাইয়া দিয়া অন্ধকার করিয়া দিল। সে আর থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—ডাক্তার-বাবু আমায় বলুন, সুরবালার অসুখ কি সাংঘাতিক? আপনাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে এর কি কোন ওষুধ নেই?

ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—ঐ নিন্। আপনি এখন ব্যবসার কথা পাড়লেন। আমরা এতক্ষণ চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করছিলাম বৈ ত নয়। ব্যবসায়ী হিসাবে একটি কথাও আমি বলিনি, প্রকাশ-বাবু।

প্রকাশ কহিল,—না, না, ডাক্তার-বাবু, মিথ্যা আমি চাই না—যা সত্য তাই বলুন। অপ্রিয় হয় হোক্, তবু আমি সত্য শুনতে চাই।

ডাক্তার-বাবু কাঁচের কাগজ-চাপাটি তুলিয়া লইয়া কেবলি ঘুরাইতেছিলেন। ফাঁসীর আসামী যেমন অদৃষ্ট ভাগ্যের প্রতীক্ষায় বিচারকের পানে চাহিয়া থাকে, সেইমত পলকহীননেত্রে প্রকাশ তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মুখ না তুলিয়া ডাক্তার-বাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—সত্য বলতে গেলে আপনার এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয়, প্রকাশ-বাবু। আমার অভিজ্ঞতায় এরকম রোগী কখনো আরাম হ'তে দেখিনি। কিন্তু সব চেয়ে খারাপ হচ্ছে এই—এ রোগে কাহারো চট্ ক'রে মৃত্যু ঘটে না। মৃত্যু যে সব সময় শত্রু হ'য়ে এসে দেখা দেয়, তা নয়। অনেক সময় বন্ধুর কাজও করে। এ এক জীবনব্যাপী দীর্ঘ যন্ত্রণা।

প্রকাশ বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় তখন গ্যাসের আলো একে একে জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

জীবনব্যাপী দীর্ঘ যন্ত্রণা! তাহার মস্তিষ্ক জুড়িয়া ডাক্তার-বাবুর কথাকটি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। এমন বাঁচায় লাভ কি? জীবনের সার্থকতাই যখন রহিল না তখন বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। বার বার তাহার মনে হইতেছিল, জীবনের সকল সুখশান্তি জলাঞ্জলি দিয়া শুদ্ধমাত্র কর্ত্তব্যের নাগপাশে আপনাকে এমন অষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিবে সে কেমন করিয়া? এই নির্জ্জীব অবিচ্ছিন্ন সতীদেহ কতকাল সে বহিয়া লইয়া বেড়াইবে? দেনা-পাওনা লইয়া সংসার—এখানে দেনা-পাওনা ভিন্ন অন্য নীতি কোথায়? আপন ন্যায্য গণ্ডা আদায় না করিয়া শুধু কেবল পরের দাবী পরেকেই দিতে হইবে? দেওয়াটাকে অত বড় করিয়া দেখিলে চলিবে কেন? পাওনার প্রয়োজন যে দেওয়ার চেয়েও বেশী।

বড় রাস্তার ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় লোক জমিয়া-

ছিল। প্রকাশ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে লোকের ভিড়। ভিতরে গ্যাসের আলোর সাম্‌নে একজন লোক বেহালা বাজাইতেছে। কৃষ্ণের পোষাকে একটি বালক নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিতেছিল।

ইতর লোকের ভিড়। ভদ্রবেশধারী প্রকাশকে দেখিয়া বেহালা-ওয়ালা তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া উৎসাহের সহিত বাজাইতে লাগিল। তারপর বাজনা শেষ হইলে মাথার পাগড়ি খুলিয়া মেলিয়া ধরিল।

প্রকাশ ধীরে ধীরে মণিব্যাগটি পকেট হইতে টানিয়া বাহির করিল, খুলিয়া ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা বাছিয়া তুলিল। তারপর কি ভাবিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাগটি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। একটি টাকা আর কয়েকটি সিকি দুয়ানি বস্ত্রখণ্ডের উপর গড়াইয়া পড়িল।

বেহালাওয়ালা সেলাম দিয়া সরিয়া গেল। দর্শকেরা বিস্মিতনেত্রে তাহার পানে চাহিয়াছিল। একজন কহিল,—পাগল।

প্রকাশ গঙ্গার রাস্তা ধরিল। তীরের সন্নিকটে পোর্ট-কমিশনারের রেল পার হইয়া রাস্তাটি রথতলার ঘাটে গিয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ রেল-রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে একটা ইঞ্জিন ঝক্ ঝক্ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল।

একজন পয়েন্টস্‌ম্যান পিছন হইতে তাহার গলায় ঝাঁকি দিয়া কহিল,—আঁখ নেহি হ্যায়? এঞ্জিন দেখ্‌তে-হও নেহি?

তখন গঙ্গার ঘাট নিরালা হইয়াছে। স্নানার্থীর ভিড় নাই। শুধু দুই একজন শ্রমিক কর্ম্মাবসানে ঘাটে নামিয়া ডুব দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। যে-স্থানে বসিয়া ঘাটের উড়িয়া পাণ্ডা চন্দনের ছাপ আঁকিয়া দেয় তাহারি নীচে কোন নিরাশ্রয় হতভাগ্য অঘোরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে।

প্রকাশ ঘাটের কোণে একটি বাঁধানো স্থানে বসিয়া পড়িল। পশ্চিমে নদীর পরপারে সারি সারি কলঘর। গর্জ্জন তখন বন্ধ হইয়া গেছে। কয়েকটি দীপোজ্জ্বল জানালা দিয়া আলোর রশ্মিগুলি ঢেউ-এর মাথায় মাথায় পড়িয়া চিকমিক করিতেছে। উপরে অগণিত তারা গুচ্ছে গুচ্ছে জ্বলিতেছে। নভোমণ্ডল নিথর, নিস্পন্দ। নিম্নে গঙ্গার উচ্ছ্বসিত জলরাশি কল্লোল তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে শান-বাঁধান পাড়ের উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িতেছিল।

এ কি বিস্ময়! ঐ অনন্ত নীরবতার তলে এ কিসের কোলাহল? ঐ নির্ব্বিকার সুপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্রাতপচ্ছায়ে এ কিসের যুঝাযুঝি? এ কোন সত্য-মিথ্যার, আঁধার-আলোকের সুপ্তি-জাগরণের দ্বন্দ্ব?

প্রকাশ ভুলিয়া গেল—সেই জীবনব্যাপী দীর্ঘ যন্ত্রণা। সে ভুলিয়া গেল—তাহার শূন্য বর্ত্তমান আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ। একটা গভীর আত্মবিস্মৃতি তাহার সকল দুঃখ-তাপ ব্যথা-বেদনা যেন বন্যার জলে ভাসাইয়া দিল। তাহার অন্তরের কোন গোপন অন্তরাল হইতে এক বিশ্বজনীন্ পরার্থপরতা অকস্মাৎ মুক্ত হইয়া সেই ব্যাপ্ত উদার বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিল। ক্ষণেকের জন্য তাহার অন্তরাত্মা যেন কোন্ মহাজাগরণের উদ্দেশে সকল দেশকাল অতিক্রম করিয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া বাহির হইল।

অকস্মাৎ পশ্চিমে মেঘ দেখা দিল। বাতাস ক্রমে জোরে বহিতে আরম্ভ করিল। কলহান্তরিতা যোষিতের মত পশ্চিমের মেঘখণ্ড দেখিতে দেখিতে আকাশময় ছড়াইয়া পড়িল। তারপর মেঘের সহিত মেঘের সংঘর্ষ, বিদ্যুতের চমক! মুহূর্ত্ত মধ্যে সারা বিশ্ব যেন এক নিষ্ঠুর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সেই অনন্ত আকাশ, মহান্ নীরবতা, নির্ব্বিকার সুপ্ত চক্ষের নিমিষে একটা গাঢ় যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

প্রকাশ যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেছে। পল্লীটি সুপ্ত—নিঝুম। মাঝে মাঝে গ্যাসের লালবাতি কোন্ কদর্য্য কৃষ্ণ দৈত্যপুরীর প্রহরীর মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

ঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক ডাকাডাকি, কড়া-নাড়ার পর সে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বলিল,—এত রাত্রে ফিরছ, বাবু। দেখত, কতক্ষণ হেথা বসে' আছি।

সাড়া পাইয়া জো আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছিল ঝির অনুযোগের সমর্থন করিয়াই যেন সে ক্ষুব্ধ স্বরে বার-দুই ডাকিয়া উঠিল। পা দিয়া কুকুরটাকে ঠেলিয়া দিয়া প্রকাশ উপরে উঠিয়া আসিল।

সুরবালা তখনো জাগিয়া ছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে সে কহিল,—অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

প্রকাশ বিছানা পাতিয়া শয়ন করিল।

সুরবালা বলিল,—বাদলা রাত, এই ঝড়-বৃষ্টি। আমি তোমার জন্য ভেবে বাঁচি না—কোথা গেলে, ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন।

প্রকাশ হাসিল,—কহিল, তবু ভাল। দেখ্ছি আমার কথা তুমি ভাব। আমি মনে কর্তাম—যাক্!

সুরবালার অন্তরে তীক্ষ্ণ সূচের মত কথা ক'টি বিঁধিল। তাহার চোখে জল দেখা দিল। অভিমান-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে সে কহিল,—আমি কি বুঝি না তোমার কি কষ্ট? এর চেয়ে যদি আমার মরণ হ'ত!

বিছানার উপর চক্ষু মুদিয়া প্রকাশ অসাড়ের মত পড়িয়া রহিল।

সুরবালা বলিতে লাগিল,—তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে ব'লেই ত তোমার এই কষ্ট। নৈলে তোমার অভাব কিসের? হা ভগবান, একটি দিনের জন্যও যদি আমি তোমায় সুখী করতে পার্তাম! এ কথা মনে ক'রে আমি যে মরেও বাঁচ্বো না।

বাহিরে আবার ঝড় উঠিয়াছিল। সেই বাতাসের সঙ্গে একটি কর্ণভেদী করুণ শব্দ কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

উঠিয়া বসিয়া প্রকাশ ডাকিল,—সুরবালা!

এ কি স্বর! সুরবালা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, অনুজ্জ্বল আলোকে হিংস্র জন্তুর মত প্রকাশের চক্ষুর্দ্বয় জ্বল জ্বল করিতেছে।

সে কহিল,—বেঁচে থেকে তোমার লাভ নেই। তোমার মরণই ভাল।

উৎসারিত অশ্রু সুরবালার চোখে নিমেষে শুকাইয়া গেল। সে ভয় পাইয়াছিল।

অস্বাভাবিক দৃঢ় কণ্ঠে প্রকাশ কহিল,—মর্তে চাও? পারবে?

সুরবালা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, প্রকাশ তাহা অনুভব করিল।

সে হাসিল—বলিল, ঢের হয়েছে। কথায় কথায় আর মরণকে ডেকো না। মরা অত সোজা নয়।

বুক-ভাঙ্গা কান্না সুরবালার কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে সে কহিল—ও গো তোমার পায়ে পড়ি—অমন ক'রে ব'ল না। আমায় বিশ্বাস কর। আমি সত্যি মর্তে চাই। আমার আর সহ্য হয় না।

প্রকাশের মাথায় রক্ত চড়িয়া গিয়াছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের উপর কয়েকটা শিশি বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ান ছিল। একটা শিশি লইয়া সে খানিক আরক গেলাসে ঢালিল। তারপর বাছিয়া একটি মোড়ক বাহির করিল, ভিতরে সাদা গুঁড়া। আরকের সহিত তাহা মিশাইয়া, সুরবালার কাছে আসিয়া, হাত বাড়াইয়া গেলাসটি ধরিয়া সে কহিল, এতে কি আছে জান? মরফিয়া—বিষ।

—দাও গো, দাও—বিষ দাও। আমি তাই খাব, বলিয়া বিপুল শক্তিসংগ্রহ করিয়া সুরবালা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার রোগজীর্ণ দেহ এই উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, চক্ষু উর্দ্ধে উঠিল। সে অচেতন হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী সুধাংশুশেখর মজুমদার

কৈবর্ত্তরাজের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রী অভিযানে নিম্নলিখিত সামন্তরাজগণ রামপালদেবের সহিত গিয়াছিলেন।

"মগধ ও পীঠীর অধিপতি ভীমযশঃ, কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তির জয়সিংহ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভীর বিক্রমরাজ, অপর মন্দারের অধিপতি এবং আটবিক সামন্ত চক্রের প্রধান লক্ষ্মীশূর, কুজবটীর শূরপাল, তৈলকম্পের রুদ্রশিখর, উচ্ছালের অধিপতি ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয়রাজ প্রতাপসিংহ, কয়ঙ্গল মণ্ডলের অধিপতি নর-

সিংহার্জ্জুন, শঙ্কট গ্রামের চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলের বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি দোরপবর্দ্ধন, পদুবন্নার সোম।"

(শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "বাঙ্গালার ইতিহাস", ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫)

উপরে উল্লিখিত পীঠী যে কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ডাক্তার কোনো অনুমান করিয়াছিলেন যে, পীঠী মান্দ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত পিঠাপুরমের প্রাচীন নাম। সুপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, এই অনুমান ঠিক নহে। তাঁহার যুক্তি এইরূপ :—

(ক) খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে, একই ব্যক্তির মগধ ও দাক্ষিণাত্যের নগরবিশেষের অধিপতি হওয়া অসম্ভব।

(খ) তৃতীয় বিগ্রহপাল অথবা নয়পালের পরে পালরাজবংশের কোন রাজার দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার অথবা দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে অধিকার রক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল না।

পূজনীয় রাখালদাসবাবুর অনুমান, পীঠী সম্ভবতঃ মগধের সীমান্তে অবস্থিত কোন প্রদেশ বা নগরের নাম। এখন দেখা যাউক, মগধ ও গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে পীঠীর সন্ধান মিলে কি না।

ই, আই, রেলওয়ের লুপ লাইনে পীরপৈঁতী নামে এক ষ্টেশন আছে। উহা ভাগলপুর হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পীরপৈঁতী ষ্টেশনটি যেখানে অবস্থিত তাহার বর্ত্তমান নাম "সিয়ারডিহি।" আসল পীরপৈঁতী ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। স্থানীয় লোক ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকের নিকট ইহা সাধারণতঃ পৈঁতী নামে খ্যাত।

আমাদের ধারণা, এই পৈঁতীর প্রাচীন নাম "পীঠী"। এই অনুমানের সপক্ষে আমাদের যুক্তি নিম্নরূপ :—

(ক) প্রথমতঃ নাম সাদৃশ্য। জে, রেনেল্ সাহেবের মানচিত্রে এই স্থানটি পৈঁতী (Pointy) নামে অভিহিত। জনসাধারণের মধ্যেও এই নাম প্রচলিত। পীঠী কালক্রমে পৈঁতীতে পরিণত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

(খ) বর্ত্তমানে পৈঁতী গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও ইহা একটি প্রাচীন নগর। ইহার চারিপার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত অনেক ধ্বংস-স্তূপ বিদ্যমান। রেনেল্ সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে ইহা সহর বলিয়া নির্দ্দেশিত।

(গ) পীঠী-সম্পর্কে মাননীয় রাখালদাস-বাবু লিখিয়াছেন যে, দেশাবলী নামক গ্রন্থে পীঠ-ঘট্টা নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে। ঘট্টা শব্দদ্বারা এই স্থান গঙ্গা বা অপর কোন নদীর উপরে অবস্থিত ছিল, ইহাই সূচিত হইতেছে (পৃঃ ২৫৮)।

আমাদের এই পৈঁতী গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এই স্থানের অনতিদূরে এক পর্ব্বতের উপরে বিক্রমশীলা সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই স্থানটি গঙ্গাতীরে থাকায় নাম পাইয়াছে "প্রস্তর ঘট্টা বা "পত্থর ঘট্টা"-পৈঁতীতে গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। পীঠীও প্রস্তর-ঘট্টার ন্যায় 'পীঠ-ঘট্টা' নাম পাইয়া থাকিবে। পীঠ বা পীঠী অর্থে দেবস্থান বা বেদীও বুঝায়। এখন লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পৈঁতীর পর্ব্বতে অতি প্রাচীন কালের একটি গুহাগৃহ ও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপ রহিয়াছে। আমরা যখন এই স্থানটি দেখিতে গিয়াছিলাম তখন কথাপ্রসঙ্গে এক মুসলমান ফকির বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে ইহা যজ্ঞস্থান ছিল। পীঠ বা পীঠী অর্থে ঐরূপই বুঝায়। গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া 'পীঠ-ঘট্টা' বা সংক্ষেপে 'পীঠী' হইয়াছে।

গুহাগৃহের পার্শ্বে আধুনিক যুগের এক পীরস্থান রহিয়াছে। এই পীরের নামানুসারেই আজকাল এই স্থানের অন্য নাম হইয়াছে 'পীরপৈঁতী'।

(ঘ) পীঠীপতিরা ছিক্কোর বংশীয় ছিলেন। পৈঁতীর ১৬ মাইল পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে 'শকৃক-গড়' নামে এক প্রাচীন গড় বিদ্যমান। ছিক্কোর-বংশীয়দের নির্ম্মিত গড় বলিয়া কি ইহার নাম 'ছিক্কোর-গড়' বা কালক্রমে 'শকৃক-গড়' হইয়াছে ? এই গড় হইতে সংগৃহীত ও সাহেবগঞ্জ স্কুল মিউজিয়মে রক্ষিত এক মূর্ত্তি খৃষ্টীয় ৮ম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

(ঙ) শকৃকগড়' হইতে ৪ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে 'শকরীগলি' অবস্থিত। এই স্থানে এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন ভগ্নস্তূপ বিরাজমান ও রেনেলের ম্যাপে

ইহা সহর বলিয়া নির্দ্দেশিত। এই স্থান হইতে অনেক মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া সাহেবগঞ্জ স্কুল মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। শকৃরুগড় ও শকৃরীগলি যে-অংশে অবস্থিত হিন্দুযুগে তাহার নাম ছিল 'মণ্ডলায় গিরিপথ'। পরবর্ত্তী যুগে নাম হইল 'শকৃরী-গলি'। 'গলি' অর্থে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বুঝাইতেছে। কিন্তু 'শকৃরী' কোথা হইতে আসিল ?

এই স্থান ও শকৃরুগড় সংক্রান্ত প্রবাদের সহিত এক শঙ্করী দেবী সংশ্লিষ্ট। তাঁহারই নামানুসারে 'শঙ্করীগলি' বা শকৃরীগলি নামের উৎপত্তি। ইতিহাসে দেখিতে পাই, পীঠীপতি দেবরক্ষিতের পত্নীর নাম শঙ্করী দেবী। ইনি মগধের রাষ্ট্রকূটবংশীয় মথন দেবের কন্যা বা রামপালদেবের মাতুল-কন্যা। আমাদের মনে হয়, এই শঙ্করী দেবীরই নামানুসারে 'শঙ্করী গলি' বা শকৃরী গলি নাম হইয়াছে। এই অঞ্চলে ছিক্কোর বংশীয়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 'মণ্ডলায় গিরিপথ' পরবর্ত্তী যুগে শকৃরীগলি নামে অভিহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

(চ) পৈঁতীর দক্ষিণাংশের বর্ত্তমান নাম "শিয়ার-ডিহি"। "ছিক্কোর-ডিহি" কি বহুশতাব্দী ক্রমে "শিয়ার ডিহি"তে পরিণত হইয়াছে ?

(ছ) এই স্থানটি প্রাচীন মগধ ও গৌড়ের মধ্যাংশে অবস্থিত থাকায় পূজনীয় রাখালদাস-বাবু পিঁউপুরমের বিরুদ্ধে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা এই স্থানের সপক্ষে প্রযুজ্য হইতে পারে। একই ব্যক্তির মগধ ও মগধের সন্নিকটস্থ এই স্থানের অধিপতি হওয়া সম্ভবপর এবং তখনও পালবংশের পক্ষে গৌড়মণ্ডলের প্রান্তে স্থিত এই স্থানটির অধিকার রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সম্ভবপর ছিল।

(জ) যতদুর জানা গিয়াছে, রামপালদেবের সামন্ত রাজগণের রাজ্য সমস্তই বর্ত্তমান বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পৈঁতী তাহারই মধ্যে পড়ে।

শ্রাবণ-দিনে

শ্রী জ্যোতিপ্রসাদ বসু

আজি এই ছায়াচ্ছন্ন শ্যাম-স্নিগ্ধ শ্রাবণ-বাসরে
হের ধরা আপনা পাসরে!
সায়াহ্নের মোহ লাগে দ্বিপ্রহর দিনের বয়ানে,
অশ্রু করে টলমল গগনের আয়ত নয়ানে,
সজল সমীর-স্পর্শে ধরা-তনু উঠিছে পুলকি',
নীরবে ঝিমায় বনে নব-পল্লবিত আমলকী।
শুধু চখাচখী
নদী-তীরে ডাকাডাকি করিছে কাতরে—
আজি এই শ্রাবণ-বাসরে।

বহুদূরে মাঠ-পারে দিগন্তের শ্যামল কান্তার
মেঘ সাথে হ'ল একাকার।
মধ্যাহ্নের ঘর্ঘরিত তীব্র-গতি কর্ম্ম-রথ-চাকা
ধরণী করেছে গ্রাস, মহাশূন্যে মেলি' শুভ্র পাখা
মূর্ত্ত স্বপনের মত মেঘ কোলে উড়িছে সারস।
চিরন্তন বিরহের মৌন-সুরে হৃদয় অবশ;
বেদনার রস
ভুবন ভরিয়া ওই ঝর ঝর ঝরে
সাঁঝ-মাখা শ্রাবণ-বাসরে।

বিপুল অম্বর ছাওয়া হেরি' নব-ঘন-সমারোহ
অবনীর লাগিয়াছে মোহ।
কণ্টকি' উঠিছে দেহ প্রত্যাসন্ন মিলনের সুখে,
হর্ষ ভীতি লাজ আজি গুরু গুরু জাগে মেঘ-বুকে;
দিগন্ত-সীমায় ওই নত হ'য়ে আসে তার মাথা,
ধরণীর শ্যাম হিয়া স্তব্ধ মুখে যেথা আছে পাতা!
মিলনের গাথা
নীরব সঙ্গীতে বহে বনে বনান্তরে,
রস-ঘন শ্রাবণ-বাসরে।

নিবিড় মিলন মাঝে মুরছিছে তৃপ্তিহীন মন,
বেজে ওঠে বিরহ-বেদন।
ঘরের মানব আজি কেঁদে মরে সুদূরপিয়াসী—
বিরাট বিশ্বের ব্যথা হৃদয়েতে পশে আজি আসি';
আপনার ক্ষুদ্র সুখ-গণ্ডী টুটি' মিশে তার সনে
গুমরিয়া ওঠে মন চাহি' দূর বনানীর পানে
অজানা কারণে!
বিরহ-রাগিণী বাজে সুখের আসরে—
স্বপ্নময় শ্রাবণ-বাসরে।

বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের গতি ও বৃদ্ধি

বাঙ্গালী হিন্দুর যদি অভ্যুদয় লাভ করিতে হয়, ব্যক্তি বিশেষ বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নয়, সমস্তভাবে সকলের যদি উন্নতি সাধন করিতে হয়, তবে সমগ্র সমাজের কিসে উন্নতি হয় সে-কথা চিন্তা করিতে হইবে।

আমাদের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে যে-সমাজের চিত্র দেখিতে পাই, সে ছিল একটা সমগ্র সমাজ—যে, ব্যক্তিগত জীবনকে সহস্র সম্বন্ধ-বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল; তাহাদিগকে জগতের অন্যান্য সমাজ হইতে স্বতন্ত্র একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়াছিল।

কিন্তু আজ আমাদের রাজনীতি শাসননীতি, সমরনীতি, অর্থশাস্ত্র—এ সবের সঙ্গে সমাজের কোনও সম্পর্ক নাই। ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রনীতিতে অনেকের সম্পর্ক আছে, ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেকের অধিকার ও কার্য্য আছে, কিন্তু যে রাজকর্ম্মচারী বা ব্যবসায়ী বা ব্যবহারজীবী—সে হিন্দুসমাজের হিন্দুরূপে নয়, একটা স্বতন্ত্র বাহিরের সমাজের অঙ্গ স্বরূপে।

কাযেই সমাজ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের খুব প্রকাণ্ড একটা অংশের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। সমাজের সম্পর্ক আছে শুধু আমাদের জীবনের কতকটা অংশের সঙ্গে,—আমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে, আহার-বিহারের সঙ্গে, বিবাহাদি সংস্কারের সঙ্গে। সুতরাং ব্যক্তির সমাজের সঙ্গে সেই পরিপূর্ণ নির্ভরের সম্পর্ক নাই, যাতে সমাজ শক্তিমান্ হয়।

আমাদের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের সমাজের সঙ্গে বর্ত্তমান সমাজের এই যে বিরাট প্রভেদ, একথা আমরা স্মরণ রাখি না বলিয়া, আমাদের সামাজিক জীবনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় অনেকটা ভুল থাকিয়া যায়। স্মৃতিকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন সমগ্র সমাজের জন্য। তাঁহারা সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্ম ও জীবন নিঃশেষে নিয়মিত করিয়াছিলেন,—সেই সমগ্র ব্যবস্থার দ্বারা সমগ্র জাতির অভ্যুদয় সাধনের উদ্দেশ্যে। সমাজের বিশিষ্ট অবস্থায় তাঁহারা হয়তো এক শ্রেণীকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন, অপর এক শ্রেণীকে খাটো করিয়াছিলেন, আর এক শ্রেণীকে হয়তো সমাজের অভ্যুদয়ের প্রতিকূল বলিয়া সমাজ হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল শ্রেণীর সর্ব্ববিষয়ক আদান-প্রদান ও কর্ম্মসমবায় দ্বারা তাঁরা সমগ্র জাতির জীবনধারণ ও সুখসমৃদ্ধি সাধন বিষয়েও সম্যক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আজ যদি আমরা এই সমাজ-বহিষ্কৃত জাতিদিগের বৃত্তি, জীবনধারণ বা অভ্যুদয়ের কোনও ভার লইতে না পারি এবং তবু তাহাদের সেই প্রাচীন বন্ধনগুলি দিয়া বাঁধিতে চাই, তবে সে-বন্ধন যে মিথ্যা ও অসার্থক বলিয়া আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুদূর অতীতে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে অন্ত্যজদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তাহারা অস্পৃশ্য, সামাজিক ব্যবহার তাহাদের সহিত নিষিদ্ধ, গ্রামে বাস তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ—ইত্যাদি। যে সমাজের মধ্যে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা ছিল পরিপূর্ণ সমাজ—শাসন, প্রজারক্ষা, সমাজের ঋদ্ধিসাধন, ধর্ম্মের অভ্যুদয়—সমস্ত বিষয়েই সমাজ যত্নবান্ ছিল। তাঁহাদের সেইসব ব্যবস্থার ফলে এই অন্ত্যজগণ তাহাদের বাহ্য প্রতিষ্ঠানে নিরঙ্কুশ ভাবে জীবনযাপন করিত, রাজার দ্বারা রক্ষিত হইত—তাহাদের জীবিকার জন্য যে বৃত্তির প্রয়োজন হইত, তাহা তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবার যথেষ্ট হেতু ছিল; কেননা, স্মৃতির সমাজে যে লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল, ইহাদের জীবন ছিল তার পরিপন্থী, ইহাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ-সংস্পর্শে সে আদর্শ ক্ষুণ্ন হইত—তা ছাড়া ইহারা সম্ভবতঃ পাপাচারী ও অসামাজিক ছিল। অনেক স্থলে ইহারা ছিল বিজিত জাতি, জেতা তাদের প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাদিগকে আপনার সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ যে সেদিন নাই, তাহা কি বলিতে হইবে? একদিকে সেই পাপমতি সমাজে প্রতিকূলপ্রবৃত্তিশালী অন্ত্যজ নাই; এখন যাহাদের অন্ত্যজ বলা হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকের চিত্তবৃত্তি সুনিয়ত, এবং সমাজের পরিপন্থী মোটেই নয়। অপর দিকে সেই শুদ্ধাচারী, ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত জীবন আর্য্যসম্প্রদায় নাই, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই। আমরা বলিতেছি, অন্ত্যজদের আমাদের নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে, অথচ তাহাদিগকে সে নিয়ম মানাইবার শক্তি আমাদের নাই, শাসনযন্ত্র পরের হাতে। তাহাদের জীবিকার্জ্জন সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় তাহারা যথেচ্ছ জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। আর আমাদিগের অধিকার বা সম্পর্ক সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারে; কেননা, দেশে এমন সব ভিন্ন সমাজ আছে, যাহারা তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা ভাল স্থান দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত।

আমরা হিন্দু বলিতে বুঝি বর্ণাশ্রমী—অনেকের মুখে শুনি বর্ণাশ্রমই হিন্দুধর্ম্মের সার এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষার জন্য নানা রকম আস্ফালন দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি না যে, আজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই এবং থাকিতে পারে না। স্মৃতির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যুগ যুগান্ত ধরিয়া গোঁজামিল দিতে দিতে আমরা এমন একটা স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি যে, এখন আমাদের বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই। এ অবস্থায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলন একেবারে মিথ্যা এবং মেকী।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, গৃহ্যসূত্রের যুগ হইতে পরাশরাদি অর্ব্বাচীন সংহিতার যুগ পর্য্যন্ত যুগ-প্রয়োজন ভেদে এই ধর্ম্মের যথোপযুক্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আবার পরবর্ত্তী কালে শবর, কুমারিল, মেধাতিথি প্রভৃতি হইতে ভবদেব চণ্ডেশ্বরাদির নিবন্ধ হইতে দেখিতে পাই যে, নিবন্ধকারগণও যুগে যুগে প্রয়োজন অনুসারে এই ধর্ম্মের আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজ সম্পূর্ণ ছিল, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমাজের বিচ্ছেদ হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত সুস্থ ভাবে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সুসংবদ্ধ ভাবে এই সব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। যখন রাজশক্তি সমাজ হইতে

বহিষ্কৃত হইয়া সমাজকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল, তখন হইতে দেখিতে পাই যে, এই সব পরিবর্ত্তন সমাজের পারিপার্শ্বিক সমুদয় অবস্থার দিকে চক্ষু বুজিয়া এমন পথে চলিয়াছে, যাহাতে সমাজকে একটা কঠিন সঙ্কীর্ণ স্থানে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, যাহাতে তাহার আত্মহত্যাই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে।

প্রাচীন যুগে পরিপূর্ণ রূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিয়া লোকের স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু এখন জীবিকার্জ্জন করিতে গিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সকল বিধি পালন করিতে গেলে জীবিকার্জ্জন কঠিন, আর্থিক অভ্যুদয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ বাহিরে এক বা একাধিক স্বতন্ত্র সমাজের প্রতিঘাতের ফলে আত্মরক্ষায় ব্যাকুল সমাজ বিধিনিষেধের কঠোরতা বৃদ্ধি করিল! সমাজ হইতে বহিষ্কারের কাযেই বেশী হইয়া পড়িল।

এমনি করিয়া জাতিচ্যুত ও বহিষ্কৃত এবং অন্ত্যজ ও সমাজ-বহিষ্কৃত ব্যক্তিদিগকে লইয়া মুসলমান সমাজ গত ৪।৫ শতাব্দী হইতে আমাদের দেশে সংখ্যায় কত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা চক্ষুর উপর দেখিতে পাইতেছি। হিন্দু সমাজ এমনি করিয়া সমাজ-বন্ধনের অস্বাভাবিকতা ও অতিমাত্র কঠোরতার ফলে ক্রমশঃ আপন সমাজ হইতে লোককে দুইহাতে ঠেলিয়া মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে।

গত চারি পাঁচ শতাব্দী হইল, হিন্দু-সমাজ কেবল আপনার লোককে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। যে বাঁধনের কোনও সার্থকতা আজ নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় যে বাঁধন আর টিকিতে পারে না, সেই সব বাঁধন খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতে গিয়া সমাজ ক্রমে ক্রমে আপনার গলায় ফাঁস শক্ত করিয়া আঁটিতেছে।

সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে এই ধ্বংসলীলা নিবারণ করিতে হইবে। এখন দুই বাহু বাড়াইয়া সকলকে আলিঙ্গন করিতে হইবে।

অস্পৃশ্যতা-বিচার একটা প্রকাণ্ড ভাঙ্গিবার যন্ত্র—ইহাকে আমাদের বর্জ্জন করিতে হইবে। অন্ত্যজ জাতিদিগকে যদি হিন্দু বলিয়া আমরা দাবী করিতে চাই, তবে তাহাদিগকে হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচারে পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। সুদূর অতীত যুগে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের তাৎকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যে-সব বিশিষ্ট বিধান করা হইয়াছিল, সেগুলির হেতু ও মূল নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কাযেই সেগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে।

হিন্দুসমাজকে যদি আমরা পুনরায় সুস্থ ও জীবন্ত দেখিতে চাই, তবে আমাদের নেতিধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া সমাজের positive দিক দেখিতে হইবে।

হিন্দুর সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রধান আদর্শই এই যে, ব্যক্তিগত স্বার্থকে ছোট করিয়া সামাজিক মঙ্গলকে বড় করিয়া দেখা। প্রত্যেক হিন্দুর জীবনের নীতি ও মূলসূত্র ইহাই যে, সকলে স্বার্থকে সংযত করিয়া সকল চেষ্টা সমাজ ও ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের জন্য নিয়োজিত করিবে; সমস্ত জীবনটা একটা প্রচণ্ড স্বার্থাবেষণে পর্য্যবসিত না হইয়া ধর্ম্ম ও সামাজিক মঙ্গলের দ্বারা নিয়মিত হইবে।

সকল আচার অনুষ্ঠান, সমস্ত হিতসাধন-চেষ্টা সকলের কেন্দ্র ও মূল আত্মার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভ। শাসনের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে, ইহা লাভ হয় না, স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে, ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মের অনুসরণে, তাহা লাভ হয়।

বাহ্য আচারের চেয়ে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের ভিতরকার এই মৌলিক ধর্ম্ম অনেক বড় কথা। এই মৌলিক ধর্ম্মরক্ষায় হিন্দুর হিন্দুত্ব, ইহাই সমাজধর্ম্মের সার। ইহাকে ছাড়িয়া বাহ্য আচার কিছুই নয়, ইহাকে রাখিয়া আচারাদি যতই পরিবর্ত্তন করা যাউক তাতে হিন্দুত্ব বা হিন্দু সমাজের বাস্তবিক কোনও ক্ষতি নাই।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, আষাঢ় ১৩৩৫)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

—

বাংলার কৃষি ও ম্যালেরিয়া*

ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে রেল, ষ্টীমার, ডাক, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির আমদানী হইয়াছে। এই সমস্ত হইয়া লোকের একদিকে যেমন নানা-প্রকারের সুবিধা হইয়াছে অন্যদিকে তেমনি দেখা যায় যে, ঐ সময় হইতে এ দেশের ধারাবাহিক আর্থিক অধঃপতন ও ভয়াবহ স্বাস্থ্যহীনতা ঘটিয়াছে। বাংলার যে জেলা বা মহকুমার অবস্থা পূর্ব্বে যত সমৃদ্ধিশালী ছিল কালচক্রে তাহারই অবস্থা আজ তত শোচনীয় হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া-সমস্যা এ দেশে এমনই দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে যে, ঠিক কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার বাস্তবিক প্রতিকার হইতে পারে, প্রভূত পর্য্যবেক্ষণ ও বহু গবেষণা করিয়াও তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা যায় নাই।

ডাক্তার বেণ্ট্‌লির মতে এত বড় একটি প্রকাণ্ড দেশের যাবতীয় লোকগুলিকে কুইনিন খাওয়ান বা সকলকেই মশারি ব্যবহার করান অথবা দেশে যেখানে যত ডোবা-খানা আছে বুজাইয়া ফেলা অথবা তাহাতে নিয়মিত কেরোসিন ঢালা কার্য্যতঃ সম্ভব নহে। জল নিকাশন ও পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত দ্বারা বাংলা দেশের ম্যালেরিয়া যথেষ্ট কমান যাইতে পারে।

সমগ্র বাংলা দেশকে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য এই ৪ ভাগে ভাগ করিয়া ১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে কোন্ অংশে কিরূপ ম্যালেরিয়া ছিল তাহার হিসাব করিলে দেখা যায় যে,

পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা উত্তরবঙ্গে ইহার প্রাদুর্ভাব তিনগুণ, মধ্যবঙ্গে চারিগুণ ও পশ্চিমবঙ্গে পাঁচগুণ বেশী। সরকারী ও বে-সরকারী হাঁসপাতালগুলিতে মোট যত সংখ্যক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল তাহার শতকরা ৪০.৯ পশ্চিম বঙ্গের, ৩২.৩ মধ্যবঙ্গের, ২৩.১ উত্তর বঙ্গের ও ৭.৫ পূর্ব্ববঙ্গের রোগী।

জন্ম-মৃত্যুর তালিকা হইতে দেখা যায় যে, এই দশ বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম, উত্তর ও মধ্যবঙ্গের মৃত্যুর হার খুব বেশী এবং জন্মের হার পূর্ব্ববঙ্গেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গদেশের বেশীর ভাগ লোকেরই কৃষি একমাত্র উপজীবিকা। উল্লিখিত তালিকাগুলির সহিত এইসকল অঞ্চলের তৎকালীন কৃষির অবস্থা তুলনা করিলে প্রমাণ হয় যে, মৃত্যুর হার কম হইয়া জন্মের হার বেশী হইলে সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতি হইয়াছে; এবং মৃত্যুর হার বেশী হইয়া জন্মের হার কম হইলেই তাহার অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই দশ বৎসরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা বাংলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশ ভালই ছিল। কৃষিতে

* ডাঃ বেণ্ট্‌লির রিপোর্ট অবলম্বনে

সাধারণতঃ যে পরিমাণে শস্য হইবার কথা, উক্ত দশ বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গের তাহা অপেক্ষা প্রতি একশত মণে ৭ মণ ৮ সের শস্য কম হইয়াছিল। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গের অবস্থা ইহার তুলনায় যথেষ্ট খারাপ ছিল। তালিকা হইতে জানা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গে শতকরা ২১ মণ ২৩ সের, মধ্য বঙ্গে ২১ মণ ও উত্তরবঙ্গে ১২ মণ শস্য কম।

অনাবৃষ্টি হইলে চাষের ক্ষতি হয় এবং ডোবাখানা ও জলাযুক্ত বিলখালগুলি ধৌত হইতে না পারাতে মশার উপদ্রব হয়। কাজেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপও দেখা দেয়। তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বর্ষা বা বন্যার জলে চারিদিক বেশ ধুইয়া যাইবার সুবিধা না হওয়ার ফলেই পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে স্বাস্থ্য ও কৃষির এরূপ ভয়াবহ অবনতি ঘটিয়াছে।

মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ বন্যা বা বর্ষার জল শীঘ্র শীঘ্র ছড়াইয়া পড়িবার ও চারিদিক ধৌত করিয়া বাহির হইয়া যাইবার ভাল পথ নাই। বর্ষার জলে শস্যক্ষেত্রগুলি ভাল করিয়া ভাসিয়া না গেলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় না। আবার বিল, খাল ও নিম্নভূমিগুলি বেশ ধৌত হইয়া না গেলে ম্যালেরিয়া বাড়িয়া উঠে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বর্ষা ও বন্যার জল যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে ও সমস্ত ধুইয়া লইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহার সুবন্দোবস্ত থাকা খুবই প্রয়োজন। জলস্রোতকে বাধা দিবার জন্য নিম্নবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে যে-সমস্ত বাঁধ বাঁধা হইয়াছে তাহা বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া হয় নাই। অপর কারণ, চতুর্দ্দিকে বেড়াজালের মত রেলপথ নির্ম্মাণের ফলে স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীগুলিকে জল নিকাশনের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে। সহজে বিনাবাধায় জল যাতায়াতের জন্য রেলপথের মধ্যে মধ্যে যেরূপ বহুসংখ্যক প্রশস্ত পুল থাকা উচিত ছিল তাহা নাই।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অংশে কৃষির অবনতি হইয়া বঙ্গদেশের কি পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হয় ডাক্তার বেণ্ট্‌লি তাহার একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন। ঢাকা জেলায় যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় তাহার অনুপাতে মধ্যবঙ্গ বা প্রেসিডেন্সী বিভাগে প্রতিবৎসর ৫০ হইতে ৬০ কোটি, এবং পশ্চিমবঙ্গে বা বর্দ্ধমান বিভাগে ৫০ হইতে ৬০ কোটি—অর্থাৎ বর্দ্ধমান প্রেসিডেন্সি দুই বিভাগে প্রতিবৎসর ১০০ হইতে ১৩০ কোটি,—টাকার ফসল হইবার কথা। সেইস্থলে বর্ত্তমানে মাত্র ৫০ হইতে ৬০ কোটি টাকার ফসল পাওয়া যাইতেছে। বাংলা দেশের ন্যায়—নদীমাতৃক দেশে কেবলমাত্র উদ্যম ও ব্যবস্থার অভাবে চতুর্দ্দিকে এত জল থাকিতেও চাষের জমিগুলি জল পায় না। তাহার ফলে দরিদ্র দেশের বৎসর বৎসর ৫০ হইতে ৬০ কোটি টাকা লোকসান যাইতেছে!

প্রত্যক্ষভাবে, মশা জন্মিতে না দেওয়া বা কুইনিন ব্যবহার করাইয়া ম্যালেরিয়া নষ্ট করা যখন অসম্ভব কল্পনা, তখন দেখিতে হইবে পরোক্ষভাবে কোনও উপায়ে কৃষির উন্নতি বিধান করিয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি অর্থাৎ ম্যালেরিয়া দমন করা সম্ভব কি না।

যে-সকল নদী বা বিল-খালে জলজউদ্ভিদ ও পাতা-লতা প্রভৃতি পচিয়া তলদেশে পলি জমিতেছে, চাষের জমিতে ঐ সকল পলি উঠাইয়া সারস্বরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। তাহাতে জমির উর্ব্বরা শক্তি বাড়িয়া কৃষির সহায়তা করিবে, ও পরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া দমন রাখিবে। পলিমাটিতে শস্যের খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকাতে কৃষিকার্য্যে সার হিসাবে ইহার মূল্য খুব বেশী। কাজেই ইহা কৃষি ও সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির-কল্পে কল্যাণকর ব্যবস্থা। এই উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ইটালিতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে। হল্যাণ্ড, মিশর ও বিলাতের জলাভূমিতে ইহার কৃতকার্য্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে তাঞ্জোর গোদাবরীর 'ব-' দ্বীপ খণ্ডেও এই প্রথা অনুসৃত হইয়াছে।

খাল-বিলের জল বাহির হইবার পথ করিয়া দিয়া, অথবা ঐ সকল আবদ্ধ জল আশেপাশে, জমিতে 'ছিঁচের' কাজে ব্যবহার করিয়া উক্ত উপায় কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। ডাক্তার বেণ্ট্‌লির মতে শেষোক্ত প্রকার কার্য্যই বাংলা দেশের অবস্থার অনুকূল। কি উপায়ে এই সকল পতিত জল, যাহা কাহারও কোন কাজে আসিতেছে না, অধিকন্তু ম্যালেরিয়ার মশার আকরস্থান হইয়া দেশের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, তাহা চাষের জমীর ধারের কাছে আনিয়া কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তাহা বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিতে হইবে। এই সমস্ত পলিমিশ্রিত জলে যে পরিমাণে জৈব সার রহিয়াছে তাহার তুলনা নাই। এত উৎকৃষ্ট সার ও অপর্য্যাপ্ত জল আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে অথচ আমরা জলের জন্য আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকা ভিন্ন অন্য উপায় জানি না।

কৃষিক্ষেত্রে যথোপযুক্ত জল-সিঞ্চনের ব্যবস্থাকল্পে বহু সমবায় জল-সরবরাহ সমিতি স্থাপিত হইতে পারে। সমবায়-পদ্ধতিতে কাজ করিবার এই এক বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে মাত্র ২৬৮টি এইরূপ সমবায় জল-সরবরাহ সমিতি আছে। তাহাদের কাজ বেশ ভালই চলিতেছে।

(ভাণ্ডার, মাঘ ১৩৩৪)

—

হরীতকীতে অর্থাগম

আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে জীবনোপায়ের প্রকৃতি-দত্ত কত উপহারই যে পড়িয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিদেশীরা আমাদের চোখের সামনে সেই সমস্ত জিনিষ লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইতেছে।

হরীতকী গাছ আকারে আম-কাঁটাল গাছ অপেক্ষাও বড় হইয়া থাকে। এই গাছ মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, ছোট-নাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

হরীতকী গাছের ফল, ছাল, পাতা, কাণ্ড সমস্তই আমাদের কাজে লাগে। হরীতকী কাঠ খুব শক্ত এবং উহাতে উই ধরে না। কেহ কেহ বলেন যে, হরীতকীর পাতা খাওয়াইলে গরুর দুধ খুব বৃদ্ধি হয়। কয়েক বৎসর হইতে প্রচুর পরিমাণে হরীতকী বিলাতে চালান হওয়ায় ব্যবসা হিসাবে উহার কদর খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

জামতাড়া, দুমকা অঞ্চলে গন্দ নামক একশ্রেণীর বুনো লোক বাস করে। উহারা প্রচুর পরিমাণে হরিতকী সংগ্রহ করিয়া ঔষধ এবং রং তৈয়ারী করিবার জন্য বাজারে বিক্রয় করে। জব্বলপুরের হরীতকীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐ সকল হরীতকীবহুল স্থান হইতে হরীতকী সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। সর্ব্বপ্রথমে বাগানগুলি এক বৎসরের জন্য 'বন্দোবস্ত' লইতে হয়। ফলগুলি ভালরূপ পাকিলে লোকদ্বারা পাড়াইয়া কলিকাতায় বড়বাজারে হরীতকীর আড়তে চালান করিতে পারিলে প্রচুর অর্থাগম হয়।

হরীতকীর কষ চামড়া পরিষ্কার এবং সংশোধন করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরিতকীর কষে কাপড় ছোপাইলে এক প্রকার ছাইয়ের রং পাওয়া যায়। হরীতকী ভিজান জলে ফিট-কারী মিশাইলে উৎকৃষ্ট পীতবর্ণ পাওয়া যায়। কিন্তু কাল রং তৈরী করিতেই ইহার ব্যবহার বেশী। হরীতকীর কষের সহিত একটু গুড় কিংবা নীল মিশাইলে রংএর উজ্জলতা সম্পাদিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহার সহিত গাবের কষ মিশাইয়া উৎকৃষ্ট কাল রং প্রস্তুত করে। হীরাকষ এবং হরীতকী মিশাইলে লিখিবার কালি প্রস্তুত হয়। ছোটনাগপুরে হরীতকীর সহিত 'কুসুম ফুল' মিশাইয়া কাল রং প্রস্তুত করা হয়। চট্টগ্রামে হরীতকী দ্বারা যে কাল রং প্রস্তুত হয়, তাহা কাপড় ছোপাইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। হীরাকষ এবং হরীতকীর কষ আধাআধি মিশাইলে খাকি রং পাওয়া যায়। মাস্ত্রাজ অঞ্চলে তুলা, চামড়া এবং পশমে খয়ের রং করিতে হরীতকী বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হরীতকীর কষ মিশ্রিত জলের সহিত তেঁতুল এবং নীল মিশাইয়া কাল ও সবুজ, নীল মিশাইয়া ঘন নীল এবং খয়ের মিশাইয়া পিঙ্গল রং পাওয়া যায়। কেহ কেহ হরীতকীর সহিত কাদা মিশাইয়া এক প্রকার উৎকৃষ্ট পুটিং প্রস্তুত করিয়া থাকে। হরীতকীর ছাল হইতেও কাঙ্গ এবং খাকি রং পাওয়া যায়। মণিপুরে বাঁশের রং করিতে এবং আসামে তসর, কোরা, এণ্ডি, মুগা এবং পশমে রং করিতে হরীকতী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশ হইতে যে-সমস্ত হরীতকী বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহা চামড়া পাকা করিবার জন্তই ব্যবহৃত হয় এবং বিদেশে শুধু এইজন্তই ইহার এত আদর।

ইংলণ্ড, অষ্ট্রীয়া, বেল্‌জিয়ম, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ইটালী, রুশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য বহু স্থানে প্রচুর পরিমাণে ইহার রপ্তানি হইতেছে এবং দিন দিন চাহিদা ও দর বাড়িয়া যাইতেছে। কলিকাতা হইতে রেলিব্রাদার্স, গিলেণ্ডার্স প্রভৃতি বণিকগণ হরীতকী বিদেশে চালান দিয়া থতকেন। কলিকাতা বড়বাজারের পোস্তায় ইহাদের আড়ত আছে।

বৎসরে আমাদের দেশ হইতে কত হরীতকী বিদেশে চালান হইয়াছে এবং ঐ হরীতকী দ্বারা ব্যবসায়িগণ কত টাকা পাইয়াছেন নিম্নে তাহার ছোট একটু হিসাব দিলাম—

১৯২০-২১	৩৯.৬৪৭ টন	দাম	২৭১,৮৭৩ পাউণ্ড
১৯২১ ২২	৬১,৯৪৭ টন	দাম	৩৯১,১০৬ পাউণ্ড
১৯২২-২৩	৭২,০৩৮ টন	দাম	৪৯৩,৪৬ ৭ পাউণ্ড

মাত্র তিন বৎসরে ১ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকার হরীতকী আমাদের দেশ হইতে বিদেশে চালান হইয়াছে। তবু আমরা নিরন্ন!

(আর্থিক উন্নতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)　শ্রী অসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ইবসেন্ শতবার্ষিকী

শ্রী ভবানী ভট্টাচার্য্য

(১)

কালপ্রবাহের যদি রূপক-চিত্র আঁকা যায় তাহ'লে দেখা যাবে, সে ছবিখানার চক্ষে একটা অত্যন্ত তিক্ত বিদ্রূপের হাসি লেগে আছে। এ বিদ্রূপের স্বরূপ বুঝ্‌তে গেলে মনে আঘাত লাগে, যেহেতু কেউ যে আমাদের দিকে চেয়ে শ্লেষের হাসি হাস্‌ছে এ চিন্তা আমাদের একেবারে অসহ্য। অসহ্যকে সহনীয় ক'রে নেবার একটা চমৎকার উপায় আমরা উদ্ভাবন করেছি— তার মুখে মুখোস পরিয়ে দেওয়া। রাম যখন শ্যামের দিকে চেয়ে হাসেন, শ্যাম তাড়াতাড়ি ভেবে নেন্ ও হাসির লক্ষ্য-স্থল তিনি নিজে নন্—অপর এক তৃতীয় ব্যক্তি। অন্যকে প্রতারণা করার চেয়ে আত্ম-প্রতারণা অনেক সহজ। ব্যঙ্গের উচ্ছলিত হাসি দিয়ে কালপ্রবাহ যখন আমাদের আঘাত করতে চায়, সে হাসির বন্যা আমরা রোধ করি উপরোক্ত উপায়ে। উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু অবধি যে-কোন দেশের যে-কোনো যুগের জীবনেতিহাসে এর রাশি রাশি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

ইউরোপ আজ তার যে-বিগ্রহের শতবার্ষিকী পূজা-উৎসব সোৎসাহে সম্পাদন করছে, সে-বিগ্রহের নাম হেন্‌রিক্ ইবসেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে নরওয়ের এক প্রান্তে ইবসেন্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আটাত্তর বৎসর ব্যাপী জীবনের মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত দীপ্তি সহ্য করতে না পেরে ইউরোপ তাঁকে দানবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। সে আসন ইবসেনের বহুদিন যাবৎ অব্যাহত ছিল; সহসা একদিন ইউরোপের সুধীবৃন্দ আবিষ্কার করলেন, ও মানুষটি আসলে দানব নয়—দেবতা; তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে ইবসেনের এক নূতন স্বর্গলাভ হ'ল; আজ সেই দেবতার জন্মোপলক্ষে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ইউরোপ

ব্যাপৃত। গত ২।৩ মাস থেকে বিলাতি কাগজগুলি ইবসেনের প্রশংসা-বাক্যে মুখরিত হচ্ছে। অসংখ্য নাট্যগৃহে ইবসেনের নাটকের অভিনয়-রজনী চলেছে। বিগত শতবর্ষের মধ্যে যে পৃথিবীতে ইবসেনের মত শক্তিমান্ দ্বিতীয় নাট্য-শিল্পীর আবির্ভাব হয়নি, একথা আজ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। ইবসেন্ যদি একদিন প্রশ্ন করতেন,—

"আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহল-ভরে,
আজি হতে শত বর্ষ পরে—"

তাহ'লে আজ সমগ্র ইউরোপের শিক্ষিত নরনারী এককণ্ঠে বলে উঠতেন, 'আমি—আমি—আমি।' অথচ এ যুগের এই দেবতা সম্বন্ধেই একদিন এক ইংরাজী পত্রিকায় লিখিত হয়েছিল—"A crazy fanatic…………cranky being not only consistently dirty but deplorably dull." পত্রান্তরে—"ugly, nasty and downright dull. A gloomy sort of ghoul, but on grouping for horrors by night, and blinking like a stupid old owl when the warm sunlight of the best of life dances into his wrinkled eyes" এগুলি পত্রবিশেষের মত নয়; তখনকার সমগ্র সাংবাদিক জগতের অভিমত!

আমাদের নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে তফাতের রেখা যে কত ক্ষীণ তা দেখে কালপ্রবাহ তীব্রতিক্ত বিদ্রূপের হাসি হাসে। সে হাসি কিন্তু নিষ্ফল, যেহেতু তার আঘাত থেকে আত্মরক্ষার্থে প্রাণপণ চেষ্টায় আমরা ভুলে গেছি যে এমন একদিন ছিল, যখন আমরা ইবসেনের সম্মান করিনি। ইতিহাস কথা বলে না—নীরবে নিঃশব্দে শুধু তার পাতার পর পাতা খুলে ধরে। অসহ্য বিরক্তিভরে তখন আমরা মুখ ফিরিয়ে বলি, 'ও আমরা নই—চল্লিশ বছর আগেকার মানুষ। ওদের সঙ্গে আধুনিকের আকাশ-পাতাল তফাত।' ইতিহাস তাতেও নিবৃত্ত হয় না,—তার শেষ-পৃষ্ঠাটি উল্‌টিয়ে দেখায়; রোমা রোলাঁর নির্ব্বাসন-কাহিনী সে পাতাটিতে লেখা। তখন আমরা নিরুত্তর ক্রোধে ইতিহাসের খাতাটা আগুনে দগ্ধ ক'রে মনের মতন নূতন ইতিহাস রচনা করতে বসি।

চল্লিশ বছর পূর্ব্বেকার মানুষ ইবসেনের লেখার মূল্য দিয়েছিল ঘৃণায়, এবং আধুনিক মানুষ তার মূল্য দিচ্ছে প্রশংসায় (১)। প্রথমোক্তের ঘৃণা কিন্তু আসলে শেষোক্তের প্রশংসার চেয়ে অধিক মূল্যবান। কথাটা কঠিন হ'লেও সত্য। যতদিন কোনো লেখা গৃহীত না হয় ততদিন তার বর্জ্জনের অন্তরালে আমাদের কৌতূহলের অন্ত থাকে না। কিন্তু যে-দিন থেকে সে লেখার মূল্য স্বীকৃত হয়, তার কথা আমরা ভুলে যেতে সুরু করি। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন থেকে সাহিত্যসম্রাট্ হয়েছেন সেদিন থেকে আমরা তাঁকে ভুলতে সুরু করেছি। আজ আমরা সবাই ইবসেনের প্রজা; আমাদের মধ্যে ইবসেনের লেখা যাঁরা স্পর্শও করেন-নি, অথবা শুধু স্পর্শই করেছেন—বোঝেন-নি, তাঁদের রাজভক্তি ইবসেনের যে-কোনো একান্ত অন্তরঙ্গ প্রজার অনুরক্তির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। অন্ধভক্তির ভিতরটা যে অনেক সময়ে ফাঁপা হয়,—এ কথা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। বার্ণাড্ শ একস্থানে বলেছেন—"The most effective way of shutting our minds against a great man's idea is to take them for granted and admit he was great and have done with him." অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "In a stupid nation, the man of genius becomes a God, everybody worships him and nobody does his will."

কৈশোরের প্রান্তে Brynjolf Bjorme এই ছদ্মনামে ইবসেন্ প্রথম যে বইখানি ছাপিয়েছিলেন, তার মাত্র ত্রিশটি কপি বিক্রী হয়েছিল। মনটা ছিল তাঁর তখন ঠিক বীণার মতন; চারিদিকের হাওয়া এসে সে-বীণায় সুর জাগিয়ে দিত। ড্যানিশ্ লেখক ওলেনস্লাগারের প্রভাব অতিক্রান্ত হবার পরই আইশল্যাণ্ডের সাহিত্যিকরা এসে সে মনোবীণা অধিকার ক'রে বসলেন। এসময়ে কিছুদিন তিনি এক নাট্যশালার

(১) কিছুকাল পূর্ব্বে নরওয়ের ভদ্রসমাজে ইবসেনের আলোচনা এত বেশী চলতি হ'য়ে উঠেছিল যে, অনেকে বিরক্তিবশত বাহিরের লোকদের স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করবার সময়ে কার্ডে এই অনুরোধ সংযুক্ত করতেন,—দয়া ক'রে এখানে ডল্‌স্ হাউস সম্বন্ধে কোন আলোচনা করবেন না!—লেখক

জন্ত নাট্যরচনা করতেন ; তারপর ক্রিষ্টিয়ানিয়ার মেডিক্যাল স্কুলে কিছুদিন শিক্ষালাভ করেছিলেন। উক্ত স্কুলে বিয়র্ণ-ষ্টিয়র্ণ বিয়র্ণ্‌সন্ ও জোনাস লাইয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। Bjornson ও Lie এর নাম আজ সর্ব্বজনবিদিত।

স্বদেশে অসম্মানের আঘাত ইবসেনের পক্ষে মহা-মঙ্গলের উৎস হ'য়ে উঠ্‌ল। বিরুদ্ধ সমালোচনায় অধীর হ'য়ে তিনি স্বদেশ ত্যাগ ক'রে ইটালিতে এসে বসতি স্থাপন করলেন। শেলী, ব্রাউনিং প্রভৃতি পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ কবি ইটালির নীলাকাশে নিজ মনের ছবি প্রতিফলিত দেখে প্রথম নিজেকে চিনে নিয়েছিলেন। স্বদেশ হতে বহুদূরে একান্ত সাধনায় নিমগ্ন থেকে ইবসেন্ পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে দেখতে শিখলেন। Brend এবং Pear Gynt এর মধ্যে তাঁর এই নবলব্ধ শক্তির প্রকাশের প্রথম প্রয়াস। এ প্রয়াসে ইবসেনের প্রতিভার একটা বিশেষ দিকের স্ফুরণ হয়েছিল,—সে তাঁর আত্মবিশ্বাস—যে অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি একা সমগ্র ইউরোপের চিন্তাধারার সহিত সংগ্রামে সাহসী হয়েছিলেন। এর পরেই তাঁর জগদ্‌বিখ্যাত সমাজ-নাট্যগুলির রচনার সূত্রপাত হয়। 'যুবক সংঘ' নাট্যে প্রথম এই প্রতিভার আভা পড়েছে। ক্রমশ এ আভা সমধিক পরিস্ফুট হয়েছে, ইবসেন্ আরও স্বচ্ছদৃষ্টিতে একেবারে নিবিড়ভাবে তলিয়ে দেখতে শিখেছেন। এ যাবৎ তিনি যা লিখেছেন তার মধ্যে ধী-শক্তির প্রখর দীপ্তি ছিল। সমাজের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচারের অনুবীক্ষণে তন্নতন্ন ক'রে দেখে তিনি যে-সব সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেগুলি ধারাবদ্ধ হ'য়ে তাঁর মনে একটা বিশিষ্ট মতবাদের সৃষ্টি ক'রে তুলছিল। মতবাদ বস্তুটাকে দৈহিক রূপ দেওয়াই শিল্পীর ধর্ম্ম ; ইবসেন্ এ যাবৎ তাঁর নিজস্ব বিশিষ্ট মতবাদের প্রকাশার্থে যে-সব দৈহিক রূপ রচনা করেছিলেন সেগুলি আসলে তাঁর নিজেরি ছায়া। চরিত্ররচনার ফাঁকে ফাঁকে এ পর্য্যন্ত তিনি বারম্বার নিজেকেই দেখিয়ে গিয়েছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বৃন্ত থেকে কিরূপে এই মতবাদ পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে তার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু শুধু ধীশক্তি এবং আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা শিল্পসৃষ্টি হয় না ; এ কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করবার পর থেকে ইবসেন্ সাধারণ নরনারীর চিত্রণ সুরু করেছেন। মনের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদে এ চিত্রণের রেখাসমষ্টি ; অনুভব-শক্তির আতিশয্য এবং কল্পনার ঐশ্বর্য্য নিয়ে তার বর্ণবৈচিত্র্য ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতবাদের পটভূমির উপরই তার যথার্থ প্রতিষ্ঠা।

এইসব প্রত্যহ-দৃষ্ট নরনারীই বিরাট্ সমাজ-যন্ত্রটার কলকব্জা। প্রকাণ্ড একটা এঞ্জিন যখন ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে চলে,তার ভিতরের ছোট একটা স্ক্রু বা বোল্‌টের কথা কেউ ভাবে না ; সমগ্র এঞ্জিনটার মত্তগতির প্রতিই সকলের লক্ষ্য। অথচ ঐ স্ক্রুটির অভাবে হয়তো মুহূর্ত্তে এঞ্জিনটা একেবারে বিকল, প্রাণহীন হ'য়ে পড়তে পারে। ইবসেনের কাছে কিন্তু এঞ্জিনের সামান্য একটা স্ক্রুর মূল্য সমগ্র এঞ্জিনটার মূল্যের সমতুল্য। সমাজ-যন্ত্রের ঘূর্ণনের সুবিধার জন্য একটিমাত্র নর কি নারীর আহুতিও তাঁর কাছে অসহ্য। অপরিসীম সহানুভূতি-বলে তিনি যে তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করেছেন তাকে ব্যক্তিত্ববাদ বলা চলে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বে তিনি ব্যষ্টির জন্য তাঁর তীক্ষ্ণধার প্রজ্ঞাশক্তির চালনা করেছেন। ১৮৭৭ সালের লেখায় তাঁর ব্যক্তিত্ববাদের সূচনা হয়। আজ পঞ্চাশ বছর পরে সমগ্র ইউরোপের বিখ্যাত নাট্যশিল্পীদের মধ্যে এমন কারো লেখা খুঁজে পাওয়া যায় না, যিনি ইবসেনের এই ব্যক্তিত্ববাদ সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করেননি। 'সমাজের স্তম্ভ' নাট্যে ইবসেনের শিল্পের এই যুগপ্রবর্ত্তক পরিণতির আরম্ভ।

(৩)

'শিল্পের জন্যই শিল্প'—সাহিত্য সমালোচনায় এ এক অতি চলিত কথা। কথাটা সত্য ; আবার এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথাও সত্য। 'শিল্প শিল্পেরই জন্য' এবং 'শিল্প জীবননিয়ন্ত্রণের জন্য'—এই দুই শিল্পসূত্রের পরস্পরে আসলে কোন বিরোধ নেই। সুন্দর বস্তুমাত্রেই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ; কিন্তু উক্ত বস্তুর বিষয়ে এই শেষ কথা নয় ; তার অন্য একটি দিক্‌ও আছে,—সে তার প্রয়োজনের দিক্। গ্রীষ্মের আকাশে নিবিড় মেঘের দেহ দর্শনেন্দ্রিয়ের যেমন প্রীতিকর, সেই দেহ হতে নিঃসৃত সুশীতল বর্ষাধারা তেম্‌নি স্পর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর। বৃক্ষের

বক্ষে পুষ্প সুন্দর দেখায়; আবার সে পুষ্প পুষ্প-ধবার হ'স্তে কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থে নিয়োজিত হ'লেও তার সৌন্দর্য্য অমলিন থাকে। সৌন্দর্য্য এবং প্রয়োজনীয়তা, বিউটি এবং ইউটিলিটি যতক্ষণ একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ, ততক্ষণ তারা দুই নয়—এক, নারীর মুখের শোভা এবং তার সেবা যেমন এক। শুধু শোভার অথবা শুধু সেবার সম্পূর্ণ তৃপ্তি নেই—যদিও এ দুই-ই সত্য। ইবসেনের শিল্পমানসী এককালে শোভনা এবং সেবানিপুণা। তার চরণের নূপুর চঞ্চল হ'য়ে বাজে, আবার স্রস্তকেশে স্বেদপ্লুতমুখে সে গৃহকর্ম্ম করে। অসাধারণ সামঞ্জস্যবোধের অভাবে শিল্পের এবম্বিধ পরিকল্পনা একান্ত বিকৃত ও অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠে। কিন্তু নিজের সামঞ্জস্যবোধে ইবসেনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং সে আত্মবিশ্বাস যে ভ্রমাত্মক নয় তা তিনি দেখিয়ে গেছেন। উক্ত সামঞ্জস্যবোধ তাঁর এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লেখাগুলির বক্ষে সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাঁর লেখার প্রচারকার্য্য এবং সৃষ্টিকার্য্য লতাতন্তুর মত; এমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের দেহে জড়িত হ'য়ে আছে যে, তাদের শুধু ছিন্ন করা যায়—বিচ্ছিন্ন করা যায় না। উদ্দেশ্যের হাওয়া ইবসেনের সকল নরনারীর নিঃশ্বাসবায়ু-স্বরূপ। কিন্তু সে হাওয়া তাদের শুষ্ক, রক্তহীন ক'রে দেয়নি, —বরং আশ্চর্য্য প্রাণময় এবং বলীয়ান্ ক'রে তুলেছে। বার্ণার্ড্ শ ভিন্ন ইবসেনের অন্যান্য আধুনিক শিষ্যবর্গ শুধু তাঁর প্রচারক সত্তাকেই গ্রহণ করতে পেরেছেন;—অর্থাৎ এইরূপ লেখার যে ভয়ানক বিপদকে বিদ্রূপ ক'রে ইবসেন এগিয়ে চলেছেন, সেই বিপদেরই অন্ধকার গহ্বরই তাঁদের গ্রাস করেছে। গাল্স্‌ওয়ার্দির লেখা পাঠ করলে তাঁকে প্রচারক (propagandist) ব'লে মনে হয়, স্রষ্টা ব'লে নয়। ইবসেনের সাহিত্যের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য আধুনিক নাট্যকারদের লেখার এইখানে মূলগত তফাৎ। শিশুর জন্মক্ষণে যে আনন্দে মায়ের বক্ষ কাঁপে, সেই আনন্দের দুঃসহ আবেগে ইবসেনের সৃষ্টি-প্রতিভা কম্পান্বিত। তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলির সকলেই মানুষ, —এবং এক-একটা পৃথক মানুষ; কেহ কাহারও ছায়া নয়। ইটালির সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সমালোচক বেনেদিত্তো ক্রোচে (Beneditto Croce) তাঁর "কাব্য ও অকাব্য" গ্রন্থের একস্থানে ইবসেন সম্বন্ধে লিখেছেন, "His creations are not cold-blooded animals, they are not abstractions, they live and suffer and break into savage cries, into vows trembling with emotion, into solemn utterances."

(৪)

'সমাজের স্তম্ভের' পরেই 'পুতুল-ঘর' রচিত হয় (১৮৭৯)। এ পুস্তকের বিশিষ্ট চিন্তাধারার মূল্য এখন বাংলা দেশে অত্যন্ত অধিক,যেহেতু বাংলার নারী আজ বুঝ্‌তে পেরেছেন, পুরুষের কাছে তিনি শুধু একটা জীবন্ত পুতুলের মত। ইউরোপের অবস্থা ঠিক্ এর বিপরীত। Strindberg তাঁর বিখ্যাত নাটক এ 'Creditors' দেখিয়েছেন, ইউরোপে আজকাল পুরুষজাতিই নারীজাতির হাতের পুতুল। 'Dolls' House' এর পুতুল একজন নারী—'নোরা'। একালের ইউরোপীয় 'Dolls House' এর পুতুল নারী নয়—পুরুষ। ইবসেনের এবং ষ্ট্রীণ্ড্‌বার্গের মতামত পাশাপাশি বিচার করলে স্বভাবতই মনে হয়, নারী অথবা পুরুষের একজনকে অপরের হাতের পুতুল হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

'পুতুলঘরের' দু'বছর পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের নাট্য 'প্রেতাত্মার' সৃষ্টি। এই নাটকখানি সমালোচকদের কাছ থেকে যেরূপ কুৎসিত সম্ভাষণ লাভ করেছে, পৃথিবীর অন্য কোন লেখার সেরূপ ভাগ্য হয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। ও পুস্তকের বর্ণনার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

"পচা নর্দ্দমা; অনাবৃত ঘৃণাকর ক্ষত; প্রকাশ্যে কৃত কুৎসিত কার্য্য। উন্মুক্ত কুষ্ঠগৃহ। পচা অশ্লীলতা; সাহিত্যিক মৃতদেহ......।" ডেলি টেলিগ্রাফ্ (সম্পাদকীয় প্রবন্ধ)

"ন্যক্কারজনক নগ্নতা। ঘৃণা-উদ্রেক পুস্তক।"

—ডেলি নিউজ্‌

"মানসিক অহিতকর নাটক......"

কুইন্।

"দুর্নীতিময়, অস্বাস্থ্যকর গল্প ; রঙ্গমঞ্চের দুর্ণাম আনবার জন্য রচিত......।"

—লয়েড্‌স্

"রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত......"

—জেণ্টে‌লউয়মেন্।

"কুৎসিত গল্পটার কি ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিকতা...... এরূপ পুস্তক পুনর্ব্বার প্রকাশিত হ'লে আশা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁদের কুঁড়েমি থেকে জেগে উঠ্‌বেন। এ নাটকের অভিনয় যারা দেখতে যায় তাদের শতকরা ৯৭ জন হীনমনা, জঘন্য আলোচনায় তাদের রুচি।"

—স্পোর্টিং অ্যাণ্ড ড্রামাটিক্ নিউজ।

" Unsexed females····· muck ferreting dogs····· effiminate men and male women... mallow inghosts." (১)

ভাল ভাল বিলাতি কাগজের সমালোচনার এই দৃষ্টান্ত!

ইবসেনের 'প্রেতাত্মা' নাটকখানিকেই আজকাল অনেকে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন। এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে ; তবে বিশ্বসাহিত্যে যে এ গ্রন্থ অমূল্য তদ্বিষয়ে দ্বিমত আছে কি না সন্দেহ। এর মর্ম্মগত গূঢ় প্রতিপাদ্য বস্তু এর এক চরিত্রের মুখে প্রকাশ, —"আমার যেন মনে হয় আমরা সবাই প্রেতাত্মার মতন। শুধু জন্মসূত্রে প্রাপ্ত চিন্তা, ভাব ধারণা নয় ; সর্ব্ববিধ প্রাণহীন সংস্কার, মৃত, পুরাতন বিশ্বাসের রাশি আমাদের মধ্যে ভূতের মত ঘুরে বেড়ায়।···সারা দেশ ছেয়ে প্রেতাত্মার দল বাস করছে,—সমুদ্রের বালুকার মত অসংখ্য"।

'সমাজের শত্রু' এর পরের বছর লিখিত। সমাজের কল্যাণকামনা যার জীবনের একান্ত লক্ষ্য, সমাজ তাকেই নিজের ঘোর শত্রু বিবেচনায় কি কঠিন শাস্তি দেয় এ পুস্তকে তাই দেখানো হয়েছে। 'প্রেতাত্মা' লিখে যে শাস্তি ইবসেন্ স্বয়ং লাভ করলেন, তার ব্যথা 'সমাজের শত্রু'র পাতায় পাতায়।

এই সময়ে আরও একটা গভীর সত্য ইবসেনের মনে স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে। তিনি বুঝলেন, বাহির থেকে কাউকে কখনো উন্নত করা যায় না। মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা, একের অপরকে নূতন ক'রে সৃষ্টি করতে যাওয়ার প্রয়াস একেবারে অনর্থক। পুতুল-ঘরের নোরা বেদিন নিজে থেকেই বুঝল যে, সে তার স্বামীর খেলার পুতুল ভিন্ন আর কিছু নয়,—সেই মুহূর্ত্তে স্বামীর গৃহ তার কাছে বিষবাষ্পে ভ'রে উঠল। স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ ক'রে বিশাল জগতে জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী বোঝাপড়া করবার জন্য সে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যদি তাকে বলা যেত,—'তুমিই পুত্তলিকা জীবন নিয়ে নিজের নারীত্বের মানবধর্ম্মের অপমান করছ,' নোরা হয়তো কিছু বুঝত না—অথবা বুঝে স্বপ্নের মায়ারঞ্জিত সুখে অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠত।

নারীর শত্রু দ্বিবিধ ; যে তাকে ঘরে আবদ্ধ ক'রে রাখে, এবং যে তাকে প্রস্তুত হবার পূর্ব্বেই ঘরের বাহিরে জোর ক'রে পাঠিয়ে দিয়ে বলে—তোমার কার্য্যক্ষেত্র তুমি নিজের শক্তিবলে বেছে নাও।

আলো-বাতাসের স্পর্শে ফুলের কুঁড়ি আপনি ফুটে ওঠে ; রূঢ় হস্তে ফোটাতে গেলে তার পাপড়ীগুলি ঝ'রে যায়। 'বুনো হাঁস' এইরূপ একটি মুকুলের ঝরার কাহিনী।

'বুনো হাঁস' লেখবার পর ইবসেন্ স্বদেশে ফিরে এলেন। এতদিনের বিদ্রোহ তাঁর ব্যর্থ হয়নি ; সমাজ এবার তাঁকে দেবতা ব'লে স্বীকার করতে সুরু করল ; বিশ্বজয় সমাপ্ত করবার পরে ইবসেন্ স্বদেশ জয় করলেন। ক্রিষ্টীয়ানিয়ার ন্যাশানাল থিয়েটারে মহা সমারোহে তাঁর বিরাট্ ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হ'ল। Rosmorsholm এবং Lady from the Sea রচনার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লেখার সমাপ্তি। এর পর তাঁর জীবনে এক নূতন পর্ব্বের আরম্ভ।

(৫)

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্—এই অন্তহীন অতৃপ্তি, শ্রান্তিহীন সন্ধান—নূতন সত্য দর্শনের জন্য অপরিসীম আকুলতাও এতদিন ইবসেন্‌কে গভীর চিন্তা ও নিবিড়তম অনুভূতির ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রান্তরে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিল। এতদিন তিনি জীবনের বিচিত্র সুর বাজিয়ে চলেছিলেন ; এবার সহসা যেন মৃত্যুর দুয়ার খুলে তার সীমাহীন অন্ধকারের গহ্বরে প্রবেশ করলেন। 'প্রেতাত্মা'র অন্তরস্থ অন্ধকার গাঢ়তর ও আরও ভয়ঙ্কর

(১) এমন জঘন্য গালাগালির ভাষার বাংলা অনুবাদ হয় না ব'লে মূল কথাগুলোই দেওয়া গেল।

—লেখক।

হ'য়ে তাঁর সমস্ত রচনা এবার কালো আচ্ছাদনে আবৃত ক'রে দিলে; পূর্ব্বের লেখার আকাশের যে স্তুতি, আলোকের যে গীতি বিদ্যমান, এই নূতন পর্য্যায়ের চারটি নাট্যে তার লেশমাত্র আভাস নেই। রক্ত-মাংসের বর্ণ ও আভার স্থান গ্রহণ করেছে শুষ্ক নরকঙ্কালের বিভীষিকা। মৃত্যুর এই চিত্রাঙ্কনে অবশ্য দৈহিক মৃত্যুর ছায়া নেই; আর্ট দৈহিক মৃত্যু চিত্রণের আবশ্যকতা স্বীকার করে না। এ মৃত্যু আত্মার। অন্তর যাদের মৃত, তাদের জীবনের ব্যর্থতায় যে-গাঢ় ব্যথা আছে, সেই ব্যথার নিবিড় নীলিমা এই নাট্যগুলির শিরার রক্তে বহমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'Borkman' নাটকখানির উল্লেখ করা চলে। তার নায়ক সুন্দরী নারীর স্বপ্ন দেখে না; ভূগর্ভস্থ ধাতু-রত্নের স্বপ্ন তার জীবন ঘিরে আছে। যক্ষপুরীর 'সর্দ্দার' সে। স্বর্ণের ঝঙ্কারধ্বনি তার কাছে স্বর্গের সঙ্গীত। দুটি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল,—দুই বোন। কনিষ্ঠাকে সে ভালবেসে ফেল্‌ল, কিন্তু বিবাহ কর্‌ল জ্যেষ্ঠাকে, যেহেতু জ্যেষ্ঠার অর্থ-সম্পদ ছিল কনিষ্ঠার চেয়ে বেশী। এইরূপে একটা অস্বাভাবিক ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি কর্‌তে গিয়ে, সে তার স্বাভাবিক ক্ষুধাতৃষ্ণা নিশ্চিহ্ন কর্‌তে লাগল,অর্থাৎ ক্রমশ তিলে তিলে তার মানবত্তার মৃত্যু হ'ল। ইবসেনের শেষ দান নাট্যচতুষ্টয়ের পরিকল্পনা জীবনের এম্‌নি অপচয়জনিত ট্রাজেডির উপর প্রতিষ্ঠিত।

জীবনের সর্ব্বশেষ রচনায় ইবসেন্ তাঁর নিঃশেষিত-প্রায় শক্তি শেষবারের মত একত্রিত করেছেন, সে লেখার নাম, 'মৃতরা যবে জেগে উঠে।' এ নাট্যে তাঁর মৃতপ্রায় সৃষ্টি-প্রতিভা সহসা জেগে উঠেছে। পূর্ব্বের তিনটি লেখায় যে মৃতদেহ তিনি চিত্রিত করেছেন, তাদের জাগরণের আশ্বাস, —এবং নারীর প্রতি যে প্রখর সহানুভূতির অগ্নিশিখা তাঁর অন্তরে চিরদিন অম্লান ছিল তার-এক নূতন অভিব্যক্তি আছে। তাঁর এই শেষদানে। নারীকে শুধু 'মানবী' ব'লে না দেখার তীব্র প্রতিবাদ এ পুস্তকে আছে। নারী কবির 'মানসী', চিত্রশিল্পীর 'মডেল'। আর্টিষ্টের কল্পনা অনুরঞ্জিত এবং তার সৃষ্টিশক্তি সঞ্জীবিত করাতেই যেন তার জীবনের শেষ সার্থকতা। এইরূপে, নারীকে স্বতন্ত্র-ভাবে না দেখে শুধু যন্ত্রস্বরূপ দেখায় তার প্রতি যে হীন অপমানের কালিমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে, সে কালিমা ফিরে এসে পুরুষ জাতিকেই কলঙ্কিত কর্‌ছে।

প্রদীপ যেমন নিভ্‌বার পূর্ব্বক্ষণে সহসা জ্বলে ওঠে, ইবসেনের নির্ব্বাণোন্মুখ শক্তি তেম্‌নি 'মৃতরা যবে জেগে উঠে', নাট্যে শেষবারের মত প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। প্রবল ঝঙ্কারে বীণার তার যেমন ছিঁড়ে যায়, এর পরে তাঁর মনোবীণার তার ঠিক্ সেইরূপে ছিন্ন হ'য়ে গেছে। সারাজীবন ইবসেন্ চিন্তাক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রম ক'রে এসেছিলেন; মনকে মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম দেন্‌নি। এর কঠিন শাস্তি তাঁকে পেতে হ'ল। অদম্য শক্তি-বলে সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর শেষ নাটক তিনি লিখে গেলেন,— মৃতদের জাগরণের বাণী প্রকাশ কর্‌লেন, কিন্তু এবার তাঁর নিজের প্রতিভার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এল। কিন্তু শেষ বয়সে শুধু প্রতিভাই তাঁকে ত্যাগ করেনি; স্মৃতিশক্তিও তাঁর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'য়ে গেল। তাঁর মন পাঁচ বৎসরের শিশুর মনের মত সাদা হ'য়ে উঠ্‌ল, চিন্তার ক্ষীণ রেখাটুকুও তাতে পড়ে না। সেই বয়সে তিনি তার একবার নূতন ক'রে 'বর্ণ-পরিচয়' পাঠ সুরু করেছিলেন। জগতের ইতিহাসে নিয়তির এত বড় নির্ম্মম পরিহাসের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আছে কি না সন্দেহ। একটা শতাব্দীর যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ নিঃশেষে বিলোপের কল্পনাও যেন ভয়াবহ। দীর্ঘ জীবনের অন্তে শান্ত, সমাহিত চিত্তে, গুরুভার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সফলতার আনন্দ নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করা ইবসেনের ভাগ্যে ছিল না। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম বৎসরের সব-চেয়ে বড় ঘটনা এই নরওয়েজীয় শিল্পীর মনোজগতের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প।

এইভাবে ছ' বছর কাটাবার পর ১৯০৬ সালে ইবসেন্ নিরতিশয় পীড়িত হ'য়ে পড়্‌লেন। নরওয়ের দুরন্ত শীতে দারুণ তুষার-বর্ষণের মাঝে সূর্য্যের আলোর জন্য তাঁর প্রাণে দুঃসহ ক্ষুধা জেগে উঠল। শেষ নিমেষে 'আলো, সূর্য্যের আলো'—বল্‌তে বল্‌তে ২৩ এ মে তিনি পৃথিবী ছেড়ে অনন্ত আলোর দেশে যাত্রা কর্‌লেন।

"প্রেতাত্মা" নাটকে অস্‌ওয়াল্‌ডের শেষ কথা—'আলো, সূর্য্যের আলো'; এর পরই সে নাটকের যবনিকা পতন। নিজের জীবনের শেষ যবনিকাপতনের পূর্ব্বক্ষণে ইবসেনের

নিজের মুখ হতে ঠিক্ এ কথাগুলিই উচ্চারিত হল,—এ এক আশ্চর্য্য রহস্য। মগ্নচৈতন্তের কোন অন্ধকার রন্ধ্রে কথা-গুলি হয়তো লুকিয়েছিল, মৃত্যুর হিমস্পর্শে সহসা বাহির হ'য়ে এল। গ্যেটের মৃত্যুমুহূর্ত্তের কথা—'আলো, আরো আলো'—জানায় যে, সমস্ত জীবন আলোর ধারা পান ক'রেও তৃষ্ণার তাঁর অন্ত ছিল না। সাহিত্য-রাজ্যে গ্যেটের অবিসম্বাদী স্থানের অধিকারী ইবসেন্ ৭৮ বৎসরের একান্ত পরিচিত সুন্দর জগৎটার কাছে বিদায় নেবার বেলায় গ্যেটেরই মত উদ্দাম পিপাসায় অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন,—আলোক-লক্ষ্মীর শুভ্র মুখে একবার শেষ চুম্বন দেবার জন্ত তাঁর শুষ্ক তপ্ত ওষ্ঠ কেঁপে উঠেছিল; কিন্তু সে-তৃষ্ণা তাঁর তৃপ্ত হয়নি।

বেণুর ব্যথা

শ্রী গোপাললাল দে

বনের বিজন নিরালা সে কোণ—চরিত ধেনু,
সেথায় কীচককুঞ্জে ছিলাম—বিলোল বেণু,
অ কাশের পানে তুলে দেহখান,
জ্যোতিজলধারে করিতাম স্নান,
রহি'রহি' সুখে খসিয়া ঝরিত বুকের রেণু,
সরল কীচককুঞ্জে ছিলাম বিলোল্ বেণু।

কত পাখী এসে বসিত যে মোর শাখার বুকে,
কেহ বা নীরব, কারো বা ঝরিত প্রলাপ মুখে,
কাকের পাখার হাওয়াটুকু লেগে
পল্লবগুলি সচকিতে জেগে
শত বাহু নাড়ি' ডাকিত কাহারে সকৌতুকে।
গাহিয়া উঠিত ছুটি ঘুঘু নব মিলন-সুখে।

একদা সে মোহ পাসরিয়া কানে বাজিল সুর,
ধ্বনিয়া স্বনিছে দিক্‌দিগন্ত নিকট দূর,
চাহিয়া দেখিনু রাখলের করে,
বাজে মেঠো বাঁশী অচেনা কী স্বরে,
অজানা নেশায় টলিতেছে যেন বনানী পুর;
ছল্ ছল্ চোখে চায় দিগ্বধূ চায় সুদূর।

বাঁশী বলে সুরে "আছিলাম বাঁশ এমনি বনে,
বেঁচে থাকা সে কি? মরেছিনু যেন গোপন কোণে,
তার পরে কত দিন রহি' রহি'
বুকে দহনের যন্ত্রণা সহি',
জেগেছি নবীন বেণু-জনমের উদ্বোধনে,
যত কিছু আশ মিটেছে তিয়াস বেণুর মনে।"

সেদিন গোপন করিলাম পণ বাঁশরী হ'ব,
ওমনি রাখাল ছেলের করেতে কেবলি র'ব,
হায়, এজীবনে কিছু সুখ নাই,
ওমনিই বেণু হ'তে আমি চাই,
বাশরী হ'বার লাগিয়া বুকেতে দহন স'ব,
মনে আর বনে সুরেতে জাগাব মুকুল নব।

তার পরে শুধু রোদনের পরে রোদন বোনা,
চৈত্ জাগিল শেষ হ'ল যবে দিবস গোনা,
নবীন পাতার অলি-গলি দিয়া,
উতল বাতাস ফিরিছে নাচিয়া,
হেনকালে মেঘে ঘন দুর্য্যোগ বাজের ফণা,
তারি কাছ হ'তে মাগিয়া নিলাম একটি কণা।

প্রথম যখন জ্বলিল এ বুক—কী উল্লাস,
তার পরে ধীরে মিটিল যখন দহন-আশ
থামিতে বলিনু, কেবা শোনে কানে,
তাণ্ডব নাচে শ্মশানীয়া গানে,
লেহি' লেহি' শিখা বাড়ায়ে তুলিল সে উচ্ছ্বাস;
কাঁদিয়া ফেলিনু, কেহ শুনিল না, ফেলিনু শ্বাস।

এ যে দেখি হায় নিজেরি গলায় পরানু ফাঁসী,
কিছুতে নেভে না এই লেলিহান্ অনলরাশি,
এস দরদিয়া কে আছ কোথায়,
বুক যে বেণুর সবই জ্বলে যায়,
ধরেছে আগুন শিরায় শিরায় সর্ব্বনাশী,
কেমনে বা হ'ব রাখাল-ছেলের গোঠের বাঁশী!

[স্ট্রাট্]ফোর্ড নাট্যমন্দিরের নারীস্থপতি—

সেক্সপীয়রের জন্মভূমি ষ্ট্রাট্ফোর্ড-অন্-এভনে সেক্সপীয়রীয় নাটকগুলির অভিনয়ের জন্য একটি নাট্যমন্দির ছিল। সে নাট্য-শালাটি অগ্নিতে ভস্মসাৎ হওয়ায় নূতন নাট্যমন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। এই সেক্স্পীয়র নাট্যমন্দিরের পরিলেখ (design) প্রস্তুত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ক্যানাডা, আমেরিকা ও গ্রেটব্রিটেনের স্থপতিদের আহ্বান করিয়াছিলেন। বাযাত্তরটি পরিলেখ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার ভিতর হইতে চরম অনুমোদনের জন্য প্রথমে ছয়টি পরিলেখ বাছিয়া লওয়া হয়। এই ছয়টির মধ্যে শেষে যেটি গৃহীত হইল তাহার স্থপতি একজন নারী, কুমারী এলিজাবেথ স্কট্। মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে মিস স্কটের পাঠ শেষ হইয়াছে

কুমারী এলিজাবেথ্ স্কট্

এবং তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে মাত্র উনত্রিশ বৎসর। বার্ণর্ড শ বলেন যে, একমাত্র তাঁহার পরিলেখটিতেই কিছুটা নাট্যশালার সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। মিস স্কট নিজে বলেন, "সেক্স্পীয়র স্মৃতি নাট্যমন্দিরে আমি যেই মূল ধারণাটিকে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছি তাহা এই যে, গৃহ যেন গৃহের উদ্দেশ্যটিকে আচ্ছন্ন বা ব্যর্থ না করে"। তাই, এই নূতন পরিলেখটিতে একটি প্রশস্ততা ও সরলতা দেখা যায়।

—

পুলিশের অপরাধী ধরা—

আমেরিকায় খুনে বদমায়েস যেমন ওস্তাদ, পুলিশও তার চেয়ে কম নয়। ম্যাসাচুসেট্স্ পুলীশ এবিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে। বেপরোয়া বদমায়েসদের ধরিবার জন্য তারা কতকগুলি প্যাঁচ ব্যবহার করে। সেগুলি সাধারণ লোকদেরও জানা থাকা ভালো। যে অপরাধী বন্দী কুঠুরিতে ঢুকিতে চাহে না, তাহাকে কি

'মাথা-মুচ্ড়ানো প্যাঁচ'

করিয়া ঢুকাইতে হয়, চিত্রে তাহাই দেখানো হইতেছে। এ প্যাঁচকে 'মাথা-মুচড়ানো' প্যাঁচ (ঘাড়-মটকানোও বটে) বলা যাইতে পারে। পাহারাওয়ালার এক হাত থাকিবে অপরাধীর মাথার পিছনে আর এক হাত তাহার চোয়ালের নীচে। একটু মোচড় দিলেই অপরাধী একেবারে শায়েস্তা হইবে।

—

আকাশচারী আমেরিকা—

আমেরিকার সরকারী ডাক আকাশ-পথে চলিয়াছে;—ব্যবসা-বাণিজ্যের ও ভ্রমণের ইচ্ছায়ও লোকে বায়ু-পথ এত বেশী অবলম্বন করিতেছে যে, পপুলার মিকানিক্স্ পত্র আমেরিকাকে আকাশ-চারী আখ্যা দিয়াছে। হেজ্লি ফিল্ড থেকে (নিউইয়র্কের সীমানা) ১২ টা ১৫ মিঃ এসব উড়োজাহাজে চড়িলে ৭ টায় শিকাগোতে, তারপর পশ্চিম দিকে দীপস্তম্ভের আলোক-ইঙ্গিত ধরিয়া উড়িতে উড়িতে রাত্রি-শেষে চেয়েন্নের কাছাকাছি এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে
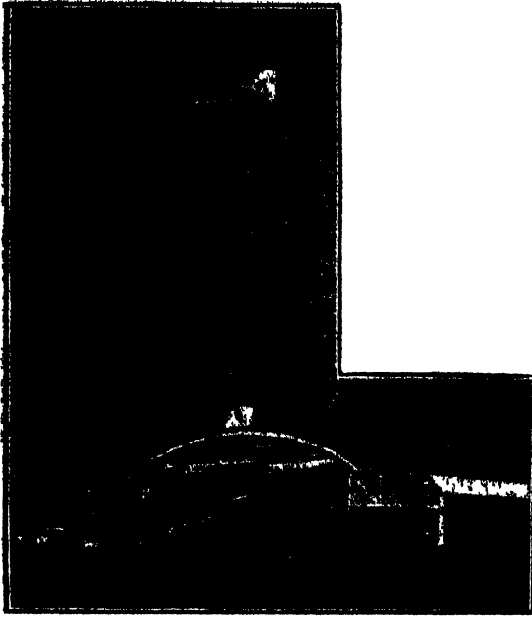
সাড়ে বারোটায় নিউইয়র্ক ছাড়িলে—আলোক-স্তম্ভটি লক্ষণীয়।
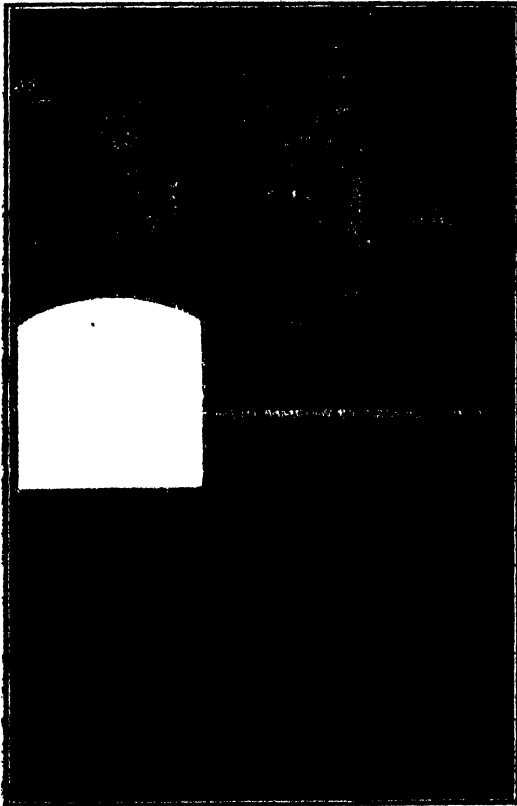
হাজার মাইল দূরের দুই নদীতীর

সঙ্গে একেবারে সান্ ফ্রান্সিস্কোতে (প্রশান্ত উপকূলের সময় ৪॥• টা নিউইয়র্কের সময় সকাল ৭ টা) আসিয়া পৌঁছানো যায়। ব্যাটারির সংলগ্ন কেমন নদীর তীর হইতে শিকাগো নদীর তীরবর্ত্তী গগন-স্পর্শী সৌধশ্রেণীর দূরত্ব এক হাজার মাইল; কিন্তু এমন উড়োজাহাজে আরামদায়ক বৈকালিক ভ্রমণেই এই দূর পথ উত্তীর্ণ হওয়া যায়। উপরে বসিয়া সেই দৃশ্য দেখিতে কিরূপ লাগে এখানকার একটি চিত্রে তাহাই বুঝানো হইতেছে। রাত্রিতে যেসব দীপস্তম্ভ আলোক বিকীরিত করে তাহাও পরম বিস্ময়ের বস্তু। আস্থার এক-একটি আলোর শক্তি প্রায় ১॥• বিলন মোমবাতির মত, আকাশ জুড়িয়া এই আলোকের মণ্ডল পড়ে। প্রত্যেক ২৫ মাইল অন্তর বড় স্তম্ভ, আর মাইল ৩ বাদে বাদে ছোট স্তম্ভ। এরূপ উড়োজাহাজে চলায় যে আজকাল আর বিপদ নাই, তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, জীবনবীমা কোম্পানি এইসব যাত্রীদের জীবনের উপর বীমা লইতে কোনো বিশেষ হারে টাকা দাবী করে না। অন্যান্য সাধারণ লোকদের হারেই ইহারাও প্রিমিয়ম দেন।

বিজ্ঞানের তৈয়ারী 'বিজলীমানুষ'—

কয়েক মাস হইল 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রে এই 'বিজলী-মানুষের' বিবরণ বাহির হইয়াছে। বিবরণটি এত কৌতূহলোদ্দীপক যে, আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে সরল ভাষায় তাহার মর্ম্মভাগ দিতে চেষ্টা করিলাম।
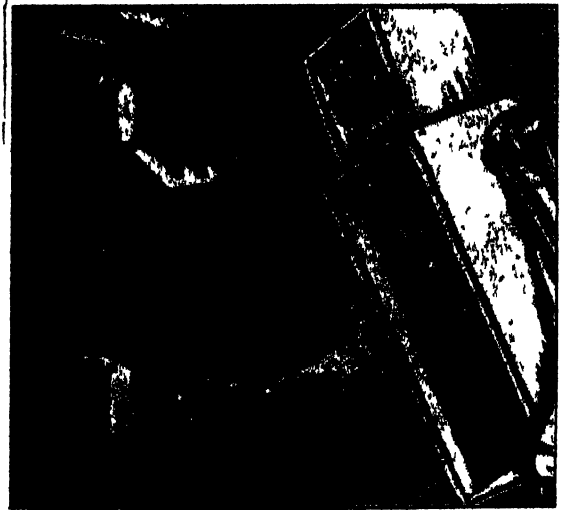
যন্ত্র-মানুষ

'ওয়েষ্টিংহাউস ইলেকট্রিক এণ্ড ম্যানুফেকচারিং কোম্পানির' টেবিলের উপর বেতার যন্ত্র বা স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন যন্ত্রের মত, দেখিতে যে জিনিষটি রহিয়াছে উহাই ওই কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার আর, জে, ওয়েন্স্‌লির আবিষ্কৃত বিজলী-মানুষ। আলো জ্বালা, পাখা খুলিয়া দেওয়া বা বন্ধ করা প্রভৃতি কাজ যন্ত্রটি মানুষের মতই করিয়া যায়—এরূপ ভৃত্য রাখিতে কাহার না লোভ হয়? বিশেষত, এ ভৃত্য যখন 'উত্তরদায়ক' হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নাই। এ যেন এ যুগেও কেনা গোলাম।—ওয়েন্স্‌লির.

যন্ত্র-মানুষ

যন্ত্র-মানুষ

তৈয়ারী তিনটি যন্ত্র-মানুষ ত ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন ডি, সি,র জলসঞ্চয়-কেন্দ্রের (reservoirs) জলের বাড়তি-কমতি লক্ষ্য করিতেছে, হিসাব রাখিতেছে এবং টেলিফোন-যোগে সমরবিভাগে সে-সব খবর জানাইতেছে। ওয়েন্‌স্‌লির নিজের কোম্পানীর বিভাগীয় কম খরচে বিভাগীয় কেন্দ্রগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইতে পারে তাহাই দেখা উচিত। প্রত্যেক বিভাগীয় কেন্দ্রেই ত টেলিফোঁ আছে; যদি সে-সব স্থানে এমন একটা যন্ত্র খাড়া করা যায় যে, তাহা আহ্বান শুনিবে, আদেশ গ্রহণ করিবে এবং নিজেরা হিসাব দাখিল
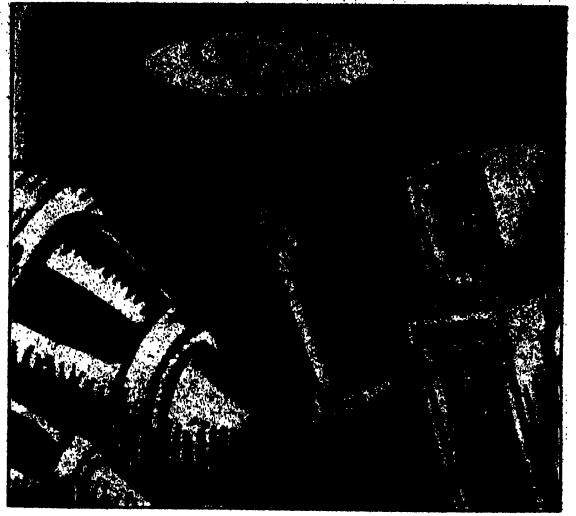
যন্ত্র-মানুষের স্রষ্টা ওয়েন্‌স্‌লি
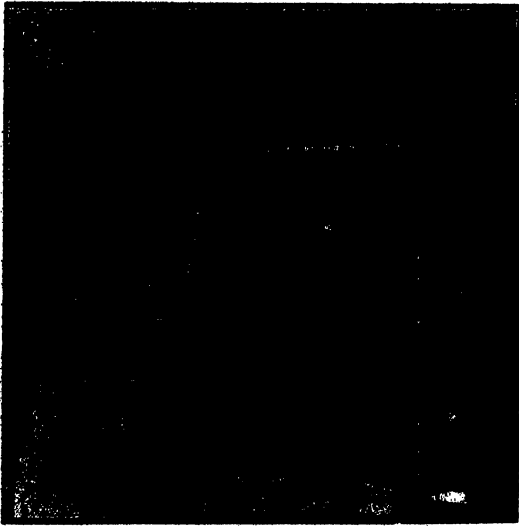
যন্ত্র-মানুষ

কেন্দ্রগুলিতে খাটিবার জন্য এইরূপ মানুষ শীঘ্রই নিযুক্ত হইবে। ওয়েন্‌স্‌লি ইহার নাম রাখিয়াছেন 'দূরবাক্‌' টেলিভক্স। সংক্ষেপে ইহার আবিষ্কারের ইতিহাস বলা যাইতে পারে—তাহা এই।—নিজেদের ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর কেন্দ্রস্থলে বসিয়া বিভাগীয় কেন্দ্রগুলির হিসাব সংগ্রহ করিতে করিতে ওয়েন্‌স্‌লির মনে হইল যে,'এরূপে সংবাদ-সংগ্রহ সহজ, কিন্তু কিরূপে এই প্রধানকেন্দ্র হইতে হুকুম দিলে করিবে তবেই গোল চুকিয়া যায়। রেডিও (বেতার) সহায়ে বা তারযোগে আমার গলার স্বর শুনানো ও চেনানো সম্ভব হইলেই এ বন্দোবস্ত সম্ভব।' ওয়েন্‌স্‌লির প্রথমে বন্দোবস্ত করিতে হইল টেলিফোঁ কোম্পানিগুলির সাথে। ও-পারে যে যন্ত্রটি থাকিবে তাহার কান, মুখ, হাত, পা সবই থাকা দরকার। তাঁহার নিজের "ইষ্ট-পীটস্‌বর্গ লেবরেটরি"তে তিনি প্রথমে যে যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, তাহা
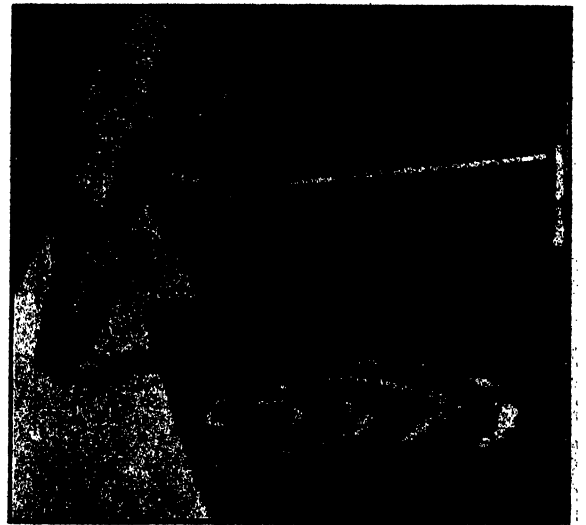
তাঁহার নিজ কণ্ঠে 'দুয়ার খোলো' বলিলেই দুয়ার খুলিত, আবার 'দুয়ার বন্ধ করো' বলিলেই দুয়ার বন্ধ করিত। কিন্তু কণ্ঠস্বর ঠিক ওইরূপ না হইলে বা ঐ অর্থসূচক অন্য শব্দ ব্যবহৃত হইলেই ও যন্ত্র একটুও কাজ দিত না। কাজেই ওয়েন্‌সলি একটি ধ্বনিময় সার্ব্বজনীন ভাষা আবিষ্কার করিতে তৎপর হইলেন—যেন সকল দেশের সকল লোকে অবলীলাক্রমে শব্দ করিলেই যন্ত্র আদেশমত কাজ করে। ঐ ভাষা মিলিল সঙ্গীতের সুর হইতে। ওয়েন্‌সলির উদ্ভাবনায় সুরের তিনটি শ্রেণীভেদ স্বরের উচ্চতা নীচতা দিয়া (pitch) নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই তিন সুর বিজলীচালিত কাঁটার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা চলে, কাজেই সুরভেদ অটুট থাকে এবং সুরগুলি পরস্পর মিশিয়া যায় না। কথকের বা প্রেরকের সুরের উঠা-নামার একটু জ্ঞান থাকিলেই আর কোনো ভুলের আশঙ্কা নাই। কথকের এই ধ্বনিপ্রাণ আদেশ একটি সাধারণ টেলিফোঁ যন্ত্রের উপরে আর-একটি উচ্চবাদক (loud-speaker) যন্ত্র পৌঁছাইয়া দেয়। তাহার দিকে এই যন্ত্রই যথেষ্ট। কিন্তু শ্রোতার দিকে যন্ত্র অনেক বেশী। সে দিকটা অনেকটা বেতারের আফিসের মত, তবে সে যন্ত্রও মাত্র তিনটি সুর-ধ্বনিতে সাড়া দেয়। শ্রুতধ্বনির শক্তি আবার যন্ত্রসাহায্যে বর্দ্ধিত হইয়া স্বয়ংক্রিয় (automatic) টেলিফোঁ-যন্ত্রের মত বিশেষ বিশেষ আদেশে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রে ঘা দেয়; ফলে আদেশানুযায়ী কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। একটি সাধারণ ঘটনা লইলে ব্যাপারটা সহজে বুঝা যাইবে। ধরা যাক, বাড়ীর গৃহিণী আর-এক-বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছেন; হঠাৎ তাঁহার মনে বাড়ী সম্বন্ধে একটা উৎকণ্ঠা জাগিল। তিনি ঘরের টেলিফোঁ-শুদ্ধ যন্ত্র-বাক্স ও উচ্চ বাদকদটি দেখিয়া বুঝিলেন, বাড়ীর খবরাখবর লওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ। বাক্সের উপরের বিজলী-বোতাম টিপিলেন—সুরের কাঁটা বা ধ্বনি-নল অমনি ঠিক হইয়া রহিল। প্রথমেই তিনি তাঁহার নিজের বাড়ীর নম্বর চাহিলেন। যন্ত্রটি অমনি সাড়া দিল। সে যন্ত্রের শব্দ একটি বিশেষ ধরণের—তাঁহার খুব চেনা, সে ধরণের শব্দ না পাইলে ভুল নম্বর বুঝিয়া তিনিও টেলিফোঁ ছাড়িয়া দিবেন, সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার টেলিফোঁও ছাড়া হইবে। আবার তিনি নম্বর চাহিবেন এবং ঠিক নম্বর পাইলে তাঁহার বিজলী-ভাষার কলে চাবি দিবেন। ধ্বনি-নল হয়ত শব্দ করিবে 'টুইটু'—অর্থাৎ 'হ্যালো, শোনো।' দূরবাক্ যন্ত্র আগেকার শব্দ থামাইয়া তিন শ্রেণীর স্বরগ্রামে একটি শ্রেণীতে স্বর মিলাইবে, অর্থাৎ বলিবে—'হাঁ বলুন।' ধ্বনি-নল বলিবে, 'টুইট্, টুইট্'—অর্থাৎ "ঘরের চুলার খবর জানিতে চাই।" দূরবাক্-যন্ত্র উত্তর দিবে, "বজ্, বজ্, বজ্-জ" অর্থাৎ "চুলার সঙ্গে আপনার যোগ হয়েছে—দেখ্‌তে পাচ্ছেন ওখানে তাপ নেই।" আর একটি বোতাম টিপিয়া গৃহিণী শব্দ করিলেন 'ব্রকর্ র্' অর্থাৎ 'আচ্ছা ওটা থাক, উনুনটা দেখতে চাই।' দূরবাক-যন্ত্র বজ-বজ শব্দ থামাইল, একটা টোকা দিয়া বুঝাইয়া দিল ঘরের চুলা বন্ধ হইল, এবং উনুনের সঙ্গে যোগ সাধিত হইল। গৃহিণী হয়ত তখন 'টুইট্ টুইট্' শব্দ করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা ও থাক, একবার নীচের তলায় যে বড় অগ্নিকুণ্ড আছে, তার অবস্থাটা কি জান্‌তে চাই।' চারটি বজ-বজ শব্দে উত্তর আসিল যে, তাঁহার আদেশমত কাজ হইল, এবং তার পরেই দুটি বজ্-বজ্ শব্দে সংবাদ পৌঁছিল, 'নিবে গেছে'। এইরূপে যত খুশী ঘরের খবর ও কাজ পরের বাড়ীতে গল্প করিতে করিতেই গৃহিণী করিলেন, এবং সর্ব্বশেষে তিনের নম্বর ধ্বনি-নলে সংবাদ নিঃসারিত করিয়া জানাইয়া দিলেন; 'আচ্ছা; আসি, নমস্কার।'

এমনিভাবে ওয়েন্‌সলির দূরবাক্-যন্ত্র 'বিজলী-মানুষ'রূপে সকল কাজ করিতেছে—জল আসিলে জানালা বন্ধ করে, ডাকের চিঠি কুড়াইয়া রাখে, ছেলেদের ঘুম ভাঙিল কি না জানায়। উপরের বিবরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, টেলিফোঁ তারের সঙ্গেও এ যন্ত্রের যোগ আছে যদিও সামান্য যোগ। সেই যোগটুকু থাকিলেই যেইখানে ইচ্ছা এরূপ ভৃত্য খাটানো সম্ভব হয়। নিউইয়র্কে বসিয়া ইংলণ্ডে বা কুবায় হুকুম দেওয়া চলে। যদি কল খারাপ হয়, শ্রুতবাক্ যন্ত্র আর কোনো শব্দ করিবে না, শুধু মানুষের অসুখ হইলে যেমন সে কাঁদে, তেমনি এ যন্ত্রও আর্ত্তনাদ করিবে। তখন, মেরামত করা দরকার।

বিজলী কোম্পানির ইঞ্জিনীয়ারের এ আবিষ্কারে সেই কোম্পানির এখনই খুব সুবিধা দেখা যায়! বিভাগীয় কেন্দ্রগুলিতে আর দলের পর দল কর্ম্মচারী রাখিবার দরকার হইবে না। আবার এইরূপে পৃথিবীর এক সমুদ্রতীরে যখন ঝড় দেখা দিবে, অমনি সে খবর দূর দূরান্তরের লোকেরাও কল টিপিয়াই জানিতে পারিবে।

ওয়েন্‌সলির দূরবাক্ যন্ত্র শব্দবাহক্ ও শব্দনিয়ন্ত্রিত। তিনি দুনিয়া ব্যাপী টেলিফোঁর প্রসার দেখিয়াই এইরূপ শব্দ-প্রাণ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এমনকি, যদি শব্দের পরিবর্ত্তে পৃথিবীতে বার্ত্তা, বাণিজ্য প্রভৃতি আলোকবাহন হয়, তবে বৈদ্যুতিক আলোক-শক্তির প্রভাবে এই দূরবাক-যন্ত্রকে আলোক-প্রাণ যন্ত্রে পরিণত করাও সহজ হইবে। ইচ্ছা করিলে এখনই এরূপ করা যাইতে পারে।

রবট-পর্য্যায়ের যন্ত্র-মানুষ লইয়া পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও কল্পনাপ্রবণ উপন্যাসিক মহলে যে আজগুবি জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল, তাহা ওয়েন্‌সলির এ আবিষ্কার শেষ করিয়া দিল। রবটমানুষ আর চলিবে না—ঠিক মানুষের আকৃতি দিয়া গঠিত যন্ত্র গানের দু একটা গদ বাজাইল, কি দু একটা ধরা-বাঁধা কাজ করিল, তাহাতে মানুষের যায় আসে না। মানুষের প্রকৃতি, মানুষের স্নায়বীয় সূক্ষ্মগড়ন, বেদনাবোধ, সর্ব্বোপরি মানুষের অসম্ভব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মগজের বিন্যাস,—ইহা মনুষ্যাকৃতি রবট পাইবে না। তাই, রবটমানুষ মানুষকে তৃপ্তি দিবে না। ওয়েন্‌সলির দূরবাক্-যন্ত্র এমন কর্ম্মিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ যে, মানুষ এরূপ বাধ্য ভৃত্য পাইয়া বর্ত্তিয়া যাইবে। রবট-মানুষের চরম বিকাশেও ইহার অপেক্ষা বেশী কিছু হওয়া সম্ভবপর নয়।

ওয়েন্‌সলির মত ইঞ্জিনীয়ারের চোখে মানুষের মূল্য মানুষের কর্ম্ম-ক্ষমতা—সেই মানুষের কর্ম্মক্ষমতা এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়া প্রকাশিত করিতে পারিয়াই তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন :—

গতমাসের 'পঞ্চশস্য' বিভাগের 'পৃথিবীর বিখ্যাত পুস্তকাগার' লেখার লেখক শ্রীযুক্ত অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম অনবধান বশত উল্লেখিত হয় নাই। ঐ সংবাদ-নিবন্ধে ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর লাইব্রেরীগুলি সম্পর্কে এই কয়েকটি কথা যুক্ত হইবে—"ঐ লাইব্রেরীগুলির মোট পুস্তক সংখ্যা তিন কোটি। ফ্রান্সে বড় লাইব্রেরীর সংখ্যা ১১১টি, তাহাদের মোট পুস্তক-সংখ্যা দুই কোটি।"

সহজ বয়ন-শিক্ষা—প্রথম ভাগ। শ্রীমণিমোহন সেনগুপ্ত। ঢাকা। মূল্য ২৲ টাকা। ১৭৩ পৃষ্ঠা।

কাপড় বুনিতে শিখাইবার অভিপ্রায়ে বইখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উৎসাহ ছিল, বাতিক ছিল, তিনি ঢাকায় তাঁতীর নিকট তাঁত বোনা শিখিয়া এবং নিজের যত্নে দক্ষ হইয়া এই বইখানি লিখিয়াছেন। তিনি কোন পুস্তক কি লিপিবদ্ধ বিবরণ কোথাও পান নাই।

কিন্তু গ্রন্থকার হইতে গেলে পূর্ব্বের গ্রন্থ দুই-একখানি দেখা ভাল ছিল। আমার মনে হইতেছে, বাঙ্গালাতেও অন্ততঃ একখানা বই ছাপা হইয়াছে। ইংরেজীতে ছোট ছোট বই আছে। আর এক কথা, গ্রন্থকার অবশ্য স্বীকার করিবেন নিজে তাঁত বুনিতে পারা এবং বই পড়াইয়া বুনিতে শেখানা, এই দুই কর্ম্মে দুইপ্রকার নৈপুণ্য আবশ্যক হয়। যিনি তাঁতীবাড়ী যাতায়াত করিতে পারিবেন, কিম্বা যিনি তাঁতবোনা কিছু কিছু জানেন, তিনি এই বই হইতে বস্ত্রবয়ন শিখিতে পারিবেন। যিনি কিছুই জানেন না, তাঁর পক্ষে এই বই বিষম ঠেকিবে। কারণ, ইহাতে বস্ত্রবয়নের বর্ণনা যত আছে, কৃত্য তত নাই। প্রথম শিক্ষার্থীকে গুরু বলিবেন, "এই কর", "ক-এর" এই আকৃতি লেখ। তিনি বলেন না, "কত-কি করিতে পার", "ক-এর কত আকৃতি হইতে পারে"।

বাঙ্গালা ভাষায় রস সাহিত্য প্রচণ্ডবেগে কূল ভাসাইয়া ছুটিয়াছে, জ্ঞান-সাহিত্য স্থান পাইতেছে না, ক্রিয়া-সাহিত্যের ত কথাই নাই। কিন্তু যে দিনকাল পড়িয়াছে, রস আস্বাদন দ্বারা—ধীমান্ ও শ্রীমান্ দিগের কালকর্ত্তন অসম্ভব। এখন ক্রিয়া-সাহিত্যের আবির্ভাব না হইলে প্রাণরক্ষা দুর্ঘট। এ বিষয়ে দুই পাঁচখানি বইও ছাপা হইয়াছে। কিন্তু আমার চোখে যে যে বই পড়িয়াছে, তাহাতে তুষ্ট হইতে পারি নাই। সকলেই শেষের কথা গোড়ায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। এই দোষ এই পুস্তকেও পাইতেছি। নানা ভেদ, নানা বিচার পাইলে পাঠক ধাঁধায় পড়িয়া যান। এখন কোন কোন বিদ্যালয়েও চরকায় সূতা কাটিতে ও তাঁতে কাপড় বুনিতে শেখানা হইতেছে। আমি যদি শিক্ষক হইতাম তাহা হইলে বালকবালিকাদিগকে প্রথমে শণ বা পাটের বেটো কাটিতে শিখাইতাম, তারপর চরকা। এখন দেখি প্রথমেই চরকা। তেমনই, প্রথমে চট বুনাইতাম, পরে মোটা সূতার গামছা, এবং শেষে অন্য কাপড়। মনে রাখা উচিত, "বয়ন" শব্দ দ্বারা তাল-পাতা কিম্বা খেজুর-পাতার তালাই বোনাও বোঝায়।

ক্রিয়াগ্রন্থে পদে পদে চিত্র আবশ্যক হয় এই পুস্তকের শতাধিক চিত্র নাকি পৃথক ছাপা হইয়াছে। কিন্তু একটাও দেখিতে পাইলাম না। বোধহয় চিত্রগুলি পৃথক পুস্তকেই রহিয়া গিয়াছে, প্রবাসী আপিসে পঁহুছে নাই, আমিও পাই নাই। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত বুঝিতেও পারিলাম না। গ্রন্থকার চিত্রগুলি পৃথক্ মুদ্রিত করিয়া বইতে জুড়িয়া দিলেন না কেন? জুড়িয়া দিলে এই বিপত্তি ঘটিত না।

স্থানভেদে তাঁতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও ক্রিয়ার নামভেদ কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাঁতের "নরাজ" পরিবর্ত্তে "নুরোজ" নাম এই প্রথম শুনিলাম। এইরূপ আরও দুই একটা শব্দ নূতন ঠেকিল। গ্রন্থকার "পুরাতন প্রথা" ও "নূতন প্রথা" দ্বারা কি বুঝিয়াছেন স্পষ্ট হইল না। নূতন প্রথা কি "ঠকঠকি" তাঁত? "ঠকঠকি" নামটি আমার রচিত। কিন্তু দেখিতেছি, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইচ্ছা করিলে গ্রন্থকারও ইংরেজী নাম ত্যাগ করিতে পারিতেন।

গ্রন্থকার তাঁতীর দুঃখ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু তাঁতীর হিসাবে, ঠকঠকি তাঁত তাহার অন্ন মারিতে বসিয়াছে, কাপড় যে সে বুনিতে শিখিতেছে, চাষবাস করিয়া অবসর-সময়ে কাপড় বুনিতেছে, অন্ন বানিতে কাপড় বেচিতেছে। গ্রাহকের সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু তাঁত যাহার একমাত্র ভরসা, সে তাঁতী মারা পড়িতেছে। এটা আগন্তু বিপদ। কয়াল কল এই দিক হইতে তাঁতীর শিয়রে বসিয়া দিন গণিতেছে। মহাজন নইলে তাহার চলে না; মহাজন বানি কমাইতেছেন, কিন্তু নিজের লাভ পুরা মাত্রায় ধরিয়া রাখিয়াছেন। সমবায় দ্বারা নিজেরাই মহাজন হইলে তাঁতীর আয় কিছু বাড়িত। কিন্তু দরিদ্রের সমবায় সহজে ঘটে না। পরস্পরের সাধুতায় বিশ্বাস না থাকিলে সমবায় অসম্ভব, আর দারিদ্র্য ও সাধুতা প্রায় পরস্পর বিরোধী। সেকরা সোনা চুরি করে, গোয়ালা দুধ চুরি করে, তাঁতী সূতা চুরি করে, ইত্যাদি ইত্যাদি ছোট ও বড় চুরি বেশ চলিতেছে। একা তাঁতীই দোষী নয়। মাসের ২০ দিনের বেশী তাঁত চলিতে পারে না, প্রত্যহ ।৶ আনার অধিক উপার্জ্জনও হয় না। একটি স্ত্রীলোকও চাই। যদি কেবল স্ত্রী পুরুষ হয় তাহা হইলেও মাসে ১৫৲ টাকা আয়ে আজকাল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন হয়, আর কিছুই হয় না; পোষ্য পাঁচটি হইলে কষ্টের অবধি থাকে না। হাতমাকু ধরুক, আর মেড়া মাকুই ধরুক, যে দুঃখ সে দুঃখই থাকে। লেখাপড়া শেখাই, আর যে বিদ্যাই দাও, দেশের সামান্য তাঁতীর সঙ্কটকাল। যাহারা চাষও ধরিয়াছে, তাহারাই বাঁচিয়া যাইতেছে। কিন্তু হায়, খাবার লোক যত, চাষের জমি তত কই?

আদি আর্য্যভূমি (The first home of the Aryans)—শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বিদ্যানিধি প্রণীত। মূল্য ১৲, ৭৫ পৃষ্ঠা। আগরতলায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

গ্রন্থকার এই পুস্তকের বিষয়-ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, ইহা "সুমেরু ও উত্তর কুরুতে আর্য্যদিগের আদি নিবাস সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ব"। তিনি নিবেদনে লিখিয়াছেন, "আর্য্যদিগের আদি নিবাসের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর্য্যদিগের ইতিহাসে এতদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর নাই।" তিনি প্রথমে "ভারতী"তে লিখিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, "ঐতিহাসিকদিগের আলোচনা বা সমালোচনা দ্বারা উহার মত পরীক্ষিত হইবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই।" ইহাতে কিন্তু আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইলাম না। কারণ একে প্রত্নতত্ত্ব,

তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, তাহাতে মাসিকপত্রের গল্প ও কবিতার ভাণ্ডারে প্রবেশিত। বাঙ্গালা পাঠকের এমন দুর্ভাগ্য হয় নাই যে, তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রত্নতত্ত্ব পড়িতে হইবে। গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেই বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরা আলোচনায় বসিয়া যাইবেন। এটা আর এক দুরাশা যদি তিনি ইংরাজীতে ছাপাইতেন ও বিলাত পাঠাইতেন, আমার বিশ্বাস, তাঁহার গবেষণার পরীক্ষা হইত।

প্রাচীন আর্য্যদিগের আদি নিবাস মেরু প্রদেশে ছিল, এই তত্ত্ব লোকমান্য টিলক প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় "মানবের আদি জন্মভূমি" মঙ্গোলিয়াতে পাইয়াছিলেন। গ্রন্থকারের অনুমানে আদি নিবাস মেরুতে এবং পরে উত্তর কুরুতে ছিল। এই উত্তর কুরু কোথায় ছিল, তাহা গ্রন্থকার সবিশেষ আলোচনা করেন নাই। কেবল লিখিয়াছেন, "উত্তর কুরু সুমেরুর সন্নিহিত দেশ।" তাহা হইলে সুমেরু প্রদেশই আসিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, সুমেরু বলিতে অল্প স্থান এমন কি বিন্দুমাত্র স্থান বুঝায়। সুতরাং সুমেরুতে বাস বলা যা, তৎসন্নিহিত প্রদেশে বাস বলাও তা। তারপর, যদি সুমেরুতেই আর্য্যদিগের আদি নিবাস স্বীকার করি তাহা হইলে বুঝি, আর্য্যগণ একেবারে সপ্তনদ প্রদেশে না আসিয়া ভারতবর্ষের উত্তরে স্থানে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। পথে মঙ্গোলিয়া পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। অতএব সুমেরু প্রদেশ ও মঙ্গোলিয়া, দুই সময়ের দুই নিবাস স্বীকার করিতে বাধা দেখিতেছি না।

মূল কথা, আদি আর্য্যভূমি মেরু প্রদেশ ছিল কি না। টিলক মহাশয় ইহার পক্ষে অনেক হেতু দেখাইয়া গিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, "তাহাতে জ্যোতিষের জটিল ও কঠিন বিচার করা হইয়াছে, সুতরাং উহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে।" তারপর লিখিয়াছেন, তিনি "উল্লিখিত কোন মতেরই অনুসরণ না করিয়া ভিন্ন প্রণালীতে ও ভিন্ন প্রমাণ সহকারে মেরুতে আদি নিবাসের মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

কিন্তু প্রণালী ভিন্ন হইলেও প্রমাণ প্রায় একই প্রকার দেখিতেছি। বাস্তবিক কোনও দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত স্থান নির্ণয়ের দুই পন্থ আছে। এক পথ আকাশে, দ্বিতীয় পথ ভূপৃষ্ঠে। লণ্ডন কোথায় বলিতে হইলে বলিব কলিকাতা হইতে লণ্ডনের অক্ষান্তর এত রেখান্তর এত। এখানে আকাশ ভিন্ন গতি নাই। কিম্বা বলিতে পারি, লণ্ডন এমন স্থান যেখানে নদী পর্ব্বত পশুপক্ষী এই এই রূপ আছে। কিন্তু এ কালের ভূ-পৃষ্ঠ দেখিয়া প্রাচীন কালের নির্ণয় করিতে পারা যাইবে না। অতএব এই দুই পথের মধ্যে দ্বিতীয়টিতে স্থান নির্ণয়ে সন্দেহ থাকে, কারণ ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রাচীনকালের লণ্ডন বলিতে গেলেই কালও নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অতএব যেখানে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী সেই জ্যোতিষিক পথ একমাত্র গ্রাহ্য। বিদ্যানিধি মহাশয় কালের ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া হেতুকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে বিদ্যানিধি মহাশয় ১৮টি হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। সকল হেতু সমান গুরু না হইলেও যুক্তির মধ্যে প্রায়ই হেত্বাভাস আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে সকল যুক্তির আলোচনার স্থান নাই। দুই একটা উদাহরণ দ্বারা আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি।

প্রথম হেতু "আর্কটিক" (Arctic) নামের রহস্যে দিয়াছেন। ঋগ্‌বেদের একটি ঋকের অনুবাদ রমেশবাবু করিয়াছেন, "এই যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে, এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, দিবাভাগে কোথায় চলিয়া যায়?" ঋকে আছে ঋক্ষ। এই ঋক্ষ শব্দের চলিত সংস্কৃত অর্থ নক্ষত্র। যদি এই অর্থ ধরি, এবং সায়ণের ব্যাখ্যায় এই অর্থও আছে, ঋকটির অর্থ সুসঙ্গত হয়। নক্ষত্র মাত্রেই উচ্চে অবস্থিত আছে এবং রাত্রিকালে দৃশ্য ও দিবাভাগে অদৃশ্য হয়। কিন্তু মক্ষমূলার প্রভৃতি শাব্দিক পণ্ডিতগণ ঋক্ষ শব্দ দ্বারা সপ্তর্ষি নক্ষত্র এবং ভল্লুক বুঝিতে বলেন। সায়ণও ঋক্ষ শব্দে সপ্তর্ষিও বুঝিয়াছেন। কিন্তু এই শব্দ দ্বারা কেন যে সপ্তর্ষি বুঝিতে হইবে তাহা সায়ণ বলেন নাই; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বলেন নাই। কেবল সপ্তর্ষি নক্ষত্র উচ্চ আকাশে অবস্থিত নহে কিংবা রাত্রিকালে দৃশ্য ও দিবাকালে অদৃশ্যও হয় না। বৈদিক ঋক্ষ এবং গ্রীক Arktos মূলে এক হউক, কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা হইতে মেরু-নিবাস সিদ্ধ করিবার কোন যুক্তি পাইতেছি না। টিলকও ঋক্ষ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি "উচ্চে অবস্থিত," এই বিশেষণ লইয়া তাঁহার মতের আনুকূল্য পাইয়াছেন। ভূপৃষ্ঠের কোন্ স্থান হইতে দেখিলে সপ্তর্ষিকে উচ্চে অবস্থিত দেখায়? সর্ব্বোচ্চে নিশ্চয়ই সেখান হইতে যেখানে সপ্তর্ষি মানুষের ঠিক মাথার উপর থাকে। সে দেশ নিশ্চয়ই উত্তর দেশ, ভারতবর্ষ নয়। টিলকের যুক্তি এই। এই যুক্তির দোষ আছে, যে দোষ তিনি ধরেন নাই, এককালে আমিও ধরিতে পারি নাই। সে সব তর্ক ছাড়িয়া দিই। বিদ্যানিধি মহাশয় আর্কটিক নামের রহস্য উদ্ভেদ করিয়া তাঁহার মতের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই রহস্য সম্বন্ধে মক্ষমূলারের ব্যাখ্যায় আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। মেরু-প্রদেশচারী শ্বেত ভল্লুকের লোম শ্বেতবর্ণ ও উজ্জ্বল। আকাশের তারাও শ্বেতবর্ণ ও উজ্জ্বল। অতএব তারা মাত্রেই ভল্লুক নাম পাইবার কথা ছিল। সব ছাড়িয়া যদি সপ্তর্ষিকেই ভল্লুক বলি তাহা হইলে বুঝি সপ্তর্ষি নক্ষত্রে গ্রীকেরা ভল্লুকের আকার যেমন দেখিয়াছিল বেদের আর্য্যগণও তেমনই দেখিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঋক্ষ অর্থে ভল্লুকের ন্যায় প্রতীয়মান নক্ষত্রবিশেষ। বেদের আর্য্যগণ ভূপৃষ্ঠে ভল্লুক দেখিয়াছিলেন, আকাশেও কয়েকটা তারাতে ভল্লুক দেখিতে পাইলেন। এই হেতু সেই তারা-সমষ্টির নাম ঋক্ষ হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক ও আর্য্যগণ একত্রবাসের সময় কিম্বা একে অন্যের নিকট নক্ষত্রের রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। কেবল সপ্তর্ষিতে নয়, অন্য নক্ষত্রেও ইহার প্রমাণ আছে।

বোধহয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিপ্রায় এই,—যেহেতু শ্বেত-ভল্লুকের লোমের দীপ্তি না দেখিলে আকাশের তারাতে সাদৃশ্য লক্ষিত হইত না,—এবং যেহেতু হিমাবৃত মেরুপ্রদেশেই শ্বেতভল্লুক বাস করে, অতএব আর্য্যগণ মেরুপ্রদেশে থাকিয়া শ্বেতভল্লুক দেখিয়াছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, সে দেশে বাস না করিলে কি শ্বেতভল্লুক দেখিতে পাইতেন না? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য, তাঁহাদের বাসভূমি কি বর্ত্তমান কালের ন্যায় হিমাচ্ছন্ন ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে ভূবিদ্যা বলেন, এমন কাল গিয়াছে যে-কাল হিমাচ্ছন্ন ছিল না। টিলক তাহা স্বীকার করিয়া সে কাল নির্ণয় করিতে গিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, দেশ ও কালের সম্বন্ধ পদে পদে আসিয়া পড়ে।

এই সম্পর্কে গ্রন্থকারের উদ্ধৃত জন্তু সম্বন্ধীয় ও উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় প্রমাণের উল্লেখ করি (১৫,১৬)। তিনি বলিতে চান, যে-হেতু প্রাচীন আর্য্যগণ হরিণ-মাংস-প্রিয় ছিলেন, এই মাংস তাঁহাদের

প্রীতিকর ছিল, এবং যেহেতু মেরু প্রদেশে বলগা হরিণ (rein-deer) প্রধান খাদ্য,—অতএব। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও এই প্রকারের উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। যদি এইরূপ বলি, আর্য্যগণ এই জন্তু ও এই উদ্ভিদ বিশেষ জানিতেন, কাজে লাগাইতেন এবং সেই জন্তু ও উদ্ভিদ কেবল মেরু প্রদেশেই দেখা যাইত অন্যত্র নহে, তাহা হইলে সে প্রমাণ দ্বারা আর্য্যদিগের মেরু নিবাস কিছু সিদ্ধ হইতে পারিত।

এখন গ্রন্থকারের লিখিত একটা জ্যোতিষিক প্রমাণের কিঞ্চিৎ আলোচনা করি। ঋগবেদের একটি ঋকের (দশম মণ্ডল, ১৯০ সূক্ত) ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "এ স্থানে প্রথম বৎসরের নাম পাইয়াই আমরা দিন রাত্রি নাম প্রাপ্ত হই। মাস, পক্ষ প্রভৃতি আর কোন নামই প্রাপ্ত হই না। ইহাতে এক অহোরাত্রেই তখন যে বৎসর পরিগণিত হইত, তাহাই যেন আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। একক্রমে ৬ মাস দিবা ও ৬ মাস রাত্রি থাকিলে যখন এক দিবা রাত্রিতেই বৎসর হইয়া যায় তখন মাস পক্ষ কল্পনা আর প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই বৈদিক বর্ণনায় ইহারা স্থান পায় নাই"।

এই ঋকে সম্বৎসর ও অহোরাত্রের উল্লেখ আছে। পক্ষ ও মাসের উল্লেখ নাই। কিন্তু ঋগ্‌বেদের অন্য বহু স্থলে স্পষ্টতঃ না হইলেও রূপকে বৎসর ঋতু মাস পক্ষ ও অহোরাত্রের উল্লেখ আছে। অতএব উদ্ধৃত ঋকে নাই বলিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ যে কেবল বৎসর আর দিন গণনাই করিতেন এরূপ অনুমান আসে কি? কাল-বিভাগে অহোরাত্র ও বৎসর আদি ও অন্ত বলা যাইতে পারে। উক্ত ঋকে আদি ও অন্তের উল্লেখ করিয়াই ঋষি ছাড়িয়া দিয়াছেন, অন্য বিভাগের উল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই। দ্রষ্টব্য, ঋকে চন্দ্রের উল্লেখ আছে। আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল মেরু-বিন্দুতে এক অহোরাত্রে বৎসর পূর্ণ হয়। মেরু হইতে দক্ষিণে আসিলেই সেরূপ আর হয় না, তখন দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ দিবা, দীর্ঘ উষা ভোগ করিতে হয়। কাজেই এক অহোরাত্রে বৎসর পূর্ণ হইবার উল্লেখে এইটুকু বুঝি যে, তাঁহারা এমন স্থান জানিতেন যে-স্থানে ৬ মাস দিন ৬ মাস রাত্রি হয়। এখানে বলি, এই উল্লেখের প্রমাণ এত আছে যে, আমি ইহা বলবান মনে করি। কিন্তু গ্রন্থকার যে-ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে প্রমাণটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি লিখিতে বহু যত্ন করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ বিষয়ের গ্রন্থ দুই এক খানি মাত্র আছে। তিনি যে-সকল হেতু উল্লেখ করিয়াছেন, প্রত্যেকটাতেই চিন্তিবার বিষয় আছে। তর্কশাস্ত্রের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার প্রচুর অধ্যয়নের ফল উপস্থাপিত করিলে পাঠক নিঃসংশয়ে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারিতেন। আমি প্রাচীন আর্য্যগণের মেরু-নিবাস স্বীকার করি। সুতরাং গ্রন্থকারের মত আমার কাছে নূতন নহে। আশা করি, তিনি তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের সময় তাঁহার আবিষ্কৃত প্রমাণগুলি তর্কশাস্ত্রের কঠিন নিকষে কষিয়া লইবেন।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

রাখালের গান ; পঞ্চকোট রাজপুরোহিত—শ্রী রাখালচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। প্রকাশক শ্রী শ্যামাপ্রকাশ ব্রহ্মচারী, পঞ্চকোট রাজহাউস, শিবালয়, ৺কাশীধাম। পৃঃ ২২৩। মূল্য ১।০ (কাগজের মলাট)।

গ্রন্থে এই কয়েকটি বিষয় আছে—গণেশবন্দনা, দুর্গা-সঙ্গীত, আগমনী, ভুবনেশ্বরী-সঙ্গীত, ধরণী-সঙ্গীত, কমলা-সঙ্গীত, বগলা-সঙ্গীত, শ্যামা-সঙ্গীত, শিব-সঙ্গীত. কৃষ্ণ-সঙ্গীত, রাম-সঙ্গীত, রামায়ণ বিষয়ক কবিতা, ও বিবিধ সঙ্গীত।

রাম-সীতা—শ্রী অরুণকান্ত রায় প্রণীত। পৃঃ ১৫৪। মূল্য ১৲ (কাগজের মলাট)।

সমগ্র রাম-লীলা নাট্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

বাল্যশিক্ষার পরিণাম ও গুরুভক্তি—লেখক ও প্রকাশক—শ্রী কৈলাসচন্দ্র দে (কালীর বাজার, কাঠাল, ময়মনসিংহ) পৃঃ ৫৯ ; মূল্য ।৵০

ছাত্রগণের অপকর্ম্ম নাট্যকারে বর্ণিত হইয়াছে।

যোগ ও যোগৈশ্বর্য্য—শ্রী সন্তোষকুমার মিত্র প্রণীত। পৃঃ ৮০ ; মূল্য ৸০ (প্রাপ্তিস্থল, গ্রন্থকার ২২ নং শিবপুর রোড, হাওড়া)।

ষট্‌চক্র, কুণ্ডলিনীশক্তি, প্রভৃতি অনেক বিষয় এই পুস্তিকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যোগতত্ত্ব ও বক্তৃতা—পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। পৃঃ ৯২। মূল্য ॥০।

এ পুস্তিকাও যোগতত্ত্ব বিষয়ক।

আবেগ—গ্রন্থকারের নাম নাই। পৃঃ ৩২। বিনামূল্যে বিতরিত। প্রাপ্তিস্থান আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মেসীর ম্যানেজার, ৭৯ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধর্ম্মবিষয়ক ৩৯টি গান ; ভাবপূর্ণ।

আশ্রম-চতুষ্টয়—প্রথম খণ্ড, ব্রহ্মচর্য্য (ছাত্রজীবন)—শ্রী সুরেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী প্রণীত। ঢাকা, ভারত ঔষধালয় হইতে শ্রীনিযোর-চন্দ্র দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১২৭ ; মূল্য ৸০ আনা, (ছাত্রদের জন্য ॥০ আনা)।

অনেক কাজের কথা আছে ; কিন্তু এমন উপদেশও আছে, যাহা আমরা ব্রহ্মচর্য্যবিরোধী ও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করি।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ

অমিয়—শ্রী তমাললতা বসু। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

ছোট গল্পের বই। লেখিকার লিখন-ভঙ্গী অতিশয় সরল। সুতরাং গল্পগুলি সম্পূর্ণ সাদাসিধা। "অনাদৃতা" ও "অবিশ্বাসী" গল্প দুইটি সুন্দর, হৃদয় স্পর্শ করে। অতিশয় সরল রচনায় একটি ত্রুটি এই যে, তাহাতে প্রায়ই শিল্পকৌশলের অভাব দেখা যায়। আলোচ্য পুস্তকের কয়েকটি গল্প এই হিসাবে ঠিক গল্প হয় নাই, সংক্ষিপ্ত একটানা বিবৃতি হইয়াছে মাত্র। এই ত্রুটি সত্ত্বেও বইখানি বেশ সরস, করুণ ও প্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

(১) পরীর দৃষ্টি—শ্রী অখিল নিয়োগী, দাম ছয় আনা।

(২) কৃতবোধ—শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চার আনা।

(৩) সুরথ রাজা—শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ছয় আনা।

(৪) দধীচি—শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চার আনা।

(৫) রঘুনাথ—শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চার আনা।

(৬) শ্রীচৈতন্য—শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ছয় আনা।

(৭) বাম মামা—শ্রী অখিল নিয়োগী, ছয় আনা। সাতখানি পুস্তক কুলজা সাহিত্য মন্দির, ৩০ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

এই সাতখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ঝরঝরে ভাষায়, সরল রচনায়, চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে ও গঠন-পরিপাট্যে পুস্তকগুলি শিশুদের পক্ষে লোভনীয় হইয়াছে।

গ্রামের কাজের ক খ গ—শ্রী গুরুসদয় দত্ত প্রণীত। এক আনা।

পদ্যে গ্রামের উন্নতির পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পদ্য-রচনায় ত্রুটি আছে। তবে বিষয়টির গুরুত্বের দিক্ বিবেচনা করিলে পুস্তকটি প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-নীতি—ডাঃ শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র বসু। ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। তিন আনা।

শরীর-রক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয় পন্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুস্তিকাটি মূল্যবান।

পল্লী-সংগঠন—শ্রীসরসীলাল সরকার। চার আনা। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীকে সংস্কৃত করিবার কতকগুলি প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ইহাতে আছে।

জয়দেব (১ম খণ্ড)—শ্রী প্রভাসচন্দ্র দে। এক টাকা।

কবি জয়দেবের জীবন-কথা বাংলা সাহিত্যে নাই বলিলেও চলে। আলোচ্য পুস্তকখানি সে-অভাব কিয়দংশে দূর করিবে। ইহাতে জয়দেবের "জীবনী, কাব্য-পরিচয়, গীত-গোবিন্দের ধর্ম্ম ও সম-সাময়িক সমাজ-চিত্র" প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দেব সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী ও অভিমত সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার বৃহৎ জীবনী-রচনার বহু উপকরণ একত্র করিয়াছেন। পুস্তকটির দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

"কৃষ্ণকান্তের উইল"এর আলোচনা—শ্রীললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ১৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

লেখক মহাশয় বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ও রসরচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার বহুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত "ফোয়ারা" পুস্তক আজও বাঙালীকে সমান আনন্দ দান করিতেছে। বাংলা সাহিত্যে সে-পুস্তক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আলোচ্য পুস্তকে প্রকাশিত বঙ্কিম-চন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র-সমূহের আলোচনাগুলি যখন মাসিক পত্রিকায় বাহির হইতেছিল তখনই পাঠক-সমাজ সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আজ সেগুলি একত্রিত হওয়ায় বাঙালী পাঠকের উপকার হইল। লেখক মহাশয় অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত বঙ্কিমচন্দ্রকে সুন্দর ভাবে বুঝিয়াছেন। চরিত্রগুলির আলোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিশদ, সরল ও সারবান হইয়াছে। তাঁহার বিশ্লেষণপন্থা সরল ও ভাষা প্রাঞ্জল বলিয়া পুস্তকখানি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে এই পুস্তক যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

কথা, কণিকা, চৈতালি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে আট আনা, বারো আনা, পাঁচ আনা।

রবীন্দ্রনাথের তিনখানি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের সুলভ নব-সংস্করণ।

যোগাভ্যাস বা জপমাহাত্ম্য—শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় এস, এন, চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদার, ৫৫।৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

পুস্তকটির নামই উহার পরিচয়। যোগাভ্যাসের উপায় ও নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্রধনু—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম ৪।৫টি কবিতা কাঁচা রচনা। সেগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত না করিলেই ভাল হইত।

বাকী কবিতাগুলি ভাবগাম্ভীর্য্যে ও শব্দসম্ভারে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। "ভূপর্য্যটক" কবিতাটি সুন্দর। সুলেখক হিসাবে সুরেশবাবু পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই কাব্যগ্রন্থ তাঁহার যশ বর্দ্ধিত করিবে।

প্রতিধ্বনি—শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল। আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

কবিতা ও গানের বই। গানগুলি বিবিধ বিষয়ক। ভারতমহিমা, ভক্তিতত্ত্ব ও জীবনের বিচিত্র উপলব্ধি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রচনা সরল ও আবেগময়। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পাঠকসমাজে ইহা আদৃত হইবার যোগ্য।

সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন। তরুণ সাহিত্য মন্দির, ১৯ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

বিনয়বাবু কয়েকখানি দেশহিতমূলক গ্রন্থ লিখিয়া বাঙালীসমাজের উপকার করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি সেগুলির অন্যতম। এখানি দ্বিতীয় সংস্করণ লাভ করিয়াছে। ইহাতে সুইজারল্যাণ্ডের সুবিস্তৃত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষা বেশ সরল। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে এই জাতীয় পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নারীর কেশ—শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। দি বুক হল, পি-৮১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। দেড় টাকা।

পুস্তকখানিতে আঠারটি ছোট গল্প আছে। অধিকাংশ গল্পই অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক। ইহার মধ্যে আবার অপূর্ব্ব সুন্দর হইতেছে "গৌরী", "স্নেহের শাসন" ও "নারীর কেশ" এই তিনটি গল্প। 'গৌরী' গল্পটি প্লটের নূতনত্বে এবং সরল অভিব্যঞ্জনায় ও করুণ-রস-সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহের অন্যতম। এক বিদ্রোহী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক জেল খাটিয়া আসিবার পর পুলি-শের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া আত্মগোপনের জন্য খুনী ও বদমায়েসদের আড্ডা এক দুর্গন্ধময় পচা বস্তীতে একটি অন্ধকারময় ঘরে তাহার গুণবতী স্ত্রী ও ৫।৬ বৎসরের কন্যা গৌরীকে লইয়া বাস করিত। সে বস্তীর অন্ধকার গলিতে রাত্রিতে রক্তমাখা ছোরা লইয়া অনেক খুনী আসিয়া লুকাইয়া থাকিত, আবার অনেক পেশোয়ারী পকেট-মার সেখানে আড্ডা গাড়িত। গৌরী ছেলেমানুষ, সে এইসব লোক-

দের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করিত ও ইহাদের তৃষ্ণা পাইলে জল ও ক্ষুধা পাইলে যা'র কাছ হইতে ভাত আনিয়া যোগাইত। এই রকমে সে ঐ সব জুয়াচোর, পকেটমার ও খুনীদের মা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গল্পের শেষভাগে এই গৌরীর মৃত্যু এবং তাহার মৃত্যুকালে ঐ সব লোকদের গৌরীর প্রতি অদ্ভুত করুণা গল্পটিকে আশ্চর্য্য রকম নূতন ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এই জাতীয় করুণরসাত্মক গল্প আরও আছে। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought—শেলীর এই উক্তি, এই গল্পগুলি পড়িয়া আমরা সজীব সত্যরূপে বোধ করিতে পারিয়াছি।

লেখক মহাশয়ের ভাষার উপর বিশেষ অধিকার আছে এবং তাঁহার শব্দসম্পদ যথেষ্ট। গল্পগুলি পাঠককে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দান করিবে। প্রত্যেকটি গল্প অতিশয় স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিয়াছে।

লেখক মহাশয় আরও গল্প লিখিয়া বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করুন। বইখানির ছাপা ও বাঁধানো ইহাকে উপহারের উপযোগী করিয়াছে।

বাংলার বীর—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ। গোল্ড কুইন্ এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

ভীরু, অলস, দুর্ব্বল ও শ্রমবিমুখ বলিয়া বাঙালী জাতির দুর্নাম আছে। এই বাঙালী জাতির মধ্যেই যে প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায়, কেদার রায়, সীতারাম, মোহনলাল, সুরেশ বিশ্বাস, শ্যামাকান্ত, গোবর প্রভৃতি বহু বিখ্যাত যোদ্ধা ও পালোয়ান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। বিগত মহাযুদ্ধেও যে, বহু সাহসী বাঙালী যুবক বিশেষ কৃতিত্বের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাও এখন আমাদের স্মরণ করা উচিত। এই পুস্তকে এই জাতীয় বহু শক্তিমান বাঙালীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা বিবৃত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বাঙালী বীরের একখানি করিয়া চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপর ছাপা ও বাঁধন সুন্দর হওয়ায় বইখানি উপহার দিবার যোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থকার মহাশয়ের ভাষা মন্দ নয়, তবে তাহা আর-একটু সরল হইলে বইখানি ছেলেমেয়েদের কাছে উপাদেয় হইত। যাহা হউক এতগুলি বীর বাঙালীর জীবনকথা একত্র করিয়া গ্রন্থকার সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শক্তিচর্চ্চার দিকে বাঙালী ছেলেরা যতই প্রণোদিত হইবে ততই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে। আলোচ্য পুস্তকখানি সেবিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। গ্রন্থকারের আক্ষেপের সহিত আমরাও আক্ষেপ করিয়া বলি—"হায় দুর্ব্বল, রুগ্ন, আলস্য-নিদ্রাভিভূত বাঙালী! একবার প্রতাপের কীর্ত্তি, সীতারামের কীর্ত্তি,—তোমার স্বদেশীয়ের সংগ্রামকুশলতা,—তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের বীর্য্যবত্তা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা কর,—আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সেই অতীত গৌরব-গরিমার আভায় ভূষিত করিতে চেষ্টা কর।"

মসজিদ ও মন্দির—শ্রী প্রমথনাথ সান্যাল শাস্ত্রী। প্রকাশক শ্রী নরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, আর্য্য পাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

পুস্তকের নাম হইতেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে। আচার, অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-পদ্ধতি ইত্যাদি লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিভিন্নতা বা বিরোধ তাহা যে মূলতঃ অতি নগণ্য, এবং উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে যে নিগূঢ় ঐক্য ও সাম্য বর্ত্তমান আছে তাহা অতিশয় সরল ভাষায় সরল ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান জাতির প্রতি লেখকের এমন একটি স্নিগ্ধ প্রীতিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যাহাতে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়। পুস্তকখানি বহুল প্রচারিত হইলে দেশের মঙ্গল হইবে।

সীবন ও কাটিং শিক্ষা—শ্রীমতী তুষারমালা দেবী। আচার্য্য এণ্ড সন্, মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা। দেড় টাকা।

লেখিকা সীবন ও কাটিং কার্য্যে অতীব সুদক্ষা এই পুস্তকে তিনি নক্সা সহযোগে সেলাইয়ের কলের বিবরণ ও নানাবিধ পোষাক তৈয়ারীর যে সব নির্দ্দেশ ও প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বাঙালী মেয়েদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে। পুস্তকখানি বাঙালীর মেয়েরা কিনিয়া পড়ুন ও এবিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া গৃহসংসারের ব্যয়সঙ্কোচে মনোযোগী হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

গুপ্ত

তুলসীদাসী রামায়ণ—পদ্যানুবাদক পণ্ডিত শ্রী রাধিকাপ্রসাদ বেদান্তশাস্ত্রী। প্রকাশক শ্রী বেণীমাধব সরকার। প্রাপ্তিস্থান মহামণ্ডলভবন, জগৎগঞ্জ, বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট। মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

বাংলাভাষাভাষীদের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যেমন একাধিপত্য তেমনই হিন্দীভাষাবিদ্‌দের নিকট তুলসীদাসী হিন্দী রামায়ণের একাধিপত্য। তুলসীদাস-রচিত রামায়ণ-রসামৃতপানে বাঙ্গালী জনসাধারণ এতদিন বঞ্চিত ছিল, গ্রন্থকার ও প্রকাশকের শ্রমসাধ্য চেষ্টায় এ অভাব দূর হইল ও সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরত্নমালায় একটি নবরত্নও সংগৃহীত হইল। গ্রন্থারম্ভে গোস্বামীপাদের চিত্র ও জীবনী দেওয়া হইয়াছে। জীবনীটি গভীর গবেষণার ফল, তজ্জন্য গ্রন্থকার অশেষ প্রশংসার্হ। ৯২৫ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া সপ্তকাণ্ডে গ্রন্থটি সুসজ্জিত, তদ্ভিন্ন মাহাত্ম্যবর্ণনাদিও আছে। রামায়ণ সম্বন্ধীয় মাত্র ৪ চারিটি চিত্র গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। আরও বেশী পরিমাণে বিশেষ বিশেষ চিত্র সন্নিবেশিত হইলে গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি হইত। পদ্যানুবাদ, ছাপা, বাঁধাই চলনসই। মোটের উপর এ গ্রন্থ বহুল প্রচারের উপযোগী, কিন্তু মূল্যাধিক্য বশতঃ আশানুরূপ প্রচার হইবে কিনা সন্দেহ।

চক্র

বাঙ্গালী এবং বৈদ্যজাতি—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ও শ্রীগিরিজামোহন রায়। আজিমগঞ্জ পোঃ, জেলা মুর্শিদাবাদ। ১৩৩৪।

এ দেশে জন্মগত জাতির অভিমান এতটা প্রবল যে, এ সম্বন্ধে সাহসের সঙ্গে কিছু আলোচনা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এ অবস্থায় গ্রন্থকারগণ যেরূপ নূতন ভাবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, তাহার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল বাঙালী তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিবেন না।

প্রথম ভাগে বাঙালীর জাতিতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেরই আকৃতি একরূপ—দেখিলেই মনে হয় এক জাতি। "বাঙ্গালী আর্য্যেতর সভ্য জাতি," "বাঙ্গালীর ভাষাও আর্য্য ভাষা হইতে স্বতন্ত্র।" যুধিষ্ঠির এবং বিদুর বঙ্গদেশ হইতে "ম্লেচ্ছ" ভাষা শিক্ষা করেন। "বাঙ্গালী কলহ করিবার সময় জাতিভেদ স্বীকার করে, নিজের অন্তরে জাতিভেদ মানে না।" "বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বেদধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার প্রয়োজন ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে হয় নাই; কেবল বঙ্গদেশেই

হইয়াছিল।" "আর্য্যজাতির শক্তির অবসান হইলেও বাঙ্গালী বহুকাল যাবৎ শক্তিশালী ছিল এবং অদ্যাপি সেই শক্তির পরিচয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা সমধিক ভাবে দিতেছে।" "বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য এবং কায়স্থ এই তিন জাতিই প্রকৃতপক্ষে একই জাতি।"

দ্বিতীয়ভাগে বৈদ্যজাতির সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের কথাও আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারগণ নিজেরাও বৈদ্য, সুতরাং তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কোন বিদ্বেষের সম্ভাবনা নাই। "বঙ্গদেশেই 'বৈদ্য' শব্দ জাতিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; ভারতবর্ষের অন্য স্থানে হয় নাই।" বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতি মহাভারতের "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ" শ্লোকাংশের বৈদ্য শব্দ দ্বারা বৈদ্যজাতি বুঝাইতে চান, কিন্তু গ্রন্থকারগণ ইহার ভুল দেখাইয়াছেন। আবার ঐ সমিতি "আয়ুর্ব্বেদজ্ঞকে" "ত্রিজ" বলিয়া ব্রাহ্মণের উপর স্থান দিতে চাহেন। এই সব ইচ্ছাকৃত অসত্য প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বৈদ্যগ্রন্থকারগণ নিজ সমাজের উপকার করিয়াছেন। "বৈদ্য ব্রাহ্মণও নহে অম্বষ্ঠও নহে, কেবল আর্য্যপ্রচলিত জাতিভেদ গ্রহণকালে আর্য্যোচিত ব্যবহারের সাদৃশ্য রক্ষার জন্য অম্বষ্ঠের বা বৈশ্যের ন্যায় অশৌচ এবং উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল মাত্র। অম্বষ্ঠ নাম গ্রহণ করে নাই, পণ্ডিতার্থক বৈদ্য নাম গ্রহণ করিয়াছিল...কায়স্থগণও শূদ্র নহে বা ক্ষত্রিয় নহে, কারণ তাহারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, কেবলমাত্র অশৌচ দ্বারা নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল, জ্ঞান এবং শক্তিমত্তায় ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য অপেক্ষা হীন নহে।"

বর্ত্তমান কালের উপযোগী নূতন সমাজ গঠনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া গ্রন্থকারগণ বলিয়াছেন—"সর্ব্বজাতিকে আহ্বান করিয়া নূতন স্মৃতিশাস্ত্র (?) প্রণয়ন কর যদ্দ্বারা এই সকল দোষ নিবারিত হয়।" তাঁহাদের সকল কথার সঙ্গে মত না মিলিলেও আশা করি আমাদের সামাজিকেরা এই কথার মূল্য বুঝিতে পারিবেন, কারণ নূতন ধরণে সমাজগঠনের উপরেই বর্ত্তমানের রাজনীতি, শিক্ষানীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতির কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

মেঘ—শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু। প্রকাশক সুধীরকুমার বসু, উকীল, ময়মনসিংহ। ছয় আনা।

এই ক্ষুদ্র নীতিকাব্যের লেখক বহুদিন যাবৎ কবিতা রচনা করিতেছেন।

তাঁহার রচিত "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" কাব্য স্বদেশীর সময় আদৃত হইয়াছিল এবং তিনি প্রতাপাদিত্য উৎসবের একজন উৎসাহী অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান কাব্যখানি মেঘ সম্বন্ধে রচিত। উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড-কবিতা রচনার পদ্ধতিতে ইহা লিখিত হইয়াছে। এরূপ রচনার প্রধান গুণ এই যে, ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না—সাদাসিধা ছন্দ, সাদাসিধা ভাবে বক্তব্য বিষয়কে মোটেই জটিল করিয়া তোলে না।

শ্রীরমেশ বসু

আবৃত্তি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রকাশক শ্রীপূর্ণেন্দু-বিকাশ দত্ত, চট্টগ্রাম। দাম এক টাকা।

গীতি-কবিতার বই। লেখক জানাইয়াছেন, এসব কবিতা তাঁহার কৈশোর-রচনা। আমরা পড়িয়া আনন্দিত হইলাম, এবং লেখকের পরবর্ত্তী দানের অপেক্ষায় রহিলাম।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন-চরিত—৺রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর প্রণীত। পঞ্চম সংস্করণ। দাম এক টাকা।

গত শতাব্দির মধ্যভাগে যাঁহারা সংস্কৃত কলেজকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কৌতূহলপ্রদ জীবন-কাহিনী অনেকের আজ জানা নাই। সংস্কৃত টীকাকার হিসাবে তিনি 'পূর্ব্ব নৈষ' ও 'রাঘবপাণ্ডবীয়ম্' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাব্যগুলিকে পাঠকদের নিকট সহজবোধ্য ও আদরের দ্রব্য করিয়া গিয়াছেন। অনেক কাব্য ও নাটকের গ্রন্থ সংগ্রহ ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াও তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত কবিতা রচনায়ও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তৎকালীন অনেক তথ্যই এই জীবনী পাঠে জানা যায়।

'রাঘবপাণ্ডবীয়ম্'—৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কৃত টীকা সহিত। দাম আড়াই টাকা।

আজকাল আর এই কাব্যখণ্ড বড় পঠিত হয় না; কিন্তু ইহার 'কপাট-বিপাটিকা' টীকা সত্য সত্যই পাঠকের নিকট এই কাব্য-রসের দুয়ার খুলিয়া দেয়। বোম্বাই নির্ণয়-সাগর যন্ত্রালয় হইতে শশধরকৃত টীকার সহিত এই কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তর্কবাগীশ মহাশয়ের মাহাত্ম্য ও পাণ্ডিত্য অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

ভারদ্বাজ

রূপতৃষ্ণা—শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য এক টাকা। রেশমী কাপড়ে বাঁধান, সোনার জলে নাম লেখা। ১৪ নং জগন্নাথ দত্তের লেন, কলিকাতা।

গ্রন্থখানিকে উপন্যাস না বলিয়া একটানা একটি বড় গল্প বলাই সঙ্গত। এই সরস গল্পটি ভালই জমিয়াছে; ভাষাও বেশ কবিত্বপূর্ণ। আমরা ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

স

ধূপ-ধুনা—কবিতা-পুস্তক। হীরেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত। মূল্য ১৲। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৩৫

কয়েকটি কবিতা। পুস্তকটি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিলাম। ছাপা বাঁধাই ভাল হইয়াছে। তবে ৪০ পাতার বইএর দাম ১৲ অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে।

গ্রন্থকীট

তরুণ বাংলা—শ্রী নলিনীকিশোর গুহ প্রণীত। প্রকাশক আর্য্য সাহিত্য ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১০৩ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা।

'বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ', 'বিপ্লবের পথে', 'ভারতের দাবী' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক নলিনীবাবু বাঙলার নিবন্ধ-সাহিত্যের অন্যতম চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 'তরুণ বাংলা'য় বারোটি ছোট ছোট প্রবন্ধে আজিকার নূতন নূতন সমস্যা ও চিন্তাধারার যে স্বাধীন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁহার জোরালো লেখার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আরো সমৃদ্ধি লাভ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 'জাতির দুর্গতি দূর করিতে হইলে, জাতির দুর্ম্মতিও দূর করিতে হয়'—এই দুর্ম্মতি যে আমাদের কত রকমের, কত ভাবে কত রূপে যে আমরা আমাদের নিজদেরকেই ছলনা করিয়া চলিয়াছি, এই বইটির প্রত্যেকটি

প্রবন্ধে তাহার ইঙ্গিত আছে। "মনের দাসত্ব' 'সাম্যের কথা' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বাধীন চিন্তার ক্ষতি ও যুক্তির ক্ষমতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তেজীয়ান্ অথচ সহজবোধ্য ভাষায় অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল যুবকেরই বইখানি পড়িয়া দেখা উচিত। ছাপা, বাঁধাই কাগজ বেশ সুন্দর ও মজবুত—তবে বইখানির দাম আর-একটু কম—এক টাকা—হইলে ভালো হইত।

নী. র রায়

হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ—শ্রী অনিলবরণ রায় প্রণীত। হিন্দু-মিলন বাণীমন্দির হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ফরমার ৭৯ পৃষ্ঠায় পূর্ণ এই পুস্তকখানিতে নিম্নলিখিত আটটি সন্দর্ভ আছে, মাতৃপূজা, পুরুষোত্তমের উপাসনা, বেদের পরিচয়, ঋগ্বেদে সোমদেব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গীতা কি নীতি-শাস্ত্র, ধর্ষিতা রমণী ও হিন্দুসমাজ এবং জাতীয় আন্দোলন ও আধ্যাত্মিকতা।

এই সকল প্রসঙ্গ এমন প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে, বিষয়-গুলি জটিল হইলেও লেখার গুণে সরল ও সহজবোধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে হিন্দুদের সমাজতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব এ সমস্তই নূতন করিয়া পড়িতে হইবে, নূতনভাবে বুঝিতে হইবে। প্রাচীনেরা যে-সকল কুসংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন,—তাহার পরদা কাটিয়া—নূতনেরা যে তীব্র উৎকট পাশ্চাত্য আলোক আনিয়াছেন—তাহা হইতে দূরে থাকিয়া, আবার আমাদের ঘরের কথা নূতনভাবে আলোচনা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের আদর্শ সনাতন, কিন্তু যুগে যুগে যুগোপযোগী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই সুপ্রাচীন আদর্শ ভারতবর্ষের জ্ঞানধর্ম্ম ও নীতির চিরন্তন দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। লেখক বুঝাইয়াছেন—বেদে যাহা সূত্রাকারে ছিল, উপনিষদে সেই সত্যের আধ্যাত্মিক অংশটা উজ্জ্বল হইয়াছিল—যুগের প্রয়োজনানু-সারে। সেই আধ্যাত্মিকতা যখন সংসার-বিমুখ বৈরাগ্যে পরিণত হইয়া জনসাধারণকে সংসারটা উপেক্ষা করিতে শিখাইল, তখন সেই সুপ্রাচীন আদর্শ আবার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল গীতোক্ত কর্ম্ম-বাদে, যুগের প্রয়োজনানুসারে। এই গীতাকে যাঁহারা কতকগুলি চিরন্তন কর্ম্ম-নীতি মনে করেন, লেখক দেখাইয়াছেন—তাঁহারা জড়বাদী; এই মহা গ্রন্থের আধ্যাত্মিকতাটা ধরিতে না পারিয়া তাঁহারা উহা পাশ্চাত্য Ethics বলিয়া ভুল করিতেছেন। তারপর তন্ত্র পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দের লীলা বুঝাইতে আসিল—তাহাও যুগের প্রয়োজনানুসারে।

যুগে যুগে এই ভাবে ভারতের নিজস্ব আধ্যাত্মিকত্ব—যোগ ও ভোগ এই উভয়ের মধ্যে নির্বিকল্প নির্ম্মল সন্ধির সম্পর্কে স্থাপন করিয়া মানুষকে উচ্চরাজ্যে লইয়া গিয়াছে। এখন দিন আসিয়াছে যখন আমাদিগকে প্রাচীন সংস্কারগুলি ত্যাগ করিতে হইবে, নবকর্ম্ম-শীলতার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। যে-মাটিতে আমরা জন্মিয়াছি—তাহা যে আমাদের পিতৃপুরুষদের পদরজঃ দ্বারা পবিত্র হইয়াছে, তাহার উপর যে শত শত বৎসরের মন্দিরোত্থিত ধূপ-ধূনার পবিত্র হাওয়া বহিয়া গিয়াছে—তাহা যে শত শত বৎসরের সন্ধ্যারতির পঞ্চপ্রদীপ শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদ চিরপবিত্র করিয়া রাখিয়াছে—সেই মাটিতে পড়িয়া যুক্ত করে বলিতে হইবে—তুমি আমার স্বর্গ। অপর দেশের সভ্য এদেশে কুহেলিকা স্বরূপ আসিয়া আমাদের চক্ষু দুটি ঘোলাটে করিয়া দিয়াছে—কিন্তু চক্ষু দুটি নির্ম্মল করিয়া দেশকে প্রতিমার মত—দুর্গোৎসবের মণ্ডপে দুর্গার মত—ভক্তির সহিত দেখিতে হইবে.। আমাদের জাতি যে মহা শিক্ষার শিক্ষক, যে মন্ত্রের জগৎগুরু—সেই শিক্ষা—সেই মন্ত্র পুনরায় তপস্যা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে।

অনিলবাবু পাঠকের চিন্তাশীলতার উদ্রেক করিবার জন্য নানা কথা পাড়িয়াছেন। আমাদের সম্মুখে উৎকট সমস্যা—এইবার মৃত্যু অথবা নবজীবন। যদি ঋষিদের তপঃবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারি—তবে বাঁচিব, নতুবা আলস্য, কুসংস্কার, ভ্রাতৃ-বিরোধ,—পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এবং কর্ম্মহীনতা যাহা আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে—সেই অহিফেন, সেই হলাহল পান করিলে মৃত্যু অবধারিত।

ধর্ষিতা রমণীদের সম্বন্ধে অনেক মামুলি কথা শুনিতেছি। কিন্তু হিন্দুরমণীদের মধ্যে যে পরস্পর্শজনিত আতঙ্ক আছে এবং অপরস্পৃষ্ট স্ত্রীলোকের প্রতি বদ্ধমূল ঘৃণা আছে—তাহা দূর করিবার উপায় কি? তাহা দূর না হইলে ধর্ষিতা রমণী যে মহিলা-কুলে মিশিতে পারিবেন না। পুরুষেরা বড় বড় নীতির উচ্চডঙ্কা বাজাইতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদের স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট বিদ্রূপ ও টিটকারী হইতে সেই হতভাগিনীদিগকে বাঁচাইবেন কে? সে একদিনের কর্ম্ম নহে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাঁহারা যে আদর্শের পূজা করিয়া আসিয়াছেন—তাহাতে মলিনতা প্রবেশ করিলে তাহারা সেটির প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না। যে-পর্য্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা এতটা না হইবে, যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন স্বকৃত কর্ম্মের জন্যই লোক দায়ী, পরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত লোক দয়ার পাত্র—তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও উপেক্ষা দেখাইলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া হয়—সে-পর্য্যন্ত আড়ালের কাণকথা ও ফিস্‌ফাস কমিবে না, এবং সেই অর্দ্ধোচ্চারিত নিদারুণ সন্ধানের আঘাত শুধু সেই রমণীটি পাইবেন না, তাঁহার সন্তানাদি, এবং স্বামী ও স্বগণ সকলেই তাহা ভোগ করিবেন। এই সংস্কার দূর হইতে অনেক দিন লাগিবে, এবং যে-পর্য্যন্ত এদেশের স্ত্রীলোকের সংস্কার একবারে দূর না হয়, সে-পর্য্যন্ত দুর্ভাগিনীদিগের জন্য আশ্রমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি কোন স্বামী বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁহাদের কষ্টের বোঝা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে উদার প্রেমের গণ্ডীতে স্থান দেন, তবে ভাল,---নতুবা জোর-জবরদস্তি এক্ষেত্রে চলিবার আশা নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ'

সাইকো-এনালিসিস্ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেক ক্ষেত্রেই সাইকো-এনালিসটরা ঠিক কি বলেন ও কেন তাহা বলেন, না বুঝার ফলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাও সাইকো-এনালিসিসের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করেন। প্রবাসীর গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে সরসীবাবু ও রবীন্দ্রনাথ এমন সব কথা বলিয়াছেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, যাহার সাইকো-এনালিসিসের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। সাধারণের মনের সেই ভ্রান্ত ধারণা উক্ত প্রবন্ধের দ্বারা আরও দৃঢ় হইতে পারে বলিয়া এবিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি।

সাইকো-এনালিসিস্ মনের অজ্ঞাত প্রদেশে যে-সকল ব্যাপার চলিতেছে তাহারই আলোচনা করে। জ্ঞাতসারে মনে যে-সকল ভাব বা চিন্তার উদয় হয়, তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে সন্দেহ নাই। এই সকল চিন্তা যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে তাহাও সুনিশ্চিত। এই মনোবৃত্তিগুলির আলোচনা মনোবিদ্যার অন্তর্গত। সাইকো-এনালিসিসের ইহার সহিত কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। মনের অজ্ঞাতে বা নির্জ্ঞানে যে-সকল ব্যাপার ঘটে, বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা সাইকো-এনালিসিস্ তাহারই অস্তিত্ব নিরূপণ করে। এই নির্জ্ঞানে কি ঘটিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিবার কোনই উপায় নাই। মানুষের জ্ঞাতসারে যে-সকল চিন্তার উদয় হয়, স্বপ্নে সে যাহা দেখে, দৈনন্দিন ব্যাপারে তাহার যে ব্যবহার লক্ষিত হয়, সে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি করে, সে যে অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনে যে ভাব উদিত হয়, তাহারই সম্যক আলোচনা করিয়া সাইকো-এনালিসট বলেন তাহার অজ্ঞাত মনে কি আছে। সাইকো-এনালিসিসের সমস্ত কথাই এইরূপ অনুমানসিদ্ধ; তাহা প্রত্যক্ষের ব্যাপার নহে। নির্জ্ঞান হইতে যে মুহূর্ত্তে কোন চিন্তা সংজ্ঞানে আসিয়া মনের গোচরীভূত হইল তখনই তাহা আর সাইকো-এনালিসিসের আলোচ্য বিষয় রহিল না। নির্জ্ঞান-মনোবিদ পরীক্ষা করিয়া যদি বলেন যে, রামের মনের অজ্ঞাত প্রদেশে অমুক 'কু-ইচ্ছা' লুকায়িত আছে তবে রাম তাহা অস্বীকার করিলেও গ্রাহ্য হইবে না, কারণ রাম নিজের সংজ্ঞানের কথাই কেবল বলিতে পারেন। কথা উঠিবে, নির্জ্ঞান-মনোবিদ নিজের খেয়াল মত রামের 'কু-ইচ্ছা' দেখিতেছেন, এবং রাম অস্বীকার করিলে তারিণী কবিরাজের মত বলিতেছেন 'হয়, হয়, zানতি পার না'। এমন কি প্রমাণ আছে যাহাতে নির্জ্ঞান-মনোবিদের কথা সত্য বলিয়া বুঝিব? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নির্জ্ঞান মনোবৃত্তির কোন প্রমাণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে না। যে-মুহূর্ত্তে কোন বৃত্তি প্রত্যক্ষ হইল তখনই তাহা আর অজ্ঞাত রহিল না, সুতরাং সাইকো-এনালিসিসের কোঠায় পড়িল না। প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ নহে। আদালতে পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ফাঁসি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়, এবং সমস্ত বিজ্ঞানেই অনুমানের এক বিশেষ স্থান আছে। পরোক্ষ প্রমাণের যেসব গুণ থাকিলে আদালত বা বিজ্ঞান তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মতই মূল্যবান মনে করেন, সেই প্রকার গুণ থাকিলেই নির্জ্ঞান-মনোবিদ পরোক্ষ প্রমাণকে গ্রহণ করেন, নচেৎ নহে। নির্জ্ঞান-মনোবিদ্যার দোহাই দিয়া কেহ যদি অপ্রামাণিক কথা বলেন, তবে তাহা সাইকো-এনালিসিসের দোষ নহে; হাতুড়ের অপরাধের জন্য চিকিৎসক দায়ী নহেন। যে-সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্জ্ঞান-মনোবিদ কথা বলেন তাহার সম্যক আলোচনা না করিয়া কাহারও তাহা অস্বীকার করিবার অধিকার নাই। রবিবাবু সাইকো-এনালিসিসের বিরুদ্ধে যে-সব আপত্তি তুলিয়াছেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা বিদেশে বহুপূর্ব্বেই উত্থাপিত হইয়াছিল। নির্জ্ঞানে কি আছে কি নাই তাহা যিনি নির্জ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়াছেন কেবল তিনিই বলিতে পারেন—অন্যে নহে। এই নির্জ্ঞান অনুসন্ধান করিয়া এমন অনেক চিন্তাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যাহা মানিতে আমাদের লজ্জা ও কষ্ট হয়। যে মনোবৃত্তির অস্তিত্ব মানিতে কোন বাধা নাই তাহার নির্জ্ঞানে প্রচ্ছন্ন থাকিবারও কোন প্রয়োজন নাই। ডারউইন যখন অনেক গবেষণার পর বলিলেন নর ও বানরের পূর্ব্বপুরুষ এক, তখন অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ডারউইনের প্রমাণ আলোচনা করিয়া পরে তাহার বিরুদ্ধে কেহ মত দিলে বৈজ্ঞানিক তাহা গ্রাহ্য করিতেন। আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া কোন মত বৈজ্ঞানিক পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই জিনিষ থাকা সম্ভব বা থাকা সম্ভব নয় তাহাও বৈজ্ঞানিক পূর্ব্বে হইতেই মানিয়া লইতে পারেন না; অনুসন্ধানের ফলে যাহা মিলিবে তাহাই মানিতে হইবে। সমস্ত মানসিক বৃত্তির বীজ লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন বৃত্তি তাহার মনে বিকশিত হইতে পারে। কোন্ বৃত্তির বশে সে কোন্ কাজ করিল, তাহা একমাত্র অনুসন্ধান দ্বারাই নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। সমস্ত কাজেরই মানুষ একটা জ্ঞাত কারণ নির্দ্দেশ করে, এই জ্ঞাত কারণ ব্যতীত আরও কোন অজ্ঞাত কারণ তাহার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে কিনা তাহা যিনি নির্জ্ঞান অনুসন্ধান করিয়াছেন, কেবল তিনিই বলিতে পারেন। কামবৃত্তি, 'অহং-জ্ঞান' ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রেরণার বশে মানুষ চলে। কামবৃত্তি অনেক সময়েই নির্জ্ঞানে থাকিয়া মানুষকে চালায়, অতএব কোন্ কাজটি কতখানি 'অহংবৃত্তির' দ্বারা হইল, কতখানি কামবৃত্তির দ্বারা হইল, তাহা হাতে-কলমে নির্জ্ঞানের আলোচনা না করিয়া বলা যায় না। উল্লিখিত প্রবন্ধে দেখা যায়, রবিবাবু ও সরসীবাবু উভয়েই সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের পার্থক্য ভুলিয়া কথা বলিয়াছেন, এইজন্যই সাইকো-এনালিসিস-সম্বন্ধে তাঁহাদের মত গ্রাহ্য নহে। শিশুর মনে কি ভাবে ক্রমে ক্রমে 'অহং-জ্ঞানের' উদয় হয়, কি ভাবে কামবৃত্তি বিকশিত হয়, ইহাদের মধ্যে কোন্‌বৃত্তি প্রবলতর, কোন্ বৃত্তিই বা আগে দেখা দেয়, কোন্‌টিই বা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে তাহা যিনি শিশুর মানসিক জীবন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। কবি দার্শনিক প্রভৃতির মত

সব সময় বৈজ্ঞানিক মত নহে। নির্জ্ঞান-মনোবিদ্ কখনও এমন কথা বলেন না যে, একমাত্র কামই মনুষ্যের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। নির্জ্ঞান-মনোবিদ্ একথাও বলেন না, যে, তিনিই একমাত্র মানুষের মনের সমস্ত বৃত্তির উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন। কেবল অজ্ঞাত মন মানুষকে কতটা চালায় নির্জ্ঞান-মনোবিদ্ তাহারই অনুসন্ধান করেন। নির্জ্ঞানে কামবৃত্তি যে অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে, তাহা তিনি দেখিয়াছেন। কোন নির্জ্ঞানবিদ্ই নিজে অনুসন্ধান না করিয়া পরের কথা গ্রাহ্য করেন না, অতএব তাঁহাকে দাসমনোভাবাপন্ন বলিলে অবিচার করা হয়।

সরসীবাবুর প্রবন্ধ "Peculiarity in the imagery of Dr. Rabindranath Tagore's poems" সাইকো-এনালিটিক্যাল নহে, তাহা সাইকলজিক্যাল মাত্র। অজ্ঞাত মনের কোন প্রামাণিক আলোচনাই ইহাতে নাই। আমি যতদূর জানি ভারতবর্ষে কাব্য ও আর্ট-সম্বন্ধে সাইকো-এনালিসিসের দিক্ হইতে প্রথম আলোচনা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙীন হালদার মহাশয়ই করেন। তাঁহার প্রবন্ধ ইণ্ডিয়ান সাইকো-এনালিটিক্যাল সোসাইটিতে ও ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কন্‌গ্রেসে পঠিত হইয়াছে।

শ্রী গিরীন্দ্রশেখর বসু

—

কীর্ত্তিলতা ও বিদ্যাপতি

'কীর্ত্তিলতার' সমালোচনা উপলক্ষ্যে গুপ্ত মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বিরুদ্ধে রূঢ়ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। এই উপলক্ষ্যে নিজের অভ্রান্ততা বিষয়ে ও শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রমপ্রমাদ বিষয়ে তিনি অনেকগুলি কথা লিখিয়াছেন।

তাঁহার লেখার উদ্দেশ্য এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাপতির ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গুপ্ত মহাশয়ের মত খণ্ডন করিতে না পারিয়া একটি ভূমিকা লিখিয়া তাঁহার দোষ-প্রদর্শনের জন্যই 'কীর্ত্তিলতা'র ন্যায় একখানি প্রকাশের অযোগ্য অজ্ঞাত-পূর্ব্ব কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ভ্রম-প্রদর্শন-প্রিয়তাকে গুপ্ত মহাশয় "খুঁৎ-ভাচীনি" বলিয়াছেন অর্থাৎ কি না গুপ্ত মহাশয়ের "বিদ্যাপতির" সংস্করণে 'ব' কারের পেট কাটা আছে কি না অথবা 'র' কারের খুঁৎ ভা অর্থাৎ অধোবিন্দু দেওয়া আছে কি না তাহাই প্রদর্শনের জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূমিকার অবতারণা; কিন্তু তিনিই স্বয়ং তাঁহার 'কীর্ত্তিলতা'র সমালোচনায় এই 'খুঁৎ ভাচীনি' পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন।

তিনি বলেন; 'কীর্ত্তিলতা' বিদ্যাপতির তরুণ বয়সের লেখা, সেইজন্য এই গ্রন্থ সমাদর-যোগ্য নহে। কিন্তু তরুণ বয়সের লেখা হইলেও গ্রন্থখানিতে কাব্য-রস যেমন আছে, ঐতিহাসিক তথ্যও সেইরূপ আছে। গুপ্ত মহাশয়-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র অনেক পদে ললিত মধুর ভাষার নামগন্ধও নাই, কিন্তু 'কীর্ত্তিলতা' আগা-গোড়া কাব্যরসের উদাহরণে ভরপূর। শাস্ত্রী মহাশয় 'কীর্ত্তিলতা' সম্পাদন করিয়া বঙ্গবাসীর ও মিথিলাবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

তবে শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ দুইটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই এবং মধ্যে মধ্যে যে ভ্রম-প্রমাদ আছে একথা শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। (কীর্ত্তিলতার ভূমিকা ৵০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

গুপ্ত মহাশয়ের পদাবলীর ৩৪ ও ৪৪ সংখ্যক পদে নসরত শাহের (১৫২১—১৫২৬ ঈশাব্দ) নাম আছে এবং তাঁহার ৪৮৪ সংখ্যক গানে হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫২১ ঈশাব্দ) নাম আছে এইজন্য এবং ইহার প্রথম দুইটি পদে (৩৪ ও ৪৪) রাধাকৃষ্ণের নাম না থাকায় ও ৪৮৪ সংখ্যক গানে 'কহাই'এর সঙ্গে 'সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর' লেখা থাকায়, শাস্ত্রী মহাশয় এই গান-গুলি বিদ্যাপতির রচিত নহে, বলিয়াছেন। কিন্তু গুপ্ত মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাপতির যে-সকল পদ চৈতন্যদেবের কাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে তাহাতে রাধাকৃষ্ণের নাম থাকুক আর নাই থাকুক সেইগুলি সমস্তই রাধাশ্যাম সম্বন্ধীয় হইয়া গিয়াছে। যে গন্ধ পুষ্প অথবা গীতিমাল্য একবার দেবতার পাদপদ্মে অর্পিত হয় তাহা নির্ম্মাল্য হয়। বৈষ্ণব কবি ও সাধকগণ বিদ্যাপতির যে-সকল পদ গ্রহণ করিয়াছেন কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার একটিও বাদ দেন।"—(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) বৈষ্ণব তত্ত্বে বিভোর হইয়া তিনি যে-যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা গবেষণা-মূলক হয় নাই। তিনি এখন যে প্রকারে এই পদ-গুলির ভণিতা পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলিয়া স্বীকার করিতেছেন (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪, ২০৪ পৃঃ) গ্রন্থ সম্পাদন-কালে তাহা করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে ঐ তিনটি পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রী মহাশয় কীর্ত্তিলতার পুঁথি আবিষ্কারের সম্পর্কে কেবল মাত্র গ্রিয়ার্সনের নাম করিয়াছেন বলিয়া গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কীর্ত্তিলতার ভূমিকা পড়িলে মনে হয় 'মহামান্য' গ্রীয়ার্‌সন্ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেহ কখনও কীর্ত্তিলতা গ্রন্থের নাম শুনে নাই। আমার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইত্যাদি (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"মহামান্য সার জর্জ্জ গ্রীয়ার্‌সন্ সাহেব যখন বিদ্যাপতির গানগুলির উদ্ধার করিতে থাকেন,* তখন তিনি শুনিয়াছিলেন বিদ্যাপতি আপনার সময়ের ঘটনা লইয়া দুইখানি কাব্য লিখেন, একখানির নাম কীর্ত্তিলতা, আর একখানির নাম কীর্ত্তিপতাকা। * * ১৮৯৮ সালে আমি একবার নেপাল যাই। তখন দরবারের পুঁথিখানায় দু'খানি পুঁথি দেখি এবং তাহার নকল আনি।"—(কীর্ত্তিলতার ভূমিকা, ১ পৃঃ) সুতরাং ঐ পুঁথির আবিষ্কার প্রসঙ্গে গুপ্ত মহাশয়ের নামোল্লেখ না থাকিলে তাঁহার ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। তারপর গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পদাবলীর ভূমিকায় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার পদাবলী প্রকাশের পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় ঐ পুঁথির আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন (পদাবলীর ভূমিকা ।০ পৃষ্ঠা) এই প্রসঙ্গে গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধেও স্বীকার করিয়াছেন। আবার একস্থানে লিখিয়াছেন যে, "কীর্ত্তিলতার পুথির নকল ৩০ বৎসর পণ্ডিত হরপ্রসাদের নিকট পড়িয়া ছিল, তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। কীর্ত্তিপতাকা ও পদাবলীর পুথি বহন করিয়া আনাই সার, তাঁহার কোন কাজে আসিল না। এতকাল পরে নেপালের আসল পুথি পাইয়া একজন পণ্ডিত ও আর একজন পিয়াদার সাহায্যে কোন রকমে তর্জ্জমা করিয়া-ছেন। ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্লাদ হইবারই কথা, কিন্তু তিনি যে আকাশ হইতে চাঁদ পাড়িয়া আনিয়াছেন ও বিদ্যাপতির ভাষা ও তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই, এই দুইটি ভ্রম যত শীঘ্র ত্যাগ করিতে পারেন ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল।" এখানে গুপ্ত মহাশয় যেরূপ রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার

* ১৮৭৫-১৮৮১ ঈশাব্দ পর্য্যন্ত,

উক্তির শূন্যগর্ভতা উপলব্ধি হয়। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শাস্ত্রী মহাশয় কীর্ত্তিলতার ভূমিকায় স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন, "আমি যে অর্থ করিয়াছি তাহা ভাল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।"

সুরেশচন্দ্র দাস

—

বিবাহের ন্যূনতম বয়স

গত চৈত্রের প্রবাসী ৮৫৯ পৃষ্ঠাতে "বিবাহের ন্যূনতম বয়স" নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, "আয়ুর্ব্বেদমতে পুরুষ ২৫ বৎসর ও নারী ১৬ বৎসর বয়সে পরিণীত হইলে সর্ব্ববিষয়ে কল্যাণপ্রদ হয়।" এরূপ কথা আয়ুর্ব্বেদের কোনও স্থানেই লিখিত হয় নাই। লেখক বোধ হয় এক কথা শুনিতে আর এক কথা শুনিয়াছেন।

প্রবাসীর লেখক যে বয়সের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা বিবাহের বয়স নহে, বীর্য্যবান্ পুত্রোৎপাদনের বয়স। "পূর্ণ ষোড়শ বর্ষীয়া স্ত্রী পূর্ণ বিংশ বর্ষের পুরুষের সহিত সংগতা হইলে বীর্য্যবান্ পুত্রোৎপত্তি হইয়া থাকে, অন্যথা দুর্ব্বল সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে।" আয়ুর্ব্বেদে এই কথা লিখিত হওয়াতেই সম্ভবতঃ এখনও আমাদের দেশে ষোল বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের সন্তান সম্ভাবনা হইলে গৃহস্থগণ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া থাকে।

শ্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহিলা-সংবাদ

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে ছাত্রীরা বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রবেশিকা, ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ তিনটি পরীক্ষাতেই ছাত্রীদের ফল খুব ভাল হইয়াছে। কিন্তু বি-এ পরীক্ষাতেই তাঁহাদের কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বরিশালের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা

শ্রীমতী এস্ দাস

শ্রীমতী কল্যাণীকুট্টি অম্মল
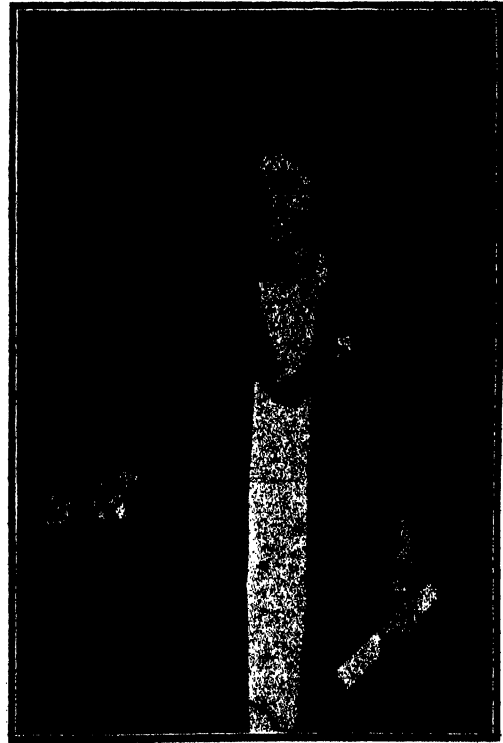
ঘোষ গণিত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ঈশান বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এ-সম্মান পাইলেন। তিনি প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতেও সমগ্র পরীক্ষার্থীর মধ্যে

শ্রীমতী পবিত্রম্

যথাক্রমে ষষ্ঠ ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শ্রীমতী শান্তিসুধার অগ্রজ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে এম এ, বি-এল্ পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষাতেই প্রথম হইয়াছিলেন এবং গণিত-শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কুমারী শান্তিসুধা অতঃপর মিশ্র-গণিতে এম্-এ পড়িবেন। আমরা অবগত হইলাম যে এবার ইংরেজী-সাহিত্যে ডায়ওসেসন্ কলেজ হইতে পরলোকগত অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লীলা রায় ও সংস্কৃত-সাহিত্যে বেথুন কলেজ হইতে শ্রীমতী সুষমা মিত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কুমারী শ্যামকুমারী নেহেরু

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও মহিলা ছাত্রীদের কৃতিত্বের সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। পুনা কৃষি কলেজের ছাত্রী কুমারী রাজুল গুজর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় কৃষি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রীরাও যদি কৃষি-বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেন তবে দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে।

এলাহাবাদের পণ্ডিত শ্যামলাল নেহেরুর দুহিতা কুমারী শ্যামকুমারী নেহেরু শেষ আইনপরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে এলাহাবাদের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর নিকট কাজ শিখিতেছেন। ত্রিবাঙ্কুরের শ্রীমতী আনা চণ্ডী শেষ

বি-এল্ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ত্রিবান্দ্রাম রাজ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা ব্যবহারাজীব।

শ্রীমতী আনা চণ্ডী
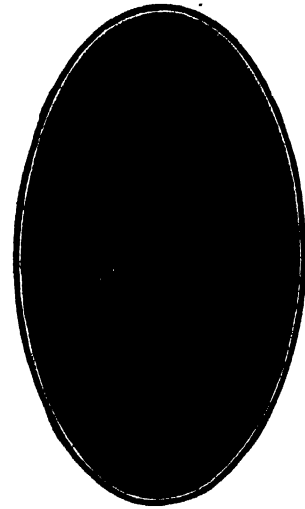
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও কুমারী কল্যাণীকুট্টি অম্মল বি এ পরীক্ষার ইতিহাসে ও অর্থনীতি শাস্ত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বেশী নম্বর পাই। টড্হাণ্টার পুরস্কার ও আকাম্মা গারু স্বুবর্ণ পদক পাইয়াছেন।

কুমারী রাজুল গুজর

কুমারী এস্ দাস ও শ্রীমতী পবিত্রম বি-এ, এল্-টি যথাক্রমে ইন্দোর ও মাদ্রাজের এরনাকুলাম মুনিসিপ্যালিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

জল্লাদ *

শ্রী সীতা দেবী

মেন্ডা সহরের ঘণ্টার মীনার হইতে রাত বারটার ঘণ্টা শোনা গেল। দুর্গের ছাদের উপর দেয়ালের গায়ে ঠেশ দিয়া যে ফরাশী সৈনিকটি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে অস্বাভাবিক রকম চিন্তামগ্ন দেখাইতেছিল। অবশ্য স্থান কাল সকলই যে গভীর চিন্তার খুবই উপযোগী ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্পেনের মেঘহীন নির্ম্মল নীল আকাশ তাহার মাথার উপরে। সে কিন্তু নিয়ে একটি সুন্দর উপত্যকার দিকে চাহিয়া ছিল। উহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সিঁড়ির মত খাদের ভিতর হইতে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, চাঁদের আলোয় তখন তাহার সমস্তখানিই প্লাবিত। সৈনিকটি ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিম্নস্থিত মেন্ডা সহরটিকেও বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল। সহরটি যেন তীক্ষ্ণ দক্ষিণ বায়ুর আঘাত হইতে আশ্রয় পাইবার জন্য পর্ব্বতের আড়ালে লুকাইয়া আছে। এই পর্ব্বতের শিখরদেশেই এই দুর্গ অধিষ্ঠিত। ঘাড় ফিরাইতেই তাহার সমুদ্রের দিকে চোখ পড়িল। জ্যোৎস্নারঞ্জিত সমুদ্রের ঢেউ, সমস্ত দৃশ্যটিকে যেন রূপার ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিল। দুর্গের জান্লাগুলির ভিতর দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল। নৃত্যের ধ্বনি, বেহালার সুর, সৈনিক এবং তাহাদের নৃত্য-সঙ্গিনীদের হাস্যালাপ, সব হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া

* ব্যালজ্যাক্ হইতে

সমুদ্রের কলগানের সহিত মিশিতেছিল। রাত্রির স্নিগ্ধতা সৈনিকের মনকে যেন নব বীর্য্যে ভরিয়া তুলিতেছিল, দিনের সকল শ্রান্তি তাহার মন হইতে মুছিয়া যাইতেছিল।

মেন্‌ডার দুর্গ স্পেনের এক সম্ভ্রান্তবংশের সম্পত্তি। তাঁহারা এখনও ইহাতে বাস করিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় হইতে এই বাড়ীর একটি তরুণী ফরাসী সৈনিকটির দিকে এমন করুণা-মাখা দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল যে, যুবক নানা প্রকার সুখের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তরুণী দুর্গাধিপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাহার নাম ক্লারা, দেখিতে সে অপূর্ব্ব সুন্দরী। যদিও তাহার তিনটি ভাই এবং আর-একটি ভগিনী ছিল, তাহা হইলেও ফরাসী যুবক ভিক্তরের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তরুণীর বিবাহের যৌতুক কিছুমাত্র সামান্য হইবে না। তাহার পিতা মারকুইসের ভূসম্পত্তির পরিমাণ দেশবিখ্যাত। কিন্তু কোন্ সাহসে এ চিন্তা সে মনে স্থান দিতেছিল যে, সারা স্পেনের ভিতর বংশের আভিজাত্যে দৃঢ়বিশ্বাসী মারকুইস্, তাঁহার কন্যাকে প্যারিসের এক মুদীর ছেলের সহিত বিবাহ দিবেন? একে ত বংশের এই তারতম্য, তাহার উপর ফরাসীদের এখানে কেহই দেখিতে পারিত না। দেশের লোকদের, ফরাসীদের বিপক্ষে, এবং ভূতপূর্ব্ব রাজা সপ্তম ফার্ডিন্যাণ্ডের পক্ষে উত্তেজিত করিতেছেন বলিয়া মারকুইস্ জেনারেল জি'র সন্দেহ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। এইজন্যই মেন্‌ডাতে ভিক্তরের অধীনস্থ সৈন্য-দল আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছিল। আশে-পাশের সকল স্থানের লোকদের ভয় দেখাইয়া দাবাইয়া রাখাই ছিল ইহাদের উদ্দেশ্য, কারণ তাহারা মারকুইসের কথা বেদবাক্যের মত মানিয়া চলিত। প্রধান সেনাপতি জি'র নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ইংরেজরা শীঘ্রই স্পেনের সমুদ্রতীরে সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করিবে, এবং মারকুইস্ তাহাদের এই চেষ্টার সাহায্য করিতেছেন।

সুতরাং ভিক্তর এবং তাহার সৈন্যদল সর্ব্বদাই খুব সতর্ক হইয়া থাকিত, যদিও তাহারা আসিয়া উপস্থিত হওয়ার সময় স্পানিয়ার্ডরা তাহাদের খুব সযত্নে অভ্যর্থনা করিয়াই লইয়াছিল। ছাদের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে ভিক্তর নিজেকে কেবলই প্রশ্ন করিতেছিল যে, মারকুইসের এই বন্ধুর মত হাবভাবের কি মানে করা যায়। দেশের অবস্থাও ত বেশ শান্ত, তাহা হইলে সৈন্যাধ্যক্ষের অত ব্যস্ততারই বা কারণ কি? কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই কৌতূহল এবং সন্দেহ আসিয়া তাহার মন হইতে এসকল চিন্তা দূর করিয়া দিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মেন্‌ডা সহরে অনেকগুলি আলো এখন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। ইহা সেণ্ট জেম্‌সের উৎসবের সময় হইলেও সে নিজে আদেশ প্রচার করিয়াছিল যেন সামরিক নিয়মানুসারে যতক্ষণ আলো জ্বলিতে পারে, তাহার এক মিনিট অধিক-কালও কেহ আলো জ্বালাইয়া না রাখে। কেবলমাত্র দুর্গ সম্বন্ধে সে এই আদেশের ব্যতিক্রম ঘটিবার অনুমতি দিয়াছিল। সে স্পষ্টভাবেই নিজের সৈন্যদের সঙ্গীনের অগ্রভাগ নানা স্থানে দেখিতে পাইতেছিল। ইহাদের পাহারা দিবার জন্য সে নিযুক্ত করিয়াছিল। সহরের ভিতর কিন্তু গভীর নীরবতা বিরাজ করিতেছিল, অধিবাসীরা যে উৎসবে মত্ত হইয়া আছে, তাহার কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না। ভিক্তর খানিকক্ষণ নিজেই নগরবাসীদের এই আদেশ লঙ্ঘনের কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই ভাবিয়া পাইল না। এই অল্পক্ষণমাত্র আগে সে কয়েকজন কর্ম্মচারীকে আদেশ দিয়া আসিয়াছে যে, তাহারা যেন চারিদিক ঘুরিয়া নগরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে। তাহারাই বা করিতেছে কি?

যৌবনের উত্তেজনায় সে দেওয়ালের একটা ভগ্ন অংশের ভিতর দিয়া লাফ মারিয়া বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। পর্ব্বতের গা বাহিয়া নামিলে সে শীঘ্রই একটা ঘাঁটীতে পৌঁছিতে পারিবে। এই ঘাঁটী ঠিক নগরের প্রবেশ-পথে অবস্থিত; সোজা পথে ইহা পৌঁছিতে হইলে প্রচুর সময় লাগে। কিন্তু একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে আসায় সে থামিয়া গেল। তাহার মনে হইল যেন দুর্গের বাগানের ভিতর যে কাঁকরবিছান পথ আছে, তাহার উপর দিয়া কোনো রমণী মৃদু পদক্ষেপে আসিতেছে। পিছন ফিরিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোকে প্রথমে তাহার চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিল, পরক্ষণেই সে এমন-একটা জিনিষ দেখিতে পাইল যে, বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে

হইতে লাগিল যে, তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে। জ্যোৎস্নার আলোয় দিগন্ত পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সে দেখিল, বহুদূরে অনেকগুলি জাহাজের পাল দেখা যাইতেছে। তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, উহা আর কিছু নয়,ঢেউয়ের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া ঐ রকম দেখাইতেছে। হঠাৎ শুনিল তাহার নাম ধরিয়া ভাঙা গলায় কে যেন ডাকিতেছে। ভিক্তর দেওয়ালের সেই ভাঙা-জায়গার দিকে চাহিয়া দেখিল একজন সৈনিক ধীরে ধীরে তাহার ভিতর দিয়া উপরে আসিতেছে। ভাল করিয়া টাহর করিয়া দেখিল লোকটা তাহারই দলের একজন গোলন্দাজ।

"সেনাপতি, আপনি না কি ?"

ভিক্তর বলিল, "হাঁ, আমিই। কি ব্যাপার কি ?" একটা ঘোর বিপদ যে সম্মুখে তাহা সে বুঝিতে পারিয়াই যেন অতি সতর্কতা অবলম্বন করিল।

"সহরের লোকগুলো সাপের মত গুড়ি মেরে এদিক ওদিক ক'রে বেড়াচ্ছে, তাই আমার নজরে কি কি পড়েছে আপনাকে তাড়াতাড়ি জানাতে এলাম।"

ভিক্তর বলিল, "বল।"

"একটা লোক লণ্ঠন হাতে ক'রে দুর্গের থেকে বেরিয়ে এই দিকে আস্‌ছিল, আমি তার পিছন পিছন আস্‌ছিলাম। লণ্ঠন দেখ্‌লে খুবই সন্দেহ হয়। ঘরের কাজের জন্য যে ঐ খৃষ্টানের বাচ্চাটি এখন লণ্ঠন জালিয়েছেন, তা ত মোটেই মনে হ'ল না। আমি মনে মনে বল্‌লাম, 'বোধ হয় আমাদের গিলে খাবার ফন্দী।' তার পিছন পিছন এসে দেখ্‌লাম যে, বেশ এক বোঝা জ্বালানি কাঠ গাদা করে রাখা হয়েছে। এই এখান থেকে দু তিন পা দূরেই।"

হঠাৎ নিম্নে নগরের মধ্যে এক ভীষণ চীৎকার শোনা গেল। সেনাপতির চোখের সম্মুখে একটা উজ্জ্বল আলোকের ঝলক দেখা দিল, এবং বেচারা গোলন্দাজ বন্দুকের গুলি খাইয়া গড়াইয়া পড়িল। কয়েক পা দূরেই দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নৃত্যগীতের শব্দ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার বদলে আহতের আর্ত্তনাদ কেবল শোনা যাইতে লাগিল। তাহার পর সমুদ্রের শুভ্র ঢেউয়ের ওপার হইতে ভাসিয়া আসিল কামানের গম্ভীর গর্জ্জন।

যুবক সেনাপতির কপালে তখন কালঘাম ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে নিজের তরোয়ালখানাও সঙ্গে আনে নাই। সে বুঝিতেই পারিল যে, তাহার সৈন্যেরা সকলেই নিহত হইয়াছে, এবং ইংরেজরাও তীরে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছে। বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে গভীর কলঙ্কের ভাগী হইতে হইবে, কল্পনায়ই সে নিজেকে সামরিক আদালতে আসামীর বেশে হাজির দেখিতে পাইল। দুর্গ-প্রাচীর হইতে উপত্যকা কতখানি নীচে তাহা সে দৃষ্টির দ্বারা মাপিয়া লইল। পরমুহূর্ত্তে যেই সে লম্ফ দিয়া নীচে পড়িতে যাইবে, ক্লারার হাত তাহার হাত জড়াইয়া ধরিল।

সে বলিল, "এখনি পালাও। আমার ভাইরা আমার পিছনে আস্‌ছে তোমাকে মার্‌বার জন্যে। ঐ পাহাড়ের গোড়ায় আমার ভাইয়ের একটা ঘোড়া বাঁধা আছে, সেইটা নিয়ে পালাও।"

যুবতী তাহাকে সবলে ঠেলিয়া দিল। যুবক তাহার দিকে খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, তারপর আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তি জাগিয়া ওঠায় সে বাগানে নামিয়া পড়িয়া যুবতীর নির্দ্দিষ্ট পথে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া চলিল। পাহাড়ের বড় বড় প্রস্তরখণ্ডগুলির একটা হইতে আর-একটাতে লাফ দিয়া দিয়া সে নীচে নামিতে লাগিল। এ পথ বন্য ছাগল ভিন্ন আর কাহারও জানা ছিল না। সে শুনিতে পাইল, ক্লারা চীৎকার করিয়া তাহার ভাইদের ডাকিয়া ফরাশীকে অনুসরণ করিতে বলিতেছে। সে নিজের শত্রুদের দ্রুত পদধ্বনি শুনিতে পাইল, কয়েক বারই তাহার কানের পাশ দিয়া বন্দুকের গুলি শন্ শন্ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সে কোনক্রমে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিয়া ঘোড়াটা খুলিয়া লইল। তাহার পর উহার পৃষ্ঠে চড়িয়া বিদ্যুৎগতিতে দৌড়িয়া চলিল।

কয়েকঘণ্টা পরে যুবক জেনারেল জি'র প্রধান ছাউনীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রধান সেনাপতি তখন নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদের লইয়া সান্ধ্যভোজ খাইতে বসিয়া-ছিলেন।

"আমি আপনার হাতে নিজের জীবন সমর্পণ কর্‌ছি।" বলিয়া মেন্‌ডার শ্রান্ত, অবসন্ন সেনাপতি বসিয়া পড়িল।

সে নিজের ভীষণ কাহিনী আগাগোড়া বলিয়া গেল। কাহিনী শেষ হইবার পর ঘরে একটা ভয়াবহ নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

খানিক পরে জেনারেল জি বলিলেন, "আমার মনে হয় তোমায় দোষ দেওয়ার চেয়ে, দয়া করাই উচিত। স্প্যানিয়ার্ডদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তুমি দায়ী নও। মার্শাল নে যদি আপত্তি না করেন, তাহ'লে আমি তোমায় মুক্ত ক'রে দেব।"

এই কথায় হতভাগ্য সেনাপতি বেশী কিছু সান্ত্বনা পাইল না। সে বলিল, "সম্রাট যখন এ সংবাদ শুন্‌বেন, তখন কি হ'বে?"

জেনারেল বলিলেন, "ওঃ, তিনি অবশ্য তোমায় গুলি ক'রে মার্‌তেই বল্‌বেন, কিন্তু তখন সে দেখা যাবে। এখন এ বিষয়ে আর বেশী কথায় কাজ নেই, এখন এমন একটা প্রতিশোধ নেবার প্রণালী ঠিক কর্‌তে হবে, যাতে এ দেশের লোকগুলোর মনে বেশ ভাল রকম ভয় হয়। এরা যুদ্ধ করে ঠিক যেন অসভ্য বর্ব্বরের মত।"

এক ঘণ্টা পরেই বিশাল একদল পদাতিক সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য এবং অনেকগুলি কামান মেন্‌ডার দিকে যাত্রা করিল। জেনারেল এবং ভিক্তর তাহাদের আগে আগে চলিলেন। সৈন্যগুলি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, কারণ তাহাদের সঙ্গীদের কি পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহা উহাদের জানান হইয়াছিল। উহাদের ছাউনী হইতে মেন্‌ডা পর্য্যন্ত পথটা তাহারা আশ্চর্য্য রকম অল্প সময়ে পার হইয়া গেল। পথের মধ্যে অনেকগুলি গ্রামকে যুদ্ধার্থে সশস্ত্র দেখা গেল। গ্রামগুলি পরিবেষ্টন করিয়া, অধিবাসীদিগকে ফরাসী সৈন্যরা হত্যা করিয়া ফেলিল।

দেখা গেল যে, ইংরাজদের রণতরীগুলি তখনও সমুদ্রেই রহিয়াছে, কূলে আসে নাই। প্রথমে সকলে ইহার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিল না, পরে জানা গেল যে, সেগুলি শুধু অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই। সৈন্য লইয়া যে জাহাজগুলি আসিতেছে, এগুলি তাহাদের ছাড়াইয়া আগেই আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং মেন্‌ডার অধিবাসীরা প্রত্যাশিত সাহায্যের কিছুই পাইল না, এবং তাহারা লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই ফরাসী সৈন্যরা তাহাদের একেবারে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ফেলিল। ইহাতে ভীত হইয়া তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে স্বীকার করিল। ভিক্তরের অধীনস্থ ফরাসী সেনাদের যাহারা হত্যা করিয়াছিল, তাহারা নগরে অধিবাসীদের বাঁচাইবার জন্য আত্মসমর্পণ করিল। জেনারেল জি'র কঠোরতা সর্ব্বজন-বিদিত; সকলেই ভয় করিতেছিল যে, তিনি হয়ত নগরে আগুন লাগাইয়া দিয়া, সমস্ত নগরবাসীকে হত্যা করিবারই আদেশ দিবেন। সৌভাগ্যক্রমে জেনারেল তাহা করিলেন না, তবে এই সর্ত্তে তিনি মেন্‌ডাকে নিষ্কৃতি দিতে রাজী হইলেন যে, প্রাসাদের সব ক'জন অধিবাসী, মারকুইস্‌ হইতে, দীনতম ভৃত্য পর্য্যন্ত ফরাসীর নিকট ধরা দিবে। এই সর্ত্তেই স্প্যানিয়ার্ডরা রাজী হইল। জেনারেল তখন সৈন্যদলকে সহরে লুটপাট করিতে বা আগুন লাগাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। মেন্‌ডাবাসীদের উপর খুব বড় রকম একটা অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইল, এবং চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর এই দণ্ড যাহাতে দেওয়া হয়, তাহার জন্য নগরের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কয়জন অধিবাসীকে বন্দী করিয়া রাখা হইল।

সৈন্যদলের যাহাতে কোনো বিপদ না হয় এজন্য জেনারেল সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। নগর সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও করিলেন এবং সৈন্যদিগকে নগরবাসীদের গৃহে খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তাহারা ছাউনী গাড়িয়া বসিলে পর তিনি দুর্গে গিয়া বিজয়ীর মত প্রবেশ করিলেন। মারকুইসের সমস্ত পরিবার-পরিজনকে হাত পা, মুখ বাঁধিয়া নৃত্যশালায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। বাহিরে কড়া পাহারা ছিল।

ফরাসী কর্ম্মচারীরা একটা বারাণ্ডার মত স্থানে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, কি উপায়ে ইংরেজদের কূলে অবতরণ নিবারণ করা যায়। মার্শাল নে'র নিকট একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল; তটভূমিতে সারি সারি কামান সাজাইয়া রাখা

হইল ; তারপর জেনারেল এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা বন্দীদের দিকে মনোযোগ দিলেন। যে দুই শত স্প্যানিয়ার্ড ফরাশী সৈনিকদের বধ করিয়াছিল তাহাদের দুর্গের চত্বরে গুলি করিয়া মারা হইল। তাহার পর জেনারেল সেই স্থানেই ফাঁশীকাঠ তৈয়ারী করিতে আদেশ দিলেন, এবং নগর হইতে জল্লাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভিক্তর এই অবসরে নৃত্যশালায় গিয়া বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিল। পরে সে জেনারেলের নিকটে গিয়া বলিল, "আমি আপনার কাছে একটু অনুগ্রহপ্রার্থী হ'য়ে এসেছি।"

জেনারেল কণ্ঠস্বরে তীব্র শ্লেষ মিশাইয়া বলিলেন, "তুমি?"

ভিক্তর বলিল "হায়, বড় বেশী অনুগ্রহ কিছু চাইবার আমার নেই। মারকুইস্ ফাঁশীকাঠ তৈরি হ'তে দেখেছেন; তিনি প্রার্থনা কর্‌ছেন যেন তাঁর পরিবারের জন্য শিরশ্ছেদের ব্যবস্থা হয়।"

জেনারেল বলিলেন, "বেশ, তাই হবে।"

ভিক্তর বলিল, "তিনি আরো দুটি বিষয়ে অনুগ্রহপ্রার্থী। প্রাণদণ্ড হবার আগে তাঁদের পুরোহিতকে যেন তাঁদের কাছে যেতে দেওয়া হয়, এবং তাঁদের হাত-পায়ের বাঁধন যেন খুলে দেওয়া হয়। তাঁরা কথা দিচ্ছেন যে, পালাবার কোনোই চেষ্টা কর্‌বেন না।"

জেনারেল বলিলেন, "আচ্ছা, কিন্তু তুমি তাঁদের জন্যে দায়ী রইলে।"

"বৃদ্ধ মার্‌কুইস্ আপনাকে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দিতে রাজী আছেন, যদি আপনি তাঁর ছোট ছেলের প্রাণভিক্ষা দেন।"

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন, "তাই নাকি? দুঃখের বিষয় তাঁর যথাসর্ব্বস্ব ইতিমধ্যেই সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেছে।"

একটুকু থামিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি তারা যতটা চায় তার বেশী দিতেও রাজী আছি। একটি ছেলে ছেড়ে দিতে কেন বৃদ্ধ অনুরোধ কর্‌ছে তা বুঝ্‌তে পেরেছি। বেশ, বংশরক্ষা কর্‌তে চায় করুক। কিন্তু যখনি তাদের নাম কোথাও কেউ শুন্‌বে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা আর তার প্রতিশোধ দুইই তাদের মনে পড়্‌বে। মার্‌-কুইসের ছেলেদের মধ্যে যে জল্লাদের কাজ কর্‌তে রাজী হবে, তাকেই এদের সমস্ত ভূসম্পত্তি দেব এবং মুক্তিও দেব। যাও, ওদের বিষয় আর কোনো কথা আমি শুন্‌তে চাই না।"

সান্ধ্যভোজ প্রস্তুত ছিল। সামরিক কর্ম্মচারীরা ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করিতে বসিয়া গেল। কেবলমাত্র একজন অনুপস্থিত রহিল, সে ভিক্তর। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে আবার নৃত্যশালায় গিয়া ঢুকিল। অত্যন্ত বিষণ্ণদৃষ্টিতে সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল মাত্র একদিন আগে, এই ঘরে, এই মানুষগুলিকে সে আনন্দে নৃত্য করিতে দেখিয়াছে, ইহাদের হাস্যালাপ শুনিয়াছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই সুন্দরী তরুণী-গুলি ঐ সুস্থ সবল যুবকগুলি ঘাতকের কুঠারের নীচে প্রাণদান করিবে, মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। মার্‌কুইস্ ও তাঁহার পরিবারবর্গ নীরবে বদ্ধ অবস্থায় বসিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহাদের আটজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া, তাহাদের হাত পিছনে বাঁধা। এই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগুলি পরস্পরের দিকে বারবার চাহিয়া দেখিতেছিল। দৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহাদের মনের ভাব বোঝা সহজ ছিল না, তবু ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ এবং নিজেদের দেশোদ্ধারের চেষ্টা বিফল হওয়ার দুঃখ অনেকের মুখের ভাবেই স্পষ্ট অঙ্কিত হইয়াছিল।

যে সৈন্যগুলি তাহাদের পাহারা দিতেছিল, তাহারাও নিজেদের এই পরম শত্রুবর্গের গভীর দুঃখের সম্মান রক্ষা করিয়া চুপ করিয়াছিল। ভিক্তর ঘরে ঢুকিবা-মাত্র সকলের মুখেই একটু কৌতূহলের ভাব দেখা গেল। সে আসিয়াই আদেশ করিল যে, বন্দীদের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হোক, এবং নিজের হাতেই ক্লারার বন্ধন মোচন করিয়া দিল। মেয়েটি তাহার দিকে চাহিয়া বিষাদমাখা হাসি হাসিল। ভিক্তর একবার তাহার সুন্দর হাতখানি স্পর্শ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কী সুন্দরী মেয়েটি! তাহার চুল ও চোখ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, গঠন অতি অপূর্ব্ব।

ক্লারা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কৃতকার্য্য হয়েছেন?"

ভিক্তরের মুখ হইতে একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বাহির হইয়া পড়িল। সে একবার ক্লারার দিকে তাকাইয়া

চোখ ফিরাইয়া তাহার তিনটি ভাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। বড় ভাই যে, তাহার বয়স ত্রিশ হইবে। সে বিশেষ লম্বা নয়, গঠনটাও তাহার ভাল নয়, কিন্তু মুখে আভিজাত্য ও অহঙ্কারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তাহার নাম জুয়ানিটো, দ্বিতীয় ভ্রাতাটির নাম ফিলিপ, দেখিতে সে ঠিক ক্লারার মত সুন্দর, বয়স কুড়ি বৎসর। ছোট ভাইটি আট বৎসরের বালক, অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ। বৃদ্ধ, শুভ্রকেশ মারকুইস্‌কে দেখিলে মনে হয় যেন ম্যুরিলোর একখানি চিত্র জীবনলাভ করিয়া আসিয়াছে। সকলের দিকে চাহিয়া ভিক্তরের মন নিরাশায় ভরিয়া গেল, কি করিয়া ইহারা জেনারেলের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবে? যাহা হউক, কোনোমতে সে ক্লারার কাছে কথাটা পাড়িয়া ফেলিল। তরুণীর শরীরের ভিতর দিয়া একটা শিহরণ খেলিয়া গেল, কিন্তু কোনো-মতে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে আপনার পিতার সম্মুখে গিয়া নতজানু হইয়া বসিল।

সে বলিল, "বাবা, জুয়ানিটোকে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে বলুন যে, সে আপনার আদেশ যত কঠোরই হোক না কেন পালন কর্‌বে। তা হ'লে আমাদের আর দুঃখ কর্‌বার কিছু থাক্‌বে না।"

মারকুইসের পত্নীর মুখে একটু আশার ভাব দেখা দিল, কিন্তু স্বামীর দিকে ফিরিয়া, তাঁহার মুখে ক্লারার ভীষণ বার্ত্তা শুনিবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন; জুয়ানিটো সবই বুঝিতে পারিল, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। মারকুইসের নিকট বাধ্যতার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া ভিক্তর ফরাসী সৈন্যদের বিদায় করিয়া দিল। মারকুইসের ভৃত্যদের প্রাণদণ্ড দিবার জন্য বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। কেবলমাত্র ভিক্তর যখন ঘরে রহিল, তখন বৃদ্ধ মারকুইস্‌ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "জুয়ানিটো।" জুয়ানিটো মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে এই ভয়াবহ সর্ত্তে রাজী নয়। সে চেয়ারে বসিয়া তীব্র দৃষ্টিতে নিজের জনকজননীর দিকে চাহিয়া রহিল। ক্লারা তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার চোখের উপর চুম্বন করিয়া বলিল, "জুয়ানিটো, তুমি যদি জান্‌তে তোমার হাতে মৃত্যু কত মধুর হবে। আমাকে তাহ'লে ঐ হতভাগা জল্লাদের হাতের স্পর্শ সহ্য কর্‌তে হবে না। ভবিষ্যতের সব বিপদের সম্ভাবনা থেকে তুমি আমায় রক্ষা কর্‌তে। আমি অন্য কারো অধিকারে যাব এ চিন্তাও তোমার অসহ্য ছিল। জুয়ানিটো তা হ'লে?"

ক্লারা বিশাল কালো চোখের জলন্ত দৃষ্টিতে একবার ভিক্তরের দিকে তাকাইল। সে যেন জুয়ানিটোর হৃদয়ে ফরাসী-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

ফিলিপ বলিল, "ভাই মনে সাহস সঞ্চয় কর, তা না হ'লে আমাদের এত বড় বংশ, প্রায় রাজবংশের তুল্য যার নাম, সেটা লুপ্ত হ'য়ে যাবে।"

হঠাৎ ক্লারা উঠিয়া দাঁড়াইল। জুয়ানিটোর চারিপাশ হইতে সকলে সরিয়া গেল, তাহার বৃদ্ধ পিতা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জুয়ানিটো, আমি তোমাকে আদেশ কর্‌ছি।"

তরুণ কাউণ্ট জুয়ানিটো কোনো সাড়া দিল না। তখন মারকুইস্‌ তাহার সাম্‌নে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার পুত্র-কন্যারাও তাঁহার অনুসরণ করিল। সকলে জুয়ানিটোর দিকে হাত বাড়াইয়া যেন অনুনয় করিতে লাগিল, তাহাদের বংশের নাম ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য।

মারকুইস্‌ বলিলেন, "পুত্র, তোমার মধ্যে কি স্প্যানিয়ার্ডের দৃঢ়তা এবং বিবেচনা একেবারে নেই? তুমি কি আমাকে তোমার সাম্‌নে ভিখারীর মত নতজানু হ'য়ে থাক্‌তে বল? তোমার নিজের জীবনের এবং নিজের দুঃখ-যাতনার কথা ভাববার কি অধিকার আছে?" তিনি নিজের পত্নীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি সত্যিই আমার পুত্র?"

তাঁহার পত্নী যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলিলেন, "ও রাজী হবে, নিশ্চয় রাজী হবে।" জুয়ানিটো আর একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিল, তাহার অর্থ কেবল তাহার মাতা বুঝিতে পারিলেন।

মারকুইসের কনিষ্ঠা কন্যা মারিকুইটা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ম্যানুয়েল ভগিনীকে রোদনের জন্য তিরস্কার করিতেছিল। ঠিক এই সময় তাহাদের পারিবারিক পুরোহিত আসিয়া

উপস্থিত হইলেন, সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া জুয়ানিটোর নিকট লইয়া আসিল। ভিক্তর আর এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না, ক্লারার কাছে ইঙ্গিতে বিদায়গ্রহণ করিয়া সে আর-একবার ইহাদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে বাহির হইয়া গেল। গিয়া দেখিল জেনারেল তখন বড়ই খোস্ মেজাজে, সামরিক কর্ম্মচারীর দল তখনও টেব্‌লে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে, তাহাদেরও মুখ খুব ছুটিতেছে।

একঘণ্টা পরে মেনডার প্রধান অধিবাসীদিগকে জেনারেলের আদেশে ডাকিয়া পাঠান হইল। তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া মার্‌কুইস্ পরিবারের প্রাণদণ্ড দেখিতে হইবে। সৈন্যদল নগর পাহারা দিতে লাগিল। নগরবাসীদের একবার সেইস্থানে ঘুরাইয়া আনা হইল যেখানে মার্‌কুইসের ভৃত্যদের ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। ইহার অনতিদূরেই বধমঞ্চ, তাহার পাশে শাণিত কুঠার লইয়া ঘাতক দাঁড়াইয়া। জুয়ানিটো যদি শেষ পর্য্যন্ত অস্বীকার করে, তাই তাহার কার্য্যের জন্য ইহাকে হাজির রাখা হইয়াছিল।

চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সৈন্যদের পদধ্বনিতে উহা টুটিয়া গেল। তাহাদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও পদধ্বনির সঙ্গে ফরাসী সেনাপতিদের ভোজনাগারের হাস্যের ও আলাপের শব্দ আসিয়া মিশিতে লাগিল।

সকলে দুর্গের দিকে তাকাইল, দেখিল দণ্ডিত মার্‌কুইসের পরিবার অত্যন্ত ধীর অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সকলের মুখ চিন্তাশূন্য, শান্ত। কেবল একজনের মূর্ত্তি যন্ত্রণাকাতর, সে অভিভূতের মত পুরোহিতের উপর ভর দিয়া আসিতেছে, পুরোহিত তাহারই কানে সান্ত্বনাবাণী ঢালিয়া দিতেছেন। ইহাকে বাঁচিতে হইবে। তখন সকলে বুঝিল জুয়ানিটো ঘাতকের কাজ করিতে সম্মত হইয়াছে। বৃদ্ধ মার্‌কুইস, তাঁহার পত্নী, তাঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা, বধমঞ্চের কিছুদূরে নতজানু হইয়া বসিলেন। জুয়ানিটোকে পুরোহিত মঞ্চের নিকট লইয়া গেলেন। নগরের ঘাতক, জুয়ানিটোকে তাহার কার্য্য সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য তাহার জামার আস্তিন ধরিয়া টানিয়া একটু আড়ালে লইয়া গেল। পুরোহিত এমন ভাবে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দাঁড় করাইলেন, যেন তাহারা কেহ অস্তদের মৃত্যুদণ্ড দেখিতে না পায়। তাহারা সকলেই স্প্যানিয়ার্ডের উপযুক্ত সাহস সহকারে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্লারা অন্যদের আগে জুয়ানিটোর পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "জুয়ানিটো আমার সাহস বড় কম। তুমি দয়া ক'রে আমায় প্রথমে নাও।"

সে কথা বলিতেছে এমন সময় দ্রুতধাবনের শব্দ শোনা গেল, এবং ভিক্তর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্লারা তখন বধমঞ্চের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার শুভ্র সুন্দর গ্রীবা যেন ঘাতকের খড়্গকে আহ্বান করিতেছিল। ভিক্তরের চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, তবু সে কোনমতে গিয়া ক্লারার পাশে দাঁড়াইল।

সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "তুমি যদি আমায় বিবাহ কর, তাহা হইলে জেনারেল তোমার প্রাণভিক্ষা দিতে রাজী আছেন।"

তরুণী তাহার দিকে অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিতে একবার তাকাইল মাত্র। তাহার পর বলিল, "জুয়ানিটো, আমি প্রস্তুত।"

তাহার মস্তক গড়াইয়া ভিক্তরের পায়ের দিকে আসিয়া পড়িল। তাহার মাতার শরীরের ভিতর দিয়া একটা যন্ত্রণার শিহরণ খেলিয়া গেল, কিন্তু তিনি আর কোনো কাতরতা প্রকাশ করিলেন না।

বালক ম্যানুয়েল অগ্রসর হইয়া আসিয়া ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জুয়ানিটো, আমি কি এই জায়গায় দাঁড়াব?"

মারিকুইটা আসিলে জুয়ানিটো বলিল, "ছিঃ, বোন্, তুমি কাঁদছ?"

বালিকা বলিল, "হ্যাঁ, জুয়ানিটো, আমার কেবল তোমার কথা মনে হচ্ছে। আমরা সকলে চ'লে গেলে তোমার কি ভয়ানক কষ্ট হবে।"

বৃদ্ধ মার্‌কুইস্ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তিনি বধমঞ্চের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, উহা তাঁহার সন্তানবর্গের

রক্তে রঞ্জিত। চারিদিকে নীরবে দণ্ডায়মান জনতার দিকে চাহিয়া তিনি সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "স্প্যানিয়ার্ডরা, তোমরা জেনে রাখ, আমি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করছি। মারকুইস, আঘাত কর, তুমি নির্দ্দোষ।"

কিন্তু যখন মারকুইস্‌পত্নী পুরোহিতের উপর ভর দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন জুয়ানিটো চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা, তুমি যে আমার বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছ!" জনতাও কোলাহল করিয়া উঠিল। জুয়ানিটোর মা বুঝিলেন তাঁহার সাহস নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। একলম্ফে দুর্গ-প্রাচীরের উপর হইতে তিনি নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পাহাড়ের উপর তাঁহার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। দর্শকবৃন্দ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। জুয়ানিটো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

নবীন মারকুইসকে দেশবাসী অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। স্পেনের রাজা তাঁহাকে 'জল্লাদ' উপাধি দিয়াছেন। কিন্তু দারুণ শোক যুবকের জীবন শুষিয়া খাইতেছে। তিনি অতি নির্জ্জনে বাস করেন, লোক-চক্ষুর সম্মুখে বড় আসেন না। তাঁহার মহাপাপের বোঝা পাষাণভারের মত তাঁহার জীবনের উপর চাপিয়া আছে। পুত্রসন্তানের জন্য তিনি যেন অধৈর্য্য হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সে আসিয়া বংশের ধারা রক্ষা করিলেই তিনি পরপারে ছায়ামূর্ত্তিদের দলে গিয়া মিশিতে পারেন। তাহারা দিনরাত তাঁহার সঙ্গী হইয়া আছে।

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৩)

সিঙ্গাপুরে শেষ দু দিন—চীনা থিয়েটার—
জাহাজে মালাকা যাত্রা

২৫শে জুলাই, সোমবার।

বিকালে ছিল সিঙ্গাপুরের সব জা'তের ছাত্র আর শিক্ষকদের কাছে কবির বক্তৃতা, ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে। এই বক্তৃতার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত E. C. M. Woolfe, কলোনিয়ল সেক্রেটারী। এই বক্তৃতায়ও খুব ভীড় হ'য়েছিল, আর কবি অতি সুন্দর ব'লেও ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেন। সুখের বিষয়, এই বক্তৃতাটীর পুরো রিপোর্ট নেওয়া হ'য়েছিল, আর মালয় দেশের কতকগুলি পত্রিকাতে বক্তৃতাটী প্রকাশিত হ'য়েছিল।

কা'ল আমরা সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নেবো। আজ বিকালে কবির বক্তৃতার পরে আমাদের কেনা-কাটার কাজ দু একটা সেরে নেওয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীযুক্ত ডাক্তার লিম্-বুন-কেঙ কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। এঁর কথা আগেই ব'লেছি। আজ সন্ধ্যার পরে কবির আর তাঁর সঙ্গে আমাদেরও ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল, মিষ্টার ক্যাশিন Cashin ব'লে একটী স্থানীয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে। ইনি ইউরেশীয়। শুনলুম এঁর পিতৃকুল সিঙ্গাপুরের অধিবাসী আরব জাতীয়, আর মাতৃকুল ইউরোপীয়। নিজে বিবাহ ক'রেছেন একটী রুমানিয়া দেশের মহিলাকে। রবারের বাগানের মালিক, বিশেষ ধনী লোক। এঁর আর এঁর পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কবি এঁদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন। আমরা যথাসময়ে উপস্থিত হ'লুম। কবি বিকালের বক্তৃতার পরে বিশেষ ক্লান্ত ছিলেন, কিন্তু এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁকে যেতে হ'ল। আমাদের গাড়ী পৌঁছলে গৃহস্বামী বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে কবিকে গাড়ী-বারান্দা থেকে অভ্যর্থনা ক'রে উপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে খুব কলা নৈপুণ্যের সঙ্গে অল্প দু চারটী কারু-দ্রব্যে সাজানো

একটি বড়ো ঘরে আর আর নিমন্ত্রিতেরা ব'সেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে' দেওয়া হ'ল। গৃহস্বামিনীটি খুব সুন্দরী মহিলা, উচ্চশিক্ষিতা, কবির একজন ভক্ত পাঠিকা ; গৃহস্বামীরও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এঁদের সন্তান, দু তিনটি মেয়ে এসে কবিকে অভিবাদন ক'রলে। মিষ্টার ক্যাশিনের শ্যালিকা গৃহস্বামিনীর একটি বোন ছিলেন, তিনিও মধুরালাপিনী। অন্য অভ্যাগত খুব কম ছিলেন, তিন চার জন মাত্র—ইটালীয়ান কন্‌স্যাল, ফরাসী কন্‌স্যাল ও তাঁর পত্নী, আর দু একটি উচ্চমনোভাবযুক্ত ইংরেজ বণিক। ইটালীয়ান কনস্যালটি সুরসিক পুরুষ ; আধাবয়সী, কিন্তু তাঁর অজস্র হাস্যরসপূর্ণ আলাপ অব্যাহত চ'লছিল ; কচিৎ ঈষৎ আদিরসমিশ্রও হচ্ছিল তাঁর আলাপ, আমাদের গৃহকর্ত্তার শ্যালিকা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও। কথাবার্ত্তা ইংরেজীতেই হ'চ্ছিল, আর চীনা খানসামাদের সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল মালাইতে। ফরাসী কনস্যল মহাশয়ের স্ত্রীটি ইংরেজী জানেন না, সুন্দরী, আর মুখের ভাবে তাঁকে অতি ভালো-মানুষ সরল সাদাসিধে মানুষ ব'লে মনে হ'ল, তিনি কথাবার্ত্তায় যোগ না দিয়ে চুপ ক'রে একটি চেয়ারে ব'সেছিলেন। পরিচয়ের পরেই ইংরেজীতে তাঁর দু-একটি একাক্ষর কথায় আলাপ শুনে, আর তিনি ফরাসী জাতীয়া শুনে, সাহস ক'রে আমার ভাঙা ভাঙা ফরাসীতেই আমি কথা শুরু ক'রলুম। তিনি অমনি বিশেষ খুশী হ'য়ে আমায় ব'ললেন যে সম্প্রতি অল্পদিন হ'ল তাঁরা সিঙ্গাপুরে এসেছেন, তিনি ইংরিজি জানেন না ; তাঁর স্বামী ফরাসী, কিন্তু তিনি নিজে রুষ-জাতীয়া। কবিকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অনেক দিন থেকে। তাঁর ভারী আফশোশ হ'চ্ছে যে তিনি কবির সঙ্গে আলাপ ক'রতে বা তাঁর মুখের কথা শুনে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারছেন না। তবে কবিকে নিকটে দেখে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই তিনি খুশী। আমরা কোথায় কোথায় যাবো, কবির কোন্ কোন্ বই তাঁর ভালো লাগে (ফরাসী আর রুষ তর্জ্জমায়), এই সব নানা বিষয়ে একটু আধটু আলাপ চ'লল। মাঝে কবিও দু চারটি কথা ব'ললেন, তাঁর লেখা সম্বন্ধে,—এমনি কথা-প্রসঙ্গে এই বিষয় উঠতে। তারপরে আহারের পালা। আহারের পরে কবি বিদায় নিলেন, তাঁর শরীর বড়োই ক্লান্ত। তিনি চ'লে গেলেন, তার খানিক পরে একটু ব'সে আলাপ ক'রে আমরাও বিদায় নিলুম। শুনলুম কবির যাবার সময়ে মিষ্টার ক্যাশিন বিশ্বভারতীর জন্য একখানি হাজার ডলারের চেক দেন। এই ছোটো-খাটো আন্তর্জ্জাতিক মিলন ক্ষেত্রে মিষ্টার ক্যাশিনের বাড়ীতে এই দিনকার সন্ধ্যাটা বেশ কাট্‌ল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা দশটায় সিগ্‌লাপে ফিরলুম। কবি তখনও শোন নি। সাগরে জোয়ার উঠেছে, তার সঙ্গে না'রকেল গাছের পাতা কাঁপিয়ে' কাঁপিয়ে' গাছের মধ্যে মনোরম মর্ম্মর ধ্বনি তুলে বেশ বাতাস বইছে, সেই বাতাসে ঈজি-চেয়ারে আধ শোয়া হ'য়ে কবি সাগরের দিকে তাকিয়ে' আছেন। সব অন্ধকার, খালি অস্ফুট তারার আলো, আর বহুদূরে দু একখান জাহাজে বিজলীর আলো জ্ব'লছে দেখা যাচ্ছে। কবির কিছু আবশ্যক হয় কি না হয়, সেই জন্য বাংলা বাড়ীর বারান্দায় হজ-কঙের নামাজী মহাশয় একখানি চেয়ারে ব'সে আছেন। আমরা ফিরতে কবি ব'ললেন, ওহে, আজ নাকি চীনে থিয়েটারে আমার যাবার কথা ছিল, তার জন্য দু তিন বার ফোন ক'রেছে, আমি আজ আর বাপু পারছি না, তোমরা গিয়ে আমার হ'য়ে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে এসো, আর পারো তো খানিক ক্ষণ থেকে দেখে এসো। কোন্ থিয়েটার, কোথায়, কিছু জানা নেই। এমন সময়ে আমাদের ফ্যঙ এক মোটর নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সিঙ্গাপুরের একটি বড়ো চীনা থিয়েটারের মালিকেরা আরিয়ামের মারফৎ কবিকে তাঁদের থিয়েটারে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। ইউরোপীয় নাটকের অনুকারী হাল ফ্যাশানের নাটক অভিনয়ের চেয়ে, প্রাচীন পদ্ধতির খাঁটি চীনা অভিনয় কবি আর তাঁর শিল্পী অনুগামীদের কাছে বেশী রোচক হবে শুনে তাঁরা ঐ রাত্রে ঐ রকমই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। কবি এতটা ক্লান্তি অনুভব ক'রছিলেন যে তাঁকে অত রাত্রে আবার চীনা থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া চলে না। এদিকে ফ্যঙ এসে ব'ললেন যে চীনের কন্সল মশায় থিয়েটারে এসেছেন, স্বয়ং উপস্থিত থেকে কবির সম্মাননা করবার জন্য, আর কবির পদার্পণ আশা ক'রে থিয়েটারওয়ালারা থিয়েটার সাজিয়েছে, আর লোকের আগমনও খুব হ'য়েছে।

চীনা থিয়েটারটী যে কি বস্তু তার একটী ভয়াবহ পরিচয় আমার আগেই হ'য়েছিল, ক'লকাতায়; আর কবিরও সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ আর প্রতিশ্রোত্র অভিজ্ঞতা ঘ'টেছিল তাঁর চীন ভ্রমণের সময়ে। চীনা নাট্যাভিনয় তার ঝাঁঝ কাঁসা কাঁসির একটানা অবিশ্রান্ত ঐক্যতান বাদন নিয়ে যে কর্ণ-পটহভেদী নিনাদ সৃষ্টি করে, সুস্থকায় লোকের পক্ষেই তা বরদাস্ত করা কঠিন। যা হোক্, কবিকে রেখে আমরাই ক্যাণ্ড-এর সঙ্গে বা'র হলুম। সিগলাপের রবার আর না'রকেলের বাগানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ বিরল-পথিক গ্রাম্য-পথ অতিক্রম ক'রে শহরে এসে পৌঁছুলুম, সেখানে চীনা মহল্লায় লোকের ভীড়, চেঁচামেচি, আলো, চীনা হোটেলের ভিতরের উজ্জ্বল দৃশ্য, রাস্তার দু-ধারে ফেরিওয়ালারা উনুন জ্বালিয়ে খাবার তৈরী করে বুভুক্ষু নিম্নশ্রেণীর চীনা খ'দ্দেরের দলকে বিক্রী ক'র্‌ছে, কোথাও বা চীনাদের বাড়ীর উপরের তলা থেকে উঁচু সপ্তকে মেয়ে গলায় গানের আওয়াজ ভেসে আস্‌ছে—এই সবের মধ্য দিয়ে, মোটরে আর রিক্সতে ভরা একটা ছোট রাস্তায় থিয়েটার বাড়ীর সাম্‌নে আমাদের মোটর এসে দাঁড়াল। থিয়েটারের ভিতর থেকে চীনে নটীর বিচিত্র গলায় গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতের আওয়াজ—একটা কর্কশ তারের যন্ত্রের ক্যাঁ-কো ধ্বনি, আর তালের জন্য দুটো কাঠে কাঠে ঠুকে টক্ টক্ টকাটক্ আওয়াজ। রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন আশা ক'রে সামনে নাট্যালয়ের ললাট-ভূষণ স্বরূপে এক মস্ত সাদা কাপড়ে লাল অক্ষরে ইংরেজীতে স্বাগত-বচন টাঙানো হ'য়েছে, আর মস্ত মস্ত চীনা হরফে ঐ কথা ও লেখা হ'য়েছে। রাস্তায় কবি-দর্শনার্থী চীনার ভীড়, কবির মোটরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। নাট্যগৃহের দরওয়ান হ'চ্ছে এক বিশাল-বপু পাঞ্জাবী মুসলমান—সে এসে আমাদের মোটরের দরজা খুলে দিলে। আমরা ভিতরে এলুম—ক্যাণ্ড কতকগুলি চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কবির অনুপস্থিতির কারণ, তাঁর দৈহিক অবসাদ আর অসুস্থতার কথা প্রচুর মার্জনা প্রার্থনার সঙ্গে সকলের কাছে আমাদের ব'লতে হ'ল। চীনা কন্‌সল মশায়ের আশে-পাশে কতকগুলি আসনে নিয়ে আমাদের বসালে, ক্যাণ্ড কাছেই র'ইলেন। কন্‌সলের ইংরিজিওয়ালা খাস-মুন্‌শীটিও ছিলেন। এঁদের কাছে কবির অনুপস্থিতির কথা ব'ল্‌লুম—তাঁর শরীর ভাল নয় শুনে সকলেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রলেন।

চীনা থিয়েটার—সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ইংরিজি ঢঙের থিয়েটারের মতনই ব্যবস্থা, তবে কোনও কোনও বিষয়ে পার্থক্য আছে। দামী আসনগুলি আমাদের থিয়েটারের ষ্টল, পিট আর গ্যালারীর স্থানে। দামী আসনগুলির ব্যবস্থা এই রকম—দুখানি চেয়ার পাশাপাশি, আর তাদের ডাইনে আর বাঁয়ে একটী ক'রে ছোটো টেবিল। চেয়ার টেবিল সব দামী আবলুশ কাঠের, খুব চীনা কারুকার্য্য করা। এই টেবিলগুলি, চেয়ারে উপবিষ্ট দর্শকদের ডান হাতের কাছে বা বাঁ হাতের কাছে থাকে। এই টেবিলগুলি খাদ্য দ্রব্য চা প্রভৃতি রাখবার জন্য। দর্শকেরা চোখে অভিনয় আর নাচ-টাচ দেখেন, কানে গান বাজনা আর কথা শোনেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখেরও কার্য্য চলে। হয় গরম চা চলে—চীনা চা, দুধ চিনি বিহীন,—নয় কমলা লেবু, নয় চীন দেশের চা'ল-কড়াই ভাজা খরমুজের বীচি ভাজা,—নখে ক'রে ভেঙে ভেঙে তার শাঁসটুকু মুখে দিতে থাকে। প্রেক্ষাগৃহে নীচের তলায় বাঁ দিকে খানিকটা জায়গা কাঠগড়া দিয়ে ঘেরা, সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটক দেখবার ব্যবস্থা, অত্যন্ত গরীব লোকেরা দু এক আনা দিয়ে টিকিট কিনে সেখানে এসে ৩।৪ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেই নাটক দর্শন করে। সর্ব্বত্রই থিয়েটার দেখার সঙ্গে সঙ্গে 'মুখ-চলা'র রেওয়াজ। এক পাল রিক্‌শওয়ালা, জেলে, কুলী, ময়লা মুখ উস্ক-খুস্ক চুল নৌকার মাঝিদের ঘরের মেয়ে—এরা গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে নাটক দেখ্‌ছে। দোতালায় তেতালায় বক্স আসন, নানা রকম চীনা জালি কাটা কাঠের পাটাতন দিয়ে আলাদা করে দেওয়া, সেখানে ধনী ঘরের পরিবারের মেয়ে আর পুরুষেরা এসে ব'সেছে।

উঁচু রঙ্গমঞ্চের বন্দোবস্তটা পুরোপুরি ইউরোপীয় থিয়েটারের মতন নয়। দৃশ্যপটের জন্য খুব বিশেষ ব্যবস্থা নেই। প্রেক্ষকদের স্থান থেকে সিঁড়ি বেয়ে রঙ্গমঞ্চে ওঠবার পথ আছে। রঙ্গমঞ্চের উপরেই, দর্শকদের বাঁ দিকে Or-chestra বা "ঐক্যতান বাদক"-দলের স্থান। এদিকে নাটক অভিনয় চ'ল্‌ছে, পাত্র পাত্রীদের মধ্যে প্রণয়ী আর প্রণয়িনী

গানে বা মৃদু আলাপে কথা কইছে, বা দুই বীর হুঙ্কার ক'রে বাগ্‌যুদ্ধ ক'র্‌ছেন, তার মাঝে নাট্যালয়ের লোকে রঙ্গমঞ্চে এসে অভিনয়-ব্যাপৃত নট-নটীদের পোষাক বা গহনা ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, বা বীরদের হাতের অস্ত্র শস্ত্র তুলে দিয়ে যাচ্ছে। ষ্টেজের উপরেই, দু-ধারে রঙ্গমঞ্চের উপরে দর্শকদের চোখের সামনে বাজে লোকে ভিড় ক'রে আছে। বাদকদের দলে দু একজন খালি গায়েও আছে—থিয়েটারে ভিতরটা বড্‌ড গরম কিনা।

আমরা বস্‌বার পরেই দেখলুম, চীনা ভাষায় লাল কালীতে লেখা একখানা খুব বড়ো ইস্তাহার যেটা ষ্টেজের একদিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ছিল, সেটা ব'দলে তার জায়গায় কালো অক্ষরে লেখা আর একটী বিজ্ঞাপনী দিয়ে গেল। ক্যঙ ব'ললেন, কবি আসবেন ভেবে লাল অক্ষরে তাঁর স্বাগত করা হ'য়েছিল, এখন কালো অক্ষরের বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হ'ল যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর আগমন সম্ভব হ'ল না। নাটক সন্ধ্যারাত্র থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে, এখন প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটা, অভিনয় পূর্ব্ববৎ চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। প্রাচীন চীন ইতিহাসের ঘটনা নিয়ে এই নাটক ; অদ্ভুত অদ্ভুত পোষাক প'রে অভিনেতারা আস্‌তে লাগ্‌ল,—এ সব হ'চ্ছে চীনাদের প্রাচীন পোষাকের থিয়েটারী নকল—নানা রঙের সমাবেশ, নানা জরীর আর ছুঁচের কাজের ফুল পাতা নক্সা ড্রাগন বা চীনা নাগমূর্ত্তি প্রভৃতির সমাবেশ এই সব পোষাকে। নট নটীদের মুখে এমনি ক'রে রঙ মাখানো হ'য়েছে—লাল, হল্‌দে, কালো,—আর এমনি ক'রে ভুরু এঁকে দেওয়া হ'য়েছে, যে মুখ দেখে মনে হয় মানুষ নয়, পুঁতুল। বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়দের আবক্ষ পাটের গোঁফ-দাড়ী, পাকা বা কালো, চীনা-সুলভ গোঁফ-দাড়ী যা বেরিয়েছে তা কেবল ওষ্ঠের উপরে আর থুঁতীতে। লড়াইয়ে' সেনাপতির চণ্ডমূর্ত্তি, পোষাকে আর মুখের রঙে বিশেষ ভাবেই প্রকট। ঘটনাটী বুঝতে পারলুম না। দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে চ'লে যেতে লাগ্‌ল—অভিনেতারা ঢুকে বহু স্থলে ধীর-গম্ভীর পদবিক্ষেপে এসে ষ্টেজের মাঝখানে খাড়া হ'য়ে, পরে নতজানু হ'য়ে প্রণাম ক'র্‌তে লাগলেন, বোধ হয় দর্শকদেরকে। কোথাও রাজসভা, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও গ্রাম্যজনের সভা আর তার আনুষঙ্গিক হাস্যরস আর ভাঁড়ামি, আর কোথাও বা চীনা প্রেমিক-প্রেমিকার বিশেষ সংযত ভাবে রমন্যাসের বিন্যাস। নাচ-ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—ঝলমলে' ঢিলা পোষাক পরা তন্বঙ্গী নটীর মনোহর নৃত্য, যাতে দৌড়ধাপ নেই, আছে কেবল চমৎকার হাতের ভঙ্গী ; আর, ঢাল-তরওয়াল নিয়ে বিকটোজ্জ্বল পোষাক প'রে মুখে সিঁদুর আর কালী মেখে যোদ্ধার পাঁয়তারা আর উদ্দণ্ড নৃত্য। ছবির মতন এক একটী দৃশ্য চোখের সামনে দিয়ে চ'লে যেতে লাগ্‌ল।

জিনিসটা তার নোতুনত্বের জন্য, আর একটা বড়ো সুসভ্য জাতির নাট্যসৃষ্টি হিসাবে, আর তার প্রাচীন নাচ গান আর অভিনয় রীতির নিদর্শন হিসাবে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ছিল ব'লে, আর তার নিজস্ব সৌন্দর্য্য আর সার্থকতাও একটা ছিল ব'লে, অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে দেখ্‌তে পারা যেত। কিন্তু তা পারা গেল না। আমরা বারোটার সময় বিদায় নিলুম, প্রায় পৌনে দু ঘণ্টা থাকবার পরে। চীনা ঐক্যতান বাদনই আমাদের তাড়ালে। এই বাজনার বিরাম নেই। বোধ হয় এই বাজনা শোনার অভ্যাসের দরুন চীনাদের কর্ণপটহের সহন-শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হ'তে লাগ্‌ল, বুঝি বা এক রাত্তির চীনা orchestra শুনে চির জীবনের জন্য আমাদের কানে তালা লেগে যায়। আগেই ব'লেছি, কয় বৎসর পূর্ব্বে কাণ্টন থেকে আগত "ভ্রাম্যমান" একটী চীনা থিয়েটারের দল সপ্তাহ খানেক ধ'রে কলকাতায় থিয়েটার দেখিয়েছিল, বীড্‌ন্‌-ষ্ট্রীটের অধুনা-লুপ্ত ন্যাশন্যাল থিয়েটার ভবনে ; ক'লকাতার সমস্ত চীনাপাড়া সেখানে ভেঙে প'ড়েছিল, কৌতুক-বশতঃ আমিও সেখানে গিয়েছিলুম। দুটো তিনটে দৃশ্যের পরে আমার মতন বাঙালী যে ক'জন গিয়েছিল সবাই স'রে প'ড়্‌ল, আমি বাহাদুরী ক'রে ঘণ্টা দেড়েক ছিলুম, তার পরে আর পারলুম না। সুতরাং এ বিষয়ে আমি ভুক্তভোগী। Orchestraর যন্ত্রগুলি প্রায় সবগুলিই gong বা কাঁসর জাতীয়,সেগুলি হ'চ্ছে এই—মস্ত বড় কাঁসর, হাত দুই তার ব্যাস হবে, গোটা দুই, কাঠের ফ্রেমে সেগুলো ঝুলছে ; মাঝারী আকারের কাঁসা গুটী

তিন চার; ছোট কাঁসা চার পাঁচ খানা; কাঠের ফলকের উপরে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে মেরে তবলার কাজ হয়; একতারা কি দোতারা জাতীয় অতি কর্কশধ্বনি তন্ত্রীময় যন্ত্র গুটিতিনেক, আর একটা কি দুটী বাঁশের বাঁশি। অভিনয় চ'লছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ছবির background বা ভিত্তি-ভূমিকার মতন এই কাঁসরের ঐক্যতান বাদন চ'লেছে, তার আর বিরাম নেই, কখনও বা মৃদুমন্দে আর কখনও বা প্রলয় নিনাদে আওয়াজ ক'রে। গান হ'চ্ছে, তারও সঙ্গে এই বাদ্যির সঙ্গত, আর বহু স্থলে বাজনার চোটে গলার স্বর চাপা প'ড়ে ত'লিয়ে যাচ্ছে। দুই বীরে তরওয়াল ঠোকাঠুকি আরম্ভ ক'রে দিলেন, অমনি প্রাণপণ জোরে যুগপৎ ছোটো বড়ো ডজন খানেক ঝাঁঝ কাঁসর আর কাঁসীতে হাতুড়ী বা কাঠি প'ড়তে লাগ্‌ল। কান ঝালাপালা হ'য়ে যায়, ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে হয়। তবুও রক্ষা ছিল যে কি জানি কেন আমাদের একটু দূরে বসিয়েছিল, একেবারে ষ্টেজের সামনে নয়। ষ্টেজের সামনে হ'লে তো প্রাণ নিয়ে পালাতে হ'ত। তার পর, একটুও বিশ্রাম ছিল না কানের। একটা গর্ভাঙ্ক বা অঙ্কের মাঝে মাঝে যে বিরাম দেবার কথা, তখন এই কাঁসার বাজনা ষ্টেজটাকে না পুরো দখলে পেয়ে, আমাদের নানা করুণ আর মিঠে চীনা গৎ শুনিয়ে দিচ্ছিল; আর বাজিয়েদের হাতে যে জোর আছে, সেটাও মাঝে মাঝে তারা বেশ এক হাত দেখিয়ে দিচ্ছিল। চীনা শ্রোতারা কিন্তু নির্ব্বিকার। বাঁশের বাঁশী বেচারীদের দুরবস্থার একশেষ—তারা ঐ কাঁসরের ঝঞ্ঝার মধ্যে প'ড়েছিল, এই ঝা—ঙ্‌ ঝা—ঙ্‌ ঝাঝাং ঝাং এর ফাঁকে ফাঁকে যে বাঁশের বাঁশীর আওয়াজ-টুকু পাবো তারও জো ছিলনা, কারণ কাঁসরের আওয়াজের বহুক্ষণব্যাপী রেশের কল্যাণে কোনও ফাঁক পাবার উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে কোনও সুকণ্ঠী গায়িকা যখন গান ধ'রছিল, তখন কাঁসর আর কাঁসাগুলি একটু 'ক্ষ্যামা' দিচ্ছিল, খালি দু একটা কাঁসী চাপা গলায় বাঁশীকে উপহাস ক'রে তাল দিচ্ছিল, তখনই যা বাঁশীর আওয়াজ একটু কাণে আস্‌ছিল। তাও আবার দোতারা-গুলির আওয়াজের সঙ্গে জড়িয়ে। "সুকণ্ঠী গায়িকা" ব'ললুম, মনে রাখতে হবে চীনা রুচি অনুসারে সুকণ্ঠী। এদের গায়িকাদের বা নটীদের গলার আওয়াজ শুনে আমাদের দেশের লোকেরা হাস্‌বে। এরা গান করে যাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের পরিভাষায় বলে falsettoতে, স্বাভাবিক গলা যে সপ্তকে গাইতে পারে, এরা তার উপরের সপ্তকেই গান ধ'রে থাকে। তাতে এদের অভিনয়ে নটীদের গান বা কথাবার্ত্তা বড়ই অস্বাভাবিক ব'লে বোধ হয়, আর এতে এরা জোরও পায় না। সুতরাং পোষাক-পরিচ্ছদে, কায়দা-করণে, নাচে, চীনা নাট্য শাস্ত্রানুযায়ী অভিনয় ভঙ্গীতে মিলে জিনিসটাকে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ক'রে তুললেও এই falsetto গলায় গাওয়ায় আর অভিনয় করায়, আর কাঁসরের বাজনার উৎপাতে অ-চীনা ব্যক্তির পক্ষে চীনা-থিয়েটারে বেশীক্ষণ থাকা কষ্টকর হ'য়ে ওঠে।

কন্‌স্যল মহাশয়ের দোভাষী আর ক্যঙ-এর সাহায্যে আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রলুম। কন্‌স্যলটীকে বেশ অমায়িক সরল প্রকৃতির লোক ব'লে মনে হ'ল। শান্তিনিকেতনে আর ভারতের অন্যত্র চীনা পড়াবার ব্যবস্থা কি হ'য়েছে সে সম্বন্ধে বেশ কৌতূহলী হ'য়ে খোঁজ নিলেন। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর আস্থা জ্ঞাপন ক'রলেন।

রাত্রি বারোটার দিকে আমরা বিদায় নিয়ে সিগ্‌লাপে ফিরলুম—আর রাত জাগা যায় না, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে আর নানা লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরাও ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি। আবার বিশেষ তো কাল আমাদের মালাক্কা যাত্রা ক'রতে হবে, তাই বাক্স-পেটরা গুছিয়ে নিতে হবে।

২৬শে জুলাই, মঙ্গলবার।

সিঙ্গাপুরে এক সপ্তাহ ধ'রে আমাদের নানা কার্য্যময় অবস্থানের শেষ দিন আজ। সকালে আজ কোনও কাজ ছিল না। আমাদের ক' জনের লগেজ অনেকগুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, সব গুছিয়ে-সুছিয়ে নিয়ে কিছু সিঙ্গাপুরে রেখে বাকী সব জাহাজে তুলে দেবার জন্য আমেরিকান এক্স্‌প্রেস কোম্পানির লোকের জিম্মা ক'রে দিলুম। দুপুরে একটি কার্য্য ছিল—"মালায়া ট্রিবিউন" ব'লে একখানা ইংরিজি খবরের কাগজ আছে তার সম্পাদক গ্রান্‌ভিল্‌ রবার্টস্‌ ব'লে এক জন ইংরেজ, সিঙ্গাপুরের আন্তর্জাতিক

সম্মিলনীর তরফ থেকে তার বাসা-বাটীতে (flatএ) কবিকে আর আমাদের ল্যাঞ্চ বা দুপুরের খাওয়া খাওয়ায়। ল্যাঞ্চে অন্ত কতকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন, তার মধ্যে সস্ত্রীক জারমান কনসুল ছিলেন, ফরাসী কন্‌স্যল ছিলেন। আর দু এক জন ইউরোপীয়,আর চীনা, আর মান্দ্রাজী। জারমান কন্‌স্যলেরই সঙ্গে কবির বেশী আলাপ হ'ল—জারমানীতে এঁর সঙ্গে কবির পূর্ব্বে পরিচয় হ'য়েছিল। রবার্টস্ কবির প্রশস্তি পাঠমূলক বক্তৃতা ক'রলে, কবিও যথাযোগ্য উত্তর দিলেন।

এদিকে দুটো বেজে গেল, চারটেয় আমাদের ষ্টীমার ধ'রতে হবে। কবি গেলেন নামাজীদের শহরের বাড়ীতে, সেখানে বিশ্রাম ক'রে চা-টা খেয়ে তিনি জাহাজে যাবেন। আমরা শহরে চললুম, ছোটো খাটো দু একটা কাজ সেরে নিয়ে, নামাজীদের বাড়ীতে কবির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে জাহাজে যাবো ঠিক হ'ল। গ্রানভিল্ রবার্ট্‌স্ সকলকার একটা গ্রুপ ফোটো তোলার ইচ্ছায় ছিল, কিন্তু কবি চ'লে যাওয়ায় আর তার ফোটোগ্রাফ-ওয়ালা দেরী ক'রে ফেলায় তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না।

আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা সমিতিতে যোগ দিয়ে তার পাণ্ডাগিরি ক'রে এই ব্যক্তি আরিয়ামের সঙ্গে পরিচিত হয়, তার পর কবির সঙ্গে দেখাও করে। এর আগে নাকি এ কবির বিরোধী ছিল। ভারতীয়দের কাছ থেকে উপকার পেয়েও ভারতবিদ্বেষী। গতবার যখন কবি মালয় দেশে আসেন, পিনাঙ-এ নামেন, তখন এই লোকটী মোড়লী ক'রতে সিঙ্গাপুর থেকে পিনাঙ অবধি নাকি ছুটেছিল। এর সম্বন্ধে অনেক কথা পরে শোনবার অবকাশ হ'য়েছিল। এবার রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে এ প্রস্তাব করে, সিঙ্গাপুরের কাছে জোহোরে ইংরেজ সরকার রণতরীর নাওয়ারা বা নৌবাটের উপযুক্ত বন্দর আর ডক বানাচ্ছেন, চলুন আপনাকে দেখিয়ে আনি। এখন, এই যে সিঙ্গাপুরে এক বিরাট Naval Scheme হ'চ্ছে, তার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চ'লছে। উদ্দেশ্য আর যাই থাকুক, ভারতরক্ষা তার একটা প্রধান উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আর ভবিষ্যৎ কোনও একটা আন্তর্জাতিক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকাও একটা উদ্দেশ্য। যাই হোক্, রবীন্দ্রনাথ প্রথমটা ব'লেছিলেন, যে তিনি গেলেও যেতে পারেন; পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তী কতকগুলি ঘটনায় দেখা গেল, লোকটার সঙ্গে না গিয়ে কবি ভালোই ক'রেছিলেন। অন্যথা, হয় তো সে দু তিন ঘণ্টা কবিকে একা একা পেয়ে, তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়ে, তাঁর কাছে কোনও বিষয়ে কিছু শুনে, নিজেই তাঁর উক্তিকে বাড়িয়ে কমিয়ে একটা ভীষণ কিছু খাড়া ক'রত। পরে এই লোকটাই নিজের কাগজে নানা নিরঙ্কুশ মিথ্যা কথা আর অর্দ্ধসত্যকে অবলম্বন ক'রে কবির বিরুদ্ধে হঠাৎ একটী প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। তার জের ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এসে' পৌঁছে, আর বাঙলা দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ কতকগুলি ব্যক্তি এই গ্রানভিল্ রবার্টসের আক্রমণকে পরম সত্য ভেবে পরম উৎফুল্ল চিত্তে কবির সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ভাবে নানা নিন্দাবাদ ক'রে খবরের কাগজ বিশেষে যথারীতি নিজেদের শিক্ষা আর রুচির উপযুক্ত পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথ যখন সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে মালাক্কা দেখে কুআলা-লুম্পুরে গিয়ে পৌঁছান—৩রা ৪ঠা আগষ্টের দিকে—তখন গ্রানভিল্ রবার্টসের কাগজে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে লেখা শুরু হয়। এই আক্রমণে অন্য কোনও কাগজ যোগ দেয় নি, আর অল্প কয় দিন বিষ উদ্গীরণ ক'রে এই কাগজকে অপ্রস্তুত হ'য়ে তুষ্ণী-ভাব অবলম্বন ক'রতে হয়।—সে সব কথা যথাস্থানে বিবৃত ক'রবো।

চারটের সময় আমরা Johnstone Pierএ উপস্থিত হ'লুম, শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ নামাজী আর তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে। জাহাজ মাঝ-গাঙে ছিল, গভর্ণরের লঞ্চ্ 'এল' কবিকে তুলে দিয়ে আস্‌বার জন্য। অনেক লোকে কবির প্রত্যুদ্গমন ক'রতে এসেছিলেন—ইউরোপীয়, চীনা, ভারতীয়, জাপানী। চীনের কন্‌স্যল এসেছিলেন। বিদায় নিয়ে Larut 'লারুৎ' জাহাজে চ'ড়লুম। চীনা সেক্রেটারী হিসাবে ফাঙও সঙ্গে চ'ললেন। জাহাজে কতকগুলি ভারতী বন্ধুও উঠলেন—নামাজীরা, শ্রীযুক্ত আলিখাঁ সুরতী, শ্রীযুক্ত জুমাভাই। খানিক শিষ্টাচারের পরে জাহাজ ছাড়বার সময়ে এঁরা বিদায় নিলেন। জাহাজ ছেড়ে দিলে।

নানা ঘটনা বিজড়িত, নানা প্রত্যক্ষ-দর্শনে আর অভিজ্ঞতায় পূর্ণ আমাদের সাতদিনের সিঙ্গাপুর প্রবাস এইরূপে শেষ হ'ল।

২৬শে জুলাই মঙ্গলবার বিকাল থেকে ২৭ জুলাই বুধবার সকাল পর্য্যন্ত—ষ্টীমারে সিঙ্গাপুর থেকে মালাক্কা।—

'লারুৎ' জাহাজখানি ছোট্টো—আমাদের পদ্মা নদীতে পাড়ী দেয় যে সব বড়ো জাহাজ তাদের চেয়ে বেশী বড়ো নয়, তবে সাগরগামী ব'লে একটু আলাদা ভাবে তৈরী। ইংরেজ কোম্পানী Straits Steamships Co.র জাহাজ। এদের জাহাজগুলি বর্ম্মা, মালয় উপদ্বীপ আর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘোরা ফেরা করে। জাহাজের খালাসীরা চীনা বা মালাই জাতীয়, খানসামারা চীনা। আমরা প্রথম শ্রেণীতে যাচ্ছিলুম। জন ৪।৫ ইংরেজ মেয়ে আর পুরুষ, আর ফ্যঙকে নিয়ে আমরা ছ জন, এই হ'ল প্রথম শ্রেণীর যাত্রী সংখ্যা। জাহাজে তেমন যাত্রীর ভীড় নেই। মাঝখানটায় প্রথম শ্রেণী, আগায় দ্বিতীয় শ্রেণী, পিছনে তৃতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণী ঘুরে এলুম। মালাই, চীনে, তামিল চেট্টি, তামিল মুসলমান, দু চার জন গুজরাটী খোজা, হিন্দুস্থানী মুসলমান জন কতক—এরা হ'ল ডেক্ যাত্রী। কতকগুলি মালাই পরিবার আরব দেশ থেকে হজ সেরে আস্‌ছে—এদের দলে গরীবও আছে, বড়োলোকও আছে। সিঙ্গাপুরকে একরকম চীনা শহর ব'ল্‌লেই হয়। সেখানে সভা সমিতিতে এক আধ জন শিক্ষিত মালাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'লেও, সাধারণ মালাইদের দূর থেকেই অল্পস্বল্প যা দেখা যেত। সারং-পরা মালাই মেয়ে, এদের চলা ফেরায় একটা ভারী সহজ আর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছিল, আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুরুষরা বেশ দৃপ্তভাবে চ'লেছে—সমস্ত জা'তটা আমাদের আকৃষ্ট ক'র্‌ত। বেশ শিল্প-কুশল, খোশ-পোষাকী দিল-দরিয়া জা'ত এরা। তারপর স্থইটেনহাম, ক্লিফর্ড, উইন্‌সটেট প্রভৃতির লেখা মালাই জা'তের আর মালাই দেশের সম্বন্ধে রোমান্টিক ভাবে পূর্ণ কতকগুলি গল্প আর প্রবন্ধ প'ড়েছি, তাতে এদের সম্বন্ধে বেশ একটা সহানুভূতির ভাব মনে জেগেছে। জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ঘুরে ফিরে এদের দেখতে লাগলুম। এরা বেশ মিশুক। আমি গত সাত দিন ধ'রে সিঙ্গাপুরে একখানি ইংরেজি-মালাই, আর মালাই-ইংরেজি পকেট অভিধান নিয়ে,চীনা তামিল যাকে পেয়েছি তার উপর আমার পুস্তক-দৃষ্ট মালাই চালিয়ে এসেছি। বিশুদ্ধ মালাইয়ে কথাবার্ত্তা শোনবার অবকাশ হয় নি। মালাইদের কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণ লক্ষ্য ক'রতে লাগলুম। সন্ধ্যে হ'য়ে গিয়েছে; মালাই যাত্রীরা খাবার বা'র ক'রে খেতে লাগ্‌ল,—সুন্দর কাজকরা বেতের ডালা দেওয়া চুবড়ী থেকে ভাত, মালাই তরকারী, শুঁটকী মাছ, সব বা'র ক'রতে লাগল। আর ডুরিয়ান ফল। এই ফল কাঁঠাল জাতীয়; এর নিজস্ব অত্যন্ত উগ্র অপরূপ বাস আছে একটা, সুগন্ধ হোক্ আর দুর্গন্ধ হোক সেটা যে একটা ভীষণ উগ্র গন্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—দূর থেকেই এই ফল নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানান্ দেয়; বিদেশী লোকেদের অনেকে এই গন্ধের জন্য মোটেই এই ফল খেতে সাহসী হয় না। এ যাত্রায় কবি, আরিয়াম, আর আমি,আমরা তিন জনে অবলীলাক্রমে শ্রীযুক্ত নামাজীর ভোজনের টেবিলে ব'সে ডুরিয়ানের এই গন্ধ-test পার হ'য়ে, স্থানীয় native দের বিস্ময় আর সম্ভ্রমের পাত্র হ'য়ে উঠেছিলুম। ধীরেন বাবু আর সুরেন বাবুর ডুরিয়ান বরদাস্ত হয় নি। গন্ধটা তো অনির্ব্বচনীয়, স্বাদও সেই রকম---স্বাদের কথা মনে হ'লে প্রচুর রসুনের সঙ্গে দুধ জ্বাল দিয়ে যদি ক্ষীর তৈরী হয়, সেইরূপ ক্ষীরের সঙ্গেই তার একমাত্র তুলনা দিতে ইচ্ছে হয়। আমাকে কাছে দেখে আর ডুরিয়ানের গন্ধে না পালানোতে, একজন বয়স্ক মালাই পুরুষ আহ্বান ক'রলে —"তুআন নাক্তি মাকান্?" অর্থাৎ মহাশয়, খেতে ইচ্ছে করেন? আমি "তিদা, ত্রিমা কাসি"—না, ধন্যবাদ, ব'লে মাফ চাইলুম। আমার ভাঙা ভাঙা মালাইয়ে, আর এদের একজনের ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানীর সাহায্যে বুঝলুম যে এরা মক্কা-মদিনা থেকে হজ ক'রে ফিরছে, কা'ল মালাক্কায় নাম্‌বে, মালাক্কার কাছেই বাড়ী। অবস্থাপন্ন কৃষক শ্রেণীর লোক। পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে এদের বেশ ভদ্র আর উৎকর্ষযুক্ত ব'লে বোধ হ'ল। চীনা যাত্রীরা ছোটো ছোটো দল পাকিয়ে বিছানাপত্র ছড়িয়ে ব'সে গিয়েছে। এদের কতকগুলিকে আনকোরা 'তাজা-আওর্দ' বা চীনদেশ থেকে নবাগত ব'লে বোধ হ'ল

এদের চোখে একটু ভীত-ভীত ভাব। ক্যাণ্ড ব'ল্‌লে যে এরা যাচ্ছে উত্তর মালাই দেশে টিনের খনিতে কাজ ক'রবে ব'লে—কুলী শ্রেণীর লোক এরা। এরা এদের মেয়েদের খুব কমই বিদেশে আন্‌তে সক্ষম হয়। এদের ভাষা জানিনা, কোনও আলাপ সম্ভব নয়, তবু দূর থেকে দেখতে লাগলুম, কেমন সুন্দর বিধি ব্যবস্থা এদের। কানে হীরার কানফুল লাগিয়ে তামিল চেট্টি, বা আচকান-পরা, মাথায় জরীর মোড়া পাগড়ী (যেন মূর্ত্তিমান্ 'নাফা-নোকসান্') গুজরাটী খোজাদের সম্বন্ধে তাদৃশ ঔৎসুক্য আমার ছিল না। এক জায়গায় ডেকের রেলিং-এর ধারে ৪।৫ জন হিন্দুস্থানী মুসলমান, ২।১ জনের মাথায় তুর্কী টুপী, উর্দ্দু-মেশানো ভোজপুরে'তে কথা কইছে শুনে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারা তখন রুটী-কাবাব বা'র ক'রে খাবার আয়োজন ক'রছে। তাদের কাছে শুন্‌লুম, তারা মালাইদেশে মুসলমানদের মধ্যে ইস্‌লামী বই, তাবিজ, মক্কা মদীনার ছবি প্রভৃতি বিক্রী ক'রে বেড়ায়। ধর্ম্মপ্রাণ জাতি ব'লে মালাইদের সুখ্যাতি ক'রলে; কোরান শরীফ, নমাজের বই, বিশুদ্ধ আরবীতে লেখা বই কিছু কিছু ভারতবর্ষ থেকে আনায়; আর স্থানীয় ছাপা মালাই ভাষায় লেখা ইস্‌লামী বইও কিছু কিছু রাখে। এই সব বই, আর তার সঙ্গে আরবী মন্ত্র লেখা তাবিজ নিয়ে এরা মালাই দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে মুসলমান মালাইদের মধ্যে বিক্রী ক'রে থাকে। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই সৎকার্য্যে তাদের লাভও মন্দ হয় না। লোকগুলি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে, "সাহ্‌ব্, উও জো পীর-সা আদমী হমারে সাথ ইস্ জহাজমেঁ চঢ়ে হৈঁ, রবীন্দ্রানাথ টাগোর উ-হী হৈঁ না? বাহ্, ক্যা নূরানী শকল্।" তার পর প্রশ্ন হ'ল, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম কি। সত্য ধর্ম্ম যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের অতীত এই রকম একটা ভূমিকার অবতারণা ক'রে বলা গেল, যে, উনি মুসলমান নন্। তখন এরা ভদ্রভাবে আমার কথা একটু শুনে, আহারে মনোনিবেশ ক'রলে।

সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছিল কতকগুলি চীনা ছাত্র আর ছাত্রী। মালাক্কাতে একটা খ্রীষ্টানী (রোমান কাথলিক) ইস্কুল আছে, এদের কতকগুলি সেখানে পড়ে, আর কতকগুলি মালাক্কার কাছে Muar মুআর ব'লে একটা ছোটো শহরে চীনাদের একটা বড়ো ইস্কুল আছে সেখানে পড়ে। ছুটী শেষ হ'য়েছে, ইস্কুলে যাচ্ছে। চীনা ছোকরাদের সাদা জীনের পোষাক, গলা-আঁটা কোট, ফেল্ট টুপি; মেয়েদের কাল রেশমের ঘাগরা, গায়ে সাদা রেশমের চীনা কোট, মাথার চুল চীনাধরণে খোঁপা ক'রে বাঁধা, কপালের উপর কিছু চুল ঝুলফী আকারে ভেঙে প'ড়েছে, মাথায় টুপী বা অন্য আবরণ নেই। এই চীনা মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদেরই মত লাজুক, তারা দূরেই রইল। কতকগুলি ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'ল, ১৮।২০।২২ বছর বয়সের সব ছোকরা, দেখতে বেশ বুদ্ধিমান। কবির সম্বন্ধে নানা খবর জান্‌তে চায়। সুরেনবাবুর হাতে ক্যামেরা ছিল, চীনা ছোকরাদের হাতেও ছিল। তখন বিকালের রোদ্দুর আছে, গোটা দুই ছবি তোলা হ'ল, গ্রুপ, এই সব চীনা ছাত্র আর ছাত্রী, আর আমাদের নিয়ে।

সিঙ্গাপুরের দক্ষিণেই ছোটো একটী দ্বীপ। মনোরম স্থান, পাহাড়, না'রকল গাছ, ঝরনা, জল, মাঝে মাঝে দু একটী বাড়ী। সিঙ্গাপুর আর এই দ্বীপের মাঝখানের খাড়ীটা একটা বড়ো নদীর মতন, পাতলা মেঘের মধ্যে অস্তগামী লাল সূর্য্যের আলোয় স্বর্ণ-মণ্ডিত। পরে সমুদ্রে গিয়ে পড়লুম। জাহাজের উপরের ডেকে, সাগর জলের আর আকাশের গাঢ়ায়মান ধূম্রবর্ণের মধ্যে, কবির সঙ্গে ব'সে ব'সে নানা বিষয়ের আলোচনা হ'তে লাগল—সিঙ্গাপুরের ঘটনাবলীর, আর যবদ্বীপ প্রভৃতিতে আমাদের কর্ত্তব্যের সম্বন্ধে।

রাত্রের আহারের ঘণ্টা প'ড়ল। একত্রে খাওয়া শেষ ক'রে এসে আবার বসা গেল, নীচের ডেকে। দূরে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিন যেখানে চীনা ছাত্ররা আছে সেখান থেকে বেহালার ধ্বনি আসছে। কবির কাছে এখন শুন্‌লুম যে কানাডাথেকে তাঁর নিমন্ত্রণ এসেছে, শীঘ্রই তাঁকে সেখানে যেতে হ'তে পারে, হয় তো সেই জন্য তাঁর যবদ্বীপের ভ্রমণ তাঁকে সংক্ষেপে সেরে নিতে হবে, কিন্তু যাতে আমরা যবদ্বীপে বেশী দিন থেকে সমস্ত দেখ্‌তে শুনতে পারি তার ব্যবস্থা তিনি ক'রে দিয়ে যাবেন।

কথাটা একটু উদ্বেগকর মনে হ'ল। কিন্তু সুখের বিষয়, অত শীঘ্র শীঘ্র কানাডা যাওয়ার পক্ষে কতকগুলি অনপনেয় বাধা ক্রমে ক্রমে প্রতীয়মান হ'য়ে পড়ায়, এ যাত্রা কানাডা যাওয়া কবি স্থগিত রাখেন, আর আমাদের যবদ্বীপ দর্শনটা মোটামুটী ভালো ক'রেই হ'য়েছিল।

রাত প্রায় এগারোটা। বিরাট কোনও জানোয়ারের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মত ধুক্‌ধুক্‌ শব্দে ইঞ্জিনের আওয়াজ হ'চ্ছে, জল কেটে কেটে জাহাজ চ'লেছে, মাঝে মাঝে খালাসীদের খালি পায়ে দুপ্-দাপ্ চলা ফেরার শব্দ বা দূর থেকে অবোধ্য ভাষায় তাদের কথার আওয়াজ। চিঠি পত্র দু'চার খানা লিখে, পরদিন থেকে আবার মালাক্কার পর্য্যায় কি রকমে আরম্ভ হয় সে বিষয়ে উৎসুক চিত্ত হ'য়ে, উঁচু বার্থের উপর উঠে আলো নিবিয়ে দিয়ে ঈশ্বর-স্মরণ ক'রে শয়ন করা গেল।

অনন্তের ডাক

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আকাশের মেঘ-রন্ধ্রে অন্ধকারে তুমি চেয়ে থাকো—
তারা হ'য়ে,
আঁখির পলক হারা হ'য়ে ;
ডাকো, ডাকো, তুমি মোরে ডাকো
আভাসে, ইঙ্গিতে, শত ডাকে ;—
আমি থাকি ক্ষুদ্রতার সীমা-নাগপাশে
ধরণীর এক পাশে
বাঁধা শত পাকে,—
চারিদিকে স্বার্থ-কোলাহল,
উচ্ছৃঙ্খল
সংগ্রাম সংঘাত,
ঘাত-প্রতিঘাত ;
তবু মাঝে মাঝে আসে কাণে
তব ডাক,—উদাস করিয়া দেয় প্রাণে।
চারিদিকে কামনা-অপ্সরী
খেলে লুকোচুরি-খেলা—করতলে মোর দুটি চক্ষু চেপে ধরি'
দৃষ্টি রোধ করি' ;
তবু মাঝে মাঝে কেন অঙ্গুলির ফাঁকে
আঁখির কিরণ তব আসি' মোর লাগে
নয়নের আগে
আলোহিত রাগে...

সে কিরণে ফুটে উঠে অন্তরের ফুল—
ঊর্দ্ধপানে মেলি' বাহু আরো ঊর্দ্ধে উঠিতে ব্যাকুল
বৃথা ঝাপটিয়া মরে পাপড়ির পাখা শুধু তার,
পা'য় দৃঢ় বাঁধন বোঁটার !
হে উদার, হে বৃহৎ, হে অশেষ, হে চির উদাসী,
বাজে, বাজে, বাজে তব মোহনিয়া বাঁশী ;—
আমি থাকি সংসারের মাঝে
ব্যস্ত শত কাজে,
চারিদিকে সংস্কার-শাসন,
বেষ্টনী-বন্ধন—
রাধিকার চারিপাশে যেন গুরুজন ;
তবু আমি রহি' কাণ পাতি' ;
ধোঁয়ার ছলনা করি' কাঁদি,
সংসার-সীমায় বসি' শুনি তব বাঁশরীর তান,
সুদূরের গান।
মনে হয়, বৃথা এ-সংসার,
ভালো কিছু নাহি লাগে আর,
ভাবি, চলি চুপি-চুপি বাহিরি' আঁধারে
তব অভিসারে ;
কিন্তু হায়, সম্মুখে দুস্তর
মায়া-কালিন্দীর স্রোত—তরঙ্গের স্তর !

ডাকো, ডাকো, তুমি মোরে ডাকো
হে প্রমুক্ত বায়ুর প্রবাহ, বাহিরের হে মুক্তি বৃহৎ,
অবকাশ,—হে শূন্য মহৎ,
বদ্ধ পিঞ্জরের ফাঁকে তুমি চেয়ে থাকো ;
আমি পিঞ্জরের পাখী,
ক্ষুদ্র পাত্রে বদ্ধ বারি—ক্ষুদ্র খাদ্যে তৃপ্ত হ'য়ে থাকি ;
নেই নির্ঝরের জল,
গিরি-বন-জাত ফল,
তবু কেন ভ্রান্তি-ভরে ভাবি সুখে আছি,—
নিরুদ্বেগে বাঁচি !
কিন্তু থেকে থেকে যবে শুনি তব ভাষ,
পাই তব দৃষ্টির আভাস,
মনে করি, চলি আমি ধেয়ে—
পাখা মেলি' মহাশূন্য বেয়ে ;
কিন্তু বৃথা—সম্মুখে যে সুদুর্গম পিঞ্জরের বাধা,
আমি বন্দী—বাঁধা !

যাব, যাব, তবু আমি যাব,—
হে অনন্ত বল' বল' আমি তোমা পাব !
পাপ্‌ড়ির ডানা খুলে' তুলে',
মুক্তির আনন্দে দুলে' দুলে'
দেখিব পরাণ-পণে
টুটিতে পারি কি নারি বোঁটার বাঁধনে…

জানি আমি, হায়,
বোঁটা যাবে টুটে',—ম্লান মর্ত্ত্যের মাটিতে পড়ে' লুটাইবে কায় ;
তবু আমি সৌরভের রূপে
হে অসীম, ভেসে' যাব তোমার মাঝারে চুপে-চুপে !

যাব, যাব, ওগো আমি যাব,
হে অনন্ত, বল' বল' আমি তোমা পাব !
এড়াইয়া সংস্কার-শাসন,
বেষ্টনী-বন্ধন,
কোনো ফাঁকে এই স্থূল আমি যদি যেতে নাহি পারি বাহিরিয়া—
রাধা হ'য়ে অভিসারে
কালিন্দীর পারে
একেলা আঁধারে
যাবে, যাবে মোর সূক্ষ্ম হিয়া !

আমি যাব, যাব, আমি যাব,—
হে অনন্ত, বল' বল' আমি তোমা পাব।
খাঁচার প্রাচীর'পরে পাখা আছাড়িয়া
যায় যাবে প্রাণ বাহিরিয়া,
তবু আমি—কলকণ্ঠ ভরি'
গাব বিপুলের গান বার বার করি' ;
আর সেই সঙ্গীতের সুর-মূর্ত্তি ধরে',
দিব পাড়ি সীমা-হারা তোমার সাগরে।

লাঙ্গুলোপাখ্যান

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

—আসিতেছে! আসিতেছে!!—

—আসিতেছে!!!—

এই খবরটার দিকে আমাদের নজর গেল। আমাদের জীবনের স্বাদের তেঁতো-মিষ্টির দৈনন্দিন তারতম্য খুব কম; জীবনের স্রোতে জোয়ার-ভাঁটার ওঠা-নামা আরো কম।... পাঁচড়া থেকে পানের চালান এল ত পান পয়সায় পাঁচটা—না এল ত দু'টো। আলু পটল ঝিঙের দর শীত গরম বর্ষায় কমি বেশী; ছেলেটার জ্বর, মেয়েটার সর্দ্দি, চাকরটার বে-আক্কেল—এম্‌নি সব খবরের আদান-প্রদান ঘুর্‌তে থাকে; তার বিরাম নেই, বদল নেই, শেষ নেই—

খুব যার কাজের নেশা সে আদার বাজারে ঘোরে—আর খুব যে-বার বিপন্নতা সে-বার কলেরা ঢোকে।

হঠাৎ দেখ্‌লে দেয়ালে, গাছে গাছে, আলোর খুঁটিতে, দোকানের ঝাঁপে, ফেরিওয়ালার ঝাঁকায়—এক কথায় নিত্যানন্দের টাক ছাড়া সমস্ত প্রকাশ্য স্থানে ঐ আস্‌বার খবরটি পেয়ে আমরা একটু ন'ড়ে বস্‌লাম অর্থাৎ একটু বিস্ময় এল আর ছোট মেয়েটির জ্বরের খবর শোন্‌বার পর শুধোলাম,—কে আস্‌ছে হে?

কিন্তু কেউ তা জানে না। কে আস্‌ছে, কেন আস্‌ছে, তা এমন করে' অনুমানই করা গেল, যা সকলেরই মন-সই। তবু মনটা খাড়া হ'য়েই রইল।

পরদিনই শোনা গেল, যে আস্‌ছে বলে' রটেছে সে এসেছে; সে আর কিছুই নয়, সার্কাসের দল। মেয়ে পুরুষ আর ছোট-বড়য় এত লোক যে, তাদের আসার খবর পেতে-না-পেতে, তারা চোখের উপর পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল। কোন্ দেশী লোক তারা তা বোঝা গেল না, কেউ পেন্টুলান পরা, কারো পরণে লুঙ্গি, কারো পায়জামা, কারো ধুতি—

হালদার বল্‌লে—মগ।

মোহন বল্‌লে,—ছাই জান, বর্গী।

তৃতীয় ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর কোনোটাই মঞ্জুর করলে না, বল্‌লে,—হেলেঙ্গী।

আমি বল্‌লাম—বাড়িতে পটোলে, আলুতে, থোড়ে, ঝিঙেয়, পোস্তর চচ্চড়ি—সব দেশের লোক ওতে আছে।

ছেলের দল তামাসা দেখ্‌তে দুপুর রোদেই ছুটল—এসে খবর দিলে,—রাজার মাঠে সার্কাসের তাঁবু উঁই উঁচু মাস্তলের সঙ্গে ঝুলে আছে, আর মানুষের চচ্চড়ির সঙ্গে ইঁদুর থেকে সিংহ পর্য্যন্ত জানোয়ারের ফোড়ন আছে।

আমাদের এখানে গাড়ী বল্‌তেই রুটিওয়ালা রঞ্জনের গাড়ী......সেই গাড়ীখানাকে তারা সাজিয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করে' গেল।

মাষ্টার তুলসীর অপূর্ব্ব ক্রীড়াচাতুর্য্য!

বীরকেশরী বিশ্বনাথের হিংস্র ব্যাঘ্রের

সহিত মল্লযুদ্ধ!!

ছয় বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু

অজিতকুমারের সিংহের পিঞ্জরে

একাকী প্রবেশ!!!

ইত্যাদি অদ্ভুত কীর্ত্তির খবর সেই হ্যাণ্ডবিলে পেয়ে জায়গাটায় এমন রৈ-রৈ উঠল যে, সর্ব্বেশ্বর আদার বাজারে গেল না; আর বওয়াটেরা তাস-পিটতেই ভুলে গেল।

রাত আটটায় খেলা আরম্ভ—

কিন্তু এমনি মানুষের ব্যগ্রতা যে, সাড়ে ছ-টা না বাজতে তাঁবুতে তিলধারণের স্থান রইল না; দু'টি মাথার ভেতর দিয়ে ছুঁচ গলান যায় না, মাথায় মাথায় এমনি ঠাসাঠাসি।
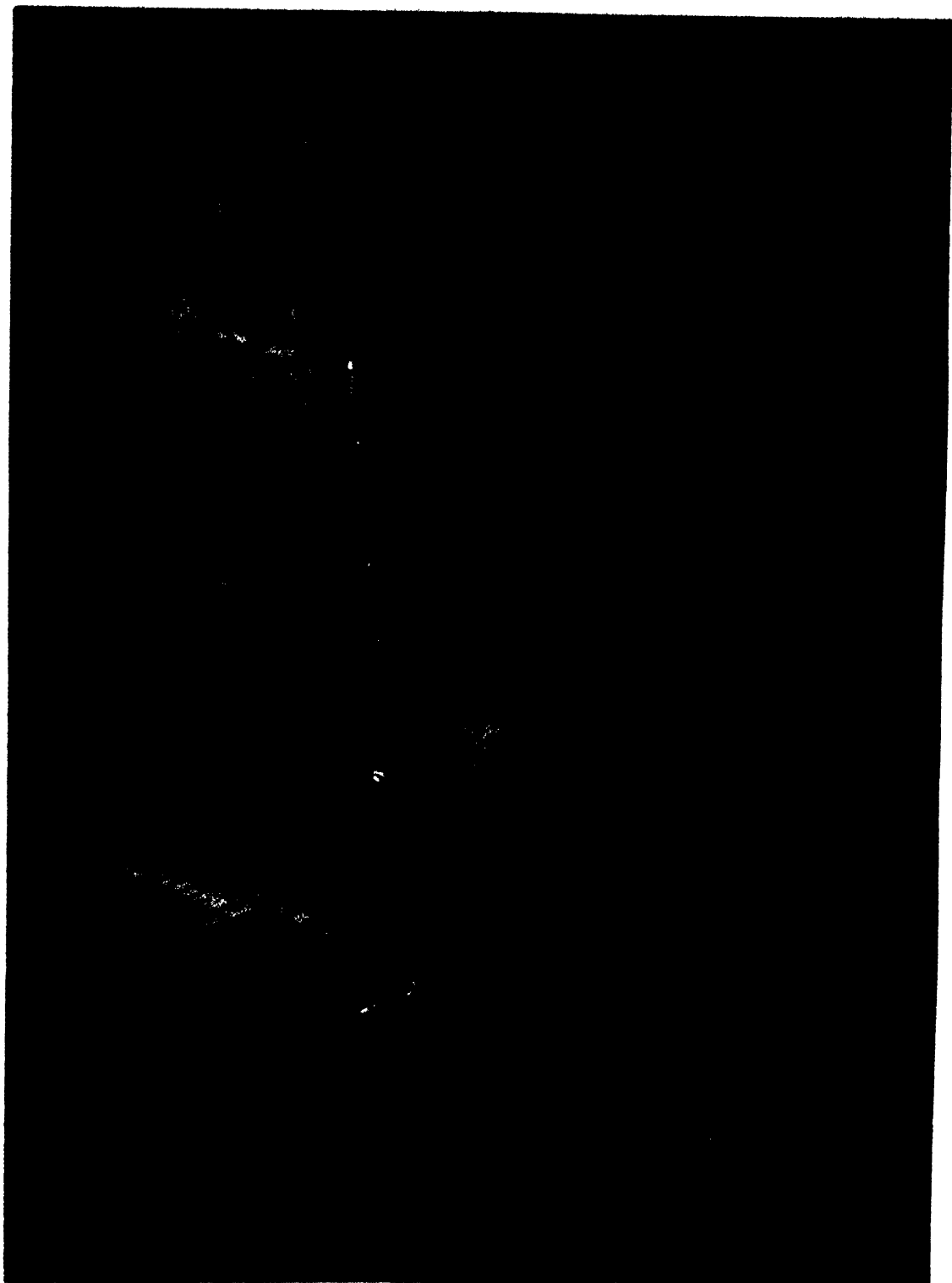
দিল্লীওয়ালা
শিল্পী শ্রী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

* * * তিন রাত্তির খেলা দেখিয়ে সার্কাসের দল খাঁচা আর তাঁবু গোযানে বোঝাই দিয়ে চলে' গেল, মাষ্টার তুলসী, বীরকিশরী বিশ্বনাথ, আর ছয় বৎসরের দুগ্ধপোষ্য শিশু অজিতকুমার তার সঙ্গে গেলেন, কিন্তু আমরা বংয়ের দল, তামাসা দেখতেই লাগলাম।—

আড়াআড়ি করে' বাঁশ বেঁধে তার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে আনন্দ চাকির ছেলেটা তার বাঁ-হাতের হাড় দু-টুক্‌রো করে' ফেল্‌লে।

শ্যামাদাসের নাত্তি ভুতো নিলে সিংহের পার্ট—

আর শ্যালা নিলে অজিতকুমারের পার্ট—

কিন্তু সিংহের চেয়ে মানুষ হিংস্র বেশী, তাই ন্যাণা ভুতোর মুখের ভেতর মাথা দেবার উদ্দেশ্যে তার হাঁ'র ভেতর নাক দিতেই ভুতো তার নাক এমন কামড়ে দিলে যে, রক্ত ঝরে' একাকার—

রক্ত বন্ধ কর্‌তে ডাক্তার ডাক্‌তে হ'ল।

ইত্যাদি।

সার্কাসের দল রওনা হ'য়ে যাবার পরদিনই যে ভয়ঙ্কর গুজবটায় দেশে হৃৎকম্প ছেয়ে এল তার চেয়ে ওলাউঠো ভাল—সার্কাসের বাঘটা না কি খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পালিয়েছে—

এই দুই এক ক্রোশের মধ্যেই।

সার্কাসের খাঁচায় মধ্যে বীরকেশরীর সঙ্গে মল্লযুদ্ধের সময় মনে হয়েছিল, বাঘকে নেশা ধরান হয়েছে... বীরকেশরীর হুঙ্কারে আর চপোটাঘাতেও তার তখন হুঁস হয়নি—

বড় নিরীহ বাঘ, রাগ নামমাত্র নাই, খাবার লোভও নাই, কোনো ক্ষমতাই তার নাই—অমন বাঘের সঙ্গে লড়ে' আমরাও জনে জনে বীরকেশরী হ'তে পারি...তখন এই সব মনে হয়েছিল, আলোচনাও হয়েছিল—

কিন্তু, সেই বাঘই দু'এক ক্রোশের মধ্যেই খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে গেছে শুনে সে যে আফিংখোর তা' চট করে' ভুলে গেলাম আর বুকের ভেতরটা শুকিয়ে নিরম্বু হ'য়ে উঠল—.

তার স্তিমিত চক্ষু আর স্তিমিত রইল না—

পিট্‌পিট্ করে' না তাকিয়ে সে যেন অজগরায়বারের রাবণের মত চারিদিক্ থেকে কটমটিয়ে তাকা'তে লাগল।

...আশু সিক্‌দার সার্কাস দেখে এসে বলেছিল,—আফিং খেয়ে ঝিমুচ্ছে যে-বাঘ, তার মুখের ভেতর হাত দেয়া ত তুচ্ছ কথা, তার মুখের ভেতর দিয়ে হেঁটে আমি তার পাকযন্ত্রে যেতে পারি। সেই আশু সিক্‌দেরও খবরটা শুনে ধাঁ করে' পেছন্‌দিকে চেয়ে নিলে; কিন্তু তার পেছনে ছিল দেয়াল।...আশুর চাউনি দেখে মনে হ'ল, সার্কাসের দলে যখন ছিল তখন বাঘ আফিং খেত; দল ছেড়ে এসে এখন সে নিরামিষ ঘাস খায় না তা আশু জানে—

বিন্দু বোষ্টম বল্‌লে—ভালই হয়েছে, বাঘটাকে একবার দেখ্‌তে পেলে নেমন্তন্ন করে' বোষ্টমীকে তার সাক্ষে দিতাম।

শুনে আমরা হাস্‌তে গেলাম, কিন্তু হাসিটা দাঁতের ওপারেই আট্‌কে রইল।

হরি ঘোষের চিরটা কাল মাতব্বরি ধরণ—

সে বল্‌লে,—বাজে গুজব। বাঘ যদি ছুটেই থাকে—

ছুটেছে বলে'ই যে এদিকে আস্‌বে তারই বা কি কথা?

কথাটা সঙ্গত—

মেনে নিতেও সুখ হ'ল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে' গেল না-আসারও ত হেতু নেই।

লোকপরম্পরায় শোনা গেল, মাইল তিনেক দূরে বাঘটাকে দেখা গেছে.........

যদিই বাঘ আসে তবে আত্ম ও আর্ত্তরক্ষার পন্থা কোন্ দিকে, সবাই মিলে সলা-পরামর্শ করে' তাই একটা নির্ণয় কর্‌তে বিধু হালদারের উঠোনে জমায়েৎ হ'লাম—কিন্তু কোনরূপ ব্যবস্থা না হ'তেই অবস্থা অন্তরূপ দাঁড়িয়ে গেল...

তালাই পেতে একে একে সব বসেছি—বিধু হালদার ছিলিমটা ধরিয়েছে—দু হাত তা ফিরেওছে—

নিমাই টেনে মোহনের হাতে দিতে যাবে, এমন সময় নিমাইয়ের হাত মধ্যপথে থেমে গেল... ...

"খেয়ে ফেল্‌লে, খেয়ে ফেল্‌লে"—এম্‌নি একটা চীৎকার শুনে চম্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলাম, একটা লোক আলুথালু হ'য়ে ছুটে আস্‌ছে—

মুহুর্মুহু পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কি দেখছে—বস্ত

সে চেঁচাচ্ছে তত তার দৌড়ের বেগ বাড়ছে……দেখতে দেখতে সে এসে পড়ল—

আসার পথে হরি ঘোষকে কাৎ ক'রে ফেলে দিয়ে জলের ঘটিটা লাথি মেরে ঝন্ করে' ছুটিয়ে দিয়েছে……

এমন সময় কে যেন বলে' উঠল,—বুঝি বাঘ! … … …

শুনে চোখের নিমেষ না পড়তেই যেন ঝড় উঠল… …

বিধু হালদার লোকটার হাত ধরে' একটা ঝাঁট্কা মেরে তাকে মাটির ওপর বসিয়ে দিলে……ভূশায়িত হরি ঘোষকে পা দিয়ে চট্কে বারান্দায় উঠে পড়লাম……

পরক্ষণেই লোকে ঘর ভরে' গেল—হরি ঘোষ বিদ্যুদ্বেগে উঠেই ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিলে……

বাইরে রইল কেবল অজানা সেই লোকটা।

সে বন্ধ দরজার ওপর হাত চাপড়ে কাঁদতে লাগল,—ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় বাঘের মুখে দিও না। … …

কিন্তু আমাদের তা কানেও গেল না।

হরি ঘোষ গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে,—ওই বেটাই বাঘ ডেকে এনেছে……ওই বাঘের পেটে যাক্।

বিন্দু বোষ্টম বল্লে—এগিয়ে যাও বাবা, এগিয়ে যাও ……সঙ্গে করে' এনেছ যদি তবে সঙ্গে নিয়েই আর একটু এগিয়ে যাও……আমরা বাঁচি।

লোকটা এগিয়ে গেল না, দরজা ধরে' কাৎরাতে লাগল। কিন্তু গোল বাধালে মোহন। সে বল্লে,—আমার বৌ-ছেলে একলা আছে……দরজা ছাড়, আমি যাব। বলে' সে বিধু হালদারের চার হাত লম্বা বাঁশের লাঠিগাছটা হাতে কর্লে।

আমরা বল্লাম, বৌ-ছেলে আমাদেরও আছে। তবু দরজা আমরা খুল্‌ব না।……মস্ত রাস্তা পাও, যাও।

দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিধু হালদার নিজে। মোহনের উদ্যম দেখে সে খিলটা চেপে ধরে' আরো শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু মোহন ভীষণ ষণ্ডা—ষাঁড়ের শিং ওপড়ায়—

সে বিনাবাক্যে এগিয়ে এসে বিধু হালদারের ঘাড়টা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধর্‌লে—এবং আমরা হাঁ হাঁ করে' উঠে কিছু ক'রে ওঠ্‌বার আগেই তাকে উঁচু করে' তুলে বরাবর দেয়াল পর্য্যন্ত ছুঁড়ে দিলে—

বিধু গিয়ে দেয়ালের ওপর পড়ল—

আর মোহন্ খিল খুলে ডাক ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে গেল……সেই অবসরে সেই লোকটা আড় হ'য়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ কর্‌তে কর্‌তে দড়াম্ করে' মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

অনর্থক আক্রান্ত হ'য়ে বিধু হতবুদ্ধির মত দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছিল……সকলের আগে সেই ছুটে এসে অচৈতন্য লোকটাকে কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে হাওয়া কর্‌তে লাগল……

ঘরের এক কোণে ভাগ্যিস্ জলের কলসী ছিল………

আমি আঁজলা করে' জল তুলে তুলে তার মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম—

শুক্‌নো কাঁচা মেঝে কাদা হ'য়ে চাষের উপযোগী হ'য়ে উঠল।

খানিক বাদেই লোকটা চোখ খুল্‌লে বটে কিন্তু দেখ্‌লাম, সে চোখে যেন কোনো ভাব নাই—মানে, চোখ চেয়েও কিছু যেন তার চোখে পড়ছে না…… তার শুক্‌নো ঠোঁট আর জলে-ভেজা চুলের দিকে চেয়ে আমার বড় মমতা হ'ল—

যেন তার কেউ নেই, বেঘোরে মর্‌ছে।

যাই হোক্, হাওয়া কর্‌তে কর্‌তে তার আচ্ছন্ন ভাবটা কাট্‌ল……শুয়েই একটু হাঁ কর্‌লে—

শুধোলাম—জল খাবে?

উত্তরে সে হাঁ করে'ই রইল।

জল গড়িয়ে জলের ঘটিটা তার মুখের কাছে আন্‌তেই অবাক্ কাণ্ড ঘটে গেল—

ইচ্ছে ছিল, জল তার মুখে ঢেলে দেব—সে গিল্‌তে থাক্‌বে—

কিন্তু আচম্‌কা সে জলের ঘটিটা কেড়ে নিয়ে মাথাটি মাটি ছেড়ে একটু তুলে এক ঘটি জল এক চুমুকে খেয়ে ফেলেই কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে' এমন একটা চীৎকার

ছাড়লে যে পিলে চমকে' আমাদের মনে হ'ল বাঘ বুঝি তার বুকের ওপর এসে বসেছে।

তার মুখের সুমুখ থেকে সরে' এসে শুধোলাম, কথাটা কি হে?

সে বললে—বাঘ।

—দেখেছ?

—হুঁ......।

—কোথায়?

—মেটেপাণি পুকুরে......পুকুরে কাপড় কাচ্‌ছিলাম ......আমি ধোপা।......একখানা কাপড় জলে ডুবিয়ে নিয়ে পাটের ওপর ফেল্‌ব বলে' যেমন হাত তুলেছি তেম্‌নি খস্‌খস্ একটা শব্দ কানে এল......চেয়ে দেখি, ওপারকার বনমল্লিকের ঝোপের ভেতর......বাবা রে!......বলে'ই লোকটা পুনরায় শিবনেত্র হ'য়ে গেল।

—কি দেখলে?

—বাঘের দুটো চোখ, জল্‌ছে।.....হাতের কাপড় ফেলে দিয়ে দিলাম ছুট......বাঘটাও এক লাফ মেরে' আমার পিছু নিলে। ভাবলাম, এইবার গেছি। কিন্তু ভগবান বাঁচিয়েছেন......বাঘ পাটের ধারে এসেই কাপড়খানাকে ছিঁড়তে লেগে গেল........

তাই রক্ষে নইলে এতক্ষণ......

কি ঘটত তা' সে বললে না—

কিন্তু বুঝ্‌তে কারু কষ্ট হ'ল না।—

বাঘ-ভির্মির রুগী আপনি সুস্থ হ'য়ে উঠুক...কিন্তু আমাদের দুর্ভাবনার কথা হ'য়ে উঠল এইটে যে, বাঘ কাপড় ছেঁড়া তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে লোকটার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে এই ঘরের কাছাকাছি এসেছে কি না জানতে হলে দরজা খুলে বেরিয়ে চারিদিকটা একবার দেখে আসা দরকার। বিশু সিকদার তাই দরজার খিল নিঃশব্দে খুলে কপাট একটুখানি ফাঁক ক'রে বাইরের কতটা দেখ্‌লে তা সেই জানে—

তবে শশব্যস্তে খিল আরও শক্ত করে' এঁটে দিয়ে বললে—কই, কোথায় বাঘ!......কোথাও ত দেখ্‌তে পেলাম না।

বিন্দু বোষ্টম বললে—নাকের ডগায় নজর দুনিয়ার এপার ছেড়ে কত দূরই বা যাবে! দুনিয়ার ওপারে যদি পথ থাকে, এ পারে ত নেই। কি বল, বিশু?

শুনে আমরা কায়ক্লেশে একটু হাস্‌লাম।—

বিপদের ওপর বিপদ বাধালে হালদার—সে বড় তাগিদ দিতে লাগল। এতগুলি লোক যদি তার বাড়ীতেই রাত কাটাবার ইচ্ছে করে' বসে তবেই একটা খরচার ধাক্কা—

চাল অভাবে চিঁড়ে-মুড়ির জলপান দিতেই হ'বে—অভুক্ত রাখাও অন্যায়—

কাজেই বিকাল পাঁচটায় সে সুদূর ভবিষ্যৎ ভেবেই ঠেলতে লাগল; বললে—বাঘ যদি এ অবধি ধাওয়া করে'ই থাকে, তবে সে কি এতক্ষণ না খেয়ে আছে ভেবেছ? ......রাস্তায় লোকজন চলেছেই, তবু আর কাউকে সে না পাক, মোহন ত এক রকম যেন তাই ভেবেই বেরিয়ে গেল। ...বাঘ দিন একটার বেশী শিকার করে না।...বাড়ী যাও তোমরা ছেলেপিলেরা সব অরক্ষিত অবস্থায় আছে।

ছেলেপিলেদের অরক্ষিত অবস্থাটা আমরাও জান্‌তাম, কিন্তু এও জান্‌তাম ছেলেপিদের মায়েরা আছেন; আমাদের অভাবে তাঁরা অত্যন্ত অরক্ষিত হ'লেও দরজায় খিল লাগিয়ে দিতে পারেন।

এই কথা শুনে হালদার হাল ছেড়ে দিলে—

"যা জানো তা-ই করো, আমি বস্‌লাম"—বলে' সে কাদার ওপরেই বসে' পড়ল; বলতে লাগল,—মোহনের দেহ কি একটুখানি!...একটা বাঘের তিন দিনের খোরাক—তা সে যত বড় বাঘই হোক না।......যতক্ষণে মোহনকে শেষ করে' বাঘের আবার ক্ষিদে পাবে ততক্ষণেও কি তোম্‌রা বাড়ী পৌঁছতে পারবে না?

শুনে তাকে যথেষ্ট কটূক্তি করা হ'ল—

কিন্তু হালদারের হালছাড়া ভাবটা গেল না।

আসান দিলে মোহন—

বাঘের পেটে গিয়ে নয়, ফিরে এসে।

"বেরোও তোম্‌রা......বাঘ মারা পড়েছে বলে' সে হুঙ্কার

ছেড়ে লাঠি ঘোরাতে লাগ্‌ল—আমরা বাতাসের আওয়াজটা পেলাম—দরজা খুলেই বেরিয়ে এলাম, বেরিয়ে দেখি, তার সঙ্গে ঢের লোক—সবায়ই হাতে লাঠি।

তারা বল্‌লে—বাঘ এ দিকে আসেনি। বলে' তারা হাসতে লাগল যেন ঠাট্টা করে'।

বাঘের ভয়ে ছেলেরা ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ করে' দিলে—

আর, দু' জনে মতলব করে' সদর দরজায় জাতি-কল পেতে রাখলে, এলেই বাঘ মারা পড়বে। মেয়েরা কালো হাঁড়ির তলায় চুণ দিয়ে ভূতের ছবি এঁকে বাঁশের মাথায় বেঁধে দিলে—

সূর্য্য না ডুবতেই ঘরে ঘরে টিনের বাদ্য বাজতে লাগল…শুনে মনে হ'ল, বাঘ যদি যম-কালা না হয় তবে এ শব্দের সীমানা ত্যাগ কর্‌তে সে বাধ্য।

পর দিন বাঘ সম্বন্ধে কোনো কথা শোনা গেল না—আমরা কিছু সাহস পেলাম…বাঘ তবে অন্যদিকে গেছে। গিরি গয়লা বাড়ী বাড়ী বেড়িয়ে একবার করে' দাঁত দেখিয়ে যেতে লাগল,—কি হে, কত বড় বাঘ? আছ ত?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, গিরিধরের হাসি বাসি হ'তেও গেল না—টাটকাই শুকিয়ে গেল।

কামিনীর মা বেচারী ছাগল পুষতো—

গিরি যেদিন হাসির টহল দিয়ে গেল সেই রাত্রের ভোরেই কামিনীর মা তার ছাগলের খোঁয়াড়ে ঢুকেই চেঁচিয়ে হাহাকার করে' বেরিয়ে এল—

মাটিতে আছড়ে পড়ে' লুটিয়ে লুটিয়ে মাথা কুট্‌তে লাগল, সে কি কান্না। একমাত্র ছেলে মরলেও মা অমন করে' কাঁদে না।

কাকের মুখের খবর পেয়ে দেখতে দেখতে মানুষ জড় হ'ল—

কামিনীর মা কাঁদ্‌তে লাগল—ধাড়ি বাচ্চায় নটা ছিল… ঐ টিম্‌টিমে দুটো আছে, আর-সব গেছে। ওরাও কি বাঁচবে? ওদের যে মা মরেছে!

কামিনীর মা মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল।

দেখলাম, খোঁয়াড়ের বেড়ার একটা দিক একেবারে ভাঙা; অগুন্তি ছোট ছোট ক্ষুরের দাগ আর হেঁচড়ে টেনে নেবার দাগ রয়েছে—ধুলোর ওপর…"ঐ টিম্‌টিমে" দুটির চোখে এমন বিহ্বল ভাব যে, বাঘ ছাড়া অপর কিছু তার কারণ হ'তেই পারে না।—

কামিনীর মাকে বোঝাব কি!—ভয়ে আমাদেরই বুদ্ধি-সুদ্ধি তাল পাকিয়ে গেল। চেয়ে দেখি, হারু সরকার মাথা ঘুরে পড়ে বুঝি!

আমরা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—

কামিনীর মা কাঁদ্‌তে লাগল—কি ঘুম তুই ঘুমিয়েছিলে হতভাগি…তোর যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।…কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হঠাৎ সে পাগলের মত উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—আমি থানায় চল্‌লাম…দেখি ত দারোগা কি বলে।

পরে শুনেছি দারোগা তাকে যা বলেছিল তা না শুন্‌লেই ভাল হ'ত—

পর দিন গেল, রাধা গয়লার দুগ্ধবতী গাভীটি। তেম্‌নি গরু—দেশের সেরা গরু; দু-বেলায় দশ সের ক্ষীরের মত দুধ দিত!—

রাধা বল্‌লে,—ঝটাপটির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় শুয়ে সস্ত্রীক কাঁপতে লাগলাম……ওদিকে গরুর পরলোক যাত্রার শব্দ ক্রমশ দূরে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল…

আতঙ্ক ষোল-আনা পূর্ণ হ'ল।—

দেশের লোক যেয়ে রাধা গয়লার গোয়ালের ভাঙা বেড়ার সাম্‌নে জম্‌ল—কেউ কেউ বাঘের পায়ের দাগ খুঁজতে লাগল, কিন্তু পেলে না।

অনুচিত পাকযন্ত্রে হজম হ'বার অপেক্ষায় খাসীর দেহ ধারণ অনাবশ্যক—মনে মনে তর্কের পর এই সিদ্ধান্তে এসে দিনু মোড়ল তার খাসিটাকে মেরে ঘরে ঘরে তার মাংস বেঁটে দিলে।

……চন্দ্র রায়ের ঘোড়াটা গেল—

আরো দু'জনের গরু গেল—

ডোমপাড়ার শূয়োর পর্য্যন্ত একাধিক্রমে বাঘের পেটে যেতে লাগল……

রোগের চিকিৎসা আছে—

মড়কে রক্ষা-কালী আছেন—

বাঘের অস্তে আফিং আছে, কিন্তু সে খাঁচায় ঢুকিয়ে... এখন উপায় কি ? ভাবতে গিয়ে চোখে আঁধার দেখতে লাগলাম।

চন্দ্র রায় প্রস্তাব করলে,—ঘোড়া, ভেরা, ছাগল, গরু, পাঁঠা, খাসী, মেষ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাতা—যার যা' আছে সব একত্র করে' একটা ঘরে খিল এঁটে সারারাত যদি বসে' থাকা যায়—

হারু বললে,—জান না তাই ও কথা বলছ।...বাঘের আবার কি ভয়ঙ্কর জোর...আবার একটি থাবায় তোমার দরজা ভেঙে বাঘ যদি তোমার—তোমায় বলে'ই বলছি—ঘরে ঢোকে, তবে সেকি আর মানুষ ফেলে পাঁঠা নিয়ে যাবে ?

চন্দ্র রায় কেঁপে উঠল।

আশ্চর্য্য এই য়ে, সেই যে লোকটা বাঘ দেখে হাঁপিয়ে এসে পড়েছিল, তারপর কেউ বাঘটিকে চাক্ষুষ করে নাই।

কে একজন অভয় দিল, রাত্তিরেই বাঘের ভয়, দিনে তারা ঘুমোয়।

শুনে' ছেলেদের আবার ইস্কুলে পাঠাতে লাগলাম—কিন্তু সেই ইস্কুলের পথ থেকেই টেকো নিত্যানন্দের ছেলেটা ভয়ে সাদা হ'য়ে মুখে বা—আ—আ শব্দ করতে করতে ছুটে এসে একেবারে মরণাপন্ন হ'য়ে উঠল।—

আমরা ভাবতে লাগলাম,—যখন গরু, বাছুর প্রভৃতি ইতরপ্রাণী সব শেষ হ'য়ে যাবে তখন কি হ'বে ?

তারপর দেখলে টেঁকো নিত্যানন্দ নিজে—

সে যে কি অবস্থা তার।...তার টাক পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল।......সামলে নিয়ে নিত্যানন্দ যা বললে তা এই—

চাদরখানা কাঁধে ফেলে সে বেয়াইবাড়ী যাবে বলে, বেরিয়েছিল, না গেলেই নয়, তাই দিনে দিনে গিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসাই ছিল তার ইচ্ছে। রায়-বাবুদের আম-কাঁটালের বাগানের ভেতর দিয়ে যে পথটা সেইটে সোজা। ...চলতে চলতে বাগানের মাঝামাঝি সে এসেছে এমন সময় দেখে মস্ত একটা মোটা কাঁটালগাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসে' আছে—বাঘ; হাঁড়ির মত মাথাটা তার।.. দেখেই তার চোখের তারা কপালে আর নিজে সে "বাবা গো" বলে' গাছে উঠে গেল।...বাঘ তারই দিকে চোখ রেখে ঠোঁট চাটতে লাগল।...সে একটা ডালে বসে' আর-একটা ডাল দুহাতে জড়িয়ে ধরে'ও পড়ে আর-কি...এমনি যখন অবস্থা, প্রাণ গেছে—আর নেই...তখন বাঘ ঠোঁট চাটতে চাটতে উঠে হেলতে দুলতে জঙ্গলে ঢুকে গেল; ডালে বসে সে কালীকে পাঁঠা আর হরিঠাকুরকে "লুট" মানৎ করেছে।...বাঘ চলে' যাবার পরও অনেকক্ষণ সে গাছ থেকে নামে নাই; সম্প্রতি নেমে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছে...কাঁধের চাদর এখন কোথায় সে-জ্ঞান তার নেই।

তারপর বললে,—বাঘটা সাত হাত লম্বা খুব হ'বে।

বিবরণ শুনে কানা কেষ্ট বললে—বাঘ তোমার পেছু নিয়েছিল সেটা বললে না যে ?

—কি রকম ?

—আমি দেখেছি যে।...তুমি ত গাছে উঠলে পরে; আগে ত এগুতে তুমি, পেছুতে বাঘ...গাছ বেড়ে বেড়ে তুমিও যত ছোটো বাঘও তত ছোটে...ঘণ্টাখানেক এমনি করে' ছোটার পর দুত্তোর বলে' তুমি গাছে উঠে গেলে।...হাতে ছড়িটড়ি থাকলে একহাত বোধ হয় লড়তেই, ভাব দেখে তাই মনে হ'ল।

—তুমি তখন কোথায় ?

—আর এক গাছের উপর। বলে' কেষ্ট খল্‌খল্‌ ক'রে হাসতে লাগল।

নিত্যানন্দ চটে গেল, বললে,—আমি কি মিছে কথা বলছি ?

কেষ্ট বললে,—আমি কি বলছি যে তুমি—

কানাকে আমরা ধমকে থামিয়ে দিলাম—

অসময়ে হাসি-তামাসা ভাল লাগে না।

মানুষ ছাড়া আর সব জন্তুই বাঘের পেটে যেতে লাগল।

দারোগা কামিনীর মাকে হাঁকিয়ে দেবার সময়

বলে' দিয়েছিল,—খালি হাতে এলে কি আর বাঘের নামে নালিশ চলে রে? একটা খাসী আন্‌তিস ত দেখা যেতো।

বাঘ যাকে দয়া করে' রেখে গেছে, নির্দ্দয় হ'য়ে তাকেই দারোগার মুখে তুলে' দিতে কামিনীর মার মন সরে নাই।

কামিনীর মা অবলা, শোকাতুরা—

তাকে দেখে দারোগা তার খাসী খেতে চেয়েছিল—

জোয়ান পুরুষ কাছে গেলে দারোগা যা' চেয়ে বস্‌বে বলে' অনুমান হ'ল তা' দামী জিনিষ—

সে-বস্তু দারোগার পাতে দেবার সামর্থ্য আমাদের নাই। কাজেই থানার দিক থেকে সাহায্য পাবার আশা ত্যাগ করে'ই বসে' ছিলাম—

একমাত্র ভরসা (যদি দয়া করেন) তিন কোশ দূরের বিজ্‌লীহাটি কুঠীর বাবুরা—ছোটবাবু মস্ত শিকারী, নাম শোনা ছিল।

দশ-বারো জন যেয়ে ছোটবাবুর পায়ের ওপর ঠাস্ হ'য়ে পড়লাম—বাবু রক্ষে করুন।

বাবু কেদারায় বসেছিলেন, হাঁটু কাঁপান বন্ধ করে' বল্লেন—কি হয়েছে তোমাদের?

—ভুবনডাঙ্গা বাঘের পেটে গেল, বাবু। বলে' হারু সরকার এগিয়ে যেতেই বাবু বল্লেন—তোমার নাম?

হারু বল্‌লে—হারাধন সরকার।

—বস'। বলে' বাবু আমাদের বসিয়ে সব কথাগুলো মন দিয়ে শুন্‌লেন।

—ঘোড়া, বলদ, মোষ, গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, খাসী পাঁঠা, এমন কি পাতিহাঁস পর্য্যন্ত, কত যে নষ্ট হয়েছে তা' আর কি বল্‌ব, বাবু! আপনি শুনেছি ভারি শিকারী......আমাদের রক্ষে করুন। ব'লে হারু সরকার তাঁর পা ধর্‌তে গেলে বাবু পা টেনে নিয়ে রাজি হ'য়ে গেলেন—

বাবু বড় ভালমানুষ।

তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে চলে' এলাম—

আর সেই রাত্রে আমার বলদটি গেল।

পরদিন দুপুরে আহারাদি করে' কুঁচকী পর্য্যন্ত বুট এঁটে ছোটবাবু শিকারে এলেন—

তাঁর বন্দুক ধর্‌বার কায়দা দেখেই ভাব্‌লাম, এ কাজ এ রই বটে।

ছোটবাবু বিশ্রাম কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লেন,—একা এ বনে ত' শিকার হয় না...জঙ্গল ঘের্‌তে হ'বে; সঙ্গে লোক চাই।

শুনে' সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌তে লাগল—

দলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে' বাঘে মানুষ নিয়ে গেছে এ গল্প শোনা আছে। কিন্তু বলদের শোকে আমার বুক জল্‌ছিল; আমি লাফিয়ে উঠে বল্‌লাম—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

ছোটবাবু হেসে বল্‌লেন,—দুজনেও হয় না।

আর-একজন উঠ্‌ল...দেখাদেখি আর একজন...ক্রমে আমরা ত্রিশ-বত্রিশ জন বাবুর সঙ্গে বাঘ মার্‌তে তৈরী হ'য়ে দাঁড়ালাম। বাবু অনেক খোঁজ-পাত্তা নিলেন, ঠিক্ হ'ল, ঠিক্ বারোটার সময় রওনা হতে হ'বে।

বাবুর হাতে বন্দুক—

আমাদের হাতে কুড়োল থেকে কাটারি পর্য্যন্ত। ঐ জাতীয় অস্ত্র একটু ধারাল' অবস্থায় যার বাড়ীতে য'টা ছিল সব এনে হাজির কর্‌লে...ছোটবাবু যার কাটারি অপছন্দ করলেন সে একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল। শিকার ব্যাপারে অস্ত্র-শস্ত্র হারাবার ভয় যথেষ্ট তা' জেনেও লোকে না বল্‌তেই তা' নিয়ে এল দেখে মনে হ'ল, ভয়ে মানুষ দুর্ব্বল হয় খুব। সে সব বাদে, প্রচুর টিন আনা হ'ল—

মশালও নিলাম—

ছোটবাবু ইংরিজি কায়দায় আমাদের সাজিয়ে নিলেন ...এক সারে চারজন...দু'সারের মাঝে দেড়হাত ফাঁক্...

সমান তালে পা ফেলে যখন রওনা হ'লাম তখন ভয়ের মধ্যেও আনন্দ হ'ল।

যেখানে নিত্যানন্দ বাঘ দেখেছিল সেই রায়বাবুদের বাগানের পরই খানিকটা ফাঁকা জায়গা; তারপরই অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা জঙ্গল; সাম্‌নেই একটা

ডোবা ; ডোবার ভেতরকার জঙ্গল একেবারে নিরেট—জঙ্গলের মাথা মাটির ওপরেই দু'মানুষ সমান উঁচু ; ডোবার পাশেও জঙ্গল—বেত আর বাঁশই বেশী। এইটেই আমাদের গন্তব্য।

রায়বাবুদের বাগানের মুখে আস্‌তেই সবারই পা যেন থেমে থেমে পড়্‌তে লাগ্‌ল—

সকলের আগে ছিল বন্দুক নিয়ে ছোটবাবু স্বয়ং ; বেশ আস্‌ছিলাম—ছোটবাবু নির্ভয়ে, আমরাও প্রায় তাই ; কিন্তু এই স্থানটিতে এসে ছোটবাবু পেছন ফিরে চেয়ে নিলেন—

তারপর মাথার ওপর বাঁ হাত ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—বল ভাই বন্দে মাতরম্‌।

বল্‌লাম।

ছোটবাবু বল্‌লেন,—বাজাও টিন্‌।

সঙ্গে সঙ্গে এমন বাদ্য বেজে উঠল যে, ভয় হ'ল, সার্কাসের বাঘ তার বীরকেশরী গুরুকে মনে পড়ে' যদি এদিকেই আসে !—

দুই সারের মধ্যে যে দেড় হাত ফাঁক ছিল, বাগান পার হ'বার সময় তা' কম্‌তে কম্‌তে অগ্রগামীর পিঠের সঙ্গে পশ্চাদ্গামীর পিঠের প্রায় ঠেকাঠেকি হ'য়ে গেল।

খোসা ফকিরের পিঠের একটা স্থান নবাই কাহারের কাটারির খোঁচা লেগে ফুটো হ'য়ে গেল—

শিকারে নবাইয়ের এম্‌নি আগ্রহ !

বাগানটা বেশ বড়ই ; পার হ'তে দেরী হ'ল··· আরো দেরী হ'ল লোকগুলোর অনর্থক ভয়ের দরুন্‌। যেতে যেতে একজন বলে' ওঠে,—ও কি !···সঙ্গে সঙ্গে সবাই থেমে ভাবে, এইবার গেছি—

কিন্তু সেটা ভ্রমমাত্র।

এম্‌নি করে' নির্ব্বিঘ্নে বাগান পার হ'য়ে ডোবার ধারে এসে ছোটবাবু বল্‌লেন,—এই জঙ্গল ত' ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পেটো টিন্‌।

টিন্‌ বাজ্‌তে লাগল—

টিন বাজিয়ে জঙ্গল দুবার প্রদক্ষিণ করা হ'ল, কিন্তু বাঘ বেরুলো না।···দু' একজন উঁচু গাছের আগডালে উঠে' চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখে এলো—

বাঘের নিশানা কোথাও নাই।......

কিন্তু দুরদৃষ্ট কাছেই ছিল, দেখা দিল।···ছোটবাবুর কথায় আর তাঁর বন্দুকের দিকে চেয়ে সাহস পেয়ে লাঠি দিয়ে চোখ বুজে' পিটুতে লাগলাম সেই মহাজঙ্গল···

পিটুতে পিটুতে—

যে জায়গায় নিত্যানন্দ পিটুছিল সেই জায়গার জঙ্গল ফুঁড়ে'—

কি বেরিয়ে এল তা দেখবার সময় কারু হ'ল না—

মুহূর্ত্ত মধ্যে শিকারবাহিনী নিজের পথ দেখ্‌লে।···

ছোটবাবু ডোবার দিকে লক্ষ্য বেখে আর কঞ্চি আশ্রয় করে' বাঁশের ঝাড়ে বসেছিলেন, তিনি সেখানে থেকে হেঁকে বল্‌লেন,—বাঘ নয়, বাঘ নয়।

যারা শুন্‌তে পেল তারা ফিরে এল।

—কি ওটা ?

—শেয়াল। বাঘ এখানে নেই। বলে' ছোটবাবু নেমে এলেন।

চূড়ান্ত ক্লান্ত হ'য়ে যখন ফির্‌লাম তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বাড়ী পৌছতে রাত হ'ল।

আমারই ঘরে ছোটবাবুকে বসিয়ে তাঁকে সুস্থ কর্‌ছি ·· ডাবটার মুখ কেটে পাথরের বাটিতে জলটুকু ঢেলে তাঁর হাতে দিয়েছি···তিনিও জলটুকু খেয়ে আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলে সবল হ'য়ে উঠেছেন, এমন সময় নেপাল সাউ মরি বাঁচি করে' ছুটতে ছুটতে এসে বল্‌লে—বাঘ।

কোথায় ?

—কানা কেষ্টর বাড়ীতে ঢুকল। শীগ্‌গির এস, এতবেলা বুঝি সাফ হ'য়ে গেল। বলে' নেপাল ধুঁক্‌তে লাগ্‌ল।···

ছোটবাবু লাফিয়ে উঠে কাঁধের ওপর বন্দুক তুলে নিলেন, আমরাও কাটারি কুড়োল যা পেলাম তাই নিয়ে মশাল জেলে ছুটতে ছুট্‌তে কেষ্টর বাড়ী এসে দেখি বাড়ী

অন্ধকার—কোন জনমানব সেখানে নেই।······হাঁকডেই কেষ্ট বেরিয়ে এল—

ছোটবাবু বল্‌লেন—খবর পেলাম, তোমার বাড়ীতে বাঘ ঢুকেছে।

কেষ্ট তার একটি চক্ষু বড় করে' বল্‌লে—আমার বাড়ীতে বাঘ? কই না।···ঢুক্‌লে আমিই আগে খবর পেতাম।

নেপাল এগিয়ে এল, বল্‌লে—হ্যাঁ ঢুকেছে, আমি দেখেছি।

কেষ্ট বল্‌লে,—রান্নাঘরে ঢুকেছিল, ফ্যান্ খেয়ে নর্দ্দমা দে বেরিয়ে গেছে।

নেপাল নাছোড়বান্দা, বল্‌লে—আমি দেখলাম।

কেষ্ট রেগে উঠল—দেখেছ, বেশ করেছ, কাল এস, রাজা করে' দেব।

ছোটবাবু বল্‌লেন,—আহা, তুমি রাগ কর্‌ছ কেন, কেষ্ট? না ঢোকাই ত মঙ্গলের কথা।

ছোটবাবুর কথায় কেষ্ট শান্ত হ'ল—

হেসে বল্‌লে—আসুন বাবু, বস্‌বেন আসুন। গরীবের ঘর—মনে কিছু কর্‌বেন না।

মহা সমাদরে বারান্দায় জল-চৌকি পেতে কেষ্ট বাবুকে বসালে।···আমার হাতের লণ্ঠন নিয়ে কেষ্ট ঘরে ঢুকে তামাক্ সাজতে বস্‌ল।

ছোটবাবু বসে' থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ বলে' উঠলেন—কেষ্ট, ওটা কি হে?

—কোন্‌টা, বাবু?

—ঐ যে তোমার বিছানার নীচে থেকে ঝুল্‌ছে।

—ও, ঐটে? ওটা একটা চামর।

—দেখি চামরটা।

কেষ্ট চুপ করে' রইল।

ছোটবাবুর আর কোন দোষ নাই, শিকারীও ভাল, তবে বড় একগুঁয়ে। বল্‌লেন—দাও না দেখি।

কেষ্ট নড়লও না, শব্দও কর্‌ল না।

ছোটবাবু তখন আমায় হুকুম কর্‌লেন—আন ত' ঐটে, আমি দেখব।

হুকুম পেয়ে এগিয়ে যেতেই কেষ্ট হাতের কল্‌কে মাটিতে রেখে চট্ করে' দাঁড়িয়ে উঠে দরজা আগলে এক চক্ষু পাকিয়ে বল্‌লে—খবরদার, আমার ঘরে ঢুকোনা বল্‌ছি।

আমি অবাক্ হ'য়ে পিছিয়ে এলাম—

কিন্তু ছোটবাবু অপমান বোধ কর্‌লেন—কর্‌বারই কথা। উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে রাগে আঙুল কাঁপিয়ে বল্‌লেন—নিয়ে এস, আমি চাই ওটা।

ছোটবাবুকে যারা খুশী কর্‌তে চায় তারাই দলে পুরু, আর সকলেই আশ্চর্য্য হয়েছিল যে, চামর দেখাতে কেষ্টর এত আপত্তি আর অনিচ্ছা কেন।···কাজেই পাঁচসাত জন এসে কেষ্টর কিলবৃষ্টি গা-পেতে নিয়ে তাকে ধরে' ফেল্‌লে—

আমি ঘরে ঢুকে বিছানা উল্‌টে দিলাম—দেখলাম, সাতফুট লম্বা একখানা বাঘছাল লম্বালম্বি পাতা।···

ঝুল্‌ছিল তারই লাঙুল।

জিঘাংসু কীটপতঙ্গ

শিকারী প্রাণীর মধ্যে গণনায় কয়েক শ্রেণীর কীট-পতঙ্গও যে পড়ে এ আশ্চর্য্য সংবাদ আমরা অনেকেই বড় বেশী জানি না। মাকড় অবশ্যই যে শিকারী প্রাণী এ কথা আমরা সকলেই জানি। টৈরাণ্টুলা (tarantula) নামীয় বড় 'দীর্ঘপাদ ঊর্ণনাভ' সাধারণ কীটপতঙ্গ শিকার করে, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকায় 'টৈরাণ্টুলা কীলার' বা ঊর্ণনাভ-সংহারক (taratula killer) আর একপ্রকার কীট আছে তাহা আবার এই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর প্রাণীগুলিকে শিকার করে।

টৈরাণ্টুলা ফাঁদ পাতিয়াই শিকার ধরে, তবে সে ফাঁদ

আমরা যত্রতত্র যেরূপ মাকড়সার জাল দেখি সেরূপ নহে। নদী-তীরের এঁটেল মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া ইহারা বাসস্থান তৈরী করে—বাড়ীর চারিদিকে অনেক সময়েই রেশমের তন্ত বিস্তৃত করিয়া যায়। ইহারা নিজেদের শক্তি ও তৎপরতায় নিজেরা এতটা বিশ্বাসী যে, জাল বুনিবার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না; এবং ইঁদুর বা ভূগর্ভ-বাসী পাখী পাইলে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলে। এ-সব শিকার যখনই টেরান্টুলার বাড়ীর দুয়ারে আসে, তখনই সেই রেশমের তন্ত-বাঁধা দুয়ার খপ্ করিয়া তাহাদের বন্দী

পদ্মকীট (Ladybug) বস্তা বাঁধিয়া আনিতেছে

করিয়া ফেলে। নিজেদের বাড়ীঘর টেরান্টুলা এমনি চতুরতার সহিত নির্ম্মাণ করে ও বাহিরাবরণে আচ্ছাদন করিয়া দেয় যে, সাধ্য নাই কেহ বাহির হইতে তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবে। তাই, নিজের বাড়িতে এসব ঊর্ণনাভ নিরাপদ, কিন্তু, বাড়ির বাহিরে পা বাড়াইলে ইহাদের ঊর্ণনাভ-ভক্ষক বোলতা জাতীয় শত্রুদের হাতে জীবন নাশের সম্ভাবনা।

এই জাতীয় বোলতাদের সহিত লড়িতে টেরান্টুলার কোনো ক্ষমতাই নাই। আক্রান্ত হইলে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া অবশেষে পার্শ্বে হোক্ বা পশ্চাতে হোক্,
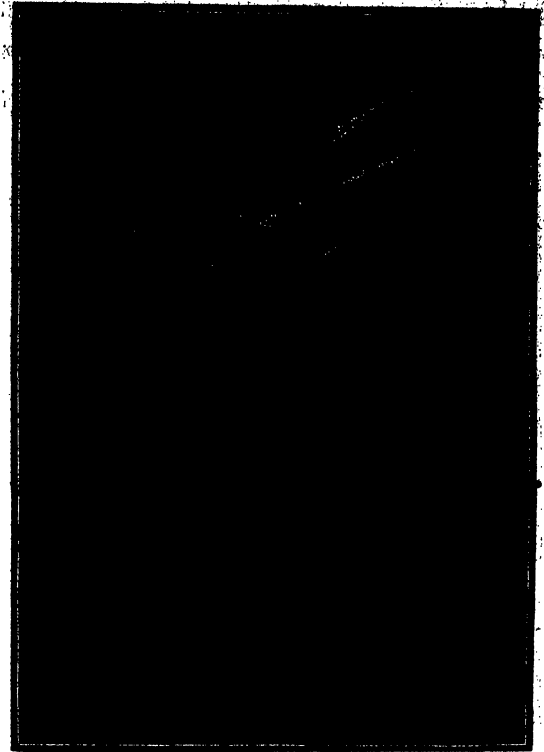
বড় জলজ কীট একটি ব্যাঙ্ ধরিয়াছে

উহাদের বিষাক্ত হুলের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া টেরান্টুলাকে প্রাণ হারাইতে হয়। এ যুদ্ধে প্রাণে বাঁচিলেও ইহারা চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কারণ, বোল্তারা এই ঊর্ণনাভদের দেহেই নিজেদের ডিম পাড়ে, তাহাতে তা পাইয়া ডিম ফুটিয়া যখন পোকা জন্মায় তখন পোকাগুলি টেরান্টুলার দেহ হইতেই যথেষ্ট আহার্য্য পায়।

কিন্তু, শিকারী কীট-পতঙ্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশস্থ (tropics) যাযাবর পিপীলিকা-পাল (driver ants)। ইহাদের স্থায়ী বাসস্থান নাই; অসংখ্য লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা সারি বাঁধিয়া সুদক্ষ,সুশিক্ষিত সৈনিক-বাহিনীর মত সুশৃঙ্খল গতিতে নিত্যনিরন্তর চলিতেছে। জীবজন্তু ইহাদের সম্মুখ হইতে পালাইয়া বাঁচে। না পালাইলে হাতীর মত অতিকায় জন্তুরও নিস্তার নাই, মানুষের মত বুদ্ধিমান্ জীবেরও অস্থি ছাড়া কণপরে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না; অলস ভোজন-তৃপ্ত অজগরেরও প্রকাণ্ড দেহ ইহাদের উদরতৃপ্তি করিবে।

কিন্তু ইহাদেরও কোন প্রতাপ খাটে না বেঙ্গালিয়া নামক মক্ষিকার (Bengalia fly) কাছে। দেখিতে এই মক্ষিকা অনেকটা 'ব্লু বটেল্' নামক ক্ষুদ্র নীলপুষ্প

বেঙ্গলিয়া মক্ষিকা যাযাবর পিপীলিকাদের কোষ চুরি করিতেছে

বিশেষের মত। পিপীলিকাদের পিছনে পিছনে উড়িয়া ইহারা তাহাদের শিকার করিয়া ফেরে। যাযাবর পিপীলিকাদের কোষ (cocoon) ও কোষস্থ আধার (chrysalides) সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মক্ষিকারা মাথার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই কোষাধারগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং নিজেদের আহারের জন্য ধাত্রী-পিপীলিকাদের মুখ হইতে এসব কাড়িয়া লইয়া যায়।

ইয়ুরোপের কীটপতঙ্গের মধ্যে ড্রিলুস্ নামক ঝিঁ ঝি পোকা (Drilus beetle) উল্লেখযোগ্য। ইহাদের শোঁয়া-পোকা জাতীয় জাতিরা শামুক শিকার করে ও আহার করে। পুং পতঙ্গগুলি দেখিতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতই; স্ত্রী-পতঙ্গগুলি অনেক বড়, কিন্তু দেখিতে নিতান্তই কুৎসিত; আর শোঁয়াপোকাগুলির রোঁয়া আছে, শত

মলয় দ্বীপপুঞ্জের গঙ্গাফড়িঙ শিকার ধরিবার উদ্যোগ করিতেছে

শত নখ আছে, শক্ত চোয়াল আছে—দেখিতেও তেমনি কদাকার।

জাভা ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে একপ্রকার গঙ্গাফড়িঙ (mantis) আছে যাহা দেখিতে ঠিক সুন্দর ফুলের মত। ফুলের দলের মধ্যেই ইহারা অতি সহজে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে। কিন্তু, একবার প্রজাপ্রতি, বা ঐ জাতীয় কোনো পতঙ্গ সে ফুলে নামিলেই হয়। খপ্ করিয়া তখুনি তাহাকে ধরিয়া একেবারে উদরসাৎ করিবে। মাটিতে পড়িয়া থাকিলে এই সব গঙ্গাফড়িঙকে দেখিতে ঠিক ঝরা ফুলের পাপ্ড়ির মত মনে হয়।

পদ্মীপোকা (পদ্মকীট বা 'ইন্দ্রগোপ' Ladybird) কিনাতে ছেলেদের ছড়ায় আদরের জিনিস। দেখিতে পোকা-

সেখানে শীতল স্থানে ইহাদের সংরক্ষণ করা হয় যাহাতে যতদিন দরকার না হয়, ততদিন সেখানেও তন্দ্রায় জড়িত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে। তারপর, ফুটির লতায় সবজে-পোকা দেখা দিলেই এই সব পদ্মপোকাদের বাগানে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। সবজে-পোকা শিকার করিয়া এই-সব পোকা ফুটির চাষকে নিরাপদ করিয়া তোলে। প্রথমে এই পরীক্ষা ইম্পীরিয়াল ভেলিতেই চলিয়াছিল, কিন্তু, ক্যালিফোর্ণিয়ার সর্ব্বত্রই এখন এই পরীক্ষার ফল গৃহীত হইয়াছে। এমন কি, জাহাজ বোঝাই করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাক্স ভরিয়া এ সব কীট এখন অন্যত্র চালান হয়।

মিশরে আর এক অদ্ভুত কীট আছে তাহার নাম

দীর্ঘকণ্ঠ পিপীলিকা-কেশরী

গুলিকে বড়ই শান্তশিষ্ট মনে হয়; কিন্তু এমন মারাত্মক শিকারী পোকা কম আছে। তবে, সৌভাগ্যক্রমে ইহাদের চোখ সবজে-পোকা ও গাছ-পোকার উপর যাহারা আমাদের শস্য ও বাগানের চারাগাছের সর্ব্বনাশ করে। তাই, পদ্মপোকা মোটের উপর মানুষের বন্ধু।

টেরান্টুলা-সংহারী বোলতা

ক্যালিফোর্ণিয়ার ইম্পীরিয়াল্ ভেলির ফুটির চাষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু, পদ্মকীট (ladybug) না হইলে সে চাষ সম্ভবপর হইত না। বসন্তকালে বন্ধুর গিরিশ্রেণীর মধ্যে তুষারাচ্ছন্ন স্থানে—বিশেষত গিরিনদীর পার্শ্বে শ্যাওলা-ঢাকা ভূমিতে, এই সব কীট শীত-জড়তায় তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে, তখন ইহাদের খুঁড়িয়া তুলিতে হয়। ইহারা শত শত প্রাণী এক সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া থাকে, এবং প্রথমে তুলিয়া লইয়া ইহাদের চালুনির মধ্যে ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তারপর ইহারা উপত্যকায় প্রেরিত হয়।

তিনটি শামুক-শিকারী

শোঁয়াপোকা, চিত্রের সম্মুখস্থ স্ত্রী ও পুং পতঙ্গদ্বয়ের সন্তান

দীর্ঘ-কণ্ঠ পিপীলিকা-কেশরী (long-necked ant lion)। এই পিপীলিকার দেহ হইতে কণ্ঠ অনেক বেশী দীর্ঘ এবং ইহার মস্তক খুব তীক্ষ্ণ ও শক্ত শাঁড়াশীর মত দুইটি সরু ভাগে বিভক্ত। এই দুটির সাহায্যে পর্ব্বতের কাটলের ভিতরের অনেক কিছুই ইহা আয়ত্ত করিতে পারে। আবার, বড় হইলে শেষের দিকে ইহার পক্ষ সঞ্জাত হয় এবং ইহা উড়িতে আরম্ভ করিয়া দেয়।]

অনেকেই শুষ্ক পুকুরের তলায় প্রায় ৪ ইঞ্চি বড় এক প্রকার কদাকার কীট দেখিয়া থাকিবেন। বড় হইলে ইহারা প্রকাণ্ড মক্ষিকার আকৃতি ধারণ করে। ইহাদের নাম বিজলী-বাতির পোকা (Electric light bug) বিজলী-বাতির কড়া আলোতেই ইহাদের বেশী দেখা যায়—পূর্ব্বেকার লোকে ভাবিত, এ জাতীয় পোকা খুব বিরল; কিন্তু তাহা ভুল। এই সব মক্ষিকা নিশাচর ও রক্তশোষক; পুকুরে বা নদীতে ডুব দিয়া মৎস্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলজ জীবদের শক্ত পদদ্বয়ে আঁকড়াইয়া ধরে এবং নিজের ঠোঁট উহাদের মাংসে ঢুকাইয়া রক্ত শুষিয়া লয়। ইহাদের জ্বালায়, কাচের পাত্রে যে সব সোনালি মাছ পোষণ করা হয়, তাহাদের রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক জাতির কীটপতঙ্গেরই ভক্ষক কীটপতঙ্গেরই মধ্যে অপর কোনো-না কোনো আর-এক শ্রেণীতে আছে। এই তথ্যটি আমেরিকার কৃষিবিভাগ কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিতেছে। ওহিওর পরীক্ষাগারে ইয়োরোপীয় শস্য নাশক (corn borer) কীটদের ধ্বংস করিবার জন্য এরূপ একজাতীয় জিঘাংসু কীটের উদ্ভাবনার চেষ্টা চলিতেছে। এইসব ইয়ুরোপীয় শস্য নাশক যখন প্রথমে ইয়ুরোপে দেখা দেয়—বোধ হয় বিদেশ হইতে কোনো-প্রকার আমদানি শস্যের সঙ্গে ইহা আসিয়াছিল—তখনই শস্যধ্বংসী কীট বিষয়ে সরকারী গবেষকগণ তথায় গমন করেন এবং ঐ শস্যনাশক কীটের প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়া দেখেন যে, ইহাদের সংহারক কীটও আছে। সেই সব সংহারক কীট তাঁহারা আমেরিকায় লইয়া আসিয়াছেন—ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন।

আমেরিকার সরকার এইরূপ কীট সংহার কর্ম্মে বহু কীট নিয়োজিত করিয়াছে। পরকীটের মত কত কীট ছাড়িয়া দিয়া যে ফলের, পাতার, ফুলের শত্রুদের বিনষ্ট করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অবশ্যই পিপীলিকাপালের মত এমন সুদক্ষ, দলবদ্ধ প্রাণী কীট-পতঙ্গ-জগতে আর নাই। ইহারা আক্রমণে ও আত্মরক্ষায় এইরূপ সুদক্ষ। ইহাদের এক দল যুদ্ধ করে, আর এক দল খাদ্য সংগ্রহ করে। যাযাবর পিপীলিকা-দল যাহা কিছু প্রাণী পায় তাহাই ঘিরিয়া ধরে, ছাড়িয়া গেলে দেখা যায় কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। নদীও ইহাদের বাধা দিতে পারে না। নদী উত্তীর্ণ হইবার কৌশলও বিচিত্র—সবাই মিলিয়া জড়ো হইয়া দলটিকে একটি গোলকের আকারে তাল পাকাইয়া ইহারা কেন্দ্রস্থলে স্ত্রী ও শিশুদের স্থান করে এবং কর্ম্মী ও যোদ্ধাদের উপরের দিকে বাহিরে রাখিয়া নদীতে ভাসিয়া পড়ে।

মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে এইসব যাযাবর পিপীলিকা দলের হাত হইতে রক্ষার একমাত্র উপায়—কেরোসিন তৈল ঢালা, পেয়ালার উপর খাটের পা কয়টি স্থাপন করিয়া সে খাটের আশ্রয় লওয়া। হানস্ হেন্স ইওরস্ নামক জার্ম্মান বিশেষজ্ঞ যখন এই সব পিপীলিকাদ্বারা মেক্সিকোতে প্রথম আক্রান্ত হন তখন প্রথম এক চেয়ারের উপরে উঠিয়া দাঁড়ান; সেখান হইতে উঠেন টেবিলে; সেখানেও বিপদ দেখিয়া এক ছোট জলের টবে লাফাইয়া নামেন; শেষে যখন দেখিলেন যে, পিপীলিকারা তাহাদের অপূর্ব্ব উপায়ে সেখানেও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিতেছে, তখন লাফাইয়া এইরূপ একটি খাটের উপর আশ্রয় লইয়া নিস্তার পাইলেন।

(১০)

বাংলা বীজগণিত

এযাবৎ বাংলাতে কোন বীজগণিত বাহির হইয়াছে কি না? হইলে, কোথায় পাইব ও গ্রন্থকার কে? নিম্নলিখিত বীজগণিতের শব্দগুলির পরিভাষা কি কি—Harmonical Progression; Graphs an Abscissa; an Ordinate and a Co-ordinate; a Variable: a Constant; Axes; Asymtote and Symtote; Rational and Irrational Surds: Theory of Indices: Elimination, Invertendo Dividendo, Componendo and Alternendo এবং Involution.

শ্রী কুমুদবন্ধু দত্ত

(১১)

শিশুপাল গড়

ভুবনেশ্বর হইতে যে রাস্তাটি বরাবর-পুরী চলিয়া গিয়াছে এবং যাহা পুরী রোড্ নামে অভিহিত তাহারই পার্শ্বে ভুবনেশ্বরের নিকটে একটি পুরাতন গড়ের চিহ্ন দেখা যায়। তাহার চারিদিক ঘেরিয়া একটি মাটির উচ্চপ্রাচীর এখনও বর্ত্তমান আছে এবং অতীতে যে তাহা গড়ের উচ্চপ্রাচীর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই গড়ের চারিদিকে "খাই" এর চিত্র এখনও আছে এবং ওখানে বহু পুরাতন মাটির ইষ্টক ইত্যাদি পাওয়া যায়। ও-দেশে বর্ত্তমানে মাটির ইষ্টক ইত্যাদি প্রচলিত নাই, গড়ের ভিতরে অট্টালিকা ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গড়ের ভিতরে এখন ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়। গ্রাম্যলোকে ঐ স্থানকে শিশুপাল নামে অভিহিত করে। এই শিশুপাল নাম ও গড় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ বা প্রামাণ্য কি আছে?

শ্রী গৌরগোবিন্দ পুরাণরত্ন

(১৩)

তাওঐ ও মাওঐ

বাঙ্গলাদেশে ভাই বা ভগ্নীর শ্বশুরকে তালৈ বা তাওই বলা হয় এবং শাশুড়ীকে মাওঐ বলা হয়। ঐ দুইটি শব্দ কোন্ ভাষা হইতে আসিল?

শ্রীরজনীকান্ত চৌধুরী

(১৪)

চিনি প্রস্তুত

ভারতবর্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চিনি প্রস্তুতের কোন কারখানা আছে কি না? থাকিলে কোথায়? সেখানে কোন শিক্ষার্থীকে লওয়া হয় কি না? অধ্যয়নের জন্য কোন স্কুল, কলেজ, প্রভৃতি কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি না? থাকিলে কোথায়? জাভায় এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায় কি না?

শ্রীরামগোপাল দত্ত

(১৫)

ধনুর্ব্বিদ্যা

ধনুর্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে কোন বাংলা বই আছে কি না? বাংলা দেশে কে সব-চেয়ে ভাল ধনুর্ব্বিদ? তাঁহার ঠিকানা কি?

মীমাংসা

(১)

কাচের উপর লিখন-প্রণালী

কাচের গায়ে স্থায়ীভাবে কিছু লিখিতে বা আঁকিতে হইলে, Hydrofluoric Acid (হাইড্রোফ্লোরিক এসিড) ব্যবহার করাই প্রশস্ত। যে কাচের উপর আঁকিতে বা লিখিতে হইবে, প্রথমে সেটাকে একটু গরম করিয়া পাতলা এক স্তর মোম অথবা প্যারাফিন (Paraffin) মাখাইতে হইবে, মোম ঠাণ্ডা হইয়া শক্ত হইলে সরু মুখ স্চ অথবা শক্ত কাটী দিয়া মোম কাটিয়া যাহা কিছু ইচ্ছামত আঁকিয়া বা লিখিয়া লইয়া, তাহার উপর খানিকটা Hydrofluoric Acid (হাইড্রোফ্লোরিক এসিড) ঢালিয়া ৪।৫ মিনিট পরে মোমটা চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলিলেই দিব্যি লেখা ফুটিয়াছে দেখা যাইবে। রং দিয়া লিখিতে হইলে খুব ফোটানো তিসির তৈলে (Linseed oil) যে-কোন রং গুলিয়া তুলি করিয়া লিখিয়া ৩।৪ দিন রাখিয়া দিলেই সেটা খুব শক্ত হইয়া ধরিয়া যাইবে, একটু বেশী তৈল দিয়া রংটা একটু হাল্কা করিয়া লিখিলেই কাচ প্রায় স্বচ্ছই থাকিয়া যাইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

Hydrofluoric acid দিয়া কাচের উপরে লেখা যাইতে পারে। ইহাতে কাচের স্বচ্ছতা বিন্দুমাত্রও নষ্ট হইবে না। ইহা গ্যাস (Gas) বা জলীয় তরলসার (aqueous solution) দুই আকারেই (state) ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে-জিনিষের উপরে লিখিতে হইবে প্রথমে তাহার উপর মোমের প্রলেপ (coating) দিতে হইবে। তারপর কোন লোহার সরু যন্ত্র (tools) দ্বারা যাহা লিখিতে হইবে বা যে ছবি আঁকিতে হইবে তাহা আস্তে আস্তে আঁকিয়া লইতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন চটিয়া মোম উঠিয়া না যায়। তারপর ঐ মোম ওঠান অংশের উপর Hydrofluoric acid গ্যাস (Gas) বা উহার জলীয় তরলসার (aqueous solution) আস্তে আস্তে লাগাইতে হইবে। acid দেওয়া মাত্রই acidএর সহিত কাচের ক্রিয়া (action) আরম্ভ হইবে। অল্পক্ষণ পরে জলদ্বারা acid ধুইয়া ফেলিয়া মোম উঠাইয়া ফেলিলেই লেখা দেখা যাইবে। উহা স্থায়ী (permanent) হইবে।

শ্রীবিজয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

পিঁপড়া তাড়াইবার উপায়

কোন জিনিষ কর্পূর-সংযুক্ত করিয়া রাখিলে তাহাতে পিঁপড়া ধরিতে পারে না।

শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

আমি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার কিরূপে পিঁপড়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলাম তাহা লিখিতেছি। আমি তখন শ্রীহট্টে ছিলাম। সেখানে গিয়া যে বাসা পাইলাম তাহার পাকঘরটা পিঁপড়ায় পূর্ণ ছিল। ঘরের মেজে ছিল পাকা। আমি সেই মেজের সর্ব্বস্থানে এক কি

দুই পয়সার চিনি ছড়াইয়া দিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ায় মেজে ছাইয়া ফেলিল। তখন ফুটন্ত জল ঢালিয়া মেজে পরিষ্কার করাইলাম; সমস্ত পিঁপড়া মরিয়া গেল। তাহার পর দিন আবার চিনি ছড়াইলাম। সে দিনও দুই তিন হাজার পিঁপড়া দেখা দিল। সেগুলিও উত্তপ্ত জল দিয়া বিনষ্ট করিলাম। ইহাতেই পিঁপড়ার বংশ একেবারে লোপ পাইল।

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(৬)

জাগ্ গান

ঐ শ্রেণীর গান পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে; কিন্তু বিক্রমপুরে উহা অন্য নামে পরিচিত; সেখানে 'জাগ গান' বলা হয় না।

পৌষ মাসের শুক্লপক্ষীয় রাত্রিতে কৃষক শ্রেণীর মুসলমান যুবক ও বালকগণ দল বাঁধিয়া প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া একপ্রকার ছড়া গান গাহিয়া থাকে। এই অঞ্চলে সাধারণ ভাষায় উহা "কুলাইবড়" বলিয়া পরিচিত। এই নামের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না। উহারা যে-ছড়াটি গাহিয়া থাকে তাহা পল্লীগ্রামের ইতর ভাষায় রচিত। কৃষক-শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের নিজ কথ্য ভাষায় উহা গাহিয়া থাকে। সম্পূর্ণ ছড়াটি আমাদের স্মরণ না থাকায় এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ উহার ভাষা অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীর নিকট সহজবোধগম্য হইবে কি না তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

তাহারা গৃহস্থদের বাড়ী যাইয়া সমস্বরে—"কুলাই বড়" "কুলাই-বড়" ধ্বনি করিয়া থাকে। ছড়াটির প্রথম ও শেষ দুই লাইন মাত্র আমরা লিখিতেছি:—

"কুলাই বড় কুলাই বড়
আইলাম রে বড় বাড়ী—
চাউল পাইমু সের চারি।"

শেষ দুই লাইন—

পয়সা দেন চইলা যাই
বাথার বয়ান গাই।" ইত্যাদি।

ছড়াটির মাঝের লাইনগুলি আমাদের স্মরণ নাই, সম্ভব হইলে পক্ষান্তরে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইব। পূর্ব্বের এই ছড়াটির খুব প্রচলন ছিল, বর্ত্তমানে আর তেমন নাই। এখন কদাচিৎ ২।৩ জন বালক ঐ ছড়াটি নিয়া গৃহস্থদের বাড়ী উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে পৌষমাসের শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে প্রত্যহ তাহারা দলে দলে বাহির হইত এবং গৃহস্থদের বাড়ী হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউলও পয়সা সংগ্রহ করিত। এখন কাল-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থদেরও হাত পাট হইয়া গিয়াছে, উহাদেরও আগের মত আনন্দ ও উৎসাহ নাই। ইহা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

এই ছড়াটির সঙ্গে উহারা আর-একটি ছড়াও গাহিয়া থাকে তাহার নাম "আড় বাষ।" আমরা দেখিয়াছি, পূর্ব্বে উহারা শুধু প্রথমোক্ত ছড়াটিই গাহিয়া ক্ষান্ত হইলে প্রাচীন বৃদ্ধারা গৃহাভ্যন্তর হইতে 'আড় বাষের' ছড়াটিও গাহিতে আদেশ করিতেন। তখন উহা গাহিত। 'আড় বাষের' ছড়াটি প্রথমোক্ত ছড়া অপেক্ষা একটু অশ্লীল ভাষায় রচিত; তাই বোধ হয় গৃহস্থের আদেশ না পাইয়া উহারা এই ছড়াটি আবৃত্তি করিতে সাহস পাইত না। এই ছড়াটি এখন খুবই কম শুনিতে পাওয়া যায়, অশ্লীল অংশ বাদ দিয়া কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আড় বাষ আড় বাষ,
আড় বাষ টৈ টৈ,
গোয়াল মাইরা খাইলাম দৈ,
আড় বাষ অরকা,
নিল বুড়ীর চড়কা।
আড় বাষ ইরা
গোয়াল মাইরা খাই ক্ষীরা।

এ ছড়াগুলির কোন অর্থ করা সুকঠিন। কতকগুলি শব্দের কোনই অর্থ পাওয়া যায় না। শুধু কেবল ছন্দবদ্ধ পদ মিলাইবার জন্যই বোধ হয় অর্থহীন শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই সকল ছড়া গাহিয়া উহারা যে চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করে তাহা দ্বারা সকলে মিলিয়া বন-ভোজন বা পিক্-নিক্ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে আর আগের মত আমোদ হয় না।

এই সকল ছড়া ও গান ইতর ভাষায় রচিত হইলেও পল্লীর সম্পদ-বিশেষ। দুঃখের বিষয়, অধুনা এই সবই লোপ পাইতে বসিয়াছে। এই গান বাঙ্গলার আর কোথায় কোথায় প্রচলিত আছে আমাদের জানা নাই।

শ্রী নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জাগ্গানের ন্যায় যশোহর জেলায় ঐরূপ একপ্রকার গান প্রচলিত আছে, উহাকে "হলাই" বলে। পৌষ-সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব্বে অনুন্নত শ্রেণীর মুসলমানগণ রাত্রে গান করিয়া পয়সা ও চাউল সংগ্রহ করে এবং উহা দ্বারা সংক্রান্তির দিন পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া সকলে একত্রে বসিয়া ভোজন করে। "জাগ্" অর্থে, আমার বিশ্বাস জাগরণীই হইবে, কারণ তাহারা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঐরূপ গান করিয়া পয়সা ও চাউল সংগ্রহ করে।

শ্রী অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

(৭)

বিয়াল্লিশ বাজনা

কেবল কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে নয়, প্রাচীন সকল বাংলা কাব্যেই বিয়াল্লিশ বাজনার উল্লেখ আছে—

বেআল্লিশ বাজনা বাজে জয়ঢাক বাজে।—শূন্যপুরাণ।

দামামা দগড় বাজে বেয়াল্লিশ বাজনা।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

ইত্যাদি। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর সমবায়ে (৬+৩৬=৪২) ৪২ সুরের উপযুক্ত ৪২ প্রকারের তাল মান সুর সঙ্গত বাদ্য।

দমামাহ্ ফার্সী শব্দ। ধ্বন্যাত্মক। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে দম্দম (শব্দকল্পদ্রুমে)। দ্রগড় শব্দও ধ্বন্যাত্মক, সংস্কৃত।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

তানসেন

তানসেন জাতিতে হিন্দু ছিলেন। তাঁহার হিন্দু নাম রামতনু পাঁড়ে,—পিতার নাম—মকরন্দ পাঁড়ে। তিনি ৯৬৬ সালে গোয়ালিয়র নগরে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮ বৎসর বয়সে ইনি কোন মুসলমান যুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ৯৭০ সালে ইনি আকবরের গায়ক নিযুক্ত হন এবং একবার আকবর তাঁহার গানে এইরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তখন তিনি (আকবর) তাঁহাকে ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার ও "তানসেন" উপাধি দান করেন। ১০০২ সালে তানসেন আগরা নগরীতে দেহত্যাগ করেন। তানসেনের কোন জীবনী এখন পর্য্যন্ত পাই নাই।

(২)

মহাভারতীয় যুগে বার

য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মত গ্রহ-নামে বার নিরূপণের প্রথা ভারতবর্ষের গ্রীকদের কাছ থেকে ধার ক'রে নেওয়া। ভারতবর্ষে ফলিত ও গণিত জ্যোতিষও গ্রীকদের কাছ থেকেই এসেছিলো।

শার্দ্দূলকর্ণাবদান নামক বৌদ্ধগ্রন্থে প্রথম গ্রহ-নামে বার নির্দ্দেশ দেখা যায়। ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থের তারিখ সম্বন্ধে এখনও সন্দিহান আছেন।

জ্যোতিষী আর্য্যভট ৪৯৯ খৃষ্টাব্দের সমকালে যে জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন তাতে শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র বারের উল্লেখ আছে। শনিবার য়িহুদীদের স্যাবাথ বা পুণ্যাহ। রোমের ক্রীশ্চান সম্রাট্ কনস্ট্যাণ্টাইন ৩২১ খৃষ্টাব্দে পুণ্য রবিবারকে সপ্তাহের প্রথম গণনা কর্বার আদেশ প্রচার করেন। সেইজন্য সংস্কৃতেও রবিবারের নাম আদিবার ও আদিত্যবার। ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন যে, রবিবারে সৃষ্টি আরম্ভ হয়, সেইজন্য রবিবারের নাম আদিবার। এই মত ক্রীশ্চান মতের অনুরূপ। ব্রহ্মগুপ্ত আরো ব'লেছেন যে, শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০২ অব্দে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। আর্য্যভটও কলিযুগ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বদিন 'ভারত বৃহস্পতিবারের' উল্লেখ ক'রেছেন। বিষ্ণুস্মৃতি ও কোনো কোনো পুরাণেও রবিবারে সৃষ্টি আরম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈখানশ-সূত্রে বুধবারের উল্লেখ আছে।

ভারতবর্ষে বারের প্রাচীনতম উল্লেখ বুধগুপ্তের একটি শিলালেখে পাওয়া যায়; সেই লেখটি ৪৮৪ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশী তিথিতে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে সুরগুরোর্দিবসে সেই লেখটি উৎকীর্ণ হয়। তারপরে চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় বিষ্ণুবর্দ্ধনের তাম্রশাসনে ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বহির্ভারতের চম্পা রাজ্যে কোচীন-চীনে ৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ও ৬৫৮ খৃষ্টাব্দের লিপিতে বারের উল্লেখ দেখা যায়। তারপরে জাভা, চম্পা, কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানের লিপিতে বারের উল্লেখ পাওয়া গেছে।

হিতোপদেশ মৃগ-শৃগাল-কাকের গল্পে ভট্টারকবারের উল্লেখ আছে। হরিণ ব্যাধের জালে বন্দী হ'য়ে পরমবন্ধু শৃগালকে দাঁত দিয়ে কামড়ে পাশ ছেদন করতে অনুরোধ করলে শৃগাল বল্লে— "ব্যাধের পাশ চামড়ার তন্ত দিয়ে তৈরী; এই ভট্টারকবারে আমি দাঁত দিয়ে সেই তন্ত কেমন ক'রে কাটি? তুমি পলায়নের অপর উপায় চিন্তা করো।"—"সখে, স্নায়ুনির্মিতাঃ পাশাস্-তদ্-অদ্য ভট্টারকবারে কথম্-এতান্ দন্তৈঃ স্পৃশামি?"—এই ভট্টারকবার যে রবিবার তা নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন। ভট্টারকবার মানে দেববার। হিতোপদেশ ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর রচনা।

হিন্দু জ্যোতিষগ্রন্থে ও গ্রীক্ জ্যোতিষগ্রন্থেও বিশ্বজগতের কেন্দ্র ছিল পৃথিবী, এবং পৃথিবী থেকে গ্রহদের দূরত্ব অনুসারে তাদের পর পর নাম করা রীতি ছিল, যথা—সোম বুধ শুক্র রবি মঙ্গল বৃহস্পতি শনি। শনির ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবলোক, নক্ষত্রলোক, ও রাশিচক্র। কিন্তু পুরাণে গ্রহ-সংস্থান অন্যবিধ—পৃথিবীর পরেই রবি, তার পরে সোম, তারপরে নক্ষত্রলোক, তার পরে যথাক্রমে বুধ শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনি। কোথাও কোথাও এই ক্রমের একটু উল্টা-পাল্টাও আছে (ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ২২,২৩ পরিচ্ছেদ)। পদ্মপুরাণে সূর্য্যকেই গ্রহমধ্যস্থ—সোমপুত্র...গ্রহমধ্যস্থ বলা হয়েছে (সৃষ্টিখণ্ড, ৭৮,৭৯,৮২ পরিচ্ছেদ)।

আল্‌বেরুনী ১০৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতভ্রমণবিবরণে ভারতীয়দের গ্রহনামে বার নির্দ্দেশের উল্লেখ ক'রেছেন। প্রাচীন সপ্তাহ সূর্য্যাদি, সোমাদি, (চন্দ্রাদি) ভৌমাদি, কুজাদি ইত্যাদি বহুপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট হ'তো। বরাহমিহিরের সময় থেকেই সপ্তাহের বারের নাম বর্ত্তমান ক্রমে কায়েমি হয়।

যাই হোক, গ্রহ প্রভৃতির নামে বার নির্দ্দেশ ভারতবর্ষে গ্রীক-সংস্রবের ফলে ৩৭৫—৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে আরম্ভ হয়, এবং অষ্টম শতাব্দীতে তার বহুল প্রচলন দেখা যায়। মহাভারত খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বের রচনা।

এ সম্বন্ধে অধিক তত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক পাঠক J.R.A.S. 1912, The Use of the Planetary Week in India by J. F. Fleet, pp. 1039—1053, দেখ্‌বেন। রায় বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

মঙ্গলবারের নাম পূর্ব্বে মঙ্গলবার ছিলো না। মঙ্গলের নাম ছিলো ভৌম (ভূমি-পুত্র), কুজ (কু অর্থাৎ পৃথিবী হইতে জাত), অঙ্গারক, অসৃজ্, লোহিত, রুধির (মঙ্গল গ্রহের বর্ণ লোহিত ব'লে এই-সব নাম), এবং ক্রূরদৃশ্, বক্র ইত্যাদি (মঙ্গল অশুভকর গ্রহ ব'লে তাকে এই সব নামে ডাকা হতো)।

যে বস্তুর প্রকৃতি অসৎ, তাকে তোষামোদে ভুলিয়ে প্রসন্ন রাখ্‌বার ইচ্ছায় তাকে সু নাম দেওয়া হয়। এইজন্য মহা জ্বালাকর ব্যাধির দেবতার নাম শীতলা। ক্রূরদৃশ বক্র গ্রহকেও প্রসন্ন রাখ্‌বার জন্য তাকে উল্টা নামে ডাক' আরম্ভ হয়, এবং তাকে নাম দেওয়া হয় মঙ্গল।

এই মঙ্গলবারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মহিসুরের রাজ্যে প্রাপ্ত একটি লেখে, যার সময় ৯২৫ খৃষ্টাব্দ। তার পরে দাক্ষিণাত্যের ১০৬২ খৃষ্টাব্দে একটি লেখে মঙ্গলবার নাম পাওয়া যায়। আল্‌বেরুনী ১০৩০ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলবার ও মঙ্গল গ্রহের উল্লেখ ক'রেছেন। তার পরে একাদশ শতাব্দী থেকে এই নামের বহুল প্রচলন হ'য়ে পড়ে।

মঙ্গলের ন্যায় শনিও পাপ গ্রহ; শনির নামোচ্চারণ না কর্‌বার জন্য তাকেও একটা উপনাম দেওয়া হয় বড্ডবার—অর্থাৎ বড়ো বার। কন্নাদ দেশের ১০০০ খৃষ্টাব্দের এক কাব্যে এই বড্ডবারের উল্লেখ আছে। কিন্তু শনির এই তোষামোদসূচক উপনামটি মঙ্গল নামের তুল্য প্রচলিত হয়নি।

কৃপণ লোকের নাম করতে লোকে ভয় পায় অশুভ ঘট্‌বার আশঙ্কায়। তেমনি অশুভ গ্রহের নাম উচ্চারণ না কর্‌বার চেষ্টাতে মঙ্গল গ্রহের উপনামটাই প্রধান ও প্রচলিত হ'য়ে গেছে।

বিশেষ বিবরণের জন্য J.R.A.S. 1917, P.119, *Mangalavara* by J. F. Fleet দ্রষ্টব্য।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
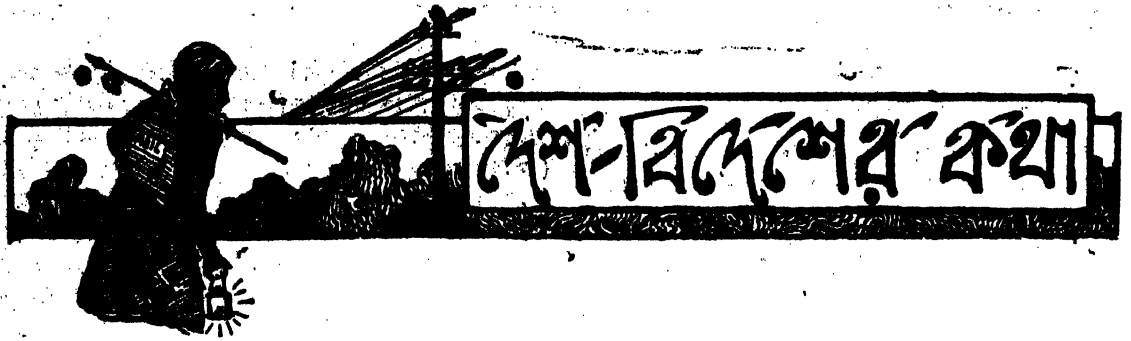
বিদেশ

উত্তর-মেরু অভিযান—

ইতালীর বিখ্যাত বীমানবীর কাপ্তেন নোবাইলের নেতৃত্বে একদল অভিযানকারী "ইটালীয়া" নামক বিমান-পোতে উত্তর মেরু অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে তাঁহাদের কোন সংবাদই পাওয়া যায় না, তাহাতে অনেকে সন্দেহ করেন যে, নোবাইলের বিমানপোত বরফের স্তূপে আটক পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তুষারের দেশে ইটালিয়া জাহাজ নষ্ট হইয়া যায় এবং মেরু-যাত্রীগণ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সাহায্য-দল প্রেরণের কথা উঠে। কয়েক দল উদ্ধারকারী বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। এদিকে কাপ্তেন নোবাইল ও তাঁহার সহচরদিগের বিপদের সংবাদে সমস্ত সভ্য জগতে দারুণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। নানা দেশ হইতে সাহায্যকারীদল বিপন্ন নোবাইল-দলের উদ্ধারকল্পে তুষারের দেশে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারক নরওয়ের বিখ্যাত মেরু-পর্য্যটক কাপ্তেন আমুন্‌সেনও উত্তর মেরু যাত্রীদের খোঁজ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। কাপ্তেন আমুন্‌সেন এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে অনেকেই আশান্বিত হইলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আমুন্‌সেন রওনা হইবার কিছু পরেই কাপ্তেন নোবাইলের খোঁজ হইল। সম্প্রতি নোবাইলের দ্বিতীয় দলের দুই জনেরও খবর পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তৃতীয় দলের এখনও কোনো সাড়া নাই। কিন্তু সেই হইতে আমুন্‌সেনের আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। এতদিন খোঁজ না পাওয়ায় তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হইয়াছেন।

কাপ্তেন আমুন্‌সেনের গৌরবময় মৃত্যুতে সমগ্র জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রথম জীবনে ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেষজ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়েই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আসক্তি জন্মে ও বিশ্বজগতের অবিকৃত স্থানগুলির আহ্বান তাঁহার মনের কোণে সাড়া দেয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর-পশ্চিম পথে অভিযানে বাহির হন। তিন বৎসর নানা বিপদজাল ছিন্ন করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম পথের উপর মানুষের বিজয়কেতন উড়াইলেন। তাহার পর তিনি দক্ষিণ মেরু অভিযানে পা বাড়াইবার কল্পনা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইংরেজ পরিব্রাজক শ্যাকেল্‌টন্ এই অভিযানে ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমুন্‌সনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তিনি দক্ষিণমেরুর বুকে নরওয়ের জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার তৃতীয় কীর্ত্তি উত্তর-পূর্ব্ব-পথ পরিক্রমণ। শুধু দুঃসাহসিকতার বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার দিক দিয়াই তিনি বড় ছিলেন না—মানবতার দিক দিয়াও তিনি খুব উদার ছিলেন। সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের মনে শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠতার গর্ব্ব তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি একবার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"Science does not recognise any such table (of white superiority). It is the age of laboratory; it is the newest development in scientific research. Careful investigations are exploding the myth of skin color and are constantly emphasising the importance of latent individual powers hidden beneath the skin. Intelligence, scholarship, mentality have no relation whatever to complexion." *

তুষারাচ্ছন্ন, জনমানবহীন মেরুপ্রদেশের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার জন্য যে-সকল বীর প্রাণদান করিলেন তাঁহাদের নাম সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

চীন—

চীনের রাজধানী পিকিংএর নাম জাতীয় দল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। উহার নূতন নাম হইল পিপিং। বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য চীনের নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত প্রস্তাব-সমূহ গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) যে-সমস্ত সন্ধির সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেগুলি অগ্রাহ্য হইয়া গেল। (২) অতঃপর নূতন সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে হইবে। (৩) যে-সমস্ত সন্ধির সময় এখনও শেষ হয় নাই, সেগুলির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। (৪) চীনের অধিবাসী বৈদেশিকগণ চীনাদের সমান অধিকার ভোগ করিবেন। (৫) জাতীয় টেরিফ প্রবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান টেরিফ অনুসারেই কাজ চলিবে।

পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই নিজেদের অভিপ্রায় অনুসারে টেরিফ নির্দ্ধারণ করিবেন।

ইংলণ্ডের নারীআন্দোলন ও শ্রীমতী প্যাঙ্কহার্ষ্ট—

সম্প্রতি ইংলণ্ডে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে ২১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেই পার্লামেণ্টে ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ঠিক এই সময়েই ইংলণ্ডের বিখ্যাত নারী আন্দোলনকারিণী শ্রীমতী প্যাঙ্কহার্ষ্টের মৃত্যু হইল। এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও তাহার জন্য যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দিলাম।

মিসেস্ প্যাঙ্কহার্ষ্টের কুমারী নাম মিস্ গোল্ডেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে

* The Modern Review, July 1925, p. 24.

ইনি ম্যাঞ্চেষ্টারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বালিকা বয়সে ইনি প্যারিসে গিয়াছিলেন এবং সেখানে হেন্‌রী রচফোর্টের কন্যার সাহচর্য্য-লাভ করিয়া "রিপাব্লিকান" হইয়া উঠেন। যখন তিনি ২০ বৎসর বয়সের কুমারী, তখন ডাঃ প্যাঙ্কহার্ষ্টের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, ডাঃ প্যাঙ্কহার্ষ্ট তখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রতিষ্ঠিত "রমণীদিগের ভোটাধিকার আন্দোলন সমিতি"র সদস্য ছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত পরিচয়ের ফলে, মিস গোল্ডেন আকৃষ্টা হইয়া পড়েন এবং ঐ বৎসরই ডাঃ প্যাঙ্কহার্ষ্টকে বিবাহ করেন।

শীঘ্রই মিসেস্ প্যাঙ্কহার্ষ্ট উপরোক্ত "নারী ভোটাধিকার সমিতির" কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অন্য একটি নারী ভোটাধিকার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৮৯৪ সনে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ লেবার পার্টিতে যোগদান করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি নারীদিগের রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি লণ্ডনে প্রবলভাবে নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করিতে আরম্ভ করেন এবং একদিন কমন্স্ সভার মহলাদিগের গ্যালারীতে "স্ত্রীলোকদিগকে ভোটাধিকার দাও"—এই লেখা সম্বলিত একটি পতাকা উড়াইয়া দেন। ইহার দরুণ মিসেস্ প্যাঙ্কহার্ষ্টকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি ৬ সপ্তাহের জন্য কারাগারে বন্দিনী হন। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে আবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঐ সময় জেলে তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কাপ্তেন আমুন্‌সেন্

নারীর ভোটধিকার লাভের জন্য তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ অনেক নির্য্যাতন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, অনেকবার পুলিশ এবং ক্রুদ্ধ জনতার নিকট হইতে তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু মিসেস্ প্যাঙ্কহার্ষ্টের উৎসাহ কমে নাই, তিনি ১৪।১৫ বার জেল খাটিয়াছেন ও দশবার প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। তিনি তাঁর অপূর্ব্ব বাগ্মীতা দ্বারা ইংলণ্ডের নারীদিগকে নিজেদের অধিকার রক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত লাঞ্ছনা সহিবার পর তাঁহার সাধনা ফলবতী হয়।

তাঁহার আন্দোলনের ফলে কমন্স সভায় স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দিবার জন্য একটি বিল উত্থাপিত হয়। দুইবার এই বিল পাশ হয়, কিন্তু তৃতীয়বারে আলোচনার সময় সামান্য কয়েকটি ভোটের ফলে বিলটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়। প্রকাশ যে, কয়েকজন বিখ্যাত রাজনীতিকের ধাপ্পাবাজীর ফলেই ঐরূপ ঘটিয়াছিল। ইহাতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখ মহিলাগণ ৫ মাইল দীর্ঘ একটি শোভাযাত্রা করেন। ইহাতে ৭০০ কারাদণ্ডে দণ্ডিতা স্ত্রীলোক এবং অন্য ২০০ শত রমণী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যোগদান করিয়াছিল।
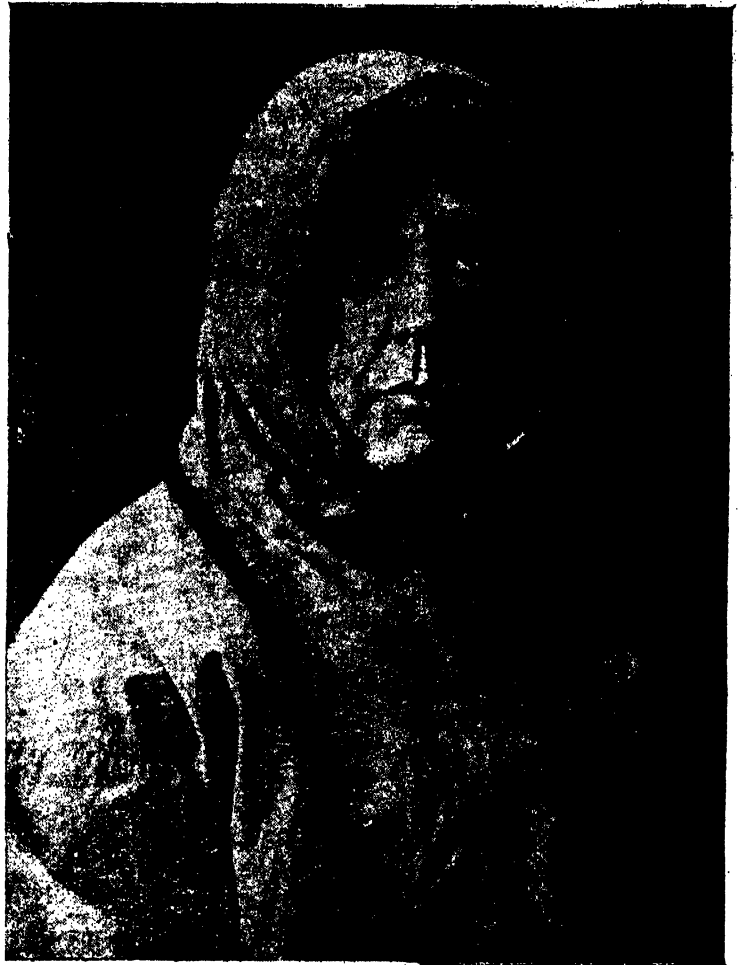
অতঃপর যুদ্ধের সময় মিসেস্ প্যাঙ্কহার্ষ্টের নেতৃত্বে স্ত্রীলোকগণ নানা বিভাগে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়।

—

ভারতবর্ষ

উৎকলমণি পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস—

বিগত ১৭ই জুন রাত্রি ৭৷৷০ টায় সত্যবাদী আশ্রমে গোপবন্ধু দাস দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র গোপবন্ধু ওকালতি পাশ করিয়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন বা পদগৌরব তাঁহার জীবনের কাম্য ছিল না। উড়িষ্যাবাসীর গভীর অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য পণ্ডিতজীকে দেশ-

সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ইহাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য ব্রতপরিকর হন এবং কতিপয় সঙ্গীসহ সত্যবাদী স্কুল ও আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'সমাজ' নামক সাপ্তাহিক পত্র উড়িষ্যায় নবজীবনের বার্ত্তা প্রচার করিতে থাকে। পণ্ডিত গোপবন্ধু দেশ-ও সমাজ-সেবাব্রত অবলম্বন করিয়া পর্ণ-কুটীরে বাস ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত ব্যসনবর্জ্জিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। যেখানে দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারীর সংবাদ পাইতেন সেখানেই তিনি ছুটিয়া যাইতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়া খদ্দর প্রচার, পল্লীগঠন, অস্পৃশ্যতাদূরীকরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কারাক্লেশও ভোগ করিতে হইয়াছিল। লালা লাজপত রায়ের প্রতিষ্ঠিত 'সার্ভেণ্ট্ অব্ পিপল্স্ সোসাইটি' বা জনসেবক সঙ্ঘের তিনি সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গত মার্চ্চ মাসে লাহোরে উক্ত সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়া ফিরিবার পথে তিনি সান্নিপাত জ্বরে আক্রান্ত হন। তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া গত ৫ঠা জুন উড়িষ্যা শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিবার জন্য তিনি কলিকাতায় আসেন। ফিরিবার পথে তাঁহার জ্বর হয় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। উড়িষ্যার দুঃখ-দৈন্য তাঁহাকে এমনই ক্লিষ্ট করিত যে, যেখানেই উড়িয়া শ্রমিক সম্পর্কিত গোলযোগ ঘটিত সেখানেই তিনি ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইবার নহে। মৃত্যুকালে পণ্ডিতজী তাঁহার 'সমাজ' পত্রিকা ও প্রেস 'সার্ভেণ্ট অব্ পিপল্স্ সোসাইটি'কে দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তির এক ট্রাষ্ট্ গঠন করিয়া তাহা জনহিতকর কার্য্যের জন্য দান করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি কন্যা বর্ত্তমান।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ—

কয়েক বৎসর হইল কতিপয় ব্রহ্মবাসী আমলাতন্ত্রের প্ররোচনায় ভারত হইতে ব্রহ্মকে বিচ্ছিন্ন করার একটি আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ৫ বৎসর পূর্ব্বে একজন ব্রহ্মদেশীয় সদস্য তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় ঐ মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি মন্ত্রীপদ লাভ করেন। এই আন্দোলনকারীদের জনসাধারণে্য কিছুমাত্র প্রভাব নাই। কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারও তাহাদের নাই। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত নেতা ভিক্ষু উত্তম সম্প্রতি সংবাদপত্রের মারফতে বলিয়াছেন—"আমার মুক্তির পর আমি ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি। ঐ সময় দেখিয়াছি ব্রহ্মদেশবাসিগণ ব্রহ্ম-ব্যবচ্ছেদের সম্পূর্ণ বিরোধী, পক্ষান্তরে ভগবান বুদ্ধ দেবের জন্মস্থান হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবারই বিশেষরূপে পক্ষপাতী। ভারত ও ব্রহ্মের মধ্যে আত্মীয়তা প্রায় ৩ হাজার বৎসরের পুরাতন এবং আমাদের শিক্ষা-শিল্প ইতিহাসের মধ্যে যাহা কিছু ভাল-সমস্তই ভারতীয়ের এবং ভারতীয় সভ্যতার দান। আমাদের ধর্ম্মের উদ্ভব-ভূমি ভারত—এই ভারতকে আমরা তীর্থস্থান জ্ঞানেই দেখিয়া থাকি। আমাদের আধুনিক ইতিহাসের মধ্যেও কোথাও আমরা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার কল্পনামাত্র দেখিতে পাই নাই। কাজেই এইরূপ একটা হীন আন্দোলনকে এই দেশে গজাইয়া উঠিতে দেখিয়া আমি অতি মাত্রায় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। আমাকে জানান হইয়াছে যে, ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার জন্য ব্রহ্মবাসীদের ঐকান্তিক ইচ্ছার ফলেই এই আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ ধারণা যে লোকের মনে স্থান লাভ করিয়াছে, ইহাতে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। আমি ব্রহ্মদেশীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতেও এতদ্দেশের সম্রান্ত ও শিক্ষিত জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্রহ্মদেশীয় জনসমিতির জেনারেল কাউন্সিলের পক্ষ হইতে সকলকে জানাইতেছি যে, এই বিচ্ছেদ আন্দোলনে ব্রহ্মদেশীয় জনসাধারণের বা বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘের কিছুমাত্র সমর্থন নাই। প্রাচ্যদেশে শ্বেতাঙ্গদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটী তৈয়ারী করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সুদূর প্রাচ্যের জন্য ইংরেজরা অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। সিঙ্গাপুরে নৌকেন্দ্র স্থাপন করিতে ইহারা অধিকতর চেষ্টায় আছে। এইজন্যই ইহারা সর্ব্বদা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, ব্রহ্মদেশের স্বার্থের চিন্তায় ইহাদের ঘুম হইতেছে না। আমলা-তন্ত্রের এতৎসম্পর্কে প্রকৃত মতলব বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। এই ব্যবচ্ছেদ দ্বারা ব্রহ্মদেশীয়গণকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়া নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করাই সরকারের উদ্দেশ্য। ভারত হইতে ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে ব্রহ্মদেশবাসিগণই নিজেদের অধিকার দাবী করিবার ব নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দাবী করিবার মত শক্তি হারাইবেন তাঁহারা চির দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন। ব্রহ্মদেশীয়গণ এখন রাজনীতি-ক্ষেত্রে শিশু—ব্রহ্মদেশে যে রাজনীতির ঈষৎ স্ফুরণ দেখা যাইতেছে ভারতের নিকট হইতেই তাহা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া পুষ্ট হইতেছে। সরকার ব্রহ্মদেশের এই জাগরণ অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ভারত হইতে ব্রহ্ম-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালান প্রত্যেক ব্রহ্মদেশীয় নেতা বা নেতৃ-সম্প্রদায়ের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি ব্রহ্মদেশের নেতাগণ ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন, তাহা ব্রহ্মের অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছুই হইবে না। ভারতীয় নেতাগণ যেন তাঁহাদের ব্রহ্ম দেশীয় ভ্রাতাদের ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন।

লণ্ডনে ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি—

লণ্ডন হইতে "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রে এই মর্ম্মে একটি বিশেষ তার আসিয়াছে যে, মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের পরামর্শানুসারে মিঃ শাকলাৎওয়ালা ও মিঃ তারিণী সিংহ লণ্ডনে ২০ জন সভ্য লইয়া একটি কংগ্রেস কমিটি গঠন করিয়াছেন।

বারদৌলী সত্যাগ্রহ—

বারদৌলী সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতেছে। ইতিমধ্যে গুজব উঠিয়াছিল যে, সত্যাগ্রহ সংগ্রামের নায়ক শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হইবে, কিন্তু তাহা ঘটে নাই। এই সম্পর্কে দেশের জননায়কগণ যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে দিলাম।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বলিয়াছেন—বারদৌলী তালুকে সরকার একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে চাহেন। মানুষ ও পশুর উপর ব অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে, ফলে গবর্ণমেণ্ট্ এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের প্রতিষ্ঠার হানি হইয়াছে। আরো লজ্জার কথা এই যে গবর্ণমেণ্ট্ জিদের বশে শুধু নিরীহ কৃষকদিগের উপর অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা দেশসেবক কর্ম্মীদিগকে ধরিয়া কঠোর সাজা দিতেছেন। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কৃষকের যে অটল দৃঢ়তা দেখাইতেছে, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করিতেছি। তাঁহারা ন্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান,—

অত্যাচার-উৎপীড়নে তাহারা দমিতেছে না। অপমান তাহারা নীরবে সহ্য করিতেছে, তাহাদের প্রিয় বস্তুসকল বলপূর্ব্বক অপসারিত হইতে দেখিয়াও তাহারা কিছু বলিতেছেন না, আত্মসমর্পণ না করিয়া নির্য্যাতন সহ্য করা তাহারা শ্রেয়ঃ মনে করিতেছে—ইহাতেই বুঝা যায় যে, তাহাদের দাবী যে ন্যায়সঙ্গত, তাহা তাহারা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছে। ন্যায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রজার দুঃখে যে-গবর্ণমেণ্টের মন গলে না, সে গবর্ণমেণ্ট—বিশেষতঃ সে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রজার দুঃখের কারণ, মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন অধিকার সে গবর্ণমেণ্টের নাই।

"আমার মতে বর্ত্তমান অবস্থায় একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিয়োগই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। নিছক সরকারী কমিশন নিরপেক্ষ হইতে পারে না, সুতরাং সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে না। কমিটিতে যদি উভয় পক্ষের লোক থাকে, তবে ভুল-ভ্রান্তি অতি সহজে ধরা পড়িবে এবং প্রতীকারের উপায় সহজে নির্দ্ধারিত হইবে। যে-মূলনীতির জন্য আজ বারদোলীতে সংগ্রাম চলিতেছে, সে-নীতি সমগ্র ভারতে প্রযোজ্য, সুতরাং বারদোলী সংগ্রামের সহিত সমগ্র ভারত সংশ্লিষ্ট। আমি আশা করি যে, সমগ্র ভারতবর্ষ বারদোলীর বীর কৃষকদিগকে সহায়তা করিয়া তাহাদের সংগ্রাম বিজয়মণ্ডিত করিবে।"

স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু বলেন—

বারদোলীর অবস্থা অতীব জটিল। আমার মতে ইহা আর অধিক দূর গড়াইতে দেওয়া সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ খাজনার হারের হ্রাস-বৃদ্ধির অধিকার আইনানুসারে গবর্ণমেণ্টের আছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রজারা এমন কতকগুলি ভীষণ অভিযোগ করিয়াছে এবং এত উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে যে, বারদোলীর প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি-সংক্রান্ত অভিযোগ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না, খাজনা আদায় ও হাঙ্গামা নিবারণের জন্য যে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তৎসমুদায় সম্বন্ধেও তদন্ত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন, তবে হাঙ্গামা দূর হইবে বলিয়া মনে করি। এই সংগ্রাম চলিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিলে গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হইয়া বৃদ্ধিই পাইবে, সুতরাং সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য লইয়া একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।

সিন্ধু দেশের মুস্লিম রাজনৈতিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মীর মহম্মদ খাঁর অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

দুর্ব্বহ করভার স্থাপন করিয়া বারদোলীর প্রজাদের প্রতি বিষম অবিচার করা হইয়াছে।

—

বাংলা

পরলোকগত অধ্যক্ষ শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী—

বিগত ২৩শে জুন ৯০ বৎসর বয়সে অধ্যক্ষ শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া শিক্ষা বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহার পরেও তিনি মডার্ণরিভিয়ু, কলিকাতা রিভিয়ু, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সারবান প্রবন্ধ লিখিয়া দেশ-বিদেশের মনীষিগণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি নিজ জন্মস্থান হুগলী জেলার গরলগাছা গ্রামের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি—

চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি গৃহ খনন করিবার সময় হাজার বৎসরের পুরাতন কয়েকটি বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত এবং এইগুলি হইতে প্রাচীন ভাস্কর্য্য-শিল্পের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী পিউরি নামক গ্রামে একজন মুসলমান একটি নূতন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইয়া খনন করিবার সময় এই মূর্ত্তিগুলি পাইয়াছেন। সেখানে কয়েকটি ব্রোঞ্জমূর্ত্তি এবং বুদ্ধের ৬৩টি প্রতিমূর্ত্তি সহ দামী পাথর বসানও একটি ক্ষুদ্র রকমের মন্দির পাওয়া

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

গিয়াছে। প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকার আবিষ্কারককে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিবেন। কারু-শিল্পের এই বহুমূল্য দ্রব্যগুলি পাওয়া মাত্র মিঃ জে, ডব্লিউ, ডেভিসের নিকট সংবাদ পাঠান হইয়াছিল এবং তিনি সরকারী আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐগুলি পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করেন। প্রকাশ যে, কলিকাতার মিউজিয়মে এই মূর্ত্তিগুলি রক্ষিত হইবে। মূর্ত্তিগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে, ঐগুলি হইতে প্রাচীন ভারতের বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে শিল্পচর্চ্চার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তিকে চট্টগ্রামের কোনও বৌদ্ধসঙ্ঘে পুরাকালে পূজা করা হইত। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ কিম্বা মুসলমানদিগের আক্রমণের সময় ঐ মূর্ত্তিগুলি শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়াছিল। মূর্ত্তিগুলির উপর যে উৎসর্গ-লিপি আছে,

তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম কিম্বা দশম শতাব্দীতে তৈয়ারী।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। তথাকার ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছেন। অভ্যর্থনার সময় মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভিয়েনার সায়েন্স একাডেমীর সদস্য পদ লাভ করিয়াছেন।

বিশেষ খ্যাতিমান বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অপর কেহ এই সঙ্ঘের সদস্য নির্ব্বাচিত হন না। স্যার জগদীশচন্দ্র যে-সম্মান লাভ করিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী লাভ করেন নাই। আজ জগতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের সমাজে স্যার জগদীশ-চন্দ্রের আসন সুপ্রতিষ্ঠ, ইহা ভারতবাসী ও বঙ্গবাসীর পক্ষে পরমানন্দের বিষয়।

বাংলায় বিধবা-বিবাহ—

বরিশালে

বরিশালের প্রসিদ্ধ জমিদার মিঃ ব্রাউন সাহেবের বাগানের মালী শ্রীবিদ্যাধর শ্যামলের সহিত বিধবা লক্ষ্মীমণি দাসীর বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্র এবং পাত্রীর উভয়ের সম্মতিক্রমে এই বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর বয়স ২৪ বৎসর। বিবাহ-সভায় বহু হিন্দু উপস্থিত ছিলেন।

পিরোজপুর মহকুমার কাউখালী থানার অন্তর্গত বান্নাকান্দা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন শিকদারের অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র শ্রীমান হরিচরণ শিকদারের সহিত খুলনার মোড়লগঞ্জ থানার অধীন চরগোবিন্দপুর নিবাসী শ্রীযুত হরকুমার মিস্ত্রী মহাশয়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী সুভাষিণীর শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

—বরিশাল-হিতৈষী

রাজসাহী

রাজসাহী জেলার কাছিকাটা নিবাসী ৺হরচন্দ্র সাহা মহাশয়ের ১৭ বৎসরের বাল বিধবা কন্যা শ্রীমতী কাত্যায়নী দাসীর সহিত নাজিরপুর সাকিনের শ্রীযুক্ত কানাইলাল সাহার বিবাহ নাজিরপুর গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ-সভায় স্থানীয় বহু হিন্দু উপস্থিত ছিল। বর একজন দোকানদার।

—হিন্দুরঞ্জিকা

নদীয়া

নদীয়া জেলার বাগুলাট গ্রামে ছোন্দা নিবাসী সহোদর মাঝীর বিধবা তৃতীয়া কন্যার সহিত গোলক মাঝীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকুঞ্জলাল মাঝীর শুভ পরিণয় হইয়াছে।

—জনমত

ময়মনসিংহে

ধামাইল গ্রাম নিবাসী শ্রীমথুরানাথ দাসের পুত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথ দাসের সহিত বানিয়া গ্রাম নিবাসী ৺জয়নারায়ণ সেনের কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরীর সহিত ময়মনসিংহে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ময়মনসিংহের সদর মহকুমার ফুলবাড়িয়া থানার অন্তর্গত কুশমাইল গ্রামে শ্রীযুত কালীচরণ সরকার কৈবর্ত্তদাসের বাড়ীতে ৪টি বাল-বিধবার বিবাহ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বরের নাম ও বয়স	কন্যার নাম ও বয়স
শ্রীরুক্মিণী তরফদার	শ্রীমতী প্রাণদাসুন্দরী দাসী
২৫ বৎসর	১৩ বৎসর
শ্রীরাজচন্দ্র দাস	শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দাসী
২৭ বৎসর	১৪ বৎসর
শ্রীচন্দ্রনাথ দাস	শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী
৩০ বৎসর	১৫ বৎসর
শ্রীদীনবন্ধু দাস	শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী
২৮ বৎসর	১৭ বৎসর

—চারুমিহির

বাঁকুড়া

কোতুলপুর থানার অধীন জানকীনগর গ্রামে একটি বালিকা বিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রী শ্রীমতী রাণীবালা দাসী (জাতি তিলি) চারি বৎসর বয়সের সময় বিধবা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বয়ঃক্রম কুড়ি বৎসর। আগুরানী গ্রাম নিবাসী শ্রীরামকুমার কুণ্ডু এই বিবাহের পাত্র হইয়াছেন।

—বাঁকুড়া-দর্পণ

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ—

এতদিন পর বরিশালে মসজিদের নিকট গীতবাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইল সম্প্রতি জেলার হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সমিতির প্রতিনিধিগণ জেলা বোর্ডের সভা-গৃহে সমবেত হইয়া একবাক্যে নিম্নোক্ত সর্ত্তসমূহে সম্মত হইয়াছেন:—

"প্রত্যেক লোকেরই জেলার সমস্ত স্থানের সমস্ত রাজপথ দিয়া সর্ব্বসময় গীতবাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অধিকার আছে, কেবলমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের আইনসম্মত শাসন-ক্ষমতা দ্বারা উক্ত শোভাযাত্রা-সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

"মূল চুক্তি ও ঘোষণাপত্রখানি জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে চিরস্থায়ী ভাবে রক্ষিত হইবে। ইহার সঠিক নকল প্রত্যেকেই উপযুক্ত মূল্য দিলে প্রাপ্ত হইবেন, এতদ্ব্যতীত যে যে সম্প্রদায় এই চুক্তিতে যোগদান করিলেন, উহার প্রত্যেক সম্প্রদায় এই চুক্তিপত্রের একখানি করিয়া মূল নকল পাইবেন। ১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই তারিখে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোনোভানের সাক্ষাতে সকল হিন্দু মুসলমান নেতা এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত সমস্ত মামলা ও ১১০ ধারার মামলাই তুলিয়া লওয়া হইবে। কারারুদ্ধগণকেও খুব সম্ভব সত্বর মুক্তি দেওয়া হইবে। এতদিনে বোধ হয় পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ সংগ্রামের অবসান হইবে ও সত্য ও ন্যায়ের জয় সর্ব্বসাধারণ ও সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইবে।

বৃদ্ধের উৎসাহ—

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর থানার অধীনে মেঘাই গ্রামে দলিমা বক্স নামে ৫৩ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ এ বৎসর কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—তাঁহার দুই পুত্র পড়াশুনা করিতে চাহে না। পুত্রদ্বয়কে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হন এবং সিণ্ডিকেটের অনুমতি লইয়া পরীক্ষা দিয়াছেন।

—স্বরাজ

পরলোকগত লালবিহারী সাহা—

গত ১লা জুলাই তারিখে কলিকাতা অন্ধ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা লালবিহারী সাহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮২৩ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। অন্ধদিগের শিক্ষাপ্রদান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া লালবিহারী বাবু তাহাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা অন্ধ বালকদিগের বিদ্যালয়ের সকল ভার তিনিই বহন করিয়াছেন। পরে বাংলা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বোর্ডের হাতে বিদ্যালয়ের ভার অর্পিত হয়। লালবিহারী-বাবু শেষ বয়সে নিজেও অন্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার পুত্র মিঃ এ, কে সাহা বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছেন। পরলোকগত সাহা মহাশয়ই উদ্যোগ করিয়া তাঁহার পুত্রকে এই বিদ্যালয় পরিচালনা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ—

বাংলার সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সমভাবেই চলিতেছে। ইহার উপর আবার কয়েক স্থানে বন্যার আশঙ্কা হইয়াছে। এই দুর্গতির অন্ধকারে আমরা এখনও হতাশ হই নাই—দেশবাসী যথাসাধ্য সাহায্য হাতে লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। উত্তর বঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনপদসমূহে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। ঐ সমাজের ধনীগণকে এই দারুণ দুর্দ্দিনে মুক্তহস্ত হইতে অনুরোধ জানাইয়া মফঃস্বলের অনেক সংবাদ-পত্র মন্তব্য করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের বিশদ বিবরণ মাসিকপত্রে দেওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা কয়েকটি জিলা সম্বন্ধে সামান্য সংবাদ এখানে দিলাম।

দিনাজপুর—বালুর ঘাট

দুর্ভিক্ষের অবস্থা এখনও পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। অন্নাভাবে পুত্রকন্যা বিক্রয়ের সংবাদ আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। বালুরঘাট দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-সমিতির সম্পাদক তার করিয়াছেন, যে পরিমাণ হউক না কেন অবিলম্বে অর্থ সাহায্য তার করিয়া পাঠান হউক। অনশনে মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। এমনি ভয়াবহ দুরবস্থা অথচ এখনও সরকার কেবল দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের পার্থক্যের সূত্র আলোচনা করিতেই ব্যস্ত রহিয়াছেন।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে ১৮।১৯ বৎসর বয়স্ক জনৈক তাঁতী পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে না পারায় আত্মহত্যা করিয়াছে। অনেকদিন যাবৎ তাহার স্ত্রী পুত্র ও সে নিজে উপবাসী থাকে। এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে। সদর মহকুমার অনেক স্থলে বহুলোক অনশনে কাল কাটাইতেছে, শিশু-সন্তানসকল কঙ্কালসার হইয়াছে। অনেকে কেবল মাত্র আম ও মহুয়ার ফল সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। ইহা কেবল মাত্র শোনা কথা নহে, বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং কাউন্সিলের সদস্য বিজয়-বাবু জেলার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর এই তাণ্ডব-লীলা দেখিয়া আসিয়াছেন।

—যুগদীপ

লালবিহারী সাহা
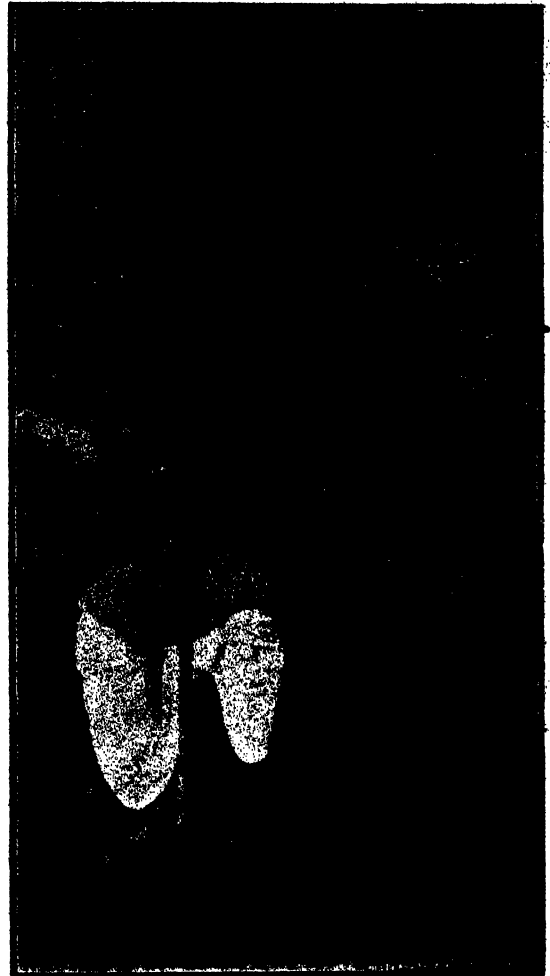
বীরভূম

বীরভূমে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বোলপুরের নিকটবর্ত্তী ধানের কলগুলি ধান অভাবে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই সকল কলের শ্রমিকগণ কেহ ১০ দিন কেহ ৫ দিন উপবাসে রহিয়াছে। অনেকেই ২।৩ মাস যাবৎ অর্দ্ধাশনে রহিয়াছে।

—বীরভূম বাণী

যশোহর-খুলনা

যশোহরে অনেক গ্রামে লোকে অন্নাভাবে শাকপাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। খুলনায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং পরিদর্শনে বাহির হইয়া বিবরণ দিয়াছেন :—দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলের দুর্দ্দশার দৃশ্য হৃদয়-বিদারক। গ্রামগুলির সকল কুঁড়ে ঘরগুলিই জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া

পড়িবার মত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিধান করিয়া আছে বলিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিতে পারে না। সর্ব্বত্র দুঃখ-দুর্দ্দশা বিরাজ করিতেছে।

দেশের সাধারণ অবস্থা শোচনীয়। অপরকে সাহায্য করিবার মত অবস্থা এবার কাহারও নাই। ভিক্ষা মিলে না। কালীগঞ্জ থানার পরই আশাশুনী থানার ৩ জনের অনশনজনিত ক্লেশে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে কালীগঞ্জে ও আশাশুনি থানায় রীতিমত ভাবে এবং সত্বর সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলে অনাহারে বিস্তর লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। এ বিষয়ে জনসাধারণ, জিলা কংগ্রেস কমিটী এবং কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

—খুলনা

বর্দ্ধমান

'শক্তি' সংবাদ দিতেছেন "অসংখ্য নর নারীর অনাহার"—মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর অসংখ্য নরনারী খাদ্যাভাবে কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন বা অনশনে দিনপাত করিতেছে। মজুরীর অভাবে নিম্ন শ্রেণীর আরও কষ্ট হইয়াছে। কাহারও ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য নাই, যাহা দ্বারা এই দুঃস্থ পরিবারগণের সামান্য মাত্রও সাহায্য হইতে পারে।

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদেও দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব-লীলা আরম্ভ হইয়াছে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শস্য হয় নাই বলিয়া চাষিগণ সম্পূর্ণ নিরন্ন হইয়াছে। স্থানে স্থানে সাহায্য-কেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। অনেক কৃষক অন্নাভাবে বাসনপত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছে।

নবাবিষ্কৃত অশোক-শিলালেখ

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার

গত চৈত্র মাসে পুরী হইতে সংবাদ পাই যে, তথাকার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় একখণ্ড শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহার অক্ষর ধৌলি পাহাড়ে খোদিত অশোক-লিপির অনুরূপ। অল্প কয়েক দিন পরে পুরী যাইয়া শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, ইহা নেপাল তরাই প্রদেশে রুমিন্দেঈ গ্রামে শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ অশোক-লিপির প্রতিলিপি। ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে পুরীর উড়িষ্যা ঐতিহাসিক পরিষদের (Orisaa Historical Association) অধিবেশনে একটি বক্তৃতায় এই অভিনব শিলালেখ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করি এবং উহার বিবরণ কলিকাতার ফরওয়ার্ড কাগজে প্রকাশিত হয়।

এই শিলালিপিতে অশোক প্রচার করিতেছেন যে, তাঁহার অভিষেকের বিংশতি বর্ষ পরে তিনি লুম্বিনী গ্রামে স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক এ স্থান শাক্যমুনি বুদ্ধের জন্ম স্থান বলিয়া ইহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, এখানে শিলাময় বৃহৎ ভিত্তি স্থাপন করান এবং শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করান। অধিকন্তু ভগবান বুদ্ধ এ স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এইহেতু তিনি লুম্বিনী গ্রামকে নানা-প্রকার কর হইতে মুক্ত করিয়া দেন। বীরেন্দ্র-বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত এই শিলাখণ্ড দৈর্ঘ্যে উনিশ ইঞ্চি,

অশোক শিলালেখ

প্রস্থে প্রায় এক ফুট এবং উচ্চতায় সাত ইঞ্চি। তিনি বহু দিন যাবৎ প্রচুর অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক প্রাচীন মুদ্রা, মূর্ত্তি, তাম্রপট্ট, পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুরীর

বাড়ীতে একটি নাতি বৃহৎ মিউজিয়াম (Roy's Museum) স্থাপন করিয়াছেন। গত মাঘ মাসে বীরেন্দ্র-বাবু কার্য্যোপলক্ষে ভুবনেশ্বরে যাইয়া অনেক লোকের কাছে বলেন যে, কেহ কোনও খোদিত শিলাখণ্ড কিংবা তাম্রপট্ট আনিয়া দিতে পারিলে তিনি তাহাকে এক মোহর পুরস্কার দিবেন। তাহাতে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের প্রায় এক মাইল স্থানে, পর্ব্বতগাত্রে এবং প্রস্তর-স্তম্ভে উৎকীর্ণ করাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিলালেখ-সমূহ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত ছয় স্থানে এবং স্তম্ভলেখগুলিও অপর ছয় স্থানে পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র শিলালেখ-সমূহেরও একই লিপি নানা স্থানে প্রচার করা হইয়াছে। বিভিন্ন
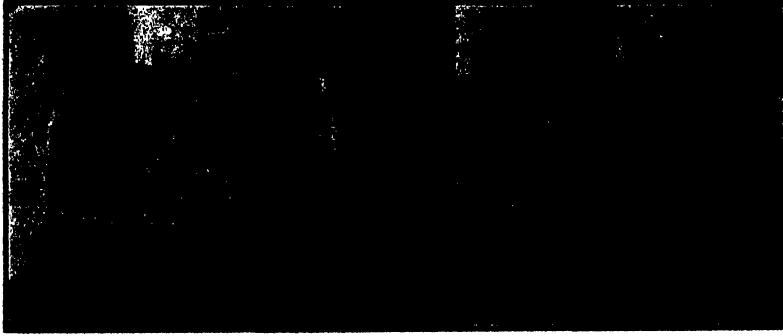
অশোক-শিলালেখ

দক্ষিণে স্থিত কপিলেশ্বর গ্রামের একজন কৃষক এই প্রস্তর খণ্ড আনিয়া তাঁহাকে দেয়। ইহা বহু পুরুষ যাবৎ তাহার বাড়ীর মাটির দেওয়ালে বসান ছিল। কিন্তু তাহার কোন্ পূর্ব্বপুরুষ কখন কোন্ স্থান হইতে আনিয়া উহা সে-স্থানে স্থাপন করিয়াছে তাহা সে কিছুই জানে না। আমি কপিলেশ্বর গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া ইহার অধিক আর কিছু সংবাদ বাহির করিতে পারিলাম না।

আমি ধৌলিতে যাইয়া অশোক-লিপির অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ধৌলির অক্ষরের সহিত এই শিলাখণ্ডের কোনও কোনও অক্ষরের পার্থক্য রহিয়াছে। রুম্মিন্দেঈ গ্রামের শিলালেখের সহিত তুলনায় দেখা যায় যে, এই শিলাখণ্ডে কোনও কোনও শব্দ অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ হইলেও কয়েকটি শব্দ ইহাতে অধিক আছে। অশোক একই অনুশাসন তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শিলালেখের ভাষা মূলতঃ এক হইলেও স্থানানুসারে সামান্য পার্থক্যও আছে। ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মস্থান-ঘটিত এই লিপিটিও সেইরূপ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি প্রচার করিবেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। ইহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না যে, উড়িষ্যা বুদ্ধদেবের জন্ম স্থান। অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে, জুন মাসের শেষ ভাগে, বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের আবকারী কমিশনার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল রায় মহাশয় আমার নিকট হইতে এই শিলাখণ্ডে লুম্বিনী শিলালেখের প্রতিলিপি আছে জানিতে পারিয়া ইহার এক খণ্ড ছাপ লন; তাহা হইতেই সম্প্রতি কোনও কোনও সংবাদপত্রে উড়িষ্যা বুদ্ধদেবের জন্মস্থান এইরূপ বহু হাস্যজনক সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে।

এই শিলালিপির অনুলিপি প্রভৃতি সহ বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

বারদোলির সংগ্রাম

গুজরাতে বারদোলি তালুকার বোম্বাই গবর্মেণ্ট প্রজাদের খাজনা অতিরিক্ত রকম বাড়াইয়া দেওয়ায় তাহারা তাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছে। তাহার ফলে তাহাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, বাজেয়াপ্ত, নিলাম হইতেছে। অন্য উপদ্রবও তাহাদের উপর হইতেছে। তাহাতেও এই কৃষক, কৃষকবধূ ও কৃষক-সন্তানদের প্রতিজ্ঞা টলে নাই। তাহারা সর্ব্বস্বপণ, প্রাণপণ করিয়াছে। বিলাতে পার্লেমেণ্টে সহকারী ভারতসচিব উইণ্টার্টন স্বীকার করিয়াছেন, বারদোলির প্রজাদের নেতা শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল অনেকটা সফল-প্রযত্ন হইয়াছেন, কিন্তু গবর্মেণ্ট আইনানুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। প্রজাপক্ষ চাহিতেছেন, যে, খাজনা বৃদ্ধি ন্যায্য হইয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে স্বাধীন তদন্ত হউক। গবর্মেণ্ট এখনও তাহাতে রাজী হন নাই। বোম্বাইয়ের লাট এ বিষয়ে বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য সিমলা যাইতেছেন।

বারদোলির প্রজারা যোগ্য নেতার নেতৃত্বে ধৈর্য্য, শান্ত বীরত্ব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হয়।

—

কংগ্রেসের সভাপতিত্ব

বহু বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর খবরের কাগজে পড়িয়া আসিতেছি, "কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সাতিশয় গুরুতর নানা প্রশ্নের আলোচনা হইবে। ভারতের ইতিহাসে এখন সন্ধিক্ষণ সমাগতপ্রায়। অতএব খুব যোগ্য নেতার প্রয়োজন। অমুক ব্যক্তিই সেই নেতা। অতএব তাঁহা-কেই এবার কংগ্রেসের সভাপতি করা উচিত।" ইত্যাদি। এবারও এবম্বিধ কথা যে শুনা যাইতেছে না, তাহা নহে। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর বহু যোগ্যতম নেতা সভাপতিত্ব করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সভাপতি না হইয়া আর কেহ হইলে যে ফল সম্বন্ধে কি প্রভেদ হইত, অনুমান করিতে পারি নাই।

এবার ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য যে-সব নামের তালিকা দিতেছেন, তাহাতে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুরই সভাপতি হইবার খুব সম্ভাবনা। তিনি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ যোগ্য লোক। এক সময়ে অনেক টাকা রোজগার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং অন্যায় আইন অমান্য করিয়া জেলে গিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে আরও অনেক যোগ্য লোক থাকিতে একই ব্যক্তিকে একাধিক বার সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার বিশেষ কারণ দেখা যাইতেছে না। পঞ্জাব হইতে কংগ্রেসের সাধারণ কোন অধিবেশনের সভাপতি কেহ নির্ব্বাচিত হন নাই। লালা লাজপৎ রায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন একটি বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি। এবার পঞ্জাব হইতে কাহাকেও সভাপতি নির্ব্বাচন করিলে ভাল হয়। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে সভাপতি নির্ব্বাচন করিতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই, এরূপ রীতির প্রয়োজনও নাই। কিন্তু উপযুক্ত লোক থাকিতে একটি প্রদেশকে একেবারে বাদ দিয়া অন্য সব প্রদেশ হইতে বার বার সভাপতি নির্ব্বাচন ঠিক নয়। পঞ্জাবে উপযুক্ত লোক আছেন। শুধু আবেদন নিবেদন প্রতিবাদ বক্তৃতা অপেক্ষা, আবশ্যক মত নিরুপদ্রব, অহিংস প্রতিরোধ অধিকতর আত্মসম্মানসঙ্গত, বীরত্বব্যঞ্জক ও চরমে অধিকতর ফলোপধায়ক। পঞ্জাবে শিখেরা কয়েকবার অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এই প্রতিরোধ-নীতির অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কোন যোগ্য নেতাকে এবার সভাপতি করিলে ভাল হয়। বার-দোলিতেও এইরূপ প্রতিরোধনীতি শ্রীযুক্ত বল্লভভাই

পটেলের নেতৃত্বে অনুসৃত হইতেছে। তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিলেও ভাল হয়।

—

লাহোরে বাঙালী অধ্যাপক

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে আমি অজ্ঞতাবশতঃ সম্পাদকের চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, যে, লাহোরে বাঙালী অধ্যাপকের সংখ্যা কম। বাস্তবিক কিন্তু আমি যাঁহাদের নাম করিয়াছিলাম, তাঁহারা ছাড়া আরও অনেক বাঙালী অধ্যাপক লাহোরে আছেন। ট্রিবিউনের সম্পাদক তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম করিয়া লিখিয়াছেন, "মোটের উপর বাঙালী অধ্যাপকের সংখ্যা আগের চেয়ে কম নয়।"

লাহোরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মৌলিক তথাকার বাঙালী অধ্যাপকদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহা নীচে মুদ্রিত হইল।

১। দয়াল-সিং কলেজ (ব্রাহ্ম)—এখানে উপস্থিত তিনজন বাঙালী অধ্যাপক আছেন। যথা :—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্রেয় ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল ; শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত। ইঁহারা সকলেই দয়ালসিং কলেজে জুনিয়র গ্রেডে বেতন পাইয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত তাপসকুমার দত্ত অস্থায়ী ভাবে গত বৎসর অধ্যাপক ছিলেন।

২। দয়ানন্দ য়্যাংলো-বেদিক কলেজ (আর্য্যসমাজী), এখানে বর্ত্তমানে তিনজন বাঙালী অধ্যাপক আছেন। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য (ইংরাজী সাহিত্য) ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার (সংস্কৃত)। উভয়েই নিজ নিজ বিষয়ের সিনিয়র প্রফেসার। ইঁহারা দয়ানন্দ য়্যাংলো-বেদিক কলেজের সিনিয়র গ্রেডে নিযুক্ত। গণিতশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ জুনিয়র গ্রেডে মাহিনা পাইতেছেন।

৩। ফর্ম্ম্যান্ ক্রিশ্চান্ কলেজের একমাত্র বাঙালী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ঐ কলেজে গণিতের প্রধান অধ্যাপক ও সিনিয়র গ্রেডে নিযুক্ত।

৪। সনাতনধর্ম্ম কলেজ (হিন্দু) এই কলেজগৃহেই লাহোরবাসী বাঙালীরা 'প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয়কে অভ্যর্থিত করিয়াছিলেন। এই কলেজের সিনিয়র গ্রেডে নিযুক্ত মোট চারিজন অধ্যাপকের মধ্যে তিনজন বাঙালী। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ মৌলিক ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। শ্রীযুক্ত অনিলকুমার গাঙ্গুলী গণিতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ইংরাজীর দ্বিতীয় অধ্যাপক।

৫। গভর্ণমেণ্ট কলেজ, লাহোর। এখানে তিনজন বাঙালী অধ্যাপক আছেন। অধ্যাপক জি, সি, চ্যাটার্জ্জী (I. E. S.) দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক। অধ্যাপক আদিত্য (P. E. S.) জীব ও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

৬। পঞ্জাব ইউনিভার্সিটী—এখানে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের রীডার বিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ হরপ্রসাদ চৌধুরী, উদ্ভিদ্ রোগ-বিজ্ঞানের (Plant Pathologyর) অধ্যাপকই একমাত্র বাঙালী অধ্যাপক।

৭। নারীদের জন্য কিন্নেয়ার্ড কলেজ (খৃষ্টিয়ান কলেজ)—অধ্যাপিকা কুমারী সরকার ; ইতিহাসের অধ্যাপক।

৮। মেয়ো স্কুল অব্ আর্টস্ (গভর্ণমেণ্ট)—চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই কলেজের ভাইস্‌প্রিন্সিপ্যাল।

—

লাহোরে "বব্‌ড হেয়ার"

লাহোরে কোন কোন হিন্দু মহিলার "বব্‌ড্ হেয়ার" অর্থাৎ ইউরোপীয় ফ্যাশনে ঘাড়ের কাছে ছাঁটা চুল দেখিয়া আমি আষাঢ়ের প্রবাসীর সম্পাদকের চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, যে, কেবলমাত্র একজন বাঙালী মহিলার এইরূপ চুল দেখিয়াছি। ইহা পড়িয়া কোন মহিলা আরও কয়েক জনের নাম আমাকে জানাইয়াছেন। এখন বলিতে হইতেছে, আমি একাধিক বাঙালী মহিলার বব্‌ড্ হেয়ার দেখিয়াছি।

—

"বাংলার হিন্দুসমাজ"

বাংলাদেশে পূর্ব্বে প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা এবং তদ্ভিন্ন হিন্দুসমাজভুক্ত কোন কোন সংস্কারক যে যে বিষয়ে সমাজসংস্কারের প্রয়োজন তাহা বলিতেন ও তদনুরূপ

আন্দোলন করিতেছেন। কিছুদিন হইতে হিন্দুসমাজভুক্ত বিস্তর লোক সমাজসংস্কারের জন্ত আন্দোলন করিতেছেন এবং কার্য্যতঃ সংস্কার করিতেছেন। তাহাতে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বালিকাদের বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে, এবং নানাজাতির মধ্যে বিধবা বালিকাদের বিবাহ বৃদ্ধি পাইতেছে। হিন্দুসমাজের কোন কোন মুখপত্রও খুব সাহস ও দৃঢ়তার সহিত সংস্কারের সমর্থন করিতেছেন। অবশ্য এখনও সংস্কারবিরোধী হিন্দুরা চীৎকার করিতে পারেন (যেমন সে দিন এলবার্ট হলে কতকগুলি লোক চীৎকার করিতেছিলেন, কিন্তু বাল্যবিবাহ-সমর্থক প্রস্তাব ধার্য্য করিতে পারেন নাই), যে, যাহারা সংস্কার চায় তাহারা অহিন্দু ও পাষণ্ড। কিন্তু অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মকে অহিন্দু ও পাষণ্ড বলা যত সোজা, সংস্কার-প্রয়াসী বহুসংখ্যক হিন্দুকে তাহা বলা তত সহজ নহে। কারণ, শেষোক্ত ব্যক্তিরাও সংস্কারবিরোধীদিগকে হিন্দুসমাজের শত্রু বলিতে পারেন ও বলিতেছেন। সুতরাং কোন্ দল হিন্দু কোন্ দল নয়, তাহার মীমাংসা কে করিবে? যে পথ অবলম্বন করিলে হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তি বাড়িবে, যাহাতে নারীদের উপর অন্তঃপুরে ও বাহিরে অত্যাচার কমিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা ও শক্তি বাড়িবে, সেই পথই অবলম্বনীয় বলিয়া হিন্দু সমাজের বিস্তর লোক বুঝিতে পারিয়াছেন।

"হিন্দু-মিশন" নামক পাক্ষিক পত্র হিন্দু সমাজের অন্যতম মুখপত্র। স্বামী নাগেশানন্দ গিরি ইহার সম্পাদক। ১৬ই আষাঢ়ের এই কাগজে "বাংলার হিন্দুসমাজ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বাল্যবিবাহের এবং বালবিধবাদের চির-বৈধব্যের কুফল সেন্সস্ রিপোর্টের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে। সেন্সস্ রিপোর্ট হইতে যে সব সংখ্যা "হিন্দু-মিশন" পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাহার আলোচনা অনেকবার করিয়াছি। কিন্তু হিন্দু সমাজের একটি মুখপত্রে তাহার সাহায্যে সমাজসংস্কার সমর্থিত হওয়ায় অধিকতর সুফলের আশা করা অযৌক্তিক নহে। "হিন্দু-মিশনে" লিখিত হইয়াছে :—

বাংলার ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজ সম্প্রতি নিজ অবস্থা সম্বন্ধে অল্পে অল্পে সচেতন হইতেছে। বাংলার অনেক গ্রাম হইতে হিন্দু জাতির চিহ্ন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। হিন্দুর পীড়া, ব্যাধি, মৃত্যু-সংখ্যা অতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাংলার যে সকল জেলায় হিন্দুরা সংখ্যাবহুল ছিল, আজ তাহার অধিকাংশ স্থানেই তাহারা ক্রমশঃ লোপের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাই এজন্য প্রধানতঃ দায়ী। বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য বাংলার হিন্দু সমাজের কি দারুণ সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে তাহা তলাইয়া বুঝিতে হইলে বাঙালী হিন্দুর নিম্নোক্ত বিধবার সংখ্যার প্রতি একবার দৃষ্টি করা উচিত,—

সংখ্যাগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। অতঃপর লেখক বলিতেছেন :—

মোট ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত (বিধবার সংখ্যা) ৫২৪৮৬২। এখন চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে এই সওয়া পাঁচলক্ষ হিন্দু বিধবার মধ্যে—

(১) কয়জন ঠিক্ ঠিক্ ব্রহ্মচর্য্য পলেন করিতে পারিতেছে,

(২) কতজন দাসীবৃত্তি বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি দুঃখ ও কলঙ্কময় উপজীবিকা অবলম্বন করিয়াছে।

(৩) প্রতিবৎসর কত হাজার ভ্রূণহত্যা ঘটিতেছে,

(৪) প্রতি বৎসর কত হাজার বিধবা হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে এবং হিন্দু সমাজের ক্ষয় ও অপর সমাজের পুষ্টি সাধন করিতেছে।

বাংলার হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহের প্রাবল্য ও বাল-বৈধব্যের ফলে যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বাস্তব তথ্যের (facts and figures) দ্বারা এখন প্রদর্শন করিতেছি।

ইহার পর "ভদ্র পরিবারে" ও অনুন্নত সমাজে বিধবাদের অবস্থা সম্বন্ধে যে-সব কথা লেখক বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিব না। অবশ্য, মন্তব্যগুলি সব বিধবার সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। কিন্তু ইহা সত্য যে, কোন কোন স্থলে "বাল বিধবাকে শীঘ্রই পাপের সহিত রফা করিতে হয়।"

"হিন্দু-মিশনে" প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে "প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাতে দশ বৎসরের কম বয়স্ক বিবাহিতা ও বিধবা স্ত্রীলোকের সংখ্যা জেলা হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।" সেই সংখ্যাগুলি হইতে লেখক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

(১) পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিতেই বাল্য-বিবাহের মাত্রা অত্যন্ত অধিক।

(২) পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমানপ্রধান জেলা ও দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় "অবাঙ্গালী" পূর্ণ জেলায় বাল্যবিবাহ অত্যন্ত কম। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম বাদ দিলে বাংলার সমভূমি চট্টগ্রাম জেলাই বাংলা দেশে বাল্যবিবাহরূপ কলঙ্ক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুক্ত।

লেখকের মতে, "বাল্য বিবাহের বিষময় ফল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিতে হইবে"—

(১) কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী সহরগুলির অধিকাংশ ঝি, চাকরানী পানওয়ালী, বারবনিতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ হইতেই আসিয়া থাকে। খুব সম্ভবত ইহার অধিকাংশই অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পর স্বামী বা পিতৃগৃহ, কোথায়ও সদ্ব্যবহার না পাইয়া এবং নানা প্রকার প্রলোভনে পড়িয়া এই কলঙ্কময় পথ অবলম্বন করে।

(২) পূর্ব্ববঙ্গে ঝি চাকরানী ও পানওয়ালী পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় তেমন সুলভ নহে।

(৩) পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে, সহর ত দূরের কথা, মফঃস্বলের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বাজারে, বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে (বিশেষত জমিদারপ্রধান স্থানে) বেশ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম ওসকল পাপ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুক্ত।

প্রতি হাজার পুরুষের মৃত্যুর সহিত প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের অনুপাতের সংখ্যা এক হইতে ষাট বৎসর পর্য্যন্ত দিয়া লেখক বলিতেছেন—

উপরি উক্ত অঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই ১৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার প্রায় শতকরা ৫০ হিসাবে বাড়িয়া যায়। সেন্সাস রিপোর্টে ইহার কারণ নিম্নলিখিত রূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে :—

(১) বাল্যবিবাহ ও অপরিণত বয়সে সন্তান প্রসব।

(২) গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পরে সময়োচিত স্বাস্থ্যবিধি পালন না করা। ইহার ফলে সহস্র সহস্র স্ত্রীলোক সূতিকা প্রভৃতি জটিল পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

উপরি উক্ত কারণ ব্যতীত পুরুষগণের ব্যভিচার জনিত নানা প্রকার কুৎসিত ব্যাধি স্ত্রীলোকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া তাহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ ঘটায় কিনা, তাহাও বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

—

বরিশালে মসজিদের সম্মুখে বাদ্য

বাখরগঞ্জ জেলার পটুয়াখালিতে মসজিদের সম্মুখ দিয়া গীত-বাদ্য সহকারে যাইবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দীর্ঘ কাল ধরিয়া শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ হিন্দুরা অহিংস আদেশলঙ্ঘন নীতির অনুসরণ করিতেছিলেন। তাহাতে সেন মহাশয়কে ও অন্য বিস্তর লোককে জেলে যাইতে ও অন্য নানা কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি বরিশালে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি-গণ একটি মীমাংসা-পত্রে দস্তখত করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যে, যে-কোন মসজিদের সম্মুখ দিয়া যে-কোন সময়ে গীত-বাদ্য সহকারে যাইবার অধিকার সর্ব্বসাধারণের আছে। ফলে পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ শেষ হইয়াছে। ভালই হইয়াছে। কোনও ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা তাঁহাদের ধর্ম্মালয়ে যখন উপাসনায় রত থাকেন, তখন কোন প্রকার গোলমাল করিয়া তাহাতে ব্যাঘাত উৎপাদন ভদ্রতাসঙ্গত নহে, ধর্ম্মসঙ্গতও নহে। এরূপ আচরণ না করা সকলেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু জোর করিয়া সকল সময়েই মসজিদের সামনে গীতবাদ্য বন্ধ করাইবার ন্যায্য অধিকার কাহারও নাই। কেন না, এইরূপ ব্যাঘাত উৎপাদন করিলে বিশেষ করিয়া মসজি-দেরই অপমান হয়, বা মুসলমানদের ঈশ্বরেরই অপমান হয়, ইহা সত্য নহে। বস্তুতঃ মানুষ কোন প্রকার দুর্ব্যবহারের দ্বারাই ঈশ্বরের অপমান করিতে পারে না—তিনি অপমানের অতীত। অনেক মুসলমান বলিয়াছেন, মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্যের নিষেধ কোরানের কোথাও নাই, এবং বিরুদ্ধ-বাদীদিগকে সেরূপ বচন উদ্ধৃত করিবার জন্য আহ্বান করিতে বলিয়াছেন। কেহ তাহা করিতে পারেন নাই। নামাজের সময় গীতবাদ্যে কাহারও নামাজে ব্যাঘাত হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক বা অজ্ঞাতসারে যে-ব্যাঘাত জন্মায় তাহাকে মারিতে গেলে ইহা প্রমাণ হয় না, যে, নামাজকারী ঈশ্বর-ভক্ত; কারণ প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তেরা মানব-প্রেমিক ও ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন।

বরিশালে উভয় সমাজের প্রতিনিধিরা যে-মীমাংসা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটের গীতবাদ্য-সহকৃত শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। আইন অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটের এই ক্ষমতা আছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত বহু স্থলে এই ক্ষমতার অপব্যবহার হইয়াছে এবং হিন্দুদের শোভাযাত্রার অধিকার অপহৃত হইয়াছে। তাহাতে নূতন করিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। ভবিষ্যতেও যখনই ম্যাজিষ্ট্রেট ভেদনীতির সমর্থক হইবেন, তখনই তিনি অনর্থ ঘটাইতে পারিবেন। সুতরাং বরিশালের মীমাংসা দ্বারা মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্যজনিত বিরোধের অবসান হইবে বলিয়া মনে করি না। তাহা কেবল ভ্রান্ত মতের বিনাশ এবং হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা সাধিত হইতে পারে।

তুরস্কে মসজিদের মধ্যে সংগীত

মুস্তাফা কমাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে শুধু যে অনেক আমূল রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা নহে;

সামাজিক পরিবর্ত্তনও অনেক হইয়াছে। যেমন, বহু বিবাহ লোপ, নারীদের অবরোধ-প্রথা লোপ, ইত্যাদি। তুর্কি ভাষা আরবী অক্ষরের পরিবর্ত্তে রোমান অক্ষরে লিখিত হইতেছে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহ্য প্রণালীতেও পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে। যেমন, মসজিদে উপাসনার সময় সংগীতের প্রচলন, আরবীর পরিবর্ত্তে তুর্কি ভাষায় প্রার্থনা ও উপদেশ।

স্বাধীন মুসলমান দেশগুলির মধ্যে তুরস্ক প্রধান। সেখানে আরবী অক্ষর পরিত্যক্ত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমানরা বলিতেছেন, আরবী অক্ষর ছাড়িয়া দিলে ইস্লামিক ধর্ম্ম ও সভ্যতাই লুপ্ত হইবে! তুরস্কে আরবী অক্ষরের পরিবর্ত্তে যে রোমান অক্ষর লইতেছে, তাহা তুরস্কজাত নহে, ইউরোপজাত; অথচ সুবিধাজনক বলিয়া তুর্করা তাহা লইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে-সব প্রদেশে নাগরী অক্ষর প্রচলিত, সেখানেও দেশজাত নাগরী অক্ষর ব্যবহারে মুসলমানদের বিষম আপত্তি। তুরস্কে মসজিদের **ভিতর** সংগীত-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে মসজিদের নিকটে ও বাহিরে সংগীত বন্ধ করিবার জন্য মুসলমানরা প্রাণ দিতে ও লইতে প্রস্তুত, প্রাণ দিয়াছেন ও লইয়াছেন! ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য ইহা বলা উচিত, যে, মসজিদের ভিতরে না হইলেও তাহার নিকটে ও সম্মুখে তাঁহারা মহরমের সময় ঢাক বাজাইয়া থাকেন। তাহাতে মসজিদ অপবিত্র হয় না, ইস্লামের অপমান হয় না এবং তাঁহাদের ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হন না।

—

বাঁকুড়ায় মসজিদের সম্মুখে সংগীত

খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, যে, বাঁকুড়ার মাচানতলায় মসজিদটির সম্মুখস্থ প্রশস্ত রাজপথ দিয়া হিন্দু সংকীর্ত্তনের দল যাওয়ায় হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ঘটিয়াছে, এবং তজ্জন্য সরকার পক্ষ হইতে মামুলী সতর্কতা অবলম্বন, পরোয়ানা জারী ইত্যাদি হইয়াছে। এই সব ঘটনার বৃত্তান্ত ইংরেজী 'মুসলমান' পত্রের একজন সংবাদদাতা ঐ কাগজে পাঠাইয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন, যে, বাঁকুড়ার মসজিদের সম্মুখ দিয়া সংকীর্ত্তনের দল লইয়া যাওয়া দীর্ঘকালস্থায়ী রীতির বিরুদ্ধ ("against the long-standing custom of the Bankura town")। আমার জন্ম ও নিবাস বাঁকুড়া, বয়স প্রায় ৬৪ বৎসর। আমি এরূপ কোন রীতির কথা কখনও শুনি নাই।

সংবাদদাতা এক স্থলে বলিতেছেন, যে, ঘটনাস্থলে দশ হইতে পনর হাজার হিন্দু একত্র হইয়াছিল। তাহার পর বলিতেছেন, যে, পনর হইতে বিশ হাজার ক্রুদ্ধ পুরুষ মানুষের একটা বিরাট সংকীর্ত্তনের দল মসজিদ ধ্বংস করিবার জন্য উহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পুনর্ব্বার তিনি লিখিয়াছেন, যে, স্থানীয় দোলতলা মন্দিরে কুড়ি হাজার হিন্দুর এক সভা হইয়াছিল।

দ্বারকেশ্বরের পরপারস্থিত বৃহৎ রাজগ্রাম নামক গ্রামটি বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত। উহা সহরের কেন্দ্র-স্থল হইতে কয়েক মাইল দূরে। সমগ্র মিউনিসিপালিটীর লোকসংখ্যা ২৫৪১২। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ২৩৮১৮। হিন্দু পুরুষের সংখ্যা ১২৫৮৪, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১২৩৪। সকলেই জানেন, আমাদের দেশের হিন্দু স্ত্রীলোকেরা নগর-কীর্ত্তন করেন না, দাঙ্গাহাঙ্গামা করা এবং হাজারে হাজারে প্রকাশ্য সভায় যোগ দেওয়াও তাহাদের অভ্যাস নাই। কোলের শিশু হইতে অথর্ব্ব বৃদ্ধ পর্য্যন্ত বাঁকুড়ার সব সুস্থ ও শয্যাশায়ী রুগ্ন হিন্দু পুরুষ মানুষ একত্র হইলেও তাহাদের মোট সংখ্যা হয় ১২৫৮৪। তাহা হইলে দশ পনর কুড়ি হাজার লোক কোথা হইতে আসিল? দোতলার মন্দিরে কুড়ি হাজার লোক একত্র হওয়া অসম্ভব। মন্দিরে ত এক হাজার লোকও কুলায় না, তাহার সংলগ্ন জায়গাতেও কুড়ি হাজার লোক ধরিতে পারে না।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংস্কৃত-অধ্যাপক

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক ও একজন ইস্লামিক সভ্যতার অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে কিরূপ লোক নিযুক্ত হওয়া উচিত, তাহার কিছু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। ইস্লামিক

সভ্যতার অধ্যাপকের পদ সম্বন্ধেও তাহা হওয়া চাই; কিন্তু তাহা করিবার অধিকার আমাদের নাই। সংস্কৃত অধ্যাপকতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার সামান্য অধিকার আমাদের আছে।

খুব ব্যাপক অর্থে যাঁহাদিগকে হিন্দু বলা হয়, তাঁহাদের সকলেরই বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রাচীন ভারতীয় জীবনের ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং তাহা হইতে বিবর্ত্তিত। বর্ত্তমানকে বুঝিতে হইলে এবং তাহার শ্রেষ্ঠ অংশকে সংরক্ষিত, বিকশিত ও বর্দ্ধিত করিতে হইলে অতীতের শ্রেষ্ঠ অংশকেও জানিতে বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমানে মন্দ যাহা, তাহা বর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও, তাহার মূল বা বনিয়াদ প্রাচীনের কিছুর মধ্যে আছে কি না, দেখিতে হইবে। অতএব, আমাদের অতীতকে জানা কেবল যে ইতিহাস-রচনার জন্য প্রয়োজন তাহা নহে, আমাদের সমগ্র সভ্যতার সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্যও আবশ্যক; তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্যও আবশ্যক। এই অতীতের সাক্ষ্য প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতিতে আছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আছে প্রাচীন সাহিত্যে। সুতরাং আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্য শব্দটি আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। পালি সাহিত্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ না করিলেও তাহার অনুশীলনও আমাদের অভিপ্রেত।

বাংলা দেশে বা ভারতের অন্যত্র যে-সব টোল আছে, তাহার কোথাও কোথাও সংস্কৃতের গভীর চর্চ্চা হয়, এবং তাহার কোন কোনটির কোন কোন অধ্যাপক ও ছাত্র সুপণ্ডিত। কিন্তু এই সকল শিক্ষালয়ে ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য, দর্শনাদির চর্চ্চা ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য, বা দর্শনাদির জন্যই হয়। একটি বা একাধিক বিষয়ের জ্ঞানের আলোকপাত অপর বিষয়গুলির উপর প্রায় হয় না, সকল বিষয়গুলির জ্ঞানের পরস্পরসাপেক্ষতা উপলব্ধ ও প্রদর্শিত হয় না, এবং সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি দ্বারা সমগ্র অতীতকে জানিবার, বুঝিবার, সমালোচনা করিবার, ও অতীতের গর্ভ হইতে রত্ন উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয় না। এইজন্য টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাবেক ধরণের সুপণ্ডিত কোন ব্যক্তিকেও "আশুতোষ" অধ্যাপক নিযুক্ত করা ঠিক হইবে না। কারণ এই অধ্যাপকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইবে, নিজের অধীত এবং জ্ঞানগোচর বিশেষ বিষয়ে গবেষণা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব কলেজে পাশ্চাত্য নানা বিদ্যার সহিত সংস্কৃতও অধীত হয়, তথায় ছাত্রেরা সংস্কৃতের যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা টোলের সাবেক পণ্ডিতদের জ্ঞানের মত গভীর হয় না, এবং ভারতবর্ষের অতীতকে জানিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্যের যেরূপ ব্যাপক জ্ঞানের আবশ্যক তেমন ব্যাপক জ্ঞানও কলেজের ছাত্রদের হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগেও সচরাচর সংস্কৃতের ঐরূপ অগভীর ও অব্যাপক জ্ঞানই লব্ধ হয়।

অতএব আশুতোষ অধ্যাপকের পদে যিনি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার সাবেক ধরণের টোলের পণ্ডিত হইলে চলিবে না, আবার কেবল আধুনিক ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস-করা ছাত্র হইলেও চলিবে না। প্রাচীন ধরণের পণ্ডিতদের গভীর সংস্কৃতজ্ঞান তাঁহার থাকা চাই, আবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ কোন কোন পণ্ডিতের মত তাঁহার ব্যাপক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিচারক্ষমতাও চাই। তাঁহার শুধু প্রাচীন ধরণের পণ্ডিত হইলে চলিবে না এই জন্য, যে, যাঁহারা কেবল বা প্রধানতঃ সংস্কৃতেরই চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান গভীর ও স্ব স্ব বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইলেও আধুনিক জগতের জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত নহে। অন্য দিকে আবার প্রাচীন ধরণের পাণ্ডিত্যও একান্ত প্রয়োজনীয়। জার্ম্যান সংস্কৃত-অধ্যাপক ডাক্তার টিব (Thibaut) এলাহাবাদের মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আমরা সাবেক ধরণের এদেশী পণ্ডিতদের সাহায্য না লইয়া কাজ করিতে পারি না।" অতএব এমন অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে, যিনি সংস্কৃত জানেন টোলের ভাল পণ্ডিতের মত এবং নিজের রচিত গ্রন্থাদি দ্বারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তিরও পরিচয় দিয়াছেন। তাহার কারণ বলিতেছি।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আবিষ্কার। এশিয়ার প্রায় সমগ্র ভূখণ্ডে ও দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতার

বিস্তার হইয়াছিল। জাপানের কোন কোন মঠে এমন সংস্কৃত বহি পাওয়া গিয়াছে, যাহা ভারতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিব্বতী ও চীন ভাষায় এমন সংস্কৃত বহির অনুবাদ আছে, যাহার মূল ভারতে এখন আর নাই। মধ্য এশিয়ায় বালুকাচ্ছন্ন ভূগর্ভপ্রোথিত বহু নগরে ও জনপদেও সংস্কৃত বা তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্যের এবং ভারতীয় শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মধ্য এশিয়ায় এমন আর্য্য ভাষার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাহা এখন পৃথিবী হইতে লয় পাইয়াছে। যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতিতে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের নিদর্শন রহিয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীনতম বর্ণমালা ভারতীয়। আনাম শ্যাম কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান। বর্ত্তমান ভারতের সীমার মধ্যে ও বাহিরে শিলালিপির উদ্ধার ও তাহার সাহায্যে প্রাচীন ভারতেতিহাসে আলোকপাতও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরে ভারতীয় অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও এই প্রকার বিবিধ কাজে সময় ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন।

ভাষাবিজ্ঞানেও সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান খুব কাজে লাগিয়াছে। কি প্রকারে ভাষাবিজ্ঞান সংস্কৃতের জ্ঞান দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে এবং ভাষা-বিজ্ঞানের আরও পুষ্টি সাধন করিতে হইলে অন্ততঃ দু একটি পাশ্চাত্য ভাষা জানা দরকার। ভারতবর্ষীয় দার্শনিক মূল গ্রন্থসমূহ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, এখন ইউরোপে নূতন বলিয়া বিবেচিত কোন কোন দার্শনিক বাদ বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। ইউরোপীয় দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাবও ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগে পড়িয়াছে। ভারতীয় জ্যোতিষের উপর বিদেশী জ্যোতিষের ছাপ আছে, আবার ভারতীয় গণিতের অন্ত কোন কোন শাখার নিকট বিদেশীরা ঋণী। বিজ্ঞানের কোন কোন শাখার উন্নতি প্রাচীন ভারতে কতক দূর হইয়া থামিয়া গিয়াছিল। প্রাচীন কালে এ বিষয়েও সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের সহিত অন্ত কোন কোন দেশের সংস্পর্শ ছিল। ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা-বিদ্যা আরবদেশীয়েরা শিখিয়া তাহা ইউরোপে বিস্তার করিয়াছিল। ভারতীয় চিকিৎসাবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থে দার্শনিক কোন কোন মতেরও আলোচনা আছে বলিয়া শুনিয়াছি। সংস্কৃত সাহিত্যের পঞ্চতন্ত্র-আদি গ্রন্থের গল্প নানা আকারে নানা দেশে ছড়াইয়াছে। ভারতীয় নাটক ও কাব্যের অন্ত কোন কোন শাখার সহিত বিদেশী নাট্যাদির সম্বন্ধও গবেষণার বিষয়।

এইরূপ বিবিধ বিষয়ের চর্চ্চা সংস্কৃতের সাহায্যে হইতে পারে। সমুদয় বিষয়েরই অনুশীলন ও তদ্বিষয়ক গবেষণা অবশ্য একটি মানুষের দ্বারা হইতে পারে না। কিন্তু কোন একটি বিষয় সম্বন্ধেও এরূপ কাজ করিতে হইলে এরূপ লোকের প্রয়োজন যাঁহার কোন কোন পাশ্চাত্য ভাষার জ্ঞান আছে, যিনি গতানুগতিকতার দাস নহেন, যিনি স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহার সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান গভীর, যাঁহার সংস্কৃতে অধ্যয়ন নানা বিদ্যাব্যাপী, এবং যিনি জানেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কি প্রণালীতে গবেষণা করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদির কাল নির্ণয় করেন, কেমন করিয়া প্রক্ষিপ্তের ও মূলের বিচার করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন বিদ্যার সকল শাখার পরস্পর সাহায্যে নানা অমূল্য সত্য আবিষ্কার ও তথ্য নিরূপণ করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন গ্রীস ও রোম, প্রাচীন চীন তিব্বত ও জাপান, প্রাচীন মিশর আসীরিয়া বাবিলোনিয়া পারস্য প্রভৃতির সভ্যতা দর্শন সাহিত্য ও শিল্পের সাহায্যে ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান উজ্জ্বলতর করেন, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনাদির তুলনা কেমন করিয়া করেন।

বাঙালী অধ্যাপকদের মধ্যেই এরূপ একাধিক লোক আছেন। নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা কেবল মাত্র যোগ্যতা অনুসারে তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন হইলে ভাল হয়।

—

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্তানুশীলন বৃত্তি

বেদান্ত দর্শনের উপর ন্যূনকল্পে বারটি বক্তৃতা করিবার জন্ত নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চারি হাজার টাকার শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্তানুশীলন বৃত্তি দিবেন। তদ্ভিন্ন বক্তৃতাগুলি ছাপিবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় আরও এক হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। বক্তৃতাগুলির

চুম্বকসহ ৩১শে আগষ্টের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে তিন মাস সময় থাকিতে। ছয় মাস সময় থাকিতে দিলে ভাল হইত। তাহা হইলে আবেদকদিগের বক্তৃতার চুম্বক প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট সময় থাকিত।

বক্তৃতাগুলি ইংরেজীতে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে করিতে হইবে। সভ্য জগতের দর্শনশাস্ত্রে বেদান্তের স্থান এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক মতসমূহের সহিত তুলনায় বেদান্তের মূল্য বক্তার বিশেষ আলোচনার বিষয় হওয়া চাই। বক্তার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমুদয় দর্শনের সহিত সম্যক্ পরিচয় থাকা চাই। বক্তার যোগ্যতা খুব উচ্চ রাখা হইয়াছে দেখিতেছি। এইরূপ যোগ্য লোক বাছিবার জন্যও বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। বিজ্ঞাপনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমুদয় দর্শনের সম্যক্ জ্ঞানের প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাচ্য দর্শন বলিতে শুধু ভারতীয় দর্শন বুঝায় না, আরব চীন ও জাপানের দর্শনও বুঝায়। ভারতীয় দর্শনও শুধু হিন্দু দর্শন নহে; বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও তাহার অন্তর্গত। এই সমুদয় দর্শনের জ্ঞান বেশী লোকের নাই। অল্প যে দু এক জনের হয়ত আছে, তাঁহারা এমন কমিটির দ্বারা নিজেদের যোগ্যতার বিচার চাহিতে না পারেন যাহার সভ্যদের যোগ্যতা এরূপ বিচারের জন্য যথেষ্ট নহে। এই জন্য নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইলে ভাল হইত। এরূপ নিয়ম করিলে হইত, যে, নির্ব্বাচক কমিটি এমন কোন কোন যোগ্য লোককেও বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন যাঁহারা দরখাস্ত করেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে দেখিলাম, ভারতবর্ষে উপযুক্ত লোক পাওয়া না গেলে দু বৎসরের টাকা একত্র করিয়া ভারতে ও বিদেশে দশ হাজার টাকা বৃত্তির বিজ্ঞাপন দিয়া বক্তা মনোনয়ন করিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি চারি হাজারের জায়গায় ছয় সাত আট নয় দশ হাজার টাকায় পাওয়া যায়, কেবলমাত্র সেইরূপ দেশী লোক পাইবার জন্যই বেশী টাকার ব্যবস্থা নাই কেন? বিদেশী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দক্ষিণা কার্য্যতঃ দেশী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আড়াই গুণ করায় দেশী দার্শনিকদের অকারণ অপমান করা হয় নাই কি? আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রায়ই এই অভিযোগ করি, যে, যেরূপ কাজ করিবার জন্য দেশী কর্ম্মচারীকে গবর্মেণ্ট যত টাকা বেতন দেন ইংরেজকে সেই কাজ করিবার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী বেতন দেন। কিন্তু শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বৃত্তি দেশী লোকের টাকায় দেশী লোকের ব্যবস্থা অনুসারে দেওয়া হয়। তাহাতে গাত্রচর্ম্মের রঙের প্রভেদ, জন্ম ও বাসের স্থানের প্রভেদ ও বংশের প্রভেদ অনুসারে পারিশ্রমিকের কার্য্যতঃ এত প্রভেদের কারণ কি? বেদান্ত বা অন্য কোন দর্শনে আমাদের অধিক বা অল্প কোন প্রকার পাণ্ডিত্য নাই; কিন্তু বিদ্যার নানা শাখায় বিদেশী ও দেশী যোগ্য অনেক লোকের নাম শুনিয়া থাকি। বেদান্তে দেশী পণ্ডিতদের চেয়ে গভীরতর জ্ঞানবান্ কোন বিদেশী পণ্ডিতের নাম মনে পড়িতেছে না।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার কে হইবেন, তাহা লইয়া খবরের কাগজে আলোচনা অনুমান গালাগালি চলিতেছে। আমরা তাহাতে যোগ দিতে অনিচ্ছুক। আলোচনায় লোকমত গঠিত হইতে পারে বটে। কিন্তু ভাইস্-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচন লোকমত অনুসারে হয় না, বঙ্গের লাট সাহেবের মর্জ্জি অনুসারে হয়। তিনি কতকটা চালিত হন তাঁহার পরামর্শদাতাদের মত অনুসারে।

বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার অনেক গালাগালি সহ্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি যদি আশুবাবুর দলের চাঁইদের ও তাঁহাদের অনুচর আশ্রিতদের অনিষ্টকর ক্ষমতা ও অন্যায় মুনফায় হাত না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজনের মত তিনিও গালাগালি হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। কিন্তু তিনি এক এক জন মানুষের একাধিক ফ্যাকল্টির সভ্য হওয়ার ও বহু যোগ্য লোককে বঞ্চিত করিয়া এক এক জনের বহু বিষয়ের পরীক্ষক হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করার বিরোধী হওয়ায় এবং এইরূপ অন্য নানা কারণে চাঁইদের অপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার পর আর যিনিই ভাইস্-চ্যান্সেলার হউন, তিনি ন্যায়পথে চলিতে গেলেই ভণ্ড স্বাধীনতাবাদীদের গালাগালি খাইবেন। ইহাও

নিশ্চিত, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-আইনের যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন না হইলে কোন ভাইস্-চ্যান্সেলারই বঙ্গে উচ্চ-শিক্ষার সম্যক্ উৎকর্ষসাধন করিতে পারিবেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম্মেও দলাদলির সৃষ্টি হওয়ায় এখানেও রাজনৈতিক চা'ল ও অল্পবুদ্ধিতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। যাঁহারা নিতান্ত দলাদলিপ্রিয়, তাঁহারা নিজের নিজের দলের লোকই চান। অন্য অনেক লোক নিরপেক্ষতার আশায় হিন্দু-মুসলমানকে অতিক্রম করিয়া বরং বিদেশী ভাইস্-চ্যান্সেলার চান, তবু বাঙালী চান না। আবার কতকটা সেইরূপ কারণে, নিরপেক্ষতার আশায় বা অন্য আশায় বি-প্রদেশী ভাইস্-চ্যান্সেলারও কেহ কেহ চান। বিদেশী ও বি-প্রদেশী কেহ নিরপেক্ষ হইতে পারেন না, এমন নয়। কিন্তু নিরপেক্ষতার আশায় ইংলণ্ডের লোকেরা কি কোন জার্ম্মান বা ইতালীয়কে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার করে? ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে দেশী রাজাদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রে নিরপেক্ষ ইংরেজ কেমন করিয়া দেশের প্রভু হইয়া বসিয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠকেরা জানেন। এখানে তার্কিক বলিবেন, সেটা হইল রাজনীতি আর বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ব্যাপার হইল বিদ্যা লইয়া। কিন্তু বিদ্যার ক্ষেত্রেও কি বাঙালীর বিদেশী বা বি-প্রদেশীর মুখাপেক্ষী ও প্রভুত্বা-ধীন হওয়া বাঞ্ছনীয়? বি-প্রদেশীর কর্ত্তৃত্বে বাঙালী যে সুবিধায় বঞ্চিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ বিজ্ঞান-কলেজে ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানা-নুশীলনার্থ ভারতসভার বর্ত্তমান অবস্থায় পাওয়া যায়।

অনেকে ঔদার্য্য বা ঔদার্য্যের ভাণ বশতঃ সমস্ত ভারত-বর্ষকে ও সমস্ত ভারতীয়কে সমান চক্ষে দেখেন বা দেখিবার ভাণ করেন। এ বিষয়ে আমাদের মনের ভাব কি, তাহা এককথায় বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের ব্যবহার ও বহুবর্ষব্যাপী নানাবিষয়ক মন্তব্যে তাহার পরিচয় ও প্রমাণ আছে। আমরা প্রকৃত বা তথাকথিত ঔদার্য্যবশতঃ বঙ্গের কোন কার্য্যক্ষেত্রেই বাঙালীর অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহি; সেই নীতিরও পক্ষপাতী নহি যাহার কুফলস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উচ্চতম অধ্যাপকের পদ নিক্রিয় বি প্রদেশীর হস্তগত হইয়াছে। কোন বিষয়ের অধ্যাপনার জন্য যোগ্য বাঙালী না পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই বি-প্রদেশী বা বিদেশী অধ্যাপক রাখা উচিত। কিন্তু আমরা জানি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোন উচ্চতম অধ্যাপকের কাজ করিবার জন্য দশ বার বৎসর আগেও বাঙালী পাওয়া যাইত, এখনও পাওয়া যায়। আর, কাজ না করিয়া টাকা লইবার বিস্তর লোক ত সব সময়েই সুপ্রাপ্য। এমন যদি হইত, যে, কোন কাজের জন্য বাঙালী পাওয়া যায় না, তাহা হইলে তখন অন্য লোক লইবার প্রয়োজন ঘটিত। কিন্তু অবস্থা সেরূপ নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যক্ষেত্রের এমন একটি দিক আছে, যাহা মনে রাখিলে, উদার নীতি বা সংকীর্ণ নীতির বিচার না করিয়াও যোগ্য বাঙালীদিগকেই উহার পরিচালক করা বাঞ্ছনীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজের দ্বারা স্থাপিত। এই জন্য প্রথম প্রথম ইহার প্রায় সমস্তটা ঝোঁক ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যার জ্ঞান বিস্তার ও জ্ঞান লাভের উপর। এখন অবশ্য ক্রমে ক্রমে আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যা শুধু পাশ্চাত্য না থাকিয়া সমুদয় পৃথিবীর বিদ্যা হইতেছে, এবং সকল জাতির লোক ইহার ভাণ্ডার পুষ্ট করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের পর, যাহা বিশেষ করিয়া ভারতীয় বিদ্যা, বিদ্যার সেই অংশের প্রতিও কিছু দৃষ্টি পড়িয়াছে। সর্ব্বশেষে বাংলার যাহা বিশেষত্ব, অর্থাৎ বঙ্গীয় ভাষা সাহিত্য শিল্প কাল্‌চ্যার, তাহার উপরও দৃষ্টি পড়িতেছে। বঙ্গের সম্বন্ধে গুণগ্রাহিতার সবে মাত্র সূত্রপাত হইয়াছে। বঙ্গের মানসিক শক্তির ফল ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ও বিস্তৃততর স্থান অধিকার করিবে। ইহার প্রথম অবস্থায় যেরূপ পরিচালকদের দ্বারা কাজ চলিত, দ্বিতীয় অবস্থায় ঠিক তাহাদের দ্বারা তাহা ভাল করিয়া চলিবার সম্ভাবনা ছিল না; প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় যাহাদের দ্বারা চলিত, তৃতীয় অবস্থায় তাহাদের দ্বারাও চলিবে না। অর্থাৎ, এখন এমন সব পরিচালক চাই, যাহারা আধুনিক সর্ব্ব-জাতীয় বিদ্যার গুণগ্রাহী ও উৎসাহদাতা, যাহারা ভারতীয় বিদ্যা ও কালচ্যারের গুণগ্রাহী ও উৎসাহদাতা, এবং বঙ্গীয় বিদ্যা ও কালচ্যারেরও গুণগ্রাহী ও উৎসাহদাতা।

সুতরাং এরূপ লোকের আবশ্যক যাঁহারা বিশ্ব ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা নহেন, এবং অন্যান্য দেশের মত বঙ্গেরও হৃদয়মনের চরম উৎকর্ষের ভিতর দিয়া জগতের ও ভারতবর্ষের চরম উন্নতি কামনা করেন। আমরা বঙ্গের সব কাজ—অন্ততঃ মননচিন্তনসাপেক্ষ সব কাজ—তাঁহাদের দ্বারাই হইতে দেখিতে চাই যাঁহাদের ভাগ্য বঙ্গের ভাগ্যের সহিত জড়িত এবং যাঁহারা বাংলাদেশকে ভাষা সাহিত্য শিল্প কালচ্যার—সব দিক দিয়া বুঝিতে ও ভালবাসিতে সচেষ্ট ও সমর্থ।

—

পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস

পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের অকাল মৃত্যুতে বিশেষ করিয়া উড়িষ্যার ক্ষতি ত হইয়াছেই, সমগ্রভারতবর্ষেরও ক্ষতি হইয়াছে। উড়িষ্যা এখন কয়েকটি প্রদেশের মধ্যে বিভক্ত হইয়া থাকায় উৎকলীয়েরা তাঁহাদের সমবেত শক্তি 'মাতৃ-ভূমির উন্নতির জন্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। পণ্ডিত গোপবন্ধু ইহা অনুভব করিতেন। সুশিক্ষার দ্বারা উৎকলের সেবা করিবার জন্য তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা প্রথমে চেষ্টা করেন। সেই জন্য তাঁহারা সত্যবাদী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার অধ্যাপনাদি তাঁহাদের নিজের আদর্শ অনুসারে সম্পাদিত হইত। পণ্ডিত গোপবন্ধু উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল; কিন্তু তিনি ধন লাভে মন না দিয়া নানা উপায়ে জনসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি দেশের সাধারণ দরিদ্র লোকদের মত জীবন যাপন করিতেন। মহাত্মা গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

—

অন্ধের বন্ধু লালবিহারী শাহ্

অন্ধেরা আমাদের দেশে সাধারণতঃ ভিক্ষা করিয়া অন্যের গলগ্রহ হইয়া প্রাণধারণ করে। অথচ তাহারা জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এবং কোন কোন পণ্যশিল্প শিখিয়া অন্য মানুষদের মত স্বাবলম্বী হইতে পারে। বাংলা দেশে স্বর্গীয় লালবিহারী শাহ্ প্রথমে ইহা উপলব্ধি করিয়া কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বহু বৎসর ইহা চালাইয়া তিনি অন্ধদের ও সমাজের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। বিস্তর ছাত্র ইহাতে শিক্ষা পাইয়া উপার্জ্জক হইয়াছে, এবং অন্য অনেক মানুষের মত জ্ঞানলাভ করিয়াছে।

—

মনস্বী শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরপাড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল সুশিক্ষক ও সুপণ্ডিত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নব্বই বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর তিন বৎসর আগে পর্য্যন্তও তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত শেষ প্রবন্ধ "Steps towards a World Federation" ১৯২৫ সালে মডার্‌ন্ রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি যাহা কিছু লিখিতেন, তাহাতে পৃথিবীর সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি নিজের বক্তব্য বেশ বিশদভাবে লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন শিক্ষাদান কার্য্যেই ব্যয়িত হওয়ায় ঘটনাবহুল ছিল না। তথাপি তাহা শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার সংক্ষিপ্ত স্বরচিত জীবনচরিত প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এখানে তাঁহার জীবনের কোন কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘজীবন হইতে এই একটি উপদেশ পাওয়া যায়, যে, অল্প বয়সে স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলেই যে মানুষ সব স্থলে স্বল্পায়ু হয়, তাহা নহে। তিনি একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, যে, এক সময়ে (তখন বোধ হয় তাঁহার বয়স ত্রিশ) তাঁহার স্বাস্থ্য এত খারাপ হইয়াছিল, যে, চিকিৎসকেরা তাঁহাকে বলিয়া-ছিলেন, যে, খুব সাবধানে থাকিলে তিনি কয়েক বৎসর বাঁচিতেও পারেন। তিনি সাবধানেই থাকিতেন। ফলে কয়েক বৎসরের পরিবর্ত্তে তাহার পর ষাট বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। শুধু জীবিত ছিলেন না, বরাবর জ্ঞানানুশীলনে

জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানবত্তা ও উন্নত চরিত্রের গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যাঁহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহারা অনেকে জানেন কিন্তু সকলে না জানিতে পারেন, যে, ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের ক্যাল্‌কাটা রিভিউ পত্রিকায়, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরেরও আগে, তিনি "কথিত ও লিখিত বাংলা" বিষয়ক প্রবন্ধে পুস্তক-রচনায় কথিত বাংলা ব্যবহারের সমর্থন করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথম পর্য্যায়ের সাবেক ক্যাল্‌কাটা রিভিউ পত্রিকায় ১৮৭৭ হইতে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত সাতটি প্রবন্ধ, মডার্‌ন্‌ রিভিউ পত্রিকায় বাইশটি প্রবন্ধ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

—

ভারতশাসনে ইংলণ্ডের অনিষ্ট

ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া ইংরেজরা ধনশালী হইয়াছে এবং তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে পদানত করিয়া শাসন করায় তাহাদের কি অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা সচরাচর আলোচিত হয় না। মডার্‌ন্‌ রিভিউ পত্রিকার গত মে সংখ্যায় আমেরিকার আচার্য্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ড একটি প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে তাহা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের মতের অসত্যতা প্রমাণ করিতে না পারিয়া কেবল ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ব্যাপারটির বৃত্তান্ত ৯ই জুলাই তারিখের ইংলিশম্যানে "Moral Effect of British Rule" শীর্ষক রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর বিলাতে ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত পেন্স্যানে পুষ্ট ইংরেজ সিবিলিয়ানরা একদিন একত্র খানা খাইয়া বক্তৃতাদি করেন। ইহাকে বলে ইণ্ডিয়া সিভিল সার্ভিস ডিনার। এ বৎসরের ডিনার লণ্ডনে গত জুন মাসে হয়। সভাপতি ছিলেন বিহারের ভূতপূর্ব্ব লাট স্যার হেনরী হুইলার, এবং বহুসংখ্যক তদ্বিধ স্যার উপস্থিত ছিলেন। স্যার হেনরী লর্ড রোনাল্ডশের খুব প্রশংসা করেন। সুতরাং প্রশংসিত ব্যক্তিও সিভিল সার্ভিসের খুব প্রশংসা করেন। লর্ড রোনাল্ডশে বক্তৃতা করিতে করিতে এই সব ভারতীয়-পেন্স্যানপুষ্ট সিভিলিয়ানদিগকে বলেন :—

In more normal times your service is not always as difficult as it proved to be during the recent time of political upheaval, but it is always of incalculable value to Great Britain and India This is a truism, but, as a cynic observes, even truisms are sometimes true. I repeat it because of the criticism to which British dominion in India is subjected at the present moment.

A typical example is to be seen in the May issue of the *Modern Review*, an important Indian periodical published in Calcutta, which has wide circulation, not only in India, but beyond its borders. The article is written by a Dr. Sunderland, whoever he may be, and his argument is that British rule in India is a source of grave moral injury not only to India herself but to Great Britain also. We are familiar enough with the argument that British rule in India is an injustice to India, but the argument that it is also an injustice to Great Britain is a somewhat novel one.—(Laughter)

অতঃপর বঙ্গের সাবেক লাট সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের প্রবন্ধ হইতে ভারতশাসক ইংরেজদের ভারতবর্ষে যে নৈতিক অবনতি হয় এবং তাহা যে ইংলণ্ডেও সংক্রামিত হয়, তদ্বিষয়ক কতকগুলি বাক্য পাঠ করেন। তাহাতে তাঁহার শ্রোতারা হাস্য করেন। ডাক্তার রাদারফোর্ডের আধুনিক ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে সাণ্ডাল্যাণ্ড সাহেব যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সাবেক বঙ্গলাট তাহা পড়াতেও তাঁহার শ্রোতারা হাস্য করেন। কিন্তু হাসিলেই সত্য কথা মিথ্যা হইয়া যায় না। সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেব আরো অনেক বিখ্যাত ইংরেজের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেগুলি লর্ড রোনাল্ডশে শ্রোতাদিগকে শুনান নাই।

—

লিলুয়ার ধর্ম্মঘট

লিলুয়ার রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট শেষ হইয়াছে। শ্রমিকরা আর বেকার অবস্থায় থাকিতে পারিল না। তাহাদের নিজের পুঁজি এবং অন্য লোকদের প্রদত্ত সাহায্য ফুরাইয়া যাওয়ায় তাহারা আর কাজ না করিয়া থাকিতে

পারিল না। ধর্ম্মঘটের অবসান হওয়ায় ইহা প্রমাণ হয় না, যে, দোষ শ্রমিকদেরই। তাহাদের অনেকে অত্যন্ত কম বেতন পায়, ইহা সত্য। তাহাদের বাসগৃহ মানুষের বাসের অযোগ্য, ইহাও সত্য। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অপেক্ষাকৃত বেশী বেতনের এবং সত্যসত্যই মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীদের জন্য বাসা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু গরীব শ্রমিকদের জন্য তাহা করিতে নারাজ।

শ্রমিকদের অভিযোগ যাহা ছিল, তাহা রহিয়া গেল। সুতরাং আবার ধর্ম্মঘট হইবার সম্ভাবনাও রহিল। এবার ধর্ম্মঘটীরা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে—বিশেষতঃ তাহাদের স্বদেশবাসী ধনী লোকদের নিকট হইতে—যথেষ্ট সাহায্য না পাওয়ায় পরাস্ত হইল। কিন্তু ভবিষ্যতে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইয়া আবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে।

—

সাইমন কমিশন ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশ সভ্যের মত অনুসারে সাত জন সভ্যের একটি কমিটি নির্ব্বাচনে রাজী হইয়াছে। ইহাকে বঙ্গের সহযোগিতা নাম দিয়া কোন কোন এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ বঙ্গের সহযোগিতা নহে। যদি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সমুদয় বা অধিকাংশ নির্ব্বাচিত সভ্য কমিটি গঠনের পক্ষে ভোট দিতেন, তাহা হইলে তাহাকে বরং কোন প্রকারে বঙ্গের সহযোগিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলিত—যদিও তাহাও বঙ্গের সহযোগিতা হইত না, কারণ ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবার যোগ্যতা এরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে, নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগকে সমুদয় বাঙালীর প্রতিনিধি বলা যায় না। যাহা হউক, এই প্রকারে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ও কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। অধিকাংশ মুসলমান সভ্য, সরকারী সভ্য এবং সরকারের মনোনীত বেসরকারী সভ্যদের ভোটের জোরে কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এরূপ ফলও যে কতকটা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে লাটসাহেবের তদ্বীরের প্রভাবে হইয়াছে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি কোনও সভ্যকে কমিটি গঠনের পক্ষে ভোট দিতে না বলিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে এবিষয়ে কথোপকথনের জন্য কাহাকেও কাহাকেও ডাকিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। অথচ এবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত থাকাই উচিত ছিল।

নির্ব্বাচিত মুসলমান সভ্যদের অধিকাংশ প্রস্তাবটার পক্ষে ভোট দেওয়ায় স্বরাজ্যদলের চুক্তি অপেক্ষা প্রলোভন ও ভয় যে প্রবলতর, তাহা আর একবার প্রমাণিত হইল।

কমিটি গঠন করায় কোন লাভ হইবে না, গঠন না করিলে কোন ক্ষতি হইত না। সাইমন কমিশনের যাহা করিবার তাহা স্থির আছে, মূলতঃ তাহাই শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে; অবান্তর ছোটখাট বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

সাইমন কমিশন সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা আগে আগে বলিয়াছি। সকল জাতিরই আত্মশাসনের অধিকার আছে। কোন জাতির আত্মশাসনের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার অধিকার অন্য কোন জাতির নাই। কোন জাতিকে আত্মশাসনের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া যে জাতি লাভবান হইয়াছে ও হইতেছে, বিশেষ করিয়া সেই জাতির লাভবান্ লোকেরা পক্ষপাতশূন্য পরীক্ষক হইতে পারে না।

সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করাটাই আমরা অপমানের বিষয় মনে করি—তাহাতে লাভ হইবে বা লোকসান হইবে, তাহা বিবেচনা করা অনাবশ্যক মনে করি। পরাধীনতা চূড়ান্ত অপমান, জানি; কিন্তু তাহা সহ্য করিতে হইতেছে বলিয়া ক্ষুদ্রতর অতিরিক্ত নূতন অপমানের বোঝা বাড়াইয়া চলিতে রাজী নহি। যেরূপ মনোভাব হইতে আমাদের এই প্রকার অকেজো কথা বাহির হয়, তাহাকে কেজো লোকেরা স্বপ্নবিলাসিতা বলিতে পারেন। তাহাতে আপত্তি করিতেছি না।

—

কৃষি-কমিশন

কৃষি-কমিশনের বৃহৎ রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহা আমরা পাই নাই, এখনও কিনিও নাই। কাগজে তাহার যে সার মর্ম্ম বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম, কৃষকরা পৃথিবীকে ও জীবনকে যে চোখে দেখে, সেই দেখার প্রকারটাকেই বদলাইয়া নূতন রকম করিয়া দেখার একান্ত প্রয়োজনীয়তা কমিশন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নূতন রকম করিয়া দেখার ফলে কৃষকরা আশাশীল হইলে অবশ্য সুফল হইতে পারে। কিন্তু দেখার প্রকারটা নূতন করিতে হইলে চাষীদের বুঝা চাই, যে, তাহাদের পরিশ্রমের ফল তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিতে পাইবে। কিন্তু তাহা তাহাদিগকে বুঝাইতে হইলে, হয় বুঝাইতে হইবে যে বর্ত্তমানে জমীর খাজনার বন্দোবস্ত সর্ব্বত্র ন্যায্য, কিংবা বুঝাইতে হইবে যে যেখানে যেখানে উহা ন্যায়সঙ্গত নহে সেখানে উহা পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু জমীর খাজনা বিষয়ক বন্দোবস্ত কমিশনের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়ই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর ও জীবনের প্রতি কৃষকদের মনের ভাব বদলাইতে হইলে তাহাদের এবং তাহাদের পরিবারভুক্ত নারীদের শিক্ষার প্রয়োজন। কমিশন স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের অবশ্যকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা করিবার জন্য যদি গবর্মেণ্ট নূতন ট্যাক্স বসাইতে চান, তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইবে। অন্য দিকে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া, নূতন ট্যাক্স না বসাইয়া, যদি গবর্মেণ্ট সকল বালকবালিকার অবৈতনিক শিক্ষাদান অবশ্যকর্ত্তব্য করিতে পারেন এবং নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক সমুদয় নরনারীর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব ইংরেজ শাসকেরা সত্যসত্যই কৃষকদের হিতৈষী।

কৃষিকমিশনের সুপারিসের মধ্যে নানা দৃষ্টিবিভ্রমজনক প্রস্তাব আছে। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য এক বৃহৎ কৃষি-কৌন্সিল স্থাপনের প্রস্তাব তাহার মধ্যে একটি। ইহা খুব ব্যয়সাধ্য এবং ইহাতে মোটা বেতনে ইংরেজ পোষণের সুবিধা হইবে। এইরূপ প্রস্তাব আরও আছে। ইংলণ্ডীয় কৃষি-পণ্ডিত পোষণ, ইংলণ্ডীয় কৃষিযন্ত্র খরিদ প্রভৃতিও কমিশনের সুপারিসের ফলে ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কৃষকশ্রেণীর লোকদের, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের, অবৈতনিক শিক্ষার কি বন্দোবস্ত হয় দেখিতে চাই। জমীর খাজনার বন্দোবস্তও কিরূপ হয়, দেখিতে চাই।

বেলুড়ের নিকট রেলওয়ে দুর্ঘটনা

সম্প্রতি বেলুড়ের নিকট যে ভীষণ রেলওয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সাতিশয় শোচনীয়। কুড়িজন লোক মারা গিয়াছে বলিয়া খবর বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে,যে, মৃতের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

দুর্ঘটনাটি কেমন করিয়া ঘটিল সেবিষয়ে অনুমানভেদ আছে। রেলের কর্ত্তারা, এংলোইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালারা, ইংরেজেরা এবং কতক দেশী লোক মনে করেন, যে, ধর্ম্মঘটীদের মধ্যে কেহ কেহ একটি রেল তুলিয়া ফেলায় ও অন্য একটি বাঁকাইয়া দেওয়ায় ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়া জলে পড়িয়া যায়। দুর্বৃত্ত কোন কোন ধর্ম্মঘটী বা অন্য লোকের পক্ষে এই ভীষণ অপকর্ম্ম করা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু ধর্ম্মঘটীদের সকলের বা অধিকাংশের চক্রান্তের ফলে এইরূপ কাজ হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে। কোন মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক রেল সরাইয়া দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে, বিশ্বাস করিবার পক্ষে বাধাও আছে। ধর্ম্মঘটীদের কেহ ইহা করিবার ইচ্ছা করিলে; যখন বামুনগাছীতে গুলি নিক্ষেপের ফলে তাহারা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত ছিল তখন, বা অন্য কোন সময়ে যখন ধর্ম্মঘট প্রবল ছিল তখন, এই কাজ না করিয়া ধর্ম্মঘট শেষ হইবার প্রাক্‌কালে তাহাদের কেহ এমন দুর্বৃত্ততা ও নির্বুদ্ধিতার কাজ কেন করিবে? অবশ্য মানবমনের গতি বিচিত্র। মানুষ এমন অনেক কাজ করে, যাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। আর একটা সন্দেহ এই, যে, যে ট্রেনটি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার দুই দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নে দুটি ট্রেন ঐ লাইন দিয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন, দেড় ঘণ্টার মধ্যে রেল সরানর কাজ হয় না; অন্য অনেকে মনে করেন, হয়।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা মনে করেন বর্ষার লাইন খারাপ হওয়ায় ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে দুই দেড় ঘণ্টা আগে দুটা ট্রেন যাওয়া পর্য্যন্ত বর্ষায় লাইন খারাপ হয় নাই, তাহার পর খারাপ হইয়াছে। ইহা সম্ভব ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না। যদি বর্ষায় লাইন খারাপ হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য রেলের কর্ম্মচারীদের ও কর্ত্তৃপক্ষের দোষ আছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন কোন ধর্ম্মঘটীর দুর্ব্বৃত্ততায় দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিলেও রেলের কর্ত্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলা যায় না। এত মাস ধরিয়া এতগুলি লোককে ক্ষুধিত ও উত্তেজিত যাহারা রাখে, উত্তেজনার কোন কুফলের জন্য যে তাহারা একটুও দোষী নয়, কেমন করিয়া বলিব?

আলোচ্য দুর্ঘটনাটার কারণ যাহাই হউক, অন্য অনেক দুর্ঘটনা রেলের কর্ম্মচারী ও কর্ত্তৃপক্ষের অসাবধানতা, অবহেলা, অব্যবস্থা কুব্যবস্থায় ঘটিয়া থাকে। যদি কুফলের জন্য শীর্ষস্থানীয় লোকদের প্রাণহানি বা অঙ্গহানি ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অধিকতর সাবধানতা অবলম্বিত হইত। একবার বিলাতী ব্যঙ্গ-পত্র পাঞ্চে একটি ছবির দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছিল, যে, রেলওয়ে ট্রেনের সংঘাতাদি দুর্ঘটনা নিবারণের একটি উপায় রেল কোম্পানীর কোন-না-কোন ডিরেক্টরকে এঞ্জিনের সাম্‌নে একটি ছোট গাড়ীতে চেয়ারে বসাইয়া রাখা। ইহা তামাসা হইলেও ইহার মধ্যে এইটুকু সত্য আছে, যে, ট্রেন-দুর্ঘটনায় যাহাদের প্রাণ গেলে রেল কর্ত্তৃপক্ষকে খুব বেশী জবাবদিহি হইতে হয়, এমন সব লোককে এঞ্জিনের পরবর্ত্তী গাড়ীগুলিতে জায়গা দিলে কর্ত্তৃপক্ষ যথাসাধ্য সাবধান হন ও সুব্যবস্থা করেন। এই জন্য আমরা প্রবাসীতে আগে লিখিয়াছিলাম, যে, পর্য্যায়ক্রমে এক দিন এঞ্জিনের পরেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী এবং পর দিন তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর গাড়ী দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে সর্ব্বদাই সকল যাত্রীবাহী ট্রেনে এঞ্জিনের পরেই তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর গাড়ী থাকে। তাহাতে রেলওয়ে দুর্ঘটনায় সর্ব্বদাই প্রধানতঃ ঐ দুই শ্রেণীর যাত্রীই মারা পড়ে। তাহাদের মৃত্যু কর্ত্তৃপক্ষ উপেক্ষা করেন, তাহাদের আত্মীয়রাও মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। এরূপ না হইয়া অনেক ইংরেজ মারা পড়িলে কর্ত্তৃপক্ষ সুবন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতেন।

—

বঙ্গের জমিদার ও বঙ্গের হিত

আমরা বারবার দেখাইয়াছি, যে, বাংলা দেশের লোকসংখ্যা যেরূপ বেশী এবং বাংলা দেশ হইতে যত রাজস্ব আদায় হয়, তাহার তুলনায় বাংলা গবর্মেণ্ট খরচের জন্য খুব কম টাকা পান। বঙ্গের স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি, কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতির জন্য যে যথেষ্ট সরকারী টাকা খরচ হয় না, বাংলা গবর্মেণ্টের আপেক্ষিক দারিদ্র্য তাহার একটি কারণ।

বাংলা গবর্মেণ্ট কেন এত কম টাকা পান, তাহার কারণ, অনেক অবাঙালী ও কোন কোন বাঙালী বলেন, জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বশতঃ বাংলা দেশ হইতে জমীর খাজনা আদায় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম হয়। জমীর খাজনা প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের পাওনা; সুতরাং কোথাও ঐ খাজনার পরিমাণ কম হইলে তথাকার গবর্মেণ্টের দারিদ্র্য অনিবার্য্য। উত্তরে একথা বারবার বলা হইয়াছে, যে, অন্য রকম রাজস্ব বাংলা দেশে খুব বেশী আদায় হয়; তাহার যথেষ্ট ও ন্যায্য অংশ কেন বাংলাদেশকে দেওয়া হয় না? বঙ্গের বর্ত্তমান ও আগেকার কোন কোন লাটসাহেবও বলিয়াছেন, যে, বাংলা দেশকে আরও বেশী টাকা দেওয়া উচিত; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

এ অবস্থায়, অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লিখিত কারণসমবায়েও, বঙ্গে জমীর রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে একটা প্রবল আন্দোলন হওয়া অসম্ভব নয়। দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সব ধনী লোকদেরই আছে। জমিদারদেরও আছে। তাঁহারা যদি খুব বেশী করিয়া সেই সব দেশহিতকর কাজে অর্থব্যয় করেন, যাহা সরকারী অর্থের অল্পতা বশতঃ ভাল করিয়া হয় না, তাহা হইলে

জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল না হইতে পারে।

—

বঙ্গের দুর্ভিক্ষ ও গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য

ব্যবস্থাপক সভায় বাঁকুড়ার সভ্য শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের দুর্ভিক্ষসম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় বাংলা গবর্মেণ্ট নিন্দিত হইয়াছেন। খবরের কাগজে যত কথা বাহির হয়, তাহাতে মধ্যে মধ্যে অত্যুক্তি ও অমূলক সংবাদ থাকিলেও, মোটের উপর ইহা সত্য, যে, বঙ্গের আট নয়টি জেলায় ভীষণ অন্নাভাব ঘটিয়াছে—তাহাকে দুর্ভিক্ষ বলিতে না চান না বলুন—এবং নিরন্ন লোকদের দুঃখ ও অকালমৃত্যু নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট যথাসময়ে যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন নাই। এখন যদি করেন, তাহা হইলেও অনেকের উপকার হইবে ও প্রাণ বাঁচিবে।

গত মাসের কাগজে দুর্ভিক্ষ ও স্বরাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে শাসনপদ্ধতির সহিত দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের যুক্তি ও মন্তব্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের জন্য ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ও শাসকসম্প্রদায়কে অন্ততঃ আংশিক ভাবে দায়ী না করিয়া থাকা যায় না। সুতরাং আমলাতন্ত্রকে নিরন্ন লোকদের আপাত অভাবমোচন ত করিতেই হইবে, অধিকন্তু স্থায়ী প্রতীকারের চেষ্টাও করিতে হইবে।

এ বিষয়ে দেশের লোকদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহাও কেহ অস্বীকার করে না। সেই কর্ত্তব্য পালন করিবার চেষ্টা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অনেক লোক করিতেছেন।

—

নিরন্ন লোকদের সাহায্যের কাজ।

অন্নাভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা নানা স্থানে হইতেছে। কর্ম্মীরা দৈনিক কাগজসমূহে আপনাদের আবেদন ও কাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিতেছেন। সেইজন্য মাসিক কাগজে তৎসমুদয় মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন নাই; স্থানও কম। বীরভূমের সুরুল হইতে কয়েকবার আবেদন ও কার্য্যবিবরণ পাইয়াছি। শান্তিনিকেতন কেন্দ্রে সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—রায় সাহেব অধ্যাপক জগদানন্দ রায়, ডাকঘর শান্তিনিকেতন, জেলা বীরভূম। যাঁহারা বাঁকুড়া জেলায় বাঁকুড়াসম্মিলনীর কার্য্যে সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা প্রবাসীর সম্পাদকের নামে টাকাকড়ি পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

—

বিশ্বভারতী

আমরা সম্প্রতি শান্তিনিকেতন গিয়াছিলাম। গ্রীষ্মাবকাশের পর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আসিয়াছে, আরও আসিতেছে। গ্রন্থাগারে অনেক নূতন বহি আসিয়াছে। অনেকে বিনামূল্যে হিন্দী বহি উপহার পাঠাইতেছেন। বিলাতে আইন অনুসারে কয়েকটি বড় লাইব্রেরীতে প্রত্যেক মুদ্রিত বহি একখানি করিয়া পাঠাইতে হয়। বঙ্গের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ যদি নিজেদের উপর অলিখিত আইন জারী করিয়া তাঁহাদের এক একখানি বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত বহি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তাহা সুরক্ষিত ও পঠিত হইবে। এখন লাইব্রেরীগৃহের কেবল নীচের তলায় পুস্তক রাখা হয়। উপরের তলায় কলাভবন অবস্থিত। কিন্তু কলাভবনের নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হইবে। তখন লাইব্রেরীভবনের সমস্ত স্থান পুস্তক রাখিবার জন্য পাওয়া যাইবে।

কলাভবনের শিক্ষালয়, গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ম এবং ছাত্রদের থাকিবার জায়গা একই জায়গায় কিন্তু আলাদা আলাদা নির্ম্মিত হইতেছে। কলাভবনে আগে আগে প্রধানতঃ ছবি আঁকিতে শিখান হইত; কিছুদিন হইতে মূর্ত্তিগঠনও শিখান হইতেছে। তাহাতে কাহারও কাহারও বেশ দক্ষতা দেখা যাইতেছে।

পিয়ার্সন হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী ও নূতন ডাকঘর নির্ম্মিত হইতেছে।

ছাত্রীরা এখন যে বাড়ীতে থাকে, তাহা উৎকৃষ্ট এবং তাহার প্রশস্ত খেলিবার জায়গাও আছে। তাহাদের জন্য নূতন উৎকৃষ্টতর বাড়ী প্রস্তুত হইবে। তাহা হইয়া গেলে

বর্ত্তমান ছাত্রীনিবাস অধিকবয়স্ক ছাত্রদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে শুনিলাম।

—

লর্ড রলিন্সনের মনের কথা

সেনাপতি লর্ড রলিন্সনের জীবনচরিত হইতে মান্দ্রাজের নিউ ইণ্ডিয়া তাঁহার অনেকগুলি মত ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেনাপতির অনেক মত আমরা সত্য মনে করি না, কিন্তু তিনি কিছু কিছু সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। দু একটি এখানে মুদ্রিত করিব।

অনেক বৎসর হইতে এই আন্দোলন হইতেছিল, যে, ভারতীয় সৈন্যদলে সম্রাটের নিয়োগপত্র (commission) দিয়া ভারতীয় নেতৃকর্ম্মচারী নিযুক্ত করা উচিত। তাহার ফলে অল্পসংখ্যক ভারতীয় লোককে ঐরূপ পদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে আলাদা এরূপ কয়েকটি সিপাহীদলে চাকরী দেওয়া হইয়াছে, যেখানে ঐরূপ ইংরেজ নেতৃকর্ম্মচারী কেহ নাই। এরূপ করিবার নানা বাজে কারণ আমলাতন্ত্র দ্বারা ব্যক্ত হয়, কিন্তু আসল কারণ যাহা তাহা ভারতীয়েরা সহজেই ধরিতে পারিয়াছিল। ভারতীয় কর্ম্মচারীর অধীনে যাহাতে ইংরেজ কোন কর্ম্মচারীকে কাজ করিতে না হয়, তাহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। লর্ড রলিন্সনের পুস্তকে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। সৈন্যদলের ভারতীয়তাপাদন সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তিনি বলেন—

To my mind the only solution is to begin by making some cavalry and infantry regiments wholly Indian. This will avoid the difficulty of making white officers serve under Indian officers, and will enable us to test the effect of the change.

দেশহিতের জন্য একান্ত আবশ্যক কোনপ্রকার ব্যবস্থার নিমিত্ত (যেমন দেশব্যাপী অবশ্যকর্ত্তব্য অবৈতনিক শিক্ষাদান ব্যবস্থার জন্য) টাকা খরচ করিতে বলিলেই ইংরেজ শাসকরা বলেন, রাজকোষে অর্থ নাই; কিন্তু তাঁহাদের পাওনা বাড়াইবার জন্য, ভারতবর্ষকে পদানত রাখিবার জন্য, ভারতবর্ষরূপ ব্রিটিশ জমিদারী অপরের অভিসন্ধি হইতে নিরাপদ রাখার জন্য, টাকার অভাব কখন হয় না। বস্তুতঃ ভারতগবর্ণ্মেণ্ট এইরূপ নানাদিকে অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। লর্ড রলিন্সন তাহাই বলিয়াছেন। যথা—

"After two years' experience of Indian Government, I have come to the conclusion that it is one of the most uneconomical in the world to-day. In general method and in detail it is out of date. The state and display which the Moguls introduced into India on a lavish scale, two hundred and odd years ago, still surrounds the Viceroy, the Governors of provinces, and the Indian states. Some degree of pomp and ceremony is, of course, necessary in any state, and particularly in the East. Still, I cannot help thinking that Curzon dreamed too much of 'the Courts where Jamshyd gloried and drank deep.' Large sums are spent annually, all over India, upon regal splendour in the form of bodyguards, red chaprassis, entertainments, huge palaces, etc., which, whatever effect they may have had upon the Indian of the past, do not impress the politically-minded Indian to-day. I ask myself whether there is any real need to maintain all these relics of past grandeur.

"Then, we are spending huge sums on the construction of New Delhi, at a time when it may quite possibly be necessary to issue paper money in order to meet ways and means of expenditure, a change which would impress the Indians more than all our state. When I come away from meetings of Council after fighting for a little money to provide for India's security and I pass the huge palace, which is being built for the Viceroy, I am tempted to curse and swear.

—

বাল্যবিবাহনিষেধক আইন

রায়সাহেব হরবিলাস সরদা প্রণীত বাল্যবিবাহ-নিষেধক আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হওয়ার পর মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মহিলারা প্রকাশ্য সভা করিয়া ঐরূপ আইনের সমর্থন করিয়াছেন। ঠিক্ নাম মনে নাই, কিন্তু আরও কোন কোন জায়গায় ঐরূপ মহিলাসভা হইয়াছে। বঙ্গের মহিলারা কিন্তু এ পর্য্যন্ত নীরব।

ইহা লিখিত হইবার পর শুনিলাম ১লা শ্রাবণ এই বিষয়টির আলোচনার জন্য কলিকাতায় তাঁহাদের একটি সভা হইবে। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মহিলাদেরও

সভা করিয়া বাল্য বিবাহ ও বাল্যমাতৃত্বের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

—

বিহারে পর্দাপ্রথার লোপ চেষ্টা

বিহারের হিন্দু পুরুষ ও নারীরা নারীদের অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

অনেক জিনিষের আরম্ভ হয় বাংলা দেশে, কিন্তু পরে কাজ হয় অন্তত্র। যেমন, বিধবাবিবাহবিষয়ক আন্দোলন আরম্ভ করেন ও প্রথমে বিধবার বিবাহ দেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। কিন্তু বঙ্গে এই কাজ খড়ের আগুনের মত নিবিয়া গিয়াছিল। এখন আবার চেষ্টা ও কাজ চলিতেছে। ভারতবর্ষের যে-সব প্রদেশে পর্দ্দা আছে, তন্মধ্যে বঙ্গে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা উহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। নিজেদের মধ্যে তাঁহারা উহা উঠাইয়া দিয়াছেন। অন্ত কোন কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যেও উহা কমিয়াছে। বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান; ইহাতে বড় সহর খুব কম। বঙ্গে গ্রামসকলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যে পর্দ্দা বেশী নাই, আগেও ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের পর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে এবং তাহার পরে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে অবরোধপ্রথা আরও শিথিল হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি না করিয়া পর্দ্দা তুলিয়া দিলে তাহাতে সুফল হইবে না। ইহাতে সত্য আছে। কিন্তু পর্দ্দা তুলিয়া না দিলেও আবার স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি হইবে না। বঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয় সমূহের একটা প্রধান ব্যয় গাড়ী রাখিবার বা ভাড়া করিবার খরচ। তদ্ভিন্ন, ইহাও বিবেচ্য, যে, শিক্ষার মানে শুধু বই পড়া ও মুখস্থ করা নহে। নিজের নিজের চোখ কান প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানা শিক্ষার প্রধান উপায়। পর্দ্দা থাকিতে নারীদের এই প্রত্যক্ষজ্ঞানলব্ধ শিক্ষা অসম্ভব।

শিক্ষা না দিয়া পর্দ্দা তুলিয়া দেওয়ায় যে সব স্থলে বিপদ ঘটিবেই, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের নিরক্ষর স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময় বাহিরে পরিশ্রম করিয়া রোজগার করিতে হয়। তাহাতে সচরাচর তাহাদের সকলের বা অধিকাংশের চরিত্রভ্রংশই ঘটে, বলা যায় না। যে-সব স্থলে তাহা ঘটে, তাহার জন্য দুশ্চরিত্র পুরুষেরা প্রধানতঃ দায়ী। এই কারণে, স্ত্রীস্বাধীনতাকে নিরাপদ করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীচরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদন আবশ্যক বটে, কিন্তু পুরুষদের সুশিক্ষা ও তাহাদের চারিত্রিক উন্নতি আরও বেশী দরকার। আবার, নারীচরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদনের ও পুরুষদের চারিত্রিক উন্নতির একটি উপায় অবরোধপ্রথা লোপ। অর্থাৎ শিক্ষার জন্ত অবরোধপ্রথা বিনষ্ট করিতে হইবে, অবরোধপ্রথা বিনষ্ট করিবার জন্ত শিক্ষা দিতে হইবে।

—

বাঢ়ে সতীদেহ

বিহারে বাঢ়ে একটি ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করেন। এই কার্য্যে যাহারা তাঁহার সহায় হইয়াছিল, পাটনা হাইকোর্টের বিচারে তাহাদের শাস্তি হইয়াছে। যাহারা কোন প্রকার আত্মহত্যার সাহায্য করে, তাহাদের শাস্তি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

স্বামীর মৃত্যু হইলে পতিপ্রাণা সতীর আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না, ইহা সত্য কথা। কিন্তু পতির চিতায় আপনাকে দগ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা আদর্শ নহে। ইহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর; হিতকর নহে। প্রাপ্তবয়স্কা সন্তানবতী বিধবা নারী পবিত্রস্বভাবা হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া পরিবারবর্গের ও জনসাধারণের হিতসাধন করিলে উচ্চতম আদর্শের অনুসরণ করা যায়। বালবিধবাদের বিবাহ বাঞ্ছনীয়।

দৈহিক বলপ্রয়োগ, লোকমতের চাপ, আত্মীয়-স্বজনের প্ররোচনা প্রভৃতি কারণে যে অনুমরণ ও সতীদাহ ঘটে, তাহা ত সর্ব্বথা নিন্দনীয় বটেই, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় অনুমরণও ভাল নয়।

স্বামীর চিতায় স্ত্রীর দাহ, স্বামীর সমাধিতে স্ত্রীর সমাধি অসভ্য যুগে সকল মহাদেশেই প্রচলিত ছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের নিজের কোন "গৌরব" নাই, অগৌরবও ভারতবর্ষের একচেটিয়া নহে। কিন্তু এই কলঙ্ক ভারতের

নিজস্ব, যে, এই প্রথাকে ধর্ম্মের আসন দেওয়া হইয়াছিল, এবং ইহা ভারতবর্ষের সভ্য যুগেও প্রচলিত ছিল।

—

"শনিবারের চিঠি"

মুখে মুখে এবং কোন কোন সংবাদপত্রে ও বক্তৃতায় ইহা বার বার বলা হইয়াছে, যে "শনিবারের চিঠি" আমার কাগজ। ইহা যে মিথ্যা, তাহা "শনিবারের চিঠি"তেই লেখা হইয়াছে। আমাকে কোন কোন বন্ধু মৌখিক ও চিঠি দ্বারা জিজ্ঞাসা করায় আমিও তাহা বলিয়াছি। কিন্তু তথাপি এই অমূলক কথাটির পুনরুক্তি হওয়ায় আমাকে লিখিতে হইতেছে, যে, ঐ কাগজটির প্রতিষ্ঠাতা বা সম্পাদক আমি নহি, পরিচালকবর্গের একজন আমি নহি, স্বত্বাধিকারী আমি নহি, অন্যতম অংশীদার আমি নহি, পরামর্শদাতা আমি নহি—এক কথায়, উহার উপর আমার কোন হাত নাই এবং কোন কালে ছিল না। ঐ কাগজটির সহিত ব্রাহ্মসমাজেরও কোনই সম্পর্ক নাই। ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য আমি ইহা লিখিতেছি। কাগজখানির সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিবার আমার প্রয়োজন নাই। আমি কোন মাসিকেরই সমালোচনা করি না।

—

চিদাম্বরম্ বিশ্ববিদ্যালয়

মান্দ্রাজের চিদাম্বরম সহরে স্যার্ অন্নমালাই চেট্টির প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মীনাক্ষি কলেজ ও বিদ্যালয় আছে। তিনি ঐ বিদ্যামন্দির ও তাহার সম্পত্তি এবং তাহার উপর আরও কুড়ি লক্ষ টাকা দিয়া চিদাম্বরম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গবর্ন্মেন্টের নিকট উপস্থিত করেন। মান্দ্রাজ গবর্ন্মেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। ঐ গবর্ন্মেণ্ট এককালীন কুড়ি লক্ষ টাকা দান করিবেন, ইমারৎ ও সাজসরঞ্জামের জন্য সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দিবেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চলিত ব্যয় বাবতে বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা দিবেন।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় না, এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেরূপ কিছু উত্তম রূপে শিক্ষা দিলে ফল ভাল হইবে।

পুরাতন কথার নূতন আবিষ্কার

কাগজে দেখিলাম, কংগ্রেসের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁহার অল্পকাল-ব্যাপী বিলাতপ্রবাসের ফলে বলিয়াছেন, যে, ভারতীয়েরা স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদেশীদের উপর নির্ভর করিলে নিরাশ হইবেন, তাঁহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে; বিলাতের সব রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একমত, তাহারা সবাই সাম্রাজ্যোপাসক ও ভারতবর্ষকে পদানত রাখিতে ও শোষণ করিতে চায়; বিলাতী শ্রমিক দলের নেতাদেরও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষার সহিত সহানুভূতি নাই, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট শ্রমিকদেরও নাই। আয়েঙ্গার মহাশয়ের এই কথাগুলি আমাদের নূতন মনে হইতেছে না। এরূপ কথা আগে অনেকে বলিয়াছেন, আমরাও বলিয়াছি। কিন্তু আয়েঙ্গার মহাশয় আর একটি কথা বলিয়াছেন, যাহা আমাদের তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা না থাকায় আমরা কখন বলি নাই ও ভাবি নাই। তাহা এই। তিনি বলিতেছেন, ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ নহেন; সুতরাং তাঁহারা এই দেশ সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিতে পারিলেই ইহাকে স্বরাজ দিবেন এরূপ মনে করা ভুল; তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, আমাদের দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞতাপ্রকাশ ভণ্ডামি মাত্র, বস্তুতঃ তাঁহারা ওয়াকিফহাল হইলেও ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন। আমাদের সহিত কোন ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যক্তির ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কখন কথাবার্ত্তা না হওয়ায় আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে আয়েঙ্গার মহাশয়ের উক্তির সমর্থন বা ভ্রমনির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের ধারণা। বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে একমাত্র মিস্টার র‍্যামজে ম্যাক-ডোনাল্ডের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, এবং তাঁহার সহিত দু একবার কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে নহে।

মুদ্রাযন্ত্র শৃঙ্খলিত করিবার ভয় প্রদর্শন

১৯২৬-২৭ সালের বঙ্গের সরকারী শাসন রিপোর্টের ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় খবরের কাগজে প্রকাশিত মিথ্যা উক্তি ও গালাগালি বন্ধ করিবার নিমিত্ত আইন করিবার একটা আভাস দেখা যায়। নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি পড়িলে তাহা বুঝা যায়:—

The campaign of unscrupulous mis-representation has now gone to such lengths that it is difficult to justify further tolerance. It is true that if the whole vocabulary of abuse is expended on trifling incidents, the influence of the press in important matters will be correspondingly negligible. It is perhaps also the path of wisdom to let the discontented "work off steam." These arguments, however, can be pushed too far, and in Bengal many thoughtful observers have been forced to the conclusion that they are an inadequate answer to the untramelled liberty of abuse that now prevails. The evil results of a campaign of persistent vilification on an ill-balanced community have already manifested themselves in ugly and ominous forms, and the reputation and prestige of the official classes and of Government have been seriously undermined by the unending repetition of falsehood. It is idle to hope that ultimately truth will prevail through its own inherent strength. Before that stage is reached, untold and irremediable mischief may be done, which alone justifies the contention that the existing state of things should be brought to an immediate end.

সংবাদপত্রে যাহা-কিছু ছাপা হয় সবই সত্য, এরূপ দাবী কোন সাংবাদিক করিতে পারেন না। অজ্ঞাতসারে অনেক অমূলক কথাও বাহির হয়। কারণ, তথ্যনিরূপণ বড় কঠিন; অনেক সময় চেষ্টা করিয়াও ঠিক খবর জানিতে পারা যায় না। এমন খবরের কাগজও আছে, যাহাতে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা, রচা কথা, বানানো কথা, প্রকাশিত হয়। এ প্রকার অবস্থার প্রকৃত প্রতিকার কি, তাহা সংক্ষেপে বলা কঠিন। কিন্তু কড়া আইন যে ভাল উপায় নহে, ইহাই আমাদের ধারণা। পাইয়োনীয়ার ইংরেজদের কাগজ, দেশী লোকদের নহে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ইহা আধা-সরকারী ও আমলাতন্ত্রের মুখপত্র ছিল। এই কাগজও সম্প্রতি খবরের কাগজগুলাকে নিগড়বদ্ধ করিবার ইচ্ছার নিন্দা করিয়াছে, এবং ইহার ফল ভাল হইবে না বলিয়াছে। যথা:—

This is extremely interesting reading. Does this mean that the Bengal Government is considering a censorship of the press or the suppression of press criticism? It is hardly conceivable that even the most reactionary administration would attempt such a foolish and fatuous step. There is much that may be criticised about the Indian Press, there is a great deal of room for improvement, but if the brilliant author of the report, just published, thinks that the way will be made smoother for the perpetuation of the old regime by such measures he is vastly mistaken. Any interference with the press will rouse a storm of united protest.

মিথ্যা কথার প্রচার ও গালাগালি বন্ধ করিবার একটি উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে, সুফল আশানুরূপ না হইলেও, কুফল কিছুই হইবে না। যাঁহারা কেবলমাত্র সত্য সংবাদ ও ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যদি একা-একা কিম্বা দলবদ্ধ হইয়া এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অর্থবল, মানসিক শক্তি, জ্ঞান ও লিখিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে কিছু সুফল ফলিতে পারে। ইহা আমরা বাংলা দেশের লোকদিগকে বলিতেছি, গবর্মেণ্টকে নহে। গবর্মেণ্ট যাহা কিছু করেন সবই মন্দ, মনে করি না। গবর্মেণ্টের অন্যায় সমালোচনা ও সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি অন্যায় গালাগালি যে কখনও হয় না, তাহাও নহে। কিন্তু যাহারা ক্ষমতাশালী এবং প্রভু, তাহারা কতকটা সমালোচনা-অসহিষ্ণু হইয়া থাকে। ন্যায্য কথাকেও তাহারা অনেক সময় গালাগালি বলিয়া ভ্রম করে। ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা ও অন্যায় সমালোচনার মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা নির্দ্দেশ করা সমালোচিত ব্যক্তির কাজ নয়। তা-ছাড়া, সরকার পক্ষ হইতে যাহা বলা হয়, তাহাও সব সময় সত্য নহে; অজ্ঞানকৃত ও জ্ঞানকৃত সত্যের অপলাপ সরকারপক্ষ হইতেও হইয়া থাকে।

সরকারপক্ষের পূর্ণ সমালোচনা বর্ত্তমান আইন অনুসারে যতটা বাধা পাইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অধিক বাধা সৃষ্টি করিবার আমরা বিরোধী। আমরা বে-সরকারী লোকেরাও মিথ্যাবাদী নিন্দুকদের আক্রমণ সহ্য করি, কিন্তু ইহার প্রতিকারের জন্য কঠোরতর আইন চাই না।

সরকারী কর্ম্মচারীদের ও সরকারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ("the reputation and prestige of the official classes and of Government") কেবল নিন্দুকদের দ্বারা মিথ্যার অবিরাম পুনরুক্তি ("the unending repetition of falsehood") বশতই হ্রাস পায়, ইহা সত্য নহে। প্রতিবাদ সত্ত্বেও ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলিয়া চলিয়াছে, এমন কয়েকটা কাগজের নাম অনায়াসে করা যায়। কিন্তু গবর্ন্মেণ্টের নিজের দোষেও তাহার যশের হানি হয়, এবং অনেক সরকারী কর্ম্মচারী যথার্থই নিন্দার পাত্র বলিয়াও নিন্দিত হইয়া থাকেন।

শরৎবাবুর উপর আক্রমণ

১৯২৬-২৭ সালের বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে ঔপন্যাসিক বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে ২৪৮ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে :—

The most popular novelist, Babu Sarat Chandra Chatterjee, found a new vent for his morbid sentimentalism in a bitterly virulent attack on the alleged land-grabbing propensities of the European powers and the suspected political aims of the various Christian missions in Asia.

ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অন্যজাতির ভূমি দখল করিবার প্রবৃত্তি অতি সত্য কথা, ইহা মিথ্যা আরোপিত ("alleged") দোষ নহে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। তদ্ভিন্ন, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ বলিতে শুধু ইংরেজ জাতিকে বুঝায় না। অন্য ইউরোপীয় জাতির দোষ ক্ষালনে আলোচ্য রিপোর্টে এত উৎসাহ কোন প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা একটি বাংলা প্রবাদ বাক্য হইতে অনুমিত হইতে পারে। খৃষ্টিয়ান মিশন সম্বন্ধে শরৎ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি প্রথমে বলেন নাই; বাইবেল, বোতল ও ব্যাটালিয়নের পরে পরে আবির্ভাব সম্বন্ধে ইংরেজীতেই উক্তি আছে।

বঙ্গে নাট্য ও নৃত্য

বঙ্গের ১৯২৬-২৭ সালের সরকারী শাসন-রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে :—

Dramatic productions of note were Rabindranath Tagore's "Chira-kumar Sabha" (The Life-long Bachelors' Association), "Sodhbodh" (Complete Discharge of the Debt) and "Natir Puja" (The Dancing Girl's Worship). The last, which was staged privately in Calcutta for the benefit of the Visva-bharati Institution by its girl pupils, is a Buddhistic story of the highest sacrifice for the cause of religion. The superb dancing introduced in the acting of the play by the poet's pupils has been hailed as the first step towards the revival of a dead art among Bengalis.

ইংরেজদের ও বাঙালীদের সংবাদপত্র

আলোচ্য শাসন-রিপোর্টে বঙ্গের ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলির প্রশংসা ও দেশী খবরের কাগজগুলির নিন্দা নিম্নলিখিতরূপ করা হইয়াছে :—

The European press maintained its enviable record of success. The serene confidence of its editorial columns kept it far above the sordid clamour of its rivals; its literary excellence suited the taste of the discerning section of the public; while the obvious efficiency of its management cannot but have reaped its due reward. There is no reason why the Indian Press should not reach the same heights, if only it would realise that the daily exhaustion of its vocabulary and the monotony of its invective can attract, and indeed deserves, nothing more than the precarious support and fitful patronage of an ill-balanced public, which can appreciate nothing else.

ইংরেজদের কাগজগুলির যে প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের লেখায় সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা সচরাচর রক্ষিত হয় কিনা, তাহাদের মত ঠিক কিনা, তদ্বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। সুতরাং ঐ প্রশংসার সমালোচনা করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। ইংরেজদের কাগজগুলির, টাকাকড়ির দিক্ দিয়া সফল হইবারই কথা; কেন না,

গবর্মেণ্টের মোটাবেতনের লোকেরা ও বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্যের মালিকরা তাহাদের জা'তভাই বলিয়া তাহাদের বিজ্ঞাপনের ও গ্রাহকের অভাব হয় না। তাহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে "শান্ত আত্মবিশ্বাস" লক্ষিত হয়,তাহারও কারণ সহজবোধ্য। ইংরেজরা ভারতবর্ষে যাহা চায়—প্রভুত্ব, ধন, আরাম—তাহা তাহাদের হস্তগত ; তাহা যে তাহাদের কাহারও জীবিত-কালে তাহারা হারাইবে, এরূপ সন্দেহ বা আশঙ্কা তাহাদের কাহারও মনে উদিত হয় না। এ অবস্থায় মানুষ শান্তচিত্তে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত লিখিতে পারে। অন্য দিকে, বাঙালীদের সব কিছু অন্যের হস্তগত বা কৃপাসাপেক্ষ। দেশ পরহস্তগত, ব্যবসাবাণিজ্যও প্রধানতঃ তাই, পৌর ও জানপদ অধিকার নামে কিছু আছে কাজে বিশেষ কিছু নাই। শক্তি নাই, স্বাস্থ্য নাই, রোগে চিকিৎসা হয় না, রাষ্ট্রীয় অধিকার নাই, শিক্ষা আশানুরূপ হয় না, গ্রাস-আচ্ছাদন গৃহ প্রয়োজনানুরূপ জুটে না, ইংরেজ ফিরিঙ্গীর হাতে প্রাণহানি অঙ্গহানি হইলে তাহার যথোচিত প্রতিকার সাধারণতঃ হয় না। এই প্রকার অবস্থায় তাহাদের সংবাদপত্রগুলি যদি চীৎকার করে, তাহা তোমাদের কানে "সর্ডিড" শুনাইতে পারে। কিন্তু চীৎকার না করিয়া আর কিছু করিবারও উপায় নাই। তাহার কল্পনা জল্পনাতেও বিনা বিচারে বা বিচারানন্তর ভীষণ শাস্তি হয়।

ইংরেজদের কাগজগুলি তাহাদের মাতৃভাষায় লিখিত, এবং সম্পাদকদিগকে ও লেখকদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবার মত আর্থিক অবস্থা তাহাদের আছে। সুতরাং তাহাদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ থাকিলে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দেশী ইংরেজী কাগজগুলির সম্পাদক ও লেখকরা বিদেশী ভাষায় লেখেন, সুতরাং তাঁহাদের ইংরেজীটা শিক্ষিত ইংরেজদের মত না হইলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। দেশভাষায় লিখিত কোন কোন কাগজের সাহিত্যিক উৎকর্ষ আছে, অনেকগুলির নাই। কারণ, শেষোক্ত কাগজগুলির আর্থিক অবস্থা এমন নয়, যে, তাহারা ভাল লেখার উপযুক্ত মূল্য দিতে পারে।

ইংরেজদের কাগজগুলির কার্য্যপরিচালন উৎকৃষ্ট হইবারই কথা ; কারণ সেগুলি উপযুক্ত কর্ম্মচারী রাখিয়া ব্যবসা হিসাবে চালিত হয়, এবং ইংরেজ জা'ত ব্যবসা বুঝে ভাল। আমাদের সব কাগজও ব্যবসা হিসাবে সততার সহিত পরিচালিত হইলে তাহাদের কার্য্যপরিচালনও উৎকৃষ্ট হইবে।

উদ্ধৃত ইংরেজী শেষ বাক্যটিতে দেশী কাগজসমূহের যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা সকল সংবাদপত্রের পক্ষে সত্য নহে, কয়েকটার পক্ষে সত্য। "ইল্ ব্যাল্যান্সট্ পাব্লিক" সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে,।তাহা জনসাধারণের অব্যবস্থিত-চিত্ত হুজুকপ্রিয় উত্তেজনাপরায়ণ অংশের প্রতি প্রযুজ্য, সকলের প্রতি নহে।

পরিশেষে ইহা দুঃখের সহিত স্বীকার্য্য, যে, বাংলা দেশে বাহ্য সৌষ্ঠব, কার্য্যপরিচালনদক্ষতা, সম্পাদননৈপুণ্য প্রভৃতি বিষয়ে দেশী লোকদের ও ইংরেজদের খবরের কাগজগুলির মধ্যে যতটা প্রভেদ লক্ষিত হয়, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর ও এলাহাবাদে ততটা প্রভেদ লক্ষিত হয় না—বিশেষতঃ বোম্বাই ও মান্দ্রাজে।

—

ভ্রম-সংশোধন

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অঙ্কিত।ছবিটির নাম ভ্রমক্রমে 'ভিখারী' ছাপা হইয়াছে। ছবিটির নাম—কুতব মিনার।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
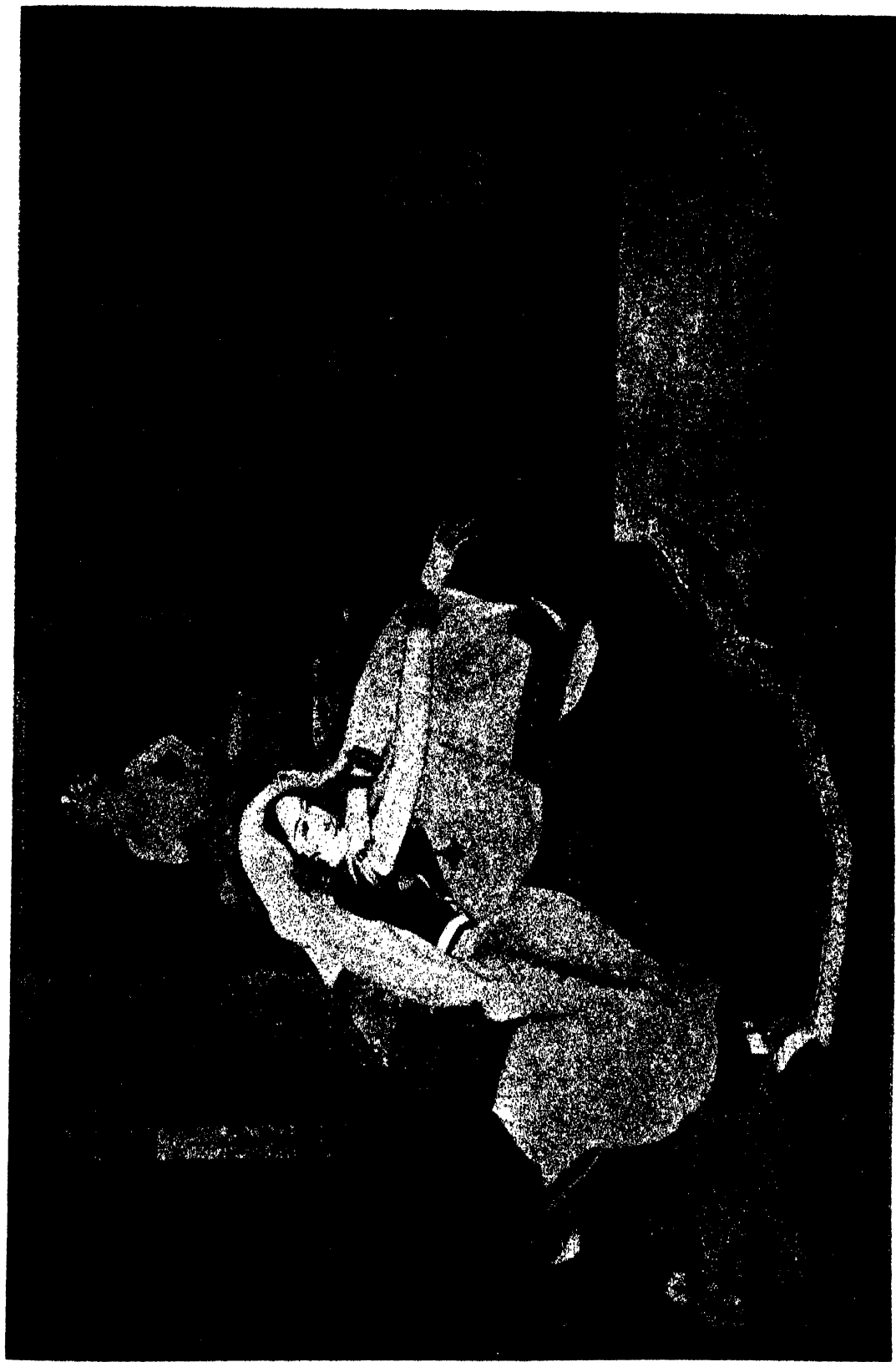
প্রতীক্ষার অবসাদ
শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩৫

৫ম সংখ্যা

শেষের কবিতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

অমিতচরিত

অমিত রায় ব্যারিষ্টার। ইংরেজী ছাঁদে রায় পদবী "রয়" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হোলো বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামান্যতা কামনা ক'রে অমিত এমন একটি বানান্ বানালে যা'তে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল—অমিট্ রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টর্। যে-পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিঁকে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এর কোঠায় পা দেবার পূর্ব্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্ত্তি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করেনি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে ব'লে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেননি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রং এমন পাকা ক'রে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেচে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে তাদের ষ্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেম্নি, ঘাড়ে-গর্দ্দানে, সাম্নে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ,

চালটা ছিল নড়বড়ে, বাংলাসাহিত্যের মতো স্থাড়া ফ্যাকাসে মরুভূমিতেই তার চলন।—সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে ব'লে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হোলো মুখোস; ষ্টাইলটা হোলো মুখশ্রী। ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, ষ্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমী ষ্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে; বঙ্কিম তা'তে নিজেকে মানিয়ে নিয়েচেন,—বঙ্কিমী ফ্যাশান নসিরামের লেখা "মনোমোহনের মোহন বাগানে", নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েচে মাটি ক'রে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যবসাদার নাচওয়ালীর দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখ্‌বার বেলায় বেনারসী ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাৎ হোলো ফ্যাশানের, আর বেনারসী হোলো ষ্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখ্‌বার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সর্‌তে ভরসা পায় না ব'লেই আমাদের দেশে ষ্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্রচন্দ্রবরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশান-দুরস্ত দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুট্‌ত। শিবের ছিল ষ্টাইল, এত ওরিজিন্যাল, যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বে-দস্তর ব'লে জান্‌ত। অক্সফোর্ডের বি-এর মুখে এ সব শুন্‌তে আমার ভাল লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় ষ্টাইল আছে—সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তা'রা "ন পুনরাবর্ত্তন্তে।"

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এসব কথা একেবারে সইতে পার্‌ত না—বল্‌ত, "রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস্‌।" সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোম-হর্ষক এম্‌-এ; তাকে পড়্‌তে হয়েচে বিস্তর, বুঝ্‌তে হয়েচে অল্প। সেদিন সে আমাকে বল্‌লে, "অমিত কেবলি ছোট লেখককে বড়ো করে, বড়ো লেখককে খাটো কর্‌বার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার সখ, তোমাকে সে করেচে তার ঢাকের কাঠি।" দুঃখের বিষয়, এই আলোচনা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভাল লাগেনি। দেখ্‌লুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেননি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য কর্‌তে অমিতর বুক দমে না। তারা হোলো, যাদের বলা যেতে পারে, বহুবাজারে চল্‌তি লেখক, বড়ো বাজারের ছাপমারা; প্রশংসা কর্‌বার জন্যে যাদের লেখা প'ড়ে দেখ্‌বার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান কর্‌লেই পাসমার্কা পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা প'ড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে কর্‌তে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড় বেশী সরকারী, বর্দ্ধমানের ওয়েটিং-রুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেচে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কাম্‌রা।

অমিতর নেশাই হোলো ষ্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে,—পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কেনো একজন মাত্র নয়, ও হোলো একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ কামানো চাঁচা-মাজা চিক্কণ শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্ত্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে

একটুও দেরী হয় না ; মনটা এমন একরকমের চকমকি যে, ঠুন্ ক'রে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিট্‌কে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এ রকম ধুতি চল্‌তি নয়। পাঞ্জাবী পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডানদিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সাম্‌নের দিক্‌টা কনুই পর্য্যন্ত দু-ভাগ করা ; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারি বাঁ দিকে ঝুল্‌চে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁক-ঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুল্‌তে থাকে, বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানী লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ করা। একে ঠিক সাজ বল্‌ব না, এ হচ্চে ওর এক-রকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম্ম আমি বুঝিনে, যারা বোঝে তারা বলে—কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যা'কে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড্। নিজেকে অপরূপ কর্‌বার সখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ কর্‌বার কৌতুক ওর অপর্য্যাপ্ত। কোনো মতে বয়স

অমিট্ রায়ে

মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জ্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবী, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেচে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এদিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাক নাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানী,—ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট বিশেষ। উঁচু খুর-ওয়ালা জুতো, লেস্‌ওয়ালা বুককাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, সাড়িটা গায়ে তির্য্যগ্‌ভঙ্গীতে আঁট ক'রে ল্যাপ্‌টানো। এরা খুটখুট ক'রে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্তে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কা'কে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপী রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর ক'রে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষ বন্ধুর চৌকির হাতার উপরে ব'সে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্দ্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জ্জন প্রকাশ ক'রে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসান্ত নেই, বিশেষ ভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বল্‌তে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে ক'রেই বাজিতে হারে, যে-রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ্‌রঙের কাপড় পর্‌তে দেখ্‌লে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্ দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা ব'লে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে-মানুষ অনেক দেবতার পূজারী, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো ব'লে স্তব করে, দেবতাদের বুঝ্‌তে বাকি থাকে না, অথচ খুসিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েচে, অমিত সোনার রঙের দিগন্ত-রেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে,—নিকটে দাহ্যবস্তু থাক্‌লেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিক্‌নিকে গঙ্গার ধারে যখন ওপারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তব্ধতার উপরে চাঁদ উঠ্‌ল ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বল্‌লে, "গঙ্গার ওপারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হ'বে না।"

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্ত্তে ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিল,—কিন্তু সে জান্‌ত একথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশী দাবী কর্‌তে গেলে বুদ্‌বুদের উপরকার বর্ণ-চ্ছটাকে দাবী করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "অমিট্, তুমি যা বল্‌লে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বল্‌লেও চল্‌ত এইমাত্র যে ব্যাঙটা টপ ক'রে জলে লাফিয়ে পড়্‌ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘট্‌বে না।"

অমিত হেসে উঠে বল্‌লে, "তফাৎ আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাৎ। আজকের সন্ধ্যাকে

ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিষ। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐক্যতানিক সৃষ্টি,—বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্ম্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে, সে যেম্‌নি একটি নিখুঁৎ সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙটি সম্পূর্ণ কর্‌লে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।"

"ভালোই হোলো, তোমার ভাবনা রইলো না, অমিট্, বিশ্বকর্ম্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধ্‌তে হ'বে না।"

"কিন্তু, লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গল গ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্ত্তটিকে আমাদের সাম্‌নে এনে ধরে, চম্‌কে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কি হবে ভেবে দেখ!"

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না ক'রে বল্‌লে, "তার পরে সোনার মুহূর্ত্তটি অন্যমনে খ'সে পড়্‌বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগ্‌লা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত্ত খ'সে প'ড়ে গেছে, ভুলে গেছ ব'লে তার হিসেব নেই।"

এই ব'লে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি লিসিরা ওকে বলে, "অমি, তুমি বিয়ে করো না কেন?"

অমিত বলে, "বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরী হচ্চে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র।"

সিসি বলে, "অবাক্ কর্‌লে, মেয়ে এত্তো আছে!"

অমিত বলে, "মেয়ে বিয়ে কর্‌ত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।"

সিসি বলে, "তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।"

অমিত বলে, "আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গর্-ঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্য্যন্ত এসে পৌঁছয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তঘরের মাটি পর্য্যন্ত আসা ঘ'টেই ওঠে না।"

সিসি বলে, "অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।"

অমিত বলে, "অর্থাৎ সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।"

লিসি বলে, "আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস্ তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইসারা কর্‌লেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে, তার কাল্‌চার নেই। কেন, ভাই, সে তো এম্-এতে বটানিতে ফার্ষ্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কাল্‌চার্।"

অমিত বলে, "কমল হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিক্‌রে পড়ে তাকেই বলে কাল্‌চার্। পাথরের ভার আছে আলোর আছে দীপ্তি।"

লিসি রেগে উঠে বলে, "ইস্, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই না কি তার

যোগ্য। অমি যদি বিমি বোস্‌কে বিয়ে করতে পাগল হ'য়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান ক'রে দেব সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।"

অমিত বল্‌লে, "পাগল না হ'লে বিমি বোস্‌কে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।"

আত্মীয়-স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েচে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উল্‌টো কথা ব'লে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধাঁ লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধ'রে আন্‌বার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো ক'রে বেড়াচ্চে,—ফিরপোর দোকানে যাকে-তাকে চা খাওয়াচ্চে, যখন-তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আস্‌চে; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিন্‌চে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্চে, ইংরেজি বই সদ্য কিনে এবাড়িতে-ওবাড়িতে ফেলে আস্‌চে, আর ফিরিয়ে আন্‌চে না।

ওর বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্চে ওর উল্‌টো কথা বলা। সজ্জন সভায় যা-কিছু সর্ব্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু-একটা ব'লে বস্‌বেই।

একদা কোন্ এক জন রাষ্ট্রতাত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল, ও ব'লে উঠ্‌ল, "বিষ্ণু যখন সতীর মৃত-দেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর একশোর অধিক পীঠ-স্থান তৈরি হ'য়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুক্‌রো এরিষ্টক্রেসির পুজো বসিয়েচে,—খুদে খুদে এরিষ্টোক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেলো, কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে তাদের কারো গাম্ভীর্য্য নেই, কেন না তাদের নিজের পরে বিশ্বাস নেই।"

একদা মেয়েদের পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস্ ক'রে বল্‌লে, "পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য সুরু করবে। দুর্ব্বলের আধিপত্য অতি ভয়ঙ্কর।"

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চ'টে উঠে বল্‌লে, "মানে কী হোলো?"

অমিত বল্‌লে, "যে-পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখীকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না, আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি সয়তানী তার জোগান দেয়।"

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হ'তে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল, মনে মনে যুদ্ধসাজ প'রে। একজন সেকেলে গোছের অতি ভালমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বল্‌লে, 'কবিমাত্রের উচিত পাঁচ বছর মেয়াদে কবিত্ব করা; পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্য্যন্ত। এ কথা বলব না যে, পরবর্ত্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজ্‌লি

আম ফুরোলে বলব না, আনো ফজলিতর আম, বলব, 'নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো ত হে।' ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ, ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হোলো ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।*** রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওয়ার্ডস্বার্থের নকল ক'রে ভদ্রলোক অতি অন্যায় রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাস পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই স'রে না পড়ে আমাদের কর্ত্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্ত্তী যিনি আসবেন, তিনিও তাল ঠুকেই গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমরাবতী বাঁধা থাকবে মর্ত্ত্যে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাকে বলি দেবার পুণ্য দিন,—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভলগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পূজোর প্রণালী এই রকমই। দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী. চতুর্দ্দশপদী দেবতাদের পূজোও এই নিয়মে। পূজা জিনিষটাকে একঘেয়ে ক'রে তোলার মতো অপবিত্র অধার্ম্মিকতা আর কিছু হ'তে পারে না।*** ভালো লাগার এভোল্যুশন্ আছে। পাঁচ বছর পূর্ব্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তাহ'লে বুঝতে হবে বেচারা জানতে পারেনি যে, সে ম'রে গেছে। একটু ঠেলা মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেন্টিমেণ্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টিসৎকার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মৎলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি।''

আমাদের মণিভূষণ চষমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, "সাহিত্য থেকে লয়াল্‌টি উঠিয়ে দিতে চান।"

"একেবারেই। এখন থেকে কবি প্রেসিডেন্টের দ্রুত নিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরণে। ওটা প্রিমিটিভ্ ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌সো করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর‍্যাল্‌জিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কাণওয়ালা, গথিক গির্জ্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন-কি, যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট্ বিল্‌ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই। ***এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলা কলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে। যেমন ক'রে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হ'বে মরণ। তার পরে কিছু দিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে প'ড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্ম্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্স্‌কে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।*** মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশের যত মুগ্ধ মিস্ত্রি মিলে যদি যেখানে-সেখানে ভারত জুড়ে কেবলি গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্বুদ বানিয়ে চলত

তাহ'লে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।

(এইখানে ব'লে রাখা দরকার, কথার তোড় সাম্‌লাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারি থেকে যে কটা টুক্‌রো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েচি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্ত মুখে ব'লে উঠ্‌ল, "ভালো জিনিষ যত বেশি হয় ততই ভালো।"

অমিত বল্‌লে, "ঠিক তার উল্টো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিষ অল্প হয় ব'লেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হ'য়ে যেত মাঝারি।*** যে-সব কবি ষাট সত্তর পর্য্যন্ত বাঁচ্‌তে একটুও লজ্জা করে না, তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা ক'রে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারিদিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাঙচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগ্‌ড়ে যায়, পূর্ব্বের লেখা থেকে চুরি সুরু ক'রে হ'য়ে পড়ে পূর্ব্বের লেখার রিসীভর্স অফ্‌ ষ্টোলন্‌ প্রপার্টি। সে-স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্ত্তব্য হচ্চে, কিছুতেই এই সব অতি প্রবীণ কবিদের বাঁচ্‌তে না দেওয়া,—শারীরিক বাঁচার কথা বল্‌চিনে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক্‌ প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।"

সেদিনকার বক্তা ব'লে উঠ্‌ল, "জান্‌তে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট করতে চান? তার নাম করুন।"

অমিত ফস্‌ ক'রে বল্‌লে, "নিবারণ চক্রবর্ত্তী।"

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠ্‌ল—"নিবারণ চক্রবর্ত্তী? সে লোকটা কে?"

"আজকের দিনে এই যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠ্‌বে।"

"ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।"

"তবে শুনুন।" ব'লে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিশে বাঁধা খাতা বের ক'রে তার থেকে প'ড়ে গেল :—

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণীতে।
আমি আগন্তুক,
আমি জন-গণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।
খোলো দ্বার,
বার্ত্তা আনিয়াছি বিধাতার।
মহা কালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,
বল্‌ দুঃসাহসী কে কে

মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তার দুরূহ উত্তর !

শুনিবে না।
মূঢ়তার সেনা
করে পথরোধ !
ব্যর্থ ক্রোধ
হুঙ্কারিয়া পড়ে বুকে ;
তরঙ্গের নিষ্ফলতা
নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট পরে,
আত্মঘাতী দম্ভ-ভরে।

পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম্ম অঙ্গদ কুণ্ডল !
শূন্য এ ললাটপট্টে লিখা
গূঢ় জয়টীকা।
ছিন্ন কন্থা দরিদ্রের বেশ।
করিব নিঃশেষ
তোমার ভাণ্ডার।
খোলো খোলো দ্বার !
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা' দিবার দাও অচিরাৎ !
বক্ষ তব কেঁপে উঠে, কম্পিত অর্গল,
পৃথ্বী টলমল।
ভয়ে আর্ত্ত উঠিছে চীৎকারি'
দিগন্ত বিদারি',
"ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দ্দান্ত দুরন্ত ভিখারী,
তোর কণ্ঠধ্বনি,
ঘুরি' ঘুরি'
নিশীথ নিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।"

অস্ত্র আনো !
ঝঞ্ঝনিয়া আমার পঞ্জরে হানো !

মৃত্যুরে মারুক্ মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
করি' যাব দান।
শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে
মুহূর্ত্তে চকিতে,
মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।

শাস্ত্র আনো।
হানো মোরে, হানো।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে
ঊর্দ্ধস্বরে চাহিব খণ্ডিতে
দিব্য বাণী।
জানি জানি
তর্কবাণ
হ'য়ে যাবে খান্ খান্।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দুচোখ,
হেরিবে আলোক।

অগ্নি জ্বালো।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক।
দূর করো শোক।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হোক বিশ্বলোক অপূর্ব্ব দীক্ষায়।

আমার দুর্ব্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি',
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তি-লুব্ধ মুমুক্ষুরে,
ভিক্ষা-জীর্ণ বুভুক্ষুরে।
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে

হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ... টেনিস্ ব্যাট, ... বোম্‌রা গেল চ'লে দার্জ্জিলিঙে

লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়,—
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি' বজ্র-মুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি'
সঙ্গোপন বর্ষণ-সঞ্চয়
ছিন্ন করে মুক্ত করে সর্ব্বজগন্ময়॥

রবি ঠাকুরের দল সেদিন্ চুপ ক'রে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে।

সভাটাকে হতবুদ্ধি ক'রে দিয়ে মোটরে ক'রে অমিত যখন বাড়ী আস্‌ছিল, সিসি তাকে বল্‌লে, "একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্ত্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাক্‌তে গ'ড়ে তুলে পকেটে ক'রে নিয়ে এসেচ, কেবলমাত্র ভালোমানুষদের বোকা বানাবার জন্যে।"

অমিত বল্‌লে, "অনাগতকে যে মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগত-বিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্ত্তী আজ মর্ত্ত্যে এসে পড়্‌ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পার্‌বে না।"

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে মনে খুব একটা গর্ব্ব বোধ করে। সে বল্‌লে, "আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকাল বেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?"

অমিত বল্‌লে, "সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্ব্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ কথাটাও আমার নোট বইয়ে লেখা আছে।"

"কিন্তু তোমার নিজের মত ব'লে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি ব'লে বসো।"

"আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা'হ'লে তার উপরে প্রত্যেক চল্‌তি মুহূর্ত্তের প্রতিবিম্ব পড়্‌ত না।"

সিসি বল্‌লে, "অমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাট্‌বে।"

সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরো একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতর হৃদয়টার পরে যে দেবতা সর্ব্বদা শরসন্ধান ক'রে ফেরেন, তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবল্ পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্ব্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট প্র্যাক্‌টিসের জায়গা সব-চেয়ে সঙ্কীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লে, "যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছিনে।"

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস্ ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক্ প'রে বোন্‌রা গেল চ'লে দার্জ্জিলিঙে। বিমি বোস্ আগেভাগেই সেখানে গিয়েচে। যখন ভাইকে

বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হোলো তখন সে চারদিক চেয়ে আবিষ্কার করলে দার্জ্জিলিঙে জনতা আছে মানুষ নেই

অমিত সবাইকে ব'লে গিয়েছিল, সে শিলঙে যাচ্চে নির্জ্জনতা ভোগের জন্যে—দু'দিন না যেতেই বুঝ্‌লে, জনতা না থাক্‌লে নির্জ্জনতার স্বাদ ম'রে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার সখ অমিতর নেই। সে বলে, আমি টুরিস্ট্ না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাট্‌ল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই প'ড়ে প'ড়ে। গল্পের বই ছুঁলো না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়্‌তে লাগ্‌ল সুনীতি চাটুজ্জের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মতান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্ব্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্য-জড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো, ধুয়ো নেই, তাল নেই, শম নেই। অর্থাৎ ওর মধ্যে বিস্তর আছে, কিন্তু এক নেই,—তাই এলানো জিনিষ ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলি চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়্‌চে, সে দুঃখ ওর এখানেও যেমন সহরেও তেম্‌নি কিন্তু সহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানা প্রকারে ক্ষয় ক'রে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হ'য়ে জ'মে জ'মে ওঠে। ঝরণা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাব্‌চে পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুসি, এমন সময় আষাঢ় এলো পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েচে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছু দিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাক বাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুল্‌বে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পর্‌ল হাইলাণ্ডারী মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলাওয়ালা মজ্‌বুৎ চামড়ার জুতো, খাকি নর্ফোক কোর্ত্তা, হাঁটু পর্য্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলা-টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখ্‌তে হোলো না,—মনে হ'তে পার্‌ত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েচে ডিস্‌ট্রিক্‌ট্ এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ সাত পাৎলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে ঢাকা খদ। এ রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না ক'রে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেচে। ঠিক সেই সময়টা ভাব্‌ছিল, আধুনিককালে দূরবর্ত্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর দূতটাই প্রশস্ত—তার মধ্যে "ধূমজ্যোতিঃসলিল-মরুতাং সন্নিবেশঃ" বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে—আর চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক ক'রে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে ক'রে যাত্রা করবে, হয়ত বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে "দেহলীদত্তপুষ্পা" যে-পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেচে সেই অবন্তিকা হোক্ বা মালবিকাই হোক্, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুবনচারিণীই হোক্ ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষ্যে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের

দেখ্‌লে আর-একটা গাড়ী উপরে উঠে আস্‌চে…পরস্পর আঘাত লাগ্‌ল…

মুখে এসেই দেখ্‌লে আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আস্‌চে। পাশ কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষ্‌তে কষ্‌তে গিয়ে পড়্‌ল তার উপরে—পরস্পর আঘাত লাগ্‌ল, কিন্তু অপঘাত ঘট্‌ল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আট্‌কে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারি উপরে সে যেন ফুটে উঠ্‌ল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র।

মন্দার পর্ব্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠ্‌ছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখ্‌লে। ড্রয়িং-রুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখ্‌বার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখ্‌বার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু পাড় দেওয়া সাদা আলোয়ানের সাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকণ শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত ক'রে পিছু হঠিয়ে চুল আঁট ক'রে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাতা কব্‌জি পর্য্যন্ত, দুহাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেচে, কটকি-কাজ-করা রূপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ ক'রে এসে দাঁড়ালো। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হোলো, একটু কৌতুকও বোধ কর্‌লে। অমিত মৃদুস্বরে বল্‌লে, "অপরাধ করেচি।"

মেয়েটি হেসে বল্‌লে, "অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের সুরু আমার থেকেই।"

উৎস-জলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারি মতো নিটোল। অল্প বয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল, এর গলার সুরে যে-একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কি ক'রে। নোটবইখানা খুলে লিখ্‌লে, "এ যেন অম্বুরি তামাকের হাল্‌কা ধোঁয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আস্‌চে,—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।"

মেয়েটি নিজের ত্রুটি ব্যাখ্যা ক'রে বল্‌লে, "একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠ্‌তেই শোফার বলেছিল এ রাস্তা হ'তে পারে না। তখন শেষ পর্য্যন্ত না গিয়ে ফের্‌বার উপায় ছিল না। তাই উপরে চলেছিলেম। এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হোলো।"

অমিত বল্‌লে, "উপরওয়ালার উপরেও উপরওয়াল আছে—একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারি কুকীর্ত্তি।"

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, "লোকসান বেশি হয়নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।"

অমিত বল্‌লে, "আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনি যেখানে অনুমতি কর্‌বেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।"

"দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস।"

"দরকার আমারি, মাপ কর্‌লেন তার প্রমাণ।"

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বল্‌লে, "আমার তরফে আরো একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই,—বিশেষ একটা মহৎ কর্ম্ম নয়—এ গাড়ি চালিয়ে পস্‌টারিটি পর্য্যন্ত পৌঁছবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এম্‌নি কপাল, সেটুকুর মধ্যেও গলদ।

উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন্ যে, জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।"

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সঙ্কোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া একদমে গেল ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জ্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে; সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন ক'রে যা চোখে পড়্‌ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ প'ড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য্য-নক্ষত্রের আগুনজ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না ব'লে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বস্‌ল। তার নির্দ্দেশমতো গাড়ী পৌঁছল যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে বল্‌লে, "কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আস্‌বেন, আমাদের কর্ত্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।"

অমিতর ইচ্ছে হ'ল বলে, "আমার সময়ের অভাব নেই, এখনি আস্‌তে পারি।" সঙ্কোচে ব'লতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোটবই নিয়ে লিখ্‌তে লাগ্‌ল :—"পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে! দুজনকে দুজায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান ক'রে দিলে। এস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে,—লাগ্‌লো তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেচে, এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বল্‌চে, আমাদের সুরু হোলো যুগল-চলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথ্‌ব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা। বাঁধা মাইনেয় বাঁধা খোরাকীতে ভাগ্যের দ্বারে প'ড়ে থাক্‌বার জো রইল না; আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।"

বাইরে বৃষ্টি পড়্‌চে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে ব'লে উঠ্‌ল, "কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্ত্তী! এইবার ভর করো আমার পরে, বাণী দাও, বাণী দাও!" বেরোলো লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্ত্তী ব'লে গেল :—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থী,
আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।
রঙীন নিমেষ ধূলার দুলাল
পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত॥

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বন-বীথিকায় কীর্ণ বকুল-পুঞ্জ।
হঠাৎ কখন্ সন্ধেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাত-বেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেন্‌ড্রন্-গুচ্ছ॥

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
পথ-পাশে পাখী পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত॥

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পার্‌লে গল্পটার সাম্‌নে এগোবার বাধা হবে না।

(ক্রমশঃ)

ঐশ্বর্য্য-লাভ

শ্রী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১)

আসন্ন সন্ধ্যা। যজ্ঞেশ্বর তাহাদের নূতন গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পৈতৃক ভিটা উপর্যুপরি কয়েক বৎসর অর্থাভাবে অসংস্কৃত ছিল এবং এ বৎসর সেই জীর্ণ বাড়ী বর্ষার প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। এক প্রতিবেশী দয়া করিয়া তাহার এই পতিত জমিটুকু ছাড়িয়া দিয়াছে;—এইখানে যজ্ঞেশ্বর তাহার বৃদ্ধা মা, শিশু-সন্তান এবং বালিকা বধূকে লইয়া একখানা কুটিরে দিন কাটাইতেছে।

চৌমাথায় আসিয়া যজ্ঞেশ্বর একবার দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া নদীর পথ ধরিল। ইতস্ততঃ করিবারই কথা। যতদিনের কথা জানিতে পারা যায়,—নদীর পথে সন্ধ্যার সময়ে, অথবা তাহার পরে একলা কেহ কখন চলে নাই। যজ্ঞেশ্বরের মত সাহসী ও বলিষ্ঠ লোকও যে এই পথের মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইবে—তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

পথের দুই ধারে ঝোপ-ঝাপ ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিল। সম্মুখে প্রান্তর। এখানে-ওখানে দুই একটা ভাঙ্গা কলসী; ইতস্ততঃ দুই একখানা জীর্ণ খাট আকাশের দিকে পা তুলিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। পাঁচ ছয়টা কুকুরের মত জীব অস্পষ্ট আলোয় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে;—কোনটা মাথা নীচু করিয়া স্থির হইয়া আছে, কোনটা একদিক্ হইতে অন্যদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সমস্ত শব্দহীন; অথচ যজ্ঞেশ্বরের মনে হইল, কোথা হইতে যেন একটা ক্ষীণ আওয়াজ কাণে আসিতেছে। প্রান্তরের কোল দিয়া নদী বহিয়া গিয়াছে। এই পথ ওই প্রান্তরের ভিতর দিয়া নদীর তীরে গিয়া পড়িয়াছে। যজ্ঞেশ্বর আবার দাঁড়াইল। মনে পড়িল আসিবার সময় মাণিক বলিয়াছিল, "কি জান দাদা, ওসব তান্ত্রিক-টান্ত্রিকের কাছে যাওয়াটা কিছু নয়।" একবার মনে করিল,—ফিরিয়া যাই। পরক্ষণেই জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া, শরীর ও মনের সমস্ত বিরূপতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, অনমসাহসী যজ্ঞেশ্বর পুনরায় অগ্রসর হইল।

শ্মশান পার হইয়া নদীর তীর দিয়া সে চলিল। যতক্ষণ দূরে ছিল, একটা অনির্দ্দেশ্য আতঙ্ক তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু যখন নিকটে আসিল, সেই ভীতিজনক নির্জ্জন শ্মশানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল, তখন তাহার আর সেই পূর্ব্বের মত 'গা-ছম্-ছমানি' ছিল না। দুই একটা ভস্মাচ্ছাদিত চুল্লী,—একটা দুইটা নরকপাল এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যজ্ঞেশ্বরের আর ভয় নাই;—সে অভিভূতের মত পথ চলিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল, জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে, ইহলোকের সহিত তাহার আর কোনও সম্পর্ক নাই।

শ্মশান যখন পার হইয়া গেল, তখন সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হইল। পূর্ব্বের নির্দ্দেশ মত দক্ষিণ দিকে একটুখানি অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল, ধূসর অন্ধকারের মধ্যে দীর্ঘ কৃষ্ণমূর্ত্তি! সরল ভাবে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি।

যজ্ঞেশ্বর আর একবার দাঁড়াইল। যাঁহার নিকট সে আসিতেছে, ওই ত সম্মুখেই তিনি। আর দুই দণ্ড,—তার পরেই তাহার সমস্ত আশা-নিরাশার,—সমস্ত দুঃখ-দ্বন্দ্বের অবসান!

সন্ন্যাসী ধ্যান ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিলেন। যজ্ঞেশ্বর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তান্ত্রিক কহিলেন—"শুভমস্তু!"

কি করিয়া সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিবে, ভাবিয়া যজ্ঞেশ্বর কূল-কিনারা পাইতেছিল না। এমন একটু সূত্র পাইয়া সে বলিল,—"বাবার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু হতভাগ্যের অদৃষ্টের দোষে আপনার কথাও বুঝি

ব্যর্থ হয়। আমার মঙ্গল কোথায়, বিধাতাপুরুষই জানেন। আমার মত দুর্ভাগা আর পৃথিবীতে নাই।" যজ্ঞেশ্বর থামিল, সন্ন্যাসী স্থিরদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলেন

তারপর সহসা যজ্ঞেশ্বর দুই হাত দিয়া সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"অনেক আশা করিয়া আজ আমি তোমার কাছে আসিয়াছি। আমাকে তোমায় কৃপা করিতেই হইবে,—নহিলে ছাড়িব না!—আমায় তুমি ফিরাইতে পারিবে না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তুমি কি চাও?"

যজ্ঞেশ্বর কহিল,—"অর্থ! সম্পদ! আমি শুনিয়াছি, আপনি ইচ্ছা করিলে অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারেন। আপনার আদেশের উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। আমি সম্পদ চাই,—সম্পদ!"

তারপর নদীর পরপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"তুমি কি বুঝিবে, ঠাকুর! দারিদ্র্যের অসহনীয় পীড়ন কি ভয়ানক তা তুমি কি জানিবে? তুমি সন্ন্যাসী, তুমি একক। তোমার কোন অভাবও নাই,—প্রয়োজনও নাই!—একমাত্র আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি,—তাহার জন্যও তোমাকে ভাবিতে হয় না। তুমি সংসারত্যাগী—পাঁচ-জনের চিন্তা ছাড়িয়া একজনের চিন্তা লইয়াই আছ। তুমি নিজের আত্মার উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত! একমাত্র শিশু-সন্তান যখন,—ওঃ! স্বার্থপর সন্ন্যাসী। দারিদ্র্যের কি কঠোর নিষ্পেষণ তুমি তার কি জানিবে!"

ধীরে-ধীরে প্রকৃতিস্থ হইয়া যজ্ঞেশ্বর সন্ন্যাসীর পানে ফিরিয়া চাহিল। বলিল,—"হাঁ প্রভু! সম্পদ চাই। যৎসামান্য নয়। যথেষ্ট নয়! অসীম ঐশ্বর্য্য! যাহা অতিবড় কৃপণও আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে না। যা' জগতের কেহ কখনও কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। অসীম সম্পদ চাই।"

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কোন্ দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল,—তাহা জানিতে পারা যায় না। অন্ধকারে, তাঁহার মুখের ভাব কিরূপ তাহাও যজ্ঞেশ্বর দেখিতে পাইল না। অমাবস্যার কৃষ্ণ তমস্রারাশি তাহাদের চারিদিকে গাঢ় হইয়া উঠিল। যজ্ঞেশ্বর বসিয়া রহিল। একান্ত নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া তাহার বক্ষস্পন্দনের শব্দ তাহার নিজের কাণেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া বাজিতে লাগিল।

অবশেষে সন্ন্যাসী মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—"তুমি অসীম সম্পদই চাও?"

যজ্ঞেশ্বর কহিল,—"হাঁ!"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"ভাল! পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সম্পদের দুয়ারই তোমার নিকট উন্মুক্ত রহিল। যেটা হইতে ইচ্ছা, অনন্ত ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া লইয়া যাও।"

যজ্ঞেশ্বর ঠিক বুঝিতে পারিল না। একটু বিস্ময়পূর্ণ বিনয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, কি আদেশ করিলেন?"

সন্ন্যাসী সহজ করিয়া বলিলেন,—"আর্থিক অথবা পারমার্থিক, কোন্ প্রকার সম্পদ তুমি পাইতে ইচ্ছা কর?"

আর্থিক অথবা পারমার্থিক! নিশ্চয়ই যজ্ঞেশ্বর আর্থিক-সম্পদের কথাই বলিয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই?—তাই উভয় প্রকার সম্পদের কথাই ধরিয়া লইলেন, এবং উভয় দ্বারই যজ্ঞেশ্বরের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন?

যজ্ঞেশ্বর উত্তর দিল না। এতক্ষণ সে আর্থিক সম্পদের কথাই বলিতেছিল বটে, কিন্তু এখন আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা শুনিবামাত্র বিদ্যুৎ চমকের মত আর-একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাহার মাতামহ অসীম অধ্যাত্মসম্পদে সম্পদশালী ছিলেন। মনে পড়িল, অতি শৈশবে, দাস-দাসী, আত্মীয়-পরিজন তাহার চারিদিকে নিয়ত শুনাইত,—"অমন দাদামহাশয়ের নাতি! উহাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখা যাইবে কিসে?" কতবার সেও মনে মনে স্থির করিয়াছে, তুচ্ছ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া দাদা মহাশয়ের মত নিত্য সম্পদের সন্ধানে যাত্রা করিবে। রাজরাজেশ্বরের অনন্ত অক্ষয় ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইয়া সন্তপ্ত মানবকে দুই হাতে সুধা বিলাইবে।

আবার মনে পড়িল, পিসিমার মুখে শোনা তাহার বৃদ্ধ-পিতামহের কথা। সেই স্বনামধন্য পুরুষের ঐশ্বর্য্যের কথা প্রবাদের মত দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া গিয়াছিল

স্বয়ং নবাব সমাদর করিয়া তাঁহাকে সভায় আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে দৃঢ়-চিত্ত যজ্ঞেশ্বর কতবার মনে ভাবিয়াছে, তাঁহার মত অতুল ঐশ্বর্য্য আহরণ করিবে। দান ধ্যান করিবে, পাঁচজনকে প্রতিপালন করিবে;—তাহাদের ভাঙ্গা সংসারকে পুনরায় দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে।

বস্তুতঃ দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথের অসীম সম্পদশালীর রক্ত তাহার দেহে ছিল বলিয়া যজ্ঞেশ্বর মনে করিত, দুই পথের যে কোনটাতে চলা এবং আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছান তার পক্ষে সহজ।

যজ্ঞেশ্বরকে নিস্তব্ধ দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"স্থির করিতে পারিতেছ না? আচ্ছা, আমি তোমাকে সাহায্য করিতেছি।"

সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিলেন। অন্ধকার রাত্রিতে ধুনীর অস্থির আলোয় তাঁহাকে অতি অদ্ভুত দেখাইতেছিল। বিশাল রক্তবর্ণ দেহে, রক্তচন্দনচর্চ্চিত ললাটে প্রশস্ত মুখের উপর অগ্নির আলোক ভীষণ রমণীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিল। এখানে কতকগুলি নরকপাল রহিয়াছে; অল্প দূরে একটা মৃত্তিকার চতুষ্কোণ বেদীর উপরে একটি শব শায়িত আছে। অন্য যে কোন সময় হইলে যজ্ঞেশ্বর ভয় পাইত। কিন্তু আজ তাহার সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ছিল কি না সন্দেহ।

ধুনী হইতে এক মুষ্টি ছাই লইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"খাইয়া ফেল।" যজ্ঞেশ্বর বিনা দ্বিধায় খাইয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল, এমন সুস্বাদু জিনিস সে কমই খাইয়াছে। সন্ন্যাসীর উপর তাহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। সে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এ কি? সেই গাঢ় অন্ধকার যজ্ঞেশ্বরের চোখে ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছে। একটা দীপ্ত আলোর চারিদিক ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে-আলো সহ্য করিতে না পারিয়া যজ্ঞেশ্বর চোখ নত করিল। আলো দীপ্ত হইতে দীপ্ততর হইতে লাগিল; সমস্ত ভুবন আচ্ছন্ন করিল। যজ্ঞেশ্বর চোখ তুলিল। আলোর দীপ্তিতে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যজ্ঞেশ্বর দেখিল সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। আর কোন চিন্তা নাই;—আর কোন ভাবনা নাই; কিছুই নাই; শুধু চরাচর পূর্ণ করিয়া এক শুভ্র অনিন্দ্য তীব্র জ্যোতিঃ!

যজ্ঞেশ্বর দৃঢ়স্বরে কহিল,—"ঠাকুর, এই আমার পথ। আমার মাতামহ এই পথে গিয়াছেন। আমিও এই পথে যাইব।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আর একটু অপেক্ষা কর।"

তিনি পূর্ব্বের মত আর এক মুষ্টি ভস্ম লইয়া তাহাকে খাইতে দিলেন। যজ্ঞেশ্বরের মাথাটা কেমন করিয়া উঠিল। তাহার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। নদীর তীরের জোর হাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা মশাল লইয়া সে চলিয়াছে। খানিক দূরে গিয়া দেখিল, দেওয়াল। বিপরীত দিকে চলিল; সে দিকেও দেওয়াল। মশালটা তুলিয়া উপর দিকে চাহিল। উজ্জ্বল বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত সুদৃশ্য ছাদ হইতে আলোক রশ্মি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। মশালটা হঠাৎ একদিকে ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, অন্ধকারের বুক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকের খণ্ড তীব্র দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। আর-একদিকে ফিরিতেই উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের উপর প্রতিফলিত কিরণ ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। হাঁ! এই বিশাল কুঠরী অনন্ত ঐশ্বর্য্যে ঠাসা! তাহার হাত হইতে মশালটা পড়িয়া নিবিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বর একহাতে হীরার স্তূপ, আর-এক হাতে সুবর্ণরাশ আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া উন্মাদের মত বলিয়া উঠিল—"এই আমি লইব! এই আমি লইব! ও সম্পদ আমি চাই না। এই সমস্তই আমি লইব।"

(২)

মাণিক কহিল, "যাই বল মা, দাদার সেদিন যাওয়াটা ঠিক হয় নাই। এত করিয়া বলিলাম, 'দাদা ওসব তান্ত্রিকদের কাছে যাওয়াটা কিছু নয়'—তা' দাদা ত' কাহারও কথা শুনিবেন না।"

যজ্ঞেশ্বরের মাতা কহিলেন, "কি করিব বাবা? আমিই কি কম বারণ করিয়াছি? দুঃখে কষ্টে দিন ত এক রকম কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ও ত' কাহারও কথা শুনে না,—নহিলে ভাবনা কি ছিল, বল? ও

চিরকালই ঐ রকম। কিন্তু বাবা, তুমি আমার ছেলের বাড়া করিয়াছ। তুমি না থাকিলে কি যে করিতাম।"

প্রত্যুত্তরে মাণিক অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিল।

দীর্ঘকাল জ্বরভোগের পর যজ্ঞেশ্বর পথ্য করিয়াছে। তাই লইয়া তাহার মাতা ও প্রতিবেশী মাণিক আলোচনা করিতেছিলেন। বস্তুতঃ যজ্ঞেশ্বরের মাতা একটুও বাড়াইয়া বলেন নাই। সেদিন অমাবস্যার রাত্রে, রাত্রি দুই প্রহরের পরে গৃহে ফিরিয়া যজ্ঞেশ্বর জ্বরে পড়িয়াছিল, আর আজ এই প্রায় তিন পক্ষ কাল, মাণিক তাঁহাদের জন্য প্রাণপণ করিয়াছে।

সেদিন আসিবার সময় সন্ন্যাসী যজ্ঞেশ্বরকে বলিয়াছিলেন—"যেদিন তোমার মনস্থির হইবে,—একান্ত মনে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি উপস্থিত হইব।" যজ্ঞেশ্বর কোন উত্তর না দিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত চলিয়া আসিয়াছিল।

অমাবস্যার গভীর রাত্রে লোকালয় হইতে বহুদূরে নির্জ্জন শ্মশান খুব প্রীতিকর ভ্রমণ-স্থান নহে। যাইবার সময় বেশ আলো ছিল, কিন্তু, অন্ততঃ তখন যজ্ঞেশ্বর তাহার ভিতর দিয়া যাইতে অত্যধিক উৎসাহ অনুভব করে নাই। কিন্তু ফিরিবার সময় সে কোন্ পথ দিয়া, কখন, কেমন করিয়া ফিরিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বোধ হয় তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিত না। কেবল এইটুক তাহার মনে পড়ে, যে, বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মনস্থির করিয়া ফেলিতেই হইবে, এই চিন্তা তাহার মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। আর, এক সময়ে সচকিত হইয়া দেখিয়াছিল, সম্মুখেই সুপরিচিত গৃহদ্বার! কখন্ যে সে এই দীর্ঘ দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে,—তাহা জানিতেও পারে নাই।

যজ্ঞেশ্বর বালাপোষখানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিল। শরতের রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। শারদীয়া পূজার আর দেরী নাই; সমস্ত বাঙ্গালা দেশ উৎফুল্ল হইয়া সেই তিনটি দিনের অপেক্ষা করিতেছে। শরতের আকাশ, শরতের বাতাস তাহাকে ঘর হইতে অহরহ টানিতেছে। বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আর তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। যজ্ঞেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। মনে মনে ইচ্ছা করিতে লাগিল, সেও যদি ছোট থাকিত! সেও যদি পথের ধারের ছোট ছেলেগুলির সঙ্গে গিয়া উহাদের খেলায় উহাদের ঝগড়ায় যোগ দিতে পারিত!

যজ্ঞেশ্বরে মা ঘরে প্রবেশ করিলেন। সংসারের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়াছে। চালে খড় নাই, ভাঁড়ারের চাউল নাই, পরণে বস্ত্র নাই। মাণিক যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। যজ্ঞেশ্বরের অসুখে বৌয়ের অবশিষ্ট শেষ গহনাখানিও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

অন্য সময়ে হইলে যজ্ঞেশ্বর স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয়ের সংবাদে দুঃখিত হইত; মাণিকের সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হইত। আজ সে কিছুমাত্র ব্যস্ত বা উত্তেজিত হইল না। জানালা হইতে মুখ ফিরাইয়া শান্ত স্বরে কহিল, "কোন ভাবনা নাই, মা; আমি আজকালের মধ্যেই সমস্ত ঠিক করিয়া দিব।"

মা চলিয়া গেলেন। তিনি ছেলের এই শান্ত নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। "জ্বরটায় কি বাছাকে কম কাহিল করিয়াছে! আগের সে তেজ নাই,—চেঁচাইয়া কথা বলিবার শক্তি নাই; যা' হোক ভাল হইয়াছে, এই রক্ষা। মায়ের পূজাটা পাঠাইয়া দিতে আর দেরী করিব না।"

মা চলিয়া গেলে যজ্ঞেশ্বর কহিল,—"আর নয়। শীঘ্রই একটা স্থির করিয়া ফেলিতে হইবে।"

যজ্ঞেশ্বর বলিল বটে,—কিন্তু অনেক 'দুই একদিন' চলিয়া গেল,—তথাপি তাহার মন স্থির হইল না।

লোকে বলিলে যজ্ঞেশ্বর কহিত,—"এত তাড়াতাড়ি কিসের? ভাল করিয়া না ভাবিয়া-চিন্তিয়া কি করিয়া স্থির করি?"

(৩)

সেদিন সমস্ত দিন মাণিকদের বাগানে, নদীর তীরে, পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অস্নাত-অভুক্ত যজ্ঞেশ্বর যখন গৃহে ফিরিল, দেখিল, সমস্ত বাড়ীটা যেন কেমন অস্বাভাবিক

রকম নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। ছেলেদের ভিতর যাহারা ছোট ছোট তাহারা ঘুমাইতেছে,—অপেক্ষাকৃত বড় যাহারা বিষণ্ণ মুখে এখানে-ওখানে বসিয়া আছে। গাইটাকে কেহ খাইতে দেয় নাই; সে সহিষ্ণু শান্ত নয়নে ইহাদের দিকে চাহিয়া আছে। যজ্ঞেশ্বরের কন্যার আদরের বিড়ালটা কেবল এঘর-ওঘর করিয়া বেড়াইতেছে। যজ্ঞেশ্বর এ' সমস্ত বড় লক্ষ্য করিত না। কিন্তু আজ গৃহের এই লক্ষ্মী-ছাড়া ভাব যেন তাহাকে সজোরে এক ঘা চাবুক কষিয়া দিল। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল বাড়ীটায় সমস্ত দিন ঝাঁট পড়ে নাই; নিদ্রিত ছেলে-মেয়েদের কাছে গিয়া দেখিল, তাহাদের কপোলে অশ্রু-চিহ্ন এখনও শুকায় নাই।

যজ্ঞেশ্বর তাহার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, "ধনা, তোর মা কোথায় রে?" ধনঞ্জয় কহিল, "ঘরে।"—বলিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

যজ্ঞেশ্বর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। তাহার প্রবেশের শব্দ শুনিয়াই সে উঠিয়া বসিল। আরক্ত চক্ষু দুইটি আঁচলে মুছিয়া ভারী কণ্ঠে মৃদু স্বরে বলিল, "কোথায় গিয়াছিলে? সমস্ত দিন স্নান নাই, খাওয়া নাই।"

যজ্ঞেশ্বর তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কহিল,—"এ কি? ছেলেরা অসময়ে ঘুমাইতেছে—তুমি এখানে পড়িয়া কাঁদিতেছ—কি হইয়াছে?"

যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী কহিল,—"ও কিছুই নয়। তুমি স্নান করিয়া খাইয়া লইবে চল।"

যজ্ঞেশ্বর কহিল, "সমস্ত না শুনিলে আমি এক পাও নড়িব না।"

যজ্ঞেশ্বরের কন্যা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সে বলিল, "বিশু কাকা মাকে বকেছে।"

যজ্ঞেশ্বর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি?"

যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল—"হাঁ।"

যে প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বরকে এই জমিটুকু দিয়াছিলেন, তিনি কয়েক মাস হইল মারা গিয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তি দূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয় বিশ্বেশ্বরে অর্শাইয়াছিল। সে-ব্যক্তি সম্পত্তি পাইয়াই যজ্ঞেশ্বরকে হয় তাহার জমি ছাড়িয়া দিতে—নতুবা দাম দিয়া কিনিয়া লইতে বলিয়াছিল। এ সমস্তই যজ্ঞেশ্বর জানিত। কিন্তু ব্যাপারটা যে এত দূর গড়াইবে, তাহা সে ভাবে নাই। বাস্তবিক বিশুর ভীতি-প্রদর্শনগুলাকে সে ঠাট্টা বলিয়াই মনে করিয়াছিল। তা ছাড়া, উপায়ও তাহার ছিল না।

যজ্ঞেরের স্ত্রী শুধু 'হাঁ' বলিল। সে বলিল না, বিশু কিরূপ ক্রূর নিষ্ঠুরতার সহিত ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে অপমান করিয়াছে, তাহার স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছে। সমস্তই সে নীরবে সহ্য করিয়াছে।

যজ্ঞেশ্বরের কপালের শির ফুলিয়া উঠিল। সে উদ্দীপ্ত স্বরে কহিল—"তারপর?"

যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী কহিল, "মা স্বর্গে যাওয়ার পর থেকে সংসারের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। আজ সমস্ত দিন ছেলেদের খাওয়াই হইত না। মাণিক ঠাকুর-পো' এই মাত্র তাহাদের লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া আনিয়াছেন। জানি না ভগবানের মনে আরও কি আছে।"

সত্যই! দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া যজ্ঞেশ্বরের মাতা পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞেশ্বরের সেই কথা মনে পড়িল। কি কষ্টেই মা মারা গিয়াছেন! কত দিনের অনাহার, অর্দ্ধাহার, অনুপযুক্ত চিকিৎসা, বার্দ্ধক্যে কত সময়ে শীতবস্ত্রের অভাব, কত উপেক্ষিত ব্যাধি, তাঁহাকে ধীরে ধীরে মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। তথাপি তিনি শান্তিতে মরিতে পারেন নাই। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি যজ্ঞেশ্বরের দুরবস্থা, যজ্ঞেশ্বরের চিন্তা, তাঁহাকে ইষ্ট দেবতার নামও লইতে দেয় নাই।

যজ্ঞেশ্বরের বুকের ভিতরটায় একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভূত হইল। সে স্ত্রীর কথার উত্তর না দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বনের ধারে, গ্রামের এক প্রান্তে নির্জ্জনে গিয়া সে ডাকিল—"বাবা ঠাকুর! বাবা ঠাকুর!"

পরক্ষণেই চমকাইয়া বলিয়া উঠিল—"একি? আমি কি করিতেছি!" বনের দিকে চাহিয়া দেখিল, এক দীর্ঘ-কায় মনুষ্য মূর্ত্তি। পর মুহূর্ত্তেই সে মূর্ত্তি অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। যজ্ঞেশ্বর মনে করিল, কোন শিকারী হয়ত সন্ধ্যার মুখে বনে তীর পাতিতে যাইতেছে।

যজ্ঞেশ্বর যখন গৃহে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া

গিয়াছে ; কিন্তু তুলসীতলায় কেহ দীপ জ্বালে নাই। ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী আগের জায়গাতেই স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সে মৃদুস্বরে কহিল, "দেখ, আর ভাবিয়া কাজ নাই! যাহাতে অর্থের সংস্থান হয়—সেই ব্যবস্থাই দেখ। আমার জন্য ভাবি না; কিন্তু তোমার আর ছেলেগুলার মুখ ত চাহিতে হইবে?"

যজ্ঞেশ্বর কহিল,—"অর্থই কি মানব-জীবনে সব হইল?"

এইরূপে দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া আসিল। চৈত্রমাসে গাজনের সন্ন্যাসীর দল বাহির হইল; চড়কের বাজনা বাজিয়া উঠিল। প্রতি বৎসর এই গ্রামে চড়কের সময় একটা মেলা হয়। অনেক জায়গা হইতে অনেক দোকানী পশারী আসে; অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসেন। যজ্ঞেশ্বর ভাবিল, "একবার মেলাটা ঘুরিয়া আসা যাক্—যদি কোন হদিস্ পাই।"

মেলার বহুবিধ দ্রব্যসম্ভারের মাঝখান দিয়া যজ্ঞেশ্বর চলিয়াছিল। এমন সময় ছিল, যখন ইহাদের মধ্যেই যজ্ঞেশ্বরের চিত্ত প্রচুর খোরাক পাইত। কিন্তু আজ সে বিস্মিত হইয়া ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য! অন্য অন্য বারে এইসব জিনিসগুলাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহুবার করিয়া দেখিয়াছি। এ-গুলার ভিতর দেখিবার এমন কি আছে?"

যজ্ঞেশ্বর শূন্যদৃষ্টিতে ঔদাস্যের সহিত দোকানগুলির দিকে চাহিয়া দেখিয়া অন্য দিকে চলিল।

অন্যমনস্কভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একস্থানে যজ্ঞেশ্বরের দৃষ্টি পড়িল। একজন সন্ন্যাসীর চারিদিকে লোকে অত্যন্ত ভিড় করিয়া আছে। তাঁহার কি শক্তি ছিল বলা যায় না; যজ্ঞেশ্বর আকৃষ্ট হইয়া, ভিড় ঠেলিয়া আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিল।

সৌম্য গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী—গম্ভীর সংযত-কণ্ঠে উপদেশ দিতেছিলেন। অনেকে অনেক জটিল সমস্যা, ধর্ম্মশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার লইয়া তাঁহার নিকট সমাধানের জন্য আসিতেছিল; এবং তিনি তাহাদের সুন্দর সরল মীমাংসা করিয়া দিতেছিলেন। তাঁহাকে যে যে-প্রশ্ন করিতেছিল, সকলেই মনের মত, অথচ সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর পাইতেছিল। যজ্ঞেশ্বর তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; সকলের পিছনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। একে একে সকলে চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বর আবিষ্টের মত বসিয়া আছে। অন্ধকার জগৎকে আচ্ছন্ন করিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "বাবা, তুমি অনেকক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতেছ। তোমার কি অভিলাষ?"

যজ্ঞেশ্বর ব্যগ্রস্বরে কহিল, "বাবা, ভগবানকে কি লাভ করা সংসারী মানুষের পক্ষে সম্ভব?"

সন্ন্যাসী হাসিলেন। কহিলেন, "ঐকান্তিক ইচ্ছার কাছে অসম্ভব কিছুই নাই।"

যজ্ঞেশ্বর চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে কহিল, "তবে এই কি আমার পথ?"

সন্ন্যাসী পুনরায় হাসিলেন। "কাহার কোন্ পথ, পথের শেষে যিনি বসিয়া আছেন, তিনিই তা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন, "তোমাকে বলিতে বাধা নাই। তোমার ভিতরে যে লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে, এই তোমার পথ।"

যজ্ঞেশ্বর উত্তর দিল না। নীরবে স্তব্ধ পাষাণের মত বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—"তোমাকে খুব বড় আধার বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, অল্প সাধনাতেই তোমার প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইবেন। অনন্ত ঐশী শক্তি তোমার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।"

যজ্ঞেশ্বর হঠাৎ এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া কহিল,—"চুলায় যাউক অনন্ত ঐশী-শক্তি! আমার স্ত্রী-পুত্র না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে।"

(৪)

তারপর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেক দিনে পরিবর্ত্তনও অনেক হইয়াছে। যজ্ঞেশ্বরের পুত্র বড় হইয়াছে। সে প্রাণপণ পরিশ্রমে সংসারের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ উন্নত করিয়াছে। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরং পূর্ব্বের অন্যমনস্ক সচিন্ত ভাব আরও

বাড়িয়াছে। পূর্ব্বের মতই গৃহের কোন ব্যাপারেই তাহার দৃষ্টি নাই; শুধু গৃহে নহে, তাহার চারিদিকে যে সংসার নব নব পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, ঘটনার পর ঘটনার ঢেউ তুলিয়া মৃদুকল্লোলে, অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছিল,—সেদিকেও তাহার নজর ছিল না। মনে হইত, যজ্ঞেশ্বর এই পৃথিবীর সহিত সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া বসিয়াছে।

যজ্ঞেশ্বরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? হইয়াছে বই কি! তাহার সবল দীর্ঘ দেহ ন্যুব্জ হইয়াছে, কপালের রেখা অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়াছে, উজ্জ্বল চোখের জ্যোতি ম্লান হইয়াছে। কালো চুলের উপর শুভ্র প্রলেপ পড়িয়াছে। হাঁ, যজ্ঞেশ্বর বৃদ্ধ হইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় গৃহের দাওয়ায় যজ্ঞেশ্বর বসিয়া ছিল। তাহার চারিদিকে কয়েকটি ছোট ছেলে-মেয়ে কোলাহল করিয়া খেলা করিতেছিল। যজ্ঞেশ্বরের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। চক্রবালের অন্তরালে কোন অজানালোকে তাহার আঁখি নিবদ্ধ ছিল, কে জানে!

একটি ছোট মেয়ে যজ্ঞেশ্বরের কোলে চড়িয়া, দুই হাত দিয়া তাহার মুখ এদিকে ফেরাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"দাদামশায়, একটা গল্প বল না।"

যজ্ঞেশ্বর আস্তে আস্তে মুখ ফিরাইল। কহিল, "সত্যকার জীবনের চেয়ে আশ্চর্য্য গল্প কেহ শুনিয়াছে কি?"

নাতিনী বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ। তবুও বলিল, "তা না শুনুক দাদামশায়,—তুমি একটা গল্প বল।"

যজ্ঞেশ্বর বলিল, "কি গল্প বলিব, বল?"

নাতিনী বলিল,—"সেই গল্পটা,—সেই কত ঘটা ক'রে বিয়ে হ'ল।" গল্পের নাম শুনিয়া সকলে চারিপাশে আসিয়া ঘেঁসিয়া বসিল। যজ্ঞেশ্বর আরম্ভ করিল।

"বেশী দিনের কথা নয়, আমাদের এইখানেই একজন লোক ছিলেন; তিনি অসীম ধনশালী।"

নাতিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"তাঁহার নাম কি দাদামহাশয়?"

যজ্ঞেশ্বর কহিল, "তাঁহার নাম?—তাঁহার নাম—নারায়ণ! হাঁ,—নারায়ণের অনেক টাকা ছিল। ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতীশালে হাতী, প্রকাণ্ড বাড়ীভরা লোকজন, সেপাই পিয়াদা গম্‌গম্‌ করিত। তাঁহার অতবড় বাড়ীটায় কত লোক যে প্রতিপালিত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশবিদেশ হইতে কত দরিদ্র তাঁহার নিকট প্রত্যর্থী হইয়া আসিয়াছে, কাহাকেও তিনি ফিরান নাই।"

সুদূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া যজ্ঞেশ্বর বলিতে লাগিল—"কেনই বা ফিরাইবেন? তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য্য! অনন্ত সম্পদ! লোকে বলিত তাঁহার টাকায় ছাতা ধরিত। তাঁহাদের পরিবারের কেহ কখনও হাত দিয়া টাকা ছুঁইত না। মাটির তলায় নারায়ণের একটি কুঠরী ছিল। সেখানে কেহ কখন প্রবেশ করে নাই। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, সেই কুঠরীতে যে-মণিরত্ন ছিল, দিল্লীশ্বরের তোষাখানায় তা ছিল না। যে-কোহিনুর দিল্লীশ্বর নিজের পাগড়ীতে পরিয়াছেন, সেইরকম হীরা তাঁহার খড়মের বোলোয় ছিল। এক একদিন গভীর রাত্রিতে নারায়ণ সেই কুঠরীতে যাইতেন। একটি মাত্র দীপের আলোয় সে কুঠরী অতি অদ্ভুত দেখাইত। সাদা হীরাগুলা সূর্য্যের মত ঝক্ ঝক্ করিত; অয়স্কান্ত, নীলা, পদ্মরাগ, চুণীর প্রভায় অন্ধকার ঘর ঝল্‌মল্ করিত। প্রকাণ্ড বড় বড় নিরেট সোনার সিন্দুকগুলা হইতে সুবর্ণ আলোক প্রতিফলিত হইত। সেরূপ কেহ কখনও কল্পনাও করিতে পারে না!"

নাতিনী সুর করিয়া বলিল,—"গল্পটা বল না, দাদা মহাশয় ওকি বলিতেছ,—ভাল লাগিতেছে না।"

যজ্ঞেশ্বর স্বপ্নোত্থিতের মত বলিল,—"হাঁ, এই বলিতেছি। নারায়ণের একটি নাতিনী ছিল।"—

নাতিনী বাধা দিয়া সাগ্রহে কহিল, "কত বড়?—কত বড়, দাদা মহাশয়?"

"তোমারই মত মাথায় হইবে। আর অমনিই অনেকটা দেখিতে। নারায়ণের ইচ্ছা ছিল নাতিনীকে গৌরীদান করিবে। কত সম্বন্ধ আসিল, কত পাত্র দেখা হইল,—কাহাকেও আর তাঁহার মনেই ধরে না। অবশেষে একটি পাত্র মিলিল,—সে কোথাকার রাজার ছেলে! তাহাকে নারায়ণের পছন্দ হইল। তখন বিয়ের যোগাড় সুরু হইল।

"সে বিয়েয় কি কম ধূম হইয়াছিল! নারায়ণের মত

লোক ছয় মাস ধরিয়া আয়োজন করিয়াছিলেন। পুরা একমাস এই পরগণার ভিতর কাহারও বাড়ী হাঁড়ি চড়ে নাই। আর প্রকাণ্ড বড় সোণার ময়ূরপঙ্খী—ময়ূরের চোখ দুইটা চুণীর, পেখমে নীলকান্ত মণি বসান,—সেই ময়ূরপঙ্খী চড়িয়া, বাজী ছুঁড়িয়া, রোশনাই করিয়া, সাদা রেশমের পোষাক পরা বর যখন আসিয়া নামিল,—তখন সকলেই বলিল—'স্বয়ং কন্দর্প আসিয়াছেন'।"

নাতিনী কহিল, "তারপর ?"

যজ্ঞেশ্বর কহিল, "তারপর বিবাহ হইয়া গেল। সন্ধ্যার মুখে বর ক'নে চলিয়া গেল। আসন্ন অন্ধকারে নারায়ণ একলা ধীরে ধীরে তাঁহার সেই কুঠরীতে নামিয়া গেলেন। তারপর তাঁহাকে আর কেহ দেখে নাই।"

আর-একদিন এমনি সন্ধ্যা হইয়াছে। সেদিন পূর্ণিমা। প্রকাণ্ড গোল চাঁদ তখন সবেমাত্র গাছের ফাঁক দিয়া দেখা গিয়াছে। তাহার আলোয় প্লাবিত দাওয়ায় আগের মত যজ্ঞেশ্বর বসিয়া আছে। তাহার চারিদিকে ছোট ছোট মুখগুলির উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে।

যজ্ঞেশ্বরকে তাহারা আগের দিনের মত ধরিয়া বসিয়াছে, "দাদামহাশয়, একটা গল্প বলিতে হইবে।"

যজ্ঞেশ্বর প্রথমে তাহাদের কথা শুনিতে পায় নাই। তারপরে তাহাদের আব্দার শুনিয়া আস্তে আস্তে আরম্ভ করিল।

"কিছুদিন আগে এই গ্রামে একঘর গৃহস্থ থাকিতেন। গৃহস্থের অবস্থা বড় ভাল ছিল না; কিন্তু তাঁহাদের মত ধার্ম্মিক পরিবার আর দেখিতে পাওয়া যাইত না। গৃহস্থের সন্তান ছিল না; সেজন্য তাঁহাদের মনে কষ্ট ছিল। অবশেষে অনেকদিন পরে, অনেক দেবতার দোর ধরিয়া তাঁহাদের এমনি চাঁদের মত একটি মেয়ে হইল। তার নাম রাখা হইল—গৌরী।

"গৌরী যে সকলের কত আদরের হইয়াছিল, তা' বুঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু সবচেয়ে তাহাকে ভালবাসিতেন তাহার দাদা-মহাশয়। তাহাকে তিনি সর্ব্বদা কোলে করিয়া রাখিতেন। নিজে খাওয়াইতেন, নিজে ঘুম পাড়াইতেন,—আর একটু কাঁদিলেই অস্থির হইয়া পড়িতেন। সকলের আদরে আদরে গৌরী যখন দুই-বৎসরে পা দিয়াছে, তখন এক ঘটনা ঘটিল। গৌরীর দাদা-মহাশয় একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। অনেক অনুসন্ধান হইল; কত দিকে কত লোক খোঁজ করিল;—গৌরীর দাদা মহাশয়কে আর পাওয়া গেল না।

"তারপর অনেকদিন কাটিয়া গেল। গৌরী বড় হইল। এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থঘরে তাহার বিবাহ হইল। গৌরী এখন লোকজন, নাতি-নাতনীপূর্ণ সংসারে অন্নপূর্ণার মত বিরাজ করিতেছে; তাহার স্নেহে সকলেই বশীভূত। লোকের মুখে তাহার প্রশংসা আর ধরে না।

"একদিন—সে দিন মৌনী অমাবস্যা—গৌরী গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া অন্ধকারে পড়িয়া গেল। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গৃহে আনিল। কবিরাজ মহাশয় আসিয়া পাচনের ব্যবস্থা করিলেন; কিছু হইল না। গৌরীর বিকার দেখা দিল। কবিরাজ মহাশয় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন।

"গৌরীকে তুলসী-তলায় শোয়ান হইয়াছে। তাহার বড় ছেলে কুষীতে করিয়া কম্পিত হস্তে তাহার মুখে গঙ্গাজল দিতেছে। কর্ত্তা বাহির বাটিতে বসিয়া আছেন; তিনি আর এদিকে আসিবেন না বলিয়াছেন। নাতি-নাতিনীরা অবাক হইয়া চুপ করিয়া আছে। গ্রামের সকল মেয়েই সেখানে উপস্থিত হইয়া সতীর পায়ের ধূলা লইতেছে। কেহই চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

"এই সময় সেখানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে কেহ কখনও দেখে নাই। সন্ন্যাসীর তেজঃপুঞ্জ চেহারা দেখিয়া সকলে সরিয়া পথ করিয়া দিল। সন্ন্যাসী অগ্রসর হইলেন; কোন দিকে না চাহিয়া তিনি তুলসী-তলার গিয়া বসিয়া, গৌরীর মাথাটি আপনার কোলে তুলিয়া নিলেন, স্থির শান্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। গ্রামের লোক অবাক্ হইয়া দেখিল,—সন্ন্যাসীর চোখে জল!

"অনেক পরে গৌরী একবার চোখ মেলিল; মুখ তুলিয়া সন্ন্যাসীর পানে চাহিল;—মনে হইল সন্ন্যাসীকে সে চিনিয়াছে। সে একটু হাসিয়া আবার আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল। সকলে দেখিল, তাহার নিঃশ্বাস আবার

পূর্ব্বের মত সরল হইয়াছে। সন্ন্যাসী কোল হইতে মাথাটি অতি সন্তর্পণে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন—'ইহাকে ঘরে বিছানায় শোয়াইয়া দাও।'

"সন্ন্যাসী চলিয়া গেল, সকলে সবিস্ময়ে বলাবলি করিতে লাগিল। কেহ বলিল, 'সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি আসিয়া গিন্নি-মাকে আরোগ্য করিয়া গেলেন।' কেহ বলিল, 'ভগবান এমন সোনার সংসারে কখনই এমন সর্ব্বনাশ করিতেই পাবেন না, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে।' বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়ের মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

"সন্ন্যাসী যখন বাহির হইয়া যান—একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'ঠাকুর, অপরাধ লইবেন না—আমাদের গিন্নিমা কি আপনার কেহ হন?'

"সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন—'এক দিন ছিল, যখন এ-প্রশ্নের উত্তরে বলিতাম, সে আমার নাতিনী। আজ বিশ্বের সকল মেয়েই আমার নাতিনী'।"

যজ্ঞেশ্বর চুপ করিল।

একটি ছোট ছেলে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা-মহাশয়, সেই সন্ন্যাসীর নাম কি?"

তাহার এক ক্ষুদ্র দিদি ভাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতায় কৌতুক অনুভব করিল। সে কহিল,—"দূর বোকা, সন্ন্যাসীদের কি আবার নাম থাকে?"

যজ্ঞেশ্বর কহিল,—"সন্ন্যাসী সেই লোকটিকে বলিয়াছিল, "সংসার ছাড়িয়া আসিবার আগে আমার নাম ছিল যজ্ঞে—এই—মুরারি!"

(৫)

গভীর রাত্রি। আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া একটা তুমুল দুর্য্যোগের উদ্যোগ করিয়াছে। আকাশ জুড়িয়া মাঝে মাঝে একটা তামাটে দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে; কালো মেঘের কোলে তাহা অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। জোরে বহিল। বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটায় পড়িতে আরম্ভ করিল। তারপর সে কি ভয়ানক ঝড়, বৃষ্টি!

বাহিরে ভীষণ ঝঞ্ঝা কিসের নির্দ্দয় আক্রোশে সমস্ত পৃথিবীকে রসাতলে দিতে চাহিতেছে। ঘরের ভিতর উন্মাদ মানব তাহার সহিত সমতালে উন্মত্তভাবে দাপাইয়া বেড়াইতেছে।

পাগল প্রকৃতি অসহ্য রোষে কেশ ফুলাইয়া গর্জ্জন করিয়া মত্ত তাণ্ডবে মাতিয়াছে। বজ্রের নির্ঘোষে তাহার অবরুদ্ধ ক্রোধ হুঙ্কার দিতেছে; বিদ্যুতের তীব্র আলো তাহার নিষ্ঠুর খড়্গের মত ঝলকিয়া উঠিতেছে। সে যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, আছড়াইয়া, লাফাইয়া, মাথা খুঁড়িয়া আপনাকে ধ্বংস করিতে চাহে। ভিতরে, ঘরে আবদ্ধ উন্মাদও যেন বৃথা আক্রোশে গুমরাইয়া-গুমরাইয়া উঠিতেছে। সেও যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে দুইহাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে চায়। সেও আপনাকে চূর্ণ-চূর্ণ করিয়া ফেলিতে চাহে।

ঝড়ের দমকায়-দমকায় ঘরের চাল লাফাইয়া-লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। এই বুঝি সমস্ত ঘর-দ্বার প্রকৃতির ভীষণ উল্লাসে কোথায় উড়াইয়া লইয়া যায়। বৃষ্টির জল ঘরে আসিয়া পড়িতেছে। যজ্ঞেশ্বরের সে দিকে খেয়াল নাই। সে ঘরের ভিতর ছুটিয়া বেড়াইতেছে। দাঁতে-দাঁত লাগাইয়া একটা চাপা হুঙ্কার ছাড়িতেছে। দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মাথার উপরে কাঁপাইয়া-কাঁপাইয়া ঊর্দ্ধে তুলিতেছে। যজ্ঞেশ্বর সম্পূর্ণরূপে উন্মাদ হইয়াছে।

বাহিরের দুর্য্যোগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে; দূরে গাছপালা ভাঙ্গিতেছে; তাহার শব্দ বৃষ্টির অবিশ্রাম ধ্বনি ভেদ করিয়া কানে আসিয়া পৌঁছাইতেছে। আলগা জানালা ঝড়ের দাপটে সশব্দে খুলিতেছে আর পড়িতেছে এবং তাহার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে তীব্র উজ্জ্বল আলো আসিয়া বৃদ্ধ যজ্ঞেশ্বরের শুভ্র কেশের উপর, লোল চর্ম্মের উপর পড়িতেছে। তাহাতে তাহাকে বাহিরের সংহার-মূর্ত্তির ঠিক সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবির মত দেখাইতেছে।

বাহিরে ঝড়-বৃষ্টি যত বাড়িতেছে, ভিতরে যজ্ঞেশ্বরের উন্মত্ততাও যেন তত বাড়িতেছে। বাহিরে নির্দ্দয় প্রকৃতি অহঙ্কারী দাম্ভিক মানবকে তাহার অনুকম্পায় নির্ভরশীল জানিয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপে প্রলয় হাসি হাসিতেছে। ভিতরে যজ্ঞেশ্বর অট্টহাস্য করিল—"হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ!"

যজ্ঞেশ্বর পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া,

মুখের সম্মুখে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া উন্মত্ত কণ্ঠে চীৎকার করিল,—"সন্ন্যাসী!—সন্ন্যাসী!"

(৬)

প্রভাতে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইল। যজ্ঞেশ্বর তখন শান্ত হইয়াছে। একজন আসিয়া বলিল—"কে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন ;—তোমাকে দেখিতে চাহেন।"

যজ্ঞেশ্বর কহিল,—"তাঁহাকে এইখানে লইয়া এস।" নিজে উঠিয়া গেল না।

যে সংবাদ আনিয়াছিল, সে একটু আশ্চর্য্য হইয়া চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরকে এমন প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতে সে অনেক দিন শুনে নাই।

সন্ন্যাসী যখন আসিলেন, যজ্ঞেশ্বর তাঁহাকে প্রণাম করিল না। হয়ত প্রণাম করিবার কথা তাহার মনে ছিল না। কেবল তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, কেন আমাকে স্মরণ করিয়াছ?"

যজ্ঞেশ্বর কোন উত্তর দিল না।

সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন—"যজ্ঞেশ্বর, স্থির করিয়াছ কি? কি জন্য আমাকে ডাকিয়াছ?"

যজ্ঞেশ্বর কহিল—"ঠাকুর, আমি ত' ঠিক করিতে পারিলাম না। তুমি যখন এত দয়া করিয়াছ,—তুমিই বলিয়া দাও কোন্‌টা লইব।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "একবার ওই দর্পণখানার ভিতর চাহিয়া দেখ দেখি, যজ্ঞেশ্বর! এখন আর অনন্ত সম্পদ লইয়া কি করিবে? তোমার জীবনের আর কয়টা দিন বাকী আছে?"

যজ্ঞেশ্বর আয়নার ভিতর দেখিল। চীৎকার করিয়া বলিল,—"কি ভয়ানক!" তার পর আয়নাখানাকে আছড়াইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

যজ্ঞেশ্বরের পুত্র আর নাতিনী ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে এক সন্ন্যাসী দেখা করিতে আসিয়াছে শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে আসিয়াছিল।

তাহাদের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—"ওই দেখ, তোমার পৌত্রী। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—আর দুই দিন বাদে সন্তান হইবে। আর ঐ দেখ তোমার ছেলে ; তাহার চুলে পাক ধরিয়াছে।"

যজ্ঞেশ্বর সবিস্ময় দৃষ্টিতে পুত্র আর পৌত্রীর পানে চাহিল। কোন উত্তর দিল না।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"তোমার মাতা দারিদ্র্য-যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া মারা গিয়াছেন। তোমার স্ত্রী উন্মাদ হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তোমার পুত্র বৃদ্ধ হইয়াছে। বল, এখনও কি অনন্ত সম্পদ তুমি চাও?"

সহসা শিথিল-দেহ পলিত-কেশ যজ্ঞেশ্বর সিংহের মত লাফাইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর দুই কাঁধ দুই হাত দিয়া দৃঢ় করিয়া ধরিল। সজোরে ঝাঁকানি দিয়া কি যেন বলিতে গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর শব্দ বাহির হইল না ; কেবল ঠোঁট দুইখানি একবার কাঁপিল।

সন্ন্যাসী ডাকিলেন,—"যজ্ঞেশ্বর!"

পুত্র ডাকিল—"বাবা! বাবা!"

যজ্ঞেশ্বর উত্তর দিল না। সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছে। সামান্য মানবের আহ্বানে সাড়া দিলে তাহার মর্য্যাদার হানি হইবে।

বাংলা কথা-সাহিত্যের গতি

শ্রী তারিণীকমল পণ্ডিত

গতবৎসর দিল্লীতে প্রবাসী সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন, "আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই মনে পড়ে যে, এ যুগে যা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাচ্ছে তা হচ্ছে-গল্প। * * * যুগ-ধর্ম্ম অনুসারে পৃথিবীর সাহিত্যরাজ্যে এযুগে গল্পের অধিকার আস্‌ছে।"

প্রমথবাবু যাহাকে গল্পসাহিত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—উপন্যাস বা আখ্যায়িকা তাহারই অন্তর্ভুক্ত। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ভিতর দিয়াই তথা-কথিত উপন্যাসের পরিস্ফুরণ। বাংলা উপন্যাস-সৃষ্টিও যে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য প্রেরণা হইতে হইয়াছে ইহাতে মতদ্বৈধ নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে কথাসাহিত্যের উল্লেখ আছে। আলঙ্কারিকগণ ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "কথা প্রবন্ধেন কল্পনা, অথবা প্রবন্ধস্য অভিধেয়স্য কল্পনা স্বয়ং রচনা।" (১) কোহ্লনাচার্য্য বলিয়াছেন—"যে কল্পনাসৃষ্ট প্রবন্ধে অসত্যের ভাগ অধিক, সত্যপ্রমেয় প্রাজ্ঞ লোকেরা তাহাই কথা বলিয়া অভিহিত করেন। (২) সুতরাং সংস্কৃতে যে কয়েকখানা কথাসাহিত্য আছে, তাহা বর্ত্তমান বাংলা উপন্যাসের সহিত আংশিক সদৃশ হইলেও মূলতঃ ভিন্ন। নীতিশিক্ষা উপন্যাস-সৃষ্টির উদ্দেশ্যের অন্যতম; এবং এই হিসাবে 'কথাসরিৎসাগর', পঞ্চতন্ত্র, বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা উপন্যাসের সদৃশ, কিন্তু তাহা ছাড়া আরও বহু দিক্ দিয়া উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান আছে।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক্ দিয়া রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি কতকটা গণনার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, তাহা উপন্যাসের পর্য্যায়ে স্থানলাভ করে নাই। জাতীয় ইতিহাসের গৌরব-ভাতি স্বরূপই ইহারা প্রকাশ পাইতেছে সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের 'পরম্পরাশ্রয়া আখ্যায়িকা'র সহিত বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান 'কথার' প্রচুর বৈষম্য।

আধুনিক বঙ্গোপন্যাসের উৎপত্তির মূল প্রধানতঃ পাশ্চাত্য নভেল। সুতরাং বাংলা কথা-সাহিত্যের গতি নির্দ্ধারিত করিবার পূর্ব্বে ইহার আদি কারণ সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্ত অবান্তর হইবে না।

ল্যাটিন Novus শব্দ হইতে ইংরেজী নভেল শব্দের উৎপত্তি। Novus শব্দের অর্থ নূতন। সমসাময়িক সমাজ-জীবনকে ভিত্তি করিয়া যে কাল্পনিক কথাসাহিত্য গঠিত হইয়া উঠে, তাহাই উপন্যাস। ইহা নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস না হইলেও ঐতিহাসিক সত্যের অনুরূপ। (৩)

ঐতিহাসিক শুষ্ক সত্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে মানুষ যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন কল্পনাশ্রয়ে নিত্য নূতন লীলার সৃজন করিয়া সেই লীলামাধুরী উপ-ভোগের চাঞ্চল্য তাহাদিগকে উপন্যাস লিখিতে প্ররোচিত করিল। তাই, প্রাকৃতিক সত্যেরই মত সভ্যজগতের বিভিন্ন স্থানে প্রায় একই প্রকারে উপন্যাস রচনার এক প্রবল আগ্রহ সূচিত হইয়াছে।

বিশ্ব-সাহিত্যের উষরক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্ভব কাব্য-সাহিত্যের এই কাব্য-সাহিত্যের পরে গদ্য-সাহিত্যের ক্রমোৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতির যে ইতিহাস তাহাও বিভিন্ন দেশে অনেকটা একই রকমের। এই গদ্য-

(১) শব্দকল্পদ্রুমঃ।
(২) প্রবন্ধস্য কল্পনা-রচনা বহ্বনৃতাল্পোক সত্যা ইতিভরতঃ।
কল্পনাং স্তোক সত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাংবিদুঃ।

(৩) A literature to the study of manners founded on observation of contemporary or recent life in which the characters—the incidents and the intrigues are imaginary and therefore 'new' to the reader. Novel is not history, but one founded on line running parallel with the actual history—Encyclopaedia Britannica.

সাহিত্যের প্রথমাভ্যুদয়ে উপন্যাস বা আখ্যায়িকার স্থান নাই। ইহার ক্রমবিকাশের সহিত উপন্যাসের উৎপত্তি হইয়াছে। উপন্যাস যে আকার বা অনুভূতি লইয়া প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল, এখন তাহাও আর সেই প্রকার রহে নাই—ক্রমবিকাশের সঙ্গে বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে উপন্যাস ছিল, তাহাতে ও তৎপরবর্ত্তীকালের উপন্যাসে এমন বিরাট ব্যবধান লক্ষিত হয়, যাহাতে দুইকালের এই দুই কল্পনাসৃষ্টিকে দুই ভিন্ন বস্তু বলিতে প্রবৃত্তি হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কিছুই থাকিবে না।

তাই Classical literatureএ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া যত 'নভেল' দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রায় অধিকাংশই ঐতিহাসিক বিশিষ্ট ঘটনাকে আদর্শ করিয়া এবং মানুষের নৈতিক দিকের পরিস্ফুরণের জন্য নিবদ্ধ হইয়াছে। (৪)

"পূর্ব্ব-সাহিত্য আমাদের শিক্ষার উপকরণ যোগাইত, আর, আমাদের জ্ঞানবৃত্তি—চিত্তবৃত্তির অনুশীলনের জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন হইত, এখন বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহের জন্যও সাহিত্যের উপর লোকের দৃষ্টি পড়িল। বিলাসবাসনা মানুষকে এমনই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল—একটু অবসর পাইলেই মানুষ আমোদ খুঁজিতে লাগিল...... সাহিত্যসেবা করিতে হইবে, সেও আমোদের জন্য—আরামের জন্য।" উপন্যাস সেই আরামের জিনিষ ইহা চরিতার্থ করিবার জন্যই বোধ হয় ইউরোপে (আধুনিক) নভেলের সৃষ্টি—সেইজন্যই 'নভেলের' এত আদর।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উপন্যাস-সৃষ্টির প্রাবল্য দেখা যায়। Francesco da Barbarinoর Docimenti d' Amor কিম্বা Boccaccioর Decameron প্রভৃতিতে কল্পনাশক্তির অনন্তলীলাবৈচিত্র্যের সমাবেশ নাই—স্বকীয় ধর্ম্মাজভূত বহু পৌরাণিক দেবদেবী ঘটিত, দৈহিক শৌর্য্যবীর্য্য এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের বাস্তব চরিত্রের ছায়াপাতই লক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে (অষ্টাদশ শতাব্দীতে) Francesco Sacchatti-কৃত Trecente Novelleতে সমাজসৃষ্টির বিশ্লেষণ ও ব্যঙ্গ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়।

উপন্যাস-জগতে ফরাসী-জাতির কৃতিত্বও অসাধারণ। কিন্তু এই কৃতিত্ব উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সম্যক্ সাধিত হয় নাই। ষ্টেনড্যাল (Stendhal) দেখাইয়াছেন, ফরাসী-উপন্যাসে কেমন করিয়া শুদ্ধ ভাষার চাতুর্য্যকে অবহেলা করিয়া কেবল মনোবিজ্ঞানের অণুবীক্ষণ সহকারে মানবজীবনের কর্ম্মসমষ্টি অপূর্ব্ব রমণীয়তা-সম্পন্ন হইয়াছে। জোলা, মুপাসাঁ, ডুমা প্রভৃতি অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্যের প্রয়োগে সমগ্র মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাল্পনিক রূপ-প্রসাধন করিতে যত্নপর হন নাই। পরন্তু ইহাকে লোকশিক্ষার উপযোগী করিয়া লইতেই চেষ্টা করিয়াছেন।

ইংরেজী সাহিত্যে প্রথমে ক্যাক্সটন (Caxton) কর্ত্তৃক (Sir Thomas Malory) ম্যালরী কৃত LeMorte d' Arthur প্রকাশিত হইয়াছিল। র‍্যালে (Raleigh) ইহার সমালোচনাসূত্রে বলিয়াছেন—"এই পুস্তকে গদ্য অপেক্ষা কাব্যেরই প্রাচুর্য্য।' ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। সেইরূপ, এলিজাবেথীয় যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিচিত্র কল্পনা তুলিকায় অপূর্ব্ব চরিত্র চিত্রণে কাহারও তেমন অধ্যবসায় কিংবা একাগ্রতা দৃষ্ট হয় না। পরন্তু ইংরেজী উপন্যাস-জগতে দ্রুত পরিবর্ত্তন এলিজাবেথীয় যুগের পর হইতেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডিফোই প্রথমে নিরেট সূক্ষ্ম অনুসন্ধান কল্পনাতুলিকায় সুস্পষ্ট করিয়া তুলেন। স্যামুয়েল রিচার্ডসন্ বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, উপন্যাস দ্বারা নীতি শিক্ষা হওয়া উচিত। যাহাতে অপরিণত বুদ্ধি যুবকবৃন্দ আপনাদিগকে পতনের মুখ হইতে সামলাইয়া লইতে সমর্থ হয়। হোরেস ওয়ালপোল, জনসন, জনষ্টোনস্ প্রভৃতির লেখাতে তত্তৎসময়ের ভীতিপূর্ণ রোমাঞ্চকর অবাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার (Pseudo-historical themes of horror and romance) প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর জেন অষ্টিন, স্কট, ডিকেন্স, এন্থনি ট্রলোপ হইতে বর্ত্তমান কালের টমাস্ হার্ডি, বার্ণাড শ পর্য্যন্ত উপন্যাস জগতে-অনুভূতির ক্রম পরিবর্ত্তনের পর্য্যায় সূচনা করে।

(৪) Vide—Milesika Aristides Lucius or Ars Lucian, in 2nd. century.

রুষিয়ার পূর্ব্ব সাহিত্য উপন্যাস সম্পদে বিশেষ সম্পন্ন ছিল না। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্কটের অনুকরণেই ইহার কথা সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে টুর্গেনিভ, ডস্টয়ভেস্কি, টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষীর সৃষ্টি প্রাচুর্য্য সহসা রুষিয়ার সাহিত্যকে সম্পন্ন করিয়া লওয়ায়, ইহা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের লোভনীয় মোহময় বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাহিত্য-জগতে এইরূপে একই নিয়মে ক্রমপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে।

সভ্যতার প্রারম্ভে, বাস্তব জগতেই মানুষের অনুধাবন করিবার এত অধিক বিষয় ছিল যে, এই সব বিষয় ছাড়িয়া প্রকৃতের [অতিপ্রাকৃতরূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন কিংবা প্রবৃত্তি মানুষের হইয়া উঠিত না—তাই প্রত্যেক জাতিই স্বীয় জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোদ্দিপ্ত বস্তু অবলম্বন করিয়াই সার্ব্বজনীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে এই একঘেয়ে বাস্তবের রসাস্বাদ করিয়া আর তাহার সুখ মিলিল না। সারা-দিবসের কঠোর কর্ম্মক্লান্তি লইয়া সন্ধ্যায় যখন মানুষ আলয়ে আসে স্বভাবকে কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া মজিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি তখন তাহার বলবতী হইয়া উঠে। 'পূর্ব্বকালে মানুষের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কোনও প্রকার উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হয় নাই। তখন পারিবারিক ও সামাজিক মিলন ও মেলনক্ষেত্রে নানা কথার অবতারণা করিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেও তাহাদের ব্যত্যয় হয় নাই। কিন্তু ক্রমে যখন পুকুরের মাছ, বাগানের শাক এবং ক্ষেতের ধান খাইয়া দিন-গুজরানো আর চলিল না—পরিবারে জন সংখ্যা বৃদ্ধিতে আপ্রাতঃ-সায়াহ্ন শক্তির অপচয় করিতে হইল তখন তাঁহাদের মেলন-ক্ষেত্রে অলস ব্যসনে বসিয়া গল্প বলা বা শুনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি লোপ পাইতে লাগিল। তাই দিনান্তের উৎকট ক্লান্তির পর আপনাকে নিঃসঙ্গ রাখিবার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ায়, সেই ইচ্ছাকে বাঁচাইয়া রাখিবার আহার্য্য স্বরূপ নভেলের সৃষ্টি হইল।

ক্রমে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ের অনুভূতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক যুগে যে-নভেলের উদ্ভব হইল তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল অহৈতুক শিল্প সাধন (art for art's sake)। ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা নীতিশিক্ষাকে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের অপ্রয়োজনীয় করিয়া মনোবিজ্ঞানের জটিল তথ্যের বিশিষ্ট বিশ্লেষণে মানব-চরিত্রকে অহৈতুক ভাবে পরিকল্পিত করার প্রবৃত্তি এই যুগের বিশেষত্ব। তাই বাস্তব চরিত্রের নৈতিক হানিকর অশ্লীলতা এই যুগের শিল্পীর বিতৃষ্ণা উদ্রেক করে না। বস্তুতঃ ফটোতে আর চিত্রশিল্পেতে যাহা তফাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য সৃষ্টিতেও তদনুরূপ প্রভেদ। ফটো বস্তুর যথার্থ প্রতিকৃতি, কিন্তু চিত্রশিল্পে যথার্থ প্রতিকৃতির বাহিরেও শিল্পীর কল্পিত অনুভূতি সংযোজিত থাকে। সুতরাং গল্পাংশ বা আখ্যায়িকাকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আধুনিক শিল্পী স্বাভাবিকের যথার্থ মনোগত অভিব্যক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যখন এইরূপে উপন্যাসের উপাদান আহরিত ও পরিণত হইয়া আসিতেছিল বাংলার জাতীয় সাহিত্যেও ইহার ব্যতিক্রম অল্পই দৃষ্ট হইতেছিল। তবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানব প্রকৃতিতে ও সমাজে মনের পার্থক্য নিবন্ধন উভয়ের সাহিত্যের পরিণতিতেও বৈষম্য থাকা স্বাভাবিক।

বলিতে গেলে, বাংলায় প্রথম উপন্যাসের সৃষ্টি টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ) হাতে। 'আলালের ঘরের দুলাল' বঙ্গভাষার তথা বঙ্গ সাহিত্যের চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় সম্পদ। "আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে অন্য কোনও গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।" (৫)। তবে প্যারীচাঁদের বিশেষত্ব গৌরবোজ্জল উপন্যাস সৃষ্টিতে নহে। তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" কলাকৌশলে পরিণত উপন্যাসও নহে—বাংলার তৎকালীন সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি এক নূতন রূপ সৃজন করিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

বাংলার গদ্য সাহিত্য যদিও দশম ও একাদশ শতাব্দীতেই জন্ম লাভ (৬) করিয়াছিল এবং প্যারীচাঁদের

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র।

(৬) শূন্যপুরাণ (রমাই পণ্ডিত], চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি (১০৮১] চণ্ডীদাস ঠাকুর। অলম্বন চন্দ্রিকা, যোগপটল ইত্যাদি একাদশ শতাব্দীর গদ্য বঙ্গসাহিত্য।

পূর্ব্বেও কথা সাহিত্যের পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল তথাপি প্যারীচাঁদই তাঁহার গ্রন্থে প্রথম দেখাইলেন "যে ভাষা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত তাহার দ্বারা বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করা যায়। আর দেখাইলেন সাহিত্যের প্রধান উপাদান আমাদের ঘরেই (৭)।

প্যারীচাঁদের উপন্যাসের পূর্ব্বেও 'ভ্রমর পদ্মিনী' 'শীতবসন্ত' 'সুলোচনা হরণ', চণ্ডীচরণ মুন্সীকৃত 'তোতার ইতিহাস' প্রভৃতি উপন্যাস রচিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন-কোষ ভিন্ন ইহারা আর কিছুই নহে। তাহাতে রচনার কারুকার্য্য নাই, শিল্প সৃষ্টির বৈচিত্র্য নাই, আখ্যান ভাগের উদ্দেশ্য বা ভিত্তি মাত্র নাই—তদুপরি শিশু বঙ্গ সাহিত্যের অস্ফুট অমার্জ্জিত ও অপরিণত ভাষা প্রয়োগ বর্ত্তমান উন্নত সাহিত্যক্ষেত্রে একান্ত অশ্রাব্য ও অপাঠ্য বলিয়াই হয়ত গণ্য হইবে। (৮)

বাংলার লোভনীয় কবি-কুঞ্জ হইতে মাত্র অব্যাহতি লাভ করায়, কাব্যের মোহময়ী মদিরার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই বলিয়া স্থানে স্থানে এই ভাষা কবিতা-বিমিশ্র ছিল। অধিকন্তু ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির সংস্কৃত কবলিত বাংলা ভাষার দার্শনিক গভীরতত্ত্ব বিশ্লেষণে জাতীয় প্রাণ হাঁপাইয়া উঠার উপক্রম করিয়াছিল। তাই, এই সমস্ত দুরূহতার লৌহশৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্ট বিশেষের অনুসন্ধান না করিয়া প্যারীচাঁদ আসরে নামিলেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট, এইজন্যই তিনি বঙ্গ সাহিত্যের গগনে অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক'।

ভূদেববাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সফলস্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়' এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপেঁচার নক্সা' বাংলা নাটক ও উপন্যাসে কথোপকথনের ধারার পরিবর্ত্তন করিয়াছে"। (৯) তথাপি, উপন্যাস বলিতে যে অনুভূতি হয়, বাংলাসাহিত্যে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্য কি ছিল এবং পরে কি হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি—"বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা, তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন—তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবি সমুজ্জ্বল তুষার-কিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরি পরিষদ্‌বর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গ-সাহিত্যও সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতিলাভ করিয়াছে।"

উপকথা কিংবা পৌরাণিক গল্পের পরিণতি ঐতিহাসিক বাস্তব আখ্যায়িকার আর এক আখ্যায়িকা, সমগ্রমানব চরিত্র ও সমাজ জীবনের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ মনোবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বের সুপ্রাঞ্জল নিরসন—ও তথাকথিত art সমন্বিত উপন্যাসে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়। বাংলার রসসাহিত্য এই ক্রমে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল সেই সময়ে তিনি অযথা গল্প ইত্যাদিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া উপন্যাসরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারই সময়ে বাংলাসাহিত্যের নিজস্ব সম্পদ স্ব-রূপের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাস ঐতিহাসিকতার নিদর্শন। 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি সুপ্রচুর সমাজ জীবনের বিচিত্র বিশ্লেষণের উদাহরণ। অন্যদিকে আবার যাঁহারা Art for art's sake সূত্রানুরাগী তাঁহারা 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতিতে কবিবর 'ভূষারদানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ চিত্রাকথা বাচিবিদগ্ধতা চ' উপভোগ করিয়া প্রীত হইবেন এবং তাঁহার কুহকিনী কল্পনা ও বিচিত্র লিপিচাতুর্য্যের বহুমান করিবেন।" (১০)। বাস্তবিক "আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতন, একতারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম্ম সংকীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল, বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া

(৭) বঙ্কিমচন্দ্র

[৮] উদাহরণ—"হিম ঋতু যথ দিনছিলো ততদিন ভ্রমর কেতকী ইত্যাদি ফুলের মধু খাইত পরে বসন্ত ঋতু আইসে উপস্থিত হওয়াতে পূর্ব্বকার আহ্লাদে পদ্মিণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন—গুন গুন ভমরা বন্ধু খাইয়া কেতকীর মধু ইত্যাদি।

(৯) স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

(১০) ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন, পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতীরাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।" (১১)। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একজীবনেই উপন্যাসকে শৈশব হইতে লালনপালন করিয়া যৌবন অতিক্রম পূর্ব্বক প্রৌঢ়ত্বে আনিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিতে একালের artকে একেবারে বাদ না দিলেও, তাঁহার লেখনী প্রধানতঃ নীতি শিক্ষাকেই অবলম্বন করিয়াছিল। "আকাশে যেমন নক্ষত্র-রাজি বিক্ষিপ্ত আছে বঙ্কিমবাবুর রচনাতে তদ্রূপ সু-নীতি রত্ন তারকার ন্যায় চক্‌মক্‌ করিতেছে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস প্রথম প্রথম সংযমশিক্ষা দিয়াছে—ক্রমে তাঁহার উপন্যাসের ধর্ম্মনীতি বিকাশিত হইয়া দেবীচৌধুরাণীর নিষ্কাম পারিবারিক ধর্ম্মচেষ্টা, সত্যানন্দ প্রভৃতির নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেম এবং জয়ন্তী সন্ন্যাসিনীর নিষ্কামধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। সেখানে নিষেধমূলক ধর্ম্মনীতি ত আছেই, তাহার উপর বিধিমূলক, প্রীতি মূলক, পরার্থপরতামূলক, আত্মবিস্মৃতিসাধক, দেহের ও বাসনার বন্ধন মুক্তি সাধক ধর্ম্ম—মহাপ্রাণাত্মক ধর্ম্ম আছে।" (১২)। মানবচরিত্রের সুসংবদ্ধ গঠনোপযোগী ধর্ম্ম সাধনের প্রতি তাঁহার লিপ্তমন সু-শৃঙ্খল বৈচিত্র্য সমন্বিত অহৈতুক শিল্পসাধনের দিকেও তীব্র সন্ধান রাখিয়াছিল। তাই তাঁহার অমর বাণী ঘোষণা করিয়াছে,"যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতের নিষ্কামধর্ম্ম একত্রিত হইবে সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে।"

"ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি সেই সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর।" বঙ্কিমের উপন্যাস-কলা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে নাই, তাই বলিয়াই তাঁহার সৃষ্টি বড় সুন্দর। জড় ও চৈতন্যের একোত্তর সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মাতৃবন্দনার যে সুর তিনি ধরিয়াছিলেন সেই সুরের কল্যাণে বিশ্বের সাহিত্য-পরিষদে বাংলাসাহিত্যেরও স্থানলাভের সুযোগ হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রমেশচন্দ্র, দামোদর, সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি লেখক বাংলা উপন্যাসকে সম্পন্ন করিলেও ঐতিহাসিক তথ্যই প্রধানতঃ তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ জোগাইত। রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণে' পাশ্চাত্য প্রভাব পূর্ণ দৃষ্ট হয়। ইহা টেনিসনের 'এনক্ আর্ডেনের' অনুসরণে লিখিত।

"মানুষের ভাষা একটা স্রোত, মানুষের মনও একটা স্রোত, এবং এই দুই স্রোত মিশিয়া যে-স্রোতের সৃষ্টি করে তাহার নাম সাহিত্য স্রোত। এ স্রোতের অন্তরে কখনো আসে জোয়ার কখনো আসে ভাটা" (১৩)। বিশ্ব সাহিত্যের ছন্দোবদ্ধ কাব্য সৃষ্টির স্রোতে ভাঁটা পড়িয়া যাওয়ার পরেই যে জোয়ার আসিয়াছে তাহা কথা-সাহিত্যের স্রোতের জোয়ার। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ হইতে উদ্ভূত সাহিত্য-প্রবাহের জোয়ারাভিমুখে আমরা তারকনাথ—স্বর্ণকুমারী—শিবনাথ প্রভৃতির শক্তি সংযোগ দেখিতে পাই। বিশেষ কোনও নূতন উপাদানে না হইলেও এই শক্তি বাংলাসাহিত্য সম্পদকে যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

অতঃপর যিনি উপন্যাসে নূতন উপাদান সংযোজনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনি বিশ্ববরেণ্য কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ভাবরাশি ব্যষ্টিবদ্ধ নহে সমষ্টিগত; তিনি শুধু বঙ্গজনের নহেন, বিশ্বের। তাই বাংলার তথা ভারতের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লইয়া একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সরল সংহত ও ঐকেন্দ্রিকতা-যুক্ত প্লট সৃষ্টি করিয়াছেন—অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সমাজমনের ভাবতরঙ্গে হিল্লোল তুলিয়া, অসংহত ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা এবং চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

"পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী যথার্থ A-posteriori কিন্তু প্রাচ্য চিন্তা-প্রণালী A-priori. প্রাচ্যেরা কার্য্যানুসন্ধান করেন, প্রতীচ্যেরা কারণানুসন্ধান করেন। হিন্দুর চরিত্র-চিত্র সংগঠন মূলক (synthetic) বিলাতী কবির চরিত্র-চিত্র বিশ্লেষপূর্ণ (analytic)। আরও একটি পার্থক্য

(১১) রবীন্দ্রনাথ।
(১২) জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।
(১৩) প্রমথ চৌধুরী।

এই যে, বিলাতী নভেল অধিকাংশ Realistic, কিন্তু দেশী উপন্যাস Idealistic পাশ্চাত্য ভাবানুভূতিকে দেশীয় ভাবের সহিত সংযোজনা করিয়াছেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথের বাংলা উপন্যাসে নূতন উপাদান সৃষ্টি। রবীন্দ্র-পূর্ব্বোপন্যাস বহুশঃ Synthetic—a-priori এবং Idealistic ছিল—তিনি তাঁহার গোরা, চোখের বালি প্রভৃতিতে নূতন করিয়া analytic a-posteriori এবং realistic ভাবরাশির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতে আর এক ঘটনার সূচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ চরিত্র সন্নিবেশই ইহার লক্ষণ।" (১৪)

"উপন্যাসে মানবমনের বহিঃপ্রকাশ অপেক্ষা অন্তঃপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের রচনার বিশেষত্ব। * * মনোবিজ্ঞানে বিশ্লেষিত মনের চিত্র যখন আমাদের নিকট নিতান্ত abstract বলিয়া মনে হয়—তখন যদি এক একটি মনোবৃত্তি জীবন্ত মানুষে অর্পণ করিয়া আমরা তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাই তাহা হইলে দর্শন শাস্ত্রটা একটা জটিল পদার্থ না হইয়া আমাদের কাছে মোহকরই হয়।" (১৫)

এমনি একটা চিন্তার ধারা জর্জ্জ ইলিয়ট্ পাশ্চাত্য সাহিত্যে বহাইয়াছিলেন এদেশেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন যোগ রাখিতে গিয়া তাঁহার উপন্যাসের ভিতর দিয়া ঘোষণা করিলেন, "পৃথিবীতে যাহারা সাহস করিয়া নিজের জীবনের দ্বারা নবনব সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হয় তাহারাই সমাজকে বড় করিয়া তোলে। যাহারা কেবল বিধি মানিয়া চলে তাহারা সমাজকে বহন করে মাত্র—তাহাকে অগ্রসর করে না।" (১৬)

রবীন্দ্রনাথের সমসময়ে বা পরে এ যাবৎ বাংলার কথাসাহিত্যের লেখকগণের উপরে জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁহারই প্রভাব লক্ষিত হইতেছিল। বস্তুতঃ শক্তিশালী মানুষের সংস্পর্শে থাকিলে তাঁহার প্রভাব মুক্ত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়। তথাপি বর্ত্তমান বাংলার সাহিত্য-জগতে শরৎচন্দ্রও একটা নূতন বৈশিষ্ট্যের দাবি করিয়া লইয়াছেন। রবিরথচক্ররেখা অনুসরণ করিয়াই তিনি তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছিলেন বটে, তবে মনোবিজ্ঞানের আরও-একটা নূতন দিক তিনি খুলিয়াছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পার্থক্য। "উপন্যাস রচনা করিতে নায়ক-নায়িকার কার্য্যকলাপই যথেষ্ট নহে—তাহাদের মনের পরিচয় চাই।" (১৭) ইহা অন্তরে রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ মনোবিজ্ঞানের abstraction বা ছায়াকে বস্তুতে আরোপ করিয়াছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র এতদতিরিক্ত দিয়াছেন প্রত্যেক চরিত্রে একটা সমবেদনা বা সহানুভূতির আস্তরণ। গৃহ ও সমাজ জীবনে স্নেহ ভালবাসা স্বাভাবিক আধার হইতে বঞ্চিত হইয়া অহরহ যে কত গভীর বেদনার—কতদুঃখ গ্লানি ও লজ্জার সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে শরৎ-বাবু সেই ক্ষুব্ধ ব্যথিত ব্যর্থ প্রেমের বেদনার পুরোহিত।" (১৮)

শরৎচন্দ্র ব'লিয়াছেন পাপকে দূর করিতে সমাজ যদি অক্ষম হয় তবে ইহাকে সহ্য ও ক্ষমা করিবার ক্ষমতা জাগাইয়া তোলা দরকার। তাই তিনি ইব্‌সেনী শিল্প-চাতুর্য্য (art) রূপ আর এক নূতন উপাদান বাংলার উপন্যাসজগতে আনয়ন করিয়াছেন। মারে বলিয়াছেন—রচনার বিষয় চারিদিকে ছড়াইয়া আছে যাঁহার শক্তি আছে, দৃষ্টি আছে তিনি উহা লইয়া ইচ্ছামত সাহিত্য গড়িতে পারেন।

শরৎচন্দ্রের আরও-একটা বিশেষত্ব তাঁহার লিপিকলার অনন্য-সাধারণ গঠন চাতুর্য্যে। ভাষার উপরে শরৎচন্দ্রের যে অসাধারণ কর্তৃত্ব আছে তাঁহার রচনায় যে নূতনত্ব, যে লালিত্য আর যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহাতে নিতান্ত একঘেয়ে বিষয়ও চিরনবীন—চিরচমৎকারিতা গুণবিশিষ্ট হয়। তাই বিচিত্র রচনা কৌশল এবং শিল্পচাতুর্য্যও যে উপন্যাসের উপাদান যোগাইতে সক্ষম—শরৎসাহিত্য হইতে ইহাও আমরা লক্ষ্য করি।

বাংলার কথা-সাহিত্য পাশ্চাত্য Novel এর অনুসরণে হইলেও তদনুযায়ী দ্রুত পরিবর্ত্তন বাংলা উপন্যাসের হয়

(১৪) অক্ষয়কুমার কৃত বঙ্কিমচন্দ্র।
(১৫) ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী)
(১৬) রবীন্দ্রনাথ—"গোরা"

(১৭) ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—(প্রবাসী)
(১৮) রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ)

নাই। তাহার হেতুও আছে—যেমন "দাশুরায়ের পাঁচালী দাশরথীর ঠিক একলার নহে, যে সমাজ সেই পাঁচালী শুনিতেছে তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালী রচিত। এই জন্য এই পাঁচালীতে কেবল দাশরথীর একলার মনের কথা পাওয়া যায় না—ইহাতে একটি বিশেষ কালের ও বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ বিরাগ শ্রদ্ধা বিশ্বাস রুচিবিকৃতি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।" সেইরূপ কথা-সাহিত্য সৃষ্টিতেও সমাজ-জীবনের সহিত সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ বর্ত্তমান। বাংলার সামাজিক বৈচিত্র্যের অপ্রতুলতা-নিবন্ধনই বাংলা সাহিত্যে নূতন নূতন উপাদান সৃষ্টি হইতে বিলম্ব হয়। শরৎ-বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসার নাই—সৈন্য-সামন্ত নাই, অস্ত্রের ঝনঝনা নাই, গুলিবারুদ নাই, বিদেশ-যাত্রা নাই, বিমানবিহার নাই, অর্ণবপোত নাই। এ সব না থাকা সত্ত্বেও কি আমরা তেমন একটা কিছু সৃষ্টি করিতে পারি?" বাস্তবিক প্রকৃতের অতি প্রাকৃত রূপ সৃষ্টি কল্পনার ক্ষমতান্তর্ভুক্ত-ইহার বাহিরে আর কিছু নহে। তাই জুলেভার্ণের মত Two Thousand Leagues Under Water কিম্বা Round the Moon এর মতন কিছু লিখিতে গেলে তদপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই হইবে না। বাংলার আছে শুধু এক সমাজ—এই রক্ষণশীল সমাজ অবলম্বন করিয়া আর কত নূতন উপাদানের সৃষ্টি করা যাইতে পারে? "তাই এই যুগে যত গল্প সাহিত্য বিকাশ পাচ্ছে—তার সবগুলিই যথার্থ বাস্তব কুসুম নহে—কাগজের ফুলও আছে। তা সত্ত্বেও গল্প সাহিত্যের আতিশয্য বঙ্গ-সাহিত্যের একটা শুভ লক্ষণ মনে করি। দশে মিলে যে জমি তৈরী করে' যাচ্ছেন তার উপরে কাব্যের যথার্থ ফুল ফুটবে।...গল্প-সাহিত্য হ'তে জাতির নব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।...ইহার অন্তরে একটা নূতন আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠ্‌ছে। সে আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আমাদের জীবন চিরাগত আচার ও সংস্কার বদ্ধ। বাঁধা-ধরা আচার-বিচারের হাত হ'তে মুক্তি লাভের কল্পনাই এই নব-সাহিত্যের মূল কল্পনা।" (১৯) কেন না, বাংলার কথা-সাহিত্যকে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন করিয়া সমৃদ্ধ করিতে হইলে বাঙ্গালীর জ্ঞান ও কর্ম্মের বৃত্ত আরও অধিকতর বর্দ্ধিত করিতে হইবে—সমাজ-বেষ্টন আরও বৃহত্তর করিয়া লইতে হইবে। নতুবা বিশ্বের সাহিত্য-সভায় একযোগে বসিতে বঙ্গজনের একটা বিশেষ রকমের দীনতা অনুভূত হইবে।

১৯ প্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীকে লিখিত পত্রাবলী

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Thomson House
Almora

স্নেহাস্পদেষু

তোমার চিঠি পাইয়া বড় খুসি হইলাম। তোমরা যে দুটি মধুকরের মত শান্তিনিকেতনের নীলাকাশ শতদলের প্রচ্ছন্ন মধুটুকু শুব্ধ হইয়া আনন্দে উপভোগ করিতেছ ইহা আমার পক্ষে সুসংবাদ। তোমরা যেখানে যাত্রা করিতেছ তাহার পথ কাহাকেও দেখাইয়া দেওয়া চলে না। শান্তিনিকেতনে আমি এত দিন ধরিয়া এত লোক জোটাইয়াছি—কত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ এই মাঠের উপর দিয়া মৌন সন্ন্যাসীর মত চলিয়া গেছে,—কেবা তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, প্রশ্ন করিয়াছে, কে বা এই দিগন্ত-প্রসারিত আকাশের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া বিশ্বলোকের সহিত অন্তরাত্মার নিগূঢ় যোগ অনুভব করিয়াছে?

তোমরা, কি বিশ্বের, কি মানব-প্রকৃতির, কি সংসারের, কি সাহিত্যের বহির্দ্বারের জনতা ছাড়াইয়া নিভৃত অন্তঃপুরের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর স্বহস্তের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ ইহাতে আমি আশান্বিত হইয়াছি। পাণ্ডবগণ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনাকে ছাড়িয়া একা কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহারা জয়ী হইয়াছিলেন। তোমরাও পুঁথিগত অভ্যস্ত বিদ্যার পথ, সহস্রের পথ, সমালোচকের পথ ছাড়িয়া নিজের অন্তরতম ধ্রুব আদর্শের এক মহাপথ ধরিয়া সার্থকতায় উত্তীর্ণ হইবে এই আমি আশা করিতেছি। সতীশের সম্মুখে একটি সার্থক পরিণাম প্রতীক্ষা করিয়া আছে ইহা আমি বিশ্বাস করি—তুমিও তাহার সঙ্গী হইবে এই আমার কামনা।

সেক্‌স্‌পিয়র সম্বন্ধে নূতন করিয়া অনেক কথা ভাবিবার ও বলিবার আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিয়ো না। এখনো মনের কথা মনে রাখিয়া দাও। কোন বৃহৎ প্রতিভার প্রকৃত মর্ম্মস্থানে পৌঁছিতে সময় লাগে। হঠাৎ একটা কোন মতের মধ্যে নিশ্চিতভাবে নিজেকে খাড়া করিলে অনেক সময় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পায়। কিন্তু যাহাই হোক্ আর কাহারো কথায় নিজের বিচার-শক্তিকে খাট করিয়ো না—সব-চেয়ে যে বড় আদর্শ তাহাই দিয়া সাহিত্যকে পরিমাপ করিবে। সে আদর্শ সর্ব্বত্রই এক—তাহা নিত্য—তাহা ধর্ম্মের বৃহত্তম আদর্শ—তাহা সংসারে ও সাহিত্যে এক ভাবেই খাটে—সংসারে তাহার বিকাশ অন্যভাবে এই মাত্র প্রভেদ। নীতি-ব্যবসায়ীদের সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের ভড়ঙের কথা আমি বলিতেছি না।

ব্যস্ত আছি। ইতি ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

গিরিডি

কল্যাণীয়েষু

বিদ্যালয়কে কতকগুলি জঞ্জাল হইতে মুক্ত করিতে হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। শীঘ্রই সে-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইব। আপাতত মনের মধ্যে অবিচলিত শান্তি রক্ষা করিয়া দৃঢ় বলে, দৃঢ় বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাও। বাহিরের কোনো ঘটনাতেই মনকে চঞ্চল হইতে দিয়ো না। অভিভাবকদের দিক্ হইতে আমাদের সমস্ত লক্ষ্য ফিরাইয়া আনিয়া বিদ্যালয়ের অন্তর্গত আদর্শের দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। সত্য বর্ত্তমান দুর্ঘটনায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। ইহা তাহার নিশ্চয় বোঝা উচিত যে, গুরুতর বিঘ্ন-বিপত্তি স্বীকার করিয়া লইয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। এ সংসারে কেবল আমরাই সমস্ত বাধাবিপদ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অনায়াসে কাজ করিয়া যাইব এমন অপরিমিত সৌভাগ্য আমরা কিছুতেই আশা করিতে পারি না। দুর্য্যোগের জন্য প্রস্তুত থাকিতেই হইবে। বস্তুত এখন আমি কেবল সত্যেন্দ্রের জন্যই উদ্বিগ্ন আছি আর কোনো দুশ্চিন্তা আমার নাই। আমি স্থায়িভাবে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার উপযুক্ত বল ও স্বাস্থ্য সংগ্রহ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। বারবার কাজে যোগ দিয়া বারবার ফিরিয়া আসিয়া কোনো ফল নাই। যদি একবারের মত দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকিতে হয় সেও ভাল তবু ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করা কিছু নয়। এখানে আমার শরীর ভালই আছে। রথী এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। ইতি ১৭ই ভাদ্র ১৩১১

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

ছুটির পরে বিদ্যালয়ের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারের কথাই চিন্তা করছিলুম। অভ্যাসের জড়তায় ভিতরের কথাটা ভুলে গিয়ে অনেক সময় কর্ম্ম নির্জ্জীব হ'য়ে যায়—আমরাও তার কাছ থেকে কিছু পাইনে তাকেও আমরা কিছু দিতে পারিনে—অন্তঃকরণের সঙ্গে, কাজের সঙ্গে মর্ম্মগত যোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। এর প্রতিকার করবার চেষ্টা করতে হ'বে নইলে বিদ্যালয় আমাদের পক্ষে কেবল ভার হ'য়েই উঠ্‌বে, আমাদের ভার বহন করবে না। ঈশ্বর ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থিমোচন করে' দিয়ে আমাদের

যথার্থভাবে সকলের সঙ্গে যুক্ত করতে থাকবেন, এই আশা আমার মনে দৃঢ় আছে এবং স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি আমাদের ভিতরকার তার কেউ একজন বাঁধছেন—বেসুর ধীরে ধীরে ক্রমেই সুরের দিকে যাচ্চে—ইতিমধ্যে আমরা যে পীড়া অনুভব ক'রে এসেছি সে এই সুর বাঁধবারই পীড়া—এখনো অনেক পীড়া সইতে হবে কিন্তু সেটাই চরম নয়, সঙ্গীতই চরম, এ আমি বেশ বুঝতে পারচি।

আমরা কার্ত্তিকের শেষেই বিদ্যালয়ে যাব। বেলা যেমন ক্লাস পড়াচ্ছিল তেম্‌নি পড়াবে। আর একটি মেয়েও বাংলা পড়াবার ভার নিতে পারবে—সে বাংলা বেশ ভালই জানে।

যে সব অধ্যাপকরা পীড়িত এবং শীঘ্র কর্ম্মে যোগ দিতে পারবেন না তাঁদের অভাবে সেশনের আরম্ভে বিশেষ অসুবিধা হ'বে বুঝতে পারচি। প্রত্যেক ছুটির পরে কিছু দিন এই উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য্য দেখতে পাচ্চি। রোগ ছাড়াও নূতন ছাত্র সমাগমও একটা উৎপাত। যতীন একটি নূতন শিক্ষকের কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমি মাঝারি গোছের লোক গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত—তাতে বিদ্যালয়কে বোঝাই করে'ই তোলে তাকে চালায় না। আমি এমন লোক চাই যিনি কাজ চালিয়ে যাওয়ার চেয়েও আর একটু উপরে—এমন কাউকে জান না? ক্ষিতিমোহনবাবুও কি কারো সন্ধান জানেন না? যাঁরা পূর্ব্ববঙ্গের মফস্বল কালেজে পড়া তাঁদের ইংরেজি উচ্চারণ একটা মুস্কিল, সে কথাও ভেবে দেখতে হ'বে। লোকের কথা চিন্তা কোরো।

আজকাল আমার শরীর অনেকটা ভাল।

ইতি ১৫ই কার্ত্তিক ১৩১৫

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শিলাইদহ

কল্যাণীয়েষু

অজিত,

রাখিবন্ধন দিনের জন্য একটি গান তোমাদের পাঠাই—আশা করি সেই দিন প্রাতে যথাসময়ে পাইবে:—

প্রভু,

আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখোনা ঢাকি'।
এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখী।
যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়বে বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই
রবে না বাকি।
আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে
তোমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।
তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক তারে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি।

রাখিবন্ধন-দিনের সম্বন্ধে কলিকাতা হইতে তোমাকে যে একটি বড় চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহা কি পাও নাই? সেই চিঠিতে বেদান্তের বই পাঠাইতে তোমাকে লিখিয়াছিলাম—আজও না পাইয়া মনে সংশয় জন্মিতেছে।

তোমাকে ৩০ টাকা পাঠাইতে কলিকাতায় বলিয়া আসিয়াছিলাম, বোধ করি তাহা এতদিনে তোমার হস্তগত হইয়াছে।

তোমাদের উৎসব কিরূপ হইল জানাইবে। তোমার শরীর কেমন আছে? আমি ভালই আছি। ইতি ২৭শে আশ্বিন, ১৩১৬।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরাজিপাঠের লেখা সুরু করিয়াছ কি? সেটা অল্প অল্প করিয়া প্রত্যহ লিখিয়ো, তাহা হইলে ক্লান্তিবোধ হইবে না।

ও

কল্যাণীয়েষু—

তোমার চিঠিতে আমার সম্বন্ধে যা লিখেছ সে-কথা সত্য। আমার জীবনে দ্বন্দ্বের অন্ত নেই—কেবল যে

নিজের প্রকৃতিতে উপর-নীচে দ্বন্দ্ব তা নয়, আমার অবস্থার মধ্যেও ঈশ্বর চিরদিন দ্বন্দ্ব ঘটিয়েছেন—সে-কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি। আমার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ অবস্থা না ঘটিয়ে তিনি বরাবর আমার অন্তরে বাহিরে দ্বন্দ্ব জাগিয়ে রেখেছেন। তাতে ক'রে চিরদিন নিজের অশক্তির দৈন্য এবং নিজের আকাঙ্ক্ষার গৌরব দুই খুব উজ্জ্বল ক'রে দেখে আস্তে হয়েছে। অহঙ্কার নিয়ে সাধনার মধ্যে প্রবেশ করলে ব্যর্থ হ'তে হয়। অহঙ্কার কর্‌বার মত উপকরণ তিনি আমাকে নানা দিক্ থেকে দিয়েছিলেন—সেইজন্যে আবার তাকে নানাদিক থেকেই আঘাত ক'রে খর্ব্ব কর্‌বার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি আমার নানা সুযোগ বশত মানুষের কাছ থেকে স্বভাবতই যা-কিছু আশা কর্‌তে পার্‌তুম তার প্রত্যেক বিষয়েই তিনি আমাকে কিছু-না-কিছু বঞ্চিত ক'রে আজ পর্যন্ত অনেকটা দূর বাঁচিয়ে রেখেছেন—এমন কি, যে-সব জায়গায় তিনি কৃতকার্য্যও করেছেন সেখানেও তিনি আমাকে সম্পূর্ণরূপে সে খবর যেন জান্‌তে দেননি। আমি অনেকটা-পরিমাণে অচেতনভাবেই কৃতকার্য্য হয়েছি।

বরাবর এম্‌নি ক'রে আমার প্রকৃতির অভ্যন্তরেই এবং আমার বাহ্য অবস্থার মধ্যেও অবিরাম দ্বন্দ্ব থাকাতে সকলের সঙ্গে আমার ব্যবহার সহজ এবং অবাধ হয়নি। ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যেন অনেকটা-পরিমাণে মেঘাচ্ছন্ন ছিলুম—ভাল ক'রে সবটা দেখতে ও বুঝতে পার্‌তুম না। বিদ্যালয়ে এসে তুমি আমার কাছ থেকে যে-সমস্ত আঘাত সহ্য করেছ তার কারণ অনেকটা সেই। সকল দিক্ থেকে সকল অবস্থায় আমি স্পষ্ট করে' তোমাদের দেখতে পাইনি। তখন আমার জীবনের উপর ভয়ানক একটা চাপ ছিল। অকস্মাৎ একটা অপরিমিত দেনার ধাক্কা কত দুঃসহ তা বুঝতেই পার—সেই অবস্থায় একদিকে সংসারের সমস্ত দাবি অন্যদিকে বিদ্যালয়কে বহন কর্‌তে হ'য়েছে। তার পরে পারিবারিক দুর্ঘটনার আঘাত আমাকে অল্পপীড়া দেয়নি। আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমার সমস্ত ক্ষতি ও দুঃখতাপ আমাকে একলা মনের মধ্যে নিঃশব্দে বহন কর্‌তে হ'ত—কেউ সে-সমস্তের ভাগী ছিল না। সকলের উপরে একটা উপদ্রব ছিল এই যে, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মীয়দের কাছ থেকে যার-পর-নাই বাধা পেতে হচ্ছিল—নিয়তই কেবল যুদ্ধ করে' আস্‌তে হ'য়েছিল, যতরকমে এই বিদ্যালয়কে ব্যর্থ করা যেতে পারে তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। একে আমার অভিজ্ঞতা ও অর্থের দিক থেকে আমি নিতান্তই অক্ষম ছিলুম তার পরে অত্যন্ত নিকটের লোকদের কাছ থেকেও আমি কেবলি বিরোধ পেয়ে এসেছি এই রকম একটা যেন নিরুপায় অবস্থার মধ্যেই এত দীর্ঘকাল কেবল দেনা করে' ও বই বিক্রি করে' এবং বিক্রি কর্‌বার উপযুক্ত আর আর যা কিছু ছিল তাই বেচে ফেলে বিদ্যালয় চালিয়ে এসেছি। সেই রকম অবস্থায় তোমাদের প্রতি আমি যথোচিত ব্যবহার নিশ্চয়ই করিনি। গর্ভিণী যেমন সংসারের অনেক কর্ত্তব্য থেকে নিষ্কৃতি গ্রহণ করে আমিও তেম্‌নি আমার দুর্ব্বল শক্তির দ্বারা বিদ্যালয়ের আইডিয়াকে বহন কর্‌বার নিত্য বেদনায় যারা আমার কাছে এসেছিল তাদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারিনি।

এখন সেদিনের চেয়ে অন্তরে ও বাহিরে অনেকটা পূর্ণতা এসেছে তবু দুইদিকেই দীনতা যথেষ্ট আছে—সংসারে এবং স্বভাবে স্বচ্ছলতা আসেনি—কিন্তু তবু তার ভার মন থেকে কিছু কিছু ক'রে হাল্কা হ'য়ে আস্‌চে। বোঝা কমেছে বলে'ই যে হাল্কা হচ্চে তা নয়—মন ভরে' উঠচে বলে'ই হাল্কা হচ্চে—কেন না দেনার অঙ্ক বেড়েই চলেছে তেমনি ঈশ্বর আমার পাওনার ঘরেও কিছু কিছু ক'রে জম্‌তে দিচ্চেন। থেকে থেকে সংসারের দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসে—কিন্তু মনে নিশ্চয় জানি এর অন্তরালে যে আলোক আছেন তিনিই ভূমা, তিনিই সত্য, এটা নয়।

তুমি বিশেষ ভাবে যে সময়ের উল্লেখ করেছ তখন তোমার মধ্যেও বিস্তর গ্রন্থি ছিল—তাতে করে' তুমি কেবলি পীড়া পেয়েছ ও পীড়া দিয়েছ। তুমি নিজের সত্যকে তখন ঠিক জায়গায় উপলব্ধি করনি এইজন্য তুমিও ঠিক সোজা ক'রে চল্‌তে পার্‌ছিলে না—তাই বরাবর তোমার জন্য আমাকে অনেকেরই সঙ্গে সুতীব্র বিরোধে প্রবৃত্ত হ'তে হ'য়েছে—তোমাকে নিয়ে তোমার উপর যত আঘাত নেমেছে আমার উপর তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত পড়েছে—তোমার সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের অন্য সকলের প্রতিই

আমি অন্যায় অবিচার করচি এই অপবাদ আমাকে চিরকাল বহন করতে হয়েছে। এর ফল আর যাই হোক্ তোমার সম্বন্ধে কিছু একটা সুবিধা করে' দেওয়া বিদ্যালয়ের তরফ থেকে একান্ত বাধাগ্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল—তাতে একজন লোকেরও প্রসন্নতা ছিল না। এই সমস্ত দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে যখন চ'লে আস্‌ছিলুম সেই সময়ে তোমার মা যখন এমন ভাব প্রকাশ করেছিলেন যে, তুমি অনায়াসেই সাংসারিক উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে পারতে আমিই তোমাকে তার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছি তখনি আমি তোমাকে উকীল হ'তে এবং অন্য চেষ্টা করতে পরামর্শ দিয়েছিলুম—অর্থাৎ আমার দিক থেকে তোমার উপরে কোনো কৃত্রিম চাপ আছে এটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হয়েছিল।

যাই হোক্ এ সমস্ত পূর্ব্বইতিহাসের কথায় কোন ফল নেই। জীবনকে ক্রমশঃ নিষ্কণ্টক এবং সরল ক'রে আন্‌তে হ'বে। হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রসাদ অবতীর্ণ হ'য়ে তাকে প্রাচুর্য্যে এমন পূর্ণ করুক যে, তোমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করা আমার পক্ষে আনন্দের ব্যাপার হোক্। যতদিন তা না হয়, যতদিন আমার মধ্যে দীনতা থাকে, ততদিন আমার সম্বন্ধে মনে কোনো অভিমান রেখো না—আমার প্রতি তোমার অধিকার আছে জেনে সেই অধিকার প্রয়োগ কোরো—তাতে আমাকে যদি কষ্টও পেতে হয় তবু সে কষ্ট সার্থক হ'বে এবং যথাসময়ে তার থেকেই আনন্দ বোধ করব। যদি দেখ আমার মধ্যে কোনো জায়গায় তোমরা হুচট খাও তবে তাকে পাশ কাটিয়ে অন্যপথে যাওয়া ঠিক নয়—সে বাধা ক্ষয় করিয়ে দাও—তোমরা দাবী করতে থাকলে আমিও দাবী পূরণ করার যোগ্য হ'তে থাকব। এইরকম জবরদস্তির হাতুড়ি ঠুকেই ত ঈশ্বর আমাকে গ'ড়ে তুলচেন। ইতি ১৭শ্রাবণ।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঙ

কল্যাণীয়েষু—

বোলপুরের স্বাস্থ্যহানির কথায় আমি বড় উদ্বিগ্ন হয়েছি। এর ত কোনোই উপায় ভেবে পাইনে। যদি আবার কালক্রমে এই ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব দূর হ'য়ে যা তা হ'লেই নিশ্চিন্ত হ'ব—আশা করচি এটা স্থায়ী নয়।

যদি শরৎবাবুকে বাংলাশিক্ষার দায় থেকে মুক্ত ক'রে তাঁকে ইংরেজীর ভার দিতে চাও তাহ'লে অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বাংলার জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে—তাঁকে দিয়ে সংস্কৃতও চলবে। ভূপেনবাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমাকে জানালেই আমি তাঁকে নিযুক্ত ক'রে পাঠাতে পারব। এটা কিনা অর্থের কথা, সেইজন্যে আমি কিছুই বলতে পারচিনে।

তোমাদের গ্রামের কাজ ভাল চলচে শুনে আমি ভারি খুসি হ'য়েছি। এখান থেকে হরিদাস ব'লে একটি ছেলে যাবে সে ঐ কাজে যতীনের বিশেষ সহায়তা করতে পারবে। লোকটি অতি হতভাগ্য এবং বড়ই কৃপাপাত্র কারণ তারই গুলি ছুটে গিয়ে সুবোধের মেয়ের মৃত্যু হ'য়েছে। তাকে দিয়ে যদি কোনো কাজ পাও ত দেখো—আপাতত তাকে বেতন দিতে হ'বে না।

এখানকার গ্রাম সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা ভাব্‌চি ত এখনো কাজে লাগবার সময় হয়নি—এখন কেবল মাত্র অবস্থাটা জানার চেষ্টা করচি। ভূপেশ প্রধানত তথ্য সংগ্রহ করচেন সেইগুলো ভাল ক'রে জমে উঠ্‌লে তখন প্ল্যান্ ঠিক করতে হ'বে। আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজস্থাপন করতে চাই—সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোট প্রতিকৃতি—খুব শক্ত কাজ অথচ না হ'লে নয়। অনেক ত্যাগের আবশ্যক—সেইজন্যে মনকে প্রস্তুত করচি—রথীকে আমি এই কাজেই লাগাব—তাকেও ত্যাগের জন্য ও কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত করতে হ'বে। নিজের বন্ধন মোচন করতে না পারলে আর কাউকে মুক্ত করতে পারব না।

তোমার মার জন্যে যেরকম ঘর তৈরি করতে চাচ্চ তাই কোরো। যদি তাঁকে কখনো আবশ্যক বশত অন্যত্র যেতে হয় এইজন্যে তোমাদের টাকা নিতে ইচ্ছে ক'রে না যা হোক যদি সেরকম ঘটে তখন বিবেচনা ক'রে যা উচিত তাই স্থির করা যাবে।

ঈশ্বর আমাদের সকলের সত্যকে উদ্বোধিত ক'রে তুলুন

এই আমি প্রার্থনা করুচি। এর জন্তে বহু দুঃখভোগ করতে হ'বে—তাই যেন শিরোধার্য্য ক'রে নিতে পারি।

তোমার মায়ের ঘর তৈরির সম্বন্ধে আমার অভিমত ভূপেনবাবুকে জানিয়ো। ইতি ২৯ শে পৌষ ১৩১৪

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তুমি যেরকম ছেলের কথা লিখেছ অনেকদিন থেকেই ঐরকম ছেলে আমি মনে মনে প্রার্থনা করুচি—তারা বিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হ'য়ে নিজেরা তৈরি হ'য়ে উঠবে এবং অন্তদের তৈরি করতে থাকবে। সেরকম যদি কাউকে পাও তা হ'লে আকর্ষণ ক'রে এনো।

এখানে পটলের পানবসন্ত হওয়াতে আমাদের কিছু উদ্বিগ্ন করেছে। পটল ত ধীরে ধীরে সার্‌বার দিকে যাচ্চে কিন্তু তার infection ত শীঘ্র যাবে না। ছেলেরা ছুটি থেকে ফিরে এসেও আবার যদি একে একে সুরু করে তাহ'লে আমাদের সকলকেই কিছু lively ক'রে তুলবে।

মীরার বিবাহব্যাপার নিয়ে ভারি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। চুকে গেলেও কিছুকাল তার জের চল্‌বে। অনেক খরচপত্রের বোঝাও ঘাড়ে চাপ্‌ল। এ সমস্ত সহজে বহন করবার শক্তিও ঈশ্বর দেবেন। আসলে আমাদের তার যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা ও আশঙ্কা করি ব'লেই বোঝাটা গুরুতর ব'লে মনে হয়।

আমাকে এই সমস্ত উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যেও প্রবাসীর জন্তে একটা ছোট গল্প লিখ্‌তে হ'য়েছে। সম্পাদক আমাকে তিনশো টাকা আগাম দিয়ে ঋণে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন।

তোমার সেই প্রবন্ধটা কেমন হ'ল ? বৈশাখের বঙ্গদর্শনে সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য পড়েছ ? এটা বোধগম্য হ'য়েছে কি ? তার পরে মহাকাব্য ব'লে একটা লিখে রেখেছি—সেটা ন্তাশনাল বিদ্যালয় খোলার অপেক্ষায় স্তম্ভিত হ'য়ে আছে। এইটে পড়া হ'য়ে গেলেই ঐ বিষয়টা খতম ক'রে দেব মনে করুচি। আজকাল আমার আর লিখতে ইচ্ছা করে না।

বুড়োকে Technical Institutionএ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত ব'লে আমি মনে করি। নীলরতনবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল—তিনিও খুব জোরের সঙ্গে ঐ পরামর্শ দিলেন। ওঁদের সমস্ত ব্যবস্থা দেখে আমি ত নিজে বেশ খুসি হয়েছি। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—মতিবাবুকে আমার বর্ত্তমান ব্যস্ততার কারণ জানিয়ে আমার সাদর নমস্কার জ্ঞাপন কোরো।

আরাতামা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

যেদিকে চাহিয়া দেখ নিবিড় দুর্ভেদ্য অরণ্য, মধ্যাহ্নেও অন্ধকার। বিশাল বিটপীসমূহ চারিদিকে বৃক্ষের শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় মিশিয়া অন্ধকার করিয়া আছে। নানাবিধ বন্ত লতা বৃক্ষে জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়াছে, এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে প্রসারিত হইয়া দীর্ঘ মালার ন্তায় দুলিতেছে। অনেক স্থানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পায় না, কোথাও কোথাও একটি রশ্মি-রেখা সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া সুবর্ণযষ্টির ন্তায় জলিতেছে। নীচে ঘন গুল্ম ধরাতল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, বৃক্ষ-শাখায় দোদুল্যমান লতায় নানা-বর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্প গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। চারিদিকে যেমন অন্ধকার সেইরূপ সর্ব্বত্র ভীতি-উৎপাদক নিস্তব্ধতা। কেবল কখন কখন বৃহৎ সর্পের গমনে শুষ্ক পত্রে ক্ষীণ মর্ম্মর-শব্দ,

কোথাও শীর্ণ নির্ঝরের মৃদু মৃদু জল-প্রবাহ। কখন কোন বন্য পশু চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সাবধান গতিতে চলিয়া যাইতেছে।

কে দেখিয়া বলিতে পারে এমন স্থানে মানুষের বাস সম্ভব! বনের মধ্যে একদিকে একটা ছোট পাহাড়ের মত, তাহার নীচে রাজা শিশেরার মৃগয়া-ভবন। বাড়ী ছোট হইলেও স্থান যথেষ্ট ও এমন কৌশলে নির্ম্মিত যে, আশে পাশে কোথাও হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, একেবারে গৃহের সম্মুখে উপস্থিত না হইলে বুঝিতে পারা যায় না যে, এই অরণ্যের মধ্যে মানুষের বাসোপযোগী গৃহ আছে। আকাশে বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিলে নীচে অবিরল ঘন বিন্যস্ত পাদপশীর্ষ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। বনের ভিতর দিয়া সেই গৃহে যাইবার পথও কৌশলে প্রস্তুত, অজানা লোকে সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না।

রাজকন্যা সাফিরা এইখানে বাস করিতেছিলেন। তিনি পিতার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছিলেন। আরাতামাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, এখন একবার তোমাকে যাইতেই হইবে। রাজা মনে করেন তাহা হইলে তোমার আশঙ্কা কম। কিন্তু যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, তুমি নগর ছাড়িয়াছ তাহা হইলে সকলেই বলিবে যে, শত্রু বিশলাম অধিকার করিবে এই ভয়ে তুমি নগর হইতে পলায়ন করিয়াছ।

সাফিরা কহিলেন—আমি দুই দিন পরেই ফিরিয়া আসিব।

—শুনিয়াছি যুদ্ধের সময় নগরের বাহিরে যাওয়া যত সহজ ফিরিয়া আসা তেমন সহজ নয়।

—কেন শত্রু কি নগর অধিকার করিবে?

—যুদ্ধের গতি কে বলিতে পারে?

শেষে সাফিরা বলিলেন,—আচ্ছা, আমি এখন যাইতেছি, কিন্তু যখন ইচ্ছা ফিরিয়া আসিব।

—আসিবার পূর্ব্বে পথ মুক্ত আছে কি না জানিও।

নূতন নূতন কয়েকদিন সাফিরার বেশ ভাল লাগিল। বনের এরূপ নিবিড় নির্জ্জনতা তিনি ইতিপূর্ব্বে কখন অনুভব করেন নাই। যখন তখন তিনি যেদিকে সেদিকে চলিয়া যাইতেন। নিকটে বন্য পশুর তেমন ভয় না থাকিলেও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য দুই তিন জন লোক সর্ব্বদা সশস্ত্র হইয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিত। প্রাতঃকালে নানাজাতীয় পাখীর কলরব শুনিয়া সাফিরার আনন্দ হইত। সূর্য্যোদয়ের পর বনফুল চয়ন করিতেন, নির্ঝরিণীর তটে বসিয়া থাকিতেন। রাত্রিকালে দুই জন দাসী তাঁহার কাছে থাকিত।

কয়েকদিন পরে তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। বনে নির্ব্বাসিত হইয়া এরূপ করিয়া কতদিন থাকিতে হইবে। যুদ্ধ কোথায় হইতেছে, কোন্ পক্ষের কিরূপ অবস্থা? সংবাদের অভাবে রাজকন্যা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সৈন্যের অধ্যক্ষকে কহিলেন, আপনি বিশলাম নগরের সংবাদ লইতে লোক পাঠাইয়া দিন।

অধ্যক্ষ কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, কাহার আদেশে পাঠাইব? আমাদের এইখানে থাকিবার আদেশ, রাজা ত আর কোন আদেশ দেন নাই।

সাফিরা রাগিয়া কহিলেন,—আমার আদেশ আপনার পক্ষে যথেষ্ট। আমার আদেশ মত আপনি দুই জন সৈনিককে নগরে প্রেরণ করুন।

অধ্যক্ষ আর আপত্তি করিলেন না। সৈনিক দুজনকে পাঠাইবার সময় বলিয়া দিলেন, রাজকন্যা এখানে আছে এ কথা যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়। তোমরা গালিম কিংবা সৈনিকদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। নগরের সাধারণ লোকে কি বলিতেছে জানিয়া আইস।

সৈনিকদ্বয় চলিয়া গেল। বন হইতে বাহির হইয়া তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সহরে যে কয়দিন থাকিতে পারে তাহাই লাভ। নগরে প্রবেশ করিয়া তাহারা বরাবর রাজবাড়ীতে গেল। পথে ফারেজ নাগরিক সৈন্যের অধ্যক্ষের বেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সৈনিক দুজন তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিল। ফারেজ দেখিলেন ইহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে। পাদুকা ও পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা, সম্মুখে ও পশ্চাতে বস্ত্রে কণ্টক লাগিয়া রহিয়াছে। ইহারা কোথায় গিয়াছিল। ফারেজ তাদের সঙ্গে কিছু দূর গমন করিলেন। কহিলেন, দেখিতেছি তোমরা অনেক দূর হইতে আসিতেছ।

নিজেদের অধ্যক্ষের কথা সৈনিকদের স্মরণ হইল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

—আমার মনে হইতেছে, তোমরা শীকার করিতে গিয়াছিলে।

—এইরূপ অনুমান আপনি কেন করিতেছেন?

কয়েক দিন তোমাদিগকে দেখি নাই সেইজন্য। আজ রাত্রে যদি তোমাদের অবকাশ থাকে তাহা হইলে আমার বাড়ীতে আহার করিও। খানিকক্ষণ আমোদ-আহ্লাদ করা যাইবে।

রাত্রে সৈনিক দুজন ফারেজের বাড়ীতে গিয়া দেখিল সেখানে লোবান আছেন, তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। ফারেজ ও লোবানে পূর্ব্বে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ফারেজ সৈনিক দুইজনকে খুব সমাদর করিয়া আহার করাইলেন। পানের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট সুরা ছিল, ফারেজ ও লোবান সৈনিকদের পানপাত্র বার বার পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা দুই জনের মধ্যে কেহ অধিক পান করিলেন না। আহারের পর জুয়াখেলা আরম্ভ হইল। তখন সৈনিকদ্বয়ের দিব্য স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। খেলিবার সময়ও তাহারা মধ্যে মধ্যে মদিরা পান করিতে লাগিল। খেলার দান অধিক নয়, অল্প-সংখ্যক রৌপ্য-মুদ্রা। বেশী ভাগ সৈনিকরাই জিতিতে লাগিল। খেলার অবকাশে ফারেজ ও লোবান অন্য কথা পাড়িলেন।

ফারেজ কহিলেন,—রাজপুত্র আমাদের জয় হইবার কোন আশা নাই, তিনি মিছামিছি রাজদ্রোহী হইলেন কেন?

একজন সৈনিক কিছু জড়িত কণ্ঠে কহিলেন,—দুর্ব্বুদ্ধি! তাঁহাকে দস্যুপতি রুদেলা নাচাইয়াছে।

দ্বিতীয় কহিলেন,—চোর ডাকাত যুদ্ধের কি জানে? একবার যুদ্ধ হইলেই আমরা তাহাদিগকে গুঁড়া করিয়া দিব।

লোবান কহিল,—তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই, তবু সাবধানে থাকা ভাল।

ফারেজ কহিলেন,—মনে কর যদি শত্রু-সৈন্য হঠাৎ আসিয়া এই নগর বেষ্টন করে।

সৈনিকরা দাম্ভিক মাতালের মত কহিল,—আমরা কি করিতে আছি?

ফারেজ বলিলেন,—তোমরা আমরা ত নগর রক্ষা করিবই, তবে রাজা এখানে নাই, সেনাপতিও নাই, সৈন্য-বলও তেমন বেশী নয়। এমন সময় রাজকন্যার কি এখানে থাকা উচিত?

সিপাহী দুই জন পরস্পরের প্রতি চাহিয়া চোক টিপিল। তাহারা মনে করিল আর কেহই দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাহাদের যে অবস্থা তাহাতে কোনরূপ সঙ্কেত অথবা মনের কথা গোপন করা কঠিন। একজন হাসিয়া কহিল—শত্রুকে আমরা মারিয়া তাড়াইয়া দিব, রাজকন্যার ভয় কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি অট্টহাস্য করিয়া উঠিল— হাঃ হাঃ হাঃ! রাজকন্যার বড় ভয়, শত্রু আসিলেই তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।

দুইজনে পরস্পরের পাঁজরায় আঙুলের খোচা দিয়া ক্রমাগত হাসিতে লাগিল, বলিল,—এবার রাজকন্যার রক্ষা নাই, শত্রু আসিলেই তিনি ধরা পড়িবেন!

ফারেজ গম্ভীরভাবে কহিলেন,—তাহা হইলেই ত মুস্কিল! রাজ-কন্যাকে মুক্ত করিবার জন্য রাজা কি না করিতে পারেন। হয়ত অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এই নগর ছাড়িয়া দিবেন।

সিপাহীদের হাসি আর থামে না। সুরা-পাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিল।

একজন কহিল—রাজা ও সেনাপতির বুদ্ধি নাই, সেই জন্য তাঁহারা রাজ-কন্যাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন।

ফারেজ কহিলেন,—ওকথা কোন কাজের নয়। রাজ-কন্যাকে আর কোথাও রাখা হইয়াছে, এমন সময় তাঁহাকে এখানে ছাড়িয়া রাজা কখন নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধে যাইতে পারিতেন না।

একজন সৈনিক আবার চোক টিপিল, কহিল,—কে বলে রাজ-কন্যা এখানে নাই?

ফারেজ কহিলেন,—এ কথা অনেকে জানে, কেহ প্রকাশ করে না। তোমরাও জান, আমাদের কাছে গোপন করিতেছ।

সৈনিকেরা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল। এক জন কহিল, আমরা জানিলেও বলিব কেন? তাহা হইলে রাজকার্য্যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

অপর ব্যক্তি কহিল,—বলিতে আমাদের নিষেধ। কোন কথা প্রকাশ করিলে আমাদের মাথা যাইবে।

ফারেজ আর কিছু প্রকাশ করিলেন না। সৈনিক দুই জনে চলিয়া গেল।

পর দিবস তাহারা নগরে শত্রু-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যথার্থ সংবাদ কেহ জানে না। কেহ বলিল, শত্রু-সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে; কেহ বলিল, তাহারা নগরের অভিমুখে আসিতেছে; কেহ বলিল, রাজপুত্র আরাদ বন্দী হইয়াছেন; অন্যত্র জনরব, শত্রু অনেক গ্রাম দখল করিয়াছে। মোটের উপর সর্ব্বত্রই চঞ্চলতা, সকলের মনে ও মুখে একটা আশঙ্কার ভাব। গালিম অশ্বারোহণে অথবা পদব্রজে নগরের সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, নগর-দ্বারে ও প্রাচীরে প্রহরী দ্বিগুণিত হইয়াছে। অশ্বারোহী সৈনিকেরা নগরের বাহিরে গ্রামসমূহে সর্ব্বদা যাতায়ত করিতেছে, যদি কোন সংবাদ পাওয়া যায়। দেখিয়া শুনিয়া সৈনিক দুই জন স্থির করিল একটা কিছু তুমুল ব্যাপার হইতেছে।

তাহারা যখন বনে ফিরিয়া যায় সেই সময় নগরের বাহিরে এক ভিক্ষুক বসিয়াছিল। সৈনিকরা লক্ষ্য করিল না যে, সে-ব্যক্তি তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। সে কখন অনেক দূরে পিছাইয়া পড়ে, আবার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আসে। সৈনিক দুইজনে বনে প্রবেশ করিল, ভিক্ষুক তাহা দেখিল। অতিশয় সন্তর্পণের সহিত তাহাদের পশ্চাৎ বনে প্রবেশ করিল, সৈনিকরা মৃগয়া-ভবনে যাইতেছে জানিয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

রুদেলার আদেশ মত সন্ধ্যার পর সৈন্যবল যাত্রা করিল। অশ্বারোহীরা আগে চলিল, রুদেলা সর্ব্বাগ্রে। আরাদ সৈন্যের মধ্যভাগে রহিলেন। পদাতিক সৈন্যের নেতা জাকেত। সৈন্যের অগ্রে ও পশ্চাতে কিছু দূরে অল্প-সংখ্যক সৈন্য। সেনার সজ্জাপ্রণালী শিথিল, প্রয়োজন হইলে সৈন্য সম্প্রসারণ করিয়া বিস্তারিত করা যায় আবার শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সঙ্কুচিত করিতে পারা যায়। সৈন্যের সঙ্গে বিমান নাই, রুদেলা বিমানের অধ্যক্ষকে পর দিবস প্রত্যূষে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

পথে স্থানে স্থানে অল্পসংখ্যক রাজসৈন্য। তাহারা শত্রুবল অনেক অধিক দেখিয়া যেখানে রাজা শিশেরা ও সেনাপতি সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন সেই অভিমুখে হটিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি প্রভাত হইলে শত্রুসৈন্য সঙ্গোপন করিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। সূর্য্যোদয়ের এক প্রহরের পর কয়েকটা বৃহৎ উপবন ও তাহার মধ্যে কূপ দেখিতে পাইয়া রুদেলা সৈন্যদিগকে আহার ও বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। রাজা শিশেরার শিবির সেখান হইতে তিন দিনের পথ। গ্রামে গ্রামে তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্র হইয়া গেল শত্রুসৈন্য সবলে অগ্রসর হইতেছে। রাত্রে যে-সকল সৈন্য পিছাইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকজন অশ্বারোহী সমস্ত রাত্রি অশ্ব-চালনা করিয়া শিবিরে উপনীত হইয়া শত্রুর আগমন-সংবাদ দিল। উভয় পক্ষের বিমান আকাশে কিয়ৎ কাল ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া গেল।

রাজা শিশেরা, সেনাপতি ও প্রধান সেনা-নায়কগ[illegible] বিচার করিতে লাগিলেন যুদ্ধ সেই স্থানে হওয়া উচিৎ অথবা শিবির ভঙ্গ করিয়া অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য শত্রু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে, না তাঁহারা শত্রুকে আক্রমণ করিবেন? শত্রু যদি কোন বড় রাজা হইতেন ও সৈন্য তাঁহার হইত তাহা হইলে সমকক্ষ বিবেচনা করিতে পারা যায়, এ কিন্তু যুদ্ধের সূত্রপাত বিদ্রোহ মাত্র। আরাদ রাজার সহোদর না হইলেও ভ্রাতা, এক পিতার সন্তান সুতরাং আরাদ রাজদ্রোহী। তাঁহার প্রধান সহায় একজন দস্যু। কিন্তু শত্রু যেই হউক তাহাকে তাচ্ছিল্য করা নির্ব্বোধের কাজ। শত্রু রাজদ্রোহী হউক, দস্যু হউক তাহাকে পরাজয় করা যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং তাহাকে বলবান বিবেচনা করা বুদ্ধির পরিচায়ক। রাজা শিশেরা ও সেনাপতি সেই হিসাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন এখন যে-স্থানে শিবির যুদ্ধের পক্ষে তাহা অতি উত্তম স্থান

না হইলেও ইহার অপেক্ষা উত্তম স্থান নিকটে আর কোথাও নাই। যদি নদী পিছনে রাখিয়া যুদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে কিছু অসুবিধা, কিন্তু শত্রু কোন্ দিক দিয়া আসিতেছে জানিলে নদীর যে-দিকে ইচ্ছা সৈন্য রাখিতে পারা যায়। শত্রু আক্রমণ করিবে কি না তাহাও বিবেচনার কথা। কোন গভীর উদ্দেশ্য না থাকিলে এত দিন তাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল কেন? যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া যদি তাহারা অন্য দিকে গমন করে, রাজ্যের আর কোথায়ও প্রবেশ করে, তাহা হইলে ত রাজা ও সেনাপতি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না, শিবির ভঙ্গ করিয়া শত্রুর পথ অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিতেই হইবে।

অপর পক্ষে শত্রু-সেনাপতি রুদেলা অপর নায়কদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। আরাদ ত সাক্ষী গোপাল, কোন বুদ্ধি বড় একটা যোগাইত না। রুদেলা বিবেচনা করিলেন তিনি যদি কোথাও শিবির রচনা করিয়া আক্রমণের অপেক্ষা করেন তাহা হইলে তাঁহার ক্ষতি, কেন না, আরাদের জন্য তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, যুদ্ধে বিলম্ব হইলে তাঁহাকে সকলে দুর্ব্বল মনে করিবে এবং রাজা শিশেরার পক্ষ আরও বলবান হইয়া উঠিবে। রুদেলা স্থির করিলেন, এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে তাঁহারই ক্ষতি। যদি যুদ্ধ না করিয়া তিনি রাজ্যে প্রবেশ করেন অথবা বিশলাম নগরের অভিমুখে গমন করেন তাহা হইলে রাজা শিশেরার সৈন্য তাঁহার পশ্চাতে থাকিবে, তাহার পর যদি তাঁহার পরাজয় হয় তাহা হইলে তাঁহার সৈন্য-নির্গমের পথ থাকিবে না। রুদেলা আদেশ প্রচার করিলেন যে, তিনি রাজা শিশেরাকে আক্রমণ করিবেন। সৈন্যেরা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অপরাহ্নে একজন অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়েক জন অশ্বারোহী তাহাকে বধ করিতে যায় এমন সময় সে অস্ত্রশূন্য হস্ত তুলিয়া ডাকিয়া কহিল,—তোমাদের সেনাপতির কাছে আমাকে লইয়া চল, আমি তাঁহার জন্য সংবাদ আনিয়াছি।

তাহাকে ধরিয়া রুদেলার সম্মুখে লইয়া গেল। তাহার নিজের ও অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, উত্তরে রক্তাক্ত কলেবর। রুদেলা দেখিয়া কহিলেন,—এ ব্যক্তি কে? শত্রুর চর? তাহা হইলে ইহাকে বধ কর।

অশ্বারোহী কহিল,—চর হইলে এমন প্রকাশ্য ভাবে আপনার কাছে আসিব কেন? যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তিনি আপনাদের জয় কামনা করেন। আমার কাছে আপনাদের কোন লোকের নামে পত্র আছে, এই দেখুন।

সে ব্যক্তি একখানি পত্র বাহির করিয়া রুদেলার হাতে দিল। তাহার উপর লেখা রত্নবণিক উজ্বাল। রুদেলা খুলিয়া পড়িলেন। পত্র ফারেজের লেখা। তিনি লিখিয়াছেন,—রাজকন্যা সাকিরা বিশলাম নগরে নাই, তাঁহাকে অন্যত্র লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। যদি আপনারা রাজকন্যাকে বন্দিনী করিতে পারেন তাহা হইলে আপনাদের কত লাভ তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন। পঞ্চাশ জন যোদ্ধা হইলেই আপনাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আমি আপনাদের সঙ্গে যাইব। যদি আপনারা এই প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে পত্রবাহক আপনাদিগকে পথ দেখাইয়া আনিবে।

রুদেলা পত্রবাহককে একটু দূরে ডাকিয়া বলিলেন, রাজকন্যা কোথায় আছেন তুমি জান?

— তিনি বনের ভিতর রাজার মৃগয়াভবনে আছেন, আমি গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি।

—ফারেজের সঙ্গে কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?

—পথে যাইতে নগর হইতে কিছু দূরে।

রুদেলা ভাবিয়া দেখিলেন ফারেজ তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। পঞ্চাশ জন সৈনিক যদি শত্রুহস্তে নিহত হয় তাহা হইলেও রুদেলার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কিন্তু রাজকন্যা তাঁহাদের হস্তগত হইলে বিনা যুদ্ধেই তাঁহাদের যথেষ্ট লাভ হইবে, রাজা শিশেরা রাজকন্যার মুক্তির জন্য সন্ধি করিতে ব্যগ্র হইবেন, আরাদকে রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়াও দিতে পারেন। বিবেচনা করিয়া রুদেলা ফারেজের দূতকে কহিলেন,—তুমি এখন বিশ্রাম কর, রাত্রে তোমার সঙ্গে সৈন্য যাইবে।

রুদেলা স্বয়ং যাইতে পারেন না, কোন প্রধান সেনানায়ককেও পাঠাইতে পারেন না। একজন বিশ্বস্ত ও সাহসী দলপতিকে পঞ্চাশ জন সৈন্যের ভার দিলেন এবং

তাহাকে বিশেষ করিয়া শাসন করিয়া দিলেন যাহাতে রাজকন্যা ধৃত হইলে তাঁহার কোনরূপ ক্লেশ বা অবমাননা না হয়। তাঁহার দাসী সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিবে, তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত শিবিরে লইয়া আসিবে। ফারেজকে পত্র লিখিয়া দিলেন, রাজকন্যা ধৃত হইলে তিনি যেন বিশলাম নগরে ফিরিয়া যান। তিনি ইহাতে লিপ্ত আছেন এ কথা যেন প্রকাশ না হয়, কারণ বিশলাম অবরোধ করিবার সময় তাঁহার সাহায্যের আবশ্যক হইবে।

রাত্রে পঞ্চাশ জন সৈনিক ও ফারেজের লোক চলিয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফারেজ তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

ওদিকে রাজকন্যা সাফিরা বনবাসে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। একা ছিলেন বলিয়া যে মনের উৎকণ্ঠা, শুধু তাহা নয়, যখন-তখন একটা অজানিত অভাবনীয় বিপদের আশঙ্কা তাঁহার মনে উদয় হইত। কিসের আশঙ্কা, কাহার জন্য আশঙ্কা তাহা বুঝিতে পারিতেন না; কিন্তু চিত্তের অস্থিরতা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। প্রহরীদিগের অধ্যক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন,—আমি নগরে ফিরিয়া যাইব, রক্ষকদিগকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করুন।

অধ্যক্ষ কহিলেন,—রাজা যদি রাগ করেন? তিনি ত নগরে ফিরিবার কোন আদেশ দিয়া যান নাই।

—আমি একবার আপনাকে বলিয়াছি যে, রাজার অবর্ত্তমানে আপনাকে আমার আদেশ পালন করিতে হইবে। তিনি কি আপনাকে আমার কথা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন?

—তাহা কেন করিবেন? কিন্তু নগরে থাকিলে আপনার যদি কোন বিপদ হয় এইজন্য আপনাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয়, এখন যদি আপনি নগরে ফিরিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হয়।

—সে অপরাধ হয় আমার হইবে, আমি পিতাকে সকল কথা বলিয়া বুঝাইব আপনার কোন দোষ নাই। শাস্তি হয় আমার হইবে।

অধ্যক্ষ মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,—সে কি কথা! আপনি রাজকন্যা, রাজার অবর্ত্তমানে আপনিই রাজা, আপনার আবার শাস্তি!

—তাহা হইলে আপনার আপত্তি কি? আপনি আমার সঙ্গে লোক না দেন আমি একা নগরে ফিরিয়া যাইব।

অধ্যক্ষ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। রাজকন্যা পর দিবস নগরে ফিরিলেন। তাঁহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া রক্ষকেরা নগরের অভিমুখে চলিল। নগর দেখা যাইতেছে এমন সময় সৈন্যাধ্যক্ষ দেখিলেন একদল অশ্বারোহী বেগে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে। তিনি দেখিয়া কহিলেন, ইহারা শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী, সংখ্যায় আমাদের দ্বিগুণ। যুদ্ধ করিলে আমরা পরাজিত হইব, রাজকন্যা বন্দিনী হইবেন। তাঁহাকে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। শত্রু আসিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে হইবে।

রাজকন্যাকে লইয়া রক্ষকেরা বেগে ধাবিত হইল। পশ্চাতের অশ্বারোহীরাও অত্যন্ত বেগে অশ্বচালনা করিল। নগরের প্রাচীরে প্রহরী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিল প্রথম সৈনিক দল রাজপুরী রক্ষকের বেশে, তাহাদের মধ্যে তিন জন স্ত্রীলোক। পশ্চাতে অশ্বারোহীরা তাহাদিগকে ঘিরিবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রহরী তৎক্ষণাৎ তূর্য্য-ধ্বনি করিল। দেখিতে দেখিতে শত শত নাগরিক সৈন্য অশ্বারোহণে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া পশ্চাতের অশ্বারোহী দল অশ্বের মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিল। রাজকন্যা নির্ব্বিঘ্নে নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

ফারেজ শত্রুদলে ছিলেন, কিন্তু তিনি কখন্ নগরের বাহির গিয়াছিলেন আর কখন্ ফিরিয়া আসিলেন, কেহ জানিল না।

(ক্রমশঃ)

ব্যাকরণের পরিশিষ্ট

শ্রী গিরিজাপ্রসন্ন সেন

আশা করি, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই পরলোকগত লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি অপরিচিত নহেন। তিনি একখানি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ ব্যাকরণখানি উপলক্ষ্য করিয়া, কৈলাসাধিপতি শ্রীমান্ মহেশ্বর, শিরোরত্ন মহাশয়ের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ভোলানাথের ভুল—চিঠির খামে ঠিকানা ঠিক ছিল না। কাজেই উহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া Dead Letter Officeএ পৌঁছে। তখন কলিকাতার সহিত কৈলাসপুরীর ডাকের যোগ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, Dead Letter Office হইতে উহা পুনরায় মহেশ্বরের নিকট ফেরৎ পাঠান যায় নাই। চিঠিখানি আমার হাতে পড়িয়াছে। হয়ত উহাতে দুই-চারিটা কাজের কথা আছে। সিদ্ধি ও গঞ্জিকা বুড়া বয়স পর্য্যন্তও মানুষের —ও বিষ্ণু, দেবতার—মস্তিষ্ক কিরূপ অবিকৃত রাখিতে পারে, এই চিঠিখানি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। অতএব, সাধারণের অবগতির জন্য আমি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

পরমকল্যাণীয়

শ্রীমান্ লোহারাম শিরোরত্ন

নিরাপচ্ছিরজীবেষু।

বৎস!

তোমার মঙ্গল হউক। তোমার প্রেরিত বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি পাইয়াছি। তুমি যে নাটক, নবেল বা অসার কবিতা না লিখিয়া, ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহাতে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। আমি নিজে একজন বৈয়াকরণ। আমার ব্যাকরণখানি এখন আর মর্ত্ত্যলোকে অধীত হয় না, তথাপি শুনিতে পাই ভূলোকে "মাহেশ ব্যাকরণ" নামটা এখনও লুপ্ত হয় নাই। আমি বৈয়াকরণ বলিয়াই সম্ভবতঃ তোমার গ্রন্থ-সম্বন্ধে আমার অভিমত জানিতে চাহিয়াছ। বয়োধর্ম্মে এখন আর আমি তেমন চক্ষে দেখিতে পাই না। অন্নপূর্ণাকে কতবার বলিয়াছি, শরৎ বা বসন্তকালে তিনি যখন পূজাগ্রহণের জন্য মর্ত্ত্যলোকে যান, তখন যেন মনে করিয়া ভাল সাহেবের দোকান হইতে আমার জন্য একজোড়া চশমা আনেন। তিনি প্রতিবারই আনিবেন বলিয়া আমাকে ভরসা দিয়া যান; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, ভুল জিনিষটা ভোলানাথেরই একচেটিয়া নহে,—তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীরও উহাতে কতকটা অধিকার আছে। যাহা হউক, চশমার অভাবে তোমার ব্যাকরণ-খানি আমি স্বচক্ষে পড়িতে পারি নাই, শ্রীমান্ নন্দী আমাকে উহা আদ্যন্ত পড়িয়া শুনাইয়াছেন। তোমার গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই, ভালই হইয়াছে। তবে আর-একটু ভাল হইলে, আর-একটু ভাল হইত। অপূর্ণ মানুষের রচনায় পূর্ণতা সম্ভব নহে; তাই তোমার গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না। তুমি শুধু সাহিত্যিক বাঙ্গালার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছ, কিন্তু কথিত বাঙ্গালা সম্বন্ধে কোন কথাই বল নাই। বলিলে বোধ হয় ভালই হইত। কারণ, সাহিত্যিক বাঙ্গালাই বাঙ্গালা, আর কথিত বাঙ্গালা বাঙ্গালা নহে,—এ অযৌক্তিক কথা কেহই বলিতে পারে না। তুমি হয়ত আমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছ না। তাই দৃষ্টান্তসহকারে আমার কথাগুলি তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে আমার প্রদর্শিত আদর্শে তুমি কথিত বাঙ্গালার কতকগুলি সূত্র প্রণয়ন করিবে এবং পরিশিষ্ট-রূপে সেগুলি তোমার ব্যাকরণে সংযুক্ত করিয়া দিবে।

পূর্ব্ববঙ্গে সম্মান বুঝাইতে ধাতুর উত্তর "খুন" প্রত্যয় হয়। খুন-জিনিষটা স্বভাবতঃ ভয়াবহ, কিন্তু যখন পূর্ব্ববঙ্গে ধাতুর মাথায় 'খুন' চাপে, তখন সে একেবারেই ধাতুর ধাত্ বদ্লাইয়া দেয়, এবং উহা কোন ভয়াবহ ঘটনা না বুঝাইয়া পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান বুঝায়।

স্থল বিশেষে বিষ যেমন অমৃতের কার্য্য করে, পূর্ব্ববঙ্গে ধাতুর উত্তর "খুন" সেইরূপ উপাদেয় হইয়া উঠে। যেমন, আস্‌খুন (আসুন), বস্‌খুন (বসুন), দেখ্‌খুন (দেখুন) ইত্যাদি।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার কথা যখন উঠিল, তখন এ সম্বন্ধে আরও একটু বলি। এ প্রদেশে অনেক স্থলে 'হ' স্থানে 'শ' বা 'স' ব্যবহার হয়। যথা, হোটেল—সোটেল। পক্ষান্তরে স্থল বিশেষে 'শ' বা 'স' স্থানে 'হ' ব্যবহার হয়। যথা, শোমা—হোমা, শতায়ু—হতায়ু। এবিষয়ে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

আশীর্ব্বাদং ন গৃহ্লীয়াৎ পূর্ব্ববঙ্গনিবাসিনঃ।
শতায়ুর্ভব ইত্যত্র হতায়ুর্ভব যো বদেৎ॥

এদেশে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার হয় না। ইংরেজেরা গুরু অপরাধের জন্য কোন কোন আসামীকে কালাপানিতে নির্ব্বাসিত করেন। পূর্ব্ববঙ্গীয়গণও বোধ হয় কোন অপরাধের জন্য চন্দ্রবিন্দুকে রাঢ় দেশে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। অপরাধটা কি, তাহা অবশ্য আমি জানি না। তুমি তাহা জানা আবশ্যক মনে করিলে, যমের দপ্তরখানায় অনুসন্ধান করিও। পূর্ব্ববঙ্গে 'হাস' হাস্য কি হংস; 'বাস' বস্ত্র কি বসতি কি বাঁশ; 'গা' গ্রাম কি শরীর—তাহা অবস্থা বিশেষে স্থির করিতে হয়। চন্দ্রবিন্দুর অভাবই এই বিড়ম্বনার কারণ।

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক সময় 'ড' স্থানে 'ঠ' এবং পক্ষান্তরে 'ঠ' স্থানে 'ড' আদেশ হয়। যথা, ডান—ঠান, চিঠি—চিডি, কাঁঠাল—কাডাল, আঁঠি—আডি, ইত্যাদি।

এ দেশের লোক 'ড'-এর প্রতি হাড়ে হাড়ে চটা। সেদিন ঐ অঞ্চলের একটি ভক্ত আমার নিকট নিবেদন করিতেছেন,—"ঠাকুর! বড় বিপদে পড়িয়া তোমারে ডাক্‌বার লাগ্‌ছি। আমার পোলার বর পীরা, হেরারে আরাম করিয়া দেও। আমি মুর্ জন, তোমার স্তব-স্তুতি জানি না। যম যেন চোপায় মারিয়া আমার পোলারে কারিয়া না লয়!"

এ প্রদেশে অনেক স্থানে কর্ত্তৃপদের শেষে একটা 'য়' আগম হয় এবং ধাতুর উত্তর সম্মানসূচক 'ন'-কারের লোপ হয়। যথা, "বাবায় কয়" (বাবা কন), "দাদায় ডাকে" (দাদা ডাকেন), "মায় দিল না" (মা দিলেন না)। উত্তম পুরুষে ভবিষ্যৎকালে ক্রিয়াপদে 'ব'-স্থানে 'মু' হয়। যথা, যাব—যামু, দেখ্‌ব—দেখমু, ইত্যাদি। Progressive tense বুঝাইতে অন্যধাতুর সহিত 'লগ্' ধাতুর ব্যবহার হয়। যথা, "যাইবার লাগ্‌ছি" (যাইতেছি) 'যাইবার লাগ্‌ছিলাম' (যাইতেছিলাম) ইত্যাদি। এরূপ স্থলে 'লগ'-ধাতুকে auxiliary verb মনে করা যাইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের কথা আর বলিব না। এখন যশোহর-খুলনার কথিত ভাষা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

যশোহর-খুলনায় বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের মধ্যে একটা নূতন বর্ণের আবির্ভাব হয় এবং ঐ নূতন বর্ণটি সম্পূর্ণরূপে চতুর্থ বর্ণের স্থান অধিকার করে। এ প্রদেশের উচ্চারিত ভাষায় 'ঘ' 'ঝ' 'ঢ' 'ধ' 'ভ'-এর আদৌ কোন স্থান নাই। ঐ সকল বর্ণ বুঝাইতে তাহাদের এবং বর্গের তৃতীয় বর্ণের মধ্যবর্ত্তী ব্যাকরণের অযুক্ত এমন একটা কিম্ভূতকিমাকার বর্ণ উচ্চারিত হয় যেটা না-তৃতীয় বর্ণ না-চতুর্থ বর্ণ। সেটা তৃতীয় বর্ণের কোমলত্ববিহীন এবং চতুর্থবর্ণের বল-বর্জ্জিত। সেটাকে উভয় বর্ণের শঙ্করসন্তান মনে করা যাইতে পারে। পত্রে লিখিয়া এ কথাটা আমি ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। তুমি নিম্নলিখিত কথাগুলি একজন যশোহর-খুলনাবাসী দ্বারা পড়াইয়া শুনিও;—তাহা হইলে আমার কথাটা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে। "ঝড়ের কি শব্দ, যেন ঢাক বাজ্‌দি নাগলো। ঘর খান নড়্‌তি নাগলো। কোদারে কনাম, খুটি ধর্। কওয়া না বোলা, এর মধ্যি ঘর ভূমিসাৎ।" *

যশোহর-খুলনায় বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ এবং 'হ'-কারের উচ্চারণ যেরূপ ভাবে করা হয়, তাহাতে এ দেশটা যে কখনও বীর প্রতাপের লীলাক্ষেত্র ছিল, এমন মনে হয় না। ঐ সকল বর্ণ উচ্চারণকালে এ প্রদেশের অধিবাসীদিগকে কেমনই একটা দৌর্ব্বল্য অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু তাহারা এ দৌর্ব্বল্যের কথঞ্চিৎ পূরণ করে 'শ' ও

* বড় হরপের বর্ণগুলি যথাযথ উচ্চারণ করিতে না পারিলে এ আলোচনার অর্থ বুঝা অসম্ভব হইবে।

'স' এর উপর একটা অস্বাভাবিক জোর দিয়া। শ ষ ও স উচ্চারণকালে তাহারা ও গুলির উপর একটা বিশ্রী শ্রুতিকর্কশ জোর দেয়। তাহারা যখন কীর্ত্তনের সুরে গাহিতে থাকে—

খাস তালুকে বসত করি,
তোর অধিকার কবে হ'লো,
ও শমন, তোর অধিকার কবে হ'লো।

তখন আমার মনে হয়, গায়কেরা গান বন্ধ করিলে শমন তাঁহার দাবী ত্যাগ করিতে অসম্মত নাও হইতে পারেন। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় আর যে দোষ হউক, তাহা শক্তিহীন নহে। তাহার তুলনায় যশোহর-খুলনার ভাষা যে বিলক্ষণ দুর্ব্বল তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ প্রদেশে অনেক সময় 'ল' ও 'ন'-এ অভেদ দেখা যায়। যথা, ললিত—নলিত, লাভ—নাভ, নাতি—লাতি, মণীন্দ্র—মলিন্দির। এ অঞ্চলে অনেক সময় ক্রিয়াপদে 'এ'-কারের স্থানে 'ই'-কার হয় এবং একারের পূর্ব্ববর্ত্তী ই-কারের লোপ হয়। যথা, যাইতেছি—যাতিছি। এখানে তে স্থানে তি হইয়াছে এবং 'তের' পূর্ব্ববর্ত্তী 'ই' লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ খাইতেছি—খাতেছি, করিতেছি—কর্‌তিছি, ভাবিতেছি—ভাব্‌তিছি, ইত্যাদি।

এখন তোমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভাষাসম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমাদের একটা ধারণা আছে, তোমরা পশ্চিমবঙ্গবাসিগণ যে ভাষায় কথা বল, বলিবার ভাষার পক্ষে তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং আদর্শ। এই ধারণাটা তোমাদের মনে এতই বদ্ধমূল যে, তোমাদের বাঙ্গালার সহিত যাহাদের বাঙ্গলার সম্পূর্ণ ঐক্য নাই তাহাদিগকে তোমরা "বাঙ্গাল" নামে অভিহিত কর। "বাঙ্গাল" বলিতে তোমরা কি বুঝ, তাহা তোমরাই জান—হয়ত অসভ্য বা বর্ব্বর বা নিকৃষ্ট ভাবাভাবী বা এমনি একটা কিছু। এই হিসাবে আমাদের নিকট জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র, মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র, আনন্দমোহন ও চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি বাঙ্গালার অনেক মুকুটমণিই বাঙ্গাল। ইহাদিগকে "বাঙ্গাল" এবং ইহাদের জন্মস্থানগুলিকে "বাঙ্গালদেশ" বলায় তোমাদের গৌরব বৃদ্ধি হয় কি না, সে বিবেচনা তোমরাই করিও। যাহা হউক, পশ্চিমবঙ্গ বলিতে ঠিক কতটকু স্থান বুঝায়, তাহা আমি আজও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমাদের বাগ্‌বিতণ্ডায় এ বুড়া বয়সে যে এ সম্বন্ধে একটা-কিছু পরিষ্কার বুঝিব এমন ভরসাও নাই। কিন্তু এটা আমি বেশ জানি যে, শান্তিপুরের কথার সহিত বাঁকুড়ার কথার বিস্তর অনৈক্য এবং যাহারা খাস কলিকাতাবাসী, মারহাট্টা-খাদের বাহিরের লোকমাত্রই তাঁহাদের নিকট বাঙ্গাল। তোমরা প্রত্যেকেই মনে কর, তোমাদের কথাই নিখুঁৎ ও আদর্শস্থানীয়। যাক্, তোমাদের ও বিতণ্ডায় এ বুড়ার কোন প্রয়োজন নাই। এখন তোমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভাষা সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুই-চারিটা কথা বলিব।

আমার মনে হয়, তোমরা পশ্চিমবঙ্গীয়গণ একটু অতিরিক্তমাত্রায় 'এ'-কারের পক্ষপাতী। সাহিত্যিক ভাষায় লেখা হয়, "সেখানে যাইয়া শুনিতে পাইলাম যে সাধু গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।" তোমাদের প্রাদেশিক ভাষায় এ কথাগুলি রূপান্তরিত হইয়া এইরূপ আকার ধারণ করে,—"সেখানে গিয়ে শুনতে পেলুম (বা পেলাম) যে সেধো গলায় দড়ী দিয়ে মরেছে।" শুধু যে ক্রিয়াপদেই তোমরা 'এ'কারের দিকে হেলিয়া পড়, তাহা নহে ;—বিশেষ্য ও বিশেষণ পদেও তোমাদের এ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। "সেধো মরেছে", "কেলে বল্‌ছে," "সে গেঁয়ো ভূত কি না তাই দেনো মদ খায়"—ইত্যাকার সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন ভাষা তোমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিরল নহে।

কলিকাতাবাসিগণ অতীতকালে ক্রিয়াপদে 'লাম' স্থানে 'লুম' এবং 'তাম্' স্থানে 'তুম' ব্যবহার করেন। যথা,—গেলুম, খেলুম, শুন্‌লুম, যেতুম, খেতুম, ইত্যাদি।

তোমাদের পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর একটু অস্বাভাবিক আধিপত্য দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে ওটির যেমনই অভাব, তোমাদের পশ্চিমবঙ্গে ওটার হেঁসেল হইতে আঁদাড় পর্য্যন্ত তেমনই ছড়াছড়ি। সে দিন বাবু বলিয়াছিলেন, তিনি না কি একবার কৌতুক করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সমুদায় চন্দ্রবিন্দু উড়াইয়া নিয়া পশ্চিমবঙ্গে রাখিয়া দেন ; এইজন্য পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষতঃ বাঁকুড়া অঞ্চলে নিতান্ত অস্থানে ও চন্দ্রবিন্দুর, বিলক্ষণ উৎপাত দেখা যায়। যেমন, কাঁচ, কুঁড়ে, জোঁক, ঘোঁড়া, ঝাঁক, পাঁঠা, ভোঁতা, কুঁজ, পুঁজ, উঁচু, বাঁচা, যুঁই,

খিঁচুড়ি, ইত্যাদি। কেন যে এই শব্দগুলি এবং আরও কতগুলি শব্দ ভূতাবিষ্টের স্থায় চন্দ্রবিন্দুগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। আবার আর এক বিপদ এই যে, কোথায় চন্দ্রবিন্দু হইবে এবং কোথায় হইবে না, সে-সম্বন্ধে তোমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসিগণও সর্ব্বত্র একমত নহে। এমন কি, একই কলিকাতা সহরবাসিগণের মধ্যে এবিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ "কুঁড়ে" লিখিয়াছিলেন তাহাতে কাব্যবিশারদ কি বলিয়াছিলেন, মনে পড়ে? "ঠাকুর-বাড়ীর কবির কথায় সূর্পণখা হারে।"

তোমাদের দেশে চন্দ্রবিন্দুর দৌরাত্ম্য দেখিয়া বাস্তবিকই সময় সময় মনে হয় যে, সূর্পণখা মরিলেও তাহার স্বরটা এদেশে অমর হইয়া রহিয়াছে। একই স্থানে যখন ঘনসন্নিবিষ্ট চন্দ্রবিন্দুর চাঁদের বাজার মিলে তখন তোমাদের ভাষাটি কেমন শ্রুতিমধুর হয় তাহার একটু নমুনা দিতেছি ঃ—

"ষাঁড়ের মত গোঁয়ার একটা কাঁসারী সাঁঝের বেলা আঁধারে এক তাঁতীর ঘরে হাঁস চুরি করতে সেঁদিয়েছিল। তাঁতী একটা বাঁশের বাঁথারি নিয়ে তাকে তাড়া করল। কাঁসারী ভোঁ দৌড় দিলে, তাঁতী আঁধারে বাঁথারীর এক বাড়ি মারল। সেটা গিয়ে পড়ল একটা ঘোঁড়ার পিঠে। সোনার চাঁদ অমনি চিঁহি রবে গাধার রাগিনী আলাপ জুড়ে দিলেন।"

আমার মনে হয়, এ দেশে চন্দ্রবিন্দু কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুশাসন মানে না, তবে যে-সকল বাঙ্গালা শব্দ সংস্কৃতমূলক তাহাদের সম্বন্ধে কতকটা নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ যে সমুদায় সংস্কৃত শব্দ "ঙ', 'ঞ' 'ণ', 'ন', 'ম', বা অনুস্বার আছে তাহাদের অপভ্রংস ব্যবহার কালে ঐ বর্ণগুলি যুক্ত হইলে, লুপ্ত বর্ণের পূর্ব্বে একটি চন্দ্রবিন্দুর আবির্ভাব হয়। দৃষ্টান্ত যথা—

'ঙ' লোপে ঃ—বঙ্কিম বাঁকা, পঙ্ক পাঁক, অঙ্ক আঁক, শঙ্খ শাঁখ।

'ঞ' লোপে ঃ—পঞ্চ—পাঁচ, অঞ্চল—আঁচল, গঞ্জিকা—গাঁজা, পঞ্জিকা—পাঁজী।

'ণ' লোপে ঃ—ষণ্ড—ষাঁড়, ভাণ্ড—ভাঁড়, বণ্টন—বাঁটা, শুণ্ড—শুঁড়, কণ্টক—কাঁটা, চণ্ডাল—চাঁড়াল, ভাণ্ডার—ভাঁড়ার।

'ন'-লোপে ঃ—চন্দ্র—চাঁদ, বন্ধন—বাঁধন, কুন্থন—কোঁথন, ছন্দ—ছাঁদ, কন্থা—কাঁথা, অন্ধকার—আঁধার, ছিন্ন—ছেঁড়া, রন্ধন—রাঁধা।

'ম'-লোপেঃ—গ্রাম—গাঁ, কম্প—কাঁপা, চম্পক—চাঁপা, ঝম্প—ঝাঁপ, ভূমি—ভূঁই।

অনুস্বর-লোপে ঃ—হংস—হাঁস, বংশী—বাঁশী, বংশ—বাঁশ, কাংস—কাঁসা।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত সূত্রটি প্রণীত হইতে পারে ঃ—যদি কোন সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালায় ব্যবহার-কালে বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ বা অনুস্বার লোপ হয় এবং লুপ্তবর্ণের পূর্ব্বস্থিত স্বরবর্ণের গুণ বা বৃদ্ধি হয়, তবে ঐ গুণযুক্ত বা বৃদ্ধিযুক্ত বর্ণে চন্দ্রবিন্দুর আগম হয়। যথা—ছিন্ন ছেঁড়া। এ স্থলে ছিন্ন-র 'ন্ন' লোপ হইয়াছে এবং উক্ত লুপ্তবর্ণের পূর্ব্বস্থিত স্বর 'ই'-কারের গুণ 'এ' হইয়া 'ছি' স্থানে 'ছে' হইয়াছে;—অতএব উক্ত 'ছে'-তে চন্দ্রবিন্দুর আগম হইয়া 'ছেঁড়া' হইয়াছে। পুনশ্চ, হংস—হাঁস। এ স্থলে অনুস্বারের লোপ হইয়াছে এবং তৎপূর্ব্ব স্বর 'অ'-কারের বৃদ্ধি 'আ' হইয়া 'হা' হইয়াছে; অতএব উক্ত 'হা'তে চন্দ্রবিন্দুর আগম হইয়া হাঁস হইয়াছে।

কিন্তু যেখানে লুপ্তবর্ণের পূর্ব্বস্বর গুণযুক্ত বা বৃদ্ধিযুক্ত হয় না, সেখানে চন্দ্রবিন্দুও সাধারণতঃ কোন দাবী রাখে না। যেমন লুণ্ঠন—লুট। এ স্থলে 'ণ্ঠ'র 'ণ' লোপ হইলেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী 'উ'কারের গুণ হয় নাই, সুতরাং এ নিগুর্ণ স্থানে চন্দ্রবিন্দুরও আগম হয় নাই। এইরূপ, মুণ্ড—মুড়া (মাছের মুড়া), গুণ্ঠন—গুঠান (জাল গুঠান) ইত্যাদি।

চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার সম্বন্ধে এই যে তোমাকে সূত্রটি দিলাম, অবশ্যই ইহার ব্যতিক্রম আছে। সকল বিধিরই ব্যতিক্রম আছে। দুই-চারিটা ব্যতিক্রমের কথা এখনই আমার মনে আসিতেছে। যেমন, যজ্ঞ—যাগ। এখানে 'ঞ'র লোপ হইয়াছে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের বৃদ্ধিও হইয়াছে। তথাপি চন্দ্রবিন্দুর আবির্ভাব হয় নাই। আবার, 'ছিন্ন

করিয়া'—ছিঁড়িয়া। এখানে 'ন'র লোপহেতু চন্দ্রবিন্দুর আগম হইয়াছে বটে, কিন্তু লুপ্তবর্ণের পূর্ব্বস্বরের গুণ হয় নাই। তথাপি আমার মনে হয়, আমার সূত্রটিকে সাধারণ বিধি ধরিয়া লইলে, নিপাতনের সংখ্যা খুব বেশী হইবে না।

কথিত বাঙ্গালা সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বলিবার ছিল। কিন্তু পত্রও দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, আমার কাগজও ফুরাইয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ এ কৈলাসপুরীতে আজকাল কাগজ যেরূপ দুষ্প্রাপ্য, সেইরূপ দুর্ম্মূল্য। আমি ভিখারী, পয়সা কোথায় পাইব? এমনই আমার নিত্যকার প্রয়োজনীয় পয়সা জোটে না। অতএব, এ পত্র এখানেই শেষ করিতে হইল।

আমার শেষ অনুরোধ, তুমি সাহিত্যিক বাঙ্গালা ব্যাকরণের পরিশিষ্টরূপে একখানি কথিত বাঙ্গালার ব্যাকরণ রচনা কর, ইতি

মেটারলিঙ্কীয় নাটকে চরিত্র-সৃষ্টি

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

মেটারলিঙ্কীয় চরিত্র-সৃষ্টির ইতিহাসটি আলোচনা করিলেই আমরা তাঁহার বাস্তব নাট্য রচনার দিকে প্রয়াণের প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝিতে পারিব। তাঁহার বাস্তব নাট্য রচনাকে একটা খামখেয়ালী ব্যাপার বলিয়া মনে করিলে মেটারলিঙ্কীয় জীবনের ক্রমবিকাশের ও পরিণতির স্বাভাবিক ধারাটিকেই বোঝা হয় নাই বলিয়া মনে করিব। এ পর্য্যন্ত ভাববস্তুর দৃশ্য পরিকল্পনা এবং বার্ত্তালাপ ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের মধ্যে সর্ব্বত্রই আমরা মেটারলিঙ্কীয় অন্তর্জ্জীবনের একটা ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইয়াছি, এখন আমরা তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টির মধ্য দিয়াও কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব।

১৮৯৬ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেটারলিঙ্ক চরিত্র সৃষ্টির দিক্ দিয়া যে সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই তাহার মূলে যে চরিত্র-সৃষ্টির মৌলিক অক্ষমতা ছিল না, তাঁহার পরবর্ত্তী নাটক তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। রহস্য-সৃষ্টি যে চরিত্র-সৃষ্টির বিরোধী এবং মেটারলিঙ্ক এক সময় রহস্য বোধের দ্বারা একেবারে আচ্ছন্ন ও মগ্ন হইয়াছিলেন বলিয়াই যে প্রথমকার নাটকে চরিত্র-সৃষ্টি হইয়া উঠে নাই তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। 'অনাহূত' 'দৃষ্টিহারা' 'সপ্ত রাজকুমারী', 'অন্দরে' 'তিন্তাজিলের মৃত্যু' প্রভৃতির মধ্যে কোনো চরিত্র-সৃষ্টি হয় নাই বলিলেও বলিতে পারা যায়। রহস্যকে মূর্ত্ত করিবার জন্য, নিয়তির অদৃশ্য ভীষণতাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য যতটুকু চরিত্র সৃষ্টি অনতিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যেও আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যথাসম্ভব ছায়াময়, স্বপ্নময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখিয়াছি।

ব্যক্তিত্ব কি?

ব্যক্তি-চরিত্রের ব্যক্তিত্ব কোথায় তাহা না বলিলে আমাদের উক্তি অস্পষ্টই থাকিয়া যাইবে। জীবনের ধর্ম্মই হইতেছে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে সে নিজের প্রয়োজন মত রূপান্তরিত করিয়া লয়। জড়জগৎ ক্রমাগতই তাহার স্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করিয়া আপনার ছন্দের সহিত মিশ খাওয়াইয়া লইতে চায়, আর জীবন কেবলই জড়জগতের বা পারিপার্শ্বিকের এই কর্ত্তৃত্বকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে নিজের বিশেষত্বের অনুরূপ রূপ দিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। এবং তাহা করিতে গিয়াই জীবন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে, ব্যক্তিত্ব লাভ করে। জীবনের এই চেষ্টার ফলেই বিশ্বজগতের বুকে, প্রকৃতির রাজ্যেরই মাঝখানে আর একটি জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে, সে-জগৎ মানুষের সমাজ সভ্যতার

জগৎ, সে-জগৎ তাহার কথায় কথায় বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বের ছাপ লইয়া জীবনের স্বাতন্ত্র্যকে প্রচার করিয়াছে।

যে-ব্যক্তি শুধু অন্যের ইচ্ছাকেই সার্থক করিবার জন্য যন্ত্রের মত চলিতে থাকে, আমরা তাহাকে ব্যক্তিত্বহীন, মেরুদণ্ডহীন মানুষ বলিয়া থাকি। তাহার কারণ অন্যের ইচ্ছার স্রোতে পড়িয়া সে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং সেই অন্য-ইচ্ছার বৈশিষ্ট্যকেই বিশ্বসংসারে ঘোষণা করিবার জন্য যেন সে বাঁচিয়া আছে; তাহার মধ্যে তাহার জীবনের যে একটি বিশেষ ইচ্ছা এবং ইঙ্গিত, আশা এবং অভিব্যক্তি সংহত রহিয়াছে তাহাকে সে প্রকাশ করিল না, তাই সে তাহার নিজস্ব রূপ বৈশিষ্ট্যকে অর্জ্জন করিতে পারিল না। তাহার কর্ম্মের মধ্যে বিশ্বজীবনের যে একটি বিশেষ সুর এবং ভঙ্গী প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল তাহাকে সে প্রকাশ করিতে পারিল না; তাহার মধ্যে পাইলাম একটা মুখোস-পরা অভিনয় মাত্র।

প্রথমযুগের চরিত্র

এইভাবে দেখিতে গেলে মেটারলিঙ্কীয় নাটকের প্রথম যুগের ব্যক্তিগুলি তাহাদের পারিপার্শ্বিকের অর্থাৎ নিয়তিরই মূর্ত্তিরূপ বলিয়া মনে হয়। 'অনাহূতের' বাপ-ঠাকুর্দ্দা-খুড়ো, 'দৃষ্টিহারার' অন্ধের দলের মধ্যে কি আমরা তাহাদের জীবনের কোনো বিশিষ্ট ইচ্ছার প্রেরণা দেখিতে পাই? সেখানে আমরা চারিদিকের বিপুল রহস্যেরই আচ্ছন্ন করা অনুভবটিকে মাত্র সকলের চেহারায় পরিস্ফুট দেখিতে পাই। তাই বলিতে হয় যে, এই সব নাটকে চরিত্রসৃষ্টি নাই। এই সব চরিত্রকে নাটকীয় দৃশ্যেরই একটা অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইলেও বিশেষ অবিচার হয় না।

কিন্তু মেটার্‌লিঙ্ক একেবারে হঠাৎ চরিত্র-সৃষ্টির দিকে যে মন দিয়াছিলেন তাহাও নহে। তাঁহার অন্তরের অবরুদ্ধ জীবনাবেগ একদিন একেবারে সব বাধাকে ঠেলিয়া দিয়া বিশ্বাসে আনন্দে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিলে যেমন বাঁধটিকে প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইবার প্রচণ্ড বেগ নদী পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চয় করিতে থাকে, নিঃশব্দে যেমন জলরাশি ফুলিয়া উঠিতে থাকে, মেটার্‌লিঙ্কের অন্তর্জ্জীবনেও যে তাহাই ঘটিয়াছিল তাহার আভাস আমরা তাঁহার নাটকীয় চরিত্র-সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব। বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চরিত্র-সৃষ্টির প্রেরণা মেটার্‌লিঙ্কীয় নাটকের প্রথম যুগেও স্থানে স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মেটার্‌লিঙ্কীয় নাট্যে চরিত্রবিকাশের ধারা

'প্রিন্সেস ম্যালানের' কথা এখানে তুলিব না; কারণ ইহার মধ্যে মেটার্‌লিঙ্কীয় নাটকের বিশেষত্ব সেক্সপীয়রীয় প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মেটার্‌লিঙ্ক ইহার মধ্যে আপনার শক্তির একটা অন্ধঅনুভব মাত্র পাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা-সঙ্গীতে যেমন আমরা তাঁহার নিজস্ব বিশেষত্বের সহিত পূর্ব্বযুগের প্রচলিত প্রথার একটা সংগ্রামের সূচনা দেখিতে পাই, নিজস্ব শক্তির সাক্ষাৎ না পাওয়ার ফলে যে একটা হাতড়ান শক্তি পাই, তেমনি মেটার্‌লিঙ্কের উক্ত নাটকখানিতেও আমরা শিল্পী মেটারলিঙ্কের পথ খোঁজা দেখিতে পাই। সেইজন্যই এখানে চরিত্র সৃষ্টির কথা বলিতে গিয়া প্রিন্সেস্ ম্যালানের কথা বাদ দিতেছি।

মেটার্‌লিঙ্কের সর্ব্বপ্রথম চরিত্র-সৃষ্টি পীলিয়াস-মেলিস্যাণ্ডায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মানব-অন্তরের নিগূঢ় পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। নিয়তির রহস্যময় অন্ধকার এই প্রেমকে পথহারা করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু তবু প্রেম এই আঁধার পথের মাঝ দিয়াও চলিয়াছে, চতুর্দ্দিকের বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্যে প্রেম তাহারও অজ্ঞাতে তাহার নিত্যসিদ্ধ পরিচয়টিকে পাইবার জন্য চকিত-ত্রস্ত-নয়নে চাহিতেছে। প্রেমের এই যে আবির্ভাব ইহার ফলেই চরিত্র-সৃষ্টি একেবারে অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। রহস্য-বোধ একটা আবহাওয়ার মত, অন্ধকারের মত, অস্বস্তিভরা অস্পষ্টতার মত বিরাজ করিতে পারে, কিন্তু প্রেম হইতেছে আলোক, তাহার ভাস্বর জ্যোতিঃ ব্যক্তির জীবনকে সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ না করিয়াই পারে না। প্রেম জীবনের নিঃশ্বাস, আত্মার খাদ্য; প্রেমের জাগরণ মানেই ব্যক্তিত্বের পথে, বৈশিষ্ট্যের পথে যাত্রা। প্রেমের প্রকাশ দুই না হইলে হইতে

পারে না, দেওয়া-পাওয়া চাই সেখানে, প্রাণের সহিত প্রাণের মিলন চাই সেখানে। এই সব অনিবার্য্য কারণেই বোধ করি পীলিয়াস-মেলিসাণ্ডা নিয়তি-বিধিকেও অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

'যুগল' প্রেমের অপরূপ রসসৌন্দর্য্যের কল্পনা করিতে গিয়াই মেটারলিঙ্ক পীলিয়াস-মেলিস্যাণ্ডাকে পাইয়াছেন। এই যুগলের প্রেমকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই গোলোডের অবতারণা। প্রেমসমস্যার এই যে তৃতীয়, ইহা মূলতঃ দুয়েরই বিকাশ ও পরিণতির জন্য, প্রেম কি এবং কি-নয় এই দুটি দিক্ দেখাইবার জন্যই তিনের অবতারণা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সে যা হোক, এই নাটকের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মেটারলিঙ্ক এমনই চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাকে সার্থক বলিতে হইবে। পুরুষ চরিত্র এখানে অনেকটা দুর্ব্বল হইলেও পীলিয়াস্, মেলিস্যাণ্ডা এবং গোলোড ইহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য মেটারলিঙ্ক অতি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ পীলিয়াস্ ও মেলিস্যাণ্ডার অন্তরতম পরিচয়ের যে অপরূপ বেদনাশ্রুর সন্ধান মেটারলিঙ্ক দিয়াছেন তাহা বিশ্বের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অভিনব রসসম্পদ্ বলিয়া বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। প্রেমানুভূতির এমন সুন্দর বেদনাময় প্রকাশ পীলিয়াস ও মেলিস্যাণ্ডার নীরব দৃষ্টির মধ্য দিয়া যে কি আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত মেটারলিঙ্ক করিয়াছেন তাহার একটু আভাস মাত্র হয়ত বা পাঠক নাটকের আখ্যানাংশ হইতে পাইতে পারেন, কিন্তু দৃশ্য পরিকল্পনা, বার্ত্তালাপ ও ঘটনা-সমাবেশের আশ্রয়ে যে মেটারলিঙ্কীয় প্রেম ও মানবাত্মার অপরূপ সৌন্দর্য্যানুভূতি কেমন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নাটকের পাঠক ভিন্ন আর কাহারও ধারণা করা সম্ভব নহে।

নিয়তিবোধের অপসারণের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই মেটারলিঙ্কীয় নাটকে প্রেমের সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহারই ফলে তাঁহার চরিত্রগুলিও বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চরিত্র-সৃষ্টির গতিটি কোন্ দিকে হইয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, মেটারলিঙ্কীয় নাটকের চরিত্রগুলি ছায়া এবং স্বপ্নের জগৎ হইতে ধীরে ধীরে বাস্তব জগতের আলো-হাওয়া ও জীবনে মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। প্রথম যুগের নাটকীয় চরিত্রের নামগুলি পর্য্যন্ত যেন রূপকথার রং মাখান। পীলিয়াস-মেলিস্যাণ্ডায় যদিও ঘটনার দিক্ দিয়া বাস্তবতার রং ধরিয়া উঠিয়াছে তথাপি তাহার সিম্বলিজম্ ও বার্ত্তালাপের প্রভাবে নাটকখানি যেন মানবাত্মার অন্তর্লোকেরই একখানি স্বপ্নময় চিত্র বলিয়া মনে হইতে থাকে। এই যে স্বপ্নময় ভাব, ইহা মেটারলিঙ্ক সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। অন্তরের নিভৃত গুহা ছাড়িয়া বহির্বিশ্বের পানে বাহির হওয়ার বিচিত্র ইতিহাসটি যে মেটারলিঙ্কেরই জীবনের বিকাশের বিশেষত্ব নহে তাহার ইঙ্গিত স্থানান্তরে করিয়াছি। সে যাহা হোক, চরিত্রসৃষ্টির ক্রমিক ইতিহাসে মেটারলিঙ্কের জীবনের বিকাশ যে কেমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে তাহা 'দৃষ্টিহারা' হইতে 'মেন্নাপসরণের' দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

মেটারলিঙ্কীয় ভাববিকাশের মনস্তত্ত্ব

এই যে অন্তরগুহা ছাড়িয়া বাহিরের বাস্তব বিশ্বের দিকে প্রয়াণ ইহার মূলে শক্তিবোধ রহিয়াছে। মানবাত্মা যখন আপনার অশক্তির মধ্যে আপনাকে অসহায় দেখিতে থাকে তখন আত্মরক্ষারই প্রেরণায় সে স্বপ্নলোকে তাহার সান্ত্বনা খুঁজিয়া বেড়ায়; কিন্তু পরিপূর্ণ শক্তিবোধ কিছুতেই মানুষকে তাহার স্বপ্নলোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় না; বহির্জ্জগতের সহিত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা না করিয়া সে আপনাকে সার্থক করিতেই পারে না। মেটারলিঙ্কের অন্তরজীবনে যে শক্তি ও সাহস ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহার নাটকের বাস্তবতার দিকে গতি দেখিলেই অনুমান করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই শক্তিবোধ নাটকে শক্তিময় চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আলাদীন ও পালোমেডিসের য়্যাষ্টোলেন, তিন্তাজিলের মৃত্যুতে ইগ্রেন, এগ্লাভেন সেলীসেটে এগ্লাভেন, আর্দ্দিয়ান ও নীলদাড়িতে আর্দ্দিয়ান, মোনাভানায় মোনাভানা, মেরী মডলীনে মডলীন ও খৃষ্ট, বার্গোমাষ্টারে ইসাবেল ও বার্গোমাষ্টার, ক্লস ও হিলমার, মেন্নাপসরণে টাটিয়ানা, সোনিয়া ও য়্যাস্কেল, মেটারলিঙ্কের শক্তিবোধের ক্রমবিকাশটিকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছে।

মেটারলিঙ্কের নারীচরিত্র

মেটারলিঙ্কীয় নাটকে সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত নারী-চরিত্রের প্রাধান্যটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। অন্তর্জ্জীবনের গভীরতর লীলাটিকে মেটারলিঙ্ক নারীচরিত্রের মধ্যেই দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত জয়জেল নাটকেও আমরা নারীচরিত্রকেই দৃঢ় ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট দেখিতে পাই। পুরুষচরিত্রগুলি যেন ব্যক্তিত্বহীন, তাহাদের মধ্যে তাহাদের জীবন যেন প্রবল হইয়া ইচ্ছার মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়। এম্, ক্লার্ক মহাশয়ও এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

"মেটারলিঙ্কের নাটকে নারীচরিত্রগুলিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুন্দর হইয়াছে। নারী যে পুরুষের চেয়ে সূক্ষ্মতর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারিণী এবং তাহার সহজ স্বভাবগত বিচারশক্তি যে পুরুষের চেয়ে বেশী এই বিশ্বাসটি বার বারই তাঁহার নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে...একমাত্র নারীই বিশ্বপ্রকৃতির ও বস্তুজগতের সত্যের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ রাখিতে পারিয়াছে। জগতের কেন্দ্র ও প্রাণ-ধমনীই নারী।" †

নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তাহার আলোচনা দীনের সম্পদে 'নারী প্রবন্ধে মেটারলিঙ্ক স্বয়ং যাহা করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। * নাটকের মধ্যেও বহু কাল পর্য্যন্ত মেটারলিঙ্ক এই ভাবটিকেই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন।

নারী ও পুরুষ

মেটারলিঙ্কের মতে যাহা-কিছু গভীরতর জীবনের বস্তু যাহা-কিছু গভীরতম অনুভবের বিষয় সে-সমস্তই নারী অতি সহজে জানিতে ও বুঝিতে পারে; পুরুষ বিচার-প্রধান, সে তাহার বুদ্ধি-বিচারের ফলেই সহজ বোধটিকে গভীরতর সত্যের সহিত স্বচ্ছন্দ যোগটিকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজকালকার ভাষায় বলিতে গেলে, নারী তাহার মগ্ন চৈতন্তের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া চলে বলিয়াই অনেক পরিমাণে অভ্রান্ত। কিন্তু পুরুষ বুদ্ধির পথে চলিয়াছে; জীবজগতের ক্রমবিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি এই মানুষের মধ্যে হইয়াছে; আর মানুষ বুদ্ধির অভিনব আবিষ্কারের দ্বারাই এই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে। মানুষের মধ্যে পুরুষ আবার বিশেষভাবে এই অভিনব শক্তির পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ক্রমপরিণতির অসীম পথে পুরুষের যাত্রা মোটে সুরু হইয়াছে বলিলেই হয়; এই বিশ্বজগতে বুদ্ধি আজও সহজ সংস্কারের তুলনায় শিশু এবং শিশু বলিয়াই সে অনন্ত জীবনের রহস্তময় শক্তিকে ও সত্যকে আজও লাভ করিতে পারে নাই, তাহার সম্মুখের পথখানি আজও তাই অজ্ঞাত রহস্ত-কুহেলিকায় ঢাকা; তাই তাহার বুদ্ধি আজও নিয়তিকে আয়ত্ত করিবার নবশক্তিকে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। নারী কিন্তু এই বুদ্ধির পথে প্রয়াণ করে নাই, সে বহু পরিমাণে আদিম মানবের স্বভাবজ সহজ বোধটিকে লইয়াই তাহার পথে চলিয়াছে; আর পুরুষ আদিম মানবের সেই সহজ জ্ঞান ও সামঞ্জস্তের পথ ছাড়িয়া দিয়া না জানি কোন্ দুরাকাঙ্ক্ষার বেগে বুদ্ধির বিপদ্‌সঙ্কুল পথে চলিয়াছে। তাই অনুভব-জীবনের গভীর গোপনে নিয়ত যাহা কিছু করিতে অগ্রসর হইতেছে, নারী তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেও পুরুষ অন্ধের মতই নিয়তির গতিবিধিকে কিছু মাত্র জানিতে পারিতেছে না। এইজন্তই আমরা মেটারলিঙ্কীয় নাট্যে নারীকে যেমন সহজ শক্তিময়ী ও নিয়তি-জয়িনী দেখিতে পাই, পুরুষকে তেমন দেখিতে পাই না। এইজন্য মেটারলিঙ্কের অধিকাংশ নাট্যে বাস্তবিক সত্ত্বাতটি দেখিতে পাই নারীর মধ্যে। পীলিয়াস, পালো-মিডিস, এগ্লাভেন, মীলিয়াণ্ডার প্রিন্সিভাল, লান্সিওর, ভীরুস্—ইহাদের মধ্যে আমরা সেইজন্তই তেমন কোনো শক্তি বা ইচ্ছার জাগ্রত প্রবলতা লক্ষ্য করি না, অথচ ইহাদের পাশাপাশি নারী চরিত্রগুলির মধ্যে মেটারলিঙ্ক নিয়তির বিরুদ্ধে প্রবল হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন দেখিতে পাই।

বাস্তব জীবন ও পুরুষ

কিন্তু বাস্তব জগতের শক্তি ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে নামিয়া আসার সঙ্গে-সঙ্গেই মেটারলিঙ্কের পুরুষ-চরিত্রগুলিও প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখিতে পাই। আমরা দেখিয়াছি যে, "মক্ষিকা জীবন" (The Life of the Bee) এবং

---

† Maurice Maeterlinck (M. Clark), p. 258.

* পূর্ব্বপ্রকাশিত 'মেটারলিঙ্কের প্রভাত-সঙ্গীত' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩২)

গোপন মন্দির (Buried Temple) এই দুইখানি বইয়ে মেটার্‌লিঙ্ক বুদ্ধির মহিমাকেই প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাহারই ফলে নাটকেও সর্ব্বপ্রথম মার্লিন চরিত্রকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন,কিন্তু মার্লিনের শক্তি ও জয়জেলের শক্তির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা দেখাইতে মেটার্‌লিঙ্ক ভুলেন নাই। জয়জেলের শক্তি তাহার নিজের নিকটও অজ্ঞাত, কিন্তু মার্লিন তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এরিয়েল তাঁহার গোপন অন্তর-শক্তি, তাহাকে তিনি জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাই জয়জেলের জীবনের শক্তি তাহার ভালবাসার সহজ দৃঢ়তার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে আর মার্লিনের শক্তি তাঁহার নৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে, তাঁহার জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। জয়জেলের শক্তি তাহার নিগূঢ়তম জীবনের স্তরে মার্লিন সেখানে পৌঁছাইতে পারেন নাই। তাই মার্লিন জয়জেলের পথটিকে শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না। মার্লিন জয়জেলের নিকট পরাজিত হইলেও সে পরাজয় গৌরবময়। মার্লিন তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা নিয়তিকে জয় করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের ট্র্যাজেডি নৈতিক দুর্ব্বলতার মধ্যে নয়, নৈতিক জীবনের পরম গৌরবই মার্লিনের জীবনকে করুণ মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

জয়জেলের পর হইতেই মেটার্‌লিঙ্কের পুরুষ চরিত্র সবল ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আর একটি কারণ আছে; বাস্তবজীবনের দিকে চাহিলে সেখানে সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে নৈতিক জীবনের সংঘাত। নারীজীবনের ক্ষেত্রটি যেন তাহার প্রেমের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রটি বিচিত্র, জগতের বহু বিচিত্র শক্তির সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে; সেখানে তাহার নৈতিক চেতনাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; নৈতিক জীবনের জয়পরাজয়ের মধ্যেই তাহার সেখানকার পরিচয়- প্রেম-জীবনের মধ্যে নহে।

সেলীসেট ও বার্গোমাষ্টার

সেলীসেট ও বার্গোমাষ্টার এই দুটি চরিত্র লইয়া দেখিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্টতর হইবে আশা করি। এগ্লাভেন সেলীসেটের পাঠকমাত্রই হয়ত একটি বিচিত্র ব্যাপার উক্ত নাটকে লক্ষ্য না করিয়া পারিবেন না। দীনের সম্পদ পড়িয়া যাঁহারা ঐ নাটকখানি পড়িতে বসিবেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এগ্লাভেন ও সেলীসেটকে দেখিয়াই বলিবেন যে, সেলীসেট শিশু, এগ্লাভেনই প্রকৃত শক্তিময়ী। মেটার্‌লিঙ্কও বোধ করি এগ্লাভেনকেই বড় করিয়া তুলিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু কবির মতের চেয়ে তাঁহার অন্তর্জীবনের গুপ্ত বোধটি যে কত প্রবল তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে সেলীসেট চরিত্রের মধ্যে। এগ্লাভেনের প্রেম যে পরিমাণে সচেতন (self-conscious) হইয়া বিচারের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেই পরিমাণেই যেন সে গভীর অন্তর্দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সেলীসেট নিজের অন্তরতম সৌন্দর্য্যকে জানে না, অথচ তাহার মধ্য দিয়া তাহার গভীরতর জীবনের সমস্তখানি প্রেম ও সৌন্দর্য্য জীবন্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এইজন্যই সেলীসেট মেটার্‌লিঙ্কীয় চরিত্রজগতের একটি অতি সুন্দর প্রাণময় সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে।

বার্গোমাষ্টারের জীবনের বিকাশ কিন্তু জীবনের অনুভূতি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে নয়; কর্ত্তব্য ও নীতিবোধের মাঝে বার্গোমাষ্টারের জীবনখানি ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা এখানে হৃদয়ের অনুভূতির মধ্য দিয়া মুখ্য হইয়া না উঠিয়া, কর্ম্ম ও বিচারের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষকে বহির্জ্জগতের মধ্যে সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়াই তাহার মধ্যে অনুভবমগ্নতা মুখ্য হইয়া থাকিতে পারে না, কর্ম্মই তাহার নিকট মুখ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্য তাহার প্রকাশ বুদ্ধির ক্ষেত্রে, বিচারের ক্ষেত্রে, কিন্তু নারীর জীবনে বুদ্ধিবিচারমূলক কর্ম্মটি প্রধান হইয়া উঠে নাই, তাহার জীবনে হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য, ভাবপ্রাধান্যই বেশি। এইজন্যই নারীজীবনের যাহা-কিছু সঙ্ঘাত তাহা বিশেষ করিয়া তাহার অনুভবের ক্ষেত্রে, প্রেমের ক্ষেত্রে; কর্ম্ম সেখানেও আছে কিন্তু তাহা মুখ্য নহে। বার্গোমাষ্টারের চরিত্রকে বিচারশীল করিয়া তোলার মূলে মেটার্‌লিঙ্কীয় জীবনে বাস্তবতার দিকে প্রয়াণ (Extroversion) রহিয়াছে সত্য, কিন্তু

পুরুষচরিত্রের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠাই তাহার প্রধান কারণ। 'মেঘাপসরণ' (The Cloud that Lifted) নাটকের ম্যাক্সেল ও টাটিয়ানা এবং সোনিয়ার চরিত্র-সমালোচনায় তাহা আরো স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

বার্গোমাষ্টারের ত্রুটী

এখানে বার্গোমাষ্টার নাটকখানির সম্বন্ধে আরো-কয়েকটি কথা বলিবার চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, বার্গোমাষ্টার নাটকখানি নৈতিক জীবনের একটি অতি মহান্ আদর্শকে দেখাইলেও তাহার মধ্যে আদর্শটি তেমন সার্থক হইয়া প্রকাশ পায় নাই। তাহার কারণ কি বুঝিতে হইলে আমাদের সর্ব্বপ্রথম এই কথাটি বুঝিতে হইবে যে, কোনো একটি জীবনের প্রতি আমাদের বিস্ময় জাগ্রত হয় কেন? যখনই আমাদের চোখের সম্মুখে আমরা জীবনের এমন একটি বিশাল মহিমাকে প্রত্যক্ষ করি যাহা আমাদের জীবনের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাব্যতার মত রহিয়াছে, অথচ যাহাকে আমরা আমাদের জীবনের মধ্যে ধরিয়া উঠিতে পারি নাই বা পারিতেছি না, তখনই আমাদের মধ্যে সেই সুপ্ত জীবন তাহার সত্য স্বরূপের সাক্ষাৎ পাইয়া হাহাকার করিয়া উঠে কিম্বা বিস্ময়ে আনন্দে অশ্রুপাত করিতে থাকে। সুতরাং দেখিতে পাইতছি যে, জীবন-ব্যাপারের কোন একটি মহিমা প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। কিন্তু মহিমার স্বরূপটি ফুটিতেই পারে না যদি সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটিও না দেখিতে পাই যে, এই মহিমা আমাদের অধিগত জীবনের বর্ত্তমান দৃষ্টিসীমার কতখানি ঊর্দ্ধে অর্থাৎ এই মহিমার প্রকাশ কতখানি বাধাকে ঠেলিয়া, কতখানি সংগ্রামকে জয় করিয়া সম্ভব হইয়াছে। আজ যদি ভগবান্ আসিয়া রাশি রাশি অত্যাশ্চর্য্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে সুরু করেন তাহা হইলে তাহাতে আমাদের বিস্ময় এতটুকুও দেখিতে পাইব না। কারণ ভগবানের কর্ম্মের মধ্যে আমরা আমাদের জীবনের কোনো সম্ভাব্যতারই সাড়া পাইব না। এইজন্যই রাম চরিত্র, মনুষ্য চরিত্র, কারণ মানুষ না হইলে রামের জীবন কখনো আমাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার যোগসূত্রে বাঁধা পড়িত না। মহাত্মা গান্ধির এই যে অপরিসীম ত্যাগ ও মৈত্রী, করুণা ও সংযম, ইহা সমস্ত জাতিকে এমন করিয়া পাগল করিয়া তুলিল কেন? তাহার কারণ তাঁহার জীবনের পশ্চাতে একটা ক্রম-বিকাশ রহিয়াছে; এই ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার জীবনখানিকে আমাদের জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই। আমাদের জীবনের সুপ্ত সম্ভাবনা তাঁহার জীবনে একটি সাধনার মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই। বার্গোমাষ্টারে আমরা তাঁহার জীবনের বিকাশ ও সংগ্রামটিকে দেখিতে পাই না; সেইজন্যই বোধ করি এতবড় ত্যাগ ও তাহার মহিমাটিকে আমাদের অনুভবের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে পারে নাই। সূর্য্য ত প্রতিদিনই প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে, কিন্তু এই অসীম নীলাকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই যে আলোকের ও আনন্দের বিস্ময়কর প্রকাশ ছড়াইয়া পড়ে তাহা কি আমাদের নিকট প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে? কাহারো জীবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্যে, বিস্ময়ের মধ্যে—যেমন ব্রাউনিঙের পিপ্পায় (Pippa Passes)—তাহাকে না দেখিলে যত বড় বিস্ময়ের বস্তুই হোক্ তাহা আমাদের নিকট একেবারে শূন্য হইয়াই থাকে, পারিপ্রেক্ষিক (Perspective) না থাকিলে যেমন চিত্রের আয়তন বোধ হয় না, চরিত্র-সৃষ্টির ব্যাপারেও তেমনি কোনো মহৎ চরিত্রের মূল্য ও মর্য্যাদাটিকে উপলব্ধির বিষয় করিতে হইলে পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া তাহার আপেক্ষিক গুরুত্বটিকে পরিস্ফুট করিতে হইবে। বার্গোমাষ্টার নাটকের আবহাওয়ার মধ্যে বার্গোমাষ্টারের ত্যাগ, ক্লসের আত্মোৎসর্গ করার জন্য উন্মুখ হৃদয়, হিলমারের আত্মত্যাগ ইত্যাদির কোনোটিই যেন বেদনা বা বিস্ময়ের দ্বারা ষ্টিলেমঁদের আকাশ বাতাসকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতে পারিল না। প্রাণের যে একটা অতি বিশাল উৎসর্গে মানবাত্মা চির অভিনন্দিত হইয়া গেল, তাহার কোনো চিহ্নই নাটকে ফুটিয়া উঠিল না। এই নাটকের ত্যাগটি নীতির ক্ষেত্রে শুষ্ক কর্ত্তব্য-বোধের মধ্যেই শুধু প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের ক্ষেত্রে এই ত্যাগের যে একটি সত্যকার ব্যথানন্দময় রসমূর্ত্তি

আছে মেটারলিঙ্ক এই নাটকখানির মধ্যে তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু দেখাইবার শক্তি যে তাঁহার আছে, 'মেঘাপসরণে' তাহা চূড়ান্ত ভাবেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। যে রস-মূর্ত্তির সন্ধান এগ্লাভেন ও সেলীসেটের স্বপ্নলোকে মেটারলিঙ্ক আরম্ভ করিয়াছিলেন, 'মেঘাপসরণে'র বাস্তব জগতে মেটারলিঙ্ক সেই মূর্ত্তিকে একেবারে রক্তমাংসে গড়িয়া তুলিয়া একেবারে স্পষ্ট দিবালোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আধুনিক নাটকের বিষয়বস্তুর আলোচনায় মেটারলিঙ্ক যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, এই সুদীর্ঘকাল পরে তিনি তাহাই তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টির মধ্যে সত্য করিয়া তুলিয়াছন।

মেঘাপসরণ

মেঘাপসরণের তিনটি চরিত্রই বলিষ্ঠ, উন্নত ও উচ্চ নীতি-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইহার মধ্যে নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের চরিত্রই যেন একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সোনিয়া ও য়্যাস্কেলের ভালবাসা, টাটিয়ানার ভালবাসার পরম উৎসর্গ, জীবনের বিপুলতা সৌন্দর্য্য ও রহস্যকে যে কি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছে তাহা বলিয়া বোঝান অসম্ভব। বাহিরের দিক দিয়া ঘটনার জটিলতা না থাকিলেও অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতের দিক্ দিয়া নাটকখানি উচ্চতর জীবনের জটিলতাকে সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে। তিনটি চরিত্রই ভালবাসার পথে যে বিপুল সংগ্রাম করিতেছে তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া মেটারলিঙ্ক দেখাইয়াছেন, মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ যথেষ্ট থাকিলেও নাটকখানি কখনও বাস্তবিক নাটক হইতে পারিত না যদি প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে একটি জীবন্ত ও প্রাণময় সমগ্রতা দেখিতে না পাওয়া যাইত। মোট কথা আমাদের নিকট নাটকখানি শুধু একটা সমস্যাকে দেখায় নাই, ইহার মধ্যে প্রেম-সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া মুখ্যতঃ জীবনই প্রকাশ পাইয়াছে।

মেটারলিঙ্কের শিশু-চরিত্র

এম্ ক্লার্কের মতে মেটারলিঙ্ক চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া ফরাসী নাট্যে একটি নূতন ব্যাপার করিয়াছেন। শিশু-চরিত্র নাকি ফরাসী নাট্যে মেটারলিঙ্কই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সে যাহাই হোক, তিনি কয়েকটি শিশু-চরিত্র যে খুব সুন্দর ও স্বাভাবিক করিয়াই সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষ করিয়া এখানে ইনিওল্ড, ইসালীন, টিলটিল মিটিল ইহাদের কথাই মনে পড়ে। গোলোড যখন সন্দেহে সংশয়ে ঈর্ষায় পাগল হইয়া পীলিয়াস ও মেলিস্তাণ্ডা কক্ষাভ্যন্তরে কি করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য, পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া ইনিওল্ডকে বাহির হইতে বাতায়নের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে তখন তাহার শিশুসুলভ পুরস্কার পাওয়ার আগ্রহাতিশয্যে কাজের কথা ভুলিয়া যাওয়া প্রভৃতি অতি স্বাভাবিক করিয়াই মেটারলিঙ্ক দেখাইয়াছেন।* পীলিয়াস মেলিস্তাণ্ডার যুগ মেটারলিঙ্কের বাস্তবসৃষ্টির যুগ নহে, কিন্তু তখনকার এই শিশুচরিত্রটি যে বাস্তব হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তারপর সেলীসেট ও ইসালীনের সেই করুণ দৃশ্যে ইসালীনের চিত্রটিও খুবই সুন্দর হইয়াছে।† নীলপাখীর টিলটিল ও মিটিলের বড়দিনের স্বপ্নের মধ্যেও শিশুজীবনের মনস্তত্ত্বটি সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়া দেখার যোগ্য।

শিশু ও বৃদ্ধ

শিশুচরিত্রের মধ্যে মেটারলিঙ্ক আর-একটি তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়াছেন; শিশু এবং বৃদ্ধ নারীর মতই রহস্যকে নিয়তির আবির্ভাবকে স্বাভাবিক ভাবেই বুঝিতে পারে এই বিশ্বাস মেটারলিঙ্ক দীনের সম্পদেই ব্যক্ত করিয়াছেন।‡ মানুষের অন্তরের সত্যস্বরূপ না কি শিশুর স্বচ্ছদৃষ্টির সম্মুখে ঢাকা থাকিতে পারে না। মৃত্যুর আগমনে 'অনাহুতের' মধ্যে সদ্যোজাত শিশুর আকস্মিক চীৎকার, 'দৃষ্টিহারার' শেষ দৃশ্যে হঠাৎ শিশুর রোদন এ সমস্তের মধ্যে কেবল যে অদৃশ্য নীরবতাকেই মূর্ত্ত করিয়া তোলা হইয়াছে তাহা নয়, মেটারলিঙ্কের শিশু-সম্বন্ধীয় বিশ্বাসটিও ব্যক্ত হইয়াছে। মেটারলিঙ্কের বৃদ্ধ চরিত্রগুলির মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে।

* Pelleas and Melisande : Act III. Sc. V.

† Aglavaine and Selysette : Act IV.

‡ Treasure of the Humble (Awak. of the Soul) P. 39.

প্রথম যুগের নাটকে—অনাহূতের অন্ধ ঠাকুর্দায় পীলিয়াস ও মেলিস্তাণ্ডায় বৃদ্ধ আর্কল,—আমরা শিশুর মত বৃদ্ধের মধ্যেও রহস্য-বোধ পরিস্ফুট দেখিতে পাই ; শুধু তাহাদের দেখার মাঝে স্পষ্টতার অভাব রহিয়াছে। বৃদ্ধ আর্কেল, এগ্লাভেন সেলীসেটের বৃদ্ধা মেলিগ্রান, মোনাভানার মার্কেট। ইহারা সকলেই শক্তিহীন, অক্ষম ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে উচ্চতর স্থায়বোধ, মানবাত্মার সত্যরূপটিকে দেখিবার শক্তি মেটার্‌লিঙ্ক দেখাইয়াছে,নযদিও চরিত্র হিসাবে ইহারা জীবন্ত হইয়া উঠে নাই।

জটিলতার অভাব

এখানে সংক্ষেপে আরো দু-একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান আলোচনার অবসান করিতে চাই। মেটার্‌লিঙ্কীয় নাটকে যে বিষয়গত বৈচিত্র্য নাই তাহা বোধ করি বিবৃত করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন ; বাহ্যিক ঘটনায়ও মেটার্‌লিঙ্ক জটিলতার বিরোধী। ইবসেনের মধ্যে আমরা ঘটনা-সমাবেশের যে জটিলতা লক্ষ্য করি, তাহার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের নানা বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের যে কৌশল দেখিতে পাই, মেটার্‌লিঙ্কে তাহা নাই বলিলেই হয়। শেষের দিকে মেটার্‌লিঙ্ককে আমরা কতকটা এই দিকে মন দিতে দেখিয়াছি। মোনাভানার পর হইতে আমরা তাঁহাকে চরিত্র-বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য দিতে দেখিয়াছি। 'মেরী মেডলীন', 'বার্গোমাষ্টার' 'মেঘাপসরণ'ও 'মৃতের দাবী'র মধ্যে নাটকীয় চরিত্র-বৈচিত্র্যের দিকে তাঁহার গতি আরো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার শক্তিরও বিকাশ দেখিতে পাইয়াছে। চরিত্র-বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মেটারলিঙ্কের শক্তি সীমাবদ্ধ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জীবনের বহু বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে যে মেটার্‌লিঙ্কের অনুভব সাড়া দেয় নাই ইহাই বোধ করি তাঁহার নাটকীয় সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্যের অল্পতার কারণ।

উপসংহার

মেটার্‌লিঙ্কীয় ভাবধারার অনুসরণ করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি মেটার্‌লিঙ্ক আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মানবজীবনে নিয়তি ও নিবিড় গভীর ভালবাসা এই দুটি বস্তু ছাড়া আর কোন শক্তিকে তেমন করিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। মানব-জীবনকে বহু ঊর্দ্ধে পবিত্র চিত্তলোকে দেখিতে চাহিয়াছেন ও দেখিয়াছেন বলিয়াই মেটার্‌লিঙ্ক মানবজীবনের বাসনা-কামনার কুরুক্ষেত্রে যে অনন্ত শক্তিপুঞ্জের সংগ্রাম চলিয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। মেটার্‌লিঙ্কের নির্জ্জনতাপ্রিয় জীবনও যে এইজন্য বহুপরিমাণে দায়ী সে-কথা বোধ করি অস্বীকার করা যায় না। যে কারণেই হোক মেটার্‌লিঙ্ক মানবকে তাহার সাধারণ জীবনক্ষেত্রে রাখিয়া আঁকিতে চাহেন নাই। মানবাত্মা যে পবিত্রতর, শুদ্ধতর নৈতিক ও আত্মিক জগতের মাঝে বিকাশ লাভ করিতে চাহিতেছে, মেটার্‌লিঙ্ক সেই জগতের গভীরতর ও সত্যতর জীবনকেই দেখাইতে চাহিয়াছেন, তাহাতে বাস্তব জীবনের বিচিত্রতার দিক দিয়া মেটারলিঙ্কীয় নাট্য উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। জীবন কিন্তু বিকশিত হইলেই বাস্তবজগতে প্রকাশ না পাইয়া পারে না। মানুষের জীবন তাহার স্বপ্ন-লোকের মাঝেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না। পীলিয়াস, মেলিস্তাণ্ডা, কিম্বা এগ্লাভেন সেলীসেটের স্বপ্ন-জগতেই এই জীবনের সত্য এবং সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই ; তখনও উহা মানবাত্মার স্বপ্নলোকেই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু মেঘাপসরণের মধ্যে অবশেষে সেই গভীরতর জীবন তাহার বাস্তবতার মধ্যে মেঘমুক্ত সূর্য্যালোকে রক্তমাংসের জীবন্তরূপ ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিতে পাই। মেটার্‌লিঙ্কীয় ভাব-জীবনের পরিণতির এও আর-একটি সুন্দর নিদর্শন। আদি হইতে এই শেষের সময় পর্য্যন্ত দেখিতে গেলে মেটার্‌লিঙ্কীয় ভাব-জীবনের ইতিহাসটিকে স্বপ্নলোক হইতে বাস্তবলোকের দিকে মানবাত্মার যাত্রার ইতিহাস বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। নব্যমনস্তত্ত্বের ভাষায় ইহাকে অন্তরাবরুদ্ধ জীবনের বিশ্ব-জগতে মুক্তি (Introversion to extroversion) বলা যাইতে পারে। অবরুদ্ধ জীবনাবেগ বাহিরে মুক্তির আশায় নিরাশ হইয়া স্বপ্নের মধ্যে যেন সার্থকতার চেষ্টা করিতেছিল। ভাল-বাসা ও প্রেম আসিয়া সেই রুদ্ধতা হইতে অন্তরকে মুক্তি দিয়াছে, তাহাকে আলো-হাওয়ার জগতে বাধামুক্ত হইয়া সহজ আনন্দে চলিবার শক্তি দিয়াছে, মেটার্‌লিঙ্কীয় জীবনের পর্য্যালোচনায় আমার এই সত্যটিকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

স্ত্রীশিক্ষার প্রকার ও মাত্রা

অনেকে বলেন, ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের শিক্ষা এক-রকম হওয়া উচিত নয়। পাশ্চাত্য যে-সব দেশ শিক্ষায় খুব অগ্রসর, তথাকার অনেক লোকও একথা বলেন। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। কিন্তু ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষার পার্থক্য কোন্‌খানে ও কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা পরিষ্কার করিয়া অনেকেই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

গৃহকর্ম্ম যে-কারণে ও যে-পরিমাণে ছাত্রীদের শিক্ষণীয়, সে-কারণে ও সে-পরিমাণে ছাত্রদের শিক্ষণীয় নহে। অর্থাৎ ছাত্রেরা যদি এইসব কাজ শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহা বাহিরের লোকের কাজ করিয়া রোজগারের জন্য করিবে। কিন্তু ছাত্রীদের নিজের পরিবারের সুখ-সুবিধার জন্য এইসব কাজ শিখা আবশ্যক। অবশ্য, তাহারা এইসব কাজ করিয়া রোজগারও করিতে পারে।

কৃষিকার্য্য, বিশেষতঃ গীতবাদ্য ও চিত্রাঙ্কন, ফল ও তরিতরকারী উৎপাদন, নারীদেরও শিক্ষণীয়। বিদ্যাশিক্ষা করা এবং গৃহ সুসজ্জিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে শিখা মেয়েদের কর্ত্তব্য। এই সমস্ত কাজই পুরুষদেরও শিক্ষণীয়। কিন্তু সকল দেশেই—বিশেষতঃ আমাদের দেশে, মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে অধিক সময় গৃহে যাপন করেন, গৃহস্থালি করা প্রধানতঃ তাঁহাদের কাজ। এইজন্য গৃহ কেমন করিয়া স্বাস্থ্যকর করিতে ও রাখিতে হয়, এবং তাহাতে বাস কেমন করিয়া দেহ-মনের তৃপ্তিকর ও হৃদয়ের উন্নতিসাধক হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা প্রধানতঃ মহিলাদেরই কাজ।

রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে শিখা নারীদের একটি কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু পুরুষদেরও ইহা শিক্ষণীয়।

সন্তানের জননীত্ব ও সন্তান-পালন, এই দুটি বিশেষ করিয়া নারীদের কাজ। ইহা উত্তমরূপে করিতে হইলে নিজের ও সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে, খাদ্য নির্ব্বাচন ও প্রস্তুত করিতে, পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন ও প্রস্তুত করিতে, এবং পীড়ার সময় সেবাশুশ্রূষা করিতে জানা চাই। মানুষের শিক্ষা অক্ষর-পরিচয়ের অনেক আগেই আরম্ভ হয়। শিশু যাহা দেখে শুনে, তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, ভৃত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়—সব ব্যাপার হইতেই তাহার সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা হয়। সাধারণতঃ শিশুদিগকে ভয় ও লোভের দ্বারা শান্ত করা হয়, ঘুম পাড়ান হয়, নানা কাজ করান হয়। ইহাতে তাহাদের চরিত্রের হীনতা ও দুর্ব্বলতা জন্মে। শিশুদিগকে প্রকৃত মানুষ করিতে হইলে শিশুর মনস্তত্ত্ব এবং সাধারণতঃ মানুষের মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্ব জানা আবশ্যক। ইহা শিক্ষা-সাপেক্ষ।

শিশুপ্রকৃতির ও নারীপ্রকৃতির নৈকট্য, শিশুর মুখ ও নারীর মুখের সাদৃশ্য, শিশুদের সম্বন্ধে নারীদের ধৈর্য্য ও তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রভৃতি নানা কারণে, নারীরা শিশুদের শিক্ষাদান-কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া থাকেন। এই কারণে শিক্ষায় অগ্রসর অনেক দেশের প্রাথমিক-বিদ্যালয় সকলে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা খুব বেশী। যেমন, সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে ১৯২৪—২৫ সালে ৪৪০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮১৫৯ ও ৮৫৭৯ ছিল। এই সব বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকা দুই পড়ে; বালক ২৪৯২৪৬ এবং বালিকা ২৪৬২৭০।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়-সকলে সাহিত্য ইতিহাস ভূগোল গণিত বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা যাহা শিখান হয়, তাহার কোনটিই বালিকাদের অশিক্ষণীয় নহে। দেখাও যাইতেছে যে, ইহার প্রত্যেক বিষয়েই বালিকারা বালকদের মত পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকে। আপত্তি উঠিতে পারে, যে, বীজগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বালিকাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কি কাজে লাগিবে? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ঐসব বিষয়ের যাঁহারা শিক্ষক হন কিম্বা বিশেষভাবে উহার কোন না কোনটির জ্ঞান দরকার এমন কাজ করেন, তাঁহারা ছাড়া বাকী অধিকাংশ বালকের ভবিষ্যৎ জীবনে ঐ বিষয়গুলি কি কাজে লাগে? বস্তুতঃ মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য নানাবিষয়ের জ্ঞানলাভ আবশ্যক, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য নানা বিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন, এবং নানা ভয় কুসংস্কারাদি হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। বালকেরা যেমন মানুষ, বালিকারাও তেমনি মানুষ। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে শুধু মানুষ নামের উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত যাহা যাহা দরকার, তাহা নারীরও জ্ঞাতব্য পুরুষেরও জ্ঞাতব্য।

নারীদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া উচিত কি না, এবং তাহা তাহাদের পক্ষে আবশ্যক কি না, তাহারও আলোচনা হইয়া থাকে। শিক্ষার মধ্যে কতটুকু নিম্নশিক্ষা ও কতটুকু উচ্চশিক্ষা, কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? বস্তুতঃ, উচ্চ ও নিম্নের এই ভাগ কৃত্রিম। কতটুকু গণিত, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি শিখিলে বিদ্যার্থী নিম্নশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং কতটুকু শিখিলে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিবেচিত হইবেন, তাহার কোন মান বা তুলাদণ্ড নাই। আর, অল্প গণিত বা পদার্থবিদ্যা বা ইতিহাস শিখিলে যদি বালিকার মানবত্ব ও স্ত্রীত্ব বিনাশ বা হ্রাস না পায়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা অনেকটা বেশী ঐ সব বিদ্যা শিখিলে নারীর মানবত্ব ও নারীত্ব কেন লুপ্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে?

পাশ্চাত্য কোন কোন দেশে—যেমন আমেরিকায়—দেখা গিয়াছে, যে, উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ করিতে চান না। এইজন্য কোথাও কোথাও কলেজে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে গার্হস্থ্য-জীবনের প্রতি ছাত্রীদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে এরূপ অবস্থা ঘটে নাই, ভবিষ্যতেও না ঘটিবারই সম্ভাবনা। সুতরাং তাহার প্রতিকার-চেষ্টার প্রয়োজন নাই।

নারীদের জন্য উচ্চতম শিক্ষার প্রয়োজন নানাকারণে আছে। নারীরা কথায় দেবী বলিয়া উক্ত হইলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা বা কৃপার ভাব অনেকের মনগত—যদিও হয়ত অনেকে নিজেদের অন্তরে এরূপভাবের অস্তিত্ব সন্দেহ করেন

না। এই ভাব বিনষ্ট না হইলে সম্যক্ সামাজিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। এই ভাবের বিনাশ সাধন করিতে হইলে নারীকে জ্ঞানে ও সৎকর্ম্মে পুরুষের সমকক্ষ হইতে হইবে। জ্ঞানে ও সৎকর্ম্মসাধনের শক্তিতে নারী পুরুষের সমান হইলে বাহিরে ও অন্তরে নারী সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইবেন। তাহাতে আর-একটি সুফল এই হইবে, যে, প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানী পুত্রদেরও মস্তক হৃদয় ও বুদ্ধি জননীর চরণে প্রণত হইবে। বর্ত্তমান অবস্থাতেও সৎপুত্রের মস্তক ও হৃদয় নিরক্ষর জননীরও চরণে প্রণত হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধি প্রণত হয় না। এরূপ পুত্র মাতাকে ভক্তি করেন, ভালবাসেন, কিন্তু এই ভালবাসাতে কতকটা অল্পবয়স্কা জ্ঞানহীনা কন্যার প্রতি স্নেহের ভাব বিদ্যমান থাকে।

সমাজস্থিতি ও সামাজিক উন্নতির জন্য গৃহ, পল্লী ও নগরের স্বাস্থ্যের বন্দোবস্ত, এবং পারিবারিক ও সামাজিক সুনীতি ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। উচিত মূল্যে বিশুদ্ধ খাদ্য-দ্রব্যের বন্দোবস্ত হওয়া চাই। মাদক দ্রব্য ব্যবহারের, ঔষধার্থে ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে ভিন্ন বন্ধ হওয়া চাই। যাহাতে শ্লীলতা রক্ষিত হয়, ঘরবাড়ী এরূপ হওয়া চাই। রেলে ষ্টীমারে ভ্রমণকালে স্ত্রীলোকদের ও শিশুদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। অন্তঃপুরে ও বাহিরে নারীর উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইলে সামাজিক মতের এবং বিবাহাদি বিষয়ক কতকগুলি আইনের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। নারীর দায়াধিকার পুরুষের সমান হওয়া চাই। এই সকল বিষয়ে কোন দেশেই পুরুষেরা যথেষ্ট মন দেন নাই। আমাদের দেশে ত নহেই। বিদেশে কোথাও কোথাও যে সুপরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তত্রত্য নারীদের চেষ্টায়। আমাদের দেশেও মিউনিসিপ্যাল-বিধি, প্রাদেশিক বিধি এবং রাষ্ট্রীয় বিধি যে-সব সভাসমিতির দ্বারা প্রণীত হয়, তাহাতে নারীদের স্থান না হইলে আবশ্যক-মত ব্যবস্থা হইবে না। পুরুষেরা নারীর সাহায্য ব্যতিরেকে যেমন পারিবারিক কর্ত্তব্য করিতে পারেন না, তেমনি বাহিরের প্রতি কর্ত্তব্যও করিতে পারিবেন না।

বাহিরের কাজ করিতে গেলে গৃহকর্ম্মে অবহেলা হইবেই, বলা যায় না। বিদেশে অনেক সন্তানবতী নারী সন্তান-পালনাদি গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াও বাহিরের কাজ করেন। অন্যদিকে, আমাদের দেশের অনেক ধনী পরিবারের নারীরা সন্তানপালনের ভার দাসদাসীর উপর দিয়া আলস্যে ব্যসনে খেলায় পরনিন্দায় কালযাপন করেন। সুতরাং সামাজিক পৌরজানপদ রাষ্ট্রীয় কাজ করিবার অবসর কোন নারীরই হইতে পারে না, এই ধারণা ভ্রান্ত। অনেক সার্ব্বজনিক পুরুষ-কর্ম্মী জীবিকা-অর্জ্জন ছাড়া গৃহকর্ম্মও করিয়া থাকেন। যে-সকল মহিলা গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াও বাহিরের কাজ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই তাহা করিবেন। বস্তুতঃ বাহির ভাল না হইলে ঘর ভাল হয় না, যেমন ঘর ভাল না হইলে বাহির ভাল হয় না।

বস্তুতঃ, কি নারী কি পুরুষ, সকলকেই বাহিরকে গৃহের সামিল করিয়া দেখিতে ও তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে। নতুবা মানবের কল্যাণ নাই। গ্রাম নগর জিলা প্রদেশাদির মঙ্গলামঙ্গল পরস্পরের সহিত জড়িত। সব-দেশের ভাগ্য পরস্পরের সহিত জড়িত। নারীরা উচ্চতর বিদ্যার ও গবেষণার অনুসরণ করিবেন মানবজাতির শ্রীবৃদ্ধির জন্য, আমরা ইহাই চাই।

(বঙ্গলক্ষ্মী, শ্রাবণ ১৩৩৫) শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার কৃষি-সমস্যা

বাংলার জাতীয় জীবন আজ নানাদিক দিয়াই বিপন্ন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক সমস্যা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার উপর আবার বিরাট অর্থসমস্যা। শতকরা ৮০ জন বাঙ্গালী কৃষিজীবী। বাংলার অর্থ সমস্যার মূলে যে কৃষি-সমস্যা অনেকখানি ক্রিয়া করে এ কথা বলাই বাহুল্য।

প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় ভূমি বন্দোবস্তের উপরই সাধারণ কৃষক সমাজের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিপূর্ণ উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু এ দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই কৃষি-সমস্যার মূলীভূত কারণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ, গুণ সবিস্তার আলোচনা করিব না। এ বন্দোবস্ত বহু দোষের আকর।

তারপর সুদ-সমস্যা। দেশের অর্থশালী মহাজনগণ দরিদ্র অজ্ঞ কৃষক সম্প্রদায়ের অর্থ কি ভাবে শোষণ করে তাহা বোধ হয় বিশদরূপে বলিবার দরকার নাই।

এই সুদ-সমস্যার প্রতিকার মোটামুটি তিনটি আছে। প্রজার স্বার্থরক্ষা সরকারের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যেখানে নিরেট নীতি শাস্ত্রের উপদেশ কার্য্যকরী হয় না, যেখানে মানুষ মানুষের সুখ-সুবিধার দিকে চায় না, সেখানে আইনের বলে দুর্ব্বলের স্বার্থরক্ষা করিতে হইবে। মহাজনগণ যথেচ্ছা উচ্চহারে সুদ আদায় করিতেছে। অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ বে-আইনী না করিলে মহাজনের কবল হইতে প্রজার উদ্ধারের আশা সুদূর-পরাহত।

পাঞ্জাবে Land Alienation Act বলিয়া একটি আইন প্রচলিত আছে। এর উদ্দেশ্য হইল মহাজনের হাত হইতে দরিদ্র কৃষককে রক্ষা করা। বাংলা দেশে মহাজনগণ (জমীর সঙ্গে যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই) অনায়াসে প্রাপ্য টাকার জন্য স্থাবর ভূসম্পত্তি দখল করিয়া বসিতে পারে। এ ব্যবস্থা বড়ই মারাত্মক। সুতরাং যাহাতে মহাজনগণ কিছুতেই জমী দখল করিতে না পারে তজ্জন্য এক কড়া Land Alienation Act পাশ করা উচিত। এ আইনের ফল নানাভাবেই মঙ্গলজনক হইবে।

তারপর সমবায় আন্দোলনের কথা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়। দরিদ্র কৃষক সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এ স্বাস্থ্যকর আন্দোলনকে অতি দ্রুত সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। ঋণ দান, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন, সমবায় নীতিকে ভিত্তি করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য চালানো পদ্ধতি বহু কাজেই এই সমবায় আন্দোলনকে সাফল্য-জনিত করিয়া তোলা যায়। মহাজনের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এর চেয়ে অমোঘ অস্ত্র আর নাই।

কিন্তু সব সমস্যার মূলেই কৃষক সমাজের অজ্ঞতা সমস্যা বিদ্যমান। সমবায় আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে হইলে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচার করিতে হইবে।

পল্লী সংস্কারই হউক, কৃষি-সমস্যার সমাধানই হউক শিক্ষার প্রচার ব্যতীত কিছুই হইবে না। প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। এ প্রস্তাব যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করা হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। প্রাইমারী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে না পারিলে সুপথ লাভের আশা নাই।

গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করিয়া তথায় কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। পাঠশালার শতকরা ৭০ জনই কৃষক-সন্তান। প্রাইমারী শিক্ষা লাভই যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য তাহাদিগকে হাতে-কলমে কৃষিকাজে পারদর্শী করিয়া তুলিতে হইবে। নূতন প্রাইমারী শিক্ষা অপূর্ণ ও অকেজো হইয়া থাকিবে। প্রাইমারী শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার করিতে পারিলে দেশে কৃষি-সাহিত্য প্রচারের পথ অনেকটা সুগম হইয়া উঠিবে। জাপান আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ডও অনেকদিন কৃষিজীবী। কিন্তু ঐসব দেশে কৃষিজীবীদের জীবন কত সুন্দর, উন্নত ও বিকশিত। এর কারণ ঐসব দেশ অধিক শিক্ষিত, তথায় কৃষি-সাহিত্যের প্রচার আছে, কৃষি-সমস্যার সমাধানের জন্ত তথায় বিরাট আয়োজন ও আন্দোলন করা হয়।

গ্রামে গ্রামে কৃষি-সমিতি গঠন করিয়া স্থানীয় কৃষি-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা যায়। কৃষি সম্পর্কীয় নানা ছোট ছোট প্রশ্নের আলোচনা কৃষির উন্নতি সাধন, প্রভৃতি এই সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে। সমিতিতে কৃষি-সাহিত্যের আলোচনা হইবে। গ্রামের কতিপয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারাই এসব সমিতি গঠিত হইবে। কালে এইসব গ্রাম্য সমিতি নিজেদের আকার আরও বৃদ্ধি করিতে পারে এবং তখন ১০।১৫ খানা গ্রাম এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া সংঘবদ্ধ ভাবে বহু কাজ করিতে পারে।

গো-পালন কৃষির একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এদেশে গোপালনের কোন বন্দোবস্ত নাই। বাংলার গোজাতি অতি নিকৃষ্ট ও দুর্ব্বল। গোজাতির উন্নতি করিতে না পারিলে কৃষির উন্নতিও সুদূর-পরাহত।

কৃষি-সমস্যা আজ আমাদের জীবনমরণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে এই সমস্যা সমাধানের জন্ত আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

(জাগরণ, শ্রাবণ ১৩৩৫) আনোয়ার হুসেন

—

আল্পনার কল্পনা

বাঙলার ছোট ছোট ব্রত, কথকতা, পুজোতে ঘরে ঘরে আল্পনার আঁচড় পড়্‌ত, আর ঘরগুলি যেমনই আভিজাত্যশূন্য হোক্ না কেন, শিউলি ফুলের মত ফুটফুটে মণ্ডন-লতায় আলো হ'য়ে থাক্‌ত।

বাঙলার চারুশিল্পের পূর্ণ বিকাশ না হ'লেও প্রবর্ত্তন যে হয়েচে তায় কোনো সন্দেহই নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে কারুশিল্পের দিকে কারু নজর পড়্‌তে বড় দেখা যায় না।

কারুশিল্পের প্রধান কাজ কারুকার্য্য এবং এই কারুকার্য্যের গোড়ায় রয়েচে পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার পোষণ নানা দেশে নানা দিকে হয়েচে—মোগলাই আমলের ডালিম আনার ফুল, বিলিতি আঙুর-লতা, দেশী পদ্মফুল, ইত্যাদি নানা জিনিষকে অবলম্বন ক'রে। ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশের মণ্ডনরীতির বেশ একটা তফাৎ টের পাওয়া যায়—কিন্তু তা ছাড়াও প্রত্যেক দেশের মণ্ডনচিত্রের এক-একটি বিশেষ রূপ আছে যা' দেখলেই বলা যায় "এটি মোরাদাবাদী কাজ", "এটি সাহারাণপুরী", "এটি কাশ্মিরী", "এটি বারাকাবাদী" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বাঙলায় আল্পনা ছাড়া এরূপ মণ্ডনরীতির ঢং বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। খালি যে সূচীর কাজে বা নক্সার কাজে আল্পনা কাজে লাগ্‌বে তা নয়, বাসনে-কোসনে, আসবাবপত্রে, বস্ত্রশিল্পেও তাকে কাজে লাগা যেতে পারে।

আল্পনা অল্প-না—অর্থাৎ যথা ইচ্ছা নানান নব নব রচনায় তার পুষ্টিসাধন ও শ্রীবৃদ্ধি করা যায়। এটার বিস্তার খেলার ছলে অনায়াসে এতদিন হয়েছিল এবং সেটা এখনও হ'তে পারে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। আল্পনা আঁকার ভিতর স্ত্রীজাতির শ্রীবোধের একটা সম্পূর্ণতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শিল্পরচনার গোড়ার কথাই হ'ল শ্রী-সুছাঁদ। এই সুছাঁদটি আল্পনার লতাপাতার মোচড়ের ভিতর নানান বঙ্কিম রেখায়-রেখায় দেখা দেয়। আল্পনা দেখ্‌লেই একটা শুভ অনুষ্ঠানের কথা মনে আসে।

বস্ত্রবয়ন কাজে পাড়ের নক্সা ঢাকা অঞ্চলে পুরোণো যা ছিল তা' এখন আর দেখা যায় না। সাদা খাদি-কাপড়ের উপর যদি আল্পনার নক্সা ছাপা যায় ত তার কদর সব যায়গায় হয়। এখনকার দিনে কারুশিল্পে দ' পড়েচে তার আর কোনোই কারণ নেই—তার মধ্যে প্রাণ নেই ব'লে। একই নক্সা বিলাত বা জাপান থেকে কলে তৈরী হয়ে চালান আসচে আর আমরা সস্তা দরে সেগুলোকে ঘরে বরণ ক'রে নিচ্চি। কাপড়ে নক্সা ছাপার নানান কৌশল ভারতের নানান দেশে এখনও প্রচলিত আছে এবং তার প্রণালীগুলি আয়ত্ত ক'রে আমরা আমাদের আল্পনায় মণ্ডিত ক'রে তুল্‌তে যদি পারি তাহ'লে সেগুলি সস্তাও হয় এবং সহজলভ্যও হ'তে পারে। যবদ্বীপের বাতি-শিল্পের কথা অনেকে হয়ত জানেন। মোমবাতি গালিয়ে কাপড়ে ছোপ্ দিয়ে নানান রঙে ছোপান যায়—এই প্রণালীতে এখন ইউরোপে ঘরে ঘরে মেয়েরা কাপড় রঙাচ্ছেন নানান নক্সা এঁকে।

কাশীর বাসনের উপর দেবদেবীর নক্সা আর মোরাদাবাদী বাসনের সূক্ষ্ম লতাপাতার মড়ুরী অর্থাৎ মণ্ডন আপন আপন বিশেষত্বে মণ্ডিত হ'য়ে বহু যুগ ধ'রে আদর পেয়ে আসচে। এই ভাবে আপন বিশেষত্বটিকে ফুটিয়ে বাঙলার তৈজসপত্রকে আল্পনার কল্পনায় ভূষিত ক'রে তুল্‌তে পারলে বাঙলার শিল্পকলারও গৌরব বৃদ্ধি হবে এবং দেশ-বিদেশে বাঙলার আর্ট হিসাবে প্রচার হবে।

আমাদের দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্র, কালীঘাটের পট, এগুলিকেও যদি আমরা ব্যাভারে লাগাতে পারি ত আমাদের ঘরের পর্দ্দায়, গৃহিণীর ওড়নায়, বৈঠকখানার আসবাবপত্রে সেগুলি অপরূপ শোভা ধারণ করতে পারে। শিল্পীর আনন্দ এইভাবে সব কাজকে যদি মণ্ডিত ক'রে তোলে তখন ঘরে আর কেবল ঘর থাকে না—সেটা শ্রীর আসন হ'য়ে ওঠে। সাঁওতাল পরগণার অসভ্যদের মধ্যে, সিংভূমে হোজাতিদের মধ্যে এইরূপ গৃহসজ্জার প্রচলন আছে। তারা ঘরের দাওয়ায় নানাপ্রকারের রঙের মাটি দিয়ে কত সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে থাকে। তাদের ঘরের মধ্যে যে শুচিতা ও শ্রী আছে তা' আমাদের দেশের অনেক ভদ্র গৃহস্থালীর মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না। ভাল জিনিষ ভাল গন্ধ ভাল আসবাবপত্র অনেকে সৌখিন ব'লে বর্জ্জন করতে উপদেশ দেন, কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর হাতের গড়া সহজলভ্য গৃহ-সজ্জায় যে শ্রী আছে সেটা আভিজাত্যের মধ্যে নেই এবং এইটেই বাঙলার কামনার বস্তু।

আমাদের দেশে এক এক জাতি এক-এক প্রকার শিল্পকলার কাজ পূর্ব্বকালে করতেন। তখনকার কালে রাজারা, যে-জাতের লোকে যে-কাজ চর্চ্চা করতেন তাঁদের বংশানুক্রমে জীবনোপায়ের সংস্থান ক'রে দিতেন। এখনও জয়পুর প্রভৃতি দেশীরাজ্যে এ নিয়ম

প্রচলিত আছে দেখা যায়। সেখানে শিল্পীরা বংশানুক্রমে ঐ একই প্রকারের আপন আপন জাতব্যবসা অনুসারে নির্ব্বিবাদে শিল্পচর্চ্চা ক'রে যাচ্ছেন। এই ভাবে বংশানুক্রমে চর্চ্চা করার শিল্পের ধারাবাহিক প্রচার থাকে বটে কিন্তু তার আর প্রসার হয় না; ক্রমে ক্রমে বড়ই প্রাণহীন একঘেয়ে ও সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়ে। ভারতশিল্পের এই একধরণের কাজ জাতিবিশেষের মধ্যে প্রচার থাকায় তার নব নব উন্মেষের চেষ্টাও হয় না এবং সেই কারণেই দিন দিন তা অধঃপতিত হ'য়ে পড়্‌চে।

এখন দেশের মা-লক্ষ্মীদের ঘরে ঘরে শিল্পকলার চর্চ্চার এক নতুন উৎসাহ নতুন আগ্রহ যদি দেখা যায় ত আবার প্রাচীনভারতের মত আধুনিক-ভারত ভবিষ্যৎ ভারতের কাছে নিজেদের অস্তিত্বের পরিচয় রেখে যেতে পারবে। এখন আমাদের এই আশা যে, ভারত-চিত্রকলার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতলক্ষ্মীদের হাতের শিল্পকলারও যদি পুনর্মুক্তি দেখতে পাওয়া যায় তবেই ভারতসন্তানেরা সুদূর ভবিষ্যতের পথ উজ্জ্বলতর এবং আধুনিক ভারতমাতাকে অলঙ্কৃত ক'রে তুল্‌তে পারবেন। নারীজাতির, মাতৃজাতির কোমলতার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে, দয়ার সঙ্গে যোগযুক্ত হ'য়ে তাঁদের চারু-অঙ্গুলি-হেলনে চারু ও কারু-শিল্পকলা পুনরায় দেশের গৌরবস্বরূপ হবে।

* জাপানে দেখা যায়, নারীজাতির কাজের মধ্যে যে খালি কাজ আছে তা নয়, অদ্ভুত শ্রী আছে। তাঁদের হাবভাবের মধ্যে, কাজ-করার ভঙ্গীটির মধ্যেও এমন একটা আর্ট আছে যা' আর কোনো দেশেই দেখা যায় না—তাদের কাজে আনন্দ আছে আর্ট আছে ব'লে। কেবল মোটামুটি দিন চলার মত কাজ ক'রে চলা যদি তাঁদের ধাত হ'ত ত সে কাজ-করার মধ্যে এমন মোহন ভঙ্গীটি দেখ্‌তে পাওয়া যেতো না। শুধু কাজটা নয় কাজ করাটাও তাদের সুশ্রী হ'য়ে উঠেচে।

যতই গরীব হোক্‌না কেন, বাড়ী আছে বাগান নেই এরূপ জাপানে বড় একটা দেখা যায় না। ইউরোপেও আজ পল্লীতে এবং সহরের মধ্যে অন্ততঃ স্থানাভাবে ঝরোখার উপর ফুলের টব সাজানার রীতি দেখা যায়। আর আমরা, আমাদের দেশের যে শ্রীটুকু পল্লীর মধ্যে, পূজোপাঠের মধ্যে ছিল সেই আল্পনার রেওয়াজও ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছি।

(বঙ্গলক্ষ্মী, শ্রাবণ ১৩৩৫) শ্রী অসিতকুমার হালদার

—

আধুনিকের গতি-বৈপরীত্য

পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্ম্মে, যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কেবল হিন্দু-সংগঠন বা মোসলেম তবলিগ্‌ নয়,—হিন্দুর আবার বিভিন্ন শ্রেণী বা বর্ণ, মুসলমানের ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী (যথা সিয়া, সুন্নী, ওয়াহাবী) সেই রকম খৃষ্টীয়, বৌদ্ধ পারসীক সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় সকলেই নিজের নিজের দীক্ষা-ঘর ফিরিয়া প্রাচীন ভিটার উপর গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রচণ্ড প্লাবনে প্রাচীনের যত সংস্কৃতি ডুবিয়া তলাইয়া গিয়াছিল, আবার যেন তাহারা একে একে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া তাই মনে হয়, যত ভবিষ্যতের দিকে আমরা ঝুঁকিয়া পড়িতেছি, ততই প্রাচীনের উপরও টান আমাদের বাড়িয়া যাইতেছে, যত বৃহতের মধ্যে আমরা ঝাঁপাইয়া পড়িতেছি, ক্ষুদ্রের ছোটর মধ্যেও ততই আমাদের পা জড়াইয়া যাইতেছে।

আমরা মনে করিতেছিলাম যে, গোষ্ঠীর কুলের শ্রেণীর বা গ্রামের ক্ষুদ্রতর জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া দিয়া দেশের নেশনের বৃহত্তর জীবনে সব একাকার হইয়া গিয়াছি; বর্ত্তমানের চেষ্টা হইতেছে আবার দেশের গণ্ডীও মুছিয়া ফেলিয়া সমস্ত মানবজাতিকে বিশাল সাম্যে ঐক্যে মিলাইয়া মিশাইয়া ধরা। বোলশেভিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌, বা এনার্কিজ্‌ম্‌ বলিয়া যে-সব রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা দিন দিন বলীয়ান্‌ হইয়া উঠিতেছে, তাহারা কেহই দেশগত জাতিগত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে না; নেশনকে ভুলিয়া দিয়া তাহারা চাহিতেছে—সর্ব্বত্র মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতিষ্ঠা। কেবল মনের জগতে নয়, স্থূল জগতেও আজ দেশে দেশে আদান-প্রদান এত সহজ সুলভ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বিদ্যুতের বাষ্পের কল্যাণে ভূমণ্ডলের পূর্ব্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে যে, স্বদেশ-পরদেশ, স্বধর্ম্ম-পরধর্ম্ম বলিয়া এতদিনকার পরিচিত পার্থক্যটি গুলাইয়া যাইতেছে।

কিন্তু এই যে প্রসারের দিকে—এই যে "কেন্দ্রবিমুখী"—গতি, যতই তাহা বেগবান হইয়া উঠিয়াছে, ততই দেখি, বিপরীত দিকেও সৃষ্টি করিয়াছে একটা সঙ্কোচনের, একটা "কেন্দ্রাভিমুখী" গতি। বিশ্বমানবতার আদর্শ স্পষ্ট ফুট জাগ্রত হইয়া উঠিতে চলিয়াছে। আমরা আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিতে সুরু করিয়াছি—ক্ষুদ্র হোক, ক্ষুদ্রতর হোক, আর ক্ষুদ্রতম হোক প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির চাই স্বাধীন স্বতন্ত্র আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সাম্যবাদীরা, একাকার-তন্ত্রীরা যখনই চাহিতেছে সমস্ত মানব-সমাজ জুড়িয়া এক ঢালা ফরাস পাতিয়া দিতে, অমনি দেখি ধর্ম্ম হিসাবে, কর্ম্ম হিসাবে, স্থান হিসাবে, প্রতিষ্ঠান হিসাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সব পৃথক পৃথক দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর দান হইতেছে দেশের আত্মোপলব্ধি—দেশ বা নেশন এই যুগে জাগিয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে একটা স্বতন্ত্র অখণ্ড জীবন্ত সত্তা লইয়া। বিংশ শতাব্দীর সাধনা চলিয়াছে দুই দিকে—এক, ঐ দেশগত বা নেশনগত চেতনাকে প্রসারিত করিয়া বিশ্ব-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা; আর দ্বিতীয় হইতেছে, এই দেশকে অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রয়াসের ফলে, ফিরিয়া দেশেরই মধ্যে তাহার অংশে অংশে সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য পৃথক পৃথক্‌ ব্যক্তিত্ব স্থাপিত করিবার চেষ্টা।

রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে তাই দেখি দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে একেবারে গ্রামের উপর। বলা হইতেছে, দেশের প্রাণ হইতেছে গ্রাম—অথবা গ্রামের সমষ্টি লইয়াই দেশ। প্রত্যেকটি গ্রাম স্বাস্থ্যে, সম্পদে, শিক্ষায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে—অনেকে এতদূর পর্য্যন্ত বলেন যে, প্রত্যেকটি গ্রাম সর্ব্ববিষয়ে হইবে স্বাধীন স্বতন্ত্র আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও দেখি, পৃথিবী-জোড়া বিপুল মহাজনী কারবারের বিরুদ্ধে বা সাথে সাথে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে দেশের খণ্ড খণ্ড অংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর আপন আপন বিশেষ অর্থসিদ্ধি। অর্থনীতির বিশ্বজনীন কর্ম্মসূত্র ও পদ্ধতি ছাড়িয়া ক্রমেই জোর দেওয়া

হইতেছে প্রদেশগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের উপর, ক্ষুদ্রতর সংহতির গুণ-কর্ম্মের উপর।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বোধ হয় আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রাদেশিকতার বাণী। সব দেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে অর্থাৎ সাবালক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে-দিন প্রাদেশিকতার খণ্ড সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য বিভিন্ন ধারা অতিক্রম করিয়া অথবা মিলাইয়া মিশাইয়া, পরিশুদ্ধ করিয়া, তুলিয়া ধরিয়া, সাহিত্য পাইয়াছে একটা দেশগত সাধরণ সত্তা ও জীবন। ইদানীন্তন কালে এই দেশগত সাহিত্যও রূপান্তরিত হইয়া সার্ব্বভৌমিক বা বিশ্ব-সাহিত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছিল—এমন-কি, কেবল ভাবের ভঙ্গিমার হিসাবে নয়, এই বিশ্ব-সাহিত্যকে এক বিশ্ব-ভাষারই (যথা, "এসপেরান্তো") উপর গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন পর্য্যন্ত কেহ কেহ দেখিতেছিলেন। কিন্তু আজ এই বিশ্বের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সাহিত্য আবার যেন চাহিতেছে তাহার প্রাদেশিক মূর্ত্তি।

সম্মুখে চলিতে চলিতে এই যে আবার পিছনের দিকে গতি, ভূমার সাধনা করিতে করিতে এই যে আবার অল্পের পূজা, ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, অখণ্ড সত্য যাহা, তাহা দুই দিকের দুই বিপরীত সত্যের সামঞ্জস্য—অতীতের সহিত ভবিষ্যতের, পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমের, বিদ্যার সহিত অবিদ্যার, অণুর সহিত মহতের উপনিষদের ব্রহ্মের মত—

"তাহা চলিতেছে, আবার তাহা চলিতেছেও না; তাহা দূরে. আবার তাহা নিকটে; তাহা এই সমস্তের ভিতরে, আবার তাহা এই সমস্তের বাহিরে।" প্রকৃতির সাধারণ গতি হইতেছে এক দিকের অতিমাত্র ঝোঁক হইতে আর একদিকের অতিমাত্র ঝোঁকে চলিয়া যাওয়া।

ধর্ম্মের সম্বন্ধে যে গতি-বৈপরীত্য, তাহার ফলে এক দিকে পাইতেছি ধার্ম্মিকতা আর একদিকে নাস্তিকতা। ধর্ম্মের প্রেরণা যত তামসিক হইয়া পড়ে, নাস্তিকতাও ততই হইয়া উঠে রাজসিক; অথবা নাস্তিক্য-বৃত্তি যত রূঢ় রুক্ষ প্রলয়ঙ্করী হইয়া দাঁড়ায় ধর্ম্ম বা ধার্ম্মিকতাও ততই হয় অন্ধ একগুঁয়ে। তাই বলিয়া ধর্ম্মকেও বাদ দেওয়া চলে না, বিজ্ঞানের দানও তুচ্ছ করা যায় না। ব্রাহ্মণ-সভার বা 'আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়া'র আদর্শ সমাজের পক্ষে হিতকর নহে, স্বীকার করিব; কিন্তু আবার মুস্তাফা কামাল বা লেনিন ধর্ম্মের Gordian Knot ছাঁটিয়া ফেলিবার যে-ব্যবস্থা দিতেছেন তাহাও মনে হয়, সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়াছে মাত্র, সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই, পূরণ করিবার চেষ্টাও করে নাই। সম্মুখের যুগের ব্রতই কিন্তু এইখানে—ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের মিলন—কেবল মিলনও নয়, সামঞ্জস্য ঐক্য স্থাপন; ধর্ম্ম অর্থ আত্মার সত্য, আর বিজ্ঞান অর্থ দেহের সত্য। একদিকে আত্ম-সর্ব্বস্ব হইব না—মায়াবাদীর মত; অন্যদিকে দেহসর্ব্বস্বও হইব না—ঋণং কৃত্বা ঘৃতপায়ীদের মত। আত্মাকে শরীরী করিয়া ধরিতে হইবে জীবনে, শরীরকেও আত্মবান করিয়া ধরিতে হইবে—ইহাই না নবযুগের সাধনা?

তারপর, ধর্ম্মের সাধনা যেখানে স্থান পাইয়াছে সেখানে দেখি, আর একটা বৈপরীত্য গজাইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মের সকল খণ্ডতা সঙ্কীর্ণতা কুসংস্কার পরিষ্কার করিতে করিতে আমরা একদিকে চলিয়া গিয়াছিলাম কেবল সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের (Universal Religion) খোঁজে। ব্যক্তির, ব্যষ্টির বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য আমরা আমলে আনিতে চাহি নাই—চাহিয়াছি, সমষ্টির জন্য সাধারণ সত্য, সাধারণ বিধান। কিন্তু সত্য যতই সর্ব্বসাধারণ হোক প্রয়োগে, জীবনের প্রয়োজনে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে তাহা বিচিত্র বিভিন্ন হইয়াই উঠিবে। আজকাল পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষার প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত মানব-সমাজেও ধর্ম্ম লইয়া যে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারও মূল এইখানে। ভগবান খোদা বা গড্ কিম্বা বিষ্ণু শিব কালী কৃষ্ণ সব এক হইলে কি হইবে? মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্যই ত এই নামের ও রূপের বিভিন্নতা দেখা দিয়াছে—ঐক্যের দিকটা যেমন ভুলিয়া যাওয়া চলে না, তেমনি বিভিন্নতার দিকটাও গণনার মধ্যে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সার্ব্বভৌমিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও তাহারই মধ্যে আবার ব্যষ্টিগত ও গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য বৈচিত্র্য কি প্রকারে প্রকাশ করিয়া ধরা যায়, এই সমস্যারও সমাধান করিবে ভবিষ্যৎ।

(উত্তরা, আষাঢ় ১৩৩৫) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

—

বাংলায় যক্ষ্মার বিস্তার

বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৭ লক্ষ লোক। যক্ষ্মার পরিমাণ কেহ খোঁজ রাখেন কি? শুধু কলিকাতা সহরেই প্রায় এগার হাজার লোক যক্ষ্মায় ভুগিতেছে। ডাঃ বেণ্ট্‌লী বলেন, বাংলা দেশে যত লোক সর্ব্বব্যাধিতে মরে তার এক দশমাংশের মৃত্যুর কারণ এই কাল ব্যাধি—যক্ষ্মা। কলিকাতা সহরে শতকরা ৮টি মৃত্যু ঘটে যক্ষ্মা রোগে। এই রোগটির সহরেই বেশী প্রাদুর্ভাব। বদ্ধ গৃহে আলোক-বাতাস-হীন প্রকোষ্ঠে, বস্তিতে অথবা গলিতে যাহাদের বাসগৃহ অবস্থিত তাহাদের মধ্যেই এই রোগের বহুল বিস্তৃতি দেখা যায়।

যক্ষ্মা রোগের কারণ বহুবিধ—সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণগুলির মধ্যে অবরোধ-প্রথা ও দারিদ্র্যের ফলেই বহু লোকের যক্ষ্মা হয়। কলিকাতার মত সহরে হাজার-করা ২৫টি পুরুষ যেখানে মরে সেখানে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার প্রায় ৪০টি।

ইহা ব্যতীত যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, এক হুঁকায় তামাক খাওয়া, রেষ্টুরেণ্ট অথবা চায়ের দোকানে এক পাত্রে খাওয়া, ধূলি-কণা পূর্ণ দোকানের খাবার খাওয়া, অথবা একত্রে খাওয়ার ফলেও বহু লোকের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হয়।

বিশেষজ্ঞেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বাংলা দেশে গড়ে ১,৫০,০০০ হাজার লোক প্রতি বৎসর এই কাল ব্যাধিতে জীবলীলা সংবরণ করে এবং প্রায় ৫ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগিয়া থাকে। এই ৫ লক্ষ লোক সমাজের ভার মাত্র। যক্ষ্মারোগ দূরীকরণ জন্য সরকার ও জনসাধারণকে সমবেত চেষ্টা করিতে হইবে।

যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী যখন কাসে অথবা জোরে কথা কহে তখন তাহার খুব কাছে থাকা যুক্তিযুক্ত নহে—কেননা এই অবস্থায় রোগের জীবাণু সহজেই সংক্রামিত হইতে পারে। রোগীর সাধারণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে জীবাণু থাকে না। রোগীর থুথু মলমূত্র প্রভৃতি যত শীঘ্র সম্ভব শতকরা ৫ ভাগ কার্ব্বলিক এসিডের সলিউসন দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। রোগীর নিজের পরিবারের, যাহাদের সঙ্গে মেলা মেশা করে তাহাদের ও সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত

স্থানে থুথু ফেলা সঙ্গত নহে। যে কোনরূপ স্রাব নিঃসরণ হয় তৎক্ষণাৎই উহা নষ্ট করিয়া ফেলা দরকার। রোগের প্রথমাবস্থায় ধরা পড়িলে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য করা যায়। আলো ও বাতাস রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার-জনক। এই রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে যে ঘরে খোলা হাওয়া এবং উপযুক্ত আলো প্রবেশ করে সেইরূপ ঘরে বাস করা উচিত। ছাত্রদের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতি প্রচার করা, তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা অথবা রোগের প্রথমাবস্থায় রোগ নির্দ্ধারণ বিষয়ে সাহায্য করা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তব্য। দেশময় উন্মুক্ত স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন (open air school) করিতে হইবে। আলোক চিত্র (lantern lecture) ও বায়োস্কোপ সাহায্যে সাধারণ পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার করা প্রতি মিউনিসিপালিটি, জেলা ও ইউনিয়নবোর্ডের অবশ্য কর্ত্তব্য।

(বৈশ্য-সাহা সমাজ, আষাঢ় ১৩৩৫) শ্রী নৃপেন্দ্রমোহন পোদ্দার

—

বঙ্গদেশের ভক্ষ্য মৎস্য

বর্ষার সময় বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, স্থলচর, জলচর ও উভচর সকল প্রকার জীবই স্ফূর্ত্তি অনুভব করে এবং বংশবিস্তারের জন্য সচেষ্ট হয়। মৎস্যকুলও এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। বঙ্গদেশের অধিকাংশ মৎস্যের পোণা বর্ষাকালেই হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দেশে মৎস্য-প্রজনন, পালন ও সংস্থানের (conservation) ব্যবস্থা খুবই কম. অথচ মাছ ধরার যন্ত্রপাতি এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, চুণো পুঁটি ও অতিশয় ক্ষুদ্র পোণা কিছুই বাদ যায় না। পুরাতন নদী, খাল, বিল এবং অন্যান্য জলাশয়ের সংস্কার না হওয়ায় জলাভাব যেমন বাড়িয়াছে, অপরিণত-মৎস্য-ধ্বংসের প্রবৃত্তিও তেমনই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে বঙ্গদেশে উত্তরোত্তর মৎস্যের অভাব যে গুরু হইয়া উঠিবে, তাহা আদৌ বিস্ময়ের ব্যাপার নহে।

বঙ্গদেশ নদীমাতৃক ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বলিয়া এতদ্দেশে মৎস্য-জাতির সংখ্যা খুবই অধিক। মৎস্যের প্রাচুর্য্যের জন্য এক সময় বঙ্গদেশ মৎস্যদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। অবশ্য খাদ্য হিসাবেই মৎস্যের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু মৎস্য হইতে অন্যান্য অনেক জিনিষও পাওয়া যায়। এইরূপ মৎস্যজাত পদার্থ-সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

(১) মৎস্য-শিরীষ; (Isinglass) রাসায়নিক সংগঠনের হিসাবে প্রকৃত শিরীষ ও জিলাটিনের সহিত ইহার পার্থক্য নাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতীয় মৎস্যের পোঁটা এইরূপ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভারতের মৎস্য-শিরীষ অনূন চৌদ্দ জাতীয় মৎস্য হইতে সংগৃহীত হয়; তন্মধ্যে দাঁতনে, খাগের ও সমগণের অন্য ৫টি মাছ, শিলন্দ ও শিঙ্গি বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত মৎস্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য-শিরীষ উৎপাদনের উপাদান। বলা বাহুল্য যে, এই শিল্প এতদ্দেশে এখনও নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে।

(২) সার।—ইক্ষু, কাফি ও নানাবিধ ফল চাষের পক্ষে মৎস্যসার বিশেষ উপকারী। দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রতটস্থ স্থানসমূহে মৎস্যসারের প্রচলন কম নহে। মালাবারে মৎস্যশিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় উৎকৃষ্ট সার উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে এ সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই। যাহারা শুঁটকিমাছ প্রস্তুত করে, তাহাদিগের সার প্রস্তুতের যথেষ্ট সুযোগ আছে; কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই নিরক্ষর লোক এবং তাহারা উত্তম সার প্রস্তুত করিতে পারে না, অথবা করে না।

(৩) মৎস্য-তৈল।—অন্যান্য মৎস্য-বহুল দেশে মৎস্য তৈলের কাজ খুবই লাভজনক এবং বহু লোক তৈলপ্রস্তুতে নিযুক্ত থাকে। বাঙ্গালার সুন্দরবন অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে মৎস্য-তৈল প্রস্তুত হয় এবং যাহা হয়, তাহাও অত্যন্ত অপকৃষ্ট শ্রেণীর। হাঙ্গর-যকৃৎ হইতে নিষ্কাশিত তৈল পূর্ব্বে কড্‌লিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইতে পারে, বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের এ সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহ নাই। তিত্‌পুঁটি, তিন জাতীয় ইলিশ, শিলন্দ প্রভৃতি হইতে ভক্ষ্য তৈল পাওয়া যায়। কেরোসিনের বহু বিস্তৃত প্রচার সত্ত্বেও এখনও পর্য্যন্ত নানা স্থানে মৎস্য-তৈল জ্বালান হইয়া থাকে। সাবান প্রস্তুতে ও শিল্পেও মৎস্য ও অন্যান্য তৈলের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অনেক জাতীয় মাছ পরিণত বয়সে যেমন নিরামিষাহারী, অল্পবয়সে তেমনই আমিষাহারের প্রত্যাশী। ম্যালেরিয়া-দমনের উপায়-সমূহের মধ্যে কতিপয় জাতীয় মাছের পোণা যথেষ্ট পরিমাণে জলাশয়ে ছাড়িয়া দেওয়া একটি প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহারা মশক-কীট-সমূহকে খাইয়া ফেলে। মশকবংশ আর বৃদ্ধি পাওয়ার অবসর পায় না। বঙ্গদেশীয় কতিপয় জাতীয় মৎস্যের এই গুণ আছে।

বঙ্গদেশে যে-সমস্ত মাছ সাধারণতঃ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জলাশয়ের মাছ। রুই, কাৎলা, মিরগেল, কালবোস্, বাটা ও ভাঙ্গন-বোটা সকলেরই সুপরিচিত। ক্ষুদ্র জলাশয়ে এই সমুদয় মাছ থাকিলেও ইহাদের পালনের পক্ষে বৃহৎ জলাশয়ই প্রশস্ত। ইহাদের প্রজননের জন্য বর্ষাকালে নদী হইতে ডিম্ব সংগৃহীত হইয়া থাকে। আগে ধারণা ছিল যে, দীঘি, ঝিল প্রভৃতিতে ইহারা প্রসব করে না। অধুনা জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম-বঙ্গের কোন কোনে স্থানের অতি বৃহৎ জলাশয়ে এবং পুরুলিয়া ও রাঁচি অঞ্চলের বাঁধ নামক জল-সংরক্ষণের বড় বড় 'খাদে' ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। রোহিত জাতীয় মৎস্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। ফলুই ও চিতল এক শ্রেণীর মাছ ও জলবাসী ফলুই কর্দ্দমে থাকিতেই ভালবাসে, কিন্তু ইহা হিংস্র নহে। পক্ষান্তরে, চিতল আকারেও যেমন বৃহৎ হয়, ইহার স্বভাবও তেমনি হিংস্র। ফলুই ও চিতল আফ্রিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে উহারা বঙ্গদেশ হইতে আফ্রিকায় গমন করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। বৃহৎ জলাশয়ের আর-একটি বড় মাছ আমুলেট্, বড় পুষ্করিণী ব্যতীত নদী ও সমুদ্রেও ইহা পাওয়া যায়। আড় ও টেঙ্গরা মাছ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। টেঙ্গরা ও আড় মাছ প্রায়ই গর্ত্তের মধ্যে বাস করে। টেঙ্গরার ৫টি জাতি সচরাচর বঙ্গদেশেই দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুই একটি জাতি স্বাদু জলে বাস করে; অন্যগুলি নদী অথবা লবণাক্ত জলের মাছ। বৃহৎ জলাশয়ে অবশ্য ক্ষুদ্র মৎস্য থাকে। তন্মধ্যে পুঁটি, চাঁদা ও মৌরলাই প্রধান।

খানা, ডোবা, নালা প্রভৃতি জলাশয়ের মাছ যে বড় বড় পুষ্করিণীতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। তবে সাধারণতঃ উক্ত শ্রেণীর মাছ ক্ষুদ্র জলাশয় হইতেই ধৃত হয় এবং যদি পালন করিতে হয়, তাহা

হইলে উহাদিগকে ক্ষুদ্র জলাশয়ে পালন করাই ভাল; তাহাতে ধরিবার কষ্ট হয় না। এই শ্রেণীর মাছের মধ্যে কই ও মাগুর উৎকৃষ্ট মাছ। এই মাছগুলিও আফ্রিকাতে পাওয়া যায়।

স্যাল্‌স ও খল্‌সে কইর সমবর্গীয় মাছ। বাজারে ইহাদের কাট্‌তিও সামান্য নহে। কিন্তু ডোবা প্রভৃতির মাছের মধ্যে শিঙ্গি মাছের চাহিদাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শোল, শাল, ল্যাটা, চেং একবর্গীয় মাছ। ভদ্র ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইহাদের ব্যবহার অধিক না হইলেও অন্যান্য লোকের ইহারা সাধারণ খাদ্য। কুঁচে, গড়ুই ও দুই জাতীয় পাঁকাল সম্বন্ধেও উক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। গুলে মাছ কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয় এবং অনেকের ধারণা যে, ইহা পুষ্টিকর। কিন্তু মফঃস্বলে অনেক স্থানে ইহা কেহ খায় না।

ইলিশ ও জাটক্যা নদীতেই ধরা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইলিশ সমুদ্রবাসী; কেবল ডিম পাড়িবার সময় নদীতে উঠিয়া আসে। পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত জাটক্যা মাছ পূর্ব্বে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন কিন্তু জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইহা ইলিশেরই শিশু। চাপিলা ইলিশ-জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য; ইহা স্বাদু জলেই থাকে। আড় ও টেঙ্গরা-বর্গীয় মাছের বাঙ্গালায় প্রাধান্যও খুবই অধিক। নদীসমূহে এ বর্গের কতিপয় মৎস্য সচরাচর দৃষ্ট হয়; যথা—গাগর, পাবদা, কুরকুরিয়া, বাচা, পাঙ্গাস, রিঠা, শিলন্দ, বোয়াল ও শিঙোর। যে-সমস্ত নদীতে জোয়ার-ভাঁটা হয়, তাহাতে গাগোর মাছ পাওয়া যায়; ইহার আরও ৫টি আত্মীয় নদীর মোহানাতে বাস করে; শুঁটকি মাছ প্রস্তুতের জন্য ইহাদের যথেষ্ট চাহিদা আছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যে স্থলে পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সেরূপ স্থল কুরকুরিয়া মাছের আবাসস্থান। বাচা ও শিলন্দ খুব বড় মাছ এবং এগুলিকেও শুঁটকি করা হইয়া থাকে। পাঙ্গাস, রিঠা ও বোয়াল কদর্য্য দ্রব্য আহার করে বলিয়া অনেকের ইহাদের উপর অভক্তি আছে; কিন্তু কলিকাতার বাজারে সবই কাটিয়া যায়। রোহিত-বর্গীয় মাছের মধ্যে করচি, দাঁড়িকা, খড়িকা ও ডানকুনি মাছ নদীতে পাওয়া যায় এবং ওজন প্রায় ১০।১৫ সের হইয়া থাকে। খরসুলা ও কালকন্দা পারসের ন্যায় নদীর মোহানার মাছ। মোতিয়া মৎস্য ইলিশজাতীয়; বঙ্গের নানাস্থানে, বিশেষতঃ সুন্দরবনে ইহা ধৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে তপসী মাছের কথা বলিতে পারা যায়। ইহা বৎসরে দুইবার সমুদ্র হইতে নদীতে আসে ও সেই সময় ধৃত হয়।

অনেক মাছ সাধারণতঃ নদী ও সাগর-সঙ্গমের নিকটেই থাকে। ঈষৎ লবণাক্ত (Brackish) জলযুক্ত বৃহৎ জলাশয়েও এই সকল মাছ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভেটকির উল্লেখ করিতে পারা যায়। মূলতঃ সমুদ্রবাসী হইলেও ইহা ক্রমশঃ সমুদ্রতট-সন্নিকটস্থ জলাশয়েও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নার ইলিশ, কৈসা ও তেল-চাপড়ি ইলিশ-বর্গীয় মাছ; সুবর্ণ-খড়িকাও তাহাই। এ সমস্তই সুস্বাদু মাছ। ভাঙ্গন ও পারসে নিকট-আত্মীয়। দাঁতনে ও ভোলা বড় মাছ, কিন্তু তেমন সুপরিচিত নহে। শুঁটকি করিবার জন্য রূপাপাতা মাছ যথেষ্ট পরিমাণে গঙ্গার মোহানায় ধরা হয়। বগুরা প্রসিদ্ধ বিলাতী মৎস্য Troutএর সমতুল্য। বাইম মাছ মুসলমানদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত। গিগলে, শোল প্রায় বঙ্গদেশেই আবদ্ধ। ইহার পাখনায় ময়ূরপঙ্খী রং, দেখিতে চমৎকার। বেলে মাছের আবাসও ঈষৎ লবণাক্ত জলে। বাঘ-আড় সমুদ্রসঙ্গমের ও সমুদ্রের একটি ভীষণাকার মাছ। হলদে জমীর উপর অনুপ্রস্থ কাল ডোরা এবং সুপুষ্ট গোঁফ থাকায় ইহা ব্যাঘ্র সদৃশ বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহা খুব বড় মাছ এবং শুঁটকি মাছের মধ্যে অন্যতম।

কতকগুলি মাছ সমুদ্রোপকূলে কিম্বা সমুদ্রজলের সহিত সংযুক্ত জলাশয়ে বাস করে। সুন্দরবনে এরূপ মৎস্য বিরল নহে। যাঁহারা বালেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ অনেক মৎস্যের সহিত পরিচিত আছেন। এই-প্রকার মাছের মধ্যে কানগুর্ণা, সবা, বাড়ং ও কুড়া-কৈসা অন্যতম। নীল, লোহিত, সবুজ ও কালর সমাবেশে কানগুর্ণার বিচিত্র অবয়ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত-উপকূল হইতে মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমুদ্র ইহাদিগের বাসস্থান। সবা প্রসিদ্ধ salmon মাছের ন্যায় সুমিষ্ট। চিল্কা হ্রদে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ইলিশ অপেক্ষা অনেক বড়—প্রায় ৩ ফুট দীর্ঘ। মহীশূরাধিপতি হায়দর আলি এই মাছের স্বাদে মুগ্ধ হইয়া এক সময়ে শ্রীরঙ্গপত্তনের বৃহৎ জলাশয়-সমূহে ইহার চাষ করাইয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত সবা মৎস্যের বংশধরগণকে উক্ত স্থলে দেখা যায়। বাড়ং বিলাতী Herring সদৃশ মাছ; তজ্জন্য ইহাকে ভারতীয় হেরিং বলে; শুঁটকি মাছের জন্য ইহা খুব ব্যবহৃত হয়। কুড়াকৈসা উপকূল ব্যতীত সুন্দরবন এবং পূর্ব্ববঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ভেটকি ও সন ভেটকি উভয়ই সামুদ্রিক মৎস্য। শীতকালে উপকূলের নিকট আসিলে ধৃত হইয়া থাকে। পায়রাচাঁদাগণের দুই এক জাতীয় মাছ ঈষৎ লবণাক্ত জলে দৃষ্ট হইলেও এই গণের সমস্ত বড় বড় জাতি সমুদ্রবাসী ও Pomfret নামে পরিচিত। খাদ্য-মৎস্য হিসাবে ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। শিল্লি মৎস্য তপসী মাছের আত্মীয়, ইহা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য-শিরীষ প্রস্তুত হয়। বঙ্গোপসাগরে মৎস্য বিভাগের জাহাজ Golden Crown দ্বারা বারো বৎসর পূর্ব্বে যে অনুসন্ধান হইয়াছিল, তাহাতে আরও নানাপ্রকার মাছ ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু সামুদ্রিক মৎস্য ধরিবার কোন ব্যবস্থা এতদ্দেশে নাই এবং শীঘ্র হওয়াও সম্ভবপর নহে। উপকূলের ২।১ মাইলের মধ্যে যে-সমস্ত মৎস্য আইসে, তাহাই ধৃত হয় মাত্র।

বৎসরে কিছু কম সাড়ে চারি লক্ষ মণ মাছ কলিকাতায় আমদানী হইলেও কলিকাতাবাসিগণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সকলে বৎসরের সকল সময় সুখাদ্য মাছ ক্রয় করিতে পারে না। এক বর্ষাকাল ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে মৎস্যের অভাব আরও অধিক। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মাছ সহরেই চলিয়া আসে। কলিকাতা হইতে মাছ লইয়া গিয়া অন্য ক্ষুদ্র সহরে সরবরাহ করা হয়। নৈহাটীর মৎস্য-ব্যবসায় তাহার দৃষ্টান্তস্থল। খাল, বিল, নদী, বৃহৎ জলাশয়াদি মজিয়া গিয়া স্বাভাবিক উপায়ে মৎস্য-বংশবৃদ্ধির পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন অবস্থাপন্ন গ্রামবাসিগণেরও মৎস্য-প্রজননের চেষ্টা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। অথচ ২।৩টি ক্ষুদ্র জলাশয় লইয়া মৎস্য-চাষ করিলে যথেষ্ট লাভ করা যায়। ফলতঃ যে-সমস্ত কারণে বঙ্গদেশে চাষের জমী কমিয়া যাইতেছে, সেই সমুদয় কারণেই মৎস্যাভাব বৃদ্ধি পাইতেছে।

(মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩৫) শ্রী নিকুঞ্জবিহারী দত্ত

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(৩০)

মাইল কুড়ি পঁচিশ ঘুরিয়া আসিয়া সুবীরের মনটা একটু হাল্কা বোধ হইতেছিল। অদৃষ্টের পরিহাসটা তাহার তত নিদারুণ আর মনে হইতেছিল না। হাজার হউক সে পুরুষ, শিক্ষা-দীক্ষাও তাহার একরকম সমাপ্ত হইয়াছে, অন্ততঃ বাংলাদেশের অতি অল্প ছেলেরই ইহার বেশী হয়। তাহার কোনো গলগ্রহ নাই, বায়ুর মতই সে মুক্ত স্বাধীন। আজ যদি হঠাৎ তাহাকে রিক্তহস্তে পথে দাঁড়াইতেই হয়, তাহাতেই বা কি? জগতে ইহার অপেক্ষা নিদারুণ দৈব-বিড়ম্বনার ইতিহাস কিছু মাত্র বিরল নয়। প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীর অধীশ্বর রুশিয়ার জারের পরিবার যদি তুষারহিম পথে দিয়াশালাই বিক্রয় করিয়া ফিরিতে পারে, একমাত্র পরিধেয় ভিন্ন তাহাদের যদি দ্বিতীয় বস্ত্রও না থাকে, তবে সুবীরের অবস্থাটা এমনই কি শোচনীয়। তাহাকে অন্ততঃ প্রাণভয়ে মূষিকের মত গর্ত্তে লুকাইয়া বেড়াইতে হইবে না। তাহার স্বাস্থ্য ভাল, তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষও সংসারে যে একেবারে নাই তাহাও নহে। জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য যে-কোন পথে যাইতে সে চায় ভানুমতীর সাহায্য সে পাইবে। উহা লইতেও কুণ্ঠিত হইবার তাহার কোনো কারণ নাই, খানিকটা ক্ষতিপূরণ সে দাবীই করিতে পারে। কাহাকেও সে বঞ্চিত করিবে না, কারণ ভানুমতীর একান্ত নিজস্ব টাকারও অভাব নাই।

ভানুমতীর ঘরে যাইতে তাহার তখন আর ইচ্ছা করিল না। নিজের ঘরে বসিয়া সে আলমারীর সব ক'টা দেরাজ টানিয়া খুলিয়া তাহার ভিতরের রাশীকৃত জিনিষ গোছাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। এ ঘর ছাড়িবার দিন ত আসিয়া পড়িল, এখন একবার ভাল করিয়া সব কিছুর হিসাব করিতে হইবে। একেবারে একবস্ত্রে তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইবে না তাহা নিশ্চয়; করিতে চাহিলেও ভানুমতী তাহাকে করিতে দিবেন না, এবং অতখানি বিয়োগান্ত নাটকের মত ব্যাপার ঘটাইয়া তুলিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। তবু যাহা কিছু সে এতদিন ব্যবহার করিয়াছে সবই লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না। ভানুমতীর এক সন্তান সাজিয়া, সে এত দিনে কম হীরা জহরৎ সংগ্রহ করে নাই। পাঞ্জাবীর সোনার এবং হীরার বোতাম, মুক্তার studs, নানা রকম বহুমূল্য টাইপিন্, দশ বারোটা হীরা, পান্না এবং নীলার আংটি, খাইবার এবং চায়ের রূপার বাসন, ফুলদানী, গৃহসজ্জাতে তাহার আলমারী ঠাসা হইয়া আছে। এগুলি লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই, উচিতও হইবে না। অধিকাংশই জমিদারীর আয় হইতে ক্রীত, উহার উপর ভানুমতীর বা সুবীরের কোনো অধিকার নাই। ভানুমতীর কন্যারই উহা প্রাপ্য। এই জিনিষগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, সুবীর আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

তাহার পর তাহার কাপড়-চোপড়। একটা মানুষ সারা জীবন ধরিয়া দিনে তিনচারখানা কাপড় পরিলেও, এগুলির অবসান হইবার সম্ভাবনা অল্প। ভানুমতীর এক রোগ কাপড় কেনা, প্রয়োজন থাক বা নাই থাক। নিজের জন্য কিনিবার উপায় নাই, ভগবান সে পথে বহুদিন হইল কাঁটা দিয়া রাখিয়াছেন। নিজের ঘরে কন্যা বা বধূ নাই, সুতরাং সুবীরের জন্য প্রয়োজনের দশগুণ অধিক কাপড়চোপড় করাইয়াই তিনি মনের ক্ষেদ মিটাইতেন। দামী শালই বোধহয় ছিল তাহার দশ কি পনেরো জোড়া। তাহার ভিতর বেশী জমকালো গুলি, একদিন করিয়া বড়জোর সে গায়ে দিয়াছে। সাহেব সাজিতে সুবীর অত্যন্তই আপত্তি অনুভব করিত, কারণ তাহার গায়ের রংটা ছিল কালো। তবু জমিদার হইয়া জন্মানোর অপরাধে তাহাকে মাঝে মাঝে বাধ্য হইয়া সাহেব-সুবার সঙ্গে দেখা করিতে হইত। তখন সাহেব না সাজিলে, দেওয়ানজী হইতে আরম্ভ করিয়া ঝাড়ুদার মেথর পর্য্যন্ত এমন মর্ম্মাহত হইয়া উঠিত যে, তাহার সাহেব না সাজিয়া

উপায় ছিল না। অতএব বছরে একবার করিয়া পরিবার জন্য বিলাতী দোকানে প্রস্তুত কুড়ি পঁচিশটা স্যুট্ তাহার wardrobe আলমারী ভরিয়া বিরাজ করিতেছিল। আনুষঙ্গিক কলার, কফ্, নেক্‌টাই, রেশমী রুমাল যে কত ছিল, তাহা গুণিবার চেষ্টাও সে কোনো দিন করে নাই। বিলাতী ড্রেসিং গাউন, এবং জাপানী কিমোনো, আন্‌কোরা নূতন অবস্থায় কাগজের বাক্সের মধ্যে গুটি পাঁচ সাত বিরাজ করিতেছে দেখা গেল। কোন এক জমিদার-বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইয়া ভানুমতী দেখিয়া আসিয়াছেন যে, জমিদারের ছেলেরা ঘরের ভিতর ড্রেসিং গাউন পরে। ফিরিয়া আসিয়া তিনি সুবীরের জন্য একসঙ্গে এতগুলি পরিচ্ছদের অর্ডার দিয়া দেন। বলা বাহুল্য তাহার ভিতর একটিও এখনও সুবীরের অঙ্গে উঠে নাই।

এগুলি লইয়া যাইলে কোন ক্ষতি নাই। কারণ জমিদারীর নূতন অধিকারিণীকে যদি পাওয়াও যায়, তাহা হইলেও এগুলি তাঁহার কোনো কাজে লাগিবে না। সুবীরেরও যে সবগুলি কাজে লাগিবে তাহা বলা যায় না, তবে লাগিলেও লাগিতে পারে।

তাহার পর তাহার বইগুলি, এগুলি তাহার নিজের সম্পত্তি। এতকাল ধরিয়া যে সে জমিদারীর পাহারাওয়ালার কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহার জন্য কিছু মাহিনা তাহার প্রাপ্য। সত্য বটে উপরি উপরি চোখ বুলাইয়া দেখা এবং নাম সহি করা ভিন্ন সে বড় বেশী কিছু করে নাই, কিন্তু গভর্ণমেন্টের বড় বড় বিভাগের কর্ত্তারাই বা তাহার চেয়ে বেশী কি করেন? সুতরাং এগুলি সে নিজের বলিয়া দাবী করিলে সম্ভবতঃ কেহই আপত্তি উত্থাপন করিবে না।

তাহার পর বাহির হইল তাহার ডাইরি, কৃষ্ণাকে লেখা চিঠির গোছা, তাহার নিজের আঁকা কৃষ্ণার অসমাপ্ত রেখাচিত্রগুলি এবং কৃষ্ণার সম্পূর্ণীকৃত তৈলচিত্রটি। থাক এগুলিতে পৃথিবীর আর কাহারও কোনো প্রয়োজন নাই। এ তাহারই, কেবলমাত্র তাহারই।

কৃষ্ণার ছবির দিকে চাহিয়া তাহার বুক কাটিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। মনে মনে বলিল, "তুমি দূরে ছিলে আরো দূরে চ'লে গেলে। কেবল একটা সাগর নয়, আরো দুর্লঙ্ঘ্য একটা সাগর আমাদের মাঝে এসে পড়েছে। নিতান্ত দেবতার কৃপা ছাড়া তোমার পাবার আর কোনো উপায় নেই আমার। তোমার ছবিই আমার চিরদিনের প্রেয়সী হ'য়ে রইল। একমাত্র তুমি স্বয়ং পারবে ওকে সে যায়গা থেকে টলাতে।"

ভানুমতীর ঘরে সেদিন আর সে গেলই না। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া নিজের জিনিষ-পত্র গোছানো ও তাহার সব ব্যবস্থা করিতে লাগিল। দেশের বাড়ীতেও কিছু কিছু জিনিষ তাহার ছিল। একদিন সুবিধামত গিয়া সেগুলিরও বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে ঠিক করিল।

C. I. D. র সেই ছেলেটি বিকালে আসিয়া নিজের অনুসন্ধানের ফলাফল জানাইবে বলিয়াছিল। সকাল হইতেই তাহার জন্য সুবীরের মনটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কখন্ সে আসিবে, কি না জানি সে বলিবে? যেমন করিয়া হোক এ ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলিবার জন্য সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গেও নহে, মর্ত্ত্যেও নহে, এমন ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলিয়া মানুষ কত দিন আর থাকিতে পারে?

ভানুমতীর কন্যাকে যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে যে কি করা হইবে, তাহাও সে ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া কিছুই পায় নাই। ভানুমতী দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাও তাঁহার শ্বশুরকুলের অনুমতি সাপেক্ষ। নিজের স্বামীর নিকট হইতে দত্তক গ্রহণের কোন অনুমতি তিনি লইয়া রাখেন নাই। শ্বশুরকুলের মধ্যে উদয় অন্ততঃ যে বাধা দিবে, অনুমতি দিবে না, সে-বিষয়ে সুবীরের কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ বিষয়-সম্পত্তি এ ক্ষেত্রে তাহারই প্রাপ্য।

কিন্তু ভানুমতীর কন্যা যে বাঁচিয়া নাই, একথা কিছুতেই, কেন জানি না, সে মনে করিতে পারিত না। সে আছে, বাঁচিয়া আছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া কিছুই শক্ত হইবে না। কেবল মাত্র তাহার ঠিকানাটা জানিবার জন্য যেন সে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহা হইলেই, ছুটিয়া গিয়া ঐ দৈবনির্ব্বাসিতাকে সে তাহার নিজস্ব স্থানে ফিরাইয়া আনে।

সকালটা এবং দুপুরটা কোনোরকম করিয়া তাহার কাটিয়া গেল। নিজের মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া আছে

বলিয়া, ভানুমতীর কাছে যাইয়াও সে বেশীক্ষণ বসে নাই। যাইবার ইচ্ছাই তার ছিল না। কিন্তু মা ডাকিয়া পাঠানোতে একবার গিয়া তাহাকে হাজিরা দিয়া আসিতে হইল।

ভানুমতী বলিলেন, "ওরে, ভবানীর দেশে খবর দেওয়া হয়েছিল, না? তার এক ভাইপো চিঠি লিখেছে। অনেক দুঃখটুঃখ ক'রে, শ্রাদ্ধের জন্যে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। কি দেওয়া যায়?"

সুবীর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "যা তোমার খুসি, মা। আমাকে জিগ্‌গেস ক'রে কি লাভ? পাঠাতে ব'লে দাও দুচার শ'। ভবানীর আত্মার শান্তি একান্ত দরকার। বেঁচে থাক্‌তে বেচারীর যে পরিমাণ অশান্তি ছিল, মর্‌বার পরেও যদি তাই থেকে যায়, তাহ'লে খুবই শোচনীয় অবস্থা বল্‌তে হবে। তার তবু একটা উপায় আছে এখন। আমাদের যে ছাই এখন শ্রাদ্ধ কর্‌লেও কোনো উপকার হবে না।"

ভানুমতীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "ছিঃ বাবা, ওকি বল্‌ছিস্? মায়ের সাম্‌নে ও কথা মুখে আনিস্ না। তুই চিরজীবী হ'। শ্রাদ্ধ শত্রুর হোক। কিসের তোর দুঃখ? আমি বেঁচে থাক্‌তে তোর গায়ে আঁচড়টি লাগ্‌তে দেব না।"

সুবীর হাসিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। হায় রে স্নেহের অহঙ্কার! কতটুকু শক্তি তার? অথচ কি প্রচণ্ড আগ্রহ আর বিশ্বাস তাহার!

বিকাল হইতেই সব চাকরবাকরকে সে বলিয়া রাখিল, একজন ছোক্‌রা বাবু বিশেষ প্রয়োজনে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে। তাহাকে যেন সোজা দোতলায় তাহার ঘরে লইয়া আসা হয়।

ছেলেটি আসিতে বিশেষ দেরি করিল না। চারটা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইবামাত্রই সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুবীর তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইয়া, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। চাকরকেও বলিয়া দিল ঘণ্টাখানেক যেন তাহাকে ডাকা না হয়।

তাহার পর যুবকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এখন আপনার রিপোর্ট কি বলুন। কিছু খোঁজ পেলেন?"

যুবক বলিল, "খোঁজ ত প্রায় সবই পাওয়া গেছে, এখন আর গোটা তিনচার টেলিগ্রাম এধার ওধার ঝাড়্‌লেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়।"

সুবীর ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তাই না কি? কতদূর আপনি জেনেছেন তাই বলুন আগে। টেলিগ্রামের ব্যবস্থা তারপর করা যাবে।"

যুবক পকেট হইতে ভবানীর চিঠির তাড়া, হিসাবের খাতা প্রভৃতি সব বাহির করিল। বলিল, "এগুলি ঘেঁটে যা বুঝলাম, সেই খ্রীষ্টান ধাত্রী মিসেস্ মিত্র, আপনার মায়ের প্রসবের কেস্ হ'য়ে যাবার পর, বেশীদিন আর কলকাতায় ছিলেন না। গিরিডিতে গিয়ে বাড়ী নিয়ে বাস কর্‌তে আরম্ভ করেন। তাঁর ঠিকানা এ খাতায় রয়েছে। মাসে তাঁকে একশ টাকা ক'রে পাঠানোর হিসাবও রয়েছে। আপনি বল্‌ছেন ভবানী বাড়ীর ঝি ছিল। এত টাকা কাউকে না জানিয়ে সে দিত কি ক'রে?"

সুবীর বলিল, "ঝি সে নামেই, কার্য্যতঃ বাড়ীর কর্ত্রী সেই ছিল। এক শ' ছেড়ে এক হাজার টাকাও সে দিতে পার্‌ত। গিরিডিতে তাঁরা এখনও আছেন ব'লে মনে হয়?"

ছেলেটি বলিল, "না। মেয়েটির বছর পনেরো ষোলো বয়স পর্য্যন্ত খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর আর ঐ ঠিকানায় টাকাকড়ি পাঠানো হয়নি। এখন খোঁজ কর্‌তে হবে গিরিডিতে, সে মেয়ে আর সে লেডী ডাক্তার বেঁচে আছে কি না।"

সুবীর বলিল, "তা বেশ। আপনার যদি ছুটি পাবার সম্ভাবনা থাকে, তা হ'লে ছুটি নিন্। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

যুবক বলিল, "দেখি চেষ্টা ক'রে। আমি যদি ছুটি নাও পাই, তাতেও দুঃখ নেই। কেস্ কিছুই শক্ত নয়, আপনি একলাই পার্‌বেন। দরকার হয় ত ভাল লোকও আমি জোগাড় ক'রে দিতে পার্‌ব, আপনার সঙ্গে যাবার জন্যে।"

সুবীর বলিল, "ব্যাপারটা এখনি আমি বেশী ছড়াতে চাই না। আপনি ছুটি পান ভালই, না হয় আমি একলাই যাব। অবশ্য আপনার আর্থিক ক্ষতি যাতে কিছু না হয় তা আমি দেখ্‌ব।"

যুবক হাসিয়া চলিয়া গেল। ভবানীর চিঠি-পত্র খাতা ইত্যাদি সুবীর নিজেরই একটা দেরাজে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

কিন্তু গিরিডি যাওয়া সুবীরের অদৃষ্টে ছিল না। সেই দিনই রাত্রে ভানুমতীর অবস্থা আবার একটু খারাপ হইল। ডাক্তার ডাকাডাকি, ওষুধ আনা, নার্স ডাকার হাঙ্গাম আবার পুরাদস্তুর সুরু হইল। সুবীর বুঝিতেই পারিল, এখন দিন দশের মত তাহার কোথাও যাওয়ার বিন্দুমাত্র আশা নাই।

তাহার গুপ্তচরটি সৌভাগ্যক্রমে ছুটি পাইল। সুবীর বলিল, "আমার ত নড়বার উপায় নেই, কয়েক দিনের মত। আপনি একলাই যান, তাতেই হয়ত আপনার কাজের সুবিধা হবে। যতটুকু যা জান্‌তে পারেন, আমাকে রেজিষ্ট্রি ক'রে চিঠি লিখে জানাবেন।"

যুবক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "খরচপত্র বেশ কিছু হবে।"

সুবীর বলিল, "না হ'লেই আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ত। তার জন্যে আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি।" সে দেরাজ খুলিয়া দুইশত টাকা বাহির করিয়া যুবকের হাতে দিল। বলিল, "এখনকার মত এই নিয়েই আরম্ভ করুন। টেলিগ্রাম করলেই আরো পাঠাব। টাকার জন্যে কিছু আট্‌কাবে না।" যুবক নমস্কার করিয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

কাজ খানিকটা অগ্রসর হওয়ায় সুবীরের মন একটু শান্ত হইল। অনেক দিন পরে সে আবার খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মায়ের তত্ত্বাবধান করিয়া, গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ইচ্ছা ছিল, বন্ধুবান্ধবদের একটু খোঁজ-খবর লইবে।

দুইটা দিন কোনোমতে কাটিয়া গেল। ভানুমতী খানিকটা আবার সাম্‌লাইয়া উঠিলেন। বিবাহের হাঙ্গাম চুকিয়া যাওয়ায় শোভাবতীরও কিছু অবসর হইয়াছিল। তিনি রোজই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর এ-বাড়ী আসিয়া হাজির হইতেন। সমস্ত দিনটা থাকিয়া, সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেন। কাজেই ভানুমতীর খোঁজ-খবর সারাক্ষণ করার প্রয়োজনটা সুবীরের অনেকটাই কমিয়া গেল।

তিনদিন পরে গিরিডি হইতে খবর পাওয়া গেল। চিঠিখানা হাতে করিয়া সুবীর মিনিট-খানেক চুপ করিয়া রহিল। তাহার জীবনের একটা অংশের উপর এইবার যবনিকা পড়িতে চলিল।

চিঠিখানা সে টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। প্রথম দুই চারিটা অপ্রয়োজনীয় কথা। তাহার পর আসল খবর। যুবক লিখিয়াছে,—"যথাসম্ভব খোঁজ করিয়াছি। বিশেষ কিছু কষ্ট পাইতে হয় নাই। মিসেস্ মিত্রকে এখানকার পুরাতন বাসিন্দারা অনেকেই চেনেন। তিনি বছর আট আগে মারা গিয়াছেন। তাঁহার একটি পালিতা কন্যার কথাও সকলে জানে। তিনি কলিকাতায় স্কুল ও কলেজে শিক্ষিতা হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতার এক খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলে কাজ করিতেন। সম্প্রতি গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কাজ লইয়া রেঙ্গুন চলিয়া গিয়াছেন। নাম মিস্ কৃষ্ণা রায়। খুব সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি আছে। ইঁহার পিতামাতার কথা কেহই অবগত নহে। অতি শিশুকাল হইতে মিসেস্ মিত্রের গৃহেই ইঁহাকে প্রতিপালিত হইতে দেখা গিয়াছে।"

সুবীরের হাত হইতে চিঠিখানা পড়িয়া গেল। ইহাই সে এতদিন জানিয়াও জানিতে চাহিতেছিল না, আজ আর কোনো সন্দেহ রহিল না।

(৩১)

আজ বিপিন এবং তাহার জ্যাঠামহাশয় কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইবেন। কয়দিন আগে বাড়ীতে যেমন আনন্দের হাওয়া বহিতেছিল, আজ ঠিক তার বিপরীত। কর্ত্তা অবশ্য কোনো দিনই বাড়ী থাকেন না, কাজেই তাঁহার আসা-যাওয়ায় গৃহিণী ভিন্ন আর কাহারও মনে বিশেষ কোনো সুখদুঃখের উদয় হয় না। কিন্তু বিপিন চিরকাল ইহাদের সঙ্গে আছে, নিজের মা ত তাহার নাই-ই, বাপ থাকিলেও বিপিনের সঙ্গে তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই। বিপিন নবীন, গৃহিণীর নিজের সন্তানদের মধ্যে এমনভাবে

মিশিয়া গিয়াছে যে নিতান্ত চেষ্টা না করিলে, তাহারা যে তাহাদের আপন ভাই নয়, তাহা তড়িৎ প্রভৃতি কেহই অনুভব করিতে পারে না। প্রতিভা অমিয়াও তাহাদের নিজের দেবরের চেয়ে কিছুমাত্র পর জ্ঞান করে না।

সুতরাং বিপিন চলিয়া যাওয়ায় সবাই দুঃখিত। প্রথমে কর্তা ঠিক করিয়াছিলেন যে নবীনকেই লইয়া যাইবেন, কারণ বিপিন রেঙ্গুনে থাকিয়াই মন্দ কাজ করিতেছিল না। কিন্তু বিপিনই বলিয়া-কহিয়া তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। হঠাৎ রেঙ্গুন ছাড়িয়া যাইবার উৎসাহ কেন যে তাহার এত বেশী হইল, তাহা কেহই ভাবিয়া পাইল না, কেবল একজন ছাড়া। কৃষ্ণা বুঝিতেই পারিল, তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইবার জন্যই বিপিন পলায়ন করিতেছে।

ট্রেন বিকাল সাড়ে পাঁচটায়। বিপিন সকাল হইতে জিনিষ গোছানোর কাজে লাগিয়া গিয়াছিল। তাহার ঘরটি ছোট একটি গুদাম-বিশেষ। এতদিনে, অল্পে অল্পে কত রকমের কত জিনিষ যে ইহার ভিতর জমিয়া উঠিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। কি লইয়া যাইবে, কি ফেলিয়া যাইবে তাহা বাছিয়া ঠিক করাই এক ব্যাপার। তবু করিতেই যখন হইবে এবং সময়ও আর নাই, তখন সে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করিয়া মাথা নীচু করিয়া একমনে কাজই করিয়া যাইতেছিল।

তড়িৎ ক্রমাগত তাহার ঘরে ঢুকিতেছিল এবং বাহির হইতেছিল। বিপিন দাদা যতই তাহার পিছনে লাগুক এবং সে যতই বিপিনের নামে সকলের কাছে নালিশ করুক না কেন তাহাকে তড়িৎ নিজের সহোদর ভাইদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ভালবাসিত না। সুতরাং আজ তাহার কেবলি গলার কাছটা ব্যথায় টন্‌টন্ করিতেছে, চোখ দিয়া জল আসিয়া পড়িতেছে।

একবার ঘরে ঢুকিয়া তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল, "বিপিনদা, এতগুলো বই কি কর্‌বে?"

বিপিন বলিল, "দু চার খানা নিয়ে যাব, বাকি এইখানেই থাক্‌বে।"

তড়িৎ বড় চোখ দুইটা আরো খানিক বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওমা, এতগুলো বই, এইখানে ফেলে রেখে যাবে? কে দেখবে?"

বিপিন বলিল, "তুই দেখিস্।"

তড়িৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওরে বাবা, আমি কিছুর ভার নিতে পার্‌ব না, আমার যা ভোলা মন! শেষে সব পোকায় কেটে নষ্ট ক'রে দেবে। তুমি বরং ও গুলো কৃষ্ণাদির কাছে দিয়ে যাও।"

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল, "যা যা তোকে বই দেখতেও হবে না, পরামর্শ দিতেও হবে না। ওগুলো এখানে যেমন আছে, তেম্‌নি থাক্। কারুকে ওগুলোর জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না।"

বিপিনের কাছে তাড়া খাইয়া তড়িৎ আসিয়া কৃষ্ণার ঘরে ঢুকিল। কৃষ্ণা তখন বসিয়া অমিয়া প্রতিভার খাতা দেখিতেছিল। সে একবার মাত্র মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, তড়িৎ?"

তড়িৎ বলিল, "কিছু না, এম্‌নি একটু এলাম।"

খানিক এটা সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, কৃষ্ণাদি, এক জায়গায় অনেক দিন থাক্‌বার পর চ'লে যেতে ভয়ানক বিশ্রী লাগে না? আপনার কল্‌কাতা থেকে আস্‌তে খারাপ লাগেনি?"

কৃষ্ণা বলিল, "তা লেগেছিল বই কি একটু? কিন্তু বোর্ডিং আর বাড়ী ত এক জায়গা নয়। বাড়ীতে থাকা যদি অভ্যাস হ'ত, তাহ'লে আরো বেশী খারাপ লাগ্‌ত বোধ হয়।"

তড়িৎ খুব বিজ্ঞভাবে মাথা দুলাইয়া বলিল, "ছেলেদের বোধ হয় মেয়েদের মত মায়া হয় না, যত দিনই যেখানে থাকুক্ না কেন। দেখুন না বিপিনদাটা যাবার জন্যে যেন নাচছে। এত দিন যে আমাদের সঙ্গে রইল সে-কথা ওর মনেও হচ্ছে না।"

কৃষ্ণা চাহিয়া দেখিল বিপিনের মায়া হোক বা না হোক, তড়িতের ত চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। সান্ত্বনা দেওয়ার বিদ্যা তাহার জানা ছিল না, সুতরাং সে আবার খাতা দেখায় মন দিল। তড়িৎ মিনিট দুই চার উস্‌খুস্ করিয়া অমিয়াদের ঘরে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে ট্রেনের সময় আসিয়া পড়িল।

গাড়ী আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল, জিনিষপত্রের জন্ত আসিল একটা ঘোড়ার গাড়ী। কন্যা বধূ সকলে কর্ত্তাকে প্রণাম করিল, গৃহিণীর মুখখানা একেবারে গম্ভীর হইয়া গেল। বিপিন গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া, অমিয়া, প্রতিভাকে প্রণাম করিতে গেল। অমিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, প্রতিভা একেবারে পলায়ন করিল। তড়িৎ এবং খুকী একেবারে হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

কৃষ্ণার এই বিদায়পর্ব্বে উপস্থিত থাকিবার বিন্দু মাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়াই সেও সকলের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা না হইলে অত্যন্তই খারাপ দেখাইবে। বিপিন দূর হইতে শুধু একটা নমস্কার করিল, কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না। কর্ত্তা বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে লক্ষ্যই করেন নাই, কারণ তাহাকে কোনো রকম বিদায় সম্ভাষণ না করিয়াই তিনি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

গাড়ীটা চোখের আড়াল হইয়া গেল। সকলে চোখ মুছিতে মুছিতে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। খুকী এবং তড়িতের কান্না তখনও থামে নাই, প্রতিভা, অমিয়ারও চোখ সজলই ছিল। কৃষ্ণার মনটা অত্যন্তই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

বিপিনকে সে ভালবাসিতে পারে নাই, কিন্তু এই যুবকটি যে এবাড়ীর কতখানি ছিল, তাহা সে যাইবামাত্রই বোঝা গেল। এখানকার হাস্যালাপ, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ সব কিছুর উৎসই যেন ছিল বিপিন। নবীন সারাদিন বাহিরে ঘুরিতেই ভালবাসিত, বাড়ীর সঙ্গে খাওয়া এবং শোওয়ার বেশী তাহার কিছু সম্পর্ক ছিল না। কাজেই সে যে বিপিনের স্থান পূর্ণ করিবে, এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বাড়ীটা যেন অনেকখানি অন্ধকার এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল। সকলে কেবল নিয়মমত আপন আপন কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই কৃষ্ণার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিল। এখান হইতে পালাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে। সমস্ত দিন একটা দারুণ অবসাদ পাথরের মত তাহার মনের উপর চাপিয়া থাকিত। কোনো কিছুতে তাহার মন লাগিত না, কিছুর দিকে তাহার তাকাইতে ইচ্ছা করিত না। যন্ত্রের মত কোনোমতে সে কাজ করিত, কিন্তু পিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত তাহার মনটা কেবলি এই কারাগারের লৌহ-শলাকায় মাথা কুটিয়া মরিত।

এতদিন পর্য্যন্ত নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ সে ভাল করিয়া অনুভবই করে নাই। দুইটি মানুষ তাহার জীবনে প্রবেশ করিয়া তাহার এতদিনকার এই নিশ্চিন্ততার অবসান করিয়া দিয়া গেল। একজন তাহাকে ভালবাসিল, আর একজনকে সে ভালবাসিল। প্রেমের দূত আসিল, চলিয়াও গেল। পিছনে রাখিয়া গেল কেবল একটা নিদারুণ শূন্যতা। কৃষ্ণার মনে হইতে লাগিল সমস্ত বিশ্ব যেন হঠাৎ কোন পৈশাচিক মন্ত্রে একেবারে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। বিরাট অন্ধকার গহ্বরের মত, মহাকায় দানবের করাল মুখব্যাদানের মত তাহার মূর্ত্তি। তাহার ভিতর ধরিবার ছুঁইবার কোথাও কিছু নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া উপহাসের অট্টহাসি শোনা যায়।

তাহার আরাম-বিরামের আয়োজনের অভাব ছিল না, ইহা তাহাকে আরো যেন পীড়া দিত। কি করিবে সে অবসর লইয়া? নিজের মনের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইলেই তাহার অস্থিরতা বাড়িয়া উঠিত। ভাবিবার অবকাশ না পাইলেই সে থাকিত ভাল। কয়েদীর মত সমস্ত দিনরাত যদি কেহ তাহাকে খাটাইয়া মারিত, তাহা হইলে সে একরকম বাঁচিয়া যাইত।

দিন কয়েক পরে প্রতিভা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণাদি, আপনার শরীর কি খারাপ যাচ্ছে?"

কৃষ্ণা তখন বইখাতা লইয়া তাহাদের পড়াইতে বসিবার জোগাড় করিতেছিল। বলিল, "না ত। কেন?"

প্রতিভা বলিল, "আপনার চেহারাটা বড় খারাপ

দেখাচ্ছে। চোখের তলায় কালি প'ড়ে গিয়েছে, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। অমন যে আগুনের মত রং আপনার, তাও একটু কালো দেখাচ্ছে।"

কৃষ্ণা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। বলিল, "বুড়ো ত হচ্ছি, কাজেই চেহারা এখন খারাপ হবে বৈ কি? অসুখ-বিসুখ আমার কিছুই করেনি।"

অমিয়া বলিল, "আহা কি না বয়েস আপনার? বিয়ে শুদ্ধ হয়নি, এরি মধ্যে অত বুড়ী সাজতে গেলেই বুঝি লোকে তা বিশ্বাস করবে? মাও সেদিন বল্‌ছিলেন আপনার চেহারা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা, তা যাক্। এখন এস, ঢের কাজ আছে।"

গৃহিণী অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে দু চার দিন ছুটি লইতে রাজি হইল না। শরীর মন যত ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, ততই কাজের উৎসাহ তাহার বাড়িয়া চলিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার কথাও সে বিবেচনা করিতেছিল। রেঙ্গুনে আসিয়াছিল সে বেশী অর্থোপার্জ্জন করিবার আশায়। ইচ্ছা ছিল টাকা জমাইয়া বিলাত যাইবার চেষ্টা করিবে। অল্প বেতনের কাজ করিয়া জীবন শেষ করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না।

এখন তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র মনের মধ্যে একেবারে বদ্‌লাইয়া যাওয়ায়, রেঙ্গুনে থাকার আর প্রয়োজন ছিল না। তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, মানসিক শান্তি ত নষ্ট হইয়াইছিল। গৃহিণীকে অন্য শিক্ষয়িত্রী দেখিতে বলা উচিত কি না, সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সামান্য একটা ঘটনায় সে মনস্থির করিয়া ফেলিল। সকাল বেলা তড়িৎ হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "জানেন কৃষ্ণাদি, আপনার ছাত্রী আরো এক জন বাড়ল।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কে সেটি?"

তড়িৎ বলিল, "আমি।"

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমার স্কুল কি অপরাধ করল?"

তড়িৎ উত্তর দিবার আগেই প্রতিভা ঘরে ঢুকিল। বলিল, "স্কুলের শিক্ষায় আর কুলোবে না, শ্বশুর-মশায় লিখেছেন ঘরকন্নার কাজ সব ভাল ক'রে শেখাতে। আমাদের শিগগিরই একটি ঠাকুর-জামাই জুটবে কিনা! সাম্‌নের মাসে শ্বশুর-মশায় মাস তিন চারের মত এসে থাক্‌বেন। একেবারে শুভকর্ম্ম শেষ ক'রে তবে ফির্‌বেন।"

তড়িৎ লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। কৃষ্ণা বলিল, "ছেলে মানুষ, এরি মধ্যে ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন?"

প্রতিভা বলিল, "শাশুড়ী ঠাকরুণ যে বড় জেদ কর্‌ছেন। মেয়ে দেখতে ভাল নয়, বেশী দেরি কর্‌লে বিয়ে দিতে কষ্ট পেতে হবে। তা না হ'লে কর্ত্তা এত অল্প বয়সে বিয়ের পক্ষপাতী নন।"

প্রতিভা চলিয়া যাইবার পর কৃষ্ণা বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবনাই ভাবিল। অবশেষে চলিয়া যাওয়াই স্থির করিল। কর্ত্তাটিকে তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই। তিনি আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার এখানকার বাস উঠাইলেই ভাল। রেঙ্গুন তাহার এম্‌নিতেই যথেষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন ছাত্রীদের লইয়া বসিবার পূর্ব্বেই সে গৃহিণীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তখন চাকরকে বাজারের পয়সা দিতেছিলেন। কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি গো, মা লক্ষ্মী?"

কৃষ্ণা বলিল, "আপনাকে একটা কথা বল্‌বার আছে। আমার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না।"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন, "তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তোমরা ত কথা শুনবে না বাছা, নিজের ইচ্ছা মত চল। এত খাটনী খাট, একটু ভাল ক'রে দুধ ঘি না খেলে কি চলে? তা দুধ ত এক ফোঁটা তুমি মুখে দেবে না। বল ত কাল থেকে তোমার জন্যে আধা বিশা ক'রে দুধ রাখি।"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "না, তার দরকার নেই। জায়গাটাই আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি কলকাতায়ই ফিরে যাব ভাব্‌ছি। অমিয়াদের জন্যে আর একটি লোক যদি ঠিক ক'রে নেন—

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, এই কথা? আমি ব'লে কত আশা ক'রে ব'সে আছি যে তুমি তড়িৎকে শুদ্ধ পড়াবে। এখন লোক আবার কোথা পাই? লোক কি আর হুট্ কর্‌তেই পাওয়া যায়?"

কৃষ্ণা বলিল, "এক মাসের মধ্যে লোক পাওয়া কিছুই শক্ত হবে না। আপনারা যা মাইনে দেন তাতে অনেক মেয়েই আসতে রাজি হবে। আমার চেনা-শোনা যারা আছে, আমিও তাদের ব'লে দেখ্‌ব।"

গৃহিণী অপ্রসন্নমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। কৃষ্ণাও আর কিছু বলিবার খুঁজিয়া পাইল না, কাজেই সেও চলিয়া আসিল।

গৃহিণী অবশ্য কথাটা নিজের পেটেই রাখিলেন না। কৃষ্ণার ছাত্রীরা যে-রকম পরম গম্ভীর মুখে পড়িতে আসিল, তাহাতে কৃষ্ণার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, খবরটা ইতিমধ্যেই রটিয়া গিয়াছে। পড়ানো শেষ হইয়া যাইতেই অমিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণাদি, আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছেন কেন?"

কৃষ্ণা বলিল, "শরীর ভাল থাকছে না। দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল।"

প্রতিভা বলিল, "আমরা আশা করেছিলাম লাল শাড়ী, সিঁদুর পর্‌বার আগে পর্য্যন্ত আপনি আমাদের সঙ্গেই থাক্‌বেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "লাল শাড়ী পর্‌বই যে তার ত ঠিকানা নেই কিছু। কিন্তু তা পরতে হ'লেও ত প্রাণটা আগে বাঁচানো দরকার? তারি ব্যবস্থা আগে করতে হচ্ছে।"

অমিয়া বলিল, "আবার কি রকম কে আস্‌বে জানি না। আপনি বেশ নিজের বোনের মত হ'য়ে গিয়েছিলেন!"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "অত ভাব্‌ছ কেন? যে নূতন লোকটি আস্‌বে তাকেও নিজের বোনের মত ক'রে নিও। আমিও ত আগে অচেনাই ছিলাম।"

প্রতিভা বলিল, "আপনার মত মেয়ে পথে-ঘাটে প'ড়ে আছে কি না?"

কৃষ্ণা দেখিল এখন কথা বাড়িতেই থাকিবে, অতএব সে চুপ করিয়া গেল।

দিন একটা একটা করিয়া কাটিয়া চলিল। নূতন শিক্ষয়িত্রীর জন্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কৃষ্ণাও লাবণ্য বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে চিঠি লিখিল। বিদ্যুৎ কিছুদিন হইল বেশী মাইনের চাকরী খুঁজিতেছিল। তাহার বড় ভাই মারা যাওয়ায় তাহাদের সাংসারিক অবস্থা বড় খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ভাই-বোনদের মধ্যে এখনও অনেকগুলি বালকবালিকা আছে, তাহাদের মানুষ করার জন্ত অর্থ প্রয়োজন। কাজেই বিদ্যুৎ বেশী বেতনের কাজ খুঁজিতেছে। অবশ্য এতদূরে সে আসিতে রাজী হইবে কি না তাহা কৃষ্ণা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

অমিয়া প্রতিভা তড়িৎ প্রভৃতির দুঃখের অবধি ছিল না। তাহারা পড়াশুনা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। গৃহিণী সারাক্ষণই মুখ গম্ভীর করিয়া থাকিতেন। কৃষ্ণার উপর তিনি চটিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার এমন ভাল বাড়ী, এত ভাল খাওয়া, এখানে থাকিয়া না কি কাহারও শরীর খারাপ হয়? মেয়ে যেন কি? কলিকাতায় সে এমন খাওয়া-দাওয়া পাইবে?

কৃষ্ণা জিনিষপত্র অল্পে অল্পে গুছাইতে সুরু করিল। এখানে তাহার হাতে টাকার অভাব ছিল না, কাজেই বন্ধুবান্ধব সকলের জন্ত উপহার কিনিতে ক্রটী করিল না। গাড়ী পাইলেই সে একবার করিয়া বাজার ঘুরিয়া আসিত।

বেলা বারোটার সময় সে একরাশ চন্দনকাঠের জিনিষ কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহার গাড়ী গলির এক দিক দিয়া প্রবেশ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই গলির অপর দিক দিয়া একটা ভাড়াটে গাড়ী ঢুকিল এবং দুইখানা গাড়ী প্রায় একই সঙ্গে বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণা মুখ বাহির করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল গাড়ীর আরোহীটি কে। তাহাকে চিনিবামাত্র কিন্তু তাহার মন বিস্ময়ে আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। সে সুবীর।

সুবীরও তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল সম্ভবতঃ। কিন্তু দুজনে দুজনের যতই পরিচিত হোক, মৌখিক আলাপ তাহাদের নাই। সুতরাং কৃষ্ণা নামিয়া পড়িয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া গেল। সুবীর দরোয়ানের কাছে গিয়া নিজের একখানা কার্ড দিয়া বলিল, "উপর লে যাও।"

দরোয়ান বলিল, "বাবুলোগ কোই নহি হ্যায়, বাবু।"

সুবীর কার্ডখানা চাহিয়া লইয়া তাহাতে লিখিয়া দিল, To see Miss Roy, on urgent business (জরুরী

কাজে মিস্ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য)। দরোয়ানকে বলিল, কার্ডখানা যাহাকে হউক দেখাইতে, তাহা হইলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। বিপিনের সাহায্য পাইবে আশা করিয়া সে আসিয়াছিল ; সে যখন নাই, তখন নিজেই যেমন করিয়া হোক কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে।

দরোয়ান তাহাকে একখানা চেয়ার দিয়া বসাইয়া, কার্ড লইয়া উপরে চলিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া সুবীরের হাসি পাইতেছিল। আশ্চর্য্য অদৃষ্টের পরিহাস। এখানে আসিবার তাহার ঠিকই ছিল, আসা হইল বটে। কৃষ্ণাকে লইয়া যাইবার জন্যই সে আসিবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু সে নিজের জীবনের অধীশ্বরীরূপে। কৃষ্ণাকে লইতেই সে আসিল, কিন্তু সে নিজে কৃষ্ণার জীবনে আর এখন কোনো স্থান পাইবার আশা রাখে না। সে দৈবক্রমে যে কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, সেইখানেই এই জ্যোতির্ম্ময়ী তারকাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইবে। এইটুকুমাত্র কৃষ্ণার জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ। দরোয়ান আসিয়া বলিল, "উপর চলিয়ে, বাবু।"

সুবীর দরোয়ানের পিছনে পিছনে উপরে আসিয়া বসিল।

এইবার নাটকের শেষ অঙ্ক। তাহার পর এই রঙ্গমঞ্চ হইতে তাহার চিরদিনের বিদায়।

(ক্রমশঃ)

নরওয়েতে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ দর্শন

অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, এফ্, আর, এস্

সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ (Total Solar Eclipse) খুবই বিরল ব্যাপার, এবং যখন ঘটে, তখন উহার দরুণ প্রকৃতিতে আকস্মিক এত অধিক পরিবর্ত্তন হয়, যে পূর্ণগ্রাস চিরকালই জনসাধারণের কৌতূহলী চিত্তকে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল অন্য দিক হইতে। তাঁহার নিকট এই বিষয়ের গুরুত্ব এত অধিক যে,—যে সামান্য কয়মিনিট এই প্রাকৃতিক ব্যাপার স্থায়ী থাকে (পূর্ণগ্রাস উর্দ্ধকল্পে ৭ মিনিটের বেশী স্থায়ী হইতে পারে না।) সেই কয় মিনিটের জন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে বৈজ্ঞানিক সমস্তপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে ও সর্ব্ববিধ কষ্ট সহ্য করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হন না। অনেক সময় বৈজ্ঞানিকেরা আমেরিকা হইতে প্রায় অর্দ্ধপৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ভারতমহাসাগরের নির্জ্জন মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ক্ষুদ্র দ্বীপে মাসের পর মাস তাঁবুতে কাটাইয়া দেন, অনেক সময় উত্তর মেরুপ্রদেশ পর্য্যন্ত অভিযান করেন। সুতরাং বিগত জুনমাসে ইউরোপ প্রবাস কালে যে বর্ত্তমান লেখক শুধু সূর্য্যগ্রহণ দেখিবার জন্য নরওয়েতে যাইতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। অবশ্য ইংল্যাণ্ডেও সূর্য্যগ্রহণ দেখা যাইত, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের আব্‌হাওয়া এত অনিশ্চিত যে উহা প্রায় প্রবাদবাক্যে হইয়া গিয়াছে। সেইজন্যই আমি এমন জায়গায় যাইয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিব স্থির করিলাম, যেখানকার আব্‌হাওয়ার উপর খানিকটা নির্ভর করা যায়।

২৩ শে জুন ইংল্যাণ্ড ছাড়িলাম, এবং হল্যাণ্ড, জার্ম্মেণী, ডেনমার্ক হইয়া নরওয়ের দিকে যাত্রা করিলাম। পথে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় লাইডেন সহরে আমার পুরাতন বন্ধু পদার্থতত্ত্বের অধ্যাপক এরেনফেষ্টের গৃহে দুইদিন কাটাইলাম। তন্মধ্যে একদিন হল্যাণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্বপ্রান্তস্থ আইণ্ডহোফেন (Eindhoven) সহরে বিখ্যাত ফিলিপের বিজলীবাতির কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে একটি সামান্য

গ্রামমাত্র ছিল। এক পুরুষ কালের মধ্যে (কারখানার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মিঃ ফিলিপ এখনও জীবিত) শুধু এই কারখানার দৌলতে এই স্থানটি ভারতের জামসেদপুরের ন্যায় বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এতবড় বিজলীবাতির কারখানা আছে কি না সন্দেহ। এই কারখানার বিশেষত্ব এই যে, এখানে যে শুধু হাতে-কলমে শেখা শিল্পীর দলই আছে তাহা নয়, এখানকার পরীক্ষাগারে (Laboratoryতে) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেন্দ্রের মত বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন প্রায় পঁচিশ জন বৈজ্ঞানিক উচ্চাঙ্গের বিশুদ্ধ গবেষণা করিতেছেন। উদ্দেশ্য, তাঁহারা বিজ্ঞানের নিত্যনূতন গবেষণাকে কারখানার কাজে লাগাইয়া কারখানার উন্নতিসাধন করিবেন। তন্মধ্যে একজন—ডাঃ হার্ট্‌জ্ (Hertz) সম্প্রতি পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। এই সমস্ত গবেষণা-ল্যাবরেটরী-সমূহের পরিচালক ডাঃ উষ্টের-হুইস্ (Ooster huis) আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া সমস্ত দেখাইলেন। অবশ্য একদিনে সমস্ত দেখা অসম্ভব, আমি শুধু যে সমস্ত জিনিষ তৈয়ারী ও পরীক্ষায় আমার বিশেষ দরকার ও কৌতূহল ছিল সেই সমস্তই দেখিলাম। আমি পরিচালক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, শুধু নিছক গবেষণার জন্য যে, এই বিপুল অর্থব্যয় করা হয়, তাহাতে কারখানার কোন লাভ হয় কি না? পরিচালক উত্তর করিলেন যে, ইহাতে যে শুধু সমস্ত খরচ পোষা-ইয়া লাভ থাকে তাহা নয়, উপরন্তু এই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর গবেষণার উপরই সমস্ত কারখানার অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই গবেষকমণ্ডলীর আবিষ্কার ও পরামর্শের ফলেই তাহাদের পক্ষে ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মেণী, আমেরিকা প্রভৃতি শক্তিশালী দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতি-যোগিতা সম্ভবপর হইয়াছে।

Eindhovenএর বিখ্যাত বেতারবার্ত্তার ষ্টেশন দেখিলাম। এই ষ্টেশন পৃথিবীর মধ্যে খুবই শক্তিশালী, এবং এখান হইতে ক্ষুদ্রতরঙ্গসহযোগে (দৈর্ঘ্য ৩০·২ মিটর) বেতার গানবাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি বিকীর্ণ করা হয়। ইহা এত শক্তিশালী যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে তিন বাতির গ্রাহকযন্ত্রসহযোগে এই কেন্দ্র হইতে বিকীর্ণ গান-বাজনা শোনা যায়। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প[র] এলাহাবাদে আমার ল্যাবরেটরীতেও আমি এই কেন্দ্র প্রেরিত বেতারবার্ত্তা শুনিয়াছি। এখানকার পরিচাল[ক] ডাঃ ভ্যানডের পোলের সহিত আলাপ হইল। ডাঃ পো[ল] বলিলেন যে, তিনি লণ্ডনের অধ্যাপক ই, ভি, এপ্‌লটনে[র] সহযোগে পরীক্ষা করিবেন যে, যখন সূর্য্যগ্রহণের সম[য়] চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া চলি[য়া] যায়, তখন সেই ছায়ার ভিতর দিয়া বেতারবার্ত্তা প্রের[ণ] করিলে উক্ত বার্ত্তার শক্তির কোন তারতম্য হয় কি না। পরে সংবাদপত্রপাঠে জানিতে পারি যে, বাস্তবিক তাঁহারা প্রমাণ করেন, যে, শক্তির খানিকটা অপচ[য়] হয়।

লাইডেন হল্যাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সমরের সময় লাইডেন বাসিগণ অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করায় পুরস্কারস্বরূপ রাষ্ট্র নেতা উইলিয়ম এ স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। নানাবিধ বিদ্যার আলোচনায় ও অধ্যাপকদের খ্যাতিতে এ স্থান ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ অপেক্ষা ন্যূন নয়। আমা[র] পক্ষে দ্রষ্টব্য জিনিষ ছিল—পরলোকগত অধ্যাপক কামের লিঙ ওনেসের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত শৈত্যসংজনক (cryo genic) বীক্ষণাগার। সমগ্র পৃথিবীতে এই ধরণে[র] বীক্ষণাগার আর নাই। আজকাল অনেকেই জানেন যে যন্ত্রসহযোগে বায়ুকে এত ঠাণ্ডা করা যায় যে, উহা জলে[র] মত তরল হইয়া যায়। কলিকাতা বেলিয়াঘাটাতে এইরূ[প] একটি কারখানা আছে। তরল বায়ুর তাপমান বরফ হইতে ১৪০ ডিগ্রী কম। কিন্তু দুইটি বায়বীয় পদার্থ জলে[র] উপাদান হাইড্রোজেন এবং হীলিয়ম নামক দুষ্প্রাপ[্য] গ্যাস্ এইরূপ তাপমানেও বায়বীয়ই থাকে। অনেক রকম চেষ্টা-চরিত্র করিয়া ইংলণ্ডে ডেওয়ার্ ও র‍্যাম্‌জে ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে হাইড্রোজেন্‌কে তরল করেন। উহা[র] তাপমান বরফ হইতে ১৮০ অংশ কম। কিন্তু হীলিয়ম্‌কে কেহ তরল করিতে পারেন নাই। এমন কি, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডেওয়ারও ইহা অসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ১৯০৯ সনে কামেরলিঙ্ ওনেস্ এই অসাধ্য সাধন করেন। তাঁহার গবেষণা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ধৈর্য্য অধ্যবসা[য়]

রিঙ্গবুর সূর্য্যগ্রহণ অভিযানের পেন্সিল চিত্র (আফ্‌টেন্‌ পোষ্টেন্‌, অস্লো, ২৯শে জুন, ১৯২৭)
ডাঃ, একম্যান, গটেবুর্গ, অধ্যাপক গ্র্যান্ট, অধ্যাপক পিটার্সন (উপ্‌সালা) ; অধ্যাপক ম্যেয়র্নর (উপ্‌সালা) ; অধ্যাপক সেলেণ্ড্‌ (অস্লো); অধ্যাপক সাহা (এলাহাবাদ) ; অধ্যাপক ভেগার্ড (অস্লো)।

ও একনিষ্ঠার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষের ত্রিবাঙ্কুর হইতে তিনি এক জাহাজ Monazite sand নামক এক প্রকার হলুদ বর্ণের বালুকা লইয়া যান এবং উহা গরম করিয়া হীলিয়ম্‌ তৈয়ার করেন। তরলীকৃত হীলিয়মের তাপমান বরফ অপেক্ষা ২৬৯ অংশ কম। বরফের তাপমান ২৭৩ অংশ কমাইতে পারিলে আমরা তাপমানের শূন্যেতে পৌঁছি। অর্থাৎ তখন অণুপরমাণুগুলি একেবারে নিশ্চল, নিস্পন্দ হইয়া যাইবে। লাইডেনের বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় তাপমানের শূন্যে পৌঁছিয়াছেন, এবং এই তাপমানে বস্তুর অনেক অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

লাইডেনে অধ্যাপক এরেনফেষ্টের অনুরোধে আমাকে আমার গবেষণা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে হইল। অধ্যাপক জাতিতে রুশীয় ইহুদী, তাঁহার স্ত্রীও বিদুষী, জাতিতে খাঁটি রুশীয়, এবং মস্কো ইউনিভার্সিটীর পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। ছুটীতে তিন মাসের জন্য স্বামীর কাছে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এরেনফেষ্ট-জায়া বলিলেন যে, আমরা যদিও Burgeois ক্লাশের, এবং যদিও বলশেভিকেরা আমাদের শ্রেণীর উপর ঢের অত্যাচার করিয়াছে, তবুও আমরা চাই না যে, বলশেভিক রাজতন্ত্র বৈদেশিকদের ষড়্‌যন্ত্রে ধ্বংস হয় কারণ তাহারা শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট করিয়াছে এবং আপনা হইতেই সংশোধন আরম্ভ করিয়াছে।

অধ্যাপক এরেনফেষ্টের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম ইউট্রেক্‌টে (Utrecht)। সেখানে পদার্থ-বিদ্যার সহকারী অধ্যাপক ডাঃ বুর্গার অনেক যত্ন করিয়া আমাকে তাহাদের লেবরেটরী দেখাইলেন। যদিও সময়টা খুবই বেহিসাবী রকমের ছিল—সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টা। এই জায়গাটি দেখিবার আমার খুব ইচ্ছা ছিল, কারণ তাপজনিত আলোক বিকীরণ সম্বন্ধে আমার যে সমস্ত গবেষণা আছে, তৎসম্বন্ধে ইঁহারা কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদ্র হল্যাণ্ড দেশের সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সমস্ত দেশটি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় আমাদের ময়মনসিংহ জিলা হইতে একটু বড় হইবে, কিন্তু এখানে ৪টি প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় চলিতেছে। আর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই সরঞ্জাম ও যন্ত্র-সম্পদে ইংল্যাণ্ড

ও জার্ম্মেনির বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য বা শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক লেবরেটরী সংলগ্ন কারখানা আছে। লেবরেটরীর দরকারী যন্ত্রপাতি অধিকাংশ নিজেদের কারখানাতেই তৈয়ারী হয়। আমাদের দেশের মত ইহারা বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি বেশী কেনে না। কামেরলিঙ্ ওনেসের যন্ত্রপাতি তিনি নিজের দেশে, নিজেদের মিস্ত্রী দিয়াই তৈয়ার করাইয়াছিলেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে হল্যাণ্ড-বাসিগণ অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এক পদার্থ-বিদ্যাতেই চার চার জন নোবেল বৃত্তিধারী হইয়াছে—লোরেঞ্জ, জিমান, ভ্যান্ ডের ভালস্ এবং কামেরলিঙ্ ওনেস্।

ইউট্রেকট্ হইতে অস্লো (নরওয়ের রাজধানী) রওনা হইলাম। পথে হামবুর্গে গাড়ী বদ্লাইতে হইল। বাল্টিক সমুদ্রের উপকূলে সাসানিজ্ বন্দরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা সমেত সমস্ত ট্রেইনখানি জাহাজে তুলিয়া লওয়া হয় এবং পরদিন সুইডেনের ট্রেলিবর্গ বন্দরে নামাইয়া দেওয়া হয়। আরোহীরা মোটে জানিতেই পারে না, তাহারা বাল্টিক সমুদ্রের মত একটা বড় সমুদ্র পার হইতেছে। অস্লোতে সন্ধ্যাবেলা পৌঁছিলাম, এবং সেই রাত্রি এক হোটেলে কাটাইয়া পরদিন অস্লো হইতে ৪০০ কিলোমিটার (প্রায় ২৫০ মাইল) উত্তরে রিঙ্গবু অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ইহার পূর্ব্বেই আমি অস্লো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ ভেগার্ডকে লিখিয়াছিলাম যে, তিনি যেন দয়া করিয়া তাঁহার দলের সহিত আমার জন্যও বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। অধ্যাপক ভেগার্ড অত্যন্ত সৌজন্য প্রকাশ করিয়া স্বয়ং ষ্টেশনে আসিয়া আমাকে তাঁহার আস্তানায় লইয়া যান। ইঁহার একটি বৃহৎ গোলাবাড়ী, আপাতত হোটেলে পরিণত করা হইয়াছিল। এই স্থানে সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ মানসে সমাগত নরওয়ে ও সুইডেনের অন্য বহুতর অধ্যাপকের সহিত আলাপ হইল। গ্রহণের পূর্ব্বদিন ইহাদের সঙ্গে খুবই আমোদে কাটান গেল। ঐ দিন নরওয়ের প্রধানতম দৈনিক পত্র আফটেন পোষ্টের একজন প্রতিনিধি আমাদের দলের বিশেষ ভাবে আমার স্বতন্ত্র একটি পেন্সিল-চিত্র অঙ্কিত করেন, এবং পরদিন ঐ দৈনিক পত্রে ঐ চিত্র গুলি প্রকাশিত হয়। ঐ দিন একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক (তিনি নোবেলের শান্তিপুরস্কার কমিটির সদস্য) কথাপ্রসঙ্গে বলেন, মহাত্মা গান্ধীকে শান্তির নোবেল পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, কিন্তু কোনোও প্রবল শক্তির প্রতিকূলতায় তাহা কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই।

এইবারে আসল গ্রহণ সম্বন্ধে লিখিব। রিংগবু একটি মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত ক্ষুদ্র সহর। অধ্যাপক ভেগার্ড বলিলেন যে, এই উপত্যকা নরওয়ের ইতিহাসে খুব প্রসিদ্ধ। এইস্থানের অক্ষমান ৬১—সেইজন্য বৎসরের এই সময়টীতে দিন প্রায় ২২ ঘণ্টা ব্যাপী ছিল। গোধূলির আলো এত উজ্জ্বল ছিল যে, মধ্যরাত্রেও অনায়াসে কাগজ-পত্র পড়া যাইত। রাত্রিটি অতি মনোরম ছিল। ভোর ৫ টায় খুব জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গান হইল। উঠিয়া দেখিলাম যে স্থানীয় প্রায় সমস্ত লোকই আশে পাশের মাঠে সমবেত হইয়াছে। প্রত্যেকের হাতেই এক একখানা ভূষা মাখানো কাঁচ। অধ্যাপক ভেগার্ডের কার্য্য প্রণালীতে তেমন কিছু আড়ম্বর ছিল না। কারণ তিনি পেশাদার জ্যোতিষী নন্ এবং ইংরেজ ও মার্কিণ দলের ন্যায় তাঁহার অত বেশী শক্তিশালী যন্ত্র-পাতিও ছিল না। আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল, এখানে সেখানে দু একটি শুভ্র মেঘখণ্ড ছাড়া সমস্তটাই উজ্জ্বল সুনীল। আমি একটি ছোট দূরবীণ (বাইনাকুলার) এবং ভূষা মাখানো কাঁচ সহযোগে গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে চন্দ্রের ছায়া দেখা গেল এবং ক্রমে ক্রমে উহা সূর্য্যকে গ্রাস করিতে লাগিল। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ঘণ্টা ধরিয়া গ্রাস চলিল। শেষ কয় মিনিটের উত্তেজনাই বাস্তবিক সকলের চেয়ে বেশী। সূর্য্যের প্রায় সাতের-আট ভাগ গ্রাস হইলে সমস্ত প্রকৃতির উপর অন্ধকার বেশ স্পষ্ট ঘনাইয়া আসিল। গ্রামের কুক্কুটগুলি ডাকিয়া উঠিল। পূর্ণগ্রাস কিন্তু এত হঠাৎ আসিল যে, আমরা প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারি নাই। সে কি দৃশ্য! কি অদ্ভুত! কি মহিমাময়! সূর্য্যের চারিপাশ হইতে হঠাৎ অতি উজ্জ্বল শুভ্র রশ্মি-সমূহ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে এবং তাহাদের অন্তস্থলে
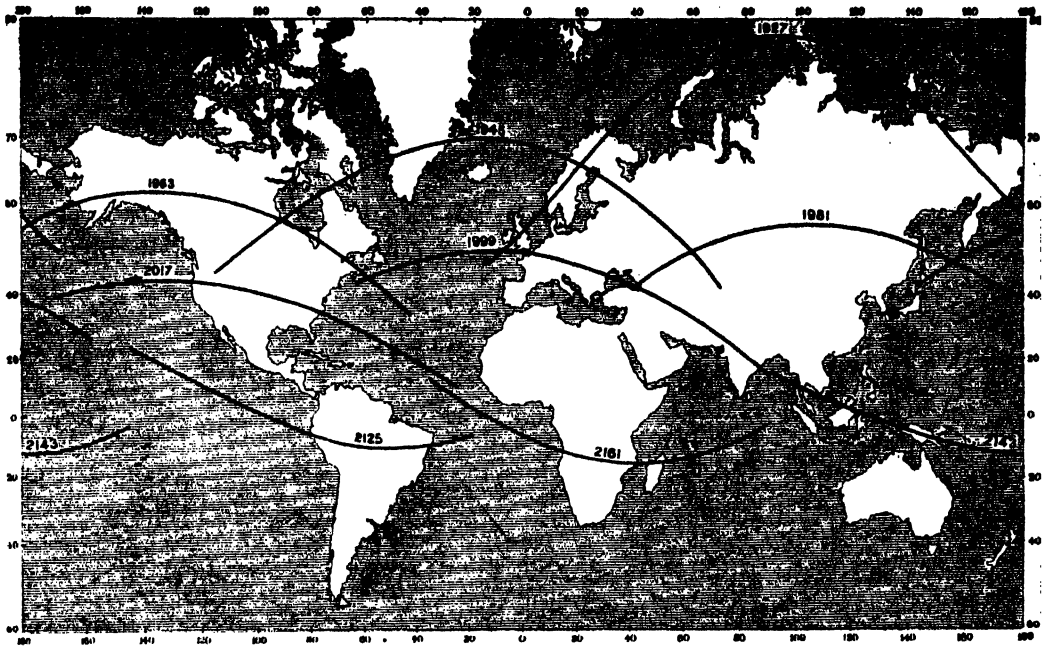
পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের পথ-নির্দ্দেশ ; ভবিষ্যৎ গ্রহণের পথগুলিও চিহ্নিত হইয়াছে, নেচার ১৮ জুন, ১৯২৭, পৃঃ ৭৬,

সূর্য্যের নিকটেই চারিটি লাল অগ্নিময় শিখা প্রচণ্ড জ্যোতির সহিত জলিতেছে।

এ দৃশ্য কখনও ভুলিবার নয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে উহা ক্ষণস্থায়ী! আমি ভূষাঙ্কিত কাচখানি নামাইয়া রাখিয়া পেন্সিল দিয়া কাগজের উপর ঐ অগ্নিময় শিখাগুলির অবস্থান অঙ্কিত করিয়া লইতেছিলাম এমন সময়ে চন্দ্র আরও অগ্রসর হইয়া গেল এবং সূর্য্যের যে-অংশ হইতে উহা সরিয়া গেল সেই অনাবৃত স্থান হইতে তীব্র আলো আসিয়া আমার চোখ ঝলসাইয়া দিল। আমি বাইনাকুলারটি নামাইয়া রাখিতে বাধ্য হইলাম। পুনরায় ঐ ভূষাঙ্কিত কাচটি চোখে লাগাইবার পূর্ব্বেই গ্রহণঘটিত ঐ দৃশ্য শেষ হইয়া গেল। এই ব্যাপার ৪২ সেকেণ্ড মাত্র ছিল, কিন্তু শুধু একটিবার ঐ অতুল দৃশ্য দেখিবার জন্য আমি আবার অর্দ্ধপৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে প্রস্তুত আছি যদি আমাকে কেহ বলিয়া দেয় যে, আমার শ্রম সার্থক হইবে।

অধ্যাপক ভেগার্ড, Corona বা সৌরকিরীটের সুন্দর একটি আলোকচিত্র লইয়াছিলেন। উহা ৭২৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। এই চিত্রে কিন্তু সূর্য্যের উজ্জ্বল রক্ত শিখাগুলি উঠে (Prominences) নাই। কিরীটের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ বহির্ম্মণ্ডলটির ছবি স্পষ্টতর করিয়া তুলিবার জন্য আলোকচিত্রটি উঠাইবার সময়ে ক্যামেরাটিকে ইচ্ছা করিয়া একটু বেশীক্ষণ খোলা রাখা হইয়াছিল। অন্য যে আলোকচিত্রটির ছবি দেওয়া হইল (৭২৯ পৃষ্ঠা) উহা ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী গিগল্‌স্‌উইক্ সহরে তোলা হইয়াছিল। উহাতে উজ্জ্বল অংশগুলি সুন্দর উঠিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের রাজজ্যোতিষীর সৌজন্যেই উহা দিতে পারিলাম। ছবি দেখিয়া যদি কেহ অনুমান করিয়া লইতে পারেন যে, উজ্জ্বল শিখাগুলি গাঢ় লাল বর্ণে রঞ্জিত এবং কিরীটের রশ্মিগুলি চন্দ্ররশ্মির মত অত্যুজ্জ্বল শুভ্র, তাহা হইলে আসল দৃশ্যটির কতকটা উপলব্ধি হইতে পারে।

সন্ধ্যার সময় আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে দুই দুইটি বড় দল—একটি মার্কিণ, অধ্যাপক মিচেলের নেতৃত্বে, ইঁহারা আমাদের একশত মাইল দক্ষিণে ফ্যাগারনেস্ নামকস্থানে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন এবং

দ্বিতীয়টি অধ্যাপক নিউআলের নেতৃত্বে কেম্ব্রিজ দল, ইঁহারা আমাদের উত্তরে আল্ সহরে গিয়াছিলেন—এই দুই দলই আপন আপন উদ্দেশ্যে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। ইঁহারা মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া বলিতে গেলে এই বিফলতা অতীব দুঃখের ব্যাপার। কারণ ছয় বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান লেখক সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে যে গবেষণা করেন এবং পরে ম্যাঞ্চেষ্টারের অধ্যাপক ই, এ, মিলনে যাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়তর করেন,বর্ত্তমান পূর্ণগ্রাসের সময় তাহার পরীক্ষা করার সুযোগ ঘটিয়াছিল। মার্কিণ ও কেম্ব্রিজের দল উভয়েই আমাদের গবেষণা ঠিক মিলিয়া যায় কি না, দেখিবার জন্য তাহা অতি পরিষ্কার, বাঁধা-ধরা কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন এবং সঙ্গে অতি শক্তিশালী ও উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতিও আনিয়াছিলেন। আরও উত্তরে ল্যাপল্যাণ্ডে, যেখানে জার্ম্মান্, সুইডিশ্ ও ডাচ্ দল গিয়া গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করেন, সেখানকার আকাশ এত পরিষ্কার ছিল যে, সচরাচর সেরূপ থাকে না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে সকল দলই হতাশ হন, একটি ছাড়া। ইঁহারা রাজজ্যোতিষী সার ফ্রাঙ্ক ওয়াট্সন্ ডাইসনের নেতৃত্বে গিগল্‌স্‌উইকে ছিলেন। গণনামতে, ইংলণ্ডে সূর্য্যের ৯৬ পারসেণ্ট অংশ গ্রাস হইবার কথা ছিল। কিন্তু গ্রহণের দিনটিই দাঁড়াইল বৎসরের মধ্যে সকলের চেয়ে বাদলা। একজন দর্শক লণ্ডনের উপকণ্ঠস্থ পার্লামেণ্ট টিলা হইতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে গ্রহণের দিন এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি বাইবেলে উক্ত নোয়ার ন্যায় আরারাত পর্ব্বতের শিখর হইতে জলপ্লাবন দেখিতেছিলেন।

সূর্য্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বুঝিতে হইলে-বৈজ্ঞানিক কারণ বুঝিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রমতে ও সাধারণে প্রচলিত সংস্কার এই যে, রাহুনামক এক রাক্ষস পর্ব্বে পর্ব্বে পূর্ব্বের আক্রোশবশতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যকে গিলিয়া ফেলে। অবশ্য এ সমস্ত শাস্ত্রবচন ছেলেভুলানো ছড়ারই মত অর্থশূন্য। কিন্তু আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা রাহু ও কেতুর বৈজ্ঞানিক অর্থ দিয়া উক্ত শাস্ত্রবচনের সদ্‌গতি করিয়াছিলেন। ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বুঝানো যাইতেছে। সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ দুই-ই গ্রহণ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইলেও দুইএর কারণ একটু বিভিন্ন। পৃথিবী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া শূন্যে ঘুরিতেছে; চন্দ্র আবার পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। প্রথম পথকে রবি-মার্গ (Ecliptic) বলা যাক (কারণ যদিও বাস্তবিক পৃথিবীই ঘোরে, তবুও আমরা পৃথিবীতে অবস্থিত বলিয়া মনে হয় পৃথিবী নিশ্চলই রহিয়াছে, সূর্য্য আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছে)। সূর্য্যের আপাতদৃশ্যমান পথকে রবিমার্গ বা সূর্য্যকক্ষা বলে। তেমনি চন্দ্রের পথকে চন্দ্রমার্গ বলা যাউক। এই দুই পথ এক নয়, উভয়ের অবনতি প্রায় ৫° ডিগ্রি। যে দুই বিন্দুতে এই দুই মার্গ পরস্পরকে ছেদ করে, প্রাচীন জ্যোতিষীরা সেই দুই বিন্দুকে রাহু ও কেতু বলিতেন। এই বিন্দু আকাশে স্থির নয়, সূর্য্যের বিপরীত দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সমস্ত আকাশ পরিভ্রমণ করিতে সূর্য্যের সম্বৎসর বা ৩৬৫¼ দিন লাগে, কিন্তু এক সম্পাত বিন্দু (রাহু) হইতে সেই সম্পাত-বিন্দুতে ফিরিয়া আসিতে সূর্য্যের ৩৪৬ দিবস লাগে। যদি চন্দ্রও সেই সময় ঐ সম্পাতবিন্দুতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তখন চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবী এক লাইনে পড়ে। চন্দ্র ও সূর্য্য যদি পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে সুতরাং চন্দ্রগ্রহণ হয়। ইহা শুধু পূর্ণিমা তিথিতেই ঘটিতে পারে। যদি চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে আসে, তাহা হইলে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে এবং সেই ছায়ার মধ্যস্থ লোকে সূর্য্যকে আংশিক বা পুরাপুরিভাবে দেখিতে পারে না। ইহাকেই সূর্য্যগ্রহণ বলে এবং ইহা শুধু অমাবস্যাতেই ঘটে। কারণ চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে আসাতে, চন্দ্রের যে দিক আমাদের দিকে থাকে তাহাতে সূর্য্যের আলো পড়ে না, সুতরাং আমরা কিছুই দেখিতে পারি না। অতএব সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ ঘটিতে হইলে দুইটি জিনিষ দরকার, প্রথমতঃ, তাহা অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় ঘটিবে; দ্বিতীয়তঃ চন্দ্র-সূর্য্য-পৃথিবী এক লাইনে হইবে। এক অমাবস্যা হইতে অন্য অমাবস্যা পর্য্যন্ত সময়মান (চান্দ্রমাস) ২৯ দিন এবং সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী পরপর এক লাইনে আসে।

রাজপুত সুন্দরী

[প্রাচীন রাজপুত চিত্র হইতে]

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অস্লো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার এল্‌মৃ ভেগার্ড ২৯শে জুন, ১৯২৭ তারিখে পূর্ণগ্রহণের সময় আলোকচিত্র লইতেছেন।

অর্থাৎ ১৮ বৎসর ১১ দিন পরপর চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে এক লাইনে অবস্থিত হইবে এবং গ্রহণ ঘটিবে। অর্থাৎ আজ যদি কলিকাতায় চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হয়, ১৮ বৎসর ১১ মাস অন্তে পুনরায় কলিকাতায় আবার সেইরূপ গ্রহণ হইবে। সুতরাং এক কালচক্রে কতগুলি গ্রহণ হইতেছে জানিতে পারিলে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য সমস্ত গ্রহণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই গণনা করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে।

প্রাচীন বেবিলোন দেশীয় জ্যোতিষিগণ এই কালচক্র আবিষ্কার করেন এবং তাঁহাদের দেশের অন্যতম নামানুসারে এই সময়কে ক্যাল্‌ডীয়ান সেরস বা কাল্‌ডীয় কালচক্র বলে। হিন্দু, গ্রীক, আরব, পারসীক প্রভৃতি অন্যান্য জাতি বেবিলোন হইতেই এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং এই কালচক্র অবলম্বন করিয়াই গণৎকারগণ পূর্ব্ব হইতে গ্রহণ গণনা করেন।

সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস:

কিন্তু সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস কতকগুলি কারণে আরও বিরল ব্যাপার।

প্রথমতঃ পূর্ণগ্রাস ব্যাপারটাই পৃথিবীর অতি সামান্য অংশ হইতে দেখা যায়। চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীকে যে বৃত্তাকারে ছেদ করে, সেই বৃত্তের ব্যাস বড়জোর ৫০ মাইল হইবে। আর এই ছায়া মিনিটে প্রায় মাইল বেগে পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং যাহারা এই ছায়ার পথের মধ্যে থাকে তাহারাই পূর্ণগ্রাস দেখিতে পায়, ছায়ার বহিঃস্থ লোকে আংশিক গ্রাস মাত্র দেখে। কোন স্থান অতিক্রম করিতে চন্দ্রচ্ছায়ার বড় জোর সাত মিনিট সময় লাগে, সুতরাং পূর্ণগ্রাস ৭ মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় না। আজ যদি কলিকাতায় সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস ঘটে, তাহা হইলে ১৮ বৎসর ১১ মাস পর পর কলিকাতায় বা নিকটবর্ত্তী স্থলে আর দুবার পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ দেখা যাইবে, তাহার পর ৩৬০

বৎসর আর পূর্ণগ্রাস, কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখা যাইবে না। প্রতি বৎসরই সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে ঘটিতেছে, কিন্তু একই স্থানে পুনরায় পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ ঘটিতে অন্ততঃ ৩৬০ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।

পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ প্রাচীন কালের লোকেদের পক্ষে পূর্ব্ব হইতে গণনা করা দুঃসাধ্য ছিল। পূর্ণগ্রাস হইতে হঠাৎ এমন একটা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটে, যে, উহা লোকের মনে বিষম ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গল্প পাওয়া যায় চীনদেশের বাঁশের পুঁথিতে লেখা পুরানো রাজবিবরণী হইতে। তাহাতে লেখা আছে যে সি এবং হো নামক দুইজন রাজজ্যোতিষী গ্রহণের সময় মাতাল হইয়া ক্রিয়াকর্ম্মে অবহেলা করাতে দানবে সূর্য্যকে খাইয়া ফেলে এবং এই অপরাধ জনিত পাপক্ষালনের জন্য সম্রাটের আজ্ঞায় এই দুই জ্যোতিষীর শিরশ্ছেদ হয়। যদি মনে করা হয় যে এই ঘটনাতে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসকেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলে এই সূর্য্যগ্রহণের সময় হইবে খ্রীঃ পূর্ব্ব ২১৩৭ সাল।

পাঠক অবশ্য বুঝিতে পারিবেন, প্রাচীন জাতিদের ঐতিহাসিক কালসংকলনের জন্য এই সমস্ত সূর্য্যগ্রহণের বিবরণ অতি মূল্যবান্। যদি উল্লেখ থাকে পৃথিবীর অমুক স্থানে দিবসের অমুক ভাগে সূর্য্যগ্রহণ ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে জ্যোতিষিক গণনা করিয়া অনায়াসেই এই ঘটনার সময় নিরূপণ করা যায়। Oppolzer নামক এক জন অষ্ট্রিয়ান পণ্ডিত প্রাচীন কাল হইতে খৃঃ ২৫০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত কতকগুলি পূর্ণসূর্য্যগ্রাস হইবে,তাহা পৃথিবীর কোন অংশ হইতে কোন সময়ে দেখা যাইবে, ও কতক্ষণ স্থায়ী হইবে, সমস্ত গণনা করিয়া একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন (Kanon der Finsternisse)। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রে এইরূপ সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস সম্বন্ধে কোন বর্ণনা পাইলে এই পুস্তক ঘাঁটিয়া দেখিতে পারেন।

হোমারের ওডিসি পড়িয়া মনে হয় যে, যে সময় পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীদিগকে ওডিসিয়স্ বধ করিতেছিলেন, সেই সময় ইথাকাদ্বীপে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমানে শ্লীম্যান প্রমুখ পুরাতত্ত্ববিদ্গণ প্রাচীন ট্রয় আর্গস প্রভৃতি নগর খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন। ট্রয়যুদ্ধের গ্রীক নেতা Agamemnonর পিতা Atreusর নামাঙ্কিত লিপি পর্য্যন্ত পাইয়াছেন, এবং গ্রীকরা যে ট্রয় নগর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ইলিয়াড ও ওডিসি একেবারে কবি কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। উপরোক্ত সূর্য্যগ্রহণ অবলম্বন করিয়া ডাঃ ফ্রদারিংহাম প্রমাণ করিয়াছেন যে খৃঃ পূর্ব্ব ১১৯১ সালে ট্রয়নগর ধ্বংস হইয়াছিল। যদি আমাদের দেশে পণ্ডিতগণ প্রাচীন পুঁথি কেতাবে, এইরূপ সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে রাম, রাবণ, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র হয়ত রক্তমাংসেরই মানুষ হইয়া দাঁড়াইবেন।

প্রাচীনকালের বেবিলোন ও আসীরিয় জাতির মত অন্য কোন জাতি জ্যোতিষ সম্বন্ধে বেশী চর্চ্চা করে নাই। আসীরিয়ার রাজধানী নিনেভা নগরী খনন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আসীরিয়ার বিখ্যাত রাজা অসুরবাণী পালের সমস্ত লাইব্রেরী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন কাগজ পত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, কাদার ফলকের উপর লোহার পেরেক দিয়া লিখিয়া সেই সমস্ত ফলক পুড়াইয়া রাখা হইত। এই ফলক পাঠে জানা যায় যে আসীরীয়ার এক রাজার রাজত্বকালে ১৫ই জুন পূর্ব্বাহ্ণে নিনেভা নগরীর সন্নিকটে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস ঘটে। জ্যোতিষিক গণনা করিয়া দেখা যায় যে এই গ্রহণ খৃঃ পূর্ব্ব ৭৬৩ অব্দে ঘটে। সুতরাং আসীরিয়ার এই রাজার সময় পাওয়া গেল। এই গণনা সম্বন্ধে কোন ভুল নাই, কারণ পরবর্ত্তী কালে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক জ্যোতিষী টলেমিও এই গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজার সময় অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অপরাপর রাজাদের সময় নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে। এইরূপে বেবিলোনের ঐতিহাসিককাল খৃঃ পূর্ব্ব ৩৫০০ অব্দ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে।

অনেকেরই হয়ত ধারণা নাই যে, আমরা সময় মাপের

জন্য ঘড়ী ইত্যাদি যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করি, তাহা সূর্য্যের নিয়মিত আহ্নিক গতির অনুকরণ মাত্র। চন্দ্রের গতিতে মাস স্থির হয়। সূর্য্য যে সময়ে সমস্ত রবিমার্গ ঘুরিয়া আসে তাহাকেই আমরা বৎসর বলি। অবস্থার বিপর্য্যয়ে মানুষের স্মৃতি যখন ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন চন্দ্র সূর্য্যরূপ শাশ্বত ঘটিকা যন্ত্রের সাহায্যে পুনরায় ঘটনা পরম্পরার ধারাবাহিকতা ঠিক করিয়া লইতে হয়।

সূর্য্যগ্রহণের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের আরম্ভ ইংরেজী ১৮৫৯ সাল হইতে। এই বৎসর জার্ম্মেণীর হাই ডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক কির্শফ বর্ণচ্ছত্রের মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। যদিও বৈজ্ঞানিক জগতে এত বড় আবিষ্কার খুবই কম হইয়াছে, তথাপি অল্প কথায় ইহার মূল তথ্য সাধারণ লোককে বুঝান তেমন কষ্টকর নয়।

ইন্দ্রধনু সকলেই দেখিয়াছেন। অনেক সময় বৃষ্টির পর আকাশে সূর্য্যের বিপরীত দিকে নানা বর্ণে চিত্রিত ইন্দ্রধনু দেখা যায়। বহুকাল হইতেই জানা ছিল যে, যদি সাদা সূর্য্যালোককে ত্রিশির কাচের ফলকের ভিতর দিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে উহা ইন্দ্রধনুর মত বিভিন্ন রঙে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

১৬৮০ খৃঃ অব্দে নিউটন দেখান যে এই সপ্তরঙে বিভক্ত সূর্য্যরশ্মিকে বিপরীতভাবে কাচফলকের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইল আবার এই সাতরঙের আলো মিশিয়া সাদা আলো উৎপন্ন হয় সুতরাং এই পরীক্ষা হইতে প্রমাণ হয় যে, সাদা আলো বিবিধ বর্ণের আলোর সমবায়ে উৎপন্ন।

নিউটনের এই আবিষ্কারের প্রায় এক শত বৎসর পর পর্য্যন্ত আলোকবিদ্যায় তেমন আর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইয়ং, ফ্রেনেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরীক্ষা প্রয়োগ সহযোগে প্রমাণ করেন যে, আলো আকাশে উৎপন্ন একপ্রকার তরঙ্গ। যেমন কোনও জলাশয়ে ঢিল মারিলে ঐ ঢিলকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে বৃত্তাকার তরঙ্গ বিস্তৃত হইতে থাকে, তেমনি
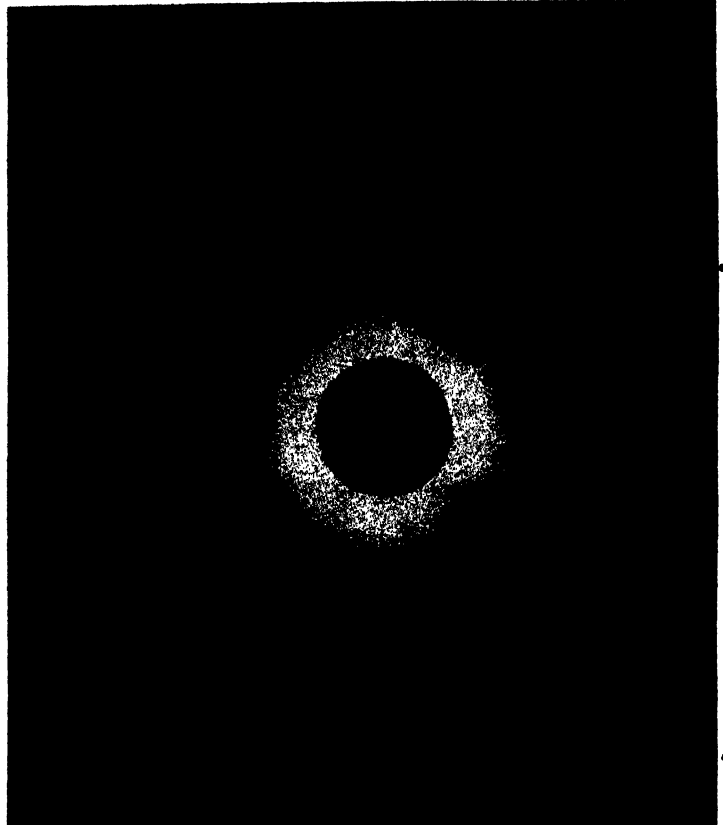
২৯শে জুন, ১৯২৭ তারিখের পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ কালে গৃহীত সূর্য্যকিরীটের (করোনার) আলোকচিত্র। অধ্যাপক স্তেগার্ড কর্ত্তৃক গৃহীত।

আকাশে কোথাও আলো জ্বালিলে সেই আলোর তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বেগে বিস্তৃত হইতে থাকে। এই তরঙ্গ আমাদের চক্ষুতে পড়িলে আলোকের জ্ঞান হয়। যন্ত্র সহযোগে এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এক তরঙ্গের চূড়া হইতে অপর তরঙ্গের চূড়া পর্য্যন্ত দূরত্ব মাপা যাইতে পারে। কিন্তু এই দৈর্ঘ্য অঙ্কে প্রকাশ করিতে সাধারণ মাপ কোন কাজে আসে না, এক সেন্টিমিটরকে দশকোটি অংশে ভাগ করিতে হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, লালতরঙ্গের দৈর্ঘ্য এইরূপ মাপকাঠির ৭০০০ এর সমান, সবুজ আলো প্রায় ৫৫০০, বেগুনী আলো প্রায় ৪০০০ মাপকাটির সমান।

লালের চেয়েও বড় তরঙ্গ আছে, এবং বেগুনীর চেয়েও ছোট তরঙ্গ আছে, কিন্তু চোখে তাহা ধরা যায় না, আলোকচিত্র বা বিশেষ যন্ত্র সাহায্যে ধরিতে হয়। সুতরাং সাদা আলো নানারূপ দৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গের সমষ্টি এবং ত্রিশিরা কাচের কলম বা অন্যবিধ যন্ত্রসহযোগে এই আলোককে বিশ্লিষ্ট করা যায়। একটী সাদা আলোর রেখাকে বিশ্লিষ্ট করিলে লাল, জরদ, হলদে, সবুজ, নীল ও বেগুনি রঙের পর পর সমাবেশে সৃষ্ট একটি ফিতার মত চিত্র পাওয়া যায়। ইংরেজীতে ইহাকে স্পেক্ট্রাম বলে, বাঙ্গলায় ইহাকে বর্ণচ্ছত্র বলা যাইতে পারে।

১৮১৪ খৃঃ অব্দে জার্ম্মেনির মিউনিক সহরে ফ্রাউন-হোফার নামক এক দরিদ্র চশমাওয়ালা খুব যত্নের সহিত নিউটনের বর্ণ-বিশ্লেষণ পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বর্ণচ্ছত্র কেবল নিরবচ্ছিন্ন বর্ণের সমাবেশে গঠিত নয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ফ্রাউনহোফার এইরূপ প্রায় হাজার খানেক সূক্ষ্ম কৃষ্ণরেখা আবিষ্কার করেন। তাহার পরে আজ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র সহযোগে প্রায় ২০,০০০ রেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদিও ফ্রাউনহোফার বা তাঁহার সমসাময়িক কোন বৈজ্ঞানিকই এই কৃষ্ণবর্ণ রেখাগুলির তত্ত্ব উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি ফ্রাউনহোফার তাঁহার আবিষ্কারের গুরুত্ব অনুভব করিয়া অতি যত্নের সহিত তাহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নিরূপণ করেন।

প্রাচীনকালের মিশর দেশের রাজারা সাঙ্কেতিক চিত্রলিপিতে তাঁহাদের নিজেদের এবং দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বত গাত্রে, দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষে, পিরামিডে সেই সমস্ত চিত্রলিপি অঙ্কিত রহিয়াছে। কালে যখন মিশরীয় সভ্যতা বিলুপ্ত হইল, তখন সেই চিত্রলিপির অর্থও লোকে ভুলিয়া গেল, তাহাতে ঐ লিপিকে দৈত্যদানবের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইয়ং ও সাম্পোলিঁয় নামক দুইজন পণ্ডিত এই চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রাচীন মিশরকে জগতের সামনে প্রকাশ করিয়াছেন।

ফ্রাউনহোফারের কালো রেখাগুলিও তেমনি এক প্রকার চিত্রলিপি, এই লিপিতে সূর্য্যদেবতা আপনার বাস্তব প্রকৃতি লিখিয়া রাখিয়াছেন। ১৮৫৯ অব্দে অধ্যাপক কির্শফ এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের নিকট সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থা সর্ব্বপ্রথম জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক, কিভাবে কির্শফ এই কৃষ্ণরেখা-গুলির পাঠোদ্ধার করেন।

সকলেই জানেন দ্রব্যমাত্রকেই উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে আলো নির্গত হয়। একখণ্ড লোহাকে উত্তপ্ত করিলে উহা লাল হয়, আরো বেশী উত্তাপে উহা হইতে প্রথমে, কমলালেবুর আভাযুক্ত আলোক বাহির হয়, পরে উত্তাপ আরও অধিক হইলে সাদা আলো বাহির হয়। যদি এই সাদা আলোককে ত্রিশির কাচকলমের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণময় একটি বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়। কিন্তু যদি কোন প্রজ্জ্বলিত গ্যাসের শিখা এই উপায়ে পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে একটি অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায় না, কয়েকটি উজ্জ্বল সূক্ষ্ম বর্ণরেখা (Spectrum Line) মাত্র পাওয়া যায়,—যেমন সাধারণ গ্যাসের আলোতে নুন্ ছিটাইয়া দিলে আলো হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, এবং বর্ণবিশ্লেষণ যন্ত্রে দুটি হলদে রেখামাত্র পাওয়া যায়। কির্শফের পূর্ব্বে দুই একজন পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, যদি সূর্য্যোলোক ও সোডিয়মের আলো (লবণমিশ্রিত দীপশিখা) পাশাপাশি রাখিয়া বর্ণবিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সোডিয়মের দুইটি পীতরেখার অবস্থান ফ্রাউনহোফরের দুইটি কৃষ্ণরেখার (D-Lines) অবস্থানের সহিত মিলিয়া যায়। অর্থাৎ উভয়েরই তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক।

কেন এইরূপ হয় কির্শফের পূর্ব্বে কোন পণ্ডিতই তাহার সদুত্তর দিতে পারেন নাই। কির্শফই প্রথমে এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরা একসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিজ্ঞান-জগতে এক মহা আবিষ্কার দান করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যথেষ্ট উত্তপ্ত করিলে সমস্ত জিনিষ হইতেই আলোক বিকীর্ণ হয়। এই আলোক বিকিরণের শক্তি সমস্ত জিনিষের সমান নয়। যে জিনিষ যত কৃষ্ণবর্ণ, তাহার আলোক বিকিরণের শক্তি তত
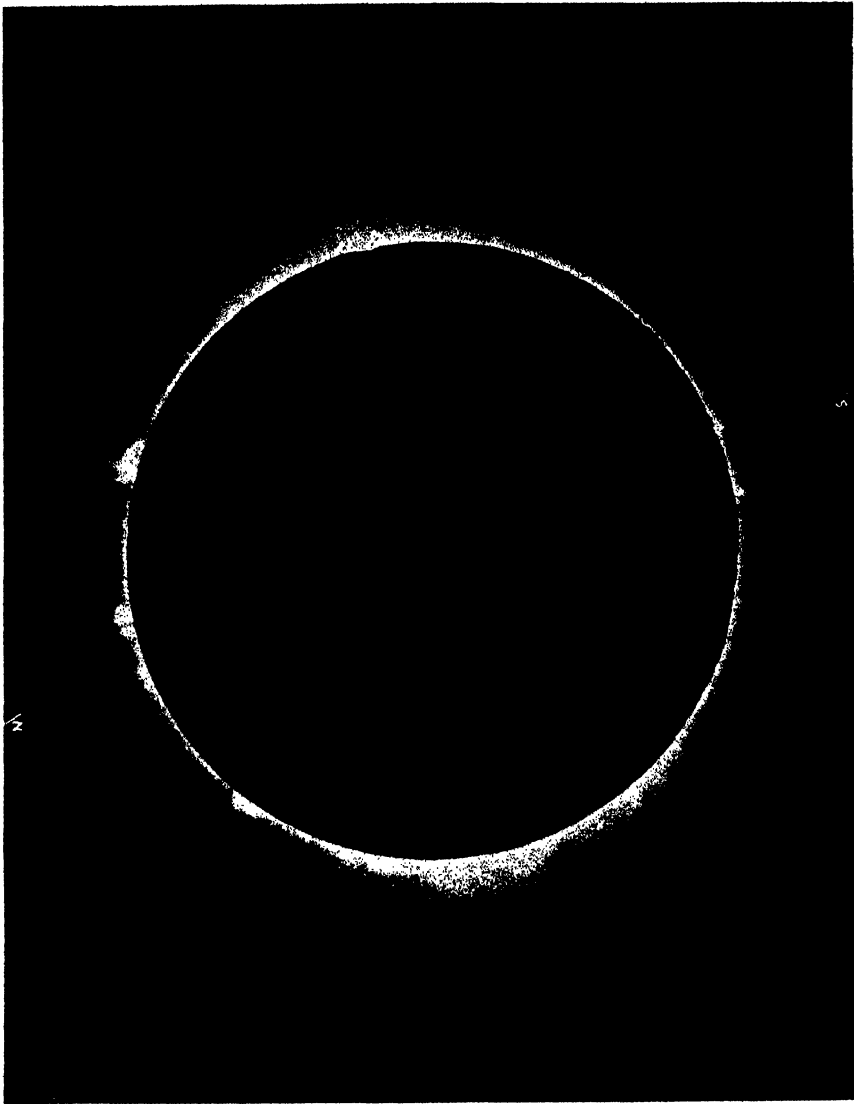
পিগ্‌ল্‌স্‌উইকে গৃহীত সূর্য্যকিরীটের আলোকচিত্র. চিত্রগ্রহণের কাল ১৯ সেকেণ্ড। n ও s অক্ষর সূর্য্যের অক্ষরেখা নির্দ্দেশ করিতেছে।

বেশী। এই ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বুঝানো যাইতেছে।

মনে করা যাক্ যে, আমাদের সাম্‌নে এই কয়টি বিভিন্ন বর্ণের চীনামাটির বাসন আছে—সাদা, লাল, সবুজ এবং কালো। এইগুলিরও কাহারও নিজস্ব আলো দিবার ক্ষমতা নাই, কারণ অন্ধকারময় ঘরে রাখিলে ইহাদের কোনটিই নয়নগোচর হয় না। আমরা শুধু প্রতিফলিত আলোকেই ইহাদিগকে দেখিতে পাই। সাদা জিনিষটির উপর সূর্য্যালোক পড়িতেছে এবং সমস্ত বর্ণই প্রতিফলিত হইতেছে সুতরাং জিনিষটির রঙ আমরা সাদা দেখিতেছি। কালো জিনিষে আলোক পড়িয়া আর ফিরিয়া আসে না, সমস্তই ঐ বস্তু কর্ত্তৃক অন্তর্গৃহীত (absorbed) হইয়া যায়। এই রঙের অভাবকেই আমরা কৃষ্ণবর্ণ বলি। লাল জিনিষটির উপরও সাদা সূর্য্যালোক পড়িতেছে—তবে আমরা উহাকে লাল দেখি কেন? উত্তর এই যে, সাদা সূর্য্যালোক বিভিন্ন

বর্ণের সমষ্টি। লাল জিনিষটি সবুজাদি রঙ অন্তর্গ্রহণ করিয়া লইয়া শুধু লালরঙটি প্রতিফলিত করে। তেমনি সবুজ জিনিষটি শুধু সবুজরঙই প্রতিফলিত করে, বাকী রঙ অন্তর্গ্রহণ করিয়া উত্তাপে পরিণত করে।

এখন দেখা যাউক এই সমস্ত বিভিন্নরঙের জিনিষকে উত্তপ্ত করিলে কি হয়? যথেষ্ট উত্তাপ দিলে সমস্ত জিনিষ হইতেই আলোক নির্গত হয়, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে একই তাপমানে সাদা অপেক্ষা কালো জিনিষ হইতে বেশী আলো বিকীর্ণ হয়। যদি এমন একটি চীনামাটির বাসন নেওয়া যায় যে, উহার অর্দ্ধাংশ সাদা, অর্দ্ধাংশ কালো, এবং যদি উহাকে কয়লার আগুনে যথাসাধ্য উত্তপ্ত (প্রায় ১০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) করিয়া অন্ধকার ঘরে নেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণবর্ণ অংশ হইতে খুব উজ্জ্বল আলো নিঃসৃত হইতেছে, সাদা অংশ একেবারে নিষ্প্রভ। তেমনি লাল জিনিষকে গরম করিলে তাহা হইতে লোহিত ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত আলো বহির্গত হয়—অর্থাৎ উহা সবুজ আলো দেয়, এবং সবুজ জিনিষকে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে লাল আলো বেশী বাহির হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা প্রমাণ ও হেতুবাদ দিয়া কির্শফ প্রমাণ করেন যে, যে-জিনিষের যে-যে প্রকারের আলোক অন্তর্গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অধিক, সেই জিনিষটিকে উত্তপ্ত করিলে, তাহার সেই সেই আলো বিকিরণ করার ক্ষমতাও অধিক হয়। কির্শফের কিছুপূর্ব্বে ইংরেজ পণ্ডিত ব্যালফুর ষ্টুয়ার্টও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

এখন দেখা যাক, কির্শফ কিরূপ ভাবে এই তত্ত্ব সূর্য্যের কৃষ্ণরেখার পাঠোদ্ধারে নিয়োজিত করেন। আমরা প্রথমে দেখিয়াছি যে বায়বীয় পদার্থ মাত্রই উত্তপ্ত হইলে বা অন্য কোনরূপে উত্তেজিত হইলে বিশিষ্ট আলো প্রদান করে। যেমন সোডিয়ম্ হইতে পীত আলো বহির্গত হয়, তাম্র হইতে উজ্জ্বল নীল আলো এবং ক্যালসিয়ম্ হইতে লাল আলো বহির্গত হয়। এই ব্যাপারটা আমাদের দেশের প্রাচীন রাসায়নিকগণেরও জানা ছিল এবং এই যে সমস্ত বিভিন্ন রঙের আতসবাজী, তাহা শুধু বারুদের সঙ্গে বিভিন্ন ধাতবচুর্ণের মিশ্রণেই প্রস্তুত। ইউরোপে এখনও আতসবাজী বাঙ্গালার আলো (Bengal Fire) নামে বিখ্যাত। কির্শফ প্রথমে মতবাদ প্রচার করেন যে, বিভিন্ন প্রকার ধাতুর পরমাণু উত্তাপ, বিদ্যুৎ বা অন্য প্রকারে উত্তেজিত হইলে উহা বিশিষ্ট বর্ণের আলো প্রদান করে। যেমন তানপুরা, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ভাবে বাঁধা হইয়া নির্দ্দিষ্ট সুর উৎপন্ন করে এবং যেমন সুর দ্বারাই বাদ্যযন্ত্র চিনিয়া লওয়া যায়, অথবা স্বরবৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রত্যেক লোককেই চিনিয়া লওয়া যায় তেমনি বর্ণচ্ছত্র দ্বারা প্রত্যেক ধাতুকেই চিনিয়া লওয়া যায়। প্রত্যেক পরমাণু যেমন এক একটি বাদ্যযন্ত্র এবং বিভিন্ন বর্ণরেখা তাহার এক একটি সুর। সুতরাং এই উপায়ে অনায়াসে বিভিন্ন ধাতুকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। মনে করা যাক্ যে, আমাকে একখণ্ড খনিজ প্রস্তর দেওয়া গেল। ইহাতে কি কি ধাতু আছে তাহা স্থির করিতে হইবে। আমি খনিজ দ্রব্যকে চূর্ণ করিয়া দীপ-শিখায় রাখিলাম। এবং বর্ণচ্ছত্র-বিশ্লেষণ-যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলাম। যদি বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের পীতবর্ণের দুইটি রেখা পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রমাণ হইল যে এই প্রস্তরে সোডিয়ম আছে। যদি বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের নীল রেখা পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রমাণ হইল যে, প্রস্তরে তাম্র আছে। এইরূপ প্রক্রিয়াতে বস্তুবিশ্লেষণকে ইংরেজীতে Spectrum Analysis বলে এবং এই উপায়ে কর্শফ ও তাঁহার পরবর্ত্তীগণ প্রায় ৪০টি বিভিন্ন প্রকারের মূলপদার্থ আবিষ্কার করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্রে আমরা উজ্জ্বল রেখা না পাইয়া কৃষ্ণরেখা পাই কেন। মনে করা যাক্ যে, আমাদের সাম্‌নে একটি জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড আছে এবং উহার চারিদিকে সোডিয়ম্ গ্যাসের একটী আবেষ্টনী আছে। জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড হইতে যে-আলো বাহির হইবে তাহার বর্ণচ্ছত্র হইবে অবিচ্ছিন্ন, তাহাতে লাল হইতে বেগুনী পর্য্যন্ত সমস্ত বর্ণই পর-পর অবিচ্ছিন্নভাবে বিন্যস্ত থাকিবে। উহার চতুর্দ্দিকে যে সোডিয়ম্ গ্যাসের আবেষ্টনী আছে, তাহা হইতে পীতাভ আলো বাহির হইবে। উহার বর্ণচ্ছত্র হইবে মাত্র দুইটি উজ্জ্বল পীত-রেখা। এখন

বিবেচনা করা যাক্ যে, যদি দীপ্ত লৌহের আলোক সোডিয়ম গ্যাসের আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া আসে, এবং উহার বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইতে আমরা কি দেখিতে পাইব? পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, যদি কোন বস্তুর কোনও বিশিষ্ট বর্ণকে অন্তর্গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে উত্তপ্ত করিলে, ঐ বস্তু ঐ বিশিষ্ট বর্ণযুক্ত আলোক বিকিরণ করিবে। অপরপক্ষে এই নিয়ম বিপরীত দিক হইতেও খাটে, অর্থাৎ কোনও বস্তুর যদি কোন বিশিষ্ট আলো বিকীর্ণ করার শক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই আলোক অন্তর্গ্রহণ করার শক্তিও একই অনুপাতে বর্ত্তমান থাকিবে। সুতরাং সোডিয়ম্ গ্যাস যেমন বিশিষ্ট পীত আলো বিকীর্ণ করিতে পারে, তেমনি এই পীত আলোক সেই পরিমাণে অন্তগ্রহণ করিতে পারে—অন্য আলোক অন্তর্গ্রহণ করিবার তেমন ক্ষমতা নাই। সুতরাং যদি জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড হইতে সর্ব্বপ্রকারের আলো সোডিয়ম্ গ্যাসের বহিরাবরণের ভিতর দিয়া আসে, তাহা হইলে ঐ দুইটি পীতরেখা অন্তর্গৃহীত হইয়া যাইবে, এবং বর্ণচ্ছত্রের এই দুইটি পীতরেখার উজ্জ্বলতা ঢের কমিয়া যাইবে। বর্ণচ্ছত্রের অন্যাংশের তুলনায় উহা কৃষ্ণবর্ণ মনে হইবে। সুতরাং ফ্রাউন্‌হোফারের আবিষ্কৃত কৃষ্ণরেখার এই ব্যাখ্যা দাঁড়াইল :—

সূর্য্য-দেহ একটি কঠিন ঘনীভূত জ্বলন্ত পিণ্ড। উহা হইতে অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রবর্ত্তী পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ন্যায় অপেক্ষাকৃত শীতল বাষ্পের একটি আবরণ আছে। হাইড্রোজেন, হীলিয়ম, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি যাবতীয় মূলপদার্থ এই বহিরাবরণে বাষ্পাকারে বর্ত্তমান, এই আবরণটির ভিতর দিয়া যখন পিণ্ডনিঃসৃত আলোক আসে, তখন প্রত্যেক মূলপদার্থ, তাহার বিশিষ্ট বর্ণ অন্তর্গৃহীত করিয়া লয়, এবং সেই সেই স্থানে কৃষ্ণরেখা উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সমস্ত কৃষ্ণরেখা পরীক্ষা করিলে, সূর্য্যের আবরণে কি কি মূলপদার্থ আছে, তাহা নির্ণয় করা যায়। এইরূপে প্রমাণ হইয়াছে যে—

ফ্রাউন হোফারের C. F. চিহ্নিত কৃষ্ণরেখা হাইড্রোজেন্ জনিত, H. K চিহ্নিত কৃষ্ণরেখা ক্যালসিয়ম্ জনিত ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের বহিরাবরণে প্রায় ৪৫টি মূলপদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সূর্য্যের এই বায়ুমণ্ডলের বহির্ভাগকে Chromosphere বা বর্ণসমুদ্র বলা হয়। এই অদ্ভুত নামাকরণের কারণ এই যে, খালি চ'খে ইহাকে উজ্জ্বল জ্বলন্ত রক্তশিখাময় বলিয়া মনে লয়। এই লাল আভা জ্বলন্ত হাইড্রোজেন গ্যাসজনিত। অন্যান্য সমস্ত বর্ণ হাইড্রোজেনের লাল আভার প্রখরতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কেন্দ্রস্থ জ্বলন্ত ঘনপিণ্ডকে Photosphere বা আলোকমণ্ডল বলা হয়। পূর্ণগ্রহণের সময় যখন Photosphere বা আলোকমণ্ডল চন্দ্রদেহে ঢাকা পড়ে, তখন দেখা যায় বর্ণসমুদ্র হইতে অত্যুজ্জ্বল শুভ্র রশ্মিরাজি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইহাকেই বলে Corona বা সূর্য্যকিরীট। করোনা শুধু পূর্ণ গ্রহণের পাঁচ সাত মিনিট সময়ের মধ্যে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু যন্ত্রবিশেষ দ্বারা বর্ণসমুদ্র সর্ব্বসময়েই পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। বর্ণসমুদ্র হইতে সর্ব্বদাই জ্বলন্ত লোহিতবর্ণের শিখা অতিবেগে চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, উহা হাইড্রোজেন-বাষ্পময়—উহার ইংরেজী নাম Prominences।

কির্শফের এই আবিষ্কারের পর হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রে এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়। এতদিন পর্য্যন্ত জ্যোতিষশাস্ত্র শুধু গ্রহ, নক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ, ভ্রমণকক্ষ-নিরূপণ প্রভৃতি ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু কির্শফের আবিষ্কারে গ্রহ, নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থাদি জানাও সম্ভবপর হইল। জ্যোতিষশাস্ত্রের এই নূতন অধ্যায়ের নাম জ্যোতিষিক পদার্থবিদ্যা। গত ৭০ বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষিক পদার্থবিদ্যাতে বহু গবেষণা হইয়াছে, এবং পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ মানমন্দিরই এই বিষয়ক গবেষণার জন্য নূতন নূতন যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আমরা সূর্য্য সম্বন্ধীয় গবেষণার কথাই বলিব।

বর্ণচ্ছত্র-বিশ্লেষণ-বিদ্যার (Spectrum Analysis) আবিষ্কারের পর প্রথম পূর্ণসূর্য্যগ্রহণ হয় ভারতবর্ষে, ১৮৬৮ অব্দে। ফরাসীদেশ হইতে জ্যাঁসে (Jansen)

নামক জ্যোতিষী পূর্ণগ্রাস পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া অন্ধ্রদেশের গণ্টুর সহরে আড্ডা গাড়েন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণগ্রাসের সময় Prominences বা সূর্য্যদেহোদ্ভূত রক্তবর্ণ শিখার বর্ণচ্ছত্র গ্রহণ করা, এবং উহার উপাদান নির্ণয় করা। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল এবং তিনি প্রমাণ করিলেন যে, উক্ত রক্তবর্ণ শিখাগুলি জলন্ত হাইড্রোজেন বাষ্পময়। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় তাঁহার মনে হইল যে, এই পর্য্যবেক্ষণের জন্য সূর্য্যগ্রহণের প্রয়োজন নাই, দিবাভাগে পূর্ণ সূর্য্যালোকেও উহা পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে। এইজন্য তিনি যে প্রণালীটি মনে মনে চিন্তা করিয়া রাখিলেন, এবং পরে কার্য্যে পরিণত করিলেন তাহা এই—সূর্য্য হইতে যে-আলোক বিকীর্ণ হয় তাহার তেজ এত প্রখর যে, খালি চ'খে উক্ত রক্তশিখাগুলি মোটে দেখাই যায় না। কিন্তু যদি কোনও উপায়ে সূর্য্যালোকের প্রখরতা হ্রাস করান যায় অথচ রক্তশিখাগুলির প্রখরতা হ্রাস না হয়, তাহা হইলে দিবাভাগেও ঐ রক্তশিখাগুলি দৃশ্যমান হইবে। যদি সূর্য্যালোককে পর পর অনেকগুলি ত্রিশির কাঁচের কলমের ভিতর দিয়া লওয়ান যায়, তাহা হইলে বর্ণচ্ছত্রের দৈর্ঘ্য ঢের বাড়িয়া যায়, কিন্তু উহার প্রখরতা তদনুযায়ী কমিয়া যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতে রক্তশিখার বর্ণচ্ছত্রের প্রখরতা মোটেই কমে না, কারণ উহা কতকগুলি বর্ণ-রেখার সমষ্টিমাত্র। আজকাল সৌরবৃত্তের যেখানে রক্ত-শিখা আছে তাহার স্পর্শরেখার সমান্তরালভাবে মোটা Slit রাখিয়া এই উপায়ে রক্তশিখার বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করা হয় (ভারতবর্ষের কোডাইকোনালের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষী মিঃ এভার্সেড এই উপায়কে সংস্কৃত করিয়া রক্তশিখা-পর্য্যবেক্ষণের নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন)। জ্যাঁসে যখন ভারতবর্ষে থাকিয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, তখন ইংলণ্ডে Admiralty Officeএ নর্ম্যান লকিয়ার নামে একজন কেরাণী সখহিসাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে-ছিলেন। লকিয়ার নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না, তিনি শুধু সখ করিয়া আপনা হইতেই জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,এবং নিজের অর্থে ক্রীত দূর-বীক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি-সাহায্যে গ্রহনক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করি-তেন। তিনিও একই সময়ে এই প্রণালী আবিষ্কার করেন এবং রক্তশিখার বর্ণচ্ছত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার আবিষ্কারের কাহিনী বিলাতে রয়েল সোসাইটিতে এবং ফ্রান্সে ফ্রেঞ্চ একাডেমীতে প্রেরণ করেন। ঘটনাচক্রে জ্যাঁসে ও লকিয়ারের বিবরণ একই দিনে ফ্রেঞ্চ একাডেমীতে আসিয়া পৌছে। এই ঘটনাটির স্মরণার্থ তদানীন্তন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট একটি স্বর্ণপদক প্রস্তুত করেন—উহার একদিকে খোদিত ছিল দুই আবিষ্কর্ত্তার মূর্ত্তি, অপরদিকে ছিল সপ্তাশ্ববাহিত রথে বন্দীকৃত সূর্য্য-দেবতা।

ইহার কিছুকাল পরে লকিয়ার আর একটি অমূল্য আবিষ্কার করেন। তিনি রক্তশিখার বর্ণচ্ছত্র সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পান যে উহাতে সোডিয়মের পীত রেখাদুটির খুব সন্নিকটে আর একটি উজ্জ্বল পীতরেখা আছে। তখন যে সমস্ত মূলপদার্থ জানা ছিল, তাহাদের কোনটিরই বর্ণচ্ছত্রের সহিত এই রেখার মিল হয় না। সুতরাং লকিয়ার মনে করিলেন যে, উহা নিশ্চয়ই এমন কোন নূতন মূলপদার্থজনিত, যাহা তখন পর্য্যন্ত ও পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। সূর্য্যের গ্রীকনাম Helios, তদনুযায়ী তিনি এই নূতন ধাতুর নাম রাখিলেন হীলিয়ম্। এই আবিষ্কারের ত্রিশবৎসর পরে লণ্ডনের অধ্যা-পক Sir William Ramsay নরওয়ে হইতে আনীত একটি খনিজদ্রব্য বিশ্লেষণ করিয়া হীলিয়ম গ্যাস্ পৃথিবীতে আবিষ্কার করেন। হীলিয়ম হাইড্রোজেন হইতে দুইগুণ মাত্র ভারী এবং বায়ু হইতে ৭গুণ হাল্কা। হাইড্রোজেন সামান্য কারণেই জলিয়া উঠে, কিন্তু হীলিয়ম সম্পূর্ণরূপে অদাহ্য। এই সমস্ত কারণে আজকাল বড় বড় উড়োজাহাজ তৈয়ার করিতে হীলিয়ম প্রভূতপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে ত্রিবাঙ্কুরের উপকূলে একপ্রকার পীতাভ বালু পাওয়া যায় উহার ইংরেজী নাম Monazite Sand, ইহাকে উত্তপ্ত করিলেও হীলিয়ম পাওয়া যায়।

কির্শফ সূর্য্যের গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করেন তাহা হইতে এই প্রশ্ন উঠে:—সূর্য্যদেহের অভ্যন্তর একটি ঘনীভূত পিণ্ড—(Photosphere) আর উহার চারি দিকে একটি পাতলা বাষ্পের আবরণ (Chromosphere) আছে। এই আলোকমণ্ডল (Photosphere) ও বর্ণ-

মণ্ডলের (Chromosphere) বর্ণচ্ছত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যায় কি না? উত্তরে বলা যায় যে, যদি আলোকমণ্ডলটি কোনওরূপে আবৃত করা যায়, তাহা হইলে আমরা শুধু বর্ণমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। কিন্তু এ ব্যাপার সহজসাধ্য নয়। আমরা একটি গোল চাকৃতী নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে এমনভাবে দূরবীক্ষণের সামনে স্থাপন করিতে পারি যে, আলোকমণ্ডল সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ সূর্য্য আকাশের যে অংশ অধিকার করিয়া আছে, শুধু যে সেই অংশ হইতেই সূর্য্যালোক পাওয়া যায় এমত নহে। আকাশের যে কোন অংশ হইতেই সূর্য্যালোক পাওয়া যায়। তাহার কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া আসার সময় ধূলিকণা ও অণু-পরমাণু দ্বারা সূর্য্যালোক বিক্ষিপ্ত (scattered) হইয়া পড়ে। এই বিক্ষিপ্ত আলোককে আমরা আকাশ-আলোক (Sky Light) বলিয়া থাকি। এই আলোক-বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া না থাকিলে, আকাশ কখনও দ্যুতিমান্ হইতে পারিত না, দিনের বেলায়ও সমস্ত তারা দেখা যাইত। সুতরাং আমাদিগকে বর্ণমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের জন্য অন্য কোন সুযোগ অন্বেষণ করিতে হয়। সূর্য্য গ্রহণের পূর্ণগ্রাসের সময় এই সুযোগ উপস্থিত হয়; তখন চন্দ্র, সূর্য্য-ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া সূর্য্য-দেহকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া ফেলে। উপরোক্ত প্রক্রিয়ার সহিত, এই ব্যাপারের বাস্তবিক কোন তফাত নাই, শুধু চন্দ্র একটি বড় চাকৃতী মাত্র, এবং আকাশের বহু উপর হইতে সূর্য্য-দেহ আবৃত করে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্ত আলোকের পরিমাণও প্রায় সম্পূর্ণভাবেই লুপ্ত হয়। সুতরাং যতক্ষণ পূর্ণগ্রাস স্থায়ী হয়, ততক্ষণই বর্ণমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করার সুবিধা ঘটে। যদি আমরা সূর্য্যের বর্ণমণ্ডলের দিকে বর্ণচ্ছত্র-দর্শক যন্ত্র ঘুরাইয়া রাখি, তাহা হইলে ঠিক পূর্ণগ্রাস আরম্ভ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা শুধু বর্ণমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্র দেখিতে পাইব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—এই বর্ণচ্ছত্র কি প্রকারের হইবে? কির্শফের মতবাদ অনুসারে বর্ণমণ্ডল বাষ্পময়, সুতরাং উহার বর্ণচ্ছত্রও অবিচ্ছিন্ন না হইয়া বর্ণ-রেখাময় হইবে অর্থাৎ ফ্রাউনহোফরের কৃষ্ণ-রেখাগুলি উজ্জ্বল রেখা হইয়া দৃশ্যমান হইবে।

আসলে কিন্তু এই প্রণালীটি কাজে খাটানো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ পূর্ণগ্রাসের স্থিতিকাল অতি অল্প—উর্দ্ধকল্পে সাত মিনিট হইতে কয়েক সেকেণ্ড পর্য্যন্ত নামিতে পারে। নরওয়েতে দৃষ্ট ১৯২৭ খৃঃ অব্দের গ্রহণ মাত্র ৪২ সেকেণ্ড কাল স্থায়ী ছিল। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণসূর্য্যগ্রহণ পৃথিবীর অতি সামান্য স্থান হইতেই দেখা যায়। এই সমস্ত স্থান এমন হইতে পারে, যে মানবের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, যেমন মেরু প্রদেশ, আফ্রিকার মরুভূমি, বা মহাসাগরের মধ্যস্থ নির্জ্জন দ্বীপ।

কিন্তু এই সকল বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াও জ্যোতির্বিদগণ ১৮৬৮ অব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল স্থানে তাঁহাদের গ্রহণ-অভিযান চালাইয়া আসিতেছেন। বিস্তারিত বিবরণ S A. Mitchel প্রণীত Eclipses of the Sun গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১৮৭১ অব্দে আমেরিকার Princeton বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষ-অধ্যাপক Young প্রথমে লক্ষ্য করেন যে, যখন চন্দ্র ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সূর্য্য-দেহকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ফ্রাউনহোফরের কালোরেখাগুলি হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া দৃশ্যমান হয়, সূর্য্যের সপ্ত বর্ণ বিচিত্রিত বর্ণচ্ছত্রটি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে দৃশ্যমান হইয়া আবার মুহূর্ত্তের মধ্যেই মিলাইয়া যায় বলিয়া তিনি বর্ণ মণ্ডলের বর্ণচ্ছত্রকে Flash Spectrum আখ্যা দেন। কিন্তু এই ঘটনার আকস্মিকতা বশতঃ ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কেহ ইহার প্রথম আলোক চিত্র গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ মেরুপর্য্যটক Shackleton উত্তর মেরুর সন্নিহিত নভজেম্বলা দ্বীপে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় সর্ব্বপ্রথম বর্ণমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্রের আলোক চিত্র তুলিতে সমর্থ হন। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে যখন ভারতবর্ষে পূর্ণসূর্য্যগ্রহণ হয়, তখন ইংল্যাণ্ড হইতে অনেকগুলি গ্রহণ-অভিযান ভারতবর্ষে আসে। তন্মধ্যে স্যার নর্ম্যান্ লকিয়ার বিজয়দ্রুগে, এভারসেড্ তালনীতে, এবং পার্শী অধ্যাপক লিগাম-ভেলা পুণাতে বিভিন্ন অবস্থায় অনেকগুলি চমৎকার বর্ণচ্ছত্র তুলিতে সক্ষম হন।

বর্ত্তমানে সূর্য্যগ্রহণের সময় পর্য্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে Einstein তাঁহার বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity) প্রকাশ করেন এবং গণনা করিয়া বলেন যে, আলোকরশ্মি যখন সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া আসে, তখন উহা ১'৭৫˝ সেকেণ্ড বাঁকিয়া যাইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য পূর্ণসূর্য্যগ্রহণের সময়ই নিরূপণ করা যাইতে পারে। কারণ তখন সূর্য্যের আলো এত কমিয়া যায়, যে, দিবাভাগেই সূর্য্যের আশেপাশের উজ্জ্বল তারা দৃশ্যমান হয়। সেই সময় যদি এই সূর্য্যপার্শ্ববর্ত্তী তারকামণ্ডলের আলোকচিত্র লওয়া যায়, এবং যদি উহা অন্য সময়ে গৃহীত ঐ তারকামণ্ডলেরই আলোকচিত্রের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে আইনষ্টাইনের মতে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী তারকাগুলি প্রথমোক্ত আলোকচিত্রে সূর্য্যের দিকে সরিয়া আসিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের অবসানে যে পূর্ণ গ্রহণ হয়, তাহা দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার মধ্যভাগ দিয়া চলিয়া যায়। এই উপলক্ষে অধ্যাপক এডিংটনের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের রয়েল অ্যাষ্ট্রোনোমিকাল সোসাইটি পশ্চিম আফ্রিকার সোব্রাল দ্বীপে এক গ্রহণাভিযান প্রেরণ করেন। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে আইনষ্টাইনের উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে।

১৯২০ অব্দে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক 'তাপপ্রভাবে পরমাণুর বিদ্যুৎকণায় বিভাজন' সম্বন্ধীয় থিওরী প্রকাশিত হয় (Thermal Ionisation of Elements)। এই থিওরীতে সূর্য্যের ও সূর্য্যের বর্ণমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণের কার্য্যতালিকাতে আরও নূতন নূতন আয়োজন ও বিধিব্যবস্থা যোগ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে সূর্য্যগ্রহণের সময় জ্যোতিষিগণের কার্য্যতালিকা কিরূপ হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে ১৯২৭ অব্দে ২১শে মে'র টাইমস্ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হেলি মেমোরিয়ল বক্তৃতা

এড্‌মাণ্ড হেলি নিউটনের সমসাময়িক ও সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনি পরে রাজজ্যোতিষীও হইয়াছিলেন। হেলিই প্রথমতঃ তাঁহার নামে পরিচিত বিখ্যাত ধূমকেতু আবিষ্কার করেন, এবং নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলম্বনে গণনা করিয়া স্থির করেন যে, এই ধূমকেতু ৭৫ বৎসর পর-পর দৃশ্যমান হইবে। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯০৯—১০ খৃঃ অব্দে এই ধূমকেতু প্রায় ২ মাস যাবৎ আকাশে দৃশ্যমান ছিল। হেলির স্মরণার্থ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফাণ্ড্ আছে এবং প্রতিবৎসর জ্যোতিষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বড় বড় জ্যোতিষিগণকে আহ্বান করা যায়। গত বৎসর বক্তৃতা দেন গ্রীনউইচ মান-মন্দিরের জ্যোতিষী F. J. M. Stratton। বিষয় ছিল—"বর্ত্তমান কালে পূর্ণগ্রহণের সময় কি কি বিষয়ের সমস্যার সমাধান হইতে পারে"।

"বিগত সহস্রবৎসরের মধ্যে একবার মাত্র ১৭১৫ খৃঃ অব্দে অক্‌স্‌ফোর্ড পূর্ণসূর্য্যগ্রহণ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল। এই উপলক্ষে বিখ্যাত জ্যোতিষী হেলি অক্‌স্‌ফোর্ডের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করেন। হেলী তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ণগ্রাসের সময় সূর্য্য লুপ্ত হইলে তাঁহার মনে ভীতির উদ্রেক হইয়াছিল, এবং সর্ব্বজাতীয় পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর মধ্যেও ভীতিজনিত চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল। এই গ্রহণের কাল ঠিকমত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষীরা চন্দ্র ও সূর্য্যের গতিসম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে-সমস্ত গণনাতালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেক ভুলপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। তিনি এই সমস্ত ভুল সংশোধন করেন।

১৮৬০ খৃঃ অব্দ হইতে বর্ণচ্ছত্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কারের ফলে গ্রহণকালীন পর্য্যবেক্ষণের কার্য্যতালিকা ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া যে কিরীটমণ্ডল (Corona) আছে, শুধু পূর্ণগ্রহণের সময়ই তাহা দৃশ্যমান হয়। এই কিরীটমণ্ডলের সমস্যাগুলির সমাধান গ্রহণকালীন পর্য্যবেক্ষণের এক মুখ্য উদ্দেশ্য। কিরীটমণ্ডলের বর্ণচ্ছত্রে অনেক নূতন বর্ণরেখা পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে জ্ঞাত কোনও মূলপদার্থের বর্ণরেখার সহিত তাহাদের মিল এখন পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে ডাঃ নিকলসন এই মতবাদ প্রচার করেন

যে—এই রেখাগুলি পার্থিব মূলপদার্থ হইতে আরও আদিম রকমের মূলপদার্থসঞ্জাত। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য আমরা আশা করি যে, পর্য্যবেক্ষণের ফল আরও অগ্রসর হইলে এইসকল রহস্যের সমাধান হইবে। এই সমস্ত বর্ণরেখার উৎপত্তি স্থির হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কিরীটমণ্ডল শুধু সূর্য্যদেহনিক্ষিপ্ত পরমাণু দ্বারা গঠিত অথবা উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ইলেক্ট্রনেরও সংমিশ্রণ আছে। * * ... ...

কিরীটমণ্ডলের আকার এক এক গ্রহণে এক এক প্রকার হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তশিখা (Red Prominences) গুলির সংস্থানের সহিত উহার একটি সুনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ লক্ষিত হইয়াছে। ১৯২০ খৃঃ অব্দে (ভারতীয়) অধ্যাপক সাহা প্রমাণ করেন যে, উত্তাপপ্রভাবে পরমাণুগুলি ইলেক্ট্রণ ও যোগাণুতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়—এই আবিষ্কারের ফলে রক্তশিখাগুলির গঠন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তৎপরে মাঞ্চেষ্টারের অধ্যাপক ই. এ. মিল্‌নে কর্ত্তৃক এই গবেষণা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

* * *

গহনা

শ্রীঅমৃতলাল শীল

গত বৎসরে প্রকাশিত গহনা প্রবন্ধ পাঠে লিখিত

যুক্ত প্রদেশের গহনা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে জানাইতেছি। নথ কে হিন্দীতে নথ্‌নী বলে। নাকের প্রাচীর-গুলিকে হিন্দীতে নথ্‌না বলে, নথ্‌নার অলঙ্কার নথ্‌নী। নথের ব্যবহার এখন দিন দিন কমিতেছে, বড় বড় নগরে আর বড় চলিত নাই, তবে পল্লীগ্রামে এখনও চলিত আছে। কেবল নাকের কেন, সমস্ত অলঙ্কার সকল জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায়ে এক প্রকার নহে, প্রত্যেক জাতির অলঙ্কার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছিল, এখনও আছে। কেবল অলঙ্কার ও কাপড় পরিবার ভঙ্গী দেখিয়া অলঙ্কৃত রমণীর জাতি বলা অসম্ভব নহে। সকলের অপেক্ষা বড় নথ কায়স্থদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাঁহাদের দুই প্রকার নথ থাকে আটপৌরে নথ প্রায় দুই ইঞ্চ ব্যাসের, তাহার একদিকে একটি সরু শিকল কানে আটকান থাকে, কিন্তু পোষাকি অথবা নিমন্ত্রণে যাইবার নথ প্রায় ৯।১০ ইঞ্চ ব্যাসের হয়, তাহার দুদিকে দুইটি শিকল থাকে; খাইবার সময়ে নথ মাথা গলাইয়া ঘাড়ে তুলিয়া দেওয়া হয়। বণিকদের নথ দুই ইঞ্চি অপেক্ষা ছোট, কিন্তু সকল গহনাপেক্ষা মূল্যবান। ব্রাহ্মণদের নথ বণিকদের নথাপেক্ষা ছোট। খেত্রীদের আদি নিবাস পঞ্জাবে, তাঁহাদের নথ চলিত নহে। এ-নিয়ম যুক্ত প্রদেশের, পঞ্জাবে কেহ নথ পরে না। দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে হিন্দু মুসলমান উভয় ধনবান সমাজে ও রাজবাটীতে প্রায় দুই ইঞ্চ ব্যাসের নথ ব্যবহৃত হয়।

শাহজহানের বিবাহ চিত্রে নথ নাই বলিয়া সে কালে নথের প্রচলন ছিল না, ইহা বলা যায় না, তবে মুসলমান সমাজে ছিল না। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে, যে, কটকের সাক্ষীগোপালের বিগ্রহ প্রথমে বৃন্দাবনে ছিল, সেখান হইতে বিজয়নগরে গিয়াছিল। পরে, "উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম নাম। সেইদেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম। * * গোপাল লইয়া রাজা কটক আইল। * * তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দরশনে। * * তাঁহার নাসাতে বহু মূল্য মুক্তা হয়। তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয়। * * রাত্রি শেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে।" * বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।" ইত্যাদি [চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য। ৫ম পরিচ্ছেদ]। এই পুরুষোত্তম ১৪৬৯ হইতে ১৪৯৬ ঈশাব্দ পর্য্যন্ত উৎকলে রাজ্য করিয়াছিলেন, ও বিজয়নগর আক্রমণ করিয়া একটি মণিমুক্তা জড়িত সিংহাসন লুট করিয়া আনিয়া জগন্নাথ মন্দিরে দিয়াছিলেন, ও গোপাল বিগ্রহ আনিয়া কটকের কাছে স্থাপন করিয়াছিলেন। (Vizagapatam Gazetteer p. 28)। অতএব শাহজহানের বিবাহের বহু পূর্ব্বে নাকে অলঙ্কার পরা প্রচলিত ছিল। আজাণ্টার চিত্রেও কোন কোন রমণীর নাকে গহনা আছে, বোধ হয় সে সময়ে ও বিশেষ বিশেষ জাতিতে ঐরূপ গহনা প্রচলিত ছিল, অন্য জাতিতে ছিল না। অন্য অঙ্গের গহনাও ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবহার হয়। যেমন, মুসলমান সমাজে এক কাণে সারি সারি ছয়টি অন্য কাণে সাতটি অথবা ১২, ও ১৩টি ছোট ছোট মাকড়ি পরা নিয়ম, কিন্তু হিন্দুরা এক কাণে তিনটি অন্য কাণে চারটি মাকড়ি পরেন। রাজপুতনা অঞ্চলে যে-রূপে শাটী পরা হয়, তাহাতে একদিকের কাণ ও উপর হাত সর্ব্বদা ঢাকা থাকে, এক দিকের খোলা থাকে, অতএব অলঙ্কার ও একদিকে পরা হয় বুন্দেলখণ্ডে হাতের (নীচে ও উপর উভয়) খাড়ুগুলি অবস্থা বিশেষে সোনা রূপা, বা কাঁসার হয়, সংখ্যায় যতগুলির সঙ্কুলান হয় তত পরে। সেগুলি অবস্থা বিশেষে আক্রমণকারীর মাথা ভাঙ্গিবার পক্ষে যথেষ্ট হয়, আবার লাঠীর আঘাতও রক্ষা করা চলে, অর্থাৎ offensive ও defensive উভয় কাজে লাগে। যুক্ত প্রদেশের গোপদের গহনাও ঐরূপ মারাত্মক ছিল, তবে এখন বড় নগরে প্রায় হালকা নূতন ফ্যাশনের গহনা চলিতেছে। পায়ের গহনা ও ঐরূপ অর্থাৎ ভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিন্ন রূপ। পায়ের

মলপরাইবার সময়ে রমণীর হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া পরাইতে দেখিয়াছি। প্রথম মল পরিবার পর ১০।১২ দিন (কখন আরও বেশী) তাহার চলিবার ক্ষমতা থাকে না। মল গরম করিয়া পরাইতে হয় বলিয়া প্রায় পুড়িয়া ঘা হইয়া যায়। খুলিবার সময়ে কাটিয়া ফেলিতে হয়। খেত্রীদের নাকে নথ নাই, কিন্তু তাঁহাদের বণিকদের ও কায়স্থদের এক এক পায়ে পাঁচশত ভরীর রূপার গহনা দেখিয়াছি। রাজপুতানার কচ্ছেলা চারণদের দুই হাতে (নীচে ও উপরে) যত দূর সঙ্কুলান হয় হস্তীদন্তের কঙ্কণ পরা নিয়ম।

এলাহাবাদে কয়েকটি বাঙ্গালী স্বর্ণশিল্পী আছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল বাঙ্গালীদের গহনাই গড়িতেন, কিন্তু আজকাল (বোধ হয় গত ১৫ বৎসর হইতে) তাঁহাদের কাছে অনেক এ দেশবাসীরা বাঙ্গালী অর্থাৎ কলিকাতার নূতন ফ্যাশানে গহনা গড়াইয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

হিন্দু পুরুষদের মধ্যে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পায়ে রবহীন সোনা অথবা রূপার তোড়া (ঘুঁঘুর বাদ পাজের বা পায়জর), কটিদেশে চন্দ্রহার বা গোট, প্রায় পুত্রের পিতা হইবার পূর্ব্বে বা ২০।২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নীচে হাতে বালা বা কঙ্কণ ও নবরত্ন, উপর হাতে তাবিজ, জওশন (জশম নহে, শব্দটি পার্শী, অর্থ অঙ্গরক্ষক বর্ম্ম, coat of mail), অঙ্গুলীতে নানাপ্রকার অঙ্গুরী বা মুদরী গলায় নানাপ্রকার হার, কাণে কাণবালা পরিতে দেখিয়াছি। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের পুরুষেরা ক্ষমতায় কুলাইলে উপর কাণে এক একটি মুক্তা অথবা নীচে এক একটি হীরক বসান ফুল পরে, উহা অবস্থাপন্নের চিহ্ন। আমার এক রাজপুতনাবাসী বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি তিনি তাঁহার দেশের রাজাকে (যাঁহার মৃত্যু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে) বৃদ্ধাবস্থাতেও কখন নিরাভরণ দেখেন নাই। রাজা দিবারাত্রি উপরিউক্ত সকল গহনা পরিয়া থাকিতেন, রাজ সভায় আসিবার সময়ে আরও বেশী অলঙ্কার পরিতেন। আমার বন্ধু ও ২০।২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ঐরূপ অলঙ্কৃত থাকিতেন, এখন কিন্তু তাঁহার বংশের বালকেরা ৯।১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত থাকে, তাহার পর আর কেহ অঙ্গুরীয় ও গলার হার ছাড়া অন্য গহনা পরে না। যুক্ত-প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর লোকে পয়সা হইলে কটীতে গোট, গলায় হার মোহর মালা ও কণ্ঠা পরে। মোহর মালা কয়েকখানি মোহরে বা গিনীতে কোঁড়া বসাইয়া হার রূপে গাঁথা। ছোট বড় নানা আকারের ফুলকাটা সোণার গোলক এক সারে গাঁথা হইলে কণ্ঠা হয়, তাহার মধ্যের গোলকগুলি বড় ও পাশেরগুলি ছোট হয়। অবশ্য ইহা ছাড়া নানা আকারের অঙ্গুরী বা মুদরী পরে। এ দেশে বিবাহে, ও আনন্দ উৎসবে এখনও বাটীর চাকরদের, নাপিত ও বারীকে রূপার অথবা সোনার বালা পারিতোষিক দেওয়া হয়। আল্‌হার গানে ও পৃথ্বীরাজ রাসোতে রণ কঙ্কণের উল্লেখ আছে। যুদ্ধ জয় করিলে এখন যেমন মেডল দেওয়া হয় সেইরূপ রাজা যোদ্ধাদের রণ-কঙ্কণ পরাইয়া দিতেন। ইহার গঠন কিরূপ ছিল জানি না, তবে সাধারণ কঙ্কণের মত নহে, ও কোনও রাজার দত্ত না হইলে যে সে এ কঙ্কণ পরিতে পাইত না।

যুক্ত প্রদেশে বালকদের নাকে কোনও প্রকার গহনা প্রচলিত নাই, কিন্তু কোনও প্রসূতির ২।৩টি সন্তান মারা যাইবার পর পুত্র হইলে আঁতুড়েই তাহার নাকের মাঝের প্রাচীরে ছিদ্র করিয়া নোলক পরাইবার প্রথা এখনও আছে; লোকে বিশ্বাস করে যে এরূপ করিলে শিশু দীর্ঘায়ু হয়। এরূপ নোলককে "বুলাক" বলে। এ শব্দটি তুর্কী ভাষার। এ বিশ্বাস তুর্কদের কাছে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে শিক্ষা করিয়াছে। তুর্কদের মধ্যে ঐ প্রকার শিশুদের নাকে বুলাক (বোলাক-নোলক) পরান প্রথা বহু প্রাচীন ও এখনও আছে, তবে ১০।১২ বৎসর বয়সের পর আর পরে না। এদেশে এরূপ হিন্দু বা মুসলমানদের নাম বুলাকীরাম বা বুলাকী খাঁ (আমাদের এককড়ি, তিনকড়ি ইত্যাদির মত) প্রায় দেখা যায়।

ক্ষত্রিয় সমাজে পুরুষদের নাকে ছিদ্র করা অতি লজ্জাকর বিষয়, উহা পুরুষত্বের অভাব প্রকাশ করে।

পরম-তৃষা

শ্রী রাধারাণী দত্ত

আদ্য

আশ্বিন মাস।

শিউলী বনের করুণ গন্ধে কিশোরী প্রভাত-লক্ষ্মীর শিশিরসিক্ত অঙ্গে একটি মধুর আবেশ জড়িয়ে আছে। কাঁচা সোণার মত স্নিগ্ধ রৌদ্রে যেন মিষ্ট-মাধুর্য্য ঝরে পড়ছে।

আঁচলভরা রাশীকৃত শিউলী ফুলের শুভ্র পাপ্‌ড়ি হ'তে বাসন্তী বৃন্তগুলি ছিন্ন ক'রে পৃথক্ ভাবে রাখ্‌তে রাখ্‌তে সুভা বললে—এবার পুজায় বৌমাকে বেণারসী শাড়ী আর পান্নার চিক্ দিতে হবে, বেয়াই!

নন্দ ছুরী দিয়ে আমের আঁঠী কেটে বাঁশী তৈরী ক'রতে ক'রতে বললে—অত পারবো না। এবার বড্ড খরচপত্র হয়ে গেছে। তা' ছাড়া অজন্মার দরুণ মোটে খাজনা আদায় হয়নি।—

সুভাষিণী শুভ্র মোতির নোলকটি দুলিয়ে কচি টুলটুলে মুখখানি পাকাগিন্নীর মত ঘুরিয়ে বল্‌লে—ও'সব কথা শুনছি না। এবার পুজোয় তা'হ'লে বৌ পাঠাবো না।

নন্দলাল কাকুতি-মিনতি ক'রে বল্‌লে—বেণারসী-শাড়ী পার্‌বো না, একখানি বোম্বাই শাড়ী কিনে দেবো। আর পান্নার চিক্ আস্‌ছে বছর নিশ্চয় গড়িয়ে দেবো, বেয়ান!

সুভা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে শিউলির বোঁটাগুলি ক্ষুদ্র ডালাখানির উপরে সযত্নে মেলে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লে—তা' হ'লে মেয়েও সেই আস্‌ছে-বছরেই নে' যেও, এ'বছরে হবে না—

পিছন দিকে সুভা'র মা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দু'টি বালক-বালিকার সংসারাভিনয়-খেলা স্নেহমুগ্ধ সতৃপ্ত নয়নে উপভোগ কর্‌ছিলেন।

সুভা'র প্রবীণার মত উক্তিতে মা সশব্দে হেসে উঠে বল্‌লেন—গয়না-কাপড় না দিলে বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাতে নেই, কোথা থেকে শিখ্‌লি বল্‌তো, পোড়ারমুখি!—

সুভা মায়ের কণ্ঠস্বরে সচকিতে পিছন ফিরে তাকিয়ে লজ্জায় তাড়াতাড়ি মাথার অবগুণ্ঠনখানি টেনে ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে' তাঁর জানুদেশে নিজের মাথা গুঁজে সলজ্জ আবদারের সুরে বল্‌লে—যাঃও,—তুমি ভারী দুষ্টু মা,—তুমি কেন এখানে এলে?—

নন্দলাল এতক্ষণ তার পুতুল-কন্যার শাশুড়ী অর্থাৎ বেয়ানের পূজার তত্ত্বের ফর্দ্দে নিতান্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল, এইবার ভরসা-প্রফুল্ল মুখে এগিয়ে এসে দীপ্তকণ্ঠে বল্‌লে—দেখোনা মা,—সুভি বল্‌ছে পান্নার চিক্ আর বেণারসী-শাড়ী না দিলে এবার পুজোর সময় পদ্মকে আমার কাছে পাঠাবে না!

মা হাস্যতরল-কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লেন—'পদ্ম' আবার কে রে?

সুভা মায়ের আঁচলখানি শক্তমুঠায় চেপে ধরে' নন্দ'র মুখের পানে সকৌতুক-নেত্রে তাকিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—জানোনা, মা? ওর মেয়ের নাম যে 'পদ্মরাণী'!

নন্দ সুভার হাসি এবং বলা'র ভঙ্গীতে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌ল। নিজের অপ্রতিভ ভাবটুকু ঢাক্‌বার জন্য ঠোঁট্ বেঁকিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলে' উঠ্‌ল—তোর ছেলের নাম আমি বলে' দিতে পারি না বুঝি?—

মায়ের অঞ্চল-প্রান্ত মুঠা হ'তে ছেড়ে দিয়ে কলহের ঝাঁঝাল' সুরে সুভাও বল্‌লে—দে' না বলে'! তাতে ভয় কিসের?

মা এবার মেয়েকে সজোরে ধমক্ দিয়ে উঠ্‌লেন।—এই সুভি!—ফের্ নন্দকে তুই-তোকারি কর্চ্ছিস্?...বারণ করে' দিয়েছি না ওকে কখনো তুই-তোকারি ক'রবিনে!

সুভা ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে বল্‌লে—আর ও'যে আমায় পোড়ারমুখী—রাক্ষুসী—বলে' গাল দেয়, চুলের মুঠি ধরে—তার বেলায় বুঝি কিচ্ছু নয়?...ভারী তো বর!! অমন বর আমি চাইনে—

সুভা 'চাইনে' শব্দটা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলে' সাভিমান-রোষে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

নন্দলালও আর নিজের পৌরুষ প্রকাশ না করে' থাক্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে—আমিও তোর মতন ছাই বৌ চাই না।...দে, আমার পুতুল ফিরিয়ে দে। পুতুল-বিয়ে ভেঙে দিলুম।

সুভা এইবার ঝর্ ঝর্ করে' কেঁদে ফেলে বল্‌লে—নে' না ফিরিয়ে তোর পুতুল!...বড় ব'য়েই গেল!

তারপর মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুভা বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে—মা, ও' আমার পুতুলের সঙ্গে ওর পুতুলের বিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছে—তুমিও ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ফিরিয়ে নাও! আমি ওর বৌ হ'তে পার্‌বো না,—কক্ষনোনা—।

হাসির বেগ দমন করে' মা উভয়কেই ধমক্ দিলেন।—ফের্ দুজনে তুই-তোকারি করে' ঝগড়া কর্‌ছিস্?...নন্দ,—সুভি,—দু'জনেই আমার কাছ থেকে আজ মার্ খাবি দেখ্‌ছি—

সুভা কাঁদতে কাঁদতে গোঁভরে বল্‌লে—কক্ষনো ওকে আমি 'তুমি' ব'ল্‌বো না।...মা, তুমি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ভেঙ্গে দাও বল্‌ছি—

মা এবার ওদের সাম্‌নেই হেসে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন—আচ্ছা, তাই-ই হবে অখন্!...কিন্তু তুমি যদি নন্দ'র নাম ধরে ডাকো আর 'তুই' বলা অভ্যাস্ না ছাড়ো তা' হ'লে কিন্তু বিয়ে আর ভাঙবে না।—

ঘণ্টা কয়েক বাদে আহারের সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়। মা ডাকাডাকি করে' নন্দ বা সুভা কারুরই সন্ধান পান না।

চাকরদের অন্বেষণে পাঠালেন। তারা এসে খবর দিলে—সদরের বড় পুকুরে সুভাষিণী ও নন্দলাল মহানন্দে সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় নেমে হাস্যকলোচ্ছ্বাসে পুষ্করিণী তোলপাড় করে' তুলেছে।

শুনে মা একটু হাস্‌লেন।

সাত বছরের বধূ—এগার বছরের বর। পুতুলের বিয়ে দেয়—লুকোচুরী খেলে—ছাদে উঠে আচার চুরি করে—মারামারি ঝগড়া করে—আবার ভাবও হয়।

না আছে তাদের সাজপোষাকের বালাই, না আছে লজ্জাসঙ্কোচের ধার—না আছে কথাবার্ত্তার শৃঙ্খলা!

রাগ হ'লে পরস্পর পরস্পরকে চিম্‌টি কাট্‌তে, চুলের মুঠি টান্‌তে, কিল বসাতেও ছাড়ে না।

মা এসে দু'জনকে ছাড়িয়ে তফাৎ করে' দেন।

কখনও মেয়েকে দু'-ঘা চড় মারেন, কখনও জামাইকে চোখ রাঙিয়ে ধম্‌কান। জামাইকেও চড়টা কাণমলাটা শাস্তি দিতে তাঁর আট্‌কায় না।

জামাই নন্দলাল তাঁর নিজেরই হাতের মানুষকরা ছেলে! সে তাঁর পেটের মেয়ে সুভারও বাড়া।

বেশী বয়স পর্য্যন্ত সন্তানপ্রতীক্ষায় কাটিয়ে সুভার মা যখন হতাশ হ'য়ে এসেছিলেন—সেই সময়ে তাঁর বিধবা বড় জা তাঁর মাতৃপিতৃহীন শিশু বোনপোটিকে সুভার বাপ-মা... হাতে স'পে দিয়ে পরপারে যাত্রা করেন।

অপত্যহীন দম্পতি বাপ-মাহারা এই এক বছর বয়স্ক সুন্দর শিশুটিকে পেয়ে সন্তানের দুঃখ ভুল্‌বার চেষ্টা করেছিলেন।

নন্দলালই তাঁদের পোষ্যপুত্ররূপে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও পারলৌকিক জলপিণ্ডদানের অধিকারী হবে স্থির হ'য়ে গিয়েছিল। নানা বাধাবিঘ্নে তখনও তাকে আইনতঃ পুত্ররূপে বরণ করা হ'য়ে ওঠেনি।

এমন সময়ে আকস্মিক আগমন কর্‌লে সুভা। নন্দলাল তখন চার বছরের।

সুভাষিণী কোন অজানা দেশ থেকে পৃথিবীতে তার মায়ের কোলে এলো বটে—কিন্তু তার অল্পদিন পরেই সুভার বাবা পৃথিবী হ'তে কোনও অজানা দেশে চিরদিনের জন্য চ'লে গেলেন।

বিসূচিকার দারুণ তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ কর্‌তে কর্‌তে সুভার বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে সুভার মাকে বলে' গেলেন—আমার নন্দকে যেন তুমি 'পর' করে' দিও না। বিষয় থেকে বঞ্চিত কোরো না। সুভার সঙ্গে নন্দ'র বিয়ে দিও, তা'হ'লে আর কোনো গোল হবে না।

সুভার বাবা আরও বলে' যান—যত শীঘ্র সম্ভব ওদের অল্প বয়সেই এই বিয়ে দিও। নইলে পরে হয়তো অনেক বাধাবিপত্তি ঘট্‌তে পারে।

সুভার মা তাই মেয়ের সাত বছর পূর্ণ না হ'তেই নন্দর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

[মধ্য]

আষাঢ় মাসের মেঘ-বিষণ্ণ দুপুর।

আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় আকাশের মুখ ম্লান কালো। বাতাস স্তব্ধ গম্ভীর।

সুভাষিণীর দিনের বেলায় ঘুম আসে না। দুপুর বেলা বসে' বসে' একরাশ সিল্কের ও ছিটের টুক্‌রা জুড়ে জুড়ে ছোট্ট ছোট্ট ফ্রক্ জামা বিছানা প্রভৃতি তৈয়ারী করে।

ঘরের ভিতরে সারিবন্দী আলমারীর কাচাবরণের মধ্যে —ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতম আকারের ও বৃহৎ হ'তে বৃহত্তম আকারের কাঁচের, সেলুলয়েডের, পোর্‌সিলেনের, পাথরের হাতির দাঁতের অসংখ্য পুতুল সাজানো। তাদের অনেকগুলিই উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণে কৃত্রিম মুক্তাহার প্রভৃতিতে সুভা কর্ত্তৃক সুসজ্জিত।

সাত বছরের সুভা এখন সাতাশ বছরের, পরিপূর্ণ-যৌবনা। এগার বছরের বালক নন্দলাল এখন একত্রিশ বৎসরের যুবা।

দৌহিত্রের অতৃপ্ত সাধ নিয়ে মা স্বর্গে চলে' গেছেন।

সুভা ও নন্দ এখন সাবালক হ'য়ে ষ্টেটের উত্তরাধিকার পেয়েছে।

নন্দলাল কি একটা প্রয়োজনে ঘরে ঢুকে সুভা'র হাতের সিল্ক টুক্‌রাগুলির পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কি তৈরী করা হচ্ছে?

সুভা কপাল ও চোখের উপরকার চূর্ণ চুলগুলি হাত দিয়ে সরাতে সরাতে মৃদু হেসে রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে—তোমার নাতি-নাত্‌নীর বিছানা জামা তৈরী হচ্ছে।

নন্দলাল একটু উদাস হাসি হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ এজন্মটা ঐ পুতুল ছেলে-মেয়ে আর পুতুল নাতি-নাত্‌নি নিয়েই কাটিয়ে দাও—!

সুভা'র হাসিভরা প্রফুল্ল মুখখানি হঠাৎ অত্যন্ত ম্লান হ'য়ে গেল। হাতের কাজে দৃষ্টি নত করে'—সূচের ফোঁড়্ তুলে যাচ্ছিল, কিন্তু আঙুলগুলি যেন শিথিল অবশ হ'য়ে এলিয়ে আস্‌ছিল।

নন্দলাল সুভা'র মলিন মুখের পানে তাকিয়ে সস্নেহ কণ্ঠে বল্‌লে—হ্যাঁরে সু,—ও'কথা ব'ললুম বলে' মনে তোর কষ্ট হ'ল নাকি?

নিতান্ত আদর-করা'র স্থলে কিম্বা রহস্যচ্ছলে আজও নন্দলালের মুখ দিয়ে স্ত্রীকে 'তুই' সম্বোধন বেরিয়ে যায়।

সুভা প্রাণপণে চোখের জল চাপ্‌তে চাপ্‌তে হাসিভরা কণ্ঠে উত্তর দিলে—দুঃর্! তুমি পাগল না কি? কষ্ট কিসের?

সুভা চেষ্টা করে' ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা টেনে আন্‌ল।

নন্দলাল নিশ্চিন্তচিত্তে শিষ্ দিতে দিতে বাহিরে

চলে' গেল। সে জান্‌তেও পারলে না—তার এই রহস্যচ্ছলে বলা ছোট্ট কথাটুকু—তার বন্ধ্যা-পত্নীর মর্ম্মের কোন্‌খানটিতে গিয়ে বিঁধে রইলো!...

প্রিয়জনের মুখের লঘু কথাটিও মানুষের বুকে কত গুরু হ'য়ে বাজে তা যদি তারা বুঝ্‌তো!

নন্দলাল চলে' গেলে সুভা হাতের রঙীন ছিটের টুকরাগুলি ছুঁড়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে বিছানার উপরে উপুড় হ'য়ে ছোট বালিকার মত ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে কেঁদে উঠ্‌ল।

নিঃশব্দ ক্রন্দনের বেগে সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করে' কেঁপে, ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল...।

কত সময়েই তো মানুষ খেলাচ্ছলে ধনুর্ব্বাণ ছোঁড়ে,—কোনও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে নয়। তারা কি জানে তাদের সেই খেলার তীরটিই কোনও ঘন-শাখান্তরালের অসহায় ছোট পাখীর বুকে বিঁধে' গভীর ক্ষত ও রক্তপাত সৃষ্টি করতে পারে?

•

সুভাষিণী স্বামীর সঙ্গে তীর্থে গেল। তীর্থে গিয়ে কত বটবৃক্ষের তলায় ফল কামনায় আঁচল বিছিয়ে বসে' থাকে। সাগরে নদীতে প্রদীপ ভাসায়।

সাধু-সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হয়,—কবচ মাদুলি ধারণ করে। স্বামীকে লুকিয়ে কত ব্রত উপবাস আচার অনুষ্ঠান করে। ধরা পড়্‌লে লজ্জিত হয়,—অস্বীকার করতে চায়।

শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে সুভার এক দূরসম্পর্কীয়া দিদিমার সঙ্গে দেখা হ'ল। সঙ্গে তাঁর ষোল-সতেরো বছরের এক অনূঢ়া নাত্‌নী। নাম চিত্রা।

সমুদ্রের ধারে চক্রতীর্থে এক মস্ত বড় জ্যোতিষী ভাগ্য-গণনা করেন। কর-কোষ্ঠী বিচার করেন।

সুভা গেল সেখানে হাত দেখাতে।

গিয়ে দেখে তার সেই দিদিমাও গেছেন অনূঢ়া নাত্‌নীর কররেখা দেখাবার জন্য।

তরুণী মেয়েটির চাঁপাফুলের মত সুন্দর নরম হাতখানি জ্যোতিষীর মোটা কর্কশ হাতের উপরে তুলে দিতে দিতে তার দিদিমা বল্লে—বাবা, আমার এই নাত্‌নীটির কবে বিয়ে হবে বলে' দিন্ দয়া করে'—

জ্যোতিষী মেয়েটির পল্লবের মত কচি হাতখানি নিজের বাম হাতে ধরে' ডান হাতে 'ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস্' নিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মেয়েটির কর-রেখা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

গম্ভীরমুখে এবং ততোধিক গম্ভীরকণ্ঠে জ্যোতিষী বল্‌লেন—এ'মেয়ে আপনার খুব সৌভাগ্যবতী হবে। যে ধনীর ঘরে এর বিয়ে হবে—আর এর গর্ভে সুলক্ষণ দীর্ঘায়ু রাজচক্রবর্ত্তী ছেলে হবে। আপনার নাত্‌নীর স্বামী-সৌভাগ্যের চেয়েও সন্তান-সৌভাগ্য বেশী উজ্জ্বল।

সুভা সাগ্রহে শুন্‌লে। মেয়েটির প্রতি বার বার তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

তারপর নিজের বাম হাতখানি এগিয়ে ধরে' শুষ্ক করুণ কণ্ঠে বল্‌লে—ঠাকুর, দেখুন তো—আমার সন্তান স্থানটা কি রকম?...

সুভার কণ্ঠস্বরে কুণ্ঠা যেন জড়িয়ে এল।

জ্যোতিষী মুহূর্ত্তেকের জন্য সুভার আপাদমস্তকে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের মহিলা।—সুন্দর দৃঢ় গঠনের চেহারা!...মুখে চোখে একটি কাতর তৃষ্ণা বা অতৃপ্তির বেদনা মাখানো।

জ্যোতিষী সুভার হাতখানি নেড়ে চেড়ে বল্‌তে লাগলেন—সন্তান-স্থান?...তা—সন্তান-স্থান তো তোমার তেমন ভালো দেখ্‌চিনে, মা! দুর্ব্বল—হ্যাঁ খুবই দুর্ব্বল—উহুঁ—সন্তান তো মোটেই নেই! তাই তো?

জ্যোতিষী ভ্রূকুঞ্চিত করে' কিছুক্ষণ সুভার হস্ত-তালুর প্রতি স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থেকে তারপর সুভার মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন,—হাঁ মা, তুমি কি বন্ধ্যা?

সুভা কিছু উত্তর দিলে না। জ্যোতিষীর হাতের ভিতর হ'তে নিজের হাতখানা টেনে নিয়ে উঠে চলে' এল।

পুরীর সমুদ্র-কিনারায় সুভা সকাল সন্ধ্যা স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যেত।

সেই দূর-সম্পর্কীয়া মাস্‌তুতো বোন্ চিত্রাকে বালু-বেলায় দেখ্‌তে পেত এক এক দিন।

তাকে দেখ্‌লেই সুভা যেন কেমন উন্মনা হ'য়ে পড়ত

নন্দলাল পাশে চল্‌তে চল্‌তে হয়তো কোনও একটা প্রশ্ন করে' অন্যমনস্কা সুভার কাছ থেকে উত্তর পেত না। স্ত্রীর কাঁধখানি ছুঁয়ে কিম্বা হাতখানি ধরে' মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে নন্দ সকৌতুককণ্ঠে বল্‌ত—কি গো বেয়ান্ ঠাকুরাণি, সমুদ্রের ধারে এসে 'কবি' হ'য়ে উঠ্‌লে নাকি?—

সুভা অপ্রতিভ ও লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বলে—আঃ কী যে ছেলে-মানুষি কর তুমি!! লোকে শুন্‌তে পেলে কি ভাব্‌বে বলতো?

পুরীতে সুভাদের বাড়ী চক্রতীর্থে।

স্বর্গদ্বার হ'তে খবর এল—সুভার সেই দিদিমার কলেরা হয়েছে। সুভা ও নন্দ গিয়ে বিদেশে আত্মীয়শূন্যা বৃদ্ধা আত্মীয়াটির দেখা শোনা সাহায্য তদারক করলে।

বৃদ্ধা ঘণ্টা কতকের মধ্যেই রোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে ভব-যন্ত্রণা এড়ালেন।

আপনার বলতে তাদের কেউই বিশেষ নেই।

চিত্রাকে সুভার হাতে সঁপে দিয়ে বৃদ্ধা বলে' গেলেন,—বোন্, তুই রাজরাণী ভাগ্যিমানি—আমার অভাগী নাতনীটার যা হোক্ দেখে শুনে একটা গতি করে' দিস্—

মৃত্যুপথযাত্রিণীর মুখের কথাগুলি সুভার কাণে পরিহাসের মত ঠেক্‌ল। জ্যোতিষীর কথাগুলি সুস্পষ্ট হ'য়ে কানে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

—হায়! সুভা না কি ভাগ্যিমানী!!...

সুভারা পুরী থেকে বাড়ী ফিরে এল। সঙ্গে এল চিত্রা।

চিত্রা মেয়েটি শান্ত লক্ষ্মী। তরুণ যৌবনের স্নিগ্ধ লাবণ্যে অপরূপ লাবণ্যময়ী।...সর্ব্বদাই একটি মধুর সঙ্কোচ বা ভীরু লজ্জা তার! নয়নে বচনে ভঙ্গিমায় জড়িয়ে আছে!

তপ্ত কাঞ্চন বর্ণে ও সুঠাম গঠনে শ্রী। তনুখানি যেন সৌন্দর্য্যেরই আরতি-দীপের স্থির শিখাটি!

চিত্রা দিদির পাশে পাশে ছায়ার মত ফেরে। সেবা-যত্নে, সংসারের গৃহ-কর্ম্মের মধ্যে তার সুন্দর হাত দু' খানি হ'তে—সুন্দরতর নিপুণতা ও কল্যাণশ্রী ঝরে' পড়ে।

নন্দলালের সাম্‌নে সে বেরোয় বটে কিন্তু খুব সামান্য সময়েই,—এবং সঙ্কুচিত ভাবেই।

সুন্দর শরৎ-প্রভাতে বাদলান্ধকারের মত চিত্রার চোখে মুখে একটি করুণ বিষণ্ণতার ছায়া সকলকারই অন্তরের ব্যথিত সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

নন্দলালের জীবনে কখনও এরকম তরুণী নারীর সান্নিধ্য ঘটেনি, যার অপরূপ রূপ-লাবণ্য সর্ব্বদা মৃদুলজ্জার আবরণে অবগুণ্ঠিত। যার আচরণ, ভঙ্গী চাহনি, কথা-কওয়া—সব-কিছুকেই যেন একটি স্নিগ্ধ মধুর রহস্যজাল ছেয়ে আছে!...যে-নব-যৌবনার প্রকৃতি ও আচরণ রহস্যাবৃত তার স্বরূপটি জান্‌বার জন্য পুরুষের কৌতূহল অদম্য হ'য়ে ওঠে, বিস্ময় বিপুল হ'য়ে ওঠে!... তাহা পুরুষের উষর কঠিন চিত্তেও ভাবে'র রঙীন-ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়ে তোলে! পুরুষের নয়ন ও মন সুদূর স্বপ্ন-কল্পনায় আবিষ্ট করে' তোলে!...

...নন্দলালের জীবনে সুভাই একমাত্র নারী। সে নারী তাকে উপলব্ধি কর্‌বার বা জান্‌তে চাওয়ার অনেক আগেই নন্দর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত দেহ-মন চিত্তে ধরা দিয়েছে!...কিন্তু নারী যতই আপনার সৌন্দর্য্য ও আপনাকে আবরণে আবৃত রাখে, তার চিত্তের শোভা মাধুরী নিঃশেষে প্রকাশ. না করে', আধ-প্রকাশ, আধ-অপ্রকাশের মধ্যে রাখে—ততই তার সৌন্দর্য্যের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। পুরুষ তার চিরঅতৃপ্তিতৃষা নিয়ে তাকে আরও জান্‌বার জন্য—আরও নিঃশেষে পাওয়ার জন্য সাধনা করে।

নারীর পক্ষে অত্যধিক প্রকাশ হওয়া নিঃশেষিত হওয়ারই সামিল।

সুভার হয়েছিল তাই। সুভার প্রতি তার স্বামীর কোনও দিন বিস্মিত দৃষ্টিনিক্ষেপের প্রয়োজন হয়নি!...

সে নন্দ'র সঙ্গে শৈশবে এক মায়েরই ক্রোড়ে লালিত হয়েছে!...বাল্যে খেলা-ধূলা মারামারি করেছে!...যৌবনের পূর্ব্ব হ'তেই স্বামী-স্ত্রী ভাবে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বিনা-মনোমালিন্যে গৃহধর্ম্ম যাপন ক'রছে।

সুভা নন্দ'র জীবনে এমনি সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন মানুষ তার দেহের কোনও একটি অংশ বিশেষ সম্বন্ধে অকারণে সর্ব্বদা সচেতন থাক্‌তে পারে না—তেমনি সুভা সম্বন্ধেও নন্দলালের চৈতন্য কোনও দিন বিশিষ্ট ভাবে জাগ্রত হ'য়ে উঠবার অবকাশ পায়নি!

সুভাষিণী যেন নন্দলালেরই দেহ মন ও চিন্তাযুক্ত জীবনের একটা অংশ মাত্র। তার প্রতি বিস্মিত দৃষ্টি-নিক্ষেপের কিম্বা মনোযোগ দেবার তাই কিছুই নেই।

তরুণী নারীর প্রতি পুরুষের যে একটি অননুভূত বিস্ময়পূর্ণ মুগ্ধ-দৃষ্টি—একটি আধস্বপ্ন আধসত্য ঘেরা বিচিত্র অনুভূতি যা চিত্তকে আচ্ছন্ন ও 'আবিষ্ট করে' ফেলে—তার উপলব্ধি নন্দলালের জীবনে এই প্রথম।

অকারণে সমগ্র হৃদয় মন তার কখনও বিপুল বেদনায় লুটিয়ে নুয়ে পড়ে—কখনও অকারণেই অদম্য পুলকে উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে!

এ' আনন্দ ও বিষাদের কোনও সঙ্গতি খুঁজে বের্ করা সুকঠিন।

সুভা বুঝতে পারে না অথচ আবার বুঝতেও পারে। ব্যথায় কাতর হ'য়ে পড়ে,—অথচ নিজেকেই তিরস্কার করে। মনে করে তারই চিত্তের দুর্ব্বলতা এই সব সন্দেহ ও নানা অদ্ভুত কল্পনার সৃষ্টি ক'রছে বুঝি!—

চিত্রা আসার পর থেকে নন্দলাল অন্দরমহলে আসা খুবই সংক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছে।

আহারের সময় ও রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে অন্দরে আসে।

রাত্রিবেলা স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে একটি নিঃশব্দ ব্যবধান কখন যে নিজের আয়তন উচ্চ হ'তে উচ্চতর করে' বাড়িয়ে তোলে নিজেরাই তা' ধর্‌তে পারে না।

সুভা মাঝে মাঝে নিদ্রাহারা-নয়নে বিছানা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় কে যেন তার নিঃশ্বাস রোধ করে' ধ'রছে!

মাঝে মাঝে বিনিদ্র রাত্রে একটি সুতীব্র আনন্দ-কল্পনা তার সমস্ত চিত্ত আকুল করে' তোলে!

তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তৃতীয় ব্যক্তির

কল্পনা!—যে তৃতীয়ের আবির্ভাব দুই-সংখ্যাকে 'এক' করে। 'দুই' 'এক' হওয়াতেই যে এই 'তিন' এর অস্তিত্ব!

সুভা বিছানা ছেড়ে মেঝের উপরে মাদুর বিছায়।

সুভা মেঝের থাকলে নন্দ খাটের উপরে ঘুমাতে পারে না। অথচ তাকে জোর করে' খাটের উপরে নিয়ে আস্তেও ভরসায় কুলায় না।

অপরাধীর মত মৃদুকণ্ঠে সুভার পাশে দাঁড়িয়ে নন্দ ডাকে—মেঝেয় শুলে কেন? অসুখ কর্‌বে যে! খাটে উঠে শোও না!

সুভা সংক্ষেপে বলে—থাক্‌। গরম হচ্ছে। এই বেশ আছি।

তারপরে নন্দলাল আর একটিও কথা বল্‌তে পারে না।

*　　*　　*　　*

সুভার খুব কঠিন অসুখ হ'ল।

নন্দ একান্ত কাতর হ'য়ে পড়ে' দিনরাত্রি উদ্বিগ্নচিত্তে সুভার রোগ-পাণ্ডুর মুখের পানে তাকিয়ে বসে' থাকৃত।

চিত্রা অহোরাত্র নিঃশব্দে দিদির সেবা কর্‌ত। নিজের সহোদরা কিম্বা আত্মজাও বুঝি এমন আন্তরিক যত্নে ও আগ্রহে সেবা কর্‌তে পারে না।

নন্দ মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে বিমুগ্ধ-নয়নে তন্বী চিত্রার সেবারতা মূর্ত্তিখানির পানে তাকিয়ে থাকৃত! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ব্যথানুতপ্ত মুখে সুভার রোগ-শীর্ণ মুখখানির উপরে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়্‌ত।

তন্দ্রাবিষ্টা সুভার ক্লান্ত করুণ মুখখানিতে, ললাটে, রুক্ষচুলগুলিতে গভীর স্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে ব্যাকুলকণ্ঠে নন্দ ডেকে উঠ্‌ত—সু,—সু,—সুভি—

চিত্রা ধীরপদে এগিয়ে এসে শান্ত মৃদুকণ্ঠে বল্‌ত—এখন জাগাবেন না। অনেক কষ্টে এইমাত্র তন্দ্রাটুকু এসেছে।

নন্দ ঘোরতর অপরাধীর মত অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়্‌ত।

নন্দ ভাব্‌ত সুভা তারই দোষে বোধহয় মর্‌তে বসেছে!...কিন্তু সে নিজে স্পষ্ট কী যে ত্রুটী বা অপরাধ করেছে তাও ভেবে পেত না। অথচ নিজেকে অপরাধী মনে করে' সর্ব্বদাই যেন তার কুণ্ঠানুভূতি হ'ত।

সুভা একটু একটু করে' সেরে উঠ্‌ল।

নন্দলালের চিন্তাম্লান উদ্বেগকাতর মুখখানিতে আনন্দের স্বচ্ছহাসি আবার ফুটে উঠ্‌ল।

সুভাষিণী স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে ভাব্‌ত যেন একটা দুঃস্বপ্ন-রাত্রির পরে সুন্দর আলোভরা প্রভাতে আবার সে চোখ মেলেছে!

সুভা বল্‌ত—চিত্রা না থাকলে এবার হয়তো বাঁচতুমই না। অদ্ভুত সেবা করেছে কিন্তু!

নন্দ চিত্রার প্রসঙ্গে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌ত, সংক্ষিপ্ত ভাবে উত্তর দিত—হ্যাঁ।

সুভা নন্দ'র মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ত—চিত্রা যে আমাদের এত বেশী ভালোবাসে, সত্যিই জানতুম না।

নন্দ এ প্রসঙ্গে চঞ্চল হ'য়ে উঠে কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে'র অবতারণার প্রয়াস কর্‌ত।

সুভা স্বামীর কথায় কান না দিয়ে নিজের কথাই বলে' চল্‌ত—ও খুব ভালো মেয়ে তা' জানতুমই। তবে ও যে আমাদের একান্তভাবে মর্ম্মে মর্ম্মে ভালোবেসেছে তা' উপলব্ধি করেছি এবারকার অসুখের মধ্যে!—

বারে বারে 'চিত্রা' ও 'ভালবাসে' শব্দ দু'টি নন্দ'র শ্রবণপথে প্রবেশ করে' বক্ষঃশোণিতে নৃত্য তুলত। সে যেন দমবন্ধ বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ত।

শুষ্ক অসংলগ্ন কণ্ঠে সুভার কথার জবাব দিত—হ্যাঁ খুব সেবা করেচে বটে! ব'লেই তাড়াতাড়ি বল্‌ত—ভাগ্যিস্‌ অসুখের গোড়াতেই ক'লকাতা থেকে বড় ডাক্তার আনিয়েছিলুম।

সুভা স্বামীর কথার উত্তরে কিছু দিত না। অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে নির্মেঘ উজ্জ্বল আকাশের পানে তাকিয়ে থাকৃত।

নন্দ অল্পক্ষণ চুপ করে' থেকে, নীরবতা সহ্য কর্‌তে না পেরে বলে' উঠ্‌ত—কী ভাব্‌চো অত?

সুভা এইবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌লে—একটা কথা তোমায় বোল্‌বো!

নন্দ'র চোখে মুখে ভয়ের ছায়া সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। অকারণে বুক কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

সুভা স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে স্থির নয়নে স্বামীর দিকে চেয়ে সুগভীর কণ্ঠে বল্‌লে—আচ্ছা, চিত্রাকে তুমি বিয়ে ক'র্‌লে কেমন হয়?—বেশ দুটি বোনে একত্রে থাকবো।......আর—আর—আমার তো—এই পর্য্যন্ত বলে' সুভা আর বল্‌তে পারে না।

স্বামীর কাছে নিজের বন্ধ্যাত্বের উল্লেখ কর্‌তে গিয়ে ওষ্ঠাগ্রে কথাটা এসেও আটকে গেল!

নন্দ সুভার কথায় কেঁপে উঠ্‌ল।

কী যেন একটা বল্‌বার চেষ্টা করে, কিন্তু কণ্ঠস্বর একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে যাওয়ায় কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না। শুধু কাতর বিবর্ণমুখে সুগভীর-ব্যথাভরা দৃষ্টিতে সুভার মুখের পানে ছলছল করুণ নয়নে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল।

সুভা এবার স্বামীর দিকে ব্যথিত অথচ মমতা-স্নিগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে মৃদু-ভর্ৎসনার সুরে বল্‌লে—ছিঃ, অত কাতর হ'লে চলে কি? পুরুষ-মানুষ তুমি। ভাল করে' সব দিক্‌ ভেবে দেখ।…

—আমরা দু'জনেতো চিরদিন থাক্‌বো না।—বাবা-মার ইচ্ছে ছিল তুমিই তোমার পুরুষানুক্রমে তাঁদের এই সম্পত্তি ভোগ কর! সে' কথাটা কি ভাবা উচিত নয়?

নন্দলাল রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে—সুভা—

সুভা বল্‌লে—অত কাতর হ'চ্ছ কেন?… তুমি আর আমি কি দুই? আমরা যে একই। আমি তো কাতর হইনি।

নন্দলাল ভয়-কুণ্ঠিত মুখে সকাতর স্বরে বল্‌লে—হ্যাঁরে সু,—আমি কি সত্যিই কিছু অপরাধ করেছি?

সুভা জিভ্‌ কেটে বল্‌লে—পাগল কি তুমি?…

অভিমান-ভরে নন্দ বল্‌লে—তবে কেন তুই এসব কথা বল্‌ছিস বল্‌-তো?

সুভা বল্‌লে—আচ্ছা তোমার যা কিছু জিনিষ, তা' আমার একান্ত নিজস্ব জিনিষ, এ কথা সত্যি কি না জবাব দাও আগে!

নন্দ বিস্ময়াভিভূতস্বরে বল্‌লে—তাও কি আজ আবার নতুন করে' বলে' দিতে হবে না কি?

সুভা এইবার স্বামীর অনাবৃত-বাহুমূলে নিজের শীর্ণ মুখখানি লুকিয়ে গাঢ়স্বরে বল্‌লে—তোমার ছেলে তা'হলে আমারই ছেলে নিঃসন্দেহ!……হোক্‌ না সে চিত্রার ছেলে, কিন্তু সে-তো তোমারই। তোমার যা কিছু সবই যে একান্তভাবে আমার।

[অন্ত]

নানান্‌ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে' সত্যিসত্যিই শেষে নন্দর সঙ্গে চিত্রার বিয়ে হ'য়ে গেল।

নন্দর শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবেরা 'ছি ছি' করলে।

নন্দ সানুযোগে সুভাকে বল্‌লে—তোমার জন্যই আমাকে এত দুর্ণামের ভাগী হ'তে হ'ল!

সুভা করুণ হেসে বল্‌লে—কৃষ্ণ-কলঙ্কে কলঙ্কী হওয়ারও যে সুখ আছে।……চিত্রাকে পাওয়ার বদলে দুর্ণাম সহ্য করা আর এমন বেশী কি!

নন্দ আরক্তিমমুখে অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠলো।

প্রথম কিছুদিন সুভা প্রাণে যেন একটা মহৎ ঔদার্য্যের স্পর্শ পেত, নিজেকে সে সংসারের সমতলভূমি হ'তে উর্দ্ধে অবস্থিতা বলে' উপলব্ধি করত এবং তার জন্য একটু গর্ব্বও বোধ করত। সংসারের সাধারণ নারীর সহিত তার নিজের যে অনেকখানিই পার্থক্য আছে—তার ত্যাগশক্তি, মহত্ত্ব ও নিঃস্বার্থতা যে এই স্বার্থপর সংসারে বহুমূল্য এবং মহার্ঘ্য এটা যেন সে নিজেই সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করে' আত্মহারা হ'য়ে পড়ত।

কিন্তু এই উগ্র মাদকের মত অহঙ্কৃত আনন্দ বেশীদিন তার আত্মত্যাগের উদার সুখানুভূতিকে সচেতন রাখতে পারলে না তাহা ক্রমশঃই পাতলা হ'য়ে আস্‌তে লাগল।…… সঙ্গে সঙ্গে দারুণ অবসন্নতা ও শূন্যতাবোধ।

বিয়ের পর সুভা চিত্রাকে বেশী করে' যত্ন-আদর করতে লাগল। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস!…

নিজের হাতে সযত্নে কবরী রচনা করে' দিয়ে মুখে ক্রিম্‌ পাউডার মাখিয়ে—কাপড়ে এসেন্স ঢেলে দিয়ে সরম-কুণ্ঠিতা আরক্তমুখী চিত্রাকে সুভা স্বামীর ঘরে গল্প করতে পাঠিয়ে দিত।

তারপর খানিক বাদে মৃদু হাসি-আঁকা সকৌতুক মুখে সুভা জানালার বাইরে খড়খড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আড়ি পাত্‌ত।

রুদ্ধদ্বার গৃহাভ্যন্তরে তখন একটি মধুর দৃশ্যের অভিনয় চলেছে।

লজ্জারুণা তরুণী চিত্রার ললাটের ভ্রূরেখা-অবধি নামান নীলাম্বরী-অবগুণ্ঠনখানি উন্মোচনের জন্য নন্দলালের সে কী ব্যাকুল প্রয়াস!

প্রিয়ার মুখের একটিমাত্র বাণী শুনবার জন্য কি নিবিড় সাধ্যসাধনা!……

তাদের কথাবার্ত্তা বাইরে থেকে কিছু শোনা না গেলেও মধুর সুখবিহ্বল স্বপ্নাবিষ্ট চাহনি, অধরের হাসি তৃষিত অথচ সলজ্জ ভঙ্গীটুকু সুস্পষ্টই দেখা যেত।

নন্দলালের পানে বিস্ফারিতনয়নে তাকিয়ে সুভার মনে হ'ত—এ নন্দলাল যেন আর একজন নতুন মানুষ। এর এই প্রেমাবিষ্ট চাহনি, সুখবিহ্বল হাসি, আত্মহারা একাগ্রতন্ময় মুখভাব—এর সঙ্গে ত সুভার আশৈশবের—আযৌবনের অতিপরিচিত নন্দলালের সাদৃশ্য নেই!

আর ঐ নূতন নন্দলালের বক্ষোনিবদ্ধা লতার মত এলিয়ে-পড়া, সলজ্জসুখাবেশে আধমুদিতনয়না মেয়েটি—এই কি নির্ব্বিকার মৌনপ্রকৃতি শান্তসংযতা বিষাদকরুণমুখী চিত্রা!

মিনিট পনেরো বাতায়নের ছিদ্রে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে—তারপর সুভা আর দাঁড়াতে পারলে না। টল্‌তে টল্‌তে এসে নিজের শূন্যঘরের মেঝের অর্দ্ধমূর্চ্ছিতার মত লুটিয়ে পড়্‌ল।

আজ সুভার প্রথম মনে হ'ল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি প্রেম সুন্দর ও সজীব হয়, তা'হ'লে তাদের মধ্যে চিরদিন

নিত্য নবীনতা ও বৈচিত্র্যানুভূতিও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তারা কি কোনও দিন পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ নূতন করে' উপলব্ধি করতে পেরেছে? নিবিড়বিস্ময়ে একে অপরের পানে তাকিয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছে?

যে-প্রেমে প্রেমাস্পদকে অপূর্ব্বরূপে দেখবার সুযোগ নেই—যাকে চাইবার আগেই পাওয়া যায়,—যার জন্য হৃদয়ে বেদনা, অভাব এবং ব্যাকুলতা অনুভবের অবকাশ ঘটে না—সে-প্রেম যত গভীরই হোক্ না কেন,—সে প্রেম বুঝি মানব-চিত্তে নিত্য নব-অমৃত পরিবেশন করতে পারে না!—তাহা জীবনকে পরম-উপভোগ্য করে' তুলতে বোধ হয় অসমর্থ!···

আজ অকস্মাৎ সুভাষিণীর মনে হ'ল—অখণ্ড-মিলনে মিলনের আনন্দ মলিন নিরুজ্জ্বল হ'য়ে যায়।

মিলনের আনন্দকে উজ্জ্বল ও রম্য ক'রে তুলতে হ'লে বিরহ-অনলে দীপালির প্রয়োজন!···স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরহ, সাময়িক মনোমালিন্য, অভিমান, রাগ, কলহ—এরা যে প্রেমকে আরও উজ্জ্বল প্রদীপ্ত ও ঘন-নিবিড় ক'রে তোলে এর একটা অস্পষ্ট-ধারণা সুভার চিত্তে ছায়া বিস্তার করল।

সুভা চিত্রাকে স্বামীর সঙ্গে নূতন আলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করত। কুণ্ঠিত-চিত্রা লজ্জাভারে নুয়ে পড়ত। তার সর্ব্ব-অবয়বে গভীর লজ্জা ও গোপন-পুলকের বিচিত্র সংমিশ্রণে একটি অপরূপ-সৌন্দর্য্যশ্রী উদ্ভাষিত হ'য়ে উঠত।

সুভা দেখত স্বামীরও চোখেমুখে সলজ্জ গভীর আবেশের ছায়া!···নয়নের দৃষ্টি,—অধরের হাসি—তার অন্তরলোকের মধু-রজনীর বসন্ত-উৎসবের আভাস বাইরে এনে দিত।···

মনে হ'ত সে যেন মাদক পান করেছে।···চোখেমুখে তারই গোলাপী-নেশা জড়িয়ে আছে!···

সুভা ভাবত সে'ও তো তার নবযৌবন-প্রভাতে স্বামীর পাশেই ছিল। কিন্তু কোনও দিন তো স্বামীর নয়নে এ' স্বপ্ন-বিহ্বলতা দেখতে পায়নি!···

চিত্রা পান সাজত—নন্দ তার পাশ দিয়ে চলে' যেতে যেতে চট্ করে' অবগুণ্ঠনটা খসিয়ে দিয়ে কবরীর একটা কাঁটা খুলে দিয়ে চলে' যেত!

চিত্রার সুগৌর মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠত। কপট-ক্রোধে স্বামীর প্রতি ভ্রূকুটি করে—কিন্তু দৃষ্টিতে সপ্রেম-হাসি উৎসারিত হ'য়ে আসত। অকারণ-প্রয়োজনের মিথ্যা-ছলে নন্দ কতবারই না অন্দরের ভিতরে আনা-গোনা করত।

তার শ্রবণ যেন সর্ব্বদা উৎকর্ণ—দৃষ্টি যেন সদাই উন্মুখ চঞ্চল—

কা'র জন্য?

দূর হ'তে হয়তো চিত্রার সঙ্গে এক নিমেষের তরে চোখা-চোখি হ'ত, উভয়েরই মুখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে যেত।

সুভার সাম্‌নে কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে ধরা পড়ে' গেলে উভয়েই রাঙা হ'য়ে উঠত। অপরাধীর মত অপ্রতিভ মুখে দু' জনে দু' দিকে সরে' যেত।

সুভা অন্যমনস্ক চিত্তে ভাবত—সে তো কখনও নন্দকে দেখে অমনতর আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠেনি! কারুর সাম্‌নে ধরা পড়লে মধুর লজ্জায় অমনতর রাঙা হ'য়ে ওঠেনি!······

অবগুণ্ঠনের আড়ালে থেকে সবাইকে লুকিয়ে চুরি করে' স্বামীকে দেখার গোপন পুলকের স্বাদ কেমন,—তা তো সে কখনও জানতে পায়নি!

সে তার স্বামীকে পেয়েছে—দ্বিপ্রহরের অনাবৃত প্রখর আলোয়—সহস্র মানবের দৃষ্টির সাম্‌নে। সেক্ষণের আলোর দীপ্তি যতই থাকুক্ মাধুর্য্য কিছু নেই।

উষার আলো-ছায়ার লুকোচুরির মধ্যে যখন সহস্র বর্ণের বিচিত্র লীলা—সে লগ্নে সবার প্রখর দৃষ্টির অন্তরালে নির্জ্জনে স্বামীকে পেয়েছে চিত্রা!

চিত্রা হ'তে সে তার অনাস্বাদিত মাতৃজীবনের রসাস্বাদন করতে পাবে, এই প্রলোভনেই চিত্রাকে স্বেচ্ছায় এবং একপ্রকার সাগ্রহেই সপত্নী করেছিল সুভা। কিন্তু চিত্রা এ কী অনাস্বাদিত জীবনের তৃষা জাগিয়ে তুললে তার!···যা' তার 'মা' হওয়ার সাধের চেয়েও আজ বড় হ'তে চাইছে!—যা' তার ইহজন্মে পূর্ণ হয়নি হবে না এবং হ'তে পারেই না।

সুভা নিঃশব্দ-বেদনায় শরাহত পাখীর মত আপনার মর্ম্ম-কোটরের মধ্যে ছটফট করত!···অভিমানক্ষুব্ধ আঁখি মেলে চারিদিকে অসহায়ভাবে তাকাত। মনে হ'ত তাকে 'আপনার' বলে' একান্তভাবে কাছে টেনে নেবার কেউ নেই।

নিজেই মনে মনে ভাবত—সতীনের প্রতি ঈর্ষার জ্বালা হয়তো একেই বলে। এইই হয়তো হিংসা বিষ! সুভা ভয়ে আপনা আপনি চোখ বুজত।

কায়মনোচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করত—হে ভগবান! আমি আর 'মা' হ'তে চাই না। আর ছেলেও চাই না,—স্বামীও চাই না। আমাকে পাপ হ'তে বাঁচাও,—নীচতা হ'তে রক্ষা কর, প্রভু!···

তোমার সু-দর্শনচক্রে আমার দৃষ্টিতে সু-দর্শন এনে দাও,—আমার মর্ম্মে সু-দর্শন দান কর—

…আমার অন্তরের তৃষ্ণা চিত্রা ও চিত্রারই স্বামীর মধ্যে তৃপ্ত হ'য়ে অমৃত সৃষ্টি করুক। ঈর্ষার অনলে যেন বিষ হ'য়ে না ওঠে! আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর দয়াময়—

… … …

নব-বিবাহের প্রথম বিহ্বলতার ঘোর কেটে এলে নন্দলালের মগ্ন চৈতন্যের তলদেশ হ'তে চিরসঙ্গিনী সুভা আবার ধীরে ধীরে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

নন্দলাল গভীর লজ্জায় দুঃখে বিবেকের তাড়নায় কাতর হ'য়ে উঠ্‌ল। তাদের এই দীর্ঘকালের সম্বন্ধকে এমন করে' অপমান করার লজ্জায় সে ভেঙে পড়্‌ল।

তার এই নিদারুণ লজ্জা ক্ষোভ ও বেদনা, প্রবল-অভিমানের রূপ ধরে' সুভাষিণীর উপরে গিয়ে পড়্‌ল। নিজের মনের দুর্ব্বলতাটাকে সে নিজের কাছেও স্বীকার কর্‌তে চাইত না। যেন তার স্বামীধর্ম্ম হ'তে চ্যুতিটা সমস্তই অপরের দোষ।

নন্দলাল ক্ষুব্ধ-অভিমানে বল্‌লে—তুমিই তো এ'র জন্য দায়ী!…

সুভা বিনা-তর্কে নিঃশব্দে স্বামীর অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিলে। অনেক কথা বল্‌তে পার্‌ত, কিন্তু কিছুই বল্‌লে না।

নন্দলাল বল্‌লে—যদি সত্যিই তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাস্‌তে,—বা স্বামীকেই একান্তভাবে চাইতে,—তা'হ'লে এমন করে অনায়াসে নিজের স্বামীকে 'পর'কে বিলিয়ে দিতে কখনো পার্‌তে না!—

সুভা বেদনা-বিবর্ণ মুখে নতনেত্রে চুপ করে' ভাব্‌তে লাগ্‌ল। স্বামীর ভয়ঙ্কর-অভিযোগের প্রতিবাদ কর্‌লে না।

অভিমানভরে নন্দ আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—স্বামীর প্রতি প্রেম না থাক্‌—কর্ত্তব্যও কি একটু থাক্‌তে নেই?… স্বামীর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে—নিজের অতৃপ্তসাধ পূর্ণ ক'র্‌বার জন্য তাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করা—স্বামী-ধর্ম্ম হ'তে স্খলিত করা—এটা কি ভাল করেছ?…

সুভা পাংশুমুখে বল্‌লে—ও' সব তুমি কী বোল্‌চো!… নন্দলাল চাপা কান্নার সুরে গর্জ্জে উঠে বলে' উঠ্‌ল—তুমি ছেলের লোভে চিত্রার কাছে স্বামীকে বিক্রী করনি?

সুভার সমস্ত মুখে কে যেন লজ্জার ও অপমানের নীলকালি লেপে দিলে। দু'হাতে মুখ ঢেকে সুভা আর্দ্রস্বরে ব'লে উঠ্‌ল—ওগো, চুপ কর। তার শাস্তি পেয়েছি। বিশ্বাস কর তুমি!

নন্দলাল শুষ্ক করুণ হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ সব দিক্ দিয়ে ঠক্‌লে তুমিই।

সুভা নন্দর বুকের কাছটিতে নিজের মাথাখানি নত করে' ছুঁইয়ে বল্‌লে—

না, না, চিত্রা ত শুধু আমার স্বামী কেড়ে নেয়নি—সে যে তোমায় নতুন ক'রে পেতে শিখিয়ে দিয়েছে।

মহিলা-সংবাদ

গত মাসে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বি-এ পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রীদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন রায়ের কন্যা শ্রীমতী লীলা রায় বি-এতে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, এ সংবাদও আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন। শ্রীমতী লীলা ইতি-পূর্ব্বে অন্যান্য পরীক্ষাতেও বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৯২৬ সালের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সেই-বার তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যা (Botany) বিষয়ের পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন। প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট উভয় পরীক্ষাতেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরীর তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুজাতা দেবী দিল্লীর লেডি হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম্, বি, বি, এস, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনিই আসামের সর্ব্বপ্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট চিকিৎসক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আসাম গবর্ণমেণ্ট শিক্ষালাভের জন্য কিছুতেই ইঁহাকে বৃত্তি দিতে রাজী হন নাই।

আমেরিকা হইতে শ্রীমতী রাগিণী দেবী আমাদিগের নিকট দুইজন আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়া ছাত্রীর কৃতিত্বের বিবরণ পাঠাইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বোম্বাইএর শ্রীমতী আনন্দীবাঈ যোশী আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের ভাসার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সামাজিক

হিতসাধন সম্পর্কিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু নারীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী হইলেন। ভাসার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি একটি বৃত্তিলাভ করেন ও তৎপরে সাইমনস্ কলেজ ও বোষ্টন হাউসে হাতেকলমে সামাজিক হিতসাধনমূলক কার্য্য শিক্ষা করেন। শ্রীমতী আনন্দীবাঈ-এর পিতা শ্রীযুক্ত এস. এল, যোশী ১৯০২ সালে একটি মিশনারী কলেজে চাকুরী পাইবার আশায় সপরিবারে আমেরিকায় আসেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার ভাগ্যে চাকুরীটি জুটিল না। বিদেশে কর্ম্মহীন হইয়া তিনি দারুণ বিপদে পড়িলেন। এই সময়ে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ. এম্ উপাধি লাভ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অর্থকষ্ট কাটিল না। এমন সময় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ লো ও শ্রীমতী কার্পেণ্টার নাম্নী একজন আমেরিকান মহিলা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের গৃহেই কুমারী আনন্দীবাঈএর জন্ম হয়। কিছু দিন পরে শ্রীযুক্ত যোশী বরোদা কলেজের অধ্যাপক হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। বরোদায় কিছু দিন অধ্যাপনা করিবার পর তিনি পুনরায় কার্ণেগী-বৃত্তি লাভ করিয়া আমেরিকায় যান। বর্ত্তমানে তিনি আমেরিকায় ডার্টমাউথ কলেজে হিন্দুদর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমতী যোশী কিছু দিন য়ুরোপের সমাজ হিতসাধন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়া বোম্বাইএ আসিয়া কর্ম্মে ব্রতী হইবেন। তাঁহার বিদ্যালয়ের সহপাঠিনীরা তাঁহাকে এই কার্য্যের জন্য ৫ শত টাকা উপহার দিয়াছেন।

শ্রীমতী লীলা রায়

আহমেদাবাদের শ্রীমতী প্রামুজম ঠাকুরও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কুমারী ঠাকুর কলম্বিয়া শিক্ষক কলেজ হইতে বি-এস্ উপাধি লইয়া বর্ত্তমানে এম্-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমেরিকায় আসিবার পূর্ব্বে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের

শ্রীমতী আনন্দীবাঈ যোশী

শ্রীমতী প্রানুভম ঠাকুর

বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেখান হইতে সাংবাদিকের কার্য্য শিক্ষার পারদর্শিতায় জন্যও উপাধি পান। তৎপর তিনি য়ুরোপের নানা শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া একটি বৃত্তি লইয়া কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তাঁহার বাগ্মীতাশক্তিও অসাধারণ এবং ইতিমধ্যেই তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ভারতে আসিয়া পল্লীশিক্ষার উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন।

গত আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর থ্যাকারসে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে স্যার দামোদর থ্যাকারসে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। দাতার নাম স্যার ভিঠলদাস দামোদর থ্যাকারসে হইবে।
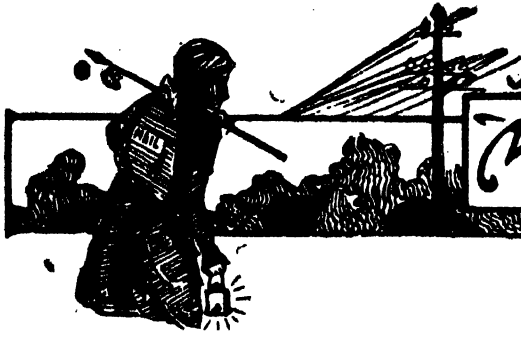
বিদেশ

মেরুঅভিযানকারী অধ্যাপক ম্যালম্‌গ্রেন্—

*ইতিপূর্ব্বে আমরা বিখ্যাত মেরু-পর্যটক আমুন্‌সেনের নিরুদ্দেশের (?) সংবাদ দিয়াছি। উত্তরমেরুর যাত্রী "ইটালিয়ার" আর একজন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ম্যালম্‌গ্রেন্‌ও এই অভিযানে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যুকাহিনী সম্পর্কিত অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিলাম—

সোভিয়েট পোত "ক্রাশিন্" বেতার যোগে অধ্যাপক ম্যালম্‌গ্রেনের মেরু-প্রদেশে মৃত্যুর এক রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ৩০শে মে তারিখে ম্যারিয়ানো, জাপি ও ম্যালম্‌গ্রেন কেপ নর্থে পৌঁছিবার জন্য যাত্রা করেন এবং সঙ্গে একমাসের খাবার লন। ম্যালম্‌গ্রেনের একখানি হাত ইতিপূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই ভাঙ্গা হাত লইয়াই তিনি একটি ভল্লুককে হত্যা করেন। ভাসমান বরফ তাঁহাদিগকে নিয়তই বিপথে লইয়া যাইতে থাকে, ১৬ই জুন ম্যালম্‌গ্রেন অধিকদূর যাইতে অসমর্থ হন এবং তিনি তাঁহার সহযাত্রী জাপ্পী ও ম্যারিয়ানোকে একটি কবর খনন করিয়া দিতে বলেন। তাহাদিগকে তিনি তাঁহার খাদ্য ও কম্পাস প্রভৃতি দেন।

ইহার পর ২৪ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়া যায় এবং এই সময়ের মধ্যে জাপ্পী ও ম্যারিয়ানো মাত্র ১০০ গজ যাইতে পারিয়াছিলেন। এই সময় দেখা যায় যে ম্যালম্‌গ্রেন কবর হইতে মাথা, তুলিয়া উহাদিগকে বলিতেছেন "তোমরা চলিয়া যাও, আমার জীবন বিনিময়ে তোমরা অন্যের জীবনরক্ষা করিতে পারিবে।"

এই প্রকারে অধ্যাপক স্বেচ্ছায় নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেন। সঙ্গী দুইজন পরে উদ্ধার পান।

"ইটালীয়া" ধ্বংস হইয়া গেলে সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পরলোকগত অধ্যাপক ম্যালম্‌গ্রেনের নোট বইটি পাওয়া যায়। বইটির কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। উহার সাঙ্কেতিক লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা হইবে।

ষ্টকহল্‌মের ২৯শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ইটালিয়া অভিযানের জাপ্পী ইটালিয় কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে মেরু অভিযানের মৃত প্রফেসর ম্যালম্‌গ্রেনের মাতার সহিত দেখা করেন ও তাঁহার হাতে প্রফেসরের কম্পাসখানি অর্পণ করেন।

যুদ্ধনিবারণী প্রচেষ্টা—

সভ্যজগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য বহুকাল যাবৎ নানা প্রকার জল্পনা, কল্পনা চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য শক্তিশালী রাজ্যসমূহের মধ্যে যাহাতে ভবিষ্যতে আর কখনও যুদ্ধবিগ্রহ না হয় সেজন্য আমেরিকার মিঃ কেলগ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন অনেক রাষ্ট্র তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। ইংলণ্ড ইতিপূর্ব্বেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। আগামী ২৭শে আগষ্ট তারিখে প্যারিসে উপস্থিত হইবার জন্য ফ্রান্সের অন্যতম মন্ত্রী মসিঁয় ব্রায়াঁ মিঃ কেলগকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রিগণ উপস্থিত হইলে ঐ তারিখে সমর প্রথার বিরুদ্ধে যে অঙ্গীকার-পত্রের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বিবেচিত ও স্বাক্ষরিত হইবে। এই প্রচেষ্টার ফলাফল কতদূর গড়াইবে তাহা কে বলিতে পারে?

মিশর—

বৃটিশরাজ প্রতিষ্ঠিত মিশর-অধিপতি ফুয়াদ মিশরের জাতীয় পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য স্থগিত করিয়া রাজ্যশাসনে স্বৈরাচার অবলম্বন করিয়াছেন।

পার্লামেণ্টের সভ্যগণ যাহাতে সভাসমিতি করিতে না পারে সেই মর্ম্মে এক নিষেধাজ্ঞাও জারী হয়। কিন্তু এই আদেশ অমান্য করিয়া ওয়াফ্‌দ্ দলের ২০০ প্রতিনিধি গভর্ণমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া এক সভা করেন এবং প্রস্তাব পাশ করেন যে, পার্লামেণ্ট এখনও আছে এবং ইহা ভঙ্গ করা বে-আইনী। সভার পর সকল সভ্য শপথ করেন যে, তাঁহারা প্রাণপাত করিয়াও কনষ্টিটিউসন রক্ষা করিবেন।

মিশরের জাতীয় বীর জগলুল পাশার আদর্শের এই অবমাননায় তাঁহার পত্নী, মিশরের অধিবাসিগণকে আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামী পরলোকগত হইলেও তাঁহার আত্মা তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান; তাঁহাদের কর্ত্তব্য সেই আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করা।

চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার—

চীনের জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত জাতীয় অর্থ সম্মেলনের অধিবেশন সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। এই সম্মিলন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তনের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন:—

(১) সৈন্যসংখ্যা ৫ লক্ষের মধ্যে রাখা; (২) ব্যাঙ্কনোট বাহির করিবার পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাঙ্ক, কৃষি, শ্রমশিল্প ও এক্সচাঞ্জ ব্যাঙ্ক সমূহ স্থাপন; (৩) ১ শিলিং মূল্যের চীনামুদ্রা তুলিয়া দিয়া যাবৎ স্বর্ণমান প্রবর্ত্তিত না হয় তাবৎ ডলার মুদ্রাকে চলতি স্বরূপ গ্রহণ করা; (৪) ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে "টেরিফওয়াল" বা মাল চলাচলের কর রহিত করা; (৫) আয়কর এবং বংশানুক্রমিক সম্পত্তি অধিকারের কর প্রবর্ত্তন।

আধুনিকতম নীতিসমূহের উপর এই সংস্কার প্রস্তাবগুলি স্থাপিত

হইয়াছে। শুল্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে একটি নূতন জাতীয় শুল্ক প্রবর্ত্তিত হইবে। যেখানে দেশীয় জিনিষের উপর কর আছে, সেখানে বিদেশী জিনিষের উপর কর বসান হইবে।

আমেরিকার সহিত চীনের বাণিজ্য সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। জাপানের সহিত এখনও সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই। ইংলণ্ডের সহিতও এই সন্ধিপত্র লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

নবীন আফগানিস্থান—

আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লা এবং রাণী সৌরিয়া তাঁহাদের রাজ্যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী বহুবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। পর্দ্দাপ্রথা দূরীকরণ, ও বহু বিবাহ নিবারণ কল্পে তাঁহারা আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন।

পেশোয়ার হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আফগান-রাণী এবং আফগানীস্থানের রাজপরিবারের মহিলাগণ চিরদিনের জন্য পর্দ্দাত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা রাজধানী কাবুলে রাজপরিবারের বাহিরের লোকের সমক্ষেই অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া প্রকাশ্যভাবে আহারাদি করিয়াছেন। কেবল যে রাণীই অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে বাহির হইয়াছেন এমন নহে, রাজকন্যাগণ এবং অন্যান্য মহিলাগণও পর্দ্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। এই সংবাদ চারিদিকে কম বিস্ময়ের সৃষ্টি করে নাই।

ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আফগানরাণী পারস্যে আসিয়াই যেরূপভাবে পর্দ্দা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বোধ হয় তিনি আবার চিরদিনের জন্য পর্দ্দার অন্তরালে নিজেকে গোপন করিয়া রাখিবেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নাই। তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য মহিলাদিগের সহিত পর্দ্দাকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। আফগানিস্থানের মোল্লারা পর্দ্দা-রহিত প্রথাকে ইসলামের পক্ষে "অবমাননাজনক" মনে করিলেও প্রকাশ্যভাবে রাজার আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইবেন না বলিয়াই মনে হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে মোল্লাদিগের একটি ডেপুটেশন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং রাজপরিবারের মহিলাগণ অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের সমক্ষে বাহির হন বলিয়া রাজার নিকট আক্ষেপ করেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদের সেই পুরাতন জীর্ণ যুক্তিতে বিচলিত হন নাই। রাণী সৌরিয়া আফগানীস্থানে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সমস্ত কাবুল সহরকে ২৫টি ওয়ার্ডে ভাগ করিয়া তিনি প্রত্যেক ওয়ার্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার এক একজন শিক্ষিতা মহিলার হাতে দিয়াছেন। চিকিৎসা রসায়ন এবং অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়া তিনি ২৫টি আফগান বালিকাকে তুরস্কে পাঠাইতেছেন।

—

ভারতবর্ষ

বারদোলি সত্যাগ্রহ—

শ্রীযুক্ত প্যাটেলের নেতৃত্বে বারদোলীর প্রজারা সরকারের অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়া যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, সে যুদ্ধে প্রজারাই জয়ী হইয়াছে। বোম্বাই সরকার সম্প্রতি সন্ধি-সর্ত্তে সম্মত হইয়াছেন। সর্ত্তগুলি এই :—

(১) বর্দ্ধিতহারে খাজনা আদায় এখন স্থগিত থাকিবে।

(২) রাজস্ব বর্দ্ধিত হইতে পারে কি না তাহা উপযুক্তরূপে তদন্ত করা হইবে।

(৩) জমী জমা যাহা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে বা বিক্রীত হইয়াছে তাহা প্রজাদের ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

(৪) সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদ কল্পে যে-সকল প্যাটেল ও তলাটি পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের পুর্ণনিয়োগ হইবে।

(৫) দণ্ডিত প্রজাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

ভূমিহারা হইয়া কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও বারদোলীর কৃষককুল অচল অটল থাকিয়া এই শান্তিময় সংগ্রামে জয়লাভ করিল।

বৃদ্ধা হিন্দু-নারীর সাহস—

দেওয়াস রাজ্যে এক বৃদ্ধা হিন্দু-রমণীর গৃহে তিনটি মুসলমান চুরির অভিপ্রায়ে প্রবেশ করে। বৃদ্ধা টের পাইয়া লাঠি দ্বারা চোরদিগকে প্রহার আরম্ভ করে। ফলে চোরেরা পলায়ন করিয়াছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

সৎসাহস—

ব্রহ্মদেশের মবিন জেলায় উত্তর অঞ্চলের একটি গ্রাম হইতে একজন শত বৎসরের বৃদ্ধের অপূর্ব্ব বীরত্বের সংবাদ আসিয়াছে। একদল ডাকাত বাড়ী আক্রমণ করিলে ঐ বৃদ্ধ তাহার তিনটি কন্যা—ইহাদের কাহারও বয়স ৬০ বৎসরের কম নহে, এবং তাহার পুত্র ও দৌহিত্রকে লইয়া ডাকাতদের সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করে। ডাকাতদের হাতে বন্দুক ছিল, তাহারা বাড়ীর সদর দরজায় একটি গর্ত্ত করে, ঐ সময় বাড়ীর লোকদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। একপক্ষে বাড়ীর লোকেরা দরজার ভিতরকার গর্ত্তের ভিতর দিয়া সড়কী এবং মাছ মারিবার টেঁটা ছুঁড়িয়া ডাকাতদিগকে মারিতে থাকে, অপর পক্ষ ডাকাতেরা বন্দুকের গুলি চালাইতে থাকে। বাড়ীর তিন জন লোক ডাকাতদের দ্বারা জখম হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা সংগ্রাম চালায়, তাহার ফলে ডাকাতেরা খালি হাতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। পরে গ্রামের অন্যান্য লোকেরা আসিয়া আহত ব্যক্তিদিগকে হাঁসপাতালে লইয়া যায়। ব্রহ্মের লাটসাহেব বৃদ্ধের পরিবারবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

উত্তর ভারতে পর্দ্দা প্রথা উচ্ছেদ—

পর্দ্দা-প্রথা উচ্ছেদের জন্য বিহারের বহু নরনারীর স্বাক্ষরিত এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। মহিলা কর্ম্মীরাই এই ব্যাপারে অগ্রণী। প্রত্যেক বড় বড় সহরে এবং উল্লেখযোগ্য স্থানে মহিলারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সভা সমিতি করিতেছেন।

কিছুদিন ধরিয়া পঞ্জাব-অঞ্চলেও নারীজাতির মধ্যে নূতন আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই আন্দোলন শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের জন্য। এই আন্দোলনের বিশেষত্ব এই যে, উত্তর ভারতের মুসলমান মহিলারা যাঁহারা এখনো কঠোর পর্দ্দায় আবদ্ধ তাঁহারাই এই আন্দোলনে অধিকতর উৎসাহী। দিল্লীতে কিছুকাল পূর্ব্বে যে নিখিল ভারতীয় নারীমহাসভা বসিয়াছিল তাহাতে এই উৎসাহ আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। কেবল শিক্ষিত নারীরাই নহে, পরন্তু ঘরের চতুঃসীমার মধ্যে বদ্ধ সাধারণ নারীমাত্রেই শিক্ষা লাভ করিতে নিজেদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়া পাইতে এবং দাস-

দিকের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কঠোর দাবী জানাইতেছে। ইহার এক লক্ষণ দিল্লী বালিকাবিদ্যালয়ে বালিকার সংখ্যাবৃদ্ধি। গত দুই বৎসরের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় চারগুণ বাড়িয়াছে। প্রত্যেক মহল্লার লোকেরা তাহাদের মেয়েদের জন্য বালিকাবিদ্যালয় খুলিবার দাবী জানাইতেছে। দিল্লী মুনিসিপালিটিও এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। মুনিসিপাল বালিকা বিদ্যালয়-গুলির পরিদর্শন এবং নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মুনিসিপালিটি সম্প্রতি একজন লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একজন মুসলমান মহিলা গ্র্যাজুয়েট্।

দিল্লীর প্রধান মুসলমানদের এক ভোজ-সভায় নারীদের স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছিল। একজন প্রাচীন-তন্ত্রের মুসলমান তাহাতে এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ঐ স্বাধীনতার ফল সর্ব্বনাশ। কিন্তু উপস্থিত বেশীর ভাগ লোকেই ঐ মত সমর্থন করেন না। যাহা তুর্কীতে হইয়া গিয়াছে, আফ্‌গানিস্থানে হইতেছে, ভারতে তাহা হইবে না কেন?

পাঞ্জাবের হিন্দু মহিলারাও উন্নতির জন্য উৎসুক ও অধীর। যে দিল্লীর হিন্দু মহিলারা মোগল আমল হইতে কঠোর পর্দ্দা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যেও নূতন প্রেরণা আসিয়াছে। সম্প্রতি হিন্দু ভদ্র মহিলাদের ক্লাবের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। হিন্দু মহিলারাই চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

—বাংলার বাণী

পদব্রজে লক্ষ মাইল—

পাঁচ শত পাউণ্ড পুরস্কারের জন্য উইলিয়ম উলফ ৭ বৎসরের মধ্যে পদব্রজে এক লক্ষ মাইল ভ্রমণে বাহির হইয়া মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছেন। উলফ ১৯২৫ সালে লস এঞ্জেলস হইতে যাত্রা করেন। তিনি এ পর্য্যন্ত ৬৩০০০ হাজার মাইল পর্য্যটন করিয়াছেন। আর তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি পর্যটন শেষ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। তিনি আমেরিকা, কানাডা, হাওয়াই দ্বীপ, দক্ষিণ সাগরের দ্বীপপুঞ্জ, নিউজীল্যাণ্ড, ফিলিপাইন্স, জাপান, ইন্দোচীন, শ্যামরাজ্য, মালয়দ্বীপ এবং সিংহল পর্যটন করিয়া এখানে পৌঁছিয়াছেন। তিনি কয়েকদিন মাদ্রাজে অবস্থান করিবেন। ভারতবর্ষ শেষ করিয়া তিনি পারস্য, তুরস্ক, আরব, রুশিয়া এবং অন্যান্য দেশ পর্য্যটন করিবেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

—

বাংলা

বাংলায় বিধবা বিবাহ—

পাবনা

গত আষাঢ় মাসে সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত চৌহালী থানার অধীন স্থল—দত্তহাটা নিবাসী শ্রীমথুরানাথ প্রামাণিকের ১৫ বৎসর বয়স্কা বালবিধবা কন্যা শ্রীমতী রুক্মিণি দাসীর সহিত কাটারবাড়ী নিবাসী শ্রীপ্রহ্লাদ প্রামাণিকের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

—সমাজ

ঢাকা

ঢাকা হিন্দুসভার উদ্যোগে গত সপ্তাহে কিশোরগঞ্জের বাবু ললিতমোহন পাঞ্জার ১৭ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যাকে ধানকোয়ার বাবু জ্ঞানচন্দ্র সাহার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। এই মেয়েটির বিধবা বড় ভগ্নীকেও এক বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

চট্টগ্রাম

খিতাপচরের ঈশানচন্দ্র শীলের কন্যা শ্রীমতী পাখীর সহিত শামপুরা নিবাসী জগৎ শীলের পুত্র শ্রীমান মনীন্দ্র শীলের হিন্দুমতে যথাশাস্ত্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই কন্যার সহিত মনীন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু বাসি বিবাহের রাত্রেই বর মারা যায়। কন্যাটির বয়স এখন ১১ বৎসর মাত্র।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার গোপালনগর গ্রামের বৈকুণ্ঠ সামন্তর বিধবা কন্যার সহিত পার্ব্বতী গ্রামের শ্রীভূষণচন্দ্র আদকের আষাঢ় মাসে শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। কন্যার বয়স ১১ বৎসর ও পাত্রের বয়স ৩০ বৎসর মাত্র।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে "উন্নতি শান্তি সম্মিলনী" হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর আচার্য্য জানাইয়াছেন—

গত আষাঢ় মাসে ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী ধামাই গ্রামের শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দে'র বিবাহ বয়রা নিবাসী ৺চন্দ্রকুমার নন্দীর বালবিধবা কন্যা সুবর্ণপ্রভার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

লামকাইন নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাচরণ নমদাসের সহিত গাজাটিয়া নিবাসী বালবিধবা শ্রীমতী সুখবালার বিবাহ হইয়াছে।

ঐ মাসে উন্নতি শান্তি সম্মিলনীর উদ্যোগে ও চেষ্টায় জঙ্গলবাড়ী নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়ের সহিত শাহচুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস কর্ম্মকারের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা শ্রীমতী প্রমদাবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

গত আষাঢ় মাস কিশোরগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত বিন্নগাঁও নিবাসী শ্রীহরমোহন গুরুদাসের পুত্র শ্রীপ্যারীমোহন গুরুদাসের সহিত উক্ত মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত বত্রিশ নিবাসী শ্রীগিরিশচন্দ্র গুরুদাসের কন্যা শ্রীমতী যামিনী দাসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

ঐ তারিখেই চর গুলাকিয়া নিবাসী মৃত মদনমোহন তরণীদাসের পুত্র শ্রীরামকমল তরণীদাসের সহিত ঈশ্বরগঞ্জ থানার অন্তর্গত পেচাজিয়া গ্রাম নিবাসী হরেকৃষ্ণ তরণীদাসের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দাসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

—হিন্দু মিশন

রাজসাহী

গত আষাঢ় মাস শনিবার নাটোর মহকুমার অন্তর্গত, বাসুদেবপুর ষ্টেসনের নিকট বৈদ্য বেলঘরিয়া নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ দাসের সহিত, নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত আত্রাই ষ্টেশনের নিকট সাহেবগঞ্জ গ্রামের ৺কেদারনাথ মণ্ডলের ১৮ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা শ্রীমতী রুগিবালা দাসীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বর ও কন্যা জাতিতে মাহিষ্য। বিবাহ হিন্দুমতে হইয়াছে।

—হিন্দুরঞ্জিকা

বাঙলার স্বাস্থ্য—

সরকারী শাসন বিবরণী হইতে ১৯২৬-২৭ সালে বাংলাদেশে কোন্ রোগে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে নীচে তাহা হইতে কতগুলি সংখ্যা তুলিয়া দিলাম।—

শিশুমৃত্যু—(প্রতি হাজারে ১৯৬ জন)	২,৫০,০০০
প্রসূতির মৃত্যু (প্রসবের এক পক্ষ মধ্যে)	৩,২২৮
ম্যালেরিয়ায়—	৪,৫৯,০০০
কালাজ্বরে—	১৪,২৭৫
এন্টেরিক (উদরাময় সহ জ্বর)	৫,৩৬৮
অন্যান্য জ্বরে	৩,৪০০,০০০
বসন্ত	২৫.০০০
ফুসফুসের রোগে	৩০,০০০
আমাশয়ে	২৫,০০০
অন্যান্য উপসর্গে	২০,০০০
সর্পদংশনে ও হিংস্র জন্তুর আক্রমণে	৪,৮৫৯

ইহার মধ্যে অধিকাংশ রোগই চিকিৎসা করিলে সারে।

পাবনা জেলার লোক-মৃত্যু—

পাবনা জেলাবোর্ডের স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্ম্মচারীর লিখিত পাবনা থানার ৩ বৎসরের জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ হইতে দেখা যায়, যত লোক জন্মিয়েছে তদপেক্ষা ৫০০ অধিক লোক প্রতি বৎসর মরিতেছে।

পাবনা জেলার তাড়াশ থানার কয়েকটি ধ্বংসোন্মুখ গ্রামের বিবরণ :—

১। গ্রাম সগুণা, ১৩০১ সনের হিন্দু জনসংখ্যা ১৩০, মুসলমান ১৫০, বর্ত্তমানে হিন্দু ১৭, মুসলমান ১৩৩।

২। গ্রাম বরগাঁও :—১৩০১ সালে হিন্দু ৫২ জন, মুসলমান ৫১০ জন, বর্ত্তমানে হিন্দু ৫, মুসলমান ২২৬।

৩। নবগ্রাম :—১৩০১ সালে হিন্দু ৫৭, মুসলমান ৫০, বর্ত্তমানে হিন্দু ০, মুসলমান ৯।

৪। গ্রাম মাধাইনগর :—১৩০১ সালে হিন্দু ৩২, মুসলমান ৭০। বর্ত্তমানে হিন্দু ১২. মুসলমান ১৯।

৫। গ্রাম নিমগাছি :—১৩০১ সালে হিন্দু ৫২, মুসলমান ৩২, বর্ত্তমানে হিন্দু ৩, মুসলমান ০।

৬। গ্রাম গুড়পেপুল :—১৩০১ সালে হিন্দু ৫, মুসলমান ১৫, বর্ত্তমানে হিন্দু ০, মুসলমান ৫।

৭। গ্রাম হাসন :—১৩০১ সালে হিন্দু ১১০, মুসলমান ২২১, বর্ত্তমানে হিন্দু ০, মুসলমান ৪।

—স্বরাজ

পরলোকে আমীর আলী—

যশস্বখ্যাত ভারতের অন্যতম মুসলমান মাননীয় সৈয়দ আমীর আলীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মহম্মদ মহসীন প্রতিষ্ঠিত হুগলী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সরকারী বৃত্তিলাভ করিয়া তিনি বিলাত গিয়া তথায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে আসিয়া হাইকোর্টে নথন ব্যবহারাজীবের কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, সেই সময়ে তিনি আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া মুসলমান আইন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত মুসলমান আইন সম্বন্ধে গ্রন্থ অদ্যাপি আইন কলেজে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। তিনি কিছুকাল কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারাসনে নিযুক্ত হইয়া প্রথম মুসলমান বিচারপতিরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি একে একে বঙ্গীয় ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের জজ নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী ঐ পদ লাভ করেন নাই। তিনিই মুসলমানদিগের রাজনীতি-ক্ষেত্রের পথ-প্রদর্শক এবং চিরদিন তিনি বাঙ্গালার মুসলমানদিগের উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও প্লাবন—

বাংলার নানা দেশ হইতে দুর্ভিক্ষের করুণ ক্রন্দনের কিছু কিছু সংবাদ আমরা কয়েক মাস ধরিয়া দিতেছি, সম্প্রতি কয়েকটি জেলা হইতে আরও দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়াছি। গত আষাঢ় মাস হইতে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা হইতে বন্যার সংবাদ পাইয়াছি।

হিন্দু মিশনের সভাপতি স্বামী সত্যানন্দ (৭নং বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা) লিখিয়াছেন—

বালুরঘাট অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের তাড়নায় কেহ অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে—কেহ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তান বিক্রয় করিতেছে—কেহ সন্তানসন্ততি-দিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে—কেহ বা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেছে—এ সকল কথা আপনি সংবাদপত্র পাঠে বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন। এই সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্ত নরনারী ও বালকবালিকার মুখে এক মুঠা অন্ন দিবার আংশিক ভার আপনাকে আজ লইতে হইবে। হিন্দুমিশন সেই উদ্দেশ্যে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দুয়ারে উপস্থিত। অন্ন, বস্ত্র, অর্থ—যাহা কিছু সম্ভব দান করিয়া ঐ মরণোন্মুখ হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করুন। দুর্ভিক্ষের অবস্থা এবং সাহায্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে হিন্দুমিশন কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিয়া সবিশেষ অবগত হউন।

পরলোকগত সাহিত্যিক মহেন্দ্রনাথ করণ—

গত ১লা শ্রাবণ মেদিনীপুরের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয় ৪১ বৎসর ৮ মাস বয়সে তাঁর জন্মস্থান তাজপুর গ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নানা দুঃখ-দৈন্যের মাঝে ইনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিখ্যাত ইতিহাস হিজলীর মস্‌নদ্‌ ই আলা, খেজুরী বন্দর ও কসবা হিজলীর বিবরণ তাঁহার গভীর গবেষণার ফল। A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods, ক্ষত্রিয়াকুলপ্রদীপ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকাবলী তাঁহার স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতির পরিচায়ক ; দুর্ভিক্ষের গান, সমাজবেণু, ফুলঝুরি প্রভৃতি ইঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক রহিয়াছে। মহেন্দ্রবাবু নিজ মহকুমায় আজাদবাড়ী করোনেশন মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিজলীর সাহিত্য সমিতি তাঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়। সাধারণের জন্য নিজগৃহে ইনি এক মূল্যবান পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইনি কালীঘাট হইতে প্রকাশিত প্রতিজ্ঞা ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার মাসিকদ্বয়ের সম্পাদক ছিলেন। মান-সম্ভ্রমের মমতা মায়া কাটাইয়া নিভৃতে সহর হইতে বহুদূরে এক পল্লীগৃহে কি করিয়া মাতৃবাণী সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারে তাহা মহেন্দ্রবাবুর জীবনে প্রতিভাত হয়। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন আগামী ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের অবকাশে ইন্দোর সহরে হইবে স্থির হইয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালীর নেতৃস্থানীয় মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্মিলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন এবং নিম্নলিখিত প্রথিতনামা সাহিত্যরথিগণ বিভিন্ন শাখা বিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

১। সাহিত্য শাখা—রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন (কলিকাতা)
২। বৃহত্তর-বাংলা-শাখা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (প্রয়াগ)

[আমাদের প্রবাস-জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাস অথবা কীর্ত্তিকথা সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে, সেগুলি এই শাখায় পঠিত এবং আলোচিত হইবে।]

৩। বিজ্ঞান শাখা—অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীমেঘনাদ সাহা এফ, আর, এস, (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)
৪। দর্শন শাখা—অধ্যাপক শ্রী অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)
৫। ইতিহাস শাখা—অধ্যাপক শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
৬। অর্থনীতি শাখা—অধ্যাপক শ্রী অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত, আই, ই, এস, (নাগপুর)
৭। শিল্প শাখা—অধ্যক্ষ শ্রী হিরণ্ময় রায় চৌধুরী (জয়পুর)
৮। সঙ্গীত শাখা—রায় শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর (ভাগলপুর)
৯। মহিলা শাখা—নির্ব্বাচন এখনও হয় নাই।

ইন্দোরের হোলকার কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

আপন-পর

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(৯)

প্রকাশ হতভম্ব হইয়া গেল। সেই এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার এখন যেন তাহার অন্তরে শিশার মতন ভাবী হইয়া চাপিয়া বসিল। এমন মতিভ্রম তাহার কিরূপে হইল? কোথায় রহিল তাহার সংযম ও তিতীক্ষা? তাহার অন্তর বিকারে ভরিয়া উঠিল—মনে হইল, সে আজ এমন জিনিষ খোয়াইয়া বসিয়াছে যাহা আর মিলিবার নহে।

অডি-কলোন মাথায় দিয়া, স্মেলিং সল্‌ট্ নাকে ধরিয়া সে সুরবালার চৈতন্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিল। সেই দুর্য্যোগের রাত্রে একাকী এই জড় দেহের পার্শ্বে বসিয়া, সুরবালার বিকৃত মুখের উপর অর্দ্ধসমুচ্চ চিত্তের বেদনা প্রকটিত দেখিয়া আশঙ্কায় উদ্বেগে তাহার মন উদ্বেলিত হইতেছিল। কিন্তু কাহাকেও সেখানে ডাকিয়া আনিবে এমন ভরসা তাহার ছিল না। এসব কথা যে কাহারো জানিবার নহে, কাহাকেও জানাইবার নহে। এই নিগূঢ় অন্তর্ব্যাতনা শুধু কেবল তাহাকেই দগ্ধ করিবে, কেহ উহার অংশ লইতে আসিবে না।

চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে উদ্‌ভ্রান্ত নেত্রে সুরবালা একটিবার মাত্র চাহিয়া দেখিল। তাহার মলিন দৃষ্টি বেদনা-কাতর, বুঝি তাহার মধ্যে একটু ভর্ৎসনাও ফুটিয়াছিল। প্রকাশ অধীর হইয়া উঠিল। সে স্বামী, সুরবালা তাহার স্ত্রী। এই স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ প্রজাপতি আপন হাতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, মানুষের অধিকার কি যে তাহা ছিন্ন করিবে? তবে সে এ কি করিতে যাইতেছিল? হত্যা? উঃ—কি ভয়ঙ্কর! তাহার আত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কেমন করিয়া সে এই দারুণ অভিযোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে?

প্রকাশ ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সেখানে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কোন অশরীরী জীবের ক্লেদার্দ্র স্পর্শে তাহার হৃদ্‌পিণ্ড জমিয়া বরফ হইয়া আসিতেছিল। বারান্দায় সে দ্রুত পায়চারি করিতে আরম্ভ করিল। না—না—না! সে কখনো হত্যা করিতে পারে না। এ মুক্তি! সুরবালার মুক্তি, তাহার মুক্তি! ডাক্তারের কথাগুলি কেবলি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মৃত্যুটি সুরবালার একমাত্র বন্ধু। এ কাজ সে শুধু নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়া করে নাই—সুরবালার কথাও সে ভাবিয়াছে। স্বার্থ আর পরার্থ এমন আলাদা করিয়া দেখিবে সে কেন? যে দীর্ঘ যন্ত্রণার কথা ডাক্তার বলিয়াছে তাহা কি এতই তুচ্ছ যে সকল গ্লানি সহ্য করিয়াও তাহার এই নিরর্থক জীবন কোনমতে জিয়াইয়া রাখিতে হইবে?

বারান্দার এক পার্শ্বে কুকুর জো পা দুটা সাম্‌নে বিস্তার

করিয়া মাথা গুঁজিয়া শুইয়া ছিল। এতক্ষণে এই জন্তুটিকে প্রকাশ লক্ষ্য করিল। তাহার চক্ষে আঁধার সহিয়া আসিয়াছিল। কুকুরটির পাশে বসিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া সে ইহার দীর্ঘ লোমগুলি মসৃণ করিতে লাগিল। জো নড়িল না—অসাড়ের মত পড়িয়া রহিল, শুধু মাঝে মাঝে একটা শিহরণ চর্ম্মের উপর দিয়া খেলিয়া যাইতে লাগিল। অন্ধকারে ইহার চোখ-টি জ্যোতিষ্কের মতন জ্বলিতেছিল। প্রকাশের বুক কাঁপিয়া উঠিল। এই জন্তুটিও কি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে? কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়া এই অবোধ জীব তাহার অন্তরের ভাষা বুঝিতে পারিল? শীতল কঠিন শানের উপর শুইয়া সে জোকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। ওরে যে যাহা বলে বলুক—তুই এমন কথা মনেও করিস্ না। তুই যে সকল অবস্থার সাথী, বন্ধু। প্রকাশের চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাপ গ্লানি ভাসিয়া গেল—তাহার অশুচি আত্মা সেই অশ্রুজলে স্নান করিয়া শান্ত হইয়া আসিল। আকাশে তখন প্রভাতের শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আষাঢ়-সিক্ত ভূমির স্পর্শশীতল একটু বায়ু ঝির ঝির করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রকাশ যখন জাগিল তখন বাড়ীর ছাদ ডিঙাইয়া আকাশে সূর্য্য অনেকখানি উঠিয়াছে। বিরাজের কণ্ঠস্বর কানে যাইতে সে উঠিয়া বসিল।

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—কাল রাত্রে যে হোটেলে যাওনি, বাবু? বৌর কি খুব অসুখ করেছিল?

প্রকাশ জবাব দিল না। তাহার অন্তরে গত রাত্রির দৃশ্য ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

বিরাজ কহিল,—রাত্রে ঘুমাওনি বুঝি? ঈস্, চোখ দুটো যে রাঙা হ'য়ে ফুলে উঠেছে। তা বাবু এত কষ্ট করছ—বাড়িতে খবর দিয়ে কাউকে আনালেই ত পার।

প্রকাশের চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

সে বলিল,—আমার কেউ নেই।

বিরাজ কহিল,—কেউ নেই—আহা! ওকি বাবু, কাঁদছ? ছি, পুরুষ মানুষের কি অত উতলা হ'লে চলে? এখন ওঠ বাবু, চান ক'রে দুটি খাবে চল। সে কি? না খেলে শরীর থাকবে কেমন করে'? সে আমি শুনছি না। এই দেখত, ভাগ্যিস্ আমি এসে পড়েছিলাম। বাজার যাচ্ছিলাম—বাইরে থেকে ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাস কর্‌লাম। সে বল্‌লে তুমি ঘুমোচ্ছ। ভাবলাম, কাল রাত্রে খেতে যাও নি, খবরটা নিয়ে যাই। এখন ওঠত বাবু, বেলা হয়েছে—চান করবে চল।

প্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। সারা রাত্রির উত্তেজনার পর অবসাদের ভারে তাহার স্নায়ুগুলি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। টলিতে টলিতে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া দরজার ফাঁক দিয়া সে দেখিল, বিছানার উপর সুরবালা অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে।

স্নান করিয়া প্রকাশ উপরে আসিল না। উঠানে দড়ির উপর পূর্ব্বদিনের একখানি ভিজা কাপড় শুকাইতেছিল, সেটি টানিয়া লইয়া পরিধান করিল।

রান্না ঘরে উনানে আঁচ দিয়া ঝি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, বৌমা এখনো ওঠেনি। পথ্যির সময় হয়েছে। তুল্‌বো কি?

প্রকাশ কিছু বলিল না। ঝি আবার কহিল,—বৌমা ত আর সাগুবার্লি খেতে চায় না, খৈ-দুধ দেব কি?

উত্তরে প্রকাশ যে কি বলিল, ঝি তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে সে দেখিল, প্রকাশ বাহিরে চলিয়া গেছে। বিরাজ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে বিনা পোষাকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—জামা জুতা প'রে এলে না, বাবু?

প্রকাশ কহিল,—না। আজ আমি আফিস যাব না।

—তা বেশ, আফিস গিয়ে কাজ নেই। সারারাত ঘুমোও নি—খেয়ে একটু জিরোও গে।

চলিতে চলিতে প্রকাশ বলিল,—বাজার যাবে বলে-ছিলে। গেলে না যে?

বিরাজ কহিল,—সে যাব'খন। আগে তোমার খাবার ব্যবস্থা ক'রে আসি। আচ্ছা বাবু, কাল যে রাত্রে তুমি খেতে এলে না—সে বুঝি রামঠাকুরের তাগাদার জ্বালায়?

যখন বন্যার প্লাবন আসিয়া পড়ে তখন আমরা ছোট-খাট বাদলদিনের সামান্য অসুবিধার কথা ভুলিয়া যাই। রামঠাকুরের পাওনা টাকা এখনো সে পরিষ্কার করিতে পারে নাই, সেজন্য কালও তাহাকে কথা শু'নতে হইয়াছে। এক্ষণে তাহা মনে করিতে সঙ্কোচের সহিত সে কহিল,—না, বিরাজ। এখনো টাকার জোগাড় ক'রে উঠতে পারি নি।

—কাজ কি বাবু বাকি বকেয়া রেখে? তুমি বরং এই টাকা কটি রামঠাকুরকে দিও—বলিয়া বিরাজ তাহার হাতে কয়েকখানা নোট গুঁজিয়া দিল।

প্রকাশ অবাক হইয়া গেল। তাহার চোখ দুটি আবার জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। আঙুল দিয়া নোটগুলি নাড়িতে নাড়িতে সে কহিল,—আমার চারিদিকে দেনা। এ টাকা যদি আর দিয়ে উঠ্‌তে না পারি?

বিরাজ হাসিয়া উঠিল,—আমি কি বলেছি, বাবু, ও টাকা আমায় ফিরিয়ে দিতেই হ'বে?

—তা হয় না, বিরাজ। তোমার টাকা আমি নেব না।

—কেন ?—বিরাজের মুখ আঁধার হইয়া উঠিয়াছিল।

—না।

স্থিরদৃষ্টিতে বিরাজ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। প্রকাশ কহিল,—বিরাজ, জগতের সকলকে ঠকাতে পারি, কিন্তু তোমায় পারবো না। তুমি আমায় মাপ কর।

কিছু না বলিয়া বিরাজ টাকা কয়টি তুলিয়া লইল। নিদারুণ বেদনায় তাহার অন্তর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল।

তাহারা হোটেলে আসিয়া পৌছিয়াছিল। কোন মতে প্রকাশের জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করিয়া নিজের ছোট ঘরখানির ভিতর আসিয়া বিরাজ মেজের উপর আছড়িয়া পড়িল। একটা গভীর ধিক্কার উঠিয়া তাহার বুকখানা যেন খান খান করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। একি অবিমৃষ্যকারিতার কাজ করিয়া বসিয়াছে সে আজ ? তাহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উপার্জ্জন লইয়া কিরূপে সে আজ প্রকাশের হাতে তুলিয়া দিতে সাহস করিল ? সমীচীন সীমা অতিক্রম করিয়া সে যাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রকাশ তাহা গ্রহণ করিল কৈ ? এই একটি আঘাত চোক রাঙ্গাইয়া এখন যেন তাহাকে আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে আনিয়া বসাইয়া দিল।

—বিরাজ !

আহারান্তে প্রকাশ দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে মেজের উপর এমন লুণ্ঠিত দেখিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ে তাহার চোখ দুটি ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—ওকি বিরাজ ? কি হয়েচে ?

—কিছু নয়।

প্রকাশ ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল।

—টাকা দাও। আমি নেব।

বিরাজ চমকিয়া উঠিল,—না না, ও টাকা আমি তোমায় দিতে পারব না।

—কেন ?

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন বিরাজের কণ্ঠরোধ করিতেছিল। কম্পিতস্বরে সে কহিল,—টাকা নাওনি ভালই করেছ, বাবু। এখন বুঝেছি—আমার মস্ত দোষ হইয়াছিল।

—কিসের দোষ ?

—সে কথা আমি তোমায় বলতে পারি না, বাবু।

ক্ষণকাল প্রকাশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল,—তোমার অপরাধ কি তা জানি না। কিন্তু এটুকু জেনে রেখ যে, সে অপরাধ যত বড়ই হোক তার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধের বোঝা আর একজন ব'য়ে বেড়াচ্ছে।

বিরাজ কি বুঝিল জানি না; বিস্মিত দৃষ্টি প্রকাশের মুখের পানে নিবদ্ধ করিয়া বিরাজ কহিল,—সে কে, বাবু ? তুমি ? না না, এ হ'তেই পারে না।

প্রকাশ হাসিল। বলিল,—এত সহজে কাউকে বিশ্বাস ক'রে বস না বিরাজ।

—না বাবু। এমন কিছু দোষ তুমি করতে পার না।

—শুনবে তবে ?

—না আমি কিছুই শুনতে চাই না।

সে হবে না বিরাজ। অতবড় একটা ভুল বিশ্বাস আমি তোমায় কখনো রাখতে দেব না।

ব্যথিত করুণ কণ্ঠে কহিল,—আমি ত এসব কিছুই শুনতে চাই না বাবু—কেন বলছ ? সকলেরই হয়ত এক একটি ভুল হ'য়ে গেছে। সে কথা বলে লাভ কি ?

মুহূর্ত্তকাল প্রকাশ চিন্তা করিল। তারপর কহিল,—সে কথা ঠিক, বিরাজ। জীবনে আমাদের সকলেরই হয়ত মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে। হয়ত যতকাল বেঁচে আছি, সেই ভুলের প্যাঁচের ভিতর আটকে থাকতে হবে। তাই বলি ভুলটাকে জীয়ন্ত ক'রে চোখের সামনে ধ'রে রেখে ফল কি ? আর এই ভুলের জন্য সব সময়ই কি আমরা দায়ী ?

হঠাৎ দরজা দিয়া লম্বা ছায়া ঘরের ভিতর বিস্তৃত হইয়া পড়াতে, উভয়ে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, দুই হাতে চৌকাঠ দুটি ধরিয়া দরজার উপর যাচনদার রামু ঘোষ দাঁড়াইয়া।

দুটো পান খুঁজতে এসেছিলাম। তা—হুম—যাচ্ছি। তাহার চোকে মুখে কৌতুক ও শ্লেষ ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল।

সে চলিয়া গেল।

কিছুকাল দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অকস্মাৎ এই লোকটির আবির্ভাবে তাহাদের চিন্তার সূত্রগুলি জট পাকাইয়া গিয়াছিল।

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—কোথা যাচ্ছ ?

—যাই ঢের কাজ আছে। বলিয়া বিরাজ বাহির হইয়া গেল।

(১০)

কিছুদিন প্রকাশ সুরবালার কাছে আসিতে সাহস করিল না। নিশাচর পক্ষী যেমন গাছের অন্ধকারে শাখা-পল্লব মধ্যে নিঃশব্দে চোক মুদিয়া থাকে, তেমনি গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে সে আনাগোনা করিতে লাগিল। একটা অকারণ বিভীষিকা তাহাকে যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। সে বুঝিল না, কেন এমন লুকোচুরি, কেন সে আজ সুরবালার কাছে আপন অপরাধ স্বীকার করিতে পারিতেছে না, কেন সে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতেছে

না—ভুলিয়া যাও এই একটি দিনের দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্নের স্মৃতি কে কবে মন-মন্দিরে আঁকিয়া রাখে? প্রতিদিন সে আপিস হইতে এই সংকল্প করিয়া ফিরিত যে, আজ সে যেমন করিয়া হোক অন্তরের কথা জানাইয়া দিবে। কিন্তু সন্ধ্যার অপ্রচুর আলোকে সে যেমন সুরবালার কাছে গিয়া দাঁড়াইত অমনি কোথা হইতে কাপুরুষোচিত ভীরুতা আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিত। বলিতে গিয়া সে পিছাইয়া আসিত, আর বলা হইত না।

সেদিনকার কথা সুরবালা একটিবারও মুখে আনিল না। সে যে এই সন্তপ্ত মনুষ্যটির আড়ষ্ট সঙ্কোচ লক্ষ্য করিল না, এমন নহে। কিন্তু তাহার মনে তখন দুরন্ত অভিমান গুমরিয়া উঠিতেছিল। তাহার দুঃখ হইল এই ভাবিয়া যে-স্বামী হইয়া সে তাহার মুখে স্বহস্তে বিষ তুলিয়া ধরিয়াছে! এ কি সেই স্বামী যে একদিন সমাজের অবিচার হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে বিবাহ করিতে সাহস করিয়াছিল? এখন আর এ কথা তাহার কাছে গোপন রহিল না, যে, সে একটা মস্ত অন্তরায়, বোঝার মত স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তবে সে কোন্ লজ্জায় এখনো বাঁচিয়া? একবার মনে হইল, সে দিন যে বিষ সে স্বেচ্ছায় সেবন করিতে গিয়াছিল আজ তাহা আবার টানিয়া হইয়া পান করে, কিন্তু মুহূর্ত্তের প্রবল উত্তেজনায় তখন এক নির্ভীক সাহস তাহার অন্তর অধিকার করিয়াছিল, এখনকার অবসন্ন জড়তার মধ্যে সে-শক্তি তাহার ছিল না।

আশ্চর্য্য এই যে, পরস্পরের প্রতি একটু গোপন সমবেদনা তখনো তাহারা অনুভব করিতেছিল। প্রকাশ জানিত, সুরবালা বাঁচিয়া আছে শুধু তাহারি মুখ পানে চাহিয়া—সেই তাহার সর্ব্বস্ব, তাই না এত অভিমান? সুরবালা জানিত, এই যে সাহসী পুরুষ দৈবের সহিত চিরদিন যুঝিয়া আসিতেছে, সে ত নিষ্ঠুর নহে! এই রূপে দুজন দুজনকে বুঝিয়াছিল, কিন্তু তবু তাহাদের মনে হইত যেন এ ব্যাপারের কোন মীমাংসা নাই। পরস্পরের সান্নিধ্য তাহার শাস্তি বলিয়া বোধ হইত—অতীতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন অবস্থার আবেষ্টনে আবার নূতন করিয়া জড়াইতে তাহারা যেন অধীর হইয়া উঠিল।

একদিন ভোরে শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রকাশ শুনিল, কে ডাকিতেছে—প্রকাশ, বাড়ী আছ?

প্রকাশ উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল নীচে বীরুদা ও চন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া।

—আরে কে ও, বীরুদা'? চন্দ্রনাথ যে! এস এস'।—তারপর নিদ্রিতা সুরবালাকে জাগাইয়া সে কহিল, শুনছ? চন্দ্রনাথ এসেছে।

শুনিয়া সুরবালা চুপ করিয়া রহিল, কিছু বলিল না।

নীচে নামিয়া প্রকাশ তাহাদের উপরে লইয়া আসিল।

বীরুদা' কহিল,—তোমার শ্বশুর আগেই বোধ করি লিখেছিলেন যে চন্দ্রনাথকে পাঠাবেন। এতদিন পাঠাবার সুবিধা হয় নি। আমারও ভাই আসার ঠিক ছিল না। কাল হঠাৎ স্থির ক'রেই বেরিয়ে পড়লাম—তারপর বৌমার খবর কি? সেই এক রকম? তাই ত!

বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া তাহাকে বসিতে দিয়া প্রকাশ দণ্ডায়মান চন্দ্রনাথের স্কন্ধে হাত রাখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—কি রে চন্দ্র, তুই যে মস্ত মরদ হ'য়ে উঠেছিস।

চন্দ্রনাথ হাসিল।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—তোদের নতুন বাড়ী কেমন হ'ল রে? নতুন গ্রামে এসে তোদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?

চন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়িল। বীরুদা কহিল,—সকলের যে অবস্থা ওদেরও তাই। পৈত্রিক ঘর-বাড়ীর মায়া কি কেউ কখনো সহজে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে?

প্রকাশ দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল। তারপর চন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া বলিল,—আয় চন্দ্র। তোর দিদির কাছে যাবি চল।

—ওগো এই দ্যাখ, চন্দ্রনাথ এসেছে। এই বলিয়া সুরবালার কাছে চন্দ্রনাথকে বসাইয়া দিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

—তারপর বীরুদা, আর সকলের খবর কি?

বীরু গ্রামের সংবাদ বলিল। বাঁড়ুয্যে মশায়ের শক্ত ব্যারাম, বাঁচেন কি না সন্দেহ। শুনিয়া প্রকাশ দুঃখ প্রকাশ করিল। এই বৃদ্ধ তাহার পরম শুভানুধ্যায়ী—সুরবালাকে বিবাহ করিতে গোটা গ্রামের ভিতর একা সেই তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল!

এইরূপ দুই চারিটা কথা-বার্ত্তার পর বীরুদা উঠিয়া দাঁড়াইল—ও কি উঠ্‌লে যে?

—ভবানীপুর চললাম। এ ক' দিন সেখানেই থাক্‌বো। জান ত ভাই, দেশের লোকজন না দেখ্‌লে আমাদের প্রাণ আইঢাই কর্‌তে থাকে।

—আমি কি আর এখন তোমাদের দেশের লোক নই, বীরুদা?

—বাঃ, তুমি দেশের লোক বৈকি। তবে কি জান, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ। দু চার বছর অন্তর একবার কলকাতায় আসি। একটু আমোদ-আহ্লাদ চাই ত। তুমি ত খেয়ে-দেয়ে আপিসে বেরুবে। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল,—এখানে ক' দিন থাক্‌বে।

বীরু কহিল,—দিন সাতেক। তোমার শ্বশুর চন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে ব'লে দিয়েচেন।

সে চলিয়া গেলে প্রকাশ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ভাই-বোনে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। আজ বহুদিন পর সুরবালা প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া কথা কহিল।

যথা সময়ে স্নান করিয়া প্রকাশ চন্দ্রনাথকে হোটেলে লইয়া চলিল। পথে চন্দ্রনাথ কহিল,—জামাইবাবু, দাদা বাড়ী এসেছিল।

—কে! ইন্দ্রনাথ?

—হঁ্যা, জামাইবাবু। পুলিস তাকে আবার ধ'রে নিয়ে গেছে।

প্রকাশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তারপর কহিল,—এ কথা তোর দিদির কাছে বলিস নি ত?

—না।

—সেই ভাল। ও কথা তাকে জানিয়ে কাজ নেই। মনে কষ্ট পাবে।

তাহারা হোটেলে আসিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রনাথকে দেখিয়া বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল,—এ ছেলেটি কে, বাবু?

প্রকাশ কহিল—আমার শালা।

বিরাজ বলিল,—ওমা তাও ত বটে। মুখখানি ঠিক দিদির মত। চন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—কখনো বিদেশে বেরোও নি বুঝি? তাহ'লে ত তোমার ভারি কষ্ট হবে হোটেলে খেতে।

প্রকাশ কহিল,—না। কষ্ট আর কি?

—কষ্ট নয়? বল কি, বাবু? প্রথম প্রথম তোমারই কি কষ্ট কম হ'ত? একটু বস বাবু, আমি এখনি আস্‌চি। বলিয়া বিরাজ বাহিরে চলিয়া গেল, এবং দোকান হইতে মাখন ও দধি কিনিয়া ফিরিয়া আসিল।

—এতেই ওর বেশ খাওয়া হবে,—এই বলিয়া প্রকাশ পকেট হইতে কয়েক আনা পয়সা বাহির করিয়া হাত বাড়াইয়া ধরিল।

বিরাজ হাসিয়া কহিল,—তাড়াতাড়ি কিসের, বাবু? এখন রাখ—দেখ্‌ছ না, আমার হাত জোড়া?

প্রকাশ আর কিছু বলিল না, পয়সা ক'টি পকেটে রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যাকালে আপিস হইতে ফিরিয়া জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে প্রকাশ কহিল,—চন্দ্র, কাল যাদুঘর আর চিড়িয়াখানা দেখতে যাবি?

চন্দ্রনাথ সুরবালার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল বলিল, হ্যাঁ দিদি, যাব?

সুরবালা কহিল, যা না।

—কিন্তু তুমি একলা থাক্‌বে যে?

—তা হোক, আমার কোন কষ্ট হবে না।

প্রকাশের দিকে ফিরিয়া চন্দ্রনাথ কহিল,—তোমায় সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু মুখুয্যে মশায়।

হাসিয়া প্রকাশ কহিল,—তোকে একলা দেখে আস্‌তে কে বলেছে। কাল আমার ছুটি আছে, আমি তোকে দেখিয়ে নিয়ে আস্‌বো।

পরদিন আহারাদির পর সে চন্দ্রনাথকে লইয়া বাহির হইল। সারাদিন তাহারা নানা স্থান দেখিয়া বেড়াইল। যাদুঘর, চৌরঙ্গির দোকান, গড়ের মাঠ, হগ সাহেবের বাজার প্রভৃতি ঘুরিয়া শেষে তাহারা ট্রামে চড়িয়া চিড়িয়াখানা দেখিয়া আসিল। চন্দ্রনাথ যাহা দেখিতেছিল, তাহাতেই অবাক। এত দেখিবার জিনিসও এখানে আছে!

ফিরিয়া আসিয়া চন্দ্রনাথের মুখ খুলিয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুরবালার কাছে স্থানগুলির বর্ণনা আরম্ভ করিয়া দিল। ও দিদি, কি চমৎকার দোকান সব, কেমন সাজসজ্জা! গড়ের মাঠে মাটির নীচে না কি কেল্লার দালান! আচ্ছা দিদি, অমন প্রকাণ্ড পাথরের মূর্ত্তিগুলি কি ক'রে সোজা ক'রে বসিয়েচে?—তারপর সে যাদুঘর ও চিড়িয়াখানার বিবরণ এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল।

এই বালকের বিস্ময়-মিশ্রিত হর্ষোচ্ছ্বাস প্রকাশ ও সুরবালা পরমতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতে লাগিল। ইহাদের ভিতরকার ব্যবধান এখন আর তত জটিল, তত দুর্লঙ্ঘ্যও রহিল না। চন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া অবাধে তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

সুরবালা কহিল,—ওগো, চন্দ্রকে একবার পরেশনাথের মন্দির দেখিয়ে এনো।

প্রকাশ কহিল,—আন্‌বো বৈ কি। কবে যাবি চন্দ্র?

চন্দ্র কহিল,—তোমার যে দিন ছুটি হবে।

—আমার আর শিগগির ছুটি নেই, ভাই

সুরবালা কহিল,—কাল যদি একটু সকাল সকাল আপিস থেকে ফিরে আস তাহ'লে সন্ধ্যা বেলা ওকে নিয়ে যেতে পারবে।

প্রকাশ কহিল,—বেশ, তাই হবে।

দেখিতে দেখিতে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। চন্দ্রনাথের যাইবার দিন নিকটে আসিয়া পড়িলে এক দিন সে প্রকাশকে বলিল, মুখুয্যে মশায়, দিদিকে আমাদের সঙ্গে দেশে পাঠাবে?

প্রকাশ গম্ভীর হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল,—একথা জিজ্ঞেস কর্‌তে কে তোকে ব'লে দিয়েচে চন্দ্র? তোর দিদি?

চন্দ্রনাথ ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

প্রকাশ তৎক্ষণাৎ ঘরে আসিয়া সুরবালাকে বলিল,—

যা হ'য়ে গেছে, তার উপর আর হাত নেই। কিন্তু সে কথা ভুলবারও কি কোন উপায় নেই, সুর?

সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—ও কথা কেন তুমি তুলচ? তোমার উপর আমার কোন রাগ থাকতে পারে?

—তা যদি নেই, তবে যেতে চাইছ কেন?

—শোন, সত্যি বলচি। আমি রাগ ক'রে যেতে চাইছি না। কিন্তু তোমার কষ্ট আমি দেখতে পারি না।

প্রকাশ বলিয়া উঠিল—না, না সুর। তোমার যাওয়া হবে না। তোমার চিকিৎসা দরকার। তুমি আরাম হবার আগে আমি তোমায় কোথাও যেতে দিতে পারবো না।

সিন্ধবাদের স্কন্ধে জড় বৃদ্ধের মত এই বোঝাটিকে এখন সে' আর ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না। এই রুগ্না একান্ত নির্ভরশীলা রমণীর প্রতি অপরিসীম করুণায় তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্ত্রীর ক্লেশের অংশ স্বামী হইয়া সে না বহিবে ত বহিবে কে? ক্ষণিক দুর্ব্বলতার মোহে এক দিন সে যদি স্ত্রীকে হত্যা করিতে গিয়াছিল, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত যে তাহাকেই করিতে হইবে। একটা উদার গভীর সহানুভূতির স্পর্শে সে পুলকিত হইয়া উঠিল। এই রুগ্না নারীর ক্লেশ মুক্ত করিতে এখন তাহার অন্তর শতমুখী হইয়া বাহির হইতে চাহিল।

ইহার পর দিনগুলি স্বচ্ছন্দ হইয়া আসিল। পরস্পরের প্রতি অভিযোগ আর তাহাদের মনে ঠাঁই পাইল না। পরোক্ষে অজ্ঞাতসারে সেইদিন হইতে তাহারা যেন জীবনের একটি নূতন সম্বৎ গণিতে আরম্ভ করিল। এই নূতন যুগের প্রাক্কালে দুঃখক্লেশ অভাব অনটনের মধ্যেও প্রকাশ এক সুন্দর লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছিল, এবং আত্মোৎসর্গের এই লক্ষ্যটিকে মনের সমুখে ধরিয়াছিল বলিয়াই অক্লান্তপরিশ্রমে পীড়িতার পরিচর্য্যা করিয়া, তাহার আত্মা অপূর্ব্ব সার্থকতা অনুভব করিতে লাগিল।

সুরবালা বিস্মিত হইল। স্বামীর এত যত্ন, এত আদর সে যে আর কখনো পাইয়াছে, এমন তাহার মনে হইল না, তাহার অনাদৃত বিফল জীবন নিতান্তই অনাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। তাই এখনকার এই সৌভাগ্য তাহার মনমাঝে বিপুল হর্ষের সূচনা করিয়া দিল এবং বুভুক্ষুতার মতই সে স্বামীর সেবাগুলি সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিতে লাগিল। সেদিনকার রাত্রির স্মৃতি তাহার মনে মাঝে-মাঝে যে জাগিয়া উঠিত না, তাহা নহে, কিন্তু তাহারই ভিতর এক পূর্ণতর মিলনের বীজ গোপনে নিহিত ছিল দেখিয়া, সে-বিষও আজ তাহার কাছে অমৃত হইয়া রহিয়া উঠিল।

তাহাদের এই নূতন সেবাভরা স্নেহমাখা জীবনের পথে ধীরে ধীরে আর একজন আসিয়া সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছিল, দু-জনার কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই—বোধ করি বিরাজ নিজেও জানিত না। প্রতিদিন কাজে-অকাজে যখনই সে বাহির হইত তখনি আসিয়া খবর লইয়া যাইত। দুপুরে প্রকাশ আপিসে চলিয়া গেলে বিরাজ রোগিনীর ঘরে তাহার পাশে আসিয়া বসিত এবং সস্নেহে তাহার শীর্ণ আঙুলগুলি মটকাইয়া হাতখানি টিপিতে টিপিতে নানা কথা বলিত। এই দয়ার্দ্রচিত্ত নারীর স্নেহস্পর্শে সুরবালার হৃদয়-কপাট মুক্ত হইয়া যাইত। তখন দু'জনে গল্প জুড়িয়া দিত, কিন্তু তাহাদের সব কথাবার্ত্তাই হইত প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া। বিরাজ বলিত, হোটেলে সকলের পিছনে একধারে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। একদিন ঠাকুর ভুলিয়া মাছ দেয় নাই, তাহা না খাইয়াই সে নিঃশব্দে উঠিয়া পড়িতেছিল, এই নিরীহ ব্যক্তিটির নির্ব্বিকার ব্যবহার প্রথম হইতে তাহার দৃষ্টি এমনই করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। শুনিয়া সুরবালা হাসিত। তারপর সে যখন বলিয়া যাইত তাহাদের বিবাহের ইতিহাস, হঠাৎ একদিন উপযাচক হইয়া কেমন করিয়া প্রকাশ নির্ব্বান্ধব পিতার কাছে তাহার পাণি প্রার্থনা করিল, তখন একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্বের আনন্দ চোখে মুখে বিচ্ছুরিত করিয়া বিরাজ কহিত—তা আর হবে না, দিদি? মাটির মানুষ যে!

কিন্তু যাহাকে লইয়া এত সব তাহাদের আলোচনা সে যদি কখনো হঠাৎ ইহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িত, অমনি কোথাকার একটা বিরাট বাধা বিরাজের মুখ আঁটিয়া দিত। প্রতিপদে এখন সে একটা সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল। প্রকাশের সাড়া পাইলেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িত, এবং নিঃসন্দিগ্ধা সুরবালার অনুরোধ সত্ত্বেও নানাকাজের ওজুহাতে যত শীঘ্র পারে চলিয়া যাইত। হোটেলে এখন প্রকাশ কদাচিৎ বিরাজের সাক্ষাৎ পাইত, কিন্তু যথারীতি স্বতন্ত্রস্থানে তাহার জায়গাটি কে কখন প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিল, এবং জলের গেলাস, পরিচ্ছন্ন থালা বাটি ও প্রচুর আহার্য্য কাহার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে নিয়তে সরবরাহ হইতেছিল, সে অত চিন্তা করিয়া দেখিত না। তাহার মন তখন বাজির ঘোড়ার মত লক্ষ্য ধরিয়া ছুটিতেছিল, এ সব ছোটখাট পরিবর্ত্তন নজরও করিল না।

বস্তুতঃ এই পরিবর্ত্তনটি এমন সহজভাবে ঘটিতেছিল যে, ইহার ভিতর কোনরূপ বিশেষত্ব বিরাজ নিজেও অনুভব করিল না। এই সেবাপরায়ণ যুবকের একনিষ্ঠা সে যতই দেখিতেছিল, ততই তাহার মনের মধ্যে একটি বিশিষ্ট অভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার

মনে হইল, জীবনের এই মস্ত ফাটলটি যেন তাহার সমগ্র নারীত্বকেই গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। সারা জীবন সে যে নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে ডুবিয়া আছে, এত কাজ সে কাহার জন্ম করিয়াছে? এ ত শুধু ভূতের বেগার! আসলে, সে কাহারো কাজে লাগে নাই—নিজেরও নহে। জগতের সকল আদান-প্রদান, হাসি-কান্না, দুঃখ-সুখ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া নিজের চারিধারে প্যাঁচাল কণ্টকাকীর্ণ বেড়ার ভিতর এত কাল সে যে বন্দিত হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহা ভাঙিয়া-চুরিয়া তাহার উদ্দীপ্ত মন ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে একটা ধূ-ধূপের মতন ছুটিয়া উঠিল। অতীতের পাতাগুলি একে একে মেলিয়া ধরিয়া সে দেখিল, তাহার জীবন সে একটা প্রাণশূন্য ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছে, যতটুকু সে পাইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত এক কপর্দকও দেয় নাই। তবুও তাহার হিসাবের খাতায় সে কেবল লোকসানের জেরই টানিয়া আনিয়াছে। আজ তাহার রিক্ত দরিদ্র অন্তর ভবিষ্যতের শূন্য পাত্রটি হাতে লইয়া সাম্নে আসিয়া দাঁড়াইতে সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার জীবন যে কাহারো নহে, কাহারো সুখ দুঃখে তাহার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই! কোন দুঃসাহসে সে এই অনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিয়াছে? একটি সঙ্গীও সে সাথে লয় নাই যাহাকে পথে কুড়ান বোঝাগুলির অংশ দিয়া একটু শ্রান্তি দূর করিবে।

সেই যে দিন নির্জ্জন ঘরে রামু ঘোষ বিরাজের পাশে প্রকাশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, সে দিন সে কি অনুমান করিয়া লইয়াছিল তাহা সে-ই জানে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তখন হইতেই সে মনে মনে একটা গভীর তথ্য আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হইতেছিল। প্রকাশ সেখানে কি জন্য আসিয়াছিল এবং গোপনে তাহাদের মধ্যে কি কথাই বা চলিতেছিল এ সব জানিবার জন্য সে কিছুমাত্র কৌতূহল দেখাইল না এমন কি বৃত্তান্তটির উল্লেখমাত্র করিল না। শুধু সে কয়েক দিন বিরাজের কাছে কাছে ঘুরিল, এবং শারীরিক ও মানসিক কুশলাদি প্রশ্ন দ্বারা আত্মীয়তার সার বিছাইয়া প্রচুর রসিকতার জলে আবাদি জমি সিচ্ করিল। শেষে একদিন নিভৃতে ডাকিয়া কানে কানে বীজমন্ত্রটি বপন করিয়া এইরূপ তত্ত্বকথা শুনাইল, মানুষের চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ যেমন দু-দুটা তেমনি দুইটি তহবিল যুক্ত করিয়া দু-জনার একত্র জীবন যাপন করাও প্রাকৃতিক বিধান, এ কথা কি বিরাজ স্বীকার করিতে চাহে না?

বিরাজ সহসা কোন জবাব দিতে পারিল না। এই লোকটিকে বিশ্বাস করিবে সে কোন্ সাহসে? সুখে-দুঃখে সম্পদে বিপদে সে কি ইহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিবে? জীবনের যে ফাঁকটি চিরদিন ফাঁকই রহিয়া গেছে তাহা পূরণ করিবার পক্ষে এই কি উপযুক্ত মানুষ? এইরূপ নানা প্রশ্ন উঠিয়া তাহার অন্তরে সংশয়ের দোল দিয়া দিল।

ক্রমশঃ

জন্মাষ্টমী

অধ্যাপক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় সম্বন্ধে ভাগবত লিখিয়াছেন—দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল, আকাশে তারকাসমূহ স্বচ্ছরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল, নদী সকলের সলিল নির্ম্মল ভাব ধারণ করিল, জলাশয়ের কমলজন্য শোভা হইল, বন্য বৃক্ষগণের স্তবক ফুটিয়া উঠিল ও তাহাতে বিহঙ্গকুল মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল, সমীরণ পবিত্র গন্ধবাহী, পবিত্র ও সুখস্পর্শ হইয়া বাহিত হইতে লাগিল ইত্যাদি। বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতেরা নিশীথকালে কৃষ্ণের জন্মকৃত্য করিলে কি হইবে? শাস্ত্রের বর্ণনায় স্পষ্টই বুঝিতে পারি উহা প্রভাত কালের বর্ণনা। নিশীথকালে জন্মাষ্টমীরও একটা হেতু আছে। সৌররূপকে চন্দ্র ও সূর্য্য এক পর্য্যায়-ভুক্ত। চন্দ্র সূর্য্যেরই নিশীথরূপ। বৈদেশিক বহু সৌর দেবতা কৃষ্ণেরই ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ। এত কথার অবতারণা এখানে চলিবে না। তবে কৃষ্ণাষ্টমীর নিশীথেই চন্দ্রোদয় এই কথা মনে রাখিলে বর্ণনা প্রভাতের হইলে জন্ম নিশীথে কেন তা বুঝা যাইবে। যাহা হউক, রূপককে ঘসিয়া মাজিয়া আমরা যে আকারই দিই না কেন, আদিতে উহা সূর্য্যোদয় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। রামায়ণের আদিস্তরে শ্রীরাম ছিলেন "বিষ্ণুরিব" সীতা ছিলেন "শ্রীরিব।" কিন্তু মানুষ সহজেই 'ইব'-এর বোঝা ঝাড়িয়া

ফেলিয়া দিয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণকার কথাটা গোপন করিবার চেষ্টাও করিলেন না। কৃষ্ণের জন্মটা কি? "অখিল জগৎরূপ পদ্মের বিকাশের জন্ত দেবকীরূপ পূর্ব্বসন্ধ্যাতে মহাত্মা বিষ্ণুরূপ সূর্য্য আবিভূর্ত হইলেন" অর্থাৎ প্রভাত কালে সূর্য্যোদয় হইল এবং জগৎ প্রকাশিত হইল। তারপর রূপক ও উপমা সকলের বিশ্লেষণের দ্বারা এবং কথার উপর কথা চাপাইয়া যতই কাব্য ও সাহিত্যের বোঝা বৃদ্ধি করি না কেন জগতে কাব্য-সাহিত্যে মহাপুরুষদিগের যে-জন্ম বর্ণনা দেখিতে পাই তার আদি কিন্তু জগতের আদি মহাপুরুষ ভাস্করদেবের আবির্ভাব। হইতে পারে সেটা কোন বিশেষ দিনের সূর্য্যোদয়, হইতে পারে সেটা কোন বিশেষ স্থানের সূর্য্যোদয়; সূর্য্যোদয় সেটা নিশ্চয়। এক দিন আদি মানবের প্রাণ-মন যে-সূর্য্যোদয় অভিভূত করিত, আনন্দোচ্ছ্বাসে তার হৃদয়কে প্লাবিত করিত তা নিদ্রার আলসে প্রাতঃকাল শয্যায় কাটাইয়া তারপর হুড় মুড় করিয়া উঠিয়া নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়া দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইবার জীব আমরা অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারিব না। তারপর ইহা যদি ৪ মাস ৬ মাস অন্তর প্রথম সূর্য্যোদয়ের কথা হয় তবে যে তা কি ব্যাপার তাহা কল্পনা করিবার সাধ্যও এতকাল পরে ও এতদূর হইতে আমাদের নাই। আমাদের 'নন্দোৎসবের' আনন্দ-কোলাহল সে উচ্ছ্বাসকে অতি অল্পই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। অতি সামান্ত একটা রূপককে কবির পর কবি ফেনাইয়া ফলাইয়া তারপর এমন জায়গায় আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন যার সঙ্গে আদির সেই রূপকের কোনই সংস্রব নাই; থাকিলেও এমনই আনুবীক্ষণিক যে সাধারণের চক্ষে তাহা ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনাই নাই। এইরূপ একটি রূপক হইতেই মহাকাব্য বৃত্র-সংহারের আবির্ভাব। আজ কি কেহ বিশ্বাস করিবেন, যে, শীতকালে যে জল জমিয়া বরফ হইয়া আটকিয়া থাকে ও বসন্ত-সূর্য্যের আবির্ভাবে আবার গলিয়া জলরূপে জীবের কল্যাণের জন্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হয়—এই ভাবটাই অতি প্রাচীন কালে কেহ এমন একটা রূপকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহা হইতে পরে মানুষ অর্থ করিল বা অর্থান্তর করিল যে ইন্দ্রদেব বজ্রাঘাতে সুরসর্প বৃত্রের মস্তক চূর্ণ করিয়া স্বর্গ রাজ্য রক্ষা করিলেন। বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া আজ কি কেহ ধরিতে পারেন যে, আদিতে বৃত্র একটি সর্প মাত্র—সর্পাকার Cosmic Vapour যদি বিশ্বাস না করেন তো লোকমান্ত তিলক প্রণীত Arctic Home in the Vedas পাঠ করিয়া দেখিতে পারিবেন। একটি রূপক ভেদ হইয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিল কাব্যের অনুরোধে, আখ্যায়িকার অনুরোধে, অলঙ্কারের অনুরোধে সে কত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, কতভাবে তার আকারের বৃদ্ধি হইতে লাগিল—একটি প্রাকৃতিক রূপকের সঙ্গে তার গতিপথে আরও কত জ্যোতিষিক আধ্যাত্মিক সৌর রূপক আসিয়া আসিয়া জুটিতে লাগিল, এমন কি, কত ঐতিহাসিক সত্য আসিয়া তাহার কলেবর বাড়াইয়া দিল তাহা হয়তো কাব্যরসরসিক একটি সম্পূর্ণ কাব্যের রসস্বাদনের সময় ভাবিবার অবসর পান না। রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশীর রসাস্বাদনে যিনি সমর্থ তাঁর কাছে যাইয়া হঠাৎ যদি এই বলিয়া তাঁর রস ভঙ্গ করিয়া দি যে, যাহাতে তিনি এত 'মস্‌গুল' সেই উর্ব্বশী আদিতে আমাদের এই প্রতিদিনের দৃষ্টি অবজ্ঞাত একটি উষার বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই নয় তাহা হইলে কি তিনি দাঁত খিঁচাইয়া উঠিবেন না—বিষয়টির সঙ্গে যদি আবার কোনও রকমে ধর্ম্মের সম্পর্ক থাকে তবেত বীভৎস রসের অবির্ভাবের সম্ভাবনাও হইয়া পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যিনি প্রবৃত্ত তাঁকে রসের বিচার করিবার জন্ত বসিয়া থাকিলে চলে না। কোন্ ঋষি বা কোন কবি কোথা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কোন্ আখ্যান রচনা করিয়াছেন তাহা আজ নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে যে আখ্যায়িকা আমাদের উন্নত জ্ঞানের কাছে কিম্ভূত-কিমাকার বলিয়া মনে হয় এবং আমাদের মার্জ্জিত নীতি-বোধকে এমন করিয়া আঘাত করে বলিয়া আমরা কত উৎকট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই, সেই আদিম অনুন্নত অবস্থায় সেই আখ্যায়িকা রচনাকারী হয়তো 'মহাকবি' বলিয়াই অভ্যার্থত হইয়া থাকিবেন। প্রাতঃকালের সূর্য্য রজনীর গর্ভ হইতে আবিভূর্ত হন, আবার সন্ধ্যাকালে রাত্রির সঙ্গে সহবাসের জন্ত অন্ধকারে লুক্কায়িত হন। এই ভাবটা বর্ত্তমানকালের মানুষ কোন্ কথায় প্রকাশ করিবে তাহা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঋগ্বেদের ঋষির মাথায় কি খেয়াল চাপিল তিনি সূর্য্যকে বলিলেন, "মাতুর্দিধিষুঃ।"

'রাধা' নামটি তো ভাগবতে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। তবে নামের ধ্বনিটি পাওয়া যায়—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।" কিন্তু আজ যদি কেহ বলেন, যে "রাধা" কৃষ্ণচরিত্রে প্রক্ষিপ্ত, নিতান্ত আধুনিকদের কারসাজি তবে তাঁহাকে নিশ্চয়তই "ধনঞ্জয়" প্রাপ্ত হইতে হইবে। অথচ 'রাধা-কৃষ্ণ' তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবার জন্ত কত মস্তিষ্কই না আলোড়িত হইতেছে?

বঙ্কিমচন্দ্র যখন কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে পৌরাণিক আবর্জ্জনার স্তূপ হইতে বাছিয়া বাহির করা। কিন্তু কোন্‌টা পৌরাণিক, কোন্‌টা ঐতিহাসিক তাহা বুঝিব কিরূপে? তিনি একটা নির্ব্বাচন-প্রণালীও স্থির

করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যখন আদর্শ মানবরূপে অবতীর্ণ, তখন তাঁহার মধ্যে অতিমানবীয় কিছু থাকিতে পারিবে না। কেন না, তাহা হইলে তিনি আর মানুষের আদর্শ রহিলেন না। কিন্তু এখানেও যে 'গলদ' রহিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অপসারিত করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান দ্রুত অগ্রসর হইতেছে—আজ যাহা অতিমানবীয়, কাল তাহা সহজমানবীয় বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইতেছে—উভয়ের মধ্যে রেখা টানা আজ দুরূহ। যীশুখৃষ্টের জীবনীসমালোচকগণ এ কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, যে, অমুক কার্য্য অতি-নৈসর্গিক সুতরাং এই কার্য্য যিনি করিয়াছেন তিনি ঈশ্বরের অবতার, এই যুক্তি আজ আর টিকিতেছে না (In Search of Jesus Christ দ্রষ্টব্য)। অতিনৈসর্গিক ঘটনার কল্পনা একেবারেই নাই, তা বলিতেছি না। যাহা নিছক্ কল্পনা—যেমন নরক বা পাতাল—তার সঙ্গে যদি জীবনীর কোন ঘটনার যোগ থাকে তবে তাহা কল্পিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেই। যখন দেখি বুদ্ধ যীশু বা কৃষ্ণ স্বর্গে বা নরকে যাইয়া তথাকার অধিবাসীদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন তখন উহাকে বাস্তবজীবনের ঘটনাবলী হইতে বাদ দিতে হইবে। দক্ষযজ্ঞের মধ্যে কত অতিনৈসর্গিক ঘটনা রহিয়াছে। অনেকে বলিবেন, সেজন্য সবটাই পরিত্যাগ করিব কেন? ঐগুলি বাদ দিয়া রক্ষণযোগ্য যা, তা না রাখিব কেন? ইঁহারা ভুলিয়া যান, যা ঘটিতে পারে, তাহাই বিশেষক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইলে তর্কশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ হয়। এটা একটা অতি সাধারণ হেত্বাভাস। এত অনৈসর্গিক যার সঙ্গে জড়িত তার মূলই বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ হয়—অথচ জামাই-শ্বশুরের ঝগড়ার মতন এমন একটা বাঙ্গালীজীবনের সত্যিকার ঘটনা আমাদের উড়াইয়া দিতেও sentimentএ বাধে; তাই আর আমাদের ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণ হইয়া উঠে না। অথচ গোড়াকার কথাটাই এমন একটা রূপক (ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন দ্রষ্টব্য) যেখানে অতিনৈসর্গিক ঘটনাবলী জড় না হইয়াই পারে নাই—তার সঙ্গে আমাদের ঘরকন্নার দৈনন্দিন ঘটনা যতই জড়াইয়া দি না কেন।

সৌররূপককে বিশ্লেষণ করিয়া আখ্যান রচনা যে কেবল আমাদের দেশেই হইয়াছে তাহা নহে। পারসীক কুরাসের (Cyrus) আখ্যায়িকা বিবৃত করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। আখ্যায়িকা এই;—রাজা স্বপ্নে দৈববাণী শুনিলেন, কন্যার গর্ভের সন্তান তাঁহার স্থানে রাজা হইবে। ভয় পাইয়া গর্ভবতী কন্যাকে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। পুত্র জন্মিলে এই সালঙ্কার ও বিচিত্র বস্ত্রপরিহিত (মনে রাখিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণও জন্মিয়াছিলেন—"পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন" এ দুইটিই সৌরচিহ্ন) সন্তানকে হত্যা করার জন্য গোপালকের নিকট দেওয়া হইল। সে হত্যা করিল না, কিন্তু স্বীয় পত্নীর সদ্যপ্রসূত মৃত পুত্রকে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল। বালক গোকুলে রাখালবালকদিগের সঙ্গে ক্রীড়ামোদে মত্ত থাকিয়া ("Playing in the village in which the oxstalls were") বাড়িয়া উঠিল। বালকদিগের মধ্যে তিনি রাখালরাজ হইলেন এবং দ্বাদশবর্ষে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তারপর বিশ্বাসঘাতক অমাত্যের প্ররোচনায় ও সাহায্যে এই বালকের হস্তে রাজার রাজ্যচ্যুতি ঘটিল। অক্রুর সব দেশেই মিলে, এখানেও মিলিল। এই কুরাস কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে, রূপককে আখ্যায়িকায় পরিণত করিতে যাইয়া কতকগুলি সাধারণ সূত্রের আবির্ভাব হইয়াছে যাহা শেষে জীবন চরিত পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। জন্মের পূর্ব্বে জাতকের মহত্ত্বসম্বন্ধে দৈববাণী, জীবনরক্ষার জন্য স্থানান্তর গমন, স্থানান্তর জন্ম, পরিণামে জীবনরক্ষা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধি। বুদ্ধ কংফুচের জীবনেও ইহা প্রবেশ করিয়াছে। সব মহাপুরুষের মস্তকের চারিপার্শ্বে যে আলোকচ্ছটা দেখিতে পাই, তাহা জগতের আদি-মহাপুরুষ অদিতির অষ্টম গর্ভজ সন্তান মার্ত্তণ্ডদেবেরই অনুকরণ। সৌররূপকে কতকগুলি যে সাধারণ সূত্র আছে তার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুতে পীতবর্ণের সংস্রব—কুরাস ও কৃষ্ণে হারকিউলিশ ও কৃষ্ণে উহা পাই। হার্ম্মিস্, হারকিউলিস্, যিশু, মিথ্ প্রভৃতির সঙ্গে 'গো' জাতির সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমাদের ভাষায় গো-শব্দের এক অর্থ 'সূর্য্যকিরণ' সুতরাং বক্তব্য আর কিছু থাকে না।

গ্রীকদিগের সূর্য্যদেব এপোলো; ইনি কৃষ্ণেরই ন্যায় জন্মমাত্রই কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—ইহা কি সূর্য্যোদয়ে বাক্য মুখরিত বিশ্বের প্রতীক? ইনি কালীয় দমনের ন্যায় পাইথন সর্পকে দমন করিয়াছিলেন। উভয়েই বংশীবদন। বংশীধ্বনি কি প্রাতঃকালীন পাখীকুলকূজনের আনন্দধ্বনি? কৃষ্ণ যেমন তুলসী কর্ত্তৃক, এপোলো তেমনি ডফিন কর্ত্তৃক নাকাল হইয়াছিলেন, কিন্তু উভয়েই পরিণামে বৃক্ষে পরিণত হন। ডফিনের পরিণতি লরাস্ যেমন এপোলোর কাছে পবিত্র, কৃষ্ণপূজায় তুলসী তেমনই পবিত্র। যাক্, বেশী কথা বলিব না। দুই একটি কথা বলি, যাহা ঐতিহাসিক হইতে পারে না, পৌরাণিক মাত্র। বাদসাদ্ দিয়া ঐতিহাসিক করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। ধরুন, সুদর্শন নামক সর্পের মুক্তির কথা। কোনো সময়ে গোপগণ বৃষচালিত শকটে সরস্বতী তীরে উপনীত হইয়া হরপার্ব্বতীর পূজা করনানন্তর শায়িত হইলে সর্প আসিয়া নন্দকে আক্রমণ করিল এবং গোপগণ প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা সর্পকে আহত করিলেও সে ছাড়িল না, তখন কৃষ্ণ তাহাকে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে

অনৈসর্গিক কিছুই নাই, কিন্তু একটি কথাতে অনৈসর্গিক হইয়া গিয়াছে। আখ্যায়িকাকার বলিতে ভুলেন নাই যে, এ সর্প পার্থিব নয়, দিব্যলোকবাসী অর্থাৎ উহা আকাশের কথা। একটি রোহিণী নক্ষত্রকে বলে শকট এবং বৃষরাশি সরস্বতী (milky way) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শিব ও দুর্গা ঐখানেই মিলিবে। ঐখানেই স্বর্গীয় সর্প অশ্লেষা নক্ষত্র দিগন্ত বিস্তৃত। গোপগণ অস্ত্র অস্ত্র ব্যবহার করিবেন কেন? ঐ যে ওখানেই অগ্নিনক্ষত্র জল-জল করিতেছে। মৃগশিরায় যখন বিষুবৎ ছিল তখন কালপুরুষই প্রজাপতি, সম্বৎসর, সূর্য্য, বিষ্ণু—কৃষ্ণ—পদতলেই সর্প, সে সুদর্শন হউক আর নাই হউক—আকাশের মানচিত্র দেখুন। তবে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, আখ্যায়িকা সকলের রচনাকারী এক ব্যক্তি নহেন এবং সকলে একই নক্ষত্রপুঞ্জে একই মূর্ত্তি দেখিবেন, তাহাও আশা করা যায় না। আমি কালপুরুষের মধ্যে একটি শঙ্খচিহ্ন দেখিতে পাই। এক বন্ধুকে বলিলাম তিনিও সায় দিলেন, আর-এক বন্ধু কিন্তু কিছুই পাইলেন না। এই কালপুরুষ নক্ষত্র অনেক খেলা খেলিয়াছে—কখনও মৎস্য, কখনও কূর্ম্ম, কখনও বরাহ, কখনও মানুষ, কখনও অসুর, কখনও ব্রহ্মা, কখনও বিষ্ণু, কখনও শিব—কত কি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গল্পের মধ্যে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নির্ণয় করা দুরূহ; কিন্তু কাল্পনিক জগতের কথা হইলে অনৈতিহাসিক ধরিতে হইবে। যমপুরী একটা কল্পিত স্থান, সুতরাং কৃষ্ণের যমপুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন একটা রূপকোপাখ্যান বলিয়া ধরিতে হইবে। হিন্দুজ্যোতিষে বিষুবৎ হইতে রবির সমুদয় দক্ষিণপথ যমপুরী, তাই যমালয়ের কল্পনা দক্ষিণে। যমালয়ের পথ বৈদিক গ্রন্থেই বর্ণিত আছে (**আমাদের জ্যোতিষি ও জ্যোতিষ দ্রষ্টব্য**)। পথে একটি নদী, একটি নৌকা, দুইটি কুকুর ও একটি ভীষণ অসুর। পুরাণ বলেন, যমপুরীর পথে কৃষ্ণ এক অসুর বধ করেন, যাহাকে মারিয়া পঞ্চজন্য শঙ্খ সংগ্রহ করেন। সেই অসুরকে পঞ্চজনা বা শঙ্খাসুর বলা হয়। এ পথে কালপুরুষই (Orion) এই অসুর। উহার হস্তপদের দুটি দুটি চারিটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ও মস্তক—সেইজন্য পঞ্চজনা শরীরে শঙ্খচিহ্নও আছে। লোকমান্য তিলক মহাশয় বলিয়াছেন—আকাশগঙ্গাই (Milky Way) বৈতরণী, অগস্ত্য (canopus) নক্ষত্র সম্বলিত নক্ষত্রপুঞ্জই ঐ বেদোক্ত নৌকা (Argo naois), লুব্ধক (Sirius) ও প্রলুব্ধক (Procyon) দুই কুকুর। লুব্ধকের বৈদিক নাম সরমা। মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুবৎ থাকিলে এ বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যাইবে এবং মৃগশিরায় যে একসময়ে বিষুবৎ ছিল তাহা ধ্রুব সত্য। যদি মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুবৎ ধরা যায় তবে সাধারণতঃ জন্মাষ্টমী যে সময়ে হয় তাহা বৎসরের প্রথমেই পড়িবে। বৎসরের মধ্যে যে চারিটি বিশিষ্ট দিন তার কোন-একটাকে সৌর-রূপকোদ্ভব দেবতার যেমন মিথ, দিওনিসস্, যিশু প্রভৃতির জন্মদিন ধরা হয়। কৃষ্ণের জন্মোৎসব লইয়া বরাহপুরাণ যে তর্ক তুলিয়াছেন তাহাতে বৎসরের মধ্যে গোটাবারো জন্মদিন করিতে হয় অর্থাৎ সূর্য্যের প্রত্যেক রাশিপ্রবেশে এক একটি। মিশরীয় সৌরদেব হোরাসের জন্মদিন আমাদের জন্মাষ্টমীর সময়েই পড়ে। আশ্চর্য্য এই, বরাহপুরাণ যেমন কৃষ্ণের একাধিক জন্মদিনের কথা পাড়িয়াছেন, ইঁহারও তাহাই। আমরা ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ের যে বর্ণনা পাইয়াছি, তাহাতে শীতের রূপক কারাগৃহের দুঃখকষ্টের পর বসন্ত বিষুবৎকেই স্মরণ করাইয়া দেয় ও সৌররূপকও কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠে—বহুদিন পরে precession of the Iquinoxes-এর জন্য তারিখের যে একআধটুকু গোলমাল তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। তবে মৃগশিরায় বিষুবৎ, সে কি আজিকার কথা? মানবজাতিই কি জন্মাষ্টমীর উৎসবকৃত্য কাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে? মানুষ স্মরণাতীত কাল হইতে গ্রহনক্ষত্র-চন্দ্রতারা ও রবিকে লইয়া ক্রিয়া ও আচার (Rituals) প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যখন "কেন করি?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছে তখনই তার সঙ্গে গল্প (myth) রচিত হইয়াছে। আমরা যে-সব ক্রিয়াকর্ম্মে রত হই, তা যে কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরম্ভ হইয়াছিল, তার খবর হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তার সঙ্গে যে গল্প জুড়িয়াছি তাহা দেশে দেশে কালে কালে নূতন হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে ২৫শে ডিসেম্বরের 'বড়দিনে'র উৎসব চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহার সঙ্গে যে গল্প ছিল, আজ আমরা সে গল্প ভুলিয়া গিয়াছি, নূতন গল্প করি—কিন্তু ২৫শে ডিসেম্বরের উৎসব চলিতেছে আবহমানকাল। আমরা এখন "দক্ষিণাভিমুখ কৃষ্ণং দোলায়ন্" (পদ্মপুরাণ) দোল করি, কিন্তু উহার আরম্ভ সূর্য্যের দক্ষিণায়ণ প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া। সে কি আজিকার কথা? আজিকার একটা গল্প জুড়িয়া দিয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কথা বলিবার ফুরসুৎ হইল না।

যবদ্বীপের পথে

শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

(৪) মালাই দেশে—মালাক্কা

২৭শে জুলাই ১৯২৭, বুধবার।

আমাদের জাহাজ সকাল সাড়ে ছটা—সাতটার মধ্যে মালাক্কা শহরের সামনে এসে দাঁড়াল, লঙ্গর ফেলে দিলে। আকাশ একেবারে পরিষ্কার নয়, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে হাওয়া দিচ্ছে একটু একটু—সমুদ্রের জল হাল্কা সবুজ, তাতে একটু পাঁশুটে রঙের আমেজ; ছোটো খাটো ঢেউ বেশ র'য়েছে, জাহাজের গায়ে প'ড়ে ছপ ছপ্ শব্দের সঙ্গে ভেঙে প'ড়ছে। মালাক্কা শহর দূরে; জাহাজ থেকে একেবারে শহরে নাম্‌তে পারা যায় না, ডিঙি ক'রে যেতে হয়। চারদিকে ছোটো বড়ো নৌকা সাম্পান এসে হাজির হ'ল। আমাদের মালাক্কা থেকে নিয়ে যেতে লোক আস্‌বে, সেইজন্য আমাদের একটু অপেক্ষা ক'রতে হ'ল। ডেকযাত্রীরা, আর অন্য সব যাত্রী নৌকায় ক'রে নাম্‌বার জন্য তৈরী হ'তে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে জাহাজেই আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলুম। ডেকের রেলিংএর উপর ভর দিয়ে অন্য যাত্রীদের অবতরণ দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। নৌকাগুলির মাল্লারা বেশীর ভাগ মালাই জাতীয়। আমাদের জাহাজের পূর্ব্বকথিত মালাই হাজীদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবার জন্য তাদের আত্মীয় বন্ধুরা একখানা নৌকো ক'রে এসেছে। এরা বহুদিন পরে বাড়ী ফিরছে, সফল যাত্রা, মুসলমানমাত্রের প্রার্থিত হাজী পদবী নিয়ে ফিরছে; মেয়ে পুরুষে সকলেই ভালো ভালো কাপড় বা'র ক'রে প'রেছে। একটী জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম—কতকগুলি মালাই—জন দুই স্ত্রীলোক, জন তিনচার পুরুষ—তাদের সুন্দর রঙীন মালাই সারং আর কোর্ত্তার বদলে পুরাপুরি আরব পোষাক প'রে তৈরী হ'য়েছে—পুরুষদের কালো কাপড়ের লম্বা আবা, ভিতরে সাদা চাপকানের মতন, মাথায় আরবী কায়দায় কাঁধ আর ঘাড় ঢেকে একখানা বড়ো তোয়ালের মতন রুমাল, তার উপরে ছোটো পাগড়ী একটী, পায়ে আরবী চাপ্‌লী; আর মেয়েদের পরণেও কালো কাপড়ের লম্বা "সওব্" বা বহির্বাস, আর "বুরকা" বা মুখঢাকা ওড়না; একেবারে "মক্কা বুড়ী"র সাজ—কালো রঙের ছাতার কাপড়ের এই পোষাক অত্যন্ত বিশ্রী দেখাচ্ছিল, সুঠাম রঙীন সারং আর ওড়না পরা আর সোনার মল দেওয়া খালিপায়ে চটীজুতাপরা মালাই মেয়েদের পাশে। বোর্ণিও-দ্বীপে কতকগুলি মুসলমান রাজবংশে এখন এই আরব পোষাক দরবারী পোষাক হিসাবে গৃহীত হ'য়েছে। যাক্, দেশে ফেরার উৎফুল্ল আনন্দে এরা ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে নেমে গেল, নীচে নৌকায় অপেক্ষমান আত্মীয়াদের সঙ্গে মেয়েদের কলরবপূর্ণ আলাপ আর অভিনন্দন শুরু হ'ল। চীনা যাত্রীরা, চেট্টীরা, সকলেই নেমে গেল; চীনা ছাত্রেরা দূর থেকে টুপী তুলে আমাদের দিকে চেয়ে অভিবাদন ক'রে গেল।

একটু পরেই সরকারী লঞ্চ-এ ক'রে কবিকে স্বাগত ক'রতে এলেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিস্‌টার Dodds ডড্‌স্, আর মালাক্কার অধিবাসীদের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ, মালাক্কার ব্যারিষ্টার আর একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন অধিবাসী। শিষ্টাচারের পরে আমরা কবির অনুগমন ক'রে লঞ্চ-এ চ'ড়লুম। মালাক্কা নদীর মোহনায় এই শহর, লঞ্চ এই নদীর মুখে ঢুকে শহরের একটী ঘাটে আমাদের হাজির ক'রলে। সেখানে স্থানীয় গণ্যমান্য লোকেরা কবির অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন, অন্য লোকেরও ভীড় খুব ছিল। অভিনন্দন পাঠ হ'ল, তারপর জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে মোটরে ক'রে আমরা আমাদের বাসার দিকে রওনা হ'লুম। সমুদ্রের ধারে ধারে মাইল ছয়েক ধ'রে চমৎকার একটী রাস্তা দিয়ে মালাক্কার পশ্চিমে Tanjong Kling তাঞ্জং-ক্লিং ("কলিঙ্গবাসীদের অন্তরীপ") নামে বেশ ঘন নারিকেল কুঞ্জের মাঝে অতি মনোরম স্থানে একটি সুন্দর বাঙলা-বাড়ীতে এসে পৌঁছুলুম। এই বাড়ীর মালিক একজন ধনী চীনা, এঁর নাম Chan Kang Swee চান-কাঙ-সুই, ইনি পরে কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন; অতি অমায়িক, সরল প্রকৃতির বৃদ্ধ—তাঁর বাড়ীতে কবির অবস্থানে তিনি ধন্য ইত্যাদি ব'লে নানা শিষ্টাচার ক'রে সৌজন্যের পরিচয় দিয়ে যান। এই বাড়ীটীতে আমাদের ত্রিরাত্র অবস্থান হ'য়েছিল—না'রকল গাছের ঘন সবুজ, সাগরের নীল, আর বালির হ'লদে রঙ, আর আলোয় ভরা আকাশের স্মিতমুখ, এই নিয়ে, একটী বড়ো খোলা বারান্দা-যুক্ত এই বাড়ীটী আমাদের স্মৃতি-পটে চিরকাল জেগে থাক্‌বে।

মালাক্কা শহরের সঙ্গে সমস্ত মালাই-দেশের ইতিহাস জড়িত র'য়েছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষের দিকে এই শহরের বাড়-বাড়ন্ত হয়—সিঙ্গাপুর শহর যবদ্বীপের লোকেরা মালাইদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় ১৩৭৭ সালে,

তারপর থেকে মালাই জা'তের একটী বড়ো কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায় এই শহর। সুমাত্রাদ্বীপ নিকটেই, আর দ্বীপময়ভারত, ইন্দোচীন, আর চীনদেশ ওদিকে, আর এদিকে ভারতবর্ষ আরব, আর পশ্চিমের জগৎ—এর মধ্যকার বাণিজ্যের গতি-পথেই এই শহরের অবস্থান। ওদিকে চীন, এদিকে আরব, আর মধ্যে ভারত—সব জায়গা থেকে বণিকেরা এখানে এসে জমা হ'ত। চীনারা নাকি মাঝে এই শহর দখলও ক'রে ছিল। ১৫১১ সালে পোর্তুগীসেরা দ্বীপময় ভারতের পথ স্বরূপ এই শহরটীকে করায়ত্ত করে, আর এ অঞ্চলে আরবদের প্রতিপত্তি কমিয়ে দেয়। পোর্তুগীসদের অধীনে এ অঞ্চলে মালাকার খুব প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল, এখানে এরা খুব সুদৃঢ় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করে, আর খ্রীষ্টানী বিদ্যালয় ধর্ম্মস্থান ইত্যাদিও স্থাপন করে। মালাকার নামেই সারা দেশটীর নামকরণ হ'তে থাকে; এখনও ডচেরা Malaka ব'ললে সমগ্র Malaya Peninsula কেই বোঝে। পোর্তুগীসদের কাছ থেকে ১৬৪১ সালে ডচেরা মালাকা কেড়ে নেয়, আর তারপরে শহরটী ১৭৯৫ সালে ইংরেজদের হাতে আসে। সেই থেকেই মালাকা ইংরেজদের দখলে আছে। পেনাঙ, মালাকা, সিঙ্গাপুর বহুদিন ধ'রে ভারত থেকেই ইংরেজ সরকার কর্ত্তৃক শাসিত হ'ত; ক'লকাতা থেকে লাট সাহেব এই সব দেশের চরম ব্যবস্থা ক'রতেন। ক'লকাতা থেকে ভোজপুরে' পাহারাওলা সেপাই গিয়ে সেখানকার শান্তি রক্ষা ক'রত, ইংরেজদের হ'য়ে ল'ড়ত। ক'লকাতার তখনকার যুগের (অর্থাৎ ১০০ বছর আগেকার) অনেক কায়দা-করণ এখনও ও অঞ্চলের রাজশাসনের অঙ্গ হ'য়ে আছে। সিঙ্গাপুরের লাট-বাড়ীতে দেখেছিলুম, মান্দ্রাজী খানসামা আর খিদমৎগার সব ঘুরছে, মান্দ্রাজী আর হিন্দুস্থানী চাপরাসী জমাদার বেহারারা ঘুরছে, তাদের মাথার পাগড়ীটা হ'চ্ছে খাঁটী বাঙলার পাগড়ী, উকীলের সামলার ধরণের, লাল সালুতে মোড়া, আর লাল সালুর কোমরবন্দে আঁটা পিতলের একটা ক'রে বড়ো চাপরাশ। সমগ্র মালাকা জেলার লোকসংখ্যা দেড় লাখের কিছু বেশী, এর মধ্যে মালাইরা সংখ্যায় খুব বেশী—৮৬ হাজার; চীনেরা হ'চ্ছে ৪৬ হাজার; আর ভারতীয় ১৯ হাজার; বাকী ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয়।

মালাকাতে এসে আমাদের একটী মালাই গ্রামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'ল। তাঞ্জং-ক্লিং যাবার পথে রাস্তার ধারে এই মালাই গ্রাম বা বসতি। না'রকল বনের মধ্যে অতি নয়নাভিরাম মালাই বাড়ীগুলি, সাদা বালীর জমীর উপরে, না'রকল গাছের গহন সবুজ ছায়ার মধ্যে; মাটী থেকে উঁচু মাচা তুলে বাড়ী, দরমার বেড়া, দরমা বোনাতে একটু আধটু নকশা কাটা হ'য়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। খড়ের বা তালজাতীয় একরকম
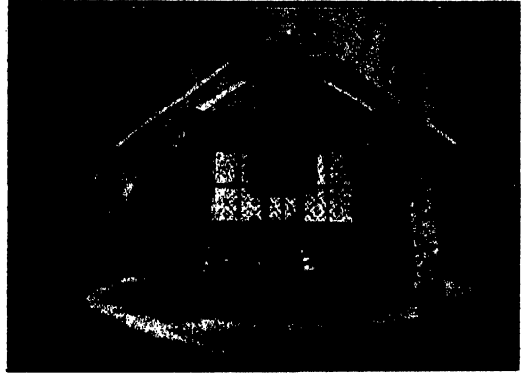
মালয়দেশের গৃহ

গাছের পাতায় ছাওয়া ছাত। আশে পাশে বাড়ীর ছেলে মেয়েরা রঙীন সারং পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেলা ক'রছে। পরিষ্কার সাদা বালীর উঠোনের মধ্যে ঘন সবুজের ভিত্তি-ভূমির উপর এই সব আধা চীনে আধা ভারতবাসী চেহারার

মালয় বালক বালিকা

মালাই ছেলেপুলেদের ভারী সুন্দর দেখায়। মাঝে রাস্তার ধারে একটী মসজিদ, প্রশস্ত উঠানে হাত মুখ ধোবার হৌজ, চারদিকে না'রকল গাছ, তিন দিক খোলা, কাঠের আর বাঁশের খ'ড়ো চালে ঢাকা মসজিদ বাড়ী, মসজিদ বাড়ীর ঠাট্ টা বর্ম্মী প্যাগোডার মতন, আর আলাদা একটী চৌকো কাঠের মিনার সেখান থেকে আজান ডাকা হয়; সৌম্যদর্শন মালাই মোল্লা, আরবী পোষাক পরা, ব'সে ব'সে বই প'ড়ছে নজরে প'ড়ল। মোটের উপরে, প্রথম এই বড়ো মালাই পল্লীটী দেখে মনটা বেশ খুশী হ'য়ে গেল। এখানকার মালাই অধিবাসীদের বেশ অবস্থাপন্ন ব'লে মনে হ'ল।

তাঙ্গং-ক্লিং-এর বাঙ্‌লায় তো আমরা অধিষ্ঠিত হ'লুম। ইংরিজি ধরণে সাজানো বাড়ী, কিন্তু হল-ঘরে এক কোণে রঙীন চীনামাটীর একটী Pu-tai পূ-তাই বা মৈত্রেয় বুদ্ধমূর্ত্তি, তার স্থূলোদর রূপে আর অপূর্ব্ব অমায়িক হাসিতে সমস্ত ঘরটাকে যেন উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে। দেয়ালে গৃহস্বামীর আত্মীয়বর্গের নানা ফোটো।

মালাক্কায় এসে একটী জিনিস দেখে মনটা একটু বিশেষ খুশী হ'ল—এই জায়গাটীতে জনকতক বাঙালী একটু প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন। এত বড়ো মালাই দেশটায় বাঙালীর সংখ্যা একে তো বড়ো কম, তারপর বড়ো কাজ করেন এ-রকম লোকও কম—কেরানীগিরি চাকরী নিয়ে জনকতক আছেন, ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ওভার্সিয়ার কিছু কিছু আছেন, ডাক্তারও বাঙালী কচিৎ পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙালী এখানে তেমন ভালো ক'রে জমিয়ে নিয়ে ব'সতে পারে নি। কিন্তু মালাক্কায় প্রথম দেখলুম, কতকগুলি বাঙালী ব্যারিষ্টার বিদ্যায় বুদ্ধিতে চারিত্র্যে স্থানীয় তামিল-চীনা-মালাই-ইউরোপীয়দের মধ্যে বেশ সম্মানজনক স্থান একটু ক'রে নিতে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ ক'লকাতার বিখ্যাত গুহ পরিবারের বংশধর; এঁরই এক ভ্রাতুষ্পুত্র হ'চ্ছেন স্বনাম-ধন্য বিখ্যাত বলী গোবর গুহ। এঁরা নিজ পদবী ইংরিজিতে Goho রূপে লেখেন। এখানে ইনি একটী এটর্নী আর ব্যারিষ্টারের আপিসের মালিক; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি এক চীনা ব্যবহারজীবীর কাজে অংশীদার হ'য়ে এদেশে আসেন, এখন তাঁর অংশীদারের অবর্ত্তমানে সমস্ত ব্যবসায় এঁর হাতে এসেছে। চীনা আর অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে এঁর কাজ চ'লছে, বেশ সদ্ভাবের সঙ্গেই মালাক্কার আশেপাশে আরও কতকগুলি ছোটোছোটো শহরে এঁর আপিস আছে, যখন জজেরা শহর থেকে শহরে ঘুরে ঘুরে বিচার ক'রে বেড়ান, তখন ৬০।৭০।১০০।১৫০ মাইল পর্য্যন্ত দিনে মোটরে ঘুরে ঘুরে এঁকেও কেস ক'রে বেড়াতে হয়। শ্রীশ বাবুর কাছে শুনলুম, খাটতে ডরায় না, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে এমন বাঙালী ব্যারিষ্টারের প্রতিষ্ঠা ক'রে নেবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ এখনও মালাই দেশে আছে; কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা হ'চ্ছে এই যে, সহজে দেশ ছেড়ে কেউ বাইরে আসতে চায় না। ইনি নিজে আরও কতকগুলি বাঙালী ব্যারিষ্টারকে দেশ থেকে আনিয়ে এই অঞ্চলে বসিয়েছেন—সুশিক্ষিত, সদালাপী, প্রিয়দর্শন এই স্বজাতীয় যুবক কয়টীকে এখানে দেখে মনটা বেশ পুলকিত হ'ল। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত, আর শ্রীযুক্ত সুধীর দাস—এঁরা আমাদের মালাক্কায় অবস্থানকালে যে হৃদ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার জিনিস। শ্রীশবাবু আর শচীনবাবু মালাক্কাতে সপরিবারে অবস্থান ক'রছেন, এবার বিদেশে বেরিয়ে এখানে এসে বাঙালী মেয়ের হাতে মায়ের আর বোনের যত্ন পাওয়া গেল। শ্রীশবাবুর সহধর্ম্মিণী এই দূরদেশে এসে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে একটী খাঁটি বাঙালী হিন্দূ পরিবারের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন,—তাঁর গৃহস্থালীর গভীর ধার্ম্মিক অনুভূতি আর পবিত্রতাতে পূর্ণ শান্ত সরল আর অনাড়ম্বর ব্যবস্থা আমাদের অন্তরকে বিশেষভাবে প্রসন্ন ক'রে তুলেছিল, আর কবিরও সাধুবাদ আকর্ষণ ক'রেছিল। এই বাঙালী কয়জনের সাহচর্য্য মালাক্কাতে আর কুআলা-লুম্পুরে আমাদের বাছে খুবই প্রীতিকর হ'য়েছিল; অবশ্য এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অ-বাঙালী ভারতীয়দের আর চীনাদেরও অমায়িক বন্ধুত্বের আর যত্নের কথারও উল্লেখ ক'রতে হয়।

শ্রীশবাবু, বরেন বাবু, সুধীর বাবু এঁরা রবীন্দ্রস্বাগতকারিণী সভার শ্রীযুক্ত Aiyathurai ঐয়াতুরেই ও শ্রীযুক্ত Haji Pitchay হাজী পিচেই প্রমুখ স্থানীয় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে আমাদের তাঙ্গং-ক্লিং-এর বাড়ী পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন ক'রলেন, আমাদের জিনিস পত্র আনিয়ে দিয়ে থাকবার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আমাদের তদারক করবার জন্য রইল শ্রীশবাবুর উড়িয়া পাচক গোকুল। সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট আর পেন্টুলেন পরা, জামার ভিতর থেকে যেন তার গলার কণ্ঠীরও দর্শন পেয়েছিলুম—গোকুল ঠাকুর দোস্ত মালাইভাষায় তামিল কুলীদের চালিয়ে নিয়ে জিনিসপত্র আমাদের নির্দ্দেশ মতন গুছিয়ে দিলে। বাবুর কাছে অনেক দিন ধ'রে কাজ ক'রছে, বারকতক দেশে আর মালাক্কায় যাওয়া-আসা ক'রেছে; লোকটীকে বেশ কাজের ব'লে মনে হ'ল। গোকুলের সঙ্গে আলাপ জমানো গেল। একটু ঘুরে এলেই, আর চোখ মেলে দুনিয়ার হাল দেখবার সুযোগ পেলেই যা হ'য়ে থাকে—তার মনটা একজন অশিক্ষিত উড়িয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে আশ্চর্য্য সংস্কারমুক্ত হ'য়ে গিয়েছে। অথচ হিন্দুত্বের গৌরব সম্বন্ধে তার একটী বেশ সাত্মাভিমান

সচেতন ধারণাও আছে। কতকগুলি শিক্ষিত হিন্দু মনের সান্নিধ্য এর একটা কারণ ব'লে মনে হ'ল।

আমাদের বাসার সব ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে আমাদের বন্ধুরা ঘণ্টাকতকের মতন বিদায় নিলেন। দুই জাপানী ফোটোগ্রাফর এল—হাতে টুপী, ঘাড় হেঁট ক'রে হাঁটু আধভাঙা ক'রে নীচু হ'য়ে নমস্কার জানিয়ে প্রার্থনা ক'রলে রবীন্দ্রনাথের দু-একখানা ছবি তারা নিতে পারে কি না। অনুমতি পেয়ে দূরে গাছতলায় রক্ষিত ক্যামেরা নিয়ে এসে কবির খানকতক ছবি নিলে। পরে আমাদের মালাক্কা ত্যাগের ২।৪ দিনের মধ্যেই তারা চমৎকার একখানি এলবাম কবিকে পাঠায়, তাঁর ছবিতে আর মালাক্কায় অবস্থানের সময়ে তাঁর অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর ফোটোতে পূর্ণ।

আজকের দিনে আমাদের কাজ ছিল খালি নিমন্ত্রণ খাওয়া, আর স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেশা। দুপুরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হাউসে মালাক্কা বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত Crichton ক্রাইটন সাহেবের সঙ্গে ছিল লাঞ্চ খাওয়া; এই আহারের নিমন্ত্রণে অন্য জনকতক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, একজন মালাই রাজাও ছিলেন। বিকালে আবার গভর্ণমেণ্ট হাউসের বাগানে একটি সান্ধ্য চা-পান সভা ছিল, তাতে শহরের গণ্যমান্য বিস্তর লোক আহূত হন। সেখানে নানা ভারতীয় সিংহলী আর চীনা ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত রেড্ডি নামে একটী তেলুগু ভদ্রলোক, ভারতীয় কুলীদের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌বার জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী, তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোকটী বেশ সহৃদয়। তাঁর কাছে থেকে শুনলুম যে ভারতীয় কুলীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন তামিল জাতীয়, আর ১৫ জন তেলুগু জাতীয়, বাকী হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি। এই সব কুলীদের অনেকে যাতে দেশে আর না ফিরে গিয়ে মালাইদেশেই বসবাস ক'রতে থাকে এইরূপ নাকি মালাইদেশের ইংরেজ সরকারের বাসনা। কারণ দেশটা মস্ত বড়ো, লোক সংখ্যা খুবই কম, আর ভারতীয় প্রজা চাষ-আবাদের কাজে খুবই পোক্ত, বিশেষতঃ এরা অতি গোবেচারী নির্ব্বিরোধী সহিষ্ণু জাতি, চীনাদের মতন দুর্দ্ধর্ষ নয়—তাই উপনিবেশিক হিসাবে ভারতীয়দেরই পছন্দ হ'চ্ছে। কিন্তু আবার অনেকের মনে ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষ ভাবও আছে। এ ছাড়া, ভারতীয়েরা সাধারণতঃ একটু বেশী ঘরমুখো, দুপয়সা জমালেই দেশে ফিরে গিয়ে উড়িয়ে দিয়ে ফতুর হ'তে চায়—আর অনেকের স্ত্রী পুত্রকে এদেশে নিয়ে আসা সামর্থ্যে কুলোয় না। শ্রীযুক্ত রেড্ডির অনুমান যে প্রায় ৬।৭ লাখ ভারতবাসী মালাই দেশে বাস করে, এর অর্দ্ধেক আন্দাজ হ'চ্ছে থিতু বাসিন্দে।

চা পানের মজলিস ভঙ্গের পর, ম্যাজিষ্ট্রেট আর কমিশনার সাহেবদের কাছ থেকে আর অভ্যাগতদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঞ্জং-ক্লিং-এ ফিরে আসা গেল। সন্ধ্যার পর রবীন্দ্র সংবর্দ্ধনা সভার তরফ থেকে এক ডিনারে কবি আর তাঁর সাথীদের আপ্যায়ন ছিল। একে একে এই সভার সভ্যরা এসে উপস্থিত হ'লেন। চীনা, তামিল হিন্দু খ্রীষ্টান আর মুসলমান, শিখ, ইংরেজ। ডিনারের আয়োজনটি বেশ ছিল। আর ছিল পানের ব্যবস্থাটা; ডিনার ভেঙে গেলে পরে, কবির অসাক্ষাতে, আহূত নানা পানীয়ের সদ্ব্যবহার কতকগুলি অভ্যাগতদ্বারা অনেক রাত পর্য্যন্ত চ'লেছিল। এই মালাইদেশে দেখ্‌ছি যে ভোজনের সঙ্গে বা পরে পান করাটা হ'চ্ছে সাধারণ রীতি। ইংরেজদের আদব-কায়দা অনেক কিছুর মধ্যে এটাও এই অভিজাত্য হীন দেশে একটু বেশী রকমই ঢুকেছে; চীনা, ভারতীয়, ইংরেজ—এরা বেশ দোস্তীর সঙ্গে পান বিষয়ে পরস্পর পাল্লা দিতে লাগল ব'লে মনে হ'ল। ডিনারে মালাক্কার আশ-পাশ থেকে কতকগুলি ইংরেজ রবারের আর না'রকল বাগানের মালিক এসেছিল। এদের মোটের উপর বেশ ভদ্র ব'লেই মনে হ'ল। খাবার টেবিলে আমার পাশে ব'সেছিলেন একটী ইংরেজ, "তুআন হাজী" অর্থাৎ "হাজী সাহেব" ব'লে সবাই তাঁকে ডাক্‌ছিল। লোকটী নিজেই আমায় তাঁর পরিচয় দিলেন, ব'ললেন যে তিনি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রেছেন, মক্কায় গিয়ে হজ পর্য্যন্তও ক'রে এসেছেন। আর কিছু ব'ল্‌লেন না। হঠাৎ কেন মুসলমান হ'তে গেলেন সে প্রশ্ন ভদ্রতা বিরুদ্ধ হ'তে পারে মনে ক'রে আমি স্পষ্ট এঁকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলুম না, আর একটু মুচকে হেসে ভদ্রলোক সে বিষয়ে নিজেও কিছু অবতারণা ক'রলেন না। ভদ্র ব্যবহারের দ্বারায় এঁকে বেশ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব'লে ধ'রতে দেরী হয় না। শুন্‌লুম, এঁর সত্যিকারের নাম হ'চ্ছে মিষ্টার ব্রাণ্টন্‌। কার কাছে যেন শুন্‌লুম, উচ্চ-বংশীয়া একটি মালাই মহিলাকে বিবাহ করার সঙ্গে এঁর ইস্‌লাম ধর্ম্ম-গ্রহণ জড়িত আছে। মুসলমান ব'লে পরিচয় দিলেও, পানে বিরক্তি দেখলুম না। সেই রাত্রেই ডিনার খেয়ে অনেক মাইল দূরে তাঁর না'রকল বাগানে তিনি ফিরবেন। আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরের দিন কোনও সময়ে নিরিবিলি দু পাঁচ মিনিট তাঁর আলাপের সুযোগ হ'তে পারে কি না। কবিকে জিজ্ঞাসা ক'রে সময় স্থির ক'রে দেওয়া হ'ল, কিন্তু তারপরে তিনি আর দেখা দেন নি।

এই ডিনারে সভাপতি ছিলেন মালাক্কার ম্যাজিস্‌ট্রেট্ মিস্‌টার ডড্‌স্। ভোজনের পরে বক্তৃতার পালা। কবির "স্বাস্থ্য-পান"এর প্রস্তাব ক'রতে উঠে তিনি ব'ললেন, মালাক্কায় কতকগুলি বিশ্ববিখ্যাত বড়ো লোকের পদার্পণ ঘ'টেছিল—যেমন পোর্তুগীস সেনাপতি আলবুকের্কে, রোমান কাথলিক প্রচারক সাধু ফ্রান্সিস্ জাভিয়ের, আর ইংরেজ লোকনায়ক আর লোকশাসক স্ট্যাম্ফর্ড র‍্যাফ্‌ল্‌স্—কিন্তু বিশ্বমৈত্রীর বার্ত্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতন ভাবুক কবি আর শিল্পীর আগমন এদেশে এই প্রথম, আর এই রকম দেশে যেখানে নানা জা'তে মিলে তাল-গোল পাকিয়ে একটা নোতুন রাজ্য গ'ড়ে তুলছে সেখানে আন্তর্জাতিক মৈত্রীর বার্ত্তা নিয়ে তাঁর মতন চিন্তা-নেতার আসার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, ইত্যাদি। কবিকে জবাবে কিছু ব'লতে হ'ল; তাঁর বক্তৃতা হাস্যরসোজ্জ্বল হওয়ায় after dinner speech হিসাবে বেশ সময়োপযোগী হ'য়েছিল। তিনি ব'ললেন যে আমাদের দেশে একটা কথা আছে "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ"—সে নিয়মের ব্যতিক্রম রূপ নাগরিকতা-বিরোধী কাজ তাঁকে ক'রতেই হ'চ্ছে নাচার হ'য়ে। তারপর বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি অল্প স্বল্প কিছু বলেন।

এই রকম গোলেমালে সামাজিকতায় মালাক্কায় আমাদের প্রথম দিনটা কেটে গেল।

২৮শে জুলাই, বৃহস্পতিবার :

আজকে মালাক্কা শহরটা দেখবার সুযোগ হ'য়েছিল, সকালে আর দুপুরে। ছোটো শহর। মালাক্কা নদীর উত্তর ধারে পুরাতন শহর। সরু সরু গলী নিয়ে চীনা পল্লী, দোকান পাট। নদীর দক্ষিণ ধারে একটা পাহাড়ের উপরে গভর্মেণ্ট হাউস আর কেল্লার ভগ্নাবশেষ। একটী মাদ্রাজী মুসলমান মণিহারীর দোকান আবিষ্কার করা গেল, তাঞ্জং-ক্লিং থেকে শহরে যাবার রাস্তায়, শহরে ঢুকতে, সেখানে হরেক রকমের মালাই আর চীনা কাজের curio পুরাতন টুকিটাকি জিনিস দেখা গেল, আজ আর কাল দু দিন ধ'রে তার জিনিসপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে আমরা কতকগুলি সুন্দর চীনা আর মালাই জিনিস সংগ্রহ ক'রলুম। দুটী পিতলের চীনা পু-তাই মুর্ত্তি, আর একটী চীনা জালিকাটা পিতলের চৌকা টেবিল অলঙ্কার table-top, তাতে অতি সুন্দর ভাবে বাঁশ আর অন্য গাছের উপবনের মধ্যে চীনা কবি আর গায়ক বাদকের দলের চিত্র খোদাই করা আছে, এগুলি আমি সংগ্রহ ক'রলুম। ভদ্র চীনা পাড়া দিয়ে ঘুরে যাওয়া গেল, বাড়ীর সামনে কাঠের সাইন্-বোর্ডে মস্ত মস্ত অক্ষরে সোনালী বা লাল বা কালো জমীর উপর চমৎকার ভাবে অন্য রঙে লেখা চীনা অক্ষর, তাতে গৃহস্বামীর নাম লেখা; বাড়ীর সামনেটায় একটু বারান্দা; তারপরেই একটি ঘর, তাতে দরজার সামনেই, নানা চিত্র-বস্তুতে ভরা এক টেবিলের উপরে পরিবারের মৃতদের আত্মার প্রতীক হিসাবে কাঠের ছোটো ছোটো নাম-ফলক, বেদির উপর দেবতাদের মূর্ত্তির মতন, কাঠের পাদ-পীঠের উপর খাড়া করা র'য়েছে। শ্রীশবাবুদের আপিস দেখলুম, মালাক্কা নদীর ধারে কাঠের বাড়ী, চীনা আর মাদ্রাজী কেরানীতে বেশ একটা ক্ষিপ্র কার্য্য-তৎপরতার ভাব—এরা চীনা আর তামিল মক্কেলদের দেখছে। শ্রীশবাবু ক'লকাতার এক বিখ্যাত ব্যবহারজীবের আইনের বইয়ের সংগ্রহ কিনেছেন, সেই সব বই এসেছে, তাদের রক্ষণের ব্যবস্থা ক'রছেন।

দুপুরে গুহ গৃহে আমাদের আহার হ'ল। গুহ মহাশয় আর দত্ত-মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীদের তত্ত্বাবধানে। পুরা ভারতীয় আর বাঙালী আহার হ'ল। আহারান্তে খানিক ক্ষণ বিশ্রাম ক'রতে হ'ল। তারপরে বেলা সওয়া তিনটায় Muar মুআর যাত্র'।

ব্রিটিশের খাস এলাকা মালাক্কা জেলা ছাড়িয়ে দক্ষিণে Johore জোহোর রাজ্যের অধীনে Muar মুআর নদীর মুখের কাছে একটী ছোট শহর গ'ড়ে উঠেছে তারও নাম মুআর, একটি প্রবর্দ্ধমান বাণিজ্য কেন্দ্র। চীনা আর তামিলদের বাস এখানে খুব। এখানকার লোকেরা কবিকে তাদের মধ্যে পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানে শ্রীশবাবুর একটি আপিস আছে, শ্রীযুক্ত সুধীর দাস এই আপিসের কাজকর্ম্ম দেখেন। মোটরে ক'রে আমরা রওনা হ'লুম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মুআরে পৌঁছানো গেল, তারপর খেয়া ষ্টীমারে ক'রে মোটর শুদ্ধ নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়া গেল। মালাই দেশের এই রাস্তাগুলি অতি সুন্দর, আর এই রাস্তার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ থেকে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির কথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। পথে আমরা কতকগুলি মালাই কাম্পং অর্থাৎ গ্রাম বা পল্লী দেখলুম, তাঞ্জং-ক্লিং-এর পথের মালাই পল্লীটির মতই শ্রীসৌন্দর্য্য সম্পন্ন। অনেক বাড়ীর সংলগ্ন কাঠের মোটর "গারাজ" বা মোটরের ঘরও আছে, গৃহস্থদের অনেকেই যে মোটর রাখবার মত অবস্থার, তা বুঝতে পারা গেল।

মুআরে আমরা ঘণ্টা দুই ছিলুম। এখানে বেশ বড়ো একটা চীনা ইস্কুল আছে, তাতে চীনা ছেলেদের ইংরিজি শেখানো হয়, আবার খাঁটি চীনে করবার জন্য চীনাও শেখানো হয়। এইরকম ইস্কুলের কথা আগে ব'লেছি। এই ইস্কুলে আমাদের আগে নিয়ে গেল। এখানে স্থানীয় শিক্ষিত আর বিশিষ্ট চীনা জনগণের সঙ্গে বৈকালী চা-ভোগ ক'রতে হ'ল, ফোটো তোলাতেও হ'ল
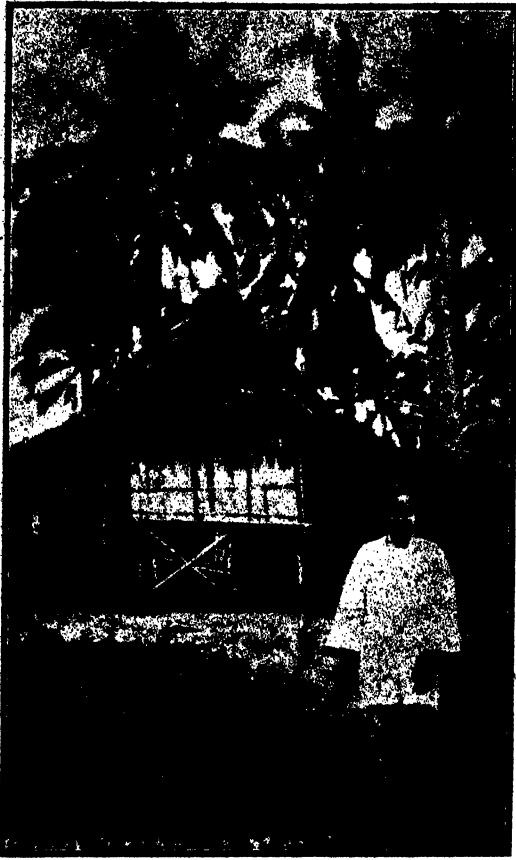
মালয়দেশের ঘরবাড়ী

কবিকে শিষ্টালাপ ক'রতে হ'ল। সুন্দর চীনা হরফে লেখা কারুকার্য্য খচিত একটী অভিনন্দন পত্র কবিকে দেওয়া হ'ল। তারপরে স্থানীয় চীনা সিনেমা থিয়েটারে এসে মুআরের সমাগত অধিবাসী, মালাই,

একটি মালয় পরিবার

ইংরেজ, চীনা, আর ভারতীয়দের কাছে কবির বক্তৃতা। মুআর জোহোর রাজ্যের অধীনস্থ স্থান ; এখানে জোহোরের সুলতানের ছেলে, যাঁর উপাধি হচ্ছে Tungku "টুংকু", তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি এই বক্তৃতা-সভার সভাপতি হবেন কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তিনি আস্‌তে পারলেন না, স্থানীয় মালাই ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর বদলে এলেন। কবি বক্তৃতা দিলেন, পরে তাঁর বক্তৃতা চীনাতে আর বন্ধুবর আরিয়াম্ কর্ত্তৃক তামিলে অনুবাদিত হ'ল। প্রভূত সম্বর্দ্ধনার সঙ্গে মুআর থেকে বিদায় নিয়ে, নদী পেরিয়ে আমরা আবার মালাক্কা তাঞ্জং-ক্লিং অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে, না'রকল গাছের মাথার উপর সূর্য্যাস্তের রঙের সমাবেশ মুগ্ধনেত্রে দেখতে দেখতে বাসায় ফেরা গেল। মালাক্কার উত্তরপূর্ব্বে Jasin জাসিন শহরে আরিয়ামের এক আত্মীয়ের বাড়ী ; আত্মীয়টী ডাক্তার, ঐ দেশেই বসবাস ক'রেছেন। আরিয়াম,সুরেন বাবু আর ধীরেন বাবুকে সেখানে নিয়ে গেলেন, এঁদের মালাই থিয়েটার দেখাবেন ব'লে। কবির সঙ্গে আমি তাঞ্জং-ক্লিং-এ র'য়ে গেলুম ; শচীনবাবু আর শ্রীশবাবু এলেন, বেশ আলাপ আলোচনায় আড্‌ডা জমানো গেল। আরিয়ামেরা অনেক রাত্রে জাসিন থেকে ফিরলেন।

কবির আগমনে স্থানীয় তামিল চেট্টীদের খুবই উৎসাহ দেখা গেল। এঁরা আজ সকাল থেকে দলে দলে আস্‌তে লাগলেন, কবির দর্শনের জন্য এক এক মোটরে ৫।৬ জন ক'রে আসেন, সঙ্গে থালায় আর বারকোষে প্রচুর ফল আর মিছরী,এলাচ প্রভৃতি নিয়ে। গায়ে কারো জামা আছে কারো বা নাই,সুন্দর সুঠামকৃষ্ণবর্ণ দেহ,কণ্ঠে সোনাবাঁধানো রুদ্রাক্ষ, কানে হীরার কানফুল, হাতে সোনার বালা, মাথায় উড়েখোঁপা, গায়ে বা কোমরে জড়ানো জরীদার ধব্‌ধবে চাদর, খালি পা বা চামড়ার চপ্পল মণ্ডিত পা, প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি এইসব চেট্টীরা। খোলা বারান্দার চেয়ারে ব'সে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন কি প'ড়ছেন, এঁরা এসে পরম ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে ফল প্রভৃতি তাঁর সামনে দিতে লাগলেন। আরিয়ামকে দোভাষীর কাজ করতে হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের দু-একটী শিষ্টালাপ-যুক্ত বচন শুনে তাঁরা খুশী হ'য়ে চ'লে যাচ্ছেন। আজকের দিন আর কাল, দু'দিন চেট্টীদের উপহৃত ফলে আমাদের ঘরের টেবিল ভ'রে গেল—কলা, আনারস, রাম্বুতান, মাঙ্গোস্তীন, লিচু, আপেল, আঙুর, কমলালেবু, আর মিছরী, বিস্তর জড়ো হ'ল। মালাক্কা ত্যাগ ক'রে আসবার সময় যথেষ্ট সঙ্গে নিয়েও বাকী চীনা খানসামা আর চাকরদের ভোগের জন্যে রেখে দিয়ে যেতে হ'ল। এই যে চেট্টীরা তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য ফলের রাশি নিয়ে উপস্থিত হ'চ্ছিলেন, এঁরা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ জানেন

না। তবে, রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়েছেন, তিনি এঁদের মতন আচারযুক্ত নিষ্ঠাবান আনুষ্ঠানিক হিন্দু নন, এটা এঁরা জানেন, শুনেছেন, দেখেছেন; কিন্তু তিনি যে ভারতের সংস্কৃতির ভারতের চিন্তার আর আধ্যাত্মিকতার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা, এটা তাঁরা অস্পষ্টভাবে হ'লেও বুঝেছেন, আর সেই বোঝার দরুন তাঁরা তাঁদের সামাজিক আর ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান আর রীতিমূলক অন্ধসংস্কারের উর্দ্ধে উঠে রবীন্দ্রনাথকে সপ্রণাম শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রতে এসেছেন।

২৯শে জুলাই, শুক্রবার।

আজকে প্রায় সমস্ত দিনটা তাঞ্জং-ক্লিং-এ ব'সে ব'সেই কাট্‌ল। মাঝে আমরা একবার শহরে ঘুরে এলুম। তাঞ্জং-ক্লিং-এর বারান্দা একেবারে সমুদ্রের ধারে—খানিকটা সিকতাভূমি, তার মধ্যে মধ্যে না'রকল গাছ দুই চারটে, আর তার পরে সমুদ্র। বারান্দায় ব'সলে হাওয়ায় যেন মাঝে মাঝে উড়িয়ে নিয়ে যায়। মেঘমুক্ত আকাশ, দূরে মাছ ধ'রছে মালাই জেলেরা, বালীর উপর মালাই ছেলেরা ঘুরছে ফিরছে, খেলা ক'রছে, ঝিনুক কুড়াচ্ছে, আর কিছু দূরে নীল সাগর, নীল আকাশের নীচে—সমস্ত দৃশ্যটা খুবই উপভোগ্য। সারা সকালবেলা ক্রমাগত কবিদর্শনেচ্ছুদের আগমন—চেট্টীদের বিশেষ ক'রে। চেট্টীরা আসে, কবিকে দেখে প্রণাম ক'রে চ'লে যায়—ইংরেজী জানে না, অতএব বেশ একটা সেকেলে ভদ্রতা এদের সব ব্যবহারে সব কথায় পরিস্ফুট। একটি ইংরেজী-শিক্ষিত তামিল যুবক, ঘোর কালো রঙে নিখুঁতভাবে সাহেব সাজা, সে এই রকম একদল চেট্টীর পাণ্ডা হ'য়ে কবিকে দর্শন করিয়ে দেবার জন্য তাদের নিয়ে আসে তাঞ্জং-ক্লিং-এ। একে একটি অল্পবয়সের ছোকরা ব'ললেও হয়। সপ্রতিভ, "স্মার্ট্",—খালি গায়ে ছাইয়ের বিভূতি মাখা রুদ্রাক্ষ আর সোণার তাড় পরা চেট্টীদের সঙ্গে একজাতির হ'লেও তার ইংরিজি ভাষার আর সাহেবী পোষাকের দৌলতে সে যে নিজেকে এদের চেয়ে একটু উঁচু ধাপের জীব ব'লে মনে করে সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। চেট্টীরা নিজে যখন দেখা ক'রতে আসে, এসেই চটপট কবির দর্শন সেরে ফেলে চ'লে যাবার তাগিদ নিয়ে আসে না; রবীন্দ্রনাথ লেখায় কি অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত থাকলে এরা প্রসন্নচিত্তে তাঁর সুবিধার জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু এই ছোক্‌রার সময়ের মূল্য বোধ হয় একটু বড়ো বেশী ছিল, সে এসেই ঘড়ী খুলে "সতেরো মিনিট মাত্র র'য়েছে সময়" গোছ ব্যস্ততা দেখাতে আরম্ভ ক'রলে। উপর উপর একটু ইংরিজি পালিশের ঝাঁজটা অনেক সময়ে নিজেকে উৎকটভাবে প্রকট ক'রে থাকে। আর এই প্রকারের আভিজাত্য-বিহীন আর শালীনতা-বিহীন দিগ্‌বিজিগীষুদের অহমিকাপূর্ণ ভাব অনেক সময়ে যেমন কৌতুককর তেমনি করুণ লাগে। চেট্টীরা নির্ব্বাক্, তারা তো আর ইংরিজি জানে না, সাহেব-সাজা স্বজাতীয় পাণ্ডাটিকে অবলম্বন ক'রে এসেছে মাত্র। ইতিমধ্যে আরি-য়াম্ এসে ছোকরাকে তার মাতৃভাষা তামিলে দু'চার কথা বলায় সে তুষ্ণীভাব অবলম্বন ক'রলে—চেট্টীরা যথারীতি রবীন্দ্রদর্শন ক'রে আনন্দিত হ'য়ে চ'লে গেল। চেট্টীদের আর এক দল এসে রবীন্দ্রনাথকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ক'রতে লাগ্‌ল, তিনি যাতে দয়া ক'রে একবার তাদের মন্দিরে আসেন। তাঁর হ'য়ে চেট্টিমন্দিরে ঘুরে আসবার ভার আমার উপর প'ড়্‌ল—স্থির হ'ল আমি বিকালে বা সন্ধ্যার দিকে গিয়ে তাঁদের মন্দির দর্শন ক'রে আস্‌বো। তাঁদের মন্দিরে গিয়েও ছিলুম। বিস্তর দেব-মূর্ত্তিতে ভরা শিবের মন্দির। যখন যাই, তখন সবে সন্ধ্যারতি শেষ হ'য়েছে। মন্দিরের আঙিনায় তামিল আর অন্য ভারতীয়দের সঙ্গে পূজাদর্শনার্থী কতকগুলি চীনাদেরও ভীড়। মন্দিরের বিস্তর সম্পত্তি আছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কেউ কেউ ইংরিজি জানে। আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গের লোক ব'লে জানতে পেরে আর ব্রাহ্মণ ব'লে আমার পরিচয় পেয়ে তারা সমাদর ক'রে মন্দিরের সমস্ত ব্যবস্থা, সংলগ্ন ধর্ম্মশালা, ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি, দেবতার রত্নাদি, সব দেখালে। একজন পুরোহিত আমার কল্যাণের জন্য বিশেষ ক'রে কতকগুলি মন্ত্র প'ড়লে, মহাদেব আর কার্ত্তিকেয়ের পিত্তল-মূর্ত্তির সাম্‌নে। মন্দিরের রাস্তায় খুব কাছাকাছি মালাইদের একটা মস্‌জিদ আছে। বলা বাহুল্য, এদের সঙ্গে কোনও গোলমালের কথা কখনও শোনা যায় নি।

দুপুরে গুহমহাশয়ের বাড়ী থেকে আমাদের জন্য আহার্য্য এল, সস্ত্রীক শ্রীশবাবু আর শচীনবাবুও এলেন। আহারের পরে গানে গল্পে দুপুরটা কাট্‌ল। বিকালের দিকে আরও চেট্টীদের আগমন। আজকের অনুষ্ঠান ছিল দুটী। একটী, বিকাল সাড়ে চারটের স্থানীয় ভারতীয় আর চীনাদের মহলে কবির অভিভাষণ; আর দ্বিতীয়টী, সন্ধ্যায় স্থানীয় রোমান কাথলিক ইস্কুল St. Francis Institution গৃহে কবির বক্তৃতা। চীনাদের একটি ক্লাব্ গৃহে বিকালের সভাটী হয়, চীনা, ভারতীয় তামিল গুজরাটী আর শিখদের খুবই ভীড় হ'য়েছিল। সন্ধ্যার সভায় শ্রীযুক্ত ক্রাইটন সভাপতি ছিলেন। তিনি কবির প্রশস্তি-বাচক একটী বক্তৃতা দেন, কবিকে একজন চীনা ভদ্রলোক মালা পরিয়ে দেওয়ার পরে তিনি তাঁর বক্তব্য বলেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ আর উদ্দেশ্য যে পৃথিবীর তাবৎ জাতিরই, এই ছিল আলোচ্য বিষয়। বক্তৃতাটীতে মালাক্কার প্রায় সকল শিক্ষিত লোকের সমাগম হ'য়েছিল।

সন্ধ্যের পরে আবার তাঞ্জং-ক্লিং এ বন্ধু সম্মেলন, আর এইরূপে মালাক্কায় আমাদের তৃতীয় দিনের অবসান।

৩০শে জুলাই, শনিবার।

আজকে আমাদের মালাক্কা ত্যাগ ক'রে যাবার দিন। সকালে জিনিস-পত্র গুছিয়ে বেঁধে ঠিক হ'য়ে রইলুম। আজও কবিদর্শনার্থীদের আগমন। বেলা দেড়টায় বেরুনো গেল—২০।২৫ মাইল উত্তরে Tampin তাম্‌পিন পর্য্যন্ত মোটরে গিয়ে, সেখান থেকে মেন্ লাইনের ট্রেন ধ'রে Kuala Lumpur কুআলা-লুম্পুরে যেতে হবে। বন্ধুরা কেউ কেউ তাঞ্জং ক্লিং এ এলেন। মালাক্কা থেকে তাম্‌পিন পর্য্যন্ত মোটর পথটা সুন্দর উঁচু খুব নীচু দেশের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। দুধারে ক্রমাগত রবারের বাগান, আর না'রকল বাগান,—খালি ঘন সবুজের সৌন্দর্য্য। মাঝে মাঝে রাস্তায় দুএকটী চীনা মুদির বা খাবারওয়ালার দোকান, আর ভারতীয় কুলীদের লাইন বা বস্তী,—এক একটা তামিল পল্লী ব'ললেই হয়। তাম্পিনে পৌঁছে, স্থির হ'ল যে ধীরেনবাবু আর সুরেনবাবু, শচীনবাবু আর সুধীরবাবুর সঙ্গে সোজাসুজী মোটরে ক'রেই কুআলা-লুম্পুরে যাবেন, আর কবি, আরিয়াম আর আমি ট্রেনে ক'রে যাবো। কুআলা-লুম্পুর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে চ'ললেন শ্রীশবাবু, তাঁর স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েরা, আর শচীনবাবু আর তৎপত্নী। তাম্পিন ষ্টেশনে একটী বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, ইনি এখানে একটী কাঠের কারবারে কেরানীর কাজ করেন, কবির গমন হবে তাম্পিনের পথে, তাই তাঁকে দেখ্‌তে এসেছেন।

মালাক্কার পাট চুকিয়ে, কুআলা-লুম্পুরের দিকে এইরূপে আমরা অগ্রসর হ'লুম।

আলোচনা

হাউস অব লেবারার্স লিমিটেড, কুমিল্লা

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রিকায় আমাদের জেলার গৌরবময় প্রতিষ্ঠান 'হাউস অব লেবারার্সে'র ভিতরকার ইতিহাসটি পাঠ করিয়া প্রাণে যুগপৎ আশা ও আনন্দের সাড়া দিতেছে।—কর্ম্মিগণের সাধনায় একদিন হয়ত ইহা কল-কারখানা বা শিল্প-জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া দেশের মহৎ উপকার সাধন করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইতিবৃত্ত-লেখক তাঁহার এই সুদীর্ঘ ও সুবর্ণিত বিবরণের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিয়াই হউক বা ভ্রমবশতই হউক একটী কথার উল্লেখ করেন নাই। তাহা কালীকচ্ছ-নিবাসী মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের কথা, যিনি এসব অনুষ্ঠানের এ জেলায় প্রথম পথ-প্রদর্শক। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী জুড়িয়া যাঁহার চিন্তা ও কর্ম্মের ধারা দেশে নূতন কর্ম্মপন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য ক্ষতির খতিয়ানের দিকে দৃকপাত মাত্র না করিয়া অটল অচল ভাবে সমস্ত বাধা বিপত্তি এড়াইয়া চলিয়াছিল, যাহার ফলে আজও কালীকচ্ছের নবীন কর্ম্মকার ও মহেন্দ্রচন্দ্র দাস সুদক্ষ কারিগর বলিয়া এ অঞ্চলে প্রখ্যাত এবং তাহারা উচ্চ বেতনে যে কোনো বড় কারখানায় এ কাজ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে; সেই গ্রামেরই দুইটী শিক্ষিত যুবক 'লেবার হাউসে'র প্রধানতম উদ্যোক্তা কর্ম্মী।

কাজেই লেখকের "কল-কব্জার সঙ্গে কাহারও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না" এ উক্তির সমর্থন আমরা করিতে পারি না। বিশেষত উদ্যোক্তাদ্বয়ের একজন কিছুকাল মহেন্দ্রবাবু এবং তাহার ভাগিনেয় কমনীয় কুমার সিংহের কারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া জানি।

ডাঃ নন্দী স্বদেশী আন্দোলনের (বঙ্গ-ভঙ্গের) বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহার স্বগ্রাম কালীকচ্ছে একটি লোহার কাজের কারখানা (workshop) স্থাপন করিয়া বিলাতী ছাঁচের ছুরি, কাঁচি, স্ক্রু, কব্জা ইত্যাদি প্রস্তুত করাইতেন, এবং ক্রমে ইহা হইতেই "দিয়াশালায়ের কল" নানা প্রকারের হাতের তাঁত চরকা "বোতাম প্রস্তুতের কল" "বেত উঠাইবার কল" ইত্যাদি আবিষ্কার করেন।

এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, যে স্থলে মহেন্দ্র চন্দ্র সজ্ঞবেদী রচনা করিয়া যুগোপযোগী আবহাওয়া বহাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে স্থানে লেবার হাউসের প্রধানতম উদ্যোক্তা ও আদর্শ কর্ম্মী প্রফুল্ল-চন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্রের ন্যায় ভ্রাতৃ যুগলের উদ্ভব মোটেই অসম্ভব বা আশ্চর্য্য বিষয় বলিয়া অন্তত আমরা মনে করি না।

এমন একটি ইতিবৃত্ত লেখার দরুণ লেখককে আমরা ধন্যবাদই দিই। তবে মহেন্দ্রবাবুর নাম এতে যোগ করিলে সোনায় সোহাগা হইত।

সত্যভূষণ দত্ত

কুণ্ডা শিল্প-বিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ১০ই শ্রাবণ ১৩৩৫

চলন্ত বিদ্যালয়—

উত্তর ওণ্টেরিও'র বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য কানাডার রেল কোম্পানিগুলির সঙ্গে সুবন্দোবস্ত করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

চলন্ত বিদ্যালয়

চলন্ত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুইখানা রেল গাড়ীতে ক্লাশ বসে,মাষ্টাররা থাকেন ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র থাকে। এইসব ক্লাশের ছাত্ররা যেমন মনোযোগী এমন মনোযোগী ছাত্র নাকি আর কোথাও নাই, ইহাই শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত।

ধোঁয়ার পর্দ্দা—

পানামা খালের উপযোগিতা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু, উড়ো-জাহাজের প্রচলন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ভাবী কালে যুদ্ধ-সময়ে

পানামা খাল ঢাকিয়া ফেলা
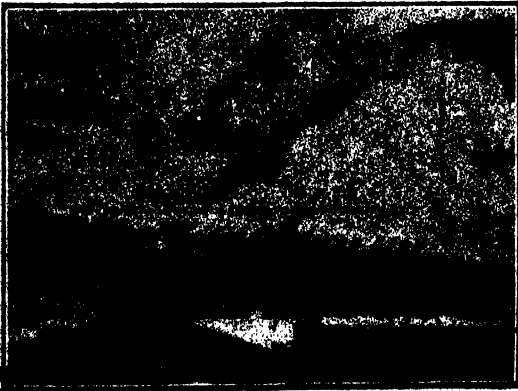
উড়োজাহাজের উপদ্রব হইতে কিরূপে এ খাল মুক্ত রাখা যাইবে আমেরিকার সরকার তাহা ভাবিতেছেন।—এইরূপ ধোঁয়ার পর্দ্দা একেবারে অবগুণ্ঠন টানিয়া সে খালকে বৈমানিকের চোখ হইতে আড়াল করিবে।

আয়র্লণ্ডের 'এ ঈ'—

জর্জ্জ রাসেলের নাম 'এ ঈ'—তিনি একাধারে কবি, মরমীয়া, চিন্তাশীল সাহিত্যিক, রাষ্ট্রকর্ম্মী,আইরিশ্ সেনেটর ও সমবায়-নেতা।
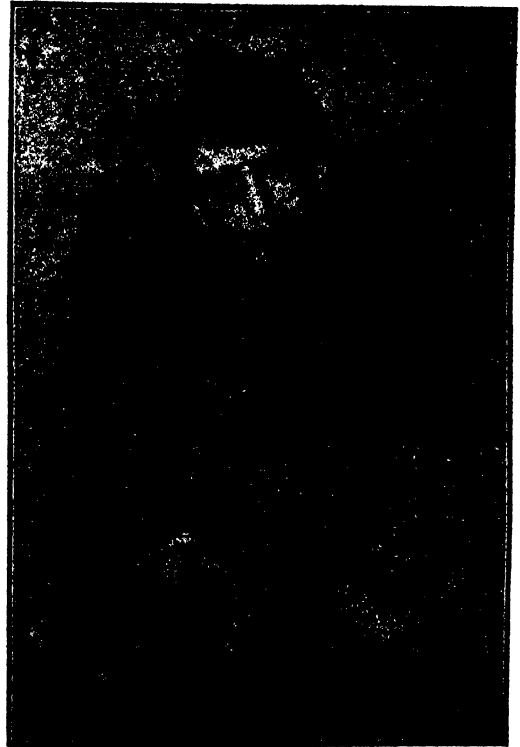
কবি 'এ ঈ'

তাঁহার এই পেন্সিল চিত্রখানা জন্ বাট্লর ঈয়েট্স-এর অঙ্কিত। কবি 'এঈ'র মতে আইরিশ্ বিপ্লব খোলাখুলি বিদ্রোহ, ও তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী আর্থিক, যান্ত্রিক বিপ্লব, রস ও মনীষার প্রেরণা দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে।

আলু-বিলাতীবেগুন—

কলম বাঁধিয়া আজকাল একই গাছের উপরে বিলাতী বেগুন ও নীচে গোলআলু জন্মাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই দুইটি জিনিসের কোথাও মিল নাই। কিন্তু, আলুর থেকে যদি তার অঙ্কুরগুলি ছাড়াইয়া লইয়া তাহার স্থলে বিলাতী বেগুনের অঙ্কুরগুলি রোপণ করা যায় তাহা হইলে গাছের মূল থাকিবে আলুর ও ডালে ধরিবে বিলাতী বেগুন। এই কলম থেকে যেই আলুর কোঁড় গজায় তাহা কাটিয়া দেওয়া হয়, বিলাতী বেগুনের কোঁড়কে বাড়িতে দেওয়া হয়। এইরূপে কলমের নীচের দিকে আলু ও উপরের দিকে বিলাতী বেগুন পাওয়া যায়।
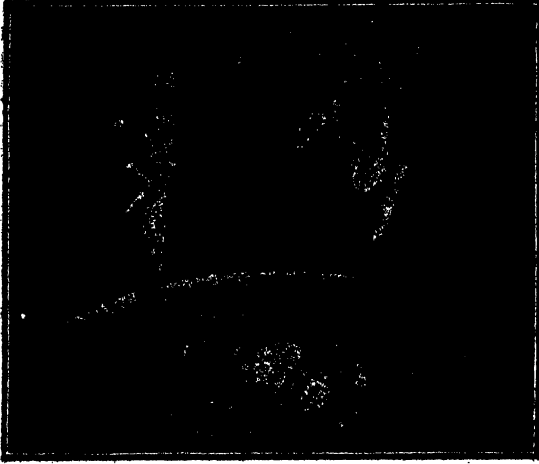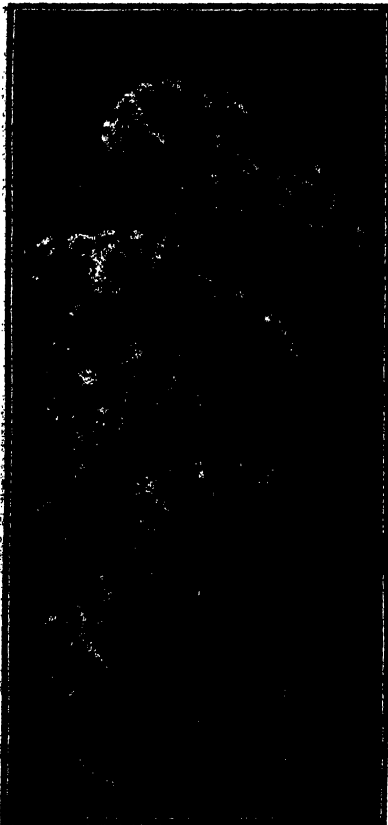
কলম-বাঁধার এক সপ্তাহ পরে

আলু-বিলাতীবেগুনগাছটি তে ফল ধরিতেছে।

সাহারায় সভ্যতা—

বর্ত্তমান সভ্যতার কবলে সাহারা মরুভূমিও আসিয়া পড়িল।

সাহারার খবরের-কাগজ ফিরিওয়ালা

টুনিস্-এ দশ হাজার মোটরকার আছে ইহার পাঁচশ আবার 'বাস্'। এই সব বাস্-এর সাহায্যে বর্ত্তমান সভ্যতা সাহারার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অধিকার করিতেছে। এখানে একটি মরু-উদ্যানের মধ্যকার একজন খবরের-কাগজ ফিরিওয়ালার চিত্র দেওয়া যাইতেছে।

পতঙ্গের সঙ্গীত—

ঝিঁঝিঁ পোকার গান আমাদের শোনা আছে। তাহাকে গান না বলিলেও, তাহা যে নিতান্ত কর্কশ ও কটু নয়, এ কথা
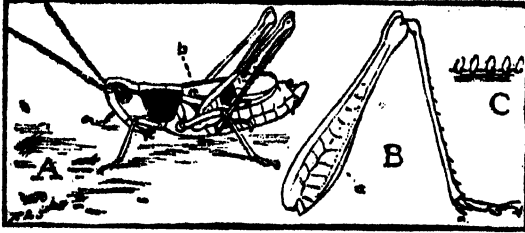
ফড়িং
(a) চিহ্নিত পিছনের দাঁতওয়ালা ডান জানু দিয়া বাম পাখার (b) চিহ্নিত তীক্ষ্ণধার শিরাযুক্ত স্থানে আঘাত করিলেই ইহার সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। A. ফড়িং B সেই দাঁতওয়ালা জানু, C. দাঁতগুলি বড় করিয়া দেখানো হইতেছে।

স্বীকার্য্য। আমেরিকার আর, ঈ, স্নড্‌গ্রাস্‌, পতঙ্গের সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক সুন্দর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, কোনো কোনো ফড়িং (Grasshopper) যে শব্দ করে তাহা শুনিতে গানের

ট্রি-ক্রিকেট্‌—পুং পতঙ্গটি পাখা বিস্তার করিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি করিতেছে। ইহারাই গায়ক।

মতই বটে। এক জাতীয় পতঙ্গ 'চিক্‌-চিক্‌-চিক্‌'করিয়া দ্রুত শব্দ করে। এইরূপ পতঙ্গকে বেহালা-বাদক বলা যাইতে পারে, সামনের পাখা দুটি বেহালার কাজ ও পিছনের একটি পা বেহালার ছড়ের কাজ করে। আর এক জাতীয় পতঙ্গের 'সঙ্গীত' শোনা যায় উড়িলে;—তাহাদের সঙ্গীত পাখার জন্ত। Katydid আমেরিকার একরকম বৃহৎ পতঙ্গ, ইহারা পতঙ্গশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাধিক সঙ্গীত-রসিক। ইহাদের সঙ্গীত-যন্ত্র একেবারে ভিন্ন ধরণের। এইসব পতঙ্গ প্রায়ই বাঁ পাখা দিয়া ডান পাখাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে। ইহাদের পাখার সূক্ষ্মগঠন এমন অদ্ভুত যে, যেই ইহারা পাখা এদিক ওদিক নাড়ে, অমনি দুই

আমেরিকার কেটিডিড্‌ নামক বড় পতঙ্গ
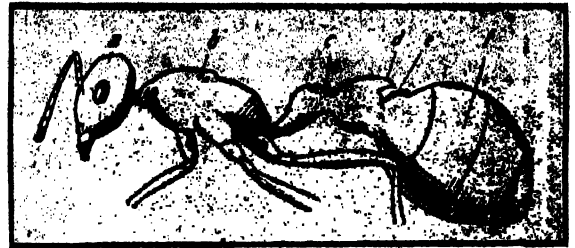
গায়ক পিঁপড়ে ও গীত-যন্ত্র। *a* মাথা; *b* বক্ষঃস্থল; *c* 'বোঁটা'; *d* মিশ্রাজ, যাহা দিয়া খাঁজকাটা বাঁশীকে আঘাত করা হয়; *f* নিম্নোদর।

পাখার ঘর্ষণে এই সঙ্গীত উঠে। কিন্তু এই পতঙ্গ প্রায় দুর্লক্ষ্য, উঁচু গাছের উঁচু ডালে ইহারা থাকে। বিলাতে ক্রিকেট্‌ এর গানই সর্ব্বাধিক খ্যাত। সেখানকার গ্রীষ্মসন্ধ্যায় ঘরের বাইরে যে অসংখ্য তান-সম্বলিত সঙ্গীত শোনা যায়—যাহা শুনিলে মনে হয় যেন অনেকগুলি তন্ত্রী একসঙ্গে আহত হইয়া ঝঙ্কার তুলিতেছে—তাহাই ট্রি-ক্রিকেট বা বৃক্ষ-পতঙ্গের গান। ইহার পরেই স্থান উঁইচিংড়ার (cicada); সচরাচর যাহাদের সে দেশে পঙ্গপাল (locust) বলে। দুপুর থেকে গরমের দিনে বেলাশেষ পর্য্যন্ত ইহাদের গান চলে। ইহাদের উদরটি দেহের তুলনায় ঢাকের তুল্য; তবে কাঠি দিয়া উহাকে আঘাত না করিয়া মাংসপেশীর প্রসার-সঙ্কোচনেই কিকাডা এই সঙ্গীতের সৃষ্টি করে। এই সব পতঙ্গ ছাড়াও অন্য কোন কোন ছোট জীব সঙ্গীতে ওস্তাদ। যেমন, এক শ্রেণীর পিঁপড়ে। ইহারা নিম্নোদরের বাঁশীর মত ও মিশ্রাজ ধরণের যন্ত্র সাহায্যে ঘষিয়া ঘষিয়া কড়্‌-কড়ে ধ্বনির সৃষ্টি করে। ইহাই ইহাদের গান।
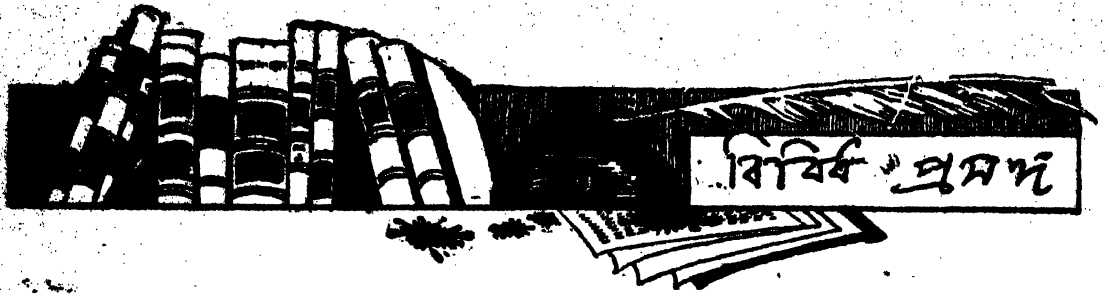
যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টা

যুদ্ধ নিবারণ করিবার নিমিত্ত আন্তরিক ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন দেশের কতকগুলি লোকের আছে। যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতিদের রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জনের এইরূপ আন্তরিক ইচ্ছা আছে, বলা কঠিন। অধুনা কতকগুলি জাতির মধ্যে সন্ধি দ্বারা যুদ্ধ নিবারণ করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা আরব্ধ হয় আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের অন্যতম রাজপুরুষ মিস্টার কেলগের দ্বারা। এই সন্ধিতে যদি পৃথিবীর সব স্বাধীন জাতি স্বাক্ষর করে, তাহা হইলে যুদ্ধ একেবারে নিবারিত না হউক, বহু পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এই সন্ধি স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা তাঁহারা গোড়াতেই রুশিয়াকে এক পাশে অপাংক্তেয়ের মত করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়াছেন—যদিও বলিতেছেন, যে, পরে ইচ্ছা করিলে রুশিয়াও সন্ধিপত্রে দস্তখত করিতে পারেন। অতএব যদি কেবল কয়েকটি জাতি যুদ্ধ-নিবারক সন্ধিতে দস্তখত করে, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ অন্তর্হিত হইবে না; যাহারা দস্তখত করে নাই, তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিবে। যাঁহারা সন্ধিতে দস্তখত করিতে রাজী হইয়াছেন, তাঁহারাও বেশ খোলা প্রাণে রাজী হন নাই, মনের মধ্যে কিছু রাখিয়াছেন। আমেরিকার দেশপতি কুলিজ বলিয়াছেন, আমরা সৈন্যদল ও রণতরী বিভাগের বল কমাইব না। ইংলণ্ড বলিয়াছেন, পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে নিরাপদ থাকার উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। অর্থাৎ কিনা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ সাম্রাজ্য হইতে বাদ পড়িলে ইংলণ্ডের চলিবে না; অতএব, ভারতবর্ষকে অধীন রাখিবার জন্য যুদ্ধ করা আবশ্যক হইতে পারে।

যুদ্ধ প্রধানতঃ দু-রকমের। যদি কোন জাতি আততায়ী হইয়া অন্য জাতিকে আক্রমণ করে, সে এক রকমের যুদ্ধ; আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ হয়, তাহা আর এক রকমের। যাহারা বাস্তবিক লোভ বা তদ্বিধ অন্য কারণে গায়ে পড়িয়া অন্য জাতিকে আক্রমণ করে, তাহারাও কিন্তু উচ্চ কণ্ঠে বলিতে থাকে, যে, তাহারা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেইজন্য, আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ কোন্‌টি নয়, বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বলা যায় না।

যাহা হউক, যদি আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ কোন্‌গুলি তাহা স্থির করা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, যে, সেরূপ যুদ্ধ সন্ধি অনুসারে করিতে দেওয়া হইবে কি না। মিঃ কেলগের সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ বৈধ হইবে, মনে হয়। তাহা হইলে তদ্দ্বারা যুদ্ধ একেবারে নিবারিত হইবে না। কি কি অবস্থায়, কি কি কারণে যুদ্ধ ঘটিলে তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ বলা হইবে, কেলগ তাহা নির্দ্দেশ করিতে রাজী নহেন।

আর এক রকমের যুদ্ধ আছে, যাহাকে স্বাধীন প্রভু জাতিরা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ বলে না, কিন্তু যাহা বাস্তবিক আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ। পরাধীন জাতিরা স্বাধীনতা লাভের জন্য যে যুদ্ধ করে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। "আত্মন্" কথাটির মধ্যে মানুষের প্রাণ, আয়ু, স্বাস্থ্য, সাহসাদিগুণ, জ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি জ্ঞান লাভের উপায়, স্বাধীনতা, ধন প্রভৃতি নানা বস্তু উহ্য আছে। অতীত ও সমসাময়িক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে, স্বাধীন অবস্থায় মানুষের এই সমুদয় জিনিষ যেরূপ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়, পরাধীন অবস্থায় তদ্রূপ হয় না। পরাধীন জাতির লোকদের প্রাণ পর্য্যন্ত অপরের কৃপার উপর নির্ভর করে। পরাধীন জাতির অধিকাংশ মানুষ স্বাধীন স্বশাসক জাতিদের অধিকাংশ মানুষের মত দীর্ঘায়ু, সুস্থ, সাহসী, শিক্ষিত, জ্ঞানবান্, বিত্তশালী হয় না। এইজন্য কোন পরাধীন জাতি যদি

স্বাধীন ও স্বশাসক হইবার জন্ত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে তাহাকেও আত্মরক্ষার জন্ত যুদ্ধ বলা উচিত।

যুদ্ধ যদি একেবারে বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আততায়ী হইয়া পরাক্রমণের যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে, আত্মরক্ষার জন্ত যুদ্ধও বন্ধ করিতে হইবে। উভয় প্রকারের যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইলে যুদ্ধনিবারক সন্ধিতে সকল স্বাধীন জাতির স্বাক্ষর করা চাই, অন্তর্জাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্ত অন্তর্জাতিক আদালত চাই, এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সেই নিষ্পত্তি মানিয়া লইবার মত প্রবৃত্তি প্রবলতম জাতিদেরও থাকা চাই। কিন্তু প্রবলতম জাতিদের এরূপ প্রবৃত্তি বর্ত্তমান কালে নাই।

স্বাধীন জাতিরা যদি পরস্পরের মধ্যে সব রকম যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে রাজী হয়, তাহা হইলেও পরাধীন জাতিদের কথা ভাবিতে হইবে। তাহাদের স্বাধীন হইবার কি উপায় হইবে? এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বাস্তবিক পরাধীন যত জাতি স্বাধীন হইয়াছে, তাহারা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, কিম্বা অপর প্রবল জাতিদের মধ্যে যুদ্ধের ফলে স্বাধীন হইয়াছে; বিনা যুদ্ধে কেহ স্বাধীন হয় নাই। অতীতে যাহা হইয়াছে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম কি প্রকারে হইবে, বুদ্ধিমান্ চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। বিনা যুদ্ধে পরাধীন জাতিদিগকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার উপায় কি?

আমরা যুদ্ধের বিরোধী। ইহা বর্ব্বরোচিত উপায়, এবং যত রকম দুষ্কর্ম্ম আছে যুদ্ধকে তাহার সমষ্টি বলিলে অতিভাষণ হয় না। এই কারণে আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্তও যুদ্ধ পছন্দ করি না। ভারতবর্ষের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে, অন্ত কতকগুলি কারণ ও অবস্থা বিদ্যমান আছে যাহার জন্ত বর্ত্তমান কালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্ত যুদ্ধ বাঞ্ছনীয় মনে করি না। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহা প্রমাণ করাও কঠিন নহে, যে, পরাধীনতাজনিত দুঃখ-দুর্গতি, অধোগতি, প্রাণ-হানি, বিত্তহানি যুদ্ধজনিত দুঃখ দুর্দ্দশা অধোগতি প্রাণহানি বিত্তহানি অপেক্ষা বেশী বই কম নয়। সুতরাং জগতের জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ চিন্তাশীল লোকেরা যদি বিনা যুদ্ধে পরাধীন জাতিদের স্বাধীন হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধের সহস্র দোষ সত্ত্বেও তাহাই চরম উপায় থাকিবে এবং অবলম্বিত হইবে। সে উপায় অবলম্বন করিয়া জাপানের অধীন কোরিয়া, হল্যাণ্ডের অধীন যবদ্বীপ ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্ত দ্বীপ, আমেরিকার অধীন ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্সের অধীন আনাম কাম্বোডিয়া আলজীরিয়া সীরিয়া প্রভৃতি দেশ, ইংরেজের অধীন ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার নানা দেশ, বা ইউরোপীয় নানা জাতির অধীন আফ্রিকার বহুদেশ স্বাধীন না হইতে পারে। কিন্তু জগতের "সভ্যতম" ও প্রবলতম জাতিরা যদি বলেন, যে, শান্তির পথে পরাধীন জাতিদিগকে স্বাধীন হইতে দিব না এবং স্বাধীনতাসমরকেও অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিব, তাহা হইলে তাঁহাদের শক্তিশালিতা অগত্যা স্বীকৃত হইলেও ন্যায়পরায়ণতা ও বুদ্ধিমত্তা কখনও স্বীকৃত হইবে না। তাঁহাদের নেতৃত্বও স্থায়ী হইবে না। অতএব আমেরিকান্, ফরাসী, জাপানী, ইটালীয় প্রভৃতি জাতিরা স্থির করুন ও বলুন, তাঁহারা বিনা যুদ্ধে পরাধীন জাতিদিগকে স্বাধীন হইতে দিবেন কি না, পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতার চেষ্টা পাশব বলে ও অস্ত্রবলে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন কি না। যদি শান্তির পথে পরাধীন জাতিদিগকে স্বাধীন হইতে দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের থাকে তাহা হইলে সেই পথ তাঁহারা নির্দ্দেশ করুন। কেবল পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধনিবারণের জন্ত সন্ধি স্থাপন করিলে চলিবে না।

শান্তির পথে স্বাধীনতা লাভের উপায় নির্দ্দেশ না করিলে লীগ্ অব্ নেশ্যন্সের সম্বন্ধে যেমন পরাধীন জাতিরা বলিয়া থাকে, যে, উহাদ্বারা পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ়তর হইতেছে, কেলগের শান্তি-প্যাক্টের সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলা হইবে।

১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি লীগ্ অব্ নেশুন্সের নিমন্ত্রণে যখন জেনীভায় ছিলাম, তখন প্যারিস্ হইতে প্রকাশিত বিলাতী ডেলী মেলের ইউরোপীয় সংস্করণ পড়িতাম। ঐ বৎসরের ৫ই সেপ্টেম্বরের কাগজখানিতে প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে একটি কথা লিখিত হইয়াছিল,

তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে মনে পড়িল। ডেলী মেল লিখিয়াছিল :—

The British Empire has no ungratified territorial ambitions and has not the smallest desire to disturb the peace, the frontiers, or the political relations of any Power, great or small. Others are in a less fortunate situation. The complex and precariously balanced States system of Europe and Asia leaves some peoples dissatisfied, nervous or uncomfortable. There are those who do not regard the existing settlement as durable and would willingly modify it to their own advantage.

তৎপর্য্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এলাকাবিস্তারের কোন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নাই। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন শক্তির শান্তিভঙ্গ করিতে, সীমা লঙ্ঘন করিতে বা তাহাদের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে কোন গোলযোগ উপস্থিত করিতে তাহার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই। কিন্তু অন্যদের তাহাদের মত সৌভাগ্যের অবস্থা নহে। ইউরোপ ও এশিয়ার যে জটিল রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অনেক জাতি ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া আছে, এবং সন্তোষ ও আরাম অনুভব করে না। তাহারা বর্ত্তমান বন্দোবস্ত টেকসই মনে করে না, এবং নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী তাহার পরিবর্ত্তন করিতে চায়।

প্রবলতম জাতিরা বিনা যুদ্ধে এই পরিবর্ত্তন করিতে দিবে কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে পৃথিবীর প্রবলতম জাতি-সমূহের লোকদের হৃদয়-মনের সুপরিবর্ত্তন না হইলে যুদ্ধ নিবারিত হইবে না। ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" এই উপদেশ অনুসারে প্রবলতম জাতিরা পরের ধনে নির্লোভ হইলে যুদ্ধ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে।

—

পাট্‌না হাইকোর্টের প্রধান বিচারক

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক মিঃ টেরেল একটি মোকর্দ্দমার রায়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন :—

"But it appears from what we knew of the former case that it was not a case of any great magnitude, and having regard to the habits of the people in this particular part of the world, where the giving of false evidence, however deplorable it may be, is not considered an offence which is fatal to a man's reputation, to say the least of it, I do not think that much importance need be placed on that fact."

ইহাতে টেরেল সাহেব বলিয়াছেন, যে, "পৃথিবীর এই বিশেষ অংশের অধিবাসীদের অভ্যাস এইরূপ যে, মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া যতই শোচনীয় হউক না কেন তাহা মানুষের সুখ্যাতির পক্ষে সাংঘাতিক দোষ বলিয়া বিবেচিত হয় না।" এ দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য অনেকে দেয় সত্য। কিন্তু সমস্ত একটা জাতির এরূপ নিন্দা বুদ্ধিমান সত্যবাদী লোকেরা করে না। ইংরেজদের নিজের দেশে মিথ্যাসাক্ষ্যের প্রাচুর্য্য এবং ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক প্রাচুর্য্য গণ্যমান্য ইংরেজদের উক্তি হইতে প্রমাণ করা কঠিন নয়। কিন্তু ইহা সত্য নহে, যে ভারতবর্ষে,বিহারে বা ইংলণ্ডে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে লোকে অখ্যাতিকর দোষ মনে করে না। বাবু গয়াপ্রসাদ সিংহ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্ন করিবেন, যে, টেরেল সাহেবের উক্ত মন্তব্যের প্রতি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে কি না; উহার অসত্যতা ও ব্যাপকতা বিবেচনা করিয়া এবং উহা বক্তার বিচারকানুচিত মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যটি প্রত্যাহার করাইবার জন্য কিম্বা মিঃ টেরেলকে তাঁহার পদ হইতে অপসৃত করাইবার জন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিবেন কি না। এরূপ প্রশ্ন করা আবশ্যক এবং ন্যায়সঙ্গত।

যে-বিচারক সমুদয় জাতিকে অপমানিত করেন, উকীল ব্যারিষ্টারেরা যদি মক্কেলদের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার আদালতে না যান, তাহা হইলে তাহাতে কি কোন আইন লঙ্ঘিত হয়? যদি তাঁহার আদালতে না গেলে কোন আইন লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে তদ্রূপ আইনলঙ্ঘন করিতে আমরা পরামর্শ দিতে পারি না; কারণ তাহার দুঃখভোগ আমাদিগকে করিতে হইবে না। কিন্তু যদি আইন লঙ্ঘিত না হয়, তাহা হইলে পাটনা হাইকোর্টের উকীল ব্যারিষ্টারদের পক্ষে আত্মসম্মান রক্ষা ও জাতীয় সম্মান রক্ষার পথ চিনিয়া লইয়া সেই পথে চলা অপেক্ষাকৃত সোজা।

—

গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা বিল

বঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী বাংলাদেশের গ্রামসকলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। তাহা আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত সিলেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য আইনের প্রয়োজন আছে। এরূপ আইন দ্বারা প্রাথমিক মান পর্য্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে শিক্ষাদান অবশ্যকৃত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়া চাই, সুতরাং তাহা অবৈতনিক করা চাই, এবং সমুদয় বালকবালিকার শিক্ষা যাহাতে হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যথাস্থানে যথেষ্টসংখ্যক প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বিলটিতে সার্ব্বজনীন অবশ্য শিক্ষণ (universal compulsory education) আদর্শের উল্লেখ এবং তদ্রূপ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার ব্যবস্থা নাই। উহার প্রধান উদ্দেশ্য নূতন ট্যাক্স বসাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এককোটি টাকা তোলা; বাংলা দেশে অন্য বড় বড় প্রদেশগুলির চেয়ে যে কম টাকা শিক্ষার জন্য গবর্ন্মেণ্ট খরচ করেন, তাহা আমরা অনেকবার দেখাইয়াছি। বাংলা দেশে যত টাকা রাজস্ব আদায় হয়, তাহার যথেষ্ট অংশ বাংলা দেশের খরচের জন্য বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে দেওয়া হয় না; অধিকাংশ টাকা ভারতগবর্ন্মেণ্ট আত্মসাৎ করেন। বঙ্গে শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ের অল্পতার ইহা একটি প্রধান কারণ। শিক্ষার দিকে গবর্ন্মেণ্টের যথেষ্ট মনোযোগের অভাবও একটি কারণ। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে, যে, বঙ্গের লাটকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে, প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলা দেশ অন্য প্রদেশ-গুলির পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন :—

I find that the percentage of expenditure by some Governments upon primary education to the total Provincial Revenues is:—

Bombay 6 per cent.
Bihar and Orissa 5.1 per cent.
Punjab 3.6 per cent.
Bengal 1.6 per cent.

These are striking figures and shew how much we are dependent on voluntary effort for the progress made in Bengal to-day.

আমি দেখিতেছি, মোট প্রাদেশিক রাজস্বের শতকরা যত অংশ কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন, তাহা এই—

বোম্বাই শতকরা	৬
বিহার-উৎকল শতকরা	৫.১,
পঞ্জাব শতকরা	৩.৬,
বাংলা শতকরা	১.৬।

এই অঙ্কগুলি মনে ঘা দেয়, এবং আমাদিগকে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গে শিক্ষার উন্নতির জন্য অধিবাসীদের স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টার উপর কতটা নির্ভর করিতে হইতেছে, তাহা প্রদর্শন করে।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বঙ্গের অধিবাসীরা নিজেদের কর্ত্তব্য যতটা করিয়াছেন, গবর্ন্মেণ্ট নিজ কর্ত্তব্য ততটা করেন নাই।

ভারতবর্ষের যে-কোন প্রদেশের চেয়ে বঙ্গের লোক-সংখ্যা বেশী, সুতরাং ইহার সরকারী শিক্ষাব্যয় অন্য যে-কোন প্রদেশের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু বড় সব প্রদেশগুলির তুলনায় বঙ্গের সরকারী শিক্ষা-ব্যয় কম। বঙ্গে রাজস্ব আদায় সব প্রদেশের চেয়ে বেশী হয়, কিন্তু অন্য সব বড় প্রদেশ নিজ নিজ ব্যয়ের জন্য বাংলা দেশের চেয়ে বেশী টাকা রাখিতে পায়। এই-জন্য, আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যে, বঙ্গে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইবার কোন আবশ্যক নাই। বঙ্গের যাহা ন্যায্য পাওনা, তাহা পাইলেই আমাদের শিক্ষার ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া পাট-শুল্কের কথা ধরা যাক্। ইহা হইতে বৎসরে প্রায় চারি কোটি টাকা আদায় হয়। এই ট্যাক্স বসিবার তারিখ হইতে এপর্য্যন্ত ভারত গবর্ন্মেণ্ট ইহা হইতে ৩৭।৩৮ কোটি টাকা পাইয়াছেন, কিন্তু বাংলাকে একটি পয়সাও দেন নাই। বঙ্গের জমিতে পাট উৎপন্ন হয়, বঙ্গের চাষী ও শ্রমিকরা ইহা উৎপন্ন করে, পাট-পচান জলের অসুবিধা তাহারা ভোগ করে, বঙ্গের গবর্ন্মেণ্টকে অন্যান্য ফসলের মত পাটের উন্নতির চেষ্টা করিতে হয়, কোন্ বৎসর কত পাট উৎপন্ন হয় তাহার আগাম আন্দাজ বাংলার কৃষিবিভাগকে প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিতে হয়; কিন্তু বাংলার গবর্ন্মেণ্ট ও অধিবাসীরা পাট-শুল্কের একটি পয়সাও পায় না। পাট-শুল্কের ন্যায্য পাওনা চারি কোটি টাকা বাংলা পাইলে

শিক্ষার নিমিত্ত এক কোটি টাকা তুলিবার জন্ত ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিতে হইত না।

বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন এবং তাঁহার আগে অন্ত সরকারী লোকেরাও বলিয়াছেন, যে, ভারত গবর্মেণ্ট বাংলাকে আর বেশী টাকা দিবেন না, পাট-শুল্ক বা অন্ত কিছুই দিবেন না. সুতরাং নূতন ট্যাক্স না বসাইয়া উপায় কি? কিন্তু সিমলা-দিল্লীর দেবতারা দিবেন না, ইহা এত সহজে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে কেন? বঙ্গের প্রত্যেক গবর্ণর বলিয়াছেন, বাংলাকে তাহার পাওনা অপেক্ষা কম টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু বেশী টাকা পাইবার জন্ত তাঁহারা কেহই সমুচিত চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বলা উচিত ছিল, "আমরা এত অল্প টাকায় বঙ্গের সব সরকারী বিভাগের কাজ চালাইতে পারিব না, বেশী টাকা চাই." এবং বেশী টাকা না পাইলে প্রত্যেকেরই ইস্তফা দেওয়া উচিত ছিল। তাহা কেহ করেন নাই। ইহা ঠিক, যে, বিদেশী ইংরেজের নিকট হইতে বঙ্গের প্রতি এত দরদ আশা করা অসঙ্গত। কিন্তু বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী যে-সব ভদ্র লোক পরে পরে হইয়াছেন, তাঁহারা ত বাঙ্গালী? তাঁহাদের একজনও ত জোর করিয়া বলিলেন না, "শিক্ষার জন্ত যথেষ্ট টাকা না দিলে আমি এই মন্ত্রিত্ব রাখিব না।" একজনও বঙ্গের প্রতি অবিচারহেতু ইস্তফা দিলেন না। দিল্লী-সিমলায় যাঁহারা বঙ্গের প্রতিনিধি, কলিকাতায় যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের প্রতিনিধি, বঙ্গের প্রতি অবিচারকে হেতু করিয়া তাঁহাদের বার বার পদত্যাগ করিয়া পুনর্নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত ছিল। তাহাও কেহ করেন নাই। এই সব উপায়েও যদি ফল না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বলা চলিত, যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু দেখা গেল ভারত গবর্মেণ্ট বঙ্গের স্থায্য পাওনা তাহাকে দিবেন না, অতএব নূতন ট্যাক্স বসান হউক।

ট্যাক্স যে-প্রকারে বসাইবার প্রস্তাব বিলে আছে, তাহাও আমাদের নিকট স্থায্য মনে হয় না। এই রূপ প্রস্তাব হইয়াছে, যে, ভূমির খাজনার টাকা প্রতি চারি পয়সা প্রজারা দিবে এবং জমীদারেরা এক পয়সা দিবে। ট্যাক্সের দ্বারা সংগৃহীত সব টাকা প্রাথমিক শিক্ষাতে ব্যয়িত হইলে অবশ্য গ্রামের প্রজারাই সাক্ষাৎ ভাবে জমীদারের চেয়ে বেশী উপকৃত হইবে; কিন্তু উভয় পক্ষের পরিশ্রমের ও আর্থিক অবস্থার তুলনা করিলে ট্যাক্সের পরিমাণের অনুপাতটা স্থায়সঙ্গত মনে হয় না। প্রজা ও জমীদার ছাড়া অন্ত লোকদের উপর ট্যাক্স বসাইবার অধিকার ম্যাজিষ্ট্রেটের থাকিবে। কিন্তু ইহা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাসাপেক্ষ না রাখিয়া কোন সুচিন্তিত নিয়মের অধীন করা উচিত ছিল।

বিলের আর একটি প্রধান ব্যবস্থা, প্রত্যেক জেলায় শিক্ষা-সমিতি স্থাপন। ইহার সভাপতি হইবেন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অধিকাংশ সভ্য হইবেন সরকারী কর্ম্মচারী। ইহাও সমীচীন বোধ হয় না। সমিতির অধিকাংশ সভ্য ও সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। কিন্তু টাকা-কড়ির হিসাব সরকারী হিসাবপরীক্ষকদের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। নির্ব্বাচন-প্রথা যে সর্ব্বত্র সকল সময়ে সুফলপ্রদ হয়, তাহা নহে। কিন্তু মোটের উপর ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রথা। তাহা হইলেও, ইহা হইতে সুফল পাইতে হইলে নির্ব্বাচকদিগকে সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ ও চালচলনের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইংরেজীতে বলে, Eternal vigilance is the price of liberty, স্বাধীনতার মূল্য সর্ব্বদা সজাগ থাকা।

—

বিশ্বভারতীতে বর্ষা-উৎসব

কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে যে-সকল উৎসব প্রচলিত আছে, তাহার কোন-কোনটি ঋতু উৎসব। যেমন হোলী বসন্তের উৎসব। এইরূপ অনেক উৎসবে মানুষের সহিত বাহ্য প্রকৃতির যোগ এখন আর অনুভূত ও রক্ষিত হয় না; সেগুলি এখন অনেক স্থলে প্রাণহীন বাহ্য ক্রিয়াকলাপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে-সব ঋতু-উৎসব প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য ক্রিয়াকলাপে পর্য্যবসিত হয় নাই। শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর স্পর্শ অনুভব ও মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নূতন বেশ ধারণ করেন,

এবং আকাশে আলোর ও রঙের খেলা ও নানা দৃশ্য ও ধ্বনির মধ্য দিয়া মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। আমরা সকলেই তাঁহার সেই প্রকাশ অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু কবি তাহা বাহিরে ও অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া গানে কবিতায় গল্পে প্রকাশ করেন। এই ঋতু-উৎসবগুলি শান্তিনিকেতনে প্রাণহীন মনে হয় না। তথায় নিপুণ শিল্পীরা থাকায় উৎসব ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রগুলি এরূপ সুসজ্জিত হয়, যে, অন্যত্র অনেক অর্থব্যয় ও আড়ম্বরেও তাহা সম্ভবপর নহে।

এবার বর্ষা-উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষ-রোপণ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনুষ্ঠানক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী ও দর্শকেরা সমবেত হইবার পর ছাত্রীনিবাস হইতে ছাত্রীরা সুন্দর সুরুচিসঙ্গত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া গান করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দু জন ছাত্র একটি পত্র-পুষ্পে শোভিত ডুলিতে একটি বৃক্ষশিশুকে বহন করিয়া আনিলেন। তাহার পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পঠিত হইল :—

> অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
> ধন্যা মহীরুহা যেভ্যো নিরাশা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ১ ॥
> পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।
> গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥ ২ ॥
> ছায়ামন্যস্য কুর্ব্বন্তি তিষ্ঠন্তি স্বয়মাতপে।
> ফলান্যপি পরার্থায় বৃক্ষাঃ সৎপুরুষা ইব ॥ ৩ ॥
> হেতবঃ সম্পদাং লোকে কেতবো ধরণীশ্রিয়ঃ।
> জীবাতবোঽত্র জীবানাং জীবন্তু তরবোঽক্ষতাঃ ॥ ৪ ॥

১। বৃক্ষদের জন্ম শ্রেষ্ঠ! সকল জীব ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। বৃক্ষগণই ধন্য! যাচকেরা ইহাদের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় না।

২। পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, রস, ক্ষার, সার, অঙ্কুর এই সকলের দ্বারা ইহারা লোকের কাম্যবস্তু দান করে।

৩। সাধু ব্যক্তির ন্যায় ইহারা স্বয়ং আতপে অবস্থান করিয়াও অন্যকে ছায়া দান করে। ইহাদের ফলগুলিও পরের জন্য।

৪। সংসারে সকল সম্পদের হেতু, ভূমিলক্ষ্মীর কেতুস্বরূপ ও জীবগণের জীবনৌষধস্বরূপ এই তরুগণ অক্ষত হইয়া বাঁচিয়া থাকুক।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের পক্ষ হইতে তাহাদের নিম্নমুদ্রিত প্রার্থনাগুলি পরে পরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং যে যে বালিকা ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি সাজিয়াছিল, তাহারা তাহার পুনরা-বৃত্তি করিল।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন, হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে।
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চির-সখ্যে।
অন্তরে থাক্ কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক্ পত্রী
তোমার অন্নসত্রে ॥

অপ্

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক্ এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এ'রে ডেকে
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা-অভিষেকে ॥

তেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক,
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হোক্।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি'
ক তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি' ॥

মরুৎ

হে পবন করো নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি'।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সঙ্গীত দিয়ো এরে ভিক্ষা।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লব-হিল্লোল শিক্ষা ॥

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্ত্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্ত্তি।
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে।
তরু-তরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য ॥

ইহার পর বৃক্ষশিশুকে ভূমিতে রোপণ করা হইল। সর্ব্বশেষে কবি এই মাঙ্গলিক কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন :—

মাঙ্গলিক

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক্, হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক্ সুধা-সিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়

প্রজ্জ্বয় প্রশান্ত তেজ। ল'য়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণ বর্ষণ-যজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো ;
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া ; পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুম বর্ষণে ; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো ; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষা-গীতিকায়,
সন্ধ্যা-বন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জ-বীথিকায়
মঞ্জুল মর্ম্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হোতে
প্রাণ-মাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্য্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাবো আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সে দিন বর্ষণ-মহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হোক্ মৃত্যুহীন!
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্ব পরিমলে ॥

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর সকলে একটি তাঁবুর নাচে ও সম্মুখে সমবেত হইলেন। তখন কবি তাঁহার সেই দিনই সেই উপলক্ষ্যে রচিত একটি সময়োপযোগী গল্প পড়িলেন। তাহা একটি বালকের কাহিনী যে উদ্ভিদের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিত। রাস্তার মাঝখানে জাত তাহার স্নেহপালিত একটি শিমুলগাছ পরিবারস্থ এমন লোকেরা কাটিয়া ফেলে যাহারা দরদী ছিল না। তাহাতে বালকটির স্নেহময়ী কাকীমা দুঃখে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। ইহা ইতিহাস নহে, কিন্তু আমরা পরে কবির মুখে শুনিতে পাই, যে, বাল্যকালে উদ্ভিদ্‌-জীবনের প্রতি তাঁহার হৃদয়মনের ভাব ঐ বালকটির মত ছিল।

ইহার পর বাদ্যসহকারে বর্ষার উপযোগী কয়েকটি বাংলা ও একটি হিন্দী গান গীত হয়। পরদিন ৬ই শ্রাবণ সুরুল গ্রামে স্থিত শ্রীনিকেতনে হলচালন উৎসব হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, যে, পুরাকালে ইহা সীতাযজ্ঞ নামে অভিহিত হইত। একটি সুন্দর সামিয়ানার নীচে অনুষ্ঠানের স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। কতকখানি জমীর ঘাস চাঁছিয়া ফেলিয়া তাহা আল্পনার ও রঙে সুশোভিত করিয়া হলচালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিন জোড়া সুপুষ্ট চিত্রিত বলদ ও একটি সুশোভিত লাঙল কৃষকেরা সম্মুখে রাখিয়াছিল।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ একটি গান করিলেন। তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিলেন :—

অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব
বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া
তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্যঃ ॥

ঋগ্বেদ, ১০, ৩৪, ১৩।

দ্যূতক্রীড়া করিও না, কৃষিই কর। তাহা দ্বারা যে বিত্ত পাও তাহাই বহু মনে করিয়া আনন্দিত হও। হে দ্যূতকর, তাহাতেই তোমার গাভীসমূহ, তাহাতেই তোমার স্ত্রী। এই সবিতা প্রসন্ন হইয়া ইহাই আমাকে বলিতেছেন।

ইহার পর বলীবর্দ্দ সম্বর্দ্ধনা হইল। বলদগুলিকে ফুলের মালা পরাইয়া তাহাদের নানা সুখাদ্য তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণসহকারে হলযোজনা করা হইল ;—

সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বিতন্বতে পৃথক্।
ধীরা দেবেষু সুম্নয়া

দেবগণের অনুগ্রহে জ্ঞানশালী মেধাবিগণ যুগ (জোয়াল) গুলি বিস্তৃত করিয়া হলসমূহ যোজনা করিতেছেন।

ইহার পর চিত্রিত ভূমিখণ্ড কর্ষিত হইল। প্রথমে পুরোহিত শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পাঠ করিলেন ;—

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং
কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্ নো
নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ ॥

(কৃষকগণ,) তোমরা যুগসমূহ বিস্তৃত কর, হলসমূহ যোজনা কর, এই নির্ম্মিত ক্ষেত্রে বীজ বপন কর। গানের দ্বারা আমাদের অন্নসমূহ পুষ্ট হইয়া উঠুক। ইহা পক্ব হউক, এবং দাত্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া আমাদের নিকটে আগমন করুক।

শুনং সুফালা বিকৃষন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অভিযন্তু বাহৈঃ।
শুনাসীরা হবিষা তোশমানা
সুপিপ্পলা ওষধীঃ কর্তনাস্মে ॥ যজুর্ব্বেদ, ১২, ৬৯

সুন্দর ফালগুলি ভূমিকে সুখে কর্ষণ করুক! হলধারিগণ বলিবর্দ্দের সহিত সুখে আগাইয়া চলুন! বায়ু ও সূর্য্য জল দ্বারা (ভূমিকে) সেচন করিয়া আমাদের জন্য ওষধিসমূহকে সুফল-যুক্ত করুন।

ঘৃতেন সীতা মধুনা সমজ্যতাং
বিশ্বৈর্দেবৈরনুমতা মরুদ্ভিঃ।
ঊর্জস্বতী পয়সা পিন্বমানা
স্মান্ সীতে পয়সাভ্যা ববৃৎস্ব ॥

বাজসনেয়িসংহিতা, ১২-৬৭-৭০

বিশ্বদেব ও মরুদ্‌গণের অনুজ্ঞায় সীতা (হালের রেখ) মধুর জলে

সংসিক্ত হউক। হে সীতা, তুমি জলে পূর্ণ হইয়া অনুবর্তী হইয়া আমাদের অনুকূল হও।

অতঃপর প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ও পরে শ্রীনিকেতনের কৃষি-ক্ষেত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু হলচালন দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিলেন।

ইহারপর রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করিলেন। ইহা কেহ লিখিয়া রাখিলে ভাল হইত। ভূমির সহিত যোগ স্থাপন করিয়া মানুষ যে কেবল দৈহিক পুষ্টি ও বাহ্য সম্পদ লাভ করে তাহা নহে, তাহার অন্তরাত্মাও যে প্রকৃতির স্পর্শে কেমন নানা প্রকারে শ্রী-সম্পদ পুষ্টি লাভ করে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। মানুষ কেবল যে ভূমি হইতে সম্পদ আহরণ করিবে, তাহা নহে, নিজের জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা তাহাকে পুষ্টও করিবে। সর্ব্বশেষে "অচলায়তন" নাটকের গান "আমরা চাষ করি আনন্দে" গীত হয়।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার

কলিকাতার স্কটিশ চার্চেজ্‌ কলেজের পাদরী অধ্যাপক রেভারেণ্ড আর্কার্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার আরও দুই বৎসরের জন্য ভাইস্‌-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইবেন, এইরূপ একটা গুজব রটিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, অসুস্থতাবশতঃ তিনি আরও দুই বৎসর কাজ করিতে অসামর্থ্য প্রকাশ করেন, জোর আরও আট মাস পারিবেন বলেন ; এইজন্য রেভারেণ্ড আর্কার্টের নিয়োগ হইয়াছে।

অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের পক্ষে ইহা ভাল হইয়াছে, এবং দেশের পক্ষেও মোটের উপর ইহা ভাল হইয়াছে। তিনি যে দুই বৎসর কাজ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটিও ভুল করেন নাই ইহা বলা যায় না—সকল কার্য্যক্ষেত্রে সকলেরই কিছু-না-কিছু ভুল হয়। তাঁহার বিরোধীদলের প্রবলতা বশতঃ তাঁহার কার্য্যকালে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন ভাল কাজ ও সংস্কার অনেক হইয়াছে, যাহার জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য। ইহাও অনুচিত কাজও কিছু স্বীকার করিতে হইবে, যে, তিনি ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কাজ করেন নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও দেশের হিতের জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যত টুকু হিতসাধন করিতে পারিয়াছেন, তাহার তুলনায় তাঁহাকে অত্যন্ত বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছে, এবং বিরোধীদের মিথ্যা নিন্দা কুৎসা ও উৎপীড়ন বশতঃ সম্ভবতঃ তাঁহার সাতিশয় চিত্তবিক্ষোভও হইয়া থাকিবে। আরও দুই বৎসর তিনি ভাইস্‌-চ্যান্সেলার থাকিলে তিনি আরও কিছু ভাল কাজ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাকে যত সময় দিতে হইত, শক্তি নিয়োগ করিতে হইত, পুস্তকরচনা কার্য্যে তাহা নিয়োগ করিলে, তাহা সময় ও শক্তির অধিকতর সদ্ব্যয় হইবে। তাহাতে দেশ লাভবান্‌ হইবে। এই কারণে আমরা বলিয়াছি, তিনি পুনর্ব্বার ভাইস্‌-চ্যান্সেলার না হওয়া তাঁহার ও দেশের পক্ষে ভাল হইয়াছে।

তিনি আরও দুই বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংস্কার করিতে পারিতেন, আর্কার্ট সাহেব তাহা করিবেন বা করিতে পারিবেন কি না, বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার নিয়োগ যে বাঙালীর গৌরবের বিষয় নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় আমরা অন্য কোন দেশের বা প্রদেশের উপর প্রভুত্ব আধিপত্য করিতে চাই না ; কিন্তু বাংলাদেশের সকল কার্য্যক্ষেত্রে বাঙালীর প্রাধান্য নিশ্চয়ই চাই। সেই কারণে, যোগ্য বাঙালী থাকিতে বিদেশী কাহারও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার হওয়া বাঙালীর অগৌরবের কারণ মনে করি। যোগ্য বাঙালীর অভাব নাই। অভাব হইলে অবাঙালী ভারতীয় কোন বিদ্বান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইতে পারিত। কলিকাতায় এরূপ লোকেরও অভাব নাই। নিজের দলের লোক নহেন বলিয়া বাঙালী বা অন্য ভারতীয় অপেক্ষা বিদেশীর নিয়োগ পছন্দ করা একটা জাতীয় দুর্ব্বলতা। এবম্বিধ জাতীয় দুর্ব্বলতার সুযোগে (ও অন্যান্য কারণে) ইংরেজ ভারত-বর্ষের রাজা হইতে পারিয়াছে। আমি যদি কোন দলের লোক হই, তাহা হইলে বঙ্গের কোন কার্য্যক্ষেত্রে বরং বিরোধী দলের কোন যোগ্য বাঙালীর প্রাধান্য বাঙালীর

মনে করিব, বিদেশীর প্রাধান্য বাঞ্ছনীয় মনে করিব না। দলাদলি পাশ্চাত্য সব স্বাধীন দেশেই আছে, বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও আছে। কিন্তু তাহা হইলেও সেই সকল বিদ্যাপীঠে প্রধান প্রধান সম্মান ও ক্ষমতার পদে কোন দলের লোকই বিরুদ্ধ দলের ইংরেজের পরিবর্ত্তে জার্ম্মান, সুইড্, ফরাসী বা ইতালীয়ের নিয়োগ পছন্দ করে না। আমরা পরাধীন বলিয়া সকল কার্য্যক্ষেত্রে বাঙালীর অধিকার রক্ষা বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদা সজাগ থাকা স্বাধীন দেশের লোকদের চেয়ে আরও বেশী দরকার। কিন্তু বাঙালী বলিয়া বা নিজের দলের লোক বলিয়া কাহারও সাত খুন মাপ হওয়া উচিত নয়। মনোনীত প্রত্যেক লোককে কর্ত্তব্যপথ হইতে অবিচ্যুত রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে

কোন বাঙালীই যাহা জানে না, বাংলা দেশে এমন কোন কাজ করিবার জন্য লোকের দরকার হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ যোগ্য বিদেশীকে নিযুক্ত করিয়া সেই সময়ের মধ্যে বুদ্ধিমান্ কোন কোন বাঙালীর সেই কাজ শিখিয়া লওয়া উচিত। জাপানে এই নীতি অনুসৃত হয়। কোন পদ বিদেশীরা এক পুরুষ দুই পুরুষ তিন পুরুষ ধরিয়া দখল করিয়া থাকিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

কে স্বদেশী, কে বিদেশী, তাহার বিচার অবশ্য বংশ অনুসারে হওয়া উচিত নয়। ইংলণ্ডের কোন কোন বিখ্যাত লোকের নাম হইতেই বুঝা যায়, যে, বংশতঃ তাঁহারা ডচ্, জার্ম্মান, ফরাসী বা ইতালীয়; কিন্তু ইংলণ্ডে স্থায়ী বসবাস করায় এবং ইংলণ্ডের ভাগ্যের সহিত তাঁহাদের ভাগ্য জড়িত থাকায় তাঁহারা ইংরেজ বলিয়াই গণিত হইয়া থাকেন তেমনি কোন বিদেশী যদি ভারতবর্ষকে স্থায়ী বাসভূমি করেন এবং আর সব দেশের চেয়ে ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্যই বেশী চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি ভারতীয় বলিয়া গণিত হইবার যোগ্য। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধেও এই যুক্তি অনুসরণীয়। যিনি যে প্রদেশ হইতেই আসুন, যিনি পঞ্জাবকে স্থায়ী বাসভূমি ও কার্য্যক্ষেত্র করিবেন তিনি পঞ্জাবী, যিনি বাংলাকে স্থায়ী বাসভূমি ও কার্য্যক্ষেত্র করিবেন তিনি বাঙালী, যিনি বিহারকে স্থায়ী বাসভূমি ও কার্য্যক্ষেত্র করিবেন তিনি বিহারী বলিয়া পরিগণিত হইবার দাবী করিতে পারিবেন, এবং সে দাবী গ্রাহ্যও হওয়া উচিত।

আর্কার্ট সাহেব বা অন্য কোন বিদেশীর ভাল কাজের সমর্থন ও মন্দ কাজের বিরোধিতা আমরা করিব। বিদেশী বলিয়াই ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের প্রতি আমাদের কোন বিরোধিতা নাই। কিন্তু যে পদ বাঙালীর প্রাপ্য এবং যাহার যোগ্য বাঙালী অনেক আছে, সেই পদ তাঁহারা দখল করিয়া আছেন, এই চিন্তা আমরা মন হইতে দূর করিব না, করিবার চেষ্টাও করিব না। আর্কার্ট সাহেব বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু তিনি কেবল বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার জন্যই ভাইস্-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন মনে করিতে পারি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ পুনর্গঠন করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহাতে অল্পসংখ্যক যে কয়জন সভ্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিয়াছিলেন, আর্কার্ট সাহেব তাহার মধ্যে একজন। তাঁহাদের রিপোর্ট বিবেচ্য বিষয়ে সরকারী মতের অনুকূল হইয়াছিল বলিয়া দেশী বেসরকারী শিক্ষিত লোকদের ধারণা। আর্কার্ট সাহেবের নিয়োগের ইহা একটি কারণ—প্রধান কারণ কি না বলিতে পারি না।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এখন যে ভাবে গঠিত, তাহাতে গবর্মেণ্ট কর্তৃক মনোনীত সভ্যদের সংখ্যা খুব বেশী। নির্ব্বাচিত সভ্যদের সংখ্যাই বেশী হওয়া উচিত। এইরূপ এবং অন্যান্য কোন কোন আবশ্যক সংস্কারের জন্য একটি সংশোধক আইনের প্রয়োজন ছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিল পেশ করিয়াছেন, তাহা আইনে পরিণত হইলে উক্তপ্রকার কোন কোন সংস্কার সাধিত হইবে। উহা সিলেক্ট কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে সভায় যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, তাহা হইতে অনুমান হয়, যে, সভ্যদের মত অপরিবর্ত্তিত থাকিলে সেনেটে ধর্ম্মসম্প্রদায়

অনুসারে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবে না। না হইলেই ভাল।

মুসলমানেরা মনে করেন, যে, কেবল নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিলে কোন মুসলমানের ফেলো হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কখনও সম্ভাবনা হইবে না, বলা যায় না; আপাততঃ অবস্থা সেইরূপ হইতেও পারে। তত দিন গবর্ন্মেণ্টের হাতে যে কয়জন ফেলো মনোনয়নের ভার থাকিবে, তাহার মধ্যে জনকতক মুসলমান মনোনীত হইতে পারেন। ক্রমশঃ মুসলমান গ্রাজুয়েটেরা ও অন্য মুসলমানরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে মনোযোগ দিলে এবং কার্য্যতঃ সহানুভূতি দেখাইলে, তাঁহারা ফেলো নির্ব্বাচিতও হইবেন। বঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী, এবং তাঁহারা সকলেই নির্ধন নহেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে-মুসলমানদের দানের পরিমাণ অতি সামান্য। শুধু অধিকারের দাবী করিয়া কোন শ্রেণীর লোক মহৎ ও শক্তিশালী হয় না; কর্ত্তব্য পালনও করিতে হয়।

নির্ব্বাচন প্রথায় কেবল যে মুসলমানদেরই কম নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা নহে; নির্ব্বাচন বিদ্যাবত্তা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে মনোযোগ ও অভিজ্ঞতা অনুসারে না হইয়া রাজনৈতিক মত অনুসারে হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। গত কয়েক বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কীয় নির্ব্বাচনে তাহা দেখা গিয়াছে। এই সকল স্থলে, আমরা যাঁহাদিগকে যোগ্য মনে করিয়াছিলাম, তাঁহারা নির্ব্বাচিত হন নাই। তথাপি আমরা নির্ব্বাচনেরই পক্ষপাতী, সরকারী মনোনয়নের পক্ষপাতী নহি।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের জন্য প্রায় একই রকমের দুটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাতে সেনেটের অধিকাংশ ফেলোর নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে। তাঁহারা উভয়েই আশুবাবুর অনুগৃহীত ও দলভুক্ত লোক ছিলেন। যত দিন আশুবাবু জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যতদিন তাঁহার দ্বারা গঠিত দল প্রবল ছিল, তত দিন তাঁহারা সেনেটে বেসরকারী নির্ব্বাচিত লোকদের সংখ্যাভূয়িষ্ঠতার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রকাশ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই। বরং আশুবাবুর দল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটকে "গণতান্ত্রিক" ভাবে গঠিত করার বিরোধিতাই বরাবর করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আশুবাবু ও তাঁহার গদীর উত্তরাধিকারীদের মনের ভাব সেই ফরাসী রাজার মত ছিল যিনি বলিয়াছিলেন, "রাষ্ট্র? রাষ্ট্র ত আমিই।" তাঁহারাও বলিতে পারিতেন, "গণমত? আমার (বা আমাদের) মতই ত গণমত।" এই রূপ মনের কোন কোন রাজনৈতিক নেতার আছে।

যাহা হউক, গণতান্ত্রিকতার প্রয়োজন যে বিলম্বেও অনুভূত হইয়াছে, তাহাও ভাল;—যেমন অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের স্বাধীনচিত্ততার প্রকাশ্য বিকাশ এবং দল-বিশেষ দ্বারা তাহার স্বীকৃতি, ব্যবহার ও ঘোষণা বিলম্বে হইয়া থাকিলেও ফলদায়ক হইতে পারে।

—

আশুতোষ সংস্কৃত অধ্যাপক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে কিরূপ লোকের নিয়োগ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা শ্রাবণের প্রবাসীতে করিয়াছিলাম। শুনিতেছি, যে কমিটির হাতে মনোনয়নের ভার ছিল, তাঁহারা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়কে মনোনীত করিয়াছেন, কিন্তু আর্থিক কারণে তাঁহার নিয়োগ না হইলে অন্য এক জনকে নিযুক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্র বাবুর নিয়োগ হইলে যোগ্য লোকেরই নিয়োগ হইবে। তাঁহার নিয়োগে আর্থিক ব্যাঘাত কি ঘটিতে পারে, বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা শুনিয়াছি, আশুতোষ সংস্কৃত অধ্যাপক ও ইসলামিক বিষয়ের অধ্যাপকের বেতন এবং প্রয়োজন হইলে গবর্ন্মেণ্টকে তাঁহাদের পেন্সান বাবতে অর্থ প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যথেষ্ট টাকা আছে। যেরূপ অধ্যাপকের প্রয়োজন নাই, যাঁহার কাজ নাই, সেরূপ কোন কোন অধ্যাপকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভুরা হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখন যোগ্য লোকের বেলায়

আর্থিক ব্যাঘাতের ওজর উপস্থিত করিলে সঙ্গতি রক্ষা পাইবে বটে।

এই পদের জন্ত দ্বিতীয় যাঁহার নাম করা হইয়াছে বলিয়া শুনিলাম, তাঁহা অপেক্ষা যোগ্য আরও অন্যূন দু জন আবেদক ছিলেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।

—

সৈয়দ আমীর আলী

সৈয়দ আমীর আলী সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। তিনি মুসলমান ও ইতিহাস ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে-যে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মুসলমানদের ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক পাঠকের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে প্রিভি কৌন্সিলের বিচার-কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন। এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ইস্‌লামিক আইন ও সাধারণ আইনের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন ভারতীয়েরা সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন কয়েক বৎসর ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত সৈয়দ আমীর আলী তাঁহাদের পক্ষে ছিলেন।

তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন করিতেন। যুদ্ধে বা অন্য কারণে বিপন্ন বিদেশী অর্থাৎ অভারতীয় মুসলমানদের সাহায্যার্থ তিনি কয়েক বার অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণ করেন। গত মহাযুদ্ধের সময় যাহাতে ভারতীয় মুসলমানেরা আপনাদিগকে তুরস্কের প্রজা বলিয়া ঘোষণা না করে, তাহার জন্ত তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রমাণিত হইয়াছিল। যখন যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ঘটিল, তখন যাহাতে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ না হয়, তাহার জন্তও তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজনৈতিক মত সাবেক বা আধুনিক কংগ্রেসের অনুরূপ ছিল না। এক সময়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মতিবিশিষ্ট অধিকাংশ মুসলমানের রাজনৈতিক মত তাঁহার মতানুসারী ছিল বোধ হয়। কিন্তু পরে তিনি এত অধিকসংখ্যক ভারতীয় মুসলমানের নেতা ছিলেন না, ভারতবর্ষেই অন্য নেতাদের আবির্ভাব হইয়াছিল।

—

শ্রমিক ও ধনিক বিষয়ক আইন

শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করায় এবং মিল ও কারখানার বেসরকারী মালিকরা ও গবর্মেণ্ট কারখানা ও মিল বন্ধ করিয়া শ্রমিকদিগকে বেকার অবস্থায় রাখায় শ্রমিক ও ধনিক উভয়ের ক্ষতি হয়, দেশে যথেষ্ট পণ্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় না, বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, দেশের লোকদের নানা অসুবিধা ও ক্ষতি হয়, এবং অশান্তি ও রক্তারক্তিও অনেক সময় হইয়া থাকে। এই জন্ত শ্রমিক ও ধনিকদের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্ত এবং ধর্ম্মঘট ও শ্রমিকদের বহিষ্করণানন্তর মিল কারখানাদির দ্বাররোধ নিবারণের জন্ত বিশেষ উপায় অবলম্বন আবশ্যক। তাহার নিমিত্ত নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে তাহাও করিতে হইবে। এ বিষয়ে কোন পক্ষেরই মতভেদ হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারী যে বিলের আভাস খবরের কাগজে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমুদয় বিধির সমর্থন করা যায় না। বিলটি আমাদের হস্তগত না হওয়ায় বিস্তারিত সমালোচনা করিতে পারিতেছি না। নিম্নলিখিতরূপ একটি ধারা আছে বলিয়া কাগজে দেখিতেছি :—

"যাহারা রেলওয়ে, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগে কাজ করে, তাহারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া অথবা একমাস আগে নোটিশ না দিয়া কাজ ছাড়িয়া দিলে তাহাদের এক মাস জেল বা ৫০০ টাকা জরিমানা হইবে।"

মূল ধারাটি না দেখায় বুঝিতে পারিতেছি না, ঐ সকল বিভাগের কর্ম্মীরা সকলে একযোগে কাজ ছাড়িয়া দিলে ঐরূপ শাস্তি হইবে, না ব্যক্তিগত ভাবে একা একা ছাড়িয়া দিলেও হইবে। যাহারা চাকরী করে, তাহারা হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া দিলে নিয়োগকর্ত্তা বা মনিবদের অসুবিধা ও ক্ষতি হয় বটে, কখন কখন চাকরীর প্রকৃতি অনুসারে সর্ব্বসাধারণেরও অসুবিধা ও ক্ষতি হয়। কিন্তু কেহ ব্যক্তিগতভাবে একা হঠাৎ কাজ ছাড়িয়া দিলে কেবল তাহার বেতন ও পেন্‌স্যনাদি না দেওয়া সঙ্গত বোধ হয়, কারাদণ্ড ও জরিমানা সঙ্গত নহে। চা-বাগানের চুক্তিবদ্ধ কোন কুলি আগে আগে

চুক্তির সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে কাজ হইতে নিরস্ত হইলে যেমন কারাদণ্ড হইত ইহাও কতকটা সেইরূপ। কুলিদের ওরূপ শাস্তি রহিত হইয়াছে। এখন কেরানী প্রভৃতির উপর ঐরূপ আইন খাটান হইবে, দেখিতেছি।

রেলওয়ে, ডাকঘর প্রভৃতির কর্ম্মচারীরা এক যোগে কাজ ছাড়িয়া দিলে গবর্মেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের অসুবিধা ও ক্ষতি হওয়া নিশ্চিত। তাহা নিবারণের জন্ম আইন করা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু ঐ সব বিভাগের লোকদের উপর যদি অন্যায় ব্যবহার হয়, যদি তাহারা দরখাস্ত আদি করিয়া অবিচার অত্যাচারের প্রতিকার না পায়, তাহা হইলে তাহারা কি ক্রীতদাসবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে? হাজার অন্যায় ব্যবহার করিলেও নিয়োগকর্ত্তা ও মনীবদের কাহারও ত জেল ও জরিমানা হয় না, হইবে না; তবে গরীবদের জন্ম এই কঠোর ব্যবস্থা কেন?

প্রস্তাবিত আইনে সহানুভূতিপ্রসূত ধর্ম্মঘটকেও বেআইনী করা হইয়াছে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মিল কারখানা ও ব্যবসার মালিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্ম একযোগে কাজ করিতে পারিবেন; তাহাতে যদি শ্রমিকদের অসুবিধা হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের সহযোগিতা ও দলবদ্ধতা বেআইনী হইবে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মিল কারখানা আদির শ্রমিকদের একজোট হইয়া ধর্ম্মঘট করা-বে-আইনী হইবে। ধনীর পক্ষে যাহা দোষ নহে, গরীবের পক্ষে তাহা দোষ হইবে।

জনসাধারণকে বা গবর্মেণ্টকে কাবু করিবার নিমিত্ত যে-সব ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাও বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু এমন অনেক ধর্ম্মঘট হইতে পারে, জনসাধারণকে বা গবর্মেণ্টকে কাবু করা যাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু ঐ ওজুহাতে সেগুলি বন্ধ করা সরকার পক্ষের লোকদের পক্ষে সোজা হইবে।

দেশের সব জায়গায় সকল বিভাগের ও সব রকমের কলকারখানার শ্রমিকদের একত্র ধর্ম্মঘটকে ইংরেজীতে, জেনেরাল ষ্ট্রাইক্ বা সাধারণ ধর্ম্মঘট বলে, প্রস্তাবিত আইনে তাহাও বে-আইনী করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রমিকরা এরূপ ধর্ম্মঘট করার মত শিক্ষিত ও দলবদ্ধ নহে। ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত এরূপ ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হইয়াছিল। সুতরাং এ দেশে যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তাহার বিরুদ্ধে আইন করা অনাবশ্যক।

অনুসন্ধানের জন্ম ও বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্ম যে-সব বোর্ড গঠন করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা আবশ্যক। তাহাদের গঠনপ্রণালী, কার্য্যপদ্ধতি প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

সমস্ত শাস্তি ও অসুবিধা শ্রমিকদের জন্ম রাখিলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। রেলওয়ে, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিভাগের বড়কর্ত্তারা এবং মিল ও কারখানার মালিকরা অন্নবস্ত্রের কষ্ট, বাসগৃহের কষ্ট, রোগে অচিকিৎসায় দুঃখ, সন্তানদের অপুষ্টি, বস্ত্রাভাব, শিক্ষাভাব, চিকিৎসার অভাব, প্রভৃতি জনিত দুঃখ ভোগ করেন না; গরীব কর্ম্মীরাই করে। এই জন্ম আবেদন-নিবেদন ছাড়া তাহাদের দুঃখ দূরীকরণের ভাল উপায় থাকা দরকার। তাহাদের প্রতিই আমাদের সহানুভূতি বেশী।

—

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন

জমাদার ও চাষী রায়তদের মাঝখানে জমীর উপর নানাবিধ স্বত্ববিশিষ্ট নানাশ্রেণীর লোক আছে। সকলের স্বার্থ পূরামাত্রায় বজায় রাখিয়া, যাহারা স্বহস্তে চাষ করে তাহাদিগকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া অতি কঠিন কাজ। এইহেতু, এখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনার্থ যে বিলটির আলোচনা হইতেছে, সে সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। শুনা যায়, বিলটির প্রায় দুই-হাজার সংশোধনের প্রস্তাব পেশ হইয়াছে। এ অবস্থায় বিষয়টির আমাদের সম্যক্ জ্ঞান থাকিলেও আমরা সময় ও স্থানাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করিতে পারিতাম না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের লিখিত একটি প্রবন্ধ পাইয়াছিলাম। স্থানাভাবে তাহাও ছাপিতে পারিলাম না। কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

—

লর্ড অলিভিয়ার ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার সমর্থক

বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসেল্‌সে আন্তর্জাতিক সোশ্যালিষ্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার বলেন, যে, উক্ত কংগ্রেস ভারতবর্ষের নিজ শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারণের সম্পূর্ণ অধিকার স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন, যে, ঐ কংগ্রেস মিসর, ভারত ও চীনের পূর্ণস্বাধীনতার সমর্থন করেন, এবং চান, যে, ইরাক ও সীরিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া লীগ অব্‌ নেশুন্সের সভ্য হউক।

—

পারস্যের পূর্ণ স্বাধীনতা

পারস্য স্বাধীন হইলেও এতদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল না। পারস্যপ্রবাসী আমেরিকান্‌ ও ইউরোপীয়েরা কোন দোষ করিলে পারস্যের নিজের আদালতে তাহাদের বিচার না হইয়া তাহাদের দেশের কন্সালের আদালতে বিচার হইত, এবং পারস্য নিজ ইচ্ছামত বাণিজ্যশুল্ক স্থাপন ও আদায় করিতে পারিত না। এখন এই দুই বিষয়েই পারস্য সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছে। আমেরিকার একখানি প্রসিদ্ধ কাগজে লিখিত হইয়াছে, যে, বর্ত্তমানে এশিয়ায় পাঁচটি স্বাধীন দেশ আছে—জাপান, চীন, পারস্য, আফগানিস্তান ও শ্যাম। নেপালকে স্বাধীন দেশের লোকেরা স্বাধীন মনে করে না।

—

ইঙ্গ-ভারতীয়দের শিক্ষা

বাংলা দেশে যাহাদিগকে সচরাচর ফিরিঙ্গী বলা হয়, তাহারা আপনাদিগকে এংলোইণ্ডিয়ান বা ইঙ্গভারতীয় বলে। এই ইঙ্গভারতীয়দের শিক্ষা সম্বন্ধে মিঃ আর্ডেন উড লণ্ডনে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে কলিকাতার ডাভটন কলেজে কাজ করিতেন। তিনি বলেন, ভারতে ফিরিঙ্গী ও ইউরোপীয়দের শিক্ষার ব্যয়ের অধিকাংশ, প্রায় শতকরা ৬৫ টাকা, ছাত্রদের বেতন ও অন্য বেসরকারী আয় হইতে নির্ব্বাহিত হয়, বাকী সরকারী দান; কিন্তু ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যয়ের অধিকাংশ সরকারী দান হইতে নির্ব্বাহিত হয়। তিনি ফিরিঙ্গী ও ইউরোপীয়দের শিক্ষার জন্য আরও বেশী টাকা চান। উত্তরে ডাক্তার পরাঞ্জপ্যে বলেন, কাহাদের শিক্ষার ব্যয়ের শতকরা কত অংশ সরকার দেন, তাহা বিবেচনা করিলে ত চলিবে না; ভারতীয় ছাত্র প্রতি ও ইঙ্গ-ভারতীয় ছাত্র প্রতি সরকার কত দেন, তাহাই বিবেচ্য। বাংলাদেশে ইউরোপীয় প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য ছাত্র প্রতি ৪৮·৮ ও ৫৯·০৩ টাকা, কিন্তু দেশী ঐরূপ বিদ্যালয়ে ১·৩ ও ৪·৯ টাকা মাত্র। ডাক্তার পরাঞ্জপ্যে অতি সত্য কথা বলিয়াছেন। ভারতে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদের প্রতি গবর্মেণ্ট পক্ষপাতিত্ব করায় তাহারা আরও বেশী পক্ষপাতিত্ব চায়।

—

বারদোলির বিবাদভঞ্জন

বারদোলিতে বোম্বাই গবর্ন্মেণ্ট জমির খাজনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে সম্মত হইয়াছেন। উভয়পক্ষ পরস্পরের সর্ত্তে রাজী হওয়ায় আপাততঃ সত্যাগ্রহ বন্ধ হইয়াছে। ইহার জন্য উভয় পক্ষই প্রশংসাভাজন। খাজনার হার সম্বন্ধে নিষ্পত্তি ন্যায়সঙ্গত হইলে তাহা সন্তোষের বিষয় হইবে। বারদোলির কৃষকেরা যে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে, কেবল নিজেদের সাহস, ধৈর্য্য, একতা, দুঃখসহিষ্ণুতা দ্বারা জয়লাভ করিয়াছে, ইহা হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। বোম্বাই গবর্মেণ্টও লর্ড উইণ্টার্টনের ধমক অনুসারে কাজ না করিয়া রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন।

—

ভারতীয় জাহাজের ব্যবসা

শ্রীযুক্ত সারাভাই হাজী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়, ভারতীয় সমুদ্রের উপকূলে উপকূলে জাহাজ চালাইবার অধিকার কেবল ভারতীয়দিগকে দিবার জন্য, একটি বিল পেশ করিয়াছেন। তিনি অতি ন্যায়সঙ্গত আইন প্রণয়ন

করাইতে চাহিয়াছেন। সমুদ্রতটবর্ত্তী সকল দেশের সমুদ্রগামী জাতিরা তাহাদের ইতিহাসের কোন না কোন সময়ে আবশুক মত এইরূপ আইন করিয়াছে। আমাদেরও তাহা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই চেষ্টায় ইউরোপীয় বণিকেরা বাধা দিতেছে। কারণ জাহাজে যাত্রী ও মাল বহন করিয়া তাহারা কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করে। প্রাচীন কালে ভারতীয়েরা সমুদ্রগামী প্রধান জাতিদের অন্যতম ছিল। সুতরাং তাহাদের পক্ষে আবার সামুদ্রিক বাণিজ্যে সফলকাম হইবার সম্ভাবনা আছে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষের জাহাজের ব্যবসা নষ্ট করা হয়।

সদ্যঃপ্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে জাহাজে মাল ও যাত্রী বহন দ্বারা ইংরেজ জাহাজের মালিকরা বৎসরে দুই শত কোটির উপর টাকা উপার্জ্জন করে। ইহার একটা বৃহৎ অংশ ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে লব্ধ; ঠিক অঙ্কটি হাতের কাছে নাই—বোধ হয় ষাট কোটি টাকা।

—

আকাশপথে বোম্বাই হইতে পুনা

কিছু দিন হইল শ্রীযুক্ত মেহতা ও পাণ্ডে আকাশযানে ৫০ মিনিটে বোম্বাই হইতে পুনা যান। শ্রীযুক্ত মেহতা বলেন, আকাশপথে যাতায়াত নিরাপদ এবং রেলওয়ে ও জাহাজে যাতায়াত অপেক্ষা কম কষ্টকর। ইউরোপে আকাশপথে যাতায়াত খুব সাধারণ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে ইহা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা বাঙালীদের উচিত।

—

পার্লেমেণ্টে ভারতীয় বিতর্ক

পার্লেমেণ্টে, অতি অল্পসংখ্যক সভ্যের সম্মুখে, অল্প সময়ের জন্ত ভারতশাসনসম্বন্ধীয় বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন রাজনৈতিক দলেরই প্রধান লোক নহেন। ব্রিটিশ্ জাতি তবু নিজেদের ৩২ কোটি লোকের ট্রাষ্টিগিরির দাবী করিতে ছাড়ে না। আশ্চর্য্য ভণ্ডামি ও মিথ্যাচরণ।

অধ্যাপক নীলমণি ধর

অধ্যাপক নীলমণি ধর বহু বৎসর আগ্রা কলেজে দক্ষতার সহিত আইনের অধ্যাপকের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌয়ে বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অনেক বিখ্যাত লোক তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন; ভগবদ্বিশ্বাস তাঁহাকে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে তাঁহার সচিত্র জীবনী বাহির হইয়াছিল।

—

কবিরাজী ও এলোপ্যাথী

পঞ্জাবের কয়েকখানি কাগজে সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদিক ও এলোপ্যাথী চিকিৎসার নিন্দাপ্রশংসামূলক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে;—হয়ত এখনও চলিতেছে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, আয়ুর্ব্বেদের ব্যবসায়ী ও সমর্থকেরাই লম্বা লম্বা ও দাম্ভিকতাপূর্ণ অধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা অব্যবসায়ী হইয়া উভয়ের মধ্যে কোন তুলনা করিতে চাই না; তাহার মত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। কিন্তু একটি কথা বলিলে অনধিকার চর্চ্চা হইবে না। এলোপ্যাথী চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকে নিত্য গবেষণা ও পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। প্রাচীন ও প্রচলিত বলিয়াই কোন মত, ঔষধ, চিকিৎসা-প্রণালী তাঁহারা সন্দেহ ও পরীক্ষার অতীত মনে করেন না। ফলে অনেক ভ্রম সংশোধিত হইতেছে। নূতন তত্ত্ব, নূতন ঔষধ, নূতন চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হইতেছে। বর্জ্জন ও গ্রহণ সজীবতার লক্ষণ। এলোপ্যাথী উন্নতিশীল, ভ্রম ত্যাগ ও সত্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আয়ুর্বেদের ভক্তেরা পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন। পুরাতনের মধ্যে রক্ষণযোগ্য, আদরণীয়, মূল্যবান জিনিষ অবশ্যই আছে। কিন্তু যাহা কিছু আয়ুর্বেদে আছে, সবই সত্য, এরূপ ধারণা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিরুদ্ধ। নূতন কিছু আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হইতে পারে না, এরূপ ধারণাও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিরুদ্ধ।

গ্রাম্য চৌকিদার নিয়োগ

১৮৯২ সালে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন পাস হইবার পূর্ব্বে পঞ্চায়েৎ চৌকীদার নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে ও তাহার বেতন নির্দ্ধারণ করিতে পারিত। ১৮৯২ সালের আইন ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেই ক্ষমতা দেয়। রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী একটি বিল পেশ করিয়া চৌকীদার ও দফাদার নিয়োগ ও বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে দিবার প্রস্তাব করেন; কারণ গ্রাম্য পুলিশের জন্য তাহাদিগকেই টাকা তুলিতে হয়। তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী বিল পাস হইয়াছে। ইহা যুক্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু কনষ্টেবল হইতে আরম্ভ করিয়া আর সব শান্তিরক্ষকদের কর্ত্তা রহিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট্, গ্রাম্য চৌকীদার ও দফাদারদের কর্ত্তা হইলেন ইউনিয়ন বোর্ডগুলি—এ প্রকার দ্বৈরাজ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন উঠিলে তাহার মীমাংসা কি প্রকারে হইবে? তাহার কোন প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে কি?

—

প্রকাশ্যে ও গোপনে ভোট দান

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রস্তাব অনুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা বাংলা গবর্মেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন, যে, ইউনিয়নবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডসমূহের নির্ব্বাচনে প্রকাশ্য ভোট দান রীতির পরিবর্ত্তে গোপনে ব্যালট দ্বারা ভোট দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম করা হউক। অনুরোধ যুক্তিসঙ্গত। ভোটদান প্রকাশ্য ভাবে হইলে নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা জানিতে পারে কোন্ নির্ব্বাচক কাহাকে ভোট দিতেছে; এইজন্য নির্ব্বাচকেরা অনেক সময় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে না। গোপনে ব্যালট দ্বারা ভোটদান প্রবর্ত্তিত হইলে তাহারা নিজের প্রকৃত ইচ্ছা অনুসারে ভোট দিতে পারিবে।

—

বঙ্গের জলসেচন-প্রণালী

স্যর উইলিয়ম উইলকক্স্ জলসেচন বিষয়ে একজন বিখ্যাত ও কৃতী এঞ্জিনীয়ার। মিশরে তাঁহার কৃতিত্বের প্রভূত নিদর্শন বিদ্যমান। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গের—বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের—নদী ও খাল সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যনের সমক্ষে বঙ্গে জলসেচন বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে ভগীরথকে এঞ্জিনীয়ার রূপে বর্ণনা করেন। এই বক্তৃতা মূল্যবান্। যাঁহারা ইহা পাঠ করেন নাই, তাঁহারা ইহার প্রধান অংশ শ্রাবণ মাসের (ইংরেজী) বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে দেখিতে পাইবেন। ইহা পড়িয়া ভারতের ও বঙ্গের ইংরেজ আমলাতন্ত্রের খুসী হইবার কারণ নাই। ইহা অনুসারে তাঁহাদের কাজ করিবার কথা নয়। কিন্তু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা সরকারপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্যার উইলিয়ম উইলকক্সের বক্তৃতার সঙ্কেত অনুসারে কি কি কাজ করা যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিবার অনুকূলে এক প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন। তাহার ফল অবশ্য অনিশ্চিত। কিন্তু ঐ বক্তৃতাটি সকল বাঙালীর পড়া উচিত। উহার প্রত্যেক কথা অভ্রান্ত না হইতে পারে। কিন্তু উহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তদনুসারে গবর্মেণ্টকে কাজ করাইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের এবং দেশহিতৈষী অন্য সকলের উঠিয়া পড়িয়া লাগা কর্ত্তব্য।

—

সকল দলের মন্ত্রণাসভার প্রতিবেদন

ভারতবর্ষে স্বশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে স্বরাজের ভিত্তিগত মূলবিধি কি কি নীতি অনুসারে প্রণীত হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত গত মে মাসে বোম্বাইয়ে সকল রাজনৈতিক দলের মন্ত্রণাসভার দ্বারা একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু তাহার সভাপতি নিযুক্ত হন। এই কমিটির প্রতিবেদন এলাহাবাদে ১০ই আগষ্ট স্বাক্ষরিত হয়। তাহার একখণ্ড আমরা একদিন পরে পাইয়াছি। প্রতিবেদনটি প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত। বিবিধ প্রসঙ্গ লিখিবার সময়ে উহা পাওয়ায় এখনও সবটি ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। তাড়াতাড়ি কতক কতক পড়িয়া যাহা মনে হইয়াছে তাহার দুএকটি কথা পরে বলিতেছি।

মানবজীবনের ও জাতীয় জীবনের নানা বিভাগে বাঙালী কি করিতেছে, না করিতেছে, তাহার আলোচনা আমরা মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকি, কোন্ দিকে বাঙালী নিজের কাজ করিতেছে না, পরাভূত বা পশ্চাৎপদ হইতেছে, মনে হইলে তাহা নির্দ্দেশ করি। ইহাতে অবাঙালীদের এবং উদার প্রকৃতির বাঙালীদের আমাদের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। সর্ব্বত্র বাঙালীর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব স্থাপন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বাঙালী; সুতরাং স্বভাবতঃ আমরা চাই, যে, বাঙালীরা কোন বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বে অন্য কোন জাতির চেয়ে নিকৃষ্ট হইবে না; তাঁহাদের যাহা হওয়া উচিত ও বঙ্গের, ভারতের ও পৃথিবীর জন্য যাহা করা উচিত, তাহা তাহারা হইবে ও করিবে। এই আশা পূর্ণ হইবার লক্ষণ না দেখিলে সতর্ক করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করি।

ব্রিটিশশাসিত ভারতের লোকসংখ্যা ২৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৬০ হাজার ২ শত। ব্রিটিশশাসিত বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত ৩৬। অর্থাৎ ব্রিটিশবঙ্গের লোকসংখ্যা ব্রিটিশভারতের লোকসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। ব্রিটিশশাসিত অন্যান্য প্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা ধরিলে ঠিক্ পঞ্চমাংশই সম্ভবতঃ হইবে। অতএব নিখিলভারতীয় সব কাজের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাঙালীদের করা উচিত।

বোম্বাইয়ে সকল দলের মন্ত্রণাসভায় যত সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাহার পঞ্চমাংশ বাঙালী ছিলেন না। উক্ত সভায় যে কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহার দশ জন সভ্যের মধ্যে বাঙালী ছিলেন কেবল সুভাষচন্দ্র বসু। কেহ ইচ্ছা করিয়া বাঙালী সভ্য কম রাখিয়াছিল, এমন নয়; উপযুক্ত এবং ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কমিটির অধিবেশনে দিনের পর দিন উপস্থিত থাকিয়া কাজ করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ বাঙালীর সংখ্যা কম বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকিবে। সমগ্রভারতীয় কাজ করিতে ইচ্ছুক, সমর্থ ও উপযুক্ত বাঙালী অনেক থাকিলে ঐ কমিটিতে অন্ততঃ দু'জন বাঙালী থাকিতেন। অন্যান্য প্রদেশে এরূপ লোকের সংখ্যা বেশী থাকায় আগ্রা-অযোধ্যার এবং বোম্বাইয়ের একাধিক অধিবাসী কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কমিটির সভাপতি পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর আমন্ত্রণে কমিটির সভ্য ছাড়া অন্য অনেকে তাহার কোন কোন অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া তাহার কাজে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কোন বাঙালীর নাম দেখিতেছি না। কোন বাঙালীকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, কিম্বা নিমন্ত্রিত হইয়াও কেহ যান নাই, দুই-ই হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই ক্রটি আমাদের। নিখিলভারতীয় সব কাজে বাঙালীদের উদ্যোগিতা বেশী থাকিলে কয়েক জন বাঙালী নিমন্ত্রিতও হইতেন, এবং নিমন্ত্রণ রক্ষাও করিতেন। ইহা অসম্ভব নহে, যে, নিমন্ত্রণসত্ত্বেও কেহ যান নাই।

কমিটিকে যদিও তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে হইয়াছে তথাপি প্রতিবেদনটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সুমুদ্রিত মনে হইতেছে। যাহা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে কোন কোন জায়গায় আমরা কমিটির সহিত একমত নহি, কিন্তু মোটের উপর একমত।

প্রতিবেদনটিতে একটি উপক্রমণিকা, সাতটি অধ্যায় একটি নোট, দুটি তফশিল, এবং তিনটি পরিশিষ্ট আছে। ভূমিকা ছাড়া অন্য জিনিষগুলির বিষয় এই;—প্রথম অধ্যায়, কমিটি; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়, বিষয়টির সাম্প্রদায়িক দিক এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব; চতুর্থ অধ্যায়, ভাষাঅনুসারে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন; পঞ্চম অধ্যায়, দেশী রাজ্যসমূহ; ষষ্ঠ অধ্যায়, কমিটির প্রস্তাবাবলী; সপ্তম অধ্যায়, কমিটির অনুরোধাবলী; ঘরোয়া রকমের মন্ত্রণাসভার বিবরণযুক্ত নোট; প্রথম তফশিল, কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ভারতগবর্ম্মেণ্টের এলাকাভুক্ত বিষয়সমূহ; দ্বিতীয় তফশিল প্রাদেশিক বিষয়সমূহ; প্রথম পরিশিষ্ট, ধর্ম্ম অনুসারে পঞ্জাবের লোকসংখ্যার বিশ্লেষণ; দ্বিতীয় পরিশিষ্ট, ধর্ম্ম অনুসারে বঙ্গের লোকসংখ্যার বিশ্লেষণ; তৃতীয় পরিশিষ্ট, বঙ্গের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসকলের নির্ব্বাচিত সভ্যদের ধর্ম্ম অনুসারে সংখ্যা।

এই পরিশিষ্টগুলি মূল্যবান্। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এগুলি সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে, স্বরাজ স্থাপিত হইলে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রত্যেক লক্ষ অধিবাসীর জন্য এক এক জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে

এবং তখন মুসলমানপ্রধান বঙ্গে ও পঞ্জাবে মুসলমানদের জন্য তাহাদের সংখ্যানুযায়ী সভ্যপদ নির্দিষ্ট না থাকিলেও তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদিগকেই অধিকাংশ পদে নির্ব্বাচিত করিতে পারিবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্ব্বাচনে এখনই অনেক মুসলমানপ্রধান জেলায় অধিকাংশ সভ্যপদে মুসলমান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ময়মনসিংহে ও চট্টগ্রামে ত একজনও হিন্দু নির্ব্বাচিত হইতে পারে নাই, সব সভ্যই মুসলমান, যদিও উভয় জেলাতেই মুসলমানেরা মোট অধিবাসীর বারআনার কম।

—

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্বন্ধে লর্ড হ্যাল্‌ডেনের প্রবন্ধ

লর্ড হ্যাল্‌ডেন বিলাতের এক জন বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিজ্ঞ। তিনি কয়েকবার তথাকার মন্ত্রীসভার সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি হিবার্ট জার্নালের বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রথমে বিজ্ঞান, কাব্য ও অন্য সাহিত্য, ললিত কলা, দর্শন ও ধর্ম্মে পাশ্চাত্য জাতিদের কৃতিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর বলিয়াছেন, জ্ঞান-বিকাশের জন্য প্রতীচ্য কি করিয়াছে তাহা আমরা জানি, কিন্তু চিন্তা-রাজ্যে জগৎকে প্রাচ্য কি দিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া জানি না। ভারতীয় দর্শন যোগ্যতার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইউরোপ ও আমেরিকায়, এমন লোক আছেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং তাঁহাদের গবেষণার ফল বিস্তৃত ভাবে বিদিত হয় নাই। অন্য দিকে, প্রাচ্যে অন্ততঃ এমন কতকগুলি দর্শনঅধ্যয়নশীল লোক আছেন যাঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ চিন্তার সহিত এরূপ ভাবে পরিচিত, যে, তাঁহাদের এই দার্শনিক জ্ঞান প্রতীচ্যেও উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। তাঁহারা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা ও ইউরোপে কম লোকেই জানে। যদি প্রাচ্যের আমাদের কিছু বলিবার থাকে, তাহা হইলে এমন অবস্থা ভাল নয়। অতঃপর হ্যাল্‌ডেন বলিতেছেন, 'তাঁহাদের আমাদিগকে কিছু শিখাইবার আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কি, তাহা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।"

প্রবন্ধটি ১৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ইহাতে তিনি অতঃপর হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন ও আধ্যাত্মিক উপদেশের কতক তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়াছেন। উপনিষদের উপদেশ বিষয়ে লিখিতে গিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ কর্ত্তৃক লিখিত "উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব" নামক ইংরেজী বহি হইতে ২০-২২ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর ভারতবর্ষীয় চিন্তা বুঝিবার জন্য যে যোগ্য হিন্দুদের লেখা পড়া উচিত, তাহা বলিয়া লিখিতেছেন :—

"The University of Calcutta has produced a series of professors of high gifts who have not only worked out the subject but have written about it in admirable English. Radha Krishnan, Das-Gupta, Haldar, are among them."

তাৎপর্য্য। "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েকজন মনস্বী অধ্যাপক উৎপন্ন করিয়াছেন যাঁহারা কেবল এই বিষয়টির জ্ঞানবিকাশের জন্য শ্রম করেন নাই কিন্তু প্রশংসনীয় ইংরেজীতে এই বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণন্, দাশ গুপ্ত, হালদার, ইঁহাদের মধ্যে।"

অতঃপর আরও আরও কিছু লিখিয়া তিনি বলিতেছেন—

"ভারতবর্ষের অনেক যোগ্য পণ্ডিতেরা মনে করেন, যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানীরা যে কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহার সমাদর ত আমরা করিই নাই, তাহা বুঝিতেও আমরা পারি না। একথা অবশ্য সত্য, যে, কিছু দিন পূর্ব্বেও হিন্দুদের লেখায় ইউরোপীয় দর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখিতে পাওয়া যাইত না, তাঁহারা প্রায়ই উপমা ও রূপকের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু আমাদের বিপক্ষে এ কথা অনেকেই বলেন, যে, ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও মতের অন্তঃস্থলে এমন একটা সত্যদর্শন আছে, যাহা পশ্চিমদেশের বিজ্ঞানবাদের বা আদর্শবাদের (Idealism এর) চেয়ে কম ব্যাপক নহে। অবশ্য, ভাষায় ইহা যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তেমন সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার নহে এবং অনেক স্থলে যাঁহারা ইহার প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের নিজেদের তর্কশাস্ত্রের প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার অভাবই ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। তথাপি অনেকে বলেন,

যে, ইহা সত্ত্বেও ইহার অন্তরে একটি যথার্থ বিশ্লেষণ আছে এবং মূল তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। আমাদের সমসাময়িক ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের লেখকদের গ্রন্থ পড়িলে বুঝা যায়, যে, তাঁহারা কেবল আমাদের দেশের বিজ্ঞানবাদীদের সমস্ত মত ও দর্শন করামলকবৎ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের চিন্তাধারার সমস্ত ফলও তাঁহাদের লেখায় তাঁহারা ফলাইয়া তুলিয়াছেন। কাজেই, এখনও যদি আমরা ভারতবর্ষের মতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না দেখাইতে পারি, তবে সেটা আরও কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই।

"আমার মনে হয় না, যে, আমাদের বিরুদ্ধে এই যে তিরস্কার, এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই তিরস্কারকে আর দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়াও চলা যায় না। এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বুঝাইবার জন্য আমি একখানি বই সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। অতি অল্পদিন হইল, অধ্যাপক দাশগুপ্ত নামে দর্শনশাস্ত্রের একজন বিখ্যাত হিন্দু অধ্যাপক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে আমাদের এখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই ছিলেন এবং এখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক।

"ইঁহার গ্রন্থের নাম 'হিন্দু অধ্যাত্ম দর্শন' (Hindu Mysticism); গত বর্ষে ওপন্ কোর্ট পাব্লিশিং কোম্পানী ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আমেরিকান কয়েকটি বক্তৃতা এই গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। ইহা সাধারণের বোধগম্য ভাবেই লিখিত। কেবলমাত্র তর্কবিচারে জীবনের উদ্দেশ্য এবং সমস্যা যে ভাবে সমাধান করা যায়, তাহার চেয়ে অনেক গভীরতর ভাবে ও সত্যরূপে তাহাকে যে অধ্যাত্ম দর্শনের দ্বারা লাভ করা যায় ইহাই বুঝাইবার জন্য তিনি অন্বীক্ষামূলক একজাতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের পক্ষ সমর্থন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিবৃত্তে এইজাতীয় ও অন্যজাতীয় চিন্তার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়, ইহাই এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।"

ইহার পর ছয় সাত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া লর্ড হ্যাল্‌ডেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্তের উল্লিখিত পুস্তকখানির তাৎপর্য্য নিজ প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাৎপর্য্য দিবার পর তিনি যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার সবগুলি এখন ছাপিবার সময় ও স্থান নাই। নীচে কিয়দংশের অনুবাদ মুদ্রিত করিলাম।

"একথা কেহ বলে না যে, আমরা বা আমাদের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষীয়দের ধর্ম্ম গ্রহণ করিব বা করিবে। কিন্তু আমরা যে ইহা বুঝিব না বা ইহার একটা মোটামোটি ধারণা করিতে পারিব না, ইহা যে বিষম ব্যাপার। হিন্দু বা মুসলমান, যাহারই সহিত আমরা আত্মীয়তা করিতে চেষ্টা করি না কেন, তাহার মূলে যেটি সব-চেয়ে প্রধান, সেটি হচ্ছে এই জাতীয় প্রাণ। অথচ আমরা যখন অপেক্ষাকৃত সুশাসনের জন্য ভারতবর্ষে কমিশন পাঠাই, তখন আমরা এই অন্তরের প্রাণের কথা একটুও ভাবি না। আমরা রাজনৈতিক-দের সহিত আলোচনা করি; কিন্তু যাহারা এই জাতীয় চিন্তাকে গড়িয়া তুলিতেছে এবং বিবিধভাবে প্রভাবিত করিতেছে, তাহাদের সহিত আমরা কোন আলোচনা করিতে চাই না। যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডে তেমনি ভারতবর্ষে আমরা গাড়ীর সামনে ঘোড়া না বসাইয়া ঘোড়ার সামনে গাড়ী বসাই। আমার বিশেষ সন্দেহ হয়, যে, অনেক ব্যাপক ও স্বতন্ত্র উপায়ে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় আমরা যদি ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যের নেতৃবর্গের শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের পাত্র হইতে না পারি তাহা হইলে আমাদের রাজনৈতিক চেষ্টায় কোন ফল ফলিবে না। ভারতীয়-দিগকে আমাদের বুঝাইতে হইবে, যে, আমরা তাহাদের চিন্তার প্রণালী বুঝি এবং তাহাদের উপায়ে তাহারা যাহাতে পূর্ণ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। সামান্য ভাবে এবিষয়ে কিছু কিছু কাজও হইয়াছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছি। কিন্তু ভারতবর্ষের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানে এখনো অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি; সমাজসংস্কারের বিষয়ে তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিবার কাজটুকুও সমস্তটুকুই বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত কার্য্যে আমাদের হাত দেওয়া উচিত এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা লাভ করিবার চেষ্টা অপেক্ষাও ভারতবর্ষের চিন্তাকে যাঁহারা গড়িয়া তুলিতেছেন আমাদের কাছে তাঁহাদের

সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

"এ বিষয়ে লিখিতে গিয়া কোনও দলে যোগ দেওয়ার আমার ইচ্ছা নাই। আমি শুধু এই কথাটি বলিতে চাই, যে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যে ধর্ম্মগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্যবন্ধন রহিয়াছে। এ কথাটি যদি সত্য হয়, তবে এইটি আমাদের ভাল করিয়া বুঝা উচিত এবং ইহার উপর নির্ভর করা উচিত। কারণ এই ঐক্যের বন্ধনগুলি একবার আবিষ্কার করিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মতে ও বিশ্বাসে পূর্ব্ব ও পশ্চিম যে একেবারে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে তাহা ঠিক নহে। এই ভ্রান্ত বুদ্ধিটি দূর হইলে আমাদের সম্মুখে নূতন কর্ম্মের ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইবে। পরস্পরকে বুঝিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিতে কি করিয়া ভারতবর্ষকে শাসন করিতে পারা যায় ইহা বুঝিতে পারিলে, যে জটিল সমস্যাটি আমরা নিজেরাই এতখানি ঘোলাইয়া তুলিয়াছি তাহা অনেকখানি পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে।"

লর্ড হ্যাল্‌ডেনের উদ্দেশ্যের কোন নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু ভারতবর্ষের মর্ম্মকথা জানিয়াও ইংরেজরা আমাদিগকে শাসন করিতেই থাকিবেন, ইহা আমরা ভাল আদর্শ মনে করি না। তাঁহারা আমাদিগকে বুঝুন, আমরাও তাঁহাদিগকে বুঝি। কিন্তু আমরা নিজের দেশে মনোরাজ্যে ও বাহিরে সেই স্থান চাই যাহা হ্যাল্‌ডেনের স্বজাতির নিজের দেশে আছে। সত্য আদর্শ যে তাঁহার মনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত বাক্যটি হইতে বুঝা যায়:— ভারতীয়দিগকে আমাদের বুঝাইতে হইবে, যে আমরা তাহাদের চিন্তার প্রণালী বুঝি, এবং তাহাদের উপায়ে তাহারা যাহাতে পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

আমাদের নিছক রাজনৈতিক পাণ্ডারাও বুঝুন, যে, তাঁহারাই একমাত্র বা প্রধান ভারতসেবক নহেন। যাঁহারা ভারতবর্ষের আত্মিক মূর্ত্তি লর্ড হ্যাল্‌ডেনের মত সমগ্র-বাসীদের কাছে উদ্ঘাটিত করেন, তাঁহারাও [illegible] সেবা করেন না।

—

ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিক উৎসব

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ৬ই ভাদ্র মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। এই শত বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ কি কাজ করিয়াছেন, তাহা সকল ভারতীয়দিগের ও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তনীয় ও কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে দেশে ব্রাহ্মদিগের যে প্রভাব ছিল, এখন তাহা হ্রাসের কারণ কি তাহাও চিন্তনীয়। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মের আগেকার ব্রাহ্মদিগের ন্যায় হিতসাধন কেমন করিয়া করিতে পারেন, এই উৎসবে ব্রাহ্মেরা বিশেষ ভাবে তাহার আলোচনা করিলে এবং সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তদনুসারে কাজ করিলে সুফল হইবে।

—

সিটি কলেজে মিটমাট

সিটি কলেজ সমস্যার উপযুক্তরূপ সমাধান হইয়া যাওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। যে-সময়ে বাংলার সমগ্র হিন্দুজাতি একজোট হইয়া সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের ভিতর দিয়া জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, সেই সময়ে এরূপ একটা বিসদৃশ ঘটনা ঘটিয়া আমাদের বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, বহু অন্ধ বা স্বার্থান্বেষী প্রাচীনপন্থী লোক এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া যুবকমহলে নেতার আসন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং সামাজিক বিষয়ে তাঁহাদিগের মতামত বর্ত্তমান-কালের উন্নতিশীল হিন্দুর আদর্শের বিরুদ্ধ হওয়াতে যুবকদিগের দ্বারা তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ সুফলপ্রদ না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। যাহা হউক বিষয়টির মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় এই আশঙ্কা বহু পরিমাণে দূর হইয়াছে। যে যে সর্ত্তে এই মিটমাট হইয়া গেল, তাহা নিম্নলিখিতরূপ:—

(1) The City College authorities recognise the right of boarders of all communities

including the Hindus to perform their worship according to their faith in the Ram Mohun Roy Hostel; but in view of differences of religious opinions and principles of the boarders and the College authorities, the boarders and the College authorities, out of mutual deference to the religious views and feelings of each other, agree and decide that no public celebrations of communal forms of worship will at any time take place within the precincts of the Ram Mohun Roy Hostel.

(2) The City College authorities accept the offer of the City College Professors' Union to provide a place of worship near the Ram Mohun Roy Hostel where Hindu boarders of the Hostel will have full facilities for the performance of their religious observances and also to raise funds to place the arrangements on a permanent basis, so that no financial burden shall ever have to be borne by the students of the Hostel. Mr. S. M. Bose in his personal capacity will see that the above arrangements are given effect to.

(3) If any other College Hostel or Mess exists or is, in future, started by the College authorities specially for Hindu students, unrestricted liberty of worship will be permitted there.

(4) The students express regret for any excess they may have committed in connection with the dispute.

(5) The City College authorities are sorry if any one among their staff has hurt the religious feelings of the Hindu students on any occasion.

অর্থাৎ

১। সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ যদিও রামমোহন রায় হষ্টেলে সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগের (হিন্দুদিগেরও) নিজ নিজ ধর্ম্মমতানুসারে পূজা করিবার অধিকার স্বীকার করেন, তথাপি ছাত্র ও কলেজকর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের পার্থক্য থাকায় ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষ, পরস্পরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ, একমত হইয়া স্থির করিতেছেন যে, রামমোহন রায় হষ্টেলের সীমানার মধ্যে কোন সময়ে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক পূজা হইতে পারিবে না।

২। সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ সিটিকলেজের প্রফেসার্স ইউনিয়নের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে প্রফেসার্স ইউনিয়ন রামমোহন রায় হষ্টেলের হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য নিজের খরচে হষ্টেলের বাহিরে একটি পূজার স্থান ঠিক করিয়া দিবেন এবং যাহাতে বরাবর এই ব্যবস্থা থাকে এবং এই জন্য ছাত্রদিগকে অথবা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে না হয় তাহার জন্য একটি ফণ্ড খুলিবার চেষ্টা করিবেন। শ্রীযুক্ত এস. এম. বসু ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যবস্থা অনুসারে যাহাতে কাজ হয়, তাহা দেখিবেন।

৩। যদি কখন সিটি কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য বিশেষ কোন ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করেন বা যদি এইরূপ কোন ছাত্রাবাস বর্ত্তমানে থাকে তাহা হইলে সেই ছাত্রাবাসে পূজার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে।

৪। ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট ও সত্যাগ্রহ কালে কোনও বাড়াবাড়ি করিয়া থাকিলে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

৫। সিটি কলেজের কোন শিক্ষাদাতা যদি কোন ভাবে কোন ছাত্রের ধর্ম্ম অনুভূতিতে আঘাত করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

এবিষয়ে সিটিকলেজ প্রফেসার্স ইউনিয়নের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে। সিটি কলেজের মীমাংসা সম্পর্কে তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে-সাহায্য করিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

In order to bring about a settlement of the present dispute between the College authorities and the orthodox Hindu students, the City College Professors' Union does hereby volunteer, on its own financial responsibility, to provide a place of worship for the orthodox Hindu boarders of the Ram Mohun Roy Hostel as near the Hostel

as practicable, and to raise funds to place the arrangement on a permanent basis so that neither the college authorities nor the boarders will have to bear any expenses or undertake any responsibility.

Resolved further that if any member has any conscientious scruple to subscribe to this fund, he be spared.

তাৎপর্য্য। সিটিকলেজের কর্তৃপক্ষ ও আচারনিষ্ঠ হিন্দুছাত্রদের মধ্যে বর্ত্তমান বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সিটি কলেজ প্রফেসার্স ইউনিয়ন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের আর্থিক দায়িত্বে রামমোহন রায় হষ্টেলের যথাসম্ভব নিকটে উহার আচারনিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীদের জন্য একটি পূজালয়ের ব্যবস্থা করিতে ও তাহা স্থায়ী করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে স্বীকার করিতেছেন, যাহাতে ছাত্র বা কর্তৃপক্ষকে ব্যয়ভার বহন বা দায়িত্ব স্বীকার করিতে না হয়। যদি ইউনিয়নের কোন অধ্যাপক-সভ্যের চাঁদা দিতে কোন বিবেক-প্রসূত বাধা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হউক।

—

সমবায়-প্রচেষ্টা

সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নহে। এই অত্যল্প কালের মধ্যে এই আন্দোলনের ফলে সকল দেশের সকল সমাজের সকল স্তরের লোকের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বিশেষ করিয়া পৃথিবীর কৃষকসমাজ এই আন্দোলনের সাহায্যে যেন পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। ফড়ে ও দালালদের নিকট দাদন লইয়া তাহারা তাহাদের কায়িক পরিশ্রমলব্ধ শস্যাদি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া এতকাল অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কাল কাটাইতেছিল। ঋণের দায়ে তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সমবায় আন্দোলনের পত্তন হয় শুধু এই কৃষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য। সমবায়-প্রচেষ্টায় যে-সকল কৃষকসমিতি যোগদান করিতেছে, তাহাদের জীবনযাত্রা যে কতদূর উন্নত ও সহজ হইয়াছে তাহার ইতিহাস বর্ত্তমান সংখ্যা "ভাণ্ডারে" বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণ এখনও সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। বঙ্গীয় সমবায়সংগঠন সমিতির উদ্যোগে "ভাণ্ডার" পত্রিকা বাহির হইতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ এই আন্দোলন সম্বন্ধে এই পত্রিকায় সহজবোধ্য ভাষায় নানা প্রবন্ধ ও বিবরণাদি প্রকাশিত হইতেছে। এই আন্দোলন সম্বন্ধে যে ধীরে ধীরে আমাদের অজ্ঞতা দূর হইতেছে তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান সংখ্যা "ভাণ্ডার"। ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের, সকল সমবায় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিবরণ এই পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছে, এবং পৃথিবীর সকল দেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়া নানা তুলনামূলক সংখ্যা ও তথ্য দ্বারা সমবায় প্রচেষ্টায় আমাদের স্থান কোথায় তাহা দেখান হইয়াছে।

এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নাম করা যাইতে পারে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সমবায়ের আদর্শ। গত ৭ই জুলাই এ্যালবার্ট হলে ষষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক উৎসব উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সমবায়সংগঠন সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে আচার্য্য রায় মহাশয় এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন। সমবায়ের মূলতত্ত্ব ও ইতিহাস, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি প্রচেষ্টার সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ এবং পৃথিবীব্যাপী সমবায়-প্রচেষ্টার ক্রম-পরিণতির সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা এই প্রবন্ধটি পড়িতে পারেন। অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে "ক্যানাডায় সমবায়" (সচিত্র) ও বঙ্গীয় সমবায়সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র মহাশয়ের লিখিত "সমবায়-উপনিবেশ" (সচিত্র) প্রবন্ধদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্যানাডায় কৃষকগণ সমবায়ের সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ বিক্রয়সমিতি স্থাপন করিয়া প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়িগণের সহিত যেভাবে প্রতিযোগিতা করিতেছে, তাহা ভারতবর্ষের কৃষকগণের অনুকরণীয়।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, প্রবাসী প্রেসে শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়
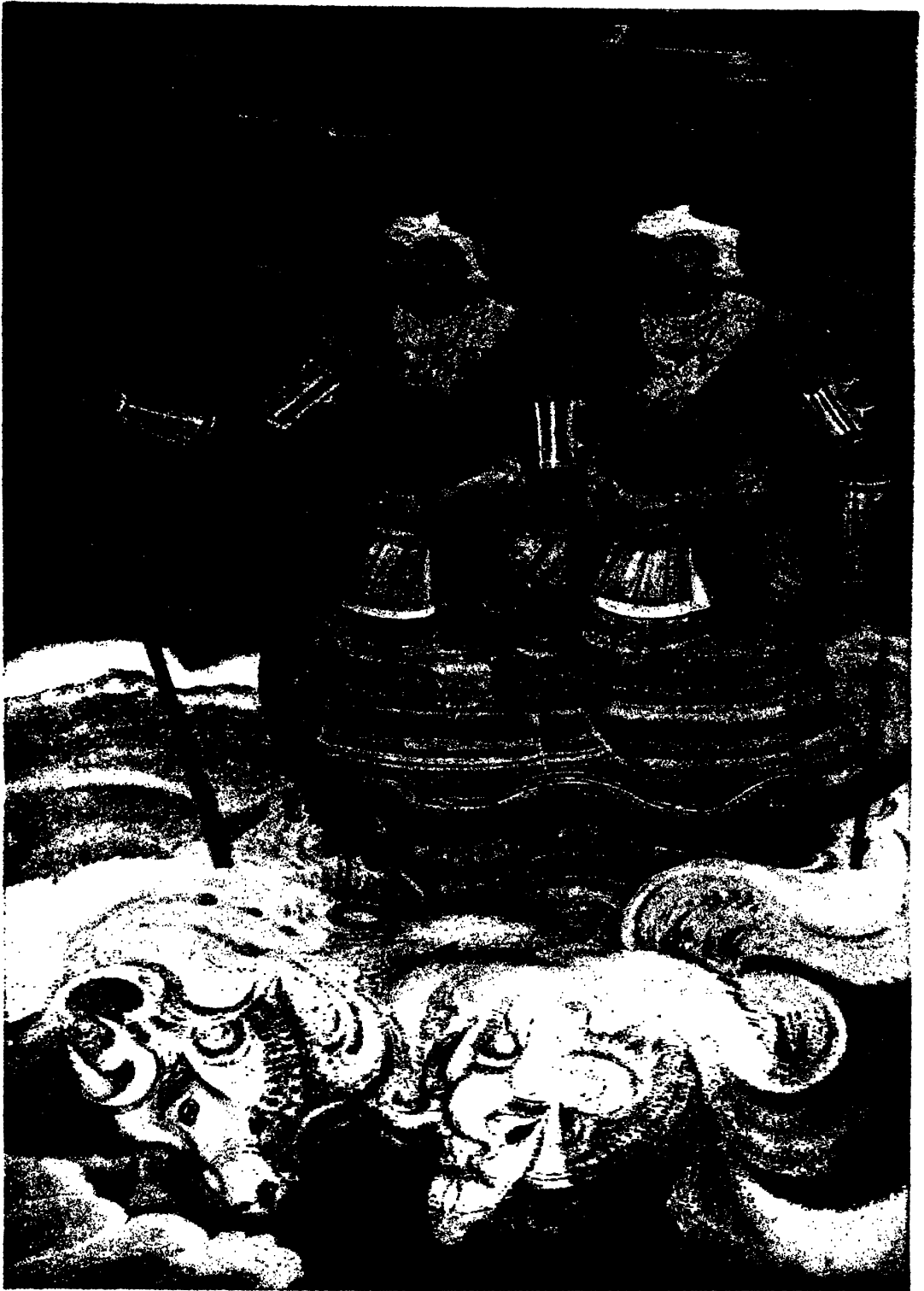
শিল্পী—শ্রী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৮শ ভাগ ।
১ম খণ্ড ।

আশ্বিন, ১৩৩৫

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শেষের কবিতা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

পূর্ব্ব ভূমিকা

বাঙলা দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্য্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজ-বিদ্রোহের যে-ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদা-শঙ্কর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছ্‌লিয়ে স'রে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউবিলাসী পাখীর মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন সকল পিতামহের নাতিরা যখন এই রকম তারিখের বিপর্য্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক দৌড়ে পৌঁছয় পঞ্জিকার একেবারে উল্টো দিকের টার্মিনসে। এক্ষেত্রেও তাই ঘট্‌ল। জ্ঞানদাশঙ্করের নাতি বরদাশঙ্কর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ পিতামহের প্রায় আদিম পূর্ব্বপুরুষ হ'য়ে উঠ্‌লেন। মনসাকেও হাত জোড় করেন, শীতলাকেও মা ব'লে ঠাণ্ডা-কর্‌তে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া সুরু হোলো; সহস্র দুর্গানাম লিখ্‌তে লিখ্‌তে দিনের পূর্ব্বাহ্ণ যায় কেটে; তাঁর এলেকায় যে বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ কর্‌তে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হোলো, হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফ্‌লেট্ ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋষিবাক্যবর্ষণ কর্‌তে কার্পণ্য কর্‌লেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্ম্মে জপে,

তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ সেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র ক'রে বানালেন। অবশেষে গোদান স্বর্ণদান ভূমিদান কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায় হরণ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরমবন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক কলেজে-পড়া, একই হোটেলে চপ্-কাট্‌লেট-খাওয়া, রামলোচন বাঁড়ুজ্জের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হ'য়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন কি, তাঁদের কেউ কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্তও লিখেচেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার বিসর্গের ভুল-চুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগ্‌লেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত-রক্ষা নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাস্‌পোর্টপ্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোলো। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নাম্‌ল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আস্‌তে হোতো। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হোতো বাজেয়াপ্ত,—প্রাক্‌বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের পরবর্ত্তী রচনা ধরা পড়্‌লে চৌকাঠ পার হ'তে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাঙলা অনুবাদ যোগমায়ার শেল্‌ফে অনেক-কাল থেকে অপেক্ষা ক'রে আছে। অবসর-বিনোদন উপলক্ষ্যে সেটা তিনি আলোচনা করবেন এমন একটা আগ্রহ এ-বাড়ির কর্ত্তৃপক্ষের মনে অন্তিমকাল পর্য্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্ধুকের মধ্যে নিজেকে সেফ্‌ ডিপজিটের মতো ভাঁজ ক'রে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন। এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বল্‌তেন, "মা, এ সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ়, তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবী সুদ্ধ সমস্ত কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে করো আমরা এ সমস্ত বিশ্বাস করি? দেখো নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলটপালট করতে দুঃখ বোধ করি না—তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানিনে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজ্‌তে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুল্‌তে চাও না, তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হ'বে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য ব'লে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।"

এক একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্ন মশায় পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌তেন, এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাক্‌ত না। বরদাশঙ্কর তাঁর চারিদিকে ছোটো বড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন, তাদের প্রতি বেদান্তরত্ন মশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল; তিনি যোগমায়াকে বল্‌তেন, "মা, সমস্ত সহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েচ।" এমনি ক'রে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পরিক্রমার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হ'য়ে উঠ্‌ল আজকালকার খবরের কাগজি কিস্তুত ভাষায় যাকে বলে "বাধ্যতামূলক।" স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশঙ্কর এবং মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়,
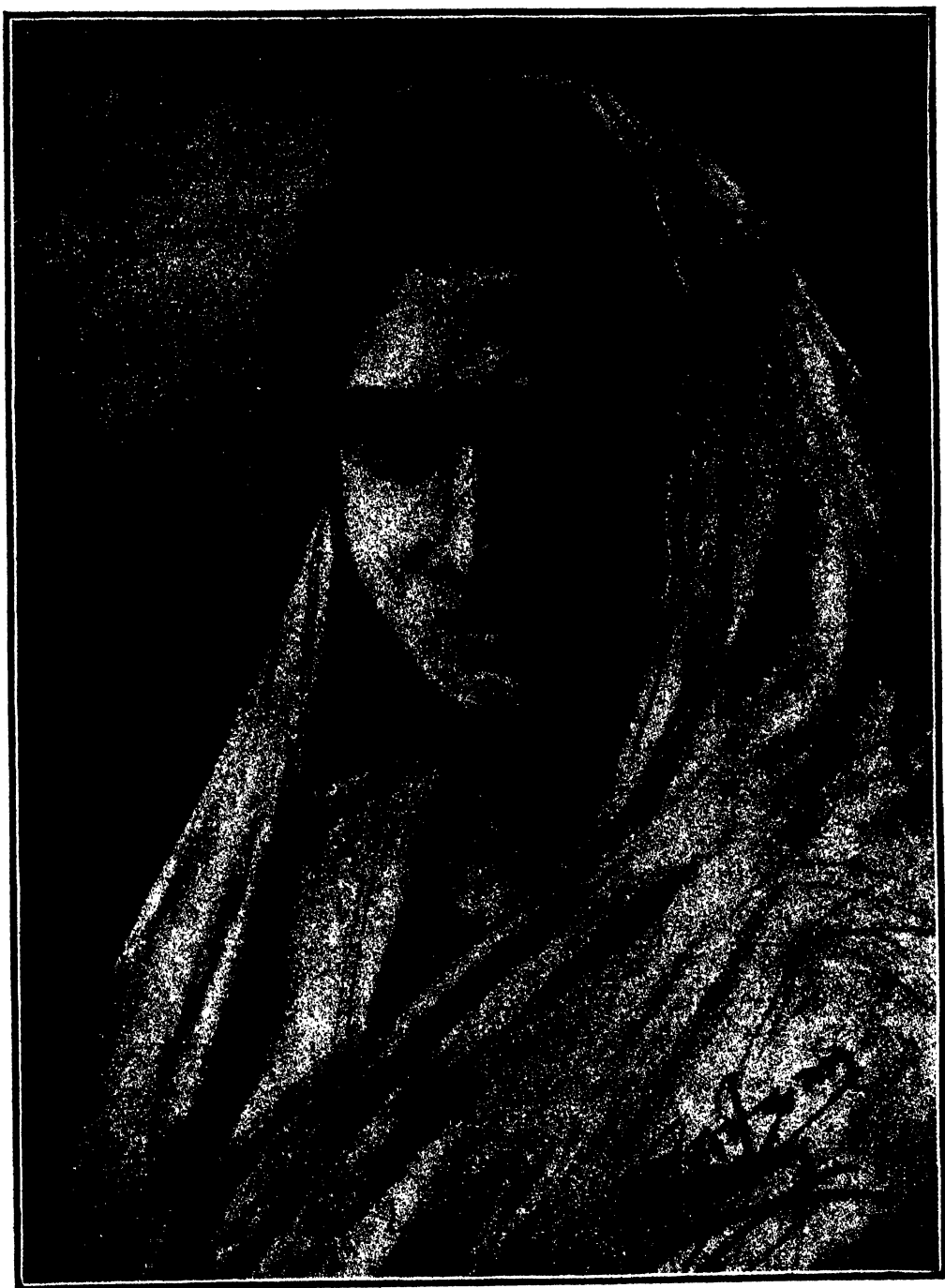
লাবণ্য

গরমের সময়ে কোনো একটা পাহাড়ে। যতিশঙ্কর এখন পড়্‌চে কলেজে ; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহুসন্ধানে তার শিক্ষার জন্যে লাবণ্যলতাকে পেয়েচেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচম্‌কা অমিতর দেখা।

লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমী কালেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন ক'রে মানুষ করেচেন যে, বহু পরীক্ষা পাশের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারেনি। এমন কি, এখনো তার পাঠানুরাগ রয়েচে প্রবল।

বাপের এক মাত্র সখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই সখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাস্তেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জ্ঞানের চর্চ্চায় যার মনটা নিরেট হ'য়ে ওঠে, সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠ্‌বার মতো সমস্ত ফাটল ম'রে যায়, সে-মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামী-সেবা আবাদের যোগ্য যে নরম জমিটুকু বাকি থাক্‌তে পার্‌ত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেণ্ট ক'রে গাঁথা হয়েছে—খুব মজবুৎ পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগ্‌লে দাগ পড়ে না। তিনি এতদূর পর্য্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাবণ্যর নাইবা হোলো বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হ'য়ে থাকল।

তাঁর আর একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর কারো দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্য্যে তার চেহারাটি দেখ্‌বামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাৎ মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

গরীবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হ'য়ে চলেচে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গ'ড়ে তোল্‌বার প্রধান কারিগরদের ফর্দ্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাক্‌বে এই গর্ব্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আস্‌ত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখ্‌লে সে সঙ্কোচে নত হ'য়ে যেত। এই সঙ্কোচের অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো ক'রে দেখ্‌তে লাবণ্যর বাধা ছিল না। দ্বিধা ক'রে নিজেকে যে-পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট ক'রে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননিগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হ'য়ে তাঁকে খুব এক-চোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যর ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের সখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপে পেন্সিলে আঁকা লাবণ্যর এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হ'য়েছে শোভনলালের টিনের প্যাট্‌রার ভিতর থেকে, গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননিগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটি লাবণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার দর যে কত বেশি, এবং আর কিছু দিন সবুর ক'রে থাক্‌লে সে দাম যে কত বেড়ে যাবে ননিগোপালের হিসাবী বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিষকে অবনীশ
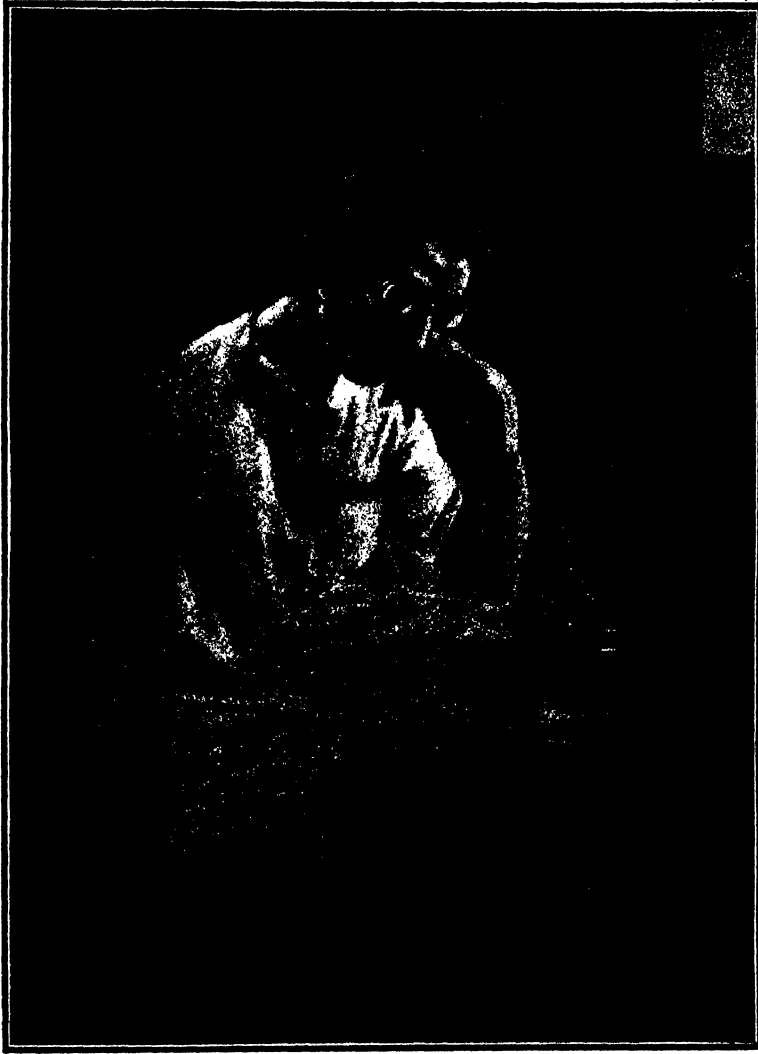
"কোনো একটা চমৎকারা চিন্তা অবনীশের পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে।"

বিনামূল্যে দখল করবার ফন্দি করচেন এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে? টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাৎ কোথায়?

এতদিন লাবণ্য জানতেই পারেনি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তার মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হয়েচে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফ্লেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জ্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট্ বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেচে। গোলাপফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হোলো। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট ক'রে, মুখ লাল ক'রে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি

থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জান্‌ত না। বি-এ পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান, লাবণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মশ্লাঘব দুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্চে শোভনের বুদ্ধির পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেকদিন আঘাত করেচে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরো হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্দ্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফল-বৈষম্য ঘট্‌ল, অথচ পরীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনো দিন অবনীশের কাছে এগোয়নি। কিছু দিন পর্য্যন্ত শোভনলালকে দেখ্‌লেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেত। এম্‌-এ পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতি-যোগিতায় লাবণ্যর জেত্‌বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হোলো জিৎ। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হোত তাহ'লে হয়তো সে খাতা ভ'রে কবিতা লিখ্‌ত—তার বদলে আপন পরীক্ষা পাশের অনেকগুলো মোটা মার্কা সে লাবণ্যর উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে দিলে।

তারপরে এদের ছাত্র দশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চ্চায় মনটা ঠাস বোঝাই থাক্‌লেও মনসিজ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ,—সেই নিরতিশয় দুর্ব্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ কর্‌লে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরীর গ্রন্থব্যূহ ভেদ ক'রে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাবণ্যের প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধ্‌ল। পড়াশুনো করতে যান খুবই জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন কোনো একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মডার্‌ন্‌-রিভিয়ু থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে,—অনুদ্‌ঘাটিত বইয়ের সাম্‌নে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকেন, এক ভাঙা বৌদ্ধস্তূপেরই মতো যার উপরে চেপে আছে বহুশতবৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হ'য়ে থাকে। হাতী যখন চোরাবালীতে পা দেয় তখন তার বাঁচ্‌বার উপায় কী?

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগ্‌ল। তাঁর মনে হোলো, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখ্‌বার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন-নি যে, শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেচে, কারণ শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাস্‌তে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার পরেই রাগ ধর্‌ল, নিজের উপরে, ননিগোপালের পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় ক'রে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখ্‌বে ব'লে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনি তিনি তাকে বিশেষ আদর ক'রে চিঠি লিখ্‌লেন, বল্‌লেন, "পূর্ব্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে ব'সেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সঙ্কোচ কর্‌বে না।"

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ধ'রে নিলে, এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যের সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আস্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার

পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যের সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ ক'রে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা কোনো কথা বলে, জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছো; যে প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত, সে-সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে একসময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা কর্‌তে পার্‌লে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী, জান্‌বার জন্যে ওর অত্যন্ত ঔৎসুক্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনো কথাই হোলো না, গায়ে প'ড়ে কিছু বল্‌তে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওল্‌টাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্চে। তখন দুপর বেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্ এক বাড়ীতে যাচ্ছেন তার নাম কর্‌লেন না,—ব'লে গেলেন, আজ আর চা খেতে আস্‌বেন না।

হঠাৎ একসময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুক্‌ল। শোভন শশব্যস্ত হ'য়ে উঠে কী কর্‌বে ভেবে পেল না। লাবণ্য অগ্নিমূর্ত্তি ধ'রে বল্‌লে, "আপনি কেন এ বাড়িতে আসেন?"

শোভনলাল চম্‌কে উঠ্‌ল, মুখে কোনো উত্তর এলো না।

"আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেচেন? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সঙ্কোচ নেই?"

শোভনলাল চোখ নীচু ক'রে বল্‌লে, "আমাকে মাপ কর্‌বেন, আমি এখনি যাচ্চি।"

এমন উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না, যে, লাবণ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ ক'রে এনেচেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সংগ্রহ ক'রে নিলে। হাত থর্‌থর্ ক'রে কাঁপ্‌চে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজর-গুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠ্‌তে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট ক'রে বাড়ি থেকে সে চ'লে গেল।

যাকে খুবই ভালবাসা যেতে পার্‌ত, তাকে ভালোবাস্‌বার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফস্‌কে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালো-বাসারই উল্‌টো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান কর্‌বে ব'লেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা ক'রে ব'সে ছিলো। শোভনলাল তেমন ক'রে ডাক দিলে না। তার পরে যা কিছু হোলো সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার কর্‌লে। তার মনে হোলো, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে ক'রেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেচেন, ওদের দু-জনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হোলো সেই নিরপরাধের উপরে।

তার পর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ ক'রে ক'রে অবনীশের বিবাহ ঘটালো। অবনীশ তাঁর সঞ্চিত টাকার প্রায় অর্দ্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য ব'লে বস্‌ল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জ্জন ক'রে চালাবে। অবনীশ মর্ম্মাহত হ'য়ে বল্‌লেন, "আমি-তো বিয়ে কর্‌তে চাই-নি, লাবণ্য, তুমিইতো জেদ ক'রে বিয়ে দিইয়েচ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন ক'রে ত্যাগ করচ?"

লাবণ্য বল্‌লে, "আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্যেই আমি এই সঙ্কল্প

করেচি। তুমি কিছু ভেবো না, বাবা। যে-পথে আমি যথার্থ সুখী হ'ব, সেই পথে তোমার আশীর্ব্বাদ চিরদিন রেখো।"

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পড়াবার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়্বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হোলো না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চ'লে যাচ্ছিল। উদ্বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরাজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ ক'রে হালের বানার্ড শ'র আমল পর্য্যন্ত, এবং বিশেষভাবে গ্রীক্ ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট, গিবন্ ও গিল্বার্ট মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমেলো ক'রে যেত না তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়্‌তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়্‌ল মোটর-গাড়ীতে চ'ড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না ক'রে। হঠাৎ গ্রীস-রোমের বিরাট ইতিহাসটা হাল্কা হ'য়ে গেল ;—আর-সমস্ত-কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্ত্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বল্‌লে, "জাগো।" লাবণ্য এক মুহূর্ত্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখ্‌তে পেলে, জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

(ক্রমশঃ)

[চিত্র দুইখানি শিল্পী শ্রী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অঙ্কিত]

ভিক্ষু

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে।
নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর,
নিঃশেষে দে বিদায় রে।
ভিক্ষাতে শুভলগ্নের ক্ষয়
কোন্ ভুলে তুই ভুলিলি।
ভাণ্ডার তোর পণ্ড যে হয়,
অর্গল নাহি খুলিলি।
আপনারে নিয়ে আবরণ দিয়ে
এ কী কুৎসিত ছলনা।
জীর্ণ এ চীর ছদ্মবেশীর,
নিজেরে সে কথা বল না।

হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে।
মিথ্যা মায়ার ছায়া ঘুচাবার
মন্ত্র কে নিবি আয় রে॥

কাঙাল যে-জন পায় না সে ধন,
পায় সে কেবল ভিক্ষা।
চির-উপবাসী মিছে সন্ন্যাসী
দিয়েছে তাহারে দীক্ষা।
তোর সাধনায় রত্ন-মাণিক
পথে পথে যাস্ ছড়ায়ে,
ভিক্ষার ঝুলি, ধিক্ তারে ধিক্,
বহিস্‌নে শিরে চড়ায়ে।
হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে।
নিঃস্বজনের দুঃস্বপনের
বন্ধ, ছিঁড়িস্ তায় রে॥

অঞ্চলে রাতি ভিক্ষার কণা
সঞ্চয় করে তারাতে,
নিয়ে সে পারাণী তবু পারিল না
তিমির-সিন্ধু পারাতে।
পূর্ব্ব গগন আপনার সোনা
ছড়ালো যখন দ্যুলোকে
পূর্ণের দানে পূর্ণ কামনা,
প্রভাত পূরিল পুলকে।
হায় রে, ভিক্ষু, হায় রে।
আপনা মাঝারে গোপন রাজারে
মন যেন তোর পায় রে॥

২৩ জুন ১৯২৮
বাঙ্গালোর

গীতায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা

মহেশচন্দ্র ঘোষ

প্রথম প্রবন্ধে আমরা 'গীতার আত্মতত্ত্ব' বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। গীতার মতে আত্মা অনাদি ও অনন্ত; অজ ও অবিনাশী; নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ; অব্যয় ও অবিকারী; সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী; অব্যক্ত ও অচিন্ত্য; অপ্রমেয়; এক ও অদ্বিতীয়।

লোকে সাধারণতঃ ভাবে, এ সমুদায় পরমাত্মারই বিশেষণ। গীতাকারের মতে এ সমুদায় আত্মার বিশেষণ। কিন্তু যে-আত্মাকে এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, সেই আত্মাকে লোকে জীবাত্মা বলিয়া থাকে।

গীতাকার 'জীবাত্মা' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন জীবাত্মাকে, কিন্তু ব্যবহার করিয়াছেন 'আত্মা' শব্দ। পরমাত্মার যে সমুদায় বিশেষণ, এই আত্মারও (অর্থাৎ জীবাত্মারও) বিশেষণ সেই সমুদায়ই। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, যিনি জীবাত্মা, তিনিই পরমাত্মা। গীতাকারের মতে এতদুভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই; প্রকৃতপক্ষে এ দুই দুই নহে—এ দুই একই।

কিন্তু কি অর্থে এই দুই এক, সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে।

মতভেদ

শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, নিম্বার্ক, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এই একত্ব শব্দের অর্থ লইয়া গুরুতর মতভেদ। কেহ কেহ সর্ব্বাংশে উভয়ের একত্ব স্বীকার করেন, কেহ বা একত্ব স্বীকার করিয়াও ভেদ স্বীকার করেন। গীতাকার কি ভাবে উভয়ের একত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি এবং কোন সম্প্রদায়ের মত সমর্থন করিবার জন্য গীতার ব্যাখ্যা করিব না। আমরা নিরপেক্ষভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

একত্বের প্রমাণ

(ক)

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে জীবাত্মাকে 'পরমাত্মা' বলা হইয়াছে।

(খ)

অন্য এক স্থলে বলা হইয়াছে, এই দেহস্থিত পুরুষ-ই 'ভর্ত্তা', 'মহেশ্বর' এবং 'পরমাত্মা'। (১৩।২৩ *)

(গ)

আর একটি শ্লোক এই:—"হে কৌন্তেয়! অনাদিত্ব-প্রযুক্ত এবং নির্গুণত্বপ্রযুক্ত এই অব্যয় পরমাত্মা (পরমাত্মা অয়ম্ অব্যয়ঃ) শরীরস্থ হইয়াও (কিছু) করেন না এবং (কিছুতে) লিপ্ত হন না (১৩।৩২)।

এই সমুদায় অংশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সর্ব্বাংশেই এক।

(ঘ)

আমরা সাধারণতঃ যে আত্মাকে জীবাত্মা বলি, সেই আত্মাকে 'সর্ব্বগত' বলা হইয়াছে (২।২৪)।

পরমাত্মা ভিন্ন কেহ সর্ব্বগত হইতে পারে না; সুতরাং এ স্থলে সম্পূর্ণভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব স্থাপন করা হইল।

(ঙ)

জীবাত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। গীতাকারের ভাষা এই—"যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্" (২।১৭) অর্থাৎ যাহা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত।

একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্বব্যাপী হইতে পারেন। আর গীতাকার অনুরূপ ভাষাতেই পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত এই:—

(১) ৮।২২ অংশে পরমপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলা

* আমাদের গণনায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৩৫।

হইয়াছে—"যস্য অন্তঃস্থানি ভূতানি, যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্' — ভূতসমূহ যাহার অন্তঃস্থ এবং যাহা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত।'

(২) ভগবান্ বলিতেছেন—'ময়া ততম্ ইদম্ সর্ব্বম্' (৯.৪) অর্থাৎ আমা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত।

(৩) বিশ্বরূপী ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন—'ত্বয়া ততম্ বিশ্বম্ অনন্তরূপ' (১১।৩৮) অর্থাৎ 'হে অনন্তরূপ! তোমাকর্ত্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত।'

(৪) অষ্টাদশ অধ্যায়ে এইরূপ "যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি, যাঁহাদ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত (যেন সর্ব্বম্ ইদম্ ততম্) মানব স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।" ১৮।৪৬

আমরা যাহাকে পরমাত্মা বলি, এই চারিটি স্থলে সেই পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে।

একমাত্র পরমাত্মাই সর্ব্বব্যাপী। আবার ২।১৭ অংশে শরীরী আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে শরীরী আত্মা পরমাত্মাই; উভয়ে সর্ব্বাংশেই এক।

(চ)

গীতাকারের মতে দেহী আত্মা 'অপ্রমেয়' (২।১৮)।

একমাত্র পরমাত্মাই অপ্রমেয়। সুতরাং এ স্থলেও সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে এক।

(ছ)

অন্য প্রকার প্রমাণও আছে। একস্থলে ভগবান বলিতেছেন ;—

"হে ভারত! সর্ব্বত্র আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও" (১৩.৩)।

'ক্ষেত্র' অর্থ দেহ; যিনি এই দেহরূপী ক্ষেত্রকে জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩.২)।

দার্শনিক ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, ক্ষেত্র অর্থ 'বিষয়'—ইংরেজীতে বলা হয় Object ; এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ বিষয়ী—ইংরেজী প্রতিশব্দ Subject। আমরা লৌকিক ভাবে বলি প্রত্যেক দেহস্থ আত্মা এক-একজন বিষয়ী (বা জ্ঞাতা) এবং এক-একটি দেহ সেই দেহস্থ আত্মার বিষয়। যত দেহ তত জীবাত্মা। কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন, 'সর্ব্ব-ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও'।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, ভগবানই ভিন্ন ভিন্ন দেহে জীবাত্মারূপে অবস্থিতি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াছেন। এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃত পক্ষে পৃথক্ পৃথক্ সত্তা নহে—এ সমুদায় সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই।

(জ)

ধর্ম্মের জন্য মানুষ কৃচ্ছ্র সাধন করে; ইহাতে তাহার দেহ ক্লিষ্ট হয়; সে নিজে কষ্ট অনুভব করে। লৌকিক ভাবে আমরা বলি মানব নিজে কষ্ট পাইতেছে অর্থাৎ জীবাত্মা কষ্টভোগ করিতেছে। কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন, এইপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধনে আমাকেই কষ্ট দেওয়া হয়, কারণ আমিই অন্তঃশরীরস্থ। গীতার ভাষা এই—"অন্তঃ শরীর-স্থম্ মাম্ কর্ষয়ন্তঃ" (অর্থাৎ অন্তঃশরীরস্থ আমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়া) ১৭।৬।

আমরা বলি কষ্ট দেওয়া হয় জীবাত্মাকে। কিন্তু এ স্থলে বলা হইতেছে 'ভগবানকে'। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরমাত্মাই দেহের অভ্যন্তরে জীবাত্মরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।

(ঝ)

এক স্থলে বলা হইয়াছে যে, একশ্রেণীর লোক আত্মদেহে ও পরদেহে অবস্থিত ভগবানকে দ্বেষ করে। গীতার ভাষা এই—"মাম্ আত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তঃ (১৬।১৮) অর্থাৎ আত্ম ও পরদেহে আমাকে দ্বেষ করিয়া"।

মানব দ্বেষ করে ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিত জীবাত্মাকে। এস্থলে বলা হইতেছে, মানব ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিত ভগবান্‌কেই দ্বেষ করে।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে পরমাত্মাই প্রতিদেহে জীবাত্ম-রূপে অবস্থিত।

(ঞ)

পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এইরূপ বলা হইয়াছে—

"তাঁহাকে জ্যোতিঃ-সমূহের ও জ্যোতিঃ এবং অন্ধকারের পর (অতীত) বলা হয়। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য; তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত"। (হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্) ১৩।১৮।

এই শ্লোকের শেষ চরণে বলা হইল যে, পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

(ট)

এ বিষয়ে ভগবান্ আর এক স্থলে বলিয়াছেন—'আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট' (সর্ব্বস্য চ অহম্ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ) ১৫। ১৫।

(১)

আর একটি শ্লোক এই :—

"হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর মায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভূত-সমূহকে ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়-দেশে অবস্থিতি করেন (হৃদ্-দেশে··· তিষ্ঠতি) ১৮।৬১।

এই শেষ তিনটি স্থলে বলা হইল ঈশ্বর মানবের হৃদয়ে বা হৃদ্দেশে বর্ত্তমান। হৃদয় শব্দের একাধিক অর্থ করা হইয়াছে। অধিকাংশ ভাষ্যকার ও টীকাকারের মতে হৃদয় অর্থ 'বুদ্ধি'। শঙ্করানন্দ বেদান্তদেশিক ও রাঘবেন্দ্রের মতে ইহার অর্থ হৃৎপিণ্ড বা হৃৎপিণ্ডস্থ আকাশ। উপনিষদের সহিত সামঞ্জস্য করিতে হইলে এই দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করিতে হয় (বৃহঃ উপঃ ৪।৪।২২; ছান্দোগ্য ৮।৩।২,৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। যে অর্থই গ্রহণ করা যাউক না কেন, সমগ্র অংশের ভাবার্থ এই :—

পরমাত্মা মানব-দেহে বর্ত্তমান।

এ স্থলে প্রশ্ন—'কিরূপে বর্ত্তমান?' না, রূপে। আমরা যে আত্মাকে জীবাত্মা বলিয়া থাকি, ভগবান মানবদেহে সেই আত্মারূপে বর্ত্তমান। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, কি ভাবে বর্ত্তমান—পূর্ণভাবে, না অংশভাবে? উভয় মতই সমর্থিত হইতে পারে। কেহ বলেন, পরমাত্মা পূর্ণ ভাবে, কেহ বা বলেন অংশভাবে হৃদয়পিণ্ডে জীবাত্মারূপে অবস্থিত।

উক্ত শ্লোকসমূহের শেষ ছয়টি দ্বারা অংশবাদও সমর্থন করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রথম ছয়টি অংশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপেই এক।

অংশবাদ

দুই একটি স্থলে গীতাকার স্পষ্টভাবেই অংশবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

ভগবান্ একস্থলে বলিয়াছেন—"জীবলোকে জীবভাব আমারই এক সনাতন অংশ" "(মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ) ১৫।৭।

এ স্থলে যে জীবাত্মার কথাই বলা হইয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ উক্ত শ্লোকেরই তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে বলা হইয়াছে যে, "ইহা প্রকৃতিতে অবস্থিত পঞ্চেন্দ্রিয়কে এবং ষষ্ঠেন্দ্রিয় মনকে আকর্ষণ করে।"

এ স্থলে বলা হইল, জীবাত্মা পরমাত্মার এক অংশ। এই অংশ নিত্য ও সনাতন। নিত্যকালই ইহা অংশরূপে বর্ত্তমান। এই অংশের আদিও নাই, অন্তও নাই।

সমগ্র বস্তু এবং ইহার অংশ সর্ব্বভাবে কখনই এক হইতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে কিছু পৃথক্। যাহা নিত্যকালই সম্পূর্ণরূপে পৃথক্, তাহা কখন অংশ হইতে পারে না। অংশ বলিলেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, অন্ততঃ এক সময়ে ইহা মূল বস্তুর সহিত সংযুক্ত ছিল। কখনই সংযুক্ত ছিল না, অথচ অংশ—এ প্রকার কল্পনা করা যায় না। আবার যখন বলা হইল এই অংশ নিত্য, তখন বলিতেই হইবে যে, এই অংশ নিত্যকালই মূলবস্তুর সহিত সংযুক্ত। একসময়ে সংযুক্ত ছিল, কিন্তু এখন পৃথক্‌ভাবে রহিয়াছে, এ প্রকার কল্পনা করিলে নিত্যতার হানি হয়।

সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাত্মা নিত্যকালই পরমাত্মার অঙ্গীভূত এবং নিত্যকালই এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে ও থাকিবে। গীতার ঐ উক্তিতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করা হইয়াছে।

যাহারা ভেদরহিত অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারাও নিজ মত সমর্থন করিয়া ঐ অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সে-ব্যাখ্যা নিতান্তই কবিকল্পিত।

প্রকৃত কথা এই যে, উক্ত অংশে ভেদাভেদ বাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করা হইয়াছে।

পরা প্রকৃতি

জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কি সম্বন্ধ—এবিষয়ে গীতাতে আরও একটি মত পাওয়া যায়। এক স্থলে ভগবানের উক্তিরূপে এই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়—

"ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট ভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত।" ৭।৪

কিন্তু এই প্রকৃতি অপরা ; ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ, আমার জীবভূতা অন্য একটি প্রকৃতি অবগত হও—যাহা দ্বারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে। ৭।৫

এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে সমুদায় ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবধারণ কর। আমিই সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থল। ৭।৬

এস্থলে বলা হইতেছে, পরমেশ্বরের দুই প্রকৃতি—অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতিই জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রকৃতির কারণ। ইহারা পরমাত্মারই প্রকৃতি ; এইজন্য গীতাকার বলিতেছেন পরমাত্মাই উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থল।

ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ অপরা প্রকৃতিকে অচেতন এবং পরা প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ক্ষেত্রজ্ঞই পরা প্রকৃতি ; বিশ্বনাথ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে পরা প্রকৃতি পরমাত্মার তটস্থা শক্তি।

এই স্থলে গীতোক্ত মতের সহিত সাংখ্য মতের তুলনা করা যাইতে পারে। সাংখ্যের তত্ত্ব ২৫টি :—

(১) পুরুষ একটি তত্ত্ব।

(২) প্রকৃতি ও প্রকৃতিমূলক তত্ত্ব ২৪টি।

সাংখ্যের পুরুষের স্থলে গীতাতে পাইতেছি 'পরা প্রকৃতি।' গীতাকার সাংখ্যের অবশিষ্ট ২৪টি তত্ত্ব গ্রহণ না করিয়া এ সমুদায়ের মধ্য হইতে কেবল ৮টি তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই কয়েকটি তত্ত্বের নাম দিয়াছেন অপরা প্রকৃতি। উভয় মতের পার্থক্য এই :—

সাংখ্য মতে ২৫টি তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু গীতার মতে পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি ছাড়াও আর একটি সত্তা আছে তাহার নাম পরমাত্মা। এমত যে গীতাকারেরই বিশেষত্ব তাহা নহে ; মহাভারতের অন্যান্য স্থলেও এই মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে (শান্তিপর্ব্ব ৩০৫।৩৮,৩৯)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সাংখ্য স্বীকার করেন দুইটি

(১) পুরুষ।

(২) প্রকৃতি।

গীতাতে স্বীকার করা হইয়াছে তিনটি :—

(১) পরমাত্মা

(২) পরা প্রকৃতি (সাংখ্যের পুরুষ)

(৩) অপরা প্রকৃতি (সাংখ্যের প্রকৃতি)

} পরমাত্মার প্রকৃতি।

গীতার অপর কোনস্থলেই পরা প্রকৃতির ব্যাখ্যা বা উল্লেখ নাই। ১৫।৭ অংশে 'জীবভূত' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের 'অংশবাদ' প্রকরণে দেখান হইয়াছে যে, পরমাত্মার এক জীবভূত সনাতন অংশই দেহী আত্মারূপে প্রকাশিত। যদি ১৫।৭ এবং ৭।৫ এই দুই অংশের সামঞ্জস্য করিয়া অর্থ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, পরা প্রকৃতি পরমাত্মার এক সনাতন অংশ।

এই মত গ্রহণ করিলে গীতার তত্ত্ববিভাগ হইবে এইরূপ :—

(১) পরমাত্মা

(২) পরমাত্মার জীবভূত অংশ (= পরা প্রকৃতি)

(৩) অপরা প্রকৃতি (=সাংখ্যের প্রকৃতি)

গীতাকারের উদ্দেশ্য যদি বর্ত্তমান যুগের আদর্শে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, গীতাকার পরমাত্মার দুইটি ভাব স্বীকার করিতেন (১) বিশ্বাতীত ভাব ; (২) বিশ্বগত ভাব। পরমাত্মা এক দিকে বিশ্বের অতীত ; অপর দিকে জগতে অনুপ্রবিষ্ট পরমাত্মার বিশ্বাতীত ভাব বুদ্ধি-মনের অগম্য। কোন কোন স্থলে এই ভাবকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে (২।২৫, ৭।২৪ ; ৮।২০,২১ ; ১২।১,২ ; ১৩।৬ ইত্যাদি)। ইহা দেশ-কালে প্রকাশিত হয় না ; সুতরাং মানব ইহার বিষয় কিছুই

জানিতে পারে না। ভগবানের বিশ্বগত ভাবই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই ভাবের সঙ্গেই জগতের সম্বন্ধ। সম্ভবতঃ এই বিশ্বগত ভাবকেই গীতাকার জীবভূত সনাতন অংশ এবং পরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে গীতার তত্ত্ব বিভাগ এইরূপ হইবে :—

(১) পরমাত্মার বিশ্বাতীত ভাব (সংক্ষেপে—পরমাত্মা)

(২) পরমাত্মার বিশ্বগত ভাব (=পরমাত্মার সনাতন অংশ বা পরাপ্রকৃতি)।

(৩) অপরাপ্রকৃতি (সাংখ্যের প্রকৃতি)।

অপরা প্রকৃতির বিষয় পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে। এ স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহার সঙ্গে পরমাত্মার কোন অঙ্গাঙ্গি-ভাব নাই। কিন্তু পরা প্রকৃতির প্রকৃতি অন্যরূপ ; ইহা পরমাত্মারই অংশ বা অঙ্গীভূত।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে আমরা এই সমুদায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম —

(১) জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একই।

(২) কোন কোন অংশে সর্ব্বাংশে উভয়ের একত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কোন কোন অংশে জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশও বলা হইয়াছে।

(৩) গীতার পরা প্রকৃতি সম্ভবতঃ পরমাত্মারই বিশ্বগত ভাব।

আত্মার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ ইহা চতুর্থ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

নবাবিষ্কৃত অশোক-শিলালেখ

শ্রী রমাপ্রসাদ চন্দ

কিছুদিন হইল কয়েকখানি ইংরেজী দৈনিক পত্রে প্রচারিত হইয়াছে যে,উড়িষ্যায় একখানি নূতন অশোকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রাবণের প্রবাসীতে (৬২৬—৬২৭পৃঃ) অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার মহাশয় এই লিপির একখানি ফটোগ্রাফও দিয়াছেন। "প্রবাসী"র চিত্র এবং এই ফটোগ্রাফ্ পরীক্ষা-করিয়া আমার অনুমান হয়, পণ্ডিতেরা এই লিপি সম্বন্ধে যে-মত প্রকাশ করিতেছেন তাহা ঠিক নহে, এই লিপি রুমিন্দেইর অশোকস্তম্ভ-লিপির অশোকের সমসময়ে সম্পাদিত প্রতিলিপি নহে ; ইহা সম্ভবতঃ আধুনিক কালে সম্পাদিত হইয়াছে। এইরূপ অনুমানের হেতু এক-একটি করিয়া উল্লেখ করিতেছি।

(১) এই লিপির কতকগুলি অক্ষরের আকার অশোকের রুমিন্দেই স্তম্ভলিপির বা উড়িষ্যায় অবস্থিত ধৌলির শিলালিপির বা অন্যান্য সুপরিচিত অশোকলিপির অক্ষরের আকারের অনুরূপ নহে। যথা—

(ক) এই নবাবিষ্কৃত লিপিতে ব্যবহৃত 'ন' অক্ষরের পাদে একটি সমকোণী চতুর্ভুজ দেখা যায়। অশোকের লিপিতে বা অন্য কোন ব্রাহ্মী লিপিতে এই আকারের 'ন' দেখা যায় না। সুতরাং এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঢঙ্গের 'ন' সম্বলিত লিপিকে আসল অশোকলিপি বলিয়া স্বীকার করা সুকঠিন।

(খ) অশোক-লিপিতে ব্যবহৃত 'ম'এর নিম্নার্দ্ধ পূর্ণ বৃত্তাকার। এই লিপিতে যে 'ম' ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নিম্নার্দ্ধ পূর্ণ বৃত্তাকার নহে, উপরদিকে ফাঁকা 'ম' অশোক-লিপিতে বা অন্য কোন ব্রাহ্মী লিপিতে দেখা যায় না।

(গ) অশোক-লিপির 'ক' ঠিক যোগ চিহ্নের (+) মত। এই লিপির সকলগুলি 'ক' সেই প্রকার নহে।

(ঘ) এই লিপির 'চ' অক্ষরটি প্রাচীন ব্রাহ্মী 'চ' এর মত নহে।

(ঙ) এই লিপির 'য' 'জ' 'স' আরও কয়েকটি অক্ষরও অশোকের লিপির সেই সেই অক্ষরের অনুরূপ নহে। চতুর্থ পংক্তির প্রথম অক্ষর 'ত' এই লিপিরই অন্যান্য 'ত' এর মত নহে।

(২) এই নবাবিষ্কৃত লিপিখানি আপাততঃ অশোকের রুম্মিন্দেই স্তম্ভলিপির প্রতিলিপি মনে হইলেও ইহাতে এমন অনেক ভুল আছে যেমন ভুল অশোকের নিয়োজিত লিপিকরের বা পাথর-মিস্ত্রীর নিকট আশা করা যায় না।

মূল রুম্মিন্দেই স্তম্ভলিপির পাঠ এই—

পংক্তি ১ দেবান পিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতি-
বসাভিসিতেন

" ২ অতন আগাচ মহীয়িতে হিদ বুধেজাতে
সক্যমুনীতি [।]

" ৩ সিলা বিগড়ভী চাকালা পিত সিলাথভেচ উসপাপিতে

" ৪ হিদ ভগবংজাতে তি [।] লুংমিনি গামে উবলিকে কটে

" ৫ অঠ ভাগিয়ে চ (Hultzsch, The Inscriptions of Asoka. P. 164)

নবাবিষ্কৃত লিপির পাঠ—

পংক্তি ১ দবান (?) পিয়েন (?) পিয়দসি (?) ন (?) লাজিন বি

" ২ সাভিসিতেন আগাচ (?)মহীদ বুধ জত

" ৩ সয় মু (?) নীতি সিলাবিগড়ভী চা (?) কালাপা

" ৪ তা (?) সিলথভচ উস (?) পপিত হিদ ভগব

" ৫ জ (?) তেত লমিনি গামে উবলিক কট * *

" ৬ * * * * * * অট ভাগিয় চ * * * * * *

(ক) অশোকের অন্যান্য লিপির ন্যায় এই রুম্মিন্দেই লিপিও প্রাকৃত ভাষায় নিবদ্ধ। সুতরাং সে কালের যে-পাথর-মিস্ত্রী এই লিপি খোদাই করিয়াছিল সে অবশ্য ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিত। মূল লিপির "বীসতি বসাভিসিতেন" পদের অর্থ "যিনি বিংশতি বৎসর যাবৎ অভিষিক্ত হইয়াছেন।" এই পদের স্থলে নবাবিষ্কৃত লিপিতে আছে, "বিসাভিসিতেন"। যদি বলা যায় "তি, ব, সা," এই তিনটি অক্ষর ভুল ক্রমে ছাড় পড়িয়াছে, তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে এই লিপি নকল করিয়াছে সে যদি এই পদের অর্থ
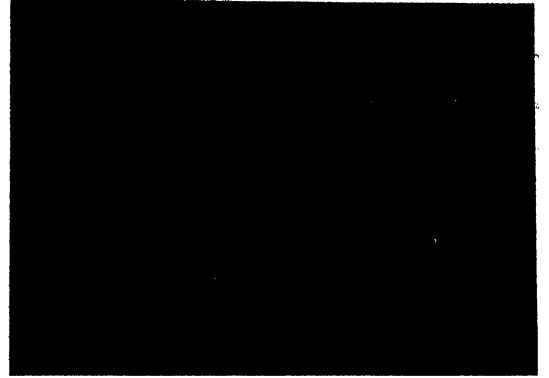
রুম্মিন্দেই স্তম্ভলিপি

বুঝিত তবে সে এত বড় ভুল সংশোধন না করিয়া পারিত না। অশোকের প্রধান শিলা-শাসন এবং প্রধান স্তম্ভ-শাসনগুলির বিভিন্ন পাঠে অভিষেকের অব্দ আরও কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও এরূপ ভুল দেখা যায় না।

(খ) "বিসাভিসিতেন" পদের পর নবাবিষ্কৃত লিপিতে "আতন" শব্দ ছাড় পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার পরের পদ "আগাচ" আছে। "আতন আগাচ" (আত্মনা আগত্য) অর্থ স্বয়ং আসিয়া। সুতরাং মিস্ত্রী বা লিপি পরিদর্শক যদি আতন শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত তবে এই ভুলও সে সংশোধন না করিয়া পারিত না।

(গ) "আগাচ" পদের পর মূল লিপিতে আছে "মহীয়িতে"; তারপর খানিকটা যায়গা খালি আছে; তারপর আছে "হিদ।" এই খালি যায়গা বাক্য-সমাপ্তি সূচিত করে। "মহীয়িতে" (মহীয়িতম্) ক্রিয়ার কর্ত্তা "পিয়দসিন" (প্রিয়দর্শিনা) এবং অর্থ পূজিত হইয়াছিল। তারপর হিদ বুধে জাতে, "এখানে বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাক্য আছে। নবাবিষ্কৃত লিপিতে পূর্ব্ব বাক্যের "মহীয়িতে" এবং পর বাক্যের "হিদ" স্থানে আছে "মহীদ।" এই প্রকার ভুল একেবারে অজ্ঞ ভিন্ন অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে।

(ঘ) সক্যমুনীতি স্থানে সয়মুনীতি একটি সাংঘাতিক ভুল। ফটোগ্রাফ্ দেখিয়া মনে হয় না 'য' এর মাথায় 'ক' এর টান কখনও দেওয়া হইয়াছিল এবং পরে মুছিয়া গিয়াছে।

(৬) নবাবিষ্কৃত লিপিতে "উবলিক কট" এবং "অঠ ভগিয় চ" এই উভয় পদের মধ্যে ছয়টি অস্পষ্ট অক্ষরের চিহ্ন আছে, মূল স্তম্ভলিপিতে এই দুই স্থলেই কোন অক্ষর নাই এবং অর্থসঙ্গতির জন্য কোন অক্ষরের বা পদের অবকাশও নাই।

(৩) নবাবিষ্কৃত অশোক-লিপির অক্ষরের এবং শব্দের বিকৃতি উপেক্ষা করিয়া যদি স্বীকার করা যায় যে, এই লিপি অশোকের সময়ে সম্পাদিত রুম্মিন্দেই স্তম্ভলিপির অনুলিপি, তথাপি এই অনুলিপি কি নিমিত্ত যে স্বতন্ত্র শিলাফলকে খোদিত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। অধ্যাপক চাকলাদার মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্মস্থান-ঘটিত এই লিপিটিও সেইরূপ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি প্রচার করিবেন। ইহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই।"

বিভিন্ন স্থানে অনুকৃত অশোকের শিলালিপির এবং স্তম্ভলিপির ন্যায়, রুম্মিন্দেই স্তম্ভলিপি বিধিনিষেধ সম্বলিত ধর্ম্মলিপি বা অনুশাসন নহে, স্মারক-লিপি। এই লিপির মর্ম্ম এই—

"দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী (অশোক) অভিষিক্ত হইবার পর বিংশ বৎসরে স্বয়ং আসিয়া (এই স্থানের) পূজা করিয়াছিলেন, কারণ এই স্থানে বুদ্ধ শাক্যমুনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ (বুদ্ধ) এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য) তিনি একটি শিলা-প্রাকার (?) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং শিলা-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। (তিনি) লুম্বিনী গ্রাম কর (বলি) মুক্ত করিয়াছিলেন এবং (এই গ্রামে উৎপন্ন শস্যের) অষ্টম ভাগ (রাজস্ব) নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

এই স্মারক স্তম্ভগাত্রে খোদিত স্মারক লিপিতে "হিদ" 'এখানে' দুইবার আছে। তীর্থযাত্রীদিগের স্থান-পূজার সুবিধা করিয়া দেওয়া এই লিপির এক উদ্দেশ্য; এবং লুম্বিনী গ্রামের রাজস্বদাতা এবং রাজস্ব সংগ্রহকর্ত্তাকে উপদেশ দেওয়া এই লিপির অপর উদ্দেশ্য। লুম্বিনী-গ্রাম ছাড়া মৌর্য্য সাম্রাজ্যের আর কোন স্থানে এই প্রকার লিপির প্রস্তরফলকে খোদিত অনুলিপির প্রচারের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সুতরাং এই লিপি-খানিকে রুম্মিন্দেই লিপির সমসময়ের অনুলিপি বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

রামমোহন রায়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোনো সার্থকতা নেই। স্রোতে-চলার দল মানুষের ভাঁটার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবেন, তাঁর দুঃখের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই। রামমোহন রায় যে-সময়ে এ দেশে এসেছিলেন সেই সময়কার ভাঁটার বেলার স্রোতকে তিনি মেনে নেন নি, সেই স্রোতও তাঁকে আপন বিরুদ্ধ ব'লে প্রতিমুহূর্ত্তে তিরস্কার করেচে। হিমালয়ের উচ্চতা, তার নিম্নতলের সঙ্গে অসমানতারই মাপে। সময়ের বিরুদ্ধতা দিয়েই মহাপুরুষের মহত্ত্বের পরিমাপ।

কোনো জাতির ইতিহাসে মানুষের প্রাণ যতদিন প্রবল থাকে ততদিন সে আপন মর্ম্মগত জাগ্রৎ শক্তিতে নিজেকে নিজে নিরন্তর সংশোধন ক'রে জয়ী ক'রে চল্‌তে পারে। বস্তুত প্রাণের প্রক্রিয়াই তাই। সে তো নিত্য সংগ্রাম আমরা চলি সে তো প্রতিপদক্ষেপেই মাটির
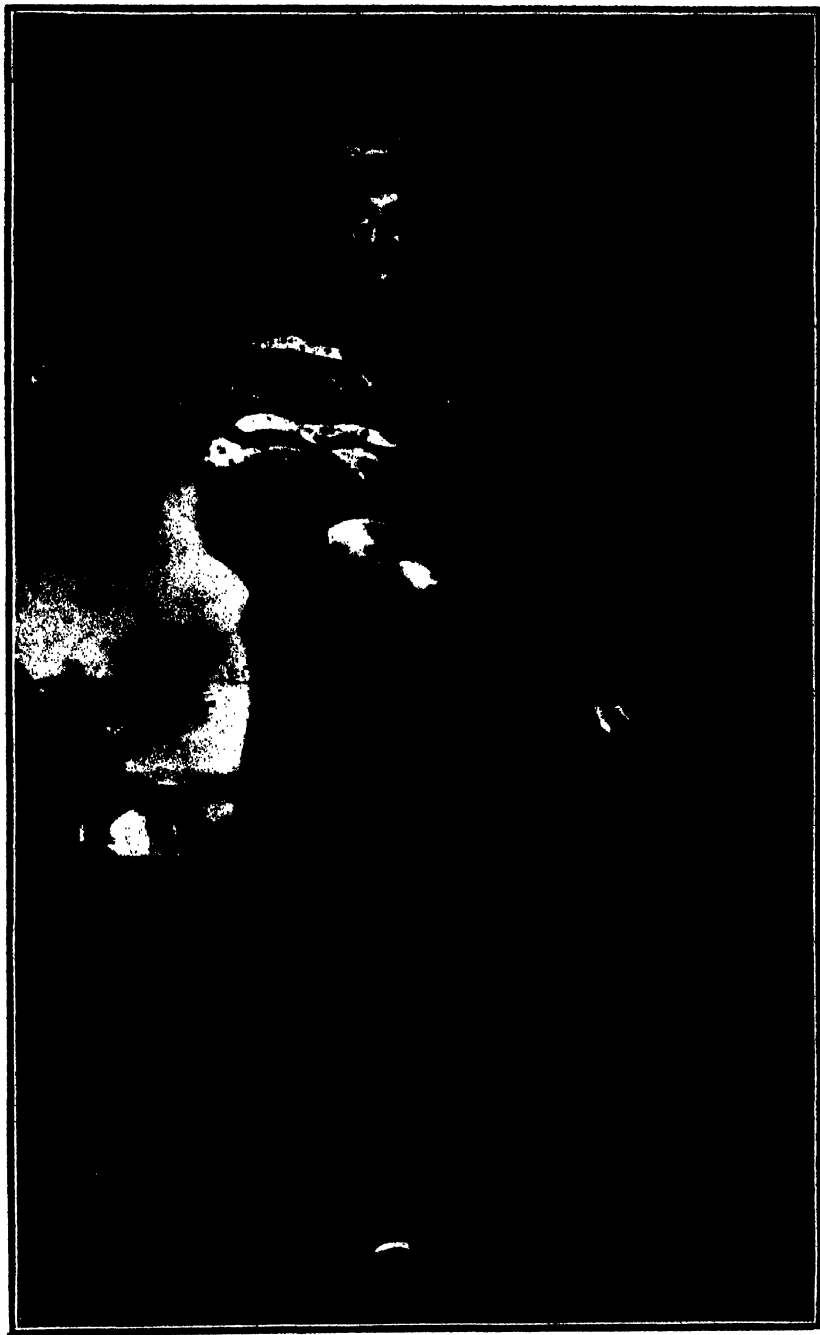
রাজা রামমোহন রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

অবিশ্রাম আকর্ষণের সঙ্গে বিরোধ। জড়তার বৃাহ চারিদিকেই, দেহের প্রত্যেক যন্ত্রই তার সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত। হৃদ্‌যন্ত্র চল্‌চে, দিনে রাত্রে নিদ্রায় জাগরণে; জড় রাজ্যের প্রকাণ্ড নিষ্ক্রিয়তা সেই চলার বিরুদ্ধ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই সে ক্লান্তির বাঁধ বাঁধ্‌তে চায়, যতক্ষণ জোর থাকে হৃদ্‌যন্ত্র মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই সেই বাধাকে অপসারণ ক'রে চলে। বাতাস আমাদের চারিদিকে আপন নিয়মে প্রবাহিত, তাকে প্রাণের ব্যবস্থাবিভাগ আপন নিয়মের পথে প্রতিক্ষণেই বলপূর্ব্বক চালনা করে। রোগের কারণ ও বীজ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই, দেহের আরোগ্য-সেনানী তাকে সর্ব্বদাই আক্রমণ করচে—এর আর অবসান নেই। জড়ধর্ম্মের সঙ্গে জীবধর্ম্মের, রোগশক্তির সঙ্গে আরোগ্য শক্তির নিরবিচ্ছন্ন যুদ্ধক্রিয়াকেই বলে প্রাণক্রিয়া। সেই সচেষ্ট শক্তি যদি ক্লান্ত হয়, এই প্রবল বিরোধে যদি শৈথিল্য ঘটে, দেহব্যবস্থায় চলার চেয়ে না চলার প্রভাব যদি বেড়ে ওঠে, তবেই বিকৃতি ও মলিনতায় দেহ কেবলি অশুচি হ'তে থাকে, তখন মৃত্যুই করুণারূপে অবতীর্ণ হ'য়ে এই শ্রান্তসংগ্রাম পরাভবকে জীবজগৎ থেকে অপসারিত ক'রে দেয়।

সমাজ দেহও সজীব দেহ। জড়ত্বের মধ্যেই তার সমস্ত অমঙ্গল। সমাজের যুদ্ধ-কুশল প্রাণধর্ম্মকে বুদ্ধির ম্লানতা, সংকল্পের দৈন্য, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, প্রীতি মৈত্রীর দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে কেবলি বিরোধ জাগিয়ে রাখ্‌তে হয়। চিত্তের অসাড়তা তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। চিত্ত যখন আপন কর্তৃত্বকে খর্ব্ব ক'রে স্থাবর হ'য়ে বস্‌তে চায় তখনি তার সর্ব্বত্রই বিকৃতির আবর্জ্জনা জ'মে উঠে তাকে অবরুদ্ধ ক'রে দেয়। এই অবরোধেই মৃত্যুর আরম্ভ। এই সময়ে আসেন যে মহাপুরুষ তিনি জড়ত্বপুঞ্জের মধ্যে প্রবল বিরোধ নিয়ে আসেন, নির্ব্বিচার প্রথার দ্বারা চালিত দীনাত্মা তাঁকে সহ্য করতে পারে না।

সুদীর্ঘকাল থেকেই ভারতবর্ষে ইতিহাস স্তম্ভিত হ'য়ে আছে। কতকাল এই দেশ নিজে চিন্তা করে নি, চেষ্টা করে নি, সৃষ্টি করে নি, বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজের অন্তর-বাহিরের সম্মার্জ্জন করেনি, তার সক্রিয় সঙ্কল্প শক্তি নব নব ব্যবস্থার দ্বারা নব নব কালের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নি। স্বাস্থ্যদৈন্য, অন্নদৈন্য, জ্ঞানদৈন্য একে একে তার প্রাণের প্রায় সকল শিখাই ম্লান ক'রে এনেচে। শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে তার পরাভব বিস্তীর্ণ হয়ে চল্‌ল। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আপন ইচ্ছায় অরাজকতা ঘটে এবং বাহিরের ইচ্ছা শূন্য সিংহাসন অধিকার ক'রে বসে, যখন তার নিজের বুদ্ধি অবসর নেয়, বাহিরের বুদ্ধি তাকে চালনা করে,—সেই বুদ্ধি তার স্বজাতির অতীত কাল থেকেই তাকে অভিভূত করুক, বা অন্যজাতির বর্ত্তমান কাল থেকে এসেই তাকে ঘুরিয়ে বেড়াক। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আত্মার কর্তৃত্ব আড়ষ্ট হয়, যখন সে কালপরম্পরাগত অভ্যাস-যন্ত্রের চাকা-গুলোকে অন্ধভাবে ঘুরিয়ে চলে, যখন সে যুক্তিকে স্বীকার করে না, উক্তিকে স্বীকার করে, আন্তরধর্ম্মকে খর্ব্ব ক'রে বাহ্য কর্ম্মকে প্রবল ক'রে তোলে। কোনো কূট কৌশলের দ্বারা বাহিরের কোনো সঙ্কীর্ণ সংক্ষিপ্ত পথে এই স্থবিরত্বভারমন্থর মানুষের পরিত্রাণ নেই।

এমনতর বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা ব'লে স্থির ক'রে নিস্তব্ধ ছিল এমন সময়েই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব। দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এমন প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর দেশ-কাল তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দ্বারাই দেশ তাঁর মহোচ্চতাকে সর্ব্বকালের কাছে ঘোষণা করেচে। এই পরুষ কণ্ঠের গর্জ্জনধ্বনির চেয়ে আর কোনো উপায়ে স্পষ্টতর ক'রে বলা যায় না যে, তিনি এদেশে অন্ধকারের বিপক্ষে আলোকের বিরোধ এনেছিলেন, তিনি অভ্যস্ত দুর্ব্বল বচনের পুনরাবৃত্তি ক'রে জড়বুদ্ধির অনুমোদন করেন নি; চাটুলুব্ধ জনতার খ্যাতিগর্ব্বিত অগ্রণীত্ব করার আত্মাবমাননাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন; তিনি উদ্যতদণ্ড জনসঙ্ঘের মূঢ় প্রতিকূলতাকে ভয় করেন নি, এবং তাদের নিবেদিত অন্ধভক্তির প্রলোভনে সত্যপথ থেকে লেশমাত্র বিচলিত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বহুযুগের পূজাবেদীতে আসীন জড়ত্বকে আঘাত করেছিলেন এবং জড়ত্ব তাঁকে ক্ষমা করেনি।

তিনি জান্‌তেন সকল প্রকার জড়ত্বের মূলে আত্মার

প্রতি অশ্রদ্ধা। জন্তু পায়নি তার স্বরাজ, কেন না সংস্কারের দ্বারা সে চালিত। জ্ঞানালোকিত আত্মা মানুষের ধর্ম্মকে, কর্ম্মকে, তার সৃষ্টিকে যে পরিমাণে অধিকার করে সেই পরিমাণেই তার স্বরাজ প্রসারিত হয়। সভ্যতার ইতিহাস মানুষের আত্মবুদ্ধি আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মানের শক্তিতে স্বরাজ্যবিস্তারের ইতিহাস।

মনুষ্যত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়ঘোষণা এক দিন এই ভারতবর্ষে যেমন অসংশয়িত বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল এমন আর কোথাও পায়নি। সেই বাণীই ভারতবর্ষে যখন খণ্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ তখনি রামমোহন রায় তাকে পুনরায় নূতন ক'রে নির্ম্মল ক'রে বহন ক'রে আন্‌লেন। তার পূর্ব্বেই অধিকাংশ ভারতবর্ষ নিজেকে নিকৃষ্ট অধিকারী ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়ে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে জ্ঞানে কর্ম্মে তামসিকতাকে অবলম্বন ক'রে আত্মাবমাননায় নিমগ্ন ছিল। তার প্রথাজড়ত্বের ব্যাধিস্ফীত মন মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকারকে কেবল যে অঙ্গীকার করলে না, তা নয়, তাকে ভৎর্সনা করলে, আঘাত করলে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত দেশের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই তিনি আত্মার বাণীকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন এমন নয়। যে কোনো সম্প্রদায়ই আপন জড় বাহ্য রূপের দ্বারা, জ্ঞানবিরোধী অন্ধ আচারের দ্বারা আপন সত্যরূপকে আবৃত করেছে তাকেই তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা বিচার করেছিলেন। তিনি মানুষের সমগ্রতাকে যেমন সমস্ত মনে প্রাণে অনুভব ও ব্যবহারে প্রকাশ করেচেন সেই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর ছিল। তিনি জানতেন, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সকল ধর্ম্মের মধ্যে মানুষের আত্মার মিলন ঘটতে পারে। তিনি জান্‌তেন, মানুষ যখন আপন ধর্ম্মতত্ত্বের বাহ্য বেষ্টনীকে তার আত্মরূপের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েচে তখনই তাতে যেমন মানুষের ব্যবধান ঘটিয়েচে, তার ধর্ম্মগত বিষয়-বুদ্ধি অহঙ্কার হিংসা বিদ্বেষ জাগিয়ে পৃথিবীকে রক্তে পঙ্কিল করেচে, এমন আর কিছুতেই করে নি। ধর্ম্মের বিশ্বতত্ত্বের ভূমিকা তিনি সেই ধর্ম্ম-সঙ্কীর্ণতার দিনে আপন চিত্তের মধ্যে লাভ ও আপন জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন।

যদিও সেদিন বাহির থেকে পৃথিবীর মানুষ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জ্ঞানের মধ্যে স্থান পেয়েছিল, তার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করেনি। মানুষের সম্বন্ধে বিশ্ববোধ আজও পৃথিবীতে নানা সঙ্কীর্ণ সংস্কারে বাধাগ্রস্ত। আজও পৃথিবী একথা বল্‌তে পাচ্চেনা যে, নূতন যুগ এল। সকল দিকেই এ যে অখণ্ডতার যুগ। এই যুগে জ্ঞানে কর্ম্মে সব মানুষকে মিলিয়ে নেবার প্রশস্ত রাজপথ উদ্‌ঘাটিত হওয়া চাই। বিজ্ঞানরাজ্যে আজ জ্ঞানে জ্ঞানে অসবর্ণতা দূর ক'রে মিলন আরম্ভ হয়েচে; বিশ্ববাণিজ্যের মধ্যে কর্ম্মের মিলও বিস্তীর্ণ হোলো, যদিও সেই মিলন-পথের বাঁকে বাঁকে আজও বাটপাড়ির ব্যবসা চলে; যতই কঠিন বাধায় কণ্টকাকীর্ণ হোক তবু বিশ্বরাষ্ট্রনীতির যে সূত্রপাত হয় নি এমন কথা বলা যায় না। এই নূতন যুগ-ধর্ম্মের উদ্বোধন বহন ক'রে বাহিরের প্রতিকূলতা ও আত্মীয়ের লাঞ্ছনার মধ্যে যাঁরা এই পৃথিবীতে বুক পেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন ক'রে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন—সেই বাণী ভারতের স্বকীয় দৈন্য নিয়ে নয়, দুর্য্যোগ নিয়ে নয়, সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্ঘ্য নিয়ে। মানবসত্যকে তিনি সমগ্র ক'রে দেখেছিলেন। তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালীর আত্ম-প্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্‌ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল; যখন তিনি তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোকে বাঙালীর মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদকে কৃত্রিম ব'লে উপহাস করতে সাহস করেচেন, ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল করা শাস্ত্র; সমাজে নারীর অধিকার সমর্থন করতে

একলা যখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তখন পশ্চিম মহাদেশেও নারী অবলাই ছিল এবং তার অধিকার ছিল সকল দিকেই সঙ্কীর্ণ; যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান দাবী করেছিলেন তখন দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও হয়নি। মনুষ্যত্বের উপকরণ-বৈচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই সম্মান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কোনো দিকেই খর্ব্ব ক'রে দেখতে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।

এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনো তাঁর সত্য পরিচয় দেশের কাছে অসম্পূর্ণ, এখনো তাঁকে অসম্মান করা দেশের লোকের কাছে অসম্ভব নয়; যে উদার দৃষ্টিতে তাঁর মহত্ত্ব সুস্পষ্ট দেখা যেত সে দৃষ্টি এখনো কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। কিন্তু, এতে সেই কুহেলিকার স্পর্দ্ধার কোনো কারণ নেই। জ্যোতিষ্ককে আবৃত ক'রে সমস্ত প্রভাতকে যদি সে ব্যর্থ ক'রে দেয় তবু সেই জ্যোতিষ্ক কুহেলিকার চেয়ে ধ্রুব ও মহৎ। মহত্ত্ব বাহিরের কর্কশ বাধার মধ্যে থেকেও কাজ করে, আলোকের অনাদরে তার বিলুপ্তি হয় না। রামমোহন যে শক্তিকে চালনা ক'রে গেছেন সেই শক্তি আজও কাজ করচে, এবং অবশেষে এমন দিন আসবে যখন তাঁর অবিচলিত প্রতিষ্ঠাকে তাঁর বীর্য্যবান্ অপ্রতিহত মহিমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করবার মতো অন্ধসংস্কারমুক্ত সবল বুদ্ধি ও নির্বিকার শ্রদ্ধার অবস্থায় দেশ উত্তীর্ণ হবে। আমরা যারা তাঁর কাছ থেকে মানুষকে প্রচুর বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও সত্য করে দেখবার প্রেরণা লাভ করি তাঁর প্রত্যেক অসম্মানে আমরা মর্ম্মাহত হই, কিন্তু তাঁর জীবিতকালেও শত শত অবমাননাতেও তাঁর কল্যাণশক্তিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ ক'রে নি, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সকল অবজ্ঞার মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত থেকে অকৃতজ্ঞতার অন্তরে অন্তরেও সফলতার বীজ বপন করবে।

উড়িষ্যায় সুবৃহৎ প্রাচীন বৌদ্ধপীঠ

শ্রী হারাণচন্দ্র চাকলাদার

উদয়গিরি, ললিতগিরি, রত্নগিরি—উড়িষ্যার এই গিরিত্রয় ভারতীয় শিল্পকলার যে শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ প্রায় সহস্রবৎসর কাল বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা এখনও শিক্ষিত ভারতবাসীর অপরিজ্ঞাত—ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? কি স্তূপ, মন্দির প্রভৃতি শিল্প-নিদর্শনের প্রাচুর্য্যে, কি প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিসমূহের সংখ্যায়, বিশালত্বে অথবা মনোমুগ্ধকর শিল্পনৈপুণ্যে, এ স্থান নালন্দ, বরহুত, সারনাথ, অমরাবতী প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান বৌদ্ধপীঠসমূহ অপেক্ষা বিশেষ হীন নহে। গৌড়মণ্ডলে পাল সম্রাটগণের প্রাধান্যের যুগে শিল্পের যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্লাবিত করিয়া যবদ্বীপে চরম বিকাশলাভ করিয়াছিল, উৎকল কলিঙ্গেও তাহারই একটি তরঙ্গ এই তিনটি গিরিশিখরকে স্পর্শ করিয়া উড়িষ্যাকে বৌদ্ধ-শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এই কেন্দ্র বর্জ্জিত হইলে ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা অস্পষ্ট রহিয়া যাইবে। ইহার প্রত্নসমৃদ্ধি এবং শিল্পসম্পদের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক ঐতিহাসিক ও কলাবিৎ ইহাকে ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান মনে করিবেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন ললিতাগিরি-দর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া ইহার ললিত-ভাস্বর ভাস্করশিল্পের যে উজ্জ্বল বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠকের সমক্ষে তাহা ধারণ করিলেই এ স্থানের শিল্পসম্পদের গরিমা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাঁহার বরলেখনীপ্রসূত বিবরণ দীর্ঘ হইলেও এ স্থলে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এক পারে উদয়-গিরি, অপর পারে ললিত-গিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিতেছে। গিরি-শিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তাল-বৃক্ষ-শোভিত ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত, পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—

উদয়গিরির বিরাট বুদ্ধ

শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান অল্তিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিত-গিরি (বর্ত্তমান নাল্তিগিরি) বৃক্ষশূন্য, প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ, এবং বৌদ্ধমন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখর দেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকা-প্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমার-সম্ভব ছাড়িয়া স্যুইন্‌বর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি! আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

"আমি যাহা দেখিতেছি তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী। তাহার উপর মাতার অলঙ্কার স্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী সহস্র সহস্র; তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ—সরল, সুপত্র, শোভাময়; মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা; নীল পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা যাক্। চারিপাশের মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত বিকম্পিত চেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন পৌরু-

ভূমিস্পর্শমুদ্রার বুদ্ধ (ললিতগিরি)
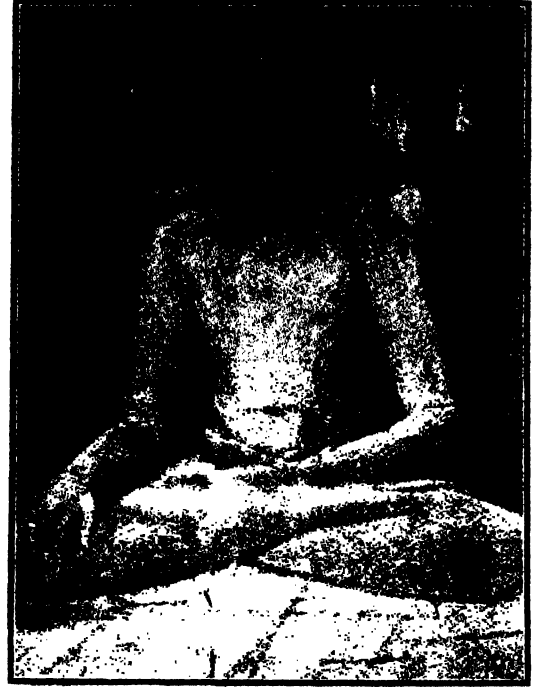
ষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলন স্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ—এই সকল স্ত্রী-মূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল।

"তখন মনে পড়িল, উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক; এই সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

(সীতারাম, প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)।

সীতারামের পাঠক হয়তো মনে করিবেন যে, বাঙলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কল্পনার চক্ষুতে এই অনিন্দ্যসুন্দর স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু যে-কেহ ললিতগিরিতে যাইলেই দেখিতে পাইবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের শব্দচিত্র একবর্ণও

অতিরঞ্জিত নহে। তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন, "আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাই লিখিতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র বৃক্ষরাজিশোভিত উদয়গিরি দূর হইতে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু সে স্থানের স্তূপ, মন্দির, মূর্ত্তি প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় সম্ভবতঃ হয় নাই। রত্নগিরির তিনি নাম করেন নাই। কিন্তু এই তিনটি গিরিশিখরের কোনটিই শিল্পগৌরবে অপরটি অপেক্ষা হীন নহে। এই গিরিত্রয় উড়িষ্যাপ্রদেশের কটক জেলায় পরস্পর হইতে অদূরে ব্যবস্থিত। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ধানমণ্ডল ষ্টেশন (কটক হইতে ২২ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ২৩২ মাইল) হইতে বিরূপা নদীর তীরে বালিচন্দ্রপুর আট মাইল। এস্থান হইতে ললিতগিরি তিন মাইল দক্ষিণদিকে এবং উদয়গিরি সাড়ে চারি মাইল পূর্ব্বে। উদয়গিরি হইতে রত্নগিরি আরও তিন মাইল পূর্ব্বে। উদয়গিরির শিখরদেশ হইতে ললিতগিরি এবং রত্নগিরি উভয় শিখরই দেখিতে পাওয়া যায়। ললিতগিরির পাদদেশে এবং উদয়গিরির সন্নিকটে গোপালপুরে ডাক বাংলা আছে। ধানমণ্ডল হইতে গো যানে অথবা পাল্‌কীতে সকল স্থানেই যাওয়া যায়। শীতকালে মোটরযান চলিতে পারে। উদয়গিরি অসিয়া নামক পর্ব্বতশ্রেণীর একটি শিখর, ললিতগিরি ও রত্নগিরি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ভুবনেশ্বরের সন্নিকটস্থিত খণ্ডগিরির পার্শ্ববর্ত্তী উদয়গিরির সহিত এ উদয়গিরির কোনও সম্বন্ধ নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বীম্‌স্‌ সাহেব উদয়গিরি ও ললিতগিরি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ বাঙ্গালা এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ১৮৭০ ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং বীম্‌স্‌ সাহেব কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রও দিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় স্বয়ং এস্থানে গমন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে (Antiquities of Orissa) বীম্‌স্‌ কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেবের চিত্রগুলি মূল মূর্ত্তির এত হীন অনুকরণ যে তাহাতে তৎপ্রতি কলাবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।
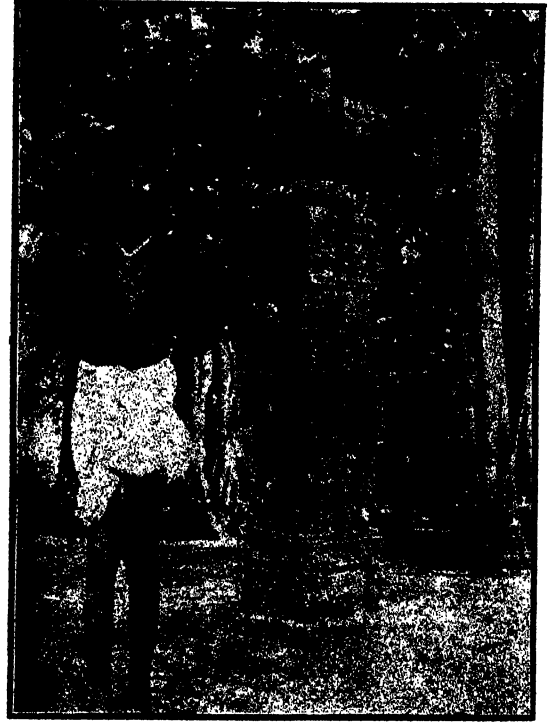
স্তম্ভের ভাস্কর্য্য (ললিতগিরি)

ললিতগিরিতে বঙ্কিমচন্দ্র অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সমুদয় অনিন্দ্যসুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহার অনেকগুলি বর্ত্তমানে ভগ্ন, নষ্ট, স্থানচ্যুত, মৃত্তিকা-গর্ভস্থ অথবা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও শিল্প-গৌরব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। একটি সুবিশাল উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্ত্তি দিব্য সৌন্দর্য্যে ললিতগিরির শিখরদেশ এখনও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কি মুখশ্রী, কি দেহের অঙ্গানুপাত, সর্ব্ববিষয়েই এ মূর্ত্তির লালিত্য অতুলনীয়। কটিদেশ হইতে মস্তকের উষ্ণীষ পর্য্যন্ত উচ্চতা ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, স্কন্ধদেশের বিস্তৃতি তিন ফুট তিন ইঞ্চি এবং উরু-দেশের বিস্তৃতি প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। লোচনদ্বয় ধ্যান-স্তিমিত, দক্ষিণ কর ভূমিস্পর্শ-মুদ্রান্বিত এবং বাম হস্ত ধ্যান মুদ্রান্বিত, উৎসঙ্গে উত্তানভাবে রক্ষিত; পদদ্বয় বজ্রপর্য্যঙ্কাসনে নিবদ্ধ। কেশ কুঞ্চিত, ভ্রূদ্বয় মধ্যে ঊর্ণা এবং মস্তোকোপরি উষ্ণীষ। ইহাই বৌদ্ধ গ্রন্থানুসারে বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তি। বুদ্ধদেব বোধি লাভকালে মার বিজয়ের সাক্ষি-স্বরূপে ভূমিকে স্পর্শ করিতেছেন।
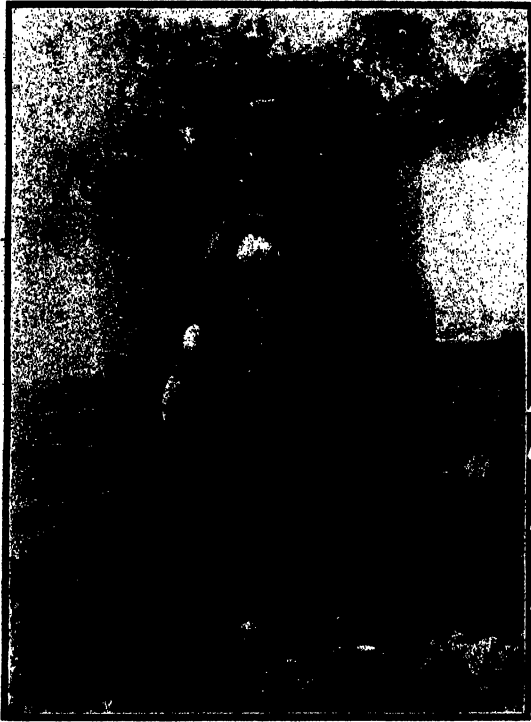
তারামূর্ত্তি (রত্নগিরি)

উদয়গিরিস্থিত বিশাল বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তি আকারে আরও বৃহৎ। ইহার নাসিকা এবং ভুজদ্বয় ভগ্ন হওয়াতে মুখশ্রীর সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু বদনমণ্ডল এখনও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। বিশাল উরঃস্থল এবং ক্ষীণ কটি দেহ-সৌষ্ঠবে একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সঞ্চার করিয়াছে। রত্নগিরিতেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটি বজ্রাসন বুদ্ধ-মূর্ত্তি রহিয়াছে। কিন্তু তাহার মস্তকে উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে মুকুট। মস্তকের চতুর্দ্দিকে দীপ্ত প্রভামণ্ডল। তদুপরি বোধি বৃক্ষজ্ঞাপক দুইটি শাখা দুইদিকে বিস্তৃত এবং পাদ-পীঠে কয়েকটি মাঙ্গল্য চিহ্ন খোদিত। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটি গজসিংহ মূর্ত্তি রহিয়াছে, গজের উপরি সিংহ এবং তদুপরি আসীন মনুষ্য-মূর্ত্তি। বর্ত্তমান উড়িষ্যায় এবং দক্ষিণভারতে মন্দিরগাত্রে ইহা বহুল পরিমাণে দেখা যাইতেছে। কিন্তু সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলায় ঝেওয়ারী নামক স্থানে পালযুগের যে সকল পিত্তল অথবা ব্রঞ্জমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তির পাদ-পীঠে গজসিংহ রহিয়াছে, এবং নালন্দেও এই চিহ্ন দেখা যাইতেছে। হিন্দু জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতেও গজসিংহোপরি দেবী আসীনা।

রত্নগিরির বিশেষত্ব কয়েকটি সুবিশাল বুদ্ধ মস্তক। একটি মাত্র মস্তকেরই উচ্চতা স্কন্ধদেশ হইতে উষ্ণীষ পর্য্যন্ত ৪৬ ইঞ্চি অর্থাৎ প্রায় চারি ফুট এবং চিবুক হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত মুখের দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই ফুট। মস্তক কুঞ্চিত কেশ, ঊর্ণা এবং উষ্ণীষ শোভিত। পর্ব্বতের অপর এক স্থলে এক খণ্ড বৃহৎ ভগ্ন-পদ পড়িয়া রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত এই বিশাল মস্তকের অনুরূপ অপর কোনও অঙ্গ দেখিতে পাই নাই। আর একটি এতদপেক্ষাও বৃহত্তর রক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর মস্তক পর্ব্বতগাত্রে সোপান নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল অমূল্য শিল্প-সম্পদ্ রক্ষার শীঘ্রই

ভৈরব মূর্ত্তি (রত্নগিরি)

বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে কিয়ৎকাল পরে আর কিছুই থাকিবে না।

বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি তিনটি পর্ব্বতেই বহুতর দেখিতে পাওয়া যায়। কতক এখনও দণ্ডায়মান, কিন্তু অনেক মূর্ত্তি ভূমিলুণ্ঠিত অথবা মৃত্তিকা মধ্যে অর্দ্ধ প্রোথিত।

উদয়গিরিতে একটি স্তুপের দুই পার্শ্বে দুইটি বোধিসত্ত্ব প্রায় আকণ্ঠ মৃত্তিকানিহিত। অপর একটি স্তুপের দুই পার্শ্বে দুইটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি অর্দ্ধ ভগ্ন অবস্থায় ভূমিতে পতিত, কণ্টক বৃক্ষে আচ্ছন্ন। উদয়গিরির নিবিড় বৃক্ষ-লতা-কণ্টকাচ্ছন্ন কত স্থানে কত মূর্ত্তি চক্ষুর অগোচর রহিয়াছে বলা যায় না। পর্ব্বতের শিখরদেশের সমীপে পর্ব্বত গাত্রে কয়েকটি বোধিসত্ত্ব এবং অন্যান্য দেবদেবী মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

বোধিসত্ত্বগণের অধিকাংশই পদ্মপাণি অথবা

দেবীমূর্ত্তি (ললিতগিরি)

অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি, দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা, বাম করে পদ্মমৃণাল, মুকুটে অনেক স্থলেই অমিতাভ সংজ্ঞক ধ্যানীবুদ্ধ, দুই পার্শ্বে দুই শক্তি। পদনিম্নে বিশ্ব পদ্মচন্দ্রাসন। দুইটি পদ্ম উর্দ্ধাধোভাবে সংলগ্ন, ইহাকে বৌদ্ধগ্রন্থে বিশ্বপদ্ম কহে, ইহার মধ্যভাগে চন্দ্রবিম্বাকৃতি অনাবৃত স্থান, তদুপরি মূর্ত্তির পদদ্বয় বিন্যস্ত, ইহাই পদ্মচন্দ্রাসন। ললিতগিরিতে একটি মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি; দক্ষিণ করে মৃণালশীর্ষে বিকসিত পদ্মোপরি বরদ মুদ্রান্বিত দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্ত

বোধিসত্ত্ব

ধৃত সনালোৎপল হইতে খড়্গ নিঃসৃত। পাদমূলে দুই পার্শ্বে দুই শক্তি, সম্ভবতঃ কেশিনী এবং উপকেশিনী দক্ষিণ পার্শ্বের শক্তির বাম হস্ত ধৃত মৃণালোপরি মঞ্জুশ্রীর এক বিশেষ চিহ্ন পুস্তক, এবং বাম পার্শ্বস্থিতা শক্তির দক্ষিণ করে মঞ্জুশ্রীর অপর বিশেষ চিহ্ন খড়্গ। মূল মূর্ত্তির পার্শ্বদ্বয় হইতে বহু শিখা বিনির্গত হইয়া মঞ্জুশ্রীর হৃদয় তমো নাশক প্রজ্ঞাদীপ্তি জ্ঞাপন করিতেছে। মঞ্জুশ্রীর স্থিরচক্র মূর্ত্তির সহিত কোনও কোনও অংশে ইহার সাদৃশ্য আছে।

রত্নগিরিতে একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি চতুর্ভুজ, উর্দ্ধ দক্ষিণ করে পদ্ম, নিম্ন দক্ষিণ কর বরদ মুদ্রান্বিত, উর্দ্ধ বাম করে অক্ষমালা এবং নিম্ন বাম কর বক্ষঃস্থলে অঞ্জলিবদ্ধ সুধনকুমারের মস্তকোপরি বিন্যস্ত; পাদমূলে দুই শক্তি (তারা ও ভৃকুটি ?) অবলোকিতেশ্বরের খদর্পণ মূর্ত্তির কোনও প্রকারভেদ হইতে পারে।

দেবীমূর্ত্তিগণ মধ্যে রত্নগিরির তারামূর্ত্তি অনিন্দ্যসুন্দর। মুখশ্রী অপূর্ব্ব লালিত্য এবং কমনীয় দ্যুতিমণ্ডিত। দক্ষিণ করে বরদ মুদ্রা, বাম করে সনাল উৎপল। পদদ্বয় পদ্ম-

কুবের

অবলোকিতেশ্বর

চন্দ্রোপরি বিন্যস্ত। দুই পার্শ্বে ষোড়শটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র। ইহার আটটিতে অষ্ট মহাভয় অঙ্কিত এবং প্রত্যেকটির উপরিভাগে উপবিষ্টা তারামূর্ত্তি। এই চিত্রগুলির একটিতে ঝটিকাবর্ত্তে নিমগ্নপ্রায় এবং জলগ্রাহ কর্ত্তৃক গ্রস্তপ্রায় নৌকার আরোহিগণ ঊর্দ্ধমুখে যুগ্মকরে আর্য্যাতারার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে; অপর চিত্রসমূহে সিংহ, অজগর, দস্যু, রাক্ষস, অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত আর্ত্ত উপাসক আর্য্যা তারার কৃপাভিক্ষা করিতেছে। সাধনমালার বর্ণনানুসারে ইহা আর্য্যাষ্ট মহাভয়তারিণী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি আরও একটি রত্নগিরিতে আছে। তদ্ভিন্ন একটি অপূর্ব্ব সুন্দর উপবিষ্ট তারামূর্ত্তির মস্তকটি কে অল্পকিছু পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। এখনও গ্রীবাদেশে ক্ষতচিহ্ন মলিন হয় নাই। আমরা যাইবার দুই একদিন পূর্ব্বেই কে আবার ইহার কটিদেশ ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অপর একটি উপবিষ্ট তারামূর্ত্তি এখনও পূর্ণাবয়বে এ স্থানে রহিয়াছে।

ললিতগিরিতে প্রত্যালীঢ়পদা একটি দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহার পদদ্বয়নিম্নে দুইটি দানবমূর্ত্তি। মস্তকোপরি এক মঞ্চারূঢ়া দেবী ছত্রধারণ করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ কর ভাঙিয়া গিয়াছিল, অল্প কিছু দিন হইল ললিতগিরিরই একজন প্রস্তরশিল্পী পদ্মকোরকযুক্ত হস্ত বসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দেবীর দেহভঙ্গীতে এবং শিরোপরিধৃত ছত্রে সাধনমালোক্ত অপরাজিতা মূর্ত্তির সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে দক্ষিণহস্তে চপেটদানের অভিনয় থাকিবার কথা এবং বাম কর "গৃহীতপাশতর্জনীকহৃদয়স্থ" হইবে; এবং পদতলে গণপতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিবে। উদয়গিরিতেও কয়েকটি দেবীমূর্ত্তি আছে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী শবরেরা চূণ-সিন্দুর-হরিদ্রা মাখাইয়া তাহাদিগের মূর্ত্তি বিশেষতঃ মুখমণ্ডল একবারে ঢাকিয়া দিয়াছে, চিনিতে পারা যায় না।

ললিতগিরিতে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বেরও একটি মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার জটামুকুটে মৈত্রেয়ের বিশেষ চিহ্নস্তূপ অঙ্কিত রহিয়াছে এবং দক্ষিণ করে বর মুদ্রা ও বাম করে পুষ্পিত নাগকেশরমঞ্জরী—কিন্তু অপর দুইটি ভুজ এ-মূর্ত্তিতে

নাই। পদতলে বিশ্বকমল এবং দুই পদপার্শ্বে মৃণালোপরিস্থিত বিশ্বকমলোপরি দুইটি শক্তিমূর্ত্তি।

ললিতগিরির জম্ভল অথবা কুবেরের মূর্ত্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বামহস্তে নকুলী, ইহার মুখ হইতে স্বর্ণমুদ্রার ধারা নির্গত হইয়া নিম্নে কলসী পূর্ণ করিতেছে। দক্ষিণহস্তে বীজপুরক (লেবু) থাকিবার কথা, গলে উৎপলমালা, দক্ষিণ পদতলে রত্নকলস।

রত্নগিরিতে হেরুকমূর্ত্তি অর্দ্ধপর্য্যঙ্কভাবে দণ্ডায়মান। দক্ষিণহস্তে বজ্র, বামকরে খট্বাঙ্গ, গলদেশে মুণ্ডমালা, পদতলে শব, শবনিম্নে পূজক এবং পূজোপকরণ। এ স্থানে একটি প্রাচীন মন্দিরে বর্ত্তমানেও মহাকালমূর্ত্তি পূজিত হইতেছে এবং মন্দিরের পার্শ্বে একটি দ্বাদশভুজ মূর্ত্তি, সম্ভবতঃ হেবজ্র অথবা শম্বর।

তিনটি গিরিশিখরেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। ললিতগিরিতে একটি মন্দিরের দ্বারদেশ নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত এবং পরবর্ত্তীযুগে উড়িষ্যার মন্দিরদ্বার লতামিথুন প্রভৃতি যে সকল শিল্পশোভিত, ইহাতে তাহার প্রথমাবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। উদয়গিরির বিশেষত্ব কয়েকটি স্তূপ; প্রতি স্তূপের চারিদিকে চারিটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। দুইটি করিয়া দুইটি স্তূপের দুই পার্শ্বে দেখিতে পাইয়াছি। ঘন কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্যে অন্বেষণ করিলে আরও বহু মূর্ত্তি এ স্থানে আবিষ্কৃত হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্তূপ তিনটি গিরিতেই চারিদিকে পতিত রহিয়াছে এবং বহুলপরিমাণে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে তুলসীমঞ্চরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ললিতগিরিতে তুলসীমঞ্চরূপে একটি নানাকারুকার্য্যখচিত চতুষ্কোণ স্তম্ভ ব্যবহৃত হইতেছে।

তিনটি পর্ব্বতেই কোনও কোনও মূর্ত্তিপৃষ্ঠের শিলা ফলকে শিরোদেশে অথবা পার্শ্বে "যেধর্ম্মা হেতুপ্রভবা মন্ত্র" খোদিত রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত উদয়গিরিতে একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির পশ্চাদ্দেশে পচিশ পংক্তি একটি লিপি খোদিত আছে এবং পর্ব্বতের পাদদেশে অপর বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির পার্শ্বদেশে "দেয়ধর্ম্মোয়ং কেশবগুপ্তস্য" এবং শিখর সন্নিহিত পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত মূর্ত্তির পার্শ্বে "দেয়ধর্ম্মোয়ং সংপাকস্য" উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উদয়গিরিতে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২৩ ফুট একটি বৃহদায়তন বাপীর গাত্রে বৃহৎ অক্ষরে "রাণকশ্রী বজ্রনাগস্য বাপী" এই কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সকল স্থানেই অক্ষরের ছাঁদ প্রায় একই রকমের। এই অক্ষর খৃষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে উত্তর ভারতবর্ষে প্রচলিত লিপির অনুরূপ। মূর্ত্তি সমূহের অবয়ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুখশ্রী গঠন-ভঙ্গী প্রভৃতি আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, পাল রাজত্ব কালে গৌড়ে নবম দশম শতাব্দীতে শিল্পের যে আদর্শ ও ধারা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এ স্থানেও তাহারই একটি শাখা প্রসারিত হইয়া পুষ্টি লাভ করিয়াছে। পরন্তু ইহার সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী যুগের শিল্পে যাহা উড়িষ্যার নিজস্ব বলিয়া বিবেচিত হয় তাহারও অনেক লক্ষণ এই সকল মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কোনও লক্ষণে আবার জাভার বরবুদরের শিল্পের সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। কলিঙ্গদেশের সহিত যবদ্বীপ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় এত প্রকার মূর্ত্তি পূজার প্রচলন দেখা যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তন্ত্রযান অথবা বজ্রযান রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে নানা প্রকার মূর্ত্তির বাহুল্য লক্ষিত হয়। এ স্থানে বজ্রযানের মূর্ত্তি সমূহই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে বজ্রযান সম্প্রদায়ের আরও বহুমূর্ত্তি এ স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ স্থানের মূর্ত্তিসমূহ অতি দ্রুত নষ্ট অথবা বিক্রীত হইয়া যাইতেছে। ললিতগিরির বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি মাত্র এক শত টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রেতা এই গুরুভার মূর্ত্তি পর্ব্বতশিখর হইতে বহন করিতে অসমর্থ হওয়ায় ইহা রক্ষা পাইয়াছে। উদয়গিরির পূর্ব্বতন জমিদার কয়েকটি মূর্ত্তি তাঁহার স্বভবন কেন্দ্রাড়ায় লইয়া গিয়াছিলেন, রায় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় সরকারের পক্ষ হইতে তাহা এবং রত্নগিরি প্রভৃতি স্থান হইতে আরও কতিপয় মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। কিন্তু সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ (Archaeological Department) এবিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়া শীঘ্রই মূর্ত্তিগুলি রক্ষায়

ব্যবস্থা না করিলে এই সকল অমূল্য শিল্পসম্ভার নষ্ট হইবার এবং বিদেশে চলিয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে ইহা যাঁহাদিগের অধিকারে রহিয়াছে তাঁহারা কাচ মূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। এতদিন ক্রেতা ছিল না, কিন্তু এ স্থানের শিল্প-সমৃদ্ধির বিবরণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতা জুটিতেছে ইহার সংবাদ পাইয়াছি।

পরভৃতিকা

শ্রী সীতা দেবী

(৩২)

কৃষ্ণার চিঠির উত্তরে বিদ্যুৎ লিখিয়াছিল, সে রেঙ্গুন আসিতে রাজী আছে, কারণ অর্থের তাহার একান্তই দরকার। কৃষ্ণা যে বাড়ীতে থাকিতে পারিয়াছে, সেখানে থাকিতে তাহার কোনোই আপত্তি হইতে পারে না। তবে সে ত, কৃষ্ণার মত, নামে মাত্র খ্রীষ্টান নয়। খ্রীষ্টধর্ম্মে সে বিশ্বাস করে, এবং গির্জ্জায় যায়, বাইবেল পড়ে, বড় দিনে এবং ঈষ্টারে উৎসব করে। এ সকলে যদি গৃহকর্ত্তা এবং গৃহিণী কোনো আপত্তি না করেন, তাহা হইলে সে এখানকার কাজে 'নোটিশ' দিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে।

কৃষ্ণাকে অবশ্য তাহার পালিকা মাতা রীতিমত খ্রীষ্টান করিতে চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। কিন্তু বছর ষোলো বয়স হইবার পর, তাহাকে আর তিনি কিছুতেই বাগ মানাইতে পারেন নাই, সে আপন ইচ্ছা মতই চলিয়াছে। অবশ্য পরিচয় দিবার সময় সে নিজেকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী বলিয়াই বলিত, কারণ আর কোনো ধর্ম্মে সে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই। কার্য্যতঃ কিন্তু তাহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া চিনিবার কোনো উপায়ই ছিল না। গৃহিণী এজন্য তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন।

রেঙ্গুন ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছাটা কৃষ্ণার মনে ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কাজেই বিদ্যুতের চিঠি পাইয়া তাহার মনের উপর হইতে একটা যেন বোঝা নামিয়া গেল। এখন গৃহিণী রাজী হইলেই হয়। তাহা হইলে কৃষ্ণা নিশ্চিন্তমনে নিজের পোঁটলা-পুটলী বাঁধিতে বসিতে পারে। সুতরাং সে আর দেরি না করিয়া ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলিবার জন্য গৃহিণীর সন্ধানে চলিল।

তিনি তখন চশমা পরিয়া উলের বুনানী লইয়া বসিয়া ছিলেন। সেলাইয়ের ভিতর এই কাজটিমাত্র তাঁহার পছন্দ এবং অভ্যস্ত ছিল। কাজেই উলের মোজা, বেনিয়ান পরিবার মত ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতিনী ঘরে না থাকা সত্ত্বেও তিনি মাসে অন্ততঃ দশবারো জোড়া মোজা এবং গুটীপাঁচছয় বেনিয়ান বুনিয়া ফেলিতেন। এগুলি কাজে লাগিত দেশের যত দরিদ্র আত্মীয়-কুটুম্বের ছেলেমেয়ের এবং এখানকার যত বন্ধুবান্ধবদের শিশুবাহিনীর।

কৃষ্ণাকে চিঠি হাতে করিয়া ঢুকিতে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কি গো মা লক্ষ্মী?"

কৃষ্ণা বলিল, "আমার যে বন্ধুটির কথা আপনাকে বলেছিলাম, সেই চিঠি লিখেছে। সে আসতে রাজী আছে যদি খ্রীষ্টান ব'লে আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, সে আবার নূতন ক'রে বলতে হবে না কি? তোমার বেলায় যখন কোনো আপত্তি করিনি, তখন তার বেলাই বা করতে যাব কেন? আজ-কালকার দিনে কি আর অত গোঁড়ামী করলে চলে?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "আমি নামে খ্রীষ্টান হ'লেও, কাজে ত আমার কোনোই বালাই নেই। সে কিন্তু গির্জ্জায় যাবে, বাইবেল পড়বে, এ সব আপনাদের কেমন লাগবে তা ত জানি না, তাই আগের থেকে জেনে নেওয়া ভাল।"

গৃহিণী মিনিট খানিক ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "তা

নিজের ঘরে ব'সে পড়ে তাতে আপত্তি কেন করব? তবে আমার বৌমাদের সঙ্গে ও-সব বিষয়ে কথাবার্ত্তা না বলে যেন, তা হ'লেই হ'ল। গির্জ্জায় যেতে চায় যাবে। শুয়োর গরু খায় না ত? শাড়ী পরে, না গাউন?"

কৃষ্ণা বলিল, "শূয়োর-গরু কখনই খায়নি, এ কথা বলতে পারব না। তবে আপনার বাড়ীতে নিশ্চয়ই খেতে চাইবে না। শাড়ীই পরে।"

গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা, তা আসতেই লিখে দাও। এর চেয়ে ভাল আর পাচ্ছি কই? এতদূরে ত আর হিন্দুর মেয়ে আসতে চাইবে না? কাজেই এই সবই রাখতে হবে।"

গৃহিণীর কথায় কৃষ্ণার হাসি পাইলেও, সে গম্ভীর ভাবেই তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। যেন হিন্দুর মেয়ে গভর্নেস্ হইবার জন্য গণ্ডায় গণ্ডায় দেশে বসিয়া আছে। এবং তাহারা কৃষ্ণা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি জীব হইতে সর্ব্বাংশেই অতি উৎকৃষ্ট, নিতান্ত এতদূরে তাহারা আসিবে না বলিয়াই গৃহিণী কোনোমতে তাহাদের অনাচরণ সহ্য করিতেছেন।

কৃষ্ণার হাতে তখন বিশেষ কোনো কাজ ছিল না। তাহার সকালের পড়ানোর পালা চুকিয়া গিয়াছিল, বিকালেরটা আরম্ভ হইতে তখনও ঢের দেরি। সুতরাং সে গাড়ী লইয়া বাজার করিতে যাত্রা করিল। এখন ইহাই ছিল তাহার একমাত্র চিত্তবিনোদনের উপায়। নিজের এবং বন্ধু বান্ধবের জন্য দরকারী অদরকারী নানাপ্রকার জিনিষ কিনিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

দরজার সামনে গাড়ীতে সুধীরকে দেখিয়া সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। আবার এখানে সে ইহাকে দেখিবার প্রত্যাশা কোনো দিনই করে নাই। কোথা হইতে সে আসিল? কেনই বা সে আসিল?

কিন্তু দরজায় দাঁড়াইয়া এ ভাবনা ভাবা চলে না। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া জুতামোজা খুলিয়া চুল খুলিতে সুরু করিল। তখনও তাহার স্নান হয় নাই।

সবেমাত্র সে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দরজার কাছ হইতে দরোয়ান ডাকিল, "দিদিমণি।"

কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া বলিল, "কি চাও?" দরোয়ান বলিল, "একজন বাবু এই কাগজ দিলেন।"

এখানে আসিবার পর বাবু বা বিবি, কোনো মানুষের সঙ্গেই কৃষ্ণার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। কাজেই একটু অবাক্ হইয়া সে উঠিয়া পড়িল। পরদা তুলিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "কোথায় কাগজ? দাও।"

দরোয়ান তাহার হাতে একটা কার্ড ধরিয়া দিল। কৃষ্ণা উহা চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবামাত্র তাহার শরীরের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। এ কি? হঠাৎ ভাগ্যবিধাতা তাহাকে লইয়া কোন্ খেলা খেলিতে বসিলেন? যে মানুষটি ভিতরে তাহার অন্তরতম, বাহিরের জগতে যে অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আবৃত, আজ হঠাৎ কি করিয়া সে কৃষ্ণারই দ্বারে অতিথিরূপে আসিয়া দাঁড়াইল? সে তাহার নাম জানিল কি করিয়া? কি চায় সে কৃষ্ণার কাছে?

দরোয়ান কৃষ্ণাকে এতখানি সময় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুকে কি চ'লে যেতে বলব?"

কৃষ্ণা বলিল, "না, উপরে নিয়ে এস।" দরোয়ান নীচে চলিয়া গেল।

উপরে আসিতে বলিয়াই কৃষ্ণার ভাবনা হইল, সুধীরকে সে বসাইবে কোথায়? এ বাড়ীতে কর্ত্তা সচরাচর বাস না করায় পুরুষ অতিথি অভ্যাগতকে বসাইবার বিশেষ কোনোই ব্যবস্থা নাই। বিপিন নবীনের বন্ধু-বান্ধবেরা প্রায়ই বাড়ীতে আসিত না, আসিলেও তাহাদের ঘরেই বসিত। মেয়েরা আসিলে গৃহিণীর ঘরে না হয় বৌদের ঘরে আড্ডা করিত।

সৌভাগ্যক্রমে বিপিনের ঘরটা খালি পড়িয়াছিল। কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি একটা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "ঐ ঘরের দরজাটা খুলে, চেয়ারগুলো একটু ঝেড়ে দাও। দরোয়ান একজন বাবুকে নিয়ে আসছে, তাঁকে ঐখানে বসিও।"

বলিতে বলিতেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কৃষ্ণা ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজের ঘরে পলায়ন করিল।

ভিতরে ঢুকিয়াই সে তাড়াতাড়ি চুলটা ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিল। তাহার দুই পা তখন

ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, বুকের ভিতরটা প্রচণ্ড দোলায় দুলিয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ সাহসিনী, সপ্রতিভ কৃষ্ণা, নিজের অবস্থায় নিজেই অবাক্ হইয়া গেল। এ তাহার হইল কি? তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে আসিয়া জমা হইয়াছে, চোখ দুইটা অস্বাভাবিক রকম দীপ্ত। সুবীর তাহাকে দেখিয়া মনে করিবে কি? কথা বলিতে গেলে তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইবে ত? আয়নার ভিতর নিজের ছায়াকে সে নিজেই যেন চিনিতে পারিতেছিল না।

কিন্তু অত ভাবিবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলিয়া সে একটা শাদা রেশমের ব্লাউস এবং জরির পাড়ের ফিকা নীল রং-এর মান্দ্রাজী শাড়ী বাহির করিয়া লইল। সুবীর কেন আসিয়াছে সে জানে না। তবু তাহার সাম্‌নে সে শ্রীহীন সাজে যাইতে পারিল না। হয়ত ইহার সঙ্গে কৃষ্ণার আর ইহজগতে সাক্ষাৎ হইবে না, তবু সে কৃষ্ণার যে মূর্ত্তি স্মৃতিমন্দিরে বহন করিয়া লইয়া যাইবে, তাহা যেন মলিনা ভ্রষ্টা রমণীমূর্ত্তি মাত্র না হয়। উল্কার মত জ্যোতির্ম্ময়ী রূপেই সে যেন এই মানুষটির জীবনাকাশে দেখা দিয়া মিলাইয়া যায়।

সুবীর দরজার দিকে মুখ করিয়াই বসিয়াছিল। কৃষ্ণাকে চোখে দেখা যাইবার আগেই তাহার লঘু দ্রুত পদধ্বনি তাহার বক্ষের ভিতর শোণিতস্রোতকে উদ্দাম করিয়া তুলিল। তাহার প্রিয়তমাকে আজ সে নিকটে পাইবে, কিন্তু চিরদিনের মত তাহাকে হারাইবেও হয়ত আজই। যে আসিতেছে, সে কৃষ্ণা মাত্র, তাহারই মত সাধারণ মানুষ, কিন্তু এক ঘণ্টা পরে এই রমণী হইবে অতুল সম্পদের অধীশ্বরী, সুবীর তাহার কাছে পথের ভিখারী মাত্র। যাক্! সব মানুষের জীবনজগতে নাট্য সেকালের উপকথার মত হয় না, ইহা বড় কঠিন সত্য। এখানে রাজকন্যার সঙ্গে কাঠকুড়ানীর ছেলের প্রেম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে-প্রেম দুইটি জীবনকে একত্রে গাঁথিয়া তোলে না, একটিকে চির নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াই অদৃশ্য নাট্যকার নিজের রচনা শেষ করেন।

কৃষ্ণাকে দেখিবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহাকে এত সুন্দর সে আগেও যেন দেখে নাই। না, হারাইতে বসিয়াছে বলিয়াই ইহাকে আজ এত অপূর্ব্ব সুন্দর লাগিতেছে? কিন্তু কেন সে কৃষ্ণাকে পূর্ব্বে চেনে নাই? এ যে ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি বলিলেই হয়। কেবল ভানুমতী যেখানে শান্ত, এ সেখানে দীপ্ত; তাঁহার মুখ স্নেহ করুণায় বিগলিত, ইহার মুখ বুদ্ধির প্রাখর্য্যে উজ্জ্বল।

কৃষ্ণা ঘরে আসিয়া ঢুকিল। কি বলিয়া তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিবে তাহা কম হইলেও কুড়ি পঁচিশবার সুবীর মনে মনে বলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে সব গোলমাল হইয়া গেল। কি বলিবে যে সে কিছু ভাবিয়া পাইল না। নমস্কার করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই দুইটি মানুষের মধ্যে কৃষ্ণাই বিচলিত হইয়াছিল যথেষ্ট বেশী, তবু কথা বলিল সেই প্রথমে। নিজে এক খানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিল, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

সুবীর বসিল। অনেকখানি চেষ্টা করিয়া নিজেকে খানিকটা প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া বলিল, "আমার পরিচয় খানিকটা আমার কার্ড থেকেই পেয়ে থাক্‌বেন। কিন্তু আমি কি জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, সেটা বুঝতে পারেননি।"

কৃষ্ণা বলিল, "আপনাকে একবার বিপিনবাবুর সঙ্গে এ বাড়ীতে দেখেছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কি? তিনি এখন আর রেঙ্গুনে থাকেন না।"

সুবীর বলিল, "ও, তা ত জানতাম না। কিছুদিন আগে তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলাম; তাতে রেঙ্গুন ছাড়ার কথা কিছু লেখেন নি। যাক্; তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসি নি আমি। আপনার কাছেই আমার প্রয়োজন।"

কৃষ্ণার মুখ হঠাৎ শ্বেত-পদ্মের মত শুভ্র রক্তহীন হইয়া উঠিল। তাহারই কাছে প্রয়োজন? কি প্রয়োজন? নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সে সুবীরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কৃষ্ণা যে অত্যন্ত বেশী বিচলিত হইয়াছে তাহা সুবীর বুঝিতে পারিল। কারণটা ঠিক বুঝিল না। তবু তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "আপনি ভয় পাবেন না। কোনো মন্দ খবর নিয়ে আমি আসিনি। সব কথা

কৈলাসে হরগৌরী

(জসল্মীর রাজ্যের মোতিমহলের দেওয়ালের একখানি চিত্র)

জসল্মীরের রাজ-এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

নিজের মা ব'লে জানতাম। কিন্তু ঘটনাচক্রে কয়েক দিন হ'ল অনেকগুলি গুপ্ত ব্যাপার প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। সব শেষ অবধি অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে যে, যদিও জমিদার-গৃহিণীর সন্তান হয়েছিল, সে সন্তান আমি নয়। তাঁর একটি মেয়ে হয়েছিল, ধাত্রী এবং বাড়ীর এক জন পুরনো ঝি ষড়যন্ত্র ক'রে মেয়েটিকে সরিয়ে ফেলে, একটি নবজাত ছেলেকে সেখানে রেখে দেয়। সেই ছেলে আমি, সেই মেয়ে আপনি।"

কৃষ্ণা রুদ্ধনিশ্বাসে এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিতেছিল। এখন জিজ্ঞাসা করিল, "এত বড় একটা কাণ্ড বাড়ীর লোকে জানতে পারল না? মা তাতে রাজী হলেন? তাঁর স্বামী কিছু জানলেন না? কেন এমন ভয়ানক কাজ ঝি বা ধাত্রী করতে গেল?"

সুবীর বলিল, "একে একে বলছি। যে-ঘরে সন্তান হয়, তার ভিতরে ধাত্রী, ঐ ঝি এবং ধাত্রীর এক ঝি ছাড়া কেউ ছিল না। মা অজ্ঞান হ'য়ে ছিলেন, তিনি কিছুই জান্‌তে পারেননি। মাঝ রাত্রে সন্তান হওয়ায় বাড়ীর অন্য লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেয়েকে সরিয়ে, ছেলে এনে রেখে, তবে তাদের জানান হয়। ধাত্রীর বাড়ী খুবই কাছে ছিল, সহজেই তারা এই কাণ্ডটা করতে পেরেছিল। আমার মা ভানুমতী দেবী গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হন। পুত্রসন্তান না হ'লে বংশ থেকে অনেক লাখ টাকা আর একজন লোকের হাতে চ'লে যেত। সে আত্মীয় হ'লেও অতিবড় শত্রু। তার হাতে থেকে রক্ষা করবার জন্যে খানিক, এবং তার প্রতি অত্যন্ত জাতক্রোধ থাকায় ঝি ভবানী এই কাজ ক'রে থাকবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "ঝি হ'য়ে সে এতবড় কাজ করতে সাহস পেল?"

সুবীর বলিল, "নামে ঝি হলেও কার্য্যতঃ সেই বাড়ীর কর্ত্রী ছিল। আমার মাকে সেই মানুষ করেছিল, তাঁর স্বার্থসম্বন্ধে সে খুবই সজাগ ছিল। আপনাকে যিনি মানুষ করেছিলেন, সেই মিসেস্ মিত্রই যে ধাত্রীর কাজ করে-ছিলেন তা বুঝতেই পেরেছেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, তা ত বুঝতেই পারছি। কি ক'রে এ সব কথা প্রকাশ হ'ল?"

সুবীর বলিল, "ঝি ভবানী মরবার সময় মাকে সব কথা খুলে ব'লে যায়। তিনি আমায় বলেন। তারপর খোঁজ ক'রে বাকিটুকু বার করতে হয়েছে।"

কৃষ্ণা চুপ করিয়া রহিল। এতক্ষণ যেন সে গল্প শুনিতেছিল। ব্যাপারটা তাহার নিজের জীবনে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিবে তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে তাহা সে এখন অনুভব করিতে আরম্ভ করিল।

এতদিনের জীবন তাহার আজ শেষ হইয়া গেল। জীবননাট্যের দুই তিনটা অঙ্কের পর যবনিকা পড়িল। আবার যখন তাহা উঠিবে, তখন অন্য দৃশ্য। কৃষ্ণা রায়, খ্রীষ্টান ধাত্রীর কুড়ানো পালিতা কন্যা অন্তর্হিতা, তাহার স্থলে অতুল বিভবের অধীশ্বরী, পরাক্রান্ত হিন্দু-জমিদারের একমাত্র কন্যা। কিন্তু এই নূতন আবেষ্টনে তাহাকে মানাইবে কি? সে কি পদে পদে আঘাত পাইবে না, আঘাত দিবে না?

কৃষ্ণা একবার সুবীরের দিকে চাহিয়া দেখিল। এই মানুষটি না জানি মনে মনে তাহাকে কি ভীষণ অভিশাপ দিতেছে। এ আজ পথের ভিখারী হইল কৃষ্ণারই জন্য। কৃষ্ণা যদি বাঁচিয়া না থাকিত, তাহা হইলে সুবীরকে ত নিজের আজন্মের সুখসম্পদের নীড় ছাড়িয়া বাহির হইতে হইত না? এ আঘাত কৃষ্ণার অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু ইহার ফল সমানই মারাত্মক।

কার্ডে সুবীরের নাম দেখিয়া তাহার বুকের ভিতর যে আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে ত এই সম্পদ পাইবার আশায় নয়। যে-ঐশ্বর্য্য রমণীর হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কামনার ধন, তাহা কি কৃষ্ণা আজ চিরদিনের মত হারাইল না? সুবীর তাহাকে আর ভুলিবে না, ইহা সত্য। নিজের অদৃষ্টাকাশে করাল ধূমকেতুর মতই সে কৃষ্ণাকে মনে রাখিবে, সর্ব্বস্বঅপহন্ত্রী পাপিষ্ঠা বলিয়াই স্মৃতিপটে বিদ্বেষের রঙে তাহাকে আঁকিয়া রাখিবে। কিন্তু কৃষ্ণার অপরাধ কোথায়? নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে সে খেলার পুতুলমাত্র।

সুবীরের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেও তাহার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। না জানি, কি সে তাহার দৃষ্টির

ভিতর দেখিবে। কৃষ্ণা আজ মা ফিরিয়া পাইল; পার্থিব ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার আজ তাহার কাছে উন্মুক্ত হইল। সুবীর হইল আজ মাতৃহীন বংশপরিচয়হীন পথের ভিখারী।

সুবীর বলিল, "এখন তবে আমি আসি। এঁদের ব'লে, আপনি যাওয়ার সব ঠিক করুন। কাল সকালেই আমি আস্‌ব। আপনার কাছে খবর পেলেই আমি জাহাজে 'বার্থ' রেজিষ্টার করতে যাব। মায়ের শরীর বড় খারাপ, উদ্বেগ জিনিষটা তাঁর বড় ক্ষতি করে। আপনি শীগ্‌গির গিয়ে পড়তে পারলে ভাল।"

সুবীর উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণাকে একটা নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে তখনও হতবুদ্ধির মত বসিয়া, একটা প্রতিনমস্কার করিতেও তাহার হাত উঠিল না।

সুবীরের পায়ের শব্দ যখন মিলাইয়া গেল, তখন সে উঠিয়া, টলিতে টলিতে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাহার যেন ভাবিবারও সাধ্য ছিল না, বিছানার উপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

(৩৩)

সুবীর এবারও সেই পাঞ্জাবী হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণার কাছে বিদায় লইয়া সে সোজা সেইখানেই ফিরিয়া আসিল। কৃষ্ণাকে সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিয়া তাহার মন হইতে যেন একটা পাষাণ ভার নামিয়া গেল। যাক্, যতই কঠোর হোক, নিজের কর্ত্তব্য সে করিতে ত্রুটী করে নাই। এখন কলিকাতা পর্য্যন্ত ভানুমতীর মেয়েকে লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেই তাহার ছুটী। তাহার পর নিজের পথ দেখা ভিন্ন তাহার আর অন্য কাজ থাকিবে না।

কৃষ্ণার মুখ তাহার মনের মধ্যে বড়ই বিপ্লব বাধাইয়া তুলিয়াছিল। কি অপূর্ব্ব সুন্দর! বুদ্ধির প্রখরতায় কেমন দীপ্ত! ইহাকে যে বিধাতা রাণী হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে দেখিলে আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। তাহাকে নিজের হাতে রাণীর কিরীট পরাইবে বলিয়া সুবীর সাধ করিয়াছিল, কিন্তু ভাগ্য তাহার হাত হইতে সে ভার কাড়িয়া লইল। যাক, আসিয়া যায় না, কৃষ্ণার অদৃষ্টে সুখ ছিল, সে তাহা পাইল। সুবীরের কোনো স্থান যদি নাই-ই থাকে এই সুন্দরীর জীবন-নাট্যের ভিতর, তাহাতে দুঃখ করিবার অধিকার তাহার কোথায়? কিন্তু বাহিরের ধনসম্পদ আজ তাহাকে যেমন করিয়া ত্যাগ করিল, ভিতরেও যে তেমনি একটা রিক্ততার সম্ভাবনা ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা সুবীর না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। ইহার পর কৃষ্ণাকে আর নিজের প্রিয়তমা বলিয়া ভাবিবার অধিকারও কি তাহার থাকিবে? সে অল্প দিনের মধ্যেই হয়ত অন্য কোন ভাগ্যবান্ পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবে। তখন তাহার চিন্তা করাও হইবে পাপ। কিন্তু হায়, যুক্তি যাহা বোঝে, হৃদয় তাহা বুঝিতে চায় কই? হউক সে পথের ভিক্ষুক, হউক কৃষ্ণা অপরের স্ত্রী, সুবীরের সাধ্য নাই তাহার মুখ নিজের অন্তর হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে। যে নিভৃত লোকে সে কৃষ্ণাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার জীবনান্ত পর্য্যন্ত সে সেখানেই বিরাজ করিবে।

বিকাল বেলাটা যে কেমন করিয়া কাটাইবে, তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। অথচ এই জনাকীর্ণ হোটেলের ঘরে বসিয়া থাকাও একান্ত কষ্টকর। অগত্যা সে চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ফুটপাথে নামিয়া একবার রিক্‌শ চড়িবে না হাঁটিয়া যাইবে তাহা মনে মনে স্থির করিল। তাহার পর সোজা চলিতে আরম্ভ করিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে যে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িল, তাহার ঠিকানা নাই। সমস্ত পথ সে কি যে দেখিল তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিতে পারিত না। যখন রাস্তায় রাস্তায় দুধারের দোকানে বাতি জ্বলিয়া উঠিল, তখন একখানা গাড়ী ডাকিয়া সে তাহার সাহায্যে হোটেলে ফিরিয়া আসিল। পরদিন ভারতবর্ষের ডাক যাইবার দিন। ভানুমতীকে একটা চিঠি লিখিবে কি না সুবীর ভাবিয়া ঠিক করিতে বসিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে কাগজ কলম রাখিয়া দিল। পৌঁছিয়া টেলিগ্রাম ত সে করিয়াছে, কাজেই ভানুমতী বেশী উদ্বিগ্ন হইবেন না। একেবারে কৃষ্ণাকে লইয়া উপস্থিত হইলেই হইবে। খাওয়া-দাওয়া করিয়া সে শুইয়া পড়িল।

রাত্রে ঘুম তাহার অনেকক্ষণ আসিলই না। চিন্তার স্রোত তাহাকে কতদিকে যে ভাসাইয়া লইয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। কৃষ্ণাকে রাখিয়া আসিয়া এই ব্রহ্মদেশে বসবাস করিবার খেয়ালটাও একবার তাহারমনে উঁকি দিয়া গেল। এখানে অন্ততঃ তাহার পরিচিত কেহই নাই, তাহার উচ্চ দশা হইতে পতনে শ্লেষের হাসি কেহই হাসিবে না। কিন্তু ভানুমতী বাঁচিয়া থাকিতে তাহা কি সম্ভব হইবে ?

আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে কখন একসময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিতে তাহার বেশ বেলাই হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। কৃষ্ণা হয়তো তাহার জন্ম অপেক্ষা করিয়া আছে।

আজ তাহাকে দেখিয়া দরোয়ান তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। নাচে বসিবার প্রস্তাব না করিয়া বলিল, "চলিয়ে বাবু উপরমে।"

সুবীর তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিপিনের সেই পরিত্যক্ত ঘরে আসিয়া বসিল। ঘরখানার চেহারা একটু ফিরিয়াছে, দেখা গেল। ঝাঁট পড়িয়াছে, জানলাটা খোলা, তাহাতে একটা বিলাতী ছিটের পরদা, চেয়ার-টেবিলগুলিও ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করা। তাহার এবং কৃষ্ণার ইতিহাস যে বাড়ীময় প্রচার হইয়াছে, অন্ততঃ আংশিকতঃ, তাহা বাড়ীর লোকের ব্যবহারেই বোঝা গেল। ছোট দুটি ছেলেমেয়ে দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বেশ কৌতূহলসহকারেই তাহাকে দেখিতে আরম্ভ করিল এবং সুবীর তাহাদের দিকে চাহিবামাত্রই তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। একটি পনেরো ষোলো বছরের মেয়েও তাহাকে একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া গেল।

মিনিট-পাঁচ বসিবার পর কৃষ্ণা আসিয়া প্রবেশ করিল। একরাত্রেই তাহার চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। মুখ ফ্যাকাশে, চোখ দুইটি অস্বাভাবিক দীপ্ত দেখাইতেছে, চোখের নীচে একটু যেন কালি পড়িয়া গিয়াছে। আজ আর সে যত্ন করিয়া সাজিয়া আসে নাই। তাহার গায়ে ভয়েলের একটি সাদা ব্লাউস এবং কাল পাড়ের ফরাসডাঙ্গার শাড়ী, পায়ে সাধারণ চটি জুতা। চুলের রাশ হাতখোঁপা করিয়া বাঁধা। তবু সুবীরের মনে হইল, ইহাকে ভিখারিণীর বেশে দেখিলেও মানুষ বুঝিবে এ রাণী হইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

কৃষ্ণা ঢুকিয়া সুবীরকে একটা নমস্কার করিয়া বসিল। প্রতিনমস্কার করিয়া সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "যাওয়ার দিন কি রকম স্থির করলেন ?"

কৃষ্ণা বলিল, "এদের প্রায় সব কথাই জানিয়েছি। না বল্‌লেও চল্‌ত, তবে তাতে এত শীগ্‌গির যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারতাম না। আমি যদিও তাঁদের এই মাসের গোড়াতেই নোটিশ দিয়েছি, তবু মাস শেষ হ'তে এখনও দিন পনেরো বাকি। আমার কাজে যিনি আস্‌বেন, তাঁকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাব, এই রকম একটা আণ্ডারস্‌টাণ্ডিং ছিল। তবে সব কথা শোনার পর এরা আপত্তি করছেন না। যত শীগ্‌গির জাহাজে 'বার্থ' পান, আমি যেতে পারি।"

ইহার পর সুবীরের উঠিয়া পড়িয়া জাহাজ অফিশের দিকে যাত্রা করা উচিত ছিল। কিন্তু এত চট্ করিয়া উঠিয়া পড়িতে সে কিছুতেই যেন পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "এখান থেকে যাওয়া তা'হ'লে আপনি আগেই ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন না কি ?"

কৃষ্ণা বলিল, "হ্যাঁ, শরীর ভাল থাক্‌ছিল না ব'লে কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ঠিক করেছিলাম।"

সুবীর বসিয়া ভাবিতে লাগিল, আর কি বলা যায়। সাধারণভাবে ইঁহার সঙ্গে আলাপ হইলে বলিবার কথার অন্ত থাকিত না। কিন্তু তাহাদের যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কথা বলিতে দু-জনেরই সঙ্কোচ, অথচ মনে মনে দুজনেরই পরস্পরের কাছে থাকিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু চোখ দিয়া ত প্রথমেই মনের ভিতরটা দেখিতে পাওয়া যায় না? সুতরাং সুবীর কেবলই ভাবিতে লাগিল, বেশী ঘনিষ্ঠতা করিতে গেলে হয় ত বা কৃষ্ণা বিরক্ত হইবে। কৃষ্ণা ভাবিতে লাগিল, তাহার আর বলিবার আছে কি ? সুবীরের সর্ব্বনাশ করিয়া এখন আর কোন্ লজ্জায় সে তাহার সহিত ভদ্রতার ঘটা দেখাইবে? যদি তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার কৃষ্ণার সাধ্য থাকিত? যদিও সুবীরের সাংসারিক রিক্ততার

মুখে সে, কিন্তু সুবীরও কি তাহাকে ইহার চেয়ে অধিকতর অসহনীয় রিক্ততার মধ্যে ফেলে নাই? এতদিন তাহার ধনসম্পদ ছিল না, কিন্তু আনন্দের অভাব ছিল না। আজ পার্থিব ধনে সে ধনী, কিন্তু আনন্দের সম্পদ কোথায় হারাইয়া গেল?

অনেক ভাবিয়া সুবীর জিজ্ঞাসা করিল, "ফার্ষ্ট ক্লাশে 'বার্থ' ঠিক কর্‌ব কি? তাহ'লে পরের মেলেই যাওয়া যেতে পারে।"

কৃষ্ণা বলিল, "না, না, অত সাহেব মেমের সঙ্গে আমার সুবিধা হ'বে না। আমি সেকেণ্ড ক্লাশেই বেশ যেতে পার্‌ব। না হয় দুদিন দেরী হ'বে।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা, তাহ'লে সেই চেষ্টাই করি।" এবার উঠিয়া পড়া ছাড়া আর উপায় নাই, তাহা সে বুঝিতেই পারিল। কিন্তু গৃহিণীর কল্যাণে তাহার আরো আধ ঘণ্টা খানেক থাকিবার সুযোগ মিলিয়া গেল। তড়িৎ বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "কৃষ্ণাদি, শুনে যান।"

কৃষ্ণা বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি তড়িৎ?"

তড়িৎ বলিল, "মা বল্‌লেন, যে-ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে চা খেয়ে যেতে।"

সুবীর কথাটা বেশ শুনিতেই পাইল। কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এত সকালে আপনার চা খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই?"

সুবীর অন্য স্থানে অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলিত। এখানে কিন্তু সে নিতান্ত সুশীল ও সুবোধ বালকের মত স্বীকার করিয়া লইল, যে, তাহার চা খাওয়া হয় নাই বটে।

কৃষ্ণা বলিল, "এইখানেই খেয়ে যান।"

সুবীর বলিল, "আচ্ছা।"

গৃহিণীর চা খাওয়ানোটা অন্য মানুষের চা খাওয়ানো অপেক্ষা কিছু ভিন্ন রকমের ব্যাপার ছিল। দেখিতে দেখিতে লুচী, তরকারি, মিষ্টান্ন, হরেক রকমের আসিয়া উপস্থিত হইল। অমিয়া প্রতিভারা কৃষ্ণার কাছে চা দিবার হাল ফ্যাশানটা শিখিয়া লইয়াছিল, কাজেই পেয়ালায় চা বানাইয়া আর চাকরে লইয়া আসিল না। দামী টী-সেট্‌এর অভাব ছিল না। জয়পুরী পিতলের ট্রেতে করিয়া, চা, দুধ, চিনি, চায়ের পেয়ালা সব আসিল। সুবীর ব্যাপার দেখিয়া বলিল, "এর নাম চা খাওয়া নাকি?"

কৃষ্ণার মুখে এতক্ষণ পরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। সে বলিল, "এ বাড়ীতে এরি নাম চা খাওয়া। বাড়ীর গিন্নি যিনি, তিনি কম খাওয়া জিনিষটার উপর হাড়ে চটা। ভুলিয়ে ফুস্‌লিয়ে কাউকে বেশী খাইয়ে দিতে পার্‌লে, তিনি সবচেয়ে খুসি হন।"

সুবীর বলিল, "বাঙালীর মেয়ের স্বভাব দেখছি সব জায়গায়ই এক রকম। আপনার একটি মাসীমাকে দেখবেন কলকাতায়, অবিকল এই রকম। মাও অনেকটা এই রকমই, তবে অসুস্থ ব'লে, এ নিয়ে বেশী জেদাজিদি কর্‌তে পারেন না।"

কৃষ্ণা নিজের মা মাসীর কাহিনী মন দিয়াই শুনিতেছিল। যাহাদের মানুষ জন্মক্ষণ হইতেই চেনে, সে তাহাদের চিনিতেছে পূর্ণ যৌবনে। অদৃষ্টের পরিহাস।

চাকর জিজ্ঞাসা করিল. "মা জিগ্‌গেস কর্‌ছেন, ফল কিছু পাঠিয়ে দেবেন?"

সুবীর আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল, "এর উপর আবার ফল? তা হ'লেই হ'য়েছে।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা, ফল না হয় থাক, কিন্তু আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না?"

সুবীর অগত্যা খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল কৃষ্ণাকেও খাইতে বলিতে, কিন্তু সে কি মনে করিবে ভাবিয়া তাহা আর বলিল না। চা ঢালিবার সময় তাহার সুন্দর হাতের ভঙ্গীর দিকে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ইহাকে যে জীবনের লক্ষ্মী গৃহের দীপ্তি রূপে পাইবে, কে না জানি সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ। কিন্তু সুবীর যেমন করিয়া ভালবাসিতে পারিতেছে, তাহা আর কেহ কি পারিবে?

খাওয়া শেষ হইলে সুবীর উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি একবার ষ্টীমারের বার্থের খোঁজ ক'রে আসি। পেলেই আপনাকে জানাব।"

কৃষ্ণা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া

গেল। এইটুকুই সুবীরের কাছে এখন অমূল্য সম্পদ। সে যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইয়াছে, এইটুকুই যে তাহার কতখানি। চিরদিন এই স্মৃতির টুকরা কয়টিই তাহার থাকিবে; ইহার বেশী পাইবার উপায় ভাগ্য তাহার রাখে নাই।

জাহাজের খোঁজ করিয়া জানিল, সৌভাগ্যক্রমে গোটা দুই তিন 'বার্থ' এখনও খালি আছে। সে একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া ফিরিল। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, কৃষ্ণাকে গিয়া খবরটা দিয়া আসে, কিন্তু কৃষ্ণা তাহা হইলে তাহাকে ভাবিবে কি? এক মাত্র ভালবাসাই এতখানি অভদ্রতা করিবার অধিকার দিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণার কাছে তাহার কি দাবী? কিছুই না। একটুখানি কৃতজ্ঞতার বালাই থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার জোরে এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করা চলে না। অগত্যা মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই চাপিয়া সে হোটেলে ফিরিয়া গেল।

বিকালবেলা কৃষ্ণার কাছে যাইবার জন্য সে বাহির হইল। বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া সুবীর ইতস্তত করিতে লাগিল। দিনে দুবার করিয়া আসিয়া জুটিলে কৃষ্ণা তাহাকে মনে করিবে কি? বাড়ীর লোকেই বা কি ভাবিবে? একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেই চলে কি না ভাবিতেছে এমন সময় দরোয়ান তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "চলিয়ে বাবু, উপর।"

এমন লোভনীয় আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারে, এতটা মনের জোর সুবীরের ছিল না। সে দরোয়ানের সঙ্গে সঙ্গে উপরেই আসিয়া জুটিল। খানিক পরে কৃষ্ণাও আসিয়া ঘরে ঢুকিল। চেয়ার টানিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বার্থ পেলেন?"

সুবীর বলিল, "পাওয়া গেছে বেশ সুবিধা মত। আপনার ক্যাবিনে আর একজন মাত্র প্যাসেঞ্জার, তাও ইউরেশীয়ান। কাজেই নোংরামী বা বোকামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে হ'বে না। বৃহস্পতিবার দশটার মধ্যেই তৈরি থাক্‌বেন।"

কৃষ্ণা বলিল, "আচ্ছা। টিকিট কিনে ফেলেছেন না কি?"

সুবীর বলিল "হ্যাঁ, কিনেই রাখলাম একেবারে। শুধু শুধু আর দেরি ক'রে লাভ কি? এত তাড়াতাড়ি যেতে আপনার কি কিছু অসুবিধা হ'বে?"

কৃষ্ণা বলিল, "কিছু মাত্র না। আমি একলা মানুষ, জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে বড় জোর চার পাঁচ ঘণ্টা লাগ্‌বে।"

এবার আর বেশীক্ষণ বসিয়া গল্প করার কোনোই উপলক্ষ্য জুটি না। সুবীর উঠিয়া চলিয়া গেল।

কৃষ্ণার মনের ভিতরটা এই দু দিন কেমন যেন অদ্ভুত হইয়াছিল। আনন্দ করিবার কারণ যথেষ্টই আছে, তবু আনন্দ তাহার মোটেই হয় না। সম্পূর্ণ অচেনা স্থানে, অজানা আত্মীয়বর্গের মধ্যে সে কেমন করিয়া দিন কাটাইবে? তাহার চালচলন, শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ অ-হিন্দু, এসকল কি তাহাদের পীড়িত করিবে না? কৃষ্ণাকে সন্তান-স্নেহে বক্ষে টানিয়া লইতে তাহার মাতাই কি পারিবেন? হিন্দু বিধবার কাছে আচারই প্রায় যথাসর্ব্বস্ব। এই বিদেশী ছাঁচে ঢালা, খ্রীষ্টীয় পরিবেষ্টনে বর্দ্ধিতা কন্যা কি তাঁহার মনকে বিমুখ করিয়া দিবে না?

সকলের চেয়ে বেশী করিয়া তাহার মনে বাজিত, সুবীরের আকস্মিক সর্ব্বনাশের কথা। তাহার না রহিল ধনজন, না রহিল বংশপরিচয়, না রহিল আপনার বলিতে একটা মানুষ। কৃষ্ণা যাহাকে সুখী করিবার জন্য সব দিতে পারিত, তাহাকেই একরকম মৃত্যুবাণ হানিয়া বসিল। সুবীরের মন এককালে তাহার জন্য খুবই ব্যাকুল ছিল, তাহা জানিতে কৃষ্ণার বাকি নাই। সেই অচেনা অজানার ভালবাসাই, তাহার নিজের হৃদয়কেও আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু এতখানি অমঙ্গল যাহার জন্য কোন মানুষকে সহ্য করিতে হয়, তাহার প্রতি আর কি মমতা থাকা সম্ভব? কৃষ্ণার ইচ্ছা করিত সুবীরকে সব কথা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু রমণীর সে অধিকার কোথায়?

নিজের বিচলিত মনকে একটুখানি ভুলাইবার আশায় সে এখন হইতে জিনিষ-গোছানোর কাজে লাগিয়া গেল। অমিয়া, প্রতিভা, তড়িৎ সকলেই এক একবার আসিয়া দেখে, আবার ম্লানমুখে চলিয়া যায়। তড়িৎ একবার ঘরে

ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কৃষ্ণাদি, আপনার আমাদের ছেড়ে যেতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না?"

কৃষ্ণা কিছু উত্তর দিবার আগে নিজেই বলিল, "কেনই বা হ'বে? নিজের মায়ের কাছে যাচ্ছেন, তাঁর চেয়ে ত আর আমরা আপন নয়?"

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "কষ্ট হচ্ছে বইকি, তড়িৎ। মা আপন বটে, কিন্তু সে মাকে ত আমি আজ পর্য্যন্ত চোখেই দেখিনি। দেখবার পর, জানবার পর, নিশ্চয়ই তিনি আপন হ'বেন।"

মাঝের একটা দিন চট্ করিয়া কাটিয়া গেল। বৃহস্পতিবার সকালে জিনিষপত্র গুছাইয়া, বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় লইয়া, সে নিজের সম্পূর্ণ অজানা অকল্পনীয় ভবিষ্যতের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

(৩৪)

সুবীর জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বেই ভানুমতীর নামে টেলিগ্রাফ করিয়া দিল। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে টেলিগ্রাম এক দিনেই পৌঁছিবার কথা, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিতে বিশেষ দেখা যায় না। কাজেই শুক্রবার সকালে ভানুমতী যখন স্নান করিয়া পূজার ঘরে ঢুকিতেছেন, তখন দরোয়ান আসিয়া, অবনত হইয়া নমস্কার করিয়া তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিয়া গেল।

স্বামীর কাছে তিনি ইংরেজী চলনসই রকম শিখিয়াছিলেন। তবে দীর্ঘ দিনের অনভ্যাসে তাহা তাঁহার মন হইতে এক-রকম মুছিয়াই গিয়াছিল। তবু টেলিগ্রাম ইত্যাদি পড়িয়া এখনও মোটের উপর বুঝিতে পারিতেন টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িয়া, তাঁহার বিষণ্ণ মুখে একটু যেন আনন্দের আভাস দেখা দিল। আজ কত দিন হইল তাঁহার ঘর অন্ধকার হইয়া আছে। সুবীর না থাকিলে ঘর-সংসার সবই তাঁহার কাছে শ্মশানের মত বোধ হয়। সুতরাং আবার সেই প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে দেখিবার আশায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল সুবীর আসিতেছে বটে, কিন্তু সে কি আর তাঁহার সেই ছেলে আছে। হৃদয়হীন নিয়তি ত তাহাকে চিরদিনের মত মায়ের কোল হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। ভানুমতীর কোলের উপর সমাজ, সংসার, প্রভৃতি সকলেই যাহার অলঙ্ঘনীয় অধিকার স্বীকার করিবে, তাহাকে আজ সুবীরই লইয়া আসিয়াছে।

জন্ম মাত্র মাতৃক্রোড়বিচ্যুতা কৃষ্ণাকে স্মরণ করিয়াও ভানুমতীর হৃদয় মমতায় বিগলিত হইল। সুবীরকে তিনি অন্তরের সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেও নিজের গর্ভজাতা কন্যার জন্য কিছুই কি রাখেন নাই? সে ত কম দুঃখিনী নয়! ভিখারীর সন্তানও যাহা জন্মাধিকারে পায় কৃষ্ণা তাহা হইতেও বঞ্চিতা। ভানুমতীর যদি দুইটি সন্তান থাকিত, দুইটিকেই কি তিনি সমান ভাবে ভালবাসিতে পারিতেন না? সুবীর তাঁহার যে স্নেহের ধন ছিল তেমনি থাকিবে, কিন্তু কৃষ্ণাকেও বক্ষে টানিয়া নিতে তাঁহার যেন কণামাত্রও না বাধে। এই মেয়েকে বধূরূপে বরণ করিয়া লইতে তিনি ত প্রস্তুত ছিলেন, না হয় কন্যারূপেই সে তাঁহার ঘর আলো করিবে।

কিন্তু সুবীরের দুঃখের যে অন্ত রহিল না। কৃষ্ণা কি এখন আর ধনহীন বংশপরিচয়হীন যুবককে বিবাহ করিতে চাহিবে? বিধাতা এমন সুন্দর জীবনটাকে এমন সকল দিয়াই কি নষ্ট করিয়া দিবেন? ভানুমতীর চোখ দিয়া টশ্ টশ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সুবীর রেঙ্গুন যাত্রা করিবার সময় ভানুমতীর কাছে সেই পুরাতন নর্স টিকে রাখিয়াই গিয়াছিল। যদিই কোন প্রয়োজন হয়? সে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি মা, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? কিছু মন্দ খবর এসেছে নাকি?"

ভানুমতী চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "না, না, ভাল খবরই। আমার মেয়ে আসছে, ছেলে আসছে। রবিবারে তারা পৌঁছবে।"

সুরবালা যথোচিত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, "ওমা, তাই নাকি? ঘর এবার ভ'রে উঠ্‌বে।"

ভানুমতী বলিলেন, "হ্যাঁ, বাছা, ঘর ভরাই যেন এর পর থেকে থাকে। মেয়ের জন্যে ঘরটর সব ঠিক করতে হবে, তুমি সরকার মশায়কে একটু খবর দাও। আমি ততক্ষণ

পুজোটা সেরে আসি।" কিন্তু পাষাণের ঠাকুর সেদিন আর তাঁহার মনকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্নেহের পুত্তলিরাই তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া রহিল।

দোতলায় গোটা দুই তিন ঘর খালিই পড়িয়াছিল। যাহার যা কিছু আবর্জ্জনা, সব এখানে ঠাশা থাকিত। হঠাৎ তাহাদের কপাল ফিরিয়া গেল। দেওয়ালে চুনকাম পড়িল, জানলা দরজায় রঙ পড়িল, সাহেববাড়ী হইতে বহুমূল্য আসবাব আসিয়া, ঘরগুলির মূর্ত্তি একেবারেই পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। একটি শয়নকক্ষ, একটি বসিবার ঘর, একটি কাপড় চোপড় পরিবার, এই তিনটি ঘর নবীনা অধিকারিণীর আগমন আশায় উৎসব-সজ্জা করিয়া রহিল। ভানুমতী নিজে এখন সব বিলাসিতা ত্যাগ করিলেও, তাঁহার রুচি নষ্ট হয় নাই। ঘর সাজানো তিনি দাঁড়াইয়াই করাইলেন, আর কাহারও কাজ তাঁহার পছন্দ হইল না।

রবিবার সকালেই তাহারা আসিয়া পৌঁছিবে। বাড়ীর গেটে নহবৎ বসিয়া গেল, মঙ্গল-ঘট, দেবদারু-পত্রের সজ্জা, কিছুই বাকি থাকিল না। শোভাবতী সপরিবারে আসিলেন, ভানুমতীর পিসী শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী জীবিতা ছিলেন না, বিজনবালাই এখন ঘরের কর্ত্রী। ছোট জা, ছেলে-পিলে সকলকে লইয়া আসিয়া জুটিল। দেওয়ানজী আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি ষ্টিমার ঘাটে ক'খানা মোটর আর কতজন লোক যাইবে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কলিকাতা এমনিই স্থান, যে, এখানে গাড়ী ঘোড়া, হাতা, লোক-লস্কর লইয়া একটা শোভাযাত্রা করিবেন, তাহারও উপায় নাই। জমিদারীতে গিয়া সে সব করা যাইবে, এই ভাবিয়া কোনো রকমে তিনি মনের খেদ মনেই রাখিলেন।

যাহার জন্য এত আয়োজন সে তখন জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া গঙ্গা তীরের ধাবমান দৃশ্যাবলীর দিকে চাহিয়া ছিল। আসিয়া ত পড়িল, আর ঘণ্টা দুই তিন মাত্র। তাহার পর কেমন ভাবে তাহার জীবন চলিবে কে জানে?

সুবীর নিজের ক্যাবিনে স্যুটকেসে তালা লাগানো বিছানা বাঁধা প্রভৃতিতে ব্যস্ত ছিল। সে-সব সারিয়া ফেলিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সব হ'য়ে গেছে নাকি? আর ক্যাবিনে যেতে হ'বে না?"

কৃষ্ণা বলিল, "হয়েই গেছে সব। কেবল 'বয়'টাকে বখশিশ দেওয়া বাকি।"

সুবীর বলিল, "সে-সব আমি ঠিক ক'রে দেব এখন; আপনাকে একটা ডেক্ চেয়ার এনে দিচ্ছি, এইখানেই বসুন।"

সে চেয়ার লইয়া ফিরিয়া আসিল, কৃষ্ণাকে বসাইয়া খানিকক্ষণ তাহার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "দেখুন একটা কথা বলি, কিছু যদি মনে না করেন।"

কৃষ্ণা বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বলিল, "বলুননা, আমি আপনার কথায় কিছু মনে কর্‌ব না, মনে কর্‌বার মত কথা আপনি বল্‌বেনও না।"

সুবীর বলিল, "এ রকম শাদা কাপড় প'রে নাম্‌বেন না। ওরা ওখানে খুব ঘটা ক'রেই আপনাকে রিসীভ কর্‌তে আস্‌বে। এ রকম ক'রে গেলে, সেটা বিশেষ মানাবে না।"

কৃষ্ণা হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আচ্ছা, আমি পোষাক বদ্‌লে নিচ্ছি। যদিও রাণী সাজ্‌বার উপযুক্ত কিছু আমার ওয়ার্ডরোবে নেই।"

সুবীর অতি কষ্টেই নিজের জিহ্বাকে সংযত করিয়া রাখিল। কৃষ্ণা কাপড় বদ্‌লাইতে নীচে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সুবীরের চোখের দৃষ্টিই তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিল। কৃষ্ণাকে প্রথমে সে যেদিন প্যাগোডাতে দেখিয়াছিল, সেদিনকার সেই নীল রেশমের পোষাকটি সে পরিয়া আসিয়াছিল। বলিতে আরম্ভ করিলে হয়ত মাত্রা রাখিতে পারিবে না বলিয়া সুবীর কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না। কেবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে কলিকাতার জাহাজঘাট আসিয়া পড়িল। সুবীর কৃষ্ণাকে বলিল, "ঐ যে বুড়ো ভদ্রলোক, ঠিক উপরতলার বারাণ্ডার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে,

উনি আমাদের দেওয়ানজী। তাঁর পাশে যে ছোক্‌রা, ওটি আপনার মাসীমার ছেলে সুশীল। বাকি লোক-জন বাইরে আছে বোধ হয়।”

কৃষ্ণার মুখটা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। আজ এসব ঘটা করিবার কিইবা আবশ্যক ছিল? এই উৎসব-কোলাহল কি সুবীরের প্রাণে শেলের মত বিঁধিবে না? কিন্তু ইহাতে আপত্তি সে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? হয়ত এ সব তাহার মায়ের আদেশেই হইতেছে।

জাহাজের সিঁড়ি পড়িবামাত্র, ডেকের যাত্রীরা মরিয়া হইয়া দৌড়িল। সুবীর বলিল, “মিনিট পাঁচ ওয়েট্ করুন, তা না হ'লে কোন্ হিন্দুস্থানীর পোঁটলার তলে চাপা পড়বেন, তার ঠিকানা নেই।”

ভীড়ের জমাট ভাব একটু কমিবার পর সুবীর কৃষ্ণাকে নামাইয়া দিল; বলিল, “আপনাকে নিজেই একটু কষ্ট ক'রে ঐ কাঠগড়াটি পার হ'য়ে যেতে হ'বে। আমি লগেজ-গুলোর ব্যবস্থা না ক'রে যেতে পার্‌ছি না।”

কৃষ্ণা ডিবার্কেশনের কাগজ লইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাঠগড়া পার হইল। দেওয়ানজী নিজের লোকলস্কর লইয়া আসিয়া পড়িলেন; কৃষ্ণার সামনে আসিয়া বলিলেন, “মা লক্ষ্মী, আপনি আমায় চিন্‌বেন না, আমি আপনাদের এষ্টেটে কাজ ক'রেই চুল পাকিয়েছি। খোকাবাবুর কাছে আমার কথা শুনে থাক্‌বেন।”

কৃষ্ণা তাঁহাকে প্রণাম করিতে অবনত হইতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। তাহার পর সুশীল আসিয়া লজ্জিত ভাবে তাহাকে একটা প্রণাম করিল, লোকজন সব তাহার চারিপাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে নমস্কার আর সেলামের চোটে কৃষ্ণা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

জাহাজঘাটের লোকজন একেবারে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। এ আবার কোথা হইতে কে আসিল? এত আসাসোটাধারী বরকন্দাজের আবির্ভাব উট্‌রাম ঘাটে সচরাচর হয় না।

সুশীল বলিল, “দেওয়ানজি, বেরিয়ে গিয়ে দিদিকে গাড়ীতে বসালে হ'ত না? কতক্ষণ এই ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?”

কৃষ্ণা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই ভীড়ের ভিতর চাপরাশ-আঁটা অনুচরে পরিবেষ্টিত হইয়া সঙের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে সত্যই তাহার কষ্ট হইতেছিল। সুবীরের তখনও দেখা নাই, কাজেই সে-সকলের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রকাণ্ড একখানা মোটরকার, আগাগোড়া ফুলের মালায় সজ্জিত হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার দরজা খুলিয়া দেওয়ানজী বলিলেন, “এইটাতে উঠুন আপনি।”

কৃষ্ণা গাড়ীতে বসিয়া জনস্রোতের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুবীরকে এখনও দেখা যায় না। এই এতগুলো লোকের মধ্যে সেই একমাত্র তাহার পরিচিত। এ যেন তাহার এক জীবনের মধ্যেই পুনর্জন্মলাভ হইল। অদৃষ্টে আরো কি আছে কে জানে? মনের ভিতরটা তাহার ক্রমেই যেন আঁধার হইয়া উঠিতেছিল।

হঠাৎ সুশীল বলিয়া উঠিল, “যাক, এতক্ষণ পরে দাদার দেখা পাওয়া গেল।” এবং মিনিট দুই তিন পরেই একদল কুলির সঙ্গে সুবীর আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণাকে বলিল, “একলা ব'সে ব'সে হাঁপিয়ে উঠেছেন, না? আচ্ছা, আর দেরি হবে না। জ্যাঠামশায়, আপনি এঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, আমরা জিনিষপত্র নিয়ে পিছনে আছি।”

কৃষ্ণা হঠাৎ গাড়ী হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, “আপনি এই গাড়ীতে আসুন, জিনিষ ওঁরা আন্‌বেন না হয়।”

সুবীর গাড়ীর পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে সে বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল। কি সে তাহার মুখে দেখিল, সে-ই জানে। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় গভীর হইয়া উঠিল। নিজেকে তৎক্ষণাৎ সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, “আচ্ছা, জ্যাঠা মশায়, আপনারা তা হ'লে জিনিষগুলো নিয়ে আসুন।” দরজা খুলিয়া সে ভিতরে ঢুকিয়া কৃষ্ণার সামনে বসিয়া পড়িল। গাড়ীও তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল।

কৃষ্ণার মুখের দিকে চাহিয়া সুবীর জিজ্ঞাসা করিল,

"সব অচেনা লোকের ভীড়ে আপনার ভাল লাগছে না, না?"

কৃষ্ণা বলিল, "চিরদিন আমি সব দিক দিয়ে এত একলা থেকেছি, যে, আমাকে নিয়ে এতগুলো লোক হৈ চৈ করেছে মনে ক'রেই আমার অসোয়াস্তি লাগছে।"

সুবীর বলিল, "এখন কয়েক দিন এ উৎপাত সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। ক্রমে সয়ে যাবে। সকল অবস্থারই একটা ক'রে ডার্ক্ সাইড আছে ত? বড় মানুষ হ'লে পাব্লিসিটি থাকিকটার জন্যে প্রস্তুতই থাকতে হয়।"

কৃষ্ণা বলিল, "এটা আমার পক্ষে একেবারেই নূতন। লোকের চোখে পড়ার এক্সপীরিয়েন্স কখনও হয় নি।"

সুবীর বলিয়া ফেলিল, "এটা বোধ হয় পুরোপুরি সত্যি কথা নয়। লোকের চোখে না প'ড়েই আপনি থাকতে পারেন না।"

কৃষ্ণার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সুবীর কথাটা বলিয়া একটু বোধ হয় অপ্রস্তুত হইয়াছিল, তাড়াতাড়ি কথা ফিরাইবার জন্য বলিল, "খুব ক্লান্ত আছেন, না? আজ এরা যদি দয়া ক'রে একটু বিশ্রাম করতে দেয় ত ভাল। কিন্তু বাঙালীর ঘরের কাণ্ড ত? সারা দিনই হয়ত হৈ চৈ করবে।"

কৃষ্ণা বলিল, "আপনি এ সব করতে বারণ করলেন না কেন? আমার ভাল লাগছে না।"

সুবীর বলিল, "আমি বারণ করবই বা কেন, আর বারণ করলে তারা শুনবেই বা কেন? শুভ দিনে উৎসব করাই ত নিয়ম। আপনার ভাল লাগবে না, তা অবশ্য ওরা মনে করে নি।"

কৃষ্ণার মনের যে-কথাটা বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বলিবার কোন উপায় নাই। আজ সুবীরের নির্ব্বাসনদণ্ড সম্পূর্ণ হইল; তাই এসব কৃষ্ণার কাছে বিষের মত ঠেকিতেছে। কিন্তু একথা সুবীরকে যে সে কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছে না।

ঘাট হইতে বাড়ী পৌঁছিতে বেশী সময় লাগে না। হঠাৎ সুবীর বলিয়া উঠিল, "ঐ যে গেট দেখা যাচ্ছে।"

কৃষ্ণা চাহিয়া দেখিল। এখানেও সেই উৎসবসজ্জা।

নহবতের বাজনা বিপুল উৎসাহে বাজিয়া উঠিল। শুভ শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। গাড়ী গেটের ভিতর ঢুকিয়া গাড়ীবারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সুবীর উল্টা দিকের দরজা খুলিয়া টপ করিয়া নামিয়া গেল।

সিঁড়ির উপর কৃষ্ণার আত্মীয়ের দল ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া। কাহাকেও সে চেনে না, স্নেহের বন্ধনে কাহারও হৃদয়ের সহিত তাহার হৃদয় বাঁধা নাই। তাহার যেন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। জমকালো পোষাকপরা দরোয়ান আসিয়া দরজা খুলিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। এখন না নামিলেই নয়। অগত্যা রুমাল এবং হ্যাণ্ডব্যাগ পাশ হইতে তুলিয়া লইয়া কৃষ্ণা নামিয়া পড়িল।

মর্ম্মর দেবী-মূর্ত্তির মত কে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল? এই কি তাহার মা? এত সুন্দর? ইহার চক্ষে স্নেহের স্নিগ্ধতা ভিন্ন আর কিছু নাই। সুবীরের নির্ব্বাসনের জন্য মা তাহা হইলে কৃষ্ণাকে ক্ষমা করিয়াছেন।

কৃষ্ণা অবনত হইয়া ভানুমতীকে প্রণাম করিতেই, তিনি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। তাঁহার চোখ হইতে জল গড়াইয়া মেয়ের চুলের উপর পড়িতে লাগিল।

শোভাবতী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ওমা, ওমা, আজকের দিনে কি করিস্? চোখের জল ফেলিস্নে, মেয়ের অকল্যাণ হবে।"

[ক্রমশঃ]

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের ভূমিকা

৺ রামমোহন রায়

["ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে"র বিজ্ঞাপনে রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলীর প্রকাশক লিখিয়াছেন, যে, মূল গ্রন্থ না পাওয়ায় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ"ই মুদ্রিত হইয়াছে। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক এই বিচারের যাহা অপ্রয়োজনীয় অপ্রধান বা পল্লবিতাংশ, তাহাই কেবল বাদ দিয়াছিলেন। ইহার ভূমিকা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বা কোন গ্রন্থাবলীতে এ-পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। তাহা নীচে প্রকাশিত হইতেছে। রামমোহন ইহাতে তর্ক-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখনও প্রণিধানযোগ্য। সহজবোধ্য বাংলা কথার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে তৎকালীন বাংলা ভাষার সংস্কারক ও সাহিত্যিক নবযুগের প্রবর্ত্তক মনে করা যাইতে পারে।

রাজা রামমোহনের জীবদ্দশায় কাষ্ঠফলকে মুদ্রিত তাঁহার যে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী হইতে "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের" ভূমিকা মুদ্রিত হইতেছে, তাহা ১০১ নং আহিরিটোলা ষ্ট্রীট নিবাসী, Indian School of Accountancyর অধ্যক্ষ ও Commercial Education পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ। রামমোহনের বিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমেশ বটব্যাল ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

শ্রী নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রী অলীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

ওঁ তৎসৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্বসাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও এক প্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় ২ সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছা পূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকা সাতষষ্টিপৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু ওই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় আর ঐ শ্রুতি কোন উপনিষদের অথবা কোন ভাষ্যে ধৃত হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্তচন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীর প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষ রূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এ গ্রন্থ কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন

করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ॥ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি ॥

আরাতামা

শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আরাতামা বাড়ীতে থাকিলে শিমাই ভৃত্য বাহিরের কোন লোক না আসিলে বড় একটা সম্মুখে আসিত না, আর প্রায় তাহার দেখা পাওয়া যাইত না। আরাতামা যদি চলিয়া গেলেন ত শিমাই মনে করিল তাহার কাজ বাড়িল, বাড়ীর সমস্ত দেখাশুনা তাহাকেই করিতে হইবে। উরীন কর্ত্তা ব্যক্তির মত নিজের ঘরে থাকিত, বাড়ীতে পাহারা পড়িয়াছে বলিয়া সে নির্ভাবনায় ছিল। বাম্বী যে কি মনে করিবে, সন্তুষ্ট হইবে বা বিরক্ত হইবে শিমাই সে কথা ভাবে নাই।

লোবানকে দুই তিনবার আসিতে দেখিয়া শিমাই বাম্বিকে জিজ্ঞাসা করিল,—এ লোকটা এখানে আসে কেন?

রাগ গোপন না করিয়াই বাম্বী কহিল,—উহাকে আগে কখন দেখ নাই? মনিবানী থাকিতে আসিত না?

—তখন ত আরও অন্য লোক আসিত, তাহারা ত কেহ আসে না, ঐ বা কেন আসে?

—তোমার ইচ্ছা হয় তুমি জিজ্ঞাসা করিও, আমার কোন মাথা-ব্যথা পড়ে নাই।

শিমাইয়ের বয়স হইয়াছে আর সে কিছু বোকা। লোবানকে তাহার পর দেখিতে পাইয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বাম্বী ও লোবানে যে কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছিল শিমাই তাহার কিছু জানিত না।

শিমাই কিছু বলিবার পূর্ব্বেই লোবান তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, তুমি আমাকে সেলাম করিলে না?

শিমাই থতমত খাইয়া বলিল,—সেলাম করিব কেন? আপনি এখন এখানে কি জন্য আসেন? মালেকা ত এখানে নাই।

—নাই বা থাকিলেন। আমি নাগরিক সেনার এক-জন অধ্যক্ষ, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি। নগরবাসীরা সকলেই আমাদিগকে সেলাম করে। তুমি কি রাজার বিপক্ষে?

কিছু না বুঝিতে পারিয়া শিমাই বাম্বীর দিকে চাহিল। কহিল,— ইনি কি বলিতেছেন?

বাম্বী রাগিয়া বলিল,—উরীন কিছু বলে না, আমি কিছু বলি না, তুমি বলিবার কে? মালেকা ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারিলে হয়ত তোমাকে তাড়াইয়া দিবেন।

ভয়ে শিমাইর মুখ শুকাইয়া গেল। লোবানকে বলিল,—আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি না জানিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

শিমাই চলিয়া গেলে বাম্বী হাসিতে লাগিল। লোবান তাহাকে সঙ্কেত করিয়া আর এক ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

লোবানের জন্য ভাবনা হইয়াছিল আর একজনের। ওবেদার অতিথিশালা এখন শূন্য। যুদ্ধের হাঙ্গামা

বাধিয়া অতিথি পর্য্যটক আর কেহ আসিত না। ওবেদার কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই, সহরসুদ্ধ লোক যেমন আসন্ন যুদ্ধের আলোচনা করিত তিনিও সেইরূপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে লোবানের কাছে যাইতেন। লোবানের ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। লোবান তেমন ভাল করিয়া কথা কহেন না, ওবেদাকে বিশেষ সমাদরও করেন না। দু একবার ওবেদার সন্দেহ হইল, লোবানের বাড়ীতে আর কোন লোক আছে তাহার কথা তিনি গোপন করিতে চাহেন। এক দিন লোবানের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় বাষ্টী বাহির হইয়া গেল। ওবেদা চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলেন। বাড়ীর ভিতর গিয়া লোবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার কাছে যে স্ত্রীলোক আসিয়াছিল সে কে?

লোবান কহিল,—আরাতামার পরিচারিকা।

—আরাতামা ত এখানে নাই, ও আপনার কাছে কেন আসে?

লোবান রুষ্ট হইয়া কহিলেন,—আমার কাছে কে কেন আসে আপনার জানিয়া কি হইবে?

—আপনি বিদেশী, এখানে একা আছেন, আপনার কাছে একটা স্ত্রীলোক একা আসে সেটা কি দেখিতে ভাল?

ওবেদার কণ্ঠস্বরে কিছু উদ্বেগ। লোবান তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিতে ওবেদার চক্ষু নত হইল। লোবান আর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, ওবেদাকে বলিলেন,—আরাতামার পরিচারিকা আমার জানা লোক, আমাদের দেশে বাড়ী, সেইজন্য বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসে। একা আসিতে দোষ কি? আপনিও ত একা আসেন।

ওবেদার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিছু বেগের সহিত কহিলেন,—একটা পরিচারিকা আর আমি কি সমান? আর আমি কি যুবতী? লোবান ওবেদার প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না।

ওবেদা কহিলেন,—আমি আপনার অপেক্ষা বড়- স্নেহভাবে যদি কখন কিছু বলি ত কিছু মনে করিবেন না।

লোবান কহিলেন,—আমি বরং দোষী, রাগিয়া আপনাকে অযথা কথা বলিয়াছি। আপনিও কিছু মনে করিবেন না।

ওবেদা হাসিমুখে চলিয়া গেলেন। লোবানের উপর তাঁহার রাগ হয়ও নাই, যদি হইয়া থাকে, অল্প ঈষৎ অভিমান কিন্তু বাষ্টীর কথা স্বতন্ত্র। তাহাকে একবার দেখিতে পাইলে হয়।

দেখা হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। ওবেদা সন্ধানে সন্ধানে থাকিতেন যাহাতে অপরের অসাক্ষাতে বাষ্টীর সহিত দেখা হয়। আরাতামার বাড়ীতে কখন যান নাই বলিয়া সেখানে যাইতে পারিতেন না, কিন্তু বাষ্টী বাড়ীর বাহিরে কখন কোথায় যায় সে খবর লইতেন। একদিন পথে দেখা হইল। বাষ্টী একা, ওবেদার সঙ্গেও কেহ নাই। ওবেদা বাষ্টীর সম্মুখে দাড়াইয়া তাহার পথ রোধ করিয়া কহিলেন,—তোমার সঙ্গে গোটা কতক কথা আছে।

ওবেদার দাঁড়াইবার ও মুখের ভাব দেখিয়াই বাষ্টী বুঝিতে পারিল যে লক্ষণ ভাল নয়, রাগারাগির কোন কথা। সে কোমরে হাত রাখিয়া উগ্রভাবে কহিল,—তোমাকে আমি চিনি না। কে তুমি? আমার সঙ্গে তোমার কি কথা?

—তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু সহরসুদ্ধ লোক আমাকে চেনে। লোবানের বাড়ীতে তুমি কি মতলবে যাওয়া আসা কর?

অন্ধকারে সর্পের শীতল অঙ্গে নগ্ন পদ ঠেকিলে যেমন কেহ চমকিয়া শিহরিয়া উঠে বাষ্টীর সেইরূপ হইল; কিন্তু প্রকাশ্যে কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করিল না। ক্রুরভাবে অল্প হাসিয়া কহিল,—এখন তোমাকে চিনিতে পারিতেছি। তুমি কি মতলবে লোবানের বাড়ী যাওয়া আসা কর?

বাষ্টীর কথায়ও তাহার বিদ্রূপপূর্ণ মুখভঙ্গীতে ওবেদার অঙ্গে বিষ ছড়াইয়া দিল। তথাপি আত্মসংযম করিয়া কহিলেন,—লোবান আমার অতিথিশালায় আসিয়া উঠিয়াছিলেন, এখন আমার বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন,

তাঁহার কিছু আবশ্যক হইলে আমাকে বলেন। আমি তাঁহার বাড়ী কাজে যাই। তোমার সেখানে কি কাজ ?

এবার বাষ্টী অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। ওবেদার সম্মুখে হাত নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—তুই কেরে মাগী, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ? আমি কি করি, কার বাড়ী যাই তোর বাপের তাতে কি ? লোবান তোর কে হয় যে, তার বাড়ী তুই ছাড়া আর কেউ যাবে না ? আর তোর অতিথিশালায় তুই কি করিস্ তাই বা কে জানে ?

পথের মাঝখানে কালো কেউটে সাপ যেন ফোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। পথের মাঝখানে আঁচড়া-আঁচড়ি কিম্বা চুলোচুলি করিয়া মারামারি করিতে ওবেদার প্রবৃত্তি হইল না। বাষ্টীর সঙ্গে তিনি আঁটিয়া উঠিতেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ। মুখে তিনি বলিলেন,—মুখ সাম্‌লে কথা কও বল্‌চি। কিন্তু একটুখানি পিছাইলেন।

বাষ্টী দুই হাত বাড়াইয়া, আঙ্গুল বাঁকাইয়া বলিল,—আর একটু এগিয়ে আয় না, তোর মুখ সাজিয়ে দিই।

আর একটু হইলেই হয়ত বাষ্টী ওবেদার মুখ নখ দিয়া খামচাইয়া দিত কিন্তু ওবেদা আর দাঁড়াইলেন না। তিনি চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া বাষ্টী উচ্চহাস্য করিয়া কহিল,—এখন পালাচ্চিস্ কেন ? এবার যদি লোবানের বাড়ী তোকে দেখতে পাই তা হ'লে সেইখানে তোর মুখ ছিঁড়ে খুঁড়ে দেব

বাষ্টী রাগে ফুলিতে ফুলিতে হন্ হন্ করিয়া লোবানের বাড়ী গেল। লোবান ঘরের ভিতর একা বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। বাষ্টী ঝনাৎ করিয়া দরজা খুলিয়া ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল,—তোমার জন্য আমাকে কি যে সে-অপমান করিবে ?

বাষ্টীর এ রকম মূর্ত্তি লোবান ইতিপূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। তাহার বেশ অসংযত, চক্ষু জ্বলিতেছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে, দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বক্ষঃস্থল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, হস্ত একবার করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে আবার মুষ্টিমুক্ত হইয়া প্রসারিত হইতেছে। লোবান সেই ক্রোধমূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন, কহিলেন,—কি হইয়াছে, কে তোমায় অপমান করিয়াছে ?

—কে আবার! সে মাগীর অতিথিশালায় তুমি ছিলে, যে তোমার কাছে সর্ব্বদা আসে।

—ওবেদা! সে তোমাকে অপমান করিবে কেন ? তোমাকে সেত চেনেও না, আর তার নিজের কাজকর্ম্ম আছে।

—কাজের মধ্যে তোমার কাছে ছুটে ছুটে আসা। তোমার সঙ্গে কি সম্পর্ক যে যখন তখন তোমার কাছে আসে ?

লোবানের স্মরণ হইল ওবেদা বাষ্টীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাষ্টীর সঙ্গে তিনি মুখামুখী ঝগড়া করিতে যাইবেন কেন ? স্ত্রীলোকের মন কে বুঝিবে ? বাষ্টীকে বলিলেন,—কি হইয়াছে শুনি। সকল কথা না শুনিলে আমি কি বুঝিব ?

—পথের মাঝখানে মাগী জিজ্ঞাসা করে কি না, কি মতলবে আমি তোমার বাড়ী আসি। আমি যে জন্যই আসি তাতে ও চোখখাগীর চোক টাটায় কেন ?

লোবান সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন,—বোধ হয় তাহার রাগারাগির ইচ্ছা ছিল না, অমনি জানিতে চাহিয়াছিল।

—তাহা হইলে অমন করিয়া চোক পাকাইয়া কথা কহিত না। মাগী ভাবিয়াছিল তাহাকে আমি ভয় করিব! এখানে আর একবার আসুক দেখি! তোমার সঙ্গে ও মাগীর নিশ্চয় কিছু মতলব আছে।

—হ্যাঁ, ওর আবার কি মতলব থাকিবে ?

লোবান বাষ্টীর হাত ধরিয়া কাছে টানিলেন। তখন অভিমানে বাষ্টীর চক্ষে জল আসিল। বাষ্টীকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিয়া লোবান কহিলেন,—এইবার যত শীঘ্র হয় আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইব। যাইবার পূর্ব্বে আর একবার আরাতামার বাড়ী ভাল করিয়া খুঁজিতে হইবে, সে জহরত বাড়ীতেই কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমরা সন্ধান পাই নাই।

বাষ্টী কহিল,—আরাতামা এখন বাড়ী নাই, এই বেলা রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া তুমি খোঁজ কর না কেন ? কিন্তু তাহার পর আর এখানে থাকা হইতে পারে না, আমা-

দিগকে আর কোথাও চলিয়া যাইতেই হইবে। আর এখানে থাকিলে কোন দিন সেই মাগীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হইবে, আমি রাগ সামলাইতে পারিব না, আর সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

বাঁদী চলিয়া গেলে লোবান ভাবিতে লাগিলেন : এ কি এক নূতন উৎপাত! ওবেদার বাঁদীর প্রতি এরূপ বিদ্বেষের কারণ কি? লোবান আসিয়া ওবেদার অতিথি-শালায় উঠিয়াছিলেন তাহার পর তাঁহার বাড়ীভাড়া করিয়া আছেন। লোবান কি করেন, তাঁহার কাছে কে আসে যায় সেজন্য ওবেদার ভাবনা কেন? যদি ওবেদা ও বাঁদীতে আবার কলহ হয় তাহা হইলে একটা গোলযোগ হইবে, হয়ত লোবান যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন তাহাই পণ্ড হইয়া যাইবে। উদ্বিগ্নচিত্তে লোবান ওবেদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ওবেদা তাঁহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

ওবেদার মুখ ভার, কহিলেন,—আজ আমার বড় ভাগ্য, এখন ত আমায় দেখিলে আপনার বিরক্তি হয়।

—সে কি কথা! আমি নানা ভাবনায় আছি, আমার মনের স্থিরতা নাই, আপনাকে সকল কথা বলিতে পারি না, আপনি নানা বিষয়ে আমার ত্রুটি দেখিতে পাইবেন।

—আপনার জন্য আমাকে কি রকম অপমানিত হইতে হইয়াছে, আপনি জানেন?

—কই, আমিত কিছু শুনি নাই।

—কেন, সেই দাসীটা আপনাকে কিছু বলে নাই? পথের মাঝখানে গালাগালি দিয়া আমাকে মারিতে আসিয়াছিল।

—সে বলিতেছিল আপনি তাহার অপমান করিয়াছেন।

—এইমাত্র আপনি যে বলিলেন কিছু শুনেন নাই? সে মাগী আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াই আপনার কাছে গিয়া থাকিবে।

লোবানের মুখে একটা মিথ্যা কথা আসিল, কহিলেন,—তাহাকে আমার বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি।

—কেন, আমার কথায়?

—তাহাতে দোষ কি? আপনি ত আমার ভালর জন্যেই বলিয়াছেন। কিন্তু আপনি অকারণে কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না। আরাতামার দাসী আমার কে? আরাতামার সঙ্গে আমার কোন বিষয়ে একটা বোঝাপড়া আছে।

ওবেদার মনে নূতন সন্দেহ হইল। হয়ত আরাতামার জন্যই তাঁহার দাসী লোবানের কাছে যাতায়াত করে। ওবেদা কহিলেন,—আমার বুঝিবার ভুল হইয়াছিল। দাসী যে মুনিবানীর পক্ষ হইতে আপনার কাছে যায় তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু এখন ত আরাতামা এখানে নাই, এখন তাঁহার দাসী আপনার কাছে যায় কেন?

লোবান কহিলেন,—এখনও আপনার বুঝিবার ভুল হইতেছে। আরাতামার পরিচয় এখানে কেহ জানে না, আমি জানি। তাঁহার সঙ্গে আমার টাকাকড়ির দেনা পাওনার কিছু কথা, আর কিছু নয়।

—অন্য কথা হইলেই বা আমার কি? এই বলিয়া ওবেদা অন্য দিকে চাহিলেন। লোবান আর কোন কথা না কহিয়া উঠিয়া আসিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যেখানে রাজা শিশেরার জন্য শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল রুদেলা এবং আরাদ সসৈন্যে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথে সেই পঞ্চাশজন সৈনিক ফিরিয়া আসিয়া সৈন্যদলে মিশিল। রুদেলা জানিলেন, রাজকন্যাকে ধৃত করিবার চেষ্টা বৃথা হইয়াছে। ফারেজ যে কোন রূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন সে তাঁহার সংশয় হইল না, কারণ তাহা হইলে সৈন্যেরা ফিরিয়া আসিত না। রাজকন্যা হয়ত নিজে ফিরিয়া গিয়াছেন, অথবা রাজা তাহাকে নগরে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক এবার রুদেলা ঠকিলেন।

রুদেলার সৈন্যের সম্মুখে কয়েক ক্রোশ দূরে নদী। যদি রাজশিবিরের সম্মুখে রুদেলা নদী পার হন তাহা হইলে তাঁহার অসুবিধা, কেন না সৈন্যেরা যেমন যেমন নদী পার হইবে রাজার সৈন্যেরা সেইরূপ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, অতএব যুদ্ধের প্রণালী রুদেলা রক্ষা করিতে পারিবেন না। উভয়

পক্ষে সৈন্যসংখ্যা তুল্য নয়, রাজপক্ষে অধিক। তথাপি রুদেলা স্থির করিলেন তাঁহার সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত করিবেন, একভাগ নদী পার হইয়া পশ্চাৎ দিক হইতে শিবির আক্রমণ করিবে আর একভাগ শিবিরের সম্মুখে নদী উত্তীর্ণ হইবে। দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইলে রাজসৈন্য অভিভূত হইয়া পড়িবে। একভাগ কিছুদূরে গিয়া রাত্রে সাবধানে নদী পার হইবে আর একভাগ প্রকাশ্যভাবে শিবিরের সম্মুখে গিয়া নদী পার হইবে।

শত্রু যে এরূপ কৌশল করিতে পারে রাজা শিশেরার সেনাপতি তাহা অনুমান করিয়াছিলেন, চরেরা যখন সংবাদ লইয়া আসিল যে, শত্রুসেনা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং হয় সেই রাত্রে কিংবা পরদিবস প্রাতে যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা তখন সেনাপতিও স্বপক্ষের আয়োজন করিলেন। রাত্রি হইতেই কতক সৈন্য নিঃশব্দে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। চারিদিকে স্থান সমভূমি হইলেও শিবির হইতে কিছুদূরে নদীর তীরে অনেকটা স্থান বন্ধুর। নদীর পাড় উচ্চ, তাহার পরেই নিম্নভূমি, আবার অল্প দূরে গিয়া উচ্চ স্থান। সশস্ত্র সৈন্যগণ এই দ্বিতীয় উচ্চ স্থানের অন্তরালে অবস্থান করিল। সেখান হইতে শিবির পর্য্যন্ত বরাবর সৈন্য দীর্ঘ সারি, একটানা রেখার মত। নদীর ধারেও শিবিরের পশ্চাতে যেখানে কোন রকম আড়াল সেই সেই স্থানে অল্পসংখ্যক সৈন্য অবস্থিত হইল। শিবিরে সর্ব্বত্র অগ্নি ও আলোক জ্বলিতেছিল, যেন সমস্ত সৈন্য নিশ্চিন্ত হইয়া শিবিরে রাত্রি যাপন করিতেছে।

শত্রুসৈন্য নদীতীরে উপনীত হইতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। রুদেলার আদেশমত সৈন্য দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। যে ভাগে সৈন্য অধিক সে ভাগ অন্য স্থানে নদী পার হইবে। শিবিরের সম্মুখে নদীর অপর পারে সৈন্যসংখ্যা খুব অধিক নয়, কিন্তু তাহারা যেরূপ ভাবে প্রসারিত হইয়া আসিতেছিল দেখিলে মনে হইত সমস্ত সৈন্য একত্র আসিতেছে। তাহারা আত্ম-গোপনেরও কোন চেষ্টা করিল না। তাহাদের কোলাহল শিবিরে স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত রাজসৈন্য শত্রু সম্মুখে বিবেচনা করিয়া তাহাদের গতি রোধ করিবে ও নদীতীরে সমবেত হইবে এবং সেই অবসরে রুদেলার অবশিষ্ট সৈন্য স্বচ্ছন্দে নদী পার হইয়া পশ্চাৎ হইতে শিবির আক্রমণ করিবে।

শিবিরের সম্মুখে রুদেলার সৈন্য নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। জল গভীর নয়, কটি পর্য্যন্ত হইবে, এবং শত্রুসৈন্য সকলে মিলিয়া একত্রে পার হইবার চেষ্টা করিল না। শিবির হইতে সৈন্য বাহির হইয়া নদীর পাড়ে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল, শত্রু পার হইলেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ যতটা আস্ফালন করিতে লাগিল নদী পার হইয়া যুদ্ধের জন্য সেরূপ আগ্রহ বা ব্যস্ততা প্রদর্শন করিল না।

ইহা বঞ্চনার কৌশল মাত্র। অধিকাংশ সৈন্য কোনরূপ গোল না করিয়া আর এক স্থানে নদী পার হইল। রুদেলা, আরাদঙ্গ ও প্রধান নেতাগণ প্রায় সকলে এই দলে ছিলেন। কয়েক সহস্র অশ্বারোহী-সৈন্য ছিল, রুদেলা তাহাদের নায়ক। নদী পার হইলে সৈন্য সজ্জিত হইল। সকলের অগ্রে পাঁচ শত অশ্বারোহী। ইহারা রুদেলার বাছাই-করা সৈন্য, প্রায় সকলেই দস্যু। তাহার কিছু পশ্চাতে পদাতিক সৈন্য, দুই পাশে কিছু অশ্বারোহী-সৈন্য, সর্ব্ব পশ্চাতেও একদল অশ্বারোহী।

যেখানে নদীর পাড় কিছু উঁচু, সৈন্য সেইখানে শ্রেণীবদ্ধ হইল। সম্মুখের নিম্নভূমিতে অশ্বারোহীরা নামিতে লাগিল, তাহাদের পিছনে ঘনশ্রেণী পদাতিক সৈন্য দলে দলে আসিল। অশ্বারোহীরা দেখিল তাহাদের সম্মুখে উচ্চ স্থানে অপর পক্ষের কয়েক জন অশ্বারোহী প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল কয়েক জন প্রহরী।

রাত্রি অবসান হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয়ের আভা, আকাশ পরিষ্কার, প্রভাতের মৃদুমন্দ শীতল পবন বহিতেছে। রুদেলা পঞ্চ শত অশ্বারোহী লইয়া বেগে উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া সম্মুখের অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা সংখ্যায় অল্প, যুদ্ধ করিল না, অশ্বের মুখ ফিরাইয়া সবেগে এক পার্শ্বে চালনা করিল। রুদেলা দেখিলেন সম্মুখে বিপুল শত্রুসৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমে কিছু অশ্বারোহী, তাহার পশ্চাতে দলবদ্ধ বহুতর পদাতিক, তাহার পশ্চাতে আবার অশ্বারোহী। রুদেলার

অশ্বারোহী সৈন্য দেখিয়াই রাজা শিশেরার সৈন্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। দুই পার্শ্ব দিয়া কতক অশ্বারোহী সৈন্য ও অনেক সহস্র পদাতিক রুদেলার অশ্বারোহীদিগকে দুই পাশে রাখিয়া তাহাদের পশ্চাতের নিম্নস্থানে পর্ব্বত শিখরযুক্ত জলপ্রপাতের ন্যায় নামিতে লাগিল। নামিবার সময় দুই ভাগ আবার মিলিয়া এক হইল, দুই সৈন্য স্রোতে, এক নিম্ন-মুখ, অপর ঊর্দ্ধ-মুখ, তুমুল সংঘর্ষ হইল। রাজপক্ষের অবশিষ্ট অশ্বারোহী ও অপর সৈন্য রুদেলার পঞ্চশত অশ্বারোহীকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিল।

রুদেলা ফিরিয়া পশ্চাতের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার পশ্চাতের সৈন্যরাও তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিত। তিনি পশ্চাতে ফিরিয়াও চাহিলেন না। উলঙ্গ অসি মাথার উপর ঘুরাইয়া, সৈন্যের কোলাহল ডুবাইয়া ভেরী নিনাদের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—আমার পশ্চাতে আইস! ইঙ্গিত মাত্র তাঁহার বিচিত্র বেগবান অশ্ব শত্রুসৈন্যে প্রবেশ করিল। আকৃষ্ট ধনুকের ছিলা হইতে যেমন পুঙ্খবান শর নির্গত হয় সেইরূপ বেগে পাঁচশত অশ্বারোহী রুদেলার সঙ্গে রাজা শিশিরার সৈন্যদলে প্রবেশ করিল। রুদ্ধদ্বারে বহুহস্তবাহিত ভীম লৌহদণ্ড প্রচণ্ড বেগে আহত হইলে যেমন দ্বার-অর্গল ভগ্ন হইয়া ঝনঝনা রবে পতিত হয় সেইরূপ রাজপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। পদাতিক সৈন্যেরাও সে বেগ রোধ করিতে পারিল না। রুদেলার মূর্ত্তি রুদ্ররূপ ধারণ করিল। চক্ষে সমরোল্লাস, বাহুতে খড়্গ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, শত্রু প্রণাশী মহাবীর!

দেখিতে দেখিতে রুদেলা শিবিরের উপর গিয়া পড়িলেন। রাজপক্ষের কতক সৈন্য ইতিপূর্ব্বেই হটিয়া শিবিরের অভিমুখে আসিয়াছিল। শিবির শূন্য, সৈন্যেরা যাহাতে শত্রুসৈন্য সহজে নদী পার হইতে না পারে সেই জন্য তাহাদের পথ অবরোধ করিয়াছিল, পশ্চাৎ হইতে শত্রু আসিতেছে জানিয়া তাহারা শিবিরের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবিরের ভিতর দিয়া অশ্বারোহী সৈন্য বেগে যাইতে পারে না সুতরাং রুদেলার সৈন্যদিগকে অশ্বের বেগ সংযত করিতে হইল।

বেথর শিবিরের সৈন্যদিগের সঙ্গে ছিল। তাহার সঙ্গে দুই শত দীর্ঘ ভল্লধারী যোদ্ধা শিবিরের প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছিল। তাহারা তিন স্তরে বিভক্ত, একশ্রেণীর পশ্চাতে আর এক শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে।

দুই হস্তে ভল্ল দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া তাহারা রুদেলার অশ্বারোহীদিগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। যেমন যেমন অশ্বারোহীরা বেগে আসিতে লাগিল ভল্লধারিগণ অমনি ভল্লের তীক্ষ্ণাগ্রভাগ অশ্বের বক্ষে বিদ্ধ করিতে লাগিল। অশ্বগন পতিত হইতেই তাহারা ভল্ল দ্বারা অশ্বারোহীদিগকে বধ করিতে লাগিল। ভল্লধারী কেহ হত বা আহত হইলেই পিছন হইতে আর একজন তাহার স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়। রুদেলা বার বার তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু সেই উত্থিত ভল্ল-শ্রেণীর প্রাচীর ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। ভল্লধারীদিগের সম্মুখে মৃত অশ্ব ও অশ্বারোহী স্তূপাকারে পতিত হইল তাহাতে অশ্বারোহীদিগকে আক্রমণের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। বহুতর অশ্ব ও অশ্বারোহী নিহত হইল দেখিয়া রুদেলা নিরস্ত হইলেন।

শিবিরের সৈন্যগণ নদীতীর পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে দেখিয়া পরপারের সৈন্যগণ নদী পার হইল। সর্ব্বত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজপক্ষের সেনাপতি রাজা শিশেরাকে সৈন্যের মধ্যস্থলে রাখিয়া নদীতীরের উচ্চস্থান অধিকার করিলেন। শিবির হইতে সে স্থান পর্য্যন্ত রাজা শিশেরার সৈন্যে পরিপূর্ণ। বেথর ভল্লধারীগণের সহিত শিবিরের প্রবেশমুখ অটলভাবে রক্ষা করিতে লাগিল। রুদেলার সৈন্য দুইভাগ হইয়া গেল, একভাগ শিশেরার সেনাপতির সম্মুখে আর একভাগ শিশেরার দিকে। রুদেলা দেখিলেন এরূপ ভাবে যুদ্ধ হইলে তাঁহার পরাজয়ের সম্ভাবনা, কেন না একে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা রাজসৈন্যের তুলনায় কিছু কম তাহাতে তাঁহার সৈন্য দুই ভাগ হইলে একে একে দুইভাগই পরাজিত হইতে পারে। তিনি যে পাঁচশত অশ্বারোহী লইয়া ঝঞ্ঝাবেগে শিবির আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য শিবিরের সৈন্যগণ পরাজিত হইলেও শিবির তাঁহার হস্তগত হইলে এবং নদীপারে সৈন্যগণ তাঁহার সহিত সমবেত হইলে তিনি রাজা শিশেরার সৈন্যদিগকে বেষ্টন করিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ

করিবেন ও যেখানে রাজসৈন্য অপেক্ষাকৃত বলহীন বিবেচনা হইবে সেইখানে তিনি প্রবেশ করিয়া ব্যূহ ভেদ করিবেন। কিন্তু বেথর ও তাঁহার ভল্লধারীরা তাঁহার গতিরোধ করিল। যে সকল সৈন্য নদী পার হইল রুদেলা তাহাদিগকে আদেশ করিলেন শিবিরের সম্মুখে যুদ্ধ না করিয়া কিছুদূর ঘুরিয়া গিয়া তাহার অপর সৈন্যের সহিত মিলিত হউক। যুদ্ধক্ষেত্র এরূপ প্রসারিত না হইয়া সঙ্কীর্ণ হওয়া উচিত, যাহাতে একস্থানে সমস্ত বলের পরীক্ষা হয়। নবাগত সৈন্যগণ তাঁহার আদেশমত শিবিররক্ষকদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া শিবির এক পার্শ্বে কিছুদূরে রাখিয়া নিজের পক্ষের অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে চলিল।

তীরের উচ্চস্থানে অশ্বারোহণে দাঁড়াইয়া সেনাপতি চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। শত্রুর নূতন সৈন্য শিবির ছাড়াইয়া ঘুরিয়া অপর সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে আসিতেছে দেখিয়া তিনি একদল অশ্বারোহী ও একদল পদাতিককে তাহাদের পথ রোধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পাঠাইলেন। রুদেলার একশত অশ্বারোহী হত হইয়াছিল, বাকি চারিশত লইয়া তিনি তীরের ন্যায় ধাবিত হইলেন। ওদিকে আরাদ কিছু সৈন্য লইয়া সৈন্যবল হইতে মুক্ত হইয়া অগ্রগামী রাজসৈন্যের অনুসরণ করিলেন।

এই স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে আরাদের সৈন্য আর রাজপক্ষের সৈন্যদিগের সহিত সংগ্রাম, তাহার পর রুদেলার অশ্বারোহীগণ ঝঞ্ঝাবেগে আসিয়া পড়িল। নদী পার হইয়া যে সকল সৈন্য আসিয়াছিল তাহারাও আসিয়া জুটিল। রাজপক্ষের অশ্বারোহী দল রুদেলার পথরোধ করিতে পারিল না। তাহারা দুই পাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। পদাতিকগণ রুদেলার অশ্বদলের পদতলে দলিত হইতে লাগিল। রাজসৈন্য বিনষ্ট হয় দেখিয়া সেনাপতি আরও সৈন্য পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া নদীপার হইতে আগত নূতন শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিল। রুদেলা তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য সদলে ধাবিত হইলেন। সেই অবকাশে পূর্ব্বাগত রাজসৈন্য আবার শ্রেণীবদ্ধ হইল। শত্রুসংখ্যা অধিক দেখিয়া রুদেলা নিজের সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার সৈন্যগণ অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত মিলিত হইল কিন্তু বহু-সংখ্যক সৈন্য হত ও আহত হইল।

উভয়পক্ষের বিমান সমূহ আকাশে ভ্রমণ করিতেছিল। আকাশ হইতে বিমানের আরোহীরা যুদ্ধ অবলোকন করিতেছিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহারা যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। নীচে চারিদিকে সৈন্য, আকাশে বিমানে বিমানে যুদ্ধ হইলে কোন বিমান ভগ্ন অথবা প্রজ্জ্বলিত হইয়া স্বপক্ষের সৈন্যের উপর পতিত হইতে পারে। যুদ্ধে জয় পরাজয় আকাশে হইতে পারে না। যদি উভয় পক্ষের সকল বিমান বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলেও যুদ্ধের মীমাংসা হইবে না। ভূতলে নদী তীরে যে যুদ্ধ হইতেছে তাহাতেই যুদ্ধের ফলাফল স্থির হইবে। ইহা জানিয়া দুই পক্ষের বিমান পরস্পরকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে নাই। দুই দল আকাশের দুই দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছিল, উভয় পক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবার কোন চেষ্টা ছিল না। আকাশে বিমান-যন্ত্রের শব্দ, নীচে সৈন্যের কোলাহল, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষারব।

তলিতা নিঃশব্দে আকাশে বিচরণ করিতেছিল। আরাতামা স্বয়ং চালনা করিতেছিলেন, সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ সেনানায়ক। আরাতামা আকাশে অধিক উপরে উঠেন নাই, বিমান হইতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন। আবার সেই রত্নবণিক! বিস্ফারিত বিমুগ্ধনয়নে আরাতামা সেই বীরের বিচিত্রবীর্য্য দেখিতে লাগিলেন। সমস্ত সৈন্যে উভয়পক্ষে এমন শূর আর। নাই। অশ্বের উল্কা তুল্য বেগ, সূর্য্য কিরণের ন্যায় দীপ্ত অসির অবিশ্রান্ত সঞ্চালন, রূপবান যুবকের হাস্যপ্রদীপ্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি! এই রুদ্রমূর্ত্তি ভীষণ নয়, সমরাঙ্গনের তীব্রোজ্জ্বল মোহন প্রতিমূর্ত্তি! যেখানে যুদ্ধ প্রবল সেইখানেই এই বীরের আবির্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত অশ্বারোহী দল। অশ্বারোহীর সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল কিন্তু সর্ব্বাগ্রে এই যে বীর ইহার অঙ্গে কখন কোন আঘাত লাগে নাই। স্বয়ং অক্ষত শরীর, অশ্বও অক্ষত।

সঙ্গীকে আরাতামা জিজ্ঞাসা করিলেন,—শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক কে?

—সেনাপতি রুদেলা। এই ব্যক্তি সমস্ত সৈন্যের নায়ক। ইহার সাহায্য না পাইলে আরাদ কি করিতে পারিতেন

আরাতামা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। দস্যুদের দলপতি কি দেখিতে এই রকম হয়? দস্যুরা নৃশংস, দুর্ব্বল দেখিয়া পীড়ন করে, নিরস্ত্র লোককে হত্যা করে, সুযোগ পাইলে লুণ্ঠন করে। দস্যু কি কখন এমন বীর হয়, দেখিতে এমন সুপুরুষ হয়? ইহার সহিত কি আবার সাক্ষাৎ হইবে? শত্রুর সহিত মিত্রভাবে কেমন করিয়া দেখা হইবে? যদি যুদ্ধে এ ব্যক্তি নিহত হয় যুদ্ধের অন্য সকল ঘটনা উপেক্ষা করিয়া আরাতামা নির্ণিমেষ নয়নে রুদেলাকে দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ যুদ্ধক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। যে উচ্চ স্থানে রাজপক্ষের সেনাপতি সৈন্যবল লইয়া অবস্থিত ছিলেন রুদেলা ও আরাদ বার বার সেই স্থান আক্রমণ করিতে লাগিলেন। সে ব্যূহ একবার ভেদ করিতে পারিলে এবং রাজসৈন্যদিগকে সে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিলে রুদেলার জয়ের সম্ভাবনা, কারণ তাহা হইলে রাজা শিশেরার সৈন্যশ্রেণী ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তুফান উঠিলে সাগরতরঙ্গ যেমন সমুদ্রবেলা অতিক্রম করিয়া তীরের উচ্চস্থানে আঘাত করে রুদেলার সৈন্যগণ সেইরূপ রাজসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তীরস্থিত পর্ব্বতে আহত হইয়া বিশাল প্রচণ্ড তরঙ্গ যেমন ব্যর্থ হয়, উদ্বেলিত ফেনকিরীটি সলিলরাশি যেমন সাগরগর্ভে ফিরিয়া যায় রুদেলার সৈন্যগণ সেইরূপ ব্যর্থ-উদ্যম হইতে লাগিল। রাজার অশ্বারোহী সৈন্যসমূহ সারি দিয়া সৈন্য মুখে দাঁড়াইয়াছিল। রুদেলা বাছা বাছা সৈন্য লইয়া সেই অশ্ব-প্রাচীর ভাঙ্গিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার সৈন্যগণ উর্দ্ধে, তিনি অধোভাগে। যদি উপরের অশ্বারোহীরা আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারে তাহা হইলে পশ্চাৎ হইতে পদাতিক-গণ অগ্রসর হইয়া উর্দ্ধগামী অশ্বদিগের বক্ষে বর্শা বিদ্ধ করে। আবার যখন পদাতিকগণ ভীমনাদ করিয়া উচ্চ অধিকার করিতে আসে তখন দৃঢ় সজ্জিত সৈন্য দ্বারা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ চলিল। উভয়পক্ষে বহুতর সৈন্য বিনষ্ট হইল, কিন্তু রুদেলা কোনমতে রাজপক্ষীয় সৈন্যদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। রাজা শিশেরা ও সেনাপতি কেবল আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিলেন। সন্ধ্যার পর যুদ্ধের অবসান হইল। রাজা এবং সেনাপতি অটলভাবে সেইখানেই সৈন্যরক্ষা করিলেন। রুদেলা ও আরাদ কিছুদূরে গিয়া সসৈন্যে বিশ্রাম করিলেন। সন্ধ্যার সময় পাখী যেমন আকাশ ছাড়িয়া যায় উভয়পক্ষের বিমান সমূহও সেইরূপ অদৃশ্য হইল।

(ক্রমশঃ)

রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম শাস্ত্রীয় বিচার

শ্রী নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ডাক্তার ভিঃ রায় মহাশয় প্রায় বার' বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামপুর কলেজে প্রাপ্ত হন ইহা সংস্কৃত প্রেসে ছাপা হইয়াছিল কিন্তু প্রকাশের তারিখ নাই। ইহার সম্পাদন-কার্য্য বন্ধুবর শ্রী সরোজকুমার দাস ও শ্রী প্রতুলচন্দ্র সোম মহাশয় আমার হস্তে ন্যস্ত করেন। আমি যে পাণ্ডুলিপি পাই তাহার অনেক স্থানে ভ্রমসংশোধন ও অর্থানুযায়ী শুদ্ধি করিতে হইয়াছে। এ-বিষয় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, কারণ ইহাতে ভাব ও ভাষার একত্র অনুবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

পুস্তকখানি রাজার ধর্ম্ম-বিষয়ক বিচার কালের ও তাঁহারা

গ্রন্থাবলীর বিচার বিভাগের অন্তর্গত। ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রকৃষ্ট ভাগের উত্তরটি রাজা বিশ দিনের মধ্যেই দান করেন। যখন আত্মীয় সভায় বিচার চলিত, সেই সময় শ্রী ভৈরবচন্দ্র দত্ত, শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার দ্বারা এই উত্তর প্রত্যুত্তর আদান প্রদান হয়। ১২২৫ সালে (১৮১৬ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ রাজার কলিকাতা বাসের পর এক বৎসর গত হইলে, এই বিচার হয়, এবং মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন।

পণ্ডিতগণের সহিত রাজা যে পাঁচটি বিচার করেন তন্মধ্যে এইটিই প্রথম বিচার। কায়স্থের সঙ্গে বিচার ধরিলে সর্ব্বসমেত সাতটি হয়। পণ্ডিত উৎসবানন্দের সঙ্গে এই বিচারটি রাজার গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাই এবং তাহার নামও গ্রন্থাবলীর কোন স্থানেই পাওয়া যায় না। আত্মীয় সভা স্থাপনের পরের বৎসরে উৎসবানন্দ রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ইং ১৮১৫ সালে এই সভা আরম্ভ হইয়াছিল ও ইহাতে রাজার বিশেষ বন্ধুগণ যোগদান করিতেন ও বন্ধুভাবে পরস্পরের মধ্যে পরমার্থতত্ত্বের অনুসন্ধান করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে, ইং ১৮১৫ সালে, রাজার বেদান্ত-গ্রন্থ ও ইং ১৮১৬ সালে বেদান্ত-সার প্রকাশ হয়। ইং ১৮১৭ সালে শঙ্কর শাস্ত্রী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (ডাক্তার মার্স‌ম্যানের মতে বাঙ্গালার জন্‌সন্) ইনিই ইং ১৮১৮ গোস্বামী,—ইং ১৮১৯ সালে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী এবং ইং ১৮২০ সালে কবিতাকারের সহিত রাজা বিচারে প্রবৃত্ত হন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সম্পাদিত ইং গ্রন্থাবলী তিন পৃষ্ঠা, এই সময়ের মধ্যে দুইখানি উপনিষৎ ও দুইখানি সহমরণ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হয়। অতএব ইং ১৮১৬ সালে উৎসবানন্দের সঙ্গে বিচারই যে সর্ব্বপ্রথম ও উৎসবানন্দ যে রাজার বেদান্তগ্রন্থ পাঠে বিচারে প্রণোদিত হন তাহার সন্দেহ নাই। তিনি স্বয়ং এইরূপ আভাসও বিচারের মধ্যেই দিয়াছেন অবশ্য শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচার ব্যতিরেকে সকলগুলিই লোকদ্বারাপ্রেরিত উত্তর-প্রত্যুত্তর আদান প্রদানের দ্বারাই চালিত হয়। কেবল সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া বিচার হয়। শঙ্কর শাস্ত্রী মাদ্রাজ কুরিয়র পত্রে রাজাকে আক্রমণ করেন ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী শ্রীবেহারীলাল চৌবের বাটীতে রাজাকে আহ্বান করেন। এই বিশেষ অধিবেশনে রাজা বাক্-তর্কের দ্বারা সাধারণের সমক্ষে বিচারে জয়ী হন। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক পণ্ডিত সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন ; ইচ্ছা ছিল যে, পণ্ডিতগণের দ্বারা রামমোহনকে পরাভূত দেখেন, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার সমক্ষে গ্রন্থগত পাণ্ডিত্য দাঁড়াইবার স্থানমাত্রও পায় নাই। ইহার পরই আত্মীয় সভা বন্ধ হইয়া যায়। (নগেন্দ্র-বাবুর রাজা রাম মোহন রায় ৩০১ পৃষ্ঠা)।

॥ ৩৪ ॥

ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়। এপ্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে আমাদিগে স্বপ্রয়োজন পর করিয়ালিখিয়াছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞলোকের বিবেচনায় রহিল। হেসর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বর তুমি আমাদিগ্যে হিংসামৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবর্ত্ত করাইবেনা ওঁতৎসৎ। ইতি শকাব্দা ১৭৩৯ ॥ ১৩ জ্যৈষ্ঠশ্য ॥

গোস্বামীর সহিত বিচার

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথবন্দ্যোপাধ্যায়স্য

উৎসবানন্দের বিচারে আত্মীয় সভার সভ্যগণ বিশেষ ভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যেহেতু তিন জনের নাম ইহাতে তিনটি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যে তিন জন উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম শ্রীভৈরবচন্দ্র দত্ত সকলের বিশেষ পরিচিত, কারণ ইনিই বেথুন কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কৃত রাজার জীবন চরিত, ৪১ পৃষ্ঠা)। দ্বিতীয় জন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়*—"যিনি আত্মীয় সভার নির্ব্বাহক ছিলেন, তাঁহার অতি কপট ব্যবহার ছিল, তিনি রাজার সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মে অচলা ভক্তি জানাইতেন, অথচ শ্রীহরিমোহন ঠাকুরের নিকট প্রত্যহ গমন করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দৃঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।" (তত্ত্ববোধিনী, ৫, ১৭৬৯)। ইঁহার নাম আর পরে পাওয়া যায় না। তাই অনুমান করা যায়, যে, শ্রীজয়কৃষ্ণ সিংহের ন্যায় ইনি আত্মীয় সভা বন্ধ হইবার পর, এবং শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় সহমরণ-বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ে রাজার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন (নগেন্দ্র বাবুর রাজা রামমোহন রায়, ২৯৯; ৩৫৯ পৃষ্ঠা)। ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনের সময় বোধ হয় ইনি উপস্থিত ছিলেন না। বৈষ্ণবদের মধ্যে গমনাগমন করায় সম্ভবতঃ ইনি উৎসবানন্দকে পাইয়াছিলেন ও রাজার সঙ্গে পরিচয় করাইয়াছিলেন, যদিও পরে স্বয়ং অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। তৃতীয় জন শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরকার। এখনও ইঁহার বিষয় বেশি কিছু জানা যায় নাই।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই, যে, বৈষ্ণব মত অনুসারে বিষ্ণুর সর্ব্বোচ্চদেবত্ব ব্রহ্মপদ বাচ্য রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ উৎসবানন্দ রামানুজ মতাবলম্বী ছিলেন ও সেইজন্য বিষ্ণুকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা দেখাইয়াছেন, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবদের দেবতা স্ব স্ব পূজকের নিকটই প্রধান মাত্র; এমত স্থলে কাহাকে স্বীকার ও কাহাকে অস্বীকার করা যায় অথবা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা উচিত এই সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়ে। তাঁহারা বেদ বেদান্তোপদিষ্ট পরম ব্রহ্ম কোন প্রকারেই হইতে পারেন না এবং এ নিমিত্ত অনেক যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিচারের মধ্যে শাস্ত্র হইতে অনেক উদ্ধৃত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে; অনেকগুলির মূল এখনও ঠিক করিতে পারা যায় নাই; যতগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ন্যায়, রাজার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এই সিদ্ধান্ত এই পুস্তক হইতে প্রতীয়মান হয় (নগেন্দ্রবাবুর রাজা রামমোহন রায় ১০৩ পৃষ্ঠা)। সে সময়ে একাধিক উৎসবানন্দ ছিলেন না ইহাও নিশ্চয়; এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ দুই ব্যক্তি হইতে পারেন না। দুই জন এত বড় পণ্ডিত এক সময়ে, এক স্থানে ও এক নামে হওয়া সম্ভবপর হয় না। উৎসবানন্দ রাজার দ্বারা স্বমতে আনীত না হইলে ইং ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে তাঁহার শাস্ত্র পাঠ করার কোনও সম্ভাবনা হইত না। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দুই জনেই সমভাবে সে সময়ে স্বীয় কার্য্য করিয়াছিলেন এবং দুই জনের নামই একসঙ্গে ও একভাবে উল্লেখ করা আছে। রাজা এই সকল কৃতবিদ্য পণ্ডিতদিগকে নিজ মতে আনয়ন করিয়া তাঁহার সমাজকে জ্ঞানের ও ভক্তির ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন। যেমন পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শ্রীযুক্ত আডাম্ তাঁহার মেধা ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় দেন, সেইরূপ মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশও তাঁহার মাহাত্ম্যের ঘোষণা করেন। এই প্রসঙ্গে রাজার সার্ব্বজনীন প্রেমে আবদ্ধ পরিব্রাজক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকেও স্মরণ করা উচিত, কারণ তিনিও স্বীয় উপস্থিতির দ্বারা আত্মীয় সভাকে সম্যক্ অলঙ্কৃত করিতেন, ও তাঁহার সহানুভূতি রাজার অতীব প্রিয় ছিল।

রাজার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তক অত্যধিক সাহসিকতার সহিত সম্পাদন করিতে হইয়াছে ও তজ্জন্য একটি বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অল্প বিস্তর ব্যাখ্যাও দেওয়া হইবে এবং মৎপ্রণীত রাজার ইংরেজী জীবনীতে ইহার প্রয়োজনীয় সমালোচনা করা হইয়াছে।

* ইঁহারই হস্তলিপির চিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

আপন-পর

শ্রী শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(১১)

গোলক ধাঁধার মোড় ঘুরিতেই যত বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত। প্রকাশেরও তাহাই ঘটিল, এবং এমনি কোন বিপর্য্যয়ই তাহার বর্ত্তমান বৈচিত্র্য-শূন্ত জীবনের গুটিগুলি বদলাইয়া দিয়া গেল।

সেদিন প্রকাশ আপিস আসিতেই বিনয়বাবু উঠিয়া আসিয়া বলিলেন,—শুনেছ প্রকাশ, তোমাকে রাণীগড় কারখানায় বদলি করেচে?

প্রকাশ অবাক হইয়া গেল। সে জানিত যে রাণীগড়ে কোম্পানির একটা মস্ত কারখানা আছে, কিন্তু তাহাকে যে সেই সুদূর দেশে যাইতে হইবে এমন কথা সে কথনো কল্পনাও করে নাই।

বিনয়বাবু বলিতে লাগিলেন,—আশুতোষ বাবু অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁর জায়গাটিতে তোমাকে পাঠাচ্ছে। সাহেব সব নিজে দেখে শুনে তোমাকেই বেছে নিয়েছেন। বড়বাবু কিন্তু যশোদার নাম 'সজেষ্ট' করেছিলেন।

—কেন? সে কি যেতে চায়?

—তা চাইবে না? আশুতোষ বাবু ছিলেন সেখানে একটা ডিপার্টমেণ্টে কেরাণীদের হেড্। তা ছাড়া পোষ্টটার মাইনেও বেশি!

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশ কহিল,—তা হোক। আমার যাওয়া হ'তে পারে না বিনয়দা। পীড়িতা স্ত্রীকে ফেলে রেখে কিছুতে যেতে পারব না।

বিষণ্ণমুখে বিনয়বাবু বলিলেন,—সে কথা ঠিক। এ অবস্থায় তোমায় যেতে বলিই বা কেমন ক'রে।

তথন ঝাঁকে ঝাঁকে বাবুরদল প্রকাশকে অভিনন্দন করিবার জন্ত আসিয়া জুটিতেছিল।

—খুব জোর বরাত প্রকাশ বাবুর। বছর খানেক মাত্র চাকরি হ'ল, এরি মধ্যে বাগিয়ে নিলেন।

—তা আর বল্‌তে? নৈলে এত লোক প'ড়ে আছে—

—কেউ কেটা নয় দাদা—গ্রাজুয়েট। দেখ্‌ছ না, প্যাথোম ধ'রে ব'সে আছেন।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শেষোক্ত শ্লেষটি করিলেন যশোদা বাবু। সকলের হাস্তে উৎসাহিত হইয়া তিনি আবার বলিলেন, ভায়া দেখতে দিব্যি ভাল মানুষটির মত মুখটি গুজে কাজ ক'রে যান, কখন আসেন কখন যান কেউ টেরও পায় না। কিন্তু, হেঁ হেঁ, দেখচ ত—তালে ঠিক আছেন।

প্রকাশ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোথা যাচ্ছ?

—সাহেবের কাছে।

যশোদার দিকে ফিরিয়া একটু ম্লানহাস্তে সে বলিল,—আমি যাচ্ছি বল্‌তে যে আমার সেখানে যাওয়া হবে না। সুতরাং আপনার নিরুৎসাহ হবার কিছুমাত্র কারণ নেই, যশোদাবাবু।

যশোদাবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। আশে-পাশের সকলকেই সালিশ মানিয়া কহিলেন,—শুনলেন ত মতিবাবু, শুনলেন ত সত্যবাবু। আচ্ছা, আপনারাই বলুন আমি কি ওকাজ চেয়েছি, না ওর জন্ত চেষ্টা করেছি। আরে মর, আমিই যদি চেষ্টা করতুম তা হ'লে কি আজ যাঁড়ের কপালে সিঁদুর পড়ে?

প্রকাশ উপরে সাহেবের ঘরের বারান্দায় উঠিয়া আসিল, এবং চাপরাশিকে দিয়া সাক্ষাতের অনুমতি লইয়া ঘরে ঢুকিল।

সাহেব কাজে নিবিষ্ট ছিলেন, প্রকাশ সেলাম করিয়া কাছে দাঁড়াইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

—তোমাকে রাণীগড়ে বদলি করেছি, তা বোধ করি জান?

প্রকাশ কহিল,—আমার উপর আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ,

সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু স্যার, আমার একটি নিবেদন আছে। যদি অনুমতি করেন—

কলমদানের উপর কলমটি তুলিয়া রাখিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল,—কি বল্‌তে চাও?

প্রকাশ কহিল,—আজ্ঞে আমার স্ত্রী বহুদিন ধ'রে অসুখে ভুগ্‌চে। কেউ নেই যে শুশ্রূষা করে। শীঘ্র যে আরাম হ'য়ে উঠবে এমন লক্ষণ দেখচি না। এরূপ অবস্থায় আপনার এই অনুগ্রহ, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে—

বিষয়টি সংক্ষেপ করিয়া সাহেব বলিলেন,—মোট কথা, তোমার স্ত্রীর অসুখ তাই তুমি যেতে চাও না। এই ত?

ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ কহিল—আজ্ঞে হাঁ।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সাহেব কহিলেন,—দেখ প্রকাশ বাবু, তোমার কাজ দেখে আমি তোমার উপর খুব খুসী হয়েছিলাম। তাই এ কাজটা তোমায় দিতে চেয়েছি, নৈলে এ রকম একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ তোমার মত একজন জুনিয়রকে দেওয়া খুবই দুঃসাহসের কর্ম্ম সন্দেহ নেই। একটা কথা মনে রেখ, এমন সুযোগ কিছু বার বার এসে দেখা দেয় না। ভালরূপে কাজ করলে এই পদে উন্নতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। এসব বিবেচনা করে যা হয় স্থির ক'রে কাল এসে আমায় জানিও। গুড্ বাই।

আফিসে ফিরিয়া নিজের স্থানটিতে সারাটিক্ষণ সে বসিয়া রহিল। সাহেবের কথাগুলি তাহার মনের ভিতর বিষম দোল দিয়া দিয়াছিল। অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিগুলি মনের তুলাদণ্ডে ওজন করিতে করিতে সে বিনয়বাবুর দিকে ফিরিল,—আচ্ছা বিনয়দা!

—কি ভাই।

—সেখানে কি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না?

একটু চিন্তা করিয়া বিনয়বাবু কহিলেন,—নূতন অপরিচিত স্থান, তার উপর দূরের রাস্তা। এমন অবস্থায় সাধারণ ক্ষেত্রেও পরিবার সঙ্গে নিলে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা। অসুস্থ স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়া একেবারেই চলে না, প্রকাশ

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আপিস হইতে বাহির হইয়া প্রকাশ গঙ্গার রাস্তা ধরিল। পথটি নিরিবিলি, গাড়ী ঘোড়ার ভিড় নাই। কুয়াশার মত একটু আবছায়া গোধূলির আবরণ সবেমাত্র জমিতে সুরু করিয়াছিল।

পিছন হইতে কে ডাকিল,—কেও, প্রকাশ?

প্রকাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কাহাকেও দেখিল না। সেই জনবিরল রাস্তাটির পার্শ্বে অনতিদূরে কেবলমাত্র একটি লোক অন্যদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নাম ধরিয়া কে ই বা ডাকিল, কোথায়ই বা সে—ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া প্রকাশ একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময় সেই লোকটি ঘুরিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, কেমন ধরেছি বল ত! কলকাতার রাস্তা, কে জানে কাকে না কাকে ডেকে শেষে অপ্রস্তুত হ'তে হবে। তাই এই ফিকিরটা করা গেল, একটিবার মাত্র হাঁকলুম—প্রকাশ!—ব্যস! তুমি যদি প্রকাশ হও, অমনি ফিরে দাঁড়াবে—আর না যদি হও, সুড় সুড় করে চলে যাবে।—বলিয়া সে এক চোট হাসিয়া লইল।

প্রকাশও হাসিল। লোকটিকে সে চিনিয়াছিল, সে মেসের সেই শ্যামবাবু।

শ্যামবাবু বলিলেন,—যাক্, ভোল নি দেখচি। তোমার চেহারাটা কিন্তু অনেক বদ্‌লে গেছে। চলন ঠিক তেমনি আছে, সেই ঝুলে ঝুলে চলা। তারপর, কি করা হচ্ছে এখন?

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া প্রকাশ কহিল,—এই একটা কাজ।

শ্যামবাবু হাসিয়া উঠিলেন,—কাজ তা ত বুঝলাম। কি কাজ তাই জিজ্ঞেস করচি।

—এমন বিশেষ কিছু নয়। মার্চ্চেন্ট আপিসে একটা সামান্য রকমের—

—ও কেরাণীগিরি! তাই বল। তোমায় দেখেই কিন্তু আমার সেটা—অনুমান ক'রে নেওয়া উচিত ছিল।

অকস্মাৎ অসন্তোষের বহ্নি আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রগলভ লোকটির কাছে আত্ম-সম্মান খাটো করিতে প্রকাশ কোন মতে পারিল না। রুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল, কাজটা মন্দ নয়, শ্যামবাবু। উন্নতির

সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। আজই আপিসে সাহেব আমাকে একটা ভাল কাজে বাহাল কর্‌বার প্রস্তাব করেছেন।

—বল কি? বেশ, বেশ! খুব খুসী হলুম। তার পর চাপা গলায় যেন কত বড় একটা গোপন কথা ব্যক্ত করিতেছেন এমনি ভাবে তিনি বলিয়া গেলেন,—কি জান প্রকাশ, স্ত্রী-পুত্রকে দুটি খাওয়াতে পারলেই আমাদের মানবজন্ম সার্থক হ'য়ে গেল, এই সংস্কারটা আমাদের চরিত্রে একেবারে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে; যতদিন এইসংস্কার মন থেকে একেবারে উপড়ে ফেল্‌তে না পারি, ততদিন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। সেই যে তখন কলসীর ভিতর দৈত্যের গল্পটা বলতুম মনে আছে? আমাদের প্রত্যেকের মনের ভিতর তেমনি এক একটা প্রকাণ্ড দৈত্য জিয়িয়ে রাখতে হবে।

প্রকাশ কহিল,—কিন্তু তাতে লাভ কি? মনকে মিছামিছি পীড়ন করা বৈ ত নয়।

শ্যামবাবু কহিল, পীড়ন! পীড়ন যে করতেই হবে, প্রকাশ। সেই সত্যযুগের আমল থেকে মুনি-ঋষিরা দেহকে যথেষ্ট পীড়ন করে আস্‌চেন, আজ যদি সত্য সত্যই মনের পীড়ন দরকার হ'য়ে থাকে, তবে তা' না ক'রে পালিয়ে বেড়ান কাপুরুষের কাজ।

প্রকাশ কহিল, কিন্তু এ সবের শেষ কোথায়? আপনি কি এমন কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখা টান্‌তে পারেন, যেখান পর্য্যন্ত আমাদের আকাঙ্ক্ষার সীমা, যেখানে পৌঁছিলে আমাদের মন তৃপ্ত হবে, আর কিছু চাইবে না? তাতো কখনো হ'বার নয়। আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলি যেমনি একে একে পূর্ণ হচ্ছে, অমনি নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনি ক'রে আমরা বরাবর অগ্রসর হ'য়ে চলেছি—কোথায়? কোন্ পথে? আমাদের লক্ষ্যই বা কি? সে সব কিছুই জানি না, জানবার প্রয়োজনও বোধ করি অনুভব করি না। অথচ কেবলি বলচি, এগিয়ে চল—এগিয়ে চল।

শ্যামবাবু কহিলেন, হাঁ, ঐ হচ্ছে আমাদের মূলমন্ত্র—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। কিন্তু কে এগিয়ে যাবে? তুমি নয়, আমি নয়—মানবজাতি এগুবে। বিবর্ত্তনের পথে মানবজাতির এই রথচক্রের তলে কত মানুষ পিষে মরবে, কত জীবন চূর্ণ হ'য়ে যাবে—তাতে কি যায় আসে? সে-দিকে ত দৃষ্টিপাত করা চলবে না। তুমি জিজ্ঞেস কর্‌বে এ সবে লাভ কি? কিন্তু যে অন্ধশক্তি বিশ্বকে এক লক্ষ্যহীন পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যার প্রাণের উদ্দাম স্পন্দন নিয়ত মানুষ জাতিকে নানা পথে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষে ঠিক পথটি আবিষ্কার ক'রে, তাই ধ'রে তাকে ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে দিচ্ছে—সেই অন্ধশক্তি কখনো লাভ-লোকসান গণনা করে না। তুমি আমি ত সেই শক্তির হাতে খেলার পুতুলমাত্র। তাই আমাদেরও লাভ-লোকসান গণনা করবার অধিকার নাই। কেবল, এগিয়ে চল—এগিয়ে চল। কোথা যাচ্ছি জেনে লাভ কি? আমরা যতদূর পারি অগ্রসর হব এবং যখন আমাদের কাজ ফুরুবে, সেই অসমাপ্ত কাজগুলির খেই ধ'রে আমাদের উত্তরপুরুষরা এগুতে থাক্‌বে। এইরূপে পুরুষানুক্রমে চলবে—অন্ধ-শক্তির বিকাশ! এর শেষ নাই প্রকাশ।

পথে লোকজন ছিল না, ল্যাম্পপোষ্টের তলে দাঁড়াইয়া তাহাদের আলোচনা বেশ জোর বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। প্রকাশ আর কিছু বলিল না, মাটির দিকে চাহিয়া আবার তাহারা পথ চলিতে আরম্ভ করিল। একটা রাস্তার মোড়ে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শ্যামবাবু বলিলেন,—আসি এখন প্রকাশ। আমি এই পথে যাব।

প্রকাশ কহিল,—কেবল আমার কথা নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা হ'ল শ্যামবাবু। আপনার খবর ত কৈ কিছু বল্‌লেন না।

শ্যামবাবু হাসিয়া উঠিলেন।—সেই দীবর—জান ত? একদিন ছিপি খুল্‌বেই,—বলিয়া একটি নাটকীয় ভঙ্গী সহকারে কপালে টোকা দিয়া জীবন্ত রহস্যের মত যেমন আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বাড়ী আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া প্রকাশ সুরবালার কাছে আসিয়া বসিল। কহিল,—সাহেব আমাকে রাণীগড় বদলি করেছে।

বিস্মিত হইয়া সুরবালা জিজ্ঞাসা করিল,—রাণীগড়? সে কোথায়?
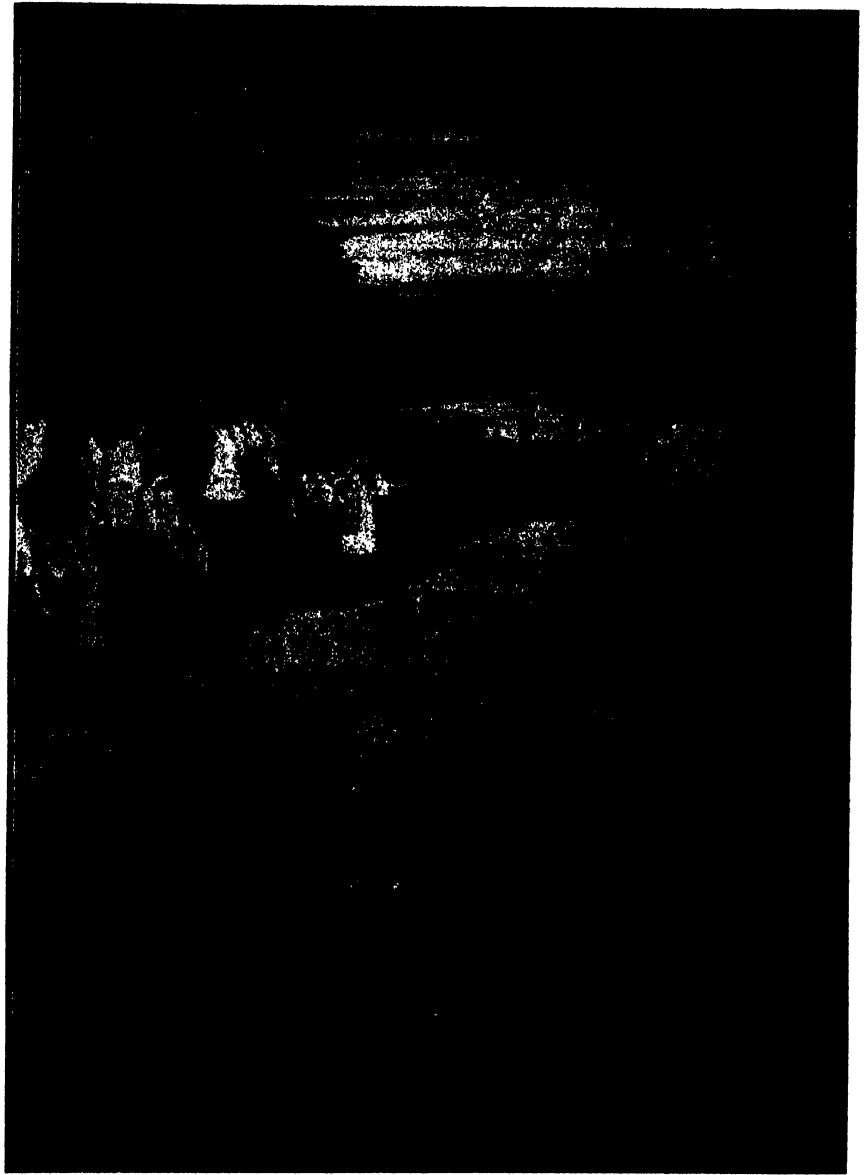
ঝুলন উৎসব

(জসম্মীর রাজ্যের মোতিমহলের দেওয়ালের একখানি চিত্র)

জসম্মীরের রাজ-এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

—অনেক দূর, পশ্চিমে। সেখানে কোম্পানীর কারখানা আছে।

সুরবালার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল।

—না গেলে ওরা আমার উপর চ'টে যাবে। আমি ত কোন উপায় দেখি না। তুমি কি বল?

—আমায় নিয়ে যাবে?—শঙ্কার সহিত কথা কয়টি জিজ্ঞাসা করিতে সুরবালার বুক দুর দুর করিয়া উঠিল।

প্রকাশ কহিল,—সে ত এখন হয় না সুর। বিদেশ বিভুঁই—একটু না দেখে শুনে তোমায় নিয়ে যেতে পারি না। আমাদের আপিসের বিনয় বাবুও সেই কথা বলছিলেন।

সুরবালা স্তব্ধ রহিল। প্রকাশ বলিয়া গেল,—মনে করচি তোমায় এখন বাপের বাড়ী রেখে আস্‌ব! তারপর সুবিধা হ'লে, এসে নিয়ে যাব। তুমি কিছু ভেব না সুর। ও কি, তুমি কাঁদ্‌চ? না না, তুমি বারণ কর্‌লে কিছুতে আমার যাওয়া হ'তে পারে না।

সত্যই সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। বারণ করিবে সে? না না, সেদিন সে যে নিজেই চন্দ্রনাথের সহিত যাইতে চাহিয়াছিল। সযত্নে প্রকাশের হাতখানি মুঠির মধ্যে টানিয়া লইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল,—না, আমি বারণ করি না। তুমি যাও।

—কিন্তু তুমি? কে তোমায় দেখবে শুন্‌বে?

—ওগো, আমার জন্য তুমি ভেব না। বাবা আছেন, চন্দ্রনাথ আছে। কথা শোন, তুমি যাও।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া তাহাদের কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। তখন আকস্মিকতার উদ্বেগ কাটিয়া গেছে, সুরবালা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিত্র কল্পনা করিয়া স্বামীকে সে অনবরত উৎসাহিত করিতে লাগিল। সে যে এমন একটি কাজ পাইয়া তাহারি জন্ত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, ভাবিতে তাহার অন্তর মধ্যে গর্ব্বের ঝিলিক খেলিয়া গেল। দেবতা জানেন, তাহার জন্ম কি না করিয়াছে এই স্বামী! এমন স্বামী তাহার—আর সে কি না একটি দিনের জন্তও তাহার পায়ে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে পারিল না! তাহার জীবন-যজ্ঞের বিপুল অনুষ্ঠান সবই যে ভস্ম হইয়া গেল। এ দুঃখ সে কোথায় রাখিবে? অতিকষ্টে উদ্গত অশ্রু নিরুদ্ধ করিয়া সে কহিল—না না, তোমায় যেতে হবে। কালই বাবাকে চিঠি লেখ।

পরদিন বিরাজ আসিয়া শুনিল। হতবুদ্ধির মতন খানিকক্ষণ স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—তুমি কেন যেতে বললে দিদিমণি? কেন বারণ করলে না?

সুরবালা বলিল,—তাও কি হয় বিরাজ। তাঁর কাজে উন্নতি হচ্ছে, আর আমি তাঁর পথে দাঁড়াব?

বিরাজ কহিল,—ছাই উন্নতি! কটা টাকার জন্য দূর দেশে গিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে। আত্মীয় স্বজন নেই, কে দেখবে শুনি?

তাহার তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া সুরবালা কিয়ৎকাল তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। কহিল,—যার আত্মীয়-স্বজন নেই, তার কোন জায়গায়ই থাকে না। তা নিয়ে দুঃখ কর্‌লে কি হবে বিরাজ? এখানেই বা আমাদের কোন আত্মীয় ছিল?

কেন জানি কথাটা বিরাজের বুকে শেলের মত গিয়া বিঁধিল। সে চেঁচাইয়া উঠিল,—তা বৈ কি দিদিমণি, নিজে আছ অথর্ব্ব হ'য়ে প'ড়ে, এখন ত ও কথা বল্‌বেই। কোথা ছিলে তুমি যখন দিনের পর দিন না খেয়েই আপিস দৌড়তে হ'ত? কোথা ছিলে তুমি যখন হোটেল ঘরের একটি কোণে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষে তাড়াতাড়িতে আধপেটা গিলে উঠে পড়তে হ'ত? এসব কি একটি বারও দেখতে এসেছিলে যে আজ তুমি তাকে যেথানে-সেথানে পাঠিয়ে দিচ্ছ, আর বল্‌চ, কোথা কার আত্মীয়-স্বজন থাকে?

সুরবালা যেন পাথর বনিয়া গিয়াছিল। তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও নিঃসৃত হইল না, শুধু বিস্মিত চক্ষুদ্বয় মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

বিরাজের ওষ্ঠাধর তখনো কাঁপিতেছিল। একটু চুপ থাকিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে সে আবার বলিয়া উঠিল,—পাঠাচ্চ—পাঠাও। যা খুশী তাই কর। আমি আর কিছু কখনো বল্‌তে আস্‌ব না। তোমাদের কথায়, তোমাদের সংস্রবে এসে পড়েছিলাম, ঝক্‌মারি হ'য়ে গেছে। কিন্তু

এই শেষ তা আজ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।—সে আর মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইল না।

বাড়ী আসিয়া বিরাজ মেজের উপর শুইয়া পড়িল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল। কোথাকার অপর্য্যাপ্ত স্মৃতি পশ্চাতে উদ্যত হইয়া তাহাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে সে সাহস করিল না। ইহারা আসিয়াছিল কেন? সে ত ইহাদের পথে গিয়া দাঁড়ায় নাই, বরঞ্চ ইহারাই কোন্ এক অজানা দেশের অজানা সংবাদ লইয়া তাহার অন্তরের নিশীথ সুপ্ত পুরীখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সে কি তবে নিশা শেষের মৃত্যুর মত এমন অকস্মাৎ চলিয়া যাইবে বলিয়া?

সারাদিন খাটুনির পর রাসু ঘোষ সবে মাত্র আসিয়াছিল। ডাকিল—বিরাজ।

বিরাজ জবাব দিল না।

জুতা জোড়া খুলিতে খুলিতে রাসু কহিল,—আহা ঢং দেখে বাঁচি না। ভূঁয়ে কেন? খাটের উপর শুলেই ত হ'ত! নে নে, ওঠ এখন বলচি। এক ছিলিম তামাক সেজে দে।—তারপর অবলুণ্ঠিত বিরাজের মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার মুখখানা ফ্যাকাসে, মুদ্রিত চক্ষুদ্বয় ঈষৎ স্ফীত। তখন শীতের অপরাহ্ণ, তথাপি তাহার ললাটের উপর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল, বিরাজ, দিনে দিনে কি যে হচ্চিস। ন্যাকামি রাখ, উঠবি কি না বল।

তথাপি বিরাজ নড়িল না। তখন একটা কুৎসিৎ গালি উচ্চারণ করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে রাসু নিজেই তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

দিন কতক পর হোটেলে একদিন খাইতে বসিয়া প্রকাশ বলিল—শ্বশুর মহাশয়ের চিঠি পেয়েছি বিরাজ। আমরা পরশু চ'লে যাচ্ছি।

বিরাজ একপাশে বসিয়া তাহার আহার দেখিতেছিল, কথাটা কানে তুলিল না। সে দিনকার ব্যাপারটার অব্যবহিত পরেই সে আবার প্রকাশের আহারের ব্যবস্থা নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছিল। আগের মত আহারের কাছে নিঃসঙ্কোচে আসিয়া বসিত, আগের মতই খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত, নানা গল্প করিত।

খাইতে খাইতে প্রকাশ বলিয়া গেল,—শ্বশুর মশায় লিখেছেন একটা ভালদিন দেখে নিয়ে যেতে। পরশু খুব ভাল দিন।

বিরাজ হাসিয়া বলিল,—কিছুই যে খাচ্ছ না, সে কি যাবার আনন্দে বাবু?

প্রকাশ মুখ তুলিয়া কহিল,—বাঃ—খেলুম না কখন? সবইত খাচ্ছি।

—এর নাম খাওয়া? আর তোমারই বা বলি কি বাবু? ঠাকুর যা রাঁধে তা কি কারুর মুখে দেবার জো আছে? বলিয়া উঠিয়া নিভৃতে ঘরের কোনে রক্ষিত একটি থালা তুলিয়া আনিয়া সামনে ধরিল।

প্রকাশ অবাক হইয়া গেল। থালার উপর একরাশ আঙ্গুল, কমলা নেবু, বাদাম, রাবড়ি, সন্দেশ প্রভৃতি উপাদেয় অপর্য্যাপ্ত ভোজ্য পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজান রহিয়াছে।

—কি সর্ব্বনাশ! এত সব খাবার কি তুমি আমার জন্য এনে রেখেছিলে, বিরাজ?

বিরাজ কহিল, এ ক'মাস হোটেলে খেয়ে বড় কষ্ট পেয়ে গেছ। আর যেন এমন ধারা কষ্ট তোমার কখনো না পেতে হয়, বাবু।

প্রকাশ বলিল,—সেই জন্যই বুঝি এই আয়োজন করা হয়েছে? ছি বিরাজ, ভাল কর নি।

বিরাজ হাসিল। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিল সব রোজগার নিজের জন্য ব্যয় না করে, যদি কেউ তারই থেকে কিছু দেবসেবায় খরচ ক'রে, তা'হলে সেটা কি এতই দোষের, বাবু?

প্রকাশ আর দ্বিরুক্তি করিল না, থালা টানিয়া লইয়া একটি একটি খাবার মুখে দিয়া নিঃশেষ করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ আহার বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া সে কহিল,—হোটেলে খেতে কষ্ট হয়েছে এমন কথা বল না বিরাজ। তুমি আমার জন্য যা করেছ এমন কেউ কখনো করে না। সে কথা আমি কখনো ভুলবো না, আমি অকৃতজ্ঞ নই

দুর্ভেদ্য জঙ্গলে শাখা-পত্রের অন্তরালে গোপন মধুচক্রটির উপর কে যেন লোষ্ট্রক্ষেপ করিল। কোথা হইতে তেমনি অস্ফুট গুঞ্জন-রব উত্থিত হইয়া হুল ফুটাইয়া বিরাজের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিয়া দিল। একটা অতৃপ্ত অভিমান বক্ষমধ্যে তাহার উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছিল। ছাই কৃতজ্ঞতা! ওই সূক্ষ্ম সূত্রটীর উপর জীবন-মরণ এমন কি নির্ভর করে! যাহা কিছু উপকার সব পশ্চাতে ফেলিয়া মদমত্ত করীর মত প্রবৃত্তির কোমল কুসুমগুলি দলিয়া পিশিয়া যাইবার সময় শুধু এই মাত্র বলিয়া যায়—মনে রহিল! হায় রে দম্ভ!

প্রকাশ চলিয়া গেলে নিজের ঘরে আসিয়া সে দোর বন্ধ করিয়া দিল। ছি ছি, আর একটু হইলে কি সর্ব্বনাশই সে করিয়া বসিত। নিজের উপর এতখানি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল সে কোন্ সাহসে? তাহার জন্য প্রভূত আহার্য্যের আয়োজন করিয়া সে যে একটা মস্ত চোরা-বালির ভিতর পা বাড়াইয়া দিয়া বসিয়াছিল, এখন সেই আশঙ্কা মনে জাগিতেই তাহার সর্ব্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। কেন, তাহার কি দায়? সে পর। এমন কত লোকই ত হোটেলে আসিয়া থাকে, আবার চলিয়া যায়। অকস্মাৎ সে অনুভব করিল, একটা বিরাট শূন্য পূর্ণ করিবার জন্য তাহার চিত্ত একদিন একাগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে যাইবার দিন আসিয়া পড়িল। সেই যে দিন সে সুরবালার উপর রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল তাহার পর একটি দিনও বিরাজ তাহাদের বাড়ীর দিক দিয়া যায় নাই, বা সুরবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই। আজ এ দিনে সে আর থাকিতে পারিল না। বিকালবেলা সুরবালার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল।

একটি মাদুরের উপর বালিস ঠেস দিয়া সুরবালা আজ উঠিয়া বসিয়াছিল। বিরাজকে দেখিয়া বলিল,—এসেছিস্ ভালই হয়েছে। আমিই আজ তোকে ডেকে পাঠাব মনে করেছিলাম। আয়, কাছে এসে বস্।

বিরাজ বসিয়া তাহার পা দুটী কোলের উপর টানিয়া লইল। অনুতপ্তের স্বরে কহিল,—সে দিন অযথা তোমায় কতকগুলো কথা বলেছি, দিদিমণি। আজ যাবার দিনে ব'লে যাও, তুমি মাপ করেচ।

সুরবালা খানিকক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল,—সেই কথাই তোকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, বিরাজ।

—না না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না, যতক্ষণ না বলবে তুমি আমায় মাপ করেচ।

সে পা দুটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। ক্ষীণকম্পিত হস্তে সুরবালা তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—ছি বিরাজ, ওঠ। সত্যি বলচি, তোর উপর আমার এতটুকু রাগ নেই।

বিরাজ উঠিয়া বসিল। তারপর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার ঘরখানির চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিল,—ও হরি! তোমাদের যে এখনো অনেক জিনিষ গুছান বাকি রয়েছে। সময় ত আর বেশী নেই রাত দশটায় গাড়ী। বাবু কোথায়?

সুরবালা অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিল, কহিল, কি কাজে গেছে। আসবে এখুনি।

—তবে ব'লে দাও কোথা কি রাখতে হবে, আমিই সব গুছিয়ে দিচ্ছি—বলিয়া সে উঠিতে যাইতেছিল, সুরবালা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

—না, তুই বোস। তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

অর্দ্ধস্ফুট শঙ্কাজড়িত কণ্ঠে বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল,—কি কথা?

—বলবি? সত্যি বল্‌বি?

সুরবালার মুখের উপর গভীর সন্দেহের ছায়া অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, বিরাজ তাহা দেখিল। তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল না।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুরবালা কহিল, আমি সব বুঝেছি বিরাজ। ভালই হয়েছে, ওকে এখান ছেড়ে চ'লে যেতে হচ্ছে। এতে তোরও মঙ্গল, ওঁরও মঙ্গল।

—কি বল্‌লে তুমি?

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখে মুখে ভয়ঙ্কর ক্রোধের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। দৃপ্তস্বরে হুঙ্কার দিয়া সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—কি বল্‌লে? কাকে বল্‌লে? আমি দাসী, আমায় যা খুসী বলতে পার, কিন্তু আর যাকে বল্‌লে, সে না তোমার স্বামী?

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, হাঁ গা, আজও কি তুমি মানুষ চিন্‌লে না? তুমি কাকে সন্দেহ করচ? কি অবস্থায় সে তোমাকে বিয়ে করেছিল, একটি বারও কি সে কথা মনে পড়লো না? ছিছি, ও কথা মুখে আন্‌বার আগে তোমার যে গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ছিল।

—এ কি! কি হয়েচে?

গভীর বিস্ময়ে চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া প্রকাশ আসিয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়াছিল।

ফিরিয়াই বিরাজ চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার হিতাহিত জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল।

শোন বাবু, শুনে যাও। যাকে এত শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে রেখেছ, যার জন্য এত সহ্য করচো, আজ কি না সেই তোমাকে অবিশ্বাস করচে—তোমারি অপমান করচে—

সুরবালা যেন মরিয়া গেল। বালিশের ভিতর মুখ চাপিয়া রাখিয়া সে কেবলি অশ্রুমোচন করিতেছিল। কি যেন বলিতে গিয়া মুখ তুলিতেই সে দেখিল, ললাটের প্রতি রেখায় ক্রোধ ও ঘৃণার অভ্রান্ত চিহ্নগুলি পরিস্ফুট করিয়া চিত্রার্পিতের মত প্রকাশ দাঁড়াইয়া তাহারি পানে চাহিয়া আছে।

১২

রাণীগড় পশ্চিমের একটি সহর; কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাণী সহরটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উত্তর প্রান্তে একটি গিরি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

এখানে এক বাঙালী পরিবার বহুকাল যাবৎ বসবাস করিতেছিলেন। গৃহ স্বামীর নাম অমরনাথ কোথা হইতে কেমন করিয়া ইহার পূর্ব্বপুরুষ এই দূর দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, বিস্তৃত কাহিনী জানা নাই—তবে, ইংরাজ ফৌজের সঙ্গে কর্ম্মোপলক্ষে পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে কেহ উত্তর ভারতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, বোধ করি এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। তখন রেল পথ তৈয়ার হয় নাই, বাংলায় ফিরিয়া যাওয়া তেমন সহজ ছিল না। কাজেই দৈবদুর্বিপাক ঘটিলে অনেক বাঙালীকে ঐ দেশেই থাকিয়া যাইতে হইত।

সহরের একদিকে ফাঁকা স্থানে অমরনাথের বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী—সম্মুখে ফুলের বাগিচা, পিছনে ফলের বাগান। অমরবাবু উকিল, ওকালতিতে পশার বিলক্ষণ। কেতা-কানুন সাহেবি ধরণের বলিয়া সহরের ভিতর পৈত্রিক বাড়াটি ভাড়াটিয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়া, এইখানে পছন্দ মত বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া উঠিয়া আসিয়াছিলেন। বাড়ীর সম্মুখে লতামণ্ডপ দিয়া ঘেরা একটি গাড়ী বারান্দা, সিঁড়িটি বারান্দায় গিয়া উঠিয়াছে, সারি সারি সাজান ফুলের টব। মাঝের 'হল' ঘরটি আসবাব পত্র-দিয়া পরিপাটিরূপে সজ্জিত। ইহার দুই পার্শ্বে বড় বড় কয়েকটি ঘর, নীচে উদ্যান।

এই পরিবারের মধ্যে একটি ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল অমরনাথের আচার পদ্ধতি। তাঁহার বিবাহের অব্যবহিত পরেই মাতা রাসমণির মৃত্যু ঘটে এবং পিতা রামজয় কিছুকাল বার্দ্ধক্যের তীরে বিরহবিধুর চক্রবাকের মত তমসাবৃত নিশির অবসান প্রতীক্ষায় থাকিয়া এক দিন চিরজন্মের মত অবসর গ্রহণ করিলেন। সংসারে রহিল শুধু পত্নী যোগমায়া ও অমরনাথের দূর সম্পর্কীয়া মাসী সুরধুনী। যোগমায়া কাশীর এক দরিদ্র বিধবার কন্যা, দরিদ্রের সংসারে প্রতিপালিত, অমরনাথের অনাচার গুলি তাঁহাকে শেলের মত বিঁধিত। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এরূপ বয়সে যখন ক্ষুণ্ণ আদর্শ নারী চিত্তকে স্বভাবতঃ কঠোর করিয়া তুলে, তাই তাঁহার অভিমানী অন্তর ঘোরতর বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, এবং এই লইয়া উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য জমিয়া উঠিতে লাগিল তাহা কি স্বামী কি স্ত্রী, কাহারো পক্ষেই শুভকর হইল না।

অমরনাথের সাহেবিয়ানার প্রধান উপসর্গ ছিল সুরাপান। ক্লাবে গিয়া 'পেগে'র পর 'পেগ' চালাইয়া অধিক রাত্রে সে যখন বাড়ী ফিরিত, তখন প্রায়ই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়া যাইত। বড় মেয়ে করুণা ভয় পাইয়া উঠিয়া আসিয়া মাতাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিত, ভৃত্যগণের মধ্যে

হুলুস্থুল পড়িয়া যাইত। স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, তাহার সুরাস্ফীত মুখের কদর্য্যরূপ যোগমায়ার অন্তরে দুরপনেয় ঘৃণার ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। স্বামী যাহার এইরূপ, তাহার যে সব থাকিয়াও কিছু নাই। কি হইবে তাহার এইসব ধন রত্ন অলঙ্কার পরিচ্ছদ দিয়া? এ সকলের বিনিময়ে তাহাকে স্বামী-সৌভাগ্য দাও, দরিদ্রের ঘরে আজন্ম দুঃখিনী হইয়াও সে সুখে কাটাইতে পারিবে। দিনের পর দিন এই যে একই বেদনা ফুটিয়া ফুটিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে, বয়সের সঙ্গেও তাহা দূর হইল না, বরঞ্চ মনের দুয়ারে বার বার আঘাত করিয়া তাহার কজাগুলিকে শিথিল করিয়া দিতে লাগিল। ক্রমেই সে শুচিবায়ুগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল, শেষে এমন হইল যে, এই মদ্যমাংসভোজী কদাচারী যবনের গৃহে দেহের শুচিতা রক্ষা করা তাহার পক্ষে এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ কিন্তু এসব দেখিয়াও দেখিল না। তাহার আচার-ব্যবহার স্বভাব-প্রকৃতির সহিত পত্নী যোগমায়ার কোথাও এক রত্তি মিল ছিল না, চিরদিন সে ইহাকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে তাহার এই নূতন খেয়ালগুলি দেখিয়া তেম্‌নি অবজ্ঞাভরে সহানুভূতিশূন্য হৃদয়ে চোখ বন্ধ করিয়া রহিল।

সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা সূচ হইয়া ঢোকে, ফাল হইয়া বাহির হয়। বহুদিন আগে ক্ষুদ্র একটি পাদ্রীর দল এখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনভিজ্ঞ লোকগুলার ধর্ম্ম সংস্কার করিবার সাধু সঙ্কল্প লইয়া এই সহরে শুভাগমন করিয়াছিল, কিন্তু একথা তখন কাহারো মনে জাগে নাই যে, ইহারা এক নূতন সভ্যতার পতাকা বহন করিয়া আনিয়াছে, পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য নহে, অসন্দিগ্ধ অধিবাসীর চিত্ত বিজাতীয় শিক্ষার নিগড়ে শৃঙ্খলিত করিবে বলিয়া। বহুকাল হইতে ইহাদের একটা স্কুল বৎসর বৎসর অনেকগুলা ছাত্রকে বিশিষ্ট শিক্ষায় দীক্ষিত করিয়া শুকপক্ষী সাজাইয়া বাহির করিতেছিল। সম্প্রতি তাহারা একটি মেয়ে স্কুল খুলিয়া অন্দর-মহল প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়াছিল।

এই স্কুলে অমরনাথ তাহার দুই মেয়ে করুণা ও অণিমাকে ভর্ত্তি করিয়া দিল। করুণার বয়স তখন তের বৎসর, সে অণিমার চেয়ে সাত বছরের বড়। সুতরাং বছর দুয়ের ভিতর তাহার স্কুল ছাড়িবার একটি কারণ উপস্থিত হইল। কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সময় সপরিবারে এই অঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছিলেন, অমরনাথের সহিত আলাপ করিতে আসিয়া করুণাকে দেখিলেন। করুণার সলজ্জ মধুর ব্যবহার, কোমল স্বভাব অচিরাৎ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে এই মেয়েটিকে তিনি পুত্রবধূ করিবার প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। অমরনাথ সম্মত হইলে, যথা সময়ে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর করুণা কলিকাতায় শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে শ্বশুর-শাশুড়ীর পরিচর্য্যা করিয়া, ননদ-দেবরে পরিবৃতা হইয়া, স্বামীর সোহাগ আকণ্ঠ পান করিয়া স্বপ্নের মত কয়েকটা বছর কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। ছয় বছর পর সে যখন আবার পিত্রালয়ে ফিরিল তখন সে বিধবা। তাহার হাতের লোহা খসিয়া গেছে, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া গেছে, পরিধানে থান কাপড়। অমরনাথ কন্যার এই সন্ন্যাসিনী রূপ দেখিল, দেখিয়া দুঃখও করিল—কিন্তু সে দুঃখ তাহার পাম্প-সু বা সৌখিন ছড়ি ব্যবহার করিবার পক্ষে কিছুমাত্র অন্তরায় হইল না।

মাতা যোগমায়া কিন্তু কন্যার এই চরম দুর্ভাগ্য নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। স্বামীর স্বেচ্ছাচার ও অবজ্ঞা-মিশ্রিত অবহেলা পূর্ব্ব হইতেই তাহার মনের বাঁধন আল্‌গা করিয়া রাখিয়াছিল; এক্ষণে এই আকস্মিক দুর্ঘটনা, মস্তিষ্ক-বিকৃতির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও সম্পূর্ণ করিয়া দিল। সেদিন তাপদগ্ধ ধরণীর উপর সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। ভৃত্যেরা ছাদ, রোয়াক জলসিক্ত করিয়া দিয়াছে। ছাদের উপর অনেকক্ষণ সে চুপটি করিয়া বসিয়াছিল, করুণাকে দেখিয়া কহিল,—এ বাড়ীতে তুই থাকিস না করু, চ'লে যা। এ বাড়ীর চারিধারে প্রেত নেচে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের কথা শুন্‌তে পাই। তারা কি বলে জানিস্? এ বাড়ীতে কারু মঙ্গল নেই। তুই যা' পালিয়ে যা।

বিস্মিত নেত্রে করুণা মাতার মুখপানে চাহিয়া রহিল। এসব কি সে বলিতেছে! তাহার চোখে মুখে অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখিয়া সে ভীত হইয়াছিল।

যোগমায়া কহিল,—তোরা ভূত দেখ্‌তে পাস্‌ না, আমি পাই। তারা আমার সঙ্গে কথা কয়। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর্‌—কিছুই মঙ্গল নেই। তারা কেবল বলে, চ'লে যা—চ'লে যা।

সুরধুনীর কাছে আসিয়া করুণা কহিল,—তুমি একবার তাকে দেখে এস। তার কি হয়েচে।

সুরধুনী অষ্টপ্রহর পূজা অর্চ্চনা সন্ধ্যা আহ্নিক লইয়া কাটাইতেন, সংসারের কোন কাজে বড় ভিড়িতেন না। করুণার কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, কেন? কি হয়েচে বৌর?

করুণা কহিল,—কি বলচে কিছুই বুঝ্‌তে পারচি না।

অমরনাথকে ডাকিয়া সুরধুনী কহিলেন, বৌর কিছু মাথার দোষ হয়েছে ব'লে মনে হচ্চে। তুমি বাবা ভাল ডাক্তার বদ্যি এনে দেখাও।

তাচ্ছিল্য সহকারে অমরনাথ উত্তর দিল, তুমিও যেমন মাসি। ওর মাথা কোন দিনই বা ভাল ছিল?

সেইদিন বৈদ্য আসিয়া দেখিয়া ব্যবস্থা দিল। চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা রীতিমত চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। নিজের ঘরের মাটির উপর সর্ব্বক্ষণ যোগমায়া মূঢ়ার মত বসিয়া থাকিত, কাহারো সহিত কথা কহিত না।

অন্তর্ঘাতনা বক্ষে চাপিয়া করুণাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল। বিধবা হইবার অব্যবহিত পরেই তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। কে তাহাকে মানুষ করিবে? মাতা পাগল, কে তাহাকে সেবা করিবে? ছোট বোন অণিমা বড় হইয়া উঠিয়াছে, কে তাহার তত্ত্বাবধান করিবে? শুধু নিজের মন্দ ভাগ্যের ভাবনা লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুজল মোচন করিলে চলিবে কেন? সংসারের বিস্তীর্ণ সমরক্ষেত্রে যে মরিবে, সে পথপার্শ্বে পড়িয়া থাকিবে। যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে।

অণিমা স্কুলে পড়িত। তাহার উজ্জ্বল সুন্দর ঈষৎ দীর্ঘ মুখাকৃতি ঘনকৃষ্ণপক্ষ্মল চক্ষুদ্বয় প্রখর বুদ্ধি প্রতিফলিত করিত। একটু যেন দৃপ্ত গাম্ভীর্য্য তাহার কমনীয় অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্ভ্রমের আবরণে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। স্ফূর্ত্তিসম্ভূত চঞ্চলতার অভাবে তাহার আচরণগুলি অনেক সময় বড়ই রুক্ষ বোধ হইত, এবং সেজন্য সহপাঠিনীরা মাঝে মাঝে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেও ছাড়িত না। যে স্বাধীন চিন্তা পারিপার্শ্বিক বাধাবন্ধের জাল ছিঁড়িয়া স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়ায়, কয়জন তাহার সন্ধান পাইয়াছে? এই বালিকার অন্তরে স্বাধীন চিন্তাগুলি তেমনি এক একটি জলদস্যুর মত আসিয়া দেখা দিয়া যাইত, তখন কি শিক্ষয়িত্রী, কি ছাত্রী, কেহই তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। সে ছিল একটি জীবন্ত প্রহেলিকা, দুর্ব্বোধ্য, জটিল।

অণিমার চরিত্রে এই জটিলতা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত, যখন সে অমরনাথের সম্মুখীন হইত। চিরদিন নীতির এই আদেশই সে শুনিয়া আসিতেছে—যে পিতা তাহাকে ভক্তি কর, পূজা কর। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করিবে, পূজা করিবে, সে কেমন করিয়া? ইহার পদে ভক্তির অর্ঘ্যদান করিতে গিয়া কতবারই না তাহার অন্তর-আত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। সে দেখিত, করুণা নিঃসঙ্কোচে পিতার পরিচর্য্যা করিয়া যাইতেছে। সে ভাবিয়া পাইত না, কিরূপে তাহার দিদি এই স্বার্থান্ধ লোকটির সকল অপরাধ নির্ব্বিকার চিত্তে সহিতে পারিতেছে। অমরনাথের বাড়াবাড়িগুলি ঢাকিতে গিয়া অনেক সময় করুণা নিরর্থক অপমান আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে দিদির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় তাহার মন অবনত হইলেও, পিতার প্রতি ভক্তি ও সম্মান কিছুমাত্র উদ্রিক্ত হইত না।

একদিন সন্ধ্যার পর পড়িবার ঘরে বাতির সম্মুখে ঝুঁকিয়া অণিমা পাঠাভ্যাস করিতেছিল। কাছেই মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া করুণা পুত্র অশোকের জন্য একটি জামা সেলাই করিতেছিল, এমন সময় সুরামত্ত অমরনাথের উচ্চ কণ্ঠের কোলাহল শোনা গেল। অমরনাথ

আজকাল আতিরিক্ত সুরা পান আরম্ভ করিয়াছে তাহা সে জানিত।

ইতিমধ্যে অণিমা পড়া বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। দিদিকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া ফিরিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—ও কি, দিদি?

অণিমার কাছে পিতার দুর্ব্বলতা করুণা বরাবর গোপন করিয়া আসিতেছিল। তাই বলিল, বাবার যে রাগ। কোন চাকর হয়ত কথা শোনেনি, তাই চ'টে গেছেন।

অণিমা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কহিল—তুমি কি মনে কর, দিদি, আমি কিছু বুঝি না?

কি যে বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া করুণা পূর্ব্ব কথার সমর্থন করিয়া কহিল,—বুঝবার কি আছে, অণু? চ'টে গেছেন এই ত?

অণিমা কহিল,—না, দিদি। শুধু তাই নয়। আজকাল যখন তখন মদ খাচ্চে আর মাতলামো করচে।

করুণা জিব কাটিল.—বলিল, ছি অণু। বাবার সম্বন্ধে তোমার আমার অমন কথা বল্‌তে নেই—ওতে পাপ হয়।

বাঙালীর মেয়ের আজন্ম সংস্কার কণ্ঠ চাপিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বাক্ রোধ করিয়া দিল, অণিমা কথা কহিতে পারিল না। ঠিক সেই সময় পিতার মুখ-নিসৃত একটি অশ্রাব্য গালি কানে যাইতেই তড়িৎস্পৃষ্টের মত সে চমকিয়া উঠিল। তাহার দ্বিধা কাটিয়া গিয়াছিল। সে গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—পাপ হয়, না? আর এসব কথা যে মুখে উচ্চারণ করতে পারে তার কোন পাপ নেই? এও বলি দিদি, তুমি ওঁকে প্রশ্রয় দিয়ে ভাল করচ না। কেবল ওঁর ভাবনা নিয়ে আছ—তোমার ভাবনা, আমার ভাবনা, মার ভাবনা একবারও ভেবেচ কি? তা যদি ভাবতে তা'হ'লে বুঝতে, মা খামকা পাগল হননি, ওঁর ব্যবহারই মাকে পাগল ক'রে দিয়েচে, এ কথা তুমি না বুঝ্‌লেও আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেচি।

অণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে যাইতেছিল—করুণা গতি রোধ করিল, কহিল, যাস্‌নে বোন, ওখানে যাস্‌নে।

—কেন?

করুণা কহিল, বাবার এখন জ্ঞান নেই। হয়ত একটা মার-ধোর ক'রে বস্‌বে।

অণিমা হাসিল,—আর এই মারধোরগুলি তুমি ত এদ্দিন দিব্যি সয়ে এসেচ। না দিদি, সে হবে না।

করুণা তখনো পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া, করুণ দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া অণিমা বলিল,—দোহাই তোমার দিদি, মা পাগল হয়েচে, আমায় পাগল ক'র না। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌চি দিদি, এ বাড়ীতে ঐ রকম ক'রে দিন কাটাতে হ'লে আমি পাগল হ'য়ে যাব।

দুই হাতে ধীরে ধীরে করুণাকে ঠেলিয়া দিয়া অণিমা সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। বাহিরের কামরায় মোটা চুরুটের ধূমে ঘর অন্ধকার করিয়া অমরনাথ তখন বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল, এবং বিড় বিড় করিয়া কি সব আপন মনে বকিয়া যাইতেছিল।

অণিমা মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল, চুরুটের ধূমে তাহার মাথা ধরিয়া আসিতেছিল। পরক্ষণে উজ্জ্বল বাতির সমুখে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া অনুত্তেজিত কণ্ঠে সে কহিল, তোমায় গুটিকত কথা বল্‌তে এসেচি, বাবা।

অমরনাথ ভড়কাইয়া গিয়াছিল। তাহার মুখে একটিও কথা ফুটিল না।

পূর্ব্ববৎ শান্তকণ্ঠে অণিমা বলিতে লাগিল,—জিজ্ঞাসা করি তোমার কি এই ইচ্ছা যে, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাই? তাই যদি হয়, তবে স্পষ্ট ক'রে বল।

অমরনাথ নীরব। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অণিমা আবার কহিল, মার অবস্থা, দিদির অবস্থা—সবই ত চোখে দেখ্‌চ। এ সব দেখেও কেমন ক'রে যে তুমি অনাচার করতে পার্‌চ, আমি তা ভেবে পাই না। ছি ছি! গাছতলায় থাক্‌ব, ভিক্ষা কর্‌ব সেও ভাল, তবু তোমার এ সব কাণ্ড দেখে এ বাড়ীতে কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌ব না, সে কথা আজ তোমায় স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়ে যাচ্চি।

অনর্থ-আশঙ্কায় করুণা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল। অগ্রসর হইয়া অণিমার বাহু ধরিয়া টানিয়া কহিল,—চ'লে আয়, বোন।

মুখ তুলিয়া করুণাকে দেখিয়া অমরনাথের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস

উথলিয়া উঠিল। ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে জড়িতকণ্ঠে সে কহিল,—শুন্‌লি, করুণা, শুন্‌লি—কি বল্‌লে ও? কালকের মেয়ে, ও আমায় অপমান করে, বলে—আমি অনাচারী? এইজন্যই কি আমি ওকে লেখাপড়া শিখিয়েচি? এত তেজ—বলে কি না ভিক্ষা করবো, গাছতলায় থাক্‌বো, বেশ বেশ, আমি বল্‌লুম তোদের মুখদর্শন করতে চাই না।—বলিয়া বিপুল উদ্যমে গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে গিয়া সে মাটীতে গড়াইয়া পড়িল।

করুণা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া অমরনাথকে তুলিতে যাইতেছিল, অণিমা বাধা দিল। কহিল,—থাক্, তুলো না। দিদি, সেবা জিনিষটা খুবই মহৎ, কিন্তু এরও একটা অপব্যবহার আছে।

আপন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া অণিমা আর পড়িতে বসিল না, সোজাসুজি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় করুণা আসিয়া পাশে বসিল। সস্নেহে ভগিনীর হাতখানি তুলিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, অণু, ঘুমিয়েচিস্?

—না।

—ওঠ—খাবি আয়।

—খাব না—খিদে নেই।

করুণা ঝুঁকিয়া বাহু দিয়া অণিমার স্কন্ধ বেড়িয়া ধরিয়া কহিল,—ছি দিদি, রাগ ক'রে কি না খেয়ে থাকতে আছে?

অণিমা মুখ ফিরাইয়া কহিল,—না,—এ ক্ষেত্রে বোধ করি ভূরিভোজনের বিধানই প্রশস্ত।

করুণা সাধ্যসাধনা করিতেছিল, সহসা অণিমা বাহুর উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া তাহার পানে একটি কঠিন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, আমি একটা কথা ভাবছি, দিদি? তোমার এ দশা কেন হয়েছে জান, দিদি? মারই বা এ দশা কেন? এ সকলের মূলে ব্যভিচার। পিতার ব্যভিচার আমাদের বংশটাকে অভিশপ্ত করেচে।

করুণার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল নামিয়া আসিতে লাগিল। এই কল্পনাপ্রবণ মেয়েটির মুখে এসব কথা শুনিয়া দারুণ আশঙ্কায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতেছিল। এক্ষণে এই অপ্রীতিকর বিষয়টির আলোচনা হইতে তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য আবেগভরা কণ্ঠে সে কহিল, অণু, আমার কথা শোন্। ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখ্। আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের কি শক্তি আছে, বোন? অমঙ্গলের চিন্তা ক'রে অমঙ্গলকে টেনে আনিস্ না। তার চেয়ে আয়, দু জনায় মিলে আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

তাহার দিকে একটি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া অণিমা কহিল—আমাদের কোন শক্তি নেই বল্‌চ, দিদি?

করুণা কহিল,—না, বোন। আমাদের কোন শক্তি নেই। পরের গলগ্রহ হ'য়ে আছি, আজীবন পরের গলগ্রহ হ'য়েই থাকব।

পূর্ব্বদিকে একটি টিলার পিছনে চাঁদ উঠিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া অণিমা দেখিল, রজতশুভ্র চন্দ্রকিরণ টিলার উপরিস্থিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ উদ্ভাসিত করিয়া ঝল মল্ করিতেছে।

কিন্তু এ দিনের ব্যাপারে অমরনাথের বেশ একটু শিক্ষা হইয়াছিল। অণিমার ভয়ে এখন আর সে যখন তখন বাড়ী আসিয়া উৎপাত করিতে সাহস করিত না। সন্ধ্যাকালে সেই যে মোটর হাঁকাইয়া বাহির হইয়া পড়িত, অনেক সময় বাহিরেই রাত্রি বাস করিত—কখনো বা অধিক রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বাড়ী ফিরিত। অমরনাথের পরিবর্ত্তন দেখিয়া করুণা ভীত হইল। এই দুর্ব্বল-চিত্ত বাসনাসক্ত ঘোর স্বার্থান্ধ লোকটির জন্য সত্যসত্যই অন্তরে সে একটু কোমল স্থান রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। যে-দিন সে বাড়ী ফিরিত না, সে দিন করুণা উদ্বিগ্নভাবে সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিত। অণিমা ও করুণা এক ঘরে একই বিছানায় শয়ন করিত। পাছে অণিমা জাগিয়া উঠে, সেই আশঙ্কায় বৃহৎ কক্ষের এক কোণে মাদুর বিছাইয়া বাতির অনুজ্জ্বল আলোকে বসিয়া সেলাই করিত, না হয় একখানি বই লইয়া পড়িত। প্রতি শব্দে প্রতি পত্রের মর্ম্মরে সে চমকিয়া উঠিত, কখনো বা বাহিরে ছুটিয়া আসিত। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা সর্ব্বক্ষণ তাহার বক্ষে বিরাজ করিত, যেন এখনি কি একটা অনর্থ ঘটিয়া বসিবে। গভীর রাত্রে অশোকের ক্রন্দনে জাগিয়া উঠিয়া অণিমা দেখিত, পার্শ্বের শয্যা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

১লা বৈশাখ ১৩৩৫

ব্যবহৃত হয় নাই। বিস্মিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিত, ঘুমোও নি বুঝি, দিদি? করুণা জবাব দিত,—সেলাইটা রাত্রেই শেষ করতে হ'বে।

অণিমা জিজ্ঞাসা করিত—কেহ মাথার দিব্য দিয়াছে কি? জীবন-কার্য্য রাত্রের জন্য স্থগিত রাখিলে প্রভাতে অরুণোদয়ের বিঘ্ন ঘটিবে কি?......

দিদি!

অণু!

বাবা ফেরে নি বুঝি?

তুই ঘুমো, অণু! এই যে আমি পাশে শুয়েচি।

অণিমা দুই বাহু দিয়া করুণাকে বেষ্টন করিল। অশ্রু-সজল মুখখানি করুণার মুখের উপর রাখিয়া বেদনাভরা কণ্ঠে সে কহিল,—তোমার তুলনা নেই, দিদি।

করুণা হাসিয়া কহিল—কেন রে, অণু? আমার কি দেখলি তুই শুনি?

অণিমা কহিল,—তোমার যা আছে তার এতটুকু পাবার জন্যে আমি সাত জন্ম তপস্যা করতে রাজি আছি। হেসো না দিদি, আমি সত্যি বলচি।

—তবে তুই তপস্যাই কর, আমায় জ্বালাস্ নে,—বলিয়া গভীর স্নেহে করুণা ভগিনীর মুখচুম্বন করিল।

শীতের কুজ্ঝটিকা উষার পথ রোধ করিতেছিল, এমন সময় বাহিরে অপরিচিত কণ্ঠে কে ডাকল,—বাড়ীতে কে আছেন?

করুণা ধড় মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

—কোথা যাচ্ছ, দিদি?

—দেখে আসি কে এসেচে, বলিয়া সিঁড়ির বাতিটি বাড়াইয়া দিয়া সে নামিয়া আসিল। নীচের হলঘরে চৌকিদার কিষণ আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। বাহিরে লোকটি অধৈর্য্যভাবে দরজায় ধাক্কা দিতেছিল, কিন্তু একদল ডাকাত পড়িলেও কিষণের নিদ্রাভঙ্গ হইত কি না সন্দেহ। সে নিঃশঙ্কচিত্তে নাসিকা গর্জ্জন করিয়া জীবিত ও মৃতের মধ্যে সামান্য ব্যবধানটুকু সপ্রমাণ করিতেছিল। এমন সময় করুণা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিল, কিষণ ও কিষণ!

বাহিরে আবার ডাক শোনা গেল,—বাড়ীতে কে আছেন? জরুরি খবর আছে।

—ওঠ্, ওঠ্ ওরে উঠে দেখ্।

অতিকষ্টে কিষণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে জম্ভিতমুখে হাত পা ছাড়াইতে ছাড়াইতে সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

যে আসিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—এইটে অমর-বাবুর বাড়ী?

—হাঁ।

—বাড়ীতে কে আছেন, ডেকে দাও। বল, জরুরি খবর।

—আমি আছি, বলিয়া কিষণ বুক ঠুকিল,—যেন ইহাই বুঝাইতে চাহিল যে, সে একাই এক'শ; অন্য লোক ডাকিবার প্রয়োজন নাই।

দরজার পিছনে আড়ালে করুণা দেয়াল-ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল,—কি খবর আমায় বল্‌বেন কি? আমি তাঁর মেয়ে।

আগন্তুক কহিল,—একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেচে। কাল রাত্রে মোটর উল্‌টে খাদের ভিতর প'ড়ে গিয়ে অমরবাবুর মাথায় গুরুতর জখম হয়েচে, তিনি হাঁসপাতালে আছেন।

করুণা কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

আগন্তুক বলিয়া গেল,—কালরাত্রে ঘন ঘন মোটরের হর্ণের শব্দে জেগে উঠি। মনে হ'ল, একটা মোটর খুব জোরে ছুটে চলেচে। তারপর একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুন্‌তে পেলাম। দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, চৌমাথার মোড়ে একটা খাদের ভিতর পড়ে মোটরখানা চুরমার হ'য়ে গেছে। নিকটেই কুলীর বস্তি, সেখান থেকে অনেক লোক ছুটে এসেছিল। ভাঙা মোটর এক পাশে সরিয়ে, তলা থেকে অমরবাবুকে তুলে আনা হ'ল। তিনি তখন অজ্ঞান, মাথা দিয়ে দর দর ক'রে রক্ত পড়্‌চে।

অণিমা পাশে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এতক্ষণ করুণা তাহা টের পায় নাই। মুখ তুলিয়া অণিমাকে দেখিয়া সে আর শোক সম্বরণ করিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত আবেগে ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল,—ওরে অণুরে—

দুই হাতে করুণাকে বেড়িয়া ধরিয়া অত্যন্ত কোমল স্বরে চাপাগলায় অণিমা কহিল, লক্ষ্মী দিদি আমার, চুপ কর। এখন কি কাঁদ্‌বার সময়? বাবা কোথা জিজ্ঞেস করেচ কি?

—তিনি হাঁসপাতালে।

—চল, আমরা সেখানে যাই। কিষণ, একখানা গাড়ী নিয়ে আয়, জল্‌দি।

আগন্তুক বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। কিষণকে যাইতে দেখিয়া সে কহিল,—গাড়ী আন্‌তে দেরী হবে। এক কাজ করুন। যে-গাড়ীতে অমরবাবুকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানা আমার সঙ্গেই আছে—ছাড়ি নি। আপনারা সেই গাড়ীতেই যেতে পারেন।

অণিমা বলিল,—তাই ভাল। চল, দিদি।

করুণার হাত ধরিয়া অণিমা বাহিরে লইয়া চলিল। এই দুই নারী একলা বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া আগন্তুক বোধ করি একটু বিস্মিত হইয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা দুজন যাবেন? কাউকে সঙ্গে নেবেন না?

অণিমা কহিল, কেউত নেই। কিষণই যাবে এখন।

তখন ভোর হইয়া আসিতেছিল—আগন্তুকের মুখমণ্ডল অল্প অল্প দেখা যাইতে লাগিল। সে যুবা, দেখিতে ফরসা। শীতবস্ত্রে মস্তকের উপরিভাগ এবং কর্ণমূল আবৃত। পরিচ্ছদ বাঙালীর, সে এতক্ষণ বাংলা কথা কহিতেছিল। সে কোচবক্সে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া অণিমা কহিল,—আপনি ওখানে ব'সে যাবেন? সে কিরকম হবে? না না, আপনি ভিতরে এসে বসুন।

বাধা দিয়া লোকটি বলিল,—আমার জন্য কিছু মাত্র ব্যস্ত হবেন না। আমি উপরে ব'সে স্বচ্ছন্দে যেতে পারব।

সে কোচবক্সে উঠিয়া বসিয়াছিল। শীতে আড়ষ্ট গাড়োয়ানকে ধীরে একটি ঝাঁকি দিয়া সে কহিল,—হাঁকাও জি—ফুর্ত্তি করো।

গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া অণিমা কহিল,—আপনি আমাদের আজ বড় উপকার কর্‌লেন। আপনি বাঙালী, কিন্তু আগে কখনো আপনাকে এখানে দেখিনি। জিজ্ঞেস করতে পারি কি, আমরা কার কাছে কৃতজ্ঞ?

আগন্তুক কহিল,—আমার নাম শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আমি এখানে নতুন এসেচি।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

(ক্রমশঃ)

রুদ্রের আহ্বান ও আশীর্ব্বাদ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে, ৬ই ভাদ্র, ১৩৩৫, সকাল বেলায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কর্ত্তৃক অনুলিখিত।]

বন্ধুগণ, জরার ক্লান্তিতে আজ আমি অভিভূত, একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও এই স্মরণ-উৎসবে সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দিতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আজ আমাদের উপাসনার একটি বিশেষ দিন। উপাসনার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্য আমাদের কাছে সময় সময় উপস্থিত হয়। প্রকৃতির মধ্যেও দেখি ঋতু ঋতুতে নূতন নূতন উৎসব। প্রত্যেক ঋতু তার নিজের অর্ঘ্য-নিবেদন বহন ক'রে আনে। শরৎ যখন তার শিশির-ধৌত নির্ম্মল সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য নিয়ে দেখা দেয় তখন সে আমাদের আত্মাকে আহ্বান করে, তখন আমাদের একটি বিশেষ বন্দনার দিন উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের

মধ্যে আমরা শুন্‌তে পাই বহু-বিচিত্রকে নিয়ে একটি অখণ্ড সুষমার বাণী। জলে স্থলে আকাশে রূপসম্মিলনের মধ্যে সেই অপরূপ একের সঙ্গীত কেবল আমাদের আত্মার কাছেই পৌঁছায়, সে এমন একটি লিপি, যার ঠিকানা একমাত্র এইখানেই।

সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। তাকে আমরা কোনোরকম ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাতে পারি না। আমাদের অন্তরতম উপলব্ধির দ্বারা তাকে আমরা শুধু স্বীকার ক'রতে পারি। সংসারের সমস্ত কিছু প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে এই সৌন্দর্য্য বিরাজমান। সৃষ্টি রক্ষা বা পালনের কোনো তাগিদ দিয়ে তার হিসাব পাওয়া যায় না। সকল প্রয়োজনের অতীত যে ঐশ্বর্য্য, বিশ্বজগতে আনন্দরূপের আবির্ভাবকে সে প্রকাশ করে। তাই সংসার-যাত্রার প্রতিদিনের সমস্ত অব্যবহিত দাবি চুকিয়ে দিয়েও যে অসীম উদ্বৃত্ত সৌন্দর্য্য দেখা দেয় তার মধ্যেই আমাদের আত্মা বিশ্বের নিত্যোৎসবের মূলসুরটিকে উপলব্ধি ক'রতে পারে।

জীবনযাত্রার ছোটোখাটো খুঁটিনাটির মধ্যে আমরা এই মূলসুরটিকে ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক'রে দেখি ব'লে তাকে তার বৃহৎ তাৎপর্য্যের মধ্যে উপলব্ধি ক'রতে পারি না। যদি আদ্যন্ত দেখ্‌তে পেতেম, যে-দেখা নানা বাধায় নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা খণ্ডিত নয় এমন একটি স্বচ্ছ সমগ্র দেখা দিয়ে যদি অনুভব ক'রতে পার্‌তেম তবে আমাদের মন অহৈতুক আনন্দে অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌তো। জান্‌তে পার্‌তেম যে-পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আমরা শরৎকালের একটি শেফালির মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্ছি তারি ছন্দ লোকে লোকে আকাশে আকাশে পরিব্যাপ্ত। প্রতিদিনকার কাজ চালাবার দেখার মধ্যে আমাদের আত্মার সেই দেখা চাপা পড়ে, আনন্দরূপের পূর্ণতাবোধ ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে ফেলি, তারপরে নোতুন ঋতু যখন পুরাতন ঋতুৎসবের পালা বদল করার আয়োজন করে তখন তার রাগিণীতে সেই মূলসুরের ধুয়াটিকে নোতুন ক'রে পাই। চন্দ্রতারা-খচিত নীল আকাশে বিশ্বের যে আশ্চর্য্য-সুন্দর শতদলটি আলোকের সরোবরে ধীরে ধীরে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছে তাকে সম্পূর্ণ ক'রে সমগ্রভাবে যিনি দেখ্‌ছেন তাঁর সেই স্থির-গম্ভীর আনন্দের আংশিক উপলব্ধি আমরা অনুভব করি।

এইরকম ক'রেই আমাদের আরেকটি বন্দনার বিষয় হয় যখন আমরা কোনো মহাপুরুষের মধ্যে সেই মহতো-মহীয়ানের পরিচয় পাই। এই পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রতিবাদ আছে, যে প্রতিবাদ আমরা প্রকৃতির মহোৎসবের মধ্যেও দেখি। চারিদিকে শ্রীহীনতার অভাব নেই, কতো কুৎসিত মলিনতা, কতো আবর্জ্জনা, কতো অসম্পূর্ণতা, প্রতিনিয়তই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু তারই মধ্যে দেখি সুন্দরকে—দেখি ক্ষণজীবী প্রজাপতির ক্ষীণ সূক্ষ্ম সুকুমার পাখার রঙে-রেখায় আশ্চর্য্য নৈপুণ্য—তখন বুঝি যা-কিছু কুশ্রী তার বিরুদ্ধে চিরকাল ধ'রে চলেছে সৌন্দর্য্যের এই প্রতিবাদ। তখন বুঝি সমস্ত কুশ্রীতাকে অতিক্রম ক'রে সৌন্দর্য্যই ধ্রুবসত্য। বিশ্বজগতের ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্মা যখন ছন্দোময় সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করে, তখন দেখি অনন্ত আকাশে সৌন্দর্য্যের তপস্যার আসন বিস্তীর্ণ। যা কুশ্রী, যা নিরর্থক, যা খণ্ড সে-সমস্তকে একটি আশ্চর্য্য সুষমার মধ্যে সুপরিমিত ক'রে নেবার জন্যে বিশ্বজগতের অন্তরে অন্তরে একটি অবিশ্রাম প্রবর্ত্তনা কাজ ক'র্‌ছে। বিক্ষিপ্তকে সংযত, বিকৃতকে সংস্কৃত করবার এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আশ্রয় ক'রে আছে আনন্দ-স্বরূপকে অমৃত-স্বরূপকে। বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত ক'রে আনন্দরূপমমৃতং প্রকাশমান ব'লেই এটি সম্ভবপর হ'য়েছে।

মানবাত্মার মধ্যেও কতো দীনতা, কতো কলুষ, কতো হিংসা-দ্বেষ সর্ব্বদাই প্রকাশ পাচ্ছে জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গেই আশ্বাস আসে—এ সমস্তকে অতিক্রম ক'রে যিনি শিবং তিনি আছেন। মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। যা কিছু অশিব তাকে পরাভূত ক'রে, সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখে এসে মহাপুরুষের জীবন যখন দাঁড়ায়, আঘাত-অপমানের মাঝখানে কল্যাণের তপস্যাকে সার্থক করে, তখন সেই আশ্চর্য্য আবির্ভাবের সম্পূর্ণ যে অর্থ তাকে দেখি। প্রমাণ পাই যে, যুগে যুগে কলুষ ক্ষয় ক'র্‌ছেন যিনি, অকল্যাণকে দুঃখের মধ্য দিয়ে কল্যাণে উত্তীর্ণ ক'র্‌ছেন যিনি, তিনিই মহাপুরুষের বাণীর

ভিতর দিয়ে বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে জাতির সঙ্গে জাতিকে ইতিহাসের বিপদসঙ্কুল বন্ধুর পথে একসূত্রে বেঁধে দিচ্ছেন, তখন জানি যে তাঁকে প্রণাম করার দিন উপস্থিত।

আমাদের উপাসনায় ধ্যানের যে মন্ত্র আমরা ব্যবহার করি—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং—সেই মন্ত্রের গভীর অর্থ হ'চ্ছে এই যে, চোখের দেখায় সত্যকে পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মা নিজের জান্‌বার ধর্ম্ম দিয়েই সত্যের স্বরূপকে দেখে। চোখের দেখা বিচ্ছিন্ন, আত্মার দেখা ঐক্যে বাঁধা। ইন্দ্রিয়-বোধ সেই একের বোধ নয়। আত্মা নিজের মধ্যে দেশ-কালের ভূমিকায় দেশ ও কালকে সমগ্রভাবে অখণ্ডভাবে বিশ্বজগতের ঐক্যসূত্রটিকে আবিষ্কার করার দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি করে। চোখ দিয়ে যখন অসীমতাকে দেখতে যাই তখন আয়তনের মধ্যে সংখ্যার মধ্যে তাকে খুঁজি। এমন ক'রে বাহিরের দিক থেকে অসীমের সত্যকে পাওয়া যায় না। যতো ছোটো আয়তনের মধ্যেই হোক্ না কেন পরিপূর্ণতাকে যখন আত্মার দৃষ্টি দিয়ে দেখি তখন পাই অনন্ত সত্যকে। শিবকে অশিবের মধ্যে দেখা—সে-ও হচ্ছে আত্মার দেখা। মহাপুরুষেরা এই দৃষ্টি নিয়ে আসেন। তাঁরা বিপদকে ভয় করেন না, নিন্দা-ক্ষতিকে গ্রাহ্য করেন না। অবমাননার ভিতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেন। যাঁরা মহৎ, ভগবান তাঁদের বাহিরের দিক থেকে দয়া করেন না। নিষ্ঠুর ভগবান মহাপুরুষকে সম্মানের পথে পুষ্প-বৃষ্টির ভিতর দিয়ে আহ্বান করেন না, দুঃখের কঠোর পথই তাঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন। সেইজন্য দুঃখের মধ্যেই মহাপুরুষের জীবনের সার্থকতা তাঁর সত্যের প্রমাণ। এই নির্দ্দয়তার মধ্যে আমরা দেখি ভগবানের দয়া—তখন ভয় যায়, তখন আমরা ভরসা পাই, তখন আমরা প্রণাম করি।

এই প্রণামের পরিপূর্ণ প্রার্থনা হ'চ্ছে "অসতো মা সদ্গময়"। অসত্য আছে জানি তার মধ্যেই সত্য দেখা দাও। কে এই সত্যকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল ক'রে দেখায়? যখন বহুল উপকরণের প্রয়োজনকেও অস্বীকার ক'রে মানুষ ব'ল্‌তে পারে, যা অমৃত নয় তা নিয়ে আমি কী ক'র্‌বো? বীর যখন আঘাতের পর আঘাতেও অবসন্ন হন্ না, তখন অসত্যের মাঝখানে সত্যের যে আবির্ভাব তাকে আমরা দেখ্‌তে পাই। মানব-ইতিহাসের সঙ্কটময় নিত্য বাধাগ্রস্ত অভিযানের মধ্যে আমরা সত্যের প্রকাশকে দেখি। আবার নিজের মধ্যেও দেখি, বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম ক'রে অসত্যকে পরাভব ক'রে সত্য প্রকাশ পায়। তখন এই বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েই আমাদের প্রণাম পৌছয়। তখন বলি "আবিরাবীর্ম্মএধি" —আমার অপ্রকাশের অস্বচ্ছতার মধ্যেই তোমার প্রকাশ উজ্জ্বল হোক্। তখন আমরা বলি "তমসো মা জ্যোতির্গময়" —অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে আলোক প্রকাশ পাক্। "মৃত্যোর্মামৃতং গময়"—মৃত্যুর মধ্যে অমৃত জাগ্রত হউক।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ ক'র্‌ছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিলো। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান ক'রেছিলেন—সেই আহ্বানের মধ্যেই রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্ব্বাদ ক'রেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিলো তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দ্দেশ। আজও সে আহ্বান ফুরোয়নি। আজ পর্য্যন্ত তাঁর অবমাননা চ'লেছে। তিনি যে-সত্যকে বহন ক'রে এনেছেন দেশ এখনও সে-সত্যকে গ্রহণ করে নি। যতোদিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ ক'র্‌বে ততোদিন এই বিরুদ্ধতা চ'ল্‌তেই থাক্‌বে। দিন-মজুরি দিয়ে জনতার স্তুতি-বাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না—রুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য ক'র্‌তে হয় এই হ'চ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ। তাঁর জন্য কোনো ছোটো পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়নি। নিন্দা-অপমানের ভিতর দিয়েই সত্যকে প্রকাশ ক'র্‌তে হবে, ক্ষতির মধ্যেই সত্যকে লাভ ক'র্‌তে হবে, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে জাগ্রত ক'র্‌তে হবে।

তাই আজ আমাদের প্রার্থনা যেন ছোটো না হয়। ভীরুর মতো ব'ল্‌বো না, আমাদের দুঃখ দূর করো। বীরের মতো ব'ল্‌বো, দুঃখ দাও, বিপদ দাও, অপমানের পথে আমাদের নিয়ে যাও। কিন্তু দুঃখ বিপদ অপমানের মধ্যেও অন্তরে যেন তোমার প্রসন্নতার আশীর্ব্বাদ অনুভব করি।

হে রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্

—তোমার যে প্রসন্ন মুখ আমাদের দেখাও। তমসো মা জ্যোতির্গময়—অন্ধকারের মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ করো। হে রুদ্র, হে নিষ্ঠুর, ক্ষতি-পরাভবের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাও। বাহিরের আঘাতের দ্বারা আমাদের শক্তিকে অন্তরে অন্তরে পুঞ্জিত করো।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ ক'র্‌ছি, যিনি রুদ্রের এই জয়-পতাকা বহন ক'রে এনেছিলেন, যিনি আমার পরম পূজনীয়, যাঁর কাছ থেকে আমার জীবনের পূজা, আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ ক'রেছি, আজ তাঁর কথা ব'ল্‌তে পারি এমন শক্তি আমার নেই, আজ আমার কণ্ঠ ক্ষীণ। যদি কিছুই না ব'ল্‌তে পারি এই মনে ক'রে আমি কিছু লিখেছিলাম, সেই লেখাটুকু প'ড়ে আমার বক্তব্য শেষ ক'র্‌বো।

[ইহার পর রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে অভিভাষণটি পাঠ করেন, তাহা প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যার ৮০৮পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।]

ছাতিম গাছ

শ্রী মৈত্রেয়ী দেবী

যাবার বেলা এসেছি তোর কাছে ওরে আমার ছোট্ট
ছাতিম গাছ,
অনেক দিন যে তোরি ছায়ে দেখেছিলেম তোরি
পাতার নাচ,
ওরে আমার ছোট্ট ছাতিম গাছ।
আমার গোপন দুঃখগুলি
তোমার পাতায় উঠ্‌ছে দুলি',
অনেক ব্যথা মলিন হয়ে রইল শাখাময় ;
তারি পরে শীতল হাওয়া বয়।
দুখের দিন্ যে ঘনিয়ে এল আজ
ওরে আমার ছোট্ট ছাতিম গাছ।
বর্ষা যখন নিবিড় ধারায় ঝরে
ক্লান্ত হ'য়ে ফির্‌তেছিলেম ঘরে,
পাতায় ভরা ছিল তোমার আকাশ-ধোয়া জল,
আমি এলে আমার দেহের পরে সোহাগভরে ঢাল্‌লে
অবিরল।
সেদিন তোমার কানে কানে অনেক গোপন কথা
বলেছিলেম অনেক মর্ম্ম-ব্যথা,
ঝরিয়েছিলেম অনেক অশ্রুজল।
আলোছায়ার পিছে পিছে
কালো কচি পাতার নীচে
আজো তারা করুছে কি টল্‌মল্ ?
বাতাস তোমার দুলিয়ে যেত শাখা,
মুগ্ধ আকাশ রইত মেঘে ঢাকা,
তোমার একটা ডালের উপর থাকি'
ছোট্ট পাখী কর্‌ত ডাকাডাকি।
আমি তখন অনেক গাছের কুড়িয়ে অনেক ফুল
তোমার গোড়ায় ঢেলে দিতেম সৌরভে আকুল।
তখন দেখে মনে হ'ত তোরে,
পাতায় পাতায়, কিসের যেন লজ্জা গেছে ভ'রে।
আমি হেসে বলেছিলেম—দুঃখ কী আর আছে,
ফুল্ ত ফোটে অনেক গাছে গাছে,
বলেছিলেম ভুলিয়ে নানাছলে—
"আমি তোরে ভালবাসি ফুল ফোটে না ব'লে॥"
ভাষা-হারা যে কথা তোর রইল প'ড়ে বাকি,
আমি আমার মর্ম্মে নেব আঁকি'।
তোরও কিরে পাতার নীচে কঠিন বুকের তল
আমার স্মৃতির বেদন-ভরে কর্‌বে না ছল্‌ছল ?
আমার কথা পড়্‌বে না তোর মনে
হাওয়ার খেলা, নীল আকাশের সনে ?
আন্‌বে না কি একটুখানি ভোরের আলোর নাচ'
ওরে আমার ছোট্ট ছাতিম গাছ !
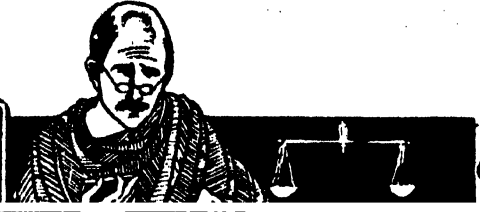
মধুসূদনের গীতিকাব্যে বৈষ্ণব কবিদিগের প্রভাব

গীতি-কবিতা মধুসূদন অল্পই লিখিয়াছেন, ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবিতাগুলিই মোটামুটি তাঁহার রচিত গীতিকবিতা। "ব্রজাঙ্গনা" নামেতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা এবং তাহা যে বৈষ্ণব কবিদিগের ভাবের অনুকরণে লিখিত, ইহা স্বতঃ প্রকাশ।

মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা কাব্য বৈষ্ণব কবিদিগের ভাব অনুসরণে লিখিয়াছেন; কিন্তু তিনি রাধাকৃষ্ণ প্রেমের একটি মাত্র রসের প্রকাশ করিয়াছেন। হয়ত তাঁহার সকল রসের দিকই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, হয়ত সময় করিয়া লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি তাঁহার প্রকাশিত কবিতাগুলির শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন, "ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা কাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।" সুতরাং আমরা তাঁহার যে কবিতা কয়টি পাইয়াছি, তাহাতে তিনি রাধার বিরহেরই রূপ ফুটাইতে চাহিয়াছেন।

বিরহিণী রাধা বংশীধ্বনি শুনিয়া ভাবিতেছেন, বুঝি রাধিকারমণ তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছেন; তাই তিনি চকিতে উঠিয়া সখীকে বলিতেছেন,—

"নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকা-রমণ!
চল সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি, সজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি,
কেমনে ধৈরয ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কুল,
চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও চরণ!"

* *

"ওই শোন, পুনঃ বাজে, মজাইয়া মন রে,
মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কাণে,
আমি শ্যাম-দাসী।"

শ্যামের বাঁশীটি রাধিকার মন যে কি ভাবে চঞ্চল করিয়াছিল, তাহা চণ্ডীদাসের একটি কবিতায় সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে—

"সজনি লো সই।
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই ॥
শ্যামের বাঁশীটী দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল ॥
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী ॥"

কবি জ্ঞানদাসের বর্ণনায় আছে—

"কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী
অতি অনুপাম,
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি
ডাকে আমার নাম।"

সুতরাং বিরহ-অবস্থায়ও রাধিকা সেই বাঁশীর ধ্বনিই শুনিতে পাইতেছেন। তাই রাধিকার মুখ দিয়া চণ্ডীদাস বলাইতেছেন, "বাঁশীর নিশাদ কাণে, সান্ধাইল বিষ-স্বরে, এ অঙ্গ জ্বলিয়া গেল মোর।"

গগনে জলধর দেখিয়া বিরহিণী রাধার শ্যাম-জলধরের বিরহ-যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। মধুসূদন বলিতেছেন,—

"হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম-জলধর;
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ, একাকিনী,
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধা-মনোহর?"

"ভরা বাদরে মাহ ভাদরে" আকাশে মেঘ উঠিলে বিরহিণী রাধার প্রাণের জ্বালা বিদ্যাপতি ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন, কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।"

অথবা—

"নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোর।"

তারপর মধুসূদনের বিরহিণী রাধিকা যমুনা-তটে গিয়া যমুনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

"মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ, ভাল ক'রে কহনা আমারে।
সাগর বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে,
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী?

* *

বসো আসি, শশিমুখি! আমার আঁচলে,
কমল-আসনে যথা কমল-বাসিনী।
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিনি!
এস গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে।"

যমুনার প্রতি রাধিকার স্বাভাবিক আসক্তি, কারণ যমুনাও যে তাঁহার শ্যামের মতই কৃষ্ণবর্ণ।

উষার উদয়ে সখীগণ ডালা ভরিয়া কুসুম চয়ন করিয়া আনিতেছে, কিন্তু বিরহিণী রাধার তাহাতে প্রীতি নাই। তিনি সখীকে ভর্ৎসনার ছলে বলিতেছেন,—

"কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি,—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী,
তারার মালা ?
আর কি যতনে, কুসুম রতনে,
ব্রজের বালা ?
*
হায় লো দোলাবি সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো, তমালের তলে
বনমালিয়া ?"

বনমালী যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন শ্রীরাধার সাজসজ্জা সব মিথ্যা, তাহাতে আর তাহার মন কৈ ? প্রান্তরে বংশীধ্বনি হইলে, শ্রীরাধার তাহা এখন অসহ্য বোধ হয়; কারণ শ্যামের বাঁশীর কথা যখন স্মরণে আইসে, তিনি সখীকে ডাকিয়া বলেন,—

"কে ও বাজাইছে বাঁশী, সজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ-বনে ?
নিবার উহারে ; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে !
এ আগুনে কেন আহুতি-দান ?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ ?"

এই বর্ণনার সহিত চণ্ডীদাসের রাধিকার শ্যামের বংশীধ্বনির স্বরূপবর্ণনার তুলনা করা যাইতে পারে।

গোধূলি আসিলে গোকুলের গাভীকুলকে বিষণ্ণ দেখিয়া শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন,—

"কোথা হে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি।
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,
আইল গোধূলি,কোথা রহিল মাধব ?"

গোবর্দ্ধন গিরিদর্শনে রাধার গোবর্দ্ধনধারীর বিরহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণচূড়া পুষ্প দর্শনে কৃষ্ণকে মনে পড়িলে, "বলয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি" বিরহিণী রাধা একাকিনী বসিয়া কাঁদিলেন। শ্যামের সহিত যে নিকুঞ্জ বনে রাধিকা বিহার করিতেন, তাহার নিকট আসিয়া তিনি কাঁদিয়া বলিলেন,—

"যমুনা-পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জ বন,
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে,
হে সখে দেখাও মোর ব্রজের রঞ্জন।
সুধাংশু সুধার হেতু, বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদীর মন যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর রূপে জিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে।"

এই কুঞ্জবনে আসিতেই শ্রীরাধার পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগিয়া উঠিল। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় সখীকে প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য কাকুতি-মিনতি করিতেছেন।

তারপর ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া দেখা দিল। গোকুল নব ফুলসাজে জাগিয়া উঠিল, কুসুমকাননে কোকিল কুহুতান তুলিল, ফুলমধুপানমত্ত অলিকুল গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া উঠিল। শ্রীরাধার বিরহ অসহ্য হইয়া উঠিল, মর্ম্মভেদ ক্রন্দনে শ্রীরাধা সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।
পিককুল কল কল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।
সখি রে,—
উদয়-অচলে উষা দেখ আসি হাসিছে।
এ বিরহ-বিভাবরী, কাটানু ধৈরয ধরি,
এবে লো রব কি করি ? প্রাণ কাঁদিছে।"

এইখানে মধুসূদন তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্যের বিরহ নামক সর্গ সমাপ্ত করিয়াছেন।

বসন্তে শ্রীরাধার বিরহদশার বর্ণনা অনেক বৈষ্ণব কবিই লিখিয়া গিয়াছেন। সে-সকল বর্ণনা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। বলরাম দাস তাঁহার শ্রীরাধার বিরহাবস্থার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"সো মধুমাস, বিলাসত জনে জনে,
আওল কাল বসন্ত।
এত দিনে কতহিঁ যতনে জীউ রাখল,
অব কি জীয়ব তুয়া কান্ত।
পিকু অলি কাকাল, কুসুম লতাবলি,
দিনে দিনে জীউ কর অন্ত।
বিকসিত কুসুম, ভরল সব কানন,
চৌদিশে ভ্রমর-ঝঙ্কার।
তরু পর কোকিল, পঞ্চম গাওই,
নিশি দিশি জীবন জার।
পাপ নিশাকর, কিরণ পসারল,
জগ ভরি আনল বিথার।
মাধবী মাসে, আশে জীউ না রহল,
অব কি সহব দুঃখ আর ॥"

বসন্তে শ্রীরাধার বিরহ কবি বিদ্যাপতি অতি সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন!—

"ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিম- শিখরসি ধাওল
পিয়া নিজ দেশ না আওই রে ॥
চান্দ-চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহু দূর দেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল ॥"

অথবা—

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত ॥
কোকিল কুল কলরব হি বিথার।
পিয়া-পরদেশ, হাম সহই ন পার ॥"

চণ্ডীদাস এ অবস্থায় এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"সখি রে—
বরষা বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবী-লতা।

কুহু কুহু করি, কোকিল কুহুরে,
গুঞ্জরে ভ্রমরী যত ॥
আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল ॥
কোন্ সে নগরে, নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর ॥"

মধুসূদন পুরাপুরি বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়াও যে বৈষ্ণব কবিতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা দেখাইবার জন্যই তাঁহার রচিত কবিতার পার্শ্বে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা উদ্ধার করিয়া তাঁহার কবিতার উপর বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। মধুসূদন অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাণের অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র ১৩৩৫) শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ

—

ঢাকা

ঢাকা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ বিশেষ করিয়া বিক্রমপুর, সাভার, ধামরাই, সোনারগাঁ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালে বঙ্গের হিন্দুরাজা সেন বংশের রাজধানী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বজ্রতান্ত্রিকগণের শীর্ষস্থানীয়; তাঁহার স্মৃতি আজও ভারতের ও তিব্বতের বৌদ্ধগণ পূজা করিয়া থাকেন। দীপঙ্করের জন্ম বিক্রমপুরের রাজকুলে। হিন্দু যুগেও মুসলমান রাজত্বের সময় ঢাকা দিগ্বিজয়ী বীর, সমুদ্রযাত্রী নাবিক ও নানা জনপদবিহারী বণিককুলের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল; জগদ্গুরু ধর্ম্মপ্রচারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানকার ধূলিকণা তীর্থে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই ঢাকা নানা ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। ঢাকাই মসলিন, ঢাকাই শাঁখা, ঢাকাই গহনা, ঢাকাই সাজের প্রশংসা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন।

মুসলমান রাজত্বকালেই ঢাকা-শহর সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাদশাহ নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাঙ্লা সুবার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙ্লা দেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে পর্ত্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার এতদূর বেশী হইয়া উঠিয়াছিল যে, গৌড়ের নিকট তাণ্ডা ও রাজমহলে থাকিয়া বাঙ্লার সুবাদারেরা দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ সুশাসন করিতে পারিলেন না। কাজেই সুবাদারের নৌবাহিনী সংস্কার করিয়া প্রধান অধ্যক্ষ আমীর-উল্-বহর ও জলবাহিত পণ্যের প্রধান অধ্যক্ষ বখ্শ্-বন্দর গৌড় হইতে আস্তানা উঠাইয়া ঢাকায় আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইসকল অঞ্চলের নদীপথগুলি জলদস্যুদের অত্যাচার হইতে মুক্ত রাখিবার নিমিত্ত মুন্সীগঞ্জ এবং শিতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীর মোহনায় দুইটি সুরক্ষিত ও অস্ত্র শস্ত্র সুসজ্জিত জলদুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুন্সীগঞ্জের বর্ত্তমান ফৌজদারী আদালত ঐ জলদুর্গের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মাতুল প্রথমবার বাঙ্লার সুবাদার হইয়া আসিয়া এই জলদস্যুদিগকে দমন করেন। তাঁহার পরে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ্-শান বাঙ্লার সুবাদার হইয়া ঢাকায় আসেন। ইহাঁর প্রাসাদ পুস্তা রাজপ্রাসাদ নামে খ্যাত ছিল। সেকালে এই বিশাল হর্ম্ম্য বুড়ীগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া সগর্ব্বে আজিম-উশ্-শানের ধনৈশ্বর্য্যের পরিচয় দিত। বর্ত্তমানে সে প্রাসাদের চিহ্ন মাত্রও নাই—তাহা বুড়ীগঙ্গার গর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে। কিছুদিনের মধ্যেই সুবাদার আজিমের সহিত রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী করতলব খাঁর (যিনি পরে মুরশিদকুলী খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া বাঙ্লার সুবাদার হইয়াছিলেন) মনোমালিন্য ঘটিল। একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে আজিম-উশ্-শান করতলব খাঁকে হত্যা করাইবার চেষ্টা করায় তিনি তাঁহার সমস্ত কর্ম্মচারী লইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করেন। এই দিন হইতেই ঢাকার প্রাধান্য লোপ পাইল—বিধাতা পুরুষ রুষ্ট হইয়া যেন ঢাকার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। আজিম-উশ্-শান সম্রাট কর্ত্তৃক পাটনায় প্রেরিত হইলেন এবং করতলব খাঁ মুরশিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। ইহার পরে ঢাকায় একজন করিয়া নায়েব নাজিম থাকিতেন। বোর্ড্ অব্ রেভিনিউ সৃষ্ট হইবার পর হইতে এ পদটিও উঠিয়া যায়। ঢাকার শেষ নায়েব-নাজিম নসরৎ জঙ্গ এর বৈঠকখানা বর্ত্তমানে ঢাকার যাদুঘরে পরিণত হইয়াছে। ১৯০৫ সালে আর একবার ঢাকার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছিল। ভারতের বড়লাট লর্ড্ কার্জ্জন্ বাঙ্লা দেশকে পূর্ব্ববঙ্গ-আসাম এবং বঙ্গদেশ এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ঢাকাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই কারণে ঢাকার প্রাধান্য আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সহকারী দপ্তরখানা, লাট সাহেবের বাড়ী সহকারী কর্ম্মচারীদের বাসগৃহের অট্টালিকারাজীতে রমণার জঙ্গলপরিপূর্ণ মাঠ সুন্দর বাগানে পরিণত হইল। কিন্তু বিধাতা পুরুষ এইসব আয়োজন দেখিয়া হয়ত অদৃশ্যে হাস্য করিলেন। কারণ ১৯১১ সালেই বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইয়া গেল। ঢাকা হইতে যুক্ত বাঙ্লার রাজধানী আবার কলিকাতায় উঠিয়া আসিল। বড় বড় বাড়ী, বিশাল দপ্তর ঘর সমস্তই খালি পড়িয়া রহিল। লর্ড কার্জ্জনের বহুদিনের বাসনা ছিল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। কিন্তু তিনি তাহা স্থাপন করিয়া যাইতে পারিলেন না। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

(ই বি রেলওয়ে সাপ্লিমেণ্ট্ টু দি ইণ্ডিয়ান্
ষ্টেট রেলওয়েজ্ ম্যাগাজিন, শ্রাবণ ১৩৩৫)

—

ভাত

ধানটি প্রধানতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত—বাহিরের আবরক বা তুঁষ এবং ভিতরের দানা বা চাউল। চাউলের গায়ে আর এক রকমের লাল পাতলা আবরক লাগিয়া থাকে, বারবার ঢেঁকিতে ছাঁটিলে উহা উঠিয়া যায়; উহাকে কুঁড়ো বলে। কুঁড়ো বাজে জিনিষ নহে; উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। ধানটিকে ঢেঁকিতে ভানিলে উহার এক কোণে চাউলের যে ভ্রূণটি থাকে তাহা ভাঙিয়া যায়।

পল্লীগ্রামে যাহারা ধান ভানে তাহারা কুঁড়ো ও এই কোণাগুলিকে চাহিয়া লইয়া যায়। এই দুইএর সংমিশ্রণে উপাদেয় পায়স প্রস্তুত করিয়া তাহারা খায়।

এদেশে লোক ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া চাউল বাহির করে; ভানার প্রথম অবস্থায় (পালটে), লাল ত্বকটি থাকিয়া যায়; এই লাল ত্বক যুক্ত চাউলকে "আকাঁড়া" চাউল বলে। দ্বিতীয়বার ধানকে ভানিলে, দ্বিতীয় পালট, উপরের লাল ত্বক বাদ যায়, কিন্তু তখনো ধানের গায়ে সূক্ষ্ম আর একটি আবরণ থাকিয়া যায়; উহাকে silver layer বলে। ইহার বেশীর ভাগই cellulose। তখন সেই চাউলকে কাঁড়া চাউল বলে; বাকী যেটা পড়িয়া থাকে তাহা "কুঁড়ো" নামে চলিত হয়। পশু বা পক্ষীরা কুঁড়োকে সাগ্রহে খাইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি যথেষ্ট ও সত্বর হয়। আমি কয়েক দিন গমের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে কুঁড়ো মিশ্রিত করিয়া রুটি ও লুচি খাইয়া দেখিয়াছি; তাহাতে ঐ রুটির একটি সুন্দর স্বাদ ও গন্ধ বাহির হয়, উহাতে "ময়ান" দিবার প্রয়োজন হয় না এবং উহাতে সুন্দর কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। কুঁড়োতে যথেষ্ট পরিমাণে তৈলাক্ত পদার্থ থাকায়, গমে ময়ান দিবার প্রয়োজন হয় না—ময়ান দিলে, সে রুটি গুরুপাক হয়। কাযেই, গমের সঙ্গে কুঁড়ো মিশাইলে দুইটি লাভ—ঘি'র খরচ কম হয়, পুষ্টিকর আহার্য্য সস্তায় লাভ হয়।

তুঁষটা এখন ধানের কলওয়ালারা ধানের কলে জ্বালানি স্বরূপ ব্যবহার করে। আমাদের উনানে উহা ব্যবহৃত হইলে কত পয়সা বাঁচিয়া যাইত। যুদ্ধের সময়ে তুঁষকে সামান্য ভাজিয়া মিহি গুঁড়া করিয়া কাপড়ের পুঁটুলির ভিতরে ভরিয়া পুঁজ ও রক্তস্রাব যুক্ত ঘায়ের উপরে বাঁধিয়া দেওয়া হইত, তাহাতে তুলা ও ক্ষত ড্রেস করিবার কত সহস্র গজ কাপড় বাঁচিয়া গিয়াছিল।

কুঁড়ো—গরু ও পাখীর খাবার। মানুষও ত উহা খাইতে পারে। অভ্যাসে কি না হয়? কুঁড়ো বাদ দেওয়ার দরুণ চাউলটি স্নেহ জাতীয় পদার্থ বর্জ্জিত হইয়া পড়ে—এই কারণে ভাতে ঘি খাওয়ার প্রয়োজন হয়। কবিরাজী শাস্ত্র মতে ঘৃতহীন অন্ন-কদন্ন। ঘৃতের উপকারিতা অসাধারণ। কিন্তু এই মহার্ঘ্যের দিনে, যখন খাঁটি ঘৃত পাওয়াই যায় না, তখন লাল ত্বক যুক্ত (আকাঁড়া) চাউল ভক্ষণ করা সাধারণ গৃহস্থের খুব উচিত। আকাঁড়া চাউল দরে সস্তা, দমে ভারী, স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকারী। সুধু দেখিতে তেমন সুশ্রী নয় এবং অনভ্যাস বশতঃ খাইতে খুব ভাল লাগে না। কিন্তু অভ্যাস ধরিলেই ঐ চাউলই সুমিষ্ট বোধ করে।

চাউল কোণা—যেটি চাউলের ভ্রূণ,—ধান ভানিবার সময়ে সেটি অধিকাংশ সময়ে বাহির হইয়া যায়, এবং কতক চাউল ভাঙিয়া যায়। ভাঙা চাউলকে ক্ষুদ বা ক্ষুদ্র চাল বলে। ক্ষুদও সাধারণ গৃহস্থ খান না—দানার্থে রাখিয়া দেন।

আজকাল চাউলকে ঢেঁকিতে না ছাঁটিয়া কলে মাজা হইতেছে। বহুলক্ষ মণ চাউল ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ হইতে ইয়ুরোপে, এসিয়ার নানা স্থানে ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়। চাউলকে মাজিলে ও তাহার সঙ্গে সামান্য চূণ মিশ্রিত করিলে, সে চাউল সহজে নষ্ট হয় না, বহুদিন থাকে। তাহা ছাড়া তুঁষ সুদ্ধ ধান লইয়া গেলে জাহাজ ভাড়া অনর্থক বেশী পড়ে—এই উদ্দেশ্যেই মাজা চাউলকে রপ্তানি করা হয়। চাউলের রপ্তানি প্রথম প্রথম ব্রহ্মদেশ হইতেই আরম্ভ হয়। উক্তদেশবাসীরা অত্যন্ত কর্ম্মবিমুখ—ধান বিক্রয় করিতে পারে, চাউল বাহির করিয়া দিতে পারে না। এই কারণেই ধান-কলের সৃষ্টি। কলে ধান মাজিলে সুধু যে উহার লালত্বক ও ভ্রূণ চলিয়া যায় তাহা নহে, silver layer ছাড়া চাউলের আরো খানিকটা পদার্থ উঠিয়া যায়—কাযেই, খাদ্য হিসাবে চাউল অত্যন্ত নিরেস হইয়া পড়ে। আমার এক এক সময়ে মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতি রোগ-প্রবণ, অল্পায়ু ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে যবে হইতে কলে মাজা চাউলের অত্যন্ত ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, আষাঢ় ১৩৩৫) শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

—

জমীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম উপায়

জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে, সচরাচর আমরা তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখি। প্রথমতঃ—

১। জমি-কর্ষণ।
২। সার-প্রয়োগ।
৩। জলসেচন।

জমীতে কোনও বিশেষ খাদ্যের অভাব হইলে, আমরা বিশেষ সার প্রয়োগ দ্বারা সেই অভাব মোচন করি। জমীতে জলের টান ধরিলে, নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে সেচনের ব্যবস্থা করি। জমীতে আগাছা জন্মিলে নিড়ান দিয়া থাকি, ইত্যাদি। কিন্তু জমীর ভিতরে গাছের শিকড়ের নানাপ্রকার ক্রিয়া বা নিশ্বাস-প্রশ্বাস-জনিত যে-সকল বিষ গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহার নিষ্কৃতির কোন উপায় করিতে বিশেষ কোন একটা চেষ্টা আমরা করি না।

আমরা যখন কোনও কাজ করি, কোনও বিশেষ পরিশ্রমের কাজ—তখন আমরা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলি; অর্থাৎ বায়ু হইতে অম্লজান (oxygen) খুব বেশী পরিমাণে গ্রহণ করি ও অঙ্গারজান (carbon dioxide) নাসিকার দ্বারা নির্গত করিয়া থাকি। অম্লজান (oxygen) আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী আর কার্‌বন্ (অঙ্গার) শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। গাছের পক্ষেও অম্লজান (oxygen) ঠিক সেইরূপ উপকারী। আর অঙ্গার (কার্‌বন্) ঠিক সেইরূপ অনিষ্টকারী।

ফসলের তিনটি অবস্থায় অম্লজানের বিশেষ দরকার হয়। যথা—

১। বীজ অঙ্কুরের সময়
২। গাছের বৃদ্ধির সময়
৩। ফলধারণের সময়

এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শিকড়কে বেশ খাটিতে হইতেছে; কারণ, শিকড় দ্বারা গাছকে আহার সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন অংশে পাঠাইতে হইতেছে। সুতরাং মাটির ভিতর অম্লজানের খরচ বেশী হইতেছে ও অঙ্গার (কার্‌বন্) অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতেছে। এই অম্লজান, গাছ বায়ু হইতে সংগ্রহ করে ও গ্রহণ

করিবার সময় বায়ু হইতে অম্লজান-টুকুকে লইয়া থাকে ও অঙ্গারটিকে ছাড়িয়া দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অঙ্গার গাছের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। এখন দেখিতে হইবে, যে, গাছের শিকড় এই বায়ু সংগ্রহ করে কোথা হইতে? সচরাচর জমী হইতে। জমী কর্ষণ করিবার সময় বায়ু মাটির ভিতর প্রবেশ করে আর এই বায়ু-প্রবেশের পরিমাণটি নির্ভর করিতেছে কর্ষণের উপর; অর্থাৎ ভাল করিয়া জমি কর্ষণ করিলে, অধিক পরিমাণে বায়ু মাটির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে।

উপযুক্ত রূপে জমী কর্ষণ না করিলে পরস্পর মৃত্তিকাকণার মধ্যে ব্যবধানের অভাব হয়; আর অধিক সেচনহেতু মাটির ভিতর হইতে অঙ্গারের (কার্ব্বনের) বহির্ভাগের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্যান্য জলে—পুষ্করিণীর জলে ইত্যাদি অম্লজানের অভাব অনেক; অর্থাৎ সেচন-জলের দ্বারা মৃত্তিকার মধ্যে অম্লজানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না; কেবলমাত্র মৃত্তিকা হইতে খাদ্যের সংস্থান করিয়া দেয় মাত্র।

একটি বৃষ্টির জলে ফসলের যে পরিমাণ উপকার সাধিত হয়, তাহা বহুসেচনের দ্বারাও সাধিত হয় না। বৃষ্টির দ্বারা ফসলের দ্বিবিধ উপকার হয়। প্রথমতঃ, জলের অভাব মোচন হয়; দ্বিতীয়তঃ, অম্লজানের অভাব কিয়ৎপরিমাণে মোচন হয়। এই অম্লজান বৃষ্টি-পাতের সময় আকাশের বায়ু হইতে সংগৃহীত হয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উপর্য্যুপরি তিন চারিটি সেচন দ্বারা অনেক সময় ফসলের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে—যথা রোগের প্রাদুর্ভাব, ফসল ধরিতে বা পাকিতে বিলম্ব হওয়া, শস্যগুলি পরিপুষ্ট না হওয়া ইত্যাদি।

এইরূপ অনিষ্ট হয় বেশীর ভাগ দো-আঁস জমিতে, অর্থাৎ রবি-শস্যের জমীতে। গম, আলু, পেঁয়াজ, তামাক ইত্যাদির জমীতে ও যে-সকল জমীতে বন্যার পলি পড়ে, এইরূপ জমী হইতে ফসল লইবার পূর্ব্বে একটি সেচন দিয়া পরে বীজ রোপণ করিলে ভাল হয়। তাহার পর গাছ বড় হইলে আর একটি সেচন দিলে ভাল হয়। জমীবিশেষে ইহার তারতম্য আছে। তবে এই প্রণালীতে গাছ বাহির হইবার পর ক্রমান্বয়ে সেচন করা উচিত নহে। যদি সেচনের বিশেষ দরকার হয় তবে মাটীকে উস্‌কাইয়া দিয়া অঙ্গার জাতীয় গ্যাসগুলিকে বাহির করিয়া দিবার উপায় করিতে হইবে; পরে এক-দিনের মধ্যে সেচন করিতে হইবে; নচেৎ জমীর মধ্যে বহুলপরিমাণে অঙ্গারজাতীয় গ্যাস সংগৃহীত হইয়া ফসলের অনিষ্ট করিবে।

যেখানে সকল জমী একই সমতল ভূমির উপর অবস্থিত অর্থাৎ জমীগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নহে, সেখানে বর্ষার সময়ে বিশেষতঃ মাটির ভিতরে বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত করা কঠিন ব্যাপার। এই স্থলে, বিশেষতঃ আখ, বেগুন, ভুট্টা, তুলা ইত্যাদির ক্ষেতে বর্ষার পূর্ব্বে জমীর মাঝে মাঝে গভীর নালা বা ড্রেন কাটিয়া রাখিতে হয়। তাহা হইলে বর্ষার সময় মাটির ভিতরকার জল-নিকাশের অনেক সুবিধা করিয়া দেয়। আর সচরাচর এই-প্রকার জমী অন্যান্য জমীর অপেক্ষা কিছু উঁচুতে হইয়া থাকে। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান অনুসারে অনেক প্রদেশে মাটির একহাত দেড়হাত তলায় চার-পাঁচ-হাত অন্তর, মাটীর পাইপ বা নালা পাতিয়া দিয়া থাকে। ঐ পাইপ লাইনবন্দী করিয়া দিতে হয়। মাটির ভিতরকার অতিরিক্ত জল মাটি চুয়াইয়া ঐ পাইপ দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই প্রকার প্রক্রিয়া নাগপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ভুট্টার ও তুলার জমীতে করিতে দেখিয়াছি। পুষা ও অন্যান্য সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রে জমীর মাঝে মাঝে বড় বড় ও গভীর নালা কাটিয়া অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন করিতে দেখিয়াছি। বর্ষাকালে পেঁপের ক্ষেত্রে গাছের গোড়ায় জল কোন প্রকারে বসিতে দিতে নাই। সেখানে বিশেষতঃ সমতল পেঁপের ক্ষেত্রে জমীর মাঝে মাঝে গভীর নালা কাটিয়া রাখিতে হয়। পরে সেচনের দরকার হইলে এই নালা দিয়া সেচনের কার্য্যাদি সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

বর্ষাকালে কোন গাছ হলদে হইতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, গাছের গোড়ায় অত্যধিক জল বসিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাত হইলেই মাটিকে বেশ ভাল করিয়া কোদাল দ্বারা নাড়িয়া দিয়া গাছের শিকড়ে হাওয়া খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে ঐ গাছগুলি ক্রমশঃ মরিয়া যাইবে। ধানের গাছ হলদে হইতে দেখিলে কিছু জল জমী হইতে কাটিয়া দিয়া উহাতে কিছু ক্ষারজাতীয় লবণ কিম্বা নাইট্রেট অফ সোডা কিম্বা এমোনিয়ম সাল্‌ফেট বিঘাপ্রতি পাঁচসের হইতে দশসের পর্য্যন্ত ছিটাইয়া দিতে হয়।

(ভাণ্ডার, ভাদ্র ১৩৩৫) শ্রীসন্তোষবিহারী বসু

পুরুষোত্তম কে ?

শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার "গীতার অক্ষর ও ব্রহ্ম" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"ক্ষরাক্ষর বিষয়ক শ্লোকসমূহ (১৫।১৬।১৮) এবং ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বিষয়ক শ্লোকটি (১৪।২৭) প্রক্ষিপ্ত। এই দুইটি অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে গীতাতে আত্মবিরোধ আছে।" (৫১৬)

১৫ অধ্যায়ের ১৬, ১৭, ১৮ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—(১৬) সংসারে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ। সর্ব্বভূতকে ক্ষর এবং কূটস্থকে অক্ষর বলা হয়। (১৭) অন্য একজন উত্তমপুরুষ আছেন, যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যিনি অব্যয় ও ঈশ্বর এবং যিনি অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া লোকত্রয়কে ধারণ করেন [১৮] যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম ; এইজন্য লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত হই।" [৫১২ পৃঃ]

ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—অষ্টাদশ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "আমি বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত হই।" কথাটা ঠিক নহে। কোন বেদের কোন শাখাতেই কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণরূপী ভগবানকে বা পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা হয় নাই।"

গীতায় বক্তা কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বা কৃষ্ণরূপী ভগবান নহেন। তিনি অর্জ্জুনের সখা। গীতার কোন স্থানেই ভগবানের উক্তিতে কৃষ্ণকে ভগবান বলা হয় নাই। তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া অন্যত্র স্বীকৃত বটে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতায় যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি নহে, তাহা ভগবানের উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের মুখে ঐ উক্তি ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

ঘোষ মহাশয় ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ স্বীকার করেন, কিন্তু পুরুষোত্তমকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আমি বলি ক্ষর অর্থ যাহা-কিছু ব্যক্ত তাহা, অক্ষর অর্থ অব্যক্ত এবং কূটস্থ। কূটস্থ অর্থ পর্ব্বতশৃঙ্গে অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চে যিনি অবস্থিত তিনিই কূটস্থ। তাঁহার উপর কেহ নাই। তবে পুরুষোত্তম কে ? আমরা গীতায় তিনটি পুরুষ পাইতেছি—(১) ক্ষর পুরুষ, (২) অব্যক্ত কূটস্থ অক্ষর পুরুষ, (৩) ত্রৈলোক্যে প্রবিষ্ট হইয়া যিনি লোকত্রয়কে ধারণ করেন।

কে ত্রৈলোক্যে প্রবেশ করিয়া লোকত্রয়কে পোষণ করেন ? স্বয়ং ভগবান। অতএব (১) ঈশ্বর স্বয়ং ক্ষররূপে লোকে অবস্থিত, (২) ঈশ্বর অক্ষর ও অব্যক্তরূপে কূটে অবস্থিত এবং (৩) ঈশ্বর পুরুষোত্তম রূপে ত্রৈলোক্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। ইহাইতো অদ্বৈতবাদ।

যিনি ক্ষরের অতীত এবং কূটস্থ অক্ষর নহেন অথচ তদপেক্ষা উত্তম তিনিই পুরুষোত্তম। অক্ষর কূটস্থ পুরুষ অব্যক্ত এবং নিষ্ক্রিয়। তাঁহাকেই নিরাকার বলে। কিন্তু পুরুষোত্তম যিনি ত্রৈলোক্যে প্রবিষ্ট তিনি সাকার। তাঁহার বহু বদন বহু চক্ষু ইত্যাদি (গীতা ১১।১০) তিনি ব্যক্ত, অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বেদে ইহাকেই পুরুষ বলে (১০।৯০।১ ঋক) অতএব গীতার ১৫।১৬-১৮ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত নহে।

ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—এই শ্লোকে (১৪।২৭) বলা হইল কৃষ্ণ ঐ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঐ শ্লোকের "আমি অমৃত অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (ব্রহ্ম হি প্রতিষ্ঠা) এবং শাশ্বত ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা," এই উক্তির আমি কে ? ঘোষ মহাশয়ের মতে "আমি" শব্দে শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার এই অর্থ ঠিক নহে। আমি অর্থ এখানে ভগবান [১১।১০] যিনি আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন। অব্যয় ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এই পুরুষোত্তমেই, তাই তিনি পুরুষোত্তম। তাই এই পুরুষোত্তম সর্ব্বশক্তিমান। সুতরাং কোন বৈষ্ণব পণ্ডিত দ্বারা এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এ কথা আমার মতে ঠিক নহে। শ্রীকৃষ্ণ এই পুরুষোত্তমের উক্তি নিজ মুখে বলিয়াছেন, গীতার ভগবান তিনি নহেন।

বনোদবিহারী রায়, বেদরত্ন

—

রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ

বর্ত্তমান বৎসরের 'প্রবাসী'র আষাঢ় সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' নামক আমার যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, প্রবাসীর শ্রাবণ সংখ্যায় ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু তাহা লইয়া একটু আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সরসীবাবুর মধ্যে মনোবিশ্লেষণ লইয়া যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা খুব সংক্ষেপে এবং সাধারণভাবেই প্রকাশ করিয়াছি। সমস্ত কথা মনে করিয়া রাখা অসম্ভব, তবে মূল বক্তব্যগুলি সমস্তই লিখিয়াছি ; এ কারণ উক্ত প্রবন্ধ পড়িয়া সাধারণের মধ্যে মনোবিশ্লেষণ (Psycho-analysis) সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে। গিরীন্দ্রবাবুর লিখিত প্রতিবাদের উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করা ; কিন্তু উদ্দেশ্য কাজে পরিণত হয় নাই। তিনি উক্ত আলোচনা অত্যন্ত ভাসা ভাসা—ধরি মাছ না ছুঁই পানি—ভাবে লিখিয়াছেন। Psyo-analysis-এর উপর রবীন্দ্রনাথের মতামত সম্বন্ধে গিরীন্দ্রবাবুর কোথায় কোথায় আপত্তি তাহা লেখা উচিত ছিল। গিরীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, নির্জ্ঞান সম্বন্ধে (the sub-conscious) মতামত নির্জ্ঞানবিদেরাই দিতে পারেন, কবি অথবা দার্শনিকের মত গ্রাহ্য নহে ;—এ কথা কি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার বলা উচিত হইয়াছে ? তিনি মনীষী—নিজের অন্তরদৃষ্টি দিয়া সকল জিনিষ বুঝেন ; এইজন্যই তাঁর মতামতের মূল্য আছে। তাঁহার মৌলিক গবেষণাশক্তির জন্যই তিনি বিলাতে Hfbbert lectures দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। কথাটা গিরীন্দ্রবাবু যেভাবে বলিয়াছেন, সেটা Freud, Jung অথবা Adler বলিলে আমরা তত কিছু মনে করিতাম না, নির্জ্ঞানসম্বন্ধে সাধারণ বৈজ্ঞানিক জগতে গিরীন্দ্রবাবুর মতামতেরই বা কতটা মূল্য আছে তাহা বিচারসাপেক্ষ। সাধারণের মধ্যে Psycho-analysis সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করাই যদি গিরীন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে রবিবাবু কোথায় কোথায় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন তাহা আলোচনা করা উচিত ছিল।

শুধু যে সাধারণের মধ্যে তাহাই নহে ; গিরীন্দ্রবাবুর মত বিশেষজ্ঞের মধ্যেও যে ভ্রান্তধারণা আছে তাহা গিরীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদের শেষভাগ পড়িয়াই বুঝা যায়। সরসীবাবুর A Peculiarity in the Imagery of Dr. Rabindranath Tagore's poems) সমস্ত ইংরাজী প্রবন্ধটি বর্ত্তমান বৎসরের Calcutta Review এর August সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে গিরীন্দ্রবাবু বলিতেছেন—উহা Psycho-analytical নহে ; Psycho-logical ! ডাক্তারবাবু দেখিতেছি Psycho-analysis ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে Psychology জিনিষটা ভুলিতে বসিয়াছেন। প্রবন্ধটি তিনি সজ্ঞানে পাঠ করিয়াছেন অথবা নিজ্ঞানে পাঠ করিয়াছেন ? আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি—শ্রীযুক্ত রবীন হালদার মহাশয় তাঁহার গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলির জঘন্য কামমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এবং সরসীবাবু Mystic ব্যাখ্যা দিয়াছেন বলিয়াই কি গিরীন্দ্রবাবু সরসীবাবুর প্রবন্ধকে মনোবিশ্লেষিক (psychoanalytic) বলিতে চাহেন না ? রবিবাবুর মতামত লইয়া যদি যথার্থ বৈজ্ঞানিক সমালোচনা হয় তবে আমরা সুখী হইব।

শ্রীঅনিলকুমার বসু

বেতালের বৈঠক

জিজ্ঞাসা

(১৬)

তমসুক

কাহাকেও টাকা ধার দিতে গিয়া যে অঙ্গীকার-পত্র গ্রহণ করা হয় তাহাকে এক কথায় তমসুক বলে। এই তমসুক শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ কি ? কোন্ অর্থে তাহাকে তমসুক বলা হয়।

শ্রীনন্দরাণী চৌধুরাণী

(১৭)

চলতি ভাষা

চলতি কথায় 'আদিখ্যেতা' ব'লে একটা কথা দেখা যায়। সেট কোন্ কথার অপভ্রংশ ? "অধ্যক্ষতা" না 'আধিক্য'তা ? কোন্টা ঠিক ? চলতি কথায় আমরা 'সাদা'র সঙ্গে বলি "ধব্ধবে", 'লালে'র সঙ্গে বলি "টুক্টুকে" বা "টক্টকে", 'কাল'র সঙ্গে বলি "কুচ্কুচে"। এই 'সাদা'র সঙ্গে "ধব্ধবে", 'লালে'র সঙ্গে "টুক্টুকে" বা "টক্টকে"র এবং 'কাল'র সঙ্গে "কুচ্কুচে"র কোন সম্পর্ক আছে কি ?

শ্রীলালবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮)

কৃষিকার্য্যের জল তোলা

শ্রী নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সরল কৃষি বিজ্ঞান" হইতে জানিয়াছি ১ টি লোকে ১ খানি দুনির সাহায্যে ৪ ফিট নীচে হইতে ১০,০০০ গ্যালন জল ১ ঘণ্টায় তুলিতে পারে। এমন কোন পাম্প আছে কি যাহা ১টি লোকের পরিশ্রমে ৪ ফিট বা ততোধিক নিম্ন হইতে ১ ঘণ্টায় ১০,০০০ গ্যালন বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ জল তুলিতে পারে ? যদি থাকে তবে তাহা কোথায় পাওয়া যায় ?

শ্রীতীর্থনাথ বসু

(১৯)

দর কষাকষি

আমাদের দেশে বাজারে জিনিষ-পত্র কিনিতে হইলে অধিকাংশ স্থলেই ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষি চলে। ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং অসুবিধাজনক তো বটেই—মানব-মনে সভ্যতার অপরিণত অবস্থারও পরিচায়ক। আমাদের দেশে এরূপ ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতেই চলিতেছে কি ? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা কিরূপ ?

শ্রীসত্যভূষণ সেন

(২০)

সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র

বাংলাদেশে দেবদেবীর পূজা অর্চনায় এবং বিবাহ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে সমস্ত মন্ত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় পঠিত এবং উচ্চারিত হয়। ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে-সব স্থলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচলিত এবং যাহাদের মাতৃভাষা মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত তাহাদের মধ্যে কিরূপ ব্যবস্থা চলিতেছে ? এই সব ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোথাও সংস্কৃত ভাষার স্থলে মাতৃভাষার প্রচলন হইয়াছে কি ?

শ্রীসত্যভূষণ সেন

—

মীমাংসা

(১)

কাচের উপর লিখন-প্রণালী

তিসির তেলের সহিত Zinc Powder মিশাইলে একরকম Paste তৈয়ারী হয়। সেই Paste কাচে মাখাইলেই বাজারের উন্নত-প্রণালীর সার্শীর কাচের ন্যায় হয়। উহা শুকাইলে তাহাতে রংও ফলান যায়।

শ্রীরাকেশলোচন সেন

(৩)

পিপ্ড়া তাড়াইবার উপায়

পিপ্ড়া তাড়াইতে হইলে ফিনাইলের পরিবর্ত্তে কেরাসিন ব্যবহার করাও চলে। কেরাসিন খাট তক্তাপোষ প্রভৃতির পায়ে মাখাইলে এবং অন্যান্য দ্রব্যাধারের গাত্রের বাহিরে মাখাইলেও পিপ্ড়ার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বর্ষাকালে পিপ্ড়াদের বাসস্থানে জল প্রবেশ করে বলিয়া তাহারা সর্ব্বদা দলে দলে মরিয়া হইয়া ঘরে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করে। বহু বাধা সত্ত্বেও তাহা রোধ করা যায়

না। খাবারের আলমারি এবং ঘি প্রভৃতির আলমারির চারি পায়ের নীচে জল-ভরা বাটী দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীরাকেশলোচন সেন

(৬)

জাগ্ গান

বন্ধুবর মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন জাগ্ গান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গে তিনি যদি দু'একটি ছড়া বা গান সংগ্রহ করিয়া দিতেন তবে বোধ হয় সকলের বুঝিবার পক্ষে সহজ হইত। কেন না, একই উৎসবের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার নাম প্রচলিত আছে। তা ছাড়া, একই উৎসব জিলাভেদে ভিন্ন সময়ে (যদিও সময়ের ব্যবধান খুব বেশী থাকে না) অনুষ্ঠিত হওয়াও বিচিত্র নয়—প্রমাণস্বরূপ গাজন গানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রাবণের প্রবাসীতে বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'কুলাই বড়' ও যশোহর জিলার 'হুলাই'র বিবরণ পড়িয়া আমার যা সন্দেহ হইতেছে তাহাই লিখিলাম।

জাগ গানের ন্যায় এক শ্রেণীর গান ত্রিপুরা জিলাতেও প্রচলিত আছে—তাহাকে 'বাঘের মাগন' বলে। শীতকালেই—কিন্তু মাঘ মাসে, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অনেকের বিবেচনায় ইহাতে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অস্পষ্ট রেখাপাত আছে; পূর্ব্বে যখন সমস্ত দেশ জঙ্গলপূর্ণ ছিল, বাঘ এবং মানুষকে প্রতিদিন প্রতিবেশী হইয়া বাস করিতে হইয়াছে, তখন গ্রামবাসিগণ নানা ছড়া গাহিয়া রাত্রি জাগরণ করিত ও সমবেত ভাবে বাড়ী বাড়ী পাহারা দিত। এখন আর সেদিন নাই, বাঘের অত্যাচার উপদ্রব হইতে নিরীহ গ্রামবাসী মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু এখনো তাহার চিহ্ন রহিয়াছে কতগুলি প্রাচীন ছড়া ও সঙ্গীতে :—

গাও, গাওরে ভাই, বাঘের পাঁচালী,
পঞ্চকোটি ঝি পুত লইয়া নামছে বাঘিনী।
পঞ্চকোটি ঝি পুতের তের কোটী ছাও,
ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া উঠে লক্ষীন্দরের নাও।
লক্ষীন্দর, লক্ষীন্দর, কি কাজ করিলা,
মাঘ মাসের তের দিন চাউল কড়ি মাগিলা।
চাউল কড়ি দিতে বেটী যেবা করে হেলা,
দুই চোখ খাইব তার ঠিক দুপুর বেলা।
দুই চোখ খাইয়া বেটী আন্দি কুন্দি ভাই,
হাইএর কান্ধে দিয়া বাঘ, গোয়াল বাড়ী যাই।
গোয়ালের সাত পুত নূতন কামেলা,
আরাগুড়া টাঙ্গা মরে মেড়ার চামড়া।
মেড়ার চামড়া নয়রে, ডাঙ্ দিল বাড়ি,
যত কিছু মেড়ামেড়ি উঠ্যা লড়ালড়ি।*

এই প্রকার গীত গাহিয়া বালকগণ আজকাল চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করে, পরে উহা দ্বারা গ্রামের মাঠে প্রচুর আয়োজনে উৎসব সম্পন্ন হয়, বাঘের পূজা হয়।

ময়মনসিংহেও এই উৎসব হয় শুনিয়াছি, সেখানে ইহা 'বাঘের ব্রত' নামে পরিচিত।

ছড়া ও অনুষ্ঠানের অধিকাংশে ঐক্য দেখিয়া এই উৎসব 'কুলাই ঠাকুরের ব্রতে'র ন্যায় একথা হয়ত বলা যাইতে পারে। প্রশ্নকর্ত্তা, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাংলার ব্রত বইখানা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

জাগগান নামে একপ্রকার গান রঙ্গপুর, ধুবড়ী, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ী অঞ্চলে আবার প্রচলিত আছে, তাহার অনুষ্ঠানাদি অন্য প্রকার। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের 'রঙ্গপুরের জাগগান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা হইতে সামান্য উদ্ধৃত হইল—'চৈত্র মাসের শুক্লত্রয়োদশী তিথিতে কামদেবের পূজা করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। *** রঙ্গপুরে বহির্বাটীতে ভদ্রলোকেরা দুই তিনটি বংশখণ্ড প্রোথিত করেন ও দুইটি বা তিনটি দীর্ঘ বস্ত্র জড়িত বংশখণ্ডের অগ্রভাগে চামর দিয়া সেই প্রোথিত বংশখণ্ডে আবদ্ধ করেন; তাহাতেই কামদেবের পূজা হয়। রাজবংশী জাতীয়েরা পল্লী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, কোন প্রান্তরে এইভাবে কামদেবের পূজা করেন। সেই পূজোৎসবে গায়কগণ কর্ত্তৃক এই জাগগান উদ্গীত হইয়া থাকে। *** এই গান দ্বারা কামকে জাগ্রত করা হয় বলিয়া বোধ হয় এ গানের নাম জাগগান। জাগ্-গান দ্বিধা বিভক্ত—কানাই ধামালী ও মোটা জাগ। মোটা জাগ অত্যন্ত অশ্লীল বলিয়া প্রান্তরে ভিন্ন কাহারও বাটীতে কখনো হয় না। কানাই ধামালী অনেক সময় অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও হইয়া থাকে।' বিশেষ বিবরণের জন্য ঐ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

শ্রীসুধীরকুমার সেন

(৭)

বিয়াল্লিশ বাজনা

"দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা"—এই লাইনটি কবিকঙ্কণের "চণ্ডীমঙ্গল" হইতে উদ্ধৃত হইলেও, কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদিকাণ্ডে ঠিক এই লাইনটির হুবহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া "বিয়াল্লিশ বাজনা"র প্রয়োগ চণ্ডীমঙ্গলের আরও তিন চার জায়গায় ও শূন্যপুরাণে আছে।

"বিয়াল্লিশ বাজনা"—ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী মিলিয়া বিয়াল্লিশ হইয়াছে। এই বিয়াল্লিশ সুরের উপযুক্ত ৪২ প্রকারের তাল মান সুর সঙ্গত বাদ্যকে বিয়াল্লিশ বাজনা বলা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী" পড়িতে হইবে।

"দামামা" ও "দামা" কথা দুইটি বাংলায় একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুইটিই বাংলা শব্দ। ইহাদের সংস্কৃত—দম্মম, ফার্সী—দম্মমা। সংস্কৃত দম—বাংলা দণ্ড। দণ্ডাঘাতে দমদম শব্দ করিয়া বাজান হয় বলিয়াও হয়তো ইহাকে দামামা বলা হইয়া থাকে।

"দগড়" কথাটিও বাংলা। ইহা ডগডগ গড়গড় শব্দকারী মাটির খোলের মুখে চামড়া ছাওয়া একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ দ্রগড়।

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী

(৯)

মহাভারতীয় যুগে বার

প্রাচীন বৈদিককাল হইতেই আর্য্য ঋষিগণ গ্রহনক্ষত্রের বিষয় নানাপ্রকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উঁহাদের যে পৃথিবীতে প্রতিপত্তি বা influence আছে এবং প্রত্যেক মানব-জীবনের উপরও প্রভাব আছে তাহাও তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কাল হইতেই তাঁহারা রবি (সূর্য্য,), সোম (চন্দ্র),

* এই ছড়াটি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত 'ত্রিপুরা জিলার কথা ভাষা' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত।

মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি প্রভৃতি গ্রহের নামানুসারে বারের নাম রাখিয়াছিলেন। ইংরাজীতেও এই প্রকার Sunday, Monday প্রভৃতির নামাকরণ প্রাচীন Normanদের আমল হইতেই হইয়াছিল।

বর্ত্তমানকালে অনেক সংস্কৃত টোলে বারের নিয়ম প্রচলিত নাই; তাহারা পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী এবং এই প্রকার তিথির অনুসারে "পাঠ বন্ধ" করিয়া থাকে। মহাভারতে যদিও বারের উল্লেখ নাই, তথাপি ঐ যুগের বহু পূর্ব্বেই রবি, সোম প্রভৃতি বারের সৃষ্টি বা নামকরণ হইয়াছিল। কেবল আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচ্যের বারের সঙ্গে প্রতীচ্যের বারের হুবহু মিল আছে।

শ্রীরাকেশলোচন সেন

(১৩)

তাঐ ও মাঐ

তাঐ শব্দের আরো দুইটি রূপ পাওয়া যায়, তাউই ও তালৈ। সংস্কৃতে তাতগু (=শ্বশুরতাত) হইতে তাঐ শব্দ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। অথবা তেলেগু ভাষার "তালা"বা তামিল ভাষার "তালৈ"। (=মাতৃ-কন্যা) শব্দ হইতে বাংলা তাঐ, তালৈ শব্দ হইয়া থাকিবে। তামিল ভাষার স্ত্রীলিঙ্গ "তালৈ" শব্দ তাত শব্দের analogyতে হয় তো পরে বাংলায় পুংলিঙ্গ হইয়াছে। তামিল ও তেলেগু ভাষার "আম্মা" শব্দ হইতে বাংলা "মাঐ" শব্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাংলা দেশের কোন কোন পল্লীতে এখনও "মাঐ"কে "আম্মা" সম্বোধন করিয়া থাকে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস

গত বৎসরের

(২৩)

শিশুকালে বাঙ্গালা ভাষায় অঙ্ক করিবার সৌভাগ্য আমার যখন হইয়াছে, তখন + প্লাসকে যোগ, – মাইনসকে বিয়োগ এবং = ইকুয়ালটুকে সমান চিহ্ন বলিয়া পড়িতাম।

যথা—

২+৩=৫ দুই যোগ তিন সমান পাঁচ।

৩ – ২=১ তিন বিয়োগ দুই সমান এক।

Positive এবং Negative শব্দের বহুজাতীয় বাংলা পড়িয়াছি:—

Positive—উত্তমর্ণ, যোগাত্মিকা।

Negative—অধমর্ণ, ধারাত্মিকা।

কোথায় পড়িয়াছি ঠিক মনে নাই।

Positive এবং Negative এর যথাক্রমে স্বভাবরূপ এবং অভাবরূপ অনুবাদ দেখিয়াছি। ইহা স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্-এ মহাশয়ের 'শব্দকথা' পুস্তকের 'বাঙ্গালায় প্রথম রসায়নগ্রন্থ' নামক শেষ প্রবন্ধে আছে। ইহা শ্রীরামপুর কলেজের ম্যাক সাহেবের রচিত 'Principles of Chemistry' নামক বইয়ের বঙ্গানুবাদ-কালে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া উদ্ধৃত।

শ্রী অজিতনাথ চক্রবর্ত্তী

বিপ্লব-চিত্র

শ্রী স্বর্ণলতা চৌধুরী

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী রাত্রি আটটার সময় একটি বৃদ্ধা রমণী সেণ্ট লরেণ্ট গির্জ্জার সম্মুখের ঢালু বড় রাস্তাটি বাহিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া ক্রমাগত তুষারপাত হওয়ায় পথে পায়ের শব্দ মোটেই শোনা যাইতেছিল না। রাস্তায় লোকজন একেবারেই ছিল না। চারিদিকের নিস্তব্ধতাই যথেষ্ট ভয়াবহ, তাহার উপর ফ্রান্সের ভিতর তখন যে বিভীষিকা রাজত্ব করিতেছিল, তাহার জন্য এই ভয়াবহতা আরোই অধিক বোধ হইতেছিল। এইজন্য বৃদ্ধা মহিলাটি এখনও পর্য্যন্ত কাহারও সাক্ষাৎলাভ পান নাই। তাঁহার দৃষ্টি বহুদিন হইতেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, সেইজন্য তিনি রাস্তার আলোতেও কিছু দূরে কয়েকটি পথিকের ছায়ার মত মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিলেন না। এই নির্জ্জনতার মধ্যে সাহসে ভর করিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার বার্দ্ধক্যই যেন তাঁহার রক্ষা-কবচ রূপে তাঁহাকে সব বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবে, এইরূপ তাঁহার ভাবে বোধ হইতেছিল।

একটি বড় রাস্তার মোড় পার হইয়া যাইতেই তাঁহার বোধ হইল যেন পিছনে কাহার ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা যাইতেছে। এতক্ষণে তাঁহার খেয়াল হইল যে, এই শব্দটা ইহার আগেও কয়েকবার তিনি শুনিতে পাইয়াছেন। তাঁহাকে কেহ অনুসরণ করিতেছে ভাবিয়া তিনি ভীত হইয়া উঠিলেন, এবং কিছু দূরে একটি দোকানে উজ্জ্বল আলো দেখিয়া,

তিনি সেখানে পৌঁছিবার আশায় তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, দোকানের আলোয় তিনি নিজের সন্দেহ সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

দোকানের জানালার ভিতর দিয়া যে-স্থানে আলোকের ধারা পথের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া তিনি ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন। কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যালোকে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। এইটুকুই যথেষ্ট হইল। ভয়ে তাঁহার পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার আর কোনো সন্দেহ রহিল না যে, ঘরের বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছে। গুপ্তচরের হাত হইতে প্রাণরক্ষা করার ইচ্ছা তাঁহাকে বল দিল। কি যে করিতেছেন তাহা না ভাবিয়াই তিনি দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, যদিও দৌড়িয়া তাঁহার অনুসরণকারীকে হারাইবার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না, কারণ একে সে পুরুষ, তাহার উপর অল্প-বয়স্ক।

কয়েক মিনিট দৌড়িয়া তিনি এক মিষ্টান্নবিক্রেতার দোকানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সম্মুখেই একটা চেয়ার ছিল, তাহাতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। ভিতরে বসিয়া একটি যুবতী শেলাই করিতেছিল। বৃদ্ধা দরজা খুলিয়া ভিতরে আসিবার আগেই সে জান্‌লার কাঁচের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার বেগুনী রঙের রেশমের গাত্রাচ্ছাদনটি চিনিতেও পারিল। সে তাড়াতাড়ি একটা দেরাজ টানিয়া খুলিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল।

যুবতীর ধরণ-ধারণ এবং মুখের ভাব দেখিয়া বেশ বোঝাই যাইতেছিল যে, সে বৃদ্ধাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিতে চায়। কারণ ইনি সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁহাকে দেখিয়া তখনকার দিনে কেহই খুসি হইত না। দেরাজটা একেবারে খালি দেখিয়া যুবতী অত্যন্ত বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করিল। তারপর বৃদ্ধার দিকে আর না তাকাইয়া সে দোকানের পিছনের দিকে গিয়া তাহার স্বামীকে ডাকিতে লাগিল। সে ব্যক্তি তখনই বাহির হইয়া আসিল।

যুবতী চোখের ইসারায় বৃদ্ধাকে দেখাইয়া, খুব একটা গোপনতার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই সেটা কোথায় রেখেছ ?"

মিষ্টান্নবিক্রেতা যদিও বৃদ্ধ মহিলার প্রকাণ্ড কাল রেশমী টুপী এবং তাহাতে বসানো বেগুনী ফিতার ফুলের গুচ্ছ ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, তবু সে স্ত্রীর দিকে একবার অর্থসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া, আবার ভিতরে চলিয়া গেল! তাহার দৃষ্টির অর্থ, "তুমি কি মনে কর, আমি এতই অসাবধান যে ও জিনিষ তোমার দোকানের দেরাজে রেখে যাব ?"

বৃদ্ধার নীরব নিস্পন্দ ভাবে কিছু অবাক্ হইয়া যুবতী তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মহিলার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মনে খানিকটা করুণা এবং কিঞ্চিৎ কৌতূহলেরও সঞ্চার হইল। বৃদ্ধার মুখের রং স্বভাবতঃই রক্তহীন, গোপনে ব্রহ্মচর্য্যপালনকারীদের যেমন হইয়া থাকে। এখন কিন্তু উহা মানসিক উত্তেজনার জন্য অস্বাভাবিকরকম শুভ্র দেখাইতেছিল। মাথার টুপী এমন ভাবে পরা, যাহাতে চুল একেবারে দেখা না যায়। দেহের কোথাও কোন অলঙ্কার না থাকায় তাহাকে বড় কঠোর দেখাইতেছিল। তাঁহার মুখশ্রী গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। তখনকার দিনে উচ্চশ্রেণীর মানুষদের ধরণধারণ চালচলন সমস্তই নিম্নশ্রেণীয়দের হইতে এত পৃথক ছিল যে, সহজেই কে কোন্ বংশের মানুষ তাহা বোঝা যাইত। সুতরাং যুবতীর দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, এই বৃদ্ধা উচ্চবংশোদ্ভূতা এবং রাজসভায় যাতায়াতে অভ্যস্তা।

সে সম্মানের সহিত বলিল, "মহাশয়া...।" এ ভাবে কাহাকেও সম্বোধন করা যে এখন নিষিদ্ধ, তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

বৃদ্ধা কোন উত্তর দিলেন না। একদৃষ্টে তিনি দোকানের জান্‌লার দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন সেখানে কোন ভয়াবহ পদার্থ তিনি দেখিতে পাইতেছেন।

দোকানদার তখনই ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে আপনার ?"

বৃদ্ধার সম্মুখে, নীল কাগজে মোড়া, ছোট একটি কাগজের বাক্স রাখিয়া সে তাঁহার চিন্তার ধারা ছিন্ন করিয়া দিল।

তিনি মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "কিছু হয়নি বন্ধু, কিছু হয়নি।" তিনি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দোকানদারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাহার মাথায় বিপ্লববাদীর লাল টুপী দেখিয়া তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।"

যুবতী এবং তাঁহার স্বামী আপত্তিসূচক অঙ্গভঙ্গী করিল। বৃদ্ধার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল, তাহা আনন্দের জন্যও হইতে পারে অথবা ইহাদের অকারণ সন্দেহ করায় লজ্জার জন্যও হইতে পারে।

তিনি শিশুর মত সরল ভাবে বলিলেন, "আমায় ক্ষমা কর।" তাহার পর পকেট হইতে একটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বলিলেন, "এই নাও দাম।"

দরিদ্র মানুষে এক শ্রেণীর দারিদ্র্য খুব সহজেই চিনিতে পারে। দোকানদার এবং তাহার পত্নী পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। দুজনের মনেই এক কথা জাগিয়া উঠিল, এই স্বর্ণমুদ্রাটিই বোধহয় বৃদ্ধার শেষ সম্বল। তিনি উহা বাহির করিয়া দোকানদারকে দিতে যাইবার সময় তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল। তিনি মুদ্রাটির দিকে বড় বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টিতে লোভের চিহ্নমাত্রও ছিল না, কিন্তু কতখানি স্বার্থত্যাগ যে তিনি করিতেছেন, তাহা যেন নিজে উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিতেছিলেন। তাঁহার মুখে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের চিহ্ন যেমন স্পষ্টভাবে আঁকা ছিল, দুঃখ এবং অনাহারের চিহ্নও তেমনি স্পষ্ট ছিল। তাঁহার পরিচ্ছদেও পুরাতন জাঁকজমকের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। উহা রেশমের, যদিও বহুবার ব্যবহার করায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গাত্রাচ্ছাদনটিও খুব পরিপাটি করিয়া পরা, এবং তাহাতে পুরাতন মেরামত করা লেশ বসানো। সম্পন্ন ব্যক্তির অর্থ ফুরাইলে যে দশা হয়, ইহা ঠিক তাই। দোকানদার এবং তাহার পত্নী, নিজেদের স্বার্থরক্ষা এবং সহানুভূতির মধ্যে কোন্ দিকে ঝুঁকিবে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। নিজেদের বিবেককে শান্ত করিবার জন্য তাহারা এই ভাবে কথা আরম্ভ করিল।

"আপনাকে ত বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।"

স্ত্রী স্বামীকে বাধা দিয়া বলিল, "মহাশয়া কি কিছু আহার করতে ইচ্ছা করেন?"

যুবক বলিল, "ঘরে খুব ভাল মাংসের ঝোল তৈরী আছে।"

যুবতী বলিল, "আজ ভয়ানক ঠাণ্ডা, আপনার পায়ে হেঁটে আসতে ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে থাকবে। এখানে ব'সে একটু নিজেকে গরম ক'রে নিন।"

দোকানদার বলিল, "আমাদের একেবারে শয়তান মনে করবার কোনো কারণ নেই।"

ইহাদের কথাবার্ত্তায় করুণার আভাষ পাইয়া, বৃদ্ধা তাহাদিগকে জানাইলেন যে, একজন অপরিচিত লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে, এইজন্য তিনি একাকী নিজের গৃহে ফিরিয়া যাইতে ভয় পাইতেছেন।

লালটুপী পরা দোকানদার বলিল, "এইতেই এত ভয় পেয়েছেন? আচ্ছা দাঁড়ান।"

সে স্বর্ণমুদ্রাটি স্ত্রীর হাতে দিল। তাহার পর বাজে জিনিষ বহু মূল্যে বিক্রয় করার আনন্দে সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া নিজের জাতীয় দেশরক্ষী সেনাদলের পোষাক পরিয়া আসিল। মাথায় টুপী পরিয়া তলোয়ার সহ কোমরবন্ধ করিয়া বাঁধিয়া সে পুরাদস্তুর বীরপুরুষ সাজিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী ততক্ষণে অনেক কথা চিন্তা করিয়া লইয়াছে। বেশী চিন্তা করার ফলে, তাহার হৃদয়ের করুণার এবং বদান্যতার ধারা একেবারে শুকাইয়া উঠিয়াছিল। পাছে তাহার স্বামী কোনো বিপদে জড়িত হইয়া পড়ে, এই ভাবনায় সে উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া উঠিল এবং দোকানদারের কোটের পিছনটা ধরিয়া তাহাকে ফিরিবার জন্য টানিতে লাগিল। কিন্তু নিজের মনের দয়ালুতার পরবশ হইয়া যুবক বৃদ্ধাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য স্বীকৃত হইল।

যুবতী অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আপনি যে মানুষটার জন্যে ভয় পাচ্ছেন, সে এখন অবধি আমাদের দরজার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব'লে মনে হচ্ছে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তাইত বোধ হয়।"

যুবতী স্বামীকে বলিল, "ও যদি গুপ্তচর হয়? যদি

অতীত ও ভবিষ্যৎ

শিল্পী শ্রী সুধীররঞ্জন খাস্তগীর

কোনো ষড়যন্ত্র হ'য়ে থাকে? তুমি যেয়ো না, আর ঐ বাক্সটা ওর কাছ থেকে ফিরিয়ে নাও”

এই কথাগুলি তাহার স্ত্রী কানে কানে বলায়, দোকানদারের সাহস হঠাৎ লোপ পাইল। সে বলিল, “আচ্ছা, আমি লোকটাকে গোটা কয়েক কথা ব'লে বিদায় ক'রে দিচ্ছি।” সে দরজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

বৃদ্ধা মহিলা ঠিক শিশুর মত বাধ্য, তাহার উপর ভয়ে তিনি প্রায় জড়পিণ্ডের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি আবার চেয়ারে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দোকানদার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখ স্বভাবতঃই লাল, আগুনের তাপে তাহা আরোই লাল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আসার সময় দেখা গেল তাহার মুখ একেবারে বিবর্ণ। সে এমন ভয় পাইয়াছে যে, তাহার পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং দুই চোখ মাতালের মত ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, “অভিজাত বংশীয়া হতভাগিনী, আমাদের মাথা কাটাতে চাও তুমি? এখনি দূর হ'য়ে যাও, আর কখনও মুখ দেখিওনা এখানে। তোমাদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের জন্যে মালমশলা জোটাব তা মনেও কোরো না।”

এই বলিয়া সে বৃদ্ধার নিকট হইতে সেই ছোট কাগজের বাক্সটি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদের উপর দোকানদারের হস্ত পড়িবামাত্র তিনি যেন যৌবনের বল ও ক্ষিপ্রতা ফিরিয়া পাইলেন। যাহা এত মূল্য দিয়া কিনিয়াছেন, তাহা হারান অপেক্ষা পথের শত অজানা বিভীষিকার ভিতর একাকিনী বিচরণ করাও তাঁহার শ্রেয় বোধ হইতেছিল। তিনি ছুটিয়া দরজার কাছে গিয়া উহা খুলিয়া ফেলিলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে দোকানদার এবং তাহার পত্নীর চক্ষের অগোচর হইয়া গেলেন।

রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিবা মাত্র বৃদ্ধা খুব দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বল ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি শুনিতে পাইলেন তাঁহার নির্ম্মম অনুসরণকারীটি পিছনে সজোরে বরফের রাশ মাড়াইতে মাড়াইতে অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধা একবার থামিলেন। লোকটিও থামিল। বৃদ্ধা তাহার সহিত কথা বলিতে সাহস করিলেন না, তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও তাঁহার বাধিতেছিল। কি বলিবেন, তাহাও তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। সুতরাং তিনি আবার ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

পিছনের লোকটিও আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিল। সে বৃদ্ধার একেবারে নিকটে আসিতেছিল না, অথচ তাঁহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতেছিল। মনে হইতেছিল সে যেন বৃদ্ধার ছায়া। এই নীরব মানুষ দুটি আবার যখন সেণ্ট লরেন্টের গির্জ্জার সম্মুখ দিয়া পার হইয়া গেল, তখন ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল।

প্রায়ই দেখা যায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইবার পর মানুষের মনে একটা অবসাদ আসে, কারণ আমাদের মানসিক বৃত্তির ক্ষমতা অসীম হইলেও, আমাদের শারীরিক যন্ত্রের ক্ষমতার সীমা আছে। সুতরাং বৃদ্ধা যখন দেখিলেন যে, পিছনের লোকটি তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতেছে না, তখন তাঁহার মনে হইল এ ব্যক্তি হয়ত বা কোনো অজানা বন্ধু, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্যই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। তিনি মনে মনে ঐ ব্যক্তির আবির্ভাবের সময়কার সব কথা ভাবিয়া দেখিলেন, নিজের মনকে তিনি বুঝাইতে চাহিতেছিলেন যে, উহার উদ্দেশ্য ভালই। কিছুক্ষণ আগেই যে ভয় পাইয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে চলিতে লাগিলেন।

আধ ঘণ্টা খানিক হাঁটিবার পর তিনি বড় রাস্তা যেখানে দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে, সেইখানের একটি বাড়ীর সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখনও যদি ঐ স্থানে যাওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, স্থানটি অতি নির্জ্জন। তীক্ষ্ণ শীতের বাতাস, বাড়ীগুলির উপর দিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। ঐগুলি বাড়ী না বলিয়া কুঁড়েঘর বলিলেই অবশ্য ঠিক হয় এমনই তাহাদের চেহারা। স্থানটি দেখিলে মনে হয়, উহা যেন নিরাশা ও দুর্গতির আশ্রয়স্থল।

যে মানুষটি বৃদ্ধাকে অত ব্যগ্রভাবে অনুসরণ করিতে-

ছিল, সে সামনের দৃশ্য দেখিয়া একটু যেন অবাক হইয়া গেল। সে চিন্তান্বিতভাবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। জায়গাটিতে রাস্তার আলো অল্প একটু আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে কুয়াসার আতিশয্যে বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছিল না। ভয়ে বৃদ্ধার দৃষ্টিও যেন প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি ঐ অপরিচিতের চেহারায় যেন অশুভসূচক কিছু দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বের ভীতি আবার মনকে পাইয়া বসিতেছে বলিয়া তিনি বুঝিলেন। ঐ লোকটি যতক্ষণ দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল, সেই সুযোগে তিনি ঐ ছায়াচ্ছন্ন গলির ভিতর দিয়া চট্ করিয়া একটা বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। দরজার হাতল ঘুরাইয়া তিনি হঠাৎ প্রেতমূর্ত্তির মত অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

অপরিচিত ব্যক্তি একই স্থানে দাঁড়াইয়া ঘরখানির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। গৃহটির বিশেষত্ব কিছু ছিল না, প্যারিসের এইসকল দরিদ্র পল্লীর যে-কোনো ঘরের সহিতই ইহা অবিকল মিলিয়া যায়। উহার গাঁথনী ইটের, তাহার উপর হলদে রঙের চূণবালির পলস্তারা। উহার আগাগোড়াই এমন ফাটা ও ভাঙ্গা, যে, দেখিলেই ভয় হয় যে হাওয়ার আঘাতে সবটা এখনই ভাঙিয়া পড়িবে। প্রত্যেক তলায় তিনটি করিয়া জানালা, তাহাদের কাঠের ফ্রেম-গুলির জলে রোদে এমন অবস্থা হইয়াছে, যে, ঘরের ভিতর অবাধে শীতের হাওয়া প্রবেশ করে। ঐ নীরব নিস্তব্ধ গৃহটি দেখিলে বোধ হয় যেন পুরাতন কোনো দুর্গের মিনার, যাহাকে মহাকাল ধ্বংস করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। সকলের উপর তলার বাঁকা-চোরা ফাটা জান্‌লার কাঁচের ভিতর দিয়া একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল, উহার জ্যোতিতে গৃহের ছাদটা দেখা যাইতেছিল, গৃহের অবশিষ্টাংশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

বৃদ্ধা বহু কষ্টে ভাঙ্গা-চোরা এবং বাঁকা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সিঁড়ির পাশে রেলিংএর পরিবর্ত্তে একটা মোটা দড়ি বাঁধা, তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে উঠিতে হইতেছিল। সবার উপরের তলার ঘরের দরজায় পৌঁছিয়া তিনি আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিলেন। দরজা খুলিয়া গেল, এবং একজন বৃদ্ধ তাঁহার দিকে একটা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "শীগ্‌গির লুকোন। যদিও আমরা এত অল্প বাইরে যাই, তবু আমাদের সব কাজ বাইরে জানাজানি হ'য়ে গেছে, আমাদের পিছনে মানুষ লেগেছে।"

আগুনের ধারে আর-একটি বৃদ্ধা বসিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন কিছু আবার হয়েছে না কি?"

"কাল থেকে যে লোকটা এই বাড়ীর চারি ধারে ঘুরছিল, সে আজ আমার পিছন পিছন এসেছে।"

এই কথা শুনিয়া ঘরের অধিবাসীত্রয় এ উহার মুখ দেখিতে লাগিল। সকলের মুখেই গভীর ভীতির চিহ্ন। তিন জনের ভিতর বৃদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা কম বিচলিত হইয়া-ছিলেন, যদিও তাঁহার বিপদই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অতিরিক্ত দুর্ভাগ্যের চাপে, বা অতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে মহৎ মানুষের সম্পূর্ণ ভাবে আত্মত্যাগ করা সহজ। দুইটি বৃদ্ধাই একদৃষ্টে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া ছিলেন। বুঝাই যাইতেছিল যে, তিনিই মহিলাদ্বয়ের উদ্বেগের প্রধান কারণ।

বৃদ্ধ নীচু গলায় বলিলেন, "ভগবানে বিশ্বাস হারানো কি দরকার, ভগিনী? মঠে যখন হত্যাকারীরা চীৎকার কর্‌ছিল, আহতেরা আর্ত্তনাদ কর্‌ছিল, তখনও সেই বিভীষিকার মধ্যে আমরা তাঁর গুণগান করেছি। সেই মহা হত্যাকাণ্ডের মধ্যে থেকেও যখন জীবন নিয়ে বেরিয়ে আস্‌তে পেরেছি, তখন আমার অদৃষ্টে আরো কাজ আছে। তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলা উচিত নয়। ভগবানই তাঁর সেবকদের রক্ষা করেন, এবং নিজের ইচ্ছা মত তাদের জীবন রাখেন বা গ্রহণ করেন। আমার কথা ভাববার প্রয়োজন নেই, তোমাদের কথাই ভাবা দরকার।"

একজন বৃদ্ধা বলিলেন, "না, না, পুরোহিতের জীবনের তুলনায় আমাদের জীবনের মূল্য কি?"

আর-একজন বলিলেন, "মঠ ছেড়ে যেদিন আমায় বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে হয়েছে, সেদিন থেকে নিজেকে মৃত ব'লেই জানি।"

বাহির হইতে যে বৃদ্ধাটি সম্প্রতি আসিয়া ঢুকিয়াছিলেন,

তিনি বলিলেন, "এই যে পূজায় বেদীর জন্তে রুটি।" এই বলিয়া তিনি কাগজের বাক্সটা বৃদ্ধের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন। পরমুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন, "সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।"

তিন জনে শুনিতে লাগিলেন, শব্দটা থামিয়া গেল। পুরোহিত বলিলেন, "ভয় পেয়োনা। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে মানুষ আসতে পারে। আমাদের বিশ্বাসী এক ব্যক্তি, ফ্রান্সের সীমানা পার হ'য়ে এখানে আসছে। সে ডিউক এবং মার্‌কুইসের কাছে আমি যে চিঠিগুলি লিখেছি, সেগুলি নিয়ে যাবে। আমি তাঁদের লিখেছি তোমাদের এ হতভাগা দেশ থেকে কোনোরকমে সরিয়ে নিয়ে যেতে, এখানে থাক্‌লে দুঃখভোগ এবং মৃত্যু অনিবার্য্য।"

সন্ন্যাসিনী দুজনের মুখে নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাহ'লে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?"

পুরোহিত সরলভাবে বলিলেন, "যেখানে নির্য্যাতিত মানুষ, সেইখানেই আমার স্থান।"

বৃদ্ধাদ্বয় নীরবে, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পুরোহিতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ খানিক পরে প্রথমা বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভগিনী মার্থা, আমাদের এই দূতকে Hosanna' এই বাক্য বল্‌লে, তিনি "fiat voluntas" এই উত্তর দিবেন। ইহাই আমাদের সাঙ্কেতিক বাক্য।"

দ্বিতীয়া সন্ন্যাসিনী বলিয়া উঠিলেন, "সিঁড়ি দিয়ে মানুষ উঠ্‌ছে।" তিনি দেয়ালের গায়ে নির্ম্মিত একটি গোপন কুঠরীর দ্বার তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিলেন।

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে, সিঁড়িতে মানুষের ভারি পায়ের শব্দ এখন বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল। পুরোহিত একটা দেওয়াল-আলমারীর ভিতর গুটিসুটি হইয়া কোনো প্রকারে ঢুকিয়া পড়িলেন, সন্ন্যাসিনীরা কতকগুলি পুরান কাপড় দিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া দিলেন।

পুরোহিত বলিলেন, "আচ্ছা, এখন আলমারীর দরজা বন্ধ করতে পার।"

দেওয়াল-আলমারীটা বন্ধ করিতে-না-করিতেই ঘরের দরজায় কে ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত করিল। বৃদ্ধারা চকিত হইয়া, পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, কাহারও মুখে কথা সরিতেছিল না।

দুইজন সন্ন্যাসিনীরই বয়স ষাটের কাছাকাছি বলিয়া বোধ হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল সংসার হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন। বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় কাঁচের ঘরে বর্দ্ধিত গাছপালা যেমন বাঁচিতে পারে না ইঁহাদের দশাও সেইরূপ। মঠের ভিতরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁহাদের জগৎসংসার সম্বন্ধে কোনোই জ্ঞান হয় নাই। বিপ্লবের আঘাতে তাঁহাদের মঠ ভাঙ্গিয়া গেল, বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নিষ্পাপ মনে বিপ্লবের ঘটনাবলি যে কি পরিমাণ ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ছোট শিশুকে হঠাৎ মায়ের কোলের আশ্রয় হইতে ছাড়াইয়া লইলে, তাহাদের যে অবস্থা হয় ইঁহাদেরও হইয়া ছিল তাহাই। সুতরাং বিপদ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা নীরবে বসিয়াই রহিলেন। ভগবানের হাতে নিজেদের সমর্পণ করা ভিন্ন তাঁহারা আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় জানিতেন না।

যে-ব্যক্তি বাহিরে দরজায় আঘাত করিতেছিল, সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী এই নীরবতার অর্থ করিল। দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। এই লোকটি কয়েকদিন হইল তাঁহাদের বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতেছিল এবং তাঁহাদের বিষয় খোঁজ লইতেছিল, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসিনীদ্বয় ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা একদৃষ্টে লোকটির দিকে উদ্বিগ্নভাবে চাহিয়া রহিলেন।

লোকটি দেখিতে খুব লম্বা-চওড়া। কিন্তু তাহার মুখের ভাব, চেহারা বা ধরণ-ধারণ কিছু দেখিয়াই তাহাকে বিশেষ দুর্বৃত্ত বলিয়া বোধ হয় না। সন্ন্যাসিনীদের মত সেও নীরব হইয়াই রহিল, কেবল তাহার চোখ ঘরের সকল স্থান ঘুরিয়া আসিতে লাগিল।

মেঝেতে পাতা একজোড়া মাদুর, ইহাই বৃদ্ধাদের শয্যা। ঘরের মাঝখানে একটা টেবল, তাহার উপর একটা পিতলের বাতিদান, কয়েকখানা প্লেট, তিনটা ছুরী এবং একখানা গোল রুটী। চিমনীর নীচে আগুন

জলিতেছিল। ঘরের অধিবাসীগুলি যে অতি দরিদ্র তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঘরের কোণে কিছু জালানি কাঠ জড় করা। ঘরের ছাদের অবস্থা অতি শোচনীয়, হলদে দেয়ালগুলির গায়ে অসংখ্য জলের ধারা ডোরা কাটিয়া গিয়াছে। মঠের ধ্বংসাবশেষ হইতে আহৃত একটি কারুকার্য্যখচিত পেটিকা, আগুন জ্বালিবার স্থানের উপরে যে তাকের মত জায়গাটি তাহার উপর রক্ষিত। তিনটি চেয়ার, দুটি বাক্স এবং একটি দেরাজ আলমারি, ইহাই ঘরটির আসবাব। দেয়ালের গায়ে একটা দরজা, তাহাতে আন্দাজ করা যায়, যে পাশে আর একটা ঘর আছে।

যে-ব্যক্তি বৃদ্ধাদের এত ভয় পাওয়াইয়াছিল, সে শীঘ্রই ঘরের ভিতর যা-কিছু দেখিবার দেখিয়া লইল। তাহার মুখে একটু করুণার ভাব দেখা দিল। বৃদ্ধা দুইজনের দিকে সে তাকাইয়া রহিল, তাহার ভাবে বোধ হইতে-ছিল, ঘরের অধিবাসিনীদের সমান সেও অপ্রস্তুত হইয়াছে। নীরবতা অল্পক্ষণ পরেই ভাঙ্গিয়া গেল; কারণ আগন্তুক বুঝিতে পারিল যে, বৃদ্ধা মহিলা দুটি ভয়ে কথা বলিতে-ছেন না। সুতরাং সে যথাসম্ভব কোমলকণ্ঠে বলিল, "আমি এখানে শত্রুরূপে আসিনি......" কিছুক্ষণ থামিয়া সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "যদি আপনাদের কোনো অনিষ্ট হয় জান্‌বেন, আমার তাতে কোনো হাত নেই। আমি আপনাদের কাছে একটু অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছি।"

মহিলারা তবুও নীরবই রহিলেন। লোকটি বলিল, "যদি আমি আপনাদের বিরক্ত করছি বা কষ্ট দিচ্ছি মনে করেন, তা হ'লে বলুন, আমি এখনি চ'লে যাব। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি আপনাদের একান্ত অনুগত এবং আমার দ্বারা যদি আপনাদের কোনো উপকার হবার সম্ভাবনা থাকে ত বলুন আমি এখনি তা করব। এখন ত রাজা ব'লে কেউ নেই, আমিই বোধ হয় একমাত্র মানুষ, যার সম্বন্ধে আইন খাটে না......"

তার কথাগুলি যে সত্য তাহা সন্দেহ করা যায় না; সুতরাং ভগিনী অগাথা একটা চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আগন্তুককে বসিতে বলিলেন। এই বৃদ্ধা অতি উচ্চবংশোদ্ভবা, ইঁহার চালচলনে পূর্ব্বদিনের সমৃদ্ধি এবং জাঁকজমকের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। আগন্তুকের মুখে একটু আনন্দের আভাষ দেখা দিল; কিন্তু বৃদ্ধা দুইজন বসিবার পূর্ব্বে সে আসন গ্রহণ করিল না।

লোকটি বসিয়া বলিতে লাগিল, "আপনারা এখানে একজন পূজনীয় পুরোহিতকে আশ্রয় দিয়েছেন। যাঁরা নূতন রাষ্ট্রীয় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেননি, ইনি তাদের মধ্যে একজন। কারমেলাইটদের মঠ ধ্বংস হওয়ার সময় তিনি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পান ....."

ভগিনী অগাথা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,— "Hosanna", এই বলিয়া তিনি ব্যগ্রভাবে লোকটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

আগন্তুক বলিল, "তাঁর নাম ও নয়।"

ভগিনী মার্থা বলিলেন, "না মহাশয়, আমাদের এখানে কোনো পুরোহিত নেই।"

লোকটি হাত বাড়াইয়া টেবলের উপর হইতে একখানি ছোট বই উঠাইয়া লইয়া বলিল, "তা যদি বলেন, তাহ'লে আপনাদের আরো অনেক সাবধান হওয়া উচিত। আপনারা কেউ লাটিন জানেন না বোধ হয়? তবে—"

সে আর কিছু বলিল না, কারণ বৃদ্ধা দুটির মুখের ভাব দেখিয়া তাহার ভয় হইতে লাগিল যে, হয় ত সে একটু বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহারা দুই জনেই ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন এবং তাঁহাদের চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছিল।

সে অকপট কণ্ঠে বলিল, "আপনারা ভয় পাবেন না, আমি আপনাদের অতিথির এবং আপনার নাম জানি। গত তিন দিন ধরে' আপনাদের কষ্টের সব খবরই আমি রাখছি এবং আপনারা পুরোহিত-ঠাকুরের জন্যে যে প্রাণপণ করছেন তাও জান্‌ছি।"

পুরোহিতের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভগিনী অগাথা ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, "চুপ চুপ।"

লোকটি বলিল, "দেখুন ভগিনী, আমার মনে যদি আপনাদের ধরিয়ে দেবার হেয় ইচ্ছাটা থাকৃত, তাহ'লে এতদিনে আমি তা অনেকবার করতে পারতাম।"

এই কথা শুনিয়া পুরোহিত দরজা খুলিয়া তাঁহার

গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া, ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অপরিচিতের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি যে আমাদের অত্যাচারীদের দলের মানুষ তা মনে হচ্ছে না। সুতরাং আপনাকে বিশ্বাস ক'রে আমি আপনার সাম্‌নে এলাম। আপনার জন্যে কি কর্‌তে পারি?"

পুরোহিতের এই পবিত্র বিশ্বাস, তাঁহার মূর্ত্তির মহত্ত্ব ও নিষ্কলুষতা দেখিয়া বোধহয় হত্যাকারীও হিংসাত্যাগ করিত। আগন্তুক কিছুক্ষণ এই তিনটি মানুষের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর স্থির ভাবে বলিতে লাগিল, "পিতা, আমি আপনাকে একজন মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থে উপাসনা কর্‌তে বল্‌তে এসেছি। তিনি পূজনীয় ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর দেহ পবিত্র ভূমিতে সমাধিস্থ হয়নি।"

পুরোহিত শিহরিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসিনী দুইজন বুঝিতে পারিলেন না আগন্তুক কাহার কথা বলিতেছে; তাঁহারা দণ্ডায়মান পুরুষ দুইজনের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। পুরোহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার মুখে তীব্র উদ্বেগের চিহ্ন, অনুনয়ের ভাবও কিছু কিছু আছে।

পুরোহিত বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি মধ্য রাত্রে আস্‌বেন, আমি তখন প্রস্তুত থাক্‌ব। আপনি যে মহাপাপের উল্লেখ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে প্রার্থনা করা যায়, আমি তা করব।"

অপরিচিত ব্যক্তি চমকিয়া উঠিল, কিন্তু বোধ হইল, তাহার গোপন দুঃখের উপর কে যেন সান্ত্বনার বারি সিঞ্চন করিয়া দিল। পুরোহিত এবং সন্ন্যাসিনীদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া সে নীরবে চলিয়া গেল। কথায় প্রকাশ না করিলেও তাহার কৃতজ্ঞতা এই তিনটি মানুষ বুঝিতে পারিল।

ঘণ্টা দুই তিন পরে সে আবার ফিরিয়া আসিয়া দরজায় আঘাত করিল। সন্ন্যাসিনীদের ভিতর একজন দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাকে ভিতরের ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে শ্রাদ্ধার্থে সব প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

চিম্‌নীর ধোঁয়া বাহিরে লইয়া যাইবার দুইটা পাইপ্ ঘরের দেওয়ালে বসানো। তাহার মাঝখানে দেওয়াল-আলমারীটা রাখা হইয়াছে। তাহার পুরাতন জীর্ণ মূর্ত্তি একটি অতি সুন্দর সবুজ রঙের কারুকার্য্যখচিত রেশমের আবরণে ঢাকা। দেওয়ালের গায়ে, হাতীর দাঁত এবং আব্‌লুষ কাঠের তৈয়ারী একটি ক্রুশ ঝুলিতেছে। হলুদে রং করা কদর্য্য দেওয়াল এবং চারিধারের রিক্ততার মধ্যে এ জিনিষটি এমনই বেমানান দেখাইতেছিল, যে, তাহা লক্ষ্য না করিয়া উপায় ছিল না। চারিটি সরু সরু মোমবাতি এই পূজার বেদীর উপর চারি কোণে বসানো, উহার আলো এতই ক্ষীণ যে, দেওয়ালের গায়েও তাহা প্রতিফলিত হইতেছিল না। ঘরের অপর পার্শ্বেও এই আলো পৌছায় নাই। কেবল পূজার পবিত্র আয়োজন-গুলির উপর এই ক্ষীণ জ্যোতিশিখা আসিয়া পড়ায়, মনে হইতেছিল উহা যেন স্বর্গীয় জ্যোতি। ঘরের মেঝে ভিজা স্যাঁৎসেতে। ঘরের ছাদ, দুইধারে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে, উহারও স্থানে স্থানে ছিদ্র, তাহার ভিতর দিয়া তীব্র শীতের বাতাস হু হু করিয়া প্রবেশ করিতেছে।

জাঁকজমক বা আড়ম্বরের চিহ্নও এখানে ছিল না, তথাপি এই শ্রাদ্ধবাসর অপেক্ষা অধিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আর কিছু কল্পনা করা কঠিন। গভীর নীরবতা, এই নৈশ উপাসনার মহিমা যেন আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

পূজার বেদীর দুই পার্শ্বে সন্ন্যাসিনী দুইজন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিলেন। মেঝেটা অত্যন্ত ভিজা হওয়ায়ও তাঁহারা বিরত হইলেন না। তাঁহারা পুরোহিতের সহিত নিজেদের প্রার্থনা মিলিত করিতে লাগিলেন। পুরোহিত নিজের আচার্য্যের পোষাক পরিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি পূজার বেদীর উপর রত্নখচিত একটি স্বর্ণ-পাত্র রাখিলেন, ইহাও পূজার সামগ্রী, কোনো রকমে মঠলুণ্ঠনকারীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকিবে। এই পাত্রটি কোনো রাজা মঠে উপহার দিয়া থাকিবেন। ইহা ভিন্ন বেদীর উপর দুটি অতি সাধারণ কাঁচের গেলাশে জল ও সুরা রক্ষিত ছিল, উহাও পূজার উপকরণ। বেদীর এক কোণে ছোট একটি প্রার্থনার পুস্তক রক্ষিত হইয়াছিল, ক্যাথোলিকদিগের প্রার্থনামন্ত্রের পুস্তক তাঁহার কাছে না থাকায়, পুরোহিত এইটি রাখিয়া-ছিলেন। হাত ধুইবার জন্য, সাধারণ একটি প্লেট রাখা

হইয়াছিল। ক্ষুদ্রতা এবং বিশালতা দারিদ্র্য ও গাম্ভীর্য্য পূজার সামগ্রী এবং দৈনিক ব্যবহারের সাধারণ জিনিষের বৈষম্য বড় বেশী লক্ষিত হইতেছিল।

অপরিচিত ব্যক্তি সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের মধ্যে নতজানু হইয়া বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল, যে, পুরোহিত ক্রুশটির তলায় এক গোছা কাল ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছেন, স্বর্ণপাত্রটির নীচেও কালফিতা। ইহা যে মৃতের শ্রাদ্ধার্থে উপাসনা তাহা বুঝাইবার আর কোনো উপায় না থাকায় তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন। আগন্তুকের মনে কোনো ভয়াবহ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল বোধ হয়, কারণ তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিতেছে দেখা গেল। এই ঘরের মানুষ চারিটি রহস্যময় দৃষ্টিতে এ উহার মুখের দিকে দেখিতে লাগিলেন। মনে হইতেছিল যেন তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছার প্রবলতায় সেই পরলোকবাসী নিহত মহাত্মাকে এই ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছায়া-মূর্ত্তিতে এখানে উপস্থিত আছেন। মৃতের দেহ এখানে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা শ্রাদ্ধের উপাসনা করিতেছিলেন। এই জীর্ণ ঘরে, ভাঙ্গা ছাদের তলায়, চারিটি খ্রীষ্টান ভগবানের নিকট ফ্রান্সের অধীশ্বরের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। রাজতন্ত্রের সকলের হইয়া একজন বৃদ্ধ ও দুইটি বৃদ্ধা প্রার্থনা করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ আগন্তুক ছিল সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি। তাহার মুখে বিষাদ ও অনুশোচনার চিহ্ন এমন প্রগাঢ়ভাবে অঙ্কিত, যে, সে যে একান্ত অনুতপ্ত হইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেছে, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ থাকে না।

লাটিন মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য অন্য তিন জনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমরা এখন ভগবানের পবিত্র আলয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি।" এই কথায় সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের এবং ঐ অপরিচিত ব্যক্তির মনে গভীর ভক্তিমিশ্রিতভাবের উদয় হইল। রোমের বিশাল ভজনালয়েও এই খ্রীষ্টান কয়টি ভগবানের উপস্থিতির মহিমা এমনভাবে অনুভব করিতেন কি না সন্দেহ। ইহা সত্য যে, ভগবান এবং তাঁহার উপাসকের মধ্যে বাহিরের জাঁকজমকের কোনো প্রয়োজন নাই, তাঁহার যে সুবিপুল মহিমা, তাহার আধার একমাত্র তিনি স্বয়ং। অপরিচিত গভীর ভক্তি সহজেই বোঝা যাইতেছিল। সুতরাং এই চারিটি উপাসকের মনেই এক ভাবের ধারা বহিতেছিল। গভীর নীরবতার মাঝখানে পবিত্র মন্ত্রগুলি ঠিক স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত মধুর শুনাইতেছিল। এক সময় ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। পুরোহিত তখন লাটিন ভাষায় এই প্রার্থনা উচ্চারণ করিতেছিলেন, "ভগবান রাজদ্রোহী হত্যাকারীদের তুমি তেমনই ক্ষমা কর, রাজা লুই যেমন তাহাদের ক্ষমা করিয়াছিলেন।"

সন্ন্যাসিনীরা দেখিতে পাইলেন, ঐ ব্যক্তির গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

শ্রাদ্ধের মন্ত্রসকল উচ্চারিত হইল। রাজার জন্য প্রার্থনাটি উচ্চারণ করার সময়, এই কয়টি বিশ্বাসী রাজ-ভক্তের মনে তাহাদের বালক রাজার মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। বেচারা এখন শত্রুহস্তে বন্দী, ভগবানের কাছে তাহার জন্য করুণা ভিক্ষা করা ভিন্ন আর কিছু তাহাদের করিবার নাই। অপরিচিত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ এই চিন্তায় শিহরিয়া উঠিল, যে, আবার হয়ত নূতন হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে উহাতে যোগ দিতে হইবে।

উপাসনান্তে আচার্য্য সন্ন্যাসিনীদ্বয়কে ইঙ্গিত করায় তাঁহারা অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। পুরোহিত তখন অপরিচিতের নিকটে গিয়া ধীরমধুর কণ্ঠে বলিলেন, "বৎস, যদি তুমিও আমাদের ধর্ম্মাত্মা রাজার রক্তে হাত কলুষিত ক'রে থাক ত আমায় খুলে বল। তোমার অনুতাপ এত মর্ম্মস্পর্শী এবং এত অকপট যে, ভগবানের কাছে তুমি নিঃসন্দেহ মার্জ্জনা লাভ করতে পার।"

পুরোহিতের কথায় ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তি ভয়ে যেন শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করিয়া সে বিস্মিত পুরোহিতের দিকে শান্তভাবে চাহিয়া বলিল, "পিতা, তাঁর রক্তপাতে আমি একেবারে নিষ্পাপ, আমার কোনো অপরাধ নেই।"

পুরোহিত বলিলেন, "তোমার কথা বিশ্বাস করাই আমার কর্ত্তব্য।"

দু-জনেই নীরব রহিলেন, পুরোহিত আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই অনুতপ্ত ব্যক্তির দিকে চাহিলেন। তাহার পর তিনি ধরিয়া লইলেন এ ব্যক্তি নূতন জাতীয় সভার কোনো ভীরু সভ্য হইবে। তাহাদের ভিতর অনেকেই নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ঘাতকের হস্তে রাজার পবিত্র মস্তক সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

পুরোহিত আবার বলিলেন, "বৎস, আর একটু ভেবে দেখ। এই মহাপাপে সোজাসুজি কোনো হাত না থাক্‌লেই যে তুমি নিরপরাধী ত নয়। যারা রাজাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তরোয়াল কোষ থেকে বার করেননি, তাঁরাও অপরাধী, ভগবানের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, নিষ্ক্রিয় থেকেই তাঁরা এই ভীষণ পাপের অনুষ্ঠাতাদের সহযোগী হয়েছেন।"

অপরিচিত হঠাৎ যেন ভয়ে অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মনে করেন, যে, কোনোভাবে ঐ হেয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক থাক্‌লেই সেটা পরলোকে শাস্তির কারণ হবে? ধরুন, যদি কোনো সৈনিক, বধমঞ্চের সামনে পাহারা দেবার জন্যে নিযুক্ত হ'য়ে থাকে, তারও কি আদেশ পালন করা পাপ হয়েছে?"

পুরোহিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। পরিপূর্ণ বাধ্যতা সামরিক নীতির মূল, পুরোহিত রাজতন্ত্রের লোক, তিনি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। অপরপক্ষে রাজার দেহ যে দেবদেহের মত আক্রমণের ঊর্দ্ধে এও তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রশ্নকারী তাহার অবস্থা দেখিয়া একটু খুসিই হইল। সে তাঁহাকে আর চিন্তা করিবার অবসর না দিয়া বলিল, "রাজার আত্মার সদ্গতির জন্যে, এবং আমার চিত্তের শান্তির জন্যে আপনি যে উপাসনা কর্‌লেন এর জন্য আপনাকে কোনো পারিশ্রমিক দিতে যেতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে। যার মূল্য নির্দ্ধারণ করাই যায় না এমন অনুগ্রহের পারিশ্রমিক অমূল্য কোনো জিনিষ দিয়েই হয়। তা হ'লে আপনি কি অনুগ্রহ ক'রে এই পবিত্র স্মৃতিচিহ্নটি উপহার স্বরূপ নেবেন? হয়ত এমন দিন আসছে, যখন আপনি এর মূল্য বুঝতে পারবেন।"

এই বলিয়া সে পুরোহিতের দিকে একটি ক্ষুদ্র বাক্স অগ্রসর করিয়া ধরিল। তিনি উহা যন্ত্রচালিতের মত গ্রহণ করিলেন, কারণ, লোকটির কথাবার্ত্তার গম্ভীরভাব, এবং ঐ বাক্সটি অতিশ্রদ্ধার সহিত হস্তে গ্রহণ করিবার ভাব পুরোহিতকে অতিমাত্রায় বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল। অতঃপর তাঁহারা সন্ন্যাসিনীদ্বয় যে-ঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন সেইখানে চলিয়া আসিলেন।

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "আপনারা যাঁর ঘরে বাস কর্‌ছেন, সেই ম্যুসিয়াস্ সিভোলা, এ পাড়ায় তাঁর দেশভক্তির জন্যে বিখ্যাত। তিনি নীচের তলায় বাস করেন। কিন্তু মনে মনে তিনি বুরবোঁ রাজবংশের অনুগত। আগে তিনি প্রিন্স কন্টির অধীনে শীকারীর কাজ কর্‌তেন। তাঁর ধনদৌলত সব ঐ মহিমান্বিত রাজকুমারের করুণায়। ফ্রান্সের আর যে-কোনো জায়গার চেয়ে এখানে থাকাই আপনাদের পক্ষে নিরাপদ। এইখানেই থাকুন। ধর্ম্মভীরু কয়েকজন লোক আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কর্‌বেন, আপনারা এই দুর্দ্দিনের অবসানের প্রতীক্ষা করুন। এক বছর পরে ২১শে জানুয়ারীতে যদি আপনারা তখনও এখানে থাকেন, তাহ'লে আমি আবার এসে আপনাদের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দেব।"

সে আর-কিছু বলিল না। ঘরের নীরব অধিবাসীত্রয়কে অভিবাদন করিয়া ঘরের চারিদিকে একবার চাহিয়া সে চলিয়া গেল।

সরল-প্রকৃতি সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের নিকট এই ব্যাপারটা প্রায় উপন্যাসের মত কৌতূহলের জিনিষ হইল। সুতরাং পুরোহিত যখন তাঁহাদের ঐ ব্যক্তির উপহারের কথা বলিলেন, তখন বাক্সটি টেবলের উপর রাখিয়া, মোমবাতির ক্ষীণ আলোতে অত্যন্ত কৌতূহল সহকারে তাঁহারা সেটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভগিনী অগাথা বাক্সটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার ভিতর অতি সুন্দর কাপড়ের একটি স্বেদসিক্ত রুমাল দেখিতে পাইলেন। উহা ভাল করিয়া মেলিয়া ধরার পর তাহাতে চিহ্ন দেখা গেল।

পুরোহিত বলিলেন, "এগুলি রক্তের চিহ্ন। অন্য সন্ন্যাসিনীটি বলিলেন, "কোণায় ফ্রান্সের মুকুট আঁকা।"

ভীত হইয়া বৃদ্ধাদ্বয় জিনিষটি বাক্সে ফেলিয়া দিলেন। ঐ অপরিচিত মানুষটির চারিধারের রহস্য তাঁহাদের নিকট আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। পুরোহিত তখন হইতে আর এ বিষয়ের কোনো অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টাও ছাড়িয়া দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, দেশে বিভীষিকার রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের কোনো অদৃশ্য হস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছে। প্রথম প্রথম তাঁহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য এবং জ্বালানি কাঠ আসিতে লাগিল। তাহার পর সন্ন্যাসিনীদ্বয় বুঝিলেন যে, কোনো স্ত্রীলোকও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন; কারণ, শীঘ্রই তাঁহাদের জন্য এমন সব পরিচ্ছদাদি আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহা পরিয়া নিরাপদে তাঁহারা বাহিরে যাতায়াত করিতে পারেন। এতদিন পর্য্যন্ত যে-সকল পরিচ্ছদ তাঁহাদিগকে পরিতে হইত, সেগুলির আভিজাত্যসূচক ছাঁটকাট সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। অবশেষে গৃহকর্ত্তা ম্যুশিয়াস্ তাঁহাদিগের জন্য দুইখানি নাগরিক কার্ড জোগাড় করিয়া দিলেন। ইহা সঙ্গে থাকিলে আর কোনো বিপদ নাই। অনেক সময়েই নানা উপায়ে তাঁহারা এমন সব খবর পাইতে লাগিলেন, যাহা পুরোহিতের রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক। এবং তাঁহারা ইহাও দেখিতে লাগিলেন যে, খবরগুলি সর্ব্বদাই এমন সুসময়ে আসিয়া পৌঁছায় যে, শাসন-বিভাগের সব গুপ্ত কথা জানে এমন মানুষ ভিন্ন কেহই এই সকল সংবাদ পাঠাইতে পারে না। যদিও প্যারিসে রীতিমত দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল তথাপি ইঁহাদের দরজায় রোজ শাদারুটি নিয়মিত ভাবে কে যেন রাখিয়া যাইত। তাঁহারা ভাবিতেন, এ সকল গৃহকর্ত্তা ম্যুশিয়াসেরই বদান্যতার ফলে আসিতে পারিতেছে।

অবশ্য তাঁহাদের কোনোই সন্দেহ ছিল না যে, এই সকল সুবিধা-সুযোগ তাঁহাদের অজ্ঞাত বন্ধুর কৃপাতেই প্রধানতঃ হইতেছে। তাঁহাকে তিন জনেই মনে মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার উপরেই একমাত্র ইঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহারা যে বাঁচিয়া-ছিলেন তাহাও ঐ মানুষটির দয়ায়। নিজেদের উপাসনার মধ্যেও তাঁহারা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সকাল সন্ধ্যায় এই বিশ্বাসী মানুষ কয়টি ঐ অপরিচিতের কল্যাণের জন্য, তাহার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা ভগবানের নিকট ভিক্ষা করিতেন, যেন উহার পথ হইতে সকল প্রলোভন দূর হয়, শত্রুরা তাহার যেন কোনো অনিষ্ট করিতে না পারে, এবং সে যেন শান্তিময় দীর্ঘ জীবন লাভ করে। তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা প্রতিদিনই যেন নব জীবন লাভ করিত, কিন্তু তাঁহাদের কৌতূহলেরও সীমা ছিল না।

ঐ ব্যক্তির আবির্ভাবের সময়ের সকল ঘটনাগুলি ইঁহাদের গল্পের বিষয় ছিল; তাহার সম্বন্ধে ইঁহারা নানা-প্রকার জল্পনা কল্পনা করিতেন, এবং অন্য চিন্তা হইতে এইরূপে তাঁহাদের মন নিবৃত্ত থাকায় তাঁহাদের উপকারই হইতেছিল। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, পুনর্ব্বার ঐ ব্যক্তি রাজার শ্রাদ্ধ-তিথিতে উপস্থিত হইলে, তাহার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না করিয়া তাঁহারা ছাড়িয়া দিলেন না।

যে-রাত্রির জন্য তাঁহারা এত ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা অবশেষে আসিয়া উপস্থিত হইল। মধ্যরাত্রে পুরাতন জীর্ণ সিঁড়িতে আবার ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। পূজার বেদী সাজানো হইয়া-ছিল, ঘরটিও অতিথির অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল। এবারে আগন্তুক দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলেন এবং সিঁড়িতে আলো দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। একজন তাহাকে দেখিবার জন্য খানিকটা নামিয়া গেলেন।

তিনি লোকটিকে দেখিয়া বলিলেন, "আসুন, আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।"

লোকটি উত্তর না দিয়া কেবল মাথা তুলিয়া সন্ন্যা-সিনীর দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া দেখিল। তাঁহার বোধ হইল যেন বরফের মত হিম একটা আবরণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া ধরিল, তিনিও আর কথা বলিতে পারিলেন না। উহাকে দেখিয়া তাঁহাদের মনের কৃতজ্ঞতা ও কৌতূহল একেবারে যেন শুকাইয়া গেল। তাহাকে যতটা ভীষণ

এবং কঠিন তাঁহাদের বোধ হইতেছিল, ততটা হয় ত সে সত্যই ছিল না, কিন্তু আগ্রহের মুখে এমন বাধা পাইয়া তাঁহাদের মন বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এই তিনটি হতভাগ্য মানুষ বুঝিতে পারিলেন যে, আগন্তুক তাঁহাদের নিকট অপরিচিতই থাকিতে চায়। তাঁহারা অবস্থাটা স্বীকার করিয়াই লইলেন।

পুরোহিতের বোধ হইল, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন দেখিয়া মানুষটার মুখে একবার একটু হাসি দেখা দিল, উহা তখনই অবশ্য সে চাপিয়া ফেলিল। সে তাঁহাদের সহিত উপাসনায় যোগ দিল, নিজেও প্রার্থনা করিল, কিন্তু তাহার পরেই সে বাহির হইয়া প্রস্থান করিল। সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে একজন তাহাকে সামান্য যে আহারের আয়োজন হইয়াছে তাহাতে উপস্থিত থাকিতে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু সে ভদ্রভাবেই উহা প্রত্যাখ্যান করিল।

রোবস্পিয়েরের পতনের পর পুরোহিত এবং সন্ন্যাসিনীরা প্যারিসের ভিতর নিরাপদে বাহিরে যাইতে সক্ষম হইলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত প্রথমেই এক সুগন্ধ দ্রব্য বিক্রেতার দোকানে গেলেন। উহার মালিক রাগোঁ এবং তাহার পত্নী। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে রাজদরবারে গন্ধ-দ্রব্যের জোগান দিত, এবং এখনও সে রাজবংশেরই অনুগত ছিল। রাজতন্ত্রের লোকেরা ইহাদের সাহায্যে নির্ব্বাসিত অভিজাতবর্গের এবং প্যারিসের রাজতন্ত্রবাদী সমিতির সহিত কথাবার্ত্তা চালাইত। পুরোহিত সাধারণ পোষাক পরিয়া এই দোকানের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এমন সময় পথে হঠাৎ একটা বিশাল জনতা দেখা দিল।

তিনি দোকানদারের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার?"

সে বলিল, "কিছু না, জল্লাদের গাড়ী, বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছে। গতবৎসর এই গাড়ীটাকে আমাদের বড় ঘন ঘন দেখতে হয়েছে। কিন্তু আজ, রাজার শ্রাদ্ধতিথির চার-দিন পরেই, এ গাড়ীটা দেখে মনে কোনো দুঃখ হচ্ছে না।"

পুরোহিত বলিলেন, "কেন? এ ভাবে কথা বলা ত খ্রীষ্টানের উচিত নয়।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "কিন্তু আজ যে রোব্‌স্পিয়েরের সঙ্গীদের মুণ্ডপাত হবে। তারা নিজেদের বাঁচাবার যথেষ্টই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ অবধি তাদের যেতেই হ'ল। যেখানে অনেক নির্দ্দোষীকে তারা পাঠিয়েছে, আজ নিজেরাই সেখানে যাচ্ছে।"

জনতা বন্যার জলের মত অবিরত স্রোতে চলিয়াছিল। পুরোহিত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, এবং দেখিলেন ঐ অশুভসূচক গাড়ীর মধ্যে তাঁহার পরিচিত সেই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই লোকটি চারদিন আগে উপাসনার্থে তাঁহার গৃহে আসিয়াছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ লোকটি কে?" দোকান-দার বলিল, "ঐ ত জল্লাদ।"

তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ দেখ, পুরোহিত ঠাকুর মারা যাচ্ছেন নাকি?" তাহারা তাড়া-তাড়ি ঔষধাদি দ্বারা বৃদ্ধ আচার্য্যের মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

পুরোহিত জ্ঞানলাভ করিয়া বলিলেন, "সে আমায় যে রুমালখানা দিয়েছিল, তা রাজারই। ঐটা দিয়ে তিনি জীবনত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কপালের ঘাম মুছেছিলেন। বেচারা!......শাণিত খড়্গের ভিতর হৃদয় ছিল, কিন্তু সারা ফ্রান্সের মনে করুণা ছিল না।"

দোকানদার ভাবিল, পুরোহিতঠাকুর প্রলাপ বকিতেছেন!

[ব্যাল্‌জাকের গল্প হইতে অনুবাদিত।]

মাতৃচিত্র ও মাতৃমূর্ত্তি—

পাশ্চাত্যদেশের চিত্রকর ও ভাস্করদের মধ্যে মধ্যযুগ হইতেই 'মাতৃমূর্ত্তি' আঁকিবার একটি প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। যীশুমাতার পবিত্র স্মৃতিই অবশ্য শিল্পীদের কল্পনা ও নৈপুণ্যের প্রেরণা জোগাইয়াছে। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা চিত্রগুলি এই সব নিদর্শনের মধ্যে সমধিক খ্যাত। এইখানে তাঁহার যে 'জননী ও সন্তান' চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল ইহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে

র‍্যাফেলের 'জননী ও সন্তান'

ক্রীত চিত্র। ৮৭৫০০০ ডলার ব্যয়ে স্যর জোসেফ ডুভিন এই চিত্র লেডি ডিবোয়ার নিকট হইতে কিনিয়া আমেরিকায় লইয়া চলিয়াছেন। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা চিত্রগুলির মধ্যে এইখানা ডিবোয়া ম্যাডোনা বা কাউপার ম্যাডোনা বা নিকোলিনি ম্যাডোনা নামে পরিচিত। মায়ের পরিচ্ছদে অস্পষ্ট অক্ষরে ইহার শিল্পীর নাম ও সৃষ্টির কালের নির্দ্দেশ আছে। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে র‍্যাফেল এই চিত্র অঙ্কিত করেন। নিকোলিনি প্রাসাদ হইতে লর্ড কাউপার ইহা কিনিয়া ইংলণ্ডে আনেন, সপ্তম লর্ড কাউপারের নিকট হইতে ইহা তাঁহার ভগ্নী লেডি ডিবোয়া প্রাপ্ত হন।—চিত্রটির ইতিহাস সংক্ষেপে এই। এই প্রতিলিপি হইতে ইহার শিল্প-মহিমা বুঝা সম্ভবপর নহে—পিছনের নীল আকাশ, মায়ের পরিধানের লাল পোষাক, নীল ওড়না ও জালিকাটা মাথার অবগুণ্ঠন ধরা শক্ত, তবে সন্তানের চোখের ছায়া-ঘন কৌতুক-লাবণ্য ও মায়ের মুখ-চোখের স্নেহোজ্জ্বল পবিত্রতা ও মহিমার আভা কতকটা বুঝা যায়।

মধ্যযুগের পরেও ম্যাডোনা চিত্র আঁকিবার প্রথা লুপ্ত হয় নাই। তবে, সেইরূপ ধর্ম্মানুরাগের বশে আজকাল আর ম্যাডোনা আঁকা হয় না। এপ্‌ষ্টিন্ এ যুগের প্রখ্যাত শিল্পী। তাঁহার যে 'প্রাচ্য মাতা'র
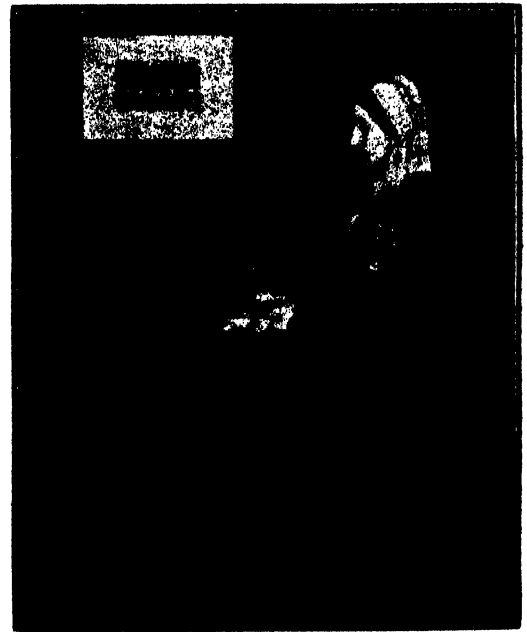
হুইস্‌লারের মাতা

প্রতিলিপি এই সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে, তাহার আদর্শ ('মডেল') ছিলেন একজন ভারতীয় মহিলা—খুব সম্ভব, কোচ্‌বিহারের মহারাণী। এই শিল্প নিদর্শনটি ইহার 'অপূর্ব্বতা'র জন্য যথেষ্ট প্রশংসা ও যথেষ্ট তিরস্কার লাভ করিয়াছে।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর হুইস্‌লারের নিজমাতার যে ছবি (লুক্সামবুর্গে রক্ষিত) প্রকাশিত হইল তাহার সহিত উপরের চিত্রদুটির বিষয়ের দিক দিয়া সম্পর্ক থাকিলেও মূলে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ নয়। হুইস্‌লার যখন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রয়াল একাডেমিতে এই চিত্র প্রদর্শন করে তখন ইহার নাম দিয়াছিলেন 'ধূসর ও কৃষ্ণের সমাবেশ'।

কিন্তু শিল্পীর ব্যক্তিগত আবেগ দর্শকের হৃদয়কেও নূতন করিয়া স্পর্শ করে। তাই ইহার বিষয়টি ভুলিবার নয়, এবং না ভুলিলেই

এপ্‌ষ্টিনের প্রাচ্য মাতা

সুইন্‌বার্ণ এই চিত্র সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায়। সুইন্‌বার্ণ এই চিত্রে দেখিয়াছিলেন 'এক নিবিড় বেদনাময় তাৎপর্য্য ও এক সুগভীর করুণ ব্যঞ্জনা।'

বধিরের শিক্ষার ব্যবস্থা—

যে-সব বালক বালিকা একেবারে বধির হয় নাই—এখনো একটু একটু শুনিতে পায়, তাহাদের প্রায় পঞ্চাশজনকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। টেবিলের উপরের রেডিয়োর মত যন্ত্র শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কথা গৃহের যে কোনো স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের কানের যন্ত্রের উপর উচ্চতর করিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। কানে পরিবার যন্ত্রটি তাহাদের ডেস্কের উপরেই থাকে। আবার প্রত্যেকেরই আসনের সঙ্গে ধ্বনি-নিয়ামক যন্ত্র আছে, ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ প্রয়োজন মত কথা

বধিরের শিক্ষা

কমাইয়া বা বাড়াইয়া গ্রহণ করে। এই যন্ত্রে বধিরদের শিক্ষার ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা হইবে।

বারুদ-চালিত যান—

আতস বাজি যেমন বারুদের শক্তিতে ছুটিয়া চলে হাওয়া গাড়ী কি তেমনি চলিতে পারে না? জার্ম্মেনীর 'ওপেল' এইরূপ একটি গাড়ী লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যেখানে 'মোটর' থাকে, সেখানে বারুদ পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং এই বারুদে আগুন লাগিয়া যেই জ্বলিয়া উঠিল, অমনি গাড়ীখানা ছুটিয়া চলিল। বারুদের কোঠাগুলি একটি-একটি করিয়া ফাটিতে থাকে, আর গাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়। বারুদ-শক্তি সেই কোঠা হইতে একেবারে সরাসরি চাকায় গিয়া ধাক্কা দেয়। 'ওপেল্'-গাড়ী মাত্র আট সেকেণ্ড চালানো
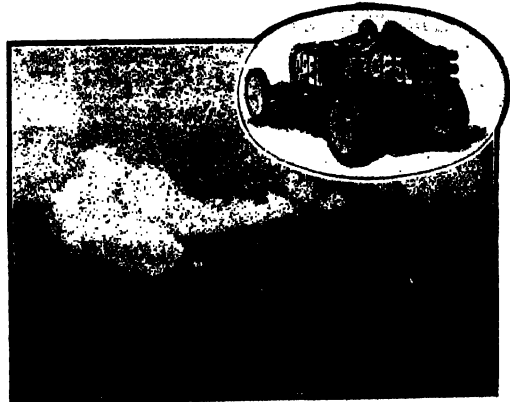
"বারুদ-তাড়িত গাড়ী ওপেল্"

হইয়াছিল; তাহার পরেই ব্রেক্ কষিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ৮সেকেণ্ডেই ঘণ্টায় ৬০ মাইল পর্য্যন্ত ইহার গতি উঠিয়াছিল। উপরে সেই গাড়িটি যাত্রার পূর্ব্বে ও যাত্রারম্ভে দেখানো হইতেছে। অনেকে মনে করেন, এইরূপে উড়ো জাহাজও বারুদের দ্বারা চলিতে পারিবে।

এট্‌লান্টিক বিজয় —

এই যুগের সভ্যতা এটলান্টিক সমুদ্রের পাড়েই তাহার ঘর বাঁধিয়াছে। সত্য বটে, প্রশান্ত সমুদ্রের তীরে তারেও যুগ সভ্যতার তরঙ্গাঘাত আজ শুনা যায়; কিন্তু আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন

কলম্বসের পোতশ্রেণী

হইয়াছে সেই দিন যেইদিন কলম্বসের জাহাজ ঘুরিতে ঘুরিতে অপ্রত্যাশিতরূপে এক মহাদেশের উপকূলের সন্ধান পাইল। তারপর, ইয়ুরোপের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এটলান্টিকের দুইতীর বহুশত যোজনের ব্যবধান সত্ত্বেও একই ভাব-প্রভাবে আন্দোলিত লাগিল। ইহার পরে যন্ত্রযুগ, এবং নূতন মহাদেশের অকল্পিত উন্নতি। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত সামান্য পাল উড়াইয়াই ইয়োরোপ ও আমেরিকা এটলান্টিকের পারাপার করিয়াছে। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে প্রথম বাষ্পতাড়িত জাহাজ কোম্পানি ইয়ুরোপ ও আমেরিকার মধ্যে মালপত্র ও যাত্রী বহিবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। জার্ম্মানীর ব্রিমেন হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত এই জাহাজ গুলির গতিবিধি ছিল—তখন এটলান্টিক পার হইতে লাগিত ১৭ দিন বর্ত্তমানে কলম্বাস প্রভৃতি বাষ্পতাড়িত জাহাজে এটলান্টিক সাতদিনেই উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু, জলপথে ভাসিয়া যাওয়া যখন এটলান্টিক পার হওয়ার একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য হইত তখনই গত যুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর একটি সাবমেরিন্ বা 'ডুবোজাহাজ মালপত্র শুদ্ধ এক ডুবে ব্রিমেন্ হইতে আমেরিকায় পৌঁছিয়া আবার আরেক ডুবে ব্রিমেন ফিরিয়া পৃথিবীকে চমৎকৃত করে। ইহার পরে যুদ্ধ শেষে মানুষ পুরাতন জলপথ ও স্থলপথ দুটিই 'সেকেলে' বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে—এটলান্টিক বিজয়েরও আরেক নূতন পথ খুলিয়া গিয়াছে। একনার তাহার জেপেলিন লইয়া পরম দুঃসাহসে আকাশ পথে প্রথম আমেরিকায় উত্তীর্ণ হইলেন। তারপর যাত্রীর অভাব হইল না, অভাব হইল বিজয়ীর। এটলান্টিকের আবহাওয়া এমনই ছলনাপর ও চঞ্চল, আবার সঙ্গে সঙ্গে এমনই সর্ব্বনেশে যে, যে-বৈমানিক আজ তাহার করাল মায়া ছিন্ন করিয়া আমেরিকার তট-ভূমির নাগাল পাইতে পারেন, তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। অবশ্য এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যাও নিত্যই বাড়িতেছে। —জার্ম্মানীর কাপ্তান কোহল, বেরন্ ভন্ হুনেফিল্ড ও আইরিশ্ ফ্রীষ্টেট্এর মেজর ফিট্জ মরিস্ এরূপ ভাগ্যবানদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহারা তিনজন ইয়ুরোপ হইতে সরাসরি আমেরিকা পৌঁছিবার কাজে প্রথম সার্থক হন্। 'ব্রিমেন' নামক তাঁহাদের বিমানই ১২ এপ্রিল আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত বল্‌ডোনেল হইতে উত্তর আমেরিকার তুহিনাচ্ছন্ন গ্রীন্‌লেণ্ডদ্বীপে পৌঁছিয়া ইয়ুরোপের পশ্চিম-বায়ুপথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। কাপ্তেন কোহল পপুলার মিকানিকস্ পত্রে এই পরম কৌতুককর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কুজ্ঝটিকার জন্য নাবিকত্রয় প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু নিউ ফাউণ্ডলেণ্ডএর কাছাকাছি পৌঁছাইতে ঝড়ে ও দুর্ভেদ্য মেঘজালে তাঁহারা প্রায় দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। কোহল্ লিখিতেছেন, তখন উপায় রহিল উপরের মেঘস্তর ছাড়িয়া নিম্নে জলের ঠিক উপরে উড়িয়া চলা। "আমরা এত নীচে নামিয়া আসিলাম যে অর্দ্ধোন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া এটলান্টিকের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত জলকণা ছিট্‌কাইয়া আসিতে লাগিল। ব্রিমেন্'-এর সমস্ত কয়টি গ্রন্থি যেন টুটিবে টুটিবে। পাখা বাঁকাইয়া গেল, চালন-চক্রের উপরে ঝড়ের ভয়ানক প্রচণ্ড ঝাপ টা লাগিতেছিল। প্রকৃতির শক্তির সঙ্গে যেন মানুষের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে।"—এমনি সময়ে কম্পাস্ গোলমাল হইয়া গেল, কম্পাসের সম্মুখের আলো আর জ্বালা গেল না। বেশী ভারি বলিয়া নাবিকগণ পূর্ব্বে বেতার যন্ত্র গ্রহণ করেন নাই, তবে উচ্চতা নির্দ্ধারক যন্ত্রটি খুবই সহায়ক হইল। ধ্রুবতারার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা গেল কম্পাস যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তখন ধ্রুবতারাই সম্বল

উড়োজাহাজ ব্রিমেন্

করিয়া ওড়া সুরু হইল—ফিট্‌জ্‌ মরিস্ কয়েকটি বোমা ফেলিয়া দিলেন। বোমা ফাটিলে বুঝা গেল নীচে কঠিন বরফ আর গাছপাতা আছে।

ব্রিমেনের নাবিকত্রয়—কোহল্, হুনেফিল্ড ও ফিট্‌জ্‌ মরিস্
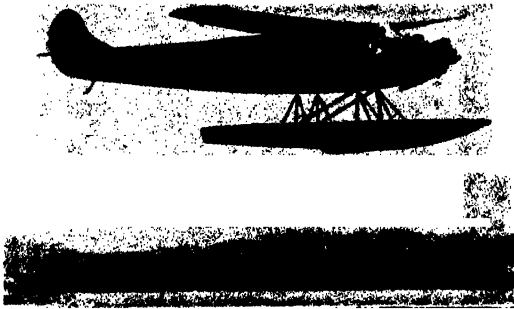
উড়োজাহাজ ফ্রেণ্ডশিপ—এই জাহাজে প্রথম নারী-আরোহিণী এট্‌লাণ্টিক পার হন্

মিস্ ইয়ারহার্ট—একমাত্র নারী যিনি উড়োজাহাজে এট্‌লাণ্টিক পার হইয়াছেন

কয়েকটা পাহাড়ের চূড়ার পাশ কাটাইয়া ব্রিমেন্ মাটিতে নামিয়া পড়িল—অথবা বরফের মধ্যে নামিয়া পড়িল। তারপর, আমেরিকার চারি দিক হইতে তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য উদ্‌গ্রীব বিমান-বীরেরা ছুটিলেন। গ্রীন্‌লে দ্বীপ নির্জ্জন, সে সময়ে সে স্থানে লোকজন থাকে না; তুষার ও দুরন্ত শীতের কবলে দ্বীপটি থাকে।—ব্রিমেন্ আরোহীদের উদ্ধারে আমেরিকাবাসী যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন।

ব্রিমেন্-এর পরে এট্‌লাণ্টিক বিজয়ে নব-নব বীর রণসজ্জা করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে মিস্ ইয়ারহার্ট নাম্নী একটি সাহসিনী নারীও আছেন।—ব্রিমেন্-বীরদের স্থান সকলের পুরোভাগে, ইঁহাদের সাহস, ধৈর্য্য, কৌশল ও অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা এট্‌লাণ্টিক বিজয়ের আধুনিক ইতিহাসে এক বিস্ময়াবহ অধ্যায়।

বার্লিনের ধর্ম্মস্থান—

কিছু দিন পূর্ব্বে বার্লিনে মুসলমানদের নূতন মস্‌জিদটি খোলা হইয়াছে। এখানে মুসলমান ছাত্রদের থাকিবার পড়িবার বন্দোবস্তও

বার্লিনের মস্‌জিদ্

করা হইয়াছে। ইহার অর্থ আসিয়াছে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের নিকট হইতে—ভারতবাসী মুসলমানদের অর্থ সাহায্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বৌদ্ধ গৃহ নামে যে প্রতিষ্ঠানটির চিত্র এই সঙ্গে প্রকাশ সম্ভব হইল না, তাহার স্থাপয়িতা ছিলেন স্বর্গীয় পল ডালকে। এই পবিত্র-হৃদয় জার্ম্মাণ মনস্বী বহু বৌদ্ধ শাস্ত্র অনূদিত ও প্রচারিত করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা পশ্চিমে প্রচার করিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

চিন্তামণি ঘোষ

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রয়াগের ইণ্ডিয়ান্ প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ পূর্ণ ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তিনি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া নিজের শক্তি ও চেষ্টায় কৃতী হইয়াছিলেন। তিনি ধনশালী হইয়াছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র ধনশালিতা তাঁহার বা অন্য কাহারও গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। ধনের সদ্ব্যবহার গৌরবের বিষয় বটে; যদি সদ্‌গুণ দ্বারা ধন উপার্জ্জিত হয়, তাহাও গৌরবের বিষয়।

চিন্তামণিবাবুর পিতা আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাবে কমিসেরিয়েট বিভাগে কাজ করিতেন, কিন্তু পুত্র তাঁহার নিকট হইতে কোন সম্পত্তি পান নাই। সুতরাং তাঁহাকে বার বৎসর কয়েক মাস বয়সেই স্কুল ছাড়িয়া এলাহাবাদের পাইয়োনীয়ার আফিসে দশ টাকা বেতনের একটি চাকরী লইতে হয়। তিনি হিসাব রাখার কাজ করিতেন, এবং নিজের কাজ খুব শীঘ্র শীঘ্র করিতে পারিতেন। এইজন্য তাঁহার যথেষ্ট অবসর থাকিত। সেই সময়ে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাপাখানার সব কাজ দেখিয়া বেড়াইতেন। পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি থাকায়, কোন্ যন্ত্রে কি কাজ হয়, তাহা কেমন করিয়া চালাইতে হয়, ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করিতে পারিতেন। তাঁহার কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা সহকর্ম্মীদের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানান্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইতেন না।

তিনি নিতান্ত অল্পবয়স্ক অথচ কার্য্যদক্ষ ছিলেন বলিয়া পাইয়োনীয়ার প্রেসের ইংরেজ ম্যানেজার তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে একটি কাকাতুয়া উপহার দিয়াছিলেন। তিনি বালক ছিলেন এবং নিজের কাজ শীঘ্র করিয়া ফেলিতেন বলিয়া, কোন কোন বয়োবৃদ্ধ সহকর্ম্মী তাঁহার দ্বারা নিজেদের কাজ করাইয়া লইতেন। এইজন্য তিনি কখন কখন টেবিলের নীচে লুকাইয়া হিসাবের খাতা লিখিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, একদিন এইরূপে টেবিলের নীচে কাজ করিবার সময় ম্যানেজার তাঁহাকে খুঁজিতে আসিলে তিনি টেবিলের নীচে হইতে বাহির হন, এবং তাহা দেখিয়া ম্যানেজার হাসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সহকর্ম্মীদের গুণগ্রাহিতার উপদ্রব খুলিয়া বলেন।

পাইয়োনীয়ার আফিসে তিনি সাত বৎসর কাজ করেন, বেতন হয় ৬০ টাকা। কিন্তু তাঁহাকে সেখানে বড় বেশী খাটিতে হইত বলিয়া তথাকার কাজ ছাড়িয়া রেলওয়ে মেল সার্বিসের আফিসে প্রবেশ করেন। তিনি পাইয়োনীয়ারের কাজ ছাড়িবার পর পরে পরে ঐ কাজে পাঁচজন লোককে নিযুক্ত করিতে হয়। ইহা হইতেই তাঁহার কাজের পরিমাণ ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। রেলওয়ে মেল সার্বিসে অল্প দিন কাজ করিয়া তিনি এলাহাবাদের মিটিঅরলজিক্যাল আফিসে চাকরীপ্রার্থী হন। তখন অধ্যাপক মিস্‌টার (পরে স্যার্) জন্ এলিয়ট উঁহার কর্ত্তা ছিলেন। তিনি চিন্তামণিবাবুর পরীক্ষা লইয়া সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে হেড্ ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স ২০ পূর্ণ হয় নাই। সেইজন্য কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, ১৯ বছরের একটা ছেলেকে হেড কেরানীর কাজ দেওয়া ভাল হয় নাই। কিন্তু চিন্তামণি-বাবু শ্রমশীলতা ও কার্য্যপটুতা দ্বারা সকলের সন্দেহ দূর করেন ও প্রশংসাভাজন হন। তাঁহার কার্য্যপটুতার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে। একদিন অধ্যাপক এলিয়ট তাঁহাকে একটি অতি জটিল হিসাবসম্বলিত বিবরণ প্রস্তুত করিতে দেন এবং তাহা জরুরী বলিয়া অন্য সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা আরম্ভ করিতে বলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের অনুমানে উহাতে ২।৩ দিন সময় লাগিবার কথা। চিন্তামণিবাবু কিন্তু তাহা কয়েক ঘণ্টায় উত্তমরূপে করিয়া দেওয়ায় তিনি বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হন, এবং নিজের লাইব্রেরীর সব বহি পড়িতে

অনুমতি দেন। তা ছাড়া মিস্টার এলিয়ট তাঁহাকে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া উচ্চ গণিত এবং মিটিঅরলজির নানা বিষয় শিখাইতে আরম্ভ করেন।

সেকালের পাইয়োনীয়ার কাগজ এবং এলিয়ট সাহেবের ও মিওর সেণ্ট্যাল কলেজের অন্য কোন কোন অধ্যাপকের গল্প চিন্তামণিবাবুর নিকট অনেক শুনিয়াছি। সব এখন ভাল করিয়া মনে নাই। দু একটা কথা বলিতেছি। ইংরেজ সরকারী চাক্‌রেয়া সে কালেও ইংরেজদের কাগজে লিখিতেন, এখনও লেখেন। সেকালে পাইয়োনীয়ার গবর্ন্মেণ্টের খুব অনুগ্রহভাজন ছিল, এবং বড় বড় রাজপুরুষেরা ইহাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতেন। চিন্তামণিবাবুরই মুখে শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে, যে, একবার একটি প্রবন্ধের জন্য পাইয়োনীয়ার একজন (বড় বা ছোট) লাটসাহেবকে দুহাজার টাকার চেক্ দিয়াছিল। এলিয়ট্ সাহেব পাইয়োনীয়ারে প্রায়ই লিখিতেন, এমন কি তাঁহার বন্ধু সম্পাদক কার্য্যান্তরে কোথাও গেলে তাঁহার হাতে কাগজের ভার দিয়া যাইতেন। একবার এলিয়ট সাহেব একদিনের লেখায় একটা কি ভুল করিয়া পরদিন নিজেই তাহা সংশোধন করেন। সম্পাদক এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলেন, আমরা যদি ভুল করি ও অপরে যদি তাহা ধরিতে না পারে, তাহা হইলে নিজে হইতে তাহা জানাইয়া দেওয়া ও সংশোধন করা চতুর সম্পাদকের কাজ নয়।

চিন্তামণিবাবু আফিসের বেশ ভাল কেরানীই ছিলেন, কিন্তু চিরকাল চাকরী করিতে ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। এই জন্য মিটীঅরলজিক্যাল আফিসে কাজ করিবার সময়ই তাঁহার একটি ছাপাখানা স্থাপন করিবার ইচ্ছা হয়। একদিন খবরের কাগজে একটা রেজিমেণ্টের ক্রাউন আকারের হ্যাণ্ডপ্রেস বিক্রীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া টাইপসহ তাহা পাঁচশত টাকায় ক্রয় করেন। এই পুরাতন যন্ত্র ও টাইপ লইয়া তিনি সমস্ত দিনের খাটুনির পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া টাইপের ঘর চেনা, টাইপ চেনা ও টাইপের পাশে টাইপ বসাইয়া কম্পোজ করা শিখিতে আরম্ভ করেন। নিজে নিজে কাজ শিখিবার সময় ছোট ছোট ছাপার কাজ আসায় তিনি নিজের হাতে কম্পোজ করা, প্রুফ দেখা ও ছাপার কাজ করিতে থাকেন, এবং মুদ্রাঙ্কন ও মুদ্রাযন্ত্র পরিচালন বিষয়ে নানা ইংরেজী বহি

চিন্তামণি ঘোষ

পড়িতে থাকেন। এইপ্রকারে কখন কখন তাঁহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত। ১৮৮৪ সালে তাঁহার ছাপাখানাটি "দি ইণ্ডিয়ান প্রেস" নামে রেজিষ্টারী হয়। ক্রমে বেশী কাজ পাওয়ায় তাঁহার উৎসাহ বাড়ে এবং বড় যন্ত্র ও অধিক পরিমাণ হরফের দরকার হয়। তখন নিজের প্রেসটি একজন ক্রেতাকে চৌদ্দশত টাকায় বিক্রী করিয়া ভাল বড় প্রেসের অর্ডার দেন। তাহা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গবর্ন্মেণ্ট প্রেস হইতে একটি ছাপিবার অর্ডার পাইলেন। যন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও তিনি তাহা ফিরাইয়া দিলেন না, ভাল করিয়া ছাপিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। খুব মন দিয়া নিজে লেখাগুলি কম্পোজ করিয়া ফেলিলেন, এবং দুখানি মসৃণ শিশু কাঠের তক্তায় কব্জা আঁটিয়া তাহার মধ্যে কম্পোজ-করা টাইপ রাখিয়া চাপিয়া চাপিয়া ছাপিতে লাগিলেন। এই প্রকারে নিজের উদ্ভাবিত

উপায়ে কাজটি সুসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার খুব আনন্দ হইল।

ইহার পর ইণ্ডিয়ান প্রেস কেমন করিয়া ক্রমাগত বড় হইয়া আসিতেছে, তাহার ইতিহাস বলিবার আমার স্থান নাই, দরকারও নাই। আমরা "শিক্ষিত শ্রেণীর" লোকেরা সাধারণতঃ কলম চালান ছাড়া হাতের দ্বারা অন্য কোন কাজ করিতে চাই না। কয়েক বৎসর হইতে তুলি ধরিয়া ছবি আঁকার কাজও "শিক্ষিত লোকেরা" করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চিন্তামণিবাবু কলম চালাইবার চাকরী করিতেন, তাহাতে তাঁহার দক্ষতাও খুব ছিল। কিন্তু হাতের অন্য ব্যবহারকে তিনি লজ্জা বা অপমানের বিষয় মনে করিতেন না। তাঁহার কৃতিত্বের এই একটি প্রধান কারণ আমাদের দেশের যুবকদিগকে জানাইবার জন্য তাঁহার প্রাথমিক জীবনের কয়েকটি ক্ষুদ্র কথা লিখিলাম।

তিনি ৩৫ বৎসর বয়সে মাসিক একশত টাকা বেতন পাইবার সময় সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের ছাপাখানার উন্নতিতে নিজের সমুদয় সময় ও শক্তি প্রয়োগ করেন। তিনি সিকি পেন্‌স্যনে অবসর গ্রহণ করেন। শুনিয়াছিলাম, যে, দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ তিনি পেন্স্যন পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আফিসের কাজ ছাড়া প্রেসের জন্য কম্পোজ করা, প্রুফ দেখা প্রভৃতি জন্য, এবং সর্ব্বোপরি নিজের ব্যবসায়-বিষয়ক নানা বহি ও সাময়িক পত্র পাঠে এই দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মে ও বৃদ্ধি পায়। চক্ষুর পীড়ায় তিনি অনেক কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন। নানা সুচিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি এরূপ প্রবল ছিল, যে, যখন দেখিতে পাইতেন না, তখনও প্রেসের সব কাজের তদারক করিতে এবং দুই দুই বার নিজের প্রেসের সুবৃহৎ বাড়ী নিজ পরিকল্পনা অনুসারে নির্ম্মাণ করাইতে পারিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান্ প্রেসের পাঁচটি শাখা কাশী, আগ্রা, পাটনা, কলিকাতা ও নাগপুরে অবস্থিত। এলাহাবাদে মূল প্রেসে ইংরেজী, বাংলা, আরবী ফারসী উর্দ্দু, এবং সংস্কৃত ও হিন্দী ছাপিবার বন্দোবস্ত আছে। টাইপের ছাপা ছাড়া, লিথোগ্রাফ ও অফ্‌সেট ছাপিবার বন্দোবস্ত আছে। টাইপ ঢালাই বিভাগ, চিত্রাঙ্কণ বিভাগ, ফোটোগ্রাফ ও হাফটোনের বিভাগ, "সরস্বতী" প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ বিভাগ, নানাপ্রকার অভিধান ও অন্যান্য বহি প্রকাশ করিবার বিভাগ এবং দপ্তরীখানা আছে। সহরের বৈদ্যুতিক শক্তি যোগাইবার ব্যবস্থা ও জল সরবরাহের কারখানা বিগড়াইয়া গেলেও যাহাতে প্রেসের কাজ বন্ধ না হয়, তাহার জন্য প্রেসের নিজের জল ও বৈদ্যুতিক শক্তি যোগাইবার বন্দোবস্ত আছে।

মুদ্রণ-কার্য্যের উৎকর্ষের এবং যথাসময়ে কাজ দিবার দিকে চিন্তামণিবাবুর বরাবর খুব দৃষ্টি ছিল। মুদ্রণ-কার্য্যের উৎকর্ষ বলিতে তিনি সর্ব্বাগ্রে বুঝিতেন নির্ভুল ছাপা। এবিষয়ে কেবল মাত্র দুটি গল্প বলিব। আমি যখন এলাহাবাদে ছিলাম, সেই সময়ে অধ্যাপক টিবো ও পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ভারতীয় দর্শন বিষয়ক একটি ইংরেজী পত্রিকা ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইত। উহার একটি সংখ্যার প্রুফে একটিমাত্র ভুল থাকায় টিবো সাহেব প্রেসের ম্যানেজারকে চিঠি লেখেন, যে, প্রুফে এরূপ ভুল থাকা প্রেসের পক্ষে অত্যন্ত অখ্যাতিকর। চিন্তামণিবাবু আমাকে ইহা বলায় আমি হাসিতেছি দেখিয়া এই মন্তব্য করেন, যে, টিবো সাহেব অন্যায় কথা বলেন নাই; কারণ, কেহ নির্ভুল লেখা প্রেসে ছাপিতে দিলে তাহার প্রুফ সম্পূর্ণ নির্ভুল হওয়াই উচিত। মডার্ন রিভিউ যখন ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইত, তখন আমি উহার সম্বন্ধে নানা সংবাদপত্রের মত সংকলন করিয়া প্রবাসীর আকারের একটি ৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা বিতরণের জন্য পাঁচ হাজার ছাপিতে দি। উহা ছাপা, সেলাই ও ছাঁটা হইয়া যাইবার পর প্রেসে গিয়া আমি একখানা হাতে লইয়া দেখিলাম, একটি পৃষ্ঠায় দুটি পংক্তি উল্টা পাল্টা হইয়া গিয়াছে: অর্থাৎ যেটি আগে বসিবে তাহা পরে বসিয়াছে। খুব সাবধান হইলেও যে হঠাৎ কখন কখন সামান্য ত্রুটি হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহা তাহা চিন্তামণিবাবুকে দেখাইবা মাত্র তিনি

গম্ভীর হইয়া বলিলেন, এই পুস্তিকাগুলি কি আজই আপনার চাই? আমি বলিলাম, না। তখন তিনি ম্যানেজারকে আবার ৫০০০ পুস্তিকা নির্ভুল করিয়া ছাপিয়া এক দিন পরে আমাকে দিতে বলিলেন, এবং পূর্ব্ব-মুদ্রিত পুস্তিকাগুলি সমস্ত নষ্ট করিয়া দিতে বলিলেন। তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, পুস্তিকাগুলি বিজ্ঞাপন-মাত্র, এবং বিতরিত হইবে; তাহার জন্ম এত লোক্সান করিবার দরকার নাই। তিনি বলিলেন, না মশায়, এতে আমার প্রেসের বদনাম হবে। সুতরাং উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা ৫০০০ পুস্তিকা নষ্ট করিয়া তিনি আবার নিজের ব্যয়ে সেইরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে তাহা ছাপিয়া দিলেন। ছাপার পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্যের উপর তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। একবার মডার্ণ রিভিউয়ের কোন সংখ্যায় দুখানি এক এক পৃষ্ঠাব্যাপী ছবি আর্ট পেপারে ছাপিয়া দিবার কথা ছিল। তাঁহার প্রেস্ এক সঙ্গে দুটি পাতা ছাপিয়া দেয়। ছাপা ভালই হইয়াছিল। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হইল, যে, এক একটি ছবির এক একটি পাতা আলাদা করিয়া ছাপিলে হয় ত আরও ভাল হইত। আমার এইরূপ অনুমান চিন্তামণিবাবুকে বলিলাম, কিন্তু অবশ্য আবার এক একটি ছবি আলাদা করিয়া ছাপিয়া দিতে বলিলাম না। কিন্তু আমার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি আপনা হইতেই কাগজের দাম ও ছাপার খরচ লোক্সান দিয়া আবার ছবি দুটি আলাদা আলাদা করিয়া ছাপিয়া দিলেন। আমি দেখিলাম, বিশেষ কোন তফাৎ হয় নাই। তাঁহারও একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট করা হইল।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ সামান্ত হাণ্ডবিল হইতে বড় বহি পর্য্যন্ত সমস্ত কাজের জন্ম নানা রকম কাগজ মজুদ রাখিত, এবং গ্রাহকের পছন্দসই কাগজে মুদ্রণ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া কাগজ ও ছাপাইয়ের বিল করিত। এখনও বোধ হয় সেই রীতিই আছে। কোন গ্রাহক প্রেসে মজুদ কাগজ অপেক্ষা সস্তা নিরেস কাগজে ছাপিতে বলিলে এবং ছাপাইয়ের নির্দ্দিষ্ট দর কমাইতে বলিলে চিন্তামণিবাবু তাহাতে রাজী হইতেন না; বলিতেন, ওরূপ কাগজে ছাপিলে আমার প্রেসের অখ্যাতি হইবে। যাহারা সস্তায় ছাপে এরূপ কোন কোন প্রেসের নাম করিয়া দিতেন।

সচিত্র কোন বহি প্রকাশ করিতে হইলে তিনি বিদেশী কোন বহি হইতে নকল করা ছবি দেওয়া পছন্দ করিতেন না; চিত্রকর দ্বারা ছবি আঁকাইয়া দিতেন। যখন ইণ্ডিয়ান প্রেস্ দ্বারা আমার সম্পাদিত আরব্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তখন উহার সব ছবি স্থানীয় একজন মুসলমান চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল।

ঐ চিত্রকরটির একটু বেশী আফিং খাওয়া অভ্যাস ছিল; কিন্তু সাবেক দেশী ধরণের ছবি আঁকায় তাহার হাত ছিল ভাল। চিত্রকলাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার আঁকা আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার এই একটা আপ্‌সোস্ চিন্তামণি-বাবুকে জানাইয়াছিল, যে, সে কেবল কাল কালীর ছবিই আঁকতে পাইল, একটাও রঙ্গীন ছবি আঁকবার ফরমাইস্ পাইল না। তাহার এই একটা উক্তি ছিল, "বাবুজ, রং এমন চীজ্, যে, গাধার উপর লাগাইয়া দিলে তাহাকেও খুব-সুরৎ মালুম হয়।" চিন্তামণিবাবু একবার এক ইংরেজ অধ্যাপককে কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য বৈজ্ঞানিক বহি লিখিয়া দিবার জন্ম দেড় হাজার টাকা অগ্রিম দেন। পরে আরও সাড়ে তিন হাজার দিবার কথা থাকে। অধ্যাপক মহাশয় বহি লিখিয়া দেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কতকগুলি ছবি ম্যাক্‌মিলানদের কোন কোন বহি হইতে স্বীকার না করিয়া গ্রহণ করেন। তাহাতে ম্যাক্‌মিলানরা ইণ্ডিয়ান প্রেসকে উকীলের চিঠি দেয়। চিন্তামণিবাবু সমস্ত বহি নষ্ট করিয়া ফেলিবার হুকুম দেন; অধ্যাপক অগ্রিম প্রাপ্ত ১৫০০ টাকা ফেরত দিতে চাহিলে গ্রহণ করেন নাই। বৈজ্ঞানিক ছবিগুলি মামুলী ধরণের ছিল। আদালতে ইণ্ডিয়ান প্রেসের বিরুদ্ধে রায় হইতই, বলা যায় না। কিন্তু চিন্তামণিবাবু মোকদ্দমা ভালবাসিতেন না। ব্যাবসা সম্পর্কে পাওনা টাকা আদায়ের জন্যও কখন আদালতের আশ্রয় লন নাই। তিনি অসহযোগ প্রচেষ্টার আগে হইতেই এবিষয়ে স্বভাব-"অসহযোগী" ছিলেন।

নানা রঙের লিথো ছবি ছাপিবার জন্য এবং তাহা

যুবকদিগকে শিখাইবার জন্য তিনি যন্ত্রপাতি এবং জার্ম্যান কারিগর্‌ ও মুদ্রাকর আনাইয়া অনেক খরচ করেন। কিছু ভাল ছবিও বাহির হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর যুবকদিগকে এই ব্যবসা শিখাইবার তাঁহার যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সফল হয় নাই। ছাপাখানার ব্যবসার উন্নতির জন্য এইরূপ তিনি বিস্তর টাকা লোকসান দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রখর ব্যবসা-বুদ্ধির জোরে মোটের উপর লাভ করিয়াছিলেন।

প্রবাসী প্রথমে এলাহাবাদ হইতে বাহির হয় ও ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হয়। ইহার জন্য ঐ প্রেসের বাংলা বিভাগ খোলা হয়। তাহার আগে চিন্তামণিবাবুর সহিত হিন্দীতেও সচিত্র মাসিক পত্র বাহির করা সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতাম; হয়ত এই কথাবার্তা হইতে উৎকৃষ্ট হিন্দী পত্রিকা "সরস্বতী"র উদ্ভব হয়।

চিন্তামণিবাবু সহজে দমিবার লোক ছিলেন না। রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলী যখন এলাহাবাদের পাণিনি আফিস ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপাইয়া বাহির করেন, তখন আমি উহার প্রুফ দেখিয়াছিলাম ও ভূমিকা লিখিয়াছিলাম। রামমোহনের সহিত খৃষ্টীয় মিশনারীদের তর্কবিতর্ক ছাপিবার সময় দেখা গেল আরবী গ্রীক ও হীব্রু অক্ষরের দরকার। আরবী অক্ষর ইণ্ডিয়ান্‌ প্রেসেই ছিল। গ্রীক ও হীব্রু অক্ষরের জন্য কলিকাতার ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেসে লেখা হইল; কেননা, উহাতে ঐ দুই ভাষাতেও বহি ছাপা হয় এবং টাইপ ঢালাইও হয়। কিন্তু উক্ত প্রেস টাইপ বিক্রী করিতে রাজী হইল না। তখন চিন্তামণিবাবু হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি নিজের টাইপ ঢালাই বিভাগে গ্রীক ও হীব্রু টাইপের ছাঁচ কাটাইয়া টাইপ ঢালাইয়া বহি ছাপিলেন। প্রবাসী ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইবার সময় আমি তাঁহাকে বলি, যে, বাংলা এণ্টীক কিছু অক্ষর পাইলে ভাল হয়। তখন কেবল ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেসে ঐরূপ টাইপ ব্যবহৃত হইত ও পাওয়া যাইত। সুতরাং সেখানে লেখা হইল। উত্তর আসিল যে, ২০০ পাউণ্ডের (প্রায় আড়াই মণের) কম উহা বিক্রী করা হয় না। চিন্তামণিবাবু ৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৬ মণের অর্ডার দিলেন। তখন ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেস উত্তর দিল, আমরা এখন বড় ব্যস্ত, দিতে পারিব না। তখন সদ্য সদ্য চিন্তামণিবাবু বাংলা কোন টাইপ ঢালান নাই; কিন্তু পরে তাঁহার নিজের কারখানায় ঢালা টাইপ হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য বহি ছাপা হইয়াছিল।

মডার্ন্‌ রিভিউ প্রথমে ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইত। চিন্তামণিবাবু প্রতিমাসে ঠিক ১লা কাগজ বাহির করিয়া দিতেন এবং কাগজগুলি গাড়ী করিয়া আমার বাসায় পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে কাগজ, ছাপাই ও বাঁধাইয়ের একটি বিল পাঠাইয়া দিতেন; বলিতেন, আমার কাজ আমি করিলাম, আপনার কাজ আপনার সুবিধা ও ইচ্ছা মত করিবেন। আমাকে টাকার জন্য কখনও তাগিদ দেন নাই। অনেক মাস কাগজ বাহির হইবার পর তবে আমি টাকা দিতে আরম্ভ করি। তাঁহার এইরূপ অনুকূলতার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আমার কোন সঞ্চয় না থাকায়, আমি ঐরূপ অনুকূল ব্যবস্থা ব্যতিরেকে হয় ত কাগজখানি বাহির করিতে পারিতাম না, কিম্বা বাহির করিলেও স্থায়ী করিতে পারিতাম না। কলিকাতায় চলিয়া আসিবার পরও আমি একবার তাঁহার হিতৈষণার ফলভাগী হইয়াছিলাম। একদা এক রকম মসৃণ কাগজ কলিকাতায় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তিনি ডিকিন্সন কোম্পানীকে তাঁহার অর্ডারী ঐরূপ কাগজের অনেক রীম আমাকে দিতে বলেন। মূল্য আমি পরে তাঁহাকে দি।

হিন্দী সাহিত্য ইণ্ডিয়ান প্রেসের নিকট বিশেষ ঋণী। তুলসীকৃত রামায়ণ প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট হিন্দী গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সংস্করণ এখান হইতে বাহির হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কৃত উৎকৃষ্ট বাংলা অভিধানের জন্য বাঙালীরা এই প্রেসের নিকট ঋণী।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের পুস্তক ও পত্রিকাদিতে অপকৃষ্ট রুচির ছবি তিনি ছাপিতে দিতেন না। যত দিন তাঁহার দৃষ্টি-শক্তি ছিল, তত দিন এই নিয়ম পালিত হইয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা। তাহার পরেও প্রেসের পরিচালকগণ সব সময়ে এই নিয়মের অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে, কোন কোন বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ, এবং দুঃস্থ বিধবাদের ও অনাথ বালকবালিকাদের দুঃখ মোচনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

সামাজিক ও ধার্ম্মিক বিষয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে কখন আলোচনা না হওয়ায় ঐ সব বিষয়ে তাঁহার মতামত সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। তবে কথাপ্রসঙ্গে কখন কখন দু একটা বিষয়ে তাঁহার মত জানা যাইত। একবার তাঁহার বাড়ীর একটি বালিকার বিবাহের সম্বন্ধ উপলক্ষ্যে কোন এক জায়গায় বরপক্ষীয় লোকেরা অনেক টাকার দাবী করে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া টাকা দিতে তিনি রাজী ছিলেন, কিন্তু শুভকার্য্যে দরদস্তুর পছন্দ করিতেন না। এইজন্য বিরক্তির সহিত তাহা বন্ধুদের নিকট বলিতে গিয়া তিনি কিছু গরম হইয়া বলেন, বরদিগকে যখন খোসামোদ করিয়া কন্যাদের সম্মতি পাইতে হইবে, তখন পণের দাবী করা উঠিয়া যাইবে, তাহার আগে নয়।

["উত্তরা" কাগজে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে আমি কিছু সাহায্য পাইয়াছি।—লেখক।]

মহিলা-সংবাদ

অশেষ লাঞ্ছনা ও কষ্ট সহ্য করিয়া বারদোলির কৃষকগণ শান্তিময় সত্যাগ্রহ সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে। শ্রীমতী সারদা বাঈ সুমন্ত মেহেতা ও কুমারী মিঠুবেন দেশাই এবং অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও বারদোলীর কৃষক রমণীদের সহিত এই সংগ্রামে যোগদান করিয়া নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী সারদাবাঈ সুমন্ত মেহেতা

শ্রীমতী রত্নকুমারী দেবী

...তী চন্দ্রাবাঈ ফোন্সসী

শ্রীমতী সীতা দেবদাস

শ্রীমতী সারদাবাঈ নাইডু

শ্রীমতী মিঠুবেন দেশাই

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি দেবদাসের কন্যা শ্রীমতী কুমারী সীতা দেবদাস উক্ত হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার হইলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মহিলাসম্প্রদায়ের মধ্যে ইনিই প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার। হাইকোর্টের প্রধান জজেরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা এবং তাঁহার মঙ্গলকামনা

করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, ব্যারিষ্টারের কন্যাই ব্যারিষ্টার হইয়াছেন এবং ইহাও সুখের বিষয় যে, কুমারী সীতার পিতাও এই সময়ে হাইকোর্টের বিচারপতির পদে আসীন আছেন।

পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলের ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী চন্দ্রাবাঈ ফোকসী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ, এল-এল্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি পুণা জজ আদালতের উকিল হইয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত জব্বলপুরের মাননীয় শেঠ গোবিন্দদাসের কন্যা শ্রীমতী রত্নকুমারী দেবী কলিকাতা সরকারী সংস্কৃত বোর্ডের অনুষ্ঠিত কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মাড়োয়ারী বালিকাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি পাইলেন। শ্রীমতী রত্নকুমারী বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

কুমারী সারদাবাঈ নাইডু পুণা সেবাসদন হইতে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া রেডক্রশ সমিতির একটি বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি লণ্ডনের বেডফোর্ড কলেজে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিবেন।

বাটপাড়

শ্রী বীরেশ্বর বাগছী

জগদলপুরের জমিদার জগৎবাবুর ম্যানেজার তাঁর কল্‌কাতার বৈঠকখানায় ব'সে রাত্তির দশটার পরে গগনবাবু নামক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গূঢ় মন্ত্রণায় রত। ম্যানেজার-বাবু বল্‌ছেন—"যাই বলুন, অর্দ্ধেকের কমে আমি এতে রাজি হ'তে পারিনে। ধর্ম্ম আর কর্ম্ম এক সঙ্গে দুটো'ত আর খোয়ানো যায় না।" গগনবাবু বল্‌লেন—"এ অতি অন্যায় কথা আপনার—আট হাজার টাকা কি কম?" ম্যানেজার-বাবু বল্‌লেন—"সাড়ে বারো হাজারের চেয়ে ত কম বটে-ই।" গগনবাবু বল্‌লেন—"কিন্তু সাড়ে বার হাজার আমিও ত একা নিতে পার্‌ছি না—আমারও ত ভাগ দিতে হ'বে।" ম্যানেজার-বাবু বল্‌লেন—"সে দিতে হয় দেবেন—আট হাজার-টাকার লোভে এত বড় বিপদ আমি ঘাড় পেতে নিতে মোটেই রাজি নই।" গগনবাবু মিনতির সুরে বললেন—"টাকার পরিমাণটা তা'লে আরও বাড়িয়ে দিন না কেন—পঁচিশ হাজারের জায়গায় চল্লিশ হাজার হোক্।" ম্যানেজার-বাবু বল্‌লেন—"সে হ'তে পারে না, সাম্‌নে মার্চ্চ কিস্তির লাট আসছে, কুলিয়ে উঠতে পার্‌বো না।" নিরুপায় কণ্ঠে গগনবাবু বল্‌লেন—"আচ্ছা তবে তিরিশ হাজার দেন।" ম্যানেজার-বাবু বল্‌লেন—"সে হ'বে না মশাই, আগে যা বলেছেন, তারই চেষ্টা দেখুন।" গগনবাবু বল্‌লেন—"ভারি মুস্কিলে ফেল্‌লেন দেখছি, সে ক্যাশিয়ার ব্যাটাকে দু'হাজারের কমে নামাতে পার্‌ব ব'লে বোধ হচ্ছে না; ব্যাটা একেবারে রাঘব বোয়াল।" ম্যানেজার-বাবু বল্‌লেন,—"তাকে অত টাকা খাওয়াবার দরকার কি? একটা মুখের কথা বল্‌বে বই ত নয়।" গগনবাবু বল্‌লেন, "শুধু মুখের কথাই বা বলি কি ক'রে—সেয়ার সার্টিফিকেটগুলোও ত সেই দেবে—নইলে যে রেজেষ্টারিই হ'বে না।" ম্যানেজার-বাবু বল্‌লেন,—আচ্ছা মিনার্ভা ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানির ক্যাশিয়ার ছাড়া আর কাউকে বাগাতে পার্‌লেন না?" গগনবাবু বল্‌লেন, "সে রকম বিশ্বাসী লোক আর কোথায় পাই বলুন—তা ছাড়া কথাটা পাঁচ কান করাও ভাল নয়।"

ম্যানেজার-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কত টাকা এখান থেকে নেবেন তা কি বলেছেন তাকে?" গগনবাবু বল্‌লেন—"পরিষ্কার কিছু বলি নি, তবে এখান থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে তারই তিন ভাগের এক ভাগ

দেব ব'লে স্বীকার করেছি।" ম্যানেজার-বাবু বল্লেন, "ব্যস্! তবেই হয়েছে। পঁচিশ হাজারের সাড়ে বার হাজার নেব আমি, বাকী সাড়ে বার হাজার থেকে তাকে দেবেন আড়াই হাজার, আপনি দশ হাজার নেবেন। তার সাক্ষাতে আমি না হয় তিন আড়াইয়ে সাড়ে সাত হাজারই স্বীকার করবো।" গগনবাবু বল্লেন, "সে মশায় ঝুনো শয়তান, বিশ্বাস করবে না। তার পরে আপনার নেওয়াটাও কিন্তু একটু বেশী বেশী হ'য়ে যাচ্ছে। ম্যানেজারবাবু বল্লেন,—"দেখুন গগনবাবু, সে একটু হ'বেই। ঝুকিটাও যে সবই আমার ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। আপনারা ত টাকা নিয়ে যে যার মতন স'রে পড়বেন—কোন গোলযোগ বাধলে জবাবদিহি করতে হ'বে আমাকে, ভেবে দেখুন একবার, কাজটা কতখানি গুরুতর! একে ছোট জাতের মেয়ে, তায় আবার বিধবা, তাকে চালাতেও চাচ্ছেন বামুনের ঘরে—তাও কি না আবার আমারই সাহায্যে! কথাটা যদি কোন রকমে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায়, তা'লে আমার কি আর রক্ষে থাক্‌বে!" গগনবাবু বল্লেন—"আপনি যে এর মূলে আছেন, তা অন্তের জানার সম্ভাবনা কোথায়?" ম্যানেজারবাবু বল্লেন,"সম্ভাবনা আপাততঃ নাই বটে, কিন্তু হঠাৎ একটা গজিয়ে উঠতে বড় বেশী দেরী হয় না।" গগনবাবু বল্লেন, "আমি বল্‌ছি কিচ্ছু হ'বে না, নিজের ঘাড়ে কোন দায়িত্ব রাখবেন না আপনি—সমস্ত দেবেন আপনার বাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে। যা কিছু করাতে হয় তাঁর Personal staffএর লোক দিয়ে তিনি করাবেন। তার পরে এ সব হচ্ছে পারিবারিক কথা, এর মধ্যে আপনার থাকারই বা দরকার কি?" ম্যানেজারবাবু বল্লেন—"দিলামই না হয় সমস্তটা বাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে, কিন্তু তিনি যখন যুক্তি জিজ্ঞেস করবেন তখন কি করবো?" গগনবাবু বল্লেন—"এত বড় একটা সম্পত্তি শাসন করছেন, আর পাড়াগেঁয়ে একজন মূর্খ জমিদারকে একটা বোকাবুঝ দিতে পারবেন না? যে আপনার হাতে খায় আপনার চোখে দেখে—তার কাছে একটা 'সসেমিরা' গোছের জবাব দিয়ে পাশ কাটিয়ে দাঁড়ানো আর মুস্কিল কি?" ম্যানেজার-বাবু বল্লেন—"যা তা একটা যে বুঝিয়ে দিতে না পারি তা নয়, তবে তাঁরই খাই কি না একটু বাধ-বাধ লাগে।" গগনবাবু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বল্লেন—"হাসালেন মশায় আপনি। জমিদারের কর্ম্মচারী তার আবার বাধ-বাধ! ওসব moral scruplesগুলো কাজের সময় পকেটে রেখে দেবেন।" শুনে ম্যানেজারবাবুর চোখ-মুখ রাঙ্গা হ'য়ে উঠল। তিনি বল্লেন—"বেশ তাই হ'বে, কিন্তু সাড়ে বার হাজারের কমে আমি এর মধ্যে যাবনা ব'লে রাখছি।" গগনবাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বল্লেন—"আমি বলি একটা মাঝামাঝি রফা ক'রে ফেলা যাক—গঙ্গাও একটু এগোন তেষ্টাও একটু এগুক!" ম্যানেজারবাবু বল্লেন—"পরিষ্কার ক'রে বলুন—ভাল বুঝলাম না।"

গগনবাবু বল্লেন—"দেখুন, এই ব্যাপারে আমরা যে যে অংশের অভিনয় করতে যাচ্ছি, তাতে কারো কাজই কম নয়। এই ধরুন, আপনার পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে টাকা পাওয়া যাবে না। আবার সে ক্যাশিয়ার মহাপ্রভু যদি কাজের সময় হঠাৎ ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সেজে বসে, তবে আপনি টাকা দিলেও আমি নিতে পারবো না। শেষে আমার কথা ধরতে গেলে আমিই হচ্ছি প্রধান অভিনেতা—আপনারা ত নেপথ্য থেকেই হাঁ কিম্বা না যা হয় একটা কিছু ব'লে সে'রে যাবেন, কিন্তু ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় সন্তোষজনক ভাবে পাশ হ'তে হ'বে আমাকেই। সব দিক্ ভেবে-চিন্তে তাই বল্‌ছিলাম, আপনি সাড়ে বার হাজারের খাঁই ছেড়ে দশ হাজারেই রাজি হন। আমি নিই দশ হাজার আর ওকে ব'লে-কয়ে পাঁচ হাজার দিইগে। অবিশ্যি ও'র সামনে আপনাকে পনর হাজারই বলতে হ'বে।" ম্যানেজার বাবু একথার কোন জবাব না দিয়ে মুখ নীচু ক'রে ভাবতে লাগলেন। গগনবাবু আবার বল্লেন—"দশ হাজার টাকা বড় কম কথা নয়—আমার কথা মত কাজ করুন, কোন বিপদ হ'বে না আপনার।" আরও কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে ম্যানেজারবাবু বল্লেন—"বেশ, আমি রাজি—কিন্তু খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে কাজ করবেন।" বেপরোয়া ভাবে গগনবাবু বল্লেন—"সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—দেখা করব কবে?" ম্যানেজার-বাবু

বল্‌লেন—"কালই আসুন না কেন—সকালে সাড়ে সাতটার পর এলেই চল্‌বে। আমি সব ঠিক্ ক'রে রাখ্‌বখন। গগনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন,—"বেশ এখন তবে আসি—নমস্কার।" ম্যানেজারবাবুও দাঁড়িয়ে বল্‌লেন,—'নমস্কার—আর দেখুন, প্রথমেই পঁচিশ হাজার চাইবেন না—দরকশাকশি হ'বে কিন্তু—যা করেন একটু মার্জ্জিন রেখেই করবেন।" "আচ্ছা, সে আমি খুব পারব"—ব'লে গগনবাবু ধীরে ধীরে পথে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

(২)

জগদলপুরের জগৎবাবুর বৈঠকখানা। বেলা আন্দাজ সাড়ে-সাতটার সময় আলবোলার নল মুখ থেকে নামিয়ে—আধমণ তূলার সুবৃহৎ তাকিয়াটা এক পাশে সরিয়ে রেখে সোজা হ'য়ে ব'সে বাবু হাঁক্‌লেন—"ছিদাম—ওরে ছিদাম।" 'কেউ সাড়া দিল না। রেগে বাবু গলা আরও চড়িয়ে হাঁক্‌লেন—"এ নিব্বুইংশার পুত গ্যালো কোন্ হানে—বলি ওরে ছিদাইম্যা।" এবার নেপথ্য থেকে জোর গলায় জবাব এল—"আইতে আছি কর্‌তা।" কর্ত্তা ধমক দিলেন—"ব্যাটা তরাতরি আইতে পারোস্ না।" মিনিট খানেক পরে ছুঁচো চেহারার একটা লোক ঘরে ঢুকে বল্‌ল—"কর্ত্তা ডাহুন ক্যারে?" কর্ত্তার মেজাজ তখনও নামে নাই—বল্‌লেন—"ডাহলে রাও করোস্‌না ক্যারে হালায়?" ছিদাম কৈফিয়ৎ দিল, "কি ভায় কর্‌বাম—কর্‌তার নতুন জুতায় কালি লাগাইতে আছলাম।"

এবার কর্ত্তা কতকটা নরম হ'য়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, "অই যে দ্যাওপুরের ওগো আওনের কথা ছিল আইছিল তারা?"

ছিদাম চট্‌পট্ জবাব দিল—"আজ্ঞা হঃ।" কর্ত্তা আবার জিজ্ঞেস করলেন—"ব্যাবাক্ ট্যাহা দিছে?" ছিদাম বল্‌ল—"আজ্ঞা হঃ।" কিন্তু ব'লেই সে মাথা চুল্‌কাতে-চুল্‌কাতে এমন ভাবে কর্ত্তার পানে চাইতে লাগ্‌ল, যে, তার আরো কিছু বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞাসা না ক'রে কর্ত্তা থাক্‌তে পার্‌লেন না। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করা মাত্র সে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে, মাঝে মাঝে একটু থেমে কায়দা-মাফিক্ ভাবে যা বল্‌লে, তার মর্ম্ম হ'ল এই যে, গুরুচরণ গোমস্তা দেবপুরের খাতকেরা টাকা সুদে আসলে পরিশোধ করতে আস্‌লে তাদের বস্‌তে ত বলেই নি, উপরন্তু আসা মাত্রই টাকার জন্যে খুব গোটা কয়েক কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে। সম্ভ্রান্ত লোক তারা গুরুচরণের ইতর ব্যবহার কেন সহ্য করতে যাবে—চ'টে তারা চ'লেই যাবার উপক্রম করেছিল—শেষটায় ছিদাম তাদের অনেক মিষ্টি কথা কয়ে তবে ফিরিয়ে এনেছে। পরে গুরুচরণ তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় কর্‌বার সময় কর্ত্তার বিনানুমতিতে সুদমধ্যে দুই টাকা সাড়ে পাঁচ আনা মাফ দিয়ে সমস্ত টাকা বুঝে নিয়েছে। ছিদামের নিষেধ মোটেই শোনে নাই। সমস্ত শুনে কর্ত্তা গর্জ্জন ক'রে বল্‌লেন—"হুদ্ মাফ দ্যাওনের হুকুম ক্যাডা দিছে তারে? বদ্রলোকের পোলাপান্ আমার কাছারীতে আইলে হালায় পরথমে বওনের কইতে পারে না! ডাক্ হালারে।"

গুরুচরণ আস্‌লে কর্ত্তা চড়া গলায় জিজ্ঞেস্ করলেন—"হালা, জমিদারী ত'র?" গুরুচরণ এরকম ব্যবহারে বরাবরই অভ্যস্ত, তাই সে কোন জবাব না দিয়ে বক্রদৃষ্টিতে ছিদামের পানে একবার তাকা'ল মাত্র। কর্ত্তা আবার জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন—"হালা রাও করোস্ না ক্যারে? আমি জিগাই, হালায়, জমিদারী ত'র?" বেগতিক দেখে গুরুচরণ একবার ঘাড় নাড়্‌ল, কিন্তু তাতে হাঁ কিম্বা না কিছুই বোঝা গেল না। কর্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌লেন—"ত'রে আর হালায় শিখাইমু কত। একশ দিন কইছি বদ্রলোকের পোলাপান আইলে পরথমে বওনের কইতে হয়—পরে জিগাইতে হয় তামুকতুমুক খায় কি না। মান্‌সেরে আগে ঠাণ্ডা কইর‍্যা লইলে হ্যাযে দুইঘা জোতাও মারন যায়। তুমি তা বোজ্‌বানা—ক্যাবাল মান্‌ষের লগে বাদাইবা গণ্ডগোল। বদ্রসমাজে তুমি আমার মুখ হাসাইবা—হুয়ার।" গুরুচরণ ধীরভাবে বল্‌ল—"তাদের তদ্বিরের কিছুমাত্র ক্রটী হয় নি।" কর্ত্তা জিজ্ঞেস করলেন—"হুদ্ ছাইর‍্যা দ্যাওনের হুকুম ক্যাডা দিছে ত'রে?" গুরুচরণ বল্‌ল—"প্রয়োজন বুঝ্‌লে কর্ত্তার বিনানুমতিতে যে কোন খাতককে সুদের তিনটাকা পর্য্যন্ত ছেড়েদেবার একখানা হুকুমই ত রয়েছে আমার কাছে।"

খানিকক্ষণ চিন্তা করে আর নতুন কোন দোষ ধর্‌তে না পেরে, শেষটায় গলার সুর একেবারে বদ্‌লে কর্ত্তা বল্‌লেন—"হোন্‌ছোনি একজন বদ্রলোকে আওনের কথা অইছে—আইলে খুব তদ্বির কর্‌বা —বড় কোকোনের বিয়ার কথা অইতে আছে তার মাইয়ার লগে।" গুরুচরণ জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কখন আস্‌বেন তিনি?" কর্ত্তা বল্‌লেন—"আইব আড্‌ডায়—খুব হুসিয়ার রইবা— বোঝ্‌নি—আর হোনো।" কর্ত্তা গুরুচণের কানে কানে গোটা কয়েক কথা বল্‌লেন। সে "যে আজ্ঞে" ব'লে চ'লে গেল।

ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় আটটা ঠিক্‌ তখন কর্ত্তার প্রাইভেট সেক্রেটারী সুরেনবাবু গগনবাবুকে সঙ্গে ক'রে কর্ত্তার বৈঠকখানায় প্রবেশ কর্‌ল। কর্ত্তা দাঁড়িয়ে হাত ধ'রে গগনবাবুকে বসালেন। পরে বড়গোছের একটা তাকিয়া তাঁর দিকে ঠেলে দিয়ে সহাস্যে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লেন —"মশায়ে মংগল ত?" ঈষৎ হেসে গগনবাবু বল্‌লেন— "আজ্ঞে মঙ্গল অর্থে হচ্ছেন স্বয়ং কেশীমথন শ্রীকৃষ্ণ—তাঁরই অপার অনুগ্রহে কোনরকমে প্রাণধারণ কর্‌ছি মাত্র। অপনার কুশল ত?" হাস্‌তে হাস্‌তে কর্ত্তা বল্‌লেন— "অহন বালই আছি। সুরাইন তুমি ওয়ার লগে কথা কও—আমি হুনি। আগে ম্যানেজারবাবুরে ডাহ। এই ন্যান্‌ তামুক খান।" ব'লে কর্ত্তা আলবোলার নলটি গগনবাবুর হাতে দিলেন। গগনবাবু অতি বিনীত ভাবে নলটি গ্রহণ ক'রে কর্ত্তাকে একটা ছোট নমস্কার ক'রে বল্‌লেন—"আজ্ঞে এটা আজও অভ্যাস্‌ করিনি।" বিস্মিত হ'য়ে কর্ত্তা বল্‌লেন—"এই ডা কয়েন কি কথা।" গগনবাবু বল্‌লেন—"আজ্ঞে এক ভাত খাওয়া অভ্যাস ক'রেই এখন পস্তাচ্ছি—এর পরেও কি আর তামাক অভ্যাস কর্‌তে সাহস হয়।" "বালো কথা কইছেন।" ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে কর্ত্তা নলটা গগনবাবুর হাত থেকে ফিরিয়ে নিলেন।

ম্যানেজারবাবু এলে কর্ত্তা তাঁকে বল্‌লেন—"উনি আইছেন—গগনবাবু, আমা গো ম্যানেজার-বাবুর কাছে ব্যাবাক্‌ কইয়া ফ্যালান। হুঁ:—বালো কথা—মাইয়া ক্যামোন—চেহারা ছবি নি বালো। আমার বড় পোলার বিয়া—মাইয়া কুচ্ছিত অইলে আমি কিন্তু গররাজি অইমু।" গগনবাবু বল্‌লেন,—"সে দেখে নেবেন— দেখতে শুন্‌তে ভাল না হ'লে কি আর এত উঁচুতে কথা কইতে সাহসী হই। মেয়েত সুরেনবাবুই দেখে এসেছেন— উনিই বলুন—রাজা-রাজড়ার ঘরেও অমনটি খুব কমই দেখা যায়। আমার গরীবের ঘরে ওকে একরকম গোবরে পদ্মফুলই বল্‌তে হ'বে।" কর্ত্তা সুরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"মাইয়া দ্যাখ্‌ছো নি—চেহারা ছবি বালো ত?" সুরেনবাবু বল্‌লেন,—"আজ্ঞে হাঁ, সে একেবারে সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা। কর্ত্তা নিজের চোখেও একবার দেখবেন— আদেশ কর্‌লেই গগনবাবু গাড়ী ক'রে এনে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।" সোৎসাহে কর্ত্তা বল্‌লেন—"হঃ তাই বালো। আপনি বৈকালে লইয়া আইবেন।" গগনবাবু বল্‌লেন—"তা হ'লে কাজের কথাও না হয় তখনই হ'বে।" অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে গগনবাবুর পানে চেয়ে ম্যানেজার-বাবু বল্‌লেন—"ও বেলা বড় লোকের ভিড় হয় তখন কোন কাজের কথা বলা সম্ভব হ'বে না। মেয়ে দেখাটা এক ফাঁকে উঠে গিয়ে হ'তে পারে বটে।" গগনবাবু বল্‌লেন, "তবে তাই হোক্‌। আমার কথা সমস্তই বলেছি আপনাকে—কর্ত্তার কাছে আপনি তার কতটুকু বলেছেন তা না জান্‌তে পার্‌লে কোথা থেকে কথা আরম্ভ কর্‌বো ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।" ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন, "টাকা-পয়সার কথা বাদে আর সবই আমি কর্ত্তাকে বলেছি। দেনাপাওনার কথাটা আপনার মুখ দিয়েই কর্ত্তার সাম্‌নে চূড়ান্ত হওয়া দরকার। টাকাকড়ির কোন দায়িত্বের মধ্যে আমি থাক্‌তে চাইনে।" কর্ত্তা বল্‌লেন—"থাক্‌তে চান না ক্যান—না থাক্‌লে চলবো ক্যাম্‌তে। ম্যালা বদ্দরলোক আইব—ট্যাহা খর্‌চা অইব—এ ব্যাবাক্‌ দ্যাখশোন্‌ কর্‌ব ক্যাডা? আমার পোলার বিয়ায় আমিত খাইমু নিমন্তন্ন।" বলেই কর্ত্তা হা হা ক'রে হাস্‌তে লাগলেন। গতিক ভাল নয় দেখে ম্যানেজারবাবু ভাল ক'রে সাফাই হ'বার আশায় বল্‌লেন, "আজ্ঞে, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা এলে তাঁদের যথাবিহিত অভ্যর্থনা, তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা, সে-সব ত আমাকেই কর্‌তে হ'বে। বড় খোকাবাবুর বিয়ে সে

আয়োজন হ'বে ছোটখাট একটা রাজসূয় যজ্ঞের। সে কাজে তিলমাত্রও ত্রুটি ঘট্‌লে কর্ত্তার সুনামের হানি হ'বার আশঙ্কা রয়েছে, সে-সব কাজ আমি অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে ককখনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।" এই পর্য্যন্ত ব'লেই ম্যানেজারবাবু একটু থেমে অপেক্ষাকৃত নীচুগলায় বল্‌লেন—"কর্ত্তার কাছে আমি আরও একটা কথা নিবেদন করব। আমি বল্‌ছিলাম, আপনাদের ব্রাহ্মণের বিয়ে —কুলকুলুজীর কথা—একেবারে নিছক শাস্ত্রীয় ব্যাপার, এসব বিষয়ে আমার আদৌ কোন জ্ঞান নাই। তাই ভয় হয়, যদি আমার কোন কথা বা কাজের ভুলভ্রান্তিতে কর্ত্তার পবিত্র বংশগৌরবের তিলমাত্রও হানি হয় তবে আমার ক্ষোভের অবধিই রইবে না। তারপরে হচ্ছে টাকা পয়সার কথা—একে আমি ভাল চিনি না, এর সঙ্গে যদি শেষে দেনাপাওনা নিয়ে কোন কথান্তর হয়, তবে হয় ত তার পূর্ণনিমিত্তভাগী হতে হ'বে আমাকেই—তাতেও আমার কর্ত্তার বিরাগভাজন হ'বার সম্পূর্ণ আশঙ্কা রয়েছে। কর্ত্তার স্নেহ এবং অনুগ্রহ এ দুটিকেই আমি প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান মনে করি। যে-বিষয়ে আমার মোটেই কোন জ্ঞান নাই, তারই ভেতরে সেঁধোতে গিয়ে বিপদে পড়া, ফলে কর্ত্তার স্নেহ-অনুগ্রহ থেকে চিরবঞ্চিত হওয়া আমার একেবারেই ইচ্ছা নয়।"

ম্যানেজারবাবুর বক্তৃতা শুনে কর্ত্তা দাঁত বের ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"হঃ হঃ সে ত ওয়াজিব কথা— না জান্‌লে আমাগো বামন বদ্রের কথায় আপনি থাক্‌বেন ক্যামতে।" শেষে গগনবাবুর পানে চেয়ে বল্‌লেন—"আপনি কইয়া ফালান্ আমি শুন্‌তে আছি। ম্যানেজারবাবুর লগে কোন কথা অইব না—ব্যাবাক্ অইব আমার লগে। আমাগো বামনের কথার মধ্যে কাইয়স্থ অইয়া আহনের তান্ ঠ্যাকাডা কি আছে।" নিষ্কৃতি পেয়ে ম্যানেজারবাবু স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন। গগনবাবু পরম উৎসাহে আরম্ভ কর্‌লেন—"আজ্ঞে সে-ত ঠিকই। ভূতের শ্রাদ্ধে আলেয়ার আসার কি দরকার? আমাদের ব্রাহ্মণ সমাজের কথা কায়স্থ হ'য়ে উনি কি বুঝ্‌বেন? এতো আর বাজে লোকের কথা নয়, আপনার মতন লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের সুযোগ পেয়ে সত্যিসত্যিই আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে কর্‌ছি। আমার মতন গরীবের মেয়েকে যদি চরণপ্রান্তে স্থান দেন তবে আপনার বংশমর্য্যাদানুযায়ী অর্থাদি যে জামাতা বাবজীকে দিতে পার্‌ব এমন ভরসা রাখি না, তবু আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যতটুকু কুলোয় তার যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব।" ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন—"ও সমস্ত বৈষ্ণব আর্ত্তি এখন কাজের সময় না। দেখিয়ে কত কি দিতে পার্‌বেন, সেটা খুলে বলুন।"

কর্ত্তা বল্‌লেন—"হঃ, ম্যানেজারবাবু বাল কথা কইছেন—কথা ব্যাবাক্ ছাপ্ হওনই বাল।" গগনবাবু বল্‌লেন—"সর্ব্বসাকুল্যে যৌতুকাদি নিয়ে হাজার দশেক টাকা আমি দিতে পার্‌বো।" শুনে কর্ত্তা মনে মনে মহাসুখী হ'লেন। তাঁর দুইবার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল্ ক'রে তিনবারের বার পাকা হ'য়ে পাশ্ করা ছেলেকে যে কেউ একডাকে দশহাজার টাকা দিতে চাইবে এ ধারণা তাঁর আদৌ ছিল না। তবুও কন্যাপক্ষকে খুশীর ভাবটা বুঝতে না দিয়ে ঝুনো চালবাজ বরকর্ত্তার মতন বল্‌লেন, "—দ্যাওনডা কিছু কমই অইয়া যাইতে আছে। দপ্পনারানপুরের চক্কোত্তিরা এ্যাহনো গুড়াগুড়ি কর্‌তে আছে। তারা দুইপেরস্ত রূপার বাসন—তিন আজার বরি হোনা, আর নগদে বারো আজার ট্যাহা দিবার চাইতে আছে।" কর্ত্তার এচাল্‌টা গগনবাবুর উপর তেমন কার্য্যকরী হ'ল না। তিনিও পাল্টা চাল দিলেন—"অবিশ্যি টাকাপয়সা থাকলে বারহাজার কেন, কুড়ি হাজার দিলেই বা ক্ষতি কি—এতো আর পরকে দেওয়া হচ্ছে না। জামাই মেয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক্‌লে ছেলের বাপ্ আর মেয়ের বাপ্ উভয়েই সুখী হ'তে পারেন। এখন আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, আমার আর কোন সন্তানাদি নাই, নিজেও বিপত্নীক। কাজেকাজেই আমার অভাবে কষ্টেসৃষ্টে সামান্য বারচৌদ্দহাজার টাকা বার্ষিক আয়ের যে একটু জোতজমি করেছি, তার সমস্ত স্বত্ব বর্ত্তিবে গিয়ে জামাতা বাবাজিরই—আমি ত আর কিছু সাথে নিয়ে যেতে পার্‌বো না।" শুনে কর্ত্তা হর্ষোৎফুল্ল অথচ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ম্যানেজারবাবুর পানে তাকালেন— তিনিও পাকা ইঙ্গিতজ্ঞের মতন গগনবাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আপনার বয়েস ত তেমন বেশী হ'য়েছে ব'লে

বোধ হয় না—এখনও বেশ কাঁচা চেহারা আছে। আর বিয়ে করবেন না?" গগনবাবু জবাব দিলেন—"আর বিয়ে! বয়স ত চল্লিশ পেরিয়ে গেল। জীবনের এই দুঃখপূর্ণ অপরাহ্ণে আর কেঁচে গণ্ডুষ করবার ইচ্ছে নেই, ম্যানেজারবাবু। প্রাণপারাবারের এই সুদীর্ঘ উপকূল বেয়ে চলতে চলতে এমন জায়গায় এসে এখন পৌঁছেছি, যেখানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের পানে তাকালে ঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনে। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণভজনা ক'রেই কাটিয়ে দেব মনে করছি—জানি না অদৃষ্টে কি আছে।"

কথাগুলি শুনে কর্ত্তা ভারি খুসী হ'লেন। এমন একজন ধর্ম্মপ্রাণ, গোবিন্দগতচিত্ত লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার সুযোগ পেয়েছেন ভেবে মনে মনে নিজেকে সৌভাগ্যবান ব'লেও ভাবতে লাগলেন। ম্যানেজার-বাবু বললেন—"আপনার তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কথা কয়েকটি শুনে খুবই আনন্দিত হ'লুম—ঐ যে দশহাজার টাকার কথা বললেন—ঐ টাকাটা কি ভাবে দেবেন—নগদ না কোন ব্যাঙ্কের উপরে চেক্ দেবেন?" ম্যানেজারবাবুর কথার সোজা কোন জবাব না দিয়ে গগনবাবু কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ম্যানেজারবাবুর কথা থেকে কি বুঝব যে ঐ দশ হাজার টাকা পেলেই আমার মেয়েকে আপনি গ্রহণ করবেন?" লম্বা লম্বা কথা শুনে বেসামাল হওয়ার পাত্র কর্ত্তা নন্—তিনি বললেন—"আরো কিছু দ্যাওন লাগ্‌ব।" গগনবাবু বললেন—"সে বলতে হ'বে কেন আমাকে। নিজেরইত জামাই মেয়ে—ভবিষ্যতে আমার যথার্থস্বইত ওদের হ'বে। তবে এখন যদি চাপ দিয়ে নেন তবে আমাকে একটু অসুবিধায় পড়তে হ'বে।" কর্ত্তা বললেন—"ম্যানেজারবাবু কি জিগাইলেন?" গগনবাবু বললেন—"হাঁ, সে কথারও জবাব দিচ্ছি। দেখুন টাকাটা আমি নগদ দিতে পারবো না। মিনার্ভা ইন্‌সিউরেন্স কোম্পানীতে আমার পঞ্চাশহাজার টাকার সেয়ার আছে। সেই সেয়ারগুলো আমি জামাতাবাজীর নামে দানপত্র লিখে রেজেষ্টারী ক'রে দেব। সেজন্য আমি ৪০ চল্লিশহাজার টাকা নেব। বরপণ বাবদ দশহাজার টাকা বাদ যাবে। ওরা আজকাল সেয়ারের ডিভিডেণ্ড দিচ্ছে শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে—তাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার সেয়ারে আমার দুহাজার টাকা পাওনা হয়েছে। কর্ত্তা দশহাজারের উপরে আরও কিছু চাইলেন ব'লেই এ 'কলের' ও দুহাজার টাকাও আমি জামাতা বাবাজিকে আশীর্ব্বাদস্বরূপ দেব। কর্ত্তার কথাত আর অমান্য করা চলে না।" শুনে খুসীতে কর্ত্তার চোখ দুটো একেবারে গোল হ'য়ে উঠল। ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞেস্ করলেন,—"ওই দুহাজার টাকা কবে 'ডিউ' হ'বে?' গগন-বাবু বললেন—"ডিউ ত অলরেডি হ'য়েই আছে। যখন খুসী টাকা নিয়ে আসতে পারেন। রেজিষ্টারী হয়ে গেলেই ওটা আমি বরাত লিখে দেব'খন।" আনন্দে এতক্ষণ কর্ত্তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছিল না। এইবার তিনি বললেন—"আপনি মশায় লাখোপতি অইয়া জামাইয়েরে মাত্তর দিবেন বার আজার! এই ডা কইলেন কি কথা!"

গগনবাবু বললেন, "বারহাজার ত আপাততঃ দিচ্ছি। এর পরেও আমার যা রইল, সে-সমস্তেরই ভাবি মালিক হতে যাচ্ছেন জামাতাবাবাজী। বর্ত্তমানে আমার টাকার অত্যন্ত দরকার কি না, তাই সেয়ারগুলো লিখে দিয়েও আত্মীয়তাস্থলে টাকা চাইতে হচ্ছে।" ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"অত টাকার বর্ত্তমানে আপনার দর-কারটা কি শুনতে পারি কি? অবিশ্যি তেমন গোপনীয় হ'লে আর শুনতে চাইনে।" গগনবাবু গম্ভীরস্বরে বললেন—"আমি যে-ভাবে জীবনযাপন করি তাতে আমার কিছু গোপনীয় থাকতে পারে না। জীবনে এমন কাজ এ পর্য্যন্ত করি নাই, যা ভদ্রসমাজে প্রকাশ করতে একটুকুও কুণ্ঠা আসতে পারে।" একটু থেমে আবার বললেন—"বহু দিন থেকেই ইচ্ছা করছি যে, শ্রীবৃন্দাবনে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে ভেকগ্রহণ করবো। এখন এই কাজ হচ্ছে—শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ। শ্রমে কাতর আমি কোন দিনও নই, অভাব হচ্ছে এখন টাকার। সম্পত্তি থেকে যে-টাকা যোগাড় করতে পেরেছি তা দিয়ে আশ্রমের জন্যে জায়গা আর আশ্রমের চালিত একখানা কাগজের জন্যে ছাপাখানা খরিদ করেছি মাত্র। এখন আশ্রমের বাড়ী তৈরী করা এবং কাগজের অন্যান্য সরঞ্জাম খরিদ করার

জন্মে টাকার দরকার ব'লেই সেয়ার বিক্রী করতে হচ্ছে।" ম্যানেজারবাবু যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে সে সুযোগ না দিয়েই গগনবাবু আবার বললেন—"সেয়ার লিখে দেওয়ার পর যে টাকা ফেরত পাব, আশ্রমের ফটকের গায়ে মার্ব্বেল পাথরের উপরে সে টাকাটা আশ্রম-প্রতিষ্ঠা এবং কাগজ বাবদ কর্ত্তার দান ব'লে লেখা থাকবে। 'মৃদঙ্গ' কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় থাকবে কর্ত্তার ফটো, তার নীচে দানবীর ইত্যাদি কয়েকটা জাঁকালো বিশেষণ দিয়ে সোনার জলে ওঁর নাম ছেপে দেব।' শেষের কথা কয়েকটি শুনে কর্ত্তার মনটা যেন একটু কেমনতর হ'য়ে উঠল। এক টাকা দিয়ে দশ টাকার জিনিষ পাওয়াই ত হচ্ছে প্রথমতঃ অত্যন্ত লাভের কথা, তার পরে আবার খবরের কাগজে ছবি ছাপা হ'বে, নীচে সোনার জলে নাম লেখা থাকবে, সেটাও বড় কম কথা নয়। কর্ত্তা ছিলেন স্বভাবতঃই একটু অতিরিক্ত সম্মানপ্রিয়। সুতরাং এই বেয়ারিং সম্মানটুকু লাভের আশা ছাড়া তাঁর পক্ষে একরকম কঠিনই হ'য়ে উঠল। তাঁর চোখমুখ দেখে গগনবাবু এবং ম্যানেজারবাবু উভয়েই একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে নিলেন, মৃদু হাসির একটা ক্ষীণরেখা মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েরই ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠল। কর্ত্তা এ সব লক্ষ্য না ক'রে হাসতে হাসতে বললেন—"হাঃ হাঃ হাঃ আমার বালো ছবি রইছে—যাওয়াকালে লইয়া যাইবেন।"

ইতিমধ্যে সঙ্কোচজড়িতপদে গুরুচরণ ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢোকামাত্রই তার সঙ্গে কর্ত্তার একবার চোখে চোখে কথা হ'য়ে গেল। গগনবাবুকে একটু অপেক্ষা করতে ব'লে কর্ত্তা তার সঙ্গে উঠে পাশের ঘরে গেলেন। সেখানে গুরুচরণকে একান্তে পেয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"গেছিলা তুমি?" সে বলল—"আজ্ঞে হা—ক্যাসিয়ারকেও পেয়েছিলাম। সে বলল,—"গগনবাবুর নামে সত্যিই পঁচাত্তর হাজার টাকার সেয়ার আছে এবং তার ডিভিডেণ্ডও পাওনা হ'য়েছে।" মহাখুসী হ'য়ে কর্ত্তা বললেন,—"বটে—হালায়—ডুব দিয়া জল খাইতে চায়—আচ্ছা যাও তুমি—যা কইলা ঠিক ত?" গুরুচরণ বলল—"আজ্ঞে হা।" কর্ত্তা বললেন, "আচ্ছা যাও।" গুরুচরণ অন্য দরজা দিয়া বেরিয়ে গেল। কর্ত্তা বৈঠকখানায় ফিরে এসে হাসতে হাসতে বললেন—"বেয়াই, হলগল্ জাইনা ফ্যালছি—আর যাইবেন কোন্ হানে।" গগনবাবু এবং ম্যানেজারবাবুর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হয়ে উঠল, কর্ত্তা কিন্তু সেটা ধরতে পারলেন না। তিনি গুরুচরণকে পাঠিয়ে গোপনে ক্যাসিয়ারের কাছ থেকে সংবাদসংগ্রহের খুব এক চোট বাহাদুরি করলেন। শেষটায় আরম্ভ করলেন নতুন করে দর কশাকশি। গগনবাবু যখন নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'লেন তখন তিনিও কর্ত্তার কাছ থেকে যত বেশী আদায় করতে পারেন তারই চেষ্টা পেতে লাগলেন। ম্যানেজারবাবু কারো কোন কথায়ই সায় না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। শেষে গগনবাবুর সঙ্গে কর্ত্তার যখন ত্রিশ হাজার টাকা রফা হ'য়ে গেল, তখন তিনি ধীরে ধীরে বললেন,—

—"কর্ত্তা একটা নিবেদন এখানে আমি না ক'রে থাকতে পাচ্ছিনে—সরকারী তবিল থেকে কিন্তু অত টাকা আমি দিয়ে উঠতে পারব না। সামনে লাটের কিস্তি আসছে—এবার বছরের যা গতিক দেখা যাচ্ছে, তাতে সেই লাট সামলাতেই আমাকে চোখে সরষের ফুল দেখতে হ'বে।" কর্ত্তা কোন জবাব দেবার আগেই গগনবাবু আগছেঁদে বললেন—"হেঁসে আর বাঁচিনে—রাজ্যিজোড়া যার টাকার দাদন, এই সামান্য গোটা কয়েক টাকার জন্যে তাঁকে কি না হা-পিত্যেশে তাকিয়ে থাকতে হ'বে খাজনার তবিলের পানে।" কথার মাঝখানে কর্ত্তার অলক্ষ্যে ম্যানেজারবাবুকেও একবার ইঙ্গিত করতে ছাড়লেন না। কর্ত্তা ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"সরকারী তবিলথনে পাইমু কত?" ম্যানেজারবাবু বললেন—"পনর হাজার—মার কাট বিশ হাজারও নিতে পারেন।" একটু চিন্তা ক'রে কর্ত্তা বললেন—"তা বেশ, ভাহো গুরুচরণেরে—পোলার বিয়ায় করমু কিছু হুদের ট্যাহা খরচো।" গুরুচরণ এলে জিজ্ঞাসা করলেন—"হুদের তবিলে ট্যাহা আছে কত?" গুরুচরণ মনে মনে একটু হিসেব ক'রে বলল—"আজকের আদায় নিয়ে সবশুদ্ধ পঁচিশ হাজার তিন শত পঁচাত্তর টাকা পাঁচ আনা ছয় পাই।" চটে কর্ত্তা বললেন, "হালা জবর মুচ্ছদ্দি আনা পাই ক্যাডা হোন্‌বার চায় রে তর

কাছে ?" এসব কানে না তুলে গুরুচরণ বল্‌ল—"টাকা-গুলো আজই ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব মনে করছি। এত টাকা ঘরে রাখা ভাল নয়।" কর্ত্তা পূর্ব্ববৎ বললেন "হালায় রাভবরের মাসী ট্যাহা পাঠাইবেন ব্যাঙ্কে। ক্যারে ট্যারে ট্যাহা কি তর কাণ চিম্‌টায় ?" অম্লানবদনে গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করল, "তা'লে টাকা কি বাড়ীতেই রাখব ?" কর্ত্তা বললেন, "হঃ বড় কোকনের বিয়ায় খরচো করমু।" গুরুচরণ 'যে আজ্ঞে' ব'লে চ'লে গেলে, গগনবাবুর পানে চেয়ে একটু হেসে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"বিয়াই মাইয়া দেখমু কহন ?" গগনবাবু বল্‌লেন, "যখন আপনার অভিরুচি।" ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন, "তা'লে আজ সাড়ে চারটের পরেই দেখাবেন—দিনটাও ভাল আছে।" কর্ত্তা বল্‌লেন, "হঃ হুভস্ত হিগগির র‍্যাজেষ্টারী, ট্যাহা দ্যাওন কাল ভোর ব্যালায় হ্যাষ করমু।" ম্যানেজার-বাবুর পানে চেয়ে বল্‌লেন, "র‍্যাজিষ্টার হায়েবেরে বাসায় আনোন লাগব।" ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন,—"যে আজ্ঞে, সে-সমস্ত ব্যবস্থা আমি আজই কর্‌বো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

কাজের কথা এই ভাবে সমস্ত ঠিক্ হ'লে গগনবাবু দাঁড়িয়ে জোড় হাত ক'রে বল্‌বেন—"বেলা ঢের হয়েছে, বিরক্তও যথেষ্ট করেছি। এইবার তবে আসি।" ব'লেই মাথাটা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে নমস্কার কর্‌লেন। কর্ত্তা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে প্রতিনমস্কার ক'রে বল্‌লেন, "এই ডা কইলেন কি ? বিরক্ত অইমু আম। আপনি অইলেন আমা গো কুটুম্ব।" গগনবাবু বল্‌লেন—"অত্যধিক অনুগ্রহ করেন ব'লেই এ কথা বল্‌লেন,নচেৎ আপনার মতন লোকের সঙ্গে একাসনে বস্‌বার পর্য্যন্ত যোগ্যতা আমার নাই।" কর্ত্তাও একটা পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ভদ্রতার এবং শিষ্টাচারের বহর ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে দেখে মাঝ-খান থেকে ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন,—"বেলা কিন্তু এখন সাড়ে এগারটা—খাওয়া-দাওয়া সেরে সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন ক'রে, আবার সাড়ে চারটেয় আস্‌তে হ'বে আপনাকে।" গগনবাবু—"হ্যাঁ, তবে এখন আসি, ব'লেই কর্ত্তাকে পূর্ব্ববৎ পুনরায় নমস্কার কর্‌লেন। কর্ত্তাও প্রতিনমস্কার ক'রে তাঁকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

(৩)

বিকালে মেয়ে দেখে পছন্দ হওয়াতে পরদিন বেলা আটটায় সব্‌রেজিষ্ট্রার বাড়ীতে এলেন। গগনবাবু তাঁর Minerva Insurance Companyর পঁচাত্তর হাজার টাকার শেয়ার নগদ ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে কর্ত্তার ছেলের নামে রেজেষ্টারি ক'রে দিলেন। টাকাটা সব্‌রেজিষ্ট্রারের সম্মুখেই দেওয়া হ'বে কথা হলে, ম্যানেজার-বাবু চুপি চুপি কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "সরকারী তবিল থেকে কতটাকা দিতে হ'বে আমাকে ?" একটু ভেবে কর্ত্তা বল্‌লেন, "না কিছু দ্যাওন লাগব না। এ বিয়ায় খাজনার তবিলের ট্যাহা আমি ছুমু না। গগন-বাবুরে চ্যাক্ দিমু।" শুনে ম্যানেজার-বাবু "যে আজ্ঞে—" বল্‌লেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখের উপরে যেন কেমনতর একটা ছায়া পড়ল।

যথাসময়ে কর্ত্তা সব্‌রেজিষ্ট্রারের সাম্‌নে দস্তখত ক'রে, Chartered Bankএর উপরে ত্রিশ হাজার টাকার এক চেক্ গগনবাবুর হাতে দিলেন। বিয়ের তারিখও সঙ্গে সঙ্গে ঠিক্ হয়ে গেল। চিন্তিত মুখে চেক্ হাতে নিয়ে গগনবাবু কর্ত্তাকে এবং সব্‌রেজিষ্ট্রারবাবুকে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালে,—ম্যানেজারবাবু তাঁকে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন, "আমার টাকা ?" গগনবাবু বল্‌লেন, —"চেক্ ভাঙ্গিয়েই দেব।" সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন,—"দেবেন ত সত্যি-ই ?" কথায় কারো কাছে ছোট হ'বার লোক গগনবাবু নন, তিনি বল্‌লেন —"কি বল্‌ছেন, ম্যানেজারবাবু আপনি ! আপনার হাতেই ত সমস্ত বিষ ! ইচ্ছে কর্‌লেই ত আপনি আমার সমস্ত কর্ম্ম ভণ্ডুল ক'রে দিতে পারেন।" ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন,—"কাজ সত্যি হ'লে পাত্তেম বটে, কিন্তু ভিতরের খবর যখন সমস্তই জান্‌ছি, তখন আর পারি ব'লে বোধ হচ্ছে না।" চেক্ ভাঙ্গিয়ে টাকা নিয়ে আজই যদি স'রে পড়েন আপনি, তা'লে আমি কি কর্‌তে পারি আপনার ?" ইচ্ছে কর্‌লে মেয়ের বিয়ে ত যেখানে সেখানেই দিতে পার্‌বেন আপনি।" দাঁতে জিভ্ কেটে গগনবাবু বল্‌লেন— "বলেন কি !" যাক্‌গে আপনার মনে যখন আমার উপরে এতখানি অবিশ্বাস এসেছে, তখন আপনি আমার সঙ্গে

চলুন বরং দুজন দারোয়ানও না হয় সাথে নিন্—অনেক টাকা আনতে হ'বে কি না! বাইরে আমার মোটর অপেক্ষা করছে। বলুন—প্রথমে ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক ভাঙ্গিয়ে আপনার টাকা আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে পরে আমি বাসায় গিয়ে স্নানাহার করব। কেমন, তাহ'লে চলবে ত?" কথাটা ম্যানেজারবাবুর ঠিক্ মনের মতন হওয়ায় তিনি হাস্তে হাস্তে বল্লেন, "অতটা করার দরকার কিছুই ছিল না। তবে আপনি যখন বলছেন চলুন, কাজের গোলমাল যত মিটিয়ে ফেলা যায় ততই ভাল। থামুন কর্ত্তাকে বলে আসি"

বাইরে সদর রাস্তায় সবুজ রংয়ের প্রকাণ্ড একখানা মটরকার দাঁড়িয়েছিল। কর্ত্তার অনুমতি নিয়ে পুরো ছয় হাত লম্বা তিনজন খোট্টা দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে ম্যানেজারবাবু গিয়ে মোটরে চাপ্লেন। পাঞ্জাবী ড্রাইভার পাশের পানের দোকান থেকে তাড়াতাড়ি এসে গাড়ীর Steering wheel বা চালনচক্র ধ'রে বস্ল। গাড়ীখানা ফট্ ফট্ ক'রে একবার কেঁপে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে পেছনের চাকার উপর দিয়ে পেট্রোলের গন্ধওয়ালা খানিকটে নীল ধোঁয়া বেরিয়ে গেল পরমমুহূর্ত্তেই পথের বিপুল জনতা ভেদ ক'রে পাশমুক্ত পক্ষিণীর মতন গাড়ীখানা ব্যাঙ্কের পথে নক্ষত্র বেগে ছুটে চল্ল। গাড়ীতে গগনবাবুর সঙ্গে ম্যানেজার-বাবুর আর কোন কথাবার্ত্তা হ'ল না একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ী যখন চার্টার্ড ব্যাঙ্কের সদর দরজার কাছে থেমে দাঁড়াল, তখন গগনবাবু গাড়ী থেকে নেমে বল্লেন, "আপনি বসুন গাড়ীতে, আমি টাকা নিয়ে আস্ছি।" ম্যানেজারবাবু বল্লেন, "আচ্ছা যান্, আর দেখুন আমার জন্তে সবগুলোই দশটাকার কারেন্সী নোট আন্বেন।" গগনবাবু ঘাড় কাত ক'রে সম্মতি জানিয়ে অগ্রসর হ'বার মুখেই ড্রাইভার বল্ল—"কুছ্ রূপেয়া আভি মিলেগা বাবু সাব্? হাঁ মিল্বে বই কি?" ব'লে কোটের ভিতরের পকেট থেকে দশ টাকার পাঁচখানা নোট বের ক'রে তার হাতে দিতে দিতে গগনবাবু বল্লেন—"তোমাকে বহুত খাটিয়েছি বাবা—সন্ধ্যাবেলা বাকীটা শোধ ক'রে দেব'খন।"

গগনবাবু ব্যাঙ্কে ঢুকলেন। ম্যানেজারবাবুর ইঙ্গিতে দারোয়ান তিনজনও শিকারী কুকুরের মতন তাঁর পেছু নিল। তারা চ'লে যাবার মিনিট দুয়েক পরেই মোটর গাড়ীখানা তীব্রবেগে চৌরঙ্গী-মুখো দিল ছুট্। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলেই ম্যানেজারবাবু চেঁচিয়ে বল্লেন—"হেইও ড্রাইভার—তুম কাঁহা যাতা?" ড্রাইভার জবাব ত দিলই না বরঞ্চ মোটরের বেগ আরও বাড়িয়ে দিল। গতিক দেখে ম্যানেজারবাবুর মনে ভয় আর সন্দেহ যুগপৎ উদয় হ'ল। তখন হিন্দীবুলি ছেড়ে খাস্ বাঙ্গালায় চীৎকার করতে লাগ্লেন—"মেরে ফেল্লে রে বাবা—ডাকাতে নিয়ে যাচ্ছে রে বাবা—রক্ষা কর বাবা"। ব'সে ব'সে এ রকম চীৎকার করে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারা গেল না দেখে, শেষটায় তিনি দাঁড়িয়ে নানা রকমের অঙ্গভঙ্গী সহকারে আরও বেশী চেঁচাতে লাগ্লেন—পাঞ্জাবী ড্রাইভার পেছন ফিরে তাঁর পানে একবার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে গাড়ী আরও জোরে চালিয়ে দিল। এবার ম্যানেজারবাবু ভয়ে আর্ত্তনাদ করতে সুরু করলেন। এল্‌গিন রোড ছাড়াবার পরে ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকুনি দিয়ে মোটরখানা দাঁড়াল—দেখতে দেখতে এক বিপুল দেহ পুলিশ সার্জেণ্ট এসে ড্রাইভারকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"তুম্ কাঁহা যাতা?" সে জবাব দিল—"থানেমে—।" মোটর অপ্রত্যাশিত ভাবে থামায় এবং সাম্নে পুলিশের লোক দেখে ম্যানেজারবাবুর মৃতদেহে যেন আবার প্রাণ ফিরে এল। গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে ভয়ঙ্কর হাতমুখ নেড়ে তিনি সাহেবকে বল্তে লাগ্লেন—Look, sir,—dacoit, sir—kill me, sir—arrest him—Put him in jail, sir." (মশায়, ডাকাতে মেরে ফেল্লে, একে ধ'রে জেলে পুরুন মশায়।) রাগে ম্যানেজারবাবুর চোখ দুটো লোটন পায়রার চোখের মতন লাল এবং গোল হ'য়ে উঠল—দুই কশ বেয়ে সাদা ফেনা পড়তে লাগল। তাঁর অবস্থা দেখে একটু মুচকে হেসে সার্জেণ্ট বল্লে—Don't make a fuss Babu পরে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে—থানেমে কাহে?" ড্রাইভার বল্ল—"বাবু মুচকে কেরায়া এক দম নেই দিয়া, মগর গালিভি দেতা—দেখিয়ে সাব কেত্তা হুয়া—" ব'লে সে সাহেবের দৃষ্টি ভাড়ার মিটারের দিকে আকৃষ্ট করল—মিটারে তখন ৩৫৸৴ পঁয়ত্রিশ টাকা চৌদ্দ

আনা উঠেছিল। সহসা এই অবথা অভিযোগ শুনে ম্যানেজারবাবু যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি চেঁচিয়ে বল্লেন—Never, Sir—Conspriacy, Sir—there was another gentleman with me, Sir"—("না মশায় এসব বড়যন্ত্র, আমার সঙ্গে আর একজন লোক ছিল।") ধমক দিয়ে সাহেব বল্ল—Don't bray, I say keep quiet please "(গাধার মত চেঁচিও না, চোপরাও।") তার পরে চোখ রাঙ্গা ক'রে ড্রাইভারকে প্রশ্ন কর্‌ল,—"বাবুকা সাথ্ আউর কোই আদ্‌মী থা ?" সে বল্‌ল—"হাঁ হুজুর একঠো আউরৎ থী।"

" তাঁর সঙ্গে আউরৎ বা স্ত্রীলোক ছিল এই মিথ্যা অপবাদ শুনেই রাগে ম্যানেজারবাবুর আপাদমস্তক জ্বলে উঠ্‌ল—তার পরে, সাহেব, আউরৎ কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করাতে, ড্রাইভারকে যখন বল্‌তে শুন্‌লেন—"আউরৎ ত হুজুর ইস্‌পালেনেড মে উতার কে বাগবাজরে টিরাম-মে সোনাগাছী গেয়া থা।" তখন তিনি ক্রোধে একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌লেন—পা থেকে জুতো খুলে উঠ্‌লেন ড্রাইভারকে মার্‌তে—সাহেব তাড়াতাড়ি হাত ধ'রে ফেল্‌ল। মার্‌তে না পেরে তিনি নিষ্ফল ক্রোধে গর্জ্জন কর্‌তে লাগলেন—শুয়ার মিথ্যেবাদী—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। জুতিয়ে হাড় ভেঙ্গে দেব একেবারে!" ড্রাইভার কথা বল্‌ল না। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে দেখে সাহেব বল্‌ল—"You must go to Thanna, Babu please get in—Quick!" বলেই হাত ধরে ম্যানেজারবাবুকে একরকম জোর ক'রে গাড়ীতে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। শেষে নিজে ড্রাইভারের পাশে উঠে ব'সে হুকুম দিল—"টালিগঞ্জ থানা—জলদি।"

থানায় ম্যানেজারবাবুর কথা কেউ বিশ্বাস কর্‌ল না। নগদ চল্লিশটা টাকা মোটর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে দেখ্‌লেন যে, যে-তিন জন দারোয়ান তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল, তাদেরই একজন একখানা চিঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কোন্ দিয়া?"—সে বল্‌ল—"গগনবাবু!" কম্পিত কণ্ঠে ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন—"গগনবাবু কাঁহা?" দারোয়ান বল্‌ল—"দোঠো এত্তা বড়া ব্যাগ লেকে হাওড়া টিশানমে চলা গিয়া।" শুনে ম্যানেজারবাবুর মাথা বন্‌বন্ ক'রে ঘুর্‌তে লাগল—কোন রকমে টল্‌তে টল্‌তে ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ারে ব'সেই চিঠি খুল্‌লেন। চিঠি প'ড়ে তাঁর মুখখানা মরা-মানুষের মতন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় চেয়ারে ব'সে রইলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে যখন ছিদাম ঘরে ঢুকে জানাল যে, কর্ত্তা ডাক্‌ছেন তখন তাঁর হুঁস হ'ল। বল্‌লেন—"বলগে যাচ্ছি।"

কর্ত্তার বৈঠকখানায় গিয়ে ম্যানেজারবাবু দেখলেন—কর্ত্তা বিরসবদনে তামাক্ টান্‌ছেন। আর গুরুচরণ নির্ব্বিকারভাবে কাছে বসে খাতা লিখ্‌ছে।

ম্যানেজার-বাবুকে দেখে কর্ত্তা বল্‌লেন—"আরে হোন্‌ছেন নি গগনবাবুর কাণ্ড। তিন দিন আগেই ডিবিডেণ্টের বেবাক ট্যাহা উঠাইয়া লইছে। জবর মিছা কয়ত।" ম্যানেজার-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কে বল্‌ল?" কর্ত্তা বললেন, "গুরুচরণ খবর আইনছে—আরে কওনা গুরুচরণ হনাও মেনেজারবাবুরে। গুরুচরণ নতুন কথা কিছুই বল্‌তে পারল না। শুধু কর্ত্তার কথারই প্রতিধ্বনি করল মাত্র। তার কথা শেষ হ'লে কর্ত্তা বল্‌লেন, "আচ্ছা, স্নান্ গিয়ে হ্যাণ্ডনডা বার করমু আগে বিয়া অইয়া যাক্—মাইয়া আট্‌কাইয়া হালার মনে দুই আজারের জাগায় চার আজার না নিয়া ছাড়মু ভাব্‌ছ?"

কর্ত্তার আস্ফালন শুনে ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন—"বিয়ে আর হচ্ছে কোথায় গগনবাবু টাকা নিয়ে ভেগেছে!" কর্ত্তা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"অ্যাঁ! বাগ্‌ছে!—ট্যাহা লইয়া বাগ্‌লো কোন্‌হানে?" গগনবাবুর চিঠিখানা কর্ত্তার সাম্‌নে রেখে ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন—"এই যে চিঠি রয়েছে প'ড়ে দেখুন একবার।" কর্ত্তা অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে চিঠিখানা তুলে নিয়ে এ-পিঠ ও-পিঠ ক'রে দেখে গুরুচরণের সাম্‌নে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন—"হিগ্‌গির পাঠ করিয়া হনাও।" গুরুচরণ পড়্‌তে লাগল—

"প্রিয় ম্যানেজারবাবু,

আপনার জমিদারবাবুকে বল্‌বেন যে, যে-মেয়েটিকে

সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, সেই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়ে, তাঁর পবিত্র বংশগৌরব ক্ষুণ্ণ কর্‌বার মতন নীচতা আমার নাই, কারণ মেয়েটি হচ্ছে একটি পতিতা স্ত্রীলোকের। জমিদারের বেটার বউ হওয়া তার পোষাবে না। তিনি যে ত্রিশ-হাজার টাকার চেক্ আমাকে দিয়েছিলেন সেখানা আমি যথাসময়ে নিরাপদে চার্টার্ড ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে আপনার উপদেশ-মত সবগুলোই দশটাকার নোট নিয়েছিলাম। দুটো বড় গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ একেবারে নোটে ভ'রে গিয়েছিল! আরো একটা খবর দিচ্ছি। আমার আসল নাম গগনবাবু নয়—আসল গগনবাবু ভাগলপুরে ওকালতি করেন। তাঁর নামের শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো নগদ সাত শত টাকা খরচ ক'রে জাল করেছিলাম। তাঁর শেয়ার যে আমি আপনাদের কাছে বিক্রী করেছি সে খবরটা, ইচ্ছে কর্‌লে আপনারা তাঁকে দিতে পারেন। তাতে তাঁর কিম্বা আমার কোন ক্ষতি হ'বার আশঙ্কা নাই। মোটর ড্রাইভার যে আমারই হাতের লোক তা বোধ হয় বেশ বুঝতে পেরেছেন।

দেখুন, আপনিও লোক সুবিধের নন্। অতবড় একটা ষ্টেট চালাতে হ'লে যতখানি হুঁশ-আক্কেল থাকার দরকার —তার সিকিও আপনার নাই—এক কথায় আপনি একটি হস্তীমূর্খ।

নিরীহ প্রজার শোণিত শোষণ ক'রে এপর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে যত টাকা জমিয়েছেন তার দশ ভাগের এক ভাগও আমি নিতে পারি নাই। ঢের টাকা রয়েছে এখনও।

এখন আসি তবে। ১টা ৫৭তে গাড়ী। জমিদার-বাবুকে আমার নমস্কার জানাবেন। খাসা লোক তিনি!

গগনবাবু।"

চিঠি শুনে কর্ত্তার চোখমুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। মিনিট পাঁচেক থর থর ক'রে কাঁপার পরে তিনি ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন—"মেনেজারবাবু, আমি আর নাই! হালায় বেবাক নাশ কর্‌ছে! মাথায় বাড়ি দিছে আমার! বাট-পাড়ের লগে কুটুম্বিতা কর্‌তে যাইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইলাম রে! ওরে আমার দম আইট্‌কা আইতে আছেরে—ছিদাম বাতাস দে! বাতাস দে! ওরে জল!" বল্‌তে বল্‌তে কর্ত্তা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

প্রাচীন ভারতের সূতা-কাটায় স্ত্রী-সহায়তা

শ্রী রাধাগোবিন্দ বসাক

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ চরকা-কাটা লইয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতেছে, তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। "চরকা-কাটা"-আন্দোলনের ভিতর নিগূঢ় রাজনৈতিক ভাব নিহিত আছে কি না তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভারতবর্ষের যে সকল প্রধান প্রধান মহাত্মারা আজকাল এই আন্দোলন চালাইতেছেন, তাঁহাদের মতবাদ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোকদ্বারাই সূতাকাটার কার্য্য প্রবর্ত্তিত রাখিতে ইচ্ছা করেন। ইহা সত্য যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতে দুইটি অতি কঠিন সমস্যা জন-সমাজের নিকট উপস্থিত। কেমন করিয়া ভারতবাসীর দারিদ্র্যদোষ দূরীভূত হইবে এবং কেমন করিয়া ভারতবাসী স্বানুরূপ কার্য্যে অনিযুক্ত না থাকে এই দুইটি প্রশ্নের সমাধান জন্য অর্থনীতিবৎ মনীষীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। গৌহাটি কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের একস্থানে এই দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে, সরকার যেন নিজ তত্ত্বাবধানে কতকগুলি নূতন নূতন শিল্প-বাণিজ্যের সৃষ্টি করিয়া

মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী প্রজাবর্গের অনিয়োগসমস্যার পূরণে কথঞ্চিৎ সচেষ্ট রহেন। প্রাচীন ভারতে অনেকগুলি শিল্প-বাণিজ্য রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল। নৌ-নির্ম্মাণ, খনি দারুপ্রভৃতির বন, হস্তিবন ও আরও নানাবিধ বিভাগের কেবল যে রক্ষণাবেক্ষণ-ভার রাজসরকারের অধীন ছিল, তাহা নহে ; সেই সমস্ত বিভাগে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা প্রস্তুত পণ্যবস্তুর কারবারও রাজসরকারের আয়ত্ত ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি কারবার কেবল রাজারই একমুখ (বা একচেটে) ছিল। রাজহস্তে ন্যস্ত এইরূপ একমুখ ব্যবসায় দ্বারা প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেরই বহুমুখ উপকার সাধিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজকীয় কর্ম্মান্তে বা কারখানায় শ্রমজীবী অনেক লোক কর্ম্মকর-রূপে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইত। বস্ত্রবয়ন ও সূত্রকর্ত্তন এই উভয়বিধ শিল্প যে কেবল গৃহস্থগণ সর্ব্বদা নিজ তত্ত্বাবধানে স্বাধীন ভাবেই সম্পাদন করিত তাহা নহে। রাজকীয় সূত্র-বিভাগেও অনেকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে, কার্য্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইতে পারিত। এই সম্বন্ধে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের একটি রাজকীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতেছে। চরকা-কাটায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নিপুণতা অধিক, তাহা বিশ্বাসযোগ্য কথা। পুরুষ স্বভাবতই একটু অস্থির-চিত্ত—স্ত্রীলোকের মনোনিবেশ, দক্ষতা ও শান্ত-চিত্ততাই সূতাকাটা-শিল্পে তাহাদের কৌশলের কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই নিমিত্তই এই কার্য্যে সূত্রাধ্যক্ষকে রাজকীয় সূত্রবিভাগে স্ত্রীলোকের সহায়তা লইতে হইত।

মৌর্য্যযুগের মহামন্ত্রী সুক্ষ্মধী কৌটিল্য তদীয় অর্থ-শাস্ত্রেও অধ্যক্ষপ্রচার অধিকরণে সূত্রাধ্যক্ষের ব্যাপার সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"ঊর্ণা-বল্ক-কার্পাস-তূল-শণ-ক্ষৌমাণি চ বিধবা-ন্যঙ্গা-কন্যা-প্রব্রজিতা-দণ্ডপ্রতিকারিণীভী রূপাজীবামাতৃকাভি-র্বৃদ্ধরাজদাসীভির্ব্যুপরতোপস্থানদেবদাসীভিশ্চ কর্ত্তয়েৎ।"

ঊর্ণা (মেষলোমজাত সূত্র), বল্ক (মূর্বাদিত্রসরজাত সূত্র,) কার্পাস সূত্র, তূলার সূত্র শণসূত্র ও ক্ষৌম (রেশম-সূত্র) তিনি (রাজকীয় সূত্রাধ্যক্ষ) নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকগণ দ্বারা কাটাইয়া লইতেন—যথা (১) বিধবা, (২) ন্যঙ্গা (বিকলাঙ্গী স্ত্রীলোক), (৩) অবিবাহিতা কন্যা, (৪) প্রব্রজিতা ও (৫) দণ্ডপ্রতিকারিণী (অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক দৈহিক কার্য্য দ্বারা নিজের উপর বিহিত রাজদণ্ডের নিষ্ক্রয় ইচ্ছা করেন তিনি) এবং (৬) রূপাজীবাদিগের (বেশ্যাগণের) যাহারা মাতা বা ধাত্রী, (৭) বৃদ্ধা রাজ-দাসীরা ও (৮) স্বকার্য্যে অনুপযুক্ত হওয়ায় যে সমস্ত দেবদাসী দেবালয়ের পরিচারিকার কার্য্য আর চালাইতে পারে না তাহারা। এই উদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখা যাই-তেছে যে, রাজকীয় সূত্রবিভাগে গৃহস্থবাড়ীর বিধবা ও অবিবাহিতা কন্যাও যেমন কাজ করিতে পারিত, তেমন আবার সংসার ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রীলোক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন তিনিও নিযুক্ত হইতে পারিতেন। অন্যদিকে আবার যেমন রাজদণ্ডে দণ্ডিতা যে-কোন স্ত্রীলোক অর্থ-দণ্ডের মূল্য দিতে অসমর্থ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নানারূপ সূতা কাটিয়া তাহা শোধ দিতে পারিত, তেমন আবার বেশ্যামাতৃকা, রাজদাসী ও দেবদাসীরাও এই কার্য্যে রাজ নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে পারিত। সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রতি এইরূপ ভাবে রাজদৃষ্টি সর্ব্বদা আকৃষ্ট থাকিলে দেশের কল্যাণ না হইয়া পারে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বিহিত ছিল যে, সূত্রকর্ত্তন-শিল্পে এই নানা শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কে কেমন শ্লক্ষ্ণ (সূক্ষ্ম), স্থূল বা মধ্যম রকমের সূতা কাটিতে পারেন এবং কে প্রতিদিন কতখানি পরিমাণ সূতা কাটিতে পারেন তাহা পরীক্ষা করিয়া সূত্রাধ্যক্ষকে তাঁহাদের বেতন নির্দ্দেশ করিতে হইত। সূত্রকর্ত্তনকারিণীদের চক্ষু ও মস্তিষ্ক শীতল থাকিলে সূত্রের বান উৎকৃষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় সরকার হইতে তাহাদের ব্যবহার জন্য তৈল ও আমলকী বিতরণ ব্যবস্থিত ছিল। তিথিদিবসে অর্থাৎ পর্ব্বদিনে অতিরিক্ত অশন ও দানাদির আয়োজন করিয়া তাহাদিগের দ্বারা সূত্র কাটা-ইয়া লওয়া হইত। সূত্রের ন্যায্যপ্রমাণের হ্রাস হইলে তাহার মূল্যানুসারে স্ত্রীলোকদের বেতনের পরিমাণ কমা-ইয়া দেওয়া হইত।

এই স্থানে অতি প্রাচীনকালের অন্য একটি ব্যবস্থার কথা উদ্ধৃত হইতেছে। উপরি উল্লিখিত স্ত্রীলোকগণ রাজকীয়

সূত্র বিভাগের সূত্রশালায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কাজ করিতে পারিত। কিন্তু যাঁহারা বাড়ীর বাহিরে যাইতে চাহিতেন না—অথচ নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ দ্বারা গ্রাসাচ্ছদনের উপায় করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহিতেন, তাঁহাদের জন্য অন্য প্রকার রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল। তাঁহারা নিজ নিজ দাসী দ্বারা অধ্যক্ষের সহিত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিতেন। তাই কৌটিল্য আরও লিখিয়াছেন—

"যাশ্চানিষ্কাসিন্যঃ প্রোষিতবিধবা ন্যঙ্গাঃ কন্যকা বাত্মানং বিভৃয়ুস্তাঃ স্বদাসীভিরনুসার্য্য সোপগ্রহং কর্ম্ম কারয়িতব্যাঃ"—

যে রমণীগণ বাড়ীর বাইরে নিষ্কাসিত হন না, যাঁহারা ভর্ত্তার প্রবাসজন্য বিযুক্ত-স্বামিকা, যাঁহারা বিকলাঙ্গী অথবা যাঁহারা অবিবাহিতা কন্যা, তাঁহারা যদি নিজ পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে চাহেন তাহা হইলে সূত্রাধ্যক্ষ তাঁহাদের দাসী জন দ্বারা বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সবহুমান সূত্র কর্ত্তন ব্যাপারে নিয়োজিত করিতেন। আর যে-সকল কুলনারী রাজসূত্রশালায় স্বয়ং আসিতে আপত্তি করেন না তাঁহারা অতি প্রত্যূষে (সাধারণ লোকের কার্য্যার্থ বহির্গমনের পূর্ব্বে) সূত্রশালায় আসিয়া স্বগৃহে নির্ম্মিত সূত্র (ভাণ্ড) জমা দিয়া তাহার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সূত্রশালার অধ্যক্ষ কেবল "সূত্রপরীক্ষামাত্র" প্রদীপ অর্থাৎ প্রদীপ যতখানি প্রকাশযুক্ত হইলে সূত্রের তত্ত্ব পরীক্ষা সুসাধিত হইতে পারে, ততখানি প্রকাশযুক্ত প্রদীপ তথায় রাখিতে পারিতেন। আর তিনি যদি সেই সূত্রশালায় স্বয়ং আগত কুলরমণীগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অথবা তাঁহাদের সহিত প্রকৃত কার্য্যের অতিরিক্ত অন্যবিষয়ক সম্ভাষণাদিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে সেই অপরাধে তাঁহার প্রথম সাহস-দণ্ড অর্থাৎ ২৫০ শত পণ অর্থদণ্ড বিহিত ছিল এবং সেই রমণীদিগের সূত্রকর্ত্তন নিমিত্ত প্রাপ্য বেতন দানের কাল অতিপাতিত হইলে অথবা অকৃতকর্ম্মা স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে উৎকোচাদি লোভে সরকারী কোষ হইতে তাহাদিগকে কোন অর্থ প্রদান করিলে তাঁহাকে মধ্যম সাহস-দণ্ড অর্থাৎ ৫০০ শত পণ অর্থ দণ্ড দিতে হইত। আবার অগ্রিম বেতন লইয়া যাহারা কার্য্য না করিত, তাহাদিগের উপর "অঙ্গুষ্ঠ-সন্দংশ" অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ ছেদের দণ্ড বিহিত ছিল। সূত্র বিক্রয় করিয়া তন্মূল্য ভক্ষণ, সূত্রাপহরণ ও সরকারী সূত্র লইয়া পলায়ন এই তিন অপরাধে কোন স্ত্রীলোক ধরা পড়িলে, তাহাদেরও "অঙ্গুষ্ঠ-সন্দংশ" নামক দণ্ড সহ্য করিতে হইত। বেতন সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার গোলমাল উপস্থিত হইলে অপরাধানুসারে অদৈহিক দণ্ডেরও বিধান করা হইত। সে যাহা হউক, অতি প্রাচীন কালের নিয়মাবলী কঠোর কি মৃদু ছিল তদ্বিষয় আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। সেকালে ভারতবর্ষে যে নানা শ্রেণীর রমণীগণ সূতা কাটায় রাজকারখানায় ব্যাপৃত থাকিয়া নিজের ও দুঃস্থ পরিবারের ভরণপোষণে সহায়তা করিত, সে-কথা আধুনিক রমণীকুলকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। অন্ততঃ এই বিষয়টিতে প্রাচীনের সহিত নবীনের সম্পর্কটা রক্ষিত হইতে পারিলেও, ভারতের অর্থকৃচ্ছ্রতা অনেক পরিমাণে লঘু হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ইন্দ্রাণী পূজা

শ্রী রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি দিনে বাঙ্গালা দেশে আগে ইন্দ্রাণী পূজা হইত, কাল-ধর্ম্মে উহা উঠিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রাণী পূজার অপর নাম চরকা-পূজা। চরকাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পূজা হইত। ইহার কথা বা কথকতা আছে। নারীরাই ইহার পূজা করিতেন। নারীরাই কথকতা করিতেন। ইহার কথকতার বিশেষত্ব—চরকার বিশিষ্টতা লইয়া

চরকার দৌলতে ধন, ধান্য বৃদ্ধি হয় ইহা তাহারই কথা। চরকার দৌলতে কেমন করিয়া দরিদ্রা ব্রাহ্মণী ধন ও ধান্যে গ্রামপূজ্যা হইয়াছিলেন, সেইসকল কথাই বলা হইয়া থাকে।

মহাত্মা গান্ধী যে বাণী প্রচার করিতেছেন এই পূজা দ্বারা বাঙ্গালার রমণীরা তাহাই দেখাইতেন। ইংরেজ-বণিকের আবদারে যখন গবর্ণমেণ্ট চরকা তুলিয়া দিলেন তখন হইতেই ইন্দ্রাণী পূজা লোপ পাইতে লাগিল। প্রাতে স্নান করিয়া পূজার দিন ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিয়া রমণীরা শুদ্ধ হইতেন। ইন্দ্রাণী দেবীর মূর্ত্তি করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে পূজা দিতেন। মহিলাগণ নিজেরাই পূজা করিতেন। এ পূজার জন্য পুরোহিতের দরকার হইত না। ইন্দ্রাণী দেবীর অনুগ্রহে কিরূপে বৃদ্ধা, দরিদ্রা ব্রাহ্মণী চরকার দৌলতে বহু অর্থ লাভ করিয়া দেশপূজ্যা হইয়াছিলেন, কথকতা দ্বারা নারীরা তাহাই প্রচার করিতেন। পূজার দিনে পূজা শেষ না হইলে নারীরা জল গ্রহণ করিতেন না। সেদিন গৃহের চরকাকে ধুইয়া, মুছিয়া তাহাতে তৈল-সিন্দূর দিয়া সাজাইয়া দিতেন এবং সকলেই ইন্দ্রাণী দেবীকে প্রণাম করিবার সময় চরকাকেও প্রণাম করিতেন। চরকার গুণকীর্ত্তন করা ইহার দ্বিতীয় পর্ব্ব।

এখন বাঙ্গলায় চরকা নাই, চরকার পূজাও নাই, চরকার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণী দেবীর পূজাও লুপ্ত হইয়াছে। নব্য ধরণে কোন কোন ঘরে চরকা দেখা যায়, কিন্তু ইন্দ্রাণী পূজা আর হয় না। ইন্দ্রাণী দেবীর বরে কেমন করিয়া দরিদ্র ধনী হয় তাহাও আর বলা হয় না। চরকা বাঙ্গলার একটি সম্পদ ছিল, সে-সম্পদ লুপ্ত হইয়াছে। চরকায় যে সকল রমণী সূতা কাটিতেন, সূতা কাটা হয় না বলিয়া সেই-সকল মহিলা এখন সূঁচ সূতায় কাজ করেন, নাটক, নবেল পড়িয়া অবসর সময় কাটাইতেছেন। আমাদের ধন, দৌলত আর কেমন করিয়া হইবে? আমাদের স্বভাবে ইন্দ্রাণী দেবী আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। দিদিমারা ইন্দ্রাণী পূজা করিতেন, ইন্দ্রাণী দেবীর কৃপায় তাঁহারা সুখী ছিলেন। এই পূজায় একখানা তাঁতে তৈরী কাপড়, চরকায় কাটা কিছু সূতা, ফল, ফুল, কলা দিয়া ভোগ দেওয়া হইত। বাড়ীর সকলে পরমানন্দে সে-প্রসাদ গ্রহণ করিত। রাজা হইতে ভিখারীর বাড়ীতে অবস্থামত এই পূজা দেওয়া হইত।

জয়পুর

[ফাল্গুনের প্রবাসীতে লিখিত জয়পুর প্রবন্ধের টীকা]

শ্রী পান্নালাল দাস

গলতায় সূর্য্যদেবের যে-মন্দির আছে, তাহা মহারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের রাও কৃপারাম নামক এক মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। রাও কৃপারাম মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য জায়গীর নিরূপিত করিয়া দেন। সেবা-পূজার ভার ব্রাহ্মণ পূজারীর উপর ন্যস্ত হয়। এখনও সেই আদি পূজারীর বংশধরেরা এই মন্দিরে পূজা করিয়া থাকেন, রাও কৃপারামের বংশধরেরা পূজা করেন না। * রাও কৃপারাম জৈনি ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু দেবদেবী মানিতেন। জৈনি দুই প্রকার। ১ম, শ্রাবক অর্থাৎ সরাওগী অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্ব-কথক; ইঁহারা হিন্দু দেবদেবী মানেন না। ২য়, ওসওয়াল, ইঁহারা বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত; জৈনি হইলেও হিন্দু দেবদেবী মানেন। রাও কৃপারাম এই

* জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ এল্‌ শাওয়ার্স প্রণীত 'Notes on Jaipur' নামক পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় রাও কৃপারামের বংশধরদের সম্বন্ধে, "His descendants in Jaipur are the hereditary worshippers at this temple to the present day." এইরূপ লিখিত থাকায় আমি তাঁহাদিগকেই পূজারী মনে করিয়াছিলাম।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত জৈনি ছিলেন। তিনি কর্ত্তব্যের দায়িত্বেই ঐ মন্দির নির্মাণে সংসৃষ্ট ছিলেন। মুসলমান মন্ত্রীদের আমলেও অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মুসলমান মন্ত্রী নবাব স্যার ফৈয়াজ আলি খাঁ বাহাদুরের নিজ বসত-বাটিতেই এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বাটিটি পূর্ব্বে জয়পুর-নির্ম্মাতা বাঙালী পণ্ডিত বিদ্যাধরজীর জন্য জয়পুর স্থাপনার সময় নির্মিত হয়। পণ্ডিত বিদ্যাধরজীর কোন উপযুক্ত বংশধর না থাকায় উহা খাল্সা করা হয়, অর্থাৎ রাজসরকারে ফিরিয়া আসে। ঐ মন্দিরে রীতিমত পূজা আরতি করাইবেন, এই সর্ত্তে মহারাজা নবাববাহাদুরকে ঐ বাটী দেন। পণ্ডিত বিদ্যাধর যশোরেশ্বরী কালিকাদেবীর পূজারীদের বংশোদ্ভব। *

জয়পুর রাজ্যের ভূতত্ত্বপরিবীক্ষণ (জিয়লজিক্যাল সার্ভে) পূর্বে কিছু হইয়াছে এবং এখনও জিয়লজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া হইতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ঐজন্য এখানে আসিয়া থাকেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ রাম-খড়ি (Talc or French Chalk), গেরিমাটি (red and yellow ochre), চীনা মাটি (porcelainএর উপযোগী মাটি) এবং বহুমূল্য খনিজ পদার্থ যথা—গার্নেট, তামা, নিকেল ও লৌহ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানকার গার্নেট পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম। জয়পুরের সন্নিহিত মকরাণা ও রাইয়াওলার শ্বেত মর্ম্মর এবং ভৈসলানা গ্রামের কৃষ্ণ মর্ম্মর বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাজমহল, মোতি মস্জিদ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি সুবিখ্যাত প্রাসাদ এই মর্ম্মরেই নির্মিত। বঙ্গবাসীর বিশেষ প্রিয় পাথরের বাসন খেলনা ও মূর্ত্তি প্রভৃতি এই প্রস্তরেই প্রস্তুত হয়। কর্ণেল হেণ্ডলী সাহেবের লিখিত মেডিকো-টপলজিক্যাল একাউন্ট অব জয়পুর নামক পুস্তকের ৮১ পৃষ্ঠায় এইরূপ লেখা আছে :—

There are numerous salt sources in .the state besides the Sambhar lake. Kankar or concretionary carbonate of lime, of which Indian roads are so often made, is another product found in abundance. The lime in the Kankar is of great value in agriculture, especially in the cultivation of cotton. Many valuable building stones are obtained. Enormous slabs of mica-schist up to 30 ft. in length × × × the stealite from which the well-known Agra toys are made is obtained.

Although the state is not rich in mineral wealth, copper. cobalt, iron have been obtained in paying quantities, but the scarcity of fuel and the difficulties of drainage of mines are the chief difficulties in working the ores.

Garnet of the best kind, the finest in the world, it is believed, are found, and beryl is also obtained. The soil is generally sandy and where there is but scanty rainfall, the crops are poor; but on the sides of water-courses and rivers and in the bed of artificial tanks, in more favored regions, the apparently useless sand yields magnificent harvests. In some places an abundant supply of grass is produced upon which are reared the flock of sheep that supply the Agra and Delhi Districts with mutton.

এখানে বাঙালীর প্রিয় পটল ছাড়া প্রায় অন্য সর্ব্বপ্রকার তরি তরকারী উৎপন্ন হয়। তরকারী, বিশেষতঃ কপি বেগুন, মূলা প্রভৃতি এত বেশী পরিমাণে হয়, যে, আজমীর আগরা দিল্লী এবং বোম্বাই প্রভৃতি সহরেও ইহা রপ্তানী হইয়া থাকে। কমলা লেবু ডালিম আঙুর ও অন্যান্য নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে হয়। খরমুজ ফসলের সময় অনেক দরিদ্র সস্তায় খরমুজ মাত্র খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। যব এখানকার প্রধান খাদ্য; টাকায় ১১।১২ সের। দুর্ভিক্ষের সময় টাকায় ৮।১০ সের ছিল এবং ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে-টাকায় ১৯।২০ সের ছিল। মোট কথা এ মরুরাজ্যেও লোকে সুজলা সুফলা বাংলা দেশ অপেক্ষা অল্প খরচে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। শক্ত মাটিতে বাস করিয়া, গভীরকূপোদক পান করিয়া, আলস্য-আরাম-পরিবর্জ্জিত থাকায় ও শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখায় বোধ হয় এ দেশের লোকেরা অন্য দেশে গিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুবিধা পাইয়াছে, যাহা বাঙ্গালীরা পায় না। আধুনিক কালে এই মন্তব্যের উদাহরণ মাড়ওয়ারী; ও পূর্ব্বকালে রাজপুত জাতি, যাহারা বিভিন্ন প্রদেশে যাইয়া রাজ্য স্থাপন

* জয়পুর রাজ্যে কোন ধর্ম্মেরই প্রতি পক্ষপাতিত্ব নাই! এরূপ ধর্ম্মবিষয়ীয় সর্ব্বমতসহিষ্ণুতা প্রশংসারযোগ্য। মহরমের সময় রাজ্যের তরফ হইতে যে তাজিয়া বাহির হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও সুন্দর। মহারাজার প্রাসাদের সীমার মধ্যে অর্থাৎ সরহদ্দে পরিচারক মুসলমানদের জন্য মস্জীদ আছে।

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের "কীর্ত্তি-মেখলায় বসুধা বেষ্টিত"।

জয়পুরে কলিকাতা ও অন্য অনেক সহরের মত এত ভিখারী দেখিতে না পাইবার কতকগুলি কারণ আছে :—

(১) মহারাজের "সদাব্রত" বলিয়া একটি বিভাগ আছে। সেখানে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আগন্তুক অতিথি প্রভৃতিকে সিধা অর্থাৎ আটা ডাল পয়সা প্রভৃতি বণ্টন করা হয়। তিন দিন ক্রমান্বয়ে একজন লোক এখান হইতে সাহায্য পাইতে পারে।

(২) অসংখ্য রাজকীয় ও নাগরিকদের মন্দিরে প্রত্যহ অনায়াসে আহার সংগ্রহ করা যায়, যেমন বৃন্দাবন প্রভৃতি জায়গায় হইয়া থাকে।

(৩) গৃহস্থ শেঠ সাওকারেরা প্রত্যহ যথাসাধ্য অতিথি ভিখারী সৎকার করিয়া থাকেন।

(৪) বিবিধ বার ব্রত একাদশী প্রভৃতি উপলক্ষে রাজার ও রাণীদের তরফ হইতে ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা আছে।

(৫) সকলের সেরা জিম্‌নার প্রথা। ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত লোকজনকে ভূরি ভোজন করানর নাম **'জিমনার'**। ইহা বিশেষ কৌতূহলপ্রদ ব্যাপার।

জিমনার প্রথার জন্য অনেক ব্রাহ্মণকে ঘরে রাঁধিয়া খাইতে হয় না। বিবাহ পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ মুণ্ডন উপনয়ন প্রভৃতি শুভ কার্য্যে এবং শ্রাদ্ধাদি অশৌচ কার্য্যে প্রত্যেক গৃহস্থ, কি ধনী কি দরিদ্র, কি উচ্চবর্ণভুক্ত কি নিম্নবর্ণ-ভুক্ত, সবাই জিম্‌নার করিয়া থাকেন। এই প্রথার জন্য অনেকের ভিটামাটি উৎসন্ন হয়। সামান্য গৃহস্থ অন্ততঃ ৪০০।৫০০ লোক, বিশিষ্ট ও ধনীরা ১০০০ হইতে দশ হাজার লোককে খাওয়াইয়া থাকেন। রাজা মহারাজার কাজে রাজ্যশুদ্ধ লোক খাওয়ান হয়। এইরূপ লোক খাওয়ানর নাম হেড়া।

প্রায় সওয়া লক্ষ লোকের দ্বারা অধিবাসিত এই সহরে বাৎসরিক মৃত্যুর হার প্রায় ৪।৫ চার পাঁচ হাজার এবং জন্মের হার তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, জিম্‌নারের সংখ্যা কত অধিক। এই প্রথা বিশেষ অনিষ্টকারী বলিয়া মহারাজা স্যার প্রতাপ সিংহ যোধপুর রাজ্যে উহা উঠাইয়া দিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

জয়পুরের রাস্তার যে বীরত্বব্যঞ্জক চেহারার অভাব সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে-সব রাজপুতকাহিনী শুনা গিয়াছে, তাহা পুরাকালের। আধুনিক কালে গ্রাম্য লোকের ভিতর হইতে, যাহাদের স্বাস্থ্য সহরবাসী হইতে ভাল, তাহাদের মধ্য হইতে, সাম্রাজ্যের জন্য রাজপুত ও জাঠ সৈন্য গঠন করা হয়। ইহাদের চেহারা বীরত্বব্যঞ্জক। শারীরিক স্বাস্থ্য ও আকারপ্রকার দৈনিক কার্য্যের উপর নির্ভর করে। কাজেই আরাম তলবকারী বা পর-অন্নভোগী নগরবাসীদের চেহারা যেমন সকল দেশেই হইয়া থাকে, বীরত্বব্যঞ্জক নহে। কিন্তু ইহা ঠিক, যে, ফেন-ফেলা ভাত ও ভেজাল তৈল ঘি দুধ খাইয়া এবং ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া বাঙালীরা যত নিবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে এদেশবাসীরা তত হয় নাই।

রাজপুত ও উচ্চপদস্থ হিন্দু এবং মুসলমান পরিবার ছাড়া অন্য কোন জাতির স্ত্রীলোকেরই কড়া পরদা নাই। তাহারা অবাধে রাস্তায় বাহির হয় এবং বিবিধ বারব্রত ও পর্ব্বে, এমন কি সামান্য ছুতানাতায়, রাস্তা অলিগলি তাহাদের উচ্চকণ্ঠের সঙ্গীতঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া থাকে। অবিবাহিতা ছাড়া সকলেই কিন্তু মুখে ঘোম্‌টার আবরণ দেয়। তাহার কারণ, পাছে কোন গুরুজন, শ্বশুর শাশুড়ী বা তদ্রূপসম্পর্কীয় কেহ তাহাদের মুখ দেখেন। মুখ ঢাকাই লজ্জা দেখানর প্রশস্ত উপায়। যে-সব দেশ মুসলমানদের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে আসিয়াছে, সেইসব দেশেই পর্দ্দার বিশেষ সৃষ্টি। মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র দেশে সেইজন্য পরদা নাই। সাঙ্গানীরে যে কাগজী মুসলমান আছে এবং অন্যান্য জায়গায় যে নীলগর রংরেজ মনিয়ার (যাহারা গালার চুড়ি তৈরি করে) প্রভৃতি মুসলমান আছে, তাহাদের স্ত্রীলোকদের পর্দা নাই। তাহারা সম্ভবতঃ পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। তাহাদের বিবাহ আদি নিত্যকার্য্যে হিন্দুদের সহিত মিল আছে এবং স্ত্রীলোকদের নাম কখন কখন হিন্দু আদর্শে রাখা হয়; যথা কমলা, লচ্ছী (লক্ষী) প্রভৃতি।

জয়পুরের সহিত বাঙালীর সম্বন্ধ বেশ ঐতিহাসিক

তথ্যে পূর্ণ, এবং ইহা তিন ভাগে ভাগ করা যায়; পুরাতন, মধ্যম ও আধুনিক।

১ম। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজ মানসিংহ আকবর বাদশাহের সেনাপতি রূপে যখন বঙ্গ জয় করিয়া যশোরেশ্বরী কালীকে আনেন, তখন বাঙালী পুজারীদেরও সঙ্গে করিয়া আনেন।

২য়। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন বাদশাহ ঔরংজেবের অত্যাচারে বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহের হিন্দুমন্দির বিধ্বস্ত হইতে থাকে, তখন তথা হইতে মদনমোহন, গোপীনাথ ও গোবিন্দ বিগ্রহগুলিকে লইয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শিষ্যসেবকেরা জয়পুরে আশ্রয়-গ্রহণ করেন। জয়পুর অধিপতিগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, তাঁহারা গোবিন্দদেবকে রাজ্যেশ্বর ও আপনাদিগকে তাঁহার দেওয়ান বলিয়া রাজত্ব করেন।

৩য়। আধুনিক জয়পুরপ্রবাসী বাঙালীর ইতিহাস খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লর্ড ক্যানিং সিপাহী বিদ্রোহের অনধিক কাল পরে ১৮৫৯ সালে আগ্রায় যে দরবার করেন, তথায় জয়পুরাধিপ মহারাজ রামসিংহ বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধিত হন। এই ঘটনায় মহারাজা রামসিংহ বঙ্গের সুসন্তান দেওয়ান রামকমল সেনের উপযুক্ত পুত্র হরমোহন সেনের আনুকূল্যে উপকৃত হন। দেওয়ান হরিমোহন সেন ইতিপূর্ব্বেই মহারাজা রামসিংহের সহিত পরিচিত ছিলেন। এখন তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় ও কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জয়পুর আসিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শিবদীনজীর মৃত্যু হইলে ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে আহ্বান করেন। কিন্তু তখনও তিনি নিজে আসিতে না পারায় মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ পুত্রগণ এবং কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়দিগকে ক্রমে ক্রমে জয়পুর প্রেরণ করেন। কান্তি বাবু, সংসার বাবু প্রথমে শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া নিজ নিজ কর্ম্মকুশলতায় পরে মন্ত্রীত্বপদে উন্নীত হন। হরিমোহন সেন মহাশয় কয়েক বৎসর পরে নিজে আসিতে পারেন, এবং মহারাজা রামসিংহের বিশ্বাসভাজন মন্ত্রীর পদে আসীন হন। তিনি জয়পুর কৌন্সিল, মহারাজার কলেজ, স্কুল অব আর্টস ও লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থাপন করেন এবং রাজ্যশাসনপ্রণালী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এই সময় হইতে আধুনিক প্রবাসী বাঙালীর যুগ প্রবর্ত্তিত।

ব্যক্তিগত ভাবে দেখিলে রাজকার্য্যে বাঙালীর যে নিষ্ঠা আছে তাহা অতুলনীয় এবং তজ্জন্য তাঁহারা রাজ্যে শ্রদ্ধার আসন পাইয়াছেন। কিন্তু যে কার্য্যে প্রতিষ্ঠা একপুরুষস্থায়ী, সে কার্য্যে কোন জাতিকেই প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত করিতে পারে না। বাঙালীর কার্য্য এক পুরুষ স্থায়ী, সেই জন্য বাঙ্গালী স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। পরমুখাপেক্ষী জীবিকায় শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য ও উৎসাহ নষ্ট হইলে আর কি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থাপনের ক্ষমতা থাকে? জীবনযাত্রায় অসহযোগী বা আনুকুল্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তনমনধন ক্ষয় হইলে সামান্য জীবিকা উপার্জ্জনই কঠিন হইয়া পড়ে। বাঙালীর ন্যায় আকাশকুসুমের প্রতীক্ষায় অবসন্ন না হইয়া বিড়লা পরিবারের মত অনেক মাড়ওয়ারী আপনাদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করিতে অবহেলা করেন নাই।

জয়পুর রাজবংশের কিম্বদন্তী কিছু আলোচনা না করিলে এ প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকে। সেই জন্য এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

ইহারা সূর্য্যবংশাবতংশ রামচন্দ্রের ২য় পুত্র কুশের বংশোদ্ভব বলিয়া খ্যাত। বর্ত্তমান মহারাজা (এখন নাবালক) সওয়াই মানসিংহ (২য়) হিসাবে ১৪০ পুরুষ অধস্তন। তাঁহা হইতে সুখশান্তির প্রসঙ্গ উঠিলেই লোকে "রামরাজত্ব"র উল্লেখ করিয়া থাকেন। মহারাজা রামসিংহ ও মহারাজা মাধো সিংহের রাজত্বকালে যাঁহাদের বাসসৌভাগ্য ঘটিয়াছে, তাঁহারা যথার্থই "রামরাজত্বের" আস্বাদ উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রজাবৃন্দকে তাঁহারা সন্তানের মত দেখিতেন। প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের রাজত্বকালে বর্ণধর্ম্ম-নির্বিশেষে অবৈতনিক শিক্ষাদান, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও আতুর ও অক্ষমের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা

হইয়াছে, রাজ্যে কর্ষিত জমির রাজস্ব ও সহরের আমদানী রপ্তানী শুল্ক ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কর গ্রহণের নিয়ম নাই। অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টি কম হইলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হয়। সেইজন্য স্থানে স্থানে গিরিনদীগুলি (যাহা কেবল বর্ষাতেই প্লাবিত হয়) বাঁধিয়া বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা হইতে কর্ষিত জমিতে জল সেচনের বন্দোবস্ত আছে। ১৮৯৯-১৯০০ সনের ভীষণ দুর্ভিক্ষের পর এখানে তেমন অন্নকষ্ট আর হয় নাই এবং দুর্ভিক্ষের সময় যাহাতে সকলেই শস্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা, এবং অতিরিক্ত মূল্যে শস্য বিক্রীত না হয় তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এ মরুরাজ্যে পানীয় জলের অভাব কখনও হয় নাই। চোরের উৎপাত লাঘব করিবার জন্য চৌকিদারকে দায়ী করা হইত। এইরূপ ও অন্যান্য অনেক প্রকার সদনুষ্ঠান প্রচলিত আছে যাহা তাঁহাদের প্রজা-বৎসলতার নিদর্শন এবং যাহাতে 'রামরাজত্বের' আভাস পাওয়া যায়। ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪।

এই প্রবন্ধটি লিখিতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আলোচনা করিতে হইয়াছে।

(1) A Medico-topographical Account of Jaipur, by Brigade-Surgeon Lt. Col. T. H. Henbley, C. I. E.

(2) The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc., by Lokenath Ghose.

(3) Life of Dewan Ram Comal Sen, by Peary Chand Mittra.

শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মেঘার্ত্ত পাণ্ডুর শশী ; শঙ্কাকুল শ্রাবণ-শর্ব্বরী ;
নির্নিগড় বিভীষিকা বিচরিছে গগনে গগনে ;
ব্যোমের পরিধি-'পরে ভ্রমিতেছে শুনি ক্ষণে ক্ষণে
জাগর নক্ষত্রদল, বৃত্তবদ্ধ কালের প্রহরী।
অতীত বৃষ্টির বিন্দু পুষ্পের কৃপণ-মুষ্টি হ'তে
ঝরে শ্লথ পত্র'পরে থেকে থেকে আপনা-আপনি ;
নিদ্রাতুর নীরবতা আচম্বিতে চমকি' অমনি
রহস্যের ঘটাটোপ কীর্ণ করে প্রপন্ন জগতে।
নিঃস্পন্দ নিরিক্ত কুঞ্জ ; পরিত্যক্ত অচ্ছোদ সরসী ;
হৃতস্পর্দ্ধা বনস্পতি পুঞ্জীভূত আতঙ্কে গম্ভীর ;
সন্ত্রাস্ত বিহঙ্গবৃন্দ অপ্রতিভ অবনত-শির
প্রহরের জপমালা আবর্ত্তিছে স্তব্ধ শাখে বসি'।
মুখর কলহালাপ কুহরণ কূজন কাকলি
কখন হয়েছে মৌন মণিকণ্ঠী চন্দনা ভরতী
দোয়েল পাপিয়া শ্যামা কলবিঙ্ক কঞ্জল কপোতী
দুর্দ্দান্ত দুঃস্বপ্নে কাঁপে আশ্রয়ের দুয়ার আগলি'।
বউ-কথা-কও কোথা দুরারোহ তমিস্র তমালে
সভয়ে সম্বরি' আছে উচ্ছৃঙ্খল দিম্বরা দীপক।
সুদূর পারস্যে বুঝি বিরহী বুলবুল পলাতক
ফুটাতে সংরক্ত রাগ সোহাগিনী গোলাপের গালে।
ডাহুকী সারসী ক্রৌঞ্চ চক্রবাক কাদম্ব কুলাল
নির্ব্বিঘ্ন তিরস্ক পানে নিরুদ্দেশ আসন্ন দুর্দ্দিনে।
চক্রচর চর্ম্মচটী লুক্কায়িত দুশ্চর বিপিনে।
প্রেত-সঞ্চারিত কক্ষে চিত্রার্পিতা সারিকা বাচাল।
সঙ্গীতের দিগ্বিজয়ে লব্ধকীর্ত্তি শকুন্ত কুলীন,
কাংস্য-ক্রেঙ্কারিত শিখী, বাগ্মী শুক, অমুলাপী পিক,
আলোড়িত কলরবে মথিছে না সুপ্তিশান্ত দিক ;
উদ্বিগ্ন নির্ব্বাত খিন্ন রুদ্ধস্রোত কালের পুলিন।

শূন্যগর্ভ নভস্তল অকস্মাৎ অম্বুনাদে ভরি'
তরঙ্গিল সারা বিশ্বে, হে কুক্কুট, তোমার মাভৈঃ।
আশার অলকানন্দা বহাইলে অশুচি বিজয়ী ;
বাঙ্ময় উদ্ধার এলো, প্রেতমুক্ত হ'ল বিভাবরী।
সে-জয়গাথায় মাতি মোর শঙ্কাস্তম্ভিত রুধির
দ্রুতবিলম্বিত নৃত্য আরম্ভিল চমকিত হৃদে ;
অহৈতুক কৃতজ্ঞতা গুঞ্জরিল, বাণী দে, বাণী দে ;
রোমাঞ্চিত ধন্যতায় মুগ্ধ হ'ল উদ্দীপ্ত শরীর।

দেখেছি, পতিত, তব অতিমর্ত্ত্য বিরাট মূরতি
অসংস্কৃত অন্ত্যজের চমৎকৃত তীব্র পরিচয়ে ;
রুচিগ্রস্ত সিদ্ধ কবি শুদ্ধ থাক্ আভিজাত্য লয়ে,
তুমি ধর, হে অস্পৃশ্য, অধ্যাত্মের সহজ প্রণতি॥

বাঙ্গলা রামায়ণে রত্নাকরের উপাখ্যান ও তাহার মূল

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

রত্নাকর নামক দস্যু রামনামের মহিমায় কিরূপে কালক্রমে মহর্ষি বাল্মীকিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত ও সুন্দর বিবরণ কৃত্তিবাস ওঝা তাঁহার বাঙ্গালা রামায়ণের প্রারম্ভে দিয়াছেন। বাঙ্গালীমাত্রেই সে বিবরণের সহিত সবিশেষ পরিচিত। বাল্মীকির পূর্ব্বজীবনের এই কাহিনী কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত কি তিনি ইহা কোন প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন সেই বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট্. মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২০ খৃঃ অঃ প্রকাশিত Bengali Ramayanas নামক গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

From what source this story was derived we do not know. It is not to be found in the great epic. The story seems to be an indigenous one and it will be a vain labour to trace, it to any early Sanskrit original' অর্থাৎ এই কাহিনীর আকর কি তাহা আমরা জানি না। মূল রামায়ণে ইহা পাওয়া যায় না। এই কাহিনীটিকে স্বদেশী [বঙ্গদেশোৎপন্ন] বলিয়াই মনে হয়। ইহার সংস্কৃত মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে এই বিবরণের মূল পাওয়া যাইবে না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই দীনেশবাবু বোধ হয় স্থানান্তরে ইহার মূল অনুসন্ধান করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের ১২৭।২৮ পৃষ্ঠায় তিনি দেখাইয়াছেন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ঈদৃশ কোন উপাখ্যান প্রচলিত না থাকিলেও মুসলমানদিগের মধ্যে ইহার অনুরূপ দুইটি কাহিনী পাওয়া যায়। জানি না, এই বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের কতটুকু আলোচনা করিয়া দীনেশবাবু 'এই উপাখ্যানের সংস্কৃত মূল পাওয়া যাইবে না' এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, কৃত্তিবাস তাঁহার প্রচলিত গ্রন্থ হইতেই এই সময়ে কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাত্মরামায়ণ গ্রন্থের অযোধ্যা কাণ্ডে ৬ষ্ঠ সর্গে (শ্লোক ৬৪—৮৭) বাল্মীকির পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে এই কাহিনীই বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। * কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই বিষয়ে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা সমস্তই ইহাতে আছে; কেবল 'রত্নাকর' এই নামের উল্লেখ ইহাতে নাই। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা সেই দীর্ঘ সন্দর্ভের অনুবাদ প্রদান করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

বনবাস প্রসঙ্গে রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলে বাল্মীকি তাঁহাদিগের যথোচিত আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"রাম, তোমার নামের মহিমা কে বর্ণনা করিতে পারে? আমি ইহারই মহিমায় ব্রহ্মর্ষিত্বলাভ করিয়াছি। প্রথমে আমি ব্যাধগণের মধ্যে তাহাদিগের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি শূদ্রাচাররত জন্মমাত্রে ব্রাহ্মণ ছিলাম। শূদ্রার গর্ভে অজিতেন্দ্রিয় আমার বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পর চোরদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমি চোর হইয়াছিলাম। একদিন গভীর বনে সাত জন মুনি দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদিগের পোষাক লইবার লোভে আমি তাঁহাদের পিছনে ছুটিলাম এবং বলিলাম 'দাঁড়াও, দাঁড়াও।' মুনিগণ আমাকে দেখিয়া বলিলেন 'দ্বিজাধম, তুমি কেন আসিতেছ?' আমি বলিলাম—'কিছু গ্রহণ করিবার জন্য। আমার স্ত্রী পুত্রগণ বুভুক্ষিত—তাহাদের রক্ষার জন্যই আমি বনে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।' তখন তাঁহারা আমাকে

---

* কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পুঁথিরক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই সন্দর্ভের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। — লেখক

বলিলেন—'যাও, তুমি তোমার পরিজনবর্গকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জিজ্ঞাসা কর যে, তুমি প্রতিদিন যে-পাপ করিতেছ তাহারা তাহার ভাগী কি না। তুমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসিবে ততক্ষণ নিশ্চয় আমরা এখানে থাকিব।' আমি 'আচ্ছা' বলিয়া বাড়ী গেলাম এবং মুনিরা যাহা বলিয়াছিলেন স্ত্রী পুত্রদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল—'পাপ সমস্তই তোমার।' ইহা শুনিয়া আমার নির্বেদ উপস্থিত হইল—যেখানে করুণাপরায়ণ মুনিগণ ছিলেন সেখানে আমি ফিরিয়া আসিলাম। মুনিদিগকে দেখিয়াই আমার চিত্ত পবিত্র হইল—ধনুক প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া আমি দণ্ডবৎ পতিত হইলাম ও বলিলাম—'মুনিগণ, নরকগামী আমাকে রক্ষা করুন।' মুনিগণ আমাকে পতিত দেখিয়া বলিলেন—'ওঠ, ওঠ, তোমার মঙ্গল হইবে। সাধু ব্যক্তিদিগের সহিত মিলন সফল হইয়াছে। তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি—তুমি তাহাতেই মুক্তি লাভ করিবে।' তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিলেন—'এই দুর্বৃত্ত দ্বিজাধম সাধুদিগের উপেক্ষার পাত্র; তথাপি শরণাগত বলিয়া মোক্ষমার্গের উপদেশের দ্বারা ইহাকে রক্ষা করা উচিত।' এইরূপ আলোচনার পর অক্ষরের ক্রম পরিবর্ত্তন করিয়া 'মরা' এই আকারে তোমার নাম সর্ব্বদা জপ করিবার জন্য আমাকে উপদেশ দিলেন। 'আমরা যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি ততক্ষণ এইরূপ জপ কর,' এই বলিয়া মুনিগণ চলিয়া গেলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহারা যেরূপ উপদেশ দিলেন সেইরূপ করিতে লাগিলাম। একাগ্রমনে জপ করিতে করিতে আমি বাহ্য পদার্থ বিস্মৃত হইলাম। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে নিশ্চল, সঙ্গবিহীন আমার উপর বল্মীক উৎপন্ন হইল। তাহার পর সহস্র যুগান্তে মুনিরা পুনরায় আসিলেন এবং বহির্গত হইতে বলায় আমি সত্বর উত্থিত হইলাম। বল্মীক হইতে বহির্গত হইলাম বলিয়া মুনিগণ বলিলেন—'হে মুনীশ্বর, তুমি বাল্মীকি, যেহেতু বল্মীক হইতে তোমার দ্বিতীয়বার জন্ম হইল।' এই বলিয়া তাঁহারা স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। হে রাম, আমি তোমার নাম-প্রভাবে এইরূপ হইয়াছি।"

ইহার উপর টীপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। তবে এই কাহিনী বা ইহার অনুরূপ বিবরণ যে কেবল অধ্যাত্মরামায়ণেই পাওয়া যায় তাহা নহে। বাল্মীকি ঋষি যে বল্মীক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা রামায়ণের টীকাকার রামানুজ ও গোবিন্দরাজ টীকার প্রারম্ভে 'বাল্মীকি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের একটি বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই—'বাল্মীক প্রভবো যস্মাৎ তস্মাদ বাল্মীকিরিত্যসৌ' অর্থাৎ যেহেতু ইনি 'বল্মীক' হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন সেই হেতু ইনি বাল্মীকি।

বাঙ্গালার বাহিরেও কোন কোন স্থানে বাল্মীকির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কর্ণাল জেলায় প্রচলিত এইরূপ একটি কাহিনী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Indian Antiquary নামক প্রসিদ্ধ পত্রে ২২০ পৃষ্ঠায় D. Ibbetson মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাহিনীতেও রত্নাকর নামের উল্লেখ নাই। ব্যাধের পক্ষে রামনাম উচ্চারণ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া মুনিগণ তাহাকে 'ম্র' এইরূপ জপ করিতে উপদেশ দেন। অনেক বৎসর পরে যখন মুনিরা সেই পথে ফিরিতেছিলেন তখন পথে প্রকাণ্ড বাল্মীক দেখিয়া বিশ্রামের জন্য তাহার উপর বসিলেন। তাহার মধ্য হইতে গুন গুন শব্দ বহির্গত হইতেছে বোধ করিয়া তাঁহারা তাহার উপর কান রাখিলেন এবং স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন যে, তাহার মধ্য হইতে 'ম্র' 'ম্র' শব্দ উত্থিত হইতেছে। তখন তাঁহারা বল্মীকটি খুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং তাহা হইতে বহির্গত হইলেন বলিয়া ব্যাধের নাম হইল বাল্মীকি।

বিদেশ

তুরস্কে ভাষা-বিপ্লব—

কনষ্টান্টিনোপলের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, "ল্যাটিন অক্ষর কমিশন" তাহাদের রিপোর্টে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তুরস্কে ল্যাটিন অক্ষর প্রবর্ত্তনের পক্ষে মত দিয়াছেন। সবই সমর্থিত হইয়াছে। কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন যে, বর্ণমালা, বানান এবং ব্যাকরণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আরবীর পরিবর্ত্তে শিক্ষা যেন ল্যাটিন ভাষায় সম্পন্ন হয়। ৭ বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

আশা করা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসর শেষ না হইতেই ল্যাটিন অক্ষর প্রবর্ত্তনের জন্য একটি নূতন আইন করা হইবে। অস্থায়ীভাবে আরবী অক্ষরের ব্যবহারই চলিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ল্যাটিন অক্ষরের প্রবর্ত্তন হয় এরূপ ব্যবস্থাও করা হইবে।

নূতন আইন অনুসারে সংবাদপত্রসমূহকেও কতক অংশ ল্যাটিন অক্ষরে ছাপিতে হইবে। কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহ জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইবে। শরৎকালে পরিষদের অধিবেশন হইবে এবং তৎপূর্ব্বে কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য এবং শেষবারের জন্য উহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রতিনিধিগণের একটি সম্মিলন হইবে।

চীনের জাতীয় শিল্প—

চীনে দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষের জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চীনের নূতন রাজধানী নানকিংয়ে একটি যাদুঘর স্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিভিন্ন শিল্পের জন্য বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে। দেশীয় শিল্প বিভাগ প্রদর্শনীর জন্য নমুনা সংগ্রহ করিবেন। যাঁহারা দ্রব্য উৎপন্ন করিবেন, তাঁহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের উন্নতি সাধনের জন্য এই বিভাগ বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিবেন এবং বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যের অনুকরণে ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তদন্ত ও সংগ্রহ বিভাগ দেশের শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন এবং বণিক ও উৎপাদকগণ এই সম্পর্কে যে সমস্ত অনুসন্ধান করিবেন, এই বিভাগ তাহার যথোচিত উত্তর দিবেন।

যাদুঘরের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রত্যেক বৎসর অক্টোবর মাসে দেশীয় শিল্পের একটি প্রদর্শনী হইবে। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য যে-কোন সময়েই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতে পারিবে। মিউজিয়মে একটি বিক্রয় বিভাগ থাকিবে এবং এই বিভাগ উৎপাদকদিগের পক্ষে দেশীয় শিল্প বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবেন।

দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য মিউজিয়ম একটি কমিশন গঠন করিবেন। উৎপাদক ও বণিকদিগের জন্য একটি পুস্তকাগার স্থাপিত হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা দিবার জন্য একটি প্রচারকারীদল গঠিত হইবে।

চীনদেশের সমস্ত প্রদেশ বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রসমূহ এবং বিশেষ বিশেষ মিউনিসিপ্যালিটীকেও ঐ প্রকারের মিউজিয়ম স্থাপন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইবে।

প্রাদেশিক মিউজিয়মগুলিকে প্রতিবৎসর আগষ্টমাসে দেশীয় শিল্পের প্রদর্শনী খুলিতে হইবে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য করা হইবে। প্রাদেশিক মিউজিয়মগুলি পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিবেন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের নমুনা সমূহ পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করিবেন। জাতীয় অথবা আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য এই সমস্ত মিউজিয়মকে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে উৎপন্ন শিল্পাদির নমুনা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কলেজ—

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান সহরে বহু ভারতবাসী ও শ্বেতাঙ্গের সমক্ষে শাস্ত্রী কলেজ নামে এক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউনিয়ন সরকার উহার উন্নতি বিধান করিবার আশ্বাস দিয়াছেন।

জননায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিগ্রহ—

বিহারের জননায়ক বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহাত্মা গান্ধীর পক্ষ হইতে, ইউরোপে গিয়া আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ প্রতিরোধ মহাসম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। অষ্ট্রীয়ার গ্রেজ সহরে ঐ অধিবেশনের সময়, এক উত্তেজিত ফ্যাসিষ্ট জনতা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া গুরুতররূপে জখম করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পরাধীন ভারতবর্ষকে ইউরোপ অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে—তাহার উপর সর্ব্বত্র প্রভুত্বপ্রয়াসী ফ্যাসিষ্টদল বিদেশী নিঃসহায় অতিথির প্রতি এই কাপুরুষোচিত দলবদ্ধ আক্রমণ করিয়া নিজেদের বর্ব্বরতারই পরিচয় দিয়াছেন।

শান্তি প্রচেষ্টা—

আমেরিকার রাষ্ট্রসচিব মিঃ কেলগ্ শান্তিবাদী রূপে যুদ্ধ বিরত হইবার সন্ধিপত্রে ইউরোপের ও অন্যান্য প্রদেশের বড় বড় শক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কেলগ প্যাক্ট নামে পরিচিত। ইংরেজ ফরাসী, ইটালী, জার্ম্মাণী, বেলজিয়ম, পোলাণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ জগতে শান্তি আনয়নের জন্য এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে লর্ড কুসেনডেন ভারতবর্ষকেও এই শান্তি সম্মিলনের অংশভাগী করিয়াছেন। স্বাক্ষরের পর অন্যান্য

দেশের উপর এই সন্ধির ধারা চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছে আমেরিকা। মিলন বৈঠকে রাশিয়া, চীন, তুরস্ক, প্রভৃতির নাম নাই।

যুদ্ধ-বিরতি ও জগদ্ব্যাপী শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল হওয়ার আশা সুদূরপরাহত। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে,—যেখানে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে প্রতিদিন স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে, সেইখানেই শান্তি স্থাপনের অভিনয় সন্দেহজনক। এই শান্তিপ্রতিষ্ঠার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বিমানবাহিনী দ্বারা লণ্ডন সহর আক্রমণ এবং তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা দেখাইয়া ইংলণ্ডে এক সপ্তাহ হৈ চৈ চলিল। এ সকল কি শান্তিরই নমুনা?

লণ্ডনে হিন্দু আবাস—

ভারতবাসীদের সুবিধার জন্য লণ্ডনে "শান্তিনিকেতন" নামক একটি ভারতবর্ষীয় আবাস ১১নং বেলসাইজ পার্ক (এন্ ডব্লু, ৩) এর ঠিকানায় খোলা হইয়াছে। ইহাতে পনের জন লোকের বাসোপযোগী স্থানের সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে হিন্দু ভদ্রলোকদিগকে বিশুদ্ধ নিরামিষ খাদ্য প্রদান করা হয়। খাদ্য ও বাসের সাপ্তাহিক খরচ কমপক্ষে আড়াই পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চৌত্রিশ টাকা।

যে সকল হিন্দুভদ্রলোক বিলাত যাইতেছেন অথবা শীঘ্রই যাইতে চান, তাঁহারা উপরোক্ত ঠিকানার শেঠ্ আর বাজারের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া অথবা "শান্তি" লণ্ডন, এই ঠিকানায় জরুরী তার-যোগে তাঁহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন।

—

ভারতবর্ষ

নেহেরু কমিটীর রিপোর্ট—

গৌহাটি কংগ্রেসের প্রাক্কালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নৃশংস হত্যার পর কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধানকল্পে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার ফলে দিল্লীতে সর্ব্বদলের এক বৈঠক হয়। অবশেষে মাদ্রাজ কংগ্রেসে সকল বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তির জন্য এবং ভারতে একটি ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈয়ারী করিবার জন্য প্রস্তাব পাশ হয়। তদনুসারে সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া দিল্লীতে এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে এক কমিটি হয়। এই কমিটি ভারতের ভাবী রাষ্ট্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন।

ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনশীল কানাডা, আয়র্ল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের ন্যায় হইবে। রাষ্ট্র অনেক সময়ে 'প্রয়োজনের' অনুরোধে জনসাধারণের মূল অধিকার কাড়িয়া লয়—এই ব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে রিপোর্টে ১৯ দফা মূল অধিকার দানের ঘোষণা (Declaration of Rights) আছে। দেশের শাসনকার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা হইবে।

(১) রাজ প্রতিনিধি, সিনেট ও প্রতিনিধি সভা লইয়া পাল্যামেণ্ট গঠিত হইবে—তাহার উপরই রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক ক্ষমতা থাকিবে।

(২) প্রাদেশিক সভাগুলিদ্বারা নির্ব্বাচিত ২ শত প্রতিনিধি লইয়া সিনেট, ও নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে ৫ শত প্রতিনিধি লইয়া প্রতিনিধি সভা গঠিত হইবে, ইহাতে ২১ বৎসর বয়স্ক যে কেহ ভোট দিতে পারিবেন।

(৩) পাল্যামেণ্টের আইন করিবার ক্ষমতা থাকিবে—বহিঃরাষ্ট্রীয় ব্যাপার পাল্যামেণ্টের অন্যান্য উপনিবেশের মত ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) একজন প্রধান মন্ত্রী ও ৬ জন মন্ত্রী লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইবে। সিনেটের কার্য্যকাল ৭ বৎসর ও প্রতিনিধি সভার কার্য্যকাল ৫ বৎসরের জন্য হইবে।

(৫) কানাডার মত ভারতবর্ষও বিদেশে দূত রাখিতে পারিবে।

(৬) প্রত্যেক প্রদেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভার থাকিবে রাজপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রীয় সভার উপর। প্রতি লক্ষ অধিবাসীর পক্ষ হইতে ১ জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। ২১ বৎসর বয়স হইলে যে কেহ ভোট দিতে পারিবে।

(৭) সভার কার্য্যকাল ৫ বৎসর থাকিবে।

(৮) ৫ জন মন্ত্রী লইয়া প্রাদেশিক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইবে।

(৯) প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভা নিজ নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোন আইন রদ করিয়া দিতে পারিবে। আর্থিক প্রস্তাব শুধু কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্যগণই তুলিতে পারিবেন।

(১০) রাজপ্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী-দিগকে লইয়া "দেশরক্ষা" পরিষৎ গঠন করিবেন—(১) প্রধান মন্ত্রী—সভাপতি (২) সমর সচিব (৩) পররাষ্ট্র সচিব (৪) প্রধান সেনাপতি (৫) খপোত বিভাগের প্রধান সেনাপতি (৬) প্রধান নৌসেনাপতি (৭) সৈন্য বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী এবং আরও দুই জন বিশেষজ্ঞ।

(১১) "দেশ রক্ষার" (National defence) বাবদে খরচার বরাদ্দ প্রতিনিধি সভার ভোট-সাপেক্ষ থাকিবে। কিন্তু কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইবার আশঙ্কা থাকিলে গভর্ণর জেনারেল "দেশরক্ষা" বাবদে খরচা মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(১২) রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় মহাসভা নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করিবেন।

(১৩) সামন্ত রাজ্যের সহিত ব্রিটিশ সরকারের যে সম্বন্ধ আছে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও তাহাই থাকিবে।

(১৪) প্রাদেশিক ও রাষ্ট্রীয় মহাসভার সদস্য নির্ব্বাচনের মিশ্র নির্ব্বাচক মণ্ডলী (Joint Electorate) থাকিবে।

(১৫) যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় অল্প (minority) সে সকল প্রদেশে মুসলমানদের জন্য এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দুদের জন্য ভিন্ন অন্য কোথাও প্রতিনিধির সংখ্যা সংরক্ষিত (Reservation of Seats) থাকিবে না। যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাল্প সেস্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যাল্প শ্রেণীর লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা সংরক্ষিত হইবে। [হিন্দু সংখ্যাল্প বাংলা ও পাঞ্জাবে এই নিয়ম খাটিবে না]

(১৬) সিন্ধু ও কর্ণাটের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত অংশগুলি (মহীশূরের মধ্যে যেটুকু আছে তাহা ছাড়া) দ্বারা দুইটি বিভিন্ন প্রদেশ গঠন করিতে হইবে।

—বাংলার বাণী

ভারতীয় দেশালাই শিল্প—

ভারতগবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত টেরিফ বোর্ড ভারতীয় দেশালাই শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এদেশের নূতন দেশালাই শিল্প বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমদানী দেশলাইয়ের উপর

সংরক্ষণ শুল্ক বসান উচিত। বর্ত্তমানে আমদানী দেশালাইয়ের উপর "গ্রোস" প্রতি দেড় টাকা বা শতকরা ১৫ ভাগ রাজস্ব শুল্ক আছে। টেরিফ বোর্ড এই রাজস্ব শুল্ককেই সংরক্ষণ শুল্কে পরিণত করিতে চান। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান রাজস্ব শুল্কের ফলে, আমদানী দেশালাইয়ের পরিমাণ ১২২১—১২ হইতে ১৯২৬—২৭—এই চারি বৎসরে, ১৩.৬৮ নিযুত (দশলক্ষ) 'গ্রোস' হইতে ৬.১৩ নিযুত গ্রোসে অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক নামিয়া গিয়াছে। যদি রাজস্ব শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে ভারতের নূতন দেশালাই শিল্পের ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক টেরিফ বোর্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া দেশীয় দেশালাই শিল্প সম্বন্ধে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ; ইহাতে দেশের বেকার সমস্যা কিয়দংশে দূর হইবে, বহু দরিদ্র লোকের অন্ন-সংস্থান হইবে।

ভারতবর্ষে বন্যা—

প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে লাহোর, ফিরোজপুর, প্রভৃতি জেলার বহুস্থান বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। লাহোরে একখানা বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় একটি ভারতীয় খৃষ্টিয়ান পরিবার ভগ্নস্তূপে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে রেল লাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় লায়লপুর, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঝেলাম নদীতে বন্যা হওয়ায় ঝেলাম সহর ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগ্রাম সমূহ ডুবিয়া গিয়াছে। ক্ষতিরপরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

অতিরিক্ত বৃষ্টি ও তুষারপাতের জন্য ছয় হাজার অমরনাথ যাত্রীর মধ্যে দুই হাজার শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। অবশিষ্ট যাত্রীগণ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় স্থানে রহিয়াছে। ঝড়ে ও ঠাণ্ডায় ২৫ জন যাত্রী ইতিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

ভারতে বিলাতী দ্রব্য—

ভারতে কি পরিমাণ বিলাতী দ্রব্য আমদানী হয়, নিম্নলিখিত সংখ্যানির্দ্দেশ দ্বারা তাহা বুঝিতে পায়া যাইবে :—

	১৯২০ সাল	১৯২৩ সাল	১৯২৬ সাল
তামাক	১৪১৯৭৮৮৲	১৭৮৭৮৯৫৯৲	২১২৮৪৫৪৪৲
খেলনা	৯৯৮৮৫০৲	১৩৪১৩২৩৲	১৪৬৫৫৭৬৲
জুতা	১৫৫৬২৮০৲	১৮০৯৮৮৪৲	৩০৫৯২৫৬৲
বাদ্যযন্ত্রাদি	৪৪২৫৯০৲	৭৪০৯৫২৲	১০৫৪৫৬৫৲
গহনা জহরাতাদি	৯৪৬৯৩০৲	১৩৫১২২৩৲	৩০০৪৬৪৩৲
সাবান	২১২২২৭৪০৲	১১৪৫৬৮৫৭৲	১৩৮৩৬৪৪২৲

—

বাংলা

খড়্গাপুরে শিখ মুসলমানে দাঙ্গা—

খড়্গাপুরে শিখ মুসলমানে বিরোধ আবার ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল। প্রকাশ যে কয়েকদিন পূর্ব্বে দুইটি গরুর জিহ্বা ছেদন ও একটি শূকর মারা লইয়া গোলযোগের সূত্রপাত হয়। গত ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে শিখ গুরুদ্বারে কতকগুলি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং উহাতে কয়েকজন আহত হয়। এই ঘটনার পর হইতে বিরোধ ভীষণাকার ধারণ করে; উত্তেজিত জনতার উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে, তাহার ফলে ৩ জন আহত হয়। এপর্য্যন্ত ১১ জন নিহত, ও ৩০ জন আহত হইয়াছে।

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট যখন গুরুদ্বারের সম্মুখে জনতার সহিত তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন, তাঁহার উপর ঢিল ছোড়া হয়; একব্যক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করে। সহরের অবস্থা শোচনীয়। প্রায় সমস্ত দোকান বন্ধ। বহু হিন্দু সহর ত্যাগ করিয়াছে। সহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে।

পরলোকগত সাহিত্যিক বাণীনাথ নন্দী—

বঙ্গ-সাহিত্যের আজীবন সেবক নানা সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ প্রবীণ সাহিত্যিক বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রায় প্রথম হইতে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে, সহকারী সম্পাদকরূপে, গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে এবং বিভিন্ন শাখা সমিতির সভ্যরূপে ইহার সেবা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনে যোগদান করিতেন। সেকালের দারোগার দপ্তর অলৌকিক রহস্য ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির তিনি পরিচালক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দান—

স্বাধীন ত্রিপুরার নবীন মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত কুমিল্লা সহরে প্রথম শুভাগমনোপলক্ষে উক্ত সহরের নানা প্রকার সাধারণ প্রতিষ্ঠানে ৬৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি এবং ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পরিচালিত অভয়াশ্রমের হাসপাতালে মহারাজার ১০,০০০৲ টাকার দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হুগলি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হস্তে তাঁহার মৃত পত্নীর স্মৃতি রক্ষার্থ একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এই মর্ম্মে ১০০০১৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের যে সমস্ত সংস্কার বিধিবদ্ধ হইতেছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিধানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) বর্গাদারের বর্গা জোতে প্রজাস্বত্বের উদ্ভব হইবে না।

(২) প্রজাগণ জোতস্বত্ব স্বাধীনভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে; কিন্তু মালিককে জোতের মূল্যের শতকরা ২০৲ টাকা সেলামী প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রজাগণ তাহাদের জোতস্থিত ভূমিতে বৃক্ষচ্ছেদন ও ফলভোগ এবং পুকুর খনন ও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদি অবাধে নির্ম্মাণ করিতে পারিবে।

(৪) প্রজার হস্তান্তরিত ভূমি মালীক খাস দখলের জন্য নিজে খরিদ করিবার পূর্ব্বাধিকার পাইবেন।

ভারতীয় নাবিকের সাহস—

বর্ত্তমান ঢাকা ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও সভ্যদের এক সভায় রায় সাহেব কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি অতি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গলার গভর্ণর স্যার ষ্টান্‌লী জ্যাকসন সেই সভায়

সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৬জন ভারতীয় নাবিককে স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ:—১৯২৪ সনের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে "নিউবি হল" নামক একখানা জাহাজ "নিউইয়র্ক" হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছিল। পথে একদিন সেই জাহাজের কাপ্তেন আন্দাজ ৪ মাইল দূরে একটি কালো রেখার মত কি দেখিতে পাইলেন। তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া নিশান তুলিয়া দিয়াছিলেন। সমুদ্রের অবস্থা তখন এত খারাপ ছিল যে উহার সম্মুখীন হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। সেই জাহাজে অন্যান্য কর্মচারীর মধ্যে ৫৭ জন ভারতীয় 'লস্কর ছিল। অতিকষ্টে জাহাজখানি 'ক্রুজের' নিকটে লইয়া যাওয়া হয় এবং উহা হইতে দুইজন আরোহীকে উদ্ধার করা হয়। ১৩ দিন যাবৎ তাহাদের মুখে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পড়ে নাই। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ৬জন ভারতীয় লস্করকে ৬টি স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ৪ জনই ঢাকা জিলার নবাবগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী।

—ঢাকা প্রকাশ

বিধবা বিবাহ—

সিরাজগঞ্জ মলকুমার চৌহালী থানার নওহাটী গ্রাম নিবাসী শ্রীমথুরানাথ প্রামাণিকের ১৫ বৎসর বয়স্কা বালবিধবা কন্যার সহিত শ্রীপ্রহ্লাদ প্রামাণিকের বিবাহ গত ৮ই আষাঢ় সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যা পক্ষের পুরাতন পুরোহিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বিবাহে পৌরহিত্য করিয়াছেন।

—স্বরাজ

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি—

গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু আগামী কলিকাতা কাগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ২০টি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর মধ্যে ১৪টি কমিটিই তাঁহার পক্ষে ভোট দিয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা; তিনি নিখিল-ভারত স্বরাজ্যদলের প্রেসিডেণ্ট। জাতীয় রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনে তিনি নিরতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেও তিনি আর একবার কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বিলাত যাত্রা—

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট স্বনামখ্যাতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ভারতের স্বরাজ আন্দোলনের প্রতিনিধি ও বিশেষ দূতস্বরূপ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে যে তিনি শুধু দেশের প্রতিনিধি নেতাগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন তাহা নহে, ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিবৃত করিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহার এই অভিযান জয়যুক্ত হউক।

ক্ষুধার্ত্ত বাংলা—

খুলনা জেলার কালীগঞ্জ থানায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা ভীষণতর হইতেছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘ ৬টি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। রীতিমত অর্থ সাহায্য না পাওয়ায় ভালরূপে কার্য্য হইতেছে না।

—আনন্দ বাজার পত্রিকা

বাঁকুড়া:—দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাঁকুড়ায় কয়েকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় আউস ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। সম্প্রতি বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। লোকের অবস্থা এখনও শোচনীয়। অন্ন নাই, কর্ম্ম নাই। দৈনিক দশ এগার পয়সা মজুরীতে লোক খাটিতেছে। সাহায্য প্রার্থীর সংখ্যা রোজই বাড়িতেছে। বর্দ্ধমান ও বীরভূমের দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এই মাসে খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

—যুগদীপ

বর্দ্ধমান:—ভাদ্র মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার বহু গ্রামে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়িয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রাভাবে এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে যে তাহারা অনেকে ভিক্ষা কেন্দ্রেও উপস্থিত হইতে পারিতেছে না। এক দেবশালাতে শতাধিক হিন্দু পরিবারের সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল মাত্র ৪৭ জন সাহায্য পাইয়াছেন।

—শক্তি

নারী-শিক্ষা সমিতি—

গত মাসে কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে নারী শিক্ষা সমিতির নবম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন; তাহাদের মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন। উক্ত সমিতির ছাত্রীদের নির্ম্মিত গামছা, বিছানার চাদর, জেলী, আচার এবং অন্যান্য জিনিষ প্রদর্শনীর জন্য সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় স্ত্রীশিক্ষার ভীষণ দুর্দ্দশার কথা বিবৃত করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সভায় বিতরণ করা হইয়াছিল। নিম্নে তাহা হইতে দুই একটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হইল:—"বাঙ্গলায় লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা ১৮ জন স্ত্রীলোক মাত্র নাম সহি করিতে ও কোন রকমে চিঠি লিখিতে ও পড়িতে পারে......বাঙ্গলার সমস্ত নারীদের (২,২৫,৪৪৩১৪ জন) মধ্যে মাত্র ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে।......যাহাদের অ, আ, ক, খ, শিক্ষার ব্যবস্থা নাই তাঁহাদের সংখ্যা মোটামুটি ৩০ লক্ষ ইত্যাদি···

বাঙ্গলায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর হিসাব—

নিম্নের তালিকায় বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর হিসাব পাওয়া যাইবে। মৃত্যুর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম। জলে ডোবা ও সাপের কামড়ে মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি জেলায় প্রবল বন্যা না হওয়াই সংখ্যাহ্রাসের কারণ বলিয়া মনে করা যায়।

আত্মহত্যা	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	১,২৪১	১,২৯০
স্ত্রীলোক	১,৯২৬	১,৯৩৩
শিশু	৫৫	৩৪
	৩,২২২	৩,২৫৭
জলে ডুবিয়া	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	১,১৫৮	৯৬৭
স্ত্রীলোক	১,০৩৯	৮৭২
শিশু	৬,৮৩৫	৬,৪৩৭
	৯,০৩২	৮,২৭৬

সর্পাঘাতে	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	১,৫১৭	১,৩৬৪
নারী	১,৮৭১	১,৫৩১
শিশু	১,০১১	৮১৪

বন্য বা মত্ত পশুদ্বারা নিহত	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	৮২	৪৮
নারী	৪৫	১৩
শিশু	১১১	৮৬
	২৩৮	১৪৭

অট্টালিকা হইতে পতনে	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	১৩৫	১৩৩
নারী	৩৭	৫৬
শিশু	৫৩	৫১
	২২৫	২৪০

অন্যান্য কারণে	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	১,১৪৮	১,০৮১
নারী	৫১১	৫০৯
শিশু	৫৮৯	৫৩৩
	২,২৪৮	২১১২৩

মোট সংখ্যা	১৯২৬	১৯২৭
পুরুষ	৫,২৮১	৪.৮৮৫
নারী	৫,৪২৯	৪,৯১৪
শিশু	৮,৬৫৪	৭,৯৫৫
	১৯,৩৬৪	১৭,৭৫২

পরলোকগত লর্ড হ্যালডেন—

লর্ড হ্যালডেন্ কিছু দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। এই যুগের ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন এবং রাষ্ট্র-নেতাদের মধ্যেও তাঁহার স্থান পুরোভাগে ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি এ্যাস্কুইথ্ মন্ত্রীমণ্ডলের অন্যতম মন্ত্রীরূপে ইংরেজের সৈন্যবলকে

লর্ড হ্যাল্ডেন্

এরূপ যুদ্ধোপযোগী করিয়া সংগঠন করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধারম্ভে ইংরেজকে ততটা বেগ পাইতে হয় নাই। জার্ম্মান্ চিন্তাধারার পূজারী ও জার্ম্মান্ দার্শনিকদের শিষ্য রূপে তিনি জার্ম্মানীর বিরুদ্ধ যুদ্ধে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি দিতে পারেন নাই। যুদ্ধশেষে তিনি শ্রমিক মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ডের আহ্বানে সেই মন্ত্রীমণ্ডপে চ্যান্সেলর্ পদ গ্রহণ করিয়া মতের ঔদার্য্য প্রদর্শন করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে হিব্বার্ট জর্ণ্যালে তিনি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভারতীয় দর্শন সম্পর্কিত পুস্তক সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ আলোচনা পূর্ণ সন্দর্ভ লেখেন। তাহাতে তাঁহার ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। এডিন্‌বরায় তিনি ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় (পি, কে, রায়) সহপাঠী ছিলেন ও পরীক্ষায় একযোগে প্রথমস্থান অধিকার করেন।

কেমাল পাশার বিবাহের গুজব—

সম্প্রতি নানা বৈদেশিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে,

মুস্তাফা কেমাল পাশা

আফগান রাজকুমারী

তুরস্কের রাষ্ট্রনেতা মুস্তাফা কেমাল পাশার সহিত আফগানিস্থানের বর্ত্তমান আমীর আমান উল্লার ভগ্নীর বিবাহ হইবে। এখন, নানা সংবাদপত্রে এই গুজব ভিত্তিহীন বলিয়া বলা হইয়াছে।

ভ্রমসংশোধন

ভাদ্র পৃঃ ৬৫০ প্রথম লাইন "চালটা ছিল" স্থানে "চালটা চিলে" হইবে।

পৃঃ ৬৫৮ ১০ম লাইন "চাহিব" স্থলে "চাহিবে" হইবে।

পুস্তক পরিচয়

ভাবুক ও সভ্যতা রহস্য —রায় বিহারী মিত্র বাহাদুর প্রণীত। পৃঃ ১৫৭। মূল্য জানা নাই।

পুস্তকের দুইটি অধ্যায়—(১) অনুসন্ধান, (২) গোঁয়ার গোবিন্দের গল্প।

দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য।

সাঙ্খ্যতত্ত্ব —শ্রী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ৩৪। মূল্য।০ (প্রাপ্তিস্থল—গ্রন্থকার, নৈহাটী, কাঁঠালপাড়া)

এই পুস্তিকাতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত 'সাঙ্খ্যযোগের আধ্যাত্মিক ভাবব্যাখ্যা' দেওয়া হইয়াছে।

আত্মদর্শন :—শ্রীযদুনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। পৃঃ ৭৬। মূল্য।/০

প্রণব, প্রাণায়াম, আচমন, গায়ত্রী, বিষ্ণুস্মরণ, মানস পূজন—ইত্যাদি নানা বিষয়ের কবিতা। গ্রন্থের শেষ ভাগে এই সমুদায় বিষয়ে সংস্কৃত মন্ত্রাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মবোধিকা :—শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ বিরচিত। পৃঃ ১০১। মূল্য ||০

ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে সংস্কৃত কবিতা ও তাহার অনুবাদ।

আত্মোন্নতি :—শ্রী ভুবনমোহন দাস, এম্‌-এ প্রণীত। পৃঃ ৫২; । মূল্য ||•

বক্তব্য বিষয়—দুঃখ, সুখ, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ইত্যাদি।

মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ :—শ্রী দুর্গাবর মজুমদার প্রণীত। পৃঃ ৭৭। মূল্য ||•

১৮৩৫ সালে জন্ম, চট্টগ্রামে। ওকালতী পাশ করেন; কিন্তু ব্যবসায় কবিরাজী। ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্র কাশ্মীর; কাশ্মীর রাজপরিবারে গৃহ-চিকিৎসক। সে-স্থলে ষড়যন্ত্র, কর্ম্মচ্যুতি, পুনর্ব্বিচার, পুনর্নিয়োগ—ইত্যাদি নানা ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

মহৎ জীবন :—ডাক্তার লুৎফর রহমান প্রণীত। পৃঃ ১০০। মূল্য ||• (প্রাপ্তিস্থল—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, ৪৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

গ্রন্থকার অনেক মহাপুরুষের জীবনের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া চরিত্র, কাজ, ভদ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

জীবন-রহস্য :—শ্রী সারদাচরণ খাস্তগির, এম-এ, বি-এল প্রণীত। পৃঃ ১০১। মূল্য ৸০

জীবন, মরণ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম, দেহ, আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই সমুদায় বিষয়ে প্রবন্ধ।

'কিসে হবে' —শ্রী শচীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। পৃঃ ১২৮। মূল্য ১৲ (প্রকাশক শ্রী আশুতোষ মিত্র, ১০১ ফ্রেজার ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন)

গল্প ও কবিতা। শ্রীকৃষ্ণের মাথা ধরা, আমার স্বপ্ন, বৃন্দাবনের পথে—ইত্যাদি নানা বিষয়। গ্রন্থকারের সংক্ষেপ আত্ম-জীবনীও আছে।

শোক ও সান্ত্বনা :—শ্রী সুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ৩৭ নং মানিক বোস ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোট ছোট কবিতা।

আত্মনিবেদনাঞ্জলি— শ্রী অমূল্যচরণ রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীস্মরজিৎ দত্ত, টাকী, ২৪ পরগণা। পৃঃ ৯০। মূল্য ৸০

ভক্তির কথা সংস্কৃত কবিতাতে রচিত। গ্রন্থকার সাকারবাদী ও অবতারবাদী; গ্রন্থে এ সমুদায়ের তত্ত্বও আছে, ব্রহ্মভাবও আছে।

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত। বাংলা অনুবাদ নাই।

কল্যাণের পথ :—শ্রী বিজয়কান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত। পৃঃ ৮১। মূল্য ||• (প্রাপ্তিস্থল—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

বিষয় "ব্রহ্মচর্য্য"। মহাত্মা গান্ধী, অশ্বিনীকুমার, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ সংগৃহীত হইয়াছে।

সংসার-সাধনা :—শ্রী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃঃ ৪৬। মূল্য।/০

লেখকের বক্তব্য—সংসার সাধন করিতে হইবে জীবন্মুক্তির জন্য।

নির্ঝরিণী :—শ্রী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। পৃঃ ৯০। মূল্য ||• (প্রাপ্তিস্থল—গ্রন্থকার, মাণিকগঞ্জ)।

পুরুষ, প্রকৃতি, মুক্ত মানব, মুক্তি, শ্রীগুরু, কৃষ্ণ গৌরাবতার প্রভৃতি বিষয়ে কবিতা।

আত্ম-দর্শন :—শ্রীযদুনাথ গুপ্ত প্রণীত। পৃঃ ৭৬। মূল্য।/০

প্রণব, বিষ্ণু, গায়ত্রী, প্রভৃতি বিষয়ক কবিতা। গ্রন্থের শেষ ভাগে সংস্কৃত মন্ত্র এবং কোন কোন স্থলে অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে।

Our Spiritual Wants and Their Supply —শ্রী সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত। পৃঃ ২৪। মূল্য।০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৪৯তম বার্ষিক সভাতে সভাপতির অভিভাষণ।

সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

রাগরেখা :— শ্রী তারানাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক আর্য্য সাহিত্য ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। ১৩৩৫।

গ্রন্থকার ইতিমধ্যেই বাঙলা কথা-সাহিত্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। এই জাতীয়তা-মূলক উপন্যাসখানি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। শৈল ও প্রতুলের চরিত্র চিত্রণে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যের দিকেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি আছে। আমরা ভরসা করি, গ্রন্থখানি পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

সারনাথ বিবরণ— (সচিত্র)—শ্রীভবতোষ মজুমদার প্রণীত ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। গবর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া সেণ্ট্রাল পাব্লিকেশন্ ব্রাঞ্চ, কলিকাতা। মূল্য ৩৲। পৃঃ ১৶০+১৬৮।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেই সারনাথ ভারতবর্ষের একটি মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ-গণের সাধনা ও অনুসন্ধানের ফলে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দ হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত দেড় হাজার বৎসরের বিভিন্ন সময়ের বহু চমৎকারপ্রদ ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ নিদর্শন ঐস্থানে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম ডেপুটী ডাইরেক্টর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী ইংরেজীতে Catalogue of the Museum of Archaeology at Sarnath নামক একখানি সুন্দর বহি প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান লেখক সেই বিবরণ অবলম্বনে বাঙলা এই সংস্করণটি সঙ্কলিত করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তকে সারনাথের ধ্বংসাবশেষ ও মূর্ত্তির পরিচয় ছাড়া সহজ সরল ভাষায় তথাকার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ও শিল্পকলার ধারাবাহিক বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থখানির পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সাহায্যে বাঙালী দর্শকগণের সারনাথের ভগ্নাবশেষ ও চিত্রশালা দেখিবার খুব সুবিধা হইবে এবং অন্য সকলেও এই পুস্তকে প্রকাশিত সারনাথ ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা আশা করি, এই সচিত্র পুস্তকখানি কি সাধারণ পাঠক কি শিল্পানুরাগী ব্যক্তি, সকলের নিকটেই সমাদর লাভ করিবে। পুস্তকের ছবি ও ছাপা ভাল।

প্র

শ্রীশ্রীচণ্ডী—প্রকাশক ও সঙ্কলক ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণেশকুমার। মূল্য দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান ১০ নং গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সঙ্কলকের পকেট গীতার প্রশংসা আমরা করিয়াছি। তাঁহার প্রকাশিত চণ্ডীখানা দেখিয়াও আমরা সুখী হইলাম। চণ্ডীর পরীক্ষক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ এবং সম্পাদক সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ; কাজেই চণ্ডীখানা যে যথার্থ ই ভাল হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাতে আছে যথাসম্ভব নির্ভুল মূল শ্লোক, অন্বয়মুখে সজ্জিত বাংলা প্রতিশব্দ, প্রধান প্রধান বিষয়সমূহের শিরোনামা সহ সরল বঙ্গানুবাদ, অধিকন্তু সবঙ্গানুবাদ দেবীসূক্ত, অর্গলা, কীলক ও কবচ—যাদের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত অনেক চণ্ডীতেই দৃষ্ট হয় না। চণ্ডীপাঠেচ্ছু নরনারীগণ ইহা দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। ছাপা বাঁধাই মনোরম।

চক্র

সৎপ্রসঙ্গ—শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক। ২ চক্রবেড়ে লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। আট আনা।

ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক আলোচনা পুস্তক। আলোচনা সারগর্ভ।

স্বাস্থ্য-পঞ্চক—শ্রীচুনীলাল বসু। প্রকাশক—বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, ৭০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহাশয় বাঙালী জাতির স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণা করিতেছেন। বহু চিন্তাপূর্ণ পুস্তক ও পুস্তিকায় তিনি এসম্বন্ধে বাঙ্গালীকে অনেক হিতকথা শুনাইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিও সেইরূপ স্বাস্থ্য-বিষয়ক। ইহাতে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা আছে—বাঙালীর স্বাস্থ্য, বাঙালীর খাদ্য, খাদ্য-প্রাণ (Vitamins), মাতৃকল্যাণ ও শিশুমঙ্গল এবং সেবিকার কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বাঙালীর বইখানি পাঠ করা উচিত,—ইহা এতই সারবান ও প্রয়োজনীয়।

মন্দিরা; সপ্তস্বরা; পত্র-চিত্র; পঞ্চপাত্র—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—মানসী প্রেস, ১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে দশ আনা, এক টাকা, বারো আনা, বারো আনা।

বসন্তবাবু বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ-গুলিতে সরলতা এবং মাধুর্য্য যথেষ্ট আছে। তাঁহার 'পত্রচিত্র' গ্রন্থ-খানিতে বাঙালীর ঘরের কয়েকটি করুণ, সরল ও নির্ম্মল চিত্র মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। সেগুলি কোথাও অস্পষ্ট বা কষ্টকল্পিত নয়। দুঃখের বিষয়—তাঁহার ছন্দে মাঝে মাঝে ত্রুটি দেখা যায়। তথাপি, কাব্যরসিক ব্যক্তি বইগুলি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মানসী প্রেস, ১৪এ রামতনু বসুর, লেন, কলিকাতা। আট আনা।

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বিবিধ ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ। পুস্তকটি গ্রন্থকারের কাব্যসজ্ঞানের বিশিষ্ট পরিচয়। রবীন্দ্র-রস-পিপাসুর নিকট পুস্তকখানি আদৃত হইবে।

মর্ম্মবাণী—শ্রীসুরবালা দেবী। প্রকাশক শ্রীসারদারঞ্জন রায়, পাবনা। পাঁচ সিকা।

কবিতা-পুস্তক। লেখিকা বাংলা সাহিত্যে পরিচিতা নহেন; তথাপি তাঁহার রচনা সাহিত্য-সমাজে পরিচিত হইবার যোগ্য। আধুনিক ভাব ও ভাষা লেখিকাকে অল্পই স্পর্শ করিয়াছে, তিনি অনেকটা প্রাচীন পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার রচনা একঘেয়ে নয়; ভাব ও ভাষা বেশ সজীব ও সমৃদ্ধ, নূতন উপলব্ধির পরিচায়ক। ছন্দে কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও কবিতাগুলি কবিত্বশক্তি-প্রসূত।

সাহারা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ১৬।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

হাস্যরসিক ললিতকুমারের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। আলোচ্য পুস্তকখানিতে অনেকগুলি সরস প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সরল অভিব্যক্তি, প্রাঞ্জল ভাষা ও অনাবিল হাস্যরস—ইহাই পুস্তকটির বিশেষত্ব। বাঙালী হাসে কম—ইহা বাঙালীর বিরুদ্ধে সত্য অভিযোগ। বাঙালীকে যাঁহারা হাসাইতে চান তাঁহারা বাঙালীর জীবনকে শক্ত-স্ফূর্ত্ত করিয়া তুলেন। এই হিসাবে ললিতকুমারের রচনা বাঙালীর

উপকার সাধন করিতেছে। পুস্তকখানিকে বাঙালী যোগ্য সমাদর প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। তাহার উপর পুস্তকটি সুশোভিত, সুচিত্রিত ও সুগঠিত হওয়ায় ইহা লোভনীয় হইয়াছে।

গীতার ভূমিকা—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। আর্য্য-সাহিত্য ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

ঘোষ মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ "ঋষি কবি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্বোধনে কণামাত্র অত্যুক্তি নাই। আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিলে অরবিন্দের অদ্ভুত ঋষি-দৃষ্টি পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলে। ভারতের সভ্যতার গতি ও মর্ম্ম এবং ভারতের সাধনার স্বরূপ তিনি প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অসাধারণ কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। গীতার মর্ম্মকথা ব্যাখানচ্ছলে তিনি কর্ম্মদৃপ্ত ধর্ম্মশান্ত ভারতের অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ভারত-জননীর প্রকৃষ্ট সন্তান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বুঝিতে হইলে এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ও সে-বিষয়ে অর্জ্জুনের সহায়তা যে ভারত-সভ্যতার কত বড় একটা প্রয়োজনীয় উপাদান তাহা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভারত-সাধনার যাঁহারা সাধক এবং ভারত-ইতিহাসের যাঁহারা সেবক ও গবেষক এই পুস্তক তাঁহাদের কণ্ঠস্থ করা উচিত। পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে গদ্য আলোচনার কথা বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয়, মনে হয় যেন গীতা সম্বন্ধীয় একখানি অপূর্ব্ব খণ্ডকাব্য পাঠ করিতেছি। প্রকাশ ও ব্যাখ্যান ভঙ্গী সম্পূর্ণ কবিচিত্ত-প্রসূত। ভারতকে উপলব্ধি করিয়া তাহার মর্ম্ম-কথার এই যে চিত্র ইহা এই দেশাত্মবোধের যুগে জাতির সমক্ষে একটি মহান্ আদর্শ স্বরূপ। গীতা কেবল ধর্ম্ম নয়, কর্ম্মেরও যে প্রকৃষ্ট প্ররোচক তাহা অনেকেই জানেন, কিন্তু এমন জীবন্ত ভাবে জানার সুযোগ তাঁহারা হারাইবেন না, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বাংলার নব রত্ন—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু। গোল্‌ডকুইন্ এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। আট আনা।

যে নয় জন বিখ্যাত বাঙালী শিক্ষাবিস্তার দ্বারা বাংলা দেশকে অগ্রসর করাইয়াছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। আলোচনা সুবিন্যস্ত ও সুরচিত নহে।

নভোরেণু—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। আট আনা।

যতীন্দ্রপ্রসাদ আধুনিক প্রসিদ্ধ কবিগণের অন্যতম। বিচিত্র ছন্দগঠনে ও স্বচ্ছন্দ সরল অভিব্যক্তি-গুণে তিনি পাঠক-সমাজের মন আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি কেবল প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ উপলব্ধি ও অঙ্কন করিয়া ক্ষান্ত নন। বাঙালীর ঘরের খুঁটিনাটি জীবন-কথা, দেশনায়কগণের প্রশস্তি ও বর্ত্তমানের দেশহিতমূলক নানা আন্দোলন তাঁহার কাব্যগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কবিতা মোটেই অস্পষ্ট নহে, ইহা তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব। গ্রন্থখানি বিশেষ আদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বাদশাহ বাবর—মৌলভী ইব্রাহীম খান। প্রকাশক ইসলামিয়া আর্ট প্রেস, ১৩৮ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। আট আনা।

বাবর একদিকে যেমন অসাধারণ যোদ্ধা ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, অন্য দিকে আবার তিনি অতি উচ্চহৃদয় দয়ালু পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অধ্যবসায়ী পরিশ্রমী বাদশাহও বিরল। বহু নৈরাশ্য ও অকৃতকার্য্যতার মধ্য দিয়া তিনি অদম্য শক্তিতে উন্নতিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বিশেষ শিক্ষণীয়। আলোচ্য পুস্তকে বহু প্রাচীন উপাদান-সহযোগে বাবরের জীবনচরিত গঠিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এরূপ সুলিখিত বাবর-চরিত বোধ হয় অল্পই আছে। এই মহৎ-জীবন-কথা বহুল প্রচারিত হইলে দেশের উপকার হইবে।

প্রাথমিক ভূগোল-পাঠ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। ম্যাক্‌মিলান্ এণ্ড কোং লিঃ, ২৯৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

লেখক মহাশয়ের রচিত ভূগোল বাঙালী ছেলেমেয়েদের আদরের বস্তু। আলোচ্য ভূগোল-পাঠ "শিক্ষাবিভাগের পরিবর্ত্তিত নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য সূচী অনুসারে" রচিত। সুতরাং ইহা বালকবালিকদের সম্পূর্ণ উপযোগী। পুস্তকটির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বিদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের জ্ঞাতব্য বিষয় অধিকতর সংযোজিত হইয়াছে; এবং এমন অনেকগুলি সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় চিত্র দেওয়া হইয়াছে যাহা সাধারণ ভূগোল পাঠে পাওয়া যায় না, অথচ যাহা বালক-বালিকাদের সমক্ষে ধরা উচিত। এই সুরচিত পুস্তকের প্রচার হইলে বালকবালিকাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে।

বিধবা বিবাহ—মহাত্মা গান্ধী লিখিত ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত। তরুণ সাহিত্য মন্দির, ১৯ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা। দশ পয়সা।

করুণা ও ত্যাগের মূর্ত্তি মহাত্মা গান্ধী ভারতের অল্পবয়স্কা বিধবাদের জন্য দুঃখ বোধ করিয়া তাঁহাদের ক্লেশমুক্তির জন্য যে সব চিন্তা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নবজীবন ও ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রে বহু প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে সেই প্রবন্ধগুলির একত্রিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বিধবাদের দুঃখমোচনের জন্য যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন এই সারবান যুক্তিপূর্ণ পুস্তক তাঁহাদের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরূপ-সনাতন—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, রাঁচি। বারো আনা।

বাংলা দেশের দুই সাধু পুরুষ রূপ ও সনাতনের জীবনচরিত পরম শিক্ষণীয়। আলোচ্য পুস্তকে এই দুই মহৎ ব্যক্তির জীবন-কথা নাটকাকারে বর্ণিত হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রণ মন্দ হয় নাই; কিন্তু নাটক হিসাবে বইটি সফল হয় নাই।

গোধূলি—শ্রীনিরুপমা দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা বারো আনা।

এই বিখ্যাত লেখিকার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ধূপ" কাব্যামোদীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। আলোচ্য কাব্যখানিতে অনেকগুলি কবিতা ও কয়েকটি গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেগুলির দুইটি প্রধান সুর অত্যন্ত প্রবল ভাবে চিত্ত অধিকার করে। প্রথম, লেখিকার স্বচ্ছন্দ ও সহজ প্রেম ব্যাহত ও আহত হইয়া তীক্ষ্ণ বেদনায় শায়কবিদ্ধ পক্ষীর মত কাতর ও করুণ হইয়া উঠিয়াছে, এবং সে কাতরতা ও করুণতা এক অপূর্ব্ব আত্মসংযম ও অপূর্ব্ব আত্মনিবেদনের শান্তির মধ্যে প্রগাঢ় হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়, তাঁহার বেদনাবিধুর-হাতুর চিত্ত সকলব্যথাহারী ভগবানের করুণার মধ্যে নিমজ্জিত হইতে

চাহিতেছে। এই দুই বিশেষ ভাব ব্যঞ্জক ছাড়া প্রকৃতির রূপবর্ণনা-পূর্ণ কয়েকটি কবিতাও আছে। তবে সেগুলির মধ্যেও ঐ দুইটি প্রধান সুরের রেশ পাওয়া যায়। কাব্যখানি সংযত বেদনার একটি অপূর্ব্ব চিত্র। আধুনিক কালের মহিলা কবিদের মধ্যে এই লেখিকার স্থান অনেক উচ্চে।

গ্রন্থখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে। বইখানি ভালো বলিয়া ইহার দুই একটি সামান্য ত্রুটিও চোখে লাগে। গ্রন্থখানির দুই এক জায়গায় কিছু ছন্দের দোষ পাইলাম; দুই চারিটি ছাপার ভুলও চোখে পড়িল; এবং কয়েক স্থলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট মনে হইল।

কন্যার প্রতি উপদেশ—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ, ৩৮ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা। এক টাকা।

"বঙ্গ-মহিলাদিগের গার্হস্থ্য-জীবনের উপযোগী প্রবন্ধাবলী" এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নারী কি করিয়া সুখময়, শৃঙ্খলাপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ও ধর্ম্মময় জীবন যাপন করিতে পারেন সে-সম্বন্ধে বহু উপদেশ ইহাতে আছে।

বিপ্লবের আহুতি—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত। তরুণ সাহিত্য মন্দির, ১৯ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা। এক টাকা।

"মনীষী টলষ্টয় লিখিত What for এবং The Divine and the Human or Three More Deaths নামক দুইটি গল্পের অনুবাদ" এই পুস্তকে আছে। অনুবাদ ভাল হইয়াছে। আমাদের দেশাত্মবোধক গ্রন্থমালায় বইখানি বিশেষ স্থান অধিকার করিবে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

আকাশ-গঙ্গা—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

গ্রন্থকার নবীন কবি। মাসিক পত্রে তাঁহার কবিতার সহিত আমাদের বহুবার পরিচয় ঘটিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। পুস্তকখানি তাঁহার কবিখ্যাতি অর্জ্জনে সহায়তা করিবে, সন্দেহ নাই।

দু-ভাই—শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক। প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬৬ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

"যাঁহারা গল্পের অনুরাগী, তাঁহারা যাহাতে কথার ছলে সুশিক্ষা পান, পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারেন, সামাজিক দোষ দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হন, সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে।" বইটি আমাদের মন্দ লাগিল না।

বসুধারা—শ্রীনরেন্দ্র দেব। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

গ্রন্থকার বহু পূর্ব্বেই কাব্যসাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে তাঁহার চল্লিশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—প্রেম বিষয়ক, প্রশস্তিমূলক ও কথা জাতীয়। এই তিন বিষয়ের মধ্যে প্রেমমূলক কবিতাগুলি কাব্যে বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। কবির যিনি অন্তরবন্দিতা বাঞ্ছিতা তাঁহার সহিত কবির মিলনের অনেক অন্তরায়। উষা ও সন্ধ্যা, দিবস ও রাত্রি, বর্ষা ও শরৎ এবং সর্ব্বোপরি বসন্ত, তাহাদের বিচিত্র শোভা, বিচিত্র আনন্দ, বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও চঞ্চলতা লইয়া কবি-প্রিয়ার চিত্তকে মিলনাকুল করিতে পারিল না, তাহারা বৃথাই তাঁহার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া গেল। বিহ্বল-ব্যাকুল, উদ্দাম-প্রবল গতিতে কবির প্রেম বর্ষার স্রোতস্বিনীর মত প্রিয়ার উদ্দেশে ছুটিয়াছে; কিন্তু তাহার সকল সন্ধান বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়। এই প্রেম-ব্যাকুলতা, "মৃত্যু-অভিসার" নামক কবিতায় অপূর্ব্ব অভিব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। প্রেমাবেশের একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ রূপ, এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম দ্বাদশটি কবিতার মধ্যে, অত্যন্ত চিত্তোতোষক ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাগুলি এত সহজ ও সুন্দর যে, ইহারাই গ্রন্থখানিকে বিশিষ্ট রূপ দিয়াছে। বাকী কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি স্থানে স্থানে একটু দীর্ঘ মনে হইলেও ভাবগুরুত্বে যথেষ্ট আনন্দ দান করে।

গ্রন্থখানির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সন্নিবিষ্ট শিল্পী দেবীপ্রসাদের দুইখানি চিত্র ছাড়া অপর ছবিগুলি ভাল হয় নাই। দুই এক জায়গায় ছন্দবিচ্যুতি ও ছাপার ভুল চোখে পড়িল।

গুপ্ত

নির্ম্মাল্য—শ্রীদেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি এল। প্রকাশক শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র, ৪।৪ এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ॥০, পৃঃ ৪২। ১৩৩৫

কবিতার বই। লেখক তাঁহার এই প্রথম রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কবিতাগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

গীতায় মুক্তিবাদ—শ্রীঅমরীকান্ত কাব্যতীর্থ। প্রথম খণ্ড, মূল্য ১।০ টাকা।

ইহাতে গীতার নূতন ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। ইহা কেমন হইয়াছে পাঠকেরা নিম্নলিখিত কয় পঙ্‌ক্তি পড়িলে নিজেই বুঝিতে পারিবেন। প্রথম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক "ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ" ইত্যাদির ব্যাখ্যায় লেখা গিয়াছে:—"পক্ষান্তরে ভবান্ শব্দটি এই সকল বীরগণের বিশেষণরূপে কল্পিত। ভূ ধাতুর মানে জন্ম। সুতরাং ভবান্ মানে জনমশালী অর্থাৎ কর্ম্মী। এই সকল বীরগণ জন্তু পদার্থ। কর্ম্ম দিয়ে তৈয়ারী, কর্ম্মীর জনক জ্ঞানী ভবান্‌টি কর্ম্মপদ রূপে ব্যবহৃত। * * কর্ণ মানে শ্রবণেন্দ্রিয়। অথবা কর্ণ মানে কানা, এক চক্ষু বিহীন। * *।"

বর্ত্তমান খণ্ডে কেবল প্রথম অধ্যায় পর্য্যন্ত আছে। ইহার পরবর্ত্তী অংশ ছাপা না হইলেই লেখক ও পাঠক উভয়েরই অপকার হইবে না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

স্ত্রী—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক কালীঘাট সঙ্গীত-সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়। দাম ১।০।

পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পটির নামে বহির নামকরণ হইয়াছে। লেখক বাঙলা সাহিত্যে অপরিচিত নহেন—তাঁহার শক্তিও এতদিনে সাধারণের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবার কথা। আমরা তাঁহার এই পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। ভবিষ্যতে লেখকের নিকট হইতে আমরা আরো কিছু লাভ করিবার আশায় রহিলাম।

সুরধুনী—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। প্রকাশক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী-কার্য্যালয়। পৃষ্ঠা ৫১। দাম বার আনা।

ছোট্ট বইখানি 'সুরের সুরধুনী'। যাহা কণ্ঠের বৈচিত্র্যে শ্রোতার পক্ষে পরম আনন্দের উপাদান হয়, তাহার রস পাঠকের পক্ষে গ্রহণ সর্ব্বত্র সহজ নয়। এই গানগুলির মধ্যে একটি সহজ মিষ্টি সুর আছে যাহা পাঠকের প্রাণকেও স্পর্শ করে। আমরা সঙ্গীত-রসিক পাঠকদের এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। ছাপা পরিষ্কার, কাগজ চমৎকার।

কমলাকান্তের পত্র—প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র রায় এম্-এ, চন্দননগর; পৃষ্ঠা ৩১৬। মূল্য দুটাকা চার আনা।

বাঙালীর কাছে কমলাকান্ত নামটি যেন জাদুমন্ত্র। সেই নসীরাম-বাবুর বৈঠকখানা, সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী, সেই খোশ নবীশ জুনিয়র,—সব মনে ভাসিয়া উঠে—আর মনে পড়ে সেই বাঙালীর পলিটিক্স্, সেই 'দুর্গোৎসব', 'একটি গান'। তাই 'কমলাকান্ত' নামের পতাকা উড়াইয়া বাংলা সাহিত্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখিলে আনন্দ হয়, আবার ভয়ও হয়। এ যুগ খোশ নবীশের যুগ, সেই পুরোনো পলিটিক্স চলিয়াছে বটে, কিন্তু কমলাকান্তের স্থান ত' এ যুগে নাই, সেই 'একটি গান' গাহিবার মত, শুনিবার মত শোনাইবার মত লোক আর নাই। তাই কমলাকান্ত নাম দেখিলে ভয় হয়। এই গ্রন্থের লেখক যখন ৩০টি প্রবন্ধ লইয়া প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন সে ভয় অমূলক বুঝিয়া আনন্দ হইয়াছিল। বিদ্রূপের বাণ যে বেদনায় কিরূপ শান দেওয়া চলে চিন্তাশীল লেখক এইখানে তাহাই দেখাইয়াছিলেন, 'কমলাকান্তের' গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। আজ সেই পুরোনো ত্রিশটির সঙ্গে নূতন ২৩টি সংযোজিত করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ লইয়া লেখক আবার উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদর অভিবাদন জানাইতেছি।

নীহারিকা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচী, ১০।১ আরপুলি লেন, কলিকাতা। পৃঃ ১৪৪; দাম একটাকা।

সুকবি বাগচী মহাশয়ের নূতন কবিতার সমষ্টি। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পূজার্থীদের মধ্যে কবির স্থান সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে—তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত বেদনা ও আনন্দ-সরস খণ্ডকবিতাগুলি বঙ্গবাণীর অর্চ্চনার একটি বিশিষ্ট নৈবেদ্য। 'রজনীর উষা দিনের সন্ধ্যা' নীহারিকার অস্পষ্ট অর্দ্ধ-উদ্ভাসিত লোকে কবির সহিত চলিতে চলিতে একটি রহস্য-ময় করুণ ভাবে আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠে,—'পাহাড়িয়া বাঁশী' সেখানে অপূর্ব্ব ধ্বনিলোকের বাণী বহিয়া আনে, তাহার মাঝে মাঝে 'ঝরণা ধারার' নৃত্য-চপল ধ্বনিটুকু মন-প্রাণকে এক-একবার নাচাইয়া তুলে। 'নীহারিকার' কবিকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি—বঙ্গবাণীর জয়ধ্বজা সুদূর নীহারিকাপুঞ্জে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা:—শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো; প্রকাশক শ্রীমানববন্ধু কানুনগো; ১৯ বি চন্দ্রমাধব রোড, কলিকাতা। পৃঃ ৩৫৮; দাম ২॥০ আড়াই টাকা।

এক সময়ে দেশে বিপ্লবের যে একটা প্রয়াস চলিয়াছিল তাহার নাম ছিল, আনার্কি, কন্স্পিরেসি, ইত্যাদি। তারপরে, হঠৎ চাকা ঘুরিয়া গেল,—সেই সময়ের নাম হইয়া গেল 'অগ্নিযুগ,' সে সব কথার নাম হইল 'অগ্নিমন্ত্র,' সে-সব মানুষের নাম হইল 'অগ্নি-সারথী,' ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই যে রোমান্স ও কল্পনার মায়াজাল সেই বিপ্লবের ক্ষীণ প্রয়াসকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের সম্মুখের এই গ্রন্থখানি লইয়া সেই প্রথম অগ্নি-সারথীদেরই একজন সেই সব ধোঁয়াও ও কুয়াসা অপসারিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। হেমবাবুর সাহস দুর্জ্জয়, সত্যনিষ্ঠা গভীর, দৃষ্টি ব্যাপক ও চিন্তাশক্তি সচরাচরের বাঁধাপথ ছাড়িতে ভীত নয়। ফ্যাশান ও ন্যাকামি ছাড়িয়া বিপ্লবকে পৃথিবীর অন্যান্য বিপ্লবের রীতি ও নীতির সঙ্গে মিলাইয়া, তুলনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, কোথায় গলদ জমিয়াছিল, জাতির বস্তুবিমুখ মানসলোককে সত্যকারের বস্তুনিষ্ঠ বিপ্লব প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ না করিয়া অজ্ঞানতা ও হৃদয়াবেগেরই খোরাক জোগাইয়া দূরদৃষ্টিহীন ভাব-বিলাসী অক্ষম বিপ্লবী নেতার দল কিরূপ 'বিপ্লবের' ছেলেখেলা করিয়াছেন। 'লীলাময় নেতা', 'ধোঁয়াময় নেতা', 'ভাবের নেতা', 'আদর্শকর্ম্মী নেতা', 'প্রতিহিংসাপরায়ণ নেতা'—নেতা, উপনেতা, এমনকি চ্যালার দলও—লেখকের এই উদ্ধত iconoclasm সহ্য করিবে না। তথাপি, এই স্পষ্ট-ভাষণের প্রয়োজন আছে—আজও দেশ হইতে এরূপ নেতারা লোপ পান নাই, এবং ইঁহাদের আওতায় বিপ্লব ত সুদূরের কথা, যে-কোনো স্বাধীনতার প্রয়াসই লোপ পাইতে বাধ্য। আমরা লেখককে সাধুবাদ করিতেছি,—দেশ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠায় উপকৃত হইবে।

মণিকাঞ্চন—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক ডি-এম লাইব্রেরী। দাম দুই টাকা।

হেমেন্দ্রবাবুর এই নূতন উপন্যাস পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার ভাষায় একটি মাধুর্য্য ও একটি স্বচ্ছন্দ কল্পনাকুশল সৌন্দর্য্য আছে যাহাতে পাঠক মুগ্ধ না হইয়া পারে না। গল্পের আখ্যানভাগও বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্যে গরীয়ান্। বেশ বড় বড় অক্ষর পরিষ্কার ছাপা, সুন্দর বাঁধাই। বইখানি বহুল আদৃত হইবে, আমাদের এইরূপ বিশ্বাস।

ধর্ম্মের কল

শ্রী সীতা দেবী

বাঁড়ুয্যেদের বড়গিন্নী যে হঠাৎ এমন করিয়া যাইবেন, তাহা কেহ ভাবে নাই। বিধবা হইয়া অবধি তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তবু কোনো দিন ঘটা করিয়া শয্যা লইতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। তাঁহার স্বামী, সাহেবী মতে কেবল নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া ঘর করা পছন্দ করিতেন না। গোড়া হইতে, তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তিনভাই একই সঙ্গে, একই অন্নে ছিলেন। ইহাতে অন্য ভাইদের আপত্তির কোনো কারণ ছিল না, কারণ, অন্নের প্রায় সবটাই জোগাইতেন তিনি। ছোট দুই বউ, বড়গিন্নীর অযথা কর্ত্তৃত্বের জন্য নৈশদরবারে মাঝে মাঝে স্বামীদের কাছে নালিশ করিলেও বিশেষ কোন সাড়া না পাইয়া চুপ করিয়া যাইতেন। বড়গিন্নী জানিতেন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হওয়ার চিন্তাও তাঁহার স্বামীর কাছে অসহ্য, কাজেই হাজার আলাতন হইলেও তিনি সহজে স্বামীর কাছে সে-কথা পাড়িতেন না। প্রথম যৌবনে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা অপেক্ষাকৃত কম থাকার দিনে, দু-একবার এই ভুল যে তিনি করেন নাই, তাহা নয়, কিন্তু স্বামীর ঔদাসীন্য তাঁহাকে বড়ই আঘাত করিয়াছিল। তাঁহার সকল অসুবিধা, অপমান যে এই ক্ষেত্রে স্বামী উপেক্ষা করিবেন, ভাইরা যে স্ত্রীর অপেক্ষা তাঁর কাছে প্রিয়তর, একথা ভাল করিয়া বুঝিবার পর আর কোনো দিন নিজের কোনো দুঃখের কথা তিনি প্রকাশ করেন নাই। দুর্জ্জয় অভিমানের বর্ম্মে, নিজের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে আবৃত করিয়া নীরবে তিনি সংসারের পথে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দিনগুলি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহার স্বামী নরেশবাবু অল্পদিনমাত্র আগে মারা গিয়াছিলেন। স্ত্রীর মনের কথা তিনি যে না বুঝিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না; কারণ, তাঁহার আর যে-দোষই থাক বুদ্ধি যে ছিল না তাহা তাঁহার শত্রুতেও কোনো দিন বলে নাই। কিন্তু এবিষয়ে স্ত্রী আর কোনো কথা না বলার দরুণই তিনি বোধ হয় আর-কিছু করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অতিরিক্ত অসুবিধা হইলে যে-কোনো স্ত্রীলোক নীরবে তাহা সহ্য করিতে পারে, বাঙালীর সন্তান নরেশবাবু তাহা ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। সুতরাং দিন একইভাবে চলিতেছিল।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের মায়া কাটাইয়া যাইবার দিন যখন আসিল তখন অসুখের মধ্যেও তিনি নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই ইহাদের অনেক ঘা খাইতে হইয়াছে, তাঁহার অবর্ত্তমানে যে এ সংসারে তাহাদের পায়ে পদে-পদে কাঁটা ফুটিবে তাহা হঠাৎ যেন তিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন।

সেদিন অবস্থা বড়ই খারাপ যাইতেছে। একজন ডাক্তার বাড়ীতেই বসিয়া, আর একজন ঘন ঘন আসা-যাওয়া করিতেছেন। নরেশচন্দ্র হঠাৎ মেজভাই বীরেশকে বলিলেন, "তোমার বউঠাকুরুণকে একবার ডেকে দাও ত!"

বীরেশ উঠিয়া গেলেন, তাঁহার মুখটা একটু বিকৃত দেখা গেল। দাদার যে এবার টেঁকা ভার, তাহা বুঝিতে ভাইদের দেরী হয় নাই। রোগের মধ্যে ঝোঁকের মাথায় কিছু-একটা করিয়া বসিয়া, পাছে দাদা উপযুক্ত ভাইদের সপরিবারে পথে বসাইয়া যান এ ভয় তাঁহাদের যথেষ্টই ছিল। সুতরাং এ কয় দিন দাদাকে বউঠাকুরাণীর হাত হইতে তাঁহারা সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিতেছিলেন। বড়ছেলে দেবেশও পিতার কাছে বড় একটা ঠাঁই পাইতেছিল না। মেয়ে চপলা কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইতেছিল, তাহাকে কাকাদের বিশেষ ভয় ছিল না। তাহাছাড়া চপলা মেয়ে, তাহার বিবাহও হইয়া গিয়াছে। ছোট ছেলে খোকার বয়স অল্প, স্কুলে পড়ে; সে একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়।

অল্পক্ষণ পরেই বড়গিন্নী বিরজা ধীর পদে ঘরে আসিয়া

প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ গভীর বিষাদে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু কোথাও উত্তেজনার কোনো চিহ্ন নাই। পরণের শাড়ীর লাল চওড়া পাড়, সিঁথির সিন্দুর যেন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখার মত প্রখর জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া স্বামীর বিছানার একপাশে বসিলেন।

ঘরে যে-ডাক্তারটি বসিয়াছিল, সে তাঁহাকে ঢুকিতে দেখিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অগত্যা বীরেশকেও বাহির হইয়া যাইতে হইল।

নরেশ বিরজার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনেকক্ষণ হ'ল তোমায় দেখিনি, কি কর্‌ছিলে?"

বিরজা বলিলেন, "অনেক বাইরের লোক ছিল ব'লে আস্‌তে পারিনি। তোমার খাবার সব তৈরি ক'রে রাখছিলাম। ঠাকুর ঠিক মত করতে পারে না।"

নরেশের হাতে তাঁহার একটি হাত ছিল, অন্য হাত দিয়া তিনি পাখাখানা উঠাইয়া লইয়া হাওয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। নরেশ বলিলেন, "থাক্‌, দরকার নেই, জান্‌লা দিয়ে বেশ হাওয়া আস্‌ছে। দিনের ভিতর পাঁচ মিনিট সময় ত কখনও তোমায় বিশ্রাম করতে দেখিনি।"

বিরজা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তা করব না কেন? তুমি কি আর সারাদিন আমায় দেখ? কতদিন দুপুরে একেবারে কাজ থাকে না।"

নরেশ বলিলেন, "যাক, তোমায় একটু কাজের জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। এতদিন একরকম ক'রে চ'লে গেছে। তোমার কষ্ট হ'ত জেনেও কোনো উপায় করতে পারিনি। মাকে কথা দিয়েছিলাম ভাইগুলোকে দেখ্‌ব। বড় বেশী দেখেছি। এত অপদার্থ হ'য়ে উঠেছে যে, কোনোদিনই নিজের ভার নিজে নিতে পার্‌বে না। অথচ লেখাপড়াও ত শিখিয়েছি হতভাগাদের। কিন্তু তোমায় ওদের হাতে ফেলে যাব না, তুমি সইতে পার্‌বে না। বল ত সব ব্যবস্থা আলাদা ক'রে যাই।"

বিরজার বুক ফাটিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এখন আর তাঁহার জন্য এ সব আয়োজন ব্যবস্থা কেন? সারাজীবনই ত তাঁহার কাঁটা মাড়াইয়া কাটিয়া গেল, এখন খেয়াঘাটের মুখে আসিয়া পৌঁছিয়া এ কুসুমশয্যার উদ্যোগ কেন? আর ক'টা দিনই বা তাঁহার বাকি?

স্বামী উত্তরের অপেক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন দেখিয়া তিনি বলিলেন, "থাক, দরকার নেই। এখন ওসব ভেবো না। তুমি ভাল হ'য়ে উঠ, যেমন সংসার চল্‌ছিল, তাই চল্‌বে।"

নরেশ বলিলেন, "নিজেকে বৃথা প্রবোধ দিয়ে কি হ'বে, বড় বৌ? আমার দিন ফুরিয়েছে। অনেক দুঃখ এ বাড়ীতে এসে পেয়েছ, ভগবানও মহাদুঃখ দেবার আয়োজন করছেন। তাই যতটা সুবিধা পারি, ক'রে দিয়ে যেতে চাচ্ছি।"

বিরজার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তিনি ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবান যদি তাই অদৃষ্টে লিখে থাকেন, তাই হ'বে। কিন্তু সে শাস্তি যদি বইতে পারি, আর সুখও বইতে পারব। তুমি আমার জন্যে ভেবো না। ঠাকুরপোরা মনে দুঃখ পাবে, অন্য ব্যবস্থার দরকার নেই।"

ইহকালে যিনি তাঁহার সুখ-দুঃখের কোনোটাই গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই, আজ এখানের পালা চুকাইয়া যাইবার সময় তাঁহার হাত হইতে এই করুণার দান গ্রহণ করিতেও বিরজার অভিমানে বাধিল। প্রয়োজন কি? যদি স্বামীকে হারাইয়াও তিনি বাঁচিয়া থাকেন, তখন অন্য জ্বালাযন্ত্রণার কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর হইবে না।

এমন সময় দুই দেবর দুই ডাক্তার লইয়া ঘরে প্রবেশ করায় তাঁহাদের কথা বন্ধ করিতে হইল। বিরজা উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ডাক্তারেরা বিশেষ কিছুই ভরসা দিতে পারিলেন না। ভাইদের মুখ দেখিয়া সে-কথা জানিতেও নরেশচন্দ্রের বাকি রহিল না। ডাক্তারেরা বিদায় হইবার পরই তিনি উকীল ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভাইদের অন্ধকার মুখ আর এক পোঁচ বেশী অন্ধকার হইয়া উঠিল।

ইহার পর মাত্র আর তিনটা দিন কোনো গতিকে কাটিল। চারদিনের দিন, সকলের কাছে বিদায় লইয়া, জ্যেষ্ঠপুত্রের হাতে বিগতচেতনা পত্নীকে সমর্পণ করিয়া নরেশ এতদিনের ঘরসংসারের বন্ধন ছেদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

মৃতদেহ বাহির করিয়া লইয়া যাইবার সময় দেবেশ

সঙ্গে গেল, তাহার ছোট-কাকাও গেলেন। বিরজার কাছে তাঁহার পুত্রকন্যা রহিল। ছোট দুই জা, এক এক বার উঁকি মারিয়া নিজের নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেন।

বীরেশ নিজের ঘরে খাটের উপর লম্বা হইয়া শুইয়াছিলেন। তাঁহার মুখ চোখ সব লাল, চুল পাগলের মত বিপর্য্যস্ত। দাদা মারা যাওয়ায় তাঁহার আঘাত লাগে নাই, একথা বলা যায় না, কারণ, যতই স্বার্থপর নীচাশয় হউন, তিনি মানুষ ত বটে? নরেশ শুধু তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ছিলেন না, পিতার অধিক যত্নে তাঁহাদের এতদিন ভরণপোষণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যতই আঘাত লাগুক, নিজের গণ্ডা ভুলিয়া যাইবার মানুষ তিনি ছিলেন না। তাহার উপর উপযুক্ত পত্নী সন্তোষিণী ছিলেন।

গৃহিণী ঘরে ঢুকিতেই কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, ওদিককার খবর কি?"

সন্তোষিণী বলিলেন, "কি জানি বাপু, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ওসব ধর্ম্মিষ্ঠী বিদুষীদের রকম-সকম বুঝি না। অমন যে স্বামী গেল তাতেও মুখ দিয়ে একটা কান্নার রব বেরল না। আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে, ঘাপ্‌টি মেরে শুয়ে আছে। চপলাটার হাজার হ'লেও বাপ গেছে, সে মাথামোড় খুঁড়ে কাঁদ্‌ছে। খোকাটা জানলার পাশে ব'সে আছে।"

বীরেশ শুধু বলিলেন, "হুঁ।"

মেজবৌ বলিয়া চলিলেন, "কাঁদ্‌বেই বা কেন? স্বামী থেকে ত ওর সুখ ছিল না, নিজের ইচ্ছামত কিছুই করতে পারেনি, আমরা তার বুকে পাথরের মত চেপে আছি। বার কর্‌তে পারেনি ত এতদিন? কেমন মহাদেব-তুল্য মানুষ ছিলেন, বড়ঠাকুর? কেউ বলবে না যে, স্ত্রীর কথায় ভাইদের পর ক'রে দিয়েছে। কিন্তু মর্‌বার সময় কি যে মতিভ্রম হ'ল জানি না। সবই কি শেষে ঐ রাকুসে মাগীর নামেই লিখে দিয়ে গেলেন? ও ত তাহ'লে কাল সকাল হ'তেই আমাদের এক কাপড়ে রাস্তায় বার ক'রে দেবে।"

বীরেশ বলিলেন, "থাক্, যা ঠিক জান না, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর হ'বে কি? এখন শ্রাদ্ধটা না হ'য়ে যাওয়া পর্য্যন্ত নূতন উইল খোলাও হ'বে না, ব্যবস্থাও কিছু বদ্‌লাবে না। একমাস এখনও সময় আছে। তারপর যা করেন ভগবান। বাড়ীটা যেন শ্মশান হ'য়ে গেল। একটা লোকের অভাবে সব যেন খাঁ খাঁ কর্‌ছে।"

সন্তোষিণী স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে বসিলেন। "কি আর করবে বল? সংসারের গতিকই এই, আজ আছে কাল নেই? কতক্ষণে যে ওরা ঘাট থেকে ফির্‌বে জানি না। সেই সকালে দুটো মুখে দিয়েছ, এখন অবধি ত পিত্তি চুঁইয়ে ব'সে আছ। একটু সরবৎ ক'রে আন্‌ব?"

বীরেশ বলিলেন, "থাক, স্নানটান করি আগে। গুপিটা গেল কোথায়? ঘাটে গেছে না কি?"

পত্নী বলিলেন, "হ্যাঁ, আর সবাই গেল, তুমি গেলে না, এই নিয়ে কত ঘোঁট হ'বে হয়ত।"

বীরেশ বলিলেন, "কি কর্‌ব বল? শরীরে না সইলে ত আর কিছু কর্‌তে পারি না।"

এই একটা মাস সকলের দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। নূতন উইলে কি যে আছে তাহা না জানায় বীরেশ, গোপীনাথ এবং তাঁহাদের গৃহিণীরা বড়ই বিপদে পড়িয়া গেলেন। বড়গিন্নীকে একেবারেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবেন, না বেশী করিয়া তাঁহার মন জোগাইয়া চলিবেন, কিছুই তাঁহারা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। বড়গিন্নীর চলনধরণ হইতেও উইলের গতিক তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। তিনি ঘর হইতে বাহিরও হন না, কাহারও সঙ্গে কথাও বলেন না; মেজবৌ অগত্যা কোনো রকমে সংসার চালান। দাদার নূতন উইল করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল, এবং সেটা শ্রাদ্ধের সময় পর্য্যন্ত লুকাইয়া রাখিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল, ভাবিয়া তাঁহার ভাইরা অস্থির হইয়া উঠিল।

শ্রাদ্ধের দিন আসিয়া পড়িল। কিন্তু কে যে বাড়ীর কর্ত্তা তাহারই ঠিকানা নাই! ব্যবস্থা করে কে? দেবেশ আর থাকিতে না পারিয়া তাহার মেজকাকার কাছে গিয়া বলিল, "কোনো আয়োজন ত হচ্ছে না, শেষে বাবার শ্রাদ্ধটা পর্য্যন্ত হ'বে না নাকি?"

বীরেশ তখন দশবারোরকম ফল, কুলারি মিষ্টান্ন সহযোগে জলযোগ সারিতেছিলেন। দুবাটি ঘনদুধ, এবং

দুতিন রকম সরবৎও সাজান। দাদার শোকে মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ, তাই বলিয়া মহাপ্রাণীকে কষ্ট দিবার মানুষ বীরেশ ছিলেন না। কোনোরকমে পোষাইয়া লইতেন। আহারে রুচি নাই, মন বড় খারাপ। কাজেই সন্তোষিণীর প্রসাদ পাইবার মতও যথেষ্ট বাকি থাকিত।

সন্তোষিণী কাছে বসিয়া মাছি তাড়াইতেছিলেন, বীরেশ উত্তর দিবার আগেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তা বাবা, মেজকাকাকে দোষ দিলে চল্‌বে কেন? ওঁর উপরত কেউ ভার দেয়নি। তাহ'লে অবিশ্যি বুক দিয়ে প'ড়ে কর্‌তেন। এখন যদি গায়ে প'ড়ে কর্‌তে যান,—পরে কৈফিয়ৎ দেবেন কার কাছে? এখন কি আর তাঁর দাদা বেঁচে আছেন তাল সাম্‌লাতে? শেষে কি চুরির দায়ে বুড়ো বয়সে জেল খাট্‌তে যাবেন?"

মেজ-কাকীমার সুমধুর বাক্যে দেবেশের চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "থাক্, তাহ'লে আপনাদের কারো কিছু ক'রে কাজ নেই, আমিই যা পারি কর্‌ব" বলিয়া চলিয়া গেল।

সন্তোষিণী বলিলেন, "অনাছিষ্টির রাগ, বাবু। নিজেদের ভালমন্দও মানুষে দেখবে না না কি?"

বীরেশ বলিলেন, "অত বক্তৃতা না কর্‌লেও পার্‌তে। বড় ঠাকরুণ সম্বন্ধে এখন কোনো কথা বল্‌তে যাওয়াই ভুল। হয় ত এর পর তাঁর হাত তোলা খেয়েই থাক্‌তে হ'বে।"

সন্তোষিণী অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেলেন। স্বামী-সেবা ত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি ছোটবৌএর সন্ধানে চলিয়া গেলেন।

দেবেশ মায়ের শয়নকক্ষে গিয়া ঢুকিল। প্রকাণ্ড কাজ করা কালো বার্ণিশের পালঙ্ক আজ শূন্য পড়িয়া আছে। মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া একখানা আধময়লা চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া তাহার মা শুইয়াছিলেন। চপলা এক কোণে বসিয়া স্বামীকে চিঠি লিখিতেছিল।

দেবেশ বলিল, "মা, তুমি যদি না ওঠ, তা হ'লে কিন্তু বাবার শ্রাদ্ধ শুদ্ধ হ'বে না। কাকাদের যা রকম দেখছি তাঁরা কিছুই করবেন না। আমি ত কিছুই জানি না, এমন কি টাকাকড়ির দরকার হ'লে কোথায় কার কাছে চাইতে হ'বে তা শুদ্ধ আমার জানা নেই।"

বিরজা উঠিয়া বসিলেন। একমাসের ভিতর তাঁহার চেহারা এমন হইয়া গিয়াছে যে, এক বৎসর রোগভোগ করিলেও সাধারণতঃ ততটা হয় কি না সন্দেহ। জানালা দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের আলো তাহাঁর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে, রুক্ষ চুলের উপর আসিয়া পড়িল।

ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কাকাদের কাছে গিয়েছিলি না কি?"

"মেজ-কাকার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি যেন কথা বল্‌তেই ভুলে গেছেন। মেজ-কাকীমা তাঁর হ'য়ে লম্বা এক বক্তৃতা দিলেন।"

বিরজা বলিলেন, "তা ত কর্‌বেনই। ঐ শিক্ষা চিরকাল পেয়েছেন কি না? যাক্, কারো কাছে গিয়ে কাজ নেই। যা পারি, আমিই ব্যবস্থা কর্‌ব। তুই একবার সরকার মশায়কে ডেকে দে।"

সন্ধ্যা হইবার আগেই, শ্রাদ্ধের সময় স্থির, চিঠি ছাপিতে দেওয়া, নিমন্ত্রিতের নামের তালিকা করা প্রভৃতি খানিকটা করিয়া করা হইয়া গেল। টাকা-কড়ির ব্যবস্থাও উকীল্ বাবুর পরামর্শ মত সকালে করা হইবে। তাঁহাকে খবর দেওয়া হইল, তিনি যেন সকালে আসিয়া বিরজার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন।

বিরজাকে এতগুলি দিন যেন অশান্তি ও শোকের আগুনে তিলে তিলে পুড়িয়া কাটাইতে হইয়াছিল। আজ আবার কাজের আসরে নামিয়া, তিনি যেন একটু শান্তি অনুভব করিলেন। দেবেশ মনে মনে রাগে-আক্রোশে গর্জ্জন করিতেছিল। কাকাদের কোনো পরামর্শ না লওয়া এবং কোনো কিছুর মধ্যে না ডাকাই সে স্থির করিয়া ফেলিল।

মাকে বলিল, "মা, দেখ, বাইরের দিক আমি, খোকা, সরকার মশায় যেমন ক'রে পারি দেখব। ভিতরেও তুমি কাকীমাদের হাতে কোনো ভার দিও না; তুমি আর খুকী যা পার করবে, না হয় মাসীমাকে আনিয়ে নিও।"

বিরজা বলিলেন, "বাবা, ওরা শত্রুতা চিরকাল করেছে

যত দিন পারবে, করবেও। আমি তোর রাগ করা অন্যায় বলছি না, তাদের ক্ষমা করতেও বলছি না। কিন্তু ওঁর শ্রাদ্ধে তাদের বাদ দেওয়া কি উচিত হ'বে? এই ভাইদের জন্যে উনি নিজের স্ত্রী-পুত্রের দিকে শুদ্ধ তাকাননি, তাদের এখন সব থেকে বিদায় করলে ওঁর আত্মা শান্তি পাবে না। পরে যা হয় কোরো।"

দেবেশ মায়ের উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল। চপলা বলিল, "মা, বাবা ওপারে গিয়েও কি আর ওঁদের চেনেন নি? বেঁচে থাকতে চোখে ধুলো ওরা খুব দিয়েছে, কিন্তু এখন আর পারবে না।"

ছোটগিন্নী কোথা দিয়া আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথা শুনিয়া গেলেন। সন্তোষিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনছ গো মেজদি, আমাদের বিদায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। মা ছেলে মেয়ে সবাই মিলে মিটিং হচ্ছে গো। শ্রাদ্ধে আমাদের ডাকা-টাকা হ'বে না।"

মেজদি গলাটা একটু নীচু করিয়া বলিলেন, "না ডাকুক, ত বয়েই গেল! খাটন'-খাটতে হ'বে না ভালই।"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "সে যেন হ'ল। কিন্তু এমন মেজাজ দেখাতে যখন ভরসা করছে, তখন কি আর তলে তলে জোর নেই? উইলের কথা ও সব জানে, চং ক'রে চুপ ক'রে আছে।"

সন্তোষিণী বলিলেন, "কি আর কথা? বড় ঠাকুরের মরবার সময় কি যে দুর্বুদ্ধি হয়েছিল জানি না। ছেলেদের নামে যদি দিতেন তাও বুঝতাম। সব ছেড়ে শেষে স্ত্রীই হ'ল তাঁর আপন। যাক্ ভেবে আর কি করব? অদৃষ্টে দুঃখ থাকলে সইতে হ'বে।"

শ্রাদ্ধের দিন আসিয়া পড়িল। দেবেশের আপত্তি সত্ত্বেও বিরজা দেওর এবং জাদের বাদ দিতে রাজী হইলেন না। তাঁহাদের ডাকা হইল। সকলে পরম গম্ভীর মুখে অভ্যাগতের মত আসিয়া, বসিয়া খাইয়া, বিদায় হইলেন। ছেলেমেয়েগুলি অবশ্য অত বুদ্ধি ধরিত না, তাহারা যথারীতি কোলাহল করিয়া সব কিছুতে যোগ দিল।

বিরজার ছোট ছেলে যোগেশ বলিল, "মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আমার কাকাদেরই শ্রাদ্ধ হচ্ছে।"

চপলা বলিল, "একরকম শ্রাদ্ধ বই আর কি? ব'সে ব'সে খাওয়ার আর পরের অনিষ্ট চিন্তা করার ত শ্রাদ্ধ হ'ল?"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। অতিথি অভ্যাগত প্রায় বিদায় হইয়া গিয়াছে। চাকর বাকরে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র গোছাইতে এবং স্তূপাকার আবর্জ্জনা সাফ করিতে ব্যস্ত। মেজকর্ত্তার ঘরের দরজা ভেজান, ছোটকর্ত্তা গোপীনাথ বাহির হইয়া গিয়াছেন। বিরজা শুইয়া পড়িয়াছিলেন। ছেলেমেয়েরা তাঁহার চারিধারে নীরবে বসিয়া ছিল।

হঠাৎ চপলা বলিল, "কাল উইল পড়া হ'য়ে গেলে বাঁচি। এ যেন জলেও নেই ডাঙ্গায়ও নেই।"

দেবেশ বলিল, 'আমাদের ভয় করবার কিছু নেই রে। বি-এ, পাশ ত করেছি, বাবার বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে কিছু একটাতে ঢুকে পড়ব। খোকার পড়ানোর এক খরচ, তা ছাড়া আমাদের খরচ কি? তোর বিয়েটা ভাগ্যে বাবা দিয়ে গিয়েছিলেন।"

চপলার বেশ বড় ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল। সে একটু গর্ব্বের সঙ্গেই বলিল, "খোকার পড়ার ভার রইল আমার উপর, তোমরা যদি অমত না কর।"

বিরজা বলিলেন, "থাক্ মা, ও সব ভাবনায় এখন কাজ নেই। যাঁর কাজ তিনি কি আর ব্যবস্থা না ক'রে গিয়েছেন? সারাদিন খেটে-খুটেছিস্, এখন যে যার শুয়ে পড়গে না।"

দেবেশ ও যোগেশ নিজেদের ঘরে চলিয়া গেল। চপলা একগাছি দার্জ্জিলিংএর ঝাঁটা আনিয়া ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল। বিধবা হওয়ার পর বিরজা আর চাকর-বাকরের হাতের কোনো কাজ নিতেন না।

ঝাঁট দেওয়া হইয়া গেলে, চপলা বিছানা পাতিতে বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আজ একটা তোষক পেতে দি? তোমার অভ্যেস নেই, গায়ে ব্যথা হ'য়ে যাবে। আজ দিলে দোষ নেই।"

বিরজা বলিলেন, "না মা, তোষক-টোসকের দরকার আমার এ জন্মের মত ঘুচে গেছে। আমার সব সইবে এখন। ঐ ভুটিয়া কম্বলটা পেতে, একটা বালিশ দিয়ে যা।

তুই আর দেরি করিস্‌নে, দেখ গিয়ে, জামাই কিছু চায়-টায় না কি। অনেক বেলায় খেয়েছে, তবু দুধ-মিষ্টি একটু দিস্। এই নে ভাঁড়ারের চাবি।"

চপলা একটু লজ্জিতভাবে চলিয়া গেল। তাহার স্বামী কাল সন্ধ্যায় আসিয়াছে, তবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিতান্ত চোখের দেখা ছাড়া, একটা কথা বলিবার সুযোগও তাহাদের হয় নাই। তাহার মন আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শোকার্ত্তা মাতাকে ফেলিয়া স্বামী-সন্দর্শনে যাত্রা করিতেও সে কুণ্ঠিত হইতেছিল। এতক্ষণে মা নিজেই তাহাকে যাইতে বলায় সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রাত্রিটা তাহার এই শোকের আবছায়াতে ও আনন্দে কাটিয়া গেল। কিন্তু এই তরুণ দম্পতিটি ছাড়া এই প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে অতি অল্প লোকেই সে-রাত্রে নিদ্রার শান্তি উপভোগ করিতে পারিল। নিতান্ত শিশু ভিন্ন সকলেরই রাত্রে দারুণ উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। সকালেই তাহাদের ভাগ্য পরীক্ষা।

সকালে উঠিয়া ছোট দুই বৌ মহোৎসাহে ঠাকুরঘরের কাজে লাগিয়া গেলেন। ঠাকুরের সম্মুখে বারম্বার প্রণিপাত করিয়া তাঁহারা কত যে আবেদন জানাইলেন তাহার ঠিকানা নেই। বড়-বৌ বিরজা স্নান শেষ করিয়া ঠাকুরঘরের দরজার সাম্‌নে আসিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বড়জাকে দেখিয়া সন্তোষিণী এবং গিরিবালা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ঠাকুরকে নিজেদের দলে টানিবার উৎসাহে তাঁহারা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, বড়-বৌএর সারা সকালটাই ঠাকুরঘরে কাটে।

আটটা বাজিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মস্ত একটা মোটর-কার বাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবেশ এবং তাহার দুই কাকা অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, উকীল-বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহারা বসাইলেন।

দেখিতে দেখিতে বাড়ীর যে যেখানে ছিল, আসিয়া বৈঠকখানায় জড় হইল। মেয়েরা পাশের ঘর হইতে জান্‌লার খড়খড়ি তুলিয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন। আসিলেন না কেবল বড়-বৌ।

উইল পড়া আরম্ভ হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকলের মুখ দারুণ বিস্ময়ে একেবারে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বীরেশ এবং গোপীনাথ পাংশু মুখে এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেবেশ মাথা নীচু করিয়া রহিল, যোগেশ এক লম্ফে ঘর ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহাদের ভগ্নীপতি সময় ক্রমাগত গোঁফে তা দিয়া দিয়া সেটাকে সূচের মত সূক্ষ্মাগ্র করিয়া তুলিল।

যোগেশ এক ছুটে আসিয়া ঠাকুরঘরের সাম্‌নে দাঁড়াইল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা।"

বিরজা চোখ খুলিয়া চাহিলেন। শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "কি বাবা?"

যোগেশ বলিল, "শীগ্‌গির উঠে বেরিয়ে এস। বাবার উইলে কি ছিল জান? সব কিছু তিনি তোমার নামে লিখে দিয়ে গিয়েছেন। আর সবাইকে অষ্টরম্ভা।"

বিরজা ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ছেলের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "কি বল্‌ছিস্ রে? তুই ঠিক শুনেছিস্ ত?"

যোগেশ বলিল, "ঠিক শুনিনি কি রকম? এতগুলো কথা ভুল শুনে যাব, এত খারাপ কান আমার হয়নি।"

মাকে কিছু মাত্র খুসি দেখাইতেছে না দেখিয়া যোগেশ কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া বাহিরের ঘরে চলিয়া আসিল। বিরজা ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসিয়া, দেবেশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নরেশ যে কেন তাঁহাকে সব লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া বিরজা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। চিরদিন নীরবে কষ্টভোগ করার পুরস্কার না কি? কিন্তু স্বামী কি তাঁহাকে এই কম চিনিতেন? এখন ধন-সম্পত্তি, ভোগ সুখের তাঁহার কি প্রয়োজন? ছেলেদের নামে দিয়া গেলেই ভাল হইত। যাক্ স্বামী বর্ত্তমানেও তিনি শ্বশুরকুলের সকলের অভিশাপ কুড়াইয়াছেন, এখনও তাহাই করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহার ভাগ্যের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই।

দেবেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি মা ডাক্‌ছ? খোকা সব বলেছে না?"

বিরজা বলিলেন, "ও ছেলে মানুষ কি বল্‌তে কি বলেছে। তুই বোস্, বল্ ভাল ক'রে।"

দেবেশ বলিল, "ঠিকই বলেছে, সম্ভবতঃ। তোমার নামে এখনকার মত সবই লিখে দিয়ে গিয়েছেন: এখানকার বাড়ী, ব্যাঙ্কের টাকা, দেশের জমিজমা। কেবল দেশের বাড়ীর একটা অংশ কাকাদের লিখে দিয়েছেন, উত্তর দিকের ভাগটা। তোমার অবর্ত্তমানে জমিজমা, আর এই বাড়ী আমরা পাব, টাকা তুমি যাকে খুসি লিখে দিয়ে যেতে পার্‌বে, যদি খরচ না ক'রে ফেলো।"

বিরজার এত দুঃখেও হাসি পাইল। হিন্দু ঘরের বিধবা, বয়স পঞ্চাশের কোটায় আসিয়া ঠেকিবার জোগাড় করিতেছে, তিনি অকস্মাৎ কি উপায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করিয়া ফেলিবেন?

দেবেশ বলিল, "উকীলবাবুর একবার তোমার সঙ্গে দেখা করা দরকার। কখন তোমার সময় হ'বে?"

বিরজা বলিলেন, "যখন তাঁর সুবিধা হয়, আমি ত সারাক্ষণ বাড়ীতেই আছি। বিকেল বেলাই আস্‌তে পারেন।"

দেবেশ চলিয়া গেল। বিরজা আবার ঠাকুরঘরের দিকে চলিলেন।

ঠাকুর-ঘরে যাইতে হইলে তাঁহার দেবরদের ঘর পার হইয়া যাইতে হয়। গিরিবালার ঘর হইতে নীচু গলায় কথার শব্দ তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল, সন্তোষিণীর ঘর হইতে শোনা গেল চাপা কান্না। বিরজার মুখ আরো বিষণ্ণ এবং গভীর হইয়া উঠিল।

গিরিবালা অস্ফুট তর্জ্জনে স্বামীকে বকিতেছিলেন। "থাক এখন থিয়েটার নিয়ে। আমি কি এখন ছেলে-মেয়ে দুটো নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে খাব, না পরের বাড়ী রাঁধুনী-গিরি করব? বি-এ পাশ করেছিলে কি করতে? কুড়িটা টাকা আন্‌বারও ত মুরোদ নেই। অথচ তোমারই ভাই এই বিদ্যে নিয়েই না লাখ লাখ টাকা রেখে গেলেন? তখনই যদি তাঁর কথামত ব্যবসায় ঢুকতে, তাহ'লে আজ কি এই হাল হয়? কালই যখন বড়গিন্নী ঘাড় ধ'রে বাড়ীর বার করবে তখন দাঁড়াবে কোন্ চুলোয়?"

গোপীনাথ বলিলেন, "ভাল জ্বালা! এ যে দেখি গোদের উপর বিষফোঁড়া! এখনই চেঁচাচ্ছ কেন? আগে রাস্তায় বের করুক তখন দেখা যাবে। আমার ভাইয়ের বাড়ী থেকে আমার বের ক'রে দেবে এতবড় ক্ষমতা কোনো মেয়েমানুষের হয়নি।"

গিরিবালা নাকমুখ সিঁটকাইয়া বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "ইল্লো! বড় পেয়ারের ভাই! তবু যদি মর্‌বার সময় মুখে লাথি মেরে না যেত। এ কি তোমার থিয়েটারের নাটক পেয়েছ যে, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেই বড়গিন্নী মূর্চ্ছা যাবে, আর তুমি এখানে ব'সে রাজত্বি কর্‌বে? ও মুখুজ্যের মেয়ে, শক্তখানি।"

গোপীনাথ শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "বড় যে বাড়ালে দেখ্‌ছি। ভারি থিয়েটারের নামে নাক সেঁটকানি! এর 'পর গুষ্টিশুদ্ধ ঐ থিয়েটারের অন্নই খেতে হবে।"

গিরিবালা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা, তুমি বলো কি গো? বামুনের ছেলে, এত লেখাপড়া শিখে, শেষে নাটক ক'রে বেড়াবে? বাপ-পিতেমোর নাম ডুববে যে? শত্রু হাস্‌বে না?"

গোপীনাথ বলিলেন, "বাপ-পিতামহের নাম ধুয়ে জল খেলে ত পেট ভর্‌বে না? আর শত্রু কি না খেয়ে রাস্তায় প'ড়ে মর্‌লে কম হাস্‌বে? তা এখনি চোখ রগ্‌ড়ে জল বার করতে হ'বে না, দেখ ভেবে-চিন্তে যদি কোনো উপায় বার কর্‌তে পারি।" এই বলিয়া তিনি ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

সন্তোষিণীর মন এতই খারাপ হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি উইল শুনিয়া আসিয়াই শয্যা গ্রহণ করিলেন। বীরেশ হাজার টানাটানি করিয়াও তাঁহাকে উঠাইতে পারিলেন না। ছোটবউও তাঁহার কাছে স্বামীর বোকামীর গল্প করিতে আসিয়া, তাঁহার কান্নার ঘটা দেখিয়া প্রস্থান করিলেন।

সকাল হইতে বিকাল পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় সন্তোষিণী উঠিয়া পড়িয়া, পাড়ার জ্ঞানদা-ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্ঞানদা বিধবা, ঘরের খাইয়া পরের উপকার করিয়া বেড়ান। ভাইয়ের ঘরে ভাজের অত্যাচারে না কি তাঁহার মন টেঁকে না। এ জন্য খাওয়া-দাওয়া সারিয়াই তিনি পাড়া

বেড়াইতে বাহির হইয়া যান, রাত্রি আটটার আগে আর ঘরমুখো হন না।

ছোটবউয়ের ডাক পড়িল মূর্খ স্বামীদের প্রতি এই দুটি হিন্দু নারীর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। যদি এক নিজেদের বুদ্ধিতে, এবং জ্ঞানদার সাহায্যে কোন উপায় হয়, তাই গুপ্তসভা ডাকিয়া তাঁহারা পরামর্শ করিতে বসিলেন।

বিরজার সঙ্গে তাঁহার ছোট জা'রা পারতপক্ষে কথা বলিতেন না। সুতরাং সন্ধ্যার পর হঠাৎ ছোটবউকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাকাইলেন।

গিরিবালার একটু অপ্রস্তুত বোধ হইল। স্বামী মারা যাইবার পর এই একমাসের মধ্যে বিরজার খোঁজ-খবর লইবার তাঁহাদের সময় হয় নাই। আজ উইল পড়া হইয়া যাইতেই বেশী যত্ন দেখাইতে আসিলে তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিতে পারে। এ জন্যই সন্তোষিণী এ দিকে অগ্রসর হইতে সোজাই অস্বীকার করিয়াছিলেন। বড়জার বিরুদ্ধে যে গোপন যুদ্ধ চলিত, তিনিই ছিলেন তাহার অধিনেত্রী, সুতরাং বিরজার সম্মুখে উপস্থিত হইতে তাঁহার আপত্তিও ছিল অধিক। গিরিবালাকেই অগত্যা এই বিরক্তিকর কাজের ভার লইতে হইল।

ঘরের দরজার কাছে আসিয়া গিরিবালা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। বিরজাই ডাকিয়া বলিলেন, "এস ছোট-বৌ।"

গিরিবালা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, জ্ঞানদা-ঠাকরুণ দেখা কর্‌তে চাইলেন তাই দেখতে এলাম তোমার অবসর আছে কি না।"

বিরজার এত দুঃখেও হাসি পাইল। হঠাৎ তাঁহার এমন কি কাজ পড়িল যে, দেখা করিবারও সময় হইবে না? যখন হাজার কাজে সত্যই তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার সময় ছিল না তখন ত এত ভদ্রতার ঘটা দেখা যাইত না, যে যখন পারিত ঢুকিয়া পড়িত। যাহা হউক, তিনি বলিলেন, "না, কাজ কি আর এখন। আস্‌তে চান আস্‌তে বল।"

জ্ঞানদা-ঠাকরুণ আসিয়া বসিবা মাত্র গিরিবালা যেন হাঁফ ছাড়িয়া উঠিয়া পলায়ন করিলেন। বিরজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল আছ, দিদি?"

কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিলেন, "ভালই আছি বোন্। আমাদের কি আর মরণ আছে, যাদের খেলা ক'রে বেড়াতে দেখেছি, তারাই আমাদের আগে চলে গেল।"

বিরজার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। জ্ঞানদা-ঠাকুরাণীও ফোঁশ্ ফোঁশ্ করিয়া সশব্দে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

খানিকপরে চোক মুছিয়া তিনি বলিলেন, "অদৃষ্টের লিখন বোন, তুমি আমি কি কর্‌তে পারি? তবুত তোমার সব ব্যবস্থা ক'রে গেছে, কারো হাতে-তোলায় তোমায় থাকৃতে হ'বে না। কত মানুষ খাবার জন্যে তোমারই কাছে জোড়হাত কর্‌বে। একি আর আমার দশা? মুখপোড়া মরণ মা, আমাকেও মেরে রেখে গেল। ভাই-ভাজের ঝাঁটা খেয়ে আর কতকাল টিঁকে থাকব জানি না। হিন্দুর বিধবার প্রাণ, কইমাছের প্রাণ, তপ্ত খোলায় উঠেও মর্‌তে জানে না।"

বিরজা চুপ করিয়াই রহিলেন। জ্ঞানদা বোধহয় আশা করিতেছিলেন তিনি দেবর এবং জা প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছু একটা মন্তব্য করিবেন, কিন্তু তিনি কিছুই না বলাতে ঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি সহজে দমিবার পাত্রী নন। একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদের সব কিরকম কি ব্যবস্থা হ'বে?"

বিরজা বলিলেন, "আমি ব্যবস্থা কর্‌বার কে, দিদি? যাঁর কর্‌বার তিনি যা ভাল বুঝেছেন, ক'রেই গেছেন।"

জ্ঞানদা মুখখানা যথাসম্ভব গোল করিয়া বলিলেন, "তাত করেইছেন তাঁর যা উচিত ছিল ক'রে গেছেন। তোমাকে ত আর দেওরদের হাতে ফেলে যেতে পারেন না তুমি হ'লে গিয়ে বড় ভাজ। তবে তারা এতকাল তোমাদের উপরেই নির্ভর করেছে কি না, এখনও হয়ত ভাব্‌ছে, যে তুমিই একটা কিছু ব্যবস্থা তাদের কর্‌বে।"

বিরজা বলিলেন, "দেশের বাড়ীতে তাঁদের যে অংশ লিখে দিয়ে গিয়েছেন, তাত তাঁরা শুনেইছেন। সকলের একসঙ্গে থাকার ইচ্ছা যদি থাক্‌ত তাঁর, তাহ'লে সেই রকম ব্যবস্থাই ক'রে যেতেন।"

জ্ঞানদা ঠিক করিলেন বড়গিন্নীর মতলব কিছু ভাল নয়। ইহাদের বিদাই করিবে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। ছোট বউ দুজন তাঁহাকে কেবল খবর জানিতেই

পাঠাইয়াছিলেন, বিরজার মত পরিবর্ত্তন করিবার কোন চেষ্টা তাঁহাকে করিতে বলেন নাই। সুতরাং আরো-কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর, তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই দেখা হইল গিরিবালার সঙ্গে। তিনি জ্ঞানদার অপেক্ষায় বোধ হয় কাছাকাছিই ঘুরিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম দেখলে দিদি ?"

জ্ঞানদা মুখ কুঞ্চিত করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "গতিক সুবিধের নয়। তোমাদের দেশের বাড়ীতে পাঠাবারই ব্যবস্থা করছে।"

গিরিবালার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন. "চল মেজদির ঘরে, সে তোমার জন্ম ব'সে আছে।"

সন্তোষিণী দুজনের মুখের ভাব দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বড়গিন্নী খুব শুনিয়েছেন বুঝি ?"

জ্ঞানদা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন গা, আমায় শোনাতে যাবে কেন ? আমি কি তার খাই, না পরি ? শোনার কিছু, মুখ দিয়ে কথাই বেরোয় না, এত দেমাক।"

সন্তোষিণী বলিলেন. "তবু ত বল্লে কিছু ?"

জ্ঞানদা বলিলেন, "রকমে বুঝলাম, তোমাদের দেশের বাড়ীতে বিদায় ক'রে দেওয়ারই ইচ্ছা। টাকাকড়ি একবার হাত করতে পেরেছে, আর কিছু দেবে না।"

সন্তোষিণী বলিলেন, "কি যে অদৃষ্টে আছে জানি না। শেষে কি ছেলেপিলে নিয়ে পথে দাঁড়াব ?"

জ্ঞানদার নিজের বক্তৃতাশক্তির উপর খুব বিশ্বাস ছিল, যদিও নিজের ভাই-ভাজের কোনো মতের পরিবর্ত্তন তিনি ঘটাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার ধারণা যে তিনি নিজের বাগ্মিতায় পাথরেরও মন গলাইয়া দিতে পারেন। সুতরাং সন্তোষিণীকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিলেন, "তা দুঃখ ক'রে আর কি করবে বল ? যেমন যার কপাল। আচ্ছা, তবে এখন আসি। ঘোষালদের বাড়ী একবার হ'য়ে যেতে হ'বে কাল একবার এসে বড়গিন্নীকে ভাল করে ব'লে দেখব। হাজার হ'লেও আমাকে মানে, একেবারে কথা ঠেলতে পারবে না।"

গিরিবালা বলিলেন, "হ্যা, ও আবার কারো কথা শুনবে! তেমনি মেয়েই বটে!"

সন্তোষিণী বলিলেন, "আচ্ছা বাবু, চুপ কর এখন। কে আবার কোথা দিয়ে শুনতে পাবে।"

বীরেশ সব শুনিয়া বলিলেন, "এ ত জানা কথাই, হাতে পেয়েছে যখন তখন কি আর সহজে ছাড়বে ? এতদিনের ঝাল জমা হ'য়ে আছে ব'লে।"

গোপীনাথ বলিলেন, "তাই নাকি ? আমাদের বিদায় ক'রে দেবে ? আচ্ছা দেখব, সেই বা কেমন মুখুজ্জের বেটা আর আমিই বা কেমন বাঁড়ুজ্জের বেটা।"

গিরিবালা বলিলেন, "আহা মস্ত বীরপুরুষ! কি করবে শুনি ?"

গোপীনাথ বলিলেন, "তোমায় বলতে গেলাম কেন ? মেয়েমানুষের দশহাত কাপড়ে কাচা নেই। সবাইকে ব'লে বেড়াও, আর আমার সব মতলব ফেঁসে যাক্।"

মেয়েমানুষের প্রতি এতটা অশ্রদ্ধা দেখানোতে তাঁহার পত্নী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। গোপীনাথ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন সকালে দেবেশ দেশের বাড়ী জমীজমা তদারক করিবার জন্ম যাত্রা করিতেছে শোনা গেল। তাহার কাকা-কাকীদের মুখ আরও গম্ভীর হইয়া গেল। দেশের বাড়ী অনেক দিন অযত্নে বে-মেরামত অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহা বাসযোগ্য করিয়া ইঁহাদের সেখানে পাঠানোর উদ্দেশ্যেই যে সে যাইতেছে, তাহা সকলে ধরিয়াই লইল।

দেবেশকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বিরজা ঘরে ঢুকিতে যাইতেছেন এমন সময় সন্তোষিণী আসিয়া মস্তবড় একগাছা চাবি আগাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "দিদি, এই নাও তোমার ভাঁড়ারের চাবি। এ সব এখন আমাদের কাছে থাকা ভাল নয়, নানা কথা উঠবে।"

বিরজা চাবিটা লইয়া বলিলেন, "কথা উঠবার ত কোনো কারণ দেখি না। আচ্ছা, তুমি না রাখতে চাও, আমার কাছেই থাক্।"

সন্তোষিণীর আশা ছিল বিরজা চাবি লইবেন না। এখন একান্ত হতাশ হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। যাইবার

সময় বলিয়া গেলেন, "বামুন ঠাকুরকে কি রান্নাবান্না হ'বে সব বলে-টলে দিও, আমি আর ও দিক মাড়াব না।"

বিরজা কিছু বলিবার আগেই সন্তোষিণী মস্ত মস্ত পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। বিরজা ঘরে ঢুকিয়া চাবিটা চপলার হাতে দিয়া বলিলেন, "ভাঁড়ার বের ক'রে দিয়ে আয় ঠাকুরকে, কাল থেকে আমিই দেব এখন।"

সবই এখন তাহার হাতে, যেমন খুসী ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবু বিরজার মন প্রসন্ন হইতেছিল না। সংসারে তাঁহার আর কোনো আনন্দ ছিল না, কেবল বোঝা বহিবার জন্য তিনি এখনও ইহার মধ্যে ছিলেন। এই ধনসম্পদ সকলই যাঁহার, তিনি চিরদিনের মত বিদায় হইয়া গিয়াছেন, যাহাদের তিনি স্ত্রী-পুত্রের অধিক করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, তাহারা আজ বিষণ্ণ, নিরাশ। হয়ত তাঁহার পতির আত্মা ইহাতে অশান্তি অনুভব করিতেছে, ইহাদের কাতরতা, ইহাদের অশ্রু, সেখানেও হয়ত তাঁহাকে অস্থির করিতেছে। এই সকল চিন্তা তাঁহার মনকে একান্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

বাড়ীর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া একরকম করিয়া চুকিয়া গেল। ছেলেমেয়েরা চিরকাল একসঙ্গে বসিয়া খায়, আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। মেজবৌ ঠাকুরকে তাঁহার ঘরে ছেলেদের খাবার দিয়া যাইতে বলিলেন, নিজে তিনি খাইলেনই না। বীরেশ সকালেই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার জন্য রান্না করিতে বারণ করিয়া গিয়াছিলেন। গিরিবালা নিজে আসিয়া সকলের খাবার ঘরে লইয়া গেলেন। প্রকাণ্ড দালানে বসিয়া আজ যোগেশ একলা খাইল। বিরজার মনের ভিতরটা এই দৃশ্য দেখিয়া কেমন যেন করিতে লাগিল।

তাঁহার জন্য চপলা রান্না করিয়া লইয়া আসিল। সেই এতদিন রান্না করিয়াছে। বিরজা বারণ করিলে বলিত, "আমি চ'লে গেলে ত তোমাকেই করতে হ'বে, যে কটা দিন আছি, আমিই ক'রে দিই।"

আজ বিরজার মুখ দিয়া যেন ভাত উঠিতেছিল না। চপলা বলিল, "মা, দিনেত একটিবার মাত্র কয়েক গ্রাস খাও, তাও কি তুলে, দেবে না কি? তোমার এমন করলে চলে না কি? দাদার আর খোকার কি গতি হ'বে, তুমিও চ'লে গেলে?"

বিরজা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সব বুঝি রে, কিন্তু মুখ দিয়ে আজ আর ভাত উঠ্‌ছে না। অতবড় দালানে আজ খোকা যখন একলা ব'সে খেল তখন থেকে আমার মনের ভিতরটা কেমন যেন কর্‌ছে। কেবলি মনে হচ্ছে এদের দুঃখ দেখে, তোর বাবা ওপারে গিয়েও যেন শান্ত পাচ্ছেন না।"

চপলা বলিল, "তা তোমার দোষ কি? ব্যবস্থা ত আর তুমি ক'রে যাওনি, বাবাই ক'রে গিয়েছেন।"

বিরজা বলিলেন, "ভাল ক'রে ভেবে করেননি, অসুখের মধ্যে অত বিবেচনা কর্‌বার সময় ছিল কোথায়? এখন হয়ত অনুতাপ করছেন। তাঁর হাতে ত কোন প্রতিকার নেই? আমার মন বোধ হয় এরি জন্যে এত খারাপ লাগ্‌ছে।" চপলা রাগ করিয়া বলিল, "যত সব বাজে কথা। মন খারাপ লাগ্‌বার তোমার কি কারণের অভাব আছে, যে এই সব ভাবছ? এখন খেয়ে নাও।"

গিরিবালার একটা স্বভাব ছিল, কোনখানে কথা শুনিলেই তিনি দাঁড়াইয়া যাইতেন। আজও এই সময় বিরজার ঘরের পাশ দিয়া, তিনি কোথায় যেন যাইতে-ছিলেন। মা-মেয়ের গলার আওয়াজ পাইবামাত্রই জানালার পাশে দাঁড়াইয়া গেলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঘরের ভিতরটা নীরব হইল, তিনি দাঁড়াইয়াই রহিলেন, পরে দ্রুতপদে গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

গোপীনাথ শুইয়া শুইয়া একখানা ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিতেছিলেন। স্ত্রীকে দেখিয়া বলিলেন, "ওমন ক'রে ছুটে এলে কেন? বাঘে তাড়া করেছে না কি?"

গিরিবালা বলিলেন, "কিবা কথার ছিরি! কখন আবার ছুট্‌লাম? বড়গিন্নীর মনে বড় অনুতাপ হয়েছে জান গো? তাই জান্‌লার পাশে দাঁড়িয়ে একটু শুনে এলাম।"

গোপীনাথ বলিলেন, "অনুতাপ হয়েছে নাকি? কি রকম শুনি? একটু হ'লে যে বাঁচি, তাহ'লে আর পেটের ভাতের ভাবনায়, মাথার চুল উঠে যায় না।"

গিরিবালা যাহা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিলেন

সব বলিয়া গেলেন। গোপীনাথ মন দিয়া সব শুনিয়া বলিলেন, "হুঁ, লক্ষণ ভাল। দেখ তোমার জ্ঞানদা দিদিকে একবার ডেকে পাঠাও!"

গিরিবালা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গো?"

গোপীনাথ বলিলেন, "আহা, এখনি সে খোঁজে কাজ কি? আগে ডাক, তারপর শুন্‌তেই ত পাবে।"

বিকালবেলা বিরজা একবার তাঁর বোনের বাড়ী যাইবার জোগাড় করিতেছিলেন। ভগ্নীপতির বড় অসুখ, দেখিতে না গেলেই নয়। গাড়ী ডাকিবার জন্য ঝিকে বলিতেছেন, এমন সময় জ্ঞানদা-ঠাকুরাণী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন।

বিরজা বলিলেন, "এস দিদি, বোসো।"

জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও বেরুচ্ছ নাকি বোন? আস্‌ব না ভাব্‌ছিলুম, কালই ত এসে দেখে গেছি, কিন্তু দরকারে প'ড়ে আস্‌তে হ'ল।"

বিরজা বলিলেন, "বোসো, বোসো, দরকার না থাক্‌লেই বা কি? আমি একটু নীরর ওখানে যাব ভাব্‌ছিলাম, তার স্বামীর অসুখ। তা সন্ধ্যের পর গেলেই হ'বে।"

জ্ঞানদা বসিয়া বলিলেন, "বল্‌তে এলুম একটা কথা। আমি আবার এসব খুব বিশ্বেস করি কি না, কাজেই না বল্‌লেই নয়। তুমি কি ভাব্‌বে বোন জানি না, যা হোক আমি ব'লে খালাস, তারপর তুমি যা ভাল বোঝ কোরো।"

বিরজা অত্যন্ত অবাক হইয়া বলিলেন, "কি এমন কথা?"

জ্ঞানদা মুখখানি অতি গম্ভীর করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ভোর রাত্রে নরেশকে স্বপ্নে দেখলাম। চেহারা বড় খারাপ, মুখে হাসি নেই। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল, 'জ্ঞানদাদিদি, বড় বৌকে বোলো, বীরু গুপীকে যেন দেখে, আমি তাদের পথে বসিয়ে এসেছি।' জেগে উঠে দেখি, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ভোরের স্বপ্ন বড় একটা মিথ্যে হয় না।"

চপলা ঘরে ঢুকিয়া জ্ঞানদা-ঠাকুরাণীর শেষের কয়টা কথামাত্র শুনিতে পাইল। বলিল, "হ্যাঁ, স্বপ্ন আবার কখনও ঠিক হয় না কি? ও সব মানুষের ভুল।"

বিরজার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "তুই ছেলে মানুষ, কি বুঝিস্ মা? ঢের স্বপ্নই সত্যি হয়।'

জ্ঞানদা ঠাকরুণ উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছিলে যাও, আর বসিয়ে রাখ্‌ব না। আহা, তোমার বোনের আবার এই বিপদ হ'ল? ভালয় ভালয় সেরে উঠ্‌লে হয় এখন।"

জ্ঞানদা চলিয়া যাইবার পর বিরজা আর দেরী করিলেন না, তাড়াতাড়ি গাড়ী ডাকাইয়া চলিয়া গেলেন। বোনের বাড়ী হইতে ফিরিতে তাঁহার অনেক রাত হইয়া গেল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন বাড়ীর সকলেই প্রায় শুইয়া পড়িয়াছে। সবাইকার খাওয়া হইয়াছে কি না খোঁজ লইতে গিয়া শুনিলেন, মেজগিন্নি রাত্রেও খান নাই, ছোট-বাবুও না খাইয়া কোথায় যেন বাহির হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার বিছানা করিয়া রাখিয়া, চপলা আগেই শুইতে চলিয়া গিয়াছিল। বিরজা গিয়া শুইয়া পড়িলেন। ঘুম সহজে আসিল না। জ্ঞানদার কথার স্মৃতি, নিজের মনের দারুণ অশান্তি, তাঁহাকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগাইয়া রাখিল।

চপলা সকালে উঠিয়া তাহার মাকে শোবার ঘরে না দেখিয়া, তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঠাকুরঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, ইহারই মধ্যে তাঁহার স্নান হইয়া গিয়াছে, করজোড়ে গলবস্ত্রে তিনি ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া আছেন।

মেয়ের পায়ের শব্দে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। চপলা বলিল, "এত ভোরেই স্নান করেছ মা? আবার অসুখ-বিসুখ করবে।"

বিরজা বলিলেন, "সারারাত জেগেই ছিলাম, শুধু শুধু বিছানায় প'ড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা কর্‌ল না, তাই, উঠে স্নান-টান সেরে ফেল্‌লাম। ভাঁড়ারের চাবিটা নিয়ে যা।"

চপলা চাবি লইয়া বলিল, "কেন সারারাত ঘুম হয় নি

মা ? ঐ জ্ঞানদা মাসীর সব বাজে কথা নিয়ে খুব ভেবেছ 'বুঝি ?"

বিরজা বলিলেন, যা বুঝিস্ না তা নিয়ে অত কথা বলিস্ নে মা। বাজে কথা সে কিছুই বলেনি, খুব খাঁটি কথাই ব'লে গেছে। তোর বাবা রাত্রে আমাকেও স্বপ্নে দেখা দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর শান্তি হচ্ছে না, এ আমি নিজের মন দিয়েই বুঝতে পার্‌ছি।"

মায়ের সঙ্গে বেশী কথা কাটাকাটি করা, বিরজার ছেলে-মেয়ের অভ্যাস ছিল না। তিনি চিরকালই স্বল্পভাষিনী, গম্ভীর প্রকৃতি। চপলা চাবি লইয়া নীরবে চলিয়া গেল।

বিরজা পূজা সারিয়া, বাহির হইয়া, এতদিন পরে, নিজে গৃহিণীর কার্য্যে আবার মন দিলেন। ভাঁড়ার দেওয়া, তরকারি কোটা, কি কি রান্না হইবে বলিয়া দেওয়া, একটা কাজও বাকি রাখিলেন না। দেবরদের ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া খাওয়ানো এবং দেবরদের, জা'দের আহারের তত্ত্বাবধান করাতে, তাঁহাদেরও আজ না খাইয়া থাকিবার সুবিধা হইল না। খাওয়া সারিয়া ঘরে ঢুকিয়া, সন্তোষিণী বলিলেন, "বড়গিন্নীর হ'ল কি ? আমাদের খাওয়াতে আজ এত ব্যস্ত ?"

বীরেশ বলিলেন, "ভালই ত, খাওয়ার ভার তিনি নিলে ত আপদ যায়।"

সন্তোষিণী বলিলেন, "তা আর নিতে হয় না। দুদিন বাদে একেবারে বিদায় কর্‌বে, তাই একটু যত্ন দেখাচ্ছে।"

দেবেশ পরের দিন ফিরিয়া আসিল। দেশের বাড়ীর এবং জমিজমার সে ব্যবস্থা করিয়া, একজন জ্ঞাতির উপর ভার দিয়া আসিয়াছে।

দুপুর বেলা, খাওয়া দাওয়ার পর, বিরজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, একটা কথা বলি, রাগ কোরো না।"

দেবেশ বলিল, "ও কি মা ? তুমি যা খুসি বল্‌বে, তার জন্তে কি আবার আমাদের অনুমতি দরকার ? রাগই বা কর্‌তে যাব কেন ?"

বিরজা বলিলেন, "উনি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে গেছেন, তার অর্দ্ধেক আমি তোমার কাকাদের নামে লিখে দিতে চাই।"

দেবেশ বিস্মিত হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা ?"

বিরজা বলিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এদের এরকম অসহায় ক'রে ফেলে গিয়ে তোমার বাবার আত্মা শান্তি পাচ্ছে না। তাঁকে যদি একটু স্বস্তি দিতে পারি, সেই কর্‌তে চাচ্ছি।"

দেবেশ বলিল, "তাই যদি মনে কর, ত ওদের দেশে না পাঠিয়ে এখানেই রাখ। সংসার যেমন চল্‌ছে চলুক। টাকা লিখে দেবার দরকার কি ? টাকা হাতে পেলেই তাঁদের অন্য মূর্ত্তি হবে।"

বিরজা বলিলেন, "না বাছা, ওদের এখানে রাখব না। নিজে যা সইবার সয়েছি, তোমরা, তোমাদের বউ ছেলে-পিলে যেন শান্তিতে থাকে। দেশেই ওরা যাক, টাকাকড়ি নিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করুক।"

দেবেশ বলিল, "তোমার যা খুসী মা, আমার আপত্তি কর্‌বার কোনো অধিকার নেই।"

বিরজা বলিলেন, "একবার উকীলবাবুকে ডেকে দিতে হ'বে।"

দেবেশ বলিল "বেশ আজই ডেকে পাঠাব।" মেজবাবু ছোটবাবুর মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। বীরেশ বলিলেন, "বড়-বৌ ঠাকরুণের মনুষ্যত্ব খানিকটা আছে দেখছি।"

গোপীনাথ বলিলেন, "দেখেছ ছোট-বৌ। এখন বল ত কার বুদ্ধি বেশী, বাঁড়ুজ্জের ছেলের, না মুখুজ্জের মেয়ের ?" ছোট-বৌ স্বামীর বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারিলেন না।

বিরজা দুই দেবরের নামে পঁচিশ হাজার টাকা লিখিয়া দিলেন দেখিয়া উকীলবাবু পর্য্যন্ত অবাক হইয়া গেলেন। তিনি বিরজাকে বলিলেন, "ঝোঁকের মাথায় কাজ করবেন না, একটু ভেবে দেখুন। ছেলেদের পড়াই এখনও আপনার শেষ হয়নি। বিলেত গেলে দুই ছেলের জন্তেই কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা লাগবে। তারপর তাদের বিবাহাদির খরচ আছে। টাকা দিতে চান, দুজনকে দশ হাজার দিলেই হবে।"

বিরজা চুপ করিয়া রহিলেন। উকীলবাবুর কথা

শুনিবার জন্ম আড়ি পাতিবার লোকের অভাব হয় নাই। গিরিবালা উকীলবাবুর চতুর্দ্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে স্বামীকে খবর দিতে ছুটিলেন।

সন্তোষিণীও তাহার ঘরে আসিয়া খবরের প্রত্যাশায় বসিয়াছিলেন। বীরেশ নিতান্ত ভাসুর বলিয়া আসিতে পারেন নাই, নিজের ঘরেই ছিলেন।

গিরিবালা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "মিন্সের মুখে আগুন, যমের বাড়ী যাক, ছেলে পিলের মরা মুখ দেখুক!"

গোপীনাথ অবাক হইয়া বলিলেন, "মিন্সে মিন্সে করছ কাকে? আমি ছাড়া আবার কোন মিন্সে তোমাকে অতখানি ঝাঁঝিয়ে তুলল?"

গিরিবালা বলিলেন, "আহা কথার ছিরি দেখ। উকীলবাবুর কথা বল্‌ছি গো, তোমাদের পরম বন্ধু উকীল বাবুর! বড়গিন্নির অনেক কষ্টে সুমতি হয়েছিল, তিনি তোমাদের দুজনের নামে পঁচিশ হাজার টাকা লিখে দিচ্ছিলেন। তা হতভাগার প্রাণে সইল না, তাঁকে সৎপরামর্শ দিচ্ছে, 'এত টাকা দিও না, তোমার ছেলেদের পড়াতে এখনও ঢের টাকা লাগবে, দিতে চাও নিতান্ত ত দশ হাজার দাও'।"

গোপীনাথ বলিলেন, "বটে? এর পর তাঁকে নিয়ে পড়তে হ'বে দেখছি। যত বড় উকীলই হোন, আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবেন না। তা বড়গিন্নী কি বল্‌লেন?"

গিরিবালা বলিলেন, "ততটা শুনে আসিনি। ঐ কথা শুনেই তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম কি না? গিয়ে দেখছি।"

দুঃখের বিষয়, তিনি ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, সভাভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। শেষ অবধি কি হইল না জানিতে পারায় তিনি বড়ই কাতর হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পরদিনটা বিরজা বোনের বাড়ীতেই কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার ভগ্নীপতির অসুখ সমানেই চলিতেছিল। কাছে থাকিলে, বোনের হয়ত বা একটু সাহায্য হইলেও হইতে পারে মনে করিয়া, তিনি মেয়ের হাতে ভাঁড়ারের ভার দিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রে ফিরিতে দশটা বাজিয়া গেল। ছেলে-মেয়েরা তখন শুইয়া পড়িয়াছে। গায়ের চাদরখানা ফেলিয়া তিনি ঘরের জান্‌লাগুলি বেশ ভাল করিয়া খুলিয়া দিলেন, বড় গরম বোধ হইতেছিল। ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিটাও নিভাইয়া দিলেন, জান্‌লা দিয়া চাঁদের আলো ঢুকিয়া ঘরখানিকে আলো-আঁধারে রহস্যময় করিয়া তুলিল।

চপলা বিছানা পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। শুইয়া পড়িয়া তিনি নিজের ভাবনার স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। আজ তিনি একাকিনী। সুখে, দুঃখে যাঁহার সহিত তাঁহার জীবন এতদিন জড়ানো ছিল, যাঁহাকে বাদ দিয়া নিজেকে তিনি কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারেন নাই তিনি আজ কোথায়? ভালবাসা অভিমান, কর্ত্তব্যের দায়, সব কিছুর অতীত আজ তিনি। প্রণপাত করিলেও আর তাঁহার সাড়া মাত্র পাওয়া যাইবে না। চিরদিন নত মস্তকে যে-নারী তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিয়াছেন তিনি আজ নাবিকহীন নৌকার মত বিপন্না। কোন্ দিকে যাইবেন, কূল কোথায়, আশ্রয় কোথায় কিছুরই ঠিকানা নাই।

হঠাৎ মৃদু একটা শব্দে বিরজা চমকিত হইয়া দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার রক্তস্রোতের চলাচল যেন থামিয়া যাইবার জোগাড় হইল। দরজার সম্মুখে যেন তাঁহার স্বর্গগত স্বামী দাঁড়াইয়া! ব্যথিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন।

এ কি দৃষ্টির ভ্রম? না সত্যই তাঁহার অন্তরের ব্যাকুলতা, পরলোকবাসী আত্মাকে আবার মর্ত্ত্যলোকে টানিয়া আনিয়াছে? তিনি চোখ মুছিয়া আবার চাহিয়া দেখিলেন। না, কোনোই প্রভেদ নাই। সেই মূর্ত্তি তেমনই দাঁড়াইয়া আছে।

কণ্ঠস্বরও শোনা গেল। "বড়-বৌ, বীরেশ গুপীকে দেখো। তাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হ'লে আমার আত্মা ভয়ানক অশান্তি ভোগ করবে। আমি মহাভুল ক'রে গিয়েছি, তুমি প্রতিকার কোরো।"

বিরজা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মিনিট তিন চার পরেই গিরিবালার ঘর হইতে বিকট চীৎকার শোনা গেল। ঘুমন্ত মানুষ জাগিয়া উঠিল, বাড়ীময় সাড়া পড়িয়া গেল।

সকলে একটু শান্ত হইলে শোনা গেল যে, গিরিবালা স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু চপলা ঠিক এই সময়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠায় সব ক'জন মানুষ ছুটিয়া বিরজার ঘরের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাঁহার মূর্চ্ছার কারণ কেহ কিছু খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু কেহই তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইল না। অত রাত্রে লোক ছুটিল ডাক্তারের বাড়ী। ডাক্তার আসিলেন। বিরজার জ্ঞান হইল অনেক কষ্টে, কিন্তু ডাক্তার তাঁহার কথাবার্ত্তা বলা একেবারে বারণ করিয়া দিলেন। তিনি রাত্রে এইখানেই থাকিবার ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইলেন।

ক্রমে ক্রমে বাড়ী আবার নীরব নিঝুম হইয়া গেল। কেবল বিরজার ঘরে তাঁহার ছেলে-মেয়েরা জাগিয়া বসিয়া রহিল।

ভোরবেলা গোপীনাথ উঠিয়া ডাক্তারের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার জাগিয়াই ছিলেন, গোপীনাথকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, আবার কোনো change দেখা দিয়েছে না কি?"

গোপীনাথ বলিলেন, "না, না, তিনি এখনও ঘুমুচ্ছেন। আমি জান্‌তে এলাম, আপনি কি রকম মনে কর্‌ছেন? ভয়ের কোনো কারণ আছে কি?"

ডাক্তার বলিলেন, অত খারাপ heart যখন, তখন ভয় খানিকটা ত আছেই।"

গোপীনাথের মুখ শুকাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই না কি? খুব খারাপ কি? কই, আগে ত কখন জানা যায় নি।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমাদের দেশের মেয়েরা ত মানুষ নন মশায়, তাঁরা হচ্ছেন দেবী। কাজেই তাঁদের যে আবার রোগ থাকতে পারে, তা তাঁরা না মরলে কেউ বিশ্বাসও করে না, জান্‌তেও পারে না। খুব সিভিয়ার শক্ পেয়েছেন ব'লে মনে হচ্ছে।"

গোপীনাথ আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন

সেই দিনটামাত্র কাটিল। পরের দিন ভোর রাত্রে বিরজা অচেতন অবস্থায়ই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সমস্ত বাড়ী যেন স্তব্ধ অভিভূত হইয়া গেল। নরেশ-চন্দ্রের মৃত্যুর জন্য সকলে তবু অনেক দিন হইতে প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু বিরজার মৃত্যু যেন অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত সংসারটার উপর আসিয়া পড়িল।

বীরেশ আলুথালু অবস্থায় ছুটিয়া উকীলের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূমিকা মাত্র না করিয়া বলিলেন, "বৌ ঠাকরুণও আমাদের ছেড়ে গেলেন।"

উকীলবাবু বলিলেন, "বিপদ একলা আসে না, কথায় বলে। সত্যিই দেখ্‌ছি।"

বীরেশ বলিলেন, "আপনি তাঁর দান পত্রটা সেদিন লিখেছিলেন না?"

উকীলবাবু বলিলেন, "তার আর দাম কি? কাগজে কালির আঁচড় মাত্র।"

বীরেশের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার মানে?"

"মানে আর কি? তাঁকে একটু ভাববার সময় দিয়ে এসেছিলাম। ওটা সাইন করা হয় নি।" বীরেশ যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই বাহির হইয়া গেলেন।

দিন দুই পরে বাড়ীর সামনে গোটাচার ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সন্তোষিণী নীরবে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গিরিবালা কিন্তু মুখ খুলিতে না পাইলে বাঁচিতেন না। বোঁচকার শেষ গিঁঠটা সজোরে বাঁধিতে বাঁধিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি। তখনই বলেছিলাম না? গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে।"
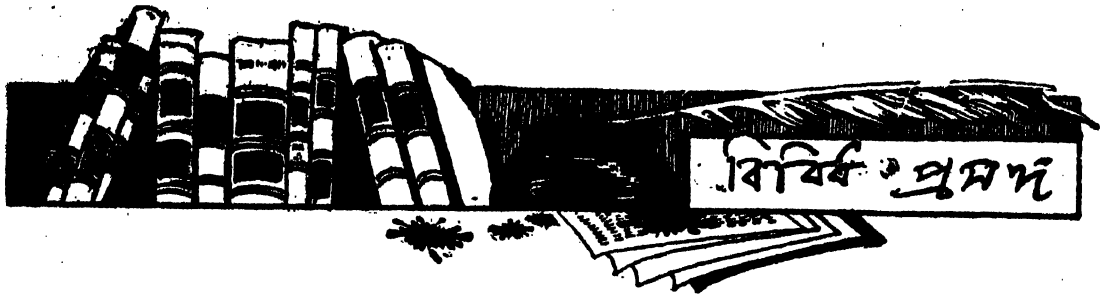
আফগানিস্থানের স্বাধীনতা-উৎসব

১৯১৮ সালে প্রায় আশি লক্ষ প্রজার রাজা আমানুল্লা খাঁ, বত্রিশ কোটি মনুষ্যদেহধারী জীবের বাসভূমি, প্রবল-পরাক্রান্ত ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অধীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সামান্য কয়েক দিন যুদ্ধের পর ঐ বৎসর ২৬শে আগষ্ট ভারতবর্ষের বিদেশী গবন্মে‍ণ্ট ও আফগান রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহার ফলে আফগানিস্থান সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। সন্ধির আগে যখন তাহার সমুদয় সর্ত্ত আলোচিত হইতেছিল, তখন বৃটিশ পক্ষ আফগান রাজাকে বার্ষিক আঠার লক্ষ টাকা সাহায্য লইয়া চলিবার জন্ত জেদ করিতে থাকেন। সর্দার মামুদ তর্জি প্রমুখ আফগান প্রতিনিধি-গণ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, যদিও আমীর আবদুর রহমান খাঁর সময় হইতে আফগানিস্থান ঐ টাকা লইয়া আসিতেছিল। দশ বৎসর আগে সন্ধির আগে যে আফগানরাজ উহা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহার কারণ সহজবোধ্য। টাকা লইলেই বাধ্যবাধকতা থাকে, সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না।

ক্ষুদ্র একটি জাতির রাজা যে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজের অন্তর্গত বৃহৎ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন এবং কার্য্যতঃ জয়ীও হইলেন, তাহার একটা কারণ অবশ্য এই, যে, ১৯১৮ সালে সকলমহাদেশব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছিল, এবং ভারত-গবন্মে‍ণ্ট আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ চালাইলে আফগানদের চেয়ে বৃহত্তর ও বলবত্তর কোন কোন জাতির তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা ছিল। তথাপি ৮০ লক্ষ লোকের সমষ্টি ক্ষুদ্র জাতির বৃহত্তর জাতিকে আক্রমণ করিবার, স্বাধীন হইবার ও স্বাধীন থাকিবার সাহস পরাধীন ভারতের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। পরাধীন থাকিতে থাকিতে পরাধীনতার তথাকথিত আরাম আফিঙের নেশার মত মানুষকে ভীরু উদ্যোগহীন দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

আফগানিস্থানের একটা সুবিধা আমরা জানি। তথায় অল্পসংখ্যক হিন্দু থাকিলেও দেশটা মুসলমানের; সুতরাং ধর্ম্মসম্প্রদায়ঘটিত বিবাদে উহার বলক্ষয় হয় না, তৃতীয় পক্ষের ভেদনীতি প্রয়োগের সুযোগও সেখানে কম। অন্য দিকে, ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিবাস বলিয়া এখানে দলাদলি ধর্ম্মবিরোধ এবং তৃতীয় পক্ষের ভেদনীতি প্রয়োগের সুযোগ বেশী।

এই সব কথা মানিয়া লইলেও, ভারতবর্ষের লোকেরা সকলে বা তাহাদের অধিকাংশ যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা বা কল্পনা প্রকাশ করিতেও সাহস পায় না, ইহা শ্লাঘার বিষয় নহে—বুদ্ধিজীবী লোকদের মত অল্পরূপ হইলেও ইহা শ্লাঘার বিষয় নহে।

১৯১৮ সালে আফগানিস্থানের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দশ বার্ষিক উৎসব সে দিন তথায় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমানুল্লা যে বক্তৃতা করেন, তাহার কোন কোন কথা ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়া এদেশে পৌছিয়াছে তিনি প্রজাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আমার ইচ্ছা এই, যে, তোমরা সকলে অন্তরে ও বাহিরে স্বাধীন হও।" "স্বাধীনতা কেবল ইহলোকে নহে, পরলোকেও তোমাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।"

এই কথাগুলির অর্থ অতি গভীর। মানুষ অন্তরে স্বাধীন না হইলে, তাহার চিন্তা কল্পনা ভাব নিগড়মুক্ত না হইলে, সে বাহিরে স্বাধীন হইতে ও থাকিতে পারে না; আবার বাহিরে স্বাধীন না হইলেও তাহার পক্ষে অন্তরে স্বাধীন হওয়া দুঃসাধ্য। আগে বাহিরে স্বাধীন হইব, না, আগে অন্তরে স্বাধীন হইব, পরাধীন জাতিদের পক্ষে

সে-বিষয়ে কোন চুলচেরা তর্ক না করিয়া উভয়বিধ স্বাধীনতা লাভেরই চেষ্টা করিতে হইবে।

চিন্তা ভাব কল্পনা আদর্শের জন্য আমরা যদি অন্যের উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে আমাদের আন্তরিক স্বাধীনতা নষ্ট হয়। অন্যের উপর নির্ভর দুই প্রকার। অতীত কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বা অন্য দেশের লোকদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা বলিয়া লিখিয়া করিয়া গিয়াছেন, অবিচারিত ভাবে তাহার অনুসরণ এক প্রকারের পরনির্ভরতা। বর্ত্তমান সময়ে অন্য দেশের লোকদের ভাব চিন্তা কল্পনা রীতিনীতি আদর্শের অবিচারিত অনুসরণ অন্যবিধ পরনির্ভরতা। আমাদের দেশের বা অন্য দেশের প্রাচীন বা আধুনিক সব-কিছু বর্জ্জন করিয়া সকল বিষয়ে একেবারে নূতন-কিছু সৃষ্টি আমাদিগকে করিতে হইবে, এরূপ ফরমাইস করিতেছি না। পুরাতনের বিচারক আমরা আধুনিকেরা হইব; সেই বিচারের ফলে বর্জ্জক ও সংরক্ষকও আমরা আধুনিকেরা হইব। আবার নূতন যাহা আবশ্যক, তাহার উদ্ভাবকও আমরা হইব। বিধাতা যে আগেকার লোকদের মত আমাদিগকেও আত্মা জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভা দিয়াছেন, তাহার দ্বারাই আমাদের স্বাধীনচিত্ততা রক্ষার অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

আমানুল্লা খাঁর আন্তরিক স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় উক্তির গভীরতা ও ব্যাপকতা কত টুকু বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই দাঁড়ায়, যে, লোকাচার দেশাচার শাস্ত্রবিধি সকলের চেয়ে বড় মানুষের আত্মা। এই আত্মার নির্ম্মল প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে ও বিচারে যাহা সত্য ও মঙ্গল বলিয়া দাঁড়াইবে, তাহাই গ্রহণীয় ও রক্ষণীয়; বাকী সমস্তই বর্জ্জনীয়। আমানুল্লার অন্তরে স্বাধীন চিন্তার দৌড় কত দূর জানি না; কিন্তু বাহিরে দেখিতেছি তিনি লোকাচার, দেশাচার, বিধিনিষেধ মানিতেছেন না। তিনি অবরোধ-প্রথা নিজ মহিষীর দৃষ্টান্ত দ্বারা তুলিয়া দিতেছেন, বহু-বিবাহের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন, নারীশিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, রাজার একচ্ছত্র প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মতকে প্রাধান্য দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং সকলধর্ম্মাবলম্বী লোকদের প্রতি সমান ব্যবহারের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আফগানরা স্বাধীন হওয়ার পরলোকেও তাহাদের মর্য্যাদা বাড়িয়াছে, আমানুল্লা এই উক্তির অর্থ খুলিয়া বলিয়াছিলেন কি না জানি না। ইহার মধ্যে যেরূপ অর্থ নিহিত থাকিতে পারে, আমাদের অনুমান অনুসারে তাহা কিছু বলিতেছি।

যাঁহারা পরলোকে বিশ্বাসী তাঁহারা মনে করেন, মানুষের বাহ্য সম্পদ পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে, তাহার আত্মিক সম্পদই মৃত্যুর পর তাহার নিজস্ব থাকে। স্বাধীন হইতে ও থাকিতে হইলে মানুষের কতকগুলি সদ্‌গুণের প্রয়োজন। এগুলি তাহার আত্মিক সম্পদ। এই সব গুণের বিকাশ সাধনাসাপেক্ষ। অনেকে মনে করেন, পরাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও আর্থিক উন্নতিতে বাধা থাকিলেও নৈতিক ও ধার্ম্মিক উন্নতি খুব হইতে পারে। আমাদের ধারণা তাহা নহে। পরাধীন জাতির এক আধ জন মানুষ সকল দিক দিয়া নীতিমান্ ও ধার্ম্মিক হইতে পারেন কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই, যে, সাধারণতঃ পরাধীন জাতির লোকদের পক্ষে পূর্ণমাত্রায় ধার্ম্মিক হওয়া কঠিন। ইহা ত দেখাই যায়, যে, পরাধীন জাতির অনেক শ্রেষ্ঠ সাধক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সঙ্গে কোন যোগই রাখেন নাই। সকলকেই খবরের কাগজে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কলম চালাইতে হইবে বা "বিরাট" জনসভায় গলাবাজী করিতে হইবে, বলিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা "সাধনা"র ব্যাঘাত হইবার ভয়ে সংসারের রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিকাদি সর্ব্ববিধ ব্যাপার হইতে দূরে থাকেন এবং দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা শিষ্যদিগকেও দূরে থাকিতে বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম অঙ্গহীন, সাধনাও অঙ্গহীন। অভয়, সত্যবাদিতা, সত্যাচরণ—এগুলি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। পরাধীন জাতির পক্ষে অভয় সত্যবাদিতা ও সত্যাচরণের সাধনায় সিদ্ধিলাভ অতি কঠিন। অথচ এরূপ সিদ্ধি ব্যতীত পরলোকে মর্য্যাদাবৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। কারণ, পরলোকের অধিবাসী আত্মাদের মধ্যে কেবল উক্তরূপ ও অন্যবিধ আত্মিক সম্পদই সম্মানের কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

যাঁহারা পরলোকে বিশ্বাস করেন না, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষের আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, উপরে আলোচিত আমানুল্লার উক্তিটির অর্থ বুঝিবার তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ও বাহিরে স্বাধীন হওয়া উচিত, আমানুল্লার এই উক্তিটির অর্থ সকলেরই বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

—

"অনন্যসংলগ্ন" স্বাধীনতা

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা কানাডার মত স্বরাজ অর্থাৎ ডোমিনিয়ন্ স্বরাজ পাইলে তাহা যে পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা ভাল, ইহা বুঝাইবার জন্য কেহ কেহ নিন্দাসূচক "আইসোলেটেড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" অর্থাৎ অনন্যসংলগ্ন স্বাধীনতা কথা দুটি প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ কি না, ভারতবর্ষ ব্রিটিশসাম্রাজ্যসংলগ্ন থাকিলে তাহার দোসর থাকিবে, কিন্তু পূরা স্বাধীনতায় সে একলা একঘরে হইয়া পড়িবে। কিন্তু ফ্রান্স, বেলজিয়ম, জাপান, ইটালী, এমন কি ক্ষুদ্র শ্যাম ও আফগানিস্থানও ত, আপনাদিগকে একলা অসহায় অনুভব করিতেছে না? তাহারা নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে মিত্র বাছিয়া লইয়া সন্ধিসূত্রে অন্যসংলগ্ন হইয়া আছে। যাঁহারা অনন্যসংলগ্ন স্বাধীনতাকে ভয় করেন, বা ভালবাসেন না, তাঁহারা বিপদে আপদে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাহায্য পাওয়ার আশা ছাড়া ডোমিনিয়ন স্বরাজের এমন আর কিছু সুবিধার কথা বলিতে পারিবেন না, যাহা পূর্ণ স্বাধীন দেশের নাই। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীন দেশসমূহও সন্ধি দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও অন্যান্য দেশের সাহায্য পাইয়া থাকে; পূর্ণ-স্বাধীন ভারতই তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবে? বর্ত্তমানে ব্রিটিশ জাতি যে ভারতের টাকায় ভারত রক্ষা করে, তাহা আমাদের প্রতি মৈত্রী বশতঃ নহে, নিজের জমীদারী রক্ষা হিসাবে করে।

ইংরেজী শব্দ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের অনুবাদ "অনধীনতা" করিয়া, উহা যে অভাবাত্মক জিনিষ সুতরাং কাম্য নহে, এইরূপ আত্মপ্রবোধ বা আত্মপ্রতারণার চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভারতীয়েরা ত অনধীনতা চাই না, স্বাধীনতা চাই; সুতরাং ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের কোন আক্ষরিক অনুবাদ লইয়া আমাদের সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "দি উঈক" অর্থাৎ "সপ্তাহ" নামক একটি রোমান কাথলিক কাগজ ডোমিনিয়ন স্বরাজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য কানাডার সহিত মিশরের তুলনা করিয়া লিখিয়াছে, কানাডা একটা ডোমিনিয়ন আর মিশর স্বাধীন, কিন্তু সবাই জানে মিশরের চেয়ে কানাডার শক্তিসম্পদ বেশী। এই হাস্যকর দৃষ্টান্ত দ্বারা "দি উঈক" বুঝাইতে চায়, যে, স্বাধীনতার চেয়ে ডোমিনিয়ন স্বরাজ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মিশর ত স্বাধীন দেশ নয়, এবং স্বাধীনতার আদর্শও নয়। আদর্শস্থানীয় স্বাধীন দেশের সঙ্গে ডোমিনিয়নের তুলনা করিতে হইলে ফ্রান্স জাপান আমেরিকা প্রভৃতির সহিত তুলনা করা উচিত। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, ইউরোপীয়বংশোদ্ভূত খৃষ্টিয়ান লোকদের অধ্যুষিত কানাডাকে ব্রিটেন যতটা রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জনে বাধা দেয় নাই, প্রধানতঃ অখৃষ্টিয়ান ও প্রাচ্য লোকদের বাসভূমির প্রতি তাহার ততটা মৈত্রী না দেখাইবার সম্ভাবনা আছে।

—

স্বাধীনতালাভের কল্পিত বাধা

আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা অপেক্ষা কম কিছুতে এখন রাজী হইলে ভবিষ্যতে পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জ্জনে নিশ্চয়ই বাধা জন্মিবে, মনে করি না। যদি স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীন, সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়অধিকারশূন্য জাতিরা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কতকটা রাষ্ট্রীয়অধিকারশালী জাতি কেন তাহা পারিবে না? আশঙ্কার কোন কারণই যে নাই; তাহা নহে। বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, অধিকারশূন্যতা ও বলহীনতা আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার জন্য যতটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, ডোমিনিয়ন স্বরাজের আমলে দশা কতকটা ফিরিলে, অধিকার কিছু বাড়িলে, বল কিছু সঞ্চিত হইলে, তত প্রবল আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে না থাকিতে পারে। এই জন্যই স্যার্ তেজবাহাদুর সাপ্রুর মত মডারেট নেতারা বলিতেছেন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রোগের অমোঘ ঔষধ

ডোমিনিয়ন্ স্বরাজ; উহা পাইলেই রোগের শান্তি হইবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, একরকম দুশ্চিকিৎস্য স্বাধীনতালিপ্সা ব্যাধিও আছে, যাহার একমাত্র ঔষধ পূর্ণ স্বাধীনতা। ডোমিনিয়ন্ স্বরাজ পাইলেও এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা স্বাধীনতাপ্রচেষ্টা চালাইতে থাকিবে, এবং তাহা চালান এখনকার চেয়ে সহজ হইবে।

যাঁহারা নিজে এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ডোমিনিয়ন্ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাহা তাঁহারা বুকে হাত দিয়া বলুন; তাঁহাদের সত্যবাদিতায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিব না। কিন্তু দুটি কথা বলিব। প্রথম, তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট করিবার সাধ্য বা অধিকার কিছুই তাঁহাদের নাই। দ্বিতীয়, আমরা নেতা বা অনুচর না হইলেও বলিতেছি, আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট, ডোমিনিয়ন স্বরাজেও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইব না, পূর্ণ-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিব এবং ধর্ম্মানুমোদিত কোন উপায়ে তাহা লাভের সম্ভাবনা থাকিলে তাহা অবলম্বনের বিরোধী হইব না। ডোমিনিয়ন্ স্বরাজ পাইলে কোন দলই বা কেহই অন্য কিছু চাহিবে না, এরূপ স্তোকবাক্যে ইংরেজ ভুলিবে না; কিন্তু যদি ইংরেজের ভুলিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও আমরা সেরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতাম না। দুশ্চিকিৎস্য স্বাধীনতাবাদগ্রস্ত লোক ভারতবর্ষে আছে বলিয়া যদি ব্রিটেন ভারতের "সর্ব্বদল"সম্মত ডোমিনিয়ন্ স্বরাজ পাওয়ার পরিপন্থী হয়, পরিণামে তাহাতে ব্রিটেনের কল্যাণ হইবে না, ভারতের ভাগ্যতরীও চড়ায় ঠেকিয়া অচল বা ভগ্ন হইবে না।

—

ভাষা অনুসারে প্রদেশ বিভাগ

একান্ত প্রয়োজন স্থলে (যেমন উৎকলীয়দের জন্য) ভাষানুসারী প্রদেশ গঠনের আমরা সমর্থন করি। কিন্তু একটা নিয়মের খাতিরে ভারতের বর্ত্তমান সব প্রদেশ ভাঙিয়া চুরিয়া প্রদেশগুলি পুনর্গঠনের আমরা পক্ষপাতী নহি। দেশহিতৈষীরা সমুদয় ভারতীয়দিগকে একটি মহাজাতিতে পরিণত করিতে চান। এক একটি প্রদেশে একাধিকভাষাভাষী লোক সদ্ভাবে বাস করিতে শিখিলে, তাহা ভারতীয় মহাজাতি গঠনে সাহায্য করে। সুতরাং কোনও প্রদেশে একাধিক ভাষার অস্তিত্ব সব দিক দিয়াই মন্দ বলা যায় না। এইরূপ সকল প্রদেশ ভাঙিবার দাবীও সেই সেই প্রদেশবাসী লোকেরা করেন নাই। বোম্বাই ভাঙিয়া স্বতন্ত্র গুজরাত ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ গড়িবার দাবী হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

খরচের দিক্‌টাও ভাবিতে হইবে। যে-সব ভারতীয় ভাষায় খুব অল্প লোক কথা বলে, তাহা ছাড়িয়া দিলেও, ভাষার সংখ্যা গোটা কুড়ি হয়। কুড়িটা প্রদেশের কুড়িজন গবর্ণর, কুড়িটা সেক্রেটারিয়েট ব্যবস্থাপক সভা মন্ত্রিমণ্ডল শাসন-পরিষদ হাইকোর্ট শিক্ষাবিভাগ পুলিসবিভাগ ইত্যাদির ব্যয় প্রদেশগুলি যদি বহন করিতে পারে, তাহা হইলেও সেরূপ ব্যয় করা কি উচিত হইবে? এই অতিরিক্ত ব্যয়টা শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য করিলে অধিকতর সুফল হইবে না কি?

যে-সব ভূখণ্ড আগে একপ্রদেশভুক্ত ছিল ও যাহাদের ভাষা এক তাহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত বহুখণ্ডিত করিয়া একভাষাভাষী লোকদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। যাহারা আগে সংখ্যাভূয়িষ্ঠের দলে ছিল, এই প্রকারে তাহাদিগকে সংখ্যান্যূনে পরিণত করা বিশেষ করিয়া দূষণীয়। ছোটনাগপুর ১৯১২ পর্য্যন্ত বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ছিল। উহার মানভূম সিংহভূম প্রভৃতি অঞ্চল এবং পূর্ণিয়ার অনেক অংশ বঙ্গেরই অঙ্গ। ১৯১২ সালে কিন্তু ঐ অঞ্চলগুলিকে বিহারের সহিত যুক্ত করায় তথাকার বাঙালীরা নিজ বাসভূমে থাকিয়াও বিহারের একটি সংখ্যান্যূন লোকসমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। এই জন্য, বর্ত্তমানে বিহার-উৎকলের সামিল যে-সব অঞ্চলে বাঙালীর সংখ্যা বেশী সেইসব ভূখণ্ডকে পুনরায় বাংলার সামিল করিয়া দেওয়া উচিত।

—

পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস

হিন্দুমুসলমান পরস্পরকে ভয় ও অবিশ্বাস করে বলিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জনের সমবেত চেষ্টা এপর্য্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া আছে। লক্ষ্ণৌয়ের মীমাংসায় যদি ভয়

অবিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণেও কমে, তাহাতে দেশের মঙ্গল হইবে।

কাহারও কথায় এই অবিশ্বাস ও ভয় দূর হইবার নয়; পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা এবং নানা দেশের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের জ্ঞান হইতে ভয় ও অবিশ্বাস ক্রমশ কমিয়া যাইতে পারে।

হিন্দুমুসলমান উভয়েই পরস্পরের পক্ষপাতিত্ব ও অত্যাচারাদির ভয়ে ভীত। কিন্তু ইংরেজ সর্ব্বোপরি কর্ত্তা থাকায় পক্ষপাতিত্ব ও অত্যাচার হইতেছে না, কেহ বলিতে পারেন কি? বাংলাদেশে নারীনিগ্রহ কম হইতেছে কি? পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বাংলার অর্দ্ধেকের কম। সেখানকার সম্প্রতিপ্রকাশিত পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায়, যে, এক বৎসরে ৫৫৬টা নারীহরণ ও নারীধর্ষণের অভিযোগ হইয়াছিল। অথচ পঞ্জাবেও ইংরেজের রাজত্ব বিদ্যমান। হিন্দু বলে, ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি চাকরী বিষয়ে পক্ষ-পাতিত্ব করে, মুসলমানরা বলে তাহার উল্‌টা। ইংরেজের প্রভুত্বে যদি চাকরীবিষয়ক পক্ষপাতিত্ব এবং নারীনিগ্রহাদি অত্যাচার সহ্য হয়, তাহা হইলে ইংরেজের প্রভুত্ব না থাকিলে তাহা এখনকার চেয়ে বেশী অসহ্য বোধ কেন হইবে? অনেকে অতীত ইতিহাসের দৃষ্টান্ত হইতে বলেন, যে, ইংরেজপ্রভুত্ব যখন ছিল না, তখন দুর্গতি আরও বেশী ছিল, সুতরাং তাহাদের প্রভুত্ব না থাকিলে আবার অত্যাচারাদি বাড়িবে। কিন্তু কোন দেশেই বর্ত্তমান অতীতের মত নহে। ইংলণ্ডেও অত্যাচার আগে বেশী হইত, এখন তত হয় না। বর্ত্তমান তুরস্ক পারস্য আফগানিস্থান শ্যাম জাপান সকলেরই স্বাধীন অবস্থাতে উন্নতি হইতেছে; ইংরেজপ্রভুত্ব ব্যতিরেকে কেবল ভারতবর্ষেরই উন্নতি হইবে না, ইহা বড় অদ্ভুত ধারণা। ইংরেজপ্রভুত্ব অন্তর্হিত হইলে পক্ষপাতিত্ব অত্যাচারাদি না বাড়িয়া কমিবার সম্ভাবনা যে আছে, তাহার কারণ ও যুক্তি প্রদর্শনও কঠিন নহে। বর্ত্তমান সময়ে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি হিন্দুর ব্যবহার ও মুসলমানের ব্যবহারের উন্নতির দৃষ্টান্তও নানা দেশ ও রাজ্য হইতে দেওয়া যায়।

ইংরেজপ্রভুত্ব অন্তর্হিত হইলে মুসলমানরা বিদেশী মুসলমানদের ডাকিয়া রাজা করিবে, পঞ্জাবের কোন কোন মুসলমানের লেখা ও উক্তি হইতে এরূপ আশঙ্কাও কাহারও কাহারও জন্মিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধি সহকারে বিদেশীকে ডাকিয়া ভারতের রাজা করিবার দুর্ব্বুদ্ধির কথা আর শোনা যাইবে না। অতীত ইতিহাসে, মুসলমান আমলে, মোগল পাঠান এক হইতে পারে নাই; পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, পরস্পরকে পদদলিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্থান, হেজাজ, ইরাক সবাই মুসলমান; কিন্তু কেহ কাহারও অধীন হইতে চায় না। যদি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের মুসলমানরা বিদেশী মুসলমানদের অধীন হইতে চায়, জন্মভূমি ভারতবর্ষকে পরাধীন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে হইবে। অবশ্য, এমন অনেক মুসলমান থাকিতে পারে, যাহারা ভারতবর্ষে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা করিয়া তার চেয়ে বিদেশী মুসলমানদের অধীনতা বাঞ্ছনীয় মনে করিতে পারে। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ স্বরাজ্যের আমলে দেশ প্রবলতম রাজনৈতিক দল দ্বারা শাসিত হইবে, এবং সেই দলে সব ধর্ম্মেরই লোক থাকিবে। বিশেষ কোন একটি রাজনৈতিক দল চিরকাল প্রবলতম থাকিবে না; কখন এক দল কখন বা অন্য দল প্রবলতম হইবে। কোন দলে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টিয়ান বৌদ্ধ শিখ পারসী প্রভৃতির অনুপাতও সব সময়ে এক থাকিবে না, তাহারও সাময়িক পরিবর্ত্তন পুনঃ পুনঃ ঘটিবে।

—

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান

ভাদ্রের প্রবাসীতে বিশ্বভারতীতে বর্ষা-উৎসবের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের বৃত্তান্ত লিখিয়াছি। এই অনুষ্ঠানের কোন অংশের ফোটোগ্রাফ লওয়া হয় নাই। ইহা হইয়া যাইবার কিছু দিন পরে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু তুলি দিয়া স্মৃতি হইতে ইহার একটি নক্‌সা আঁকিয়া পাঠান। তাহার প্রতিলিপি এখানে দিতেছি। অনুষ্ঠানক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী ও দর্শকেরা সমবেত হইবার পর যখন ছাত্রীনিবাস হইতে ছাত্রীরা সুন্দর সুরুচিসঙ্গত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নানা অর্ঘ্য লইয়া গান করিতে

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু দ্বারা 'প্রবাসী'র জন্য অঙ্কিত

শ্রীনিকেতনে হলচালন উৎসব

শিল্পী শ্রী নন্দলাল বসু কর্তৃক 'প্রবাসী'র জন্য অঙ্কিত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]
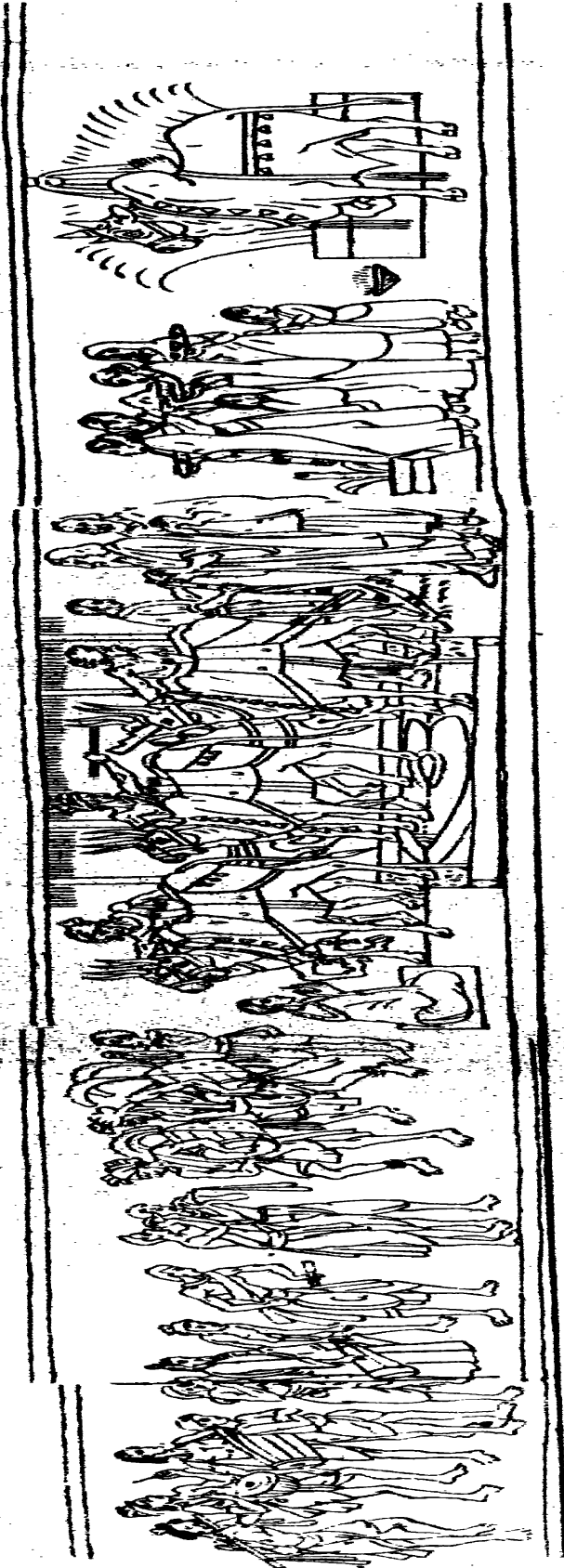
করিতে তথায় আসেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে দু-জন ছাত্র পত্রপুষ্পে শোভিত একটি ডুলিতে একটি বৃক্ষশিশুকে বহন করিয়া আনেন, ইহা অনুষ্ঠানের সেই অংশের ছবি।

শ্রীনিকেতনে হলচালন উৎসব

বর্ষা-উৎসবের অঙ্গস্বরূপ শ্রাবণ মাসে সুরুল গ্রামে স্থিত শ্রীনিকেতনে যে হলচালন উৎসব হয়, ভাদ্রের প্রবাসীতে তাহারও বর্ণনা আছে। এই অনুষ্ঠানের কয়েকটি ফোটো-

রবীন্দ্রনাথ হলচালন উৎসবের প্রারম্ভে গান গাইতেছেন

রবীন্দ্রনাথ হলচালন করিতেছেন

ছিঁড়িয়া না যায় উহা এরূপ শক্ত কাগজে ছাপা হইয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে ছিদ্রশ্রেণীর বরাবর ছিঁড়িয়া উহা বাঁধাইয়া রাখিতে পারিবেন।

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গল্প

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে একটি সুন্দর গল্প রচনা করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা প্রবাসীর পরবর্ত্তী এক সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল

বারদোলির কৃষকেরা, কৃষকপত্নীরা, এবং তাহাদের সন্তানেরা সত্য ও ন্যায়ের জন্য ধীর শান্ত ভাবে নানা কষ্ট ও অপমান সহ্য করিয়াছে। কোন ভয় তাহাদিগকে ভীত করিতে পারে নাই। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেলের মত ভগবদ্বিশ্বাসী, সাহসী, ধৈর্য্যশীল ও শান্ত নেতার নেতৃত্ব বারদোলির অধিবাসীদিগের প্রশংসনীয় আচরণের অন্যতম কারণ।

সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল

গ্রাফ লওয়া হইয়াছিল। কোনটিই সুস্পষ্ট হয় নাই। তথাপি উৎসবের দৃশ্যের কতকটা ধারণা জন্মাইবার জন্য এখানে দুখানি ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি দিতেছি। একটিতে দৃষ্ট হইবে, রবীন্দ্রনাথ উৎসবের প্রারম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া পুস্তক হইতে তাঁহার একটি গান গাইতেছেন। অন্যটিতে দেখা যাইবে, তিনি হলচালন আরম্ভ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু উৎসবের কিছুদিন পরে তুলি দিয়া উহার যে একটি ছবি আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিলিপি স্বতন্ত্র ছাপিয়া এই মাসের প্রবাসীর সহিত দিলাম। যাহাতে ভাঁজে ভাঁজে

"রাজাকে রক্ষা কর"

লক্ষ্ণৌতে "সর্ব্বদল" কন্‌ফারেন্সে ডোমিনিয়ন্ স্বরাজের পক্ষে মত প্রকাশিত হওয়ায় পাইয়োনীয়রের সম্পাদক, কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ডাক্তার আন্সারীকে এই টেলিগ্রাম পাঠান, যে, যখন ভারতীয় সব দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের-অন্তর্গত থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছেন, তখন তাঁহারা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নৃপতি পঞ্চম জর্জ্জের প্রতি বাধ্যতা ও প্রীতিব্যঞ্জক "গড্ সেভ্ দি কিং," "ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন," এই ব্রিটিশ জাতীয় গানটি গাইয়া সভার কাজ শেষ করুন। ডাক্তার আন্‌সারী উত্তরে বলেন, "ডোমিনিয়ন্ স্বরাজ পাইবার পর এবিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে; আপাততঃ পাইয়োনীয়ার আমাদের সহিত বন্দেমাতরম্ গান করুন।" ইহাতে পাইয়োনীয়ার চটিয়া সিডীশ্যনের গন্ধ পাইয়াছেন। এলাহাবাদের লীডার বলিয়াছেন, যে, ডাক্তার আন্‌সারী লঘুচিত্ততার সহিত উত্তর দিয়াছেন। সুতরাং বিচার করিতে হইতেছে, যে, পাইয়োনীয়ারের অনুরোধটা গম্ভীর-ভাবে করা হইয়াছিল কিনা, কিম্বা এরূপ অনুরোধ গম্ভীর ভাবে করা যায় কিনা। "গড্ সেভ্ দি কিং" গানটির কথাগুলি ইংরেজী, সুর ইউরোপীয়। কোনটাই ভারত-বর্ষের কোন প্রদেশের নিজস্ব জিনিষ নহে। ডাক্তার আন্‌সারী, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি সকলে সমস্বরে দেশী গান গাইতেও অভ্যস্ত নহেন, ইংরেজী গান গাইবার অভ্যাস বোধ করি তাঁহাদের কাহারও নাই। এ অবস্থায় কন্‌ফারেন্সের সভ্যেরা গড্ সেভ্ দি কিং গাইলে তাহার ফল সঙ্গীত হিসাবে শোচনীয় হইত, যদিও শ্রোতারা অন্য কারণে আমোদ পাইত।

তা ছাড়া, "গড্ সেভ্ দি কিং" বা তদ্রূপ অন্য কোন গান গাইয়া রাজভক্তি প্রকাশ আমাদের দেশী রীতি নয়। হিন্দুরা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া বা কালীঘাটে পাঁঠা মানসিক করিয়া হয়ত রাজার মঙ্গল কামনা করিতে পারেন। সাধারণ মুসলমানেরা সেই উদ্দেশ্যে কোন পীরকে সিন্নি মানত করিতে পারেন।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বে এবং তাহার আগে হইতে ইংরেজরা নানা অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের ধন দৌলত স্বাস্থ্য শিক্ষা সুখ বাড়িতেছে। এই জন্য তাহারা রাজবংশের প্রতি অনুরক্ত। তা ছাড়া তিনি তাহাদের সধর্ম্মী, স্বজাতি, স্বদেশী মানুষ। এই সব কারণে স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি তাহাদের একটা টান আছে। ভারতীয় লোকেরা, তাহাদের বেলায় এই সকল কারণ না থাকাতেও রাজা পঞ্চম জর্জকে অশ্রদ্ধা করে না, তাঁহার ভৃত্যদের প্রণীত আইন আদি মানিয়া চলে। ইহার বেশী কিছু মনোভাব দাবী করিয়া তাহার বাহ্য প্রকাশ আদায় করিবার চেষ্টা করিলে ফল ভাল হইবে মনে হয় না। ডোমিনিয়ন্ স্বরাজ পাইবার পর ভারতীয়দের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইলে তাহার যথাযোগ্য প্রকাশও লক্ষিত হইতে পারে। তাহার জন্য কাহাকেও অনুরোধ বা তাগিদ পাঠাইতে হইবে না।

রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার পূর্ব্বে বা পরে আইরিশরা এবং বুয়াররা গড্ সেভ্ দি কিং গাইয়াছিল কিনা, তাহাও জিজ্ঞাস্য। সাধারণতন্ত্রবাদী এবং কম্যুনিষ্ট্ ইংরেজরা ঐ গান করে কি?

—

আসামে বাঙালী

১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত আসাম বঙ্গের সহিত এক ছোট লাটের দ্বারা শাসিত হইত; এবং বর্ত্তমান আসামের অন্তর্ভূত বিস্তর জায়গায় বাঙালীরাই সংখ্যায় বেশী এবং বহুপুরুষ ধরিয়া তথাকার আদিম অধিবাসী। এই সব কারণে আসামের এই সব অঞ্চলেরও বঙ্গের সহিত পুনঃসংলগ্ন হইবার দাবী আছে।

এক্ষেত্রে কিন্তু আসামের বাঙালীদিগকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে বলিতে পারা যায়। বিহার-উৎকলে বাঙালীরা একটি সংখ্যান্যূন লোকসমষ্টি। তাহাতে অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যে সুশিক্ষার এবং তাহার সম্যক্ চর্চ্চার ব্যাঘাতও ঘটে। কিন্তু আসামে বাঙালীদের অবস্থা সেরূপ নহে। আসামের ৭৬০,০৬,২৩০ জন মানুষের মধ্যে বাঙালীরই সংখ্যাই বেশী —৩৫,২৫,২২০, অসমিয়াভাষীদের সংখ্যা তাহার প্রায় অর্দ্ধেক—১৭,২৫,৬৮৯। তাহার পর যে-সব ভাষাভাষীরা আছে, তাহাদের কোন সমষ্টির সংখ্যাই পাঁচ লক্ষও নহে—হিন্দীভাষীরাই সবচেয়ে বেশী, সংখ্যা ৪,৬৬,৩৮২। অতএব, দেখা যাইতেছে, যে, আসামে সংখ্যা হিসাবে বাঙালীরাই প্রধান অধিবাসী। তাহা হইলে বাঙালীরা দুটি প্রদেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ—বঙ্গে ও আসামে। হিন্দীভাষীরা তিনটি প্রদেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ—আগ্রা-অযোধ্যায়, বিহার-

উৎকল এবং মধ্যপ্রদেশ-বেরারে। ভারতীয় আর কোন ভাষাভাষীরা একাধিক প্রদেশে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নহে।

আসামে বাঙালীরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ এ কারণে নহে, যে, তাহারা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে; কিন্তু এই কারণে, যে, প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত তাহাদের পৈত্রিক বাসভূমি আসামের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহারা অসমিয়াভাষীদিগকে বেদখল করিতেছে না।

আরও একটি কথা বিচার্য্য। ব্রিটিশঅধিকারভুক্ত বঙ্গের আয়তন ৭৬,৮৪৩ বর্গ মাইল এবং তাহাতে ৪ কোটি ৬৬ লক্ষের উপর লোক বাস করে। এখানে হাত পা ছড়াইবার জায়গা নাই। কিন্তু আসামের ৫৩,০১৫ বর্গ মাইল জায়গায় মোটে ৭৬,০৬,২৩০ জন লোক বাস করে। অর্থাৎ আসামের আয়তন বঙ্গের রকম এগার আনা, কিন্তু লোকসংখ্যা বঙ্গের একষষ্ঠাংশেরও কম। সুতরাং আসামে, এখনও উদ্যোগী জাতির বাড়িবার স্থান ও অবসর যথেষ্ট আছে। এইরূপ একটি প্রদেশের সঙ্গে যোগ ছাড়িয়া ঘন-বসতি বঙ্গের সহিত যোগ কি বাঞ্ছনীয়? অবশ্য শ্রীহট্ট কাছাড় গোয়ালপাড়া বঙ্গের সামিল হইলেও যে-কোন স্থান হইতে বাঙালীরা গিয়া আসামের বিরলবসতি স্থানসমূহে অ'ড্ডা গাড়িতে ও তথাকার উদ্ভিজ্জ প্রাণিজ খনিজ সম্পত্তির অধিকারী হইতে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা না পাইতে পারে। কিন্তু আসাম-প্রদেশের অধিবাসী থাকিলে এপক্ষে যতটা সুবিধা হইবে, বঙ্গের অধিবাসী হইলে তাহা না মিলিতে পারে।

যদি আসাম বাঙালী ও অসমিয়াভাষী প্রভৃতি সকলেরই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যথেষ্ট বৃহৎ না হইত, তাহা হইলে বাঙালীদের উহা অন্যভাষাভাষীদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বিবেচনার যোগ্য হইত। কিন্তু ঐ প্রদেশ সকলের প্রয়োজনের জন্যই যথেষ্ট বড়।

আসামে বাঙালীদের সংখ্যা যেরূপ, তাহাতে তাহাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে কোনই বাধা নাই। অধিকন্তু আসামের বাঙালীদের একটি কল্যাণকর কাজ করিবার বিশেষ সুযোগ আছে। তাঁহারা নানা অসভ্য আদিম জাতিকে বাংলা শিখাইয়া ও বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদে অধিকারী করিয়া তাহাদের হিতসাধন করিতে এবং বঙ্গসাহিত্যের পাঠকবৃদ্ধি ও বঙ্গভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন। শিলচরের রামকৃষ্ণ আশ্রম এই চেষ্টা করিতেছেন।

আসামের বাঙালীরা আসামে থাকিয়াও বঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ এখনও পান, পরেও পাইতে পারেন। কিন্তু বস্তুতঃ আসামের মত এত বড় একটি প্রদেশকে শিক্ষাবিষয়ে আত্মনির্ভরক্ষম করা উচিত এবং তাহা অসাধ্যও নহে। আসামকে বড় বলায় অনেক হয় ত বিস্মিত হইবেন। ইহার লোকসংখ্যা কম বটে, কিন্তু পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশের লোকসংখ্যা ইহার চেয়েও কম। সেই সব দেশের প্রত্যেকটিতে অন্যূন একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। এরূপ কয়েকটি দেশের নাম, লোকসংখ্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

দেশ।	লোকসংখ্যা।	বিশ্ববিদ্যালয়সংখ্যা।
আসাম	৭৬,০৬,২৩০	০
অষ্ট্রিয়া	৬৬,০০,০০০	৩
বেলজিয়াম	৭৬,০০,০০০	৪
ডেন্মার্ক	৩৪,৩৫,০০০	১
গ্রীস	৭০,০০,০০০	৩
হল্যাণ্ড	৭৫,২৭,০০০	৬
নরওয়ে	২৭,৮৯,০০০	১
পোর্ত্তুগ্যাল	৬৪,০০,০০০	৩
সুইডেন	৬০,৭৪,০০০	২
সুইজারল্যাণ্ড	৪০,০০,০০	৭
তুরস্ক (ইউরোপীয়)	২০,০০,০০০	১

ইহা অবশ্য ঠিক কথা, যে, আসাম এই সব ইউরোপীয় দেশের মত ধনী লোকদের দেশ নহে। কিন্তু ধনশালিতার সম্ভাবনা আসামে খুব আছে। শিক্ষাবিস্তার ধন উৎপাদ-নের একটি উপায়। অবশ্য যে-শিক্ষা কেবল লেখনীজীবী ও বাক্যজীবী প্রস্তুত করে, তাহা ধন-উৎপাদনে সাহায্য করে না। আসামের ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেতাবী শিক্ষা ছাড়া অন্য রকম শিক্ষা দিবার বন্দোবস্তও করিতে হইবে।

বাংলার সহিত আসামের কয়েকটি জেলা পুনরায় যুক্ত করিবার সপক্ষে যুক্তিগুলি সুবিদিত। আমরা তাহার

বিরোধী নহি, কিন্তু বাঙালীদের আসামে থাকিবার সপক্ষে যুক্তিরও মূল্য আছে বলিয়া তাহার কিছু লিখিলাম। সব লিখিলাম না।

—

সারা বাংলার ছাত্রদের সভা

আমরা সমগ্র বাংলার ছাত্রদের একটি সভার মূল নিয়মাবলীর একটি ইংরেজী খসড়া পাইয়াছি। সমস্তটি এখনও পড়ি নাই। সভ্য হইবার নিয়মের মধ্যে দেখিলাম, বঙ্গের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী, (ক) চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে, (খ) বার্ষিক চারি আনা চাঁদা দিলে, এবং (গ) সভার ক্রীড (মত ও বিশ্বাস) গ্রহণ করিলে, এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন। বয়স যত কমই রাখা হউক না কেন, কর্ত্তব্য কাজের পক্ষে তাহা কাঁচা না হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্তু যে-কাজের পক্ষে যে-বয়সে বুদ্ধি যথেষ্ট পরিপক্ব হয় না এবং জ্ঞানও যথেষ্ট সঞ্চিত হয় না, সেই কাজ সেই বয়সের লোকদিগকে করিতে বলিলে তাহা ভাল দেখায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ছাত্র-কন্‌ফারেন্সের সংস্রবে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর তর্কবিতর্কের প্রতিযোগিতা হইবে। বাংলায় তর্কবিতর্কের বিষয়:—"বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশুন্স বা বিধানাবলী প্রণয়নে ছাত্রদের হাত থাকা উচিত।" এই অধিকার ছাত্রদের থাকা উচিত কি না, তাহা এখন আলোচনা করিতে চাই না। কিন্তু যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, ছাত্রদের এই অধিকার থাকা উচিত, তাহা হইলে জানা দরকার, কি বয়সের ও কতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্রদের তাহা থাকা উচিত। ছাত্রদের প্রস্তাবিত সভার সভ্য চৌদ্দ বৎসরের বালকবালিকারাও হইতে পারে। সুতরাং চৌদ্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বয়সের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ হইতে এই অধিকারের দাবী করা হইতেছে, মনে করা যাইতে পারে। বিচার করিতে হইবে, ইহার মধ্যে সব বয়সের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানাবলী প্রণয়নে হাত থাকা উচিত, না কেবল কোন কোন বয়সের। যদি কোন কোন বয়সের হয়, তাহা হইলে তাহা কি? কাহারও কাহারও জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা অল্প বয়সেই বেশী হইয়া থাকে; তাহাদের সংখ্যা খুব কম। সাধারণতঃ কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের নীচে লোকদিগকে নাবালক মনে করা হয়।

এই আর একটা কথাও বিবেচ্য, যে, পৃথিবীতে কোথাও ছাত্রদের এই অধিকার আছে কি না। পৃথিবীর যাহা কোথাও নাই, বাংলাদেশে তাহা হওয়া উচিত নহে, বলিতেছি না। কিন্তু শিক্ষায় অগ্রসর দেশসকলের অভিজ্ঞতার এবং তাহাদের অনুমোদিত রীতির একটা মূল্য আছে।

—

সোশিয়্যালিজম্ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক

ছাত্রদের উক্ত সভায় আর-একটি বিষয়েও বিতর্ক হইবে। তাহা এই:—

"মানবজাতিকে পূর্ণতর ও মুক্ততর জীবন দিবার জন্য সোশিয়্যালিজমের মূলনীতিসমূহ অনুসারে সমাজ পুনর্গঠিত হওয়া উচিত।"

আমরা ইংরেজী সোশিয়্যালিজম্ শব্দটি ব্যবহার করিলাম এইজন্য, যে, বাংলায় সমাজতান্ত্রিকতা, সমাজতন্ত্র, স্বত্বসাম্যবাদ, সমষ্টিবাদ প্রভৃতি নানা প্রতি-শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকিলেও, কোনটিই বিশেষ প্রচলিত হয় নাই, এবং কোনটির দ্বারাই সোশিয়্যালিজ্‌মের নানা মত ও নীতি ব্যক্ত হয় না। ইহার একটি মত এই, যে, সমাজস্থ সকল লোকের পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া পরস্পরের সহযোগিতায় ধন উৎপাদন করা এবং উৎপাদিত ধন সকলের মধ্যে সমান ভাবে বাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আর একটি মত এই, যে, জমী এবং মূলধন ব্যতীত যখন ধন উৎপাদন করা যায় না, তখন জমী ও মূলধন এক এক জনের সম্পত্তি না হইয়া রাষ্ট্রের সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত; রাষ্ট্র সকলের হিতের জন্য জমীর ও মূলধনের ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবে। সোশিয়্যালিজ্‌মের এইরূপ আরও অনেক মত আছে। সেই সকল সম্বন্ধে অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধিকায় তৎসমুদয়ের আলোচনা দূরে থাক্, উল্লেখও সম্ভবপর নহে।

সোশিয়্যালিজ্‌মের দোষ-গুণের বিচার না করিয়া উহার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইলেও দেখিতে হইবে, যে, সমস্ত জাতির উৎপন্ন ধনে যদি দেশের সব লোকের অংশ সমান করা যায়, তাহা হইলে ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে হইলে সব মানুষের পরিশ্রমের প্রকার ও পরিমাণ, পরিশ্রমের শক্তি, পরিশ্রমের ইচ্ছা, বুদ্ধি প্রভৃতিও সমান করিতে হইবে। কারণ বুদ্ধি শ্রমশক্তি প্রভৃতি সকলের সমান না হওয়ায়, ধন উৎপাদনের সামর্থ্যও সকলের সমান নহে। এই তারতম্য সত্ত্বেও মোট উৎপন্ন ধন সমভাবে সকলের মধ্যে বাঁটিয়া দিলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। এইজন্য সোশিয়্যালিষ্ট্‌দিগকে প্রত্যেক মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তি, শ্রমের শক্তি ও প্রবৃত্তি, প্রাপ্তবয়স্কদের সন্তান ও অন্য পোষ্যদের সংখ্যার সমানতা, কিম্বা তাহা সম্ভব না হইলে রাষ্ট্র দ্বারা সকলের সকল শিশুর ভরণপোষণ শিক্ষাদির সমান ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হইবে।

এই সব তর্ক ছাড়িয়া দিয়া একটা মোটা কথার প্রতি মন দেওয়া সদ্য সদ্য দরকার হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত ভারতের লোকদের প্রত্যেকের গড় আয়ের অনুমান অনেকে করিয়াছেন। সর্ব্বোচ্চ অনুমান বার্ষিক এক শত টাকার অর্থাৎ মাসিক ৮।৴৪ এর চেয়ে অনেক কম। কল্পনা করা যাক্, যে, সোশিয়্যালিজ্‌মের মত অনুসারে প্রত্যেকের আয় মাসে আট টাকা পাঁচ আনা চারি পাই হইল। ইহাতে ভারতবর্ষের কতগুলি মানুষের জীবন পূর্ণ ও মুক্ত হইবে? একজনেরও হইবে না। যাহাদের কোন শ্রমলব্ধ উপার্জ্জন নাই, ভিক্ষা যাহাদের বৃত্তি, তাহাদের বার্ষিক আয় এক শত টাকা হইলে জীবন কতটা পূর্ণ ও মুক্ত হইবে জানি না; কিন্তু বর্ত্তমানে যাহারা স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে, তাহাদের আয় মাসিক আট টাকা হইলে বিশেষ কষ্টের কারণ হইবে। অতএব মোটের উপর এরূপ বন্দোবস্তে দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িবে কিনা, সন্দেহস্থল। আমাদের ধারণা, মোটের উপর কমিবে। পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য মূলধন পুঞ্জীভূত হওয়ার যে প্রয়োজন আছে, তাহাতেও বাধা পড়িবে। যে-সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের বেতন সাত টাকা চৌদ্দ পনের টাকা কুড়ি টাকা দেন, তাঁহাদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে? রাষ্ট্র যদি সকলের অবৈতনিক উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে, তবে কেবল "ভদ্র" শ্রেণীর জন্য করিলে চলিবে না; সকলের জন্য করিতে হইবে। তাহা করিবার মত টাকা ভারতের এখন আছে কি? আছে বলিয়া আমরা জানি না।

সকল জিনিষে সকলের সমান অধিকার রুশিয়াতেও স্থাপিত হয় নাই, হইতে পারে না। সেখানে একজন যে-সব কোট প্যাণ্টালুন পরে, তাহার কোনটা কি অন্য কেহ ইচ্ছা-মত যখন তখন বিনা বাক্যব্যয়ে লইতে পারে? সকলের আয় সমান করা কত বার হইবে? সমান আয় হইতে কেহ সঞ্চয় করিবে, কেহ সঞ্চয় করিবে না, কেহ বা ঋণগ্রস্তও হইবে। সঞ্চয়ীর টাকা বার বার কাড়িয়া লইয়া কি অসঞ্চয়ী বা অপব্যয়ীদের মধ্যে আর বার বিলাইয়া দেওয়া হইবে?

আমাদের বিদ্যার্থী ও অন্য নবীনেরা বড় বড় বিষয়ের আলোচনা করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই; যদি রীতিমত বহু অধ্যয়ন ও চিন্তার পর করেন, তাহা হইলে বরং লাভ আছে। একটি আশঙ্কার কথা কিন্তু ভয়ে ভয়ে বলিতে হইতেছে। আমাদের মত বৃদ্ধদের বাচালতা দোষ হয় ত মার্জ্জনীয়। মানুষের এমন বয়স আসে, যখন তাহারা বাক্‌সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে; কারণ অন্যবিধ কর্ম্মশক্তি কমিয়া আসে বা লোপ পায়। নবীন যাঁহারা, তাঁহারাও তাঁহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের বাক্‌সর্ব্বস্বতার অনুসরণ করিলে ভুল করিবেন। বড় বড় সমস্যার বিচার আলোচনা তাঁহারা করুন, কিন্তু কাজও তাঁহারা কিছু করুন। এবং বিদ্যার্থীরা সর্ব্বাগ্রে বিদ্যা অর্জ্জন ও চরিত্র গঠন করুন। আমরা নিরুপায় অসহায় হইয়া লক্ষ্য করিতেছি, বাঙালী জ্ঞান অন্বেষণ, জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বর্দ্ধন ও বিদ্যা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে হটিয়া যাইতেছে—যদিও এক সময় এবিষয়ে বাঙালীর শ্রেষ্ঠতা ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাঙালীর পরাভব ঘটিয়াছে। কিন্তু অগ্রণীদের মধ্যে স্থান আবার বাঙালী পাইতে পারে যদি প্রতিজ্ঞা ও চেষ্টা থাকে।

—

নূতন অপদেবতা

নূতন হইলেও খুব নূতন নহে। এই অপদেবতার নাম "আকস্মিকতা।" শুনা যায়, ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন। তাঁহাদের সকলের নাম কোথাও দেখি নাই—এমন বৃহৎ কোন শাস্ত্র নাই যাহার শব্দসংখ্যা তেত্রিশ কোটি। সুতরাং নূতন অপদেবতাটার আগে দেবতাদের মধ্যে স্থান ছিল কিনা বলা যায় না।

কিছু কাল হইতে দেখা যাইতেছে, যে, হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত, অসদ্ভাব ও বিরোধ কমিয়া আন্তরিক বা বাহ্য সদ্ভাব ও মিলনের সম্ভাবনা হইবা মাত্র অকস্মাৎ এমন একটা বিরোধ রক্তারক্তি ঘটে যাহাতে সমগ্র হিন্দু ও মুসলমান সমাজ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাহার আধুনিকতম দৃষ্টান্ত লক্ষ্ণৌ ও খড়্গাপুরে পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্ণৌতে বহু হিন্দু মুসলমান শিখ নেতা মিলিয়া আপোষে একটা মীমাংসা করিলেন, নানা দলের কাগজ নেতাদের প্রশংসায় পূর্ণ হইল, আত্মপ্রসাদের অবধি রহিল না। হর্ষোল্লাস থামিতে না থামিতে খড়্গাপুরে হঠাৎ এমন কিছু ঘটিল যাহাতে মারামারি কাটাকাটিতে অনেকের প্রাণ গেল। এমন বিপরীত রকমের ঘটনা ঠিক পরে পরে বার বার কেন ঘটে, তাহার কারণ "দেবা ন জানন্তি কুতো মানবাঃ"। সভ্য মানুষেরা ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করিতে পারিবেন। আমরা অসভ্য বলিয়া, যেমন শীতলা, ওলাই চণ্ডী, ফুলু বিবি প্রভৃতিকে নানা অনর্থের কারণীভূত মনে করি,তেমনি বক্ষ্যমান বিষয়েও আকস্মিকতা নামক অপদেবতার কর্তৃত্ব অনুমান করিতেছি।

—

লক্ষ্ণৌয়ের মীমাংসা ও মুসলমানগণ

লক্ষ্ণৌতে নানা দলের নেতারা ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মনঃপূত না হইলেও মোটের উপর তাঁহাদের আলোচনার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে। কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ছিলেন ডাক্তার আন্সারী। তদ্ভিন্ন অন্য কয়েক জন বিখ্যাত মুসলমান নেতাও উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। এই জন্য মনে করা গিয়াছিল, যে, মোটের উপর লক্ষ্ণৌয়ের সিদ্ধান্তগুলিতে মুসলমানেরা সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা বরাবর হইয়া আসিতেছে—এবং অন্য কোন সম্প্রদায়কে অসুবিধায় না ফেলিয়া তাঁহাদিগকে যতটা সুবিধা ও অধিকার দেওয়া যায়, তাহা কর্ত্তব্যও বটে। কারণ, স্বরাজ লাভ সর্ব্বাগ্রে ও সকলের চেয়ে আবশ্যক এবং তজ্জন্য হিন্দুমুসলমানের সমবেত চেষ্টা হইলে কাজটা অপেক্ষাকৃত সোজা হয়; স্বরাজ লব্ধ হইলে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বুঝাপড়া পরে হইতে পারে।

মুসলমানেরা যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কোন কোন কাগজের লেখা হইতেও অনুমিত হইয়াছিল। বাঙালী মুসলমানদের প্রধান ইংরেজী মুখপত্র "দি মুসলমান" সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অসন্তুষ্টদের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। মৌলানা শৌকৎ আলী, ডাক্তার আহাম্মদ খাঁ আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নানা দলের অনেক মুসলমান এখন বলিতেছেন, লক্ষ্ণৌয়ের প্রস্তাবগুলি অসন্তোষকর, নিরাশাজনক এবং গ্রহণের অযোগ্য। কিন্তু তাঁহারা যাহাই বলুন. আশা ও ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। সকল সম্প্রদায়ের যে-সব লোক সম্প্রদায়িক স্বার্থের পরিবর্ত্তে সমুদয় দেশের হিত চান, তাঁহারা ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করিতে থাকুন। মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি রাখিতেছেন, তাঁহারাও নিশ্চিত জানিয়া রাখুন, তাঁহাদের কুচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে যদি অধিকাংশ ভারতীয় লোক মুক্ত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

—

জমীতে প্রজার অধিকার

বাংলার নূতন প্রজাস্বত্ব আইন ব্যবস্থাপক সভায় পাস্ হইয়া গিয়াছে। ইহাকে প্রজাস্বত্ব আইন বলা হইবে, না জমিদারীস্বত্ব আইন বলা হইবে, সে বিচার তত দরকারী নয়। কিন্তু ইহার দ্বারা জমিদারদের সুবিধা বাড়িল, না রায়তদের বাড়িল, তাহাই বিশেষ করিয়া বিবেচ্য।

রায়তদিগকে জমীতে উৎপন্ন বৃক্ষাদির উপর অধিকার

পুষ্করিণী খননের অধিকার এবং ইমারৎ আদি নির্ম্মাণের অধিকার প্রভৃতি কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। বিক্রয় দ্বারা জমী হস্তান্তরের অধিকারও প্রজাকে দেওয়া হইয়াছে বটে। কিন্তু সে জমী বিক্রী করিতে চাহিলে তাহা কিনিবার অধিকার সর্ব্বাগ্রে জমীদারেরই হইবে। এই অধিকার জমিদারদের ছিল না। ইহার দ্বারা প্রজাকে প্রদত্ত বিক্রয়াধিকার অনেকটা খর্ব্ব করা হইয়াছে। অগ্রে ক্রয়ের অছিলায় জমীদার পক্ষ হইতে প্রজার স্বাধীনতা হ্রাস ব্যতীত আর্থিক ক্ষতিও অনেক হইতে পারবে। জমীদার যদি বিক্রেয় জমী না কেনেন, অন্ত কেহ ক্রয় করেন, তাহা হইলে জমীর মূল্যের শতকরা কুড়ি টাকা জমীদার নজরানা পাইবেন। ইহাতেও প্রজার ক্ষতি। এক প্রজার পরিবর্ত্তে আর একজন প্রজা হইবে এবং সে আগেকার প্রজার মতই খাজানা দিবে। সুতরাং নজরানার ব্যবস্থা—বিশেষতঃ এত বেশী নজরানার ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে না। জমীদার স্বয়ং যখন জমী ক্রয় করিবেন, তখন নজরানার দাবীতে প্রজাকে শতকরা কুড়ি টাকা কম দাম প্রকাশ্যভাবে বা পাকে চক্রে দিবেন না ত? বেনামী খরিদের রকমওয়ারীও বহুৎ আছে।

আগেকার আইন বা নূতন আইন অনুসারে গবর্ন্মেণ্ট জমীদারের দেয় রাজস্ব বাড়াইতে পারেন না, কিন্তু নূতন আইনের বলে কারণবিশেষে জমীদার রায়তের খাজনা বাড়াইতে পারিবেন। ইহা অপক্ষপাত বন্দোবস্ত নহে।

যাঁহারা জমীদার বা রায়ৎ বা মধ্যবর্ত্তী কোন শ্রেণীর লোক, তাঁহারা অভিজ্ঞতা হইতে আগে কোন্ শ্রেণীর কি সুবিধা-অসুবিধা ছিল এবং এখনই বা কি হইল, বলিতে পারিবেন। প্রবাসীর সম্পাদকের কোনও শ্রেণীতেই স্থান না থাকায় সেরূপ অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত কোন মন্তব্য করিবার ক্ষমতা নাই। কেবল মাত্র মুদ্রিত জিনিষ পড়িয়া ঠিক্ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

—

ত্রৈলোক্যনাথ দেব

নয় দশ বৎসর বয়সে বাঁকুড়ার বাংলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উদ্ভিদবিদ্যা আমাকে পড়িতে হইয়াছিল। ইহাতে নানাবিধ গাছপালা ফুলফলের কাষ্ঠফলকে খোদিত সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। তখন হাফ্-টোন ছবির প্রচলন এদেশে হয় নাই। সেই সব ছবির কোন একটা জায়গায় ইংরেজী টি এন্ ডি এই তিনটি অক্ষর খোদিত আছে। যখন উদ্ভিদবিদ্যা পড়িতাম তখন ইংরেজী না জানায় ঐ অক্ষরগুলি পড়িতে পারিতাম না। পরে পড়িয়াছিলাম। ঐ অক্ষরগুলি কাষ্ঠফলকে চিত্র-খোদক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেব মহাশয়ের ছবি। সম্প্রতি একাশি বৎসর বয়সে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কাষ্ঠফলকে ছবি খোদাই যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার পেশা ছিল। তিনি সদালাপী অমায়িক বিনয়ী লোক ছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্ম বলিয়া সেকালের ব্রাহ্মসমাজের অনেক গল্প গোলদীঘিতে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার মুখে শুনিতাম। "অতীতের ব্রাহ্মসমাজ" নামক একখানি বহিও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা চিত্রিত উদ্ভিদবিদ্যা পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছিলাম তাঁহাকে বলায় তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। চীনে মাটির পাত্র, পুতুল, টেলিগ্রাফের সরঞ্জাম প্রভৃতি নির্ম্মাণে দক্ষ শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব তাঁহার পুত্র।

—

রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ

ময়মনসিংহ জেলার বেতাগরি নিবাসী পণ্ডিত রাজেন্দ্র-কুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণের মৃত্যুতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সমাজহিতকর নানা কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। বঙ্গনারীগণের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। নবদ্বীপ ও অন্যত্র নারীহিতৈষণার ব্যপদেশে যে স্ত্রীলোকবিক্রয়ের ব্যবসা চলিতেছে, তাহার উচ্ছেদ সাধন তাঁহার চেষ্টার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এবিষয়ে তাঁহার লিখিত দুটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ আমাদের নিকট রহিয়াছে।

—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর আমেরিকা যাত্রা

ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া তাহার কোন রাষ্ট্রীয় দূত ভারতীয়েরা কোথাও পাঠাইতে পারে না। কিন্তু বেসরকারী দূত প্রেরণে কোন বাধা নাই। শ্রীমতী

সরোজিনী নাইডু ভারতের সকল প্রদেশের প্রতিনিধিদের কোন সভায় দূত নির্ব্বাচিত না হইলেও, তিনি বস্তুতঃ আমেরিকায় ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমান সভ্যতা ও জীবনের ব্যাখ্যাত্রীর কাজ চিত্তাকর্ষক রূপে করিতে পারিবেন। হায়দরাবাদে দীর্ঘকাল জীবন যাপন করায় এবং মুসলমান সভ্যতার সহিত তাঁহার পরিচয় ও সহানুভূতি থাকায় মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতার সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ প্রভাবে ভারতবর্ষের যে-উপকার হইয়াছে, তাহাও তাঁহার অঙ্কিত ভারতচিত্র হইতে বাদ পড়িবে না। আমেরিকায় অধুনা ভারতবর্ষের সমাজ ও জীবনের কেবলমাত্র মন্দ দিক্‌টা দেখাইবার চেষ্টা খুব হইতেছে। এই চেষ্টা আগে হইতেই হইয়া আসিতেছে। তাহার আংশিক ব্যয় ভারতীয়দিগের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে দেওয়া হইয়াছে। অন্য সব দেশের মত ভারতবর্ষের সমাজের ভাল মন্দ দুই দিক্‌ই আছে। কেহ উভয় দিক্ প্রদর্শন করিলে তাহাতে আপত্তি করা অনুচিত। কিন্তু কেবল মন্দ দিক্‌টা দেখান দুরভিসন্ধিপ্রসূত। বাস্তবিক মন্দ যাহা, শুধু তাহাই বর্ণিত হইলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারতের অনেক কাল্পনিক দোষ জগতের সম্মুখে ধরা হইয়াছে, এবং সত্য ছোট দোষকে বড় ও অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে। এইরূপ নানা দুশ্চেষ্টায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকায় যে ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদিত হইয়াছে,তাহা দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তথায় যাইতেছেন। তিনি ইংরেজীতে সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারেন। তাঁহার কবিপ্রতিভা আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানও অল্প নহে। এই সব কারণে তাঁহার চেষ্টা কতকটা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি নিজেই ভারতবর্ষের অযথা নিন্দার একটি আংশিক জবাব। মিস্ মেয়ো ও ভারতবর্ষের অন্য অনেক নিন্দুকেরা ভারতরমণীদের অবস্থার এমন বর্ণনা দিয়াছে, যেন বর্ত্তমান কালে কোন ভারতনারীই মানবজাতির উন্নত সভ্য জীবনের অংশী হইতে পারেন না। ভারতবর্ষে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক; কিন্তু উহা যত মন্দ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তত মন্দ নহে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা শুনিলে, তাঁহার কবিতা পড়িলে, আমেরিকার লোকেরা বুঝিতে পারিবে, যে, ভারতনারীর অবস্থা ভারতশত্রুরা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছে, সেরূপ নহে।

—

শ্রীমতী ফাজিলৎউন্নিসার বিদেশ যাত্রা

বিদ্যাশিক্ষার জন্য শ্রীমতী ফাজিলৎউন্নিসা সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাত যাত্রা করিতেছেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পিতা যে সামাজিক নিন্দা ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাঁহাকে এম্ এ পর্য্যন্ত পড়াইয়াছেন এবং বিলাত যাইতেও দিলেন, তজ্জন্য তিনি দেশবাসী সকলের বিশেষ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহার কন্যার বিদ্যানুরাগ ও সাহস তাঁহাকে মুসলমান নারীসমাজের হিতৈষিণী নেত্রীস্থানীয়া করিলে সাক্ষাৎ ভাবে বঙ্গীয় মুসলমানদের এবং পরোক্ষভাবে বঙ্গের অন্য সকল সমাজের কল্যাণ হইবে।

শুনিলাম, বাংলা গবর্ন্মেণ্ট্ ইঁহাকে এই সর্ত্তে সরকারী বৃত্তি দিয়াছেন, যে, তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিন বৎসর সরকারী চাকরী করিতে বাধ্য থাকিবেন। আমরা যতদূর জানি, পুরুষ ছাত্রদিগকে এরূপ কোন সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া সরকারী বৃত্তি দেওয়া হয় না। তাহা হইলে তাঁহার বেলায় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কেন করা হইল?

—

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষে বিপন্ন বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংবাদ আসিতেছে, যে, চাষের কাজে নিযুক্ত থাকায় কিছুদিন যে-সব গরীব লোকের অন্ন জুটিয়াছিল, তাহা এখন শেষ হইয়া যাওয়ায় তাহারা আবার বেকার হইয়াছে। এই জন্য সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। তাহাদিগকে নবেম্বর মাসের শেষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সাহায্য দিতে হইবে। অতএব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন ঐ সময় পর্য্যন্ত নিরন্নদিগকে সাহায্যদাতাদের নামে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাইয়া তাঁহাদের কাজ সুসম্পন্ন করেন।

—

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

আধুনিক যুগে রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। সেই ঘটনা হইতে ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হয়। তখন হইতে এক শত বৎসর অতীত হওয়ায়, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব হইতেছে। কলিকাতার উৎসবের কিয়দংশ শেষ হইয়া এখন মফঃস্বলে নানা স্থানে প্রচার ও উৎসব চলিতেছে। কলিকাতার উৎসবে, রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রথম ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তনের দিন ৬ই ভাদ্র তারিখে, রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দুটি প্রবন্ধের আকারে অন্যত্র প্রকাশিত হইল। তাঁহার মৌখিক ও লিখিত অভিভাষণের যে-সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য বাংলা ও ইংরেজী কাগজে বাহির হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ আনুমানিক। লিখিত প্রকৃত অভিভাষণটির ইংরেজী মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত হইয়াছে, মৌখিকটিরও ইংরেজী উক্ত মাসিকে বাহির হইবে। প্রকৃত বাংলা মৌখিক ও লিখিত অভিভাষণ দুটি প্রবাসীতে প্রথম মুদ্রিত হইল।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে উৎসব কমিটি রামমোহনের বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থাবলীর একটি নূতন সংস্করণ বাহির করিতেছেন। বাংলার এক খণ্ড ও ইংরেজীর এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় পুস্তক সুদৃশ্য কাপড়ের মলাটের উপর সোনার জলে নাম লিখাইয়া বিক্রী করা হইতেছে। কলিকাতায় ২১০।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভবনে উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট উহা পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর নিকট তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী থাকা উচিত। অবাঙালী প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের নিকট অন্ততঃ তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থাবলী থাকা উচিত। যাঁহাদের নিকট আগেকার সংস্করণগুলি নাই, বর্ত্তমান সংস্করণ তাঁহাদের অভাব পূরণ করিবে। গিরিডির ডাক্তার বিপিনবিহারী রায় এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির অনুসন্ধানের ফলে গ্রন্থাবলীর আগেকার কয়েক সংস্করণে অপ্রকাশিত রামমোহনের যে যে লেখা পাওয়া গিয়াছে, আশা করি, উৎসব কমিটি তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে সেগুলি সন্নিবেশিত করিবেন। "একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার" নামক তাঁহার আরবী-ফারসী বহিটির অনুবাদ দেওয়াও আবশ্যক।

—

রামমোহনের ফারসী কাগজ কেন বন্ধ হয়

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত পাঠকেরা জানেন, যে, মিরাৎ উল্ আখ্‌বার্ নামক তাঁহার একটি ফারসী কাগজ ছিল। তাহা তিনি কেন বন্ধ করিতে বাধ্য হন, তাহার সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় নাই। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী পুরাতন দলিলাদি রক্ষার আফিসে অনুসন্ধান করিয়া এবিষয়ে যতটুকু প্রকাশ করিবার অনুমতি গবর্মেণ্টের নিকট হইতে পাইয়াছেন, তাহা ১লা সেপ্টেম্বরের কলিকাতা ম্যুনিসিপাল গেজেটে মুদ্রিত করিয়াছেন। রামমোহনের জীবনচরিত সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা কৌতূহলী, তাঁহারা ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি পড়িলে কিছু নূতন কথা জানিতে পারিবেন।

—

লক্ষ্ণৌতে নানা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত

ভারতবর্ষ এত বড় দেশ এবং ইহাতে এত রকম ভাষা, ধর্ম্ম ও জাতি আছে, যে, কোন বিষয়েই কিছু 'কিন্তু' কাহারও থাকিবে না, এমন একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য—অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই জন্য, মোটের উপর যাহা যুক্তিসঙ্গত, তাহাতেই অধিকাংশ লোকের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। লক্ষ্ণৌতে "সকল দলের" কন্‌ফারেন্সে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহা মোটের উপর যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

শিক্ষা ও ধনশালিতা নির্বিশেষে সকল সাবালক পুরুষ ও স্ত্রীলোককে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। অনেকে বলিবেন, কেহ কেহ ইতিমধ্যেই বলিয়াছেন, ইংলণ্ড ও অন্য অনেক দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর লোককে ভোটের অধিকার দিয়া সকল সাবালক মানুষকে উহা সম্প্রতি দেওয়া হইয়াছে, এবং ঐসব

দেশে প্রায় সমস্ত সাবালক লোকই লেখাপড়া জানে; ভারতবর্ষের মত নিরক্ষরপ্রধান দেশে অনেক ধাপ এক লাফে অতিক্রম করিয়া সকল সাবালক পুরুষ ও নারীকে ভোট দেওয়া সমীচীন নহে। কথাগুলি একেবারে অযৌক্তিক নহে। কিন্তু মানুষের কোথাও কোন বিষয়ে উন্নত অবস্থায় পৌঁছিতে যত শত বা হাজার বৎসর লাগিয়াছে, সব জায়গাতেই এখনও ততই লাগিবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। আমরা স্বরাজলাভের যোগ্যতা বিষয়ক একটি প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। লেখাপড়া-জানা লোকেরা সবাই কেবল যোগ্যতা দেখিয়া প্রতিনিধি পদপ্রার্থীকে ভোট দেন, কেবল নিরক্ষর লোকেরাই তাহা দিবে না, ইহাও সত্য নহে।

বঙ্গের ও পঞ্জাবের হিন্দুরা সকলে, অনেকে, বা কেহ কেহ বলিবেন, ঐ দুই প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক; অতএব সকল সাবালক পুরুষ ও নারী ভোট পাইলে তথায় মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য অনিবার্য্য, এবং নেহরু কমিটির রিপোর্টের পরিশিষ্টেও মানচিত্র দ্বারা তাহার প্রমাণও দেওয়া হইয়াছে। তাহাই যদি হয়, তাহা একটা অভিযোগের বা আপত্তির বিষয় করিলে চলিবে কেন? যে-সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী, তথাকার মুসলমানদেরও ঐরূপ অভিযোগ ও আপত্তি ত হইতে পারে? বস্তুতঃ, যাহারা যেখানে সংখ্যায় বেশী, কৌশল দ্বারা তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রভাবহীন দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার ইচ্ছা অসাধু ইচ্ছা; তাহারা বর্ত্তমানে কোন ঐতিহাসিক বা অন্য কারণে রাষ্ট্রীয়প্রভাবহীন ও দুর্ব্বল থাকিলে চিরকালই সেইরূপ থাকিবে, এরূপ কোন গোপন আশা পোষণ করাও উচিত নয়। নিজেদের ব্যবহার দ্বারা এবং সমগ্র জাতির মধ্যে সাধারণ শিক্ষা এবং পৌর ও জানপদ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষার বিস্তার দ্বারা সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মন হইতে সংকীর্ণ স্বার্থসাধন চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা করা দেশহিতৈষী ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য। এই চেষ্টা যে-পরিমাণে সফল হইবে, সেই পরিমাণে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ভয় ও অবিশ্বাস করিতে বিরত হইবে।

কোন কোন সম্প্রদায় যে কোন কোন প্রদেশে সংখ্যায় বেশী হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক, ধার্ম্মিক ও সামাজিক কারণ আছে। সেই সকল কারণের অতীত অংশের উপর কাহারও হাত নাই; তাহার জন্য দুঃখ করা মূর্খতা। গতানুশোচনা মূর্খতা ও কাপুরুষতা, দুই-ই। তাহাতে সময় নষ্ট না করিয়া ন্যায়ধর্ম্মের পথে থাকিয়া বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রকৃত শক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অধিকারী।

—

লক্ষ্ণৌতে সিন্ধুদেশ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

ভারতবর্ষে হিন্দুপ্রধান যতগুলি প্রদেশ আছে, ঠিক্ ততগুলি না হউক, তাহার নিকটতমসংখ্যক মুসলমান-প্রধান প্রদেশ প্রাদেশিক পুনর্গঠন দ্বারা পাইবার ইচ্ছা যে-যে উদ্দেশ্যে মুসলমানদের হয়, তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। তাঁহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অনেক নেতা ব্যগ্র ছিলেন ও আছেন। এরূপ ব্যগ্রতার জন্য তাঁহাদের দোষ দি না। কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, মুসলমান-প্রধান প্রদেশ গড়িবার পক্ষে তাঁহারা যে-যে যুক্তির অবতারণা করিতেছেন, তাহা পশ্চাৎচিন্তিত।

সিন্ধুদেশকে আলাদা একটি প্রদেশ করিবার পক্ষে আগে আগে যত যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা আমরা আগেই করিয়াছি। নেহরু কমিটির রিপোর্টে একটি নূতন যুক্তি দেখিলাম। তাঁহারা বলেন, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে স্বাধীনতা দিলে এবং "কাল্‌চার‍্যাল্ অটনমী" দিলে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে গেলে আমাদের কাহাকেও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে আপত্তি নাই, এবং অন্য ধর্ম্মের অবিরোধী সেরূপ স্বাধীনতা সব ধর্ম্মের লোকের ভারতবর্ষে আছে। "কাল্‌চার‍্যাল্ অটনমী" শব্দ দুটি ইংরেজীই রাখিয়াছি, কারণ, উহার কোন বাংলা প্রতিশব্দের বিস্তৃত প্রচলন এখনও হয় নাই। কাল্‌চ্যার বলিতে জ্ঞান ধর্ম্ম ললিতকলাদির অনুশীলন এবং তাহার দ্বারা হৃদয়মনের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাই বুঝায়। এইরূপ অনুশীলন সম্বন্ধে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যদি অটনমী অর্থাৎ আত্মকর্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে

নেহরু কমিটির মতে তদ্দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও অসদ্ভাব দূর হইবে। এই মতের মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে। কিন্তু "আনুশীলনিক আত্মকর্তৃত্বের" ফল বিপরীত রকম হইবার সম্ভাবনাও খুব আছে। কারণ, যদি হিন্দুরা বলে, আমরা একমাত্র বা প্রধানতঃ আমাদের নিজস্ব জ্ঞান সভ্যতা ইতিহাসেরই চর্চ্চা করিব, মুসলমান খৃষ্টিয়ান বৌদ্ধ শিখ প্রভৃতিরাও তাহাই বলে, তাহা হইলে অনুশীলনের সাধারণ বিষয় ও ভূমি অপেক্ষা বিশেষ বিষয় ও ভূমির উপর বেশী ঝোঁক পড়িতে পারে। তাহার ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির চেষ্টায় এক একটি ভিন্ন রকমের মানসিক ছাঁচ প্রস্তুত হইতে পারে। এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালা মন লইয়া হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান শিখেরা এখনকার চেয়ে বেশী সদ্ভাবে সামঞ্জস্যে দেশের কাজ করিয়া মহাজাতি গড়িবেন, ইহা বেশী সম্ভব? না, ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে মন ঢালা হইলে মতভেদ, সংঘর্ষ, বিরোধের কারণ বেশী হইবে, ইহাই বেশী সম্ভব? আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার ফল কোন্ দিকে হেলিয়াছে?

যাহা হউক, মানিয়া লওয়া যাক্, যে, কাল্‌চার্‌য়াল অটনমী সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাব, সংঘর্ষ ও বিরোধের একটি প্রতিকার। কিন্তু আনুশীলনিক আত্মকর্তৃত্বের জন্য সিন্ধুদেশকে একটি আলাদা প্রদেশে পরিণত করিবার কি দরকার আছে? সেখানকার মুসলমানেরা সংখ্যায় খুব বেশী, মোট অধিবাসীর শতকরা ৭৩ জনের উপর। তাঁহারা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ুন না? আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে মুসলমানরা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৫ জন মাত্র। অথচ সেখানে মুসলমানরা আলীগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়াছেন। মুসলমান-প্রধান একটি আলাদা প্রদেশ না গড়িয়াও যদি তাঁহারা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে সিন্ধুদেশের মুসলমানেরা কাল্‌চার্‌য়াল অটনমির জন্য আলাদা প্রদেশ কেন চাহিতেছেন?

ইহার ভিতর হয়ত এই মতলব আছে, যে, উহা আলাদা প্রদেশ হইলে তাঁহারা সংখ্যায় বেশী বলিয়া শিক্ষার জন্য সরকারী বরাদ্দের অধিকাংশ টাকা তাঁহারা আপনাদের সাম্প্রদায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ করিবেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে সিন্ধু দেশের হিন্দুদের কাল্‌চার্‌য়াল অটনমীর জন্য টাকা কোথা হইতে আসিবে? সিন্ধুদেশের মোট শিক্ষাব্যয়ের সরকারী বরাদ্দের শতকরা ৭৫ টাকা মুসলমান সভ্যতা-অনুযায়ী শিক্ষার নিমিত্ত যদি ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে হিন্দুসভ্যতা অনুযায়ী শিক্ষার এবং খৃষ্টিয়ান শিখ প্রভৃতি কাল্‌চারের অনুযায়ী শিক্ষার জন্যও ত যথেষ্ট টাকা চাই। এই টাকা কোথা হইতে আসিবে?

যে-কোন সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর লোকের ইচ্ছা হইবে, তাহাদের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার অধিকার অবশ্যই তাহাদের থাকা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সভ্যতার বিশেষ প্রকৃতির মূল্য আছে, এবং তদনুসারে শিক্ষাও চাই, তাহার অনুশীলনও চাই। কিন্তু সমগ্র মানব জাতির জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন ললিতকলার মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। তাহার প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সরকারী ব্যয়ে যে-শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তাহা যথাসম্ভব এই সাধারণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অসাম্প্রদায়িক হইলে ভাল হয়। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহেও সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা সরকারী শিক্ষাব্যয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার পূরা ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

সিন্ধুদেশকে যে-যে সর্ত্তে পৃথক্ প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাবে লক্ষ্ণৌতে সমবেত হিন্দু মুসলমান শিখ আদি সকল নেতা রাজী হইয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

নেহরু কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী গবন্মেণ্ট স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুদেশকে বোম্বাই হইতে পৃথক্ করিয়া স্বতন্ত্র একটি প্রদেশে পরিণত করা হইবে, যদি—

১। অনুসন্ধানে দৃষ্ট হয়, যে, (ক) সিন্ধু নিজ ব্যয় নির্ব্বাহে সমর্থ, কিম্বা (খ) সেরূপ সামর্থ্য উহার না থাকিলে স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থা উহার অধিবাসীদের সম্মুখে স্থাপিত হইবার পর তাহাদের অধিকাংশ নূতন ব্যবস্থার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী হয়।

২। সিন্ধুর গবন্মে´ন্ট অন্যান্য প্রদেশের গবন্মে´ন্ট যে-প্রকারের সেই প্রকারের হইবে।

৩। সিন্ধুর লোকদের মধ্যে অমুসলমান ন্যূনাংশের প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের সেইরূপ অধিকার থাকিবে, নেহরু কমিটির রিপোর্ট অনুসারে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের যেরূপ অধিকার হইবে।

এই সব সর্ত্ত যুক্তিসঙ্গত। যাঁহারা সিন্ধুকে আলাদা প্রদেশ করিয়া তথায় প্রভুত্ব করিতে চান, সেই প্রভুত্বের মূল্য কেবলমাত্র তাঁহাদেরই দেওয়া উচিত। যেউলিয়া কোন প্রদেশের কাজ চালাইবার নিমিত্ত অন্য কোন প্রদেশের লোকদের প্রদত্ত ট্যাক্সের কোন অংশ ব্যয়িত হওয়া উচিত নহে। সিন্ধুকে স্বতন্ত্রীকরণে আপত্তিকারী তত্রত্য হিন্দুদের মাথাতেও কাঁঠাল ভাঙ্গা উচিত নহে। এখন যে কয়টি প্রদেশ আছে, তাহার মধ্যেই দেখিতে পাই, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যয় প্রভূত পরিমাণে ভারত গবন্মে´ন্টকে দিতে হয়; অর্থাৎ ভারত গবন্মে´ন্ট অন্য সব প্রদেশের নিকট হইতে যত রাজস্ব আত্মসাৎ করেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাহার একটা অংশ ব্যয় করেন। এই প্রদেশের তিন বৎসরের আয় ও ব্যয় নীচে দিলাম।

বৎসর	আয়	ব্যয়
১৯১৮-১৯	৬৬,২৬,৮৫৬ টাকা	১,৫৫,০৪,৮৬৮ টাকা
১৯২৪-২৫	৭৭,২০,০০০ ,,	২,৭০,৮০,০০০ ,,
১৯২৬-২৭	৮৬,২০,০০০ ,,	২,৮৫,৩০,০০০ ,,

অতএব বর্ত্তমানেই দেখা যাইতেছে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে ক্রমান্বয়ে অধিকতর টাকা ভারত গবন্মে´ন্ট অন্যত্র সংগৃহীত রাজস্ব হইতে দিয়া আসিতেছেন। আরও এইরূপ প্রদেশ সৃষ্ট হইলে অন্য সব প্রদেশের, বিশেষতঃ বঙ্গের ন্যায্য টাকা পাইবার পক্ষে অধিকতর বাধা জন্মিবে। বঙ্গের নাম বিশেষ করিয়া করিবার কারণ প্রবাসীর পাঠকেরা অবগত আছেন। বাংলা হইতে সরকারী আয় কোন প্রদেশ অপেক্ষা কম হয় না, এবং বঙ্গের লোকসংখ্যাও আর সব প্রদেশের চেয়ে বেশী। অথচ বাংলাদেশের প্রাদেশিক গবন্মে´ন্ট নিজের ব্যয়ের নিমিত্ত মান্দ্রাজ বোম্বাই আগ্রা অযোধ্যা ও পঞ্জাবের প্রাদেশিক গবন্মে´ন্টগুলি অপেক্ষা কম টাকা পান। যেউলিয়া প্রদেশের সংখ্যা যত বাড়িবে, বঙ্গের ন্যায্য পাওনা পাইবার বাধা তত বেশী হইবে।

বর্ত্তমানে সিন্ধু বোম্বাইয়ের সহিত যুক্ত থাকাতেও একটি কমিটির অনুমান অনুসারে সিন্ধুর সরকারী আয় অপেক্ষা সরকারী ব্যয় বার্ষিক ৪৩ লক্ষ টাকা হয়। অপর একটি কমিটির অনুমান অনুসারে আয় অপেক্ষা ব্যয় ১৭০ লক্ষ টাকা হয়। সিন্ধুকে আলাদা প্রদেশ করিলে গবর্ণরের বেতনাদি বাবদে ন্যূনকল্পে আরও বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িবে। যদি কমিটির দুটির একটির অনুমানও সত্য হয়; তাহা হইলে সৈন্ধব ভ্রাতাদের সখটি নিঃসন্দেহ খুবই বড়মানুষী রকমের। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সখ মিটাইবার মত হইলে দুঃখের বিষয় হইবে না। কিন্তু তাঁহারা ৩০ লক্ষ টাকায় গবর্ণরাদি না পুষিয়া ঐ পরিমাণ টাকা চাঁদা তুলিয়া শিক্ষা কৃষি বাণিজ্য স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য ব্যয় করুন না? তাহা হইলে সিন্ধুর কাল্‌চার‍্যাল্ অটনমী হইবে, অন্য সব রকমেও উপকার হইবে।

—

নেহরুর কমিটির ভবিষ্যৎ কাজ

শ্রীমতী এনী বেশাণ্টের উদ্যোগে ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বিলাতী পার্লেমেণ্টে একটি বিল কিছুকাল পূর্ব্বে পেশ করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, নেহরু কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী একটি বিল প্রস্তুত হইলে তাঁহার বিলটি প্রত্যাহার করাইয়া নূতন বিলটি পার্লেমেণ্টে উপস্থাপিত করাইবেন। এখন নেহরু কমিটিকে তাঁহাদের রিপোর্ট ও তদন্তর্গত অনুরোধগুলি (রিকমেণ্ডেশ্যন্স্) অনুসারে ঐরূপ একটি বিলের মুসাবিদা করিতে হইবে। সেই জন্য আমরা তাঁহাদের কোন কোন অনুরোধ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

ভারতীয়দের মূলীভূত অধিকার

ভারতীয়দের মূলীভূত অধিকারের মধ্যে ত্রয়োদশটি এইরূপ :—

"কাহারও ধর্ম্ম জাতি বা ধর্ম্মমতের জন্য তাহার কোন সরকারী চাকরী কিম্বা ক্ষমতা বা সম্মানের পদ প্রাপ্তিতে এবং কোন ব্যবসা বা পেশার অনুসরণে বাধা জন্মিবে না।"

"ধর্ম্মমতের" পর আমরা যোগ করিতে চাই, "কিম্বা তাহার বা তাহার পূর্ব্বপুরুষের জন্ম ও নিবাসস্থানের জন্য।" অন্য যে-কোন প্রদেশের লোক বঙ্গে সব রকম চাকরী ও পদ পাইতে এবং ব্যবসা ও পেশা অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু বাঙালীদের সর্ব্বত্র সে সুবিধা নাই ; যেমন, বিহার-উৎকলে ডোমিসাইল্‌ড্‌ অর্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া গবর্মেণ্ট্‌ দ্বারা স্বীকৃত না হইলে বাঙালী তথায় সরকারী কাজ পায় না, কিন্তু তথায় অন্য কোন প্রদেশের লোকদের সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

সেনেটের সভ্য নির্ব্বাচন

ভারতীয় পার্লেমেণ্ট্‌ বা ব্যবস্থাপক সভার একটি কক্ষের নাম হইবে সেনেট। তাহার সভ্যেরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে। আমাদের মতে ইহাতে সেনেট-সভ্যদের সহিত দেশের জনসাধারণের সংস্পর্শ সম্পর্ক দূর ও পরোক্ষ হইবে, জনসাধারণের তাঁহাদের উপর প্রভাব কম হইবে, এবং তাহাদের নিকট তাঁহাদের দায়িত্ববোধ কম হইবে। এইজন্য আমেরিকার মত আমরা ভারতেও সেনেটের সভ্যনির্ব্বাচন সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণের দ্বারা চাই, যদিও তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবার অধিকার সাবালকমাত্রকেই না দিয়া ভিন্ন ও উচ্চতর কোন প্রকার যোগ্যতা অনুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার উভয় কক্ষে প্রাদেশিক প্রতিনিধির সংখ্যা

পার্লেমেণ্টের সেনেটে যেমন তেম্‌নি প্রতিনিধি-সভাতেও প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধির সংখ্যা তাহার লোকসংখ্যার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হইবে, ইহা পরিষ্কার করিয়া লিখিত থাকা আবশ্যক।

বিল নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা

রিপোর্টের ১০৭-৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ২১ ধারায় ইহা পরিষ্কার করিয়া লিখিত থাকা উচিত, যে, যেরূপ উপায়ে আমেরিকার কংগ্রেস বা ব্যবস্থাপক সভার আইন করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে, ভারতীয় পার্লেমেণ্টেরও সেই উপায়ে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু নেহরু কমিটির রিপোর্টে যেরূপ বিধির মুসাবিদা আছে, তাহাতে গবর্ণর জেনেরাল রাজার সম্মতিজ্ঞাপন না করিলে ভারতীয় পার্লেমেণ্টে অনুমোদিত বিলও নামঞ্জুর হইয়া যাইবে, এইরূপ অনুমান হয়। রাজা অবশ্য বড়লাটের পরামর্শ অনুসারেই কাজ করিবেন। অতএব নেহরু কমিটি বড়লাটকেই প্রত্যেক আইন পাশ করা না-করার চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়াছেন। আমরা তাহার বিরোধী। ইংলণ্ডে রাজার আইন নামঞ্জুর করিবার ক্ষমতা থাকিলেও তিনি সে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। ভারতবর্ষে বড় লাট ও অন্য লাটেরা প্রত্যেক ক্ষমতাই নিজেদের কাজে লাগাইতেছেন। সুতরাং ইউরোপীয় বা ইউরোপীয়-বংশোদ্ভূত লোকদের কোন কোন দেশে রাজার চূড়ান্ত ক্ষমতা আছে বলিয়া আমাদের দেশেও তাহা থাকা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধেও নেহরু কমিটির অনুরোধ এই, যে, গবর্ণর কোন বিলে সম্মতি না দিলে তাহা আইনে পরিণত হইবে না। ইহা দ্বারা গবর্ণরকে আইন প্রণয়নে চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহাও অবাঞ্ছনীয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌সে) কংগ্রেসের পাস-করা কোন বিল প্রেসিডেণ্ট্‌ বা দেশপতি নামঞ্জুর করিলে ও তাহা তাঁহার আপত্তির বর্ণনাসহ কংগ্রেসে ফেরত পাঠাইলে, কংগ্রেস যদি অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের মত অনুসারে তাহা আবার পাস্‌ করে, তাহা হইলে তাহা দেশপতির আপত্তি সত্ত্বেও আইনে পরিণত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক ষ্টেট্‌ বা রাষ্ট্রেও এই প্রণালী অনুসারে গবর্ণরের আপত্তি সত্ত্বেও আইন পাস্‌ হইতে পারে।

মন্ত্রীদের নিয়োগ

বড়লাট যে-সব প্রধান ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন, তাহা পার্লেমেণ্টের নির্ব্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতে করিবেন কিনা এবং মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইবার পরও তাঁহারা পার্লেমেণ্টের সভ্য থাকিবেন কিনা, নেহরু কমিটির রিপোর্ট পড়িয়া তাহা বুঝা যায় না। প্রাদেশিক মন্ত্রী বা কার্য্য-নির্ব্বাহকদের সম্বন্ধেও ঐরূপ কোন স্পষ্ট বর্ণনা রিপোর্টে নাই। তাহা থাকা উচিত।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীদের দায়িত্ব

ভারতীয় পার্লেমেণ্ট ভারতীয় মন্ত্রীদিগকে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রাদেশিক মন্ত্রীদিগকে তাঁহাদের কাজের জন্য যে নিজেদের নিকট দায়ী করিবেন, তাহার কোন উপায় ও প্রণালী অনুরোধগুলির মধ্যে লিখিত নাই। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা যে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবেন, এ কথাটা পর্য্যন্ত রিপোর্টে লেখা নাই। এ সব কথা বিশদভাবে লিখিত থাকা উচিত।

অসামরিক ও সামরিক চাকরী

একাশীসংখ্যক অনুরোধে আছে, যে, ভারতীয় পার্লেমেণ্ট সিবিল অর্থাৎ অসামরিক সমুদয় চাকরীর জন্য কাহাদের মধ্য হইতে কিরূপ লোক কি প্রকারে সংগ্রহ করিবেন, তৎসম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবেন। কিন্তু স্থলযুদ্ধ-বিভাগ, জলযুদ্ধবিভাগ ও আকাশযুদ্ধবিভাগের জন্য উক্ত উদ্দেশ্যে ভারতীয় পার্লেমেণ্ট কেন আইন প্রণয়ন করিবেন না, কিম্বা আমাদের পার্লেমেণ্ট তাহা না করিলে অন্য কে তাহা করিবে, তাহা রিপোর্টে লিখিত হয় নাই। সিবিল চাকরীর জন্য যদি এরূপ আইনের দরকার হয়, তাহা হইলে সামরিক চাকরীর জন্য তাহা আরো বেশী দরকার। কারণ, নানা সিবিল বিভাগে ভারতীয়দের চাকরীর দাবী যতটা উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সামরিক বিভাগে উপেক্ষা ও অবিচার তার চেয়ে অনেক বেশী।

বিষয়সমূহের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিকে ভাগ

নেহরু কমিটির রিপোর্টে সরকারী কোন্ কোন্ বিষয় ভারতগবর্ন্মেণ্টের হাতে থাকিবে, কোন্গুলিই বা প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের হাতে থাকিবে, তাহার ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে। বিষয়বিভাগ মোটের উপর ঠিক্ই হইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও সংশোধনের আবশ্যক আছে মনে হয়। যথা, রিপোর্টের প্রথম তফসিলে লেখা হইয়াছে, যে, খনিসমূহের কর্ত্তা হইবেন ভারত গবর্ন্মেণ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় তফসিলে ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থের উত্তোলনাদি দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধির ভার প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের হাতে দেওয়া হইয়াছে। একই বিষয়ে দুই কর্ত্তৃপক্ষের এলাকা কিরূপ হইবে, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট না হইলে সংঘর্ষ ও কাজের অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য খনির সম্পূর্ণ ভার এক মাত্র কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া ভাল, এবং প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট এই ভার পাইবার যোগ্য।

—

নারীর উপর অত্যাচার

বাংলা দেশে নারীর উপর দুর্বৃত্ত লোকদের অত্যাচার কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কিছু কাল পূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে জবাব পাওয়া গিয়াছিল, যে, এই অত্যাচার দমনের জন্য সরকারী বিশেষ কোন চেষ্টা করা হইবে না। সরকার অবস্থাটা সঙ্গীন মনে করেন না, না অন্য কোন কারণে বিশেষ চেষ্টা করিবেন না, বুঝিতে পারা যায় নাই। ইহা ঠিক, যে, দেশের লোকে সজাগ ও সচেষ্ট না হইলে কেবল সরকারী চেষ্টায় এরূপ অত্যাচারের সম্পূর্ণ প্রতিকার হইতে পারে না। কিন্তু সরকারী চেষ্টায় দুর্বৃত্ত লোকদের দমন অনেকটা হইতে পারে। অনেক ধর্ষিতা অপহৃতা নারীর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তাহাদিগকে কেহ বধ করিয়াছে কিনা, তাহাও স্থির হয় না। যে-সব জেলার যে-সব থানার এলাকায় এরূপ ঘটনা ঘটে, তথাকার পুলিস কর্ম্মচারীদের উপর এজন্য উপরওয়ালাদের নিকট হইতে কোন তাগিদ আসে কিনা, জানি না। নারীহরণ ও নারীধর্ষণের অভিযোগ যে-সকল পুলিস কর্ম্মচারী গ্রহণ করে না বা করিতে বিলম্ব করে এইরূপ অভিযোগ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়, তাহাদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগের কোন তদন্ত হয় কি না, জানা যায় না। সরকারী মতে অন্য কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্ত সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইলে তাহার সরকারী প্রতিবাদ হয়; কিন্তু কোন পুলিস কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে উক্তরূপ অভিযোগের প্রতিবাদ দেখিতে পাই না।

নারীর উপর অত্যাচারের সব দোষটা মুসলমানদের উপর আরোপ করিয়া হিন্দুরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; কারণ, এই প্রকার পাপাচারের তালিকায় অনেক হিন্দুর নামও দেখা যায়। মুসলমানরাও অত্যাচার-কাহিনীগুলা সব বা অধিকাংশ হিন্দুদের বানান বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারেন না। কারণ, মুসলমানদের

বিরুদ্ধে এরূপ অনেক মোকদ্দমার হাইকোর্ট পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বিচারে আসামীদের দণ্ড হইয়াছে; নিম্ন আদালতে মুসলমান জুরারদের মতে অনেক মুসলমান আসামী দণ্ডিত হইয়াছে; এবং মুসলমানদের দ্বারা মুসলমান রমণীর উপর অত্যাচারের মোকদ্দমার সংখ্যাও কম নয়।

এই লজ্জাকর পাপ ও দৌরাত্ম্য শুধু বাংলা দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। অন্যান্য প্রদেশেও ইহা অল্লাধিক আছে। সম্প্রতি পঞ্জাবের যে বার্ষিক পুলিস রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে ইহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উত্তর ভারতের কোন কোন কাগজে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা পড়িয়া মনে হয়, পঞ্জাব বীরের দেশ বলিয়া বিখ্যাত হইলেও, এই কাপুরুষতার প্রাদুর্ভাব সেখানে খুব আছে। পঞ্জাবের লোকসংখ্যা বঙ্গের অর্দ্ধেকেরও কম; অথচ সেখানে এক বৎসরে এইরূপ দৌরাত্ম্য প্রায় ছয় শত নারীর উপর হইয়াছিল। দুরাত্মাদের মধ্যে অধিকাংশ কোন্ সম্প্রদায়ের লোক, অত্যাচারিতা নারীরাই বা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী, রিপোর্ট হইতে খবরের কাগজে উদ্ধৃত অংশগুলিতে তাহা লিখিত নাই।

সিন্ধুদেশেও এইরূপ দুর্বৃত্ততার খুব প্রাদুর্ভাব আছে।

ভারতবর্ষের এতগুলি প্রদেশে পাশবিকতার এত প্রাদুর্ভাব একটা জাতীয় কলঙ্ক।

হিন্দুরা নারীকে দেবী ও শক্তিরূপিনী বলেন। নারীর প্রতি শ্রদ্ধার কার্য্যতঃ পরিচয় নারীরক্ষার প্রবল চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদের দেওয়া উচিত। মুসলমানেরা দাবী করেন, যে, কোরানে নারীকে যত উচ্চ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়া হইয়াছে, আর কোন শাস্ত্রে তেমন দেওয়া হয় নাই; অতএব মুসলমান সমাজে নারীর মর্য্যাদা খুব বেশী। যাঁহারা নিজেদের সমাজে ও পরিবারে নারীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা নারীমাত্রকেই স্বভাবতঃ শ্রদ্ধার চক্ষে নিশ্চয়ই দেখিবেন। অতএব নারীর সম্মান রক্ষা কার্য্যে প্রাধান্যের দ্বারা মুসলমানরা নিজেদের দাবী কার্য্যতঃ প্রমাণ করিবেন, এরূপ আশা ও অনুরোধ অসঙ্গত হইবে না।

—

সর্ব্বসাধারণের আপৎশূন্যতা বিল

একটি পাব্লিক সেফ্‌টি বা সর্ব্বসাধারণের আপৎশূন্যতা উৎপাদক ও সংরক্ষক আইন পাস্ করিবার চেষ্টা ভারত সরকার করিতেছেন। ভারতবর্ষের লোকরা সকলের চেয়ে বেশী বিপন্ন কিসে? মূর্খ লোকেরা বলিবে, দারিদ্র্যে; কিম্বা ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্লেগ, ক্ষয়কাশ, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে। একটু দার্শনিক ও ভাবুক ধরণের মূর্খেরা বলিবে, অজ্ঞতাই ভারতবর্ষের লোকদের সকলের চেয়ে বড় আপদ্। কিন্তু এই সমস্ত বিশ্বাসই ভ্রান্ত। সকলের চেয়ে বড় আপদ চারশ্চক্ষু সরকার বাহাদুর আবিষ্কার করিয়াছেন। বিদেশী কতকগুলা লোক—বিশেষতঃ রুশিয়ার বা রুশীয় টাকাখোর কতকগুলা লোক—ভারতবর্ষে আসিয়া দেশটাকে উৎসন্ন দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সেই লোকগুলাকে ঘাড়ে ধরিয়া পোঁটলা-পুঁটলী সমেত তুরন্ত দেশ হইতে চালান না করিয়া দিলে আর স্বস্তি নাই।

এরকম লোক যে গণ্ডায় গণ্ডায় দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ সরকার পক্ষ হইতে দেওয়া হয় নাই—তাঁহাদের মতে তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। সত্য বলিয়া যদি মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার পর যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহারা কি কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, উত্তর পাওয়া যাইবে—এক নম্বর, তাহারা রেল কলকার্‌খানা প্রভৃতিতে ধর্ম্মঘট ঘটাইতেছে; ধর্ম্মঘটের সময়, বা মালিকরা কলকার্‌খানা বন্ধ করিয়া দিলে সেই সময়, গরীব মজুরদের অনাহারে মৃত্যু নিবারণের জন্য রুশিয়া হল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে টাকা আমদানী করিতেছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। ধর্ম্মঘট দ্বারা যদি শ্রমিকরা কিছু বেশী মজুরী আদায় করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ নিশ্চয়ই বড় বিপন্ন হইবে, দেশটা রসাতলে যাইবে। ধর্ম্ম-ঘটের সময় অনশন নিবারণের জন্য রুশিয়া প্রভৃতি দুশমন শয়তানের দেশ হইতে টাকা আমদানী বন্ধ করিবার একটা উপায় দেবধাম বিলাত হইতে উপবাসী শ্রমিকদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আমদানী; কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধ, যে, তদ্দ্বারা দেশটা আপৎশূন্য হইবে না।

বিদেশী চক্রান্তকারীদের আর একটা দোষ, তাহারা নাকি দেশের লোকের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগাইয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে। স্বাধীনতার মত আপৎসঙ্কুল অবস্থা আর হইতে পারে না। এখন ভারতীয় নরনারী কাহাকেও অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু গৃহশত্রু বিদেশী শত্রু কাহারও ভয়ে ভীত হইতে হয় না, খাওয়াপরা চিকিৎসা লেখাপড়া শিখা কোন বিষয়ের জন্যই মাথা ঘামাইতে হয় না; সরকার মা-বাপ, যা-কিছু দরকার সব যথাসময়ে প্রচুর পরিমাণে করেন। দেশটা স্বাধীন হইয়া গেলে আমাদের প্রত্যেককে নিজের ভাবনা নিজে ভাবিতে হইবে এবং সমস্ত দেশের ভাবনাও ভাবিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা আপদ কি হইতে পারে?

এবম্বিধ নানা কারণে দেশটাকে ও সর্ব্ব-সাধারণকে আপৎশূন্য করিবার নিমিত্ত বিদেশী চক্রান্তকারীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য আইনের প্রয়োজন। প্রয়োজন যে হইয়াছে তাহা মানিতেই হইবে; কারণ প্রভু যাঁহারা তাঁহারা বলিতেছেন খুব বেশী প্রয়োজন হইয়াছে।

অতঃপর মূর্খ লোকেরা আশা করিবে, যে, বিদেশী দুষ্ট লোকগুলার বিচার হইবে, বিচারের লম্বা লম্বা ভীষণ বৃত্তান্ত খবরের কাগজে বাহির হইবে, তাহার পর তাহাদের শাস্তি হইবে। হাস্যকর আশা! আদালতের বিচারে প্রকৃত দোষী নির্ণয়ের ও প্রকৃত দোষীর শাস্তির আশা কোথায়? সব্-ডেপুটী, ডেপুটী, ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা জজ, প্রিভিকৌন্সিলের জজ, সকলেরই ভুল হয়; কিন্তু গুপ্তচরদের রিপোর্ট অনুসারে সরকারী সেক্রেটারীরা যাহাদিগকে দোষী স্থির করেন, তাহারা নিশ্চয়ই অপরাধী। এপর্য্যন্ত চূড়ান্ত প্রকাশ্য বিচারে যত লোকের প্রাণদণ্ড ও অন্যান্য দণ্ড হইয়াছে, তাহাদের সকলে না হউক অনেকেই নিরপরাধ ছিল, বিচারকদের মতিভ্রম বশতঃ তাহারা সাজা পাইয়াছে। কিন্তু তিন নম্বর রেগুলেশ্যন, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি অনুসারে বিনা বিচারে যাহাদের শাস্তি হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই দোষী। তাহার আরও একটা অকাট্য প্রমাণ এই, যে, বিধাতা তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও ক্ষয়কাশাদি রোগে আক্রান্ত করিয়াছেন—বিধাতার ত ভুল হইবার যো নাই।

এই জন্য সর্ব্বসাধারণের আপৎশূন্যতা উৎপাদক ও সংরক্ষক প্রস্তাবিত আইন অনুসারে যাহাদের ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশন হইবে, তাহাদের বিচার হইবে না।

যে-কোন জাহাজে চড়াইয়া ভারতসরকার দুষ্ট লোকগুলাকে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন। জাহাজের কাপ্তেনের ওজর-আপত্তি শোনা হইবে না। কাপ্তেনের পক্ষ হইতে যাহাতে ওজর-আপত্তি না হয়, তজ্জন্য 'বিবেচনা' অবশ্যই করা হইবে। বিদেশী লোকগুলা প্রায়শঃ স্বাধীন দেশেরই লোক হইবে; কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতায় এই অবিচারিত হস্তক্ষেপে তাহাদের দেশের গবর্ন্মেণ্ট যাহাতে কোন উচ্চবাচ্য না করে, তাহার ব্যবস্থাও বোধ হয় আগে হইতে হইয়া গিয়াছে।

প্রস্তাবিত আইনটি যে কত আবশ্যক এবং ইহার বিধানগুলি যে কত ভাল, তাহা আমরা প্রমাণ করিলাম কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেক দুষ্ট ও মূর্খ লোকে মনে মনে সন্দেহ করিবে, যে, সর্ব্বসাধারণের আপৎশূন্যতা উহার উদ্দেশ্য নহে—বিদেশী আমলাতন্ত্রের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব এবং বিদেশী ধনিকদের সর্ব্বোচ্চ ডিভিডেণ্ড আপৎশূন্য করাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইংলণ্ড এখন কন্‌সার্ভেটিভ্ বা স্থিতিশীল স্থাণু দলের দ্বারা শাসিত, এবং এই দল রুশিয়ার জাতীয় এজমালীসম্পত্তিবাদী স্বত্বসাম্যবাদী কম্যুনিষ্টদের বিরোধী। ভারতীয় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র বিদেশী কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে এই আইন করিয়া ইংলণ্ডের শাসকদলকে ও জনসাধারণকে যদি বুঝাইতে পারেন, যে, তাঁহাদেরই হাতে ইংলণ্ডের জমিদারী নিরাপদ আছে ও থাকিবে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান গবর্ন্মেণ্ট ও জনসাধারণ আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা কমাইয়া ও ভারতীয় লোকদিগকে কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়া ব্রিটিশ জমিদারী বিপন্ন করিতে কখনও রাজী হইবে না। অতএব মূর্খলোকদের ধারণা এই, যে, সাইমন কমিশনকে নিভাঁজ শ্বেত করা এবং আলোচিত আইনটির প্রস্তাব করা একই উদ্দেশ্যপ্রসূত।

—

নূতন প্রেস্ আইনের খসড়া

ছাত্রেরা তাহাদের বিতর্কসভায় যে-সব বিষয়ের আলোচনা করে, তাহার মধ্যে আমার এলাহাবাদ বাস-

কালে একটির আলোচনা মধ্যে মধ্যে হইতে দেখিতাম—কলম না তলোয়ার, কাহার শক্তি বেশী। তাহাতে এলাহাবাদের কেল্লার গোরা সৈনিকরাও কখন কখন যোগ দিত। এবিষয়ে সরকার বাহাদুরের ঠিক্ মত কি, জানা যায় নাই। কিন্তু অনুমান হয়, সরকারী মতে কলম খুব শক্তিহীন নহে। কেন না, সাংবাদিকদের কলমকে সায়েস্তা করিবার নিমিত্ত ভারতে ইংরেজের আইন আছে। ইহা অবশ্য আমাদের খুবই সান্ত্বনার বিষয়, যে, আমরা নিতান্ত কেউ-কেটা নই! আমাদের অহঙ্কার আরও বাড়াইয়া দিবার জন্য সরকার বাহাদুর আইনে একটা নূতন ধারা বসাইবেন। যদি ভারতবর্ষের কোন খবরের কাগজ বা কেতাব এমন কিছু লেখে, যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের শত্রুতা জন্মিতে পারে, তাহা হইলে সেরূপ লেখাকে দণ্ডনীয় করা হইবে। অর্থাৎ আমরা ভারতবর্ষের ইংরেজ গবর্মেণ্টের ও ইংরেজদের সম্বন্ধে খুব অপ্রিয় কথাত বিনা দণ্ডে লিখিতে পাইই না, অন্য কোন গবর্মেণ্ট বা জাতি সম্বন্ধেও লিখিতে পাইব না;—ইংরেজরা আমাদিগকে পরনিন্দা অপরাধ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া পরম সাধু বানাইবেন।

রাষ্ট্রীয় হিসাবে ভারতীয় জাতির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকেরা কোন বিদেশী জাতির সহিত মৈত্রী করিবে, না যুদ্ধ করিবে, তাহা স্থির করিবার মালিক তাহারা নহে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিজের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অনুসারে ভারতবর্ষের নামে বিদেশী জাতিদের সহিত সন্ধি করে ও যুদ্ধ করে। বিদেশী স্বাধীন জাতিরা তাহাদের গবর্মেণ্টের মারফৎ অন্য জাতিদের সহিত সন্ধিবিগ্রহ করিয়া থাকে। আমাদের তাহা করিবার অধিকার নাই। ইহা সমুদয় সভ্য স্বাধীন দেশের গবর্মেণ্ট ও লোকদের সুবিদিত। সুতরাং আমরা আমাদের কাগজে কেতাবে কোন দেশের ও জাতির সম্বন্ধে কিছু লিখিব, আর তাহার জন্য ব্রিটিশ ভারতীয় গবর্মেণ্টের সহিত সেই দেশ ও জাতির শত্রুতা বাধিয়া যাইবে, এবং তজ্জন্য তদ্রূপ লেখা বন্ধ করিবার জন্য আইনের প্রয়োজন, এই হাস্যকর কথার গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারি নাই, কোন অনুমানও করিতে পারি নাই। কারণ, স্বাধীন সভ্য দেশসকলের সংবাদপত্রের লেখায় দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মনোমালিন্য, বিদ্বেষ, এমন কি যুদ্ধ, উৎপন্ন হইলেও, তদ্রূপ লেখা কোন সভ্য স্বাধীন দেশের আইনেই শান্তির সময়ে দণ্ডনীয় নহে। সুতরাং ভারতীয়দের লেখায় তদ্রূপ ফল না ফলিলেও কেন তাহা দণ্ডনীয় হইবে?

একটা সন্দেহ কিন্তু মাথায় আসিয়াছে। তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলা আবশ্যক। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি।

মিস্ মেয়োর মাদার ইণ্ডিয়াতে ভারতীয় মানুষ সমাজ ও সভ্যতাকে মসীলিপ্ত করা হইয়াছে। তাহার একটা বা একমাত্র উদ্দেশ্য, ভারতীয়দিগকে স্বাধীনতার অযোগ্য প্রমাণ করা। তজ্জন্য অনেক ভারতীয় সাংবাদিক ও গ্রন্থকার শুধু মিস্ মেয়োর মিথ্যা কথা ভ্রম ও অত্যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া আমেরিকার ইংলণ্ডের ও সাধারণতঃ পাশ্চাত্য সমাজের অনেক পাপ ও কলঙ্কের কথাও প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই, যে, মিস্ মেয়োর কথিত সব দোষ যদি ভারতের থাকেও, তাহা হইলেও তাহার মত ও তদপেক্ষা বেশী দোষ অন্যান্য দেশের থাকা সত্ত্বেও যখন কেহ তাহাদিগকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে না, তখন ভারতবর্ষকেই কেন সে-কারণে বঞ্চিত রাখা হইবে? গায়ের জোর ভিন্ন এরূপ যুক্তির কোন উত্তর নাই। সুতরাং আইন করিয়া বিদেশী পাশ্চাত্য দেশের দোষ উদ্‌ঘাটন বন্ধ করা দরকার হইতে পারে। মিস্ মেয়োর নিন্দার জবাবে অন্য যে-যে দেশের নিন্দা হইতেছে, তাহাদিগকে তদ্রূপ নিন্দা হইতে রক্ষা করিয়া ইংরেজ তাহাদিগকে সন্তুষ্ট ও বন্ধুভাবাপন্ন করিতে পারিবেন।

আমাদের এই একটা অনুমান।

আর একটা অনুমান বলি।

আমরা পরাধীন, পরাধীনকতার দুঃখ-অপমান আমাদের অস্থিমজ্জায় বিদ্ধ হইয়া আছে। ইহা হইতে উদ্ভূত সকল রকমের অকল্যাণের সহিত আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এইজন্য, ভারতবর্ষের বাহিরে অন্য যত পরাধীন জাতি আছে, তাহাদের স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টার সহিত আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য। এইরূপ সব বা কোন প্রচেষ্টা সফল হইলে আমরা আনন্দিত,

উৎসাহিত, আশান্বিত হইব। তাহাদের বর্ণনা ও তাহাদের সহিত সহানুভূতি ভারতীয় নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার তাহাদের প্রভু প্রবল জাতিরা তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য যাহা করেন; এবং অনেক সময় স্বাধীনতাকামী পরাধীন লোকদের উপর যেরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার হয় (যেমন জাভায় ডচ্‌দের দ্বারা, কোরিয়ায় জাপানীদের দ্বারা হইয়াছে), তাহার নিন্দাও ভারতবর্ষীয় কাগজে বাহির হয়। এরূপ লেখা ইংরেজ ও অন্য প্রবল প্রভু জাতিদের পক্ষে প্রীতিকর নহে। সব সাম্রাজ্যোপাসক জাতির ভিতরে ভিতরে এক বিষয়ে মনের মিল আছে—তাহারা সবাই অধীনকে অধীন রাখিতে চায়। এই জন্য ইরাকের আরব, মিশরের মিশরী, ফিলিপাইন্সের ফিলিপিনো, জাভার জাভানীজ্‌, আনাম কাম্বোডিয়ার আনামী কাম্বোজ, প্রভৃতি কাহারও দুঃখের কথা আমরা বলিলে তাহা কোন প্রভু জাতির প্রীতি উৎপাদন করে না।

আমেরিকা যে ভারতীয়দিগকে আমেরিকার পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আমরা কেহ কেহ লিখিতে গিয়া আমেরিকার মানবভ্রাতৃত্বে ও স্বাধীনতাপ্রীতিতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ভণ্ড বলি। ইহা আমেরিকার সাম্রাজ্যোপাসকদের ভাল লাগে না। ভারতীয়েরা অবাধে কোন স্বাধীন দেশের পৌর অধিকার পায়, ইংরেজ তাহা চায় না। সুতরাং ইংরেজ আমেরিকায় ভারতীয়দের লাঞ্ছনা পছন্দই করিয়াছে—সম্ভবতঃ এই লাঞ্ছনা আংশিকভাবে ইংরেজের প্ররোচনাতে হইয়া থাকিবে। অতএব ইংলণ্ডের মহাজন ও প্রবল বন্ধুপ্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকাকে খুশি রাখা দরকার। তাহাকে খুশি রাখিতে হইলে ভারতীয়দের দ্বারা আমেরিকার বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করা আবশ্যক হইতে পারে।

চীনের মত দেশের কথা ভাবিয়া দেখিলেও কিছু আলোক পাওয়া যাইতে পারে। চীন নিজের চেষ্টায় সুশৃঙ্খল ও স্বাধীন হইয়া উঠিলে উহা আর বিদেশীর ধন-আহরণের ক্ষেত্র থাকিবে না। এই জন্য সকল বিদেশী সাম্রাজ্যোপাসক বণিক্‌ জাতি উহার সুশৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা লাভে নানা প্রকারে বাধা দিয়া আসিতেছে। এই সব জাতির কোন একটার কান টানিলে অন্য সকলের মাথা আসে। সুতরাং প্রাচ্য বা প্রতীচ্য এইরূপ কোন জাতির ভারতীয় সাংবাদিকদের হাতে কানমলা খাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

অন্যে পরে কা কথা, বর্ত্তমানে রুশিয়ার প্রবল দল যে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কম্যুনিষ্ট দলের লোকদিগকে বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত, কারারুদ্ধ বা অন্য প্রকারে দণ্ডিত করিতেছে, তাহার নিন্দাও ভারতের ইংরেজ আমলাতন্ত্রের পক্ষে অপ্রীতিকর হইতে পারে; কারণ রুশিয়া ও ভারতবর্ষ উভয়ত্র এই বিনা বিচারে শাস্তি দিবার রীতি আছে।

আর একটা অনুমানের কথা বলিয়া এই নিবন্ধিকা শেষ করি। লীগ্‌ অব্‌ নেশুন্স এবং যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য কেলগ চুক্তি সম্বন্ধে লিখিতে গেলে, তাহাতে যে কেবল মাত্র প্রবল জাতিদের সুবিধা, এবং দুর্ব্বল পরাধীন জাতিদের কোন সুবিধা নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ বিদেশী অনেক জাতির সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় কথা বলা দরকার হইতে পারে। তাহা ইংরেজদেরও প্রিয় নহে; সুতরাং তৎসমুদয়ের প্রকাশ নিবারিত হইলে ক্ষতি কি?

অন্ধকারে আর অধিক ঢিল ছুঁড়িব না।

বঙ্গে শিক্ষার অবস্থা ও অগ্রগতি

সাইমন কমিশনের সাহায্য করিবার জন্য একটি শিক্ষা-কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষাকমিটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যে-সব প্রশ্ন পাঠাইতেছেন, তাহার মধ্যে একটি এই, যে, গত দশ বৎসরে শিক্ষার প্রগতি সন্তোষজনক হইয়াছে কি না। প্রত্যেক প্রদেশ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করা হইতেছে। প্রশ্নটির মধ্যে "গত দশ বৎসরে" শব্দগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহার আগে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কমিশনের ও কমিটির অনুসন্ধানের বিষয় নহে। প্রশ্নটাতে যেন ধরিয়াই লওয়া হইয়াছে, যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব আরম্ভ হইবার তারিখ হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত শিক্ষার প্রগতি সন্তোষজনক হইয়া আসিতেছিল। তাহার পর শিক্ষা প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত হয়। তাঁহারা, এবং পরোক্ষভাবে দেশের অন্য সব লোক আমরা, এরূপ ভার পাইবার উপযুক্ত কি না,

এবং দেশে শিক্ষার বিস্তার যেরূপ হইয়াছে তাহাতে দেশের লোক রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার যোগ্য কিনা, ইহা স্থির করিবার জন্য বোধ করি শিক্ষা-কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের কোথাও গত দশ বৎসরে এবং তাহার পূর্ব্বে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি সন্তোষজনক হয় নাই। ইংরেজ আমলাতন্ত্র এই অবস্থার জন্য দোষটা সব আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া থাকেন। গত দশ বৎসরের জন্য ত আরও বেশী করিয়া চাপাইবেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহার জন্য গবর্ন্মেণ্টেই বেশী দোষী যদিও দেশের লোকেরাও দোষ-শূন্য নহে।

১৯২৫-২৬ সালে ভারতে শিক্ষার অবস্থা বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, ঐ বৎসরে সর্ব্বত্র শিক্ষালয় ও ছাত্রছাত্রী বাড়িয়াছে; কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী বাড়িয়াছে মান্দ্রাজে এবং তাহার নীচে পঞ্জাবে। বঙ্গে যে বেশী বাড়ে নাই, তাহার কারণ, বাংলাদেশ হইতে ব্রিটিশ সরকার টাকা খুব আদায় করেন, কিন্তু এখানে খরচ করিতে দেন খুব কম। একে ত বাংলা গবর্ন্মেণ্ট মান্দ্রাজ বোম্বাই আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাবের চেয়ে কম টাকা পায়, তাহার উপর প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা যত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে, তাহাও অন্য অনেক প্রদেশের চেয়ে কম। বঙ্গের লাটের তদ্বিষয়ক তালিকা এই :—

বোম্বাই	শতকরা	৬
বিহার-উৎকল	”	৫.১
পঞ্জাব	”	৩.৬
বাংলা	”	১.৬

১৯২৫-২৬ সালের ভারতবর্ষীয় সরকারী শিক্ষা রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, আগ্রা অযোধ্যায় শিক্ষার জন্য মোট ব্যয়ের শতকরা ৫৭ অংশ গবর্ন্মেণ্ট দেন, বঙ্গে কিন্তু দেন ৩৮.১ অংশ। মধ্যভারতে ছাত্রদত্ত বেতন হইতে মোট ব্যয়ের শতকরা ১১.২ অংশ নির্ব্বাহিত হয় বঙ্গে হয় ৪১.২ অংশ। ছাত্রদত্ত বেতন হইতে মোট, শিক্ষাব্যয়ের এত বেশী অংশ আর কোনও প্রদেশ হইতে নির্ব্বাহিত হয় না। গবর্ন্মেণ্ট ছাত্র প্রতি সকলের চেয়ে বেশী খরচ করেন বালুচীস্থানে (৪৫॥৶); বড় প্রদেশগুলির মধ্যে বেশী করেন বোম্বাইয়ে (১৮।১০) এবং সকলের চেয়ে কম করেন বাংলায় (৬৶৫) (ও বিহার-উৎকলে (২৸৮)।

ভারতে স্বরাজ স্থাপিত হইবার পরও বাংলা দেশ তাহার লোকসংখ্যার অনুপাতে সরকারী রাজস্বের অংশ পাইবে কিনা, সন্দেহ। বাঙালীরা শিক্ষায় যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহার প্রশংসার অধিক অংশ তাহাদের নিজের প্রাপ্য। কিন্তু বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে তাহাদিগকে শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ করিয়া প্রাথমিক-শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতিতে, খুব বেশী মন দিতে হইবে। সরকারী টাকার উপর নির্ভর তাহারা কোনকালেই করিতে পারে নাই; স্বরাজ্য লাভের পরও সম্ভবতঃ পারিবে না, কারণ, বাংলাদেশের প্রতি অন্য সব প্রদেশের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার উপর বঙ্গের ন্যায্য রাজস্ব পাওয়া নির্ভর করিবে; কিন্তু এই ন্যায়পরায়ণতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারি না।

নারীর কল্যাণার্থ আইন

বঙ্গের যুবকেরা ও মহিলারা বাল্যবিবাহ ও বাল্যমাতৃত্ব নিবারণ উদ্দেশ্যে আইনের সমর্থন করিতেছেন, ইহা সুলক্ষণ।

উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ সম্পত্তিতে নারীর ন্যায্য অংশ লাভ, স্মৃতিতে উল্লিখিত নানা কারণে নারীর পুনরায় বিবাহের অধিকার লাভ, সম্মতির বয়স বৃদ্ধি, প্রভৃতি নারী-মঙ্গলজনক নানা আইন প্রণীত হইলে দেশের কল্যাণ হইবে।

পূজার ছুটি

আগামী ৫ই কার্ত্তিক (২২শে অক্টোবর) হইতে ১৮ই কার্ত্তিক (৪ঠা নবেম্বর) অবধি প্রবাসী কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। কার্ত্তিকের প্রবাসী আগামী ২৫শে আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। সেখানিও পূজার সংখ্যা হইবে। কার্ত্তিকের প্রবাসীতেও বহু রঙিন ও একবর্ণ চিত্র, সারবান প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি থাকিবে। বিজ্ঞাপন-দাতাগণ ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে তাঁহাদের কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ছুটির মধ্যে যে-সকল চিঠি-পত্র, প্রবন্ধাদি আসিবে ছুটির পর সেগুলির ব্যবস্থা হইবে।

---

৯১ নং আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেসে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।